

রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী।

| গদ্যাংশ |

গল্প।

সংসার চিত্র।

—০:০:০—

নিশীথে।

"ডাক্তার! ডাক্তার!"

জ্বালাতন করিল! এই অর্দ্ধেক রাত্রে—

চোখ মেলিয়া দেখি আমাদের জমিদার দক্ষিণাচরণ বাবু। ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পিঠভাঙ্গা চৌকিটা টানিয়া আনিয়া তাঁহাকে বসিতে দিলাম এবং উদ্বিগ্নভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। ঘড়িতে দেখি তখন রাত্রি আড়াইটা।

দক্ষিণাচরণ বাবু বিবর্ণমুখে বিস্ফারিত নেত্রে কহিলেন, আজ রাত্রে আবার সেইরূপ উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে,—তোমার ঔষধ কোন কাজে লাগিল না।

আমি কিঞ্চিৎ সসঙ্কোচে বলিলাম, আপনি বোধ করি মদের মাত্রা আবার বাড়াইয়াছেন।

দক্ষিণা বাবু অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন,—ওটা তোমার ভারি ভ্রম। মদ নহে; আদ্যোপান্ত বিবরণ না শুনিলে তুমি আসল কারণটা অনুমান করিতে পারিবে না।

কুলুঙ্গির মধ্যে ক্ষুদ্র টিনের ডিবায় ম্লানভাবে কেরোসিন্ জ্বলিতেছিল, আমি তাহা উস্কাইয়া দিলাম; একটুখানি আলো জাগিয়া উঠিল এবং অনেকখানি ধোঁয়া বাহির হইতে লাগিল। কোঁচাখানা গায়ের উপর টানিয়া একখানা খবরের কাগজ-পাতা প্যাক্ বাক্সের উপর বসিলাম। দক্ষিণা বাবু বলিতে লাগিলেন।—

আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর মত এমন গৃহিণী অতি দুর্লভ ছিল। কিন্তু আমার তখন বয়স বেশী ছিল না; সহজেই রস

ছিল, তাহার উপর আবার কাব্য-শাস্ত্রটা ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলাম, তাই অবিমিশ্র গৃহিণীপনায় মন উঠিত না। কালিদাসের সেই শ্লোকটা প্রায় মনে উদয় হইত,—

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।

কিন্তু আমর গৃহিণীর কাছে ললিত কলা-বিধির কোন উপদেশ খাটিত না এবং সখী-ভাবে প্রণয়সম্ভাষণ করিতে গেলে তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। গঙ্গার স্রোতে যেমন ইন্দ্রের ঐরাবত নাকাল হইয়াছিল, তেমনি তাঁহার হাসির মুখে বড় বড় কাব্যের টুকরা এবং ভাল ভাল আদরের সম্ভাষণ মুহূর্ত্তের মধ্যে অপদস্থ হইয়া ভাসিয়া যাইত। তাঁহার হাসিবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল।

তাহার পর, আজ বছর চারেক হইল আমাকে সাংঘাতিক রোগে ধরিল। ওষ্ঠব্রণ হইয়া জ্বরবিকার হইয়া মরিবার দাখিল হই-লাম। বাঁচিবার আশা ছিল না। একদিন এমন হইল যে, ডাক্তারে জবাব দিয়া গেল। এমন সময় আমার এক আত্মীয় কোথা হইতে এক ব্রহ্মচারী আনিয়া উপস্থিত করিল;—সে গব্যঘৃতের সহিত একটা শিকড় বাঁটিয়া আমাকে খাওয়াইয়া দিল। ঔষধের গুণেই হউক বা অদৃষ্টক্রমেই হউক সে যাত্রা বাঁচিয়া গেলাম।

রোগের সময় আমার স্ত্রী অহর্নিশি এক মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্রাম করেন নাই। সেই ক'টা দিন একটি অবলা স্ত্রীলোক, মানুষের সামান্য শক্তি লইয়া, প্রাণপণ ব্যাকুলতার সহিত, দ্বারে সমাগত যমদূতগুলার সঙ্গে অন-বরত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত প্রেম, সমস্ত হৃদয়, সমস্ত যত্ন দিয়া আমার এই অযোগ্য প্রাণটাকে যেন বক্ষের শিশুর মত দুই হস্তে ঝাপিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন। আহার ছিল না, নিদ্রা ছিল না, জগতের আর কোন কিছুর প্রতিই দৃষ্টি ছিল না।

যম তখন পরাহত ব্যাঘ্রের ন্যায় আমাকে তাঁহার কবল হইতে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু যাইবার সময় আমার স্ত্রীকে একটা প্রবল থাবা মারিয়া গেলেন।

আমার স্ত্রী তখন গর্ভবতী ছিলেন, অনতিকাল পরে এক মৃত সন্তান প্রসব করি-লেন। তাহার পর হইতেই তাঁহার নানা-প্রকার জটিল ব্যামোর সূত্রপাত হইল। তখন আমি তাঁহার সেবা আরম্ভ করিয়া দিলাম। তাহাতে তিনি বিব্রত হইয়া উঠিলেন। বলিতে লাগিলেন—আঃ, কর কি! লোকে বলিবে কি! অমন করিয়া দিন রাত্রি তুমি আমার ঘরে যাতায়াত করিয়ো না!

যেন নিজে পাখা খাইতেছি এইরূপ ভাণ করিয়া রাত্রে যদি তাঁহাকে তাঁহার জ্বরের সময় পাখা করিতে যাইতাম'ত ভারি একটা কাড়াকাড়ি ব্যাপার পড়িয়া যাইত; কোন দিন যদি তাঁহার শুশ্রূষা উপলক্ষে আমার আহারের নিয়মিত সময় দশ মিনিট উত্তীর্ণ হইয়া যাইত তবে সেও নানাপ্রকার অনুনয় অনুরোধ অনুযোগের কারণ হইয়া দাঁড়াইত। স্বল্পমাত্র সেবা করিতে গেলে হিতে বিপরীত হইয়া উঠিত। তিনি বলিতেন, পুরুষ মানু-ষের অতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়।

আমাদের সেই বরানগরের বাড়িটি বোধ করি তুমি দেখিয়াছ। বাড়ীর সামনেই বাগান, এবং বাগানের সম্মুখেই গঙ্গা বহি-তেছে। আমাদের শোবার ঘরের নীচেই দক্ষিণের দিকে খানিকটা জমি মেহেদির বেড়া দিয়া ঘিরিয়া আমার স্ত্রী নিজের মনের

মত একটুক্‌রা বাগান বানাইয়াছিলেন। সমস্ত বাগানটির মধ্যে সেই খণ্ডটিই অত্যন্ত সাদাসিধা এবং নিতান্ত দিশী। অর্থাৎ তাহার মধ্যে গন্ধের অপেক্ষা বর্ণের বাহার, ফুলের অপেক্ষা পাতার বৈচিত্র্য ছিল না—এবং টবের মধ্যে অকিঞ্চিৎকর উদ্ভিজ্জের পার্শ্বে কাঠি অবলম্বন করিয়া কাগজে নির্ম্মিত লাটিন নামের জয়ধ্বজা উড়িত না। বেল, জুঁই, গোলাপ, গন্ধরাজ, করবী এবং রজনীগন্ধারই প্রাদুর্ভাব কিছু বেশী। প্রকাণ্ড একটা বকুল গাছের তলা সাদা মার্ব্বল পাথর দিয়া বাঁধানো ছিল। সুস্থ অবস্থায় তিনি নিজে দাঁড়াইয়া দুইবেলা তাহা ধুইয়া সাফ করাইয়া রাখিতেন। গ্রীষ্মকালে কাজের অবকাশে সন্ধ্যার সময় সেই তাঁহার বসিবার স্থান ছিল। সেখান হইতে গঙ্গা দেখা যাইত কিন্তু গঙ্গা হইতে কুঠির প্লান্সীর বাবুরা তাঁহাকে দেখিতে পাইত না।

অনেকদিন শয্যাগত থাকিয়া একদিন চৈত্রের শুক্লপক্ষ সন্ধ্যায় তিনি কহিলেন, ঘরে বদ্ধ থাকিয়া আমার প্রাণ কেমন করিতেছে? আজ একবার আমার সেই বাগানে গিয়া বসিব।

আমি তাঁহাকে বহু যত্নে ধরিয়া ধীরে ধীরে সেই বকুলতলের প্রস্তর-বেদিকায় লইয়া গিয়া শয়ন করাইয়া দিলাম। আমারই জানুর উপরে তাঁহার মাথাটি তুলিয়া রাখিতে পারিতাম কিন্তু জানি সেটাকে তিনি অদ্ভুত আচরণ বলিয়া গণ্য করিবেন। তাই একটি বালিশ আনিয়া তাঁহার মাথার তলায় রাখিলাম।

দুটি একটি করিয়া প্রস্ফুট বকুল ফুল ঝরিতে লাগিল এবং শাখান্তরাল হইতে ছায়াঙ্কিত-জ্যোৎস্না তাঁহার শীর্ণ মুখের উপর আসিয়া পড়িল। চারিদিক্ শান্ত নিস্তব্ধ; সেই ঘনগন্ধপূর্ণ ছায়ান্ধকারে একপার্শ্বে নীরবে বসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আমার চোখে জল আসিল।

আমি ধীরে ধীরে কাছের গোড়ায় আসিয়া দুই হস্তে তাঁহার একটি উত্তপ্ত শীর্ণ হাত তুলিয়া লইলাম। তিনি তাহাতে কোন আপত্তি করিলেন না। কিছুক্ষণ এইরূপ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া আমার হৃদয় কেমন উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, আমি বলিয়া উঠিলাম—তোমার ভালবাসা আমি কোন কালে ভুলিব না!

তখনি বুঝিলাম, কথাটা বলিবার কোন আবশ্যক ছিল না। আমার স্ত্রী হাসিয়া উঠিলেন। সে হাসিতে লজ্জা ছিল, সুখ ছিল এবং কিঞ্চিৎ অবিশ্বাস ছিল—এবং উহার মধ্যে অনেকটা পরিমাণে পরিহাসের তীব্রতাও ছিল। প্রতিবাদস্বরূপে একটি কথামাত্র না বলিয়া কেবল তাঁহার সেই হাসির দ্বারা জানাইলেন, কোন কালে ভুলিবে না, ইহা কখনও সম্ভব নহে, এবং আমি তাহা প্রত্যাশাও করি না।

ঐ সুমিষ্ট সুতীক্ষ্ণ হাসির ভয়েই আমি কখন আমার স্ত্রীর সঙ্গে রীতিমত প্রেমালাপ করিতে সাহস করি নাই। অসাক্ষাতে যে সকল কথা মনে উদয় হইত, তাঁহার সম্মুখে গেলেই সে গুলাকে নিতান্ত বাজে কথা বলিয়া বোধ হইত। ছাপার অক্ষরে যে সব কথা পড়িলে দুই চক্ষু বাহিয়া দর দর ধারায় জল পড়িতে থাকে সেইগুলা মুখে বলিতে গেলে কেন যে হাস্যের উদ্রেক করে এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিলাম না।

বাদ প্রতিবাদ কথায় চলে, কিন্তু হাসির উপরে তর্ক চলে না, কাজেই চুপ করিয়া

যাইতে হইল। জ্যোৎস্না উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল, একটা কোকিল ক্রমাগতই কুহু কুহু ডাকিয়া অস্থির হইয়া গেল। আমি বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম এমন জ্যোৎস্না রাত্রেও কি পিকবধূ বধির হইয়া আছে?

বহু চিকিৎসায় আমার স্ত্রীর রোগ উপশমের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। ডাক্তার বলিল, একবার বায়ু-পরিবর্ত্তন করিয়া দেখিলে ভাল হয়। আমি স্ত্রীকে লইয়া এলাহাবাদে গেলাম।

এইখানে দক্ষিণাবাবু হঠাৎ থমকিয়া চুপ করিলেন। সন্দিগ্ধভাবে আমার মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর দুই হাতের মধ্যে মাথা রাখিয়া ভাবিতে লাগিলেন। আমিও চুপ করিয়া রহিলাম। কুলুঙ্গিতে কেরোসিন্ মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল এবং নিস্তব্ধ ঘরে মশার ভন্‌ভন্ শব্দ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। হঠাৎ মৌন-ভঙ্গ করিয়া দক্ষিণাবাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন।

সেখানে হারাণ ডাক্তার আমার স্ত্রীকে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে অনেক কাল একভাবে কাটাইয়া ডাক্তারও বলিলেন, আমিও বুঝিলাম এবং আমার স্ত্রীও বুঝিলেন যে, তাঁহার ব্যামো সারিবার নহে। তাঁহাকে চিররুগ্ন হইয়াই কাটাইতে হইবে।

তখন, একদিন আমার স্ত্রী আমাকে বলিলেন,—যখন ব্যামোও সারিবে না এবং শীঘ্র আমার মরিবার আশাও নাই, তখন আর কতদিন এই জীবন্মৃতকে লইয়া কাটাইবে? তুমি আর একটা বিবাহ কর।

এটা যেন কেবল একটা সুযুক্তি এবং সদ্বিবেচনার কথা—ইহার মধ্যে যে, ভারি একটা মহত্ত্ব বীরত্ব বা অসামান্য কিছু আছে, এমন ভাব তাঁহার লেশমাত্র ছিল না।

এইবার আমার হাসিবার পালা ছিল। কিন্তু আমার কি তেমন করিয়া হাসিবার ক্ষমতা আছে? আমি উপন্যাসের প্রধান নায়কের ন্যায় গম্ভীর সমুচ্চভাবে বলিতে লাগিলাম—যতদিন এই দেহে জীবন আছে—

তিনি বাধা দিয়া কহিলেন—নাও! নাও! আর বলিতে হইবে না! তোমার কথা শুনিয়া আমি আর বাঁচি না!

আমি পরাজয় স্বীকার না করিয়া বলিলাম—এ জীবনে আর কাহাকেও ভালবাসিতে পারিব না!

শুনিয়া আমার স্ত্রী ভারি হাসিয়া উঠিলেন। তখন আমাকে ক্ষান্ত হইতে হইল।

জানি না, তখন নিজের কাছেও কখনও স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছি কি না, কিন্তু এখন বুঝিতে পারিতেছি এই আরোগ্য-আশাহীন সেবাকার্য্যে আমি মনে মনে পরিশ্রান্ত হইয়া গিয়াছিলাম। এ কার্য্যে যে ভঙ্গ দিব, এমন কল্পনাও আমার মনে ছিল না; অথচ চিরজীবন এই চিররুগ্নকে লইয়া যাপন করিতে হইবে এ কল্পনাও আমার নিকট পীড়াজনক হইয়াছিল। হায়! প্রথম যৌবনকালে যখন সম্মুখে তাকাইয়াছিলাম তখন প্রেমের কুহকে, সুখের আশ্বাসে, সৌন্দর্য্যের মরীচিকায় সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবন প্রফুল্ল দেখাইতেছিল। আজ হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবলই আশাহীন সুদীর্ঘ সতৃষ্ণ মরুভূমি।

আমার সেবার মধ্যে সেই আন্তরিক শ্রান্তি নিশ্চয় তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন! তখন জানিতাম না কিন্তু এখন সন্দেহমাত্র নাই যে, তিনি আমাকে যুক্ত-অক্ষরহীন

প্রথমভাগ শিশুশিক্ষার মত অতি সহজে বুঝিতেন। সেই জন্য, যখন উপন্যাসের নায়ক সাজিয়া গম্ভীরভাবে তাঁহার নিকট কবিত্ব ফলাইতে যাইতাম তিনি এমন সুগভীর স্নেহ অথচ অনিবার্য্য কৌতুকের সহিত হাসিয়া উঠিতেন। আমার নিজের অগোচর অন্তরের কথাও অন্তর্যামীর ন্যায় তিনি সমস্তই জানিতেন, এ কথা মনে করিলে আজও লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে।

হারাণ ডাক্তার আমাদের স্বজাতীয়। তাঁহার বাড়িতে আমার প্রায়ই নিমন্ত্রণ থাকিত। কিছুদিন যাতায়াতের পর ডাক্তার তাঁহার মেয়েটার সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। মেয়েটি অবিবাহিত—তাহার বয়স পনরো হইবে। ডাক্তার বলেন তিনি মনের মত পাত্র পান নাই বলিয়া বিবাহ দেন নাই। কিন্তু বাহিরের লোকের কাছে গুজব শুনিতাম, মেয়েটির কুলের দোষ ছিল।

কিন্তু আর কোন দোষ ছিল না। যেমন সুরূপ তেমনি সুশিক্ষা। সেই জন্য মাঝে মাঝে এক এক দিন তাঁহার সহিত নানা কথার আলোচনা করিতে করিতে আমার বাড়ি ফিরিতে রাত হইত, আমার স্ত্রীকে ঔষধ খাওয়াইবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইত। তিনি জানিতেন, আমি হারাণ ডাক্তারের বাড়ি গিয়াছি, কিন্তু বিলম্বের কারণ একদিনও আমাকে জিজ্ঞাসাও করেন নাই।

মরুভূমির মধ্যে আর একবার মরীচিকা দেখিতে লাগিলাম। তৃষ্ণা যখন বুক পর্য্যন্ত, তখন চোখের সাম্‌নে কূলপরিপূর্ণ স্বচ্ছ জল ছলছল চলচল করিতে লাগিল। তখন মনকে প্রাণপণে টানিয়া আর ফিরাইতে পারিলাম না।

রোগীর ঘর আমার কাছে দ্বিগুণ নিরানন্দ হইয়া উঠিল। এখন প্রায়ই শুশ্রূষা করিবার এবং ঔষধ খাওয়াইবার নিয়ম ভঙ্গ হইতে লাগিল।

হারাণ ডাক্তার আমাকে প্রায় মাঝে মাঝে বলিতেন, যাহাদের রোগ আরোগ্য হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, তাহাদের পক্ষে মৃত্যুই ভাল। কারণ, বাঁচিয়া তাহাদের নিজেরও সুখ নাই, অন্যেরও অসুখ। কথাটা সাধারণভাবে বলিতে দোষ নাই, তথাপি আমার স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া এমন প্রসঙ্গ উত্থাপন করা তাঁহার উচিত হয় নাই। কিন্তু মানুষের জীবনমৃত্যু সম্বন্ধে ডাক্তারদের মন এমন অসাড় যে, তাহারা ঠিক আমাদের মনের অবস্থা বুঝিতে পারে না।

হঠাৎ একদিন পাশের ঘর হইতে শুনিতে পাইলাম, আমার স্ত্রী হারাণ বাবুকে বলিতেছেন,—ডাক্তার, কতকগুলা মিথ্যা ওষুধ গিলাইয়া ডাক্তারখানার দেনা বাড়াইতেছ কেন? আমার প্রাণটাই যখন একটা ব্যামো, তখন এমন একটা ওষুধ দাও যাহাতে শীঘ্র এই প্রাণটা যায়।

ডাক্তার বলিলেন, ছি, এমন কথা বলিবেন না।

কথাটা শুনিয়া হঠাৎ আমার বক্ষে বড় আঘাত লাগিল।

ডাক্তার চলিয়া গেলে আমার স্ত্রীর ঘরে গিয়া তাঁহার শয্যা-প্রান্তে বসিলাম, তাঁহার কপালে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলাম। তিনি কহিলেন, এ ঘর বড় গরম—তুমি বাহিরে যাও। তোমার বেড়াইতে যাইবার সময় হইয়াছে। খানিকটা না বেড়াইয়া আসিলে আবার রাত্রে তোমার ক্ষুধা হইবে না।

বেড়াইতে যাওয়ার অর্থ ডাক্তারের বাড়ি যাওয়া। আমিই তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলাম, ক্ষুধাসঞ্চারের পক্ষে খানিকটা বেড়াইয়া আসা বিশেষ আবশ্যক। এখন নিশ্চয় বলিতে পারি, তিনি প্রতিদিনই আমার এই ছলনাটুকু বুঝিতেন। আমি নির্ব্বোধ, মনে করিতাম তিনি নির্ব্বোধ।

এই বলিয়া দক্ষিণা বাবু অনেকক্ষণ করতলে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। অবশেষে কহিলেন, আমাকে একগ্লাস জল আনিয়া দাও। জল খাইয়া বলিতে লাগিলেন ;—

একদিন ডাক্তার বাবুর কন্যা মনোরমা আমার স্ত্রীকে দেখিতে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। জানি না, কি কারণে তাঁহার সে প্রস্তাব আমার ভাল লাগিল না। কিন্তু প্রতিবাদ করিবার কোন হেতু ছিল না। তিনি একদিন সন্ধ্যা বেলায় আমাদের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সে দিন আমার স্ত্রীর বেদনা অন্যদিনের অপেক্ষা কিছু বাড়িয়া উঠিয়াছিল। যেদিন তাঁহার ব্যথা বাড়ে সে দিন তিনি অত্যন্ত স্থির নিস্তব্ধ হইয়া থাকেন ; কেবল মাঝে মাঝে মুষ্টিবদ্ধ হইতে থাকে এবং মুখ নীল হইয়া আসে তাহাতেই তাঁহার যন্ত্রণা বুঝা যায়। ঘরে কোন সাড়া ছিল না, আমি শয্যাপ্রান্তে চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম ;—সে দিন আমাকে বেড়াইতে যাইতে অনুরোধ করেন, এমন সামর্থ্য তাঁহার ছিল না, কিংবা হয় ত বড় কষ্টের সময় আমি কাছে থাকি এমন ইচ্ছা তাঁহার মনে মনে ছিল। চোখে লাগিবে বলিয়া কেরোসিনের আলোটা দ্বারের পার্শ্বে ছিল। ঘর অন্ধকার এবং নিস্তব্ধ। কেবল এক একবার যন্ত্রণার কিঞ্চিৎ উপশমে আমার স্ত্রীর গভীর দীর্ঘনিশ্বাস শুনা যাইতেছিল।

এমন সময়ে মনোরমা ঘরের প্রবেশদ্বারে দাঁড়াইলেন। বিপরীত দিক্ হইতে কেরোসিনের আলো আসিয়া তাঁহার মুখের উপর পড়িল। আলো-আঁধারে লাগিয়া তিনি কিছুক্ষণ ঘরে কিছুই দেখিতে না পাইয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

আমার স্ত্রী চমকিয়া আমার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ও কে ?—তাঁহার সেই দুর্ব্বল অবস্থায় হঠাৎ অচেনা লোক দেখিয়া ভয় পাইয়া আমাকে দুই তিন বার অস্ফুটস্বরে প্রশ্ন করিলেন, ও কে ? ও কে গো ?

আমার কেমন দুর্ব্বুদ্ধি হইল আমি প্রথমেই বলিয়া ফেলিলাম, আমি চিনি না ! বলিবামাত্রই কে যেন আমাকে কশাঘাত করিল। পরের মুহূর্ত্তেই বলিলাম—ওঃ, আমাদের ডাক্তার বাবুর কন্যা।

স্ত্রী একবার আমার মুখের দিকে চাহিলেন ;—আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে পারিলাম না। পরক্ষণেই তিনি ক্ষীণস্বরে অভ্যাগতকে বলিলেন, আপনি আসুন।—আমাকে বলিলেন, আলোটা ধর !

মনোরমা ঘরে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার সহিত রোগিণীর অল্পস্বল্প আলাপ চলিতে লাগিল। এমন সময় ডাক্তারবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তিনি তাঁহার ডাক্তারখানা হইতে দুই শিশি ওষুধ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সেই দুটি শিশি বাহির করিয়া আমার স্ত্রীকে বলিলেন—এই নীল শিশিটা মালিশ করিবার,

আর এইটি খাইবার। দেখিবেন, দুইটাতে মিলাইবেন না; এ ওষুধটা ভারি বিষ।

আমাকেও একবার সতর্ক করিয়া দিয়া ঔষধ দুটি শয্যাপার্শ্ববর্ত্তী টেবিলে রাখিয়া দিলেন। বিদায় লইবার সময় ডাক্তার তাঁহার কন্যাকে ডাকিলেন।

মনোরমা কহিলেন—বাবা, আমি থাকি না কেন। সঙ্গে স্ত্রীলোক কেহ নাই, ইঁহাকে সেবা করিবে কে?

আমার স্ত্রী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, না, না, আপনি কষ্ট করিবেন না। পুরাণো ঝি আছে সে আমাকে মায়ের মত যত্ন করে।

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন—উনি মা-লক্ষ্মী, চিরকাল পরের সেবা করিয় আসিয়াছেন, অন্যের সেবা সহিতে পারেন না।

কন্যাকে লইয়া ডাক্তার গমনের উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় আমার স্ত্রী বলিলেন, ডাক্তার বাবু, ইনি বদ্ধঘরে অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন, ইঁহাকে একবার বাহিরে বেড়াইয়া লইয়া আসিতে পারেন?

ডাক্তার বাবু আমাকে কহিলেন, আসুন না, আপনাকে নদীর ধার হইয়া একবার বেড়াইয়া আনি।—

আমি ঈষৎ আপত্তি দেখাইয়া অনতিবিলম্বে সম্মত হইলাম। ডাক্তার বাবু যাইবার সময় দুই শিশি ঔষধ সম্বন্ধে আবার আমার স্ত্রীকে সতর্ক করিয়া দিলেন।

সে দিন ডাক্তারের বাড়িতেই আহার করিলাম। ফিরিয়া আসিতে রাত হইল। আসিয়া দেখি, আমার স্ত্রী ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। অনুতাপে বিদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম তোমার কি ব্যথা বাড়িয়াছে?—

তিনি উত্তর করিতে পারিলেন না, নীরবে আমার মুখের দিকে চাহিলেন। তখন তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়াছে।

আমি তৎক্ষণাৎ সেই রাত্রেই ডাক্তারকে ডাকাইয়া আনিলাম। ডাক্তার প্রথমটা আসিয়া অনেকক্ষণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই ব্যথাটা কি বাড়িয়া উঠিয়াছে? ঔষধটা একবার মালিশ করিলে হয় না?

বলিয়া শিশিটা টেবিল হইতে লইয়া দেখিলেন সেটা খালি।

আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি ভুল করিয়া এই ওষুধটা খাইয়াছেন? আমার স্ত্রী ঘাড় নাড়িয়া নীরবে জানাইলেন—হাঁ।

ডাক্তার তৎক্ষণাৎ গাড়ি করিয়া তাঁহার বাড়ি হইতে পাম্প আনিতে ছুটিলেন। আমি অর্দ্ধমূর্চ্ছিতের ন্যায় আমার স্ত্রীর বিছানার উপর গিয়া পড়িলাম।

তখন, মাতা তাহার পীড়িত শিশুকে যেমন করিয়া সান্ত্বনা করে তেমনি করিয়া তিনি আমার মাথা তাঁহার বক্ষের কাছে টানিয়া লইয়া দুই হস্তের স্পর্শে আমাকে তাঁহার মনের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কেবল তাঁহার সেই করুণ স্পর্শের দ্বারাই আমাকে বারংবার করিয়া বলিতে লাগিলেন—শোক করিয়ো না, ভালই হইয়াছে—তুমি সুখী হইবে, এবং সেই মনে করিয়া আমি সুখে মরিলাম।

ডাক্তার যখন ফিরিলেন, তখন জীবনের সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রীর সকল যন্ত্রণার অবসান হইয়াছে।

—দক্ষিণাচরণ আর একবার জল খাইয়া বলিলেন, উঃ বড় গরম! বলিয়া দ্রুত বাহির হইয়া বারকয়েক বারান্দায় পায়চারি করিয়া

আসিয়া বসিলেন। বেশ বোঝা গেল তিনি বলিতে চাহেন না কিন্তু আমি যেন যাদু করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কথা কাড়িয়া লইতেছি। আবার আরম্ভ করিলেন—

মনোরমাকে বিবাহ করিয়া দেশে ফিরিলাম।

মনোরমা তাহার পিতার সম্মতিক্রমে আমাকে বিবাহ করিল। কিন্তু আমি যখন তাহাকে আদরের কথা বলিতাম, প্রেমালাপ করিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিবার চেষ্টা করিতাম সে হাসিত না, গম্ভীর হইয়া থাকিত। তাহার মনের কোথায় কোনখানে কি খট্‌কা লাগিয়া গিয়াছিল আমি কেমন করিয়া বুঝিব?

এই সময় আমার মদ খাইবার নেশা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল।

একদিন প্রথম শরতের সন্ধ্যায় মনোরমাকে লইয়া আমাদের বরানগরের বাগানে বেড়াইতেছি। ছমছমে অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। পাখীদের বাসায় ডানা ঝাড়িবার শব্দটুকুও নাই। কেবল বেড়াইবার পথের দুই ধারে ঘন ছায়াবৃত ঝাউগাছ বাতাসে সশব্দে কাঁপিতেছিল।

শ্রান্তিবোধ করিতেই মনোরমা সেই বকুলতলার শুভ্র পাথরের বেদীর উপর আসিয়া নিজের দুই বাহুর উপর মাথা রাখিয়া শয়ন করিল। আমিও কাছে আসিয়া বসিলাম।

সেখানে অন্ধকার আরও ঘনীভূত,—যতটুকু আকাশ দেখা যাইতেছে একেবারে তারায় আচ্ছন্ন; তরুতলের ঝিল্লিধ্বনি যেন অনন্তগগনবক্ষচ্যুত নিঃশব্দতার নিম্নপ্রান্তে একটি শব্দের সরু পাড় বুনিয়া দিতেছে।

সেদিনও বৈকালে আমি কিছু মদ খাইয়াছিলাম, মনটা বেশ একটু তরলাবস্থায় ছিল। অন্ধকার যখন চোখে সহিয়া আসিল তখন বনচ্ছায়াতলে পাণ্ডুরবর্ণে অঙ্কিত সেই শিথিল অঞ্চল শ্রান্তকায় রমণীর আবছায়া মূর্ত্তিটি আমার মনে এক অনিবার্য্য আবেগের সঞ্চার করিল। মনে হইল, ও যেন একটি ছায়া, ওকে যেন কিছুতেই দুই বাহু দিয়া ধরিতে পারিব না।

এমন সময় অন্ধকার ঝাউগাছের শিখরদেশে যেন আগুন ধরিয়া উঠিল; তাহার পরে কৃষ্ণপক্ষের জীর্ণপ্রান্ত হলুদবর্ণ চাঁদ ধীরে ধীরে গাছের মাথার উপরকার আকাশে আরোহণ করিল;—শাদা পাথরের উপর শাদা সাড়িপরা সেই শ্রান্তশয়ান রমণীর মুখের উপর জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িল। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। কাছে আসিয়া দুই হাতে তাহার হাতটি তুলিয়া ধরিয়া কহিলাম, মনোরমা, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না, কিন্তু তোমাকে আমি ভালবাসি তোমাকে আমি কোনকালে ভুলিতে পারিব না।

কথাটা বলিবামাত্র চমকিয়া উঠিলাম; মনে পড়িল ঠিক এই কথাটা আর এক দিন আর কাহাকেও বলিয়াছি! এবং সেই মুহূর্ত্তেই বকুল গাছের শাখার উপর দিয়া, ঝাউ গাছের মাথার উপর দিয়া, কৃষ্ণপক্ষের পীত বর্ণ ভাঙ্গাচাঁদের নীচে দিয়া গঙ্গার পূর্ব্ব পার হইতে গঙ্গার সুদূর পশ্চিম পার পর্য্যন্ত হাহা—হাহা—হাহা করিয়া অতি দ্রুতবেগে একটা হাসি বহিয়া গেল! সেটা মর্ম্মভেদী হাসি, কি অভ্রভেদী হাহাকার, বলিতে পারি না। আমি তদ্দণ্ডেই পাথরের বেদীর উপর হইতে মূর্চ্ছিত হইয়া নীচে পড়িয়া গেলাম।

মূর্চ্ছাভঙ্গে দেখিলাম আমার ঘরে বিছানায় শুইয়া আছি। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার হঠাৎ এমন হইল কেন?—আমি কাঁপিয়া উঠিয়া বলিলাম, শুনিতে পাও নাই সমস্ত আকাশ ভরিয়া হাহা করিয়া একটা হাসি বহিয়া গেল?

স্ত্রী হাসিয়া কহিলেন—সে বুঝি হাসি? সার বাঁধিয়া দীর্ঘ এক ঝাঁক পাখী উড়িয়া গেল, তাহাদেরই পাখার শব্দ শুনিয়াছিলাম। তুমি এত অল্পেই ভয় পাও?—

দিনের বেলায় স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, পাখীর ঝাঁক উড়িবার শব্দই বটে, এই সময়ে উত্তর দেশ হইতে হংসশ্রেণী নদীর চরে চরিবার জন্য আসিতেছে। কিন্তু সন্ধ্যা হইলে সে বিশ্বাস রাখিতে পারিতাম না। তখন মনে হইত চারিদিকে সমস্ত অন্ধকার ভরিয়া ঘন হাসি জমা হইয়া রহিয়াছে, সামান্য একটা উপলক্ষে হঠাৎ আকাশ ভরিয়া অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিবে। অবশেষে এমন হইল, সন্ধ্যার পর মনোরমার সহিত একটা কথা বলিতে আমার সাহস হইত না।

তখন আমাদের বরানগরের বাড়ি ছাড়িয়া মনোরমাকে লইয়া বোটে করিয়া বাহির হইলাম। অগ্রহায়ণ মাসে নদীর বাতাসে সমস্ত ভয় চলিয়া গেল। কয়দিন বড় সুখে ছিলাম। চারিদিকের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া মনোরমাও যেন তাহার হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার অনেক দিন পরে ধীরে ধীরে আমার নিকট খুলিতে লাগিল।

গঙ্গা ছাড়াইয়া, খ'ড়ে ছাড়াইয়া, অবশেষে পদ্মায় আসিয়া পৌছিলাম। ভয়ঙ্করী পদ্মা তখন হেমন্তের বিবরলীন ভুজঙ্গিনীর মত কৃশ নির্জ্জীবভাবে সুদীর্ঘ শীতনিদ্রায় নিবিষ্ট ছিল। উত্তর পারে জনশূন্য তৃণশূন্য চিহ্নশূন্য দিগন্তপ্রসারিত বালির চর ধূ ধূ করিতেছে—এবং দক্ষিণের উচ্চ পাড়ের উপর গ্রামের আমবাগানগুলি এই রাক্ষসীনদীর নিতান্ত মুখের কাছে যোড়হস্তে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে;—পদ্মা ঘুমের ঘোরে এক একবার পাশ ফিরিতেছে এবং বিদীর্ণ তটভূমি ঝুপ্ ঝাপ্ করিয়া ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

এইখানে বেড়াইবার সুবিধা দেখিয়া বোট বাঁধিলাম।

একদিন আমরা দুই জনে বেড়াইতে বেড়াইতে বহুদূরে চলিয়া গেলাম। সূর্য্যাস্তের স্বর্ণচ্ছায়া মিলাইয়া যাইতেই শুক্লপক্ষের নির্ম্মল চন্দ্রালোক দেখিতে দেখিতে ফুটিয়া উঠিল। সেই অন্তহীন শুভ্র বালির চরের উপর যখন অজস্র অবারিত উচ্ছ্বসিত জ্যোৎস্না একেবারে আকাশের সীমান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া গেল—তখন মনে হইল যেন জনশূন্য চন্দ্রলোকের অসীম স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে কেবল আমরা দুই জনে ভ্রমণ করিতেছি। একটি লাল শাল মনোরমার মাথার উপর হইতে নামিয়া তাহার মুখখানি বেষ্টন করিয়া তাহার শরীরটি আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। নিস্তব্ধতা যখন নিবিড় হইয়া আসিল, কেবল একটি সীমাহীন দিশাহীন শুভ্রতা এবং শূন্যতা ছাড়া যখন আর কিছুই রহিল না, তখন মনোরমা ধীরে ধীরে হাতটি বাহির করিয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিল; অত্যন্ত কাছে আসিয়া সে যেন তাহার সমস্ত শরীর মন, জীবন যৌবন আমার উপর বিন্যস্ত করিয়া নিতান্ত নির্ভর করিয়া দাঁড়াইল। পুলকিত উদ্বেলিত হৃদয়ে মনে করিলাম, ঘরের মধ্যে কি যথেষ্ট ভালবাসা যায়? এইরূপ অনাবৃত অবারিত অনন্ত আকাশ

নহিলে কি ছুটি মানুষকে কোথাও ধরে? তখন মনে হইল, আমাদের ঘর নাই, দ্বার নাই, কোথাও ফিরিবার নাই, এমনি করিয়া হাতে হাতে ধরিয়া গম্যহীন পথে, উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণে চন্দ্রালোকিত শূন্যতার উপর দিয়া অবারিতভাবে চলিয়া যাইব।

এইরূপে চলিতে চলিতে এক জায়গায় আসিয়া দেখিলাম সেই বালুকারাশির মাঝখানে অদূরে একটি জলাশয়ের মত হইয়াছে—পদ্মা সরিয়া যাওয়ার পর সেইখানে জল বাধিয়া আছে।

সেই মরুবালুকাবেষ্টিত নিস্তরঙ্গ নিসুপ্ত নিশ্চল জলটুকুর উপরে একটি সুদীর্ঘ জ্যোৎস্নার রেখা মূর্চ্ছিতভাবে পড়িয়া আছে। সেই জায়গাটাতে আসিয়া আমরা দুইজনে দাঁড়াইলাম—মনোরমা কি ভাবিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল; তাহার মাথার উপর হইতে শালটা হঠাৎ খসিয়া পড়িল। আমি তাহার সেই জ্যোৎস্নাবিকশিত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া চুম্বন করিলাম।

এমন সময় সেই জনমানবশূন্য নিঃশব্দ মরুভূমির মধ্যে গম্ভীরস্বরে কে তিনবার বলিয়া উঠিল—ও কে; ও কে? ও কে?

আমি চমকিয়া উঠিলাম, আমার স্ত্রীও কাঁপিয়া উঠিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আমরা দুইজনেই বুঝিলাম, এই শব্দ মানুষিক নহে, অমানুষিকও নহে—চর-বিহারী জলচর পাখীর ডাক। হঠাৎ এতরাত্রে তাহাদের নিরাপদ নিভৃত নিবাসের কাছে লোকসমাগম দেখিয়া চকিত হইয়া উঠিয়াছে।

সেই ভয়ের চমক খাইয়া আমরা দুই জনেই তাড়াতাড়ি বোটে ফিরিলাম। রাত্রে বিছানায় আসিয়া শুইলাম; শ্রান্তশরীরে মনোরমা অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িল।

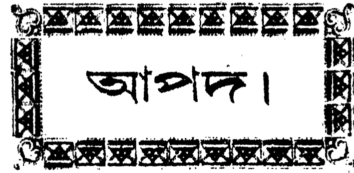
তখন অন্ধকারে কে এক জন আমার মশারির কাছে দাঁড়াইয়া সুষুপ্ত মনোরমার দিকে একটি মাত্র দীর্ঘ শীর্ণ অস্থিসার অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া যেন আমার কাণে কাণে অত্যন্ত চুপি চুপি অস্ফুটকণ্ঠে কেবলি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—ও কে? ও কে? ও কে গো?—

তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেশালাই জ্বালাইয়া বাতি ধরাইলাম। সেই মুহূর্ত্তেই ছায়ামূর্ত্তি মিলাইয়া গিয়া, আমার মশারি কাঁপাইয়া, বোট দুলাইয়া, আমার সমস্ত ঘর্ম্মাক্ত শরীরের রক্ত হিম করিয়া দিয়া হাহা—হাহা—হাহা করিয়া একটা হাসি অন্ধকার রাত্রির ভিতর দিয়া বহিয়া চলিয়া গেল। পদ্মা পার হইল, পদ্মার চর পার হইল, তাহার পরবর্ত্তী সমস্ত সুপ্ত দেশ গ্রাম নগর পার হইয়া গেল—যেন তাহা চিরকাল ধরিয়া দেশদেশান্তর লোকলোকান্তর পার হইয়া ক্রমশঃ ক্ষীণ, ক্ষীণতর, ক্ষীণতম হইয়া অসীম সুদূরে চলিয়া যাইতেছে,—ক্রমে যেন তাহা জন্মমৃত্যুর দেশ ছাড়াইয়া গেল—ক্রমে তাহা যেন সূচির অগ্রভাগের ন্যায় ক্ষীণতম হইয়া আসিল—এত ক্ষীণ শব্দ কখন শুনি নাই, কল্পনা করি নাই—আমার মাথার মধ্যে যেন অনন্ত আকাশ রহিয়াছে এবং সেই শব্দ যতই দূরে যাইতেছে, কিছুতেই আমার মস্তিষ্কের সীমা ছাড়াইতে পারিতেছে না;—অবশেষে যখন একান্ত অসহ্য হইয়া আসিল, তখন ভাবিলাম, আলো নিবাইয়া না দিলে ঘুমাইতে পারিব না। যেমন আলো নিবাইয়া শুইলাম, অমনি আমার মশারির পাশে, আমার কাণের কাছে অন্ধকারে আবার সেই অবরুদ্ধ স্বর বলিয়া উঠিল—ও কে, ও কে, ও কে গো। আমার বুকের রক্ত

ঠিক সমান তালে ক্রমাগতই ধ্বনিত হইতে লাগিল—ও কে, ও কে, ও কে গো! ও কে, ও কে, ও কে গো! সেই গভীর রাত্রে নিস্তব্ধ বোটের মধ্যে আমার গোলাকার ঘড়িটাও সজীব হইয়া উঠিয়া তাহার ঘণ্টার কাঁটা মনোরমার দিকে প্রসারিত করিয়া শেল্‌ফের উপর হইতে তালে তালে বলিতে লাগিল, ও কে, ও কে, ও কে গো! ও কে ও কে, ও কে গো!

বলিতে বলিতে দক্ষিণাবাবু পাংশুবর্ণ হইয়া আসিলেন, তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। আমি তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলাম একটু জল খান। এমন সময় হঠাৎ আমার কেরোসিনের শিখাটা দপ্‌দপ্ করিতে করিতে নিবিয়া গেল। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, বাহিরে আলো হইয়াছে। কাক ডাকিয়া উঠিল। দোয়েল শিশ্ দিতে লাগিল। আমার বাড়ির সম্মুখবর্ত্তী পথে একটা মহিষের গাড়ির কঁ্যাচ্ কঁ্যাচ্ শব্দ জাগিয়া উঠিল। তখন দক্ষিণাবাবুর মুখের ভাব একেবারে বদল হইয়া গেল। ভয়ের কিছুমাত্র চিহ্ন রহিল না। রাত্রির কুহকে, কাল্পনিক শঙ্কার মত্ততায় আমার কাছে যে এত কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন সে জন্য যেন অত্যন্ত লজ্জিত এবং আমার উপর আন্তরিক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। শিষ্টসম্ভাষণমাত্র না করিয়া অকস্মাৎ উঠিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন।

সেই দিনই অর্দ্ধরাত্রে আবার আমার দ্বারে আসিয়া ঘা পড়িল—ডাক্তার ডাক্তার!



আপদ।

সন্ধ্যার দিকে ঝড় ক্রমশঃ প্রবল হইতে লাগিল। বৃষ্টির ঝাপট, বজ্রের শব্দ, এবং বিদ্যুতের ঝিক্‌মিকিতে আকাশে যেন সুরাসুরের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। কালো কালো মেঘগুলো মহাপ্রলয়ের জয়পতাকার মত দিগ্বিদিকে উড়িতে আরম্ভ করিল, গঙ্গার এপারে ওপারে বিদ্রোহী ঢেউগুলো কলশব্দে নৃত্য জুড়িয়া দিল, এবং বাগানের বড় বড় গাছগুলো সমস্ত শাখা ঝট্‌পট্ করিয়া হা হুতাশ সহকারে দক্ষিণে বামে লুটোপুটি করিতে লাগিল।

তখন চন্দননগরের বাগানবাড়িতে একটি দীপালোকিত রুদ্ধ কক্ষে খাটের সম্মুখবর্ত্তী নীচের বিছানায় বসিয়া স্ত্রীপুরুষে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল।

শরৎ বাবু বলিতেছিলেন, আর কিছু দিন থাকিলেই তোমার শরীর সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিবে, তখন আমরা দেশে ফিরিতে পারিব।

কিরণময়ী বলিতেছিলেন, আমার শরীর সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিয়াছে, এখন দেশে ফিরিলে কোন ক্ষতি হইবে না।

বিবাহিত ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন, কথাটা যত সংক্ষেপে রিপোর্ট করিলাম তত সংক্ষেপে শেষ হয় নাই। বিষয়টি বিশেষ দুরূহ নয়, তথাপি বাদ প্রতিবাদ কিছুতেই মীমাংসার দিকে অগ্রসর হইতেছিল না; কর্ণহীন নৌকার মত ক্রমাগতই ঘুর খাইয়া মরিতেছিল; অবশেষে অশ্রুতরঙ্গে ডুবি হইবার সম্ভাবনা দেখা দিল।

শরৎ কহিলেন, ডাক্তার বলিতেছে আর কিছুদিন থাকিয়া গেলে ভাল হয়।

কিরণ কহিলেন, তোমার ডাক্তার ত সব জানে!

শরৎ কহিলেন, জান ত, এই সময়ে দেশে নানাপ্রকার ব্যামোর প্রাদুর্ভাব হয়, অতএব আর মাস দুয়েক কাটাইয়া গেলেই ভাল হয়।

কিরণ কহিলেন, এখানে এখন বুঝি কোথাও কাহারো কোন ব্যামো হয় না!

পূর্ব্ব ইতিহাসটা এই। কিরণকে তাহার ঘরের এবং পাড়ার সকলেই ভালবাসে, এমন কি, শাশুড়ি পর্য্যন্ত। সেই কিরণের যখন কঠিন পীড়া হইল তখন সকলেই চিন্তিত হইয়া উঠিল—এবং ডাক্তার যখন বায়ুপরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিল, তখন গৃহ এবং কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া প্রবাসে যাইতে তাহার স্বামী এবং শাশুড়ি কোন আপত্তি করিলেন না। যদিও গ্রামের বিবেচক প্রাজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই, বায়ুপরিবর্ত্তনে আরোগ্যের আশা করা এবং স্ত্রীর জন্য এতটা হুলস্থূল করিয়া তোলা নব্য স্ত্রৈণতার একটা নির্লজ্জ আতিশয্য বলিয়া স্থির করিলেন এবং প্রশ্ন করিলেন, ইতিপূর্ব্বে কি কাহারও স্ত্রীর কঠিন পীড়া হয় নাই, শরৎ যেখানে যাওয়া স্থির করিয়াছেন সেখানে কি মানুষরা অমর, এবং এমন কোন দেশ আছে কি যেখানে অদৃষ্টের লিপি সফল হয় না—তথাপি শরৎ এবং তাঁহার মা সে সকল কথায় কর্ণপাত করিলেন না; তখন গ্রামের সমস্ত সমবেত বিজ্ঞতার অপেক্ষা তাঁহাদের হৃদয়লক্ষ্মী কিরণের প্রাণটুকু তাঁহাদের নিকট গুরুতর বোধ হইল। প্রিয় ব্যক্তির বিপদে মানুষের এরূপ মোহ ঘটিয়া থাকে।

শরৎ চন্দননগরের বাগানে আসিয়া বাস করিতেছেন, এবং কিরণও রোগমুক্ত হইয়াছেন, কেবল শরীর এখনও সম্পূর্ণ সবল হয় নাই। তাঁহার মুখে চক্ষে একটি সকরুণ কৃশতা অঙ্কিত হইয়া আছে, যাহা দেখিলে হৃৎকম্প সহ মনে উদয় হয়, আহা, বড় রক্ষা পাইয়াছে!

কিন্তু কিরণের স্বভাবটা সঙ্গপ্রিয়, আমোদপ্রিয়। এখানে একলা আর ভাল লাগিতেছে না; তাহার ঘরের কাজ নাই, পাড়ার সঙ্গিনী নাই, কেবল সমস্ত দিন আপনার রুগ্ন শরীরটাকে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে মন যায় না। ঘণ্টায় ঘণ্টায় দাগ মাপিয়া ঔষধ খাও, তাপ দাও, পথ্য পালন কর, ইহাতে বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছে; আজ ঝড়ের সন্ধ্যাবেলায় রুদ্ধগৃহে স্বামী স্ত্রীতে তাহাই লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল।

কিরণ যতক্ষণ উত্তর দিতেছিল ততক্ষণ উভয় পক্ষে সমকক্ষভাবে দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিতেছিল, কিন্তু অবশেষে কিরণ যখন নিরুত্তর হইয়া বিনা প্রতিবাদে শরতের দিক্ হইতে ঈষৎ বিমুখ হইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বসিল, তখন দুর্ব্বল নিরুপায় পুরুষটির আর কোন অস্ত্র রহিল না। পরাভব স্বীকার করিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় বাহির হইতে বেহারা উচ্চৈঃস্বরে কি একটা নিবেদন করিল।

শরৎ উঠিয়া দ্বার খুলিয়া শুনিলেন, নৌকা ডুবি হইয়া একটি ব্রাহ্মণ-বালক সাঁতার দিয়া তাঁহাদের বাগানে আসিয়া উঠিয়াছে।

শুনিয়া কিরণের মান অভিমান দূর হইয়া গেল, তৎক্ষণাৎ আল্‌না হইতে

শুষ্কবস্ত্র বাহির করিয়া দিলেন, এবং শীঘ্র এক বাটি দুধ গরম করিয়া ব্রাহ্মণের ছেলেকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

ছেলেটির লম্বা চুল, বড় বড় চোখ, গোঁফের রেখা এখনো উঠে নাই। কিরণ তাহাকে নিজে থাকিয়া ভোজন করাইয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

শুনিলেন, সে যাত্রার দলের ছোক্‌রা; তাহার নাম নীলকান্ত। তাহারা নিকটবর্ত্তী সিংহ বাবুদের বাড়ি যাত্রার জন্য আহূত হইয়াছিল; ইতিমধ্যে নৌকা ডুবি হইয়া তাহাদের দলের লোকের কি গতি হইল কে জানে; সে ভাল সাঁতার জানিত, কোন মতে প্রাণরক্ষা করিয়াছে।

ছেলেটি এইখানেই রহিয়া গেল। আর একটু হইলেই সে মারা পড়িত এই মনে করিয়া তাহার প্রতি কিরণের অত্যন্ত দয়ার উদ্রেক হইল।

শরৎ মনে করিলেন, হইল ভাল, কিরণ একটা নূতন কাজ হাতে পাইলেন, এখন কিছুকাল এইভাবেই কাটিয়া যাইবে। ব্রাহ্মণ-বালকের কল্যাণে পুণ্যসঞ্চয়ের প্রত্যাশায় খাশুড়িও প্রসন্নতা লাভ করিলেন। এবং অধিকারী মহাশয় ও যমরাজের হাত হইতে সহসা এই ধনী পরিবারের হাতে বদ্‌লি হইয়া নীলকান্ত বিশেষ আরাম বোধ করিল।

কিন্তু অনতিবিলম্বে শরৎ এবং তাঁহার মাতার মত পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। তাঁহারা ভাবিলেন আর আবশ্যক নাই, এখন এই ছেলেটাকে বিদায় করিতে পারিলে আপদ যায়।

নীলকান্ত গোপনে শরতের গুড়্‌গুড়িতে ফড়্‌ফড়্‌ শব্দে তামাক টানিতে আরম্ভ করিল। বৃষ্টির দিনে অম্লানবদনে তাঁহার সখের সিল্কের ছাতাটি মাথায় দিয়া নববন্ধু-সঞ্চয়চেষ্টায় পল্লীতে পর্য্যটন করিতে লাগিল। কোথাকার একটা মলিন গ্রাম্য কুক্কুরকে আদর দিয়া এমনি স্পর্দ্ধিত করিয়া তুলিল যে, সে অনাহূত শরতের সুসজ্জিত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নির্ম্মল জাজিমের উপর পদপল্লবচতুষ্টয়ের ধূলিরেখায় আপন শুভাগমনসংবাদ স্থায়িভাবে মুদ্রিত করিয়া আসিতে লাগিল। নীলকান্তের চতুর্দ্দিকে দেখিতে দেখিতে একটি সুবৃহৎ ভক্তশিশু-সম্প্রদায় গঠিত হইয়া উঠিল, এবং সে বৎসর গ্রামের আম্রকাননে কচি আম পাকিয়া উঠিবার অবসর পাইল না।

কিরণ এই ছেলেটিকে বড় বেশী আদর দিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। শরৎ এবং শরতের মা সে বিষয়ে তাঁহাকে অনেক নিষেধ করিতেন, কিন্তু তিনি তাহা মানিতেন না। শরতের পুরাতন জামা মোজা এবং নূতন ধুতি চাদর জুতা পরাইয়া তিনি তাহাকে বাবু সাজাইয়া তুলিলেন। মাঝে মাঝে যখন তখন তাহাকে ডাকিয়া লইয়া তাঁহার স্নেহ এবং কৌতুক উভয়ই চরিতার্থ হইত। কিরণ সহাস্যমুখে পানের বাটা পাশে রাখিয়া খাটের উপর বসিতেন, দাসী তাঁহার ভিজে এলোচুল চিরিয়া চিরিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া শুকাইয়া দিত এবং নীলকান্ত নীচে দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া নলদময়ন্তীর পালা অভিনয় করিত—এইরূপে দীর্ঘ মধ্যাহ্ন অত্যন্ত শীঘ্র কাটিয়া যাইত। কিরণ শরৎকে তাঁহার সহিত একাসনে দর্শকশ্রেণীভুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু শরৎ অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন এবং শরতের সম্মুখে নীলকান্তের প্রতিভাও সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি পাইত না।

খাশুড়ি এক একদিন ঠাকুর-দেবতার নাম শুনিবার আশায় আকৃষ্ট হইয়া আসিতেন কিন্তু অবিলম্বে তাঁহার চিরাভ্যস্ত মধ্যাহ্ন-কালীন নিদ্রাবেশ ভক্তিকে অভিভূত এবং তাঁহাকে শয্যাশায়ী করিয়া দিত।

শরতের কাছ হইতে কাণমলা চড়টা চাপড়টা নীলকান্তের অদৃষ্টে প্রায়ই জুটিত; কিন্তু তদপেক্ষা কঠিনতর শাসনপ্রণালীতে আজন্ম অভ্যস্ত থাকাতে সেটা তাহার নিকট অপমান বা বেদনাজনক বোধ হইত না। নীলকান্তের দৃঢ় ধারণা ছিল যে, পৃথিবীর জল স্থল বিভাগের ন্যায় মানবজন্মটা আহার এবং প্রহারে বিভক্ত; প্রহারের অংশটাই অধিক।

নীলকান্তের ঠিক কত বয়স নির্ণয় করিয়া বলা কঠিন; যদি চোদ্দ পনেরো হয়, তবে বয়সের অপেক্ষা মুখ অনেক পাকিয়াছে বলিতে হইবে; যদি সতেরো আঠারো হয়, তবে বয়সের অনুরূপ পাক ধরে নাই। হয় সে অকাল-পক্ক, নয় সে অকাল-অপক্ক।

আসল কথা এই, সে অতি অল্প বয়সেই যাত্রার দলে ঢুকিয়া রাধিকা, দময়ন্তী, সীতা এবং বিদ্যার সখী সাজিত। অধিকারীর আবশ্যকমত বিধাতার বরে খানিকদূর পর্য্যন্ত বাড়িয়া তাহার বাড় থামিয়া গেল। তাহাকে সকলে ছোটই দেখিত, আপনাকেও সে ছোটই জ্ঞান করিত, বয়সের উপযুক্ত সম্মান সে কাহারও কাছে পাইত না। এই সকল স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক কারণ প্রভাবে সতেরো বৎসর বয়সের সময় তাহাকে অনতিপক্ক সতেরোর অপেক্ষা অতিপরিপক্ক চোদ্দর মত দেখাইত। গোঁফের রেখা না উঠাতে এই ভ্রম আরো দৃঢ়মূল হইয়াছিল। তামাকের ধোঁয়া লাগিয়াই হৌক্ বা বয়সানুচিত ভাষা প্রয়োগবশতই হৌক্, নীলকান্তের ঠোঁটের কাছটা কিছু বেশী পাকা বোধ হইত, কিন্তু তাহার বৃহৎ তারাবিশিষ্ট দুইটি চক্ষের মধ্যে একটা সারল্য এবং তারুণ্য ছিল। অনুমান করি, নীলকান্তের ভিতরটা স্বভাবতঃ কাঁচা, কিন্তু যাত্রার দলের তা' লাগিয়া উপরিভাগে পক্কতার লক্ষণ দেখা দিয়াছে।

শরৎ বাবুর আশ্রয়ে চন্দননগরের বাগানে বাস করিতে করিতে নীলকান্তের উপর স্বভাবের নিয়ম অব্যাহতভাবে আপন কাজ করিতে লাগিল। সে এতদিন যে একটা বয়ঃসন্ধিস্থলে অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘকাল থামিয়াছিল, এখানে আসিয়া সেটা কখন্ এক সময় নিঃশব্দে পার হইয়া গেল। তাহার সতেরো আঠারো বৎসরের বয়ঃক্রম বেশ সম্পূর্ণভাবে পরিণত হইয়া উঠিল।

তাহার সে পরিবর্ত্তন বাহির হইতে কাহারও চোখে পড়িল না, কিন্তু তাহার প্রথম লক্ষণ এই যে, যখন কিরণ নীলকান্তের প্রতি বালকযোগ্য ব্যবহার করিতেন সে মনে মনে লজ্জিত ও ব্যথিত হইত। একদিন আমোদপ্রিয় কিরণ তাহাকে স্ত্রী-বেশে সখী সাজিবার কথা বলিয়াছিলেন, সে কথাটা অকস্মাৎ তাহার বড়ই কষ্টদায়ক লাগিল অথচ তাহার উপযুক্ত কারণ খুঁজিয়া পাইল না। আজকাল তাহাকে যাত্রার অনুকরণ করিতে ডাকিলেই সে অদৃশ্য হইয়া যাইত। সে যে একটা লক্ষ্মীছাড়া যাত্রার দলের ছোকরার অপেক্ষা অধিক কিছু নয় এ কথা কিছুতে তাহার মনে লইত না।

এমন কি, সে বাড়ির সরকারের নিকট

কিছু কিছু করিয়া লেখাপড়া শিখিবার সঙ্কল্প করিল। কিন্তু বৌঠাকরুণের স্নেহভাজন বলিয়া নীলকান্তকে সরকার দুই চক্ষে দেখিতে পারিত না—এবং মনের একাগ্রতা রক্ষা করিয়া পড়াশুনো কোন কালে অভ্যাস না থাকাতে অক্ষরগুলো তাহার চোখের সাম্নে দিয়া ভাসিয়া যাইত। গঙ্গার ধারে চাঁপাতলায় গাছের গুড়িতে ঠেসান দিয়া কোলের উপর বই খুলিয়া সে দীর্ঘকাল বসিয়া থাকিত; জল ছল্ ছল্ করিত, নৌকা ভাসিয়া যাইত, শাখার উপরে চঞ্চল অন্যমনস্ক পাখী কিচ্ মিচ্ শব্দে স্বগত উক্তি প্রকাশ করিত, নীলকান্ত বইয়ের পাতায় চক্ষু রাখিয়া কি ভাবিত সেই জানে অথবা সেও জানে না। একটা কথা হইতে কিছুতেই আর একটা কথায় গিয়া পৌঁছিতে পারিত না, অথচ, বই পড়িতেছি মনে করিয়া তাহার ভারি একটা আত্মগৌরব উপস্থিত হইত। সাম্নে দিয়া যখন একটা নৌকা যাইত তখন সে আরও অধিক আড়ম্বরের সহিত বইখানা তুলিয়া লইয়া বিড় বিড় করিয়া পড়ার ভাণ করিত; দর্শক চলিয়া গেলে সে আর পড়ার উৎসাহ রক্ষা করিতে পারিত না।

পূর্ব্বে সে অভ্যস্ত গানগুলো যন্ত্রের মত যথানিয়মে গাহিয়া যাইত, এখন সেই গানের সুরগুলো তাহার মনে এক অপূর্ব্ব চাঞ্চল্য সঞ্চার করে। গানের কথা অতি যৎসামান্য, তুচ্ছ অনুপ্রাসে পরিপূর্ণ, তাহার অর্থও নীলকান্তের নিকট সম্যক্ বোধগম্য নহে, কিন্তু যখন সে গাহিত—

ওরে রাজহংস, জন্মি দ্বিজবংশে,
এমন নৃশংস কেন হলি রে,—
বল্ কি জন্যে, এ অরণ্যে,
রাজকন্যের প্রাণসংশয় করিলি রে,—

তখন সে যেন সহসা লোকান্তরে জন্মান্তরে উপনীত হইত—তখন চারিদিকের অভ্যস্ত জগৎটা এবং তাহার তুচ্ছ জীবনটা গানে তর্জ্জমা হইয়া একটা নূতন চেহারা ধারণ করিত। রাজহংস এবং রাজকন্যার কথা হইতে তাহার মনে এক অপরূপ ছবির আভাস জাগিয়া উঠিত, সে আপনাকে কি মনে করিত স্পষ্ট করিয়া বলা যায় না, কিন্তু যাত্রার দলের পিতৃমাতৃহীন ছোকরা বলিয়া ভুলিয়া যাইত। নিতান্ত অকিঞ্চনের ঘরের হতভাগ্য মলিন শিশু যখন সন্ধ্যাশয্যায় শুইয়া, রাজপুত্র, রাজকন্যা এবং সাত রাজার ধন মাণিকের কথা শোনে তখন সেই ক্ষীণ দীপালোকিত জীর্ণ গৃহকোণের অন্ধকারে তাহার মনটা সমস্ত দারিদ্র্য ও হীনতার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া এক সর্ব্বসম্ভব রূপকথার রাজ্যে একটা নূতন রূপ, উজ্জ্বল বেশ এবং অপ্রতিহত ক্ষমতা ধারণ করে; সেই রূপ গানের সুরের মধ্যে এই যাত্রার দলের ছেলেটি আপনাকে এবং আপনার জগৎটিকে একটি নবীন আকারে সৃজন করিয়া তুলিত; জলের ধ্বনি, পাতার শব্দ, পাখীর ডাক, এবং যে লক্ষ্মী এই লক্ষ্মীছাড়াকে আশ্রয় দিয়াছেন তাঁহার সহাস্য স্নেহমুখচ্ছবি, তাঁহার কল্যাণমণ্ডিত বলয়বেষ্টিত বাহু দুইখানি এবং দুর্লভ সুন্দর পুষ্পদল-কোমল রক্তিম চরণযুগল কি এক মায়ামন্ত্রবলে রাগিণীর মধ্যে রূপান্তরিত হইয়া যাইত। আবার এক সময় এই গীত-মরীচিকা কোথায় অপসারিত হইত, যাত্রার দলের নীলকান্ত ঝাঁক্ড়া চুল লইয়া প্রকাশ পাইত, আমবাগানের অধ্যক্ষ প্রতিবেশীর অভিযোগক্রমে শরৎ আসিয়া তাহার গালে ঠাস্ ঠাস্ করিয়া চড় কসাইয়া দিতেন, এবং বালক ভক্তমণ্ডলীর অধিনায়ক

হইয়া নীলকান্ত জলে স্থলে এবং তরুশাখাগ্রে নব নব উপদ্রব সৃজন করিতে বাহির হইত।

ইতিমধ্যে শরতের ভাই সতীশ কলিকাতা হইতে কলেজের ছুটিতে বাগানে আসিয়া আশ্রয় লইল। কিরণ ভারি খুসি হইলেন, তাঁহার হাতে আর একটি কাজ জুটিল; উপবেশনে আহারে আচ্ছাদনে সমবয়স্ক ঠাকুরপোর প্রতি পরিহাস-পাশ বিস্তার করিতে লাগিলেন। কখনও হাতে সিঁদুর মাখিয়া তাহার চোখ টিপিয়া ধরেন, কখনও তাহার জামার পিঠে বাঁদর লিখিয়া রাখেন, কখনও ঝনাৎ করিয়া বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সুললিত উচ্চহাস্যে পলায়ন করেন। সতীশও ছাড়িবার পাত্র নহে; সে তাঁহার চাবি চুরি করিয়া, তাঁহার পানের মধ্যে লঙ্কা পূরিয়া, অলক্ষিতে খাটের খুরার সহিত তাঁহার আঁচল বাঁধিয়া প্রতিশোধ তুলিতে থাকে। এইরূপে উভয়ে সমস্ত দিন তর্জ্জন ধাবন হাস্য, এমন কি, মাঝে মাঝে কলহ, ক্রন্দন, সাধাসাধি এবং পুনরায় শান্তিস্থাপন চলিতে লাগিল।

নীলকান্তকে কি ভূতে পাইল কে জানে! সে কি উপলক্ষ করিয়া কাহার সহিত বিবাদ করিবে ভাবিয়া পায় না, অথচ তাহার মন তীব্র তিক্তরসে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সে তাহার ভক্ত বালকগুলিকে অন্যায়রূপে কাঁদাইতে লাগিল, তাহার সেই পোষা দিশী কুকুরটাকে অকারণে লাথি মারিয়া কেঁই কেঁই শব্দে নভোমণ্ডল ধ্বনিত করিয়া তুলিল, এমন কি, পথে ভ্রমণের সময় সবেগে ছড়ি মারিয়া আগাছাগুলার শাখাচ্ছেদন করিয়া চলিতে লাগিল।

যাহারা ভাল খাইতে পারে, তাহাদিগকে সম্মুখে বসিয়া খাওয়াইতে কিরণ অত্যন্ত ভালবাসেন। ভাল খাইবার ক্ষমতাটা নীলকান্তের ছিল, সুখাদ্য দ্রব্য পুনঃপুনঃ খাইবার অনুরোধ তাহার নিকট কদাচ ব্যর্থ হইত না। এই জন্য কিরণ প্রায় তাহাকে ডাকিয়া নিজে থাকিয়া খাওয়াইতেন, এবং এই ব্রাহ্মণ-বালকের তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার দেখিয়া তিনি বিশেষ সুখ অনুভব করিতেন। সতীশ আসার পরে অনবসরবশতঃ নীলকান্তের আহারস্থলে প্রায় মাঝে মাঝে কিরণকে অনুপস্থিত থাকিতে হইত; পূর্ব্বে এরূপ ঘটনায় তাহার ভোজনের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইত না; সে সর্ব্বশেষে দুধের বাটি ধুইয়া তাহার জলসুদ্ধ খাইয়া তবে উঠিত,—কিন্তু আজ কাল কিরণ নিজে ডাকিয়া না খাওয়াইলে তাহার বক্ষ ব্যথিত তাহার মুখ বিস্বাদ হইয়া উঠিত, না খাইয়া উঠিয়া পড়িত; বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে দাসীকে বলিয়া যাইত, আমার ক্ষুধা নাই। মনে করিত, কিরণ সংবাদ পাইয়া এখনি অনুতপ্তচিত্তে তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইবেন, এবং খাইবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিবেন, সে তথাপি কিছুতেই সে অনুরোধ পালন করিবে না, বলিবে, আমার ক্ষুধা নাই। কিন্তু কিরণকে কেহ সংবাদও দেয় না, কিরণ তাহাকে ডাকিয়াও পাঠান না; খাবার যাহা থাকে দাসী খাইয়া ফেলে। তখন সে আপন শয়নগৃহের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া অন্ধকার বিছানার উপর পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া ফাঁপিয়া ফাঁপিয়া মুখের উপর সবলে বালিশ চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে থাকে; কিন্তু কি তাহার নালিশ, কাহার উপরে তাহার দাবী, কে তাহাকে সান্ত্বনা করিতে আসিবে! যখন কেহই আসে না

তখন স্নেহময়ী বিশ্বধাত্রী নিদ্রা আসিয়া ধীরে ধীরে কোমল করস্পর্শে এই মাতৃহীন ব্যথিত বালকের অভিমান শান্ত করিয়া দেন।

নীলকান্তের দৃঢ় ধারণা হইল সতীশ কিরণের কাছে তাহার নামে সর্ব্বদাই লাগায়; যে দিন কিরণ কোন কারণে গম্ভীর হইয়া থাকিতেন সে দিন নীলকান্ত মনে করিত, সতীশের চক্রান্তে কিরণ তাহারই উপর রাগ করিয়া আছেন।

এখন হইতে নীলকান্ত এক মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সর্ব্বদাই দেবতার নিকট প্রার্থনা করে, আর জন্মে আমি যেন সতীশ হই, এবং সতীশ যেন আমি হয়। সে জানিত ব্রাহ্মণের একান্তমনের অভিশাপ কখন নিষ্ফল হয় না, এই জন্য সে মনে মনে সতীশকে ব্রহ্মতেজে দগ্ধ করিতে গিয়া নিজে দগ্ধ হইতে থাকিত, এবং উপরের তলা হইতে সতীশ ও তাহার বৌঠাকুরাণীর উচ্ছ্বসিত উচ্চহাস্যমিশ্রিত পরিহাসকলরব শুনিতে পাইত।

নীলকান্ত স্পষ্টতঃ সতীশের কোনরূপ শত্রুতা করিতে সাহস করিত না, কিন্তু সুযোগমত তাহার ছোটখাট অসুবিধা ঘটাইয়া প্রীতিলাভ করিত। ঘাটের সোপানে সাবান রাখিয়া সতীশ যখন গঙ্গায় নামিয়া ডুব দিতে আরম্ভ করিত, তখন নীলকান্ত ফস্ করিয়া আসিয়া সাবান চুরি করিয়া লইত—সতীশ যথাকালে সাবানের সন্ধানে আসিয়া দেখিত সাবান নাই। একদিন নাহিতে নাহিতে হঠাৎ দেখিল তাহার বিশেষ সখের চিকণের কাজ করা জামাটি গঙ্গার জলে ভাসিয়া যাইতেছে, ভাবিল হাওয়ায় উড়িয়া গেছে, কিন্তু হাওয়াটা কোন দিক্ হইতে বহিল তাহা কেহ জানে না।

একদিন সতীশকে আমোদ দিবার জন্য কিরণ নীলকান্তকে ডাকিয়া তাহাকে যাত্রার গান গাহিতে বলিলেন—নীলকান্ত নিরুত্তর হইয়া রহিল। কিরণ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর আবার কি হলরে? নীলকান্ত তাহার জবাব দিল না। কিরণ পুনশ্চ বলিলেন, সেই গানটা গা না!—সে আমি ভুলে গেছি বলিয়া নীলকান্ত চলিয়া গেল।

অবশেষে কিরণের দেশে ফিরিবার সময় হইল। সকলেই প্রস্তুত হইতে লাগিল;—সতীশও সঙ্গে যাইবে। কিন্তু নীলকান্তকে কেহ কোন কথাই বলে না। সে সঙ্গে যাইবে কি থাকিবে সে প্রশ্নমাত্র কাহারও মনে উদয় হয় না।

কিরণ নীলকান্তকে সঙ্গে লইবার প্রস্তাব করিলেন তাহাতে শাশুড়ি স্বামী এবং দেবর সকলেই একবাক্যে আপত্তি করিয়া উঠিলেন, কিরণও তাঁহার সংকল্প ত্যাগ করিলেন। অবশেষে যাত্রার দুই দিন আগে ব্রাহ্মণ-বালককে ডাকিয়া কিরণ তাহাকে স্নেহবাক্যে স্বদেশে যাইতে উপদেশ করিলেন।

সে উপরি উপরি কয় দিন অবহেলার পর মিষ্টবাক্য শুনিতে পাইয়া আর থাকিতে পারিল না, একেবারে কাঁদিয়া উঠিল। কিরণেরও চোখ ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল;—যাহাকে চিরকাল কাছে রাখা যাইবে না, তাহাকে কিছুদিন আদর দিয়া তাহার মায়া বসিতে দেওয়া ভাল হয় নাই বলিয়া কিরণের মনে বড় অনুতাপ উপস্থিত হইল।

সতীশ কাছে উপস্থিত ছিল, সে অতবড় ছেলের কান্না দেখিয়া ভারি বিরক্ত

হইয়া বলিয়া উঠিল—আরে মোলো! কথা নাই বার্ত্তা নাই, একেবারে কাঁদিয়াই অস্থির!—

কিরণ এই কঠোর উক্তির জন্ত সতীশকে ভর্ৎসনা করিলেন; সতীশ কহিল, তুমি বোঝ না বৌদিদি, তুমি সকলকেই বড় বেশী বিশ্বাস কর; কোথাকার কে তাহার ঠিক নাই, এখানে আসিয়া দিব্য রাজার হালে আছে। আবার পুনর্ম্মূষিক হইবার আশঙ্কায় আজ মায়া-কান্না জুড়িয়াছে—ও বেশ জানে যে দু ফোঁটা চখের জল ফেলিলেই তুমি গলিয়া যাইবে।

নীলকান্ত তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল;—কিন্তু তাহার মনটা সতীশের কাল্পনিক মূর্ত্তিকে ছুরি হইয়া কাটিতে লাগিল, ছুঁচ হইয়া বিঁধিতে লাগিল, আগুন হইয়া জ্বালাইতে লাগিল, কিন্তু প্রকৃত সতীশের গায়ে একটি চিহ্নমাত্র বসিল না, কেবল তাহারই মর্ম্মস্থল হইতে রক্তপাত হইতে লাগিল।

কলিকাতা হইতে সতীশ একটি সৌখীন দোয়াতদান কিনিয়া আনিয়াছিল, তাহাতে দুই পাশে দুই ঝিনুকের নৌকার উপর দোয়াত বসান, এবং মাঝে একটা জর্ম্মণ রৌপ্যের হাঁস উন্মুক্ত চঞ্চুপুটে কলম লইয়া পাখা মেলিয়া বসিয়া আছে, সেটির প্রতি সতীশের অত্যন্ত যত্ন ছিল; প্রায় সে মাঝে মাঝে সিল্কের রুমাল দিয়া অতি সযত্নে সেটি ঝাড়পোঁচ করিত। কিরণ প্রায়ই পরিহাস করিয়া সেই রৌপ্যহংসের চঞ্চু-অগ্রভাগে অঙ্গুলির আঘাত করিয়া বলিতেন, ওরে রাজহংস, জন্মি দ্বিজবংশে এমন নৃশংস কেন হলি রে—এবং ইহাই উপলক্ষ করিয়া দেবরে তাঁহাতে হাস্যকৌতুকের বাগ্‌যুদ্ধ চলিত।

স্বদেশযাত্রার আগের দিন সকাল-বেলায় সে জিনিষটা খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। কিরণ হাসিয়া কহিলেন, ঠাকুরপো, তোমার রাজহংস তোমার দময়ন্তীর অন্বেষণে উড়িয়াছে।

কিন্তু সতীশ অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিল। নীলকান্তই যে সেটা চুরি করিয়াছে সে বিষয়ে তাহার সন্দেহমাত্র রহিল না—গতকল্য সন্ধ্যার সময় তাহাকে সতীশের ঘরের কাছে ঘুর ঘুর করিতে দেখিয়াছে এমন সাক্ষীও পাওয়া গেল।

সতীশের সম্মুখে অপরাধী আনীত হইল। সেখানে কিরণও উপস্থিত ছিলেন। সতীশ একেবারেই তাহাকে বলিয়া উঠিলেন, তুই আমার দোয়াত চুরি করে কোথায় রেখেছিস্, এনে দে!

নীলকান্ত নানা অপরাধে এবং বিনা অপরাধেও শরতের কাছে অনেক মার খাইয়াছে, এবং বরাবর প্রফুল্লচিত্তে তাহা বহন করিয়াছে। কিন্তু কিরণের সম্মুখে যখন তাহার নামে দোয়াৎ চুরির অপবাদ আসিল, তখন তাহার বড় বড় দুই চোখ আগুনের মত জ্বলিতে লাগিল; তাহার বুকের কাছটা ফুলিয়া কণ্ঠের কাছে ঠেলিয়া উঠিল; সতীশ আর একটা কথা বলিলেই সে তাহার দুই হাতের দশ নখ লইয়া ক্রুদ্ধ বিড়ালশাবকের মত সতীশের উপর গিয়া পড়িত।

তখন কিরণ তাহাকে পাশের ঘরে ডাকিয়া লইয়া মৃদুমিষ্টস্বরে বলিলেন—নীলু, যদি সেই দোয়াৎটা নিয়ে থাকিস্ আমাকে আস্তে আস্তে দিয়ে যা, তোকে কেউ কিছু বল্‌বে না!

নীলকান্তর চোখ ফাটিয়া টস্ টস্

করিয়া জল পড়িতে লাগিল, অবশেষে সে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কিরণ বাহিরে আসিয়া বলিলেন, নীলকান্ত কখনই চুরি করে নি!

শরৎ এবং সতীশ উভয়েই বলিতে লাগিলেন, নিশ্চয়, নীলকান্ত ছাড়া আর কেহই চুরি করেনি।

কিরণ সবলে বলিলেন, কখনই না।

শরৎ নীলকান্তকে ডাকিয়া সওয়াল করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিরণ বলিলেন, না, উহাকে এই চুরি সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে না।

সতীশ কহিলেন, উহার ঘর এবং বাক্স খুঁজিয়া দেখা উচিত।

কিরণ বলিলেন, তাহা যদি কর, তাহা হইলে তোমার সঙ্গে আমার জন্মশোধ আড়ি হইবে। নির্দ্দোষের প্রতি কোনরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিতে পাইবে না।

বলিতে বলিতে তাঁহার চোখের পাতা দুই ফোটা জলে ভিজিয়া উঠিল। তাহার পর সেই দুটি করুণ চক্ষুর অশ্রুজলের দোহাই মানিয়া নীলকান্তের প্রতি আর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হইল না।

নিরীহ আশ্রিত বালকের প্রতি এইরূপ অত্যাচারে কিরণের মনে অত্যন্ত দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি ভাল দুই যোড়া ফরাসডাঙ্গার ধুতি চাদর, দুইটি জামা, এক যোড়া নূতন জুতা এবং একখানি দশ টাকার নোট লইয়া সন্ধ্যাবেলায় নীলকান্তের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, নীলকান্তকে না বলিয়া সেই স্নেহ-উপহারগুলি আস্তে আস্তে তাহার বাক্সর মধ্যে রাখিয়া আসিবেন। টিনের বাক্সটিও তাঁহার দত্ত।

আঁচল হইতে চাবির গোচ্ছা লইয়া নিঃশব্দে সেই বাক্স খুলিলেন। কিন্তু তাঁহার উপহারগুলি ধরাইতে পারিলেন না। বাক্সর মধ্যে লাঠাই, কঞ্চি, কাঁচা আম কাটিবার জন্য ঘষা ঝিনুক, ভাঙ্গা গ্লাসের তলা প্রভৃতি নানা জাতীয় পদার্থ স্তূপাকারে রক্ষিত।

কিরণ ভাবিলেন, বাক্সটি ভাল করিয়া গুছাইয়া তাহার মধ্যে সকল জিনিষ ধরাইতে পারিবেন। সেই উদ্দেশে বাক্সটি খালি করিতে লাগিলেন। প্রথমে লাঠাই লাঠিম ছুরি ছড়ি প্রভৃতি বাহির হইতে লাগিল—তাহার পরে খান কয়েক ময়লা এবং কাচা কাপড় বাহির হইল, তাহার পরে সকলের নীচে হঠাৎ সতীশের সেই বহুযত্নের রাজহংসশোভিত দোয়াতদানটি বাহির হইয়া আসিল।

কিরণ আশ্চর্য্য হইয়া আরক্তিমমুখে অনেকক্ষণ সেটি হাতে করিয়া লইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে কখন্ নীলকান্ত পশ্চাৎ হইতে ঘরে প্রবেশ করিল তিনি তাহা জানিতেও পারিলেন না। নীলকান্ত সমস্তই দেখিল; মনে করিল কিরণ স্বয়ং চোরের মত তাহার চুরি ধরিতে আসিয়াছেন, এবং তাহার চুরিও ধরা পড়িয়াছে। সে যে সামান্য চোরের মত লোভে পড়িয়া চুরি করে নাই, সে যে কেবল প্রতিহিংসাসাধনের জন্য এ কাজ করিয়াছে, সে যে ঐ জিনিষটা গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিবে বলিয়াই ঠিক করিয়াছিল, কেবল এক মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতাবশতঃ ফেলিয়া না দিয়া নিজের বাক্সর মধ্যে পুরিয়াছে, সে সকল কথা সে কেমন করিয়া বুঝাইবে! সে চোর নয়, সে চোর নয়!

তবে সে কি? কেমন করিয়া বলিবে সে কি! সে চুরি করিয়াছে, কিন্তু সে চোর নহে; কিরণ যে তাহাকে চোর বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন এ নিষ্ঠুর অন্যায় সে কিছুতেই বুঝাইতেও পারিবে না, বহন করিতেও পারিবে না।

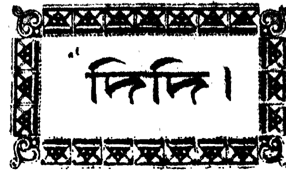
কিরণ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সেই দোয়াতদানটা বাক্সর ভিতরে রাখিলেন। চোরের মত তাহার উপরে ময়লা কাপড় চাপা দিলেন, তাহার উপর বালকের লাঠাই লাঠি লাঠিম ঝিনুক কাঁচের টুক্‌রা প্রভৃতি সমস্তই রাখিলেন, এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার উপহারগুলি ও দশ টাকার নোটটি সাজাইয়া রাখিলেন।

কিন্তু পরের দিন সেই ব্রাহ্মণ-বালকের কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না। গ্রামের লোকেরা বলিল, তাহাকে দেখে নাই; পুলিস বলিল তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। তখন শরৎ বলিল, এইবার নীলকণ্ঠের বাক্সটা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক্।

কিরণ জেদ্ করিয়া বলিলেন, সে কিছুতেই হইবে না।

বলিয়া বাক্সটি আপন ঘরে আনাইয়া দোয়াৎদানটি বাহির করিয়া গোপনে গঙ্গার জলে ফেলিয়া আসিলেন।

শরৎ সপরিবারে দেশে চলিয়া গেলেন; বাগান একদিনে শূন্য হইয়া গেল; কেবল নীলকান্তের সেই পোষা গ্রাম্য কুকুরটা আহার ত্যাগ করিয়া নদীর ধারে ধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া খুজিয়া খুজিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল।



প্রথম পরিচ্ছেদ।

পল্লীবাসিনী কোন এক হতভাগিনীর অন্যায়কারী অত্যাচারী স্বামীর দুষ্কৃতি সকল সবিস্তারে বর্ণন পূর্ব্বক প্রতিবেশিনী তারা অত্যন্ত সংক্ষেপে নিজের রায় প্রকাশ করিয়া কহিল এমন স্বামীর মুখে আগুন।

শুনিয়া জয়গোপাল বাবুর স্ত্রী শশি অত্যন্ত পীড়া অনুভব করিলেন;—স্বামী-জাতির মুখে চুরটের আগুন ছাড়া অন্য কোন প্রকার আগুন কোন অবস্থাতেই কামনা করা স্ত্রী-জাতিকে শোভা পায় না।

অতএব এ সম্বন্ধে তিনি কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ প্রকাশ করাতে কঠিন-হৃদয় তারা দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত কহিল এমন স্বামী থাকার চেয়ে সাতজন্ম বিধবা হওয়া ভাল। এই বলিয়া সে সভাভঙ্গ করিয়া চলিয়া গেল।

শশি মনে মনে কহিল, স্বামীর এমন কোন অপরাধ কল্পনা করিতে পারি না, যাহাতে তাঁহার প্রতি মনের ভাব এত কঠিন হইয়া উঠিতে পারে। এই কথা মনের মধ্যে আলোচনা করিতে করিতেই তাহার কোমল হৃদয়ের সমস্ত প্রীতিরস তাহার প্রবাসী স্বামীর অভিমুখে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; শয্যাতলে তাহার স্বামী যে অংশে শয়ন করিত সেই অংশের উপর বাহু প্রসারণ করিয়া পড়িয়া শূন্য বালিশকে চুম্বন করিল, বালিশের মধ্যে স্বামীর মাথার আঘ্রাণ অনুভব করিল এবং দ্বাররুদ্ধ করিয়া কাঠের

বাক্স হইতে স্বামীর একখানি বহুকালের লুপ্তপ্রায় ফটোগ্রাফ এবং হাতের লেখা চিঠিগুলি বাহির করিয়া বসিল। সেদিনকার নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন এইরূপে নিভৃত কক্ষে, নির্জ্জন চিন্তায়, পুরাতন স্মৃতিতে এবং বিষাদের অশ্রুজলে কাটিয়া গেল।

শশিকলা এবং জয়গোপালের যে নব-দাম্পত্য তাহা নহে। বাল্যকালে বিবাহ হইয়াছিল, ইতিমধ্যে সন্তানাদিও হইয়াছে। উভয়ে বহুকাল একত্র অবস্থান করিয়া নিতান্ত সহজ সাধারণ ভাবেই দিন কাটিয়াছে; কোন পক্ষেই অপরিমিত প্রেমোচ্ছ্বাসের কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই। প্রায় ষোল বৎসর একাদিক্রমে অবিচ্ছেদে যাপন করিয়া হঠাৎ কর্ম্মবশে তাহার স্বামী বিদেশে চলিয়া যাওয়ার পর শশির মনে একটা প্রবল প্রেমাবেগ জাগ্রৎ হইয়া উঠিল। বিরহের দ্বারা বন্ধনে যতই টান পড়িল কোমল হৃদয়ে প্রেমের ফাঁশ ততই শক্ত করিয়া আঁটিয়া ধরিল; ঢিলা অবস্থায় যাহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারে নাই এখন তাহার বেদনা টনটন্ করিতে লাগিল।

তাই আজ এতদিন পরে এত বয়সে ছেলের মা হইয়া শশি বসন্তমধ্যাহ্নে নির্জ্জন ঘরে বিরহশয্যায় উন্মেষিতযৌবনা নব-বধূর সুখস্বপ্ন দেখিতে লাগিল। যে প্রেম অজ্ঞাতভাবে জীবনের সম্মুখ দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, সহসা আজ তাহারই কলগীতিশব্দে জাগ্রৎ হইয়া মনে মনে তাহারই উজান বাহিয়া দুই তীরে বহু দূরে অনেক সোণার পুরী অনেক কুঞ্জবন দেখিতে লাগিল;—কিন্তু সেই অতীত সুখসম্ভাবনার মধ্যে এখন আর পদার্পণ করিবার স্থান নাই। মনে করিতে লাগিল এইবার যখন স্বামীকে নিকটে পাইব, তখন জীবনকে নীরস এবং বসন্তকে নিষ্ফল হইতে দিব না। কতদিন কতবার তুচ্ছতর্কে সামান্য কলহে স্বামীর প্রতি সে উপদ্রব করিয়াছে আজ অনুতপ্তচিত্তে একান্ত মনে সঙ্কল্প করিল আর কখনই সে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিবে না, স্বামীর ইচ্ছায় বাধা দিবে না, স্বামীর আদেশ পালন করিবে, প্রীতিপূর্ণ নম্রহৃদয়ে নীরবে স্বামীর ভালমন্দ সমস্ত আচরণ সহ্য করিবে; কারণ, স্বামী সর্ব্বস্ব, স্বামী প্রিয়তম, স্বামী দেবতা।

অনেকদিন পর্য্যন্ত শশিকলা তাহার পিতামাতার একমাত্র আদরের কন্যা ছিল। সেই জন্য, জয়গোপাল যদিও সামান্য চাক্‌রি করিত, তবু ভবিষ্যতের জন্য তাহার কিছু-মাত্র ভাবনা ছিল না। পল্লীগ্রামে রাজভোগে থাকিবার পক্ষে তাহার শ্বশুরের যথেষ্ট সম্পত্তি ছিল।

এমন সময় নিতান্ত অকালে প্রায় বৃদ্ধ-বয়সে শশিকলার পিতা কালীপ্রসন্নের একটি পুত্রসন্তান জন্মিল। সত্য কথা বলিতে কি, পিতামাতার এইরূপ অনপেক্ষিত অসঙ্গত অন্যায় আচরণে শশি মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল; জয়গোপালও সবিশেষ প্রীতিলাভ করে নাই।

অধিক বয়সের ছেলেটির প্রতি পিতা-মাতার স্নেহ অত্যন্ত ঘনীভূত হইয়া উঠিল। এই নবাগত, ক্ষুদ্রকায়, স্তন্যপিপাসু, নিদ্রাতুর শ্যালকটি অজ্ঞাতসারে দুই দুর্ব্বল হস্তের অতি ক্ষুদ্র বদ্ধমুষ্টির মধ্যে জয়গোপালের সমস্ত আশা ভরসা যখন অপহরণ করিয়া বসিল, তখন সে আসামের চা-বাগানে এক চাক্‌রি লইল।

নিকটবর্ত্তী স্থানে চাক্‌রির সন্ধান করিতে

সকলেই তাহাকে পীড়াপীড়ি করিয়াছিল— কিন্তু সর্ব্বসাধারণের উপর রাগ করিয়াই হউক, অথবা চা-বাগানে দ্রুত বাড়িয়া উঠিবার কোন উপায় জানিয়াই হউক, জয়গোপাল কাহারও কথায় কর্ণপাত করিল না; শশিকে সন্তানসহ তাহার বাপের বাড়ি রাখিয়া সে আসামে চলিয়া গেল। বিবাহিত জীবনে স্বামী স্ত্রীর এই প্রথম বিচ্ছেদ।

এই ঘটনায় শিশু ভ্রাতাটির প্রতি শশিকলার ভারি রাগ হইল। যে মনের আক্ষেপ মুখ ফুটিয়া বলিবার যো নাই, তাহারই আক্রোশটা সব চেয়ে বেশী হয়। ক্ষুদ্র ব্যক্তিটি আরামে স্তন্যপান করিতে ও চক্ষু মুদিয়া নিদ্রা দিতে লাগিল এবং তাহার বড় ভগিনীটি দুধ গরম, ভাত ঠাণ্ডা, ছেলের ইস্কুলে যাওয়ার দেরি প্রভৃতি নানা উপলক্ষে নিশিদিন মান অভিমান করিয়া অস্থির হইল এবং অস্থির করিয়া তুলিল।

অল্পদিনের মধ্যেই ছেলেটির মার মৃত্যু হইল; মরিবার পূর্ব্বে জননী তাহার কন্যার হাতে শিশুপুত্রটিকে সমর্পণ করিয়া দিয়া গেলেন।

তখন অনতিবিলম্বেই সেই মাতৃহীন ছেলেটি অনায়াসেই তাহার দিদির হৃদয় অধিকার করিয়া লইল। হুহুঙ্কার শব্দ পূর্ব্বক সে যখন তাঁহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পরম আগ্রহের সহিত দন্তহীন ক্ষুদ্র মুখের মধ্যে তাঁহার মুখ চক্ষু নাসিকা সমস্তটা গ্রাস করিবার চেষ্টা করিত, ক্ষুদ্র মুষ্টির মধ্যে তাঁহার কেশগুচ্ছ লইয়া কিছুতেই দখল ছাড়িতে চাহিত না, সূর্য্যোদয় হইবার পূর্ব্বেই জাগিয়া উঠিয়া গড়াইয়া তাঁহার গায়ের কাছে আসিয়া কোমল স্পর্শে তাঁহাকে পুলকিত করিয়া মহাকলরব আরম্ভ করিয়া দিত; যখন ক্রমে সে তাঁহাকে জিজি এবং জিজিমা বলিয়া ডাকিতে লাগিল এবং কাজকর্ম্ম ও অবসরের সময় নিষিদ্ধ কার্য্য করিয়া, নিষিদ্ধ খাদ্য খাইয়া, নিষিদ্ধ স্থানে গমনপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি বিধিমত উপদ্রব আরম্ভ করিয়া দিল, তখন শশি আর থাকিতে পারিলেন না। এই স্বেচ্ছাচারী ক্ষুদ্র অত্যাচারীর নিকটে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া দিলেন। ছেলেটির মা ছিল না বলিয়া তাহার প্রতি তাঁহার আধিপত্য ঢের বেশী হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

ছেলেটির নাম হইল নীলমণি। তাহার বয়স যখন দুই বৎসর তখন তাহার পিতার কঠিন পীড়া হইল। অতি শীঘ্র চলিয়া আসিবার জন্য জয়গোপালের নিকট পত্র গেল। জয়গোপাল যখন বহু চেষ্টায় ছুটি লইয়া আসিয়া পৌঁছিল তখন কালীপ্রসন্নের মৃত্যুকাল উপস্থিত।

মৃত্যুর পূর্ব্বে কালীপ্রসন্ন, নাবালক ছেলেটির তত্ত্বাবধানের ভার জয়গোপালের প্রতি অর্পণ করিয়া তাঁহার বিষয়ের সিকি অংশ কন্যার নামে লিখিয়া দিলেন।

সুতরাং বিষয়-রক্ষার জন্য জয়গোপালকে কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আসিতে হইল।

অনেক দিনের পরে স্বামীস্ত্রীর পুনর্ম্মিলন হইল। একটা জড়পদার্থ ভাঙ্গিয়া গেলে আবার ঠিক তাহার খাঁজে খাঁজে মিলাইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু দুটি মানুষকে যেখানে

বিচ্ছিন্ন করা হয়, দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে আর ঠিক সেখানে রেখায় রেখায় মেলে না ;— কারণ, মন জিনিষটা সজীব পদার্থ ; নিমেষে নিমেষে তাহার পরিণতি এবং পরিবর্ত্তন।

শশির পক্ষে এই নূতন মিলনে নূতন ভাবের সঞ্চার হইল। সে যেন তাহার স্বামীকে ফিরিয়া বিবাহ করিল। পুরাতন দাম্পত্যের মধ্যে চিরাভ্যাসবশতঃ যে এক অসাড়তা জন্মিয়া গিয়াছিল, বিরহের আকর্ষণে তাহা অপসৃত হইয়া সে তাহার স্বামীকে যেন পূর্ব্বাপেক্ষা সম্পূর্ণতর ভাবে প্রাপ্ত হইল,—মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, যেমন দিনই আসুক্, যতদিনই যাক্, স্বামীর প্রতি এই দীপ্ত প্রেমের উজ্জ্বলতাকে কখনই ম্লান হইতে দিব না।

নূতন মিলনে জয়গোপালের মনের অবস্থাটা অন্যরূপ। পূর্ব্বে যখন উভয়ে অবিচ্ছেদে একত্র ছিল যখন স্ত্রীর সহিত তাহার সমস্ত স্বার্থের এবং বিচিত্র অভ্যাসের ঐক্যবন্ধন ছিল, স্ত্রী তখন জীবনের একটি নিত্য সত্য হইয়াছিল,—তাহাকে বাদ দিতে গেলে দৈনিক অভ্যাসজালের মধ্যে সহসা অনেকখানি ফাঁক পড়িত। এই জন্য বিদেশে গিয়া জয়গোপাল প্রথম প্রথম অগাধ জলের মধ্যে পড়িয়াছিল। কিন্তু ক্রমে তাহার সেই অভ্যাস-বিচ্ছেদের মধ্যে নূতন অভ্যাসের তালি লাগিয়া গেল।

কেবল তাহাই নহে। পূর্ব্বে নিতান্ত নিশ্চেষ্ট নিশ্চিন্তভাবে তাহার দিন কাটিয়া যাইত। মাঝে দুই বৎসর, অবস্থা-উন্নতিচেষ্টা তাহার মনে এমন প্রবলভাবে জাগিয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার মনের সম্মুখে আর কিছুই ছিল না। এই নূতন নেশার তীব্রতার তুলনায় তাহার পূর্ব্বজীবন বস্তুহীন ছায়ার মত দেখাইতে লাগিল। স্ত্রীলোকের প্রকৃতিতে প্রধান পরিবর্ত্তন ঘটায় প্রেম, এবং পুরুষের ঘটায় দুশ্চেষ্টা।

জয়গোপাল দুই বৎসর পরে আসিয়া অবিকল তাহার পূর্ব্ব স্ত্রীটিকে ফিরিয়া পাইল না। তাহার স্ত্রীর জীবনে শিশু শ্যালকটি একটা নূতন পরিসর বৃদ্ধি করিয়াছে। এই অংশটি তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিচিত,—এই অংশে স্ত্রীর সহিত তাহার কোন যোগ নাই। স্ত্রী তাহাকে আপনার এই শিশুস্নেহের ভাগ দিবার অনেক চেষ্টা করিত— কিন্তু ঠিক কৃতকার্য্য হইত কি না, বলিতে পারি না।

শশি নীলমণিকে কোলে করিয়া আনিয়া হাস্যমুখে তাহার স্বামীর সম্মুখে ধরিত— নীলমণি প্রাণপণে শশির গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কাঁধে মুখ লুকাইত, কোন প্রকার কুটুম্বিতার খাতির মানিত না। শশির ইচ্ছা, তাহার এই ক্ষুদ্র ভ্রাতাটির যত প্রকার মন ভুলাইবার বিদ্যা আয়ত্ত আছে, সবগুলি জয়গোপালের নিকট প্রকাশ হয় ; কিন্তু জয়গোপালও সে জন্য বিশেষ আগ্রহ অনুভব করিত না এবং শিশুটিও বিশেষ উৎসাহ দেখাইত না। জয়গোপাল কিছুতেই বুঝিতে পারিত না এই কৃশকায় বৃহৎমস্তক গম্ভীরমুখ শ্যামবর্ণ ছেলেটার মধ্যে এমন কি আছে যে জন্য তাহার প্রতি এতটা স্নেহের অপব্যয় করা হইতেছে।

ভালবাসার ভাবগতিক মেয়েরা খুব চট্ করিয়া বোঝে। শশি অবিলম্বেই বুঝিল জয়গোপাল নীলমণির প্রতি বিশেষ অনুরক্ত নহে। তখন ভাইটিকে সে বিশেষ সাবধানে আড়াল করিয়া রাখিত—স্বামীর স্নেহহীন বিরাগদৃষ্টি হইতে তাহাকে তফাতে রাখিতে

চেষ্টা করিত। এইরূপে ছেলেটি তাহার গোপন যত্নের ধন, তাহার একলার স্নেহের সামগ্রী হইয়া উঠিল। সকলেই জানেন, স্নেহ যত গোপনের, যত নির্জ্জনের হয়, ততই প্রবল হইতে থাকে।

নীলমণি কাঁদিলে জয়গোপাল অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিত—এই জন্য শশি তাহাকে তাড়াতাড়ি বুকের মধ্যে চাপিয়া সমস্ত প্রাণ দিয়া তাহার কান্না থামাইবার চেষ্টা করিত;—বিশেষতঃ নীলমণির কান্নায় যদি রাত্রে তাহার স্বামীর ঘুমের ব্যাঘাত হইত, এবং স্বামী এই ক্রন্দনপরায়ণ ছেলেটার প্রতি অত্যন্ত হিংস্রভাবে ঘৃণা প্রকাশ পূর্ব্বক জর্জ্জরচিত্তে গর্জ্জন করিয়া উঠিত তখন শশি যেন অপরাধিনীর মত সঙ্কুচিত শশব্যস্ত হইয়া পড়িত, তৎক্ষণাৎ তাহাকে কোলে করিয়া দূরে লইয়া গিয়া একান্ত সানুনয় স্নেহের স্বরে সোণা আমার, ধন আমার, মাণিক আমার বলিয়া ঘুম পাড়াইতে থাকিত।

ছেলেতে ছেলেতে নানা উপলক্ষে ঝগড়া বিবাদ হইয়াই থাকে। পূর্ব্বে এরূপ স্থলে শশি নিজের ছেলেদের দণ্ড দিয়া ভাইয়ের পক্ষ অবলম্বন করিত, কারণ, তাহার মা ছিল না। এখন বিচারকের সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডবিধির পরিবর্ত্তন হইল। এখন সর্ব্বদাই নিরপরাধে এবং অবিচারে নীলমণিকে কঠিন দণ্ড ভোগ করিতে হইত। সেই অন্যায় শশির বক্ষে শেলের মত বাজিত; তাই সে দণ্ডিত ভ্রাতাকে ঘরে লইয়া গিয়া তাহাকে মিষ্ট দিয়া খেলেনা দিয়া আদর করিয়া চুমো খাইয়া শিশুর আহত হৃদয়ে যথাসাধ্য সান্ত্বনা বিধান করিবার চেষ্টা করিত।

ফলতঃ দেখা গেল, শশি নীলমনিকে যতই ভালবাসে জয়গোপাল নীলমণির প্রতি ততই বিরক্ত হয়; আবার জয়গোপাল নীলমণির প্রতি যতই বিরাগ প্রকাশ করে, শশি তাহাকে ততই স্নেহসুধায় অভিষিক্ত করিয়া দিতে থাকে।

জয়গোপাল লোকটা কখনও তাহার স্ত্রীর প্রতি কোনরূপ কঠোর ব্যবহার করে না এবং শশি নীরবে নম্রভাবে প্রীতির সহিত তাহার স্বামীর সেবা করিয়া থাকে, কেবল এই নীলমণিকে লইয়া ভিতরে ভিতরে উভয়ে উভয়কে অহরহঃ আঘাত দিতে লাগিল।

এইরূপ নীরব দ্বন্দ্বের গোপন আঘাত প্রতিঘাত প্রকাশ্য বিবাদের অপেক্ষা ঢের বেশী দুঃসহ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

নীলমণির সমস্ত শরীরের মধ্যে মাথাটাই সর্ব্বপ্রধান ছিল। দেখিলে মনে হইত বিধাতা যেন একটা সরু কাঠির মধ্যে ফুঁ দিয়া তাহার ডগার উপরে একটা বড় বুদ্বুদ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ডাক্তাররাও মাঝে মাঝে আশঙ্কা প্রকাশ করিত ছেলেটি এইরূপ বুদ্বুদের মতই ক্ষণভঙ্গুর ক্ষণস্থায়ী হইবে। অনেক দিন পর্য্যন্ত সে কথা কহিতে এবং চলিতে শেখে নাই। তাহার বিষণ্ণ গম্ভীর মুখ দেখিয়া বোধ হইত, তাহার পিতামাতা তাঁহাদের অধিক বয়সের সমস্ত চিন্তাভার এই ক্ষুদ্র শিশুর মাথার উপরে চাপাইয়া দিয়া গেছেন।

দিদির যত্নে ও সেবায় নীলমণি তাহার বিপদের কাল উত্তীর্ণ হইয়া ছয় বৎসরে পা দিল।

কার্ত্তিকমাসে ভাইফোঁটার দিনে নূতন জামা, চাদর এবং একখানি লালপেড়ে ধুতি পরাইয়া বাবু সাজাইয়া নীলমণিকে শশি ভাইফোঁটা দিতেছেন এমন সময়ে পূর্ব্বোক্ত স্পষ্টভাষিণী প্রতিবেশিনী তারা আসিয়া কথায় কথায় শশির সহিত ঝগড়া বাধাইয়া দিল।

সে কহিল, গোপনে ভাইয়ের সর্ব্বনাশ করিয়া ঘটা করিয়া ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিবার কোন ফল নাই।

শুনিয়া শশি বিস্ময়ে ক্রোধে বেদনায় বজ্রাহত হইল। অবশেষে শুনিতে পাইল, তাহারা স্বামী স্ত্রীতে পরামর্শ করিয়া নাবালক নীলমণির সম্পত্তি খাজনার দায়ে নিলাম করাইয়া তাহার স্বামীর পিস্‌তুতো ভাইয়ের নামে বেনামী করিয়া কিনিতেছে।

শুনিয়া শশি অভিশাপ দিল, যাহারা এতবড় মিথ্যা কথা রটনা করিতে পারে তাহাদের মুখে কুষ্ঠ হউক্।

এই বলিয়া সরোদনে স্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া জনশ্রুতির কথা তাহাকে জানাইল।

জয়গোপাল কহিল আজকালকার দিনে কাহাকেও বিশ্বাস করিবার যো নাই। উপেন আমার আপন পিস্‌তুতো ভাই, তাহার উপরে বিষয়ের ভার দিয়া আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলাম—সে কখন্ গোপনে খাজনা বাকী ফেলিয়া মহল হাসিল্‌পুর নিজে কিনিয়া লইয়াছে আমি জানিতেও পারি নাই।

শশি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, নালিশ করিবে না?

জয়গোপাল কহিল, ভাইয়ের নামে নালিশ করি কি করিয়া? এবং নালিশ করিয়াও ত কোন ফল নাই, কেবল অর্থ নষ্ট।

স্বামীর কথা বিশ্বাস করা শশির পরম কর্ত্তব্য, কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না। তখন এই সুখের সংসার এই প্রেমের গার্হস্থ্য সহসা তাহার নিকট অত্যন্ত বিকট বীভৎস আকার ধারণ করিয়া দেখা দিল। যে সংসারকে আপনার পরম আশ্রয় বলিয়া মনে হইত—হঠাৎ দেখিল সে একটা নিষ্ঠুর স্বার্থের ফাঁদ—তাহাদের দুটি ভাইবোনকে চারিদিক্ হইতে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। সে একা স্ত্রীলোক, অসহায় নীলমণিকে কেমন করিয়া রক্ষা করিবে ভাবিয়া কূল কিনারা পাইল না। যতই চিন্তা করিতে লাগিল, ততই ভয়ে এবং ঘৃণায় এবং বিপন্ন বালক ভ্রাতাটির প্রতি অপরিসীম স্নেহে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল সে যদি উপায় জানিত তবে লাট্ সাহেবের নিকট নিবেদন করিয়া, এমন কি, মহারাণীর নিকট পত্র লিখিয়া তাহার ভাইয়ের সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিত। মহারাণী কখনই নীলমণির বার্ষিক সাত শ আটান্ন টাকার মুনফার হাসিলপুর মহল বিক্রয় হইতে দিতেন না।

এইরূপে শশি যখন একেবারে মহারাণীর নিকট দরবার করিয়া তাহার পিস্‌তুতো দেবরকে সম্পূর্ণ জব্দ করিয়া দিবার উপায়চিন্তা করিতেছে তখন হঠাৎ নীলমণির জ্বর আসিয়া আক্ষেপসহকারে মূর্চ্ছা হইতে লাগিল।

জয়গোপাল এক গ্রাম্য নেটিভ ডাক্তারকে ডাকিল। শশি ভাল ডাক্তারের জন্য অনুরোধ করাতে জয়গোপাল বলিল, কেন মতিলাল মন্দ ডাক্তার কি!

শশি তখন তাঁহার পায়ে পড়িল, মাথার দিব্য দিল ; জয়গোপাল বলিল, আচ্ছা সহর হইতে ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইতেছি।

শশি নীলমণিকে কোলে করিয়া বুকে করিয়া পড়িয়া রহিল। নীলমণিও তাহাকে এক দণ্ড চোখের আড়াল হইতে দেয় না ; পাছে ফাঁকি দিয়া পালায় এই ভয়ে তাহাকে জড়াইয়া থাকে ; এমন কি, ঘুমাইয়া পড়িলেও আঁচলটি ছাড়ে না।

সমস্ত দিন এমনি ভাবে কাটিলে সন্ধ্যার পর জয়গোপাল আসিয়া বলিল—সহরে ডাক্তার বাবুকে পাওয়া গেল না, তিনি দূরে কোথায় রোগী দেখিতে গিয়াছেন। ইহাও বলিল, মকদ্দমা উপলক্ষে আমাকে আজই অন্যত্র যাইতে হইতেছে ; আমি মতিলালকে বলিয়া গেলাম সে নিয়মিত আসিয়া রোগী দেখিয়া যাইবে।

রাত্রে নীলমণি ঘুমের ঘোরে প্রলাপ বকিল। প্রাতঃকালেই শশি কিছুমাত্র বিচার না করিয়া রোগী ভ্রাতাকে লইয়া নৌকা চড়িয়া একবারে সহরে গিয়া ডাক্তারের বাড়ি উপস্থিত হইল। ডাক্তার বাড়িতে আছেন—সহর ছাড়িয়া কোথাও যান নাই। ভদ্রস্ত্রীলোক দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বাসা ঠিক করিয়া একটি প্রাচীনা বিধবার তত্ত্বাবধানে শশিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন এবং ছেলেটির চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন।

পরদিনই জয়গোপাল আসিয়া উপস্থিত। ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া স্ত্রীকে তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত ফিরিতে অনুমতি করিল।

স্ত্রী কহিল, আমাকে যদি কাটিয়া ফেল তবু আমি এখন ফিরিব না। তোমরা আমার নীলমণিকে মারিয়া ফেলিতে চাও—উহার মা নাই, বাপ নাই, আমি ছাড়া উহার আর কেহই নাই—আমি উহাকে রক্ষা করিব।

জয়গোপাল রাগিয়া কহিল, তবে এইখানেই থাক, তুমি আর আমার ঘরে ফিরিয়ো না।

শশি তখন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়া কহিল ঘর তোমার কি ! আমার ভাইয়েরই ত ঘর।

জয়গোপাল কহিল—আচ্ছা সে দেখা যাইবে !

পাড়ার লোকে এই ঘটনার কিছুদিন খুব আন্দোলন করিতে লাগিল। প্রতিবেশিনী তারা কহিল, স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করিতে হয় ঘরে বসিয়া কর না বাপু। ঘর ছাড়িয়া যাইবার আবশ্যক কি ! হাজার হোক্ স্বামী ত বটে।

সঙ্গে যাহা টাকা ছিল সমস্ত খরচ করিয়া গহনাপত্র বেচিয়া শশি তাহার ভাইকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিল। তখন সে খবর পাইল, দ্বারিগ্রামে তাহাদের যে বড় জোৎ ছিল, যে জোতের উপরে তাহাদের বাড়ি, নানা রূপে যাহার আয় প্রায় বার্ষিক দেড় হাজার টাকা হইবে সেই জোৎটি জমিদারের সহিত যোগ করিয়া জয়গোপাল নিজের নামে খারিজ করিয়া লইয়াছে। এখন বিষয়টি সমস্তই তাহাদের—তাহার ভাইয়ের নহে।

ব্যামো হইতে সারিয়া উঠিয়া নীলমণি করুণস্বরে বলিতে লাগিল, দিদি, বাড়ি চল। সেখানে তাহার সঙ্গী ভাগিনেয়দের জন্ত তাহার মন-কেমন করিতেছে। তাই বারংবার বলিল, দিদি আমাদের সেই ঘরে চল

না, দিদি! শুনিয়া দিদি কাঁদিতে লাগিল। আমাদের ঘর আর কোথায়!

কিন্তু কেবল কাঁদিয়া কোন ফল নাই—তখন পৃথিবীতে দিদি ছাড়া তাহার ভাইয়ের আর কেহ ছিল না। ইহা ভাবিয়া চোখের জল মুছিয়া শশি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ তারিণী বাবুর অন্তঃপুরে গিয়া তাঁহার স্ত্রীকে ধরিল।

ডেপুটি বাবু জয়গোপালকে চিনিতেন। ভদ্রঘরের স্ত্রী ঘরের বাহির হইয়া বিষয় সম্পত্তি লইয়া স্বামীর সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে চাহে ইহাতে শশির প্রতি তিনি বিশেষ বিরক্ত হইলেন। তাহাকে ভুলাইয়া রাখিয়া তৎক্ষণাৎ জয়গোপালকে পত্র লিখিলেন। জয়গোপাল শ্যালকসহ তাহার স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক নৌকায় তুলিয়া বাড়ি লইয়া গিয়া উপস্থিত করিল।

স্বামী স্ত্রীতে, দ্বিতীয় বিচ্ছেদের পর, পুনশ্চ এই দ্বিতীয় বার মিলন হইল! প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ!

অনেক দিন পরে ঘরে ফিরিয়া পুরাতন সহচরদিগকে পাইয়া নীলমণি বড় আনন্দে খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার সেই নিশ্চিন্ত আনন্দ দেখিয়া অন্তরে অন্তরে শশির হৃদয় বিদীর্ণ হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

শীতকালে ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব মফঃস্বল পর্য্যবেক্ষণে বাহির হইয়া শীকার সন্ধানে গ্রামের মধ্যে তাঁবু ফেলিয়াছেন। গ্রামের পথে সাহেবের সঙ্গে নীলমণির সাক্ষাৎ হয়। অন্য বালকেরা তাঁহাকে দেখিয়া চাণক্য শ্লোকের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক নখী দন্তী শৃঙ্গী প্রভৃতির সহিত সাহেবকেও যোগ করিয়া যথেষ্ট দূরে সরিয়া গেল। কিন্তু সুগম্ভীর প্রকৃতি নীলমণি অটল কৌতূহলের সহিত প্রশান্তভাবে সাহেবকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল।

সাহেব সকৌতুকে কাছে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি পাঠশালায় পড়?—

বালক নীরবে মাথা নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কোন পুস্তক পড়িয়া থাক?—

নীলমণি পুস্তক শব্দের অর্থ না বুঝিয়া নিস্তব্ধভাবে ম্যাজিষ্ট্রেটের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ম্যাজিষ্ট্রর সাহেবের সহিত এই পরিচয়ের কথা নীলমণি অত্যন্ত উৎসাহের সহিত তাহার দিদির নিকট বর্ণনা করিল।

মধ্যাহ্নে চাপকান প্যাণ্ট্‌লুন পাগ্‌ড়ি পরিয়া জয়গোপাল ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে সেলাম করিতে গিয়াছে। অর্থী প্রত্যর্থী চাপ্‌রাশী কন্‌ষ্টেবলে চারিদিক্ লোকারণ্য। সাহেব গরমের ভয়ে তাম্বুর বাহিরে খোলা ছায়ায় ক্যাম্পটেবিল পাতিয়া বসিয়াছেন এবং জয়গোপালকে চৌকিতে বসাইয়া তাহাকে স্থানীয় অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। জয়গোপাল তাহার গ্রামবাসী সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে এই গৌরবের আসন অধিকার করিয়া মনে মনে স্ফীত হইতেছিল, এবং মনে করিতেছিল এই সময়ে চক্রবর্ত্তীরা এবং নন্দীরা কেহ আসিয়া দেখিয়া যায় ত বেশ হয়!

এমন সময় নীলমণিকে সঙ্গে করিয়া

অবগুণ্ঠনাবৃত একটি স্ত্রীলোক একেবারে ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, সাহেব, তোমার হাতে আমার এই অনাথ ভাইটিকে সমর্পণ করিলাম, তুমি ইহাকে রক্ষা কর!

সাহেব তাঁহার সেই পূর্ব্বপরিচিত বৃহৎ-মস্তক গম্ভীরপ্রকৃতি বালকটিকে দেখিয়া এবং স্ত্রীলোকটিকে ভদ্রস্ত্রীলোক বলিয়া অনুমান করিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন—কহিলেন, আপনি তাঁবুতে প্রবেশ করুন।

স্ত্রীলোকটি কহিল, আমার যাহা বলিবার আছে আমি এইখানেই বলিব।

জয়গোপাল বিবর্ণমুখে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। কৌতূহলী গ্রামের লোকেরা পরম কৌতুক অনুভব করিয়া চারিদিকে ঘেঁষিয়া আসিবার উপক্রম করিল। সাহেব বেত উচাঁইবামাত্র সকলে দৌড় দিল।

তখন শশি তাহার ভ্রাতার হাত ধরিয়া সেই পিতৃমাতৃহীন বালকের সমস্ত ইতিহাস আদ্যোপান্ত বলিয়া গেল। জয়গোপাল মধ্যে মধ্যে বাধা দিবার উপক্রম করাতে ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ রক্তবর্ণ মুখে গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—চুপ্‌ রও! এবং বেত্রাগ্র দ্বারা, তাহাকে চৌকি ছাড়িয়া সম্মুখে দাঁড়াইতে নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

জয়গোপাল মনে মনে শশির প্রতি গর্জ্জন করিতে করিতে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নীলমণি দিদির অত্যন্ত কাছে ঘেঁষিয়া অবাক্‌ হইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল।

শশির কথা শেষ হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ জয়গোপালকে গুটিকতক প্রশ্ন করিলেন এবং তাহার উত্তর শুনিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শশিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন—বাছা, এ মকদ্দমা যদিও আমার কাছে উঠিতে পারে না তথাপি তুমি নিশ্চিন্ত—থাক—এ সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য আমি করিব। তুমি তোমার ভাইটিকে লইয়া নির্ভয়ে বাড়ি ফিরিয়া যাইতে পার!

শশি কহিল—সাহেব, যতদিন নিজের বাড়ি ও না ফিরিয়া পায় ততদিন আমার ভাইকে বাড়ি লইয়া যাইতে আমি সাহস করি না। এখন নীলমণিকে তুমি নিজের কাছে না রাখিলে ইহাকে কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না।

সাহেব কহিলেন, তুমি কোথায় যাইবে।

শশি কহিল, আমি আমার স্বামীর ঘরে ফিরিয়া যাইব, আমার কোন ভাবনা নাই।

সাহেব ঈষৎ হাসিয়া অগত্যা এই গলায় মাদুলি পরা কৃশকায় শ্যামবর্ণ গম্ভীর প্রশান্ত মৃদুস্বভাব বাঙ্গালীর ছেলেটিকে সঙ্গে লইতে রাজি হইলেন।

তখন শশি বিদায় লইবার সময় বালক তাহার আঁচল চাপিয়া ধরিল। সাহেব কহিলেন, বাবা তোমার কোন ভয় নেই—এস!

ঘোম্‌টার মধ্য হইতে অবিরল অশ্রুমোচন করিতে করিতে শশি কহিল—লক্ষ্মী ভাই, যা ভাই—আবার তোর দিদির সঙ্গে দেখা হবে!

এই বলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া কোন মতে আপন অঞ্চল ছাড়াইয়া তাড়াতাড়ি সে চলিয়া গেল; অমনি সাহেব নীলমণিকে বাম হস্তের দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধরিলেন, সে দিদিগো দিদি করিয়া উচ্চৈঃ-

স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল ;—শশি একবার ফিরিয়া চাহিয়া দূর হইতে প্রসারিত দক্ষিণ হস্তে তাহার প্রতি নীরবে সান্ত্বনা প্রেরণ করিয়া বিদীর্ণ হৃদয়ে চলিয়া গেল।

আবার সেই বহুকালের চিরপরিচিত পুরাতন ঘরে স্বামী স্ত্রীর মিলন হইল। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ!

কিন্তু এ মিলন অধিক দিন স্থায়ী হইল না। কারণ, ইহার অনতিকাল পরেই একদিন প্রাতঃকালে গ্রামবাসিগণ সংবাদ পাইল যে, রাত্রে শশি ওলাউঠো রোগে আক্রান্ত হইয়া মরিয়াছে—এবং রাত্রেই তাহার দাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেছে।

কেহ এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিল না। কেবল সেই প্রতিবেশিনী তারা মাঝে মাঝে গর্জ্জন করিয়া উঠিতে চাহিত, সকলে চুপ্ চুপ্ করিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দিত।

বিদায়কালে শশি ভাইকে কথা দিয়া গিয়াছিল আবার দেখা হইবে—সে কথা কোনখানে রক্ষা হইয়াছে জানি না।

মধ্যবর্ত্তিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

নিবারণের সংসার নিতান্তই সচরাচর রকমের, তাহাতে কাব্যরসের কোন নামগন্ধ ছিল না। জীবনে উক্ত রসের যে কোন আবশ্যক আছে এমন কথা তাহার মনে কখনও উদয় হয় নাই। যেমন পরিচিত পুরাতন চটিযোড়াটার মধ্যে পাদুটো দিব্য নিশ্চিন্তভাবে প্রবেশ করে, এই পুরাতন পৃথিবীটার মধ্যে নিবারণ সেইরূপ আপনার চিরাভ্যস্ত স্থানটি অধিকার করিয়া থাকে, সে সম্বন্ধে ভ্রমেও কোনরূপ চিন্তা, তর্ক বা তত্ত্বালোচনা করে না।

নিবারণ প্রাতঃকালে উঠিয়া গলির ধারে গৃহদ্বারে খোলাগায়ে বসিয়া অত্যন্ত নিরুদ্বিগ্ন ভাবে হুঁকাটি লইয়া তামাক খাইতে থাকে। পথ দিয়া লোকজন যাতায়াত করে, গাড়িঘোড়া চলে, বৈষ্ণব-ভিখারী গান গাহে, পুরাতন বোতল-সংগ্রহকারী হাঁকিয়া চলিয়া যায় ; এই সমস্ত চঞ্চল দৃশ্য মনকে লঘুভাবে ব্যাপৃত রাখে এবং যে দিন কাঁচা আম অথবা তপ্‌সী মাছওয়ালা আসে, সে দিন অনেক দরদাম করিয়া কিঞ্চিৎ বিশেষরূপ রন্ধনের আয়োজন হয়। তাহার পর যথাসময়ে তেল মাখিয়া স্নান করিয়া আহারান্তে দড়িতে ঝুলান চাপকানটি পরিয়া, এক ছিলিম তামাক পানের সহিত নিঃশেষ পূর্ব্বক আর একটি পান মুখে পুরিয়া, আপিসে যাত্রা করে। আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া সন্ধ্যাবেলাটা প্রতিবেশী রামলোচন ঘোষের বাড়িতে প্রশান্ত গম্ভীরভাবে সন্ধ্যাযাপন করিয়া আহারান্তে রাত্রে শয়নগৃহে স্ত্রী হরসুন্দরীর সহিত সাক্ষাৎ হয়।

সেখানে মিত্রদের ছেলের বিবাহে আইবড়ভাত পাঠান, নবনিযুক্ত ঝির অবাধ্যতা, ছেঁচ্‌কিবিশেষে ফোড়নবিশেষের উপযোগিতা সম্বন্ধে যে সমস্ত সংক্ষিপ্ত সমালোচনা চলে, তাহা এ পর্য্যন্ত কোন কবি ছন্দোবদ্ধ করেন নাই এবং সে জন্য নিবারণের মনে কখনও ক্ষোভের উদয় হয় নাই।

ইতিমধ্যে ফাল্গুনমাসে হরসুন্দরীর সঙ্কট পীড়া উপস্থিত হইল। জ্বর আর কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না। ডাক্তার যতই কুইনাইন্ দেয়, বাধাপ্রাপ্ত প্রবল স্রোতের ন্যায় জ্বরও তত উর্দ্ধে চড়িতে থাকে। এমন বিশ দিন, বাইশ দিন, চল্লিশ দিন পর্যন্ত ব্যাধি চলিল।

নিবারণের আপিস্ বন্ধ; রামলোচনের বৈকালিক সভায় বহুকাল আর সে যায় না; কি যে করে তাহার ঠিক নাই।

একবার শয়ন-গৃহে গিয়া রোগীর অবস্থা জানিয়া আসে, একবার বাহিরের বারান্দায় বসিয়া চিন্তিত মুখে তামাক টানিতে থাকে।

দুই বেলা ডাক্তার বৈদ্য পরিবর্ত্তন করে এবং যে যাহা বলে সেই ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাহে।

ভালবাসার এইরূপ অব্যবস্থিত শুশ্রূষা সত্ত্বেও চল্লিশ দিনে হরসুন্দরী ব্যাধিমুক্ত হইল। কিন্তু এমনি দুর্ব্বল এবং শীর্ণ হইয়া গেল যে, শরীরটি যেন বহুদূর হইতে অতি ক্ষীণস্বরে "আছি" বলিয়া সাড়া দিতেছে মাত্র।

তখন বসন্তকালে দক্ষিণের হাওয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং উষ্ণ নিশীথের চন্দ্রালোকও সীমন্তিনীদের উন্মুক্ত শয়নকক্ষে নিঃশব্দপদসঞ্চারে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে।

হরসুন্দরীর ঘরের নীচেই প্রতিবেশীদের খিড়কীর বাগান। সেটা যে বিশেষ কিছু সুদৃশ্য রমণীয় স্থান তাহা বলিতে পারি না। এক সময় কে একজন সক করিয়া গোটাকতক ক্রোটোন রোপণ করিয়াছিল, তার পরে আর সে দিকে বড় একটা দৃক্‌পাত করে নাই। শুষ্ক ডালের মাচার উপর কুষ্মাণ্ডলতা উঠিয়াছে; বৃদ্ধ কুলগাছের তলায় বিষম জঙ্গল; রান্নাঘরের পাশে প্রাচীর ভাঙ্গিয়া কতকগুলো ইঁট জড় হইয়া আছে এবং তাহারই সহিত দগ্ধাবশিষ্ট পাথুরে কয়লা এবং ছাই দিন দিন রাশীকৃত হইয়া উঠিতেছে।

কিন্তু বাতায়নতলে শয়ন করিয়া এই বাগানের দিকে চাহিয়া হরসুন্দরী প্রতি-মুহূর্ত্তে যে একটি আনন্দরস পান করিতে লাগিল, তাহার অকিঞ্চিৎকর জীবনে এমন সে আর কখনো করে নাই। গ্রীষ্মকালে স্রোতোবেগ মন্দ হইয়া ক্ষুদ্র গ্রাম্যনদীটি যখন বালুশয্যার উপরে শীর্ণ হইয়া আসে, তখন সে যেমন অত্যন্ত স্বচ্ছতা লাভ করে; তখন যেমন প্রভাতের সূর্য্যালোক তাহার তলদেশে পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়া থাকে, বায়ু-স্পর্শ তাহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত করিয়া তোলে, এবং আকাশের তারা তাহার স্ফটিক দর্পণের উপর সুখস্মৃতির ন্যায় অতি সুস্পষ্টভাবে প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনি হরসুন্দরীর ক্ষীণ জীবনতন্তুর উপর আনন্দময়ী প্রকৃতির প্রত্যেক অঙ্গুলী যেন স্পর্শ করিতে লাগিল এবং অন্তরের মধ্যে যে একটি সঙ্গীত উঠিতে লাগিল তাহার ঠিক ভাবটি সে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিল না।

এমন সময় তাহার স্বামী যখন পাশে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিত, "কেমন আছ" তখন তাহার চোকে যেন জল উছলিয়া উঠিত। রোগশীর্ণ মুখে তাহার চোখ দুটি অত্যন্ত বড় দেখায়, সেই বড় বড় প্রেমার্দ্র সকৃতজ্ঞ চোখ স্বামীর মুখের দিকে তুলিয়া শীর্ণহস্তে স্বামীর হস্ত ধরিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিত, স্বামীরও অন্তরেও যেন কোথা

হইতে একটা নূতন অপরিচিত আনন্দরশ্মি প্রবেশ লাভ করিত।

এই ভাবে কিছু দিন যায়। একদিন রাত্রে ভাঙ্গা-প্রাচীরের উপরিবর্ত্তী খর্ব্ব অশথগাছের কম্পমান শাখান্তরাল হইতে একখানি বৃহৎ চাঁদ উঠিতেছে এবং সন্ধ্যা-বেলাকার গুমট্ ভাঙ্গিয়া হঠাৎ একটা নিশাচর বাতাস জাগ্রৎ হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময় নিবারণের চুলের মধ্যে অঙ্গুলি বুলাইতে বুলাইতে হরসুন্দরী কহিল, "আমাদের ত ছেলেপুলে কিছুই হইল না, তুমি আর একটি বিবাহ কর !"

হরসুন্দরী কিছুদিন হইতে এই কথা ভাবিতেছিল। মনে যখন একটা প্রবল আনন্দ, একটা বৃহৎ প্রেমের সঞ্চার হয়, তখন মানুষ মনে করে আমি সব করিতে পারি। তখন হঠাৎ একটা আত্মবিসর্জ্জনের ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে। স্রোতের উচ্ছ্বাস যেমন কঠিন তটের উপর আপনাকে সবেগে মূর্চ্ছিত করে, তেমনি প্রেমের আবেগ, আনন্দের উচ্ছ্বাস একটা মহৎ ত্যাগ, একটা বৃহৎ দুঃখের উপর আপনাকে যেন নিক্ষেপ করিতে চাহে।

সেইরূপ অবস্থায় অত্যন্ত পুলকিত চিত্তে একদিন হরসুন্দরী স্থির করিলেন, আমার স্বামীর জন্য আমি খুব বড় একটা কিছু করিব। কিন্তু হায়, যতখানি সাধ ততখানি সাধ্য কাহার আছে। হাতের কাছে কি আছে, কি দেওয়া যায়! ঐশ্বর্য্য নাই, বুদ্ধি নাই, ক্ষমতা নাই, শুধু একটা প্রাণ আছে, সেটাও যদি কোথাও দিবার থাকে এখনি দিয়া ফেলি, কিন্তু তাহারই বা মূল্য কি?

আর স্বামীকে যদি দুগ্ধফেনের মত শুভ্র, নবনীর মত কোমল, শিশুকন্দর্পের মত সুন্দর একটি স্নেহের পুত্তলি সন্তান দিতে পারিতাম! কিন্তু প্রাণপণে ইচ্ছা করিয়া মরিয়া গেলেও ত সে হইবে না। তখন মনে হইল, স্বামীর একটি বিবাহ দিতে হইবে। ভাবিল, স্ত্রীরা ইহাতে এত কাতর হয় কেন, এ কাজ ত কিছুই কঠিন নহে! স্বামীকে যে ভালবাসে, সপত্নীকে ভালবাসা তাহার পক্ষে কি এমন অসাধ্য! মনে করিয়া বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল।

প্রস্তাবটা প্রথম যখন শুনিল, নিবারণ হাসিয়া উড়াইয়া দিল, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বারেও কর্ণপাত করিল না। স্বামীর এই অসম্মতি, এই অনিচ্ছা দেখিয়া হরসুন্দরীর বিশ্বাস এবং সুখ যতই বাড়িয়া উঠিল তাহার প্রতিজ্ঞাও ততই দৃঢ় হইতে লাগিল।

এ দিকে নিবারণ যত বারংবার এই অনুরোধ শুনিল, ততই ইহার অসম্ভাব্যতা তাহার মন হইতে দূর হইল, এবং গৃহদ্বারে বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে সন্তানপরিবৃত গৃহের সুখময় চিত্র তাহার মনে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল।

একদিন নিজেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া কহিল, "বুড়াবয়সে একটি কচি খুঁকিকে বিবাহ করিয়া আমি মানুষ করিতে পারিব না।"

হরসুন্দরী কহিল, "সে জন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না। মানুষ করিবার ভার আমার উপর রহিল।" বলিতে বলিতে এই সন্তানহীনা রমণীর মনে একটি কিশোরবয়স্কা, সুকুমারী, লজ্জাশীলা, মাতৃক্রোড় হইতে সদ্যোবিচ্যুতা নববধূর মুখচ্ছবি উদয় হইল এবং হৃদয় স্নেহে বিগলিত হইয়া গেল।

নিবারণ কহিল, "আমার আপিস

আছে, কাজ আছে, তুমি আছ, কচি মেয়ের আবদার শুনিবার অবসর আমি পাইব না।”

হরসুন্দরী বারবার করিয়া কহিল তাহার জন্য কিছুমাত্র সময় নষ্ট করিতে হইবে না এবং অবশেষে পরিহাস করিয়া কহিল—“আচ্ছা গো, তখন দেখিব কোথায় বা তোমার কাজ থাকে, কোথায় বা আমি থাকি, আর কোথায় বা তুমি থাক!”

নিবারণ সে কথার উত্তরমাত্র দেওয়া আবশ্যক বোধ করিল না, শাস্তির স্বরূপ হরসুন্দরীর কপোলে হাসিয়া তর্জ্জনী আঘাত করিল। এই ত গেল ভূমিকা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

একটি নলকপরা অশ্রুভরা ছোটখাটো মেয়ের সহিত নিবারণের বিবাহ হইল, তাহার নাম শৈলবালা।

নিবারণ ভাবিল, নামটি বড় মিষ্ট এবং মুখখানিও বেশ ঢলঢল। তাহার ভাবখানা, তাহার চেহারাখানি, তাহার চলাফেরা একটু বিশেষ মনোযোগ করিয়া চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু সে আর কিছুতেই হইয়া উঠে না। উল্টিয়া এমন ভাব দেখাইতে হয় যে, ঐত এককোঁটা মেয়ে, উহাকে লইয়া ত বিষম বিপদে পড়িলাম, কোনমতে পাশ কাটাইয়া আমার বয়সোচিত কর্ত্তব্যক্ষেত্রের মধ্যে গিয়া পড়িলে যেন পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

হরসুন্দরী নিবারণের এই বিষম বিপদ্‌গ্রস্ত ভাব দেখিয়া মনে মনে বড় আমোদ বোধ করিত। এক এক দিন হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিত, “আহা পালাও কোথায়! ঐটুকু মেয়ে, ওত আর তোমাকে খাইয়া ফেলিবে না।”—

নিবারণ দ্বিগুণ শশব্যস্ত ভাব ধারণ করিয়া বলিত, “আরে রোস রোস, আমার একটু বিশেষ কাজ আছে।”—বলিয়া যেন পালাইবার পথ পাইত না। হরসুন্দরী হাসিয়া দ্বার আটক করিয়া বলিত, আজ ফাঁকি দিতে পারিবে না। অবশেষে নিবারণ নিতান্তই নিরুপায় হইয়া কাতরভাবে বসিয়া পড়িত।

হরসুন্দরী তাহার কাণের কাছে বলিত, “আহা পরের মেয়েকে ঘরে আনিয়া অমন হতশ্রদ্ধা করিতে নাই।”

এই বলিয়া শৈলবালাকে ধরিয়া নিবারণের বাম পাশে বসাইয়া দিত, এবং জোর করিয়া ঘোমটা খুলিয়া ও চিবুক ধরিয়া, তাহার আনতমুখ তুলিয়া নিবারণকে বলিত, “আহা কেমন চাঁদের মত মুখখানি দেখ দেখি!”—

কোন দিন বা উভয়কে ঘরে বসাইয়া কাজ আছে বলিয়া উঠিয়া যাইত এবং বাহির হইতে ঝনাৎ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিত। নিবারণ নিশ্চয় জানিত দু'টি কৌতূহলী চক্ষু কোন-না কোন ছিদ্রে সংলগ্ন হইয়া আছে—অতিশয় উদাসীনভাবে পাশ ফিরিয়া নিদ্রার উপক্রম করিত, শৈলবালা ঘোমটা টানিয়া গুটিসুটি মারিয়া মুখ ফিরিয়া একটা কোণের মধ্যে মিলাইয়া থাকিত।

অবশেষে হরসুন্দরী নিতান্ত না পারিয়া হাল ছাড়িয়া দিল, কিন্তু খুব বেশী দুঃখিত হইল না।

হরসুন্দরী যখন হাল ছাড়িল, তখন স্বয়ং নিবারণ হাল ধরিল। এ বড় কৌতূহল, এ বড় রহস্য! একটুক্‌রা হীরক পাইলে তাহাকে নানাভাবে নানাদিকে ফিরাইয়া দেখিতে ইচ্ছা করে, আর এ একটি ক্ষুদ্র সুন্দর মানুষের মন—বড় অপূর্ব্ব! ইহাকে কত রকম করিয়া স্পর্শ করিয়া, সোহাগ করিয়া, অন্তরাল হইতে, সম্মুখ হইতে, পার্শ্ব হইতে দেখিতে হয়! কখন একবার কাণের দুলে দোল দিয়া, কখনো ঘোমটা একটুখানি টানিয়া তুলিয়া, কখনো বিদ্যুতের মত সহসা সচকিতে, কখনো নক্ষত্রের মত দীর্ঘকাল একদৃষ্টে নবনব সৌন্দর্য্যের সীমা আবিষ্কার করিতে হয়।

ম্যাক্‌মোরান্ কোম্পানির আপিসের হেডবাবু শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্রের অদৃষ্টে এমন অভিজ্ঞতা ইতিপূর্ব্বে হয় নাই। সে যখন প্রথম বিবাহ করিয়াছিল তখন বালক ছিল, যখন যৌবন লাভ করিল তখন স্ত্রী তাহার নিকট চিরপরিচিত, বিবাহিত জীবন চিরাভ্যস্ত। হরসুন্দরীকে অবশ্যই সে ভাল বাসিত, কিন্তু কখনই তাহার মনে ক্রমে ক্রমে প্রেমের সচেতন সঞ্চার হয় নাই।

একেবারে পাকা আম্রের মধ্যেই যে পতঙ্গ জন্মলাভ করিয়াছে, যাহাকে কোন কালে রস অন্বেষণ করিতে হয় নাই, অল্পে অল্পে রসাস্বাদ করিতে হয় নাই, তাহাকে একবার বসন্ত কালের বিকশিত পুষ্পবনের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হোক্ দেখি—বিকচোন্মুখ গোলাপের আধখোলা মুখটির কাছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার আগ্রহ! একটুকু যে সৌরভ পায়, একটুকু যে মধুর আস্বাদ লাভ করে তাহাতে তাহার কি নেশা!

নিবারণ প্রথমটা কখন বা একটা গাউন্‌পরা কাঁচের পুতুল, কখনো বা এক শিশি এসেন্স, কখনো বা কিছু মিষ্টদ্রব্য কিনিয়া আনিয়া শৈলবালাকে গোপনে দিয়া যাইত। এমনি করিয়া একটুখানি ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হয়। অবশেষে কখন্ একদিন হরসুন্দরী গৃহকার্য্যের অবকাশে আসিয়া দ্বারের ছিদ্র দিয়া দেখিল, নিবারণ এবং শৈলবালা বসিয়া কড়ি লইয়া দশ পঁচিশ খেলিতেছে।

বুড়া বয়সের এই খেলা বটে! নিবারণ সকালে আহারাদি করিয়া যেন আপিসে বাহির হইল কিন্তু আপিসে না গিয়া কখন্ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে! এ প্রবঞ্চনার কি আবশ্যক ছিল! হঠাৎ একটা জ্বলন্ত বজ্রশলাকা দিয়া কে যেন হরসুন্দরীর চোক খুলিয়া দিল, সেই তীব্রতাপে চোকের জল বাষ্প হইয়া শুকাইয়া গেল!

হরসুন্দরী মনে মনে কহিল, আমিই ত উহাকে ঘরে আনিলাম, আমিই ত মিলন করাইয়া দিলাম, তবে আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার কেন, যেন আমি উঁহাদের সুখের কাঁটা।

হরসুন্দরী শৈলবালাকে গৃহকার্য্য শিখাইত। একদিন নিবারণ মুখ ফুটিয়া বলিল, "ছেলেমানুষ, উহাকে তুমি বড় বেশী পরিশ্রম করাইতেছ, উহার শরীর তেমন সবল নহে।"

বড় একটা তীব্র উত্তর হরসুন্দরীর মুখের কাছে আসিয়াছিল, কিন্তু কিছু বলিল না, চুপ করিয়া গেল।

সেই অবধি বউকে কোন গৃহকার্য্যে হাত দিতে দিত না। রাঁধাবাড়া, দেখাশুনা সমস্ত কাজ নিজে করিত। এমন হইল,

শৈলবালা আর নড়িয়া বসিতে পারে না, হরসুন্দরী দাসীর মত তাহার সেবা করে এবং স্বামী বিদূষকের মত তাহার মনোরঞ্জন করে। সংসারের কাজ করা, পরের দিকে তাকানো যে, জীবনের কর্ত্তব্য এ শিক্ষাই তাহার হইল না।

হরসুন্দরী যে নীরবে দাসীর মত কাজ করিতে লাগিল তাহার মধ্যে ভারি একটা গর্ব্ব আছে। তাহার মধ্যে ন্যূনতা এবং দীনতা নাই। সে কহিল, তোমারা দুই শিশুতে মিলিয়া খেলা কর সংসারের সমস্ত ভার আমি লইলাম!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

হায়, আজ কোথায় সে বল, যে বলে হরসুন্দরী মনে করিয়াছিল স্বামীর জন্য চিরজীবনকাল সে আপনার প্রেমের দাবীর অর্দ্ধেক অংশ অকাতরে ছাড়িয়া দিতে পারিবে। হঠাৎ এক দিন পূর্ণিমার রাত্রে জীবনে যখন জোয়ার আসে, তখন দুই কূল প্লাবিত করিয়া মানুষ মনে করে, আমার কোথাও সীমা নাই। তখন যে একটা বৃহৎ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে, জীবনের সুদীর্ঘ ভাটার সময় সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে তাহার সমস্ত প্রাণে টান পড়ে। হঠাৎ ঐশ্বর্য্যের দিনে লেখনীর এক আঁচড়ে যে দানপত্র লিখিয়া দেয়, চির-দারিদ্র্যের দিনে পলে পলে তিল তিল করিয়া তাহা শোধ করিতে হয়। তখন বুঝা যায়, মানুষ বড় দীন, হৃদয় বড় দুর্ব্বল, তাহার ক্ষমতা অতি যৎসামান্য।

দীর্ঘ রোগাবসানে ক্ষীণ, রক্তহীন, পাণ্ডু কলেবরে হরসুন্দরী সে দিন শুক্ল দ্বিতীয়ার চাঁদের মত একটি শীর্ণ রেখামাত্র ছিল; সংসারে নিতান্ত লঘু হইয়া ভাসিতেছিল। মনে হইয়াছিল, আমার যেন কিছুই না হইলেও চলে। ক্রমে শরীর বলী হইয়া উঠিল, রক্তের তেজ বাড়িতে লাগিল, তখন হরসুন্দীর মনে কোথা হইতে এক দল শরীক আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহারা উচ্চৈঃস্বরে কহিল, তুমি ত ত্যাগপত্র লিখিয়া বসিয়া আছ, কিন্তু আমাদের দাবী আমরা ছাড়িব না।

হরসুন্দরী যেদিন প্রথম পরিষ্কাররূপে আপন অবস্থা বুঝিতে পারিল, সেদিন নিবারণ ও শৈলবালাকে আপন শয়নগৃহ ছাড়িয়া দিয়া ভিন্ন গৃহে একাকিনী গিয়া শয়ন করিল।

আট বৎসর বয়সে বাসররাত্রে যে শয্যায় প্রথম শয়ন করিয়াছিল আজ সাতাশ বৎসর পরে সেই শয্যা ত্যাগ করিল। প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া এই সধবা রমণী যখন অসহ্য হৃদয়ভার লইয়া তাহার নূতন বৈধব্যশয্যার উপরে আসিয়া পড়িল, তখন গলির অপর প্রান্তে একজন সৌখিন যুবা বেহাগ রাগিণীতে মালিনীর গান গাহিতেছিল, আর একজন বাঁয়া তব্‌লায় সঙ্গৎ করিতেছিল এবং শ্রোতৃবন্ধুগণ সমের কাছে হা-হাঃ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল।

তাহার সেই গান সেই নিস্তব্ধ জ্যোৎস্না-রাত্রে পার্শ্বের ঘরে মন্দ শুনাইতেছিল না। তখন বালিকা শৈলবালার ঘুমে চোখ ঢুলিয়া পড়িতেছিল, আর নিবারণ তাহার কাণের কাছে মুখ রাখিয়া ধীরে ধীরে ডাকিতেছিল, সই!

লোকটা ইতিমধ্যে বঙ্কিম বাবুর চন্দ্রশেখর পড়িয়া ফেলিয়াছে এবং দুই একজন আধুনিক কবির কাব্যও শৈলবালাকে পড়িয়া শুনাইয়াছে।

নিবারণের জীবনের নিম্নস্তরে যে যৌবন-উৎস বরাবর চাপা পড়িয়াছিল, আঘাত পাইয়া হঠাৎ বড় অসময়ে তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কেহই সেজন্য প্রস্তুত ছিল না, এই হেতু অকস্মাৎ তাহার বুদ্ধিশুদ্ধি এবং সংসারের সমস্ত বন্দোবস্ত উল্টাপাল্টা হইয়া গেল। সে বেচারা কোন কালে জানিত না, মানুষের ভিতরে এমন সকল উপদ্রবজনক পদার্থ থাকে, এমন সকল দুর্দ্দাম দুরন্ত শক্তি, যাহা সমস্ত হিসাব কিতাব, শৃঙ্খলা সামঞ্জস্য একেবারে নয়ছয় করিয়া দেয়।

কেবল নিবারণ নহে, হরসুন্দরীও একটা নূতন বেদনার পরিচয় পাইল। এ কিসের আকাঙ্ক্ষা, এ কিসের দুঃসহ যন্ত্রণা! মন এখন যাহা চায়, কখনও ত তাহা চাহেও নাই, কখনও ত তাহা পায়ও নাই। যখন ভদ্রভাবে নিবারণ নিয়মিত আপিসে যাইত, যখন নিদ্রার পূর্ব্বে কিয়ৎকালের জন্য গয়লার হিসাব, দ্রব্যের মহার্ঘতা এবং লৌকিকতার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা চলিত, তখন ত এই অন্তর্বিপ্লবের কোন সূত্রপাতমাত্র ছিল না। ভাল বাসিত বটে, কিন্তু তাহার ত কোন উজ্জ্বলতা, কোন উত্তাপ ছিল না। সে ভালবাসা অপ্রজ্বলিত ইন্ধনের মত ছিল মাত্র।

আজ তাহার মনে হইল, জীবনের সফলতা হইতে যেন চিরকাল কে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছে। তাহার হৃদয় যেন চির দিন উপবাসী হইয়া আছে। তাহার এই নারীজীবন বড় দারিদ্র্যেই কাটিয়াছে। সে কেবল হাটবাজার পানমসলা তরিতরকারীর ঝঞ্ঝাট লইয়াই সাতাশটা অমূল্য বৎসর দাসীবৃত্তি করিয়া কাটাইল, আর আজ জীবনের মধ্যপথে আসিয়া দেখিল, তাহারই শয়নকক্ষের পার্শ্বে এক গোপন মহামহৈশ্বর্য্য ভাণ্ডারের কুলুপ খুলিয়া একটি ক্ষুদ্র বালিকা একেবারে রাজরাজেশ্বরী হইয়া বসিল। নারী দাসী বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে নারী রাণীও বটে। কিন্তু ভাগাভাগী করিয়া একজন নারী হইল দাসী, আর একজন নারী হইল রাণী; তাহাতে দাসীর গৌরব গেল, রাণীর সুখ রহিল না।

কারণ, শৈলবালাও নারী-জীবনের যথার্থ সুখের স্বাদ পাইল না। এত অবিশ্রাম আদর পাইল যে, ভালবাসিবার আর মুহূর্ত্ত অবসর রহিল না। সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হইয়া, সমুদ্রের মধ্যে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া বোধ করি নদীর একটি মহৎ চরিতার্থতা আছে, কিন্তু সমুদ্র যদি জোয়ারের টানে আকৃষ্ট হইয়া ক্রমাগতই নদীর উন্মুখীন হইয়া রহে, তবে নদী কেবল নিজের মধ্যেই নিজে স্ফীত হইতে থাকে। সংসার তাহার সমস্ত আদর সোহাগ লইয়া দিবারাত্রি শৈলবালার দিকে অগ্রসর হইয়া রহিল, তাহাতে শৈলবালার আত্মাদর অতিশয় উত্তুঙ্গ হইয়া উঠিতে লাগিল, সংসারের প্রতি তাহার ভালবাসা পড়িতে পাইল না। সে জানিল, আমার জন্যই সমস্ত, এবং আমি কাহারও জন্যও নহি। এ অবস্থায় যথেষ্ট অহঙ্কার আছে কিন্তু পরিতৃপ্তি কিছুই নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

একদিন ঘনঘোর মেঘ করিয়া বর্ষা আসিয়াছে। এমনি অন্ধকার করিয়াছে যে, ঘরের মধ্যে কাজকর্ম্ম করা অসাধ্য। বাহিরে ঝুপঝুপ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। কুলগাছের তলায় লতাগুল্মের জঙ্গল প্রায় নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে এবং প্রাচীরের পার্শ্ব-বর্ত্তী নালা দিয়া ঘোলা জলস্রোত কল্‌কল্ শব্দে বহিয়া চলিয়াছে। হরসুন্দরী আপনার নূতন শয়ন-গৃহের নির্জ্জন অন্ধকারে জানলার কাছে চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

এমন সময় নিবারণ চোরের মত ধীরে ধীরে দ্বারের কাছে প্রবেশ করিল, ফিরিয়া যাইবে কি অগ্রসর হইবে ভাবিয়া পাইল না। হরসুন্দরী তাহা লক্ষ্য করিল কিন্তু একটি কথাও কহিল না।

তখন নিবারণ হঠাৎ একেবারে তীরের মত হরসুন্দরীর পার্শ্বে গিয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল—গোটাকতক গহনার আবশ্যক হইয়াছে। জান ত অনেকগুলো দেনা হইয়া পড়িয়াছে, দেনদার বড়ই অপমান করিতেছে—কিছু বন্ধক রাখিতে হইবে—শীঘ্রই ছাড়াইয়া লইতে পারিব।

হরসুন্দরী কোন উত্তর দিল না, নিবারণ চোরের মত দাঁড়াইয়া রহিল। অবশেষে পুনশ্চ কহিল, তবে আজ কি হইবে না?—

হরসুন্দরী কহিল—"না।"

ঘরে প্রবেশ করাও যেমন শক্ত, ঘর হইতে অবিলম্বে বাহির হওয়াও তেমনি কঠিন। নিবারণ একটু এদিকে ওদিকে চাহিয়া ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "তবে অন্যত্র চেষ্টা দেখিগে যাই"—বলিয়া প্রস্থান করিল।

ঋণ কোথায় এবং কোথায় গহনা বন্ধক দিতে হইবে হরসুন্দরী তাহা সমস্তই বুঝিল। বুঝিল নববধূ পূর্ব্বরাত্রে তাহার এই হতবুদ্ধি পোষা পুরুষটিকে অত্যন্ত ঝঙ্কার দিয়া বলিয়াছিল, "দিদির সিন্ধুকভরা গহনা, আর আমি বুঝি একখানি পরিতে পাই না?"

নিবারণ চলিয়া গেলে ধীরে ধীরে উঠিয়া লোহার সিন্ধুক খুলিয়া একে একে সমস্ত গহনা বাহির করিল। শৈলবালাকে ডাকিয়া প্রথমে আপনার বিবাহের বেণারসী সাড়িখানি পরাইল, তাহার পর তাহার আপাদমস্তক এক একখানি করিয়া গহনায় ভরিয়া দিল। ভাল করিয়া চুল বাঁধিয়া দিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া দেখিল বালিকার মুখখানি বড় সুমিষ্ট, একটি সদ্যঃপক্ক সুগন্ধ ফলের মত নিটোল, রসপূর্ণ। শৈলবালা যখন ঝম্‌ঝম্ শব্দ করিয়া চলিয়া গেল, সেই শব্দ বহুক্ষণ ধরিয়া হরসুন্দরীর শিরায় রক্তের মধ্যে ঝিম্‌ঝিম্ করিয়া বাজিতে লাগিল। মনে মনে কহিল, আজ আর কি লইয়া তোতে আমাতে তুলনা হইবে? কিন্তু এক সময়ে আমারও ত ঐ বয়স ছিল, আমিও ত অমনি যৌবনের শেষরেখা পর্য্যন্ত ভরিয়া উঠিয়াছিলাম; তবে আমাকে সে কথা কেহ জানায় নি কেন? কখন্ সে দিন আসিল এবং কখন্ সে দিন গেল তাহা একবার সংবাদও পাইলাম না! কিন্তু কি গর্ব্বে, কি গৌরবে, কি তরঙ্গ তুলিয়াই শৈলবালা চলিয়াছে।

হরসুন্দরী যখন কেবলমাত্র ঘরকন্নাই জানিত তখন এই গহনাগুলি তাহার কাছে কত দামী ছিল! তখন কি নির্ব্বোধের মত

এ সমস্ত এমন করিয়া এক মুহূর্ত্তে হাত ছাড়া করিতে পারিত? এখন ঘরকন্না ছাড়া আর একটা বড় কিসের পরিচয় পাইয়াছে, এখন গহনার দাম, ভবিষ্যতের হিসাব সমস্ত তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে।

আর শৈলবালা সোণামাণিক ঝক্‌মক্‌ করিয়া শয়নগৃহে চলিয়া গেল, একবার মুহূর্ত্তের তরে ভাবিলও না হরসুন্দরী তাহাকে কতখানি দিল। সে জানিল চতুর্দ্দিক্‌ হইতে সমস্ত সেবা, সমস্ত সম্পদ, সমস্ত সৌভাগ্য স্বাভাবিক নিয়মে তাহার মধ্যে আসিয়া পরিসমাপ্ত হইবে, কারণ, সে হইল শৈলবালা, সে হইল সই!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এক এক জন লোক স্বপ্নাবস্থায় নির্ভীক ভাবে অত্যন্ত সঙ্কটের পথ দিয়া চলিয়া যায়, মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করে না। অনেক জাগ্রৎ মানুষেরও তেমনি চির-স্বপ্নাবস্থা উপস্থিত হয়, কিছুমাত্র জ্ঞান থাকে না, বিপদের সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া নিশ্চিন্ত মনে অগ্রসর হইতে থাকে, অবশেষে নিদারুণ সর্ব্বনাশের মধ্যে গিয়া জাগ্রৎ হইয়া উঠে।

আমাদের ম্যাক্‌মোরান্‌ কোম্পানির হেড্‌বাবুটিরও সেই দশা। শৈলবালা তাহার জীবনের মাঝখানে একটা প্রবল আবর্ত্তের মত ঘুরিতে লাগিল, এবং বহুদূর হইতে বিবিধ মহার্ঘ পদার্থ আকৃষ্ট হইয়া তাহার মধ্যে বিলুপ্ত হইতে লাগিল। কেবল যে নিবারণের মনুষ্যত্ব এবং মাসিক বেতন, হরসুন্দরীর সুখসৌভাগ্য এবং বসনভূ- তাহা নহে; সঙ্গে সঙ্গে ম্যাক্‌মোরান্‌ কোম্পানির ক্যাশ তহবিলেও গোপনে টান পড়িল। তাহার মধ্য হইতেও দুটা একটা করিয়া তোড়া অদৃশ্য হইতে লাগিল। নিবারণ স্থির করিত আগামী মাসের বেতন হইতে আস্তে আস্তে শোধ করিয়া রাখিব। কিন্তু আগামী মাসের বেতনটি হাতে আসিবামাত্র সেই আবর্ত্ত হইতে টান পড়ে এবং শেষে দুআনীটি পর্য্যন্ত চকিতের মত চিক্‌মিক্‌ করিয়া বিদ্যুৎ-বেগে অন্তর্হিত হয়।

শেষে একদিন ধরা পড়িল। পুরুষানুক্রমের চাকুরি; সাহেব বড় ভালবাসে; তহবিল পূরণ করিয়া দিবার জন্য দুইদিনমাত্র সময় দিল।

কেমন করিয়া যে ক্রমে ক্রমে আড়াই হাজার টাকার তহবিল ভাঙ্গিয়াছে তাহা নিবারণ নিজেই বুঝিতে পারিল না। একেবারে পাগলের মত হইয়া হরসুন্দরীর কাছে গেল, বলিল, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে!"

হরসুন্দরী সমস্ত শুনিয়া একেবারে পাংশুবর্ণ হইয়া গেল!

নিবারণ কহিল, "শীঘ্র গহনাগুলা বাহির কর।" হরসুন্দরী কহিল, "সে ত আমি সমস্তই ছোটবৌকে দিয়াছি।"

নিবারণ নিতান্ত শিশুর মত অধীর হইয়া বলিতে লাগিল, "কেন দিলে ছোটবৌকে? কেন দিলে? কে তোমাকে দিতে বলিল?"

হরসুন্দরী তাহার প্রকৃত উত্তর না দিয়া কহিল, "তাহাতে ক্ষতি কি হইয়াছে? সে ত আর জলে পড়ে নাই?"

ভীরু নিবারণ কাতর স্বরে কহিল, "তবে যদি তুমি কোন ছুতা করিয়া তাহার কাছ হইতে বাহির করিতে পার! কিন্তু

আমার মাথা খাও বলিয়ো না যে, আমি চাহিতেছি, কিংবা কি জন্য চাহিতেছি !"

তখন হরসুন্দরী মর্ম্মান্তিক বিরক্তি ও ঘৃণাভরে বলিয়া উঠিল, "এই কি তোমার ছল ছুতা করিবার সোহাগ দেখাইবার সময় ! চল !" বলিয়া স্বামীকে লইয়া ছোট-বৌয়ের ঘরে প্রবেশ করিল।

ছোট-বৌ কিছু বুঝিল না। সে সকল কথাতেই বলিল, "সে আমি কি জানি !"

সংসারের কোন চিন্তা যে তাহাকে কখন ভাবিতে হইবে এমন কথা কি তাহার সহিত ছিল ? সকলে আপনার ভাবনা ভাবিবে এবং সকলে মিলিয়া শৈলবালার আরাম চিন্তা করিবে, অকস্মাৎ ইহার ব্যতিক্রম হয়, এ কি ভয়ানক অন্যায় !

তখন নিবারণ শৈলবালার পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া পড়িল। শৈলবালা কেবলি বলিল, "সে আমি জানি না। আমার জিনিষ আমি কেন দিব ?"

নিবারণ দেখিল ঐ দুর্ব্বল ক্ষুদ্র সুন্দর সুকুমারী বালিকাটি লোহার সিন্দুকের অপেক্ষাও কঠিন। হরসুন্দরী সঙ্কটের সময় স্বামীর এই দুর্ব্বলতা দেখিয়া ঘৃণায় জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। শৈলবালার চাবি বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইতে গেল। শৈলবালা চাবির গোছা প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া পুষ্করিণীর মধ্যে ফেলিয়া দিল।

হরসুন্দরী হতবুদ্ধি স্বামীকে কহিল, "তালা ভাঙ্গিয়া ফেল না !"

শৈলবালা প্রশান্তমুখে বলিল, "তাহা হইলে আমি গলায় দড়ি দিয়া মরিব !"—

নিবারণ কহিল, আমি আর একটা চেষ্টা দেখিতেছি, বলিয়া এলো-থেলো বেশে বাহির হইয়া গেল।

নিবারণ দুই ঘণ্টা মধ্যেই পৈতৃক বাড়ি আড়াই হাজার টাকায় বিক্রয় করিয়া আসিল।

বহুকষ্টে হাতে বেড়িটা বাঁচিল, কিন্তু চাকরী গেল। স্থাবর জঙ্গমের মধ্যে রহিল কেবল দুটিমাত্র স্ত্রী। তাহার মধ্যে ক্লেশ-কাতর বালিকা স্ত্রীটি গর্ভবতী হইয়া নিতান্ত স্থাবর হইয়াই পড়িল। গলির মধ্যে একটি ছোট স্যাঁৎসেঁতে বাড়িতে এই ক্ষুদ্র পরিবার আশ্রয় গ্রহণ করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

ছোটবৌয়ের অসন্তোষ এবং অসুখের আর শেষ নাই। সে কিছুতেই বুঝিতে চায় না তাহার স্বামীর ক্ষমতা নাই। "ক্ষমতা নাই যদি ত বিবাহ করিলে কেন ?"

উপরের তলায় কেবল দুটিমাত্র ঘর। একটি ঘরে নিবারণ ও শৈলবালার শয়নগৃহ। আর একটি ঘরে হরসুন্দরী থাকে। শৈলবালা খুঁৎখুঁৎ করিয়া বলে, "আমি দিনরাত্রি শোবার ঘরে কাটাইতে পারি না।"

নিবারণ মিথ্যা আশ্বাস দিয়া বলিত, "আমি আর একটা ভাল বাড়ির সন্ধানে আছি, শীঘ্র বাড়ি বদল করিব।"

শৈলবালা বলিত, "কেন, ঐ ত পাশে আর একটা ঘর আছে !"

শৈলবালা তাহার পূর্ব্ব প্রতিবেশিনীদের দিকে কখনো মুখ তুলিয়া চাহে নি। নিবারণের বর্ত্তমান দুরবস্থায় ব্যথিত হইয়া তাহারা একদিন দেখা করিতে আসিল, শৈলবালা ঘরে খিল দিয়া বসিয়া রহিল,

কিছুতেই দ্বার খুলিল না। তাহারা চলিয়া গেলে রাগিয়া, কাঁদিয়া, উপবাসী থাকিয়া, হিষ্টিরিয়া করিয়া পাড়া মাথায় করিল। এমনতর উৎপাত প্রায় ঘটিতে লাগিল।

অবশেষে শৈলবালার এই শারীরিক সঙ্কটের অবস্থায় গুরুতর পীড়া হইল, এমন কি গর্ভপাত হইবার উপক্রম হইল।

নিবারণ হরসুন্দরীর দুই হাত ধরিয়া বলিল, "তুমি শৈলকে বাঁচাও।"

হরসুন্দরী দিন নাই রাত্রি নাই শৈলবালার সেবা করিতে লাগিল। তিলমাত্র ত্রুটি হইলে শৈল তাহাকে দুর্ব্বাক্য বলিত, সে একটি উত্তরমাত্র করিত না।

শৈল কিছুতেই সাগু খাইতে চাহিত না, বাটিসুদ্ধ ছুঁড়িয়া ফেলিত—জ্বরের সময় কাঁচা আমের অম্বল দিয়া ভাত খাইতে চাহিত, না পাইলে রাগিয়া কাঁদিয়া অনর্থপাত করিত—হরসুন্দরী তাহাকে, "লক্ষ্মী আমার", "বোন আমার", "দিদি আমার" বলিয়া শিশুর মত ভুলাইতে চেষ্টা করিত।

কিন্তু শৈলবালা বাঁচিল না। সংসারের সমস্ত সোহাগ আদর লইয়া পরম অসুখ ও অসন্তোষে বালিকার ক্ষুদ্র অসম্পূর্ণ ব্যর্থ জীবন অকালে নষ্ট হইয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

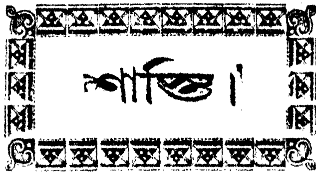
—০:*:০—

নিবারণের প্রথমে খুব একটা আঘাত লাগিল, পরক্ষণেই দেখিল তাহার একটা মস্ত বাঁধন ছিঁড়িয়া গিয়াছে। শোকের মধ্যেও হঠাৎ তাহার একটা মুক্তির আনন্দ বোধ হইল। হঠাৎ মনে হইল এতদিন তাহার বুকের উপর একটা দুঃস্বপ্ন চাপিয়া ছিল। চৈতন্য হইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে জীবন নিরতিশয় লঘু হইয়া গেল। মাধবীলতাটির মত এই যে কোমল জীবনপাশ ছিঁড়িয়া গেল, এই কি তাহার আদরের শৈলবালা? হঠাৎ নিশ্বাস টানিয়া দেখিল, না, সে তাহার উদ্বন্ধন-রজ্জু।

আর তাহার চিরজীবনের সঙ্গিনী হরসুন্দরী? দেখিল সেই ত তাহার সমস্ত সংসার একাকিনী অধিকার করিয়া তাহার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখের স্মৃতিমন্দিরের মাঝখানে বসিয়া আছে—কিন্তু তবু মধ্যে একটা বিচ্ছেদ। ঠিক যেন একটি ক্ষুদ্র উজ্জ্বল সুন্দর নিষ্ঠুর ছুরি আসিয়া একটি হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ এবং বাম অংশের মাঝখানে বেদনাপূর্ণ বিদারণ-রেখা টানিয়া দিয়া গেছে।

একদিন গভীর রাত্রে সমস্ত সহর যখন নিদ্রিত, নিবারণ ধীরে ধীরে হরসুন্দরীর নিভৃত শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। নীরবে সেই পুরাতন নিয়মমত সেই পুরাতন শয্যার দক্ষিণ অংশ গ্রহণ করিয়া শয়ন করিল। কিন্তু এবার তাহার সেই চির-অধিকারের মধ্যে চোরের মত প্রবেশ করিল।

হরসুন্দরীও একটি কথা বলিল না, নিবারণও একটি কথা বলিল না। উহারা পূর্ব্বে যেরূপ পাশাপাশি শয়ন করিত এখনও সেইরূপ পাশাপাশি শুইল, কিন্তু ঠিক মাঝখানে একটি মৃত বালিকা শুইয়া রহিল, তাহাকে কেহ লঙ্ঘন করিতে পারিল না।



শাস্তি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—ঃ(*)ঃ—

দুখিরাম রুই এবং ছিদাম রুই দুই ভাই সকালে যখন দা হাতে লইয়া জন খাটিতে বাহির হইত তখন তাহাদের দুই স্ত্রীর মধ্যে মহা বকাঝকি চেঁচামেচি চলিতেছে। কিন্তু প্রকৃতির অন্যান্য নানাবিধ নিত্য কলরবের ন্যায় এই কলহ কোলাহলও পাড়াসুদ্ধ লোকের অভ্যাস হইয়া গেছে। তীব্র কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র লোকে পরস্পরকে বলে "ঐ রে বাধিয়া গিয়াছে," অর্থাৎ যেমনটি আশা করা যায় ঠিক তেম্‌নিটি ঘটিয়াছে, আজও স্বভাবের নিয়মের কোনরূপ ব্যত্যয় হয় নাই। প্রভাতে পূর্ব্বদিকে সূর্য্য উঠিলে যেমন কেহ তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করে না তেমনি এই কুরিদের বাড়িতে দুই যায়ের মধ্যে যখন একটা হৈ হৈ পড়িয়া যায় তখন তাহার কারণ নির্ণয়ের জন্য কাহারও কোনরূপ কৌতূহলের উদ্রেক হয় না।

অবশ্য এই কোন্দল-আন্দোলন প্রতিবেশীদের অপেক্ষা দুই স্বামীকে বেশী স্পর্শ করিত সন্দেহ নাই কিন্তু সেটা তাহারা কোনরূপ অসুবিধার মধ্যে গণ্য করিত না। তাহারা দুই ভাই যেন দীর্ঘ সংসারপথ একটা এক্কা গাড়িতে করিয়া চলিয়াছে, দুই দিকের দুই স্প্রিংবিহীন চাকার অবিশ্রাম ছড়্ ছড় খড় খড় শব্দটাকে জীবনরথযাত্রার একটা বিধিবিহিত নিয়মের মধ্যেই ধরিয়া লইয়াছে।

বরঞ্চ ঘরে যেদিন কোন শব্দমাত্র নাই, সমস্ত থম্‌থম্ ছম্‌ছম্ করিতেছে, সেদিন একটা আসন্ন অনৈসর্গিক উপদ্রবের আশঙ্কা জন্মিত, সেদিন যে কখন কি হইবে তাহা কেহ হিসাব করিয়া বলিতে পারিত না।

আমাদের গল্পের ঘটনা যেদিন আরম্ভ হইল সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে দুই ভাই যখন জন খাটিয়া শ্রান্তদেহে ঘরে ফিরিয়া আসিল তখন দেখিল স্তব্ধ গৃহ গম্‌গম্ করিতেছে!

বাহিরেও অত্যন্ত গুমট। দুই প্রহরের সময় খুব এক পস্‌লা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এখনও চারিদিকে মেঘ জমিয়া আছে। বাতাসের লেশমাত্র নাই। বর্ষায় ঘরের চারিদিকে জঙ্গল এবং আগাছাগুলা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে, সেখান হইতে এবং জলমগ্ন পাটের ক্ষেত হইতে সিক্ত উদ্ভিজ্জের ঘন গন্ধবাষ্প চতুর্দ্দিকে একটি নিশ্চল প্রাচীরের মত জমাট হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। গোয়ালের পশ্চাদ্বর্ত্তী ডোবার মধ্য হইতে ভেক ডাকিতেছে এবং ঝিল্লিরবে সন্ধ্যার নিস্তব্ধ আকাশ একেবারে পরিপূর্ণ।

অদূরে বর্ষার পদ্মা নবমেঘচ্ছায়ায় বড় স্থির ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করিয়া চলিয়াছে। শস্যক্ষেত্রের অধিকাংশই ভাঙ্গিয়া লোকালয়ের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। এমন কি, ভাঙ্গনের ধারে দুই চারিটা আম কাঁঠালগাছের শিকড় বাহির হইয়া দেখা দিয়াছে, যেন তাহাদের নিরুপায় মুষ্টির প্রসারিত অঙ্গুলিগুলি শূন্যে একটা কিছু অন্তিম অবলম্বন আঁকড়িয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছে।

দুখিরাম এবং ছিদাম সেদিন জমিদারের কাছারি-ঘরে কাজ করিতে গিয়াছিল। ওপারের চরে জলিধান পাকিয়াছে। বর্ষায় চর ভাসিয়া যাইবার পূর্ব্বেই ধান কাটিয়া লইবার জন্য দেশের দরিদ্র লোকমাত্রেই কেহ বা নিজের ক্ষেতে কেহ বা পাট খাটিতে নিযুক্ত হইয়াছে; কেবল কাছারি হইতে পেয়াদা আসিয়া এই দুই ভাইকে জবরদস্তি করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। কাছারি-ঘরের চাল ভেদ করিয়া স্থানে স্থানে জল পড়িতেছিল তাহাই সারিয়া দিতে এবং গোটাকতক ঝাঁপ নির্ম্মাণ করিতে তাহারা সমস্ত দিন খাটিয়াছে। বাড়ি আসিতে পায় নাই, কাছারি হইতেই কিঞ্চিৎ জলপান খাইয়াছে। মধ্যে মধ্যে বৃষ্টিতেও ভিজিতে হইয়াছে,—উচিতমত পাওনা মজুরি পায় নাই, এবং তাহার পরিবর্ত্তে যে সকল অন্যায় কটুকথা শুনিতে হইয়াছে সে তাহাদের পাওনার অনেক অতিরিক্ত।

পথের কাদা এবং জল ভাঙ্গিয়া সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দুই ভাই দেখিল, ছোট যা চন্দরা ভূমিতে অঞ্চল পাতিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া আছে;—আজিকার এই মেঘলা দিনের মত সেও মধ্যাহ্নে প্রচুর অশ্রুবর্ষণপূর্ব্বক সায়াহ্নের কাছাকাছি ক্ষান্ত দিয়া অত্যন্ত গুমট্ করিয়া আছে; আর বড় যা রাধা মুখটা মস্ত করিয়া দাওয়ায় বসিয়াছিল—তাহার দেড় বৎসরের ছোট ছেলেটি কাঁদিতেছিল, দুই ভাই যখন প্রবেশ করিল, দেখিল উলঙ্গ শিশু প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে চীৎ হইয়া পড়িয়া ঘুমাইয়া আছে।

ক্ষুধিত দুখিরাম আর কালবিলম্ব না করিয়া বলিল "ভাত দে।"

বড় বৌ বারুদের বস্তায় স্ফুলিঙ্গপাতের মত এক মুহূর্ত্তেই তীব্র কণ্ঠস্বর আকাশ পরিমাণ করিয়া বলিয়া উঠিল, "ভাত কোথায় যে ভাত দিব? তুই কি চাল দিয়া গিয়াছিলি? আমি কি নিজে রোজগার করিয়া আনিব?"

সারাদিনের শ্রান্তি ও লাঞ্ছনার পর অন্নহীন নিরানন্দ অন্ধকার ঘরে প্রজ্বলিত ক্ষুধানলে গৃহিণীর রূক্ষবচন, বিশেষতঃ শেষ কথাটার গোপন কুৎসিত শ্লেষ দুখিরামের হঠাৎ কেমন একেবারেই অসহ্য হইয়া উঠিল।

ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় গম্ভীর গর্জ্জনে বলিয়া উঠিল "কি বলি!" বলিয়া, মুহূর্ত্তের মধ্যে দা লইয়া কিছু না ভাবিয়া একেবারে স্ত্রীর মাথায় বসাইয়া দিল। রাধা তাহার ছোট যায়ের কোলের কাছে পড়িয়া গেল এবং মৃত্যু হইতে মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইল না।

চন্দরা রক্তসিক্ত বস্ত্রে "কি হল গো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ছিদাম তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। দুখিরাম দা ফেলিয়া মুখে হাত দিয়া হতবুদ্ধির মত ভূমিতে বসিয়া পড়িল। ছেলেটা জাগিয়া উঠিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বাহিরে তখন পরিপূর্ণ শান্তি। রাখাল বালক গরু লইয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিতেছে। পরপারের চরে যাহারা নূতন-পাকা ধান কাটিতে গিয়াছিল, তাহারা পাঁচ সাতজনে এক একটি ছোট নৌকায় এপারে ফিরিয়া পরিশ্রমের পুরস্কার দুই চারি আটি

ধান মাথায় লইয়া প্রায় সকলেই নিজ নিজ ঘরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

চক্রবর্ত্তীদের বাড়ির রামলোচন খুড়ো গ্রামের ডাকঘরে চিঠি দিয়া ঘরে ফিরিয়া নিশ্চিন্ত মনে চুপচাপ তামাক খাইতেছিলেন। হঠাৎ মনে পড়িল, তাঁহার কোর্ফা প্রজা দুখির অনেক টাকা খাজনা বাকি; আজ কিয়দংশ শোধ করিবে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। এতক্ষণে তাহারা বাড়ি ফিরিয়াছে স্থির করিয়া চাদরটা কাঁধে ফেলিয়া ছাতা লইয়া বাহির হইলেন।

কুরীদের বাড়িতে ঢুকিয়া তাঁহার গা ছম্‌ছম্‌ করিয়া উঠিল। দেখিলেন, ঘরে প্রদীপ জ্বালা হয় নাই। অন্ধকার দাওয়ায় দুই চারিটা অন্ধকার মূর্ত্তি অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। রহিয়া রহিয়া দাওয়ার এক কোণ হইতে একটা অস্ফুট রোদন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে—এবং ছেলেটা যত মা মা করিয়া কাঁদিয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেছে ছিদাম তাহার মুখ চাপিয়া ধরিতেছে।

রামলোচন কিছু ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দুখি, আছিস্ না কি!"

দুখি এতক্ষণ প্রস্তরমূর্ত্তির মত নিশ্চল হইয়া বসিয়াছিল, তাহার নাম ধরিয়া ডাকিবামাত্র একেবারে অবোধ বালকের মত উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ছিদাম তাড়াতাড়ি দাওয়া হইতে অঙ্গনে নামিয়া চক্রবর্ত্তীর নিকটে আসিল। চক্রবর্ত্তী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাগীরা বুঝি ঝগড়া করিয়া বসিয়া আছে? আজ ত সমস্ত দিনই চীৎকার শুনিয়াছি।"

এতক্ষণ ছিদাম কিংকর্ত্তব্য কিছুই ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই। নানা অসম্ভব গল্প তাহার মাথায় উঠিতেছিল। আপাততঃ স্থির করিয়াছিল রাত্রি কিঞ্চিৎ অধিক হইলে মৃতদেহ কোথাও সরাইয়া ফেলিবে। ইতিমধ্যে যে চক্রবর্ত্তী আসিয়া উপস্থিত হইবে এ সে মনেও করে নাই। ফস্ করিয়া কোন উত্তর যোগাইল না। বলিয়া ফেলিল, "হাঁ, আজ খুব ঝগড়া হইয়া গিয়াছে।"

চক্রবর্ত্তী দাওয়ার দিকে অগ্রসর হইবার উপক্রম করিয়া বলিল, "কিন্তু সে জন্য দুখি কাঁদে কেন রে!"

ছিদাম দেখিল আর রক্ষা হয় না, হঠাৎ বলিয়া ফেলিল—"ঝগড়া করিয়া ছোট বৌ বড় বৌয়ের মাথায় এক দায়ের কোপ বসাইয়া দিয়াছে।"

উপস্থিত বিপদ ছাড়া যে আর কোন বিপদ থাকিতে পারে এ কথা সহজে মনে হয় না। ছিদাম তখন ভাবিতেছিল, ভীষণ সত্যের হাত হইতে কি করিয়া রক্ষা পাইব? মিথ্যা যে তদপেক্ষা ভীষণ হইতে পারে তাহা তাহার জ্ঞান হইল না। রামলোচনের প্রশ্ন শুনিবামাত্র তাহার মাথায় তৎক্ষণাৎ একটা উত্তর যোগাইল এবং তৎক্ষণাৎ বলিয়া ফেলিল।

রামলোচন চমকিয়া উঠিয়া, কহিল, "অ্যা! বলিস্ কি! মরে নাই ত!"

ছিদাম কহিল, "মরিয়াছে!" বলিয়া চক্রবর্ত্তীর পা জড়াইয়া ধরিল।

চক্রবর্ত্তী পালাইবার পথ পায় না। ভাবিল, রাম, রাম, সন্ধ্যাবেলায় একি বিপদেই পড়িলাম! আদালতে সাক্ষ্য দিতে দিতেই প্রাণ বাহির হইয়া পড়িবে। ছিদাম কিছুতেই তাঁহার পা ছাড়িল না,

কহিল "দাদা ঠাকুর এখন, আমার বৌকে বাঁচাইবার কি উপায় করি!"

মামলা মোকদ্দমার পরামর্শে রামলোচন সমস্ত গ্রামের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি একটু ভাবিয়া বলিলেন, দেখ, ইহার এক উপায় আছে। তুই এখনি থানায় ছুটিয়া যা—বল্‌গে, তোর বড় ভাই দুখি সন্ধ্যাবেলায় ঘরে আসিয়া ভাত চাহিয়াছিল; ভাত প্রস্তুত ছিল না বলিয়া স্ত্রীর মাথায় দা বসাইয়া দিয়াছে। আমি নিশ্চয় বলিতেছি এ কথা বলিলে ছুঁড়িটা বাঁচিয়া যাইবে।

ছিদামের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিল; উঠিয়া কহিল, ঠাকুর, বৌ গেলে বৌ পাইব কিন্তু আমার ভাই ফসি গেলে আর ত ভাই পাইব না। কিন্তু যখন নিজের স্ত্রীর নামে দোষারোপ করিয়াছিল তখন এ সকল কথা ভাবে নাই। তাড়াতাড়িতে একটা কাজ করিয়া ফেলিয়াছে, এখন অলক্ষিত ভাবে মন আপনার পক্ষে যুক্তি এবং প্রবোধ সঞ্চয় করিতেছে।

চক্রবর্ত্তীও কথাটা যুক্তিসঙ্গত বোধ করিলেন, কহিলেন, তবে যেমনটি ঘটিয়াছে তাই বলিস্ সকল দিক্ রক্ষা করা অসম্ভব।

বলিয়া রামলোচন অবিলম্বে প্রস্থান করিল এবং দেখিতে দেখিতে গ্রামে রাষ্ট্র হইল যে, কুরীদের বাড়ির চন্দরা রাগারাগি করিয়া তাহার বড় যায়ের মাথায় দা বসাইয়া দিয়াছে।

বাঁধ ভাঙিলে যেমন জল আসে গ্রামের মধ্যে তেমনি হুহুঃশব্দে পুলিস আসিয়া পড়িল; অপরাধী এবং নিরপরাধ সকলেই বিষম উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—•:o:•—

ছিদাম ভাবিল, যে পথ কাটিয়া ফেলিয়াছে সেই পথেই চলিতে হইবে। সে চক্রবর্ত্তীর কাছে নিজ মুখে এক কথা বলিয়া ফেলিয়াছে সে কথা গাঁসুদ্ধ রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে, এখন আবার আর একটা কিছু প্রকাশ হইয়া পড়িলে কি জানি কি হইতে কি হইয়া পড়িবে সে নিজেই কিছু ভাবিয়া পাইল না। মনে করিল কোন মতে সেই কথাটা রক্ষা করিয়া তাহার সহিত আর পাঁচটা গল্প জুড়িয়া স্ত্রীকে রক্ষা করা ছাড়া আর কোন পথ নাই।

ছিদাম তাহার স্ত্রী চন্দরাকে অপরাধ নিজ স্কন্ধে লইবার জন্য অনুরোধ করিল। সে ত একেবারে বজ্রাহত হইয়া গেল। ছিদাম তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, যাহা বলিতেছি তাই কর, তোর কোন ভয় নাই, আমরা তোকে বাঁচাইয়া দিব।—আশ্বাস দিল বটে কিন্তু গলা শুকাইল, মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল।

চন্দরার বয়স সতেরো আঠারোর অধিক হইবে না। মুখখানি হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল—শরীরটি অনতিদীর্ঘ, আঁটসাঁট সুস্থ সবল; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে এমনি একটি সৌষ্ঠব আছে যে, চলিতে ফিরিতে নড়িতে চড়িতে দেহের কোথাও যেন কিছু বাধে না। একখানি নূতন তৈরি নৌকার মত; বেশ ছোট এবং সুডৌল, অত্যন্ত সহজে সরে এবং তাহার কোথাও কোন গ্রন্থি শিথিল হইয়া যায় নাই। পৃথিবীর সকল বিষয়েই তাহার একটা

কৌতুক এবং কৌতুহল আছে; পাড়ায় গল্প করিতে যাইতে ভাল বাসে; এবং কুম্ভকক্ষে ঘাটে যাইতে আসিতে দুই অঙ্গুলি দিয়া ঘোমটা ঈষৎ ফাক করিয়া উজ্জ্বল চঞ্চল ঘনকৃষ্ণ চোখ দুটি দিয়া পথের মধ্যে দর্শনযোগ্য যাহা কিছু সমস্ত দেখিয়া লয়।

বড়বৌ ছিল ঠিক ইহার উল্টা; অত্যন্ত এলোমেলো ঢিলেঢালা অগোছালো। মাথার কাপড় কোলের শিশু, ঘরকন্নার কাজ কিছুই সে সামলাইতে পারিত না। হাতে বিশেষ একটা কিছু কাজও নাই অথচ কোন কালে যেন সে অবসর করিয়া উঠিতে পারে না। ছোটয়া তাহাকে অধিক কিছু কথা বলিত না, মৃদুস্বরে দুই একটা তীক্ষ্ণ দংশন করিত, আর সে হাউ হাউ দাউ দাউ করিয়া রাগিয়া মাগিয়া বকিয়া ঝকিয়া সারা হইত এবং পাড়াসুদ্ধ অস্থির করিয়া তুলিত।

এই দুই যুড়ি স্বামী স্ত্রীর মধ্যেও একটা আশ্চর্য্য স্বভাবের ঐক্য ছিল। দুখিরাম মানুষটা কিছু বৃহদায়তনের—হাড়গুলা খুব চওড়া—নাসিকা খর্ব্ব—দুটি চক্ষু এই দৃশ্যমান সংসারকে যেন ভাল করিয়া বোঝে না, অথচ ইহাকে কোনরূপ প্রশ্ন করিতেও চায় না। এমন নিরীহ অথচ ভীষণ, এমন সবল অথচ নিরুপায় মানুষ অতি দুর্লভ।

আর ছিদামকে একখানি চকচকে কাল পাথরে কে যেন বহুযত্নে কুঁদিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। লেশমাত্র বাহুল্য-বর্জ্জিত এবং কোথাও যেন কিছু টোল খায় নাই। প্রত্যেক অঙ্গটি বলের সহিত নৈপুণ্যের সহিত মিশিয়া অত্যন্ত সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। নদীর উচ্চপাড় হইতে নিম্নে লাফাইয়া পড়ুক, লগি দিয়া নৌকা ঠেলুক, বাঁশগাছে চড়িয়া বাছিয়া বাছিয়া কঞ্চি কাটিয়া আনুক, সকল কাজেই তাহার একটি পরিমিত পারিপাট্য, একটি অবলীলা-কৃত শোভা প্রকাশ পায়। বড় বড় কাল চুল তেল দিয়া কপাল হইতে যত্নে আঁচড়াইয়া তুলিয়া কাঁধে আনিয়া ফেলিয়াছে—বেশভূষা সাজ-সজ্জায় বিলক্ষণ একটা যত্ন আছে।

অপরাপর গ্রামবধূদিগের সৌন্দর্য্যের প্রতি যদিও তাহার উদাসীন দৃষ্টি ছিল না, এবং তাহাদের চক্ষে আপনাকে মনোরম করিয়া তুলিবার ইচ্ছাও তাহার যথেষ্ট ছিল তবু ছিদাম তাহার যুবতী স্ত্রীকে একটু বিশেষ ভাল বাসিত। উভয়ে ঝগড়াও হইত, ভাবও হইত, কেহ কাহাকে পরাস্ত করিতে পারিত না। আর একটি কারণে উভয়ের মধ্যে বন্ধন কিছু সুদৃঢ় ছিল। ছিদাম মনে করিত চন্দরা যেরূপ চটুল চঞ্চল প্রকৃতির স্ত্রীলোক তাহাকে যথেষ্ট বিশ্বাস নাই, আর চন্দরা মনে করিত, আমার স্বামীটির চতুর্দ্দিকেই দৃষ্টি, তাঁহাকে কিছু কষাকষি করিয়া না বাঁধিলে কোন্ দিন হাতছাড়া হইতে আটক নাই।

উপস্থিত ঘটনা ঘটিবার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে ভারি একটা গোলযোগ চলিতেছিল। চন্দরা দেখিয়াছিল তাহার স্বামী কাজের ওজর করিয়া মাঝে মাঝে দূরে চলিয়া যায়, এমন কি, দুই একদিন অতীত করিয়া আসে, অথচ কিছু উপার্জ্জন করিয়া আনে না। লক্ষণ মন্দ দেখিয়া সেও কিছু বাড়াবাড়ি দেখাইতে লাগিল। যখন তখন ঘাটে যাইতে আরম্ভ করিল এবং পাড়া পর্য্যটন করিয়া আসিয়া কা—

মজুমদারের মেজ ছেলেটির প্রচুর ব্যাখ্যা করিতে লাগিল।

ছিদামের দিন এবং রাত্রিগুলির মধ্যে কে যেন বিষ মিশাইয়া দিল। কাজে কর্ম্মে কোথাও একদণ্ড গিয়া সুস্থির হইতে পারে না। একদিন ভাজকে আসিয়া ভর্ৎসনা করিল। সে হাত নাড়িয়া ঝঙ্কার দিয়া অনুপস্থিত মৃত পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—ও মেয়ে ঝড়ের আগে ছোটে উহাকে আমি সাম্লাইব! আমি জানি ও কোন্ দিন কি সর্ব্বনাশ করিয়া বসিবে!

চন্দরা পাশের ঘর হইতে আসিয়া আস্তে আস্তে কহিল "কেন দিদি তোমার এত ভয় কিসের!" এই ত দুই যায়ে বিষম দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল।

ছিদাম চোখ পাকাইয়া বলিল, এবার যদি কখনও শুনি তুই একলা ঘাটে গিয়াছিস্ তোর হাড় গুঁড়াইয়া দিব।

চন্দরা বলিল—তাহা হইলে ত হাড় যুড়ায়!—বলিয়া তৎক্ষণাৎ বাহিরে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল।

ছিদাম একলম্ফে তাহার চুল ধরিয়া টানিয়া ঘরে পুরিয়া বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

কর্ম্মস্থান হইতে সন্ধ্যাবেলায় ফিরিয়া আসিয়া দেখে ঘর খোলা, ঘরে কেহ নাই। চন্দরা তিনটে গ্রাম ছাড়াইয়া একেবারে তাহার মামার বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

ছিদাম সেখান হইতে বহুকষ্টে অনেক সাধ্যসাধনায় তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিল, কিন্তু এবার পরাস্ত মানিল। দেখিল, এক অঞ্জলি পারদকে মুষ্টির মধ্যে শক্ত করিয়া ধরা যেমন দুঃসাধ্য এই মুষ্টিমেয় স্ত্রীটুকুকেও কঠিন করিয়া ধরিয়া রাখা তেমনি অসম্ভব—ও যেন দশ আঙুলের ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

আর কোন জবরদস্তি করিল না, কিন্তু বড় অশান্তিতে বাস করিতে লাগিল। তাহার এই চঞ্চলা যুবতি স্ত্রীর প্রতি সদাশঙ্কিত ভালবাসা উগ্র একটা বেদনার মত বিষম টনটনে হইয়া উঠিল। এমন কি, এক একবার মনে হইত এ যদি মরিয়া যায় তবে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া একটুখানি শান্তিলাভ করিতে পারি!—মানুষের উপরে মানুষের যতটা ঈর্ষ্যা হয় যমের উপরে এতটা নহে!

এমন সময়ে ঘরে সেই বিপদ ঘটিল।

চন্দরাকে যখন তাহার স্বামী খুন স্বীকার করিয়া লইতে কহিল, সে স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিল। তাহার কালো দুটি চক্ষু কালো অগ্নির ন্যায় নীরবে তাহার স্বামীকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তাহার সমস্ত শরীর মন যেন ক্রমেই সঙ্কুচিত হইয়া এই স্বামীরাক্ষসের হাত হইতে বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা একান্ত বিমুখ হইয়া দাঁড়াইল।

ছিদাম আশ্বাস দিল তোমার কিছু ভয় নাই।—বলিয়া পুলিসের কাছে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে কি বলিতে হইবে বারবার শিখাইয়া দিল। চন্দরা সে সমস্ত দীর্ঘ কাহিনী কিছুই শুনিল না, কাঠের মূর্ত্তি হইয়া বসিয়া রহিল।

সমস্ত কাজেই ছিদামের উপর দুখিরামের একমাত্র নির্ভর। ছিদাম যখন চন্দরার উপর সমস্ত দোষারোপ করিতে বলিল, দুখি কহিল, তাহা হইলে বৌমার কি হইবে। ছিদাম কহিল, উহাকে আমি

বাঁচাইয়া দিব। বৃহৎকায় দুখিরাম নিশ্চিন্ত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—০:০:০—

ছিদাম তাহার স্ত্রীকে শিখাইয়া দিয়াছিল যে, তুই বলিস বড় যা আমাকে বঁটি লইয়া মারিতে আসিয়াছিল, আমি তাহাকে দা লইয়া ঠেকাইতে গিয়া হঠাৎ কেমন করিয়া লাগিয়া গিয়াছে। এসমস্তই রামলোচনের রচিত। ইহার অনুকূলে যে যে অলঙ্কার এবং প্রমাণ প্রয়োগের আবশ্যক তাহাও সে বিস্তারিত ভাবে ছিদামকে শিখাইয়াছিল।

পুলিস আসিয়া তদন্ত করিতে লাগিল। চন্দরাই যে তাহার বড় যাকে খুন করিয়াছে গ্রামের সকল লোকেরই মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। সকল সাক্ষীর দ্বারাই সেইরূপ প্রমাণ হইল। পুলিস যখন চন্দরাকে প্রশ্ন করিল, চন্দরা কহিল, হাঁ, আমি খুন করিয়াছি।

কেন খুন করিয়াছ?

আমি তাহাকে দেখিতে পারিতাম না।

কোন বচসা হইয়াছিল?

না।

সে তোমাকে প্রথমে মারিতে আসিয়াছিল?

না।

তোমার প্রতি কোন অত্যাচার করিয়াছিল?

না।

এইরূপ উত্তর শুনিয়া সকলে অবাক্ হইয়া গেল।

ছিদাম ত একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল। কহিল, উনি ঠিক কথা বলিতেছেন না। বড় বৌ প্রথমে—

দারোগা খুব এক তাড়া দিয়া তাহাকে থামাইয়া দিল। অবশেষে তাহাকে বিধিমতে জেরা করিয়া বার বার সেই একই উত্তর পাইল—বড় বৌএর দিক্ হইতে কোনরূপ আক্রমণ চন্দরা কিছুতেই স্বীকার করিল না।

এমন একগুঁয়ে মেয়েও ত দেখা যায় না। একেবারে প্রাণপণে ফাঁসিকাঠের দিকে ঝুঁকিয়াছে, কিছুতেই তাহাকে টানিয়া রাখা যায় না। চন্দরা বড় অভিমানে মনে মনে স্বামীকে বলিতেছে, আমি তোমাকে ছাড়িয়া আমার এই নবযৌবন লইয়া ফাঁসিকাঠকে বরণ করিলাম—আমার ইহজন্মের শেষবন্ধন তাহার সহিত।

বন্দিনী হইয়া চন্দরা, একটী নিরীহ ক্ষুদ্র চঞ্চল কৌতুকপ্রিয় গ্রামবধূ, চিরপরিচিত গ্রামের পথ দিয়া, রথের তলা দিয়া, হাটের মধ্য দিয়া, ঘাটের প্রান্ত দিয়া, মজুমদারের বাড়ির সম্মুখ দিয়া, পোষ্টআফিস এবং ইস্কুল-ঘরের পার্শ্ব দিয়া সমস্ত পরিচিত লোকের চক্ষের উপর দিয়া কলঙ্কের ছাপ লইয়া চিরকালের মত গৃহ ছাড়িয়া গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গেল। একপাল ছেলে পিছন পিছন চলিল এবং গ্রামের মেয়েরা তাহার সইসাঙাৎরা কেহ ঘোমটার ফাঁক দিয়া, কেহ দ্বারের প্রান্ত হইতে, কেহ বা গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া পুলিস-চালিত চন্দরাকে দেখিয়া ঘৃণায় লজ্জায় ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছেও চন্দরা দোষ স্বীকার করিল। এবং খুনের সময় বড়

বৌ যে, তাহার প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল তাহার কথায় তাহা প্রকাশ হইল না।

কিন্তু যেদিন ছিদাম সাক্ষ্যস্থলে আসিয়াই একেবারে কাঁদিয়া যোড়হস্তে কহিল, দোহাই হুজুর আমার স্ত্রীর কোন দোষ নাই। হাকিম ধমক দিয়া তাহার উচ্ছ্বাস নিবারণ করিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, সে একে একে সত্য ঘটনা সমস্ত প্রকাশ করিল।

হাকিম তাহার কথা বিশ্বাস করিলেন না। কারণ, প্রধান বিশ্বস্ত ভদ্রসাক্ষী রামলোচন কহিল, খুনের অনতিবিলম্বেই আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলাম। সাক্ষী ছিদাম আমার নিকট সমস্ত স্বীকার করিয়া আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, বৌকে কি করিয়া উদ্ধার করিব আমাকে যুক্তি দিন। আমি ভাল মন্দ কিছুই বলিলাম না। সাক্ষী আমাকে বলিল, আমি যদি বলি আমার বড় ভাই ভাত চাহিয়া ভাত পায় নাই বলিয়া রাগের মাথায় স্ত্রীকে মারিয়াছে, তাহা হইলে কি সে রক্ষা পাইবে? আমি কহিলাম, খবরদার হারামজাদা, আদালতে এক বর্ণ মিথ্যা বলিস্ না—এতবড় মহাপাপ আর নাই—ইত্যাদি।

রামলোচন প্রথমে চন্দরাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশে অনেকগুলা গল্প বানাইয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু যখন দেখিল চন্দরা নিজে বাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন ভাবিল, ওরে বাপ্‌রে শেষকালে কি মিথ্যা-সাক্ষীর দায়ে পড়িব! যে টুকু জানি সেইটুকু বলা ভাল। এই মনে করিয়া রামলোচন যাহা জানে তাহাই বলিল।* বরঞ্চ তাহার চেয়েও কিছু বেশী বলিতে ছাড়িল না।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সেশনে চালান দিলেন।

ইতিমধ্যে চাষবাস হাটবাজার হাসিকান্না পৃথিবীর সমস্ত কাজ চলিতে লাগিল। এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের মত নবীন ধান্যক্ষেত্রে শ্রাবণের অবিরল বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতে লাগিল।

পুলিস আসামী এবং সাক্ষী লইয়া আদালতে হাজির। সম্মুখবর্ত্তী মুন্সেফের কোর্টে বিস্তর লোক নিজ নিজ মোকদ্দমার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। রন্ধনশালার পশ্চাদ্বর্ত্তী একটি ডোবার অংশ বিভাগ লইয়া কলিকাতা হইতে এক উকীল আসিয়াছে এবং তদুপলক্ষে বাদীর পক্ষে উনচল্লিশ জন সাক্ষী উপস্থিত আছে। কতশত লোক আপন আপন কড়াগণ্ডা হিসাবের চুলচেরা মীমাংসা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আসিয়াছে, জগতে আপাততঃ তদপেক্ষা গুরুতর আর কিছুই উপস্থিত নাই এইরূপ তাহাদের ধারণা। ছিদাম বাতায়ন হইতে এই অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত প্রতিদিনের পৃথিবীর দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া আছে, সমস্তই স্বপ্নের মত বোধ হইতেছে। কম্পাউণ্ডের বৃহৎ বটগাছ হইতে একটি কোকিল ডাকিতেছে—তাহাদের কোনরূপ আইন আদালত নাই।

চন্দরা জজের কাছে কহিল, ওগো সাহেব, এক কথা আর বারবার কতবার করিয়া বলিব!

জজসাহেব তাহাকে বুঝাইয়া কহিলেন, তুমি যে অপরাধ স্বীকার করিতেছ তাহার শাস্তি কি জান?

চন্দরা কহিল, না।

জজসাহেব কহিলেন—তাহার শাস্তি ফাঁসী।

চন্দরা কহিল—ওগো তোমার পায়ে পড়ি, তাই দাও না সাহেব! তোমাদের যাহা খুসি কর—আমার ত আর সহ্য হয় না!

যখন ছিদামকে আদালতে উপস্থিত করিল—চন্দরা মুখ ফিরাইল। জজ কহিলেন—সাক্ষীর দিকে চাহিয়া বল এ তোমার কে হয়।

চন্দরা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কহিল, ও আমার স্বামী হয়।

প্রশ্ন হইল—ও তোমাকে ভালবাসে না?

উত্তর—উঃ! ভারি ভালবাসে।

প্রশ্ন। তুমি উহাকে ভালবাস না?

উত্তর। খুব ভালবাসি!

ছিদামকে যখন প্রশ্ন হইল, ছিদাম কহিল, আমি খুন করিয়াছি।

প্রশ্ন। কেন?

ছিদাম। ভাত চাহিয়াছিলাম বড় বৌ ভাত দেয় নাই।

দুখিরাম সাক্ষ্য দিতে আসিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর উত্তর করিল—সাহেব খুন আমি করিয়াছি।

কেন?

ভাত চাহিয়াছিলাম ভাত দেয় নাই।

বিস্তর জেরা করিয়া এবং অন্যান্য সাক্ষ্য শুনিয়া জজ সাহেব স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন—ঘরের স্ত্রীলোককে ফাঁসির অপমান হইতে বাঁচাইবার জন্য ইহারা দুই ভাই অপরাধ স্বীকার করিতেছে। কিন্তু চন্দরা পুলিস হইতে সেশন আদালত পর্য্যন্ত বরাবর এক কথা বলিয়া আসিতেছে, তাহার কথার তিলমাত্র নড়চড় হয় নাই। দুইজন উকীল স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে প্রাণদণ্ড হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু অবশেষে তাহার নিকট পরাস্ত মানিয়াছে।

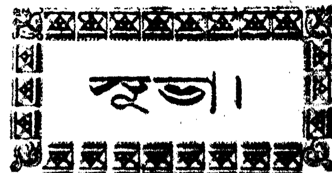
যেদিন একরত্তি বয়সে একটি কালো কালো ছোটখাটো মেয়ে তাহার গোলগাল মুখটি লইয়া খেলার পুতুল ফেলিয়া বাপের ঘর হইতে শ্বশুরঘরে আসিল, সেদিন রাত্রে শুভলগ্নের সময় আজিকার দিনের কথা কে কল্পনা করিতে পারিত! তাহার বাপ মরিবার সময় এই বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল যে, যাহা হউক আমার মেয়েটির একটি সদ্‌গতি করিয়া গেলাম।

জেলখানায় ফাঁসির পূর্ব্বে দয়ালু সিভিল সার্জ্জন চন্দরাকে জিজ্ঞাসা করিল কাহাকেও দেখিতে ইচ্ছা কর?

চন্দরা কহিল, একবার আমার মাকে দেখিতে চাই।

ডাক্তার কহিল—তোমার স্বামী তোমাকে দেখিতে চায়, তাহাকে কি ডাকিয়া আনিব

চন্দরা কহিল—মরণ!—



সুভা।

১।

মেয়েটির নাম যখন সুভাষিণী রাখা হইয়াছিল তখন কে জানিত সে বোবা হইবে? তাহার দুটি বড় বোনকে সুকেশিনী ও সুহাসিনী নাম দেওয়া হইয়াছিল, তাই মিলের অনুরোধে তাহার বাপ ছোট

মেয়েটির নাম সুভাষিণী রাখে। এখন সকলে তাহাকে সংক্ষেপে সুভা বলে।

দস্তুরমত অনুসন্ধান ও অর্থব্যয়ে বড় দুটি মেয়ের বিবাহ হইয়া গেছে, এখন ছোটটি পিতামাতার নীরব হৃদয়ভারের মত বিরাজ করিতেছে।

যে কথা কয় না, সে যে কিছু অনুভব করে, ইহা সকলের মনে হয় না, এই জন্য তাহার সাক্ষাতেই সকলে তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিত। সে যে, বিধাতার অভিশাপস্বরূপে তাহার পিতৃগৃহে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এ কথা সে শিশুকাল হইতে বুঝিয়া লইয়াছিল। তাহার ফল এই হইয়াছিল, সাধারণের দৃষ্টিপথ হইতে সে আপনাকে গোপন করিয়া রাখিতে সর্ব্বদাই চেষ্টা করিত। মনে করিত; আমাকে সবাই ভুলিলে বাঁচি। কিন্তু বেদনা কি কেহ কখন ভোলে? পিতামাতার মনে সে সর্ব্বদাই জাগরূক ছিল।

বিশেষতঃ তাহার মা তাহাকে নিজের একটা ত্রুটিস্বরূপে দেখিতেন। কেন না, মাতা পুত্র অপেক্ষা কন্যাকে নিজের অংশ-স্বরূপে দেখেন—কন্যার কোন অসম্পূর্ণতা দেখিলে সেটা যেন বিশেষরূপে নিজের লজ্জার কারণ বলিয়া মনে করেন। বরঞ্চ কন্যার পিতা বাণীকণ্ঠ সুভাকে তাঁহার অন্য মেয়ের অপেক্ষা যেন একটু বেশী ভাল-বাসিতেন, কিন্তু মাতা তাহাকে নিজের গর্ভের কলঙ্ক জ্ঞান করিয়া তাহার প্রতি বড় বিরক্ত ছিলেন।

সুভার কথা ছিল না, কিন্তু তাহার সুদীর্ঘপল্লববিশিষ্ট বড় বড় দুটি কালো চোখ ছিল—এবং তাহার ওষ্ঠাধর ভাবের আভাসমাত্রে কচি কিশলয়ের মত কাঁপিয়া উঠিত।

কথায় আমরা যে ভাব প্রকাশ করি, সেটা আমাদিগকে অনেকটা নিজের চেষ্টায় গড়িয়া লইতে হয়, কতকটা তর্জ্জমা করার মত; সকল সময়ে ঠিক হয় না, ক্ষমতা অভাবে অনেক সময়ে ভুলও হয়। কিন্তু কালো চোখকে কিছু তর্জ্জমা করিতে হয় না—মন আপনি তাহার উপরে ছায়া ফেলে; ভাব আপনি তাহার উপরে কখন প্রসারিত, কখন মুদিত হয়, কখন উজ্জ্বলভাবে জ্বলিয়া উঠে, কখন ম্লানভাবে নিবিয়া আসে, কখন অস্তমান চন্দ্রের মত অনিমেষভাবে চাহিয়া থাকে, কখন দ্রুত চঞ্চল বিদ্যুতের মত দিগ্বিদিকে ঠিকরিয়া উঠে। মুখের ভাব বই আজন্মকাল যাহার অন্য ভাষা নাই, তাহার চোখের ভাষা অসীম উদার এবং অতলস্পর্শ গভীর, অনেকটা স্বচ্ছ আকাশের মত, উদয়াস্ত এবং ছায়ালোকের নিস্তব্ধ রঙ্গভূমি। এই বাক্যহীন মনুষ্যের মধ্যে বৃহৎ প্রকৃতির মত একটা বিজন মহত্ত্ব আছে। এইজন্য সাধারণ বালকবালিকারা তাহাকে একপ্রকার ভয় করিত, তাহার সহিত খেলা করিত না। সে নির্জ্জন দ্বিপ্রহরের মত শব্দহীন এবং সঙ্গিহীন।

২।

গ্রামের নাম চণ্ডীপুর। নদীটি বাঙ্গালা দেশের একটি ছোট নদী, গৃহস্থ ঘরের মেয়েটির মত; বহুদূর পর্য্যন্ত তাহার প্রসর নহে; নিরলসা তন্বী নদীটি আপন কূল রক্ষা করিয়া কাজ করিয়া যায়, দুই ধারের গ্রামের সকলেরই সঙ্গে তাহার যেন একটা-না-একটা সম্পর্ক আছে। দুই ধারে লোকালয় এবং তরুচ্ছায়াঘন উচ্চতট; নিম্ন

তল দিয়া গ্রামলক্ষ্মী স্রোতস্বিনী আত্মবিস্মৃত দ্রুত পদক্ষেপে, প্রফুল্লহৃদয়ে আপনার অসংখ্য কল্যাণকার্য্যে চলিয়াছে।

বাণীকণ্ঠের ঘর নদীর একেবারে উপরেই। তাহার বাখারির বেড়া, আটচালা, গোয়ালঘর, ঢেঁকিশালা, খড়ের স্তূপ, তেঁতুলতলা, আম কাঁঠাল এবং কলার বাগান, নৌকাবাহীমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই গার্হস্থ্য সচ্ছলতার মধ্যে বোবা মেয়েটি কাহারও নজরে পড়ে কি না জানি না, কিন্তু কাজকর্ম্মে যখনি অবসর পায় তখনি সে এই নদীতীরে আসিয়া বসে।

প্রকৃতি যেন তাহার ভাষার অভাব পূরণ করিয়া দেয়। যেন তাহার হইয়া কথা কয়। নদীর কলধ্বনি, লোকের কোলাহল মাঝির গান, পাখীর ডাক, তরুর মর্ম্মর সমস্ত মিশিয়া চারিদিকের চলাফেরা আন্দোলন কম্পনের সহিত এক হইয়া, সমুদ্রের তরঙ্গরাশির ন্যায়, বালিকার চির-নিস্তব্ধ হৃদয়-উপকূলের নিকটে আসিয়া ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে। প্রকৃতির এই বিবিধ শব্দ এবং বিচিত্র গতি ইহাও বোবার ভাষা—বড় বড় চক্ষুপল্লব-বিশিষ্ট সুভার যে ভাষা, তাহারই একটা বিশ্বব্যাপী বিস্তার; ঝিল্লিরবপূর্ণ তৃণভূমি হইতে শব্দাতীত নক্ষত্রলোক পর্য্যন্ত কেবল ইঙ্গিত, ভঙ্গী, সঙ্গীত, ক্রন্দন এবং দীর্ঘনিশ্বাস।

এবং মধ্যাহ্নে যখন মাঝিরা জেলেরা খাইতে যাইত, গৃহস্থেরা ঘুমাইত, পাখীরা ডাকিত না, খেয়া নৌকা বন্ধ থাকিত, সজন জগৎ সমস্ত কাজকর্ম্মের মাঝখানে সহসা থামিয়া গিয়া ভয়ানক বিজন মূর্ত্তি ধারণ করিত, তখন রুদ্র মহাকাশের তলে কেবল একটি বোবা প্রকৃতি এবং একটি বোবা মেয়ে মুখামুখি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত—একজন সুবিস্তীর্ণ রৌদ্রে আর একজন ক্ষুদ্র তরুচ্ছায়ায়।

সুভার যে গুটিকতক অন্তরঙ্গ বন্ধুর দল ছিল না তাহা নহে। গোয়ালের দুটি গাভী, তাহাদের নাম সর্ব্বশী ও পাঙ্গুলি। সে নাম বালিকার মুখে তাহারা কখন শুনে নাই, কিন্তু তাহার পদশব্দ তাহারা চিনিত—তাহার কথাহীন একটা করুণ সুর ছিল, তাহার মর্ম্ম তাহারা ভাষার অপেক্ষা সহজে বুঝিত। সুভা কখন্ তাহাদের আদর করিতেছে, কখন্ ভর্ৎসনা করিতেছে, কখন্ মিনতি করিতেছে, তাহা তাহারা মানুষের অপেক্ষা ভাল বুঝিতে পারিত।

সুভা গোয়ালে ঢুকিয়া দুই বাহুর দ্বারা সর্ব্বশীর গ্রীবা বেষ্টন করিয়া তাহার কানের কাছে আপনার গণ্ডদেশ ঘর্ষণ করিত এবং পাঙ্গুলি স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া তাহার গা চাটিত। বালিকা দিনের মধ্যে নিয়মিত তিনবার করিয়া গোয়ালঘরে যাইত, তাহা ছাড়া অনিয়মিত আগমনও ছিল; গৃহে যেদিন কোন কঠিন কথা শুনিত, সেদিন সে অসময়ে তাহার এই মূক বন্ধু দুটির কাছে আসিত—তাহার সহিষ্ণুতাপরিপূর্ণ বিষাদশান্ত দৃষ্টিপাত হইতে তাহারা কি একটা অন্ধ অনুমানশক্তি দ্বারা বালিকার মর্ম্মবেদনা যেন বুঝিতে পারিত, এবং সুভার গা ঘেঁসিয়া আসিয়া অল্পে অল্পে তাহার বাহুতে শিং ঘষিয়া ঘষিয়া তাহাকে নির্ব্বাক্ ব্যাকুলতার সহিত সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিত।

ইহারা ছাড়া ছাগল এবং বিড়ালশাবকও ছিল, কিন্তু তাহাদের সহিত সুভার এরূপ সমকক্ষ ভাবের মৈত্রী ছিল না,

তথাপি তাহারা যথেষ্ট আনুগত্য প্রকাশ করিত। বিড়ালশিশুটি দিনে এবং রাত্রে যখন্ তখন্ সুভার গরম কোলটি নিঃসঙ্কোচে অধিকার করিয়া সুখনিদ্রার আয়োজন করিত এবং সুভা তাহার গ্রীবা ও পৃষ্ঠে কোমল অঙ্গুলি বুলাইয়া দিলে যে, তাহার নিদ্রাকর্ষণের বিশেষ সহায়তা হয়, ইঙ্গিতে এরূপ অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিত।

৩।

উন্নত-শ্রেণীর জীবের মধ্যে সুভার আরো একটি সঙ্গী জুটিয়াছিল, কিন্তু তাহার সহিত বালিকার ঠিক কিরূপ সম্পর্ক ছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন, কারণ, সে ভাষাবিশিষ্ট জীব; সুতরাং উভয়ের মধ্যে সমভাষা ছিল না।

গোঁসাইদের ছোট ছেলেটি—তাহার নাম প্রতাপ। লোকটি নিতান্ত অকর্ম্মণ্য। সে যে, কাজকর্ম্ম করিয়া সংসারের উন্নতি করিতে যত্ন করিবে বহু চেষ্টার পর বাপ মা সে আশা ত্যাগ করিয়াছেন। অকর্ম্মণ্য লোকের একটা সুবিধা এই যে, আত্মীয় লোকেরা তাহাদের উপর বিরক্ত হয় বটে, কিন্তু প্রায় তাহারা নিঃসম্পর্ক লোকদের প্রিয়পাত্র হয়—কারণ, কোন কার্য্যে আবদ্ধ না থাকাতে তাহারা সরকারী সম্পত্তি হইয়া দাঁড়ায়। সহরে যেমন এক-আধটা গৃহসম্পর্কহীন সরকারী বাগান থাকা আবশ্যক, তেমনি গ্রামে দুই চারটা অকর্ম্মণ্য সরকারী লোক থাকার বিশেষ প্রয়োজন। কাজেকর্ম্মে, আমোদে অবসরে যেখানে একটা লোক কম পড়ে, সেখানেই তাহাদিগকে হাতের কাছে পাওয়া যায়।

প্রতাপের প্রধান সখ, ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরা। ইহাতে অনেকটা সময় সহজে কাটান যায়। অপরাহ্নে নদীতীরে ইহাকে প্রায় এই কাজে নিযুক্ত দেখা যাইত। এবং এই উপলক্ষে সুভার সহিত তাহার প্রায় সাক্ষাৎ হইত। যে কোন কাজেই নিযুক্ত থাক্, একটা সঙ্গী পাইলে প্রতাপ থাকে ভাল। মাছধরার সময় বাক্যহীন সঙ্গীই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—এইজন্য প্রতাপ সুভার মর্য্যাদা বুঝিত। এইজন্য, সকলেই সুভাকে সুভা বলিত, প্রতাপ আর একটু অতিরিক্ত আদর সংযোগ করিয়া সুভাকে 'সু' বলিয়া ডাকিত।

সুভা তেঁতুলতলায় বসিয়া থাকিত এবং প্রতাপ অনতিদূরে মাটিতে ছিপ্ ফেলিয়া জলের দিকে চাহিয়া থাকিত। প্রতাপের একটি করিয়া পান বরাদ্দ ছিল, সুভা তাহা নিজে সাজিয়া আনিত। এবং বোধ করি, অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া চাহিয়া চাহিয়া ইচ্ছা করিত প্রতাপের কোন একটা বিশেষ সাহায্য করিতে, একটা কোন কাজে লাগিতে, কোন মতে জানাইয়া দিতে যে, এই পৃথিবীতে সেও একজন কম প্রয়োজনীয় লোক নহে। কিন্তু কিছুই করিবার ছিল না। তখন সে মনে মনে বিধাতার কাছে অলৌকিক ক্ষমতা প্রার্থনা করিত—মন্ত্রবলে সহসা এমন একটা আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটাইতে ইচ্ছা করিত যাহা দেখিয়া প্রতাপ আশ্চর্য্য হইয়া যাইত, বলিত, তাইত, আমাদের সুভির যে এত ক্ষমতা তাহা ত জানিতাম না!"

মনে কর, সুভা যদি জলকুমারী হইত; আস্তে আস্তে জল হইতে উঠিয়া একটা সাপের মাথার মণি ঘাটে রাখিয়া যাইত; প্রতাপ তাহার তুচ্ছ মাছধরা রাখিয়া সেই মাণিক লইয়া জলে ডুব মারিত; এবং

পাতালে গিয়া দেখিত, রূপার অট্টালিকায় সোণার পালঙ্কে—কে বসিয়া ?—আমাদের বাণীকণ্ঠের ঘরের সেই বোবা মেয়ে সু—আমাদের সু সেই মণিদীপ্ত গভীর নিস্তব্ধ পাতালপুরীর একমাত্র রাজকন্যা। তাহা কি হইতে পারিত না, তাহা কি এতই অসম্ভব! আসলে কিছুই অসম্ভব নয়, কিন্তু তবুও সু প্রজাশূন্য পাতালের রাজবংশে না জন্মিয়া বাণীকণ্ঠের ঘরে আসিয়া জন্মিয়াছে এবং গোঁসাইদের ছেলে প্রতাপকে কিছুতেই আশ্চর্য্য করিতে পারিতেছে না।

৪।

সুভার বয়স ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। ক্রমে সে যেন আপনাকে আপনি অনুভব করিতে পারিতেছে। যেন কোন একটা পূর্ণিমা তিথিতে কোন একটা সমুদ্র হইতে একটা জোয়ারের স্রোত আসিয়া তাহার অন্তরাত্মাকে এক নূতন অনির্ব্বচনীয় চেতনাশক্তিতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। সে আপনাকে আপনি দেখিতেছে, ভাবিতেছে, প্রশ্ন করিতেছে এবং বুঝিতে পারিতেছে না।

গভীর পূর্ণিমা রাত্রে সে একদিন ধীরে শয়ন-গৃহের দ্বার খুলিয়া ভয়ে ভয়ে মুখ বাড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখে। পূর্ণিমা প্রকৃতিও সুভার মত একাকিনী সুপ্ত জগতের উপর জাগিয়া বসিয়া—যৌবনের রহস্যে, পুলকে বিষাদে, অসীম নির্জ্জনতার একেবারে শেষ সীমা পর্য্যন্ত, এমন কি, তাহা অতিক্রম করিয়াও থম্‌থম্ করিতেছে, একটি কথা কহিতে পারিতেছে না। এই নিস্তব্ধ ব্যাকুল প্রকৃতির প্রান্তে একটি নিস্তব্ধ ব্যাকুলা বালিকা দাঁড়াইয়া।

এদিকে কন্যাভারগ্রস্ত পিতামাতা চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছে। লোকেও নিন্দা আরম্ভ করিয়াছে। এমন কি, একঘরে করিবে এমন জনরবও শুনা যায়। বাণীকণ্ঠের স্বচ্ছল অবস্থা, দুই বেলাই মাছ ভাত খায়, এজন্য তাহার শত্রু ছিল।

স্ত্রীপুরুষে বিস্তর পরামর্শ হইল। কিছুদিনের মত বাণী বিদেশে গেল।

অবশেষে ফিরিয়া আসিয়া কহিল "চল, কলিকাতায় চল"।

বিদেশযাত্রার উদ্যোগ হইতে লাগিল। কুয়াশা-ঢাকা প্রভাতের মত সুভার সমস্ত হৃদয় অশ্রুবাষ্পে একেবারে ভরিয়া গেল। একটা অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কাবশে সে কিছুদিন হইতে ক্রমাগত নির্ব্বাক্ জন্তুর মত তাহার বাপমায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত—ডাগর চক্ষু মেলিয়া তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া কি একটা বুঝিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু তাঁহারা কিছু বুঝাইয়া বলিতেন না।

ইতিমধ্যে একদিন অপরাহ্ণে জলে ছিপ্ ফেলিয়া প্রতাপ হাসিয়া কহিল, "কিরে, সু, তোর না কি বর পাওয়া গেছে, তুই বিয়ে করতে যাচ্চিস্? দেখিস্, আমাদের ভুলিস্ নে।" বলিয়া আবার মাছের দিকে মনোযোগ করিল।

মর্ম্মবিদ্ধ হরিণী ব্যাধের দিকে যেমন করিয়া তাকায়, নীরবে বলিতে থাকে "আমি তোমার কাছে কি দোষ করিয়াছিলাম," সুভা তেমনি করিয়া প্রতাপের দিকে চাহিল; সেদিন গাছের তলায় আর বসিল না; বাণীকণ্ঠ নিদ্রা হইতে উঠিয়া শয়ন-গৃহে তামাক খাইতেছিলেন, সুভা তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল। অবশেষে তাহাকে

সান্ত্বনা দিতে গিয়া বাণীকণ্ঠের শুষ্ক কপোলে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

কাল কলিকাতায় যাইবার দিন স্থির হইয়াছে। সুভা গোয়ালঘরে তাহার বাল্যসঙ্গীদের কাছে বিদায় লইতে গেল, তাহাদিগকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া, গলা ধরিয়া একবার দুই চোখে যত পারে কথা ভরিয়া তাহাদের মুখের দিকে চাহিল—দুই নেত্রপল্লব হইতে টপটপ করিয়া অশ্রুজল পড়িতে লাগিল।

সেদিন শুক্ল দ্বাদশীর রাত্রি। সুভা শয়ন-গৃহ হইতে বাহির হইয়া তাহার সেই চিরপরিচিত নদীতটে শষ্পশয্যায় লুটাইয়া পড়িল—যেন ধরণীকে, এই প্রকাণ্ড মূক মানবমাতাকে দুই বাহুতে ধরিয়া বলিতে চাহে, "তুমি আমাকে যাইতে দিয়ো না মা, আমার মত দুটি বাহু বাড়াইয়া তুমিও আমাকে ধরিয়া রাখ।"

কলিকাতার এক বাসায় সুভার মা একদিন সুভাকে খুব করিয়া সাজাইয়া দিলেন। আঁটিয়া চুল বাঁধিয়া, খোঁপায় জরির ফিতা দিয়া, অলঙ্কারে আচ্ছন্ন করিয়া তাহার স্বাভাবিক শ্রী যথাসাধ্য বিলুপ্ত করিয়া দিলেন। সুভার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু পড়িতেছে, পাছে চোখ ফুলিয়া খারাপ দেখিতে হয় এজন্য তাহার মাতা তাহাকে বিস্তর ভর্ৎসনা করিলেন, কিন্তু অশ্রুজল ভর্ৎসনা মানিল না।

বন্ধু সঙ্গে বর স্বয়ং কনে দেখিতে আসিলেন—কন্যার মাবাপ চিন্তিত, শঙ্কিত, শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, যেন দেবতা স্বয়ং নিজের বলির পশু বাছিয়া লইতে আসিয়াছেন। মা নেপথ্য হইতে বিস্তর তর্জ্জন গর্জ্জন শাসন করিয়া বালিকার অশ্রুস্রোত দ্বিগুণ বাড়াইয়া পরীক্ষকের সম্মুখে পাঠাইলেন।

পরীক্ষক অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন "মন্দ নহে।"

বিশেষতঃ বালিকার ক্রন্দন দেখিয়া বুঝিলেন, ইহার হৃদয় আছে এবং হিসাব করিয়া দেখিলেন, যে হৃদয় আজ বাপমায়ের বিচ্ছেদ-সম্ভাবনায় ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে, সেই হৃদয় আজ বাদে কাল আমারই ব্যবহারে লাগিতে পারিবে। শুক্তির মুক্তার ন্যায় বালিকার অশ্রুজল কেবল বালিকার মূল্য বাড়াইয়া দিল, তাহার হইয়া আর কোন কথা বলিল না।

পঞ্জিকা মিলাইয়া খুব একটা শুভলগ্নে বিবাহ হইয়া গেল।

বোবা মেয়েকে পরের হস্তে সমর্পণ করিয়া বাপ মা দেশে চলিয়া গেল—তাহাদের জাতি ও পরকাল রক্ষা হইল।

বর পশ্চিমে কাজ করে। বিবাহের অনতিবিলম্বে স্ত্রীকে পশ্চিমে লইয়া গেল।

সপ্তাহ খানেকের মধ্যে সকলেই বুঝিল, নববধূ বোবা। তা কেহ বুঝিল না, সেটা তাহার দোষ নহে। সে কাহাকেও প্রতারণা করে নাই। তাহার দুটি চক্ষু সকল কথাই বলিয়াছিল, কিন্তু কেহ তাহা বুঝিতে পারে নাই। সে চারিদিকে চায়—ভাষা পায় না, যাহারা বোবার ভাষা বুঝিত সেই আজন্মপরিচিত মুখগুলি দেখিতে পায় না—বালিকার চিরনীরব হৃদয়ের মধ্যে একটা অসীম অব্যক্ত ক্রন্দন বাজিতে লাগিল—অন্তর্যামী ছাড়া আর কেহ তাহা শুনিতে পাইল না।

এবার তাহার স্বামী চক্ষু এবং কর্ণেন্দ্রিয়ের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া এক ভাষা-বিশিষ্ট কন্যা বিবাহ করিয়া আনিল।



প্রতিহিংসা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:(০):—

মুকুন্দ বাবুদের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ানের পৌত্রী, বর্ত্তমান ম্যানেজারের স্ত্রী ইন্দ্রাণী অশুভক্ষণে বাবুদের বাড়িতে তাঁহাদের দৌহিত্রের বিবাহে বৌ-ভাতের নিমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন।

তৎপূর্ব্বকার ইতিহাস সংক্ষেপে বলিয়া রাখিলে কথাটা পরিষ্কার হইবে।

এক্ষণে মুকুন্দ বাবুও ভূতপূর্ব্ব, তাঁহার দেওয়ান গৌরীকান্তও ভূতপূর্ব্ব; কালের আহ্বান অনুসারে উভয়ের কেহই স্বস্থানে সশরীরে বর্ত্তমান নাই। কিন্তু যখন ছিলেন তখন উভয়ের মধ্যে বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। পিতৃমাতৃহীন গৌরীকান্তের যখন কোন জীবনোপায় ছিল না, তখন মুকুন্দলাল কেবলমাত্র মুখ দেখিয়া তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার উপরে নিজের ক্ষুদ্র বিষয় সম্পত্তি পর্য্যবেক্ষণের ভার দেন। কালে প্রমাণ হইল যে, মুকুন্দলাল ভুল করেন নাই। কীট যেমন করিয়া বল্মীক রচনা করে, স্বর্গকামী যেমন করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করে, গৌরীকান্ত তেমনি করিয়া অশ্রান্ত যত্নে তিলে তিলে দিনে দিনে মুকুন্দলালের বিষয় বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। অবশেষে যখন তিনি কৌশলে আশ্চর্য্য সুলভ-মূল্যে তরফ বাঁকাগাড়ি ক্রয় করিয়া মুকুন্দ-লালের সম্পত্তিভুক্ত করিলেন, তখন হইতে মুকুন্দবাবুরা গণ্যমান্য জমিদার শ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। প্রভুর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভৃত্যেরও উন্নতি হইল;—অল্পে অল্পে তাঁহার কোঠাবাড়ি, জোতজমা, এবং পূজার্চ্চনা বিস্তার লাভ করিল। এবং যিনি এককালে সামান্য তহশীলদার শ্রেণীর ছিলেন, তিনিও সাধারণের নিকট দেওয়ানজি নামে পরিচিত হইলেন।

ইহাই ভূতপূর্ব্ব কালের ইতিহাস। বর্ত্তমান কালে মুকুন্দবাবুর একটি পোষ্যপুত্র আছেন, তাঁহার নাম বিনোদবিহারী। এবং গৌরীকান্তের সুশিক্ষিত নাতজামাই অম্বিকাচরণ তাঁহাদের ম্যানেজারের কাজ করিয়া থাকেন। দেওয়ানজি তাঁহার পুত্র রমাকান্তকে বিশ্বাস করিতেন না—সেই জন্য বার্দ্ধক্যবশতঃ নিজে যখন কাজ ছাড়িয়া দিলেন, তখন পুত্রকে লঙ্ঘন করিয়া নাত-জামাই অম্বিকাকে আপন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

কাজকর্ম্ম বেশ চলিতেছে; পূর্ব্বের আমলে যেমন ছিল এখনও সকলি প্রায় তেমনি আছে, কেবল একটা বিষয়ে একটু প্রভেদ ঘটিয়াছে; এখন প্রভুভৃত্যের সম্পর্ক কেবল কাজকর্ম্মের সম্পর্ক—হৃদয়ের সম্পর্ক নহে। পূর্ব্বকালে টাকা শস্তা ছিল এবং হৃদয়টাও কিছু সুলভ ছিল, এখন সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে হৃদয়ের বাজে খরচটা একপ্রকার রহিত হইয়াছে। নিতান্ত আত্মীয়ের

ভাগেই টানাটানি পড়িয়াছে, তা বাহিরের লোকে পাইবে কোথা হইতে!"

ইতিমধ্যে বাবুদের বাড়িতে দৌহিত্রের বিবাহে বৌভাতের নিমন্ত্রণে দেওয়ানজীর পৌত্রী ইন্দ্রাণী গিয়া উপস্থিত হইল।

সংসারটা কৌতূহলী অদৃষ্টপুরুষের রাসায়নিক পরীক্ষা-শালা। এখানে কতকগুলা বিচিত্র-চরিত্র মানুষ একত্র করিয়া তাহাদের সংযোগ বিয়োগে নিয়ত কত চিত্রবিচিত্র অভূতপূর্ব্ব ইতিহাস সৃজিত হইতেছে, আর তাহার সংখ্যা নাই।

এই বৌভাতের নিমন্ত্রণস্থলে, এই আনন্দকার্য্যের মধ্যে দুটি দুই রকমের মানুষের দেখা হইল এবং দেখিতে দেখিতে সংসারের অশ্রান্ত জালবুনানীর মধ্যে একটা নূতন বর্ণের সূত্র উঠিয়া পড়িল এবং একটা নূতন রকমের গ্রন্থি পড়িয়া গেল।

সকলের আহারাদি শেষ হইয়া গেলে ইন্দ্রাণী বৈকালের দিকে কিছু বিলম্বে মনিব-বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। বিনোদের নয়নতারা যখন বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিল, ইন্দ্রাণী গৃহকর্ম্মের ব্যস্ততা, শারীরিক অস্বাস্থ্য প্রভৃতি দুই চারিটা কারণ প্রদর্শন করিল, কিন্তু তাহা কাহারও সন্তোষজনক বোধ হইল না।

প্রকৃত কারণ যদিও ইন্দ্রাণী গোপন করিল তথাপি তাহা বুঝিতে কাহারও বাকি রহিল না। সে কারণটি এই,—মুকুন্দ বাবুরা প্রভু ধনী বটেন কিন্তু কুলমর্য্যাদায় গৌরীকান্ত তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রাণী সে শ্রেষ্ঠতা ভুলিতে পারে না। সেই জন্য মনিবের বাড়ি পাছে খাইতে হয়, এই ভয়ে সে যথেষ্ট বিলম্ব করিয়া গিয়াছিল। তাহার অভিসন্ধি বুঝিয়া তাহাকে খাওয়াই-বার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করা হইয়াছিল কিন্তু ইন্দ্রাণী পরাস্ত হইবার মেয়ে নহে, তাহাকে কিছুতেই খাওয়ান গেল না।

একবার মুকুন্দ এবং গৌরীকান্ত বর্ত্তমানেও কুলাভিমান লইয়া ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর বিপ্লব বাধিয়াছিল। সে ঘটনা এই স্থানে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ইন্দ্রাণীকে দেখিতে বড় সুন্দর। আমাদের ভাষায় সুন্দরীর সহিত স্থির-সৌদামিনীর তুলনা প্রসিদ্ধ আছে। সে তুলনা অধিকাংশ স্থলে খাটে না, কিন্তু ইন্দ্রাণীকে খাটে। ইন্দ্রাণী যেন আপনার মধ্যে একটি প্রবল বেগ এবং প্রখর জ্বালা একটি সহজ শক্তির দ্বারা অটল গাম্ভীর্য্যপাশে অতি অনায়াসে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। বিদ্যুৎ তাহার মুখে চক্ষে এবং সর্ব্বাঙ্গে নিত্যকাল ধরিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। এখানে তাহার চপলতা নিষিদ্ধ।

এই সুন্দরী মেয়েটিকে দেখিয়া মুকুন্দ বা তাঁহার পোষ্যপুত্রের সহিত ইহার বিবাহ দিবার প্রস্তাব গৌরীকান্তের নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলেন। প্রভুভক্তিতে গৌরীকান্ত কাহারও নিকটে ন্যূন ছিলেন না; তিনি প্রভুর জন্য প্রাণ দিতে পারিতেন; এবং তাঁহার অবস্থার যতই উন্নতি হউক এবং কর্ত্তা তাঁহার প্রতি বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিয়া তাঁহাকে যতই প্রশ্রয় দিন তিনি কখনও ভ্রমেও স্বপ্নেও প্রভুর সম্মান বিস্মৃত হন নাই; প্রভুর সম্মুখে, এমন কি, প্রভুর প্রসঙ্গে তিনি যেন সন্নত হইয়া পড়িতেন—কিন্তু এই বিবাহের প্রস্তাবে তিনি কিছুতেই সম্মত হন নাই। প্রভুভক্তির দেনা তিনি কড়ায় গণ্ডায় শোধ করিতেন, কুলমর্য্যাদার পাওনা তিনি ছাড়িবেন

কেন! মুকুন্দলালের পুত্রের সহিত তিনি তাঁহার পৌত্রীর বিবাহ দিতে পারেন না।

ভৃত্যের এই কুলগর্ব্ব মুকুন্দলালের ভাল লাগে নাই। তিনি আশা করিয়াছিলেন এই প্রস্তাবের দ্বারা তাঁহার ভক্ত সেবকের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করা হইবে, গৌরীকান্ত যখন কথাটা সে ভাবে লইলেন না তখন মুকুন্দলাল কিছুদিন তাঁহার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত মনঃকষ্ট দিয়াছিলেন। প্রভুর বিমুখভাব গৌরীকান্তের বক্ষে মৃত্যুশেলের ন্যায় বাজিয়াছিল কিন্তু তথাপি তিনি তাঁহার পৌত্রীর সহিত এক পিতৃমাতৃহীন দরিদ্র কুলীনসন্তানের বিবাহ দিয়া তাহাকে ঘরে পালন করিয়া নিজের অর্থে শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন।

সেই কুলমদগর্ব্বিত পিতামহের পৌত্রী ইন্দ্রাণী তাহার প্রভুগৃহে গিয়া আহার করিল না; ইহাতে তাহার প্রভুপত্নী নয়নতারার অন্তঃকরণে সুমধুর প্রীতিরস উদ্বেলিত হইয়া উঠে নাই সে কথা বলা বাহুল্য। তখন ইন্দ্রাণীর অনেকগুলি স্পর্দ্ধা নয়নতারার বিদ্বেষকষায়িত কলোচক্ষে প্রকাশ পাইতে লাগিল।

প্রথম, ইন্দ্রাণী অনেক গহনা পরিয়া অত্যন্ত সুসজ্জিত হইয়া আসিয়াছিল। মনিববাড়িতে এত ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর করিয়া প্রভুদের সহিত সমকক্ষতা দেখাইবার কি আবশ্যক ছিল?

দ্বিতীয়, ইন্দ্রাণীর রূপের গর্ব্ব। ইন্দ্রাণীর রূপটা ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, এবং নিম্নপদস্থ ব্যক্তির এত অধিক রূপ থাকা অনাবশ্যক এবং অন্যায় হইতে পারে কিন্তু তাহার গর্ব্বটা সম্পূর্ণ নয়নতারার কল্পনা। রূপের কাহাকেও দোষী করা যায় না এই জন্য নিন্দা করিতে হইলে অগত্যা গর্ব্বের অবতারণা করিতে হয়।

তৃতীয়, ইন্দ্রাণীর দাম্ভিকতা,—চলিত ভাষায় যাহাকে দেমাক। ইন্দ্রাণীর একটি স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ছিল—অত্যন্ত প্রিয়পরিচিত ব্যক্তি ব্যতীত সে কাহারও সহিত মাখামাখি করিতে পারিত না। তাহা ছাড়া গায়ে পড়িয়া একটা গোলগোল করা, অগ্রসর হইয়া সকল কাজে হস্তক্ষেপ করিতে যাওয়া সেও তাহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল না।

এইরূপ নানাপ্রকার অমূলক ও সমূলক কারণে নয়নতারা ক্রমশঃ উত্তপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। এবং অনাবশ্যক সূত্র ধরিয়া ইন্দ্রাণীকে "আমাদের ম্যানেজারের স্ত্রী" "আমাদের দেওয়ানের নাতনী" বলিয়া বারংবার পরিচিত ও অভিহিত করিতে লাগিল। তাহার একজন প্রিয় মুখরা দাসীকে শিখাইয়া দিল—সে ইন্দ্রাণীর গায়ের উপর পড়িয়া পরম সখীভাবে তাহার গহনাগুলি হাত দিয়া নাড়িয়া নাড়িয়া সমালোচনা করিতে লাগিল;—কণ্ঠী এবং বাজুবন্দের প্রশংসা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ ভাই, এ কি গিল্‌টি-করা?"

ইন্দ্রাণী পরম গম্ভীর মুখে কহিল, "না, এ পিতলের!"

নয়নতারা ইন্দ্রাণীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "ওগো, তুমি ওখানে একলা দাঁড়িয়ে কি করছ, এই খাবারগুলো হাটখোলার পাল্কীতে তুলে দিয়ে এস না।" অদূরে বাড়ির দাসী উপস্থিত ছিল।

ইন্দ্রাণী কেবল মুহূর্ত্তকালের জন্য তাহার বিপুলপক্ষ্মচ্ছায়াগভীর উদার দৃষ্টি মেলিয়া

নয়নতারার মুখের দিকে চাহিল এবং পরক্ষণেই নীরবে মিষ্টান্নপূর্ণ সরা খুরি তুলিয়া লইয়া হাটখোলার পাল্কীর উদ্দেশে নীচে চলিল।

যিনি এই মিষ্টান্ন উপহার প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি শশব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "তুমি কেন ভাই কষ্ট করচ, দাও না ঐ দাসীর হাতে দাও।"

ইন্দ্রাণী তাহাতে সম্মত না হইয়া কহিলেন, "এতে আর কষ্ট কিসের!"

অপরা কহিলেন, "তবে ভাই আমার হাতে দাও!"

ইন্দ্রাণী কহিলেন, "না, আমিই নিয়ে যাচ্চি।"

বলিয়া, অন্নপূর্ণা যেমন স্নিগ্ধগম্ভীর মুখে সমুচ্চ স্নেহে ভক্তকে স্বহস্তে অন্ন তুলিয়া দিতে পারিতেন, তেমনি অটলস্নিগ্ধভাবে তিনি পাল্কীতে মিষ্টান্ন রাখিয়া আসিলেন—এবং সেই দুই মিনিটকালের সংস্রবে হাটখোলাবাসিনী ধনিগৃহ-বধূ এই স্বল্পভাষিণী মিতহাসিনী ইন্দ্রাণীর সহিত জন্মের মত প্রাণের সখীত্ব স্থাপনের জন্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

এইরূপে নয়নতারা স্ত্রীজনসুলভ নিষ্ঠুর নৈপুণ্যের সহিত যতগুলি অপমানশর বর্ষণ করিল ইন্দ্রাণী তাহার কোনটাকেই গায়ে বিঁধিতে দিল না;—সকলগুলিই তাহার অকলঙ্ক সমুজ্জ্বল সহজ তেজস্বিতার কঠিন বর্ম্মে ঠেকিয়া আপনি ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল। তাহার গম্ভীর অবিচলতা দেখিয়া নয়নতারার আক্রোশ আরও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল এবং ইন্দ্রাণী তাহা বুঝিতে পারিয়া এক সময় অলক্ষ্যে কাহারও নিকট বিদায় না লইয়া বাড়ি চলিয়া আসিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

যাহারা শান্তভাবে সহ্য করে তাহারা গভীরতররূপে আহত হয়; অপমানের আঘাত ইন্দ্রাণী যদিও অসীম অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তথাপি তাহা তাহার অন্তরে বাজিয়াছিল।

ইন্দ্রাণীর সহিত যেমন বিনোদবিহারীর বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল তেমনি এক সময় ইন্দ্রাণীর এক দূর সম্পর্কের নিঃস্ব পিস্তুতো ভাই বামাচরণের সহিত নয়নতারার বিবাহের কথা হয়;—সেই বামাচরণ এখন বিনোদের সেরেস্তায় একজন সামান্য কর্ম্মচারী। ইন্দ্রাণীর এখনো মনে পড়ে, বাল্যকালে একদিন নয়নতারার বাপ নয়নকে সঙ্গে করিয়া তাঁহাদের বাড়িতে আসিয়া বামাচরণের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহের জন্য গৌরীকান্তকে বিস্তর অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে ক্ষুদ্র বালিকা নয়নতারার অসামান্য প্রগল্‌ভতায় গৌরীকান্তের অন্তঃপুরে সকলেই আশ্চর্য্য এবং কৌতুকান্বিত হইয়াছিলেন, এবং তাহার সেই অকালপক্কতার নিকট মুখচোরা লাজুক ইন্দ্রাণী নিজেকে নিতান্ত অক্ষমা অনভিজ্ঞা জ্ঞান করিয়াছিল। গৌরীকান্ত এই মেয়েটির অনর্গল কথায় বার্ত্তায় এবং চেহারায় বড়ই খুসী হইয়াছিলেন কিন্তু কুলের যৎকিঞ্চিৎ ত্রুটি থাকায় বামাচরণের

সহিত ইহার বিবাহপ্রস্তাবে মত দিলেন না। অবশেষে তাঁহারই পছন্দে এবং তাঁহারই চেষ্টায় অকুলীন বিনোদের সহিত নয়নতারার বিবাহ হয়।

এই সকল কথা মনে করিয়া ইন্দ্রাণী কোন সান্ত্বনা পাইল না, বরং অপমান আরও বেশী করিয়া বাজিতে লাগিল। মহাভারতে বর্ণিত শুক্রাচার্য্যদুহিতা দেবযানী এবং শর্ম্মিষ্ঠার কথা মনে পড়িল। দেবযানী যেমন তাহার প্রভুকন্যা শর্ম্মিষ্ঠার দর্পচূর্ণ করিয়া তাহাকে দাসী করিয়াছিল, ইন্দ্রাণী যদি তেমনি করিতে পারিত তবেই যথোপযুক্ত বিধান হইত। এক সময় ছিল, যখন দৈত্যদের নিকট দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের ন্যায় মুকুন্দ বাবুর পরিবারবর্গের নিকট তাহার পিতামহ গৌরীকান্ত একান্ত আবশ্যক ছিলেন। তখন তিনি যদি ইচ্ছা করিতেন তবে মুকুন্দ বাবুকে হীনতা স্বীকার করাইতে পারিতেন—কিন্তু তিনিই মুকুন্দলালের বিষয় সম্পত্তিকে উন্নতির চরম সীমায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়া সর্ব্বপ্রকার শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, অতএব আজ আর তাঁহাকে স্মরণ করিয়া প্রভুদের কৃতজ্ঞ হইবার আবশ্যকতা নাই। ইন্দ্রাণী মনে করিল, বাঁকাগাড়ি পরগণা তাহার পিতামহ অনায়াসে নিজের জন্যই কিনিতে পারিতেন, তখন তাঁহার সে ক্ষমতা জন্মিয়াছিল, তাহা না করিয়া তিনি সেটা মনিবকে কিনিয়া দিলেন—ইহা যে একপ্রকার দান করা সে কথা কি আজ সেই মনিবের বংশে কেহ মনে করিয়া রাখিয়াছে? আমাদেরই দত্ত ধনমানের গর্ব্বে তোমরা আমাদিগকে আজ অপমান করিবার অধিকার পাইয়াছ ইহাই মনে করিয়া ইন্দ্রাণীর চিত্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া সে দেখিল তাহার স্বামী প্রভুগৃহের নিমন্ত্রণ ও তাহার পরে জমিদারী কাছারির সমস্ত কাজকর্ম্ম সারিয়া তাঁহার শয়নকক্ষের একটি কেদারা আশ্রয় করিয়া নিভৃতে খবরের কাগজ পাঠ করিতেছেন।

অনেকের ধারণা আছে যে স্বামী স্ত্রীর স্বভাব প্রায়ই একরূপ হইয়া থাকে। তাহার কারণ, দৈবাৎ কোন কোন স্থলে স্বামী স্ত্রীর স্বভাবের মিল দেখিতে পাইলে সেটা আমাদের নিকট এমন সমুচিত এবং সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় যে, "আমরা আশা করি এই নিয়ম বুঝি অধিকাংশ স্থলেই খাটে। যাহা হউক, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অম্বিকাচরণের সহিত ইন্দ্রাণীর দুই একটা বিশেষ বিষয়ে বাস্তবিক স্বভাবের মিল দেখা যায়। অম্বিকাচরণ তেমন মিশুক্ লোক নহেন। তিনি বাহিরে যান কেবলমাত্র কাজ করিতে। নিজের কাজ সম্পূর্ণ শেষ করিয়া এবং অন্যকে পুরামাত্রায় কাজ করাইয়া লইয়া বাড়ি আসিয়া যেন তিনি অনাত্মীয়তার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য এক দুর্গম-দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করেন। বাহিরে তিনি এবং তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ঘরের মধ্যে তিনি এবং তাঁহার ইন্দ্রাণী—ইহাতেই তাঁহার সমস্ত জীবন পর্য্যাপ্ত।

ভূষণের ছটা বিস্তার করিয়া যখন সুসজ্জিতা ইন্দ্রাণী ঘরে প্রবেশ করিলেন, তখন অম্বিকাচরণ তাঁহাকে পরিহাস করিয়া কি একটা কথা বলিবার উপক্রম করিলেন, কিন্তু সহসা ক্ষান্ত হইয়া চিন্তিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার কি হয়েচে?"

ইন্দ্রাণী তাঁহার সমস্ত চিন্তা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন,

"কি আর হবে? সম্প্রতি আমার স্বামী রত্নের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে।"

অম্বিকা খবরের কাগজ ভূমিতলে ফেলিয়া দিয়া কহিলেন—"সে ত আমার অগোচর নেই। তৎপূর্ব্বে?"

ইন্দ্রাণী একে একে গহনা খুলিতে খুলিতে বলিলেন, "তৎপূর্ব্বে স্বামিনীর কাছে থেকে সমাদর লাভ হয়েচে।"

অম্বিকা জিজ্ঞাসা করিলেন—"সমাদরটা কি রকমের?

ইন্দ্রাণী স্বামীর কাছে আসিয়া তাঁহার কেদারার হাতার উপর বসিয়া তাঁহার গ্রীবা বেষ্টন করিয়া উত্তর করিল, "তোমার কাছ থেকে যে রকমের পাই ঠিক সে রকমের নয়।"

তাহার পর, ইন্দ্রাণী একে একে সকল কথা বলিয়া গেল। সে মনে করিয়াছিল স্বামীর কাছে এ সকল অপ্রিয় কথার উত্থাপন করিবে না; কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল না, এবং ইহার অনুরূপ প্রতিজ্ঞাও ইন্দ্রাণী ইতিপূর্ব্বে কখনও রক্ষা করিতে পারে নাই। বাহিরের লোকের নিকট ইন্দ্রাণী যতই সংযত সমাহিত হইয়া থাকিত, স্বামীর নিকটে সে সেই পরিমাণে আপন প্রকৃতির সমুদয় স্বাভাবিক বন্ধনমোচন করিয়া ফেলিত—সেখানে লেশমাত্র আত্মগোপন করিতে পারিত না।

অম্বিকাচরণ সমস্ত ঘটনা শুনিয়া মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, এখনি আমি কাজে ইস্তফা দিব। তৎক্ষণাৎ তিনি বিনোদ বাবুকে এক কড়া চিঠি লিখিতে উদ্যত হইলেন।

ইন্দ্রাণী তখন চৌকির হাতা হইতে নীচে নামিয়া মাদুরপাতা মেঝের উপর স্বামীর পায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার কোলের উপর বাহু রাখিয়া বলিল—এত তড়াতাড়ি কাজ নেই। চিঠি আজ থাক্। কাল সকালে যা হয় স্থির কোরো।

অম্বিকা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, না, আর এক দণ্ড বিলম্ব করা উচিত নয়।

ইন্দ্রাণী তাহার পিতামহের হৃদয়মৃণালে একটিমাত্র পদ্মের মত ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার অন্তর হইতে সে যেমন স্নেহ-রস আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল তেমনি পিতামহের চিত্তসঞ্চিত অনেকগুলি ভাব সে অলক্ষ্যে গ্রহণ করিয়াছিল। মুকুন্দ-লালের পরিবারের প্রতি গৌরীকান্তের যে একটি অচলা নিষ্ঠা ও ভক্তি ছিল ইন্দ্রাণী যদিও তাহা সম্পূর্ণ প্রাপ্ত হয় নাই, কিন্তু প্রভুপরিবারের হিতসাধনে জীবন অর্পণ করা যে তাহাদের কর্ত্তব্য, এই ভাবটি তাহার মনে দৃঢ়বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল তাহার সুশিক্ষিত স্বামী ইচ্ছা করিলে ওকলাতী করিতে পারিতেন, সম্মানজনক কাজ লইতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর হৃদয়ের দৃঢ় সংস্কার অনুসরণ করিয়া তিনি অনন্যমনে সন্তুষ্টচিত্তে বিনোদের বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। ইন্দ্রাণী যদিও অপমানে আহত হইয়াছিল, তথাপি তাহার স্বামী যে বিনোদলালের কাজ ছাড়িয়া দিবে এ তাহার কিছুতেই মনে হইল না।

ইন্দ্রাণী তখন যুক্তির অবতারণা করিয়া মৃদু মিষ্ট স্বরে কহিল—বিনোদ বাবুর ত কোন দোষ নেই তিনি এর কিছুই জানেন না—তাঁর স্ত্রীর উপর রাগ করে তুমি হঠাৎ তাড়াতাড়ি তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করতে যাবে কেন?

শুনিয়া অম্বিকা বাবু উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন—নিজের সঙ্কল্প তাঁহার নিকট অত্যন্ত হাস্যকর বলিয়া বোধ হইল। তিনি কহিলেন, "সে একটা কথা বটে! কিন্তু মনিব হোন্ আর যিনিই হোন্ ওদের ওখানে আর কখন তোমাকে পাঠাচ্চিনে।"

এই অল্প একটু ঝড়েই সে দিনকার মত মেঘ কাটিয়া গেল, গৃহ প্রসন্ন হইয়া উঠিল এবং স্বামীর বিশেষ আদরে ইন্দ্রাণী বাহিরের সমস্ত অনাদর বিস্মৃত হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:-*-০:—

বিনোদবিহারী অম্বিকাচরণের উপর সম্পূর্ণ ভার দিয়া জমিদারীর কাজ কিছুই দেখিতেন না। নিতান্ত-নির্ভর ও অতি-নিশ্চয়তাবশতঃ কোন কোন স্বামী ঘরের স্ত্রীকে যেরূপ অবহেলার চক্ষে দেখিয়া থাকে, নিজের জমিদারীর প্রতিও বিনোদের কতকটা সেই ভাবের উপেক্ষা ছিল। জমিদারীর আয় এতই নিশ্চিত এতই বাঁধা যে তাহাকে আয় বলিয়া বোধ হয় না—তাহা অভ্যস্ত, এবং তাহার কোন আকর্ষণ ছিল না।

বিনোদের ইচ্ছা ছিল, একটা সংক্ষেপ সুড়ঙ্গপথ অবলম্বন করিয়া হঠাৎ এক রাত্রির মধ্যে কুবেরের ভাণ্ডারের মধ্যে প্রবেশ করিবেন। সেই জন্য নানা লোকের পরামর্শে তিনি গোপনে নানা প্রকার অদ্ভুত-গবী ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিতেন। কখনও স্থির হইত দেশের সমস্ত বাব্‌লা গাছ জমা লইয়া গোরুর গাড়ির চাকা তৈরি করিবেন, কখনও পরামর্শ হইত সুন্দর বনের সমস্ত মধুচক্র তিনি আহরণ করিবেন, কখনও লোক পাঠাইয়া পশ্চিম প্রদেশের বনগুলি বন্দোবস্ত করিয়া হরীতকীর ব্যবসায় একচেটে করিবার আয়োজন হইত। বিনোদ মনে মনে ইহা বুঝিতেন যে, অন্য লোকে শুনিলে হাসিবে, সেই জন্য কাহারও কাছে প্রকাশ করিতে চাহিতেন না। বিশেষতঃ অম্বিকাচরণকে তিনি একটু বিশেষ লজ্জা করিতেন; অম্বিকা পাছে মনে করেন তিনি টাকাগুলো নষ্ট করিতে বসিয়াছেন সেজন্য মনে মনে সঙ্কুচিত ছিলেন। অম্বিকার নিকট তিনি এমন ভাবে থাকিতেন যেন অম্বিকাই জমিদার এবং তিনি কেবল বসিয়া থাকিবার জন্য বার্ষিক কত টাকা করিয়া বেতন পাইতেন।

নিমন্ত্রণের পরদিন হইতে নয়নতারা তাঁহার স্বামীর কাণে মন্ত্র দিতে লাগিলেন। তুমি ত নিজে কিছুই দেখ না, তোমাকে অম্বিকা হাত তুলিয়া যাহা দেয় তাহাই তুমি শিরোধার্য্য করিয়া লও; এদিকে ভিতরে ভিতরে কি সর্ব্বনাশ হইতেছে তাহা কেহই জানে না। তোমার ম্যানেজারের স্ত্রী যা গয়না পরিয়া আসিয়াছিল, এমন গয়না তোমার ঘরে আসিয়া আমি কখনও চক্ষেও দেখি নাই। এ সব গয়না সে পায় কোথা হইতে এবং এত দেমাকই বা তাহার বাড়িল কিসের জোরে! ইত্যাদি ইত্যাদি। গহনার বর্ণনা নয়নতারা অনেকটা অতিরঞ্জিত করিয়া বলিল, এবং ইন্দ্রাণী নিজ মুখে তাহার দাসীকে কি সকল কথা বলিয়া গেছে তাহাও সে বহুল পরিমাণে রচনা করিয়া গেল।

বিনোদ দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক—এক দিকে সে পরের প্রতি নির্ভর না করিয়াও থাকিতে পারে না, অপরদিকে যে তাহার কাণে যেরূপ সন্দেহ তুলিয়া দেয় সে তাহাই বিশ্বাস করিয়া বসে। ম্যানেজার যে চুরি করিতেছে মুহূর্ত্তকালের মধ্যেই এ বিশ্বাস তাহার দৃঢ় হইল। বিশেষতঃ কাজ সে নিজে দেখে না বলিয়া কল্পনায় সে নানাপ্রকার বিভীষিকা দেখিতে লাগিল—অথচ কেমন করিয়া ম্যানেজারের চুরি ধরিতে হইবে তাহারও রাস্তা সে জানে না। স্পষ্ট করিয়া তাহাকে কিছু বলিতে পারে এমন সাহস নাই—মহা মুস্কিল হইল।

অম্বিকাচরণের একাধিপত্যে কর্ম্মচারিগণ সকলেই ঈর্ষ্যান্বিত ছিল। বিশেষতঃ গৌরীকান্ত তাঁহার যে দূরসম্পর্কীয় ভাগিনেয় বামাচরণকে কাজ দিয়াছিলেন, অম্বিকার প্রতি বিদ্বেষ তাহারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। কারণ, সম্পর্ক প্রভৃতি অনুসারে সে নিজেকে অম্বিকার সমান জ্ঞান করিত এবং অম্বিকা তাহার আত্মীয় হইয়াও কেবলমাত্র ঈর্ষ্যাবশতঃই তাহাকে উচ্চপদ দিতেছে না, এ ধারণা তার দৃঢ় ছিল। পদ পাইলেই পদের উপযুক্ত যোগ্যতা আপনি যোগায় এই তাহার মত। বিশেষতঃ ম্যানেজারের কাজকে সে অত্যন্ত তুচ্ছজ্ঞান করিত; বলিত, সেকালে রথের উপর যেমন ধ্বজা থাকিত, আজকাল আপিসের কাজে ম্যানেজার সেইরূপ—ঘোড়াবেটা খাটিয়া মরে আর ধ্বজা মহাশয় রথের সঙ্গে সঙ্গে কেবল দর্পভরে দুলিতে থাকেন।

বিনোদ ইতিপূর্ব্বে কাজকর্ম্মের কোন খোজখবর লইত না—কেবল যখন ব্যবসা উপলক্ষে হঠাৎ অনেক টাকার আবশ্যক হইত তখন গোপনে খাজাঞ্চিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিত, এখন তহবিলে কত টাকা আছে? খাজাঞ্চি টাকার পরিমাণ বলিলে কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া সে টাকাটা চাহিয়া ফেলিত—যেন তাহা পরের টাকা। খাজাঞ্চি তাহার নিকট সই লইয়া টাকা দিত। তাহার পরে কিছুকাল ধরিয়া অম্বিকা বাবুর নিকট বিনোদ কুণ্ঠিত হইয়া থাকিত। কোন মতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না হইলে আরাম বোধ করিত।

অম্বিকাচরণ মাঝে মাঝে ইহা লইয়া বিপদে পড়িতেন। কারণ জমিদারের অংশ জমিদারকে দিয়া তহবিলে প্রায় আমানতী, সদরখাজনা, অথবা আমলাবর্গের বেতন প্রভৃতি খরচের টাকা জমা থাকিত। সে টাকা অন্যায় ব্যয় হইয়া গেলে বড়ই অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। কিন্তু বিনোদ টাকাটি লইয়া এমনি চোরের মত লুকাইয়া বেড়াইত যে, তাহাকে এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার অবসর পাওয়া যাইত না—পত্র লিখিলেও কোনও ফল হইত না—কারণ, লোকটার কেবল চক্ষুলজ্জা ছিল আর কোন লজ্জা ছিল না, এই জন্য সে কেবল সাক্ষাৎকারকে ডরাইত।

ক্রমে যখন বিনোদ বাড়াবাড়ী করিতে লাগিল তখন অম্বিকাচরণ বিরক্ত হইয়া লোহার সিন্ধুকের চাবি নিজের কাছে রাখিলেন। বিনোদের গোপনে টাকা লওয়া একেবারে বন্ধ হইল। অথচ লোকটা এতই দুর্ব্বল প্রকৃতি যে, প্রভু হইয়াও স্পষ্ট করিয়া এ সম্বন্ধে কোন প্রকার বল খাটাইতে পারিল না। অম্বিকাচরণের বৃথা চেষ্টা। অলক্ষ্মী যাহার সহায়, লোহার সিন্ধুকের চাবি তাহার টাকা আটক করিয়া

রাখিতে পারে না। বরং হিতে বিপরীত হইল। কিন্তু সে সকল কথা পরে হইবে।

অম্বিকাচরণের কড়া নিয়মে বিনোদ ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত উত্যক্ত হইয়াছিল। এমন সময় নয়নতারা যখন তাহার মনে সন্দেহ জন্মাইয়া দিল তখন সে কিছু খুসি হইল। গোপনে একে একে নিম্নতন কর্ম্মচারী-দিগকে ডাকিয়া সন্ধান লইতে লাগিল। তখন বামাচরণ তাহার প্রধান চর হইয়া উঠিল।

গৌরীকান্তের আমলে দেওয়ানজি বলপূর্ব্বক পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারের জমিতে হস্তক্ষেপ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না এমন করিয়া তিনি অনেকের অনেক জমি অপহরণ করিয়াছেন। কিন্তু অম্বিকাচরণ কখনও সে কাজে প্রবৃত্ত হইতেন না। এবং মোকদ্দমা বাধিবার উপক্রম হইলে তিনি যথাসাধ্য আপষের চেষ্টা করিতেন। বামাচরণ ইহারই প্রতি প্রভুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। স্পষ্ট বুঝাইয়া দিল, অম্বিকাচরণ নিশ্চয় অপরপক্ষ হইতে ঘুষ লইয়া মনিবের ক্ষতি করিয়া আপষ করিয়াছে। বামাচরণের নিজেরও বিশ্বাস তাহাই—যাহার হাতে ক্ষমতা আছে সে যে ঘুষ না লইয়া থাকতে পারে ইহা সে মরিয়া গেলেও বিশ্বাস করিতে পারে না।

এইরূপে গোপনে নানা মুখ হইতে ফুৎকার পাইয়া বিনোদের সন্দেহশিখা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল—কিন্তু সে প্রত্যক্ষভাবে কোন উপায় অবলম্বন করিতেই সাহস করিল না। এক চক্ষুলজ্জা, দ্বিতীয়তঃ আশঙ্কা, পাছে সমস্ত অবস্থাভিজ্ঞ অম্বিকাচরণ তাহার কোন অনিষ্ট করে।

অবশেষে নয়নতারা স্বামীর এই কাপুরুষতায় জ্বলিয়া পুড়িয়া বিনোদের অজ্ঞাতসারে একদিন অম্বিকাচরণকে ডাকিয়া পর্দ্দার আড়াল হইতে বলিলেন—"তোমাকে আর রাখা হবে না, তুমি বামাচরণকে সমস্ত হিসেব বুঝিয়ে দিয়ে চলে যাও।"

তাঁহার সম্বন্ধে বিনোদের নিকট আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে সে কথা অম্বিকা পূর্ব্বেই আভাসে জানিতে পারিয়াছিলেন, সেই জন্য নয়নতারার কথায় তিনি তেমন আশ্চর্য্য হন নাই; তৎক্ষণাৎ বিনোদবিহারীর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে কি আপনি কাজ থেকে নিষ্কৃতি দিতে চান?"

বিনোদ শশব্যস্ত হইয়া কহিল, "না কখনই না"

অম্বিকাচরণ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার উপর কি আপনার কোন সন্দেহের কারণ ঘটেছে?"

বিনোদ অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া কহিল —"কিছুমাত্র না!" অম্বিকাচরণ নয়নতারার ঘটনা উল্লেখমাত্র না করিয়া আপিসে চলিয়া আসিলেন—বাড়িতে ইন্দ্রাণীকেও কিছু বলিলেন না। এইভাবে কিছুদিন গেল।

এমন সময় অম্বিকাচরণ ইনফ্লুয়েঞ্জায় পড়িলেন। শক্তব্যামো নহে, কিন্তু দুর্ব্বলতাবশতঃ অনেকদিন আপিস কামাই করিতে হইল।

সেই সময় সদর খাজনা দেয় এবং অন্যান্য কাজের বড় ভীড়। সেই জন্য একদিন সকালে রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া অম্বিকাচরণ হঠাৎ আপিসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সে দিন কেহই তাঁহাকে প্রত্যাশা করে নাই, এবং সকলেই বলিতে লাগিল, আপনি

বাড়ি যান, এত কাহিল শরীরে কাজ করিবেন না।

অম্বিকাচরণ নিজের দুর্ব্বলতার প্রসঙ্গ উড়াইয়া দিয়া, ডেস্কে গিয়া বসিলেন। আমলারা সকলেই কিছু যেন অস্থির হইয়া উঠিল এবং হঠাৎ অত্যন্ত অতিরিক্ত মনোযোগের সহিত নিজ নিজ কাজে প্রবৃত্ত হইল।

অম্বিকা ডেস্ক্ খুলিয়া দেখেন তাহার মধ্যে তাঁহার একখানি কাগজও নাই। সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ কি ; সকলেই যেন আকাশ হইতে পড়িল, চোরে লইয়াছে, কি, ভূতে লইয়াছে কেহ ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না।

বামাচরণ কহিল,"আরে মশায় আপনার ন্যাকামি রেখে দিন্! সকলেই জানেন, ওর কাগজপত্র বাবু নিজে তলব করে নিয়ে গেছেন"।

অম্বিকা রুদ্ধ-রোষে শ্বেতবর্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'কেন?'

বামাচরণ কাগজ লিখিতে লিখিতে বলিল,"সে আমরা কেমন করে বল্‌ব?"

বিনোদ অম্বিকাচরণের অনুপস্থিতি সুযোগে বামাচরণের মন্ত্রণাক্রমে নূতন চাবি তৈয়ার করাইয়া ম্যানেজারের প্রাইভেট ডেস্ক খুলিয়া তাঁহার সমস্ত কাগজপত্র পরীক্ষা করিতে লইয়া গিয়াছেন। চতুর বামাচরণ যে কথা গোপন করিল না— অম্বিকা অপমানিত হইয়া কাজে ইস্তফা দেন ইহা তাহার অনভিপ্রেত ছিল না।

অম্বিকাচরণ ডেস্কে চাবি লাগাইয়া কম্পিতদেহে বিনোদের সন্ধানে গেলেন— বিনোদ বলিয়া পাঠাইল তাহার মাথা ধরিয়াছে ; সেখান হইতে বাড়ি গিয়া হঠাৎ দুর্ব্বলদেহে বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। ইন্দ্রাণী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে তাহার সমস্ত হৃদয় দিয়া যেন আবৃত করিয়া ধরিল। ক্রমে ইন্দ্রাণী সকল কথা শুনিল।

স্থির-সৌদামিনী আর স্থির রহিল না— তাহার বক্ষ ফুলিতে লাগিল, বিস্ফারিত মেঘকৃষ্ণ চক্ষুপ্রান্ত হইতে উন্মুক্ত বজ্রশিখা সুতীব্র শুভ্রজ্বালা বিক্ষেপ করিতে লাগিল। এমন স্বামীর এমন অপমান! এত বিশ্বাসের এই পুরস্কার!

ইন্দ্রাণীর এই অত্যুগ্র নিঃশব্দ রোষদাহ দেখিয়া অম্বিকার রাগ থামিয়া গেল— তিনি যেন দেবতার শাসন হইতে পাপীকে রক্ষা করিবার জন্য ইন্দ্রাণীর হাত ধরিয়া বলিলেন—"বিনোদ ছেলেমানুষ, দুর্ব্বলস্বভাব, পাঁচ জনের কথা শুনে তার মন বিগ্‌ড়ে গেছে!"

তখন ইন্দ্রাণী দুই হস্তে তাহার স্বামীর গলদেশ বেষ্টন করিয়া তাঁহাকে বক্ষের কাছে টানিয়া লইয়া আবেগের সহিত চাপিয়া ধরিল এবং হঠাৎ তাহার দুই চক্ষুর রোষদীপ্তি ম্লান করিয়া দিয়া ঝর্‌ঝর্ করিয়া অশ্রুজল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। পৃথিবীর সমস্ত অন্যায় হইতে সমস্ত অপমান হইতে দুই বাহুপাশে টানিয়া লইয়া সে যেন তাহার হৃদয়দেবতাকে আপন হৃদয়মন্দিরে তুলিয়া রাখিতে চায়।

স্থির হইল অম্বিকাচরণ এখনি কাজ ছাড়িয়া দিবেন,—আজ আর কেহ তাহাতে কিছুমাত্র প্রতিবাদ করিল না। কিন্তু এই তুচ্ছ প্রতিশোধে ইন্দ্রাণীর মন সান্ত্বনা মানিল না। যখন সন্দিগ্ধ প্রভু নিজেই অম্বিকাকে ছাড়াইতে উদ্যত, তখন কাজ ছাড়িয়া দিয়া তাহার আর কি শাসন

হইল? কাজে জবাব দিবার সঙ্কল্প করিয়াই অম্বিকার রাগ থামিয়া গেল, কিন্তু সকল কাজকর্ম্ম সকল আরাম বিশ্রামের মধ্যে ইন্দ্রাণীর রাগ তাহার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে জ্বলিতে লাগিল।

পরিশিষ্ট।

এমন সময়ে চাকর আসিয়া খবর দিল বাবুদের বাড়ির খাজাঞ্চি আসিয়াছে। অম্বিকা মনে করিলেন, বিনোদ স্বাভাবিক চক্ষুলজ্জাবশতঃ খাজাঞ্চির মুখ দিয়া তাঁহাকে কাজ হইতে জবাব দিয়া পাঠাইয়াছেন। সেই জন্য নিজেই একখানি ইস্তফাপত্র লিখিয়া খাজাঞ্চির হস্তে গিয়া দিলেন।

খাজাঞ্চি তৎসম্বন্ধে কোনপ্রশ্ন না করিয়া কহিল, সর্ব্বনাশ হইয়াছে! অম্বিকা জিজ্ঞাসা করিলেন কি হইয়াছে?

তদুত্তরে শুনিলেন, যখন হইতে অম্বিকাচরণের সতর্কতাবশতঃ খাজাঞ্চিখানা হইতে বিনোদের টাকা লওয়া বন্ধ হইয়াছে তখন হইতে বিনোদ নানা স্থান হইতে গোপনে বিস্তর টাকা ধার লইতে আরম্ভ করিয়াছিল। একটার পর আর একটা ব্যবসা ফাঁদিয়া সে যতই প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে ছিল ততই তাহার রোখ্ চড়িয়া যাইতেছিল—ততই নূতন নূতন অসম্ভব উপায়ে আপন ক্ষতি নিবারণের চেষ্টা করিয়া অবশেষে আকণ্ঠ ঋণে নিমগ্ন হইয়াছে। অম্বিকাচরণ যখন পীড়িত ছিলেন তখন বিনোদ সেই সুযোগে তহবিল হইতে সমস্ত টাকা উঠাইয়া লইয়াছে। বাঁকাগাড়ি পরগণা অনেক কাল হইতেই পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারের নিকট রেহেনে আবদ্ধ; সে এ পর্য্যন্ত টাকার অন্ত কোন প্রকার তাগাদা না দিয়া অনেক টাকা সুদ জমিতে দিয়াছে, এখন সময় বুঝিয়া হঠাৎ ডিক্রী করিয়া লইতে উদ্যত হইয়াছে। এই ত বিপদ!

শুনিয়া অম্বিকাচরণ কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। অবশেষে কহিলেন, "আজ কিছুই ভেবে উঠ্‌তে পারচিনে—কাল এর পরামর্শ করা যাবে।" খাজাঞ্চি যখন বিদায় লইতে উঠিলেন তখন অম্বিকা তাঁহার ইস্তফাপত্র চাহিয়া লইলেন।

অন্তঃপুরে আসিয়া অম্বিকা ইন্দ্রাণীকে সকল কথা বিস্তারিত জানাইয়া কহিলেন—বিনোদের এ অবস্থায় ত আমি কাজ ছেড়ে দিতে পারিনে।

ইন্দ্রাণী অনেকক্ষণ প্রস্তরমূর্ত্তির মত স্থির হইয়া রহিল—অবশেষে অন্তরের সমস্ত বিরোধদ্বন্দ্ব সবলে দলন করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—না, এখন ছাড়তে পার না।

তাহার পরে কোথায় টাকা কোথায় টাকা করিয়া সন্ধান পড়িয়া গেল—যথেষ্ট পরিমাণে টাকা আর জুটে না। অন্তঃপুর হইতে গহনাগুলি সংগ্রহ করিবার জন্য অম্বিকা বিনোদকে পরামর্শ দিলেন। ইতিপূর্ব্বে ব্যবসায় উপলক্ষে বিনোদ সে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কখন কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এবারে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া অনেক দীনতা স্বীকার করিয়া গহনাগুলি ভিক্ষা চাহিলেন। নয়নতারা কিছুতেই দিলেন না;—তিনি মনে করিলেন, তাঁহার চারিদিক্ হইতে সকলি খসিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে; এখন এই গহনাগুলি তাঁহার একমাত্র শেষ

অবলম্বনস্থল—এবং ইহা তিনি অন্তিম আগ্রহ সহকারে প্রাণপণে চাপিয়া ধরিলেন।

যখন কোথা হইতেও কোন টাকা পাওয়া গেল না, তখন ইন্দ্রাণীর প্রতিহিংসা-ভ্রুকুটির উপরে একটা তীব্র আনন্দের জ্যোতিঃ পতিত হইল। সে তাহার স্বামীর হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, তোমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা ত করিয়াছ এখন তুমি ক্ষান্ত হও, যাহা হইবার তা হউক।

স্বামীর অবমাননায় উদ্দীপ্ত সতীর রোষানল এখনও নির্ব্বাহিত হয় নাই, দেখিয়া অম্বিকা মনে মনে হাসিলেন। বিপদের দিনে অসহায় বালকের ন্যায় বিনোদ তাঁহার উপরে এমন একান্ত নির্ভর করিয়া আছে যে, তাহার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত দয়ার উদ্রেক হইয়াছে—এখন তাহাকে তিনি কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারেন না। তিনি মনে করিতেছিলেন তাঁহার নিজের বিষয় আবদ্ধ রাখিয়া টাকা উঠাইবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু ইন্দ্রাণী তাঁহাকে মাথার দিব্য দিয়া বলিল, ইহাতে আর তুমি হাত দিতে পারিবে না।

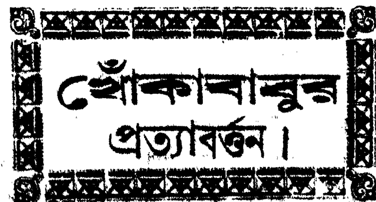
অম্বিকাচরণ বড় ইতস্ততের মধ্যে পড়িয়া ভাবিতে বসিয়া গেলেন। তিনি ইন্দ্রাণীকে আস্তে আস্তে বুঝাইবার যতই চেষ্টা করিতে লাগিলেন ইন্দ্রাণী কিছুতেই তাঁহাকে কথা কহিতে দিল না। অবশেষে অম্বিকা কিছু বিমর্ষ হইয়া গম্ভীর হইয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন।

তখন ইন্দ্রাণী লোহার সিন্ধুক খুলিয়া তাহার সমস্ত গহনা একটি বৃহৎ থালায় স্তূপাকার করিল এবং সেই গুরুভার থালাটি বহুকষ্টে দুই হস্তে তুলিয়া ঈষৎ হাসিয়া তাহার স্বামীর পায়ের কাছে রাখিল।

পিতামহের একমাত্র স্নেহের ধন ইন্দ্রাণী পিতামহের নিকট হইতে জন্মাবধি বৎসরে বৎসরে অনেক বহুমূল্য অলঙ্কার উপহার পাইয়া আসিয়াছে; মিতাচারী স্বামীরও জীবনের অধিকাংশ সঞ্চয় এই সন্তানহীন রমণীর ভাণ্ডারে অলঙ্কাররূপে রূপান্তরিত হইয়াছে। সেই সমস্ত স্বর্ণ মাণিক্য স্বামীর নিকট উপস্থিত করিয়া ইন্দ্রাণী কহিল—আমার এই গহনাগুলি দিয়া আমার পিতামহের দত্ত দান উদ্ধার করিয়া আমি পুনর্ব্বার তাঁহার প্রভুবংশকে দান করিব।

এই বলিয়া সে সজল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মস্তক নত করিয়া কল্পনা করিল, তাহার সেই বিরলশুভ্রকেশধারী সরলসুন্দরমুখচ্ছবি শান্তস্নেহহাস্যময়, ধী-প্রদীপ্ত উজ্জ্বলগৌরকান্তি বৃদ্ধ পিতামহ এই মুহূর্ত্তে এখানে উপস্থিত আছেন, এবং তাহার নত মস্তকে শীতল স্নেহহস্ত রাখিয়া তাহাকে নীরবে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।

বাঁকাগাড়ি পরগণা পুনশ্চ ক্রয় হইয়া গেলে, তখন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া গতভূষণা ইন্দ্রাণী আবার নয়নতারার অন্তঃপুরে নিমন্ত্রণে গমন করিল; আর তাহার মনে কোন অপমান বেদনা রহিল না।



প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাইচরণ যখন বাবুদের বাড়ি প্রথম চাকরী করিতে আসে তখন তাহার বয়স বারো। যশোহর জিলায় বাড়ি। লম্বা চুল, বড় বড় চোখ, শ্যামচিক্কণ ছিপছিপে বালক। জাতিতে

কায়স্থ। তাহার প্রভুরাও কায়স্থ। বাবুদের এক বৎসর বয়স্ক একটি শিশুর রক্ষণ ও পালন-কার্য্যে সহায়তা করা তাহার প্রধান কর্ত্তব্য ছিল।

সেই শিশুটি কালক্রমে রাইচরণের কক্ষ ছাড়িয়া স্কুলে, স্কুল ছাড়িয়া কলেজে, অবশেষে কলেজ ছাড়িয়া মুন্সেফিতে প্রবেশ করিয়াছেন। রাইচরণ এখনো তাঁহার ভৃত্য।

তাহার আর একটি মনিব বাড়িয়াছে; মাঠাকুরাণী ঘরে আসিয়াছেন; সুতরাং অনুকূলবাবুর উপর রাইচরণের পূর্ব্বে যতটা অধিকার ছিল তাহার অধিকাংশই নূতন কর্ত্রীর হস্তগত হইয়াছে।

কিন্তু কর্ত্রী যেমন রাইচরণের পূর্ব্বাধিকার কতকটা হ্রাস করিয়া লইয়াছেন তেমনি একটি নূতন অধিকার দিয়া অনেকটা পূরণ করিয়া দিয়াছেন। অনুকূলের একটি পুত্রসন্তান অল্পদিন হইল জন্মলাভ করিয়াছে—এবং রাইচরণ কেবল নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে।

তাহাকে এমনি উৎসাহের সহিত দোলাইতে আরম্ভ করিয়াছে, এমনি নিপুণতার সহিত তাহাকে দুই হাতে ধরিয়া আকাশে উৎক্ষিপ্ত করে, তাহার মুখের কাছে আসিয়া এমনি সশব্দে শিরশ্চালন করিতে থাকে, উত্তরের কোন প্রত্যাশা না করিয়া এমন সকল সম্পূর্ণ অর্থহীন অসঙ্গত প্রশ্ন সুর করিয়া শিশুর প্রতি প্রয়োগ করিতে থাকে যে এই ক্ষুদ্র আনুকৌলবটি রাইচরণকে দেখিলে একেবারে পুলকিত হইয়া উঠে।

অবশেষে ছেলেটি যখন হামাগুড়ি দিয়া অতি সাবধানে চৌকাট পার হইত, এবং কেহ ধরিতে আসিলে খিল্ খিল্ হাস্যকলরব তুলিয়া দ্রুতবেগে নিরাপদ স্থানে লুকাইতে [illegible] তাহার অসাধারণ চাতুর্য্য ও বিচারশক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া যাইত। মার কাছে গিয়া সগর্ব্ব সবিস্ময়ে বলিত "মা তোমার ছেলে বড় হলে জজ হবে, পাঁচ হাজার টাকা রোজগার করবে।"

পৃথিবীতে আর কোন মানবসন্তান যে এই বয়সে চৌকাট লঙ্ঘন প্রভৃতি অসম্ভব চাতুর্য্যের পরিচয় দিতে পারে তাহা রাইচরণের ধ্যানের অগম্য, কেবল ভবিষ্যৎ জজেদের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য্য নহে।

অবশেষে শিশু যখন টলমল করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার এবং যখন মাকে মা, পিসিকে পিসি, এবং রাইচরণকে চন্ন বলিয়া সম্ভাষণ করিল, তখন রাইচরণ সেই প্রত্যয়াতীত সংবাদ যাহার তাহার কাছে ঘোষণা করিতে লাগিল।

সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, "মাকে মা বলে, পিসিকে পিসি বলে, কিন্তু আমাকে বলে চন্ন!" বাস্তবিক শিশুর মাথায় এ বুদ্ধি কি করিয়া যোগাইল বলা শক্ত। নিশ্চয়ই কোন বয়স্ক লোক কখনই অলোকসামান্যতার পরিচয় দিত না, এবং দিলেও তাহার জজের পদ প্রাপ্তি সম্ভাবনা সম্বন্ধে সাধারণের সম্পূর্ণ সন্দেহ উপস্থিত হইত।

কিছুদিন বাদে মুখে দড়ি দিয়া রাইচরণকে ঘোড়া সাজিতে হইল। এবং মল্ল সাজিয়া শিশুর সহিত কুস্তি করিতে হইত—আবার পরাভূত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া না গেলে বিষম বিপ্লব বাধিত। এই সময়ে অনুকূল পদ্মাতীরবর্ত্তী এক জিলায় বদলী হইলেন।

অনুকূল তাহার শিশুর জন্য কলিকাতা হইতে এক ঠেলাগাড়ি লইয়া গেলেন। সাটিনের জামা এবং মাথায় একটা জরির টুপি হাতে সোণার বালা এবং পায়ে দুই গাছি মল পরাইয়া রাই-

রণ নবকুমারকে দুই বেলা গাড়ি করিয়া হাওয়া খাওয়াইতে লইয়া যাইত।

বর্ষাকাল আসিল। ক্ষুধিত পদ্মা উদ্যান গ্রাম শস্যক্ষেত্র এক এক গ্রাসে মুখে পূরিতে লাগিল। বালুকাচরের কাশবন এবং বন-ঝাউ জলে ডুবিয়া গেল। পাড় ভাঙ্গার অবিশ্রাম ঝুপ্‌ঝাপ্ শব্দ এবং জলের গর্জ্জনে দশদিক্ মুখরিত হইয়া উঠিল, এবং দ্রুতবেগে ধাবমান ফেনরাশি নদীর তীব্রগতি প্রত্যক্ষগোচর করিয়া তুলিল।

অপরাহ্ণে মেঘ করিয়াছিল, কিন্তু বৃষ্টির কোন সম্ভাবনা ছিল না। রাইচরণের খামখেয়ালি ক্ষুদ্র প্রভু কিছুতেই ঘরে থাকিতে চাহিল না। গাড়ির উপর চড়িয়া বসিল। রাইচরণ ধীরে ধীরে গাড়ি ঠেলিয়া ধান্যক্ষেত্রের প্রান্তে নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। নদীতে একটিও নৌকা নাই, মাঠে একটিও লোক নাই—মেঘের ছিদ্র দিয়া দেখা গেল পরপারে জনহীন বালুকাতীরে শব্দহীন দীপ্ত সমারোহের সহিত সূর্য্যাস্তের আয়োজন হইতেছে। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে শিশু সহসা এক দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল "চন্ন, ফু!"

অনতিদূরে সজল পঙ্কিল ভূমির উপর একটি বৃহৎ কদম্ব বৃক্ষের উচ্চশাখায় গুটিকতক কদম্ব ফুল ফুটিয়াছিল, সেই দিকে শিশুর লুব্ধ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। দুই চারি দিন হইল রাইচরণ কাঠি দিয়া বিদ্ধ করিয়া তাহাকে কদম্ব ফুলের গাড়ি বানাইয়া দিয়াছিল, তাহাতে দড়ি বাঁধিয়া টানিতে এত আনন্দ বোধ হইয়াছিল যে সেদিন রাইচরণকে আর লাগাম পড়িতে হয় নাই; ঘোড়া হইতে সে একেবারেই সহিসের পদে উন্নীত হইয়াছিল।

কাদা ভাঙ্গিয়া ফুল তুলিতে যাইতে চন্নর প্রবৃত্তি হইল না—তাড়াতাড়ি বিপরীত দিকে দেখ পাখী—ওই উড়ে—এ গেল! আয়রে পাখী আয় আয়" এইরূপ অবিশ্রান্ত বিচিত্র কলরব করিতে করিতে সবেগে গাড়ি ঠেলিতে লাগিল।

কিন্তু যে ছেলের ভবিষ্যতে জজ হইবার কোন সম্ভাবনা আছে, তাহাকে এরূপ সামান্য উপায়ে ভুলাইবার প্রত্যাশা করা বৃথা—বিশেষতঃ চারিদিকে দৃষ্টি আকর্ষণের উপযোগী কিছুই ছিল না এবং কাল্পনিক পাখী লইয়া অধিকক্ষণ কাজ চলে না।

রাইচরণ বলিল "তবে তুমি গাড়িতে বসে থাক, আমি চট্ করে ফুল তুলে আন্‌চি। খবরদার জলের ধারে যেয়ো না।" বলিয়া হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া কদম্ব বৃক্ষের অভিমুখে চলিল।

কিন্তু ঐ যে জলের ধারে যাইতে নিষেধ করিয়া গেল, তাহাতে শিশুর মন কদম্বফুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সেই মুহূর্ত্তেই জলের দিকে ধাবিত হইল। দেখিল, জল খল্‌খল্ ছল্ ছল্ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; যেন দুষ্টামি করিয়া কোন্ এক বৃহৎ রাইচরণের হাত এড়াইয়া এক লক্ষ শিশু প্রবাহ সহাস্য কলস্বরে নিষিদ্ধ স্থানাভিমুখে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছে।

তাহাদের সেই অসাধু দৃষ্টান্তে মানবশিশুর চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। গাড়ি হইতে আস্তে আস্তে নামিয়া জলের ধারে গেল—একটা দীর্ঘ তৃণ কুড়াইয়া লইয়া তাহাকে ছিপ কল্পনা করিয়া ঝুঁকিয়া মাছ ধরিতে লাগিল—দুরন্ত জলরাশি অস্ফুট কলভাষায় শিশুকে বারবার আপনাদের খেলাঘরে আহ্বান করিল।

একবার ঝপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল, কিন্তু বর্ষার পদ্মাতীরে এমন শব্দ কত শোনা যায়! রাইচরণ আঁচল ভরিয়া কদম্ব ফুল তুলিল। গাছ হইতে নামিয়া সহাস্যমুখে গাড়ির কাছে

চাহিয়া দেখিল কোথাও কাহারও কোন চিহ্ন নাই।

মুহূর্ত্তে রাইচরণের শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল। সমস্ত জগৎসংসার মলিন বিবর্ণ ধোঁয়ার মত হইয়া আসিল। ভাঙ্গাবুকের মধ্য হইতে একবার প্রাণপণ চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল "বাবু—খোকাবাবু, লক্ষ্মি, দাদাবাবু আমার!"

কিন্তু চন্ন বলিয়া কেহ উত্তর দিল না, দুষ্টামি করিয়া কোন শিশুর কণ্ঠ হাসিয়া উঠিল না; কেবল পদ্মা পূর্ব্ববৎ ছল্‌ছল্ খল্‌খল্ করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল, যেন সে কিছুই জানে না, এবং পৃথিবীর এই সকল সামান্য ঘটনায় মনোযোগ দিতে তাহার যেন এক মুহূর্ত্ত সময় নাই।

সন্ধ্যা হইয়া আসিলে উৎকণ্ঠিত জননী চারিদিকে লোক পাঠাইয়া দিলেন। লণ্ঠন হাতে নদীতীরে লোক আসিয়া দেখিল রাই-চরণ নিশীথের ঝোড়া বাতাসের মত সমস্ত ক্ষেত্রময় "বাবু, খোকাবাবু আমার" বলিয়া ভগ্নকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছে। অব-শেষে ঘরে ফিরিয়া রাইচরণ দড়াম্ করিয়া মা ঠাকরুণের পায়ের কাছে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। তাহাকে যত জিজ্ঞাসা করে সে কাঁদিয়া বলে "জানিনে মা!"

যদিও সকলেই মনে মনে বুঝিল পদ্মারই এই কাজ, তথাপি গ্রামের প্রান্তে যে এক দল "বেদে"র সমাগম হইয়াছে তাহাদের প্রতিও সন্দেহ দূর হইল না। এবং মাঠাকুরাণীর মনে এমন সন্দেহ উপস্থিত হইল যে রাইচরণই বা চুরি করিয়াছে; এমন কি, তাহাকে ডাকিয়া অত্যন্ত অনুনয় পূর্ব্বক বলিলেন "তুই আমার বাছাকে ফিরিয়ে এনে দে—তুই যত টাকা চাস্ তোকে দেব।" শুনিয়া রাইচরণ কেবল কপালে করাঘাত করিল। গৃহিণী তাহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

অনুকূল বাবু তাঁহার স্ত্রীর মন হইতে রাই-চরণের প্রতি এই অন্যায় সন্দেহ দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন রাইচরণ এমন জঘন্য কাজ কি উদ্দেশে করিতে পারে! গৃহিণী বলিলেন "কেন? তাহার গায়ে সোণার গহনা ছিল।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

রাইচরণ দেশে ফিরিয়া গেল। এত কাল তাহার সন্তানাদি হয় নাই, হইবার বিশেষ আশাও ছিল না। কিন্তু দৈবক্রমে, বৎসর না যাইতেই তাহার স্ত্রী অধিকবয়সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিয়া লোকলীলা সম্বরণ করিল।

এই নবজাত শিশুটির প্রতি রাইচরণের অত্যন্ত বিদ্বেষ জন্মিল। মনে করিল, এ যেন ছল করিয়া খোকাবাবুর স্থান অধিকার করিতে আসিয়াছে। মনে করিল, প্রভুর এক মাত্র ছেলেটি জলে ভাসাইয়া নিজে পুত্রসুখ উপভোগ করা যেন একটি মহাপাতক। রাইচরণের বিধবা ভগিনী যদি না থাকিত তবে এ শিশুটি পৃথি-বীর বায়ু বেশী দিন ভোগ করিতে পাইত না।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই ছেলেটি কিছুদিন বাদে চৌকাট পার হইতে আরম্ভ করিল, এবং সর্ব্বপ্রকার নিষেধ লঙ্ঘন করিতে সকৌতুক চতুরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। এমন কি, ইহার কণ্ঠস্বর হাস্যক্রন্দনধ্বনি অনেকটা সেই শিশুরই মত। এক-একদিন যখন ইহার কান্না শুনিত, রাইচরণের বুকটা সহসা দড়াস্ করিয়া উঠিত, মনে হইত দাদাবাবু রাইচরণকে হারাইয়া কোথায় কাঁদিতেছে।

ফেল্‌না—রাইচরণের ভগিনী ইহার নাম

রাখিয়াছিল ফেলনা—যথা সময়ে পিসিকে পিসি বলিয়া ডাকিল। সেই পরিচিত ডাক শুনিয়া একদিন হঠাৎ রাইচরণের মনে হইল—তবে ত খোকাবাবু আমার মায়া ছাড়িতে পারে নাই। সে ত আমার ঘরে আসিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

এই বিশ্বাসের অনুকূলে কতকগুলি অকাট্য যুক্তি ছিল।

প্রথমতঃ সে যাইবার অনতিবিলম্বেই ইহার জন্ম। দ্বিতীয়তঃ, এতকাল পরে সহসা যে তাহার স্ত্রীর গর্ভে সন্তান জন্মে এ কখনই স্ত্রীর নিজগুণে হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ এও হামাগুড়ি দেয়, টলমল্ করিয়া চলে, এবং পিসিকে পিসি বলে। যে সকল লক্ষণ থাকিলে ভবিষ্যতে জজ হইবার কথা, তাহার অনেকগুলি ইহাতে বর্ত্তিয়াছে।

তখন মাঠাকরুণের সেই দারুণ সন্দেহের কথা হঠাৎ মনে পড়িল—আশ্চর্য্য হইয়া মনে মনে কহিল "আহা, মায়ের মন জানিতে পারিয়াছিল তাহার ছেলেকে কে চুরি করিয়াছে!"—তখন, এতদিন যে শিশুকে অযত্ন করিয়াছে, সে জন্য বড় অনুতাপ উপস্থিত হইল। শিশুর কাছে আবার ধরা দিল।

এখন হইতে ফেলনাকে রাইচরণ এমন করিয়া মানুষ করিতে লাগিল যেন সে বড় ঘরের ছেলে। সাটিনের জামা কিনিয়া দিল। জরির টুপি আনিল। মৃত স্ত্রীর গহনা গলাইয়া চুড়ি এবং বালা তৈয়ারি হইল। পাড়ার কোন ছেলের সহিত তাহাকে খেলিতে দিত না—রাত্রিদিন নিজেই তাহার একমাত্র খেলায় সঙ্গী হইল। পাড়ার ছেলেরা সুযোগ পাইলে তাহাকে নবাবপুত্র বলিয়া উপহাস করিত এবং দেশের লোক রাইচরণের এইরূপ উন্মত্তবৎ আচরণে আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

ফেলনার যখন বিদ্যাভ্যাসের বয়স হইল তখন রাইচরণ নিজের জোতজমা সমস্ত বিক্রয় করিয়া ছেলেটিকে কলিকাতায় লইয়া গেল। সেখানে বহুকষ্টে একটি চাকরীর যোগাড় করিয়া ফেলনাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইল। নিজে যেমন-তেমন করিয়া থাকিয়া ছেলেকে ভাল খাওয়া, ভাল পরা, ভাল শিক্ষা দিতে ত্রুটি করিত না। মনে মনে বলিত, বৎস, ভালবাসিয়া আমার ঘরে আসিয়াছ বলিয়া যে তোমার কোন অযত্ন হইবে, তা হইবে না।

এম্নি করিয়া বারো বৎসর কাটিয়া গেল। ছেলে পড়ে শুনে ভাল, এবং দেখিতে শুনিতেও বেশ, হৃষ্টপুষ্ট উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ—কেশবেশ-বিন্যাসের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি, মেজাজ্ কিছু সুখী এবং সৌখীন। বাপকে ঠিক বাপের মত মনে করিতে পারিত না। কারণ, রাইচরণ স্নেহে বাপ এবং সেবায় ভৃত্য ছিল, এবং তাহার আর একটি দোষ ছিল, সে যে ফেলনার বাপ এ কথা সকলের কাছেই গোপন রাখিয়াছিল। যে ছাত্রনিবাসে ফেলনা বাস করিত সেখানকার ছাত্রগণ বাঙ্গাল রাইচরণকে লইয়া সর্ব্বদা কৌতুক করিত এবং পিতার অসাক্ষাতে ফেলনাও যে সেই কৌতুকালাপে যোগ দিত না তাহা বলিতে পারি না। অথচ নিরীহ বৎসল-স্বভাব রাইচরণকে সকল ছাত্রই বড় ভাল বাসিত এবং ফেলনাও ভাল বাসিত, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঠিক বাপের মত নহে, তাহাতে কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ মিশ্রিত ছিল।

রাইচরণ বৃদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। তাহার প্রভু কাজকর্ম্মে সর্ব্বদাই দোষ ধরে। বাস্তবিক তাহার শরীরও শিথিল হইয়া আসিয়াছে কাজেও তেমনি মন দিতে পারে না, কেবলি ভুলিয়া যায়—কিন্তু যে পূরা বেতন দেয় বার্দ্ধক্যের ওজর সে মানিতে চাহে না। এদিকে রাইচরণ বিষয় বিক্রয় করিয়া যে নগদ টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল তাহাও নিঃশেষ

হইয়া আসিয়াছে। ফেল্‌না আজকাল বসনভূষণের অভাব লইয়া সর্ব্বদা খুঁৎখুঁৎ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

একদিন রাইচরণ হঠাৎ কর্ম্মে জবাব দিল এবং ফেল্‌নাকে কিছু টাকা দিয়া বলিল—আবশ্যক পড়িয়াছে, আমি কিছু দিনের মত দেশে যাইতেছি। এই বলিয়া বারাসতে গিয়া উপস্থিত হইল। অনুকূল বাবু তখন সেখানে মুন্সেফ ছিলেন।

অনুকূলের আর দ্বিতীয় সন্তান হয় নাই, গৃহিণী এখনো সেই পুত্রশোক বক্ষের মধ্যে লালন করিতেছিলেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় বাবু কাছারি হইতে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন এবং কর্ত্রী একটি সন্ন্যাসীর নিকট হইতে সন্তান কামনায় বহুমূল্য একটি শিকড় ও আশীর্ব্বাদ কিনিতেছেন—এমন সময় প্রাঙ্গণে শব্দ উঠিল—জয় হোক্ মা ?

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—কেরে !

রাইচরণ আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল আমি রাইচরণ।

বৃদ্ধকে দেখিয়া অনুকূলের হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠিল। তাহার বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সহস্র প্রশ্ন করিলেন এবং আবার তাহাকে কর্ম্মে নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিলেন।

রাইচরণ ম্লান হাস্য করিয়া কহিল "মাঠাকরুণকে একবার প্রণাম করতে চাই।"

অনুকূল তাহাকে সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। মাঠাকরুণ রাইচরণকে তেমন প্রসন্নভাবে সমাদর করিলেন না—রাইচরণ তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া যোড়হস্তে কহিল—"প্রভু, মা, আমিই তোমাদের ছেলেকে চুরি করিয়া লইয়াছিলাম। পদ্মাও নয়, আর কেহও নয়, কৃতঘ্ন অধম এই আমি।—"

অনুকূল বলিয়া উঠিলেন "বলিস্ কিরে! কোথায় সে।" আজ্ঞা আমার কাছেই আছে আমি পরশ্ব আনিয়া দিব।"

সে দিন রবিবার। কাছারি নাই। প্রাতঃকাল হইতে স্ত্রী পুরুষে দুইজনে উন্মুখভাবে পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন। দশটার সময় ফেল্‌নাকে সঙ্গে লইয়া রাইচরণ উপস্থিত হইল।

অনুকূলের স্ত্রী কোন প্রশ্ন কোন বিচার না করিয়া তাহাকে কোলে বসাইয়া, তাহাকে স্পর্শ করিয়া, তাহার আঘ্রাণ লইয়া অতৃপ্ত নয়নে তাহার মুখনিরীক্ষণ করিয়া কাঁদিয়া হাসিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বাস্তবিক ছেলেটি দেখিতে বেশ—বেশভূষা আকার প্রকারে দারিদ্র্যের কোন লক্ষণ নাই। মুখে অত্যন্ত প্রিয়দর্শন বিনীত সলজ্জ ভাব দেখিয়া অনুকূলের হৃদয়েও সহসা স্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

তথাপি তিনি অবিচলিত ভাব ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কোন প্রমাণ আছে ?

রাইচরণ কহিল—এমন কাজের প্রমাণ কি করিয়া থাকিবে ? আমি যে তোমার ছেলে চুরি করিয়াছিলাম সে কেবল ভগবান্ জানেন, পৃথিবীতে আর কেহ জানে না।

অনুকূল ভাবিয়া স্থির করিলেন যে, ছেলেটিকে পাইবামাত্র তাহার স্ত্রী যেরূপ আগ্রহের সহিত তাহাকে আগলাইয়া ধরিয়াছেন এখন প্রমাণসংগ্রহের চেষ্টা করা সুযুক্তি নহে ; যেমন হউক বিশ্বাস করাই ভাল। তা ছাড়া, রাইচরণ এমন, ছেলেই বা কোথায় পাইবে ? এবং বৃদ্ধ ভৃত্য তাঁহাকে অকারণে প্রতারণাই বা কেন করিবে ?—

ছেলেটির সহিত কথোপকথন করিয়া

জানিলেন যে, সে শিশুকাল হইতে চন্নের সহিত আছে এবং রাইচরণকে সে পিতা বলিয়া জানিত, কিন্তু রাইচরণ কখনও তাহাকে পিতার ন্যায় ব্যবহার করে নাই, অনেকটা ভৃত্যের ভাব ছিল।

অনুকূল মন হইতে সন্দেহ দূর করিয়া বলিলেন—"কিন্তু রাইচরণ, তুই আর আমাদের ছায়া মাড়াইতে পাইবি না।

রাইচরণ করোযোড়ে গদ্গদ কণ্ঠে বলিল "প্রভু, বৃদ্ধবয়সে কোথায় যাইব!"

কর্ত্রী কহিলেন "আহা থাক্! আমার বাছার কল্যাণ হৌক্! ওকে আমি মাপ করিলাম।"

ন্যায়পরায়ণ অনুকূল কহিলেন "যে কাজ করিয়াছে উহাকে মাপ করা যায় না।"

রাইচরণ অনুকূলের পা জড়াইয়া কহিল "আমি করি নাই, ঈশ্বর করিয়াছেন।"

নিজের পাপ ঈশ্বরের স্কন্ধে চাপাইবার চেষ্টা দেখিয়া অনুকূল আরো বিরক্ত হইয়া কহিলেন "যে এমন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিয়াছে তাহাকে আর বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নয়।"

রাইচরণ প্রভুর পা ছাড়িয়া কহিল "সে আমি নয় প্রভু!"

"তবে কে?"

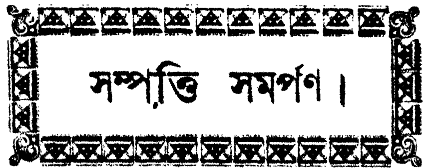
"আমার অদৃষ্ট!"

কিন্তু এরূপ কৈফিয়তে কোন শিক্ষিত লোকের সন্তোষ হইতে পারে না।

ফেল্না যখন দেখিল সে মুন্সেফের সন্তান, রাইচরণ তাহাকে এতদিন চুরি করিয়া নিজের ছেলে বলিয়া অপমানিত করিয়াছে তখন তাহার মনে মনে কিছু রাগ হইল। কিন্তু তথাপি উদার ভাবে পিতাকে বলিল "বাবা উহাকে মাপ কর। বাড়িতে থাকিতে না দাও, উহার মাসিক কিছু টাকা বরাদ্দ করিয়া দাও।"

ইহার পর রাইচরণ কোন কথা না বলিয়া একবার পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিল, সকলকে প্রণাম করিল; তাহার পর দ্বারের বাহির হইয়া পৃথিবীর অগণ্য লোকের মধ্যে মিশিয়া গেল। বাঁচিল কি মরিল কি কি হইল কেহ জানে না। মাসান্তে অনুকূল যখন তাহার দেশের ঠিকানায় কিঞ্চিৎ বৃত্তি পাঠাইলেন তখন সে টাকা ফিরিয়া আসিল। সেখানে কোন লোক নাই।

—:*:—



সম্পত্তি সমর্পণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

বৃন্দাবন কুণ্ড মহা ক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়া তাহার বাপকে কহিল—"আমি এখনি চলিলাম।"

বাপ যজ্ঞনাথ কুণ্ড কহিল "বেটা অকৃতজ্ঞ, ছেলেবেলা হইতে তোকে খাওয়াইতে পরাইতে যে ব্যয় হইয়াছে তাহা পরিশোধ করিবার নাম নাই, আবার তেজ দেখ না!"

যজ্ঞনাথের ঘরে যেরূপ অশন বসনের প্রথা, তাহাতে খুব যে বেশী ব্যয় হইয়াছে তাহা নহে। প্রাচীন কালের ঋষিরা আহার এবং পরিচ্ছদ সম্বন্ধে অসম্ভব অল্প খরচে জীবন নির্ব্বাহ করিতেন; যজ্ঞনাথের ব্যবহারে প্রকাশ পাইত বেশভূষা আহার বিহারে তাঁহারও সেইরূপ অত্যুচ্চ আদর্শ ছিল। সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই; সে কতকটা আধুনিক সমাজের দোষে, এবং কতকটা

শরীররক্ষা সম্বন্ধে প্রকৃতির কতকগুলি অন্যায় নিয়মের অনুরোধে।

ছেলে যতদিন অবিবাহিত ছিল সহিয়াছিল, কিন্তু বিবাহের পর হইতে খাওয়াপরা সম্বন্ধে বাপের অত্যন্ত বিশুদ্ধ আদর্শের সহিত ছেলের আদর্শের অনৈক্য হইতে লাগিল। দেখা গেল ছেলের আদর্শ ক্রমশঃই আধ্যাত্মিকের চেয়ে বেশী আধিভৌতিকের দিকে যাইতেছে। শীতগ্রীষ্মক্ষুধাতৃষ্ণাকাতর পার্থিব সমাজের অনুকরণে কাপড়ের বহর এবং আহারের পরিমাণ উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছে।

এ সম্বন্ধে পিতাপুত্রে প্রায় বচসা হইতে লাগিল। অবশেষে বৃন্দাবনের স্ত্রীর গুরুতর পীড়াকালে কবিরাজ বহুব্যয়সাধ্য এক ঔষধের ব্যবস্থা করাতে যজ্ঞনাথ তাহাতেই কবিরাজের অনভিজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। বৃন্দাবন প্রথমে হাতে পায়ে ধরিল, তার পরে রাগারাগি করিল, কিন্তু কোন ফল হইল না। পত্নীর মৃত্যু হইলে বাপকে স্ত্রীহত্যাকারী বলিয়া গাল দিল।

বাপ বলিল, "কেন, ঔষধ খাইয়া কেহ মরে না? দামী ঔষধ খাইলেই যদি বাঁচিত তবে রাজা বাদসারা মরে কোন্ দুঃখে! যেমন করিয়া তোর মা মরিয়াছে তার দিদিমা মরিয়াছে তোর স্ত্রী তাহার চেয়ে কি বেশী ধুম করিয়া মরিবে?"

বাস্তবিক যদি শোকে অন্ধ না হইয়া বৃন্দাবন স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিত তাহা হইলে এ কথায় অনেকটা সান্ত্বনা পাইত। তাঁহার মা দিদিমা কেহই মরিবার সময় ঔষধ খান নাই। এ বাড়ির এইরূপ সনাতন প্রথা। কিন্তু আধুনিক লোকেরা প্রাচীন নিয়মে মরিতেও চায় না। যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন এদেশে ইংরাজের নূতন সমাগম হইয়াছিল, কিন্তু সে সময়েও তখনকার সেকালের লোক তখনকার একালের লোকের ব্যবহার দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া অধিক করিয়া তামাক টানিত।

যাহা হউক তখনকার নব্য বৃন্দাবন তখনকার প্রাচীন যজ্ঞনাথের সহিত বিবাদ করিয়া কহিল "আমি চলিলাম!"

বাপ তাহাকে তৎক্ষণাৎ যাইতে অনুমতি করিয়া সর্ব্বসমক্ষে কহিলেন, বৃন্দাবনকে যদি তিনি কখনও এক পয়সা দেন তবে তাহা গোরক্তপাতের সহিত গণ্য হইবে। বৃন্দাবনও সর্ব্বসমক্ষে যজ্ঞনাথের ধন গ্রহণ মাতৃরক্তপাতের তুল্যপাতক বলিয়া স্বীকার করিলেন। ইহার পর পিতাপুত্রে ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল।

বহুকাল শান্তির পরে এইরূপ একটি ছোটখাট বিপ্লবে গ্রামের লোক বেশ একটু প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ যজ্ঞনাথের ছেলে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হওয়ার পর সকলেই নিজ নিজ শক্তি অনুসারে যজ্ঞনাথের দুঃসহ পুত্রবিচ্ছেদদুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সকলেই বলিল, সামান্য একটা বৌয়ের জন্য বাপের সহিত বিবাদ করা কেবল একালেই সম্ভব।

বিশেষতঃ তাহার খুব একটা যুক্তি দেখাইল; বলিল, একটা বৌ গেলে অনতিবিলম্বে আর একটা বৌ সংগ্রহ করা যায়, কিন্তু বাপ গেলে দ্বিতীয় বাপ মাথা খুঁড়িলেও পাওয়া যায় না। যুক্তি খুব পাকা সন্দেহ নাই; কিন্তু আমার বিশ্বাস, বৃন্দাবনের মত ছেলে এ যুক্তি শুনিলে অনুতপ্ত না হইয়া বরং কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইত।

বৃন্দাবনকে বিদায়কালে তাহার পিতা যে অধিক মনঃকষ্ট পাইয়াছিলেন তাহা বোধ হয় না। বৃন্দাবন যাওয়াতে একত ব্যয় সংক্ষেপ হইল তাহার উপরে যজ্ঞনাথের একটা মহা ভয় দূর হইল। বৃন্দাবন কখন্ তাঁহাকে বিষ

খাওয়াইয়া মারে এই আশঙ্কা সর্ব্বদাই তাঁহার ছিল। যে অত্যল্প আহার ছিল তাহার সহিত বিষের কল্পনা সর্ব্বদাই লিপ্ত হইয়া থাকিত। বধূর মৃত্যুর পর এ আশঙ্কা কিঞ্চিৎ কমিয়াছিল এবং পুত্রের বিদায়ের পর অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ হইল।

কেবল একটি বেদনা মনে বাজিয়াছিল। যজ্ঞনাথের চারিবৎসর বয়স্ক নাতি গোকুলচন্দ্রকে বৃন্দাবন সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। গোকুলের খাওয়াপরার খরচ অপেক্ষাকৃত কম ছিল। সুতরাং তাহার প্রতি যজ্ঞনাথের স্নেহ অনেকটা নিষ্কণ্টক ছিল। তথাপি বৃন্দাবন যখন তাহাকে নিতান্তই লইয়া গেল তখন অকৃত্রিম শোকের মধ্যেও যজ্ঞনাথের মনে মুহূর্ত্তের জন্য একটা জমাখরচের হিসাব উদয় হইয়াছিল; উভয়ে চলিয়া গেলে মাসে কতটা খরচ কমে এবং বৎসরে কতটা দাঁড়ায়—এবং যে টাকাটা সাশ্রয় হয় তাহা কত টাকার সুদ।

কিন্তু তবু, শূন্যগৃহে গোকুলচন্দ্রের উপদ্রব না থাকাতে গৃহে বাস করা কঠিন হইয়া উঠিল। আজকাল যজ্ঞনাথের এমনি মুস্কিল হইয়াছে, পূজার সময়ে কেহ ব্যাঘাত করে না, খাওয়ার সময় কেহ কাড়িয়া খায় না, হিসাব লিখিবার সময় দোয়াত লইয়া পালায় এমন উপযুক্ত লোক কেহ নাই। নিরুপদ্রবে স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল।

মনে হইল যেন মৃত্যুর পরেই লোকে এইরূপ উৎপাতহীন শূন্যতা লাভ করে; বিশেষতঃ বিছানার কাঁথায় তাঁহার নাতির কৃত ছিদ্র এবং বসিবার মাদুরে উক্ত শিল্পীকৃত অঙ্কিত মসীচিহ্ন দেখিয়া তাঁহার হৃদয় আরও অশান্ত হইয়া উঠিত। সেই অমিতাচারী বালকটি দুই বৎসরের মধ্যেই পরিবার ধুতি সম্পূর্ণ অব্যবহার্য্য করিয়া তুলিয়াছিল বলিয়া পিতামহের নিকট বিস্তর তিরস্কার সহ্য করিয়াছিল, এক্ষণে তাহার শয়নগৃহে সেই শতগ্রন্থিবিশিষ্ট মলিন পরিত্যক্ত চীরখণ্ড দেখিয়া তাঁহার চক্ষু ছল্ ছল্ করিয়া আসিয়াছিল; সেটি, পলিতাপ্রস্তুতকরণ কিংবা অন্য কোন গার্হস্থ্যব্যবহারে না লাগাইয়া যত্নপূর্ব্বক সিন্দুকে তুলিয়া রাখিলেন এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যদি গোকুল ফিরিয়া আসে এবং এমন কি, বৎসরে একখানি করিয়া ধুতিও নষ্ট করে তথাপি তাহাকে তিরস্কার করিবেন না।

কিন্তু গোকুল ফিরিল না এবং যজ্ঞনাথের বয়স যেন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠিল এবং শূন্যগৃহ প্রতিদিন শূন্যতর হইতে লাগিল।

যজ্ঞনাথ আর ঘরে স্থির থাকিতে পারেন না। এমন কি, মধ্যাহ্নে যখন সকল সম্ভ্রান্ত লোকই আহারান্তে নিদ্রাসুখ লাভ করে যজ্ঞনাথ হুকাহস্তে পাড়ায় পাড়ায় ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। তাঁহার এই নীরব মধ্যাহ্নভ্রমণের সময় পথের ছেলেরা খেলা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরাপদ স্থানে পলায়ন করিয়া তাঁহার মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে স্থানীয় কবিরচিত বিবিধ ছন্দোবদ্ধ রচনা শ্রুতিগম্য উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিত। পাছে আহারের ব্যাঘাত ঘটে বলিয়া তাঁহার পিতৃদত্ত নাম উচ্চারণ করিতে কেহ সাহস করিত না, এইজন্য সকলেই স্বেচ্ছামতে তাঁহার নূতন নামকরণ করিত। বুড়োরা তাঁহাকে যজ্ঞনাশ বলিতেন কিন্তু ছেলেরা কেন যে তাঁহাকে "চামচিকে" বলিয়া ডাকিত তাহার স্পষ্ট কারণ পাওয়া যায় না। বোধ হয় তাঁহার রক্তহীন শীর্ণ চর্ম্মের সহিত উক্ত খেচরের কোনপ্রকার শরীরগত সাদৃশ্য ছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

একদিন এইরূপে আম্রতরুচ্ছায়াশীতল গ্রামের পথে যজ্ঞনাথ মধ্যাহ্নে বেড়াইতেছিলেন—দেখিলেন এক জন অপরিচিত বালক গ্রামের ছেলেদের সর্দ্দার হইয়া উঠিয়া একটা সম্পূর্ণ নূতন উপদ্রবের পন্থা নির্দ্দেশ করিতেছে। অন্যান্য বালকেরা তাহার চরিত্রের বল এবং কল্পনার নূতনত্বে অভিভূত হইয়া কায়মনে তাহার বশ মানিয়াছে।

অন্য বালকেরা বৃদ্ধকে দেখিয়া যেরূপ খেলায় ভঙ্গ দিত, এ তাহা না করিয়া চট্ করিয়া আসিয়া যজ্ঞনাথের গায়ের কাছে চাদর ঝাড়া দিল এবং একটা বন্ধনমুক্ত গির্-গিটি চাদর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া তাঁহার গা বাহিয়া অরণ্যাভিমুখে পলায়ন করিল—আকস্মিক ত্রাসে বৃদ্ধের সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। ছেলেদের মধ্যে ভারি একটা আনন্দের কলরব পড়িয়া গেল। আর কিছুদূর যাইতে না যাইতে যজ্ঞনাথের স্কন্ধ হইতে হঠাৎ তাঁহার গামছা অদৃশ্য হইয়া অপরিচিত বালকটির মাথায় পাগ্ড়ির আকার ধারণ করিল।

এই অজ্ঞাত মানবকের নিকট হইতে এই-প্রকার নূতন প্রণালীর শিষ্টাচার প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞনাথ ভারি সন্তুষ্ট হইলেন। কোন বালকের নিকট হইতে এরূপ অসঙ্কোচ আত্মীয়তা তিনি বহুদিন পান নাই। বিস্তর ডাকাডাকি করিয়া এবং নানামত আশ্বাস দিয়া যজ্ঞনাথ তাঁহাকে কতকটা আয়ত্ত করিয়া লইলেন।

জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নাম কি ?"

সে বলিল "নিতাই পাল।"

"বাড়ি কোথায় ?"

"বলিব না।"

"বাপের নাম কি ?"

"বলিব না।"

"কেন বলিবে না ?"

"আমি বাড়ি ছাড়িয়া পালাইয়া আসিয়াছি।"

"কেন ?"

"আমার বাপ আমাকে পাঠশালায় দিতে চায়।"

এরূপ ছেলেকে পাঠশালায় দেওয়া যে একটা নিষ্ফল অপব্যয় এবং বাপের বিষয়-বুদ্ধিহীনতার পরিচয়, তাহা তৎক্ষণাৎ যজ্ঞ-নাথের মনে উদয় হইল।

যজ্ঞনাথ বলিলেন "আমার বাড়িতে আসিয়া থাকিবে ?"

বালকটি কোন আপত্তি না করিয়া এমনি নিঃসঙ্কোচে সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিল যেন সে একটা পথপ্রান্তবর্ত্তী তরুতল।

কেবল তাহাই নয়, খাওয়াপরা সম্বন্ধে এমনি অম্লানবদনে নিজের অভিপ্রায়মত আদেশ প্রচার করিতে লাগিল যেন পূর্ব্বাহ্ণেই তাহার পূরা দাম চুকাইয়া দিয়াছে। এবং ইহা লইয়া মাঝে মাঝে গৃহস্বামীর সহিত রীতিমত ঝগড়া করিত। নিজের ছেলেকে পরাস্ত করা সহজ কিন্তু পরের ছেলের কাছে যজ্ঞনাথকে হার মানিতে হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

যজ্ঞনাথের ঘরে নিতাই পালের এই অভাবনীয় সমাদর দেখিয়া গ্রামের লোক আশ্চর্য্য হইয়া গেল। বুঝিল, বৃদ্ধ আর বেশী দিন বাঁচিবে না এবং কোথাকার এই বিদেশী ছেলেটাকেই সমস্ত বিষয় দিয়া যাইবে।

বালকের উপর সকলেরই পরম ঈর্ষা উপস্থিত হইল এবং সকলেই তাহার অনি-

করিবার জন্ত কৃতসংকল্প হইল। কিন্তু বৃদ্ধ তাহাকে বুকের পাঁজরের মত ঢাকিয়া বেড়াইত।

ছেলেটা মাঝে মাঝে চলিয়া যাইবে বলিয়া শাসাইত। যজ্ঞনাথ তাহাকে প্রলোভন দেখাইত "ভাই তোকে আমি আমার সমস্ত বিষয় আশয় দিয়া যাইব।" বালকের বয়স অল্প কিন্তু এই আশ্বাসের মর্য্যাদা সে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিত।

তখন গ্রামের লোকেরা বালকের বাপের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা সকলেই বলিল "আহা বাপমায়ের মনে না জানি কত কষ্টই হইতেছে। ছেলেটাও ত পাপিষ্ঠ কম নয়!"

বলিয়া ছেলেটার উদ্দেশে অকথ্য উচ্চারণে গালি প্রয়োগ করিত। তাহার এতই বেশী ঝাজ যে ন্যায়বুদ্ধির উত্তেজনা অপেক্ষা তাহাতে স্বার্থের গাত্রদাহ বেশী অনুভূত হইত।

বৃদ্ধ একদিন এক পথিকের কাছে শুনিতে পাইল, দামোদর পাল বলিয়া এক ব্যক্তি তাহার নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে, অবশেষে এই গ্রামের অভিমুখেই আসিতেছে।

নিতাই এই সংবাদ শুনিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। ভাবী বিষয় আশয় সমস্ত ত্যাগ করিয়া পলায়নোদ্যত হইল।

যজ্ঞনাথ নিতাইকে বারংবার আশ্বাস দিয়া কহিল, "তোমাকে আমি এমন স্থানে লুকাইয়া রাখিব যে, কেহই খুঁজিয়া পাইবে না। গ্রামের লোকেরাও না।"

বালকের ভারি কৌতূহল হইল, কহিল "কোথায় দেখাইয়া দাও না।"

যজ্ঞনাথ কহিল "এখন দেখাইতে গেলে প্রকাশ হইয়া পড়িবে। রাত্রে দেখাইব।"

নিতাই এই নূতন রহস্য আবিষ্কারের আশ্বাসে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বাপ অকৃতকার্য্য হইয়া চলিয়া গেলেই বালকদের সঙ্গে বাজি রাখিয়া একটা লুকোচুরি খেলিতে হইবে এইরূপ মনে মনে সঙ্কল্প করিল। কেহ খুঁজিয়া পাইবে না! ভারি মজা! বাপ আসিয়া সমস্ত দেশ খুঁজিয়া কোথাও তাহার সন্ধান পাইবে না সেও খুব কৌতুক।

মধ্যাহ্নে যজ্ঞনাথ বালককে গৃহে রুদ্ধ করিয়া কোথায় বাহির হইয়া গেল। ফিরিয়া আসিলে নিতাই তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া করিয়া অস্থির করিয়া তুলিল।

সন্ধ্যা হইতে না হইতে বলিল "চল।"

যজ্ঞনাথ বলিল "এখনো রাত্রি হয় নাই।"

নিতাই আবার কহিল "রাত্রি হইয়াছে দাদা, চল।"

যজ্ঞনাথ কহিল "এখনো পাড়ার লোক ঘুমায় নাই।"

নিতাই মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়াই কহিল "এখন ঘুমাইয়াছে চল।"

রাত্রি বাড়িতে লাগিল। নিদ্রাতুর নিতাই বহুকষ্টে নিদ্রা সম্বরণের প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে আরম্ভ করিল। রাত্রি দুই প্রহর হইলে যজ্ঞনাথ নিতাইয়ের হাত ধরিয়া নিদ্রিত গ্রামের অন্ধকার পথে বাহির হইলেন। আর কোন শব্দ নাই, কেবল থাকিয়া থাকিয়া কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল, এবং সেই শব্দে নিকটে এবং দূরে যতগুলা কুকুর ছিল সকলে তারস্বরে যোগ দিল। মাঝে মাঝে পক্ষী পদশব্দে ত্রস্ত হইয়া ঝট্‌পট্‌ করিয়া বনের মধ্য দিয়া উড়িয়া গেল। নিতাই ভয়ে যজ্ঞনাথের হাত দৃঢ় করিয়া ধরিল।

অনেক মাঠ ভাঙ্গিয়া অবশেষে এক জঙ্গলের মধ্যে এক দেবতাহীন ভাঙ্গা মন্দিরে উভয়ে গিয়া উপস্থিত হইল। নিতাই কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণস্বরে কহিল "এই খানে!"

যেরূপ মনে করিয়াছিল সেরূপ কিছুই নয়। ইহার মধ্যে তেমন রহস্য নাই। পিতৃ-

গৃহত্যাগের পর এমন পোড়ো মন্দিরে তাহাকে মাঝে মাঝে রাত্রিযাপন করিতে হইয়াছে। স্থানটা যদিও লুকাচুরি খেলার পক্ষে মন্দ নয় কিন্তু তবু এখান হইতে সন্ধান করিয়া বাহির করা নিতান্ত অসম্ভব নহে।

যজ্ঞনাথ মন্দিরের মধ্য হইতে একখণ্ড পাথর উঠাইয়া ফেলিল। বালক দেখিল নিম্নে একটা ঘরের মত, এবং সেখানে প্রদীপ জলিতেছে। দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময় এবং কৌতূহল হইল, সেই সঙ্গে ভয়ও করিতে লাগিল। একটি মই বাহিয়া যজ্ঞনাথ নামিয়া গেলেন তাহার পশ্চাতে নিতাইও ভয়ে ভয়ে নামিল।

নীচে গিয়া দেখিল চারিদিকে পিতলের কলস। মধ্যে একটি আসন এবং তাহার সম্মুখে সিঁদুর চন্দন ফুলের মালা পূজার উপকরণ। বালক কৌতূহলনিবৃত্তি করিতে গিয়া দেখিল ঘড়ায় কেবল টাকা এবং মোহর।

যজ্ঞনাথ কহিল, "নিতাই, আমি বলিয়াছিলাম আমার সমস্ত টাকা তোমাকে দিব। আমার অধিক কিছুই নাই, সবে এই ক'টি মাত্র ঘড়া আমার সম্বল। আজ আমি ইহার সমস্তই তোমার হাতে দিব।"

বালক লাফাইয়া উঠিয়া কহিল "সমস্তই? ইহার একটি টাকাও তুমি লইবে না?"

"যদি লই তবে আমার হাতে যেন কুষ্ঠ হয়। কিন্তু একটা কথা আছে। যদি কখনো আমার নিরুদ্দেশ নাতি গোকুলচন্দ্র কিংবা তাহার ছেলে কিংবা তাহার পৌত্র কিংবা তাহার প্রপৌত্র কিংবা তাহার বংশের কেহ আসে তবে তাহার কিংবা তাহাদের হাতে এই সমস্ত টাকা গণিয়া দিতে হইবে।"

বালক মনে করিল যজ্ঞনাথ পাগল হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিল, "আচ্ছা।"

যজ্ঞনাথ কহিল "তবে এই আসনে বইস।"

"কেন?"

তোমার পূজা হইবে।"

"কেন?"

"এইরূপ নিয়ম।"

বালক আসনে বসিল। যজ্ঞনাথ তাহার কপালে চন্দন দিল, সিঁদুরের টিপ দিয়া দিল, গলায় মালা দিল; সম্মুখে বসিয়া বিড় বিড় করিয়া মন্ত্র পড়িতে লাগিল।

দেবতা হইয়া বসিয়া মন্ত্র শুনিতে নিতাইয়ের ভয় করিতে লাগিল; ডাকিল "দাদা।"

যজ্ঞনাথ কোন উত্তর না করিয়া মন্ত্র পড়িয়া গেলেন।

অবশেষে এক একটি ঘড়া বহুকষ্টে টানিয়া বালকের সম্মুখে স্থাপিত করিয়া উৎসর্গ করিলেন এবং প্রত্যেকবার বলাইয়া লইলেন "যুধিষ্ঠির কুণ্ডের পুত্র গদাধর কুণ্ড তস্য পুত্র প্রাণকৃষ্ণ কুণ্ড তস্য পুত্র পরমানন্দ কুণ্ড তস্য পুত্র যজ্ঞনাথ কুণ্ড তস্য পুত্র বৃন্দাবন কুণ্ড তস্য পুত্র গোকুলচন্দ্র কুণ্ডকে কিংবা তাহার পুত্র অথবা পৌত্র অথবা প্রপৌত্রকে কিংবা তাহার বংশের ন্যায্য উত্তরাধিকারীকে এই সমস্ত টাকা গণিয়া দিব।"

এইরূপ বার বার আবৃত্তি করিতে করিতে ছেলেটা হতবুদ্ধির মত হইয়া আসিল। তাহার জিহ্বা ক্রমে জড়াইয়া আসিল। যখন অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইয়া গেল তখন দীপের ধূম ও উভয়ের নিশ্বাসবায়ুতে সেই ক্ষুদ্র গহ্বর বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। বালকের তালু শুষ্ক হইয়া গেল, হাত পা জ্বালা করিতে লাগিল, শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল।

প্রদীপ ম্লান হইয়া হঠাৎ নিবিয়া গেল। অন্ধকারে বালক অনুভব করিল যজ্ঞনাথ মই বাহিয়া উপরে উঠিতেছে।

ব্যাকুল হইয়া কহিল "দাদা কোথায় যাও!"

যজ্ঞনাথ কহিলেন "আমি চলিলাম। তু

এখানে থাক্—তোকে আর খুঁজিয়া পাইবে না। কিন্তু মনে রাখিস্, যজ্ঞনাথের পৌত্র বৃন্দাবনের পুত্র গোকুলচন্দ্র।"

বলিয়া উপরে উঠিয়াই মই তুলিয়া লইলেন। বালক রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠ হইতে অতিকষ্টে বলিল "দাদা, আমি বাবার কাছে যাব!"

যজ্ঞনাথ ছিদ্রমুখে পাথর চাপা দিলেন এবং কাণ পাতিয়া শুনিলেন—নিতাই আর একবার রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল "বাবা।"

তার পর একটা পতনের শব্দ হইল, তার পরে আর কোন শব্দ হইল না।

যজ্ঞনাথ এইরূপে যক্ষের হস্তে ধন সমর্পণ করিয়া সেই প্রস্তরখণ্ডের উপর মাটি চাপা দিতে লাগিলেন। তাহার উপরে ভাঙ্গা মন্দিরের ইঁট বালি স্তূপাকার করিলেন। তাহার উপর ঘাসের চাপড়া বসাইলেন, বনের গুল্ম রোপণ করিলেন। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল কিন্তু কিছুতেই সে স্থান হইতে নড়িতে পারিলেন না। থাকিয়া থাকিয়া কেবলি মাটিতে কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন। মনে হইতে লাগিল যেন অনেক দূর হইতে, পৃথিবীর অতলস্পর্শ হইতে একটা ক্রন্দনধ্বনি উঠিতেছে। মনে হইল যেন রাত্রির আকাশ সেই একমাত্র শব্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, পৃথিবীর সমস্ত নিদ্রিত লোক যেন সেই শব্দে শয্যার উপরে জাগিয়া উঠিয়া কাণ পাতিয়া বসিয়া আছে।

বৃদ্ধ অস্থির হইয়া কেবলি মাটির উপরে মাটি চাপাইতেছে। যেন এমনি করিয়া কোনমতে পৃথিবীর মুখচাপা দিতে চাহে। ঐ কে ডাকে "বাবা!"

বৃদ্ধ মাটিতে আঘাত করিয়া বলে "চুপ কর। সবাই শুনিতে পাইবে!"

আবার কে ডাকে "বাবা!"

দেখিল রৌদ্র উঠিয়াছে। ভয়ে মন্দির ছাড়িয়া মাঠে বাহির হইয়া পড়িল।

সেখানেও কে ডাকিল "বাবা!" যজ্ঞনাথ সচকিত হইয়া পিছন ফিরিয়া দেখিল বৃন্দাবন।

বৃন্দাবন কহিল "বাবা, সন্ধান পাইলাম আমার ছেলে তোমার ঘরে লুকাইয়া আছে তাহাকে দাও!"

বৃদ্ধ চোখ মুখ বিকৃত করিয়া বৃন্দাবনের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল "তোর ছেলে?"

বৃন্দাবন কহিল "হাঁ। গোকুল। এখন তাহার নাম নিতাই পাল, আমার নাম দামোদর। কাছাকাছি সর্ব্বত্রই তোমার খ্যাতি আছে সেই জন্য আমরা লজ্জায় নাম পরিবর্ত্তন করিয়াছি নহিলে কেহ আমাদের নাম উচ্চারণ করিত না।"

বৃদ্ধ দশ অঙ্গুলি দ্বারা আকাশ হাতড়াইতে হাতড়াইতে যেন বাতাস আঁকড়িয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

চেতনা লাভ করিয়া যজ্ঞনাথ বৃন্দাবনকে মন্দিরে টানিয়া লইয়া গেল। কহিল "কান্না শুনিতে পাইতেছ?"

বৃন্দাবন কহিল "না।"

"কাণ পাতিয়া শোন দেখি, বাবা বলিয়া কেহ ডাকিতেছে?"

বৃন্দাবন কহিল "না।" বৃদ্ধ তখন যেন ভারি নিশ্চিন্ত হইল।

তাহার পর হইতে বৃদ্ধ সকলকেই জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়ায়, "কান্না শুনিতে পাইতেছ?" পাগ্লামীর কথা শুনিয়া সকলেই হাসে।

অবশেষে বৎসর চারেক পরে বৃদ্ধের মৃত্যুর দিন উপস্থিত হইল। যখন চোখের উপর হইতে জগতের আলো নিবিয়া আসিল, এবং শ্বাস রুদ্ধপ্রায় হইল তখন বিকারের বেগে সহসা উঠিয়া বসিল; একবার দুই হস্তে

চারিদিক্ হাতড়াইয়া মুমূর্ষু কহিল "নিতাই, আমার মইটা কে উঠিয়ে নিলে ?"

সেই বায়ুহীন আলোকহীন মহাগহ্বর হইতে উঠিবার মই খুঁজিয়া না পাইয়া আবার ধুপ্ করিয়া বিছানায় পড়িয়া গেল। সংসারের লুকাচুরি খেলায় যেখানে কাহাকেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না সেইখানেই অন্তর্হিত হইল।



অতিথি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

কাঁঠালিয়ার জমিদার মতিলাল বাবু নৌকা করিয়া সপরিবারে স্বদেশে যাইতেছিলেন। পথের মধ্যে মধ্যাহ্নে নদীতীরের এক গঞ্জের নিকট নৌকা বাঁধিয়া পাকের আয়োজন করিতেছেন এমন সময় এক ব্রাহ্মণ-বালক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবু তোমরা যাচ্চ কোথায় ?—প্রশ্নকর্ত্তার বয়স ১৫।১৬র অধিক হইবে না।

মতিবাবু উত্তর করিলেন, কাঁঠালে। ব্রাহ্মণবালক কহিল, আমাকে পথের মধ্যে নন্দীগাঁয়ে নাবিয়ে দিতে পার ?

বাবু সম্মতি প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি ?

ব্রাহ্মণ-বালক কহিল, 'আমার নাম তারাপদ।'

গৌরবর্ণ ছেলেটিকে বড় সুন্দর দেখিতে। বড় বড় চক্ষু এবং প্রসন্ন হাস্যময় ওষ্ঠাধরে একটি সুললিত সৌকুমার্য্য প্রকাশ পাইতেছে। পরিধানে একখানি মলিন ধুতি। অনাবৃত দেহখানি সর্ব্বপ্রকার বাহুল্যবর্জ্জিত; কোন শিল্পী যেন বহু যত্নে নিখুঁৎ নিটোল করিয়া গড়িয়া দিয়াছে। যেন সে পূর্ব্বজন্মে তাপস বালক ছিল, এবং নির্ম্মল তপস্যার প্রভাবে তাহার শরীর হইতে শরীরাংশ বহুল পরিমাণে ক্ষয় হইয়া একটি সম্মার্জ্জিত ব্রাহ্মণ্যশ্রী পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

মতিলাল বাবু তাহাকে পরম স্নেহভরে কহিলেন, বাবা তুমি স্নান করে এস, এইখানেই আহারাদি হবে।

তারাপদ বলিল, রসুন। বলিয়া তৎক্ষণাৎ অসঙ্কোচে রন্ধনের আয়োজনে যোগদান করিল। মতিলাল বাবুর চাকরটা ছিল হিন্দুস্থানী, মাছ কোটা প্রভৃতি কার্য্যে তাহার তেমন পটুত্ব ছিল না; তারাপদ তাহার কাজ নিজে লইয়া অল্পকালের মধ্যেই সুসম্পন্ন করিল এবং দুই একটা তরকারীও অভ্যস্ত নৈপুণ্যের সহিত রন্ধন করিয়া দিল। পাককার্য্য শেষ হইলে তারাপদ নদীতে স্নান করিয়া বোঁচকা খুলিয়া একটি শুভ্র বস্ত্র পরিল; একটি ছোট কাঠের কাঁকই লইয়া মাথার বড় বড় চুল কপাল হইতে তুলিয়া গ্রীবার উপর ফেলিল এবং মার্জ্জিত পৈতার গোচ্ছা বক্ষে বিলম্বিত করিয়া নৌকায় মতিবাবুর নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

মতিবাবু তাহাকে নৌকার ভিতরে লইয়া গেলেন। সেখানে মতিবাবুর স্ত্রী এবং তাঁহার নবমবর্ষীয়া এক কন্যা বসিয়াছিলেন। মতিবাবুর স্ত্রী অন্নপূর্ণা এই সুন্দর বালকটিকে দেখিয়া স্নেহে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন—মনে মনে কহিলেন আহা কাহার বাছা, কোথা হইতে আসিয়াছে—ইহার মা ইহাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া প্রাণ ধরিয়া আছে !—

যথাসময়ে মতিবাবু এবং এই ছেলেটির জন্য পাশাপাশি দুইখানি আসন পড়িল।

ছেলেটি তেমন ভোজনপটু নহে; অন্নপূর্ণা তাহার স্বল্প আহার দেখিয়া মনে করিলেন সে লজ্জা করিতেছে; তাহাকে এটা ওটা খাইতে বিস্তর অনুরোধ করিলেন; কিন্তু যখন সে আহার হইতে নিরস্ত হইল, তখন সে কোন অনুরোধ মানিল না। দেখা গেল, ছেলেটি সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করে, অথচ এমন সহজে করে যে, তাহাতে কোন প্রকার "জেদ" অথবা "গোঁ" প্রকাশ পায় না। তাহার ব্যবহারে লজ্জার লক্ষণও লেশমাত্র দেখা গেল না।

সকলের আহারাদির পরে অন্নপূর্ণা তাহাকে কাছে বসাইয়া প্রশ্ন করিয়া তাহার ইতিহাস জানিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিস্তারিত বিবরণ কিছুই সংগ্রহ হইল না। মোট কথা এইটুকু জানা গেল, ছেলেটি সাত আট বৎসর বয়সেই স্বেচ্ছাক্রমে ঘর ছাড়িয়া পালাইয়া আসিয়াছে।

অন্নপূর্ণা প্রশ্ন করিলেন, তোমার মা নাই?

তারাপদ কহিল—আছেন।

অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি তোমাকে ভালবাসেন না?

তারাপদ এই প্রশ্ন অত্যন্ত অদ্ভুত জ্ঞান করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, কেন ভাল-বাস্‌বেন না?

অন্নপূর্ণা প্রশ্ন করিলেন, তবে তুমি তাঁকে ছেড়ে এলে যে?

তারাপদ কহিল, তাঁর আরও চারিটি ছেলে এবং তিনটি মেয়ে আছে।

অন্নপূর্ণা বালকের এই অদ্ভুত উত্তরে ব্যথিত হইয়া কহিলেন, ওমা, সে কি কথা! পাঁচটি আঙুল আছে বলে কি একটি আঙুল ত্যাগ করা যায়।

তারাপদর বয়স অল্প, তাহার ইতিহাসও সেই পরিমাণে সংক্ষিপ্ত, কিন্তু ছেলেটি সম্পূর্ণ নূতনতর। সে তাহার পিতামাতার চতুর্থ পুত্র, শৈশবেই পিতৃহীন হয়। বহু সন্তানের ঘরেও তারাপদ সকলের অত্যন্ত আদরের ছিল;—মা ভাই বোন এবং পাড়ার সকলেরই নিকট হইতে সে অজস্র স্নেহ লাভ করিত। এমন কি, গুরুমহাশয়ও তাহাকে মারিত না—মারিলেও বালকের আত্মীয় পর সকলেই তাহাতে বেদনা বোধ করিত, এমন অবস্থায় তাহার গৃহত্যাগ করিবার কোনই কারণ ছিল না। যে উপেক্ষিত রোগা ছেলেটা সর্ব্বদাই চুরি-করা গাছের ফল এবং গৃহস্থ লোকদের নিকট তাহার চতুর্গুণ প্রতিফল খাইয়া বেড়ায় সেও তাহার পরিচিত গ্রামসীমার মধ্যে তাহার নির্য্যাতনকারিণী মার নিকট পড়িয়া রহিল আর সমস্ত গ্রামের এই আদরের ছেলে একটা বিদেশী যাত্রার দলের সহিত মিলিয়া অকাতর চিত্তে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

সকলে খোঁজ করিয়া তাহাকে গ্রামে ফিরাইয়া আনিল। তাহার মা তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া অশ্রুজলে আর্দ্র করিয়া দিল, তাহার বোনরা কাঁদিতে লাগিল; তাহার বড় ভাই পুরুষ অভিভাবকের কঠিন কর্ত্তব্যপালন উপলক্ষে তাহাকে মৃদুরকম শাসন করিবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে অনুতপ্তচিত্তে বিস্তর প্রশ্রয় এবং পুরস্কার দিল। পাড়ার মেয়েরা তাহাকে ঘরে ঘরে ডাকিয়া প্রচুরতর আদর এবং বহুতর প্রলোভনে বাধ্য করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু বন্ধন, এমন কি স্নেহবন্ধনও তাহার সহিল না;—তাহার জন্মনক্ষত্র তাহাকে গৃহহীন করিয়া দিয়াছে;—সে যখনি দেখিত নদী দিয়া বিদেশী নৌকা গুণ টানিয়া চলিয়াছে, গ্রামের বৃহৎ অশ্বত্থগাছের তলে কোন্ দূর দেশ হইতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে অথবা "বেদেরা নদীতীরের পতিত মাঠে ছোট ছোট চাটাই বাঁধিয়া বাঁখারি

ছুলিয়া চাঙারি নির্ম্মাণ করিতে বসিয়াছে, তখন অজ্ঞাত বহিঃপৃথিবীর স্নেহহীন স্বাধীনতার জন্য তাহার চিত্ত অশান্ত হইয়া উঠিত। উপরি উপরি দুই তিন বার পলায়নের পর তাহার আত্মীয়বর্গ এবং গ্রামের লোক তাহার আশা পরিত্যাগ করিল।

প্রথমে সে একটা যাত্রার দলের সঙ্গ লইয়াছিল। অধিকারী যখন তাহাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতে লাগিল এবং দলস্থ ছোটবড় সকলেরই যখন সে প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল, এমন কি, যে বাড়িতে যাত্রা হইত সে বাড়ির অধ্যক্ষগণ, বিশেষতঃ পুরোমহিলাবর্গ যখন বিশেষরূপে তাহাকে আহ্বান করিয়া সমাদর করিতে লাগিল, তখন একদিন সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেল তাহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না।

তারাপদ হরিণশিশুর মত বন্ধনভীরু আবার হরিণেরই মত সঙ্গীতমুগ্ধ। যাত্রার গানেই তাহাকে প্রথম ঘর হইতে বিবাগী করিয়া দেয়। গানের সুরে তাহার সমস্ত শিরার মধ্যে অনুকম্পন এবং গানের তালে তাহার সর্ব্বাঙ্গে আন্দোলন উপস্থিত হইত। যখন সে নিতান্ত শিশু ছিল তখনও সঙ্গীতসভায় সে যেরূপ সংযত গম্ভীর বয়স্কভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়া বসিয়া বসিয়া দুলিত, দেখিয়া প্রবীণ লোকের হাস্য সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইত। কেবল সঙ্গীত কেন, গাছের ঘনপল্লবের উপর যখন শ্রাবণের বৃষ্টিধারা পড়িত, আকাশে মেঘ ডাকিত, অরণ্যের ভিতর মাতৃহীন দৈত্যশিশুর ন্যায় বাতাস ক্রন্দন করিতে থাকিত, তখন তাহার চিত্ত যেন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিত। নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে বহুদূর আকাশ হইতে চিলের ডাক, বর্ষার সন্ধ্যায় ভেকের কলরব, গভীর রাত্রে শৃগালের চীৎকারধ্বনি সকলি তাহাকে উতলা করিত। এই সঙ্গীতের মোহে আকৃষ্ট হইয়া সে অনতিবিলম্বে এক পাঁচালীর দলের মধ্যে গিয়া প্রবিষ্ট হইল। দলাধ্যক্ষ তাহাকে পরম যত্নে গান শিখাইতে এবং পাঁচালী মুখস্থ করাইতে প্রবৃত্ত হইল, এবং তাহাকে আপন বক্ষপিঞ্জরের পাখীর মত প্রিয় জ্ঞান করিয়া স্নেহ করিতে লাগিল। পাখী কিছু কিছু গান শিখিল এবং একদিন প্রত্যূষে উড়িয়া চলিয়া গেল।

শেষবারে সে এক জিম্ন্যাষ্টিকের দলে জুটিয়াছিল। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষভাগ হইতে আষাঢ় মাসের অবসানপর্য্যন্ত এ অঞ্চলে স্থানে স্থানে পর্য্যায়ক্রমে বারোয়ারির মেলা হইয়া থাকে। তদুপলক্ষে দুই তিন দল যাত্রা, পাঁচালী, কবি, নর্ত্তকী এবং নানাবিধ দোকান নৌকাযোগে ছোট ছোট নদী উপনদী দিয়া এক মেলা অন্তে অন্য মেলায় ঘুরিয়া বেড়ায়। গত বৎসর হইতে কলিকাতার এক ক্ষুদ্র জিম্ন্যাষ্টিকের দল এই পর্য্যটনশীল মেলার আমোদচক্রের মধ্যে যোগ দিয়াছিল। তারাপদ প্রথমতঃ নৌকারোহী দোকানীদের সহিত মিশিয়া মেলায় পানের খিলি বিক্রয়ের ভার লইয়াছিল। পরে তাহার স্বাভাবিক কৌতূহলবশতঃ এই জিম্ন্যাষ্টিকের ছেলেদের আশ্চর্য্য ব্যায়ামনৈপুণ্যে আকৃষ্ট হইয়া এই দলে প্রবেশ করিয়াছিল। তারাপদ নিজে নিজে অভ্যাস করিয়া ভাল বাঁশী বাজাইতে শিখিয়াছিল— জিম্ন্যাষ্টিকের সময় তাহাকে দ্রুততালে লক্ষ্ণৌ ঠুংরির সুরে বাঁশী বাজাইতে হইত এই তাহার একমাত্র কাজ ছিল।

এই দল হইতেই তাহার শেষ পলায়ন। সে শুনিয়াছিল, নন্দীগ্রামের জমীদার বাবুরা মহাসমারোহে এক সখের যাত্রা খুলিতেছেন— শুনিয়া সে তাহার ক্ষুদ্র বোঁচকাটি লইয়া নন্দীগ্রামে যাত্রার আয়োজন করিতেছিল,

এমন সময় মতিবাবুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়।

তারাপদ পর্য্যায়ক্রমে নানা দলের মধ্যে ভিড়িয়াও আপন স্বাভাবিক কল্পনাপ্রবণ প্রকৃতিপ্রভাবে কোন দলের বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। অন্তরের মধ্য সে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত এবং মুক্ত ছিল। সংসারের অনেক কুৎসিত কথা সে সর্ব্বদা শুনিয়াছে এবং অনেক কদর্য্য দৃশ্য তাহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, কিন্তু তাহা তাহার মনের মধ্যে সঞ্চিত হইবার তিলমাত্র অবসর প্রাপ্ত হয় নাই। এ ছেলেটির কিছুতেই খেয়াল ছিল না। অন্যান্য বন্ধনের ন্যায় কোন প্রকার অভ্যাসবন্ধনও তাহার মনকে বাধ্য করিতে পারে নাই, সে এই সংসারের পঙ্কিল জলের উপর দিয়া শুভ্রপক্ষ রাজহংসের মত সাঁতার দিয়া বেড়াইত। কৌতূহলবশতঃ যতবারই ডুব দিত তাহার পাখা সিক্ত বা মলিন হইতে পারিত না। এই জন্য এই গৃহত্যাগী ছেলেটির মুখে একটি শুভ্র স্বাভাবিক তারুণ্য অম্লানভাবে প্রকাশ পাইত, তাহার সেই মুখশ্রী দেখিয়া প্রবীণ বিষয়ী মতিলাল বাবু তাহাকে বিনা প্রশ্নে বিনা সন্দেহে পরম আদরে আহ্বান করিয়া লইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আহারান্তে নৌকা ছাড়িয়া দিল। অন্নপূর্ণা পরমস্নেহে এই ব্রাহ্মণ-বালককে তাহার ঘরের কথা, তাহার আত্মীয় পরিজনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; তারাপদ অত্যন্ত সংক্ষেপে তাহার উত্তর দিয়া বাহিরে আসিয়া পরিত্রাণ লাভ করিল। বাহিরে বর্ষার নদী পরিপূর্ণতার শেষ রেখা পর্য্যন্ত ভরিয়া উঠিয়া আপন আত্মহারা উদ্দাম চাঞ্চল্যে প্রকৃতিমাতাকে যেন উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল। মেঘনির্ম্মুক্ত রৌদ্রে নদীতীরের অর্দ্ধনিমগ্ন কাশতৃণশ্রেণী, এবং তাহার ঊর্দ্ধে সরস সঘন ইক্ষুক্ষেত্র এবং তাহার পরপ্রান্তে দূরদিগন্তচুম্বিত নীলাঞ্জনবর্ণ বনরেখা সমস্তই যেন কোন এক রূপকথার সোণার কাঠির স্পর্শে সদ্যো-জাগ্রৎ নবীন সৌন্দর্য্যের মত নির্ব্বাক্ নীলাকাশের মুগ্ধদৃষ্টির সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল, সমস্তই যেন সজীব, স্পন্দিত, প্রগল্‌ভ, আলোকে উদ্ভাসিত, নবীনতায় সুচিক্কণ, প্রাচুর্য্যে পরিপূর্ণ।

তারাপদ নৌকার ছাদের উপরে পালের ছায়ায় গিয়া আশ্রয় লইল। পর্য্যায়ক্রমে ঢালু সবুজ মাঠ, প্লাবিত পাটের ক্ষেত, গাঢ় শ্যামল আমন ধান্যের আন্দোলন, ঘাট হইতে গ্রামাভিমুখী সঙ্কীর্ণ পথ, ঘনবনবেষ্টিত ছায়াময় গ্রাম তাহার চোখের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল। এই জলস্থল আকাশ, এই চারিদিকের সচলতা, সজীবতা, মুখরতা,—এই ঊর্দ্ধ অধোদেশের ব্যাপ্তি এবং বৈচিত্র্য এবং নির্লিপ্ত সুদূরতা, এই সুবৃহৎ, চিরস্থায়ী, নির্নিমেষ, বাক্যবিহীন বিশ্বজগৎ তরুণ বালকের পরমাত্মীয় ছিল;—অথচ সে এই চঞ্চল মাণবকটিকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্নেহবাহু দ্বারা ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিত না। নদীতীরে বাছুর লেজ তুলিয়া ছুটিতেছে, গ্রাম্য টাটু ঘোড়া সম্মুখের দুই দড়িবাঁধা পা লইয়া লাফ দিয়া দিয়া ঘাস খাইয়া বেড়াইতেছে, মাছরাঙা জেলেদের জাল বাঁধিবার বংশদণ্ডের উপর হইতে ঝপ্ করিয়া সবেগে জলের মধ্যে ঝাঁপাইয়া মাছ ধরিতেছে, ছেলেরা জলের মধ্যে পড়িয়া মাতামাতি করিতেছে, মেয়েরা উচ্চকণ্ঠে সহাস্য গল্প করিতে করিতে আবক্ষজলে বসনাঞ্চল প্রসারিত করিয়া দুই হস্তে তাহা মার্জ্জন করিয়া লইতেছে, কোমর-বাঁধা মেছুনীরা চুপ্‌ড়ি লইয়া

জেলেদের নিকট হইতে মাছ কিনিতেছে, এ সমস্তই সে চিরনূতন অশ্রান্ত কৌতূহলের সহিত বসিয়া বসিয়া দেখে, কিছুতেই তাহার দৃষ্টির পিপাসা নিবৃত্ত হয় না।

নৌকার ছাতের উপরে গিয়া তারাপদ ক্রমশঃ দাঁড়ি মাঝিদের সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিল। মাঝে মাঝে আবশ্যকমতে মাল্লাদের হাত হইতে লগি লইয়া নিজেই ঠেলিতে প্রবৃত্ত হইল; মাঝির যখন তামাক খাইবার আবশ্যক, তখন সে নিজে গিয়া হাল ধরিল—যখন যে দিকে পাল্ ফিরান আবশ্যক সমস্ত সে দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়া দিল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে অন্নপূর্ণা তারাপদকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, রাত্রে তুমি কি খাও!

তারাপদ কহিল, যা' পাই তাই খাই; সকল দিন খাইও না।

এই সুন্দর ব্রাহ্মণ-বালকটির আতিথ্য-গ্রহণে ঔদাসীন্য অন্নপূর্ণাকে ঈষৎ পীড়া দিতে লাগিল। তাঁহার বড় ইচ্ছা, খাওয়াইয়া পরাইয়া এই গৃহচ্যুত পান্থ বালকটিকে পরিতৃপ্ত করিয়া দেন। কিন্তু কিসে যে তাহার পরিতোষ হইবে তাহার কোন সন্ধান পাইলেন না। অন্নপূর্ণা চাকরদের ডাকিয়া গ্রাম হইতে দুধ মিষ্টান্ন প্রভৃতি ক্রয় করিয়া আনিবার জন্য ধূম-ধাম বাধাইয়া দিলেন। তারাপদ যথাপরিমাণে আহার করিল; কিন্তু দুধ খাইল না। মৌন স্বভাব মতিলাল বাবুও তাহাকে দুধ খাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন; সে সংক্ষেপে বলিল, আমার ভাল লাগে না।

নদীর উপর দুই তিন দিন গেল। তারাপদ রাঁধাবাড়া বাজার করা হইতে নৌকাচালনা পর্য্যন্ত সকল কাজেই স্বেচ্ছা এবং তৎপরতার সহিত যোগ দিল। যে কোন দৃশ্য তাহার চোখের সম্মুখে আসে তাহার প্রতি তারাপদের সকৌতূহল দৃষ্টি ধাবিত হয়, যে কোন কাজ তাহার হাতের কাছে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাতেই সে আপনি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। তাহার দৃষ্টি, তাহার হস্ত, তাহার মন সর্ব্বদাই সচল হইয়া আছে; এই জন্য সে এই নিত্যসচলা প্রকৃতির মত সর্ব্বদাই নিশ্চিন্ত উদাসীন অথচ সর্ব্বদাই ক্রিয়াসক্ত। মানুষমাত্রেরই নিজের একটি স্বতন্ত্র অধিষ্ঠানভূমি আছে;—কিন্তু তারাপদ এই অনন্ত নীলাম্বরবাহী বিশ্বপ্রবাহের একটি আনন্দোজ্জ্বল তরঙ্গ,—ভূত ভবিষ্যতের সহিত তাহার কোন বন্ধন নাই—সম্মুখাভিমুখে চলিয়া যাওয়াই তাহার একমাত্র কার্য্য।

এ দিকে অনেক দিন নানা সম্প্রদায়ের সহিত যোগ দিয়া অনেক প্রকার মনোরঞ্জনী বিদ্যা তাহার আয়ত্ত হইয়াছিল। কোন প্রকার চিন্তার দ্বারা আচ্ছন্ন না থাকাতে তাহার নির্ম্মল স্মৃতিপটে সকল জিনিষ আশ্চর্য্য সহজে মুদ্রিত হইয়া যাইত। পাঁচালী, কথকতা, কীর্ত্তনগান, যাত্রাভিনয়ের সুদীর্ঘ খণ্ডসকল তাহার কণ্ঠাগ্রে ছিল। মতিলাল বাবু চির-প্রথামত একদিন সন্ধ্যাবেলায় তাঁহার স্ত্রী কন্যাকে রামায়ণ পড়িয়া শুনাইতেছিলেন; কুশ লবের কথার সূচনা হইতেছে, এমন সময় তারাপদ উৎসাহ সম্বরণ করিতে না পারিয়া নৌকার ছাদের উপর হইতে নামিয়া আসিয়া কহিল, বই রাখুন! আমি কুশ লবের গান করি, আপনারা শুনে যান্।

এই বলিয়া সে কুশ লবের পাঁচালী আরম্ভ করিয়া দিল। বাঁশির মত সুমিষ্ট পরিপূর্ণস্বরে দাশুরায়ের অনুপ্রাস ক্ষিপ্রবেগে বর্ষণ করিয়া চলিল;—দাঁড়ি মাঝি সকলেই দ্বারের কাছে আসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল; হাস্য, করুণা এবং সঙ্গীতে সেই নদীতীরের সন্ধ্যাকাশে এক অপূর্ব্ব রসস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল,—দুই নিস্তব্ধ তটভূমি কুতূহলী হইয়া উঠিল, পাশ

দিয়া যে সকল নৌকা চলিতেছিল, তাহাদের আরোহিগণ ক্ষণকালের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া সেই দিকে কাণ দিয়া রহিল ; যখন শেষ হইয়া গেল সকলেই ব্যথিত চিত্তে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, ইহারই মধ্যে শেষ হইল কেন ?

সজলনয়না অন্নপূর্ণার ইচ্ছা করিতে লাগিল, ছেলেটিকে কোলে বসাইয়া বক্ষে চাপিয়া তাহার মস্তক আঘ্রাণ করেন। মতিলাল বাবু ভাবিতে লাগিলেন, এই ছেলেটিকে যদি কোনমতে কাছে রাখিতে পারি তবে পুত্রের অভাব পূর্ণ হয়। কেবল ক্ষুদ্র বালিকা চারুশশির অন্তঃকরণ ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চারুশশি তাহার পিতামাতার একমাত্র সন্তান, তাঁহাদের পিতৃমাতৃস্নেহের একমাত্র অধিকারিণী। তাহার খেয়াল এবং জেদের অন্ত ছিল না। খাওয়া, কাপড়পরা, চুলবাঁধা সম্বন্ধে তাহার নিজের স্বাধীন মত ছিল, কিন্তু সে মতের কিছুমাত্র স্থিরতা ছিল না। যে দিন কোথাও নিমন্ত্রণ থাকিত সে দিন তাহার মায়ের ভয় হইত পাছে মেয়েটি সাজসজ্জা সম্বন্ধে একটা অসম্ভব জেদ্ ধরিয়া বসে। যদি দৈবাৎ একবার চুলবাঁধাটা তাহার মনের মত না হইল, তবে সে দিন যতবার চুল খুলিয়া যত রকম করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া যাক্ কিছুতেই তাহার মন পাওয়া যাইবে না, অবশেষে মহা কান্নাকাটির পালা পড়িয়া যাইবে। সকল বিষয়েই এইরূপ। আবার এক এক সময় চিত্ত যখন প্রসন্ন থাকে তখন কিছুতেই তাহার কোন আপত্তি থাকে না। তখন সে অতিমাত্রায় ভালবাসা প্রকাশ করিয়া তাহার মাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিয়া হাসিয়া বকিয়া একেবারে অস্থির করিয়া তোলে। এই ক্ষুদ্র মেয়েটি একটি দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা।

এই বালিকা তাহার দুর্বাধ্য হৃদয়ের সমস্ত বেগ প্রয়োগ করিয়া মনে মনে তারাপদকে সুতীব্র বিদ্বেষে তাড়না করিতে লাগিল। পিতামাতাকেও সর্ব্বতোভাবে উদ্বেজিত করিয়া তুলিল। আহারের সময় রোদনোন্মুখী হইয়া ভোজনের পাত্র ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়, রন্ধন তাহার রুচিকর বোধ হয় না—দাসীকে মারে, সকল বিষয়েই অকারণ অভিযোগ করিতে থাকে। তারাপদের বিদ্যাগুলি যতই তাহার এবং অন্য সকলের মনোরঞ্জন করিতে লাগিল, ততই যেন তাহার রাগ বাড়িয়া উঠিল। তারাপদের যে কোন গুণ আছে, ইহা স্বীকার করিতে তাহার মন বিমুখ হইল, অথচ তাহার প্রমাণ যখন প্রবল হইতে লাগিল, তাহার অসন্তোষের মাত্রাও উচ্চে উঠিল। তারাপদ যে দিন কুশলবের গান করিল, সে দিন অন্নপূর্ণা মনে করিলেন, সঙ্গীতে বনের পশু বশ হয়, আজ বোধ হয় আমার মেয়ের মন গলিয়াছে ;—তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—চারু, কেমন লাগ্‌ল ? সে কোন উত্তর না দিয়া অত্যন্ত প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া দিল। এই ভঙ্গীটিকে ভাষায় তর্জ্জমা করিলে এইরূপ দাঁড়ায় :—কিছুমাত্র ভাল লাগে নাই এবং কোন কালে ভাল লাগিবে না !

চারুর মনে ঈর্ষ্যার উদয় হইয়াছে বুঝিয়া তাহার মাতা চারুর সম্মুখে তারাপদের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতে বিরত হইলেন। সন্ধ্যার পরে যখন সকাল সকাল খাইয়া চারু শয়ন করিত তখন অন্নপূর্ণা নৌকাকক্ষের দ্বারের নিকট আসিয়া বসিতেন এবং মতি বাবু ও তারাপদ বাহিরে বসিত এবং অন্নপূর্ণার অনুরোধে তারাপদ গান আরম্ভ করিত ; তাহার গানে যখন নদীতীরের বিশ্রামনিরতা গ্রামশ্রী সন্ধ্যার

বিপুল অন্ধকারে মুগ্ধ নিস্তব্ধ হইয়া রহিত এবং অন্নপূর্ণার কোমল হৃদয়খানি স্নেহে ও সৌন্দর্য্যরসে উচ্ছলিত হইতে থাকিত তখন হঠাৎ চারু দ্রুতপদে বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া সরোষ সরোদনে বলিত, মা তোমরা কি গোল করচ আমার ঘুম হচ্চে না। পিতামাতা তাহাকে একলা ঘুমাইতে পাঠাইয়া তারাপদকে ঘিরিয়া সঙ্গীত উপভোগ করিতেছেন ইহা তাহার একান্তঅসহ্য হইয়া উঠিত। এই দীপ্তকৃষ্ণনয়না বালিকার স্বাভাবিক সুতীব্রতা তারাপদের নিকট অত্যন্ত কৌতুকজনক বোধ হইত। সে ইহাকে গল্প শুনাইয়া, গান গাহিয়া, বাঁশি বাজাইয়া বশ করিতে অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইল না! কেবল, তারাপদ মধ্যাহ্নে যখন নদীতে স্নান করিতে নামিত, পরিপূর্ণ জলরাশির মধ্যে গৌরবর্ণ সরল তনু দেহখানি নানা সন্তরণভঙ্গীতে অবলীলাক্রমে সঞ্চালন করিয়া তরুণ জলদেবতার মত শোভা পাইত, তখন বালিকার কৌতূহল আকৃষ্ট না হইয়া থাকিত না; সে সেই সময়টির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত; কিন্তু আন্তরিক আগ্রহ কাহাকেও জানিতে দিত না, এবং এই অশিক্ষাপটু অভিনেত্রী পশমের গলাবন্ধ বোনা এক মনে অভ্যাস করিতে করিতে মাঝে মাঝে যেন অত্যন্ত উপেক্ষাভরে কটাক্ষে তারাপদের সন্তরণলীলা দেখিয়া লইত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নন্দীগ্রাম কখন্ ছাড়াইয়া গেল, তারাপদ তাহার খোঁজ লইল না। অত্যন্ত মৃদুমন্দ গতিতে বৃহৎ নৌকা কখনো পাল তুলিয়া কখনো গুণ টানিয়া নানা নদীর শাখপ্রশাখার ভিতর দিয়া চলিতে লাগিল;—নৌকারোহীদের দিনগুলিও এই সকল নদী উপনদীর মত, শান্তিময় সৌন্দর্য্যময় বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া সহজ সৌম্য গমনে মৃদুমিষ্ট কলস্বরে প্রবাহিত হইতে লাগিল। কাহারো কোনরূপ তাড়া ছিল না; মধ্যাহ্নে স্নানাহারে অনেকক্ষণ বিলম্ব হইত, এদিকে সন্ধ্যা হইতে না হইতেই একটা বড় দেখিয়া গ্রামের ধারে, ঘাটের কাছে, ঝিল্লীমন্দ্রিত খদ্যোতখচিত বনের পাশে নৌকা বাঁধিত।

এমনি করিয়া দিনদশেকে নৌকা কাঁঠালিয়ায় পৌঁছিল। জমিদারের আগমনে বাড়ি হইতে পাল্কী এবং টাটু ঘোড়ার সমাগম হইল, এবং বাঁশের লাঠি হস্তে পাইক বরকন্দাজের দল ঘন ঘন বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজে গ্রামের উৎকণ্ঠিত কাক সমাজকে যৎপরোনাস্তি মুখর করিয়া তুলিল।

এই সমস্ত সমারোহে কালবিলম্ব হইতেছে ইতিমধ্যে তারাপদ নৌকা হইতে দ্রুত নামিয়া একবার সমস্ত গ্রাম পর্য্যটন করিয়া লইল। কাহাকেও দাদা, কাহাকেও খুড়া, কাহাকেও দিদি, কাহাকেও মাসী বলিয়া দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত গ্রামের সহিত সৌহার্দ্দাবন্ধন স্থাপিত করিয়া লইল কোথাও তাহার প্রকৃত বন্ধন ছিল না বলিয়াই এই বালক আশ্চর্য্য সত্বর ও সহজে সকলেরই সহিত পরিচয় করিয়া লইতে পারিত। তারাপদ দেখিতে দেখিতে অল্প দিনের মধ্যেই গ্রামের সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া লইল।

এত সহজে হৃদয়হরণ করিবার কারণ এই, তারাপদ সকলেরই সঙ্গে তাহাদের নিজের মত হইয়া স্বভাবতই যোগ দিতে পারিত। সে কোন প্রকার বিশেষ সংস্কারের দ্বারা বদ্ধ ছিল না, অথচ সকল অবস্থা

সকল কাজের প্রতিই তাহার এক প্রকার সহজ প্রবণতা ছিল। বালকের কাছে সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বালক, অথচ তাহাদের হইতে শ্রেষ্ঠ ও স্বতন্ত্র, বৃদ্ধের কাছে সে বালক নহে অথচ জ্যাঠাও নহে, রাখালের সঙ্গে সে রাখাল অথচ ব্রাহ্মণ। সকলের সকল কাজেই সে চিরকালের সহযোগীর ন্যায় অভ্যস্তভাবে হস্তক্ষেপ করে;—ময়রার দোকানে গল্প করিতে করিতে ময়রা বলে দাদাঠাকুর একটু বস ত ভাই আমি আস্চি—তারাপদ অম্লানবদনে দোকানে বসিয়া একখানা শালপাতা লইয়া সন্দেশের মাছি তাড়াইতে প্রবৃত্ত হয়। ভিয়ান্ করিতেও সে মজ্‌বুৎ, তাঁতের রহস্যও তাহার কিছু কিছু জানা আছে, কুমারের চক্রচালনাও তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত নহে।

তারাপদ সমস্ত গ্রামটি আয়ত্ত করিয়া লইল, কেবল গ্রামবাসিনী একটি বালিকার ঈর্ষা সে এখনো জয় করিতে পারিল না। এই বালিকাটি তারাপদের সুদূরে নির্ব্বাসন তীব্রভাবে কামনা করিতেছে জানিয়াই বোধ করি তারাপদ এই গ্রামে এত দিন আবদ্ধ হইয়া রহিল।

কিন্তু বালিকাবস্থাতেও নারীদের অন্তর-রহস্য ভেদ করা সুকঠিন, চারুশশি তাহার প্রমাণ দিল।

বামুন-ঠাক্‌রুণের মেয়ে সোণামণি পাঁচ বছর বয়সে বিধবা হয়; সেই চারুর সমবয়সী সখী। তাহার শরীর অসুস্থ থাকাতে গৃহ-প্রত্যাগত সখীর সহিত সে কিছুদিন সাক্ষাৎ করিতে পারে নাই। সুস্থ হইয়া যে দিন দেখা করিতে আসিল সে দিন প্রায় বিনা কারণেই দুই সখীর মধ্যে একটা মনোবিচ্ছেদ ঘটিবার উপক্রম হইল।

চারু অত্যন্ত ফাঁদিয়া গল্প আরম্ভ করিয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল, তারাপদ নামক তাহাদের নবার্জ্জিত পরমরত্নটির আহরণ কাহিনী সবিস্তরে বর্ণনা করিয়া সে তাহার সখীর কৌতূহল এবং বিস্ময় সপ্তমে চড়াইয়া দিবে। কিন্তু যখন সে শুনিল, তারাপদ সোণামণির নিকট কিছুমাত্র অপরিচিত নহে, বামুন ঠাকরুণকে সে মাসী বলে এবং সোণামণি তাহাকে দাদা বলিয়া থাকে, যখন শুনিল, তারাপদ কেবল যে বাঁশিতে কীর্ত্তনের সুর বাজাইয়া মাতা ও কন্যার মনোরঞ্জন করিয়াছে তাহা নহে, সোণামণির অনুরোধে তাহাকে স্বহস্তে একটি বাঁশের বাঁশী বানাইয়া দিয়াছে, তাহাকে কতদিন উচ্চশাখা হইতে ফল ও কণ্টকশাখা হইতে ফুল পাড়িয়া দিয়াছে তখন চারুর অন্তঃকরণে যেন তপ্তশেল বিঁধিতে লাগিল। চারু জানিত তারাপদ বিশেষরূপে তাহাদেরই তারাপদ—অত্যন্ত গোপনে সংরক্ষণীয় ইতরসাধারণে তাহার একটু আধটু আভাসমাত্র পাইবে অথচ কোনমতে নাগাল পাইবে না, দূর হইতে তাহার রূপে গুণে মুগ্ধ হইবে এবং চারুশশিদের ধন্যবাদ দিতে থাকিবে। এই আশ্চর্য্য দুর্লভ দৈবলব্ধ ব্রাহ্মণ-বালকটি সোণামণির কাছে কেন সহজগম্য হইল? আমরা যদি এত যত্ন করিয়া না আনিতাম, এত যত্ন করিয়া না রাখিতাম তাহা হইলে সোণামণিরা তাহার দর্শন পাইত কোথা হইতে? সোণামণির দাদা! শুনিয়া সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া যায়!

যে তারাপদকে চারু মনে মনে বিদ্বেষশরে জর্জ্জর করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহারই একাধিকার লইয়া এমন প্রবল উদ্বেগ কেন? বুঝিবে কাহার সাধ্য!

সেই দিনই অপর একটা তুচ্ছসূত্রে সোণা-মণির সহিত চারুর মর্ম্মান্তিক আড়ি হইয়া গেল। এবং সে তারাপদর ঘরে গিয়া তাহার সখের বাঁশিটি বাহির করিয়া তাহার উপর

লাফাইয়া মাড়াইয়া সেটাকে নির্দ্দয়ভাবে ভাঙ্গিতে লাগিল।

চারু যখন প্রচণ্ড আবেগে এই বংশীধ্বংস-কার্য্যে নিযুক্ত আছে এমন সময় তারাপদ আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। সে বালিকার এই প্রলয় মূর্ত্তি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কহিল "চারু, আমার বাঁশিটা ভাঙ্‌চ কেন?" চারু রক্তনেত্রে রক্তিম-মুখে "বেশ করচি, খুব করচি" বলিয়া আরও বার দুই চার বিদীর্ণ বাঁশির উপর অনাবশ্যক পদাঘাত করিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তারাপদ বাঁশিটি তুলিয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল তাহাতে আর পদার্থ নাই। অকারণে, তাহার পুরাতন নিরপরাধ বাঁশিটার এই আকস্মিক দুর্গতি দেখিয়া সে আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। চারুশশি প্রতিদিনই তাহার পক্ষে পরম কৌতূহলের বিষয় হইয়া উঠিল।

তাহার আর একটি কৌতূহলের ক্ষেত্র ছিল, মতিলাল বাবুর লাইব্রেরিতে ইংরাজি ছবির বইগুলি। বাহিরের সংসারের সহিত তাহার যথেষ্ট পরিচয় হইয়াছে, কিন্তু এই ছবির জগতে সে কিছুতেই ভাল করিয়া প্রবেশ করিতে পারে না। কল্পনার দ্বারা আপনার মনে অনেকটা পূরণ করিয়া লইত কিন্তু তাহাতে মন কিছুতেই তৃপ্তি মানিত না।

ছবির বহির প্রতি তারাপদের এই আগ্রহ দেখিয়া একদিন মতিলাল বাবু বলিলেন, "ইংরাজি শিখবে? তা হলে এ সমস্ত ছবির মানে বুঝ্‌তে পারবে"। তারাপদ তৎক্ষণাৎ বলিল "শিখব।"

মতিবাবু খুব খুসি হইয়া গ্রামের এণ্ট্রেন্স্ স্কুলের হেড্‌মাষ্টার রামরতন বাবুকে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় এই বালকের ইংরাজি অধ্যাপন-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

তারাপদ তাহার প্রখর স্মরণশক্তি এবং অখণ্ড মনোযোগ লইয়া ইংরাজি শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইল। সে যেন এক নূতন দুর্গম রাজ্যের মধ্যে ভ্রমণে বাহির হইল, পুরাতন সংসারের সহিত কোন সম্পর্ক রাখিল না। পাড়ার লোকেরা আর তাহাকে দেখিতে পাইল না; যখন সে সন্ধ্যার পূর্ব্বে নির্জ্জন নদীতীরে দ্রুতবেগে পদচারণ করিতে করিতে পড়া মুখস্থ করিত, তখন তাহার উপাসক বালকসম্প্রদায় দূর হইতে ক্ষুণ্ণচিত্তে সসম্ভ্রমে তাহাকে নিরীক্ষণ করিত, তাহার পাঠে ব্যাঘাত করিতে সাহস করিত না।

চারুও আজকাল তাহাকে বড় একটা দেখিতে পাইত না। পূর্ব্বে তারাপদ অন্তঃপুরে গিয়া অন্নপূর্ণার স্নেহদৃষ্টির সম্মুখে বসিয়া আহার করিত—কিন্তু তদুপলক্ষে প্রায় মাঝে মাঝে কিছু বিলম্ব হইয়া যাইত বলিয়া সে মতিবাবুকে অনুরোধ করিয়া বাহিরে আহারের বন্দোবস্ত করিয়া লইল। ইহাতে অন্নপূর্ণা ব্যথিত হইয়া আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু মতিবাবু বালকের অধ্যয়নের উৎসাহে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া এই নূতন ব্যবস্থায় অনুমোদন করিলেন।

এমন সময় চারুও হঠাৎ জেদ্ করিয়া বসিল, আমিও ইংরাজি শিখিব। তাহার পিতামাতা তাঁহাদের খামখেয়ালি-কন্যার এই প্রস্তাবটিকে প্রথমে পরিহাসের বিষয় জ্ঞান করিয়া স্নেহমিশ্রিত হাস্য করিলেন—কিন্তু কন্যাটি এই প্রস্তাবের পরিহাস্য অংশটুকুকে প্রচুর অশ্রুজলধারায় অতি শীঘ্রই নিঃশেষে ধৌত করিয়া ফেলিয়াছে। অবশেষে এই স্নেহদুর্ব্বল নিরুপায় অভিভাবকদ্বয় বালিকার

প্রস্তাব গম্ভীরভাবে গ্রাহ্য করিলেন। চারু মাষ্টারের নিকট তারাপদের সহিত একত্র অধ্যয়নে নিযুক্ত হইল।

কিন্তু পড়াশুনা করা এই অস্থিরচিত্ত বালিকার স্বভাবসঙ্গত ছিল না। সে নিজে কিছু শিখিল না, কেবল তারাপদর অধ্যয়নে ব্যাঘাত করিতে লাগিল। সে পিছাইয়া পড়ে, পড়া মুখস্থ করে না, কিন্তু তবু কিছুতেই তারাপদর পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া থাকিতে চাহে না। তারাপদ তাহাকে অতিক্রম করিয়া নূতন পড়া লইতে গেলে সে মহা রাগারাগি করিত, এমন কি, কান্নাকাটি করিতে ছাড়িত না। তারাপদ পুরাতন বই শেষ করিয়া নূতন বই কিনিলে তাহাকেও সেই নূতন বই কিনিয়া দিতে হইত। তারাপদ অবসরের সময় নিজে ঘরে বসিয়া লিখিত এবং পড়া মুখস্থ করিত, ইহা সেই ঈর্ষ্যাপরায়ণা কন্যাটির সহ্য হইত না; সে গোপনে তাহার লেখা খাতায় কালি ঢালিয়া আসিত, কলম চুরি করিয়া রাখিত, এমন কি বইয়ের যেখানে অভ্যাস করিবার, সেই অংশটি ছিঁড়িয়া আসিত। তারাপদ এই বালিকার অনেক দৌরাত্ম্য সকৌতুকে সহ্য করিত; অসহ্য হইলে মারিত, কিন্তু কিছুতেই শাসন করিতে পারিত না।

দৈবাৎ একটা উপায় বাহির হইল। একদিন বড় বিরক্ত হইয়া নিরুপায় তারাপদ তাহার মসীবিলুপ্ত লেখা খাতা ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া গম্ভীর বিষণ্ণমুখে বসিয়াছিল;—চারু দ্বারের কাছে আসিয়া মনে করিল, আজ মার খাইবে। কিন্তু তাহার প্রত্যাশা পূর্ণ হইল না। তারাপদ একটি কথামাত্র না কহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বালিকা ঘরের ভিতরে বাহিরে ঘুরঘুর করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বারংবার এত কাছে ধরা দিল যে, তারাপদ ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই তাহার পৃষ্ঠে এক চপেটাঘাত বসাইতে দিতে পারিত। কিন্তু সে তাহা না দিয়া গম্ভীর হইয়া রহিল। বালিকা মহামুস্কিলে পড়িল। কেমন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয় সে বিদ্যা তাহার কোন কালেই অভ্যাস ছিল না, অথচ অনুতপ্ত ক্ষুদ্র হৃদয়টি তাহার সহপাঠীর ক্ষমালাভের জন্য একান্ত কাতর হইয়া উঠিল। অবশেষে কোন উপায় না দেখিয়া ছিন্ন খাতার এক টুক্‌রা লইয়া তারাপদর নিকটে বসিয়া খুব বড় বড় করিয়া লিখিল, আমি আর কখন খাতায় কালি মাখিব না। লেখা শেষ করিয়া সেই লেখার প্রতি তারাপদর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য অনেক প্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে লাগিল। দেখিয়া তারাপদ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না—হাসিয়া উঠিল। তখন বালিকা লজ্জায় ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া ঘর হইতে দ্রুতবেগে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। যে কাগজের টুক্‌রায় সে স্বহস্তে দীনতা প্রকাশ করিয়াছে সেটা অনন্তকাল এবং অনন্ত জগৎ হইতে সম্পূর্ণ লোপ করিতে পারিলে তবে তাহার হৃদয়ের নিদারুণ ক্ষোভ মিটিতে পারিত।

এদিকে সঙ্কুচিতচিত্ত সোণামণি দুই একদিন অধ্যয়নশালার বাহিরে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছে। সখী চারুশশির সহিত তাহার সকল বিষয়েই বিশেষ হৃদ্যতা ছিল, কিন্তু তারাপদর সম্বন্ধে চারুকে সে অত্যন্ত ভয় এবং সন্দেহের সহিত দেখিত। চারু যে সময়ে অন্তঃপুরে থাকিত, সেই সময়টি বাছিয়া সোণামণি সসঙ্কোচে তারাপদর দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইত। তারাপদ বই হইতে মুখ তুলিয়া সস্নেহে বলিত, কি সোণা! খবর কি? মাসী কেমন আছে?

সোণামণি কহিত, অনেকদিন যাওনি, মা তোমাকে একবার যেতে বলেছে। মা'র কোমরে ব্যথা বলে দেখ্‌তে আস্‌তে পারে না।

এমন সময় হয়ত হঠাৎ চারু আসিয়া উপস্থিত। সোণামণি শশব্যস্ত। সে যেন গোপনে তাহার সখীর সম্পত্তি চুরি করিতে আসিয়াছিল। চারু কণ্ঠস্বর সপ্তমে চড়াইয়া চোখ মুখ ঘুরাইয়া বলিত, অ্যাঁ সোণা! তুই পড়ার সময় গোল কর্‌তে এসেছিস্‌, আমি এখনি বাবাকে গিয়ে বলে দেব!"—যেন তিনি নিজে তারাপদর একটি প্রবীণা অভিভাবিকা; তাহার পড়াশুনায় লেশমাত্র ব্যাঘাত না ঘটে রাত্রিদিন ইহার প্রতিই তাহার একমাত্র দৃষ্টি। কিন্তু সে নিজে কি অভিপ্রায়ে এই অসময়ে তারাপদর পাঠগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা অন্তর্যামীর অগোচর ছিল না এবং তারাপদও তাহা ভালরূপ জানিত। কিন্তু সোণামণি বেচারা ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ একরাশ মিথ্যা কৈফিয়ৎ সৃজন করিত; অবশেষে চারু যখন ঘৃণাভরে তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া সম্ভাষণ করিত তখন সে লজ্জিত শঙ্কিত পরাজিত হইয়া ব্যথিত চিত্তে ফিরিয়া যাইত। দয়ার্দ্র তারাপদ তাহাকে ডাকিয়া বলিত, "সোণা, আজ সন্ধ্যাবেলায় আমি তোদের বাড়ি যাব এখন!" চারু সর্পিণীর মত ফোঁস করিয়া উঠিয়া বলিত—"যাবে বৈ কি! তোমার পড়া কর্‌তে হবে না? আমি মাষ্টার মশায়কে বলে দেব না?"

চারুর এই শাসনে ভীত না হইয়া তারাপদ দুই একদিন সন্ধ্যার পর বামুন ঠাক্‌রুণের বাড়ি গিয়াছিল। তৃতীয় বা চতুর্থ বারে চারু ফাঁকা শাসন না করিয়া আস্তে আস্তে এক সময় বাহির হইতে তারাপদর ঘরের দ্বারে শিকল আঁটিয়া দিয়া মা'র মসলার বাক্সের চাবি তালা আনিয়া তালা লাগাইয়া দিল। সমস্ত সন্ধ্যাবেলা তারাপদকে এইরূপ বন্দী অবস্থায় রাখিয়া আহারের সময় দ্বার খুলিয়া দিল। তারাপদ রাগ করিয়া কথা কহিল না এবং না খাইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। তখন অনুতপ্ত ব্যাকুল বালিকা করযোড়ে সানুনয়ে বারংবার বলিতে লাগিল, তোমার দুটিপায়ে পড়ি আর আমি এমন করব না! তোমার দুটি পায়ে পড়ি তুমি খেয়ে যাও!" তাহাতেও যখন তারাপদ বশ মানিল না, তখন সে অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিল; তারাপদ সঙ্কটে পড়িয়া ফিরিয়া আসিয়া খাইতে বসিল।

চারু কতবার একান্তমনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, সে তারাপদর সহিত সদ্ব্যবহার করিবে, আর কখনও তাহাকে মুহূর্ত্তের জন্য বিরক্ত করিবে না, কিন্তু সোণামণি প্রভৃতি আর পাঁচজন মাঝে আসিয়া পড়াতে কখন তাহার কিরূপ মেজাজ হইয়া যায় কিছুতেই আত্মসম্বরণ করিতে পারে না। কিছুদিন যখন উপরি উপরি সে ভালমানুষী করিতে থাকে, তখনি একটা উৎকট আসন্ন বিপ্লবের জন্য তারাপদ সতর্কভাবে প্রস্তুত হইয়া থাকে। আক্রমণটা হঠাৎ কি উপলক্ষে কোন্ দিক্ হইতে আসে কিছুই বলা যায় না। তাহার পরে প্রচণ্ড ঝড়, ঝড়ের পরে প্রচুর অশ্রুবারি-বর্ষা তাহার পরে প্রসন্ন স্নিগ্ধ শান্তি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এমনি করিয়া প্রায় দুই বৎসর কাটিল। এত সুদীর্ঘকালের জন্য তারাপদ কখনো কাহারও নিকট ধরা দেয় নাই। বোধ করি, পড়া শুনার মধ্যে তাহার মন এক অপূর্ব্ব আকর্ষণে বদ্ধ হইয়াছিল; বোধ করি, বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল এবং স্থায়ী হইয়া বসিয়া সংসারের সুখস্বচ্ছন্দ ভোগ করিবার দিকে তাহার মন পড়িয়াছিল; বোধ করি তাহার সহপাঠিকা বালি-

কার নিয়ত দৌরাত্ম্যচঞ্চল সৌন্দর্য্য অলক্ষিতভাবে তাহার হৃদয়ের উপর বন্ধন বিস্তার করিতেছিল।

এদিকে চারুর বয়স এগারো উত্তীর্ণ হইয়া যায়। মতিবাবু সন্ধান করিয়া তাঁহার মেয়ের বিবাহের জন্য দুই তিনটি ভাল ভাল সম্বন্ধ আনাইলেন। কন্যার বিবাহবয়স উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া মতিবাবু তাহার ইংরাজি পড়া এবং বাহিরে যাওয়া নিষেধ করিয়া দিলেন। এই আকস্মিক অবরোধে চারু ঘরের মধ্যে ভারি একটা আন্দোলন উপস্থিত করিল।

তখন একদিন অন্নপূর্ণা মতিবাবুকে ডাকিয়া কহিলেন, "পাত্রের জন্যে তুমি অত খোঁজ করে বেড়াচ্চ কেন? তারাপদ ছেলেটি ত বেশ। আর তোমার মেয়েরও ওকে পছন্দ হয়েছে।"

শুনিয়া মতিবাবু অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। কহিলেন, "সেও কি কখনো হয়? তারাপদর কুল-শীল কিছুই জানা নেই! আমার একটিমাত্র মেয়ে আমি ভাল ঘরে দিতে চাই।"

একদিন রায়ডাঙ্গার বাবুদের বাড়ি হইতে মেয়ে দেখিতে আসিল। চারুকে বেশভূষা পরাইয়া বাহির করিবার চেষ্টা করা হইল। সে শোবার ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল—কিছুতেই বাহির হইল না। মতিবাবু ঘরের বাহির হইতে অনেক অনুনয় করিলেন, ভর্ৎসনা করিলেন, কিছুতেই কিছু ফল হইল না। অবশেষে বাহিরে আসিয়া রায়ডাঙ্গার দূতবর্গের নিকট মিথ্যা করিয়া বলিতে হইল, কন্যার হঠাৎ অত্যন্ত অসুখ করিয়াছে, আজ আর দেখান হইবে না। তাহারা ভাবিল মেয়ের বুঝি কোন একটা দোষ আছে, তাই এইরূপ চাতুরী অবলম্বন করা হইল।

তখন মতিবাবু ভাবিতে লাগিলেন, তারাপদ ছেলেটি দেখিতে শুনিতে সকল হিসাবেই ভাল; উহাকে আমি ঘরেই রাখিতে পারিব, তাহা হইলে আমার একমাত্র মেয়েটিকে পরের বাড়ি পাঠাইতে হইবে না। ইহাও চিন্তা করিয়া দেখিলেন, তাঁহার অশান্ত অবাধ্য মেয়েটির দুরন্তপনা তাঁহাদের স্নেহের চক্ষে যতই মার্জ্জনীয় বোধ হউক শ্বশুর-বাড়িতে কেহ সহ্য করিবে না।

তখন স্ত্রী পুরুষে অনেক আলোচনা করিয়া তারাপদর দেশে তাহার সমস্ত কৌলিক সংবাদ সন্ধান করিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। খবর আসিল যে, বংশ ভাল কিন্তু দরিদ্র। তখন মতি বাবু ছেলের মা এবং ভাইয়ের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া সম্মতি দিতে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিলেন না।

কাঁঠালিয়ায় মতিবাবু এবং অন্নপূর্ণা বিবাহের দিনক্ষণ আলোচনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু স্বাভাবিক গোপনতাপ্রিয় সাবধানী মতিবাবু কথাটা গোপনে রাখিলেন।

চারুকে ধরিয়া রাখা গেল না। সে মাঝে মাঝে বর্গির হাঙ্গামার মত তারাপদর পাঠগৃহে গিয়া পড়িত। কখনো রাগ, কখনো অনুরাগ, কখনো বিরাগের দ্বারা তাহার পাঠচর্য্যার নিভৃতশান্তি অকস্মাৎ তরঙ্গিত করিয়া তুলিত। তাহাতে আজ কাল, এই নির্লিপ্ত মুক্তস্বভাব ব্রাহ্মণ-বালকের চিত্তে মাঝে মাঝে ক্ষণকালের জন্য বিদ্যুৎস্পন্দনের ন্যায় এক অপূর্ব্ব চাঞ্চল্য সঞ্চার হইত। যে ব্যক্তির লঘুভার চিত্ত চিরকাল অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহতভাবে কালস্রোতের তরঙ্গচূড়ায় ভাসমান হইয়া সম্মুখে প্রবাহিত হইয়া যাইত, সে আজ কাল এক একবার অন্যমনস্ক হইয়া বিচিত্র দিবাস্বপ্নজালের মধ্যে জড়ীভূত হইয়া পড়ে। এক একদিন পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া সে মতিবাবুর লাইব্রেরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ছবির বইয়ের পাতা উল্টাইতে থাকিত; সেই ছবিগুলির

মিশ্রণে যে কল্পনালোক সৃজিত হইত তাহা পূর্ব্বেকার হইতে অনেক স্বতন্ত্র এবং অধিকতর রঙীন্। চারুর অদ্ভুত আচরণ লক্ষ্য করিয়া সে আর পূর্ব্বের মত স্বভাবতঃ পরিহাস করিতে পারিত না, দুষ্টামি করিলে তাহাকে মারিবার কথা মনেও উদয় হইত না। নিজের এই নিগূঢ় পরিবর্ত্তন এই আবদ্ধ আসক্তভাব তাহার নিজের কাছে এক নূতন স্বপ্নের মত মনে হইতে লাগিল।

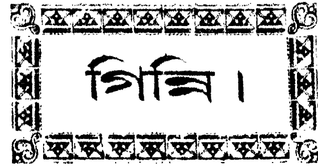
শ্রাবণ মাসে বিবাহের শুভদিন স্থির করিয়া মতিবাবু তারাপদর মা ও ভাইদের আনিতে পাঠাইলেন, তারাপদকে তাহা জানিতে দিলেন না। কলিকাতার মোক্তারকে গড়ের বাদ্য বায়না দিতে আদেশ করিলেন এবং জিনিষপত্রের ফর্দ্দ পাঠাইয়া দিলেন।

আকাশে নববর্ষার মেঘ উঠিল। গ্রামের নদী এতদিন শুষ্কপ্রায় হইয়াছিল, মাঝে মাঝে কেবল এক একটা ডোবায় জল বাধিয়া থাকিত; ছোট ছোট নৌকা সেই পঙ্কিল জলে ডোবানো ছিল, এবং শুষ্ক নদী-পথে গরুরগাড়ি চলাচলের সুগভীর চক্রচিহ্ন খোদিত হইতেছিল—এমন সময় একদিন, পিতৃগৃহ প্রত্যাগত পার্ব্বতীর মত, কোথা হইতে দ্রুতগামিনী জলধারা কলহাস্যসহকারে গ্রামের শূন্যবক্ষে আসিয়া সমাগত হইল—উলঙ্গ বালকবালিকারা তীরে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে নৃত্য করিতে লাগিল, অতৃপ্ত আনন্দে বারংবার জলে ঝাঁপ দিয়া দিয়া নদীকে যেন আলিঙ্গন করিয়া ধরিতে লাগিল, কুটীরবাসিনীরা তাহাদের পরিচিত প্রিয়সঙ্গিনীকে দেখিবার জন্য বাহির হইয়া আসিল,—শুষ্ক নির্জ্জীব গ্রামের মধ্যে কোথা হইতে এক প্রবল বিপুল প্রাণহিল্লোল আসিয়া প্রবেশ করিল। দেশ বিদেশ হইতে বোঝাই লইয়া ছোট বড় নানা আয়তনের নৌকা আসিতে লাগিল—বাজারের ঘাট সন্ধ্যাবেলায় বিদেশী মাঝির সঙ্গীতে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। দুই তীরের গ্রামগুলি সম্বৎসর আপনার নিভৃত কোণে আপনার ক্ষুদ্র ঘরকন্না লইয়া একাকিনী দিনযাপন করিতে থাকে, বর্ষার সময়ে বাহিরের বৃহৎ পৃথিবী বিচিত্র পণ্যোপহার লইয়া গৈরিক-বর্ণ জল-রথে চড়িয়া এই গ্রামকন্যকাগুলির তত্ত্ব লইতে আসে; তখন জগতের সঙ্গে আত্মীয়তাগর্ব্বে কিছুদিনের জন্য তাহাদের ক্ষুদ্রতা ঘুচিয়া যায়, সমস্তই সচল সজাগ সজীব হইয়া উঠে, এবং মৌন নিস্তব্ধ দেশের মধ্যে সুদূর রাজ্যের কলালাপধ্বনি আসিয়া চারিদিকের আকাশকে আন্দোলিত করিয়া তুলে।

এই সময় কুড়ুলকাটায় নাগবাবুদের এলাকায় বিখ্যাত রথযাত্রার মেলা হইবে। জ্যোৎস্না-সন্ধ্যায় তারাপদ ঘাটে গিয়া দেখিল কোন নৌকা নাগরদোলা, কোন নৌকা যাত্রার দল, কোন নৌকা পণ্য দ্রব্য লইয়া প্রবল নবীন স্রোতের মুখে দ্রুতবেগে মেলা অভিমুখে চলিয়াছে; কলিকাতার কন্সর্টের দল বিপুলশব্দে দ্রুততালের বাজনা জুড়িয়া দিয়াছে, যাত্রারদল বেহালার সঙ্গে গান গাহিতেছে এবং সমের কাছে হাহাহাঃ শব্দে চীৎকার উঠিতেছে, পশ্চিমদেশী নৌকার দাঁড়িমাল্লাগুলো কেবলমাত্র মাদল এবং করতাল লইয়া উন্মত্ত উৎসাহে বিনা সঙ্গীতে খচমচ শব্দে আকাশ বিদীর্ণ করিতেছে—উদ্দীপনার সীমা নাই। দেখিতে দেখিতে পূর্ব্ব দিগন্ত হইতে ঘন মেঘরাশি প্রকাণ্ড কালো পাল তুলিয়া দিয়া আকাশের মাঝখানে উঠিয়া পড়িল চাঁদ আচ্ছন্ন হইল—পূবে- বাতাস বেগে বহিতে লাগিল, মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিয়া চলিল, নদীর জল খল খল হাস্যে স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল—নদীতীর-বর্ত্তী আন্দোলিত বনশ্রেণীর মধ্যে অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল, ভেক ডাকিতে আরম্ভ করিল, ঝিল্লিধ্বনি যেন করাত দিয়া অন্ধকারকে

চরিতে লাগিল ;—সম্মুখে আজ যেন সমস্ত জগতের রথযাত্রা, চাকা ঘুরিতেছে, ধ্বজা উড়িতেছে, পৃথিবী কাঁপিতেছে ;—মেঘ উড়িয়াছে, বাতাস ছুটিয়াছে, নদী বহিয়াছে, নৌকা চলিয়াছে, গান উঠিয়াছে ; দেখিতে দেখিতে গুরু গুরু শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল, বিদ্যুৎ আকাশকে কাটিয়া কাটিয়া ঝলসিয়া উঠিল, সুদূর অন্ধকার হইতে একটা মুষলধারাবর্ষী বৃষ্টির গন্ধ আসিতে লাগিল। কেবল নদীর একতীরে এক পার্শ্বে কাঁঠালিয়াগ্রাম আপন কুটীর দ্বার বন্ধ করিয়া দীপ নিবাইয়া দিয়া নিঃশব্দে ঘুমাইতে লাগিল।

পরদিন তারাপদর মাতা ও ভ্রাতৃগণ কাঁঠালিয়ায় আসিয়া অবতরণ করিলেন, পরদিন কলিকাতা হইতে বিবিধ সামগ্রীপূর্ণ তিনখানা বড় নৌকা আসিয়া কাঁঠালিয়ার জমিদারিকাছারির ঘাটে লাগিল এবং পরদিন অতি প্রাতে সোণামণি কাগজে কিঞ্চিৎ আমসত্ত এবং পাতার ঠোঙায় কিঞ্চিৎ আচার লইয়া ভয়ে ভয়ে তারাপদের পাঠগৃহদ্বারে আসিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইল—কিন্তু পরদিন তারাপদকে দেখা গেল না। স্নেহ প্রেম বন্ধুত্বের ষড়যন্ত্র-বন্ধন তাহাকে চারিদিক্ হইতে সম্পূর্ণরূপে ঘিরিবার পূর্ব্বেই সমস্ত গ্রামের হৃদয়খানি চুরি করিয়া একদা বর্ষার মেঘান্ধকার রাত্রে এই ব্রাহ্মণবালক আসক্তিবিহীন উদাসীন জননী বিশ্ব পৃথিবীর নিকট চলিয়া গিয়াছে।



গিন্নি।

ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের দুইতিন শ্রেণী নীচে আমাদের পণ্ডিত ছিলেন শিবনাথ। তাঁহার গোঁপ দাড়ি কামানো, চুল ছাঁটা এবং টিকিটি হ্রস্ব। তাঁহাকে দেখিলেই বালকদের অন্তরাত্মা শুষ্ক হইয়া যাইত।

প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায় যাহাদের হুল আছে তাহাদের দাঁত নাই—আমাদের পণ্ডিত মহাশয়ের দুই একত্র ছিল। এদিকে কিলচড়চাপড় চারাগাছের বাগানের উপর শিলবৃষ্টির মত অজস্র বর্ষিত হইত, ওদিকে তীব্র বাক্যজ্বালায় প্রাণ বাহির করিয়া যাইত।

ইনি আক্ষেপ করিতেন, পুরাকালের মত গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ এখন আর নাই ; ছাত্রেরা গুরুকে আর দেবতার মত ভক্তি করে না ; এই বলিয়া আপনার উপেক্ষিত দেবমহিমা বালকদের মস্তকে সবেগে নিক্ষেপ করিতেন ; এবং মাঝে মাঝে হুঙ্কার দিয়া উঠিতেন, কিন্তু তাহার মধ্যে এত ইতর কথা মিশ্রিত থাকিত যে তাহাকে দেবতার বজ্রনাদের রূপান্তর বলিয়া কাহারো ভ্রম হইতে পারে না। বাপান্ত যদি বজ্রনাদ সাজিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করে, তাহার ক্ষুদ্র বাঙ্গালী মূর্ত্তি কি ধরা পড়ে না ?

যাহা হোক্ আমাদের স্কুলের এই তৃতীয় শ্রেণী দ্বিতীয় বিভাগের দেবতাটিকে ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ অথবা কার্ত্তিক বলিয়া কাহারো ভ্রম হইত না ; কেবল একটি দেবতার সহিত তাঁহার সাদৃশ্য উপলব্ধি করা যাইত তাঁহার নাম যম ; এবং এতদিন পরে স্বীকার করিতে দোষ নাই এবং ভয়ও নাই আমরা মনে মনে কামনা করি-

তাম উক্ত দেবালয়ে গমন করিতে তিনি যেন অধিক বিলম্ব না করেন।

কিন্তু এটা বেশ বুঝা গিয়াছিল নরদেবতার মত বালাই আর নাই। সুরলোকবাসী দেবতাদের উপদ্রব নাই। গাছ হইতে একটা ফুল পাড়িয়া দিলে খুসী হন, না দিলে তাগাদা করিতে আসেন না। আমাদের নরদেবগণ চা'ন অনেক বেশী, এবং আমাদের তিলমাত্র ত্রুটি হইলে চক্ষু দুটো রক্তবর্ণ করিয়া তাড়া করিয়া আসেন, তখন তাঁহাদিগকে কিছুতেই দেবতার মত দেখিতে হয় না!

বালকদিগকে পীড়ন করিবার জন্য আমাদের শিবনাথ পণ্ডিতের একটি অস্ত্র ছিল সেটি শুনিতে যৎসামান্য কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত নিদারুণ। তিনি ছেলেদের নূতন নামকরণ করিতেন। নাম জিনিষটা, যদিচ শব্দ বই আর কিছুই নয় কিন্তু সাধারণতঃ লোকে আপনার চেয়ে আপনার নামটা বেশী ভাল বাসে; নিজের নাম রাষ্ট্র করিবার জন্য লোকে কি কষ্টই না স্বীকার করে, এমন কি নামটিকে বাঁচাইবার জন্য লোকে আপনি মরিতে কুণ্ঠিত হয় না।

এমন নামপ্রিয় মানবের নাম বিকৃত করিয়া দিলে তাহার প্রাণের চেয়ে প্রিয়তর স্থানে আঘাত করা হয়। এমন কি যাহার নাম ভূতনাথ তাহাকে নলিনীকান্ত বলিলে তাহার অসহ্য বোধ হয়।

ইহা হইতে এই তত্ত্ব পাওয়া যায় মানুষ বস্তুর চেয়ে অবস্তুকে বেশী মূল্যবান্ জ্ঞান করে; সোণার চেয়ে বাণী প্রাণের চেয়ে মান এবং আপনার চেয়ে আপনার নামটাকে বড় মনে করে।

মানবস্বভাবের অন্তর্নিহিত এই সকল নিগূঢ় নিয়মবশতঃ পণ্ডিত মহাশয় যখন শশিশেখরকে ভেট্‌কি নাম দিলেন তখন সে নিরতিশয় কাতর হইয়া পড়িল। বিশেষতঃ উক্ত নামকরণে তাহার চেহারার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করা হইতেছে জানিয়া তাহার মর্ম্মযন্ত্রণা আরো দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল, অথচ একান্ত শান্তভাবে সমস্ত সহ্য করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইল।

আশুর নাম ছিল গিন্নি, কিন্তু তাহার সঙ্গে একটু ইতিহাস জড়িত আছে। ✓

আশু ক্লাসের মধ্যে নিতান্ত বেচারা ভাল মানুষ ছিল। কাহাকেও কিছু বলিত না, বড় লাজুক; বোধ হয় বয়সে সকলের চেয়ে ছোট; সকল কথাতেই কেবল মৃদু মৃদু হাসিত; বেশ পড়া করিত; স্কুলের অনেক ছেলেই তাহার সঙ্গে ভাব করিবার জন্য উন্মুখ ছিল কিন্তু সে কোন ছেলের সঙ্গেই খেলা করিত না এবং ছুটি হইবামাত্রই মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া বাড়ি চলিয়া যাইত।

পত্রপুটে গুটিকতক মিষ্টান্ন এবং ছোট কাঁসার ঘটিতে জল লইয়া একটার সময় বাড়ি হইতে দাসী আসিত। আশু সে জন্য বড় অপ্রতিভ; দাসীটা কোন মতে বাড়ি ফিরিলে সে যেন বাঁচে। সে যে স্কুলের ছাত্রের অতিরিক্ত আর কিছু, এটা সে স্কুলের ছেলেদের কাছে প্রকাশ করিতে যেন বড় অনিচ্ছুক। সে যে বাড়ির কেহ, সে যে বাপ মায়ের ছেলে, ভাইবোনের ভাই, এটা যেন ভারি একটা গোপন কথা, এটা সঙ্গীদের কাছে কোনমতে প্রকাশ না হয় এই তাহার একান্ত চেষ্টা।

পড়াশুনা সম্বন্ধে তাহার আর কোন ত্রুটি ছিল না কেবল এক এক দিন ক্লাসে আসিতে বিলম্ব হইত এবং শিবনাথ পণ্ডিত তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে কোন সদুত্তর দিতে পারিত না। সে জন্য মাঝে মাঝে তাহার লাঞ্ছনার সীমা থাকিত না। পণ্ডিত তাহাকে হাঁটুর উপর হাত দিয়া পীঠ নীচু করিয়া দালা-

নের সিঁড়ির কাছে দাঁড় করাইয়া রাখিতেন; চারিটা ক্লাসের ছেলে সেই লজ্জাকাতর হতভাগ্য বালককে এইরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইত।

একদিন গ্রহণের ছুটি ছিল। তাহার পরদিন স্কুলে আসিয়া চৌকিতে বসিয়া পণ্ডিত মহাশয় দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিলেন একখানি শ্লেট্ ও মসীচিহ্নিত কাপড়ের থলীর মধ্যে পড়িবার বইগুলি জড়াইয়া লইয়া অন্যদিনের চেয়ে সঙ্কুচিতভাবে আশু ক্লাসে প্রবেশ করিতেছে।

শিবনাথ পণ্ডিত শুষ্ক-হাস্য হাসিয়া কহিলেন, "এই যে গিন্নি আসছে।"

তাহার পর পড়া শেষ হইলে ছুটির পূর্ব্বে তিনি সকল ছাত্রদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন "শোন্ তোরা সব শোন্!"

পৃথিবীর সমস্ত মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সবলে বালককে নীচের দিকে টানিতে লাগিল; কিন্তু ক্ষুদ্র আশু সেই বেঞ্চির উপর হইতে একখানি কোঁচা ও দুইখানি পা ঝুলাইয়া ক্লাসের সমস্ত বালকের লক্ষ্যস্থল হইয়া বসিয়া রহিল। এতদিনে আশুর অনেক বয়স হইয়া থাকিবে এবং তাহার জীবনে অনেক গুরুতর সুখদুঃখলজ্জার দিন আসিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেইদিনকার বালক-হৃদয়ের ইতিহাসের সহিত কোন দিনের তুলনা হইতে পারে না।

কিন্তু ব্যাপারটা অতি ক্ষুদ্র এবং দুই কথায় শেষ হইয়া যায়।

আশুর একটি ছোট বোন আছে; তাহার সমবয়স্ক সঙ্গিনী কিংবা ভগিনী আর কেহ নাই সুতরাং আশুর সঙ্গেই তাহার যত খেলা।

একটি গেটওয়ালা লোহার রেলিঙের মধ্যে আশুদের বাড়ির গাড়ি-বারান্দা। সেদিন মেঘ করিয়া খুব বৃষ্টি হইতেছিল। জুতা হাতে করিয়া ছাতা মাথায় দিয়া যে দুই চারি জন পথিক পথ দিয়া চলিতেছিল তাহাদের কোন দিকে চাহিবার অবসর ছিল না। সেই মেঘের অন্ধকারে সেই বৃষ্টিপতনের শব্দে সেই সমস্তদিন ছুটিতে গাড়িবারান্দার সিঁড়িতে বসিয়া আশু তাহার বোনের সঙ্গে খেলা করিতেছিল।

সেদিন তাহাদের পুতুলের বিয়ে। তাহারি আয়োজন সম্বন্ধে অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে ব্যস্ত হইয়া আশু তাহার ভগিনীকে উপদেশ দিতেছিল।

এখন তর্ক উঠিল কাহাকে পুরোহিত করা যায়। বালিকার কি মনে হইল, চট্ করিয়া ছুটিয়া একজনকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল "হাঁগা, তুমি আমাদের পুরুত ঠাকুর হবে?"

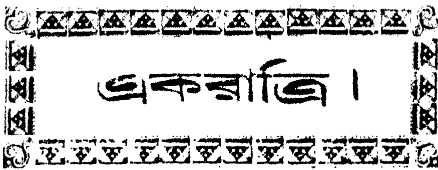
আশু পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখে, শিবনাথ পণ্ডিত ভিজে ছাতা মুড়িয়া অর্দ্ধসিক্ত অবস্থায় তাহাদের গাড়িবারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন; পথ দিয়া যাইতেছিলেন; বৃষ্টির উপদ্রব হইতে সেখানে আশ্রয় লইয়াছেন। বালিকা তাঁহাকে পুতুলের পৌরোহিত্যে নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিতেছে!

পণ্ডিত মশায়কে দেখিয়াই আশু তাহার খেলা এবং ভগিনী সমস্ত ফেলিয়া এক দৌড়ে গৃহের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। তাহার ছুটির দিন সম্পূর্ণ মাটী হইয়া গেল।

পরদিন শিবনাথ পণ্ডিত যখন শুষ্ক উপহাসের সহিত এই ঘটনাটি ভূমিকা স্বরূপে উল্লেখ করিয়া সাধারণ-সমক্ষে আশুর "গিন্নি" নামকরণ করিলেন, তখন প্রথমে সে যেমন সকল কথাতেই মৃদুভাবে হাসিয়া থাকে, তেমন করিয়া হাসিয়া চারিদিকের কৌতুক-হাস্যে ঈষৎ যোগ দিতে চেষ্টা করিল; এমন সময় একটার ঘণ্টা বাজিল, অন্য সকল ক্লাস ভাঙ্গিয়া গেল; এবং শালপাতায় দুটি মিষ্টান্ন ও ঝক্‌ঝকে কাঁসার ঘটিতে জল লইয়া দাসী আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইল।

তখন হাসিতে হাসিতে সহসা তাহার মুখকাণ টকটকে লাল হইয়া উঠিল, ব্যথিত কপালের শিরা ফুলিয়া উঠিল, এবং উচ্ছ্বসিত অশ্রুজল আর কিছুতেই বাধা মানিল না।

শিবনাথ পণ্ডিত বিশ্রামগৃহে জলযোগ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে তামাক খাইতে লাগিলেন—ছেলেরা পরমাহ্লাদে আশুকে ঘিরিয়া গিন্নি গিন্নি করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সেই ছুটির দিনের ছোট বোনের সহিত খেলা জীবনের একটি সর্ব্বপ্রধান লজ্জাজনক ভ্রম বলিয়া আশুর কাছে বোধ হইতে লাগিল, পৃথিবীর লোক কোনকালেও যে সে দিনের কথা ভুলিয়া যাইবে এ তাহার মনে বিশ্বাস হইল না।



একরাত্রি।

সুরবালার সঙ্গে একত্র পাঠশালায় গিয়াছি, এবং বউবউ খেলিয়াছি। তাহাদের বাড়িতে গেলে সুরবালার মা আমাকে বড় যত্ন করিতেন, এবং আমাদের দুজনকে একত্র করিয়া আপনাআপনি বলাবলি করিতেন "আহা, দুটিতে বেশ মানায়!"

ছোট ছিলাম কিন্তু কথাটার অর্থ একরকম বুঝিতে পারিতাম। সুরবালার প্রতি যে সর্ব্বসাধারণের অপেক্ষা আমার কিছু বিশেষ দাবী ছিল সে ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। সেই অধিকারমদে মত্ত হইয়া তাহার প্রতি যে আমি শাসন এবং উপদ্রব না করিতাম তাহা নহে। সেও সহিষ্ণুভাবে আমার সকল রকম ফরমাস খাটিত এবং শাস্তি বহন করিত। পাড়ায় তাহার রূপের প্রশংসা ছিল—কিন্তু বর্ব্বর বালকের চক্ষে সে সৌন্দর্য্যের কোন গৌরব ছিল না—আমি কেবল জানিতাম, সুরবালা আমারই প্রভুত্ব স্বীকার করিবার জন্য পিতৃগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এই জন্য সে আমার বিশেষরূপে অবহেলার পাত্র।

আমার পিতা চৌধুরী জমিদারের নায়েব ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল আমার হাতটা পাকিলেই আমাকে জমিদারী সেরেস্তার কাজ শিখাইয়া একটা কোথাও গোমস্তাগিরিতে প্রবৃত্ত করাইয়া দিবেন। কিন্তু আমি মনে মনে তাহাতে নারাজ ছিলাম। আমাদের পাড়ার নীলরতন যেমন কলিকাতায় পালাইয়া লেখাপড়া শিখিয়া কালেক্টার সাহেবের নাজির হইয়াছে, আমারও জীবনের লক্ষ্য সেইরূপ অত্যুচ্চ ছিল—কালেক্টারের নাজির না হইতে পারি ত জজ আদালতের হেড্‌ক্লার্ক হইব ইহা আমি মনে মনে নিশ্চয় স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম।

সর্ব্বদাই দেখিতাম আমার বাপ উক্ত আদালতজীবীদিগকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন—নানা উপলক্ষে মাছটা তরকারীটা টাকাটা সিকেটা লইয়া যে তাঁহাদের পূজার্চ্চনা করিতে হইত তাহাও শিশুকাল হইতে আমার জানা ছিল, এই জন্য আদালতের ছোট কর্ম্মচারী, এমন কি, পেয়াদাগুলাকে পর্য্যন্ত হৃদয়ের মধ্যে খুব একটা সম্ভ্রমের আসন দিয়াছিলাম। ইহারা আমাদের বাঙ্গালা দেশের পূজ্য দেবতা। তেত্রিশ কোটির ছোট ছোট নূতন সংস্করণ। বৈষয়িক সিদ্ধিলাভ সম্বন্ধে স্বয়ং সিদ্ধিদাতা গণেশ অপেক্ষা ইহাদের প্রতি লোকের আন্তরিক নির্ভর ঢের বেশী, সুতরাং পূর্ব্বে গণেশের যাহা কিছু পাওনা ছিল আজকাল ইহারাই তাহা সমস্ত পাইয়া থাকেন।

আমিও নীলরতনের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া এক সময় বিশেষ সুবিধাযোগে কলিকাতায়

পালাইয়া গেলাম। প্রথমে গ্রামের একটি আলাপী লোকের বাসায় ছিলাম, তাহার পরে বাপের কাছ হইতেও কিছু কিছু অধ্যয়নের সাহায্য পাইতে লাগিলাম। লেখাপড়া যথা-নিয়মে চলিতে লাগিল।

ইহার উপরে আবার সভা সমিতিতেও যোগ দিতাম। দেশের জন্য হঠাৎ প্রাণ বিসর্জ্জন করা যে, আশু আবশ্যক এ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু কি করিয়া উক্ত দুঃসাধ্য কাজ করা যাইতে পারে আমি জানিতাম না, এবং কেহ দৃষ্টান্তও দেখাইত না।

কিন্তু তাহা বলিয়া উৎসাহের কোন ত্রুটি ছিল না। আমরা পাড়াগেঁয়ে ছেলে, ইঁচড়ে-পাকা কলিকাতার মত সকল জিনিষকেই পরিহাস করিতে শিখি নাই সুতরাং আমাদের নিষ্ঠা অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। আমাদের সভার কর্তৃপক্ষীয়েরা বক্তৃতা দিতেন, আর আমরা চাঁদার খাতা লইয়া না খাইয়া দুপুর রৌদ্রে টোঁটোঁ করিয়া বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা ফিরিয়া বেড়াইতাম, রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া বিজ্ঞাপন বিলি করিতাম, সভাস্থলে গিয়া বেঞ্চি চৌকি সাজাইতাম, দলপতির নামে কেহ একটা কথা বলিলে কোমর বাঁধিয়া মারামারি করিতে উদ্যত হইতাম। সহরের ছেলেরা এই সকল লক্ষণ দেখিয়া আমাদিগকে বাঙ্গাল বলিত।

নাজির সেরেস্তাদার হইতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু মাট সীনি গারিবাল্ডি হইবার আয়োজন করিতে লাগিলাম।

এমন সময়ে আমার পিতা এবং সুরবালার পিতা একমত্ত হইয়া সুরবালার সহিত আমার বিবাহের জন্য উদ্যোগী হইলেন। আমি পনরো বৎসর বয়সের সময় কলিকাতায় পালাইয়া আসি তখন সুরবালার বয়স আট; এখন আমি আঠারো। পিতার মতে আমার বিবাহের বয়স ক্রমে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে। কিন্তু এদিকে আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আজীবন বিবাহ না করিয়া স্বদেশের জন্য মরিব—বাপকে বলিলাম বিদ্যাভ্যাস সম্পূর্ণ সমাধা না করিয়া বিবাহ করিব না।

দুই চারি মাসের মধ্যে খবর পাইলাম উকীল রামলোচন বাবুর সহিত সুরবালার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পতিত ভারতের চাঁদা আদায় কার্য্যে ব্যস্ত ছিলাম, এ সংবাদ অত্যন্ত তুচ্ছ বোধ হইল।

এণ্ট্রেন্স পাস করিয়াছি, ফার্ষ্ট আর্টস্ দিব, এমন সময় পিতার মৃত্যু হইল। সংসারে কেবল আমি একা নই, মাতা এবং দুটি ভগিনী আছেন। সুতরাং কালেজ ছাড়িয়া কাজের সন্ধানে ফিরিতে হইল। বহু চেষ্টায় নওয়াখালি বিভাগের একটি ছোট সহরে এণ্ট্রেন্স স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টারি পদ প্রাপ্ত হইলাম।

মনে করিলাম, আমার উপযুক্ত কাজ পাইয়াছি। উপদেশ এবং উৎসাহ দিয়া এক একটি ছাত্রকে ভাবী ভারতের এক একটি সেনাপতি করিয়া তুলিব।

কাজ আরম্ভ করিয়া দিলাম। দেখিলাম ভাবী ভারতবর্ষ অপেক্ষা আসন্ন এগজামিনের তাড়া ঢের বেশী। ছাত্রদিগকে গ্রামার অ্যাল্‌জেব্রার বহির্ভূত কোন কথা বলিলে হেড মাষ্টার রাগ করে। মাসদুয়েকের মধ্যে আমারও উৎসাহ নিস্তেজ হইয়া আসিল।

আমাদের মত প্রতিভাহীন লোক ঘরে বসিয়া নানারূপ কল্পনা করে, অবশেষে কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া ঘাড়ে লাঙ্গল বহিয়া পশ্চাৎ হইতে ল্যাজমলা খাইয়া নতশিরে সহিষ্ণুভাবে প্রাত্যহিক মাটিভাঙ্গার কাজ করিয়া সন্ধ্যাবেলায় এক-একপেট জাব না খাইতে পাইলেই সন্তুষ্ট থাকে, লম্ফে ঝম্ফে আর উৎসাহ থাকে না।

অগ্নিদাহের আশঙ্কায় একজন করিয়া মাষ্টার স্কুলের ঘরেতেই বাস করিত। আমি

একা মানুষ, আমার উপরেই সেই ভার পড়িয়াছিল। স্কুলের বড় আটচালার সংলগ্ন একটি চালায় আমি বাস করিতাম।

স্কুল ঘরটি লোকালয় হইতে কিছু দূরে। একটি বড় পুষ্করিণীর ধারে। চারিদিকে সুপারি নারিকেল এবং মাদারের গাছ, এবং স্কুল গৃহের প্রায় গায়েই দুটা প্রকাণ্ড বৃদ্ধ নিমগাছ গায়ে গায়ে সংলগ্ন হইয়া ছায়া দান করিতেছে।

একটা কথা এতদিন উল্লেখ করি নাই, এবং এতদিন উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হয় নাই। এখানকার সরকারী উকীল রামলোচন রায়ের বাসা আমাদের স্কুল ঘরের অনতিদূরে। এবং তাঁহার সঙ্গে যে তাঁহার স্ত্রী—আমার বাল্যসখী সুরবালা—ছিল তাহা আমার জানা ছিল।

রামলোচন বাবুর সঙ্গে আমার আলাপ হইল। সুরবালার সহিত বাল্যকালে আমার জানাশোনা ছিল, তাহা রামলোচন বাবু জানিতেন কি না জানি না, আমিও নূতন পরিচয়ে সে সম্বন্ধে কোন কথা বলা সঙ্গত বোধ করিলাম না। এবং সুরবালা, যে, কোন কালে আমার জীবনের সঙ্গে কোনরূপে জড়িত ছিল সে কথা আমার ভাল করিয়া মনে উদয় হইত না।

একদিন ছুটির দিনে রামলোচন বাবুর বাসায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছি। মনে নাই কি বিষয়ে আলোচনা হইতেছিল, বোধ করি বর্ত্তমান ভারতবর্ষের দুরবস্থা সম্বন্ধে। তিনি যে সে জন্য বিশেষ চিন্তিত এবং ম্রিয়মাণ ছিলেন তাহা নহে, কিন্তু বিষয়টা এমন যে, তামাক টানিতে টানিতে এ সম্বন্ধে ঘণ্টাখানেক-দেড়েক অনর্গল সখের দুঃখ করা যাইতে পারে।

এমন সময় পাশের ঘরে অত্যন্ত মৃদু একটু চুড়ির টুংটাং, কাপড়ের একটুখানি খস্‌খস্‌, এবং পায়েরও একটুখানি শব্দ শুনিতে পাইলাম; বেশ বুঝিতে পারিলাম জানালার ফাঁক দিয়া কোন কৌতূহলপূর্ণনেত্র আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে।

তৎক্ষণাৎ দু'খানি চোখ আমার মনে পড়িয়া গেল—বিশ্বাস, সরলতা এবং শৈশব প্রীতিতে ঢলঢল দু'খানি বড়বড় চোখ, কালো কালো তারা, ঘনকৃষ্ণ পল্লব, স্থিরস্নিগ্ধ দৃষ্টি। সহসা হৃৎপিণ্ডকে কে যেন একটা কঠিন মুষ্টির দ্বারা চাপিয়া ধরিল এবং বেদনায় ভিতরটা টনটন করিয়া উঠিল।

বাসায় ফিরিয়া আসিলাম কিন্তু সেই ব্যথা লাগিয়া রহিল। লিখি পড়ি যাহা করি কিছুতে মনের ভার দূর হয় না; মনটা সহসা একটা বৃহৎ বোঝার মত হইয়া বুকের শিরা ধরিয়া দুলিতে লাগিল।

সন্ধ্যাবেলায় একটু স্থির হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, এমনটা হইল কেন? মনের মধ্য হইতে উত্তর আসিল, তোমার সে সুরবালা কোথায় গেল।

আমি প্রত্যুত্তরে বলিলাম—আমি ত তাহাকে ইচ্ছা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি। সে কি চিরকাল আমার জন্যে বসিয়া থাকিবে।

মনের ভিতরে কে বলিল—তখন যাহাকে ইচ্ছা করিলেই পাইতে পারিতে এখন মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও তাহাকে একবার চক্ষে দেখিবার অধিকারটুকুও পাইবে না। সেই শৈশবের সুরবালা তোমার যত কাছেই থাকুক, তাহার চুড়ির শব্দ শুনিতে পাও, তাহার মাথাঘষার গন্ধ অনুভব কর, কিন্তু মাঝখানে বরাবর একখানি করিয়া দেয়াল থাকিবে।

আমি বলিলাম তা থাক্ না, সুরবালা আমার কে!

উত্তর শুনিলাম, সুরবালা আজ তোমার কেহই নয়, কিন্তু সুরবালা তোমার কি না হইতে পারিত!

সে কথা সত্য। সুরবালা আমার কি না 'তে পারিত? আমার সব চেয়ে অন্তরঙ্গ, মার সব চেয়ে নিকটবর্ত্তী, আমার জীবনের ন্ত সুখদুঃখভাগিনী হইতে পারিত, সে আজ তদুর, এত পর, আজ তাহাকে দেখা নিষেধ, হার সঙ্গে কথা কওয়া দোষ, তাহার বিষয়ে ন্তা করা পাপ! আর, একটা রামলোচন থাও কিছু নাই হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত; বল গোটাদুয়েক মুখস্থ মন্ত্র পড়িয়া সুরবালাকে থবীর আর সকলের নিকট হইতে এক হূর্ত্তে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল।

আমি মানবসমাজে নূতন নীতি প্রচার রিতে বসি নাই, সমাজ ভাঙ্গিতে আসি নাই, ন্ধন ছিঁড়িতে চাই না। আমি আমার মনের কৃত ভাবটা ব্যক্ত করিতেছি মাত্র। আপন নে যে সকল ভাব উদয় হয় তাহার কি সবই বেচনাসঙ্গত! রামলোচনের গৃহভিত্তির াড়ালে যে সুরবালা বিরাজ করিতেছিল সে রামলোচনের অপেক্ষাও বেশী করিয়া ামার, এ কথা আমি কিছুতেই মন হইতে াড়াইতে পারিতেছিলাম না। এরূপ চিন্তা তান্ত অসঙ্গত এবং অন্যায় তাহা স্বীকার করি কন্তু অস্বাভাবিক নহে।

এখন হইতে আর কোন কাজে মনঃসংযোগ রিতে পারি না। দুপুর বেলায় ক্লাসে যখন াত্রেরা গুন্‌গুন্ করিতে থাকিত, বাহিরে সমস্ত া ঝাঁ করিত, ঈষৎ উত্তপ্ত বাতাসে নিমগাছের পুষ্পমঞ্জরীর সুগন্ধ বহন করিয়া আনিত, তখন চ্ছা করিত—কি ইচ্ছা করিত জানি না এই র্য্যন্ত বলিতে পারি ভারতবর্ষের এই সমস্ত াবী আশাস্পদদিগের ব্যাকরণের ভ্রম সংশোধন করিয়া জীবনযাপন করিতে ইচ্ছা করিত না।

স্কুলের ছুটি হইয়াগেলে আমার বৃহৎ ঘরে একলা থাকিতে মন টিকিত না, অথচ কোন ভদ্রলোক দেখা করিতে আসিলেও অসহ্য বোধ হইত। সন্ধ্যাবেলায় পুষ্করিণীর ধারে সুপারি নারিকেলের অর্থহীন মর্ম্মরধ্বনি শুনিতে শুনিতে ভাবিতাম, মনুষ্যসমাজ একটা জটিল ভ্রমের জাল। ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করিতে কাহারো মনে পড়ে না, তাহার পর বেঠিক সময়ে বেঠিক বাসনা লইয়া অস্থির হইয়া মরে।

তোমার মত লোক সুরবালার স্বামীটি হইয়া বুড়াবয়স পর্য্যন্ত বেশ সুখে থাকিতে পারিত, তুমি কি না হইতে গেলে গারিবাল্‌ডি, এবং হইলে শেষে একটি পাড়াগেঁয়ে ইস্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার! আর রামলোচন রায় উকীল তাহার বিশেষ করিয়া সুরবালারই স্বামী হইবার কোন জরুরি আবশ্যক ছিল না; বিবাহের পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহার পক্ষে সুরবালাও যেমন ভবশঙ্করীও তেমন, সেই কি না কিছুমাত্র না ভাবিয়া চিন্তিয়া বিবাহ করিয়া সরকারী উকীল হইয়া দিব্য পাঁচটাকা রোজগার করিতেছে—যে দিন দুধে ধোঁয়ার গন্ধ হয় সে দিন সুরবালাকে তিরস্কার করে, যে দিন মন প্রসন্ন থাকে সে দিন সুরবালার জন্য গহনা গড়াইতে দেয়। বেশ মোটাসোটা, চাপকান-পরা, কোন অসন্তোষ নাই, পুষ্করিণীর ধারে বসিয়া আকাশের তারার দিকে চাহিয়া কোন দিন হাহুতাশ করিয়া সন্ধ্যাযাপন করে না।

রামলোচন একটা বড় মোকদ্দমায় কিছু কালের জন্য অন্যত্র গিয়াছে। আমার স্কুলঘরে আমি যেমন একলা ছিলাম সে দিন সুরবালার ঘরেও সুরবালা বোধ করি সেইরূপ একা ছিল।

মনে আছে সে দিন সোমবার। সকাল হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আছে। বেলা দশটা হইতে টিপ্‌টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল। আকাশের ভাবগতিক দেখিয়া হেডমাষ্টার সকাল সকাল স্কুলের ছুটি দিলেন। খণ্ড

খণ্ড কালো মেঘ যেন একটা কি মহা আয়োজনে সমস্ত দিন আকাশময় আনাগোনা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার পরদিন বিকালের দিকে মুষলধারে বৃষ্টি এবং সঙ্গে সঙ্গে ঝড় আরম্ভ হইল। যত রাত্রি হইতে লাগিল বৃষ্টি এবং ঝড়ের বেগ ততই বাড়িতে চলিল। প্রথমে পূর্ব্ব-দিক্ হইতে বাতাস বহিতেছিল ক্রমে উত্তর উত্তরপূর্ব্ব দিয়া বহিতে লাগিল।

এ রাত্রে ঘুমাইবার চেষ্টা করা বৃথা। মনে পড়িল এই দুর্যোগে সুরবালা ঘরে একলা আছে। আমাদের স্কুলঘর তাহাদের ঘরের অপেক্ষা অনেক মজবুত। কতবার মনে করিলাম, তাহাকে স্কুলঘরে ডাকিয়া আনিয়া আমি পুষ্করিণীর পাড়ের উপর রাত্রিযাপন করিব। কিন্তু কিছুতেই মনস্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

রাত্রি যখন একটা দেড়টা হইবে হঠাৎ বানের ডাক শোনা গেল—সমুদ্র ছুটিয়া আসিতেছে। ঘর ছাড়িয়া বাহির হইলাম। সুরবালার বাড়ির দিকে চলিলাম। পথে আমাদের পুষ্করিণীর পাড়—সে পর্য্যন্ত যাইতে আমার হাঁটু জল হইল। পাড়ের উপর যখন উঠিয়া দাঁড়াইলাম তখন দ্বিতীয় আর একটা তরঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাদের পুকুরের পাড়ের একটা অংশ প্রায় এগারো হাত উচ্চ হইবে। পাড়ের উপরে আমিও যখন উঠিলাম, বিপরীত দিক হইতে আর একটি লোকও উঠিল। লোকটি কে তাহা আমার সমস্ত অন্তরাত্মা, আমার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিল। এবং সেও যে আমাকে জানিতে পারিল তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।

আর সমস্ত জলময় হইয়া গেছে কেবল হাত পাঁচ ছয় দ্বীপের উপর আমরা দুটি প্রাণী আসিয়া দাঁড়াইলাম।

তখন প্রলয় কাল, তখন আকাশে তারার আলো ছিল না, এবং পৃথিবীর সমস্ত প্রদীপ নিভিয়া গেছে—তখন একটা কথা বলিলেও ক্ষতি ছিল না—কিন্তু একটা কথাও বলা গেল না। কেহ কাহাকেও একটা কুশল প্রশ্নও করিল না।

কেবল দুজনে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিলাম। পদতলে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ উন্মত্ত মৃত্যু-স্রোত গর্জ্জন করিয়া ছুটিয়া চলিল।

আজ সমস্ত বিশ্বসংসার ছাড়িয়া সুরবালা আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ আমি ছাড়া সুরবালার আর কেহ নাই। কবেকার সেই শৈশবে সুরবালা কোন্ এক জন্মান্তর, কোন এক পুরাতন রহস্যান্ধকার হইতে ভাসিয়া এই সূর্য্যচন্দ্রালোকিত লোকপরিপূর্ণ পৃথিবীর উপরে আমারই পার্শ্বে আসিয়া সংলগ্ন হইয়াছিল; আর আজ কতদিন পরে সেই আলোকময় লোকময় পৃথিবী ছাড়িয়া এই ভয়ঙ্কর জনশূন্য প্রলয়ান্ধকারের মধ্যে সুরবালা একাকিনী আমারই পার্শ্বে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। জন্মস্রোতে সেই নবকলিকাকে আমার কাছে আনিয়া ফেলিয়াছিল, মৃত্যুস্রোতে সেই বিকশিত পুষ্পটিকে আমারই কাছে আনিয়া ফেলিয়াছে—এখন কেবল আর একটা ঢেউ আসিলেই পৃথিবীর এই প্রান্তটুকু হইতে বিচ্ছেদের এই বৃন্তটুকু হইতে খসিয়া আমরা দুজনে এক হইয়া যাই।

সে ঢেউ না আসুক! স্বামীপুত্রগৃহধনজন লইয়া সুরবালা চিরদিন সুখে থাকুক! আমি এই এক রাত্রে মহাপ্রলয়ের তীরে দাঁড়াইয়া অনন্ত আনন্দের আস্বাদ পাইয়াছি।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল—ঝড় থামিয়া গেল, জল নামিয়া গেল—সুরবালা কোন কথা না বলিয়া বাড়ি চলিয়া গেল, আমিও কোন কথা না বলিয়া আমার ঘরে গেলাম।

ভাবিলাম, আমি নাজিরও হই নাই,

সেরেস্তাদারও হই নাই, গারিবাল্ডিও হই নাই, আমি এক ভাঙ্গা স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার, আমার সমস্ত ইহজীবনে কেবল ক্ষণকালের জন্য একটি অনন্তরাত্রির উদয় হইয়াছিল—আমার পরমায়ুর সমস্ত দিনরাত্রির মধ্যে সেই একটি মাত্র রাত্রিই আমার তুচ্ছ-জীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা।



ছুটি।

বালকদিগের সর্দ্দার ফটিক চক্রবর্ত্তীর মাথায় চট করিয়া একটা নূতন ভাবোদয় হইল। নদীর ধারে একটা প্রকাণ্ড শালকাষ্ঠ মাস্তলে রূপান্তরিত হইবার প্রতীক্ষায় পড়িয়াছিল, স্থির হইল সেটা সকলে মিলিয়া গড়াইয়া লইয়া যাইবে।

যে ব্যক্তির কাষ্ঠ, আবশ্যককালে তাহার যে কতখানি বিস্ময়, বিরক্তি এবং অসুবিধা বোধ হইবে তাহাই উপলব্ধি করিয়া বালকেরা এ প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিল।

কোমর বাঁধিয়া সকলেই যখন মনোযোগের সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে ফটিকের কনিষ্ঠ মাখনলাল গম্ভীরভাবে সেই গুঁড়ির উপরে গিয়া বসিল; ছেলেরা তাহার এইরূপ উদার ঔদাসিন্য দেখিয়া কিছু বিমর্ষ হইয়া গেল।

একজন আসিয়া ভয়ে ভয়ে তাহাকে একটু আধটু ঠেলিল, কিন্তু সে তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না, এই অকাল-তত্ত্বজ্ঞানী মানব সকলপ্রকার ক্রীড়ার অসারতা সম্বন্ধে নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল।

ফটিক আসিয়া আস্ফালন করিয়া কহিল "দেখ্, মার খাবি! এই বেলা ওঠ!"

সে তাহাতে আরও একটু নড়িয়া চড়িয়া আসনটি বেশ স্থায়ীরূপে দখল করিয়া লইল।

এরূপ স্থলে সাধারণের নিকট রাজসম্মান রক্ষা করিতে হইলে অবাধ্য ভ্রাতার গণ্ডদেশে অনতিবিলম্বে এক চড় কসাইয়া দেওয়া ফটিকের কর্ত্তব্য ছিল—সাহস হইল না। কিন্তু এমন একটা ভাব ধারণ করিল যেন ইচ্ছা করিলেই এখনি উহাকে রীতিমত শাসন করিয়া দিতে পারে; কিন্তু করিল না, কারণ পূর্ব্বাপেক্ষা আর একটা ভাল খেলা মাথায় উদয় হইয়াছে, তাহাতে আর একটু বেশী মজা আছে। প্রস্তাব করিল, মাখনকে সুদ্ধ ঐ কাঠ গড়াইতে আরম্ভ করা যাক্।

মাখন মনে করিল, ইহাতে তাহার গৌরব আছে; কিন্তু অন্যান্য পার্থিব গৌরবের ন্যায় ইহার আনুষঙ্গিক যে বিপদের সম্ভাবনাও আছে তাহা তাহার কিংবা আর কাহারও মনে উদয় হয় নাই।

ছেলেরা কোমর বাঁধিয়া ঠেলিতে আরম্ভ করিল—মারো ঠেলা হেঁইয়ো, সাবাস জোয়ান হেঁইয়ো। গুঁড়ি একপাক ঘুরিতে না ঘুরিতেই মাখন তাহার গাম্ভীর্য্য, গৌরব এবং তত্ত্বজ্ঞান সমেত ভূমিসাৎ হইয়া গেল।

খেলার আরম্ভেই এইরূপ আশাতীত ফললাভ করিয়া অন্যান্য বালকেরা বিশেষ হৃষ্ট হইয়া উঠিল, কিন্তু ফটিক কিছু শশব্যস্ত হইল। মাখন তৎক্ষণাৎ ভূমিশয্যা ছাড়িয়া ফটিকের উপরে গিয়া পড়িল, একেবারে অন্ধভাবে মারিতে লাগিল। তাহার নাকে মুখে আঁচড় কাটিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহাভিমুখে গমন করিল। খেলা ভাঙ্গিয়া গেল।

ফটিক গোটাকতক কাশ উৎপাটন করিয়া লইয়া একটা অর্দ্ধনিমগ্ন নৌকার গলুইয়ের

উপরে চড়িয়া বসিয়া চুপচাপ্ করিয়া কাশের গোড়া চিবাইতে লাগিল।

এমন সময় একটা বিদেশী নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিল। একটি অর্দ্ধবয়সী ভদ্রলোক কাঁচা গোঁফ এবং পাকা চুল লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন "চক্রবর্ত্তীদের বাড়ি কোথায় ?"

বালক ডাটা চিবাইতে চিবাইতে কহিল "ওই হোথা !" কিন্তু কোন্ দিকে যে নির্দ্দেশ করিল কাহারও বুঝিবার সাধ্য রহিল না।

ভদ্রলোকটি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথা ?"

সে বলিল "জানিনে।" বলিয়া পূর্ব্ববৎ তৃণমূল হইতে রসগ্রহণে প্রবৃত্ত হইল। বাবুটি তখন অন্য লোকের সাহায্য অবলম্বন করিয়া চক্রবর্ত্তীদের গৃহের সন্ধানে চলিলেন।

অবিলম্বে বাঘা বাগ্‌দি আসিয়া কহিল "ফটিক দাদা, মা ডাক্‌চে।"

ফটিক কহিল "যাব না।"

বাঘা তাহাকে বলপূর্ব্বক আড়কোলা করিয়া তুলিয়া লইয়া গেল, ফটিক নিষ্ফল আক্রোশে হাত পা ছুঁড়িতে লাগিল।

ফটিককে দেখিবামাত্র তাহার মা অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া কহিলেন "আবার তুই মাখনকে মেরেচিস্ !"

ফটিক কহিল "না মারিনি !"

"ফের মিথ্যে কথা বল্‌চিস্ !"

"কখ্‌খনো মারিনি ! মাখনকে জিজ্ঞাসা কর।"

মাখনকে প্রশ্ন করাতে মাখন আপনার পূর্ব্ব নালিশের সমর্থন করিয়া বলিল "হাঁ মেরেচে।"

তখন আর ফটিকের সহ্য হইল না। দ্রুত গিয়া মাখনকে এক সশব্দ চড় বসাইয়া দিয়া কহিল "ফের মিথ্যে কথা।"

মা মাখনের পক্ষ লইয়া ফটিককে সবেগে নাড়া দিয়া তাহার পৃষ্ঠে দুটা তিনটা প্রবল চপেটাঘাত করিলেন। ফটিক মাকে ঠেলিয়া দিল।

মা চীৎকার করিয়া কহিলেন "অ্যা, তুই আমার গায়ে হাত তুলিস্ !"

এমন সময়ে সেই কাঁচাপাকা বাবুটি ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন "কি হ'চ্চে তোমাদের !"

ফটিকের মা বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হইয়া কহিলেন "ওমা, এ যে দাদা ! তুমি কবে এলে !" বলিয়া গড় করিয়া প্রণাম করিলেন।

বহুদিন হইল দাদা পশ্চিমে কাজ করিতে গিয়াছিলেন, ইতিমধ্যে ফটিকের মার দুই সন্তান হইয়াছে, তাহারা অনেকটা বাড়িয়া উঠিয়াছে ; তাহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু একবারও দাদার সাক্ষাৎ পায় নাই। আজ বহুকাল পরে দেশে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্বম্ভর বাবু তাঁহার ভগিনীকে দেখিতে আসিলেন।

কিছুদিন খুব সমারোহে গেল। অবশেষে বিদায় লইবার দুই এক দিন পূর্ব্বে বিশ্বম্ভর বাবু তাঁহার ভগিনীকে ছেলেদের পড়াশুনা এবং মানসিক উন্নতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। উত্তরে ফটিকের অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খলতা, পাঠে অমনোযোগ, এবং মাখনের সুশান্ত সুশীলতা ও বিদ্যানুরাগের বিবরণ শুনিলেন।

তাঁহার ভগিনী কহিলেন "ফটিক আমার হাড় জ্বালাতন করিয়াছে।"

শুনিয়া বিশ্বম্ভর প্রস্তাব করিলেন, তিনি ফটিককে কলিকাতায় লইয়া গিয়া নিজের কাছে রাখিয়া শিক্ষা দিবেন। বিধবা এ প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইলেন।

ফটিককে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন রে ফটিক, মামার সঙ্গে কল্কাতায় যাবি ?"

ফটিক লাফাইয়া উঠিল, বলিল "যাব।"

যদিও ফটিককে বিদায় করিতে তাহার মায়ের আপত্তি ছিল না, কারণ তাঁহার মনে

সর্ব্বদাই আশঙ্কা ছিল কোন্ দিন সে মাখনকে জলেই ফেলিয়া দেয়, কি মাথাই ফাটায়, কি, কি একটা দুর্ঘটনা ঘটায়, তথাপি ফটিকের বিদায়গ্রহণের জন্য এতাদৃশ আগ্রহ দেখিয়া তিনি ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইলেন।

"কবে যাবে" করিয়া ফটিক তাহার মামাকে অস্থির করিয়া তুলিল ; উৎসাহে তাহার রাত্রে নিদ্রা হয় না।

অবশেষে যাত্রাকালে আনন্দের ঔদার্য্য বশতঃ তাহার ছিপ ঘুড়ি লাঠাই সমস্ত মাখনকে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিবার পুরা অধিকার দিয়া গেল।

কলিকাতায় মামার বাড়ি পৌছিয়া প্রথমতঃ মামীর সঙ্গে আলাপ হইল। মামী এই অনাবশ্যক পরিবারবৃদ্ধিতে মনে মনে যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার নিজের তিনটি ছেলে লইয়া তিনি নিজের নিয়মে ঘরকন্না পাতিয়া বসিয়া আছেন, ইহার মধ্যে সহসা একটি তেরো বৎসরের অপরিচিত অশিক্ষিত পাড়াগেঁয়ে ছেলে ছাড়িয়া দিলে কিরূপ একটা বিপ্লবের সম্ভাবনা উপস্থিত হয়! বিশ্বম্ভরের এত বয়স হইল তবু কিছুমাত্র যদি জ্ঞানকাণ্ড আছে।

বিশেষতঃ তেরো চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মত পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোন কাজেও লাগে না। স্নেহও উদ্রেক করে না, তাহার সঙ্গসুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধ-আধ কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি, এবং কথামাত্রই প্রগল্‌ভতা। হঠাৎ কাপড়চোপড়ের পরিমাণ রক্ষা না করিয়া বেমানানরূপে বাড়িয়া উঠে ; লোকে সেটা তাহার একটা কুশ্রী স্পর্দ্ধা স্বরূপ জ্ঞান করে। তাহার শৈশবের লালিত্য এবং কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা সহসা চলিয়া যায়, লোকে সে জন্য তাহাকে মনে মনে অপরাধ না দিয়া থাকিতে পারে না। শৈশব এবং যৌবনের অনেক দোষ মাপ করা যায়, কিন্তু এই সময়ের কোন স্বাভাবিক অনিবার্য্য ত্রুটিও যেন অসহ্য বোধ হয়।

সেও সর্ব্বদা মনে মনে বুঝিতে পারে, পৃথিবীর কোথাও সে ঠিক খাপ খাইতেছে না; এইজন্য আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্ব্বদা লজ্জিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া থাকে। অথচ এই বয়সেই স্নেহের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত কাতরতা মনে জন্মায়। এই সময়ে যদি সে কোন সহৃদয় ব্যক্তির নিকট হইতে স্নেহ কিংবা সখ্য লাভ করিতে পারে তবে তাহার নিকট আত্মবিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাকে স্নেহ করিতে কেহ সাহস করে না, কারণ সেটা সাধারণে প্রশ্রয় বলিয়া মনে করে। সুতরাং তাহার চেহারা এবং ভাবখানা অনেকটা প্রভুহীন পথের কুকুরের মত হইয়া যায়।

অতএব এমন অবস্থায় মাতৃভবন ছাড়া আর কোন অপরিচিত স্থান বালকের পক্ষে নরক। চারিদিকের স্নেহশূন্য বিরাগ তাহাকে পদে পদে কাঁটার মত বিঁধে। এই বয়সে সাধারণতঃ নারীজাতিকে কোন এক শ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকের দুর্লভ জীব বলিয়া মনে ধারণা হইতে আরম্ভ হয়, অতএব তাঁহাদের নিকট হইতে উপেক্ষা অত্যন্ত দুঃসহ বোধ হয়।

মামীর স্নেহহীন চক্ষে সে যে একটা দুর্গ্রহের মত প্রতিভাত হইতেছে এইটে ফটিককে সবচেয়ে বাজিত। মামী যদি দৈবাৎ তাহাকে কোন একটা কাজ করিতে বলিতেন, তাহা হইলে সে মনের আনন্দে যতটা আবশ্যক তার চেয়ে বেশী কাজ করিয়া ফেলিত, অবশেষে মামী যখন তাহার উৎসাহ দমন করিয়া বলিতেন "ঢের হয়েচে, ঢের হয়েচে! ওতে আর তোমার হাত দিতে হবে না! এখন তুমি নিজের কাজে মন দাওগে! একটু পড়গে

যাও!” তখন তাহার মানসিক উন্নতির প্রতি মামার এতটা যত্নবহুল্য তাহার অত্যন্ত নিষ্ঠুর অবিচার বলিয়া মনে হইত।

ঘরের মধ্যে এইরূপ অনাদর, ইহার পর আবার হাঁফ ছাড়িবার জায়গা ছিল না। দেয়ালের মধ্যে আট্‌কা পড়িয়া কেবলি তাহার সেই গ্রামের কথা মনে পড়িত।

প্রকাণ্ড একটা ধাউস্‌ ঘুড়ি লইয়া বোঁ বোঁ শব্দে উড়াইয়া বেড়াইবার সেই মাঠ, "তাইরে নাইরে নাইরে না" করিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্বরচিত রাগিণী আলাপ করিয়া অকর্ম্মণ্যভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবার সেই নদীতীর, দিনের মধ্যে যখন-তখন ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিবার সেই সঙ্কীর্ণ স্রোতস্বিনী, সেই সব দলবল, উপদ্রব, স্বাধীনতা এবং সর্ব্বোপরি সেই অত্যাচারিণী অবিচারিণী মা অহর্নিশি তাহার নিরুপায় চিত্তকে আকর্ষণ করিত।

জন্তুর মত এক প্রকার অবুঝ ভালবাসা— কেবল একটা কাছে যাইবার অন্ধ ইচ্ছা, কেবল একটা না দেখিয়া অব্যক্ত ব্যাকুলতা, গোধূলি সময়ের মাতৃহীন বৎসের মত কেবল একটা আন্তরিক মা মা ক্রন্দন—সেই লজ্জিত শঙ্কিত শীর্ণ দীর্ঘ অসুন্দর বালকের অন্তরে কেবলি আলোড়িত হইত।

স্কুলে এত বড় নির্ব্বোধ এবং অমনোযোগী বালক আর ছিল না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত। মাষ্টার যখন মার আরম্ভ করিত তখন ভারক্লান্ত গর্দ্দভের মত নীরবে সহ্য করিত। ছেলেদের যখন খেলিবার ছুটি হইত তখন জানালার কাছে দাঁড়াইয়া দূরের বাড়িগুলার ছাদ নিরীক্ষণ করিত; যখন সেই দ্বিপ্রহর রৌদ্রে কোন একটা ছাদে দুটি একটি ছেলে মেয়ে কিছু একটা খেলার ছলে ক্ষণেকের জন্য দেখা দিয়া যাইত তখন তাহার চিত্ত অধীর হইয়া উঠিত।

একদিন অনেক প্রতিজ্ঞা করিয়া অনেক সাহসে মামাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"মামা, মার কাছে কবে যাব?"

মামা বলিয়াছিলেন "স্কুলের ছুটি হোক।" কার্ত্তিক মাসে পূজার ছুটি সে এখনো ঢের দেরী।

একদিন ফটিক তাহার স্কুলের বই হারাইয়া ফেলিল। একেত সহজেই পড়া তৈরি হয় না, তাহার পর বই হারাইয়া একেবারে নাচার হইয়া পড়িল। মাষ্টার প্রতিদিন তাহাকে অত্যন্ত মারধোর অপমান করিতে আরম্ভ করিলেন। স্কুলে তাহার এমন অবস্থা হইল যে তাহার মামাতো ভাইরা তাহার সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করিত। ইহার কোন অপমানে তাহারা অন্যান্য বালকের চেয়েও যেন বলপূর্ব্বক বেশী করিয়া আমোদ প্রকাশ করিত।

অসহ্য বোধ হওয়াতে একদিন ফটিক তাহার মামীর কাছে নিতান্ত অপরাধীর মত গিয়া কহিল "বই হারিয়ে ফেলেচি।"

মামী অধরের দুই প্রান্তে বিরক্তির রেখা অঙ্কিত করিয়া বলিলেন, "বেশ করেচ, আমি তোমাকে মাসের মধ্যে পাঁচবার করে' বই কিনে দিতে পারিনে!"

ফটিক আর কিছু না বলিয়া চলিয়া আসিল —সে যে পরের পয়সা নষ্ট করিতেছে এই মনে করিয়া তাহার মায়ের উপর অত্যন্ত অভিমান উপস্থিত হইল, নিজের হীনতা এবং দৈন্য তাহাকে মাটির সহিত মিশাইয়া ফেলিল।

স্কুল হইতে ফিরিয়া সেই রাত্রে তাহার মাথাব্যথা করিতে লাগিল এবং গা সির্‌সির্‌ করিয়া আসিল। বুঝিতে পারিল তাহার জ্বর আসিতেছে। বুঝিতে পারিল ব্যামো বাধাইলে তাহার মামীর প্রতি অত্যন্ত অনর্থক উপদ্রব করা হইবে। মামী এই ব্যামোটাকে যে কিরূপ একটা অকারণ অনাবশ্যক জ্বালাতনের

স্বরূপ দেখিবে তাহা সে স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিল। রোগের সময় এই অকর্ম্মণ্য অদ্ভুত নির্ব্বোধ বালক পৃথিবীতে নিজের মা ছাড়া আর কাহারও কাছে সেবা পাইতে পারে এরূপ প্রত্যাশা করিতে তাহার লজ্জা বোধ হইতে লাগিল।

পরদিন প্রাতঃকালে ফটিককে আর দেখা গেল না। চতুর্দ্দিকে প্রতিবেশীদের ঘরে খোঁজ করিয়া তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

সেদিন আবার রাত্রি হইতে মুষলধারে শ্রাবণের বৃষ্টি পড়িতেছে। সুতরাং তাহার খোঁজ করিতে লোকজনকে অনর্থক অনেক ভিজিতে হইল। অবশেষে কোথাও না পাইয়া বিশ্বম্ভর বাবু পুলিষে খবর দিলেন।

সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যার সময় একটা গাড়ি আসিয়া বিশ্বম্ভর বাবুর বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল। তখনও ঝুপ্ ঝাপ্ করিয়া অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়িতেছে; রাস্তায় একহাঁটু জল দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

দুইজন পুলিষের লোক গাড়ি হইতে ফটিককে ধরাধরি করিয়া নামাইয়া বিশ্বম্ভর বাবুর নিকট উপস্থিত করিল। তাহার আপাদ মস্তক ভিজা, সর্ব্বাঙ্গে কাদা, মুখ চক্ষু লোহিতবর্ণ, থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতেছে। বিশ্বম্ভর বাবু প্রায় কোলে করিয়া তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন।

মামী তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন—"কেন বাপু, পরের ছেলেকে নিয়ে কেন এ কর্ম্মভোগ! দাও ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও!"

বাস্তবিক, সমস্ত দিন দুশ্চিন্তায় তাঁহার ভালরূপ আহারাদি হয় নাই, এবং নিজের ছেলেদের সহিতও নাহক অনেক খিট্‌মিট্ করিয়াছেন।

ফটিক কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল "আমি মার কাছে যাচ্ছিলুম, আমাকে ফিরিয়ে এনেচে।"

বালকের জ্বর অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি প্রলাপ বকিতে লাগিল। বিশ্বম্ভর বা[বু] চিকিৎসক লইয়া আসিলেন।

ফটিক তাহার রক্তবর্ণ চক্ষু একবার উন্মীলিত করিয়া কড়িকাঠের দিকে হতবুদ্ধিভাবে তাকাইয়া কহিল "মামা, আমার ছুটি হয়েছি কি?"

বিশ্বম্ভর বাবু রুমালে চোখ মুছিয়া সস্নেহে ফটিকের শীর্ণ তপ্ত হাতখানি হাতের উপর তুলিয়া লইয়া তাহার কাছে আসিয়া বসিলেন।

ফটিক আবার বিড়বিড় করিয়া বকিতে লাগিল—বলিল "মা, আমাকে মারিস্‌নে মা। সত্যি বল্‌চি আমি কোন দোষ করিনি।"

পরদিন দিনের বেলা কিছুক্ষণের জন্য সচেতন হইয়া ফটিক কাহার প্রত্যাশায় ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া ঘরের চারিদিকে চাহিল। নিরাশ হইয়া আবার নীরবে দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

বিশ্বম্ভর বাবু তাহার মনের ভাব বুঝিয়া তাহার কাণের কাছে মুখ নত করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন "ফটিক, তোর মাকে আন্‌তে পাঠিয়েচি।"

তাহার পরদিনও কাটিয়া গেল। ডাক্তার চিন্তিত বিমর্ষ মুখে জানাইলেন অবস্থা বড়ই খারাপ।

বিশ্বম্ভর বাবু স্তিমিতপ্রদীপে রোগশয্যায় বসিয়া প্রতিমুহূর্ত্তেই ফটিকের মাতার জ[ন্য] প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ফটিক খালাসীদের মত সুর করিয়া করি[য়া] বলিতে লাগিল "এক বাঁও মেলে না। দো বাঁ[ও] মেলে—এ-এ-না।" কলিকাতায় আসিবা[র] সময় কতকটা রাস্তা ষ্টীমারে আসিতে হইয়াছিল, খালাসীরা কাছি ফেলিয়া সুর করিয়া জল মাপিত; ফটিক প্রলাপে তাহাদেরই অনুকরণে করুণস্বরে জল মাপিতেছে এবং যে অকূল সমুদ্রে যাত্রা করিতেছে বালক রশি ফেলিয়া কোথাও তাহার তল পাইতেছে না।

এমন সময়ে ফটিকের মাতা ঝড়ের মত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই উচ্চ কলরবে শোক করিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভর বহুকষ্টে তাঁহার শোকোচ্ছ্বাস নিবৃত্ত করিলে তিনি শয্যার উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন "ফটিক, সোণার মাণিক আমার!"

ফটিক যেন অতি সহজেই তাহার উত্তর দিয়া কহিল "অ্যাঁ।"—

মা আবার ডাকিলেন "ওরে ফটিক্, বাপধনরে!"

ফটিক আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়া কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া মৃদুস্বরে কহিল "মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্চি।"

—:*:—

দানপ্রতিদান।

বড় গিন্নি যে কথাগুলা বলিয়া গেলেন তাহার ধার যেমন তাহার বিষও তেমনি। যে হতভাগিনীর উপর প্রয়োগ করিয়া গেলেন তাহার চিত্তপুত্তলি একেবারে জ্বলিয়া জ্বলিয়া লুটিতে লাগিল।

বিশেষতঃ কথাগুলা তাহার স্বামীর উপর লক্ষ্য করিয়া বলা—এবং স্বামী রাধাকুমুন্দ তখন রাত্রের আহার সমাপন করিয়া অনতিদূরে বসিয়া তাম্বুলের সহিত তাম্রকূটধূম্র সংযোগ করিয়া খাদ্য পরিপাকে প্রবৃত্ত ছিলেন। কথাগুলো শ্রুতিপথে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পরিপাকের যে বিশেষ ব্যাঘাত করিল এমন বোধ হইল না। অবিচলিত গাম্ভীর্য্যের সহিত তাম্রকূট নিঃশেষ করিয়া অভ্যাসমত যথাকালে শয়ন করিতে গেলেন।

কিন্তু এরূপ অসামান্য পরিপাকশক্তি সকলের নিকটে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। রাসমণি আজ শয়নগৃহে আসিয়া স্বামীর সহিত এমন ব্যবহার করিল যাহা ইতিপূর্ব্বে সে কখনো করিতে সাহস করে নাই। অন্যদিন শান্তভাবে শয্যায় প্রবেশ করিয়া নীরবে স্বামীর পদসেবায় নিযুক্ত হইত, আজ একেবারে সবেগে কঙ্কণ ঝঙ্কার করিয়া স্বামীর প্রতি বিমুখ হইয়া বিছানার একপাশে শুইয়া পড়িল এবং ক্রন্দনাবেগে শয্যাতল কম্পিত করিয়া তুলিল।

রাধামুকুন্দ তৎপ্রতি মনোযোগ না দিয়া একটা প্রকাণ্ড পাশবালিশ আঁকড়িয়া ধরিয়া নিদ্রার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার এই ঔদাসীন্যে স্ত্রীর অধৈর্য্য উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়া অবশেষে মৃদুগম্ভীর স্বরে জানাইলেন যে, তাঁহাকে বিশেষ কার্য্যবশতঃ ভোরে উঠিতে হইবে, এক্ষণে নিদ্রা আবশ্যক।

স্বামীর কণ্ঠস্বরে রাসমণির ক্রন্দন আর বাধা মানিল না, মুহূর্ত্তে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

রাধামুকুন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইয়াছে?"

রাসমণি উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিলেন "শোন নাই কি?"

রাধামুকুন্দ। শুনিয়াছি। কিন্তু বৌঠাকরুণ একটা কথাও ত মিথ্যা বলেন নাই। আমি কি দাদার অন্নেই প্রতিপালিত নহি? তোমার এই কাপড়চোপড় গহনাপত্র এ সমস্ত আমি কি আমার বাপের কড়ি হইতে আনিয়া দিয়াছি? যে খাইতে পরিতে দেয় সে যদি দুটো কথা বলে, তাহাও খাওয়াপরার সামিল করিয়া লইতে হয়।

"এমন খাওয়াপরায় কাজ কি?"

"বাঁচিতে ত হইবে।"

"মরণ হইলেই ভাল হয়।"

"যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ একটু ঘুমাইবার চেষ্টা কর, আরাম বোধ করিবে।"

বলিয়া রাধামুকুন্দ উপদেশ ও দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্য-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাধামুকুন্দ ও শশিভূষণ সহোদর ভাই নহে, নিতান্ত নিকট-সম্পর্কও নয়; প্রায় গ্রাম-সম্পর্ক বলিলেই হয়। কিন্তু প্রীতিবন্ধন সহোদর ভাইয়ের চেয়ে কিছু কম নহে। বড় গিন্নি ব্রজসুন্দরীর সেটা কিছু অসহ্য বোধ হইত। বিশেষতঃ শশিভূষণ দেওয়া-থোওয়া সম্বন্ধে ছোটবৌয়ের অপেক্ষা নিজ স্ত্রীর প্রতি অধিক পক্ষপাত করিতেন না। বরঞ্চ যে জিনিষটা নিতান্ত একযোড়া না মিলিত, সেটা গৃহিণীকে বঞ্চিত করিয়া ছোট বৌকেই দিতেন। তাহা ছাড়া অনেক সময়ে তিনি স্ত্রীর অনুরোধ অপেক্ষা রাধামুকুন্দের পরামর্শের প্রতি বেশী নির্ভর করিতেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। শশিভূষণ লোকটা নিতান্ত ঢিলাঢালা রকমের, তাই ঘরের কাজ এবং বিষয়কর্ম্মের সমস্ত ভার রাধামুকুন্দের উপরেই ছিল। বড় গিন্নির সর্ব্বদাই সন্দেহ রাধামুকুন্দ তলে তলে তাঁহার স্বামীকে বঞ্চনা করিবার আয়োজন করিতেছে—তাহার যতই প্রমাণ পাওয়া যাইত না, রাধার প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ততই বাড়িয়া উঠিত! মনে করিতেন, প্রমাণগুলোও অন্যায় করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে, এই জন্য তিনি আবার প্রমাণের উপর রাগ করিয়া তাহাদের প্রতি নিরতিশয় অবজ্ঞা প্রকাশপূর্ব্বক নিজের সন্দেহকে ঘরে বসিয়া দ্বিগুণ দৃঢ় করিতেন। তাঁহার এই বহুযত্নপোষিত মানসিক আগুন আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় ভূমিকম্প সহকারে প্রায় মাঝে মাঝে উষ্ণভাষায় উচ্ছ্বসিত হইত।

রাত্রে রাধামুকুন্দের ঘুমের ব্যাঘাত হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না—কিন্তু পরদিন সকালে উঠিয়া তিনি বিরসমুখে শশিভূষণের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। শশিভূষণ ব্যস্তসমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "রাধে, তোমায় এমন দেখিতেছি কেন? অসুখ হয় নাই ত।"

রাধামুকুন্দ মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন "দাদা, আর ত আমার এখানে থাকা হয় না" এই বলিয়া গত সন্ধ্যাকালে বড় গৃহিণীর আক্রমণ-বৃত্তান্ত সংক্ষেপে এবং শান্তভাবে বর্ণন করিয়া গেলেন।

শশিভূষণ হাসিয়া কহিলেন "এই! এ ত নূতন কথা নহে। ও ত পরের ঘরের মেয়ে, সুযোগ পাইলেই দুটো কথা বলিবে, তাই বলিয়া কি ঘরের লোককে ছাড়িয়া যাইতে হইবে। কথা আমাকেও ত মাঝে মাঝে শুনিতে হয়, তাই বলিয়া ত সংসারত্যাগ করিতে পারি না"।

রাধা কহিলেন "মেয়েমানুষের কথা কি আর সহিতে পারি না, তবে পুরুষ হইয়া জন্মিলাম কি করিতে! কেবল ভয় হয়, তোমার সংসারে পাছে অশান্তি ঘটে"।

শশিভূষণ কহিলেন "তুমি গেলে আমার কিসের শান্তি"!

আর অধিক কথা হইল না। রাধামুকুন্দ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেলেন, তাঁহার হৃদয়ভার সমান রহিল।

এদিকে বড় গৃহিণীর আক্রোশ ক্রমশই বাড়িয়া উঠিতেছে। সহস্র উপলক্ষে যখন-তখন তিনি রাধাকে খোঁটা দিতে পারিলে ছাড়েন না; মুহুর্মুহু বাক্যবাণে রাসমণির অন্তরাত্মাকে একপ্রকার শরশয্যাশায়ী করিয়া তুলিলেন। রাধা যদিও চুপচাপ করিয়া তামাক টানেন এবং স্ত্রীকে ক্রন্দনোন্মুখী দেখিবামাত্র [redacted] বুজিয়া নাক ডাকাইতে আরম্ভ করেন, তবু ভাবে বোধ হয় তাঁহারও অসহ্য হইয়া আসিয়াছে।

কিন্তু শশিভূষণের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ত

আজিকার নহে—দুই ভাই যখন প্রাতঃকালে পান্তাভাত খাইয়া পাৎতাড়ি কক্ষে একসঙ্গে পাঠশালায় যাইত, উভয়ে যখন একসঙ্গে পরামর্শ করিয়া গুরুমহাশয়কে ফাঁকি দিয়া পাঠশালা হইতে পালাইয়া রাখাল-ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া নানাবিধ খেলা ফাঁদিত, এক বিছানায় শুইয়া স্তিমিত আলোকে মাসীর নিকট গল্প শুনিত, ঘরের লোককে লুকাইয়া রাত্রে দূর পল্লীতে যাত্রা শুনিতে যাইত এবং প্রাতঃকালে ধরা পড়িয়া অপরাধ এবং শাস্তি উভয়ে সমান ভাগ করিয়া লইত—তখন কোথায় ছিল ব্রজসুন্দরী, কোথায় ছিল রাসমণি! জীবনের এতগুলো দিনকে কি একদিনে বিচ্ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাওয়া যায়? কিন্তু এই বন্ধন যে স্বার্থপরতার বন্ধন, এই প্রগাঢ় প্রীতি যে পরান্ন প্রত্যাশার সুচতুর ছদ্মবেশ, এরূপ সন্দেহ, এরূপ আভাসমাত্র তাঁহার নিকট বিষতুল্য বোধ হইত, অতএব আর কিছুদিন এরূপ চলিলে কি হইত বলা যায় না। কিন্তু এমন সময়ে একটা গুরুতর ঘটনা ঘটিল।

যে সময়ের কথা বলিতেছি সে আজ চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। তখন নির্দ্দিষ্ট দিনে সূর্য্যাস্তের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের খাজনা শোধ না করিলে জমীদারী-সম্পত্তি নিলাম হইয়া যাইত।

একদিন খবর আসিল শশিভূষণের একমাত্র জমিদারী পরগণা এনাৎসাহী লাটের খাজনার দায়ে নিলাম হইয়া গেছে।

রাধামুকুন্দ তাঁহার স্বাভাবিক মৃদু প্রশান্তভাবে কহিলেন "আমারই দোষ"! শশিভূষণ কহিলেন "তোমার কিসের দোষ! তুমি ত খাজনা চালান দিয়াছিলে, পথে যদি ডাকাতে পড়িয়া লুটিয়া লয়, তুমি তাহার কি করিতে পার"?

দোষ কাহার এক্ষণে তাহা স্থির করিতে বসিয়া কোন ফল নাই—এখন সংসার চালাইতে হইবে। শশিভূষণ হঠাৎ যে কোন কাজকর্ম্মে হাত দিবেন সেরূপ তাঁহার স্বভাব ও শিক্ষা নহে। তিনি যেন ঘাটের বাঁধা সোপান হইতে পিছলিয়া এক মুহূর্ত্তে ডুবজলে গিয়া পড়িলেন।

প্রথমেই তিনি স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিতে উদ্যত হইলেন। রাধামুকুন্দ এক থলে টাকা সম্মুখে ফেলিয়া তাহাতে বাধা দিলেন। তিনি পূর্ব্বেই নিজ স্ত্রীর গহনা বন্ধক রাখিয়া যথোপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

সংসারে একটা এই মহৎ পরিবর্ত্তন দেখা গেল, সম্পৎকালে গৃহিণী যাহাকে দূর করিবার সহস্র চেষ্টা করিয়াছিলেন, বিপৎকালে তাহাকে ব্যাকুলভাবে অবলম্বন করিয়া ধরিলেন। এই সময়ে দুই ভ্রাতার মধ্যে কাহার উপরে অধিক নির্ভর করা যাইতে পারে তাহা বুঝিয়া লইতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। কখনো যে রাধামুকুন্দের প্রতি তাঁহার তিলমাত্র বিদ্বেষভাব ছিল এখন আর তাহা প্রকাশ পায় না।

রাধামুকুন্দ পূর্ব্ব হইতেই স্বাধীন উপার্জ্জনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। নিকটবর্ত্তী সহরে সে মোক্তারি আরম্ভ করিয়া দিল। তখন মোক্তারি-ব্যবসায়ে আয়ের পথ এখনকার অপেক্ষা বিস্তৃত ছিল, এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি সাবধানী রাধামুকুন্দ প্রথম হইতেই পসার জমাইয়া তুলিল। ক্রমে সে জিলার অধিকাংশ বড় বড় জমিদারের কার্য্যভার গ্রহণ করিল।

এক্ষণে রাসমণির অবস্থা পূর্ব্বের ঠিক বিপরীত। এখন রাসমণির স্বামীর অন্নেই শশিভূষণ এবং ব্রজসুন্দরী প্রতিপালিত। সে কথা লইয়া সে স্পষ্ট কোন গর্ব্ব করিয়াছিল কি না জানি না, কিন্তু কোন একদিন বোধ করি আভাসে ইঙ্গিতে ব্যবহারে সেই ভাব ব্যক্ত করিয়াছিল; বোধ করি, দেমাকের সহিত পা ফেলিয়া এবং হাত দুলাইয়া কোন একটা বিষয়ে বড় গিন্নির ইচ্ছার প্রতিকূলে নিজের মনোমত

কাজ করিয়াছিল—কিন্তু সে কেবল একটি দিন মাত্র—তাহার পরদিন হইতে সে যেন পূর্ব্বের অপেক্ষাও নম্র হইয়া গেল। কারণ, কথাটা তাহার স্বামীর কাণে গিয়াছিল; এবং রাত্রে রাধামুকুন্দ কি কি যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছিল ঠিক বলিতে পারি না, পরদিন হইতে তাহার মুখে আর রা রহিল না, বড় গিন্নির দাসীর মত হইয়া রহিল;—শুনা যায়, রাধামুকুন্দ সেই রাত্রেই স্ত্রীকে তাহার পিতৃভবনে পাঠাইবার উদ্যোগ করিয়াছিল এবং সপ্তাহকাল তাহার মুখদর্শন করে নাই—অবশেষে ব্রজসুন্দরী ঠাকুরপোর হাতে ধরিয়া অনেক মিনতি করিয়া দম্পতির মিলনসাধন করাইয়া দেন; এবং বলেন, "ছোটবৌ ত সে দিন আসিয়াছে, আর আমি কতকাল হইতে তোমাদের ঘরে আছি ভাই। তোমাতে আমাতে যে চিরকালের প্রিয়সম্পর্ক তাহার মর্য্যাদা ও কি বুঝিতে শিখিয়াছে? ও ছেলেমানুষ, উহাকে মাপ কর।"

রাধামুকুন্দ সংসারখরচের সমস্ত টাকা ব্রজসুন্দরীর হাতে আনিয়া দিতেন। রাসমণি নিজের আবশ্যকীয় ব্যয় নিয়ম অনুসারে অথবা প্রার্থনা করিয়া ব্রজসুন্দরীর নিকট হইতে পাইতেন। গৃহমধ্যে বড় গিন্নির অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল বই মন্দ নহে; কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি শশিভূষণ স্নেহবশে এবং নানা বিবেচনায় রাসমণিকে বরঞ্চ অনেক সময় অধিক পক্ষপাত দেখাইতেন।

শশিভূষণের মুখে যদিও তাঁহার সহজ প্রফুল্ল হাস্যের বিরাম ছিল না কিন্তু গোপন অসুখে তিনি প্রতিদিন কৃশ হইয়া যাইতেছিলেন। আর কেহ তাহা ততটা লক্ষ্য করে নাই, কেবল দাদার মুখ দেখিয়া রাধার চক্ষে নিদ্রা ছিল না। অনেক সময়ে গভীর রাত্রে রাসমণি জাগ্রৎ হইয়া দেখিত, গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া অশান্তভাবে রাধা এপাশ ওপাশ করিতেছে।

রাধামুকুন্দ অনেক সময় শশিভূষণকে গি[য়া] আশ্বাস দিত, "তোমার কোন ভাবনা না[ই] দাদা। তোমার পৈতৃক বিষয় আমি ফিরাই[য়া] আনিব—কিছুতেই ছাড়িয়া দিব না। বে[শী] দিন দেরীও নাই।"

বাস্তবিক বেশী দিন দেরীও হইল না[।] শশিভূষণের সম্পত্তি যে ব্যক্তি নিলামে খরি[দ] করিয়াছিল, সে ব্যবসায়ী লোক, জমিদারী কাজে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সম্মানের প্রত্যাশ[ায়] কিনিয়াছিল, কিন্তু ঘর হইতে সদর খাজ[না] দিতে হইত—এক পয়সা মুনফা পাইত ন[া।] রাধামুকুন্দ বৎসরের মধ্যে দুই একবার লাঠিয়া[ল] লইয়া লুঠপাট করিয়া খাজনা আদায় করি[য়া] আনিত। প্রজারাও তাহার বাধ্য ছি[ল।] অপেক্ষাকৃত নিম্নজাতীয় ব্যবসাজীবী জমিদারে[কে] তাহারা মনে মনে ঘৃণা করিত, এবং রাধ[া]মুকুন্দের পরামর্শে ও সাহায্যে সর্ব্বপ্রকারে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল।

অবশেষে সে বেচারা বিস্তর মোকদ্দম[া] মাম্‌লা করিয়া বারবার অকৃতকার্য্য হইয়া এ[ই] ঝঞ্ঝাট হাত হইতে ঝাড়িয়া ফেলিবার জ[ন্য] উৎসুক হইয়া উঠিল। সামান্য মূল্যে রাধামুকু[ন্দ] সেই পূর্ব্ব সম্পত্তি পুনর্ব্বার কিনিয়া লইলেন[।]

লেখায় যত অল্পদিন মনে হইল আসলে তত নয়। ইতিমধ্যে প্রায় দশবৎসর উত্তীর্ণ হই[য়া] গিয়াছে। দশবৎসর পূর্ব্বে শশিভূষণ যৌবনে[র] সর্ব্বপ্রান্তে প্রৌঢ় বয়সের আরম্ভভাগে ছিলে[ন] কিন্তু এই আট দশ বৎসরের মধ্যেই তি[নি] যেন অন্তররুদ্ধ মানসিক উত্তাপের বাষ্পযা[নে] চড়িয়া একেবারে সবেগে বার্দ্ধক্যের মাঝখা[নে] আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। পৈতৃক সম্পত্তি য[খন] ফিরিয়া পাইলেন, তখন কি জানি কেন, আ[র] তেমন প্রফুল্ল হইতে পারিলেন না। বহুদি[ন]

অব্যবহারে হৃদয়ের বীণাযন্ত্র বোধ করি বিকল হইয়া গিয়াছে, এখন সহস্রবার তার টানিয়া বাঁধিলেও ঢিলা হইয়া নামিয়া যায়—সে স্বর আর কিছুতেই বাহির হয় না।

গ্রামের লোকেরা বিস্তর আনন্দ প্রকাশ করিল। তাহারা একটা ভোজের জন্য শশিভূষণকে গিয়া ধরিল। শশিভূষণ রাধামুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বল ভাই?"

রাধামুকুন্দ বলিলেন "অবশ্য শুভদিনে আনন্দ করিতে হইবে বৈ কি!"

গ্রামে এমন ভোজ বহুকাল হয় নাই। গ্রামের ছোট বড় সকলেই খাইয়া গেল। ব্রাহ্মণেরা দক্ষিণা এবং দুঃখিকাঙালগণ পয়সা ও কাপড় পাইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেল।

শীতের আরম্ভে গ্রামে তখন সময়টা খারাপ ছিল, তাহার উপরে শশিভূষণ পরিবেশনাদি বিবিধ কার্য্যে তিন চারি দিন বিস্তর পরিশ্রম এবং অনিয়ম করিয়াছিলেন, তাঁহার ভগ্ন শরীরে আর সহিল না—তিনি একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। অন্যান্য দুরূহ উপসর্গের সহিত কম্প দিয়া জ্বর আসিল—বৈদ্য মাথা নাড়িয়া কহিল "বড় শক্ত ব্যাধি।"

রাত্রি দুই তিন প্রহরের সময় রোগীর ঘর হইতে সকলকে বাহির করিয়া দিয়া রাধামুকুন্দ কহিলেন "দাদা, তোমার অবর্ত্তমানে বিষয়ের অংশ কাহাকে কিরূপ দিব সেই উপদেশ দিয়া যাও।"

শশিভূষণ কহিলেন "ভাই, আমার কি আছে যে কাহাকে দিব!"

রাধামুকুন্দ কহিলেন "সবই ত তোমার!"

শশিভূষণ উত্তর দিলেন "এককালে আমার ছিল, এখন আমার নহে।"

রাধামুকুন্দ অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বসিয়া বসিয়া শয্যার এক অংশের চাদর দুই হাত দিয়া বারবার সমান করিয়া দিতে লাগিল। শশিভূষণের শ্বাসক্রিয়া কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল।

রাধামুকুন্দ তখন শয্যাপ্রান্তে উঠিয়া বসিয়া রোগীর পা দু'টি ধরিয়া কহিল "দাদা, আমি যে মহাপাতকের কাজ করিয়াছি, তাহা তোমাকে বলি, আর ত সময় নাই।"

শশিভূষণ কোন উত্তর করিলেন না—রাধামুকুন্দ বলিয়া গেলেন—সেই স্বাভাবিক শান্তভাব এবং ধীরে ধীরে কথা, কেবল মাঝে মাঝে এক একটা দীর্ঘনিশ্বাস উঠিতে লাগিল। "দাদা, আমার ভাল করিয়া বলিবার ক্ষমতা নাই। মনের যথার্থ যে ভাব সে অন্তর্যামী জানেন, আর পৃথিবীতে যদি কেহ বুঝিতে পারে ত হয় ত তুমি পারিবে। বালককাল হইতে তোমাতে আমাতে অন্তরে প্রভেদ ছিল না, কেবল বাহিরে প্রভেদ। কেবল এক প্রভেদ ছিল, তুমি ধনী আমি দরিদ্র। যখন দেখিলাম সেই সামান্য সূত্রে তোমাতে আমাতে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা ক্রমশই গুরুতর হইয়া উঠিতেছে, তখন আমিই সে প্রভেদ লোপ করিয়াছিলাম। আমিই সদর খাজনা লুঠ করাইয়া তোমার সম্পত্তি নিলাম করাইয়াছিলাম।"

শশিভূষণ তিলমাত্র বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ না করিয়া ঈষৎ হাসিয়া মৃদুস্বরে রুদ্ধ উচ্চারণে কহিলেন, "ভাই ভালই করিয়াছিলে। কিন্তু যেজন্য এত করিলে তাহা কি সিদ্ধ হইল? কাছে কি রাখিতে পারিলে? দয়াময় হরি!" বলিয়া প্রশান্ত মৃদু হাস্যের উপরে দুই চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

রাধামুকুন্দ তাঁহার দুই পায়ের নীচে মাথা রাখিয়া কহিল "দাদা, মাপ করিলে ত।"

শশিভূষণ তাহাকে কাছে ডাকিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিলেন "ভাই, তবে শোন। এ কথা আমি প্রথম হইতেই জানিতাম। তুমি যাহাদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছিলে তাহারাই

আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছে। আমি তখন হইতে তোমাকে মাপ করিয়াছি।"

রাধামুকুন্দ দুই করতলে লজ্জিত মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে কহিল—"দাদা, মাপ যদি করিয়াছ, তবে তোমার সম্পত্তি তুমি গ্রহণ কর। রাগ করিয়া ফিরাইয়া দিয়োনা।"

শশিভূষণ উত্তর দিতে পারিলেন না—তখন তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়াছে—রাধামুকুন্দ মুখের দিকে অনিমেষ দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া একবার দক্ষিণ হস্ত তুলিলেন। তাহাতে কি বুঝাইল বলিতে পারি না। বোধ করি রাধামুকুন্দ বুঝিয়া থাকিবে!

—:*:—

কাবুলিওয়ালা।

আমার পাঁচ বছর বয়সের ছোট মেয়ে মিনি এক দণ্ড কথা না কহিয়া থাকিতে পারে না। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভাষা শিক্ষা করিতে সে কেবল একটি বৎসর কাল ব্যয় করিয়াছিল, তাহার পর হইতে যতক্ষণ সে জাগিয়া থাকে এক মুহূর্ত্ত মৌনভাবে নষ্ট করে না। তাহার মা অনেক সময় ধমক দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেয়, কিন্তু আমি তাহা পারি না। মিনি চুপ করিয়া থাকিলে এমনি অস্বাভাবিক দেখিতে হয় যে সে আমার বেশীক্ষণ সহ্য হয় না। এই জন্য আমার সঙ্গে তাহার কথোপকথনটা কিছু উৎসাহের সহিত চলে।

সকাল বেলায় আমার নভেলের সপ্তদশ পরিচ্ছেদে হাত দিয়াছি এমন সময় মিনি আসি-

যাই আরম্ভ করিয়া দিল, "বাবা, রামদয়াল দরোয়ান কাককে কৌয়া বল্‌ছিল, সে কিচ্ছু জানে না। না?"

আমি, পৃথিবীতে ভাষার বিভিন্নতা সম্বন্ধে তাহাকে জ্ঞানদান করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই সে দ্বিতীয় প্রসঙ্গে উপনীত হইল। "দেখ বাবা, ভোলা বল্‌ছিল আকাশে হাতি শুঁড় দিয়ে জল ফেলে তাই বৃষ্টি হয়। মাগো, ভোলা এত মিছিমিছি বক্‌তে পারে! কেবলি বকে, দিনরাত বকে!"

এ সম্বন্ধে আমার মতামতের জন্য কিছুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল "বাবা, মা তোমার কে হয়?"

মনে মনে কহিলাম, শ্যালিকা; মুখে কহিলাম "মিনি, তুই ভোলার সঙ্গে খেলা করগে যা! আমার এখন কাজ আছে!"

সে তখন আমার লিখিবার টেবিলের পার্শ্বে আমার পায়ের কাছে বসিয়া নিজের দুই হাঁটু এবং হাত লইয়া অতি দ্রুত উচ্চারণে আগ্‌ডুম্ বাগ্‌ডুম্ খেলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। আমার সপ্তদশ পরিচ্ছেদে প্রতাপ সিংহ তখন কাঞ্চনমালাকে লইয়া অন্ধকার রাত্রে কারাগারের উচ্চ বাতায়ন হইতে নিম্নবর্ত্তী নদীর জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছেন।

আমার ঘর পথের ধারে। হঠাৎ মিনি আগ্‌ডুম্ বাগ্‌ডুম্ খেলা রাখিয়া জানালার ধারে ছুটিয়া গেল এবং চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা!"

ময়লা ঢিলা কাপড় পরা, পাগ্‌ড়ি মাথায় ঝুলি ঘাড়ে, হাতে গোটা দুইচার আঙুরের বাক্স এক লম্বা কাবুলিওয়ালা মৃদুমন্দ গমনে পথ দিয়া যাইতেছিল, তাহাকে দেখিয়া আমার [illegible] কিরূপ ভাবোদয় হইল বলা শক্ত, তাহাকে ঊর্দ্ধস্বরে ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিল। আমি ভাবিলাম, এখনি ঝুলি ঘাড়ে একটা আপ

আসিয়া উপস্থিত হইবে, আমার সপ্তদশ পরিচ্ছেদ আর শেষ হইবে না।

কিন্তু মিনির চীৎকারে যেমনি কাবুলিওয়ালা হাসিয়া মুখ ফিরাইল এবং আমাদের বাড়ির দিকে আসিতে লাগিল, অমনি সে উর্দ্ধশ্বাসে অন্তঃপুরে দৌড় দিল, তাহার আর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার মনের মধ্যে একটা অন্ধ বিশ্বাসের মত ছিল যে ঐ ঝুলিটার ভিতরে সন্ধান করিলে তাহার মত ছটো চারটে জীবিত মানবসন্তান পাওয়া যাইতে পারে।

এদিকে কাবুলিওয়ালা আসিয়া সহাস্যে আমাকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল—আমি ভাবিলাম, যদিচ প্রতাপ সিংহ এবং কাঞ্চনমালার অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন,তথাপি লোকটাকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়া তাহার কাছ হইতে কিছু না কেনাটা ভাল হয় না।

কিছু কেনা গেল। তাহার পর পাঁচটা কথা আসিয়া পড়িল। আবদর রহমান, রুষ, ইংরাজ প্রভৃতিকে লইয়া সীমান্তরক্ষানীতি সম্বন্ধে গল্প চলিতে লাগিল।

অবশেষে উঠিয়া যাইবার সময় সে জিজ্ঞাসা করিল,বাবু, তোমার লড়কী কোথা গেল।

আমি মিনির অমূলক ভয় ভাঙ্গাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে অন্তঃপুর হইতে ডাকাইয়া আনিলাম—সে আমার গা ঘেষিয়া কাবুলির মুখ এবং ঝুলির দিকে সন্দিগ্ধনেত্রক্ষেপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কাবুলি ঝুলির মধ্য হইতে কিস্‌মিস্ খোবানি বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেল, সে কিছুতেই লইল না, দ্বিগুণ সন্দেহের সহিত আমার হাঁটুর কাছে সংলগ্ন হইয়া রহিল। প্রথম পরিচয়টা এমনি ভাবে গেল।

কিছুদিন পরে একদিন সকাল বেলায় আবশ্যকবশতঃ বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় দেখি, আমার দুহিতাটি দ্বারের সমীপস্থ বেঞ্চির উপর বসিয়া অনর্গল কথা কহিয়া যাইতেছে এবং কাবুলিওয়ালা তাহার পদতলে বসিয়া সহাস্য মুখে শুনিতেছে এবং মধ্যেমধ্যে প্রসঙ্গক্রমে নিজের মতামতও দো-আঁস্‌লা বাঙ্গালায় ব্যক্ত করিতেছে। মিনির পঞ্চবর্ষীয় জীবনের অভিজ্ঞতায় বাবা ছাড়া এমন ধৈর্য্যবান্ শ্রোতা সে কখনো পায় নাই। আবার দেখি, তাহার ক্ষুদ্র আঁচল বাদাম কিস্‌মিসে পরিপূর্ণ। আমি কাবুলিওয়ালাকে কহিলাম, উহাকে এ সব কেন দিয়াছ? অমন আর দিয়োনা। বলিয়া পকেট হইতে একটা আধুলি লইয়া তাহাকে দিলাম। সে অসঙ্কোচে আধুলি গ্রহণ করিয়া ঝুলিতে পুরিল।

বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, সেই আধুলিটি লইয়া ষোল আনা গোলযোগ বাধিয়া গেছে।

মিনির মা একটা শ্বেত চক্‌চকে গোলাকার পদার্থ লইয়া ভর্ৎসনায় স্বরে মিনিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,"তুই এ আধুলি কোথায় পেলি?"

মিনি বলিতেছে "কাবুলিওয়ালা দিয়েছে।"

তাহার মা বলিতেছেন ',কাবুলিওয়ালার কাছ হইতে আধুলি তুই কেন নিতে গেলি!"

মিনি ক্রন্দনের উপক্রম করিয়া কহিল, "আমি চাইনি,সে আপনি দিল!"

আমি আসিয়া মিনিকে তাহার আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া বাহিরে লইয়া গেলাম।

সংবাদ পাইলাম, কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির এই যে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ তাহা নহে, ইতিমধ্যে সে প্রায় প্রত্যহ আসিয়া পেস্তা বাদাম ঘুষ দিয়া মিনির ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু অনেকটা অধিকার করিয়া লইয়াছে।

দেখিলাম, এই ছুটি বন্ধুর মধ্যে গুটিকতক বাঁধা কথা এবং ঠাট্টা প্রচলিত আছে—যথা,রহমৎকে দেখিবামাত্র আমার কন্যা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিত "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা, তোমার ও ঝুলির ভিতর কি?"

রহমৎ একটা অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া হাসিতে হাসিতে উত্তর করিত "হাঁতি।" অর্থাৎ তাহার ঝুলির ভিতরে যে একটা হস্তী আছে এইটেই তাহার পরিহাসের সূক্ষ্ম মর্ম্ম।—খুব যে বেশী সূক্ষ্ম তাহা বলা যায় না, তথাপ এই পরিহাসে উভয়েই বেশ একটু কৌতুক অনুভব করিত—এবং শরৎকালের প্রভাতে একটি বয়স্ক এবং একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর সরল হাস্য দেখিয়া আমারও বেশ লাগত।

উহাদের মধ্যে আরো একটা কথা প্রচলিত ছিল। রহমৎ মিনিকে বলিত "খোকী, তোমি সসুর-বাড়ি কখুনু যাবে না!"

বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে আজন্মকাল "শ্বশুর-বাড়" শব্দটার সহিত পরিচিত, কিন্তু আমরা কিছু এ-কেলে ধরণের লোক হওয়াতে শিশু মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে সজ্ঞান করিয়া তোলা হয় নাই। এই জন্য রহমতের অনুরোধটা সে পরিষ্কার বুঝিতে পারিত না, অথচ কথাটার একট কোন জবাব না দিয়া চুপ করিয়া থাকা নিতান্ত তাহার স্বভাববিরুদ্ধ, সে উল্টিয়া জিজ্ঞসা করিত "তুমি শ্বশুর-বাড়ি যাবে?"

রহমৎ কাল্পনিক শ্বশুরের প্রতি প্রকাণ্ড মোটা মুষ্টি আস্ফালন করিয়া বলিত "হামি সসুরকে মারবে।"

শুনিয়া মিনি শ্বশুর নামক কোন এক অপরিচিত জীবের দুরবস্থা কল্পনা করিয়া অত্যন্ত হাসিত।

এখন শুভ্র শরৎকাল। প্রাচীনকালে এই সময়েই রাজারা দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন। আমি কলিকাতা ছাড়িয়া কখন কোথাও যাই নাই, কিন্তু সেই জন্যই আমার মনটা পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়ায়। আমি যেন আমার ঘরের কোণে চিরপ্রবাসী, বাহিরের পৃথিবীর জন্য আমার সর্ব্বদা মন কেমন করে। একটা বিদেশের নাম শুনিলেই অমনি আমার চিত্ত ছুটিয়া যায়, তেমন বিদেশী লোক দেখিলেই অমনি নদী পর্ব্বত অরণ্যের মধ্যে একটা কুটিরের দৃশ্য মনে উদয় হয়, এবং একটা উল্লাসপূর্ণ স্বাধীন জীবনযাত্রার কথা কল্পনায় জাগিয়া উঠে।

এদিকে আবার আমি এমনি উদ্ভিজ্জ প্রকৃতি যে আমার কোণটুকু ছাড়িয়া একবার বাহির হইতে গেলে মাথায় বজ্রাঘাত হয়। এই জন্য সকালবেলায় আমার ছোট ঘরে টেবিলের সাম্নে বসিয়া এই কাবুলির সঙ্গে গল্প করিয়া আমার অনেকটা ভ্রমণের কাজ হইত। দুইধারে বন্ধুর দুর্গম দগ্ধ রক্তবর্ণ উচ্চ গিরিশ্রেণী, মধ্যে সঙ্কীর্ণ মরুপথ, বোঝাই-করা উষ্ট্রের শ্রেণী চলিয়াছে; পাগ্‌ড়ি-পরা বণিক ও পথিকেরা কেহ বা উটের পরে কেহ বা পদব্রজে, কাহারো হাতে বর্শা, কাহারো হাতে সেকেলে চক্‌মকি-ঠোকা বন্দুক; কাবুলি মেঘমন্দ্রস্বরে ভাঙ্গা বাঙ্গালায় স্বদেশের গল্প করিত, আর এই ছবি আমার চখের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইত।

মিনির মা অত্যন্ত শঙ্কিতস্বভাবের লোক। রাস্তায় একটা শব্দ শুনিলেই তাঁহার মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত মাতাল আমাদের বাড়িটাই বিশেষ লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। এই পৃথিবীটা যে সর্ব্বত্রই চোর ডাকাত মাতাল সাপ বাঘ ম্যালেরিয়া শুঁয়াপোকা আরসোলা এবং গোরার দ্বারা পরিপূর্ণ, এত দিন (খুব বেশী দিন নহে) পৃথিবীতে বাস করিয়াও সে বিভীষিকা তাঁহার মন হইতে দূর হইয়া যায় নাই।

রহমৎ কাবুলিওয়ালা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসংশয় ছিলেন না। তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য তিনি আমাকে বারবার অনুরোধ করিয়াছেন। আমি তাঁহার সন্দেহ হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলে তিনি পর্য্যায়ক্রমে আমাকে গুটিকতক প্রশ্ন করিলেন—কখনো কি কাহারো ছেলে চুরি যায় না? কাবুলদেশে কি

দাস-ব্যবসায় প্রচলিত নাই? এক জন প্রকাণ্ড কাবুলির পক্ষে একটি ছোট ছেলে চুরি করিয়া লইয়া যাওয়া কি একেবারেই অসম্ভব?

আমাকে মানিতে হইল ব্যাপারটা যে অসম্ভব তাহা নহে কিন্তু অবিশ্বাস্য। বিশ্বাস করিবার শক্তি সকলের সমান নহে, এই জন্য আমার স্ত্রীর মনে ভয় রহিয়া গেল। কিন্তু তাই বলিয়া বিনা দোষে রহমৎকে আমাদের বাড়িতে আসিতে নিষেধ করিতে পারিলাম না।

প্রতি বৎসর মাঘ মাসের মাঝামাঝি রহমৎ দেশে চলিয়া যায়। এই সময়টা সমস্ত পাওনার টাকা আদায় করিবার জন্য সে বড় ব্যস্ত থাকে। বাড়ি বাড়ি ফিরিতে হয় কিন্তু তবু একবার মিনিকে দর্শন দিয়া যায়। দেখিলে বাস্তবিক মনে হয় উভয়ের মধ্যে যেন একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে। সকালে যে দিন আসিতে পারে না, সে দিন দেখি সন্ধ্যার সময় আসিয়াছে; অন্ধকারে ঘরের কোণে সেই ঢিলেঢালা জামা-পায়জামা-পরা সেই ঝোলা-ঝুলিওয়ালা লম্বা লোকটাকে দেখিলে বাস্তবিক হঠাৎ মনের ভিতরে একটা আশঙ্কা উপস্থিত হয়।

কিন্তু যখন দেখি মিনি "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা" করিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আসে এবং দুই অসমবয়সী বন্ধুর মধ্যে পুরাতন সরল পরিহাস চলিতে থাকে তখন সমস্ত হৃদয় প্রসন্ন হইয়া উঠে।

একদিন সকালে আমার ছোট ঘরে বসিয়া প্রুফ শিট সংশোধন করিতেছি। বিদায় লইবার পূর্ব্বে আজ দুই তিন দিন হইতে শীতটা খুব কনকনে হইয়া উঠিয়াছে, চারিদিকে একেবারে হীহীকার পড়িয়া গেছে। জানালা ভেদ করিয়া সকালের রৌদ্রটি টেবিলের নীচে আমার পায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, সেই উত্তাপটুকু বেশ মধুর বোধ হইতেছে। বেলা বোধ করি আটটা হইবে—মাথায় গলাবন্দ জড়ানো ঊষাচরগণ প্রাতভ্রমণ সমাধা করিয়া প্রায় সকলে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে। এমন সময় রাস্তায় ভারি একটা গোল শুনা গেল।

চাহিয়া দেখি, আমাদের রহমৎকে দুই পাহারাওয়ালা বাঁধিয়া লইয়া আসিতেছে—তাহার পশ্চাতে কৌতূহলী ছেলের দল চলিয়াছে। রহমতের গাত্রবস্ত্রে রক্তচিহ্ন, এবং এক জন পাহারাওয়ালার হাতে রক্তাক্ত ছোরা। আমি দ্বারের বাহিরে গিয়া পাহারাওয়ালাকে দাঁড় করাইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম ব্যাপারটা কি?

কিয়দংশ তাহার কাছে কিয়দংশ রহমতের কাছে শুনিয়া জানিলাম যে আমাদের প্রতিবেশী একজন লোক রামপুরী চাদরের জন্য রহমতের কাছে কিঞ্চিৎ ধারিত—মিথ্যাপূর্ব্বক সেই দেনা সে অস্বীকার করে, এবং তাহাই লইয়া বচসা করিতে করিতে রহমৎ তাহাকে এক ছুরি বসাইয়া দিয়াছে।

রহমৎ সেই মিথ্যাবাদীর উদ্দেশে নানা রূপ অশ্রাব্যগালি দিতেছে এমন সময়ে "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা" করিয়া ডাকিতে ডাকিতে মিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রহমতের মুখ মুহূর্ত্তের মধ্যে কৌতুক হাস্যে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার স্কন্ধে আজ ঝুলি ছিল না সুতরাং ঝুলি সম্বন্ধে তাহাদের অভ্যস্ত আলোচনা হইতে পারিল না—মিনি একেবারেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি শ্বশুরবাড়ি যাবে?"

রহমৎ হাসিয়া কহিল "সিখানেই যাচ্চে!"

দেখিল উত্তরটা মিনির হাস্যজনক হইল না, তখন হাত দেখাইয়া বলিল—সম্বুরাকে মারিতাম কিন্তু কি করিব হাত বাঁধা।

সাংঘাতিক আঘাত করা অপরাধে কয়েক বৎসর রহমতের কারাদণ্ড হইল।

তাহার কথা একপ্রকার ভুলিয়া গেলাম।

আমরা যখন ঘরে বসিয়া চিরাভ্যস্তমত নিত্য কাজের মধ্যে দিনের পর দিন কাটাইতাম তখন একজন স্বাধীন পর্ব্বতচারী পুরুষ কারাপ্রাচীরের মধ্যে যে কেমন করিয়া বর্ষযাপন করিতেছে তাহা আমাদের মনেও উদয় হইত না।

আর, চঞ্চল-হৃদয়া মিনির আচরণ যে অত্যন্ত লজ্জাজনক তাহা তাহার বাপকেও স্বীকার করিতে হয়। সে স্বচ্ছন্দে তাহার পুরাতন বন্ধুকে বিস্মৃত হইয়া প্রথমে নবী সহিসের সহিত সখ্য স্থাপন করিল। পরে ক্রমে যত তাহার বয়স বাড়িয়া উঠিতে লাগিল ততই সখার পরিবর্ত্তে একটি একটি করিয়া সখী জুটিতে লাগিল। এমন কি এখন তাহার বাবার লিখিবার ঘরেও তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি ত তাহার সহিত এক প্রকার আড়ি করিয়াছি।

কত বৎসর কাটিয়া গেল। আর একটি শরৎকাল আসিয়াছে। আমার মিনির বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। পূজার ছুটির মধ্যেই তাহার বিবাহ হইবে। কৈলাসবাসিনীর সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘরের আনন্দময়ী পিতৃভবন অন্ধকার করিয়া পতিগৃহে যাত্রা করিবে।

প্রভাতটি অতি সুন্দর হইয়া উদয় হইয়াছে। বর্ষার পরে এই শরতের নূতনধৌত রৌদ্র যেন সোহাগায়-গলানো নির্ম্মল সোণার মত রং ধরিয়াছে। এমন কি, কলিকাতার গলির ভিতরকার ইষ্টক-জর্জ্জর অপরিচ্ছন্ন ঘেঁষাঘেঁষি বাড়িগুলার উপরেও এই রৌদ্রের আভা একটি অপরূপ লাবণ্য বিস্তার করিয়াছে।

আমার ঘরে আজ রাত্রিশেষ হইতে না হইতে সানাই বাজিতেছে। সে বাঁশি যেন আমার বুকের পঞ্জরের হাড়ের মধ্য হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাজিয়া উঠিতেছে। করুণ ভৈরবী রাগিণীতে আমার আসন্ন বিচ্ছেদব্যথাকে প্রভাতের রৌদ্রের সহিত সমস্ত বিশ্বজগৎময় ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে। আজ আমার মিনির বিবাহ।

সকাল হইতে ভারি গোলমাল, লোকজনের আনাগোনা। উঠানে বাঁশ বাঁধিয়া পাল খাটানো হইতেছে; বাড়ির ঘরেঘরে এবং বারান্দায় ঝাড় টাঙ্গাইবার ঠুংঠাং শব্দ উঠিতেছে; হাঁক-ডাকের সীমা নাই।

আমি আমার লিখিবার ঘরে বসিয়া হিসাব দেখিতেছি, এমন সময় রহমৎ আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

আমি প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। তাহার সে ঝুলি নাই, তাহার সে লম্বা চুল নাই, তাহার শরীরে পূর্ব্বের মত সে তেজ নাই। অবশেষে তাহার হাসি দেখিয়া তাহাকে চিনিলাম।

কহিলাম, কিরে রহমৎ, কবে আসিলি?

সে কহিল, কাল সন্ধ্যাবেলা জেল হইতে খালাস পাইয়াছি।

কথাটা শুনিয়া কেমন কানে খট্ করিয়া উঠিল। কোন খুনীকে কখন প্রত্যক্ষ দেখি নাই, ইহাকে দেখিয়া সমস্ত অন্তঃকরণ যেন সঙ্কুচিত হইয়া গেল। আমার ইচ্ছা করিতে লাগিল আজিকার এই শুভদিনে এ লোকটা এখান হইতে গেলেই ভাল হয়।

আমি তাহাকে কহিলাম, আজ আমাদের বাড়িতে একটা কাজ আছে আমি কিছু ব্যস্ত আছি, তুমি আজ যাও।—

কথাটা শুনিয়াই সে তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল, অবশেষে দরজার কাছে গিয়া একটু ইতস্তত করিয়া কহিল খোঁখীকে একবার দেখিতে পাইব না?

তাহার মনে বুঝি বিশ্বাস ছিল, মিনি সেই ভাবেই আছে। সে যেন মনে করিয়াছিল, মিনি আবার সেই পূর্ব্বের মত "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা" করিয়া ছুটিয়া আসিবে, তাহা-

বলিল "মায়াকান্না।" কিন্তু সেটা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

উইলের বৃত্তান্ত শুনিয়া নবদ্বীপের মা ছুটিয়া আসিয়া বিষম গোল বাধাইয়া দিল— বলিল—মরণকালে বুদ্ধিনাশ হয়। এমন সোণারচাঁদ ভাইপো থাকিতে—

রামকানাই যদিও স্ত্রীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন—এত অধিক যে তাহাকে ভাষান্তরে ভয় বলা যাইতে পারে—কিন্তু তিনি থাকিতে পারিলেন না—ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন মেজবৌ, তোমার ত বুদ্ধিনাশের সময় হয় নাই, তবে তোমার এমন ব্যবহার কেন? দাদা গেলেন, এখন আমি ত রহিয়া গেলাম, তোমার যা কিছু বক্তব্য আছে অবসরমত আমাকে বলিয়ো এখন ঠিক সময় নয়।—"

নবদ্বীপ সংবাদ পাইয়া যখন আসিল তখন তাহার জ্যাঠামহাশয়ের কাল হইয়াছে। নবদ্বীপ মৃত ব্যক্তিকে শাসাইয়া কহিল দেখিব মুখাগ্নি কে করে—এবং শ্রাদ্ধশান্তি যদি করি ত আমার নাম নবদ্বীপ নয়। গুরুচরণ লোকটা কিছুই মানিত না। সে ডফ সাহেবের ছাত্র ছিল। শাস্ত্রমতে যেটা সর্ব্বাপেক্ষা অখাদ্য সেইটাতে তার বিশেষ পরিতৃপ্তি ছিল। লোকে যদি তাহাকে ক্রীশ্চান বলিত সে জিভ কাটিয়া বলিত "রাম, আমি যদি ক্রীশ্চান হই ত গোমাংস খাই!" জীবিত অবস্থায় যাহার এই দশা, সদ্যোমৃত অবস্থায় সে যে পিণ্ডনাশ আশঙ্কায় কিছুমাত্র বিচলিত হইবে এমন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু উপস্থিতমত ইহা ছাড়া আর কোন প্রতিশোধের পথ ছিল না। নবদ্বীপ একটা সান্ত্বনা পাইল যে লোকটা পরকালে গিয়া মরিয়া থাকিবে। যতদিন ইহলোকে থাকা যায় জ্যাঠামহাশয়ের বিষয় না পাইলেও কোনক্রমে পেট চলিয়া যায় কিন্তু জ্যাঠা মহাশয় যে লোকে গেলেন সেখানে ভিক্ষা করিয়া পিণ্ড মেলে না। বাঁচিয়া থাকিবার অনেক সুবিধা আছে।

রামকানাই বরদাসুন্দরীর নিকট গিয়া বলিলেন "বৌ ঠাকুরাণি, দাদা তোমাকেই সমস্ত বিষয় দিয়া গিয়াছেন। এই তাঁহার উইল. লোহার সিন্দুকে যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দিয়ো।"

বিধবা তখন মুখে মুখে দীর্ঘপদ রচনা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতেছিলেন, দুই চারি জন দাসীও তাঁহার সহিত স্বর মিলাইয়া মধ্যে মধ্যে দুই চারিটা নূতন শব্দ যোজনা পূর্ব্বক শোকসঙ্গীতে সমস্ত পল্লীর নিদ্রা দূর করিতেছিল। মাঝে হইতে এই কাগজ খণ্ড আসিয়া এক প্রকার লয় ভঙ্গ হইয়া গেল এবং ভাবেরও পূর্ব্বাপর যোগ রহিল না। ব্যাপারটা নিম্নলিখিতমত অসংলগ্ন আকার ধারণ করিল—

"ওগো, আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল গো কি সর্ব্বনাশ হ'ল! আচ্ছা ঠাকুরপো লেখাটা কার? তোমার বুঝি? ওগো তেমন যত্ন ক'রে আমাকে আর কে দেখবে, আমার দিকে কে মুখ তুলে চাইবে গো! তোরা একটুকু থাম্, মেলা চেঁচাস্‌নে কথাটা শুনতে দে। ওগো আমি কেন আগে গেলুমনা গো—আমি কেন বেঁচে রইলুম! রামকানাই মনে মনে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "সে আমাদের কপালের দোষ!"

বাড়ি ফিরিয়া গিয়া নবদ্বীপের মা রামকানাইকে লইয়া পড়িলেন। বোঝাই গাড়ি সমেত খাদের মধ্যে পড়িয়া হতভাগ্য বলদ, গাড়োয়ানের সহস্র গুঁতা খাইয়াও অনেকক্ষণ যেমন নিরুপায় নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, রামকানাই তেমনি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া সহ্য করিলেন—অবশেষে কাতর স্বরে কহিলেন "আমার অপরাধ কি! আমিত দাদা নই!

নবদ্বীপের মা ফোঁস্ করিয়া উঠিয়া বলিলেন —"না, তুমি বড় ভাল মানুষ, তুমি কিছুই বোঝ না; দাদা বল্লেন লেখ, ভাই অমনি লিখে

গেলেন। তোমরা সবাই সমান! তুমিও সময়-কালে ওই কীর্ত্তি করবে বলে ব'সে আছ। আমি মলেই কোন পোড়ারমুখী ডাইনিকে ঘরে আনবে—আর আমার সোণারচাঁদ নবদ্বীপকে পাথারে ভাসাবে! কিন্তু সে জন্যে ভেবো না' আমি শীগ্‌গির মরচিনে।"

এইরূপে রামকানাইয়ের ভাবী অত্যাচার আলোচনা করিয়া গৃহিণী উত্তরোত্তর অধিকতর অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতে লাগিলেন। রামকানাই নিশ্চয় জানিতেন যদি এইসকল উৎকট কাল্পনিক আশঙ্কা নিবারণ উদ্দেশে ইহার তিলমাত্র প্রতিবাদ করেন তবে হিতে বিপরীত হইবে। এই ভয়ে অপরাধীর মত চুপ করিয়া রহিলেন—যেন কাজটা করিয়া ফেলিয়াছেন। যেন তিনি সুপাত্র নবদ্বীপকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহার ভাবী দ্বিতীয় পক্ষকে সমস্ত লিখিয়া দিয়া থুইয়া বসিয়া আছেন, এখন অপরাধ স্বীকার না করিয়া কোন গতি নাই।

ইতিমধ্যে নবদ্বীপ তাহার বুদ্ধিমান বন্ধুবর্গের সহিত অনেক পরামর্শ করিয়া মাকে আসিয়া বলিল, কোন ভাবনা নাই। এ বিষয় আমিই পাইব। কিছুদিনের মত বাবাকে এখান হইতে স্থানান্তরিত করা চাই। তিনি থাকিলে সমস্ত ভণ্ডুল হইয়া যাইবে। নবদ্বীপের বাবার বুদ্ধিশুদ্ধির প্রতি নবদ্বীপের মার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না সুতরাং কথাটা তাঁরও যুক্তিযুক্ত মনে হইল। অবশেষে মার তাড়নায় এই নিতান্ত অনাবশ্যক নির্ব্বোধ কর্ম্মনাশা বাবা একটা যেমন তেমন ছল করিয়া কিছুদিনের মত কাশীতে গিয়া আশ্রয় লইলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই বরদাসুন্দরী এবং নবদ্বীপচন্দ্র পরস্পরের নামে উইল জালের অভিযোগ করিয়া আদালতে গিয়া উপস্থিত হইল। নবদ্বীপ তাহার নিজের নামে যে উইলখানি বাহির করিয়াছে তাহাতে নাম সহি দেখিলে গুরুচরণের হস্তাক্ষর স্পষ্ট প্রমাণ হয়; উইলের দুই একজন নিঃস্বার্থ সাক্ষীও পাওয়া গিয়াছে। বরদাসুন্দরীর পক্ষে নবদ্বীপের বাপ একমাত্র সাক্ষী এবং সহি কাহারো বুঝিবার সাধ্য নাই। তাঁহার গৃহপোষ্য একটি মামাতো ভাই ছিল সে বলিল, দিদি তোমার ভাবনা নাই, আমি সাক্ষ্য দিব এবং আরও সাক্ষ্য জুটাইব।

ব্যাপারটা যখন সম্পূর্ণ পাকিয়া উঠিল তখন নবদ্বীপের মা নবদ্বীপের বাপকে কাশী হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অনুগত ভদ্রলোকটি ব্যাগ ও ছাতা হাতে যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এমন কি, কিঞ্চিৎ রসালাপ করিবারও চেষ্টা করিলেন—যোড়হস্তে সহাস্যে বলিলেন—"গোলাম হাজির, এখন মহারাণীর কি অনুমতি হয়?"

গৃহিণী মাথা নাড়িয়া বলিলেন "নেও, নেও, আর রঙ্গ করতে হবে না। এতদিন ছুতো করে কাশীতে কাটিয়ে এলেন একদিনের তরে ত মনে পড়েনি।" ইত্যাদি।

এইরূপে উভয় পক্ষে অনেকক্ষণ ধরিয়া পরস্পরের নামে আদরের অভিযোগ আনিতে লাগিলেন,—অবশেষে নালিশ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া জাতিতে গিয়া পৌঁছিল—নবদ্বীপের মা পুরুষের ভালবাসার সহিত মুসলমানের মুর্গি বাৎসল্যের তুলনা করিলেন, নবদ্বীপের বাপ বলিলেন, রমণীর মুখে মধু হৃদয়ে ক্ষুর—যদিও এই মৌখিক মধুরতার পরিচয় নবদ্বীপের বাপ কবে পাইলেন বলা শক্ত।

ইতিমধ্যে রামকানাই সহসা আদালত হইতে এক সাক্ষীর সপিনা পাইলেন। অবাক্ হইয়া যখন তাহার মর্ম্মগ্রহণের চেষ্টা করিতেছেন তখন নবদ্বীপের মা আসিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিলেন। বলিলেন হাড়জ্বালানী ডাকিনী কেবল যে বাছা নবদ্বীপকে তাহার স্নেহশীল জ্যাঠার ন্যায্য উত্তরাধিকার হইতে

বঞ্চিত করিতে চায় তাহা নহে, আবার সোণার ছেলেকে জেলে পাঠাইবার আয়োজন করিতেছে।

অবশেষে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ব্যাপারটা অনুমান করিয়া লইয়া রামকানাইয়ের চক্ষুস্থির হইয়া গেল। উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন "তোরা এ কি সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্।" গৃহিণী ক্রমে নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন—"কেন, এতে নবদ্বীপের দোষ হয়েচে কি? সে তার জ্যাঠার বিষয় নেবে না! অমনি এক কথায় ছেড়ে দেবে!"

কোথা হইতে এক চক্ষুখাদিকা, ভর্ত্তার পরমায়ুহন্ত্রী, অষ্টকুষ্ঠীর পুত্রী উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিবে ইহা কোন সৎকুলপ্রদীপ কনকচন্দ্র সন্তান সহ্য করিতে পারে? যদি বা মরণকালে এবং ডাকিনীর মন্ত্রগুণে কোন এক মূঢ়মতি জ্যেষ্ঠতাতের বুদ্ধিভ্রম হইয়া থাকে, তবে সুবর্ণময় ভ্রাতুষ্পুত্র সে ভ্রম নিজহস্তে সংশোধন করিয়া লইলে এমন কি অন্যায় কার্য্য হয়!

হতবুদ্ধি রামকানাই যখন দেখিলেন তাঁহার স্ত্রীপুত্র উভয়ে মিলিয়া কখন বা তর্জ্জন গর্জ্জন কখন বা অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন তখন ললাটে করাঘাত করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন—আহার ত্যাগ করিলেন, জল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিলেন না।

এইরূপ দুই দিন নীরবে অনাহারে কাটিয়া গেল। মকদ্দমার দিন উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে নবদ্বীপ বরদাসুন্দরীর মামাতো ভাইটিকে ভয় প্রলোভন দেখাইয়া এমনি বশ করিয়া লইয়াছে যে, সে অনায়াসে নবদ্বীপের পক্ষে সাক্ষ্য দিল। জয়শ্রী যখন বরদাসুন্দরীকে ত্যাগ করিয়া অন্যপক্ষে যাইবার আয়োজন করিতেছে, তখন রামকানাইকে ডাক পড়িল।

অনাহারে মৃতপ্রায় শুষ্কওষ্ঠ শুষ্করসনা বৃদ্ধ কম্পিত শীর্ণ অঙ্গুলি দিয়া সাক্ষ্যমঞ্চের কাঠগড়া চাপিয়া ধরিলেন। চতুর বারিষ্টার অত্যন্ত কৌশলে কথা বাহির করিয়া লইবার জন্য জে[রা] করিতে আরম্ভ করিলেন—বহুদূর হইতে আরম্ভ করিয়া সাবধানে অতিধীর বক্রগতি[তে] প্রসঙ্গের নিকটবর্ত্তী হইবার উদ্যোগ করি[তে] লাগিলেন।

তখন রামকানাই জজের দিকে ফিরি[য়া] যোড়হস্তে কহিলেন "হুজুর, আমি বৃদ্ধ, অ[ত্যন্ত] দুর্ব্বল। অধিক কথা কহিবার সামর্থ্য নাই। আমার যা বলিবার সংক্ষেপে বলিয়া লই। আমার দাদা স্বর্গীয় গুরুচরণ চক্রবর্ত্তী মৃত্যুকা[লে] সমস্ত বিষয় সম্পত্তি তাঁহার পত্নী শ্রীমতী বরদা-সুন্দরীকে উইল করিয়া দিয়া যান। সে উই[ল] আমি নিজহস্তে লিখিয়াছি এবং দাদা নি[জ]হস্তে স্বাক্ষর করিয়াছেন। আমার পুত্র ন[ব]দ্বীপচন্দ্র যে উইল দাখিল করিয়াছেন তা[হা] মিথ্যা!" এই বলিয়া রামকানাই কাঁপি[তে] কাঁপিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

চতুর ব্যারিষ্টর সকৌতুকে পার্শ্ববর্ত্তী অ্যাট[র্ণি]দিকে বলিলেন, বাই জোভ্! লোকটাকে কেমন ঠেসে ধরে ছিলুম?

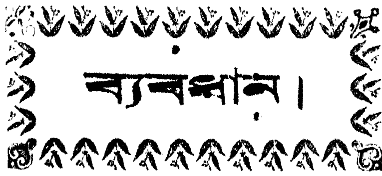
মামাতো ভাই ছুটিয়া দিদিকে গিয়া বলি[ল] —"বুড়ো সমস্ত মাটী করিয়াছিল—আমা[র] সাক্ষ্যে মকদ্দমা রক্ষা পায়।"

দিদি বলিলেন "বটে? লোক কে চিন্[তে] পারে! আমি বুড়াকে ভাল বলে জানতুম!"

কারাবরুদ্ধ নবদ্বীপের বুদ্ধিমান বন্ধুরা অনেক ভাবিয়া স্থির করিল "নিশ্চয়ই বৃদ্ধ ভ[য়ে] এই কাজ করিয়া ফেলিয়াছে। সাক্ষীর বাক্[সের] মধ্যে উঠিয়া বুড়া বুদ্ধি ঠিক রাখিতে পা[রে] নাই। এমনতর আস্ত নির্ব্বোধ সমস্ত সহ[রে] খুঁজিলে মিলে না!"

গৃহে ফিরিয়া আসিয়া রামকানাইয়ের কঠিন বিকার জ্বর উপস্থিত হইল। প্রলাপে পুত্রের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে এই

নং র্ব্বোধ, সর্ব্বকর্ম্মপণ্ডকারী নবদ্বীপের অনা-
শুক বাপ পৃথিবী হইতে অপসৃত হইয়া গেল
—আত্মীয়দের মধ্যে কেহ কেহ কহিল আর
ছুদিন পূর্ব্বে গেলেই ভাল হইত—কিন্তু
াহাদের নাম করিতে চাহি না।



সম্পর্ক মিলাইয়া দেখিতে গেলে বনমালী
বং হিমাংশুমালী উভয়ে মামাতো পিসতুতো
াই; সেও অনেক হিসাব করিয়া দেখিলে
বে মেলে। কিন্তু ইহাদের দুই পরিবার
চকাল হইতে প্রতিবেশী, মাঝে কেবল
কটা বাগানের ব্যবধান, এই জন্য ইহাদের
ম্পর্ক নিতান্ত নিকট না হইলেও ঘনিষ্ঠতার
ভাব নাই।

বনমালী হিমাংশুর চেয়ে অনেক বড়।
িমাংশুর যখন দন্ত এবং বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় নাই,
খন বনমালী তাহাকে কোলে করিয়া এই
াগানে সকালে সন্ধ্যায় হাওয়া খাওয়াইয়াছে,
েলা করিয়াছে, কান্না থামাইয়াছে, ঘুম পাড়া-
য়াছে এবং শিশুর মনোরঞ্জন করিবার জন্য
রিণতবুদ্ধি বয়স্ক লোকদিগকে সবেগে শির-
ালন, তারস্বরে প্রলাপভাষণ প্রভৃতি যে
কল বয়সানুচিত চাপল্য এবং উৎকট উদ্যম
্রকাশ করিতে হয় বনমালী তাহাও করিতে
্রুটি করেন নাই।

বনমালী লেখাপড়া বড় একটা কিছু করে
াই। তাহার বাগানের সখ ছিল এবং এই
র সম্পর্কের ছোট ভাইটি ছিল। ইহাকে
খুব একটি দুর্লভ দুর্ম্মূল লতার মত বনমালী
হৃদয়ের সমস্ত স্নেহসিঞ্চন করিয়া পালন করি-
তেছিল এবং সে যখন তাহার সমস্ত অন্তর
বাহিরকে আচ্ছন্ন করিয়া লতাইয়া উঠিতে
লাগিল তখন বনমালী আপনাকে ধন্য জ্ঞান
করিল।

এমন সচরাচর দেখা যায় না কিন্তু এক
একটি স্বভাব আছে যে একটি ছোট খেয়াল
কিংবা একটি ছোট শিশু কিংবা একটি অকৃতজ্ঞ
বন্ধুর নিকটে অতি সহজে আপনাকে সম্পূর্ণ
বিসর্জ্জন করে; এই বিপুল পৃথিবীতে একটি
মাত্র ছোট স্নেহের কারবারে জীবনের সমস্ত
মূলধন সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, তারপরে
হয় ত সামান্য উপস্বত্বে পরম সন্তোষে জীবন
কাটাইয়া দেয় কিংবা সহসা একদিন প্রভাতে
সমস্ত ঘরবাড়ি বিক্রয় করিয়া কাঙাল হইয়া
পথে গিয়া দাঁড়ায়।

হিমাংশুর বয়স যখন আর একটু বাড়িল
তখন বয়স এবং সম্পর্কের বিস্তর তারতম্যসত্ত্বেও
বনমালীর সহিত তাহার যেন একটি বন্ধুত্বের
বন্ধন স্থাপিত হইল। উভয়ের মধ্যে যেন
ছোট বড় কিছু ছিল না।

এরূপ হইবার একটু কারণও ছিল। হিমাংশু
লেখাপড়া করিত এবং স্বভাবতই তাহার
জ্ঞানস্পৃহা অত্যন্ত প্রবল ছিল। বই পাইলেই
পড়িতে বসিত, তাহাতে অনেক বাজে বই
পড়া হইয়াছিল বটে কিন্তু যেমন করিয়াই
হৌক চারিদিকেই তাহার মনের একটি পরি-
ণতি সাধন হইয়াছিল। বনমালী বিশেষ
একটু শ্রদ্ধার সহিত তাহার কথা শুনিত,
তাহার পরামর্শ লইত, তাহার সহিত ছোট
বড় সকল কথার আলোচনা করিত, কোন
বিষয়েই তাহাকে বালক বলিয়া অগ্রাহ্য করিত
না। হৃদয়ের সর্ব্ব প্রথম স্নেহরস দিয়া যাহাকে
মানুষ করা গিয়াছে, বয়সকালে যদি সে বুদ্ধি,

জ্ঞান এবং উন্নত স্বভাবের জন্য শ্রদ্ধার অধিকারী হয় তবে তাহার মত এমন পরম প্রিয়বস্তু পৃথিবীতে আর পাওয়া যায় না।

বাগানের সখও হিমাংশুর ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে প্রভেদ ছিল। বনমালীর ছিল হৃদয়ের সখ হিমাংশুর ছিল বুদ্ধির সখ। পৃথিবীর এই কোমল গাছপালাগুলি, এই অচেতন জীবন রাশি, যাহারা যত্নের কোন লালসা রাখে না অথচ যত্ন পাইলে ঘরের ছেলেগুলির মত বাড়িয়া উঠে, যাহারা মানুষের শিশুর চেয়েও শিশু, তাহাদিগকে সযত্নে মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য বনমালীর একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ছিল। কিন্তু হিমাংশুর গাছপালার প্রতি একটি কৌতূহল দৃষ্টি ছিল। অঙ্কুর গজাইয়া উঠে কিশলয় গজাইয়া দেখা দেয়, কুঁড়ি ধরে ফুল ফুটিয়া উঠে ইহাতে তাহার একান্ত মনোযোগ আকর্ষণ করিত।

গাছের বীজ বপন, কলম করা, সার দেওয়া, চান্‌কা তৈয়ারি প্রভৃতি সম্বন্ধে হিমাংশুর মাথায় বিবিধ পরামর্শের উদয় হইত এবং বনমালী অত্যন্ত আনন্দের সহিত তাহা গ্রহণ করিত। এই উদ্যানখণ্ডটুকু লইয়া আকৃতি প্রকৃতির যতপ্রকার সংযোগ বিয়োগ সম্ভব তাহা উভয়ে মিলিয়া সাধন করিত।

দ্বারের সম্মুখে বাগানের উপরেই একটি বাঁধানো বেদীর মত ছিল। চারটে বাজিলেই একটী পাতলা জামা পরিয়া, একটি কোঁচানো চাদর কাঁধের উপর ফেলিয়া গুড়গুড়ি লইয়া বনমালী সেইখানে ছায়ায় গিয়া বসিত। কোন বন্ধুবান্ধব নাই, হাতে একখানি বই কিংবা খবরের কাগজ নাই। বসিয়া বসিয়া তামাক টানিত, এবং আড়চক্ষে উদাসীনভাবে কখন বা দক্ষিণে কখন বা বামে দৃষ্টিপাত করিত। এমনি করিয়া সময় তাহার গুড়গুড়ির বাষ্পকুণ্ডলীর মত ধীরে ধীরে অত্যন্ত লঘুভাবে উড়িয়া যাইত, ভাঙ্গিয়া যাইত, মিলাইয়া যাইত, কোথাও কোন চিহ্ন রাখিত না।

অবশেষে যখন হিমাংশু স্কুল হইতে ফিরিয়া জল খাইয়া হাত মুখ ধুইয়া দেখা দিত, তখন তাড়াতাড়ি গুড়গুড়ির নল ফেলিয়া বনমালী উঠিয়া পড়িত। তখনি তাহার আগ্রহ দেখিয়া বুঝা যাইত এতক্ষণ ধৈর্য্যসহকারে সে কাহার প্রত্যাশায় বসিয়া ছিল।

তাহার পরে দুইজনে বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে কথা। অন্ধকার হইয়া আসিলে দুই জনে বেঞ্চের উপর বসিত দক্ষিণের বাতাস গাছের পাতা মর্ম্মরিত করিয়া বহিয়া যাইত; কোন দিন বা বাতাস বহিত না, গাছপালাগুলি ছবির মত স্থির দাঁড়াইয়া রহিত, মাথার উপরে আকাশ ভরিয়া তারাগুলি জ্বলিতে থাকিত।

হিমাংশু কথা কহিত বনমালী চুপ করিয়া শুনিত। যাহা বুঝিত না তাহাও তার ভাল লাগিত; যে সকল কথা আর কাহারো নিকট হইতে অত্যন্ত বিরক্তিজনক লাগিতে পারিত সেই কথাই হিমাংশুর মুখে বড় কৌতুকের মনে হইত। এমন শ্রদ্ধাবান্ বয়স্ক শ্রোতা পাইয়া হিমাংশুর বক্তৃতাশক্তি, স্মৃতিশক্তি, কল্পনাশক্তির সবিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ হইত। সে কতক বা পড়িয়া বলিত, কতক বা ভাবিয়া বলিত, কতক বা উপস্থিতমত তাহার মাথায় যোগাইত এবং অনেক সময়ে কল্পনার সহায়তায় জ্ঞানের অভাব ঢাকা দিয়া লইত। অনেক ঠিক কথা বলিত অনেক বেঠিক কথাও বলিত কিন্তু বনমালী গম্ভীরভাবে শুনিত, মাঝে মাঝে দুটো একটা কথা বলিত, হিমাংশু তাহার প্রতিবাদ করিয়া যাহা বুঝাইত তাহাই বুঝিত এবং তাহার পরদিন ছায়ায় বসিয়া গুড়গুড়ি টানিতে টানিতে সেই সুকর্ণ কথা অনেকক্ষণ ধরিয়া বিস্ময়ের সহিত চিন্তা করিত।

ইতিমধ্যে এক গোল বাধিল। বনমালী-

দের বাগান এবং হিমাংশুদের বাড়ির মাঝ-খানে জল যাইবার একটি নালা আছে। সেই নালার এক জায়গায় একটি পাতিনেবুর গাছ জন্মিয়াছে। সেই গাছে যখন ফল ধরে তখন বনমালীদের চাকর তাহা পাড়িতে চেষ্টা করে এবং হিমাংশুদের চাকর তাহা নিবারণ করে এবং উভয় পক্ষে যে গালাগালি বর্ষিত হয় তাহাতে যদি কিছুমাত্র বস্তু থাকিত তাহা হইলে সমস্ত নালা ভরাট হইয়া যাইত।

মাঝে হইতে বনমালীর বাপ হরচন্দ্র এবং হিমাংশুমালীর বাপ গোকুলচন্দ্রের মধ্যে তাহাই লইয়া ঘোর বিবাদ বাধিয়া গেল। দুই পক্ষে নালার দখল লইয়া আদালতে হাজির।

উকীল ব্যারিষ্টরদের মধ্যে যতগুলি মহা-রথী ছিল সকলেই অন্যতর পক্ষ অবলম্বন করিয়া সুদীর্ঘ বাক্‌যুদ্ধ আরম্ভ করিল। উভয় পক্ষের যে টাকাটা খরচ হইয়া গেল ভাদ্রের প্লাবনেও উক্ত নালা দিয়া এত জল কখনো বহে নাই।

শেষকালে হরচন্দ্রের জিত হইল; প্রমাণ হইয়া গেল নালা তাহারি, এবং পাতিনেবুতে আর কাহারো কোন অধিকার নাই। আপীল হইল কিন্তু নালা এবং পাতিনেবু হরচন্দ্রেরই রহিল।

যতদিন মকদ্দমা চলিতেছিল দুই ভায়ের বন্ধুত্বে কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই। এমন কি, পাছে বিবাদের ছায়া পরস্পরকে স্পর্শ করে এই আশঙ্কায় কাতর হইয়া বনমালী দ্বিগুণ ঘনিষ্ঠভাবে হিমাংশুকে হৃদয়ের কাছে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিত, হিমাংশুও লেশ-মাত্র বিমুখভাব প্রকাশ করিত না।

যে দিন আদালতে হরচন্দ্রের জিত হইল, সে দিন বাড়িতে বিশেষতঃ অন্তঃপুরে পরম উল্লাস পড়িয়া গেল; কেবল বনমালীর চক্ষে ঘুম রহিল না। তাহার পরদিন অপরাহ্ণে সে এমন ম্লানমুখে সেই বাগানের বেদীতে গিয়া বসিল যেন পৃথিবীতে আর কাহারো কিছু হয় নাই কেবল তাহারই একটা মস্ত হার হইয়া গেছে।

সে দিন সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, ছয়টা বাজিয়া গেল কিন্তু হিমাংশু আসিল না। বনমালী একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া হিমাংশুদের বাড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল। খোলা জানালার ভিতর দিয়া দেখিতে পাইল আলনার উপরে হিমাংশুর স্কুলের ছাড়া কাপড় ঝুলিতেছে; অনেকগুলি চিরপরিচিত লক্ষণ মিলাইয়া দেখিল হিমাংশু বাড়িতে আছে। গুড়গুড়ির নল ফেলিয়া দিয়া বিষণ্ণ মুখে বেড়াইতে লাগিল এবং সহস্রবার সেই বাতায়নের দিকে চাহিল কিন্তু হিমাংশু বাগানে আসিল না।

সন্ধ্যার আলো জ্বলিলে বনমালী ধীরে ধীরে হিমাংশুর বাড়িতে গেল।

গোকুলচন্দ্র দ্বারের কাছে বসিয়া তপ্তদেহে হাওয়া লাগাইতে ছিলেন। তিনি বলিলেন "কেও!"

বনমালী চমকিয়া উঠিল। যেন সে চুরি করিতে আসিয়া ধরা পড়িয়াছে।

কম্পিতকণ্ঠে বলিল "মামা আমি!"

মামা বলিলেন "কাহাকে খুঁজিতে আসি-য়াছ বাড়িতে কেহ নাই।"

বনমালী আবার বাগানে ফিরিয়া আসিয়া চুপ করিয়া বসিল।

যত রাত হইতে লাগিল দেখিল হিমাংশু-দের বাড়ির জানালাগুলি একে একে বন্ধ হইয়া গেল; দরজার ফাঁক দিয়া যে দীপা-লোকরেখা দেখা যাইতেছিল তাহাও ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি নিবিয়া গেল। অন্ধকার রাত্রে বন-মালীর মনে হইল হিমাংশুদের বাড়ির সমুদায় দ্বার তাহারই নিকট রুদ্ধ হইয়া গেল, সে কেবল বাহিরের অন্ধকারে একলা পড়িয়া রহিল।

আবার তাহার পরদিন বাগানে আসিয়া বসিল. মনে করিল আজ হয় ত আসিতেও

পারে। যে বহুকাল হইতে প্রতিদিন আসিত সে যে একদিনও আসিবে না এ কথা সে কিছুতেই মনে করিতে পারিল না। কখন মনে করে নাই এ বন্ধন কিছুতেই ছিঁড়িবে; এমন নিশ্চিন্ত মনে থাকিত যে জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখ কখন্ সেই বন্ধনে ধরা দিয়াছে তাহা সে জানিতেও পারে নহে। আজ সহসা জানিল সেই বন্ধন ছিঁড়িয়াছে কিন্তু এক মুহূর্ত্তে যে তাহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে তাহা সে কিছুতেই অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতে পারিল না।

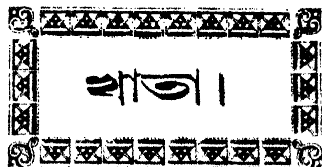
প্রতিদিন যথাসময়ে বাগানে বসিত যদি দৈবক্রমে আসে! কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য, যাহা নিয়মক্রমে প্রত্যহ ঘটিত তাহা দৈবক্রমেও এক দিন ঘটিল না।

রবিবার দিন ভাবিল পূর্ব্ব নিয়মমত আজও হিমাংশু সকালে আমাদের এখানে খাইতে আসিবে। ঠিক যে বিশ্বাস করিল তাহা নয় কিন্তু তবু আশা ছাড়িতে পারিল না। সকাল আসিল সে আসিল না।

তখন বনমালী বলিল "তবে আহার করিয়া আসিবে"। আহার করিয়া আসিল না। বনমালী ভাবিল "আজ বোধ হয় আহার করিয়া ঘুমাইতেছে। ঘুম ভাঙ্গিলেই আসিবে"। ঘুম কখন ভাঙ্গিল জানি না কিন্তু আসিল না।

আবার সেই সন্ধ্যা হইল রাত্রি আসিল, হিমাংশুদের দ্বার একে একে রুদ্ধ হইল, আলোগুলি একে একে নিবিয়া গেল।

এমনি করিয়া সোমবার হইতে রবিবার পর্য্যন্ত সপ্তাহের সাতটা দিনই যখন দুরদৃষ্ট তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইল আশাকে আশ্রয় দিবার জন্ত যখন আর একটা দিনও বাকি রহিল না, তখন হিমাংশুদের রুদ্ধদ্বার অট্টালিকার দিকে তাহার অশ্রুজলপূর্ণ দুটি কাতরচক্ষু বড় একটা মর্ম্মভেদী অভিমানের নালিশ পাঠাইয়া দিল এবং জীবনের সমস্ত বেদনাকে একটিমাত্র আর্ত্তস্বরের মধ্যে সংহত করিয়া বলিল "ে দয়াময়!"



খাতা।

লিখিতে শিখিয়া অবধি উমা বিষম উ দ্র আরম্ভ করিয়াছে। বাড়ির প্রত্যেক ঘরে দেয়ালে কয়লা দিয়া বাঁকা লাইন কাটিয়া বড়ব কাঁচা অক্ষরে কেবলি লিখিতেছে জল পে পাতা নড়ে।

তাহার বৌঠাকুরাণীর বালিশের নীচে হরি দাসের গুপ্তকথা ছিল, সেটা সন্ধান করি বাহির করিয়া তাহার পাতায় পাতায় পেন্সি দিয়া লিখিয়াছে কাল জল, লাল ফল।

বাড়ির সর্ব্বদা-ব্যবহার্য্য নূতন পঞ্জিকা হইতে অধিকাংশ তিথি নক্ষত্র খুব বড় বড় অক্ষরে এ প্রকার লুপ্ত করিয়া দিয়াছে।

বাবার দৈনিক হিসাবের খাতায় জমাখর চের মাঝখানে লিখিয়া রাখিয়াছে "লেখাপড় করে যেই, গাড়িঘোড়া চড়ে সেই।"

এ প্রকার সাহিত্যচর্চ্চায় এ পর্য্যন্ত ে কোন প্রকার বাধা পায় নাই, অবশেষে একদি একটা গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটিল।

উমার দাদা গোবিন্দলাল দেখিতে অত্য নিরীহ, কিন্তু সে খবরের কাগজে সর্ব্বদা লিখিয়া থাকে। তাহার কথাবার্ত্তা শুনি তাহার আত্মীয় স্বজন কিংবা তাহার পরি চিত প্রতিবেশীরা কেহ তাহাকে চিন্তাশী বলিয়া কখন সন্দেহ করে না। এবং বাস্তবিক

যে কোন বিষয়ে কখনও চিন্তা করে ন অপবাদ তাহাকে দেওয়া যায় না। কিন্তু লেখে; এবং বাঙ্গালার অধিকাংশ পাঠকের ঙ্গ তার মতের সম্পূর্ণ ঐক্য হয়।

শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকমণ্ড-র মধ্যে কতকগুলি গুরুতর ভ্রম প্রচলিত াছে, সে গুলি গোবিন্দলাল যুক্তির কোন াহায্য অবলম্বন না করিয়াও কেবল মাত্র ামাঞ্চজনক ভাষার প্রভাবে সতেজে খণ্ডন র্ব্বক একটি উপাদেয় প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিল।

উমা একদিন নির্জ্জন দ্বিপ্রহরে দাদার ালী কলম লইয়া সেই প্রবন্ধটীর উপরে বড় ড় করিয়া লিখিল—গোপাল বড় ভাল ছেলে, াহাকে যাহা দেওয়া যায় সে তাহাই খায়।

গোপাল বলিতে সে যে গোবিন্দলালের াবন্ধ পাঠকদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছিল াহা আমার বিশ্বাস হয় না, কিন্তু দাদার ক্রোধের সীমা ছিল না। প্রথমে তাহাকে ারিল অবশেষে একটি স্বল্পাবশিষ্ট পেন্সিল, াদ্যোপান্ত মসীলিপ্ত একটি ভোতা কলম, াহার বহুযত্ন সঞ্চিত যৎসামান্ত লেখ্যোপ-রণের পুঁজি কাড়িয়া লইল। অপমানিত ালিকা তাহার এতাদৃশ গুরুতর লাঞ্ছনার ারণ সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিয়া ঘরের কোণে াসিয়া ব্যথিত হৃদয়ে কাঁদিতে লাগিল।

শাসনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে পর গোবিন্দ-াল কিঞ্চিৎ অনুতপ্ত চিত্তে উমাকে তাহার লুণ্ঠিত সামগ্রীগুলি ফিরাইয়া দিল এবং উপরন্তু একখানি মসী লাইন টানা ভাল বাঁধানো খাতা দিয়া বালিকার হৃদয়বেদনা দূর করিবার চেষ্টা করিল।

উমার বয়স তখন সাত বৎসর। এখন হইতে এই খাতাটি রাত্রিকালে উমার বালিশের নীচে ও দিনের বেলা সর্ব্বদা তাহার কক্ষে ক্রোড়ে বিরাজ করিতে লাগিল।

ছোট বেণীটি বাঁধিয়া ঝি সঙ্গে করিয়া যখন সে গ্রামের বালিকা বিদ্যালয়ে পড়িতে যাইত খাতাটি সঙ্গে সঙ্গে যাইত। দেখিয়া মেয়েদের কাহারো বিস্ময়, কাহারো লোভ, কাহারো বা দ্বেষ হইত।

প্রথম বৎসরে অতি যত্ন করিয়া খাতায় লিখিল "পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল।" শয়ন গৃহের মেঝের উপরে বসিয়া খাতাটি আঁকড়িয়া ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে সুর করিয়া পড়িত এবং লিখিত। এমনি করিয়া অনেক গদ্য পদ্য সংগ্রহ হইল।

দ্বিতীয় বৎসরে মধ্যে মধ্যে দুটি একটি স্বাধীন রচনা দেখা দিতে লাগিল। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত সারবান্—ভূমিকা নাই উপসংহার নাই। দুটা একটা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

খাতায় কথামালার ব্যাঘ্র ও বকের গল্পটা যেখানে কাপি করা আছে, তাহার নীচে এক জায়গায় একটা লাইন পাওয়া গেল সেটা কথা মালা কিংবা বর্ত্তমান বঙ্গ সাহিত্যের আর কোথাও ইতিপূর্ব্বে দেখা যায় নাই। সে লাইনটি এই—"যশিকে আমি খুব ভাল বাসি"।

কেহ না মনে করেন আমি এইবার একটা প্রেমের গল্প বানাইতে বসিয়াছি। যশি পাড়ার কোন একাদশ কিংবা দ্বাদশবর্ষীয় বালক নহে। বাড়ির একটি পুরাতন দাসী; তাহার প্রকৃত নাম যশোদা।

কিন্তু যশির প্রতি বালিকার প্রকৃত মনো-ভাব কি এই এক কথা হইতে তাহার কোন দৃঢ় প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে যিনি বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস লিখিতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি এই খাতাতেই দু পাতা অন্তরে পূর্ব্বোক্ত কথাটির সুস্পষ্ট প্রতিবাদ দেখিতে পাইবেন।

এমন একটা আধটা নয়, উমার রচনায় পদে পদে পরস্পর-বিরোধিতা দোষ লক্ষিত

হয়। এক স্থলে দেখা গেল—হরির সঙ্গে জন্মের মত আড়ি। (হরিচরণ নয়, হরিদাসী, বিদ্যালয়ের সহপাঠিকা)। তার অনতিদূরেই এমন কথা আছে যাহা হইতে সহজেই বিশ্বাস জন্মে যে, হরির মত প্রাণের বন্ধু তাহার আর ত্রিভুবনে নাই।

তাহার পর বৎসরে বালিকার বয়স যখন নয় বৎসর, তখন একদিন সকাল বেলা হইতে তাহাদের বাড়িতে সানাই বাজিতে লাগিল। উমার বিবাহ। বরটির নাম প্যারীমোহন, গোবিন্দলালের সহযোগী লেখক। বয়স যদিও অধিক নয় এবং লেখাপড়াও কিঞ্চিৎ শেখা আছে, তথাপি নব্যভাব তার মনে কিছুমাত্র প্রবেশ করিতে পারে নাই এই জন্য পাড়ার লোকে সর্ব্বদা তাহাকে ধন্য ধন্য করিত, এবং গোবিন্দলাল তাহার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

উমা বেনারসী সাড়ী পরিয়া ঘোমটায় ক্ষুদ্র মুখখানি আবৃত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শ্বশুরবাড়ি গেল। মা বলিয়া দিলেন, "বাছা শাশুড়ীর কথা মানিয়া চলিস্, ঘর কন্নার কাজ করিস্, লেখাপড়া লইয়া থাকিস্‌নে।"

গোবিন্দলাল বলিয়া দিলেন "দেখিস্, সেখানে দেয়ালে আঁচড় কাটিয়া বেড়াস্‌নে, সে তেমন বাড়ি নয়। আর প্যারীমোহনের কোন লেখার উপরে খবরদার কলম চালাস্‌নে।"

বালিকার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তখন বুঝিতে পারিল সে যেখানে যাইতেছে, সেখানে কেহ তাহাকে মার্জ্জনা করিবে না। এবং তাহারা কাহাকে দোষ বলে অপরাধ বলে ত্রুটি বলে তাহা অনেক ভর্ৎসনার পর অনেক দিনে শিখিয়া লইতে হইবে।

সেদিন সকালেও সানাই বাজিতেছিল। কিন্তু সেই ঘোমটা এবং বেনারসী সাড়ী এবং অলঙ্কারে মণ্ডিত ক্ষুদ্র বালিকার কম্পিত হৃদয়টুকুর মধ্যে কি হইতে ছিল তাহা ভাল করিয়া বোঝে এমন এক জনও সেই লোকারণ্যের মধ্যে ছিল কি না সন্দেহ।

যশিও উমার সঙ্গে গেল। কিছু দিন থাকিয়া উমাকে শ্বশুর বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সে চলিয়া আসিবে এমনি কথা ছিল।

স্নেহশীলা যশি অনেক বিবেচনা করি[য়া] উমার খাতাটি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। [এই] খাতাটি তাহার পিতৃভবনের একটী অং[শ]; তাহার অতিক্ষণিক জন্মগৃহবাসের স্নেহ[ময়] স্মৃতিচিহ্ন; পিতামাতার অঙ্কস্থলীর এব[ং] সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, অত্যন্ত বাঁকাচোরা ক[াঁচা] অক্ষরে লেখা! তাহার এই অকাল গৃহি[ণী]পনার মধ্যে বালিকাস্বভাবরোচক একটুখা[নি] স্নেহমধুর স্বাধীনতার আস্বাদ।

শ্বশুরবাড়ি গিয়া প্রথম কিছুদিন সে কি[ছু] লেখে নাই। সময়ও পায় নাই। অবশে[ষে] কিছুদিন পরে যশি তাহার পূর্ব্বস্থানে চলি[য়া] গেল।

সেদিন উমা দুপুরবেলা শয়নগৃহের দ্[বার] রুদ্ধ করিয়া টিনের বাক্স হইতে খাতাটি বা[হির] করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে লিখিল "যশি বা[ড়ি] চলে গেছে আমিও মার কাছে যাব।"

আজকাল চারুপাঠ এবং বোধোদয় হই[তে] কিছু কাপি করিবার অবসর নাই, বোধ ক[রি] তেমন ইচ্ছাও নাই। সুতরাং আজ ক[াল] বালিকার সংক্ষিপ্ত রচনার মধ্যে মধ্যে দী[র্ঘ] বিচ্ছেদ নাই। পূর্ব্বোদ্ধৃত পদটির পরেই দে[খা] যায় লেখা আছে "দাদা যদি একবার বা[ড়ি] নিয়ে যায় তাহলে দাদার লেখা আর কখনো খারাপ করে দেব না।"

শুনা যায় উমার পিতা উমাকে প্রায় মা[ঝে] মাঝে বাড়ি আনিতে চেষ্টা করেন। কি[ন্তু] গোবিন্দলাল প্যারীমোহনের সঙ্গে যোগ দি[য়া] তাহার প্রতিবন্ধক হয়

গোবিন্দলাল বলে এখন উমার পতিভক্তি শিক্ষার সময়, এখন তাহাকে মাঝে মাঝে পতিগৃহ হইতে পুরাতন পিতৃস্নেহের মধ্যে আনয়ন করিলে তাহার মনকে অনর্থক বিক্ষিপ্ত করিয়া দেওয়া হয়। এই বিষয়ে সে উপদেশে বিদ্রূপে জড়িত এমন সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছিল যে তাহার একমতবর্ত্তী সকল পাঠকেই উক্ত রচনার অকাট্য সত্য সম্পূর্ণ স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারে নাই।

লোকমুখে সেই কথা শুনিয়াই উমা তাহার খাতায় লিখিয়াছিল "দাদা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে একবার তোমাদের ঘরে নিয়ে যাও, আমি তোমাকে আর কখন রাগাব না।"

এক দিন উমা দ্বার রুদ্ধ করিয়া এমনি কি একটা অর্থহীন তুচ্ছ কথা খাতায় লিখিতেছিল। তাহার ননদ তিলকমঞ্জরীর অত্যন্ত কৌতূহল হইল—সে ভাবিল বৌদিদি মাঝে মাঝে দরজা বন্ধ করিয়া কি করে দেখিতে হইবে। দ্বারের ছিদ্র দিয়া দেখিল লিখিতেছে। দেখিয়া অবাক। তাহাদের অন্তঃপুরে কখনই সরস্বতীর এরূপ গোপন সমাগম হয় নাই।

তাহার ছোট কনকমঞ্জরী সেও আসিয়া একবার উঁকি মারিয়া দেখিল। এবং তাহারো ছোট অনঙ্গমঞ্জরী সেও পদাঙ্গুলির উপর ভর দিয়া বহুকষ্টে ছিদ্রপথ দিয়া রুদ্ধগৃহের রহস্যভেদ করিয়া লইল।

উমা লিখিতে লিখিতে সহসা গৃহের বাহিরে তিনটী পরিচিত কণ্ঠের খিল্‌খিল্‌ হাসি শুনিতে পাইল। ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল। খাতাটি তাড়াতাড়ি বাক্সে বন্ধ করিয়া লজ্জায় ভয়ে বিছানায় মুখ লুকাইয়া পড়িয়া রহিল।

প্যারীমোহন এই সংবাদ অবগত হইয়া বিশেষ চিন্তিত হইল। পড়া শুনা আরম্ভ হইলেই নভেল নাটকের আমদানী হইবে এবং গৃহধর্ম্ম রক্ষা করা দায় হইয়া উঠিবে।

তা ছাড়া বিশেষ চিন্তা দ্বারা এ বিষয়ে সে একটি অতি সূক্ষ্মতত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছিল। সে বলিত, স্ত্রীশক্তি এবং পুংশক্তি উভয় শক্তির সম্মিলনে পবিত্র দাম্পত্য শক্তির উদ্ভব হয়; কিন্তু লেখা পড়া শিক্ষার দ্বারা যদি স্ত্রীশক্তি পরাভূত হইয়া একান্ত পুংশক্তির প্রাদুর্ভাব হয়, তবে পুংশক্তির সহিত পুংশক্তির প্রতিঘাতে এমন একটি প্রলয়শক্তির উৎপত্তি হয় যদ্দ্বারা দাম্পত্য শক্তি বিনাশ-শক্তির মধ্যে বিলীনসত্ত্বা লাভ করে, সুতরাং রমণী বিধবা হয়। এ পর্য্যন্ত এ তত্ত্বের কেহ প্রতিবাদ করিতে পারে নাই।

প্যারীমোহন সন্ধ্যাকালে ঘরে আসিয়া উমাকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিল এবং কিঞ্চিৎ উপহাসও করিল—বলিল সাম্‌লা ফরমাস দিতে হইবে, গিন্নি কাণে কলম গুঁজিয়া আপিসে যাইবেন।

উমা ভাল বুঝিতে পারিল না। প্যারিমোহনের প্রবন্ধ সে কখন পড়ে নাই, এই জন্য তাহার এখনো ততদূর রসবোধ জন্মে নাই। কিন্তু সে মনে মনে একান্ত সঙ্কুচিত হইয়া গেল—মনে হইল পৃথিবী দ্বিধা হইলে তবে সে লজ্জা রক্ষা করিতে পারে।

বহুদিন আর সে লেখে নাই। কিন্তু এক দিন শরৎকালের প্রভাতে একটি গায়িকা ভিখারিণী আগমনীর গান গাহিতেছিল। উমা জানালার গরাদের উপর মুখ রাখিয়া চুপ করিয়া শুনিতেছিল। একে শরৎকালের রৌদ্রে ছেলেবেলাকার সকল কথা মনে পড়ে, তাহার উপরে আগমনীর গান শুনিয়া সে আর থাকিতে পারিল না।

উমা গান গাহিতে পারিত না; কিন্তু লিখিতে শিখিয়া অবধি এমনি তাহার অভ্যাস

হইয়াছে যে একটা গান শুনিলেই সেটা লিখিয়া লইয়া গান গাহিতে না পারার খেদ মিটাইত। আজ কাঙ্গালী গাহিতেছিল—

"পুরবাসী বলে উমার মা,
তোর হারা তারা এল ওই!
শুনে পাগলিনীর প্রায়, অমনি রাণী ধায়,
কই উমা বলি কই!
কেঁদে রাণী বলে, আমার উমা এলে
একবার আয় মা, একবার আয় মা,
একবার আয় মা করি কোলে!
অমনি দুবাহু পসারি, মায়ের গলা ধরি
অভিমানে কাঁদি রাণীরে বলে।
কই মেয়ে বলে আন্‌তে গিয়েছিলে।"

অভিমানে উমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া চোখে জল ভরিয়া গেল। গোপনে গায়িকাকে ডাকিয়া গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া বিচিত্র বানানে এই গানটি খাতায় লিখিতে আরম্ভ করিল।

তিলকমঞ্জরী, কনকমঞ্জরী এবং অনঙ্গমঞ্জরী সেই ছিদ্রযোগে সমস্ত দেখিল এবং সহসা করতালি দিয়া বলিয়া উঠিল "বউদিদি, কি করচো আমরা সমস্ত দেখেছি!"

তখন উমা তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া কাতর স্বরে বলিতে লাগিল "লক্ষ্মীভাই কাউকে বলিস্‌নে ভাই, তোদের দুটি পায়ে পড়ি ভাই—আমি আর কর্ব্বো না, আমি আর লিখ্‌ব না!"

অবশেষে উমা দেখিল তিলকমঞ্জরী তাহার খাতাটির প্রতি লক্ষ্য করিতেছে। তখন সে ছুটিয়া গিয়া খাতাটি বক্ষে চাপিয়া ধরিল; ননদীরা অনেক বল প্রয়োগ করিয়া সেটা কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল; কৃতকার্য্য না হইয়া অনঙ্গ, দাদাকে ডাকিয়া আনিল।

প্যারীমোহন আসিয়া গম্ভীরভাবে খাটে বসিল। মেঘমন্দ্র স্বরে বলিল "খাতা দাও"। আদেশ পালন হইল না দেখিয়া আরো দুই এক সুর গলা নামাইয়া কহিল "দাও"।

বালিকা খাতাটি বক্ষে ধরিয়া একান্ত অনুনয় দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। যখন দেখিল প্যারীমোহন খাতা কাড়িয়া লইবার জন্য উঠিয়াছে, তখন সেটা মাটিতে ফেলিয়া দিয়া দুই বাহুতে মুখ ঢাকিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

প্যারীমোহন খাতাটি লইয়া বালিকার লেখাগুলি উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে লাগিল; শুনিয়া উমা পৃথিবীকে উত্তরোত্তর গাঢ়তর আলিঙ্গনে বদ্ধ করিতে লাগিল; এবং অপর তিনটি বালিকা শ্রোতা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া অস্থির হইল।

সেই হইতে উমা আর সে খাতা পায় নাই।

প্যারীমোহনেরও সূক্ষ্মতত্ত্বকণ্টকিত বিবিধ প্রবন্ধপূর্ণ একখানি খাতা ছিল। কিন্তু সেটি কাড়িয়া লইয়া ধ্বংস করে এমন মানবহিতৈষী কেহ ছিল না।



উদ্ধার।

গৌরী প্রাচীন ধনীবংশের পরমাদরে পালিতা সুন্দরী কন্যা। স্বামী পরেশ হীনাবস্থা হইতে সম্প্রতি নিজের উপার্জ্জনে কিঞ্চিৎ অবস্থার উন্নতি করিয়াছে। যতদিন তাহার দৈন্য ছিল ততদিন কন্যার কষ্ট হইবে ভয়ে শ্বশুর শাশুড়ী স্ত্রীকে তাঁহার বাড়ীতে পাঠান নাই। গৌরী বেশ একটু বয়স্থা হইয়াই পতিগৃহে আসিয়াছিল।

বোধকরি এই সকল কারণেই পরেশ সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্তগম্য

বলিয়া বোধ করিতেন না এবং বোধ করি সন্দিগ্ধ স্বভাব তাঁহার একটা ব্যাধির মধ্যে। পরেশ পশ্চিমে একটি ক্ষুদ্র সহরে ওকালতী করিতেন —ঘরে আত্মীয় স্বজন বড় কেহ ছিল না— একাকিনী স্ত্রীর জন্য তাঁহার চিত্ত উদ্বিগ্ন হইয়া থাকিত। মাঝে মাঝে এক এক দিন হঠাৎ অসময়ে তিনি আদালত হইতে বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। প্রথম প্রথম স্বামীর এইরূপ আকস্মিক অভ্যুদয়ের কারণ গৌরী ঠিক বুঝিতে পারিত না। মাঝে মাঝে অকারণে পরেশ এক একটা করিয়া চাকর ছাড়াইয়া দিতে লাগিলেন; কোন চাকর তাঁহার আর দীর্ঘকাল পছন্দ হয় না। বিশেষতঃ অসুবিধার আশঙ্কা করিয়া যে চাকরকে গৌরী রাখিবার জন্য অধিক আগ্রহ প্রকাশ করিত, তাহাকে পরেশ এক মুহূর্ত্ত স্থান দিতেন না। তেজস্বিনী গৌরী ইহাতে যতই আঘাত বোধ করিত স্বামী ততই অস্থির হইয়া এক এক সময়ে অদ্ভুত ব্যবহার করিতে থাকিতেন।

অবশেষে আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া যখন দাসীকে গোপনে ডাকিয়া পরেশ নানা প্রকার সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন তখন সে সকল কথা গৌরীর কর্ণগোচর হইতে লাগিল। এবং অভিমানিনী স্বল্পভাষিণী নারী অপমানে আহত সিংহিনীর ন্যায় অন্তরে অন্তরে উদ্দীপ্ত হইতে লাগিলেন এবং এই উন্মত্ত সন্দেহ দম্পতির মাঝখানে প্রলয়খড়্গের মত পড়িয়া উভয়কে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল।

গৌরীর কাছে তাঁহার তীব্র সন্দেহ প্রকাশ পাইয়া যখন একবার লজ্জা ভাঙ্গিয়া গেল তখন পরেশ স্পষ্টতই প্রতিদিন পদে পদে আশঙ্কা ব্যক্ত করিয়া স্ত্রীর সহিত কলহ করিতে আরম্ভ করিল এবং গৌরী যতই নিরুত্তর অবজ্ঞা এবং কষাঘাতের ন্যায় তীক্ষ্ণ কটাক্ষ দ্বারা তাঁহাকে আপাদমস্তক যেন ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিল, ততই তাঁহার সংশয় মত্ততা আরো যেন বাড়িবার দিকে চলিল।

এইরূপ স্বামীসুখ হইতে প্রতিহত হইয়া পুত্রহীনা তরুণী ধর্ম্মে মন দিলেন। হরিসভার নবীন প্রচারক ব্রহ্মচারী পরমানন্দস্বামীকে ডাকিয়া মন্ত্র লইলেন এবং তাঁহার নিকট ভাগবতের ব্যাখ্যা শুনিতে আরম্ভ করিলেন। নারীহৃদয়ের সমস্ত ব্যর্থ স্নেহ প্রেম কেবল ভক্তি আকারে পুঞ্জীভূত হইয়া গুরুদেবের পদতলে সমর্পিত হইল।

পরমানন্দের সাধুচরিত্র সম্বন্ধে দেশে বিদেশে কাহারও মনে সংশয় মাত্র ছিল না। সকলে তাঁহাকে পূজা করিত। পরেশ ইহার সম্বন্ধে মুখ ফুটিয়া সংশয় প্রকাশ করিতে পারিতেন না বলিয়াই তাহা গুপ্ত ক্ষতের মত ক্রমশঃ তাঁহার মর্ম্মের নিকট পর্য্যন্ত খনন করিয়া চলিয়াছিল।

একদিন সামান্য কারণে বিষ উদ্গীরিত হইয়া পড়িল। স্ত্রীর কাছে পরমানন্দকে উল্লেখ করিয়া দুশ্চরিত্র ভণ্ড বলিয়া গালি দিলেন এবং কহিলেন, তোমার শালগ্রাম স্পর্শ করিয়া শপথ পূর্ব্বক বল দেখি সেই বকধার্ম্মিককে তুমি মনে মনে ভালবাসনা?

দলিত ফণিনীর ন্যায় মুহূর্ত্তের মধ্যেই উদগ্র হইয়া মিথ্যা স্পর্দ্ধা দ্বারা স্বামীকে বিদ্ধ করিয়া গৌরী রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন—ভালবাসি, তুমি কি করিতে চাও কর!—পরেশ তৎক্ষণাৎ ঘরে তালা চাবি লাগাইয়া তাঁহাকে রুদ্ধ করিয়া আদালতে চলিয়া গেল।

অসহ্য রোষে গৌরী কোন মতে দ্বার উন্মোচন করাইয়া তৎক্ষণাৎ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

পরমানন্দ নিভৃত ঘরে জনহীন মধ্যাহ্নে শাস্ত্র পাঠ করিতেছিলেন। হঠাৎ অমেঘবাহিনী বিদ্যুল্লতার মত গৌরী ব্রহ্মচারীর

শাস্ত্রাধ্যয়নের মাঝখানে আসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল! গুরু কহিলেন—একি! শিষ্যা কহিলেন, গুরুদেব, অপমানিত সংসার হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া চল, তোমার সেবাব্রতে আমি জীবন উৎসর্গ করিব। পরমানন্দ কঠোর ভর্ৎসনা করিয়া গৌরীকে গৃহে ফিরিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু হায় গুরুদেব, সে দিনকার সেই অকস্মাৎ ছিন্ন বিছিন্ন অধ্যায়ন সূত্র আর কি তেমন করিয়া যোড়া লাগিতে পারিল।

পরেশ গৃহে আসিয়া মুক্তদ্বার দেখিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানে কে আসিয়াছিল? স্ত্রী কহিলেন, কেহ আসে নাই, আমি গুরুদেবের গৃহে গিয়াছিলাম। পরেশ মুহূর্ত্তকাল পাংশু এবং পরক্ষণেই রক্তবর্ণ হইয়া কহিলেন—কেন গিয়াছিলে? গৌরী কহিলেন আমার খুসী!—সে দিন হইতে পাহারা বসাইয়া স্ত্রীকে ঘরে রুদ্ধ করিয়া পরেশ এমনি উপদ্রব আরম্ভ করিলেন যে সহরময় কুৎসা রটিয়া গেল।

এই সকল কুৎসিত অপমান ও অত্যাচারের সংবাদে পরমানন্দের হরিচিন্তা দূর হইয়া গেল। এই নগর অবিলম্বে পরিত্যাগ করা তিনি কর্ত্তব্য বোধ করিলেন, অথচ উৎপীড়িতকে ফেলিয়া কোন মতেই দূরে যাইতে পারিলেন না। সন্ন্যাসীর এই কয়দিনকার দিনরাত্রের ইতিহাস কেবল অন্তর্য্যামীই জানেন।

অবশেষে অবরোধের মধ্যে থাকিয়া গৌরী একদিন পত্র পাইলেন,—বৎসে, আলোচনা করিয়া দেখিলাম ইতিপূর্ব্বে অনেক সাধ্বী সাধক-রমণী কৃষ্ণপ্রেমে সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। যদি সংসারের অত্যাচারে হরিপাদপদ্ম হইতে তোমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে তবে জানাইলে ভগবানের সহায়তায় তাঁহার সেবিকাকে উদ্ধার করিয়া প্রভুর অভয় পদারবিন্দে উৎসর্গ করিতে প্রয়াসী হইব। ২৬শে ফাল্গুন বুধবারে অপরাহ্ণ ২ ঘটিকার সময় ইচ্ছা করিলে তোমাদের পুষ্করিণীর তীরে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পার।

গৌরী পত্রখানি কেশে বাঁধিয়া খোপার মধ্যে ঢাকিয়া রাখিল। ২৬শে ফাল্গুন মধ্যাহ্নে স্নানের পূর্ব্বে চুল খুলিবার সময় দেখিল, চিঠিখানি নাই। হঠাৎ সন্দেহ হইল হয়ত চিঠিখানি কখন্ বিছানায় স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহা তাঁহার স্বামীর হস্তগত হইয়াছে। স্বামী সে পত্র পাঠে ঈর্ষ্যায় দগ্ধ হইতেছে মনে করিয়া গৌরী মনে মনে এক প্রকার জ্বালাময় আনন্দ অনুভব করিল—কিন্তু তাহার শিরোভূষণ পত্রখানি পাষণ্ডহস্তস্পর্শে লাঞ্ছিত হইতেছে এ কল্পনাও তাহার সহ্য হইল না। দ্রুতপদে স্বামীগৃহে গেল।

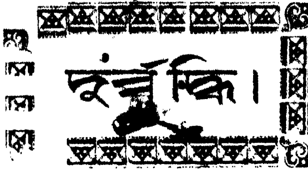
দেখিল স্বামী ভূতলে পড়িয়া গোঁ গোঁ করিতেছে, মুখ দিয়া ফেনা পড়িতেছে, চক্ষুতারকা কপালে উঠিয়াছে। দক্ষিণ বদ্ধমুষ্টি হইতে পত্রখানি ছাড়াইয়া লইয়া তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকিয়া পাঠাইল। ডাক্তার আসিয়া কহিল, আপোপ্লেক্সি,—তখন রোগীর মৃত্যু হইয়াছে।

সেই দিন মফস্বলে পরেশের একটি জরুরি মকদ্দমা ছিল। সন্ন্যাসীর এতদূর পতন হইয়াছিল যে তিনি সেই সংবাদ লইয়া গৌরীর সহিত সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। সদ্যঃবিধবা গৌরী যেমন বাতায়ন হইতে গুরুদেবকে চোরের মত পুষ্করিণীতটে দেখিল তৎক্ষণাৎ বজ্রচকিতের ন্যায় দৃষ্টি অবনত করিল। গুরু যে কোথা হইতে কোথায় নামিয়াছেন তাহা যেন বিদ্যুদালোকে সহসা এই মুহূর্ত্তে তাহার হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। গুরু ডাকিলেন, গৌরি! গৌরী কহিল, আসিতেছি গুরুদেব।

মৃত্যু সংবাদ পাইয়া পরেশের বন্ধুগণ যখন।

সৎকারের জন্য উপস্থিত হইল, দেখিল গৌরীর মৃতদেহ স্বামীর পার্শ্বে শয়ান। সে বিষ খাইয়া মরিয়াছে। আধুনিক কালে এই আশ্চর্য্য সহমরণের দৃষ্টান্তে সতীমাহাত্ম্যে সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

—:*:—



ভিটা ছাড়িতে হইল। কেমন করিয়া তাহা খোলসা করিয়া বলিব না—আভাস দিব মাত্র।

আমি পাড়াগেঁয়ে নেটিব ডাক্তার, পুলিসের থানার সম্মুখে আমার বাড়ি। যমরাজের সহিত আমার যে পরিমাণ আনুগত্য ছিল দারোগা বাবুদের সহিত তাহা অপেক্ষা কম ছিল না—সুতরাং নর এবং নারায়ণের দ্বারা মানুষের যত বিবিধ রকমের পীড়া ঘটিতে পারে তাহা আমার সুগোচর ছিল। যেমন মণির দ্বারা বলয়ের এবং বলয়ের দ্বারা মণির শোভা বৃদ্ধি হয় তেমনি আমার মধ্যস্থতায় দারোগার এবং দারোগার মধ্যস্থতায় আমার উত্তরোত্তর আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটিতেছিল।

এইসকল ঘনিষ্ঠ কারণে হাল নিয়মের কৃতবিদ্য দারোগা ললিত চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে আমার একটু বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহার একটি অরক্ষণীয়া আত্মীয়া কন্যার সহিত বিবাহের জন্য মাঝে মাঝে অনুরোধ করিয়া আমাকেও প্রায় তিনি অরক্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু শশী আমার একমাত্র কন্যা, মাতৃহীনা, তাহাকে বিমাতার হাতে সমর্পণ করিতে পারিলাম না। বর্ষে বর্ষে নূতন পঞ্জিকার মতে বিবাহের কত শুভলগ্নই ব্যর্থ হইল! আমারই চক্ষের সম্মুখে কত যোগ্য এবং অযোগ্য পাত্র চতুর্দ্দোলায় চড়িল, আমি কেবল বরযাত্রীর দলে বাহির বাড়িতে মিষ্টান্ন খাইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

শশীর বয়স বারো হইয়া প্রায় তেরোয় পড়ে। কিছু সুবিধামত টাকার যোগাড় করিতে পারিলেই মেয়েটিকে একটি বিশিষ্ট বড় ঘরে বিবাহ দিতে পারিব এমন আশা পাইয়াছি। সেই কর্ম্মটি শেষ করিতে পারিলে অবিলম্বে আর একটি শুভকর্ম্মের আয়োজনে মনোনিবেশ করিতে পারিব।

সেই অত্যাবশ্যক টাকাটার কথা ধ্যান করিতেছিলাম এমন সময় তুলসীপাড়ার হরিনাথ মজুমদার আসিয়া আমার পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া পড়িল। কথাটা এই, তাহার বিধবা কন্যা রাত্রে হঠাৎ মারা গিয়াছে; শত্রুপক্ষ গর্ভপাতের অপবাদ দিয়া দারোগার কাছে বেনামী পত্র লিখিয়াছে। এক্ষণে পুলিস তাহার মৃতদেহ লইয়া টানাটানি করিতে উদ্যত।

সদ্য কন্যাশোকের উপর এত বড় অপমানের আঘাত তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়াছে। আমি ডাক্তারও বটে, দারোগার বন্ধুও বটে, কোন মতে উদ্ধার করিতে হইবে।

লক্ষ্মী যখন ইচ্ছা করেন তখন এমনি করিয়াই কখনো সদর কখনো খিড়কি দরজা দিয়া অনাহূত আসিয়া উপস্থিত হন। আমি ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম ব্যাপারটা বড় গুরুতর, দুটো একটা কল্পিত উদাহরণ প্রয়োগ করিলাম—কম্পমান বৃদ্ধ হরিনাথ শিশুর মত কাঁদিতে লাগিল।

বিস্তারিত বলা বাহুল্য—কন্যার অন্ত্যেষ্টি

সৎকারের সুযোগ করিতে হরিনাথ ফতুর হইয়া গেল।

আমার কন্যা শশী ক[illegible] ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল বাবা, ঐ বুড়ো তোমার পায়ে ধরিয়া কেন অমন করিয়া কাঁদিতেছিল? আমি তাহাকে ধমক দিয়া বলিলাম যা, যা, তোর এত খবরে দরকার কি?

এইবার সৎপাত্রে কন্যাদানের পথ সুপ্রশস্ত হইল। বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। একমাত্র কন্যার বিবাহ ভোজের আয়োজন প্রচুর করিলাম। বাড়িতে গৃহিণী নাই, প্রতিবেশীরা দয়া করিয়া আমাকে সাহায্য করিতে আসিল। সর্ব্বস্বান্ত কৃতজ্ঞ হরিনাথ দিনরাত্রি খাটিতে লাগিল।

গায়েহলুদের দিনে রাত তিনটার সময় হঠাৎ শশীকে ওলাউঠায় ধরিল। রোগ উত্তরোত্তর কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল। অনেক চেষ্টার পর নিষ্ফল ঔষধের শিশিগুলা [illegible] আরম্ভ করিলেন যে [illegible] বলিয়া [illegible] ভূতলে ফেলিয়া ছুটিয়া গিয়া হরিনাথের পা জড়াইয়া ধরিলাম। কহিলাম, মাপ কর দাদা, পাষণ্ডকে মাপ কর। আমার একমাত্র কন্যা, আমার আর কেহ নাই।

হরিনাথ শশব্যস্ত হইয়া কহিল, ডাক্তার বাবু করেন কি, করেন কি! আপনার কাছে আমি চিরঋণী—আমার পায়ে হাত দিবেন না!

আমি কহিলাম নিরপরাধে আমি তোমার সর্ব্বনাশ করিয়াছি সেই পাপে আমার কন্যা মরিতেছে।

এই বলিয়া সর্ব্বলোকের সমক্ষে আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম ওগো আমি এই বৃদ্ধের সর্ব্বনাশ করিয়াছি, আমি তাহার দণ্ড লইতেছি, ভগবান্ আমার শশীকে রক্ষা করুন!

বলিয়া হরিনাথের চটিজুতা খুলিয়া লইয়া নিজের মাথায় মারিতে লাগিলাম; বৃদ্ধ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আমার হাত হইতে জুতা কাড়িয়া লইল।

পরদিন দশটা বেলায় গায়ে হলুদের হরিদ্রা চিহ্ন লইয়া শশী ইহসংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

তাহার পর দিনেই দারোগা বাবু কহিলেন —ওহে, আর কেন, এইবার বিবাহ করিয়া ফেল! দেখা শুনারত একজন লোক চাই!

মানুষের মর্ম্মান্তিক দুঃখশোকের প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর অশ্রদ্ধা সয়তানকেও শোভা পায় না। কিন্তু নানা ঘটনায় দারোগার কাছে এমন মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়াছিলাম যে কোন কথা বলিবার মুখ ছিল না। দারোগার বন্ধুত্ব সেই দিন যেন আমাকে চাবুক মারিয়া অপমান করিল।

হৃদয় যতই ব্যথিত থাক্ কর্ম্মচক্র চলিতেই থাকে! আগেকার মতই ক্ষুধার আহার, পরিধানের বস্ত্র, এমন কি, চুলার কাষ্ঠ এবং জুতার ফিতা পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ উদ্যমে নিয়মিত সংগ্রহ করিয়া ফিরিতে হয়।

কাজের অবকাশে যখন একলা ঘরে আসিয়া বসিয়া থাকি তখন মাঝে মাঝে কাণে সেই করুণকণ্ঠের প্রশ্ন বাজিতে থাকে, বাবা ঐ বুড়ো তোমার পায়ে ধরিয়া কেন অমন করিয়া কাঁদিতেছিল?—দরিদ্র হরিনাথের জীর্ণঘর নিজের ব্যয়ে ছাইয়া দিলাম—আমার দুগ্ধবতী গাভীটি তাহাকে দান করিলাম, তাহার বন্ধকী জোত জমা মহাজনের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া দিলাম।

কিছুদিন সদ্যঃশোকের দুঃসহ বেদনায় নির্জ্জন সন্ধ্যায় এবং অনিদ্র রাত্রে কেবলি মনে হইত, আমার কোমলহৃদয়া মেয়েটি সংসারলীলা শে[ষ] করিয়াও তাহার বাপের নিষ্ঠুর দুষ্কর্ম্মে পর[-] লোকে কোন মতেই শান্তি পাইতেছে না, [illegible]

যেন ব্যথিত হইয়া কেবলি আমাকে প্রশ্ন করিয়া ফিরিতেছে, বাবা, কেন এমন করিলে?

কিছুদিন এমনি হইয়াছিল গরীবের চিকিৎসা করিয়া টাকার জন্য তাগিদ্ করিতে পারিতাম না। কোন ছোট মেয়ের ব্যামো হইলে মনে হইত আমার শশীই যেন পল্লীর সমস্ত রুগ্না বালিকার মধ্যে রোগ ভোগ করিতেছে।

তখন পূরা বর্ষায় পল্লী ভাসিয়া গেছে। ধানের ক্ষেত এবং গৃহের অঙ্গনপার্শ্ব দিয়া নৌকায় করিয়া ফিরিতে হয়। ভোর রাত্রি হইতে বৃষ্টি সুরু হইয়াছে, এখনো বিরাম নাই।

জমিদারের কাছারি বাড়ি হইতে আমার ডাক পড়িয়াছে। বাবুদের পান্সির মাঝি সামান্য বিলম্বটুকু সহ্য করিতে না পারিয়া উদ্ধত হইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে।

ইতিপূর্ব্বে এরূপ দুর্য্যোগে যখন আমাকে বাহির হইতে হইত তখন একটি লোক ছিল যে আমার পুরাতন ছাতাটি খুলিয়া দেখিত তাহাতে কোথাও ছিদ্র আছে কি না, এবং একটি ব্যগ্র-কণ্ঠ বাদলার হাওয়া ও বৃষ্টির ছাঁট হইতে সযত্নে আত্মরক্ষা করিবার জন্য আমাকে বার-বার সতর্ক করিয়া দিত। আজ শূন্য নীরব গৃহ হইতে নিজের ছাতা নিজে সন্ধান করিয়া লইয়া বাহির হইবার সময় তাহার সেই স্নেহমুখখানি স্মরণ করিয়া একটুখানি বিলম্ব হইতেছিল। তাহার রুদ্ধ শয়ন ঘরটার দিকে তাকাইয়া ভাবিতেছিলাম, যে লোক পরের দুঃখকে কিছুই মনে করে না, তাহার সুখের জন্য ভগবান্ ঘরের মধ্যে এত স্নেহের আয়োজন কেন রাখিবেন? এই ভাবিতে ভাবিতে সেই শূন্য ঘরটার দরজার কাছে আসিয়া বুকের মধ্যে হু হু করিতে লাগিল। বাহিরে বড়লোকের ভৃত্যের তর্জ্জন স্বর শুনিয়া তাড়াতাড়ি শোক সম্বরণ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

নৌকায় উঠিবার সময় দেখি থানার ঘাটে ডোঙ্গা বাধা—একজন চাষা কৌপীন পরিয়া বৃষ্টিতে ভিজিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কিরে? উত্তরে শুনিলাম, গত রাত্রে তাহার কন্যাকে সাপে কাটিয়াছে, থানায় রিপোর্ট করিবার জন্য হতভাগ্য তাহাকে দূর গ্রাম হইতে বাহিয়া আনিয়াছে। দেখিলাম সে তাহার নিজের একমাত্র গাত্র বস্ত্র খুলিয়া মৃত দেহ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। জমিদারী কাছারার অসহিষ্ণু মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল।

বেলা একটার সময় বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দেখি তখনো সেই লোকটা বুকের কাছে হাত পা গুটাইয়া বসিয়া বসিয়া ভিজিতেছে। দারোগা বাবুর দর্শন মেলে নাই। আমি তাহাকে আমার রন্ধন অন্নের এক অংশ পাঠাইয়া দিলাম। সে তাহা ছুঁইল না।

তাড়াতাড়ি আহার সারিয়া কাছারির রোগীর তাগিদে পুনর্ব্বার বাহির হইলাম। সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিয়া দেখি তখনো লোকটা একেবারে অভিভূতের মত বসিয়া আছে। কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতে পারে না, মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে। এখন তাহার কাছে, এই নদী, ঐ গ্রাম, ঐ থানা, এই মেঘাচ্ছন্ন আর্দ্র পঙ্কিল পৃথিবীটা স্বপ্নের মত। বারংবার প্রশ্নের দ্বারা জানিলাম একবার একজন কনষ্টেবল্ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল ট্যাঁকে কিছু আছে কি না। সে উত্তর করিয়াছিল সে নিতান্তই গরীব, তাহার কিছু নাই। কনষ্টেবল্ বলিয়া গেছে, থাক্ বেটা তবে এখ্‌ন বসিয়া থাক্।

এমন দৃশ্য পূর্ব্বেও অনেক বার দেখিয়াছি কখনো কিছুই মনে হয় নাই। আজ কোন মতেই সহ্য করিতে পারিলাম না। আমার শশীর করুণা গদগদ অব্যক্ত কণ্ঠ সমস্ত বাদলার

আকাশ জুড়িয়া বাজিয়া উঠিল। ঐ কন্যাহারা বাক্যহীন চাষার অপরিমেয় দুঃখ আমার বুকের পাঁজর গুলাকে যেন ঠেলিয়া তুলিতে লাগিল।

দারোগা বাবু বেতের মোড়ায় বসিয়া আরামে গুড়গুড়ি টানিতেছিলেন, তাঁহার কন্যাদায়গ্রস্ত আত্মীয় মেসোটি আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই সম্প্রতি দেশ হইতে আসিয়াছেন; তিনি মাদুরের উপর বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। আমি একদমে ঝড়ের বেগে সেখানে উপস্থিত হইলাম, চীৎকার করিয়া বলিলাম, আপনারা মানুষ না পিশাচ? বলিয়া আমার সমস্ত দিনের উপার্জ্জনের টাকা ঝনাৎ করিয়া তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া কহিলাম—টাকা চান্ ত এই নিন্, যখন মরিবেন সঙ্গে লইয়া যাইবেন, এখন এই লোকটাকে ছুটি দিন, ও কন্যার সৎকার করিয়া আসুক্!

বহু উৎপীড়িতের অশ্রুসেচনে দারোগার সহিত ডাক্তারের যে প্রণয় বাড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা এই ঝড়ে ভূমিসাৎ হইয়া গেল।

অনতিকাল পরে দারোগার পায়ে ধরিয়াছি, তাঁহার মহদাশয়তার উল্লেখ করিয়া অনেক স্তুতি এবং নিজের বুদ্ধিভ্রংশতা লইয়া অনেক আত্মধিক্কার প্রয়োগ করিয়াছি, কিন্তু শেষটা ভিটা ছাড়িতে হইল।

দৃষ্টি-দান।

শুনিয়াছি আজকাল অনেক বাঙ্গালীর মেয়েকে নিজের চেষ্টায় স্বামী-সংগ্রহ করিতে হয়। আমিও তাই করিয়াছি কিন্তু দেবতার সহায়তায়। আমি ছেলেবেলা হইতে অনেক ব্রত এবং অনেক শিবপূজা করিয়াছিলাম।

আমার আট বৎসর বয়স উত্তীর্ণ না হইতেই বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বজন্মের পাপবশতঃ আমি আমার এমন স্বামী পাইয়াও সম্পূর্ণ পাইলাম না। মা ত্রিনয়নী আমার দুইচক্ষু হইলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত স্বামীকে দেখিয়া লইবার সুখ দিলেন না।

বাল্যকাল হইতেই আমার অগ্নিপরীক্ষার আরম্ভ হয়। চোদ্দ বৎসর পার না হইতেই আমি একটি মৃতশিশু জন্ম দিলাম, নিজেও মরিবার কাছাকাছি গিয়াছিলাম; কিন্তু যাহাকে দুঃখভোগ করিতে হইবে সে মরিলে চলিবে কেন? যে দীপ জ্বলিবার জন্য হইয়াছে তাহার তেল অল্প হয় না; রাত্রিভোর জ্বলিয়া তবে তাহার নির্ব্বাণ।

বাঁচিলাম বটে, কিন্তু শরীরের দুর্ব্বলতায় মনের খেদে, অথবা যে কারণেই হউক আমার চোখের পীড়া হইল।

আমার স্বামী তখন ডাক্তারী পড়িতেছিলেন। নূতন বিদ্যাশিক্ষার উৎসাহবশতঃ চিকিৎসা করিবার সুযোগ পাইলে তিনি খুসি হইয়া উঠিতেন। তিনি নিজেই আমার চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন।

দাদা সে বছর বি, এল, দিবেন বলিয়া কালেজে পড়িতেছিলেন। তিনি একদিন আসিয়া আমার স্বামীকে কহিলেন, করিতেছ কি? কুমুর চোখ দুটো যে নষ্ট করিতে বসিয়াছ। একজন ভাল ডাক্তার দেখাও।

আমার স্বামী কহিলেন, ভাল ডাক্তার আসিয়া আর নূতন চিকিৎসা কি করিবে? ওষুধ পত্র ত সব জানাই আছে।

দাদা কিছু রাগিয়া কহিলেন, তবে ত

তোমার সঙ্গে তোমাদের কালেজের বড় সাহেবের কোন প্রভেদ নাই।

স্বামী বলিলেন, আইন পড়িতেছ ডাক্তারীর তুমি কি বোঝ? তুমি যখন বিবাহ করিবে, তখন তোমার স্ত্রীর সম্পত্তি লইয়া যদি কখন মকদ্দমা বাধে তুমি কি আমার পরামর্শমত চালবে?

আমি মনে মনে ভাবিতেছিলাম, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইলে উলুখড়েরই বিপদ সবচেয়ে বেশী। স্বামীর সঙ্গে বিবাদ বাধিল দাদার,—কিন্তু দুই পক্ষ হইতে বাজিতেছে আমাকেই। আবার ভাবিলাম, দাদারা যখন আমাকে দানই করিয়াছেন তখন আমার সম্বন্ধে কর্ত্তব্য লইয়া এ সমস্ত ভাগাভাগি কেন? আমার সুখদুঃখ আমার রোগ ও আরোগ্য সে ত সমস্তই আমার স্বামীর।

সে দিন আমার এই এক সামান্য চোখের চিকিৎসা লইয়া দাদার সঙ্গে আমার স্বামীর যেন একটু মনান্তর হইয়া গেল। সহজেই আমার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল, আমার জলের ধারা আরও বাড়িয়া উঠিল তাহার প্রকৃত কারণ আমার স্বামী কিংবা দাদা কেহই তখন বুঝিলেন না।

আমার স্বামী কালেজে গেলে বিকাল বেলায় হঠাৎ দাদা এক ডাক্তার লইয়া আসিয়া উপস্থিত। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া কহিল সাবধানে না থাকিলে পীড়া গুরুতর হইবার সম্ভাবনা আছে। এই বলিয়া কি সমস্ত ওষুধ লিখিয়া দিল, দাদা তখনি তাহা আনাইতে পাঠাইলেন!

ডাক্তার চলিয়া গেলে আমি দাদাকে বলিলাম, দাদা আপনার পায়ে পড়ি আমার যে চিকিৎসা চলিতেছে তাহাতে কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটাইবেন না।

আমি শিশুকাল হইতে দাদাকে খুব ভয় করিতাম, তাঁহাকে যে মুখ ফুটিয়া এমন করিয়া কিছু বলিতে পারিব ইহা আমার পক্ষে এক আশ্চর্য্য ঘটনা। কিন্তু আমি বেশ বুঝিয়াছিলাম, আমার স্বামীকে লুকাইয়া দাদা আমার যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেছেন তাহাতে আমার অশুভ বই শুভ নাই।

দাদাও আমার প্রগল্‌ভতায় বোধ করি কিছু আশ্চর্য্য হইলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিয়া অবশেষে বলিলেন, আচ্ছা আমি আর ডাক্তার আনিব না, কিন্তু যে ওষুধটা আসিবে তাহা বিধিমতে সেবন করিয়া দেখিস্।—ওষুধ আসিলে পর আমাকে তাহা ব্যবহারের নিয়ম বুঝাইয়া দিয়া দাদা চলিয়া গেলেন। স্বামী কালেজ হইতে আসিবার পূর্ব্বেই আমি সে কৌটা এবং শিশি এবং তুলি এবং বিধিবিধান সমস্তই সযত্নে আমাদের প্রাঙ্গণের পাতকুয়ার মধ্যে ফেলিয়া দিলাম।

দাদার সঙ্গে কিছু আড়ি করিয়াই আমার স্বামী যেন আরো দ্বিগুণ চেষ্টায় আমার চোখের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলেন। এ বেলা ও বেলা ওষুধ বদল হইতে লাগিল। চোখে ঠুলি পরিলাম, চসমা পরিলাম, চোখে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ওষুধ ঢালিলাম, গুঁড়া লাগাইলাম, দুর্গন্ধ মাছের তেল খাইয়া ভিতরকার পাকযন্ত্রসুদ্ধ যখন বাহির হইবার উদ্যম করিত তাহাও দমন করিয়া রহিলাম।

স্বামী জিজ্ঞাসা করিতেন কেমন বোধ হইতেছে, আমি বলিতাম অনেকটা ভাল। আমি মনে করিতেও চেষ্টা করিতাম যে, ভালই হইতেছে। যখন বেশী জল পড়িতে থাকিত তখন ভাবিতাম জল কাটিয়া যাওয়াই ভাল লক্ষণ; যখন জল পড়া বন্ধ হইত তখন

ভাবিতাম এই ত আরোগ্য হইবার পথে দাঁড়াইয়াছি।

কিন্তু কিছুকাল পরে যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিল। চোখে ঝাপসা দেখিতে লাগিলাম এবং মাথার বেদনায় আমাকে স্থির থাকিতে দিল না। দেখিলাম আমার স্বামীও যেন কিছু অপ্রতিভ হইয়াছেন। এত দিন পরে কি ছুতা করিয়া যে ডাক্তার ডাকিবেন ভাবিয়া পাইতেছেন না।

আমি তাঁহাকে বলিলাম, দাদার মন রক্ষার জন্য একবার একজন ডাক্তার ডাকিতে দোষ কি? এই লইয়া তিনি অনর্থক রাগ করিতেছেন ইহাতে আমার মনে কষ্ট হয়। চিকিৎসা ত তুমিই করিবে, ডাক্তার একজন উপসর্গ থাকা ভাল।

স্বামী কহিলেন, ঠিক বলিয়াছ। এই বলিয়া সেই দিনই এক ইংরাজ ডাক্তার লইয়া হাজির করিলেন। কি কথা হইল জানি না কিন্তু মনে হইল যেন সাহেব আমার স্বামীকে কিছু ভর্ৎসনা করিলেন, তিনি নতশিরে নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ডাক্তার চলিয়া গেলে, আমি আমার স্বামীর হাত ধরিয়া বলিলাম, কোথা হইতে একটা গোঁয়ার গোরা গর্দ্দভ ধরিয়া আনিয়াছ,—একজন দেশী ডাক্তার আনিলেই হইত। আমার চোখের রোগ ও কি তোমার চেয়ে ভাল বুঝিবে?

স্বামী কিছু কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, চোখে অস্ত্র করা আবশ্যক হইয়াছে।

আমি একটু রাগের ভাণ করিয়া কহিলাম—অস্ত্র করিতে হইবে সে ত তুমি জানিতে কিন্তু প্রথম হইতেই সে কথা আমার কাছে গোপন করিয়া গেছ! তুমি কি মনে কর আমি ভয় করি।

স্বামীর লজ্জা দূর হইল—তিনি বলিলেন চোখে অস্ত্র করিতে হইবে শুনিলে ভয় না করে পুরুষের মধ্যে এমন বীর কয়জন আছে?

আমি ঠাট্টা করিয়া বলিলাম—পুরুষের বীরত্ব কেবল স্ত্রীর কাছে!

স্বামী তৎক্ষণাৎ ম্লান গম্ভীর হইয়া কহিলেন—সে কথা ঠিক। পুরুষের কেবল অহঙ্কার সার।

আমি তাঁহার গাম্ভীর্য্য উড়াইয়া দিয়া কহিলাম, অহঙ্কারেও বুঝি তোমরা মেয়েদের সঙ্গে পার? তাহাতেও আমাদের জিত!

ইতিমধ্যে দাদা আসিলে আমি দাদাকে বিরলে ডাকিয়া বলিলাম—দাদা, আপনার সেই ডাক্তারের ব্যবস্থামত চলিয়া এতদিন আমার চোখ বেশ ভালই হইতেছিল—একদিন ভ্রমক্রমে খাইবার ওষুধটা চক্ষে লেপন করিয়া তাহার পর হইতে চোখ যায় যায় হইয়া উঠিয়াছে। আমার স্বামী বলিতেছেন চোখে অস্ত্র করিতে হইবে।

দাদা বলিলেন আমি ভাবিতেছিলাম, তোর স্বামীর চিকিৎসাই চলিতেছে তাই আরও আমি রাগ করিয়া এত দিন আসি নাই।

আমি বলিলাম—না, আমি গোপনে সেই ডাক্তারের ব্যবস্থামতই চলিতেছিলাম,—স্বামীকে জানাই নাই পাছে তিনি রাগ করেন।

স্ত্রীজন্ম গ্রহণ করিলে এত মিথ্যাও বলিতে হয়! দাদার মনেও কষ্ট দিতে পারি না, স্বামীর যশও ক্ষুণ্ণ করা চলে না। মা হইয়া কোলের শিশুকে ভুলাইতে হয়, স্ত্রী হইয়া শিশুর বাপকে ভুলাইতে হয়, মেয়েদের এত ছলনার প্রয়োজন!

ছলনার ফল হইল এই যে, অন্ধ হইবার পূর্ব্বে আমার দাদা এবং স্বামীর মিলন দেখিতে পাইলাম। দাদা ভাবিলেন গোপন চিকিৎসা

করিতে গিয়া এই দুর্ঘটনা ঘটিল, স্বামী ভাবিলেন, গোড়ায় আমার দাদার পরামর্শ শুনিলেই ভাল হইত। এই ভাবিয়া দুই অনুতপ্ত হৃদয় ভিতরে ভিতরে ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া পরস্পরের অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইল। স্বামী দাদার পরামর্শ লইতে লাগিলেন, দাদাও বিনীতভাবে সকল বিষয়ে আমার স্বামীর মতের প্রতিই নির্ভর প্রকাশ করিলেন।

অবশেষে উভয়ের পরামর্শক্রমে একদিন একজন ইংরাজ ডাক্তার আসিয়া আমার বাম চোখে অস্ত্রাঘাত করিল। দুর্ব্বল চক্ষু সে আঘাত কাটাইয়া উঠিতে পারিল না, তাহার ক্ষীণ দীপ্তিটুকু হঠাৎ নিবিয়া গেল। তাহার পরে বাকী চোখটাও দিনে দিনে অল্পে অল্পে অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেল। বাল্যকালে শুভদৃষ্টির দিনে যে চন্দনচর্চ্চিত তরুণ মূর্ত্তি আমার সম্মুখে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার উপরে চিরকালের মত পর্দ্দা পড়িয়া গেল।

একদিন স্বামী আমার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া কহিলেন তোমার কাছে আর মিথ্যা বড়াই করিব না, তোমার চোখ দুটি আমিই নষ্ট করিয়াছি।

দেখিলাম, তাঁহার কণ্ঠস্বরে অশ্রুজল ভরিয়া আসিয়াছে। আমি দুইহাতে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত চাপিয়া কহিলাম, বেশ করিয়াছ, তোমার জিনিষ তুমি লইয়াছ। ভাবিয়া দেখ দেখি যদি কোন ডাক্তারের চিকিৎসায় আমার চোখ নষ্ট হইত তাহাতে আমার কি সান্ত্বনা থাকিত! ভবিতব্যতা যখন খণ্ডে না তখন চোখ ত আমার কেহই বাঁচাইতে পারিত না—সে চোখ তোমার হাতে গিয়াছে এই আমার অন্ধতার একমাত্র সুখ। যখন পূজায় ফুল কম পড়িয়াছিল তখন রামচন্দ্র তাঁহার দুই চক্ষু উৎপাটন করিয়া দেবতাকে দিতে গিয়াছিলেন। আমার দেবতাকে আমার দৃষ্টি দিলাম,—তোমার চোখে যখন যাহা ভাল লাগিবে আমাকে মুখে বলিয়ো, সে আমি তোমার চোখের দেখার প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করিব।

আমি এত কথা বলিতে পারি নাই, মুখে এমন করিয়া বলাও যায় না; এ সব কথা আমি অনেক দিন ধরিয়া ভাবিয়াছি; মাঝে মাঝে যখন অবসাদ আসিত, নিষ্ঠার তেজ ম্লান হইয়া পড়িত, নিজেকে বঞ্চিত দুঃখিত দুর্ভাগ্যদগ্ধ বলিয়া মনে হইত,—তখন আমি নিজের মনকে দিয়া এই সব কথা বলাইয়া লইতাম,—এই শান্তি এই ভক্তিকে অবলম্বন করিয়া নিজের দুঃখের চেয়েও নিজেকে উচ্চ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতাম। সে দিন, কতকটা কথায় কতকটা নীরবে বোধ করি আমার মনের ভাবটা তাঁহাকে একরকম করিয়া বুঝাইতে পারিয়াছিলাম। তিনি কহিলেন কুমু, মূঢ়তা করিয়া তোমার যা নষ্ট করিয়াছি সে আর ফিরাইয়া দিতে পারিব না, কিন্তু আমার যতদূর সাধ্য তোমার চোখের অভাবমোচন করিয়া তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব।

আমি কহিলাম, সে কোন কাজের কথা নয়। তুমি যে তোমার ঘরকন্নাকে একটি অন্ধের হাঁসপাতাল করিয়া রাখিবে সে আমি কিছুতেই দিব না। তোমাকে আর একটি বিবাহ করিতেই হইবে।

কি জন্য যে বিবাহ করা নিতান্ত আবশ্যক তাহা সবিস্তারে বলিবার পূর্ব্বে আমার একটু-খানি কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হইল। একটু কাশিয়া, একটু সামলাইয়া লইয়া বলিতে যাই-তেছি এমন সময় আমার স্বামী উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিয়া উঠিলেন—আমি মূঢ়, আমি

অহঙ্কারী, কিন্তু তাই বলিয়া আমি পাষণ্ড নই। নিজের হাতে তোমাকে অন্ধ করিয়াছি, অবশেষে সেই দোষে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যদি অন্য স্ত্রী গ্রহণ করি তবে আমাদের ইষ্টদেব গোপীনাথের শপথ করিয়া বলিতেছি আমি যেন ব্রহ্মহত্যা পিতৃহত্যার পাতকী হই।

এত বড় শপথটা করিতে দিতাম না, বাধা দিতাম—কিন্তু অশ্রু তখন বুক বাহিয়া কণ্ঠ চাপিয়া দুই চক্ষু ছাপিয়া ঝরিয়া পড়িবার যো করিতেছিল, তাহাকে সম্বরণ করিয়া কথা বলিতে পারিতেছিলাম না। তিনি যাহা বলিলেন তাহা শুনিয়া বিপুল আনন্দের উদ্বেগে বালিশের মধ্যে মুখ চাপিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। আমি অন্ধ তবু তিনি আমাকে ছাড়িবেন না! দুঃখীর দুঃখের মত আমাকে হৃদয়ে করিয়া রাখিবেন। এত সৌভাগ্য আমি চাই না, কিন্তু মন ত স্বার্থপর।

অবশেষে অশ্রুর প্রথম পস্‌লাটা সবেগে বর্ষণ হইয়া গেলে তাঁহার মুখ আমার বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলাম এমন ভয়ঙ্কর শপথ কেন করিলে? আমি কি তোমাকে নিজের সুখের জন্য বিবাহ করিতে বলিয়াছিলাম? সতীন্‌কে দিয়া আমি আমার স্বার্থসাধন করিতাম। চোখের অভাবে তোমার যে কাজ নিজে করিতাম না সে আমি তাহাকে দিয়া করাইতাম।

স্বামী কহিলেন—কাজত দাসীতেও করে। আমি কি কাজের সুবিধার জন্য একটা দাসী বিবাহ করিয়া আমার এই দেবীর সঙ্গে একাসনে বসাইতে পারি?—বলিয়া আমার মুখ তুলিয়া ধরিয়া আমার ললাটে একটি নির্ম্মল চুম্বন করিলেন,—সেই চুম্বনের দ্বারা আমার যেন তৃতীয় নেত্র উন্মীলিন হইল, সেই ক্ষণে আমার দেবীত্বে অভিষেক হইয়া গেল। আমি মনে মনে কহিলাম, সেই ভাল। যখন অন্ধ হইয়াছি তখন আমি এই বহিঃসংসারের আর গৃহিণী হইতে পারি না,—এখন আমি সংসারের উপরে উঠিয়া দেবী হইয়া স্বামীর মঙ্গল করিব। আর মিথ্যা নয়, ছলনা নয়, গৃহিণী রমণীর যত কিছু ক্ষুদ্রতা এবং কপটতা আছে সমস্ত দূর করিয়া দিলাম।

সে দিন সমস্তদিন নিজের সঙ্গে একটা বিরোধ চলিতে লাগিল। গুরুতর শপথে বাধ্য হইয়া স্বামী, যে, কোন মতেই দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারিবেন না, এই আনন্দ মনের মধ্যে যেন একেবারে দংশন করিয়া রহিল কিছুতেই তাহাকে ছাড়াইতে পারিলাম না। অদ্য আমার মধ্যে যে নূতন দেবীর আবির্ভাব হইয়াছে তিনি কহিলেন, হয়ত এমন দিন আসিতে পারে যখন এই শপথ পালন অপেক্ষা বিবাহ করিলে তোমার স্বামীর মঙ্গল হইবে। কিন্তু আমার মধ্যে যে পুরাতন নারী ছিল সে কহিল, তা হউক, কিন্তু তিনি যখন শপথ করিয়াছেন তখন ত আর বিবাহ করিতে পারিবেন না।—দেবী কহিলেন, তা হউক, কিন্তু ইহাতে তোমার খুসী হইবার কোন কারণ নাই। মানবী কহিল, সকলি বুঝি, কিন্তু যখন তিনি শপথ করিয়াছেন তখন, ইত্যাদি —বারবার সেই এক কথা! দেবী তখন কেবল নিরুত্তরে ভ্রূকুটী করিলেন এবং একটা ভয়ঙ্কর আশঙ্কার অন্ধকারে আমার সমস্ত অন্তঃকরণ আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

আমার অনুতপ্ত স্বামী চাকর দাসীকে নিষেধ করিয়া নিজে আমার সকল কাজ করিয়া দিতে উদ্যত হইলেন। স্বামীর উপর তুচ্ছ বিষয়েও এইরূপ নিরুপায় নির্ভর প্রথমটা ভালই লাগিত। কারণ এমনি করিয়া সর্ব্বদাই তাঁহাকে কাছে পাইতাম। চোখে তাঁহাকে

দেখিলাম না বলিয়া তাঁহাকে সর্ব্বদা কাছে পাইবার আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। স্বামীমুখের যে অংশ আমার চোখের ভাগে পড়িয়াছিল সেইটে এখন অন্য ইন্দ্রিয়েরা বাঁটিয়া লইয়া নিজেদের ভাগ বাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল। এখন আমার স্বামী অধিকক্ষণ বাহিরের কাজে থাকিলে মনে হইত আমি যেন শূন্যে রহিয়াছি, আমি যেন কোথাও কিছু ধরিতে পারিতেছি না, আমার যেন সব হারাইল। পূর্ব্বে স্বামী যখন কালেজে যাইতেন তখন বিলম্ব হইলে পথের দিকের জানালা একটুখানি ফাঁক করিয়া পথ চাহিয়া থাকিতাম। যে জগতে তিনি বেড়াইতেন সে জগৎটাকে আমি চোখের দ্বারা নিজের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম। আজ আমার দৃষ্টিহীন সমস্ত শরীর তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে চেষ্টা করে। তাঁহার পৃথিবীর সহিত আমার পৃথিবীর যে প্রধান সাঁকো ছিল সেটা আজ ভাঙ্গিয়া গেছে। এখন, তাঁহার এবং আমার মাঝখানে একটা দুস্তর অন্ধতা;—এখন আমাকে কেবল নিরুপায় ব্যগ্রভাবে বসিয়া থাকিতে হয় কখন্ তিনি তাঁহার পার হইতে আমার পারে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। সেই জন্য এখন যখন ক্ষণকালের জন্যও তিনি আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যান, তখন আমার সমস্ত অন্ধ দেহ উদ্যত হইয়া তাঁহাকে ধরিতে যায়, হাহাকার করিয়া তাঁহাকে ডাকে।

কিন্তু এত আকাঙ্ক্ষা এত নির্ভর ত ভাল নয়। একেত স্বামীর উপরে স্ত্রীর ভারই যথেষ্ট, তাহার উপরে আবার অন্ধতার প্রকাণ্ডভার চাপাইতে পারি না। আমার এই বিশ্বযোড়া অন্ধকার এ আমিই বহন করিব। আমি একাগ্রমনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, আমার এই অনন্ত অন্ধতা দ্বারা স্বামীকে আমি আমার সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিব না!

অল্পকালের মধ্যেই কেবল শব্দ গন্ধ স্পর্শের দ্বারা আমি আমার সমস্ত অভ্যস্ত কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে শিখিলাম। এমন কি, আমার অনেক গৃহকর্ম্ম পূর্ব্বের চেয়ে অনেক বেশী নৈপুণ্যের সহিত নির্ব্বাহ করিতে পারিলাম। এখন মনে হইতে লাগিল দৃষ্টি আমাদের কাজের যতটা সাহায্য করে তাহার চেয়ে ঢের বেশী বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। যতটুকু দেখিলে কাজ ভাল হয় চোখ তাহার চেয়ে ঢের বেশী দেখে। এবং চোখ যখন পাহারার কাজ করে কাণ তখন অলস হইয়া যায়,—যতটা তাহার শোনা উচিত তাহার চেয়ে সে কম শোনে। এখন চঞ্চল চোখের অবর্ত্তমানে আমার অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয় তাহাদের কর্ত্তব্য শান্ত এবং সম্পূর্ণভাবে করিতে লাগিল।

এখন আমার স্বামীকে আর আমার কোন কাজ করিতে দিলাম না—এবং তাঁহার সমস্ত কাজ আবার পূর্ব্বের মত আমিই করিতে লাগিলাম।

স্বামী আমাকে কহিলেন, আমার প্রায়শ্চিত্ত হইতে আমাকে বঞ্চিত করিতেছ।

আমি কহিলাম, তোমার প্রায়শ্চিত্ত কিসের আমি জানি না, কিন্তু আমার পাপের ভার আমি বাড়াইব কেন?

যাহাই বলুন্ আমি যখন তাঁহাকে মুক্তি দিলাম তখন তিনি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। অন্ধ স্ত্রীর সেবাকে চিরজীবনের ব্রত করা পুরুষের কর্ম্ম নহে।

আমার স্বামী ডাক্তারী পাশ করিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া মফস্বলে গেলেন।

পাড়াগাঁয়ে আসিয়া যেন মাতৃক্রোড়ে আসিলাম মনে হইল। আমার আট বৎসর বয়সের

সময় আমি গ্রাম ছাড়িয়া সহরে আসিয়াছিলাম। ইতি মধ্যে দশবৎসরে জন্মভূমি আমার মনের মধ্যে ছায়ার মত অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছিল। যত দিন চক্ষু ছিল কলিকাতা সহর আমার চারিদিকে আর সমস্ত স্মৃতিকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। চোখ যাইতেই বুঝিলাম কলিকাতা কেবল চোখ ভুলাইয়া রাখিবার সহর,—ইহাতে মন ভরিয়া রাখে না। দৃষ্টি হারাইবামাত্র আমার সেই বাল্যকালের পল্লিগ্রাম দিবাবসানে নক্ষত্রলোকের মত আমার মনের মধ্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

অগ্রহায়ণের শেষাশেষি আমরা হাসিমপুরে গেলাম। নূতন দেশ, চারিদিক্ দেখিতে কি রকম তাহা বুঝিলাম না—কিন্তু বাল্যকালের সেই গন্ধে এবং অনুভবে আমাকে সর্ব্বাঙ্গে বেষ্টন করিয়া ধরিল। সেই শিশিরে-ভেজা নূতন চষা ক্ষেত হইতে প্রভাতের হাওয়া, সেই সোণা-ঢালা অড়'র এবং সরিষা ক্ষেতের আকাশভরা কোমল সুমিষ্ট গন্ধ, সেই রাখালের গান, এমন কি, ভাঙ্গা রাস্তা দিয়া গরুর গাড়ি চলার শব্দ পর্য্যন্ত আমাকে পুলকিত করিয়া তুলিল। আমার সেই জীবনারম্ভের অতীত স্মৃতি তাহার অনির্ব্বচনীয় ধ্বনি ও গন্ধ লইয়া প্রত্যক্ষ বর্ত্তমানের মত আমাকে ঘিরিয়া বসিল, অন্ধ চক্ষু তাহার কোন প্রতিবাদ করিতে পারিল না। সেই বাল্যকালের মধ্যে ফিরিয়া গেলাম—কেবল মাকে পাইলাম না। মনে মনে দেখিতে পাইলাম দিদিমা তাঁহার বিরল কেশগুচ্ছ মুক্ত করিয়া রৌদ্রে পিঠ দিয়া প্রাঙ্গণে বড়ি দিতেছেন, কিন্তু তাঁহার সেই মৃদুকম্পিত প্রাচীন দুর্ব্বল কণ্ঠে আমাদের গ্রাম্য সাধু ভজনদাসের দেহতত্ত্ব গান গুঞ্জনস্বরে শুনিতে পাইলাম না, সেই নবান্নের উৎসব শীতের শিশিরস্নাত আকাশের মধ্যে সজীব হইয়া জাগিয়া উঠিল, কিন্তু ঢেকিশালে নূতন ধান কুটিবার, জনতার মধ্যে আমার ছোট ছোট পল্লি-সঙ্গিনীদের সমাগম কোথায় গেল? সন্ধ্যাবেলা অদূরে কোথা হইতে হাম্বাধ্বনি শুনিতে পাই,—তখন মনে পড়ে মা সন্ধ্যাদীপ হাতে করিয়া গোয়ালে আলো দেখাইতে যাইতেছেন; সেই সঙ্গে ভিজা জাবনার খড় জ্বালানো ধোঁয়ার গন্ধ যেন হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে, এবং শুনিতে পাই পুকুরের পাড়ে বিদ্যালঙ্কারদের ঠাকুরবাড়ি হইতে কাঁসর ঘণ্টার শব্দ আসিতেছে। কে যেন আমার সেই শিশুকালের আটটি বৎসরের মধ্য হইতে তাহার সমস্ত বস্তু-অংশ ছাঁকিয়া লইয়া কেবল তাহার রসটুকু আমার চারিদিকে রাশীকৃত করিয়াছে।

এই সঙ্গে আমার সেই ছেলেবেলাকার ব্রত এবং ভোরবেলায় ফুল তুলিয়া শিবপূজার কথা মনে পড়িল। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, কলিকাতার আলাপ আলোচনা আনাগোনার গোলমালে বুদ্ধির একটু বিকার ঘটেই। ধর্ম্ম কর্ম্ম ভক্তিশ্রদ্ধার মধ্যে নির্ম্মল সরলতাটুকু থাকে না। সে দিনের কথা আমার মনে পড়ে, যে দিন অন্ধ হওয়ার পরে কলিকাতায় আমার পল্লিবাসিনী এক সখী আসিয়া আমাকে বলিয়াছিল—"তোর রাগ হয় না কুমু? আমি হইলে এমন স্বামীর মুখ দেখিতাম না।" আমি বলিলাম, "ভাই মুখ দেখা ত বন্ধই বটে সে জন্যে এ পোড়া চোখের উপরে রাগ হয় কিন্তু স্বামীর উপর রাগ করিতে যাইব কেন?" যথাসময়ে ডাক্তার ডাকেন নাই বলিয়া লাবণ্য আমার স্বামীর উপর অত্যন্ত রাগিয়াছিল এবং আমাকেও রাগাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। আমি তাহাকে বুঝাইলাম সংসারে থাকিতে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় জ্ঞানে অজ্ঞানে ভুলে ভ্রান্তিতে দুঃখ সুখ নানা রকম ঘটিয়া থাকে, কিন্তু মনের

মধ্যে যদি ভক্তি স্থির রাখিতে পারি তবে দুঃখের মধ্যেও একটা শান্তি থাকে,—নহিলে কেবল রাগারাগি রেষারেষি বকাবকি করিয়াই জীবন কাটিয়া যায়। অন্ধ হইয়াছি এই ত যথেষ্ট দুঃখ তাহার পরে স্বামীর প্রতি বিদ্বেষ করিয়া দুঃখের বোঝা বাড়াইব কেন? আমার মত বালিকার মুখে সেকেলে কথা শুনিয়া লাবণ্য রাগ করিয়া অবজ্ঞাভরে মাথা নাড়িয়া চলিয়া গেল। কিন্তু যাই বলি, কথার মধ্যে বিষ আছে; কথা একেবারে ব্যর্থ হয় না। লাবণ্যের মুখ হইতে রাগের কথা আমার মনের মধ্যে ছুটো একটা স্ফুলিঙ্গ ফেলিয়া গিয়াছিল, আমি সেটা পা দিয়া মাড়াইয়া নিবাইয়া দিয়াছিলাম,—কিন্তু তবু ছুটো একটা দাগ থাকিয়াছিল। তাই বলিতেছিলাম কলিকাতায় অনেক তর্ক অনেক কথা, সেখানে দেখিতে দেখিতে বুদ্ধি অকালে পাকিয়া কঠিন হইয়া উঠে।

পাড়াগাঁয়ে আসিয়া আমার সেই শিবপূজার শীতল শিউলিফুলের গন্ধে হৃদয়ের সমস্ত আশা ও বিশ্বাস আমার সেই শিশুকালের মতই নবীন ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দেবতায় আমার হৃদয় এবং আমার সংসার পরিপূর্ণ হইয়া গেল। আমি নতশিরে লুটাইয়া পড়িলাম। বলিলাম হে দেব, আমার চক্ষু গেছে বেশ হইয়াছে, তুমি ত আমার আছ।

হায়, ভুল বলিয়াছিলাম! তুমি আমার আছ এ কথাও স্পর্দ্ধার কথা। আমি তোমার আছি কেবল এইটুকু বলিবারই অধিকার আছে। ওগো, একদিন কণ্ঠ চাপিয়া আমার দেবতা এই কথাটা আমাকে বলাইয়া লইবে। কিছুই না থাকিতে পারে, কিন্তু আমাকে থাকিতেই হইবে।—কাহারও উপরে কোন দাবী নাই কেবল নিজের উপরেই আছে।

কিছুকাল বেশ সুখে কাটিল। ডাক্তারীতে আমার স্বামীরও প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল। হাতে কিছু টাকাও জমিল।

কিন্তু টাকা জিনিষটা ভাল নয়। উহাতে মন চাপা পড়িয়া যায়। মন যখন রাজত্ব করে তখন সে আপনার সুখ আপনি সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু ধন যখন সুখ সঞ্চয়ের ভার নেয় তখন মনের আর কাজ থাকে না। তখন, আগে যেখানে মনের সুখ ছিল, জিনিষপত্র আসবাব আয়োজন সেই জায়গাটুকু জুড়িয়া বসে। তখন, সুখের পরিবর্ত্তে কেবল সামগ্রী পাওয়া যায়।

কোন বিশেষ কথা বা বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিতে পারি না কিন্তু অন্ধের অনুভবশক্তি বেশী বলিয়া, কিম্বা কি কারণ জানি না, অবস্থার স্বচ্ছলতার সঙ্গে সঙ্গে আমার স্বামীর পরিবর্ত্তন আমি বেশ বুঝিতে পারিতাম। যৌবনারম্ভে ন্যায় অন্যায় ধর্ম্ম অধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার স্বামীর যে একটি বেদনা বোধ ছিল সেটা যেন প্রতিদিন অসাড় হইয়া আসিতেছিল। মনে আছে তিনি এক দিন বলিতেন—ডাক্তারী যে কেবল জীবিকার জন্য শিখিতেছি তাহা নহে, ইহাতে অনেক গরীবের উপকার করিতে পারিব। যে সব ডাক্তার দরিদ্র মুমূর্ষুর দ্বারে আসিয়া আগাম ভিজিট না লইয়া নাড়ি দেখিতে চায় না তাহাদের কথা বলিতে গিয়া ঘৃণায় তাঁহার বাক্‌রোধ হইত। আমি বুঝিতে পারি এখন আর সে দিন নাই। একমাত্র ছেলের প্রাণরক্ষার জন্য দরিদ্র নারী তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়াছে তিনি তাহা উপেক্ষা করিয়াছেন; শেষে আমি মাথার দিব্য দিয়া তাঁহাকে চিকিৎসায় পাঠাইয়াছি কিন্তু মনের সঙ্গে কাজ করেন নাই। যখন আমাদের টাকা অল্প ছিল তখন অন্যায়

উপার্জ্জনকে আমার স্বামী কি চক্ষে দেখিতেন তাহা আমি জানি। কিন্তু ব্যাঙ্কে এখন অনেক টাকা জমিয়াছে এখন একজন ধনী লোকের আমলা আসিয়া তাঁহার সঙ্গে গোপনে দুই দিন ধরিয়া অনেক কথা বলিয়া গেল; কি বলিল আমি কিছুই জানি না,—কিন্তু তাহার পরে যখন তিনি আমার কাছে আসিলেন, অত্যন্ত প্রফুল্লতার সঙ্গে অন্য নানা বিষয়ে নানা কথা বলিলেন, তখন আমার অন্তঃকরণের স্পর্শশক্তি দ্বারা বুঝিলাম তিনি আজ কলঙ্ক মাখিয়া আসিয়াছেন।

অন্ধ হইবার পূর্ব্বে আমি যাঁহাকে শেষবার দেখিয়াছিলাম আমার সে স্বামী কোথায়? যিনি আমার দৃষ্টিহীন দুই চক্ষুর মাঝখানে একটি চুম্বন করিয়া আমাকে একদিন দেবী পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন আমি তাঁহার কি করিতে পারিলাম? একদিন একটা রিপুর ঝড় আসিয়া যাহাদের অকস্মাৎ পতন হয় তাহারা আর একটা হৃদয়াবেগে আবার উপরে উঠিতে পারে, কিন্তু এই যে, দিনে দিনে পলে পলে মজ্জার ভিতর হইতে কঠিন হইয়া যাওয়া, বাহিরে বাড়িয়া উঠিতে উঠিতে অন্তরকে তিলে তিলে চাপিয়া ফেলা ইহার প্রতিকার ভাবিতে গেলে কোন রাস্তা খুঁজিয়া পাই না।

স্বামীর সঙ্গে আমার চোখে-দেখার যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে সে কিছুই নয়;—কিন্তু প্রাণের ভিতরটা যে হাঁপাইয়া ওঠে যখন মনে করি আমি যেখানে তিনি সেখানে নাই;—আমি অন্ধ, সংসারের আলোক-বর্জ্জিত অন্তর প্রদেশে আমার সেই প্রথম বয়সের নবীন প্রেম, অক্ষুণ্ণ ভক্তি, অখণ্ড বিশ্বাস লইয়া বসিয়া আছি, আমার দেবমন্দিরে জীবনের আরম্ভে আমি বালিকার করপুটে যে শেফালিকার অর্ঘ্যদান করিয়াছিলাম তাহার শিশির এখনও শুকায় নাই,—আর আমার স্বামী এই ছায়াশীতল চির নবীনতার দেশ ছাড়িয়া টাকা উপার্জ্জনের পশ্চাতে সংসার মরুভূমির মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া চলিয়া যাইতেছেন! আমি যাহা বিশ্বাস করি, যাহাকে ধর্ম্ম বলি, যাহাকে সকল সুখ সম্পত্তির অধিক বলিয়া জানি, তিনি অতি দূর হইতে তাহার প্রতি হাসিয়া কটাক্ষপাত করেন। কিন্তু একদিন এবিচ্ছেদ ছিল না, প্রথম বয়সে আমরা এক পথেই যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলাম,—তাহার পরে কখন যে পথের ভেদ হইতে আরম্ভ হইতেছিল তাহা তিনিও জানিতে পারেন নাই, আমিও জানিতে পারি নাই, অবশেষে আজ আমি আর তাঁহাকে ডাকিয়া সাড়া পাই না।

এক এক সময়ে ভাবি, হয় ত অন্ধ বলিয়া সামান্য কথাকে আমি বেশী করিয়া দেখি। চক্ষু থাকিলে আমি হয় ত সংসারকে ঠিক সংসারের মত করিয়া চিনিতে পারিতাম।

আমার স্বামীও আমাকে একদিন তাহাই বুঝাইয়া বলিলেন। সে দিন সকালে একটি বৃদ্ধ মুসলমান তাহার পৌত্রীর ওলাউঠার চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে ডাকিতে আসিয়াছিল। আমি শুনিতে পাইলাম, সে কহিল, বাবা আমি গরীব, কিন্তু আল্লা তোমার ভাল করিবেন!—আমার স্বামী কহিলেন, "আল্লা যাহা করিবেন কেবল তাহাতেই আমার চলিবে না, তুমি কি করিবে সেটা আগে শুনি।" শুনিবামাত্র ভাবিলাম, ঈশ্বর আমাকে অন্ধ করিয়াছেন, কিন্তু বধির করেন নাই কেন? বৃদ্ধ গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত হে আল্লা বলিয়া বিদায় হইয়া গেল। আমি তখনি ঝিকে দিয়া তাহাকে অন্তঃপুরের খিড়কিদ্বারে ডাকাইয়া আনিলাম,—কহিলাম, বাবা, তোমার নাত্‌নির জন্য এই ডাক্তারের খরচা কিছু দিলাম, তুমি আমার স্বামীর মঙ্গল

প্রার্থনা করিয়া পাড়া হইতে হরিশ ডাক্তারকে ডাকিয়া লইয়া যাও।

কিন্তু সমস্ত দিন আমার মুখে অন্ন রুচিল না। স্বামী অপরাহ্ণে নিদ্রা হইতে জাগিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে বিমর্ষ দেখিতেছি কেন? পূর্ব্বকালের অভ্যস্ত উত্তর একটা মুখে আসিতেছিল—না কিছুই হয় নাই,—কিন্তু ছলনার কাল গিয়াছে—আমি স্পষ্ট করিয়া বলিলাম, কতদিন তোমাকে বলিব মনে করি, কিন্তু বলিতে গিয়া ভাবিয়া পাই না ঠিক কি বলিবার আছে। আমার অন্তরের কথাটা আমি বুঝাইয়া বলিতে পারিব কি না জানি না, কিন্তু নিশ্চয় তুমি নিজের মনের মধ্যে বুঝিতে পার, আমরা দুজনে যেমন ভাবে এক হইয়া জীবন আরম্ভ করিয়াছিলাম, আজ তাহা পৃথক্ হইয়া গেছে।—স্বামী হাসিয়া কহিলেন, পরিবর্ত্তনই ত সংসারের ধর্ম্ম। আমি কহিলাম, টাকা কড়ি রূপ যৌবন সকলেরই পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু নিত্য জিনিষ কি কিছুই নাই?—তখন তিনি একটু গম্ভীর হইয়া কহিলেন—"দেখ অন্য স্ত্রীলোকেরা সত্যকার অভাব লইয়া দুঃখ করে,—কাহারো স্বামী উপার্জ্জন করে না, কাহারো স্বামী ভালবাসে না—তুমি আকাশ হইতে দুঃখ টানিয়া আন!" আমি তখনই বুঝিলাম, অন্ধতা আমার চোখে এক অঞ্জন মাখাইয়া আমাকে এই পরিবর্ত্তমান সংসারের বাহিরে লইয়া গেছে, আমি অন্য স্ত্রীলোকের মত নহি; আমাকে আমার স্বামী বুঝিবেন্ না।

ইতিমধ্যে আমার এক পিস্‌শাশুড়ী দেশ হইতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের সংবাদ লইতে আসিলেন। আমরা উভয়ে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিতেই তিনি প্রথম কথাতেই বলিলেন "বলি বউমা, তুমিত কপালক্রমে দুটি চক্ষু খোয়াইয়া বসিয়াছ, এখন আমাদের অবিনাশ অন্ধ স্ত্রীকে লইয়া ঘরকন্না চালাইবে কি করিয়া? উহার আর একটা বিয়ে থাওয়া দিয়ে দাও!" স্বামী যদি ঠাট্টা করিয়া বলিতেন, তা বেশত পিসিমা, তোমরা দেখিয়া শুনিয়া একটা ঘটকালি করিয়া দাও না,—তাহা হইলে সমস্ত পরিষ্কার হইয়া যাইত। কিন্তু তিনি কুণ্ঠিত হইয়া কহিলেন আঃ, পিসিমা কি বলিতেছ!—পিসিমা উত্তর করিলেন, কেন, অন্যায় কি বলিতেছি?—আচ্ছা বৌমা, তুমিই বলত বাছা। আমি হাসিয়া কহিলাম, পিসিমা, ভাল লোকের কাছে পরামর্শ চাহিতেছ? যাহার গাঁঠ কাটিতে হইবে তাহার কি কেহ সম্মতি নেয়?" পিসিমা উত্তর করিলেন, হাঁ সে কথা ঠিক বটে! তা, তোতে আমাতে গোপনে পরামর্শ করিব—কি বলিস্ অবিনাশ! তাও বলি বৌমা, কুলীনের মেয়ের সতীন যত বেশী হয়, তাহার স্বামীর গৌরব ততই বাড়ে। আমাদের ছেলে ডাক্তারী না করিয়া যদি বিবাহ করিত, তবে উহার রোজগারের ভাবনা কি ছিল! রোগী ত ডাক্তারের হাতে পড়িলেই মরে—মরিলে ত আর ভিজিট দেয় না—কিন্তু বিধাতার শাপে কুলীনের স্ত্রীর মরণ নাই এবং সে যত দিন বাঁচে, তত দিনই স্বামীর লাভ।

দুই দিন বাদে আমার স্বামী আমার সম্মুখে পিসিমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"পিসিমা, আত্মীয়ের মত করিয়া বৌয়ের সাহায্য করিতে পারে—এমন একটি ভদ্র ঘরের স্ত্রীলোক দেখিয়া দিতে পার? উনি চোখে দেখিতে পান না, সর্ব্বদা ওঁর একটি সঙ্গিনী কেহ থাকিলে আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি?" যখন নূতন অন্ধ হইয়াছিলাম, তখন এ কথা বলিলে খাটিত, কিন্তু এখন চোখের অভাবে আমার কিংবা ঘরকরনার বিশেষ কি অসুবিধা হয় জানি না। কিন্তু প্রতিবাদ মাত্র না করিয়া চুপ করিয়া রহি-

লাম। পিসিমা কহিলেন অভাব কি? আমারি ত ভাসুরের এক মেয়ে আছে যেমন সুন্দরী তেমনি লক্ষ্মী। মেয়েটির বয়স হইল কেবল উপযুক্ত বরের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিয়া আছে; তোমার মত কুলীন পাইলে এখনি বিবাহ দিয়া দেয়।"—স্বামী চকিত হইয়া কহিলেন, বিবাহের কথা কে বলিতেছে? পিসিমা কহিলেন—ওমা, বিবাহ না করিলে ভদ্র ঘরের মেয়ে কি তোমার ঘরে অম্নি আসিয়া পড়িয়া থাকিবে? কথাটা সঙ্গত বটে, এবং স্বামী তাহার কোন সদুত্তর দিতে পারিলেন না।

আমার রুদ্ধ চক্ষুর অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে আমি একলা দাঁড়াইয়া উর্দ্ধমুখে ডাকিতে লাগিলাম ভগবান, আমার স্বামীকে রক্ষা কর!

তাহার দিন কয়েক পরে একদিন সকাল বেলায় আমার পূজা আহ্নিক সারিয়া বাহিরে আসিতেই পিসিমা কহিলেন, বৌমা যে ভাসুরঝির কথা বলিয়াছিলাম সেই আমাদের হেমাঙ্গিনী আজ দেশ হইতে আসিয়াছে। হিমু, ইনি তোমার দিদি, ইহাঁকে প্রণাম কর!

এমন সময় আমার স্বামী হঠাৎ আসিয়া যেন অপরিচিত স্ত্রীলোককে দেখিয়া ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। পিসিমা কহিলেন, "কোথা যাস অবিনাশ!" স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন "ইনি কে।" পিসিমা কহিলেন "এই মেয়েটিই আমার সেই ভাসুর ঝি হেমাঙ্গিনী। ইহাকে কখন আনা হইল, কে আনিল, কি বৃত্তান্ত, লইয়া আমার স্বামী বারংবার অনেক অনাবশ্যক আশ্চর্য্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

আমি মনে মনে কহিলাম যাহা ঘটিতেছে তাহাত সবই বুঝিতেছি—কিন্তু ইহার উপরে আবার ছলনা আরম্ভ হইল? লুকাচুরি, ঢাকাঢাকি, মিথ্যা কথা! অধর্ম্ম করিতে যদি হয় ত কর, সে নিজের অশান্ত প্রবৃত্তির জন্য—কিন্তু আমার জন্য কেন হীনতা করা? আমাকে ভুলাইবার জন্য কেন মিথ্যাচরণ?

হেমাঙ্গিনীর হাত ধরিয়া আমি তাহাকে আমার শয়নগৃহে লইয়া গেলাম। তাহার মুখে গায়ে হাত বুলাইয়া তাহাকে দেখিলাম,—মুখটি সুন্দর হইবে, বয়সও চোদ্দ পনেরর কম হইবে না।

বালিকা হঠাৎ মধুর উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, কহিল, ওকি করিতেছ? আমার ভূত ঝাড়াইয়া দিবে নাকি?

সেই উন্মুক্ত সরল হাস্যধ্বনিতে আমাদের মাঝখানের একটা অন্ধকার মেঘ যেন এক মুহূর্ত্তে কাটিয়া গেল। আমি দক্ষিণ বাহুতে তাহার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া কহিলাম, আমি তোমাকে দেখিতেছি ভাই! বলিয়া তাহার কোমল মুখখানিতে আর একবার হাত বুলাইলাম।

দেখিতেছ? বলিয়া সে আবার হাসিতে লাগিল। কহিল—আমি কি তোমার বাগানের সিম না বেগুন যে হাত বুলাইয়া দেখিতেছ কতবড়টা হইয়াছি?"

তখন আমার হঠাৎ মনে হইল, আমি যে অন্ধ তাহা হেমাঙ্গিনী জানে না। কহিলাম, বোন, আমি যে অন্ধ! শুনিয়া সে কিছুক্ষণ আশ্চর্য্য হইয়া গম্ভীর হইয়া রহিল। বেশ বুঝিতে পারিলাম, তাহার কুতূহলী তরুণ আয়ত নেত্র দিয়া সে আমার দৃষ্টিহীন চক্ষু এবং মুখের ভাব মনোযোগের সহিত দেখিল—তাহার পরে কহিল—"ওঃ তাই বুঝি কাকীকে এখানে আনাইয়াছ?"

আমি কহিলাম—না, আমি ডাকি নাই। তোমার কাকী আপনি আসিয়াছেন—

বালিকা আবার হাসিয়া উঠিয়া কহিল "দয়া করিয়া? তাহা হইলে দয়াময়ী শীঘ্র নড়িতে

ছেন না! কিন্তু বাবা আমাকে এখানে কেন পাঠাইলেন ?"

এমন সময়ে পিসিমা ঘরে প্রবেশ করিলেন। এতক্ষ আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁহার কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। ঘরে আসিতেই হেমাঙ্গিনী কহিল কাকী, আমরা বাড়ি ফিরিব কবে বল!

পিসিমা কহিলেন, "ওমা! এই মাত্র আসিয়াই অমনি যাই যাই! অমন চঞ্চল মেয়েও ত দেখি নাই!"

হেমাঙ্গিনী কহিল, কাকী, তোমার ত এখান হইতে শীঘ্র নড়িবার গতিক দেখি না। তা, তোমার এ হ'ল আত্মীয় ঘর, তুমি যতদিন খুসি থাক আমি কিন্তু চলিয়া যাইব, তা তোমাকে বলিয়া রাখিতেছি।—এই বলিয়া আমার হাত ধরিয়া কহিল, কি বল ভাই! তোমরা ত আমার ঠিক আপন নও!—আমি তাহার এই সরল প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া তাহাকে আমার বুকের কাছে টানিয়া লইলাম। দেখিলাম পিসিমা যতই প্রবলা হউন এই কন্যাটিকে তাঁহার সাম্‌লাইবার সাধ্য নাই। পিসিমা প্রকাশ্যে রাগ না দেখাইয়া হেমাঙ্গিনীকে একটু আদর করিবার চেষ্টা করিলেন, সে তাহা যেন গা হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল। পিসিমা সমস্ত ব্যাপারটাকে আদুরে মেয়ের একটা পরিহাসের মত উড়াইয়া দিয়া হাসিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। আবার কি ভাবিয়া ফিরিয়া আসিয়া হেমাঙ্গিনীকে কহিলেন হিমু, চল্ তোর স্নানের বেলা হইল। সে আমার কাছে আসিয়া কহিল, "আমরা দুই জনে ঘাটে যাইব, কি বল ভাই ?" পিসিমা অনিচ্ছাসত্ত্বেও ক্ষান্ত দিলেন ; তিনি জানিতেন টানাটানি করিতে গেলে হেমাঙ্গিনীরই জয় হইবে এবং তাঁহাদের মধ্যেকার বিরোধ অশোভনরূপে আমার সম্মুখে প্রকাশ হইবে।

খিড়কির ঘাটে যাইতে যাইতে হেমাঙ্গিনী আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার ছেলেপুলে নাই কেন ?—আমি ঈষৎ হাসিয়া কহিলাম, কেন তাহা কি করিয়া জানিব—ঈশ্বর দেন নাই! হেমাঙ্গিনী কহিল—অবশ্য তোমার ভিতরে কিছু পাপ ছিল। আমি কহিলাম, তাহাও অন্তর্যামী জানেন। বালিকা প্রমাণস্বরূপে কহিল, দেখনা কাকীর ভিতরে এত কুটিলতা যে উহার গর্ভে সন্তান জন্মিতে পায় না।—পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ, দণ্ড পুরস্কারের তত্ত্ব নিজেও বুঝি না, বালিকাকেও বুঝাইলাম না,—কেবল একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে তাহাকে কহিলাম—তুমিই জান! হেমাঙ্গিনী তৎক্ষণাৎ আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল—ওমা আমার কথা শুনিয়াও তোমার নিশ্বাস পড়ে! আমার কথা বুঝি কেহ গ্রাহ্য করে!

দেখিলাম, স্বামীর ডাক্তারী ব্যবসায়ে ব্যাঘাত হইতে লাগিল। দূরে ডাক পড়িলে ত যানই না—কাছে কোথাও গেলেও চট্‌পট সারিয়া চলিয়া আসেন। পূর্ব্বে যখন কর্ম্মের অবসরে ঘরে থাকিতেন, মধ্যাহ্নে আহার এবং নিদ্রার সময় কেবল বাড়ির ভিতরে আসিতেন। এখন পিসিমাও যখন তখন ডাকিয়া পাঠান, তিনিও অনাবশ্যক পিসিমার খবর লইতে আসেন। পিসিমা যখন ডাক ছাড়িয়া বলেন, হিমু, আমার পানের বাটাটা নিয়ে আয় ত—আমি বুঝিতে পারি পিসিমার ঘরে আমার স্বামী আসিয়াছেন। প্রথম প্রথম দিন দুই তিন হেমাঙ্গিনী পানের বাটা, তেলের বাটি, সিঁদুরের কৌটা প্রভৃতি যথাদিষ্ট লইয়া যাইত। কিন্তু তাহার পরে ডাক পড়িলে সে আর কিছুতেই নড়িত না, ঝির হাত দিয়া আদিষ্ট দ্রব্য পাঠাইয়া দিত। পিসি

ডাকিতেন, হেমাঙ্গিনী, হিমু, হিমি—বালিকা যেন আমার প্রতি একটা করুণার আবেগে আমাকে জড়াইয়া থাকিত,—একটা আশঙ্কা এবং বিষাদে তাহাকে আচ্ছন্ন করিত। ইহার পর হইতে আমার স্বামীর কথা সে আমার কাছে ভ্রমেও উল্লেখ করিত না।

ইতিমধ্যে আমার দাদা আমাকে দেখিতে আসিলেন। আমি জানিতাম দাদার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। ব্যাপারটা কিরূপ চলিতেছে তাহা তাঁহার নিকট গোপন করা প্রায় অসাধ্য হইবে। আমার দাদা বড় কঠিন বিচারক। তিনি লেশমাত্র অন্যায়কে ক্ষমা করিতে জানেন না। আমার স্বামী যে তাঁহারই চক্ষের সম্মুখে অপরাধী রূপে দাঁড়াইবেন, ইহাই আমি সব চেয়ে ভয় করিতাম। আমি অতিরিক্ত প্রফুল্লতা দ্বারা সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া রাখিলাম। আমি বেশী কথা বলিয়া বেশী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া অত্যন্ত ধূমধাম করিয়া চারিদিকে যেন একটা ধূলা উড়াইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু সেটা আমার পক্ষে এমন অস্বাভাবিক যে, তাহাতেই আরো বেশী ধরা পড়িবার কারণ হইল। কিন্তু দাদা বেশী দিন থাকিতে পারিলেন না—আমার স্বামী এমনি অস্থিরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে তাহা প্রকাশ্য রূঢ়তার আকার ধারণ করিল। দাদা চলিয়া গেলেন। বিদায় লইবার পূর্ব্বে পরিপূর্ণ স্নেহের সহিত আমার মাথার উপর অনেকক্ষণ কম্পিত হস্ত রাখিলেন—মনে মনে একাগ্রচিত্তে কি আশীর্ব্বাদ করিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম; তাঁহার অশ্রু আমার অশ্রুসিক্ত কপোলের উপর আসিয়া পড়িল!

মনে আছে সে দিন চৈত্রমাসের সন্ধ্যাবেলায় হাটের বারে লোকজন বাড়ি ফিরিয়া যাইতেছে। দূর হইতে বৃষ্টি লইয়া একটা ঝড় আসিতেছে, তাহারই মাটি-ভেজা গন্ধ এবং বাতাসের আর্দ্রভাব আকাশে ব্যাপ্ত হইয়াছে,—সঙ্গচ্যুত সাথিগণ অন্ধকার মাঠের মধ্যে পরস্পরকে ব্যাকুল উর্দ্ধ-কণ্ঠে ডাকিতেছে। অন্ধের শয়ন গৃহে যতক্ষণ আমি একলা থাকি, ততক্ষণ প্রদীপ জ্বালানো হয় না—পাছে শিখা লাগিয়া কাপড় ধরিয়া উঠে বা কোন দুর্ঘটনা হয়। আমি সেই নির্জ্জন অন্ধকার কক্ষের মধ্যে মাটিতে বসিয়া দুই হাত জুড়িয়া আমার অনন্ত অন্ধজগতের জগদীশ্বরকে ডাকিতেছিলাম—বলিতেছিলাম,—প্রভু, তোমার দয়া যখন অনুভব হয় না, তোমার অভিপ্রায় যখন বুঝি না, তখন এই অনাথ ভগ্ন হৃদয়ের হালটাকে প্রাণপণে দুই হাতে বক্ষে চাপিয়া ধরি, বুক দিয়া রক্ত বাহির হইয়া যায় তবু তুফান সাম্‌লাইতে পারি না আমার আর কত পরীক্ষা করিবে, আমার কতটুকুই বা বল!—এই বলিতে বলিতে অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—খাটের পর মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। সমস্ত দিন ঘরের কাজ করিতে হয়, হেমাঙ্গিনী ছায়ার মত কাছে কাছে থাকে—বুকের ভিতরে যে অশ্রু ভরিয়া উঠে সে আর ফেলিবার অবসর পাই না। অনেকদিন পরে আজ চোখের জল বাহির হইল। এমন সময় দেখিলাম খাট একটু নড়িল মানুষ চলার উস্‌খুস্‌ শব্দ হইল—এবং মুহূর্ত্ত পরে হেমাঙ্গিনী আসিয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া নিঃশব্দে অঞ্চল দিয়া আমার চোখ মুছাইয়া দিতে লাগিল। সে যে সন্ধ্যার আরম্ভে কি ভাবিয়া কখন্ আসিয়া খাটেই শুইয়াছিল, আমি জানিতে পারি নাই। সে একটি প্রশ্নও করিল না, আমিও তাহাকে কোন কথাই বলিলাম না। সে ধীরে ধীরে তাহার শীতল হস্ত আমার ললাটে বুলাইয়া দিতে লাগিল। ইতিমধ্যে কখন্ মেঘগর্জ্জন এবং

মুষলধারে বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে একটা ঝড় হইয়া গেল বুঝিতেই পারিলাম না—বহুকাল পরে একটি সুস্নিগ্ধ শান্তি আসিয়া আমার জ্বরদাহদগ্ধ হৃদয়কে জুড়াইয়া দিল।

পর দিন হেমাঙ্গিনী কহিল, কাকী, তুমি যদি বাড়ি না যাও, আমি আমার কৈবর্ত্ত দাদার সঙ্গে চলিলাম, তাহা বলিয়া রাখিতেছি। পিসিমা কহিলেন, তাহাতে কাজ কি, আমিও কাল যাইতেছি, এক সঙ্গেই যাওয়া হইবে। এই দেখ্ হেমু; আমার অবিনাশ তোর জন্য কেমন একটি মুক্তা-দেওয়া আংটি কিনিয়া দিয়াছে ?—বলিয়া সগর্ব্বে পিসিমা আংটি হেমাঙ্গিনীর হাতে দিলেন। হেমাঙ্গিনী কহিল, এই দেখ কাকী, আমি কেমন সুন্দর লক্ষ্য করিতে পারি।—বলিয়া জানলা হইতে তাক করিয়া আংটি খিড়কি পুকুরের মাঝখানে ফেলিয়া দিল। পিসিমা রাগে দুঃখে বিস্ময়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিলেন। আমাকে বারংবার করিয়া হাতে ধরিয়া বলিয়া দিলেন—বৌমা উহার এই ছেলেমানসির কথা অবিনাশকে খবরদার বলিয়ো না—ছেলে আমার তাহা হইলে মনে দুঃখ পাইবে। মাথা খাও বৌমা! আমি কহিলাম, আর বলিতে হইবে না পিসিমা, আমি কোন কথাই বলিব না।

পরদিনে যাত্রার পূর্ব্বে হেমাঙ্গিনী আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—দিদি আমাকে মনে রাখিস্! আমি দুই হাত বারংবার তাহার মুখে বুলাইয়া কহিলাম—অন্ধ কিছু ভোলে না বোন্—আমার ত জগৎ নাই, আমি কেবল মন লইয়াই আছি! বলিয়া তাহার মাথাটা লইয়া একবার আঘ্রাণ করিয়া চুম্বন করিলাম। ঝর্ ঝর্ করিয়া তাহার কেশ রাশির মধ্যে আমার অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

হেমাঙ্গিনী বিদায় লইলে আমার পৃথিবীটা শুষ্ক হইয়া গেল,—সে আমার প্রাণের মধ্যে যে সৌগন্ধ্য, সৌন্দর্য্য, সঙ্গীত যে উজ্জ্বল আলো এবং যে কোমল তরুণতা আনিয়াছিল, তাহা চলিয়া গেলে একবার আমার সমস্ত সংসার, আমার চারিদিকে দুই হাত বাড়াইয়া দেখিলাম কোথায় আমার কি আছে!—আমার স্বামী আসিয়া বিশেষ প্রফুল্লতা দেখাইয়া কহিলেন—ইঁহারা গেলেন এখন বাঁচা গেল, একটু কাজ-কর্ম্ম করিবার অবসর পাওয়া যাইবে।—ধিক্ ধিক্ আমাকে! আমার জন্য কেন এত চাতুরী! আমি কি সত্যকে ডরাই? আমি কি আঘাতকে কখনও ভয় করিয়াছি? আমার স্বামী কি জানেন না, যখন আমি দুই চক্ষু দিয়াছিলাম, তখন আমি শান্তমনে আমার চিরান্ধকার গ্রহণ করি নাই?

এতদিন আমি এবং আমার স্বামীর মধ্যে কেবল অন্ধতার অন্তরাল ছিল, আজ হইতে আর একটা ব্যবধান সৃজন হইল। আমার স্বামী ভুলিয়াও কখনো হেমাঙ্গিনীর নাম আমার কাছে উচ্চারণ করিতেন না,—যেন তাঁহার সম্পর্কীয় সংসার হইতে হেমাঙ্গিনী একেবারে লুপ্ত হইয়া গেছে, যেন সেখানে সে কোনকালে লেশমাত্র রেখাপাত করে নাই। অথচ পত্র দ্বারা তিনি যে সর্ব্বদাই তাহার খবর পাইতেছেন, তাহা আমি অনায়াসে অনুভব করিতে পারিতাম; যেমন পুকুরের মধ্যে বন্যার জল যে দিন একটু প্রবেশ করে সেই দিনই পদ্মের ডাঁটায় টান পড়ে—তেম্‌নি তাঁহার ভিতরে একটুও যে দিন স্ফীতির সঞ্চার হয়, সে দিন আমার হৃদয়ের মূলের মধ্য হইতে আমি আপনি অনুভব করিতে পারি। কবে তিনি খবর পাইতেন এবং কবে পাইতেন না তাহা আমার কাছে কিছু অগোচর ছিল না। কিন্তু আমিও তাঁহাকে তাহার কথা শুধাইতে

পারিতাম না। আমার অন্ধকার হৃদয়ে সেই যে উন্মত্ত উদ্দাম উজ্জ্বল সুন্দর তারাটি ক্ষণ-কালের জন্য উদয় হইয়াছিল, তাহার একটু খবর পাইবার এবং তাহার কথা আলোচনা করিবার জন্য আমার প্রাণ তৃষিত হইয়া থাকিত, কিন্তু আমার স্বামীর কাছে মুহূর্ত্তের জন্য তাহার নাম করিবার অধিকার ছিল না। আমাদের দুজনার মাঝখানে বাক্য এবং বেদনায় পরিপূর্ণ এই একটা নীরবতা অটল-ভাবে বিরাজকরিত।

বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি একদিন ঝি আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, মা ঠাকুরুণ, ঘাটে যে অনেক আয়োজনে নৌকা প্রস্তুত হইতেছে, বাবা মশায় কোথায় যাইতে-ছেন ?—আমি জানিতাম একটা কি উদ্যোগ হইতেছে, আমার অদৃষ্টাকাশে প্রথম কিছুদিন ঝড়ের পূর্ব্বাকার নিস্তব্ধতা এবং তাহার পরে প্রলয়ের ছিন্ন বিছিন্ন মেঘ আসিয়া জমিতেছিল, সংহারকারী শঙ্কর নীরব অঙ্গুলির ইঙ্গিতে তাঁহার সমস্ত প্রলয় শক্তিকে আমার মাথার উপরে জড় করিতেছেন—তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছিলাম। ঝিকে বলিলাম, কই, আমি ত এখনো কোন খবর পাই নাই। ঝি আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে সাহস না করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল।

অনেক রাত্রে আমার স্বামী আসিয়া কহিলেন, দূরে এক জায়গায় আমার ডাক পড়িয়াছে, কাল ভোরেই আমাকে রওনা হইতে হইবে। বোধ করি ফিরিতে দিন দুই তিন বিলম্ব হইতে পারে।

আমি শয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলাম, কেন আমাকে মিথ্যা বলিতেছ ?

আমার স্বামী কম্পিত অস্ফুটকণ্ঠে কহি-লেন, মিথ্যা কি বলিলাম !

আমি কহিলাম, তুমি বিবাহ করিতে যাইতেছ !

তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। আমিও স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ ঘরে কোন শব্দ রহিল না। শেষে আমি বলিলাম—একটা উত্তর দাও ! বল, হাঁ আমি বিবাহ করিতে যাইতেছি।

তিনি প্রতিধ্বনির ন্যায় উত্তর দিলেন—হাঁ, আমি বিবাহ করিতে যাইতেছি !

আমি কহিলাম, না, তুমি যাইতে পারিবে না, তোমাকে আমি এই মহাবিপদ মহাপাপ হইতে রক্ষা করিব ! এ যদি না পারি তবে আমি তোমার কিসের স্ত্রী ; কি জন্য আমি শিবপূজা করিয়াছিলাম !

আবার অনেকক্ষণ গৃহ নিঃশব্দ হইয়া রহিল। আমি মাটিতে পড়িয়া স্বামীর পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিলাম—আমি তোমার কি অপরাধ করিয়াছি, কিসে আমার ত্রুটি হইয়াছে—অন্য স্ত্রীতে তোমার কিসের প্রয়োজন ! মাথা খাও, সত্য করিয়া বল !

তখন আমার স্বামী ধীরে ধীরে কহিলেন—সত্যই বলিতেছি, আমি তোমাকে ভয় করি। তোমার অন্ধতা তোমাকে এক অনন্ত আবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, সেখানে আমার প্রবেশ করিবার যো নাই। তুমি আমার দেবতা, তুমি আমার দেবতার ন্যায় ভয়ানক, তোমাকে লইয়া প্রতিদিন গৃহকার্য্য করিতে পারি না। যাহাকে বকিব ঝকিব রাগ করিব সোহাগ করিব গহনা গড়াইয়া দিব, এমন একটি সামান্য রমণী আমি চাই।

আমার বুকের ভিতরে চিরিয়া দেখ ! আমি সামান্য রমণী—আমি মনের মধ্যে সেই নব বিবাহের বালিকা বই কিছু নই,—আমি বিশ্বাস করিতে চাই, নির্ভর করিতে চাই, পূজা

করিতে চাই—তুমি নিজেকে অপমান করিয়া আমাকে দুঃসহ দুঃখ দিয়া তোমার চেয়ে আমাকে বড় করিয়া তুলিয়ো না, আমাকে সর্ব্ববিষয়ে তোমার পায়ের নীচে রাখিয়া দাও।

আমি কি কি কথা বলিয়াছিলাম সে কি আমার মনে আছে? ক্ষুব্ধ সমুদ্র কি নিজের গর্জ্জন নিজে শুনিতে পায়? কেবল মনে পড়ে বলিয়াছিলাম, যদি আমি সতী হই, তবে ভগবান্ সাক্ষী রহিলেন, তুমি কোন মতেই তোমার ধর্ম্মশপথ লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। সে মহাপাপের পূর্ব্বে হয় আমি বিধবা হইব, নয় হেমাঙ্গিনী বাঁচিবে না। এই বলিয়া আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলাম।

যখন আমার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইয়া গেল, তখনো রাত্রি শেষের পাখী ডাকিতে আরম্ভ করে নাই এবং আমার স্বামী চলিয়া গেছেন।

আমি ঠাকুর ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পূজায় বসিলাম। সমস্ত দিন আমি ঘরের বাহির হইলাম না। সন্ধ্যার সময়ে কালবৈশাখী ঝড়ে দালান কাঁপিতে লাগিল। আমি বলিলাম না, যে, হে ঠাকুর, আমার স্বামী এখন নদীতে আছেন তাঁহাকে রক্ষা কর। আমি কেবল একান্ত মনে বলিতে লাগিলাম, ঠাকুর আমার অদৃষ্টে যাহা হইবার তা হৌক কিন্তু আমার স্বামীকে মহাপাতক হইতে নিরস্ত কর।—সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। তাহার পরদিনও আসন পরিত্যাগ করি নাই। এই অনিদ্রা অনাহারে কে আমাকে বল দিয়া ছিল জানি না—আমি পাষাণ মূর্ত্তির সম্মুখে পাষাণমূর্ত্তির মতই বসিয়াছিলাম।

সন্ধ্যার সময় বাহির হইতে দ্বার ঠেলাঠেলি আরম্ভ হইল। দ্বার ভাঙ্গিয়া যখন ঘরে লোক প্রবেশ করিল, তখন আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছি।

মূর্চ্ছাভঙ্গে শুনিলাম দিদি। দেখিলাম হেমাঙ্গিনীর কোলে শুইয়া আছি। মাথা নাড়িতেই তাহার নূতন চেলি খস্‌খস্ করিয়া উঠিল।—হা ঠাকুর আমার প্রার্থনা শুনিলে না। আমার স্বামীর পতন হইল।

হেমাঙ্গিনী মাথা নীচু করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, দিদি তোমার আশীর্ব্বাদ লইতে আসিয়াছি।

প্রথম একমুহূর্ত্ত কাঠের মত হইয়া পরক্ষণেই উঠিয়া বসিলাম—কহিলাম, কেন আশীর্ব্বাদ করিব না বোন? তোমার কি অপরাধ?

হেমাঙ্গিনী তাহার সুমিষ্ট উচ্চ কণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, কহিল অপরাধ! তুমি বিবাহ করিলে অপরাধ হয় না, আর আমি করিলেই অপরাধ?

হেমাঙ্গিনীকে জড়াইয়া ধরিয়া আমিও হাসিলাম। মনে মনে কহিলাম, জগতে আমার প্রার্থনাই কি চূড়ান্ত? তাঁহার ইচ্ছাই কি শেষ নহে? যে আঘাত পড়িয়াছে সে আমার মাথার উপরেই পড়ুক্—কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে যেখানে আমার ধর্ম্ম আমার বিশ্বাস আছে সেখানে পড়িতে দিব না। আমি যেমন ছিলাম তেমনি থাকিব!—হেমাঙ্গিনী আমার পায়ের কাছে পড়িয়া আমার পায়ের ধুলা লইল। আমি কহিলাম; তুমি চিরসৌভাগ্যবতী, চিরসুখিনী হও!

হেমাঙ্গিনী কহিল, কেবল আশীর্ব্বাদ নয়, তোমার সতীর হস্তে আমাকে এবং তোমার ভগিনীপতিকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। তুমি তাঁহাকে লজ্জা করিলে চলিবে না। যদি অনুমতি কর তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া আসি!

আমি কহিলাম—আন।

কিছুক্ষণ পরে আমার ঘরে নূতন পদশব্দ প্রবেশ করিল। সস্নেহ প্রশ্ন শুনিলাম-ভাল আছিস্ কুমু

আমি ত্রস্ত বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া কহিলাম—দাদা!

হেমাঙ্গিনী কহিল—দাদা কিসের?—কাণ মলিয়া দাও, ও তোমার ছোট ভগিনীপতি!

তখন সমস্ত বুঝিলাম। আমি জানিতাম, দাদার প্রতিজ্ঞা ছিল বিবাহ করিবেন না,—মা নাই, তাঁহাকে অনুনয় করিয়া বিবাহ করাইবার কেহ ছিল না। এবার আমিই তাঁহার বিবাহ দিলাম। দুই চক্ষু বাহিয়া হুহু করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল—কিছুতেই থামাইতে পারি না। দাদা ধীরে ধীরে আমার চুলের মধ্যে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন, হেমাঙ্গিনী আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কেবল হাসিতে লাগিল।

রাত্রে ঘুম হইতেছিল না, আমি উৎকণ্ঠিত-চিত্তে স্বামীর প্রত্যাগমন প্রত্যাশা করিতে-ছিলাম। লজ্জা এবং নৈরাশ্য তিনি কিরূপ ভাবে সম্বরণ করিবেন, তাহা আমি স্থির করিতে পারিতেছিলাম না।

অনেক রাত্রে অতিধীরে দ্বার খুলিল। আমি চমকিয়া উঠিয়া বসিলাম। আমার স্বামীর পদশব্দ। বক্ষের মধ্যে হৃদপিণ্ড আছাড় খাইতে লাগিল।

তিনি বিছানার মধ্যে আসিয়া আমার হাত ধরিয়া কহিলেন তোমার দাদা আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। আমি ক্ষণকালের মোহে পড়িয়া মরিতে যাইতেছিলাম। সে দিন আমি যখন নৌকায় উঠিয়াছিলাম, আমার বুকের মধ্যে যে কি পাথর চাপিয়াছিল, তাহা অন্ত-র্যামী জানেন;—যখন নদীর মধ্যে ঝড়ে পড়িয়া-ছিলাম তখন প্রাণের ভয়ও হইতেছিল—সেই সঙ্গে ভাবিতেছিলাম যদি ডুবিয়া যাই তাহা হইলেই আমার উদ্ধার হয়। মথুরগঞ্জে পৌঁছিয়া শুনিলাম—তাহার পূর্ব্বদিনেই তোমার দাদার সঙ্গে হেমাঙ্গিনীর বিবাহ হইয়া গেছে। কি লজ্জায় এবং কি আনন্দে নৌকায় ফিরিয়া-ছিলাম তাহা বলিতে পারি না। এই কয়দিনে আমি নিশ্চয় করিয়া বুঝিয়াছি তোমাকে ছাড়িয়া আমার কোন সুখ নাই। তুমি আমার দেবী।

আমি হাসিয়া কহিলাম, না, আমার দেবী হইয়া কাজ নাই—আমি তোমার ঘরের গৃহিণী—আমি সামান্য নারী মাত্র।

স্বামী কহিলেন, আমারও একটা অনু-রোধ তোমাকে রাখিতে হইবে। আমাকে আর দেবতা বলিয়া কখনো অপ্রতিভ করিয়ো না।

পরদিন হুলুরব ও শঙ্খধ্বনিতে পাড়া মাতিয়া উঠিল। হেমাঙ্গিনী আমার স্বামীকে আহারে উপবেশনে, প্রভাতে রাত্রে নানা প্রকারে পরিহাস করিতে লাগিল—নির্যাতনের আর সীমা রহিল না—কিন্তু তিনি কোথায় গিয়াছিলেন,—কি ঘটিয়াছিল কেহ তাহার লেশমাত্র উল্লেখ করিল না।

শুভদৃষ্টি।

কান্তিচন্দ্রের বয়স অল্প, তথাপি স্ত্রীবিয়ো-গের পর দ্বিতীয় স্ত্রীর অনুসন্ধানে ক্ষান্ত থাকিয়া পশু পক্ষী শিকারেই মনোনিবেশ করিয়াছেন। দীর্ঘ কৃশ কঠিন লঘু শরীর, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, অব্যর্থ লক্ষ্য, সাজসজ্জায় পশ্চিমদেশীর মত, সঙ্গে সঙ্গে কুস্তিগির হীরা সিং, ছক্কনলাল, এবং গাইয়ে বাজিয়ে খাঁ সাহেব মিঞা সাহেব অনেক

ফিরিয়া থাকে; অকর্ম্মণ্য অনুচর পরিচরেরও অভাব নাই।

দুই চারিজন শিকারী বন্ধুবান্ধব লইয়া অগ্রাণের মাঝামাঝি কান্তিচন্দ্র নৈদিঘির বিলের ধারে শিকার করিতে গিয়াছেন। নদীতে দুইটি বড় বোটে তাঁহাদের বাস, আরো গোটা তিন চার নৌকায় চাকর বাকরের দল গ্রামের ঘাট ঘিরিয়া বসিয়া আছে। গ্রাম-বধূদের জলতোলা, স্নানকরা প্রায় বন্ধ। সমস্ত দিন বন্দুকের আওয়াজে জলস্থল কম্পমান, সন্ধ্যা-বেলায় ওস্তাদীগলার তানকর্ত্তবে পল্লীর নিদ্রা তন্দ্রা তিরোহিত।

একদিন সকালে কান্তিচন্দ্র বোটে বসিয়া বন্দুকের চোঙ স্বহস্তে পরিষ্কার করিতেছেন এমন সময় অনতিদূরে হাঁসের ডাক শুনিয়া চাহিয়া দেখিলেন, একটী বালিকা দুইহাতে দুইটি তরুণ হাঁস বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া ঘাটে আনিয়াছে। নদীটি ছোট, প্রায় স্রোতহীন নানা জাতীয় শৈবালে ভরা। বালিকা হাঁস দুইটিকে জলে ছাড়িয়া দিয়া একেবারে আয়ত্তের বাহিরে না যায় এই ভাবে ত্রস্ত সতর্ক স্নেহে তাহাদের আগলাইবার চেষ্টা করিতেছে। এটুকু বুঝা গেল, অন্য দিন সে তাহার হাঁস জলে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইত, কিন্তু সম্প্রতি শিকারীর ভয়ে নিশ্চিন্ত চিত্তে রাখিয়া যাইতে পারিতেছে না।

মেয়েটির সৌন্দর্য্য নিরতিশয় নবীন,—যেন বিশ্বকর্ম্মা তাহাকে সদ্য নির্ম্মাণ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। বয়স ঠিক করা শক্ত। শরীরটি বিকশিত কিন্তু মুখটি এমন কাঁচা যে সংসার কোথাও যেন তাহাকে লেশ মাত্র স্পর্শ করে নাই। সে যে যৌবনে পা ফেলিয়াছে এখনো নিজের কাছে সে খবরটি তাহার পৌঁছে নাই।

কান্তিচন্দ্র ক্ষণকালের জন্য বন্দুক সাফ করায় ঢিল দিলেন। তাঁহার চমক লাগিয়া গেল। এমন জায়গায় এমন মুখ দেখিবেন বলিয়া কখনও আশা করেন নাই। অথচ রাজার অন্তঃপুরের চেয়ে এই জায়গাতেই এই মুখখানি মানাইয়াছিল। সোণার ফুলদানীর গাছেই ফুলকে সাজে। সে দিন শরতের শিশিরে এবং প্রভাতের রৌদ্রে নদীতীরে বিকশিত কাশবনটি ঝলমল করিতেছিল তাহারি মধ্যে সেই সরল নবীন মুখখানি কান্তিচন্দ্রের মুগ্ধ চক্ষে আশ্বিনের আসন্ন আগমনীর একটি আনন্দচ্ছবি আঁকিয়া দিল। মন্দাকিনী-তীরে তরুণ পার্ব্বতী কখনও কখনও এমন হংস-শিশু বক্ষে লইয়া আসিতেন কালিদাস সে কথা লিখিতে ভুলিয়াছেন।

এমন সময় হঠাৎ মেয়েটি ভীতত্রস্ত হইয়া কাঁদ কাঁদ মুখে তাড়াতাড়ি হাঁস দুটিকে বুকে তুলিয়া লইয়া অব্যক্ত আর্ত্তস্বরে ঘাট ত্যাগ করিয়া চলিল। কান্তিচন্দ্র কারণ সন্ধানে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার একটি রসিক পারিষদ কৌতুক করিয়া বালিকাকে ভয় দেখাইবার জন্য হাঁসের দিকে ফাঁকা বন্দুক লক্ষ্য করিতেছে। কান্তিচন্দ্র পশ্চাৎ হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইয়া হঠাৎ তাহার গালে সশব্দে প্রকাণ্ড একটি চপেটাঘাত করিলেন, অকস্মাৎ রসভঙ্গ হইয়া লোকটা সেইখানে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। কান্তি পুনরায় কামরায় আসিয়া বন্দুক সাফ করিতে লাগিলেন।

কৌতূহলী কান্তিচন্দ্র পাখীর সন্ধানে ঝোপ-ঝোড় ভেদ করিয়া ভিতরে গিয়া দেখিলেন একটি স্বচ্ছল গৃহস্থ-ঘর, প্রাঙ্গণে সারিসারি ধানের গোলা। পরিচ্ছন্ন বৃহৎ গোয়ালঘরের কুলগাছ তলায় বসিয়া সকালবেলাকার সেই মেয়েটি একটি আহত ঘুঘু বুকের কাছে তুলিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতেছে এবং গামলার জলে

অঞ্চল ভিজাইয়া পাখীর চঞ্চুপুটের মধ্যে জল নিংড়াইয়া দিতেছে। পোষা বিড়ালটা তাহার কোলের উপর দুই পা তুলিয়া ঊর্দ্ধমুখে ঘুঘুটির প্রতি উৎসুক দৃষ্টিপাত করিতেছে; বালিকা মধ্যে মধ্যে তাহার নাসিকাগ্রভাবে তর্জ্জনী আঘাত করিয়া লুব্ধ জন্তুর অতিরিক্ত আগ্রহ দমন করিয়া দিতেছে।

পল্লীর নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে একটি গৃহস্থ প্রাঙ্গণের স্বচ্ছল শান্তির মধ্যে এই করুণচ্ছবি এক মুহূর্ত্তেই কান্তিচন্দ্রের হৃদয়ের মধ্যে আঁকা হইয়া গেল। বিরলপল্লব গাছটির ছায়া ও রৌদ্র বালিকার ক্রোড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে; অদূরে আহার পরিতৃপ্ত পরিপুষ্ট গাভী আলস্যে মাটিতে বসিয়া শৃঙ্গ ও পুচ্ছ আন্দোলনে পিঠের মাছি তাড়াইতেছে, মাঝে মাঝে বাঁশের ঝাড়ে ফিস্ ফিস্ কথার মত নূতন উত্তর বাতাসে খস্ খস্ শব্দ উঠিতেছে। সে দিন প্রভাতে নদীতীরে বনের মধ্যে যাহাকে বনশ্রীর মত দেখিতে হইয়াছিল, আজ মধ্যাহ্নে নিস্তব্ধ গোষ্ঠপ্রাঙ্গণচ্ছায়ায় তাহাকে স্নেহবিগলিত গৃহলক্ষ্মীটির মত দেখিতে হইল।

কান্তিচন্দ্র বন্দুক হস্তে হঠাৎ এই বালিকার সম্মুখে আসিয়া অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। মনে হইল যেন বমালসুদ্ধ চোর ধরা পড়িলাম। পাখীটি যে আমার গুলিতে আহত হয় নাই কোন প্রকারে এই কৈফিয়ৎটুকু দিতে ইচ্ছা হইল, কেমন করিয়া কথাটা পাড়িবেন ভাবিতেছেন, এমন সময়ে কুটির হইতে কে ডাকিল সুধা! বালিকা যেন চমকিত হইয়া উঠিল। আবার ডাক পড়িল সুধা! তখন সে তাড়াতাড়ি পাখীটি হইয়া কুটির মুখে চলিয়া গেল। কান্তিচন্দ্র ভাবিলেন, নামটি উপযুক্ত বটে। সুধা!

কান্তি তখন দলের লোকের হাতে বন্দুক রাখিয়া ... র পথ দিয়া সেই কুটিরের দ্বারে আসিয়া পস্থিত হইলেন। দেখিলেন একটি প্রৌঢ় ... মুণ্ডিতমুখ শান্তমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ দাওয়ায় বসিয়া হরিভক্তিবিলাস পাঠ করিতেছেন। ভক্তিমণ্ডিত তাঁহার মুখের সুগভীর স্নিগ্ধ প্রশান্ত ভাবের সহিত কান্তিচন্দ্র সেই বালিকার দয়ার্দ্র মুখের সাদৃশ্য অনুভব করিলেন।

কান্তি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কহিলেন, তৃষ্ণা পাইয়াছে ঠাকুর, এক ঘটি জল পাইতে পারি কি? ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন এবং ভিতর হইতে পিতলের রেকাবিতে কয়েকটি বাতাসা ও কাঁসার ঘটিতে জল লইয়া স্বহস্তে অতিথির সম্মুখে রাখিলেন।

কান্তি জল খাইলে পর ব্রাহ্মণ তাঁহার পরিচয় লইলেন। কান্তি পরিচয় দিয়া কহিলেন, ঠাকুর আপনার যদি কোন উপকার করিতে পারি ত কৃতার্থ হই।

নবীন বাড়ুয্যে কহিলেন, বাবা, আমার আর কি উপকার করিবে। তবে সুধা বলিয়া আমার একটি কন্যা আছে তাহার বয়স হইতে চলিল, তাহাকে একটি সৎপাত্রে দান করিতে পারিলেই সংসারের ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করি। কাছে কোথাও ভাল ছেলে দেখি না, দূরে সন্ধান করিবার মত সামর্থ্যও নাই, ঘরে গোপীনাথের বিগ্রহ আছে তাঁহাকে ফেলিয়া কোথাও যাই নাই।

কান্তি কহিলেন, আপনি নৌকায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে পাত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

এদিকে কান্তির প্রেরিত চরগণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা সুধার কথা যাহাকেই জিজ্ঞাসা করিল সকলেই একবাক্যে কহিল এমন লক্ষ্মীস্বভাবা কন্যা আর হয় না।

পরদিন নবীন বোটে উপস্থিত হইলে কান্তি তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন এবং জানাইলেন তিনিই ব্রাহ্মণের কন্যাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক আছেন। ব্রাহ্মণ এই অভাবনীয় সৌভাগ্যে রুদ্ধ-কণ্ঠে কিছুক্ষণ কথাই কহিতে পারিলেন না।

মনে করিলেন কিছু একটা ভ্রম হইয়াছে। কহিলেন, আমার কন্যাকে তুমি বিবাহ করিবে?

কান্তি কহিলেন, আপনার যদি সম্মতি থাকে আমি প্রস্তুত আছি।

নবীন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন সুধাকে? —উত্তরে শুনিলেন হাঁ।

নবীন স্থির ভাবে কহিলেন, তা দেখা শোনা—

কান্তি যেন দেখেন নাই, ভাণ করিয়া কহিলেন, সেই একেবারে শুভদৃষ্টির সময়।

নবীন গদ্গদ কণ্ঠে কহিলেন, আমার সুধা বড় সুশীলা মেয়ে, রাঁধাবাড়া ঘরকন্নার কাজে অদ্বিতীয়। তুমি যেমন না দেখিয়াই তাহাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছ তেমনি আশীর্ব্বাদ করি আমার সুধা পতিব্রতা সতীলক্ষ্মী হইয়া চিরকাল তোমার মঙ্গল করুন! কখন মুহূর্ত্তের জন্য তোমার পরিতাপের কারণ না ঘটুক।

কান্তি আর বিলম্ব করিতে চাহিলেন না, মাঘ মাসেই বিবাহ স্থির হইয়া গেল।

পাড়ার মজুমদারদের পুরাতন কোঠা বাড়িতে বিবাহের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বর হাতি চড়িয়া মশাল জ্বালাইয়া বাজনা বাজাইয়া যথা সময়ে আসিয়া উপস্থিত।

শুভদৃষ্টির সময় বর কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন। নতশির টোপরপরা চন্দনচর্চ্চিত সুধাকে ভাল করিয়া যেন দেখিতে পাইলেন না। উদ্বেলিত হৃদয়ের আনন্দে চোখে যেন ধাঁধা লাগিল।

বাসরঘরে পাড়ার সরকারী ঠানদিদি যখন বরকে দিয়া জোর করিয়া মেয়ের ঘোমটা খোলাইয়া দিলেন তখন কান্তি হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন।

এ ত সেই মেয়ে নয়! হঠাৎ বুকের কাছ হইতে একটা কাল বজ্র উঠিয়া তাঁহার মস্তিষ্ককে যেন আঘাত করিল—মুহূর্ত্তে বাসরঘরের সমস্ত প্রদীপ যেন অন্ধকার হইয়া গেল এবং সেই অন্ধকার-প্লাবনে নববধূর মুখ খানিকেও যেন কালিমালিপ্ত করিয়া দিল।

কান্তিচন্দ্র দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবেন না বলিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন; সেই প্রতিজ্ঞা কি এমনি একটা অদ্ভুত পরিহাসে অদৃষ্ট তুড়ি দিয়া ভাঙ্গিয়া দিল! কত ভাল ভাল বিবাহের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন, কত আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের সানুনয় অনুরোধ অবহেলা করিয়াছেন; উচ্চ কুটুম্বিতার আকর্ষণ, অর্থের প্রলোভন, রূপখ্যাতির মোহ সমস্ত কাটাইয়া অবশেষে কোন এক অখ্যাত পল্লীগ্রামে বিলের ধারে এক অজ্ঞাত দরিদ্রের ঘরে এত বড় বিড়ম্বনা! লোকের কাছে মুখ দেখাইবেন কি করিয়া!

শ্বশুরের উপরে প্রথমটা রাগ হইল। প্রতারক এক মেয়ে দেখাইয়া আর এক মেয়ের সহিত আমার বিবাহ দিল। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলেন, নবীন ত তাঁহাকে বিবাহের পূর্ব্বে কন্যা দেখান নাই—তিনি নিজেই দেখিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। বুদ্ধির দোষে যে এত বড় ঠকাটা ঠকিয়াছেন সে লজ্জার কথাটা কাহারো কাছে প্রকাশ না করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন।

ঔষধ যেন গিলিলেন কিন্তু মুখের ভারটা

বিগড়িয়ে গেল। বাসরঘরের ঠাট্টা আমোদ কিছুই তাঁহার কাছে রুচিল না। নিজের এবং সর্ব্বসাধারণের প্রতি রাগে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল।

এমন সময় হঠাৎ তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তিনী বধূ অব্যক্ত ভীত স্বরে চমকিয়া উঠিল। সহসা তাহার কোলের কাছ দিয়া একটা খরগোসের বাচ্ছা ছুটিয়া গেল; পরক্ষণেই সেদিনকার সেই মেয়েটি শশকশিশুর অনুসরণ পূর্ব্বক তাহাকে ধরিয়া গালের কাছে রাখিয়া একান্ত স্নেহে আদর করিতে লাগিল। "ঐ রে পাগ্‌লী আসিয়াছে" বলিয়া সকলে তাহাকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিল। সে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া ঠিক বরকন্যার সম্মুখে বসিয়া শিশুর মত কৌতূহলে কি হইতেছে দেখিতে লাগিল। বাড়ির কোন দাসী তাহাকে ধরিয়া টানিয়া লইবার চেষ্টা করিলে বর ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, আহা থাক্‌না, বসুক।

মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি?

সে উত্তর না দিয়া দুলিতে লাগিল। ঘর সুদ্ধ রমণী হাসিয়া উঠিল।

কান্তি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার হাঁস ছাট কত বড় হইল!'

অসঙ্কোচে মেয়েটি নীরবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

হতবুদ্ধি কান্তি সাহস পূর্ব্বক আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সেই ঘুঘু আরাম হইয়াছে ত? কোন ফল পাইলেন না। মেয়েরা এমন ভাবে হাসিতে লাগিল যেন বর ভারি ঠকিয়াছেন।

অবশেষে প্রশ্ন করিয়া খবর পাইলেন—মেয়ে কালা এবং বোবা, পাড়ার যত পশু পক্ষীর সঙ্গিনী। সেদিন যে সুধা ডাক শুনিয়া উঠিয়া ঘরে গিয়াছিল সে তাঁহার অনুমান মাত্র, তাহার আর কোন কারণ ছিল।

কান্তি তখন মনে মনে চমকিয়া উঠিলেন। যাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া পৃথিবীতে তাঁহার কোন সুখ ছিল না, শুভ দৈবক্রমে তাহার নিকট হইতে পরিত্রাণ পাইয়া নিজকে ধন্য জ্ঞান করিলেন। মনে করিলেন যদি এই মেয়েটির বাপের কাছে যাইতাম এবং সে ব্যক্তি আমার প্রার্থনা অনুসারে কন্যাটিকে কোন মতে আমার হাতে সমর্পণ করিয়া নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করিত।

যতক্ষণ আয়ত্তচ্যুত এই মেয়েটির মোহ তাঁহার মনটিকে আলোড়িত করিতেছিল, ততক্ষণ নিজের বধূটি সম্বন্ধে একবারে অন্ধ হইয়াছিলেন। নিকটেই আর কোথাও কিছু সান্ত্বনার কারণ ছিল কি না তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তিও ছিল না। যেই শুনিলেন মেয়েটি বোবা ও কালা অমনি সমস্ত জগতের উপর হইতে একটা কালো পর্দ্দা ছিন্ন হইয়া পড়িয়া গেল। দূরের আশা দূর হইয়া নিকটের জিনিষ গুলি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। সুগভীর পরিত্রাণের নিশ্বাস ফেলিয়া কান্তি লজ্জাবনত বধূর মুখের দিকে কোন এক সুযোগে চাহিয়া দেখিলেন। এতক্ষণে যথার্থ শুভদৃষ্টি হইল। চর্ম্মচক্ষুর অন্তরালবর্ত্তী মনোনেত্রের উপর হইতে সমস্ত বাধা খসিয়া পড়িল। হৃদয় হইতে এবং প্রদীপ হইতে সমস্ত আলোক বিচ্ছুরিত হইয়া একটি মাত্র কোমল সুকুমার মুখের উপরে প্রতিফলিত হইল। কান্তি দেখিলেন, একটি স্নিগ্ধ শ্রী একটি শান্ত লাবণ্যে মুখখানি মণ্ডিত। বুঝিলেন, নবীনের আশীর্ব্বাদ সার্থক হইবে।

উলুখড়ের বিপদ।

বাবুদের নায়েব গিরিশ বসুর অন্তঃপুরে প্যারী বলিয়া একটি নূতন দাসী নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহার বয়স অল্প; চরিত্র ভাল। দূর বিদেশ হইতে আসিয়া কিছুদিন কাজ করার পরেই একদিন সে বৃদ্ধ নায়েবের অনুরাগ দৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষার জন্য গৃহিণীর নিকট কাঁদিয়া গিয়া পড়িল। গৃহিণী কহিলেন, বাছা, তুমি অন্য কোথাও যাও; তুমি ভালমানুষের মেয়ে এখানে থাকিলে তোমার সুবিধা হইবে না। বলিয়া গোপনে তাহাকে কিছু অর্থ দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন।

কিন্তু পালানো সহজ ব্যাপার নহে, হাতে পথ খরচও সামান্য, সেই জন্য প্যারী গ্রামে হরিহর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট গিয়া আশ্রয় লইল। বিবেচক ছেলেরা কহিল বাবা, কেন বিপদ ঘরে আনিতেছেন; হরিহর কহিলেন, বিপদ স্বয়ং আসিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তাহাকে ফিরাইতে পারি না।

গিরিশ বসু সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কহিলেন, ভট্টাচার্য্য মহাশয়, আপনি আমার ঝি ভাঙ্গাইয়া আনিলেন কেন? ঘরে কাজের ভারি অসুবিধা হইতেছে। ইহার উত্তরে হরিহর দুচারটে সত্য কথা খুব শক্ত করিয়াই বলিলেন। তিনি মানী লোক ছিলেন, কাহারো খাতিরে কোন কথা ঘুরাইয়া বলিতে জানিতেন না। নায়েব মনে মনে উদ্গতপক্ষ পিপীলিকার সহিত তাঁহার তুলনা করিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় খুব ঘটা করিয়া পায়ের ধূলা লইল। দুই চারিদিনের মধ্যেই ভট্টাচার্য্যের বাড়িতে পুলিশের সমাগম হইল। গৃহিণী ঠাকুরাণীর বালিশের নীচে হইতে নায়েবের স্ত্রীর এক যোড়া ইয়ারিং বাহির হইল। ঝি প্যারী চোর সাব্যস্ত হইয়া জেলে গেল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় দেশবিখ্যাত প্রতিপত্তির জোরে, চোরাই মাল রক্ষার অভিযোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। নায়েব পুনশ্চ ব্রাহ্মণের পদধূলি লইয়া গেল। ব্রাহ্মণ বুঝিলেন হতভাগিনীকে তিনি আশ্রয় দেওয়াতেই প্যারীর সর্ব্বনাশ ঘটিল। তাঁহার মনে শেল বিঁধিয়া রহিল। ছেলেরা কহিল, জমিজমা বেচিয়া কলিকাতায় যাওয়া যাক্, এখানে বড় মুস্কিল দেখিতেছি। হরিহর কহিলেন, পৈতৃক ভিটা ছাড়িতে পারিব না, অদৃষ্টে থাকিলে বিপদ কোথায় না ঘটে।

ইতিমধ্যে নায়েব গ্রামে অতিমাত্রায় খাজনা বৃদ্ধির চেষ্টা করায় প্রজারা বিদ্রোহী হইল। হরিহরের সমস্তই ব্রহ্মোত্তর জমা, জমিদারের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। নায়েব তাহার প্রভুকে জানাইল হরিহরই প্রজাদিগকে প্রশ্রয় দিয়া বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছে। জমিদার কহিলেন, যেমন করিয়া পার ভট্টাচার্য্যকে শাসন কর। নায়েব ভট্টাচার্য্যের পদধূলি লইয়া কহিল, সামনের ঐ জমিটা পরগণার ভিটার মধ্যে পড়িতেছে; ওটা ত ছাড়িয়া দিতে হয়। হরিহর কহিলেন, সে কি কথা! ও যে আমার বহুকেলে ব্রহ্মোত্ত। হরিহরের গৃহপ্রাঙ্গণের সংলগ্ন পৈতৃক জমিদারীর অন্তর্গত বলিয়া নালিশ রুজু হইল। হরিহর বলিলেন, এ জমিটা ত তবে ছাড়িয়া দিতে হয় আমি ত বৃদ্ধ বয়সে আদালতে সাক্ষী দিতে পারিব না। ছেলেরা বলিল, বাড়ির

সংলগ্ন জমিটাই যদি ছাড়িয়া দিতে হয় তবে ভিটায় টিঁকিব কি করিয়া।

প্রাণাধিক পৈতৃক ভিটার মায়ায় বৃদ্ধ কম্পিতপদে আদালতের সাক্ষ্যমঞ্চে গিয়া দাঁড়াইলেন। মুন্সেফ নবগোপাল বাবু তাঁহার সাক্ষ্যই প্রামাণ্য করিয়া মকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিয়া দিলেন। ভট্টাচার্য্যের খাস প্রজারা ইহা লইয়া গ্রামে ভারি উৎসব সমারোহ আরম্ভ করিয়া দিল। হরিহর তাড়াতাড়ি তাহাদিগকে থামাইয়া দিলেন। নায়েব আসিয়া পরম আড়ম্বরে ভট্টাচার্য্যের পদধূলি লইয়া গায়ে মাথায় মাখিল এবং আপিল রুজু করিল। উকীলরা হরিহরের নিকট হইতে টাকা লন না। তাঁহারা ব্রাহ্মণকে বারংবার আশ্বাস দিলেন, এ মকদ্দমায় হারিবার কোন সম্ভাবনাই নাই। দিন কি কখনো রাত হইতে পারে? শুনিয়া হরিহর নিশ্চিন্ত হইয়া ঘরে বসিয়া রহিলেন।

একদিন জমিদারী কাছারিতে ঢাকঢোল বাজিয়া উঠিল, পাঁঠা কাটিয়া নায়েবের বাসায় কালিপূজা হইবে। ব্যাপারখানা কি? ভট্টাচার্য্য খবর পাইলেন আপিলে তাঁহার হার হইয়াছে।

ভট্টাচার্য্য মাথা চাপড়াইয়া উকীলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বসন্ত বাবু করিলেন কি? আমার কি দশা হইবে?

দিন যে কেমন করিয়া রাত হইল, বসন্ত বাবু তাহার নিগূঢ় বৃত্তান্ত বলিলেন :—সম্প্রতি যিনি নূতন অ্যাডিশনাল জজ হইয়া আসিয়াছেন তিনি মুন্সেফ থাকা কালে মুন্সেফ নবগোপাল বাবুর সহিত তাঁহার ভারি খিটিমিটি বাধিয়াছিল। তখন কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই; আজ জজের আসনে বসিয়া নবগোপাল বাবুর রায় পাইবামাত্র উল্টাইয়া দিতেছেন, আপনি হারিলেন সেই জন্য। ব্যাকুল হরিহর কহিলেন, হাইকোর্টে ইহার কোন আপীল নাই? বসন্ত কহিলেন, জজবাবু আপীলে ফল পাইবার সম্ভাবনা মাত্র রাখেন নাই। তিনি আপনাদের সাক্ষীকে সন্দেহ করিয়া বিরুদ্ধ পক্ষের সাক্ষীকেই বিশ্বাস করিয়া গিয়াছেন। হাইকোর্টে ত সাক্ষীর বিচার হইবে না।

বৃদ্ধ সাশ্রুনেত্রে কহিলেন, তবে আমার উপায়!

উকীল কহিলেন উপায় কিছু দেখি না।

গিরিশ বসু পরদিন লোকজন সঙ্গে লইয়া ঘটা করিয়া ব্রাহ্মণের পদধূলি লইয়া গেল এবং বিদায় কালে উচ্ছ্বসিত দীর্ঘনিশ্বাসে কহিল— প্রভু, তোমারি ইচ্ছা।

রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী।

সমাজ চিত্র।

—০:০:০—

প্রায়শ্চিত্ত।

—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মাঝখানে একটা অনির্দ্দেশ্য অরাজক স্থান আছে, যেখানে ত্রিশঙ্কু রাজা ভাসিয়া বেড়াইতেছেন, যেখানে আকাশ-কুসুমের অজস্র আবাদ হইয়া থাকে। সেই বায়ুদুর্গবেষ্টিত মহাদেশের নাম "হইলে-হইতে-পারিত"। যাঁহারা মহৎকার্য্য করিয়া অমরতা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা ধন্য হইয়াছেন, যাঁহারা সামান্য ক্ষমতা লইয়া সাধারণ মানবের মধ্যে সাধারণভাবে সংসারের প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য সাধনে সহায়তা করিতেছেন, তাঁহারাও ধন্য; কিন্তু যাঁহারা অদৃষ্টের ভ্রমক্রমে হঠাৎ দুয়ের মাঝখানে পড়িয়াছেন তাঁহাদের আর কোন উপায় নাই। তাঁহারা একটা কিছু হইলে হইতে পারিতেন কিন্তু সেই কারণেই তাঁহাদের পক্ষে কিছু একটা হওয়া সর্ব্বাপেক্ষা অসম্ভব।

আমাদের অনাথবন্ধু সেই মধ্যদেশবিলম্বিত বিধিবিড়ম্বিত যুবক। সকলেরই বিশ্বাস তিনি ইচ্ছা করিলে সকল বিষয়েই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন। কিন্তু কোন কালে তিনি ইচ্ছাও করিলেন না, এবং কোন বিষয়ে তিনি কৃত-কার্য্যও হইলেন না এবং সকলের বিশ্বাস তাঁহার প্রতি অটল রহিয়া গেল। সকলে বলিল তিনি পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হইবেন, তিনি আর পরীক্ষা দিলেন না। সকলের বিশ্বাস, চাকরিতে প্রবিষ্ট হইলে যে কোন ডিপার্ট-মেণ্টের উচ্চতম স্থান তিনি অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারিবেন,—তিনি কোন চাকরিই গ্রহণ করিলেন না। সাধারণ লোকের প্রতি তাঁহার বিশেষ অবজ্ঞা, কারণ তাহারা অত্যন্ত সামান্য, অসাধারণ লোকের প্রতি তাঁহার

কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না, কারণ মনে করিলেই তিনি তাহাদের অপেক্ষা অসাধারণতর হইতে পারিতেন।

অনাথবন্ধুর সমস্ত খ্যাতি-প্রতিপত্তিসুখ-সম্পদসৌভাগ্য দেশকালাতীত অসম্ভবতার ভাণ্ডারে নিহত ছিল—বিধাতা কেবল বাস্তব-রাজ্যে তাঁহাকে একটি ধনী শ্বশুর এবং একটি সুশীলা স্ত্রী দান করিয়াছিলেন। স্ত্রীর নাম বিন্ধ্যবাসিনী।

স্ত্রীর নামটি অনাথবন্ধু পছন্দ করেন নাই এবং স্ত্রীটিকেও রূপে গুণে তিনি আপন যোগ্য জ্ঞান করিতেন না, কিন্তু বিন্ধ্যবাসিনীর মনে স্বামিসৌভাগ্যগর্ব্বের সীমা ছিল না। সকল স্ত্রীর সকল স্বামীর অপেক্ষা তাঁহার স্বামী যে সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, এ সম্বন্ধে তাঁহার কোন সন্দেহ ছিল না এবং তাঁহার স্বামীরও কোন সন্দেহ ছিল না এবং সাধারণের ধারণাও এই বিশ্বাসের অনুকূল ছিল।

এই স্বামিগর্ব্ব পাছে কিছু মাত্র ক্ষুণ্ণ হয়, এজন্য বিন্ধ্যবাসিনী সর্ব্বদাই শঙ্কিত ছিলেন। তিনি যদি আপন হৃদয়ের অভ্রভেদী অটল ভক্তি-পর্ব্বতের উচ্চতম শিখরের উপরে এই স্বামীটিকে অধিরোহণ করাইয়া তাঁহাকে মূঢ় মর্ত্ত্য-লোকের সমস্ত কটাক্ষপাত হইতে দূরে রক্ষা করিতে পারিতেন, তবে নিশ্চিন্তচিত্তে পতি-পূজায় জীবন উৎসর্গ করিতেন। কিন্তু জড়-জগতে কেবলমাত্র ভক্তির দ্বারা ভক্তিভাজনকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া রাখা যায় না এবং অনাথবন্ধুকে পুরুষের আদর্শ বলিয়া মানে না এমন প্রাণী সংসারে বিরল নহে। এই জন্য বিন্ধ্যবাসিনীকে অনেক দুঃখ পাইতে হইয়াছে।

অনাথবন্ধু যখন কালেজে পড়িতেন তখন শ্বশুরালয়েই বাস করিতেন। পরীক্ষার সময় আসিল পরীক্ষা দিলেন না এবং তাহার পর-বৎসর কালেজ ছাড়িয়া দিলেন।

এই ঘটনায় সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে বিন্ধ্য-বাসিনী অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। রাত্রে মৃদুস্বরে অনাথবন্ধুকে বলিলেন, "পরীক্ষাটা দিলেই ভাল হ'ত!"

অনাথবন্ধু অবজ্ঞাভরে হাসিয়া কহিলেন, "পরীক্ষা দিলেই কি চতুর্ভুজ হয় না কি? আমাদের কেদারও ত পরীক্ষায় পাস হইয়াছে।"

বিন্ধ্যবাসিনী সান্ত্বনা লাভ করিলেন। দেশের অনেক গো-গর্দ্দভ যে পরীক্ষায় পাস করিতেছে সে পরীক্ষা দিয়া অনাথবন্ধুর গৌরব কি আর বাড়িবে!

প্রতিবেশিনী কমলা তাহার বাল্যসখী বিন্দিকে আনন্দ সহকারে খবর দিতে আসিল যে, তাহার ভাই রমেশ এবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জলপানী পাইতেছে। শুনিয়া বিন্ধ্য-বাসিনী অকারণে মনে করিল, কমলার এই আনন্দ বিশুদ্ধ আনন্দ নহে, ইহার মধ্যে তাহার স্বামীর প্রতি কিঞ্চিৎ গূঢ় শ্লেষ আছে। এই জন্য সখীর উল্লাসে উল্লাস প্রকাশ না করিয়া বরং গায়ে পড়িয়া কিঞ্চিৎ ঝগড়ার সুরে শুনাইয়া দিল যে, এল, এ, পরীক্ষা একটা পরীক্ষার মধ্যেই গণ্য নহে; এমন কি, বিলাতের কোন কালেজে বি, এ, র নীচে পরীক্ষাই নাই।—বলা বাহুল্য, এ সমস্ত সংবাদ এবং যুক্তি বিন্ধ্য স্বামীর নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছে।

কমলা সুখসংবাদ দিতে আসিয়া সহসা পরম প্রিয়তমা প্রাণসখীর নিকট হইতে এরূপ আঘাত পাইয়া প্রথমটা কিছু বিস্মিত হইল। কিন্তু সেও না কি স্ত্রীজাতীয় মনুষ্য, এই জন্য মুহূর্ত্তকালের মধ্যেই বিন্ধ্যবাসিনীর মনের ভাব বুঝিতে পারিল এবং ভ্রাতার অপমানে তৎ-ক্ষণাৎ তাহারও রসনাগ্রে একবিন্দু তীব্র বিষ

সঞ্চারিত হইল; সে বলিল, আমরা ত ভাই বিলাতেও যাই নাই, সাহেব স্বামীকেও বিবাহ করি নাই অত খবর কোথায় পাইব! মূর্খ মেয়েমানুষ, মোটামুটি এই বুঝি যে, বাঙ্গালীর ছেলেকে কালেজে এল,এ, দিতে হয়;—তাও ত ভাই সকলে পারে না। অত্যন্ত নিরীহ এবং সুমিষ্ট বন্ধুভাবে এই কথা গুলি বলিয়া কমলা চলিয়া আসিল। কলহবিমুখ বিন্ধ্য নিরুত্তরে সহ্য করিল এবং ঘরে প্রবেশ করিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল।

অল্পকালের মধ্যে আর একটি ঘটনা ঘটিল। একটি দূরস্থ ধনী কুটুম্ব কিয়ৎকালের জন্য কলিকাতায় আসিয়া বিন্ধ্যবাসিনীর পিত্রালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তদুপলক্ষে তাহার পিতা রাজকুমার বাবুর বাড়িতে বিশেষ একটা সমারোহ পড়িয়া গেল। জামাই বাবু বাহিরের যে বড় বৈঠকখানাটি অধিকার করিয়া থাকিতেন নব-অভ্যাগতদের বিশেষ সমাদরের জন্য সেই ঘরটি ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাকে মামা বাবুর ঘরে কিছুদিনের জন্য আশ্রয় হইতে অনুরোধ করা হইল।

এই ঘনটায় অনাথবন্ধুর অভিমান উচ্ছ্বসিত [হ]ইয়া উঠিল! প্রথমতঃ স্ত্রীর নিকট গিয়া [তা]হার পিতৃনিন্দা করিয়া তাহাকে কাঁদাইয়া দিয়া [শ্ব]শুরের উপর প্রতিশোধ তুলিলেন। তাহার [প]রে অনাহার প্রভৃতি অন্যান্য প্রবল উপায়ে [অ]ভিমান প্রকাশের উপক্রম করিলেন। তাহা [দে]খিয়া বিন্ধ্যবাসিনী নিরতিশয় লজ্জিত হইল। [তা]হার মনে যে একটি সহজ আত্মসম্ভ্রমবোধ [ছি]ল, তাহা হইতেই সে বুঝিল, এরূপ স্থলে [সক]লসমক্ষে অভিমান প্রকাশ করার মত লজ্জা-[জনক] আত্মাবমাননা আর কিছুই নাই। হাতে [পা]য়ে ধরিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া বহু কষ্টে সে [তা]হার স্বামীকে ক্ষান্ত করিয়া রাখিল।

বিন্ধ্য অবিবেচক ছিল না, এই জন্য সে তাহার পিতা মাতার প্রতি কোন দোষারোপ করিল না; সে বুঝিল ঘটনাটি সামান্য ও স্বাভাবিক, কিন্তু এ কথাও তাহার মনে হইল যে, তাহার স্বামী শ্বশুরালয়ে বাস করিয়া কুটুম্বের আদর হইতে বঞ্চিত হইতেছেন।

সেই দিন হইতে প্রতিদিন সে তাহার স্বামীকে বলিতে লাগিল, আমাকে তোমাদের ঘরে লইয়া চল; আমি আর এখানে থাকিব না।

অনাথবন্ধুর মনে অহঙ্কার যথেষ্ট ছিল কিন্তু আত্মসম্ভ্রমবোধ ছিল না। তাঁহার নিজগৃহের দারিদ্র্যের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে কিছুতেই তাঁহার অভিরুচি হইল না। তখন তাঁহার স্ত্রী কিছু দৃঢ়তা প্রকাশ করিয়া কহিল, তুমি যদি না যাও ত আমি একলাই যাইব।

অনাথবন্ধু মনে মনে বিরক্ত হইয়া তাঁহার স্ত্রীকে কলিকাতার বাহিরে দূর ক্ষুদ্র পল্লীতে তাঁহাদের মৃত্তিকানির্ম্মিত খোড়ো ঘরে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন। যাত্রাকালে রাজকুমার বাবু এবং তাঁহার স্ত্রী, কন্যাকে আরও কিছুকাল পিতৃগৃহে থাকিয়া যাইবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন; কন্যা নীরবে নতশিরে গম্ভীর মুখে বসিয়া মৌনভাবে জানাইয়া দিল—না, সে হইতে পারিবে না।

তাহার সহসা এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দেখিয়া পিতা মাতার সন্দেহ হইল যে, অজ্ঞাতসারে বোধ করি কোনরূপে তাহাকে আঘাত দেওয়া হইয়াছে। রাজকুমার বাবু ব্যথিতচিত্তে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা, আমাদের কোন অজ্ঞানকৃত আচরণে তোমার মনে কি ব্যথা লাগিয়াছে?

বিন্ধ্যবাসিনী তাহার পিতার মুখের দিকে করুণ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া কহিল, এক মুহূর্ত্তের

জন্যও নহে। তোমাদের এখানে বড় সুখে বড় আদরে আমার দিন গিয়াছে!—বলিয়া সে কাঁদিতে লাগিল! কিন্তু তাহার সংকল্প অটল রহিল।

বাপ মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিলেন, যত স্নেহে যত আদরেই মানুষ কর, বিবাহ দিলেই মেয়ে পর হইয়া যায়।

অবশেষে অশ্রুনেত্রে সকলের নিকট বিদায় লইয়া আপন আজন্মকালের স্নেহমণ্ডিত পিতৃগৃহ এবং পরিজন ও সঙ্গিনীগণকে ছাড়িয়া বিন্ধ্যবাসিনী পাল্কীতে আরোহণ করিল।

—:*:—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

কলিকাতার ধনিগৃহে এবং পল্লিগ্রামের গৃহস্থঘরে বিস্তর প্রভেদ। কিন্তু বিন্ধ্যবাসিনী একদিনের জন্যও ভাবে অথবা আচরণে অসন্তোষ প্রকাশ করিল না। প্রফুল্লচিত্তে গৃহকার্য্যে শাশুড়ীর সহায়তা করিতে লাগিল। তাহাদের দরিদ্র অবস্থা জানিয়া পিতা নিজব্যয়ে কন্যার সহিত একটি দাসী পাঠাইয়াছিলেন। বিন্ধ্যবাসিনী স্বামিগৃহে পৌঁছিয়াই তাহাকে বিদায় করিয়া দিল। তাহার শ্বশুরঘরের দারিদ্র্য দেখিয়া বড়মানুষের ঘরের দাসী প্রতিমুহূর্ত্তে মনে মনে নাসাগ্র আকুঞ্চিত করিতে থাকিবে, এ আশঙ্কাও তাহার অসহ্য বোধ হইল।

শাশুড়ী স্নেহবশতঃ বিন্ধ্যকে শ্রমসাধ্য কার্য্য হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু বিন্ধ্য নিরলস অশ্রান্তভাবে প্রসন্নমুখে সকল কার্য্যে যোগ দিয়া শাশুড়ীর হৃদয় অধিকার করিয়া লইল এবং পল্লীরমণীগণ তাহার গুণে মুগ্ধ হইয়া গেল।

কিন্তু ইহার ফল সম্পূর্ণ সন্তোষজনক হইল না। কারণ, বিশ্বনিয়ম নীতিবোধ প্রথমভাগের ন্যায় সাধুভাষায় রচিত সরল উপদেশাবলী নহে। নিষ্ঠুর বিদ্রূপপ্রিয় সয়তান মাঝখানে আসিয়া সমস্ত নীতিসূত্রগুলিকে ঘাঁটিয়া জট পাকাইয়া দিয়াছে। তাই ভাল কাজে সকল সময়ে উপস্থিতমত বিশুদ্ধ ভাল ফল ঘটে না, হঠাৎ একটা গোল বাধিয়া ওঠে।

অনাথবন্ধুর দুইটি ছোট এবং একটি বড় ভাই ছিল। বড় ভাই বিদেশে চাকরি করিয়া যে গুটিপঞ্চাশেক টাকা উপার্জ্জন করিতেন তাহাতেই তাহাদের সংসার চলিত এবং ছোট দুটি ভাইয়ের বিদ্যাশিক্ষা হইত।

বলা বাহুল্য, আজকালকার দিনে মাসিক পঞ্চাশ টাকায় সংসারের শ্রীবৃদ্ধিসাধন অসম্ভব কিন্তু বড় ভাইয়ের স্ত্রী শ্যামাশঙ্করীর গরিমা বৃদ্ধির পক্ষে উহাই যথেষ্ট ছিল। স্বামী সংবৎসরকাল কাজ করিতেন, এই জন্য স্ত্রী সংবৎসরকাল বিশ্রামের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কাজকর্ম্ম কিছুই করিতেন না অথচ এমন ভাবে চলিতেন, যেন তিনি কেবলমাত্র তাঁহার উপার্জ্জনক্ষম স্বামীটির স্ত্রী হইয়া সমস্ত সংসারটাকে পরম বাধিত করিয়াছেন।

বিন্ধ্যবাসিনী যখন শ্বশুরবাড়ি আসিয়া গৃহলক্ষ্মীর ন্যায় অহর্নিশি ঘরের কাজে প্রবৃত্ত হইল তখন শ্যামাশঙ্করীর সঙ্কীর্ণ অন্তঃকরণটুকে যেন আঁটিয়া ধরিতে লাগিল। তাহার কারণ বোঝা শক্ত। বোধ করি বড় বৌ মনে করিলেন, মেজবৌ বড় ঘরের মেয়ে হইয়া কেবল লোক দেখাইবার জন্য ঘরকন্নার নীচ কাজে নিযুক্ত হইয়াছে, উহাতে কেবল তাহাকে লোকের চক্ষে অপদস্থ করা হইতেছে।

কারণেই হউক, মাসিক পঞ্চাশ টাকার স্ত্রী কিছুতেই ধনিবংশের কন্যাকে সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি তাহার নম্রতার মধ্যে অসহ্য দেমাকের লক্ষণ দেখিতে পাইলেন।

এদিকে অনাথবন্ধু পল্লীতে আসিয়া লাইব্রেরী স্থাপন করিলেন; দশ বিশ জন স্কুলের ছাত্র জড় করিয়া সভাপতি হইয়া খবরের কাগজে টেলিগ্রাম প্রেরণ করিতে লাগিলেন; এমন কি, কোন কোন ইংরাজী সংবাদপত্রের বিশেষ সংবাদদাতা হইয়া গ্রামের লোকদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন। কিন্তু দরিদ্র সংসারে একপয়সা আনিলেন না, বরঞ্চ বাজে খরচ অনেক হইতে লাগিল।

একটা কোন চাকরী লইবার জন্য বিন্ধ্যবাসিনী তাঁহাকে সর্ব্বদাই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। তিনি কাণ দিলেন না। স্ত্রীকে বলিলেন, তাঁহার উপযুক্ত চাকরী আছে বটে কিন্তু পক্ষপাতী ইংরাজ গবর্মেণ্ট সে সকল পদে বড় বড় ইংরাজকে নিযুক্ত করে, বাঙ্গালী হাজার যোগ্য হইলেও তাহার কোন আশা নাই।

শ্যামাশঙ্করী তাঁহার দেবর এবং মেঝযা'র প্রতি লক্ষ্যে এবং অলক্ষ্যে সর্ব্বদাই বাক্যবিষ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। গর্ব্বভরে নিজেদের দারিদ্র্য আস্ফালন করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমরা গরীব মানুষ, বড়মানুষের মেয়ে এবং বড়মানুষের জামাইকে পোষণ করিব কেমন করিয়া? সেখানে ত বেশ ছিলেন কোন দুঃখ ছিল না—এখানে ডালভাত খাইয়া এত কষ্ট কি সহ্য হইবে?

শাশুড়ী বড়বৌকে ভয় করিতেন, তিনি দুর্ব্বলের পক্ষ অবলম্বন করিয়া কোন কথা বলিতে সাহস করিতেন না। মেজবৌও মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনের ডালভাত এবং তদীয় স্ত্রীর বাক্য ঝাল খাইয়া নীরবে পরিপাক করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে বড় ভাই ছুটিতে কিছুদিনের জন্য ঘরে আসিয়া স্ত্রীর নিকট হইতে অনেক উদ্দীপনাপূর্ণ ওজোগুণসম্পন্ন বক্তৃতা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে নিদ্রার ব্যাঘাত যখন প্রতিরাত্রেই গুরুতর হইয়া উঠিতে লাগিল তখন একদিন অনাথবন্ধুকে ডাকিয়া শান্তভাবে স্নেহের সহিত কহিলেন, 'তোমার একটা চাকরির চেষ্টা দেখা উচিত, কেবল আমি একলা সংসার চালাইব কি করিয়া?

অনাথবন্ধু পদাহত সর্পের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, দুই বেলা দুই মুষ্টি অত্যন্ত অখাদ্য মোটা ভাতের পর এত খোঁটা সহ্য হয় না। তৎক্ষণাৎ স্ত্রীকে লইয়া শ্বশুরবাড়ি যাইতে সংকল্প করিলেন।

কিন্তু স্ত্রী কিছুতেই সম্মত হইল না। তাহার মতে ভাইয়ের অন্ন এবং ভাজের গালিতে কনিষ্ঠের পারিবারিক অধিকার আছে কিন্তু শ্বশুরের আশ্রয়ে বড় লজ্জা। বিন্ধ্যবাসিনী শ্বশুরবাড়িতে দীনহীনের মত নত হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু বাপের বাড়িতে সে আপন মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া মাথা তুলিয়া চলিতে চায়।

এমন সময় গ্রামের এণ্ট্রেন্সস্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের পদ খালি হইল। অনাথবন্ধুর দাদা এবং বিন্ধ্যবাসিনী উভয়েই তাঁহাকে এই কাজটি গ্রহণ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেন। তাহাতেও হিতে বিপরীত হইল। নিজের ভাই এবং একমাত্র ধর্ম্মপত্নী যে তাঁহাকে এমন একটা অত্যন্ত তুচ্ছ কাজের যোগ্য বলিয়া মনে করিতে পারেন, ইহাতে তাঁহার মনে দুর্জ্জয় অভিমানের সঞ্চার হইল এবং সংসারের

সমস্ত কাজকর্ম্মের প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা চতুর্গুণ বৈরাগ্য জন্মিয়া গেল।

তখন আবার দাদা তাঁহার হাতে ধরিয়া মিনতি করিয়া তাঁহাকে অনেক করিয়া ঠাণ্ডা করিলেন। সকলেই মনে করিলেন, ইঁহাকে আর কোন কথা বলিয়া কাজ নাই, এ এখন কোন প্রকারে ঘরে টিঁকিয়া গেলেই ঘরের সৌভাগ্য।

ছুটি অন্তে দাদা কর্ম্মক্ষেত্রে চলিয়া গেলেন; শ্যামাশঙ্করী রুদ্ধ আক্রোশে মুখখানা গোলাকার করিয়া তুলিয়া একটা বৃহৎ কুদর্শন চক্র নির্ম্মাণ করিয়া রহিলেন। অনাথবন্ধু বিন্ধ্যবাসিনীকে আসিয়া কহিলেন, আজকাল বিলাতে না গেলে কোন ভদ্র চাকরী পাওয়া যায় না। আমি বিলাতে যাইতে মনস্থ করিয়াছি, তুমি তোমার বাবার কাছ হইতে কোন ছুতায় কিছু অর্থ সংগ্রহ কর।

এক ত বিলাত যাইবার কথা শুনিয়া বিন্ধ্যার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল; তাহার পরে পিতার কাছে কি করিয়া অর্থ ভিক্ষা করিতে যাইবে, তাহা সে মনে করিতে পারিল না এবং মনে করিতে গিয়া লজ্জায় মরিয়া গেল।

শ্বশুরের কাছে নিজমুখে টাকা চাহিতেও অনাথবন্ধুর অহঙ্কারে বাধা দিল, অথচ বাপের কাছ হইতে কন্যা কেন যে ছলে অথবা বলে অর্থ আকর্ষণ করিয়া না আনিবে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। ইহা লইয়া অনাথ অনেক রাগারাগি করিলেন এবং মর্ম্মপীড়িত বিন্ধ্যবাসিনীকেও বিস্তর অশ্রুপাত করিতে হইল।

এমনি করিয়া কিছুদিন সাংসারিক অভাবে এবং মনের কষ্টে কাটিয়া গেল।

অবশেষে শরৎকালে পূজা নিকটবর্ত্তী হইল। কন্যা এবং জামাতাকে সাদরে আহ্বান করিয়া আনিবার জন্য রাজকুমার বাবু বহুসমারোহে যানবাহনাদি প্রেরণ করিলেন। এক বৎসর পরে কন্যা স্বামী সহ পুনরায় পিতৃভবনে প্রবেশ করিল। ধনী কুটুম্বের যে আদর তাঁহার অসহ্য হইয়াছিল, জামাতা এবার তদপেক্ষা অনেক বেশী আদর পাইলেন। বিন্ধ্যবাসিনীও অনেককাল পরে মাথার অবগুণ্ঠন ঘুচাইয়া অহর্নিশি স্বজনস্নেহে ও উৎসবতরঙ্গে আন্দোলিত হইতে লাগিল।

আজ ষষ্ঠী। কাল সপ্তমী পূজা আরম্ভ হইবে। ব্যস্ততা এবং কোলাহলের সীমা নাই। দূর এবং নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয় পরিজনে অট্টালিকার প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ একেবারে পরিপূর্ণ।

সে রাত্রে বড় শ্রান্ত হইয়া বিন্ধ্যবাসিনী শয়ন করিল। পূর্ব্বে যে ঘরে শয়ন করিত এ সে ঘর নহে; এবার বিশেষ আদর করিয়া মা জামাতাকে তাঁহার নিজের ঘর ছাড়িয়া দিয়াছেন। অনাথবন্ধু কখন্ শয়ন করিতে আসিলেন তাহা বিন্ধ্য জানিতেও পারিল না। সে তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিল।

খুব ভোরের বেলা হইতে শানাই বাজিতে লাগিল। কিন্তু ক্লান্তদেহ বিন্ধ্যবাসিনীর নিদ্রাভঙ্গ হইল না। কমল এবং ভুবন দুই সখী বিন্ধ্যর শয়নদ্বারে আড়ি পাতিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া অবশেষে পরিহাসপূর্ব্বক বাহির হইতে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল; তখন বিন্ধ্য তাড়াতাড়ি জাগিয়া উঠিয়া দেখিল তাহার স্বামী কখন্ উঠিয়া গিয়াছেন সে জানিতে পারে নাই। লজ্জিত হইয়া শয্যা ছাড়িয়া নামিয়া দেখিল তাহার মাতার লোহার সিন্দুক খোলা এবং তাহার মধ্যে তাহার বাপের যে ক্যাশবাক্সটি থাকিত, সেটিও নাই।

তখন মনে পড়িল, কাল সন্ধ্যাবেলায় মায়ের চাবির গোচ্ছা হারাইয়া গিয়া বাড়িতে

খুব একটা গোলযোগ পড়িয়া গিয়াছিল। সেই চাবি চুরি করিয়া কোন একটি চোর এই কাজ করিয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তখন হঠাৎ আশঙ্কা হইল, পাছে সেই চোর তাহার স্বামীকে কোনরূপ আঘাত করিয়া থাকে! বুকটা ধড়াস্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। বিছানার নীচে খুঁজিতে গিয়া দেখিল, খাটের পায়ের কাছে তাহার মায়ের চাবির গোচ্ছার নীচে একটি চিঠি চাপা রহিয়াছে।

চিঠি তাহার স্বামীর হস্তাক্ষরে লেখা। খুলিয়া পড়িয়া জানিল, তাহার স্বামী তাহার কোন এক বন্ধুর সাহায্যে বিলাতে যাইবার জাহাজভাড়া সংগ্রহ করিয়াছে; এক্ষণে সেখানকার খরচপত্র চালাইবার জন্য কোন উপায় ভাবিয়া না পাওয়াতে গতরাত্রে শ্বশুরের অর্থ অপহরণ করিয়া বারান্দাসংলগ্ন কাঠের সিঁড়ি দিয়া অন্দরের বাগানে নামিয়া প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া পলায়ন করিয়াছে। অদ্যই প্রত্যুষে জাহাজ ছাড়িয়া দিয়াছে।

পত্রখানা পাঠ করিয়া বিন্ধ্যবাসিনীর শরীরের সমস্ত রক্ত হিম হইয়া গেল। সেইখানেই খাটের খুরা ধরিয়া সে বসিয়া পড়িল। তাহার দেহের অভ্যন্তরে কর্ণকুহরের মধ্যে নিস্তব্ধ মৃত্যুরজনীর ঝিল্লিধ্বনির মত একটা শব্দ হইতে লাগিল। তাহারই উপরে, প্রাঙ্গণ হইতে, প্রতিবেশীদের বাড়ি হইতে এবং দূর অট্টালিকা হইতে বহুতর শানাই বহুতর সুরে তান ধরিল। সমস্ত বঙ্গদেশ তখন আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

শরতের উৎসব-হাস্য-রঞ্জিত রৌদ্র সকৌতুকে শয়নগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। এত বেলা হইল তথাপি উৎসবের দিনে দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া ভুবন ও কমলা উচ্চহাস্যে উপহাস করিতে করিতে গুম্ গুম্ শব্দে দ্বারে কিল মারিতে লাগিল। তাহাতেও কোন সাড়া না পাইয়া কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া উর্দ্ধকণ্ঠে "বিন্দী" "বিন্দী" করিয়া ডাকিতে লাগিল।

বিন্ধ্যবাসিনী ভগ্নরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "যাচ্চি; তোরা এখন যা!"

তাহারা সখীর পীড়া আশঙ্কা করিয়া মাকে ডাকিয়া আনিল। মা আসিয়া কহিলেন,—"বিন্দু, কি হয়েছে মা—এখনো দ্বার বন্ধ কেন!"

বিন্ধ্য উচ্ছ্বসিত অশ্রু সম্বরণ করিয়া কহিল, "একবার বাবাকে সঙ্গে করে নিয়ে এস!"

মা অত্যন্ত ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ রাজকুমার বাবুকে সঙ্গে করিয়া দ্বারে আসিলেন। বিন্ধ্য দ্বার খুলিয়া তাঁহাদিগকে ঘরে আনিয়া তাড়াতাড়ি বন্ধ করিয়া দিল।

তখন বিন্ধ্য ভূমিতে পড়িয়া তাহার বাপের পা ধরিয়া বক্ষ শতধা বিদীর্ণ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "বাবা! আমাকে মাপ কর, আমি তোমার সিন্দুক হইতে টাকা চুরি করিয়াছি।"

তাঁহারা অবাক্ হইয়া বিছানায় বসিয়া পড়িলেন। বিন্ধ্য বলিল, তাহার স্বামীকে বিলাতে পাঠাইবার জন্য সে এই কাজ করিয়াছে।

তাহার বাপ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের কাছে চাহিস্ নাই কেন?"

বিন্ধ্যবাসিনী কহিল, "পাছে বিলাত যাইতে তোমরা বাধা দেও!"

রাজকুমার বাবু অত্যন্ত রাগ করিলেন। মা কাঁদিতে লাগিলেন, মেয়ে কাঁদিতে লাগিল এবং কলিকাতার চতুর্দ্দিক্ হইতে বিচিত্র সুরে আনন্দের বাদ্য বাজিতে লাগিল।

যে বিন্ধ্য বাপের কাছেও কখনও অর্থ প্রার্থনা করিতে পারে নাই এবং যে স্ত্রী স্বামীর লেশমাত্র অসম্মান পরমাত্মীয়ের নিকট হইতেও গোপন করিবার জন্য প্রাণপণ করিতে পারিত,

আজ একেবারে উৎসবের জনতার মধ্যে তাহার পত্নী-অভিমান, তাহার দুহিতৃসম্ভ্রম, তাহার আত্মমর্য্যাদা চূর্ণ হইয়া প্রিয় এবং অপ্রিয়, পরিচিত এবং অপরিচিত সকলের পদতলে ধূলির মত লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। পূর্ব্ব হইতে পরামর্শ করিয়া, ষড়যন্ত্রপূর্ব্বক চাবি চুরি করিয়া, স্ত্রীর সাহায্যে রাতারাতি অর্থ অপহরণপূর্ব্বক অনাথবন্ধু বিলাতে পলায়ন করিয়াছে, এ কথা লইয়া আত্মীয়কুটুম্বপরিপূর্ণ বাড়িতে একটা টী টী পড়িয়া গেল। দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ভুবন, কমল এবং আরও অনেক স্বজন প্রতিবেশী দাস দাসী সমস্ত শুনিয়াছিল। রুদ্ধদ্বার জামাতৃগৃহে উৎকণ্ঠিত কর্ত্তাগৃহিণীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সকলেই কৌতূহলে এবং আশঙ্কায় ব্যগ্র হইয়া আসিয়াছিল।

বিন্ধ্যবাসিনী কাহাকেও মুখ দেখাইল না। দ্বার রুদ্ধ করিয়া অনাহারে বিছানায় পড়িয়া রহিল। তাহার সেই শোকে কেহ দুঃখ অনুভব করিল না। ষড়যন্ত্রকারিণীর দুষ্ট বুদ্ধিতে সকলেই বিস্মিত হইল। সকলেই ভাবিল, বিন্ধ্যর চরিত্র এতদিন অবসরাভাবে অপ্রকাশিত ছিল। নিরানন্দ গৃহে পূজার উৎসব কোন প্রকারে সম্পন্ন হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:০:—

অপমান এবং অবসাদে অবনত হইয়া বিন্ধ্য শ্বশুরবাড়ি ফিরিয়া আসিল। সেখানে পুত্রবিচ্ছেদকাতরা বিধবা শাশুড়ীর সহিত পতিবিরহবিধুরা বধূর ঘনিষ্ঠতর যোগ স্থাপিত হইল। উভয়ে পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইয়া নীরব শোকের ছায়াতলে সুগভীর সহিষ্ণুতার সহিত সংসারের সমস্ত তুচ্ছতম কার্য্যগুলি পর্য্যন্ত স্বহস্তে সম্পন্ন করিয়া যাইতে লাগিল। শাশুড়ী যে পরিমাণে কাছে আসিল পিতামাতা সেই পরিমাণে দূরে চলিয়া গেল। বিন্ধ্য মনে মনে অনুভব করিল, শাশুড়ী দরিদ্র, আমিও দরিদ্র আমরা এক দুঃখবন্ধনে বদ্ধ; পিতামাতা ঐশ্বর্য্যশালী, তাঁহারা আমাদের অবস্থা হইতে অনেক দূরে। একে দরিদ্র বলিয়া বিন্ধ্য তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক দূরবর্ত্তী, তাহাতে আবার চুরি স্বীকার করিয়া সে আরও অনেক নীচে পড়িয়া গিয়াছে। স্নেহসম্পর্কের বন্ধন এত অধিক পার্থক্যভার বহন করিতে পারে কি না কে জানে!

অনাথবন্ধু বিলাতে গিয়া প্রথম প্রথম স্ত্রীকে রীতিমত চিঠি পত্র লিখিতেন। কিন্তু ক্রমেই চিঠি বিরল হইয়া আসিল, এবং পত্রের মধ্যে একটা অবহেলার ভাব অলক্ষিতভাবে প্রকাশ হইতে লাগিল। তাঁহার অশিক্ষিতা গৃহকার্য্যরতা স্ত্রী অপেক্ষা বিদ্যাবুদ্ধিরূপগুণ সর্ব্ব বিষয়েই শ্রেষ্ঠতর অনেক ইংরাজকন্যা অনাথবন্ধুকে সুযোগ্য সুবুদ্ধি এবং সুরূপ বলিয়া সমাদর করিত। এমত অবস্থায় অনাথবন্ধু আপনার এক বস্ত্রপরিহিত অবগুণ্ঠনবতী অগৌরবর্ণা স্ত্রীকে কোন অংশেই আপনার সমযোগ্য জ্ঞান করিবেন না ইহাতে বিচিত্র নাই।

কিন্তু, তথাপি যখন অর্থের অনাটন হইল, তখন এই নিরুপায় বাঙ্গালীর মেয়েকেই টেলিগ্রাফ করিতে তাঁহার সঙ্কোচ বোধ হইল না। এবং এই বাঙ্গালির মেয়েই দুই হাতে কেবল দুই গাছি কাঁচের চুড়ী রাখিয়া গায়ের সমস্ত গহনা বেচিয়া টাকা পাঠাইতে লাগিল। পাড়াগাঁয়ে নিরাপদে রক্ষা করিবার উপযুক্ত স্থান নাই বলিয়া তাহার সমস্ত বহুমূল্য গহনাগুলি পিতৃগৃহে ছিল। স্বামীর কুটুম্বভবনে নিমন্ত্রণে

যাইবার ছল করিয়া নানা উপলক্ষে বিন্ধ্যবাসিনী একে একে সকল গহনাই আনাইয়া লইল। অবশেষে হাতের বালা, রূপার চুড়ী, বেনরসী সাড়ী এবং শাল পর্য্যন্ত বিক্রয় শেষ করিয়া বিস্তর বিনীত অনুনয়পূর্ব্বক মাথার দিব্য দিয়া, অশ্রুজলে পত্রের প্রত্যেক অক্ষর পংক্তি বিকৃত করিয়া বিন্ধ্য স্বামীকে ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ করিল।

স্বামী চুল খাট করিয়া দাড়ি কামাইয়া কোট্‌প্যাণ্টলুন পরিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। এবং হোটেলে আশ্রয় লইলেন। পিতৃগৃহে বাস করা অসম্ভব, প্রথমতঃ উপযুক্ত স্থান নাই, দ্বিতীয়তঃ পল্লীবাসী দরিদ্র গৃহস্থ জাতিনষ্ট হইলে একেবারে নিরুপায় হইয়া পড়ে। শ্বশুরগণ আচারনিষ্ঠ পরম হিন্দু; তাহারাও জাতিচ্যুতকে আশ্রয় দিতে পারেন না।

অর্থাভাবে অতি শীঘ্রই হোটেল হইতে বাসায় নামিতে হইল। সে বাসায় তিনি স্ত্রীকে আনিতে প্রস্তুত নহেন। বিলাত হইতে আসিয়া স্ত্রী এবং মাতার সহিত কেবল দিন দুই তিন দিনের বেলায় দেখা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত আর সাক্ষাৎ হয় নাই।

দুইটি শোকার্ত্তা রমণীর কেবল এক সান্ত্বনা ছিল যে, অনাথবন্ধু স্বদেশে আত্মীয়বর্গের নিকটবর্ত্তী স্থানে আছেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে অনাথবন্ধুর অসামান্য ব্যারিষ্টরী কীর্ত্তিতে তাহাদের মনে গর্ব্বের সীমা রহিল না। বিন্ধ্যবাসিনী আপনাকে যশস্বী স্বামীর অযোগ্য স্ত্রী বলিয়া ধিক্কার দিতে লাগিল, পুনশ্চ অযোগ্য বলিয়াই স্বামীর অহঙ্কার অধিক করিয়া অনুভব করিল। সে দুঃখে পীড়িত এবং গর্ব্বে বিস্ফারিত হইল। ম্লেচ্ছ-আচার সে ঘৃণা করে, তবু স্বামীকে দেখিয়া মনে মনে কহিল, আজ কাল ঢের লোক ত সাহেব হয়, কিন্তু এমন ত কাহাকেও মানায় না—একেবারে ঠিক যেন বিলাতী সাহেব। বাঙ্গালী বলিয়া চিনিবার যো নাই!

বাসাখরচ যখন অচল হইয়া আসিল, যখন অনাথবন্ধু মনের ক্ষোভে স্থির করিলেন, অভিশপ্ত ভারতবর্ষে গুণের সমাদর নাই এবং তাঁহার স্বব্যবসায়িগণ ঈর্ষ্যাবশতঃ তাঁহার উন্নতিপথে গোপনে বাধা স্থাপন করিতেছে; যখন তাঁহার খানার ডিশে আমিষ অপেক্ষা উদ্ভিজ্জের পরিমাণ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, দগ্ধ কুক্কুটের সম্মানকর স্থান ভর্জ্জিত চিংড়ি একচেটে করিবার উপক্রম করিল, বেশভূষার চিক্কণতা এবং ক্ষৌরমসৃণ মুখের গর্ব্বোজ্জ্বল জ্যোতি ম্লান হইয়া আসিল—যখন সুতীব্র নিখাদে-বাঁধা জীবন-তন্ত্রী ক্রমশঃ সকরুণ কড়ি মধ্যমের দিকে নামিয়া আসিতে লাগিল, এমন সময় রাজকুমার বাবুর পরিবারে এক গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটিয়া অনাথবন্ধুর সঙ্কটসঙ্কুল জীবনযাত্রার পরিবর্ত্তন আনয়ন করিল। একদা গঙ্গাতীরবর্ত্তী মাতুলালয় হইতে নৌকাযোগে ফিরিবার সময় রাজকুমার বাবুর একমাত্র পুত্র হরকুমার ষ্টিমারের সংঘাতে স্ত্রী এবং বালক পুত্র সহ জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে। এই ঘটনায় রাজকুমারের বংশে কন্যা বিন্ধ্যবাসিনী ব্যতীত আর কেহ রহিল না।

নিদারুণ শোকের কথঞ্চিৎ উপশম হইলে পর রাজকুমার বাবু অনাথবন্ধুকে গিয়া অনুনয় করিয়া কহিলেন,—"বাবা, তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জাতে উঠিতে হইবে। তোমরা ব্যতীত আমার আর কেহ নাই!"

অনাথবন্ধু উৎসাহসহকারে সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তিনি মনে করিলেন যে সকল বার্-লাইব্রেরী-বিহারী স্বদেশীয় ব্যারিষ্টরগণ তাঁহাকে ঈর্ষা করে এবং তাঁহার অ

মাত্র ধীশক্তির প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রকাশ করে না এই উপায়ে তাহাদের প্রতি প্রতিশোধ লওয়া হইবে।

রাজকুমার বাবু পণ্ডিতদিগের বিধান লইলেন। তাঁহারা বলিলেন অনাথবন্ধু যদি গোমাংস না খাইয়া থাকে তবে তাহাকে জাতে তুলিবার উপায় আছে।

বিদেশে যদিচ উক্ত নিষিদ্ধ চতুষ্পদ তাঁহার প্রিয় খাদ্যশ্রেণীর মধ্যে ভুক্ত হইত, তথাপি তাহা অস্বীকার করিতে তিনি কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিলেন না। প্রিয় বন্ধুদের নিকট কহিলেন—সমাজ যখন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা কথা শুনিতে চাহে তখন একটা মুখের কথায় তাহাকে বাধিত করিতে দোষ দেখি না। যে রসনা গোরু খাইয়াছে, সে রসনাকে গোময় এবং মিথ্যা কথা নামক ছুটো কদর্য্য পদার্থ দ্বারা বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া আমাদের আধুনিক সমাজের নিয়ম; আমি সে নিয়ম লঙ্ঘন করিতে চাহি না।

প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে উঠিবার একটা শুভদিন নির্দ্দিষ্ট হইল। ইতিমধ্যে অনাথবন্ধু কেবল যে ধূতি চাদর পরিলেন তাহা নহে, তর্ক এবং উপদেশের দ্বারা বিলাতী সমাজের গালে কালি এবং হিন্দু-সমাজের গালে চূণ লেপন করিতে লাগিলেন। যে শুনিল সকলেই খুসী হইয়া উঠিল।

আনন্দে, গর্ব্বে বিন্ধ্যবাসিনীর প্রীতিসুধাসিক্ত কোমল হৃদয়টি সর্ব্বত্র উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। সে মনে মনে কহিল, বিলাত হইতে যিনিই আসেন, একেবারে আস্ত বিলাতী সাহেব হইয়া আসেন, দেখিয়া বাঙ্গালী বলিয়া চিনিবার যো থাকে না, কিন্তু আমার স্বামী একেবারে অবিকৃত ভাবে ফিরিয়াছেন বরঞ্চ তাঁহার হিন্দুধর্ম্মে ভক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অনেক বাড়িয়া উঠিয়াছে।

যথানির্দ্দিষ্ট দিনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে রাজকুমার বাবুর ঘর ভরিয়া গেল। অর্থব্যয়ের কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। আহার এবং বিদায়ের আয়োজন যথোচিত হইয়াছিল।

অন্তঃপুরেও সমারোহের সীমা ছিল না। নিমন্ত্রিত পরিজনবর্গের পরিবেশন ও পরিচর্য্যায় সমস্ত প্রকোষ্ঠ ও প্রাঙ্গণ সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। সেই ঘোরতর কোলাহল এবং কর্ম্মরাশির মধ্যে বিন্ধ্যবাসিনী প্রফুল্ল মুখে শারদ-রৌদ্ররঞ্জিত প্রভাতবায়ুবাহিত লঘু মেঘখণ্ডের মত আনন্দে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। আজিকার দিনের সমস্ত বিশ্বব্যাপারের প্রধান নায়ক তাহার স্বামী! আজ যেন সমস্ত বঙ্গভূমি একটি মাত্র রঙ্গভূমি হইয়াছে এবং যবনিকা উদ্ঘাটন পূর্ব্বক একমাত্র অনাথবন্ধুকে বিস্মিত বিশ্ব দর্শকের নিকট প্রদর্শন করাইতেছে। প্রায়শ্চিত্ত যে অপরাধস্বীকার তাহা নহে, এ যেন অনুগ্রহপ্রকাশ। অনাথ বিলাত হইতে ফিরিয়া হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিয়া হিন্দুসমাজকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন। এবং সেই গৌরবচ্ছটা সমস্ত দেশ হইতে সহস্র রশ্মিতে বিচ্ছুরিত হইয়া বিন্ধ্যবাসিনীর প্রেমপ্রমুদিত মুখের উপরে অপরূপ মহিমাজ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে। এতদিনকার তুচ্ছ জীবনের সমস্ত দুঃখ এবং ক্ষুদ্র অপমান দূর হইয়া সে আজ তাহার পরিপূর্ণ পিতৃগৃহে সমস্ত আত্মীয় স্বজনের সমক্ষে উন্নত মস্তকে গৌরবের আসনে আরোহণ করিল। স্বামীর মহত্ত্ব আজ অযোগ্য স্ত্রীকে বিশ্বসংসারের নিকট সম্মানাস্পদ করিয়া তুলিল।

অনুষ্ঠান সমাধা হইয়াছে। অনাথবন্ধু জাতে উঠিয়াছেন। অভ্যাগত আত্মীয় ও

ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সহিত একাসনে বসিয়া তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার শেষ করিয়াছেন।

আত্মীয়েরা জামাতাকে দেখিবার জন্ম অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। জামাতা সুস্থচিত্তে তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে প্রসন্নহাস্যমুখে আলস্যমন্থরগমনে ভূমিলুণ্ঠ্যমান চাদরে অন্তঃপুরে যাত্রা করিলেন।

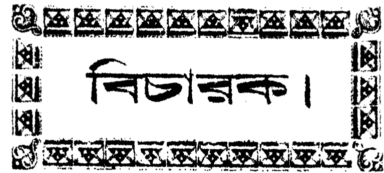
আহারান্তে ব্রাহ্মণগণের দক্ষিণার আয়োজন হইতেছে এবং ইত্যবসরে তাঁহারা সভাস্থলে বসিয়া তুমুল কলহসহকারে পাণ্ডিত্য বিস্তার করিতেছেন। কর্ত্তা রাজকুমার বাবু ক্ষণকাল বিশ্রাম উপলক্ষে সেই কোলাহলাকুল পণ্ডিত-সভায় বসিয়া স্মৃতির তর্ক শুনিতেছেন এমন সময় দ্বারবান্ গৃহস্বামীর হস্তে এক কাড দিয়া খবর দিল, "এক সাহেবলোগ কা মেম আয়া।"

রাজকুমার বাবু চমৎকৃত হইয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই কাডের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, তাহাতে ইংরাজিতে লেখা রহিয়াছে—মিসেস্ অনাথবন্ধু সরকার। অর্থাৎ অনাথবন্ধু সরকারের স্ত্রী।

রাজকুমার বাবু অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া কিছুতেই এই সামান্য একটি শব্দের অর্থগ্রহ করিতে পারিলেন না। এমন সময়ে বিলাত হইতে সদ্যঃপ্রত্যাগতা, আরক্তকপোলা, আতাম্রকুন্তলা, আনীললোচনা, দুগ্ধফেনশুভ্রা, হরিণলঘুগামিনী ইংরাজমহিলা স্বয়ং সভাস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়া প্রত্যেকের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরিচিত প্রিয়মুখ দেখিতে পাইলেন না। অকস্মাৎ মেমকে দেখিয়া সংহিতার সমস্ত তর্ক থামিয়া সভাস্থল শ্মশানের ন্যায় গভীর নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

এমন সময়ে ভূমিলুণ্ঠ্যমান চাদর লইয়া অলসমন্থরগামী অনাথবন্ধু রঙ্গভূমিতে আসিয়া পুনঃপ্রবেশ করিলেন। এবং মুহূর্ত্তের মধ্যেই ইংরাজমহিলা ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া তাঁহার তাম্বুলরাগরক্ত ওষ্ঠাধরে দাম্পত্যের মিলন-চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিলেন।

সে দিন সভাস্থলে সংহিতার তর্ক আর উত্থাপিত হইতে পারিল না।



প্রথম পরিচ্ছেদ।

অনেক অবস্থান্তরের পর অবশেষে গত-যৌবনা ক্ষীরোদা যে পুরুষের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেও যখন তাহাকে জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া গেল, তখন অন্নমুষ্টির জন্য দ্বিতীয় আশ্রয় অন্বেষণের চেষ্টা করিতে তাহার অত্যন্ত ধিক্কার বোধ হইল।

যৌবনের শেষে শুভ্র শরৎকালের ন্যায় একটি গভীর প্রশান্ত প্রগাঢ় সুন্দর বয়স আসে যখন জীবনের ফল ফলিবার এবং শস্য পাকিবার সময়। তখন আর উদ্দাম যৌবনের বসন্ত-চঞ্চলতা শোভা পায় না। ততদিনে সংসারের মাঝখানে আমাদের ঘরবাঁধা এক প্রকার সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে; অনেক ভাল মন্দ অনেক সুখ দুঃখ জীবনের মধ্যে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া অন্তরের মানুষটিকে পরিণত করিয়া তুলিয়াছে; আমাদের আয়ত্তের অতীত কুহকিনী দুরাশার কল্পনালোক হইতে সমস্ত উদ্‌ভ্রান্ত বাসনাকে প্রত্যাহরণ করিয়া আপন ক্ষুদ্র ক্ষমতার গৃহ-প্রাচীরমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি; তখন নূতন

প্রণয়ের মুগ্ধদৃষ্টি আর আকর্ষণ করা যায় না, কিন্তু পুরাতন লোকের কাছে মানুষ আরও প্রিয়তর হইয়া উঠে। তখন যৌবন-লাবণ্য অল্পে অল্পে বিশীর্ণ হইয়া আসিতে থাকে, কিন্তু জরাবিহীন অন্তরপ্রকৃতি বহুকালের সহবাস-ক্রমে মুখে চক্ষে যেন স্ফুটতর রূপে অঙ্কিত হইয়া যায়; হাসিটি দৃষ্টিপাতটি কণ্ঠস্বরটি ভিতর-কার মানুষটির দ্বারা ওতপ্রোত হইয়া উঠে। যাহা কিছু পাই নাই তাহার আশা ছাড়িয়া, যাহারা ত্যাগ করিয়া গিয়াছে তাহাদের জন্য শোক সমাপ্ত করিয়া, যাহারা বঞ্চনা করিয়াছে, তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া, যাহারা কাছে আসিয়াছে ভালবাসিয়াছে, সংসারের সমস্ত ঝড়ঝঞ্ঝা শোক-তাপ-বিচ্ছেদের মধ্যে যে কয়টি প্রাণী নিকটে অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহাদিগকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া সুনিশ্চিত, সুপরী-ক্ষিত চিরপরিচিতগণের প্রীতিপরিবেষ্টনের মধ্যে নিরাপদ নীড় রচনা করিয়া তাহারই মধ্যে সমস্ত চেষ্টার অবসান এবং সমস্ত আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি লাভ করা যায়। যৌবনের সেই স্নিগ্ধ সায়াহ্নে জীবনের সেই শান্তিপর্ব্বেও যাহাকে নূতন সঞ্চয়, নূতন পরিচয়, নূতন বন্ধনের বৃথা আশ্বাসে নূতন চেষ্টায় ধাবিত হইতে হয়, তখনও, যাহার বিশ্রামের জন্য শয্যা রচিত হয় নাই, যাহার গৃহপ্রত্যাবর্ত্তনের জন্য সন্ধ্যাদীপ প্রজ্বলিত হয় নাই সংসারে তাহার মত শোচনীয় আর কেহ নাই।

ক্ষীরোদা তাহার যৌবনের প্রান্তসীমায় যে দিন প্রাতঃকালে জাগিয়া উঠিয়া দেখিল তাহার প্রণয়ী পূর্ব্বরাত্রে তাহার সমস্ত অলঙ্কার ও অর্থ অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে,—বাড়ীভাড়া দিবে এমন সঞ্চয় নাই, তিন বৎসরের শিশু পুত্রটিকে দুধ আনিয়া খাওয়াইবে এমন সঙ্গতি নাই,—যখন সে ভাবিয়া দেখিল তাহার জীবনের আটত্রিশ বৎসরে সে একটি লোককেও আপনার করিতে পারে নাই, একটি ঘরের প্রান্তেও বাঁচিবার এবং মরিবার অধিকার প্রাপ্ত হয় নাই,—

যখন তাহার মনে পড়িল আবার আজ অশ্রুজল মুছিয়া দুই চক্ষে অঞ্জন পরিতে হইবে, অধরে ও কপোলে অলক্তরাগ চিত্রিত করিতে হইবে, জীর্ণ যৌবনকে বিচিত্র ছলনায় আচ্ছন্ন করিয়া হাস্যমুখে অসীম ধৈর্য্য সহকারে নূতন হৃদয় হরণের জন্য নূতন মায়াপাশ বিস্তার করিতে হইবে,—তখন সে ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভূমিতে লুটাইয়া বারংবার কঠিন মেঝের উপর মাথা খুঁড়িতে লাগিল,—সমস্ত দিন অনাহারে মুমূর্ষুর মত পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিল; দীপহীন গৃহকোণে অন্ধকার ঘনীভূত হইতে লাগিল। দৈবক্রমে একজন পুরাতন প্রণয়ী আসিয়া "ক্ষীরো" "ক্ষীরো" শব্দে দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল। ক্ষীরোদা অকস্মাৎ দ্বার খুলিয়া ঝাঁটাহস্তে বাঘিনীর মত গর্জ্জন করিয়া ছুটিয়া আসিল,—রসপিপাসু যুবকটি অনতিবিলম্বে পলায়নের পথ অবলম্বন করিল।

ছেলেটা ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া খাটের নীচে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সেই গোলেমালে জাগিয়া উঠিয়া অন্ধকারের মধ্য হইতে ভগ্নকাতর কণ্ঠে মা মা করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তখন ক্ষীরোদা সেই ক্রন্দমান শিশুকে প্রাণপণে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া নিকটবর্ত্তী কূপের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

শব্দ শুনিয়া আলো হস্তে প্রতিবেশিগণ কূপের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্ষীরোদা এবং শিশুকে তুলিতে বিলম্ব

হইল না। ক্ষীরোদা তখন অচেতন এবং শিশুটি মরিয়া গেছে।

হাঁসপাতালে গিয়া ক্ষীরোদা আরোগ্য লাভ করিল। হত্যাপরাধে ম্যাজিষ্ট্রেট্ তাহাকে সেশনে চালান করিয়া দিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

জজ মোহিতমোহন দত্ত। ষ্ট্যাট্যুটারি সিভিলিয়ান্। তাঁহার কঠিন বিচারে ক্ষীরোদার ফাঁসির হুকুম হইল। হতভাগিনীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া উকীলগণ তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না। জজ তাহাকে তিলমাত্র দয়ার পাত্রী বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না।

না পারিবার কারণ আছে। একদিকে তিনি হিন্দুমহিলাগণকে দেবী আখ্যা দিয়া থাকেন, অপরদিকে স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার আন্তরিক অবিশ্বাস। তাঁহার মত এই যে, রমণীগণ কুলবন্ধন ছেদন করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে, শাসন তিলমাত্র শিথিল হইলেই সমাজপিঞ্জরে একটি কুলনারীও অবশিষ্ট থাকিবে না।

তাঁহার এরূপ বিশ্বাসের কারণও আছে। সে কারণ জানিতে গেলে মোহিতের যৌবন-ইতিহাসের কিয়দংশ আলোচনা করিতে হয়।

মোহিত যখন কালেজে সেকেণ্ড-ইয়ারে পড়িতেন তখন আকারে এবং আচারে এখনকার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকারের মানুষ ছিলেন। এখন মোহিতের সম্মুখে টাক, পশ্চাতে টিকি; মুণ্ডিত মুখে প্রতিদিন প্রাতঃকালে খরক্ষুরধারে গুম্ফশ্মশ্রুর অঙ্কুর উচ্ছেদ হইয়া থাকে; কিন্তু তখন তিনি সোণার চশ্মায় গোঁফদাড়িতে এবং সাহেবীধরণের কেশবিন্যাসে ঊনবিংশ শতাব্দীর নূতন সংস্করণ কার্ত্তিকটির মত ছিলেন। বেশভূষায় বিশেষ মনোযোগ ছিল, মদ্য মাংসে অরুচি ছিল না এবং আনুষঙ্গিক আরও দুটো একটা উপসর্গ ছিল।

অদূরে এক ঘর গৃহস্থ বাস করিত। তাহাদের হেমশশি বলিয়া এক বিধবা কন্যা ছিল। তাহার বয়স অধিক হইবে না। চৌদ্দ হইতে পনরয় পড়িবে।

সমুদ্র হইতে বনরাজিনীলা তটভূমি যেমন রমণীয় স্বপ্নবৎ চিত্রবৎ মনে হয় এমন তীরের উপরে উঠিয়া হয় না। বৈধব্যের বেষ্টন-অন্তরালে হেমশশি সংসার হইতে যে টুকু দূরে পড়িয়াছিল সেই দূরত্বের বিচ্ছেদ-বশতঃ সংসারটা তাহার কাছে পরপারবর্ত্তী পরমরহস্যময় প্রমোদবনের মত ঠেকিত। সে জানিত না এইজগৎযন্ত্রটার কলকারখানা অত্যন্ত জটিল এবং লৌহকঠিন,—সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে, সংশয়ে সঙ্কটে ও নৈরাশ্যে পরিতাপে বিমিশ্রিত। তাহার মনে হইত সংসারযাত্রা কলনাদিনী নির্ঝরিণীর স্বচ্ছ জলপ্রবাহের মত সহজ, সম্মুখবর্ত্তী সুন্দর পৃথিবীর সকল পথগুলিই প্রশস্ত ও সরল, সুখ কেবল তাহার বাতায়নের বাহিরে এবং তৃপ্তিহীন আকাঙ্ক্ষা কেবল তাহার বক্ষঃপঞ্জরবর্ত্তী স্পন্দিত পরিতপ্ত কোমল হৃদয়টুকুর অভ্যন্তরে। বিশেষতঃ তখন তাহার অন্তরাকাশের দূর দিগন্ত হইতে একটা যৌবন-সমীরণ উচ্ছ্বসিত হইয়া বিশ্বসংসারকে বিচিত্র বাসন্তী শ্রীতে বিভূষিত করিয়া দিয়াছিল; সমস্ত নীলাম্বর তাহারই হৃদয়হিল্লোলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং পৃথিবী যেন তাহারই সুগন্ধ মর্ম্মকোষের চতুর্দ্দিকে

রক্তপদ্মের কোমল পাপড়িগুলির মত স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়া ছিল।

ঘরে তাহার বাপ মা এবং দুটি ছোট ভাই ছাড়া আর কেহ ছিল না। ভাই দুটি সকাল সকাল খাইয়া ইস্কুলে যাইত, আবার স্কুল হইতে আসিয়া আহারান্তে সন্ধ্যার পর পাড়ার নাইটস্কুলে পাঠ অভ্যাস করিতে গমন করিত। বাপ সামান্য বেতন পাইতেন, ঘরে মাষ্টার রাখিবার সামর্থ্য ছিল না।

কাজের অবসরে হেম তাহার নির্জ্জন ঘরের বাতায়নে আসিয়া বসিত। একদৃষ্টে রাজপথের লোক চলাচল দেখিত; ফেরিওয়ালা করুণ উচ্চস্বরে হাঁকিয়া যাইত তাহাই শুনিত; এবং মনে করিত পথিকেরা সুখী, ভিক্ষুকেরাও স্বাধীন, এবং ফেরিওয়ালারা, যে, জীবিকার জন্য সুকঠিন প্রয়াসে প্রবৃত্ত তাহা নহে, উহারা যেন এই লোকচলাচলের সুখরঙ্গভূমিতে অন্যতম অভিনেতামাত্র।

আর সকালে বিকালে সন্ধ্যাবেলায় পরিপাটীবেশধারী গর্ব্বোদ্ধত স্ফীতবক্ষ মোহিতমোহনকে দেখিতে পাইত। দেখিয়া তাহাকে সর্ব্বসৌভাগ্যসম্পন্ন পুরুষশ্রেষ্ঠ মহেন্দ্রের মত মনে হইত। মনে হইত, ঐ উন্নতমস্তক সুবেশ সুন্দর যুবকটির সব আছে এবং উহাকে সব দেওয়া যাইতে পারে। বালিকা যেমন পুতুলকে সজীব মানুষ করিয়া খেলা করে, বিধবা তেমনি মোহিতকে মনে মনে সকলপ্রকার মহিমায় মণ্ডিত করিয়া তাহাকে দেবতা গড়িয়া খেলা করিত।

এক একদিন সন্ধ্যার সময় দেখিতে পাইত মোহিতের ঘর আলোকে উজ্জ্বল, নর্ত্তকীর নূপুরনিক্কণ এবং বামাকণ্ঠের সঙ্গীতধ্বনিতে মুখরিত। সেদিন সে ভিত্তিস্থিত চঞ্চল ছায়াগুলির দিকে চাহিয়া চাহিয়া বিনিদ্র সতৃষ্ণ নেত্রে দীর্ঘরাত্রি জাগিয়া বসিয়া কাটাইত। তাহার ব্যথিত পীড়িত হৃৎপিণ্ড, পিঞ্জরের পক্ষীর মত, বক্ষঃপঞ্জরের উপর দুর্দ্দান্ত আবেগে আঘাত করিতে থাকিত।

সে কি তাহার কৃত্রিম দেবতাটিকে বিলাসমত্ততার জন্য মনে মনে ভৎর্সনা করিত, নিন্দা করিত? তাহা নহে। অগ্নি যেমন পতঙ্গকে নক্ষত্রলোকের প্রলোভন দেখাইয়া আকর্ষণ করে, মোহিতের সেই আলোকিত গীতবাদ্যবিক্ষুব্ধ প্রমোদমদিরোচ্ছ্বসিত কক্ষটি হেমশশিকে সেইরূপ স্বর্গমরীচিকা দেখাইয়া আকর্ষণ করিত। সে গভীর রাত্রে একাকিনী জাগিয়া বসিয়া সেই অদূর বাতায়নের আলোক ও ছায়া ও সঙ্গীত এবং আপন মনের আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনা লইয়া একটি মায়ারাজ্য গড়িয়া তুলিত, এবং আপন মানসপুত্তলিকাকে সেই মায়াপুরীর মাঝখানে বসাইয়া বিস্মিত বিমুগ্ধনেত্রে নিরীক্ষণ করিত এবং আপন জীবন যৌবন সুখ দুঃখ ইহকাল পরকাল সমস্তই বাসনার অঙ্গারে ধূপের মত পোড়াইয়া সেই নির্জ্জন নিস্তব্ধ মন্দিরে তাহার পূজা করিত। সে জানিত না তাহার সম্মুখবর্ত্তী ঐ হর্ম্ম্যবাতায়নের অভ্যন্তরে ঐ তরঙ্গিত প্রমোদ-প্রবাহের মধ্যে এক নিরতিশয় ক্লান্তি, গ্লানি, পঙ্কিলতা, বীভৎস, ক্ষুধা এবং প্রাণক্ষয়কর দাহ আছে। ঐ বীতনিদ্র নিশাচর আলোকের মধ্যে যে এক হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার কুটিল হাস্য প্রলয়ক্রীড়া করিতে থাকে বিধবা দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইত না।

হেম আপন নির্জ্জন বাতায়নে বসিয়া তাহার এই মায়াস্বর্গ এবং কল্পিত দেবতাটিকে লইয়া চিরজীবন স্বপ্নাবেশে কাটাইয়া দিতে পারিত কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দেবতা অনুগ্রহ করিলেন এবং স্বর্গ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। স্বর্গ যখন একেবারে পৃথিবীকে আসিয়া স্পর্শ করিল

তখন স্বর্গও ভাঙ্গিয়া গেল এবং যে ব্যক্তি এতদিন একলা বসিয়া স্বর্গ গড়িয়াছিল সেও ভাঙ্গিয়া ধূলিসাৎ হইল।

এই বাতায়নবাসিনী মুগ্ধ বালিকাটির প্রতি কখন মোহিতের লালায়িত দৃষ্টি পড়িল, কখন্ তাহাকে "বিনোদচন্দ্র" নামক মিথ্যাস্বাক্ষরে বারংবার পত্রলিখিয়া অবশেষে একখানি শঙ্কিত উৎকণ্ঠিত, অশুদ্ধ বানান ও উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগপূর্ণ উত্তর পাইল—এবং তাহার পর কিছুদিন ঘাতপ্রতিঘাতে, উল্লাসে সঙ্কোচে, সন্দেহে সম্ভ্রমে, আশায় আশঙ্কায় কেমন করিয়া ঝড় বহিতে লাগিল,—তাহার পরে প্রলয়সুখোন্মত্ততায় সমস্ত জগৎ সংসার বিধবার চারিদিকে কেমন করিয়া ঘুরিতে লাগিল, এবং ঘুরিতে ঘুরিতে ঘূর্ণনবেগে সমস্ত জগৎ অমূলক ছায়ার মত কেমন করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল,—এবং অবশেষে কখন্ একদিন অকস্মাৎ সেই ঘূর্ণ্যমান সংসারচক্র হইতে বেগে বিচ্ছিন্ন হইয়া রমণী অতি দূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল, সে সকল বিবরণ বিস্তারিত করিয়া বলিবার আবশ্যক দেখি না।

একদিন গভীর রাত্রে পিতা মাতা ভ্রাতা এবং গৃহ ছাড়িয়া হেমশশি "বিনোদচন্দ্র" ছদ্মনামধারী মোহিতের সহিত এক গাড়িতে উঠিয়া বসিল। দেবপ্রতিমা যখন তাহার সমস্ত মাটি এবং খড় এবং রাংতার গহনা লইয়া তাহার পার্শ্বে আসিয়া সংলগ্ন হইল, তখন সে লজ্জায় এবং ধিক্কারে মাটিতে মিশাইয়া গেল। অবশেষে গাড়ি যখন ছাড়িয়া দিল, তখন সে কাঁদিয়া মোহিতের পায়ে ধরিল, বলিল, "ওগো, পায়ে পড়ি আমা আমার বাড়িকে রেখে এস!" মোহিত শশব্যস্ত হইয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল—গাড়ি দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল।

জলনিমগ্ন মরণাপন্ন ব্যক্তির যেমন মুহূর্তের মধ্যে জীবনের সমস্ত ঘটনাবলী স্পষ্ট মনে পড়ে তেমনি সেই দ্বাররুদ্ধ গাড়ির গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে হেমশশির মনে পড়িতে লাগিল, প্রতিদিন আহারের সময় তাহার বাপ তাহাকে সম্মুখে না লইয়া খাইতে বসিতেন না;—মনে পড়িল তাহার সর্ব্বকনিষ্ঠ ভাইটি ইস্কুল হইতে আসিয়া তাহার দিদির হাতে খাইতে ভালবাসে; মনে পড়িল, সকালে সে তাহার মায়ের সহিত পান সাজিতে বসিত এবং বিকালে মা তাহার চুল বাঁধিয়া দিতেন। ঘরের প্রত্যেক ক্ষুদ্র কোণ এবং দিনের প্রত্যেক ক্ষুদ্র কাজটি তাহার মনের সম্মুখে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিতে লাগিল। তখন তাহার নিভৃত জীবন এবং ক্ষুদ্র সংসারটিকেই স্বর্গ বলিয়া মনে হইল। সেই পানসাজা, চুলবাঁধা, পিতার আহারস্থলে পাখা করা, ছুটির দিনে মধ্যাহ্ননিদ্রার সময় তাঁহার পাকাচুল তুলিয়া দেওয়া, ভাইদের দৌরাত্ম্য সহ্য করা,—এ সমস্তই তাহার কাছে পরম-শান্তিপূর্ণ দুর্লভ সুখের মত বোধ হইতে লাগিল,—বুঝিতে পারিল না এ সব থাকিতে সংসারে আর কোন্ সুখের আবশ্যক আছে!

মনে হইতে লাগিল, পৃথিবীতে ঘরে ঘরে সমস্ত কুলকন্যারা এখন গভীর সুষুপ্তিতে নিমগ্ন। সেই আপনার ঘরে আপনার শয্যাটির মধ্যে নিস্তব্ধ রাত্রের নিশ্চিন্ত নিদ্রা যে কত সুখের তাহা ইতিপূর্ব্বে কেন সে বুঝিতে পারে নাই! ঘরের মেয়েরা কাল সকালবেলায় ঘরের মধ্যে জাগিয়া উঠিবে, নিঃসঙ্কোচে নিত্যকর্ম্মের মধ্যে প্রবৃত্ত হইবে, আর গৃহচ্যুতা হেমশশির এই নিদ্রাহীন রাত্রি কোন্খানে গিয়া প্রভাত হইবে, এবং সেই নিরানন্দ প্রভাতে তাহাদের সেই গলির ধারের ছোটখাট ঘরকন্নাটির উপর যখন সকালবেলাকার চিরপরিচিত শান্তিময় হাস্যপূর্ণ রৌদ্রটি আসিয়া পতিত হইবে তখন সেখানে

হসা কি লজ্জা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে, কি াঞ্ছনা কি হাহাকার জাগ্রৎ হইয়া উঠিবে!

হেম হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া কাঁদিয়া মরিতে াগিল;—সকরুণ অনুনয়সহকারে বলিতে াগিল, "এখনো রাত আছে; আমার মা, আমার দুটি ভাই এখনো জাগে নাই, এখনো আমাকে ফিরাইয়া রাখিয়া আইস!" কিন্তু তাহার দেবতা কর্ণপাত করিল না; এক দ্বিতীয় শ্রেণীর চক্রশব্দমুখরিত রথে চড়াইয়া তাহাকে তাহার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গলোকাভিমুখে লইয়া চলিল!

ইহার অনতিকাল পরেই দেবতা এবং স্বর্গ পুনশ্চ আর একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর জীর্ণরথে চড়িয়া আর এক পথে প্রস্থান করিলেন,—রমণী আকণ্ঠ পঙ্কের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া রহিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:(*):—

মোহিতমোহনের পূর্ব্ব-ইতিহাস হইতে এই একটিমাত্র ঘটনা উল্লেখ করিলাম। রচনা পাছে "একঘেয়ে" হইয়া উঠে এই জন্য অন্য-গুলি বলিলাম না!

এখন সে সকল পুরাতন কথা উত্থাপন করিবার আবশ্যকও নাই। এখন সেই বিনোদ-চন্দ্র নাম স্মরণ করিয়া রাখে এমন কোন লোক জগতে আছে কি না সন্দেহ। এখন মোহিত শুদ্ধাচারী হইয়াছেন, তিনি আহ্নিক তর্পণ করেন এবং সর্ব্বদাই শাস্ত্রালোচনা করিয়া থাকেন। নিজের ছোট ছোট ছেলেদিগকেও যোগাভ্যাস করাইতেছেন এবং বাড়ির মেয়েদিগকে সূর্য্য চন্দ্র মরুদ্‌গণের দুষ্প্রবেশ্য অন্তঃপুরে প্রবল শাসনে রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু এক কালে তিনি একাধিক রমণীর প্রতি অপরাধ করিয়াছিলেন বলিয়া আজ রমণীর সর্ব্বপ্রকার সামাজিক অপরাধের কঠিনতম দণ্ড-বিধান করিয়া থাকেন।

ক্ষীরোদার ফাঁসির হুকুম দেওয়ার দুই এক দিন পরে ভোজনবিলাসী মোহিত জেলখানার বাগান হইতে মনোমত তরীতরকারী সংগ্রহ করিতে গিয়াছেন। ক্ষীরোদা তাহার পতিত জীবনের সমস্ত অপরাধ স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছে কি না জানিবার জন্য তাঁহার কৌতূ-হল হইল। বন্দিনীশালায় প্রবেশ করিলেন।

দূর হইতে খুব একটা কলহের ধ্বনি শুনিতে পাইতেছিলেন। ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন ক্ষীরোদা প্রহরীর সহিত ভারি ঝগড়া বাধাই-য়াছে। মোহিত মনে মনে হাসিলেন, ভাবি-লেন, স্ত্রীলোকের স্বভাবই এমনি বটে! মৃত্যু সন্নিকট তবু ঝগড়া করিতে ছাড়িবে না ইহারা বোধ করি যমালয়ে গিয়া যমদূতের সহিত কোন্দল করে।

মোহিত ভাবিলেন, যথোচিত ভৎর্সনা ও উপদেশের দ্বারা এখন ইহার অন্তরে অনুতাপের উদ্রেক করা উচিত। সেই সাধু উদ্দেশ্যে তিনি ক্ষীরোদার নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র ক্ষীরোদা সকরুণস্বরে করযোড়ে কহিল—ওগো জজ বাবু, দোহাই তোমার! উহাকে বল আমার আংটি ফিরাইয়া দেয়!

প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, ক্ষীরোদার মাথা চুলের মধ্যে একটি আংটি লুকান ছিল—দৈবা প্রহরীর চোখে পড়াতে সে সেটি কাড়িয়া লইয়াছে।

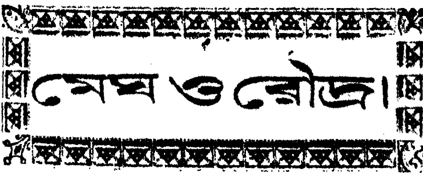
মোহিত আবার মনে মনে হাসিলেন আজ বাদে কাল ফাঁসিকাঠে আরোহণ করিবে তবু আংটীর মায়া ছাড়িতে পারে না! গহনা মেয়েদের সর্ব্বস্ব!

প্রহরীকে কহিলেন—কই, আংটী দেখি। প্রহরী তাঁহার হাতে আংটী দিল।

তিনি হঠাৎ যেন জলন্ত অঙ্গার হাতে লইলেন এমনি চমকিয়া উঠিলেন। আংটীর একদিকে হাতির দাঁতের উপর তেলের রঙে আঁকা একটি গুম্ফশ্মশ্রুশোভিত যুবকের অতি ক্ষুদ্র ছবি বসানো আছে, এবং অপর দিকে সোণার গায়ে খোদা রহিয়াছে—বিনোদচন্দ্র।

তখন মোহিত আংটি হইতে মুখ তুলিয়া একবার ক্ষীরোদার মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিলেন। চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বেকার আর একটি অশ্রুসজল প্রীতিসুকোমল সলজ্জশঙ্কিত মুখ মনে পড়িল; সে মুখের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে।

মোহিত আর একবার সোণার আংটীর দিকে চাহিলেন এবং তাহার পরে যখন ধীরে ধীরে মুখ তুলিলেন তখন তাঁহার সম্মুখে কলঙ্কিনী পতিতা রমণী একটি ক্ষুদ্র স্বর্ণাঙ্গুরীয়কের উজ্জল প্রভায় স্বর্ণময়ী দেবীপ্রতিমার মত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।



মেঘ ও রৌদ্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।



পূর্ব্বদিনে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আজ ক্ষান্তবর্ষণ প্রাতঃকালে ম্লান রৌদ্র এবং খণ্ড মেঘে মিলিয়া পরিপক্কপ্রায় আউষ ধানের ক্ষেত্রের উপর পর্য্যায়ক্রমে আপন আপন সুদীর্ঘ তুলি বুলাইয়া যাইতেছিল; সুবিস্তীর্ণ শ্যাম চিত্রপট একবার আলোকের স্পর্শে উজ্জল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিতেছিল আবার পরক্ষণেই ছায়াপ্রলেপে গাঢ় স্নিগ্ধতায় অঙ্কিত হইতেছিল।

যখন সমস্ত আকাশ-রঙ্গভূমিতে মেঘ এবং রৌদ্র, দুইটি মাত্র অভিনেতা, আপন আপন অংশ অভিনয় করিতেছিল, তখন নিম্নে সংসার-রঙ্গভূমিতে কত স্থানে কত অভিনয় চলিতেছিল তাহার আর সংখ্যা নাই।

আমরা যেখানে একটি ক্ষুদ্র জীবননাট্যের পট উত্তোলন করিলাম সেখানে গ্রামে পথের ধারে একটি বাড়ি দেখা যাইতেছে। বাহিরের একটিমাত্র ঘর পাকা; এবং সেই ঘরের দুই পার্শ্ব দিয়া জীর্ণপ্রায় ইষ্টকের প্রাচীর গুটিকতক মাটির ঘর বেষ্টন করিয়া আছে। পথ হইতে গরাদের জানলা দিয়া দেখা যাইতেছে একটি যুবা পুরুষ খালি গায়ে তক্তপোষে বসিয়া বামহস্তে ক্ষণেক্ষণে তালপাতার পাখা লইয়া গ্রীষ্ম এবং মশক দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং দক্ষিণ হস্তে বই লইয়া পাঠে নিবিষ্ট আছেন।

বাহিরে গ্রামের পথে একটি ডুরে-কাপড়-পরা বালিকা আঁচলে গুটিকতক কালো জাম লইয়া একে একে নিঃশেষ করিতে করিতে উক্ত গরাদে-দেওয়া জানালার সম্মুখ দিয়া বারংবার যাতায়াত করিতেছিল। মুখের ভাবে স্পষ্টই বোঝা যাইতেছিল ভিতরে যে মানুষটি তক্তপোষে বসিয়া বই পড়িতেছে তাহার সহিত বালিকার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে—এবং কোন মতে সে তাহার মনোযোগ আকর্ষণ পূর্ব্বক তাহাকে নীরবে অবজ্ঞাভরে জানাইয়া যাইতে চাহে যে, সম্প্রতি কালোজাম খাইতে আমি অত্যন্ত ব্যস্ত আছি, তোমাকে আমি গ্রাহ্যমাত্র করি না।

দুর্ভাগ্যক্রমে ঘরের ভিতরকার অধ্যয়নশীল

পুরুষটি চক্ষে কম দেখেন, দূর হইতে বালিকার নীরব উপেক্ষা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। বালিকাও তাহা জানিত, সুতরাং অনেক ক্ষণ নিষ্ফল আনাগোনার পর নীরব উপেক্ষার পরিবর্ত্তে কালোজামের আঁটি ব্যবহার করিতে হইল। অন্ধের নিকটে অভিমানের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা এতই দুরূহ।

যখন ক্ষণে ক্ষণে দুই চারিটা কঠিন আঁটি যেন দৈবক্রমে বিক্ষিপ্ত হইয়া কাঠের দরজার উপর ঠক্ করিয়া শব্দ করিয়া উঠিল তখন পাঠরত পুরুষটি মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখিল। মায়াবিনী বালিকা তাহা জানিতে পারিয়া দ্বিগুণ নিবিষ্টভাবে অঞ্চল হইতে দংশনযোগ্য সুপক্ক কালোজাম নির্ব্বাচন করিতে প্রবৃত্ত হইল। পুরুষটি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিশেষ চেষ্টাসহকারে নিরীক্ষণপূর্ব্বক বালিকাকে চিনিতে পারিল এবং বই রাখিয়া জানালার কাছে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাস্যমুখে ডাকিল—গিরিবালা!

গিরিবালা অবিচলিতভাবে নিজের অঞ্চলের মধ্যে জাম পরীক্ষাকার্য্যে সম্পূর্ণ অভিনিবিষ্ট থাকিয়া মৃদুগমনে আপনমনে এক এক পা করিয়া চলিতে লাগিল।

তখন ক্ষীণদৃষ্টি যুবা পুরুষের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, কোন একটি অজ্ঞানকৃত অপরাধের দণ্ডবিধান হইতেছে। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া কহিলেন—"কই, আজ আমাকে জাম দিলে না?" গিরিবালা সে কথা কাণে না আনিয়া বহু অন্বেষণ ও পরীক্ষায় একটি জাম মনোনীত করিয়া অত্যন্ত নিশ্চিন্ত মনে খাইতে আরম্ভ করিল।

এই জামগুলি গিরিবালাদের বাগানের জাম এবং যুবা পুরুষের দৈনিক বরাদ্দ। কি জানি, সে কথা কিছুতেই আজ গিরিবালার স্মরণ হইল না। তাহার ব্যবহারে প্রকাশ পাইল যে এগুলি সে একমাত্র নিজের জন্যই আহরণ করিয়াছে। কিন্তু নিজের বাগান হইতে ফল পাড়িয়া পরের দরজার সম্মুখে আসিয়া ঘটা করিয়া খাইবার কি অর্থ পরিষ্কার বুঝা গেল না। তখন পুরুষটি কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিল। গিরিবালা প্রথমটা আঁকিয়া বাঁকিয়া হাত ছাড়াইয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিল, তাহার পরে সহসা অশ্রুজলে ভাসিয়া কাঁদিয়া উঠিল, এবং আঁচলের জাম ভূতলে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

সকালবেলাকার চঞ্চল রৌদ্র এবং চঞ্চল মেঘ বৈকালে শান্ত ও শ্রান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে;—শুভ্র স্ফীত মেঘ আকাশের প্রান্তভাগে স্তূপাকার হইয়া পড়িয়া আছে এবং অপরাহ্ণের অবসন্নপ্রায় আলোক গাছের পাতায় পুষ্করিণীর জলে এবং বর্ষাস্নাত প্রকৃতির প্রত্যেক অঙ্গে প্রত্যঙ্গে ঝিক্‌ঝিক্ করিতেছে। আবার সেই বালিকাটিকে সেই গরাদের জানালার সম্মুখে দেখা যাইতেছে এবং ঘরের মধ্যে সেই যুবা পুরুষটি বসিয়া আছে। প্রভেদের মধ্যে, এ বেলা বালিকার অঞ্চলে জাম নাই এবং যুবকের হস্তেও বই নাই। তদপেক্ষা গুরুতর এবং নিগূঢ় প্রভেদও কিছু কিছু ছিল।

এবেলাও বালিকা কি বিশেষ আবশ্যকে সেই বিশেষ স্থানে আসিয়া ইতস্ততঃ করিতেছে বলা কঠিন। আর যাহাই আবশ্যক থাক্ ঘরের ভিতরকার মানুষটির সহিত আলাপ করিবার যে আবশ্যক আছে ইহা কোন মতেই বালিকার ব্যবহারে প্রকাশ পায় না। বরঞ্চ বোধ হইল সে দেখিতে আসিয়াছে সকাল বেলায় যে জামগুলা ফেলিয়া গেছে বিকাল বেলায় তাহার কোনটার অঙ্কুর বাহির হইয়াছে কি না।

কিন্তু অঙ্কুর না বাহির হইবার অন্যান্য

কারণের মধ্যে একটি গুরুতর কারণ এই ছিল যে, ফলগুলি সম্প্রতি যুবকের সম্মুখে তক্তপোষের উপরে রাশীকৃত ছিল; এবং বালিকা যখন ক্ষণে ক্ষণে অবনত হইয়া কোন একটা অনির্দ্দেশ্য কাল্পনিক পদার্থের অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিল তখন যুবক মনের হাস্য গোপন করিয়া অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে একটি একটি জাম নির্ব্বাচন করিয়া সযত্নে আহার করিতেছিল। অবশেষে যখন দুটো একটা আঁটি দৈবক্রমে বালিকার পায়ের কাছে, এমন কি, গায়ের উপরে আসিয়া পড়িল তখন গিরিবালা বুঝিতে পারিল যুবক বালিকার অভিমানের প্রতিশোধ লইতেছে। কিন্তু এই কি উচিত! যখন সে আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়টুকুর সমস্ত গর্ব্ব বিসর্জ্জন দিয়া আত্মসমর্পণ করিবার অবসর খুঁজিতেছে তখন কি তাহার সেই অত্যন্ত দুরূহ পথে বাধা দেওয়া নিষ্ঠুরতা নহে? ধরা দিতে আসিয়াছে এই কথাটা ধরা পড়িয়া বালিকা যখন ক্রমশঃ আরক্তিম হইয়া পলায়নের পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিল তখন যুবক বাহিরে আসিয়া তাহার হাত ধরিল।

সকালবেলাকার মত এবেলাও বালিকা আঁকিয়া বাঁকিয়া হাত ছাড়াইয়া পালাইবার বহু চেষ্টা করিল—কিন্তু কাঁদিল না। বরঞ্চ রক্তবর্ণ হইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া উৎপীড়নকারীর পৃষ্ঠদেশে মুখ লুকাইয়া প্রচুর পরিমাণে হাসিতে লাগিল এবং যেন কেবলমাত্র বাহ্য আকর্ষণে নীত হইয়া পরাভূত বন্দীভাবে লৌহগরাদে বেষ্টিত কারাগারের মধ্যে প্রবেশ করিল।

আকাশে মেঘ রৌদ্রের খেলা যেমন সামান্য, ধরাপ্রান্তে এই দুটি প্রাণীর খেলাও তেম্নি সামান্য তেম্নি ক্ষণস্থায়ী। আবার, আকাশে মেঘ রৌদ্রের খেলা যেমন সামান্য নহে এবং খেলা নহে কিন্তু খেলার মত দেখিতে মাত্র; তেম্নি এই দুটি অখ্যাতনামা মনুষ্যের একটি কর্ম্মহীন বর্ষাদিনের ক্ষুদ্র ইতিহাস সংসারের শত শত ঘটনার মধ্যে তুচ্ছ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে কিন্তু ইহা তুচ্ছ নহে। যে বৃদ্ধ বিরাট অদৃষ্ট অবিচলিত গম্ভীর মুখে অনন্তকাল ধরিয়া যুগের সহিত যুগান্তর গাঁথিয়া তুলিতেছে, সেই বৃদ্ধই বালিকার এই সকাল বিকালের তুচ্ছ হাসিকান্নার মধ্যে জীবনব্যাপী সুখ দুঃখের বীজ অঙ্কুরিত করিয়া তুলিতেছিল। তথাপি বালিকার এই অকারণ অভিমান বড়ই অর্থহীন বলিয়া বোধ হইল। কেবল দর্শকের কাছে নহে, এই ক্ষুদ্র নাট্যের প্রধান পাত্র উক্ত যুবকের নিকটেও। এ বালিকা কেন যে এক দিন বা রাগ করে, একদিন বা অপরিমিত স্নেহ প্রকাশ করিতে থাকে—কোন দিন বা দৈনিক বরাদ্দ বাড়াইয়া দেয়, কোন দিন বা দৈনিক বরাদ্দ একেবারেই বন্ধ করে, তাহার কারণ খুজিয়া পাওয়া সহজ নহে। এক এক দিন সে যেন তাহার সমস্ত কল্পনা ভাবনা এবং নৈপুণ্য একত্র করিয়া যুবকের সন্তোষসাধনে প্রবৃত্ত হয়, আবার এক একদিন তাহার সমস্ত ক্ষুদ্র শক্তি তাহার সমস্ত কাঠিন্য একত্র সংহত করিয়া তাঁহাকে আঘাত করিতে চেষ্টা করে। বেদনা দিতে না পারিলে তাহার কাঠিন্য দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠে; কৃতকার্য্য হইলে সে কাঠিন্য অনুতাপের অশ্রুজলে শতধা বিগলিত হইয়া অজস্র স্নেহ-ধারায় প্রবাহিত হইতে থাকে।

এই তুচ্ছ মেঘরৌদ্র খেলার প্রথম তুচ্ছ ইতিহাস পরপরিচ্ছেদে সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গ্রামের মধ্যে আর সকলেই দলাদলি, চক্রান্ত, ইক্ষুর চাষ, মিথ্যা মকদ্দমা এবং পাটের কারবার লইয়া থাকিত, ভাবের আলোচনা এবং সাহিত্য চর্চ্চা করিতে কেবল শশিভূষণ এবং গিরিবালা।

ইহাতে কাহারো ঔৎসুক্য বা উৎকণ্ঠার কোন বিষয় নাই। কারণ গিরিবালার বয়স দশ এবং শশিভূষণ একটি সদ্য বিকশিত এমে, বিএল। উভয়ে প্রতিবেশী মাত্র।

গিরিবালার পিতা হরকুমার এককালে নিজগ্রামের পত্তনীদার ছিলেন। এখন দুরবস্থায় পড়িয়া সমস্ত বিক্রয় করিয়া তাঁহাদের বিদেশী জমিদারের নায়েবী পদগ্রহণ করিয়াছেন। যে পরগণায় তাঁহাদের বাস সেই পরগণারই নায়েবী; সুতরাং তাঁহাকে জন্মস্থান হইতে নড়িতে হয় না।

শশিভূষণ এম, এ পাশ করিয়া আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন কিন্তু কিছুতেই কোন কর্ম্মে ভিড়িলেন না। লোকের সঙ্গে মেশা বা সভাস্থলে দুটো কথা বলা সেও তাঁহার দ্বারা হইয়া উঠে না। চোখে কম দেখেন বলিয়া চেনা লোককে চিনিতে পারেন না এবং সেই কারণেই ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দৃষ্টিপাত করিতে হয়, লোকে সেটাকে ঔদ্ধত্য বলিয়া বিবেচনা করে।

কলিকাতার জনসমুদ্রের মধ্যে আপন মনে একলা থাকা শোভা পায় কিন্তু পল্লিগ্রামে সেটা বিশেষ স্পর্দ্ধার মত দেখিতে হয়। শশিভূষণের বাপ যখন নিজের চেষ্টায় পরাস্ত হইয়া অবশেষে তাঁহার অকর্ম্মণ্য পুত্রটিকে পল্লীতে তাঁহাদের সামান্য বিষয়রক্ষাকার্য্যে নিয়োগ করিলেন তখন শশিভূষণকে পল্লীবাসীদের নিকট হইতে বিস্তর উৎপীড়ন, উপহাস এবং লাঞ্ছনা সহিতে হইয়াছিল। লাঞ্ছনার আরও একটা কারণ ছিল; শান্তিপ্রিয় শশিভূষণ বিবাহ করিতে সম্মত ছিলেন না—কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতাগণ তাঁহার এই অনিচ্ছাকে দুঃসহ অহঙ্কার জ্ঞান করিয়া কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিতেন না।

শশিভূষণের উপর যতই উপদ্রব হইতে লাগিল শশিভূষণ ততই আপন বিবরের মধ্যে অদৃশ্য হইতে লাগিলেন। একটি কোণের ঘরে তক্তপোষের উপর কতকগুলি বাঁধানো ইংরাজি বই লইয়া বসিয়া থাকিতেন—যখন যেটা ইচ্ছা হইত পাঠ করিতেন, এই ত ছিল তাঁহার কাজ, বিষয় কি করিয়া রক্ষা হইত তাহা ঈশ্বরই জানে।

এবং পূর্ব্বেই আভাসে বলা গিয়াছে মানুষের মধ্যে তাঁহার সম্পর্ক ছিল কেবল গিরিবালার সহিত।

গিরিবালার ভাইরা ইস্কুলে যাইত এবং ফিরিয়া আসিয়া মূঢ় ভগিনীটিকে কোন দিন জিজ্ঞাসা করিত পৃথিবীর আকার কিরূপ, কোন দিন বা প্রশ্ন করিত সূর্য্য বড় না পৃথিবী বড়, সে যখন ভুল বলিত তখন তাহার প্রতি বিপুল অবজ্ঞা দেখাইয়া ভ্রমসংশোধন করিত। সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা বৃহৎ এ মতটা যদি গিরিবালার নিকট প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইত এবং সেই সন্দেহ যদি সে সাহস করিয়া প্রকাশ করিত, তবে তাহার ভাইরা তাহাকে দ্বিগুণ উপেক্ষাভরে কহিত "দিদ্! আমাদের বইয়ে লেখা আছে আর তুই—"

ছাপার বইয়ে এমন কথা লেখা আছে শুনিয়া গিরিবালা সম্পূর্ণ নিরুত্তর হইয়া যাইত

দ্বিতীয় আর কোন প্রমাণ তাহার নিকট আবশ্যক বোধ হইত না।

কিন্তু তাহার মনে মনে বড় ইচ্ছা করিত সেও দাদাদের মত বই লইয়া পড়ে। কোন কোন দিন সে আপন ঘরে বসিয়া কোন একটা বই খুলিয়া বিড়বিড় করিয়া পড়ার ভাণ করিত এবং অনর্গল পাতা উল্টাইয়া যাইত। ছাপার কালো কালো ছোট ছোট অপরিচিত অক্ষরগুলি কি যেন এক মহারহস্যশালার সিংহদ্বারে দলে দলে সার বাঁধিয়া স্কন্ধের উপরে ইকার ঐকার রেফ উঁচাইয়া পাহারা দিত, গিরিবালার কোন প্রশ্নের কোনই উত্তর করিত না। কথামালা তাহার ব্যাঘ্র শৃগাল অশ্বগর্দ্দভের একটি কথাও কৌতূহলকাতর বালিকার নিকট ফাঁস করিত না এবং আখ্যানমঞ্জরী তাহার সমস্ত আখ্যানগুলি লইয়া মৌনব্রতের মত নীরবে চাহিয়া থাকিত।

গিরিবালা তাহার ভাইদের নিকট পড়া শিখিবার প্রস্তাব করিয়াছিল কিন্তু তাহার ভাইরা সে কথায় কর্ণপাতমাত্র করে নাই। একমাত্র শশিভূষণ তাহার সহায় ছিল।

গিরিবালার নিকট কথামালা এবং আখ্যানমঞ্জরী যেমন দুর্ভেদ্য রহস্যপূর্ণ ছিল শশিভূষণও প্রথম প্রথম অনেকটা সেইরূপ ছিল। লোহার গোরাদে দেওয়া রাস্তার ধারের ছোট বসিবার ঘরটিতে যুবক একাকী তক্তপোষের উপর পুস্তকে পরিবৃত হইয়া বসিয়া থাকিত; গিরিবালা গরাদে ধরিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া এই নতপৃষ্ঠ পাঠ-নিবিষ্ট অদ্ভুত লোকটিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিত; পুস্তকের সংখ্যা তুলনা করিয়া মনে মনে স্থির করিত শশিভূষণ তাহার ভাইদের অপেক্ষা অনেক বেশী বিদ্বান্। তদপেক্ষা বিস্ময়জনক ব্যাপার তাহার নিকট আর কিছুই ছিল না। কথামালা প্রভৃতি পৃথিবীর প্রধান প্রধান পাঠ্যপুস্তকগুলি শশিভূষণ যে নিঃশেষপূর্ব্বক পাঠ করিয়া ফেলিয়াছে এবিষয়ে তাহার সন্দেহমাত্র ছিল না। এই জন্য, শশিভূষণ যখন পুস্তকের পাত উল্টাইত সে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া তাহার জ্ঞানের অবধি নির্ণয় করিতে পারিত না।

অবশেষে এই বিস্ময়মগ্ন বালিকাটি ক্ষীণদৃষ্টি শশিভূষণেরও মনোযোগ আকর্ষণ করিল শশিভূষণ একদিন একটা ঝকঝকে বাঁধানো বই খুলিয়া বলিল—গিরিবালা ছবি দেখ্‌বি আয়। গিরিবালা তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া পালাইয়া গেল।

কিন্তু পরদিন সে পুনর্ব্বার ডুরে কাপড় পরিয়া সেই গরাদের বাহিরে দাঁড়াইয়া সেইরূপ গম্ভীর মৌন মনোযোগের সহিত শশিভূষণের অধ্যয়ন কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল। শশিভূষণ সেদিনও ডাকিল এবং সেদিনও সে বেণী দুলাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পালাইল।

এইরূপে তাহাদের পরিচয়ের সূত্রপাত হইয়া ক্রমে কখন ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিল এবং কখন যে বালিকা গরাদের বাহির হইতে শশিভূষণের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার তক্তপোষের উপর বাঁধানো পুস্তকস্তূপের মধ্যে স্থান পাইল ঠিক সে তারিখটা নির্ণয় করিয়া দিতে ঐতিহাসিক গবেষণার আবশ্যক।

শশিভূষণের নিকট গিরিবালার লেখাপড়ার চর্চ্চা আরম্ভ হইল। শুনিয়া সকলে হাসিবেন, এই মাষ্টারটি তাহার ক্ষুদ্র ছাত্রীকে কেবল যে অক্ষর, বানান এবং ব্যাকরণ শিখাইত তাহা নহে—অনেক বড় বড় কাব্য তর্জ্জমা করিয়া শুনাইত এবং তাহার মতামত জিজ্ঞাসা করিত। বালিকা কি বুঝিত তাহা অন্তর্যামীই জানেন, কিন্তু তাহার ভাল লাগিত তাহাতে সন্দেহ নাই। সে বোঝা না-বোঝায় মিশাইয়া আপন বাল্য-

হৃদয়ে নানা অপরূপ কল্পনাচিত্র আঁকিয়া লইত। নীরবে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মন দিয়া শুনিত, মাঝে মাঝে এক একটা অত্যন্ত অসঙ্গত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত এবং কখন কখন অকস্মাৎ একটা অসংলগ্ন প্রসঙ্গান্তরে গিয়াও উপনীত হইত। শশিভূষণ তাহাতে কখনো কিছু বাধা দিত না—বড় বড় কাব্য সম্বন্ধে এই অতি ক্ষুদ্র সমালোচকের নিন্দা প্রশংসা টীকা ভাষ্য শুনিয়া সে বিশেষ আনন্দ লাভ করিত। সমস্ত পল্লীর মধ্যে এই গিরিবালাই তাহার একমাত্র সমজদার বন্ধু।

গিরিবালার সহিত শশিভূষণের প্রথম পরিচয় যখন, তখন গিরির বয়স আট ছিল, এখন তাহার বয়স দশ হইয়াছে। এই দুই বৎসরে সে ইংরাজি ও বাঙ্গলা বর্ণমালা শিখিয়া দুই চারিটা সহজ বই পড়িয়া ফেলিয়াছে। এবং শশিভূষণের পক্ষেও পল্লিগ্রাম এই দুই বৎসর নিতান্ত সঙ্গবিহীন বিরস বলিয়া বোধ হয় নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কিন্তু গিরিবালার বাপ হরকুমারের সহিত শশিভূষণের ভালরূপ বনিবনাও হয় নাই। হরকুমার প্রথম প্রথম এই এম্ এ, বি, এলের নিকট মকদ্দমা মামলা সম্বন্ধে পরামর্শ লইতে আসিত; এম্ এ বি এল্ তাহাতে বড় একটা মনোযোগ করিত না, এবং আইন বিদ্যা সম্বন্ধে নায়েবের নিকট আপন অজ্ঞতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইত না। নায়েব সেটাকে নিতান্তই ছল মনে করিত। এমন ভাবে বছর দুয়েক কাটিল।

সম্প্রতি একটি অবাধ্য প্রজাকে শাসন করা আবশ্যক হইয়াছে। নায়েব মহাশয় তাহার নামে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ভিন্ন ভিন্ন অপরাধ ও দাবীতে নালিষ রুজু করিয়া দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া পরামর্শের জন্য শশিভূষণকে কিছু বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেন। শশিভূষণ পরামর্শ দেওয়া দূরে থাক্ শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে হরকুমারকে এমন গুটি দুই চারি কথা বলিলেন, যাহা তাহার কিছুমাত্র মিষ্ট বোধ হইল না।

এদিকে আবার প্রজার নামে একটি মকদ্দমাতেও হরকুমার জিতিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা হইল শশিভূষণ উক্ত হতভাগ্য প্রজার সহায় ছিল! তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন এমন লোককে গ্রাম হইতে অবিলম্বে তাড়াইতে হইবে।

শশিভূষণ দেখিলেন তাঁহার ক্ষেতের মধ্যে গোরু প্রবেশ করে, তাঁহার কলাইয়ের খোলায় আগুন লাগিয়া যায়, তাঁহার সীমানা লইয়া বিবাদ বাধে, তাঁহার প্রজারা সহজে খাজনা দেয় না এবং উল্টিয়া তাঁহার নামে মিথ্যা মকদ্দমা আনিবার উপক্রম করে, এমন কি, সন্ধ্যার সময় পথে বাহির হইলে তাঁহাকে মারিবে এবং রাত্রে তাঁহার বসত বাটিতে আগুন লাগাইয়া দিবে এমন সকল জনশ্রুতিও শোনা যাইতে লাগিল।

অবশেষে শান্তিপ্রিয় নিরীহপ্রকৃতি শশিভূষণ গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় পালাইবার আয়োজন করিলেন।

যাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময়ে গ্রামে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের তাঁবু পড়িল। বরকন্দাজ কনষ্টেবল্ খানসামা কুকুর ঘোড়া সহিস্ মেথরে সমস্ত গ্রাম চঞ্চল হইয়া উঠিল। ছেলের দল ব্যাঘ্রের অনুবর্ত্তী

শৃগালের পালের ন্যায় সাহেবের আড্ডার নিকটে সশঙ্কিত কৌতূহল সহকারে ঘুরিতে লাগিল।

নায়েব মহাশয় যথারীতি আতিথ্য শিরে খরচ লিখিয়া সাহেবের মুর্গি আণ্ডা ঘৃত দুগ্ধ যোগাইতে লাগিলেন। জয়েণ্ট সাহেবের যে পরিমাণে খাদ্য আবশ্যক নায়েব মহাশয় তদপেক্ষা অনেক বেশী অক্ষুণ্ণ চিত্তে সরবরাহ করিয়াছিলেন কিন্তু প্রাতঃকালে সাহেবের মেথর আসিয়া যখন সাহেবের কুকুরের জন্য একেবারে চারি সের ঘৃত আদেশ করিয়া বসিল তখন দুর্গ্রহবশতঃ সেটা তাঁহার সহ্য হইল না —মেথরকে উপদেশ দিলেন যে, সাহেবের কুত্তা যদিচ দেশি কুকুরের অপেক্ষা অনেকটা ঘি বিনা পরিতাপে হজম করিতে পারে তথাপি এতাধিক পরিমাণে স্নেহপদার্থ তাহার স্বাস্থ্যের পক্ষে কল্যাণজনক নহে। তাহাকে ঘি দিলেন না।

মেথর গিয়া সাহেবকে জানাইল যে, কুকুরের জন্য মাংস কোথায় পাওয়া যাইতে পারে ইহাই সে নায়েবের নিকট সন্ধান লইতে গিয়াছিল কিন্তু সে জাতিতে মেথর বলিয়া নায়েব অবজ্ঞাপূর্ব্বক তাহাকে সর্ব্বলোকসমক্ষে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে, এমন কি সাহেবের প্রতিও উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

একে ব্রাহ্মণের জাত্যভিমান সাহেব লোকের সহজেই অসহ্য বোধ হয় তাহার উপর তাঁহার মেথরকে অপমান করিতে সাহস করিয়াছে ইহাতে ধৈর্য্য রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ চাপরাশিকে আদেশ করিলেন—বোলাও নায়েবকো।

নায়েব কম্পান্বিত কলেবরে দুর্গা নাম জপ করিতে করিতে সাহেবের তাম্বুর সম্মুখে খাড়া হইলেন। সাহেব তাম্বু হইতে মচ্ মচ্ শব্দে বাহির হইয়া আসিয়া নায়েবকে উচ্চ কণ্ঠে বিজাতীয় উচ্চারণে জিজ্ঞাসা করিলেন—টুমি কি কারণ বশটো আমার মেঠরকে ডূর করিয়াছে?

হরকুমার শশব্যস্ত হইয়া করযোড়ে জানাইলেন, সাহেবের মেথরকে দূর করিতে পারেন এমন স্পর্দ্ধা কখনই তাঁহাতে সম্ভবে না; তবে কিনা কুকুরের জন্য একেবারে চারি সের ঘি চাহিয়া বসাতে প্রথমে তিনি উক্ত চতুষ্পদের মঙ্গলার্থে মৃদুভাবে আপত্তি প্রকাশ করিয়া পরে ঘৃত সংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লোক পাঠাইয়াছেন।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন কাহাকে পাঠানো হইয়াছে এবং কোথায় পাঠানো হইয়াছে।

হরকুমার তৎক্ষণাৎ যেমন মুখে আসিল নাম করিয়া দিলেন। সেই সেই নামীয় লোকগণ সেই সেই গ্রামে ঘৃত আনিবার জন্য গিয়াছে কি না সন্ধান করিতে অতি সত্বর লোক পাঠাইয়া দিয়া সাহেব নায়েবকে তাম্বুতে বসাইয়া রাখিলেন।

দূতগণ অপরাহ্নে ফিরিয়া আসিয়া সাহেবকে জানাইল ঘৃতসংগ্রহের জন্য কেহ কোথাও যায় নাই। নায়েবের সমস্ত কথাই মিথ্যা এবং মেথর যে সত্য বলিয়াছে তাহাতে আর হাকিমের সন্দেহ রহিল না। তখন জয়েণ্ট সাহেব ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া মেথরকে ডাকিয়া কহিলেন, এই শ্যালকের কর্ণ ধরিয়া তাম্বুর চারি ধারে ঘোড়দৌড় করাও। মেথর আর কালবিলম্ব না করিয়া চতুর্দ্দিকের লোকারণ্যের মধ্যে সাহেবের আদেশপালন করিল।*

* খুলনার মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক মুহুরি মারার বহুপূর্ব্বে এই গল্প রচিত হইয়াছে। বেল্ সাহেবের সহৃদয় বদান্যতার বৃত্তান্ত আমরা অনেক অবগত আছি; তাঁহার ন্যায় উদার প্রকৃতি ব্যক্তির বিরুদ্ধে কটাক্ষপাত করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

দেখিতে দেখিতে কথাটা ঘরে ঘরে রাষ্ট্র হইয়া গেল, হরকুমার গৃহে আসিয়া আহার ত্যাগ করিয়া মুমূর্ষুবৎ পড়িয়া রহিলেন।

জমীদারী কার্য্য উপলক্ষে নায়েবের শত্রু বিস্তর ছিল তাহারা এই ঘটনায় অত্যন্ত আনন্দলাভ করিল কিন্তু কলিকাতায় গমনোদ্যত শশিভূষণ যখন এই সংবাদ শুনিলেন তখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের রক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি তাঁহার নিদ্রা হইল না।

পরদিন প্রাতে তিনি হরকুমারের বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলেন, হরকুমার তাঁহার হাত ধরিয়া ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। শশিভূষণ কহিলেন, সাহেবের নামে মানহানির মোকদ্দমা আনিতে হইবে, আমি তোমার উকীল হইয়া লড়িব।

স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নামে মোকদ্দমা আনিতে হইবে শুনিয়া হরকুমার প্রথমটা ভীত হইয়া উঠিলেন—শশিভূষণ কিছুতেই ছাড়িলেন না।

হরকুমার বিবেচনা করিতে সময় লইলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন কথাটা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়াছে, এবং শত্রুগণ আনন্দ প্রকাশ করিতেছে তখন তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, শশিভূষণের শরণাপন্ন হইলেন—কহিলেন, বাপু শুনিলাম তুমি অকারণে কলিকাতায় যাইবার আয়োজন করিতেছ সে ত কিছুতেই হইতে পারিবে না। তোমার মত একজন লোক গ্রামে থাকিলে আমাদের সাহস কত থাকে। যাহা হউক আমাকে এই ঘোর অপমান হইতে উদ্ধার করিতে হইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যে শশিভূষণ চিরকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে নিভৃত নির্জ্জনতার মধ্যে আপনাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, তিনি আজ আদালতে আসিয়া হাজির হইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার নালিশ শুনিয়া তাঁহাকে প্রাইভেট্ কাম্‌রার মধ্যে ডাকিয়া লইয়া অত্যন্ত খাতির করিয়া কহিলেন, শশিবাবু এ মকদ্দমাটা গোপনে মিট্‌মাট্ করিয়া ফেলিলে ভাল হয় নাকি।

শশিবাবু টেবিলের উপরিস্থিত একখানি আইন গ্রন্থের মলাটের উপর তাঁহার কুঞ্চিতভ্রূ ক্ষীণদৃষ্টি অত্যন্ত নিবিষ্টভাবে রক্ষা করিয়া কহিলেন, আমার মক্কেলকে আমি এরূপ পরামর্শ দিতে পারি না। তিনি প্রকাশ্যভাবে অপমানিত হইয়াছেন, গোপনে ইহার মিট্‌মাট্ হইবে কি করিয়া।

সাহেব দুইচারি কথা কহিয়া বুঝিলেন এই স্বল্পভাষী স্বল্পদৃষ্টি লোকটিকে সহজে বিচলিত করা সম্ভব নহে, কহিলেন, অল্‌রাইট বাবু, দেখা যাউক কতদূর কি হয়।

এই বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব মকদ্দমার দিন ফিরাইয়া দিয়া মফস্বল ভ্রমণে বাহির হইলেন।

এদিকে জয়েণ্ট সাহেব জমিদারকে পত্র লিখিলেন, তোমার নায়েব আমার ভৃত্যদিগকে অপমান করিয়া আমার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে, আশা করি তুমি ইহার সমুচিত প্রতিকার করিবে।

জমিদার শশব্যস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ হরকুমারকে তলব করিলেন। নায়েব আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলেন। জমিদার

অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন, সাহেবের মেথর যখন চারিসের ঘি চাহিল তুমি বিনা বাক্যব্যয়ে তৎক্ষণাৎ কেন দিলে না? তোমার কি বাপের কড়ি লাগিত?

হরকুমার অস্বীকার করিতে পারিলেন না যে, ইহাতে তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তির কোনরূপ ক্ষতি হইত না। অপরাধ স্বীকার করিয়া কহিলেন, আমার গ্রহ মন্দ তাই এমন দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিয়াছিল।

জমিদার কহিলেন, তাহার পর আবার সাহেবের নামে নালিশ করিতে তোমাকে কে বলিল?—

হরকুমার কহিলেন, ধর্ম্মাবতার, নালিশ করিবার ইচ্ছা আমার ছিল না; ঐ আমাদের গ্রামের শশি, তাহার কোথাও কোন মোকদ্দমা জোটে না, সে ছোঁড়া নিতান্ত জোর করিয়া প্রায় আমার সম্মতি না লইয়াই এই হেঙ্গামা বাধাইয়া বসিয়াছে।

শুনিয়া জমিদার শশিভূষণের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। বুঝিলেন, লোকটা অপদার্থ নব্য উকীল, কোন ছুতায় একটা হুজুক তুলিয়া সাধারণের সমক্ষে পরিচিত হইবার চেষ্টায় আছে। নায়েবকে হুকুম করিয়া দিলেন মকদ্দমা তুলিয়া লইয়া যেন অবিলম্বে ছোট বড় ম্যাজিষ্ট্রেট যুগলকে ঠাণ্ডা করা হয়।

নায়েব সাহেবের জন্য কিঞ্চিৎ ফলমূল শীতলভোগ উপহার লইয়া জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের বাসায় গিয়া হাজির হইলেন। সাহেবকে জানাইলেন সাহেবের নামে মকদ্দমা করা তাঁহার আদৌ স্বভাববিরুদ্ধ, কেবল শশিভূষণ নামে গ্রামের একটি অজাতশ্মশ্রু অপোগণ্ড অর্ব্বাচীন উকীল তাঁহাকে এক প্রকার না জানাইয়া এইরূপ স্পর্দ্ধার কাজ করিয়াছে। সাহেব শশিভূষণের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত এবং নায়েবের প্রতি বড় সন্তুষ্ট হইলেন এবং কহিলেন রাগের মাথায় নায়েব বাবুকে "ডণ্ড বিধান" করিয়া তিনি "দুঃখিট্" আছেন। সাহেব বাঙ্গালা ভাষার পরীক্ষায় সম্প্রতি পুরস্কার লাভ করিয়া সাধারণের সহিত সাধুভাষায় বাক্যালাপ করিয়া থাকেন।

নায়েব কহিলেন, মা বাপ কখনো বা রাগ করিয়া শাস্তিও দিয়া থাকেন কখনও বা আদর করিয়া কোলেও টানিয়া লন, ইহাতে সন্তানের বা মা বাপের দুঃখের কোন কারণ নাই।

অতঃপর জয়েণ্ট সাহেবের সমস্ত ভৃত্যবর্গকে যথাযোগ্য পারিতোষিক দিয়া হরকুমার মফস্বলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত দেখা করিতে গেলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার মুখে শশিভূষণের স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া কহিলেন, আমিও আশ্চর্য্য হইতেছিলাম যে, নায়েব বাবুকে বরাবর ভাল লোক বলিয়া জানিতাম, তিনি যে সর্ব্বাগ্রে আমাকে জানাইয়া গোপনে মিট্‌মাট্ না করিয়া হঠাৎ মোকদ্দমা আনিবেন একি অসম্ভব ব্যাপার! এখন সমস্ত বুঝিতে পারিতেছি।

অবশেষে নায়েবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, শশি কন্‌গ্রেসে যোগ দিয়াছেন কি না। নায়েব অম্লানমুখে বলিলেন হাঁ।

সাহেব তাঁহার সাহেবী বুদ্ধিতে স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, এ সমস্তই কন্‌গ্রেসের চাল। একটা পাকচক্র বাধাইয়া অমৃতবাজারে প্রবন্ধ লিখিয়া গবর্মেণ্টের সহিত খিটিমিটি করিবার জন্য কন্‌গ্রেসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেলাগণ লুক্কায়িতভাবে চতুর্দ্দিকে অবসর অনুসন্ধান করিতেছে। এই সকল ক্ষুদ্র কণ্টকগণকে একদমে দলন করিয়া ফেলিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের হস্তে অধিকতর সরাসরি ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই বলিয়া সাহেব ভারতবর্ষীয় গবমেণ্টকে অত্যন্ত

দুর্ব্বল গবমেণ্ট বলিয়া মনে মনে ধিক্কার দিলেন। কিন্তু কন্‌গ্রেস্‌ওয়ালা শশিভূষণের নাম ম্যাজিষ্ট্রেটের মনে রহিল।

—:o:—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—o:✱:o—

সংসারে বড় বড় ব্যাপারগুলি যখন প্রবলভাবে গজাইয়া উঠিতে থাকে তখন ছোট ছোট ব্যাপারগুলিও ক্ষুধিত ক্ষুদ্র শিকড়জাল লইয়া জগতের উপর আপন দাবী বিস্তার করিতে ছাড়ে না।

শশিভূষণ যখন এই ম্যাজিষ্ট্রেটের হাঙ্গামা লইয়া বিশেষ ব্যস্ত, যখন বিস্তৃত পুঁথিপত্র হইতে আইন উদ্ধার করিতেছেন, মনে মনে বক্তৃতায় শান দিতেছেন, কল্পনায় সাক্ষীকে জেরা করিতে বসিয়া গিয়াছেন ও প্রকাণ্ড আদালতের লোকারণ্য দৃশ্য এবং এই যুদ্ধপর্ব্বের ভাবী পর্ব্বাধ্যায়গুলি মনে আনিয়া ক্ষণে ক্ষণে কম্পিত ও ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিতেছেন, তখন তাঁহার ক্ষুদ্র ছাত্রীটি তাহার ছিন্নপ্রায় চারুপাঠ ও মসীবিচিত্র লিখিবার খাতা, বাগান হইতে কখন ফুল কখন ফল, মাতৃভাণ্ডার হইতে কোন দিন আচার, কোন দিন নারিকেলের মিষ্টান্ন, কোনদিন পাতায় মোড়া কেতকীকেশর-সুগন্ধি গৃহনির্ম্মিত খয়ের আনিয়া নিয়মিত সময়ে তাঁহার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইত।

প্রথম দিনকতক দেখিল শশিভূষণ একখানা চিত্রহীন প্রকাণ্ড কঠোরমূর্ত্তি গ্রন্থ খুলিয়া অন্যমনস্ক ভাবে পাত উল্টাইতেছেন, সেটা যে মনোযোগ দিয়া পাঠ করিতেছেন তাহাও বোধ না। অন্য সময়ে শশিভূষণ যে সকল গ্রন্থ পড়িতেন; তাহার মধ্য হইতে কোন না কোন অংশ গিরিবালাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু ঐ স্থূল কায় কালো মলাটের পুস্তক হইতে গিরিবালাকে শুনাইবার যোগ্য কি দুটো কথাও ছিল না? তা না থাক্‌, তাই বলিয়া ঐ বই খানা কি এতই বড়, আর গিরিবালা কি এতই ছোট?

প্রথমটা গুরুর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য গিরিবালা সুর করিয়া বানান করিয়া বেণীসমেত দেহের উত্তরার্দ্ধ সবেগে দুলাইতে দুলাইতে উচ্চৈঃস্বরে আপনিই পড়া আরম্ভ করিয়া দিল। দেখিল তাহাতে বিশেষ ফল হইল না। কালো মোটা বইখানার উপর মনে মনে অত্যন্ত চটিয়া গেল। ওটাকে একটা কুৎসিত কঠোর নিষ্ঠুর মানুষের মত করিয়া দেখিতে লাগিল। ওই বইখানা যে গিরিবালাকে বালিকা বলিয়া সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে তাহা যেন তাহার প্রত্যেক দুর্ব্বোধ পাতা দুষ্ট মানুষের মুখের মত আকার ধারণ করিয়া নীরবে প্রকাশ করিতে লাগিল। সেই বইখানা যদি কোন চোরে চুরি করিয়া লইয়া যাইত, তবে সেই চোরকে সে তাহার মাতৃভাণ্ডারের সমস্ত কেয়াখয়ের চুরি করিয়া পুরস্কার দিতে পারিত। সেই বইখানার বিনাশের জন্য সে মনে মনে দেবতার নিকট যে সকল অসঙ্গত ও অসম্ভব প্রার্থনা করিয়াছিল তাহা দেবতারা শুনেন নাই এবং পাঠকদিগকেও শুনাইবার কোন আবশ্যক দেখি না।

তখন ব্যথিতহৃদয় বালিকা দুই একদিন চারুপাঠ হস্তে গুরু গৃহে গমন বন্ধ করিল। এবং সেই দুই একদিন পরে এই বিচ্ছেদের ফল পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য সে অন্য ছলে শশিভূষণের গৃহসম্মুখবর্ত্তী পথে আসিয়া কটাক্ষপাত করিয়া দেখিল শশিভূষণ সেই

কালো বইখানা ফেলিয়া একাকী দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া লোহার গরাদেগুলার প্রতি বিজাতীয় ভাষায় বক্তৃতা প্রয়োগ করিতেছেন। বোধ করি, বিচারকের মন কেমন করিয়া গলাইবেন এই লোহাগুলার উপর তাহার পরীক্ষা হইতেছে। সংসারে অনভিজ্ঞ, গ্রন্থ-বিহারী শশিভূষণের ধারণা ছিল যে, পুরাকালে ডিমস্থিনীস্, সিসিরো, বার্ক, শেরিডন, প্রভৃতি বাগ্মিগণ বাক্যবলে যে সকল অসামান্য কার্য্য করিয়া গিয়াছেন; সেইরূপ শব্দভেদী শর-বর্ষণে অন্যায়কে ছিন্নভিন্ন, অত্যাচারকে লাঞ্ছিত এবং অহঙ্কারকে ধূলিশায়ী করিয়া দিয়াছেন আজিকার দোকানদারীর দিনেও তাহা অসম্ভব নহে। প্রভুত্বমদগর্ব্বিত উদ্ধত ইংরাজকে কেমন করিয়া তিনি জগৎ সমক্ষে লজ্জিত ও অনুতপ্ত করিবেন তিলকুচি গ্রামের জীর্ণ ক্ষুদ্র গৃহে দাঁড়াইয়া শশিভূষণ তাহারই চর্চ্চা করিতেছিলেন। আকাশের দেবতারা শুনিয়া হাসিয়াছিলেন কি তাঁহাদের দেবচক্ষু অশ্রুসিক্ত হইতেছিল তাহা কেহ বলিতে পারে না।

সুতরাং সে দিন গিরিবালা তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িল না। সে দিন বালিকার অঞ্চলে জাম ছিল না; পূর্ব্বে একবার জামের আঁটি ধরা পড়িয়া অবধি ঐ ফল সম্বন্ধে সে অত্যন্ত সঙ্কুচিত ছিল। এমন কি, শশিভূষণ যদি কোন দিন নিরীহভাবে জিজ্ঞাসা করিত "গিরি, আজ জাম নেই," সে সেটাকে গূঢ় উপহাস জ্ঞান করিয়া সক্ষোভে "যাঃ ও" বলিয়া তর্জ্জন করিয়া পলায়নের উপক্রম করিত। জামের আঁটির অভাবে আজ তাহাকে একটা কৌশল অবলম্বন করিতে হইল। সহসা দূরের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বালিকা উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল—"স্বর্ণ, ভাই, তুই যাস্‌নে, আমি এখনি যাচ্চি।"

পুরুষ পাঠক মনে করিতে পারেন যে, কথাটা স্বর্ণলতা নামক কোন দূরবর্ত্তিনী সঙ্গিনীকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চারিত; কিন্তু পাঠিকারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন, দূরে কেহই ছিল না, লক্ষ্য অত্যন্ত নিকট! কিন্তু হায়, অন্ধ পুরুষের প্রতি সে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া গেল। শশিভূষণ যে, শুনিতে পান নাই, তাহা নহে, তিনি তাহার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি মনে করিলেন, বালিকা সত্যই ক্রীড়ার জন্য উৎসুক—এবং সে দিন তাহাকে খেলা হইতে অধ্যয়নে আকর্ষণ করিয়া আনিতে তাঁহার অধ্যবসায় ছিল না—কারণ তিনিও সে দিন কোন কোন হৃদয়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্ণ শর সন্ধান করিতেছিলেন। বালিকার ক্ষুদ্র হস্তের সামান্য লক্ষ্য যেমন ব্যর্থ হইয়াছিল তাঁহার শিক্ষিত হস্তের মহৎ লক্ষ্যও সেইরূপ ব্যর্থ হইয়াছিল পাঠকেরা সে সংবাদ পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন।

জামের আঁটির একটা গুণ এই যে, একে একে অনেকগুলি নিক্ষেপ করা যায়, চারিটি নিষ্ফল হইলে অন্ততঃ পঞ্চমটি ঠিক স্থানে গিয়া লাগিতে পারে। কিন্তু, স্বর্ণ হাজার কাল্পনিক হৌক, তাহাকে "এখনি যাচ্চি" আশা দিয়া অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা যায় না। থাকিলে স্বর্ণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে লোকের স্বভাবতই সন্দেহ জন্মিতে পারে। সুতরাং সে উপায়টি যখন নিষ্ফল হইল তখন গিরিবালাকে অবিলম্বে চলিয়া যাইতে হইল। তথাপি, স্বর্ণনাম্নী কোন দূরস্থিত সহচরীর সঙ্গ লাভ করিবার অভিলাষ আন্তরিক হইলে যেরূপ সবেগে উৎসাহের সহিত পাদচারণা করা স্বাভাবিক হইত, গিরিবালার গতিতে তাহা লক্ষিত হইল না। সে যেন তাহার পৃষ্ঠ দিয়া অনুভব করিবার চেষ্টা করিতেছিল পশ্চাতে কেহ

আসিতেছে কি না; যখন নিশ্চয় বুঝিল কেহ আসিতেছে না, তখন আশার শেষতম ক্ষীণতম ভগ্নাংশটুকু লইয়া একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, এবং কাহাকেও না দেখিয়া সেই ক্ষুদ্র আশাটুকু এবং শিথিলপত্র চারুপাঠ খানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া পথে ছড়াইয়া দিল। শশিভূষণ তাহাকে যে বিদ্যাটুকু দিয়াছে সেটুকু যদি কোন মতে ফিরাইয়া দিতে পারিত, তবে বোধ হয় পরিত্যজ্য জামের আঁটির মত সে সমস্তই শশিভূষণের দ্বারের সম্মুখে সশব্দে নিক্ষেপ করিয়া দিয়া চলিয়া আসিত। বালিকা প্রতিজ্ঞা করিল দ্বিতীয় বার শশিভূষণের সহিত দেখা হইবার পূর্ব্বেই সে সমস্ত পড়াশুনা ভুলিয়া যাইবে—তিনি যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন তাহার কোনটিরই উত্তর দিতে পারিবে না! একটি, একটি, একটিরও না! তখন শশিভূষণ অত্যন্ত জব্দ হইবে!

গিরিবালার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। পড়া ভুলিয়া গেলে শশিভূষণের যে কিরূপ তীব্র অনুতাপের কারণ হইবে তাহা মনে করিয়া সে পীড়িত হৃদয়ে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিল, এবং কেবল মাত্র শশিভূষণের দোষে বিস্মৃতশিক্ষা সেই হতভাগিনী ভবিষ্যৎ গিরিবালাকে কল্পনা করিয়া তাহার নিজের প্রতি করুণারস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। আকাশে মেঘ করিতে লাগিল; বর্ষাকালে এমন মেঘ প্রতিদিন করিয়া থাকে। গিরিবালা পথের প্রান্তে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া অভিমানে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল; এমন অকারণ কান্না প্রতিদিন কত বালিকা কাঁদিয়া থাকে! উহার মধ্যে লক্ষ্য করিবার বিষয় কিছুই ছিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

শশিভূষণের আইন সম্বন্ধীয় গবেষণা এবং বক্তৃতা-চর্চ্চা কি কারণে ব্যর্থ হইয়া গেল তাহা পাঠকদের অগোচর নাই। ম্যাজিষ্ট্রেটের নামে মকদ্দমা অকস্মাৎ মিটিয়া গেল। হরকুমার তাঁহাদের জেলার বেঞ্চে অনরারি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন। একখানা মলিন চাপকান ও তৈলাক্ত পাগড়ি পরিয়া হরকুমার আজকাল প্রায়ই জেলায় গিয়া সাহেব সুবাদিগকে নিয়মিত সেলাম করিয়া আসেন।

শশিভূষণের সেই কালো মোটা বইখানার প্রতি এতদিন পরে গিরিবালার অভিশাপ ফলিতে আরম্ভ করিল; সে একটি অন্ধকার কোণে নির্ব্বাসিত হইয়া অনাদৃত বিস্মৃতভাবে ধূলিস্তর সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু তাহার অনাদর দেখিয়া যে বালিকা আনন্দ লাভ করিবে সেই গিরিবালা কোথায়!

শশিভূষণ যে দিন প্রথম আইনের গ্রন্থ বন্ধ করিয়া বসিলেন সেই দিনই হঠাৎ বুঝিতে পারিলেন গিরিবালা আসে নাই। তখন একে একে কয় দিনের ইতিহাস অল্পে অল্পে তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। মনে পড়িতে লাগিল একদিন উজ্জ্বল প্রভাতে গিরিবালা অঞ্চল ভরিয়া নববর্ষার আর্দ্র বকুলফুল আনিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়াও যখন তিনি গ্রন্থ হইতে দৃষ্টি তুলিলেন না, তখন তাহার উচ্ছ্বাসে সহসা বাধা পড়িল। সে তাহার অঞ্চলবিদ্ধ একটা সুঁচ সূতা বাহির করিয়া নতশিরে একটি একটি করিয়া ফুল লইয়া মালা গাঁথিতে লাগিল—মালা অত্যন্ত ধীরে ধীরে গাঁথিল, অনেক বিলম্বে শেষ হইল—বেলা হইয়া আসিল, গিরিবালার ঘরে ফিরিবার সময় হইল, তথাপি শশিভূষণের

পড়া শেষ হইল না। গিরিবালা মালাটা তক্তপোষের উপর রাখিয়া ম্লানভাবে চলিয়া গেল। মনে পড়িল, তাহার অভিমান প্রতিদিন কেমন করিয়া ঘনীভূত হইয়া উঠিল; কবে হইতে সে তাঁহার ঘরে প্রবেশ না করিয়া ঘরের সম্মুখবর্ত্তী পথে মধ্যে মধ্যে দেখা দিত এবং চলিয়া যাইত; অবশেষে কবে হইতে বালিকা সেই পথে আসাও বন্ধ করিয়াছে। সেও ত আজ কিছুদিন হইল। গিরিবালার অভিমান ত এতদিন স্থায়ী হয় না। শশিভূষণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হতবুদ্ধি হতকর্ম্মের মত দেয়ালে পিঠ দিয়া বসিয়া রহিলেন। ক্ষুদ্র ছাত্রীটি না আসাতে তাঁহার পাঠ্য গ্রন্থগুলি নিতান্ত বিস্বাদ হইয়া আসিল। বই টানিয়া টানিয়া লইয়া দুই চারি পাতা পড়িয়া ফেলিয়া দিতে হয়। লিখিতে লিখিতে ক্ষণে ক্ষণে সচকিতে পথের দিকে দ্বারের অভিমুখে প্রতীক্ষাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে এবং লেখা ভঙ্গ হয়।

শশিভূষণের আশঙ্কা হইল গিরিবালার অসুখ হইয়া থাকিবে। গোপনে সন্ধান লইয়া জানিলেন সে আশঙ্কা অমূলক। গিরিবালা আজকাল আর ঘর হইতে বাহির হয় না। তাহার জন্য পাত্র স্থির হইয়াছে।

গিরি যে দিন চারুপাঠের ছিন্নখণ্ডে গ্রামের পঙ্কিল পথ বিকীর্ণ করিয়াছিল তাহার পরদিন প্রত্যূষে ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিচিত্র উপহার সংগ্রহ করিয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিল। অতিশয় গ্রীষ্ম হওয়াতে নিদ্রাহীন রাত্রি অতিবাহন করিয়া হরকুমার ভোরবেলা হইতে বাহিরে বসিয়া গা খুলিয়া তামাক খাইতেছিলেন। গিরিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় যাচ্ছিস্? গিরি কহিল "শশি দাদার বাড়ি!" হরকুমার ধমক দিয়া কহিলেন, "শশি দাদার বাড়ি যেতে হবে না ঘরে যা!" এই বলিয়া আসন্ন-শ্বশুর-গৃহবাস বয়ঃপ্রাপ্ত কন্যার লজ্জার অভাব সম্বন্ধে বিস্তর তিরস্কার করিলেন। সেই দিন হইতে তাহার বাহিরে আসা বন্ধ হইয়াছে। এবার আর তাহার অভিমান ভঙ্গ করিবার অবসর জুটিল না। আমসত্ত্ব, কেয়াখয়ের এবং জারকনেবু ভাণ্ডারের যথাস্থানে ফিরিয়া গেল। বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, বকুল ফুল ঝরিতে লাগিল, গাছ ভরিয়া পেয়ারা পাকিয়া উঠিল এবং শাখাস্খলিত পক্ষীচঞ্চুক্ষত সুপক্ক কালোজামে তরুতল প্রতিদিন সমাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। হায়, সেই ছিন্নপ্রায় চারুপাঠখানিও আরও নাই!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গ্রামে গিরিবালার বিবাহে যে দিন শানাই বাজিতেছিল সে দিন অনিমন্ত্রিত শশিভূষণ নৌকা করিয়া কলিকাতা অভিমুখে চলিতেছিলেন।

মকদ্দমা উঠাইয়া লওয়া অবধি হরকুমার শশিকে বিষচক্ষে দেখিতেন। কারণ, তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, শশি তাঁহাকে নিশ্চয় ঘৃণা করিতেছে। শশির মুখে চখে ব্যবহারে তিনি তাহার সহস্র কাল্পনিক নিদর্শন দেখিতে লাগিলেন। গ্রামের সকল লোকেই তাঁহার অপমান বৃত্তান্ত ক্রমশঃ বিস্মৃত হইতেছে, কেবল শশিভূষণ একাকী সেই দুঃস্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছেন মনে করিয়া তিনি তাঁহাকে দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র তাঁহার অন্তঃকরণের মধ্যে একটুখানি সলজ্জ সঙ্কোচ এবং সেই সঙ্গে প্রবল আক্রোশের সঞ্চার

হইত। শশিকে গ্রামছাড়া করিতে হইবে বলিয়া হরকুমার প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন।

শশিভূষণের মত লোককে গ্রামছাড়া করা কাজটা তেমন দুরূহ নহে। নায়েব মহাশয়ের অভিপ্রায় অনতিবিলম্বে সফল হইল। একদিন সকাল বেলা পুস্তকের বোঝা এবং গুটিদুইচার টিনের বাক্স সঙ্গে লইয়া শশি নৌকায় চড়িলেন। গ্রামের সহিত তাঁহার যে একটি সুখের বন্ধন ছিল সেও আজ সমারোহ সহকারে ছিন্ন হইতেছে। সুকোমল বন্ধনটি যে কত দৃঢ়ভাবে তাঁহার হৃদয়কে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছিল তাহা তিনি পূর্ব্বে সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারেন নাই। আজ যখন নৌকা ছাড়িয়া দিল, গ্রামের বৃক্ষচূড়াগুলি অস্পষ্ট এবং উৎসবের বাদ্যধ্বনি ক্ষীণতর হইয়া আসিল, তখন সহসা অশ্রুবাষ্পে হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিয়া তাঁহার কণ্ঠরোধ করিয়া ধরিল, রক্তোচ্ছ্বাসবেগে কপালের শিরাগুলা টন্ টন্ করিতে লাগিল; এবং জগৎসংসারের সমস্ত দৃশ্য ছায়া-নির্ম্মিত মায়া-মরীচিকার মত অত্যন্ত অস্পষ্ট প্রতিভাত হইল।

প্রতিকূল বাতাস অতিশয় বেগে বহিতেছিল, সেই জন্য স্রোত অনুকূল হইলেও নৌকা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। এমন সময়ে নদীর মধ্যে এক কাণ্ড ঘটিল যাহাতে শশিভূষণের যাত্রার ব্যাঘাত করিয়া দিল।

ষ্টেশন ঘাট হইতে সদর মহকুমা পর্য্যন্ত একটি নূতন ষ্টীমার লাইন সম্প্রতি খুলিয়াছে। সেই ষ্টীমারটি সশব্দে পক্ষ সঞ্চালন করিয়া ঢেউ তুলিয়া উজানে আসিতেছিল। জাহাজে নূতন লাইনের অল্পবয়স্ক ম্যানেজার সাহেব এবং অল্প সংখ্যক যাত্রী ছিল। যাত্রীদের মধ্যে শশিভূষণের গ্রাম হইতেও কেহ কেহ উঠিয়াছিল।

একটি মহাজনের নৌকা কিছু দূর হইতে এই ষ্টীমারের সহিত পাল্লা দিয়া আসিতে চেষ্টা করিতেছিল, আবার মাঝে মাঝে ধরিধরি করিতেছিল, আবার মাঝে মাঝে পশ্চাতে পড়িতেছিল। মাঝির ক্রমশঃ রোখ চাপিয়া গেল। সে প্রথম পালের উপর দ্বিতীয় পাল এবং দ্বিতীয় পালের উপরে ক্ষুদ্র তৃতীয় পালটা পর্য্যন্ত তুলিয়া দিল। বাতাসের বেগে সুদীর্ঘ মাস্তুল সম্মুখে আনত হইয়া পড়িল, এবং বিদীর্ণ তরঙ্গরাশি অট্টকলস্বরে নৌকার দুই পার্শ্বে উন্মত্তভাবে নৃত্য করিতে লাগিল। নৌকা তখন ছিন্নবল্গা অশ্বের ন্যায় ছুটিয়া চলিল। এক স্থানে ষ্টীমারের পথ কিঞ্চিৎ বাঁকা ছিল, সেইখানে সংক্ষিপ্ততর পথ অবলম্বন করিয়া নৌকা ষ্টীমারকে ছাড়াইয়া গেল। ম্যানেজার সাহেব আগ্রহভরে রেলের উপর ঝুঁকিয়া নৌকার এই প্রতিযোগিতা দেখিতেছিল। যখন নৌকা তাহার পূর্ণতম বেগ প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং ষ্টীমারকে হাত দুয়েক ছাড়াইয়া গিয়াছে এমন সময়ে সাহেব হঠাৎ একটা বন্দুক তুলিয়া স্ফীত পাল লক্ষ্য করিয়া আওয়াজ করিয়া দিল। এক মুহূর্ত্তে পাল ফাটিয়া গেল, নৌকা ডুবিয়া গেল, ষ্টীমার নদীর বাঁকের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ম্যানেজার কেন যে এমন করিল তাহা বলা কঠিন। ইংরাজ-নন্দনের মনের ভাব আমরা বাঙ্গালী হইয়া ঠিক বুঝিতে পারি না। হয়ত দিশী পালের প্রতিযোগিতা সে সহ্য করিতে পারে নাই, হয় ত একটা স্ফীত বিস্তীর্ণ পদার্থ বন্দুকের গুলির দ্বারা চক্ষের পলকে বিদীর্ণ করিবার একটা হিংস্র প্রলোভন আছে, হয় ত এই গর্ব্বিত নৌকাটার বস্ত্রখণ্ডের মধ্যে গুটিকয়েক ফুটা করিয়া নিমেষের মধ্যে ইহার নৌকালীলা সমাপ্ত করিয়া দিবার মধ্যে একটা প্রবল পৈশাচিক হাস্যরস আছে; নিশ্চয় জানি না।

জন্ম ইহা নিশ্চয়, ইংরাজের মনের ভিতরে একটুখানি বিশ্বাস ছিল যে, এই রসিকটুকু রার দরুণ সে কোনরূপ শাস্তির দায়িক নহে— এবং ধারণা ছিল, যাহাদের নৌকা গেল এবং সম্ভবতঃ প্রাণ সংশয়, তাহারা মানুষের মধ্যেই গণ্য হইতে পারে না।

সাহেব যখন বন্দুক তুলিয়া গুলি করিল এবং নৌকা ডুবিয়া গেল তখন শশিভূষণের পান্সী ঘটনাস্থলের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। শেষোক্ত ব্যাপারটি শশিভূষণ প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন। তাড়াতাড়ি নৌকা লইয়া গিয়া মাঝি এবং মাল্লাদিগকে উদ্ধার করিলেন। কেবল এক ব্যক্তি ভিতরে বসিয়া রন্ধনের জন্য মসলা পিশিতেছিল, তাহাকে আর দেখা গেল না। বর্ষার নদী খরবেগে বহিয়া চলিল।

শশিভূষণের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে উত্তপ্ত রক্ত ফুটিতে লাগিল। আইন অত্যন্ত মন্দগতি— সে একটা বৃহৎ জটিল লৌহযন্ত্রের মত; তৌল করিয়া সে প্রমাণ গ্রহণ করে এবং নির্ব্বিকার ভাবে সে শাস্তি বিভাগ করিয়া দেয়, তাহার মধ্যে মানব-হৃদয়ের উত্তাপ নাই। কিন্তু ক্ষুধার সহিত ভোজন, ইচ্ছার সহিত উপভোগ ও রোষের সহিত শাস্তিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া শশিভূষণের নিকট সমান অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইল। অনেক অপরাধ আছে যাহা প্রত্যক্ষ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ নিজ হস্তে তাহার শাস্তিবিধান না করিলে অন্তর্যামী বিধাতা পুরুষ যেন অন্তরের মধ্যে থাকিয়া প্রত্যক্ষকারীকে দগ্ধ করিতে থাকেন। তখন, আইনের কথা স্মরণ করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে হৃদয় লজ্জা বোধ করে। কিন্তু কলের আইন এবং কলের জাহাজ ম্যানেজারটিকে শশিভূষণের নিকট হইতে দূরে লইয়া গেল। তাহাতে জগতের আর আর কি উপকার হইয়াছিল বলিতে পারি না কিন্তু সে যাত্রায় নিঃসন্দেহ শশিভূষণের ভারতবর্ষীয় প্লীহা রক্ষা পাইয়াছিল।

মাঝিমাল্লা যাহারা বাঁচিল তাহাদিগকে লইয়া শশি গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। নৌকায় পাট বোঝাই ছিল, সেই পাট উদ্ধারের জন্য লোক নিযুক্ত করিয়া দিলেন এবং মাঝিকে ম্যানেজারের বিরুদ্ধে পুলিশে দরখাস্ত দিতে অনুরোধ করিলেন।

মাঝি কিছুতেই সম্মত হয় না। সে বলিল নৌকা ত মজিয়াছে এক্ষণে নিজেকে মজাইতে পারিব না। প্রথমতঃ পুলিশকে দর্শনি দিতে হইবে, তাহার পর কাজকর্ম্ম আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া আদালতে আদালতে ঘুরিতে হইবে, তাহার পর সাহেবের নামে নালিশ করিয়া কি বিপাকে পড়িতে হইবে ও কি ফল লাভ হইবে তাহা ভগবান্ জানেন। অবশেষে সে যখন জানিল, শশিভূষণ নিজে উকীল, আদালত-খরচা তিনিই বহন করিবেন এবং মকদ্দমায় ভবিষ্যতে খেসারৎ পাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে তখন রাজি হইল। কিন্তু শশিভূষণের গ্রামের লোক যাহারা ষ্টীমারে উপস্থিত ছিল তাহারা কিছুতেই সাক্ষ্য দিতে চাহিল না। তাহারা শশিভূষণকে কহিল, মহাশয়, আমরা কিছুই দেখি নাই; আমরা জাহাজের পশ্চাদ্-ভাগে ছিলাম, কলের ঘটঘট্ এবং জলের কল্ কল্ শব্দে সেখান হইতে বন্দুকের আওয়াজ শুনিবারও কোন সম্ভাবনা ছিল না।

দেশের লোককে আন্তরিক ধিক্কার দিয়া শশিভূষণ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট মকদ্দমা চালাইলেন। সাক্ষীর কোন আবশ্যক হইল না। ম্যানেজার স্বীকার করিল যে, সে বন্দুক ছুঁড়িয়াছিল। কহিল আকাশে এক ঝাঁক বক উড়িতেছিল তাহাদেরই প্রতি লক্ষ্য

করা হইয়াছিল। ষ্টীমার তখন পূর্ণবেগে চলিতেছিল এবং সেই মুহূর্ত্তেই নদীর বাঁকের অন্তরালে প্রবেশ করিয়াছিল। সুতরাং সে জানিতেও পারে নাই, কাক মরিল, কি বক মরিল, কি নৌকাটা ডুবিল। অন্তরীক্ষে এবং পৃথিবীতে এত শিকারের জিনিস আছে, যে, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক "ডার্টিব্যাগ্" অর্থাৎ মলিন বস্ত্রখণ্ডের উপর শিকিপয়সা দামেরও ছিটাগুলি অপব্যয় করিতে পারে না।

বেকসুর খালাস পাইয়া ম্যানেজার সাহেব চুরট ফুঁকিতে ফুঁকিতে ক্লাবে হুইষ্ট খেলিতে গেল; যে লোকটা নৌকার মধ্যে মসলা পিশিতেছিল, নয় মাইল তফাতে তাহার মৃত দেহ ডাঙ্গায় আসিয়া লাগিল এবং শশিভূষণ চিত্তদাহ লইয়া আপন গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন।

যে দিন ফিরিয়া আসিলেন, সে দিন নৌকা সাজাইয়া গিরিবালাকে শ্বশুরবাড়ি লইয়া যাইতেছে। যদিও তাঁহাকে কেহ ডাকে নাই, তথাপি শশিভূষণ ধীরে ধীরে নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘাটে লোকের ভিড় ছিল সেখানে না গিয়া কিছু দূরে অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইলেন। নৌকা ঘাট ছাড়িয়া যখন তাঁহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল তখন চকিতের মত একবার দেখিতে পাইলেন, মাথায় ঘোমটা টানিয়া নববধূ নতশিরে বসিয়া আছে। অনেক দিন হইতে গিরিবালার আশা ছিল, যে, গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্ব্বে কোন মতে একবার শশিভূষণের সহিত সাক্ষাৎ হইবে কিন্তু আজ সে জানিতেও পারিল না যে, তাহার গুরু অনতিদূরে তীরে দাঁড়াইয়া আছেন। একবার সে মুখ তুলিয়া দেখিল না, কেবল নিঃশব্দ রোদনে তাহার দুই কপোল বাহিয়া অশ্রুজল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

নৌকা ক্রমশঃ দূরে চলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। জলের উপর প্রভাতের রৌদ্র ঝিক্ ঝিক্ করিতে লাগিল, নিকটের আম্রশাখায় একটা পাপিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মুহুর্মুহু গান গাহিয়া মনের আবেগ কিছুতেই নিঃশেষ করিতে পারিল না, খেয়ানৌকা লোক বোঝাই লইয়া পারাপার হইতে লাগিল, মেয়েরা ঘাটে জল লইতে আসিয়া উচ্চ কলস্বরে গিরির শ্বশুরালয় যাত্রার আলোচনা তুলিল, শশিভূষণ চস্‌মা খুলিয়া চোখ মুছিয়া সেই পথের ধারে সেই গরাদের মধ্যে সেই ক্ষুদ্র গৃহে গিয়া প্রবেশ করিলেন। হঠাৎ একবার মনে হইল যেন গিরিবালার কণ্ঠ শুনিতে পাইলেন! "শশিদাদা!"—কোথায় রে কোথায়? কোথাও না! সে গৃহে না, সে পথে না, সে গ্রামে না—তাঁহার অশ্রুজলাভিষিক্ত অন্তরের মাঝখানটিতে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

—:*:—

শশিভূষণ পুনরায় জিনিষপত্র বাঁধিয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কলিকাতায় কোন কাজ নাই, সেখানে যাওয়ার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নাই; সেই জন্য রেলপথে না গিয়া বরাবর নদীপথে যাওয়াই স্থির করিলেন।

তখন পূর্ণবর্ষায় বাঙ্গালা দেশের চারিদিকেই ছোট বড় আঁকাবাঁকা সহস্র জলময় জাল বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। সরস শ্যামল বঙ্গভূমির শিরা উপশিরাগুলি পরিপূর্ণ হইয়া তরুলতা তৃণগুল্ম ঝোপঝাড় ধান পাট ইক্ষুতে দশদিকে উন্মত্ত যৌবনের প্রাচুর্য্য যেন একেবারে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে।

শশিভূষণের নৌকা সেই সমস্ত সঙ্কীর্ণ বক্র

জলস্রোতের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল। জল তখন তীরের সহিত সমতল হইয়া গিয়াছে। কাশবন শরবন এবং স্থানে স্থানে শস্যক্ষেত্র জলমগ্ন হইয়াছে। গ্রামের বেড়া, বাঁশঝাড় ও আমবাগান একেবারে জলের অব্যবহিত ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—দেবকন্যারা যেন বাঙ্গালা দেশের তরুমূলবর্ত্তী আলবালগুলি জলসেচনে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

যাত্রার আরম্ভকালে স্নানচিক্কণ বনশ্রী রৌদ্রে উজ্জ্বল হাস্যময় ছিল, অনতিবিলম্বেই মেঘ করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তখন যে দিকে দৃষ্টি পড়ে সেই দিকই বিষণ্ণ এবং অপরিচ্ছন্ন দেখাইতে লাগিল। বন্যার সময়ে গরুগুলি যেমন জলবেষ্টিত মলিন পঙ্কিল সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠপ্রাঙ্গণের মধ্যে ভিড় করিয়া করুণনেত্রে সহিষ্ণুভাবে দাঁড়াইয়া শ্রাবণের ধারাবর্ষণে ভিজিতে থাকে, বাঙ্গালা দেশ আপনার কর্দ্দমপিচ্ছিল ঘনসিক্ত রুদ্ধ জঙ্গলের মধ্যে মূক বিষণ্ণমুখে সেইরূপ পীড়িত ভাবে অবিশ্রাম ভিজিতে লাগিল। চাষীরা টোকা মাথায় দিয়া বাহির হইয়াছে, স্ত্রীলোকেরা ভিজিতে ভিজিতে বাদলার শীতল বায়ুতে সঙ্কুচিত হইয়া কুটীর হইতে কুটীরান্তরে গৃহকার্য্যে যাতায়াত করিতেছে ও পিচ্ছিল ঘাটে অত্যন্ত সাবধানে পা ফেলিয়া সিক্তবস্ত্রে জল তুলিতেছে, এবং গৃহস্থ পুরুষেরা দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছে, নিতান্ত কাজের দায় থাকিলে কোমরে চাদর জড়াইয়া জুতা হস্তে ছাতি মাথায় বাহির হইতেছে। অবলা রমণীর মস্তকে ছাতি এই রৌদ্রদগ্ধ বর্ষাপ্লাবিত বঙ্গদেশের সনাতন পবিত্র প্রথার মধ্যে নাই।

বৃষ্টি যখন কিছুতেই থামে না তখন রুদ্ধ নৌকার মধ্যে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া শশিভূষণ পুনশ্চ রেলপথে যাওয়াই স্থির করিলেন। এক জায়গায় একটা প্রশস্ত মোহনার মত জায়গায় আসিয়া শশিভূষণ নৌকা বাঁধিয়া আহারের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

খোঁড়ার পা খানায় পড়ে—সে কেবল খানার দোষ নয়, খোঁড়ার পাটারও পড়িবার দিকে একটু বিশেষ ঝোঁক আছে। শশিভূষণ সে দিন তাহার একটা প্রমাণ দিলেন।

দুই নদীর মোহনার মুখে বাঁশ বাঁধিয়া জেলেরা একটা প্রকাণ্ড জাল পাতিয়াছে। কেবল একপার্শ্বে নৌকা চলাচলের স্থান রাখিয়াছে। বহুকাল হইতে তাহারা এ কার্য্য করিয়া থাকে এবং সে জন্য খাজনাও দেয়। দুর্ভাগ্যক্রমে এ বৎসর এই পথে হঠাৎ জেলার পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাহাদুরের শুভাগমন হইয়াছে। তাঁহার বোট আসিতে দেখিয়া জেলেরা পূর্ব্ব হইতে পার্শ্ববর্ত্তী পথ নির্দ্দেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সাবধান করিয়া দিল। কিন্তু মনুষ্যরচিত কোন বাধাকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া ঘুরিয়া যাওয়া সাহেবের মাঝির অভ্যাস নাই। সে সেই জালের উপর দিয়াই বোট চালাইয়া দিল। জাল অবনত হইয়া বোটকে পথ ছাড়িয়া দিল, কিন্তু তাহার হাল বাধিয়া গেল। কিঞ্চিৎ বিলম্বে এবং চেষ্টায় হাল ছাড়াইয়া লইতে হইল।

পুলিস সাহেব অত্যন্ত গরম এবং রক্তবর্ণ হইয়া বোট বাঁধিলেন। তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়াই জেলে চারটে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। সাহেব তাঁহার মাল্লাদিগকে, জাল কাটিয়া ফেলিতে আদেশ করিলেন। তাহারা সেই সাত আট শত টাকার বৃহৎ জাল কাটিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিল।

জালের উপর ঝাল ঝাড়িয়া অবশেষে জেলেদিগকে ধরিয়া আনিবার আদেশ হইল। কন্‌ষ্টেবল্ পলাতক জেলে চারিটির সন্ধান না পাইয়া যে চারিজনকে হাতের কাছে পাইল

তাহাদিগকে ধরিয়া আনিল। তাহারা আপনাদিগকে নিরপরাধ বলিয়া যোড়হস্তে কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল। পুলিস্ বাহাদুর যখন সেই বন্দীদিগকে সঙ্গে লইবার হুকুম দিতেছেন, এমন সময় চস্মা-পরা শশিভূষণ তাড়াতাড়ি একখানা জামা পরিয়া তাহার বোতাম না লাগাইয়া চটিজুতা চট্ চট্ করিতে করিতে উদ্ধশ্বাসে পুলিসের বোটের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কম্পিতস্বরে কহিলেন, "সার্, জেলের জাল ছিঁড়িবার এবং এই চারিজন লোককে উৎপীড়ন করিবার তোমার কোন অধিকার নাই।"

পুলিসের বড় কর্ত্তা তাঁহাকে হিন্দিভাষায় একটা বিশেষ অসম্মানের কথা বলিবামাত্র তিনি এক মুহূর্ত্তে কিঞ্চিৎ উচ্চ ডাঙ্গা হইতে বোটের মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়াই একেবারে সাহেবের উপরে আপনাকে নিক্ষেপ করিলেন। বালকের মত পাগলের মত মারিতে লাগিলেন।

তাহার পর কি হইল তিনি জানেন না। পুলিসের থানার মধ্যে যখন জাগিয়া উঠিলেন, তখন—বলিতে সঙ্কোচ বোধ হয়—যেরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হইলেন তাহাতে মানসিক সম্মান অথবা শারীরিক আরাম বোধ করিলেন না।

নবম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

শশিভূষণের বাপ উকীল ব্যারিষ্টার লাগাইয়া প্রথমতঃ শশিকে হাজত হইতে জামিনে খালাস করিলেন। তাহার পরে মকদ্দমার যোগাড় চলিতে লাগিল।

যে সকল জেলের জাল নষ্ট হইয়াছে তাহারা শশিভূষণের এক পরগণার অন্তর্গত, এক জমিদারের অধীন। বিপদের সময় কখন কখন শশির নিকটে তাহারা আইনের পরামর্শ লইতেও আসিত। যাহাদিগকে সাহেব বোটে ধরিয়া আনিয়াছিলেন তাহারাও শশিভূষণের অপরিচিত নহে।

শশি তাহাদিগকে সাক্ষ্য মানিবেন বলিয়া ডাকাইয়া আনিলেন। তাহারা ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিল। স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়া যাহাদিগকে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয় পুলিসের সহিত বিবাদ করিলে তাহারা কোথায় গিয়া নিষ্কৃতি পাইবে? একটার অধিক প্রাণ কাহার শরীরে আছে? যাহা লোকসান হইবার তাহাত হইয়াছে, এখন আবার সাক্ষ্যের সপিনা ধরাইয়া এ কি মুস্কিল! সকলে বলিল, "ঠাকুর তুমি ত আমাদিগকে বিষম ফেসাদে ফেলিলে!"

বিস্তর বলা কহার পর তাহারা সত্য কথা বলিতে স্বীকার করিল।

ইতিমধ্যে হরকুমার যে দিন বেঞ্চের কর্ম্মোপলক্ষে জেলার সাহেবদিগকে সেলাম করিতে গেলেন পুলিস সাহেব হাসিয়া কহিলেন, নায়েব বাবু শুনিতেছি তোমার প্রজারা পুলিসের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। নায়েব সচকিত হইয়া কহিলেন, হাঁ! এও কি কখনো সম্ভব হয়? অপবিত্র জন্তুজাত পুত্রদিগের অস্থিতে এত ক্ষমতা!

সংবাদপত্র পাঠকেরা অবগত আছেন মকদ্দমায় শশিভূষণের পক্ষ কিছুতেই টিকিতে পারিল না।

জেলেরা একে একে আসিয়া কহিল, পুলিস সাহেব তাহাদের জাল কাটিয়া দেন নাই; বোটে ডাকিয়া তাহাদের নাম ধাম লিখিয়া লইতেছিলেন।

কেবল তাহাই নহে, তাঁহার দেশস্থ গুটি-

চারেক পরিচিত লোক সাক্ষ্য দিল যে, তাহারা সে সময়ে ঘটনাস্থলে বিবাহের বরযাত্র উপলক্ষে উপস্থিত ছিল। শশিভূষণ যে, অকারণে অগ্রসর হইয়া পুলিশের পাহারাওয়ালাদের প্রতি উপদ্রব করিয়াছে তাহা তাহারা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে!

শশিভূষণ স্বীকার করিলেন যে, গালি খাইয়া বোটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি সাহেবকে মারিয়াছেন। কিন্তু জাল কাটিয়া দেওয়া ও জেলেদের প্রতি উপদ্রবই তাহার মূল কারণ।

এরূপ অবস্থায়, যে বিচারে শশিভূষণ শাস্তি পাইলেন তাহাকে অন্যায় বলা যাইতে পারে না। তবে শাস্তিটা কিছু গুরুতর হইল। তিন চারিটা অভিযোগ, আঘাত, অনধিকারপ্রবেশ, পুলিসের কর্ত্তব্যে ব্যাঘাত ইত্যাদি; সব কটাই তাহার বিরুদ্ধে পুরা প্রমাণ হইল।

শশিভূষণ তাহার সেই ক্ষুদ্র গৃহে তাহার প্রিয় পাঠ্য গ্রন্থগুলি ফেলিয়া পাঁচ বৎসর জেল খাটিতে গেলেন! তাঁহার বাপ আপিল করিতে উদ্যত হইল, তাঁহাকে শশিভূষণ বারংবার নিষেধ করিলেন—কহিলেন, জেল ভাল! লোহার বেড়ি মিথ্যা কথা বলে না, কিন্তু জেলের বাহিরে যে স্বাধীনতা আছে সে আমাদিগকে প্রতারণা করিয়া বিপদে ফেলে। আর যদি সৎসঙ্গের কথা বল, ত, জেলের মধ্যে মিথ্যাবাদী কৃতঘ্ন কাপুরুষের সংখ্যা অল্প, কারণ স্থান পরিমিত—বাহিরে অনেক বেশী!

দশম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

শশিভূষণ জেলে প্রবেশ করিবার অনতিকাল পরেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল। তাঁহার আর বড় কেহ ছিল না। এক ভাই বহুকাল হইতে সেণ্টাল প্রভিন্সে কাজ করিতেন, দেশে আসা তাঁহার বড় ঘটিয়া উঠিত না, সেইখানেই তিনি বাড়ি তৈয়ারি করিয়া সপরিবারে স্থায়ী হইয়া বসিয়াছিলেন। দেশে বিষয় সম্পত্তি যাহা ছিল; নায়েব হরকুমার তাহার অধিকাংশ নানা কৌশলে আত্মসাৎ করিলেন।

জেলের মধ্যে অধিকাংশ কয়েদীকে যে পরিমাণে দুঃখ ভোগ করিতে হয় দৈববিপাকে শশিভূষণকে তদপেক্ষা অনেক বেশী সহ্য করিতে হইয়াছিল। তথাপি দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল।

আবার একদা বর্ষার দিনে জীর্ণ শরীর ও শূন্যহৃদয় লইয়া শশিভূষণ কারা-প্রাচীরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। স্বাধীনতা পাইলেন, কিন্তু তাহা ছাড়া কারার বাহিরে তাঁহার আর কেহ অথবা আর কিছু ছিল না। গৃহহীন আত্মীয়হীন সমাজহীন কেবল তাঁহার একলাটির পক্ষে এতবড় জগৎ সংসার অত্যন্ত ঢিলা বলিয়া ঠেকিতে লাগিল।

জীবনযাত্রার বিচ্ছিন্ন সূত্র আবার কোথা হইতে আরম্ভ করিবেন এই কথা ভাবিতেছেন এমন সময়ে এক বৃহৎ জুড়ি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। এক জন ভৃত্য নামিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার নাম শশিভূষণ বাবু?—

তিনি কহিলেন হাঁ।—

সে তৎক্ষণাৎ গাড়ির দরজা খুলিয়া তাঁহার প্রবেশের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইল।—

তিনি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আমাকে কোথায় যাইতে হইবে?—

সে কহিল, আমার প্রভু আপনাকে ডাকিয়াছেন।

পথিকদের কৌতুহল দৃষ্টিপাত অসহ্য বোধ হওয়াতে তিনি সেখানে আর অধিক বাদানুবাদ না করিয়া গাড়িতে উঠিয়া পড়িলেন। ভাবিলেন নিশ্চয় ইহার মধ্যে একটা কিছু ভ্রম আছে। কিন্তু একটা কোন দিকে ত চলিতে হইবে—না হয় এমনি করিয়া ভ্রম দিয়াই এই নূতন জীবনের ভূমিকা আরম্ভ হউক।

সে দিনও মেঘ এবং রৌদ্র আকাশময় পরস্পরকে শিকার করিয়া ফিরিতেছিল। পথের প্রান্তবর্ত্তী বর্ষার জলপ্লাবিত গাঢ়শ্যাম শস্যক্ষেত্র চঞ্চল ছায়ালোকে বিচিত্র হইয়া উঠিতেছিল। হাটের কাছে একটা বৃহৎ রথ পড়িয়াছিল এবং তাহার অদূরবর্ত্তী মুদির দোকানে একদল বৈষ্ণব ভিক্ষুক গুপিযন্ত্র ও খোলকরতাল যোগে গান গাহিতেছিল—

এস এস ফিরে এস—নাথ হে ফিরে এস!

আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত, বঁধু হে ফিরে এস!

গাড়ি অগ্রসর হইয়া চলিল, গানের পদ ক্রমে দূর হইতে দূরতর হইয়া কাণে প্রবেশ করিতে লাগিল—

ওগো নিষ্ঠুর ফিরে এস হে আমার করুণ কোমল এস!

ওগো সজল জলদ স্নিগ্ধকান্ত সুন্দর ফিরে এস!

গানের কথা ক্রমে ক্ষীণতর অস্ফুটতর হইয়া আসিল, আর বুঝা গেল না। কিন্তু গানের ছন্দে শশিভূষণের হৃদয়ে একটা আন্দোলন তুলিয়া দিল, তিনি আপন মনে গুন্‌গুন্ করিয়া পদের পর পদ রচনা করিয়া যোজনা করিয়া চলিলেন, কিছুতে যেন থামিতে পারিলেন না,—

আমার নিতিসুখ ফিরে এস, আমার চিরদুখ ফিরে এস,—

আমার সব-সুখ-দুখ-মন্থন ধন অন্তরে ফিরে এস!

আমার চিরবাঞ্ছিত এস, আমার চিতসঞ্চিত এস,—

ওহে চঞ্চল, হে চিরন্তন, ভুজবন্ধনে ফিরে এস!

আমার বক্ষে ফিরিয়া এস, আমার চক্ষে ফিরিয়া এস,—

আমার শয়নে স্বপনে বসনে ভূষণে নিখিল ভুবনে এস!

আমার মুখের হাসিতে এস হে
আমার চোখের সলিলে এস,
আমার আদরে আমার ছলনে
আমার অভিমানে ফিরে এস!

আমার সর্ব্বস্মরণে এস আমার সর্ব্বভরমে এস—

আমার ধরম করম সোহাগ সরম জনম মরণে এস!

গাড়ি যখন একটি প্রাচীরবেষ্টিত উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি দ্বিতল অট্টালিকার সম্মুখে থামিল তখন শশিভূষণের গান থামিল।

তিনি কোন প্রশ্ন না করিয়া ভৃত্যের নির্দ্দেশ ক্রমে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

যে ঘরে আসিয়া বসিলেন সে ঘরের চারিদিকেই বড় বড় কাঁচের আলমারীতে বিচিত্র বর্ণের বিচিত্র মলাটের সারি সারি বই সাজান। সেই দৃশ্য দেখিবামাত্র তাঁহার পুরাতন জীবন দ্বিতীয়বার কারামুক্ত হইয়া বাহির হইল। এই সোণার জলে অঙ্কিত নানা বর্ণে রঞ্জিত বইগুলি আনন্দলোকের মধ্যে প্রবেশ করিবার সুপরি-

চিত রত্নখচিত সিংহদ্বারের মত তাঁহার নিকটে প্রতিভাত হইল।

টেবিলের উপরেও কি কতকগুলি ছিল। শশিভূষণ তাঁহার ক্ষীণদৃষ্টি লইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিলেন, একখানি বিদীর্ণ শ্লেট, তাহার উপরে গুটিদুয়েক পুরাতন খাতা, একখানি ছিন্নপ্রায় ধারাপাত কথামালা এবং একখানি কাশিরাম দাসের মহাভারত।

শ্লেটের কাঠের ফ্রেমের উপর শশিভূষণের হস্তাক্ষরে কালী দিয়া খুব মোটা করিয়া লেখা —গিরিবালা দেবী। খাতা ও বহিগুলির উপরেও ঐ এক হস্তাক্ষরে এক নাম লিখিত।

শশিভূষণ কোথায় আসিয়াছেন বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার বক্ষের মধ্যে রক্তস্রোত তরঙ্গিত হইয়া উঠিল। মুক্তবাতায়ন দিয়া বাহিরে চাহিলেন—সেখানে কি চক্ষে পড়িল? সেই ক্ষুদ্র গরাদে দেওয়া ঘর, সেই অসমতল গ্রাম্যপথ—সেই ডুরে-কাপড়পরা ছোট মেয়েটি—এবং সেই আপনার শান্তিময় নিশ্চিন্ত নিভৃত জীবনযাত্রা।

সে দিনকার সেই সুখের জীবন কিছুই অসামান্য বা অত্যধিক নহে; দিনের পর দিন ক্ষুদ্র কাজে ক্ষুদ্র সুখে অজ্ঞাতসারে কাটিয়া যাইত, এবং তাঁহার নিজের অধ্যয়ন-কার্য্যের মধ্যে একটি বালিকা ছাত্রীর অধ্যাপন-কার্য্য তুচ্ছ ঘটনার মধ্যেই গণ্য ছিল; কিন্তু গ্রাম-প্রান্তরে সেই নির্জ্জন দিনযাপন, সেই ক্ষুদ্র শান্তি, সেই ক্ষুদ্র সুখ, সেই ক্ষুদ্র বালিকার ক্ষুদ্র মুখখানি, সমস্তই যেন স্বর্গের মত দেশ কালের বহির্ভূত এবং আয়ত্তের অতীতরূপে কেবল আকাঙ্ক্ষারাজ্যের কল্পনাচ্ছায়ার মধ্যে বিরাজ করিতে লাগিল। সে দিনকার সেই সমস্ত ছবি এবং স্মৃতি আজিকার এই বর্ষাম্লান প্রভাতের আলোকের সহিত এবং মনের মধ্যে মৃদুগুঞ্জিত সেই কীর্ত্তনের গানের-সহিত জড়িত মিশ্রিত হইয়া এক প্রকার সঙ্গীত-ময় জ্যোতির্ম্ময় অপূর্ব্বরূপ ধারণ করিল। সেই জঙ্গলে বেষ্টিত কর্দ্দমাক্ত সঙ্কীর্ণ গ্রাম্যপথের মধ্যে সেই অনাদৃত ব্যথিত বালিকার অভিমান-মলিন মুখের শেষ স্মৃতিটি যেন বিধাতা-বিরচিত এক অসাধারণ আশ্চর্য্য অপরূপ, অতি গভীর, অতি বেদনাপরিপূর্ণ স্বর্গীয় চিত্রের মত তাঁহার মানসপটে প্রতিফলিত হইয়া উঠিল। তাহারই সঙ্গে কীর্ত্তনের করুণ সুর বাজিতে লাগিল, এবং মনে হইল যেন সেই পল্লিবালিকার মুখে সমস্ত বিশ্বহৃদয়ের এক অনির্ব্বচনীয় দুঃখ আপনার ছায়া নিক্ষেপ করিয়াছে। শশিভূষণ দুই বাহুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া সেই টেবিলের উপর সেই শ্লেট বহি খাতার উপর মুখ রাখিয়া অনেককাল পরে অনেক দিনের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

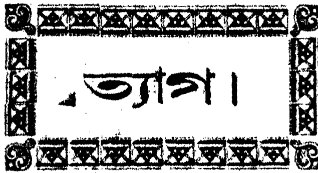
অনেকক্ষণ পরে মৃদু শব্দে সচকিত হইয়া মুখ তুলিয়া দেখিলেন। তাঁহার সম্মুখে রূপার থালায় ফলমূল মিষ্টান্ন রাখিয়া গিরিবালা অদূরে দাঁড়াইয়া নীরবে অপেক্ষা করিতেছিল। তিনি মস্তক তুলিতেই নিরাভরণা শুভ্রবসনা বিধবা-বেশধারিণী গিরিবালা তাঁহাকে নতজানু হইয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল।

বিধবা উঠিয়া দাঁড়াইয়া যখন শীর্ণমুখ ম্লান-বর্ণ ভগ্নশরীর শশিভূষণের দিকে সকরুণ স্নিগ্ধ-নেত্রে চাহিয়া দেখিল—তখন তাহার দুই চক্ষু ঝরিয়া দুই কপোল বাহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল।

শশিভূষণ তাহাকে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু ভাষা খুঁজিয়া পাইলেন না, নিরুদ্ধ অশ্রুবাষ্প তাঁহার বাক্যপথ সবলে অবরোধ করিল—কথা এবং অশ্রু উভয়েই নিরুপায় ভাবে হৃদয়ের মুখে কণ্ঠের দ্বারে

বদ্ধ হইয়া রহিল। সেই কীর্ত্তনের দল ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে করিতে অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া গাহিতে লাগিল—

এস এস হে!



ত্যাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

ফাল্গুনের প্রথম পূর্ণিমায় আম্রমুকুলের গন্ধ লইয়া নব বসন্তের বাতাস বহিতেছে। পুষ্করিণীতীরের একটি পুরাতন লিচু গাছের ঘন পল্লবের মধ্য হইতে একটি নিদ্রাহীন অশ্রান্ত পাপিয়ার গান মুখুয্যেদের বাড়ির একটি নিদ্রাহীন শয়নগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। হেমন্ত কিছু চঞ্চল ভাবে কখন তার স্ত্রীর এক গুচ্ছ চুল খোঁপা হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া লইয়া আঙুলে জড়াইতেছে, কখন তাহার বালাতে চুড়িতে সংঘাত করিয়া ঠুং ঠুং শব্দ করিতেছে, কখন তাহার মাথার ফুলের মালাটা টানিয়া স্বস্থান চ্যুত করিয়া তাহার মুখের উপর আনিয়া ফেলিতেছে। সন্ধ্যাবেলাকার নিস্তব্ধ ফুলের গাছটিকে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য বাতাস যেমন একবার এপাশ হইতে একবার ওপাশ হইতে একটু আধটু নাড়াচাড়া করিতে থাকে, হেমন্তের কতকটা সেই ভাব।

কিন্তু কুসুম সম্মুখের চন্দ্রালোকপ্লাবিত অসীম শূন্যের মধ্যে দুই নেত্রকে নিমগ্ন করিয়া দিয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছে। স্বামীর চাঞ্চল্য তাহাকে স্পর্শ করিয়া প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে। অবশেষে হেমন্ত কিছু অধীর ভাবে কুসুমের দুই হাত নাড়া দিয়া বলিল "কুসুম তুমি আছ কোথায়! তোমাকে যেন একটা মস্ত দুরবীণ কষিয়া বিস্তর ঠাহর করিয়া বিন্দুমাত্র দেখা যাইবে এমনি দূরে গিয়া পড়িয়াছ। আমার ইচ্ছা, তুমি আজ একটু কাছাকাছি এস। দেখ দেখি কেমন চমৎকার রাত্রি!"

কুসুম শূন্য হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া স্বামীর মুখের দিকে রাখিয়া কহিল—"এই জ্যোৎস্না রাত্রি এই বসন্তকাল সমস্ত এই মুহূর্ত্তে মিথ্যা হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে এমন একটা মন্ত্র আমি জানি।"

হেমন্ত বলিল "যদি জান ত সেটা উচ্চারণ করিয়া কাজ নাই। বরং এমন যদি কোন মন্ত্র জানা থাকে যাহাতে সপ্তাহের মধ্যে তিনটে চারটে রবিবার আসে কিংবা রাত্রিটা বিকাল পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্ত টিকিয়া যায়, ত তাই শুনিতে রাজি আছি।" বলিয়া কুসুমকে আর একটু টানিয়া লইতে চেষ্টা করিল। কুসুম সে আলিঙ্গনপাশে ধরা না দিয়া কহিল —"আমার মৃত্যুকালে তোমাকে যে কথাটা বলিব মনে করিয়াছিলাম আজ তাহা বলিতে ইচ্ছা করিতেছে। আজ মনে হইতেছে তুমি আমাকে যত শাস্তি দাও না কেন আমি বহন করিতে পারিব।"

শাস্তি সম্বন্ধে জয়দেব হইতে শ্লোক আওড়াইয়া হেমন্ত একটা রসিকতা করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। এমন সময়ে শোনা গেল একটা ক্রুদ্ধ চটি জুতার চটাচট্ শব্দ নিকটবর্ত্তী হইতেছে। হেমন্তের পিতা হরিহর

মুখুয্যের পরিচিত পদশব্দ। হেমন্ত শশব্যস্ত হইয়া উঠিল।

হরিহর দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া ক্রুদ্ধ গর্জ্জনে কহিল "হেমন্ত, বৌকে এখনি বাড়ি হইতে দূর করিয়া দাও।" হেমন্ত স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিল, স্ত্রী কিছুই বিস্ময় প্রকাশ করিল না, কেবল দুই হাতের মধ্যে কাতরে মুখ লুকাইয়া আপনার সমস্ত বল এবং ইচ্ছা দিয়া আপনাকে যেন লুপ্ত করিয়া দিতে চেষ্টা করিল। দক্ষিণে বাতাসে পাপিয়ার স্বর ঘরে প্রবেশ করিতে লাগিল, কাহারো কাণে গেল না। পৃথিবী এমন অসীম সুন্দর অথচ এত সহজেই সমস্ত বিকল হইয়া যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

হেমন্ত বাহির হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল "সত্য কি?"

স্ত্রী কহিল "সত্য।"

"এতদিন বল নাই কেন?"

"অনেক বার বলিতে চেষ্টা করিয়াছি বলিতে পারি নাই। আমি বড় পাপিষ্ঠা।"

"তবে আজ সমস্ত খুলিয়া বল।"

কুসুম গম্ভীর দৃঢ়স্বরে বলিয়া গেল—যেন অটল চরণে ধীর গতিতে আগুণের মধ্যে দিয়া চলিয়া গেল, কতখানি দগ্ধ হইতেছিল কেহ বুঝিতে পারিল না। সমস্ত শুনিয়া হেমন্ত উঠিয়া গেল।

কুসুম বুঝিল, যে স্বামী চলিয়া গেল, সে স্বামীকে আর ফিরিয়া পাইবে না। কিছু আশ্চর্য্য মনে হইল না; এ ঘটনাও যেন অন্যান্য দৈনিক ঘটনার মত অত্যন্ত সহজ ভাবে উপস্থিত হইল; মনের মধ্যে এমন একটা শুষ্ক অসাড়তার সঞ্চার হইয়াছে। কেবল পৃথিবীকে এবং ভালবাসাকে আগাগোড়া মিথ্যা এবং শূন্য বলিয়া মনে হইল। এমন কি, হেমন্তের সমস্ত অতীত ভালবাসার কথা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত নীরস কঠিন নিরানন্দ হাসি একটা খরধার নিষ্ঠুর ছুরির মত তাহার মনের একধার হইতে আর একধার পর্য্যন্ত একটি দাগ রাখিয়া দিয়া গেল। বোধ করি সে ভাবিল, যে ভালবাসাকে এতখানি বলিয়া মনে হয়, এত আদর, এত গাঢ়তা, যাহার তিলমাত্র বিচ্ছেদ এমন মর্ম্মান্তিক, যাহার মুহূর্ত্তমাত্র মিলন এমন নিবিড়ানন্দময়; যাহাকে অসীম অনন্ত বলিয়া মনে হয়, জন্মজন্মান্তরেও যাহার অবসান কল্পনা করা যায় না—সেই ভালবাসা এই! এইটুকুর উপর নির্ভর! সমাজ যেমনি একটু আঘাত করিল অমনি অসীম ভালবাসা চূর্ণ হইয়া এক মুষ্টি ধূলি হইয়া গেল। হেমন্ত কম্পিতস্বরে এই কিছুপূর্ব্বে কাণের কাছে বলিতেছিল "চমৎকার রাত্রি!" সে রাত্রিত এখনও শেষ হয় নাই; এখনো সেই পাপিয়া ডাকিতেছে, দক্ষিণের বাতাস মশারি কাঁপাইয়া যাইতেছে, এবং জ্যোৎস্না সুখশ্রান্ত সুপ্ত সুন্দরীর মত বাতায়নবর্ত্তী পালঙ্কের এক প্রান্তে নিলীন হইয়া পড়িয়া আছে। সমস্তই মিথ্যা! ভালবাসা আমার অপেক্ষাও মিথ্যাবাদিনী মিথ্যাচারিণী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রভাতেই অনিদ্রাশুষ্ক হেমন্ত পাগলের মত হইয়া প্যারিশঙ্কর ঘোষালের বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইল। প্যারিশঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল "কিহে বাপু, কি খবর।"

হেমন্ত মস্ত একটা আগুনের মত যেন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল "তুমি আমাদের জাতি নষ্ট করিয়াছ, সর্ব্বনাশ করিয়াছ—তোমাকে ইহার শাস্তি ভোগ করিতে হইবে"—বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল।

প্যারিশঙ্কর ঈষৎ হাসিয়া কহিল "আর তোমরা আমার জাতি রক্ষা করিয়াছ আমার সমাজ রক্ষা করিয়াছ, আমার পিঠে হাত বুলাইয়া দিয়াছ! আমার প্রতি তোমাদের বড় যত্ন, বড় ভালবাসা।"

হেমন্তের ইচ্ছা হইল সেই মুহূর্ত্তেই প্যারিশঙ্করকে ব্রহ্মতেজে ভস্ম করিয়া দিতে কিন্তু সেই তেজে সে নিজেই জ্বলিতে লাগিল, প্যারিশঙ্কর দিব্য সুস্থ নিরাময় ভাবে বসিয়া রহিল।

হেমন্ত ভগ্নকণ্ঠে বলিল "আমি তোমার কি করিয়াছিলাম।"

প্যারিশঙ্কর কহিল "আমি জিজ্ঞাসা করি, আমার একটিমাত্র কন্যা ছাড়া আর সন্তান নাই, আমার সেই কন্যা তোমার বাপের কাছে কি অপরাধ করিয়াছিল! তুমি তখন ছোট ছিলে, তুমি হয়ত জান না—ঘটনাটা তবে মন দিয়া শোন। ব্যস্ত হইয়ো না, বাপু, ইহার মধ্যে বিস্তর কৌতুক আছে।

"আমার জামাতা নবকান্ত আমার কন্যার গহনা চুরি করিয়া যখন পালাইয়া বিলাতে গেল, তখন তুমি শিশু ছিলে। তাহার পর পাঁচ বৎসর বাদে সে যখন ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিল তখন পাড়ায় যে একটা গোলমাল বাধিল তোমার বোধ করি কিছু কিছু মনে থাকিতে পারে। কিংবা তুমি না জানিতেও পার তুমি তখন কলিকাতার স্কুলে পড়িতে। তোমার বাপ গ্রামের দলপতি হইয়া বলিলেন—মেয়েকে যদি স্বামীগৃহে পাঠান অভিপ্রায় থাকে তবে সে মেয়েকে আর ঘরে লইতে পারিবে না। আমি তাঁহাকে হাতে পায়ে ধরিয়া বলিলাম, দাদা এ যাত্রা তুমি আমাকে রক্ষা কর। আমি ছেলেটিকে গোবর খাওয়াইয়া প্রায়শ্চিত্ত করাইতেছি তোমরা তাহাকে জাতে তুলিয়া লও। তোমার বাপ কিছুতেই রাজি হইলেন না, আমিও আমার একমাত্র মেয়েকে ত্যাগ করিতে পারিলাম না। জাত ছাড়িয়া দেশ ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া ঘর করিলাম। এখানে আসিয়াও আপদ মিটিল না। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের যখন বিবাহের সমস্ত আয়োজন করিয়াছি—তোমার বাপ কন্যাকর্ত্তাদের উত্তেজিত করিয়া সে বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিলেন। আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম যদি ইহার প্রতিশোধ না লই তবে আমি ব্রাহ্মণের ছেলে নহি।—এইবার কতকটা বুঝিতে পারিয়াছ—কিন্তু আর একটু সবুর কর—সমস্ত ঘটনাটি শুনিলে খুসী হইবে—ইহার মধ্যে একটু রস আছে।

"তুমি যখন কালেজে পড়িতে তোমার বাসার পাশেই বিপ্রদাস চাটুয্যের বাড়ি ছিল। বেচারা এখন মারা গিয়াছে। চাটুয্যে মহাশয়ের বাড়িতে কুসুম নামে একটি শৈশব-বিধবা অনাথা কায়স্থকন্যা আশ্রিতভাবে থাকিত। মেয়েটি বড় সুন্দরী—বুড়ো ব্রাহ্মণ কালেজের ছেলেদের দৃষ্টিপথ হইতে তাহাকে সম্বরণ করিয়া রাখিবার জন্য কিছু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু বুড়ো মানুষকে ফাঁকি দেওয়া একটি মেয়ের পক্ষে কিছুই শক্ত নহে। মেয়েটি প্রায়ই কাপড় শুকাইতে দিতে ছাতে উঠিত এবং তোমারও বোধ করি ছাতে না উঠিলে পড়া মুখস্থ হইত না। পরস্পরের ছাত হইতে তোমাদের কোনরূপ কথা-

বার্ত্তা হইত কি না সে তোমরাই জান, কিন্তু মেয়েটির ভাবগতিক দেখিয়া বুড়ার মনেও সন্দেহ হইল। কারণ, কাজকর্ম্মে তাহার ক্রমিক ভুল হইতে দেখা গেল এবং তপস্বিনী গৌরীর মত দিন দিন সে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিতে লাগিল। এক এক দিন সন্ধ্যাবেলায় সে বুড়ার সম্মুখেই অকারণে অশ্রু সংবরণ করিতে পারিত না।

"অবশেষে বুড়া আবিষ্কার করিল ছাতে তোমাদের মধ্যে সময়ে অসময়ে নীরব দেখা সাক্ষাৎ চলিয়া থাকে—এমন কি কালেজ কামাই করিয়াও মধ্যাহ্নে চিলের ঘরের ছায়ায় ছাতের কোণে তুমি বই হাতে করিয়া বসিয়া থাকিতে; নির্জ্জন অধ্যয়নে সহসা তোমার এত উৎসাহ জন্মিয়াছিল। বিপ্রদাস যখন আমার কাছে পরামর্শ জানিতে আসিল আমি কহিলাম, খুড়ো, তুমি ত অনেক দিন হইতে কাশী যাইবার মানস করিয়াছ, মেয়েটকে আমার কাছে রাখিয়া তীর্থবাস করিতে যাও আমি তাহার ভার লইতেছি।

"বিপ্রদাস তীর্থে গেল। আমি মেয়েটিকে শ্রীপতি চাটুয্যের বাসায় রাখিয়া তাহাকেই মেয়ের বাপ বলিয়া চালাইলাম। তাহার পর যাহা হইল তোমার জানা আছে। তোমার কাছে আগাগোড়া সব কথা খোলসা করিয়া বলিয়া বড় আনন্দ লাভ করিলাম। এ যেন একটি গল্পের মত। ইচ্ছা আছে সমস্তটা লিখিয়া একটা বই করিয়া ছাপাই। আমার লেখা আসে না। আমার ভাইপোটা শুনিতেছি একটু আধটু লেখে—তাহাকে দিয়া লেখাইবার মানস আছে। কিন্তু তোমাতে তাহাতে মিলিয়া লিখিলে সব চেয়ে ভাল হয়; কারণ, গল্পের উপসংহারটি আমার ভাল জানা নাই।"

হেমন্ত প্যারিশঙ্করের এই শেষ কথাগুলিতে বড় একটা কাণ না দিয়া কহিল "কুসুম এই বিবাহে কোন আপত্তি করে নাই?"

প্যারিশঙ্কর কহিল "আপত্তি ছিল কি না বোঝা ভারি শক্ত। জান ত, বাপু, মেয়েমানুষের মন; যখন 'না" বলে তখন 'হাঁ' বুঝিতে হয়। প্রথমেত দিনকতক নূতন বাড়িতে আসিয়া তোমাকে না দেখিতে পাইয়া কেমন পাগলের মত হইয়া গেল। তুমিও দেখিলাম কোথা হইতে সন্ধান পাইয়াছ; প্রায়ই বই হাতে করিয়া কালেজে যাত্রা করিয়া তোমার পথ ভুল হইত—এবং শ্রীপতির বাসার সম্মুখে আসিয়া কি যেন খুঁজিয়া বেড়াইতে; ঠিক যে প্রেসিডেন্সি কালেজের রাস্তা খুজিতে তাহা বোধ হইত না, কারণ ভদ্রলোকের বাড়ির জানালার ভিতর দিয়া কেবল পতঙ্গ এবং উন্মাদ যুবকদের হৃদয়ের পথ ছিল মাত্র। দেখিয়া শুনিয়া আমার বড় দুঃখ হইল। দেখিলাম, তোমার পড়ার বড়ই ব্যাঘাত হইতেছে এবং মেয়েটির অবস্থাও সঙ্কটাপন্ন।

"একদিন কুসুমকে ডাকিয়া লইয়া কহিলাম—বাছা, আমি বুড়ামানুষ, আমার কাছে লজ্জা করিবার আবশ্যক নাই—তুমি যাহাকে মনে মনে প্রার্থনা কর আমি জানি। ছেলেটিও মাটি হইবার যো হইয়াছে। আমার ইচ্ছা তোমাদের মিলন হয়। শুনিবামাত্র কুসুম একেবারে বুক ফাটিয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং ছুটিয়া পালাইয়া গেল। এমনি করিয়া প্রায় মাঝে মাঝে সন্ধ্যাবেলায় শ্রীপতির বাড়ি গিয়া কুসুমকে ডাকিয়া তোমার কথা পাড়িয়া ক্রমে তাহার লজ্জা ভাঙিলাম। অবশেষে প্রতিদিন ক্রমিক আলোচনা করিয়া তাহাকে বুঝাইলাম যে, বিবাহ ব্যতীত পথ দেখি না। তাহা ছাড়া মিলনের আর কোন উপায় নাই। কুসুম কহিল কেমন করিয়া হইবে? আমি

কহিলাম, তোমাকে কুলীনের মেয়ে বলিয়া চালাইয়া দিব। অনেক তর্কের পর সে এ বিষয়ে তোমার মত জানিতে কহিল। আমি কহিলাম, ছেলেটা একে ক্ষেপিয়া যাইবার যো হইয়াছে, তাহাকে আবার এ সকল গোলমালের কথা বলিবার আবশ্যক কি? কাজটা বেশ নিরাপত্তে নিশ্চিন্তে নিষ্পন্ন হইয়া গেলেই সকল দিকে সুখের হইবে। বিশেষতঃ এ কথা যখন কখনও প্রকাশ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই তখন বেচারাকে কেন গায়ে পড়িয়া চিরজীবনের মত অসুখী করা!—

"কুসুম বুঝিল, কি বুঝিল না আমি বুঝিতে পারিলাম না। কখন কাঁদে কখন চুপ করিয়া থাকে। অবশেষে আমি যখন বলি, তবে কাজ নাই, তখন আবার সে অস্থির হইয়া উঠে। এইরূপ অবস্থায় শ্রীপতিকে দিয়া তোমাকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠাই। দেখিলাম সম্মতি দিতে তোমার তিলমাত্র বিলম্ব হইল না। তখন বিবাহের সমস্ত ঠিক হইল।

"বিবাহের অনতিপূর্ব্বে কুসুম এমনি বাঁকিয়া দাঁড়াইল তাহাকে আর কিছুতেই বাগাইতে পারি না। সে আমার হাতে পায়ে ধরে, বলে ইহাতে কাজ নাই জ্যাঠামশায়। আমি বলিলাম, কি সর্ব্বনাশ, সমস্ত স্থির হইয়া গেছে, এখন কি বলিয়া ফিরাইব!—কুসুম বলে তুমি রাষ্ট্র করিয়া দাও আমার হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে, আমাকে এখান হইতে কোথাও পাঠাইয়া দাও!—আমি বলিলাম তাহা হইলে ছেলেটির দশা কি হইবে! তাহার বহুদিনের আশা কালপূর্ণ হইবে বলিয়া সে স্বর্গে চড়িয়া বসিয়াছে, আজ আমি হঠাৎ তাহাকে তোমার মৃত্যুসংবাদ পাঠাইব! আবার তাহার পরদিন তোমাকে তাহার মৃত্যুসংবাদ পাঠাইতে হইবে, এবং সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় আমার কাছে তোমার মৃত্যুসংবাদ আসিবে। আমি কি এই বুড়া বয়সে স্ত্রীহত্যা ব্রহ্মহত্যা করিতে বসিয়াছি!

"তাহার পর শুভলগ্নে শুভবিবাহ সম্পন্ন হইল—আমি আমার একটা কর্ত্তব্যদায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া বাঁচিলাম। তাহার পর কি হইল তুমি জান।"

হেমন্ত কহিলেন "আমাদের যাহা করিবার তাহা ত করিলেন আবার কথাটা প্রকাশ করিলেন কেন?"

প্যারিশঙ্কর কহিলেন "দেখিলাম তোমার ছোট ভগ্নীর বিবাহের সমস্ত স্থির হইয়া গেছে তখন মনে মনে ভাবিলাম, একটা ব্রাহ্মণের জাত মারিয়াছি কিন্তু সে কেবল কর্ত্তব্যবোধে। আবার আর একটা ব্রাহ্মণের জাত মারা পড়ে, আমার কর্ত্তব্য এটা নিবারণ করা। তাই তাহাদের চিঠি লিখিয়া দিলাম। বলিলাম, হেমন্ত যে শূদ্রের কন্যা বিবাহ করিয়াছে তাহার প্রমাণ আছে।"

হেমন্ত বহুকষ্টে ধৈর্য্য সম্বরণ করিয়া কহিল "এই যে মেয়েটিকে আমি পরিত্যাগ করিব, ইহার দশা কি হইবে? আপনি ইহাকে আশ্রয় দিবেন?"

প্যারিশঙ্কর কহিলেন "আমার যাহা কাজ তাহা আমি করিয়াছি, এখন পরের পরিত্যক্ত স্ত্রীকে পোষণ করা আমার কর্ম্ম নহে। ওরে হেমন্ত বাবুর জন্য বরফ দিয়া এক গ্লাস ডাবের জল লইয়া আয়, আর পান আনিস্!"

হেমন্ত এই সুশীতল আতিথ্যের জন্য অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী। অন্ধকার রাত্রি। পাখী ডাকিতেছে না। পুষ্করিণীর ধারের লিচু গাছটি কালো চিত্রপটের উপর গাঢ়তর কালির দাগের মত লেপিয়া গেছে। কেবল দাক্ষিণের বাতাস এই অন্ধকারে অন্ধভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যেন তাহাকে "নিশি"তে পাইয়াছে! আর আকাশের তারা নির্নিমেষ সতর্ক নেত্রে প্রাণপণে অন্ধকার ভেদ করিয়া কি একটা রহস্য আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত আছে।

শয়নগৃহে দীপ জ্বালা হয় নাই। হেমন্ত বাতায়নের কাছে খাটের উপরে বসিয়া সম্মুখের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া আছে। কুসুম ভূমিতলে দুই হাতে তাহার পা জড়াইয়া পায়ের উপর মুখ রাখিয়া পড়িয়া আছে। সময় যেন স্তম্ভিত সমুদ্রের মত স্থির হইয়া আছে। যেন অনন্ত নিশিথিনীর উপর অদৃষ্ট চিত্রকর এই একটি চিরস্থায়ী ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছে—চারিদিকে প্রলয়, মাঝখানে একটি বিচারক, এবং তাহার পায়ের কাছে একটি অপরাধিনী।

আবার চটিজুতার শব্দ হইল। হরিহর মুখুয্যে দ্বারের কাছে আসিয়া বলিলেন—"অনেকক্ষণ হইয়া গিয়াছে আর সময় দিতে পারি না। মেয়েটাকে ঘর হইতে দূর করিয়া দাও!"

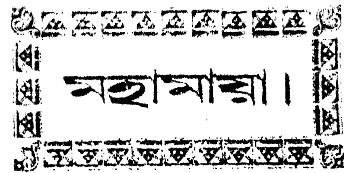
কুসুম এই স্বর শুনিবামাত্র একবার মুহূর্ত্তের মত চিরজীবনের সাধ মিটাইয়া হেমন্তের দুই পা দ্বিগুণতর আবেগে চাপিয়া ধরিল—চরণ চুম্বন করিয়া পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া পা ছাড়িয়া দিল।

হেমন্ত উঠিয়া গিয়া পিতাকে বলিল—"আমি স্ত্রীকে ত্যাগ করিব না।"

হরিহর গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহিল—"জাত খোয়াইবি?"

হেমন্ত কহিল "আমি জাত মানি না।"

"তবে তুইসুদ্ধ দূর হইয়া যা।"



প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

মহামায়া এবং রাজীবলোচন উভয়ে নদীর ধারে একটা ভাঙ্গা মন্দিরে সাক্ষাৎ করিল।

মহামায়া কোন কথা না বলিয়া তাহার স্বাভাবিক গম্ভীর দৃষ্টি ঈষৎ ভর্ৎসনার ভাবে রাজীবের প্রতি নিক্ষেপ করিল। তাহার মর্ম্ম এই, তুমি কি সাহসে আজ অসময়ে আমাকে এখানে আহ্বান করিয়া আনিয়াছ? আমি এপর্য্যন্ত তোমার সকল কথা শুনিয়া আসিতেছি বলিয়াই তোমার এতদূর স্পর্দ্ধা বাড়িয়া উঠিয়াছে?

রাজীব একে মহামায়াকে বরাবর ঈষৎ ভয় করিয়া চলে তাহাতে এই দৃষ্টিপাতে তাহাকে ভারি বিচলিত করিয়া দিল—দুটা কথা গুছাইয়া বলিবে মনে করিয়াছিল, সে আশায় তৎক্ষণাৎ জলাঞ্জলি দিতে হইল। অথচ অবিলম্বে এই মিলনের একটা কোন কিছু কারণ না দেখাইলেও চলে না, তাই দ্রুত বলিয়া ফেলিল—"আমি প্রস্তাব করিতেছি, এখান হইতে পালা-

হইয়া গিয়া আমরা দুজনে বিবাহ করি।"—রাজীবের যে কথাটা বলিবার উদ্দেশ্য ছিল সে কথাটা ঠিক বলা হইল বটে, কিন্তু যে ভূমিকাটি মনে মনে স্থির করিয়া আসিয়াছিল তাহার কিছুই হইল না। কথাটা নিতান্ত নীরস নিরলঙ্কার, এমন কি, অদ্ভুত শুনিতে হইল। নিজে বলিয়া নিজেই থতমত খাইয়া গেল—আরও দুটো পাঁচটা কথা জুড়িয়া ওটাকে যে বেশ একটু নরম করিয়া আনিবে তাহার সামর্থ্য রহিল না। ভাঙ্গা মন্দিরে নদীর ধারে এই মধ্যাহ্নকালে মহামায়াকে ডাকিয়া আনিয়া নির্ব্বোধ লোকটা শুদ্ধ কেবল বলিল, চল আমরা বিবাহ করিগে!

মহামায়া কুলীনের ঘরের কুমারী। বয়স চব্বিশ বৎসর। যেমন পরিপূর্ণ বয়স, তেমনি পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য। যেন শরৎকালের রৌদ্রের মত কাঁচা সোণার প্রতিমা—সেই রৌদ্রের মতই দীপ্ত এবং নীরব এবং তাহার দৃষ্টি দিবালোকের ন্যায় উন্মুক্ত এবং নির্ভীক।

তাহার বাপ নাই; বড় ভাই আছেন—তাহার নাম ভবানীচরণ চট্টোপাধ্যায়। ভাই-বোন প্রায় এক প্রকৃতির লোক—মুখে কথাটি নাই কিন্তু এমনি একটা তেজ আছে যে, দিবা দ্বিপ্রহরের মত নিঃশব্দে দহন করে। লোকে ভবানীচরণকে অকারণে ভয় করিত।

রাজীব লোকটা বিদেশী। এখানকার রেশমের কুঠির বড় সাহেব তাহাকে নিজের সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে। রাজীবের বাপ এই সাহেবের কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইলে সাহেব তাঁহার অল্পবয়স্ক পুত্রের ভরণ-পোষণের ভার নিজে লইয়া তাহাকে বাল্যাবস্থায় এই বামনহাটীর কুঠিতে লইয়া আসেন। আমি যে প্রাচীনকালের কথা বলিতেছি তখনকার সাহেবদের মধ্যে এরূপ সহৃদয়তা প্রায় দেখা যাইত। বালকের সঙ্গে কেবল তাহার স্নেহশীলা পিসি ছিলেন। ইহারা ভবানীচরণের প্রতিবেশীরূপে বাস করিতেন। মহামায়া রাজীবের বাল্যসঙ্গিনী ছিল এবং রাজীবের পিসির সহিত মহামায়ার সুদৃঢ় স্নেহবন্ধন ছিল।

রাজীবের বয়স ক্রমে ক্রমে ষোল, সতের, আঠারো, এমন কি, উনিশ হইয়া উঠিল, তথাপি পিসির বিস্তর অনুরোধসত্ত্বেও সে বিবাহ করিতে চায় না। সাহেব বাঙ্গালীর ছেলের এরূপ অসামান্য সুবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া ভারি খুসি হইলেন; মনে করিলেন, ছেলেটি তাঁহাকেই আপনার জীবনের আদর্শস্থল করিয়াছে। সাহেব অবিবাহিত ছিলেন। ইতিমধ্যে পিসিরও মৃত্যু হইল।

এদিকে সাধ্যাতীত ব্যয় ব্যতীত মহামায়ার জন্যও অনুরূপ কুলসম্পন্ন পাত্র জোটে না। তাহারও কুমারী-বয়স ক্রমে বাড়িতে লাগিল।

পাঠকদিগকে বলা বাহুল্য যে, পরিণয়বন্ধন যে দেবতার কার্য্য তিনি যদিও এই নরনারী-যুগলের প্রতি এ যাবৎ বিশেষ অমনোযোগ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু প্রণয়বন্ধনের ভার যাঁহার প্রতি তিনি এতদিন সময় নষ্ট করেন নাই। বৃদ্ধ প্রজাপতি যখন ঢুলিতেছিলেন, যুবক কন্দর্প তখন সম্পূর্ণ সজাগ অবস্থায় ছিলেন।

ভগবান্ কন্দর্পের প্রভাব ভিন্ন লোকের উপর ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়। রাজীব তাঁহার প্ররোচনায় দুটো চারটে মনের কথা বলিবার অবসর খুঁজিয়া বেড়ায়, মহামায়া তাহাকে সে অবসর দেয় না—তাহার নিস্তব্ধ গম্ভীর দৃষ্টি রাজীবের ব্যাকুল হৃদয়ে একটা ভীতির সঞ্চার করিয়া দেয়।

আজ শতবার মাথার দিব্য দিয়া রাজীব মহামায়াকে এই ভাঙ্গা মন্দিরে আনিতে কৃত-

কার্য্য হইয়াছে। তাই মনে করিয়াছিল, যত কিছু বলিবার আছে আজ সব বলিয়া লইবে, তাহার পরে, হয়, আমরণ সুখ, নয়, আজীবন মৃত্যু। জীবনের এমন একটা সঙ্কটের দিনে রাজীব কেবল কহিল—"চল, তবে বিবাহ করা যাউক্!" এবং তার পরে বিস্মৃতপাঠ ছাত্রের মত থতমত খাইয়া চুপ করিয়া রহিল।

রাজীব যে এরূপ প্রস্তাব করিবে মহামায়া যেন আশা করে নাই। অনেকক্ষণ তাই নীরব হইয়া রহিল।

মধ্যাহ্নকালের অনেকগুলি অনির্দ্দিষ্ট করুণ-ধ্বনি আছে, সেইগুলি এই নিস্তব্ধতায় ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। বাতাসে মন্দিরের অর্দ্ধসংলগ্ন ভাঙ্গা কপাট এক একবার অত্যন্ত মৃদুমন্দ আর্ত্তস্বর সহকারে ধীরে ধীরে খুলিতে এবং বন্ধ হইতে লাগিল; মন্দিরের গবাক্ষে বসিয়া পায়রা বকম্-বকম্ করিয়া ডাকে, বাহিরে শিমুল-গাছের শাখায় বসিয়া কাঠঠোক্‌রা একঘেয়ে ঠক্‌ঠক্ শব্দ করে, শুষ্ক পত্ররাশির মধ্য দিয়া গিরগিটি সর্‌সর্ শব্দে ছুটিয়া যায়, হঠাৎ একটা উষ্ণবাতাস মাঠের দিক হইতে আসিয়া সমস্ত গাছের পাতার মধ্যে ঝর্‌ঝর্ করিয়া উঠে, এবং হঠাৎ নদীর জল জাগিয়া উঠিয়া ভাঙ্গা ঘাটের সোপানের উপর ছলাৎছলাৎ করিয়া আঘাত করিতে থাকে। এইসমস্ত আকস্মিক অলস শব্দের মধ্যে বহুদূর তরুতল হইতে একটি রাখালের বাঁশিতে মেঠো সুর বাজিতেছে। রাজীব মহামায়ার মুখের দিকে চাহিতে সাহসী না হইয়া মন্দিরের ভিত্তির উপর ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া একপ্রকার শ্রান্ত স্বপ্নাবিষ্টের মত নদীর দিকে চাহিয়া আছে।

কিছুক্ষণ পরে মুখ ফিরাইয়া লইয়া রাজীব আর একবার ভিক্ষুকভাবে মহামায়ার মুখের দিকে চাহিল। মহামায়া মাথা নাড়িয়া কহিল —"না, সে হইতে পারে না।"

মহামায়ার মাথা যেমনি নড়িল, রাজীবের আশাও অমনি ভূমিসাৎ হইয়া গেল। কারণ, রাজীব সম্পূর্ণ জানিত মহামায়ার মাথা মহামায়ার নিজের নিয়মানুসারেই নড়ে, আর কাহারও সাধ্য নাই তাঁহাকে আপন মতে বিচলিত করে। প্রবল কুলাভিমান মহামায়ার বংশে কতকাল হইতে প্রবাহিত হইতেছে—সে কি কখনো রাজীবের মত বংশজ ব্রাহ্মণকে বিবাহ করিতে সম্মত হইতে পারে! ভালবাসা এক এবং বিবাহ করা আর। যাহা হউক্, মহামায়া বুঝিতে পারিল তাহার নিজের বিবেচনা-হীন ব্যবহারেই রাজীবের এতদূর স্পর্দ্ধা বাড়িয়াছে; তৎক্ষণাৎ সে মন্দির ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

রাজীব অবস্থা বুঝিয়া তাড়াতাড়ি কহিল —"আমি কালই এদেশ হইতে চলিয়া যাইতেছি।"

মহামায়া প্রথমে মনে করিয়াছিল যে, ভাবটা দেখাইবে—সে খবরে আমার কি আবশ্যক! কিন্তু পারিল না। পা তুলিতে গিয়া পা উঠিল না—শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল "কেন?"

রাজীব কহিল, আমার সাহেব এখান হইতে সোণাপুরের কুঠিতে বদ্‌লি হইতেছেন, আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন।

মহামায়া আবার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। ভাবিয়া দেখিল দুই জনের জীবনের গতি দুই দিকে—একটা মানুষকে চিরদিন নজরবন্দী করিয়া রাখা যায় না। তাই চাপা ঠোঁট ঈষৎ খুলিয়া কহিল—"আচ্ছা!" সেটা কতকটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের মত শুনাইল।

কেবল এই কথাটুকু বলিয়া মহামায়া পুনশ্চ

গমনোদ্যত হইতেছে—এমন সময় রাজীব চমকিয়া উঠিয়া কহিল—"চাটুয্যে মহাশয়!"

মহামায়া দেখিল, ভবানীচরণ মন্দিরের অভিমুখে আসিতেছে, বুঝিল তাহাদের সন্ধান পাইয়াছে। রাজীব মহামায়ার বিপদের সম্ভাবনা দেখিয়া মন্দিরের ভগ্নভিত্তি দিয়া লাফাইয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিল। মহামায়া সবলে তাহার হাত ধরিয়া আটক করিয়া রাখিল। ভবানীচরণ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন—কেবল একবার নীরবে নিস্তব্ধভাবে উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন!

মহামায়া রাজীবের দিকে চাহিয়া অবিচলিত ভাবে কহিল, "রাজীব, তোমার ঘরেই আমি যাইব। তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করিও।"

ভবানীচরণ নিঃশব্দে মন্দির হইতে বাহির হইলেন, মহামায়াও নিঃশব্দে তাঁহার অনুগমন করিল—আর রাজীব হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—যেন তাহার ফাঁসির হুকুম হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

সেই রাত্রেই ভবানীচরণ একখানা লাল চেলি আনিয়া মহামায়াকে বলিলেন—এইটে পরিয়া আইস।

মহামায়া পরিয়া আসিল। তাহার পর বলিলেন, "আমার সঙ্গে চল।"

ভবানীচরণের আদেশ, এমন কি, সঙ্কেতও কেহ কখন অমান্য করে নাই। মহামায়াও না।

সেই রাত্রে উভয়ে নদীতীরে শ্মশান অভিমুখে চলিলেন। শ্মশান বাড়ি হইতে অধিক দূর নহে। সেখানে গঙ্গাযাত্রীর ঘরে একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করিয়াছিল। তাহারই শয্যাপার্শ্বে উভয়ে গিয়া দাঁড়াইলেন। ঘরের এক কোণে পুরোহিত ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিল, ভবানীচরণ তাহাকে ইঙ্গিত করিলেন। সে অবিলম্বে শুভানুষ্ঠানের আয়োজন করিয়া লইয়া প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল; মহামায়া বুঝিল এই মুমূর্ষুর সহিত তাহার বিবাহ। সে আপত্তির লেশমাত্র প্রকাশ করিল না। দুইটি অদূরবর্ত্তী চিতার আলোকে অন্ধকারপ্রায় গৃহে মৃত্যুযন্ত্রণার আর্ত্তধ্বনির সহিত অস্পষ্ট মন্ত্রোচ্চারণ মিশ্রিত করিয়া মহামায়ার বিবাহ হইয়া গেল।

যে দিন বিবাহ তাহার পরদিনই মহামায়া বিধবা হইল। এই দুর্ঘটনায় বিধবা অতিমাত্র শোক অনুভব করিল না—এবং রাজীবও মহামায়ার অকস্মাৎ বিবাহসংবাদে যেরূপ বজ্রাহত হইয়াছিল, বৈধব্যসংবাদে সেরূপ হইল না। এমন কি, কিঞ্চিৎ প্রফুল্ল বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু সে ভাব অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। দ্বিতীয় আর একটা বজ্রাঘাতে রাজীবকে একবারে ভূপাতিত করিয়া ফেলিল। সে সংবাদ পাইল, শ্মশানে আজ ভারি ধূম। মহামায়া সহমৃতা হইতেছে।

প্রথমেই সে ভাবিল, সাহেবকে সংবাদ দিয়া তাঁহার সাহায্যে এই নিদারুণ ব্যাপার বলপূর্ব্বক রহিত করিবে। তাহার পরে মনে পড়িল, সাহেব আজই বদলি হইয়া সোণাপুরে রওনা হইয়াছে—রাজীবকেও সঙ্গে লইতে চাহিয়াছিল কিন্তু রাজীব একমাসের ছুটি লইয়া থাকিয়া গেছে।

মহামায়া তাহাকে বলিয়াছে "তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করিও।" সে কথা সে কিছুতেই লঙ্ঘন করিতে পারে না। আপাততঃ এক-মাসের ছুটি লইয়াছে, আবশ্যক হইলে দুই মাস, ক্রমে তিন মাস এবং অবশেষে সাহেবের কর্ম

ছাড়িয়া দিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া খাইবে, তবু চিরজীবন অপেক্ষা করিতে ছাড়িবে না।

রাজীব যখন পাগলের মত ছুটিয়া হয় আত্মহত্যা, নয় একটা কিছু করিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় সন্ধ্যাকালে মুষলধারায় বৃষ্টির সহিত একটা প্রলয়-ঝড় উপস্থিত হইল। এম্‌নি ঝড় যে, রাজীবের মনে হইল বাড়ি মাথার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িবে। যখন দেখিল, বাহ্যপ্রকৃতিতেও তাহার অন্তরের অনুরূপ একটা মহাবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, তখন সে যেন কতকটা শান্ত হইল। তাহার মনে হইল, সমস্ত প্রকৃতি তাহার হইয়া একটা কোনরূপ প্রতিবিধান করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। সে নিজে যতটা শক্তিপ্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করিত মাত্র কিন্তু পারিত না, প্রকৃতি আকাশ-পাতাল জুড়িয়া ততটা শক্তিপ্রয়োগ করিয়া কাজ করিতেছে।

এমন সময়ে বাহির হইতে সবলে কে দ্বার ঠেলিল। রাজীব তাড়াতাড়ি খুলিয়া দিল। ঘরের মধ্যে আর্দ্রবস্ত্রে একটি স্ত্রীলোক প্রবেশ করিল, তাহার মাথায় সমস্ত মুখ ঢাকিয়া ঘোম্‌টা। রাজীব তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিল, সে মহামায়া।

উচ্ছ্বসিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"মহামায়া, তুমি চিতা হইতে উঠিয়া আসিয়াছ?"

মহামায়া কহিল "হাঁ! আমি তোমার কাছে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, তোমার ঘরে আসিব। সেই অঙ্গীকার পালন করিতে আসিয়াছি। কিন্তু রাজীব, আমি ঠিক সে আমি নাই, আমার সমস্ত পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। কেবল আমি মনে মনে সেই মহামায়া আছি। এখনো বল, এখনো আমার চিতায় ফিরিয়া যাইতে পারিব। আর যদি প্রতিজ্ঞা কর কখনো আমার ঘোম্‌টা খুলিবে না, আমার মুখ দেখিবে না—তবে আমি তোমার ঘরে থাকিতে পারি।"

মৃত্যুর হাত হইতে ফিরিয়া পাওয়াই যথেষ্ট, তখন আর সমস্তই তুচ্ছজ্ঞান হয়। রাজীব তাড়াতাড়ি কহিল "তুমি যেমন ইচ্ছা তেমনি করিয়া থাকিও—আমাকে ছাড়িয়া গেলে আর আমি বাঁচিব না।"

মহামায়া কহিল "তবে এখনি চল—তোমার সাহেব যেখানে বদ্‌লি হইয়াছে সেইখানে যাই।"

ঘরে যাহা কিছু ছিল সমস্ত ফেলিয়া রাজীব মহামায়াকে লইয়া সেই ঝড়ের মধ্যে বাহির হইল। এমনি ঝড় যে দাঁড়ান কঠিন—ঝড়ের বেগে কঙ্কর উড়িয়া আসিয়া ছিটাগুলির মত গায়ে বিঁধিতে লাগিল। মাথার উপরে গাছ ভাঙ্গিয়া পড়িবার ভয়ে পথ ছাড়িয়া উভয়ে খোলা মাঠ দিয়া চলিতে লাগিল। বায়ুর বেগ পশ্চাৎ হইতে আঘাত করিল। যেন ঝড়ে লোকালয় হইতে দুইটা মানুষকে ছিন্ন করিয়া প্রলয়ের দিকে উড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

গল্পটা পাঠকেরা নিতান্ত অমূলক অথবা অলৌকিক মনে করিবেন না। যখন সহমরণ-প্রথা প্রচলিত ছিল, তখন এমন ঘটনা কদাচিৎ মাঝে মাঝে ঘটিতে শুনা গিয়াছে।

মহামায়ার হাত পা বাঁধিয়া তাহাকে চিতায় সমর্পণ করিয়া যথাসময়ে অগ্নিপ্রয়োগ করা হইয়াছিল। অগ্নিও ধূ ধূ করিয়া ধরিয়া উঠিয়াছে, এমন সময়ে প্রচণ্ড ঝড় ও মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। যাহারা দাহ করিতে আসিয়াছিল তাহারা তাড়াতাড়ি গঙ্গাযাত্রীর

ঘরে আশ্রয় লইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। বৃষ্টিতে চিতানল নিবিতে বিলম্ব হইল না। ইতিমধ্যে মহামায়ার হাতের বন্ধন ভস্ম হইয়া তাহার হাত দুটি মুক্ত হইয়াছে। অসহ্য দাহযন্ত্রণায় একটিমাত্র কথা না কহিয়া মহামায়া উঠিয়া বসিয়া পায়ের বন্ধন খুলিল। তাহার পর, স্থানে স্থানে দগ্ধ বস্ত্রখণ্ড গাত্রে জড়াইয়া উলঙ্গপ্রায় মহামায়া চিতা হইতে উঠিয়া প্রথমে আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিল। গৃহে কেহই ছিল না, সকলেই শ্মশানে। প্রদীপ জ্বালিয়া একখানি কাপড় পরিয়া মহামায়া একবার দর্পণে মুখ দেখিল। দর্পণ ভূমিতে আছাড়িয়া ফেলিয়া একবার কি ভাবিল। তাহার পর মুখের উপর দীর্ঘ ঘোম্‌টা টানিয়া অদূরবর্ত্তী রাজীবের বাড়ি গেল। তাহার পর কি ঘটিল পাঠকের অগোচর নাই।

মহামায়া এখন রাজীবের ঘরে, কিন্তু রাজীবের জীবনে সুখ নাই। অধিক নহে, উভয়ের মধ্যে কেবল একখানি মাত্র ঘোম্‌টার ব্যবধান। কিন্তু সেই ঘোম্‌টাটুকু মৃত্যুর-ন্যায় চিরস্থায়ী, অথচ মৃত্যুর অপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক। কারণ নৈরাশ্যে মৃত্যুর বিচ্ছেদ-বেদনাকে কাল-ক্রমে অসাড় করিয়া ফেলে, কিন্তু এই ঘোম্‌টার বিচ্ছেদটুকুর মধ্যে একটি জীবন্ত আশা প্রতি-দিন প্রতিমুহূর্ত্তেই পীড়িত হইতেছে।

একে মহামায়ার চিরকালই একটা নিস্তব্ধ নীরব ভাব আছে, তাহাতে এই ঘোম্‌টার ভিতরকার নিস্তব্ধতা দ্বিগুণ দুঃসহ বোধ হয়। সে যেন একটা মৃত্যুর মধ্যে আবৃত হইয়া বাস করিতেছে। এই নিস্তব্ধ মৃত্যু রাজীবের জীবনকে আলিঙ্গন করিয়া প্রতিদিন যেন বিশীর্ণ করিতে লাগিল। রাজীব পূর্ব্বে যে মহামায়াকে জানিত তাহাকেও হারাইল এবং তাহার সেই আশৈশব সুন্দর স্মৃতিকে যে আপনার সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবে, এই ঘোম্‌টাচ্ছন্ন মূর্ত্তি চিরদিন পার্শ্বে থাকিয়া নীরবে তাহাতেও বাধা দিতে লাগিল। রাজীব ভাবিত, মানুষে মানুষে স্বভাবতই যথেষ্ট ব্যবধান আছে—বিশেষতঃ মহামায়া পুরাণ-বর্ণিত কর্ণের মত সহজ কবচধারী—সে আপনার স্বভাবের চারিদিকে একটা আবরণ লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহার পর মাঝে আবার যেন আর একবার জন্মগ্রহণ করিয়া আবার আরো একটা আবরণ লইয়া আসিয়াছে, অহরহ পার্শ্বে থাকিয়াও সে এত দূরে চলিয়া গিয়াছে যে, রাজীব যেন আর তাহার নাগাল পায় না—কেবল একটা মায়াগণ্ডীর বাহিরে বসিয়া অতৃপ্ত তৃষিত হৃদয়ে এই সূক্ষ্ম অথচ অটল রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছে—নক্ষত্র যেমন প্রতিরাত্রি নিদ্রাহীন নির্নিমেষ নতনেত্রে অন্ধকার নিশীথিনীকে ভেদ করিবার প্রয়াসে নিষ্ফলে নিশিযাপন করে।

এমনি করিয়া এই দুই সঙ্গীহীন একক প্রাণী কতকাল একত্র যাপন করিল।

একদিন বর্ষাকালে শুক্লপক্ষ দশমীর রাত্রে প্রথম-মেঘ কাটিয়া চাঁদ দেখা দিল। নিস্পন্দ জ্যোৎস্না-রাত্রি সুপ্ত পৃথিবীর শিয়রে জাগিয়া বসিয়া রহিল। সে রাত্রে নিদ্রাত্যাগ করিয়া রাজীবও আপনার জানালায় বসিয়া ছিল। গ্রীষ্মক্লিষ্ট বন হইতে একটা গন্ধ এবং ঝিল্লির শ্রান্তরব তাহার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিতেছিল। রাজীব দেখিতেছিল অন্ধকার তরু-শ্রেণীর প্রান্তে শান্ত সরোবর একখানি মার্জ্জিত রূপার পাতের মত ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। মানুষ এ রকম সময় স্পষ্ট একটা কোন কথা ভাবে কি না বলা শক্ত। কেবল তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ একটা কোন দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে—বনের মত একটা গন্ধোচ্ছ্বাস দেয়, রাত্রির মত একটা ঝিল্লিধ্বনি করে। রাজী

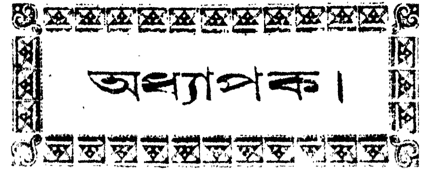
কি ভাবিল জানি না, কিন্তু তাহার মনে হইল আজ যেন সমস্ত পূর্ব্ব নিয়ম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আজ বর্ষারাত্রি তাহার মেঘাবরণ খুলিয়া ফেলিয়াছে এবং আজিকার এই নিশীথিনীকে সেকালের সেই মহামায়ার মত নিস্তব্ধ সুন্দর এবং সুগম্ভীর দেখাইতেছে। তাহার সমস্ত অস্তিত্ব সেই মহামায়ার দিকে একযোগে ধাবিত হইল।

স্বপ্নচালিতের মত উঠিয়া রাজীব মহামায়ার শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ করিল। মহামায়া তখন ঘুমাইতেছিল।

রাজীব কাছে গিয়া দাঁড়াইল—মুখ নত করিয়া দেখিল—মহামায়ার মুখের উপর জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু হায়, এ কি! সে চিরপরিচিত মুখ কোথায়! চিতানলশিখা তাহার নিষ্ঠুর লেলিহান রসনায় মহামায়ার বামগণ্ড হইতে কিয়দংশ সৌন্দর্য্য একেবারে লেহন করিয়া লইয়া আপনার ক্ষুধার চিহ্ন রাখিয়া গেছে।

বোধ করি রাজীব চমকিয়া উঠিয়াছিল, বোধ করি একটা অব্যক্ত ধ্বনিও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া থাকিবে। মহামায়া চমকিয়া জাগিয়া উঠিল—দেখিল সম্মুখে রাজীব। তৎক্ষণাৎ ঘোমটা টানিয়া শয্যা ছাড়িয়া একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইল। রাজীব বুঝিল এই বার বজ্র উদ্যত হইয়াছে। ভূমিতে পড়িল—পায়ে ধরিয়া কহিল, "আমাকে ক্ষমা কর।"

মহামায়া একটি উত্তরমাত্র না করিয়া মুহূর্ত্তের জন্য পশ্চাতে না ফিরিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। রাজীবের ঘরে আর সে প্রবেশ করিল না। কোথাও তাহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না। সেই ক্ষমাহীন চিরবিদায়ের নীরব ক্রোধানল রাজীবের সমস্ত ইহজীবনে একটি সুদীর্ঘ দগ্ধচিহ্ন রাখিয়া দিয়া গেল।



অধ্যাপক।

কালেজে আমার সহপাঠী সম্প্রদায়ের মধ্যে আমার একটু বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। সকলেই আমাকে সকল বিষয়েই সমজদার বলিয়া মনে করিত।

ইহার প্রধান কারণ—ভুল হউক আর ঠিক হউক সকল বিষয়েই আমার একটা মতামত ছিল। অধিকাংশ লোকেই হাঁ এবং না জোর করিয়া বলিতে পারে না আমি সেটা খুব বলিতাম।

কেবল যে আমি মতামত লইয়া ছিলাম তাহা নহে, নিজেও রচনা করিতাম; বক্তৃতা দিতাম, কবিতা লিখিতাম, সমালোচনা করিতাম—এবং সর্ব্বপ্রকারেই আমার সহপাঠিদের ঈর্ষা ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলাম।

কালেজে এইরূপে শেষ পর্য্যন্ত আপন মহিমা মহীয়ান্ রাখিয়া বাহির হইয়া আসিতে পারিতাম। কিন্তু ইতিমধ্যে আমার খ্যাতিস্থানের শনি এক নূতন অধ্যাপকের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কলেজে উদিত হইল।

আমাদের তখনকার সেই নবীন অধ্যাপকটি আজ কালকার একজন সুবিখ্যাত লোক,—অতএব আমার এই জীবনবৃত্তান্তে তাঁহার নাম গোপন করিলেও তাঁহার উজ্জ্বল নামের বিশেষ ক্ষতি হইবে না। আমার প্রতি তাঁহার আচরণ লক্ষ্য করিয়া বর্ত্তমান ইতিহাসে তাঁহাকে বামাচরণ বাবু বলিয়া ডাকা যাইবে।

ইহার বয়স যে আমাদের অপেক্ষা অধিক ছিল তাহা নহে; অল্পদিন হইল এম, এ পরী

ক্ষায় প্রথম হইয়া টনি সাহেবের বিশেষ প্রশংসালাভ করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছেন; কিন্তু লোকটি ব্রাহ্ম বলিয়া কেমন তাঁহাকে অত্যন্ত সুদূর এবং স্বতন্ত্র মনে হইত—আমাদের সমকালীন সমবয়স্ক বলিয়া বোধ হইত না। আমরা নব্য হিন্দুর দল পরস্পরের মধ্যে তাঁহাকে ব্রহ্মদৈত্য বলিয়া ডাকিতাম।

আমাদের একটি তর্কসভা ছিল। আমিই সে সভার বিক্রমাদিত্য এবং আমিই সে সভার নবরত্ন ছিলাম। আমরা ছত্রিশ জন সভ্য ছিলাম, তন্মধ্যে পঁয়ত্রিশ জনকে গণনা হইতে বাদ দিলে কোন ক্ষতি হইত না, এবং অবশিষ্ট এক জনের যোগ্যতা সম্বন্ধে আমার যেরূপ ধারণা উক্ত পঁয়ত্রিশ জনেরও সেইরূপ ধারণা ছিল।

এই সভার বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে আমি কার্লাইলের সমালোচনা করিয়া এক ওজস্বী প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলাম। মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তাহার অসাধারণত্বে শ্রোতা-মাত্রেই চমৎকৃত হইবে। চমৎকৃত হইবার কথা ছিল—কারণ, আমার প্রবন্ধে কার্লাইলকে আদ্যোপান্ত নিন্দা করিয়াছিলাম।

সে অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন বামাচরণ বাবু। প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে আমার সহাধ্যায়ী ভক্তগণ আমার মতের অসমসাহসিকতা, ও ইংরাজিভাষার বিশুদ্ধ তেজস্বিতায় বিমুগ্ধ ও নিরুত্তর হইয়া বসিয়া রহিল। কাহারও কিছু বক্তব্য নাই শুনিয়া বামাচরণ বাবু উঠিয়া শান্ত গম্ভীর স্বরে সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিলেন যে আমেরিকার সুলেখক সুবিখ্যাত লাউয়েল্ সাহেবের প্রবন্ধ হইতে আমার প্রবন্ধটির যে অংশ চুরি সে অংশ অতি চমৎকার, এবং যে অংশ আমার সম্পূর্ণ নিজের সেটুকু পরিত্যাগ করিলেই ভাল হইত।

যদি তিনি বলিতেন, লাউয়েলের সহিত নবীন প্রবন্ধ লেখকের মতের এমন কি ভাষারও আশ্চর্য্য অবিকল ঐক্য দেখা যাইতেছে তাহা হইলে তাঁহার কথাটা সত্যও হইত অথচ অপ্রিয়ও হইত না।

এই ঘটনার পর, সহপাঠীমহলে আমার প্রতি যে অখণ্ড বিশ্বাস ছিল তাহাতে একটি বিদারণরেখা পড়িল। কেবল আমার চিরানুরক্ত ভক্তাগ্রগণ্য অমূল্যচরণের হৃদয়ে লেশমাত্র বিকার জন্মিল না। সে আমাকে বারংবার বলিতে লাগিল, তোমার বিদ্যাপতি নাটকখানা ব্রহ্মদৈত্যকে শুনাইয়া দাও, দেখি সে সম্বন্ধে নিন্দুক কি বলিতে পারে!

রাজা শিবসিংহের মহিষী লছিমাদেবীকে কবি বিদ্যাপতি ভালবাসিতেন এবং তাঁহাকে না দেখিলে তিনি কবিতা-রচনা করিতে পারিতেন না। এই মর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আমি একখানি পরম শোকাবহ উচ্চশ্রেণীর পদ্যনাটক রচনা করিয়াছিলাম। আমার শ্রোতৃবর্গের মধ্যে যাঁহারা পুরাতত্ত্বের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে চাহেন না তাঁহারা বলিতেন ইতিহাসে এরূপ ঘটনা ঘটে নাই। আমি বলিতাম, সে ইতিহাসের দুর্ভাগ্য!—ঘটিলে ইতিহাস ঢের বেশী সরস ও সত্য হইত।

নাটকখানি যে উচ্চশ্রেণীর, সে কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অমূল্য বলিত সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর। আমি আপনাকে যতটা মনে করিতাম, সে আবার আমাকে তাহারও চেয়ে বেশী মনে করিত। অতএব আমার যে কি এক বিরাটরূপ তাহার চিত্তে প্রতিফলিত ছিল আমিও তাহার ইয়ত্তা করিতে পারিতাম না।

নাটকখানি বামাচরণ বাবুকে শুনাইয়া দিবার পরামর্শ আমার কাছে মন্দ লাগিল না—কারণ, সে নাটকে নিন্দাযোগ্য ছিদ্র লেশমাত্র

ছিল না এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাস। অতএব আর এক দিন তর্কসভার বিশেষ অধিবেশন আহূত হইল—ছাত্রবৃন্দের সমক্ষে আমি আমার নাটকখানি পাঠ করিলাম এবং বামাচরণ বাবু তাহার সমালোচনা করিলেন।

সে সমালোচনাটি বিস্তারিত আকারে লিপিবদ্ধ করিবার প্রবৃত্তি আমার নাই। সংক্ষেপতঃ—সমালোচনাটি আমার অনুকূল হয় নাই; বামাচরণ বাবুর মতে নাটকগত পাত্রগণের চরিত্র ও মনোভাব সকল নির্দ্দিষ্ট বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। বড় বড় সাধারণ ভাবের কথা আছে, কিন্তু তাহা বাষ্পবৎ অনিশ্চিত—লেখকের অন্তরের মধ্যে আকার ও জীবন প্রাপ্ত হইয়া তাহা সৃজিত হইয়া উঠে নাই।

বৃশ্চিকের পুচ্ছদেশেই হুল্ থাকে—বামাচরণ বাবুর সমালোচনার উপসংহারেই তীব্রতম বিষ সঞ্চিত ছিল। আসনগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তিনি বলিলেন, আমার এই নাটকের অনেকগুলি দৃশ্য এবং মূলভাবটি গেটে-রচিত টাসো নাটকের অনুকরণ, এমন কি, অনেক স্থলে অনুবাদ।

এ কথার সদুত্তর ছিল। আমি বলিতে পারিতাম, হৌক্ অনুকরণ, কিন্তু সেটা নিন্দার বিষয় নহে। সাহিত্য রাজ্যে চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা—এমন কি, ধরা পড়িলেও। সাহিত্যের বড় বড় মহাজনগণ এই কাজ করিয়া আসিয়াছেন—এমন কি, শেক্স্পিয়রও বাদ যান্ না। সাহিত্যে যাহার ওরিজিন্যালিটি অত্যন্ত অধিক, সেই চুরি করিতে সাহস করে—কারণ, সে পরের জিনিষকে সম্পূর্ণ আপনার করিতে পারে।

ভাল ভাল এইরূপ আরও অনেক কথা ছিল—কিন্তু সে দিন বলা হয় নাই। বিনয় তাহার কারণ নহে। আসল কথা সে দিন একটি কথাও মনে পড়ে নাই। প্রায় পাঁচ সাত দিন পরে একে একে উত্তর গুলি দৈবাগত ব্রহ্মাস্ত্রের ন্যায় আমার মনে উদয় হইতে লাগিল;—কিন্তু শত্রুপক্ষ সম্মুখে উপস্থিত না থাকাতে সে অস্ত্রগুলি আমাকেই বিঁধিয়া মারিল। ভাবিতাম একথাগুলো অন্ততঃ আমার ক্লাশের ছাত্রদিগকে শুনাইয়া দিব। কিন্তু উত্তরগুলি আমার সহাধ্যায়ী গর্দ্দভদিগের বুদ্ধির পক্ষে কিছু অতিমাত্র সূক্ষ্ম ছিল। তাহারা জানিত চুরি মাত্রেই চুরি; আমার চুরি এবং অন্যের চুরিতে যে কতটা প্রভেদ আছে তাহা বুঝিবার সামর্থ্য যদি তাহাদের থাকিত তবে আমার সহিতও তাহাদের বিশেষ প্রভেদ থাকিত না।

বি, এ, পরীক্ষা দিলাম—পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিব তাহাতেও আমার সন্দেহ ছিল না কিন্তু মনে আনন্দ রহিল না। বামাচরণের সেই গুটিকতক কথার আঘাতে আমার সমস্ত খ্যাতি ও আশার অভ্রভেদী মন্দির ভগ্নস্তূপ হইয়া পড়িল। কেবল আমার প্রতি অবোধ অমূল্যের শ্রদ্ধা কিছুতেই হ্রাস হইল না;—প্রভাতে যখন যশঃসূর্য্য আমার সম্মুখে উদিত ছিল তখনও সেই শ্রদ্ধা অতি দীর্ঘ ছায়ার ন্যায় আমার পদতললগ্ন হইয়াছিল, আবার সায়াহ্নে যখন আমার যশঃসূর্য্য পশ্চাতে অস্তোন্মুখ হইল তখনও সেই শ্রদ্ধা দীর্ঘায়তন বিস্তার করিয়া আমার পদপ্রান্ত পরিত্যাগ করিল না। কিন্তু এ শ্রদ্ধায় কোন পরিতৃপ্তি নাই—ইহা শূন্য ছায়ামাত্র—ইহা মূঢ় ভক্ত হৃদয়ের মোহান্ধকার—ইহা বুদ্ধির উজ্জ্বল রশ্মিপাত নহে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—৺৺—

বাবা, বিবাহ দিবার জন্য আমাকে দেশ হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি কিছুদিন সময় লইলাম।

বামাচরণ বাবুর সমালোচনায় আমার নিজের মধ্যে একটা আত্মবিরোধ, নিজের প্রতি নিজের একটা বিদ্রোহভাব জন্মিয়াছিল। আমার সমালোচক অংশ আমার লেখক অংশকে গোপনে আঘাত দিতেছিল। আমার লেখক অংশ বলিতেছিল, আমি ইহার প্রতিশোধ লইব; আবার একবার লিখিব, এবং তখন দেখিব আমি বড়, না, আমার সমালোচক বড়!

মনে মনে স্থির করিলাম, বিশ্বপ্রেম, পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন, এবং শত্রুকে মার্জ্জনা—এই ভাবটি অবলম্বন করিয়া গদ্যে হৌক্ পদ্যে হৌক্ খুব "সারাইম্" গোছের একটা কিছু লিখিব; বাঙ্গালী সমালোচকদিগকে সুবৃহৎ সমালোচনার খোরাক যোগাইব।

স্থির করিলাম, একটি সুন্দর নির্জ্জন স্থানে বসিয়া আমার জীবনের এই সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তিটির সৃষ্টিকার্য্য সমাধা করিব। প্রতিজ্ঞা করিলাম, অন্ততঃ একমাস কাল বন্ধুবান্ধব পরিচিত অপরিচিত কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিব না।

অমূল্যকে ডাকিয়া আমার প্ল্যান বলিলাম। সে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল,—সে যেন তখনি আমার ললাটে স্বদেশের অনতিদূরবর্ত্তী ভাবী মহিমার প্রথম অরুণজ্যোতি দেখিতে পাইল। গম্ভীর মুখে আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বিস্ফারিত নেত্র আমার মুখের প্রতি স্থাপন করিয়া মৃদুস্বরে কহিল—যাও ভাই অমর কীর্ত্তি অক্ষয় গৌরব অর্জ্জন করিয়া আইস!

আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল; মনে হইল যেন আসন্নগৌরবগর্ব্বিত ভক্তিবিহ্বল বঙ্গদেশের প্রতিনিধি হইয়া অমূল্য এই কথাগুলি আমাকে বলিল।

অমূল্যও বড় কম ত্যাগস্বীকার করিল না। সে স্বদেশের হিতের জন্য সুদীর্ঘ একমাস কাল আমার সঙ্গপ্রত্যাশা সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন করিল। সুগভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আমার বন্ধু ট্রামে চড়িয়া তাহার কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের বাসায় চলিয়া গেল, আমি গঙ্গার ধারে ফরাস্‌ডাঙ্গার বাগানে অমর কীর্ত্তি অক্ষয়গৌরব উপার্জ্জন করিতে গেলাম।

গঙ্গার ধারে নির্জ্জন ঘরে চিৎ হইয়া শুইয়া বিশ্বজনীন প্রেমের কথা ভাবিতে ভাবিতে মধ্যাহ্নে প্রগাঢ় নিদ্রাবেশ হইত—একেবারে অপরাহ্ণে পাঁচটার সময় জাগিয়া উঠিতাম। তাহার পর শরীর মনটা কিছু অবসাদগ্রস্ত হইয়া থাকিত; কোনমতে চিত্তবিনোদন ও সময় যাপনের জন্য বাগানের পশ্চাদ্দিকে রাজপথের ধারে একটা ছোট কাষ্ঠাসনে বসিয়া চুপচাপ করিয়া গোরুরগাড়ি ও লোকচলাচল দেখিতাম। নিতান্ত অসহ্য হইলে ষ্টেসনে গিয়া বসিতাম—টেলিগ্রাফের কাঁটা কট্‌কট্ শব্দ করিত, টিকিটের ঘণ্টা বাজিত, লোকসমাগম হইত, রক্তচক্ষু সহস্রপদ লৌহ সরীসৃপ ফুঁসিতে ফুঁসিতে আসিত, উৎকট চীৎকার করিয়া চলিয়া যাইত, লোকজনের হুড়ামুড়ি পড়িত—কিয়ৎক্ষণের জন্য কৌতুক বোধ করিতাম। বাড়ি ফিরিয়া আহার করিয়া সঙ্গী অভাবে সকাল সকাল শুইয়া পড়িতাম—এবং প্রাতঃকালে সকাল সকাল উঠিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন না থাকাতে বেলা, আট নয়টা পর্য্যন্ত বিছানায় যাপন করিলাম।

শরীর মাটি হইল, বিশ্বপ্রেমেরও কোনও

অন্ধি সন্ধি খুঁজিয়া পাইলাম না। কোনকালে একা থাকা অভ্যাস না থাকাতে সঙ্গীহীন গঙ্গাতীর শূন্যশ্মশানের মত বোধ হইতে লাগিল ;—অমূল্যটাও এম্‌নি গর্দ্দভ যে, একদিনের জন্যও সে আপন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিল না।

ইতিপূর্ব্বে কলিকাতায় বসিয়া ভাবিতাম, বিপুলচ্ছায়া বটবৃক্ষের তলে পা ছড়াইয়া বসিব, পদপ্রান্তে কলনাদিনী স্রোতস্বিনী আপন মনে বহিয়া চলিবে—মাঝখানে স্বপ্নাবিষ্ট কবি, এবং চারিদিকে তাহার ভাবরাজ্য ও বহিঃপ্রকৃতি কাননে পুষ্প, শাখায় বিহঙ্গ, আকাশে তারা, মনের মধ্যে বিশ্বজনীন্ প্রেম এবং লেখনীর মুখে অশ্রান্ত অজস্র ভাবস্রোত বিচিত্র ছন্দে প্রবাহিত। কিন্তু কোথায় প্রকৃতি এবং কোথায় প্রকৃতির কবি—কোথায় বিশ্ব আর কোথায় বিশ্বপ্রেমিক। একদিনের জন্য বাগানে বাহির হই নাই। কাননের ফুল কাননে ফুটিত, আকাশের তারা আকাশে উঠিত, বটবৃক্ষের ছায়া বটবৃক্ষের তলে পড়িত—আমিও ঘরের ছেলে ঘরেই পড়িয়া থাকিতাম।

আত্মমাহাত্ম্য কিছুতেই প্রমাণ করিতে না পারিয়া বামাচরণের প্রতি আক্রোশ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

সে সময়টাতে বাল্যবিবাহ লইয়া বাঙ্গালার শিক্ষিতসমাজে একটা বাগ্‌যুদ্ধ বাধিয়াছিল। বামাচরণ বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধ পক্ষে ছিলেন এবং পরস্পর শোনা গিয়া ছিল যে, তিনি একটি যুবতী কুমারীর প্রণয়পাশে আবদ্ধ এবং অচিরে পরিণয় পাশে বদ্ধ হইবার প্রত্যাশায় আছেন।

বিষয়টা আমার কাছে অত্যন্ত কৌতুকাবহ ঠেকিয়াছিল, এবং বিশ্বপ্রেমের মহাকাব্যও ধরা দিল না,—তাই বসিয়া বসিয়া বামাচরণকে নায়কের আদর্শ করিয়া কনকবলি মজুমদার নামক একটি কাল্পনিক যুবতীকে নায়িকা খাড়া করিয়া সুতীব্র এক প্রহসন লিখিলাম। লেখনী এই অমর কীর্ত্তিটি প্রসব করিবার পর আমি কলিকাতা যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। এমন সময় যাত্রায় ব্যাঘাত পড়িল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

একদিন অপরাহ্ণে ষ্টেশনে না গিয়া অলসভাবে বাগানবাড়ির ঘরগুলি পরিদর্শন করিতেছিলাম। আবশ্যক না হওয়াতে ইতিপূর্ব্বে অধিকাংশ ঘরে পদার্পণ করি নাই—বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে আমার কৌতূহল বা অভিনিবেশ লেশমাত্র ছিল না। সে দিন নিতান্তই সময়যাপনের উদ্দেশে বায়ুভরে উড্ডীন চ্যুতপত্রের মত ইতস্ততঃ ফিরিতেছিলাম।

উত্তরদিকের ঘরের দরজা খুলিবামাত্র একটি ক্ষুদ্র বারান্দায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। বারান্দার সম্মুখেই বাগানের উত্তর সীমার প্রাচীরের গাত্রসংলগ্ন দুইটি বৃহৎ জামের গাছ মুখামুখী করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সেই দুইটি গাছের মধ্যবর্ত্তী অবকাশ দিয়া আর একটি বাগানের সুদীর্ঘ বকুলবীথির কিয়দংশ দেখা যায়।

কিন্তু সে সমস্তই আমি পরে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম—তখন আমার আর কিছু দেখিবার অবসর হয় নাই, কেবল দেখিয়াছিলাম একটি ষোড়শী যুবতী হাতে একখানি বই লইয়া মস্তক আনমিত করিয়া পদচারণা করিতে করিতে অধ্যয়ন করিতেছে।

ঠিক সে সময়ে কোনরূপ তত্ত্বালোচন করিবার ক্ষমতা ছিল না—কিন্তু কিছুদিন পরে ভাবিয়াছিলাম যে, দুষ্যন্ত বড় বড় বাণ শরাসন

বাগাইয়া রথে চড়িয়া বনে মৃগয়া করিতে আসিয়াছিলেন, মৃগ ত মরিল না, মাঝে হইতে দৈবাৎ দশমিনিট কাল গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া যাহা দেখিলেন যাহা শুনিলেন তাহাই তাঁহার জীবনের সকল দেখাশুনার সেরা হইয়া দাঁড়াইল। আমিও পেন্সিল কলম এবং খাতাপত্র উদ্যত করিয়া কাব্যমৃগয়ায় বাহির হইয়াছিলাম, বিশ্বপ্রেম বেচারা ত পালাইয়া রক্ষা পাইল, আর আমি দুইটি জামগাছের আড়াল হইতে যাহা দেখিবার তাহা দেখিয়া লইলাম; মানুষের একটা জীবনে এমন দুইবার দেখা যায় না!

পৃথিবীতে অনেক জিনিষই দেখি নাই। জাহাজে উঠি নাই, বেলুনে চড়ি নাই, কয়লার খনির মধ্যে নামি নাই—কিন্তু আমার নিজের মানুষী আদর্শের সম্বন্ধে আমি যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং অজ্ঞ ছিলাম তাহা এই উত্তরদিকের বারান্দায় আসিবার পূর্ব্বে সন্দেহমাত্র করি নাই। বয়স একুশ প্রায় উত্তীর্ণ হয়, ইতিমধ্যে আমার অন্তঃকরণ কল্পনাযোগবলে নারীসৌন্দর্য্যের একটা ধ্যানমূর্ত্তি যে সৃজন করিয়া লয় নাই একথা বলিতে পারি না। সেই মূর্ত্তিকে নানা বেশভূষায় সজ্জিত এবং নানা অবস্থার মধ্যে স্থাপন করিয়াছি কিন্তু কখনো সুদূর স্বপ্নেও তাহার পায়ে জুতা গায়ে জামা হাতে বই দেখিব এমন আশাও করি নাই, ইচ্ছাও করি নাই—কিন্তু আমার লক্ষ্মী ফাল্গুণশেষের অপরাহ্ণে প্রবীণ তরুশ্রেণীর আকম্পিত ঘনপল্লববিতানে দীর্ঘনিপতিত ছায়া এবং আলোকরেখাঙ্কিত পুষ্পবনপথে জুতা পায়ে দিয়া জামা গায়ে দিয়া বই হাতে করিয়া দুইটি জামগাছের আড়ালে অকস্মাৎ দেখা দিলেন—আমিও কোন কথাটি কহিলাম না।

দুই মিনিটের বেশী আর দেখা গেল না। নানা ছিদ্র দিয়া দেখিবার নানা চেষ্টা করিলাম কিন্তু কোন ফল পাই নাই। সেইদিন প্রথম সন্ধ্যার প্রাক্কালে বটবৃক্ষতলে প্রসারিতচরণে বসিলাম—আমার চোখের সম্মুখে পরপারের ঘনীভূত তরুশ্রেণীর উপর সন্ধ্যাতারা প্রশান্ত স্মিতহাস্যে উদিত হইল—এবং দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা-শ্রী আপন নাথহীন বিপুল নির্জ্জন বাসরগৃহের দ্বার খুলিয়া দিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল।

যে বই খানি তাহার হাতে দেখিয়াছিলাম সেটা আমার পক্ষে একটা নূতন রহস্যনিকেতন হইয়া দাঁড়াইল। ভাবিতে লাগিলাম, সেটা কি বই? উপন্যাস অথবা কাব্য? তাহার মধ্যে কি ভাবের কথা আছে? যে পাতাটি খোলা ছিল, এবং যাহার উপরে সেই অপরাহ্ণ বেলার ছায়া ও রবিরশ্মি, সেই বকুলবনের পল্লবমর্ম্মর এবং সেই যুগলচক্ষুর ঔৎসুক্যপূর্ণ স্থিরদৃষ্টি নিপতিত হইয়াছিল, ঠিক সেই পাতাটিতে গল্পের কোন্ অংশ কাব্যের কোন্ রসটুকু প্রকাশ পাইতেছিল? সেই সঙ্গে ভাবিতে লাগিলাম, ঘনমুক্ত কেশজালের অন্ধকারচ্ছায়াতলে সুকুমার ললাটমণ্ডপটির অভ্যন্তরে বিচিত্র ভাবের আবেশ কেমন করিয়া লীলায়িত হইয়া উঠিতেছিল, কুমারী-হৃদয়ে নিভৃত নির্জ্জনতার উপরে নব নব কাব্যমায়া কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যলোক সৃজন করিতেছিল—অর্দ্ধেক রাত্রি ধরিয়া এমন কত কি ভাবিয়াছিলাম তাহা পরিস্ফুটরূপে ব্যক্ত করা অসম্ভব।

কিন্তু সে যে কুমারী একথা আমাকে কে বলিল? আমার বহু পূর্ব্ববর্ত্তী প্রেমিক দুষ্যন্তকে পরিচয় লাভের পূর্ব্বেই যিনি শকুন্তলা-সম্বন্ধে আশ্বাস দিয়াছিলেন, তিনিই। তিনি মনের বাসনা;—তিনি মানুষকে লজ্জা দিয়া

চের কথা অজস্র বলিয়া থাকেন, কোনটা খাটে কোনটা খাটে না—দুষ্মন্তের এবং আমারটা খাটিয়া গিয়াছিল।

আমার এই অপরিচিতা প্রতিবেশিনী, বিবাহিতা কি কুমারী, ব্রাহ্মণ কি শূদ্র সে সংবাদ লওয়া আমার পক্ষে কঠিন ছিল না—কিন্তু তাহা করিলাম না—কেবল নীরব চকোরের মত বহু সহস্র যোজন দূর হইতে আমার চন্দ্রমণ্ডলটিকে বেষ্টন করিয়া করিয়া উদ্ধকণ্ঠে নিরীক্ষণ করিবার চেষ্টা করিলাম।

পরদিন মধ্যাহ্নে একখানি ছোট নৌকা ভাড়া করিয়া তীরের দিকে চাহিয়া জোয়ার বাহিয়া চলিলাম—মাল্লাদিগকে দাঁড় টানিতে নিষেধ করিয়া দিলাম।

আমার শকুন্তলার তপোবন কুটীরটি গঙ্গার ধারেই ছিল,—কুটীরটি ঠিক কণ্বের মত ছিল না;—গঙ্গা হইতে ঘাটের সিঁড়ি বৃহৎ বাড়ির বারান্দার উপর উঠিয়াছে—বারান্দাটি ঢালু কাঠের ছাদ দিয়া ছায়াময়।

আমার নৌকাটি যখন নিঃশব্দে ঘাটের সম্মুখে ভাসিয়া আসিল, দেখিলাম আমার নবযুগের শকুন্তলা বারান্দার ভূমিতলে বসিয়া আছেন;—পিঠের দিকে একটা চৌকি, চৌকির উপরে গোটাকতক বই রহিয়াছে—সেই বইগুলির উপরে তাঁহার খোলা চুল স্তূপাকারে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—তিনি সেই চৌকিতে ঠেস্ দিয়া উর্দ্ধমুখ করিয়া উত্তোলিত বাম বাহুর উপর মাথা রাখিয়াছেন—নৌকা হইতে তাঁহার মুখ অদৃশ্য, কেবল সুকোমল কণ্ঠের একটি সুকুমার বক্ররেখা দেখা যাইতেছে—খোলা দুইখানি পদপল্লবের একটি, ঘাটের উপরের সিঁড়ির এবং একটি তাহার নীচের সিঁড়িতে প্রসারিত—শাড়ির কালো পাড়টি বাঁকা হইয়া পড়িয়া সেই দুটী পা বেষ্টন করিয়া আছে। একখানা বই মনোযোগহীন শিথিল দক্ষিণহস্ত হইতে স্রস্ত হইয়া ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে। মনে হইল যেন মূর্ত্তিমতী মধ্যাহ্নলক্ষ্মী। সহসা দিবসের কর্ম্মের মাঝখানে একটি নিস্পন্দসুন্দরী অবসরপ্রতিমা। পদতলে গঙ্গা, সম্মুখে সুন্দর পরপার এবং উর্দ্ধে তীব্রতাপিত নীলাম্বর তাহাদের সেই অন্তরাত্মারূপিণীর দিকে—সেই দুটি খোলা পা, সেই অলসবিন্যস্ত বামবাহু, সেই উৎক্ষিপ্ত বঙ্কিম কণ্ঠরেখার দিকে নিরতিশয় নিস্তব্ধ একাগ্রতার সহিত নীরবে চাহিয়া আছে।

যতক্ষণ দেখা যায় দেখিলাম—দুই সজলপল্লব নেত্রপাতের দ্বারা দুইখানি চরণপদ্ম বারংবার নিছিয়া মুছিয়া লইলাম।

অবশেষে নৌকা যখন দূরে গেল, মাঝখানে একটা তীরতরুর আড়াল আসিয়া পড়িল—তখন হঠাৎ যেন একটা ত্রুটি স্মরণ হইল—চমকিয়া মাঝিকে কহিলাম, মাঝি, আজ আর আমার হুগলি যাওয়া হইল না—এই খান হইতেই বাড়ি ফের।—কিন্তু ফিরিবার সময় উজানে দাঁড় টানিতে হইল—সেই শব্দে আমি সঙ্কুচিত হইয়া উঠিলাম। সেই দাঁড়ের শব্দ যেন এমন কাহাকে আঘাত করিতে লাগিল। যাহা সচেতন সুন্দর সুকুমার, যাহা অনন্ত আকাশব্যাপী, অথচ একটি হরিণশাবকের মত ভীরু। নৌকা যখন ঘাটের নিকটবর্ত্তী হইল তখন দাঁড়ের শব্দে আমার প্রতিবেশিনী ধীরে মুখ তুলিয়া মৃদু কৌতূহলের সহিত আমার নৌকার দিকে চাহিল—মুহূর্ত্ত পরেই আমার ব্যগ্রব্যাকুল দৃষ্টি দেখিয়া সে চকিত হইয়া গৃহমধ্যে চলিয়া গেল—আমার মনে হইল আমি যেন তাহাকে আঘাত করিলাম—যেন কোথায় তাহার বাজিল!

তাড়াতাড়ি উঠিবার সময় তাহার ক্রোড় হইতে একটি অর্দ্ধদষ্ট স্বল্পপক পেয়ারা গড়াইতে

গড়াইতে নিম্নসোপানে আসিয়া পড়িল—সেই দশনচিহ্নিত অধরচুম্বিত ফলটির জন্য আমার সমস্ত অন্তঃকরণ উৎসুক হইয়া উঠিল—কিন্তু মাঝিমাল্লাদের লজ্জায় তাহা দূর হইতে নিরীক্ষণ করিতে করিতে চলিয়া গেলাম—দেখিলাম উত্তরোত্তর লোলুপায়মান জোয়ারের জল ছলছল লুব্ধ শব্দে তাহার লোল রসনার দ্বারা সেই ফলটিকে আয়ত্ত করিবার জন্য বারংবার উন্মুখ হইয়া উঠিতেছে—আধঘণ্টার মধ্যে তাহার নির্লজ্জ অধ্যবসায় চরিতার্থ হইবে ইহাই কল্পনা করিয়া ক্লিষ্টচিত্তে আমি আমার বাড়ির ঘাটে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলাম।

বটবৃক্ষচ্ছায়ায় পা ছড়াইয়া দিয়া সমস্ত দিন স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম, দুইখানি সুকোমল পদপল্লবের তলে বিশ্বপ্রকৃতি মাথা নত করিয়া পড়িয়া আছে,—আকাশ আলোকিত, ধরণী পুলকিত, বাতাস উতলা—তাহারি মধ্যে দুই-খানি অনাবৃত চরণ স্থির নিস্পন্দ সুন্দর—তাহারা জানেও না যে, তাহাদেরই রেণুকণার মাদকতায় তপ্তযৌবন নববসন্ত দিগ্বিদিকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে।

ইতিপূর্ব্বে প্রকৃতি আমার কাছে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ছিল—নদী বন আকাশ সমস্তই স্বতন্ত্র ছিল। আজ সেই বিশাল বিপুল বিকীর্ণতার মাঝখানে একটি সুন্দরী প্রতিমূর্ত্তি দেখা দিবামাত্র তাহা অবয়ব ধারণ করিয়া এক হইয়া উঠিয়াছে। আজ প্রকৃতি আমার কাছে এক ও সুন্দর—সে আমাকে অহরহ মূকভাবে অনুনয় করিতেছে, আমি মৌন তুমি আমাকে ভাষা দেও, আমার অন্তঃকরণে যে একটি অব্যক্ত স্তব উত্থিত হইতেছে তুমি তাহাকে ছন্দে লয়ে তানে তোমার সুন্দর মানবভাষায় ধ্বনিত করিয়া তোল!—

প্রকৃতির সেই নীরব অনুনয়ে আমার হৃদয়ের তন্ত্রী বাজিতে থাকে—বারংবার কেবল এই গান শুনি—"হে সুন্দরি, হে মনোহারিণি, হে বিশ্বজয়িনি হে মনপ্রাণপতঙ্গের একটি মাত্র দীপশিখা, হে অপরিসীম জীবন, হে অনন্তমধুর মৃত্যু!"—এ গান শেষ করিতে পারি না—সংলগ্ন করিতে পারি না, ইহাকে আকারে পরিস্ফুট করিতে পারি না, ইহাকে ছন্দে গাঁথিয়া ব্যক্ত করিয়া বলিতে পারি না—মনে হয় আমার অন্তরের মধ্যে জোয়ারের জলের মত একটা অনির্ব্বচনীয় অপরিমেয় শক্তি সঞ্চার হইতেছে—এখনো তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারিতেছি না—যখন পারিব তখন আমার কণ্ঠ অকস্মাৎ দিব্য সঙ্গীতে ধ্বনিত আমার ললাট অলৌকিক আভায় আলোকিত হইয়া উঠিবে।

এমন সময় একটি নৌকা পরপারের নৈহাটী ষ্টেশন হইতে পার হইয়া আমার বাগানের ঘাটে আসিয়া লাগিল। দুই স্কন্ধের উপর কোঁচানো চাদর ঝুলাইয়া ছাতাটি কক্ষে লইয়া হাস্যমুখে অমূল্য নামিয়া পড়িল। অকস্মাৎ বন্ধুকে দেখিয়া আমার মনে যেরূপ ভাবোদয় হইল আশা করি শত্রুর প্রতিও কাহারো যেন সেরূপ না ঘটে। বেলা প্রায় দুইটার সময় আমাকে সেই বটের ছায়ায় নিতান্ত ক্ষিপ্তের মত বসিয়া থাকিতে দেখিয়া অমূল্যর মনে ভারি একটা আশার সঞ্চার হইল। পাছে বঙ্গদেশের ভবিষ্যৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্যের কোন একটা অংশ তাহার পদশব্দে সচকিত হইয়া বন্য রাজহংসের মত একবারে জলের মধ্যে গিয়া পড়ে সেই ভয়ে সে সসঙ্কোচে মৃদুমন্দ গমনে আসিতে লাগিল—দেখিয়া আমার আরো রাগ হইল—কিঞ্চিৎ অধীর হইয়া কহিলাম, কি হে অমূল্য, ব্যাপারখানা কি! তোমার পায়ে কাঁটা ফুটিল না কি?" অমূল্য ভাবিল, আমি খুব একটা মজার কথা বলিয়াছি;—হাসিতে হাসিতে

কাছে আসিয়া তরুতল কোঁচা দিয়া বিশেষরূপে ঝাড়িয়া লইল পকেট হইতে একটি রুমাল ভাঁজ খুলিয়া বিছাইয়া তাহার উপরে সাবধানে বসিল—কহিল, "যে প্রহসনটা লিখিয়া পাঠাইয়াছ—সেটা পড়িয়া হাসিয়া বাঁচি না।" বলিয়া তাহার স্থানে স্থানে আবৃত্তি করিতে করিতে হাস্যোচ্ছ্বাসে তাহার নিশ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল। আমার এমনি মনে হইল যে,—যে কলমে সেই প্রহসনটা লিখিয়াছিলাম, সেটা যে গাছের কাষ্ঠদণ্ডে নির্ম্মিত, সেটাকে শিকড় সুদ্ধ উৎপাটন করিয়া মস্ত একটা আগুন প্রহসনটাকে ছাই করিয়া ফেলিলেও আমার খেদ মিটিবে না।

অমূল্য সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার সে কাব্যের কতদূর! শুনিয়া আরো আমার গা জ্বলিতে লাগিল—মনে মনে কহিলাম—যেমন আমার কাব্য তেম্‌নি তোমার বুদ্ধি! মুখে কহিলাম—সে সব পরে হইবে ভাই—আমাকে অনর্থক ব্যস্ত করিয়া তুলিয়ো না।

অমূল্য লোকটা কৌতূহলী—চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া সে থাকিতে পারে না—তাহার ভয়ে আমি উত্তরের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিলাম। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল ওদিকে কি আছে হে! আমি বলিলাম—কিছু না!-এত বড় মিথ্যা কথাটা আমার জীবনে আর কখনো বলি নাই।

দুটা দিন আমাকে নানা প্রকারে বিদ্ধ করিয়া দগ্ধ করিয়া তৃতীয়দিনের সন্ধ্যার ট্রেণে অমূল্য চলিয়া গেল। এই দুটা দিন আমি বাগানের উত্তরের দিকে যাই নাই, সে দিকে নেত্রপাতমাত্র করি নাই—কৃপণ যেমন তাহার রত্নভাণ্ডারটি লুকাইয়া বেড়ায় আমি তেমনি করিয়া আমার উত্তরের সীমানার বাগানটি সামলাইয়া বেড়াইতেছিলাম। অমূল্য চলিয়া যাইবামাত্র একেবারে ছুটিয়া দ্বার খুলিয়া দোতলার ঘরের উত্তরের বারান্দায় বাহির হইয়া পড়িলাম। উপরে উন্মুক্ত আকাশে প্রথম কৃষ্ণপক্ষের অপর্য্যাপ্ত জ্যোৎস্না; নিম্নে শাখাজাল-নিবদ্ধ তরুশ্রেণীতলে খণ্ডকিরণখচিত একটি গভীর নিভৃত প্রদোষান্ধকার; মর্ম্মরিত ঘনপল্লবের দীর্ঘ নিঃশ্বাসে, তরুতলবিচ্যুত বকুলফুলের নিবিড় সৌরভে এবং সন্ধ্যারণ্যের স্তম্ভিত সংযত নিঃশব্দতায়, তাহা রোমে রোমে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তাহারি মাঝখানটিতে আমার কুমারী প্রতিবেশিনী তাহার শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধ পিতার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া ধীরে ধীরে পদচারণা করিতে করিতে কি কথা কহিতেছিল—বৃদ্ধ সস্নেহে অথচ শ্রদ্ধাভরে ঈষৎ অবনমিত হইয়া নীরবে মনোযোগসহকারে শুনিতেছিলেন। এই পবিত্র স্নিগ্ধ বিশ্রম্ভালাপে ব্যাঘাত করিবার কিছুই ছিল না—সন্ধ্যাকালের শান্ত নদীতে ক্বচিৎ দাঁড়ের শব্দ সুদূরে বিলীন হইতেছিল, এবং অবিরল তরুশাখার অসংখ্য নীড়ে দুটি একটি পাখী দৈবাৎ ক্ষণিক মৃদুকাকলীতে জাগিয়া উঠিতেছিল। আমার অন্তঃকরণ আনন্দে অথবা বেদনায় যেন বিদীর্ণ হইবে মনে হইল। আমার অস্তিত্ব যেন প্রসারিত হইয়া সেই ছায়ালোকবিচিত্র ধরণীতলের সহিত এক হইয়া গেল—আমি যেন আমার বক্ষঃস্থলের উপর ধীরবিক্ষিপ্ত পদচারণা অনুভব করিতে লাগিলাম—যেন তরুপল্লবের সহিত সংলগ্ন হইয়া গিয়া আমার কানের কাছে মধুর মৃদুগুঞ্জনধ্বনি শুনিতে পাইলাম। এই বিশাল মূঢ় প্রকৃতির অন্তর্বেদনা যেন আমার সর্ব্বশরীরের অস্থিগুলির মধ্যে কুহরিত হইয়া উঠিল—আমি যেন বুঝিতে পারিলাম ধরণী পায়ের নীচে পড়িয়া থাকে অথচ পা জড়াইয়া ধরিতে পারে না বলিয়া ভিতরে ভিতরে কেমন করিতে

থাকে, নতশাখা বনস্পতিগুলি কথা শুনিতে পারে অথচ কিছুই বুঝিতে পারে না বলিয়া সমস্ত শাখায় পল্লবে মিলিয়া কেমন ঊর্দ্ধশ্বাসে উন্মাদ কলশব্দে হাহাকার করিয়া উঠিতে চাহে। আমিও আমার সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বান্তঃকরণে ঐ পদবিক্ষেপ ঐ বিশ্রম্ভালাপ অব্যবহিতভাবে অনুভব করিতে লাগিলাম কিন্তু কোনমতেই ধরিতে পারিলাম না বলিয়া ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরিতে লাগিলাম।

পরদিনে আমি আর থাকিতে পারিলাম না। প্রাতঃকালে আমার প্রতিবেশীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। ভবনাথ বাবু তখন বড় এক পেয়ালা চা পাশে রাখিয়া চোকে চস্‌মা দিয়া নীল পেন্সিলে দাগ করা একখানা হ্যামিল্‌টনের পুরাতন পুঁথি মনোযোগ দিয়া পড়িতেছিলেন। আমি ঘরে প্রবেশ করিলে চস্‌মার উপরিভাগ হইতে আমাকে কিয়ৎক্ষণ অন্যমনস্কভাবে দেখিলেন—বই হইতে মনটাকে একমুহূর্ত্তে প্রত্যাহরণ করিতে পারিলেন না। অবশেষে অকস্মাৎ সচকিত হইয়া ব্রস্তভাবে আতিথ্যের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিলেন। আমি সংক্ষেপে আত্ম-পরিচয় দিলাম। তিনি এমনি শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন যে, চস্‌মার খাপ খুঁজিয়া পাইলেন না। খামকা বলিলেন, আপনি চা খাইবেন? আমি যদিচ চা খাইনা, তথাপি বলিলাম, আপত্তি নাই। ভবনাথ বাবু ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া "কিরণ" "কিরণ" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। দ্বারের নিকট অত্যন্ত মধুর শব্দ শুনিলাম "কি বাবা।" ফিরিয়া দেখিলাম, তাপস-কণ্বদুহিতা সহসা আমাকে দেখিয়া ত্রস্ত হরিণীর মত পলায়নোদ্যতা হইয়াছেন। ভবনাথ বাবু তাঁহাকে ফিরিয়া ডাকিলেন—আমার পরিচয় দিয়া কহিলেন, ইনি আমাদের প্রতিবেশী মহীন্দ্রকুমার বাবু।—এবং আমাকে কহিলেন, ইনি আমার কন্যা কিরণবালা। আমি কি করিব ভাবিয়া পাইতেছিলাম না; ইতিমধ্যে কিরণ আমাকে আনম্রসুন্দর নমস্কার করিলেন। আমি তাড়াতাড়ি ত্রুটি সারিয়া লইয়া তাহা শোধ করিয়া দিলাম। ভবনাথ বাবু কহিলেন, মা, মহীন্দ্র বাবুর জন্যে এক পেয়ালা চা আনিয়া দিতে হইবে। আমি মনে মনে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিলাম কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবার পূর্ব্বেই কিরণ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আমার মনে হইল যেন কৈলাসে সনাতন ভোলানাথ তাঁহার কন্যা স্বয়ং লক্ষ্মীকে অতিথির জন্য এক পেয়ালা চা আনিতে বলিলেন;—অতিথির পক্ষে সে নিশ্চয়ই অমিশ্র অমৃত হইবে, কিন্তু তবু, কাছাকাছি নন্দী-ভৃঙ্গী কেহ বেটাই কি হাজির ছিল না!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভবনাথ বাবুর বাড়ি আমি এখন নিত্য অতিথি। পূর্ব্বে চা জিনিষটাকে অত্যন্ত ডরাইতাম—এক্ষণে সকালে বিকালে চা খাইয়া খাইয়া আমার চায়ের নেশা ধরিয়া গেল।

আমাদের বি, এ, পরীক্ষার জন্য জর্ম্মান পণ্ডিত বিরচিত দর্শনশাস্ত্রের নব্য ইতিহাস আমি সদ্য পাঠ করিয়া আসিয়াছিলাম, তদুপলক্ষে ভবনাথ বাবুর সহিত কেবল দর্শন আলোচনার জন্যই আসিতাম কিছুদিন এই প্রকার ভাণ করিলাম। তিনি হ্যামিল্‌টন্ প্রভৃতি কতকগুলি সেকালপ্রচলিত ভ্রান্ত পুঁথি লইয়া এখনো নিযুক্ত রহিয়াছেন ইহাতে তাঁহাকে আমি কৃপাপাত্র মনে করিতাম, এবং আমার

চন বিদ্যা অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত জাহির রিতে ছাড়িতাম না। ভবনাথ বাবু এমনি ালমানুষ এবং এমনি সকল বিষয়ে সসঙ্কোচ া, আমার মত অল্পবয়স্ক যুবকের মুখ হইতেও কল কথা মানিয়া যাইতেন, তিলমাত্র প্রতি-াব করিতে হইলে অস্থির হইয়া উঠিতেন, ভয় রিতেন পাছে আমি কিছুতে ক্ষুণ্ণ হই। কিরণ ামাদের এই সকল তত্ত্বালোচনার মাঝখান ইতেই কোন ছুতায় উঠিয়া চলিয়া যাইত। াহাতে আমার যেমন ক্ষোভ জন্মিত তেমনি ামি গর্ব্বও অনুভব করিতাম। আমাদের ালোচ্য বিষয়ের দুরূহ পাণ্ডিত্য কিরণের পক্ষে ঃসহ;—সে যখন মনে মনে আমার বিদ্যাপর্ব্ব-তের পরিমাপ করিত তখন তাহাকে কত চেই চাহিতে হইত!

কিরণকে যখন দূর হইতে দেখিতাম তখন াহাকে শকুন্তলা দময়ন্তী প্রভৃতি বিচিত্র নামে বং বিচিত্র ভাবে জানিতাম—এখন ঘরের ধ্যে তাহাকে কিরণ বলিয়া জানিলাম। এখন স আর জগতের বিচিত্র নায়িকার ছায়া-পিণী নহে, এখন সে একমাত্র কিরণ। এখন স শত শতাব্দীর কাব্যলোক হইতে অবতীর্ণ ইয়া, অনন্তকালের যুবকচিত্তের স্বপ্নস্বর্গ পরি-াগ করিয়া একটি নির্দ্দিষ্ট বাঙ্গালীঘরের মধ্যে মারী কন্যারূপে বিরাজ করিতেছে। সে ামারি মাতৃভাষায় আমার সঙ্গে অত্যন্ত সাধা-ণ ঘরের কথা বলিয়া থাকে, সামান্য কথায় রলভাবে হাসিয়া উঠে, সে আমাদেরই ঘরের ময়ের মত দুই হাতে দুটি সোণার বালা ারিয়া থাকে, গলার হারটি বেশী কিছু নয় কন্তু বড় সুমিষ্ট,—সাড়ির প্রান্তটি কখনো কব-রীর উপরিভাগ বাঁকিয়া বেষ্টন করিয়া আসে, খনো বা পিতৃগৃহের অনভ্যাসবশতঃ চ্যুত ইয়া পড়িয়া যায়, ইহা আমার কাছে বড় আনন্দের। সে যে অকাল্পনিক, সে যে সত্য, সে যে কিরণ, সে যে তাহা ব্যতীত নহে এবং তাহার অধিক নহে, এবং যদিচ সে আমার নহে, তবুও সে যে আমাদের, সে জন্য আমার অন্তঃকরণ সর্ব্বদাই তাহার প্রতি উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতারসে অভিষিক্ত হইতে থাকে।

একদিন জ্ঞানমাত্রেরই আপেক্ষিকতা লইয়া ভবনাথ বাবুর নিকট অত্যন্ত উৎসাহসহকারে বাচালতা প্রকাশ করিতেছিলাম; আলোচনা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবামাত্র কিরণ উঠিয়া গেল—এবং অনতিকাল পরেই সম্মুখের বারান্দায় একটা তোলা উনান এবং রাঁধিবার সরঞ্জাম আনিয়া রাখিয়া ভবনাথ বাবুকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিল—বাবা, কেন তুমি মহীন্দ্র বাবুকে ঐ সকল শক্ত কথা লইয়া বৃথা বকাইতেছ! আসুন্ মহীন্দ্র বাবু, তার চেয়ে আমার রান্নায় যোগ দিলে কাজে লাগিবে।

ভবনাথ বাবুর কোন দোষ ছিল না—এবং কিরণ্ তাহা অবগত ছিল। কিন্তু ভবনাথ বাবু অপরাধীর মত অনুতপ্ত হইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, তা বটে! আচ্ছা ও কথাটা আর একদিন হইবে।—এই বলিয়া নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে তিনি তাঁহার নিত্যনিয়মিত অধ্যয়নে নিযুক্ত হইলেন।

আবার আর একদিন অপরাহ্ণে আর একটা গুরুতর কথা পাড়িয়া ভবনাথ বাবুকে স্তম্ভিত করিয়া দিতেছি এমন সময় মাঝখানে আসিয়া কিরণ কহিল—মহীন্দ্র বাবু, অবলাকে সাহায্য করিতে হইবে। দেয়ালে লতা চড়াইব, নাগাল পাইতেছি না, আপনাকে এই পেরেকগুলি মারিয়া দিতে হইবে।—আমি উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া গেলাম—ভবনাথ বাবুও প্রফুল্ল মনে পড়িতে বসিলেন।

এমনি প্রায় যখনই ভবনাথ বাবুর কাছে

আমি ভারি কথা পাড়িবার উপক্রম করি, কিরণ একটা না একটা কাজের ছুতা ধরিয়া ভঙ্গ করিয়া দেয়। ইহাতে আমি মনে মনে পুলকিত হইয়া উঠিতাম—আমি বুঝিতাম যে, কিরণের কাছে আমি ধরা পড়িয়াছি;—সে কেমন করিয়া বুঝিতে পারিয়াছে যে ভবনাথ বাবুর সহিত তত্ত্বালোচনা আমার জীবনের চরম সুখ নহে।

বাহ্য বস্তুর সহিত আমাদের ইন্দ্রিয়বোধের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে গিয়া যখন দুরূহ রহস্যরসাতলের মধ্যপথে অবতীর্ণ হইয়াছি এমন সময় কিরণ আসিয়া বলিত, মহীন্দ্র বাবু, রান্না ঘরের পাশে আমার বেগুনের ক্ষেত আপনাকে দেখাইয়া আনি গে চলুন্।

আকাশকে অসীম মনে করা কেবল আমাদের অনুমানমাত্র; আমাদের অভিজ্ঞতা ও কল্পনাশক্তির বাহিরে কোথাও কোন একরূপে তাহার সীমা থাকা কিছুই অসম্ভব নহে ইত্যাকার মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি এমন সময় কিরণ আসিয়া বলিত, মহীন্দ্র বাবু, দুটো আম পাকিয়াছে আপনাকে ডাল নামাইয়া ধরিতে হইবে।

কি উদ্ধার, কি মুক্তি! অকূল সমুদ্রের মাঝখান হইতে এক মুহূর্ত্তে কি সুন্দর কূলে আসিয়া উঠিতাম। অনন্ত আকাশ ও বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে সংশয়জাল যতই দুশ্ছেদ্য জটিল হোক্ না কেন, কিরণের বেগুনের ক্ষেত বা আমগুলো সম্বন্ধে কোন প্রকার দুরূহতা বা সন্দেহের লেশমাত্র ছিল না। কাব্যে বা উপন্যাসে তাহা উল্লেখযোগ্য নহে কিন্তু জীবনে তাহা সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপের ন্যায় মনোহর। মাটিতে পা ঠেকা যে কি আরাম তাহা সেই জানে যে বহুকাল জলের মধ্যে সাঁতার দিয়াছে। আমি এতদিন কল্পনায় যে প্রেমসমুদ্র সৃজন করিয়াছিলাম তাহা যদি সত্য হইত তবে সেখানে চিরকাল যে কি করিয়া ভাসিয়া বেড়াইতাম তাহা বলিতে পারি না সেখানে আকাশও অসীম, সমুদ্রও অসীম, সেখান হইতে আমাদের প্রতিদিবসের বিচিত্র জীবনযাত্রার সীমাবদ্ধ ব্যাপার একেবারে নির্ব্বাসিত, সেখানে তুচ্ছতার লেশমাত্র নাই, সেখানে কেবল ছন্দে পদ্যে সঙ্গীতে ভাব ব্যক্ত করিতে হয়, এবং তলাইতে গেলে কোথাও তল পাওয়া যায় না। কিরণ সেখান হইতে মজ্জমান এই হতভাগ্যের কেশপাশ ধরিয়া যখন তাহার আমতলায় তাহার বেগুনের ক্ষেতে টানিয়া তুলিল তখন পায়ের তলায় মাটি পাইয়া আমি বাঁচিয়া গেলাম। আমি দেখিলাম, বারান্দায় বসিয়া খিচুড়ি রাঁধিয়া, মই চড়িয়া দেয়ালে পেরেক মারিয়া, লেবু গাছে ঘন সবুজ পত্ররাশির মধ্য হইতে সবুজ লেবু ফল সন্ধান করিতে সাহায্য করিয়া অভাবনীয় আনন্দ লাভ করা যায়—অথচ সে আনন্দলাভের জন্য কিছুমাত্র প্রয়াস পাইতে হয় না,—আপনি যে কথা মুখে আসে, আপনি যে হাসি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, আকাশ হইতে যতটুকু আলো আসে এবং গাছ হইতে যতটুকু ছায়া পড়ে তাহাই যথেষ্ট। ইহা ছাড়া আমার কাছে একটি সোণার কাঠি ছিল, আমার নবযৌবন, একটি পরশপাথর ছিল, আমার প্রেম, একটি অক্ষয় কল্পতরু ছিল, আমার নিজের প্রতি নিজের অক্ষুণ্ণবিশ্বাস। আমি বিজয়ী, আমি ইন্দ্র, আমার উচ্চৈঃশ্রবার পথে কোন বাধা দেখিতে পাই না কিরণ আমার কিরণ, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই! সে কথা এখনও স্পষ্ট করিয়া বলি নাই, কিন্তু হৃদয়ের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত মুহূর্ত্তের মধ্যে মহাসুখে বিদীর্ণ করিয়া সে কথা বিদ্যুতের মত আমার সমস্ত অন্তঃকরণ ধাঁধিয়া ক্ষণে ক্ষণে নাচিয়া উঠিতেছিল। কিরণ আমার কিরণ!

ইতিপূর্ব্বে আমি কোন অনাত্মীয়া মহিলার ংশ্রবে আসি নাই, যে নব্যরমণীগণ শিক্ষা-াভ করিয়া অবরোধের বাহিরে সঞ্চরণ করেন াহাদের রীতিনীতি আমি কিছুই অবগত হি,—অতএব তাঁহাদের আচরণে কোন্‌খানে ষ্টতার সীমা কোন্‌খানে প্রেমের অধিকার াহা আমি কিছুই জানি না;—কিন্তু ইহাও ানি না আমাকে কেনই বা ভাল না বাসিবে? ামি কোন অংশে ন্যূন?

কিরণ যখন আমারি হাতে চায়ের পেয়া-াটি দিয়া যাইত তখন চায়ের সঙ্গে পাত্রভরা রণের ভালবাসাও গ্রহণ করিতাম—চা-টি খন পান করিতাম তখন মনে করিতাম আমার হণ সার্থক হইল এবং কিরণেরও দান সার্থক ইল। কিরণ যদি সহজস্বরে বলিত, মহীন্দ্র াবু কাল সকাল আস্‌বেন ত,—তাহার মধ্যে ন্দে লয়ে বাজিয়া উঠিত—

"কি মোহিনী জান বন্ধু কি মোহিনী জান!
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন!

আমি সহজ কথায় উত্তর করিতাম "কাল াটটার মধ্যে আস্‌ব" তাহার মধ্যে কিরণ কি ুনিতে পাইত না,—

"পরাণ পুতলি তুমি হিয়ে মণি হার,
সরবসধন মোর সকল সংসার।"

আমার সমস্ত দিন এবং সমস্ত রাত্রি অমৃতে ূর্ণ হইয়া গেল। আমার সমস্ত চিন্তা এবং ল্পনা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নূতন নূতন শাখা প্রশাখা বস্তার করিয়া লতার ন্যায় কিরণকে আমার াহিত বেষ্টন করিয়া বাঁধিতে লাগিল। যখন ভ অবসর আসিবে তখন কিরণকে কি পড়া-ব, কি শিখাইব, কি শুনাইব, কি দেখাইব াহারি অসংখ্য সঙ্কল্পে আমার মন আচ্ছন্ন ইয়া গেল। এমন কি, স্থির করিলাম জর্ম্মান্ াণ্ডতরচিত দর্শনশাস্ত্রের নব্য ইতিহাসেও যাহাতে তাহার চিত্তের ঔৎসুক্য জন্মে এমন শিক্ষা তাহাকে দিতে হইবে—নতুবা আমাকে সে সর্ব্বতোভাবে বুঝিতে পারিবে না। ইংরাজি কাব্য সাহিত্যের সৌন্দর্য্যালোকে আমি তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইব। আমি মনে মনে হাসিলাম, কহিলাম, কিরণ, তোমার আমলতা বেগুনের ক্ষেত আমার কাছে নূতন রাজ্য,—আমি কস্মিন্ কালে স্বপ্নেও জানিতাম না যে, সেখানে বেগুন এবং ঝড়ে-পড়া কাঁচা আম ছাড়াও দুর্লভ অমৃতফল এত সহজে পাওয়া যায় কিন্তু যখন সময় আসিবে তখন আমিও তোমাকে এমন এক রাজ্যে লইয়া যাইব, যেখানে বেগুন ফলে না কিন্তু তথাপি বেগুনের অভাব মুহূর্ত্তের জন্য অনুভব করিতে হয় না! সে জ্ঞানের রাজ্য, ভাবের স্বর্গ!

সূর্য্যাস্তকালের দিগন্তবিলীন পাণ্ডুবর্ণ সন্ধ্যা-তারা ঘনায়মান সায়াহ্নে ক্রমেই যেমন পরিস্ফুট দীপ্তিলাভ করে—কিরণও তেমনি কিছুদিন ধরিয়া ভিতর হইতে আনন্দে, লাবণ্যে, নারী-ত্বের পূর্ণতায় যেন প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। সে যেন তাহার গৃহের তাহার সংসারের ঠিক মধ্য-আকাশে অধিরোহণ করিয়া চারিদিকে আনন্দের মঙ্গলজ্যোতি বিকীর্ণ করিতে লাগিল—সেই জ্যোতিতে তাহার বৃদ্ধ পিতার শুভ্র-কেশের উপর পবিত্রতর উজ্জ্বল আভা পড়িল, এবং সেই জ্যোতি আমার উদ্বেলিত হৃদয়-সমুদ্রের প্রত্যেক তরঙ্গের উপর কিরণের মধুর নামের একটি করিয়া জ্যোতির্ম্ময় স্বাক্ষর মুদ্রিত করিয়া দিল। এদিকে আমার ছুটি সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিল —বিবাহ উদ্দেশে বাড়ি আসিবার জন্য পিতার সস্নেহ অনুরোধ ক্রমে কঠিন আদেশে পরিণত হইবার উপক্রম হইল—এদিকে অমূল্যকেও আর ঠেকাইয়া রাখা যায় না—সে কোন্ দিন উন্মত্ত বন্যহস্তীর ন্যায় আমার এই পদ্মবনের

মাঝখানে ফস্‌ করিয়া তাহার বিপুল চরণ চতুষ্টয় নিক্ষেপ করিবে এ উদ্বেগও উত্তরোত্তর প্রবল হইতে লাগিল। কেমন করিয়া অবিলম্বে অন্তরের আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করিয়া আমার প্রণয়কে পরিণয়ে বিকশিত করিয়া তুলিব তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

একদিন মধ্যাহ্নকালে ভবনাথ বাবুর গৃহে গিয়া দেখি তিনি গ্রীষ্মের উত্তাপে চৌকিতে ঠেসান দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, এবং সম্মুখে গঙ্গাতীরের বারান্দায় নির্জ্জন ঘাটের সোপানে বসিয়া কিরণ কি বই পড়িতেছে। আমি নিঃশব্দ-পদে পশ্চাতে গিয়া দেখি, একখানি নূতন কাব্য-সংগ্রহ—যে পাতাটি খোলা আছে, তাহাতে Shelleyর একটি কবিতা উদ্ধৃত এবং তাহার পার্শ্বে লাল কালীতে একটি পরিষ্কার লাইন টানা—সেই কবিতাটি পাঠ করিয়া কিরণ ঈষৎ একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্বপ্নভারাকুল নয়নে আকাশের দূরতম প্রান্তের দিকে চাহিল—বোধ হইল যেন সেই একটি কবিতা কিরণ আজ একঘণ্টা ধরিয়া দশবার করিয়া পড়িয়াছে এবং অনন্ত নীলাকাশে আপন হৃদয়-তরণীর পালে একটি মাত্র উত্তপ্ত দীর্ঘ নিঃশ্বাস দিয়া তাহাকে অতিদূর নক্ষত্রলোকে প্রেরণ করিয়াছে। শেলি কাহার জন্য এই কবিতাটি লিখিয়াছিল, জানি না—মহীন্দ্রনাথ বাবু নামক কোন বাঙালি যুবকের জন্য লেখেন নাই তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু আজ এই স্তবগানে আমি ছাড়া আর কাহারও অধিকার নাই ইহা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। কিরণ এই কবিতাটির পাশে আপন অন্তরতম হৃদয়পেন্সিল দিয়া একটি উজ্জ্বল রক্ত চিহ্ন আঁকিয়া দিয়াছে, সেই মায়াগণ্ডীর মোহমন্ত্রে কবিতাটি আজ তাহারই—এবং সেই সঙ্গে আমারও। আমি পুলকোচ্ছ্বসিত চিত্তকে সম্বরণ করিয়া সহজ স্বরে কহিলাম কি পড়িতেছেন। পালভরা নৌকা যেন হঠাৎ চড়ায় ঠেকিয়া গেল। কিরণ চমকিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি বইখানা বন্ধ করিয়া একেবারে আঁচলের মধ্যে ঢাকিয়া ফেলিল। আমি হাসিয়া কহিলাম, বইখানি একবার দেখিতে পারি? কিরণকে কি যেন বাজিল—সে আগ্রহ সহকারে বলিয়া উঠিল, না, না, ও বই থাক্।

আমি কিয়দ্দূরে একটা ধাপ নীচে বসিয়া ইংরাজি কাব্যসাহিত্যের কথা উত্থাপন করিলাম—এমন করিয়া কথা তুলিলাম যাহাতে কিরণেরও সাহিত্য শিক্ষা হয় এবং আমারও মনের কথা ইংরাজ কবির জবানীতে ব্যক্ত হইয়া উঠে। খররৌদ্রতাপে সুগভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে জলের স্থলের ছোট ছোট কলশব্দগুলি নিদ্রাকাতর জননীর ঘুমপাড়ানী গানের মত অতিশয় মৃদু এবং সকরুণ হইয়া আসিল।

কিরণ যেন অধীর হইয়া উঠিল—কহিল, "বাবা একা বসিয়া আছেন, অনন্ত আকাশ সম্বন্ধে তোমাদের সে তর্কটা শেষ করিবে না?" আমি মনে মনে ভাবিলাম, অনন্ত আকাশ ত চিরকাল থাকিবে এবং তাহার সম্বন্ধে তর্কও ত কোন কালে শেষ হইবে না, কিন্তু জীবন স্বল্প এবং শুভ অবসর দুর্লভ ও ক্ষণস্থায়ী। কিরণের কথার উত্তর না দিয়া কহিলাম, "আমার কতকগুলি কবিতা আছে আপনাকে শুনাইব।" কিরণ কহিল, "কাল শুনিব।" বলিয়া একেবারে উঠিয়া ঘরের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "বাবা, মহীন্দ্রবাবু আসিয়াছেন।" ভবনাথবাবু নিদ্রাভঙ্গে বালকের ন্যায় তাঁহার সরল নেত্রদ্বয় উন্মীলন করিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। আমার বক্ষে যেন ধক্ করিয়া একটা মস্ত ঘা লাগিল। ভবনাথবাবুর ঘরে গিয়া অনন্ত

াকাশ সম্বন্ধে তর্ক করিতে লাগিলাম। কিরণ ই হাতে লইয়া দোতলায় বোধ হয় তাহার নর্জ্জন শয়নকক্ষে নির্ব্বিঘ্নে পড়িতে গেল।

পরদিন সকালের ডাকে লাল পেন্সিলের াগ দেওয়া একখানা ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ কাগজ পাওয়া গল, তাহাতে বি, এ, পরীক্ষার ফল বাহির ইয়াছে! প্রথমেই প্রথম ডিবিশান্ বিভাগে করণবালা বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়া একটা নাম চাখে পড়িল—আমার নিজের নাম প্রথম দ্বতীয় তৃতীয় কোন বিভাগেই নাই।

পরীক্ষায় অকৃতার্থ হইবার বেদনার সঙ্গে দঙ্গে বজ্রাগ্নির ন্যায় একটা সন্দেহ বাজিতে লাগিল যে, কিরণবালা বন্দ্যোপাধ্যায় হয়ত আমাদেরই কিরণবালা। সে যে কালেজে পড়িয়াছে বা পরীক্ষা দিয়াছে এ কথা যদিও আমাকে বলে নাই তথাপি সন্দেহ ক্রমেই প্রবল হইতে লাগিল। কারণ, ভাবিয়া দেখিলাম, বৃদ্ধ পিতা এবং তাহার কন্যাটি নিজেদের সম্বন্ধে কোন কথাই কখনো আলাপ করে নাই—এবং আমিও নিজের আখ্যান বলিতে এবং নিজের বিদ্যাপ্রচার করিতে সর্ব্বদাই এমন নিযুক্ত ছিলাম যে, তাঁহাদের কথা ভাল করিয়া জিজ্ঞাসাও করি নাই।

জর্ম্মানপণ্ডিতরচিত আমার নূতন-পড়া দর্শনের ইতিহাস, সম্বন্ধীয় তর্কগুলি আমার মনে পড়িতে লাগিল—এবং মনে পড়িল আমি একদিন কিরণকে বলিয়াছিলাম, আপনাকে যদি আমি কিছুদিন গুটিকতক বই পড়াইবার সুযোগ পাই, তাহা হইলে ইংরাজি কাব্য সাহিত্য সম্বন্ধে আপনার একটা পরিষ্কার ধারণা জন্মাইতে পারি।

কিরণবালা দর্শনশাস্ত্রে অনার্ লইয়াছেন এবং সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণা। যদি এই কিরণ হয়।

অবশেষে প্রবল খোঁচা দিয়া আপন ভস্মাচ্ছন্ন অহঙ্কারকে উদ্দীপ্ত করিয়া কহিলাম—"হয় হোক্—আমার রচনাবলী আমার জয়স্তম্ভ"। বলিয়া খাতা হাতে সবলে পা ফেলিয়া মাথা পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চে তুলিয়া ভবনাথবাবুর বাগানে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

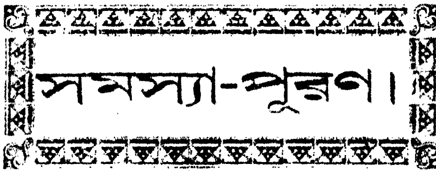
তখন তাঁহার ঘরে কেহ ছিল না। আমি একবার ভাল করিয়া বৃদ্ধের পুস্তকগুলি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, এক কোণে আমার সেই নব্য জর্ম্মানপণ্ডিতরচিত দর্শনের ইতিহাসখানি অনাদরে পড়িয়া রহিয়াছে—খুলিয়া দেখিলাম, ভবনাথবাবুর স্বহস্তলিখিত নোটে তাহার মার্জ্জিন পরিপূর্ণ। বৃদ্ধ নিজে তাঁহার কন্যাকে শিক্ষা দিয়াছেন। আমার সন্দেহ রহিল না।

ভবনাথ বাবু অন্যদিনের অপেক্ষা প্রসন্নজ্যোতির্বিচ্ছুরিত মুখে ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন—যেন কোন সুসংবাদের নির্ঝরধারায় তিনি সদ্য প্রাতঃস্নান করিয়া আসিয়াছেন। আমি অকস্মাৎ কিছু দম্ভের ভাবে রূক্ষহাস্য হাসিয়া কহিলাম—"ভবনাথবাবু, আমি পরীক্ষায় ফেল্ করিয়াছি!" যে সকল বড় বড় লোক বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ফেল্ করিয়া জীবনের পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়, আমি যেন আজ তাহাদেরই মধ্যে গণ্য হইলাম। পরীক্ষা, বাণিজ্য ব্যবসায়, চাকুরী প্রভৃতিতে কৃতকার্য্য হওয়া মাঝামাঝি লোকের লক্ষণ—নিম্নতম এবং উচ্চতম শ্রেণীর লোকেদেরই অকৃতকার্য্য হইবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে। ভবনাথবাবুর মুখ সস্নেহকরুণ হইয়া আসিল, তিনি তাঁহার কন্যার পরীক্ষোত্তরণ সংবাদ আমাকে আর দিতে পারিলেন না; কিন্তু আমার অসঙ্গত উগ্রপ্রফুল্লতা দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইয়া গেলেন। তাঁহার সরল

বুদ্ধিতে আমার গর্ব্বের কারণ বুঝিতে পারিলেন না।

এমন সময় আমাদের কালেজের নবীন অধ্যাপক বামাচরণবাবুর সহিত কিরণ সলজ্জ-সরসোজ্জ্বল মুখে বর্ষাধৌত লতাটির মত ছলছল করিতে করিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমার আর কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না। রাত্রে বাড়িতে আসিয়া আমার রচনাবলীর খাতাখানা পোড়াইয়া ফেলিয়া দেশে গিয়া বিবাহ করিলাম।

গঙ্গার ধারে যে বৃহৎ কাব্য লিখিবার কথা ছিল তাহা লেখা হইল না, কিন্তু জীবনের মধ্যে তাহা লাভ করিলাম।



সমস্যা-পূরণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:•:—

ঝিকড়াকোটার কৃষ্ণগোপাল সরকার জ্যেষ্ঠপুত্রের প্রতি জমিদারী এবং সংসারের ভার দিয়া কাশী চলিয়া গেলেন। দেশের যত অনাথ দরিদ্র লোক তাঁহার জন্য হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল—এমন বদান্যতা এমন ধর্ম্মনিষ্ঠতা কলিযুগে দেখা যায় না, এই কথা সকলেই বলিতে লাগিল।

তাঁহার পুত্র বিপিনবিহারী আজকালকার একজন সুশিক্ষিত বি এ। দাড়ি রাখেন, চস্‌মা পরেন, কাহারো সহিত বড় একটা মিশেন না। অতিশয় সচ্চরিত্র—এমন কি, তামাকটি পর্য্যন্ত খান না, তাস পর্য্যন্ত খেলেন না। অত্যন্ত ভালমানুষের মত চেহারা, কিন্তু লোকটি ভারি কড়াক্কড়।

তাঁহার প্রজারা শীঘ্রই তাহা অনুভব করিতে পারিল। বুড়া কর্ত্তার কাছে রক্ষা ছিল কিন্তু ইঁহার কাছে কোন ছুতায় দেনা খাজনার এক পয়সা রেয়াৎ পাইবার প্রত্যাশা নাই। নির্দ্দিষ্ট সময়েরও একদিন এদিক-ওদিক হইতে পায় না।

বিপিনবিহারী হাতে কাজ লইয়াই দেখিলেন তাঁহার বাপ বিস্তর ব্রাহ্মণকে জমি বিনা খাজনায় ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং খাজনা যে কত লোককে কমি দিয়াছেন তাহার আর সংখ্যা নাই। তাঁহার কাছে কেহ একটা কিছু প্রার্থনা করিলে তিনি তাহা পূর্ণ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না—সেটা তাঁহার একটা দুর্ব্বলতা ছিল।

বিপিনবিহারী কহিলেন, এ কখনই হইতে পারে না। অর্দ্ধেক জমিদারী আমি লাখেরাজ ছাড়িয়া দিতে পারি না। তাঁহার মনে নিম্নলিখিত দুই যুক্তির উদয় হইল।

প্রথমতঃ, যে সকল অকর্ম্মণ্য লোক ঘরে বসিয়া এই সকল জমির উপস্বত্ব ভোগ করিয়া স্ফীত হইতেছে তাহারা অধিকাংশই অপদার্থ এবং দয়ার অযোগ্য। এরূপ দানে দেশে কেবল আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

দ্বিতীয়তঃ—তাঁহার পিতৃপিতামহের সময়ের অপেক্ষা এখন জীবিকা অত্যন্ত দুর্লভ এবং দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়িয়াছে। অভাব অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এখন একজন ভদ্রলোকের আত্মসম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলিতে পূর্ব্বাপেক্ষা চারগুণ খরচ পড়ে। অতএব তাঁহার পিতা যেরূপ নিশ্চিন্ত মনে দুই হস্তে সমস্ত বিলাইয়া ছড়াইয়া গিয়াছেন এখন আর তাহা করিলে

ব না বরঞ্চ সেগুলি কুড়াইয়া বাড়াইয়া
ার ঘরে আনিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।
কর্ত্তব্যবুদ্ধি তাঁহাকে যাহা বলিল তিনি
ই করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি
া প্রিন্সিপল্‌ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন।
ঘর হইতে যাহা বাহির হইয়াছিল আবার
। অল্পে অল্পে ঘরে ফিরিতে লাগিল।
ার অতি অল্প দানই তিনি বাহাল রাখি-
, এবং যাহা রাখিলেন তাহাও যাহাতে
স্থায়ী দানের স্বরূপে গণ্য না হয় এমন
য় করিলেন।

কৃষ্ণগোপাল কাশীতে থাকিয়া পত্রযোগে
াদিগের ক্রন্দন শুনিতে পাইলেন—এমন
কেহ কেহ তাঁহার নিকটে গিয়াও কাঁদিয়া
লে। কৃষ্ণগোপাল বিপিনবিহারীকে পত্র
খিলেন যে, কাজটা গর্হিত হইতেছে।

বিপিনবিহারী উত্তরে লিখিলেন, "পূর্ব্বে
ন দান করা যাইত তেমনি পাওনা নানা
ারের ছিল। তখন জমিদার এবং প্রজা
য়পক্ষের মধ্যেই দান প্রতিদান ছিল। সম্প্রতি
ন নূতন আইন হইয়া কেবলমাত্র ন্যায্য
না ছাড়া অন্য পাঁচ রকম পাওনা একেবারে
হইয়াছে, এবং কেবলমাত্র খাজনা আদায়
া ছাড়া জমিদারের অন্যান্য গৌরবজনক
ধকারও উঠিয়া গিয়াছে—অতএব এখনকার
ন যদি আমি আমার ন্যায্য পাওনার
ক কঠিন দৃষ্টি না রাখি তবে আর
মার থাকে কি! এখন প্রজাও আমাকে
তিরিক্ত কিছু দিবে না আমিও তাহাকে
তিরিক্ত কিছুই দিব না—এখন আমাদের
ধ্য কেবলমাত্র দেনাপাওনার সম্পর্ক। দান
রাং করিতে গেলে ফতুর হইতে হইবে;
ষয় রক্ষা এবং কুলসম্ভ্রম রক্ষা করা দুরূহ
য়া পড়িবে।

কৃষ্ণগোপাল সময়ের এতাধিক পরিবর্ত্তনে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া উঠিলেন এবং ভাবিতেন এখনকার ছেলেরা এখনকার কালের উপযোগী কাজ করিতেছে—আমার সেকালের নিয়ম এখন খাটিবে না। আমি দূরে বসিয়া ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে তাহারা বলিবে, তবে তোমার বিষয় তুমি ফিরিয়া লও, আমরা ইহা রাখিতে পারিব না। কাজ কি বাপু, এ কয়টা দিন কোনমতে হরিনাম করিয়া কাটাইয়া দিতে পারিলে বাঁচি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

এই ভাবে কাজ চলিতে লাগিল। অনেক মকদ্দমা মামলা হাঙ্গাম ফেসাদ্‌ করিয়া বিপিনবিহারী সমস্তই প্রায় এক প্রকার মনের মত গুছাইয়া লইলেন।

অনেক প্রজাই ভয়ক্রমে বশ্যতা স্বীকার করিল, কেবল মির্জা বিবির পুত্র অছিমদ্দি বিশ্বাস কিছুতেই বাগ মানিল না।

বিপিনবিহারীর আক্রোশও তাহার উপরে সব চেয়ে বেশী। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোত্তরের একটা অর্থ বোঝা যায় কিন্তু এই মুসলমান সন্তান যে কি হিসাবে এতটা জমি নিষ্কর ও স্বল্প করে উপভোগ করে বুঝা যায় না। একটা সামান্য যবন বিধবার ছেলে, গ্রামের ছাত্রবৃত্তি-স্কুলে দুই ছত্র লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে কিন্তু আপনার সৌভাগ্যগর্ব্বে সে যেন কাহাকেও গ্রাহ্যই করে না।

বিপিন পুরাতন কর্ম্মচারীদের কাছে জানিতে পারিলেন কর্ত্তার আমল হইতে বাস্তবিক ইহারা বহুকাল অনুগ্রহ পাইয়া আসিতেছে কিন্তু এ অনুগ্রহের কোন বিশেষ কারণ তাহারা

নির্ণয় করিতে পারে না। বোধ করি, অনাথা বিধবা নিজ দুঃখ জানাইয়া কর্ত্তার দয়া উদ্রেক করিয়াছিল।

কিন্তু বিপিনের নিকট এই অনুগ্রহ সর্ব্বাপেক্ষা অযোগ্য বলিয়া প্রতিভাত হইল! বিশেষতঃ ইহাদের পূর্ব্বেকার দরিদ্র অবস্থা বিপিন দেখেন নাই, এখন ইহাদের স্বচ্ছলতার বাড়াবাড়ি এবং অপর্য্যাপ্ত দম্ভ দেখিয়া বিপিনের মনে হইত ইহারা যেন তাঁহার দয়া-দুর্ব্বল সরল পিতাকে ঠকাইয়া তাঁহাদের বিষয়ের এক অংশ চুরি করিয়া লইয়াছে।

অছিমদ্দিও উদ্ধত প্রকৃতির যুবক। সে বলিল, প্রাণ যাইবে তবু আমার অধিকারের এক তিল ছাড়িয়া দিব না। উভয় পক্ষে ভারি যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল।

অছিমদ্দির বিধবা মাতা ছেলেকে বারম্বার করিয়া বুঝাইল, জমিদারের সহিত কাজিয়া করিয়া কাজ নাই, এতদিন যাঁহার অনুগ্রহে জীবন কাটিল তাঁহার অনুগ্রহের পরে নির্ভর করাই কর্ত্তব্য, জমিদারের প্রার্থনামত কিছু ছাড়িয়া দেওয়া যাক্।

অছিমদ্দি কহিল, মা, তুমি এসকল বিষয় কিছু বোঝ না।

মকদ্দমায় অছিমদ্দি একে একে হারিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু যতই হার হইতে লাগিল ততই তাহার জিদ্ বাড়িয়া উঠিল। তাহার সর্ব্বস্বের জন্য সে সর্ব্বস্বই পণ করিয়া বসিল।

মির্জ্জা বিবি একদিন বৈকালে বাগানের তরিতরকারী কিঞ্চিৎ উপহার লইয়া ছেলেকে লুকাইয়া গোপনে বিপিন বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিল। বৃদ্ধা যেন তাহার সকরুণ মাতৃদৃষ্টির দ্বারা সস্নেহে বিপিনের সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া কহিল, "তুমি আমার বাপ; আল্লা তোমার ভাল করুন। বাবা, অছিমকে তুমি নষ্ট করিয়ো না, ইহাতে তোমার ধর্ম্ম হইবে না। তাহাকে আমি তোমার হস্তেই সমর্পণ করিলাম— তাহাকে নিতান্তই অবশ্য-প্রতিপাল্য একটি অকর্ম্মণ্য ছোট ভাইয়ের মত গ্রহণ কর—সে তোমার অসীম ঐশ্বর্য্যের ক্ষুদ্র এককণা পাইয়াছে বলিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়ো না বাপ্!"

অধিক বয়সের স্বাভাবিক প্রগল্‌ভতাবশতঃ বুড়ি তাঁহার সহিত ঘরকন্না পাতাইতে আসিয়াছে দেখিয়া বিপিন ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিল। কহিল—"তুমি মেয়ে মানুষ, এ সমস্ত কথা কিছুই বোঝ না। যদি কিছু জানাইবার থাকে তোমার ছেলেকে পাঠাইয়া দিয়ো!"

মির্জ্জা বিবি নিজের ছেলে এবং পরের ছেলে উভয়ের কাছেই শুনিল, সে এ বিষয়ের কিছুই বোঝে না। আল্লার নাম স্মরণ করিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বিধবা ঘরে ফিরিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

মকদ্দমা ফৌজদারী হইতে দেওয়ানী—দেওয়ানী হইতে জেলা-আদালত, জেলা-আদালত হইতে হাইকোর্ট পর্য্যন্ত চলিল। বৎসর দেড়েক এম্‌নি করিয়া কাটিয়া গেল। অছিমদ্দি যখন দেনার মধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়াছে তখন আপিল-আদালতে তাহার আংশিক জয় সাব্যস্ত হইল।

কিন্তু ডাঙ্গার বাঘের মুখ হইতে যে টুকু বাঁচিল জলের কুমীর তাহার প্রতি আক্রমণ করে। মহাজন সময় বুঝিয়া ডিক্রীজারী করিল। অছিমদ্দির যথাসর্ব্বস্ব নিলামে হইবার দিন স্থির হইল।

সে দিন সোমবার, হাটের দিন। ছোট একটি নদীর ধারে হাট। বর্ষাকালে নদী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কতক নৌকায় এবং কতক ডাঙ্গায় কেনাবেচা চলিতেছে, কলরবের অন্ত নাই। পণ্যদ্রব্যের মধ্যে এই আষাঢ় মাসে কাঁঠালের আমদানীই সব চেয়ে বেশী, ইলিশ মাছও যথেষ্ট। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে; অনেক বিক্রেতা বৃষ্টির আশঙ্কায় বাঁশ পুতিয়া তাহার উপর একটা কাপড় খাটাইয়া দিয়াছে।

অছিমদ্দিও হাট করিতে আসিয়াছে—কিন্তু তাহার হাতে একটি পয়সাও নাই, এবং তাহাকে আজ কাল কেহ ধারেও বিক্রয় করে না। সে একটি কাটারি এবং একটি পিতলের থালা হাতে করিয়া আসিয়াছে, বন্ধক রাখিয়া ধার করিবে।

বিপিন বাবু বিকালের দিকে হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন, সঙ্গে দুই তিন জন লাঠিহস্তে পাইক চলিয়াছে। কলরবে আকৃষ্ট হইয়া তিনি একবার হাট দেখিতে ইচ্ছুক হইলেন।

হাটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বারী কলুকে কৌতুহলবশতঃ তাহার আয়ব্যয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছেন এমন সময় অছিমদ্দি কাটারি তুলিয়া বাঘের মত গর্জ্জন করিয়া বিপিন বাবুর প্রতি ছুটিয়া আসিল। হাটের লোক তাহাকে অৰ্দ্ধপথে ধরিয়া তৎক্ষণাৎ নিরস্ত্র করিয়া ফেলিল—অবিলম্বে তাহাকে পুলিশের হস্তে সমর্পণ করা হইল এবং আবার হাটে যেমন কেনাবেচা চলিতেছিল চলিতে লাগিল।

বিপিন বাবু এই ঘটনায় মনে মনে যে খুসি হন নাই তাহা বলা যায় না। আমরা যাহাকে শিকার করিতে চাহি সে যে আমাদিগকে থাবা মারিতে আসিবে এরূপ বজ্জাতী এবং বে-আদবী অসহ্য। যাহা হোক্, বেটা যেরূপ বদ্‌মায়েস্ সেইরূপ তাহার উচিত শাস্তি হইবে।

বিপিনের অন্তঃপুরে মেয়েরা আজিকার ঘটনা শুনিয়া কণ্টকিত হইয়া উঠিলেন—সকলেই বলিলেন, মাগো, কোথাকার বজ্জাত হারামজাদা বেটা! তাহার উচিত শাস্তির সম্ভাবনায় তাঁহারা অনেকটা সান্ত্বনা লাভ করিলেন।

এদিকে সেই সন্ধ্যাবেলায় বিধবার অন্নহীন পুত্রহীন গৃহ মৃত্যুর অপেক্ষাও অন্ধকার হইয়া গেল। এই ব্যাপারটা সকলেই ভুলিয়া গেল, আহারাদি করিল, শয়ন করিল, নিদ্রা দিল—কেবল একটী বৃদ্ধার কাছে পৃথিবীর সমস্ত ঘটনার মধ্যে এইটেই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হইয়া উঠিল, অথচ ইহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সমস্ত পৃথিবীতে আর কেহই নাই, কেবল দীপহীন কুটির-প্রান্তে কয়েকখানি জীর্ণ অস্থি এবং একটি হতাশ্বাস ভীত হৃদয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

ইতিমধ্যে দিন তিনেক অতিবাহিত হইয়া গেছে। কাল ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচারের দিন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিপিনকেও সাক্ষ্য দিতে যাইতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে জমিদারকে কখনো সাক্ষ্যমঞ্চে দাঁড়াইতে হয় নাই—কিন্তু বিপিনের ইহাতে কোন আপত্তি নাই।

পরদিন যথাসময়ে পাগ্‌ড়ি পরিয়া ঘড়ির চেন ঝুলাইয়া পাল্কি চড়িয়া মহাসমারোহে বিপিন বাবু কাছারিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ তাঁহাকে সসম্ভ্রমে আপন পার্শ্ববর্ত্তী আসনে স্থান দিলেন। এজ্‌লাসে

আজ আর লোক ধরে না। এতবড় হুজুক্ আদালতে অনেক দিন ঘটে নাই।

যখন মকদ্দমা উঠিতে আর বড় বিলম্ব নাই, এমন সময় একজন বরকন্দাজ আসিয়া বিপিন বাবুর কাণে কাণে কি একটা কথা বলিয়া দিল —তিনি তটস্থ হইয়া আবশ্যক আছে বলিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, কিছু দূরে এক বটতলায় তাঁহার বৃদ্ধ পিতা দাঁড়াইয়া আছেন। খালি পা, গায়ে একখানি নামাবলী, হাতে হরিনামের মালা, কৃশ শরীরটি যেন স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময়। ললাট হইতে একটি শান্ত করুণা বিশ্বে বিকীর্ণ হইতেছে।

বিপিন চাপকান জোব্বা এবং আঁট প্যাণ্ট্‌লুন্ লইয়া কষ্টে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। মাথার পাগ্‌ড়িটি নাসাগ্রান্তে নামিয়া আসিল, ঘড়িটি জেব হইতে বাহির হইয়া পড়িল; সেগুলি শশব্যস্তে সারিয়া লইয়া পিতাকে নিকটবর্ত্তী উকীলের বাসায় প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিলেন।

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, না, আমার যাহা বক্তব্য আমি এইখানেই বলিয়া লই।

বিপিনের অনুচরগণ কৌতূহলী লোকদিগকে দূরে ঠেলিয়া রাখিল।

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন—অছিম যাহাতে খালাস পায় সেই চেষ্টা করিতে হইবে এবং উহার যে সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছ তাহা ফিরাইয়া দিবে।

বিপিন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— এইজন্যই আপনি কাশী হইতে এত দূরে আসিয়াছেন? উহাদের উপরে আপনার এত অধিক অনুগ্রহ কেন?

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন—সে কথা শুনিয়া তোমার লাভ কি হইবে বাপু?

বিপিন ছাড়িলেন না—কহিলেন, "অযোগ্যতা বিচার করিয়া কত লোকের কত দান ফিরাইয়া লইয়াছি, তাহার মধ্যে কত ব্রাহ্মণও ছিল, আপনি তাহার কিছুতে হস্তক্ষেপ করেন নাই, আর এই মুসলমান সন্তানের জন্য আপনার এতদূর পর্য্যন্ত অধ্যবসায়! আজ এত কাণ্ড করিয়া অবশেষে যদি অছিমকে খালাস দিতে এবং সমস্ত ফিরাইয়া দিতে হয় ত লোকের কাছে কি বলিব!"

কৃষ্ণগোপাল কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। অবশেষে দ্রুতকম্পিত অঙ্গুলিতে মালা ফিরাইতে ফিরাইতে কিঞ্চিৎ কম্পিতস্বরে কহিলেন, "লোকের কাছে যদি সমস্ত খুলিয়া বলা আবশ্যক হয় ত বলিয়ো, অছিমদ্দিন তোমার ভাই হয়, আমার পুত্র।"

বিপিন চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন—যবনীর গর্ভে?

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন—হাঁ বাপু।

বিপিন অনেকক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া কহিলেন, সে সব কথা পরে হইবে এখন আপনি ঘরে চলুন।

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন—না, আমি ত আর গৃহে প্রবেশ করিব না। আমি এখনি এখান হইতে ফিরিয়া চলিলাম। এখন তোমার ধর্ম্মে যাহা উচিত বোধ হয় করিয়ো। বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া অশ্রুনিরোধপূর্ব্বক কম্পিতকলেবরে ফিরিয়া চলিলেন।

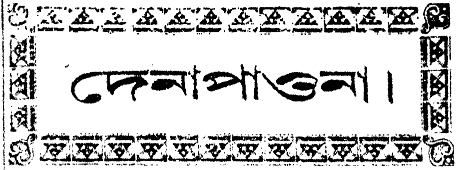
বিপিন কি বলিবে কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু এটুকু তাহার মনে উদয় হইল, সেকালের ধর্ম্মনিষ্ঠা এইরূপই বটে! শিক্ষা এবং চরিত্রে আপনাকে আপনার পিতার চেয়ে ঢের শ্রেষ্ঠ বোধ হইল। স্থির করিলেন, একটা প্রিন্সিপ্‌লু না থাকার এই ফল!

আদালতে যখন ফিরিলেন, দেখিলেন শীর্ণ ক্লিষ্ট শুষ্ক শ্বেতওষ্ঠাধর দীপ্তনেত্র অছিম দুই পাহারাওয়ালার হস্তে বন্দী হইয়া একখানি মলিন চীর পরিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে বিপিনের ভ্রাতা!

ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত বিপিনের বন্ধুত্ব ছিল। মকদ্দমা একপ্রকার গোলমাল করিয়া ফাঁসিয়া গেল। এবং অছিমও অল্পদিনের মধ্যে পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া পাইল। কিন্তু তাহার কারণ সেও বুঝিতে পারিল না, অন্য লোকেও আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

মকদ্দমার সময় যে, কৃষ্ণগোপাল আসিয়াছিলেন সে কথা রাষ্ট্র হইতে বিলম্ব হইল না! সকলেই নানা কথা কাণাকাণী করিতে লাগিল।

সূক্ষ্মবুদ্ধি উকীলেরা ব্যাপারটা সমস্তই অনুমান করিয়া লইল। রামতারণ উকীলকে কৃষ্ণগোপাল নিজের খরচে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়াছিলেন—সে বরাবরই সন্দেহ করিত কিন্তু এতদিনে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিল যে, ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিলে সকল সাধুই ধরা পড়ে। যিনি যত মালা জপুন পৃথিবীতে আমার মতই সব বেটা! সংসারে সাধু অসাধুর মধ্যে প্রভেদ এই যে, সাধুরা কপট এবং অসাধুরা অকপট! যাহা হউক্, কৃষ্ণগোপালের জগদ্বিখ্যাত দয়াধর্ম্মমহত্ত্ব সমস্তই যে কাপট্য ইহাই স্থির করিয়া রামতারণের যেন এতদিনকার একটা দুর্ব্বোধ সমস্যার পূরণ হইল এবং কি যুক্তি অনুসারে জানি না, তাহাতে কৃতজ্ঞতার বোঝাও যেন স্কন্ধ হইতে লঘু হইয়া গেল! ভারি আরাম পাইল।



পাঁচ ছেলের পর যখন এক কন্যা জন্মিল তখন বাপ মায়ে অনেক আদর করিয়া তাহার নাম রাখিলেন নিরুপমা। এ গোষ্ঠীতে এমন সৌখীন নাম ইতিপূর্ব্বে কখন শোনা যায় নাই। প্রায় ঠাকুরদেবতার নামই প্রচলিত ছিল—গণেশ, কার্ত্তিক, পার্ব্বতী তাহার উদাহরণ।

বলা বাহুল্য নিরুপমার আদরের সীমা ছিল না। অতিরিক্ত আদরে নষ্ট হইয়া না যায় এমন ছেলে অতি দুর্লভ; কিন্তু দৈবক্রমে এমন এক আধটি মেয়ে দেখা যায় আদরে যাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। পদ্ম যেমন সহজেই জল ভেদ করিয়া মধুর শোভায় উপরে জাগিয়া উঠে, তেমনি এক একটি মেয়ে আছে যে স্বভাবতই ভরা আদরের মাঝখানে ঢলঢল হইয়া ফুটিয়া উঠে।

নিরুপমা বাপ মা, পাঁচ ভাই এবং যেখানকার যত আত্মীয় স্বজন, সকলেরই আদর পাইত। কিন্তু তবু তাহার মন সর্ব্বদাই একটি সরল সন্তোষে পূর্ণ থাকিত; তাহার মুখের স্বাভাবিক ভাবটি এমনি ছিল সে যেন কাহারো কাছে কিছু চায় না।

আমার বর্ণনা শুনিয়া কেহবা হাসিতে পারেন! মনে করিতে পারেন সহজেই যে পায় সে আর চাহিবে কেন? কিন্তু সংসারের গতিক যদি ভাল করিয়া আলোচনা করা যায় ত দেখা যাইবে, যে না চাহিয়া পায় তাহার আবদার আর কিছুতেই মেটে না। পৃথিবীতে ষোল আনা আদর যে পায় না আঠার আনা

আদরের প্রতি সে কোন দাবী রাখে না—এমন কি অল্পস্বল্প যাহা পায় সেটুকু না হইলেও তাহার চলিয়া যায়, কিন্তু যে দুর্ভাগা বিনা চেষ্টায় পুরাপুরি পায় উপরি-পাওনা না হইলে তাহার কিছুতেই সুখ হয় না।

কিন্তু এই সংসারতত্ত্বের সহিত আমার গল্পের কোন যোগ নাই, অতএব এ আলোচনা পরে হইবে।

এখন নিরুপমার বিবাহের প্রস্তাব চলিতেছে। তাহার পিতা রামসুন্দর মিত্র অনেক খোঁজ করেন কিন্তু পাত্র কিছুতেই মনের মতন হয় না। অবশেষে মস্ত এক রায়বাহাদুরের ঘরের একমাত্র ছেলেকে সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছেন। উক্ত রায়বাহাদুরের পৈতৃক বিষয় আশয় যদিও অনেক হ্রাস হইয়া আসিয়াছে কিন্তু বনেদী ঘর বটে।

কিন্তু বরপক্ষ হইতে দশ হাজার টাকা পণ এবং বহুল দানসামগ্রী চাহিয়া বসিল। রামসুন্দর কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন; এমন পাত্র কোনমতে হাতছাড়া করা যায় না।

কিন্তু কিছুতেই টাকার যোগাড় আর হয় না। বাঁধা দিয়া বিক্রয় করিয়া অনেক চেষ্টাতেও হাজার ছয় সাত বাকি রহিল। এদিকে বিবাহের দিন নিকট হইয়া আসিয়াছে।

অবশেষে বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। নিতান্ত অতিরিক্ত সুদে একজন বাকি টাকাটা ধার দিতে স্বীকার করিয়াছিল কিন্তু সময়কালে সে উপস্থিত হইল না। বিবাহ-সভায় একটা তুমুল গোলযোগ বাধিয়া গেল। রামসুন্দর আমাদের রায়বাহাদুরের হাতে পায়ে ধরিয়া বলিলেন, শুভকার্য্য সম্পন্ন হইয়া যাক্ আমি নিশ্চয় টাকাকা শোধ করিয়া দিব। রায়বাহাদুর বলিলেন টাকা হাতে না পাইলে বর সভাস্থ করা যাইবে না।

এই দুর্ঘটনায় অন্তঃপুরে একটা কান্না পড়িয়া গেল। এই গুরুতর বিপদের যে মূল কারণ সে চেলি পরিয়া গহনা পরিয়া, কপালে চন্দন লেপিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ভাবী শ্বশুর কুলের প্রতি যে তাহার খুব একটা ভক্তি কিংবা অনুরাগ জন্মিতেছে তাহা বলা যায় না।

ইতিমধ্যে একটা সুবিধা হইল। বর সহসা তাহার পিতৃদেবতার অবাধ্য হইয়া উঠিল। সে বাপকে বলিয়া বসিল কেনাবেচা দরদামের কথা আমি বুঝি না, বিবাহ করিতে আসিয়াছি বিবাহ করিয়া যাইব।

বাপ যাহাকে দেখিল তাহাকেই বলিল দেখেছেন মহাশয় আজকালকার ছেলেদের ব্যবহার। দুই একজন প্রবীণ লোক ছিল তাহারা বলিল শাস্ত্রশিক্ষা নীতিশিক্ষা একেবারে নাই, কাজেই।

বর্ত্তমান শিক্ষার বিষময় ফল নিজের সন্তানের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়া রায়বাহাদুর হতোদ্যম হইয়া বসিয়া রহিলেন। বিবাহ এক প্রকার বিষণ্ণ নিরানন্দভাবে সম্পন্ন হইয়া গেল।

শ্বশুরবাড়ী যাইবার সময় নিরুপমাকে বুকে টানিয়া লইয়া বাপ আর চোখের জল রাখিতে পারিলেন না। নিরু জিজ্ঞাসা করিল "ওরা কি আর আমাকে আস্‌তে দেবে না বাবা?" রামসুন্দর বলিলেন "কেন আস্‌তে দেবে না মা? আমি তোমাকে নিয়ে আস্‌ব।"

রামসুন্দর প্রায়ই মেয়েকে দেখিতে যান কিন্তু বেহাই বাড়ীতে তাঁর কোন প্রতিপত্তি নাই। চাকরগুলো পর্য্যন্ত তাঁহাকে নীচু নজরে দেখে। অন্তঃপুরের বাহিরে একটা স্বতন্ত্র ঘরে পাঁচ মিনিটের জন্য কোন দিন বা

মেয়েকে দেখিতে পান কোন দিন বা দেখিতে পান না।

কুটুম্বগৃহে এমন করিয়া আর অপমান ত সহ্য যায় না।

রামসুন্দর স্থির করিলেন যেমন করিয়া হউক, টাকাটা শোধ করিয়া দিতে হইবে।

কিন্তু যে ঋণভার কাঁধে চাপিয়াছে তাহারই ভার সাম্‌লানো দুঃসাধ্য। খরচপত্রের অত্যন্ত টানাটানি পড়িয়াছে ; এবং পাওনাদারদের দৃষ্টিপথ এড়াইবার জন্য সর্ব্বদাই নানারূপ হীন কৌশল অবলম্বন করিতে হইতেছে।

এদিকে শ্বশুর বাড়ী উঠিতে বসিতে মেয়েকে খোঁটা খাইতে হয়। পিতৃগৃহের নিন্দা শুনিয়া ঘরে দ্বার দিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন তাহার নৈমিত্তিক ক্রিয়ার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে।

বিশেষতঃ শাশুড়ীর আক্রোশ আর কিছুতেই মেটে না। যদি কেহ বলে "আহা কি শ্রী! বৌয়ের মুখখানি দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়!" শাশুড়ী ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়া বলে "শ্রীত ভারি! যেমন ঘরের মেয়ে তেমনি শ্রী!"

এমন কি বৌয়ের খাওয়া পরারও যত্ন হয় না। যদি কোন দয়াপরতন্ত্র প্রতিবেশিনী কোন ত্রুটির উল্লেখ করে শাশুড়ী বলে "ঐ ঢের হয়েছে!" অর্থাৎ বাপ যদি পূরা দাম দিত ত মেয়ে পূরা যত্ন পাইত। সকলেই এমন ভাব দেখায় যেন বধূর এখানে কোন অধিকার নাই, ফাঁকি দিয়া প্রবেশ করিয়াছেন।

বোধ হয় কন্যার এই সকল অনাদর এবং অপমানের কথা বাপের কাণে গিয়া থাকিবে। তাই রামসুন্দর অবশেষে বসত বাড়ি বিক্রয়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু ছেলেদের যে গৃহহীন করিতে বসিয়াছেন সে কথা তাহাদের নিকট হইতে গোপনে রাখিলেন। স্থির করিয়াছিলেন বাড়ি বিক্রয় করিয়া সেই বাড়িই ভাড়া লইয়া বাস করিবেন ; এমন কৌশলে চলিবেন যে তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে এ কথা ছেলেরা জানিতে পারিবে না।

কিন্তু ছেলেরা জানিতে পারিল। সকলে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। বিশেষতঃ বড় তিনটি ছেলে বিবাহিত এবং তাহাদের কাহারো বা সন্তান আছে। তাহাদের আপত্তি অত্যন্ত গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। বাড়ি বিক্রয় স্থগিত হইল। তখন রামসুন্দর নানাস্থান হইতে বিস্তর সুদে অল্প অল্প করিয়া টাকা ধার করিতে লাগিল। এমন হইল যে সংসারের খরচ আর চলে না। নিরু বাপের মুখ দেখিয়া সব বুঝিতে পারিল। বৃদ্ধের পক্ককেশ, শুষ্কমুখে এবং সদাসঙ্কুচিত ভাবে দৈন্য এবং দুশ্চিন্তা প্রকাশ হইয়া পড়িল। মেয়ের কাছে যখন বাপ অপরাধী তখন সে অপরাধের অনুতাপ কি আর গোপন রাখা যায়? রামসুন্দর যখন বেহাই বাড়ির অনুমতিক্রমে ক্ষণকালের জন্য কন্যার সাক্ষাৎ লাভ করিতেন, তখন বাপের বুক যে কেমন করিয়া ফাটে তাহা তাঁহার হাসি দেখিলেই টের পাওয়া যাইত।

সেই ব্যথিত পিতৃহৃদয়কে সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশে দিন কতক বাপের বাড়ি যাইবার জন্য নিরু নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছে। বাপের ম্লান মুখ দেখিয়া সে আর দূরে থাকিতে পারে না। একদিন রামসুন্দরকে কহিল "বাবা, আমাকে একবার বাড়ি লইয়া যাও।" রামসুন্দর বলিলেন "আচ্ছা।"

কিন্তু তাঁহার কোন জোর নাই—নিজের কন্যার উপরে পিতার যে স্বাভাবিক অধিকার আছে তাহা যেন পণের টাকার পরিবর্ত্তে বন্ধক রাখিতে হইয়াছে। এমন কি কন্যার দর্শন সেও অতি সসঙ্কোচে ভিক্ষা চাহিতে হয় এবং

সময়বিশেষে নিরাশ হইলে দ্বিতীয় কথাটি কহিবার মুখ থাকে না।

কিন্তু মেয়ে আপনি বাড়ি আসিতে চাহিলে বাপ তাহাকে না আনিয়া কেমন করিয়া থাকে! তাই, বেহাইয়ের নিকট সে সম্বন্ধে দরখাস্ত পেশ করিবার পূর্ব্বে রামসুন্দর কত হীনতা, কত অপমান, কত ক্ষতি স্বীকার করিয়া যে তিনটি হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে ইতিহাস গোপন থাকাই ভাল।

নোট ক'খানি রুমালে জড়াইয়া চাদরে বাঁধিয়া রামসুন্দর বেহাইয়ের নিকট গিয়া বসিলেন। প্রথমে হাস্যমুখে পাড়ার খবর পাড়িলেন। হরেকৃষ্ণের বাড়িতে একটা মস্ত চুরি হইয়া গিয়াছে, তাহার আদ্যোপান্ত বিবরণ বলিলেন। নবীনমাধব এবং রাধামাধব দুই ভায়ের তুলনা করিয়া বিদ্যাবুদ্ধি ও স্বভাব সম্বন্ধে রাধামাধবের সুখ্যাতি এবং নবীনমাধবের নিন্দা করিলেন; সহরে একটা নূতন ব্যামো আসিয়াছে সে সম্বন্ধে অনেক আজগবি আলোচনা করিলেন, অবশেষে হুকাটি নামাইয়া রাখিয়া কথায় কথায় বলিলেন, "হাঁ, হাঁ বেহাই, সেই টাকাটা বাকি আছে বটে। রোজই মনে করি—যাচ্চি অমনি হাতে করে কিছু নিয়ে যাই কিন্তু সময়কালে মনে থাকে না। আর ভাই, বুড়ো হয়ে পড়েছি!" এম্‌নি এক দীর্ঘ ভূমিকা করিয়া পঞ্জরের তিন খানি অস্থির মত সেই তিন খানি নোট যেন অতি সহজে অতি অবহেলে বাহির করিলেন। সবে মাত্র তিন হাজার টাকার নোট দেখিয়া রায়বাহাদুর অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন।

বলিলেন "থাক্ বেহাই ওতে আমার কাজ নেই।" একটা প্রচলিত বাঙ্গালা প্রবাদের উল্লেখ করিয়া বলিলেন সামান্য কারণে হাত গন্ধ করিতে তিনি চান না।

এই ঘটনার পরে মেয়েকে বাড়ি আনিবার প্রস্তাব কাহারো মুখে আসে না—কেবল রামসুন্দর ভাবিলেন সে সকল কুটুম্বিতার সঙ্কোচ আমাকে আর শোভা পায় না। মর্ম্মাহতভাবে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে মৃদুস্বরে কথাটা পাড়িলেন। রায় বাহাদুর কোন কারণ মাত্র উল্লেখ না করিয়া বলিলেন "সে এখন হচ্চে না।" এই বলিয়া কর্ম্মোপলক্ষে স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

রামসুন্দর মেয়ের কাছে মুখ না দেখাইয়া কম্পিতহস্তে কয়েকখানি নোট চাদরের প্রান্তে বাঁধিয়া বাড়ি ফিরিয়া গেলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যত দিন না সমস্ত টাকা শোধ করিয়া দিয়া অসঙ্কোচে কন্যার উপরে দাবী করিতে পারিবেন, ততদিন আর বেহাই-বাড়ি যাইব না।

বহুদিন গেল। নিরুপমা লোকের উপর লোক পাঠায় কিন্তু বাপের দেখা পায় না। অবশেষে অভিমান করিয়া লোক পাঠান বন্ধ করিল—তখন রামসুন্দরের মনে বড় আঘাত লাগিল কিন্তু তবু গেল না।

আশ্বিন মাস আসিল। রামসুন্দর বলিলেন এবার পূজার সময় মাকে ঘরে আনিবই নহিলে আমি—খুব একটা শক্ত রকম শপথ করিলেন।

পঞ্চমী কি ষষ্ঠীর দিনে আবার চাদরের প্রান্তে গুটিকতক নোট বাঁধিয়া রামসুন্দর যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। পাঁচ বৎসরের এক নাতি আসিয়া বলিল "দাদা আমার জন্যে গাড়ী কিন্‌তে যাচ্চিস্?" বহু দিন হইতে তাহার ঠেলা গাড়িতে চড়িয়া হাওয়া খাইবার সখ হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তাহা মিটিবার উপায় হইতেছে না। ছয় বৎসরের এক নাতিনী আসিয়া সরোদনে কহিল পূজার

নিমন্ত্রণে যাইবার মত তাহার একখানিও ভাল পড় নাই।

রামসুন্দর তাহা জানিতেন এবং সে সম্বন্ধে মাক খাইতে খাইতে বৃদ্ধ অনেক চিন্তা রিয়াছেন। রায় বাহাদুরের বাড়ী যখন দার নিমন্ত্রণ হইবে তখন তাহার বধূগণকে ত যৎসামান্য অলঙ্কারে অনুগ্রহপাত্র দরিদ্রের ;, যাইতে হইবে এ কথা স্মরণ করিয়া তিনি নক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়াছেন কিন্তু হাতে তাঁহার ললাটের বার্দ্ধক্যরেখা গভীর- । অঙ্কিত হওয়া ছাড়া আর কোন ফল নাই।

দৈন্যপীড়িত গৃহের ক্রন্দনধ্বনি কাণে লইয়া তাঁহার বেহাই বাড়িতে প্রবেশ করিলেন। জ তাঁহার সে সঙ্কোচ ভাব নাই; দ্বাররক্ষী ভৃত্যদের মুখের প্রতি সে চকিত সলজ্জ পাত দূর হইয়া গিয়াছে, যেন আপনার গৃহে বেশ করিলেন। শুনিলেন, রায় বাহাদুর র নাই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে। নর উচ্ছ্বাস সম্বরণ করিতে না পারিয়া রাম- দর কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আনন্দে চোক দিয়া জল পড়িতে লাগিল। বাপও দে, মেয়েও কাঁদে; দুই জনে কেহ আর থা কহিতে পারে না। এমন করিয়া কিছু- ণ গেল। তারপরে রামসুন্দর কহিলেন বারে তোকে নিয়ে যাচ্ছি মা। আর কোন াল নাই।"

এমন সময়ে রামসুন্দরের জ্যেষ্ঠপুত্র হর- াহন তাঁহার দুটি ছোট ছেলে সঙ্গে হইয়া হসা ঘরে প্রবেশ করিলেন।

পিতাকে বলিলেন "বাবা আমাদের তবে বার পথে ভাসালে ?"

রামসুন্দর সহসা অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া বলিলেন তোদের জন্য কি আমি নরকগামী হব? আমাকে তোরা আমার সত্যপালন করতে দিবিনে ?" রামসুন্দর বাড়ি বিক্রয় করিয়া বসিয়া আছেন, ছেলেরা কিছুতে না জানিতে পায় তাহার অনেক ব্যবস্থা করিয়াছিলেন কিন্তু তবু তাহারা জানিয়াছে দেখিয়া, তাহাদের প্রতি হঠাৎ অত্যন্ত রুষ্ট ও বিরক্ত হইয়া উঠি- লেন। তাঁহার নাতি তাঁহার দুই হাঁটু সবলে জড়াইয়া ধরিয়া মুখ তুলিয়া কহিল "দাদা আমাকে গাড়ি কিনে দিলে না ?" তখন রামসুন্দরের মনে হইল—গাড়ি কিনিয়া দিব কি তোদের বাড়ি ছাড়া করিলাম।

নতশির রামসুন্দরের কাছে বালক কোন উত্তর না পাইয়া নিরুর কাছে গিয়া বলিল "পিসি মা আমাকে একখানা গাড়ি কিনে দেবে ?" নিরুপমা সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া কহিল "বাবা" তুমি যদি আর এক পয়সা আমার শ্বশুরকে দাও তাহলে আর তোমার মেয়েকে দেখ্তে পাবে না, এই তোমার গা ছুঁয়ে বল্লুম।"

রামসুন্দর বলিলেন "ছি মা, অমন কথা বল্তে নেই! আর এ টাকাটা যদি আমি না দিতে পারি, তা হলে তোর বাপের অপমান আর তোরও অপমান।"

নিরু কহিল "টাকা যদি দাও তবেই অপ- মান! তোমার মেয়ের কি মোন মর্য্যাদা নেই ? আমি কি কেবল একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম। না বাবা, এ টাকা দিয়ে তুমি আমাকে অপ- মান কোরোনা। তা ছাড়া আমার স্বামীত এ টাকা চান না।"

রামসুন্দন কহিলেম "তা হলে তোমাকে যেতে দেবে না মা!" নিরুপমা কহিল "না দেয় ত কি করবে বল। তুমিও আর নিয়ে যেতে চেয়ো না।"

রামসুন্দর কম্পিত হস্তে নোটবাঁধা চাদরটি কাঁধে তুলিয়া আবার চোরের মত সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া বাড়ি ফিরিয়া গেলেন।

কিন্তু রামসুন্দর এই যে টাকা আনিয়াছিলেন এবং কন্যার নিষেধে সে টাকা না দিয়াই চলিয়া গিয়াছেন, সে কথা গোপন রহিল না। কোন স্বভাবকৌতূহলী দ্বারলগ্নকর্ণ দাসী নিরুর শাশুড়ীকে এই খবর দিল। শুনিয়া তাঁহার আর আক্রোশের সীমা রহিল না।

নিরুপমার পক্ষে তাহার শ্বশুরবাড়ি শরশয্যা হইয়া উঠিল। এদিকে তাহার স্বামী বিবাহের অল্পদিন পরেই ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইয়া দেশান্তরে চলিয়া গিয়াছে; এবং পাছে সংসর্গদোষে হীনতা শিক্ষা হয় এই ওজরে সম্প্রতি তাহার বাপের বাড়ির আত্মীয়দের সহিত তাহার সাক্ষাৎকার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

এই সময়ে নিরুর একটা গুরুতর পীড়া হইল। কিন্তু সেজন্য তাহার শাশুড়ীকে সম্পূর্ণ দোষ দেওয়া যায় না।

শরীরের প্রতি সে অত্যন্ত অবহেলা করিত। কার্ত্তিক মাসের হিমের সময় সমস্ত রাত মাথার দরজা খোলা, শীতের সময় গায়ে কাপড় নাই। আহারের নিয়ম নাই। দাসীরা যখন বিস্মৃতিবশতঃ মাঝে মাঝে খাবার আনিতে ভুলিয়া যাইত, তখন যে তাহাদের একবার মুখ খুলিয়া স্মরণ করাইয়া দেওয়া তাহাও সে করিত না। সে যে পরের ঘরের দাসদাসী এবং কর্ত্তা গৃহিণীদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া বাস করিতেছে এই সংস্কার তাহার মনে বদ্ধমূল হইতেছিল। কিন্তু এরূপ ভাবটাও শাশুড়ীর সহ্য হইত না। যদি আহারের প্রতি বধূর কোন অবহেলা দেখিত তবে শাশুড়ী বলিতেন "নবাবের বাড়ির মেয়ে কি না।" গরীবের ঘরের অন্ন ওঁর মুখে রোচে না!" কখন বা বলিতেন "দেখ না একবার ছিরি হচ্চে দেখ না, দিনে দিনে পোড়াকাঠ হয়ে যাচ্চে!"

রোগ যখন গুরুতর হইয়া উঠিল তখন শাশুড়ী বলিলেন "ওঁর সমস্ত ন্যাকামি!" অবশেষে একদিন নিরু সবিনয়ে শাশুড়ীকে বলিল "বাবাকে আর আমার ভাইদের একবার দেখ্‌বো মা!" শাশুড়ী বলিলেন "কেবল বাপের বাড়ি যাইবার ছল।"

কেহ বলিলে বিশ্বাস করিবে না—যে দিন সন্ধ্যার সময় নিরুর শ্বাস উপস্থিত হইল সেই দিন প্রথম ডাক্তার দেখিল, এবং সেই দিন ডাক্তারের দেখা শেষ হইল।

বাড়ির বড়বৌ মরিয়াছে খুব ধূম করিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইল। প্রতিমা বিসর্জ্জনের সমারোহ সম্বন্ধে জেলার মধ্যে রায়চৌধুরীদের যেমন লোকবিখ্যাত প্রতিপত্তি আছে, বড়বৌয়ের সংকার সম্বন্ধে রায়বাহাদুরদের তেমনি একটা খ্যাতি রটিয়া গেল—এমন চন্দন কাষ্ঠের চিতা এ মুলুকে কেহ কখন দেখে নাই। এমন ঘটা করিয়া শ্রাদ্ধও কেবল রায়বাহাদুরদের বাড়িতেই সম্ভব এবং শুনা যায় ইহাতে তাঁহাদের কিঞ্চিৎ ঋণ হইয়াছিল।

রামসুন্দরকে সান্ত্বনা দিবার সময়, তাহার মেয়ের যে কিরূপ মহাসমারোহে মৃত্যু হইয়াছে সকলেই তাহার বহুল বর্ণনা করিল।

এদিকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চিঠি আসিল—আমি এখানে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছি অতএব অবিলম্বে আমার স্ত্রীকে এখানে পাঠাইবে। রায় বাহাদুরের মহিষী লিখিলেন "বাবা, তোমার জন্যে আর একটি মেয়ের সম্বন্ধ করিয়াছি, অতএব অবিলম্বে ছুটি লইয়া এখানে আসিবে।"

এবারে বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়।

পোষ্টমাষ্টার।

প্রথম কাজ আরম্ভ করিয়াই উলাপুর গ্রামে পোষ্টমাষ্টারকে আসিতে হয়। গ্রামটি অতি সামান্য। নিকটে একটি নীলকুঠি আছে, তাই কুঠির সাহেব অনেক যোগাড় করিয়া এই নূতন পোষ্টআপিস স্থাপন করাইয়াছে।

আমাদের পোষ্টমাষ্টার কলিকাতার ছেলে। জলের মাছকে ডাঙ্গায় তুলিলে যে রকম হয় এই গণ্ডগ্রামের পোষ্ট মধ্যে আসিয়া পোষ্টমাষ্টারেরও সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে। একখানি অন্ধকার আটচালার মধ্যে তাঁহার আফিস; অদূরে একটি পানাপুকুর এবং তাহার চারিপাড়ে জঙ্গল। কুঠির গোমস্তা প্রভৃতি যে সকল কর্ম্মচারী আছে তাহাদের ফুরসৎ প্রায় নাই এবং তাহারা ভদ্রলোকের সহিত মিশিবার উপযুক্ত নহে।

বিশেষতঃ কলিকাতার ছেলে ভাল করিয়া মিশিতে জানে না। অপরিচিত স্থানে গেলে হয় উদ্ধত নয় অপ্রতিভ হইয়া থাকে। এই কারণে স্থানীয় লোকের সহিত তাঁহার মেলামেশা হইয়া উঠে না। অথচ হাতে কাজ অধিক নাই। কখনও কখনও দুটো একটা কবিতা লিখিতে চেষ্টা করেন। তাহাতে এমন ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সমস্ত দিন তরুপল্লবের কম্পন এবং আকাশের মেঘ দেখিয়া জীবন বড় সুখে কাটিয়া যায়—কিন্তু অন্তর্যামী জানেন যদি আরব্য উপন্যাসের কোন দৈত্য আসিয়া এক রাত্রের মধ্যে এই শাখাপল্লবসমেত সমস্ত গাছগুলা কাটিয়া পাকা রাস্তা বানাইয়া দেয়, এবং সারি সারি অট্টালিকা আকাশের মেঘকে দৃষ্টিপথ হইতে রুদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে এই আধমরা ভদ্রসন্তানটি পুনশ্চ নবজীবন লাভ করিতে পারে।

পোষ্টমাষ্টারের বেতন অতি সামান্য। নিজে রাঁধিয়া খাইতে হয় এবং গ্রামের একটি পিতৃ-মাতৃ-হীন অনাথা বালিকা তাঁহার কাজ-কর্ম্ম করিয়া দেয়, চারিটি চারিটি খাইতে পায়। মেয়েটির নাম রতন। বয়স বারো তেরো। বিবাহের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় না।

সন্ধ্যার সময় যখন গ্রামের গোয়ালঘর হইতে ধূম কুণ্ডলায়িত হইয়া উঠিত, দলবদ্ধ মশক ঝাঁওড়া বনের উপরে অনেকক্ষণ ব্যাণ্ড বাজাইয়া ও সন্ধ্যার হাওয়া খাইয়া পরিপূর্ণ ক্ষুধা সঞ্চয় পূর্ব্বক মানবের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিত—ঝোপে ঝোপে ঝিল্লি ডাকিয়া উঠিত—দূরে গ্রামের নেশাখোর বাউলের দল খোল করতাল বাজাইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান জুড়িয়া দিত—যখন অন্ধকার দাওয়ায় একলা বসিয়া গাছের কম্পন দেখিলে কবি-হৃদয়েও ঈষৎ হৃৎকম্প উপস্থিত হইত,—তখন ঘরের কোণে একটি ক্ষীণশিখা প্রদীপ জ্বালিয়া পোষ্টমাষ্টার ডাকিতেন "রতন।" রতন দ্বারে বসিয়া এই ডাকের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিত কিন্তু এক ডাকেই ঘরে আসিত না—বলিত "কিগা বাবু, কেনে ডাকচ ?"

পোষ্টমাষ্টার—"তুই কি করছিস্ ?"

রতন—"এখনি চুলো ধরাতে যেতে হবে—হেঁশেলের—"

পোষ্টমাষ্টার—"তোর হেঁশেলের কাজ

পারে হবে এখন—একবার তামাকটা সেজে দে ত।”

অনতিবিলম্বে দুটি গাল ফুলাইয়া কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে রতনের প্রবেশ। হাত হইতে কলিকাটা লইয়া পোষ্টমাষ্টার ফস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, “আচ্ছা রতন, তোর মাকে মনে পড়ে ?” সে অনেক কথা ; কতক মনে পড়ে কতক মনে পড়ে না। মায়ের চেয়ে বাপ তাহাকে বেশী ভাল বাসিত, বাপকে অল্প অল্প মনে আছে। পরিশ্রম করিয়া বাপ সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ফিরিয়া আসিত,তাহারি মধ্যে দৈবাং দুটি একটি সন্ধ্যা তাহার মনে পরিষ্কার ছবির মত অঙ্কিত আছে। এই কথা হইতে হইতে ক্রমে রতন পোষ্টমাষ্টারের পায়ের কাছে মাটির উপর বসিয়া পড়িত। মনে পড়িত তাহার একটি ছোট ভাই ছিল—বহু পূর্ব্বেকার বর্ষার দিনে একদিন একটা ডোবার ধারে দুইজনে মিলিয়া গাছের ভাঙ্গা ডালকে ছিপ করিয়া মিছামিছি মাছধরা খেলা করিয়াছিল—অনেক গুরুতর ঘটনার চেয়ে সেই কথাটাই তাহার মনে বেশী উদয় হইত। এইরূপ কথাপ্রসঙ্গে মাঝে মাঝে বেশী রাত হইয়া যাইত তখন আলস্যক্রমে পোষ্টমাষ্টারের আর রাঁধিতে ইচ্ছা করিত না। সকালের বাসী ব্যঞ্জন থাকিত এবং রতন তাড়াতাড়ি উনুন ধরাইয়া খানকয়েক রুটি সেঁকিয়া আনিত—তাহাতেই উভয়ের রাত্রের আহার চলিয়া যাইত।

এক এক দিন সন্ধ্যাবেলায় সেই বৃহৎ আটচালার কোণে আপিসের কাঠের চৌকির উপর বসিয়া পোষ্টমাষ্টারও নিজের ঘরের কথা পাড়িতেন—ছোট ভাই, মা এবং দিদির কথা, প্রবাসে একলা ঘরে বসিয়া যাহাদের জন্য হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিত তাহাদের কথা। যে সকল কথা সর্ব্বদাই মনে উদয় হয় অথচ নীলকুঠির গোমস্তাদের কাছে যাহা কোন মতেই উত্থাপন করা যায় না—সেই কথা একটি অশিক্ষিতা ক্ষুদ্র বালিকাকে বলিয়া যাইতেন কিছুমাত্র অসঙ্গত মনে হইত না। অবশেষে এমন হইল বালিকা কথোপকথনকালে তাঁহার ঘরের লোকদিগকে মা, দিদি, দাদা বলিয়া চিরপরিচিতের ন্যায় উল্লেখ করিত। এমন কি তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়পটে বালিকা তাঁহাদের কাল্পনিক মূর্ত্তিও চিত্রিত করিয়া লইয়াছিল।

একদিন বর্ষাকালের মেঘমুক্ত দ্বিপ্রহরে ঈষৎ তপ্ত সুকোমল বাতাস দিতেছিল, রৌদ্রে ভিজা ঘাস এবং গাছ পালা হইতে একপ্রকার গন্ধ উত্থিত হইতেছিল মনে হইতেছিল যেন ক্লান্ত ধরণীর উষ্ণ নিঃশ্বাস গায়ের উপরে আসিয়া লাগিতেছে, এবং কোথাকার এক নাছোড়বান্দা পাখী তাহার একটা একসুরের নালিশ সমস্ত দুপুরবেলা প্রকৃতির দরবারে অত্যন্ত করুণস্বরে বারবার আবৃত্তি করিতেছিল। পোষ্টমাষ্টারের হাতে কাজ ছিল না—সেদিনকার বৃষ্টিধৌত মসৃণ চিক্কণ তরুপল্লবের হিল্লোল, এবং পরাভূত বর্ষার ভগ্নাবশিষ্ট রৌদ্রশুভ্র স্তূপাকার মেঘস্তর বাস্তবিকই দেখিবার বিষয় ছিল—পোষ্টমাষ্টার তাহা দেখিতেছিলেন এবং ভাবিতেছিলেন, এই সময়ে কাছে একটি কেহ নিতান্ত আপনার লোক থাকিত—হৃদয়ের সহিত একান্ত সংলগ্ন একটি স্নেহপুত্তলি মানবমূর্ত্তি ! ক্রমে মনে হইতে লাগিল সেই পাখী ঐ কথাই বারবার বলিতেছে এবং এই জনহীন, তরুচ্ছায়ানিমগ্ন মধ্যাহ্নের পল্লবমর্ম্মরের অর্থও কতকটা ঐরূপ। কেহ বিশ্বাস করে না, এবং জানিতেও পায় না, কিন্তু ছোট পল্লির সামান্য বেতনের সাব্‌পোষ্টমাষ্টারের মনে গভীর নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে দীর্ঘ ছুটির দিনে এইরূপ একটা ভাবের উদয় হইয়া থাকে।

পোষ্টমাষ্টার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া

ডাকিলেন "রতন।" রতন তখন পেয়ারাতলায় পা ছড়াইয়া দিয়া কাঁচা পেয়ারা খাইতেছিল; প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া অবিলম্বে ছুটিয়া আসিল—হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "দাদাবাবু, ডাকচ?" পোষ্টমাষ্টার বলিলেন "তোকে আমি একটু একটু করে পড়তে শেখাব।" বলিয়া সমস্ত দুপুর বেলা তাহাকে লইয়া "স্বরে অ" "স্বরে আ," করিলেন। এবং এইরূপে অল্পদিনেই যুক্ত অক্ষর উত্তীর্ণ হইলেন।

শ্রাবণ মাসে বর্ষণের আর অন্ত নাই। খাল বিল নালা জলে ভরিয়া উঠিল। অহর্নিশি ভেকের ডাক এবং বৃষ্টির শব্দ। গ্রামের রাস্তায় চলাচল প্রায় একপ্রকার বন্ধ—নৌকায় করিয়া হাটে যাইতে হয়।

একদিন প্রাতঃকাল হইতে খুব বাদ্‌লা করিয়াছে। পোষ্টমাষ্টারের ছাত্রীটি অনেকক্ষণ দ্বারের কাছে অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছিল, কিন্তু অন্যদিনের মত যথাসাধ্য নিয়মিত ডাক শুনিতে না পাইয়া আপনি খুঙ্গিপুঁথি লইয়া ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, পোষ্টমাষ্টার তাঁহার খাটিয়ার উপর শুইয়া আছেন—বিশ্রাম করিতেছেন মনে করিয়া অতি নিঃশব্দে পুনশ্চ ঘর হইতে বাহিরে যাইবার উপক্রম করিল। সহসা শুনিল "রতন!" তাড়াতাড়ি ফিরিয়া গিয়া বলিল "দাদাবাবু, ঘুমচ্ছিলে?" পোষ্টমাষ্টার কাতরস্বরে বলিলেন "শরীরটা ভাল বোধ হচ্চে না—দেখ্‌ত আমার কপালে হাত দিয়ে।"

এই নিতান্ত নিঃসঙ্গ প্রবাসে ঘনবর্ষায় রোগকাতর শরীরে একটুখানি সেবা পাইতে ইচ্ছা করে। তপ্ত ললাটের উপর শাঁখাপরা কোমল হস্তের স্পর্শ মনে পড়ে। এই ঘোর প্রবাসে রোগ যন্ত্রণায় স্নেহময়ী নারীরূপে জননী ও দিদি পাশে বসিয়া আছেন এই কথা মনে করিতে ইচ্ছা করে। এবং এস্থলে প্রবাসীর মনের অভিলাষ ব্যর্থ হইল না। বালিকা রতন আর বালিকা রহিল না। সেই মুহূর্ত্তেই সে জননীর পদ অধিকার করিয়া বসিল, বৈদ্য ডাকিয়া আনিল, যথাসময়ে বটিকা খাওয়াইল, সারারাত্রি শিয়রে জাগিয়া রহিল, আপনি পথ্য রাঁধিয়া দিল, এবং শতবার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "হাঁগো দাদা বাবু, একটুখানি ভাল বোধ হচ্চে কি?"

বহুদিন পরে পোষ্টমাষ্টার ক্ষীণ শরীরে রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন—মনে স্থির করিলেন আর নয়, এখান হইতে কোন মতে বদ্‌লি হইতে হইবে। স্থানীয় অস্বাস্থ্যের উল্লেখ করিয়া তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় কর্ত্তৃপক্ষদের নিকট বদ্‌লি হইবার জন্য দরখাস্ত করিলেন।

রোগ-সেবা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া রতন দ্বারের বাহিরে আবার স্বস্থান অধিকার করিল। কিন্তু পূর্ব্ববৎ আর তাহাকে ডাক পড়ে না। মাঝে মাঝে উঁকি মারিয়া দেখে, পোষ্টমাষ্টার অত্যন্ত অন্যমনস্ক ভাবে চৌকিতে বসিয়া অথবা খাটিয়ায় শুইয়া আছেন। রতন যখন আহ্বান প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া আছে তিনি তখন অধীরচিত্তে তাঁহার দরখাস্তের উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছেন। বালিকা দ্বারের বাহিরে বসিয়া সহস্রবার করিয়া তাহার পুরাণো পড়া পড়িল। পাছে যে দিন সহসা ডাক পড়িবে সে দিন তাহার যুক্ত অক্ষর সমস্ত গোলমাল হইয়া যায় এই তাহার একটা আশঙ্কা ছিল। অবশেষে সপ্তাহখানেক পরে একদিন সন্ধ্যা বেলায় ডাক পড়িল। উদ্বেলিত হৃদয়ে রতন গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল "দাদা বাবু, আমাকে ডাকছিলে?"

পোষ্টমাষ্টার বলিলেন, "রতন, কালই আমি যাচ্চি।"

রতন। "কোথায় যাচ্চ দাদা বাবু?

পোষ্টমাষ্টার। "বাড়ি যাচ্চি।"

রতন। "আবার কবে আস্‌বে?"

পোষ্টমাষ্টার। "আর আস্‌ব না।"

রতন আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। পোষ্টমাষ্টার আপনিই তাহাকে বলিলেন—তিনি বদ্‌লির জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন—দরখাস্ত নামঞ্জুর হইয়াছে। তাই তিনি কাজে জবাব দিয়া বাড়ি যাইতেছেন। অনেকক্ষণ আর কেহ কোন কথা কহিল না। মিট্‌মিট্‌ করিয়া প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল এবং একস্থানে ঘরের জীর্ণ চাল ভেদ করিয়া একটি মাটির সরার উপর টপটপ করিয়া বৃষ্টির জল পড়িতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে রতন আস্তে আস্তে উঠিয়া রান্নাঘরে রুটি গড়িতে গেল। অন্য দিনের মত তেমন চট্‌পট্‌ হইল না। বোধ করি মধ্যে মধ্যে মাথায় অনেক ভাবনা উদয় হইয়াছিল। পোষ্টমাষ্টারের আহার সমাপ্ত হইলে পর বালিকা হঠাৎ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল "দাদা বাবু, আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে?"

পোষ্টমাষ্টার হাসিয়া কহিলেন "সে কি করে হবে?" ব্যাপারটা যে কি কি কারণে অসম্ভব তাহা বালিকাকে বুঝানো আবশ্যক বোধ করিলেন না।

সমস্ত রাত্রি স্বপ্নে এবং জাগরণে বালিকার কাণে পোষ্টমাষ্টারের হাস্যধ্বনির কণ্ঠস্বর বাজিতে লাগিল "সে কি করে হবে?"

ভোরে উঠিয়া পোষ্টমাষ্টার দেখিলেন তাঁহার স্নানের জল ঠিক আছে। কলিকাতার অভ্যাস অনুসারে তিনি তোলা জলে স্নান করিতেন। কখন্ তিনি যাত্রা করিবেন সে কথা বালিকা কি কারণে জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই; পাছে প্রাতঃকালে আবশ্যক হয় এই জন্য রতন ততরাত্রে নদী হইতে তাঁহার স্নানের জল তুলিয়া আনিয়াছিল। স্নান সমাপন হইলে রতনের ডাক পড়িল। রতন নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিল এবং আদেশ প্রতীক্ষায় একবার নীরবে প্রভুর মুখের দিকে চাহিল। প্রভু কহিলেন—"রতন, আমার জায়গায় যে লোকটি আসিবেন তাঁকে বলে দিয়ে যাব তিনি তোকে আমারি মতন যত্ন করবেন, আমি যাচ্চি বলে তোকে কিছু ভাবতে হবে না।" এই কথাগুলি যে অত্যন্ত স্নেহগর্ভ এবং দয়ার্দ্র-হৃদয় হইতে উত্থিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই কিন্তু নারীহৃদয় কে বুঝিবে? রতন অনেক দিন প্রভুর অনেক তিরস্কার নীরবে সহ্য করিয়াছে কিন্তু এই নরম কথা সহিতে পারিল না। একেবারে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল "না না, তোমার কাউকে কিছু বল্‌তে হইবে না, আমি থাক্‌তে চাইনে।"

পোষ্টমাষ্টার রতনের এরূপ ব্যবহার কখনও দেখেন নাই, তাই অবাক্ হইয়া রহিলেন।

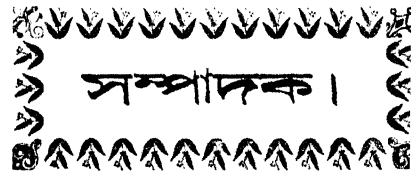
নূতন পোষ্টমাষ্টার আসিল। তাহাকে সমস্ত চার্জ্জ বুঝাইয়া দিয়া পুরাতন পোষ্টমাষ্টার গমনোন্মুখ হইলেন। যাইবার সময় রতনকে ডাকিয়া বলিলেন, "রতন, তোকে আমি কখনো কিছু দিতে পারি নি। আজ যাবার সময় তোকে কিছু দিয়ে গেলুম এতে তোর দিন কয়েক চল্‌বে।" বলিয়া পথ খরচা বাদে তাঁহার বেতনের যত টাকা পাইয়াছিলেন পকেট হইতে বাহির করিলেন। তখন রতন ধূলায় পড়িয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল "দাদাবাবু, তোমার দুটি পায়ে পড়ি,

আমাকে কিছু দিতে হবে না; তোমার দুটি পায়ে পড়ি আমার জন্যে কাউকে কিছু ভাব্‌তে হবে না” বলিয়া এক দৌড়ে সেখান হইতে পালাইয়া গেল।

ভূতপূর্ব্ব পোষ্টমাষ্টার নিঃশ্বাস ফেলিয়া হাতে কার্পেটের ব্যাগ ঝুলাইয়া, কাঁধে ছাতা লইয়া মুটের মাথায় নীল ও শ্বেত রেখার বিচিত্র টিনের পেঁটরা তুলিয়া ধীরে ধীরে নৌকাভিমুখে চলিলেন।

যখন নৌকায়• উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল,—বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মত চারিদিকে ছল ছল করিতে লাগিল, তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন—একটি সামান্য গ্রাম্যবালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্ম্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি—কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়াছে—এবং নদী-প্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কি! পৃথিবীতে কে কাহার!

কিন্তু রতনের মনে কোন তত্ত্বের উদয় হইল না। সে সেই পোষ্ট আপিস গৃহের চারিদিকে কেবল অশ্রুজলে ভাসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বোধ করি তাহার মনে ক্ষীণ আশা জাগিতেছিল, দাদা বাবু যদি ফিরিয়া আসে,—সেই বন্ধনে পড়িয়া কিছুতেই দূরে যাইতে পারিতেছিল না। হায় বুদ্ধিহীন মানবহৃদয়! ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচে না, যুক্তি-শাস্ত্রের বিধান বহুবিলম্বে মাথায় প্রবেশ করে, প্রবল প্রমাণকেও অবিশ্বাস করিয়া মিথ্যা আশাকে দুই বাহুপাশে বাঁধিয়া বুকের ভিতরে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরা যায়, অবশেষে এক-দিন সমস্ত নাড়ী কাটিয়া হৃদয়ের রক্ত শুষিয়া সে পলায়ন করে, তখন চেতনা হয় এবং দ্বিতীয় ভ্রান্তি পাশে পড়িবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।



আমার স্ত্রী বর্ত্তমানে প্রভা সম্বন্ধে আমার কোন চিন্তা ছিল না। তখন প্রভা অপেক্ষা প্রভার মাতাকে লইয়া কিছু অধিক ব্যস্ত ছিলাম।

তখন কেবল প্রভার খেলাটুকু হাসিটুকু দেখিয়া তাহার আধ আধ কথা শুনিয়া এবং আদরটুকু লইয়াই তৃপ্ত থাকিতাম; যতক্ষণ ভাল লাগিত নাড়াচাড়া করিতাম, কান্না আরম্ভ করিলেই তাহার মার কোলে সমর্পণ করিয়া সত্বর অব্যাহতি লইতাম। তাহাকে যে বহু চিন্তা ও চেষ্টায় মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে এ কথা আমার মনে আসে নাই।

অবশেষে অকালে আমার স্ত্রীর মৃত্যু হইলে এক দিন মায়ের কোল হইতে খসিয়া মেয়েটি আমার কোলের কাছে আসিয়া পড়িল, তাহাকে বুকে টানিয়া লইলাম।

কিন্তু মাতৃহীনা দুহিতাকে দ্বিগুণ স্নেহে পালন করা আমার কর্ত্তব্য এটা আমি বেশী

চিন্তা করিয়াছিলাম, না, পত্নীহীন পিতাকে পরম যত্নে রক্ষা করা তাহার কর্ত্তব্য এইটে সে বেশী অনুভব করিয়াছিল আমি ঠিক বুঝিতে পারি না; কিন্তু ছয় বৎসর বয়স হইতেই সে গিন্নিপনা আরম্ভ করিয়াছিল। বেশ দেখা গেল, ঐটুকু মেয়ে তাহার বাবার একমাত্র অভিভাবক হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

আমি মনে মনে হাসিয়া তাহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিলাম। দেখিলাম, যতই আমি অকর্ম্মণ্য অসহায় হই ততই তাহার লাগে ভাল; দেখিলাম, আমি নিজে কাপড়টা ছাতাটা পাড়িয়া লইলে সে এমন ভাব ধারণ করে যেন তাহার অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে। বাবার মত এত বড় পুতুল সে ইতিপূর্ব্বে কখনো পায় নাই, এইজন্য বাবাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া বিছানায় শুয়াইয়া সে সমস্ত দিন বড় আনন্দে আছে। কেবল ধারাপাত এবং পদ্যপাঠ প্রথম ভাগ অধ্যাপনের সময় আমার পিতৃত্বকে কিঞ্চিৎ সচেতন করিয়া তুলিতে হইত।

কিন্তু মাঝে মাঝে ভাবনা হইত মেয়েটিকে সৎপাত্রে বিবাহ দিতে হইলে অনেক অর্থের আবশ্যক—আমার এত টাকা কোথায়? মেয়েকে ত সাধ্যমত লেখাপড়া শিখাইতেছি কিন্তু একটা পরিপূর্ণ মূর্খের হাতে পড়িলে তাহার কি দশা হইবে?

উপার্জ্জনে মন দেওয়া গেল। গবর্ণমেণ্ট আপিসে চাকরি করিবার বয়স গেছে, অন্য আপিসে প্রবেশ করিবারও ক্ষমতা নাই। অনেক ভাবিয়া বই লিখিতে লাগিলাম।

বাঁশের নল ফুটা করিলে তাহাতে তেল রাখা যায় না, জল রাখা যায় না, তাহার ধারণাশক্তি মূলেই থাকে না; তাহাতে সংসারের কোন কাজই হয় না, কিন্তু ফুঁ দিলে বিনা খরচে বাঁশি বাজে ভাল। আমি স্থির জানিতাম, সংসারের কোন কাজেই যে হতভাগ্যের বুদ্ধি খেলে না, সে নিশ্চয়ই ভাল বই লিখিবে। সেই সাহসে একখানা প্রহসন লিখিলাম, লোকে ভাল বলিল এবং রঙ্গভূমিতে অভিনয় হইয়া গেল।

সহসা যশের আস্বাদ পাইয়া এমনি বিপদ হইল প্রহসন আর কিছুতেই ছাড়িতে পারি না। সমস্ত দিন ব্যাকুল চিন্তান্বিত মুখে প্রহসন লিখিতে লাগিলাম।

প্রভা আসিয়া আদর করিয়া স্নেহসহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল "বাবা, নাইতে যাবে না"?

আমি হুঙ্কার দিয়া উঠিলাম "এখন যা, এখন যা, এখন বিরক্ত করিস্‌নে!"

বালিকার মুখখানি বোধ করি একটি ফুৎকারে নির্ব্বাপিত প্রদীপের মত অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল; কখন সে অভিমান-বিস্ফারিত হৃদয়ে নীরবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল আমি জানিতেও পারি নাই।

দাসীকে তাড়াইয়া দিই, চাকরকে মারিতে যাই, ভিক্ষুক সুর করিয়া ভিক্ষা করিতে আসিলে তাহাকে লাঠি লইয়া তাড়া করি। পথপার্শ্বেই আমার ঘর হওয়াতে যখন কোন নিরীহ পান্থ জানালার বাহির হইতে আমাকে পথ জিজ্ঞাসা করে, আমি তাহাকে জাহান্নম নামক একটা অস্থানে যাইতে অনুরোধ করি। হায়, কেহই বুঝিত না আমি খুব একটা মজার প্রহসন লিখিতেছি।

কিন্তু যতটা মজা এবং যতটা যশ হইতেছিল সে পরিমাণে টাকা কিছুই হয় নাই। তখন টাকার কথা মনেও ছিল না। এদিকে প্রভার যোগ্য পাত্রগুলি অন্য ভদ্রলোকদের কন্যাদায় মোচন করিবার জন্য গোকুলে

বাড়িতে লাগিল, আমার তাহাতে খেয়াল ছিল না।

পেটের জ্বালা না ধরিলে চৈতন্য হইত না, কিন্তু এমন সময় একটা সুযোগ জুটিয়া গেল। জাহিরগ্রামের এক জমিদার একখানি কাগজ বাহির করিয়া আমাকে তাহার বেতনভোগী সম্পাদক হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন। কাজটা স্বীকার করিলাম।

দিন কতক এম্নি প্রতাপের সহিত লিখিতে লাগিলাম যে, পথে বাহির হইলে লোকে আমাকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইত এবং আপনাকে মধ্যাহ্নতপনের মত দুনিরীক্ষ্য বলিয়া বোধ হইত।

জাহিরগ্রামের পার্শ্বে আহিরগ্রাম। দুই গ্রামের জমিদারে ভারি দলাদলি। পূর্ব্বে কথায় কথায় লাঠালাঠি হইত। এখন উভয় পক্ষে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট মুচলেকা দিয়া লাঠি বন্ধ করিয়াছে এবং কৃষ্ণের জীব আমাকে পূর্ব্ববর্ত্তী খুনী লাঠিয়ালদের স্থানে নিযুক্ত করিয়াছে। সকলেই বলিতেছে আমি পদমর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছি।

আমার লেখার জ্বালায় আহিরগ্রাম আর মাথা তুলিতে পারে না। তাহাদের জাতিকুল, পূর্ব্বপুরুষের ইতিহাস সমস্ত আদ্যোপান্ত মসীলিপ্ত করিয়া দিয়াছি।

এই সময়টা ছিলাম ভাল। বেশ মোটাসোটা হইয়া উঠিলাম। মুখ সর্ব্বদা প্রসন্ন হাস্যময় ছিল। আহিরগ্রামের পিতৃপুরুষদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এক একটা মর্ম্মান্তিক বাক্যশেল ছাড়িতাম আর সমস্ত জাহিরগ্রাম হাসিতে হাসিতে পাকা ফুটির মত বিদীর্ণ হইয়া যাইত। বড় আনন্দে ছিলাম।

অবশেষে আহিরগ্রামও একখানা কাগজ বাহির করিল। সে কোন কথা ঢাকিয়া বলিত না। এম্নি উৎসাহের সহিত অবিমিশ্র প্রচলিত ভাষায় গাল পাড়িত যে, ছাপার অক্ষরগুলা পর্য্যন্ত যেন চক্ষের সমক্ষে চীৎকার করিতে থাকিত। এই জন্য দুই গ্রামের লোকেই তাহার কথা খুব স্পষ্ট বুঝিতে পারিত।

কিন্তু আমি চিরাভ্যাসবশতঃ এম্নি মজা করিয়া এত কূট কৌশল সহকারে বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিতাম যে, শত্রু মিত্র কেহই বুঝিতে পারিত না আমার কথার মর্ম্মটা কি।

তার ফল হইল এই, জিৎ হইলেও সকলে মনে করিত আমার হার হইল। দায়ে পড়িয়া সুরুচি সম্বন্ধে একটি উপদেশ লিখিলাম। দেখিলাম ভারি ভুল করিয়াছি; কারণ, যথার্থ ভাল জিনিষকে যেমন বিদ্রূপ করিবার সুবিধা, এমন উপহাস্য বিষয়কে নহে। হনুবংশীয়েরা মনুবংশীয়দের যেমন সহজে বিদ্রূপ করিতে পারে মনুবংশীয়েরা হনুবংশীয়দিগকে তদ্রূপ করিয়া কখন তেমন কৃতকার্য্য হইতে পারে না। সুতরাং সুরুচিকে তাহারা দন্তোন্মীলন করিয়া দেশছাড়া করিল।

আমার প্রভু আমার প্রতি আর তেমন সমাদর প্রকাশ করেন না। সভাস্থলেও আমার কোন সম্মান নাই। পথে বাহির হইলে লোকে পায়ে পড়িয়া আলাপ করিতে আসে না। এমন কি, আমাকে দেখিয়া কেহ কেহ হাসিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ইতিমধ্যে আমার প্রহসনগুলার কথাও লোকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছে। হঠাৎ বোধ হইল আমি যেন একটা দেশালায়ের কাঠি; মিনিটখানেক জ্বলিয়া একেবারে শেষ পর্য্যন্ত পুড়িয়া গিয়াছি।

মন এমনি নিরুৎসাহ হইয়া গেল মাথা খুঁড়িয়া মরিলে এক লাইন লেখা বাহির হয়

না। মনে হইতে লাগিল বাঁচিয়া কোন সুখ নাই।

প্রভা আমাকে এখন ভয় করে। বিনা আহ্বানে সহসা কাছে আসিতে সাহস করে না। সে বুঝিতে পারিয়াছে, মজার কথা লিখিতে পারে এমন বাবার চেয়ে মাটির পুতুল ঢের ভাল সঙ্গী।

একদিন দেখা গেল আমাদের আহিরগ্রাম-প্রকাশ জমিদারকে ছাড়িয়া আমাকে লইয়া পড়িয়াছে। গোটাকতক অত্যন্ত কুৎসিত কথা লিখিয়াছে। আমার পরিচিত বন্ধুবান্ধবেরা একে একে সকলেই সেই কাগজখানা লইয়া হাসিতে হাসিতে আমাকে শুনাইয়া গেল। কেহ কেহ বলিল, ইহার বিষয়টা যেমনই হৌক, ভাষার বাহাদুরী আছে। অর্থাৎ গালি যে দিয়াছে তাহা ভাষা দেখিলেই পরিষ্কার বুঝা যায়। সমস্ত দিন ধরিয়া বিশ জনের কাছে ঐ এক কথা শুনিলাম।

আমার বাসার সম্মুখে একটু বাগানের মত ছিল। সন্ধ্যাবেলায় নিতান্ত পীড়িত চিত্তে সেইখানে একাকী বেড়াইতেছিলাম। পাখীরা নীড়ে ফিরিয়া আসিয়া যখন কলরব বন্ধ করিয়া স্বচ্ছন্দে সন্ধ্যার শান্তির মধ্যে আত্মসমর্পণ করিল, তখন বেশ বুঝিতে পারিলাম পাখীদের মধ্যে রসিক লেখকের দল নাই, এবং সুরুচি লইয়া তর্ক হয় না।

মনের মধ্যে কেবলি ভাবিতেছি কি উত্তর দেওয়া যায়। ভদ্রতার একটা বিশেষ অসুবিধা এই যে, সকল স্থানের লোকে তাহাকে বুঝিতে পারে না। অভদ্রতার ভাষা অপেক্ষাকৃত পরিচিত, তাই ভাবিতেছিলাম সেই রকম ভাবের একটা মুখের মত জবাব লিখিতে হইবে। কিছুতেই হার মানিতে পারিব না।

এমন সময়ে সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে একটি পরিচিত ক্ষুদ্র কণ্ঠের স্বর শুনিতে পাইলাম, এবং তাহার পরেই আমার করতলে একটি কোমল উষ্ণ স্পর্শ অনুভব করিলাম। এত উদ্বেজিত অন্যমনস্ক ছিলাম যে, সেই মুহূর্ত্তে সেই স্বর ও সেই স্পর্শ জানিয়াও জানিতে পারিলাম না।

কিন্তু এক মুহূর্ত্ত পরেই সেই স্বর ধীরে ধীরে আমার কর্ণে জাগ্রৎ, সেই সুধাস্পর্শ আমার করতলে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। বালিকা একবার আস্তে আস্তে কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে ডাকিয়াছিল "বাবা!" কোন উত্তর না পাইয়া আমার দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া ধরিয়া একবার আপনার কোমল কপোলে বুলাইয়া আবার ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিয়া যাইতেছে।

বহুদিন প্রভা আমাকে এমন করিয়া ডাকে নাই এবং স্বেচ্ছাক্রমে আসিয়া আমাকে এতটুকু আদর করে নাই। তাই আজ স্নেহস্পর্শে আমার হৃদয় সহসা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে ঘরে ফিরিয়া গিয়া দেখিলাম প্রভা বিছানায় শুইয়া আছে। শরীর ক্লিষ্টচ্ছবি, নয়ন ঈষৎ নিমীলিত; দিনশেষের ঝরিয়া পড়া ফুলের মত পড়িয়া আছে।

মাথায় হাত দিয়া দেখি অত্যন্ত উষ্ণ; উত্তপ্ত নিশ্বাস পড়িতেছে; কপালের শির দপ দপ্ করিতেছে।

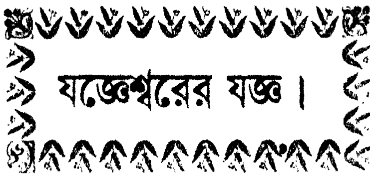
বুঝিতে পারিলাম, বালিকা আসন্ন রোগের তাপে কাতর হইয়া পিপাসিত হৃদয়ে একবার পিতার স্নেহ, পিতার আদর লইতে গিয়াছিল, পিতা তখন আহিরপ্রকাশের জন্য খুব একটা কড়া জবাব কল্পনা করিতেছিল।

পাশে আসিয়া বসিলাম। বালিকা কোন কথা না বলিয়া তাহার দুই জ্বরতপ্ত করতলের মধ্যে আমার হস্ত টানিয়া লইয়া তাহার

উপরে কপোল রাখিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

জাহিরগ্রাম এবং আহিরগ্রামের যত কাগজ ছিল সমস্ত পুড়াইয়া ফেলিলাম। কোন জবাব লেখা হইল না। হার মানিয়া এত সুখ কখনো হয় নাই।

বালিকার যখন মাতা মরিয়াছিল তখন তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়াছিলাম, আজ তাহার বিমাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া আবার তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া ঘরে চলিয়া গেলাম।



যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ।

এক সময় যজ্ঞেশ্বরের অবস্থা ভালই ছিল। এখন প্রাচীন ভাঙ্গা কোঠাবাড়িটাকে সাপ ব্যাং বাদুড়ের হস্তে সমর্পণ করিয়া খোড়ো ঘরে ভগবদ্গীতা লইয়া কালযাপন করিতেছেন।

এগারো বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মেয়েটি যখন জন্মিয়াছিল তখন বংশের সৌভাগ্যশশী কৃষ্ণপক্ষের শেষ কলায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। সেইজন্ত সাধ করিয়া মেয়ের নাম রাখিয়াছিলেন কমলা। ভাবিয়াছিলেন, যদি এই কৌশলে ফাঁকি দিয়া চঞ্চলা লক্ষ্মীকে কন্তারূপে ঘরে ধরিয়া রাখিতে পারেন! লক্ষ্মী সে ফন্দীতে ধরা দিলেন না, কিন্তু মেয়েটির মুখে নিজের শ্রী রাখিয়া গেলেন। বড় সুন্দরী মেয়ে।

মেয়েটির বিবাহ সম্বন্ধে যজ্ঞেশ্বরের যে খুব উচ্চ আশা ছিল তাহা নহে। কাছাকাছি যে কোন একটি সৎপাত্রে বিবাহ দিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার জেঠাইমা তাঁহার বড় আদরের কমলাকে বড় ঘর না হইলে দিবেন না পণ করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার নিজের হাতে অল্প কিছু সঙ্গতি ছিল, ভাল পাত্র পাইলে তাহা বাহির করিয়া দিবেন স্থির করিয়াছেন।

অবশেষে জেঠাইমার উত্তেজনায় শাস্ত্রাধ্যায়নগুঞ্জিত শান্ত পল্লী-গৃহ ছাড়িয়া যজ্ঞেশ্বর পাত্র সন্ধানে বাহির হইলেন। রাজসাহীতে তাঁহার এক আত্মীয় উকীলের বাড়িতে গিয়া আশ্রয় লইলেন।

এই উকীলের মক্কেল ছিলেন জমিদার গৌরসুন্দর চৌধুরী। তাঁহার একমাত্র পুত্র বিভূতিভূষণ এই উকীলের অভিভাবকতায় কালেজে পড়াশুনা করিত। ছেলেটি কখন্ যে মেয়েটিকে আসিয়া দেখিয়াছিল তাহা ভগবান প্রজাপতিই জানিতেন।

কিন্তু প্রজাপতির চক্রান্ত যজ্ঞেশ্বরের বুঝিবার সাধ্য ছিল না। তাই বিভূতি সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোন প্রকার দুরাশা স্থান পায় নাই। নিরীহ যজ্ঞেশ্বরের অল্প আশা অল্প সাহস,—বিভূতির মত ছেলে যে তাঁহার জামাই হইতে পারে এ তাঁহার সম্ভব বলিয়া বোধ হইল না।

উকীলের যত্নে একটি চলনসই পাত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাহার বুদ্ধিশুদ্ধি না থাক্ বিষয় আশয় আছে। পাশ একটিও দেয় নাই বটে কিন্তু কালেক্টরীতে ৩২৭৫ টাকা খাজনা দিয়া থাকে।

পাত্রের দল একদিন আসিয়া মেয়েটিকে পছন্দ করিয়া ক্ষীরের ছাঁচ, নারিকেলের মিষ্টান্ন ও নাটোরের কাঁচাগোল্লা খাইয়া গেল। বিভূতি তাহার অনতিকাল পরে আসিয়া খবর শুনিলেন। যজ্ঞেশ্বর মনের আনন্দে তাঁহাকেও

কাঁচাগোল্লা খাওয়াইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু ক্ষুধার অত্যন্ত অভাব জানাইয়া বিভূতি কিছু খাইল না; কাহারো সহিত ভাল করিয়া কথাই কহিল না, বাড়ি চলিয়া গেল।

সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় উকীল বাবু বিভূতির কাছ হইতে এক পত্র পাইলেন। মর্ম্মটা এই, যজ্ঞেশ্বরের কন্যাকে তাহার বড় পছন্দ এবং তাহাকে সে বিবাহ করিতে উৎসুক।

উকীল ভাবিলেন, এ ত বড় মুস্কিলে পড়িলাম! গৌরসুন্দর বাবু ভাবিবেন আমিই আমার আত্মীয়-কন্যার সহিত তাঁহার ছেলের বিবাহের চক্রান্ত করিতেছি!

অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া তিনি যজ্ঞেশ্বরকে দেশে পাঠাইলেন, এবং পূর্ব্বোক্ত পাত্রটির সহিত বিবাহের দিন যথাসম্ভব নিকটবর্ত্তী করিয়া দিলেন। বিভূতিকে ডাকিয়া অভিভাবক মহাশয় পড়াশুনা ছাড়া আর কোন দিকে মন দিতে বিশেষ করিয়া নিষেধ করিলেন। শুনিয়া রাগে বিভূতির জেদ চা'র গুণ বাড়িয়া গেল।

বিবাহের আয়োজন উদ্যোগ চলিতেছে এমন সময় একদিন যজ্ঞেশ্বরের খোড়ো ঘরে বিভূতিভূষণ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত। যজ্ঞেশ্বর ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, এস বাবা এস! কিন্তু কোথায় বসাইবেন কি খাওয়াইবেন কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না! এখানে নাটোরের কাঁচা গোল্লা কোথায়?

বিভূতিভূষণ যখন স্নানের পূর্ব্বে রোয়াকে বসিয়া তেল মাখিতেছেন তখন জ্যাঠাইমা তাঁহার রজতগিরিনিভ গৌর পুষ্ট দেহটি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। যজ্ঞেশ্বরকে ডাকিয়া কহিলেন এই ছেলেটির সঙ্গে আমাদের কমলের বিবাহ হয় না কি?—ভীরু যজ্ঞেশ্বর বিস্ফারিত নেত্রে কহিলেন, সে কি হয়?

জ্যাঠাইমা কহিলেন, কেন হইবে না? চেষ্টা করিলেই হয়।—এই বলিয়া তিনি বাথানপাড়ার গয়লাদের ঘর হইতে ভাল ছানা ও ক্ষীর আনাইয়া বিবিধ আকার ও আয়তনের মোদক নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্নানাহারের পর বিভূতিভূষণ সলজ্জে সসঙ্কোচে নিজের বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। যজ্ঞেশ্বর আনন্দে ব্যাকুল হইয়া জ্যাঠাইমাকে সুসংবাদ দিলেন।

জ্যাঠাইমা শান্ত মুখে কহিলেন, তা বেশ হয়েছে, বাপু, কিন্তু তুমি একটু ঠাণ্ডা হও!—তাঁহার পক্ষে এটা কিছুই আশাতীত হয় নাই! যদি কমলার জন্য একদিক্ হইতে কাবুলের আমীর ও অন্যদিক্ হইতে চীনের সম্রাট্ তাঁহার দ্বারস্থ হইত তিনি আশ্চর্য্য হইতেন না।

ক্ষীণাশ্বাস যজ্ঞেশ্বর বিভূতিভূষণের হাত ধরিয়া বলিতে লাগিলেন দেখো বাবা, আমার সকল দিক যেন নষ্ট না হয়।

বিবাহের প্রস্তাব পাকা করিয়া বিভূতিভূষণ তাঁহার বাপের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

গৌরসুন্দর নিজে নিরক্ষর ছিলেন বলিয়া শিক্ষিত ছেলেটিকে মনে মনে বিশেষ খাতির করিতেন। তাঁহার কোন আচরণে বা মতে পাছে তাঁহার ছেলের কাছে সুশিক্ষা বা শিষ্টতার অভাব ধরা পড়ে এই সঙ্কোচ তিনি দূর করিতে পারিতেন না। তাঁহার একমাত্র প্রাণাধিক পুত্র যেন বাপকে মনে মনে ধিক্কার না দেয়, যেন অশিক্ষিত বাপের জন্য তাহাকে লজ্জিত না হইতে হয় এ চেষ্টা তাঁহার সর্ব্বদা ছিল। কিন্তু তবু যখন শুনিলেন বিভূতি দরিদ্রকন্যাকে বিবাহ করিতে উদ্যত তখন প্রথমটা রাগ প্রকাশ করিয়া উঠিলেন। বিভূতি নতশিরে চুপ করিয়া রহিল। তখন

গৌরসুন্দর কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া নিজেকে সংশোধন করিয়া লইয়া কহিলেন—আমি কি পণের লোভে তোমাকে বিবাহ করিতে বলিতেছি, তা মনে করিয়ো না! নিজের ছেলেকে লইয়া বেহাইয়ের সঙ্গে দরদস্তুর করিতে বসিব, আমি তেমন ছোটলোক নই! কিন্তু বড় ঘরের মেয়ে চাই।

বিভূতিভূষণ বুঝাইয়া দিলেন, যজ্ঞেশ্বর সম্ভ্রান্তবংশীয়, সম্প্রতি গরীব হইয়াছেন।

গৌরসুন্দর দায়ে পড়িয়া মত দিলেন, কিন্তু মনে মনে যজ্ঞেশ্বরের প্রতি অত্যন্ত রাগ করিলেন।

তখন দুই পক্ষে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। আর সব ঠিক হইল কিন্তু বিবাহ হইবে কোথায় তাহা লইয়া কিছুতেই নিষ্পত্তি হয় না। গৌরসুন্দর এক ছেলের বিবাহে খুব ধুমধাম করিতে চান—কিন্তু বুড়া শিবতলার সেই খোড়ো ঘরে সমস্ত ধুমধাম ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তিনি জেদ্ করিলেন তাঁহারই বাড়িতে বিবাহসভা হইবে।

শুনিয়া মাতৃহীনা কন্যার দিদিমা কান্না জুড়িয়া দিলেন। তাঁহাদেরও ত এক সময় সুদিন ছিল, আজ লক্ষ্মী বিমুখ হইয়াছেন বলিয়া কি সমস্ত সাধ জলাঞ্জলি দিতে হইবে, পিতৃপুরুষের মান বজায় থাকিবে না? সে হইবে না; আমাদের ঘর খোড়ো হউক্ আর যাই হউক এখানেই বিবাহ দিতে হইবে।

নিরীহ প্রকৃতি যজ্ঞেশ্বর অত্যন্ত দ্বিধায় পড়িয়া গেলেন। অবশেষে বিভূতিভূষণের চেষ্টায় কন্যাগৃহে বিবাহই স্থির হইল।

ইহাতে গৌরসুন্দর এবং তাঁহার দলবল কন্যাকর্ত্তার উপর আরো চটিয়া গেলেন। সকলেই স্থির করিলেন স্পর্দ্ধিত দরিদ্রকে অপদস্থ করিতে হইবে। বরযাত্র যাহা জোটান হইল তাহা পল্টন বিশেষ। এ সম্বন্ধে গৌরসুন্দর ছেলের কোন পরামর্শ লইলেন না।

বৈশাখ মাসে বিবাহের দিন স্থির। যজ্ঞেশ্বর তাহার স্বল্পাবশিষ্ট যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়া আয়োজন করিয়াছে। নূতন আটচালা বাঁধিয়াছে, পাবনা হইতে ঘি ময়দা চিনি দধি প্রভৃতির আয়োজন করিয়াছে। জ্যাঠাইমা তাঁহার যে গোপন পুঁজির বলে স্বগৃহেই বিবাহ প্রস্তাবে জেদ্ করিয়াছিলেন তাহার প্রায় শেষ পয়সাটি পর্য্যন্ত বাহির করিয়া দিয়াছেন।

এমন সময় দুর্ভাগার অদৃষ্টক্রমে বিবাহের দুই দিন আগে হইতে প্রচণ্ড দুর্যোগ আরম্ভ হইল। ঝড় যদি বা থামে ত বৃষ্টি থামে না, কিছুক্ষণের জন্য যদি বা নরম পড়িয়া আসে, আবার দ্বিগুণ বেগে আরম্ভ হয়। এমন বর্ষণ বিশ পঁচিশ বছরের মধ্যে কেহ দেখে নাই।

গৌরসুন্দর পূর্ব্ব হইতেই গুটিকয়েক হাতি ও পাল্কী ষ্টেশনে হাজির রাখিয়াছিনে। আশপাশের গ্রাম হইতে যজ্ঞেশ্বর ছইওয়ালা গরুর গাড়ির যোগাড় করিতে লাগিলেন। দুর্দ্দিনে গাড়োয়ানরা নড়িতে চায় না—হাতে পায়ে ধরিয়া দ্বিগুণ মূল্য কবুল করিয়া যজ্ঞেশ্বর তাহাদের রাজি করিলেন। বরযাত্রের মধ্যে যাহাদিগকে গোরুর গাড়িতে চড়িতে হইল তাহারা চটিয়া আগুন হইল।

গ্রামের পথে জল দাঁড়াইয়া গেছে। হাতির পা বসিয়া যায়, গাড়ির চাকা ঠেলিয়া তোলা দায় হইল। তখনো বৃষ্টির বিরাম নাই। বরযাত্রগণ ভিজিয়া কাদা মাখিয়া বিধিবিড়ম্বনার প্রতিশোধ কন্যাকর্ত্তার উপর তুলিবে বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়া রাখিল। হতভাগ্য যজ্ঞেশ্বরকে এই অসাময়িক বৃষ্টির জন্য জবাবদিহি করিতে হইবে।

বর সদলবলে কন্যাকর্ত্তার কুটীরে আসিয়া

পৌঁছিলেন। অভাবনীয় লোকসমাগম দেখিয়া গৃহস্বামীর বুক দমিয়া গেল। ব্যাকুল যজ্ঞেশ্বর কাহাকে কোথায় বসাইবেন ভাবিয়া পান না, কপালে করাঘাত করিয়া কেবলি বলিতে থাকেন, বড় কষ্ট দিলাম, বড় কষ্ট দিলাম! যে আটচালা বানইয়াছিলেন, তাহার চারিদিক হইতে জল পড়িতেছে। বৈশাখমাসে যে এমন শ্রাবণধারা বহিবে তাহা তিনি স্বপ্নেও আশঙ্কা করেন নাই। গণ্ডগ্রামের ভদ্র অভদ্র সমস্ত লোকই যজ্ঞেশ্বরকে সাহায্য করিতে উপস্থিত হইয়াছিল; সঙ্কীর্ণ স্থানকে তাহারা আরো সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলিল এবং বৃষ্টির কল্লোলের উপর তাহাদের কলরব যোগ হইয়া একটা সমুদ্রমন্থনের মত গোলমালের উৎপত্তি হইল। পল্লীবৃদ্ধগণ ধনী অতিথিদের সম্মাননার উপযুক্ত উপায় না দেখিয়া যাহাকে তাহাকে ক্রমাগতই যোড়হস্তে বিনয় করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বরকে যখন অন্তঃপুরে লইয়া গেল তখন ক্রুদ্ধ বরযাত্রির দল রব তুলিল তাহাদের ক্ষুধা পাইয়াছে আহার চাই। মুখ পাংশুবর্ণ করিয়া যজ্ঞেশ্বর গলায় কাপড় দিয়া সকলকে বলিলেন আমার সাধ্যমত যাহা কিছু আয়োজন করিয়াছিলাম সব জলে ভাসিয়া গেছে।

দ্রব্যসামগ্রী কতক পাবনা হইতে পথের মধ্যে কতক বা ভগ্নপ্রায় পাকশালায় গলিয়া গুলিয়া উনান নিবিয়া একাকার হইয়া গেছে। সহসা উপযুক্ত পরিমাণ আহার্য্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে বুড়াশিবতলা এমন গ্রামই নহে।

গৌরসুন্দর যজ্ঞেশ্বরের দুর্গতিতে খুসি হইলেন। কহিলেন—এতগুলা মানুষকে ত অনাহারে রাখা যায় না, কিছুত উপায় করিতে হইবে।

বরযাত্রগণ ক্ষেপিয়া উঠিয়া মহা হাঙ্গামা করিতে লাগিল। কহিল, আমরা ষ্টেশনে গিয়া ট্রেণ ধরিয়া এখনি বাড়ি ফিরিয়া যাই।

যজ্ঞেশ্বর হাত যোড় করিয়া কহিল, একেবারে উপবাস নয়। শিবতলার ছানা বিখ্যাত। উপযুক্ত পরিমাণে ছানা কদমা সংগ্রহ আছে। আমার অন্তরের মধ্যে যাহা হইতেছে তাহা অন্তর্যামীই জানেন।

যজ্ঞেশ্বরের দুর্গতি দেখিয়া বাথানপাড়ার গোয়ালারা বলিয়াছিল, ভয় কি ঠাকুর, ছানা যিনি যত খাইতে পারেন আমরা যোগাইয়া দিব।—বিদেশের বরযাত্রগণ না খাইয়া ফিরিলে শিবতলা গ্রামের অপমান;—সেই অপমান ঠেকাইবার জন্য গোয়ালারা প্রচুর ছানার বন্দোবস্ত করিয়াছে।

বরযাত্রগণ পরামর্শ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, যত আবশ্যক ছানা যোগাইতে পারিবে ত?

যজ্ঞেশ্বর কথঞ্চিৎ আশান্বিত হইয়া কহিল—তা পারিব! আচ্ছা তবে আন! বলিয়া বরযাত্রগণ বসিয়া গেল। গৌরসুন্দর বসিলেন না, তিনি নীরবে এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া কৌতুক দেখিতে লাগিলেন।

আহারস্থানের চারিদিকেই পুষ্করিণী ভরিয়া উঠিয়া জলে কাদায় একাকার হইয়া গেছে। যজ্ঞেশ্বর যেমন যেমন পাতে ছানা দিয়া যাইতে লাগিলেন, তৎক্ষণাৎ বরযাত্রগণ তাহা কাঁধ ডিঙাইয়া পশ্চাতে কাদার মধ্যে টপটপ্ করিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল।

উপায়বিহীন যজ্ঞেশ্বরের চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল। বারংবার সকলের কাছে যোড়হাত করিতে লাগিলেন—কহিলেন, আমি অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, আপনাদের নির্যাতনের যোগ্য নই।

একজন শুষ্কহাস্য হাসিয়া উত্তর করিল, মেয়ের বাপ ত বটেন, সে অপরাধ যায় কোথায়? যজ্ঞেশ্বরের স্বগ্রামের বৃদ্ধগণ বারবার

ধিক্কার করিয়া বলিতে লাগিল, তোমার যেমন অবস্থা সেই মত ঘরে কন্যাদান করিলেই এ দুর্গতি ঘটিত না!

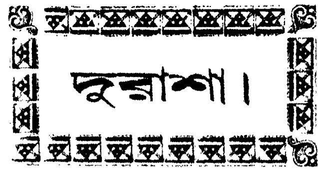
এদিকে অন্তঃপুরে মেয়ের দিদিমা অকল্যাণ-শঙ্কাসত্ত্বেও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। দেখিয়া মেয়ের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। যজ্ঞেশ্বরের জ্যাঠাইমা আসিয়া বিভূতিকে কহিলেন—ভাই অপরাধ যা হইবার তা ত হইয়াই গেছে,—এখন মাপ কর, আজিকার মত শুভকার্য্য সম্পন্ন হইতে দাও।

এদিকে ছানার অন্যায় অপব্যয় দেখিয়া গোয়ালার দল রাগিয়া হাঙ্গাম করিতে উদ্যত। পাছে বরযাত্রদের সহিত তাহাদের একটা বিবাদ বাধিয়া যায় এই আশঙ্কায় যজ্ঞেশ্বর তাহাদিগকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য বহুতর চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমন সময় ভোজনশালায় অসময়ে বর আসিয়া উপস্থিত। বরযাত্ররা ভাবিল, বর বুঝি রাগ করিয়া অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন—তাহাদের উৎসাহ বাড়িয়া উঠিল।

বিভূতি রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, বাবা আমাদের এ কি রকম ব্যবহার? বলিয়া একটা ছানার থালা স্বহস্তে লইয়া তিনি পরিবেশনে প্রবৃত্ত হইলেন। গোয়ালাদিগকে বলিলেন তোমরা পশ্চাৎ দাঁড়াও, কাহারো ছানা যদি পাকে পড়ে ত সে গুলা আবার পাতে তুলিয়া দিতে হইবে।

গৌরসুন্দরের মুখের দিকে চাহিয়া দুই একজন উঠিবে কি না ইতস্ততঃ করিতেছিল—বিভূতি কহিলেন, বাবা, তুমিও বসিয়া যাও, অনেক রাত হইয়াছে!

গৌরসুন্দর বসিয়া গেলেন। ছানা যথাস্থানে পৌঁছিতে লাগিল।



দাৰ্জ্জিলিঙ্গে গিয়া দেখিলাম মেঘে বৃষ্টিতে দশ দিক্ আচ্ছন্ন। ঘরের বাহির হইতে ইচ্ছা হয় না ঘরের মধ্যে থাকিতে আরও অনিচ্ছা জন্মে।

হোটেলে প্রাতঃকালের আহার সমাধা করিয়া পায়ে মোটা বুট এবং আপাদমস্তক ম্যাকিণ্টশ পরিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছি। ক্ষণে ক্ষণে টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে এবং সর্ব্বত্র ঘন মেঘের কুজ্ঝটিকায় মনে হইতেছে যেন বিধাতা হিমালয়পর্ব্বতশুদ্ধ সমস্ত বিশ্বচিত্র রবার দিয়া ঘসিয়া ঘসিয়া মুছিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছেন।

জনশূন্য ক্যাল্‌কাটা রোডে একাকী পদচারণ করিতে করিতে ভাবিতেছিলাম—অবলম্বনহীন মেঘরাজ্যে আর ত ভাল লাগে না, শব্দস্পর্শ-রূপময়ী বিচিত্রা ধরণী মাতাকে পুনরায় পাঁচ ইন্দ্রিয় দ্বারা পাঁচ রকমে আঁকড়িয়া ধরিবার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে।

এমন সময়ে অনতিদূরে রমণীকণ্ঠের সকরুণ রোদনগুঞ্জন ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। রোগশোকসঙ্কুল সংসারে রোদনধ্বনিটা কিছুই বিচিত্র নহে—অন্যত্র অন্য সময় হইলে ফিরিয়া চাহিতাম কি না সন্দেহ,—কিন্তু এই অসীম মেঘরাজ্যের মধ্যে সে রোদন সমস্ত লুপ্ত জগতের এক মাত্র রোদনের মত আমার কাণে আসিয়া প্রবেশ করিল, তাহাকে তুচ্ছ বলিয়া মনে হইল না।

শব্দ লক্ষ্য করিয়া নিকটে গিয়া দেখিলাম

গৈরিক বসনাবৃতা নারী, তাহার মস্তকে স্বর্ণ-কপিশ জটাভার চূড়া আকারে আবদ্ধ, পথ-প্রান্তে শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া মৃদুস্বরে ক্রন্দন করিতেছে। তাহা সদ্যঃশোকের বিলাপ নহে, বহুদিন-সঞ্চিত নিঃশব্দ শ্রান্তি ও অবসাদ আজ মেঘান্ধকার নির্জ্জনতার ভারে ভাঙ্গিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছে।

মনে মনে ভাবিলাম—এ বেশ হইল, ঠিক যেন ঘর-গড়া গল্পের মত আরম্ভ হইল, পর্ব্বত-শৃঙ্গে সন্ন্যাসিনী বসিয়া কাঁদিতেছে ইহা যে কখন চর্ম্মচক্ষে দেখিব এমন আশা কস্মিন্‌কালে ছিল না।

মেয়েটি কোন্ জাত ঠাহর হইল না। সদয় হিন্দি ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলাম—"কে তুমি, তোমার কি হইয়াছে?"

প্রথমে উত্তর দিল না—মেঘের মধ্য হইতে সজল দীপ্তনেত্রে আমাকে একবার দেখিয়া লইল।

আমি আবার কহিলাম আমাকে ভয় করিও না আমি ভদ্রলোক।

শুনিয়া সে হাসিয়া সে খাস্ হিন্দুস্থানীতে বলিয়া উঠিল, "বহুদিন হইতে ভয় ডরের মাথা খাইয়া বসিয়া আছি, লজ্জা সরমও নাই। বাবুজি, এক সময় আমি যে জেনানায় ছিলাম সেখানে আমার সহোদর ভাইকে প্রবেশ করিতে হইলেও অনুমতি লইতে হইত, আজ বিশ্বসংসারে আমার পর্দ্দা নাই।"

প্রথমটা একটু রাগ হইল; আমার চাল চলন সমস্তই সাহেবী, কিন্তু এই হতভাগিনী বিনা দ্বিধায় আমাকে বাবুজি সম্বোধন করে কেন? ভাবিলাম এইখানেই আমার উপন্যাস শেষ করিয়া সিগারেটের ধোঁয়া উড়াইয়া উদ্যত-নাসা সাহেবিয়ানার রেলগাড়ির মত সশব্দে সবেগে সদর্পে প্রস্থান করি! অবশেষে কৌতূহল জয় লাভ করিল। আমি কিছু উচ্চভাব ধারণ করিয়া বক্রগ্রীবায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমাকে কিছু সাহায্য করিতে পারি? তোমার কোন প্রার্থনা আছে?"

সে স্থিরভাবে আমার মুখের দিকে চাহিল এবং ক্ষণকাল পরে সংক্ষেপে উত্তর করিল "আমি বদ্রাওনের নবাব গোলাম কাদের খাঁর পুত্রী।"

বদ্রাওন্ কোন্ মুল্লুকে এবং নবাব গোলাম কাদের খাঁ কোন্ নবাব এবং তাঁহার কন্যা যে কি দুঃখে সন্ন্যাসিনীবেশে দার্জ্জিলিঙ্গে ক্যাল্‌কাটা রোডের ধারে বসিয়া কাঁদিতে পারে আমি তাহার বিন্দুবিসর্গ জানি না এবং বিশ্বাসও করি না,—কিন্তু ভাবিলাম রসভঙ্গ করিব না, গল্পটি দিব্য জমিয়া আসিতেছে।

তৎক্ষণাৎ সুগম্ভীর মুখে সুদীর্ঘ সেলাম করিয়া কহিলাম, "বিবিসাহেব, মাপ কর, তোমাকে চিনিতে পারি নাই।"

চিনিতে না পারিবার অনেকগুলি যুক্তি-সঙ্গত কারণ ছিল, তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান কারণ, তাঁহাকে পূর্ব্বে কস্মিন্‌কালে দেখি নাই, তাহার উপর এমনি কুয়াশা যে নিজের হাত পা কয়খানিই চিনিয়া লওয়া দুঃসাধ্য।

বিবিসাহেবও আমার অপরাধ লইলেন না এবং সন্তুষ্ট কণ্ঠে দক্ষিণ হস্তের ইঙ্গিতে স্বতন্ত্র শিলাখণ্ড নির্দ্দেশ করিয়া আমাকে অনুমতি করিলেন, "বৈঠিয়ে!"

দেখিলাম রমণীটির আদেশ করিবার ক্ষমতা আছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে সেই সিক্ত শৈবালাচ্ছন্ন কঠিন বন্ধুর শিলাখণ্ড-তলে আসন গ্রহণের সম্মতি প্রাপ্ত হইয়া এক অভাবনীয় সম্মান লাভ করিলাম। বদ্রাওনের গোলাম কাদের খাঁর পুত্রী নুর্ উন্নীসা বা মেহের উন্নীসা বা নুর্ উল্ মুল্‌ক্ আমাকে

দার্জ্জিলিঙ্গে ক্যাল্‌কাটা রোডের ধারে তাঁহার অনতিদূরবর্ত্তী অনতিউচ্চ, পঙ্কিল আসনে বসিবার অধিকার দিয়াছেন; হোটেল হইতে ম্যাকিণ্টশ্ পরিয়া বাহির হইবার সময় এমন সুমহৎ সম্ভাবনা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

হিমালয়বক্ষে শিলাতলে একান্তে দুইটি পান্থ নরনারীর রহস্যালাপ-কাহিনী সহসা সদ্যসম্পূর্ণ কবোষ্ণ কাব্যকথার মত শুনিতে হয়—পাঠকের হৃদয়ের মধ্যে দূরাগত নির্জ্জন গিরিকন্দরের নির্ঝরপ্রপাতধ্বনি এবং কালিদাসরচিত মেঘদূত কুমারসম্ভবের বিচিত্র সঙ্গীতমর্ম্মর জাগ্রৎ হইয়া উঠিয়া থাকে, তথাপি এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, যে, বুট এবং ম্যাকিণ্টশ্ পরিয়া ক্যাল্‌কাটা রোডের ধারে কর্দ্দমাসনে এক দীনবেশিনী হিন্দুস্থানী রমণীর সহিত একত্র উপবেশন পূর্ব্বক সম্পূর্ণ আত্মগৌরব অক্ষুণ্ণভাবে অনুভব করিতে পারে, এমন নব্যবঙ্গ অতি অল্পই আছে। কিন্তু সে দিন ঘনঘোর বাষ্পে দশদিক্ আবৃত ছিল, সংসারের নিকট চক্ষুলজ্জা রাখিবার কোন বিষয় কোথাও ছিল না, কেবল অনন্ত মেঘরাজ্যের মধ্যে বদ্রাওনের নবাব গোলাম কাদের খাঁর পুত্রী এবং আমি এক নববিকশিত বাঙ্গালী সাহেব, দুই জনে দুই খানি প্রস্তরের উপর বিশ্বজগতের দুই খণ্ড প্রলয়াবশেষের ন্যায় অবশিষ্ট ছিলাম—এই বিসদৃশ সম্মিলনের পরম পরিহাস কেবল আমাদের অদৃষ্টের গোচর ছিল, কাহারও দৃষ্টিগোচর ছিল না।

আমি কহিলাম, "বিবিসাহেব, তোমার এ হাল কে করিল?"

বদ্রাওনকুমারী কপালে করাঘাত করিলেন। কহিলেন "কে সমস্ত করায় তা আমি কি জানি! এত বড় প্রস্তরময় কঠিন হিমালয়কে কে সামান্য বাষ্পের মেঘে অন্তরাল করিয়াছে?"

আমি কোনরূপ দার্শনিক তর্ক না তুলিয়া সমস্ত স্বীকার করিয়া লইলাম—কহিলাম, "তা বটে, অদৃষ্টের রহস্য কে জানে! আমরা ত কীট মাত্র!"

তর্ক তুলিতাম, বিবিসাহেবকে আমি এত সহজে নিষ্কৃতি দিতাম না। কিন্তু আমার ভাষায় কুলাইত না। দরোয়ান এবং বেহারাদের সংসর্গে যে টুকু হিন্দি অভ্যস্ত হইয়াছে তাহাতে ক্যাল্‌কাটা রোডের ধারে বসিয়া বদ্রাওনের অথবা অন্য কোন স্থানের কোন নবাব পুত্রীর সহিত অদৃষ্টবাদ ও স্বাধীন ইচ্ছাবাদ সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইত।

বিবিসাহেব কহিলেন, "আমার জীবনের আশ্চর্য্য কাহিনী অদ্যই পরিসমাপ্ত হইয়াছে, যদি ফরমায়েস্ করেন ত বলি।"

আমি শশব্যস্ত হইয়া কহিলাম—"বিলক্ষণ! ফরমায়েস্ কিসের! যদি অনুগ্রহ করেন ত শুনিয়া শ্রবণ সার্থক হইবে!"

কেহ না মনে করেন, আমি ঠিক এই কথাগুলি এম্‌নি ভাবে হিন্দুস্থানী ভাষায় বলিয়াছিলাম—বলিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সামর্থ্য ছিল না। বিবি সাহেব যখন কথা কহিতেছিলেন আমার মনে হইতেছিল যেন শিশিরস্নাত স্বর্ণশীর্ষ স্নিগ্ধশ্যামল শস্যক্ষেত্রের উপর দিয়া প্রভাতের মন্দমধুর বায়ু হিল্লোলিত হইয়া যাইতেছে, তাহার পদে পদে এমন সহজ নম্রতা, এমন সৌন্দর্য্য, এমন বাক্যের অবারিত প্রবাহ। আর আমি অতি সংক্ষেপে খণ্ড খণ্ড ভাবে বর্ব্বরের মত সোজা উত্তর দিতেছিলাম। ভাষায় সেরূপ সুসম্পূর্ণ অবিচ্ছিন্ন সহজ শিষ্টতা

আমার কোন কালে জানা ছিল না; বিবি-সাহেবের সহিত কথা কহিবার সময় এই প্রথম নিজের আচরণের দীনতা পদে পদে অনুভব করিতে লাগিলাম।

তিনি কহিলেন, "আমার পিতৃকুলে দিল্লীর সম্রাটবংশের রক্ত প্রবাহিত ছিল—সেই কুলগর্ব্ব রক্ষা করিতে গিয়া আমার উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান পাওয়া দুঃসাধ্য হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌয়ের নবাবের সহিত আমার সম্বন্ধের প্রস্তাব আসিয়াছিল—পিতা ইতস্ততঃ করিতেছিলেন এমন সময় দাঁতে টোটা কাটা লইয়া সিপাহি লোকের সহিত সরকার বাহাদুরের লড়াই বাধিল, কামানের ধোঁয়ায় হিন্দুস্থান অন্ধকার হইয়া গেল।"

স্ত্রীকণ্ঠে, বিশেষতঃ সম্ভ্রান্ত মহিলার মুখে হিন্দুস্থানী কখনো শুনি নাই—শুনিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, এ ভাষা আমিরের ভাষা—এ সেদিনের ভাষা সে দিন আর নাই—আজ রেলোয়ে টেলিগ্রাফে, কাজের ভিড়ে, আভিজাত্যের বিলোপে সমস্তই যেন হ্রস্ব খর্ব্ব নিরলঙ্কার হইয়া গেছে। নবাবজাদীর ভাষা মাত্র শুনিয়া সেই ইংরাজ-রচিত আধুনিক শৈলনগরী দারজ্জিলিঙ্গের ঘন কুজ্ঝটিকাজালের মধ্যে আমার মনশ্চক্ষের সম্মুখে মোগল সম্রাটের মানসপুরী মায়াবলে জাগিয়া উঠিতে লাগিল—শ্বেতপ্রস্তর-রচিত বড় বড় অভ্রভেদী সৌধশ্রেণী, পথে লম্বপুচ্ছ অশ্বপৃষ্ঠে মছলন্দের সাজ, হস্তিপৃষ্ঠে স্বর্ণ-ঝালর-খচিত হাওদা, পুরবাসিগণের মস্তকে বিচিত্রবর্ণের উষ্ণীষ, শালের রেসমের মস্লিনের প্রচুর-প্রসর জামা পায়জামা, কোমরবন্ধে বক্র তরবারী, জরির জুতার অগ্রভাগে বক্র শীর্ষ,—সুদীর্ঘ অবসর, সুলম্ব পরিচ্ছদ, সুপ্রচুর শিষ্টাচার।

নবাবপুত্রী কহিলেন, "আমাদের কেল্লা যমুনার তীরে। আমাদের ফৌজের অধিনায়ক ছিল একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ। তাহার নাম ছিল কেশরলাল।"

রমণী এই কেশরলাল শব্দটির উপর তাহার নারীকণ্ঠের সমস্ত সঙ্গীত যেন একেবারে এক মুহূর্ত্তে উপুড় করিয়া ঢালিয়া দিল। আমি ছড়িটা ভূমিতে রাখিয়া নড়িয়া চড়িয়া খাড়া হইয়া বসিলাম।

"কেশরলাল পরম হিন্দু ছিল। আমি প্রত্যহ প্রত্যূষে উঠিয়া অন্তঃপুরের গবাক্ষ হইতে দেখিতাম কেশরলাল আবক্ষ যমুনার জলে নিমগ্ন হইয়া প্রদক্ষিণ করিতে করিতে যোড়করে ঊর্দ্ধমুখে নবোদিত সূর্য্যের উদ্দেশে অঞ্জলি প্রদান করিত। পরে সিক্তবস্ত্রে ঘাটে বসিয়া একাগ্রমনে জপ সমাপন করিয়া পরিষ্কার সুকণ্ঠে ভৈরোঁরাগে ভজন গান করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া আসিত।

"আমি মুসলমান-বালিকা ছিলাম কিন্তু কখনো স্বধর্ম্মের কথা শুনি নাই এবং স্বধর্ম্মসঙ্গত উপাসনাবিধিও জানিতাম না। তখনকার দিনে বিলাসে মদ্যপানে স্বেচ্ছাচারে আমাদের পুরুষের মধ্যে ধর্ম্মবন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছিল, এবং অন্তঃপুরের প্রমোদভবনেও ধর্ম্ম সজীব ছিল না।

বিধাতা আমার মনে বোধ করি স্বাভাবিক ধর্ম্মপিপাসা দিয়াছিলেন অথবা আর কোন নিগূঢ় কারণ ছিল কি বলিতে পারি না—কিন্তু প্রত্যহ প্রশান্ত প্রভাতে নবোন্মেষিত অরুণালোকে নিস্তরঙ্গ নীল যমুনার নির্জ্জন শ্বেত সোপানতটে কেশরলালের পূজার্চ্চনাদৃশ্যে আমার সদ্যঃসুপ্তোত্থিত অন্তঃকরণ একটি অব্যক্ত ভক্তিমাধুর্য্যে পরিপ্লুত হইয়া যাইত।

নিয়ত সংযত শুদ্ধাচারে ব্রাহ্মণ কেশরলালের গৌরবর্ণ প্রাণসার সুন্দর তনু দেহখানি

ম্লেশহীন জ্যোতিঃশিখার মত বোধ হইত; ব্রাহ্মণের পুণ্যমাহাত্ম্য অপূর্ব্ব শ্রদ্ধাভরে এই মুসলমানদুহিতার মূঢ় হৃদয়কে বিনম্র করিয়া দিত।

আমার একটি হিন্দু বাঁদি ছিল সে প্রতিদিন নত হইয়া প্রণাম করিয়া কেশরলালের পদধূলি লইয়া আসিত—দেখিয়া আমার আনন্দও হইত ঈর্ষাও জন্মিত। ক্রিয়াকর্ম্ম পার্ব্বণ উপলক্ষে এই বন্দিনী মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দিত। আমি নিজে হইতে তাহাকে অর্থ সাহায্য করিয়া বলিতাম, তুই কেশরলালকে নিমন্ত্রণ করিবি না? সে জিভ কাটিয়া বলিত কেশরলাল ঠাকুর কাহারও অন্ন গ্রহণ বা দান প্রতিগ্রহ করেন না।

এইরূপে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কেশরলালকে কোনরূপ ভক্তিচিহ্ন দেখাইতে না পারিয়া আমার চিত্ত যেন ক্ষুব্ধ ক্ষুধাতুর হইয়া থাকিত।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষের কেহ একজন একটি ব্রাহ্মণ-কন্যাকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করিয়া আনিয়াছিলেন—আমি অন্তঃপুরের প্রান্তে বসিয়া তাঁহারই পুণ্যরক্তপ্রবাহ আপন শিরার মধ্যে অনুভব করিতাম এবং সেই রক্তসূত্রে কেশরলালের সহিত একটি ঐক্য সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে তৃপ্তি বোধ হইত।

আমার হিন্দু দাসীর নিকট হিন্দুধর্ম্মের সমস্ত আচার ব্যবহার, দেবীর সমস্ত আশ্চর্য্য কাহিনী, রামায়ণ মহাভারতের সমস্ত অপূর্ব্ব ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া শুনিতাম—শুনিয়া সেই অবরুদ্ধ অন্তঃপুরের প্রান্তে বসিয়া হিন্দু জগতের এক অপরূপ দৃশ্য আমার মনের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইত। মূর্ত্তি প্রতিমূর্ত্তি, শঙ্খঘণ্টা ধ্বনি, স্বর্ণচূড়াখচিত দেবালয়, ধূপধুনার ধূম্র, অগুরুচন্দন মিশ্রিত পুষ্পরাশির সুগন্ধ, যোগী সন্ন্যাসীর অলৌকিক ক্ষমতা, ব্রাহ্মণের অমানুষিক মাহাত্ম্য, মানুষ-ছদ্মবেশধারী দেবতাদের বিচিত্র লীলা সমস্ত জড়িত হইয়া আমার নিকটে এক অতি পুরাতন অতি বিস্তীর্ণ অতি সুদূর অপ্রাকৃত মায়ালোক সৃজন করিত—আমার চিত্ত যেন নীড়হারা ক্ষুদ্র পক্ষীর ন্যায় প্রদোষকালের একটি প্রকাণ্ড প্রাচীন প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইত। হিন্দু সংসার আমার বালিকা হৃদয়ের নিকট একটি পরম রমণীয় রূপকথার রাজ্য ছিল।

এমন সময় কোম্পানি বাহাদুরের সহিত সিপাহী লোকের লড়াই বাধিল আমাদের বদ্রাওনের ক্ষুদ্র কেল্লাটির মধ্যেও বিপ্লবের তরঙ্গ জাগিয়া উঠিল।

কেশরলাল বলিল, এইবার গোখাদক গোরালোককে আর্য্যাবর্ত্ত হইতে দূর করিয়া দিয়া আর একবার হিন্দুস্থানে হিন্দু মুসলমানে রাজপদ লইয়া দ্যূতক্রীড়া বসাইতে হইবে

আমার পিতা গোলাম কাদের খাঁ সাবধানী লোক ছিলেন; তিনি ইংরাজজাতিকে কোন একটি বিশেষ কুটুম্ব সম্ভাষণে অভিহিত করিয়া বলিলেন, উহারা অসাধ্য সাধন করিতে পারে, হিন্দুস্থানের লোক উহাদের সহিত পারিয়া উঠিবে না। আমি অনিশ্চিত প্রত্যাশে আমার এই ক্ষুদ্র কেল্লাটুকু খোয়াইতে পারিব না—আমি কোম্পানি বাহাদুরের সহিত লড়িব না।

যখন হিন্দুস্থানের সমস্ত হিন্দু মুসলমানের রক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, তখন আমার পিতার এই বণিকের মত সাবধানতায় আমাদের সকলের মনেই ধিক্কার উপস্থিত হইল। আমার বেগম মাতৃগণ পর্য্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

এমন সময় ফৌজ লইয়া সশস্ত্র কেশরলাল আসিয়া আমার পিতাকে বলিলেন, নবাব

সাহেব, আপনি যদি আমাদের পক্ষে যোগ না দেন তবে যতদিন লড়াই চলে আপনাকে বন্দী রাখিয়া আপনার কেল্লার আধিপত্যভার আমি গ্রহণ করিব।

পিতা বলিলেন, সে সমস্ত হাঙ্গামা কিছুই করিতে হইবে না, তোমাদের পক্ষে আমি রহিব।

কেশরলাল কহিলেন, ধনকোষ হইতে কিছু অর্থ বাহির করিতে হইবে।

পিতা বিশেষ কিছু দিলেন না।—কহিলেন, যখন যেমন আবশ্যক হইবে আমি দিব।

আমার সীমন্ত হইতে পদাঙ্গুলি পর্য্যন্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যত কিছু ভূষণ ছিল সমস্ত কাপড়ে বাঁধিয়া আমার হিন্দু দাসী দিয়া গোপনে কেশরলালের নিকট পাঠাইয়া দিলাম। তিনি গ্রহণ করিলেন। আনন্দে আমার ভূষণবিহীন প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

কেশরলাল মরিচাপড়া বন্দুকের চোঙ এবং পুরাতন তলোয়ারগুলি মাজিয়া ঘষিয়া সাফ করিতে প্রস্তুত হইলেন—এমন সময় হঠাৎ একদিন অপরাহ্নে জিলার কমিশনার সাহেব লালকুর্ত্তি গোরা লইয়া আকাশে ধুলা উড়াইয়া আমাদের কেল্লার মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল।

আমার পিতা গোলাম কাদের খাঁ গোপনে তাঁহাকে বিদ্রোহ সংবাদ দিয়াছিলেন।

বক্সাওনের ফৌজের উপর কেশরলালের এমন একটি অলৌকিক আধিপত্য ছিল যে, তাঁহার কথায় তাহারা ভাঙ্গা বন্দুক ও ভোঁতা তরবারী হস্তে লড়াই করিয়া মরিতে প্রস্তুত হইল।

বিশ্বাসঘাতক পিতার গৃহ আমার নিকট নরকের মত বোধ হইল। ক্ষোভে দুঃখে লজ্জায় ঘৃণায় বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, তবু চোখ দিয়া এক ফোঁটা জল বাহির হইল না। আমার ভীরু ভ্রাতার পরিচ্ছদ পরিয়া ছদ্মবেশে অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া গেলাম, কাহারও দেখিবার অবকাশ ছিল না।

তখন ধুলা এবং বারুদের ধোঁয়া, সৈনিকের চীৎকার এবং বন্দুকের শব্দ থামিয়া গিয়া মৃত্যুর ভীষণ শান্তি জলস্থল আকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছে। যমুনার জল রক্তরাগে রঞ্জিত করিয়া সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, সন্ধ্যাকাশে শুক্লপক্ষের পরিপূর্ণপ্রায় চন্দ্রমা।

রণক্ষেত্র মৃত্যুর বিকট দৃশ্যে আকীর্ণ। অন্য সময় হইলে করুণায় আমার বক্ষ ব্যথিত হইয়া উঠিত—কিন্তু সে দিন স্বপ্নাবিষ্টের মত আমি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম—খুঁজিতেছিলাম কোথায় আছে কেশরলাল,—সেই একমাত্র লক্ষ্য ছাড়া আর সমস্ত আমার নিকট অলীক বোধ হইতেছিল।

খুঁজিতে খুঁজিতে রাত্রি দ্বিপ্রহরে উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইলাম, রণক্ষেত্রের অদূরে যমুনাতীরের আম্রকাননচ্ছায়ায় কেশরলাল এবং তাঁহার ভক্তভৃত্য দেওকিনন্দনের মৃতদেহ পড়িয়া আছে। বুঝিতে পারিলাম সাংঘাতিক আহত অবস্থায়, হয় প্রভু ভৃত্যকে অথবা ভৃত্য প্রভুকে রণক্ষেত্র হইতে এই নিরাপদ স্থানে বহন করিয়া আনিয়া শান্তিতে মৃত্যুহস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

প্রথমেই আমি আমার বহুদিনের বুভুক্ষিত ভক্তিবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করিলাম। কেশরলালের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া আমার আজানুবিলম্বিত কেশজাল উন্মুক্ত করিয়া দিয়া বারংবার তাঁহার পদধূলি মুছিয়া লইলাম—আমার উত্তপ্ত ললাটে তাঁহার হিমশীতল পাদপদ্ম তুলিয়া লইলাম, তাঁহার চরণ চুম্বন করিবা-

াত্র বহুদিবসের নিরুদ্ধ অশ্রুরাশি উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

এমন সময়ে কেশরলালের দেহ বিচলিত ইল—এবং সহসা তাঁহার মুখ হইতে বেদনার অস্ফুট আর্ত্তস্বর শুনিয়া আমি তাঁহার চরণ-তল ছাড়িয়া চমকিয়া উঠিলাম—শুনিলাম, নমীলিত নেত্রে শুষ্ক কণ্ঠে একবার বলিলেন 'জল।"

আমি তৎক্ষণাৎ আমার গাত্রবস্ত্র যমুনার জলে ভিজাইয়া ছুটিয়া চলিয়া আসিলাম। সন নিংড়াইয়া কেশরলালের আমীলিত ওষ্ঠাধরের মধ্যে জল দিতে লাগিলাম, এবং াম চক্ষু নষ্ট করিয়া তাঁহার কপালে যে নদারুণ আঘাত লাগিয়াছিল সেই আহত স্থানে আমার সিক্ত বসনপ্রান্ত ছিঁড়িয়া বাঁধিয়া দিলাম।

এমনি বারকতক যমুনা হইতে জল আনিয়া তাহার মুখে চক্ষে সিঞ্চন করার পর অল্পে অল্পে চেতনার সঞ্চার হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আর জল দিব? কেশরলাল কহি-লেন, কে তুমি? আমি আর থাকিতে পারিলাম না—বলিলাম, অধীনা আপনার ভক্ত-সেবিকা। আমি নবাব গোলাম কাদের খাঁর কন্যা।—মনে করিয়াছিলাম, কেশরলাল আসন্ন মৃত্যু কালে তাঁহার ভক্তের শেষ পরিচয় সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন, এ সুখ হইতে আমাকে কেহ বঞ্চিত করিতে পারিবে না।

আমার পরিচয় পাইবামাত্র কেশরলাল সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া বলিলেন—বেইমানের কন্যা, বিধর্ম্মী! মৃত্যুকালে যবনের জল দিয়া তুই আমার ধর্ম্ম নষ্ট করিলি!"

এই বলিয়া প্রবল বলে আমার কপোল-দেশে দক্ষিণ করতলের আঘাত করিলেন—আমি মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম।

তখন আমি ষোড়শী—প্রথম দিন অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিয়াছি—তখনো বহিরা-কাশের লুব্ধ তপ্ত সূর্য্যকর আমার সুকুমার কপোলের রক্তিম লাবণ্যবিভা অপহরণ করিয়া লয় নাই—সেই বহিঃসংসারে পদক্ষেপ করিবা-মাত্র সংসারের নিকট হইতে আমার সংসারের দেবতার নিকট হইতে এই প্রথম সম্ভাষণ প্রাপ্ত হইলাম।

আমি নির্ব্বাপিত-সিগারেট এতক্ষণ মোহ-মুগ্ধ চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়াছিলাম। গল্প শুনিতেছিলাম, কি, ভাষা শুনিতেছিলাম, কি, সঙ্গীত শুনিতেছিলাম জানি না—আমার মুখে একটি কথা ছিল না। এতক্ষণ পরে আমি আর থাকিতে পারিলাম না—হঠাৎ বলিয়া উঠিলাম—জানোয়ার।

নবাবজাদী কহিলেন—কে জানোয়ার! জানোয়ার কি মৃত্যুযন্ত্রণার সময় মুখের নিকট সমাহৃত জলবিন্দু পরিত্যাগ করে!

আমি অপ্রতিভ হইয়া কহিলাম—তা বটে। সে দেবতা। নবাবজাদী কহিলেন—কিসের দেবতা! দেবতা কি ভক্তের একাগ্র চিত্তের সেবা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে!

আমি বলিলাম—তাও বটে! বলিয়া চুপ করিয়া গেলাম। নবাবপুত্রী কহিতে লাগিলেন—প্রথমটা আমার বড় বিষম বাজিল। মনে হইল সমস্ত বিশ্বজগৎ হঠাৎ আমার মাথার উপর চুরমার হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল। মুহূর্ত্তের মধ্যে সংজ্ঞা লাভ করিয়া সেই কঠোর কঠিন নিষ্ঠুর নির্ব্বিকার পবিত্র বীর ব্রাহ্মণের পদতলে দূর হইতে প্রণাম করিলাম—মনে মনে কহিলাম—হে ব্রাহ্মণ, তুমি হীনের সেবা, পরের অন্ন, ধনীর দান,

যুবতীর যৌবন, রমণীর প্রেম কিছুই গ্রহণ কর না; তুমি স্বতন্ত্র, তুমি একাকী, তুমি নির্লিপ্ত, তুমি সুদূর তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করিবার অধিকারও আমার নাই!

নবাব-দুহিতাকে ভূলুণ্ঠিত মস্তকে প্রণাম করিতে দেখিয়া কেশরলাল কি মনে করিল বলিতে পারি না—কিন্তু তাহার মুখে বিস্ময় অথবা কোন ভাবান্তর প্রকাশ পাইল না। শান্তভাবে একবার আমার মুখের দিকে চাহিল,—তাহার পরে ধীরে ধীরে উঠিল। আমি সচকিত হইয়া আশ্রয় দিবার জন্য আমার হস্তপ্রসারণ করিলাম—সে তাহা নীরবে প্রত্যাখ্যান করিল —এবং বহুকষ্টে যমুনার ঘাটে গিয়া অবতীর্ণ হইল। সেখানে একটি খেয়া নৌকা বাঁধা ছিল পার হইবার লোকও ছিল না, পার করিবার লোকও ছিল না। সেই নৌকার উপর উঠিয়া কেশরলাল বাঁধন খুলিয়া দিল—নৌকা দেখিতে দেখিতে মধ্য স্রোতে গিয়া ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া গেল—আমার ইচ্ছা হইতে লাগিল, সমস্ত হৃদয়ভার, সমস্ত যৌবনভার, সমস্ত অনাদৃত ভক্তিভার লইয়া সেই অদৃশ্য নৌকার অভিমুখে যোড়কর করিয়া সেই নিস্তব্ধ নিশীথে সেই চন্দ্রালোক-পুলকিত নিস্তরঙ্গ যমুনার মধ্যে অকালবৃন্তচ্যুত পুষ্পমঞ্জরীর ন্যায় এই ব্যর্থ জীবন বিসর্জ্জন করি।

কিন্তু পারিলাম না। আকাশের চন্দ্র, যমুনাপারের ঘনকৃষ্ণ বনরেখা, কালিন্দীর নিবিড় নীল নিষ্কম্প জলরাশি, দূরে আম্রবনের ঊর্দ্ধে আমাদের জ্যোৎস্নাচিক্কণ কেল্লার চূড়াগ্রভাগ সকলেই নিঃশব্দগম্ভীর ঐকতানে মৃত্যুর গান গাহিল;—সেই নিশীথে গ্রহচন্দ্রতারাখচিত নিস্তব্ধ তিন ভুবন আমাকে একবাক্যে মরিতে কহিল। কেবল বীচিভঙ্গবিহীন প্রশান্ত যমুনাবক্ষোবাহিত একখানি অদৃশ্য জীর্ণ নৌকা সেই জ্যোৎস্নারজনীর সৌম্য সুন্দর শান্ত শীতল অনন্ত ভুবনমোহন মৃত্যুর প্রসারিত আলিঙ্গনপাশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আমাকে জীবনের পথে টানিয়া লইয়া চলিল। আমি মোহস্বপ্নাভিহতার ন্যায় যমুনার তীরে তীরে কোথাও বা কাশবন কোথাও বা মরুবালুকা কোথাও বা বন্ধুর বিদীর্ণ তট, কোথাও বা ঘনগুল্মদুর্গম বনখণ্ডের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলাম।

এইখানে বক্তা চুপ করিল। আমিও কোন কথা কহিলাম না।

অনেকক্ষণ পরে নবাবদুহিতা কহিল—ইহার পরে ঘটনাবলী বড় জটিল। সে কেমন করিয়া বিশ্লেষ করিয়া পরিষ্কার করিয়া বলিব জানি না। একটা গহন অরণ্যের মাঝখান দিয়া যাত্রা করিয়াছিলাম, ঠিক কোন্ পথ দিয়া কখন চলিয়াছিলাম সে কি আর খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি!—কোথায় আরম্ভ করিব, কোথায় শেষ করিব, কোন্‌টা ত্যাগ করিব, কোন্‌টা রাখিব, সমস্ত কাহিনীকে কি উপায়ে এমন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিব যাহাতে কিছুই অসাধ্য অসম্ভব অপ্রকৃত বোধ না হয়!

কিন্তু জীবনের এই কয়টা দিনে ইহা বুঝিয়াছি যে, অসাধ্য অসম্ভব কিছুই নাই। নবাব-অন্তঃপুরের বালিকার পক্ষে বাহিরের সংসার একান্ত দুর্গম বলিয়া মনে হইতে পারে—কিন্তু তাহা কাল্পনিক;—একবার বাহির হইয়া পড়িলে একটা চলিবার পথ থাকেই। সে পথ নবাবী পথ নহে, কিন্তু পথ—সে পথে মানুষ চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে—তাহা বন্ধুর বিচিত্র সীমাহীন, তাহা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত, তাহা সুখে দুঃখে বাধা বিঘ্নে জটিল, কিন্তু তাহা পথ।

এই সাধারণ মানবের পথে একাকিনী নবাব-দুহিতার সুদীর্ঘ ভ্রমণবৃত্তান্ত সুখশ্রাব্য হইবে না—হইলেও সে সব কথা বলিবার উৎসাহ

আমার নাই। এক কথায়, দুঃখ কষ্ট বিপদ অবমাননা অনেক ভোগ করিতে হইয়াছে, তবু জীবন অসহ্য হয় নাই। আতসবাজির মত যত দাহন ততই উদ্দাম গতি লাভ করিয়াছি। যতক্ষণ বেগে চলিয়াছিলাম ততক্ষণ পুড়িতেছি বলিয়া বোধ ছিল না—আজ হঠাৎ সেই পরম দুঃখের সেই চরম সুখের আলোক-শিখাটি নিবিয়া গিয়া এই পথপ্রান্তের ধূলির উপর জড় পদার্থের ন্যায় পড়িয়া গিয়াছি—আজ আমার যাত্রা শেষ হইয়া গেছে, এইখানেই আমার কাহিনী সমাপ্ত।

এই বলিয়া নবাবপুত্রী থামিল। আমি মনে মনে ঘাড় নাড়িলাম; এখানে ত কোন মতেই শেষ হয় না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ভাঙ্গা হিন্দীতে বলিলাম—বেয়াদবি মাপ করিবেন, শেষ দিককার কথাটা আর অল্প একটু খোলসা করিয়া বলিলে অধীনের মনের ব্যাকুলতা অনেকটা হ্রাস হয়।

নবাবপুত্রী হাসিলেন। বুঝিলাম আমার ভাঙ্গা হিন্দীতে ফল হইয়াছে। যদি আমি খাস হিন্দীতে বাৎ চালাইতে পারিতাম তাহা হইলে আমার কাছে তাঁহার লজ্জা ভাঙ্গিত না কিন্তু আমি যে তাঁহার মাতৃভাষা অতি অল্পই জানি সেইটেই আমাদের উভয়ের মধ্যে বৃহৎ ব্যবধান—সেইটেই একটা আব্রু।

তিনি পুনরায় আরম্ভ করিলেন—কেশরলালের সংবাদ আমি প্রায়ই পাইতাম কিন্তু কোন মতেই তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারি নাই। তিনি তাঁতিয়াটোপির দলে মিশিয়া সেই বিপ্লবাচ্ছন্ন আকাশতলে অকস্মাৎ কখনো পূর্ব্বে, কখনো পশ্চিমে, কখনো ঈশানে, কখনো নৈঋতে বজ্রপাতের মত মুহূর্ত্তের মধ্যে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে অদৃশ্য হইতেছিলেন।

আমি তখন যোগিনী সাজিয়া কাশীর শিবানন্দ স্বামীকে পিতৃসম্বোধন করিয়া তাঁহার নিকট সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলাম। ভারতবর্ষের সমস্ত সংবাদ তাঁহার পদতলে আসিয়া সমাগত হইত—আমি ভক্তিভরে শাস্ত্রশিক্ষা করিতাম এবং মর্ম্মান্তিক উদ্বেগের সহিত যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহ করিতাম।

ক্রমে ব্রিটিশরাজ হিন্দুস্থানের বিদ্রোহবহ্নি পদতলে দলন করিয়া নিবাইয়া দিল। তখন সহসা কেশরলালের সংবাদ আর পাওয়া গেল না। ভীষণ প্রলয়ালোকের রক্তরশ্মিতে ভারতবর্ষের দূর দূরান্তর হইতে যে সকল বীরমূর্ত্তি ক্ষণে ক্ষণে দেখা যাইতেছিল, হঠাৎ তাহারা অন্ধকারে পড়িয়া গেল।

তখন আমি আর থাকিতে পারিলাম না গুরুর আশ্রয় ছাড়িয়া ভৈরবীবেশে আবার বাহির হইয়া পড়িলাম। পথে পথে তীর্থে তীর্থে মঠে মন্দিরে ভ্রমণ করিয়াছি কোথাও কেশরলালের কোন সন্ধান পাই নাই। দুই একজন, যাহারা তাহার নাম জানিত, কহিল, সে, হয় যুদ্ধে নয় রাজদণ্ডে মৃত্যু লাভ করিয়াছে। আমার অন্তরাত্মা কহিল কখনো নহে, কেশরলালের মৃত্যু নাই, সেই ব্রাহ্মণ সেই দুঃসহ জলদগ্নি কখনো নির্ব্বাণ পায় নাই, আমার আত্মাহুতি গ্রহণ করিবার জন্য সে এখনো কোন দুর্গম নির্জ্জন যজ্ঞবেদীতে ঊর্দ্ধশিখা হইয়া জ্বলিতেছে।

হিন্দুশাস্ত্রে আছে জ্ঞানের দ্বারা তপস্যার দ্বারা শূদ্র ব্রাহ্মণ হইয়াছে—মুসলমান ব্রাহ্মণ হইতে পারে কি না সে কথার কোন উল্লেখ নাই—তাহার একমাত্র কারণ, তখন মুসলমান ছিল না। আমি জানিতাম কেশরলালের সহিত আমার মিলনের বহু বিলম্ব আছে,—কারণ, তৎপূর্ব্বে আমাকে ব্রাহ্মণ হইতে হইবে।

একে একে ত্রিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইল। আমি অন্তরে বাহিরে আচারে ব্যবহারে কায়মনোবাক্যে ব্রাহ্মণ হইলাম, আমার সেই ব্রাহ্মণ পিতামহীর রক্ত নিষ্কলুষতেজে আমার সর্ব্বাঙ্গে প্রবাহিত হইল, আমি মনে মনে আমার সেই যৌবনারম্ভের প্রথম ব্রাহ্মণ, আমার যৌবনশেষের শেষ ব্রাহ্মণ, আমার ত্রিভুবনের এক ব্রাহ্মণের পদতলে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া একটি অপরূপ দীপ্তিলাভ করিলাম।

যুদ্ধবিপ্লবের মধ্যে কেশরলালের বীরত্বের কথা আমি অনেক শুনিয়াছি—কিন্তু সে কথা আমার হৃদয়ে মুদ্রিত হয় নাই। আমি সেই যে দেখিয়াছিলাম নিঃশব্দে জ্যোৎস্নানিশীথে নিস্তব্ধ যমুনার মধ্যস্রোতে একখানি ক্ষুদ্র নৌকার মধ্যে একাকী কেশরলাল ভাসিয়া চলিয়াছে, সেই চিত্রই আমার মনে অঙ্কিত হইয়া আছে। আমি কেবল অহরহ দেখিতেছিলাম—ব্রাহ্মণ নির্জ্জন স্রোত বাহিয়া নিশিদিন কোন্ অনির্দ্দেশ মহা রহস্যাভিমুখে ধাবিত হইতেছে—তাহার কোন সঙ্গী নাই, সেবক নাই, কাহাকেও তাহার কোন আবশ্যক নাই, সেই নির্ম্মল আত্মনিমগ্ন পুরুষ আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ;—আকাশের গ্রহচন্দ্রতারা তাহাকে নিঃশব্দে নিরীক্ষণ করিতেছে।

এমন সময় সংবাদ পাইলাম কেশরলাল রাজদণ্ড হইতে পলায়ন করিয়া নেপালে আশ্রয় লইয়াছে। আমি নেপালে গেলাম। সেখানে দীর্ঘকাল বাস করিয়া সংবাদ পাইলাম—কেশরলাল বহুকাল হইল নেপাল ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে কেহ জানে না।

তাহার পর হইতে পাহাড়ে পাহাড়ে ভ্রমণ করিতেছি। এ হিন্দুর দেশ নহে—ভুটিয়া লেপ্‌চারণ ম্লেচ্ছ—ইহাদের আচার ব্যবহারে আচার বিচার নাই—ইহাদের দেবতা ইহাদের পূজার্চ্চনাবিধি সকলি স্বতন্ত্র;—বহুদিনের সাধনায় আমি যে বিশুদ্ধ শুচিতা লাভ করিয়াছি ভয় হইতে লাগিল পাছে তাহাতে রেখামাত্র চিহ্ন পড়ে। আমি বহু চেষ্টায় আপনাকে সর্ব্বপ্রকার মলিন সংস্পর্শ হইতে রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলাম। আমি জানিতাম আমার তরী তীরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, আমার জীবনের চরমতীর্থ অনতিদূরে।

তাহার পরে আর কি বলিব! শেষ কথা অতি স্বল্প। প্রদীপ যখন নেবে তখন একটি ফুৎকারেই নিবিয়া যায়—সে কথা আর সুদীর্ঘ করিয়া কি ব্যাখ্যা করিব।

আটত্রিশ বৎসর পরে এই দার্জ্জিলিঙ্গে আসিয়া আজ প্রাতঃকালে কেশরলালের দেখা পাইয়াছি।

বক্তাকে এইখানে ক্ষান্ত হইতে দেখিয়া আমি ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম—কি দেখিলেন?

নবাবপুত্রী কহিলেন, দেখিলাম বৃদ্ধ কেশরলাল ভুটিয়া পল্লীতে ভুটিয়া স্ত্রী এবং তাহার গর্ভজাত পৌত্র পৌত্রী লইয়া ম্লান বস্ত্রে মলিন অঙ্গনে ভুট্টা হইতে শস্য সংগ্রহ করিতেছে।

গল্প শেষ হইল। আমি ভাবিলাম একটা সান্ত্বনার কথা বলা আবশ্যক। কহিলাম—আটত্রিশ বৎসর একাদিক্রমে যাহাকে প্রাণভয়ে বিজাতীয়ের সংস্রবে অহরহ থাকিতে হইয়াছে সে কেমন করিয়া আপন আচার রক্ষা করিবে।

নবাব-কন্যা কহিলেন—আমি কি তাহা বুঝি না? কিন্তু এতদিন আমি কি মোহ লইয়া ফিরিতেছিলাম? যে ব্রহ্মণ্য আমার কিশোর হৃদয় হরণ করিয়া লইয়াছিল আমি কি জানিতাম তাহা অভ্যাস, তাহা সংস্কার মাত্র? আমি জানিতাম তাহা ধর্ম্ম, তাহা অনাদি

অনন্ত। তাহাই যদি না হইবে তবে ষোল বৎসর বয়সে প্রথম পিতৃগৃহ হইতে বাহির হইয়া সেই জ্যোৎস্না-নিশীথে আমার বিকশিত পুষ্পিত ভক্তিবেগকম্পিত দেহমনপ্রাণের প্রতিদানে ...ণের দক্ষিণ হস্ত হইতে যে দুঃসহ অপ... প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, কেন তাহা গুরুহস্তের ...র ন্যায় নিঃশব্দে অবনত মস্তকে দ্বিগুণিত ...ভরে শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছিলাম? ব্রাহ্মণ, তুমিত তোমার এক অভ্যাসের ...বর্ত্তে আর এক অভ্যাস লাভ করিয়াছ ...ম আমার এক যৌবন এক জীবনের পরি-... আর এক জীবন যৌবন কোথায় ফিরিয়া ...ব?

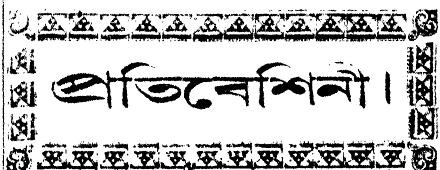
এই বলিয়া রমণী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, ...স্কার বাবুজি!—

মুহূর্ত্তপরেই যেন সংশোধন করিয়া কহিল সেলাম বাবু সাহেব! এই মুসলমান অভি-...নের দ্বারা সে যেন জীর্ণভিত্তি ধূলিশায়ী ব্রহ্মণ্যের নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিল। ...ম কোন কথা বলিতে না বলিতেই সে ... হিমাদ্রিশিখরের ধূসর কুজ্ঝটিকা রাশির ...য় মেঘের মত মিলাইয়া গেল।

আমি ক্ষণকাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সমস্ত ...নাবলী মানসপটে চিত্রিত দেখিতে লাগি-...ম। মছলন্দের আসনে যমুনাতীরের ...ক্ষে সুখাসীনা ষোড়শী নবাব-বালিকাকে ...লাম, তীর্থমন্দিরে সন্ধ্যারতিকালে তপস্বি-...র ভক্তিগদগদ একাগ্র মূর্ত্তি দেখিলাম—...র পরে এই দার্জ্জিলিঙ্গে ক্যাল্‌কাটা ...ডের প্রান্তে প্রবীণার কুহেলিকাচ্ছন্ন ভগ্ন-...ভারকাতর নৈরাশ্য মূর্ত্তিও দেখিলাম—...টি সুকুমার রমণী-দেহে ব্রাহ্মণ-মুসলমানের ...তরঙ্গের বিপরীত সংঘর্ষ-জনিত বিচিত্র ...কুল সঙ্গীতধ্বনি সুন্দর সুসম্পূর্ণ উর্দ্দু ভাষায় বিগলিত হইয়া আমার মস্তিষ্কের মধ্যে স্পন্দিত হইতে লাগিল।

চক্ষু খুলিয়া দেখিলাম, হঠাৎ মেঘ কাটিয়া গিয়া স্নিগ্ধ রৌদ্রে নির্ম্মল আকাশ ঝল ঝল করিতেছে—ঠেলা গাড়িতে ইংরাজরমণী ও অশ্বপৃষ্ঠে ইংরাজ পুরুষগণ বায়ুসেবনে বাহির হইয়াছে—মধ্যে মধ্যে দুই একটি বাঙ্গালীর গলাবন্ধবিজড়িত মুখমণ্ডল হইতে আমার প্রতি সকৌতুক কটাক্ষ বর্ষিত হইতেছে।

দ্রুত উঠিয়া পড়িলাম—এই সূর্য্যালোকিত অনাবৃত জগৎদৃশ্যের মধ্যে সেই মেঘাচ্ছন্ন কাহি-নীকে আর সত্য বলিয়া মনে হইল না। আমার বিশ্বাস আমি পর্ব্বতের কুয়াশার সহিত আমার সিগারেটের ধূম্র ভূরি পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া একটি কল্পনাখণ্ড রচনা করিয়াছিলাম, সেই মুসলমানব্রাহ্মণী সেই বিপ্রবীর, সেই যমুনাতীরের কেল্লা কিছুই সত্য নহে।



প্রতিবেশিনী।

আমার প্রতিবেশিনী বালবিধবা। যেন শরতের শিশিরাশ্রুপ্লুত শেফালিকার মত বৃন্ত-চ্যুত,—কোন বাসরগৃহের ফুলশয্যার জন্য সে নহে, সে কেবল দেবপূজার জন্যই উৎসর্গ করা।

তাহাকে আমি মনে মনে পূজা করিতাম। তাহার প্রতি আমার মনের ভাবটা যে কি ছিল পূজা ছাড়া তাহা অন্য কোন সহজ ভাষায় প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না—পরের কাছে ত নয়ই, নিজের কাছেও না।

আমার অন্তরঙ্গ প্রিয়বন্ধু নবীনমাধব, সেও কিছু জানিত না। এইরূপে এই যে আমার গভীরতম আবেগটিকে গোপন করিয়া নির্ম্মল করিয়া রাখিয়াছিলাম ইহাতে আমি কিছু গর্ব্ব অনুভব করিতাম।

কিন্তু মনের বেগ পার্ব্বতী নদীর মত, নিজের জন্মাশখরে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহে না। কোন একটা উপায়ে বাহির হইবার চেষ্টা করে। অকৃতকার্য্য হইলে বক্ষের মধ্যে বেদনার সৃষ্টি করিতে থাকে। তাই ভাবিতেছিলাম, কবিতায় ভাব প্রকাশ করিব কিন্তু কুণ্ঠিতা লেখনী কিছুতেই অগ্রসর হইতে চাহিল না।

পরমাশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঠিক এই সময়েই আমার বন্ধু নবীনমাধবের অকস্মাৎ বিপুলবেগে কবিতা লিখিবার ঝোঁক আসিল; যেন হঠাৎ ভূমিকম্পের মত।

সে বেচারার এরূপ দৈববিপত্তি পূর্ব্বে কখন হয় নাই; সুতরাং সে এই অভিনব আন্দোলনের জন্য লেশমাত্র প্রস্তুত ছিল না। তাহার হাতের কাছে ছন্দ মিল কিছুরই যোগাড় ছিল না, তবু সে দমিল না দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। কবিতা যেন বৃদ্ধ বয়সের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর মত তাহাকে পাইয়া বসিল। নবীনমাধব ছন্দ মিল সম্বন্ধে সহায়তা ও সংশোধনের জন্য আমার শরণাপন্ন হইল।

কবিতার বিষয়গুলি নূতন নহে; অথচ পুরাতনও নহে। অর্থাৎ তাহাকে চিরনূতনও বলা যায়, চিরপুরাতন বলিলেও চলে। প্রেমের কবিতা, প্রিয়তমার প্রতি। আমি তাহাকে একটা ঠেলা দিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কেহে, ইনি কে?

নবীন হাসিয়া কহিল—এখনো সন্ধান পাই নাই।

নবীন রচয়িতার সহায়তাকার্য্যে আমি অত্যন্ত আরাম পাইলাম। নবীনের কাল্পনিক প্রিয়তমার প্রতি আমার রুদ্ধ আবেগ প্রয়োগ করিলাম। শাবকহীন মুর্গী যেমন হাঁসের ডিম পাইলেও বুক পাতিয়া তা' দিতে বসে, হতভাগ্য আমি তেমনি নবীনমাধবের ভাবের উপরে হৃদয়ের সমস্ত উত্তাপ দিয়া চাপিয়া বসিলাম। আনাড়ির লেখা এমনি প্রবল বেগে সংশোধন করিতে লাগিলাম যে প্রায় পনেরো আনা আমারি লেখা দাঁড়াইল।

নবীন বিস্মিত হইয়া বলে—ঠিক এই কথাই আমি বলিতে চাই কিন্তু বলিতে পারি না। অথচ তোমার এ সব ভাব যোগায় কোথা হইতে?

আমি কবির মত উত্তর করি—কল্পনা হইতে। কারণ, সত্য নীরব, কল্পনাই মুখরা। সত্যঘটনা ভাবস্রোতকে পাথরের মত চাপিয়া থাকে, কল্পনাই তাহার পথ মুক্ত করিয়া দেয়।

নবীন গম্ভীর মুখে একটুখানি ভাবিয়া কহিল, তাই ত দেখিতেছি! ঠিক বটে!—আবার খানিকক্ষণ ভাবিয়া বলিল—ঠিক্ ঠিক্!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার ভালবাসার মধ্যে একটি কাতর সঙ্কোচ ছিল, তাই নিজের জবানীতে কোনমতে লিখিতে পারিলাম না। নবীনকে পর্দার মধ্যে মাঝখানে রাখিয়া তবেই আমার লেখনী-মুখ খুলিতে পারিল। লেখাগুলো যেন রসে ভরিয়া উত্তাপে ফাটিয়া উঠিতে লাগিল।

নবীন বলিল, এত তোমারই লেখা! তোমারি নামে বাহির করি।

আমি কহিলাম, বিলক্ষণ! এ তোমারি

লেখা—আমি সামান্য একটু বদল করিয়াছি মাত্র!

ক্রমে নবীনেরও সেইরূপ ধারণা জন্মিল!

জ্যোতির্বিদ্ যেমন নক্ষত্রোদয়ের অপেক্ষায় আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে, আমিও যে তেমনি মাঝে মাঝে আমাদের পাশের বাড়ির বাতায়নের দিকে চাহিয়া দেখিতাম সে কথা অস্বীকার করিতে পারি না। মাঝে মাঝে ভক্তের সেই ব্যাকুল দৃষ্টিক্ষেপ সার্থকও হইত। সেই কর্ম্মযোগনিরতা ব্রহ্মচারিণীর সৌম্য মুখশ্রী হইতে শান্তস্নিগ্ধ জ্যোতি প্রতিবিম্বিত হইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার সমস্ত চিত্তক্ষোভ দমন করিয়া দিত।

কিন্তু সেদিন সহসা এ কি দেখিলাম! আমার চন্দ্রলোকেও কি এখনো অগ্ন্যুৎপাত আছে? সেখানকার জনশূন্য সমাধিমগ্ন গিরি-গুহার সমস্ত বহ্নিদাহ এখনো সম্পূর্ণ নির্ব্বাণ হইয়া যায় নাই কি?

সে দিন বৈশাখ মাসের অপরাহ্ণে ঈশান কোণে মেঘ ঘন হইয়া আসিতেছিল। সেই আসন্ন ঝঞ্ঝার মেঘবিচ্ছুরিত রুদ্রদীপ্তিতে আমার প্রতিবেশিনী জানালায় একাকিনী দাঁড়াইয়া-ছিল। সে দিন তাহার শূন্যনিবিষ্ট ঘনকৃষ্ণ দৃষ্টির মধ্যে কি সুদূর প্রসারিত নিবিড় বেদনা দেখিতে পাইলাম।

আছে, আমার ঐ চন্দ্রলোকে এখনো উত্তাপ আছে! এখনো সেখানে উষ্ণ নিশ্বাস সমীরিত! দেবতার জন্য মানুষ নহে, মানুষের জন্যই সে! তাহার সেই দুটি চক্ষুর বিশাল ব্যাকুলতা সেদিনকার সেই ঝড়ের আলোকে ব্যগ্র পাখীর মত উড়িয়া চলিয়াছিল। স্বর্গের দিকে নহে—মানব হৃদয়নীড়ের দিকে।

সেই উৎসুক আকাঙ্ক্ষা-উদ্দীপ্ত দৃষ্টপাতটি দেখার পর হইতে অশান্ত চিত্তকে সুস্থির করিয়া রাখা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইল। তখন কেবল পরের কাঁচা কবিতা সংশোধন করিয়া তৃপ্তি হয় না—একটা যে কোনপ্রকার কাজ করিবার জন্য চঞ্চলতা জন্মিল।

তখন সংকল্প করিলাম, বাঙ্গালা দেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য আমার সমস্ত চেষ্টা প্রয়োগ করিব। কেবল বক্তৃতা ও লেখা নহে, অর্থ সাহায্য করিতেও অগ্রসর হইলাম।

নবীন আমার সঙ্গে তর্ক করিতে লাগিল। সে বলিল—চিরবৈধব্যের মধ্যে একটি পবিত্র শান্তি আছে, একাদশীর ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকিত সমাধিভূমির মত একটি বিরাট রমণীয়তা আছে; বিবাহের সম্ভাবনামাত্রেই কি সেটা ভাঙ্গিয়া যায় না?

এসব কবিত্বের কথা শুনিলেই আমার রাগ হইত। দুর্ভিক্ষে যে লোক জীর্ণ হইয়া মরি-তেছে তাহার কাছে আহারপুষ্ট লোক যদি খাদ্যের স্থূলত্বের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া ফুলের গন্ধ এবং পাখীর গান দিয়া মুমূর্ষুর পেট ভরাইতে চাহে তাহা হইলে সে কেমন হয়?

আমি রাগিয়া কহিলাম—দেখ নবীন, আর্টিষ্ট লোকে বলে, দৃশ্য হিসাবে পোড়ো বাড়ির বড় একটি সৌন্দর্য্য আছে। কিন্তু বাড়িটাকে কেবল ছবির হিসাবে দেখিলে চলে না, তাহাতে বাস করিতে হয়—অতএব আর্টিষ্ট যাহাই বলুন মেরামত আবশ্যক। বৈধব্য লইয়া তুমি ত দূর হইতে দিব্য কবিত্ব, করিতে চাও—কিন্তু তাহার মধ্যে একটি আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ মানবহৃদয় আপনার বিচিত্র বেদনা লইয়া বাস করিতেছে সেটা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

মনে করিয়াছিলাম নবীনমাধবকে কোন-মতেই দলে টানিতে পারিব না—সেদিন সেই-জন্যই কিছু অতিরিক্ত উষ্মার সহিত কথা

কহিয়াছিলাম। কিন্তু হঠাৎ দেখিলাম, আমার বক্তৃতা অবসানে নবীনমাধব একটিমাত্র গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আমার সমস্ত কথা মানিয়া লইল; বাকি আরও অনেক ভাল ভাল কথা বলিবার অবকাশই ছিল না।

সপ্তাহখানেক পরে নবীন আসিয়া কহিল, তুমি যদি সাহায্য কর আমি একটি বিধবাবিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি।

এমনি খুসি হইলাম—নবীনকে বুকে টানিয়া কোলাকুলি করিলাম, কহিলাম যত টাকা লাগে আমি দিব। তখন নবীন তাহার ইতিহাস বলিল।

বুঝিলাম তাহার প্রিয়তমা কাল্পনিক নহে। কিছুকাল ধরিয়া একটি বিধবা নারীকে সে দূর হইতে ভাল বাসিত, কাহারও কাছে তাহা প্রকাশ করে নাই। যে মাসিকপত্রে নবীনের তরফে আমার কবিতা বাহির হইত সেই পত্রগুলি যথাস্থানে গিয়া পৌঁছিত। কবিতাগুলি ব্যর্থ হয় নাই। বিনা সাক্ষাৎকারে চিত্ত আকর্ষণের এই এক উপায় আমার বন্ধু বাহির করিয়াছিলেন।

কিন্তু নবীন বলেন তিনি চক্রান্ত করিয়া এই সকল কৌশল অবলম্বন করেন নাই। এমন কি, তাঁহার বিশ্বাস ছিল বিধবা পড়িতে জানে না। বিধবার ভাইয়ের নামে কাগজগুলি বিনা স্বাক্ষরে বিনা মূল্যে পাঠাইয়া দিতেন। এ কেবল মনকে সান্ত্বনা দিবার একটা পাগলামী মাত্র। মনে হইত দেবতার উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি দান করা গেল তিনি জানুন্ বা না জানুন্, গ্রহণ করুন্ বা না নাই করুন্।

নানা ছুতায় বিধবার ভাইয়ের সঙ্গে নবীন যে বন্ধুত্ব করিয়া লইয়াছিলেন নবীন বলেন তাহারও মধ্যে কোন উদ্দেশ্য ছিল না। যাহাকে ভালবাসা যায় তাহার নিকটবর্ত্তী আত্মীয়ের সঙ্গ মধুর বোধ হয়।

অবশেষে ভাইয়ের কঠিন পীড়া উপলক্ষে ভগিনীর সহিত কেমন করিয়া সাক্ষাৎ হয় সে সুদীর্ঘ কথা। কবির সহিত কবিতার অবলম্বিত বিষয়টির প্রত্যক্ষ পরিচয় হইয়া কবিতা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়া গেছে। আলোচনা যে কেবল ছাপান কবিতা কয়টির মধ্যেই বদ্ধ ছিল তাহাও নহে।

সম্প্রতি আমার সহিত তর্কে পরাস্ত হইয়া নবীন সেই বিধবার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিয়া বসিয়াছে। প্রথমে কিছুতেই সম্মতি পায় নাই। নবীন তখন আমার মুখের সমস্ত যুক্তিগুলি প্রয়োগ করিয়া এবং তাহার সহিত নিজের চোখের দুই চা'র ফোঁটা জল মিশাইয়া তাহাকে সম্পূর্ণ হার মানাইয়াছে। এখন বিধবার অভিভাবক পিসে কিছু টাকা চায়।

আমি বলিলাম—এখনি লও!

নবীন বলিল, তাহা ছাড়া বিবাহের পর প্রথম মাস পাঁচ ছয় বাবা নিশ্চয় আমার মাস হারা বন্ধ করিয়া দিবেন, তখনকার মত উভয়ের খরচ চালাইবার যোগাড় করিয়া দিতে হইবে। আমি কথাটি না কহিয়া চেক্ লিখিয়া দিলাম। বলিলাম—এখন তাঁহার নামটি বল। আমার সঙ্গে যখন কোন প্রতিযোগিতা নাই তখন পরিচয় দিতে ভয় করিও না, তোমার গা ছুঁইয়া শপথ করিতেছি আমি তাঁহার নামে কবিতা লিখিব না, এবং যদি লিখি তাঁহার ভাইকে না পাঠাইয়া তোমার কাছে পাঠাইয়া দিব।

নবীন কহিল—আরে, সে জন্ত আমি ভয় করি না। বিধবা বিবাহের লজ্জায় তিনি অত্যন্ত কাতর—তাই তোমাদের কাছে তাঁহার

সম্বন্ধে আলোচনা করিতে তিনি অনেক করিয়া নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এখন আর ঢাকিয়া রাখা মিথ্যা।—তিনি তোমারই প্রতি-বেশিনী, ১৯ নম্বরে থাকেন।

হৃৎপিণ্ডটা যদি লোহার বয়লার হইত ত এক চমকে ধক্ করিয়া ফাটিয়া যাইত। জিজ্ঞাসা করিলাম, বিধবা বিবাহে তাঁহার অমত নাই?

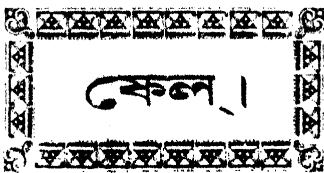
নবীন হাসিয়া কহিল, সম্প্রতি ত নাই!

আমি কহিলাম—কেবল কবিতা পড়িয়াই তিনি মুগ্ধ?

নবীন কহিল—কেন, আমার সেই কবিতা-গুলি ত মন্দ হয় নাই?

আমি মনে মনে কহিলাম—ধিক্!

ধিক্ কাহাকে? তাঁহাকে, না আমাকে, না বিধাতাকে? কিন্তু ধিক্!



ফেল্।

ল্যাজা এবং মুড়া, রাহু এবং কেতু, পরস্পরের সঙ্গে আড়াআড়ি করিলে যেমন দেখিতে হইত এও ঠিক সেই রকম। প্রাচীন হালদার বংশ দুই খণ্ডে পৃথক্ হইয়া প্রকাণ্ড বসতবাড়ির মাঝখানে এক ভিত্তি তুলিয়া পরস্পর পিঠাপিঠি করিয়া বসিয়া আছে, কেহ কাহারো মুখদর্শন করে না।

নবগোপালের ছেলে নলিন্ এবং ননীগোপালের ছেলে নন্দ একবংশজাত, একবয়সী, এক স্কুলে যায় এবং পারিবারিক বিদ্বেষ ও রেষারেষিতেও উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্য

নলিনের বাপ নবগোপাল অত্যন্ত কড়া লোক। ছেলেকে হাঁপ ছাড়িতে দিতেন না, পড়াশুনা ছাড়া আর কথা ছিল না। খেলা, খাদ্য ও সাজসজ্জা সম্বন্ধে ছেলের সর্ব্বপ্রকার সখ্ তিনি খাতাপত্র ও ইস্কুলবইয়ের নীচে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন।

নন্দর বাপ ননীগোপালের শাসনপ্রণালী অত্যন্ত শিথিল ছিল। মা তাহাকে অত্যন্ত ফিট্‌ফাট্ করিয়া সাজাইয়া ইস্কুলে পাঠাইতেন, আনা তিনেক জলপানীও সঙ্গে দিতেন; নন্দ ভাজা মসলা ও কুল্‌পির বরফ, লাঠিম ও মার্ব্বল-গুলিকা ইচ্ছামত ভোগবিতরণের দ্বারা যশস্বী হইয়া উঠিয়াছিল।

মনে মনে পরাভব অনুভব করিয়া নলিন কেবলি ভাবিত নন্দর বাবা যদি আমার বাবা হইত এবং আমার বাবা যদি নন্দর পিতৃস্থান অধিকার করিত তাহা হইলে নন্দকে মজা দেখাইয়া দিতাম।

কিন্তু সেরূপ সুযোগ ঘটিবার পূর্ব্বে ইতিমধ্যে নন্দ বৎসরে বৎসরে প্রাইজ্ পাইতে লাগিল; নলিন রিক্তহস্তে বাড়ি আসিয়া ইস্কুলের কর্ত্তৃপক্ষদের নামে পক্ষপাতের অপবাদ দিতে লাগিল! বাপ তাহাকে অন্য স্কুলে দিলেন, বাড়িতে অন্য মাষ্টার রাখিলেন, ঘুমের সময় হইতে এক ঘণ্টা কাটিয়া পড়ার সময়ে যোগ করিলেন, কিন্তু ফলের তারতম্য হইল না। নন্দ পাস্ করিতে করিতে বি, এ, উত্তীর্ণ হইয়া গেল, নলিন্ ফেল করিতে করিতে এণ্ট্রান্স ক্লাসে জাতিকলের ইঁদুরের মত আট্‌কা পড়িয়া রহিল।

এমন সময় তাহার পিতা তাহার প্রতি দয়া করিলেন। তিনি মরিলেন। তিন বৎসর মেয়াদ খাটিয়া এণ্ট্রান্স ক্লাস হইতে তাহার মুক্তি হইল এবং স্বাধীন নলিন্ আংটি বোতাম ঘড়ির চেনে আত্মোপান্ত ঝক্‌মক্

করিয়া নন্দকে নিরতিশয় নিষ্প্রভ করিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এণ্ট্রেন্স ফেলের যুড়ি চৌঘুড়ি, বি, এ-পাসের এক ঘোড়ার গাড়িকে অনায়াসে ছাড়াইয়া যাইতে লাগিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিক্রী, ওয়েলার ঘোড়ার সহিত সমান চালে চলিতে পারিল না।

এদিকে নলিন্ এবং নন্দর বিবাহের জন্য পাত্রীর সন্ধান চলিতেছে। নলিনের প্রতিজ্ঞা সে এমন কন্যা বিবাহ করিবে যাহার উপমা মেলা ভার, তাহার যুড়ি এবং তাহার স্ত্রীর কাছে নন্দকে হার মানিতেই হইবে।

সব-চেয়ে-ভালর জন্য যাহার আকাঙ্ক্ষা, অনেক ভাল তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়। কাছাকাছি কোন মেয়েকেই নলিন্ পছন্দ করিয়া খতম্ করিতে সাহস করিল না, পাছে আরো-ভাল তাহাকে ফাঁকি দিয়া আর কাহারো ভাগ্যে জোটে।

অবশেষে খবর পাওয়া গেল রাওলপিণ্ডিতে এক প্রবাসী বাঙ্গালীর এক পরমাসুন্দরী মেয়ে আছে। কাছের সুন্দরীর চেয়ে দূরের সুন্দরীকে বেশী লোভনীয় মনে হয়। নলিন মাতিয়া উঠিল; খরচপত্র দিয়া কন্যাকে কলিকাতায় আনান হইল। কন্যাটি সুন্দরী বটে! নলিন্ কহিল, যিনি যাই করুন্ ফস্ করিয়া রাওলপিণ্ডি ছাড়াইয়া যাইবেন এমন সাধ্য কাহারও নাই। অন্ততঃ একথা কেহ বলিতে পারিবেন না যে, এ মেয়ে ত আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছিলাম, পছন্দ হয় নাই বলিয়া সম্বন্ধ করি নাই। কথাবার্ত্তা ত প্রায় এক প্রকার স্থির, পাণপত্রের আয়োজন হইতেছে এমন সময় একদিন প্রাতে দেখা গেল ননীগোপালের বাড়ি হইতে বিচিত্র থালার উপর বিবিধ উপঢৌকন লইয়া দাসীচাকরের দল সার বাঁধিয়া চলিয়াছে।

নলিন্ কহিল, দেখে এস ত হে, ব্যাপার খানা কি?

খবর আসিল, নন্দর ভাবী বধুর জন্য পাণপত্র যাইতেছে। নলিন্ তৎক্ষণাৎ গুড়গুড়ি টানা বন্ধ করিয়া সচকিত হইয়া উঠিয়া বসিল, বলিল, খবর নিতে হচ্চে ত!

তৎক্ষণাৎ গাড়ি ভাড়া করিয়া ছড় ছড় শব্দে দূত ছুটিল। বিপিন হাজরা ফিরিয়া আসিয়া কহিল, ক'লকাতার মেয়ে, কিন্তু খাস মেয়ে।

নলিনের বুক দমিয়া গেল—কহিল, বল কি হে!

হাজরা কেবলমাত্র কহিল—খাসা মেয়ে।

নলিন্ বলিল, এ ত দেখ্‌তে হচ্চে!

পারিষদ বলিল—সে আর শক্তটা কি!—বলিয়া তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠে একটা কাল্পনিক টাকা বাজাইয়া দিল।

সুযোগ করিয়া নলিন্ মেয়ে দেখিল। যতই মনে হইল এ মেয়ে নন্দর জন্য একেবারে স্থির হইয়া গেছে ততই বোধ হইতে লাগিল মেয়েটি রাওলপিণ্ডিটার চেয়ে ভাল দেখিতে। দ্বিধাপীড়িত হইয়া নলিন্ পারিষদকে জিজ্ঞাসা করিল, কেমন ঠেক্‌চে হে।

হাজরা কহিল, আজ্ঞে আমাদের চোকে ত ভালই ঠেক্‌চে।

নলিন্ কহিল, সে ভাল কি, এ ভাল?

হাজরা বলিল, এই ভাল।

তখন নলিনের বোধ হইল, ইহার চোখের পল্লব তাহার চেয়ে আরও একটু যেন ঘন; তাহার রংটা ইহার চেয়ে একটু যেন বেশী ফ্যাকাসে, ইহার গৌরবর্ণে একটু যেন হলদে আভায় সোণা মিশাইয়াছে। ইহাকে ত হাতছাড়া করা যায় না!

নলিন্ বিমর্ষভাবে চিৎ হইয়া গুড়গুড়ি

ন্‌তে টানিতে কহিল—ওহে হাজ্‌রা কি রা যায় বল ত ?

হাজ্‌রা বলিল, মহারাজ শক্তটা কি !—লয়া পুনশ্চ অঙ্গুষ্ঠে তর্জ্জনীতে কাল্পনিক কা বাজাইয়া দিল।

টাকাটা যখন সত্যই সশব্দে বাজিয়া উঠিল ন যথোচিত ফল হইতে বিলম্ব হইল না। ন্যার পিতা একটা অকারণ ছুতা করিয়া রের পিতার সহিত তুমুল ঝগড়া বাধাইলেন। রর পিতা বলিলেন তোমার কন্যার সহিত মার পুত্রের যদি বিবাহ দিই তবে ইত্যাদি ত্যাদি।

কন্যার পিতা আরও এক গুণ অধিক করিয়া লিলেন তোমার পুত্রের সহিত আমার কন্যার দি বিবাহ দিই তবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

অতঃপর আর বিলম্ব মাত্র না করিয়া লিন নন্দকে ফাঁকি দিয়া শুভলগ্নে শুভবিবাহ ত্বর সম্পন্ন করিয়া ফেলিল। এবং হাসিতে াসিতে হাজ্‌রাকে বলিল, "বিএ পাস করা ত এ'কেই বলে! কি বল হে হাজ্‌রা! এবারে আমাদের ওবাড়ির বড় বাবু ফেল্‌!"

অনতিকাল পরেই নবগোপালের বাড়িতে একদিন ঢাক ঢোল সানাই বাজিয়া উঠিল। নন্দর গায়ে হলুদ্‌।

নলিন্‌ কহিল ওহে হাজ্‌রা, খবর লও ত পাত্রীটি কে।

হাজ্‌রা আসিয়া খবর দিল, পাত্রীটি সেই রাওলপিণ্ডির মেয়ে।

রাওলপিণ্ডির মেয়ে! হাঃ হাঃ হাঃ। নলিন অত্যন্ত হাসিতে লাগিল। ওবাড়ির বড় বাবু আর কন্যা পাইলেন না, আমাদেরই পরিত্যক্ত পাত্রীটিকে বিবাহ করিতেছেন। হাজ্‌রাও ান্তর হাসিল।

কিন্তু উত্তরোত্তর নলিনের হাসির আর জোর রহিল না! তাহার হাসির মধ্যে কীট প্রবেশ করিল। একটি ক্ষুদ্র সংশয় তীক্ষ্নস্বরে কাণে কাণে বলিতে লাগিল, আহা, হাতছাড়া হইয়া গেল! শেষকালে নন্দর কপালে জুটিল! ক্ষুদ্র সংশয় ক্রমশই রক্তস্ফীত জোঁকের মত বড় হইয়া উঠিল—তাহার কণ্ঠস্বরও মোটা হইল। সে বলিল, এখন আর কোন মতেই ইহাকে পাওয়া যাইবে না, কিন্তু আসলে ইহাকেই দেখিতে ভাল! ভারি ঠকিয়াছ!

অন্তঃপুরে নলিন যখন খাইতে গেল তখন তাহার স্ত্রীর ছোট খাট সমস্ত খুঁৎ মস্ত হইয়া তাহাকে উপহাস করিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল স্ত্রীটা তাহাকে ভয়ানক ঠকাইয়াছে।

রাওলপিণ্ডিতে যখন সম্বন্ধ হইতেছিল তখন নলিন সেই কন্যার যে ফটো পাইয়াছিল সেইখানি বাহির করিয়া দেখিতে লাগিল। বাহবা অপরূপ রূপমাধুরী! এমন লক্ষ্মীকে হাতে পাইয়া ঠেলিয়াছি আমি এত বড় গাধা!

বিবাহ সন্ধ্যায় আলো জ্বালাইয়া বাজনা বাজাইয়া জুড়িতে চড়িয়া বর বাহির হইল। নলিন শুইয়া পড়িয়া গুড়গুড়ি হইতে যৎসামান্য সান্ত্বনা আকর্ষণের নিষ্ফল চেষ্টা করিতেছে এমন সময় হাজ্‌রা প্রসন্নবদনে হাসিতে হাসিতে আসিয়া নন্দকে লক্ষ্য করিয়া পরিহাস জমাইবার উপক্রম করিল!

নলিন হাঁকিল, দরোয়ান!

হাজ্‌রা তটস্থ হইয়া দরোয়ানকে ডাকিয়া দিল!

বাবু হাজ্‌রাকে দেখাইয়া দিয়া কহিল, অব্‌ হি ইস্কো কাণ পকড়কে বাহার নিকাল দো!

রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী।

রঙ্গ চিত্র।

চিরকুমার সভা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অক্ষয়কুমারের শ্বশুর হিন্দুসমাজে ছিলেন, কিন্তু তাঁহার চালচলন অত্যন্ত নব্য ছিল। মেয়েদের তিনি দীর্ঘকাল অবিবাহিত রাখিয়া লেখা পড়া শিখাইতে ছিলেন। লোকে আপত্তি করিলে বলিতেন আমরা কুলীন, আমাদের ঘরে ত চিরকালই এইরূপ প্রথা।

তাঁহার মৃত্যুর পর বিধবা জগত্তারিণীর ইচ্ছা, লেখা পড়া বন্ধ করিয়া মেয়েগুলির বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত হন। কিন্তু তিনি ঢিলা প্রকৃতির স্ত্রীলোক, ইচ্ছা যাহা হয় তাহার উপায় অন্বেষণ করিয়া উঠিতে পারেন না। সময় যতই অতীত হইতে থাকে, আর পাঁচ-জনের উপর দোষারোপ করিতে থাকেন।

জামাতা অক্ষয়কুমার পুরা নব্য। শ্যালি-গুলিকে তিনি পাস করাইয়া নব্যসমাজের খোলাখুলি মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে ইচ্ছুক। সেক্রেটারিয়েটে তিনি বড় রকমের কাজ করেন, গরমের সময় তাঁহাকে সিমলা পাহাড়ে আপিস করিতে হয়, অনেক রাজঘরের দূত, বড় সাহেবের সহিত বোঝা পড়া করাইয়া দিবার জন্য বিপদে আপদে তাঁহার হাতে পায়ে আসিয়া ধরে। এই সকল নানা কারণে শ্বশুর বাড়িতে তাঁহার পসার বেশী। বিধবা শাশুড়ী তাঁহাকেই অনাথা পরিবারের অভিভাবক বলিয়া জ্ঞান করেন। শীতের কয়মাস শাশুড়ীর পীড়াপীড়িতে তিনি কলিকাতায় তাঁহার ধনী শ্বশুর গৃহেই যাপন করেন। সেই কয়মাস তাঁহার শ্যালীসমিতিতে উৎসব পড়িয়া যায়।

সেইরূপ কলিকাতা বাসের সময় একদা

র বাড়িতে স্ত্রী পুরবালার সঙ্গে অক্ষয়-
ারের নিম্নলিখিত মত কথাবার্ত্তা হয়ঃ—

পুরবালা। তোমার নিজের বোন্ হলে
তুমি কেমন চুপ করে বসে থাক্‌তে! এত-
নে এক একটির তিনটি চারটি করে পাত্র
টিয়ে আন্‌তে! ওরা আমার বোন্ কি না—

অক্ষয়। মানব চরিত্রের কিছুই তোমার
ছে লুকোনো নেই। নিজের বোনে এবং
র বোনে যে কত প্রভেদ তা এই কাঁচা
সেই বুঝে নিয়েছ! তা ভাই শ্বশুরের
নিও কন্যাটিকেই পরের হাতে সমর্পণ করতে
ছুতেই মন সরে না—এ বিষয়ে আমার
র্য্যের অভাব আছে তা স্বীকার করতে হবে।

পুরবালা সামান্য একটু রাগের মত ভাব
রিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল—দেখ তোমার
ঙ্গ আমার একটা বন্দোবস্ত করতে হচ্চে।

অক্ষয়। একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ত
পড়ে' বিবাহের দিনেই হয়ে গেছে,
বার আর একটা!—

পুরবালা। ওগো, এটা তত ভয়ানক
য়! এটা হয়ত তেমন অসহ্য না হতেও
রে।

অক্ষয় যাত্রার অধিকারীর মত হাত নাড়িয়া
লিল—সখি, তবে খুলে বল!—বলিয়া
ঝিটে গান ধরিল—

কি জানি কি ভেবেছ মনে,
খুলে বল ললনে!
কি কথা হায়, ভেসে যায়,
ঐ ছলছল নয়নে!

এইখানে বলা আবশ্যক, অক্ষয়কুমার
ঝাঁকের মাথায় দুটো চারটা লাইন গান মুখে
খে বানাইয়া গাহিয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু
খনই কোন গান রীতিমত সম্পূর্ণ করিতেন
া। বন্ধুরা বিরক্ত হইয়া বলিতেন, তোমার
এমন অসামান্য ক্ষমতা কিন্তু গান গুলো শেষ
কর না কেন? অক্ষয় ফস্ করিয়া তান ধরিয়া
তাহার জবাব দিতেন—

সখা, শেষ করা কি ভালো?
তেল ফুরোবার আগেই আমি
নিবিয়ে দেব আলো!

এইরূপ ব্যবহারে সকলেই বিরক্ত হইয়া
বলে অক্ষয়কে কিছুতেই পারিয়া উঠা যায় না।

পুরবালাও ত্যক্ত হইয়া বলিলেন—ওস্তা-
দজি থাম! আমার প্রস্তাব এই যে, দিনের মধ্যে
একটা সময় ঠিক কর যখন তোমার ঠাট্টা বন্ধ
থাক্‌বে,—যখন তোমার সঙ্গে দুটো একটা
কাজের কথা হতে পারবে!

অক্ষয়। গরীবের ছেলে, স্ত্রীকে কথা
বল্‌তে দিতে ভরসা হয় না, পাছে থপ্ করে
বাজুবন্দ চেয়ে বসে! (আবার গান)

পাছে চেয়ে বসে আমার মন,
আমি তাই ভয়ে ভয়ে থাকি,
পাছে চোখে চোখে পড়ে বাঁধা
আমি তাইত তুলিনে আঁখি!

পুরবালা। তবে যাও!

অক্ষয়। না, না, রাগারাগি না! আচ্ছা
যা বল তাই শুনব! খাতায় নাম লিখিয়ে
তোমার ঠাট্টানিবারিণী সভার সভ্য হব!
তোমার সাম্‌নে কোন রকমের বেয়াদবী করব
না! তা কি কথা হচ্ছিল! শ্যালীদের বিবাহ!
উত্তম প্রস্তাব।

পুরবালা গম্ভীর বিষণ্ণ হইয়া কহিল—দেখ,
এখন বাবা নেই। মা তোমারি মুখ চেয়ে
আছেন। তোমারি কথা শুনে এখনো তিনি
বেশী বয়স পর্য্যন্ত মেয়েদের লেখা পড়া
শেখাচ্চেন। এখন যদি সৎপাত্র না জুটিয়ে
দিতে পার তাহলে কি অন্যায় হবে ভেবে দেখ
দেখি!

অক্ষয় দুর্লক্ষণ দেখিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা কথঞ্চিৎ গম্ভীর হইয়া কহিলেন—আমিত তোমাকে বলেইছি তোমরা কোন ভাবনা কোরো না। আমার শ্যালীপতিরা ভগবান্ প্রজাপতির বিশ্ব-বিদ্যালয়ে মানুষ হচ্চেন, বি, এ, ডিগ্রি নিতে আর বিলম্ব নেই।

পুরবালা। বিদ্যালয়টি কোথায়?

অক্ষয়। যেখান থেকে আমি পাস করে তোমার মত ডিপ্লোমাটি পেয়েছি! জানইত আমাদের সেই চিরকুমার সভা।

সভার নাম শুনিয়াই কাহারও বুঝিতে বাকি নাই যে, সভাটি ছাত্রসভা—এবং সভ্যরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তাহারা কখনও বিবাহ করিবে না।

পুরবালা সন্দেহ প্রকাশ করিয়া কহিল—প্রজাপতির সঙ্গে তাদের যে লড়াই!

অক্ষয়। দেবতার সঙ্গে লড়াই করে পারবে কেন? তাঁকে কেবল চটিয়ে দেয় মাত্র! সেই জন্যে ভগবান্ প্রজাপতির বিশেষ ঝোঁক ঐ সভাটার উপরেই। সরা-চাপা হাঁড়ির মধ্যে মাংস যেমন গুমে গুমে সিদ্ধ হতে থাকে—প্রতিজ্ঞার মধ্যে চাপা থেকে সভ্য-গুলিও একবারে হাড়ের কাছ পর্য্যন্ত নরম হয়ে উঠেছেন—দিব্যি বিবাহ-যোগ্য হয়ে এসেছেন—এখন পাতে দিলেই হয়। আমিও ত এককালে ঐ সভার সভাপতি ছিলুম!

আনন্দিতা পুরবালা বিজয়গর্ব্বে ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তোমার কি রকম দশাটা হয়েছিল!

অক্ষয়। সে আর কি বলিব! প্রতিজ্ঞা ছিল স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ পর্য্যন্ত মুখে উচ্চারণ করব না, কিন্তু শেষকালে এমনি হল যে, মনে হত শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ গোপিনী যদি বা সম্প্রতি দুষ্প্রাপ্য হন অন্ততঃ মহাকালীর চৌষট্টি হাজার যোগিনীর সন্ধান পেলেও একবার পেট ভরে প্রেমালাপটা করে নিই—ঠিক সেই সময়টাতেই তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল আর কি!

পুরবালা। চৌষট্টি হাজারের সখ মিট্‌ল?

অক্ষয়। সে আর তোমার মুখের সাম্‌নে বল্‌ব না! জাঁক হবে। তবে ইসারায় বল্‌তে পারি মা কালী দয়া করেছেন বটে!—এই বলিয়া পুরবালার চিবুক ধরিয়া মুখটি একটু খানি তুলিয়া সকৌতুক স্নিগ্ধ প্রেমে একবার নিরী-ক্ষণ করিয়া দেখিলেন। পুরবালা কৃত্রিম কলহে মুখ সরাইয়া লইয়া কহিলেন—তবে আমিও বলি, বাবা ভোলানাথের নন্দী ভৃঙ্গীর অভাব ছিল না, আমাকে বুঝি তিনি দয়া করে-ছিলেন?

অক্ষয়। তা হতে পারে, সেইজন্যই কার্ত্তি-কটি পেয়েছ!

পুরবালা। আবার ঠাট্টা সুরু হলো?

অক্ষয়। কার্ত্তিকের কথাটা বুঝি ঠাট্টা? গা ছুঁয়ে বল্‌চি ওটা আমার অন্তরের বিশ্বাস!

এমন সময়ে শৈলবালার প্রবেশ। ইনি মেজ বোন। বিবাহের এক মাসের মধ্যে বিধবা। চুলগুলি ছোট করিয়া ছাঁটা বলিয়া ছেলের মত দেখিতে। ঠোঁটের কাছে একটু যেন বিষাদের ছায়া, কিন্তু চঞ্চল চোখ দুটি হাসিতেছে। সাজসজ্জার চেষ্টা মাত্র নাই। গরম হয় এবং খোঁপার ব্যাপারে সময় যায় বলিয়া আজানুলম্বিত চুলগুলি ছাঁটিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছে। সংস্কৃত ভাষায় অনার দিয়া বি, এ পাস করিবার জন্য উৎসুক।

শৈল আসিয়া বলিল—মুখুয্যে মশায়, এই-বার তোমার ছোট দুটি শ্যালীকে রক্ষা কর।

অক্ষয়। যদি অরক্ষণীয়া হয়ে থাকেন ত আমি আছি। ব্যাপারটা কি?

শৈল। মার কাছে তাড়া খেয়ে রসিক দাদা কোথা থেকে এক যোড়া কুলীনের ছেলে

ন হাজির করেছেন, মা স্থির করেছেন দের সঙ্গেই তাঁর দুই মেয়ের বিবাহ দেবেন।

অক্ষয় ওরে বাসরে! একেবারে বিয়ের পডেমিক্! প্লেগের মত! এক বাড়িতে এক ঙ্গ দুই কন্যেকে আক্রমণ! ভয় হয় পাছে মাকেও ধরে।—বলিয়া কালাংড়ায় গান রয়া দিলেন—

আমি বড় থাকি কাছাকাছি,
তাই সদা ভয়ে ভয়ে আছি!

নয়ন বচন কোথায় কখন্ বাজিলে বাঁচি না চ!

শৈল। এই কি তোমার গান গাবার সময় না?

অক্ষয়। কি করব ভাই! রসুনচৌকি জাতে শিখিনি, তা হলে ধরতুম্। বল কি, চকর্ম! দুই শ্যালীর উদ্বাহবন্ধন! কিন্তু এত ড়াতাড়ি কেন?

শৈল। বৈশাখ মাসের পর আস্‌চে বছরে কাল পড়বে আর বিয়ের দিন নেই!

পুরবালা নিজের স্বামীটি লইয়া সুখী এবং হার বিশ্বাস যেমন করিয়া হোক্ স্ত্রীলোকের কটা বিবাহ হইয়া গেলেই সুখের দশা। সে নে মনে খুসী হইয়া বলিল, তোরা আগে কতে ভাবিস্ কেন শৈল, পাত্র আগে দেখা কত।

ঢিলা লোকদের স্বভাব এই যে, হঠাৎ কদা অসময়ে তাহারা মন স্থির করে, তখন াল মন্দ বিচার করিবার পরিশ্রম স্বীকার না রিয়া একদমে পূর্ব্বকার সুদীর্ঘ শৈথিল্য সারিয়া ইতে চেষ্টা করে। তখন কিছুতেই তাহাদের ার এক মুহূর্ত্ত সবুর সয় না। কর্ত্রী ঠাকুরাণীর সইরূপ অবস্থা! তিনি আসিয়া বলিলেন, াবা অক্ষয়!

অক্ষয়। কি মা!

জগৎ। তোমার কথা শুনে আর ত মেয়েদের রাখ্‌তে পারিনে!—ইহার মধ্যে এইটুকু আভাস ছিল যে, তাঁহার মেয়েদের সকল প্রকার দুর্ঘটনার জন্য অক্ষয়ই দায়ী।

শৈল কহিল—মেয়েদের রাখতে পার না বলেই কি মেয়েদের ফেলে দেবে মা!

জগৎ। ঐ ত! তোদের কথা শুনলে গায়ে জ্বর আসে। বাবা অক্ষয় শৈল বিধবা মেয়ে, ওকে এত পড়িয়ে পাস করিয়ে কি হবে বল দেখি? ওর এত বিদ্যের দরকার কি?

অক্ষয়। মা, শাস্ত্রে লিখেছে, মেয়ে মানুষের একটা না একটা উৎপাত থাকা চাই—হয় স্বামী, নয় বিদ্যে, নয় হিষ্টিরিয়া। দেখনা, লক্ষ্মীর আছেন বিষ্ণু, তাঁর আর বিদ্যের দরকার হয় নি,—তিনি স্বামীটিকে এবং পেঁচাটিকে নিয়েই আছেন,—আর সরস্বতীর স্বামী নেই, কাজেই তাঁকে বিদ্যে নিয়ে থাক্‌তে হয়!

জগৎ। তা যা বল বাবা, আস্‌চে বৈশাখে মেয়েদের বিয়ে দেবই।

পুরবালা। হাঁ মা, আমারও সেই মত। মেয়ে মানুষের সকাল সকাল বিয়ে হওয়াই ভাল!

শুনিয়া অক্ষয় তাহাকে জনান্তিকে বলিয়া লইল, তা ত বটেই! বিশেষতঃ যখন একাধিক স্বামী শাস্ত্রে নিষেধ, তখন সকাল সকাল বিয়ে করে সময়ে পুষিয়ে নেওয়া চাই!

পুরবালা। আঃ কি বকচ! মা শুনতে পাবেন!

জগৎ। রসিক কাকা আজ পাত্র দেখাতে আস্‌বেন, তা চল্ মা পুরি, তাদের জলখাবার ঠিক করে রাখিগে।

আনন্দে উৎসাহে মার সঙ্গে পুরবালা ভাণ্ডার অভিমুখে প্রস্থান করিল।

মুখুয্যে মশায়ের সঙ্গে শৈল। তখন গোপন কমিটি —না, তোর বোনদের গণপতি দুটি

পরস্পরের পরম বন্ধু ছিল। অক্ষয়ের মত এবং রুচির দ্বারাই শৈল অনেকটা গঠিত। অক্ষয় তাঁহার এই শিষ্যাটিকে যেন আপনার প্রায় সমবয়স্ক ভাইটির মত দেখিতেন—স্নেহের সহিত সৌহার্দ্দ মিশ্রিত। তাহাকে শ্যালীর মত ঠাট্টা করিতেন বটে কিন্তু তাহার প্রতি বন্ধুর মত একটি সহজ শ্রদ্ধা ছিল।

শৈল কহিল—আর ত দেরী করা যায় না মুখুয্যে মশায়! এইবার তোমার সেই চিরকুমার সভার বিপিনবাবু এবং শ্রীশবাবুকে বিশেষ একটু তাড়া না দিলে চল্‌চে না। আহা ছেলে দুটি চমৎকার! আমাদের নেপ আর নীরর সঙ্গে দিব্যি মানায়! তুমি ত চৈত্রমাস যেতে না যেতে আপিস্ ঘাড়ে করে সিম্‌লে যাবে, এবারে মাকে ঠেকিয়ে রাখা শক্ত হবে!

অক্ষয়। কিন্তু তাই বলে সভাটিকে হঠাৎ অসময়ে তাড়া লাগালে যে চম্‌কে যাবে! ডিমের খোলা ভেঙে ফেল্‌লেই কিছু পাখী বেরয় না। যথোচিত তা' দিতে হবে, তাতে সময় লাগে।

শৈল একটুখানি চুপ করিয়া রহিল—তার পরে হঠাৎ হাসিয়া বলিয়া উঠিল—বেশত তা দেবার ভার আমি নেব মুখুয্যে মশায়।

অক্ষয়। আর একটু খোলসা করে বল্‌তে হচ্চে।

শৈল। ঐ ত দশ নম্বরে ওদের সভা? আমাদের ছাদের উপর দিয়ে দেখন্-হাসির বাড়ি পেরিয়ে ওখানে ঠিক যাওয়া যাবে। আমি পুরুষবেশে ওদের সভার সভ্য হব, তার পরে সভা কতদিন টেঁকে আমি দেখে নেব।

অক্ষয় নয়ন বিস্ফারিত করিয়া মুহূর্ত্তকাল স্তম্ভিত থাকিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। কহিল, আহা কি আপশোষ যে, তোমার দিদিকে বিয়ে [illegible] একেবারে [illegible] পেলেও একবার পেটে

জন্মের মত ঘুচিয়েছি, নইলে দলেবলে আমি সুদ্ধ ত তোমার জালে জড়িয়ে চক্ষু বুজে মরে পড়ে থাক্‌তুম! এমন সুখের ফাঁড়াও কাটে! সখী তবে মনোযোগ দিয়ে শোন্,—

(সিন্ধু ভৈরবীতে গান)

ওগো হৃদয়-বনের শিকারী!
মিছে তারে জালে ধরা যে তোমারি ভিখারী!
সহস্রবার পায়ের কাছে আপনি যে জন ম'রে আছে,
নয়নবাণের খোঁচা খেতে সে যে অনধিকারী!

শৈল কহিল—ছি মুখুয্যে মশায় তুমি সেকেলে হয়ে যাচ্চ! ঐ সব নয়ন বাণটান গুলোর এখন কি আর চলন আছে? যুদ্ধ-বিদ্যার যে এখন অনেক বদল হয়ে গেছে?

ইতিমধ্যে দুই বোন্ নৃপবালা, নীরবালা, ষোড়শী এবং চতুর্দ্দশী প্রবেশ করিল। নৃপ শান্ত স্নিগ্ধ, নীরু তাহার বিপরীত, কৌতুকে এবং চাঞ্চল্যে সে সর্ব্বদাই আন্দোলিত।

নীরু আসিয়াই শৈলকে জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—মেজদিদি ভাই, আজ কারা আস্‌বে বল ত?

নৃপ। মুখুয্যে মশায় আজ কি তোমার বন্ধুদের নিমন্ত্রণ আছে? জলখাবারের আয়োজন হচ্চে কেন?

অক্ষয়। ঐ ত! বই পড়ে পড়ে চোখ কানা করলে—পৃথিবীর আকর্ষণে উল্কাপাত কি করে সে সমস্ত লাখ দুলাখ ক্রোশের খবর রাখ, আর আজ ১৮ নম্বর মধুমিস্ত্রির গলিতে কার আকর্ষণে কে এসে পড়চে সেটা অনুমান কর্‌তেও পার্‌লে না?

নীরু। বুঝেছি ভাই, সেজদিদি!—বলিয়া নৃপর পিঠে একটা চাপড় মারিল এবং তাহার কাণের কাছে মুখ রাখিয়া অল্প একটু গলা নামাইয়া কহিল—তোর বর আস্‌চে

গই, তাই সকালবেলা আমার বাঁ চোখ
াচ্‌ছিল!

নৃপ তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া কহিল, তোর
া চোক নাচলে আমার বর আস্‌বে কেন?

নীরু কহিল, তা ভাই, আমার বাঁ চোখটা
ায় তোরি বরের জন্যে নেচে নিলে তাতে
। দুঃখিত নই! কিন্তু মুখুজ্যে মশায়,
াবারত ছুটি লোকের জন্যে দেখলুম, সেজ-
কি স্বয়ম্বরা হবে না কি?

অক্ষয়। আমাদের ছোড়দিদিও বঞ্চিত
ন না।

নীরু। আহা মুখুয্যে মহাশয়, কি
বাদ শোনালে? তোমাকে কি বক্‌শিষ
! এই নাও আমার গলার হার—আমার
তের বালা।

শৈল ব্যস্ত হইয়া কহিল—আঃ ছিঃ হাত
া করিস্‌নে।

নীরু। আজ আমাদের বরের অনারে
ার ছুটি দিতে হবে মুখুয্যে মহাশয়!

নৃপ। আঃ কি বর বর করছিস্‌! দেখত
মেজদিদি।

অক্ষয়। ওকে ঐ জন্যেইত বর্ব্বরা নাম
য়ছি। অয়ি বর্ব্বরে, ভগবান্‌ তোমাদের
ি সহোদরাকে এই একটি অক্ষয় বর দিয়ে
খছেন, তবু তৃপ্তি নেই?

নীরু। সেই জন্যেইত লোভ-আরো বেড়ে
ছে!

নৃপ তাহার ছোট বোনকে সংযত করা
াধ্য দেখিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল।
চলিতে চলিতে দ্বারের নিকট হইতে মুখ
াইয়া কহিল—এলে খবর দিয়ো মুখুয্যে
ায়, ফাঁকি দিয়ো না! দেখ্‌চত সেজদিদি
রক চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

সহাস্য সস্নেহে দুই বোনকে নিরীক্ষণ
করিয়া শৈল কহিল—মুখুয্যে মশায়, আমি
ঠাট্টা করচিনে—আমি চিরকুমার সভার সভ্য
হব। কিন্তু আমার সঙ্গে পরিচিত একজন
কাউকে চাইত। তোমার বুঝি আর সভ্য
হবার যো নেই?

অক্ষয়। না আমি পাপ করেছি। তোমার
দিদি আমার তপস্যা ভঙ্গ করে আমাকে স্বর্গ
হতে বঞ্চিত করেছেন।

শৈল। তাহলে রসিক দাদাকে ধরতে
হচ্চে। তিনি ত কোন সভার সভ্য না হয়েও
চিরকুমার ব্রত রক্ষা করেচেন।

অক্ষয়। সভ্য হলেই এই বুড়ো বয়সে
ব্রতটি খোয়াবেন। ইলিস মাছ অম্‌নি দিব্যি
থাকে, ধরলেই মারা যায়—প্রতিজ্ঞাও ঠিক
তাই, তাকে বাঁধ্‌লেই তার সর্ব্বনাশ।

এমন সময় সম্মুখের মাথায় টাক, পাকা
গোঁফ, গৌরবর্ণ দীর্ঘাকৃতি রসিকদাদা আসিয়া
উপস্থিত হইলেন। অক্ষয় তাঁহাকে তাড়া
করিয়া গেল—কহিল, ওরে পাষণ্ড, ভণ্ড,
অকাল কুষ্মাণ্ড!

রসিক প্রসারিত দুই হস্তে তাহাকে সম্বরণ
করিয়া কহিলেন—কেনহে,—মত্তমন্থর কুঞ্জ-
কুঞ্জর পুঞ্জ-অঞ্জনবর্ণ।

অক্ষয়। তুমি আমার শ্যালীপুষ্পবনে
দাবানল আনতে চাও?

শৈল। রসিকদাদা, তোমারই বা তাতে
কি লাভ?

রসিক। ভাই, সইতে পারলুম না কি
করি! বছরে বছরেই তোর বোনদের বয়স
বাড়চে, বড় মা আমারই দোষ দেন কেন?
বলেন, দুবেলা বসে বসে কেবল খাচ্চ, মেয়েদের
জন্যে দুটো বর দেখে দিতে পার না! আচ্ছা
ভাই আ না খেতে রাজি আছি, তা হলেই
বর টবে,—না, তোর বোন্‌দের বয়স কম্‌তে

থাক্‌বে? এদিকে যে দুটির বর জুটচে না, তাঁরাত দিব্যি খাচ্চেন-দাচ্চেন! শৈল ভাই, কুমারসম্ভবে পড়েছিস্, মনে আছে ত?—

স্বয়ং বিশীর্ণ দ্রুমপর্ণ বৃত্তিতা
পরাহি কাষ্ঠা তপসস্তয়া পুনঃ,
তদপ্যপাকীর্ণ মতঃ প্রিয়ংবদাং
বদন্ত্যপর্ণেতি চ তাং পুরাবিদঃ—

তা ভাই দুর্গা নিজের বর খুঁজ্‌তে খাওয়া দাওয়া ছেড়ে তপস্যা করেছিলেন—কিন্তু নাৎনীদের বর জুটচে না বলে আমি বুড় মানুষ খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দেব, বড়মার একি বিচার! আহা শৈল, ওটা মনে আছে ত? তদপ্যপাকীর্ণমতঃ প্রিয়ংবদাং—

শৈল। মনে আছে দাদা, কিন্তু কালিদাস এখন ভাল লাগ্‌চে না।

রসিক। তা হলেত অত্যন্ত দুঃসময় বল্‌তে হবে।

শৈল। তাই তোমার সঙ্গে পরামর্শ আছে।

রসিক। তা রাজি আছি ভাই। যে রকম পরামর্শ চাও, তাই দেব। যদি "হাঁ" বলাতে চাও "হাঁ" বল্‌ব, "না" বলাতে চাও "না" বল্‌ব। আমার ঐ গুণটি আছে। আমি সকলের মতের সঙ্গে মত দিয়ে যাই বলেই সবাই আমাকে প্রায় নিজের মত বুদ্ধিমান ভাবে।

অক্ষয়। তুমি অনেক কৌশলে তোমার পসার বাঁচিয়ে রেখেচ, তার মধ্যে তোমর এই টাক্ একটি।

রসিক। আর একটি হচ্চে—যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে—তা' আমি বাইরের লোকের কাছে বেশী কথা কইনে—

শৈল। সেইটে বুঝি আমাদের কাছে পুষিয়ে নাও!

রসিক। তোদের কাছে যে ধরা পড়েছি।

শৈল। ধরা যদি পড়ে থাক ত চল—যা বলি তাই করতে হবে।—বলিয়া পরামর্শের জ[ন্য] শৈল তাঁহাকে অন্য ঘরে টানিয়া লইয়া চলি[ল।]

অক্ষয় বলিতে লাগিল—অ্যাঁ, শৈল[...] এই বুঝি! আজ রসিক দা হলেন, রাজমন্ত্রী[,] আমকে ফাঁকি!

শৈল যাইতে যাইতে পশ্চাৎ ফিরি[য়া] হাসিয়া কহিল—তোমার সঙ্গে আমার [...] পরামর্শের সম্পর্ক মুখুয্যে মশায়? পরা[মর্শ] যে বুড়ো না হলে হয় না।

অক্ষয় বলিল—তবে রাজমন্ত্রীপদের জ[ন্য] আমার দরবার উঠিয়ে নিলুম।—বলিয়া শ[ূন্য] ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া হঠাৎ উচ্চৈঃস্ব[রে] খাম্বাজে গান ধরিলেন—

আমি কেবল ফুল যোগাব
তোমার দুটি রাঙা হাতে,
বুদ্ধি আমার খেলেনাক
পাহারা বা মন্ত্রণাতে!

বাড়ির কর্ত্তা যখন বাঁচিয়া ছিলেন তি[নি] রসিককে খুড়া বলিতেন। রসিক দীর্ঘক[াল] হইতে তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া বাড়ির [সুখ] দুঃখে সম্পূর্ণ জড়িত হইয়াছিলেন। গি[ন্নির] অগোছালো থাকাকে কর্ত্তার অবর্ত্তমানে তাঁহ[ার] কিছু অযত্ন অসুবিধা হইতেছিল এবং জগ[ত্তা]রিণীর অসঙ্গত ফরমাস্ খাটিয়া তাঁহার [অব]কাশের অভাব ঘটিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার [...] সমস্ত অভাব অসুবিধা পূরণ করিবার [লো]ক ছিল শৈল। শৈল থাকাতেই মাঝে মা[ঝে] ব্যামোর সময় তাঁহার পথ্য এবং সেবার [...] হইতে পারে নাই; এবং তাহারই সহকারি[তায়] তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা পুরা দ[মে] চলিয়াছিল। প্রসন্ন হাস্যময়ী শৈলই ক্ষুদ্র প[রি]বারটির প্রতিষ্ঠাকেন্দ্র। চাকর বাকর আ[শ্রিত] অভ্যাগত এমন কি প্রতিবেশীরা তাহা[র] চতুর্দ্দিকে আকৃষ্ট হইয়া, যেন আবর্ত্তিত [...]

হ। পাড়ার ছোট ছেলেরা তাহার কাছে বলিয়া লৃক্ষ, এবং প্রতিবেশিদের ঘরে পীড়া ল শৈল বিনা আড়ম্বরে তাহাদের সেবার গ্রহণ করে। তাহাকে দেখিয়া কেহ পাস্ বিদুষী বলিয়াও ভয় করিত না, আবার ী রমণী বলিয়াও সঙ্কোচ বা মোহ প্রকাশ তে পারিত না। তাহার মধ্যে বালকের তুৎপরতা, পুরুষের উদার ঋজুভাব এবং ীর স্নেহপূর্ণ সেবাশীলতা মিশ্রিত ছিল।

রসিক দাদা শৈলবালার অদ্ভুত প্রস্তাব য়ে প্রথমটা হাঁ করিয়া রহিলেন, তাহার পর তে লাগিলেন, তাহার পর রাজি হইয়া লন। কহিলেন, ভগবান্ হরি নারী-ছদ্ম-শ পুরুষকে ভুলিয়ে ছিলেন, তুই শৈল যদি ষ-ছদ্মবেশে পুরুষকে ভোলাতে পারিস লে হরিভক্তি উড়িয়ে দিয়ে তোর পূজোতেই বয়সটা কাটাব। কিন্তু মা যদি টের পান?

শৈল। তিন কন্যাকে কেবলমাত্র স্মরণ রই মা মনে মনে এত অস্থির হয়ে ওঠেন তিনি আমাদের আর খবর রাখ্‌তে পারেন । তাঁর জন্যে ভেবো না।

রসিক। কিন্তু সভায় কি রকম করে তা করতে হয় সে আমি কিছুই জানিনে।

শৈল। আচ্ছা সে আমি চালিয়ে নেব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

মুখুয্যেমশায়!

অক্ষয় বলিলেন—আজ্ঞা কর!

শৈল কহিল—ছেলে জুটোকে কোন করে তাড়াতে হবে!

অক্ষয় উৎসাহ পূর্ব্বক কহিলেন—তা ত হবেই। বলিয়া রামপ্রসাদী সুরে গান জুড়িয়া দিলেন—

দেখ্‌ব কে তোর কাছে আসে!
তুই রবি একেশ্বরী,
একলা আমি রৈব পাশে!

শৈল হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—একেশ্বরী?

অক্ষয় বলিলেন, না হয় তোমরা চার ঈশ্বরীই হলে, শাস্ত্র আছে অধিকন্তু ন দোষায়।

শৈল কহিল—আর, তুমিই একলা থাকবে? ওখানে বুঝি অধিকন্তুটা খাটে না?

অক্ষয় কহিলেন, ওখানে শাস্ত্রের আর একটা পবিত্র বচন আছে—সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং।

শৈল। কিন্তু মুখুয্যেমশায়, ও পবিত্র বচনটা ত বরাবর খাটবে না। আরও সঙ্গী জুটবে।

অক্ষয় বলিলেন—তোমাদের এই একটি শালার জায়গায় দশশালা বন্দোবস্ত হবে? তখন আবার নূতন কার্য্যবিধি দেখা যাবে। ততদিন কুলীনের ছেলেটেলে গুলোকে ঘেষ্‌তে দিচ্চিনে!

এমন সময় চাকর আসিয়া খবর দিল দুটি বাবু আসিয়াছে। শৈল কহিল, ঐ বুঝি তাঁরা এল। দিদি আর মা ভাঁড়ারে ব্যস্ত আছেন, তাদের অবকাশ হবার পূর্ব্বেই ওদের কোন মতে বিদায় করে দিয়ো।

অক্ষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বক্‌শিষ মিল্‌বে?

শৈল কহিল—আমরা তোমার সব শালীরা মিলে তোমাকে শালীবাহন রাজা খেতাব দেব।

অক্ষয়। শালীবাহন দি সেকেণ্ড?

শৈল। সেকেণ্ড হতে যাবে কেন? সে শালীবাহনের নাম ইতিহাস থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তুমি হবে শালীবাহন দি গ্রেট্!

অক্ষয়। বল কি? আমার রাজ্যকাল থেকে জগতে নূতন শাল প্রচলিত হবে? এই বলিয়া অত্যন্ত সাড়ম্বর তানসহকারে ভৈরবীতে গান ধরিলেন—

তুমি আমায় করবে মস্ত লোক!
দেবে লিখে রাজার টীকে প্রসন্ন ঐ চোখ!

শৈলবালার প্রস্থান। ভৃত্য আদিষ্ট হইয়া দুই ভদ্রলোককে উপস্থিত করিল। একটি বিসদৃশ লম্বা, রোগা, বুট জুতাপরা, ধুতি প্রায় হাঁটুর কাছে উঠিয়াছে, চোখের নীচে কালি পড়া, ম্যালেরিয়া রোগীর চেহারা; বয়স বাইশ হইতে বত্রিশ পর্য্যন্ত যেটা খুসি হইতে পারে। আর একটি বেঁটেখাটো, অত্যন্ত দাড়ি গোঁফ-সঙ্কুল, নাকটি বটিকাকার, কপালটি ঢিবি, কালোকোলো গোলগাল।

অক্ষয় অত্যন্ত সৌহার্দ্য সহকারে উঠিয়া অগ্রসর হইয়া প্রবলবেগে শেকহাণ্ড করিয়া দুটি ভদ্রলোকের হাত প্রায় ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। বলিলেন আসুন মিষ্টার ন্যাথানিয়াল্ আসুন মিষ্টার জেরেমায়া, বসুন্ বসুন্! ওরে বরফ জল নিয়ে আয়রে, তামাক দে!

রোগা লোকটি সহসা বিজাতীয় সম্ভাষণে সঙ্কুচিত হইয়া মৃদুস্বরে বলিল, আজ্ঞে আমার নাম মৃত্যুঞ্জয় গাঙ্গুলী।

বেঁটে লোকটি বলিল—আমার নাম শ্রীদারুকেশ্বর মুখোপাধ্যায়!

অক্ষয়। ছি মশায়! ও নামগুলো এখনো ব্যবহার করেন বুঝি? আপনাদের ক্রিশ্চান্ নাম?

আগন্তুকদিগকে হতবুদ্ধি নিরুত্তর দেখিয়া কহিলেন—এখনো বুঝি নামকরণ হয়নি? তা তাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না, ঢের সময় আছে!

বলিয়া নিজের গুড়গুড়ির নল মৃত্যুঞ্জয়ের হাতে অগ্রসর করিয়া দিলেন। সে লোকটি ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া বলিলেন বিলক্ষণ আমার সাম্‌নে আবার লজ্জা! সাত বছর বয়স থেকে লুকিয়ে তামাক খেয়ে পেকে উঠেছি ধোঁয়া লেগে লেগে বুদ্ধিতে ঝুল পড়ে গেল লজ্জা যদি করতে হয় তাহলে আমার ত আর ভদ্র সমাজে মুখ দেখাবার যো থাকে না।

তখন সাহস পাইয়া দারুকেশ্বর মৃত্যুঞ্জয়ের হাত হইতে ফস্ করিয়া নল কাড়িয়া লইয়া ফড় ফড়্ শব্দে টানিতে আরম্ভ করিল। অক্ষয়কুমারকে পাকা ইয়ার বলিয়া ঠিক করিয়া উভয়ে পরম আরাম অনুভব করিল। গোড়াতেই ক্রিশ্চান্ নাম লইয়া আলোচনাটা একটা ইয়ার্কি বলিয়া বুঝিল। অক্ষয় পকেট হইতে কড়া বর্ম্মা চুরোট বাহির করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ের হাতে দিলেন। যদিচ তাহার চুরোট অভ্যাস ছিল না, তবু সে সদ্য স্থাপিত ইয়ার্কির খাতিরে প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া মৃদুমন্দ টান দিতে লাগিল এবং কোন গতিকে কাশি চাপিয়া রাখিল।

অক্ষয় কহিলেন—এখন কাজের কথাটা সুরু করা যাক্! কি বলেন?

মৃত্যুঞ্জয় চুপ করিয়া রহিল, দারুকেশ্বর বলিল—তা'নয়ত কি? শুভস্য শীঘ্রং!—বলিয়া হাসিতে লাগিল, ভাবিল ইয়ার্কি জমিতেছে।

তখন অক্ষয় গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মুর্গি না মাটন্?

মৃত্যুঞ্জয় অবাক্ হইয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল। দারুকেশ্বর বুঝিল নিশ্চয় ইহার মধ্যে মজা আছে, অপরিমিত হাসিতে আরম্ভ করিল। মৃত্যুঞ্জয় ক্ষুব্ধ লজ্জিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, এরা দুজন ত বেশ জমাইয়াছে, আমিই নিরেট বোকা!

অক্ষয় কহিলেন,—আরে মশায়, নাম শুনেই হাসি! তা হলেত্ত, গন্ধে অজ্ঞান এবং

পাতে পড়্লে মারাই যাবেন! তা'যেটা হয় নিস্থির করে বলুন্—মুর্গি হবে না মাটন্ হবে?

তখন দুজনে বুঝিল আহারের কথা হইতেছে। ভীরু মৃত্যুঞ্জয় নিরুত্তর হইয়া চাহিতে লাগিল। দারুকেশ্বর লালায়িত রসনায় একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল!

অক্ষয় কহিলেন—ভয় কিসের মশায়? নাচতে বসে ঘোম্‌টা? শুনিয়া দারুকেশ্বর দুই হাতে দুই পা চাপড়াইয়া হাসিতে লাগিল। কহিল, হাঁ মুর্গিই ভাল, কট্‌লেট্, কি বলেন?

বৃদ্ধ মৃত্যুঞ্জয় সাহস পাইয়া বলিল, মাটান্‌টাই বা মন্দ কি ভাই! চপ!—বলিয়া আর কথাটা শেষ করিতে পারিল না।

অক্ষয়। ভয় কি দাদা, দুই হবে! দোমনা করে খেয়ে সুখ হয় না।—চাকরকে ডাকিয়া কহিলেন—ওরে, মোড়ের মাথায় যে হোটেল আছে সেখান থেকে কলিমদ্দি খানসামাকে ডেকে আন্ দেখি!

তাহার পর অক্ষয় বুড়ো আঙ্গুল দিয়া মৃত্যুঞ্জয়ের গা টিপিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন—বিয়ার, না শেরি?

মৃত্যুঞ্জয় লজ্জিত হইয়া মুখ বাঁকাইল।

দারুকেশ্বর সঙ্গীটিকে বেরসিক বলিয়া মনে মনে গালি দিয়া কহিল—হুইস্কির বন্দোবস্ত নেই বুঝি?

অক্ষয় তাহার পিঠ চাপড়াইয়া কহিলেন—নইত কি? বেঁচে আছি কি করে? বলিয়া বেহাগ সুরে গাহিয়া উঠিলেন—

যদি জিজ্ঞাসা কর আমার wish কি,
তোমার গা ছুঁয়ে বলুচি কেবলি হুইস্কি!

ক্ষীণপ্রকৃতি মৃত্যুঞ্জয়ও প্রাণপণে হাস্য করা কর্ত্তব্য বোধ করিল এবং দারুকেশ্বর ফস্ করিয়া একটা বই টানিয়া লইয়া টপাটপ্ বাজাইতে আরম্ভ করিল।

অক্ষয় দুলাইন গাহিয়া থামিবামাত্র দারুকেশ্বর বলিল দাদা, ওটা শেষ করে ফেল! বলিয়া নিজেই ধরিল," "যদি জিজ্ঞাসা কর আমার wish কি;"—মৃত্যুঞ্জয় মনে মনে তাহাকে বাহাদুরী দিতে লাগিল। অক্ষয় মৃত্যুঞ্জয়কে ঠেলা দিয়া কহিলেন, ধর না হে, তুমিও ধর!—সলজ্জ মৃত্যুঞ্জয় নিজের প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য মৃদুস্বরে যোগ দিল—অক্ষয় ডেস্ক্ চাপড়াইয়া বাজাইতে লাগিলেন। এক জায়গায় হঠাৎ থামিয়া গম্ভীর হইয়া কহিলেন—হাঁ, হাঁ, আসল কথাটা জিজ্ঞাসা করা হয় নি। এদিক ত সব ঠিক—এখন আপনারা কি হলে রাজি হন?

দারুকেশ্বর কহিল,—আমাদের বিলেতে পাঠাতে হবে।

অক্ষয় কহিলেন—সে ত হবেই। তার না কাট্‌লে কি শ্যাম্পেনের ছিপি খোলে? দেশে আপনাদের মত লোকের বিদ্যে বুদ্ধি চাপা থাকে, বাঁধন কাট্‌লেই একেবারে নাকে মুখে চোখে উছ্‌লে উঠবে!

দারুকেশ্বর অত্যন্ত খুসি হইয়া অক্ষয়ের হাত চাপিয়া ধরিল, কহিল, দাদা, এইটে তোমাকে করে দিতেই হচ্চে! বুঝলে?

অক্ষয় কহিলেন, সে কিছুই শক্ত নয়। কিন্তু ব্যাপ্‌টাইজ্ড আজই ত হবেন?

দারুকেশ্বর ভাবিল ঠাট্টাটা বোঝা যাইতেছে না। হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, সেটা কি রকম?

অক্ষয় কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের ভাবে কহিলেন—কেন, আপনারা ত জানেন, রেভারেণ্ড বিশ্বাস আজ রাত্রেই আস্‌চেন। ব্যাপ্‌টিজম্ না হলে ত ক্রিশ্চান্ মতে বিবাহ হতে পারে না!

মৃত্যুঞ্জয় অত্যন্ত ভীত হইয়া কহিল—ক্রিশ্চান মতে কি মশায়?

অক্ষয় কহিলেন—আপনি যে আকাশ থেকে পড়লেন! সে হচ্চে না—ব্যাপটাইজ যেমন করে হোক্, আজ রাত্রেই সারতে হচ্চে। কিছুতেই ছাড়ব না।

মৃত্যুঞ্জয় জিজ্ঞাসা করিল—আপনারা ক্রিশ্চান না কি?

অক্ষয়। মশায়, ন্যাকামি রাখুন। যেন কিছুই জানেন না।

মৃত্যুঞ্জয় অত্যন্ত ভীত ভাবে কহিল—মশায়, আমরা হিঁদু, ব্রাহ্মণের ছেলে, জাত খোয়াতে পারব না!

অক্ষয় হঠাৎ অত্যন্ত উদ্ধতস্বরে কহিলেন—জাত কিসের মশায়! এ দিকে কলিমদ্দির হাতে মুর্গি খাবেন, বিলেত যাবেন, আবার জাত!

মৃত্যুঞ্জয় ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া কহিল—চুপ, চুপ, চুপ করুন্! কে কোথা থেকে শুনতে পাবে।

তখন দারুকেশ্বর কহিল—ব্যস্ত হবেন না মশায়, একটু পরামর্শ করে দেখি!—বলিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে একটু অন্তরালে ডাকিয়া লইয়া বলিল, বিলেত থেকে ফিরে সেই ত একবার প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তেই হবে—তখন ডবল্ প্রায়শ্চিত্ত করে একেবারে ধর্ম্মে ওঠা যাবে। এ সুযোগটা ছাড়লে আর বিলেত যাওয়া ঘটে উঠবে না! দেখলি ত কোন শ্বশুরই রাজি হল না। আর ভাই, ক্রিশ্চানের হুঁকোয় তামাকই যখন খেলুম তখন ক্রিশ্চান্ হতে আর বাকি কি রৈল?—এই বলিয়া অক্ষয়ের কাছে আসিয়া কহিল—বিলেত যাওয়াটা ত নিশ্চয় পাকা? তা হলে ক্রিশ্চান্ হ'তে রাজি আছি।

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, কিন্তু আজ রাতটা থাক্।

দারুকেশ্বর কহিল—হতে হয় ত চট্‌পট্ সেরে ফেলে পাড়ি দেওয়াই ভাল—গোড়াতেই বলেছি শুভস্য শীঘ্রং।

ইতিমধ্যে অন্তরালে রমণীগণের সমাগম। দুই থালা ফল মিষ্টান্ন লুচি ও বরফ জল লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ। ক্ষুণ্ণ দারুকেশ্বর কহিল—কই মশায়, অভাগার অদৃষ্টে মুর্গি বেটা উড়েই গেল না কি? কট্‌লেট্ কোথায়?

অক্ষয় মৃদুস্বরে বলিলেন,—আজকের মত এইটেই চলুক!

দারুকেশ্বর কহিল—সে কি হয় মশায়! আশা দিয়ে নৈরাশ! শ্বশুর বাড়ি এসে মটন চাপ খেতে পাব না? আর এ যে বরফ জল মশায়, আমার আবার সর্দ্দির ধাত, সাদা জল সহ্য হয় না! বলিয়া গান জুড়িয়া দিল—"যদি জিজ্ঞাসা কর, আমার Wish কি" ইত্যাদি। অক্ষয় মৃত্যুঞ্জয়কে কেবলি টিপিতে লাগিলেন এবং অস্পষ্ট স্বরে কহিতে লাগিলেন, ধর না হে, তুমিও ধর না—চুপচাপ কেন ;- সে ব্যক্তি কতক ভয়ে কতক লজ্জায় মৃদু মৃদু যোগ দিতে লাগিল! গানের উচ্ছ্বাস থামিলে অক্ষয় আহার পাত্র দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—নিতান্তই কি এটা চল্‌বে না?

দারুকেশ্বর ব্যস্ত হইয়া কহিল, না মশায়, ও সব রুগীর পথ্যি চল্‌বে না। মুর্গি না পেয়েই ত ভারতবর্ষ গেল! বলিয়া ফড়্ ফড়্ করিয়া গুড়গুড়ি টানিতে লাগিল। অক্ষয় কাণের কাছে আসিয়া লক্ষৌ ঠুংরিতে ধরাইয়া দিলেন—

কতকাল রবে বল ভারতরে
শুধু ডাল ভাত জল পথ্য করে!

শুনিয়া দারুকেশ্বর উৎসাহসহকারে গানটা ধরিল এবং মৃত্যুঞ্জয়ও অক্ষয়ের গোপন ঠেলা খাইয়া সলজ্জভাবে মৃদু মৃদু যোগ দিতে লাগিল।

অক্ষয় আবার কাণে কাণে ধরাইয়া দিলেন—

দেশে অন্নজলের হল ঘোর্ অনটন,
ধর হুইস্কি সোডা আর মুর্গিমটন!

অমনি দারুকেশ্বর মাতিয়া উঠিয়া উৰ্দ্ধস্বরে ঐ পদটা ধরিল এবং অক্ষয়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের প্রবল উৎসাহে মৃত্যুঞ্জয়ও কোন মতে সঙ্গে সঙ্গে যোগ দিয়া গেল।

অক্ষয় পুনশ্চ ধরাইয়া দিলেন—

যাও ঠাকুর চৈতন চুট্‌কি নিয়া!
এস দাড়ি নাড়ি কলিমদ্দি মিঞা!

যতই উৎসাহসহকারে গান চলিল, দ্বারের পার্শ্ব হইতে উস্‌খুস্ শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। এবং অক্ষয় নিরীহ ভালমানুষটির মত মাঝে মাঝে সেই দিকে কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন।

এমন সময় ময়লা ঝাড়ন হাতে কলিমদ্দি আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। দারুকেশ্বর উৎসাহিত হইয়া কহিল,—এই যে চাচা! আজ রান্নাটা কি হয়েছে বল দেখি!

সে অনেক গুলা ফৰ্দ্দ দিয়া গেল। দারুকেশ্বর কহিল কোনটাইত মন্দ শোনাচ্চেনা হে! (অক্ষয়ের প্রতি) মশায়, কি বিবেচনা করেন? ওর মধ্যে বাদ দেবার কি কিছু আছে?

অক্ষয় অন্তরালের দিকে কটাক্ষ করিয়া কহিলেন—সে আপনারা যা ভাল বোঝেন্।

দারুকেশ্বর কহিল, আমার ত মত, ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ বলে সব কটাকেই আদর করে নিই।

অক্ষয়। তা ত বটেই ওঁরা সকলেই পূজ্য।

কলিমদ্দি সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। অক্ষয় কিঞ্চিৎ গলা চড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মশায়রা কি তা'হলে আজ রাত্রেই ক্রিশ্চান হতে চান্।

খানার আশ্বাসে প্রফুল্লচিত্ত দারুকেশ্বর কহিল—আমার ত কথাই আছে, শুভস্য শীঘ্রং। আজই ক্রিশ্চান্ হব, এখনি ক্রিশ্চান হব, ক্রিশ্চান্ হয়ে তবে অন্য কথা! মশায়, আর ঐ পুঁই শাক কলাইয়ের ডাল খেয়ে প্রাণ বাঁচে না! আনুন্ আপনার পাদ্রি ডেকে! বলিয়া পুনশ্চ উচ্চস্বরে গান ধরিল—

যাও ঠাকুর চৈতন চুট্‌কি নিয়া,
এস দাড়ি নাড়ি কলিমদ্দি মিঞা!

চাকর আসিয়া অক্ষয়ের কাণে কাণে কহিল—মাঠাকরুণ একবার ডাক্‌চেন।

অক্ষয় উঠিয়া দ্বারের অন্তরালে গেলে জগত্তারিণী কহিলেন—এ কি! কাণ্ডটা কি?

অক্ষয় গম্ভীর মুখে কহিলেন—মা সে সব পরে হবে এখন ওরা হুইস্কি চাচ্চে, কি করি? তোমার পায়ে মালিশ করবার জন্যে সেই যে ব্রাণ্ডি এসেছিল, তার কি কিছু বাকি আছে?

জগত্তারিণী হতবুদ্ধি হইয়া কহিলেন, বল কি বাছা? ব্রাণ্ডি খেতে দেবে?

অক্ষয় কহিলেন, কি করব মা, শুনেইছ ত ওর মধ্যে একটী ছেলে আছে যার জল খেলেই সর্দ্দি হয়, মদ না পেলে আর একটীর মুখে কথাই বের হয় না!

জগত্তারিণী কহিলেন—ক্রিশ্চান্ হবার কথা কি বল্‌চে ওরা?

অক্ষয় কহিলেন—ওরা বল্‌চে হিঁদু হয়ে খাওয়া দাওয়ার বড় অসুবিধে, পুঁই শাক কড়াইয়ের ডাল খেলে ওদের অসুখ করে!

জগত্তারিণী অবাক্ হইয়া কহিলেন, তাই বলে কি ওদের আজ রাত্তেই মুর্গি খাইয়ে ক্রিশ্চান্ করবে নাকি।

অক্ষয় কহিলেন, তা মা ওরা যদি রাগ করে চলে যায় তা হলে দুটি পাত্র এখনি হাত ছাড়া হবে। তাই ওরা যা বল্‌চে তাই শুন্‌তে হচ্চে, আমাকে সুদ্ধ মদ ধরাবে দেখচি।

পুরবালা কহিলেন—বিদায় কর, বিদায় কর, এখনি বিদায় কর!

জগত্তারিণী ব্যস্ত হইয়া কহিলেন—বাবা, এখানে মুর্গি খাওয়া টাওয়া হবে না, তুমি ওদের বিদায় করে দাও। আমার ঘাট হয়েছিল আমি রসিক কাকাকে পাত্র সন্ধান করতে দিয়েছিলুম! তাঁর দ্বারা যদি কোন কাজ পাওয়া যায়!

রমণীগণের প্রস্থান। অক্ষয় ঘরে আসিয়া দেখেন, মৃত্যুঞ্জয় পলায়নের উপক্রম করিতেছে এবং দারুকেশ্বর হাত ধরিয়া তাহাকে টানাটানি করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। অক্ষয়ের অবর্তমানে মৃত্যুঞ্জয় অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। অক্ষয় ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র মৃত্যুঞ্জয় রাগের স্বরে বলিয়া উঠিল, না মশায় আমি ক্রিশ্চান হতে পারব না, আমার বিয়ে করে কাজ নেই।

অক্ষয় কহিলেন, তা মশায়, আপনাকে কে পায়ে ধরাধরি করচে!

দারুকেশ্বর কহিল, আমি রাজি আছি মশায়!

অক্ষয় কহিলেন, রাজি থাকেন ত গির্জ্জেয় যান না মশায়! আমার সাত পুরুষে ক্রিশ্চান করা ব্যবসা নয়!

দারুকেশ্বর কহিল—ঐ যে কোন বিশ্বাসের কথা বল্লেন—

অক্ষয়। তিনি টেরেটির বাজারে থাকেন, তাঁর ঠিকানা লিখে দিচ্চি।

দারুকেশ্বর। আর বিবাহটা?

অক্ষয়। সেটা এ বংশে নয়।

দারুকেশ্বর। তাহলে এতক্ষণ পরিহাস করছিলেন মশায়? খাওয়াটাও কি—

অক্ষয়। সেটাও এ ঘরে নয়।

দারুকেশ্বর। অন্ততঃ হোটেলে?

অক্ষয়। সে কথা ভাল।—বলিয়া টাকার ব্যাগ হইতে গুটিকয়েক টাকা বাহির করিয়া দুটিকে বিদায় করিয়া দিলেন।

তখন নৃপর হাত ধরিয়া টানিয়া নীরবালা বসন্তকালের দমকা হাওয়ার মত ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। কহিল, মুখুয্যে মশায়, দিদি এ দুটির কোনটিকেই বাদ দিতে চান্ না!

নৃপ তাহার কপোলে গুটি দুই তিন অঙ্গুলির আঘাত করিয়া কহিল, ফের মিথ্যে কথা বলচিস্?

অক্ষয়। ব্যস্ত হস্‌নে ভাই, সত্য মিথ্যের প্রভেদ আমি একটু একটু বুঝতে পারি। এ রকম জায়গায় সত্য কথা বল্লে সত্যের অপমান করা হয়।

নীরু। আচ্ছা মুখুয্যে মশায়, এ দুটি কি রসিক দাদার রসিকতা, না আমাদের সেজ দিদিরই ফাঁড়া?

অক্ষয়। বন্দুকের সকল গুলিই কি লক্ষ্যে গিয়ে লাগে? প্রজাপতি টার্গেট প্র্যাক্‌টিস্ করছিলেন, এ দুটো ফস্‌কে গেল। প্রথম প্রথম এমন গোটাকতক হয়েই থাকে। এই হতভাগ্য ধরা পড়বার পূর্ব্বে তোমার দিদির ছিপে অনেক জলচর ঠোকর দিয়ে গিয়েছিল, বঁড়শি বিঁধল কেবল আমারি কপালে!—বলিয়া কপালে চপেটাঘাত করিলেন!

নৃপ। এখন থেকে রোজই প্রজাপতির প্র্যাক্‌টিস চল্‌বে না কি মুখুয্যে মশায়? তা হলে ত আর বাঁচা যায় না!

নীরু। কেন ভাই দুঃখ করিস্? রোজই কি ফস্কাবে? একটা না একটা এসে ঠিক মতন পৌছবে।

রসিকের প্রবেশ।

নীরু। রসিক দাদা, এবার থেকে আমরাও তোমার জন্যে পাত্রী জোটাচ্চি।

রসিক। সে ত সুখের বিষয়।

নীরু। হাঁ! সুখ দেখিয়ে দেব! তুমি নিজে থাক হোগ্‌লার ঘরে, আর পরের দালানে আগুন লাগাতে চাও! আমাদের হাতে টাকে নেই? আমাদের সঙ্গে যদি লাগ, তা হলে তোমার দু দুটো বিয়ে দিয়ে দেব—মাথায় যে ক'টি চুল আছে সাম্‌লাতে পারবে না!

রসিক। দেখ্‌ দিদি, দুটো আস্ত জন্তু এনেছিলুম বলেই ত রক্ষে পেলি, যদি মধ্যম রকমের হত, তা হলেই ত বিপদ ঘট্‌ত। যাকে জন্তু বলে চেনা যায় না, সেই জন্তুই ভয়ানক!

অক্ষয়। সে কথা ঠিক। মনে মনে আমার ভয় ছিল, কিন্তু একটু পিঠে হাত বুলবামাত্রই চট্‌পট্‌ শব্দে ল্যাজ নড়ে উঠ্‌ল। কিন্তু মা বল্‌চেন কি?

রসিক। সে যা বল্‌চেন সে আর পাঁচ জনকে ডেকে ডেকে শোনাবার মত নয়। সে আমি অন্তরের মধ্যেই রেখে দিলুম! যা হোক্‌ শেষে এই স্থির হয়েছে, তিনি কাশীতে তাঁর বোনপোর কাছে যাবেন, সেখানে পাত্রেরও সন্ধান পেয়েছেন, তীর্থদর্শনও হবে।

নীরু। বল কি, রসিক দাদা! তা হলে এখানে আমাদের রোজ রোজ নূতন নূতন নমুনা দেখা বন্ধ?

নৃপ। তোর এখনো সখ আছে নাকি?

নীরু। এ কি সখের কথা হচ্চে? এ হচ্চে শিক্ষা। রোজ রোজ অনেক গুলি দৃষ্টান্ত দেখ্‌তে দেখ্‌তে জিনিষটা সহজ হয়ে আস্‌বে; যেটিকে বিয়ে করবি সেই প্রাণীটিকে বুঝ্‌তে কষ্ট হবে না।

নৃপ। তোমার প্রাণীকে তুমি বুঝে নিয়ো আমার জন্যে তোমার ভাব্‌তে হবে না!

নীরু। সেই কথাই ভাল—তুইও নিজের জন্যে ভাবিস্‌ আমিও নিজের জন্যে ভাবব—কিন্তু রসিক দাদাকে আমাদের জন্যে ভাবতে দেওয়া হবে না!

নৃপ নীরুকে বলপূর্ব্বক টানিয়া লইয়া গেল। শৈলবালা ঘরে প্রবেশ করিয়াই বলিল—রসিকদা তোমার ত মার সঙ্গে কাশী গেলে চল্‌বে না—আমরা যে চিরকুমার সভার সভ্য হব, আবেদন পত্রের সঙ্গে প্রবেশিকার দশটা টাকা পাঠিয়ে দিয়ে বসে আছি।

অক্ষয় কহিলেন, মার সঙ্গে কাশী যাবার জন্যে আমি লোক ঠিক করে দেব এখন, সে জন্যে ভাবনা নেই।

শৈল। এই যে মুখুয্যে মশায়! তুমি তাদের কি বানর বানিয়েই ছেড়ে দিলে—শেষকালে বেচারাদের জন্যে আমার মায়া করছিল!

অক্ষয়। বানর কেউ বানাতে পারে না শৈল, ওটা প্রকৃতি বানিয়ে রাখেন। ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ থাকা চাই! যেমন কবি হওয়া আর কি! ল্যাজই বল কবিত্বই বল ভিতরে না থাক্‌লে জোর করে টেনে বের করবার যো নেই!

পুরবালা প্রবেশ করিয়া কেরোসিন্‌ ল্যাম্পটা লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া কহিল—বেহারা কি রকম আলো দিয়ে গেছে, মিট্‌মিট্‌ করচে! ওকে বলে বলে পারা গেল না!

অক্ষয়। সে বেটা জানে অন্ধকারেই আমাকে বেশী মানায়।

পুরবালা। আলোতে মানায় না? বিনয় হচ্চে না কি? এটা ত নতুন দেখ্‌চি!

অক্ষয়। আমি বল্‌ছিলুম, বেহারা বেটা চাঁদ বলে আমাকে সন্দেহ করেচে!

পুর। ওঃ তাই ভাল! তা ওর মাইনে বাড়িয়ে দাও! কিন্তু রসিক দাদা, আজ কি কাণ্ডটাই করলে!

রসিক। ভাই, বর ঢের পাওয়া যায়

কিন্তু সবাই বিবাহযোগ্য হয় না, সেইটের একটা সামান্য উদাহরণ দিয়ে গেলুম।

পুর। সে উদাহরণ না দেখিয়ে দুটো একটা বিবাহযোগ্য বরের উদাহরণ দেখালেই ত ভাল হত!

শৈল। সে ভার আমি নেয়েছি দিদি।

পুর। তা আমি বুঝেছি! তুমি আর তোমার মুখুয্যে মশায়ে মিলে ক'দিন ধরে যে রকম পরামর্শ চল্‌চে একটা কি কাণ্ড হবেই।

অক্ষয়। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ত আজ হয়ে গেল।

রসিক। লঙ্কাকাণ্ডের আয়োজনও হচ্চে, চিরকুমার সভার স্বর্ণলঙ্কায় আগুন লাগাতে চলেছি।

পুর। শৈল তার মধ্যে কে ?

রসিক। হনুমান ত নয়ই।

অক্ষয়। উনিই হচ্চেন স্বয়ং আগুন।

রসিক। এক ব্যক্তি ওঁকে ল্যাজে করে নিয়ে যাবেন!

পুর। আমি কিছু বুঝ্‌তে পারচিনি! শৈল, তুই চিরকুমার সভায় যাবি না কি!

শৈল। আমি যে সভ্য হব।

পুর। কি বলিস্ তার ঠিক নেই! মেয়েমানুষ আবার সভ্য হবে কি!

শৈল। আজকাল মেয়েরাও যে সভ্য হয়ে উঠেছে। তাই আমি শাড়ি ছেড়ে চাপকান ধরব ঠিক করেছি।

পুর। বুঝেছি, ছদ্মবেশে সভ্য হ'তে যাচ্চিস বুঝি! চুলটাত কেটেই চিস্, ঐটেই বাকি ছিল। তোমাদের যা খুসি কর, আমি এর মধ্যে নেই।

অক্ষয়। না, না, তুমি এ দলে ভিড়ো না! আর যার খুসি পুরুষ হোক্, আমার অদৃষ্টে তুমি চিরদিন মেয়েই থেকো—নইলে ব্রীচ অফ্ কণ্ট্রাক্ট—সে বড় ভয়ানক মকদ্দমা!—বলিয়া সিন্ধুতে গান ধরিলেন—

ওগো চির-পুরাণো চাঁদ!
তুমি চির দিবস এমনি থেকো আমার এই সাধ!
ঐ পুরাণো হাসি, পুরাণো সুধা, মিটায় মম পুরাণো ক্ষুধা,
নূতন কোন চকোর যেন পায় না পরসাদ!

পুরবালা রাগ করিয়া চলিয়া গেল। অক্ষয় শৈলবালাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন—ভয় নেই! রাগটা হয়ে গেলেই মনটা পরিষ্কার হবে—একটু অনুতাপও হবে—সেইটেই সুযোগের সময়।

রসিক। কোপো যত্র ভ্রূকুটিরচনা, নিগ্রহো যত্র মৌনং,
যত্রান্যোহন্যস্মিতমনুনয়ং যত্র দৃষ্টিঃ প্রসাদঃ,—

শৈল। রসিক দাদা তুমি ত দিব্যি শ্লোক আউড়ে চলেচ—কোপ জিনিষটা কি, তা মুখুয্যে মশায় টের পাবেন।

রসিক। আরে ভাই, বদল করতে রাজি আছি! মুখুয্যে মশায় যদি শ্লোক আওড়াতেন আর আমাকেই যদি মান ভাঙ্গাতে হত তা হলে এই পোড়া কপালকে সোণা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখতুম। কিন্তু দিদি, ঐ জলখাবারের থালা দুটি ত মান করে নি, বসে গেলে বোধ হয় আপত্তি নেই ?

অক্ষয়। ঠিক ঐ কথাটাই ভাবছিলুম।

উভয়ে আহারে উপবেশন করিলেন, শৈলবালা পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

শৈলবালা ডাকিল—মুখুয্যে মশায়!

অক্ষয় অত্যন্ত ত্রস্তভাব দেখাইয়া কহিলেন-আবার মুখুয্যে মশায়! এই বালিখিল্য মুনিদের ধ্যানভঙ্গ ব্যাপারের মধ্যে আমি নেই!

শৈলবালা। ধ্যানভঙ্গ আমরা করব। কেবল মুনিকুমার গুলিকে এই বাড়িতে আনা চাই।

অক্ষয় চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন—সভাসুদ্ধ এইখানে উৎপাটিত করে আনতে হবে? যত দুঃসাধ্য কাজ সবই এই একটিমাত্র মুখুয্যে মশায়কে দিয়ে?

শৈলবালা হাসিয়া কহিল, মহাবীর হবার ঐত মুস্কিল! যখন গন্ধমাদনের প্রয়োজন হয়েছিল তখন নল নীল অঙ্গদকে ত কেউ পোঁছেও নি!

অক্ষয় গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, ওরে পোড়ারমুখী, ত্রেতাযুগের পোড়ার মুখোকে ছাড়া আর কোন উপমাও তোর মনে উদয় হল না? এত প্রেম!

শৈলবালা কহিল—হাঁ গো এতই প্রেম!

অক্ষয় ভৈরোঁতে গাহিয়া উঠিলেন—

পোড়া মনে শুধু পোড়া মুখ জাগেরে!
এত আছে লোক, তবু পোড়া চোখে
আর কেহ নাহি লাগেরে!

আচ্ছা, তাই হবে! পঙ্গপাল ক'টাকে শিখার কাছে তাড়িয়ে নিয়ে আসব। তাহলে চট্‌করে আমাকে একটা পান এনে দাও তোমার স্বহস্তের রচনা!

শৈল। কেন দিদির হস্তের—

অক্ষয়। আরে দিদির হস্ত ত যোগাড় করেইচি, নইলে পাণিগ্রহণ কি জন্যে? এখন অন্য পদ্মহস্তগুলির প্রতি দৃষ্টি দেবার অবকাশ পাওয়া গেছে!

শৈল। আচ্ছা গো মশায়! পদ্মহস্ত তোমার পানে এমনি চুণ মাখিয়ে দেবে যে, পোড়ারমুখ আবার পুড়বে!

অক্ষয় গাহিলেন—

যারে মরণ দশায় ধরে
সে যে শতবার করে মরে।
পোড়া পতঙ্গ যত পোড়ে তত
আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে!

শৈল। মুখুয্যে মশায় ও কাগজের গোলাটা কিসের?

অক্ষয়। তোমাদের সেই সভ্য হবার আবেদন পত্র এবং প্রবেশিকার দশটাকার নোট পকেটে ছিল, ধোবা বেটা কেচে এমনি পরিষ্কার করে দিয়েছে, একটা অক্ষরও দেখতে পাচ্চিনে। ও বেটা বোধ হয় স্ত্রীস্বাধীনতার ঘোরতর বিরোধী, তাই তোমার ঐ পত্রটা একবারে আগাগোড়া সংশোধন করে দিয়েছে।

শৈল। এই বুঝি!

অক্ষয়। চারটিতে মিলে স্মরণশক্তি যুড়ে বসে আছ, আর কিছু কি মনে রাখ্‌তে দিলে?

সকলি ভুলেছে ভোলামন
ভোলেনি ভোলেনি শুধু ঐ চন্দ্রানন।

১০ নম্বর মধুমিস্ত্রির গলিতে একতলায় একটি ঘরে চিরকুমার সভার অধিবেশন হয়। বাড়িটি সভাপতি চন্দ্রমাধব বাবুর বাসা। তিনি লোকটি ব্রাহ্ম কালেজের অধ্যাপক। দেশের কাজে অত্যন্ত উৎসাহী; মাতৃভূমির উন্নতির জন্য ক্রমাগতই নানা মৎলব তাঁহার মাথায় আসিতেছে। শরীরটি কৃশ কিন্তু কঠিন, মাথাটা মস্ত, বড় দুইটি চোখ অন্যমনস্ক খেয়ালে পরিপূর্ণ। প্রথমটা সভায় সভ্য অনেকগুলি ছিল। সম্প্রতি সভাপতি বাদে তিনটিতে

আসিয়া ঠেকিয়াছে। যূথভ্রষ্টগণ বিবাহ করিয়া গৃহী হইয়া রোজগারে প্রবৃত্ত। এখন তাঁহারা কোনপ্রকার চাঁদার খাতা দেখিলেই প্রথমে হাসিয়া উড়াইয়া দেন, তাহাতেও খাতাধারী টিঁকিয়া থাকিবার লক্ষণ প্রকাশ করিলে গালি দিতে আরম্ভ করেন। নিজেদের দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়া দেশহিতৈষীর প্রতি তাঁহাদের অত্যন্ত অবজ্ঞা জন্মিয়াছে।

বিপিন, শ্রীশ, এবং পূর্ণ তিনটি সভ্য কালেজে পড়িতেছে, এখনো সংসারে প্রবেশ করে নাই। বিপিন ফুটবল্ খেলে, তাহার শরীরে অসামান্য বল, পড়াশুনা কখন্ করে কেহ বুঝিতে পারে না, অথচ চট্‌পট্ একজামিন পাস করে। শ্রীশ বড় মানুষের ছেলে, স্বাস্থ্য তেমন ভাল নয় তাই বাপ মা পড়াশুনার দিকে তত বেশী উত্তেজনা করেন না—শ্রীশ নিজের খেয়াল লইয়া থাকে। বিপিন এবং শ্রীশের বন্ধুত্ব অবিচ্ছেদ্য।

পূর্ণ গৌরবর্ণ; একহারা, লঘুগামী, ক্ষিপ্রকারী, দ্রুতভাষী, সকল বিষয়ে গাঢ় মনোযোগ, চেহারা দেখিয়া মনে হয় দৃঢ়-সংকল্প কাজের লোক। পূর্ণ অল্পদিন হইল সভ্য হইয়াছে—সে ইতিহাসটুকু বলা আবশ্যক।

সে ছিল চন্দ্রমাধব বাবুর ছাত্র। ভালরূপ পাশ করিয়া ওকালতী দ্বারা সুচারুরূপ জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার প্রত্যাশায় সে রাত জাগিয়া পড়া করে। দেশের কাজ লইয়া নিজের কাজ নষ্ট করা তাহার সংকল্পের মধ্যে ছিল না। চিরকৌমার্য্য তাহার কাছে অত্যন্ত মনোহর বলিয়া বোধ হইত না। সন্ধ্যাবেলায় নিয়মিত আসিয়া সে চন্দ্রবাবুর নিকট হইতে পাস করিবার উপযুক্ত নোট লইত; এবং সে মনে মনে নিশ্চয় জানিত যে, চির কৌমার্য্য ব্রত না লওয়াতে এবং নিজের ভবিষ্যৎ মাটি করিবার জন্য লেশমাত্র ব্যগ্র না হওয়াতে তাহার প্রতি চন্দ্রমাধব বাবুর শ্রদ্ধামাত্র ছিল না, কিন্তু সেজন্য সে কখনো অসহ্য দুঃখানুভব করে নাই।

একদিন সন্ধ্যাকালে কেরোসিন্ ল্যাম্পের সম্মুখে বসিয়া চন্দ্রমাধববাবুর নিকট হইতে গ্রন্থের বিশেষ পাঠ্য জায়গায় পূর্ণ নীল পেন্সিলের দাগ দিয়া লইতেছিল, এমন সময় একটি উচ্চমধুর কণ্ঠ ডাকিয়া উঠিল—মামা! এবং তখনি একটি কন্যা মুক্তবেণী আন্দোলন পূর্ব্বক আচম্‌কা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। চন্দ্রমাধব বাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "যাচ্চি কেন!" তখন উক্ত আকস্মিক অভ্যাগতা তাহার মাতুলের ছাত্রটিকে দেখিতে পাইয়া সচকিতে জিভ কাটিয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিল। কিন্তু সহসা পাঠগৃহের মধ্যে অনাহুত বিদ্যুৎশিখা আসিয়া অধ্যয়নের মাথায় বজ্রাঘাত করিয়া গেল, পাঠশালার বদ্ধবাতাস উত্তরে দক্ষিণে তড়িৎকম্পনে বারংবার তরঙ্গিত হইতে লাগিল!

কন্যাটির নাম নির্ম্মলা, চন্দ্রমাধব বাবুর পিতৃমাতৃহীনা ভাগনেয়ী। চন্দ্রবাবু তাহাকে বরাবর শিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন। চন্দ্রবাবু তাহার নিকট নরলোকে দেবতার আদর্শ। চন্দ্রবাবুর সমস্ত কথা মধুরতর কণ্ঠে, সমস্ত মত তীব্রতর আবেগে, সমস্ত কার্য্য অদ্ভুতর উৎসাহে এই বালিকাকে আশ্রয় করিয়া আছে। সেও কখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছে যে, বিবাহ না করিয়া সে দেশের কাজেই জীবন উৎসর্গ করিবে। "দেশের কাজকে সে আপনার মনে অনুবাদ করিয়াছিল চন্দ্রমাধব বাবুর কাজ। বাস্তবিক দেশের কাজ করিবার লোক অল্প থাকিতে পারে কিন্তু চন্দ্রমাধব বাবুর কাজ করিবার লোকের বিশেষ প্রয়োজন। বই পড়িয়া পড়িয়া তাঁহার দৃষ্টিশক্তি

ক্ষীণ কিন্তু কোনমতে চস্‌মা ব্যবহার করেন না, সকল জিনিষ ক্রমাগত চোখের কাছে আনিয়া আনিয়া দেখেন সুতরাং সংসারের অধিকাংশ পদার্থই তাঁহার দৃষ্টি-সীমার বহির্ভূত। হাতে পেন্সিল লইয়া তিনি পেন্সিল খোঁজেন, ট্রামে যাইবার সময় পয়সা লইয়া যান না, ধুতি পরিবার সময় নির্ম্মলার চওড়া লালপেড়ে সাড়ি পরিয়া বসেন এবং দর্শকগণ হাস্য সম্বরণে অক্ষম হইলে তাহার কোনই কারণ বুঝিতে পারেন না। নির্ম্মলা সতর্কচিত্তে এইগুলি সর্ব্বদা সংশোধন পূর্ব্বক অধ্যাপক মহাশয়কে ভদ্রসমাজের প্রচলিত রীতিনীতির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

বলা বাহুল্য, পূর্ণর তরুণ চক্ষু নিজের সমস্ত কর্ত্তব্য নিমেষের মধ্যে পরিহার করিয়া সেদিনকার সেই ক্ষণিক দৃশ্যটি ভাল করিয়াই দেখিয়া লইয়াছিল। ইহার পর কিছুদিন সে পড়িতে পড়িতে চমকিয়া উঠিত; দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিত, তাহার মনে হইত যেন অদূরে চকিত চরণের ত্রস্ত শব্দ শুনা যাইতেছে।

পূর্ণ তাহাদের অধ্যয়নের নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই যাতায়াত করা আরম্ভ করাতে প্রায়ই এমন হইতে লাগিল যে, সেও সিঁড়িতে উঠিতেছে নির্ম্মলাও নামিতেছে, মধ্যপথে সাক্ষাৎ। কোনদিন বা পূর্ণ অধ্যয়ন গৃহে আসিয়া দেখে নির্ম্মলা তাহার মামার পেন্সিল কাগজ নোটবই গুছাইয়া রাখিতেছে, ক্ষীণদৃষ্টি অধ্যাপকের জন্য আলোক-শিখা সযত্নে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিতেছে। এইরূপে পূর্ণ প্রায় প্রত্যহই এই সেবাব্রতধারিণী সুন্দর বালিকার অশ্রান্ত মঙ্গল কার্য্যের অকস্মাৎ পরিচয় পাইতে লাগিল।

এইরূপে কিছু দিন যাইতেই চন্দ্রমাধব বাবুর শ্রদ্ধা পূর্ণর কাছে আর উপেক্ষণীয় বলিয়া বোধ হইল না। সে চিরকুমার সভার সভ্য হইল। ছাত্রের চরিত্রের প্রতি নিজের "নৈতিক প্রভাবে" চন্দ্রমাধব বাবু অত্যন্ত শ্লাঘা বোধ করিলেন।

সে দিন সভা বসিয়াছে। চন্দ্রমাধব বাবু বলিতেছেন, আমাদের এই সভার সভ্যসংখ্যা অল্প হওয়াতে কারো হতাশ্বাস হবার কোন কারণ নেই—

তাঁহার কথা শেষ না হইতেই রুগ্নকায়া উৎসাহী শ্রীশ বলিয়া উঠিল—হতাশ্বাস! সেইত আমাদের সভার গৌরব! এ সভার মহৎ আদর্শ এবং কঠিনবিধান কি সর্ব্বসাধারণের উপযুক্ত! আমাদের সভা অল্প লোকের সভা।

চন্দ্রমাধব বাবু কার্য্যবিবরণের পাতাটা চোখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন—কিন্তু আমাদের আদর্শ উন্নত এবং বিধান কঠিন বলেই আমাদের বিনয় রক্ষা করা কর্ত্তব্য; সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত আমরা আমাদের সঙ্কল্প সাধনের যোগ্য না হতেও পারি। ভেবে দেখ পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে এমন অনেক সভ্য ছিলেন যাঁরা হয়ত আমাদের চেয়ে সর্ব্বাংশে মহত্তর ছিলেন, কিন্তু তাঁরাও নিজের সুখ এবং সংসারের প্রবল আকর্ষণে একে একে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছেন। আমাদের কয় জনের পথেও যে প্রলোভন কোথায় অপেক্ষা করচে তা কেউ বলতে পারে না। সেই জন্য আমরা দম্ভ পরিত্যাগ করব, এবং কোন রকম শপথেও বদ্ধ হতে চাইনে—আমাদের মত এই যে, কোন কালে মহৎ চেষ্টাকে মনে স্থান না দেওয়ার চেয়ে চেষ্টা করে অকৃতকার্য্য হওয়া ভাল।

পাশের ঘরে ঈষৎ মুক্ত দরজার অন্তরালে একটি শ্রোত্রী এই কথায় যে একটুখানি বিচলিত হইয়া উঠিল, তাহার অঞ্চলবদ্ধ চাবির গোচ্ছায় দুই একটা চাবি যে একটু ঠুন শব্দ

করিল তাহা পূর্ণ ছাড়া আর কেহ লক্ষ্য করিতে পারিল না।

চন্দ্রমাধব বাবু বলিতে লাগিলেন, আমাদের সভাকে অনেকেই পরিহাস করেন; অনেকেই বলেন তোমরা দেশের কাজ করবার জন্য কৌমার্য্য ব্রত গ্রহণ করচ, কিন্তু সকলেই যদি এই মহৎ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয় তা হলে পঞ্চাশ বৎসর পরে দেশে এমন মানুষ কে থাক্‌বে যার জন্যে কোন কাজ করা কারো দরকার হবে। আমি প্রায়ই নম্র নিরুত্তরে এই সকল পরিহাস বহন করি; কিন্তু এর কি কোন উত্তর নেই?—বলিয়া তিনি তাঁহার তিনটী মাত্র সভ্যের দিকে চাহিলেন।

পূর্ণ নেপথ্যবাসিনীকে স্মরণ করিয়া সোৎসাহে কহিল—আছে বৈ কি। সকল দেশেই একদল মানুষ আছে যারা সংসারী হবার জন্যে জন্মগ্রহণ করেনি, তাদের সংখ্যা অল্প। সেই কটিকে আকর্ষণ করে এক উদ্দেশ্য-বন্ধনে বাঁধবার জন্যে আমাদের এই সভা—সমস্ত জগতের লোককে কৌমার্য্যব্রতে দীক্ষিত করবার জন্যে নয়। আমাদের এই জাল অনেক লোককে ধরবে এবং অধিকাংশকেই পরিত্যাগ করবে, অবশেষে দীর্ঘকাল পরীক্ষার পর দুটি চারটি লোক থেকে যাবে। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে তোমরাই কি সেই দুটি চারটী লোক তবে স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক কে নিশ্চয় রূপে বল্‌তে পারে। হাঁ আমরা জালে আকৃষ্ট হয়েছি এই পর্য্যন্ত কিন্তু পরীক্ষায় শেষ পর্য্যন্ত টিঁক্‌তে পারব কি না তা অন্তর্যামীই জানেন। কিন্তু আমরা কেউ টিঁক্‌তে পারি বা না পারি, আমরা একে একে স্খলিত হই বা না হই, তাই বলে আমাদের এই সভাকে পরিহাস করবার অধিকার কারো নেই। কেবল যদি আমাদের সভাপতি মশায় একলামাত্র থাকেন, তবে আমাদের এই পরিত্যক্ত সভাক্ষেত্র সেই এক তপস্বীর তপঃ-প্রভাবে পবিত্র উজ্জ্বল হয়ে থাকবে এবং তাঁর চিরজীবনের তপস্যার ফল দেশের পক্ষে কখনই ব্যর্থ হবে না।

কুণ্ঠিত সভাপতি কার্য্যবিবরণের খাতাখানি পুনর্ব্বার তাঁহার চোখের অত্যন্ত কাছে ধরিয়া অন্যমনস্কভাবে কি দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু পূর্ণর এই বক্তৃতা যথাস্থানে যথাবেগে গিয়া পৌঁছিল। চন্দ্রমাধব বাবুর একাকী তপস্যার কথায় নির্ম্মলার চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল এবং বিচলিত বালিকার চাবির গোচ্ছার ঝনক শব্দ উৎকর্ণ পূর্ণকে পুরস্কৃত করিল।

বিপিন চুপ করিয়া ছিল, এতক্ষণ পরে সে তাহার জলদ মন্দ্র গম্ভীর কণ্ঠে কহিল—আমরা এ সভার যোগ্য কি অযোগ্য, কালেই তার পরিচয় হবে, কিন্তু কাজ করাও যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয় তবে সেটা কোন এক সময়ে সুরু করা উচিত। আমার প্রশ্ন এই—কি করতে হবে?

চন্দ্রমাধব উজ্জ্বল উৎসাহিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, এই প্রশ্নের জন্য আমরা এতদিন অপেক্ষা করেছিলাম, কি করতে হবে? এই প্রশ্ন যেন আমাদের প্রত্যেককে দংশন করে অধীর করে তোলে, কি করতে হবে? বন্ধুগণ কাজই একমাত্র ঐক্যের বন্ধন। এক সঙ্গে যারা কাজ করে তারাই এক। এই সভায় আমরা যতক্ষণ সকলে মিলে একটা কাজে নিযুক্ত না হব ততক্ষণ আমরা যথার্থ এক হতে পারব না। অতএব বিপিন বাবু আজ এই যে প্রশ্ন করচেন—কি করতে হবে—এই প্রশ্নকে নিব্‌তে দেওয়া হবে না। সভ্যমহাশয়-গণ, আপনারা উত্তর করুন্ কি করতে হবে?

দুর্ব্বল দেহ শ্রীশ অস্থির হইয়া বলিয়া উঠিল আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন কি করতে

হবে, আমি বলি আমাদের সকলকে সন্ন্যাসী হয়ে ভারতবর্ষের দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে দেশহিতব্রত করে বেড়াতে হবে, আমাদের দলকে পুষ্ট করে তুল্‌তে হবে, আমাদের এই সভাটিকে সূক্ষ্ম সূত্র স্বরূপ করে সমস্ত ভারতবর্ষকে গেঁথে ফেলতে হবে।

বিপিন হাসিয়া কহিল; সে ঢের সময় আছে, যা কালই সুরু করা যেতে পারে এমন একটা কিছু কাজ বল। "মারিত গণ্ডার" "লুঠিত ভাণ্ডার" যদি পণ করে বস, তবে গণ্ডারও বাঁচবে ভাণ্ডারও বাঁচবে, তুমিও যেমন আরামে আছ তেমনি আরামে থাকবে। আমি প্রস্তাব করি, আমরা প্রত্যেকে ছুটি করে বিদেশী ছাত্র পালন করব, তাদের পড়া শুনো এবং শরীর মনের সমস্ত চর্চ্চার ভার আমাদের উপর থাক্‌বে।

শ্রীশ কহিল—এই তোমার কাজ। এর জন্যই আমরা সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করেছি? শেষকালে ছেলে মানুষ করতে হবে, তাহলে নিজের ছেলে কি অপরাধ করেছে!

বিপিন বিরক্ত হইয়া কহিল, তা যদি বল তাহলে সন্ন্যাসীর ত কর্ম্মই নেই; কর্ম্মের মধ্যে ভিক্ষে এবং ভ্রমণ ও ভণ্ডামি!

শ্রীশ রাগিয়া কহিল, আমি দেখ্‌চি আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন এসভার মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি যাঁদের শ্রদ্ধামাত্র নেই, তাঁরা যত শীঘ্র এ সভা পরিত্যাগ করে সন্তানপালনে প্রবৃত্ত হন ততই আমাদের মঙ্গল!

বিপিন আরক্তবর্ণ হইয়া বলিল—নিজের সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে চাইনে কিন্তু এ সভায় এমন কেউ কেউ আছেন, যাঁরা সন্ন্যাস গ্রহণের কঠোরতা এবং সন্তানপালনের ত্যাগ স্বীকার দুয়েরই অযোগ্য, তাঁদের—

চন্দ্রমাধব বাবু চোখের কাছ হইতে কার্য্যবিবরণের খাতা নামাইয়া কহিলেন, উত্থাপিত প্রস্তাব সম্বন্ধে পূর্ণ বাবুর অভিপ্রায় জান্‌তে পারিলে আমার মন্তব্য প্রকাশ করবার অবসর পাই।

পূর্ণ কহিল, অদ্য বিশেষরূপে সভার ঐক্যবিধানের জন্য একটা কাজ অবলম্বন করবার প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু কাজের প্রস্তাবে ঐক্যের লক্ষণ কি রকম পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে সে আর কাউকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার দরকার নেই। ইতিমধ্যে আমি যদি আবার একটা তৃতীয় মত প্রকাশ করে বসি তাহলে বিরোধানলে তৃতীয় আহুতি দান করা হবে—অতএব আমার প্রস্তাব এই যে সভাপতি মশায় আমাদের কাজ নির্দ্দেশ করে দেবেন এবং আমরা তাই শিরোধার্য্য করে নিয়ে বিনা বিচারে পালন করে যাব, কার্য্যসাধন এবং ঐক্য সাধনের এই এক মাত্র উপায় আছে।

পাশের ঘরে এক ব্যক্তি আবার একবার নড়িয়া চড়িয়া বসিল এবং তাহার চাবি ঝম্‌ করিয়া উঠিল।

বিষয়কর্ম্মে চন্দ্রমাধব বাবুর মত অপটু কে নাই কিন্তু তাঁহার মনের খেয়াল বাণিজ্যো দিকে। তিনি বলিলেন, আমাদের প্রথ কর্ত্তব্য ভারতবর্ষের দারিদ্র্যমোচন, এবং তা আশু উপায় বাণিজ্য। আমরা কয়জনে ব বাণিজ্য চালাতে পারিনে, কিন্তু তার সূত্রপা করতে পারি। মনে কর আমরা সকলে যদি দিয়াশেলাই সম্বন্ধে পরীক্ষা আরম্ভ করি এমন যদি একটা কাটি বের করতে পারি সহজে জ্বলে, শীঘ্র নেবে না এবং দেশের সর্ব্ব প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় তাহলে দে সস্তা দেশালাই নির্ম্মাণের কোন বাধা থাকে ন —এই বলিয়া জাপানে এবং য়ুরোপে সবশু কত দেশালাই প্রস্তুত হয়, তাহাতে কোন্ কে

কাঠের কাঠি ব্যবহার হয়, কাঠির সঙ্গে কি কি দাহ্যপদার্থ মিশ্রিত করে, কোথা হইতে কত দেশালাই রপ্তানি হয়, তাহার মধ্যে কত ভারতবর্ষে আসে এবং তাহার মূল্য কত, চন্দ্রমাধব বাবু তাহা বিস্তারিত করিয়া বলিলেন। বিপিন শ্রীশ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। পূর্ণ কহিল, পাকাটি এবং খ্যাংরা কাঠি দিয়ে শীঘ্রই পরীক্ষা করে দেব।—শ্রীশ মুখ ফিরাইয়া হাসিল।

এমন সময় ঘরের মধ্যে অক্ষয় আসিয়া প্রবেশ করিলেন। কহিলেন, মশায় প্রবেশ করতে পারি?

ক্ষীণদৃষ্টি চন্দ্রমাধব বাবু হঠাৎ চিনিতে না পারিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। অক্ষয় কহিলেন, মশায় ভয় পাবেন না এবং অমন ভ্রূকুটি করে আমাকেও ভয় দেখাবেন না—আমি অভূতপূর্ব্ব নই—এমন কি, আমি আপনাদেরই ভূতপূর্ব্ব—আমার নাম—

চন্দ্রমাধব বাবু তাড়াতাড়ি উঠিয়া কহিলেন আর নাম বল্‌তে হবে না—আসুন্ আসুন্ অক্ষয় বাবু—

তিন তরুণ সভ্য অক্ষয়কে নমস্কার করিল। বিপিন ও শ্রীশ দুই বন্ধু সন্তোবিবাদের বিমর্ষতায় গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল; পূর্ণ কহিল, মশায়, অভূতপূর্ব্বর চেয়ে ভূতপূর্ব্বকেই বেশী ভয় হয়!

অক্ষয় কহিলেন—পূর্ণ বাবু বুদ্ধিমানের মত কথাই বলেচেন। সংসারে ভূতের ভয়টাই প্রচলিত। নিজে যে ব্যক্তি ভূত অন্যলোকের জীবনসম্ভোগটা তার কাছে বাঞ্ছনীয় হতে পারেই না, এই মনে করে মানুষ ভূতকে ভয়ঙ্কর কল্পনা করে। অতএব সভাপতিমশায়, চিরকুমার সভার ভূতটিকে সভাথেকে ঝাড়াবেন, না পূর্ব্ব সম্পর্কের মমতা বশতঃ একখানি চৌকি দেবেন, এইবেলা বলুন!

"চৌকি দেওয়াই স্থির" বলিয়া চন্দ্রবাবু একখানি চেয়ার অগ্রসর করিয়া দিলেন। "সর্ব্ব সম্মতিক্রমে আসন গ্রহণ করলুম" বলিয়া অক্ষয় বাবু বসিলেন বলিলেন, আপনারা আমাকে নিতান্ত ভদ্রতা করে বস্‌তে বল্লেন বলেই যে আমি অভদ্রতা করে বসেই থাক্‌ব আমাকে এমন অসভ্য মনে করবেন না—বিশেষতঃ পান তামাক এবং পত্নী আপনাদের সভার নিয়ম বিরুদ্ধ অথচ ঐ তিনটে বদ্‌অভ্যাসই আমাকে একেবারে মাটি করেছে সুতরাং চটপট্ কাজের কথা সেরেই বাড়িমুখো হতে হবে।

চন্দ্রবাবু হাসিয়া কহিলেন, আপনি যখন সভ্য নন্ তখন আপনার সম্বন্ধে সভার নিয়ম নাই খাটালেম—পান তামাকের বন্দোবস্ত বোধ হয় করে দিতে পারব কিন্তু আপনার তৃতীয় নেশাটি—

অক্ষয়। সেটি এখানে বহন করে আনবার চেষ্টা করবেন না, আমার সে নেশাটি প্রকাশ্য নয়!

চন্দ্রবাবু পান তামাকের জন্য সনাতন চাকরকে ডাকিবার উপক্রম করিলেন। পূর্ণ কহিল আমি ডাকিয়া দিতেছি বলিয়া উঠিল;—পাশের ঘরে চাবি এবং চুড়ি এবং সহসা পলায়নের শব্দ একসঙ্গে শোনা গেল।

অক্ষয় তাহাকে থামাইয়া কহিলেন, "যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ" যতক্ষণ আমি এখানে আছি ততক্ষণ আমি আপনাদের চিরকুমার—কোন প্রভেদ নেই! এখন আমার প্রস্তাবটা শুনুন।

চন্দ্রবাবু টেবিলের উপর কার্য্যবিবরণের খাতাটির প্রতি অত্যন্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়া মন দিয়া শুনিতে লাগিলেন।

অক্ষয় কহিলেন আমার কোন মক্কেলের

ধনী বন্ধু তাঁর একটি সন্তানকে আপনাদের কুমার সভার সভ্য করতে ইচ্ছা করেচেন।

চন্দ্রবাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, বাপ ছেলেটির বিবাহ দিতে চান না!

অক্ষয়। সে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন—বিবাহ সে কোনক্রমেই করবে না আমি তার জামিন রইলুম। তার দূর সম্পর্কের এক দাদা সুদ্ধ সভ্য হবেন। তাঁর সম্বন্ধেও আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, কারণ যদিচ তিনি আপনাদের মত সুকুমার নন কিন্তু আপনাদের সকলের চেয়ে বেশী কুমার, তাঁর বয়স ৬০ পেরিয়ে গেছে—সুতরাং তাঁর সন্দেহের বয়সটা আর নেই, সোভাগ্যক্রমে সেটা আপনাদের সকলেরই আছে।

অক্ষয় বাবুর প্রস্তাবে চিরকুমার সভা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, সভাপতি কহিলেন সভ্যপদপ্রার্থীদের নাম ধাম বিবরণঃ—

অক্ষয়। অবশ্যই তাঁদের নাম ধাম বিবরণ একটা আছেই—সভাকে তার থেকে বঞ্চিত করিতে পারা যাবে না—সভ্য যখন পাবেন তখন নাম ধাম বিবরণ সুদ্ধই পাবেন। কিন্তু আপনাদের এই একতলার স্যাঁৎসেঁতে ঘরটি স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয়; আপনাদের এই চিরকুমার ক'টির চিরত্ব যাতে হ্রাস না হয় সেদিকে একটু দৃষ্টি রাখবেন!

চন্দ্রবাবু কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া খাতাটি নাকের কাছে তুলিয়া লইয়া বলিলেন—অক্ষয় বাবু আপনি জানেন ত আমাদের আয়—

অক্ষয়। আয়ের কথাটা—আর প্রকাশ করবেন না, আমি জানি ও আলোচনাটা চিত্তপ্রফুল্লকর নয়। ভালঘরের বন্দোবস্ত করে রাখা হয়েছে সে জন্যে আপনাদের ধনাধ্যক্ষকে স্মরণ করতে হবে না। চলুন না আজই সমস্ত দেখিয়ে শুনিয়ে আনি।

বিমর্ষ বিপিন শ্রীশের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সভাপতিও প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়া চুলের মধ্যদিয়া বারবার আঙ্গুল বুলাইতে বুলাইতে চুলগুলাকে অত্যন্ত অপরিষ্কার করিয়া তুলিলেন। কেবল পূর্ণ অত্যন্ত দমিয়া গেল। সে বলিল, সভার স্থান পরিবর্ত্তনটা কিছু নয়। অক্ষয় কহিলেন,—কেন, এবাড়ি থেকে ওবাড়ি করলেই কি আপনাদের চির-কৌমার্য্যের প্রদীপ হাওয়ায় নিবে যাবে?

পূর্ণ। এ ঘরটি ত আমাদের মন্দ বোধ হয় না।

অক্ষয়। মন্দ নয়, কিন্তু এর চেয়ে ভাল ঘর সহরে দুষ্প্রাপ্য হবে না!

পূর্ণ। আমার ত মনে হয় বিলাসিতার দিকে মন না দিয়ে খানিকটা কষ্টসহিষ্ণুতা অভ্যাস করা ভাল!

শ্রীশ কহিল, সেটা সভার অধিবেশনে না করে সভার বাইরে করা যাবে।

বিপিন কহিল—একটা কাজে প্রবৃত্ত হোলেই এত ক্লেশ সহ্য করবার অবসর পাওয়া যায় যে, অকারণে বলক্ষয় করা মূঢ়তা।

অক্ষয়। বন্ধুগণ, আমার পরামর্শ শোন, সভাঘরের অন্ধকার দিয়ে চিরকৌমার্য্য ব্রতের অন্ধকার আর বাড়িয়োনা। আলোক এবং বাতাস স্ত্রীলিঙ্গ নয় অতএব সভার মধ্যে ওদুটোকে প্রবেশ করতে বাধা দিয়ো না। আরো বিবেচনা করে দেখ, এস্থানটি অত্যন্ত সরস, তোমাদের ব্রতটি তদুপযুক্ত নয়। বাতিকের চর্চ্চা করচ কর, কিন্তু বাতের চর্চ্চা তোমাদের প্রতিজ্ঞার মধ্যে নয়। কি বল শ্রীশ বাবু বিপিন বাবুর কি মত?

দুই বন্ধু বলিল—ঠিক কথা। ঘরটা একবার দেখেই আসা যাক্ না।

পূর্ণ বিমর্ষ হইয়া নিরুত্তর রহিল। পাশের

ঘরেও চাবি একবার ঠুন্ করিল, কিন্তু অত্যন্ত অপ্রসন্ন সুরে!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

অক্ষয় বলিলেন—স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র তীর্থ। মান কি না?

পুরবালা। আমি কি পণ্ডিত মশায়ের কাছে শাস্ত্রের বিধান নিতে এসেছি? আমি মার সঙ্গে আজ কাশী চলেছি এই খবরটি দিয়ে গেলুম।

অক্ষয়। খবরটি সুখবর নয়—শোনবামাত্র তোমাকে শাল দোশালা বক্‌শিশ্‌ দিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করচে না।

পুরবালা। ইস্, হৃদয় বিদীর্ণ হচ্চে! না? সহ্য কর্‌তে পার্‌চ না?

অক্ষয়। আমি কেবল উপস্থিত বিচ্ছেদটার কথা ভাবচি নে—এখন তুমি দুদিন না রইলে, আরো ক'জন রয়েছেন, এক রকম করে এই হতভাগ্যের চলে যাবে। কিন্তু এর পরে কি হবে? দেখ, ধর্ম্ম কর্ম্মে স্বামীকে এগিয়ে যেয়ো না,—স্বর্গে তুমি যখন ডবল প্রোমোশন্ পেতে থাক্‌বে আমি তখন পিছিয়ে থাক্‌ব—তোমাকে বিষ্ণুদূতে রথে চড়িয়ে নিয়ে যাবে, আর আমাকে যমদূতে কাণে ধরে হাঁটিয়ে দৌড় করাবে—(গান)

তোমায় নিয়ে যাবে উড়িয়ে,
আর আমি চলুব খুঁড়িয়ে!
ইচ্ছা হবে বিষ্ণুদূতের
মাথাটা দিই গুঁড়িয়ে!

পুরবালা। আচ্ছা, আচ্ছা, থাম!

অক্ষয়। আমি থামব, কেবল তুমিই চল্‌বে! উনবিংশ শতাব্দীর এই বন্দোবস্ত? নিতান্তই চল্‌লে?

পুরবালা। চল্লুম।

অক্ষয়। আমাকে কার হাতে সমর্পণ করে গেলে?

পুরবালা। রসিক দাদার হাতে!

অক্ষয়। মেয়ে মানুষ, হস্তান্তর করবার আইন কিছুই জান না! সেই জন্যেই ত বিরহাবস্থায় উপযুক্ত হাত নিজেই খুঁজে নিয়ে আত্মসমর্পণ করতে হয়।

পুরবালা। তোমাকে ত বেশী খোঁজাখুঁজি করতে হবে না!

অক্ষয়। তা হবে না। (গান)—

কার হাতে যে ধরা দেব হায়।
(তাই) ভাবতে আমার বেলা যায়।
ডান দিকেতে তাকাই যখন,
বাঁয়ের লাগি কাঁদেরে মন,
বাঁয়ের দিকে ফিরলে তখন,
দক্ষিণ ডাকে আয়রে আয়।

আচ্ছা আমার যেন সান্ত্বনার গুটি দুই তিন সদুপায় আছে কিন্তু তুমি

বিরহ যামিনী কেমনে যাপিবে,
বিচ্ছেদ তাপে যখন তাপিবে
এপাশ ওপাশ বিছানা মাপিবে,
মকরকেতনে কেবলি শাপিবে,

পুরবালা। রক্ষে কর, ও মিলটা ঐ খানেই শেষ কর!

অক্ষয়। দুঃখের সময় আমি থামতে পারিনে—কাব্য আপনি বেরতে থাকে। মিল ভাল না বাস অমিত্রাক্ষর আছে, তুমি যখন বিদেশে থাকবে আমি "আর্ত্তনাদ বধ কাব্য" বলে একটা কাব্য লিখ্‌ব—সখি তার আরম্ভটা শোন—(সাড়ম্বরে)

বাষ্পীয় শকটে চড়ি নারী চূড়ামণি।
পুরবালা চলি যবে গেলা কাশীধামে
বিকালে, কহ হে দেবি অমৃতভাষিণী
কোন্ বরাঙ্গনে বরি বরমাল্যদানে
যাপিলা বিচ্ছেদ মাস শ্যালীত্রয়ীশালী
শ্রীঅক্ষয় !

পুরবালা। (সগর্ব্বে) আমার মাথা খাও, ঠাট্টা নয়, তুমি একটা সত্যিকার কাব্য লেখনা।

অক্ষয়। মাথা খাওয়ার কথাটা যদি বল্লে, আমি নিজের মাথাটি খেয়ে অবধি বুঝেছি ওটা সুখাদ্যের মধ্যে গণ্য নয়। আর ঐ কাব্য লেখা, ও কার্য্যটাও সুসাধ্য বলে জ্ঞান করিনে। বুদ্ধিতে আমার এক জায়গায় ফুটো আছে, কাব্য জমতে পারে না—ফস্ ফস্ করে বেরিয়ে পড়ে।

তুমি জান আমার গাছে ফল কেন না ফলে।
যেমনি ফুলটি ফুটে ওঠে আনি চরণতলে !

কিন্তু আমার প্রশ্নের ত কোন উত্তর পেলুম না। কৌতূহলে মরে যাচ্চি। কাশীতে যে চলেছ, উৎসাহটা কিসের জন্য ? আপাততঃ সেই বিষ্ণু দূতটাকে মনে মনে ক্ষমা করলুম, কিন্তু ভগবান্ ভূতনাথ ভবানীপতির অনুচরগুলোর উপর ভারি সন্দেহ হচ্চে। শুনেছি নন্দী ও ভৃঙ্গী অনেক বিষয়ে আমাকেও জেতে, ফিরে এসে হয়ত এই ভূতটিকে পছন্দ না হতেও পারে !

অক্ষয়ের পরিহাসের মধ্যে একটু যে অভিমানের জ্বালা ছিল, সেটুকু পুরবালা অনেকক্ষণ বুঝিয়াছে। তাহা ছাড়া, প্রথমে কাশী যাইবার প্রস্তাবে তাহার যে উৎসাহ হইয়াছিল, যাত্রার সময় যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল ততই তাহা ম্লান হইয়া আসিতেছে।

সে কহিল—আমি কাশী যাব না।

অক্ষয়। সে কি কথা ! ভূতভাবনের যে ভূত্যগুলি একবার মরে ভূত হয়েছে—তারা যে দ্বিতীয়বার মরবে !

রসিকের প্রবেশ।

পুরবালা। আজ যে রসিকদাদার মুখ ভারি প্রফুল্ল দেখাচ্চে ?

রসিক। ভাই, তোর রসিকদাদার মুখের ঐ রোগটা কিছুতেই ঘুচ্‌ল না। কথা নেই বার্ত্তা নেই প্রফুল্ল হয়েই আছে—বিবাহিত লোকেরা দেখে, মনে মনে রাগ করে।

পুরবালা। শুন্‌লে ত, বিবাহিত লোক ! এর একটা উপযুক্ত জবাব দিয়ে যাও !

অক্ষয়। আমাদের প্রফুল্লতার খবর ও বৃদ্ধ কোথা থেকে জানবে ? সে এত রহস্যময় যে, তা উদ্ভেদ করতে আজ পর্য্যন্ত কেউ পারলে না—সে এত গভীর যে আমরাই হাতড়ে খুঁজে পাইনে, হঠাৎ সন্দেহ হয় আছে কি না।

পুরবালা "এই বুঝি !" বলিয়া রাগ করিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল।

অক্ষয় তাহাকে ধরিয়া ফিরাইয়া কহিল—দোহাই তোমার এই লোকটির সাম্‌নে রাগারাগি করো না—তাহলে ওর আস্পর্দ্ধা আরো বেড়ে যাবে।—দেখ দাম্পত্য তত্ত্বানভিজ্ঞ বৃদ্ধ, আমরা যখন রাগ করি তখন স্বভাবতঃ আমাদের কণ্ঠস্বর প্রবল হয়ে উঠে, সেইটেই তোমাদের কর্ণগোচর হয়; আর অনুরাগে যখন আমাদের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে, কাণের কাছে মুখ আন্‌তে গিয়ে মুখ বারংবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়তে থাকে,—তখন ত খবর পাও না !

পুরবালা। আঃ—চুপ কর !

অক্ষয়। যখন গয়নার ফর্দ্দ হয় তখন বাড়ির সরকার থেকে স্যাকরা পর্য্যন্ত সেটা কারো অবিদিত থাকে না কিন্তু বসন্ত নিশীথে যখন প্রেয়সী—

পুরবালা। আঃ—থাম !

অক্ষয়। বসন্ত নিশীথে প্রেয়সী—

পুরবালা। আঃ—কি বক্‌চ তার ঠিক নেই!

অক্ষয়। বসন্তনিশীথে যখন প্রেয়সী গর্জ্জন করে বলেন, আমি কালই বাপের বাড়ি চলে যাব, আমার এক দণ্ড এখানে থাক্‌তে ইচ্ছে নেই—আমার হাড় কালি হল—আমার—

পুরবালা। হাঁগো মশায়, কবে তোমার প্রেয়সী বাপের বাড়ি যাব বলে বসন্তনিশীথে গর্জ্জন করেচে?

অক্ষয়। ইতিহাসের পরীক্ষা? কেবল ঘটনা রচনা করে নিষ্কৃতি নেই? আবার সন তারিখ সুদ্ধ মুখে মুখে বানিয়ে দিতে হবে? আমি কি এত বড় প্রতিভাশালী?

রসিক। (পুরবালার প্রতি) বুঝেছ ভাই, সোজা করে ও তোমার কথা বল্‌তে পারে না—ওর এত ক্ষমতাই নেই—তাই উল্টে বলে, আদরে না কুলোলে গাল দিয়ে আদর করতে হয়!

পুরবালা। আচ্ছা মল্লিনাথজি, তোমার আর ব্যাখ্যা করতে হবে না। মা যে শেষকালে তোমাকেই কাশী নিয়ে যাবেন স্থির করেচেন!

রসিক। তা বেশ ত, এতে আর ভয়ের কথাটা কি? তীর্থে যাবার ত বয়সই হয়েছে। এখন তোমাদের লোল কটাক্ষে এ বৃদ্ধের কিছুই করতে পারবে না—এখন চিত্ত চন্দ্রচূড়ের চরণে—

মুগ্ধস্নিগ্ধবিদগ্ধমুগ্ধমধুরৈর্লোলৈঃ কটাক্ষৈরলং
চেতশ্চম্বতি চন্দ্রচূড়চরণধ্যানামৃতে বর্ত্ততে।

পুরবালা। সে ত খুব ভাল কথা—তোমার উপরে আর কটাক্ষের অপব্যয় করতে চাইনে—এখন চন্দ্রচূড় চরণে চল—তাহলে মাকে ডাকি!

রসিক। (করযোড়ে) বড়দিদি ভাই, তোমার মা আমাকে সংশোধনের বিস্তর চেষ্টা করচেন, কিন্তু একটু অসময়ে সংস্কার কার্য্য আরম্ভ করেচেন—এখন তাঁর শাসনে কোন ফল হবে না। বরঞ্চ এখনো নষ্ট হবার বয়স আছে, সে বয়সটা বিধাতার কৃপায় বরাবরই থাকে, লোল কটাক্ষটা শেষকাল পর্য্যন্ত খাটে, কিন্তু উদ্ধারের বয়স আর নেই। তিনি এখন কাশী যাচ্চেন, কিছুদিন এই বৃদ্ধ শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতিসাধনের দুরাশা পরিত্যাগ করে শান্তিতে থাকুন—কেন তোরা তাঁকে কষ্ট দিবি?

জগত্তারিণীর প্রবেশ।

জগত্তারিণী। বাবা তা হলে আসি।

অক্ষয়। চল্লে না কি মা? রসিকদাদা যে এতক্ষণ দুঃখ করছিলেন যে তুমি—

রসিক। (ব্যাকুলভাবে) দাদার সকল কথাতেই ঠাট্টা! মা, আমার কোন দুঃখ নেই—আমি কেন দুঃখ করতে যাব?

অক্ষয়। বল্‌ছিলে না যে, বড়মা একলাই কাশী যাচ্চেন, আমাকে সঙ্গে নিলেন না?

রসিক। হাঁ সে ত ঠিক কথা! মনে ত লাগ্‌তেই পারে—তবে কি না মা যদি নিতান্তই—

জগত্তারিণী। না বাপু, বিদেশে তোমার রসিকদাদাকে সাম্‌লাবে কে? ওঁকে নিয়ে পথ চল্‌তে পারব না!

পুরবালা। কেন মা, রসিকদাদাকে নিয়ে গেলে উনি তোমাকে দেখতে শুন্‌তে পার্ত্তেন।

জগত্তারিণী। রক্ষে কর, আমাকে আর দেখে শুনে কাজ নেই! তোমার রসিকদাদার বুদ্ধির পরিচয় ঢের পেয়েছি।

রসিকদাদা। (টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে) তা মা, যেটুকু বুদ্ধি আছে তার পরিচয় সর্ব্বদাই দিচ্চি—ও ও ত চেপে রাখ্‌বার যো নেই—ধরা পড়তেই হবে। ভাল্লা চাকাটাই

সব চেয়ে খড় খড় করে—তিনি যে ভাঙ্গা সেটা পাড়াসুদ্ধ খবর পায়। সেই জন্যেই বড়মা চুপচাপ করে থাক্‌তেই যাই, কিন্তু তুমি যে আবার চালাতেও ছাড় না!

নিজের শৈথিল্যে যাহার কিছুই মনের মত হয় না, সর্ব্বদা ভর্ৎসনা করিবার জন্য তাহার একটা হতভাগ্যকে চাই। রসিকদাদা জগত্তারিণীর বহিস্থিত আত্মগ্লানি বিশেষ।

জগত্তারিণী। আমি তাহলে হারাণের বাড়ি চল্লুম, একেবারে তাদের সঙ্গে গাড়িতে উঠ্‌ব—এর পরে আর যাত্রার সময় নেই। পুরো, তোরাত দিনক্ষণ মানিস্‌নে, ঠিক সময়ে ইষ্টেশনে যাস্‌।

তাঁহার কন্যাজামাতার অসামান্য আসক্তি মা বেশ অবগত ছিলেন। পঞ্জিকার খাতিরে শেষ মুহূর্ত্তের পূর্ব্বে তাহাদের বিচ্ছেদ সংঘটনের চেষ্টা তিনি বৃথা বলিয়াই জানিতেন।

কিন্তু পুরবালা যখন বলিল, মা আমি কাশী যাব না—সেটা তিনি বাড়াবাড়ি মনে করিলেন। পুরবালার প্রতি তাঁহার বড় নির্ভর। সে তাঁহার সঙ্গে যাইতেছে বলিয়া তিনি নিশ্চন্ত আছেন। পুরবালা স্বামীর সঙ্গে সিমলা যাতায়াত করিয়া বিদেশ ভ্রমণে পাকা হইয়াছে; পুরুষ অভিভাবকের অপেক্ষা পুরবালাকেই তিনি পথসঙ্কটে সহায়রূপে আশ্রয় করিয়াছেন। হঠাৎ তাহার অসম্মতিতে বিপন্ন হইয়া জগত্তারিণী তাঁহার জামাতার মুখের দিকে চাহিলেন।

অক্ষয় তাহার শাশুড়ীর মনের ভাব বুঝিয়া কহিলেন—সে কি হয়? তুমি মার সঙ্গে না গেলে ওঁর অসুবিধা হবে। আচ্ছা মা, তুমি এগোও, আমি ওকে ঠিক সময়ে ষ্টেশনে নিয়ে যাব। জগত্তারিণী নিশ্চিন্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন। রসিক দাদা টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বিদায় কালীন বিমর্ষতা মুখে আনিবার জন্য চেষ্টা করতে লাগিলেন।

অক্ষয়। কে মশায়! আপনি কে?

"আজ্ঞে মশায়, আপনার সহধর্ম্মিণীর সঙ্গে আমার বিশেষ সম্বন্ধ আছে" বলিয়া পুরুষ বেশধারী শৈল অক্ষয়ের সঙ্গে শেক হ্যাণ্ড্‌ করিল।

শৈল। মুখুয্যেমশায় চিন্‌তে ত পারলে না?

অক্ষয়। শাস্ত্রে আছে কাউকে কাউকে চেনা যায় না "যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে।"

পুরবালা। অবাক্‌ করলি! লজ্জা করচে না?

শৈল। দিদি, লজ্জা যে স্ত্রীলোকের ভূষণ—পুরুষের বেশ ধরতে গেলেই সেটা পরিত্যাগ করতে হয়। তেমনি আবার মুখুয্যেমশায় যদি মেয়ে সাজেন, উনি লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবেন না। রসিক দাদা, চুপ করে রৈলে যে!

রসিক। আহা শৈল! যেন কিশোর কন্দর্প! যেন সাক্ষাৎ কুমার, ভবানীর কোল থেকে উঠে এল! ওকে বরাবর শৈল বলে দেখে আস্‌চি, চোখে অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল, ও সুন্দরী, কি মাঝারি, কি চলনসই সে কথা কখনো মনেও ওঠেনি—আজ ঐ বেশটি বদল করেছে বলেই ত ওর রূপ খানি ধরা দিলে! পুরো দিদি, লজ্জার কথা কি বল্‌চিস্‌ আমার ইচ্ছে করচে ওকে টেনে নিয়ে ওর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করি!

পুরবালা শৈলের তরুণ সুকুমার প্রিয়দর্শন পুরুষ মূর্ত্তিতে মনে মনে মুগ্ধ হইতেছিল। গভীর বেদনার সহিত তাহার কেবলি মনে হইতেছিল, আহা শৈল আমাদের বোন না হয়ে যদি ভাই হত! ওর এমন রূপ এমন বুদ্ধি ভগবান্‌ সমস্তই ব্যর্থ করে দিলেন! পুরবালার স্নিগ্ধ চোখ দুইটী ছল ছল করিয়া উঠিল।

অক্ষয় স্নেহাভিষিক্ত গাম্ভীর্য্যের সহিত ছদ্মবেশিনীকে ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—সত্যি বলচি শৈল, তুমি যদি আমার শ্যালী না হয়ে আমার ছোট ভাই হতে তা হলেও আমি আপত্তি করতুম না।

শৈল ঈষৎ বিচলিত হইয়া কহিল, আমিও কর্ত্তুম না মুখুয্যেমশায়! বাস্তবিক ইহারা দুই ভাইয়ের মতই ছিল। কেবল সেই ভ্রাতৃভাবের সহিত কৌতুকময় বয়স্যভাব মিশ্রিত হইয়া কোমল সম্বন্ধ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

পুরবালা শৈলকে বুকের কাছে টানিয়া কহিল, এই বেশে তুই কুমার সভার সভ্য হতে যাচ্চিস্ শৈল?

শৈল। অন্য বেশে হতে গেলে যে ব্যাকরণের দোষ হয় দিদি! কি বল রসিক দাদা!

রসিক। তা ত বটেই, ব্যাকরণ বাঁচিয়ে ত চলতেই হবে। ভগবান্ পাণিনি বোপদেব এরা কি বৃথা জন্মগ্রহণ করেছিলেন? কিন্তু ভাই শ্রীমতী শৈলবালার উত্তর চাপ্‌কান্ প্রত্যয় করলেই কি ব্যাকরণ রক্ষে হয়!

অক্ষয়। নূতন মুগ্ধবোধে তাই লেখে। আমি লিখে পড়ে দিতে পারি চিরকুমার সভার মুগ্ধদের কাছে শৈল যেমন প্রত্যয় করাবে তাঁরা তেমনি প্রত্যয় যাবেন। কুমারদের ধাত আমি জানি কি না।

পুরবালা একটুখানি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া শৈলকে কহিল—তোর মুখুয্যেমশায়কে আর এই বুড়ো বয়সীটিকে নিয়ে তোর খেলা তুই আরম্ভ কর—আমি মার সঙ্গে কাশী চল্লুম।

পুরবালা এই সকল নিয়মবিরুদ্ধ ব্যাপার মনে মনে পছন্দ করিত না। কিন্তু তাহার স্বামীর ও ভগিনীটির বিচিত্র কৌতুকলীলায় সর্ব্বদা বাধা দিতেও তাহার মন সরিত না। নিজের স্বামী-সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া বিধবা বোনটির প্রতি তাহার করুণা ও প্রশ্রয়ের অন্ত ছিল না। ভাবিত, হতভাগিনী যেমন করিয়া ভুলিয়া থাকে থাক্! পুরবালা জিনিষপত্র গুছাইতে গেল।

এমন সময় নৃপবালা ও নীরবালা ঘরে প্রবেশ করিয়াই পলায়নোদ্যত হইল। নীর দরজার আড়াল হইতে আর একবার ভাল করিয়া তাকাইয়া "মেজদিদি" বলিয়া ছুটিয়া আসিল—কহিল, মেজদিদি তোমাকে ভাই জড়িয়ে ধর্ত্তে ইচ্ছে করচে, কিন্তু ঐ চাপকানে বাধচে। মনে হচ্চে তুমি যেন কোন্ রূপকথার রাজপুত্র, তেপান্তর মাঠ পেরিয়ে আমাদের উদ্ধার করতে এসেচ।

নীরর সমুচ্চ কণ্ঠস্বরে আশ্বস্ত হইয়া নৃপও ঘরে প্রবেশ করিয়া মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া রহিল। নীর তাহাকে টানিয়া লইয়া কহিল, অমন করে লোভীর মত তাকিয়ে আছিস্ কেন? যা মনে করছিস তা নয়, ও তোর দুষ্মন্ত নয়—ও আমাদের মেজদিদি!

রসিক। ইয়মধিকমনোজ্ঞা চাপ্‌কানেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্!

অক্ষয়। মূঢ়ে, তোরা কেবল চাপ্‌কানটা দেখেই মুগ্ধ! গিণ্টির এত আদর? এদিকে যে খাঁটি সোনা দাঁড়িয়ে হাহাকার করচে!

নীর। আজকাল খাঁটি সোনার দর যে বড় বেশী, আমাদের এই গিণ্টিই ভাল! কি বল ভাই মেজদিদি! বলিয়া শৈলর কৃত্রিম গোঁফটা একটু পাকাইয়া দিল।

রসিক। (নিজেকে দেখাইয়া) এই খাঁটি সোনাটি খুব সস্তা যাচ্চে ভাই—এখনো কোন টাকশালে গিয়ে কোন মহারাণীর ছাপটি পর্য্যন্ত পড়েনি!

নীর। আচ্ছা বেশ, সেজদিদিকে দান

করলুম। (বলিয়া রসিক দাদার হাত ধরিয়া নৃপর হাতে সমর্পণ করিল)। রাজি আছিস্ ত ভাই?

নৃপ। তা আমি রাজি আছি।—বলিয়া রসিকদাদাকে একটা চৌকীতে বসাইয়া সে তাহার মাথার পাকাচুল তুলিয়া দিতে লাগিল।

নীর শৈলর কৃত্রিম গোঁফে তা দিয়া পাকাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। শৈল কহিল—আঃ কি করচিস্ আমার গোঁফ পড়ে যাবে।

রসিক। কাজ কি, এদিকে আয়না ভাই, এ গোঁফ কিছুতেই পড়বে না।

নীর। আবার! ফের! সেজদিদির হাতে সঁপে দিলুম কি কর্ত্তে? আচ্ছা রসিক দাদা, তোমার মাথার দুটো একটা চুল কাঁচা আছে, কিন্তু গোঁফ আগাগোড়া পাকালে কি করে?

রসিক। কারো কারো মাথা পাক্‌বার আগে মুখটা পাকে!

নীর। দিদিদের সভাটা কোন ঘরে বস্‌বে মুখুয্যে মশায়?

অক্ষয়। আমার বসবার ঘরে।

নীর। তা হলে সে ঘরটা একটু সাজিয়ে গুজিয়ে দিইগে!

অক্ষয়। যতদিন আমি সে ঘরটা ব্যবহার করচি, একদিনও সাজাতে ইচ্ছে হয় নি বুঝি?

নীর। তোমার জন্ত ঝড়ু বেহারা আছে তবু বুঝি আশা মিট্‌ল না?

পুরবালার প্রবেশ।

পুর। কি হচ্চে তোমাদের?

নীর। মুখুয্যেমশায়ের কাছে পড়া বলে নিতে এসেছি দিদি। তা উনি বলচেন ওঁর বাইরের ঘরটা ভাল করে ঝেড়ে সাজিয়ে না দিলে উনি পড়াবেন না। তাই সেজদিদিতে আমাতে ওঁর ঘর সাজাতে যাচ্চি! আয় ভাই!

নৃপ। তোর ইচ্ছে হয়েছে তুই ঘর সাজাতে যা না—আমি যাবনা!

নীর। বাঃ, আমি একা খেটে মরব, আর তুমি সুদ্ধ তার ফল পাবে সে হবে না!—নৃপকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া নীর চলিয়া গেল।

পুর। সব গুছিয়ে নিয়েছি। এখনো ট্রেণ যাবার দেরী আছে বোধ হয়!

অক্ষয়। যদি মিস্ করতে চাও তাহলে ঢের দেরি আছে।

পুর। তা হলে চল, আমাকে ষ্টেশনে পৌঁছিয়ে দেবে। চল্লুম রসিক দাদা—তুমি এখানে রইলে, এই শিশুগুলিকে একটু সাম্‌লে রেখ। (প্রণাম)

রসিক। কিন্তু ভেবো না দিদি, এরা সকলে আমাকে যে রকম বিপরীত ভয় করে, টুঁশব্দটি করতে পারবে না।

শৈল। দিদি ভাই, তুমি একটু থাম! আমি এই কাপড়টা ছেড়ে এসে তোমাকে প্রণাম করচি!

পুর। কেন! ছাড়তে মনে গেল যে?

শৈল। না ভাই, এ কাপড়ে নিজেকে আর এক জন বলে মনে হয় তোদের গায়ে হাত দিতে ইচ্ছে হয় না। রসিক দাদা এই নাও, আমার গোঁফটা সাবধানে রেখে দাও, হারিয়ো না!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

শ্রীশ তাহার বাসায় দক্ষিণের বারান্দায় এক খানা বড়হাতা ওয়ালা কেদারায় দুই হাতার উপর দুই পা তুলিয়া দিয়া শুক্লসন্ধ্যায় চুপচাপ বসিয়া সিগারেট ফুঁকিতেছিল। পাশে

টিপায়ের উপর একটি রেকাবীতে স্তূপীকৃত শুভ্র বেলফুলের গোড়ে গন্ধে চারিদিক্ আমোদিত করিয়াছিল।

বিপিন পশ্চাৎ হইতে প্রবেশ করিয়া তাহার স্বাভাবিক প্রবল গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল—কি গো সন্ন্যাসী ঠাকুর!

শ্রীশ তৎক্ষণাৎ হাতা হইতে পা নামাইয়া উঠিয়া বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল—কহিল, এখনো বুঝি ভুল্‌তে পার নি?

ঝগড়ার ব্যথাটুকু দুই বন্ধুর কেহই ভুলিতে পারে নাই। শ্রীশ কিছুক্ষণ আগেই ভাবিতেছিল, একবার বিপিনের ওখানে যাওয়া যাক্। কিন্তু গ্রীষ্ম সন্ধ্যার দক্ষিণ বাতাসের দ্বারা আবিষ্ট হইয়া নড়িতে পারিতেছিল না। একটি গ্লাস্ বরফশীতল লেমনেড ও বেলফুলের মালা আনাইয়া জ্যোৎস্নাশুভ্র আকাশে সিগারেটের ধূমসহযোগে বিচিত্র কল্পনাকুণ্ডলী নির্ম্মাণ করিতেছিল। বিপিন তাহাদের কলহের পর এই প্রথম অবকাশ পাইবামাত্র বন্ধুর কাছে সত্বর আসিয়া উপস্থিত হইল।

শ্রীশ। আচ্ছা ভাই, শিশুপালক, তুমি কি সত্যি মনে কর আমি সন্ন্যাসী হতে পারিনে?

বিপিন। কেন পার্ব্বে না! কিন্তু অনেকগুলি তল্পিদার চেলা সঙ্গে থাকা চাই।

শ্রীশ। তার তাৎপর্য্য এই যে, কেউ বা আমার বেলফুলের মালা গেঁথে দেবে, কেউবা বাজার থেকে লেমনেড ও বরফ ভিক্ষে করে আন্‌বে, এই ত? তাতে ক্ষতিটা কি? যে সন্ন্যাস ধর্ম্মে বেলফুলের প্রতি বৈরাগ্য এবং ঠাণ্ডা লেমনেডের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মায় সেটা কি খুব উঁচুদরের সন্ন্যাস?

বিপিন। সাধারণ ভাষায় ত সন্ন্যাসধর্ম্ম বল্‌তে সেই রকমটাই বোঝায়।

শ্রীশ। ঐ শোন! তুমি কি মনে কর ভাষায় একটা কথার একটা বৈ অর্থ নেই? এক জনের কাছে সন্ন্যাসী কথাটার যে অর্থ, আর এক জনের কাছেও যদি ঠিক সেই অর্থই হয় তা হলে মানুষের মন বলে একটা স্বাধীন পদার্থ আছে কি কর্ত্তে?

বিপিন। তোমার মন সন্ন্যাসী কথাটার কি অর্থ করচেন আমার মন সেইটি শোনবার জন্য উৎসুক হয়েচেন!

শ্রীশ। আমার সন্ন্যাসীর সাজ এই রকম—গলায় ফুলের মালা, গায়ে চন্দন, কাণে কুণ্ডল, মুখে হাস্য। আমার সন্ন্যাসীর কাজ মানুষের চিত্ত আকর্ষণ। সুন্দর চেহারা, মিষ্ট গলা, বক্তৃতায় অধিকার, এ সমস্ত না থাকিলে সন্ন্যাসী হয়ে উপযুক্ত ফল পাওয়া যায় না। রুচি বুদ্ধি কার্য্যক্ষমতা ও প্রফুল্লতা, সকল বিষয়েই আমার সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে গৃহস্থের আদর্শ হতে হবে।

বিপিন। অর্থাৎ একদল কার্ত্তিককে ময়ূরের উপর চড়ে রাস্তায় বেরতে হবে।

শ্রীশ! ময়ূর না পাওয়া যায়, ট্রাম্, আছে, পদব্রজেও নারাজ নই। কুমার সভা মানেই ত কার্ত্তিকের সভা। কিন্তু কার্ত্তিক কি কেবল সুপুরুষ ছিলেন? তিনিই ছিলেন স্বর্গের সেনাপতি।

বিপিন। লড়াইয়ের জন্যে তাঁর দুটি মাত্র হাত, কিন্তু বক্তৃতা করবার জন্যে তাঁর তিন যোড়া মুখ।

শ্রীশ। এর থেকে প্রমাণ হয় আমাদের আর্য্য পিতামহরা বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবলকে তিন গুণ বেশী বলেই জান্‌তেন। আমিও পালোয়ানীকে বীরত্বের আদর্শ বলে মানিনে।

বিপিন। ওটা বুঝি আমার উপর হ'ল?

শ্রীশ। ঐ দেখ! মানুষকে অহঙ্কারে কি রকম মাটি করে। তুমি ঠিক করে রেখেচ,

পালোয়ান বল্লেই তোমাকে বলা হল! তুমি কলিযুগের ভীমসেন! আচ্ছা এস, যুদ্ধং দেহি! একবার বীরত্বের পরীক্ষা হয়ে যাক্!

এই বলিয়া দুই বন্ধু ক্ষণকালের জন্য লীলাচ্ছলে হাত কাড়াকাড়ি করিতে লাগিল। বিপিন হঠাৎ "এইবার ভীমসেনের পতন" বলিয়া ধপ করিয়া শ্রীশের কেদারটা অধিকার করিয়া তাহার উপরে দুই পা তুলিয়া দিল; এবং "উঃ অসহ্য তৃষ্ণা" বলিয়া লেমনেডের গ্লাসটি এক নিঃশ্বাসে খালি করিল। তখন শ্রীশ তাড়াতাড়ি বেলফুলের মালাটি সংগ্রহ করিয়া—"কিন্তু বিজয় মালাটি আমার" বলিয়া সেটা মাথায় জড়াইল এবং বেতের মোড়াটার উপরে বসিয়া কহিল আচ্ছা ভাই সত্যি বল, একদল শিক্ষিত লোক যদি এই রকম সংসার পরিত্যাগ করে' পরিপাটি সজ্জায় প্রফুল্ল সন্ন মুখে গানে এবং বক্তৃতায় ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে শিক্ষা বিস্তার করে' বেড়ায় তাতে উপকার হয় কি না?

বিপিন এই তর্কটা লইয়া বন্ধুর সঙ্গে আর ঝগড়া করিতে ইচ্ছা করিল না—কহিল, আইডিয়াটা ভাল বটে!

শ্রীশ। অর্থাৎ শুনতে সুন্দর কিন্তু কর্ত্তে অসাধ্য! আমি বলচি অসাধ্য নয় এবং আমি দৃষ্টান্ত দ্বারা তার প্রমাণ করব। ভারতবর্ষে সন্ন্যাসধর্ম্ম বলে একটা প্রকাণ্ড শক্তি আছে, তার ছাই ঝেড়ে তার ঝুলিটা কেড়ে নিয়ে তার জটা মুড়িয়ে তাকে সৌন্দর্য্য এবং কর্ম্মনিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত করাই চিরকুমার সভার এক মাত্র উদ্দেশ্য। ছেলে পড়ান এবং দেশলাইয়ের কাটি তৈরি করবার জন্যে আমাদের মত লোক চিরজীবনের ব্রত অবলম্বন করে নি। বল বিপিন, তুমি আমার প্রস্তাবে রাজি আছ কি না?

বিপিন। তোমার সন্ন্যাসীর যে রকম চেহারা গলা এবং আস্‌বাবের প্রয়োজন আমার ত তার কিছুই নেই। তবে তল্পিদার হয়ে পিছনে যেতে রাজি আছি! কাণে যদি সোণার কুণ্ডল, অন্ততঃ চোখে যদি সোণার চস্‌মাটা পরে' ও যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াও তা হলে একটা প্রহরীর দরকার, সে কাজটা আমার দ্বারা কতকটা চল্‌তে পারবে!

শ্রীশ। আবার ঠাট্টা!

বিপিন। না ভাই ঠাট্টা নয়। আমি সত্যিই বলচি তোমার প্রস্তাবটাকে যদি সম্ভবপর করে' তুল্‌তে পার তা হলে খুব ভালই হয়। তবে এ রকম একটা সম্প্রদায়ে সকলেরই কাজ সমান হতে পারে না, যার যেমন স্বাভাবিক ক্ষমতা সে সেই অনুসারে যোগ দিতে পারে।

শ্রীশ। সে ত ঠিক কথা। কেবল একটি বিষয়ে আমাদের খুব দৃঢ় হতে হবে, স্ত্রীজাতির কোন সংস্রব রাখ্‌ব না।

বিপিন। মাল্যচন্দন অঙ্গদকুণ্ডল সবই রাখতে চাও কেবল ঐ একটা বিষয়ে অত বেশী দৃঢ়তা কেন?

শ্রীশ। ঐ গুলো রাখচি বলেই দৃঢ়তা। যে জন্যে চৈতন্য তাঁর অনুচরদের স্ত্রীলোকের সঙ্গ থেকে কঠিন শাসনে রেখেছিলেন। তাঁর ধর্ম্ম, অনুরাগ এবং সৌন্দর্য্যের ধর্ম্ম, সে জন্যেই তার পক্ষে প্রলোভনের ফাঁদ অনেক ছিল।

বিপিন। তা হলে ভয়টুকুও আছে!

শ্রীশ। আমার নিজের জন্য লেশমাত্র নেই। আমি আমার মনকে পৃথিবীর বিচিত্র সৌন্দর্য্যে ব্যাপ্ত করে রেখে দিই, কোনও একটা ফাঁদে আমাকে ধরে কার সাধ্য. কিন্তু তোমরা যে দিন রাত্রি ফুটবল্‌ টেনিস ক্রিকেট নিয়ে

থাক—তোমরা একবার পড়লে ব্যাট্‌বল্‌ গুলি-ডাণ্ডা সব সুদ্ধ ঘাড়মোড় ভেঙ্গে পড়বে।

বিপিন। আচ্ছা ভাই, সময় উপস্থিত হলে দেখা যাবে।

শ্রীশ। ও কথা ভাল নয়! সময় উপস্থিত হবে না, সময় উপস্থিত হতে দেব না। সময় ত রথে চড়ে আসেন না—আমরা তাঁকে ঘাড়ে করে নিয়ে আসি—কিন্তু তুমি যে সময়টার কথা বলচ তাকে বাহন অভাবে ফিরতেই হবে।

পূর্ণবাবুর প্রবেশ।

উভয়ে। এস এস পূর্ণ বাবু!

বিপিন তাহাকে কেদারাটা ছাড়িয়া দিয়া একটা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিল। পূর্ণর সহিত শ্রীশ ও বিপিনের তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না বলিয়া তাহাকে দুজনেই একটু বিশেষ খাতির করিয়া চলিত।

পূর্ণ। তোমাদের এই বারান্দায় জ্যোৎস্না-টিত মন্দ রচনা কর নি—মাঝে মাঝে থামের ছায়া ফেলে ফেলে সাজিয়েছ ভাল!

শ্রীশ। ছাদের উপর জ্যোৎস্না রচনা করা প্রভৃতি কতকগুলি অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা জন্মাবার পূর্ব্ব হতেই আমার কাছে। কিন্তু দেখ পূর্ণ বাবু, ঐ দেশলাই করা টরা ও গুলো আমার ভাল আসে না।

পূর্ণ। (বেলফুলের মালার দিকে চাহিয়া) সন্ন্যাসধর্ম্মেই কি তোমার অসামান্য দখল আছে না কি?

শ্রীশ। সেই কথাইত হচ্ছিল। সন্ন্যাসধর্ম্ম তুমি কাকে বল শুনি!

পূর্ণ। যে ধর্ম্মে দর্জ্জি ধোবা নাপিতের কোন সহায়তা নিতে হয় না, তাঁতীকে একেবারেই অগ্রাহ্য করিতে হয়, পিয়ার্স সোপের বিজ্ঞাপনের দিকে দৃক্‌পাত করতে হয় না—

শ্রীশ। আরে ছিঃ, সে সন্ন্যাসধর্ম্ম ত বুড়ো হয়ে মরে গেছে—এখন নবীন সন্ন্যাসী আছেন বলে' একটা সম্প্রদায় গড়্‌তে হবে—

পূর্ণ। বিদ্যাসুন্দরের যাত্রায় যে নবীন সন্ন্যাসী আছেন তিনি মন্দ দৃষ্টান্ত নন—কিন্তু তিনি ত চিরকুমার সভার বিধানমতে চলেন নি।

শ্রীশ। যদি চল্‌তেন তা হলে তিনিই ঠিক দৃষ্টান্ত হতে পার্ত্তেন। সাজে সজ্জায় বাক্যে আচরণে সুন্দর এবং সুনিপুণ হতে হবে—

পূর্ণ। কেবল রাজকন্যার দিক থেকে দৃষ্টি নামাতে হবে। এই ত? বিনি সুতোর মালা গাঁথ্‌তে হবে কিন্তু সে মালা পরাতে হবে কার গলায় হে?

শ্রীশ। স্বদেশের!; কথাটা কিছু উচ্চ শ্রেণীর হয়ে পড়ল, কিন্তু কি করব বল, মালিনী মাসী এবং রাজকুমারী একেবারেই নিষিদ্ধ কিন্তু ঠাট্টা নয় পূর্ণ বাবু—

পূর্ণ। ঠাট্টার মত মোটেই শোনাচ্চেনা—ভয়ানক কড়া কথা, একেবারে খট্‌খটে শুক্‌নো!

শ্রীশ। আমাদের চিরকুমার সভা থেকে এমন একটি সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গঠন করতে হবে যারা রুচি, শিক্ষা ও কর্ম্মে সকল গৃহস্থের আদর্শ হবে। যারা সঙ্গীত প্রভৃতি কলাবিদ্যায় অদ্বিতীয় হবে, আবার লাঠি তলোয়ার খেলা, ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক লক্ষ্য করায় পারদর্শী হবে—

পূর্ণ। অর্থাৎ মনোহরণ এবং প্রাণ হরণ দুই কর্ম্মেই মজবুৎ হবে। পুরুষ দেবী চৌধুরাণীর দল আর কি।

শ্রীশ। বঙ্কিম বাবু আমার আইডিয়াটা পূর্ব্বে হতেই চুরি করে রেখেছেন—কিন্তু ওটাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের নিজের করে নিতে হবে।

পূর্ণ। সভাপতি মশায় কি বলেন?

শ্রীশ। তাঁকে কাঁদিন ধরে বুঝিয়ে বুঝিয়ে

আমার দলে টেনে নিয়েছি। কিন্তু তিনি তাঁর দেশলাইয়ের কাঠি ছাড়েন নি। তিনি বলেন সন্ন্যাসীরা কৃষিতত্ত্ব বস্তুতত্ত্ব প্রভৃতি শিখে গ্রামে গ্রামে চাষাদের শিখিয়ে বেড়ায়—এক টাকা করে শেয়ার নিয়ে একটা ব্যাঙ্ক খুলে বড় বড় পল্লীতে নূতন নিয়মে এক একটা দোকান বসিয়ে আস্‌বে—ভারতবর্ষের চারিদিকে বাণিজ্যের জাল বিস্তার করে দেবে। তিনি খুব মেতে উঠেছেন।

পূর্ণ। বিপিনবাবুর কি মত?

আসলে, বিপিনের মতে শ্রীশের এই কল্পনাটি কার্য্যসাধ্য নয়, কিন্তু শ্রীশের সর্ব্বপ্রকার পাগ্‌লামিকে সে স্নেহের চক্ষে দেখিত;—প্রতিবাদ করিয়া শ্রীশের উৎসাহে আঘাত দিতে তাহার কোনমতেই মন সরিত না। সে বলিল—যদিচ আমি নিজেকে শ্রীশের নবীন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের আদর্শ পুরুষ বলে জ্ঞান করিনে কিন্তু দল যদি গড়ে ওঠে ত আমিও সন্ন্যাসী সাজ্‌তে রাজি আছি।

পূর্ণ। কিন্তু সাজ্‌তে খরচ আছে মশায়—কেবল কৌপীন নয় ত—অঙ্গদ, কুণ্ডল, আভরণ, কুন্তলীন, দেল্‌খোস্‌—

শ্রীশ। পূর্ণ বাবু ঠাট্টাই কর আর যাই কর, চিরকুমার সভা সন্ন্যাসী সভা হবেই। আমরা একদিকে কঠোর আত্মত্যাগ করব, অন্যদিকে মনুষ্যত্বের কোন উপকরণ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করব না—আমরা কঠিন শৌর্য্য এবং ললিত সৌন্দর্য্য উভয়কেই সমান আদরে বরণ করব—সেই দুরূহ সাধনায় ভারতবর্ষে নবযুগের আবির্ভাব হবে—

পূর্ণ। বুঝেছি শ্রীশবাবু—কিন্তু নারী কি মনুষ্যত্বের একটা সর্ব্বপ্রধান উপকরণের মধ্যে গণ্য নয়? এবং তাঁকে উপেক্ষা করলে ললিত সৌন্দর্য্যের প্রতি কি সমাদর রক্ষা হবে? তার কি উপায় করলে?

শ্রীশ। নারীর একটা দোষ নরজাতিকে তিনি লতার মত বেষ্টন করে ধরেন, যদি তাঁর দ্বারা বিজড়িত হবার আশঙ্কা না থাক্‌ত, যদি তাঁকে রক্ষা করেও স্বাধীনতা রক্ষা করা যেত, তা হলে কোন কথা ছিল না। কাজে যখন জীবন উৎসর্গ করতে হবে তখন কাজের সমস্ত বাধা দূর করতে চাই—পাণিগ্রহণ করে ফেল্‌লে নিজের পাণিকেও বদ্ধ করে ফেল্‌তে হবে, সে হলে চল্‌বে না পূর্ণবাবু!

পূর্ণ। ব্যস্ত হয়োনা ভাই, আমি আমার শুভ বিবাহে তোমাদের নিমন্ত্রণ করতে আসিনি। কিন্তু ভেবে দেখ দেখি, মনুষ্য জন্ম আর পাব কি না সন্দেহ—অথচ হৃদয়কে চিরজীবন যে পিপাসার জল থেকে বঞ্চিত করতে যাচ্চি তার পূরণস্বরূপ আর কোথাও আর কিছু জুটবে কি? মুসলমানের স্বর্গে হুরি আছে হিন্দুর স্বর্গেও অপ্সরার অভাব নেই, চিরকুমার সভার স্বর্গে সভাপতি এবং সভ্যমশায়দের চেয়ে মনোরম আর কিছু পাওয়া যাবে কি!

শ্রীশ। পূর্ণবাবু বল কি? তুমি যে—

পূর্ণ। ভয় নেই ভাই, এখনো মরিয়া হয়ে উঠিনি। তোমার এই ছাদভরা জ্যোৎস্না আর ঐ বেল ফুলের গন্ধ কি কৌমার্য্যব্রতরক্ষায় সহায়তা করবার জন্যে সৃষ্ট হয়েছে? মনের মধ্যে মাঝে মাঝে যে বাষ্প জমে আমি সেটাকে উচ্ছ্বসিত করে দেওয়াই ভাল বোধ করি—চেপে রেখে নিজেকে ভোলাতে গেলে কোন দিন চিরকুমারব্রতের লোহার বয়লার খানা ফেটে যাবে। যাই হোক্‌ যদি সন্ন্যাসী হওয়াই স্থির কর ত আমিও যোগ দেব—কিন্তু আপাততঃ সভাটাকে ত রক্ষা করতে হবে।

শ্রীশ। কেন? কি হয়েছে?

পূর্ণ। অক্ষয় বাবু আমাদের সভাকে যে স্থানান্তর করবার ব্যবস্থা করচেন এটা আমার ভাল ঠেক্‌চে না।

শ্রীশ। সন্দেহ জিনিষটা নাস্তিকতার ছায়া। মন্দ হবে, ভেঙ্গে যাবে, নষ্ট হবে এ সব ভাব আমি কোন অবস্থাতেই মনে স্থান দিইনে। ভালই হবে—যা হচ্চে বেশ হচ্চে—চিরকুমার সভার উদার বিস্তীর্ণ ভবিষ্যৎ আমি চোখের সম্মুখে দেখ্‌তে পাচ্চি—অক্ষয় বাবু সভাকে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে তার কি অনিষ্ট কর্‌তে পারেন? কেবল গলির এক নম্বর থেকে আরেক নম্বরে নয়, আমাদের যে পথে পথে দেশে দেশে সঞ্চরণ করে বেড়াতে হবে! সন্দেহ শঙ্কা উদ্বেগ এগুলো মন থেকে দূর করে দাও পূর্ণবাবু—বিশ্বাস এবং আনন্দ না হলে বড় কাজ হয় না!

পূর্ণ নিরুত্তর হইয়া বসিয়া রহিল। বিপিন কহিল—দিনকতক দেখাইযাক্‌ না—যদি কোন অসুবিধার কারণ ঘটে তা হলে স্বস্থানে ফিরে আসা যাবে—আমাদের সেই অন্ধকার বিবরটি ফস্‌করে কেউ কেড়ে নিচ্চে না!

হায়, পূর্ণের হৃদয় বেদনা কে বুঝিবে?

অকস্মাৎ চন্দ্রমাধব বাবুর সবেগে প্রবেশ। তিন জনের সসম্ভ্রমে উত্থান।

চন্দ্র। দেখ আমি সেই কথাটা ভাবছিলুম—

শ্রীশ। বসুন!

চন্দ্র। না, না, বসব না, আমি এখনি যাচ্চি! আমি বল্‌ছিলুম, সন্ন্যাসব্রতের জন্যে আমাদের এখন থেকে প্রস্তুত হতে হবে। হঠাৎ একটা অপঘাত ঘট্‌লে, কিংবা সাধারণ জ্বরজ্বালায়, কি রকম চিকিৎসা সে আমাদের শিক্ষা করতে হবে—ডাক্তার রামরতন বাবু কি রবিবারে আমাদের দুঘণ্টা করে বক্তৃতা দেবেন বন্দোবস্ত করে এসেছি।

শ্রীশ। কিন্তু তাতে অনেক বিলম্ব হবে না?

চন্দ্র। বিলম্বত হবেই, কাজটিত সহজ নয়। কেবল তাই নয়—আমাদের কিছু কিছু আইন অধ্যয়নও দরকার। অবিচার অত্যাচার থেকে রক্ষা করা, এবং কার কতদূর অধিকার সেটা চাষাভুষোদের বুঝিয়ে দেওয়া আমাদের কাজ।

শ্রীশ। চন্দ্রবাবু বসুন—

চন্দ্র। না শ্রীশবাবু, বস্‌তে পারচিনে, আমার একটু কাজ আছে। আর একটি আমাদের করতে হচ্চে—গোরুর গাড়ি, ঢেঁকি, তাঁত প্রভৃতি আমাদের দেশী অত্যাবশ্যক জিনিষগুলিকে একটু আধটু সংশোধন করে যাতে কোন অংশে তাদের শস্তা বা মজবুৎ বা বেশী উপযোগী করে তুল্‌তে পারি সে চেষ্টা আমাদের করতে হবে। এবারে গর্ম্মির ছুটিতে কেদারবাবুদের কারখানায় গিয়ে প্রত্যহ আমাদের কতকগুলি পরীক্ষা করা চাই।

শ্রীশ। চন্দ্রবাবু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন—(চৌকি অগ্রসরকরণ)।

চন্দ্র। না, না, আমি এখনি যাচ্চি। দেখ আমার মত এই যে, এই সমস্ত গ্রামের ব্যবহার্য্য সামান্য জিনিষগুলির যদি আমরা কোন উন্নতি করিতে পারি তা হলে তাতে করে চাষাদের মনের মধ্যে যে রকম আন্দোলন হবে, বড় বড় সংস্কার কার্য্যেও তেমন হবে না। তাদের সেই চিরকেলে ঢেঁকি ঘাণির কিছু পরিবর্ত্তন করতে পারলে তবে তাঁদের সমস্ত মন সজাগ হয়ে উঠবে, পৃথিবী যে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই এ তারা বুঝতে পারবে—

শ্রীশ। চন্দ্রবাবু বসবেন না কি?

চন্দ্র। থাক না। একবার ভেবে দেখ আমরা যে এতকাল ধরে শিক্ষা পেয়ে আসচি

উচিত ছিল আমাদের ঢেঁকি, কুলো থেকে তার পরিচয় আরম্ভ হওয়া। বড় বড় কল-কারখানা ত দূরের কথা, ঘরের মধ্যেই আমাদের সজাগ দৃষ্টি পড়ল না। আমাদের হাতের কাছে যা আছে আমরা না তার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলুম, না তার সম্বন্ধে কিছুমাত্র চিন্তা করলুম। যা ছিল সব তেমনিই রয়ে গেছে। মানুষ অগ্রসর হচ্চে অথচ তার জিনিষপত্র পিছিয়ে থাকচে এ কখনো হতেই পারে না। আমরা পড়েই আছি—ইংরাজ আমাদের কাঁধে করে বহন করেচে, তাকে এগোনো বলে না! ছোট খাটো সামান্য গ্রাম্য জীবন-যাত্রা পল্লীগ্রামের পঙ্কিল পথের মধ্যে বদ্ধ হয়ে অচল হয়ে আছে, আমাদের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে সেই গরুর গাড়ির চাকা ঠেলতে হবে—কলের গাড়ির চালক হবার দুরাশা এখন থাক্! কটা বাজল শ্রীশবাবু?

শ্রীশ। সাড়ে আটটা বেজে গেছে।

চন্দ্র। তাহলে আমি যাই। কিন্তু এই কথা রইল, আমাদের এখন অন্য সমস্ত আলোচনা ছেড়ে নিয়মিত শিক্ষাকার্য্যে প্রবৃত্ত হতে হবে এবং—

পূর্ণ। আপনি যদি একটু বসেন চন্দ্রবাবু তাহলে আমার দুই একটা কথা বলবার আছে—

চন্দ্র। না আজ আর সময় নেই—

পূর্ণ। বেশী কিছু নয় আমি বল্‌ছিলুম আমাদের সভা—

চন্দ্র। সে কথা কাল হবে পূর্ণবাবু—

পূর্ণ। কিন্তু কালই ত সভা বসচে—

চন্দ্র। আচ্ছা তা হলে পরশু, আমার সময় নেই—

পূর্ণ। দেখুন, অক্ষয় বাবু যে—

চন্দ্র। পূর্ণবাবু আমাকে মাপ করতে হবে, আজ দেরি হয়ে গেছে। কিন্তু দেখ, আমার একটা কথাই মনে হচ্ছিল যে, চিরকুমার সভা যদি ক্রমে বিস্তীর্ণ হয়ে পড়ে তাহলে আমাদের সকল সভ্যই কিছু সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যেতে পারবেন না—অতএব ওর মধ্যে দুটি বিভাগ রাখা দরকার হবে—

পূর্ণ। স্থাবর এবং জঙ্গম।

চন্দ্র। তা সে যে নামই দাও। তা ছাড়া অক্ষয়বাবু সে দিন একটি কথা যা বল্লেন সেও আমার মন্দ লাগ্‌ল না। তিনি বল্লেন, চির-কুমার সভার সংস্রবে আর একটি সভা রাখা উচিত যাতে বিবাহিত এবং বিবাহ সংকল্পিত লোকদের নেওয়া যেতে পারে। গৃহী লোক-দেরও ত দেশের প্রতি কর্ত্তব্য আছে। সকলকেই সাধ্যমত কোন না কোন হিতকর কাজে নিযুক্ত থাকতে হবে—এইটে হচ্চে সাধারণ ব্রত। আমাদের একদল কুমারব্রত ধারণ করে দেশে দেশে বিচরণ করবেন, এক-দল কুমারব্রত ধারণ করে একজায়গায় স্থায়ী হয়ে বসে কাজ করবেন, আর একদল গৃহী নিজ নিজ রুচি ও সাধ্য অনুসারে একটা কোন প্রয়োজনীয় কাজ অবলম্বন করে দেশের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করবেন। যাঁরা পর্য্যটক সম্প্র-দায়ভুক্ত হবেন তাঁদের ম্যাপ প্রস্তুত, জরিপ, ভূতত্ত্ববিদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্যা, প্রাণিতত্ত্ব প্রভৃতি শিখতে হবে;—তাঁরা যে দেশে যাবেন সেখান-কার সমস্ত তথ্য তন্ন তন্ন করে সংগ্রহ করবেন—তা হলেই ভারতবর্ষীয়ের দ্বারা ভারতবর্ষের যথার্থ বিবরণ লিপিবদ্ধ হবার ভিত্তি স্থাপিত পারবে—হণ্টার সাহেবের উপরেই নির্ভর করে কাটাতে হবে না—

পূর্ণ। চন্দ্রবাবু যদি বসেন তা হলে একটা কথা—

চন্দ্র। না—আমি বল্‌ছিলুম যেখানে যেখানে যাব সেখানকার ঐতিহাসিক জনশ্রু

এবং পুরাতন পুঁথি সংগ্রহ করা আমাদের কাজ হবে—শিলালিপি, তাম্রশাসন এগুলোও সন্ধান করতে হবে—অতএব প্রাচীন লিপি পরিচয়টাও আমাদের কিছুদিন অভ্যাস করা আবশ্যক।

পূর্ণ। সে সব ত পরের কথা, আপাততঃ—

চন্দ্র। না, না, আমি বল্‌চিনে সকলকেই সব বিদ্যা শিখতে হবে, তা হলে কোন কালে শেষ হবে না। অভিরুচি অনুসারে ওর মধ্যে আমরা কেউবা একটা কেউবা দুটো তিনটে শিক্ষা করব—

শ্রীশ। কিন্তু তা হলেও—

চন্দ্র। ধর, পাঁচ বছর। পাঁচ বছরে আমরা প্রস্তুত হয়ে বেরতে পারব। যারা চির জীবনের ব্রত গ্রহণ করবে, পাঁচ বছর তাদের পক্ষে কিছুই নয়। তা ছাড়া এই পাঁচ বছরেই আমাদের পরীক্ষা হয়ে যাবে—যাঁরা টিকে থাকতে পারবেন তাঁদের সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকবে না।

পূর্ণ। কিন্তু দেখুন, আমাদের সভাটা যে স্থানান্তর করা হচ্চে,—

চন্দ্র। না পূর্ণবাবু আজ আর কিছুতেই না, আমার অত্যন্ত জরুরী কাজ আছে। পূর্ণবাবু আমার কথাগুলো ভাল করে চিন্তা করে দেখো। আপাততঃ মনে হতে পারে অসাধ্য—কিন্তু তা নয়। দুঃসাধ্য বটে—তা ভাল কাজ মাত্রই দুঃসাধ্য। আমরা যদি পাঁচটি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক পাই তা হলে আমরা যা কাজ করব তা চিরকালের জন্য ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করে দেবে।

শ্রীশ। কিন্তু আপনি যে বলছিলেন গোরুর গাড়ির চাকা প্রভৃতি ছোট ছোট জিনিষ—

চন্দ্র। ঠিক কথা, আমি তাকেও ছোট মনে করে উপেক্ষা করিনে—এবং বড় কাজ-কেও অসাধ্য জ্ঞান করে ভয় করিনে—

পূর্ণ। কিন্তু সভার অধিবেশন সম্বন্ধেও—

চন্দ্র। সে সব কথা কাল হবে পূর্ণবাবু! আজ তবে চল্লুম!

(চন্দ্রবাবুর দ্রুতবেগে প্রস্থান)

বিপিন। ভাই শ্রীশ, চুপচাপ যে! এক মাতালের মাৎলামী দেখে অন্য মাতালের নেশা ছুটে যায়। চন্দ্রবাবুর উৎসাহে তোমাকে সুদ্ধ দমিয়ে দিয়েছে।

শ্রীশ। না হে, অনেক ভাববার কথা আছে। উৎসাহ কি সব সময়ে কেবল বকা-বকি করে? কখনো বা একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে থাকে, সেইটেই হল সাংঘাতিক অবস্থা।

বিপিন। পূর্ণবাবু হঠাৎ পালাচ্চ যে?

পূর্ণ। সভাপতি মশায়কে রাস্তায় ধরতে যাচ্চি—পথে যেতে যেতে যদি দৈবাৎ আমার দুটো একটা কথায় কর্ণপাত করেন।

বিপিন। ঠিক উল্টো হবে। তাঁর যে কটা কথা বাকি আছে সেই গুলো তোমাকে শোনাতে শোনাতে কোথায় যাবার আছে সে কথা ভুলেই যাবেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

চন্দ্রমাধব বাবু যখন ডাকিলেন—"নির্ম্মল," তখন একটা উত্তর পাইলেন বটে, "কি মামা," কিন্তু সুরটা ঠিক বাজিল না। চন্দ্রবাবু ছাড়া আর যে কেহ হইলে বুঝিতে পারিত সে অঙ্কে অল্প একটুখানি গোল আছে।

"নির্ম্মল, আমার গলার বোতামটা খুঁজে পাচ্চিনে।"

"বোধ হয় ঐখানেই কোথাও আছে।"

এরূপ অনাবশ্যক এবং অনির্দ্দিষ্ট সংবাদে কাহারও কোন উপকার নাই, বিশেষতঃ যাহার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ। ফলতঃ এই সংবাদে অদৃশ্য বোতাম সম্বন্ধে কোন নূতন জ্ঞানলাভের সহায়তা না করিলেও নির্ম্মলার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেকটা আলোক বর্ষণ করিল। কিন্তু অধ্যাপক চন্দ্রমাধব বাবুর দৃষ্টিশক্তি সে দিকেও যথেষ্ট প্রখর নহে। তিনি অন্য দিনের মতই নিশ্চিন্ত নির্ভরের ভাবে কহিলেন—একবার খুঁজে দেখত ফেনি!

নির্ম্মলা কহিল—তুমি কোথায় কি ফেল আমি কি খুঁজে বের করতে পারি?

এতক্ষণে চন্দ্রবাবুর স্বভাবনিঃশঙ্ক মনে একটুখানি সন্দেহের সঞ্চার হইল—স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন—তুমিই ত পার নির্ম্মল! আমার সমস্ত ত্রুটি সম্বন্ধে এত ধৈর্য্য আর কার আছে?

নির্ম্মলার রুদ্ধ অভিমান চন্দ্রবাবুর স্নেহস্বরে অকস্মাৎ অশ্রুজলে বিগলিত হইবার উপক্রম করিল; নিঃশব্দে সম্বরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া চন্দ্রমাধববাবু নির্ম্মলার কাছে আসিলেন এবং যেমন করিয়া সন্দিগ্ধ মোহরটি চোখের খুব কাছে ধরিয়া পরীক্ষা করিতে হয় তেমনি করিয়া নির্ম্মলার মুখখানি দুই আঙুল দিয়া তুলিয়া ধরিয়া ক্ষণকাল দেখিলেন এবং গম্ভীর মৃদু হাস্যে কহিলেন নির্ম্মল আকাশে একটুখানি মালিন্য দেখচি যেন! কি হয়েছে বল দেখি?

নির্ম্মলা জানিত চন্দ্রমাধব অনুমানের চেষ্টাও করিবেন না। যাহা স্পষ্ট প্রকাশমান নহে তাহা তিনি মনের মধ্যে স্থানও দিতেন না। তাঁহার নিজের চিত্ত যেমন শেষ পর্য্যন্ত স্বচ্ছ অন্যের নিকটও সেইরূপ একান্ত স্বচ্ছতা প্রত্যাশা করিতেন।

নির্ম্মলা ক্ষুব্ধস্বরে কহিল—এত দিন পরে আমাকে তোমাদের চিরকুমার সভা থেকে বিদায় দিচ্চ কেন? আমি কি করেছি?

চন্দ্রমাধববাবু আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন—চিরকুমার সভা থেকে তোমাকে বিদায়? তোমার সঙ্গে সে সভার যোগ কি?

নির্ম্মলা। দরজার আড়ালে থাক্‌লে বুঝি যোগ থাকে না? অন্ততঃ সেই যতটুকু যোগ তাই বা কেন যাবে?

চন্দ্রবাবু। নির্ম্মল, তুমিত এ সভার কাজ করবে না—যারা কাজ করবে তাদের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখেই—

নির্ম্মলা। আমি কেন কাজ করব না? তোমার ভাগ্নে না হয়ে ভাগ্নী হয়ে জন্মেছি বলেই কি তোমাদের হিতকার্য্যে যোগ দিতে পারব না? তবে আমাকে এত দিন শিক্ষা দিলে কেন? নিজের হাতে আমার সমস্ত মন প্রাণ জাগিয়ে দিয়ে শেষকালে কাজের পথ রোধ করে দাও কি বলে?

চন্দ্রমাধববাবু এই উচ্ছ্বাসের জন্য কিছুমাত্র প্রস্তুত ছিলেন না; তিনি যে নির্ম্মলাকে নিজে কি ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহা নিজেই জানিতেন না। ধীরে ধীরে কহিলেন—নির্ম্মল, এক সময়ে ত বিবাহ করে তোমাকে সংসারের কাজে প্রবৃত্ত হতে হবে—চিরকুমার সভার কাজ—

"বিবাহ আমি করব না!"

"তবে কি করবে বল?"

"দেশের কাজে তোমার সাহায্য করব।"

"আমরা ত সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়েছি!"

"ভারতবর্ষে কি কেউ কখনো সন্ন্যাসিনী হয়নি ?"

চন্দ্রমাধববাবু স্তম্ভিত হইয়া হারানো বোতামটার কথা একেবারে ভুলিয়া গেলেন। নিরুত্তর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

উৎসাহদীপ্তিতে মুখ আরক্তিম করিয়া নির্ম্মলা কহিল—মামা, যদি কোন মেয়ে তোমাদের ব্রত গ্রহণের জন্যে অন্তরের সঙ্গে প্রস্তুত হয় তবে প্রকাশ্যভাবে তোমাদের সভার মধ্যে কেন তাকে গ্রহণ করবে না? আমি তোমাদের কৌমার্য্য সভার কেন সভ্য না হব ?

নিষ্কলুষচিত্ত চন্দ্রমাধবের কাছে ইহার কোন উত্তর ছিল না। তবু দ্বিধাকুণ্ঠিতভাবে বলিতে লাগিলেন—অন্য যাঁরা সভ্য আছেন—

নির্ম্মলা কথা শেষ না হইতেই বলিয়া উঠিল—যাঁরা সভ্য আছেন, যাঁরা ভারতবর্ষের হিতব্রত নেবেন, যাঁরা সন্ন্যাসী হতে যাচ্চেন—তাঁরা কি একজন ব্রতধারিণী স্ত্রীলোককে অসঙ্কোচে নিজের দলে গ্রহণ করতে পারবেন না ? তা যদি হয় তাহলে তাঁরা গৃহী হয়ে ঘরে রুদ্ধ থাকুন্ তাঁদের দ্বারা কোন কাজ হবে না!

চন্দ্রমাধববাবু চুলগুলোর মধ্যে ঘন ঘন পাঁচ আঙুল চালাইয়া অত্যন্ত উস্কোখুস্কো করিয়া তুলিলেন। এমন সময় হঠাৎ তাঁহার আস্তিনের ভিতর হইতে হারা বোতামটা মাটিতে পড়িয়া গেল। নির্ম্মলা হাসিতে হাসিতে কুড়াইয়া লইয়া চন্দ্রমাধব বাবুর কামিজের গলায় লাগাইয়া দিল—চন্দ্রমাধববাবু তাহার কোন খবরই লইলেন না—চুলের মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে মস্তিষ্ক কুলায়ের চিন্তাগুলিকে বিব্রত করিতে লাগিলেন।

চাকর আসিয়া খবর দিল, পূর্ণবাবু আসিয়াছেন। নির্ম্মলা ঘর হইতে চলিয়া গেলে তিনি প্রবেশ করিলেন। কহিলেন—চন্দ্রবাবু, সে কথাটা কি ভেবে দেখ্‌লেন ? আমাদের সভাটিকে স্থানান্তর করা আমার বিবেচনায় ভাল হচ্চে না!

চন্দ্রবাবু। আজ আর একটি কথা উঠছে, সেটা পূর্ণবাবু তোমার সঙ্গে ভাল করে আলোচনা করতে ইচ্ছা করি। আমার একটি ভাগ্নী আছেন বোধ হয় জান ?

পূর্ণ। (নিরীহভাবে) আপনার ভাগ্নী ?

চন্দ্র। হাঁ, তাঁর নাম নির্ম্মলা। আমাদের চিরকুমার সভার সঙ্গে তাঁর হৃদয়ের খুব যোগ আছে!

পূর্ণ। (বিস্মিতভাবে) বলেন কি ?

চন্দ্র। আমার বিশ্বাস, তাঁর অনুরাগ এবং উৎসাহ আমাদের কারো চেয়ে কম নয়।

পূর্ণ। (উত্তেজিতভাবে) এ কথা শুনলে আমাদের উৎসাহ বেড়ে ওঠে! স্ত্রীলোক হয়ে তিনি—

চন্দ্রবাবু। আমিও সেই কথা ভাবচি, স্ত্রীলোকের সরল উৎসাহ পুরুষের উৎসাহে যেন নূতন প্রাণ সঞ্চার করতে পারে—আমি নিজেই সেটা আজ অনুভব করেছি!

পূর্ণ। (আবেগপূর্ণভাবে) আমিও সেটা বেশ অনুমান করতে পারি।

চন্দ্রবাবু। পূর্ণবাবু, তোমারও কি ঐ মত ?

পূর্ণ। কি মত বল্‌চেন ?

চন্দ্র। অর্থাৎ যথার্থ অনুরাগী স্ত্রীলোক আমাদের কঠিন কর্ত্তব্যের বাধা না হয়ে যথার্থ সহায় হতে পারেন ?

পূর্ণ। (নেপথ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উচ্চ কণ্ঠে) সে বিষয়ে আমার লেশমাত্র সন্দেহ নেই। স্ত্রীজাতির অনুরাগ পুরুষের অনুরাগের একমাত্র সজীব নির্ভর—পুরুষের উৎসাহকে নবজাত শিশুটির মত মানুষ করে তুলতে পারে কেবল স্ত্রীলোকের উৎসাহ।

শ্রীশ ও বিপিনের প্রবেশ।

শ। তাত পারে পূর্ণবাবু—কিন্তু সেই উৎসাহের অভাবেই কি আজ সভায় যেতে বিলম্ব হচ্চে?

পূর্ণ এত উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিয়াছিলেন যে নবাগত দুইজনে সিঁড়ি হইতে সকল কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন।

চন্দ্রবাবু কহিলেন, না, না, দেরি হবার কারণ, আমার গলার বোতামটা কিছুতেই খুঁজে পাচ্চিনে।

শ্রীশ। গলায় ত একটা বোতাম লাগান রয়েছে দেখতে পাচ্চি—আরো কি প্রয়োজন আছে? যদি বা থাকে, আর ছিদ্র পাবেন কোথা?

চন্দ্রবাবু গলায় হাত দিয়া বলিলেন, তাইত। বলিয়া ঈষৎ লজ্জিত হইয়া হাসিতে লাগিলেন।

চন্দ্র। আমরা সকলেই ত উপস্থিত আছি এখন সেই কথাটার আলোচনা হয়ে যাওয়া ভাল, কি বল পূর্ণবাবু?

হঠাৎ পূর্ণবাবুর উৎসাহ অনেকটা নামিয়া গেল। নির্ম্মলার নাম করিয়া সকলের কাছে আলোচনা উত্থাপন তাহার কাছে রুচিকর বোধ হইল না। সে কিছু কুণ্ঠিতস্বরে কহিল, সে বেশ কথা কিন্তু এদিকে দেরি হয়ে যাচ্চে না?

চন্দ্র। না, এখনো সময় আছে। শ্রীশবাবু তোমরা একটু বস না কথাটা একটু স্থির হয়ে ভেবে দেখবার যোগ্য। আমার একটী ভাগ্নী আছেন, তাঁর নাম নির্ম্মলা,—

পূর্ণ হঠাৎ কাশিয়া লাল হইয়া উঠিল। ভাবিল চন্দ্রবাবুর কাণ্ডজ্ঞান মাত্রই নাই—পৃথিবীর লোকের কাছে নিজের ভাগ্নীর পরিচয় দিবার কি দরকার—অনায়াসে নির্ম্মলাকে বাদ দিয়া কথাটা আলোচনা করা যাইতে পারে। কিন্তু কোন কথার কোন অংশ বাদ দিয়া বলা চন্দ্রবাবুর স্বভাব নহে।

চন্দ্র। আমাদের কুমারসভার সমস্ত উদ্দেশ্যের সঙ্গে তাঁর একান্ত সহানুভূতি।

এত বড় একটা খবর শ্রীশ এবং বিপিন অবিচলিত নিরুৎসুক ভাবে শুনিয়া যাইতে লাগিল। পূর্ণ কেবলি ভাবিতে লাগিল নির্ম্মলার প্রসঙ্গ সম্বন্ধে যাহারা জড় পাষাণের মত উদাসীন, নির্ম্মলাকে যাহারা পৃথিবীর সাধারণ স্ত্রীলোকের সহিত পৃথক করিয়া দেখে না, তাহাদের কাছে সে নামের উল্লেখ করা কেন?

চন্দ্র। এ কথা আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি তাঁর উৎসাহ আমাদের কারো চেয়ে কম নয়।

শ্রীশ ও বিপিনের কাছ হইতে কিছুমাত্র সাড়া না পাইয়া চন্দ্রবাবুও বোধ করি মনে মনে একটু উত্তেজিত হইতেছিলেন।

চন্দ্র। একথা আমি ভালরূপ বিবেচনা করে দেখে স্থির করেছি স্ত্রীলোকের উৎসাহ পুরুষের সমস্ত বৃহৎ কার্য্যের মহৎ অবলম্বন। কি বল পূর্ণবাবু।

পূর্ণবাবুর কোন কথা বলিবার ইচ্ছাই ছিল না—কিন্তু নিস্তেজভাবে বলিল, তা ত বটেই।

চন্দ্রবাবুর পালে কোন দিক হইতে কোন হাওয়া লাগিল না দেখিয়া হঠাৎ সবেগে ঝোঁকা মারিয়া বলিয়া উঠিলেন—নির্ম্মলা যদি কুমারসভার সভ্য হবার জন্য প্রার্থী থাকে তাহলে তাকে আমরা সভ্য না করব কেন?

পূর্ণ ত একেবারে বজ্রাহতবৎ! বলিয়া উঠিল—বলেন কি চন্দ্রবাবু?

শ্রীশ পূর্ণর মত অত্যুগ্র বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া কহিল—আমরা কখনো কল্পনা করিনি যে, কোন স্ত্রীলোক আমাদের সভার সভ্য হতে ইচ্ছা প্রকাশ করবেন, সুতরাং এ সম্বন্ধে আমাদের কোন নিয়ম নেই—

ন্যায়পরায়ণ বিপিন গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, নিষেধও নেই।

অসহিষ্ণু শ্রীশ কহিল, স্পষ্ট নিষেধ না থাকতে পারে কিন্তু আমাদের সভার যে সকল উদ্দেশ্য তা স্ত্রীলোকের দ্বারা সাধিত হবার নয়।

কুমারসভায় স্ত্রীলোকসভ্য লইবার জন্য বিপিনের যে বিশেষ উৎসাহ ছিল তাহা নয়, কিন্তু তাহার মানসপ্রকৃতির মধ্যে একটা স্বাভাবিক সংযম থাকায় কোন শ্রেণীবিশেষের বিরুদ্ধে একদিকঘেঁষা কথা সে সহিতে পারিত না। তাই সে বলিয়া উঠিল—আমাদের সভার উদ্দেশ্য সঙ্কীর্ণ নয়; এবং বৃহৎ উদ্দেশ্য সাধন করতে গেলে বিচিত্র শ্রেণীর ও বিচিত্র শক্তির লোকের বিচিত্র চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া চাই। স্বদেশের হিতসাধন একজন স্ত্রীলোক যে রকম পারবেন তুমি সে রকম পারবে না এবং তুমি যে রকম পারবে একজন স্ত্রীলোক সে রকম পারবেন না—অতএব সভার উদ্দেশ্যকে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণভাবে সাধন করতে গেলে তোমারও যেমন দরকার স্ত্রীসভ্যেরও তেমনি দরকার।

লেশমাত্র উত্তেজনা প্রকাশ না করিয়া বিপিন শান্তগম্ভীরস্বরে বলিয়া গেল—কিন্তু শ্রীশ কিছু উত্তপ্ত হইয়া বলিল, যারা কাজ করতে চায় না, তারাই উদ্দেশ্যকে ফলাও করে তোলে। যথার্থ কাজ করতে গেলেই লক্ষ্যকে সীমাবদ্ধ করতে হয়। আমাদের সভার উদ্দেশ্যকে যত বৃহৎ মনে করে তুমি বেশ নিশ্চিন্ত আছ, আমি তত বৃহৎ মনে করিনে।

বিপিন শান্তমুখে কহিল, আমাদের সভার কার্য্যক্ষেত্র অন্ততঃ এতটা বৃহৎ যে তোমাকে গ্রহণ করেচে বলে আমাকে পরিত্যাগ করতে হয় নি এবং আমাকে গ্রহণ করেচে বলে তোমাকে পরিত্যাগ করতে হয় নি। তোমার আমার উভয়েরই যদি এখানে স্থান হয়ে থাকে, আমাদের দুজনেরই যদি এখানে উপযোগিতা ও আবশ্যকতা থাকে তাহলে আরও একজন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের এখানে স্থান হওয়া এমন কি কঠিন?

শ্রীশ চটিয়া কহিল—উদারতা অতি উত্তম জিনিষ, সে আমি নীতিশাস্ত্রে পড়েছি। আমি তোমার সেই উদারতাকে নষ্ট করতে চাইনে, বিভক্ত করতে চাই মাত্র। স্ত্রীলোকেরা যে কাজ করতে পারেন তার জন্যে তাঁরা স্বতন্ত্র সভা করুন, আমরা তার সভ্য হবার প্রার্থী হব না এবং আমাদের সভাও আমাদেরই থাক্! নইলে আমরা পরস্পরের কাজের বাধা হব মাত্র। মাথাটা চিন্তা করে মরুক্; উদরটা পরিপাক করতে থাক—পাকযন্ত্রটি মাথার মধ্যে এবং মস্তিষ্কটি পেটের মধ্যে প্রবেশ চেষ্টা না করলেই বস্!

বিপিন। কিন্তু তাই বলে মাথাটা ছিঁ[ড়ে] এক জায়গায় এবং পাকযন্ত্রটাকে আ[র] এক জায়গায় রাখলেও কাজের সুবিধা হয় না!

শ্রীশ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিল—উপম[া] ত আর যুক্তি নয় যে সেটাকে খণ্ডন করলে[ই] আমার কথাটাকে খণ্ডন করা হল! উপ[মা] কেবল খানিক দূর পর্য্যন্ত খাটে—

বিপিন অর্থাৎ যতটুকু কেবল তোমা[র] যুক্তির পক্ষে খাটে।

এই দুই পরম বন্ধুর মধ্যে এমন বিব[াদ] সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে। পূর্ণ অত্যন্ত বিমনা হই[য়া] বসিয়াছিল—সে কহিল, বিপিন বাবু আম[ার] মত এই যে, আমাদের এই সকল কা[জে] মেয়েরা অগ্রসর হয়ে এলে তাতে তাঁদের মা[ধুর্য্য] নষ্ট হয়।

চন্দ্রবাবু একখানা বই চক্ষের অত্যন্ত ক[াছে] ধরিয়া কহিলেন মহৎ কার্য্যে যে মাধুর্য্য নষ্ট সে মাধুর্য্য সযত্নে রক্ষা করিবার যোগ্য নয়

শ্রীশ বলিয়া উঠিল—না চন্দ্রবাবু আমি ওসব সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের কথা আনুচিইনে। সৈন্যদের মত এক চালে আমাদের চল্‌তে হবে, অনভ্যাস বা স্বাভাবিক দুর্ব্বলতাবশতঃ যাঁদের পিছিয়ে পড়বার সম্ভাবনা আছে—তাঁদের নিয়ে ভারগ্রস্ত হলে আমাদের সমস্তই ব্যর্থ হবে!

এমন সময় নির্ম্মলা অকুণ্ঠিত মর্য্যাদার সহিত গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। যদিচ একটা অশ্রুপূর্ণ ক্ষোভে তাহার কণ্ঠস্বর আর্দ্র ছিল তথাপি সে দৃঢ়স্বরে কহিল—আপনাদের কি উদ্দেশ্য এবং আপনারা দেশের কাজে কতদূর পর্য্যন্ত যেতে প্রস্তুত আছেন তা আমি কিছুই জানিনে,—কিন্তু আমি আমার মামাকে জানি, তিনি যে পথে যাত্রা করে চলেছেন আপনারা কেন আমাকে সে পথে তাঁর অনুসরণ করতে বাধা দিচ্চেন?

শ্রীশ নিরুত্তর, পূর্ণ কুণ্ঠিত অনুতপ্ত, বিপিন প্রশান্ত গম্ভীর, চন্দ্রবাবু সুগভীর চিন্তামগ্ন।

পূর্ণ এবং শ্রীশের প্রতি বর্ষার রৌদ্ররশ্মির ন্যায় অশ্রুজলস্নাত কটাক্ষপাত করিয়া নির্ম্মলা কহিল—আমি যদি কাজ করতে চাই, যিনি আমার আশৈশবের গুরু মৃত্যু পর্য্যন্ত যদি সকল শুভ চেষ্টায় তাঁর অনুবর্ত্তিনী হতে ইচ্ছা করি, আপনারা কেবল তর্ক করে আমার অযোগ্যতা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন কেন? আপনারা আমাকে কি জানেন!

শ্রীশ স্তব্ধ। পূর্ণ ঘর্ম্মাক্ত।

নির্ম্মলা। আমি আপনাদের কুমারসভা বা অন্য কোন সভা জানিনে। কিন্তু যাঁর শিক্ষায় আমি মানুষ হয়েছি তিনি যখন কুমারসভাকে অবলম্বন করেই তাঁর জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তখন এই কুমারসভা থেকে আপনারা আমাকে দূরে রাখ্‌তে পারবেন না। (চন্দ্রবাবুর দিকে ফিরিয়া) তুমি যদি বল আমি তোমার কাজের যোগ্য নই, তাহলে আমি বিদায় হব, কিন্তু এঁরা আমাকে কি জানেন? এঁরা কেন আমাকে তোমার অনুষ্ঠান থেকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্যে সকলে মিলে, তর্ক করচেন?

শ্রীশ তখন বিনীত মৃদুস্বরে কহিল—মাপ করবেন, আমি আপনার সম্বন্ধে কোন তর্ক করিনি, আমি সাধারণতঃ স্ত্রীজাতি সম্বন্ধেই বল্‌ছিলুম—

নির্ম্মলা। আমি স্ত্রীজাতি পুরুষ জাতির প্রভেদ নিয়ে কোন বিচার করতে চাইনে—আমি নিজের অন্তঃকরণ জানি এবং যাঁর উন্নত দৃষ্টান্তকে আশ্রয় করে রয়েছি তাঁর অন্তঃকরণ জানি, কাজে প্রবৃত্ত হতে এর বেশী আমার আর কিছু জান্‌বার দরকার নেই!

চন্দ্রবাবু নিজের দক্ষিণ করতল চোখের অত্যন্ত কাছে লইয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। পূর্ণ খুব চমৎকার করিয়া একটা কিছু বলিবার ইচ্ছা করিল, কিন্তু তাহার মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না। নির্ম্মলা দ্বারের অন্তরালে থাকিলে পূর্ণর বাক্‌শক্তি যেরূপ সতেজ থাকে আজ তাহার কোন পরিচয় পাওয়া গেল না।

তবু সে মনে মনে অনেক আপত্তি করিয়া বলিল দেবী, এই পঙ্কিল পৃথিবীর কাজে কেন আপনার পবিত্র দুইখানি হস্ত প্রয়োগ করিতে চাচ্চেন?

কথাটা মনে যেমন লাগিতেছিল মুখে তেমন শোনাইল না—পূর্ণ বলিয়াই বুঝিতে পারিল কথাটা গদ্যের মধ্যে হঠাৎ পদ্যের মত কিছু যেন বাড়াবাড়ি হইয়া পড়িল। লজ্জায় তাহার কাণ লাল হইয়া উঠিল। বিপিন স্বাভাবিক সুগম্ভীর শান্তস্বরে কহিল—পৃথিবী

যত বেশী পঙ্কিল পৃথিবীর সংশোধন কার্য্য তত বেশী পবিত্র।

এই কথাটায় কৃতজ্ঞ নির্ম্মলার মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া পূর্ণ ভাবিল আহা, কথাটা আমারি বলা উচিত ছিল।—বিপিন বলিয়াছে বলিয়া তাহার উপর অত্যন্ত রাগ হইল।

শ্রীশ। সভার অধিবেশনে স্ত্রীসভ্য লওয়া সম্বন্ধে নিয়মমত প্রস্তাব উত্থাপন করে যা স্থির হয় আপনাকে জানাব।

নির্ম্মলা এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করিয়া পালের নৌকার মত নিঃশব্দে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। হঠাৎ অধ্যাপক সচেতন হইয়া ডাকিলেন—ফেনি, আমার সেই গলার বোতামটা?

নির্ম্মলা সলজ্জ হাসিয়া মৃদুকণ্ঠে ইসারা করিয়া কহিল; গলাতেই আছে।

চন্দ্রবাবু গলায় হাত দিয়া "হাঁ হাঁ আছে বটে" বলিয়া তিন ছাত্রের দিকে চাহিয়া হাসিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

নৃপ। আজকাল তুই মাঝে মাঝে কেন অমন গম্ভীর হচ্চিস বল্‌ত নীরু।

নীরু। আমাদের বাড়ির যত কিছু গাম্ভীর্য্য সব বুঝি তোর একলার? আমার খুসি আমি গম্ভীর হব!

নৃপ। তুই কি ভাবছিস্ আমি বেশ জানি।

নীরু। তোর অত আন্দাজ করবার দরকার কি ভাই? এখন তোর নিজের ভাবনা ভাববার সময় হয়েছে।

নৃপ। নীরুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—তুই ভাবচিস্, মাগো মা, আমরা কি জঞ্জাল! আমাদের বিদায় করে দিতেও এত ভাবনা, এত ঝঞ্ঝাট!

নীরু। তা আমরা ত ভাই ফেলে দেবার জিনিষ নয় যে বৃষ উৎসর্গের মত অমনি ছেড়ে দিলেই হল! আমাদের জন্যে যে এতটা হাঙ্গাম হচ্চে সে ত গৌরবের কথা! কুমারসম্ভবেত পড়েছিস্ গৌরীর বিয়ের জন্য একটি আস্ত দেবতা পুড়ে ছাই হয়ে গেল! যদি কোন কবির কাণে উঠে তাহলে আমাদের বিবাহেরও একটা বর্ণনা বেরিয়ে যাবে।

নৃপ। না ভাই আমার ভারি লজ্জা করচে!

নীরু। আর আমার বুঝি লজ্জা করচে না? আমি বুঝি বেহায়া! কিন্তু কি করবি বল? ইস্কুলে যেদিন প্রাইজ নিতে গিয়েছিলুম লজ্জা করেছিল, আবার তার পর বছরেও প্রাইজ নেবার জন্যে রাত জেগে পড়া মুখস্থ করেছিলেম। লজ্জাও করে প্রাইজও ছাড়িনে, আমার এই স্বভাব।

নৃপ। আচ্ছা নীরু এবারে যে প্রাইজ-টার কথা চল্‌চে সেটার জন্যে তুই কি খুব ব্যস্ত হয়েছিস্?

নীরু। কোন্‌টা বল দেখি? চিরকুমার সভার দুটো সভ্য?

নৃপ। যেই হোক্ না কেন, তুইত বুঝতে পারচিস্।

নীরু। তা ভাই সত্যি কথা বল্‌ব? (নৃপর গলা জড়াইয়া কাণে কাণে) শুনেছি কুমার সভার দুটি সভ্যের মধ্যে খুব ভাব, আমরা যদি দুজনে দুই বন্ধুর হাতে পড়ি তা হলে বিয়ে হয়েও আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে না—নইলে আমরা কে কোথায় চলে যাব তার ঠিক নেই।

তাইত সেই যুগল দেবতার জন্যে এত পূজোর আয়োজন করেছি ভাই! যোড়হস্তে মনে মনে বল্‌চি, হে কুমারসভার অশ্বিনীকুমারযুগল, আমাদের দুটি বোনকে, এক বোঁটার দুই ফুলের মত তোমরা একসঙ্গে গ্রহণ কর!

বিরহ সম্ভাবনার উল্লেখমাত্রে দুই ভগিনী পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিল এবং নৃপ কোন মতে চোখের জল সাম্‌লাইতে পারিল না।

নৃপ। আচ্ছা নীরু মেজদিদিকে কেমন করে ছেড়ে যাবি বল্‌ দেখি? আমরা দুজনে গেলে ওঁর আর কে থাকবে?

নীরু। সে কথা অনেক ভেবেছি। থাকতে যদি দেন তাহলে কি ছেড়ে যাই? ভাই, ওঁরত স্বামী নেই, আমাদেরও না হয় স্বামী না রইল। মেজদিদির চেয়ে বেশী সুখে আমাদের দরকার কি?

পুরুষবেশধারিণী শৈলবালার প্রবেশ। নীরু টেবিলের উপরিস্থিত থালা হইতে একটি ফুলের মালা তুলিয়া লইয়া শৈলবালার গলায় পরাইয়া কহিল—আমরা দুই স্বয়ম্বরা তোমাকে আমাদের পতিরূপে বরণ করলুম।—এই বলিয়া শৈলবালাকে প্রণাম করিল।

শৈল। ও আবার কি?

নীরু। ভয় নেই ভাই, আমরা দুই সতীনে তোমাকে নিয়ে ঝগড়া করব না। যদি করি, সেজদিদি আমার সঙ্গে পারবে না—আমি একলাই মিটিয়ে নিতে পারব, তোমাকে কষ্ট পেতে হবে না। না, সত্যি বল্‌চি মেজদিদি, তোমার কাছে আমরা যেমন আদরে আছি এমন আদর কি আর কোথাও পাব? কেন তবে আমাদের পরের গলায় দিতে চাস্‌?

পুনর্ব্বার নৃপর দুই চক্ষু বাহিয়া ঝরঝর্‌ রয়া জল পড়িতে লাগিল। "ও কি ও নৃপ, ছি" বলিয়া শৈল তাহার চোখ মুছিয়া দিল—কহিল—তোদের কিসে সুখ তা কি তোরা জানিস্‌? আমাকে নিয়ে যদি তোদের জীবন সার্থক হত তা হলে কি আমি আর কারো হাতে তোদের দিতে পারতুম?

তিনজনে মিলিয়া একটা অশ্রুবর্ষণকাণ্ড ঘটিবার উপক্রম করিতেছিল এমন সময়ে রসিকদাদা প্রবেশ করিয়া কাতরস্বরে কহিলেন—ভাই আমার মত অসভ্যটাকে তোরা সভ্য করলি—আজ ত সভা এখানে বসবে, কি রকম ভাবে চলব শিখিয়ে দে?

নীরু কহিল—ফের, পুরোণো ঠাট্টা? তোমার ঐ সভ্য অসভ্যর কথাটা এই পঞ্চ থেকে বল্‌চ।

রসিক। যাকে জন্ম দেওয়া যায় তার প্রতি মমতা হয় না? ঠাট্টা একবার মুখ থেকে বের হলেই কি রাজপুতের কন্যার মত তাকে গলা টিপে মেরে ফেল্‌তে হবে? হয়েচে কি—যতদিন চিরকুমার সভা টিঁকে থাকবে এই ঠাট্টা তোদের দুবেলা শুনতে হবে।

নীরু। তবে ওটাকে ত একটু সকাল সকাল সেরে ফেল্‌তে হচ্চে। মেজদিদি ভাই, আর দয়ামায়া নয়—রসিকদাদার রসিকতাকে পুরোন হতে দেব না, চিরকুমার সভার চিরত্ব আমরা অচিরে ঘুচিয়ে দেব তবেই ত আমাদের বিশ্ব-বিজয়িনী নারী নাম সার্থক হবে! কি রকম করে আক্রমণ করতে হবে একটা কিছু প্ল্যান ঠাউরেছিস্‌?

শৈল। কিছুই না। ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে যখন যে রকম মাথায় আসে।

নীরু। আমাকে যখন দরকার হবে রণভেরীধ্বনিত করলেই আমি হাজির হব। আমি কি ডরাই সখি কুমারসভারে? নাকি বিগল এ ভুজ মৃণালে?

অক্ষয় ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, অদ্যকার সভায় বিদুষীমণ্ডলীকে একটি ঐতিহাসিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করি।

শৈল। প্রস্তুত আছি।

অক্ষয়। বল দেখি যে দুটি ডালে দাঁড়িয়েছিলেন সেই দুটি ডাল কাটতে চেয়েছিলেন কে?

নৃপ তাড়াতাড়ি উত্তর করিল, আমি জানি মুখুয্যে মশায়, কালিদাস।

অক্ষয়। না আরো একজন বড় লোক। শ্রীঅক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায়।

নীরু। ডাল দুটি কে?

অক্ষয় বামে নীরুকে টানিয়া বলিলেন "এই একটি," এবং দক্ষিণে নৃপকে টানিয়া আনিয়া কহিলেন "এই আর একটি!"

নীরু। আর, কুড়ুল বুঝি আজ আস্‌চে?

অক্ষয়। আসচে কেন, এসেচে বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। ঐ যে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্চে!

শুনিয়া দৌড়, দৌড়! শৈল পালাইবার সময় রসিকদাদাকে টানিয়া লইয়া গেল। চুড়িবালার ঝঙ্কার এবং ত্রস্ত পদপল্লব কয়েকটির দ্রুত পতন শব্দ সম্পূর্ণ না মিলাইতেই শ্রীশ ও বিপিনের প্রবেশ। ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্ দূর হইতে দূরে বাজিতে লাগিল। এবং ঘরের আলোড়িত বাতাসে এসেন্স ও গন্ধতৈলের মিশ্রিত মৃদু পরিমল যেন পরিত্যক্ত আসবাবগুলির মধ্যে আপনার পুরাতন আশ্রয়গুলিকে খুঁজিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বিজ্ঞান শাস্ত্রে বলে শক্তির অপচয় নাই, রূপান্তর আছে। ঘর হইতে হঠাৎ তিন ভগিনীর পলায়নে বাতাসে যে একটি সুগন্ধ আন্দোলন উঠিয়াছিল সেটা কি প্রথমে কুমারযুগলের বিচিত্র স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে একটি নিগূঢ় স্পন্দনে ও অব্যবহিত পরেই তাঁহাদের অন্তঃকরণের দিক্‌প্রান্তে ক্ষণকালের জন্য একটি অনির্ব্বচনীয় পুলকে পরিণত হয় নাই? কিন্তু সংসারে যেখান হইতে ইতিহাস সুরু হয় তাহার অনেক পরের অধ্যায় হইতে লিখিত হইয়া থাকে;—প্রথম স্পর্শ স্পন্দন আন্দোলন ও বিদ্যুৎচমকগুলি প্রকাশের অতীত।

পরস্পর নমস্কারের পর অক্ষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, পূর্ণবাবু এলেন না যে?

শ্রীশ। চন্দ্রবাবুর বাসায় তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ তাঁর শরীরটা খারাপ হয়েছে বলে আজ আর আস্‌তে পারিলেন না।

অক্ষয়। (পথের দিকে চাহিয়া) একটু বসুন—আমি চন্দ্রবাবুর অপেক্ষায় দ্বারের কাছে গিয়ে দাঁড়াই। তিনি অন্ধমানুষ কোথায় যেতে কোথায় গিয়ে পড়বেন তার ঠিক নেই—কাছাকাছি এমন স্থানও আছে যেখানে কুমারসভার অধিবেশন কোন মতেই প্রার্থনীয় নয়।

বলিয়া অক্ষয় নামিয়া গেলেন।

আজ চন্দ্রবাবুর বাসায় হঠাৎ নির্ম্মলা আবির্ভূত হইয়া চিরকুমারদলের শান্তমনের মধ্যে যে একটা মন্থন উৎপন্ন করিয়া দিয়াছিল তাহার অভিঘাত বোধ করি এখনো শ্রীশের মাথায় চলিতেছিল। দৃশ্যটি অপূর্ব্ব, ব্যাপারটি অভাবনীয়, এবং নির্ম্মলার কমনীয় মুখে যে একটি দীপ্তি ও তাহার কথাগুলির মধ্যে যে একটি আন্তরিক আবেগ ছিল তাহাতে তাঁহাকে বিস্মিত ও তাঁহার চিন্তার স্বাভাবিক গতিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছে। তিনি লেশমাত্র প্রস্তুত ছিলেন না বলিয়া এই আকস্মিক আঘাতেই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তর্কের মাঝখানে হঠাৎ এমন জায়গা হইতে এমন করিয়া এমন একটা উত্তর আসিয়া উপস্থিত হইবে স্বপ্নেও মনে করেন নাই বলিয়াই উত্তর

তাঁহার কাছে এমন প্রবল হইয়া উঠিল। উত্তরের প্রত্যুত্তর থাকিতে পারে, কিন্তু সেই আবেগ কম্পিত ললিতকণ্ঠ, সেই গূঢ় অশ্রুকরুণ বিশাল কৃষ্ণচক্ষুর দীপ্তিচ্ছটার প্রত্যুত্তর কোথায়? পুরুষের মাথায় ভাল ভাল যুক্তি থাকিতে পারে, কিন্তু যে আরক্ত অধর কথা বলিতে গিয়া স্ফুরিত হইতে থাকে, যে কোমল কপোল দুটি দেখিতে দেখিতে ভাবের আভাসে করুণাভ হইয়া উঠে তাহার বিরুদ্ধে দাঁড় করাইতে পারে পুরুষের হাতে এমন কি আছে?

পথে আসিতে আসিতে দুই বন্ধুর মধ্যে কোন কথাই হয় নাই। এখানে আসিয়া ঘরে প্রবেশ না করিতেই যে শব্দগুলি শোনা গেল, অন্য কোন দিন হইলে শ্রীশ তাহা লক্ষ্য করিত কি না সন্দেহ—আজ তাহার কাছে কিছুই এড়াইল না। অনতিপূর্ব্বেই ঘরের মধ্যে রমণীদল যে ছিল, ঘরে প্রবেশ করিয়াই সে তাহা বুঝিতে পারিল।

অক্ষয় চলিয়া গেলে ঘরটি শ্রীশ ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। টেবিলের মাঝখানে ফুলদানিতে ফুল সাজানো। সেটা ছবিতে তাহাকে একটু যেন বিচলিত করিল। তাহার একটা কারণ শ্রীশ অত্যন্ত ফুল ভাল বাসে, তাহার আর একটা কারণ, শ্রীশ কল্পনাচক্ষে দেখিতে পাইল, অনতিকাল পূর্ব্বেই যাহাদের সুনিপুণ দক্ষিণ হস্ত এই ফুলগুলি সাজাইয়াছে তাহারাই এখনি ত্রস্তপদে ঘর হইতে পালাইয়া গেল।

বিপিন ঈষৎ হাসিয়া বলিল, যা বল ভাই, এ ঘরটি চিরকুমার সভার উপযুক্ত নয়।

হঠাৎ মৌনভঙ্গে শ্রীশ চকিত হইয়া উঠিয়া কহিল, কেন নয়?

বিপিন কহিল, ঘরের সজ্জাগুলি তোমার নবীন সন্ন্যাসীদের পক্ষেও যেন বেশী বোধ হচ্চে।

শ্রীশ। আমার সন্ন্যাসধর্ম্মের পক্ষে বেশী কিছুই হতে পারে না।

বিপিন। কেবল নারী ছাড়া!

শ্রীশ কহিল, হাঁ ঐ একটি মাত্র!—লেখকের অনুমান মাত্র হইতে পারে কিন্তু অন্য দিনের মত কথাটায় তেমন জোর পৌঁছিল না।

বিপিন কহিল, দেয়ালের ছবি এবং অন্যান্য পাঁচ রকমে এ ঘরটিতে সেই নারী জাতির অনেকগুলি পরিচয় পাওয়া যায় যেন।

শ্রীশ। সংসারে নারীজাতির পরিচয় ত সর্ব্বত্রই আছে।

বিপিন। তা ত বটেই। কবিদের কথা যদি বিশ্বাস করা যায় তাহলে চাঁদে ফুলে লতায় পাতায় কোন খানেই নারীজাতির পরিচয় থেকে হতভাগ্য পুরুষমানুষের নিষ্কৃতি পাবার যো নেই।

শ্রীশ হাসিয়া কহিল, কেবল ভেবেছিলুম, চন্দ্রবাবুর বাসার সেই একতলার ঘরটিতে রমণীর কোন সংস্রব ছিল না। আজ সে ভ্রমটা হঠাৎ ভেঙ্গে গেল। নাঃ, ওরা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে।

বিপিন। বেচারা চিরকুমার কটির জন্যে একটা কোনও ফাঁকা রাখেনি। সভা করবার জায়গা পাওয়াই দায়।

শ্রীশ। এই দেখ না!—বলিয়া কোণের একটা টিপাই হইতে গোটাদুয়েক চুলের কাঁটা তুলিয়া দেখাইল।

বিপিন কাঁটা দুটি লইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কহিল, ওহে ভাই এস্থানটাতে কুমারদের পক্ষে নিষ্কণ্টক নয়।

শ্রীশ। ফুলও আছে কাঁটাও আছে।

বিপিন। সেইটেই ত বিপদ। কেবল কাঁটা থাক্‌লে এড়িয়ে চলা যায়!

শ্রীশ অপর কোণের ছোট বইয়ের শেল্‌ফ হইতে বইগুলি তুলিয়া দেখিতে লাগিল। কতকগুলি নভেল, কতকগুলি ইংরাজি কাব্য-সংগ্রহ। প্যাল্‌গ্রেভের গীতিকাব্যের স্বর্ণ-ভাণ্ডার খুলিয়া দেখিল, মার্জ্জিনে মেয়েলি অক্ষরে নোট লেখা—তখন গোড়ার পাতাটা উল্টাইয়া দেখিল। দেখিয়া একটু নাড়িয়া চাড়িয়া বিপিনের সম্মুখে ধরিল।

বিপিন পড়িয়া কহিল, নৃপবালা! আমার বিশ্বাস নামটি পুরুষমানুষের নয়। কি বোধ কর।

শ্রীশ। আমারও সেই বিশ্বাস। এ নামটিও অন্য জাতীয়ের বলে ঠেকচে হে!—বলিয়া আর একটা বই দেখাইল।

বিপিন কহিল—নীরবালা! এ নামটি কাব্যগ্রন্থে চলে কিন্তু কুমারসভায়—

শ্রীশ। কুমার সভাতেও এই নামধারিণীরা যদি চলে আসেন তা হলে দ্বাররোধ করতে পারি এত বড় বলবান্ ত আমাদের মধ্যে কাউকে দেখিনে।

বিপিন। পূর্ণ ত একটি আঘাতেই আহত হয়ে পড়ল—রক্ষা পায় কি না সন্দেহ!

শ্রীশ। কি রকম?

বিপিন। লক্ষ্য করে দেখনি বুঝি?

প্রশান্ত স্বভাব বিপিনকে দেখিলে মনে হয় না যে সে কিছু দেখে; কিন্তু তাহার চোখে কিছুই এড়ায় না। পরম দুর্ব্বল অবস্থায় পূর্ণকে সে দেখিয়া লইয়াছে।

শ্রীশ। না না ও তোমার অনুমান!

বিপিন। হৃদয়টা ত অনুমানেরই জিনিষ, না যায় দেখা, না যায় ধরা।

শ্রীশ থমকিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল,—কহিল, পূর্ণর অসুখটাও তা হলে বৈদ্য-শাস্ত্রের অন্তর্গত নয়?

বিপিন। না, এ সকল ব্যাধি সম্বন্ধে মেডিকাল কলেজে কোন লেক্‌চার চলে না।

শ্রীশ উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিল, গম্ভীর বিপিন স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিল।

চন্দ্রবাবু প্রবেশ করিয়া কহিলেন—আজকের তর্কবিতর্কের উত্তেজনায় পূর্ণবাবুর হঠাৎ শরীর খারাপ হল দেখে আমি তাঁকে তাঁর বাড়ি পৌঁছে দেওয়া উচিত বোধ করলুম।

শ্রীশ বিপিনের মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ একটু হাসিল, বিপিন গম্ভীরমুখে কহিল, পূর্ণবাবুর যে রকম দুর্ব্বল অবস্থা দেখচি পূর্ব্ব হতেই তার বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

চন্দ্রমাধব সরলভাবে উত্তর করিলেন, পূর্ণবাবুকে ত বিশেষ অসাবধান বলে বোধ হয় না!

চন্দ্রমাধব বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই অক্ষয় রসিকদাদাকে সঙ্গে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। কহিলেন—মাপ করবেন, এই নবীন সভ্যটিকে আপনাদের হাতে সমর্পণ করে দিয়েই আমি চলে যাচ্চি।

রসিক হাসিয়া কহিলেন—আমার নবীনতা বাইরে থেকে বিশেষ প্রত্যক্ষগোচর নয়—

অক্ষয়। অত্যন্ত বিনয়বশতঃ সেটা বাহ্য প্রাচীনতা দিয়ে ঢেকে রেখেচেন—ক্রমশঃ পরিচয় পাবেন। ইনিই হচ্চেন সার্থকনামা শ্রীরসিকচক্রবর্ত্তী।

শুনিয়া শ্রীশ ও বিপিন সহাস্যে রসিকের মুখের দিকে চাহিল,—রসিকদাদা কহিলেন, পিতা আমার রসবোধ সম্বন্ধে পরিচয় পাবার পূর্ব্বেই রসিক নাম রেখেছিলেন, এখন পিতৃসত্য পালনের জন্য আমাকে রসিকতার চেষ্টা

করতে হয়, তার পরে "যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোঽত্র দোষঃ।"

অক্ষয় প্রস্থান করিলেন। ঘরে দুটি কেরোসিনের দীপ জ্বলিতেছে; সেই দুটিকে বেষ্টন করিয়া ফিরোজরঙের রেশমের অবগুণ্ঠন। সেই আবরণ ভেদ করিয়া ঘরের আলোটি মৃদু এবং রঙীন হইয়া উঠিয়াছে।

পুরুষবেশী শৈল আসিয়া সকলকে নমস্কার করিল। ক্ষীণদৃষ্টি চন্দ্রমাধব বাবু ঝাপ্সাভাবে তাহাকে দেখিলেন—বিপিন ও শ্রীশ তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

শৈলের পশ্চাতে দুই জন ভৃত্য,কয়েকটি ভোজনপাত্র হাতে করিয়া উপস্থিত হইল। শৈল ছোট ছোট রূপার থালাগুলি লইয়া শাদা পাথরের টেবিলের উপর সাজাইতে লাগিল। প্রথম পরিচয়ের দুর্নিবার লজ্জাটুকু সে এইরূপ আতিথ্যব্যাপারের মধ্যে ঢাকিয়া লইবার চেষ্টা করিল।

রসিক কহিলেন, ইনি আপনাদের সভার আর একটি নবীন সভ্য। এঁর নবীনতা সম্বন্ধে কোন তর্ক নেই। ঠিক আমার বিপরীত। ইনি বুদ্ধির প্রবীণতা বাহ্য নবীনতা দিয়ে গোপন করে রেখেচেন। আপনারা কিছু বিস্মিত হয়েচেন।দেখচি; হবার কথা। এঁকে দেখে মনে হয় বালক, কিন্তু আমি আপনাদের কাছে জামিন রইলুম—ইনি বালক নন্।

চন্দ্র। এঁর নাম?

রসিক। শ্রীঅবলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীশ বলিয়া উঠিল, অবলাকান্ত?

রসিক। নামটি আমাদের সভার উপযোগী নয় স্বীকার করি। নামটির প্রতি আমারও বিশেষ মমত্ব নেই—যদি পরিবর্ত্তন করে বিক্রম সিংহ বা ভীমসেন বা অন্য কোন উপযুক্ত নাম রাখেন তাতে উনি আপত্তি করবেন না। যদিচ শাস্ত্রে আছে বটে স্বনামা পুরুষো ধন্যঃ—কিন্তু উনি অবলাকান্ত নামটির দ্বারাই জগতের ধন্যবাদ অর্জ্জন করতে ব্যাকুল নন।

শ্রীশ কহিল—বলেন কি মশায়! নাম ত আর গায়ের বস্ত্র নয়, যে বদল করলেই হ'ল।

রসিক। ওটা আপনাদের একেলে সংস্কার শ্রীশ বাবু। নামটাকে প্রাচীনেরা পোষাকের মধ্যেই গণ্য করতেন। দেখুন না কেন, অর্জ্জুনের পিতৃদত্ত নাম কি, ঠিক করে বলা শক্ত,—পার্থ, ধনঞ্জয়, সব্যসাচী, লোকের যখন যা মুখে আস্ত তাই বলেই ডাক্ত। দেখুন, নামটাকে আপনারা বেশী সত্য মনে করবেন না;—ওঁকে যদি ভুলে আপনি অবলাকান্ত নাও বলেন উনি লাইবেলের মকদ্দমা আনবেন না।

শ্রীশ হাসিয়া কহিল—আপনি যখন এতটা অভয় দিচ্চেন, তখন অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হলুম—কিন্তু ওঁর ক্ষমাগুণের পরিচয় নেবার দরকার হবে না—নাম ভুল করব না মশায়।

রসিক। আপনি না করতে পারেন কিন্তু আমি করি মশায়। উনি আমার সম্পর্কে নাতি হন—সেই জন্যে ওঁর সম্বন্ধে আমার রসনা কিছু শিথিল, যদি কখনো এক বল্তে আর বলি সেটা মাপ করবেন।

শ্রীশ উঠিয়া কহিল—অবলাকান্ত বাবু, আপনি এ সমস্ত কি আয়োজন করেচেন? আমাদের সভার কার্য্যাবলীর মধ্যে মিষ্টান্নটা ছিল না।

রসিক। (উঠিয়া) সেই ত্রুটি যিনি সংশোধন করচেন তাঁকে সভার হয়ে ধন্যবাদ দিই।

শ্রীশের মুখের দিকে না চাহিয়া থালা সাজাইতে সাজাইতে শৈল কহিল, শ্রীশ বাবু আহারটাও কি আপনাদের নিয়মবিরুদ্ধ।

শ্রীশ দেখিল কণ্ঠস্বরটিও অবলা নামের উপযুক্ত, কহিল এই সভ্যটির আকৃতি নিরীক্ষণ করে দেখলেই ও সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকবে না।—বলিয়া বিপুলায়তন বিপিনকে টানিয়া আনিল।

বিপিন কহিল, নিয়মের কথা যদি বলেন অবলাকান্ত বাবু, সংসারে শ্রেষ্ঠ জিনিষমাত্রই নিজের নিয়ম নিজে সৃষ্টি করে; ক্ষমতাশালী লোক নিজের নিয়মে চলে, শ্রেষ্ঠ কাব্য সমালোচকের নিয়ম মানে না। যে মিষ্টান্নগুলি সংগ্রহ করেচেন এর সম্বন্ধেও কোন সভার নিয়ম খাটতে পারে না—এর একমাত্র নিয়ম, বসে যাওয়া এবং নিঃশেষ করা! ইনি যতক্ষণ আছেন ততক্ষণ জগতের অন্য সমস্ত নিয়মকে দ্বারের কাছে অপেক্ষা করতে হবে।

শ্রীশ কহিল—তোমার হল কি বিপিন? তোমাকে খেতে দেখেছি বটে কিন্তু এক নিঃশ্বাসে এত কথা কইতে শুনিনি ত!

বিপিন। রসনা উত্তেজিত হয়েছে, এখন সরস বাক্য বলা আমার পক্ষে অত্যন্ত সহজ। হয়েছে। যিনি আমার জীবনবৃত্তান্ত লিখবেন, হায়, এ সময়ে তিনি কোথায়?

রসিক টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, আমার দ্বারা সে কাজটা প্রত্যাশা করবেন না, আমি অত দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে পারব না।

নূতন ঘরের বিলাস সজ্জার মধ্যে আসিয়া চন্দ্রমাধব বাবুর মনটা বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার উৎসাহস্রোত যথাপথে প্রবাহিত হইতেছিল না। তিনি ক্ষণে ক্ষণে কার্য্য বিবরণের খাতা, ক্ষণে ক্ষণে নিজের করকোষ্ঠি অকারণে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিলেন। শৈল তাঁহার সম্মুখে গিয়া সবিনয়ে নিবেদন করিল, সভার কার্য্যের যদি কিছু ব্যাঘাত করে থাকি ত মাপ করবেন, চন্দ্রবাবু, কিন্তু কিছু জলযোগ—

চন্দ্রবাবু শৈলকে নিকটে পাইয়া তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন—এ সমস্ত সামাজিকতায় সভার কার্য্যের ব্যাঘাত করে, তাতে সন্দেহ নেই।

রসিক কহিলেন—আচ্ছা পরীক্ষা করে দেখুন, মিষ্টান্নে যদি সভার কার্য্য রোধ হয় তা হলে—

বিপিন মৃদুস্বরে কহিল—তা হলে ভবিষ্যতে না হয় সভাটা বন্ধ রেখে মিষ্টান্নটা চালাইলেই হবে।

চন্দ্রবাবু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে দেখিতে শৈলের সুন্দর সুকুমার চেহারাটি কিয়ৎ-পরিমাণে আয়ত্ত করিয়া লইলেন। তখন শৈলকে ক্ষুণ্ণ করিতে তাঁহার আর প্রবৃত্তি হইল না।

বলা আবশ্যক, অচিরকাল পূর্ব্বেই বিপিন জলযোগ করিয়াই বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল। তাহার ভোজনের ইচ্ছামাত্র ছিল না কিন্তু এই প্রিয়দর্শন কুমারটিকে দেখিয়া বিশেষতঃ তাহার মুখের অত্যন্ত কোমল একটি স্মিতহাস্যে বিপুলবলশালী বিপিনের চিত্ত হঠাৎ এমনি স্নেহাকৃষ্ট হইয়া পড়িল যে, অস্বাভাবিক মুখরতার সহিত মিষ্টান্নের প্রতি সে অতিরিক্ত লোলুপতা প্রকাশ করিল। রোগভীরু শ্রীশের অসময়ে খাইবার সাহস ছিল না, তাহারাও মনে হইল, না খাইতে বসিলে এই তরুণ কুমারটির প্রতি কঠোর রূঢ়তা করা হইবে।

শ্রীশ কহিল—আসুন রসিক বাবু। আপনি উঠচেন না যে!

রসিক। রোজ রোজ খেচে এবং মাঝে মাঝে কেড়ে খেয়ে থাকি, আজ চিরকুমার সভার সভ্যরূপে আপনাদের সম্বর্দ্ধনগৌরবে

কিঞ্চিৎ উপরোধের প্রত্যাশায় ছিলুম, কিন্তু—

শৈল। কিন্তু আবার কি রসিক দাদা? তুমি যে রবিবার করে থাক, আজ তুমি কিছু খাবে নাকি?

রসিক। দেখেচেন মশায়! নিয়ম আর কারো বেলায় নয়, কেবল রসিক দাদার বেলায়! নাঃ—বলং বলং বাহুবলম্! উপরোধ অনুরোধের অপেক্ষা করা নয়!

বিপিন। (চারটিমাত্র ভোজন পাত্র দেখিয়া) আপনি আমাদের সঙ্গে বসবেন না!

শৈল। না আমি আপনাদের পরিবেশন করব!

শ্রীশ উঠিয়া কহিল—সে কি হয়!

শৈল কহিল—আমার জন্যে আপনারা অনেক অনিয়ম সহ্য করেছেন, এখন আমার আর একটি মাত্র ইচ্ছা পূর্ণ করুন। আমাকে পরিবেশন করতে দিন, খাওয়ার চেয়ে তাতে আমি ঢের বেশী খুসী হব!

শ্রীশ। রসিক বাবু, এটা কি ঠিক হচ্চে?

রসিক। ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ; উনি পরিবেশন করতে ভাল বাসেন আমরা আহার করতে ভাল বাসি এ রকম রুচিভেদে বোধ হয় পরস্পরের কিছু সুবিধা আছে!

আহার আরম্ভ হইল।

শৈল। চন্দ্রবাবু, ওটা মিষ্ট, ওটা আগে খাবেন না, এই দিকে তরকারী আছে। জলের গ্লাস্ খুঁজ্চেন? এই যে গ্লাস্—বলিয়া গ্লাস অগ্রসর করিয়া দিল।

চন্দ্রবাবুর নির্ম্মলাকে মনে পড়িল। মনে হইল এই বালকটি যেন নির্ম্মলার ভাই। আত্মসেবায় অনিপুণ চন্দ্রবাবুর প্রতি শৈলের একটু বিশেষ স্নেহোদ্রেক হইল। চন্দ্রবাবুর পাতে আম ছিল তিনি সেটাকে ভালরূপ আয়ত্ত করিতে পারিতেছিলেন না—অনুতপ্ত শৈল তাড়াতাড়ি তাহা কাটিয়া সহজসাধ্য করিয়া দিল। যে সময়ে যেটি আবশ্যক সেটি আস্তে আস্তে হাতের কাছে যোগাইয়া দিয়া তাঁহার ভোজন ব্যাপারটি নির্ব্বিঘ্ন করিতে লাগিল।

চন্দ্র। শ্রীশ বাবু, স্ত্রী সভ্য নেওয়া সম্বন্ধে আপনি কিছু বিবেচনা করেচেন?

শ্রীশ। ভেবে দেখতে গেলে ওতে আপত্তির কারণ বিশেষ নেই, কেবল সমাজের আপত্তির কথাটা আমি ভাবি।

বিপিনের তর্কপ্রবৃত্তি চড়িয়া উঠিল। কহিল—সমাজকে অনেক সময় শিশুর মত গণ্য করা উচিত। শিশুর সমস্ত আপত্তি মেনে চল্‌লে শিশুর উন্নতি হয় না, সমাজ সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা খাটে।

আজ শ্রীশ উপস্থিত প্রস্তাবটা সম্বন্ধে অনেকটা নরমভাবে ছিল, নতুবা উত্তাপ হইতে বাষ্প ও বাষ্প হইতে বৃষ্টির মত এই তর্ক হইতে কলহ ও কলহ হইতে পুনর্ব্বার সদ্ভাবের সৃষ্টি হইত।

এমন কি, শ্রীশ কথঞ্চিৎ উৎসাহের সহিত বলিলেন, আমার বোধ হয় আমাদের দেশে যে এত সভাসমিতি আয়োজন অনুষ্ঠান অকালে ব্যর্থ হয় তার প্রধান কারণ, সে সকল কার্য্যে স্ত্রীলোকদের যোগ নেই। রসিক বাবু কি বলেন?

রসিক। অবস্থা গতিকে যদিও স্ত্রীজাতির সঙ্গে আমার বিশেষ সম্বন্ধ নেই তবু এটুকু জেনেছি স্ত্রীজাতি হয় যোগ দেন নয় বাধা দেন, হয় সৃষ্টি নয় প্রলয়। অতএব ওঁদের দলে টেনে অন্য সুবিধা যদি বা নাও হয় তবু বাধার হাত এড়ান যায়। বিবেচনা করে দেখুন চিরকুমার সভার মধ্যে যদি স্ত্রীজাতিকে আপনারা গ্রহণ করতেন তাহলে গোপনে এই

সভাটিকে নষ্ট করিবার জন্যে ওঁদের উৎসাহ থাক্‌ত না—কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায়—

শৈল। বেশী বয়স হলে মানুষ আনুমানিক আশঙ্কা নিয়ে অস্থির হয়। কুমারসভার উপর স্ত্রীজাতির আক্রোশের খবর রসিক দাদা কোথায় পেলে?

রসিক। বিপদের খবর না পেলে কি আর সাবধান করতে নেই? এক চক্ষু হরিণ যে দিকে কাণা ছিল সেই দিক থেকেই ত তীর খেয়েছিল—কুমারসভা যদি স্ত্রীজাতির প্রতিই কাণা হন তাহলে সেই দিক থেকেই হঠাৎ ঘা খাবেন।

শ্রীশ। (বিপিনের প্রতি মৃদু স্বরে) এক চক্ষু হরিণ ত আজ একটা তীর খেয়েচেন, একটি সভ্য ধূলিশায়ী।

চন্দ্র। কেবল পুরুষ নিয়ে যারা সমাজের ভাল করতে চায় তারা এক পায়ে চল্‌তে চায়। সেই জন্যই খানিক দূর গিয়েই তাদের বসে পড়তে হয়। সমস্ত মহৎ চেষ্টা থেকে মেয়েদের দূরে রেখেছি বলেই আমাদের দেশের কাজে প্রাণসঞ্চার হচ্চে না। আমাদের হৃদয় আমাদের কাজ আমাদের আশা বাইরে ও অন্তঃপুরে খণ্ডিত। সেই জন্যে আমরা বাইরে গিয়ে বক্তৃতা দিই ঘরে এসে ভুলি! দেখ অবলাকান্ত বাবু এখনো তোমার বয়স অল্প আছে, এই কথাটি ভাল করে মনে রেখো—স্ত্রীজাতিকে অবহেলা কোরো না। স্ত্রীজাতিকে যদি আমরা নীচু করে রাখি তাহলে তাঁরাও আমাদের নীচের দিকেই আকর্ষণ করেন; তা হলে তাঁদের ভারে আমাদের উন্নতির পথে চলা অসাধ্য হয়—দুপা চলেই আবার ঘরের কোণে এসেই আবদ্ধ হয়ে পড়ি। তাঁদের যদি আমরা উচ্চে রাখি, তাহলে ঘরের মধ্যে এসে নিজের আদর্শকে খর্ব্ব করতে লজ্জা বোধ হয়। আমাদের দেশে বাইরে লজ্জা আছে কিন্তু ঘরের মধ্যে সেই লজ্জাটি নেই, সেই জন্যেই আমাদের সমস্ত উন্নতি কেবল বাহ্যাড়ম্বরে পরিণত হয়।

শৈল চন্দ্রবাবুর এই কথাগুলি আনত মস্তকে শুনিল—কহিল, আশীর্ব্বাদ করুন্ আপনার উপদেশ যেন ব্যর্থ না হয়, নিজেকে যেন আপনার আদর্শের উপযুক্ত করতে পারি।

একান্ত নিষ্ঠার সহিত উচ্চারিত এই কথাগুলি শুনিয়া চন্দ্রবাবু কিছু বিস্মিত হইলেন। তাঁহার সকল উপদেশের প্রতি নির্ম্মলার তর্কবিহীন বিনম্র শ্রদ্ধার কথা মনে পড়িল! স্নেহার্দ্র মনে আবার ভাবিলেন, এ যেন নির্ম্মলারই ভাই।

চন্দ্র। আমার ভাগ্নী নির্ম্মলাকে কুমারসভার সভ্যশ্রেণীতে ভুক্ত করতে আপনাদের কোন আপত্তি নেই?

রসিক। আর কোন আপত্তি নেই, কেবল একটু ব্যাকরণের আপত্তি। কুমারসভার কেউ যদি কুমারী বেশে আসেন তাহলে বোপদেবের অভিশাপ।

শৈল। বোপদেবের অভিশাপ একালে খাটে না!

রসিক। আচ্ছা, অন্ততঃ লোহারামকে ত বাঁচিয়ে চল্‌তে হবে। আমি ত বোধকরি, স্ত্রীসভ্যরা যদি পুরুষ সভ্যদের অজ্ঞাতসারে বেশ ও নাম পরিবর্ত্তন করে আসেন তাহলে সহজে নিষ্পত্তি হয়।

শ্রীশ। তাহলে একটা কৌতুক এই হয় যে কে স্ত্রী কে পুরুষ নিজেদের সেই। সন্দেহটা থেকে যায়—

বিপিন। আমি বোধ হয় সন্দেহ থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারি।

রসিক। আমাকেও বোধ হয় আমার

নাৎনী বলে কারো হঠাৎ আশঙ্কা না হতে পারে!

শ্রীশ। কিন্তু অবলাকান্ত বাবু সম্বন্ধে একটা সন্দেহ থেকে যায়। তখন শৈল অদূরবর্ত্তী টিপাই হইতে মিষ্টান্নের থালা আনিতে প্রস্থান করিল।

চন্দ্র। দেখুন রসিক বাবু, ভাষাতত্ত্বে দেখা যায়, ব্যবহার করতে করতে একটা শব্দের মূল অর্থ লোপ পেয়ে বিপরীত অর্থ ঘটে থাকে। স্ত্রীসভা গ্রহণ করলে চিরকুমার সভার অর্থের যদি পরিবর্ত্তন ঘটে তাতে ক্ষতি কি?

রসিক। কিছু না। আমি পরিবর্ত্তনের বিরোধী নই—তা নাম পরিবর্ত্তন বা বেশ পরিবর্ত্তন বা অর্থ পরিবর্ত্তন যাই হোক না কেন, যখন যা ঘটে আমি বিনা বিরোধে গ্রহণ করি বলেই আমার প্রাণটা নবীন আছে।

মিষ্টান্ন শেষ হইল এবং স্ত্রীসভ্য লওয়া সম্বন্ধে কাহারো আপত্তি হইল না।

আহার অবসানে রসিক কহিল, আশা করি সভার কাজের কোন ব্যাঘাত হয় নি।

শ্রীশ কহিল—কিছু না—অন্যদিন কেবল মুখেরই কাজ চল্‌ত আজ দক্ষিণ হস্তও যোগ দিয়েছে।

বিপিন। তাতে আভ্যন্তরিক তৃপ্তিটা কিছু বেশী হয়েছে।

শুনিয়া শৈল খুসি হইয়া তাহার স্বাভাবিক স্নিগ্ধকোমল হাস্যে সকলকে পুরস্কৃত করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অক্ষয়। হল কি বল দেখি! আমার যে ঘরটি এতকাল কেবল ঝড়ু বেহারার ঝাড়নের তাড়নে নির্ম্মল ছিল, সেই ঘরের হাওয়া দুবেলা তোমাদের দুই বোনের অঞ্চল বীজনে চঞ্চল হয়ে উঠচে যে!

নীর। দিদি নেই, তুমি একলা পড়ে আছ বলে দয়া করে মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যাই, তার উপরে আবার জবাব দিহি?

অক্ষয়—(গান করিয়া) ভৈরবী।

ওগো দয়াময়ী চোর! এত দয়া মনে তোর!
বড় দয়া করে কণ্ঠে আমার জড়াও মায়ার ডোর!
বড় দয়া করে চুরি করি লও শূন্য হৃদয় মোর!

নীর। মশায়, এখন সিঁধ কাটার পরিশ্রম মিথ্যে; আমাদের এমন বোকা চোর পাওনি! এখন হৃদয় আছে কোথায় যে, চুরি করতে আসব?

অক্ষয়। ঠিক করে বল দেখি হতভাগা হৃদয়টা গেছে কতদূরে?

নৃপ। আমি জানি মুখুয্যে মশায়। বলব? ৪৭৫ মাইল!

নীর। সেজ দিদি অবাক্ করলে! তুই কি মুখুয্যে মশায়ের হৃদয়ের পিছনে পিছনে মাইল গুনতে গুনতে ছুটেছিলি নাকি?

নৃপ। না ভাই, দিদি কাশী যাবার সময় টাইম্ টেবিলে মাইলটা দেখেছিলুম।

অক্ষয়। (গান) বাহার।

চলেছে ছুটিয়ে পলাতকা হিয়া
বেগে বহে শিরা ধমনী,
হায় হায় হায় ধরিবারে তায়
পিছে পিছে ধায় রমণী!
বায়ু বেগভরে উড়ে অঞ্চল,
লটপট বেণী দুলে চঞ্চল;
একিরে রঙ্গ, আকুল অঙ্গ
ছুটে কুরঙ্গ-গমনী!

নীর। কবিবর, সাধু সাধু! কিন্তু তোমার রচনায় কোন কোন আধুনিক কবির ছায়া দেখ্‌তে পাই যেন!

অক্ষয়। তার কারণ আমিও অত্যন্ত আধুনিক! তোরা কি ভাবিস তোদের মুখুয্যে মশায় কৃত্তিবাস ওঝার যমজ ভাই। ভূগোলের মাইল গুণে দিচ্চিস, আর ইতিহাসের তারিখ ভুল? তাহলে আর বিদুষীশ্যালী থেকে ফল হল কি? এত বড় আধুনিটাকে তোদের প্রাচীন বলে ভ্রম হয়?

নীর। মুখুযোমশায়, শিব যখন বিবাহ সভায় গিয়েছিলেন, তখন তাঁর শ্যালীরাও ঐ রকম ভুল করেছিলেন, কিন্তু উমার চোখে ত অন্য রকম ঠেকেছিল! তোমার ভাবনা কিসের, দিদি তোমাকে আধুনিক বলেই জানেন!

অক্ষয়। মূঢ়ে, শিবের যদি শ্যালী থাক্‌ত তাহলে কি তাঁর ধ্যানভঙ্গ করবার জন্যে অনঙ্গ-দেবের দরকার হত; আমার সঙ্গে তাঁর তুলনা?

নৃপ। আচ্ছা মুখুয্যেমশায়, এতক্ষণ তুমি এখানে বসে বসে কি করছিলে?

অক্ষয়। তোদের গয়লা বাড়ির দুধের হিসেব লিখ্‌ছিলুম!

নীর। (ডেস্কের উপর হইতে অসমাপ্ত চিঠি তুলিয়া লইয়া) এই তোমার গয়লা বাড়ির হিসেব? হিসেবের মধ্যে ক্ষীর নবনীর অংশটাই বেশী!

অক্ষয়। (ব্যস্তসমস্ত) না, না, ওটা নিয়ে গোল করিস্‌নে আহা, দিয়ে যা—

নৃপ। নীরু ভাই জ্বালাস্‌নে—চিঠিখানা ওঁকে ফিরিয়ে দে, ওখানে শ্যালীর উপদ্রব সয় না! কিন্তু মুখুয্যে মশায় তুমি দিদিকে চিঠিতে কি বলে সম্বোধন কর বল না।

অক্ষয়। রোজ নূতন সম্বোধন করে থাকি—

নৃপ। আজ কি করেছ বল দেখি?

অক্ষয়। শুনবে? তবে সখি শোন! চঞ্চল-চকিতচিত্তচকোরচৌর চঞ্চুচুম্বিতচারুচন্দ্রিক-রুচিরুচির চিরচন্দ্রমা।

নীর। চমৎকার চাটু-চাতুর্য্য!

অক্ষয়। এর মধ্যে চৌর্য্যবৃত্তি নেই, চর্ব্বিত চর্ব্বণ শূন্য।

নৃপ। (সবিস্ময়ে) আচ্ছা মুখুয্যেমশায় রোজ রোজ তুমি এই রকম লম্বা লম্বা সম্বোধন রচনা কর? তাই বুঝি দিদিকে চিঠি লিখতে এত দেরী হয়?

অক্ষয়। ঐ জন্যেই ত নৃপর কাছে আমার মিথ্যে কথা চলে না! ভগবান যে আমাকে সত্ত সত্ত বানিয়ে বলবার এমন অসাধারণ ক্ষমতা দিয়েছেন সেটা দেখছি খাটাতে দিলে না! ভগ্নিপতির কথা বেদবাক্য বলে বিশ্বাস করতে কোন্ মনুসংহিতায় লিখেছে বল্ দেখি?

নীর। রাগ করো না, শান্ত হও মুখুয্যে মশায় শান্ত হও! সেজ দিদির কথা ছেড়ে দাও, কিন্তু ভেবে দেখ, আমি তোমার আধখানা কথা সিকি পয়সাও বিশ্বাস করিনে, এতেও তুমি সান্ত্বনা পাও না?

নৃপ। আচ্ছা মুখুয্যেমশায়, সত্যি করে বল, দিদির নামে তুমি কখনো কবিতা রচনা করেছ?

অক্ষয়। একবার তিনি যখন অত্যন্ত রাগ করেছিলেন তখন তাঁর স্তব রচনা করে গান করেছিলুম—

নৃপ। তার পরে?

অক্ষয়। তার পরে দেখলুম, তাতে উল্টে ফল হল, বাতাস পেয়ে যেমন আগুন বেড়ে ওঠে তেমনি হল—সেই অবধি স্তব রচন ছেড়েই দিয়েছি।

নৃপ। ছেড়েই দিয়ে কেবল গয়লা বাড়ি হিসেব লিখ্‌চ। কি স্তব লিখেছিলে মুখুয্যে মশায় আমাদের শোনাও না।

অক্ষয়। সাহস হয় না, শেষকালে আমার উপরওয়ালার কাছে রিপোর্ট করবি!

নৃপ। না আমরা দিদিকে বলে দেব না।

অক্ষয়। তবে অবধান কর! (সিন্ধুকাফি)

মনোমন্দির সুন্দরী!
মণিমঞ্জীর গুঞ্জরী!
স্খলদঞ্চলা চল চঞ্চলা
অয়ি মঞ্জুলা মঞ্জরী!
রোষারুণরাগরঞ্জিতা!
বঙ্কিমভুরু ভঙ্গিতা!
গোপনহাস্য- কুটিল আস্য
কপট কলহ গঞ্জিতা!
সঙ্কোচনত-অঙ্গিনী!
ভয় ভঙ্গুর ভঙ্গিনী!
চকিতচপলনবকুরঙ্গ
যৌবনবনরঙ্গিণী!
অয়ি খল, ছলগুণ্ঠিতা!
মধুকরভরকুণ্ঠিতা!
লুব্ধ-পবন-ক্ষুব্ধ-লোভন
মল্লিকা অবলুণ্ঠিতা!
চুম্বনধনবঞ্চিনী!
দুরূহগর্ব্বমঞ্চিনী!
রুদ্ধ কোরক সঞ্চিত মধু
কঠিন কনক কঞ্চিনী!

কিন্তু আর নয়। এবারে মশায়রা বিদায় হন।

নীর। কেন এত অপমান কেন? দিদির কাছে তাড়া খেয়ে আমাদের উপরে বুঝি তার ঝাল ঝাড়তে হবে?

অক্ষয়। এরা দেখ্‌ছি পবিত্র জেনানা আর রাখতে দিলে না। আরে দুর্ব্বৃত্তে! এখনি লোক আস্‌বে!

নৃপ! তার চেয়ে বলনা দিদির চিঠিখানা শেষ করতে হবে!

অক্ষয়। নৃপবালা, তোমার এই কথাটাতে বড় খুসি হলুম, ক্রমে আমার বাক্যে তোমার সরল মনে সন্দেহ জন্মাচ্ছে! স্পষ্ট বোঝা যাচ্চে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে আস্‌চে!

নীর। তা আমরা থাক্‌লেই বা, তুমি চিঠি লেখ না, আমরা কি তোমার কলমের মুখ থেকে কথা কেড়ে নেব না কি?

অক্ষয়। তোমরা কাছাকাছি থাক্‌লে মনটা এই খানেই মারা যায়, দূরে যিনি আছেন সে পর্য্যন্ত আর পৌছয় না! না ঠাট্টা নয়, পালাও! এখনি লোক আস্‌বে—ঐ একটি বই দরজা খোলা নেই, তখন পালাবার পথ পাবে না।

নৃপ। এই সন্ধ্যে বেলায় কে তোমার কাছে আস্‌বে?

অক্ষয়। যাদের ধ্যান কর তারা নয় গো তারা নয়।

নীর। যার ধ্যান করা যায় সে সকল সময় আসে না তুমি আজ কাল সেটা বেশ বুঝতে পারচ কি বল মুখুয্যে মশায়! দেবতার ধ্যান কর আর উপদেবতার উপদ্রব হয়!

"অবলাকান্ত বাবু আছেন?" বলিয়া ঘরের মধ্যে সহসা শ্রীশের প্রবেশ। "মাপ করবেন" বলিয়া পলায়নোন্মম। নৃপ ও নীরর সবেগে প্রস্থান।

অক্ষয়। এস এস শ্রীশ বাবু!

শ্রীশ। (সলজ্জভাবে) মাপ করবেন।

অক্ষয়। রাজি আছি কিন্তু অপরাধটা কি, আগে বল!

শ্রীশ। খবর না দিয়েই—

অক্ষয়। তোমার অভ্যর্থনার জন্য মুনিসিপালিটির কাছ থেকে যখন বাজেট স্যাংশন করে নিতে হয় না তখন না হয় খবর না দিয়েই এলে শ্রীশ বাবু!

শ্রীশ। আপনি যদি বলেন, এখানে আমার অসময়ে অনধিকার প্রবেশ হয় নি তা হলেই হল!

অক্ষয়। তাই বল্লেম! তুমি যখনি আসবে তখনি সুসময়, এবং যেখানে পদার্পণ করবে সেইখানেই তোমার অধিকার, শ্রীশবাবু স্বয়ং বিধাতা সর্ব্বত্র তোমাকে পাস্‌পোর্ট দিয়ে রেখেছেন। একটু বোস অবলাকান্ত বাবুকে খবর পাঠিয়ে দিই! (স্বগত) না পলায়ন করলে চিঠি শেষ করতে পারব না!

(প্রস্থান)

শ্রীশ। চক্ষের সম্মুখ দিয়ে এক যোড়া মায়া স্বর্ণমৃগী ছুটে পালাল, ওরে নিরস্ত্র ব্যাধ তোর ছোটবার ক্ষমতা নেই! নিকষের উপর সোনার রেখার মত চকিত চোকের চাহনি দৃষ্টিপথের উপরে যেন আঁকা রয়ে গেল!

রসিকের প্রবেশ।

শ্রীশ। সন্ধ্যাবেলায় এসে আপনাদের ত বিরক্ত করিনি রসিকবাবু?

রসিক। "ভিক্ষুক-কক্ষে বিনিক্ষিপ্তঃ কিমিক্ষু নীরসো ভবেৎ? শ্রীশ বাবু আপনাকে দেখে বিরক্ত হব আমি কি এত বড় হতভাগ্য!

শ্রীশ। অবলাকান্ত বাবু বাড়ি আছেন ত?

রসিক। আছেন বৈ কি, এলেন বলে!

শ্রীশ। না, না, যদি কাজে থাকেন তাহলে তাঁকে ব্যস্ত করে কাজ নেই—আমি কুড়ে লোক, বেকার মানুষের সন্ধানে ঘুরে বেড়াই।

রসিক। সংসারে যেরা লোকেরাই কুড়ে এবং বেকার লোকেরাই ধন্য। উভয়ে সম্মিলন হলেই মণিকাঞ্চনযোগ! এই কুড়ে বেকারের মিলনের জন্যেই ত সন্ধ্যে বেলাটার সৃষ্টি হয়েছে। যোগীদের জন্যে সকাল বেলা, রোগীদের জন্যে রাত্রি, কাজের লোকের জন্যে দশটা চারটে, আর সন্ধ্যে বেলাটা, সত্যি কথা বলচি, চিরকুমার সভায় অধিবেশনের জন্যে চতুর্ম্মুখ সৃজন করেন নি! কি বলেন শ্রীশ বাবু?

শ্রীশ। সে কথা মানতে হবে বৈ কি, সন্ধ্যা চিরকুমার সভার অনেক পূর্ব্বেই সৃজন হয়েছে, সে আমাদের সভাপতি চন্দ্র বাবুর নিয়ম মানে না—

রসিক। সে যে চন্দ্রের নিয়ম মানে তার নিয়মই আলাদা। আপনার কাছে খুলে বলি হাসবেন না শ্রীশ বাবু আমার একতলার ঘরে কায়ক্লেশে একটি জানলা দিয়ে অল্প একটু জ্যোৎস্না আসে—শুক্ল সন্ধ্যায় সেই জ্যোৎস্নার শুভ্র রেখাটি যখন আমার বক্ষের উপর এসে পড়ে তখন মনে হয় কে আমার কাছে কি খবর পাঠালে গো? শুভ্র একটি হংসদূত কোন বিরহিণীর হয়ে এই চিরবিরহীর কাণে কাণে বলচে—

অলিন্দে কালিন্দীকমল সুরভৌ কুঞ্জবসতে-
র্বসন্তীং বাসন্তীনবপরিমলোদগার চিকুরাং।
ত্বদুৎসঙ্গে লীনাং মদমুকুলিতাক্ষীং পুনরিমাং
কদাহং সেবিষ্যে কিসলয় কলাপব্যজনিনীং।

শ্রীশ। বেশ বেশ রসিক বাবু, চমৎকার। কিন্তু ওর মানেটা বলে দিতে হবে। ছন্দের ভিতর দিয়ে ওর রসের গন্ধটা পাওয়া যাচ্চে কিন্তু অনুস্বার বিসর্গ দিয়ে একেবারে এঁটে বন্ধ করে রেখেছে!

রসিক। বাঙ্গালায় একটা তর্জ্জমাও করেছি—পাছে সম্পাদকরা খবর পেয়ে ছড়াছড়ি লাগিয়ে দেয়, তাই লুকিয়ে রেখেছি—শুনবেন শ্রীশ বাবু!

কুঞ্জ কুটীরের স্নিগ্ধ অলিন্দের পর
কালিন্দীকমলগন্ধ ছুটিবে সুন্দর।

লীনা রবে মদিরাক্ষী তব অঙ্কতলে,
বহিবে বাসন্তীবাস ব্যাকুল কুন্তলে।
তাঁহারে কবিব সেবা, কবে হবে হায়,
কিসলয় পাখা খানি দোলাইব গায় ?

শ্রীশ। বা, বা, রসিক বাবু আপনার মধ্যে এত আছে তা ত জানতুম না।

রসিক। কি করে জানবেন বলুন। কাব্যলক্ষ্মী যে তাঁর পদ্মবন থেকে মাঝে মাঝে এই টাকের উপরে খোলা হাওয়া খেতে আসেন এ কেউ সন্দেহ করে না। (হাত বুলাইয়া) কিন্তু এখন ফাঁকা জায়গা আর নেই !

শ্রীশ। আহা হা রসিক বাবু, যমুনাতীরে সেই স্নিগ্ধ অলিন্দওয়ালা কুঞ্জ কুটিরটি আমার ভারি মনে লেগে গেছে। যদি পায়োনিয়রে বিজ্ঞাপন দেখি সেটা দেনার দায়ে নিলেমে বিক্রী হচ্ছে তা হলে কিনে ফেলি !

রসিক। বলেন কি শ্রীশ বাবু ! শুধু অলিন্দ নিয়ে করবেন কি ? সেই মদমুকুলিতাক্ষীর কথাটা ভেবে দেখবেন। সে নিলেমে পাওয়া শক্ত।

শ্রীশ। কার রুমাল এখানে পড়ে রয়েছে !

রসিক। দেখি দেখি ! তাইত ! দুর্লভ জিনিষ আপনার হাতে ঠেকে দেখ্‌চি ! বাঃ দিব্যি গন্ধ ! শ্লোকের লাইনটা বদ্‌লাতে হবে মশায়, ছন্দ ভঙ্গ হয় হোক্ গে—"বাসন্তীনবপরিমলোদ্‌গাররুমালাং" ! শ্রীশবাবু, এ রুমালটাতে ত আমাদের কুমারসভার পতাকা নির্ম্মাণ চল্‌বে না। দেখেছেন, কোণে একটি ছোট্ট ন অক্ষর লেখা রয়েছে।

শ্রীশ। কি নাম হতে পারে বলুন দেখি ! নলিনী ? না, বড্ড চলিত নাম। নীলাম্বুজা ? ভয়ঙ্কর ঘোটা। নীহারিকা ? বড় বাড়াবাড়ি। বলুন না রসিক বাবু, আপনার কি মনে হয় !

রসিক। নাম মনে হয় না মশায়, আমার ভাব মনে আসে, অভিধানে যত ন আছে সমস্ত মাথার মধ্যে রাশীকৃত হয়ে উঠ্‌তে চাচ্চে, নয়ের মালা গেঁথে একটি নীলোৎপলনয়নার গলায় পরিয়ে দিতে ইচ্ছে করচে—নির্ম্মলনবনীনিন্দিত নবীন—বলুন না শ্রীশবাবু—শেষ করে দিন না—

শ্রীশ। নবমল্লিকা।

(রসিক। বেশ বেশ—নির্ম্মলনবনী নিন্দিত নবীন নবমল্লিকা ! গীতগোবিন্দ মাটি হল ! আরো অনেকগুলো ভাল ভাল ন মাথার মধ্যে হাহাকার করে বেড়াচ্চে, মিলিয়ে দিতে পাচ্চি নে—নিভৃত নিকুঞ্জনিলয়, নিপুণনূপুরনিক্কণ, নিবিড় নীরদনির্ম্মুক্ত—অক্ষয় দাদা থাক্‌লে ভাবতে হত না ! মাষ্টার মশায়কে দেখবামাত্র ছেলেগুলো যেমন বেঞ্চে নিজ নিজ স্থানে সার বেঁধে বসে—তেমনি অক্ষয় দাদার সাড়া পাবামাত্র কথাগুলো দৌড়ে এসে যুড়ে দাঁড়ায়। শ্রীশবাবু, বুড়ো মানুষকে বঞ্চনা করে রুমালখানা চুপি চুপি পকেটে পুরবেন না—

শ্রীশ। আবিষ্কার কর্ত্তার অধিকার সকলের উপর—

রসিক। আমার ঐ রুমালখানিতে একটু প্রয়োজন আছে শ্রীশ বাবু ! আপনাকে ত বলেছি আমার নির্জ্জন ঘরের একটি মাত্র জানলা দিয়ে একটু মাত্র চাঁদের আলো আসে —আমার একটি কবিতা মনে পড়ে—

বীথীষু বীথীষু বিলাসিনীনাং
মুখানি সংবীক্ষ্য শুচিস্মিতানি,
জালেষু জালেষু করং প্রসার্য্য
লাবণ্যভিক্ষামটতীব চন্দ্রঃ।

কুঞ্জ পথে পথে চাঁদ উঁকি দেয় আসি,
দেখে বিলাসিনীদের মুখভরা হাসি।
কর প্রসারণ করি ফিরে সে জাগিয়া
বাতায়নে বাতায়নে লাবণ্য মাগিয়া।

হতভাগা ভিক্ষুক আমার বাতায়নটায় যখন আসে তখন তাকে কি দিয়ে ভোলাই বলুনত? কাব্য শাস্ত্রের রসালো জায়গা যা কিছু মনে আসে সমস্ত আউড়ে যাই, কিন্তু কথায় চিঁড়ে ভেজে না! সেই দুর্ভিক্ষের সময় ঐ রুমালখানি বড় কাজে লাগ্‌বে। ওতে অনেকটা লাবণ্যের সংস্রব আছে।

শ্রীশ। সে লাবণ্য কি দৈবাৎ কখনো দেখেছেন রসিক বাবু?

রসিক। দেখেছি বৈ কি, নইলে কিঐ রুমালখানার জন্যে এত লড়াই করি? আর ঐ যে ন অক্ষরের কথাগুলো আমার মাথার মধ্যে এখনো এক ঝাঁক ভ্রমরের মত গুঞ্জন করে বেড়াচ্চে তাদের সাম্‌নে কি একটি কমলবনবিহারিণী মানসীমূর্ত্তি নেই?

শ্রীশ। রসিক বাবু, আপনার ঐ মগজটি একটি মৌচাক বিশেষ, ওর ফুকরে ফুকরে কবিত্বের মধু—আমাকে সুদ্ধ মাতাল করে দেবেন দেখছি! (দীর্ঘ নিঃশ্বাস পতন).

পুরুষবেশী শৈলবালার প্রবেশ।

শৈল। আমার আস্‌তে অনেক দেরী হয়ে গেল, মাপ করবেন শ্রীশ বাবু।

শ্রীশ। আমি এই সন্ধ্যে বেলায় উৎপাত করতে এলুম, আমাকেও মাপ করবেন অবলাকান্ত বাবু!

শৈল। রোজ সন্ধ্যা বেলায় যদি এই রকম উৎপাত করেন তাহলে মাপ করব, নইলে নয়।

শ্রীশ। আচ্ছা রাজি, কিন্তু এর পরে যখন অনুতাপ উপস্থিত হবে তখন প্রতিজ্ঞা স্মরণ কর্‌বেন।

শৈল। আমার জন্যে ভাববেন না, কিন্তু আপনার যদি অনুতাপ উপস্থিত হয় তা হলে আপনাকে নিষ্কৃতি দেব।

শ্রীশ। সেই ভরসায় যদি থাকেন তাহলে অনন্তকাল অপেক্ষা করতে হবে।

শৈল। রসিক দাদা তুমি শ্রীশ বাবুর পকেটের দিকে হাত বাড়াচ্চ কেন? বুড়ো বয়সে গাঁটকাটা ব্যবসা ধরবে না কি?

রসিক। না ভাই, সে ব্যবসা তোদের বয়সেই শোভা পায়। একখানা রুমাল নিয়ে শ্রীশবাবুতে আমাতে তকরার চল্‌চে, তোকে তার মীমাংসা করে দিতে হবে।

শৈল। কি রকম?'

রসিক। প্রেমের বাজারে বড় মহাজনী করবার মূলধন আমার নেই—আমি খুচরো মালের কারবারী—রুমালটা, চুলের দড়িটা, ছেঁড়া কাগজে দুচারটে হাতের অক্ষর এই সমস্ত কুড়িয়ে বাড়িয়েই আমাকে সন্তুষ্ট থাকৃতে হয়। শ্রীশ বাবুর যে রকম মূলধন আছে তাতে উনি বাজার সুদ্ধ পাইকেরি দরে কিনে নিতে পারেন—রুমাল কেন সমস্ত নীলাঞ্চলে অৰ্দ্ধেক ভাগ বসাতে পারেন; আমরা যেখানে চুলের দড়ি গলায় জড়িয়ে মরতে ইচ্ছে করি উনি যে সেখানে আগুল্‌ফবিলম্বিত চিকুররাশির সুগন্ধ ঘনান্ধকারের মধ্যে সম্পূর্ণ অস্ত যেতে পারেন। উনি উঞ্ছবৃত্তি করতে আসেন কেন?

শ্রীশ। অবলাকান্ত বাবু, আপনি ত নিরপেক্ষ ব্যক্তি, রুমালখানা এখন আপনার হাতেই থাক্, উভয় পক্ষের বক্তৃতা শেষ হয়ে গেলে বিচারে যার, প্রাপ্য হয় তাকেই দেবেন।

শৈল। (রুমালখানি পকেটে পুরিয়া) আমাকে আপনি নিরপেক্ষ লোক মনে করচেন বুঝি? এই কোণে যেমন একটি ন অক্ষর লাল সুতোয় সেলাই করা আছে আমার হৃদয়ের একটি কোণে খুঁজলে দেখতে পাবেন ঐ

অক্ষরটি রক্তের বর্ণে লেখা আছে। এ রুমাল আমি আপনাদের কাউকেই দেব না।

শ্রীশ। রসিক বাবু এ কি রকম জবরদস্তি। আর, ন অক্ষরটিও ত বড় ভয়ানক অক্ষর!

রসিক। শুনেছি বিলাতী শাস্ত্রে ন্যায়ধর্ম্মও অন্ধ ভালবাসাও অন্ধ এখন দুই অন্ধে লড়াই হোক, যার বল বেশী তারই জিত হবে।

শৈল। শ্রীশ বাবু, যার রুমাল আপনি ত তাকে দেখেন নি, তবে কেন কেবলমাত্র কল্পনার উপর নির্ভর করে ঝগড়া করচেন।

শ্রীশ। দেখিনি কে বল্লে?

শৈল। দেখেছেন? কাকে দেখলেন। ন ত দুটি আছে—

শ্রীশ। দুটিই দেখেছি—তা এ রুমাল দুজনের যাঁরই হোক্, দাবী আমি পরিত্যাগ করতে পারব না।

রসিক। শ্রীশ বাবু বৃদ্ধের পরামর্শ শুনুন, হৃদয়গগনে দুই চন্দ্রের আয়োজন করবেন না, একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি।

ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। (শ্রীশের প্রতি) চন্দ্র বাবুর চিঠি নিয়ে একটি লোক আপনার বাড়ি খুঁজে শেষকালে এখানে এসেছে।

শ্রীশ। (চিঠি পড়িয়া) একটু অপেক্ষা করবেন? চন্দ্র বাবুর বাড়ি কাছেই—আমি একবার চট্ করে দেখা করে আসব।

শৈল। পালাবেন না ত?

শ্রীশ। না আমার রুমাল বন্ধক রইল, ওটা না খালাস না করে যাচ্চিনে। (প্রস্থান)

রসিক। ভাই শৈল, কুমারসভার সভ্যগুলিকে যে রকম ভয়ঙ্কর কুমার ঠাউরেছিলুম তার কিছুই নয়। এদের তপস্যা ভঙ্গ করতে মেনকা রম্ভা মদন বসন্ত কারো দরকার হয় না, এই বুড়ো রসিকই পারে।

শৈল। তাই ত দেখছি।

রসিক। আসল কথাটা কি জান? যিনি দার্জ্জিলেঙে থাকেন তিনি ম্যালেরিয়ার দেশে পা বাড়াবামাত্রই রোগে চেপে ধরে। এরা এতকাল চন্দ্রবাবুর বাসায় বড্ড নীরোগ জায়গায় ছিলেন, এই বাড়িটি যে রোগের বীজে ভরা; এখানকার রুমালে, বইয়ে, চৌকিতে, টেবিলে যেখানে স্পর্শ করচেন সেইখান থেকেই একেবারে নাকে মুখে রোগ ঢুকচে—আহা, শ্রীশ বাবুটি গেল।

শৈল। রসিক দাদা, তোমার বুঝি রোগের বীজ অভ্যেস হয়ে গেছে?

রসিক। আমার কথা ছেড়ে দাও! আমার পিলে যকৃৎ যা কিছু হবার তা হয়ে গেছে।

নীরবালার প্রবেশ।

নীরবালা। দিদি আমরা পাশের ঘরেই ছিলুম।

রসিক। জেলেরা জাল টানাটানি করে মরচে, আর চিল বসে আছে ছোঁ মারবার জন্যে?

নীর। সেজ দিদির রুমালখানা নিয়ে শ্রীশ বাবু কি কাণ্ডটাই করলে? সেজদিদি ত লজ্জায় লাল হয়ে পালিয়ে গেছে। আমি এম্নি বোকা, ভুলেও কিছু ফেলে যাইনি। বারোখানা রুমাল এনেছি ভাব্‌ছি এবার ঘরের মধ্যে রুমালের হরির লুঠ দিয়ে যাব!

শৈল। তোর হাতে ও কিসের খাতা নীর?

নীর। যে গানগুলো আমার পছন্দ হয় ওতে লিখে রাখি দিদি।

রসিক। ছোড়দিদি, আজকাল তোর কি রকম পারমার্থিক গান পছন্দ হচ্ছে তার এক আধটা নমুনা দেখ্‌তে পারি কি?

নীর। —"দিন গেলরে, ডাক দিয়েনে পারের খেয়া,

চুকিয়ে হিসেব মিটিয়ে দে তোর দেয়া নেয়া"।

রসিক। দিদি ভারি ব্যস্ত যে! পার করবার নেয়ে ডেকে দিচ্ছি ভাই! যা দেবে যা নেবে সেটা মোকাবিলায় ঠিক করে নিয়ো।

"অবলাকান্ত বাবু আছেন?" বলিয়া বিপিন ঘরে প্রবিষ্ট ও সচকিত হইয়া স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান—নীরবালা মুহূর্ত্ত হতবুদ্ধি হইয়া দ্রুতবেগে বহিষ্ক্রান্ত।

শৈল। আসুন বিপিন বাবু।

বিপিন। ঠিক করে বলুন আস্‌ব কি? আমি আসার দরুন আপনাদের কোন রকম লোকসান নেই?

রসিক। ঘর থেকে কিছু লোকসান না করলে লাভ হয় না বিপিন বাবু—ব্যবসার এই রকম নিয়ম। যা গেল তা আবার দুনো হোয়ে ফিরে আস্‌তে পারে, কি বল অবলাকান্ত?

শৈল। রসিক দাদার রসিকতা আজকাল একটু শক্ত হয়ে আস্‌চে।

রসিক। গুড় জমে যে রকম শক্ত হয়ে আসে। কিন্তু বিপিন বাবু কি ভাবচেন বলুন দেখি?

বিপিন। ভাবচি কি ছুতো করে বিদায় নিলে আমাকে বিদায় দিতে আপনাদের ভদ্রতায় বাধবে না!

শৈল। বন্ধুত্বে যদি বাধে?

বিপিন। তা হলে ছুতো খোঁজবার কোন দরকারই হয় না।

শৈল। তবে সেই খোঁজটা পরিত্যাগ করুন, ভাল হয়ে বসুন।

রসিক। মুখখানা প্রসন্ন করুন বিপিন বাবু! আমাদের প্রতি ঈর্ষা করবেন না। আমি ত বৃদ্ধ, যুবকের ঈর্ষার যোগ্যই নই। আর অমাদের সুকুমারমূর্ত্তি অবলাকান্ত বাবুকে কোন স্ত্রীলোক পুরুষ বলে জ্ঞানই করে না। আপনাকে দেখে যদি কোন সুন্দরী কিশোরী ত্রস্ত হরিণীর মত পলায়ন করে থাকেন তাহলে মনকে এই বলে সান্ত্বনা দেবেন যে, তিনি আপনাকে পুরুষ বলেই মস্ত খাতিরটা করেছেন। হায়রে হতভাগ্য রসিক, তোকে দেখে কোন তরুণী লজ্জাতে পলায়নও করে না!

বিপিন। রসিক বাবু আপনাকেও যে, দলে টান্‌চেন অবলাকান্ত বাবু! এ কি রকম হল।

শৈল। কি জানি বিপিন বাবু—আমার এই অবলাকান্ত নামটাই মিথ্যে—কোন অবলা ত এ পর্য্যন্ত আমাকে কান্ত বলে বরণ করে নি।

বিপিন। হতাশ হবেন না, এখনো সময় আছে।

শৈল। সে আশা এবং সে সময় যদি থাক্‌ত তাহলে চিরকুমার-সভায় নাম লেখাতে যেতুম না।

বিপিন। (স্বগত) এঁর মনের মধ্যে একটা কি বেদনা রয়েছে নইলে এত অল্প বয়সে এই কাঁচামুখে এমন স্নিগ্ধ কোমল করুণভাব থাক্‌ত না। এটা কিসের খাতা? গান লেখা দেখচি। নীরবালা দেবী! (পাঠ)

শৈল। কি পড়চেন বিপিন বাবু?

বিপিন। কোন একটি অপরিচিতার কাছে অপরাধ করচি, হয় ত তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবার সুযোগ পাব না এবং হয়ত তাঁর কাছে শাস্তি পাবারও সৌভাগ্য হবে না কিন্তু এই গানগুলি মাণিক এবং হাতের অক্ষর গুলি মুক্তো! যদি লোভে পড়ে চুরি করি তবে দণ্ডদাতা বিধাতা ক্ষমা করবেন!

শৈল। বিধাতা মাপ করতে পারেন কিন্তু আমি করব না। ও খাতাটির পরে আমার লোভ আছে বিপিন বাবু।

রসিক। আর আমি বুঝি লোভ মোহ মত্ত জয় করে বসে আছি? আহা, হাতের অক্ষরের মত জিনিষ আর আছে? মনের ভাব মূর্ত্তি ধরে আঙুলের আগা দিয়ে বেরিয়ে আসে—অক্ষরগুলির উপর চোখ বুলিয়ে গেলে, হৃদয়টি যেন চোখে এসে লাগে! অবলাকান্ত, এ খাতাখানি ছেড়োনা ভাই! তোমাদের চঞ্চলা নীরবালা দেবী কৌতুকের ঝরনার মত দিনরাত ঝরে পড়ছে, তাকে ত ধরে রাখতে পার না, এই খাতাখানির পত্রপুটে তারি একটি গণ্ডূষ ভরে উঠেছে—এ জিনিষের দাম আছে! বিপিন বাবু, আপনি ত নীরবালাকে জানেন না, আপনি এ খাতাখানা নিয়ে কি করবেন।

বিপিন। আপনারা ত স্বয়ং তাঁকেই জানেন—খাতাখানিতে আপনাদের প্রয়োজন কি? এই খাতা থেকে আমি যেটুকু পরিচয় প্রত্যাশা করি তার প্রতি আপনারা দৃষ্টি দেন কেন?

শ্রীশের প্রবেশ।

শ্রীশ। মনে পড়েছে মশায়—সে দিন এখানে একটা বইয়েতে নাম দেখেছিলেম, নৃপবালা, নীরবালা—একি, বিপিন যে! তুমি এখানে হঠাৎ?

বিপিন। তোমার সম্বন্ধেও ঠিক ঐ প্রশ্নটা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

শ্রীশ। আমি এসেছিলুম আমার সেই সন্ন্যাস সম্প্রদায়ের কথাটা অবলাকান্ত বাবুর সঙ্গে আলোচনা করতে। ওঁর যে রকম চেহারা, কণ্ঠস্বর, মুখের ভাব, উনি ঠিক আমার সন্ন্যাসীর আদর্শ হতে পারেন। উনি যদি ওঁর ঐ চন্দ্রকলার মত কপালটিতে চন্দন দিয়ে, গলায় মালা পরে, হাতে একটি বীণা নিয়ে সকাল বেলায় একটি পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করেন তা হলে কোন্ গৃহস্থের হৃদয় না গলাতে পারেন?

রসিক। বুঝতে পারচিনে মশায়, হৃদয় গলাবার কি খুব জরুর দরকার হয়েছে?

শ্রীশ। চিরকুমারসভা হৃদয় গলাবার সভা।

রসিক। বলেন কি? তবে আমার দ্বারা কি কাজ পাবেন?

শ্রীশ। আপনার মধ্যে যে রকম উত্তাপ আছে আপনি উত্তর মেরুতে গেলে সেখানকার বরফ গলিয়ে বন্যা করে দিয়ে আসতে পারেন। বিপিন উঠচ না কি?

বিপিন। যাই আমাকে রাত্রে একটু পড়তে হবে।

রসিক। (জনান্তিকে) অবলাকান্ত জিজ্ঞাসা করচেন পড়া হয়ে গেলে বইখানা কি ফেরৎ পাওয়া যাবে?

বিপিন। (জনান্তিকে) পড়া হয়ে গেলে সে আলোচনা পরে হবে, আজ থাক।

শৈল। (মৃদুস্বরে) শ্রীশ বাবু ইতস্ততঃ করচেন কেন, আপনার কিছু হারিয়েছে না কি?

শ্রীশ (মৃদুস্বরে) আজ থাক, আর এক দিন খুঁজে দেখব!

উভয়ের প্রস্থান।

নীরবালা। (দ্রুত প্রবেশ করিয়া) এ কি রকমের ডাকাতী দিদি? আমার গানের খাতাখানা নিয়ে গেল? আমার ভয়ানক রাগ হচ্ছে।

রসিক। রাগ শব্দে নানা অর্থ অভিধানে কয়।

নীর। আচ্ছা পণ্ডিত মশায়, তোমার

অভিধান জাহির করতে হবে না—আমার খাতা ফিরিয়ে আন।

রসিক। পুলিসে খবর দে ভাই, চোর ধরা আমার ব্যবসা নয়।

নীর। কেন দিদি তুমি আমার খাতা নিয়ে যেতে দিলে?

শৈল। এমন অমূল্য ধন তুই ফেলে রেখে যাস্ কেন?

নীর। আমি বুঝি ইচ্ছে করে ফেলে রেখে গেছি?

রসিক। লোকে সেই রকম সন্দেহ করচে!

নীর। না রসিকদাদা, তোমার ঠাট্টা আমার ভাল লাগে না!

রসিক। তা হলে ভয়ানক খারাপ অবস্থা!

(সক্রোধে প্রস্থান)

সলজ্জ নৃপবালার প্রবেশ।

রসিক। কি নৃপ, হারাধন খুঁজে বেড়াচ্ছিস?

নৃপ। না আমার কিছু হারায় নি!

রসিক। সে ত অতি সুখের সংবাদ। শৈলদিদি, তা হলে আর কেন, রুমালখানার মালিক যখন পাওয়া যাচ্চে না, তখন যে লোক কুড়িয়ে পেয়েছে তাকেই ফিরিয়ে দিস্। (শৈলের হাত হইতে রুমাল লইয়া) এ জিনিষটা কার ভাই?

নৃপ। ও আমার নয়! (পলায়নোদ্যত)

রসিক। (নৃপকে ধরিয়া) যে জিনিষটা খোওয়া গেছে নৃপ তার উপরে কোন দাবীও রাখতে চায় না।

নৃপ। রসিক দাদা, ছাড় আমার কাজ আছে।

নবম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

পথে বাহির হইয়াই শ্রীশ কহিল—ওহে বিপিন, আজ মাঘের শেষে প্রথম বসন্তের বাতাস দিয়েছে, জ্যোৎস্নাও দিব্যি, আজ যদি এখনি ঘুমতে কিংবা পড়া মুখস্থ করতে যাওয়া যায় তাহলে দেবতারা ধিক্কার দেবেন।

বিপিন। তাঁদের ধিক্কার খুব সহজে সহ্য হয় কিন্তু ব্যামোর ধাক্কা কিংবা—

শ্রীশ। দেখ, ঐ জন্যে তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়। আমি বেশ জানি দক্ষিণে হাওয়ায় তোমারও প্রাণটা চঞ্চল হয়, কিন্তু পাছে কেউ তোমাকে কবিত্বের অপবাদ দেয় বলে মলয় সমীরণটাকে একেবারেই আমল দিতে চাও না। এতে তোমার বাহাদুরীটা কি জিজ্ঞাসা করি? আমি তোমার কাছে আজ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করচি, আমার ফুল ভাল লাগে। জ্যোৎস্না ভাল লাগে, দক্ষিণে হাওয়া ভাল লাগে—

বিপিন। এবং—

শ্রীশ। এবং যা কিছু ভাল লাগবার মত জিনিষ সবই ভাল লাগে।

বিপিন। বিধাতা ত তোমাকে ভারি আশ্চর্য্য রকম ছাঁচে গড়েছেন দেখচি।

শ্রীশ। তোমার ছাঁচ আরও আশ্চর্য্য তোমার লাগে ভাল, কিন্তু বল অন্য রকম—আমার সেই শোবার ঘরের ঘড়িটার মত—সে চলে ঠিক কিন্তু বাজে ভুল।

বিপিন। পৃথিবীর অনেক মনুষ্য কথা বলে ঠিক কিন্তু চলে অন্য রকম, পাছে তাদের দলের বলে সন্দেহ করে, তাই বলাটা একটু বেঠিক করে রাখতে হয় হে। কিন্তু শ্রীশ

তোমার যদি সব মনোরম জিনিষই মনোহর লাগ্‌তে লাগ্‌ল তাহলে ত আসন্ন বিপদ।

শ্রীশ। আমি ত কিছুই বিপদ বোধ করিনে।

বিপিন। সেই লক্ষণটাই ত সব চেয়ে খারাপ। রোগের যখন বেদনা বোধ চলে যায় তখন আর চিকিৎসার রাস্তা থাকে না। আমি ভাই স্পষ্টই কবুল করচি, স্ত্রীজাতির একটা আকর্ষণ আছে—চিরকুমার সভা যদি সেই আকর্ষণ এড়াতে চান তাহলে তাকে খুব তফাৎ দিয়ে যেতে হবে।

শ্রীশ। ভুল, ভুল, ভয়ানক ভুল! তুমি তফাতে থাক্‌লে কি হবে, তাঁরা ত তফাতে থাকেন না। সংসার রক্ষার জন্যে বিধাতাকে এত নারী সৃষ্ট করতে হয়েছে যে, তাঁদের এড়িয়ে চলা অসম্ভব। অতএব কৌমার্য্য যদি রক্ষা করতে চাও তাহলে নারীজাতিকে অল্পে অল্পে সইয়ে নিতে হবে। ঐযে স্ত্রীসভ্য নেবার নিয়ম হয়েছে এতদিন পরে কুমারসভা চিরস্থায়ী হবার উপায় অবলম্বন করেছে। কিন্তু কেবল এক জন মহিলা হলে চল্‌বে না বিপিন, অনেক-গুলি স্ত্রীসভ্য চাই। বন্ধ ঘরের একটি জানলা খুলে ঠাণ্ডা লাগালে সর্দ্দি ধরে, খোলা হাওয়ায় থাক্‌লে সে বিপদ নেই।

বিপিন। আমি তোমার ঐ খোলা হাওয়া বন্ধ হাওয়া বুঝিনে ভাই! যার সর্দ্দির ধাত তাকে সর্দ্দি থেকে রক্ষা করতে দেবে মানবে কেউ পারে না।

শ্রীশ। তোমার ধাত কি বল্‌চে হে?

বিপিন। সে কথা খোলসা করে বল্লেই বুঝতে পারবে তোমার ধাতের সঙ্গে তার চমৎকার মিল আছে। নাড়ীটা যে সব সময়ে ঠিক চিরকুমারের নাড়ীর মত চলে তা জাঁক করে বল্‌তে পারব না।

শ্রীশ। ঐটে তোমার আর একটা ভুল। চিরকুমারের নাড়ীর উপরে উনপঞ্চাশ পবনের নৃত্য হতে দাও—কোন ভয় নেই—বাঁধাবাঁধি চাপাচাপি কোরো না। আমাদের এটা ত নির্ব্বাণ মুক্তির সভা নয়—ঠিক তার উল্টো—আমাদের হল অগ্নিকাণ্ড ব্রত। তবে আমাদের অগ্নি গৃহকর্ম্মের অগ্নি নয়—এ অগ্নি দেশে দেশে হৃদয়ে হৃদয়ে জ্বালাতে হবে। আমাদের মত ব্রত যাদের, তারা কি হৃদয়টিকে তুলো দিয়ে মুড়ে রাখতে পারে? তাকে অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়ার মত ছেড়ে দাও, যে তাকে বাঁধবে তার সঙ্গে লড়াই কর—আমাদের এটাত বিনা সংগ্রামের যজ্ঞ নয়!

বিপিন। ও কেহে! পূর্ণ দেখ্‌চি। ও বেচারার এ গলি থেকে আর বেরবার যো নেই! ঐ বীরপুরুষের অশ্বমেধের ঘোড়াটি কেন্দ্রায় ঘোঁড়াচ্চে। ওকে একবার ডাক দেব?

শ্রীশ। ডাক। ও কিন্তু আমাদের দুজনকে অন্বেষণ করে গলিতে গলিতে ঘুরচে বলে বোধ হচ্চে না—আমাদের দুজনের সাড়া পাবা-মাত্রই যে পুলকিত হয়ে উঠ্‌বে এমন লক্ষণ নয়।

বিপিন। পূর্ণ বাবু, খবর কি?

পূর্ণ। অত্যন্ত পুরোনো। কাল পর্শু যে খবর চল্‌ছিল আজও তাই চল্‌চে।

শ্রীশ। কাল পর্শু শীতের হাওয়া বচ্ছিল, আজ বসন্তর হাওয়া দিয়েছে—এতে দুটো একটা নতুন খবরের আশা করা যেতে পারে!

পূর্ণ। দক্ষিণের হাওয়ায় যে সব খবরের সৃষ্টি হয়, কুমারসভার খবরের কাগজে তার স্থান নাই। তপোবনে এক দিন অকাল বসন্তের হাওয়া দিয়েছিল তাই নিয়ে কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্য রচনা হয়েছে—আমাদের কপালগুণে বসন্তের হাওয়ায় কুমার-অসম্ভব কাব্য হয়ে দাঁড়ায়।

বিপিন। হয় ত হোক্ না পূর্ণ বাবু—সে কাব্যে যে দেবতা দগ্ধ হয়েছিলেন এ কাব্যে তাঁকে পুনর্জীবন দেওয়া যাক্।

পূর্ণ। এ কাব্যে চিরকুমার সভা দগ্ধ হোক্! যে দেবতা জ্বলেছিলেন তিনি জ্বালান্! না, আমি ঠাট্টা করচিনে শ্রীশ বাবু আমাদের চিরকুমার সভাটি একটি আস্ত জতু গৃহ বিশেষ। আগুন লাগ্‌লে রক্ষে নেই। তার চেয়ে বিবাহিত সভা স্থাপন কর স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে নিরাপদ থাক্‌বে। যে ইট পাঁজায় পুড়েছে তা' দিয়ে ঘর তৈরি করলে আর পোড়বার ভয় থাকে না হে!

শ্রীশ। যে সে লোক বিবাহ করে করে বিবাহ জিনিবটা মাটি হয়ে গেছে পূর্ণ বাবু। সেই জন্যেইত কুমার সভা। আমার যত দিন প্রাণ আছে ততদিন এ সভায় প্রজাপতির প্রবেশ নিষেধ।

বিপিন। পঞ্চশর?

শ্রীশ। আসুন্ তিনি। একবার তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেলে, বাস্, আর ভয় নেই!

পূর্ণ। দেখো শ্রীশবাবু!

শ্রীশ। দেখ্‌ব আর কি? তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্চি! এক চোট দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্‌ব, কবিতা আওড়াব, কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠ হয়ে যাব, তবে রীতিমত সন্ন্যাসী হতে পারব। আমাদের কবি লিখেছেন—

নিশি না পোহাতে জীবন প্রদীপ
জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া
তোমার অনল দিয়া!
কবে যাবে তুমি সমুখের পথে
দীপ্ত শিখাটি বাহি
আছি তাই পথ চাহি!
পুড়িবে বলিয়া রয়েছে আশায়
আমার নীরব হিয়া
আপন আঁধার নিয়া!
নিশি না পোহাতে জীবন প্রদীপ
জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া!

পূর্ণ। ওহে শ্রীশ বাবু, তোমার কবিটি ত মন্দ লেখেনি!—

নিশি না পোহাতে জীবন প্রদীপ
জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া!

ঘরটি সাজান রয়েছে—থালায় মালা, পালঙ্কে পুষ্পশয্যা, কেবল জীবন প্রদীপটি জ্বলচে না, সন্ধ্যা ক্রমে রাত্রি হতে চল্‌ল! বাঃ দিব্যি লিখেছ! কোন্ বইটাতে আছে বল দেখি?

শ্রীশ। বইটার নাম আবাহন।

পূর্ণ। নামটাও বেছে বেছে দিয়েছে ভাল! (আপন মনে)—

নিশি না পোহাতে জীবন প্রদীপ
জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া (দীর্ঘনিশ্বাস)

তোমরা কি বাড়ির দিকে চলেচ?

শ্রীশ। বাড়ি কোন্ দিকে ভুলে গেছি ভাই!

পূর্ণ। আজ পথ ভোলবার মতই রাতটা হয়েছে বটে! কি বল বিপিন বাবু!

শ্রীশ। বিপিন বাবু এসকল বিষয়ে কোন কথাই কন না, পাছে ওঁর ভিতরকার কবিত্ব ধরা পড়ে! কৃপণ যে জিনিষটার বেশী আদর করে সেইটেকেই মাটির নীচে পুতে রাখে।

বিপিন। অস্থানে বাজে খরচ করতে চাইনে ভাই, স্থান খুঁজে বেড়াচ্চি। মরতে হলে একেবারে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে মরাই ভাল!

পূর্ণ। এত উত্তম কথা, শাস্ত্রসঙ্গত কথা! বিপিন বাবু একেবারে অন্তিমকালের জন্যে কবিত্ব সঞ্চয় করে রাখ্‌চেন, যখন অন্যে বাক্য কবেন কিন্তু উনি রবেন নিরুত্তর! আশীর্ব্বাদ করি অন্তের সেই বাক্য গুলি যেন মধুমাখা হয়—

শ্রীশ। এবং তার সঙ্গে যেন কিঞ্চিৎ গানের সম্পর্কও থাকে—

বিপিন। এবং বাক্যবর্ষণ করেই যেন মুখের সমস্ত কর্ত্তব্য নিঃশেষ না হয়,—

পূর্ণ। বাক্যের বিরাম স্থলগুলি যেন বাক্যের চেয়ে মধুমত্তর হয়ে ওঠে!

শ্রীশ। সে দিন নিদ্রা যেন না আসে—

পূর্ণ। রাত্রি যেন না যায়—

বিপিন। চন্দ্র যেন পূর্ণচন্দ্র হয়—

পূর্ণ। বিপিন যেন বসন্তের ফুলে প্রফুল্ল হয়ে ওঠে—

শ্রীশ। এবং হতভাগ্য শ্রীশ যেন কুঞ্জদ্বারের কাছে এসে উঁকি ঝুঁকি না মারে।

পূর্ণ। দূর হোক্ গে শ্রীশ বাবু তোমার সেই আবাহন থেকে আর একটা কিছু কবিতা আওড়াও। চমৎকার লিখেছে হে।

নিশি না পোহাতে জীবন প্রদীপ
জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া!

আহা! একটি জীবন প্রদীপের শিখাটুকু আরেকটি জীবন প্রদীপের মুখের কাছে কেবল একটু ঠেকিয়ে গেলেই হয়, বাস্, আর কিছুই নয়—দুটি কোমল অঙ্গুলি দিয়ে প্রদীপখানি একটু হেলিয়ে একটু ছুঁইয়ে যাওয়া তার পরেই চকিতের মধ্যে সমস্ত আলোকিত! (আপন মনে) নিশি না পোহাতে (ইত্যাদি)।

শ্রীশ। পূর্ণ বাবু, যাও কোথায়!

পূর্ণ। চন্দ্র বাবুর বাসায় একখানা বই ফেলে এসেছি সেইটে খুঁজতে যাচ্ছি।

বিপিন। খুঁজলে পাবে ত? চন্দ্রবাবুর বাসা বড় এলোমেলো জায়গা—সেখানে যা হারায় সে আর পাওয়া জায় না।

(পূর্ণের প্রস্থান)

শ্রীশ। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া) পূর্ণ বেশ আছে ভাই বিপিন।

বিপিন। ভিতরকার বাষ্পের চাপে ওর মাথাটা সোডাওয়াটারের ছিপির মত একেবারে টপ্ করে উড়ে না যায়!

শ্রীশ। যায় ত যাক্ না! কোনমতে লোহার তার এঁটে মাথাটাকে ঠিক জায়গায় ধরে রাখাই কি জীবনের চরম পুরুষার্থ? মাঝে মাঝে মাথার বেঠিক না হলে রাতদিন মুটের বোঝার মত মাথাটাকে বয়ে বেড়াচ্চি কেন? দাও ভাই তার কেটে, একবার উড়ুক। সেদিন তোমাকে শোনাচ্ছিলুম—

ওরে সাবধানী পথিক, বারেক
পথ ভুলে মর ফিরে!
খোলা-আঁখি দুটো অন্ধ করে' দে
আকুল আঁখির নীরে!
সে ভোলা-পথের প্রান্তে রয়েছে
হারান'-হিয়ার কুঞ্জ;
ঝরে' পড়ে' আছে কাঁটাতরুতলে
রক্ত কুসুম পুঞ্জ;
সেথা দুই বেলা ভাঙা-গড়া খেলা
অকূল সিন্ধুতীরে!
ওরে সাবধানী পথিক, বারেক
পথ ভুলে' মর ফিরে!

বিপিন। আজ কাল তুমি খুব কবিতা পড়তে আরম্ভ করেছ, শীঘ্রই একটা মুস্কিলে পড়বে দেখচি!

শ্রীশ। যে লোক ইচ্ছে করে মুস্কিলের রাস্তা খুঁজে বেড়াচ্চে তার জন্যে কেউ ভেবো না। মুস্কিলকে এড়িয়ে চলতে গিয়ে হঠাৎ মুস্কিলের মধ্যে পা ফেলেই বিপদ। আসুন, আসুন রসিকবাবু রাত্রে পথে বেরিয়েছেন যে?

(রসিকের প্রবেশ)।

রসিক। আমার রাতই বা কি, আর দিনই বা কি!

বরমসৌ দিবসো ন পুনর্নিশা,
ননু নিশৈব বরং ন পুনর্দিনম্।
উভয়মেতদুপৈত্বথবা ক্ষয়ং
প্রিয়জনেন ন যত্র সমাগমঃ!

শ্রীশ। অস্যার্থঃ?

রসিক। অস্যার্থ হচ্চে—

আসে ত আসুক্ রাতি, আসুক্ বা দিবা,
যায় যদি যাক্ নিরবধি!
তাহাদের যাতায়াতে আসে যায় কিবা
প্রিয় মোর নাহি আসে যদি!

অনেক গুলো দিন রাত এ পর্য্যন্ত এসেছে এবং গেছে কিন্তু তিনি আজ পর্য্যন্ত এসে পৌঁছিলেন না—তাই, দিনই বলুন আর রাত্তিই বলুন ও দুটোর পরে আমার আর কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নেই!

শ্রীশ। আচ্ছা রসিকবাবু, প্রিয়জন এখনি যদি হঠাৎ এসে পড়েন?

রসিক। তাহলে আমার দিকে তাকাবেন না, তোমাদের দুজনের মধ্যে একজনের ভাগেই পড়বেন।

শ্রীশ। তাহ'লে তদ্দণ্ডেই তিনি অরসিক বলে প্রমাণ হয়ে যাবেন।

রসিক। এবং পরদণ্ডেই পরমানন্দে কাল-যাপন করতে থাক্‌বেন। তা আমি ঈর্ষ্যা করতে চাইনে শ্রীশবাবু! আমার ভাগ্যে যিনি আস্‌তে বহু বিলম্ব করলেন, আমি তাঁকে তোমাদের উদ্দেশেই উৎসর্গ করলুম। দেবি, তোমার বরমাল্য গেঁথে আন। আজ বসন্তের শুক্ল রজনী, আজ অভিসারে এস!

মন্দং নিধেহি চরণৌ, পরিধেহি নীলং
বাসঃ, পিধেহি বলয়াবলিমঞ্চলেন!
মা জল্প সাহসিনি, শারদচন্দ্রকান্ত-
দন্তাংশবস্তব তমাংসি সমাপয়ন্তি।

ধীরে ধীরে চল তন্বি, পর নীলাম্বর
অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখ কঙ্কণমুখর;
কথাটি ব'য়ো না তব দন্ত-অংশুরুচি
পথের তিমির রাশি পাছে ফেলে মুছি!

শ্রীশ। রসিকবাবু আপনার ঝুলি যে একেবারে ভরা। এমন কত তর্জ্জমা করে রেখেছেন?

রসিক। বিস্তর। লক্ষ্মীত এলেন না, কেবল বাণীকে নিয়েই দিন যাপন করচি।

শ্রীশ। ওহে বিপিন অভিসার ব্যাপারটা কল্পনা করতে বেশ লাগে।

বিপিন। ওটা পুনর্ব্বার চালাবার জন্যে চিরকুমার সভায় একটা প্রস্তাব এনে দেখ না!

শ্রীশ। কতকগুলো জিনিষ আছে যার আইডিয়াটা এত সুন্দর যে, সংসারে সেটা চালাতে সাহস হয় না। যে রাস্তায় অভিসার হতে পারে, যেখানে কামিনীদের হার থেকে মুক্তো ছিঁড়ে ছড়িয়ে পড়ে সে রাস্তা কি তোমার পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট? সে রাস্তা জগতে কোথাও নেই। বিরহিণীর হৃদয় নীলাম্বর পরে' মনোরাজ্যের পথে ঐ রকম করে বেরিয়ে থাকে—বক্ষের উপর থেকে মুক্তো ছিঁড়ে চেয়েও দেখে না—সত্যিকার মুক্তো হলে কুড়িয়ে নিত! কি বলেন রসিকবাবু।

রসিক। সে কথা মান্‌তেই হয়—অভিসারটা মনে মনেই ভাল, গাড়িঘোড়ার রাস্তা অত্যন্ত বেমানান্। আশীর্ব্বাদ করি শ্রীশবাবু এই রকম বসন্তের জ্যোৎস্নারাত্রে কোন এক জানলা থেকে কোন এক রমণীর ব্যাকুল হৃদয় তোমার বাসার দিকে যেন অভিসারে যাত্রা করে।

শ্রীশ। তা করবে রসিকবাবু, আপনার আশীর্ব্বাদ ফলবে। আজকের হাওয়াতে সেই খবরটা আমি মনে মনে পাচ্চি। বিশে ডাকা

যেমন খবর দিয়ে ডাকাতী করত, আমার অজানা অভিসারিকা তেম্নি পূর্ব্বে হতেই আমাকে অভিসারের খবর পাঠিয়েছে।

বিপিন। তোমার সেই ছাতের বারান্দাটা সাজিয়ে প্রস্তুত হয়ে থেকো।

শ্রীশ। তা আমার সেই দক্ষিণের বারান্দায় একটি চৌকিতে আমি বসি, আর একটি চৌকি সাজান থাকে।

বিপিন। সেটাতে আমি এসে বসি।

শ্রীশ। মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ, অভাব-পক্ষে তোমাকে নিয়ে চলে।

বিপিন। মধুময়ী যখন আস্বেন তখন হতভাগার ভাগ্যে রগুড়ং দদ্যাৎ।

রসিক। (জনান্তিকে) শ্রীশবাবু, আপনার সেই দক্ষিণের ছাতটিকে চিহ্নিত করে রাখবার জন্যে যে পতাকা ওড়ান আবশ্যক সেটা যে ফেলে এলেন!

শ্রীশ। রুমালটা কি এখন চেষ্টা করলে পাওয়া যেতে পারবে?

রসিক। চেষ্টা করতে দোষ কি?

শ্রীশ। বিপিন, তুমি ভাই রসিকবাবুর সঙ্গে একটু কথাবার্ত্তা কও, আমি চট্ করে আস্‌চি। (প্রস্থান)

বিপিন। আচ্ছা রসিক বাবু, রাগ করবেন না;—

রসিক। যদি বা করি আপনার ভয় করবার কোন কারণ নেই—আমি ভারি দুর্ব্বল!

বিপিন। দুই একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব আপনি বিরক্ত হবেন না।

রসিক। আমার বয়স সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন নয় ত?

বিপিন। না।

রসিক। তবে জিজ্ঞাসা করুন ঠিক উত্তর পাবেন।

বিপিন। সে দিন যে মহিলাটিকে দেখলাম তিনি—

রসিক। তিনি আলোচনার যোগ্য, আপনি সঙ্কোচ করবেন না বিপিনবাবু—তাঁর সম্বন্ধে আপনি যদি মাঝে মাঝে চিন্তা ও চর্চ্চা করে থাকেন তবে তাতে আপনার অসাধারণত্ব প্রমাণ হয় না—আমরাও ঠিক ঐ কাজ করে থাকি।

বিপিন। অবলাকান্তবাবু বুঝি—

রসিক। তাঁর কথা বল্‌বেন না—তাঁর মুখে অন্য কথা নেই।

বিপিন। তিনি কি—

রসিক। হাঁ তাই বটে! তবে হয়েছে কি, তিনি নৃপবালা নীরবালা দুজনের কাকে যে বেশী ভালবাসেন স্থির করে উঠতে পারেন না—তিনি দুজনের মধ্যে সর্ব্বদাই দোলায়মান।

বিপিন। কিন্তু তাঁদের কেউ কি ওঁর প্রতি—

রসিক। না, এমন ভাব নয় যে, ওঁকে বিবাহ করতে পারেন। সে হলে ত কোন গোলই ছিল না!

বিপিন। তাই বুঝি অবলাকান্তবাবু কিছু—

রসিক। কিছু যেন চিন্তান্বিত।

বিপিন। শ্রীমতী নীরবালা বুঝি গান ভাল বাসেন?

রসিক। বাসেন বটে,—আপনার পকেটের মধ্যেইত তার সাক্ষী আছে।

বিপিন। (পকেট হইতে গানের খাতা বাহির করিয়া) এখানা নিয়ে আসা আমার অত্যন্ত অভদ্রতা হয়েছে—

রসিক। সে অভদ্রতা আপনি না করলে আমরা কেউ না কেউ কর্ত্তেম।

বিপিন। আপনারা করলে তিনি মার্জ্জনা করতেন, কিন্তু আমি—বাস্তবিক অন্যায় হয়েছে, কিন্তু এখন ফিরিয়ে দিতেও ত—

রসিক। মূল অন্যায়টা অন্যায়ই থেকে যায়।

বিপিন। অতএব—

রসিক। যাঁহাতক বাহান্ন তাঁহাতক তিপ্পান্ন। হরণে যে দোষ টুকু হয়েছে রক্ষণে না হয় তাতে আরেকটু যোগ হল।

বিপিন। খাতাটা সম্বন্ধে তিনি কি আপনাদের কাছে কিছু বলেছেন?

রসিক। বলেছেন অল্পই, কিন্তু না বলেছেন অনেকটা।

বিপিন। কি রকম?

রসিক। লজ্জায় অনেকখানি লাল হয়ে উঠলেন।

বিপিন। ছি ছি, সে লজ্জা আমারি।

রসিক। আপনার লজ্জা তিনি ভাগ করে নিলেন, যেমন অরুণের লজ্জায় ঊষা রক্তিম।

বিপিন। আমাকে আর পাগল করবেন না রসিকবাবু!

রসিক। দলে টানচি মশায়!

বিপিন। (খাতা পুনর্ব্বার পকেটে পূরিয়া) ইংরাজিতে বলে দোষ করা মানবের ধর্ম্ম, ক্ষমা করা দেবতার।

রসিক। আপনি তা হলে মানবধর্ম্ম পালনটাই সাব্যস্ত করলেন!

বিপিন। দেবীর ধর্ম্মে যা বলে তিনি তাই করবেন।

শ্রীশের প্রবেশ।

শ্রীশ। অবলাকান্ত বাবুর সঙ্গে দেখা হল না।

বিপিন। তুমি রাতারাতিই তাঁকে সন্ন্যাসী করতে চাও না কি?

শ্রীশ। যা হোক্ অক্ষয়বাবুর কাছে বিদায় নিয়ে এলুম।

বিপিন। বটে বটে, তাঁকে বলে আসতে ভুলে গিয়েছিলেম—একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসিগে।

রসিক। (জনান্তিকে) পুনর্ব্বার' কিছু সংগ্রহের চেষ্টায় আছেন বুঝি? মানবধর্ম্মটা ক্রমেই আপনাকে চেপে ধরচে?

বিপিনের প্রস্থান।

শ্রীশ। রসিক বাবু, আপনার কাছে আমার একটা পরামর্শ আছে!

রসিক। পরামর্শ দেবার উপযুক্ত বয়স হয়েছে, বুদ্ধি না হতেও পারে।

শ্রীশ। আপনাদের ওখানে সে দিন যে দুটি মহিলাকে দেখেছিলেম, তাঁদের দুজনকেই আমার সুন্দরী বলে বোধ হল।

রসিক। আপনার বোধশক্তির দোষ দেওয়া যায় না। সকলেই ত ঐ এক কথাই বলে।

শ্রীশ। তাঁদের সম্বন্ধে যদি মাঝে মাঝে আপনার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করি তাহলে কি—

রসিক। তাহলে আমি খুসি হব, আপনারও সেটা ভাল লাগ্‌তে পারে এবং তাঁদেরও বিশেষ ক্ষতি হবে না।

শ্রীশ। কিছুমাত্র না। ঝিল্লি যদি নক্ষত্র সম্বন্ধে জল্পনা করে—

রসিক। তাতে নক্ষত্রের নিদ্রার ব্যাঘাত হয় না।

শ্রীশ। ঝিল্লিরই অনিদ্রা রোগ জন্মাতে পারে, কিন্তু তাতে আমার আপত্তি নেই।

রসিক। আজ ত তাই বোধ হচ্চে।

শ্রীশ। যাঁর রুমাল কুড়িয়ে পেয়েছিলুম তাঁর নামটি বলতে হবে।

রসিক। তাঁর নাম নৃপবালা।

শ্রীশ। তিনি কোন্‌টি ?

রসিক। আপনিই আন্দাজ করে বলুন শ্রীশ।

শ্রীশ। যাঁর সেই লালরঙের রেশমের শাড়ি পরা ছিল ?

রসিক। বলে যান।

শ্রীশ। যিনি লজ্জায় পালাতে চাচ্ছিলেন অথচ পালাতেও লজ্জা বোধ করছিলেন—তাই মুহূর্ত্তকালের মত হঠাৎ ত্রস্ত হরিণীর মত থমকে দাঁড়িয়েছিলেন, সাম্‌নের দুই এক গুচ্ছ চুল প্রায় চোখের উপরে এসে পড়েছিল—অবির-গোচ্ছা-বাঁধা চ্যুত অঞ্চলটি বাঁ হাতে তুলে ধরে যখন দ্রুতবেগে চলে গেলেন তখন তার পিঠভরা কালোচুল আমার দৃষ্টিপথের উপর দিয়ে একটি কালো জ্যোতিষ্কের মত চকিতে নৃত্য করে চলে গেল।

রসিক। এ ত নৃপবালাই বটে! পা দুখানি লজ্জিত, হাত দুখানি কুণ্ঠিত, চোখ দুটি ত্রস্ত, চুলগুলি কুঞ্চিত;—দুঃখের বিষয় হৃদয়টি দেখতে পান নি—সে যেন ফুলের ভিতরকার কোনো মধুটুকুর মত মধুর, শিশিরটুকুর মত করুণ।

শ্রীশ। রসিকবাবু, আপনার মধ্যে এত যে কবিত্বরস সঞ্চিত হয়ে রয়েছে তার উৎস কোথায় এবার টের পেয়েছি।

রসিক। ধরা পড়েছি শ্রীশবাবু—

কবীন্দ্রাণাং চেতঃ কমলবনমালাতপরুচিং
ভজন্তে যে সন্তঃ কতিচিদরুণামেব ভবতীং
বিরিঞ্চিপ্রেয়স্যাস্তরুণতর শৃঙ্গারলহরীং
গভীরাভির্বাগ্‌ভির্বিদধতি সভারঞ্জনময়ীং।

কবীন্দ্রদের চিত্তকমলবনমালার কিরণ লেখা যে তুমি তোমাকে যারা শেলমাত্র ভজনা করে তারাই গভীর বাক্যে যারা সরস্বতীর সভারঞ্জনময়ী তরুণলীলালহরী প্রকাশ করতে পারে। আমি সেই কবিচিত্ত কমলবনের কিরণ লেখাটির পরিচয় পেয়েছি।

শ্রীশ। আমিও অল্পদিন হল একটু পরিচয় পেয়েছি তার পর থেকে কবিত্ব আমার পক্ষে সহজ হয়ে এসেছে!

অক্ষয়ের প্রবেশ।

অক্ষয়। (স্বগত) নাঃ, দুটি নবযুবকে মিলে আমাকে আর ঘরে তিষ্ঠতে দিলে না দেখচি। একটি ত গিয়ে চোরের মত আমার ঘরের মধ্যে হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন—ধরা পড়ে ভাল রকম জবাবদিহি করতে পারলে না—শেষকালে আমাকে নিয়ে পড়ল। তার খানিক বাদেই দেখি দ্বিতীয় ব্যক্তিটি গিয়ে ঘরের বইগুলি নিয়ে উল্টে পাল্টে নিরীক্ষণ করচে। তফাৎ থেকে দেখেই পালিয়ে এসেছি। বেশ মনের মত করে চিঠিখানি যে লিখব এরা তা আর দিলে না। আহা চমৎকার জ্যোৎস্না হয়েছে!

শ্রীশ। এই যে অক্ষয় বাবু!

অক্ষয়। ঐরে! একটা ডাকাত ঘরের মধ্যে, আর একটা ডাকাত গলির মোড়ে? হা প্রিয়ে, তোমার ধ্যান থেকে যারা আমার মনকে বিক্ষিপ্ত করচে তারা মেনকা উর্ব্বশী রম্ভা হলে আমার কোন খেদ ছিল না—মনের মত ধ্যানভঙ্গও অক্ষয়ের অদৃষ্টে নেই—কলিকালে ইন্দ্রদেবের বয়স বেশী হয়ে বেরসিক হয়ে উঠেছে!

বিপিনের প্রবেশ।

বিপিন। এই যে অক্ষয় বাবু, আপনাকেই খুঁজছিলুম।

অক্ষয়। হায় হতভাগ্য, এমন রাত্রি কি আমাকে খোঁজ করে বেড়াবার জন্যই হয়েছিল?

In such a night as this,
When the sweet wind did gently kiss the trees
And they did make no noise, in such a night
Troilus methiks mounted the Troyan walls.
And sighed his soul toward the Grecian tents,
Where Cressid lay that night.

শ্রীশ। In such a night আপনি কি করতে বেরিয়েছেন অক্ষয় বাবু?

রসিক। অপসরতি ন চক্ষুষো মৃগাক্ষী
রজনিরিয়ং চ ন যাতি নৈতি নিদ্রা!
চক্ষু পরে মৃগাক্ষীর চিত্র খানি ভাসে;
রজনীও নাহি যায়, নিদ্রাও না আসে!
অক্ষয় বাবুর অবস্থা আমি জানি মশায়!

অক্ষয়। তুমি কে হে?

রসিক। আমি রসিকচন্দ্র—দুই দিকে দুই যুবককে আশ্রয় করে যৌবন সাগরে ভাসমান।

অক্ষয়। এ বয়সে যৌবন সহ্য হবে না রসিক দাদা।

রসিক। যৌবনটা কোন্ বয়সে যে সহ্য হয় তা ত জানিনে, ওটা অসহ্য ব্যাপার। শ্রীশ বাবু আপনার কি রকম বোধ হচ্চে;

শ্রীশ। এখনো সম্পূর্ণ বোধ করতে পারি নি!

রসিক। আমার মত পরিণত বয়সের জন্তে অপেক্ষা করচেন বুঝি? অক্ষয় দা, আজ তোমাকে বড় অন্যমনস্ক দেখাচ্চে।

অক্ষয়। তুমি ত অন্যমনস্ক দেখবেই, মনটা ঠিক তোমার দিকে নেই।—বিপিন বাবু তুমি আমাকে খুঁজছিলে বল্লে বটে, কিন্তু খুব যে জরুর দরকার আছে বলে বোধ হচ্চে না অতএব আমি এখন বিদায় হই, একটু বিশেষ কাজ আছে।

(প্রস্থান)

রসিক। বিরহী চিঠি লিখতে চল্ল।

শ্রীশ। অক্ষয় বাবু আছেন বেশ। রসিক-বাবু, ওঁর স্ত্রীই বুঝি বড় বোন? তাঁর নাম?

রসিক। পুরবালা।

বিপিন। (নিকটে আসিয়া) কি নাম বল্লেন?

রসিক। পুরবালা।

বিপিন। তিনিই বুঝি সব চেয়ে বড়?

রসিক। হাঁ

বিপিন। সব ছোটটির নাম?

রসিক। নীরবালা।

শ্রীশ আর নৃপবালা কোন্‌টি?

রসিক। তিনি নীরবালার বড়।

শ্রীশ তাহলে নৃপবালাই হলেন মেজ।

বিপিন আর নীরবালা ছোট।

শ্রীশ পুরবালার ছোট নৃপবালা।

বিপিন তাঁর ছোট হচ্চেন নীরবালা

রসিক (স্বগত) এরা ত নাম জপ করতে সুরু করলে। আমার মুস্কিল। আর ত হিম সহ্য হবে না, পালাবার উপায় করা যাক।

দশম পরিচ্ছেদ

রসিক। ভাই শৈল

শৈল। কি রসিক দাদা

রসিক এ কি আমার কাজ? মহাদেব তপোভঙ্গের কাজে স্বয়ং কন্দর্পদেব ছিলেন —আর আমি বৃদ্ধ—।

শৈল। তুমি ত বৃদ্ধ, তেমনি যুবক ছটিও ত যুগল মহাদেব নন!

রসিক। তা নন, সে আমি বেশ ঠাহর করেই দেখেছি! সেই জন্মেই ত নির্ভয়ে এসেছিলুম। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে রাস্তার মধ্যে হিমে দাঁড়িয়ে অর্দ্ধেক রাত পর্য্যন্ত রসালাপ করবার মত উত্তাপ আমার শরীরে ত নেই।

শৈল। তাঁদের সংসর্গে উত্তাপ সঞ্চয় করে নেবে।

রসিক। সজীব গাছ যে সূর্য্যের তাপে প্রফুল্ল হয়ে ওঠে মরাকাঠ তাতেই ফেটে যায়, যৌবনের উত্তাপে বুড়োমানুষের পক্ষে ঠিক উপযোগী বোধ হয় না।

শৈল। কই তোমাকে দেখে ফেটে যাবে বলে ত বোধ হচ্চে না।

রসিক। হৃদয়টা দেখলেই বুঝতে পারতিস্ ভাই।

শৈল। কি বল রসিক দা। তোমারি ত এখন সব চেয়ে নিরাপদ বয়েস। যৌবনের দাহে তোমার কি করবে?

রসিক। শুষ্কেন্ধনে বহ্নিরুপৈতি বৃদ্ধিম্! যৌবনের দাহ বৃদ্ধকে পেলেই হু হুঃ শব্দে জ্বলে ওঠে—সেই জন্মেই ত বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা বিপত্তির কারণ! কি আর বলব ভাই। নৃপ এবং নীরুর নাম করে পথে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে ক্রমেই আমার অসহ্য হয়ে উঠতে থাকে,—

শৈল। কেমন বল দেখি।

রসিক। কেবল যে বিরহের দহনে তা নয় ভাই। কবিরা বলেন অবস্থাবিশেষে চন্দ্রকিরণ অসহ্য, কবিরাজরাও ঠিক সেই কথাই বলেন। আমার বাতের ধাতে বরং বিরহ সহ্য হতে পারে কিন্তু মাঘ মাসের চন্দ্রালোক কিছুতেই নয়। এই যে আসচেন।

নীরবালার প্রবেশ।

রসিক। আগচ্ছ বরদে দেবি! কিন্তু বর তুমি আমাকে দেবে কি না জানিনে আমি তোমাকে একটি বর দেবার জন্মে প্রাণপাত করে মরচি। শিব ত কিছুই করচেন না তবু তোমাদের পূজো পাচ্চেন, আর এই যে বুড়ো খেটে মরচে এ কি কিছুই পাবে না?

নীরবালা। শিব পান ফুল তুমি পাবে তার ফল—তোমাকেই বরমাল্য দেব রসিক দাদা!

রসিক। মাটির দেবতাকে নৈবেদ্য দেবার সুবিধা এই যে সেটি সম্পূর্ণ ফিরে পাওয়া যায়—আমাকেও নির্ভয়ে বরমাল্য দিতে পারিস্ যখন দরকার হবে তখনি ফিরে পাবি—তার চেয়ে ভাই আমাকে একটা গলাবন্ধ বুনে দিস্ বরমাল্যের চেয়ে সেটা বুড়োমানুষের কাজে লাগ্‌বে।

নীর। তা দেব—এক যোড়া পশমের জুতো বুনে রেখেছি সেও শ্রীচরণেষু হবে।

রসিক। আহা, কৃতজ্ঞতা একেই বলে! কিন্তু নীরু, আমার পক্ষে গলাবন্ধই যথেষ্ট—আপাদমস্তক নাই হোল, সে জন্যে উপযুক্ত লোক পাওয়া যাবে, জুতোটা তারি জন্যে রেখে দে।

নীর। আচ্ছা, তোমার বক্তৃতাও তুমি রেখে দাও?

রসিক। দেখেছিস্ ভাই শৈল, আজকাল নীরুরও লজ্জা দেখা দিয়েছে—লক্ষণ খারাপ।

শৈল। নীরু তুই করচিস্ কি? আবার এ ঘরে এসেছিস্? আজ যে এখানে আমাদের সভা বসবে—এখনি কে এসে পড়বে, বিপদে পড়বি।

রসিক। সেই বিপদের স্বাদ ত এখনো

পেয়েছে, এখন বারবার বিপদে পড়বার জন্যে ছট্‌ফট্ করে বেড়াচ্চে।

নীর। দেখ রসিকদাদা তুমি যদি আমাকে বিরক্ত কর তা'হলে গলাবন্ধ পাবে না বল্‌চি। দেখ দেখি দিদি, তুমিও যদি রসিকদার কথায় ঐ রকম করে হাস তা'হলে ওর আস্পর্দ্ধা আরও বেড়ে যায়।

রসিক। দেখেছিস্ ভাই শৈল, নীরু আজ কাল ঠাট্টাও সইতে পারচে না, মন এত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে! নীরু দিদি, কোন কোন সময় কোকিলের ডাক শ্রুতিকটু বলে ঠেকে এই রকম শাস্ত্রে আছে, তোর রসিকদাদার ঠাট্টা-কেও কি তোর আজকাল কুহুতান বলে ভ্রম হতে লাগ্‌ল?

নীর। সেই জন্যেইত তোমার গলায় গলাবন্ধ জড়িয়ে দিতে চাচ্চি তানটা যদি একটু কমে।

শৈল। নীরু আর ঝগড়া করিস্‌নে— আয়, এখনি সবাই এসে পড়বে। (উভয়ের প্রস্থান।)

পূর্ণর প্রবেশ।

রসিক। আসুন্ পূর্ণবাবু!

পূর্ণ। এখনো আর কেউ আসেন নি?

রসিক। আপনি বুঝি কেবল এই বৃদ্ধটিকে দেখে হতাশ হয়ে পড়েচেন। আরো সকলে আসবেন পূর্ণবাবু!

পূর্ণ। হতাশ কেন হব রসিক বাবু?

রসিক। তা কেমন করে বলব বলুন? কিন্তু ঘরে যেই ঢুক্‌লেন আপনার দুটি চক্ষু দেখে বোধ হল তারা যাকে ভিক্ষা করে বেড়াচ্চে সেব্যক্তি আমি নই।

পূর্ণ। চক্ষুতত্ত্বে আপনার এতদূর অধিকার হল কি করে?

রসিক। আমার পানে কেউ কোন দিন তাকায় নি পূর্ণবাবু তাই এই প্রাচীন বয়স পর্য্যন্ত পরের চক্ষু পর্য্যবেক্ষণের যথেষ্ট অবসর পেয়েছি। আপনাদের মত শুভাদৃষ্ট হলে দৃষ্টিতত্ত্ব লাভ না করে অনেক দৃষ্টিলাভ করতে পারতুম। কিন্তু যাই বলুন পূর্ণবাবু, চোখ দুটির মত এমন আশ্চর্য্য সৃষ্টি আর কিছু হয় নি—শরীরের মধ্যে মন যদি কোথাও প্রত্যক্ষ বাস করে সে ঐ চোখের উপরে।

পূর্ণ। (সোৎসাহে) ঠিক বলেছেন রসিক-বাবু! ক্ষুদ্র শরীরের মধ্যে যদি কোথাও অনন্ত আকাশ কিংবা অনন্ত সমুদ্রের তুলনা থাকে সে ঐ দুটি চোখে!

রসিক। নিঃসীমশোভাসৌভাগ্যং নতাঙ্গ্যা নয়নদ্বয়ং

অন্যোহন্যালোকনানন্দবিরহাদিব চঞ্চলং—

বুঝেচেন পূর্ণবাবু?

পূর্ণ। না, কিন্তু বোঝবার ইচ্ছা আছে।

রসিক। আনতাঙ্গী বালিকার শোভা-সৌভাগ্যের সার নয়ন যুগল,

না দেখিয়া পরস্পরে তাই কি বিরহভরে হয়েছে চঞ্চল?

পূর্ণ। না রসিকবাবু, ও ঠিক হ'ল না! ও কেবল বাক্‌চাতুরী। দুটো চোখ পরস্পরকে দেখ্‌তে চায় না।

রসিক। অন্য দুটো চোখকে দেখতে চায় ত? সেই রকম অর্থ করেই নিন্ না। শেষ দুটো ছত্র বদলে দেওয়া যাক্—

প্রিয়চক্ষু দেখাদেখি যে আনন্দ, তাই সে কি খুঁজিছে চঞ্চল?

পূর্ণ। চমৎকার হয়েছে রসিক বাবু!

প্রিয়চক্ষু-দেখাদেখি যে আনন্দ, তাই সে কি খুঁজিছে চঞ্চল?

অথচ সে বেচারা বন্দী—খাঁচার পাখীর মত কেবল এপাশে ওপাশে ছট্‌ফট্ করে—প্রিয়চক্ষু

যেখানে, সেখানে পাখা মেলে উড়ে যেতে পারে না!

রসিক। আবার দেখাদেখির ব্যাপার-খানাও যে কি রকম নিদারুণ, তাও শাস্ত্রে লিখেচে—

হত্বা লোচন.বশিখৈর্গত্বা কতিচিৎপদানি পদ্মাক্ষী
জীবতি যুবা ন বা কিং ভূয়ো ভূয়ো বিলোকয়তি।

বিঁধিয়া দিয়া আঁখিবাণে
যায় সে চলি গৃহপানে,—
জনমে অনুশোচনা ;—
বাঁচিল কি না দেখিবারে
চায় সে ফিরে বারে বারে
কমলবরলোচনা!

পূর্ণ। রসিকবাবু বারে বারে ফিরে চায় কেবল কাব্যে।

রসিক। তার কারণ, কাব্যে ফিরে চাবার কোন অসুবিধে নেই। সংসারটা যদি ঐ রকম ছন্দে তৈরি হত তা হলে এখানেও ফিরে ফিরে চাইত পূর্ণবাবু—এখানে মন ফিরে চায়, চক্ষু ফেরে না!

পূর্ণ। (সনিঃশ্বাসে) বড় বিশ্রী জায়গা রসিক বাবু! কিন্তু ওটা আপনি বেশ বলেচেন—প্রিয়চক্ষু দেখাদেখি যে আনন্দ, তাই সে কি খুঁজিছে চঞ্চল?

রসিক। আহা পূর্ণবাবু; নয়নের কথা যদি উঠল ও আর শেষ করতে ইচ্ছা করে না—

লোচনে হরিণগর্ব্বমোচনে
মা বিদূষয় নতাঙ্গি কজ্জলৈঃ।
সায়কঃ সপদি জীবহারকঃ
কিং পুনর্হি গরলেন লেপিতঃ?
হরিণগর্ব্বমোচন লোচনে
কাজল দিয়ো না, সরলে!
এমনি ত বাণ নাশ করে প্রাণ
কি কাজ লেপিয়া গরলে?

পূর্ণ। থামুন রসিকবাবু থামুন? ঐ বুঝি কারা আস্‌চেন?

চন্দ্রবাবু ও নির্ম্মলার প্রবেশ।

চন্দ্র। এই যে অক্ষয় বাবু!

রসিক। আমার সঙ্গে অক্ষয় বাবুর সাদৃশ্য আছে শুনলে তিনি এবং তাঁর আত্মীয়গণ বিমর্ষ হবেন। আমি রসিক।

চন্দ্র। মাপ করবেন রসিকবাবু—হঠাৎ ভ্রম হয়েছিল।

রসিক। মাপ করবার কি কারণ ঘটেছে মশায়! আমাকে অক্ষয়বাবু ভ্রম করে কিছুমাত্র অসম্মান করেন নি। মাপ তাঁর কাছে চাইবেন। পূর্ণবাবুতে আমাতে এতক্ষণে বিজ্ঞানচর্চ্চা করছিলুম চন্দ্রবাবু।

চন্দ্র। আমাদের কুমারসভায় আমরা মাসে একদিন করে বিজ্ঞান আলোচনার জন্যে স্থির করব মনে করছিলুম। আজ কি বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছিল পূর্ণবাবু?

পূর্ণ। না, সে কিছুই না চন্দ্রবাবু!

রসিক। চোখের দৃষ্টি সম্বন্ধে দুচার কথা বলাবলি করা যাচ্ছিল।

চন্দ্র। দৃষ্টির রহস্য ভারি শক্ত রসিক বাবু।

রসিক। শক্ত বৈকি! পূর্ণবাবুরও সেই মত।

চন্দ্র। সমস্ত জিনিষের ছায়াই আমাদের দৃষ্টপটে উল্টো হয়ে পড়ে, সেইটেকে যে কেমন করে আমরা সোজাভাবে দেখি সে সম্বন্ধে কোন মতই আমার সন্তোষজনক বলে বোধ হয় না।

রসিক। সন্তোষজনক হবে কেমন করে? সোজা দেখা বাঁকা দেখা এই সমস্ত নিয়ে মানুষের মাথা ঘুরে যায়। বিষয়টা বড় সঙ্কটময়।

চন্দ্র। নির্ম্মলার সঙ্গে রসিক বাবুর

পরিচয় হয় নি? ইনিই আমাদের কুমার সভার প্রথম স্ত্রীসভ্য।

রসিক। (নমস্কার করিয়া) ইনি আমাদের সভার সভালক্ষ্মী। আপনাদের কল্যাণে আমাদের সভায় বুদ্ধি বিদ্যার অভাব ছিল না, ইনি আমাদের শ্রী দান করতে এসেছেন।

চন্দ্র। কেবল শ্রী নয়, শক্তি।

রসিক। একই কথা চন্দ্রবাবু। শক্তি যখন শ্রীরূপে আবির্ভূতা হন তখনই তাঁর শক্তির সীমা থাকে না! কি বলেন পূর্ণবাবু?

পুরুষবেশী শৈলের প্রবেশ।

শৈল। মাপ করবেন চন্দ্রবাবু, আমার কি আসতে দেরি হয়েছে?

চন্দ্র। (ঘড়ি দেখিয়া) না এখনও সময় হয় নি। অবলাকান্ত বাবু আমার ভাগ্নী নির্ম্মলা আজ আমাদের সভার সভ্য হয়েছেন।

শৈল। (নির্ম্মলার নিকট বসিয়া) দেখুন পুরুষরা স্বার্থপর, মেয়েদের কেবল নিজেদের সেবার জন্যই বিশেষ করে বদ্ধ করে রাখতে চায়—চন্দ্রবাবু যে আপনাকে আমাদের সভার হিতের জন্যে দান করেছেন তাতে তাঁর মহত্ত্ব প্রকাশ পায়।

নির্ম্মলা। আমার মামার কাছে দেশের কাজ এবং নিজের কাজ একই। আমি যদি আপনাদের সভার কোন উপকার করতে পারি তাতে তাঁরই সেবা হবে।

শৈল। আপনি যে সৌভাগ্যক্রমে চন্দ্রবাবুকে ভাল করে জানবার যোগ্যতা লাভ করেছেন এতে আপনি ধন্য।

নির্ম্মলা। আমি ওঁকে জানব না ত কে জানবে?

শৈল। আত্মীয় সব সময় আত্মীয়কে জানে না। আত্মীয়তায় ছোটকে বড় করে তোলে বটে, তেমনি বড়কেও ছোট করে আনে। চন্দ্রবাবুকে যে আপনি যথার্থভাবে জেনেছেন তাতে আপনার ক্ষমতা প্রকাশ পায়।

নির্ম্মলা। কিন্তু আমার মামাকে যথার্থভাবে জানা খুব সহজ, ওঁর মধ্যে এমন একটি স্বচ্ছতা আছে!

শৈল। দেখুন সেই জন্যেইত ওঁকে ঠিক মত জানা শক্ত। দুর্য্যোধন স্ফটিকের দেয়ালকে দেয়াল বলে দেখতেই পান নি। সরল স্বচ্ছতার মহত্ত্ব কি সকলে বুঝতে পারে? তাকে অবহেলা করে। আড়ম্বরেই লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

নির্ম্মলা। আপনি ঠিক কথা বলেছেন। বাইরের লোকে আমার মামাকে কেউ চেনেই না। বাইরের লোকের মধ্যে এতদিন পরে আপনার কাছে মামার কথা শুনে আমার যে কি আনন্দ হচ্চে সে কি বলব!

শৈল। আপনার ভক্তিও আমাকে ঠিক সেই রকম আনন্দ দিচ্চে।

চন্দ্র। (উভয়ের নিকটে আসিয়া) অবলাকান্ত বাবু, তোমাকে যে বইটি দিয়েছিলেম সেটা পড়েছ?

শৈল। পড়েছি, এবং তার থেকে সমস্ত নোট্ করে আপনার ব্যবহারের জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছি।

চন্দ্র। আমার ভারি উপকার হবে,—আমি বড় খুসি হলুম অবলাকান্ত বাবু। পূর্ণ নিজে আমার কাছে ঐ বইটি চেয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ওঁর শরীর ভাল ছিল না বলে কিছুই করে উঠতে পারেন নি। খাতাটি তোমার কাছে আছে?

শৈল। এনে দিচ্চি। (প্রস্থান)

রসিক। পূর্ণ বাবু আপনাকে কেমন ম্লান দেখছি অসুখ করচে কি?

পূর্ণ। না; কিছুই না! রসিক বাবু, যিনি গেলেন এঁরই নাম অবলাকান্ত?

রসিক। হাঁ।

পূর্ণ। আমার কাছে ওঁর ব্যবহারটা তেমন ভাল ঠেক্‌চে না।

রসিক। অল্প বয়স কি না সেই জন্যে—

পূর্ণ। মহিলাদের সঙ্গে কি রকম আচরণ করা উচিত সে শিক্ষা ওঁর বিশেষ দরকার।

রসিক। আমিও সেটা লক্ষ্য করে দেখেছি মেয়েদের সঙ্গে উনি ঠিক পুরুষোচিত ব্যবহার করতে জানেন না—কেমন যেন গায়ে-পড়া ভাব! ওটা হয়ত অল্প বয়সের ধর্ম্ম।

পূর্ণ। আমাদেরও ত বয়স খুব প্রাচীন হয় নি, কিন্তু আমরা ত—

রসিক। তা ত দেখ্‌চি, আপনি খুব দূরে দূরেই থাকেন, কিন্তু উনি হয়ত সেটাকে ঠিক ভদ্রতা বলেই গ্রহণ করেন না। ওঁর হয়ত ভ্রম হচ্চে আপনি ওঁকে অগ্রাহ্য করেন।

পূর্ণ। বলেন কি রসিক বাবু? কি করব বলুন ত? আমিত ভেবেই পাইনে কি কথা বলবার জন্যে আমি ওঁর কাছে অগ্রসর হতে পারি।

রসিক। ভাবতে গেলে ভেবে পাবেন না। না ভেবে অগ্রসর হবেন তার পরে কথা আপনি বেরিয়ে যাবে।

পূর্ণ। না রসিক বাবু, আমার একটা কথাও বেরয় না। কি বল্‌ব আপনিই বলুন না।

রসিক। এমন কোন কথাই বল্‌বেন না যাতে জগতে যুগান্তর উপস্থিত হবে। গিয়ে বলুন, আজকাল হঠাৎ কি রকম গরম পড়েছে।

পূর্ণ। তিনি যদি বলেন হাঁ গরম পড়েছে তারপরে কি বলব?

বিপিন ও শ্রীশের প্রবেশ।

শ্রীশ। (চন্দ্রবাবু ও নির্ম্মলাকে নমস্কার করিয়া নির্ম্মলার প্রতি) আপনাদের উৎসাহ ঘড়ির চেয়ে এগিয়ে চল্‌চে—এই দেখুন এখনো সাড়ে ছটা বাজে নি!

নির্ম্মলা। আজ আপনাদের সভায় আমার প্রথম দিন সেই জন্যে সভা বসবার পূর্ব্বেই এসেছি—প্রথম সভ্য হবার সঙ্কোচ ভাঙ্গতে একটু সময় দরকার।

বিপিন। কিন্তু আপনার কাছে নিবেদন এই যে আমাদের কিছুমাত্র সঙ্কোচ করে চল্‌বেন না। আজ থেকে আপনি আমাদের ভার নিলেন—লক্ষ্মীছাড়া পুরুষ সভ্যগুলিকে অনুগ্রহ করে দেখবেন শুনবেন এবং হুকুম করে চালাবেন।

রসিক। যান্ পূর্ণবাবু, আপনিও একটা কথা বলুন্ গে।

পূর্ণ। কি বল্‌ব?

নির্ম্মলা। চালাবার ক্ষমতা আমার নেই

শ্রীশ। আপনি কি আমাদের এতই অচল বলে মনে করেন?

বিপিন। লোহার চেয়ে অচল আর কি আছে কিন্তু আগুণ ত লোহাকে চালাচ্চে—আমাদের মত ভারী জিনিষ গুলোকে চলনস‌ই করে তুলতে আপনাদের মত দীপ্তির দরকার।

রসিক। শুনচেন ত পূর্ণবাবু?

পূর্ণ। আমি কি বল্‌ব বলুন না!

রসিক। বলুন্ লোহাকে চলাতে চাইলেও আগুন চাই, গলাতে চাইলেও আগুন চাই।

বিপিন। কি পূর্ণবাবু, রসিকবাবুর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে?

পূর্ণ। হাঁ।

বিপিন। আপনার শরীর আজ ভাল আছে ত?

পূর্ণ। হাঁ।

বিপিন। অনেকক্ষণ এসেছেন না কি?

পূর্ণ। না।

বিপিন। দেখেছেন এবারে শীতটা ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মত সজোরে দৌড়ে মাঘের মাঝামাঝি একেবারে থপকরে থেমে গেল।

পূর্ণ। হাঁ।

শ্রীশ। এই যে পূর্ণবাবু, গেলবারে আপনার শরীর খারাপ ছিল—এবারে বেশ ভাল বোধ হচ্চে ত?

পূর্ণ। হাঁ।

শ্রীশ। এতদিন কুমার সভার যে কি একটা মহৎ অভাব ছিল আজ ঘরের মধ্যে ঢুকেই তা বুঝতে পেরেছি,—সোণার মুকুটে মাঝখানটিতে কেবল একটি হীরে বসাবার অপেক্ষা ছিল—আজ সেইটি বসান হয়েছে কি বলেন পূর্ণবাবু!

পূর্ণ। আপনাদের মত এমন রচনাশক্তি আমার নেই—আমি এত বানিয়ে বানিয়ে কথা বলতে পারিনে—বিশেষতঃ মহিলাদের সম্বন্ধে।

শ্রীশ। আপনার অক্ষমতার কথা শুনে দুঃখিত হলেম পূর্ণবাবু—আশা করি ক্রমে উন্নতিলাভ করতে পারবেন।

বিপিন। (রসিককে জনান্তিকে টানিয়া) দুই বীর পুরুষে যুদ্ধ চলুক এ ন আসুন রসিক বাবু আপনার সঙ্গে দুই একটা কথা আছে!—দেখুন—সেই খাতা সম্বন্ধে আর কোন কথা উঠেছিল?

রসিক। অপরাধ করা মানবের ধর্ম্ম আর ক্ষমা করা দেবীর সে কথাটা আমি প্রসঙ্গক্রমে তুলেছিলেম—

বিপিন। তাতে কি বল্লেন?

রসিক। কিছু না বলে বিদ্যুতের মত চলে গেলেন।

বিপিন। চলে গেলেন?

রসিক। কিন্তু সে বিদ্যুতে বজ্র ছিল না।

বিপিন। গর্জ্জন?

রসিক। তাও ছিল না।

বিপিন। তবে?

রসিক। এক প্রান্তে কিংবা অন্য প্রান্তে একটু হয়ত বর্ষণের আভাস ছিল।

বিপিন। সেটুকুর অর্থ?

রসিক। কি জানি মহাশয়! অর্থও থাকতে পারে অনর্থও থাকতে পারে!

বিপিন। রসিকবাবু আপনি কি বলেন আমি কিছু বুঝতে পারিনে!

রসিক। কি করে বুঝবেন—ভারি শক্ত কথা!

শ্রীশ। (নিকটে আসিয়া) কি কথা শক্ত মশায়?

রসিক। এই বৃষ্টি বজ্রবিদ্যুতের কথা!

শ্রীশ। ওহে বিপিন, তার চেয়ে শক্ত কথা যদি শুনতে চাও তা হলে পূর্ণর কাছে যাও!

বিপিন। শক্ত কথা সম্বন্ধে আমার খুব বেশী সখ নেই ভাই।

শ্রীশ। যুদ্ধ করার চেয়ে সন্ধি করার বিদ্যেটা ঢের বেশী দুরূহ—সেটা তোমার আসে। দোহাই তোমার, পূর্ণকে একটু ঠাণ্ডা করে এসগে। আমি বরঞ্চ ততক্ষণ রসিকবাবুর সঙ্গে বৃষ্টিবজ্রবিদ্যুতের আলোচনা করে নিই। (বিপিনের প্রস্থান) রসিকবাবু, ঐ যে সেদিন আপনি যাঁর নাম নৃপবালা বল্লেন, তিনি—তিনি—তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত করে কিছু বলুন। সেদিন চকিতের মধ্যে তাঁর মুখে এমন একটি স্নিগ্ধভাব দেখেছি, তাঁর সম্বন্ধে কৌতূহল কিছুতেই থামাতে পারচিনে।

রসিক। বিস্তারিত করে বল্লে কৌতূহল

আরো বেড়ে যাবে। এ রকম কৌতূহল "হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে"। আমি ত তাঁকে এতকাল ধরে জেনে আস্‌চি, কিন্তু সেই কোমল হৃদয়ের স্নিগ্ধ মধুর ভাবটি আমার কাছে " ক্ষণে ক্ষণে তন্নবতামুপৈতি"।

শ্রীশ। আচ্ছা তিনি—আমি সেই নৃপবালার কথা জিজ্ঞাসা করচি—

রসিক। সে আমি বেশ বুঝতেই পারচি।

শ্রীশ। তা তিনি—কি আর প্রশ্ন করব? তাঁর সম্বন্ধে যা হয় কিছু বলুন না—কাল কি বল্লেন, আজ সকালে কি করলেন যত সামান্য হোক্ আপনি বলুন আমি শুনি।

রসিক।) শ্রীশের হাত ধরিয়া) বড় খুসি হলুম শ্রীশ বাবু আপনি যথার্থ ভাবুক বটেন—আপনি তাঁকে কেবল চাকতের মধ্যে দেখে' এটুকু কি করে ধরতে পারলেন যে তাঁর সম্বন্ধে তুচ্ছ কিছুই নেই। তিনি যদি বলেন, রসিক দা, ঐ কেরোসিনের বাতিটা একটুখানি উস্কে দাওত, আমার মনে হয় যেন একটা নতুন কথা শুনলেম—আদি কবির প্রথম অনুষ্টুপ ছন্দের মত। কি বল্‌ব শ্রীশ বাবু, আপনি শুনলে হয়ত হাস্‌বেন, সে দিন ঘরে ঢুকে দেখি নৃপবালা ছুঁচের মুখে সুতো পরাচ্চেন কোলের উপর বালিশের ওয়াড় পড়ে রয়েছে, আমার মনে হল এক আশ্চর্য্য দৃশ্য। কতবার কত দরজির দোকানের সামনে দিয়ে গেছি, কখনো মুখ তুলে দেখিনি কিন্তু—

শ্রীশ। আচ্ছা রসিকবাবু, তিনি নিজের হাতে ঘরের সমস্ত কাজ করেন?

শৈলের প্রবেশ।

শৈল। রসিকদার সঙ্গে কি পরামর্শ করচেন?

রসিক। কিছুই না, নিতান্ত সামান্য কথা নিয়ে আমাদের আলোচনা চল্‌চে, যত দূর তুচ্ছ হতে পারে।

চন্দ্র। সভা অধিবেশনের সময় হয়েছে আর বিলম্ব করা উচিত হয় না। পূর্ণবাবু, কৃষি-বিদ্যালয় সম্বন্ধে আজ তুমি যে প্রস্তাব উত্থাপন করবে বলেছিলে সেটা আরম্ভ কর।

পূর্ণ। (দণ্ডায়মান হইয়া ঘড়ির চেন নাড়িতে নাড়িতে) আজ—আজ—(কাশি)

রসিক। (পার্শ্বে বসিয়া মৃদুস্বরে) আজ এই সভা—

পূর্ণ। আজ এই সভা—

রসিক। যে নূতন সৌন্দর্য্য এবং গৌরব লাভ করিয়াছে—

পূর্ণ। যে নূতন সৌন্দর্য্য এবং গৌরব লাভ করিয়াছে—

রসিক। প্রথমে তাহারই জন্য অভিনন্দন প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

পূর্ণ। প্রথমে তাহারই জন্য অভিনন্দন প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

রসিক। (মৃদু স্বরে) বলে যান্ পূর্ণবাবু।

পূর্ণ। তাহারই জন্য অভিনন্দন প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

রসিক। ভয় কি পূর্ণবাবু বলে যান্।

পূর্ণ। যে নূতন সৌন্দর্য্য এবং গৌরব—(কাশি) যে নূতন সৌন্দর্য্য (পুনরায় কাশি) অভিনন্দন—

রসিক। (উঠিয়া)—সভাপতিমশায়, আমার একটা নিবেদন আছে। আজ পূর্ণবাবু সকল সভ্যের পূর্ব্বেই সভায় উপস্থিত হয়েছেন। উনি অত্যন্ত অসুস্থ, তথাপি উৎসাহ সম্বরণ করতে পারেন নি। আজ আমাদের সভায় প্রথম অরুণোদয়, তাই দেখবার জন্যে পাখী প্রত্যুষেই নীড় পরিত্যাগ করে বেরিয়েছেন—কিন্তু দেহ রুগ্ন তাই পূর্ণহৃদয়ের

আবেগ কণ্ঠে ব্যক্ত করিবার শক্তি নেই—অতএব ওঁকে আজ আমাদের নিষ্কৃতি দান করতে হবে। এবং আজ নব প্রভাতের যে অরুণচ্ছটার স্তবগান করতে উনি উঠেছিলেন তাঁর কাছেও এই অবরুদ্ধকণ্ঠ ভক্তের হয়ে আমি মার্জ্জনা প্রার্থনা করি। পূর্ণবাবু, আজ বরঞ্চ আমাদের সভার কার্য্য বন্ধ থাকে সেও ভাল তথাপি বর্ত্তমান অবস্থায় আজ আপনাকে কোন প্রস্তাব উত্থাপন করতে দিতে পারিনে। সভাপতিমশায় ক্ষমা করবেন এবং আমাদের সভাকে যিনি আপন প্রভা দ্বারা অদ্য সার্থকতা দান করতে এসেছেন ক্ষমা করা তাঁদের স্বজাতিসুলভ করুণ হৃদয়ের সহজ ধর্ম্ম।

চন্দ্র। আমি জানি, কিছুকাল থেকে পূর্ণবাবু ভাল নেই, এ অবস্থায় আমরা ওঁকে ক্লেশ দিতে পারি না। বিশেষতঃ অবলাকান্তবাবু ঘরে বসেই আমাদের সভার কাজ অনেকদূর অগ্রসর করে দিয়েছেন। এপর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় কৃষি সম্বন্ধে গবর্মেণ্ট থেকে যতগুলি রিপোর্ট বাহির হয়েছে সবগুলি আমি ওঁর কাছে দিয়েছিলেম—তার থেকে উনি, জমিতে সার দেওয়া সম্বন্ধীয় অংশটুকু সংক্ষেপে সঙ্কলন করে রেখেছেন—সেইটি অবলম্বন করে উনি সর্ব্বসাধারণের সুবোধ্য বাঙ্গালা ভাষায় একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করতেও প্রতিশ্রুত হয়েছেন। ইনি যেরূপ উৎসাহ ও দক্ষতার সঙ্গে সভার কার্য্যে যোগদান করেছেন সে জন্য ওঁকে প্রচুর ধন্যবাদ দিয়ে অদ্যকার সভা আগামী রবিবার পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা গেল। বিপিনবাবু, য়ুরোপীয় ছাত্রাবাস সকলের নিয়ম ও কার্য্যপ্রণালী সঙ্কলনের ভার নিয়েছিলেন এবং শ্রীশবাবু, স্বেচ্ছাকৃত দানের দ্বারা লণ্ডন নগরে যত বিচিত্র লোকহিতকর অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হয়েছে তার তালিকা সংগ্রহ ও তৎসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনায় প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, বোধ হয় এখনো তা সমাধা করতে পারেন নি। আমি একটি পরীক্ষায় প্রবৃত্ত আছি—সকলেই জানেন, আমাদের দেশের গরুর গাড়ি এমন ভাবে নির্ম্মিত যে তার পিছনে ভার পড়লেই গাড়ি উঠে পড়ে এবং গরুর গলায় ফাঁস লেগে যায় আবার কোন কারণে গরু যদি পড়ে যায় তবে বোঝাই সুদ্ধ গাড়ি তার ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়ে—এরই প্রতিকার করবার জন্যে আমি উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত আছি—কৃতকার্য্য হব বলে আশা করি। আমরা মুখে গোজাতি সম্বন্ধে দয়া প্রকাশ করি অথচ প্রত্যহ সেই গরুর সহস্র অনাবশ্যক কষ্ট নিতান্ত উদাসীন ভাবে নিরীক্ষণ করে থাকি—আমার কাছে এইরূপ মিথ্যা ও শূন্য ভাবুকতার অপেক্ষা লজ্জাকর ব্যাপার জগতে আর কিছুই নেই—আমাদের সভা থেকে যদি এর কোন প্রতিকার করতে পারি তবে আমাদের সভা ধন্য হবে। আমি রাত্রে গাড়োয়ান পল্লীতে গিয়ে গোরুর অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেছি—গোরুর প্রতি অনর্থক অত্যাচার যে স্বার্থ ও ধর্ম্ম উভয়ের বিরোধী হিন্দু গাড়োয়ানদের তা বোঝান নিতান্ত কঠিন বলে বোধ হয় না। এসম্বন্ধে আমি গাড়োয়ানদের মধ্যে একটা পঞ্চায়েৎ করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত আছি। শ্রীমতী নির্ম্মলা আকস্মিক অপঘাতের আশু চিকিৎসা এবং রোগীচর্য্যা সম্বন্ধে রামরতন ডাক্তার মহাশয়ের কাছ থেকে নিয়মিত উপদেশ লাভ করচেন—ভদ্র লোকদের মধ্যে সেই শিক্ষা ব্যাপ্ত করবার জন্যে তিনি দুই একটি অন্তঃপুরে গিয়ে শিক্ষাদানে নিযুক্ত হয়েছেন। এইরূপে প্রত্যেক সভ্যের স্বতন্ত্র ও বিশেষ চেষ্টায় আমাদের এই ক্ষুদ্র কুমার সভা সাধারণের অজ্ঞাতসারে ক্রমশই বিচিত্র সফ-

লতা লাভ করতে থাকবে এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীশ। ওহে বিপিন, আমার কাজ ত আমি আরম্ভও করি নি।'

বিপিন। আমারও ঠিক সেই অবস্থা।

শ্রীশ। কিন্তু করতে হবে।

বিপিন। আমাকেও করতে হবে।

শ্রীশ। কিছুদিন অন্য সমস্ত আলোচনা ত্যাগ না করলে চল্‌চে না।

বিপিন। আমিও তাই ভাবচি।

শ্রীশ। কিন্তু অবলাকান্ত বাবুকে ধন্য বলতে হবে—উনি যে কখন আপনার কাজটি করে যাচ্চেন কিছু বোঝবার যো নেই।

বিপিন। তাই ত বড় আশ্চর্য্য! অথচ মনে হয় যেন ওঁর অন্যমনস্ক হবার বিশেষ কারণ আছে।

শ্রীশ। যাই ওঁর সঙ্গে একবার আলোচনা করে আসিগে।

(শৈলের নিকট গমন)

পূর্ণ। রসিকবাবু আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ জানাব?

রসিক। কিছু বলবেন না, আমি এমনি বুঝে নেব। কিন্তু সকলে আমার মত নয় পূর্ণবাবু—আন্দাজে বুঝবে না, বলাকওয়ার দরকার।

পূর্ণ। আপনি আমার অন্তরের কথা বুঝে নিয়েছেন রসিকবাবু—আপনাকে পেয়ে আমি বেঁচে গেছি। আমার যা কথা তা মুখে উচ্চারণ করতেও সঙ্কোচ বোধ হয়। আপনি আমাকে পরামর্শ দিন কি করতে হবে।

রসিক। প্রথমে আপনি ওঁর কাছে গিয়ে যা-হয় একটা কিছু কথা আরম্ভ করে দিন।

পূর্ণ। ঐ দেখুন না, অবলাকান্তবাবু আবার ওঁর কাছে গিয়ে বসেচেন—

রসিক। তা হোক না, তিনি ত ওঁকে চারিদিকে ঘিরে দাঁড়ান নি। অবলাকান্তকে ত ব্যূহের মত ভেদ করে যেতে হবে না! আপনিও এক পাশে গিয়ে দাঁড়ান না।

পূর্ণ। আচ্ছা আমি দেখি!

শৈল। (নির্ম্মলার প্রতি) আমাকে এত করে বল্‌বেন না—আপনি আমার চেয়ে ঢের বেশী কাজ করচেন।—কিন্তু বেচারা পূর্ণবাবুর জন্যে আমার বড় দুঃখ হয়। আপনি আস্‌বেন বলেই উনি আজ বিশেষ উৎসাহ করে এসেছিলেন—অথচ সেটা ব্যক্ত করতে না পেরে উনি বোধ হয় অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়েচেন। আপনি যদি ওঁকে—

নির্ম্মলা। আপনাদের অন্যান্য সভ্যদের থেকে আমাকে একটু বিশেষভাবে পৃথক করে দেখচেন বলে আমি বড় সঙ্কোচ বোধ করচি,—আমাকে সভ্য বলে আপনাদের মধ্যে গণ্য করবেন মহিলা বলে স্বতন্ত্র করবেন না।

শৈল। আপনি যে মহিলা হয়ে জন্মেছেন সে সুবিধাটুকু আমাদের সভা ছাড়তে পারেন না। আপনি আমাদের সঙ্গে এক হয়ে গেলে যত কাজ হবে, আমাদের থেকে স্বতন্ত্র হলে তার চেয়ে বেশী কাজ হবে। যে লোক গুণের দ্বারা নৌকাকে অগ্রসর করে দেবে তাকে নৌকো থেকে কতকটা দূরে থাকতে হবে। চন্দ্রবাবু আমাদের নৌকোর হাল ধরে আছেন তিনিও আমাদের থেকে কিছু দূরে এবং উচ্চে আছেন, আপনাকে গুণের দ্বারা আকর্ষণ করতে হবে সুতরাং আপনাকে পৃথক্ থাকতে হবে। আমরা সব দাঁড়ির দলে বসে গেছি।

নির্ম্মলা। আপনাকেও কর্ম্মে এবং ভাবে এঁদের সকলের থেকে পৃথক্ বোধ হয়। এক দিন মাত্র দেখেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস হচ্চে এ

সভার মধ্যে আপনিই আমার প্রধান সহায় হবেন।

শৈল। সেত আমার সৌভাগ্য! এই যে! আসুন পূর্ণবাবু! আমরা আপনার কথাই বল্‌ছিলেম। বসুন।

শ্রীশ। অবলাকান্তবাবু আসুন, আপনার সঙ্গে অনেক কথা বল্‌বার আছে। (জনান্তিকে লইয়া) আজ সভার পুরাতন সভ্য তিনটিকে আপনারা দুজনে লজ্জা দিয়েছেন। তা ঠিক হয়েছে—পুরাতনের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করবার জন্যই নূতনের প্রয়োজন।

শৈল। আবার নূতন চালা কাঠে আগুন জ্বালাবার জন্যে পুরাতন ধরা কাঠের দরকার।

শ্রীশ। আচ্ছা সে বিচার পরে হবে। কিন্তু আমার সেই রুমালটি? সেটি হরণ করে আমার পরকাল খুইয়েছি আবার রুমালটিও খোয়াতে পারিনে! (পকেট হইতে বাহির করিয়া) এই আমি এক ডজন রেসমের রুমাল এনেছি, এই বদল করে নিতে হবে! এ যে তার উচিত মূল্য তা বল্‌তে পারিনে—তার উপযুক্ত মূল্য দিতে গেলে চীন জাপান উজাড় করে দিতে হয়।

শৈল। মশায়, এছলনাটুকু বোঝবার মত বুদ্ধি বিধাতা আমাকে দিয়েছেন। এ উপহার আমার জন্যে আসেও নি—যাঁর রুমাল হরণ করেছেন আমাকে উপলক্ষ করে এগুলি—

শ্রীশ। অবলাকান্ত বাবু, ভগবান্ বুদ্ধি আপনাকে যথেষ্ট দিয়াছেন দেখতে পাচ্চি কিন্তু দয়ার ভাগটা কিছু যেন কম বোধ হচ্চে—হতভাগ্যকে রুমালটি ফিরিয়ে দিলেই সেই কলঙ্ক টুকু একেবারে দূর হয়।

শৈল। আচ্ছা আমি দয়ার পরিচয় দিচ্ছি—কিন্তু আপনি সভার জন্য যে প্রবন্ধ লিখতে প্রতিশ্রুত সেটা লিখে দেওয়া চাই।

শ্রীশ। নিশ্চয় দেব—রুমালটা ফিরে পেলেই কাজে মন দিতে পারব—তখন অন্য সন্ধান ছেড়ে কেবল সত্যানুসন্ধান করতে থাক্‌ব।

বিপিন। বুঝেচেন রসিক বাবু আমি তাঁর গানের নির্ব্বাচন চাতুরী দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। গান যে তৈরি করেছে তার কবিত্ব থাক্‌তে পারে কিন্তু এই গানের নির্ব্বাচনে যে কবিত্ব প্রকাশ পেয়েছে তার মধ্যে ভারি একটি সৌকুমার্য্য আছে।

রসিক। ঠিক বলেছেন—নির্ব্বাচনের ক্ষমতাইত ক্ষমতা! লতায় ফুলত আপনি ফোটে, কিন্তু যে লোক মালা গাঁথে নৈপুণ্য এবং সুরুচিত তারি!

বিপিন। আপনার ও গানটা মনে আছে?

তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়
কোন্ পাথারে কোন্ পাষাণের ঘায়!
নবীন তরী নতুন চলে,
দিইনি পাড়ি অগাধ জলে,
বাহি তারে খেলার ছলে কিনার কিনারায়!
তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়!
ভেসে ছিল স্রোতের ভরে
একা ছিলেম কর্ণ ধরে
লেগে ছিল পালের পরে মধুর মৃদু বায়।
সুখে ছিলেম আপন মনে,
মেঘ ছিল গগন কোণে;
লাগ্‌বে তরী কুসুম বনে ছিলাম সে আশায়!
তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়!

রসিক। যাক্ ডুবে, কি বলেন বিপিন বাবু!

বিপিন। যাক্‌গে! কিন্তু কোথায় ডুবল তার একটু ঠিকানা রাখা চাই। আচ্ছা রসিক

বাবু, এ গানটা তিনি কেন খাতায় লিখে রাখ্লেন ?

রসিক। স্ত্রী হৃদয়ের রহস্য বিধাতা বোঝেন না এই রকম।একটা প্রবাদ আছে, রসিক বাবুত তুচ্ছ।

শ্রীশ। (নিকটে আসিয়া) বিপিন, তুমি চন্দ্র বাবুর কাছে একবার যাও! বাস্তবিক, আমাদের কর্ত্তব্যে আমরা ঢিলে দিয়েছি—ওঁর সঙ্গে একটু আলোচনা করলে উনি খুসি হবেন

বিপিন। আচ্ছা। আসচি রসিক বাবু (প্রস্থান)

শ্রীশ। হাঁ, আপনি সেই যে শেলাইয়ের কথা বল্‌ছিলেন—উনি বুঝি নিজের হাতে সমস্ত গৃহ কর্ম্ম করেন ?

রসিক। সমস্তই।

শ্রীশ। আপনি বুঝি সে দিন গিয়ে দেখ্‌লেন তাঁর কোলে বালিশের ওয়াড়গুলো পড়ে রয়েছে আর তিনি—

রসিক। মাথা নীচু করে ছুঁচে সুতো পরাচ্ছিলেন।

শ্রীশ। ছুঁচে সুতো পরাচ্ছিলেন। তখন স্নান করে এসেছেন বুঝি ?

রসিক। বেলা তখন তিনটে হবে।

শ্রীশ। বেলা তিনটে। তিনি বুঝি তাঁর খাটের উপর বসে—

রসিক। না খাটে নয়— বারান্দার উপর মাদুর বিছিয়ে—

শ্রীশ। বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে বসে ছুঁচে সুতো পরাচ্ছিলেন—

রসিক। হাঁ ছুঁচে সুতো পরাচ্ছিলেন। (স্বগত) আর ত পারা যায় না!

শ্রীশ। আমি যেন ছবির মত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—পা দুটি ছড়ানো, মাথা নীচু, খোলা চুল মুখের উপর এসে পড়েছে—বিকেল-বেলার আলো—

বিপিন। (নিকটে আসিয়া) চন্দ্রবাবু তোমার সঙ্গে তোমার সেই প্রবন্ধটা সম্বন্ধে কথা কইতে চান। (শ্রীশের প্রস্থান) রসিক বাবু!

রসিক। (স্বগত) আর কত বক্‌ব ?

নির্ম্মলা। (পূর্ণর প্রতি) আপনার শরীর আজ বুঝি তেমন ভাল নেই।

পূর্ণ। না, বেশ আছে—হাঁ, একটু ইয়ে হয়েছে বটে—বিশেষ কিছু নয়— তবু একটু ইয়ে বই কি—তেমন বেশ—(কাশি) আপনার শরীর বেশ ভাল আছে ?

নির্ম্মলা। হাঁ।

পূর্ণ। আপনি—জিজ্ঞাসা করছিলুম যে আপনি—আপনি আপনার ইয়ে কি রকম বোধ হয় ঐ যে—মিল্‌টনে আরিয়ো প্যাজিটিকা—ওটা কিনা আমাদের এম, এ, কোর্সে আছে ওটা আপনার বেশ ইয়ে বোধ হয় না ?

নির্ম্মলা। আমি ওটা পড়িনি!

পূর্ণ। পড়েন নি? (নিস্তব্ধ) ইয়ে হয়েছে—আপনি—এবারে কি রকম গরম পড়েছে—আমি একবার রসিকবাবু—রসিক-বাবুর সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে। (নির্ম্মলার নিকট হইতে প্রস্থান)

বিপিন। রসিকবাবু, আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় ও গানটা তিনি বিশেষ কিছু মনে করে লিখেছেন।

রসিক। হতেও পারে। আপনি আমাকে সুদ্ধ ধোঁকা লাগিয়ে দিলেন যে! পূর্ব্বে ওটা ভাবিনি।

বিপিন। "তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায় কোন পাথরে কোন্ পাষাণের ঘায়।"

আচ্ছা রসিক বাবু এখানে তরী বল্‌তে ঠিক কি বোঝাচ্চে?

রসিক। হৃদয় বোঝাচ্চে তার আর সন্দেহ নেই। তবে ঐ পাথরটা কোথায় আর পাষণটা কে সেইটেই ভাববার বিষয়!

পূর্ণ। (নিকটে আসিয়া) বিপিনবাবু, মাপ করবেন—রসিকবাবুর সঙ্গে আমার একটি কথা আছে—যদি—

বিপিন। বেশ, বলুন, আমি যাচ্চি।

(প্রস্থান)

পূর্ণ! আমার মত নির্ব্বোধ জগতে নেই রসিক বাবু!

রসিক। আপনার চেয়ে ঢের নির্ব্বোধ আছে যারা নিজেকে বুদ্ধিমান বলে জানে—যথা আমি।

পূর্ণ। একটু নিরালা পাই যদি আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে, সভা ভেঙ্গে গেলে আজ রাত্রে একটু অবসর করতে পারেন?

রসিক। বেশ কথা।

পূর্ণ। আজ দিব্য জ্যোৎস্না আছে গোল-দিঘির ধারে—কি বলেন?

রসিক। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ!

শ্রীশ। (নিকটে আসিয়া) ওঃ পূর্ণ বাবু কথা কচ্চেন বুঝি। আচ্ছা এখন থাক্। রাত্রে আপনার অবসর হবে রসিকবাবু?

রসিক। তা হতে পারে।

শ্রীশ। তা হলে কালকের মত—কি বলেন? কাল দেখ্‌লেন ত ঘরের চেয়ে পথে জমে ভাল।

রসিক। জমে বৈ কি! (স্বগত) সর্দ্দি জমে, কাশি জমে, গলার স্বর দইয়ের মত জমে যায় (শ্রীশের প্রস্থান)

পূর্ণ। আচ্ছা রসিকবাবু আপনি হলে কি বলে কথা আরম্ভ করতেন?

রসিক। হয় ত বলতুম—সেদিন বেলুন উড়ে ছিল আপনাদের বাড়ির ছাত থেকে দেখতে পেয়েছিলেন কি?

পূর্ণ। তিনি যদি বল্‌তেন হাঁ—

রসিক। আমি বলতুম, মনকে ওড়বার অধিকার দিয়াছেন বলেই ঈশ্বর মানুষের শরীরে পাখা দেন নি—শরীরকে বদ্ধ রেখে বিধাতা মনের আগ্রহ কেবল বাড়িয়ে দিয়েছেন—

পূর্ণ। বুঝেছি রসিকবাবু—চমৎকার—এর থেকে অনেক কথার সৃষ্টি হতে পারে।

বিপিন। (নিকটে আসিয়া) পূর্ণবাবুর সঙ্গে কথা হচ্চে। থাক্ তবে আমাদের সেই যে একটা কথা ছিল সেটা আজ রাত্রে হবে, কি বলেন?

রসিক। সেই ভাল।

বিপিন। জ্যোৎস্নায় রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে দিব্যি আরামে কি বলেন?

রসিক। খুব আরাম। (স্বগত) কিন্তু ব্যামোটা তার পূর্ব্বে।

শৈল। (নির্ম্মলার প্রতি) তা বেশ, আপনি যদি ইচ্ছা করেন আমিও ঐ বিষয়টার আলোচনা করে দেখব। ডাক্তারী আমি অল্প অল্প চর্চ্চা করেছি—বেশী নয়—কিন্তু আমি যোগদান করলে আপনার যদি উৎসাহ হয় আমি প্রস্তুত আছি।

পূর্ণ। (নিকটে আসিয়া) সে দিন বেলুন উড়েছিল আপনি কি ছাঁদের উপর থেকে দেখতে পেয়েছিলেন?

নির্ম্মলা। বেলুন?

পূর্ণ। হাঁ ঐ বেলুন (সকলে নিরুত্তর) রসিকবাবু বলছিলেন আপনি বোধ হয় দেখে থাকবেন—আমাকে মাপ করবেন—আপনা-

দের আলোচনায় আমি ভঙ্গ দিলুম—আমি অত্যন্ত হতভাগ্য!

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—১—

পূর্ব্বদিনে পুরবালা তাহার মাতার সহিত কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে।

অক্ষয় কহিলেন, দেবি, যদি অভয় দাও ত একটি প্রশ্ন আছে।

পুরবালা। কি শুনি।

অক্ষয়। শ্রীঅঙ্গে কৃশতার ত কোন লক্ষণ দেখচিনে।

পুরবালা। শ্রীঅঙ্গ ত কৃশ হবার জন্যে পশ্চিমে বেড়াতে যায় নি।

অক্ষয়। তবে কি বিরহবেদনা বলে জিনিষটা মহাকবি কালিদাসের সঙ্গে সহমরণে মরেচে?

পুরবালা। তার প্রমাণ তুমি। তোমারও ত স্বাস্থ্যের বিশেষ ব্যাঘাত হয় নি দেখচি!

অক্ষয়। হতে দিল কই? তোমার তিন ভগ্নী মিলে অহরহ আমার কৃশতা নিবারণ করে রেখেছিল—বিরহ যে কাকে বলে সেটা আর কোন মতেই বুঝতে দিলে না।

(পিলু)

বিরহে মরিব বলে ছিল মনে পণ।
কে তোরা বাহুতে বাঁধি করিলি বারণ?
ভেবেছিনু অশ্রুজলে, ডুবিব অকূল তলে
কাহার সোণার তরী করিল তারণ?

প্রিয়ে, কাশীধামে বুঝি পঞ্চশর ত্রিলোচনের ভয়ে এগোতে পারেন না?

পুরবালা। তা হতে পারে—কিন্তু কলকাতায় তাঁর ত যাতায়াত আছে।

অক্ষয়। তা আছে—কোম্পানীর শাসন তিনি মানেন না, আমি তার প্রমাণ পেয়েছি।

নৃপ ও নীরর প্রবেশ।

নীর। দিদি!

অক্ষয়। এখন দিদি বই আর কথা নেই, অকৃতজ্ঞ! দিদি যখন বিচ্ছেদ দহনে উত্তরোত্তর তপ্ত কাঞ্চনের মত শ্রী ধারণ করছিলেন তখন তোমাদের ক'টিকে সুশীতল করে রেখেছিল কে?

নীর। শুনচ দিদি! এমন মিথ্যে কথা! তুমি যতদিন ছিলে না আমাদের একবার ডেকেও জিজ্ঞাসা করেন নি—কেবল চিঠি লিখেচেন আর টেবিলের উপর দুই পা তুলে দিয়ে বই হাতে করে পড়েচেন। তুমি এসেছ এখন আমাদের নিয়ে গান হবে, ঠাট্টা হবে, দেখাবেন যেন—

নৃপ। দিদি, তুমিও ত ভাই এতদিন আমাদের একখানিও চিঠি লেখনি।

পুরবালা। আমার কি সময় ছিল ভাই? মাকে নিয়ে দিনরাত ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল।

অক্ষয়। যদি বলতে, তোদের ভগ্নীপতির ধ্যানে নিমগ্ন ছিলুম তা হলে কি লোকে নিন্দে করত?

নীর। তা হলে ভগ্নীপতির আস্পর্দ্ধা আরো বেড়ে যেত। মুখুয্যেমশায়, তুমি তোমার বাইরের ঘরে যাও না! দিদি এতদিন পরে এসেচেন আমরা কি ওঁকে নিয়ে একটু গল্প করতে পাব না?

অক্ষয়। নৃশংসে, বিরহদাবদগ্ধ তোর দিদিকে আবার বিরহে জ্বালাতে চাস্? তোদের ভগ্নীপতিরূপ ঘনকৃষ্ণ মেঘ মিলনরূপ মুষল ধারাবর্ষণ দ্বারা প্রিয়ার চিত্তরূপ লতানিকুঞ্জে আনন্দরূপ কিসলয়োদ্গম করে প্রেমরূপ বর্ষায় কটাক্ষরূপ বিদ্যুৎ—

নার। এবং বকুনিরূপ ভেকের কলরব—

শৈলের প্রবেশ।

অক্ষয়। এস এস—উত্তমাধমমধ্যমা এই তিন শ্যালী না হলে আমার—

নীর। উত্তম মধ্যম হয় না।

শৈল। (নৃপ ও নীরর প্রতি) তোরা ভাই একটু যা ত, আমাদের কথা আছে।

অক্ষয়। কথাটা কি বুঝতে পারচিস্ ত, নীরু? হরিনাম কথা নয়।

নীর। আচ্ছা, তোমার আর বক্‌তে হবে না!

(নৃপ ও নীরর প্রস্থান)

শৈল। দিদি, নৃপ নীরর জন্তে মা দুটি পাত্র তা হলে স্থির করেচেন?

পুর। হাঁ, কথা একরকম ঠিক হয়ে গেছে। শুনেছি ছেলে দুটি মন্দ নয়—তারা মেয়ে দেখে পছন্দ করলেই পাকাপাকি হয়ে যাবে।

শৈল। যদি পছন্দ না করে?

পুর। তা হলে তাদের অদৃষ্ট মন্দ।

অক্ষয়। এবং আমার শ্যালী দুটির অদৃষ্ট ভাল!

শৈল। নৃপ নীরু যদি পছন্দ না করে?

অক্ষয়। তা হলে ওদের রুচির প্রশংসা করব!

পুর। পছন্দ আবার না করবে কি? তোদের সব বাড়াবাড়ি। স্বয়ম্বরার দিন গেছে। মেয়েদের পছন্দ করবার দরকার হয় না—স্বামীহলেই তাকে ভালবাস্‌তে পারে।

অক্ষয়। নইলে তোমার বর্ত্তমান ভগ্নীপতির কি দুর্দ্দশাই হত শৈল?

জগত্তারিণীর প্রবেশ।

জগৎ। বাবা অক্ষয়, ছেলে দুটিকে তা হলেত খবর দিতে হয়। তারা ত আমাদের বাড়ির ঠিকানা জানে না।

অক্ষয়। বেশ ত মা, রসিক দাদাকে পাঠিয়ে দেওয়া যাক্।

জগৎ। পোড়া কপাল! তোমার রসিক দাদার যে রকম বুদ্ধি! তিনি কাকে আনতে কাকে আনবেন ঠিক নেই!

অক্ষয়। তাতেই বা দোষ কি মা। যতক্ষণ তারা তোমার জামাই না হচ্চে ততক্ষণ এক পাত্র ভুলে আর এক পাত্র আন্‌তে ত ক্ষতি দেখিনে।

পুর। আঃ তুমি কি বক তার ঠিক নেই। তা মা, তুমি কিছু ভেবো না। ছেলে দুটিকে আনাবার ব্যবস্থা করে দেব।

জগৎ। মা পুরী, তুই একটু মনোযোগ না করলে হবে না। আজকালকার ছেলে, তাদের সঙ্গে কি রকম ব্যাভার করতে হয় না হয় আমি কিছুই বুঝিনে।

অক্ষয়। (জনান্তিকে) পুরীর হাতযশ আছে। পুরী তাঁর মার জন্তে যে জামাইটি জুটিয়েছেন, পসার খুব বেড়ে গেছে! আজকালকার ছেলে কি করে বশ করতে হয় সে বিদ্যে—

পুর। (জনান্তিকে) মশায় বুঝি আজকালকার ছেলে?

জগৎ। মা, তোমরা পরামর্শ কর, কায়েত দিদি এসে বসে আছেন, আমি তাঁকে বিদায় করে আসি।

শৈল। মা, তুমি একটু বিবেচনা করে দেখ—ছেলে দুটিকে এখনো তোমরা কেউ দেখনি, হঠাৎ—

জগৎ। বিবেচনা করতে করতে আমার জন্ম শেষ হয়ে এল—আর বিবেচনা করতে পারিনে—

অক্ষয়। বিবেচনা সময় মত এর পরে করলেই হবে, এখন কাজটা আগে হয়ে যাক্।

জগৎ। বলত বাবা, শৈলকে বুঝিয়ে বলত! (প্রস্থান)

পুর। মিথ্যে তুই ভাব্‌ছিস্‌ শৈল,—মা যখন মনস্থির করেচেন ওঁকে আর কেউ টলাতে পারবে না। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ আমি মানি ভাই—যার সঙ্গে যার হবার, হাজার বিবেচনা করে মলেও, সে হবেই।

অক্ষয়। সে ত ঠিক কথা—নইলে যার সঙ্গে যার হয়ে থাকে তার সঙ্গে না হয়ে আর একজনের সঙ্গে হত। কিন্তু তা হ'লেও এখনকার সঙ্গে কিছুই তফাৎ হত না।

পুর। কি যে তর্ক কর, তোমার অর্দ্ধেক কথা বোঝাই যায় না।

অক্ষয়। তার কারণ আমি নির্ব্বোধ।

পুর। যাও এখন স্নান করিতে যাও, মাথা ঠাণ্ডা করে এস গে!

(প্রস্থান)

রসিকের প্রবেশ।

শৈল। রসিক দাদা, শুনেছ ত সব? মুস্কিলে পড়া গেছে।

রসিক। মুস্কিল কিসের? কুমার সভারও কৌমার্য্য রয়ে গেল নৃপ নীরুও পার পেলে. সব দিক রক্ষা হল।

শৈল। কোন দিক রক্ষা হয় নি।

রসিক। অন্ততঃ এই বুড়োর দিকটা রক্ষা হয়েছে—দুটো অর্ব্বাচীনের সঙ্গে মিশে আমাকে রাত্রে রাস্তায় দাঁড়িয়ে শ্লোক আওড়াতে হবে না।

শৈল। মুখুয্যে মশায়, তুমি না হলে রসিক দাদাকে কেউ শাসন করতে পারে না—উনি আমাদের কথা মানেন না।

অক্ষয়। যে বয়সে তোমাদের কথা বেদবাক্য বলে মান্‌তেন্‌ সে বয়স পেরিয়েছে কি না তাই লোকটা বিদ্রোহ করতে সাহস করচে। আচ্ছা আমি ঠিক করে দিচ্চি। চল ত রসিক দা, আমার বাইরের ঘরটাতে বসে তামাক নিয়ে পড়া যাক্‌।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ওস্তাদ্‌ আসীন। তানপূরা হস্তে বিপিন অত্যন্ত বেস্থরা গলায় সা রে গা মা সাধিতেছেন। ভৃত্য আসিয়া খবর দিল—একটি বাবু এসেছেন।

বিপিন। বাবু? কি রকম বাবু রে?

ভৃত্য। বুড়ো লোকটি।

বিপিন। মাথায় টাক আছে?

ভৃত্য। আছে।

বিপিন। (তানপূরা রাখিয়া) নিয়ে আয় এখনি নিয়ে আয়! ওরে তামাক দিয়ে যা! বেহারাটা কোথায় গেল, পাখা টান্‌তে বলে দে। আর দেখ চট্‌ করে গোটাকতক মিঠে পানের দোনা কিনে আন্‌ত রে! দেরি করিস্‌নে, আর, আধ সের বরফ নিয়ে আসিস্‌, বুঝেচিস্‌, (পদশব্দ শুনিয়া) রসিক বাবু আসুন!

একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোকের প্রবেশ।

বিপিন। রসিক বাবু—কে আপনি?

বৃদ্ধ। আজ্ঞে, আমার নাম বনমালী ভট্টাচার্য্য।

বিপিন। বনমালী ভট্টাচার্য্য? কোন কাজ আছে?

বনমালী। কাজ বিশেষ নেই, আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে—

বিপিন। আপনার যদি কাজ না থাকে আমার আছে—আপনি এখন যদি আর কারো সঙ্গে আলাপ করিতে যান, আমি একটুখানি—

বনমালী। তবে আমার কাজের কথাটি চট্‌পট্ শেষ করে যাই—

বিপিন। সেই ভাল।

বনমালী। কুমারটুলির নীলমাধব চৌধুরী মহাশয়ের দুটি পরমাসুন্দরী কন্যা আছে—তাঁদের বিবাহ যোগ্য বয়স হয়েছে—

বিপিন। (রাগিয়া উঠিয়া) হয়েছে ত হয়েছে—আমার সঙ্গে তার সম্বন্ধটা কি?

বনমালী। মশায়, একটু মনোযোগ করলেই সম্বন্ধ হতে পারে—সে জন্যে আপনাকে কোন কষ্ট পেতে হবে না—আমি সমস্তই ঠিক করে দেব—

বিপিন। আপনার দয়া যথেষ্ট কিন্তু সে দয়া অপাত্রে অপব্যয় করচেন—

বনমালী। অপাত্র! বিলক্ষণ! আপনার মত সৎপাত্র পাব কোথায়! আপনার বিনয় গুণে আরো মুগ্ধ হলেম!

বিপিন। কিন্তু আপনি যদি শীঘ্র ক্ষান্ত না হন তাহলে মুগ্ধভাব অধিকক্ষণ থাকবে না। বিনয় গুণ অধিক টান সয় না।

বনমালী। কন্যার বাপ যথেষ্ট টাকা দিতে সম্মত আছেন—

বিপিন। কন্যার বাপের যথেষ্ট টাকা যদি থাকে সংসারে ভিক্ষুকও যথেষ্ট আছে—আপনি শীঘ্র উঠুন।

বনমালী। যে আজ্ঞে, আপনি ব্যস্ত আছেন দেখছি—আর এক সময় আসব এখন। (প্রস্থান)

বিপিন। (তানপূরা তুলিয়া লইয়া) সারে গা, রেগামা, গামাপা,—

শ্রীশের প্রবেশ।

শ্রীশ। কিহে বিপিন—একি? কুস্তি ছেড়ে দিয়ে গান ধরেছ?

বিপিন। (শিক্ষকের প্রতি) ওস্তাদজি আজ ছুটি। কাল বিকেলে এস! (ওস্তাদের প্রস্থান) কি করব বল, গান না শিখলে ত তোমার সন্ন্যাসীদলে আমল পাওয়া যাবে না।

শ্রীশ। আচ্ছা, তুমি যে সারেগামা সাধতে বসেছ, কুমার সভার সেই লেখাটায় হাত দিতে পেরেছ?

বিপিন। না ভাই সেটাতে এখনো হাত দিতে পারিনি। তোমার লেখাটি হয়ে গেছে নাকি?

শ্রীশ। না আমিও হাত দিইনি! (কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) না ভাই ভারি অন্যায় হচ্চে। ক্রমেই আমরা আমাদের সঙ্কল্প থেকে যেন দূরে চলে যাচ্চি।

বিপিন। অনেক সঙ্কল্প ব্যাঙাচির ল্যাজের মত, পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে আপনি অন্তর্দ্ধান করে। কিন্তু যদি ল্যাজ টুকুই থেকে যেত, আর ব্যাংটা যেত শুকিয়ে, সে কি রকম হত? এক সময়ে একটা সঙ্কল্প করেছিলেম বলেই যে সেই সঙ্কল্পের খাতিরে নিজেকে শুকিয়ে মারতে হবে আমি ত তার মানে বুঝিনে।

শ্রীশ। আমি বুঝি। অনেক সঙ্কল্প আছে যার কাছে নিজেকে শুকিয়ে মারাও শ্রেয়! অফলা গাছের মত আমাদের ডালে পালায় প্রতিদিন যেন অতিরিক্ত পরিমাণ রস সঞ্চার হচ্চে এবং সফলতার আশা প্রতিদিন যেন দূর হয়ে যাচ্চে। আমি ভুল করেছিলুম ভাই বিপিন—সব বড় কাজেই তপস্যা চাই, নিজেকে নানা ভোগ থেকে বঞ্চিত না করলে, নানা দিক থেকে প্রত্যাহার করে না আনতে পারলে চিত্তকে কোন মহৎ কাজে সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত করা যায় না—এবার থেকে রসচর্চ্চা একেবারে পরিত্যাগ করে কঠিন কাজে হাত দেব—এই রকম প্রতিজ্ঞা করেছি।

বিপিন। তোমার কথা মানি। কিন্তু সব

ত ধান ফলে না—শুকতে গেলে কেবল ক শুকিয়ে মরাই হবে ফল ফলবে না। দিন থেকে আমার মনে হচ্ছে আমরা সঙ্কল্প গ্রহণ করেছি সে সঙ্কল্প আমাদের সফল হবে না—অতএব আমাদের সাধ্য অন্য কোন রকম পথ অবলম্বন শ্রেয়।

শ্রীশ। এ কোন কাজের কথা নয়। পিন, তোমার ওগুলো ফেল—

বিপিন। আচ্ছা ফেল্লুম, তাতে পৃথিবীর ক্ষতি হবে না।

শ্রীশ। চন্দ্র বাবুর বাসায় আমাদের সভা নিয়ে যাওয়া যাক্—

বিপিন। উত্তম কথা।

শ্রীশ। আমরা দুজনে মিলে রসিক কে একটু সংযত করে রাখব।

বিপিন। তিনি একলা আমাদের দুজনকে করে না তোলেন।

দ্বিতীয় ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। একটি বুড়ো বাবু এসেছেন!

বিপিন। বুড়ো বাবু? জ্বালালে দেখছি! নমালী এসেছে!

শ্রীশ। বনমালী? সে যে এক বিবাহের স্তাব নিয়ে আমার কাছেও এসেছিল!

বিপিন। আমাকেও সে গোড়ায় খুব রপার বলে ঠাওরেছিল, আশা করেছিলেম শেষাশেষি তার মতের পরিবর্ত্তন হয়ে এসেছে, ন্তু দেখছি এখনো আমাকে ভাল মানুষ লে বিশ্বাস করে। ওরে, বুড়োকে বিদায় রে দে!

শ্রীশ। তুমি বিদায় করলে আবার আমার ড়ের উপর গিয়ে পড়বে। তার চেয়ে ডেকে সিক আমরা দুজনে মিলে বিদায় করে দিই। ভৃত্যের প্রতি) বুড়োকে নিয়ে আয়!

রসিকের প্রবেশ।

বিপিন। একি! এত বনমালী নয়, এযে রসিক বাবু!

রসিক। আজ্ঞে হাঁ,—আপনাদের আশ্চর্য্য চেনবার শক্তি—আমি বনমালী নই। ধীর সমীরে যমুনা তীরে বসতি বনে বনমালী

শ্রীশ। না রসিক বাবু, ও সব নয়, রসালাপ আমরা বন্ধ করে দিয়েছি!

রসিক। আঃ বাঁচিয়েছেন!

শ্রীশ। অন্য সকল প্রকার আলোচনা পরিত্যাগ করে এখন থেকে আমরা একান্ত মনে কুমার সভার কাজে লাগ্‌ব।

রসিক। আমারও সেই ইচ্ছে।

শ্রীশ। বনমালী বলে এক জন বুড়ো কুমারটুলির নীলমাধব চৌধুরীর দুই কন্যার সঙ্গে আমাদের বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল আমরা তাকে সংক্ষেপে বিদায় করে দিয়েছি—এ সকল প্রসঙ্গও আমাদের কাছে অসঙ্গত বোধ হয়।

রসিক। আমার কাছেও ঠিক তাই। বনমালী যদি দুই না ততোধিক কন্যার বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হতেন তবে বোধ হয় তাঁকে নিষ্ফল হয়ে ফিরতে হত!

বিপিন। রসিক বাবু কিছু জলযোগ করে যেতে হবে!

রসিক। না মশায়, আজ থাক্। আপনাদের সঙ্গে দুটো একটা বিশেষ কথা ছিল কিন্তু কঠিন প্রতিজ্ঞার কথা শুনে সাহস হচ্ছে না।

বিপিন। (সাগ্রহে) না, না, তাই বলে কথা থাক্‌তে বল্‌বেন না কেন?

শ্রীশ। আমাদের যতটা ঠাওরাচ্ছেন ততটা ভয়ঙ্কর নই। কথাটা কি বিশেষ করে আমার সঙ্গে?

বিপিন। না, সে দিন যে রসিক বাবু

বলছিলেন আমারি সঙ্গে ওঁর দুটো একটা আলোচনার বিষয় আছে।

রসিক। কাজ নেই থাক্!

শ্রীশ। বলেন ত আজ রাত্রে গোলদিঘির ধারে—

রসিক। না শ্রীশ বাবু মাপ করবেন।

শ্রীশ। বিপিন ভাই, তুমি একটু ও ঘরে যাও না, বোধ হয় তোমার সাক্ষাতে রসিক বাবু—

রসিক। না না দরকার কি—

বিপিন। তার চেয়ে রসিক বাবু, তেতলার ঘরে চলুন—শ্রীশ এখানে একটু অপেক্ষা করবেন এখন!

রসিক। না আপনারা দুইজনেই বসুন—আমি উঠি।

বিপিন। সে কি হয়! কিছু খেয়ে যেতে হবে।

শ্রীশ। না আপনাকে কিছুতেই ছাড়চিনে! সে হবে না।

রসিক। তবে কথাটা বলি। নৃপবালা নীরবালার কথা ত পূর্ব্বেই আপনারা শুনচেন—

শ্রীশ। শুনেছি বই কি—তা নৃপবালার সম্বন্ধে যদি কিছু—

বিপিন। নীরবালার কোন বিশেষ সংবাদ—

রসিক। তাঁদের দুজনের সম্বন্ধেই বিশেষ চিন্তার কারণ হয়ে পড়েছে।

উভয়ে। অসুখ নয় ত?

রসিক। তার চেয়ে বেশী। তাঁদের বিবাহের সম্বন্ধ—

শ্রীশ। বলেন কি রসিক বাবু? বিবাহের ত কোন কথা শোনা যায় নি—

রসিক। কিছু না—হঠাৎ মা কাশী থেকে এসে দুটো অকাল কুষ্মাণ্ডের সঙ্গে মেয়ে দুটির বিবাহ স্থির করেছেন—

বিপিন। এ ত কিছুতেই হতে পারে না রসিক বাবু!

শ্রীশ। একি কখনো সম্ভব হয়?

রসিক। এখন আপনারা সাহায্য না করলে মেয়ে দুটি নেহাৎ জলে পড়ে—

শ্রীশ। নিশ্চয় সাহায্য করব।

বিপিন। কি করতে হবে বলুন!

রসিক। শুক্রবারে সেই ছেলে দুটি নৃপনীরুকে দেখতে আসবে—

শ্রীশ। দেখতে আসবে বলেন কি?

বিপিন। আমি পথের মধ্যে তাদের আটকে রাখব।

রসিক। তার দরকার হবে না—তাদের আমি সাম্লাতে পারব, সেই দিন আপনারা মেয়ে দেখতে যাবেন, মা মনে করবেন তারাই এসেছে—

শ্রীশ। খুব ভাল কথা!

বিপিন। এ ত আমাদের কর্ত্তব্য কাজ।

রসিক। সে দিনটা কোন প্রকারে ঠেকিয়ে রাখলে তার পরে আমরা যোগাড় জাগাড় করে দুটি ভাল পাত্র স্থির করতে পারব—আপনারাও একটু সন্ধান করে দেখবেন—

শ্রীশ। ভাল পাত্র পাওয়া ভারি শক্ত—

বিপিন। তাঁদের মত শিক্ষিত মেয়ের উপযুক্ত সম্মান বোঝে আজকালকার দিনে এমন ছেলে ক'টা পাওয়া যায়!

রসিক। সেই জন্যেই ত এতদিন অপেক্ষা করে অবশেষে এই ঘোর বিপদে পড়া গেছে। বিবাহের প্রসঙ্গ মাত্র আপনাদের কাছে অপ্রিয় অথচ দেখুন আপনাদের বন্ধু—

বিপিন। সে জন্য কিছুমাত্র সঙ্কোচ করবেন না রসিক বাবু—

শ্রীশ। আপনি যে আর কারো কাছে

। গিয়ে আমাদের কাছে এসেছেন এ জন্যে আপনাকে অন্তরের সঙ্গে ধন্যবাদ দিচ্চি।

রসিক। আমি আর আপনাদের ধন্যবাদ দেব না! সেই কন্যা দুটির চিরজীবনের ধন্যবাদ আপনাদের পুরস্কৃত করবে।

বিপিন। ওরে পাখাটা টান্।

শ্রীশ। রসিক বাবুর জন্যে যে জলখাবার আনাবে বলেছিলে—

বিপিন। সে এল বলে! ততক্ষণ এক গ্লাস বরফ দেওয়া জল খান্—

শ্রীশ। জল কেন, লেমনেড আনিয়ে দাও না। (পকেট হইতে টিনের বাক্স বাহির করিয়া) এই নিন্ রসিক বাবু পান খান!

বিপিন। ওদিকে কি হাওয়া পাচ্চেন? এই তাকিয়াটা নিন্ না।

শ্রীশ। আচ্ছা, রসিক বাবু, নৃপবালা বুঝি খুব বিষণ্ণ হয়ে পড়েছেন—

বিপিন। নীরবালাও অবশ্য খুব—

রসিক। সে আর বল্‌তে।

শ্রীশ। নৃপবালা বুঝি কান্নাকাটি করচেন?

রসিক। আচ্ছা নীরবালা তাঁর মাকে কেন একটু ভাল করে বুঝিয়ে বলেন না—

রসিক। (স্বগত) ঐরে সুরু হ'ল? আমার লেমনেডে কাজ নাই! (প্রকাশ্যে) মাপ করবেন, আমায় কিন্তু এখনি উঠ্‌তে হচ্চে!

শ্রীশ। বলেন কি?

বিপিন। সে কি হয়?

রসিক। সেই ছেলে দুটোকে ভুল ঠিকানা দিয়ে আস্‌তে হবে নইলে—

শ্রীশ। বুঝেছি, তা হলে এখনি যান!

বিপিন। তা হলে আর দেরি করবেন না!

—•—

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

নির্ম্মলা বাতায়নতলে আসীন। চন্দ্রের প্রবেশ।

চন্দ্র। (স্বগত) বেচারা নির্ম্মল বড় কঠিন ব্রত গ্রহণ করেছে। আমি দেখ্‌চি ক'দিন ধরে ও চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে রয়েছে; স্ত্রীলোক, মনের উপর এতটা ভার কি সহ্য করতে পারবে? (প্রকাশ্যে) নির্ম্মল!

নির্ম্মলা। (চমকিয়া) কি মামা!

চন্দ্র। সেই লেখাটা নিয়ে বুঝি ভাবচ? আমার বোধ হয় অধিক না ভেবে মনকে দুই একদিন বিশ্রাম দিলে লেখার পক্ষে সুবিধা হতে পারে।

নির্ম্মলা। (লজ্জিত হইয়া) আমি ঠিক ভাবছিলুম না মামা। আমার এতক্ষণ সেই লেখায় হাত দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এই ক'দিন থেকে গরম পড়ে দক্ষিণে হওয়া দিতে আরম্ভ করেছে, কিছুতেই যেন মন বসাতে পারচিনে—ভারি অন্যায় হচ্চে আজ আমি যেমন করে হোক্—

চন্দ্র। না, না, জোর করে চেষ্টা কোরো না। আমার বোধ হয় নির্ম্মল, বাড়িতে কেউ সঙ্গিনী নেই, নিতান্ত একলা কাজ করতে তোমার শ্রান্তি বোধ হয়। কাজে দুই একজনের সঙ্গ এবং সহায়তা না হলে—

নির্ম্মলা। অবলাকান্ত বাবু আমাকে কতকটা সাহায্য করবেন বলেচেন—আমি তাঁকে রোগীশুশ্রূষা সম্বন্ধে সেই ইংরাজী বইটা দিয়েছি, তিনি একটা অধ্যায় আজ লিখে পাঠাবেন বলেচেন—বোধ হয় এখনি পাওয়া যাবে, তাই আমি অপেক্ষা করে বসে আছি।

চন্দ্র। ঐ ছেলেটি বড় ভাল—

নির্ম্মলা। খুব ভাল—চমৎকার—

চন্দ্র। এমন অধ্যবসায়, এমন কার্য্য-তৎপরতা-

নির্ম্মলা। আর এমন সুন্দর নম্রস্বভাব!

চন্দ্র। ভাল প্রস্তাবমাত্রেই তাঁর উৎসাহ দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়েছি।

নির্ম্মলা। তা ছাড়া, তাঁকে দেখবামাত্র তাঁর মনের মাধুর্য্য মুখে এবং চেহারায় কেমন স্পষ্ট বোঝা যায়।

চন্দ্র। এত অল্পকালের মধ্যেই যে কারো প্রতি এত গভীর স্নেহ জন্মাতে পারে তা আমি কখনো মনে করিনি—আমার ইচ্ছা করে ঐ ছেলেটিকে নিজের কাছে রেখে ওর সকল প্রকার লেখাপড়ার এবং কাজে সহায়তা করি!

নির্ম্মলা। তা হলে আমারও ভারি উপকার হয়, অনেক কাজ করতে পারি! আচ্ছা এ রকম প্রস্তাব করে একবার দেখই না!—ঐ যে বেহারা আসচে। বোধ হয় তিনি লেখাটা পাঠিয়ে দিয়েছেন। রামদীন, চিঠি আছে? এইদিকে নিয়ে আয়। (বেহারার প্রবেশ ও চন্দ্রবাবুর হাতে চিঠি প্রদান) মামা, সেই প্রবন্ধটা নিশ্চয় তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, ওটা আমাকে দাও!

চন্দ্র! না ফেনি, এটা আমার চিঠি।

নির্ম্মলা। তোমার চিঠি! অবলাকান্ত বাবু বুঝি তোমাকেই লিখেচেন? কি লিখেচেন?

চন্দ্র। না, এটা পূর্ণর লেখা।

নির্ম্মলা। পূর্ণবাবুর লেখা? ওঃ।

চন্দ্র। পূর্ণ লিখচেন—"গুরুদেব আপনার চরিত্র মহৎ, মনের বল অসামান্য; আপনার মত বলিষ্ঠ প্রকৃতি লোকেই মানুষের দুর্ব্বলতা ক্ষমার চক্ষে দেখিতে পারেন ইহাই মনে করিয়া অদ্য এই চিঠিখানি আপনাকে লিখিতে সাহসী হইতেছি।"

নির্ম্মলা। হয়েছে কি? বোধ হয় পূর্ণ বাবু চিরকুমার সভা ছেড়ে দেবেন তাই এত ভূমিকা করচেন। লক্ষ্য করে দেখেছ বোধ হয় পূর্ণ বাবু আজ কাল কুমার সভার কোন কাজই করে উঠতে পারেন না।

চন্দ্র। "দেব, আপনি যে আদর্শ আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন তাহা অত্যুচ্চ, যে উদ্দেশ্য আমাদের মস্তকে স্থাপন করিয়াছেন তাহা গুরুভার—সে আদর্শ এবং সেই উদ্দেশ্যের প্রতি এক মুহূর্ত্তের জন্য ভক্তির অভাব হয় নাই কিন্তু মাঝে মাঝে শক্তির দৈন্য অনুভব করিয়া থাকি তাহা শ্রীচরণ সমীপে সবিনয়ে স্বীকার করিতেছি।

নির্ম্মলা। আমার বোধ হয়, সকল বড় কাজেই মানুষ মাঝে মাঝে আপনার অক্ষমতা অনুভব করে হতাশ হয়ে পড়ে—শ্রান্ত মন এক একবার বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু সে কি বরাবর থাকে?

চন্দ্র। "সভা হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া যখন কার্য্যে হাত দিতে যাই, তখন সহসা নিজকে একক মনে হয়, উৎসাহ যেন আশ্রয়-হীন লতার মত লুণ্ঠিত হইয়া পড়িতে চাহে।" নির্ম্মল আমরা ত ঠিক এই কথাই বলছিলেম।

নির্ম্মলা। পূর্ণবাবু যা লিখেচেন সেটা সত্য—মানুষের সঙ্গ না হলে কেবলমাত্র সঙ্কল্প নিয়ে উৎসাহ জাগিয়ে রাখা শক্ত।

চন্দ্র। "আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন, কিন্তু অনেক চিন্তা করিয়া একথা স্থির বুঝিয়াছি, কুমারব্রত সাধারণ লোকের জন্য নহে,—তাহাতে বল দান করেনা, বল হরণ করে। স্ত্রী পুরুষ পরস্পরের দক্ষিণ হস্ত—তাহারা মিলিত থাকিলে তবেই সম্পূর্ণরূপে সংসারের সকল কাজের উপযোগী হইতে পারে।" তোমার কি মনে হয় নির্ম্মল? (নির্ম্মলা নিরুত্তর।

ক্ষয়বাবুও এই কথা নিয়ে সে দিন আমার সঙ্গে তর্ক করছিলেন, তাঁর অনেক কথার উত্তর দিতে পারি নি!

নির্ম্মলা। তা হতে পারে। বোধ হয় ওটার মধ্যে অনেকটা সত্য আছে।

চন্দ্র। "গৃহস্থসন্তানকে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত না করিয়া গৃহাশ্রমকে উন্নত আদর্শে গঠিত করাই আমার মতে শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য।"

নির্ম্মলা। এ কথাটা কিন্তু পূর্ণবাবু বেশ বলেছেন।

চন্দ্র। আমিও কিছুদিন থেকে মনে করছিলেম কুমারব্রত গ্রহণের নিয়ম উঠিয়ে দেব।

নির্ম্মলা। আমারও বোধ হয় উঠিয়ে দিলে মন্দ হয় না, কি বল মামা? অন্য কেউ কি আপত্তি করবেন? অবলাকান্তবাবু, শ্রীশবাবু—

চন্দ্র। আপত্তির কোন কারণ নেই।

নির্ম্মলা। তবু একবার অবলাকান্ত বাবুদের মত নিয়ে দেখা উচিত।

চন্দ্র। মত ত নিতেই হবে।—(পত্রপাঠ) "এ পর্য্যন্ত যাহা লিখিলাম সহজে লিখিয়াছি, এখন যাহা বলিতে চাহি তাহা লিখিতে কলম সরিতেছে না।"

নির্ম্মলা। মামা, পূর্ণবাবু হয়ত কোন গোপনীয় কথা লিখচেন, তুমি চেঁচিয়ে পড়চ কেন?

চন্দ্র। ঠিক বলেছ ফেনি। (আপন মনে পাঠ) কি আশ্চর্য্য! আমি কি সকল বিষয়েই অন্ধ! এত দিনেও আমি কিছুই বুঝতে পারি নি! নির্ম্মল, পূর্ণ বাবুর কোন ব্যবহার কি কখনো তোমার কাছে—

নির্ম্মলা। হাঁ, পূর্ণ বাবুর ব্যবহার আমার কাছে মাঝে মাঝে অত্যন্ত নির্ব্বোধের মত ঠেকেছিল।

চন্দ্র। অথচ পূর্ণবাবু খুব বুদ্ধিমান। তাহলে তোমাকে খুলে বলি—পূর্ণবাবু বিবাহের প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন—

নির্ম্মলা। তুমি ত তাঁর অভিভাবক নও—তোমার কাছে প্রস্তাব—

চন্দ্র। আমি যে তোমার অভিভাবক—এই পড়ে দেখ।

নির্ম্মলা। (পত্র পড়িয়া রক্তিম মুখে) এ হতেই পারে না।

চন্দ্র। আমি তাকে কি বল্‌ব?

নির্ম্মলা। বোলো, কোন মতে হতেই পারে না।

চন্দ্র। কেন নির্ম্মল, তুমি ত বল্‌ছিলে কুমার ব্রত পালনের নিয়ম সভা থেকে উঠিয়ে দিতে তোমার আপত্তি নেই।

নির্ম্মলা। তাই বলেই কি যে প্রস্তাব করবে তাকেই—

চন্দ্র। পূর্ণ বাবু ত যে সে নয়, অমন ভাল ছেলে—

নির্ম্মলা। মামা, তুমি এসব বিষয়ে কিছুই বোঝ না, তোমাকে বোঝাতে পারবও না—আমার কাজ আছে। (প্রস্থানোদ্যম) মামা, তোমার পকেটে ওটা কি উঁচু হয়ে আছে?

চন্দ্র। (চমকিয়া উঠিয়া) হাঁ হাঁ ভুলে গিয়েছিলেম—বেহারা আজ সকালে তোমার নাম লেখা একটা কাগজ আমাকে দিয়ে গেছে—

নির্ম্মলা। (তাড়াতাড়ি কাগজ লইয়া) দেখ দেখি মামা, কি অন্যায়, অবলাকান্ত বাবুর লেখাটা সকালেই এসেছে আমাকে দাওনি? আমি ভাবছিলেম তিনি হয়ত ভুলেই গেছেন—ভারি অন্যায়!

চন্দ্র। অন্যায় হয়েছে বটে। কিন্তু এর চেয়ে ঢের বেশী অন্যায় ভুল আমি প্রতিদিনই করে

থাকি কোন—তুমিই ত আমাকে প্রত্যেকবার সহাস্যে মাপ করে করে প্রশ্রয় দিয়েছ।

নির্ম্মলা। না, ঠিক অন্যায় নয়—আমিই অবলাকান্ত বাবুর প্রতি মনে মনে অন্যায় কর্‌ছিলেম, ভাব্‌ছিলেম—এই যে রসিকবাবু আস্‌চেন। আসুন রসিক বাবু, মামা এই-খানেই আছেন।

রসিকের প্রবেশ।

চন্দ্র। এই যে রসিকবাবু এসেছেন ভালই হয়েছে।

রসিক। আমার আসাতেই যদি ভাল হয় চন্দ্রবাবু তাহলে আপনাদের পক্ষে ভাল অত্যন্ত সুলভ। যখনি বলবেন তখনি আসব, না বল্লেও আস্‌তে রাজি আছি।

চন্দ্র। আমরা মনে করচি আমাদের সভা থেকে চিরকুমার ব্রতের নিয়মটা উঠিয়ে দেব—আপনি কি পরামর্শ দেন?

রসিক। আমি খুব নিঃস্বার্থভাবেই পরামর্শ দিতে পারিব, কারণ, এ ব্রত রাখুন বা উঠিয়ে দিন আমার পক্ষে দুই সমান। আমার পরামর্শ এই যে উঠিয়ে দিন, নইলে সে কোন্ দিন আপনিই উঠে যাবে। আমাদের পাড়ার রামহরি মাতাল রাস্তার মাঝখানে এসে সকলকে ডেকে বলেছিল, বাবাসকল, আমি স্থির করেছি এইখানটাতেই আমি পড়ব! স্থির না করলেও সে পড়ত, অতএব স্থির করাটাই তার পক্ষে ভাল হয়েছিল!

চন্দ্র। ঠিক বলেচেন রসিকবাবু, যে জিনিষ বলপূর্ব্বক আস্‌বেই তাকে বল প্রকাশ করতে না দিয়ে আসতে দেওয়াই ভাল। আসচে রবিবারের পূর্ব্বেই এই প্রস্তাবটা সকলের কাছে একবার তুলতে চাই।

রসিক। আচ্ছা শুক্রবারের সন্ধ্যাবেলায় আপনারা আমাদের ওখানে যাবেন আমি সকলকে সংবাদ দিয়ে আনাব।

চন্দ্র। রসিকবাবু, আপনার যদি সময় থাকে তা হলে আমাদের দেশে গোজাতির উন্নতি সম্বন্ধে একটা প্রস্তাব আপনাকে—

রসিক। বিষয়টা শুনে খুব ঔৎসুক্য জন্মাচ্চে, কিন্তু সময় খুব যে বেশী—

নির্ম্মলা। না রসিকবাবু, আপনি ও ঘরে চলুন, আপনার সঙ্গে অনেক কথা কবার আছে। মামা, তোমার লেখাটা শেষ কর, আমরা থাক্‌লে ব্যাঘাত হবে।

রসিক। তা হলে চলুন।

নির্ম্মলা। (চলিতে চলিতে) অবলাকান্ত বাবু আমাকে তাঁর সেই সেই লেখাটা পাঠিয়ে দিয়েছেন—আমার অনুরোধ যে তিনি মনে করে রেখেছিলেন সে জন্যে আপনি তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন!

রসিক। ধন্যবাদ না পেলেও আপনার অনুরোধ রক্ষা করেই তিনি কৃতার্থ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

জগত্তারিণী। বাবা অক্ষয়! দেখত, মেয়েদের নিয়ে আমি কি কিরি! নেপ্‌ বসে বসে কাঁদচে, নীর রেগে অস্থির, সে বলে সে কোন মতেই বেরবে না। ভদ্রলোকের ছেলেরা আজ এখনি আসবে, তাদের এখন কি বলে ফেরাবে! তুমিই বাপু ওদের শিখিয়ে পড়িয়ে বিবি করে তুলেছ এখন তুমিই ওদের সামলাও!

পুরবালা। সত্যি, আমিও ওদের রকম দেখে অবাক্ হয়ে গেছি ওরা কি মনে করেছে ওরা—

অক্ষয়। বোধ হয় আমাকে ছাড়া আর কে ওরা পছন্দ করচে না ; তোমারই সহ-কিনা, রুচিটা তোমারি মত !

পুরবালা। ঠাট্টা রাখ, এখন ঠাট্টার সময় —তুমি ওদের একটু বুঝিয়ে বলবে কি না ! তুমি না বল্লে ওরা শুনবে না !

অক্ষয়। এত অনুগত ! এ'কেই বলে ভগ্নী-ব্রতা শালী ! আচ্ছা আমার কাছে এক পাঠিয়ে দাও,—দেখি ! (জগত্তারিণী ও বালার প্রস্থান)

নৃপ ও নীরর প্রবেশ।

নীর। না, মুখুয্যেমশায়, সে কোনমতেই ব না !

নৃপ। মুখুয্যেমশায় তোমার দুটি পায়ে ড় আমাদের যার তার সাম্‌নে ও রকম করে র করো না !

অক্ষয়। ফাঁসির হুকুম হলে একজন বলে-ন, আমাকে বেশী উঁচুতে চড়িয়ো না মার মাথাঘোরা ব্যামো আছে ! তোদের যে ই হল ! বিয়ে করতে যাচ্ছিস এখন দেখা তে লজ্জা করলে চলবে কেন ?

নীর। কে বল্লে আমরা বিয়ে করতে চ্ছি ?

অক্ষয়। অহো, শরীরে পুলক সঞ্চার চ্চে !—কিন্তু হৃদয় দুর্ব্বল এবং দৈব বলবান্, দি দৈবাৎ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে হয়—

নীর। না ভঙ্গ হবে না।

অক্ষয়। হবে না ত ? তবে নির্ভয়ে এস ; বক দুটোকে দেখা দিয়ে আধপোড়া করে ড়ে দাও—হতভাগারা বাসায় ফিরে গিয়ে রে থাকুক !

নীর। অকারণে প্রাণী হত্যা করবার স্তে আমাদের এত উৎসাহ নেই।

অক্ষয়। জীবের প্রতি কি দয়া ! কিন্তু সামান্য ব্যাপার নিয়ে গৃহবিচ্ছেদ করবার দর-কার কি ? তোদের মা দিদি যখন ধরে পড়ে-চেন এবং ভদ্রলোক দুটি যখন গাড়িভাড়া করে আসচে তখন একবার মিনিট পাঁচেকের মত দেখা দিস্, তারপরে আমি আছি—তোদের অনিচ্ছায় কোনমতেই বিবাহ দিতে দেব না।

নীর। কোনমতেই না ?

অক্ষয়। কোনমতেই না !

পুরবালার প্রবেশ।

পুর। আয়, তোদের সাজিয়ে দিইগে !

নীর। আমরা সাজব না !

পুর। ভদ্রলোকের সামনে এই রকম বেশেই বেরোবি ? লজ্জা করবে না ?

নীর। লজ্জা করবে বৈ কি দিদি—কিন্তু সেজে বেরতে আরো বেশী লজ্জা করবে।

অক্ষয়। উমা তপস্বিনী বেশে মহাদেবের মনোহরণ করেছিলেন ; শকুন্তলা যখন দুষ্যন্তের হৃদয় জয় করেছিল তখন তার গায়ে একখানি বাকল ছিল, কালিদাস বলেন সেও কিছু আঁট হয়ে পড়েছিল, তোমার বোনেরা সেই সব পড়ে সেয়ানা হয়ে উঠেছে সাজতে চায় না !

পুর। সে সব হল সত্যযুগের কথা। কলিকালের দুষ্যন্ত মহারাজারা সাজসজ্জাতেই ভোলেন।

অক্ষয়। যথা—

পুর। যথা তুমি। যেদিন তুমি দেখতে এলে মা বুঝি আমাকে সাজিয়ে দেন নি ?

অক্ষয়। আমি মনে মনে ভাবলেম, সাজেও যখন একে সেজেছে তখন সৌন্দর্য্যে না জানি কত শোভা হবে !

পুর। আচ্ছা তুমি থাম, নীরু আয় !

নীরু। না ভাই দিদি—

পুর। আচ্ছা, সাজ নাই করলি চুল ত বাঁধতে হবে !

শ্রীশ। আচ্ছা রসিক বাবু, আমাদের কষ্ট স্বীকার করতে দিতে আপনার এত আপত্তি হচ্ছে কেন?

বিপিন। এঁদের জন্যে যদিই আমাদের কোন কষ্ট করতে হয় সেটা যে আমরা সম্মান বলে জ্ঞান করব।

শ্রীশ। দু'দিন ধরে, রসিকবাবু, বেশী কষ্ট পেতে হবে না বলে আপনি ক্রমাগতই আমাদের আশ্বাস দিচ্ছেন—এতে আমরা বাস্তবিক দুঃখিত হয়েছি।

রসিক। আমাকে মাপ করবেন—আমি আর কখনও এমন অবিবেচনার কাজ করবনা, আপনারা কষ্ট স্বীকার করবেন!

শ্রীশ। আপনি কি এখনো আমাদের চিন্‌লেন না?

রসিক। চিনেছি বই কি, সেজন্যে আপনারা কিছু মাত্র চিন্তিত হবেন না।

কুণ্ঠিত নৃপ ও নীরবালার প্রবেশ।

শ্রীশ। (নমস্কার করিয়া) রসিক বাবু, আপনি এঁদের বলুন আমাদের যেন মার্জ্জনা করেন।

বিপিন। আমরা যদি ভ্রমেও ওঁদের লজ্জা বা ভয়ের কারণ হই তবে তার চেয়ে দুঃখের বিষয় আমাদের পক্ষে আর কিছু হতে পারে না, সে জন্যে যদি ক্ষমা না করেন তবে—

রসিক। বিলক্ষণ! ক্ষমা চেয়ে অপরাধিনীদের অপরাধ আরো বাড়াবেন না। এঁদের অল্প বয়স মাত্র অতিথিদের কি রকম সম্ভাষণ করা উচিত তা যদি এঁরা হঠাৎ ভুলে গিয়ে নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকেন তাহলে আপনাদের প্রতি অসদ্ভাব কল্পনা করে এঁদের আরো লজ্জিত করবেন না। নৃপ দিদি, নীর দিদি—কি বল ভাই! যদিও এখনো তোমাদের চোখের পাতা তুলতে পারনি—তবু এঁদের প্রতি তোমাদের মন যে বিমুখ নয় সে কথা কি জানাতে পারি? (নৃপ ও নীর লজ্জিত নিরুত্তর) না একটু আড়ালে জিজ্ঞাসা করা দরকার। (জনান্তিকে) ভদ্রলোকদের এখন কি বলি বলত ভাই? বলব কি, তোমরা যত শীঘ্র পার বিদায় হও!

নীর। (মৃদুস্বরে) রসিকদাদা কি বক তার ঠিক নেই, আমরা কি তাই বলেছি, আমরা কি জান্‌তুম এঁরা এসেছেন?

রসিক। (শ্রীশ বিপিনের প্রতি) এঁরা বলচেন—

সখা, কি মোর করমে লেখি—
তপন বলিয়া তপনে ডরিনু,
চাঁদের কিরণ দেখি!

এর উপরে আপনাদের আর কিছু বল্‌বার আছে?

নীর। (জনান্তিকে) আঃ রসিক দাদা, কি বল্‌চ তার ঠিক নেই! ওকথা আমরা কখন বল্লুম!

রসিক। (শ্রীশ বিপিনের প্রতি) এঁদের মনের ভাবটা আমি সম্পূর্ণ ব্যক্ত করতে পারিনি বলে এঁরা আমাকে ভর্ৎসনা করচেন! এঁরা বল্‌তে চান্‌, চাঁদের কিরণ বল্লেও যথেষ্ট বলা হয় না—তার চেয়ে আরো যদি—

নীর। (জনান্তিকে) তুমি অমন কর যদি তা হলে আমরা চলে যাব!

রসিক। সখি, ন যুক্তম্ অকৃতসৎকারম্ অতিথি বিশেষম্ উজ্ঝিত্বা স্বচ্ছন্দতো গমনম্! (শ্রীশ বিপিনের প্রতি), এঁরা বল্‌চেন এঁদের যথার্থ মনের ভাবটি যদি আপনাদের কাছে ব্যক্ত করে বলি, তা হলে এঁরা লজ্জায় এঘর থেকে চলে যাবেন। (নীর নৃপর প্রস্থানোদ্যম)

শ্রীশ। রসিকবাবুর অপরাধে আপনারা নির্দ্দোষদের সাজা দেবেন কেন? আমরা ত

কোন প্রকার প্রগল্‌ভতা করিনি। (উভয়ের ন যযৌ ন তস্থৌ ভাব)

বিপিন। (নীরকে লক্ষ্য করিয়া) পূর্ব্বকৃত কোন অপরাধ যদি থাকে ত ক্ষমা প্রার্থনার অবকাশ কি দেবেন না?

রসিক। (জনান্তিকে) এই ক্ষমাটুকুর জন্যে বেচারা অনেক দিন থেকে সুযোগ প্রত্যাশা করচে—

নীর। (জনান্তিকে) অপরাধ কি হয়েছে, যে ক্ষমা করতে যাব?

রসিক। (বিপিনের প্রতি) ইনি বলচেন, আপনার অপরাধ এমন মনোহর যে, তাকে ইনি অপরাধ বলে লক্ষ্যই করেন নি।—কিন্তু আমি যদি সেই খাতাটি হরণ করতে সাহসী হতেম তবে সেটা অপরাধ হত—আইনের বিশেষ ধারায় এই রকম লিখচে।

বিপিন। ঈর্ষা করবেন না রসিকবাবু! আপনারা সর্ব্বদাই অপরাধ করবার সুযোগ পান এবং সেজন্য দণ্ড ভোগ করে কৃতার্থ হন, আমি দৈবক্রমে একটি অপরাধ করবার সুবিধা পেয়েছিলুম—কিন্তু এতই অধম যে দণ্ডনীয় বলেও গণ্য হলেম না, ক্ষমা পাবার যোগ্যতাও লাভ করলেম না!

রসিক। বিপিন বাবু, একেবারে হতাশ হবেন না! শাস্তি অনেক সময় বিলম্বে আসে কিন্তু নিশ্চিত আসে। ফস্ করে মুক্তি না পেতেও পারেন!

ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। জল খাবার তৈরি। (নৃপ ও নীরর প্রস্থান)

শ্রীশ। আমরা কি দুর্ভিক্ষের দেশ থেকে আসচি রসিকবাবু? জল খাবারের জন্যে এত তাড়া কেন?

রসিক। মধুরেণ সমাপয়েৎ।

শ্রীশ। (নিশ্বাস ফেলিয়া) কিন্তু সমাপনটাত মধুর নয়! (জনান্তিকে বিপিনের প্রতি) কিন্তু বিপিন, এদের ত প্রতারণা করে যেতে পারব না!

বিপিন। (জনান্তিকে) তা যদি করি তবে আমরা পাষণ্ড!

শ্রীশ। (জনান্তিকে) এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি!

বিপিন। (জনান্তিকে) সে কি আর জিজ্ঞাসা করতে হবে?

রসিক। আপনারা দেখচি ভয় পেয়ে গেছেন! কোন আশঙ্কা নেই শেষকালে যেমন করেই হোক্ আমি আপনাদের উদ্ধার করবই।

(সকলের প্রস্থান)

অক্ষয় ও জগত্তারিণীর প্রবেশ।

জগৎ। দেখলে ত বাবা, কেমন ছেলে দুটি?

অক্ষয়। মা, তোমার পছন্দ ভাল, এ কথা আমি ত অস্বীকার করতে পারি নে!

জগৎ। মেয়েদের রকম দেখলে ত বাবা! এখন কান্নাকাটি কোথায় গেছে তার ঠিক নেই!

অক্ষয়। ঐত ওদের দোষ! কিন্তু মা, তোমাকে নিজে গিয়ে আশীর্ব্বাদ দিয়ে ছেলে দুটিকে দেখতে হচ্চে।

জগৎ। সে কি ভাল হবে অক্ষয়? ওরা কি পছন্দ জানিয়েছে?

অক্ষয়। খুব জানিয়েছে। এখন তুমি নিজে এসে আশীর্ব্বাদ করে গেলেই চট্‌পট্‌ স্থির হয়ে যায়!

জগৎ। তা বেশ, তোমরা যদি বল, ত যাব, আমি ওদের মার বয়সী, আমার লজ্জা কিসের!

পুরবালার প্রবেশ।

পুর। খাবার গুছিয়ে দিয়ে এসেছি।

ওদের কোন্ ঘরে বসিয়েছে আমি আর দেখ্‌তেই পেলুম না।

জগৎ। কি আর বল্‌ব পুরো, এমন সোণার চাঁদ ছেলে!

পুর। তা জান্‌তুম,! নীর নৃপর অদৃষ্টে কি খারাপ ছেলে হতে পারে!

অক্ষয়। তাদের বড়দিদির অদৃষ্টের আঁচ লেগেছে আর কি।

পুর। আচ্ছা থাম; য ও দেখি, তাদের সঙ্গে একটু আলাপ করগে; কিন্তু শৈল গেল কোথায়?

অক্ষয়। সে খুসী হয়ে দরজা বন্ধ করে পূজোয় বসেছে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

অক্ষয়। ব্যাপারটা কি? রসিক দা, আজকাল ত খুব খাওয়াচ্চ দেখ্‌ছি। প্রত্যহ যাকে দুবেলা দেখচ তাকে যে হঠাৎ ভুলে গেলে?

রসিক। এঁদের নতুন আদর, পাতে যা পড়চে তাতেই খুসী হচ্চেন তোমার আদর পুরোণো হয়ে এল, তোমাকে নতুন করে খুসী করি এমন সাধ্য নেই ভাই।

অক্ষয়। কিন্তু শুনেছিলেম, আজকের সমস্ত মিষ্টান্ন এবং এপরিবারের সমস্ত অনাস্বাদিত মধু উজাড় করে নেবার জন্যে দুটি অখ্যাতনামা যুবকের অভ্যুদয় হবে—এঁরা তাঁদেরই অংশে ভাগ বসাচ্চেন না কি? ওহে রসিক দা ভুল করনি ত?

রসিক। ভুলের জন্যেইত আমি বিখ্যাত। বড় মা জানেন তাঁর বুড়ো রসিককাকা যাতে হাত দেবেন তাতেই গলদ হবে।

অক্ষয়। বল কি রসিক দাদা? করেছ কি? সে দুটি ছেলেকে কোথায় পাঠালে?

রসিক। ভ্রমক্রমে তাঁদের ভুল ঠিকানা দিয়েছি!

অক্ষয়। সে বেচারাদের কি গতি হবে?

রসিক। বিশেষ অনিষ্ট হবে না। তাঁরা কুমারটুলিতে নীলমাধব চৌধুরীর বাড়িতে এতক্ষণে জলযোগ সমাধা করেছেন। বনমালী ভট্টাচায্য তাঁদের তত্ত্বাবধানের ভার নিয়েছেন।

অক্ষয়। তা যেন বুঝলুম, মিষ্টান্ন সকলেরই পাতে পড়ল, কিন্তু তোমারই জলযোগটি কিছু কটু রকমের হবে! এইবেলা ভ্রমসংশোধন করে নাও! শ্রীশ বাবু, বিপিন বাবু কিছু মনে কোরো না, এর মধ্যে একটু পারিবারিক রহস্য আছে।

শ্রীশ। সরল প্রকৃতি রসিক বাবু সে রহস্য আমাদের কাছে ভেদ করেই দিয়েছেন! আমাদের ফাঁকি দিয়ে আনেন নি!

বিপিন। মিষ্টান্নের থালায় আমরা অনধিকার আক্রমণ করি নি, শেষ পর্য্যন্ত তার প্রমাণ দিতে প্রস্তুত আছি।

অক্ষয়। বল কি বিপিন বাবু? তা হলে চিরকুমার সভাকে চিরজন্মের মত কাঁদিয়ে এসেছ? জেনেশুনে, ইচ্ছা পূর্ব্বক?

রসিক। না, না, তুমি ভুল করচ অক্ষয়।

অক্ষয়। আবার ভুল? আজ কি সকলেরই ভুল করবার দিন হল না কি? বিপিন দা।

(গান)

ভুলে ভুলে আজ ভুলময়!
ভুলের লতায় বাতাসের ভুলে,
ফুলে ফুলে হোক্ ফুলময়!
আনন্দ ঢেউ ভুলের সাগরে
উছলিয়া হোক্ কুলময়।

রসিক। একি বড় মা আস্‌চেন যে।

অক্ষয়। আসবারই ত কথা! উনি ত ার কুমারটুলির ঠিকানায় যাবেন না!

জগত্তারিণীর প্রবেশ। শ্রীশ ও বিপিনের মিষ্ঠ হইয়া প্রণাম! দুইজনকে দুই মোহর য়া জগত্তারিণীর আশীর্ব্বাদ! জনান্তিকে ক্ষয়ের সহিত জগত্তারণীর আলাপ।

অক্ষয়। মা বল্‌চেন, তোমাদের আজ ল করে খাওয়া হল না সমস্তই পাতে পড়ে ইল।

শ্রীশ। আমরা দুবার চেয়ে নিয়ে খেয়েছি!

বিপিন। যেটা পাতে পড়ে আছে, ওটা তীয় কিস্তী।

শ্রীশ। ওটা না পড়ে থাক্‌লে আমাদেরই ড়ে থাক্‌তে হত।

জগত্তারিণী। (জনান্তিকে) তা হলে তোমরা ওঁদের বসিয়ে কথাবার্ত্তা কও াছা আমি আসি। (প্রস্থান)

রসিক। না এ ভারি অন্যায় হল।

অক্ষয়। অন্যায়টা কি হল?

রসিক। আমি ওঁদের বারবার করে বলে এসেছি যে, ওঁরা কেবল আজ আহারটি করেই ছুটি পাবেন কোন রকম বাঁধ বন্ধনের আশঙ্কা নেই!—কিন্তু—

শ্রীশ। ওর মধ্যে কিন্তুটা কোথায় রসিক বাবু, আপনি অত চিন্তিত হচ্চেন কেন?

রসিক। বলেন কি শ্রীশবাবু, আপনাদের আমি কথা দিয়েছি যখন—

বিপিন। তা বেশ ত, এমনিই কি মহা-বিপদে ফেলেচেন!

শ্রীশ। মা আমাদের যে আশীর্ব্বাদ করে গেলেন আমরা যেন তার যোগ্য হই!

রসিক। না, না, শ্রীশবাবু, সে কোন কাজের কথা নয়। আপনারা যে দায়ে পড়ে ভদ্রতার খাতিরে—

বিপিন। রসিকবাবু আপনি আমাদের প্রতি অবিচার করবেন না—দায়ে পড়ে—

রসিক। দায় নয় ত কি মশায়। সে কিছু-তেই হবেনা! আমি বরঞ্চ সেই ছেলে দুটোকে বনমালীর হাতছাড়িয়ে কুমারটুলি থেকে এখনও ফিরিয়ে আনব তবু—

শ্রীশ। আপনার কাছে কি অপরাধ করেছি রসিক বাবু?—

রসিক। না, না, এ ত অপরাধের কথা হচ্চে না। আপনারা ভদ্রলোক, কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করেছেন—আমার অনুরোধে পড়ে পরের উপকার করতে এসে শেষকালে—

বিপিন। শেষকালে নিজের উপকার করে ফেলব এটুকু আপনি সহ্য করতে পারবেন না —এমনি হিতৈষী বন্ধু!

শ্রীশ। আমরা যেটাকে সৌভাগ্য বলে স্বীকার করচি—আপনি তার থেকে আমাদের বঞ্চিত করতে চেষ্টা করচেন কেন?

রসিক। শেষকালে আমাকে দোষ দেবেন না?

বিপিন। নিশ্চয় দেব যদি না আপনি স্থির হয়ে শুভকর্ম্মে সহায়তা করেন।

রসিক। আমি এখনো সাবধান করচি—
গতং তদ্‌গাম্ভীর্য্যং তটমপি চিতং জালিকশতৈঃ
সখে হংসোত্তিষ্ঠ, ত্বরিতমমুতো গচ্ছ সরসঃ!
সে গাম্ভীর্য্য গেল কোথা, নদীতট হের হোথা
জালিকেরা জালে ফেলে ঘিরে—
সখে হংস ওঠ ওঠ, সময় থাকিতে ছোট
হেথা হতে মানসের তীরে!

শ্রীশ। কিছুতেই না! তা, আপনার সংস্কৃত শ্লোক ছুড়ে মারলেও সখা হংসরা কিছু-তেই এখান থেকে নড়চেন না!

রসিক। স্থান খারাপ বটে। নড়বার

যো নেই! আমি ত অচল হয়ে বসে আছি—হায়, হায়—

অয়ি কুরঙ্গ তপোবন বিভ্রমাৎ
উপগতাসি কিরাতপুরীমিমাম্!

ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। চন্দ্রবাবু এসেচেন।

অক্ষয়। এইখানেই ডেকে নিয়ে আয়।

(ভৃত্যের প্রস্থান)।

রসিক। একেবারে দারোগার হাতে চোর দুটিকে সমর্পণ করে দেওয়া হক্।

চন্দ্রবাবুর প্রবেশ।

চন্দ্র। এই যে আপনারা এসেচেন। পূর্ণ বাবুকেও দেখচি!

অক্ষয়। আজ্ঞে না, আমি পূর্ণ নই, তবু অক্ষয় বটে!

চন্দ্র। অক্ষয় বাবু! তা বেশ হয়েছে, আপনাকেও দরকার ছিল!

অক্ষয়। আমার মত অদরকারী লোককে যে দরকারে লাগাবেন তাতেই লাগতে পারি—বলুন কি করতে হবে?

চন্দ্র। আমি ভেবে দেখেছি, আমাদের সভা থেকে কুমার ব্রতের নিয়ম না ওঠালে সভাকে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ করে রাখা হচ্চে। শ্রীশ বাবু বিপিন বাবুকে এই কথাটা একটু ভাল করে বোঝাতে হবে।

অক্ষয়। ভারি কঠিন কাজ, আমার দ্বারা হবে কি না সন্দেহ!

চন্দ্র। একবার একটা মতকে ভাল বলে গ্রহণ করেছি বলেই সেটাকে পরিত্যাগ করবার ক্ষমতা দূর করা উচিত নয়। মতের চেয়ে বিবেচনাশক্তি বড়। শ্রীশবাবু, বিপিন বাবু—

শ্রীশ। আমাদের অধিক বলা বাহুল্য—

চন্দ্র। কেন বাহুল্য? আপনারা যুক্তিতেও কর্ণপাত করবেন না?

বিপিন। আমরা আপনারই মতে—

চন্দ্র। আমার মত এক সময় ভ্রান্ত ছিল সে কথা স্বীকার করছি, আপনারা এখনো সেই মতেই—

রসিক। এই যে পূর্ণবাবু আসচেন! আসুন আসুন!

পূর্ণর প্রবেশ।

চন্দ্র। পূর্ণবাবু, তোমার প্রস্তাবমতে আমাদের সভা থেকে কুমার ব্রত তুলে দেবার জন্যেই আজ আমরা এখানে মিলিত হয়েছি! কিন্তু শ্রীশবাবু এবং বিপিনবাবু অত্যন্ত দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, এখন ওদের বোঝাতে পারলেই—

রসিক। ওঁদের বোঝাতে আমি ত্রুটি করিনি চন্দ্রবাবু—

চন্দ্র। আপনার মত বাগ্মী যদি ফল না পেয়ে থাকেন তা হলে—

রসিক। ফল যে পেয়েছি তা ফলেন পরিচীয়তে।

চন্দ্র। কি বলচেন ভাল বুঝতে পারচিনে।

অক্ষয়। ওহে রসিক দা, চন্দ্রবাবুকে খুব স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার! আমি দুটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখনি এনে উপস্থিত করচি!

শ্রীশ। পূর্ণবাবু, ভাল আছেন ত?

পূর্ণ। হাঁ।

বিপিন। আপনাকে একটু শুক্‌নো দেখাচ্চে।

পূর্ণ। না, কিছু না।

শ্রীশ। আপনাদের পরীক্ষার আর ত দেরী নেই।

পূর্ণ। না।

(নৃপ ও নীরকে লইয়া অক্ষয়ের প্রবেশ।)

অক্ষয়। (নৃপ ও নীরর প্রতি) ইনি চন্দ্রবাবু ইনি তোমাদের গুরুজন, এঁকে প্রণাম কর।

(নৃপ নীরর প্রণাম) চন্দ্র বাবু, নূতন নিয়মে আপনাদের সভায় এই দুটি সভ্য বাড়ল!

চন্দ্র। বড় খুসি হলেম। এরা কে?

অক্ষয়। আমার সঙ্গে এদের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। এরা আমার দুটি শ্যালী। শ্রীশবাবু এবং বিপিন বাবুর সঙ্গে এঁদের সম্বন্ধ শুভলগ্নে আরো ঘনিষ্ঠতর হবে। এঁদের প্রতি দৃষ্টি করলেই বুঝবেন, রসিক বাবু এই যুবক দুটির যে মতের পরিবর্ত্তন করিয়েছেন সে কেবল মাত্র বাগ্মিরত দ্বারা নয়।

চন্দ্র। বড় আনন্দের কথা।

পূর্ণ। শ্রীশ বাবু, বড় খুসি হলুম! বিপিন বাবু আপনাদের বড় সৌভাগ্য! আশা করি, অবলাকান্ত বাবুও বঞ্চিত হন নি, তারো একটি—

নির্ম্মলার প্রবেশ।

চন্দ্র। নির্ম্মলা শুনে খুসি হবে, শ্রীশবাবু এবং বিপিন বাবুর সঙ্গে এঁদের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেছে। তা হলে কুমারব্রত উঠিয়ে দেওয়া সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করাই বাহুল্য।

নির্ম্মলা। কিন্তু অবলাকান্তবাবুর মত ত নেওয়া হয় নি—তাঁকে এখানে দেখচিনে—

চন্দ্র। ঠিক কথা, আমি সেটা ভুলেই গিয়েছিলুম, তিনি আজ এখনো এলেন না কেন?

রসিক। কিছু চিন্তা করবেন না, তাঁর পরিবর্ত্তন দেখলে আপনারা আরো আশ্চর্য্য হবেন।

অক্ষয়। চন্দ্রবাবু, এবারে আমাকেও দলে নেবেন। সভাটি যে রকম লোভনীয় হয়ে উঠলো, এখন আমাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন না।

চন্দ্র। আপনাকে পাওয়া আমাদের সৌভাগ্য।

অক্ষয়। আমার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি সভ্যও পাবেন। আজকের সভায় তাঁকে কিছুতেই উপস্থিত করতে পারলেম না। এখন তিনি নিজেকে সুলভ করবেন না,—বাসরঘরে ভূতপূর্ব্ব কুমারসভাটিকে সাধ্যমত পিণ্ডদান করে তার পরে যদি দেখা দেন! এইবার অবশিষ্ট সভ্যটি এলেই আমাদের চিরকুমার-সভা সম্পূর্ণ সমাপ্ত হয়!

শৈলের প্রবেশ

শৈল। (চন্দ্রকে প্রণাম করিয়া) আমাকে ক্ষমা করবেন!

শ্রীশ। একি, অবলাকান্ত বাবু—

অক্ষয়। আপনারা মত পরিবর্ত্তন করেছেন, ইনি বেশ পরিবর্ত্তন করেছেন মাত্র।

রসিক। শৈলজা ভবানী এতদিন কিরাত বেশ ধারণ করেছিলেন, আজ ইনি আবার তপস্বিনী বেশ গ্রহণ করলেন।

চন্দ্র। নির্ম্মলা আমি কিছুই বুঝতে পারচিনে।

নির্ম্মলা। অন্যায়! ভারি অন্যায়! অবলাকান্তবাবু—

অক্ষয়। নির্ম্মলা দেবী ঠিক বলেছেন—অন্যায়! কিন্তু সে বিধাতার অন্যায়! এঁর অবলাকান্ত হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু ভগবান্ এঁকে বিধবা শৈলবালা করে কি মঙ্গল সাধন করচেন সে রহস্য আমাদের অগোচর!

শৈল। (নির্ম্মলার প্রতি) আমি অন্যায় করেছি, সে অন্যায়ের প্রতিকার আমার দ্বারা কি হবে? আশা করি কালে সমস্ত সংশোধন হয়ে যাবে।

পূর্ণ। (নির্ম্মলার নিকটে আসিয়া) এই অবকাশে আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, চন্দ্রবাবুর পত্রে আমি যে স্পর্দ্ধা প্রকাশ করেছিলুম সে আমার পক্ষে অন্যায় হয়েছিল—আমার মত অযোগ্য—

চন্দ্র। কিছু অন্যায় হয় নি পূর্ণবাবু—আপনার যোগ্যতা যদি নির্ম্মলা না বুঝ্‌তে পারেন ত সে নির্ম্মলারই বিবেচনার অভাব! (নির্ম্মলার নতমুখে নিরুত্তরে অবস্থান)

রসিক। (পূর্ণের প্রতি জনান্তিকে) ভয় নেই পূর্ণবাবু আপনার দরখাস্ত মঞ্জুর—প্রজাপতির আদালতে ডিক্রি পেয়েছেন—কাল প্রত্যূষেই জারি করতে বেরবেন।

শ্রীশ। (শৈলবালার প্রতি) বড় ফাঁকি দিয়েছেন।

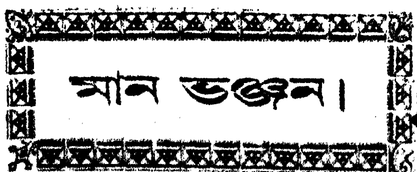
বিপিন। সম্বন্ধের পূর্ব্বেই পরিহাসটা করে নিয়েছেন।

শৈল। পরে তাই বলে নিষ্কৃতি পাবেন না!

বিপিন। নিষ্কৃতি চাইনে!

রসিক। এইবারে নাটক শেষ হল—এইখানে ভরতবাক্য উচ্চারণ করে দেওয়া যাক্।

সর্ব্বস্তরতু দুর্গানি সর্ব্বো ভদ্রাণি পশ্যতু।
সর্ব্বঃ কামানবাপ্নোতু সর্ব্বঃ সর্ব্বত্র নন্দতু॥



প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:•:—

রমানাথ শীলের ত্রিতল অট্টালিকায় সর্ব্বোচ্চ তলের ঘরে গোপীনাথ শীলের স্ত্রী গিরিবালা বাস করেন। শয়নকক্ষের দক্ষিণ দ্বারের সম্মুখে ফুলের টবে গুটিকতক বেলফুল এবং গোলাপফুলের গাছ;—ছাতটি উচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘেরা—বহির্দৃশ্য দেখিবার জন্য প্রাচীরের মাঝে মাঝে একটি করিয়া ইট ফাঁক দেওয়া আছে। শোবার ঘরে নানা বেশ এবং বিবেশ-বিশিষ্ট বিলাতী নারীমূর্ত্তির বাঁধানো এন্‌গ্রেভিং টাঙ্গানো রহিয়াছে; কিন্তু প্রবেশদ্বারের সম্মুখবর্ত্তী বৃহৎ আয়নার উপরে ষোড়শী গৃহস্বামিনীর যে প্রতিবিম্বটি পড়ে, তাহা দেয়ালের কোন ছবি অপেক্ষা সৌন্দর্য্যে ন্যূন নহে।

গিরিবালার সৌন্দর্য্য অকস্মাৎ আলোকরশ্মির ন্যায়, বিস্ময়ের ন্যায়, নিদ্রাভঙ্গে চেতনার ন্যায় একেবারে চকিতে আসিয়া আঘাত করে এবং এক আঘাতে অভিভূত করিয়া দিতে পারে। তাহাকে দেখিলে মনে হয় ইহাকে দেখিবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। চারিদিকে এবং চিরকাল যেরূপ দেখিয়া আসিতেছি, এ একেবারে হঠাৎ তাহা হইতে অনেক স্বতন্ত্র।

গিরিবালাও আপন লাবণ্যোচ্ছ্বাসে আপনি আদ্যোপান্ত তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছে। মদের ফেনা যেমন পাত্র ছাপিয়া পড়িয়া যায়, নবযৌবন এবং নবীন সৌন্দর্য্য তাহার সর্ব্বাঙ্গে তেমনি ছাপিয়া পড়িয়া যাইতেছে,—তাহার বসনে ভূষণে গমনে, তাহার বাহুর বিক্ষেপে, তাহার গ্রীবার ভঙ্গীতে, তাহার চঞ্চল চরণের উদ্দাম ছন্দে, নূপুরনিক্কণে, কঙ্কণের কিঙ্কিণীতে, তরল হাস্যে, ক্ষিপ্রভাষায় উজ্জ্বল কটাক্ষে একেবারে উচ্ছৃঙ্খলভাবে উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে।

আপন সর্ব্বাঙ্গের এই উচ্ছলিত মদিররসে গিরিবালার একটা নেশা লাগিয়াছে। প্রায় দেখা যাইত, একখানি কোমল রঙিন বস্ত্রে আপনার পরিপূর্ণ দেহখানি জড়াইয়া সে ছাতের উপরে অকারণে চঞ্চল হইয়া বেড়াইতেছে। যেন মনের ভিতরকার কোন এক অশ্রুত অব্যক্ত সঙ্গীতের তালে তালে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ

নৃত্য করিতে চাহিতেছে। আপনার অঙ্গকে নানা ভঙ্গীতে উৎক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত প্রক্ষিপ্ত করিয়া তাহার যেন বিশেষ কি এক আনন্দ আছে ;—সে যেন আপন সৌন্দর্য্যের নানা দিকে নানা ঢেউ তুলিয়া দিয়া সর্ব্বাঙ্গের উত্তপ্ত রক্তস্রোতে অপূর্ব্ব পুলক সহকারে বিচিত্র আঘাতে প্রতিঘাত অনুভব করিতে থাকে। সে হঠাৎ গাছ হইতে পাতা ছিঁড়িয়া দক্ষিণ বাহু আকাশে তুলিয়া সেটা বাতাসে উড়াইয়া দেয়—অমনি তাহার বালা বাজিয়া উঠে,তাহার অঞ্চল বিস্রস্ত হইয়া পড়ে, তাহার সুললিত বাহুর ভঙ্গীটি পিঞ্জরমুক্ত অদৃশ্য পাখীর মত অনন্ত আকাশে মেঘরাজ্যের অভিমুখে উড়িয়া চলিয়া যায়। হঠাৎ সে টব হইতে একটা মাটির ঢেলা তুলিয়া অকারণে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয় ; চরণাঙ্গুলির উপর ভর দিয়া উচ্চ হইয়া দাঁড়াইয়া প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া বৃহৎ বহির্জ্জগৎটা একবার চট্‌ করিয়া দেখিয়া লয়—আবার ঘুরিয়া আঁচল ঘুরাইয়া চলিয়া আসে, আঁচলের চাবির গোচ্ছা ঝিন্ ঝিন্ করিয়া বাজিয়া উঠে। হয় ত আয়নার সম্মুখে গিয়া খোঁপা খুলিয়া ফেলিয়া অসময়ে চুল-বাঁধিতে বসে ; চুল বাঁধিবার দড়ি দিয়া কেশমূল বেষ্টন করিয়া সেই দড়ি কুন্দদন্তপংক্তিতে দংশন করিয়া ধরে, দুই বাহু উর্দ্ধে তুলিয়া মস্তকের পশ্চাতে বেণীগুলিকে দৃঢ় আকর্ষণে কুণ্ডলায়িত করে—চুল বাঁধা শেষ করিয়া হাতের সমস্ত কাজ ফুরাইয়া যায়—তখন সে আলস্যভরে কোমল বিছানার উপরে আপনাকে পত্রান্তরালচ্যুত একটি জ্যোৎস্নালেখার মত বিস্তীর্ণ করিয়া দেয়।

তাহার সন্তানাদি নাই, ধনিগৃহে তাহার কোন কাজকর্ম্মও নাই—সে কেবল নির্জ্জনে প্রতিদিন আপনার মধ্যে আপনি সঞ্চিত হইয়া শেষকালে আপনাকে আর ধারণ করিয়া রাখিতে পারিতেছে না। স্বামী আছে কিন্তু তাহার আয়ত্তের মধ্যে নাই। গিরিবালা বাল্য-কাল হইতে যৌবনে এমন পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠিয়াও কেমন করিয়া তাহার স্বামীর চক্ষু এড়াইয়া গেছে।

বরঞ্চ বাল্যকালে সে তাহার স্বামীর আদর পাইয়াছিল। স্বামী তখন ইস্কুল পালাইয়া তাহার সুপ্ত অভিভাবকদিগকে বঞ্চনা করিয়া নির্জ্জন মধ্যাহ্নে তাহার বালিকা স্ত্রীর সহিত প্রণয়ালাপ করিতে আসিত। এক বাড়িতে থাকিয়াও সৌখীন চিঠির কাগজে স্ত্রীর সহিত চিঠিপত্র লেখালেখি করিত। স্কুলের বিশেষ বন্ধু-দিগকে সেই সমস্ত চিঠি দেখাইয়া গর্ব্ব অনুভব করিত। তুচ্ছ এবং কল্পিত কারণে স্ত্রীর সহিত মান অভিমানেরও অসদ্ভাব ছিল না।

এমন সময়ে বাপের মৃত্যুতে গোপীনাথ স্বয়ং বাড়ির কর্ত্তা হইয়া উঠিল। কাঁচা কাঠে তক্তায় শীঘ্র পোকা ধরে—কাঁচা বয়সে গোপীনাথ যখন স্বাধীন হইয়া উঠিল তখন অনেক-গুলি জীবজন্তু তাহার স্কন্ধে বাসা করিল। তখন ক্রমে অন্তঃপুরে তাহার গতিবিধি হ্রাস হইয়া অন্যত্র প্রসারিত হইতে লাগিল।

দলপতিত্বের একটা উত্তেজনা আছে ; মানুষের কাছে মানুষের নেশাটা অত্যন্ত বেশী। অসংখ্য মনুষ্যজীবন এবং সুবিস্তীর্ণ ইতিহাসের উপর আপন প্রভাব বিস্তার করিবার প্রতি নেপোলিয়নের যে একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল —একটি ছোট বৈঠকখানার ছোট কর্ত্তাটিরও নিজের ক্ষুদ্র দলের নেশা অল্পতর পরিমাণে সেই এক জাতীয়। সামান্য ইয়ারকিবন্ধনে আপনার চারিদিকে একটা লক্ষ্মীছাড়া ইয়ার-মণ্ডলী সৃজন করিয়া তুলিলে তাহাদের উপর আধিপত্য এবং তাহাদের নিকট হইতে বাহবা লাভ করা একটা প্রচণ্ড উত্তেজনার কারণ হইয়া দাঁড়ায় ; সেজন্য অনেক লোক

বিষয় নাশ, ঋণ, কলঙ্ক সমস্তই স্বীকার করিতে প্রস্তুত হয়।

গোপীনাথ তাহার ইয়ার-সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ হইয়া ভারি মাতিয়া উঠিল। সে প্রতিদিন ইয়ার্কির নব নব কীর্ত্তি নব নব গৌরব লাভ করিতে লাগিল। তাহার দলের লোক বলিতে লাগিল—শ্যালকবর্গের মধ্যে ইয়ার্কিতে অদ্বিতীয় খ্যাতিলাভ করিল গোপীনাথ; সেই গর্ব্বে সেই উত্তেজনায় অন্যান্য সমস্ত সুখদুঃখ-কর্ত্তব্যের প্রতি অন্ধ হইয়া হতভাগ্য ব্যক্তিটি রাত্রিদিন অবের্ত্তের মত পাক খাইয়া খাইয়া বেড়াইতে লাগিল।

এদিকে জগজ্জয়ী রূপ লইয়া আপন অন্তঃপুরের প্রজাহীন রাজ্যে, শয়ন-গৃহের শূন্য সিংহাসনে গিরিবালা অধিষ্ঠান করিতে লাগিল। সে নিজে জানিত বিধাতা তাহার হস্তে রাজদণ্ড দিয়াছেন—সে জানিত, প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া যে বৃহৎ জগৎখানি দেখা যাইতেছে, সেই জগৎটিকে সে কটাক্ষে জয় করিয়া আসিতে পারে—অথচ বিশ্বসংসারের মধ্যে একটি মানুষকেও সে বন্দী করিতে পারে নাই।

গিরিবালার একটি সুরসিকা দাসী আছে, তাহার নাম সুধো, অর্থাৎ সুধামুখী। সে গান গাহিত, নাচিত, ছড়া কাটিত, প্রভুপত্নীর রূপের ব্যাখ্যা করিত, এবং অরসিকের হস্তে এমন রূপ নিষ্ফল হইল বলিয়া আক্ষেপ করিত। গিরিবালার যখন তখন এই সুধোকে নহিলে চলিত না। উল্টিয়া পাল্টিয়া সে নিজের মুখের শ্রী, দেহের গঠন, বর্ণের উজ্জ্বলতা সম্বন্ধে বিস্তৃত সমালোচনা শুনিত; মাঝে মাঝে তাহার প্রতিবাদ করিত, এবং পরম পুলকিত চিত্তে সুধোকে মিথ্যাবাদিনী চাটুভাষিণী বলিয়া গঞ্জনা করিতে ছাড়িত না;—সুধো তখন শত শত শপথ সহকারে নিজের মতের অকৃত্রিমতা প্রমাণ করিতে বসিত, গিরিবালার পক্ষে তাহা বিশ্বাস করা নিতান্ত কঠিন হইত না।

সুধো গিরিবালাকে গান শুনাইত—"দাসখত দিলাম লিখে শ্রীচরণে";—এই গানের মধ্যে গিরিবালা নিজের অলক্তাঙ্কিত অনিন্দ্য সুন্দর চরণপল্লবের স্তব শুনিতে পাইত এবং একটি পদলুণ্ঠিত দাসের ছবি তাহার কল্পনায় উদিত হইত—কিন্তু হায়, দুটি শ্রীচরণ মলের শব্দে শূন্য ছাতের উপরে আপন জয়গান ঝঙ্কৃত করিয়া বেড়ায়, তবু কোন স্বেচ্ছাবিক্রীত ভক্ত আসিয়া দাসখৎ লিখিয়া দিয়া যায় না।

গোপীনাথ যাহাকে দাসখৎ লিখিয়া দিয়াছে, তাহার নাম লবঙ্গ,—সে থিয়েটারে অভিনয় করে—সে ষ্টেজের উপরে চমৎকার মূর্চ্ছা যাইতে পারে—সে যখন সানুনাসিক কৃত্রিম কাঁদুনীর স্বরে হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া টানিয়া টানিয়া আধ আধ উচ্চারণে "প্রাণনাথ প্রাণেশ্বর" করিয়া ডাক ছাড়িতে থাকে, তখন পাৎলা ধুতির উপর ওয়েষ্টকোট্-পরা, ফুল্-মোজামণ্ডিত দর্শকমণ্ডলী "এক্সেলেণ্ট্" "এক্সেলেণ্ট্" করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

এই অভিনেত্রী লবঙ্গের অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতার বর্ণনা গিরিবালা ইতিপূর্ব্বে অনেকবার তাহার স্বামীর মুখেই শুনিয়াছে। তখনও তাহার স্বামী সম্পূর্ণ রূপে পলাতক হয় নাই। তখন সে তাহার স্বামীর মোহাবস্থা না জানিয়াও মনে মনে অসূয়া অনুভব করিত। আর কোন নারীর এমন কোন মনোরঞ্জনী বিদ্যা আছে যাহা তাহার নাই ইহা সে সহ্য করিতে পারিত না। সাসূয় কৌতূহলে সে অনেকবার থিয়েটার দেখিতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিত, কিন্তু কিছুতেই স্বামীর মত করিতে পারিত না।

অবশেষে সে একদিন টাকা দিয়া সুধোকে

থয়েটার দেখিতে পাঠাইয়া দিল ;—সুধো আসিয়া নাসাগ্র কুঞ্চিত করিয়া রামনাম উচ্চারণ পূর্ব্বক অভিনেত্রীদিগের ললাটদেশে সম্মার্জ্জনীর ব্যবস্থা করিল—এবং তাহাদের কদর্য্যমূর্ত্তি ও কৃত্রিম ভঙ্গীতে যে সমস্ত পুরুষের অভিরুচি জন্মে তাহাদের সম্বন্ধেও সেই একই রূপ বিধান স্থির করিল। শুনিয়া গিরিবালা বিশেষ আশ্বস্ত হইল।

কিন্তু যখন তাহার স্বামী বন্ধন ছিন্ন করিয়া গেল, তখন তাহার মনে সংশয় উপস্থিত হইল। সুধোর কথায় অবিশ্বাস প্রকাশ করিলে সুধো গিরির গা ছুঁইয়া বারংবার কহিল, বস্ত্রখণ্ডাবৃত দগ্ধকাষ্ঠের মত তাহার নীরস এবং কুৎসিত চেহারা। গিরি তাহার আকর্ষণীশক্তির কোন কারণ নির্ণয় করিতে পারিল না, এবং নিজের অভিমানে সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়া জ্বলিতে লাগিল।

অবশেষে একদিন সন্ধ্যাবেলায় সুধোকে লইয়া গোপনে থিয়েটার দেখিতে গেল। নিষিদ্ধ কাজের উত্তেজনা বেশী। তাহার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে যে এক মৃদু কম্পন উপস্থিত হইয়াছিল সেই কম্পনাবেগে এই আলোকময়, লোকময়, বাদ্যসঙ্গীত-মুখরিত দৃশ্যপট-শোভিত রঙ্গভূমি তাহার চক্ষে দ্বিগুণ অপরূপতা ধারণ করিল। তাহার সেই প্রাচীর-বেষ্টিত নির্জ্জন নিরানন্দ অন্তঃপুর হইতে এ কোন্ এক সুসজ্জিত সুন্দর উৎসবলোকের প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। সমস্ত স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

সে দিন মানভঞ্জন অপেরা অভিনয় হইতেছে। যখন ঘণ্টা বাজিল, বাদ্য থামিয়া গেল, চঞ্চল দর্শকগণ মুহূর্ত্তে স্থির নিস্তব্ধ হইয়া বসিল, রঙ্গমঞ্চের সম্মুখবর্ত্তী আলোকমালা উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল, পট উঠিয়া গেল, একদল সুসজ্জিত নটী ব্রজাঙ্গনা সাজিয়া সঙ্গীত-সহযোগে নৃত্য করিতে লাগিল, দর্শকগণের করতালি ও প্রশংসাবাদে নাট্যশালা থাকিয়া থাকিয়া ধ্বনিত কম্পিত হইয়া উঠিল, তখন গিরিবালার তরুণ দেহের রক্ত-লহরী উন্মাদনায় আলোড়িত হইতে লাগিল। সেই সঙ্গীতের তানে, আলোক ও আভরণের ছটায়, এবং সম্মিলিত প্রশংসাধ্বনিতে সে ক্ষণকালের জন্য সমাজ সংসার সমস্তই বিস্মৃত হইয়া গেল—মনে করিল, এমন এক জায়গায় আসিয়াছে যেখানে বন্ধনমুক্ত সৌন্দর্য্যপূর্ণ স্বাধীনতার কোন বাধামাত্র নাই।

সুধো মাঝে মাঝে আসিয়া ভীতস্বরে কাণে কাণে বলে বৌঠাকরুণ, এই বেলা বাড়ি ফিরিয়া চল ; দাদাবাবু জানিতে পারিলে রক্ষা থাকিবে না। গিরিবালা সে কথায় কর্ণপাত করে না। তাহার মনে এখন আর কিছুমাত্র ভয় নাই।

অভিনয় অনেক দূর অগ্রসর হইল। রাধার দুর্জ্জয় মান হইয়াছে ;—সে মানসাগরে কৃষ্ণ আর কিছুতেই থই পাইতেছে না ; কত অনুনয় বিনয় সাধাসাধি কাঁদাকাঁদি—কিছুতেই কিছু হয় না। তখন গর্ব্বভরে গিরিবালার বক্ষ ফুলিতে লাগিল। কৃষ্ণের এই লাঞ্ছনায় সে যেন মনে মনে রাধা হইয়া নিজের অসীম প্রতাপ নিজে অনুভব করিতে লাগিল। কেহ তাহাকে কখন এমন করিয়া সাধে নাই ; সে অবহেলিত অবমানিত পরিত্যক্ত স্ত্রী, কিন্তু তবু সে এক অপূর্ব্ব মোহে স্থির করিল যে, এমন করিয়া নিষ্ঠুরভাবে কাঁদাইবার ক্ষমতা তাহারও আছে। সৌন্দর্য্যের যে কেমন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ তাহা সে কাণে শুনিয়াছে অনুমান করিয়াছে মাত্র—আজ দীপের আলোকে, গানের সুরে, সুদৃশ্য রঙ্গমঞ্চের উপরে তাহা সুস্পষ্টরূপে

প্রত্যক্ষ করিল। নেশায় তাহার সমস্ত মস্তিষ্ক ভরিয়া উঠিল।

অবশেষে যবনিকা পতিত হইল, গ্যাসের আলো ম্লান হইয়া আসিল, দর্শকগণ প্রস্থানের উপক্রম করিল; গিরিবালা মন্ত্রমুগ্ধের মত বসিয়া রহিল। এখান হইতে উঠিয়া যে বাড়ি যাইতে হইবে একথা তাহার মনে ছিল না। সে ভাবিতেছিল, অভিনয় বুঝি ফুরাইবে না, যবনিকা আবার উঠিবে, রাধিকার নিকট শ্রীকৃষ্ণের পরাভব, জগতে ইহা ছাড়া আর কোন বিষয় উপস্থিত নাই। সুধো কহিল, বৌঠাকুরুণ, কর কি, ওঠ, এখনি সমস্ত আলো নিবাইয়া দিবে।

গিরিবালা গভীর রাত্রে আপন শয়নকক্ষে ফিরিয়া আসিল। কোণে একটি দীপ মিট্‌মিট্‌ করিতেছে—ঘরে একটি লোক নাই, শব্দ নাই —গৃহপ্রান্তে নির্জ্জন শয্যার উপরে একটি পুরাতন মশারি বাতাসে অল্প অল্প দুলিতেছে; তাহার প্রতিদিনের জগৎ অত্যন্ত বিশ্রী বিরস এবং তুচ্ছ বলিয়া ঠেকিতে লাগিল। কোথায় সেই সৌন্দর্য্যময় আলোকময় সঙ্গীতময় রাজ্য যেখানে সে আপনার সমস্ত মহিমা বিকীর্ণ করিয়া দিয়া জগতের কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করিতে পারে—যেখানে সে অজ্ঞাত অবজ্ঞাত তুচ্ছ সাধারণ নারীমাত্র নহে।

এখন হইতে সে প্রতি সপ্তাহেই থিয়েটারে যাইতে আরম্ভ করিল। কালক্রমে তাহার সেই প্রথম মোহ অনেকটা পরিমাণে হ্রাস হইয়া আসিল—এখন সে নটনটীদের মুখের রং চং, সৌন্দর্য্যের অভাব, অভিনয়ের কৃত্রিমতা সমস্ত দেখিতে পাইল, কিন্তু তবু তাহার নেশা ছুটিল না। রণসঙ্গীত শুনিলে যোদ্ধার হৃদয় যেমন নাচিয়া উঠে, রঙ্গমঞ্চের পট উঠিয়া গেলেই তাহার বক্ষের মধ্যে সেইরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইত। ঐ যে, সমস্ত সংসার হইতে স্বতন্ত্র সুদৃশ্য সমুচ্চ সুন্দর বেদিকা, স্বর্ণলেখায় অঙ্কিত চিত্রপটে সজ্জিত, কাব্য এবং সঙ্গীতের ইন্দ্রজালে মায়ামণ্ডিত, অসংখ্য মুগ্ধদৃষ্টির দ্বারা আক্রান্ত নেপথ্যভূমির গোপনতার দ্বারা অপূর্ব্ব রহস্যপ্রাপ্ত, উজ্জ্বল আলোকমালায় সর্ব্বসমক্ষে সুপ্রকাশিত,—বিশ্ববিজয়িনী সৌন্দর্য্যরাজ্ঞীর পক্ষে এমন মায়া-সিংহাসন আর কোথায় আছে?

প্রথমে যে দিন সে তাহার স্বামীকে রঙ্গভূমিতে উপস্থিত দেখিল, এবং যখন গোপীনাথ কোন নটীর অভিনয়ে উন্মত্ত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন স্বামীর প্রতি তাহার মনে প্রবল অবজ্ঞার উদয় হইল। সে জর্জ্জরিত চিত্তে মনে করিল যদি কখন এমন দিন আসে যে তাহার স্বামী তাহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া দগ্ধপক্ষ পতঙ্গের মত তাহার পদতলে আসিয়া পড়ে, এবং সে আপন চরণনখরের প্রান্ত হইতে উপেক্ষা বিকীর্ণ করিয়া দিয়া অভিমানভরে চলিয়া যাইতে পারে তবেই তাহার এই ব্যর্থ রূপ ব্যর্থ যৌবন সার্থকতা লাভ করিবে।

কিন্তু সে শুভদিন আসিল কই? আজকাল গোপীনাথের দর্শন পাওয়াই দুর্লভ হইয়াছে। সে আপন প্রমত্ততার ঝড়ের মুখে ধূলিধ্বজের মত একটা দল পাকাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তাহার আর ঠিকানা নাই।

একদিন চৈত্রমাসের বাসন্তী পূর্ণিমায় গিরিবালা বাসন্তীরঙের কাপড় পরিয়া দক্ষিণ বাতাসে অঞ্চল উড়াইয়া ছাতের উপর বসিয়াছিল যদিও ঘরে স্বামী আসে না তবু গিরি উল্টিয়া পাল্টিয়া প্রতিদিন বদল করিয়া নূতন নূতন গহনায় আপনাকে সুসজ্জিত করিয়া তুলিত

হীরামুক্তার আভরণ তাহার অঙ্গে প্রত্যঙ্গে একটি উন্মাদনা সঞ্চার করিত, ঝল্‌মল্‌ করিয়া রুনুঝুনু বাজিয়া তাহার চারিদিকে একটি হিল্লোল তুলিতে থাকিত। আজ সে হাতে বাজুবন্ধ এবং গলায় একটি চুনী ও মুক্তার কণ্ঠী পরিয়াছে এবং বাম হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে একটি নীলার আংটি দিয়াছে। সুধো পায়ের কাছে বসিয়া মাঝে মাঝে তাহার নিটোলকোমল রক্তোৎপল পদপল্লবে হাত বুলাইতেছিল—এবং অকৃত্রিম উচ্ছ্বাসের সহিত বলিতেছিল, আহা বৌঠাকরুণ আমি যদি পুরুষ মানুষ হইতাম তাহা হইলে এই পা দুখানি বুকে লইয়া মরিতাম। গিরিবালা সগর্ব্বে হাসিয়া উত্তর দিতেছিল, বোধ করি বুকে না লইয়াই মরিতে হইত—তখন কি আর এমন করিয়া পা ছড়াইয়া দিতাম? আর বকিস্‌নে; তুই সেই গানটা গা!

সুধো সেই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নির্জ্জন ছাদের উপর গাহিতে লাগিল—

দাসখৎ দিলেম লিখে শ্রীচরণে,
সকলে সাক্ষী থাকুক বৃন্দাবনে।

তখন রাত্রি দশটা। বাড়ির আর সকলে আহারাদি সমাধা করিয়া ঘুমাইতে গিয়াছে। এমন সময় আতর মাখিয়া উড়ানী উড়াইয়া হঠাৎ গোপীনাথ আসিয়া উপস্থিত হইল,—সুধো অনেকখানি জিব কাটিয়া সাত হাত ঘোম্‌টা টানিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

গিরিবালা ভাবিল আজ তাহার দিন আসিয়াছে। সে মুখ তুলিয়া চাহিল না। সে রাধিকার মত গুরুমানভরে অটল হইয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু দৃশ্যপট উঠিল না—শিখিপুচ্ছ-চূড়া পায়ের কাছে লুটাইল না—কেহ কাফি রাগিণীতে গাহিয়া উঠিল না—

কেন, পূর্ণিমা আঁধার কর লুকায়ে বদন শশী!

সঙ্গীতহীন নীরসকণ্ঠে গোপীনাথ বলিল—একবার চাবিটা দাও দেখি!

এমন জ্যোৎস্নায় এমন বসন্তে এতদিনের বিচ্ছেদের পরে এই কি প্রথম সম্ভাষণ! কাব্যে নাটকে উপন্যাসে যাহা লেখে তাহার আগাগোড়াই মিথ্যা কথা! অভিনয়মঞ্চেই প্রণয়ী গান গাহিয়া পায়ে আসিয়া লুটাইয়া পড়ে—এবং তাহাই দেখিয়া যে দর্শকের চিত্ত বিগলিত হইয়া যায়, সেই লোকটি বসন্তনিশীথে গৃহচ্ছাদে আসিয়া আপন অনুপমা যুবতী স্ত্রীকে বলে, ওগো একবার চাবিটা দাও দেখি! তাহাতে না আছে রাগিণী, না আছে প্রীতি, তাহাতে কোন মোহ নাই, মাধুর্য্য নাই, তাহা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর।

এমন সময়ে দক্ষিণে বাতাস জগতের সমস্ত অপমানিত কবিত্বের মর্ম্মান্তিক দীর্ঘনিশ্বাসের মত হুহু করিয়া বহিয়া গেল—টবভরা ফুটন্ত বেলফুলের গন্ধ ছাদময় ছড়াইয়া দিয়া গেল—গিরিবালার চূর্ণ অলক চোখে মুখে আসিয়া পড়িল এবং তাহার বাসন্তীরঙের সুগন্ধি আঁচল অধীরভাবে যেখানে সেখানে উড়িতে লাগিল। গিরিবালা সমস্ত মান বিসর্জ্জন দিয়া উঠিয়া পড়িল।

স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল, চাবী দিব এখন তুমি ঘরে চল।—আজ সে কাঁদিবে কাঁদাইবে, তাহার সমস্ত নির্জ্জন কল্পনাকে সার্থক করিবে, তাহার সমস্ত ব্রহ্মাস্ত্র বাহির করিয়া বিজয়ী হইবে, ইহা সে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছে।

গোপীনাথ কহিল, আমি বেশী দেরী করিতে পারিব না—তুমি চাবি দাও।

গিরিবালা কহিল—আমি চাবি দিব এবং

চাবির মধ্যে যাহা কিছু আছে সমস্ত দিব—কিন্তু আজ রাত্রে তুমি কোথাও যাইতে পারিবে না।

গোপীনাথ বলিল—সে হইবে না। আমার বিশেষ দরকার আছে।

গিরিবালা বলিল—তবে আমি চাবি দিব না!

গোপী বলিল, দিবে না বৈ কি? কেমন না দাও দেখিব!

বলিয়া সে গিরিবালার আঁচলে দেখিল চাবি নাই। ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তাহার আয়নার বাক্সর দেরাজ খুলিয়া দেখিল তাহার মধ্যেও চাবি নাই। তাহার চুল বাঁধিবার বাক্স জোর করিয়া ভাঙ্গিয়া খুলিল—তাহাতে কাজললতা, সিঁদুরের কোটা, চুলের দড়ি প্রভৃতি বিচিত্র উপকরণ আছে—চাবি নাই। তখন সে বিছানা ঘাঁটিয়া গদি উঠাইয়া আলমারি ভাঙ্গিয়া নাস্তানাবুদ করিয়া তুলিল।

গিরিবালা প্রস্তরমূর্ত্তির মত শক্ত হইয়া দরজা ধরিয়া ছাদের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ব্যর্থমনোরথ গোপীনাথ রাগে গর-গর করিতে করিতে আসিয়া বলিল—চাবি দাও বলিতেছি নহিলে ভাল হইবে না।

গিরিবালা উত্তরমাত্র দিল না। তখন গোপী তাহাকে চাপিয়া ধরিল এবং তাহার হাত হইতে বাজুবন্ধ, গলা হইতে কণ্ঠী, অঙ্গুলি হইতে আংটি ছিনিয়া লইয়া তাহাকে লাথি মারিয়া চলিয়া গেল।

বাড়ির কাহারও নিদ্রাভঙ্গ হইল না, পল্লীর কেহ কিছুই জানিতে পারিল না, জ্যোৎস্নারাত্রি তেমনি নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, সর্ব্বত্র যেন অখণ্ড শান্তি বিরাজ করিতেছে। কিন্তু অন্তরের চীৎকারধ্বনি যদি বাহিরে শুনা যাইত তবে সেই চৈত্র মাসের সুখসুপ্ত জ্যোৎস্নানিশীথিনী অকস্মাৎ তীব্রতম আর্ত্তস্বরে দীর্ণ বিদীর্ণ হইয়া যাইত। এমন সম্পূর্ণ নিঃশব্দে এমন হৃদয়-বিদারণ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে!

অথচ সে রাত্রিও কাটিয়া গেল। এমন পরাভব এত অপমান গিরিবালা সুধোর কাছেও বলিতে পারিল না। মনে করিল, আত্মহত্যা করিয়া, এই অতুল রূপ যৌবন নিজের হাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সে আপন অনাদরের প্রতিশোধ লইবে। কিন্তু তখনি মনে পড়িল, তাহাতে কাহারও কিছু আসিবে যাইবে না—পৃথিবীর যে কতখানি ক্ষতি হইবে তাহা কেহ অনুভবও করিবে না। জীবনেও কোন সুখ নাই, মৃত্যুতেও কোন সান্ত্বনা নাই।

গিরিবালা বলিল, আমি বাপের বাড়ি চলিলাম।—তাহার বাপের বাড়ি কলিকাতা হইতে দূরে। সকলেই নিষেধ করিল—কিন্তু বাড়ির কর্ত্রী নিষেধও শুনিল না কাহাকে সঙ্গেও লইল না। এদিকে গোপীনাথও সদলবলে নৌকাবিহারে কত দিনের জন্য কোথায় চলিয়া গিয়াছে কেহ জানে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—০—

গান্ধর্ব্ব থিয়েটারে গোপীনাথ প্রায় প্রত্যেক অভিনয়েই উপস্থিত থাকিত। সেখানে মনোরমা নাটকে লবঙ্গ মনোরমা সাজিত এবং গোপীনাথ সদলে সম্মুখের সারে বসিয়া তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে বাহবা দিত এবং ষ্টেজের উপর তোড়া ছুঁড়িয়া ফেলিত। মাঝে মাঝে এক এক দিন গোলমাল করিয়া দর্শকদের অত্যন্ত বিরক্তিভাজন হইত। তথাপি রঙ্গভূমির

অধ্যক্ষগণ তাহাকে কখন নিষেধ করিতে সাহস করে নাই।

অবশেষে একদিন গোপীনাথ কিঞ্চিৎ মত্তাবস্থায় গ্রীণরুমের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভারি গোল বাধাইয়া দিল। কি এক সামান্ত কাল্পনিক কারণে সে আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া কোনও নটীকে গুরুতর প্রহার করিল—তাহার চীৎকারে, এবং গোপীনাথের গালি বর্ষণে সমস্ত নাট্যশালা চকিত হইয়া উঠিল।

সে দিন অধ্যক্ষগণ আর সহ্য করিতে না পারিয়া গোপীনাথকে পুলিশের সাহায্যে বাহির করিয়া দেয়।

গোপীনাথ এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে কৃতনিশ্চয় হইল। থিয়েটারওয়ালারা পূজার একমাস পূর্ব্ব হইতে নূতন নাটক মনোরমার অভিনয় খুব আড়ম্বরসহকারে ঘোষণা করিয়াছে। বিজ্ঞাপনের দ্বারা কলিকাতা সহরটাকে কাগজে মুড়িয়া ফেলিয়াছে;—রাজধানীতে যেন সেই বিখ্যাত গ্রন্থকারের নামাঙ্কিত নামাবলী পরাইয়া দিয়াছে।

এমন সময় গোপীনাথ তাহাদের প্রধান অভিনেত্রী লবঙ্গকে লইয়া বোটে চড়িয়া কোথায় অন্তর্দ্ধান হইল তাহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না।

থিয়েটারওয়ালারা হঠাৎ অকূলপাথারে পড়িয়া গেল। কিছুদিন লবঙ্গের জন্ত অপেক্ষা করিয়া অবশেষে এক নূতন অভিনেত্রীকে মনোরমার অংশ অভ্যাস করাইয়া লইল—তাহাতে তাহাদের অভিনয়ের সময় পিছাইয়া গেল।

কিন্তু বিশেষ ক্ষতি হইল না। অভিনয়স্থলে দর্শক আর ধরে না। শত শত লোক দ্বার হইতে ফিরিয়া যায়। কাগজেও প্রশংসার সীমা নাই।

সে প্রশংসা দূরদেশে গোপীনাথের কাণে গেল। সে আর থাকিতে পারিল না। বিদ্বেষে এবং কৌতূহলে পূর্ণ হইয়া সে অভিনয় দেখিতে আসিল।

প্রথম পট-উৎক্ষেপে অভিনয়ের আরম্ভভাগে মনোরমা দীনহীন বেশে দাসীর মত তাহার শ্বশুরবাড়িতে থাকে—প্রচ্ছন্ন বিনম্র সঙ্কুচিতভাবে সে আপনার কাজ কর্ম্ম করে—তাহার মুখে কথা নাই, এবং তাহার মুখ ভাল করিয়া দেখাই যায় না।

অভিনয়ের শেষাংশে মনোরমাকে পিতৃগৃহে পাঠাইয়া তাহার স্বামী অর্থলোভে কোন এক লক্ষপতির একমাত্র কন্তাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছে। বিবাহের পর বাসরঘরে যখন স্বামী নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল তখন দেখিতে পাইল—এও সেই মনোরমা, কেবল সেই দাসীবেশ নাই—আজ সে রাজকন্তা সাজিয়াছে—তাহার নিরুপম সৌন্দর্য্য, আভরণে ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত হইয়া দশদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। শিশুকালে মনোরমা তাহার ধনী পিতৃগৃহ হইতে অপহৃত হইয়া দরিদ্রের গৃহে পালিত হইয়াছে। বহুকাল পরে সম্প্রতি তাহার পিতা সেই সন্ধান পাইয়া কন্তাকে ঘরে আনাইয়া তাহার স্বামীর সহিত পুনরায় নূতন সমারোহে বিবাহ দিয়াছে। তাহার পরে বাসরঘরে মানভঞ্জনের পালা আরম্ভ হইল।

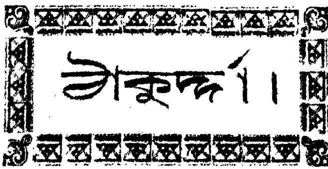
কিন্তু ইতিমধ্যে দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে ভারি এক গোলমাল বাধিয়া উঠিল। মনোরমা যতক্ষণ মলিন দাসীবেশে ঘোমটা টানিয়া ছিল ততক্ষণ গোপীনাথ নিস্তব্ধ হইয়া দেখিতেছিল। কিন্তু যখন সে আভরণে ঝল্‌মল্ করিয়া রক্তাম্বর পরিয়া মাথার ঘোমটা ঘুচাইয়া, রূপের তরঙ্গ তুলিয়া বাসর-ঘরে দাঁড়াইল এবং এক অনির্ব্বচনীয় গর্ব্বে গৌরবে গ্রীবা বঙ্কিম করিয়া সমস্ত দর্শকমণ্ডলীর প্রতি এবং বিশেষ করিয়া

সম্মুখবর্ত্তী গোপীনাথের প্রতি চকিত বিদ্যুতের ন্যায় অবজ্ঞাপূর্ণ তীক্ষ্ণকটাক্ষ নিক্ষেপ করিল—যখন সমস্ত দর্শকমণ্ডলীর চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া প্রশংসায় করতালিতে নাট্যস্থলী সুদীর্ঘকাল কম্পান্বিত করিয়া তুলিতে লাগিল—তখন গোপীনাথ সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া গিরিবালা গিরিবালা করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ছুটিয়া ষ্টেজের উপর লাফ দিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল—বাদকগণ তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

এই অকস্মাৎ রসভঙ্গে মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া দর্শকগণ, ইংরাজিতে বাঙ্গালায়, দূর করে দাও, বের করে দাও, বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

গোপীনাথ পাগলের মত ভগ্নকণ্ঠে চীৎকার করিতে লাগিল, আমি ওকে খুন করব, ওকে খুন করব!

পুলিস আসিয়া গোপীনাথকে ধরিয়া টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেল। সমস্ত কলিকাতা সহরের দর্শক দুই চক্ষু ভরিয়া গিরিবালার অভিনয় দেখিতে লাগিল—কেবল গোপীনাথ সেখানে স্থান পাইল না।



প্রথম পরিচ্ছেদ।

—o—

নয়নযোড়ের জমিদারেরা এককালে বাবু বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। তখনকার কালের বাবুয়ানার আদর্শ বড় সহজ ছিল না। এখন যেমন রাজা রায়বাহাদুর খেতাব অর্জ্জন করিতে অনেককে খানা নাচ ঘোড়দৌড় এবং সেলাম সুপারিসের শ্রাদ্ধ করিতে হয়, তখনও সাধারণের নিকট হইতে বাবু উপাধি লাভ করিতে বিস্তর দুঃসাধ্য তপশ্চরণ করিতে হইত।

আমাদের নয়নযোড়ের বাবুরা পাড় ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ঢাকাই কাপড় পড়িতেন, কারণ পাড়ের কর্কশতায় তাঁহাদের সুকোমল বাবুয়ানা ব্যথিত হইত। তাঁহারা লক্ষ টাকা দিয়া বিড়ালশাবকের বিবাহ দিতেন এবং কথিত আছে, একবার কোন উৎসব উপলক্ষে রাত্রিকে দিন করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া অসংখ্য দীপ জ্বালাইয়া সূর্য্যকিরণের অনুকরণে তাঁহারা সাঁচ্চা রূপার জরি উপর হইতে বর্ষণ করাইয়াছিলেন।

ইহা হইতেই সকলে বুঝিবেন সেকালে বাবুদের বাবুয়ানা বংশানুক্রমে স্থায়ী হইতে পারিত না। বহু-বর্ত্তিকা-বিশিষ্ট প্রদীপের মত নিজের তৈল নিজে অল্পকালের ধূমধামেই নিঃশেষ করিয়া দিত।

আমাদের কৈলাসচন্দ্র রায় চৌধুরী সেই প্রখ্যাতযশ নয়নযোড়ের একটি নির্ব্বাপিত বাবু। ইনি যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তৈল তখন প্রদীপের তলদেশে আসিয়া ঠেকিয়াছিল;—ইঁহার পিতার মৃত্যু হইলে পর নয়নযোড়ের বাবুয়ানা গোটাকতক অসাধারণ শ্রাদ্ধশান্তিতে অন্তিম দীপ্তি প্রকাশ করিয়া হঠাৎ নিবিয়া গেল। সমস্ত বিষয় আশয় ঋণের দায়ে বিক্রয় হইল—যে অল্প অবশিষ্ট রহিল তাহাতে পূর্ব্বপুরুষের খ্যাতি রক্ষা করা অসম্ভব।

সেই জন্য নয়নযোড় ত্যাগ করিয়া পুত্রকে সঙ্গে লইয়া কৈলাস বাবু কলিকাতায় আসিয়া বাস করিলেন—পুত্রটিও একটি কন্যামাত্র রাখিয়া এই হতগৌরব সংসার পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিলেন।

আমরা তাঁহার কলিকাতায় প্রতিবেশী

আমাদের ইতিহাসটা তাঁহাদের হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত। আমার পিতা নিজের চেষ্টায় ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন; তিনি কখনও হাঁটুর নিম্নে কাপড় পারিতেন না, কড়া ক্রান্তির হিসাব রাখিতেন, এবং বাবু উপাধি লাভের জন্য তাঁহার লালসা ছিল না। সে জন্য আমি তাঁহার একমাত্র পুত্র তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি। আমি যে লেখা পড়া শিখিয়াছি এবং নিজের প্রাণ ও মান রক্ষার উপযোগী যথেষ্ট অর্থ বিনা চেষ্টায় প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহাই আমি পরম গৌরবের বিষয় বলিয়া জ্ঞান করি—শূন্য ভাণ্ডারে পৈতৃক বাবুয়ানার উজ্জ্বল ইতিহাসের অপেক্ষা লোহার সিন্দুকের মধ্যে পৈতৃক কোম্পানির কাগজ আমার নিকট অনেক বেশী মূল্যবান্ বলিয়া মনে হয়।

বোধ করি সেই কারণেই, কৈলাসবাবু তাঁহাদের পূর্ব্বগৌরবের ফেল্-করা ব্যাঙ্কের উপর যখন দেদার লম্বাচৌড়া চেক্ চালাইতেন তখন তাহা আমার এত অসহ্য ঠেকিত। আমার মনে হইত, আমার পিতা স্বহস্তে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন বলিয়া কৈলাসবাবু বুঝি মনে মনে আমাদের প্রতি অবজ্ঞা অনুভব করিতেছেন। আমি রাগ করিতাম এবং ভাবিতাম অবজ্ঞার যোগ্য কে? যে লোক সমস্ত জীবন কঠোর ত্যাগস্বীকার করিয়া, নানা প্রলোভন অতিক্রম করিয়া, লোকমুখের তুচ্ছ খ্যাতি অবহেলা করিয়া, অশ্রান্ত এবং সতর্ক বুদ্ধিকৌশলে সমস্ত প্রতিকূল বাধা প্রতিহত করিয়া সমস্ত অনুকূল অবসরগুলিকে আপনার আয়ত্তগত করিয়া একটি একটি রৌপ্যের স্তরে সম্পদের একটি সুমুচ্চ পিরামিড্ একাকী স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, তিনি হাঁটুর নীচে কাপড় পরিতেন না বলিয়া যে কম লোক ছিলেন তাহা নয়।

তখন বয়স অল্প ছিল সেই জন্য এইরূ তর্ক করিতাম রাগ করিতাম—এখন বয়স বে হইয়াছে এখন মনে করি, ক্ষতি কি! আমার ত বিপুল বিষয় আছে, আমার কিসের অভাব? যাহার কিছু নাই, সে যদি অহঙ্কার করিয়া সুখী হয়, তাহাতে আমার ত শিকি পয়সার লোকসান নাই, বরং সে বেচারার সান্ত্বনা আছে।

ইহাও দেখা গিয়াছে আমি ব্যতীত আর কেহ কৈলাসবাবুর উপর রাগ করিত না। কারণ, এত বড় নিরীহ লোক সচরাচর দেখা যায় না। ক্রিয়াকর্ম্মে সুখে দুঃখে প্রতিবেশীদের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ যোগ ছিল। ছেলে হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলকেই দেখা হইবামাত্র তিনি হাসিমুখে প্রিয় সম্ভাষণ করিতেন—যেখানে যাহার যে কেহ আছে সকলেরই কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া তবে তাঁহার শিষ্টতা বিরাম লাভ করিত। এই জন্য কাহারও সহিত তাঁহার দেখা হইলে একটা সুদীর্ঘ প্রশ্নোত্তরমালার সৃষ্টি হইত; ভাল ত? শশী ভাল আছে? আমাদের বড় বাবু ভাল আছেন? মধুর ছেলেটির জ্বর হয়েছিল শুনেছিলুম সে এখন ভাল আছে ত? হরিচরণ বাবুকে অনেক কাল দেখিনি তাঁর অসুখ বিসুখ কিছু হয়নি? তোমাদের রাখালের খবর কি? বাড়ির এঁরা সকলে ভাল আছেন? ইত্যাদি।

লোকটি ভারি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কাপড় চোপড় অধিক ছিল না, কিন্তু মেরজাইটি চাদরটি, জামাটি, এমন কি, বিছানায় পাতিবার একটি পুরাতন র‍্যাপার, বালিশের ওয়াড়, একটি ক্ষুদ্র সতরঞ্চ সমস্ত স্বহস্তে রৌদ্রে দিয়া ঝাড়িয়া দড়িতে খাটাইয়া ভাঁজ করিয়া আল-

নায় তুলিয়া পরিপাটি করিয়া রাখিতেন। যখন তাঁহাকে দেখা যাইত তখনি মনে হইত যেন তিনি সুসজ্জিত প্রস্তুত হইয়া আছেন। অল্পস্বল্প সামান্য আস্‌বাবেও তাঁহার ঘরদ্বার সমুজ্জ্বল হইয়া থাকিত। মনে হইত যেন তাঁহার আরও অনেক আছে।

ভৃত্যাভাবে অনেক সময় ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তিনি নিজের হস্তে অতিশয় পরিপাটি করিয়া ধুতি কোঁচাইতেন এবং চাদর ও জামার আস্তিন বহুযত্নে ও পরিশ্রমে "গিলে" করিয়া রাখিতেন। তাঁহার বড় বড় জমিদারী ও বহুমূল্যের বিষয়সম্পত্তি লোপ পাইয়াছে, কিন্তু একটি বহুমূল্য গোলাপপাশ, আতরদান, একটি সোণার রেকাবী, একটি রূপার আল্‌বোলা, একটি বহুমূল্য শাল ও সেকেলে জামাযোড়া ও পাগ্‌ড়ী দারিদ্রের গ্রাস হইতে বহুচেষ্টায় তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন। কোন একটা উপলক্ষ উপস্থিত হইলে এই গুলি বাহির হইত এবং নয়নযোড়ের জগদ্বিখ্যাত বাবুদের গৌরব রক্ষা হইত।

এদিকে কৈলাসবাবু মাটির মানুষ হইলেও কথায় যে অহঙ্কার করিতেন সেটা যেন পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি কর্ত্তব্য বোধে করিতেন; সকল লোকেই তাহাতে প্রশ্রয় দিত এবং বিশেষ আমোদ বোধ করিত।

পাড়ার লোকে তাঁহাকে ঠাকুর্দ্দামশাই বলিত এবং তাঁহার ওখানে সর্ব্বদা বিস্তর লোক সমাগম হইত; কিন্তু দৈন্যাবস্থায় পাছে তাঁহার তামাকের খরচটা গুরুতর হইয়া উঠে এই জন্য প্রায়ই পাড়ার কেহ না কেহ দুই এক সের তামাক কিনিয়া লইয়া গিয়া তাঁহাকে বলিত, ঠাকুর্দ্দামশায় একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ দেখি ভাল গয়ার তামাক পাওয়া গেছে।

ঠাকুর্দ্দামশায় দুই এক টান টানিয়া বলিতেন, বেশ ভাই, বেশ তামাক। অমনি সেই উপলক্ষে ষাট পঁয়ষট্টি টাকা ভরির তামাকের গল্প পাড়িতেন; এবং জিজ্ঞাসা করিতেন সে তামাক কাহারও আস্বাদ করিয়া দেখিবার ইচ্ছা আছে কি না?

সকলেই জানিত সে যদি কেহ ইচ্ছা প্রকাশ করে তবে নিশ্চয় চাবির সন্ধান পাওয়া যাইবে না অথবা অনেক অন্বেষণের পর প্রকাশ পাইবে যে পুরাতন ভৃত্য গণেশ বেটা কোথায় যে কি রাখে তাহার আর ঠিকানা নাই—গণেশও বিনা প্রতিবাদে সমস্ত অপবাদ স্বীকার করিয়া লইবে। এই জন্য সকলেই একবাক্যে বলিত, ঠাকুর্দ্দামশায় কাজ নেই, সে তামাক আমাদের সহ্য হবে না, আমাদের এই ভাল।

শুনিয়া ঠাকুর্দ্দা দ্বিরুক্তি না করিয়া ঈষৎ হাস্য করিতেন। সকলে বিদায় লইবার কালে বৃদ্ধ হঠাৎ বলিয়া উঠিতেন, সে যেন হল, তোমরা কবে আমার এখানে খাবে বল দেখি ভাই?

অমনি সকলে বলিত, সে একটা দিন ঠিক করে দেখা যাবে।

ঠাকুর্দ্দা মশায় বলিতেন, সেই ভাল, একটু বৃষ্টি পড়ুক, ঠাণ্ডা হোক্, নইলে এ গরমে গুরুভোজনটা কিছু নয়।

যখন বৃষ্টি পড়িত তখন ঠাকুর্দ্দাকে কেহ তাঁহার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিত না—বরঞ্চ কথা উঠিলে সকলে বলিত, "এই বৃষ্টি বাদলটা না ছাড়লে সুবিধে হচ্চে না। ক্ষুদ্র বাসাবাড়িতে বাস করাটা তাঁহার পক্ষে ভাল দেখাইতেছে না এবং কষ্টও হইতেছে এ কথা তাঁহার বন্ধুবান্ধব সকলেই তাঁহার সমক্ষে স্বীকার করিত অথচ কলিকাতায় কিনিবার উপযুক্ত বাড়ি খুঁজিয়া পাওয়া যে কত কঠিন, সে বিষয়েও কাহারও সন্দেহ ছিল না—এমন

কি আজ ছয় সাত বৎসর সন্ধান করিয়া ভাড়া লইবার মত একটা বড় বাড়ি পাড়ার কেহ দেখিতে পাইল না—অবশেষে ঠাকুর্দ্দামশাই বলিতেন, "তা হোক্ ভাই, তোমাদের কাছাকাছি আছি এই আমার সুখ, নয়নযোড়ে বড় বাড়ি ত পড়েই আছে কিন্তু সেখানে কি মন টেকে?"

আমার বিশ্বাস, ঠাকুর্দ্দাও জানিতেন যে, সকলে তাঁহার অবস্থা জানে, এবং যখন তিনি ভূতপূর্ব্ব নয়নযোড়কে বর্ত্তমান বলিয়া ভাণ করিতেন এবং অন্য সকলেও তাহাতে যোগ দিত তখন তিনি মনে মনে বুঝিতেন যে, পরস্পরের এই ছলনা কেবল পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্দ্যবশতঃ।

কিন্তু আমার বিষম বিরক্তি বোধ হইত। অল্প বয়সে পরের নিরীহ গর্ব্বও দমন করিতে ইচ্ছা করে এবং সহস্র গুরুতর অপরাধের তুলনায় নির্ব্বুদ্ধিতাই সর্ব্বাপেক্ষা অসহ্য বোধ হয়। কৈলাসবাবু ঠিক নির্ব্বোধ ছিলেন না, কাজে কর্ম্মে তাঁহার সহায়তা এবং পরামর্শ সকলেই প্রার্থনীয় জ্ঞান করিত। কিন্তু নয়নযোড়ের গৌরব প্রকাশ সম্বন্ধে তাঁহার কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। সকলে তাঁহাকে ভালবাসিয়া এবং আমোদ করিয়া তাঁহার কোন অসম্ভব কথাতেই প্রতিবাদ করিত না বলিয়া তিনি আপনার কথার পরিমাণ রক্ষা করিতে পারিতেন না। অন্য লোকেও যখন আমোদ করিয়া অথবা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নয়নযোড়ের কীর্ত্তিকলাপ সম্বন্ধে বিপরীত মাত্রায় অত্যুক্তি প্রয়োগ করিত, তিনি অকাতরে সমস্ত গ্রহণ করিতেন এবং স্বপ্নেও সন্দেহ করিতেন না যে, অন্য কেহ এ সকল কথা লেশমাত্র অবিশ্বাস করিতে পারে।

আমার এক এক সময় ইচ্ছা করিত, বৃদ্ধ এই যে মিথ্যা দুর্গ অবলম্বন করিয়া বাস করিতেছে এবং মনে করিতেছে ইহা চিরস্থায়ী, এই দুর্গটি দুইতোপে সর্ব্বসমক্ষে উড়াইয়া দিই। একটা পাখীকে সুবিধামত ডালের উপর বসিয়া থাকিতে দেখিলেই শিকারীর ইচ্ছা করে তাহাকে গুলি বসাইয়া দিতে, পাহাড়ের গায়ে একটা প্রস্তর পতনোন্মুখ থাকিতে দেখিলেই বালকের ইচ্ছা করে এক লাথি মারিয়া তাহাকে গড়াইয়া ফেলিতে—যে জিনিষটা প্রতি মুহূর্ত্তে পড়ি পড়ি করিতেছে অথচ কোন একটা কিছুতে সংলগ্ন হইয়া আছে, তাহাকে ফেলিয়া দিলেই তবে যেন তাহার সম্পূর্ণতা সাধন এবং দর্শকের মনের তৃপ্তিলাভ হয়। কৈলাসবাবুর মিথ্যাগুলি এতই সরল, তাহার ভিত্তি এতই দুর্ব্বল, তাহা ঠিক্ সত্য বন্দুকের লক্ষ্যের সাম্নে এমনি বুক ফুলাইয়া নৃত্য করিত যে, তাহাকে মুহূর্ত্তের মধ্যে বিনাশ করিবার জন্য একটি আবেগ উপস্থিত হইত—কেবল নিতান্ত আলস্যবশতঃ এবং সর্ব্বজনসম্মত প্রথার অনুসরণ করিয়া সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতাম না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নিজের অতীত মনোভাব বিশ্লেষণ করিয়া যতটা মনে পড়ে তাহাতে মনে হয়, কৈলাসবাবুর প্রতি আমার আন্তরিক বিদ্বেষের আর একটি গূঢ় কারণ ছিল। তাহা একটু বিস্তৃত করিয়া বলা আবশ্যক।

আমি বড়মানুষের ছেলে হইয়াও যথাকালে এম, এ, পাস্ করিয়াছি, যৌবন সত্ত্বেও কোন প্রকার কুসংসর্গ কুৎসিত আমোদে যোগ দিই নাই, এবং অভিভাবকের মৃত্যুর পরে স্বয়ং

কর্ত্তা হইয়াও আমার স্বভাবের কোন প্রকার বিকৃতি উপস্থিত হয় নাই। তাহা ছাড়া চেহারাটা এমন যে, তাহাকে আমি নিজ মুখে সুশ্রী বলিলে অহঙ্কার হইতে পারে কিন্তু মিথ্যাবাদ হয় না।

অতএব বাঙ্গালা দেশে ঘটকালির হাটে আমার দাম যে অত্যন্ত বেশী তাহাতে আর সন্দেহ নাই—এই হাটে আমার সেই দাম আমি পূরা আদায় করিয়া লইব, এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। ধনী পিতার পরম রূপবতী একমাত্র বিদুষী কন্যা আমার কল্পনায় আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছিল।

দশ হাজার বিশ হাজার টাকা পণের প্রস্তাব করিয়া দেশ বিদেশ হইতে আমার সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। আমি অবিচলিতচিত্তে নিক্তি ধরিয়া তাহাদের যোগ্যতাযোগ্যতা ওজন করিয়া লইতে ছিলাম, কোনটাই আমার সমযোগ্য বোধ হয় নাই! অবশেষে ভবভূতির ন্যায় আমার ধারণা হইয়াছিল যে,—

কি জানি জন্মিতে পারে মম সমতুল,
অসীম সময় আছে, বসুধা বিপুল।

কিন্তু বর্ত্তমান কালে এবং ক্ষুদ্র বঙ্গদেশে সেই অসম্ভব দুর্লভ পদার্থ জন্মিয়াছে কি না সন্দেহ।

কন্যাদায়গ্রস্তগণ প্রতিনিয়ত নানা ছন্দে আমার স্তবস্তুতি এবং বিবিধোপচারে আমার পূজা করিতে লাগিল। কন্যা পছন্দ হউক বা না হউক, এই পূজা আমার মন্দ লাগিল না। ভাল ছেলে বলিয়া, কন্যার পিতৃগণের এই পূজা আমার উচিতপ্রাপ্য স্থির করিয়াছিলাম। শাস্ত্রে পড়া যায়, দেবতা বর দিন্ আর না দিন যথাবিধি পূজা না পাইলে বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। নিয়মিত পূজা পাইয়া আমারও মনে সেইরূপ অত্যুচ্চ দেবভাব জন্মিয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, ঠাকুর্দ্দা মশায়ের একটি পৌত্রী ছিল। তাহাকে অনেকবার দেখিয়াছি কিন্তু কখনও রূপবতী বলিয়া ভ্রম হয় নাই। সুতরাং তাহাকে বিবাহ করিবার কল্পনাও উদিত হয় নাই। কিন্তু ইহা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম যে, কৈলাস বাবু, লোকমারফৎ অথবা স্বয়ং পৌত্রীটিকে অর্ঘ্য দিবার মানসে আমার পূজার বোধন করিতে আসিবেন, কারণ,আমি ভাল ছেলে। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না।

শুনিতে পাইলাম, আমার কোন বন্ধুকে তিনি বলিয়াছিলেন, নয়নযোড়ের বাবুরা কখনও কোন বিষয়ে অগ্রসর হইয়া কাহারও নিকটে প্রার্থনা করে নাই—কন্যা যদি চিরকুমারী হইয়া থাকে তথাপি সেই কুলপ্রথা তিনি ভঙ্গ করিতে পারিবেন না।

শুনিয়া আমার বড় রাগ হইল। সে রাগ অনেক দিন পর্য্যন্ত আমার মনের মধ্যে ছিল—কেবল ভাল ছেলে বলিয়াই চুপচাপ করিয়া ছিলাম।

যেমন বজ্রের সঙ্গে বিদ্যুৎ থাকে, তেমনি আমার চরিত্রে রাগের সঙ্গে সঙ্গে একটা কৌতুকপ্রিয়তা জড়িত ছিল। বৃদ্ধকে শুদ্ধমাত্র নিপীড়ন করা আমার দ্বারা সম্ভব হইত না—কিন্তু একদিন হঠাৎ এমন একটা কৌতুকাবহ প্লান্ মাথায় উদয় হইল যে, সেটা কাজে খাটাইবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৃদ্ধকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নানা লোকে নানা মিথ্যা কথার সৃজন করিত। পাড়ার একজন পেন্সনভোগী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট প্রায় বলিতেন, ঠাকুর্দ্দা, ছোটলাটের সঙ্গে যখনি দেখা হয় তিনি নয়নযোড়ের বাবুদের খবর না নিয়ে ছাড়েন না—সাহেব বলেন, বাঙ্গালাদেশে বর্দ্ধমানের রাজা এবং

নয়নযোড়ের বাবু, এই দুটি মাত্র যথার্থ বনেদী বংশ আছে!

ঠাকুর্দ্দা ভারি খুসি হইতেন—এবং ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে অন্যান্য কুশলসংবাদের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেন—ছোটলাট সাহেব ভাল আছেন? তাঁর মেমসাহেব ভাল আছেন? তাঁর পুত্র কন্যারা সকলেই ভাল আছেন? সাহেবের সহিত শীঘ্র একদিন সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন এমন ইচ্ছাও প্রকাশ করিতেন। কিন্তু ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি নিশ্চয় জানিতেন নয়নযোড়ের বিখ্যাত চৌঘুড়ি প্রস্তুত হইয়া দ্বারে আসিতে আসিতে বিস্তর ছোট লাট এবং বড় লাট বদল হইয়া যাইবে!

আমি একদিন প্রাতঃকালে গিয়া কৈলাস বাবুকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া চুপি চুপি বলিলাম—ঠাকুর্দ্দা, কাল লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের লেভিতে গিয়েছিলুম। তিনি নয়নযোড়ের বাবুদের কথা পাড়াতে আমি বল্লুম নয়নযোড়ের কৈলাস বাবু কলকাতাতেই আছেন—শুনে ছোটলাট এতদিন দেখা করতে আসেন নি বলে ভারি দুঃখিত হলেন—বলে দিলেন আজই দুপুর বেলা তিনি গোপনে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসবেন।

আর কেহ হইলে কথাটার অসম্ভবতা বুঝিতে পারিত এবং আর কাহারও সম্বন্ধে হইলে কৈলাস বাবুও এ কথায় হাস্য করিতেন—কিন্তু নিজের সম্বন্ধীয় বলিয়া এ সংবাদ তাঁহার লেশমাত্র অবিশ্বাস্য বোধ হইল না। শুনিয়া যেমন খুসি হইলেন তেমনি অস্থির হইয়া উঠিলেন—কোথায় বসাইতে হইবে, কি করিতে হইবে, কেমন করিয়া অভ্যর্থনা করিবেন—কি উপায়ে নয়নযোড়ের গৌরব রক্ষিত হইবে কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। তাহা ছাড়া, তিনি ইংরাজি জানেন না, কথা চালাইবেন কি করিয়া সেও এক সমস্যা।

আমি বলিলাম সে জন্য ভাবনা নাই, তাঁহার সঙ্গে এক জন করিয়া দোভাষী থাকে; কিন্তু ছোটলাট সাহেবের বিশেষ ইচ্ছা, আর কেহ যেন উপস্থিত না থাকে।

মধ্যাহ্নে পাড়ার অধিকাংশ লোক যখন আপিসে গিয়াছে এবং অবশিষ্ট অংশ দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিদ্রামগ্ন তখন কৈলাস বাবুর বাসার সম্মুখে এক জুড়ি আসিয়া দাঁড়াইল।

তকমা-পরা চাপরাসি তাঁহাকে খবর দিল ছোটলাট সাহেব আয়া! ঠাকুর্দ্দা প্রাচীনকাল-প্রচলিত শুভ্র জামাযোড়া এবং পাগড়ী পরিয়া প্রস্তুত হইয়াছিলেন তাঁহার পুরাতন ভৃত্য গণেশটিকে তাঁহার নিজের ধুতি চাদর জামা পরাইয়া ঠিক ঠাক করিয়া রাখিয়াছিলেন। ছোটলাটের আগমনসংবাদ শুনিয়াই হাঁপাইতে হাঁপাইতে কাঁপিতে কাঁপিতে ছুটিয়া দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন—এবং সন্নতদেহে বারংবার সেলাম করিতে করিতে ইংরাজবেশধারী আমার এক প্রিয়বয়স্যকে ঘরে লইয়া গেলেন।

সেখানে চৌকির উপরে তাঁহার একমাত্র বহুমূল্য শালটি পাতিয়া রাখিয়াছিলেন তাহারই উপর কৃত্রিম ছোটলাটকে বসাইয়া উর্দ্দুভাষায় এক অতি বিনীত সুদীর্ঘ বক্তৃতা পাঠ করিলেন এবং নজরের স্বরূপে স্বর্ণ রেকাবীতে তাঁহাদের বহুকষ্টরক্ষিত কুলক্রমাগত এক আসরফির মালা ধরিলেন। প্রাচীন ভৃত্য গণেশ গোলাপ-পাশ এবং আতরদান লইয়া উপস্থিত ছিল।

কৈলাস বাবু বারংবার আক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের নয়নযোড়ের বাড়িতে হুজুর বাহাদুরের পদধূলি পড়িলে তাঁহাদের যথাসাধ্য যথোচিত আতিথ্যের আয়োজন করিতে পারিতেন—কলিকাতায় তিনি প্রবাসী

—এখানে তিনি জলহীন মীনের ন্যায় সর্ব্ব বিষয়েই অক্ষম—ইত্যাদি।

আমার বন্ধু দীর্ঘ হ্যাট সমেত অত্যন্ত গম্ভীর-ভাবে মাথা নাড়িতে লাগিলেন! ইংরাজ-কায়দা-অনুসারে এরূপ স্থলে মাথায় টুপি না থাকিবার কথা কিন্তু আপনার বন্ধু ধরা পড়িবার ভয়ে যথাসম্ভব আচ্ছন্ন থাকিবার চেষ্টায় টুপি খোলেন নাই।

কৈলাস বাবু এবং তাঁহার গর্ব্বান্ধ প্রাচীন ভৃত্যটি ছাড়া আর সকলেই মুহূর্ত্তের মধ্যেই বাঙ্গালীর এই ছদ্মবেশ ধরিতে পারিত।

দশমিনিট কাল ঘাড় নাড়িয়া আমার বন্ধু গাত্রোত্থান করিলেন এবং পূর্ব্বশিক্ষামত চাপরাসিগণ সোণার রেকাবীসুদ্ধ আসরফির মালা, চৌকি হইতে সেই শাল, এবং ভৃত্যের হাত হইতে গোলাপপাশ এবং আতরদান সংগ্রহ করিয়া ছদ্মবেশীর গাড়িতে তুলিয়া দিল—কৈলাস বাবু বুঝিলেন ইহাই ছোটলাটের প্রথা। আমি গোপনে এক পাশের ঘরে লুকাইয়া দেখিতেছিলাম এবং রুদ্ধ হাস্যাবেগে আমার পঞ্জর বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইতেছিল।

অবশেষে কিছুতে আর থাকিতে না পারিয়া ছুটিয়া কিঞ্চিৎদূরবর্ত্তী এক ঘরের মধ্যে গিয়া প্রকাশ করিলাম—এবং সেখানে হাসির উচ্ছ্বাস উন্মুক্ত করিয়া দিয়া হঠাৎ দেখি, একটি বালিকা তক্তপোষের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

আমাকে হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করিয়া হাসিতে দেখিয়া সে তৎক্ষণাৎ তক্তা ছাড়িয়া দাঁড়াইল—এবং অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে রোষের গর্জ্জন আনিয়া আমার মুখের উপর সজল বিপুল কৃষ্ণচক্ষের সুতীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ বর্ষণ করিয়া কহিল—"আমার দাদামশায় তোমাদের কি করেছেন—কেন তোমরা তাঁকে ঠকাতে এসেচ—কেন এসেচ তোমরা"—অবশেষে আর কোন কথা জুটিল না—বাক্‌রুদ্ধ হইয়া মুখে কাপড় দিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কোথায় গেল আমার হাস্যাবেগ! আমি যে কাজটি করিয়াছি তাহার মধ্যে কৌতুক ছাড়া আর যে কিছু ছিল এতক্ষণ তাহা আমার মাথায় আসে নাই—হঠাৎ দেখিলাম অত্যন্ত কোমল স্থানে অত্যন্ত কঠিন আঘাত করিয়াছি; হঠাৎ আমার কৃত কার্য্যের বীভৎস নিষ্ঠুরতা আমার সম্মুখে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল—লজ্জায় এবং অনুতাপে পদাহত কুক্কুরের ন্যায় ঘর হইতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলাম। বৃদ্ধ আমার কাছে কি দোষ করিয়াছিল? তাহার নিরীহ অহঙ্কার ত কখন কোন প্রাণীকে আঘাত করে নাই। আমার অহঙ্কার কেন এমন হিংস্রমূর্ত্তি ধারণ করিল?

তাহা ছাড়া আর একটি বিষয়ে আজ হঠাৎ দৃষ্টি খুলিয়া গেল। এতদিন আমি কুসুমমণিকে, কোন অবিবাহিত পাত্রের প্রসন্ন দৃষ্টিপাতের প্রতীক্ষায় সংরক্ষিত পণ্য-পদার্থের মত দেখিতাম—ভাবিতাম, আমি পছন্দ করি নাই বলিয়া ও পড়িয়া আছে, দৈবাৎ যাহার পছন্দ হইবে ও তাহারই হইবে। আজ দেখিলাম এই গৃহকোণে, ঐ বালিকামূর্ত্তির অন্তরালে একটি মানব হৃদয় আছে। তাহার নিজের সুখ দুঃখ অনুরাগ বিরাগ লইয়া একটি অন্তঃকরণ একদিকে অজ্ঞেয় অতীত আর একদিকে অভাবনীয় ভবিষ্যৎ নামক দুই অনন্ত রহস্য-রাজ্যের দিকে পূর্ব্বে পশ্চিমে প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে। যে মানুষের মধ্যে হৃদয় আছে সে কি কেবল পণের টাকা এবং নাক চোখের পরিমাণ মাপিয়া পছন্দ করিয়া লইবার যোগ্য?

সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। পরদিন

প্রত্যূষে বৃদ্ধের সমস্ত অপহৃত বহুমূল্য দ্রব্যগুলি লইয়া চোরের ন্যায় চুপি চুপি ঠাকুর্দ্দার বাসায় গিয়া প্রবেশ করিলাম—ইচ্ছা ছিল কাহাকেও কিছু না বলিয়া গোপনে চাকরের হাতে সমস্ত দিয়া আসিব।

চাকরকে দেখিতে না পাইয়া ইতস্ততঃ করিতেছি এমন সময় অদূরবর্ত্তী ঘরে বৃদ্ধের সহিত বালিকার কথোপকথন শুনিতে পাইলাম। বালিকা সুমিষ্ট সস্নেহ স্বরে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, দাদা মহাশয়, কাল লাট সাহেব তোমাকে কি বল্লেন? ঠাকুর্দ্দা অত্যন্ত হর্ষিত চিত্তে লাট সাহেবের মুখে প্রাচীন নয়নযোড় বংশের বিস্তর কাল্পনিক গুণানুবাদ বসাইতেছিলেন। বালিকা তাহাই শুনিয়া মহোৎসাহ প্রকাশ করিতেছিল।

বৃদ্ধ অভিভাবকের প্রতি মাতৃহৃদয়া এই ক্ষুদ্র বালিকার সকরুণ ছলনায় আমার দুই চক্ষে জল ছল্ ছল্ করিয়া আসিল। অনেকক্ষণ চুপ্ করিয়া বসিয়া রহিলাম—অবশেষে ঠাকুর্দ্দা তাঁহার কাহিনী সমাপন করিয়া চলিয়া আসিলে আমার প্রতারণার বমালগুলি লইয়া বালিকার নিকট উপস্থিত হইলাম এবং নিঃশব্দে তাহার সম্মুখে সমস্ত রাখিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

বর্ত্তমান কালের প্রথানুসারে অন্যদিন বৃদ্ধকে দেখিয়া কোন প্রকার অভিবাদন করিতাম না—আজ তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। বৃদ্ধ নিশ্চয় মনে ভাবিলেন, গতকল্য ছোট লাট তাঁহার বাড়িতে আসাতেই সহসা তাঁহার প্রতি আমার ভক্তির উদ্রেক হইয়াছে। তিনি পুলকিত হইয়া শতমুখে ছোটলাটের গল্প বানাইয়া বলিতে লাগিলেন—আমিও কোন প্রতিবাদ না করিয়া তাহাতে যোগ দিলাম। বাহিরের অন্য লোক যাহারা শুনিল তাহারা এ কথাটাকে আদ্যোপান্ত গল্প বলিয়া স্থির করিল, এবং সকৌতুকে বৃদ্ধের সহিত সকল কথায় সায় দিয়া গেল।

সকলে উঠিয়া গেলে আমি অত্যন্ত সলজ্জ মুখে দীনভাবে বৃদ্ধের নিকট একটি প্রস্তাব করিলাম। বলিলাম, যদিও নয়নযোড়ের বাবুদের সহিত আমাদের বংশমর্য্যাদার তুলনাই হইতে পারে না তথাপি—

প্রস্তাবটা শেষ হইবামাত্র বৃদ্ধ আমাকে বক্ষে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন, এবং আনন্দবেগে বলিয়া উঠিলেন—আমি গরীব—আমার যে এমন সৌভাগ্য হবে তা আমি জানতুম না, ভাই—আমার কুসুম অনেক পুণ্য করেছে তাই তুমি আজ ধরা দিলে! বলিতে বলিতে বৃদ্ধের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বৃদ্ধ, আজ এই প্রথম, তাঁহার মহিমান্বিত পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া স্বীকার করিলেন যে, তিনি গরীব, স্বীকার করিলেন যে, আমাকে লাভ করিয়া নয়নযোড় বংশের গৌরব হানি হয় নাই। আমি যখন বৃদ্ধকে অপদস্থ করিবার জন্য চক্রান্ত করিতেছিলাম তখন বৃদ্ধ আমাকে পরম সৎপাত্র জানিয়া একান্তমনে কামনা করিতেছিলেন।

মুক্তির উপায়।

১

ফকিরচাঁদ বাল্যকাল হইতেই গম্ভীরপ্রকৃতি। বৃদ্ধসমাজে তাহাকে কখনই বেমানান্ দেখাইত না। ঠাণ্ডা জল, হিম, এবং হাস্য পরিহাস

তাহার একেবারে সহ্য হইত না। একে গম্ভীর তাহাতে বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময়েই মুখমণ্ডলের চারিদিকে কালো পশমের গলাবন্ধ জড়াইয়া থাকাতে তাহাকে ভয়ঙ্কর উঁচুদরের লোক বলিয়া বোধ হইত। ইহার উপরে, অতি অল্প বয়সেই তাহার ওষ্ঠাধর এবং গণ্ডস্থল প্রচুর গোঁফ দাড়িতে আচ্ছন্ন হওয়াতে সমস্ত মুখের মধ্যে হাস্যবিকাশের স্থান আর তিল মাত্র অবশিষ্ট রহিল না।

স্ত্রী হৈমবতীর বয়স অল্প এবং তাহার মন পার্থিব বিষয়ে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট। সে বঙ্কিম বাবুর নভেল পড়িতে চায় এবং স্বামীকে ঠিক দেবতার ভাবে পূজা করিয়া তাহার তৃপ্তি হয় না। সে একটুখানি হাসিখুসি ভালবাসে, এবং বিকচোন্মুখ পুষ্প যেমন বায়ুর আন্দোলন এবং প্রভাতের আলোকের জন্য ব্যাকুল হয়, সেও তেমনি এই নব যৌবনের সময় স্বামীর নিকট হইতে আদর এবং হাস্যামোদ যথাপরিমাণে প্রত্যাশা করিয়া থাকে। কিন্তু স্বামী তাহাকে অবসর পাইলেই ভাগবত পড়ায়, সন্ধ্যাবেলায় ভগবদ্গীতা শুনায়, এবং তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির উদ্দেশে মাঝে মাঝে শারীরিক শাসন করিতেও ক্রটি করে না। যে দিন হৈমবতীর বালিশের নীচে হইতে "কৃষ্ণকান্তের উইল, বাহির হয় সে দিন উক্ত লঘুপ্রকৃতি যুবতীকে সমস্ত রাত্রি অশ্রুপাত করাইয়া তবে ফকির ক্ষান্ত হন। একে নভেল পাঠ তাহাতে আবার পতিদেবকে প্রতারণা! যাহা হউক্ অবিশ্রাম আদেশ অনুদেশ উপদেশ ধর্ম্মনীতি এবং দণ্ডনীতির দ্বারা অবশেষে হৈমবতীর মুখের হাসি, মনের সুখ এবং যৌবনের আবেগ একেবারে নিষ্কর্ষণ করিয়া ফেলিতে স্বামীদেবতা সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

কিন্তু অনাসক্ত লোকের পক্ষে সংসারে বিস্তর বিঘ্ন। পরে পরে ফকিরের এক ছেলে এক মেয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারবন্ধন বাড়িয়া গেল। পিতার তাড়নায় এতবড় গম্ভীরপ্রকৃতি ফকিরকেও আপিসে আপিসে কর্ম্মের উমেদারীতে বাহির হইতে হইল, কিন্তু কর্ম্ম জুটিবার কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না।

তখন তিনি মনে করিলেন বুদ্ধদেবের মত আমি সংসার ত্যাগ করিব। এই ভাবিয়া একদিন গভীর রাত্রে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেলেন।

২

মধ্যে আর একটি ইতিহাস বলা আবশ্যক।

নবগ্রামবাসী ষষ্ঠিচরণের এক ছেলে। নাম মাখনলাল। বিবাহের অনতিবিলম্বে সন্তানাদি না হওয়াতে পিতার অনুরোধে এবং নূতনত্বের প্রলোভনে আর একটি বিবাহ করেন। এই বিবাহের পর হইতে যথাক্রমে তাঁহার উভয় স্ত্রীর গর্ভে সাতটি কন্যা এবং একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল।

মাখন লোকটা নিতান্ত সৌখীন এবং চপল প্রকৃতি, কোন প্রকার গুরুতর কর্ত্তব্যের দ্বারা আবদ্ধ হইতে নিতান্ত নারাজ। একে ত ছেলেপুলের ভার, তাহার পরে যখন দুই কর্ণধার দুই কর্ণে ঝিকা মারিতে লাগিল তখন নিতান্ত অসহ্য হইয়া সেও একদিন গভীর রাত্রে ডুব মারিল।

বহুকাল তাহার আর সাক্ষাৎ নাই। কখন কখন শুনা যায়, এক বিবাহে কিরূপ সুখ তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য সে কাশীতে গিয়া গোপনে আর একটি বিবাহ করিয়াছে; শুনা যায়, হতভাগ্য কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিয়াছে। কেবল দেশের কাছাকাছি আসিবার জন্য মাঝে মাঝে তাহার মন উতলা হয়, ধরা পড়িবার ভয়ে আসিতে পারে না।

৩

কিছু দিন ঘুরিতে ঘুরিতে উদাসীন ফকির-নবগ্রামে আসিয়া উপস্থিত। পথপার্শ্ব-ী এক বটবৃক্ষতলে বসিয়া নিশ্বাস ছাড়িয়া লেন "আহা, বৈরাগ্যমেবাভয়ং। দারা ধন জন কেউ কারো নয়। কা তে কান্তা স্ত পুত্রঃ।" বলিয়া এক গান জুড়িয়া দিলেন।

শোন্‌রে শোন্‌, অবোধ মন!
শোন্‌ সাধুর উক্তি কিসে মুক্তি
সেই সুযুক্তি কর গ্রহণ!
ভবের শুক্তি ভেঙ্গে মুক্তি-মুক্তা কর অন্বেষণ।
ওরে ও ভোলা মন, ভোলা মন রে!

সহসা গান বন্ধ হইয়া গেল। "ও কে ও! বা দেখ্‌চি! সন্ধান পেয়েছেন বুঝি! তবেই সর্ব্বনাশ। আবার ত সংসারের অন্ধকূপে টেনে নিয়ে যাবেন! পালাতে হল।"

৪

ফকির তাড়াতাড়ি নিকটবর্ত্তী এক গৃহে প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধ গৃহস্বামী চুপ্‌ চাপ বসিয়া তামাক টানিতেছিল। ফকিরকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কেহে তুমি?"

ফকির। বাবা, আমি সন্ন্যাসী।

বৃদ্ধ। সন্ন্যাসী! দেখি দেখি বাবা, আলোতে এস দেখি! এই বলিয়া আলোতে টানিয়া লইয়া ফকিরের মুখের পরে ঝুঁকিয়া বুড়া মানুষ বহু কষ্টে যেমন করিয়া পুঁথি পড়ে তেমনি করিয়া ফকিরের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া বিড়্‌ বিড়্‌ করিয়া বকিতে লাগিল।

"এই ত আমার সেই মাখনলাল দেখ্‌চি! সেই নাক, সেই চোখ, কেবল কপালটা বদ্‌লেচে, আর সেই চাঁদমুখ গোঁফে দাড়িতে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেচে।" বলিয়া বৃদ্ধ সস্নেহে ফকিরের শ্মশ্রুল মুখে দুই একবার হাত বুলাইয়া লইল, এবং প্রকাশ্যে কহিল "বাবা, মাখন!" বলা বাহুল্য বৃদ্ধের নাম ষষ্ঠিচরণ।

ফকির। (সবিস্ময়ে) মাখন! আমার নাম ত মাখন নয়! পূর্ব্বে আমার নাম যাই থাক্‌, এখন আমার নাম চিদানন্দ স্বামী। ইচ্ছা হয় ত পরমানন্দও বল্‌তে পার।

ষষ্ঠি। বাবা, তা এখন আপনাকে চিঁড়েই বল আর পরমান্নই বল, তুই যে আমার মাখন, বাবা সে ত আমি ভুল্‌তে পারব না!—বাবা, তুই কোন্‌ দুঃখে সংসার ছেড়ে গেলি! তোর কিসের অভাব! দুই স্ত্রী; বড়টিকে না ভাল বাসিস্‌ ছোটটি আছে। ছেলে পিলের দুঃখও নেই। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে সাতটি কন্যে, একটি ছেলে। আর আমি বুড়ো বাপ ক'দিনই বা বাঁচব, তোর সংসার তোরই থাক্‌বে!

ফকির একেবারে আঁৎকিয়া উঠিয়া কহিল "কি সর্ব্বনাশ! শুন্‌লেও যে ভয় হয়!"

এতক্ষণে প্রকৃত ব্যাপারটা বোধগম্য হইল। ভাবিল, মন্দ কি, দিন দুই বৃদ্ধের পুত্রভাবেই এখানে লুকাইয়া থাকা যাক্‌, তাহার পরে সন্ধানে অকৃতকার্য্য হইয়া বাপ চলিয়া গেলেই এখান হইতে পলায়ন করিব।

ফকিরের নিরুত্তর দেখিয়া বৃদ্ধের মনে আর সংশয় রহিল না। কেষ্টা চাকরকে ডাকিয়া বলিল "ওরে ও কেষ্টা, তুই সকলকে খবর দিয়ে আয়গে, আমার মাখন ফিরে এসেছে।"

৫

দেখিতে দেখিতে লোকে লোকারণ্য। পাড়ার লোকে অধিকাংশই বলিল সেই বটে, কেহ বা সন্দেহ প্রকাশ করিল। কিন্তু বিশ্বাস করিবার জন্যই লোকে এত ব্যগ্র যে, সন্দিগ্ধ লোকদের উপরে সকলে হাড়ে চটিয়া গেল। যেন তাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক কেবল রসভঙ্গ করিতে আসিয়াছে; যেন তাহারা পাড়ায় চৌদ্দ অক্ষ-

তাহার একেবারে সহ্য হইত না। একে গম্ভীর তাহাতে বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময়েই মুখমণ্ডলের চারিদিকে কালো পশমের গলাবন্ধ জড়াইয়া থাকাতে তাহাকে ভয়ঙ্কর উঁচুদরের লোক বলিয়া বোধ হইত। ইহার উপরে, অতি অল্প বয়সেই তাহার ওষ্ঠাধর এবং গণ্ডস্থল প্রচুর গোঁফ দাড়িতে আচ্ছন্ন হওয়াতে সমস্ত মুখের মধ্যে হাস্যবিকাশের স্থান আর তিল মাত্র অবশিষ্ট রহিল না।

স্ত্রী হৈমবতীর বয়স অল্প এবং তাহার মন পার্থিব বিষয়ে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট। সে বঙ্কিম বাবুর নভেল পড়িতে চায় এবং স্বামীকে ঠিক দেবতার ভাবে পূজা করিয়া তাহার তৃপ্তি হয় না। সে একটুখানি হাসিখুসি ভালবাসে, এবং বিকচোন্মুখ পুষ্প যেমন বায়ুর আন্দোলন এবং প্রভাতের আলোকের জন্য ব্যাকুল হয়, সেও তেমনি এই নব যৌবনের সময় স্বামীর নিকট হইতে আদর এবং হাস্যামোদ যথাপরিমাণে প্রত্যাশা করিয়া থাকে। কিন্তু স্বামী তাহাকে অবসর পাইলেই ভাগবত পড়ায়, সন্ধ্যাবেলায় ভগবদ্গীতা শুনায়, এবং তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির উদ্দেশে মাঝে মাঝে শারীরিক শাসন করিতেও ত্রুটি করে না। যে দিন হৈমবতীর বালিশের নীচে হইতে "কৃষ্ণকান্তের উইল, বাহির হয় সে দিন উক্ত লঘুপ্রকৃতি যুবতীকে সমস্ত রাত্রি অশ্রুপাত করাইয়া তবে ফকির ক্ষান্ত হন। একে নভেল পাঠ তাহাতে আবার পতিদেবকে প্রতারণা! যাহা হউক অবিশ্রাম আদেশ অনুদেশ উপদেশ ধর্ম্মনীতি এবং দণ্ডনীতির দ্বারা অবশেষে হৈমবতীর মুখের হাসি, মনের সুখ এবং যৌবনের আবেগ একেবারে নিষ্কর্ষণ করিয়া ফেলিতে স্বামীদেবতা সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

কিন্তু, অনাসক্ত লোকের পক্ষে সংসারে বিস্তর বিঘ্ন। পরে পরে ফকিরের এক ছেলে এক মেয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারবন্ধন বাড়িয়া গেল। পিতার তাড়নায় এতবড় গম্ভীরপ্রকৃতি ফকিরকেও আপিসে আপিসে কর্ম্মের উমেদারীতে বাহির হইতে হইল, কিন্তু কর্ম্ম জুটিবার কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না।

তখন তিনি মনে করিলেন বুদ্ধদেবের মত আমি সংসার ত্যাগ করিব। এই ভাবিয়া একদিন গভীর রাত্রে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেলেন।

২

মধ্যে আর একটি ইতিহাস বলা আবশ্যক।

নবগ্রামবাসী ষষ্ঠিচরণের এক ছেলে। নাম মাখনলাল। বিবাহের অনতিবিলম্বে সন্তানাদি না হওয়াতে পিতার অনুরোধে এবং নূতনত্বের প্রলোভনে আর একটি বিবাহ করেন। এই বিবাহের পর হইতে যথাক্রমে তাঁহার উভয় স্ত্রীর গর্ভে সাতটি কন্যা এবং একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল।

মাখন লোকটা নিতান্ত সৌখীন এবং চপল প্রকৃতি, কোন প্রকার গুরুতর কর্ত্তব্যের দ্বারা আবদ্ধ হইতে নিতান্ত নারাজ। একে ত ছেলেপুলের ভার, তাহার পরে যখন দুই কর্ণধার দুই কর্ণে ঝিঁকা মারিতে লাগিল তখন নিতান্ত অসহ্য হইয়া সেও একদিন গভীর রাত্রে ডুব মারিল।

বহুকাল তাহার আর সাক্ষাৎ নাই। কখন কখন শুনা যায়, এক বিবাহে কিরূপ সুখ তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য সে কাশীতে গিয়া গোপনে আর একটি বিবাহ করিয়াছে; শুনা যায়, হতভাগ্য কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিয়াছে। কেবল দেশের কাছাকাছি আসিবার জন্য মাঝে মাঝে তাহার মন উতলা হয়, ধরা পড়িবার ভয়ে আসিতে পারে না।

৩

কিছু দিন ঘুরিতে ঘুরিতে উদাসীন ফকির-র নবগ্রামে আসিয়া উপস্থিত। পথপার্শ্বে এক বটবৃক্ষতলে বসিয়া নিশ্বাস ছাড়িয়া বলেন "আহা, বৈরাগ্যমেবাভয়ং। দারা ধন জন কেউ কারো নয়। কা তে কান্তা স্তে পুত্রঃ।" বলিয়া এক গান জুড়িয়া দিলেন।

শোন্‌রে শোন্‌, অবোধ মন!
শোন্‌ সাধুর উক্তি কিসে মুক্তি
সেই সুযুক্তি কর্‌ গ্রহণ!
ভবের শুক্তি ভেঙ্গে মুক্তি-মুক্তা কর অন্বেষণ।
ওরে ও ভোলা মন, ভোলা মন রে!

সহসা গান বন্ধ হইয়া গেল। "ও কে ও! বা দেখ্‌চি! সন্ধান পেয়েছেন বুঝি! তবেই সর্ব্বনাশ। আবার ত সংসারের অন্ধকূপে টেনে নিয়ে যাবেন! পালাতে হল।"

৪

ফকির তাড়াতাড়ি নিকটবর্ত্তী এক গৃহে প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধ গৃহস্বামী চুপ্‌ চাপ বসিয়া তামাক টানিতেছিল। ফকিরকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কেহে তুমি?"

ফকির। বাবা, আমি সন্ন্যাসী।

বৃদ্ধ। সন্ন্যাসী! দেখি দেখি বাবা, আলোতে এস দেখি! এই বলিয়া আলোতে টানিয়া লইয়া ফকিরের মুখের পরে ঝুঁকিয়া বুড়া মানুষ বহু কষ্টে যেমন করিয়া পুঁথি পড়ে তেমনি করিয়া ফকিরের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া বিড়্‌ বিড়্‌ করিয়া বকিতে লাগিল।

"এই ত আমার সেই মাখনলাল দেখ্‌চি! সেই নাক, সেই চোখ, কেবল কপালটা বদ্‌লেচে, আর সেই চাঁদমুখ গোঁফে দাড়িতে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেচে।" বলিয়া বৃদ্ধ স্নেহে ফকিরের শশ্রুস মুখে দুই একবার হাত বুলাইয়া লইল, এবং প্রকাশ্যে কহিল "বাবা, মাখন!"

বলা বাহুল্য বৃদ্ধের নাম ষষ্ঠিচরণ।

ফকির। (সবিস্ময়ে) মাখন! আমার নাম ত মাখন নয়! পূর্ব্বে আমার নাম যাই থাক্‌, এখন আমার নাম চিদানন্দ স্বামী। ইচ্ছা হয় ত পরমানন্দও বল্‌তে পার।

ষষ্ঠি। বাবা, তা এখন আপনাকে চিঁড়েই বল আর পরমান্নই বল, তুই যে আমার মাখন, বাবা সে ত আমি ভুল্‌তে পারব না!—বাবা, তুই কোন্‌ দুঃখে সংসার ছেড়ে গেলি! তোর কিসের অভাব! দুই স্ত্রী; বড়টিকে না ভাল বাসিস্‌ ছোটটি আছে। ছেলে পিলের দুঃখও নেই। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে সাতটি কন্যে, একটি ছেলে। আর আমি বুড়ো বাপ ক'দিনই বা বাঁচব, তোর সংসার তোরই থাক্‌বে!

ফকির একেবারে আঁৎকিয়া উঠিয়া কহিল "কি সর্ব্বনাশ! শুনলেও যে ভয় হয়!"

এতক্ষণে প্রকৃত ব্যাপারটা বোধগম্য হইল। ভাবিল, মন্দ কি, দিন দুই বৃদ্ধের পুত্রভাবেই এখানে লুকাইয়া থাকা যাক্‌, তাহার পরে সন্ধানে অকৃতকার্য্য হইয়া বাপ চলিয়া গেলেই এখান হইতে পলায়ন করিব।

ফকিরের নিরুত্তর দেখিয়া বৃদ্ধের মনে আর সংশয় রহিল না। কেষ্টা চাকরকে ডাকিয়া বলিল "ওরে ও কেষ্টা, তুই সকলকে খবর দিয়ে আয়গে, আমার মাখন ফিরে এসেছে।"

৫

দেখিতে দেখিতে লোকে লোকারণ্য। পাড়ার লোকে অধিকাংশই বলিল সেই বটে, কেহ বা সন্দেহ প্রকাশ করিল! কিন্তু বিশ্বাস করিবার জন্যই লোকে এত ব্যগ্র যে, সন্দিগ্ধ লোকদের উপরে সকলে হাড়ে চটিয়া গেল। যেন তাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক কেবল রসভঙ্গ করিতে আসিয়াছে; যেন তাহারা পাড়ায় চৌদ্দ অক্ষ-

রের পয়ারকে সতের অক্ষর করিয়া বসিয়া আছে, কোন মতে তাহাদিগকে সংক্ষেপ করিতে পারিলেই তবে পাড়াশুদ্ধ লোক আরাম পায়; তাহারা ভূতও বিশ্বাস করে না, ওঝাও বিশ্বাস করে না, আশ্চর্য্য গল্প শুনিয়া যখন সকলের তাক্ লাগিয়া গিয়াছে তখন তাহারা প্রশ্ন উত্থাপন করে। এক প্রকার নাস্তিক বলিলেই হয়। কিন্তু ভূত অবিশ্বাস করিলে ততটা ক্ষতি নাই, তাই বলিয়া বুড়া বাপের হারা ছেলেকে অবিশ্বাস করা যে নিতান্ত হৃদয়-হীনতার কাজ। যাহা হউক, সকলের নিকট হইতে তাড়না পাইয়া সংশয়ীর দল থামিয়া গেল!

ফকিরের অতি ভীষণ অটল গাম্ভীর্য্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া পাড়ার লোকেরা তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া বলিতে লাগিল— "আরে আরে, আমাদের সেই মাখন আজ ঋষি হয়েছেন, তপিস্বি হয়েচেন! চিরটা কাল ইয়ার্কি দিয়ে কাটালে আজ হঠাৎ মহামুনি জামদগ্নি হয়ে বসেচেন।"

কথাটা উন্নতচেতা ফকিরের অত্যন্ত খারাপ লাগিল, কিন্তু নিরুপায়ে সহ্য করিতে হইল। একজন গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল "ওরে মাখন, তুই কুচ্‌কুচে কালো ছিলি রংটা এমন ফর্সা কর্‌লি কি করে'।"

ফকির উত্তর দিল "যোগ অভ্যাস করে'।"

সকলেই বলিল "যোগের কি আশ্চর্য্য প্রভাব!"

একজন উত্তর করিল "আশ্চর্য্য আর কি! শাস্ত্রে আছে, ভীম যখন হনুমানের লেজ ধরে তুল্‌তে গেলেন কিছুতেই তুল্‌তে পারলেন না। সে কি করে' হ'ল? সে ত যোগবলে!"

একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইল।

হেনকালে ষষ্ঠিচরণ আসিয়া ফকিরকে বলিল "বাবা একবার বাড়ির ভিতরে যেতে হচ্চে।"

এ সম্ভাবনাটা ফকিরের মাথায় উদয় হয় নাই—হঠাৎ বজ্রাঘাতের মত মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া, পাড়ার লোকের বিস্তর অন্যায় পরিহাস পরিপাক করিয়া অবশেষে বলিল "বাবা, আমি সন্ন্যাসী হয়েচি আমি অন্তঃপুরে ঢুকতে পারব না।"

ষষ্ঠিচরণ পাড়ার লোকদের সম্বোধন করিয়া বলিল "তা হলে আপনাদের একবার গা তুল্‌তে হচ্চে। বৌমাদের এইখানেই নিয়ে আসি। তাঁরা বড় ব্যাকুল হয়ে আছেন।"

সকলে উঠিয়া গেল। ফকির ভাবিল এইবেলা এখান হইতে এক দৌড় মারি। কিন্তু রাস্তায় বাহির হইলেই পাড়ার লোক কুকুরের মত তাহার পশ্চাতে ছুটিবে ইহাই কল্পনা করিয়া তাহাকে নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া থাকিতে হইল।

যেমনি মাখনলালের দুইস্ত্রী প্রবেশ করিল ফকির অমনি নতশিরে তাহাদিগকে প্রণাম করিয়া কহিল "মা আমি তোমাদের সন্তান!"

অমনি ফকিরের নাকের সম্মুখে একটা বালা-পরা হাত খড়্গের মত খেলিয়া গেল এবং একটি কাংস্যবিনিন্দিত কণ্ঠে বাজিয়া উঠিল "ওরে ও পোড়াকপালে মিন্সে, তুই মা বল্লি কা'কে!"

অমনি আর একটি কণ্ঠ আরো দুই সুর উচ্চে পাড়া কাঁপাইয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিল "চোখের মাথা খেয়ে বসেছিস্, তোর মরণ হয় না!"

নিজের স্ত্রীর নিকট হইতে এরূপ চলিত বাঙ্গালা শোনা অভ্যাস ছিল না। সুতরাং একান্ত কাতর হইয়া ফকির যোড়হস্তে কহিল "আপনারা ভুল বুঝচেন। আমি এই আলোতে দাঁড়াচ্চি আমাকে একটু ঠাউরে দেখুন!"

প্রথমা ও দ্বিতীয়া পরে পরে কহিল "ঢের

দেখেছি! দেখে দেখে চোখ ক্ষয়ে গেছে। তুমি কচি খোকা নও, আজ নতুন জন্মাও নি! তোমার দুধের দাঁত অনেক দিন ভেঙ্গেছে। তোমার কি বয়সের গাছপাথর আছে! তোমায় যম ভুলেছে বলে কি আমরা ভুলব!"

এরূপ একতরফা দাম্পত্য আলাপ কতক্ষণ চলিত বলা যায় না—কারণ ফকির একেবারে বাক্‌শক্তি রহিত হইয়া নতশিরে দাঁড়াইয়া ছিল! এমন সময় অত্যন্ত কোলাহল শুনিয়া এবং পথে লোক জমিতে দেখিয়া ষষ্ঠিচরণ প্রবেশ করিল।

বলিল "এতদিন আমার ঘর নিস্তব্ধ ছিল, একেবারে টুঁ শব্দ ছিল না! আজ মনে হচ্ছে বটে আবার মাখন ফিরে এসেচে!"

ফকির করযোড়ে কহিল "মশায়, আপনার পুত্রবধূদের হাত থেকে আমাকে রক্ষে করুন!"

ষষ্ঠি। বাবা, অনেক দিন পরে এসেছ তাই প্রথমটা একটু অসহ্য বোধ হচ্চে। তা, মা, তোমরা এখন যাও! বাবা মাখন ত এখন এখানেই রইলেন, ওঁকে আর কিছুতেই যেতে দিচ্চি নে।

ললনাদ্বয় বিদায় হইলে ফকির ষষ্ঠিচরণকে বলিল, "মশায় আপনার পুত্র কেন যে সংসার ত্যাগ করে গেছেন তা আমি সম্পূর্ণ অনুভব করতে পারচি। মশায় আমার প্রণাম জানবেন আমি চল্লেম।"

বৃদ্ধ এমনি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন উত্থাপন করিল যে পাড়ার লোক মনে করিল মাখন তাহার বাপকে মারিয়াছে। তাহারা হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিল। সকলে আসিয়া ফকিরকে জানাইয়া দিল এমন ভণ্ডতপস্বিগিরি এখানে খাটিবে না! ভালমানুষের ছেলের মত কাল কাটাইতে হইবে। একজন বলিল "ইনি ত পরমহংস নন্‌ পরম বক।"

গাম্ভীর্য্য গোঁফদাড়ি এবং গলাবন্ধের জোরে ফকিরকে এমন সকল কুৎসিত কথা কখন শুনিতে হয় নাই। যাহা হউক্ লোকটা পাছে আবার পালায় পাড়ার লোকেরা অত্যন্ত সতর্ক রহিল। স্বয়ং জমিদার ষষ্ঠিচরণের পক্ষ অবলম্বন করিল।

৬

ফকির দেখিল এম্‌নি কড়া পাহারা যে, মৃত্যু না হইলে ইহারা ঘরের বাহির করিবে না। একাকী ঘরে বসিয়া গান গাহিতে লাগিল—

শোন্ সাধুর উক্তি কিসে মুক্তি
সেই সুযুক্তি কর্ গ্রহণ।

বলা বাহুল্য, গানটার আধ্যাত্মিক অর্থ অনেকটা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে।

এমন করিয়াও কোনমতে দিন কাটিত। কিন্তু মাখনের আগমন সংবাদ পাইয়া দুই স্ত্রীর সম্পর্কের এক ঝাঁক শ্যালা ও শ্যালী আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহারা আসিয়াই প্রথমতঃ ফকিরের গোঁফ দাড়ি ধরিয়া টানিতে লাগিল—তাহারা বলিল এ ত সত্যকার গোঁফ দাড়ি নয়, ছদ্মবেশ করিবার জন্য আঠা দিয়া জুড়িয়া আসিয়াছে।

নাসিকার নিম্নবর্ত্তী গুম্ফ ধরিয়া টানাটানি করিলে ফকিরের ন্যায় অত্যন্ত মহৎ লোকেরও মাহাত্ম্য রক্ষা করা দুষ্কর হইয়া উঠে। ইহা ছাড়া কাণের উপর উপদ্রবও ছিল; প্রথমতঃ মলিয়া, দ্বিতীয়তঃ এমন সকল ভাষা প্রয়োগ করিয়া যাহাতে কাণ না মলিলেও, কাণ লাল হইয়া উঠে।

ইহার পর ফকিরকে তাহারা এমন সকল গান ফরমায়েস্ করিতে লাগিল, আধুনিক বড়

বড় নূতন পণ্ডিতেরা যাহার কোনরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে হার মানেন। আবার নিদ্রাকালে তাহারা ফকিরের স্বল্পাবশিষ্ট গণ্ডস্থলে চুনকালি মাখাইয়া দিল, আহারকালে কেসুরের পরিবর্ত্তে কচু, ডাবের জলের পরিবর্ত্তে হুঁকার জল, দুধের পরিবর্ত্তে পিঠালি গোলার আয়োজন করিল, পিঁড়ার নীচে সুপারি রাখিয়া তাহাকে আছাড় খাওয়াইল, লেজ বানাইল এবং সহস্র প্রচলিত উপায়ে ফকিরের অভ্রভেদী গাম্ভীর্য্য ভূমিসাৎ করিয়া দিল।

ফকির রাগিয়া ফুলিয়া ফাঁকিয়া ঝাঁকিয়া হাঁকিয়া কিছুতেই উপদ্রবকারীদের মনে ভীতির সঞ্চার করিতে পারিল না। কেবল সর্ব্বসাধারণের নিকট অধিকতর হাস্যাস্পদ হইতে লাগিল। ইহার উপরে আবার অন্তরাল হইতে একটি মিষ্ট কণ্ঠের উচ্চহাস্য মাঝে মাঝে কর্ণগোচর হইত; সেটা যেন পরিচিত বলিয়া ঠেকিত এবং মন দ্বিগুণ অধৈর্য্য হইয়া উঠিত।

পরিচিত কণ্ঠ পাঠকের অপরিচিত নহে। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ষষ্ঠিচরণ কোন এক সম্পর্কে হৈমবতীর মামা। বিবাহের পর শাশুড়ীর দ্বারা নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া পিতৃমাতৃহীনা হৈমবতী মাঝে মাঝে কোন-না-কোন কুটুম্ব বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করিত। অনেক দিন পরে সে মামার বাড়ি আসিয়া নেপথ্য হইতে ঐক পরম কৌতুকাবহ অভিনয় নিরীক্ষণ করিতেছে। তৎকালে হৈমবতীর স্বাভাবিক রঙ্গপ্রিয়তার সঙ্গে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির উদ্রেগ হইয়াছিল কি না চরিত্রতত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা স্থির করিবেন, আমরা বলিতে অক্ষম।

ঠাট্টার সম্পর্কীয় লোকেরা মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিত কিন্তু স্নেহের সম্পর্কীয় লোকদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন। সাত মেয়ে এবং এক ছেলে তাঁহাকে একদণ্ড ছাড়ে না। বাপের স্নেহ অধিকার করিবার জন্য তাহাদের মা তাহাদিগকে অনুক্ষণ নিযুক্ত রাখিয়াছিল। দুই মাতার মধ্যে আবার রেষারেষি ছিল উভয়েরই চেষ্টা যাহাতে নিজের সন্তানই অধিক আদর পায়। উভয়েই নিজ নিজ সন্তানদিগকে সর্ব্বদাই উত্তেজিত করিতে লাগিল—দুই দলে মিলিয়া পিতার গলা জড়াইয়া ধরা, কোলে বসা, মুখ চুম্বন করা প্রভৃতি প্রবল স্নেহব্যক্তি কার্য্যে পরস্পরকে জিতিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

বলা বাহুল্য ফকির লোকটা অত্যন্ত নির্লিপ্ত স্বভাব, নহিলে নিজের সন্তানদের অকাতরে ফেলিয়া আসিতে পারিত না; শিশুরা ভক্তি করিতে জানে না, তাহারা সাধুত্বের নিকট অভিভূত হইতে শিখে নাই, এই জন্য ফকির শিশুজাতির প্রতি তিলমাত্র অনুরক্ত ছিল না, তাহাদিগকে তিনি কীট পতঙ্গের ন্যায় দেহ হইতে দূরে রাখিতে ইচ্ছা করিতেন। সম্প্রতি তিনি অহরহ শিশুপঙ্গপালে আচ্ছন্ন হইয়া বর্জ্জইস্ অক্ষরের ছোট বড় নোটের দ্বারা আদ্যোপান্ত সমাকীর্ণ ঐতিহাসিক প্রবন্ধের ন্যায় শোভমান হইলেন। তাহাদের মধ্যে বয়সের বিস্তর তারতম্য ছিল, এবং তাহারা সকলেই কিছু তাঁহার সহিত বয়ঃপ্রাপ্ত সভ্যজনোচিত ব্যবহার করিত না; শুদ্ধশুচি ফকিরের চক্ষে অনেক সময় অশ্রুর সঞ্চার হইত এবং তাহা আনন্দাশ্রু নহে।

পরের ছেলেরা যখন নানা সুরে তাঁহাকে বাবা বাবা করিয়া ডাকিয়া আদর করিত; তখন তাঁহার সংঘাতিক পাশবশক্তি প্রয়োগ করিবার একান্ত ইচ্ছা হইত কিন্তু ভয়ে পারিতেন না। মুখ চক্ষু বিকৃত করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন।

অবশেষে ফকির মহা চেঁচামেচি করিয়া বলিতে লাগিল, "আমি যাবই, দেখি আমাকে কে আটক করিতে পারেন!"

তখন গ্রামের লোক এক উকীল আনিয়া উপস্থিত করিল। উকীল আসিয়া কহিল জানেন আপনার দুই স্ত্রী।"

ফকির। আজ্ঞে এখানে এসে প্রথম জান্‌লুম।

উকীল! আর আপনার সাত মেয়ে এক ছেলে, তার মধ্যে দুটি মেয়ে বিবাহযোগ্যা।

ফকির। আজ্ঞে, আপনি আমার চেয়ে ঢের বেশী জানেন দেখিতে পাচ্চি।

উকীল। আপনার এই বৃহৎ পরিবারের ভরণপোষণের ভার আপনি যদি না নেন্ তবে আপনার অনাথিনী দুই স্ত্রী আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, পূর্ব্বে হ'তে বলে' রাখলুম।

ফকির সব চেয়ে আদালতকে ভয় করিত। তাহার জানা ছিল উকীলরা জেরা করিবার সময় মহাপুরুষদিগের মানমর্য্যাদা গাম্ভীর্য্যকে খাতির করে না—প্রকাশ্যে অপমান করে এবং খবরের কাগজে তাহার রিপোর্ট বাহির হয়; ফকির অশ্রুসিক্ত লোচনে উকীলকে বিস্তারিত আত্মপরিচয় দিতে চেষ্টা করিল—উকীল তাহার চাতুরীর, তাহার উপস্থিত বুদ্ধির, তাহার মিথ্যা গল্পরচনার অসাধারণ ক্ষমতার ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতে লাগিল। শুনিয়া ফকিরের আপন হস্ত পদ দংশন করিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল।

ষষ্টিচরণ ফকিরকে পুনশ্চ পলায়নোদ্যত দেখিয়া শোকে অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিল। পাড়ার লোকে তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া অজস্র গালি দিতে লাগিল, এবং উকীল তাহাকে এমন শাসাইল যে তাহার মুখে আর কথা রহিল না।

ইহার উপর যখন আটজন বালক বালিকা গাঢ় স্নেহে তাহাকে চারিদিকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া তাহার শ্বাসরোধ করিবার উপক্রম করিত তখন অন্তরালস্থিত হৈমবতী হাসিবে কি কাঁদিবে ভাবিয়া পাইল না।

ফকির অন্য উপায় না দেখিয়া ইতিমধ্যে নিজের পিতাকে একখানা চিঠি লিখিয়া সমস্ত অবস্থা নিবেদন করিয়াছিল। সেই পত্র পাইয়া ফকিরের পিতা হরিচরণ বাবু আসিয়া উপস্থিত। কিন্তু, পাড়ার লোক, জমিদার এবং উকীল কিছুতেই দখল ছাড়ে না!

এ লোকটি যে ফকির নহে মাখন, তাহারা তাহার সহস্র অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগ করিল—এমন কি, যে ধাত্রী মাখনকে মানুষ করিয়াছিল সেই বুড়ীকে আনিয়া হাজির করিল। সে কম্পিত হস্তে ফকিরের চিবুক তুলিয়া ধরিয়া মুখ নিরীক্ষণ করিয়া তাহার দাড়ির উপরে দরবিগলিত ধারায় অশ্রুপাত করিতে লাগিল।

যখন দেখিল, তাহাতেও ফকির রাশ মানে না, তখন ঘোমটা টানিয়া দুই স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইল। পাড়ার লোকেরা শশব্যস্ত হইয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল। কেবল দুই বাপ, ফকির, এবং শিশুরা ঘরে রহিল।

দুই স্ত্রী হাত নাড়িয়া নাড়িয়া ফকিরকে জিজ্ঞাসা করিল "কোন্ চুলোয় যমের কোন্ দুয়োরে যাবার ইচ্ছে হয়েচে?"

ফকির তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিতে পারিল না সুতরাং নিরুত্তর হইয়া রহিল। কিন্তু ভাবে যেরূপ প্রকাশ পাইল তাহাতে যমের কোন বিশেষ দ্বারের প্রতি তাহার যে বিশেষ পক্ষপাত আছে এরূপ বোধ হইল না; আপাততঃ যে কোন একটা দ্বার পাইলেই সে বাঁচে, কেবল একবার বাহিরিতে পারিলেই হয়।

তখন আর একটি রমণীমূর্ত্তি গৃহে প্রবেশ করিয়া ফকিরকে প্রণাম করিল।

ফকির প্রথমে অবাক্ তাহার পরে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া বলিল "এ যে হৈমবতী!"

নিজের অথবা পরের স্ত্রীকে দেখিয়া এত প্রেম তাহার চক্ষে ইতিপূর্ব্বে কখন প্রকাশ পায় নাই! মনে হইল মূর্ত্তিমতী মুক্তি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত।

পরিশিষ্ট।

আর একটি লোক মুখের উপর শালমুড়ি দিয়া অন্তরাল হইতে দেখিতেছিল। তাহার নাম মাখনলাল। একটি অপারিচিত নিরীহ ব্যক্তিকে নিজপদে অভিষিক্ত দেখিয়া সে এতক্ষণ পরম সুখানুভব করিতেছিল। অবশেষে যখন হৈমবতীকে উপস্থিত দেখিয়া বুঝিতে পারিল উক্ত নিরপরাধ ব্যক্তি তাহার নিজের ভগ্নী-পতি, তখন দয়াপরতন্ত্র হইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল—না, আপনার লোককে এমন বিপদে ফেলা মহাপাতক। দুই স্ত্রীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, এ আমারি দড়ি, আমারি কলসী।

মাখনলালের এই অসাধারণ মহত্ত্ব ও বীরত্বে পাড়ার লোক আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

রাজটীকা।

নবেন্দুশেখরের সহিত অরুণলেখার যখন বিবাহ হইল, তখন হোমধূমের অন্তরাল হইতে ভগবান্ প্রজাপতি ঈষৎ একটু হাস্য করিলেন। হায়, প্রজাপতির পক্ষে যাহা খেলা আমাদের পক্ষে তাহা সকল সময়ে কৌতুকের নহে।

নবেন্দুশেখরের পিতা পূর্ণেন্দুশেখর ইংরাজ রাজসরকারে বিখ্যাত। তিনি এই ভবসমুদ্রে কেবলমাত্র দ্রুতবেগে সেলাম চালনা দ্বারা রায়বাহাদুর পদবীর উত্তুঙ্গ মরুকূলে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন;—আরও দুর্গমতর সম্মানপথের পাথেয় তাঁহার ছিল, কিন্তু পঞ্চান্ন বৎসর বয়ঃক্রমকালে অনতিদূরবর্ত্তী রাজখেতাবের কুহেলিকাচ্ছন্ন গিরিচূড়ার প্রতি করুণলোলুপদৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ করিয়া এই রাজানুগৃহীত ব্যক্তি অকস্মাৎ খেতাববর্জ্জিতলোকে গমন করিলেন এবং তাঁহার বহু সেলাম-শিথিল গ্রীবাগ্রন্থি শ্মশানশয্যায় বিশ্রাম লাভ করিল।

কিন্তু বিজ্ঞানে বলে শক্তির স্থানান্তর ও রূপান্তর আছে নাশ নাই—চঞ্চলা লক্ষ্মীর অচ-ঞ্চলা সখী সেলামশক্তি পৈতৃক স্কন্ধ হইতে পুত্রের স্কন্ধে অবতীর্ণ হইলেন—এবং নবেন্দুর নবীন মস্তক তরঙ্গতাড়িত কুষ্মাণ্ডের মত ইংরাজের দ্বারে দ্বারে অবিশ্রাম উঠিতে পড়িতে লাগিল।

নিঃসন্তান অবস্থায় ইঁহার প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হইলে যে পরিবারে ইনি দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিলেন সেখানকার ইতিহাস ভিন্ন প্রকার।

সেই পরিবারের বড় ভাই প্রমথনাথ

পরিচিতবর্গের প্রীতি এবং আত্মীয়বর্গের আদরের স্থল ছিলেন। বাড়ির লোকে এবং পাড়ার পাঁচজনে তাঁহাকে সর্ব্ববিষয়ে অনুকরণ-স্থল বলিয়া জানিত!

প্রমথনাথ বিদ্যায় বি, এ, এবং বুদ্ধিতে বিচক্ষণ ছিলেন কিন্তু মোটা মাহিনা বা জোর কলমের কোন ধার ধারিতেন না; মুরুব্বির বলও তাঁহার বিশেষ ছিল না; কারণ, ইংরাজ তাঁহাকে যে পরিমাণ দূরে রাখিত তিনিও তাহাকে সেই পরিমাণ দূরে রাখিয়া চলিতেন। অতএব গৃহকোণ এবং পরিচিতমণ্ডলীর মধ্যেই প্রমথনাথ জাজ্বল্যমান ছিলেন—দূরস্থ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার কোন ক্ষমতা তাঁহার ছিল না।

এই প্রমথনাথ একবার বছর তিনেকের জন্য বিলাতে ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন। সেখানে ইংরাজের সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া ভারতবর্ষের অপমানদুঃখ সমস্ত ভুলিয়া ইংরাজি সাজ পরিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন।

ভাইবোনেরা প্রথমটা একটু কুণ্ঠিত হইল—অবশেষে দুই দিন পরে বলিতে লাগিল ইংরাজি কাপড়ে দাদাকে যেমন মানায় এমন আর কাহাকেও না। ইংরাজিবস্ত্রের গৌরবগর্ব্ব পরিবারের অন্তরের মধ্যে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইল।

প্রমথনাথ বিলাত হইতে মনে ভাবিয়া আসিয়াছিলেন কি করিয়া ইংরাজের সহিত সমপর্য্যায় রক্ষা করিয়া চলিতে হয় আমি তাহারই অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দেখাইব,—নত না হইলে ইংরাজের সহিত মিলন হয় না এ কথা যে বলে সে নিজের হীনতা প্রকাশ করে এবং ইংরাজকেও অন্যায় অপরাধী করিয়া থাকে।

প্রমথনাথ বিলাতের বড় বড় লোকের কাছ হইতে অনেক সাদরপত্র আনিয়া ভারতবর্ষীয় ইংরাজমহলে কিঞ্চিৎ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। এমন কি মধ্যে মধ্যে সস্ত্রীক ইংরাজের চা, ডিনার খেলা এবং হাস্যকৌতুকের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভাগ পাইতে লাগিলেন। সৌভাগ্যমদমত্ততায় ক্রমশই তাঁহার শিরা উপশিরাগুলি অল্প অল্প রীরী করিতে সুরু করিল।

এমন সময় একটি নূতন রেলওয়ে লাইন খোলা উপলক্ষে রেলওয়ে কোম্পানির নিমন্ত্রণে ছোটলাটের সঙ্গে দেশের অনেকগুলি রাজপ্রসাদগর্ব্বিত সম্ভ্রান্তলোকে গাড়ি বোঝাই করিয়া নবলৌহপথে যাত্রা করিলেন। প্রমথনাথও তাহার মধ্যে ছিলেন।

ফিরিবার সময় একটা ইংরাজদারোগা দেশীয় বড় লোকদিগকে কোন এক বিশেষ গাড়ি হইতে অত্যন্ত অপমানিত করিয়া নামাইয়া দিল। ইংরাজবেশধারী প্রমথনাথও মানে মানে নামিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছেন দেখিয়া দারোগা কহিল, "আপনি উঠিতেছেন কেন, আপনি বসুন না!"

এই বিশেষ সম্মানে প্রমথনাথ প্রথমটা একটু স্ফীত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু যখন গাড়ি ছাড়িয়া দিল, যখন তৃণহীন কর্ষণ-ধূসর পশ্চিম প্রান্তরের প্রান্ত সীমা হইতে ম্লান সূর্য্যাস্ত আভা সকরুণ রক্তিম লজ্জার মত সমস্ত দেশের উপর যেন পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল—এবং যখন তিনি একাকী বসিয়া বাতায়নপথ হইতে অনিমেষনয়নে বনান্তরালবাসিনী কুণ্ঠিতা বঙ্গভূমির প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, তখন ধিক্কারে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল এবং দুই চক্ষু দিয়া অগ্নিজ্বালাময়ী অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল।

তাঁহার মনে একটা গল্পের উদয় হইল। একটি গর্দ্দভ রাজপথ দিয়া দেবপ্রতিমার রথ টানিয়া চলিতেছিল, পথিকবর্গ তাহার সম্মুখে

ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া প্রতিমাকে প্রণাম করিতেছিল এবং মূঢ় গর্দ্দভ আপন মনে ভাবিতেছিল সকলে আমাকেই সম্মান করিতেছে।

প্রমথনাথ মনে মনে কহিলেন—গর্দ্দভের সহিত আমার এই একটু প্রভেদ দেখিতেছি, আমি আজ বুঝিয়াছি সম্মান আমাকে নহে আমার স্কন্ধের বোঝাগুলাকে।

প্রমথনাথ বাড়ি আসিয়া বাড়ির ছেলে-পুলে সকলকে ডাকিয়া একটা হোমাগ্নি জ্বালাইলেন এবং বিলাতী বেশভূষাগুলো একে একে আহুতি-স্বরূপে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

শিখা যতই উচ্চ হইয়া উঠিল ছেলেরা ততই উচ্ছ্বসিত আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। তাহার পর হইতে প্রমথনাথ ইংরাজ ঘরের চা'য়ের চুমুক এবং রুটির টুকরা পরিত্যাগ করিয়া পুনশ্চ গৃহকোণদুর্গের মধ্যে দুর্গম হইয়া বসিলেন, এবং পূর্ব্বোক্ত লাঞ্ছিত উপাধিধারিগণ পূর্ব্ববৎ ইংরাজের দ্বারে দ্বারে উষ্ণীষ আন্দোলিত করিয়া ফিরিতে লাগিল।

দৈবদুর্য্যোগে দুর্ভাগ্য নবেন্দুশেখর এই পরিবারের একটি মধ্যমা ভগিনীকে বিবাহ করিয়া বসিলেন। বাড়ির মেয়েগুলি লেখা-পড়াও যেমন জানে দেখিতে শুনিতেও তেম্নি, নবেন্দু ভাবিলেন, বড় জিতিলাম।

কিন্তু আমাকে পাইয়া তোমরাও জিতিয়াছ একথা প্রমাণ করিতে কালবিলম্ব করিলেন না। কোন্ সাহেব তাঁহার বাবাকে কবে কি চিঠি লিখিয়াছিল তাহা যেন নিতান্ত ভ্রমবশতঃ দৈবক্রমে পকেট হইতে বাহির করিয়া শ্যালীদের হস্তে চালান্ করিয়া দিতে লাগিলেন। শ্যালীদের সুকোমল বিম্বোষ্ঠের ভিতর হইতে তীক্ষ্ণপ্রখর হাসি যখন টুক্‌টুকে মখ্‌মলের খাপের ভিতরকার ঝক্‌ঝকে ছোরার মত দেখা দিতে লাগিল, তখন স্থানকালপাত্র সম্বন্ধে হতভাগ্যের চৈতন্য জন্মিল। বুঝিল বড় ভুল করিয়াছি।

শ্যালীবর্গের মধ্যে জ্যেষ্ঠা এবং রূপেগুণে শ্রেষ্ঠা লাবণ্যলেখা একদা শুভদিন দেখিয়া নবেন্দুর শয়নকক্ষের কুলুঙ্গির মধ্যে দুই যোড়া বিলাতি বুট্ সিন্দুরে মণ্ডিত করিয়া স্থাপন করিল; এবং তাহার সম্মুখে ফুল চন্দন ও দুই জ্বলন্ত বাতি রাখিয়া ধূপধুনা জ্বালাইয়া দিল। নবেন্দু ঘরে প্রবেশ করিবা মাত্র দুই শ্যালী তাঁহার দুই কাণ ধরিয়া কহিল তোমার ইষ্ট দেবতাকে প্রণাম কর, তাঁহার কল্যাণে তোমার পদবৃদ্ধি হোক্।

তৃতীয়া শ্যালী কিরণলেখা বহুদিন পরিশ্রম করিয়া একখানি চাদরে জোন্স স্মিথ ব্রাউন টম্‌সন্ প্রভৃতি একশত প্রচলিত ইংরাজি নাম লাল সূতা দিয়া সেলাই করিয়া একদিন মহা-সমারোহে নবেন্দুকে নামাবলী উপহার দিল।

চতুর্থী শ্যালী শশাঙ্কলেখা যদিও বয়ঃক্রম হিসাবে গণ্য ব্যক্তির মধ্যে নহে, বলিল ভাই আমি একটা জপমালা তৈরি করিয়া দিব সাহেবের নাম জপ করিবে।

তাহার বড় বোন্‌রা তাহাকে শাসন করিয়া বলিল যাঃ তোর আর জ্যাঠামি করিতে হইবে না।

নবেন্দুর মনে মনে রাগও হয় লজ্জা হয় কিন্তু শ্যালীদের ছাড়িতেও পারে না; বিশেষতঃ বড় শ্যালীটি রূপসী—সুন্দরী। তাহার মধুও যেমন কাঁটাও তেমনি; তাহার নেশা এবং তাহার জ্বালা দুটোই মনের মধ্যে একেবারে লাগিয়া থাকে। ক্ষতপক্ষ পতঙ্গ রাগিয়া ভোঁ ভোঁ করিতে থাকে অথচ অন্ধ অবোধের মত চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরে।

অবশেষে শ্যালীসংসর্গের প্রবল মোহে

পড়িয়া সাহেবের সোহাগলালসা নবেন্দু সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে লাগিল। বড় সাহেবকে যেদিন সেলাম নিবেদন করিতে যাইত শ্যালীদিগকে বলিত সুরেন্দ্রবাড়ুয্যের বক্তৃতা শুনিতে যাইতেছি। দার্জ্জিলং হইতে প্রত্যাসন্ন মেজো সাহেবকে ষ্টেশনে সম্মান জ্ঞাপন করিতে যাইবার সময় শ্যালীদিগকে বলিয়া যাইত, মেজো মামার সহিত দেখা করিতে চলিলাম।

সাহেব এবং শ্যালী এই দুই নৌকায় পা দিয়া হতভাগা বিষম সঙ্কটে পড়িল। শ্যালীরা মনে মনে কহিল তোমার অন্য নৌকাটাকে ফুটা না করিয়া ছাড়িব না।

মহারাণীর আগামী জন্মদিনে নবেন্দু দেতাব-স্বর্গলোকের প্রথম সোপানে রায়বাহাদুর পদ-বীতে পদার্পণ করিবেন এইরূপ গুজব শুনা গেল—কিন্তু সেই সম্ভাবিত সম্মানলাভের আনন্দউচ্ছ্বসিত সংবাদ ভীরু বেচারা শ্যালীদের নিকটে ব্যক্ত করিতে পারিল না;—কেবল একদিন শরৎ-শুক্লপক্ষের সায়াহ্নে সর্ব্বনেশে চাঁদের আলোকে পরিপূর্ণচিত্তাবেগে স্ত্রীর কাছে প্রকাশ করিয়া ফেলিল। পরদিন দিবা-লোকে স্ত্রী পাল্কী করিয়া তাহার বড় দিদির বাড়ি গিয়া অশ্রুগদগদ কণ্ঠে আক্ষেপ করিতে লাগিল। লাবণ্য কহিল, তা বেশত, রায়-বাহাদুর হইয়া তোর স্বামীর ত লেজ বাহির হইবে না—তোর এত লজ্জাটা কিসের।

অরুণলেখা বারংবার বলিতে লাগিল,—না দিদি, আর যাই হই, আমি রায়বাহাদুরনী হইতে পারিব না!

আসল কথা অরুণের পরিচিত ভূতনাথ বাবু রায়বাহাদুর ছিলেন—পদবীটার প্রতি আন্ত-রিক আপত্তির কারণ তাহাই!

লাবণ্য অনেক আশ্বাস দিয়া কহিল, আচ্ছা, তোকে সে জন্য ভাবিতে হইবে না।

বক্সারে লাবণ্যর স্বামী নীলরতন। কাজ করিতেন। শরতের অবসানে নবেন্দু সেখান হইতে লাবণ্যর নিমন্ত্রণ পাইলেন। আনন্দ-চিত্তে অনতিবিলম্বে গাড়ি চড়িয়া যাত্রা করি-লেন। রেলে চড়িবার সময় তাঁহার বামাঙ্গ কাঁপিল না—কিন্তু তাহা হইতে কেবল এই প্রমাণ হয় যে, আসন্ন বিপদের সময় বামাঙ্গ কাঁপাটা একটা অমূলক কুসংস্কারমাত্র!

লাবণ্যলেখা পশ্চিম প্রদেশের নব শীতা-গমসম্ভূত স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য্যের অরুণে পাণ্ডুরে পূর্ণ পরিস্ফুট হইয়া নির্ম্মল শরৎকালের নির্জ্জননদীকূলশালিনী অম্লানপ্রফুল্লা কাশ-বনশ্রীর মত হাস্যে ও হিল্লোলে ঝলমল করিতে ছিল।

নবেন্দুর মুগ্ধদৃষ্টির উপরে যেন একটি পূর্ণ-পুষ্পিতা মালতীলতা নবপ্রভাতের শীতোজ্জ্বল শিশিরকণা ঝলকে ঝলকে বর্ষণ করিতে লাগিল।

মনের আনন্দে এবং পশ্চিমের হাওয়ায় নবেন্দুর অজীর্ণ রোগ দূর হইয়া গেল। স্বাস্থ্যের নেশায়, সৌন্দর্য্যের মোহে এবং শ্যালীহস্তের শুশ্রূষাপুলকে সে যেন মাটি ছাড়িয়া আকাশের উপর দিয়া চলিতে লাগিল। তাহাদের বাগা-নের সম্মুখ দিয়া পরিপূর্ণ গঙ্গা যেন তাহারই মনের দুরন্ত পাগলামিকে আকার দান করিয়া বিষম গোলমাল করিতে করিতে প্রবল আবেগে নিরুদ্দেশ হইয়া চলিয়া যাইত।

ভোরের বেলা নদীতীরে বেড়াইয়া ফি-রিবার সময় শীতপ্রভাতের স্নিগ্ধ রৌদ্র যেন প্রিয়-মিলনের উত্তাপের মত তাহার সমস্ত শরীরকে চরিতার্থ করিয়া দিত। তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া শ্যালীর সখের রন্ধনে যোগান দিবার ভার লইয়া নবেন্দুর অজ্ঞতা ও অনৈপুণ্য পদে পদে প্রকাশ পাইতে থাকিত। কিন্তু অভ্যাস ও মনোযোগের দ্বারা উত্তরোত্তর তাহা সংশোধন

করিয়া লইবার জন্য মূঢ় অনভিজ্ঞের কিছুমাত্র আগ্রহ দেখা গেল না,—কারণ প্রত্যহ নিজেকে অপরাধী করিয়া সে যে সকল তাড়না ভর্ৎসনা লাভ করিত তাহাতে কিছুতেই তাহার তৃপ্তির শেষ হইত না। যথাযথ পরিমাণে মালমস্‌লা বিভাগ, উনান হইতে হাঁড়ি তোলা নামা, উত্তাপাধিক্যে ব্যঞ্জন পুড়িয়া না যায় তাহার যথোচিত ব্যবস্থা—ইত্যাদি বিষয়ে সে যে সদ্যোজাত শিশুর মত অপটু অক্ষম এবং নিরুপায় ইহাই প্রত্যহ বলপূর্ব্বক প্রমাণ করিয়া নবেন্দু শ্যালীর কৃপামিশ্রিত হাস্য এবং হাস্যমিশ্রিত লাঞ্ছনা মনের সুখে ভোগ করিত।

মধ্যাহ্নে একদিকে ক্ষুধার তাড়না অন্যদিকে শ্যালীর পীড়াপীড়ি, নিজের আগ্রহ এবং প্রিয়জনের ঔৎসুক্য, রন্ধনের পারিপাট্য এবং রন্ধনীর সেবামাধুর্য্য উভয়ের সংযোগে ভোজন ব্যাপারের ওজন রক্ষা করা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিত।

আহারের পর সামান্য তাস খেলাতেও নবেন্দু প্রতিভার পরিচয় দিতে পারিত না! চুরি করিত, হাতের কাগজ দেখিত, কাড়াকাড়ি বকাবকি বাধাইয়া দিত কিন্তু তবু জিতিতে পারিত না। না জিতিলেও জোর করিয়া তাহার হার অস্বীকার করিত—এবং সে জন্য প্রত্যহ তাহার গঞ্জনার সীমা থাকিত না, তথাপিও পাষণ্ড আত্মসংশোধন-চেষ্টায় সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল।

কেবল এক বিষয়ে তাহার সংশোধন সম্পূর্ণ হইয়াছিল! সাহেবের সোহাগ যে জীবনের চরম লক্ষ্য একথা সে উপস্থিতমত ভুলিয়া গিয়াছিল। আত্মীয় স্বজনের শ্রদ্ধা ও স্নেহ যে কত সুখের ও গৌরবের ইহাই সে সর্ব্বান্তঃকরণে অনুভব করিতেছিল।

তাহা ছাড়া, সে যেন এক নূতন আবহাওয়ার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিল! ল্যাবণ্যর স্বামী নীলরতন বাবু আদালতে বড় উকিল হইয়াও সাহেব সুবাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন না বলিয়া অনেক কথা উঠিত—তিনি বলিতেন—কাজ কি ভাই! যদি পাল্টা ভদ্রতা না করে তবে আমি যাহা দিলাম তাহা ত কোন মতেই ফিরাইয়া পাইব না। মরুভূমির বালি ফুটফুটে শাদা বলিয়াই কি তাহাতে বীজ বুনিয়া কোন সুখ আছে! ফসল ফিরিয়া পাইলে কালো জমিতেও বীজ বোনা যায়।

নবেন্দুও টানে পড়িয়া দলে ভিড়িয়া গেল। তাহার আর পরিণাম চিন্তা রহিল না। পৈতৃক এবং স্বকীয় যত্নে পূর্ব্বে জমি যাহা পাট করা ছিল তাহাতেই রায়বাহাদুর খেতাবের সম্ভাবনা আপনিই বাড়িতে লাগিল ইতিমধ্যে আর নবজল সিঞ্চনের প্রয়োজন রহিল না। নবেন্দু ইংরাজের বিশেষ একটি সখের সহরে এক বহুব্যয়সাধ্য ঘোড়দৌড়স্থান নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

হেনকালে কন্‌গ্রেসের সময় নিকটবর্ত্তী হইল। নীলরতনের নিকট চাঁদা সংগ্রহের অনুরোধপত্র আসিল।

নবেন্দু লাবণ্যর সহিত মনের আনন্দে নিশ্চিন্ত মনে তাস খেলিতেছিল। নীলরতন খাতা হস্তে মধ্যে আসিয়া পড়িয়া কহিল—একটা সই দিতে হইবে।

পূর্ব্ব সংস্কারক্রমে নবেন্দুর মুখ শুকাইয়া গেল। লাবণ্য শশব্যস্ত হইয়া কহিল, খবরদার এমন কাজ করিয়ো না, তোমার ঘোড়দৌড়ের মাঠখানা মাটি হইয়া যাইবে!

নবেন্দু আস্ফালন করিয়া কহিল—সেই ভাবনায় আমার রাত্রে ঘুম হয় না!

নীলরতন আশ্বাস দিয়া কহিল, তোমার নাম কোন কাগজে প্রকাশ হইবে না।

লাবণ্য অত্যন্ত চিন্তিত বিজ্ঞভাবে কহিল -তবু কাজ কি। কি জানি কথায় কথায়—

নবেন্দু তীব্রস্বরে কহিল, কাগজে প্রকাশ হলে আমার নাম কইয়া যাইবে না।

এই বলিয়া নীলরতনের হাত হইতে খাতা নিয়া একেবারে হাজার টাকা ফস্ করিয়া ই করিয়া দিল। মনের মধ্যে আশা রহিল াগজে সংবাদ বাহির হইবে না।

লাবণ্য মাথায় হাত দিয়া কহিল "করিলে ক!"

নবেন্দু দর্পভরে কহিল, "কেন, অন্যায় কি রিয়াছি!"

লাবণ্য কহিল—শেয়ালদ ষ্টেশনের গার্ড, য়াইট অ্যাবের দোকানের অ্যাসিষ্টাণ্ট, র্টবাদারদের সহিস্ সাহেব এঁরা যদি তোমার উপর রাগ করিয়া অভিমান করিয়া বসেন— দি তোমার পূজার নিমন্ত্রণে শ্যাম্পেন খাইতে না আসেন, যদি দেখা হইলে তোমার পিঠ না চাপড়ান!

নবেন্দু উদ্ধত ভাবে কহিল, তাহা হইলে আমি বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিব!

দিন কয়েক পরেই নবেন্দু প্রাতঃকালে চা খাইতে খাইতে খবরের কাগজ পড়িতেছেন হঠাৎ চোখে পড়িল এক X স্বাক্ষরিত পত্রপ্রেরক তাঁহাকে প্রচুর ধন্যবাদ দিয়া কন্‌গ্রেসে চাঁদার কথা প্রকাশ করিয়াছে এবং তাঁহার মত লোককে দলে পাইয়া কন্‌গ্রেসের যে কতটা বলবৃদ্ধি হইয়াছে লোকটা তাহারও পরিমাণ নির্ণয় করিতে পারে নাই।

কন্‌গ্রেসের বলবৃদ্ধি! হা স্বর্গগত তাত পূর্ণেন্দুশেখর! কন্‌গ্রেসের বলবৃদ্ধি করিবার জন্যই কি তুমি হতভাগ্যকে ভারতভূমিতে জন্মদান করিয়াছিলে!

কিন্তু দুঃখের সঙ্গে সুখও আছে। নবেন্দুর মত লোক যে, যে-সে লোক নহেন—তাঁহাকে নিজতীরে তুলিবার জন্য, যে, একদিকে ভারতবর্ষীয় ইংরাজসম্প্রদায় অপরদিকে কন্‌গ্রেস লালায়িত ভাবে ছিপ ফেলিয়া অনিমিষলোচনে বসিয়া আছে এ কথাটা নিতান্ত ঢাকিয়া রাখিবার কথা নহে। অতএব নবেন্দু হাসিতে হাসিতে কাগজখানা লইয়া লাবণ্যকে দেখাইলেন। কে লিখিয়াছে যেন কিছুই জানেন না এম্‌নি ভাবে লাবণ্য আকাশ হইতে পড়িয়া কহিল—ওমা, এযে সমস্তই ফাঁস করিয়া দিয়াছে, আহো! আহো! তোমার এমন শত্রু কে ছিল! তাহার কলমে যেন ঘুন ধরে, তাহার কালিতে যেন বালি পড়ে, তাহার কাগজ যেন পোকায় কাটে—

নবেন্দু হাসিয়া কহিল—আর অভিশাপ দিয়ো না! আমি আমার শত্রুকে মার্জ্জনা করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি তাহার সোণার দোয়াৎ কলম হয় যেন!

দুইদিন পরে কন্‌গ্রেসের বিপক্ষপক্ষীয় একখানা ইংরাজসম্পাদিত ইংরাজি কাগজ ডাকযোগে নবেন্দুর হতে আসিয়া পৌঁছিলে পড়িয়া দেখিলেন তাহাতে "One who knows" স্বাক্ষরে পূর্ব্বোক্ত সংবাদের প্রতিবাদ বাহির হইয়াছে। লেখক লিখিতেছেন যে, নবেন্দুকে যাহারা জানেন তাঁহারা তাঁহার সম্বন্ধে এই দুর্নাম রটনা কখনই বিশ্বাস করিতে পারেন না;—চিতা বাঘের পক্ষে নিজ চর্ম্মের কৃষ্ণ অঙ্কগুলির পরিবর্ত্তন যেমন সম্ভব নবেন্দুর পক্ষেও কন্‌গ্রেসের দলবৃদ্ধি করা তেমনি। বাবু নবেন্দুশেখরের যথেষ্ট নিজস্ব পদার্থ আছে—তিনি কর্ম্ম-শূন্য উমেদার ও মক্কেল-শূন্য আইনজীবী নহেন। তিনি দুইদিন বিলাতে ঘুরিয়া বেশভূষা আচার ব্যবহারে অদ্ভুত কপিবৃত্তি করিয়া স্পর্দ্ধাভরে ইংরাজ-সমাজে প্রবেশোদ্যত

হইয়া অবশেষে ক্ষুণ্ণমনে হতাশভাবে ফিরিয়া আসেন নাই অতএব কেন যে তিনি এই সকল ইত্যাদি ইত্যাদি।

হা পরলোকগত পিতঃ পূর্ণেন্দুশেখর! ইংরাজের নিকট এত নাম এত বিশ্বাস সঞ্চয় করিয়া তবে তুমি মরিয়াছিলে!

এ চিঠিখানিও শ্যালীর নিকট পেশমের মত বিস্তার করিয়া ধরিবার যোগ্য। ইহার মধ্যে একটা কথা আছে যে নবেন্দু অখ্যাত অকিঞ্চন লক্ষ্মীছাড়া নহেন, তিনি সারবান্ পদার্থবান লোক!

লাবণ্য পুনশ্চ আকাশ হইতে পড়িয়া কহিল — এ আবার তোমার কোন্ পরম বন্ধু লিখিল! কেন্ টিকিট্ কালেক্টার কোন্ চামড়ার দালাল, কোন্ গড়ের বাদ্যের বাজন্দার!

নীলরতন কহিল; এ চিঠির একটা প্রতিবাদ করা ত তোমার উচিত!

নবেন্দু কিছু উঁচু চালে বলিল—দরকার কি? যে যা বলে তাহারই কি প্রতিবাদ করিতে হইবে?

লাবণ্য উচ্চৈঃস্বরে চারিদিকে একেবারে হাসির ফোয়ারা ছড়াইয়া দিল।

নবেন্দু অপ্রতিভ হইয়া কহিল, এত হাসি যে!

তাহার উত্তরে লাবণ্য পুনর্ব্বার অনিবার্য্য বেগে হাসিয়া পুষ্পিতযৌবনা দেহলতা লুণ্ঠিত করিতে লাগিল। নবেন্দু নাকে মুখে চোখে এই প্রচুর পরিহাসের পিচকারি খাইয়া অত্যন্ত নাকাল হইল। একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল—তুমি মনে করিতেছ প্রতিবাদ করিতে আমি ভয় করি!

লাবণ্য কহিল—তা কেন! আমি ভাবিতেছিলাম তোমার অনেক আশা ভরসার সেই ঘোড়দৌড়ের মাঠখানি বাঁচাইবার চেষ্টা এখনো ছাড় নাই, যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ!

নবেন্দু কহিল, আমি বুঝি সেই জন্য লিখিতে চাহি না। অত্যন্ত রাগিয়া দোয়াতকলম লইয়া বসিল। কিন্তু লেখার মধ্যে রাগের রক্তিমা বড় প্রকাশ পাইল না, কাজেই লাবণ্য ও নীলরতনকে সংশোধনের ভার লইতে হইল। যেন লুচি ভাজার পালা পড়িল—নবেন্দু যেটা জলে ও ঘিয়ে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা নরম নরম করিয়া এবং চাপিয়া যথাসাধ্য চেপটা করিয়া বেলিয়া দেয় তাঁহার দুই সহকারী তৎক্ষণাৎ সেটাকে ভাজিয়া কড়া ও গরম করিয়া ফুলাইয়া ফুলাইয়া তোলে। লেখা হইল যে, আত্মীয় যখন শত্রু তখন বহিঃশত্রু অপেক্ষা ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। পাঠান অথবা রাশিয়ান ভারতগবর্ণমেণ্টের তেমন শত্রু নহে যেমন শত্রু গর্ব্বোদ্ধত অ্যাংলোইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়। গবর্ণমেণ্টের সহিত প্রজাসাধারণের নিরাপদ সৌহার্দ্য বন্ধনের তাহারই দুর্ভেদ্য অন্তরায়। কন্‌গ্রেস রাজা ও প্রজার মাঝখানে স্থায়ী সদ্ভাব সাধনের যে প্রশস্ত রাজপথ খুলিয়াছে, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান্ কাগজগুলো ঠিক তাহার মধ্যস্থল জুড়িয়া একেবারে কণ্টকিত হইয়া রহিয়াছে। ইত্যাদি।

নবেন্দুর ভিতরে ভিতরে ভয় ভয় করিতে লাগিল অথচ লেখাটা বড় সরেস্ হইয়াছে মনে করিয়া রহিয়া রহিয়া একটু আনন্দও হইতে লাগিল। এমন সুন্দর রচনা তাহার সাধ্যাতীত ছিল।

ইহার পর কিছুদিন ধরিয়া নানা কাগজে বিবাদ বিসম্বাদ বাদ প্রতিবাদে নবেন্দুর চাঁদা এবং কন্‌গ্রেসে যোগ দেওয়ার কথা লইয়া দশদিকে ঢাক বাজিতে লাগিল।

নবেন্দু এক্ষণে মরীয়া হইয়া কথায় বার্ত্তায় শ্যালীসমাজে অত্যন্ত নির্ভীক দেশহিতৈষী হইয়া উঠিল। লাবণ্য মনে মনে হাসিয়া কহিল এখনো তোমার অগ্নিপরীক্ষা বাকি আছে।

একদিন প্রাতঃকালে নবেন্দু স্নানের পূর্ব্বে

ক্ষঃস্থল তৈলাক্ত করিয়া পৃষ্ঠদেশের দুর্গম অংশগুলিতে তৈল সঞ্চার করিবার কৌশল অবলম্বন করিতেছেন এমন সময় বেহারা এক কার্ড হাতে করিয়া তাঁহাকে দিল, তাহাতে স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেটের নাম আঁকা। লাবণ্য অকুতূহলী চক্ষে আড়াল হইতে কৌতুক দেখিতেছিল!

তৈললাঞ্ছিত কলেবরে ত ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করা যায় না,—নবেন্দু ভাজিবার পূর্ব্বে মসলামাখা কৈ মৎস্যের মত বৃথা ব্যতিব্যস্ত হইতে লাগিলেন। তাড়াতাড়ি চকিতের মধ্যে স্নান করিয়া কোন মতে কাপড় পরিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে বাহিরের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বেহারা বলিল সাহেব অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এই অনাবশ্যক মিথ্যাচরণ পাপের কতটা অংশ বেহারার এবং কতটা অংশ লাবণ্যর তাহা নৈতিক গণিত শাস্ত্রের একটা সূক্ষ্ম সমস্যা।

টিকটিকির কাটা লেজ যেমন সম্পূর্ণ অন্ধভাবে ধড়ফড় করে নবেন্দুর ক্ষুব্ধ হৃদয় ভিতরে ভিতরে তেমনি আছাড় খাইতে লাগিল। সমস্ত দিন খাইতে শুইতে আর সোয়াস্তি রহিল না।

লাবণ্য আভ্যন্তরিক হাস্যের, সমস্ত আভাস মুখ হইতে সম্পূর্ণ দূর করিয়া দিয়া উদ্বিগ্নভাবে থাকিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, আজ তোমার কি হইয়াছে বল দেখি! অসুখ করে নাই ত?

নবেন্দু কায়ক্লেশে হাসিয়া কোনমতে একটা দেশকালপাত্রোচিত উত্তর বাহির করিল— কহিল—তোমার এলেকার মধ্যে আবার অসুখ কিসের? তুমি আমার ধন্বন্তরিণী!

কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যেই হাসি মিলাইয়া গেল—এবং সে ভাবিতে লাগিল,—একে আমি কন্‌গ্রেসে চাঁদা দিলাম, কাগজে কড়া চিঠি লিখিলাম—তাহার উপরে ম্যাজিষ্ট্রেট নিজে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, আমি তাঁহাকে বসাইয়া রাখিলাম—না জানি কি মনে করিতেছেন!

হা তাত, হা পূর্ণেন্দুশেখর! আমি যাহা নই ভাগ্যের বিপাকে গোলেমালে তাহাই প্রতিপন্ন হইলাম।

পরদিন সাজগোজ করিয়া ঘড়ির চেন ঝুলাইয়া মস্ত একটা পাগড়ি পরিয়া নবেন্দু বাহির হইল। লাবণ্য জিজ্ঞাসা করিল, যাও কোথায়? নবেন্দু কহিল একটা বিশেষ কাজ আছে—লাবণ্য কিছু বলিল না।

সাহেবের দরজার কাছে কার্ড বাহির করিবামাত্র আরদালি কহিল এখন দেখা হইবে না।

নবেন্দু পকেট হইতে দুইটা টাকা বাহির করিল। আরদালি সংক্ষিপ্ত সেলাম করিয়া কহিল আমরা পাঁচ জন আছি। নবেন্দু তৎক্ষণাৎ দশ টাকার এক নোট বাহির করিয়া দিলেন।

সাহেবের নিকট তলব পড়িল। সাহেব তখন চটি জুতা ও মর্নিং গৌন্ পরিয়া লেখাপড়ার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। নবেন্দু একটা সেলাম করিলেন—ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে বসিবার অনুমতি করিয়া কাগজ হইতে মুখ না তুলিয়া কহিলেন—কি বলিবার আছে বাবু?

নবেন্দু ঘড়ির চেন নাড়িতে নাড়িতে বিনীত কম্পিতস্বরে বলিল—কাল আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন কিন্তু—

সাহেব ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একটা চোখ কাগজ হইতে তুলিয়া কহিলেন—সাক্ষাৎ

করিতে গিয়াছিলাম! Babu what nonsense are you talking!

নবেন্দু "Beg your pardon, ভুল হইয়াছে, গোল হইয়াছে"—করিতে করিতে ঘর্ম্মাপ্লুত কলেবরে কোন মতে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। এবং সে রাত্রে বিছানায় শুইয়া কোন দুঃস্বপ্নশ্রুত মন্ত্রের ন্যায় একটা বাক্য থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার কানে আসিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল—Babu, you are a howling idiot!

পথে আসিতে আসিতে তাঁহার মনে ধারণা হইল যে, ম্যাজিষ্ট্রেট্ যে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল সে কথাটা কেবল রাগ করিয়া সে অস্বীকার করিল। মনে মনে কহিলেন, ধরণী দ্বিধা হও! কিন্তু ধরণী তাঁহার অনুরোধ রক্ষা না করাতে নির্ব্বিঘ্নে বাড়ি আসিয়া পৌঁছিলেন।

লাবণ্যকে আসিয়া কহিলেন, দেশে পাঠাইবার জন্য গোলাপজল কিনিতে গিয়াছিলাম।

বলিতে না বলিতে কালেক্টরের চাপরাস-পরা জনছয়েক পেয়াদা আসিয়া উপস্থিত সেলাম করিয়া হাস্যমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

লাবণ্য হাসিয়া কহিল, তুমি কন্‌গ্রেসে চাঁদা দিয়াছ বলিয়া তোমাকে গ্রেফ্‌তার করিতে আসে নাই ত?

পেয়াদা ছয়জনে বারো পাটি দন্তাগ্রভাগ উন্মুক্ত করিয়া কহিল—বক্‌শিস্ বাবু সাহেব!

নীলরতন পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া বিরক্তস্বরে কহিলেন—কিসের বক্‌শিস্?

পেয়াদারা বিকশিতদন্তে কহিল, ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন তাহার বক্‌শিস!

লাবণ্য হাসিয়া কহিল, ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব আজকাল গোলাপ জল বিক্রি ধরিয়াছেন নাকি? এমন অত্যন্ত ঠাণ্ডা ব্যবসায় ত তাঁহার পূর্ব্বে ছিল না।

হতভাগ্য নবেন্দু গোলাপজলের সহিত ম্যাজিষ্ট্রেট্ দর্শনের সামঞ্জস্য সাধন করিতে গিয়া কি যে আবোল্ তাবোল বলিল তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না।

নীলরতন কহিল—বক্‌শিসের কোন কাজ হয় নাই। বক্‌শিস নাহি মিলেগা!

নবেন্দু সঙ্কুচিতভাবে পকেট হইতে একটা নোট বাহির করিয়া কহিল—উহারা গরীব মানুষ, কিছু দিতে দোষ কি?

নীলরতন নবেন্দুর হাত হইতে নোট টানিয়া লইয়া কহিল, উহাদের অপেক্ষা গরীব-মানুষ জগতে আছে আমি তাহাদিগকে দিব।

রুষ্ট মহেশ্বরের ভূতপ্রেতগণকেও কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা করিবার সুযোগ না পাইয়া নবেন্দু অত্যন্ত ফাঁপরে পড়িয়া গেল। পেয়াদাগণ যখন বজ্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গমনোদ্যত হইল, তখন নবেন্দু একান্ত করুণভাবে তাহাদের দিকে চাহিলেন—নীরবে নিবেদন করিলেন, বাবা সকল, আমার কোন দোষ নাই তোমরা ত জান।

কলিকাতায় কন্‌গ্রেসের অধিবেশন। তদুপলক্ষে নীলরতন সস্ত্রীক রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। নবেন্দুও তাঁহাদের সঙ্গে ফিরিল।

কলিকাতায় পদার্পণ করিবামাত্র কন্‌গ্রেসের দলবল নবেন্দুকে চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া একটা প্রকাণ্ড তাণ্ডব সুরু করিয়া দিল। সম্মান সমাদর স্তুতিবাদের সীমা রহিল না। সকলে বলিল আপনাদের মত নায়কগণ দেশের কার্য্যে যোগ না দিলে দেশের উপায় নাই। কথাটা যাথার্থ্য নবেন্দু অস্বীকার করিতে পারিলে না,—এবং গোলেমালে হঠাৎ কখন দেশে

একজন অধিনায়ক হইয়া উঠিলেন। কন্‌গ্রেস সভায় যখন পদার্পণ করিলেন তখন সকলে মিলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিজাতীয় বিলাতী তারস্বরে "হিপ্ হিপ হুরে," শব্দে তাঁহাকে উৎকট অভিবাদন করিল। আমাদের মাতৃভূমির কর্ণমূল লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠিল।

যথাকালে মহারাণীর জন্মদিন আসিল—নবেন্দুর রায়বাহাদুর খেতাব নিকট-সমাগত মরীচিকার মত অন্তর্দ্ধান করিল।

সেইদিন সায়াহ্নে লাবণ্যলেখা সমারোহে নবেন্দুকে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক তাঁহাকে নববস্ত্রে ভূষিত করিয়া স্বহস্তে তাঁহার ললাটে রক্তচন্দনের তিলক এবং প্রত্যেক শ্যালী তাঁহার কণ্ঠে একগাছি করিয়া স্বরচিত পুষ্পমালা পরাইয়া দিল। অরুণাম্বরবসনা অরুণলেখা সেদিন হাস্যে লজ্জায় এবং অলঙ্কারে আড়াল হইতে ঝকমক করিতে লাগিল। তাহার স্বেদাঙ্কিত লজ্জাশীতল হস্তে একটা 'গড়ে' মালা দিয়া ভগিনীরা তাহাকে টানাটানি করিল কিন্তু সে কোন মতে বশ মানিল না এবং সেই প্রধান মালাখানি নবেন্দুর কণ্ঠ কামনা করিয়া জনহীন নিশীথের জন্য গোপনে অপেক্ষা করিতে লাগিল। শ্যালীরা নবেন্দুকে কহিল আজ আমরা তোমাকে রাজা করিয়া দিলাম। ভারতবর্ষে এমন সম্মান তুমি ছাড়া আর কাহারও সম্ভব হইবে না।

নবেন্দু ইহাতে সম্পূর্ণ সান্ত্বনা পাইল কিনা তাহা তাহার অন্তঃকরণ আর অন্তর্য্যামীই জানেন—কিন্তু আমাদের এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস মরিবার পূর্ব্বে সে রায়বাহাদুর হইবেই—এবং তাহার মৃত্যু উপলক্ষে Englishman ও Pioneer সমস্বরে শোক করিতে ছাড়িবে না। অতএব ইতিমধ্যে Three Cheers for Babu পূর্ণেন্দুশেখর! হিপ হিপ হুরে, হিপ হিপ হুরে! হিপ্ হিপ্ হুরে!

রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী।

বিচিত্র চিত্র।

—০—

ক্ষুধিত পাষাণ।

আমি এবং আমার আত্মীয় পূজার ছুটিতে দেশভ্রমণ সারিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতেছিলাম এমন সময় রেলগাড়িতে বাবুটির সঙ্গে দেখা হয়। তাঁহার বেশভূষা দেখিয়া প্রথমটা তাহাকে পশ্চিমদেশীয় মুসলমান বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। তাঁহার কথাবার্তা শুনিয়া আরও ধাঁধাঁ লাগিয়া যায়। পৃথিবীর সকল বিষয়েই এমন করিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন যেন তাঁহার সহিত প্রথম পরামর্শ করিয়া বিশ্ববিধাতা সকল কাজ করিয়া থাকেন। বিশ্বসংসারের ভিতরে ভিতরে যে এমন সকল অশ্রুতপূর্ব্ব নিগূঢ় ঘটনা ঘটিতেছিল, রুশিয়ানরা যে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে, ইংরাজদের যে এমন সকল গোপন মৎলব আছে, দেশীয় রাজাদের মধ্যে যে একটা খিচুড়ি পাকিয়া উঠিয়াছে, এ সমস্ত কিছুই না জানিয়া আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া ছিলাম। আমাদের নবপরিচিত আলাপীটি ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, There happen more things in heaven and earth, Horatio, than are reported in your news-papers. আমরা এই প্রথম ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছি, সুতরাং লোকটির রকম-সকম দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম। লোকটা সামান্য উপলক্ষে কখন বিজ্ঞান বলে, কখনো বেদের ব্যাখ্যা করে, আবার হঠাৎ কখনো পার্সি বয়েৎ আওড়াইতে থাকে; বিজ্ঞান, বেদ এবং পার্সিভাষায় আমাদের কোনরূপ অধিকার না থাকাতে তাঁহার প্রতি আমাদের ভক্তি উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। এমন কি, আমার থিয়সফিষ্ট আত্মীয়টির মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, আমাদের এই সহযাত্রীটির সহিত কোন এক রকমের অলৌকিক ব্যাপারের কিছু একটা যোগ আছে; কোন একটা অপূর্ব্ব ম্যাগ্নেটিজম্ অথবা দৈবশক্তি, অথবা সূক্ষ্ম শরীর

অথবা ঐ ভাবের একটা কিছু। তিনি এই সামান্য লোকের সমস্ত সামান্য কথাও ভক্তি-বিহ্বল মুগ্ধভাবে শুনিতেছিলেন এবং গোপনে নোট করিয়া লইতেছিলেন; আমার ভাবে বোধ হইল, অসামান্য ব্যক্তিটিও গোপনে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং কিছু খুসি হইয়াছিলেন।

গাড়িটি আসিয়া জংশনে থামিলে আমরা দ্বিতীয় গাড়ির অপেক্ষায় ওয়েটিংরুমে সমবেত হইলাম। তখন রাত্রি সাড়ে দশটা। পথের মধ্যে একটা কি ব্যাঘাত হওয়াতে গাড়ি অনেক বিলম্বে আসিবে শুনিলাম। আমি ইতিমধ্যে টেবিলের উপর বিছানা পাতিয়া ঘুমাইব স্থির করিয়াছি এমন সময়ে সেই অসামান্য ব্যক্তিটি নিম্নলিখিত গল্প ফাঁদিয়া বসিলেন। সে রাত্রে আমার আর ঘুম হইল না।

রাজ্যচালনা সম্বন্ধে দুই একটা বিষয়ে মতান্তর হওয়াতে আমি জুনাগড়ের কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া হাইদ্রাবাদে যখন নিজাম সরকারে প্রবেশ করিলাম তখন আমাকে অল্পবয়স্ক মজবুৎ লোক দেখিয়া প্রথমেই বরীচে তুলার মাশুল আদায়ে নিযুক্ত করিয়া দিল।

বরীচ জায়গাটি বড় রমণীয়। নির্জ্জন পাহাড়ের নীচে বড় বড় বনের ভিতর দিয়া শুস্তা নদীটি (সংস্কৃত "স্বচ্ছতোয়া"র অপভ্রংশ) উপল-মুখরিত পথে নিপুণা নর্ত্তকীর মত পদে পদে বাঁকিয়া বাঁকিয়া দ্রুত নৃত্যে চলিয়া গিয়াছে। ঠিক সেই নদীর ধারেই পাথর-বাঁধানো দেড়শত সোপানময় অত্যুচ্চ ঘাটের উপরে একটি শ্বেত প্রস্তরের প্রাসাদ শৈলপদমূলে একাকী দাঁড়াইয়া আছে—নিকটে কোথাও লোকালয় নাই। বরীচের তুলার হাট এবং গ্রাম এখান হইতে দূরে।

প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে দ্বিতীয় শা মামুদ্‌ ভোগবিলাসের জন্য প্রাসাদটি এই নির্জ্জন স্থানে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তখন ইহার স্নানশালার ফোয়ারার মুখ হইতে গোলাপগন্ধী জলধারা উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকিত এবং সেই শীকর-শীতল নিভৃত গৃহের মধ্যে মর্ম্মরখচিত স্নিগ্ধ শিলাসনে বসিয়া কোমল নগ্ন পদপল্লব জলাশয়ের নির্ম্মল জলরাশির মধ্যে প্রসারিত করিয়া তরুণী পারসিক রমণীগণ স্নানের পূর্ব্বে কেশ মুক্ত করিয়া দিয়া সেতার কোলে দ্রাক্ষাবনের গজল্‌ গান করিত।

এখন আর সে ফোয়ারা খেলে না, সে গান নাই শাদা পাথরের উপর শুভ্র চরণের সুন্দর আঘাত পড়ে না—এখন ইহা আমাদের মত নির্জ্জনবাসপীড়িত সঙ্গিনীহীন মাশুল কালেক্টরের অতি বৃহৎ এবং অতি শূন্য বাসস্থান। কিন্তু আপিসের বৃদ্ধ কেরাণী করিম খাঁ আমাকে এই প্রাসাদে বাস করিতে বারংবার নিষেধ করিয়াছিল। বলিয়াছিল, ইচ্ছা হয়, দিনের বেলা থাকিবেন কিন্তু কখনো এখানে রাত্রিযাপন করিবেন না। আমি হাসিয়া উড়াইয়া দিলাম। ভৃত্যেরা বলিল, তাহারা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাজ করিবে কিন্তু রাত্রে এখানে থাকিবে না। আমি বলিলাম, তথাস্তু। এ বাড়ির এমন বদ্‌নাম ছিল যে, রাত্রে চোরও এখানে আসিতে সাহস করিত না।

প্রথম প্রথম আসিয়া এই পরিত্যক্ত পাষাণ-প্রাসাদের বিজনতা আমার বুকের উপর যেন একটা ভয়ঙ্কর ভারের মত চাপিয়া থাকিত, আমি যতটা পারিতাম বাহিরে থাকিয়া অবিশ্রাম কাজ কর্ম্ম করিয়া রাত্রে ঘরে ফিরিয়া শ্রান্তদেহে নিদ্রা দিতাম।

কিন্তু সপ্তাহ খানেক না যাইতেই বাড়িটার এক অপূর্ব্ব নেশা আমাকে ক্রমশঃ আক্রমণ

করিয়া ধরিতে লাগিল। আমার সে অবস্থা বর্ণনা করাও কঠিন এবং সে কথা লোককে বিশ্বাস করানও শক্ত। সমস্ত বাড়িটা একটা সজীব পদার্থের মত আমাকে তাহার জঠরস্থ মোহ-রসে অল্পে অল্পে যেন জীর্ণ করিতে লাগিল।

বোধ হয় এ বাড়িতে পদার্পণমাত্রেই এ প্রক্রিয়ার আরম্ভ হইয়াছিল—কিন্তু আমি যে দিন সচেতন ভাবে প্রথম ইহার সূত্রপাত অনুভব করি, সেদিনকার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে।

তখন গ্রীষ্মকালের আরম্ভে বাজার নরম; আমার হাতে কোন কাজ ছিল না। সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্বে আমি সেই নদীতীরে ঘাটের নিম্নতলে একটা আরাম-কেদারা লইয়া বসিয়াছি। তখন শুস্তানদী শীর্ণ হইয়া আসিয়াছে;—ওপারে অনেকখানি বালুতট অপরাহ্নের আভায় রঙীন্ হইয়া উঠিয়াছে, এপারে ঘাটের সোপানমূলে স্বচ্ছ অগভীর জলের তলে নুড়ি গুলি ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে। সে দিন কোথাও বাতাস ছিল না। নিকটের পাহাড়ে বন তুলসী, পুদিনা ও মৌরির জঙ্গল হইতে একটা ঘন সুগন্ধ উঠিয়া স্থির আকাশকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল।

সূর্য্য যখনি গিরিশিখরের অন্তরালে অবতীর্ণ হইল তৎক্ষণাৎ দিবসের নাট্যশালায় একটা দীর্ঘ ছায়া-যবনিকা পড়িয়া গেল;—এখানে পর্ব্বতের ব্যবধান থাকাতে সূর্য্যাস্তের সময় আলো আঁধারের সম্মিলন অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। ঘোড়ায় চড়িয়া একবার ছুটিয়া বেড়াইয়া আসিব মনে করিয়া উঠিব উঠিব করিতেছি, এমন সময়ে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনিতে পাইলাম। পিছনে ফিরিয়া দেখিলাম,—কেহ নাই।

ইন্দ্রিয়ের ভ্রম মনে করিয়া পুনরায় ফিরিয়া বসিতেই, একেবারে অনেকগুলি পায়ের শব্দ শোনা গেল—যেন অনেকে মিলিয়া ছুটাছুটি করিয়া নামিয়া আসিতেছে। ঈষৎ ভয়ের সহিত এক অপরূপ পুলক মিশ্রিত হইয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। যদিও আমার সম্মুখে কোন মূর্ত্তি ছিল না তথাপি স্পষ্ট প্রত্যক্ষবৎ মনে হইল যে, এই গ্রীষ্মের সায়াহ্নে একদল প্রমোদচঞ্চল নারী শুস্তার জলের মধ্যে স্নান করিতে নামিয়াছে। যদিও সেই সন্ধ্যাকালে নিস্তব্ধ গিরিতটে, নদীতীরে, নির্জ্জন প্রাসাদে কোথাও কিছুমাত্র শব্দ ছিল না তথাপি আমি যেন স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম নির্ঝরের শত ধারার মত সকৌতুক কলহাস্যের সহিত পরস্পরের দ্রুত অনুধাবন করিয়া আমার পার্শ্ব দিয়া স্নানার্থিনীরা চলিয়া গেল। আমাকে যেন লক্ষ্য করিল না। তাহারা যেমন আমার নিকট অদৃশ্য, আমিও যেন সেইরূপ তাহাদের নিকট অদৃশ্য। নদী পূর্ব্ববৎ স্থির ছিল, কিন্তু আমার নিকট স্পষ্ট বোধ হইল, স্বচ্ছতোয়ার অগভীর স্রোত অনেকগুলি বলয়শিঞ্জিত বাহুবিক্ষেপে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে, হাসিয়া হাসিয়া সখীগণ পরস্পরের গায়ে জল ছুঁড়িয়া মারিতেছে, সন্তরণকারিণীদের পদাঘাতে জলবিন্দুরাশি মুক্তামুষ্টির মত আকাশে ছিটিয়া পড়িতেছে।

আমার বক্ষের মধ্যে এক প্রকার কম্পন হইতে লাগিল; সে উত্তেজনা ভয়ের, কি আনন্দের, কি কৌতূহলের, ঠিক বলিতে পারি না। বড় ইচ্ছা হইতে লাগিল ভাল করিয়া দেখি কিন্তু সম্মুখে দেখিবার কিছুই ছিল না, মনে হইল, ভাল করিয়া কাণ পাতিলেই উহাদের কথা সমস্তই স্পষ্ট শোনা যাইবে—কিন্তু একান্ত মনে কাণ পাতিয়া কেবল অরণ্যের ঝিল্লিরব

শানা যায়। মনে হইল আড়াই শত বৎসরের কৃষ্ণবর্ণ যবনিকা ঠিক আমার সম্মুখে দুলিতেছে—ভয়ে ভয়ে একটি ধার তুলিয়া ভিতরে দৃষ্টিপাত করি—সেখানে বৃহৎ সভা বসিয়াছে কিন্তু গাঢ় অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না।

হঠাৎ গুমট্ ভাঙ্গিয়া হুহু করিয়া একটা বাতাস দিল—শুস্তার স্থির জলতল দেখিতে দেখিতে অপ্সরীর কেশদামের মত কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, এবং সন্ধ্যাচ্ছায়াচ্ছন্ন সমস্ত বনভূমি এক মুহূর্ত্তে এক সঙ্গে মর্ম্মরধ্বনি করিয়া যেন দুঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিল। স্বপ্নই বল আর সত্যই বল, আড়াই শত বৎসরের অতীত ক্ষেত্র হইতে প্রতিফলিত হইয়া আমার সম্মুখে যে এক অদৃশ্য মরীচিকা অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহা চকিতের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। যে মায়াময়ীরা আমার গায়ের উপর দিয়া দেহহীন দ্রুতপদে শব্দহীন উচ্চকলহাস্যে ছুটিয়া শুস্তার জলের উপর গিয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিল তাহারা সিক্ত অঞ্চল হইতে জল নিষ্কর্ষণ করিতে করিতে আমার পাশ দিয়া উঠিয়া গেল না। বাতাসে যেমন করিয়া গন্ধ উড়াইয়া লইয়া যায়, বসন্তের এক নিশ্বাসে তাহারা তেমনি করিয়া উড়িয়া চলিয়া গেল।

তখন আমার বড় আশঙ্কা হইল যে, হঠাৎ বুঝি নির্জ্জন পাইয়া কবিতাদেবী আমার স্কন্ধে আসিয়া ভর করিলেন; আমি বেচারা তুলার মাশুল আদায় করিয়া খাটিয়া খাই, সর্ব্বনাশিনী এইবার বুঝি আমার মুণ্ডপাত করিতে আসিলেন। ভাবিলাম ভাল করিয়া আহার করিতে হইবে;—শূন্য উদরেই সকল প্রকার দুরারোগ্য রোগ আসিয়া চাপিয়া ধরে। আমার পাচকটিকে ডাকিয়া প্রচুর ঘৃতপক্ক, মসলা-সুগন্ধি রীতিমত মোগলাইখানা হুকুম করিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে সমস্ত ব্যাপারটি পরম হাস্যজনক বলিয়া বোধ হইল। আনন্দমনে, সাহেবের মত সোলাটুপি পরিয়া নিজের হাতে গাড়ি হাঁকাইয়া গড়্ গড়্ শব্দে আপন তদন্তকার্য্যে চলিয়া গেলাম। সে দিন ত্রৈমাসিক রিপোর্ট্ লিখিবার দিন থাকাতে বিলম্বে বাড়ি ফিরিবার কথা। কিন্তু সন্ধ্যা হইতে না হইতেই আমাকে বাড়ির দিকে টানিতে লাগিল। কে টানিতে লাগিল বলিতে পারি না; কিন্তু মনে হইল আর বিলম্ব করা উচিত হয় না। মনে হইল সকলে বসিয়া আছে। রিপোর্ট্ অসমাপ্ত রাখিয়া সোলার টুপি মাথায় দিয়া সেই সন্ধ্যাধূসর তরুচ্ছায়াঘন নির্জ্জন পথ রথচক্রশব্দে সচকিত করিয়া সেই অন্ধকার শৈলান্তবর্ত্তী নিস্তব্ধ প্রকাণ্ড প্রাসাদে গিয়া উত্তীর্ণ হইলাম।

সিঁড়ির উপরে সম্মুখের ঘরটি অতি বৃহৎ। তিন সারি বড় বড় থামের উপর কারুকার্য্যখচিত খিলানে বিস্তীর্ণ ছাদ ধরিয়া রাখিয়াছে। এই প্রকাণ্ড ঘরটি আপনার বিপুল শূন্যতা ভরে অহর্নিশি গম্‌গম্ করিতে থাকে। সে দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে তখনো প্রদীপ জ্বালানো হয় নাই। দরজা ঠেলিয়া আমি সেই বৃহৎ ঘরে যেমন প্রবেশ করিলাম অমনি মনে হইল ঘরের মধ্যে যেন ভারি একটা বিপ্লব বাধিয়া গেল—যেন হঠাৎ সভা ভঙ্গ করিয়া চারিদিকের দরজা জানলা ঘর পথ বারান্দা দিয়া কে কোন্ দিকে পালাইল তাহার ঠিকানা নাই। আমি কোথাও কিছু না দেখিতে পাইয়া অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। শরীর একপ্রকার আবেশে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। যেন বহুদিবসের লুপ্তাবশিষ্ট মাথাঘসা ও আতরের মৃদু গন্ধ আমার নাসার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। আমি সেই দীপহীন জনহীন প্রকাণ্ড ঘরের প্রাচীন প্রস্তরস্তম্ভশ্রেণীর মাঝখানে দাঁড়াইয়া

শুনিতে পাইলাম—ঝর্ঝর শব্দে ফোয়ারার জল শাদা পাথরের উপরে আসিয়া পড়িতেছে, সেতারে কি সুর বাজিতেছে বুঝিতে পারিতেছি না, কোথাও বা স্বর্ণভূষণের শিঞ্জিত, কোথাও বা নূপুরের নিক্কণ, কখন বা বৃহৎ তাম্রঘণ্টায় প্রহর বাজিবার শব্দ, অতি দূরে নহবতের আলাপ, বাতাসে দোদুল্যমান ঝাড়ের স্ফটিক দোলকগুলির ঠুনঠুন ধ্বনি, বারান্দা হইতে খাঁচার বুল্‌বুলের গান, বাগান হইতে পোষা সারসের ডাক আমার চতুর্দ্দিকে একটা প্রেতলোকের রাগিণী সৃষ্টি করিতে লাগিল।

আমার এমন একটা মোহ উপস্থিত হইল, মনে হইল, এই অস্পৃশ্য অগম্য অবাস্তব ব্যাপারই জগতে একমাত্র সত্য, আর সমস্তই মিথ্যা মরীচিকা। আমি যে আমি—অর্থাৎ আমি যে শ্রীযুক্ত অমুক, ৺ অমুকের জ্যেষ্ঠ পুত্র, তূলার মাশুল সংগ্রহ করিয়া সাড়ে চারশো টাকা বেতন পাই, আমি যে সোলার টুপি এবং খাটো কোর্ত্তা পরিয়া টম্‌টম্ হাঁকাইয়া আপিস্ করিতে যাই, এ সমস্তই আমার কাছে এমন অদ্ভুত হাস্যকর অমূলক মিথ্যা কথা বলিয়া বোধ হইল যে আমি সেই বিশাল নিস্তব্ধ অন্ধকার ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলাম।

তখনি আমার মুসলমান ভৃত্য প্রজ্বলিত কেরোসিন ল্যাম্প হাতে করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সে আমাকে পাগল মনে করিল কি না জানি না, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমার স্মরণ হইল যে, আমি ৺ অমুকচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত অমুক নাথ বটে, ইহাও মনে করিলাম যে, জগতের ভিতরে অথবা বাহিরে কোথাও অমূর্ত্ত ফোয়ারা নিত্যকাল উৎসারিত ও অদৃশ্য অঙ্গুলির আঘাতে কোন মায়া-সেতারে অনন্ত রাগিণী ধ্বনিত হইতেছে কি না তাহা আমাদের মহাকবি এবং কবিবরেরাই বলিতে পারেন কিন্তু এ কথা নিশ্চয় সত্য যে আমি বরীচের হাটে তূলার মাশুল আদায় করিয়া মাসে সাড়ে চারশো টাকা বেতন লইয়া থাকি। তখন আবার আমার পূর্ব্বক্ষণের অদ্ভুত মোহ স্মরণ করিয়া কেরোসীন-প্রদীপ্ত ক্যাম্প টেবিলের কাছে খবরের কাগজ লইয়া সকৌতুকে হাসিতে লাগিলাম।

খবরের কাগজ পড়িয়া এবং মোগ্‌লাই খানা খাইয়া একটি ক্ষুদ্র কোণের ঘরে প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া বিছানায় গিয়া শয়ন করিলাম। আমার সম্মুখবর্ত্তী খোলা জানালার ভিতর দিয়া অন্ধকার বনবেষ্টিত অরালী পর্ব্বতের ঊর্দ্ধদেশে একটি অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র সহস্র কোটী যোজন দূর আকাশ হইতে সেই অতি তুচ্ছ ক্যাম্পখাটের উপর শ্রীযুক্ত মাশুল-কালেক্টরকে এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিল,—ইহাতে আমি বিস্ময় ও কৌতুক অনুভব করিতে করিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম বলিতে পারি না। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম তাহাও জানি না। সহসা এক সময় শিহরিয়া জাগিয়া উঠিলাম;—ঘরে যে কোন শব্দ হইয়াছিল তাহা নহে, কোন যে লোক প্রবেশ করিয়াছিল তাহাও দেখিতে পাইলাম না। অন্ধকার পর্ব্বতের উপর হইতে অনিমেষ নক্ষত্রটি অস্তমিত হইয়াছে এবং কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণচন্দ্রালোক অনধিকারসঙ্কুচিত ম্লানভাবে আমার বাতায়ন-পথে প্রবেশ করিয়াছে।

কোন লোককেই দেখিলাম না তবু যেন আমার স্পষ্ট মনে হইল কে এক জন আমাকে আস্তে আস্তে ঠেলিতেছে। আমি জাগিয়া উঠিতেই সে কোন কথা না বলিয়া কেবল যেন তাহার অঙ্গুরীখচিত পাঁচ অঙ্গুলির ইঙ্গিতে অতি সাবধানে তাহার অনুসরণ আদেশ করিল।

আমি অত্যন্ত চুপি চুপি উঠিলাম। যদিও সেই শতকক্ষপ্রকোষ্ঠময় প্রকাণ্ড শূন্যতাময়, নিদ্রিত ধ্বনি এবং সজাগ প্রতিধ্বনিময় বৃহৎ প্রাসাদে আমি ছাড়া আর জনপ্রাণীও ছিল না তথাপি পদে পদে ভয় হইতে লাগিল পাছে কেহ জাগিয়া উঠে। প্রাসাদের অধিকাংশ ঘর রুদ্ধ থাকিত, এবং সে সকল ঘরে আমি কখন যাই নাই।

সে রাত্রে নিঃশব্দপদক্ষেপে সংযত নিশ্বাসে সেই অদৃশ্য আহ্বানরূপিণীর অনুসরণ করিয়া আমি যে কোথায় যাইতেছিলাম আজ তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি না। কত সঙ্কীর্ণ অন্ধকার পথ, কত দীর্ঘ বারান্দা, কত গম্ভীর নিস্তব্ধ সুবৃহৎ সভাগৃহ, কত রুদ্ধবায়ু ক্ষুদ্র গোপন কক্ষ পার হইয়া যাইতে লাগিলাম তাহার ঠিকানা নাই।

আমার অদৃশ্য দূতীটিকে যদিও চক্ষে দেখিতে পাই নাই, তথাপি তাহার মূর্ত্তি আমার মনের অগোচর ছিল না। আরব রমণী, ঝোলা আস্তিনের ভিতর দিয়া শ্বেতপ্রস্তর-রচিতবৎ কঠিন নিটোল হস্ত দেখা যাইতেছে, টুপির প্রান্ত হইতে মুখের উপরে একটি সূক্ষ্ম বসনের আবরণ পড়িয়াছে, কটিবন্ধে একটি বাঁকা ছুরি বাঁধা।

আমার মনে হইল, আরব্য উপন্যাসের একাধিক সহস্র রজনীর একটি রজনী আজ উপন্যাসলোক হইতে উড়িয়া আসিয়াছে। আমি যেন নিশীথে সুপ্তিমগ্ন বোগ্‌দাদের নির্ব্বাপিত-দীপ সঙ্কীর্ণ পথে কোন এক সঙ্কটশঙ্কিল অভিসারে যাত্রা করিয়াছি।

অবশেষে আমার দূতী একটি ঘননীল পর্দ্দার সম্মুখে সহসা থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া যেন নিম্নে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল। নিম্নে কিছুই ছিল না, কিন্তু ভয়ে আমার বক্ষের রক্ত স্তম্ভিত হইয়া গেল। আমি অনুভব করিলাম, সেই পর্দ্দার সম্মুখে ভূমিতলে কিংখাবের সাজপরা একটি ভীষণ কাফ্রি খোজা কোলের উপর খোলা তলোয়ার লইয়া দুই পা ছড়াইয়া দিয়া বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে। দূতী লঘুগতিতে তাহার দুই পা ডিঙ্গাইয়া পর্দ্দার এক প্রান্তদেশ তুলিয়া ধরিল।

ভিতর হইতে একটি পারস্য গালিচা পাতা ঘরের কিয়দংশ দেখা গেল। তক্তের উপরে কে বসিয়া আছে দেখা গেল না—কেবল জাফ্রান রঙের স্ফীত পায়জামার নিম্নভাগে জরির চটি পরা দুইখানি ক্ষুদ্র সুন্দর চরণ গোলাপী মখমল্ আসনের উপর অলস-ভাবে স্থাপিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। মেজের একপার্শ্বে একটি নীলাভ স্ফটিক পাত্রে কতকগুলি আপেল, নাশ্‌পাতী, নারাঙ্গী এবং প্রচুর আঙুরের গুচ্ছ সজ্জিত রহিয়াছে এবং তাহার পার্শ্বে দুইটি ছোট পেয়ালা ও একটি স্বর্ণাভ মদিরার কাচপাত্র অতিথির জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। ঘরের ভিতর হইতে একটা অপূর্ব্ব ধূপের একপ্রকার মাদক সুগন্ধি ধূম্র আসিয়া আমাকে বিহ্বল করিয়া দিল।

আমি কম্পিত বক্ষে সেই খোজার প্রসারিত পদদ্বয় যেমন লঙ্ঘন করিতে গেলাম, অমনি সে চমকিয়া জাগিয়া উঠিল—তাহার কোলের উপর হইতে তলোয়ার পাথরের মেজে শব্দ করিয়া পড়িয়া গেল।

সহসা একটা বিকট চীৎকার শুনিয়া চমকিয়া দেখিলাম, আমার সেই ক্যাম্প্ খাটের উপরে ঘর্ম্মাক্তকলেবরে বসিয়া আছি—ভোরের আলোয় কৃষ্ণপক্ষের খণ্ড-চাঁদ জাগরণক্লিষ্ট রোগীর মত পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেছে—এবং আমাদের পাগ্‌লা মেহের আলি তাহার প্রাত্যহিক প্রথা অনুসারে প্রত্যুষের জনশূন্য পথে "তফাৎ

যাও” “তফাৎ যাও” করিয়া চীৎকার করিতে করিতে চলিয়াছে।

এইরূপে আমার আরব্য উপন্যাসের এক-রাত্রি অকস্মাৎ শেষ হইল—কিন্তু এখনো এক সহস্র রজনী বাকি আছে।

আমার দিনের সহিত রাত্রের ভারি একটা বিরোধ বাধিয়া গেল। দিনের বেলায় শ্রান্ত ক্লান্তদেহে কর্ম্ম করিতে যাইতাম, এবং শূন্যস্বপ্নময়ী মোহময়ী মায়াবিনী রাত্রিকে অভিসম্পাত করিতে থাকিতাম--আবার সন্ধ্যার পরে আমার দিনের বেলাকার কর্ম্মবদ্ধ অস্তিত্বকে অত্যন্ত তুচ্ছ, মিথ্যা এবং হাস্যকর বলিয়া বোধ হইত।

সন্ধ্যার পরে আমি একটা নেশার জালের মধ্যে বিহ্বলভাবে জড়াইয়া পড়িতাম। শত শত বৎসর পূর্ব্বেকার কোন এক অলিখিত ইতিহাসের অন্তর্গত আর একটা অপূর্ব্ব ব্যক্তি হইয়া উঠিতাম, তখন আর বিলাতী খাটো কোর্ত্তা, এবং আঁট প্যাণ্টলুনে আমাকে মানাইত না। তখন আমি মাথায় এক লাল মখমলের ফেজ্ তুলিয়া, ঢিলা পায়জামা, ফুলকাটা কাবা এবং রেশমের দীর্ঘ চোগা পরিয়া রঙীন্ রুমালে আতর মাখিয়া বহুযত্নে সাজ করিতাম এবং সিগারেট্ ফেলিয়া দিয়া গোলাপজলপূর্ণ বহুকুণ্ডলায়িত বৃহৎ আল্‌বোলা লইয়া এক উচ্চগদিবিশিষ্ট বড় কেদারায় বসিতাম। যেন রাত্রে কোন এক অপূর্ব্ব প্রিয়সম্মিলনের জন্য পরমাগ্রহে প্রস্তুত হইয়া থাকিতাম।

তাহার পর অন্ধকার যতই ঘনীভূত হইত ততই কি যে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতে থাকিত তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। ঠিক যেন একটা চমৎকার গল্পের কতকগুলি ছিন্ন অংশ বসন্তের আকস্মিক বাতাসে এই বৃহৎ প্রাসাদের বিচিত্র ঘরগুলির মধ্যে উড়িয়া বেড়াইত। খানিকটা দূর পর্য্যন্ত পাওয়া যাইত তাহার পরে আর শেষ দেখা যাইত না। আমিও সেই ঘূর্ণ্যমান বিচ্ছিন্ন অংশগুলির অনুসরণ করিয়া সমস্ত রাত্রি ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতাম।

এই খণ্ডস্বপ্নের আবর্ত্তের মধ্যে,—এই কচিৎ হেনার গন্ধ, কচিৎ সেতারের শব্দ, কচিৎ সুরভি জলশীকরমিশ্র বায়ুর হিল্লোলের মধ্যে একটি নায়িকাকে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎশিখার মত চকিতে দেখিতে পাইতাম। তাহারি জাফ্‌রান্ রঙের পায়জামা এবং দুটি শুভ্র রক্তিম কোমল পায়ে বক্রশীর্ষ জরির চটিপরা, বক্ষে অতিপিনদ্ধ জরির ফুলকাটা কাঁচলি আবদ্ধ, মাথায় একটি লাল টুপি এবং তাহা হইতে সোণার ঝালর ঝুলিয়া তাহার শুভ্র ললাট এবং কপোল বেষ্টন করিয়াছে।

সে আমাকে পাগল করিয়া দিয়াছিল। আমি তাহারই অভিসারে প্রতিরাত্রে নিদ্রার রসাতলরাজ্যে স্বপ্নের জটিলপথসঙ্কুল মায়াপুরীর মধ্যে গলিতে গলিতে কক্ষে কক্ষে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছি।

এক একদিন সন্ধ্যার সময় বড় আয়নার দুই দিকে দুই বাতি জ্বালাইয়া যত্নপূর্ব্বক শাহজাদার মত সাজ করিতেছি এমন সময় হঠাৎ দেখিতে পাইতাম আয়নায় আমার প্রতিবিম্বের পার্শ্বে ক্ষণিকের জন্য সেই তরুণী ইরাণীর ছায়া আসিয়া পড়িল;—পালকের মধ্যে গ্রীবা বাঁকাইয়া, তাহার ঘনকৃষ্ণ বিপুল চক্ষুতারকায় সুগভীর আবেগতীব্র বেদনাপূর্ণ আগ্রহকটাক্ষপাত করিয়া, সরস সুন্দর বিম্বাধরে একটি অস্ফুট ভাষার আভাসমাত্র দিয়া, লঘু ললিত নৃত্যে আপন যৌবনপুষ্পিত দেহলতাটিকে দ্রুতবেগে ঊর্দ্ধাভিমুখে আবর্ত্তিত করিয়া, মুহূর্ত্তকালের মধ্যে বেদনা বাসনা ও বিভ্রমের, হাস্য কটাক্ষ

ও ভূষণজ্যোতির স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি করিয়া দিয়া দর্পণেই মিলাইয়া গেল। গিরিকাননের সমস্ত সুগন্ধ লুণ্ঠন করিয়া একটা উদ্দাম বায়ুর উচ্ছ্বাস আসিয়া আমার দুইটা বাতি নিবাইয়া দিত ;—আমি সাজসজ্জা ছাড়িয়া দিয়া বেশগৃহের প্রান্তবর্ত্তী শয্যাতলে পুলকিতদেহে মুদ্রিতনেত্রে শয়ন করিয়া থাকিতাম—আমার চারিদিকে সেই বাতাসের মধ্যে, সেই আরালী গিরিকুঞ্জের সমস্ত মিশ্রিত সৌরভের মধ্যে যেন অনেক আদর অনেক চুম্বন অনেক কোমল করস্পর্শ নিভৃত অন্ধকার পূর্ণ করিয়া ভাসিয়া বেড়াইত, কাণের কাছে অনেক কলগুঞ্জন শুনিতে পাইতাম, আমার কপালের উপর সুগন্ধ নিশ্বাস আসিয়া পড়িত, এবং আমার কপোলে একটি মৃদুসৌরভরমণীয় সুকোমল ওড়না বারংবার উড়িয়া উড়িয়া আসিয়া স্পর্শ করিত। অল্পে অল্পে যেন একটি মোহিনী সর্পিণী তাহার মাদক বেষ্টনে আমার সর্ব্বাঙ্গ বাঁধিয়া ফেলিত, আমি গাঢ় নিশ্বাস ফেলিয়া অসাড় দেহে সুগভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িতাম।

একদিন অপরাহ্নে আমি ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইব সংকল্প করিলাম—কে আমাকে নিষেধ করিতে লাগিল জানি না—কিন্তু সে দিন নিষেধ মানিলাম না। একটা কাষ্ঠদণ্ডে আমার সাহেবী হ্যাট্ এবং খাটো কোর্ত্তা দুলিতেছিল, পাড়িয়া লইয়া পরিবার উপক্রম করিতেছি এমন সময় শুস্তানদীর বালী এবং আরালী পর্ব্বতের শুষ্ক পল্লবরাশির ধ্বজা তুলিয়া হঠাৎ একটা প্রবল ঘূর্ণাবাতাস আমার সেই কোর্ত্তা এবং টুপি ঘুরাইতে ঘুরাইতে লইয়া চলিল এবং একটা অত্যন্ত সুমিষ্ট কলহাস্য সেই হাওয়ার সঙ্গে ঘুরিতে ঘুরিতে কৌতুকের সমস্ত পর্দ্দায় পর্দ্দায় আঘাত করিতে করিতে উচ্চ হইতে উচ্চতর সপ্তকে উঠিয়া সূর্য্যাস্তলোকের কাছে গিয়া মিলাইয়া গেল।

সে দিন আর ঘোড়ায় চড়া হইল না এবং তাহার পরদিন হইতে সেই কৌতুকাবহ খাটো কোর্ত্তা এবং সাহেবী হ্যাট্‌পরা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছি।

আবার সেই দিন অর্দ্ধরাত্রে বিছানার মধ্যে উঠিয়া বসিয়া শুনিতে পাইলাম, কে যেন গুমরিয়া গুমরিয়া বুক ফাটিয়া ফাটিয়া কাঁদিতেছে—যেন আমার খাটের নীচে, মেঝের নীচে এই বৃহৎ প্রাসাদের পাষাণভিত্তির তলবর্ত্তী একটা আর্দ্র অন্ধকার গোরের ভিতর হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও—কঠিন মায়া, গভীর নিদ্রা নিষ্ফল স্বপ্নের সমস্ত দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তুমি আমাকে ঘোড়ায় তুলিয়া তোমার বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া, বনের ভিতর দিয়া পাহাড়ের উপর দিয়া নদী পার হইয়া তোমাদের সূর্য্যালোকিত ঘরের মধ্যে আমাকে লইয়া যাও! আমাকে উদ্ধার কর!

আমি কে! আমি কেমন করিয়া উদ্ধার করিব! আমি এই ঘূর্ণ্যমান পরিবর্ত্তমান স্বপ্নপ্রবাহের মধ্য হইতে কোন্ মজ্জমানা কামনাসুন্দরীকে তীরে টানিয়া তুলিব! তুমি কবে ছিলে, কোথায় ছিলে হে দিব্যরূপিণী! তুমি কোন্ শীতল উৎসের তীরে খর্জ্জুরকুঞ্জের ছায়ায় কোন্ গৃহহীনা মরুবাসিনীর কোলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে! তোমাকে কোন বেদুয়ীন্ দস্যু বনলতা হইতে পুষ্পকোরকের মত মাতৃক্রোড় হইতে ছিন্ন করিয়া বিদ্যুৎগামী অশ্বের উপর চড়াইয়া জলন্ত বালুকারাশি পার হইয়া কোন্ রাজপুরীর দাসীহাটে বিক্রয়ের জন্য লইয়া গিয়াছিল! সেখানে কোন্ বাদ্‌শাহের ভৃত্য তোমার নববিকশিত সলজ্জকাতর

যৌবনশোভা নিরীক্ষণ করিয়া স্বর্ণমুদ্রা গণিয়া দিয়া, সমুদ্র পার হইয়া তোমাকে সোণার শিবিকায় বসাইয়া প্রভুগৃহের অন্তঃপুরে উপহার দিয়াছিল। সেখানে সে কি ইতিহাস! সেই সারঙ্গীর সঙ্গীত, নূপুরের নিক্কণ এবং সিরাজের স্বর্ণমদিরার মধ্যে মধ্যে ছুরির ঝলক, বিষের জ্বালা, কটাক্ষের আঘাত! কি অসীম ঐশ্বর্য্য, কি অনন্ত কারাগার! দুইদিকে দুই দাসী বলয়ের হীরকে বিজুলি খেলাইয়া চামর দুলাইতেছে শাহেন্‌শা বাদ্‌শা শুভ্র চরণের তলে মণিমুক্তাখচিত পাদুকার কাছে লুটাইতেছে;—বাহিরের দ্বারের কাছে যমদূতের মত হাব্‌সী, দেবদূতের মত সাজ করিয়া, খোলা তলোয়ার হাতে দাঁড়াইয়া। তাহার পরে সেই রক্তকলুষিত ঈর্ষা-ফেনিল ষড়যন্ত্রসঙ্কুল ভীষণোজ্জ্বল ঐশ্বর্য্যপ্রবাহে ভাসমান হইয়া, তুমি মরুভূমির পুষ্পমঞ্জরী কোন্ নিষ্ঠুর মৃত্যুর মধ্যে অবতীর্ণ অথবা কোন্ নিষ্ঠুরতর মহিমাতটে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিলে?

এমন সময় হঠাৎ সেই পাগলা মেহের আলি চীৎকার করিয়া উঠিল—"তফাৎ যাও, তফাৎ যাও! সব ঝুঁট্ হ্যায় সব ঝুঁট্ হ্যায়!" চাহিয়া দেখিলাম, সকাল হইয়াছে, চাপরাশি ডাকের চিঠিপত্র লইয়া আমার হাতে দিল এবং পাচক আসিয়া সেলাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল আজ কিরূপ খানা প্রস্তুত করিতে হইবে।

আমি কহিলাম, না, আর এ বাড়িতে থাকা হয় না। সেই দিনই আমার জিনিষপত্র তুলিয়া আপিস-ঘরে গিয়া উঠিলাম। আপিসের বৃদ্ধ কেরাণী করীম্ খাঁ আমাকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিল। আমি তাহার হাসিতে বিরক্ত হইয়া কোন উত্তর না করিয়া কাজ করিতে লাগিলাম।

যত বিকাল হইয়া আসিতে লাগিল ততই অন্যমনস্ক হইতে লাগিলাম মনে হইতে লাগিল এখনি কোথায় যাইবার আছে—তুলার হিসাব পরীক্ষার কাজটা নিতান্ত অনাবশ্যক মনে হইল, নিজামের নিজামৎও আমার কাছে বেশী কিছু বোধ হইল না—যাহা কিছু বর্ত্তমান, যাহা কিছু আমার চারি দিকে চলিতেছে ফিরিতেছে খাটিতেছে খাইতেছে সমস্তই আমার কাছে অত্যন্ত দীন, অর্থহীন, অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইল।

আমি কলম ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, বৃহৎ খাতা বন্ধ করিয়া তৎক্ষণাৎ টম্‌টম্ চড়িয়া ছুটিলাম। দেখিলাম, টম্‌টম্ ঠিক গোধূলি মুহূর্ত্তে আপনিই সেই পাষাণপ্রাসাদের দ্বারের কাছে গিয়া থামিল। দ্রুতপদে সিঁড়িগুলি উত্তীর্ণ হইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

আজ সমস্ত নিস্তব্ধ। অন্ধকার ঘরগুলি যেন রাগ করিয়া মুখ ভার করিয়া আছে। অনুতাপে আমার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল কিন্তু কাহাকে জানাইব, কাহার নিকট মার্জ্জনা চাহিব খুঁজিয়া পাইলাম না। আমি শূন্যমনে অন্ধকার ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। ইচ্ছা করিতে লাগিল একখানা যন্ত্র হাতে লইয়া কাহাকেও উদ্দেশ করিয়া গান গাহি, বলি, হে বহ্নি! যে পতঙ্গ তোমাকে ফেলিয়া পালাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, সে আবার মরিবার জন্য আসিয়াছে! এবার তাহাকে মার্জ্জনা কর, তাহার দুই পক্ষ দগ্ধ করিয়া দাও, তাহাকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেল!

হঠাৎ উপর হইতে আমার কপালে দুই ফোঁটা অশ্রুজল পড়িল। সে দিন অরালী পর্ব্বতের চূড়ায় ঘনঘোর মেঘ করিয়া আসিয়াছিল। অন্ধকার অরণ্য এবং শুস্তার মসীবর্ণ জল একটা ভীষণ প্রতীক্ষায় স্থির হইয়াছিল। জলস্থল আকাশ সহসা শিহরিয়া উঠিল; এবং

অকস্মাৎ একটা বিদ্যুদ্দন্তবিকশিত ঝড় শৃঙ্খলচ্ছিন্ন উন্মাদের মত পথহীন সুদূর বনের ভিতর দিয়া আর্ত্ত চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল। প্রাসাদের বড় বড় শূন্য ঘরগুলা সমস্ত দ্বার আছড়াইয়া তীব্র বেদনায় হুহু করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আজ ভৃত্যগণ সকলেই আপিস্-ঘরে ছিল, এখানে আলো জ্বালাইবার কেহ ছিল না। সেই মেঘাচ্ছন্ন অমাবস্যার রাত্রে গৃহের ভিতরকার নিকষকৃষ্ণ অন্ধকারের মধ্যে আমি স্পষ্ট অনুভব করিতে লাগিলাম—একজন রমণী পালঙ্কের তলদেশে গালিচার উপরে উপুড় হইয়া পড়িয়া দুই দৃঢ় বদ্ধমুষ্টিতে আপনার আলুলায়িত কেশজাল টানিয়া ছিঁড়িতেছে, তাহার গৌরবর্ণ ললাট দিয়া রক্ত ফাটিয়া পড়িতেছে, কখনও সে শুষ্ক তীব্র অট্টহাস্যে হাহা করিয়া হাসিয়া উঠিতেছে, কখনও ফুলিয়া ফুলিয়া ফাটিয়া ফাটিয়া কাঁদিতেছে, দুই হস্তে বক্ষের কাঁচুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া অনাবৃত বক্ষে আঘাত করিতেছে, মুক্ত বাতায়ন দিয়া বাতাস গর্জ্জন করিয়া আসিতেছে এবং মুষলধারে বৃষ্টি আসিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিয়া দিতেছে।

সমস্ত রাত্রি ঝড়ও থামে না ক্রন্দনও থামে না। আমি নিষ্ফল পরিতাপে ঘরে ঘরে অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কেহ কোথাও নাই, কাহাকে সান্ত্বনা করিব? এই প্রচণ্ড অভিমান কাহার? এই অশান্ত আক্ষেপ কোথা হইতে উত্থিত হইতেছে?

পাগল চীৎকার করিয়া উঠিল, "তফাৎ যাও, তফাৎ যাও! সব ঝুঁট হ্যায়, সব ঝুঁট হ্যায়!"

দেখিলাম ভোর হইয়াছে এবং মেহেরআলি এই ঘোর দুর্য্যোগের দিনেও যথানিয়মে প্রাসাদ প্রদক্ষিণ করিয়া তাহার অভ্যস্ত চীৎকার করিতেছে। হঠাৎ আমার মনে হইল, হয় ত ঐ মেহেরআলিও আমার মত এক সময় এই প্রাসাদে বাস করিয়াছিল, এখন পাগল হইয়া বাহির হইয়াও এই পাষাণ রাক্ষসের মোহে আকৃষ্ট হইয়া প্রত্যহ প্রত্যূষে প্রদক্ষিণ করিতে আসে।

আমি তৎক্ষণাৎ সেই বৃষ্টিতে পাগলার নিকট ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মেহেরআলি, ক্যা ঝুঁট হ্যায়রে?"

সে আমার কথায় কোন উত্তর না করিয়া আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া অজগরের কবলের চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণমান মোহাবিষ্ট পক্ষীর ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে বাড়ির চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। কেবল প্রাণপণে নিজেকে সতর্ক করিবার জন্য বারংবার বলিতে লাগিল—"তফাৎ যাও, তফাৎ যাও, সব ঝুঁট হ্যায়, সব ঝুঁট হ্যায়!"

আমি সেই জলঝড়ের মধ্যে পাগলের মত আপিসে গিয়া করীম্‌খাঁকে ডাকিয়া বলিলাম, ইহার অর্থ কি আমায় খুলিয়া বল।

বৃদ্ধ যাহা কহিল তাহার মর্ম্মার্থ এই, এক সময় ঐ প্রাসাদে অনেক অতৃপ্ত বাসনা, অনেক উন্মত্ত সম্ভোগের শিখা আলোড়িত হইত—সেই সকল চিত্তদাহে, সেই সকল নিষ্ফল কামনার অভিশাপে এই প্রাসাদের প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড ক্ষুধার্ত্ত তৃষার্ত্ত হইয়া আছে, সজীব মানুষ পাইলে তাহাকে লালায়িত পিশাচীর মত খাইয়া ফেলিতে চায়। যাহারা ত্রিরাত্রি ঐ প্রাসাদে বাস করিয়াছে তাহাদের মধ্যে কেবল মেহেরআলি পাগল হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে, এ পর্য্যন্ত আর কেহ তাহার গ্রাস এড়াইতে পারে নাই।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার উদ্ধারের কি কোন পথ নাই?

বৃদ্ধ কহিল, একটি মাত্র উপায় আছে তাহা অত্যন্ত দুরূহ। তাহা তোমাকে বলিতেছি—কিন্তু তৎপূর্ব্বে ঐ গুলবাগের একটি ইরাণী ক্রীতদাসীর পুরাতন ইতিহাস বলা আবশ্যক। তেমন আশ্চর্য্য এবং তেমন হৃদয়বিদারণ ঘটনা সংসারে আর কখন ঘটে নাই।

এমন সময় কুলিরা আসিয়া খবর দিল—গাড়ি আসিতেছে। এত শীঘ্র? তাড়াতাড়ি বিছানাপত্র বাঁধিতে বাঁধিতে গাড়ি আসিয়া পড়িল। সে গাড়ির ফার্ষ্ট ক্লাসে একজন সুপ্তোত্থিত ইংরাজ জান্‌লা হইতে মুখ বাড়াইয়া ষ্টেশনের নাম পড়িবার চেষ্টা করিতেছিল, আমাদের সহযাত্রী বন্ধুটিকে দেখিয়া ই "হ্যালো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল এবং নিজের গাড়িতে তুলিয়া লইল। আমরা সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিলাম। বাবুটি কে খবর পাইলাম না, গল্পেরও শেষ শোনা হইল না।

আমি বলিলাম, লোকটা আমাদিগকে বোকার মত দেখিয়া কৌতুক করিয়া ঠকাইয়া গেল—গল্পটা আগাগোড়া বানানো।

এই তর্কের উপলক্ষে আমার থিয়সফিষ্ট আত্মীয়টির সহিত আমার জন্মের মত বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেছে।

অনধিকার প্রবেশ।

একদা প্রাতঃকালে পথের ধারে দাঁড়াইয়া এক বালক আর এক বালকের সহিত একটি অসমসাহসিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বাজি রাখিয়াছিল। ঠাকুর বাড়ির মাধবী-বিতান হইতে ফুল তুলিয়া আনিতে পারিবে কি না ইহাই লইয়া তর্ক। একটি বালক বলিল পারিব, আর একটি বালক বলিল কখনই পারিবে না।

কাজটি শুনিতে সহজ অথচ করিতে কেন সহজ নহে তাহার বৃত্তান্ত আর একটু বিস্তারিত করিয়া বলা আবশ্যক।

পরলোকগত মাধবচন্দ্র তর্কবাচস্পতির বিধবা স্ত্রী জয়কালী দেবী এই রাধানাথ জীউর মন্দিরের অধিকারিণী। অধ্যাপক মহাশয় টোলে যে তর্কবাচস্পতি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন পত্নীর নিকটে একদিনের জন্যও সে উপাধি সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই। কোন কোন পণ্ডিতের মতে উপাধির সার্থকতা ঘটিয়াছিল, কারণ তর্ক এবং বাক্য সমস্তই তাঁহার পত্নীর অংশে পড়িয়াছিল, তিনি পতিরূপে তাহার সম্পূর্ণ ফলভোগ করিয়াছিলেন।

সত্যের অনুরোধে বলিতে হইবে জয়কালী অধিক কথা কহিতেন না—কিন্তু অনেক সময় দুটি কথায়, এমন কি, নীরবে অতি বড় প্রবল মুখবেগও বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন।

জয়কালী দীর্ঘাকার, দৃঢ়শরীর, তীক্ষ্ণনাসা, প্রখরবুদ্ধি স্ত্রীলোক। তাঁহার স্বামী বর্ত্তমানে তাঁহাদের দেবত্র সম্পত্তি নষ্ট হইবার যো হইয়াছিল। বিধবা তাহার সমস্ত বাকি বকেয়া আদায়, সীমা সরহদ্দ স্থির এবং বহুকালের

বেদখল উদ্ধার করিয়া সমস্ত পরিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাপ্য হইতে কেহ তাঁহাকে এক কড়ি বঞ্চিত করিতে পারিত না।

এই স্ত্রীলোকটির প্রকৃতির মধ্যে বহুল পরিমাণে পৌরুষের অংশ থাকাতে তাঁহার যথার্থ সঙ্গী কেহ ছিল না। স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে ভয় করিত। পরনিন্দা, ছোট কথা বা নাকীকান্না তাঁহার অসহ্য ছিল। পুরুষেরাও তাঁহাকে ভয় করিত; কারণ, পল্লিবাসী ভদ্র পুরুষদের চণ্ডীমণ্ডপগত অগাধ আলস্যকে তিনি এক প্রকার নীরব ঘৃণাপূর্ণ তীক্ষ্ণ কটাক্ষের দ্বারা ধিক্কার করিয়া যাইতে পারিতেন যাহা তাহাদের স্থূল জড়ত্ব ভেদ করিয়াও অন্তরে প্রবেশ করিত।

প্রবলরূপে ঘৃণা করিবার এবং সে ঘৃণা প্রবলরূপে প্রকাশ করিবার অসাধারণ ক্ষমতা এই প্রৌঢ়া বিধবাটির ছিল। বিচারে যাহাকে অপরাধী করিতেন তাহাকে তিনি কথায় এবং বিনা কথায়, ভাবে এবং ভঙ্গীতে একেবারে দগ্ধ করিয়া যাইতে পারিতেন।

পল্লীর সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্মে বিপদে সম্পদে তাঁহার নিরলস হস্ত ছিল। সর্ব্বত্রই তিনি নিজের একটি গৌরবের স্থান বিনা চেষ্টায় অতি সহজেই অধিকার করিয়া লইতেন। যেখানে তিনি উপস্থিত থাকিতেন সেখানে তিনিই যে সকলের প্রধানপদে, সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের অথবা উপস্থিত কোন ব্যক্তির মনে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিত না।

রোগীর সেবায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন, কিন্তু রোগী তাঁহাকে যমের মত ভয় করিত। পথ্য বা নিয়মের লেশমাত্র লঙ্ঘন হইলে তাঁহার ক্রোধানল রোগের তাপ অপেক্ষা রোগীকে অধিক উত্তপ্ত করিয়া তুলিত।

এই দীর্ঘাকার কঠিন বিধবাটি বিধাতার কঠোর নিয়মদণ্ডের ন্যায় পল্লীর মস্তকের উপর উদ্যত ছিলেন; কেহ তাঁহাকে ভালবাসিতে অথবা অবহেলা করিতে সাহস করিত না। পল্লীর সকলের সঙ্গেই তাঁহার যোগ ছিল অথচ তাঁহার মত অত্যন্ত একাকিনী কেহ ছিল না।

বিধবা নিঃসন্তান ছিলেন। পিতৃমাতৃহীন দুইটি ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার গৃহে মানুষ হইত। পুরুষ অভিভাবক-অভাবে তাহাদের যে, কোন প্রকার শাসন ছিল না এবং স্নেহান্ধ পিসিমার আদরে তাহারা যে নষ্ট হইয়া যাইতেছিল এমন কথা কেহ বলিতে পারিত না। তাহাদের মধ্যে বড়টির বয়স আঠারো হইয়াছিল। মাঝে মাঝে তাহার বিবাহের প্রস্তাবও আসিত এবং পরিণয়বন্ধন সম্বন্ধে বালকটির চিত্তও উদাসীন ছিল না। কিন্তু পিসিমা তাহার সেই সুখবাসনায় একদিনের জন্যও প্রশ্রয় দেন নাই। অন্য স্ত্রীলোকের ন্যায় কিশোর নব দম্পতির নব প্রেমোদ্গম দৃশ্য তাঁহার কল্পনায় অত্যন্ত উপভোগ্য মনোরম বলিয়া প্রতীত হইত না। বরং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বিবাহ করিয়া অন্য ভদ্র গৃহস্থের ন্যায় আলস্যভরে ঘরে বসিয়া পত্নীর আদরে প্রতিদিন স্ফীত হইতে থাকিবে এ সম্ভাবনা তাঁহার নিকট নিরতিশয় হেয় বলিয়া প্রতীত হইত। তিনি কঠিনভাবে বলিতেন, পুলিন আগে উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করুক্ তার পরে বধূ ঘরে আসিবে। পিসিমার মুখের সেই কঠোর বাক্যে প্রতিবেশিনীদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত।

ঠাকুরবাড়িটি জয়কালীর সর্ব্বাপেক্ষা যত্নের ধন ছিল। ঠাকুরের শয়ন বসন স্নানাহারের তিলমাত্র ত্রুটি হইতে পারিত না। পূজক ব্রাহ্মণ দুটি দেবতার অপেক্ষা এই একটি মানবীকে অনেক বেশী ভয় করিত। পূর্ব্বে এক সময় ছিল যখন দেবতার বরাদ্দ দেবতা পুরা পাইতেন না। কারণ, পূজক ঠাকুরের আর একটি

পূজার প্রতিমা গোপন মন্দিরে ছিল। তাহার নাম ছিল নিস্তারিণী। গোপনে ঘৃত দুগ্ধ ছানা ময়দার নৈবেদ্য স্বর্গে নরকে ভাগাভাগি হইয়া যাইত। কিন্তু আজ কাল জয়কালীর শাসনে পূজার ষোলআনা অংশই ঠাকুরের ভোগে আসিতেছে—উপদেবতাগণকে অন্যত্র জীবিকার অন্য উপায় অন্বেষণ করিতে হইয়াছে।

বিধবার যত্নে ঠাকুরবাড়ির প্রাঙ্গণটি পরিষ্কার তকতক্ করিতেছে—কোথাও একটি তৃণমাত্র নাই। একপার্শ্বে মঞ্চ অবলম্বন করিয়া মাধবীলতা উঠিয়াছে, তাহার শুষ্কপত্র পড়িবামাত্রে জয়কালী তাহা তুলিয়া লইয়া বাহিরে ফেলিয়া দেন। ঠাকুরবাড়িতে পারিপাট্য পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইলে বিধবা তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। পাড়ার ছেলেরা পূর্ব্বে লুকাচুরি খেলা উপলক্ষে এই প্রাঙ্গণের প্রান্তে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিত এবং মধ্যে মধ্যে পাড়ার ছাগশিশু আসিয়া মাধবীলতার বল্কলাংশ কিছু কিছু ভক্ষণ করিয়া যাইত। এখন আর সে সুযোগ নাই। পর্ব্বকাল ব্যতীত অন্য দিনে ছেলের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে পাইত না এবং ক্ষুধাতুর ছাগশিশুকে দণ্ডাঘাত খাইয়াই দ্বারের নিকট হইতে তারস্বরে আপন অজ-জননীকে আহ্বান করিতে করিতে ফিরিতে হইত।

অনাচারী ব্যক্তি পরমাত্মীয় হইলেও দেবালয়ের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে পারিত না। জয়কালীর একটি যবনকরপককুক্কুট মাংসলোলুপ ভগিনীপতি আত্মীয় সন্দর্শন উপলক্ষে গ্রামে উপস্থিত হইয়া মন্দির অঙ্গনে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন, জয়কালী তাহাতে ত্বরিত ও তীব্র আপত্তি প্রকাশ করাতে সহোদরা ভগিনীর সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল। এই দেবালয় সম্বন্ধে বিধবার এতই অতিরিক্ত অনাবশ্যক সতর্কতা ছিল যে, সাধারণের নিকট তাহা অনেকটা বাতুলতারূপে প্রতীয়মান হইত।

জয়কালী আর সর্ব্বত্রই কঠিন উন্নত স্বতন্ত্র, কেবল এই মন্দিরের সম্মুখে তিনি পরিপূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। এই বিগ্রহটির নিকট তিনি একান্তরূপে জননী পত্নী. দাসী—ইহার কাছে তিনি সতর্ক, সুকোমল, সুন্দর এবং সম্পূর্ণ অবনম্র। এই প্রস্তরের মূর্ত্তিটি তাঁহার নিগূঢ় নারীস্বভাবের একমাত্র চরিতার্থতার বিষয় ছিল। ইহাই তাঁহার স্বামী পুত্র তাঁহার সমস্ত সংসার।

ইহা হইতেই পাঠকেরা বুঝিবেন যে, যে বালকটি মন্দির প্রাঙ্গণ হইতে মাধবীমঞ্জরী আহরণ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল তাহার সাহসের সীমা ছিল না। সে জয়কালীর কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র নলিন। সে তাহার পিসিমাকে ভাল করিয়াই জানিত তথাপি তাহার দুর্দান্ত প্রকৃতি শাসনের বশ হয় নাই। যেখানে বিপদ সেখানেই তাহার একটা আকর্ষণ ছিল, এবং যেখানে শাসন সেখানেই লঙ্ঘন করিবার জন্য তাহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া থাকিত। জনশ্রুতি আছে বাল্যকালে তাহার পিসিমার স্বভাবটিও এইরূপ ছিল।

জয়কালী তখন মাতৃস্নেহমিশ্রিত ভক্তির সহিত ঠাকুরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দালানে বসিয়া একমনে মালা জপিতেছিলেন ?

বালকটি নিঃশব্দপদে পশ্চাৎ হইতে আসিয়া মাধবীতলায় দাঁড়াইল। দেখিল নিম্নশাখার ফুলগুলি পূজার জন্য নিঃশেষিত হইয়াছে। তখন অতি ধীরে ধীরে সাবধানে মঞ্চে আরোহণ করিল। উচ্চশাখায় দুটি একটী বিকচোন্মুখ কুঁড়ি দেখিয়া যেমন সে শরীর এবং বাহু প্রসারিত করিয়া তুলিতে যাইবে অমনি সেই

প্রবল চেষ্টার ভরে জীর্ণ মঞ্চ সশব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল। আশ্রিত লতা এবং বালক একত্র ভূমিসাৎ হইল।

জয়কালী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রটির কীর্ত্তি দেখিলেন। সবলে বাহু ধরিয়া তাহাকে মাটি হইতে তুলিলেন। আঘাত তাহার যথেষ্ট লাগিয়াছিল—কিন্তু সে আঘাতকে শাস্তি বলা যায় না, কারণ, তাহা অজ্ঞান জড়ের আঘাত। সেই জন্য পতিত বালকের ব্যথিত দেহে জয়কালীর সজ্ঞান শাস্তি মুহুর্মুহু সবলে বর্ষিত হইতে লাগিল। বালক একবিন্দু অশ্রুপাত না করিয়া নীরবে সহ্য করিল। তখন তাহার পিসিমা তাহাকে টানিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে রুদ্ধ করিলেন। তাহার সেদিনকার বৈকালিক আহার নিষিদ্ধ হইল।

আহার বন্ধ হইল শুনিয়া দাসী মোক্ষদা কাতরকণ্ঠে ছলছলনেত্রে বালককে ক্ষমা করিতে অনুনয় করিল। জয়কালীর হৃদয় গলিল না। ঠাকুরাণীর অজ্ঞাতসারে গোপনে ক্ষুধিত বালককে কেহ যে খাদ্য দিবে বাড়িতে এমন দুঃসাহসিক কেহ ছিল না।

বিধবা মঞ্চসংস্কারের জন্য লোক ডাকিতে পাঠাইয়া পুনর্ব্বার মালাহস্তে দালানে আসিয়া বসিলেন। মোক্ষদা কিছুক্ষণ পরে সভয়ে নিকটে আসিয়া কহিল, ঠাকুরমা, কাকাবাবু ক্ষুধায় কাঁদিতেছেন তাঁহাকে কিছু দুধ আনিয়া দিব কি?

জয়কালী অবিচলিত মুখে কহিলেন, "না।" মোক্ষদা ফিরিয়া গেল। অদূরবর্ত্তী কুটিরের গৃহ হইতে নলিনের করুণ ক্রন্দন ক্রমে ক্রোধের গর্জ্জনে পরিণত হইয়া উঠিল—অবশেষে অনেকক্ষণ পরে তাহার কাতরতার শ্রান্ত উচ্ছ্বাস থাকিয়া থাকিয়া জপনিযুক্ত পিসিমার কাণে আসিয়া ধ্বনিত হইতে লাগিল।

নলিনের আর্ত্তকণ্ঠ যখন পরিশ্রান্ত ও মৌনপ্রায় হইয়া আসিয়াছে এমন সময়ে আর একটি জীবের ভীত কাতর ধ্বনি নিকটে ধ্বনিত হইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে ধাবমান মনুষ্যের দূরবর্ত্তী চীৎকার শব্দ মিশ্রিত হইয়া মন্দিরের সম্মুখস্থ পথে একটা তুমুল কলরব উত্থিত হইল।

সহসা প্রাঙ্গণের মধ্যে একটা পদশব্দ শোনা গেল। জয়কালী পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন ভূপর্য্যস্ত মাধবীলতা আন্দোলিত হইতেছে।

সরোষ কণ্ঠে ডাকিলেন, "নলিন!"

কেহ উত্তর দিল না। বুঝিলেন অবাধ্য নলিন বন্দীশালা হইতে কোন ক্রমে পলায়ন করিয়া পুনরায় তাঁহাকে রাগাইতে আসিয়াছে।

তখন অত্যন্ত কঠিনভাবে অধরের উপরে ওষ্ঠ চাপিয়া বিধবা প্রাঙ্গণে নামিয়া আসিলেন।

লতাকুঞ্জের নিকট পুনরায় ডাকিলেন—নলিন!

উত্তর পাইলেন না। শাখা তুলিয়া দেখিলেন একটা অত্যন্ত মলিন শূকর প্রাণ ভয়ে ঘন পল্লবের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে।

যে লতাবিতান এই ইষ্টক প্রাচীরের মধ্যে বৃন্দাবিপিনের সংক্ষিপ্ত প্রতিরূপ; যাহার বিকশিত কুসুমমঞ্জরীর সৌরভ গোপীবৃন্দের সুগন্ধি নিশ্বাস স্মরণ করাইয়া দেয় এবং কালিন্দীতীরবর্ত্তী সুখবিহারের সৌন্দর্য্যস্বপ্ন জাগ্রৎ করিয়া তোলে—বিধবার সেই প্রাণাধিক যত্নের সুপবিত্র নন্দনভূমিতে অকস্মাৎ এই বীভৎস ব্যাপার ঘটিল।

পূজারি ব্রাহ্মণ লাঠিহস্তে তাড়া করিয়া আসিল।

জয়কালী তৎক্ষণাৎ নামিয়া আসিয়া

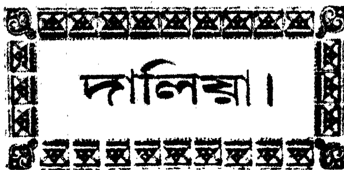
তাহাকে নিষেধ করিলেন এবং দ্রুতবেগে ভিতর হইতে মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

অনতিকাল পরেই সুরাপানে উন্মত্ত ডোমের দল মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া তাহাদের বলির পশুর জন্য চীৎকার করিতে লাগিল।

জয়কালী রুদ্ধদ্বারের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কহিলেন, যা বেটারা ফিরে যা! আমার মন্দির অপবিত্র করিস্‌নে!

ডোমের দল ফিরিয়া গেল। জয়কালী ঠাকুরাণী যে তাঁহার রাধানাথ জীউর মন্দিরের মধ্যে অশুচি জন্তুকে আশ্রয় দিবেন ইহা তাহারা প্রায় প্রত্যক্ষ দেখিয়াও বিশ্বাস করিতে পারিল না।

এই সামান্য ঘটনায় নিখিল জগতের সর্ব্ব-জীবের মহাদেবতা পরম প্রসন্ন হইলেন কিন্তু ক্ষুদ্র পল্লীর সমাজনামধারী অতি ক্ষুদ্র দেব-তাটি নিরতিশয় সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।



ভূমিকা।

পরাজিত শা সুজা ঔরঙ্গজীবের ভয়ে পলা-য়ন করিয়া আরাকান রাজের আতিথ্য গ্রহণ করেন। সঙ্গে তিন সুন্দরী কন্যা ছিল। আরা-কান রাজের ইচ্ছা হয় যুবরাজদের সহিত তাহা-দের বিবাহ দেন। সেই প্রস্তাবে শা সুজা নিতান্ত অসন্তোষ প্রকাশ করাতে একদিন রাজার আদেশে তাঁহাকে ছলক্রমে নৌকাযোগে নদী-মধ্যে লইয়া নৌকা ডুবাইয়া দিবার চেষ্টা করা হয়। সেই বিপদের সময় কনিষ্ঠা বালিকা আমিনাকে তিনি স্বয়ং নদীমধ্যে নিক্ষেপ করেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা আত্মহত্যা করিয়া মরে। এবং সুজার একটি বিশ্বাসী কর্ম্মচারী রহমৎ আলি জুলিখাকে লইয়া সাঁতার দিয়া পালায় এবং সুজা যুদ্ধ করিতে করিতে মরেন।

আমিনা খরস্রোতে প্রবাহিত হইয়া দৈব-ক্রমে অনতিবিলম্বে এক ধীবরের জালে উদ্ধৃত হয় এবং তাহারি গৃহে পালিত হইয়া বড় হইয়া উঠে।

ইতিমধ্যে বৃদ্ধ রাজার মৃত্যু হইয়াছে, এবং যুবরাজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

একদিন সকালে বৃদ্ধ ধীবর আসিয়া আমি-নাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিল "তিন্নি"। ধীবর আরাকান ভাষায় আমিনার নূতন নামকরণ করিয়াছিল। "তিন্নি, আজ সকালে তোর হল কি! কাজকর্ম্মে যে একেবারে হাত লাগাস্‌ নাই! আমার নূতন জালে আঠা দেওয়া হয় নাই, আমার নৌকো"—

আমিনা ধীবরের কাছে আসিয়া আদর করিয়া কহিল "বুঢ়া, আজ আমার দিদি আসিয়াছেন, তাই আজ ছুটি!"

"তোর আবার দিদি কে রে তিন্নি!"

জুলিখা কোথা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কহিল "আমি"।

বৃদ্ধ অবাক্ হইয়া গেল। তার পর আগ-

থার অনেক কাছে আসিয়া ভাল করিয়া তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল।

খপ্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুই কাজ কাম্ কিছু জানিস্?"

আমিনা কহিল "বুঢ়া, দিদির হইয়া আমি কাজ করিয়া দিব। দিদি কাজ করিতে পারিবে না।"

বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুই থাকিবি কোথায়?"

জুলিখা বলিল "আমিনার কাছে।"

বৃদ্ধ ভাবিল এওত বিষম বিপদ! জিজ্ঞাসা করিল "খাইবি কি?"

জুলিখা বলিল "তাহার উপায় আছে" বলিয়া অবজ্ঞাভরে ধীবরের সম্মুখে একটা স্বর্ণমুদ্রা ফেলিয়া দিল।

আমিনা সেটা কুড়াইয়া ধীবরের হাতে তুলিয়া দিয়া চুপি চুপি কহিল "বুঢ়া আর কোন কথা কহিস না, তুই কাজে যা। বেলা হইয়াছে।"

জুলিখা ছদ্মবেশে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে আমিনার সন্ধান পাইয়া কি করিয়া ধীবরের কুটিরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে সে সমস্ত কথা বলিতে গেলে দ্বিতীয় আর একটি কাহিনী হইয়া পড়ে। তাহার রক্ষাকর্ত্তা রহমৎ শেখ ছদ্মনামে আরাকান রাজসভায় কাজ করিতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:০:—

ছোট নদীটি বহিয়া যাইতেছিল এবং প্রথম গ্রীষ্মের শীতল প্রভাত বায়ুতে কৈলু গাছের রক্তবর্ণ পুষ্পমঞ্জরী হইতে ফুল ঝরিয়া পড়িতেছিল।

গাছের তলায় বসিয়া জুলিখা আমিনাকে কহিল "ঈশ্বর যে আমাদের দুই ভগ্নীকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন সে কেবল পিতার হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য। নহিলে, আর ত কোন কারণ খুঁজিয়া পাই না।"

আমিনা নদীর পরপারে সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী সর্ব্বাপেক্ষা ছায়াময় বনশ্রেণীর দিকে দৃষ্টি মেলিয়া ধীরে ধীরে কহিল "দিদি, আর ওসব কথা বলিস্‌নে ভাই। আমার এই পৃথিবীটা এক-রকম বেশ লাগিতেছে। মরিতে চায় ত পুরুষগুলো কাটাকাটি করিয়া মরুকগে, আমার এখানে কোন দুঃখ নাই।"

জুলিখা বলিল "ছি ছি আমিনা, তুই কি সাহজাদার ঘরের মেয়ে! কোথায় দিল্লীর সিংহাসন, আর কোথায় আরাকানের ধীবরের কুটির!"

আমিনা হাসিয়া কহিল "দিদি, দিল্লীর সিংহাসনের চেয়ে আমার বুঢ়ার এই কুটির এবং এই কৈলু গাছের ছায়া যদি কোন বালিকার বেশী ভাল লাগে তাহাতে দিল্লীর সিংহাসন একবিন্দু অশ্রুপাত করিবে না।"

জুলিখা কতকটা আনমনে কতকটা আমি-নাকে কহিল "তা তোকে দোষ দেওয়া যায় না, তুই তখন নিতান্ত ছোট ছিলি। কিন্তু এক-বার ভাবিয়া দেখ্ পিতা তোকে সব চেয়ে বেশী ভাল বাসিতেন বলিয়া তোকেই স্বহস্তে জলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। সেই পিতৃদত্ত মৃত্যুর চেয়ে এই জীবনকে বেশী প্রিয় জ্ঞান করিস্ না। তবে যদি প্রতিশোধ তুলিতে পারিস্ তবেই জীবনের অর্থ থাকে।"

আমিনা চুপ করিয়া দূরে চাহিয়া রহিল। কিন্তু বেশ বুঝা গেল সকল কথা সত্ত্বেও বাহি-রের এই বাতাস এবং গাছের ছায়া, এবং

আপনার নবযৌবন এবং কি একটা সুখস্মৃতি তাহাকে নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

কিছুক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল "দিদি তুমি একটু অপেক্ষা কর ভাই। আমার ঘরের কাজ বাকি আছে। আমি না রাঁধিয়া দিলে বুড়া খাইতে পাইবে না।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জুলিখা আমিনার আস্থা চিন্তা করিয়া ভারি বিমর্ষ হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এমন সময় হঠাৎ ধুপ্ করিয়া একটা লম্ফের শব্দ হইল, এবং পশ্চাৎ হইতে কে একজন জুলিখার চোখ টিপিয়া ধরিল।

জুলিখা ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া কহিল "কে ও!"

স্বর শুনিয়া যুবক চোখ ছাড়িয়া দিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, জুলিখার মুখের দিকে চাহিয়া অম্লানবদনে কহিল "তুমি ত তিন্নি নও।" যেন জুলিখা বরাবর আপনাকে তিন্নি বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিতেছিল, কেবল যুবকের অসামান্য তীক্ষ্ণবুদ্ধির কাছে সমস্ত চাতুরী প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

জুলিখা বসন সম্বরণ করিয়া দৃপ্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই চক্ষে অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি!"

যুবক কহিল "তুমি আমাকে চেন না। তিন্নি জানে। তিন্নি কোথায়!"

তিন্নি গোলযোগ শুনিয়া বাহির হইয়া আসিল। জুলিখার রোষ এবং যুবকের হতবুদ্ধি বিস্মিতমুখ দেখিয়া আমিনা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

কহিল "দিদি ওর কথা তুমি কিছু মনে করিয়ো না। ওকি মানুষ! ও একটা বনের মৃগ। যদি কিছু বেয়াদবী করিয়া থাকে, আমি উহাকে শাসন করিয়া দিব। দালিয়া তুমি কি করিয়াছিলে!"

যুবক তৎক্ষণাৎ কহিল "চোখ টিপিয়া ধরিয়াছিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম তিন্নি। কিন্তু ও ত তিন্নি নয়।"

তিন্নি সহসা সুসহ ক্রোধ প্রকাশ করিয়া উঠিয়া কহিল "ফের! ছোট মুখে বড় কথা! কবে তুমি তিন্নির চোখ টিপিয়াছ? তোমার ত সাহস কম নয়।"

যুবক কহিল "চোখ টিপিতে ত খুব বেশী সাহসের আবশ্যক করে না। বিশেষতঃ পূর্ব্বের অভ্যাস থাকিলে। কিন্তু সত্য বলিতেছি তিন্নি, আজ একটু ভয় পাইয়া গিয়াছিলাম।"

বলিয়া গোপনে জুলিখার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আমিনার মুখের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল।

আমিনা কহিল "না, তুমি অতি বর্ব্বর! সাহজাদীর সম্মুখে দাঁড়াইবার যোগ্য নও। তোমাকে সহবৎ শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। দেখ, এম্নি করিয়া সেলাম কর।"

বলিয়া আমিনা তাহার যৌবনমঞ্জরিত তনুলতা অতি মধুর ভঙ্গীতে নত করিয়া জুলিখাকে সেলাম করিল। যুবক বহুকষ্টে তাহার নিতান্ত অসম্পূর্ণ অনুকরণ করিল।

বলিল "এমন করিয়া তিন পা পিছু হটিয়া আইস।" যুবক পিছু হটিয়া আসিল।

"আবার সেলাম কর।" আবার সেলাম করিল।

এমনি করিয়া পিছু হটাইয়া সেলাম করাইয়া আমিনা যুবককে কুটিরের দ্বারের কাছে লইয়া গেল।

কহিল "ঘরে প্রবেশ কর।" যুবক ঘরে

প্রবেশ করিল। আমিনা বাহির হইতে ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া কহিল "একটু ঘরের কাজ কর। আগুনটা জাগাইয়া রাখ।" বলিয়া দিদির পাশে আসিয়া বসিল।

কহিল "দিদি, রাগ করিস্‌নে ভাই, এখানকার মানুষগুলা এই রকমের। হাড় জ্বালাতন হইয়া গেছে।"

কিন্তু আমিনার মুখে কিংবা ব্যবহারে তাহার লক্ষণ কিছুই প্রকাশ পায় না। বরং অনেক বিষয়ে এখানকার মানুষের প্রতি তাহার কিছু অন্যায় পক্ষপাত দেখা যায়।

জুলিখা যথাসাধ্য রাগ প্রকাশ করিয়া কহিল "বাস্তবিক, আমিনা তোর ব্যবহারে আমি আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছি। একজন বাহিরের যুবক আসিয়া তোকে স্পর্শ করিতে পারে এত বড় তাহার সাহস!"

আমিনা দিদির সহিত যোগ দিয়া কহিল "দেখ দেখি বোন্! যদি কোন বাদশাহ কিংবা নবাবের ছেলে এমন ব্যবহার করিত তবে তাহাকে অপমান করিয়া দূর করিয়া দিতাম।"

জুলিখার ভিতরের হাসি আর বাধা মানিল না—হাসিয়া উঠিয়া কহিল "সত্য করিয়া বল্ দেখি আমিনা তুই যে বলিতেছিলি পৃথিবীটা তোর বড় ভাল লাগিতেছে, সে কি ঐ বর্ব্বর যুবকটার জন্য?"

আমিনা কহিল "তা সত্য কথা বলি দিদি, ও আমার অনেক উপকার করে। ফুলটা ফলটা পাড়িয়া দেয়, শীকার করিয়া আনে, একটা কিছু কাজ করিতে ডাকিলে ছুটিয়া আসে। অনেকবার মনে করি, উহাকে শাসন করিব। কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা। যদি খুব চোখ রাঙাইয়া বলি, দালিয়া, তোমার প্রতি আমি ভারি অসন্তুষ্ট হইয়াছি—দালিয়া মুখের দিকে চাহিয়া পরম কৌতুকে নিঃশব্দে হাসিতে থাকে। এদের দেশে পরিহাস বোধ করি এই রকম; দু'ঘা মারিলে ভারি খুসি হইয়া উঠে তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। ঐ দেখ না, ঘরে পুরিয়া রাখিয়াছি বড় আনন্দে আছে, দ্বার খুলিলেই দেখিতে পাইব, মুখ চক্ষু লাল করিয়া মনের সুখে আগুনে ফুঁ দিতেছে। ইহাকে লইয়া কি করি বল ত বোন! আমি ত আর পারিয়া উঠি না।"

জুলিখা কহিল "আমি চেষ্টা দেখিতে পারি।"

আমিনা হাসিয়া মিনতি করিয়া বলিল "তোর দুটি পায়ে পড়ি বোন্। ওকে আর তুই কিছু বলিস্ না।"

এমন করিয়া বলিল যেন ঐ যুবকটি আমিনার একটি বড় সাধের পোষা হরিণ, এখনো তাহার বন্য স্বভাব দূর হয় নাই—পাছে অন্য কোন মানুষ দেখিলে ভয় পাইয়া নিরুদ্দেশ হয় এমন আশঙ্কা আছে।

এমন সময় ধীবর আসিয়া কহিল "আজ দালিয়া আসে নাই তিন্নি?"

"আসিয়াছে।"

"কোথায় গেল?"

"সে বড় উপদ্রব করিতেছিল তাই তাহাকে ঐ ঘরে পুরিয়া রাখিয়াছি।"

বৃদ্ধ কিছু চিন্তান্বিত হইয়া কহিল "যদি বিরক্ত করে সহিয়া থাকিস্। অল্প বয়সে অমন সকলেই দুরন্ত হইয়া থাকে। বেশী শাসন করিস্ না। দালিয়া কাল এক থলু দিয়া আমার কাছে তিনটি মাছ লইয়াছিল।" (থলু অর্থে স্বর্ণ মুদ্রা।)

আমিনা কহিল "ভাবনা নাই বুড়া, আজ আমি তাহার কাছে দুই থলু আদায় করিয়া দিব, একটিও মাছ দিতে হইবে না।"

বৃদ্ধ তাহার পালিত কন্যার এত অল্প বয়সে এমন চাতুরী এবং বিষয়বুদ্ধি দেখিয়া পরম

প্রীত হইয়া তাহার মাথায় সস্নেহ হাত বুলাইয়া চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আশ্চর্য্য এই, দালিয়ার আসা যাওয়া সম্বন্ধে জুলিখার ক্রমে আর আপত্তি রহিল না। ভাবিয়া দেখিলে ইহাতে আশ্চর্য্য নাই।

কারণ, নদীর যেমন এক দিকে স্রোত এবং আর এক দিকে কূল, রমণীর সেইরূপ হৃদয়াবেগ এবং লোকলজ্জা। কিন্তু সভ্যসমাজের বাহিরে আরাকানের প্রান্তে এখানে লোক কোথায়!

এখানে কেবল ঋতুপর্য্যায়ে তরু মঞ্জরিত হইতেছে, এবং সম্মুখের নীলা নদী বর্ষায় স্ফীত, শরতে স্বচ্ছ এবং গ্রীষ্মে ক্ষীণ হইতেছে, পাখীর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বরে সমালোচনার লেশমাত্র নাই, এবং দক্ষিণ বায়ু মাঝে মাঝে পরপারের গ্রাম হইতে মানবচক্রের গুঞ্জনধ্বনি বহিয়া আনে কিন্তু কাণাকাণি আনে না।

পতিত অট্টালিকার উপরে ক্রমে যেমন অরণ্য জন্মে, এখানে কিছুদিন থাকিলে সেইরূপ প্রকৃতির গোপন আক্রমণে লৌকিকতার মানবনির্ম্মিত দৃঢ় ভিত্তি ক্রমে অলক্ষিতভাবে ভাঙিয়া যায় এবং চতুর্দ্দিকে প্রাকৃতিক জগতের সহিত সমস্ত একাকার হইয়া আসে। দুটি সমযোগ্য নরনারীর মিলনদৃশ্য দেখিতে রমণীর যেমন সুন্দর লাগে এমন আর কিছু নয়। এত রহস্য, এত সুখ, এত অতলস্পর্শ কৌতূহলের বিষয় তাহার পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না। অতএব এই বর্ব্বর কুটিরের মধ্যে নির্জ্জন দারিদ্র্যের ছায়ায় যখন জুলিখার কুলগর্ব্ব এবং লোকমর্য্যাদার ভাব আপনিই শিথিল হইয়া আসিল তখন পুষ্পিত কৈলুতরুচ্ছায়ে আমিনা এবং দালিয়ার মিলনের এই এক মনোহর খেলা দেখিতে তাহার বড় আনন্দ হইত।

বোধ করি তাহারও তরুণ হৃদয়ের একটা অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিত এবং তাহাকে সুখে দুঃখে চঞ্চল করিয়া তুলিত। অবশেষে এমন হইল কোন দিন যুবকের আসিতে বিলম্ব হইলে আমিনা যেমন উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিত, জুলিখাও তেমনি আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিত এবং উভয়ে একত্র হইলে, চিত্রকর নিজের সদ্য-সমাপ্ত ছবি ঈষৎ দূর হইতে যেমন করিয়া দেখে, তেমনি করিয়া সস্নেহে সহাস্যে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিত। কোন কোন দিন মৌখিক ঝগড়াও করিত, ছল করিয়া ভর্ৎসনা করিত, আমিনাকে গৃহে রুদ্ধ করিয়া যুবকের মিলনাবেগ প্রতিহত করিত।

সম্রাট এবং অরণ্যের মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে। উভয়ে স্বাধীন, উভয়েই স্বরাজ্যের একাধিপতি, উভয়কেই কাহারো নিয়ম মানিয়া চলিতে হয় না। উভয়ের মধ্যেই প্রকৃতির একটা স্বাভাবিক বৃহত্ত্ব এবং সরলতা আছে। যাহারা মাঝারি, যাহারা দিনরাত্রি লোকশাস্ত্রের অক্ষর মিলাইয়া জীবন যাপন করে তাহারাই কিছু স্বতন্ত্র গোছের হয়। তাহারাই বড়র কাছে দাস, ছোটর কাছে প্রভু, এবং অস্থানে নিতান্ত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়ায়। বর্ব্বর দালিয়া প্রকৃতি-সাম্রাজ্ঞীর উচ্ছৃঙ্খল ছেলে, শাহজাদীর কাছে কোন সঙ্কোচ ছিল না, এবং শাহজাদীরাও তাহাকে সমকক্ষ লোক বলিয়া চিনিতে পারিত। সহাস্য, সরল, কৌতুকপ্রিয়, সকল অবস্থাতেই নির্ভীক, অসঙ্কুচিত, তাহার চরিত্রে দারিদ্র্যের কোন লক্ষণই ছিল না।

কিন্তু এই সকল খেলার মধ্যে এক একবার

জুলিখার হৃদয়টা হায় হায় করিয়া উঠিত,ভাবিত সম্রাটপুত্রীর জীবনের এই কি পরিণাম।

একদিন প্রাতে দালিয়া আসিবামাত্র জুলিখা তাহার হাত চাপিয়া কহিল "দালিয়া, এখানকার রাজাকে দেখাইয়া দিতে পার?"

"পারি। কেন বল দেখি?"

"আমার একটা ছোরা আছে তাহার বুকের মধ্যে বসাইতে চাহি!"

প্রথমে দালিয়া কিছু আশ্চর্য্য হইয়া গেল তাহার পরে জুলিখার হিংসাপ্রখর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার সমস্ত মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল; যেন এত বড় মজার কথা সে ইতিপূর্ব্বে কখনও শোনে নাই—যদি পরিহাস বলত এই বটে, রাজ-পুত্রীর উপযুক্ত। কোন কথা নাই বার্ত্তা নাই প্রথম আলাপেই একখানি ছোরার আধ-খানা একটা জীবন্ত রাজার বক্ষের মধ্যে চালনা করিয়া দিলে এইরূপ অত্যন্ত অন্তরঙ্গ শিষ্টা-চারে রাজাটা হঠাৎ কিরূপ অবাক্ হইয়া যায় সেই চিত্র ক্রমাগত তাহার মনে উদিত হইতে লাগিল, এবং তাহার নিঃশব্দ কৌতুক হাসি থাকিয়া থাকিয়া উচ্চহাস্যে পরিণত হইতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

তাহার পরদিনেই রহমৎশেখ জুলিখাকে গোপনে পত্র লিখিল যে, আরাকানের নূতন রাজা ধীবরের কুটিরে দুই ভগ্নীর সন্ধান পাইয়াছেন, এবং গোপনে আমিনাকে দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহাকে বিবাহার্থে অবিলম্বে প্রাসাদে আনিবার আয়োজন করিতেছেন। প্রতিহিংসার এমন সুন্দর অবসর আর পাওয়া যাইবে না।

তখন জুলিখা দৃঢ়ভাবে আমিনার হাত ধরিয়া কহিল "ঈশ্বরের ইচ্ছা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। আমিনা, এইবার তোর জীবনের কর্ত্তব্য পালন করিবার সময় আসিয়াছে, এখন আর খেলা ভাল দেখায় না।"

দালিয়া উপস্থিত ছিল, আমিনা তাহার মুখের দিকে চাহিল, দেখিল সে সকৌতুকে হাসিতেছে।

আমিনা তাহার হাসি দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়া কহিল। "জান দালিয়া, আমি রাজবধূ হইতে যাইতেছি।"

দালিয়া হাসিয়া বলিল "সে ত বেশীক্ষণের জন্য নয়।"

আমিনা পীড়িত বিস্মিত চিত্তে মনে মনে ভাবিল—বাস্তবিকই এ বনের মৃগ, এর সঙ্গে মানুষের মত ব্যবহার করা আমারই পাগলামী।

আমিনা দালিয়াকে আর একটু সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য কহিল "রাজাকে মারিয়া আর কি আমি ফিরিব!"

দালিয়া কথাটা সঙ্গত জ্ঞান করিয়া কহিল "ফেরা কঠিন বটে।"

আমিনার সমস্ত অন্তরাত্মা একেবারে ম্লান হইয়া গেল।

জুলিখার দিকে ফিরিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল "দিদি, আমি প্রস্তুত আছি।"

এবং দালিয়ার দিকে ফিরিয়া বিদ্ধ অন্তরে পরিহাসের ভাণ করিয়া কহিল "রাণী হইয়াই আমি প্রথমে তোমাকে রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগ দেওয়া অপরাধে শাস্তি দিব তার পরে আর যাহা করিতে হয় করিব।"

শুনিয়া দালিয়া বিশেষ কৌতুক বোধ করিল, যেন প্রস্তাবটা কার্য্যে পরিণত হইলে

তাহার মধ্যে অনেকটা আমোদের বিষয় আছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—*—

অশ্বারোহী পদাতিক নিশান হস্তী বাদ্য এবং আলোকে ধীবরের ঘর দুয়ার ভাঙিয়া পড়িবার যো হইল। রাজপ্রাসাদ হইতে স্বর্ণমণ্ডিত দুই শিবিকা আসিয়াছে।

আমিনা জুলিখার হাত হইতে ছুরি টানিয়া লইল। তাহার হস্তিদন্তনির্ম্মিত কারুকার্য্য অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিল। তাহার পর বসন উদ্‌ঘাটন করিয়া নিজের বক্ষের উপর একবার ধার পরীক্ষা করিয়া দেখিল। জীবন-মুকুলের বৃন্তের কাছে ছুরিটি একবার স্পর্শ করিল, অবশেষে সেটি খাপের মধ্যে পুরিয়া বসনের মধ্যে লুকাইয়া রাখিল।

একান্ত ইচ্ছা ছিল এই মরণযাত্রার পূর্ব্বে একবার দালিয়ার সহিত দেখা হয়, কিন্তু কাল হইতে সে নিরুদ্দেশ। দালিয়া সেই যে হাসিতেছিল তাহার ভিতরে কি অভিমানের জ্বালা প্রচ্ছন্ন ছিল?

শিবিকায় উঠিবার পূর্ব্বে আমিনা তাহার বাল্যকালের আশ্রয়টি অশ্রুজলের ভিতর হইতে একবার দেখিল, তাহার সেই ঘরের গাছ, তাহার সেই ঘরের নদী। ধীবরের হাত ধরিয়া বাষ্পরুদ্ধ কম্পিতস্বরে কহিল "বুঢ়া তবে চলিলাম। তিন্নি গেলে তোর ঘরকন্না কে দেখিবে!"

বুঢ়া একেবারে বালকের মত কাঁদিয়া উঠিল।

আমিনা কহিল "বুঢ়া, যদি দালিয়া আর এখানে আসে, তাহাকে এই আংটি দিয়ো। বলিয়ো, তিন্নি যাইবার সময় দিয়া গেছে।"

এই বলিয়াই দ্রুত শিবিকায় উঠিয়া পড়িল। মহা সমারোহে শিবিকা চলিয়া গেল। আমিনার কুটির, নদীতীর, কৈলুতরুতল অন্ধকার নিস্তব্ধ জনশূন্য হইয়া গেল।

যথাকালে শিবিকাদ্বয় তোরণদ্বার অতিক্রম করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। দুই ভগ্নী শিবিকা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল।

আমিনার মুখে হাসি নাই, চোখেও অশ্রুচিহ্ন নাই। জুলিখার মুখ বিবর্ণ।

কর্ত্তব্য যতক্ষণ দূরে ছিল ততক্ষণ তাহার উৎসাহের তীব্রতা ছিল—এখন সে কম্পিত হৃদয়ে ব্যাকুল স্নেহে আমিনাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল, মনে মনে কহিল নব প্রেমের বৃন্ত হইতে ছিন্ন করিয়া এই ফুটন্ত ফুলটিকে কোন্ রক্তস্রোতে ভাসাইতে যাইতেছি।

কিন্তু তখন আর ভাবিবার সময় নাই। পরিচারিকাদের দ্বারা নীত হইয়া শত সহস্র প্রদীপের অনিমেষ তীব্রদৃষ্টির মধ্য দিয়া স্বপ্নাহতের মত চলিতে লাগিল, অবশেষে, বাসরঘরের দ্বারের কাছে মুহূর্ত্তের জন্য থামিয়া আমিনা জুলিখাকে কহিল "দিদি!"

জুলিখা আমিনাকে গাঢ় আলিঙ্গনে বাঁধিয়া চুম্বন করিল।

উভয়ে ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিল।

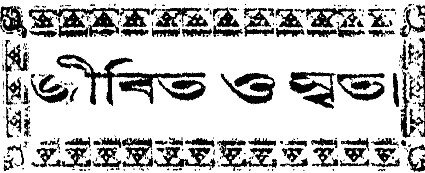
রাজবেশ পরিয়া ঘরের মাঝখানে মছলন্দ শয্যার উপর রাজা বসিয়া আছেন। আমিনা সসঙ্কোচে দ্বারের অনতিদূরে দাঁড়াইয়া রহিল।

জুলিখা অগ্রসর হইয়া রাজার নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিল রাজা নিঃশব্দে সকৌতুকে হাসিতেছেন।

জুলিখা বলিয়া উঠিল "দালিয়া!" আমিনা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

দালিয়া উঠিয়া তাহাকে আহত পাখীটির মত কোলে করিয়া তুলিয়া শয্যায় লইয়া গেল। আমিনা সচেতন হইয়া বুকের মধ্য হইতে ছুরিটি বাহির করিয়া দিদির মুখের দিকে চাহিল, দিদি দালিয়ার মুখের দিকে চাহিল, দালিয়া চুপ করিয়া হাস্যমুখে উভয়ের প্রতি চাহিয়া রহিল, ছুরিও তাহার খাপের মধ্য হইতে একটুখানি মুখ বাহির করিয়া এই রঙ্গ দেখিয়া ঝিক্‌ঝিক্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

——:*:——



জীবিত ও মৃত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাণীহাটের জমিদার শারদাশঙ্কর বাবুদের বাড়ির বিধবা বধূটির পিতৃকুলে কেহ ছিল না; সকলেই একে একে মারা গিয়াছে। পতিকুলেও ঠিক আপনার বলিতে কেহ নাই, পতিও নাই, পুত্রও নাই। একটি ভাসুরপো, শারদাশঙ্করের ছোট ছেলেটি, সেই তাহার চক্ষের মণি ছিল। সে জন্মিবার পর তাহার মাতার বহুকাল ধরিয়া শক্ত পীড়া হইয়াছিল সেইজন্য এই বিধবা কাকী কাদম্বিনীই তাহাকে মানুষ করিয়াছিল। পরের ছেলে মানুষ করিলে তাহার প্রতি প্রাণের টান আরো যেন বেশী হয়, কারণ, তাহার উপরে অধিকার থাকে না;—তাহার উপরে কোন সামাজিক দাবী নাই কেবল স্নেহের দাবী—কিন্তু কেবলমাত্র স্নেহ সমাজের সমক্ষে আপনার দাবী কোন দলিল অনুসারে সপ্রমাণ করিতে পারে না এবং চাহেও না, কেবল অনিশ্চিত প্রাণের ধনটিকে দ্বিগুণ ব্যাকুলতার সহিত ভালবাসে।

বিধবার সমস্ত রুদ্ধ প্রীতি এই ছোট ছেলেটির প্রতি সিঞ্চন করিয়া একদিন শ্রাবণের রাত্রে কাদম্বিনীর অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। হঠাৎ কি কারণে তাহার হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ হইয়া গেল—সময় জগতের আর সর্ব্বত্রই চলিতে লাগিল কেবল সেই স্নেহকাতর ক্ষুদ্র কোমল বক্ষটির ভিতর সময়ের ঘড়ির কল চিরকালের মত বন্ধ হইয়া গেল।

পাছে পুলিসের উপদ্রব ঘটে এই জন্য অধিক আড়ম্বর না করিয়া জমিদারের চারিজন ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী অনতিবিলম্বে মৃতদেহ দাহ করিতে লইয়া গেল।

রাণীহাটের শ্মশান লোকালয় হইতে বহুদূরে। পুষ্করিণীর ধারে একখানি কুটির, এবং তাহার নিকটে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ, বৃহৎ মাঠে আর কোথাও কিছু নাই। পূর্ব্বে এইখান দিয়া নদী বহিত, এখন নদী একেবারে শুকাইয়া গেছে; সেই শুষ্ক জলপথের এক অংশ খনন করিয়া শ্মশানের পুষ্করিণী নির্ম্মিত হইয়াছে। এখনকার লোকেরা এই পুষ্করিণীকেই পুণ্য স্রোতস্বিনীর প্রতিনিধিস্বরূপ জ্ঞান করে।

মৃতদেহ কুটিরের মধ্যে স্থাপন করিয়া চিতার কাঠ আসিবার প্রতীক্ষায় চারজনে বসিয়া রহিল। সময় এত দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল যে অধীর হইয়া চারিজনের মধ্যে নিতাই এবং গুরুচরণ কাঠ আনিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন দেখিতে গেল, বিধু এবং বনমালী মৃতদেহ রক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল।

শ্রাবণের অন্ধকার রাত্রি। থমথমে মেঘ

করিয়া আছে, আকাশে একটি তারা দেখা যায় না। অন্ধকার ঘরে দুই জনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। একজনের চাদরে দিয়াশলাই এবং বাতি বাঁধা ছিল। বর্ষাকালের দিয়াশলাই বহুচেষ্টাতেও জ্বলিল না—যে লণ্ঠন সঙ্গে ছিল তাহাও নিবিয়া গেছে।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একজন কহিল "ভাইরে এক ছিলিম তামাকের যোগাড় থাকিলে বড় সুবিধা হইত। তাড়াতাড়িতে কিছুই আনা হয় নাই!"

অন্য ব্যক্তি কহিল "আমি চট্‌ করিয়া এক দৌড়ে সমস্ত সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারি!"

বনমালীর পলায়নের অভিপ্রায় বুঝিয়া বিধু কহিল—"মাইরি! আর আমি বুঝি এখানে একলা বসিয়া থাকিব!"

আবার কথাবার্ত্তা বন্ধ হইয়া গেল। পাঁচ মিনিটকে এক ঘণ্টা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। যাহারা কাঠ আনিতে গিয়াছিল তাহাদিগকে মনে মনে ইহারা গালি দিতে লাগিল—তাহারা যে দিব্য আরামে কোথাও বসিয়া গল্প করিতে করিতে তামাক খাইতেছে, এ সন্দেহ ক্রমশই তাহাদের মনে ঘনীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল।

কোথাও কিছু শব্দ নাই—কেবল পুষ্করিণীতীর হইতে অবিশ্রাম ঝিল্লি এবং ভেকের ডাক শুনা যাইতে লাগিল। এমন সময় মনে হইল যেন খাটটা ঈষৎ নড়িল—যেন মৃতদেহ পাশ ফিরিয়া শুইল।

বিধু এবং বনমালী রামনাম জপিতে জপিতে কাঁপিতে লাগিল। হঠাৎ ঘরের মধ্যে একটা দীর্ঘনিশ্বাস শুনা গেল। বিধু এবং বনমালী এক মুহূর্ত্তে ঘর হইতে লম্ফ দিয়া বাহির হইয়া গ্রামের অভিমুখে দৌড় দিল।

প্রায় ক্রোশ দেড়েক পথ গিয়া দেখিল তাহার অবশিষ্ট দুই সঙ্গী লণ্ঠন হাতে ফিরিয়া আসিতেছে। তাহারা বাস্তবিকই তামাক খাইতে গিয়াছিল, কাঠের কোন খবর জানে না, তথাপি সংবাদ দিল গাছ কাটিয়া কাঠ ফাড়াইতেছে—অনতিবিলম্বে রওনা হইবে। তখন বিধু এবং বনমালী কুটিরের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিল। নিতাই এবং গুরুচরণ অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দিল, এবং কর্ত্তব্য ত্যাগ করিয়া আসার জন্য অপর দুইজনের প্রতি অত্যন্ত রাগ করিয়া বিস্তর ভর্ৎসনা করিতে লাগিল।

কালবিলম্ব না করিয়া চারজনেই শ্মশানে সেই কুটিরে গিয়া উপস্থিত হইল। ঘরে ঢুকিয়া দেখিল মৃতদেহ নাই, শূন্য খাট পড়িয়া আছে। পরস্পর মুখ চাহিয়া রহিল, যদি শৃগালে লইয়া গিয়া থাকে? কিন্তু আচ্ছাদনবস্ত্রটি পর্য্যন্ত নাই। সন্ধান করিতে করিতে বাহিরে গিয়া দেখে, কুটিরের দ্বারের কাছে খানিকটা কাদা জমিয়াছিল তাহাতে স্ত্রীলোকের সদ্য এবং ক্ষুদ্র পদচিহ্ন।

শারদাশঙ্কর সহজ লোক নহেন, তাঁহাকে এই ভূতের গল্প বলিলে হঠাৎ যে কোন শুভফল পাওয়া যাইবে এমন সম্ভাবনা নাই। তখন চারজনে বিস্তর পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, দাহকার্য্য সমাধা হইয়াছে এইরূপ খবর দেওয়াই ভাল।

ভোরের দিকে যাহারা কাঠ লইয়া আসিল, তাহারা সংবাদ পাইল, বিলম্ব দেখিয়া পূর্ব্বেই কার্য্য শেষ করা হইয়াছে, কুটিরের মধ্যে কাঠ সঞ্চিত ছিল। এ সম্বন্ধে কাহারো সহজে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না—কারণ, মৃতদেহ এমন কিছু বহুমূল্য সম্পত্তি নহে যে কেহ ফাঁকি দিয়া চুরি করিয়া লইয়া যাইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

সকলেই জানেন জীবনের যখন কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না তখনো অনেক সময় জীবন প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে, এবং সময়মত পুনর্ব্বার মৃতবৎ দেহে তাহার কার্য্য আরম্ভ হয়। কাদম্বিনীও মরে নাই—হঠাৎ কি কারণে তাহার জীবনের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

যখন সে সচেতন হইয়া উঠিল, দেখিল চতুর্দ্দিকে নিবিড় অন্ধকার। চিরাভ্যাসমত যেখানে শয়ন করিয়া থাকে মনে হইল এটা সে জায়গা নহে। একবার ডাকিল—"দিদি" —অন্ধকার ঘরে কেহ সাড়া দিল না। সভয়ে উঠিয়া বসিল, মনে পড়িল সেই মৃত্যুশয্যার কথা। সেই হঠাৎ বক্ষের কাছে একটা বেদনা —শ্বাসরোধের উপক্রম। তাহার বড় যা ঘরের কোণে বসিয়া একটা অগ্নিকুণ্ডের উপর খোকার জন্ত দুধ গরম করিতেছিল—কাদম্বিনী আর দাঁড়াইতে না পারিয়া বিছানার উপর আছাড় খাইয়া পড়িল—রুদ্ধকণ্ঠে কহিল "দিদি, একবার খোকাকে আনিয়া দাও—আমার প্রাণ কেমন করিতেছে।" তাহার পর সমস্ত কালো হইয়া আসিল—যেন একটি লেখা খাতার উপরে দোয়াত-সুদ্ধ কালি গড়াইয়া পড়িল— কাদম্বিনীর সমস্ত স্মৃতি এবং চেতনা, বিশ্বগ্রন্থের সমস্ত অক্ষর এক মুহূর্ত্তে একাকার হইয়া গেল। খোকা তাহাকে একবার শেষবারের মত তাহার সেই সুমিষ্ট ভালবাসার স্বরে কাকীমা বলিয়া ডাকিয়াছিল কি না, তাহার অনন্ত অজ্ঞাত মরণযাত্রার পথের চিরপরিচিত পৃথিবী হইতে এই শেষ স্নেহ-পাথেয়টুকু সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল কিনা বিধবার তাহাও মনে পড়ে না।

প্রথমে মনে হইল যমালয় বুঝি এইরূপ চিরনির্জ্জন এবং চিরান্ধকার। সেখানে কিছুই দেখিবার নাই, শুনিবার নাই, কাজ করিবার নাই, কেবল চিরকাল এইরূপ উঠিয়া জাগিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে।

তাহার পর যখন মুক্তদ্বার দিয়া হঠাৎ একটা ঠাণ্ডা বাদ্‌লার বাতাস দিল এবং বর্ষার ভেকের ডাক কাণে প্রবেশ করিল তখন এক মুহূর্ত্তে তাহার এই স্বল্প-জীবনের আশৈশব সমস্ত বর্ষার স্মৃতি ঘনীভূতভাবে তাহার মনে উদয় হইল এবং পৃথিবীর নিকট-সংস্পর্শ সে অনুভব করিতে পারিল। একবার বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল—সম্মুখে পুষ্করিণী, বটগাছ, বৃহৎ মাঠ এবং সুদূর তরুশ্রেণী এক পলকে চখে পড়িল। মনে পড়িল মাঝে মাঝে পুণ্য তিথি উপলক্ষে এই পুষ্করিণীতে আসিয়া স্নান করিয়াছে, এবং মনে পড়িল সেই সময়ে এই শ্মশানে মৃতদেহ দেখিয়া মৃত্যুকে কি ভয়ানক মনে হইত!

প্রথমেই মনে হইল, বাড়ি ফিরিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু তখনি ভাবিল, আমি ত বাঁচিয়া নাই, আমাকে বাড়িতে ফিরিয়া লইবে কেন? সেখানে যে অমঙ্গল হইবে। জীবরাজ্য হইতে আমি যে নির্ব্বাসিত হইয়া আসিয়াছি—আমি যে আমার প্রেতাত্মা।

তাই যদি না হইবে তবে সে এই অর্দ্ধরাত্রে শারদাশঙ্করের সুরক্ষিত অন্তঃপুর হইতে এই দুর্গম শ্মশানে আসিল কেমন করিয়া? এখনও যদি তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ না হইয়া থাকে তবে দাহ করিবার লোকজন গেল কোথায়? শারদাশঙ্করের আলোকিত গৃহে তাহার মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্ত মনে পড়িল, তাহার পরেই এই

বহুদূরবর্ত্তী জনশূন্য অন্ধকার শ্মশানের মধ্যে আপনাকে একাকিনী দেখিয়া সে জানিল আমি এই পৃথিবীর জনসমাজের আর কেহ নাই—আমি অতি ভীষণ, অকল্যাণকারিণী আমি আমার প্রেতাত্মা।

এই কথা মনে উদয় হইবামাত্রই তাহার মনে হইল, তাহার চতুর্দ্দিক হইতে বিশ্বনিয়মের সমস্ত বন্ধন যেন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। যেন তাহার অদ্ভুত শক্তি, অসীম স্বাধীনতা—যাহা ইচ্ছা করিতে পারে, যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারে। এই অভূতপূর্ব্ব নূতন ভাবের আবির্ভাবে সে উন্মত্তের মত হইয়া হঠাৎ একটা দম্‌কা বাতাসের মত ঘর হইতে বাহির হইয়া অন্ধকার শ্মশানের উপর দিয়া চলিল—মনে লজ্জা ভয় ভাবনার লেশমাত্র রহিল না।

চলিতে চলিতে চরণ শ্রান্ত, দেহ দুর্ব্বল হইয়া আসিতে লাগিল। মাঠের পর মাঠ আর শেষ হয় না—মাঝে মাঝে ধান্যক্ষেত্র—কোথাও বা এক হাঁটু জল দাঁড়াইয়া আছে। যখন ভোরের আলো অল্প অল্প দেখা দিল তখন অদূরে লোকালয়ের বাঁশঝাড় হইতে দুটা একটা পাখীর ডাক শুনা গেল।

তখন তাহার কেমন ভয় করিতে লাগিল। পৃথিবীর সহিত জীবিত মনুষ্যের সহিত এখন তাহার কিরূপ নূতন সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে সে কিছুই জানে না। যতক্ষণ মাঠে ছিল, শ্মশানে ছিল, শ্রাবণরজনীর অন্ধকারের মধ্যে ছিল ততক্ষণ সে যেন নির্ভয়ে ছিল, যেন আপন রাজ্যে ছিল। দিনের আলোকে লোকালয় তাহার পক্ষে অতি ভয়ঙ্কর স্থান বলিয়া বোধ হইল। মানুষ ভূতকে ভয় করে, ভূতও মানুষকে ভয় করে, মৃত্যু-নদীর দুই পারে দুইজনের বাস।

—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

কাপড়ে কাদা মাখিয়া, অদ্ভুত ভাবের বশে ও রাত্রি জাগরণে পাগলের মত হইয়া, কাদম্বিনীর যেরূপ চেহারা হইয়াছিল তাহাতে মানুষ তাহাকে দেখিয়া ভয় পাইতে পারিত, এবং ছেলেরা বোধ হয় দূরে পালাইয়া গিয়া তাহাকে ঢেলা মারিত। সৌভাগ্যক্রমে একটি পথিক ভদ্রলোক তাহাকে সর্ব্বপ্রথমে এই অবস্থায় দেখিতে পায়।

সে আসিয়া কহিল "মা, তোমাকে ভদ্রকুলবধূ বলিয়া বোধ হইতেছে, তুমি এ অবস্থায় একলা পথে কোথায় চলিয়াছ?"

কাদম্বিনী প্রথমে কোন উত্তর না দিয়া তাকাইয়া রহিল। হঠাৎ কিছুই ভাবিয়া পাইল না। সে যে সংসারের মধ্যে আছে, তাহাকে যে ভদ্রকুলবধূর মত দেখাইতেছে, গ্রামের পথে পথিক তাহাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে, এ সমস্তই তাহার কাছে অভাবনীয় বলিয়া বোধ হইল।

পথিক তাহাকে পুনশ্চ কহিল—"চল, মা, আমি তোমাকে ঘরে পৌঁছাইয়া দিই—তোমার বাড়ি কোথায় আমাকে বল।"

কাদম্বিনী চিন্তা করিতে লাগিল। শ্বশুরবাড়ি ফিরিবার কথা মনে স্থান দেওয়া যায় না, বাপের বাড়ি ত নাই—তখন ছেলেবেলার সইকে মনে পড়িল।

সই যোগমায়ার সহিত যদিও ছেলেবেলা হইতেই বিচ্ছেদ তথাপি মাঝে মাঝে চিঠিপত্র চলে। এক এক সময় রীতিমত ভালবাসার লড়াই চলিতে থাকে—কাদম্বিনী জানাইতে চাহে ভালবাসা তাহার দিকেই প্রবল, যোগমায়া জানাইতে চাহে কাদম্বিনী তাহার ভাল-

ালসার যথোপযুক্ত প্রতিদান দেয় না। কোন সুযোগে একবার উভয়ে মিলন হইতে পারিলে যে একদণ্ড কেহ কাহাকে চোখের আড়াল করিতে পারিবে না এ বিষয়ে কোন পক্ষেরই কোন সন্দেহ ছিল না।

কাদম্বিনী ভদ্রলোকটিকে কহিল "নিশিন্দাপুরে শ্রীপতিচরণ বাবুর বাড়ি যাইব।"

পথিক কলিকাতায় যাইতেছিলেন; নিশিন্দাপুর যদিও নিকটবর্ত্তী নহে তথাপি তাঁহার গম্য পথেই পড়ে। তিনি স্বয়ং বন্দোবস্ত করিয়া কাদম্বিনীকে শ্রীপতিচরণ বাবুর বাড়ি পৌঁছাইয়া দিলেন।

দুই সইয়ে মিলন হইল। প্রথমে চিনিতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল, তাহার পরে বাল্যসাদৃশ্য উভয়ের চক্ষে ক্রমশই পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

যোগমায়া কহিল "ওমা, আমার কি ভাগ্য! তোমার যে দর্শন পাইব এমন ত আমার মনেই ছিল না! কিন্তু ভাই, তুমি কি করিয়া আসিলে! তোমার শ্বশুর বাড়ির লোকেরা যে তোমাকে ছাড়িয়া দিল!"

কাদম্বিনী চুপ করিয়া রহিল—অবশেষে কহিল "ভাই, শ্বশুরবাড়ির কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না! আমাকে দাসীর মত বাড়ির এক প্রান্তে স্থান দিয়ো, আমি তোমাদের কাজ করিয়া দিব।"

যোগমায়া কহিল "ওমা সে কি কথা! দাসীর মত থাকিবে কেন! তুমি আমার সই, তুমি আমার"—ইত্যাদি।

এমন সময় শ্রীপতি ঘরে প্রবেশ করিল। কাদম্বিনী খানিকক্ষণ তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল —মাথায় কাপড় দেওয়া, বা কোনরূপ সঙ্কোচ বা সম্ভ্রমের লক্ষণ দেখা গেল না।

পাছে তাহার সইয়ের বিরুদ্ধে শ্রীপতি কিছু মনে করে এজন্য ব্যস্ত হইয়া যোগমায়া নানারূপে তাহাকে বুঝাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু এতই অল্প বুঝাইতে হইল এবং শ্রীপতি এত সহজে যোগমায়ার সমস্ত প্রস্তাবে অনুমোদন করিল যে, যোগমায়া মনে মনে বিশেষ সন্তুষ্ট হইল না।

কাদম্বিনী সইয়ের বাড়িতে আসিল, কিন্তু সইয়ের সঙ্গে মিশিতে পারিল না—মাঝে মৃত্যুর ব্যবধান। আত্মসম্বন্ধে সর্ব্বদা একটা সন্দেহ এবং চেতনা থাকিলে পরের সঙ্গে মেলা যায় না। কাদম্বিনী যোগমায়ার মুখের দিকে চায় এবং কি যেন ভাবে—মনে করে স্বামী এবং ঘরকন্না লইয়াও যেন বহুদূরে আর এক জগতে আছে। স্নেহমমতা এবং সমস্ত কর্ত্তব্য লইয়াও যেন পৃথিবীর লোক, আর আমি যেন শূন্য ছায়া। ও যেন অস্তিত্বের দেশে, আর আমি যেন অনন্তের মধ্যে।

যোগমায়ারও কেমন কেমন লাগিল—কিছুই বুঝিতে পারিল না। স্ত্রীলোক রহস্য সহ্য করিতে পারে না—কারণ অনিশ্চিতকে লইয়া কবিত্ব করা যায়, বীরত্ব করা যায়, পাণ্ডিত্য করা যায়, কিন্তু ঘরকন্না করা যায় না। এই জন্য স্ত্রীলোক যেটা বুঝিতে পারে না, হয় সেটার অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া তাহার সহিত কোন সম্পর্ক রাখে না, নয় তাহাকে স্বহস্তে নূতন মূর্ত্তি দিয়া নিজের ব্যবহারযোগ্য একটি সামগ্রী গড়িয়া তোলে—যদি দুইয়ের কোনটাই না পারে তবে তাহার উপর ভারি রাগ করিতে থাকে।

কাদম্বিনী যতই দুর্ব্বোধ হইয়া উঠিল যোগমায়া তাহার উপর ততই রাগ করিতে লাগিল; ভাবিল, এ কি উপদ্রব স্কন্ধের উপর চাপিল?

আবার আর এক বিপদ। কাদম্বিনীর আপনাকে আপনি ভয় করে। সে নিজের কাছ হইতে নিজে কিছুতেই পালাইতে পারে না।

যাহাদের ভূতের ভয় আছে তাহারা আপনার পশ্চাদ্দিক্‌কে ভয় করে—যেখানে দৃষ্টি রাখিতে পারে না সেইখানেই ভয়। কিন্তু কাদম্বিনীর আপনার মধ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভয়—বাহিরে তার ভয় নাই।

এই জন্য বিজন দ্বিপ্রহরে সে একা ঘরে এক এক দিন চীৎকার করিয়া উঠিত—এবং সন্ধ্যাবেলায় দীপালোকে আপনার ছায়া দেখিলে তাহার গা ছম্‌-ছম্‌ করিতে থাকিত।

তাহার এই ভয় দেখিয়া বাড়িসুদ্ধ লোকের মনে কেমন একটা ভয় জন্মিয়া গেল। চাকর-দাসীরা এবং যোগমায়াও যখন তখন যেখানে সেখানে ভূত দেখিতে আরম্ভ করিল।

একদিন এমন হইল, কাদম্বিনী অর্দ্ধরাত্রে আপন শয়নগৃহ হইতে কাঁদিয়া বাহির হইয়া একেবারে যোগমায়ার গৃহদ্বারে আসিয়া কহিল—"দিদি, দিদি, তোমাদের দুটি পায়ে পড়ি গো! আমাকে একলা ফেলিয়া রাখিয়ো না।"

যোগমায়ার যেমন ভয়ও পাইল, তেমনি রাগও হইল। ইচ্ছা করিল তদ্দণ্ডেই কাদম্বিনীকে দূর করিয়া দেয়। দয়াপরবশ শ্রীপতি অনেক চেষ্টায় তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে স্থান দিল।

পরদিন অসময়ে অন্তঃপুরে শ্রীপতির তলব হইল। যোগমায়া তাহাকে অকস্মাৎ ভর্ৎসনা করিতে আরম্ভ করিল—"হাঁ গা, তুমি কেমন-ধারা লোক! একজন মেয়েমানুষ আপন শ্বশুর-ঘর ছাড়িয়া তোমার ঘরে আসিয়া অধিষ্ঠান হইল মাসখানেক হইয়া গেল তবু যাইবার নাম করে না, আর তোমার মুখে যে একটি আপত্তি মাত্র শুনি না! তোমার মনের ভাবটা কি বুঝাইয়া বল দেখি। তোমরা পুরুষ মানুষ এম্‌নি জাতই বটে!"

বাস্তবিক সাধারণ স্ত্রীজাতির পরে পুরুষ মানুষের একটা নির্ব্বিচার পক্ষপাত আছে, এবং সে জন্য স্ত্রীলোকেরাই তাহাদিগকে অধিক অপরাধী করে। নিঃসহায়া অথচ সুন্দরী কাদম্বিনীর প্রতি শ্রীপতির করুণা যে, যথোচিত মাত্রার চেয়ে কিঞ্চিৎ অধিক ছিল তাহার বিরুদ্ধে তিনি যোগমায়ার গাত্র স্পর্শপূর্ব্বক শপথ করিতে উদ্যত হইলেও তাঁহার ব্যবহারে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইত না।

তিনি মনে করিতেন নিশ্চয়ই শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এই পুত্রহীনা বিধবার প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিত তাই নিতান্ত সহ্য করিতে না পারিয়া পালাইয়া কাদম্বিনী আমার আশ্রয় লইয়াছে। যখন ইহার বাপ মা কেহই নাই, তখন আমি ইহাকে কি করিয়া ত্যাগ করি!—এই বলিয়া তিনি কোনরূপ সন্ধান লইতে ক্ষান্ত ছিলেন, এবং কাদম্বিনীকেও এই অপ্রীতিকর বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া ব্যথিত করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইত না।

তখন তাঁহার স্ত্রী তাঁহার অসাড় কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে নানাপ্রকার আঘাত দিতে লাগিল। কাদম্বিনীর শ্বশুরবাড়িতে খবর দেওয়া যে তাঁহার গৃহের শান্তিরক্ষার পক্ষে একান্ত আবশ্যক, তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন। অবশেষে স্থির করিলেন হঠাৎ চিঠি লিখিয়া বসিলে ভাল ফল নাও হইতে পারে, অতএব রাণীহাটে তিনি নিজে গিয়া সন্ধান লইয়া যাহা কর্ত্তব্য স্থির করিবেন।

শ্রীপতি ত গেলেন, এদিকে যোগমায়া আসিয়া কাদম্বিনীকে কহিলেন "সই, এখানে তোমার আর থাকা ভাল দেখাইতেছে না! লোকে বলিবে কি!"

কাদম্বিনী গম্ভীর ভাবে যোগমায়ার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল "লোকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি!"

যোগমায়া কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেল। কিঞ্চিৎ রাগিয়া কহিল "তোমার না থাকে, আমাদের ত আছে! আমরা পরের ঘরের বধূকে কি বলিয়া আটক করিয়া রাখিব!"

কাদম্বিনী কহিল "আমার শ্বশুরঘর কোথায়?"

যোগমায়া ভাবিল—"আ মরণ! পোড়া-কপালী বলে কি?"

কাদম্বিনী ধীরে ধীরে কহিল—"আমি কি তোমাদের কেহ? আমি কি এ পৃথিবীর? তোমরা হাসিতেছ, কাঁদিতেছ, ভালবাসিতেছ, সবাই আপন আপন লইয়া আছ, আমি ত কেবল চাহিয়া আছি! তোমরা মানুষ, আর আমি ছায়া! বুঝিতে পারি না, ভগবান্ আমাকে তোমাদের এই সংসারের মাঝখানে কেন রাখিয়াছেন!"

এম্নি ভাবে চাহিয়া কথাগুলা বলিয়া গেল যে, যোগমায়া কেমন একরকম করিয়া মোটের উপর একটা কি বুঝিতে পারিল কিন্তু আসল কথাটা বুঝিল না, জবাবও দিতে পারিল না, দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করিতেও পারিল না। অত্যন্ত ভারগ্রস্ত গম্ভীর ভাবে চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—•:•:•—

রাত্রি প্রায় যখন দশটা তখন শ্রীপতি রাণী-হাট হইতে ফিরিয়া আসিলেন। মুষলধারে বৃষ্টিতে পৃথিবী ভাসিয়া যাইতেছে। ক্রমাগতই তাহার ঝর্ ঝর্ শব্দে মনে হইতেছে বৃষ্টির শেষ নাই, আজ রাত্রিরও শেষ নাই।

যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইল?"

শ্রীপতি কহিলেন "সে অনেক কথা। পরে হইবে।" বলিয়া কাপড় ছাড়িয়া আহার করিলেন। এবং তামাক খাইয়া শুইতে গেলেন। ভাবটা অত্যন্ত চিন্তিত।

যোগমায়া অনেকক্ষণ কৌতূহল দমন করিয়া ছিলেন, শয্যায় প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি শুনিলে বল?"

শ্রীপতি কহিলেন "নিশ্চয় তুমি একটা ভুল করিয়াছ।"

শুনিবামাত্র যোগমায়া মনে মনে ঈষৎ রাগ করিলেন। ভুল মেয়েরা কখনই করে না, যদি বা করে কোন সুবুদ্ধি পুরুষের সেটা উল্লেখ করা কর্ত্তব্য হয় না, নিজের ঘাড় পাতিয়া লওয়াই সুযুক্তি। যোগমায়া কিঞ্চিৎ উষ্ণভাবে কহিলেন "কিরকম শুনি!"

শ্রীপতি কহিলেন "যে স্ত্রীলোকটিকে তোমার ঘরে স্থান দিয়াছ সে তোমার সেই কাদম্বিনী নহে।"

এমনতর কথা শুনিলে সহজেই রাগ হইতে পারে—বিশেষতঃ নিজের স্বামীর মুখে শুনিলে ত কথাই নাই। যোগমায়া কহিলেন "আমার সইকে আমি চিনি না, তোমার কাছ হইতে চিনিয়া লইতে হইবে—কি কথার শ্রী!"—

শ্রীপতি বুঝাইলেন এস্থলে কথার শ্রী লইয়া কোনরূপ তর্ক হইতেছে না, প্রমাণ দেখিতে হইবে। যোগমায়ার সই কাদম্বিনী যে মারা গিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

যোগমায়া কহিলেন—"ঐ শোন্! তুমি নিশ্চয় একটা গোল পাকাইয়া আসিয়াছ! কোথায় যাইতে কোথায় গিয়াছ, কি কি শুনিয়াছ তাহার ঠিক নাই! তোমাকে নিজে যাইতে কে বলিল, একখানা চিঠি লিখিয়া দিলেই সমস্ত পরিষ্কার হইত।"

নিজের কর্ম্মপটুতার প্রতি স্ত্রীর এইরূপ

বিশ্বাসের অভাবে শ্রীপতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বিস্তারিত ভাবে সমস্ত প্রমাণ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন—কিন্তু কোন ফল হইল না। উভয়পক্ষে হাঁ না করিতে করিতে রাত্রি দ্বিপ্রহর হইয়া গেল।

যদিও কাদম্বিনীকে এই দণ্ডেই গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া সম্বন্ধে স্বামী স্ত্রী কাহারো মতভেদ ছিল না—কারণ শ্রীপতির বিশ্বাস তাঁহার অতিথি ছদ্মপরিচয়ে তাঁহার স্ত্রীকে এতদিন প্রতারণা করিয়াছে এবং যোগমায়ার বিশ্বাস সে কুলত্যাগিনী—তথাপি উপস্থিত তর্কটা সম্বন্ধে উভয়ের কেহই হার মানিতে চাহেন না।

উভয়ের কণ্ঠস্বর ক্রমেই উচ্চ হইয়া উঠিতে লাগিল, ভুলিয়া গেলেন পাশের ঘরেই কাদম্বিনী শুইয়া আছে।

একজন বলেন "ভাল বিপদেই পড়া গেল! আমি নিজের কাণে শুনিয়া আসিলাম!"

আর একজন দৃঢ়স্বরে বলেন "সে কথা বলিলে মানিব কেন, আমি নিজের চক্ষে দেখিতেছি!"

অবশেষে যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা কাদম্বিনী কবে মরিল বল দেখি।"

ভাবিলেন, কাদম্বিনীর কোন একটা চিঠির তারিখের সহিত অনৈক্য বাহির করিয়া শ্রীপতির ভ্রম সপ্রমাণ করিয়া দিবেন।

শ্রীপতি যে তারিখের কথা বলিলেন, উভয়ে হিসাব করিয়া দেখিলেন, যেদিন সন্ধ্যাবেলায় কাদম্বিনী তাঁহাদের বাড়িতে আসে সে তারিখ ঠিক তাহার পূর্ব্বের দিনেই পড়ে! শুনিবামাত্র যোগমায়ার বুকটা হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল, শ্রীপতিরও কেমন একরকম বোধ হইতে লাগিল।

এমন সময়ে তাঁহাদের ঘরের দ্বার খুলিয়া গেল, একটা বাদলার বাতাস আসিয়া প্রদীপটা ফস্ করিয়া নিবিয়া গেল। বাহিরের অন্ধকার প্রবেশ করিয়া এক মুহূর্ত্তে সমস্ত ঘরটা আগাগোড়া ভরিয়া গেল। কাদম্বিনী একেবারে ঘরের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন রাত্রি আড়াই প্রহর হইয়া গিয়াছে, বাহিরে অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়িতেছে।

কাদম্বিনী কহিল "সই, আমি তোমার সেই কাদম্বিনী, কিন্তু এখন আমি আর বাঁচিয়া নাই। আমি মরিয়া আছি!"

যোগমায়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—শ্রীপতির বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

"কিন্তু আমি মরিয়াছি ছাড়া তোমাদের কাছে আর কি অপরাধ করিয়াছি! আমার যদি ইহলোকেও স্থান নাই, পরলোকেও স্থান নাই—ওগো, আমি তবে কোথায় যাইব!" তীব্রকণ্ঠে চীৎকার করিয়া যেন এই গভীর বর্ষানিশীথে সুপ্ত বিধাতাকে জাগ্রত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ওগো, আমি তবে কোথায় যাব!"—

এই বলিয়া মূর্চ্ছিত দম্পতিকে অন্ধকার ঘরে ফেলিয়া বিশ্বজগতে কাদম্বিনী আপনার স্থান খুঁজিতে গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কাদম্বিনী যে কেমন করিয়া রাণীহাটে ফিরিয়া গেল তাহা বলা কঠিন। কিন্তু প্রথমে কাহাকেও দেখা দিল না। সমস্ত দিন অনাহারে একটা ভাঙা পোড়ো মন্দিরে যাপন করিল।

বর্ষার অকাল সন্ধ্যা যখন অত্যন্ত ঘন হইয়া আসিল এবং আসন্ন দুর্য্যোগের আশঙ্কায় গ্রামের লোকেরা ব্যস্ত হইয়া আপন আপন গৃহ আশ্রয়

করিল তখন কাদম্বিনী পথে বাহির হইল। শ্বশুর-বাড়ির দ্বারে গিয়া একবার তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু মস্ত ঘোমটা টানিয়া যখন ভিতরে প্রবেশ করিল দাসীভ্রমে দ্বারীরা কোনরূপ বাধা দিল না। এমন সময় বৃষ্টি খুব চাপিয়া আসিল, বাতাসও বেগে বহিতে লাগিল।

তখন বাড়ির গৃহিণী শারদাশঙ্করের স্ত্রী তাঁহার বিধবা ননদের সহিত তাস খেলিতে-ছিলেন। ঝি ছিল রান্নাঘরে, এবং পীড়িত খোকা জ্বরের উপশমে শয়নগৃহে বিছানায় ঘুমাইতেছিল। কাদম্বিনী সকলের চক্ষু এড়াইয়া সেই ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। সে যে কি ভাবিয়া শ্বশুরবাড়ি আসিয়াছিল জানি না, সে নিজেও জানে না, কেবল এইটুকু জানে যে একবার খোকাকে চক্ষে দেখিয়া যাইবার ইচ্ছা। তাহার পর কোথায় যাইবে কি হইবে, সে কথা সে ভাবেও নাই।

দীপালোকে দেখিল রুগ্ন শীর্ণ খোকা হাত মুঠা করিয়া ঘুমাইয়া আছে। দেখিয়া উত্তপ্ত হৃদয় যেন তৃষাতুর হইয়া উঠিল—তাহার সমস্ত বালাই লইয়া তাহাকে একবার বুকে না চাপিয়া ধরিলে কি বাঁচা যায়! আর, তাহার পর মনে পড়িল, আমি নাই, ইহাকে দেখিবার কে আছে! ইহার মা সঙ্গ ভালবাসে, গল্প ভালবাসে, খেলা ভালবাসে, এতদিন আমার হাতে ভার দিয়াই সে নিশ্চিন্ত ছিল, কখন তাহাকে ছেলে মানুষ করিবার কোন দায় পোহাইতে হয় নাই। আজ ইহাকে কে তেমন করিয়া যত্ন করিবে!—

এমন সময় খোকা হঠাৎ পাশ ফিরিয়া অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় বলিয়া উঠিল—"কাকীমা, জল দে!"—আ মরিয়া যাই! সোণা আমার, তোর কাকীমাকে এখনো ভুলিস্ নাই! তাড়াতাড়ি কুঁজা হইতে জল গড়াইয়া লইয়া খোকাকে বুকের উপর তুলিয়া কাদম্বিনী তাহাকে জল পান করাইল।

যতক্ষণ ঘুমের ঘোর ছিল, চিরাভ্যাসমত কাকীমার হাত হইতে জল খাইতে খোকার কিছুই আশ্চর্য্য বোধ হইল না। অবশেষে কাদম্বিনী যখন বহুকালের আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া তাহাকে আবার শুয়াইয়া দিল, তখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, এবং কাকীমাকে জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাকীমা, তুই মরে' গিয়েছিলি?"

কাকীমা কহিল "হাঁ খোকা!"

"আবার তুই খোকার কাছে ফিরে এসেছিস? আর তুই মরে' যাবিনে?"

ইহার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই একটা গোল বাধিল—ঝি এক বাটি সাগু হাতে করিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, হঠাৎ বাটি ফেলিয়া মাগো বলিয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল।

চীৎকার শুনিয়া তাস ফেলিয়া গিন্নি ছুটিয়া আসিলেন, ঘরে ঢুকিতেই তিনি একেবারে কাঠের মত হইয়া গেলেন, পালাইতেও পারিলেন না, মুখ দিয়া একটি কথাও সরিল না!

এই সকল ব্যাপার দেখিয়া খোকারও মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়া উঠিল—সে কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল —"কাকীমা, তুই যা!"

কাদম্বিনী অনেক দিন পরে আজ অনুভব করিয়াছে যে সে মরে নাই—সেই পুরাতন ঘর দ্বার, সেই সমস্ত, সেই খোকা, সেই স্নেহ, তাহার পক্ষে সমান জীবন্ত ভাবেই আছে, মধ্যে কোন বিচ্ছেদ কোন ব্যবধান জন্মায় নাই। সইয়ের বাড়ি গিয়া অনুভব করিয়াছিল বাল্য-কালের সে সই মরিয়া গিয়াছে—খোকার ঘরে আসিয়া বুঝিতে পারিল, খোকার কাকীমা ত এক তিলও মরে নাই।

ব্যাকুল ভাবে কহিল, "দিদি, তোমরা

আমাকে দেখিয়া কেন ভয় পাইতেছ! এই দেখ, আমি তোমাদের সেই তেমনি আছি।”

গিন্নি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন

ভগ্নীর কাছে সংবাদ পাইয়া শারদাশঙ্কর বাবু স্বয়ং অন্তঃপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—তিনি যোড়হস্তে কাদম্বিনীকে কহিলেন “ছোট বৌমা, এই কি তোমার উচিত হয়। সতীশ আমার বংশের একমাত্র ছেলে, উহার প্রতি তুমি কেন দৃষ্টি দিতেছ? আমরা কি তোমার পর? তুমি যাওয়ার পর হইতে ও প্রতিদিন শুকাইয়া যাইতেছে উহার ব্যামো আর ছাড়ে না, দিনরাত কেবল কাকীমা কাকীমা করে। যখন সংসার হইতে বিদায় লইয়াছ তখন এ মায়াবন্ধন ছিঁড়িয়া যাও—আমরা তোমার যথোচিত সৎকার করিব!”—

তখন কাদম্বিনী আর সহিতে পারিল না, তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল “ওগো, আমি মরি নাই গো মরি নাই! আমি কেমন করিয়া তোমাদের বুঝাইব আমি মরি নাই! এই দেখ আমি বাঁচিয়া আছি!”

বলিয়া কাঁসার বাটিটা ভূমি হইতে তুলিয়া কপালে আঘাত করিতে লাগিল, কপাল ফাটিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল।

তখন বলিল “এই দেখ, আমি বাঁচিয়া আছি!”

শারদাশঙ্কর মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিলেন—খোকা ভয়ে বাবাকে ডাকিতে লাগিল, দুই মূর্চ্ছিতা রমণী মাটিতে পড়িয়া রহিল!

তখন কাদম্বিনী “ওগো আমি মরি নাই গো মরি নাই গো মরি নাই”—বলিয়া চীৎকার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া অন্তঃপুরের পুষ্করিণীর জলের মধ্যে গিয়া পড়িল। শারদাশঙ্কর উপরের ঘর হইতে শুনিতে পাইলেন ঝপাস্‌ করিয়া একটা শব্দ হইল।

সমস্ত রাত্রি বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, তাহার পরদিন সকালেও বৃষ্টি পড়িতেছে—মধ্যাহ্নেও বৃষ্টির বিরাম নাই। কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল সে মরে নাই।

ডিটেকটিভ্।

আমি পুলিসের ডিটেক্‌টিভ্‌ কর্ম্মচারী। আমার জীবনে দুটিমাত্র লক্ষ্য ছিল—আমার স্ত্রী এবং আমার ব্যবসায়। পূর্ব্বে একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে ছিলাম—সেখানে আমার স্ত্রীর প্রতি সমাদরের অভাব হওয়াতেই আমি দাদার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া বাহির হইয়া আসি। দাদাই উপার্জ্জন করিয়া আমাকে পালন করিতেছিলেন—অতএব সহসা সস্ত্রীক তাঁহার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া আসা আমার পক্ষে দুঃসাহসের কাজ হইয়াছিল।

কিন্তু কখনো নিজের উপরে আমার বিশ্বাসের ত্রুটি ছিল না। আমি নিশ্চয় জানিতাম, সুন্দরী স্ত্রীকে যেমন বশ করিয়াছি বিমুখ অদৃষ্টলক্ষ্মীকেও তেমনি বশ করিতে পারিব। মহিমচন্দ্র এ সংসারে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে না।

পুলিস্‌ বিভাগে সামান্যভাবে প্রবেশ করিলাম, অবশেষে ডিটেক্‌টিভ পদে উত্তীর্ণ হইতে অধিক বিলম্ব হইল না।

উজ্জ্বল শিখা হইতেও যেমন কজ্জলপাত

হয় তেমনি আমার স্ত্রীর প্রেম হইতেও ঈর্ষ্যা এবং সন্দেহের কালিমা বাহির হইত। সেটাতে আমার কিছু কাজের ব্যাঘাত করিত ;—কারণ পুলিসের কর্ম্মে স্থানাস্থান কালাকাল বিচার করিলে চলে না—বরঞ্চ স্থানের অপেক্ষা অস্থান এবং কালের অপেক্ষা অকালটারই চর্চ্চা অধিক করিয়া করিতে হয়—তাহাতে করিয়া আমার স্ত্রীর স্বভাবসিদ্ধ সন্দেহ আরো যেন দুর্নিবার হইয়া উঠিত। সে আমাকে ভয় দেখাইবার জন্য বলিত, তুমি এমন যখন তখন যেখানে সেখানে যাপন কর, কালে ভদ্রে আমার সঙ্গে দেখা হয়—আমার জন্য তোমার আশঙ্কা হয় না।—আমি তাহাকে বলিতাম, সন্দেহ করা আমাদের ব্যবসায়, সেই কারণে ঘরের মধ্যে সেটাকে আর আনি না।

স্ত্রী বলিত—সন্দেহ করা আমার ব্যবসায় নহে উহা আমার স্বভাব—আমাকে তুমি লেশ মাত্র সন্দেহের কারণ দিলে আমি সব করিতে পারি।

ডিটেক্‌টিভ লাইনে আমি সকলের সেরা হইব, একটা নাম রাখিব এ প্রতিজ্ঞা আমার দৃঢ় ছিল। এ সম্বন্ধে যত কিছু বিবরণ এবং গল্প আছে তাহার কোনটাই পড়িতে বাকী রাখি নাই। কিন্তু পড়িয়া কেবল মনের অসন্তোষ এবং অধীরতা বাড়িতে লাগিল।

কারণ, আমাদের দেশের অপরাধীগুলা ভীরু এবং নির্ব্বোধ, অপরাধগুলা নির্জ্জীব এবং সরল—তাহার মধ্যে দুরূহতা দুর্গমতা কিছুই নাই। আমাদের দেশের খুনী নররক্তপাতের উৎকট উত্তেজনা কোন মতেই নিজের মধ্যে সম্বরণ করিতে পারে না। জালিয়াৎ যে জাল বিস্তার করে তাহাতে অনতিবিলম্বে নিজেই আপাদ মস্তক জড়াইয়া পড়ে—অপরাধব্যূহ হইতে নির্গমনের কূটকৌশল সে কিছুই জানে না। এমন নির্জ্জীব দেশে ডিটেক্‌টিভের কাজে সুখও নাই গৌরবও নাই।

বড়বাজারের মাড়োয়ারী জুয়াচোরকে অনায়াসে গ্রেক্‌তার করিয়া মনে মনে বলিয়াছি, "ওরে অপরাধিকুলকলঙ্ক, পরের সর্ব্বনাশ করা গুণী ওস্তাদলোকের কর্ম্ম; তোর মত আনাড়ি নির্ব্বোধের সাধু তপস্বী হওয়া উচিত ছিল!" খুনীকে ধরিয়া তাহার প্রতি স্বগত উক্তি করিয়াছি,—"গবর্ণমেণ্টের সমুন্নত ফাঁসকাষ্ঠ কি তোদের মত গৌরববিহীন প্রাণীদের জন্য হইয়াছিল—তোদের না আছে উদার কল্পনাশক্তি, না আছে কঠোর আত্মসংযম, তোরা বেটারা খুনী হইবার স্পর্দ্ধা করিস্!"

আমি কল্পনাচক্ষে যখন লণ্ডন এবং প্যারিসের জনাকীর্ণ পথের দুই পার্শ্বে শীতবাষ্পাকুল অভ্রভেদী হর্ম্ম্যশ্রেণী দেখিতে পাইতাম তখন আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত! মনে মনে ভাবিতাম, এই হর্ম্ম্যরাজি এবং পথ উপপথের মধ্য দিয়া যেমন জনস্রোত, কর্ম্মস্রোত, উৎসবস্রোত, সৌন্দর্য্যস্রোত, অহরহ বহিয়া যাইতেছে, তেমনি সর্ব্বত্রই হিংস্রকুটিল কৃষ্ণকুঞ্চিত ভয়ঙ্কর অপরাধপ্রবাহ তলে তলে আপনার পথ করিয়া চলিয়াছে, তাহারই সামীপ্যে য়ুরোপীয় সামাজিকতার হাস্য কৌতুক শিষ্টাচার এমন বিরাটভীষণ রমণীয়তা লাভ করিয়াছে। আর আমাদের কলিকাতার পথপার্শ্বের মুক্তবাতায়ন গৃহশ্রেণীর মধ্যে রান্নাবাড়না, গৃহকার্য্য, পরীক্ষার পাঠ, তাস দাবার বৈঠক, দাম্পত্য কলহ, বড় জোর, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ এবং মকদ্দমার পরামর্শ ছাড়া বিশেষ কিছু নাই—কোন একটা বাড়ির দিকে চাহিয়া কখনো এ কথা মনে হয় না যে, হয়ত এই মুহূর্ত্তেই এই গৃহের কোন একটা কোণে সর্ব্ব-

তান মুখ গুঁজিয়া বসিয়া আপনার কালো কালো ডিম গুলিতে তা দিতেছে।

আমি অনেক সময়ই রাস্তায় বাহির হইয়া পথিকদের মুখ এবং চলনের ভাব পর্য্যবেক্ষণ করিতাম—ভাবে ভঙ্গীতে যাহাদিগকে কিছুমাত্র সন্দেহজনক বোধ হইয়াছে আমি অনেক সময়ই গোপনে তাহাদের অনুসরণ করিয়াছি, তাহাদের নাম ধাম ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়াছি, অবশেষে পরম নেরাশ্যের সহিত আবিষ্কার করিয়াছি, তাহারা নিষ্কলঙ্ক ভালমানুষ লোক—এমন কি, তাহাদের আত্মীয় বান্ধবেরাও তাহাদের সম্বন্ধে আড়ালে কোন প্রকার গুরুতর মিথ্যা অপবাদও প্রচার করে না। পথিকদের মধ্যে সব চেয়ে যাহাকে পাষণ্ড বলিয়া মনে হইয়াছে, এমন কি, যাহাকে দেখিয়া নিশ্চয় মনে করিয়াছি যে, এইমাত্র সে কোন একটা উৎকট দুষ্কার্য্য সাধন করিয়া আসিয়াছে, সন্ধান করিয়া জানিয়াছি সে একটি ছাত্রবৃত্তি স্কুলের দ্বিতীয় পাণ্ডিত তখনি অধ্যাপনকার্য্য সমাধা করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিতেছে। এই সকল লোকেরাই অন্য কোন দেশে জন্মগ্রহণ করিলে বিখ্যাত চোর ডাকাত হইয়া উঠিতে পারিত, কেবলমাত্র যথোচিত জীবনীশক্তি এবং যথেষ্ট পরিমাণ পৌরুষের অভাবেই আমাদের দেশে ইহারা কেবল পাণ্ডিতী করিয়া বৃদ্ধবয়সে পেন্সন্ লইয়া মরে;—বহু চেষ্টা ও সন্ধানের পর এই দ্বিতীয় পণ্ডিতটার নিরীহতার প্রতি আমার যেরূপ সুগভীর অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল কোন অতি ক্ষুদ্র ঘটিবাটিচোরের প্রতি তেমন হয় নাই।

অবশেষে একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদেরই বাসার অনতিদূরে একটি গ্যাস্‌পোষ্টের নীচে একটা মানুষ দেখিলাম, বিনা আবশ্যকে সে উৎসুক ভাবে একই স্থানে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে।—তাঁহাকে দেখিয়া আমার সন্দেহ মাত্র রহিল না যে, সে একটি কোন গোপন দুরভিসন্ধির পশ্চাতে নিযুক্ত রহিয়াছে। নিজে অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাহার চেহারাখানা বেশ ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম—তরুণ বয়স, দেখিতে সুশ্রী;—আমি মনে মনে কহিলাম, দুষ্কর্ম্ম করিবার এই ত ঠিক উপযুক্ত চেহারা; নিজের মুখশ্রীই যাহাদের সর্ব্বপ্রধান বিরুদ্ধ সাক্ষী, তাহারা যেন সর্ব্বপ্রকার অপরাধের কাজ সর্ব্বপ্রযত্নে পরিহার করে;—সৎকার্য্য করিয়া তাহারা নিষ্ফল হইতে পারে কিন্তু দুষ্কর্ম্ম দ্বারা সফলতা লাভও তাহাদের পক্ষে দুরাশা। দেখিলাম ছোকরাটির চেহারাটাই ইহার সর্ব্বপ্রধান বাহাদুরী—সেজন্য আমি মনে মনে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার তারিফ করিলাম—বলিলাম, ভগবান্ তোমাকে যে দুর্লভ সুবিধাটি দিয়াছেন সেটাকে রীতিমত কাজে খাটাইতে পার, তবে ত বলি সাবাস্!

আমি অন্ধকার হইতে তাহার সম্মুখে আসিয়াই পৃষ্ঠে চপেটাঘাত পূর্ব্বক বলিলাম, এই যে ভাল আছেন ত? সে তৎক্ষণাৎ প্রবল মাত্রায় চমকিয়া উঠিয়া একেবারে ফ্যাকাসে হইয়া উঠিল। আমি কহিলাম, "মাপ করিবেন ভুল হইয়াছে, হঠাৎ আপনাকে অন্যলোক ঠাওরাইয়াছিলাম।" মনে মনে কহিলাম কিছুমাত্র ভুল করি নাই, যাহা ঠাওরাইয়াছিলাম তাই বটে! কিন্তু এতটা অধিক চমকিয়া ওঠা তাহার পক্ষে অনুপযুক্ত হইয়াছিল—ইহাতে আমি কিছু ক্ষুণ্ণ হইলাম; নিজের শরীরের প্রতি তাহার আরো অধিক দখল থাকা উচিত ছিল, কিন্তু শ্রেষ্ঠতার সম্পূর্ণ আদর্শ অপরাধীশ্রেণীর মধ্যে বিরল। চোরকেও সেরা চোর করিয়া তুলিতে প্রকৃতি কৃপণতা করিয়া থাকে।

অন্তরালে আসিয়া দেখিলাম, সে ত্রস্তভাবে গ্যাস্‌পোষ্ট ছাড়িয়া চলিয়া গেল, পিছনে পিছনে গেলাম, দেখিলাম, ছোকরাটি গোলদীঘির মধ্যে প্রবেশ করিয়া পুষ্করিণীতীরে তৃণশয্যার উপর চীৎ হইয়া শুইয়া পড়িল ;—আমি ভাবিলাম, উপায় চিন্তার এ একটা স্থান বটে, গ্যাস্‌পোষ্টের তলদেশের অপেক্ষা অনেকাংশে ভাল,—লোকে যদি কিছু সন্দেহ করে ত বড় জোর এই ভাবিতে পারে যে, ছোকরাটি অন্ধকার আকাশে প্রেয়সীর মুখচন্দ্র অঙ্কিত করিয়া কৃষ্ণপক্ষ রাত্রির অভাব পূরণ করিতেছে। ছেলেটির প্রতি উত্তরোত্তর আমার চিত্ত আকৃষ্ট হইতে লাগিল।

অনুসন্ধান করিয়া তাহার বাসা জানিলাম। মন্মথ তাহার নাম—সে কালেজের ছাত্র, পরীক্ষা ফেল্ করিয়া গ্রীষ্মাবকাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহার বাসার সহবাসী ছাত্রগণ সকলেই আপন আপন বাড়ি চলিয়া গেছে। দীর্ঘ অবকাশকালে সকল ছাত্রই বাসা ছাড়িয়া পালায়—এই লোকটিকে কোন্ দুষ্টগ্রহ ছুটি দিতেছে না, সেটা বাহির করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম।

আমিও ছাত্র সাজিয়া তাহার বাসার এক অংশ গ্রহণ করিলাম। প্রথম দিন যখন সে আমাকে দেখিল কেমন এক রকম করিয়া সে আমার মুখের দিকে চাহিল, তাহার ভাবটা ভাল বুঝিলাম না। যেন সে বিস্মিত, যেন সে আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছে—এমনি একটা ভাব। বুঝিলাম, শিকারীর উপযুক্ত শিকার বটে—ইহাকে সোজা ভাবে ফস্ করিয়া বাগান করা যাইবে না।

অথচ যখন তাহার সহিত প্রণয়বন্ধনের চেষ্টা করিলাম, তখন সে ধরা দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিল না। কিন্তু মনে হইল সেও আমাকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে, সেও আমাকে চিনিতে চায়। মনুষ্যচরিত্রের প্রতি এইরূপ সদাসতর্ক সজাগ কৌতূহল—ইহা ওস্তাদের লক্ষণ। এত অল্প বয়সে এতটা চাতুরী দেখিয়া বড় খুসি হইলাম।

মনে ভাবিলাম, মাঝখানে একজন রমণী না আনিলে এই অসাধারণ অকালধূর্ত্ত ছেলেটির হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটন করা সহজ হইবে না।

একদিন গদগদকণ্ঠে মন্মথকে বলিলাম, ভাই, একটি স্ত্রীলোককে আমি ভালবাসি, কিন্তু সে আমাকে ভালবাসে না।

প্রথমটা সে যেন কিছু চকিতভাবে আমার মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর ঈষৎ হাসিয়া কহিল—এরূপ দুর্য্যোগ বিরল নহে। এই প্রকার মজা করিবার জন্যই কৌতুকপর বিধাতা নরনারীর প্রভেদ করিয়াছেন।

আমি কহিলাম, তোমার পরামর্শ ও সাহায্য চাহি।—সে সম্মত হইল।

আমি বানাইয়া বানাইয়া অনেক ইতিহাস কহিলাম—সে সাগ্রহে কৌতূহলে সমস্ত কথা শুনিল—কিন্তু অধিক কথা কহিল না। আমার ধারণা ছিল, ভালবাসার—বিশেষতঃ গর্হিত ভালবাসার—ব্যাপার প্রকাশ করিয়া বলিলে মানুষের মধ্যে অন্তরঙ্গতা দ্রুত বাড়িয়া উঠে—কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহার কোন লক্ষণ দেখা গেল না—ছোকরাটি পূর্ব্বাপেক্ষা যেন চুপ মারিয়া গেল—অথচ সকল কথা মনে গাঁথিয়া লইল। ছেলেটির প্রতি আমার ভক্তির সীমা রহিল না।

এদিকে মন্মথ প্রত্যহ গোপনে দ্বার রোধ করিয়া কি করে—এবং তাহার গোপন অভিসন্ধি কিরূপে কতদূর অগ্রসর হইতেছে আমি তাহার ঠিকানা করিতে পারিলাম না—অথচ অগ্রসর হইতেছিল সন্দেহ নাই। কি একটা

স্তান মুখ গুজিয়া বসিয়া আপনার কালো কালো ডিম গুলিতে তা দিতেছে!

আমি অনেক সময়ই রাস্তায় বাহির হইয়া পথিকদের মুখ এবং চলনের ভাব পর্য্যবেক্ষণ করিতাম—ভাবে ভঙ্গীতে যাহাদিগকে কিছুমাত্র সন্দেহজনক বোধ হইয়াছে আমি অনেক সময়ই গোপনে তাহাদের অনুসরণ করিয়াছি, তাহাদের নাম ধাম ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়াছি, অবশেষে পরম নেরাশ্যের সহিত আবিষ্কার করিয়াছি, তাহারা নিষ্কলঙ্ক ভালমানুষ লোক—এমন কি, তাহাদের আত্মীয় বান্ধবেরাও তাহাদের সম্বন্ধে আড়ালে কোন প্রকার গুরুতর মিথ্যা অপবাদও প্রচার করে না। পথিকদের মধ্যে সব চেয়ে যাহাকে পাষণ্ড বলিয়া মনে হইয়াছে, এমন কি, যাহাকে দেখিয়া নিশ্চয় মনে করিয়াছি যে, এইমাত্র সে কোন একটা উৎকট দুষ্কার্য্য সাধন করিয়া আসিয়াছে, সন্ধান করিয়া জানিয়াছি সে একটি ছাত্রবৃত্তি স্কুলের দ্বিতীয় পাণ্ডিত তখন অধ্যাপনকার্য্য সমাধা করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিতেছে। এই সকল লোকেরাই অন্য কোন দেশে জন্মগ্রহণ করিলে বিখ্যাত চোর ডাকাত হইয়া উঠিতে পারিত, কেবলমাত্র যথোচিত জীবনীশক্তি এবং যথেষ্ট পরিমাণ পৌরুষের অভাবেই আমাদের দেশে ইহারা কেবল পাণ্ডিত্য করিয়া বৃদ্ধবয়সে পেন্সন্ লইয়া মরে;—বহু চেষ্টা ও সন্ধানের পর এই দ্বিতীয় পণ্ডিতটার নিরীহতার প্রতি আমার যেরূপ সুগভীর অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল কোন অতি ক্ষুদ্র ঘটিবাটিচোরের প্রতি তেমন হয় নাই।

অবশেষে একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদেরই বাসার অনতিদূরে একটি গ্যাস্‌পোষ্টের নীচে একটা মানুষ দেখিলাম, বিনা আবশ্যকে সে ঔৎসুক ভাবে একই স্থানে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে।—তাঁহাকে দেখিয়া আমার সন্দেহ মাত্র রহিল না যে, সে একটি কোন গোপন দুরভিসন্ধির পশ্চাতে নিযুক্ত রহিয়াছে। নিজে অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাহার চেহারাখানা বেশ ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম—তরুণ বয়স, দেখিতে সুশ্রী;—আমি মনে মনে কহিলাম, দুষ্কর্ম্ম করিবার এই ত ঠিক উপযুক্ত চেহারা; নিজের মুখশ্রীই যাহাদের সর্ব্বপ্রধান বিরুদ্ধ সাক্ষী, তাহারা যেন সর্ব্বপ্রকার অপরাধের কাজ সর্ব্বপ্রযত্নে পরিহার করে;—সৎকার্য্য করিয়া তাহারা নিষ্ফল হইতে পারে কিন্তু দুষ্কর্ম্ম দ্বারা সফলতা লাভও তাহাদের পক্ষে দুরাশা। দেখিলাম ছোকরাটির চেহারাটাই ইহার সর্ব্বপ্রধান বাহাদুরী—সেজন্য আমি মনে মনে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার তারিফ করিলাম—বলিলাম, ভগবান্ তোমাকে যে দুর্লভ সুবিধাটি দিয়াছেন সেটাকে রীতিমত কাজে খাটাইতে পার, তবে ত বলি সাবাস্!

আমি অন্ধকার হইতে তাহার সম্মুখে আসিয়াই পৃষ্ঠে চপেটাঘাত পূর্ব্বক বলিলাম, এই যে ভাল আছেন ত? সে তৎক্ষণাৎ প্রবল মাত্রায় চমকিয়া উঠিয়া একেবারে ফ্যাকাসে হইয়া উঠিল! আমি কহিলাম, "মাপ করিবেন ভুল হইয়াছে, হঠাৎ আপনাকে অন্যলোক ঠাওরাইয়াছিলাম!" মনে মনে করিলাম কিছুমাত্র ভুল করি নাই, যাহা ঠাওরাইয়াছিলাম তাই বটে! কিন্তু এতটা অধিক চমকিয়া ওঠা তাহার পক্ষে অনুপযুক্ত হইয়াছিল—ইহাতে আমি কিছু ক্ষুন্ন হইলাম; নিজের শরীরের প্রতি তাহার আরো অধিক দখল থাকা উচিত ছিল; কিন্তু শ্রেষ্ঠতার সম্পূর্ণ আদর্শ অপরাধীশ্রেণীর মধ্যে বিরল! চোরকেও সেরা চোর করিয়া তুলিতে প্রকৃতি কৃপণতা করিয়া থাকে!

অন্তরালে আসিয়া দেখিলাম, সে ত্রস্তভাবে গ্যাস্‌পোষ্ট ছাড়িয়া চলিয়া গেল, পিছনে পিছনে গেলাম, দেখিলাম, ছোকরাটি গোলদীঘির মধ্যে প্রবেশ করিয়া পুষ্করিণীতীরে তৃণশয্যার উপর চীৎ হইয়া শুইয়া পড়িল ;—আমি ভাবিলাম, উপায় চিন্তার এ একটা স্থান বটে, গ্যাস্‌পোষ্টের তলদেশের অপেক্ষা অনেকাংশে ভাল,—লোকে যদি কিছু সন্দেহ করে ত বড় জোর এই ভাবিতে পারে যে, ছোকরাটি অন্ধকার আকাশে প্রেয়সীর মুখচন্দ্র অঙ্কিত করিয়া কৃষ্ণপক্ষ রাত্রির অভাব পূরণ করিতেছে। ছেলেটির প্রতি উত্তরোত্তর আমার চিত্ত আকৃষ্ট হইতে লাগিল।

অনুসন্ধান করিয়া তাহার বাসা জানিলাম। মন্মথ তাহার নাম—সে কালেজের ছাত্র, পরীক্ষা ফেল্ করিয়া গ্রীষ্মাবকাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহার বাসার সহবাসী ছাত্রগণ সকলেই আপন আপন বাড়ি চলিয়া গেছে। দীর্ঘ অবকাশকালে সকল ছাত্রই বাসা ছাড়িয়া পালায়—এই লোকটিকে কোন্ দুষ্টগ্রহ ছুটি দিতেছে না, সেটা বাহির করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম।

আমিও ছাত্র সাজিয়া তাহার বাসার এক অংশ গ্রহণ করিলাম। প্রথম দিন যখন সে আমাকে দেখিল কেমন এক রকম করিয়া সে আমার মুখের দিকে চাহিল, তাহার ভাবটা ভাল বুঝিলাম না। যেন সে বিস্মিত, যেন সে আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছে—এমনি একটা ভাব। বুঝিলাম, শিকারীর উপযুক্ত শিকার বটে—ইহাকে সোজা ভাবে ফস্ করিয়া কায়দা করা যাইবে না।

অথচ যখন তাহার সহিত প্রণয়বন্ধনের চেষ্টা করিলাম, তখন সে ধরা দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিল না। কিন্তু মনে হইল সেও আমাকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে, সেও আমাকে চিনিতে চায়। মনুষ্যচরিত্রের প্রতি এইরূপ সদাসতর্ক সজাগ কৌতূহল—ইহা ওস্তাদের লক্ষণ। এত অল্প বয়সে এতটা চাতুরী দেখিয়া বড় খুসি হইলাম।

মনে ভাবিলাম, মাঝখানে একজন রমণী না আনিলে এই অসাধারণ অকালধূর্ত্ত ছেলেটির হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটন করা সহজ হইবে না।

একদিন গদগদকণ্ঠে মন্মথকে বলিলাম, ভাই, একটি স্ত্রীলোককে আমি ভালবাসি, কিন্তু সে আমাকে ভালবাসে না।

প্রথমটা সে যেন কিছু চকিতভাবে আমার মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর ঈষৎ হাসিয়া কহিল—এরূপ দুর্যোগ বিরল নহে। এই প্রকার মজা করিবার জন্যই কৌতুকপর বিধাতা নরনারীর প্রভেদ করিয়াছেন।

আমি কহিলাম, তোমার পরামর্শ ও সাহায্য চাহি।—সে সম্মত হইল।

আমি বানাইয়া বানাইয়া অনেক ইতিহাস কহিলাম—সে সাগ্রহে কৌতূহলে সমস্ত কথা শুনিল—কিন্তু অধিক কথা কহিল না। আমার ধারণা ছিল, ভালবাসার—বিশেষতঃ গর্হিত ভালবাসার—ব্যাপার প্রকাশ করিয়া বলিলে মানুষের মধ্যে অন্তরঙ্গতা দ্রুত বাড়িয়া উঠে—কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহার কোন লক্ষণ দেখা গেল না—ছোকরাটি পূর্ব্বাপেক্ষা যেন চুপ মারিয়া গেল—অথচ সকল কথা মনে গাঁথিয়া লইল। ছেলেটির প্রতি আমার ভক্তির সীমা রহিল না।

এদিকে মন্মথ প্রত্যহ গোপনে দ্বার রোধ করিয়া কি করে—এবং তাহার গোপন অভিসন্ধি কিরূপে কতদূর অগ্রসর হইতেছে আমি তাহার ঠিকানা করিতে পারিলাম না—অথচ অগ্রসর হইতেছিল সন্দেহ নাই। কি একটা

নিগূঢ় ব্যাপারে সে ব্যাপৃত আছে এবং সম্প্রতি সেটা অত্যন্ত পরিপক্ক হইয়াছে তাহা এই নবযুবকটির মুখ দেখিবামাত্র বুঝা যাইত। আমি গোপন চাবিতে তাহার ডেস্ক খুলিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে একটা অত্যন্ত দুর্ব্বোধ কবিতার খাতা, কলেজের বক্তৃতার নোট এবং বাড়ির লোকের গোটাকতক অকিঞ্চিৎকর চিঠি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় নাই। কেবল, বাড়ির চিঠি হইতে এই প্রমাণ হইয়াছে যে, বাড়ি ফিরিবার জন্য আত্মীয় স্বজন বারংবার প্রবল অনুরোধ করিয়াছে—তথাপি, তৎসত্ত্বেও বাড়ি না যাইবার একটা সঙ্গত কারণ অবশ্য আছে—সেটা যদি ন্যায়সঙ্গত হইত তবে নিশ্চয় এতদিনে কথায় কথায় ফাঁস হইত, কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইবার সম্ভাবনা থাকাতেই এই ছোকরাটির গতিবিধি এবং ইতিহাস আমার কাছে এমন নিরতিশয় ঔৎসুক্যজনক হইয়াছে;—যে অসামাজিক মনুষ্য সম্প্রদায় পাতালতলে সম্পূর্ণ আত্মগোপন করিয়া এই বৃহৎ মনুষ্য সমাজকে সর্ব্বদাই নীচের দিক হইতে দোলায়মান করিয়া রাখিয়াছে, এই বালকটি সেই বিশ্বব্যাপী বহু পুরাতন বৃহৎজাতির একটি অঙ্গ; এ সামান্য একজন স্কুলের ছাত্র নহে—এ জগৎবক্ষঃবিহারিণী সর্ব্বনাশিনীর একটি প্রলয় সহচর—আধুনিক কালের চস্মাপরা নিরীহ বাঙ্গালী ছাত্রের বেশে কালেজে পাঠ অধ্যয়ন করিতেছে—নৃমুণ্ডধারী কাপালিক বেশে ইহার ভৈরবতা আমার নিকট আরও ভৈরবতর হইত না;—আমি ইহাকে ভক্তি করি।

অবশেষে সশরীরে রমণীর অবতারণা করিতে হইল। পুলিসের বেতনভোগী হরিমতি আমার সহায় হইল। মন্মথকে জানাইলাম আমি এই হরিমতির হতভাগ্য প্রণয়াকাঙ্ক্ষী ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই আমি কিছু দিন গোলদীঘির ধারে মন্মথের পার্শ্বচর হইয়া "আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয়রে" কবিতাটি বারংবার আবৃত্তি করিলাম—এবং হরিমতিও কতকটা অন্তরের সহিত, কতকটা লীলা সহকারে জানাইল যে তাহার চিত্ত সে মন্মথকে সমর্পণ করিয়াছে—কিন্তু আশানুরূপ ফল হইল না—মন্মথ সুদূর নির্লিপ্ত অবিচলিত কৌতূহলের সহিত সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

এমন সময় একদিন মধ্যাহ্নে তাহার ঘরের মেজেতে একখানি চিঠির গুটিকতক ছিন্নাংশ কুড়াইয়া পাইলাম। যোড়া দিয়া দিয়া এই অসম্পূর্ণ বাক্যটুকু আদায় করিলাম "আজ সন্ধ্যা সাতটার সময় গোপনে তোমার বাসায়"—অনেক খুঁজিয়া আর কিছু বাহির করিতে পারিলাম না।

আমার অন্তঃকরণ পুলকিত হইয়া উঠিল;—মাটির মধ্য হইতে কোন বিলুপ্তবংশ প্রাচীন প্রাণীর একখণ্ড হাড় পাইলে প্রত্নজীবতত্ত্ববিদের কল্পনা যেমন মহানন্দে সজাগ হইয়া উঠে আমারও সেই অবস্থা হইল।

আমি জানিতাম আজ রাত্রি দশটার সময় আমাদের বাসায় হরিমতির আবির্ভাব হইবার কথা আছে—ইতিমধ্যে সন্ধ্যা সাতটার সময় ব্যাপার না কি? ছেলেটির যেমন সাহস তেমনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। যদি কোনও গোপন অপরাধের কাজ করিতে হয় তবে ঘরে যেদিন কোন একটা বিশেষ হাঙ্গামা আছে সেই দিন অবকাশ বুঝিয়া করা ভাল। প্রথমতঃ প্রধান ব্যাপারের দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট থাকে দ্বিতীয়তঃ যেদিন যেখানে কোন বিশেষ সমাগম আছে সেদিন সেখানে কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন গোপন ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিবে ইহা কেহ সম্ভব মনে করে না।

হঠাৎ আমার সন্দেহ হইল যে, আমার সহিত এই নূতন বন্ধুত্ব এবং হরিমতির সহিত এই প্রেমাভিনয় ইহাকেও মন্মথ আপন কার্য্য-সিদ্ধির উপায় করিয়া লইয়াছে ;—এই জন্যই সে আপনাকে ধরাও দেয় না আপনাকে ছাড়াইয়াও লয় না। আমরা তাহাকে তাহার গোপন কার্য্য হইতে আড়াল্ করিয়া রাখিয়াছি—সকলেই মনে করিতেছে সে আমাদিগকে লইয়াই ব্যাপৃত রহিয়াছে—সেও সে ভ্রম দূর করিতে চায় না।

তর্কগুলা একবার ভাবিয়া দেখ। যে বিদেশী ছাত্র ছুটির সময় আত্মীয় স্বজনের অনুনয় বিনয় উপেক্ষা করিয়া শূন্যবাসায় একলা পড়িয়া থাকে,—নির্জ্জন স্থানে তাহার বিশেষ প্রয়োজন আছে এ বিষয়ে কাহারও সংশয় থাকিতে পারে না—অথচ আমি তাহার বাসায় আসিয়া তাহার নির্জ্জনতা ভঙ্গ করিয়াছি, এবং একটা রমণীর অবতারণা করিয়া নূতন উপদ্রব সৃজন করিয়াছি ;—কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সে বিরক্ত হয় না, বাসা ছাড়ে না আমাদের সঙ্গ হইতে দূরে থাকে না—অথচ হরিমতি অথবা আমার প্রতি তাহার তিলমাত্র আসক্তি জন্মে নাই ইহা নিশ্চয় সত্য ;—এমন কি, তাহার অসতর্ক অবস্থায় বারংবার লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, আমাদের উভয়ের প্রতি তাহার একটা আন্তরিক ঘৃণা ক্রমেই যেন প্রবল হইয়া উঠিতেছে।

ইহার একমাত্র তাৎপর্য্য এই যে, সজনতার সাফাইটুকু রক্ষা করিয়া নির্জ্জনতার সুবিধাটুকু ভোগ করিতে হইলে আমার মত নবপরিচিত লোককে নিকটে রাখা সর্ব্বাপেক্ষা সদুপায় ;—এবং কোন বিষয়ে একান্তমনে লিপ্ত হওয়ার পক্ষে রমণীর মত এমন সহজ ছুতা আর কিছু নাই। ইতিপূর্ব্বে মন্মথর আচরণ যেরূপ নিরর্থক এবং সন্দেহজনক ছিল, আমাদের আগমনের পর তাহা সম্পূর্ণ লোপ হইল। কিন্তু এতটা দূরের কথা মুহূর্ত্তের মধ্যে বিচার করিয়া দেখিতে পারে, এত বড় মৎলবী লোক যে আমাদের বাঙ্গালা দেশে জন্মগ্রহণ করিতে পারে ইহা চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ হইয়া উঠিল। মন্মথ কিছু যদি মনে না করিত তবে আমি বোধ হয় তাহাকে দুই হাতে বক্ষে চাপিয়া ধরিতে পারিতাম।

সেদিন মন্মথের সঙ্গে দেখা হইবামাত্র তাহাকে বলিলাম, আজ তোমাকে সন্ধ্যা সাতটার সময় হোটেলে খাওয়াইব সঙ্কল্প করিয়াছি। শুনিয়া সে একটু চমকিয়া উঠিল—পরে আত্মসম্বরণ করিয়া কহিল ভাই মাপ কর, আমার পাকযন্ত্রের অবস্থা আজ বড় শোচনীয়।—হোটেলের খানায় মন্মথর কখনো কোন কারণে অনভিরুচি দেখি নাই,—আজ তাহার অন্তরিন্দ্রিয় নিশ্চয়ই নিতান্তই দুরূহ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে।

সেদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বভাগে আমার বাসায় থাকিবার কথা ছিল না। কিন্তু আমি সেদিন গায়ে পড়িয়া নানা কথা পাড়িয়া বৈকালের দিকে কিছুতেই আর উঠিবার গা করিলাম না। মন্মথ মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল, আমার সকল মতের সঙ্গেই সে সম্পূর্ণ সম্মতি প্রকাশ করিল, কোন তর্কে কিছুমাত্র প্রতিবাদ করিল না। অবশেষে ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ব্যাকুলচিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—হরিমতিকে আজ আনিতে যাইবে না?—আমি সচকিতভাবে কহিলাম—হাঁ, হাঁ, সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তুমি ভাই আহারাদি প্রস্তুত করিয়া রাখ, আমি ঠিক সাড়ে দশটা রাত্রে তাহাকে এখানে আনিয়া উপস্থিত করিব।" এই বলিয়া চলিয়া গেলাম।

আনন্দের নেশা আমার সর্ব্বশরীরের রক্তের মধ্যে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। সন্ধ্যা সাত ঘটিকার প্রতি মন্মথের যে প্রকার ঔৎসুক্য দেখিলাম আমার ঔৎসুক্য তদপেক্ষা অল্প ছিল না;—আমি আমাদের বাসার অনতিদূরে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া প্রেয়সীসমাগমোৎকণ্ঠিত প্রণয়ীর ন্যায় মুহুর্মুহু ঘড়ি দেখিতে লাগিলাম। গোধূলির অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া যখন রাজপথে গ্যাস জ্বালিবার সময় হইল এমন সময় একটি রুদ্ধদ্বার পাল্কী আমাদের বাসার মধ্যে প্রবেশ করিল। ঐ আচ্ছন্ন পাল্কীটির মধ্যে একটি অশ্রুসিক্ত অবগুণ্ঠিত পাপ একটি মূর্ত্তিমতী ট্রাজিডি কলেজের ছাত্রনিবাসের মধ্যে গুটিকতক উড়ে বেহারার স্কন্ধে চাপিয়া সমুচ্চ হাঁই-হুঁই শব্দে অত্যন্ত অনায়াসে সহজভাবে প্রবেশ করিতেছে কল্পনা করিয়া আমার সর্ব্বশরীরে অপূর্ব্ব পুলক সঞ্চার হইল।

আমি আর অধিক বিলম্ব করিতে পারিলাম না। অনতিকাল পরে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বাহিয়া দোতলায় উঠিলাম। ইচ্ছা ছিল গোপনে লুকাইয়া দেখিয়া শুনিয়া লইব—কিন্তু তাহা ঘটিল না; কারণ, সিঁড়ির সম্মুখবর্ত্তী ঘরেই সিঁড়ির দিকে মুখ করিয়া মন্মথ বসিয়াছিল—এবং গৃহের অপর প্রান্তে বিপরীতমুখে একটি অবগুণ্ঠিতা নারী বসিয়া মৃদুস্বরে কথা কহিতেছিল। যখন দেখিলাম, মন্মথ আমাকে দেখিতে পাইয়াছে, তখন দ্রুত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই বলিলাম, "ভাই আমার ঘড়িটা ঘরে ফেলিয়া আসিয়াছি, তাই লইতে আসিলাম।" মন্মথ এমনি অভিভূত হইয়া পড়িল যে, বোধ হইল যেন তখনি সে মাটিতে পড়িয়া যাইবে। আমি কৌতুক এবং আনন্দে নিরতিশয় ব্যগ্র হইয়া উঠিলাম, "ভাই, তোমার অসুখ করিয়াছে না কি?" সে কোন উত্তর দিতে পারিল না। তখন সেই কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ আড়ষ্ট অবগুণ্ঠিত নারীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি মন্মথর কে হন?" কোন উত্তর পাইলাম না, কিন্তু দেখিলাম, তিনি মন্মথর কেহই হন না, আমারই স্ত্রী হন! তাহার পর কি হইল সকলে জানেন!

এই আমার ডিটেক্‌টিভ্‌ পদের প্রথম চোর ধরা।—

আমি কিয়ৎক্ষণ পরে ডিটেক্‌টিভ্‌ মহিমচন্দ্রকে কহিলাম, "মন্মথর সহিত তোমার স্ত্রীর সম্বন্ধ সমাজ-বিরুদ্ধ না হইতেও পারে।"

মহিম কহিল—"না হইবারই সম্ভব। আমার স্ত্রীর বাক্স হইতে মন্মথর এই চিঠিখানি পাওয়া গেছে।" বলিয়া একখানি চিঠি আমার হাতে দিল; সেখানি নিম্নে প্রকাশিত হইল।

সুচরিতাসু,

হতভাগ্য মন্মথের কথা তুমি বোধ করি এতদিনে ভুলিয়া গিয়াছ। বাল্যকালে যখন কাজিবাড়ির মাতুলালয়ে যাইতাম, তখন সর্ব্বদাই সেখান হইতে তোমাদের বাড়ি গিয়া তোমার সহিত অনেক খেলা করিয়াছি। আমাদের সে খেলাঘর এবং সে খেলার সম্পর্ক ভাঙ্গিয়া গেছে। তুমি জান কি না বলিতে পারি না, এক সময় ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া এবং লজ্জার মাথা খাইয়া তোমার সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ চেষ্টাও করিয়াছিলাম, কিন্তু আমাদের বয়স প্রায় এক বলিয়া উভয় পক্ষেরই কর্ত্তারা কোন ক্রমে রাজি হইলেন না।

তাহার পর তোমার বিবাহ হইয়া গেলে চার পাঁচ বৎসর তোমার আর কোন সন্ধান পাই নাই। আজ পাঁচ মাস হইল তোমার স্বামী কলিকাতার পুলিসের কর্ম্ম লইয়া সহরে বদলি হইয়াছেন খবর পাইয়া আমি তোমাদের বাসা সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছি।

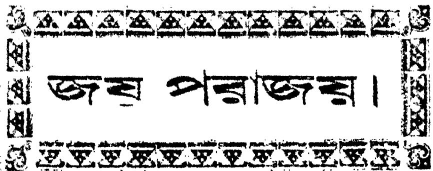
তোমার সহিত সাক্ষাতের দুরাশা আমার নাই, এবং অন্তর্যামী জানেন, তোমার গার্হস্থ্য-সুখের মধ্যে উপদ্রবের মত প্রবেশলাভ করিবার দুরভিসন্ধিও আমি রাখি না। সন্ধ্যার সময় তোমাদের বাসার সম্মুখবর্ত্তী একটি গ্যাস-পোষ্টের তলে আমি সূর্য্যোপাসকের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকি—তুমি ঠিক সাড়ে সাতটার সময় একটি প্রজ্বলিত কেরোসিন ল্যাম্প লইয়া প্রত্যহ নিয়মিত তোমাদের দোতলার দক্ষিণ-দিকের ঘরের কাঁচের জানলাটির সম্মুখে স্থাপন কর—সেই সময় মুহূর্ত্তকালের জন্য তোমার দীপালোকিত প্রতিমাখানি আমার দৃষ্টিপথে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে—তোমার সম্বন্ধে আমার এই একটিমাত্র অপরাধ।

ইতিমধ্যে ঘটনাক্রমে তোমার স্বামীর সহিত আমার আলাপ এবং ক্রমে ঘনিষ্ঠতাও হইয়াছে। তাঁহার চরিত্র যেরূপ দেখিলাম, তাহাতে বুঝিতে বাকি নাই যে, তোমার জীবন সুখের নহে। তোমার প্রতি আমার কোন প্রকার সামাজিক অধিকার নাই কিন্তু যে বিধাতা তোমার দুঃখকে আমার দুঃখে পরিণত করিয়াছেন, তিনিই সে দুঃখ মোচনের চেষ্টাভার আমার উপরেই স্থাপন করিয়াছেন।

অতএব আমার স্পর্দ্ধা মাপ করিয়া শুক্রবার সন্ধ্যাবেলায় ঠিক সাতটার সময় গোপনে পাল্কী করিয়া একবার ত্রিশ মিনিটের জন্য আমার বাসায় আসিলে আমি তোমাকে তোমার স্বামী সম্বন্ধে কতকগুলি গোপন কথা বলিতে চাহি—যদি বিশ্বাস না কর এবং যদি সহ্য করিতে পার তবে তৎসম্বন্ধে প্রমাণও দেখাইতে পারি—এবং সেই সঙ্গে কতকগুলি পরামর্শ দিতেও ইচ্ছা করি;—আমি ভগবানকে অন্তরে রাখিয়া, আশা করিতেছি সেই পরামর্শমতে চলিলে তুমি একদিন সুখী হইতে পারিবে!

আমার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ নহে;—ক্ষণকালের জন্য তোমাকে সম্মুখে দেখিব, তোমার কথা শুনিব, এবং তোমার চরণতল-স্পর্শে আমার গৃহখানিকে চিরকালের জন্য সুখস্বপ্নমণ্ডিত করিয়া তুলিব এ আকাঙ্ক্ষাও আমার অন্তরে আছে। যদি আমাকে বিশ্বাস না কর এবং যদি এ সুখ হইতেও আমাকে বঞ্চিত করিতে চাও, তবে সে কথা আমাকে লিখিয়ো—আমি তদুত্তরে পত্রযোগেই সকল কথা জানাইব। যদি চিঠি লিখিবার বিশ্বাসও না থাকে তবে আমার এই পত্রখানি তোমার স্বামীকে দেখাইও,—তাহার পরে আমার যাহা বক্তব্য তাহা তাঁহাকেই বলিব।

নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী,
শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার।



জয় পরাজয়।

রাজকন্যার নাম অপরাজিতা। উদয়নারায়ণের সভাকবি শেখর তাঁহাকে কখন চক্ষেও দেখেন নাই। কিন্তু যে দিন কোন নূতন কাব্য রচনা করিয়া সভাতলে বসিয়া রাজাকে শুনাইতেন, সেদিন কণ্ঠস্বর ঠিক এতটা উচ্চ করিয়া পড়িতেন, যাহাতে তাহা সেই সমুচ্চ গৃহের উপরিতলের জালায়নবর্ত্তিনী অদৃশ্য শ্রোত্রীগণের কর্ণপথে প্রবেশ করিতে পারে। যেন তিনি কোন এক অগম্য নক্ষত্রলোকের উদ্দেশে আপনার সঙ্গীতোচ্ছ্বাস প্রেরণ করিতেন, যেখানে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার জীব-

নের একটি অপরিচিত শুভগ্রহ অদৃশ্য মহিমায় বিরাজ করিতেছেন।

কখন ছায়ার মতন দেখিতে পাইতেন, কখন নূপুরশিঞ্জনের মতন শুনা যাইত; বসিয়া বসিয়া মনে মনে ভাবিতেন, সে কেমন দুইখানি চরণ যাহাতে সেই সোণার নূপুর বাঁধা থাকিয়া তালে তালে গান গাহিতেছে! সেই দুইখানি রক্তিম শুভ্র কোমল চরণতল প্রতি পদক্ষেপে কি সৌভাগ্য কি অনুগ্রহ কি করুণার মত করিয়া পৃথিবীকে স্পর্শ করে। মনের মধ্যে সেই চরণ দুটি প্রতিষ্ঠা করিয়া কবি অবসরকালে সেইখানে আসিয়া লুটাইয়া পড়িত এবং সেই নূপুরশিঞ্জনের সুরে আপনার গান বাঁধিত।

কিন্তু যে ছায়া দেখিয়াছিল, যে নূপুর শুনিয়াছিল, সে কাহার ছায়া কাহার নূপুর এমন তর্ক এমন সংশয় তাহার ভক্তহৃদয়ে কখন উদয় হয় নাই।

রাজকন্যার দাসী মঞ্জরী যখন ঘাটে যাইত, শেখরের ঘরের সম্মুখ দিয়া তাহার পথ ছিল। আসিতে যাইতে কবির সঙ্গে তাহার দুটা কথা না হইয়া যাইত না। তেমন নির্জ্জন দেখিলে সে সকালে সন্ধ্যায় শেখরের ঘরের মধ্যে গিয়াও বসিত। যতবার সে ঘাটে যাইত, ততবার যে তাহার আবশ্যক ছিল, এমনও বোধ হইত না, যদি বা আবশ্যক ছিল এমন হয়, কিন্তু ঘাটে যাইবার সময় উহারই মধ্যে একটু বিশেষ যত্ন করিয়া একটা রঙীন কাপড় এবং কাণে দুইটা আম্রমুকুল পরিবার কোন উচিত কারণ পাওয়া যাইত না।

লোকে হাসাহাসি কাণাকাণি করিত। লোকের কোন অপরাধ ছিল না। মঞ্জরীকে দেখিলে শেখর বিশেষ আনন্দলাভ করিতেন। তাহা গোপন করিতেও তাঁহার তেমন প্রয়াস ছিল না।

তাহার নাম ছিল মঞ্জরী; বিবেচনা করিয়া দেখিলে সাধারণ লোকের পক্ষে সেই নামই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু শেখর আবার আরও একটু কবিত্ব করিয়া তাহাকে বসন্তমঞ্জরী বলিতেন। লোকে শুনিয়া বলিত, আ সর্ব্বনাশ!

আবার কবির বসন্ত-বর্ণনার মধ্যে—"মঞ্জুল বঞ্জুল মঞ্জরী" এমনতর অনুপ্রাসও মাঝে মাঝে পাওয়া যাইত। এমন কি, জনরব রাজার কাণেও উঠিয়াছিল।

রাজা তাঁহার কবির এইরূপ রসাধিক্যের পরিচয় পাইয়া বড়ই আমোদ বোধ করিতেন—তাহা লইয়া কৌতুক করিতেন, শেখরও তাহাতে যোগ দিতেন।

রাজা হাসিয়া প্রশ্ন করিতেন, "ভ্রমর কি কেবল বসন্তের রাজসভায় গান গায়"—

কবি উত্তর দিতেন, "না, পুষ্পমঞ্জরীর মধুও খাইয়া থাকে।"

এমনি করিয়া সকলেই হাসিত, আমোদ করিত; বোধ করি অন্তঃপুরে রাজকন্যা অপরাজিতাও মঞ্জরীকে লইয়া মাঝে মাঝে উপহাস করিয়া থাকিতেন। মঞ্জরী তাহাতে অসন্তুষ্ট হইত না!

এমনি করিয়া সত্যে মিথ্যায় মিশাইয়া মানুষের জীবন একরকম করিয়া কাটিয়া যায়—খানিকটা বিধাতা গড়েন, খানিকটা আপনি গড়ে, খানিকটা পাঁচজনে গড়িয়া দেয়; জীবনটা একটা পাঁচমিশালি রকমের জোড়াতাড়া; প্রকৃত এবং অপ্রকৃত, কাল্পনিক এবং বাস্তবিক।

কেবল কবি যে গানগুলি গাহিতেন তাহাই সত্য এবং সম্পূর্ণ। গানের বিষয় সেই রাধা এবং কৃষ্ণ—সেই চিরন্তন নর এবং চিরন্তন নারী, সেই অনাদি দুঃখ এবং অনন্ত সুখ। সেই গানেই তাঁহার যথার্থ নিজের কথা ছিল—এবং সেই গানের যাথার্থ্য অমরাপুরের রাজা

হইতে দীনদুঃখী প্রজা পর্য্যন্ত সকলেই আপনার হৃদয়ে হৃদয়ে পরীক্ষা করিয়াছিল। তাঁহার গান সকলেরই মুখে। জ্যোৎস্না উঠিলেই, একটু দক্ষিণা বাতাসের আভাস দিলেই অমনি দেশের চতুর্দ্দিকে কত কানন, কত পথ, কত নৌকা, কত বাতায়ন, কত প্রাঙ্গণ হইতে তাঁহার রচিত গান উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত— তাঁহার খ্যাতির আর সীমা ছিল না।

এই ভাবে অনেক দিন কাটিয়া গেল। কবি কবিতা লিখিতেন, রাজা শুনিতেন, রাজসভার লোক বাহবা দিত, মঞ্জরী ঘাটে আসিত, এবং অন্তঃপুরের বাতায়ন হইতে কখন কখন একটা ছায়া পড়িত, কখন কখন একটা নূপুর শুনা যাইত।

এমন সময়ে দাক্ষিণাত্য হইতে এক দিগ্বিজয়ী কবি শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে রাজার স্তবগান করিয়া রাজসভায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি স্বদেশ হইতে বাহির হইয়া পথিমধ্যে সমস্ত রাজকবিদিগকে পরাস্ত করিয়া অবশেষে অমরাপুরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

রাজা পরম সমাদরের সহিত কহিলেন "এহি, এহি!" কবি পুণ্ডরীক দম্ভভরে কহিলেন "যুদ্ধং দেহি।"

রাজার মান রাখিতে হইবে—যুদ্ধ দিতে হইবে, কিন্তু কাব্যযুদ্ধ যে কিরূপ হইতে পারে শেখরের সে সম্বন্ধে ভালরূপ ধারণা ছিল না। তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ও শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। রাত্রে নিদ্রা হইল না। যশস্বী পুণ্ডরীকের দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, সুতীক্ষ্ণ বক্রনাসা এবং দর্পোদ্ধত উন্নত মস্তক দিগ্বিদিকে অঙ্কিত দেখিতে লাগিলেন।

প্রাতঃকালে কম্পিতহৃদয় কবি রণক্ষেত্রে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। প্রত্যূষ হইতে সভাতল লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেছে, কলরবের সীমা নাই; নগরে আর সমস্ত কাজকর্ম্ম একেবারে বন্ধ।

কবি শেখর বহুকষ্টে মুখে সহাস্য প্রফুল্লতার আয়োজন করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী কবি পুণ্ডরীককে নমস্কার করিলেন—পুণ্ডরীক প্রচণ্ড অবহেলাভরে নিতান্ত ইঙ্গিতমাত্রে নমস্কার ফিরাইয়া দিলেন এবং নিজের অনুবর্ত্তী ভক্তবৃন্দের দিকে চাহিয়া হাসিলেন।

শেখর একবার অন্তঃপুরের জালায়নের দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন, বুঝিতে পারিলেন সেখান হইতে আজ শত শত কৌতূহলপূর্ণ কৃষ্ণতারকার ব্যগ্রদৃষ্টি এই জনতার উপরে অজস্র নিপতিত হইতেছে। একবার একাগ্রভাবে চিত্তকে সেই ঊর্দ্ধলোকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া আপনার জয়লক্ষ্মীকে বন্দনা করিয়া আসিলেন, মনে মনে কহিলেন "আমার যদি আজ জয় হয় তবে, হে দেবি, হে অপরাজিতা, তাহাতে তোমারি নামের সার্থকতা হইবে।"

তূরী ভেরী বাজিয়া উঠিল। জয়ধ্বনি করিয়া সমাগত সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। শুক্লবসন রাজা উদয়নারায়ণ শরৎপ্রভাতের শুভ্র মেঘরাশির ন্যায় ধীরগমনে সভায় প্রবেশ করিলেন এবং সিংহাসনে উঠিয়া বসিলেন।

পুণ্ডরীক উঠিয়া সিংহাসনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বৃহৎ সভা স্তব্ধ হইয়া গেল।

বক্ষ বিস্ফারিত করিয়া গ্রীবা ঈষৎ ঊর্দ্ধে হেলাইয়া বিরাটমূর্ত্তি পুণ্ডরীক গম্ভীরস্বরে উদয়নারায়ণের স্তব পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। কণ্ঠস্বর ঘরে ধরে না—বৃহৎ সভাগৃহের চারিদিকের ভিত্তিতে স্তম্ভে ছাদে সমুদ্রের তরঙ্গের মত গম্ভীর মন্দ্রে আঘাত প্রতিঘাত করিতে লাগিল, এবং কেবল সেই ধ্বনির বেগে সমস্ত জনমণ্ডলীর বক্ষকবাট থর্ থর্ করিয়া স্পন্দিত

হইয়া উঠিল। কত কৌশল, কত কারুকার্য্য উদয়নারায়ণ নামের কতরূপ ব্যাখ্যা, রাজার নামাক্ষরের কতদিক হইতে কতপ্রকার বিন্যাস, কত ছন্দ, কত যমক!

পুণ্ডরীক যখন শেষ করিয়া বসিলেন, কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ সভাগৃহ তাঁহার কণ্ঠের প্রতিধ্বনি ও সহস্র হৃদয়ের নির্ব্বাক্ বিস্ময়রাশিতে গম্ গম্ করিতে লাগিল। বহুদূরদেশ হইতে আগত পণ্ডিতগণ দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে সাধু সাধু করিয়া উঠিলেন।

তখন সিংহাসন হইতে রাজা একবার শেখরের মুখের দিকে চাহিলেন। শেখরও ভক্তি প্রণয় অভিমান এবং একপ্রকার সকরুণ সঙ্কোচপূর্ণ দৃষ্টি রাজার দিকে প্রেরণ করিল এবং ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। রাম যখন লোকরঞ্জনার্থে দ্বিতীয়বার অগ্নিপরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন তখন সীতা যেন এইরূপ ভাবে চাহিয়া এম্নি করিয়া তাঁহার স্বামীর সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন।

কবির দৃষ্টি নীরবে রাজাকে জানাইল— "আমি তোমারই। তুমি যদি বিশ্বসমক্ষে আমাকে দাঁড় করাইয়া পরীক্ষা করিতে চাও ত কর। কিন্তু—" তাহার পরে নয়ন নত করিলেন।

পুণ্ডরীক সিংহের মত দাঁড়াইয়াছিল, শেখর চারিদিকে ব্যাধবেষ্টিত হরিণের মত দাঁড়াইল। তরুণ যুবক, রমণীর ন্যায় লজ্জা এবং স্নেহকোমল মুখ, পাণ্ডুবর্ণ কপোল, শরীরাংশ নিতান্ত স্বল্প, দেখিলে মনে হয় ভাবের স্পর্শমাত্রেই সমস্ত দেহ যেন বীণার তারের মত কাঁপিয়া বাজিয়া উঠিবে।

শেখর মুখ না তুলিয়া প্রথমে অতি মৃদুস্বরে আরম্ভ করিলেন। প্রথম একটা শ্লোক বোধ হয় কেহ ভাল করিয়া শুনিতে পাইল না। তাহার পরে ক্রমে ক্রমে মুখ তুলিলেন— যেখানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন সেখান হইতে যেন সমস্ত জনতা এবং রাজসভার পাষাণপ্রাচীর বিগলিত হইয়া বহুদূরবর্ত্তী অতীতের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গেল। সুমিষ্ট পরিষ্কার কণ্ঠস্বর কাঁপিতে কাঁপিতে উজ্জ্বল অগ্নিশিখার ন্যায় ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। প্রথমে রাজার চন্দ্রবংশীয় আদিপুরুষের কথা আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে কত যুদ্ধ বিগ্রহ শৌর্য্য বীর্য্য যজ্ঞ দান কত মহদনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া তাঁহার রাজকাহিনীকে বর্ত্তমান কালের মধ্যে উপনীত করিলেন। অবশেষে সেই দূরস্মৃতিবদ্ধ দৃষ্টিকে ফিরাইয়া আনিয়া রাজার মুখের উপর স্থাপিত করিলেন এবং রাজ্যের সমস্ত প্রজাহৃদয়ের একটা বৃহৎ অব্যক্ত প্রীতিকে ভাষায় ছন্দে মূর্ত্তিমান্ করিয়া সভার মাঝখানে দাঁড় করাইয়া দিলেন—যেন দূর দূরান্তর হইতে শত সহস্র প্রজার হৃদয়স্রোত ছুটিয়া আসিয়া রাজপিতামহদিগের এই অতি পুরাতন প্রাসাদকে মহাসঙ্গীতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল—ইহার প্রত্যেক ইষ্টককে যেন তাহারা স্পর্শ করিল, আলিঙ্গন করিল, চুম্বন করিল, ঊর্দ্ধে অন্তঃপুরের বাতায়ন সম্মুখে উত্থিত হইয়া রাজলক্ষ্মী-স্বরূপা প্রাসাদলক্ষ্মীদের চরণতলে স্নেহার্দ্র ভক্তিভরে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, এবং সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাজাকে এবং রাজার সিংহাসনকে মহামহোল্লাসে শত শত বার প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। অবশেষে বলিলেন, মহারাজ, বাক্যেতে হার মানিতে পারি কিন্তু ভক্তিতে কে হারাইবে! এই বলিয়া কম্পিতদেহে বসিয়া পড়িলেন। তখন অশ্রুজলে অভিষিক্ত প্রজাগণ জয় জয় রবে আকাশ কাঁপাইতে লাগিল।

সাধারণ জনমণ্ডলীর এই উন্মত্ততাকে

ধিক্কারপূর্ণ হাস্যের দ্বারা অবজ্ঞা করিয়া পুণ্ডরীক আবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দৃপ্তগর্জ্জনে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাক্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কে! সকলে এক মুহূর্ত্তে স্তব্ধ হইয়া গেল।

তখন তিনি নানা ছন্দে অদ্ভুত পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া বেদ বেদান্ত আগম নিগম হইতে প্রমাণ করিতে লাগিলেন—বিশ্বের মধ্যে বাক্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বাক্যই সত্য, বাক্যই ব্রহ্ম। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বাক্যের বশ—অতএব বাক্য তাঁহাদের অপেক্ষা বড়। ব্রহ্মা চারিমুখে বাক্যকে শেষ করিতে পারিতেছেন না—পঞ্চানন পাঁচমুখে বাক্যের অন্ত না পাইয়া অবশেষে নীরবে ধ্যানপরায়ণ হইয়া বাক্য খুঁজিতেছেন।

এমনি করিয়া পাণ্ডিত্যের উপর পাণ্ডিত্য এবং শাস্ত্রের উপর শাস্ত্র চাপাইয়া বাক্যের জন্য একটা অভ্রভেদী সিংহাসন নির্ম্মাণ করিয়া বাক্যকে মর্ত্যলোক এবং সুরলোকের মস্তকের উপর বসাইয়া দিলেন এবং পুনর্ব্বার বজ্রনিনাদে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাক্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কে?

দর্পভরে চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিলেন; যখন কেহ কোন উত্তর দিল না তখন ধীরে ধীরে আসন গ্রহণ করিলেন। পণ্ডিতগণ সাধু সাধু ধন্য ধন্য করিতে লাগিল—রাজা বিস্মিত হইয়া রহিলেন এবং কবি শেখর এই বিপুল পাণ্ডিত্যের নিকটে আপনাকে ক্ষুদ্র মনে করিলেন। আজিকার মত সভাভঙ্গ হইল।

পরদিন শেখর আসিয়া গান আরম্ভ করিয়া দিলেন;—বৃন্দাবনে প্রথমে বাঁশি বাজিয়াছে, তখনও গোপিনীরা জানে না, কে বাজাইল—জানে না, কোথায় বাজিতেছে। একবার মনে হইল দক্ষিণ পবনে বাজিতেছে, একবার মনে হইল উত্তরে গিরিগোবর্দ্ধনের শিখর হইতে ধ্বনি আসিতেছে; মনে হইল উদয়াচলের উপরে দাঁড়াইয়া কে মিলনের জন্য আহ্বান করিতেছে; মনে হইল অস্তাচলের প্রান্তে বসিয়া কে বিরহশোকে কাঁদিতেছে; মনে হইল যমুনার প্রত্যেক তরঙ্গ হইতে বাঁশি বাজিয়া উঠিল, মনে হইল আকাশের প্রত্যেক তারা যেন সেই বাঁশির ছিদ্র—অবশেষে কুঞ্জে কুঞ্জে, পথে ঘাটে, ফুলে ফলে, জলে স্থলে, উচ্চে নীচে, অন্তরে বাহিরে বাঁশি সর্ব্বত্র হইতে বাজিতে লাগিল—বাঁশি কি বলিতেছে তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না, এবং বাঁশির উত্তরে হৃদয় কি বলিতে চাহে তাহাও কেহ স্থির করিতে পারিল না; কেবল দুটি চক্ষু অশ্রুজলে ভাসিয়া উঠিল, এবং একটি অলোকসুন্দর শ্যামস্নিগ্ধ মরণের আকাঙ্ক্ষায় সমস্ত প্রাণ যেন উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল।

সভা ভুলিয়া, রাজা ভুলিয়া, আত্মপক্ষ প্রতিপক্ষ ভুলিয়া, যশ অপযশ, জয় পরাজয়, উত্তর প্রত্যুত্তর, সমস্ত ভুলিয়া শেখর আপনার নির্জ্জন হৃদয়কুঞ্জের মধ্যে যেন একলা দাঁড়াইয়া এই বাঁশির গান গাহিয়া গেলেন। কেবল মনে ছিল একটি জ্যোতির্ম্ময়ী মানসী মূর্ত্তি, কেবল কাণে বাজিতেছিল দুটি কমল-চরণের নূপুর-ধ্বনি। কবি যখন গান শেষ করিয়া হতজ্ঞানের মত বসিয়া পড়িলেন, তখন একটি অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে একটি বৃহৎ ব্যাপ্ত বিরহ-ব্যাকুলতায় সভাগৃহ পরিপূর্ণ হইয়া রহিল, কেহ সাধুবাদ দিতে পারিল না।

এই ভাবের প্রবলতার কিঞ্চিৎ উপশম হইলে পুণ্ডরীক সিংহাসন-সম্মুখে উঠিলেন। প্রশ্ন করিলেন—রাধাই বা কে, কৃষ্ণই বা কে?—বলিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং শিষ্যদের প্রতি চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলেন "রাধাই বা কে, কৃষ্ণই বা কে?" বলিয়া অসামান্য পাণ্ডিত্য বিস্তার

করিয়া আপনিই তাহার উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন।

বলিলেন রাধা প্রণব, ওঁকার, কৃষ্ণ ধ্যান যোগ এবং বৃন্দাবন ভ্রূ যুগলের মধ্যবর্ত্তী বিন্দু। ইড়া, সুষুম্না, পিঙ্গলা, নাভিপদ্ম, হৃৎপদ্ম, ব্রহ্মরন্ধ্র, সমস্ত আনিয়া ফেলিলেন। রা অর্থেই বা কি, ধা অর্থেই বা কি, কৃষ্ণ শব্দের ক হইতে মূর্দ্ধণ্য ণ পর্য্যন্ত প্রত্যেক অক্ষরের কত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হইতে পারে তাহার একে একে মীমাংসা করিলেন। একবার বুঝাইলেন কৃষ্ণ যজ্ঞ, রাধিকা অগ্নি, একবার বুঝাইলেন কৃষ্ণ বেদ এবং রাধিকা ষড়্‌দর্শন, তাহার পরে বুঝাইলেন কৃষ্ণ শিক্ষা এবং রাধিকা দীক্ষা। রাধিকা তর্ক, কৃষ্ণ মীমাংসা; রাধিকা উত্তর প্রত্যুত্তর কৃষ্ণ জয়লাভ।

এই বলিয়া রাজার দিকে পণ্ডিতের দিকে এবং অবশেষে তীব্র হাস্যে শেখরের দিকে চাহিয়া পুণ্ডরীক বসিলেন।

রাজা পুণ্ডরীকের আশ্চর্য্য ক্ষমতায় মুগ্ধ হইয়া গেলেন, পণ্ডিতদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না, এবং কৃষ্ণ রাধার নব নব ব্যাখ্যায় বাঁশীর গান, যমুনার কল্লোল, প্রেমের মোহ একেবারে দূর হইয়া গেল; যেন পৃথিবীর উপর হইতে কে এক জন বসন্তের সবুজ রঙটুকু মুছিয়া লইয়া আগাগোড়া পবিত্র গোময় লেপন করিয়া গেল। শেখর আপনার এত দিনকার সমস্ত গান বৃথা বোধ করিতে লাগিলেন, ইহার পরে তাঁহার আর গান গাহিবার সামর্থ্য রহিল না। সেদিন সভা ভঙ্গ হইল।

পরদিন পুণ্ডরীক ব্যস্ত এবং সমস্ত, দ্বিব্যস্ত এবং দ্বিসমস্তক, বৃত্ত, তার্ক্ষ্য, সৌত্র, চক্র, পদ্ম, কাকপদ, আদ্যুত্তর, মধ্যোত্তর, অন্তোত্তর, বাক্যোত্তর, শ্লোকোত্তর, বচনগুপ্ত, মাত্রাচ্যুতক, চ্যুতদত্তাক্ষর, অর্থগূঢ়, স্তুতিনিন্দা, অপহ্নুতি, শুদ্ধাপভ্রংশ, শাব্দী, কালসার, প্রহেলিকা প্রভৃতি অদ্ভুত শব্দচাতুরী দেখাইয়া দিলেন! শুনিয়া সভাশুদ্ধ লোক বিস্ময় রাখিতে স্থান পাইল না।

শেখর যে সকল পদ রচনা করিতেন তাহা নিতান্ত সরল—তাহা সুখে দুঃখে উৎসবে আনন্দে সর্ব্বসাধারণ ব্যবহার করিত—আজ তাহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল তাহাতে কোন গুণপনা নাই, যেন তাহা ইচ্ছা করিলেই তাহারাও রচনা করিতে পারিত, কেবল অনভ্যাস অনিচ্ছা অনবসর ইত্যাদি কারণেই পারে না—নহিলে কথাগুলো বিশেষ নূতনও নহে, দুরূহও নহে, তাহাতে পৃথিবীর লোকের নূতন একটা শিক্ষাও হয় না, সুবিধাও হয় না—কিন্তু আজ যাহা শুনিল তাহা অদ্ভুত ব্যাপার; কাল যাহা শুনিয়াছিল তাহাতেও বিস্তর চিন্তা এবং শিক্ষার বিষয় ছিল। পুণ্ডরীকের পাণ্ডিত্য ও নৈপুণ্যের নিকট তাহাদের আপনার কবিটিকে নিতান্ত বালক ও সামান্য লোক বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

মৎস্যপুচ্ছের তাড়নায় জলের মধ্যে যে গূঢ় আন্দোলন চলিতে থাকে, সরোবরের পদ্ম যেমন তাহার প্রত্যেক আঘাত অনুভব করিতে পারে, শেখর তেমনি তাঁহার চতুর্দ্দিকবর্ত্তী সভাস্থজনের মনের ভাব হৃদয়ের মধ্যে বুঝিতে পারিলেন।

আজ শেষদিন। আজ জয় পরাজয় নির্ণয় হইবে। রাজা তাঁহার কবির প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহার অর্থ এই, আজ নিরুত্তর হইয়া থাকিলে চলিবে না—তোমার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে।

শেখর শ্রান্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কেবল এই ক'টি কথা বলিলেন—"বীণাপাণি, শ্বেতভূজা, তুমি যদি তোমার কমলবন শূন্য

করিয়া আজ মল্লভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইলে তবে তোমার চরণাসক্ত যে ভক্তগণ অমৃত-পিপাসী, তাহাদের কি গতি হইবে ?" মুখ ঈষৎ উপরে তুলিয়া করুণ স্বরে বলিলেন, যেন শ্বেতভুজা বীণাপাণি নতনয়নে রাজান্তঃপুরে জালায়নসম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন।

তখন পুণ্ডরীক উঠিয়া সশব্দে হাস্য করিলেন—এবং "শেখর" শব্দের শেষ দুই অক্ষর গ্রহণ করিয়া অনর্গল শ্লোক রচনা করিয়া গেলেন। বলিলেন, পদ্মবনের সহিত খরের কি সম্পর্ক ? এবং সঙ্গীতে বিস্তর চর্চাসত্ত্বেও উক্ত প্রাণী কিরূপ ফললাভ করিয়াছে ? আর সরস্বতীর অধিষ্ঠান ত পুণ্ডরীকেই ; মহারাজের অধিকারে তিনি কি অপরাধ করিয়াছিলেন, যে, এদেশে তাঁহাকে খর-বাহন করিয়া অপমান করা যাইতেছে ?

পণ্ডিতেরা এই প্রত্যুত্তরে উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিলেন। সভাসদেরাও তাহাতে যোগ দিল—তাঁহাদের দেখা-দেখি সভাশুদ্ধ সমস্ত লোক—যাহারা বুঝিল এবং না বুঝিল—সকলেই হাসিতে লাগিল।

ইহার উপযুক্ত প্রত্যুত্তরের প্রত্যাশায় রাজা তাঁহার কবিসখাকে বারবার অঙ্কুশের ন্যায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টির দ্বারা তাড়না করিতে লাগিলেন। কিন্তু শেখর তাহার প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ না করিয়া অটলভাবে বসিয়া রহিলেন।

তখন রাজা শেখরের প্রতি মনে মনে অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিলেন—এবং নিজের কণ্ঠ হইতে মুক্তার মালা খুলিয়া পুণ্ডরীকের গলায় পরাইয়া দিলেন—সভাস্থ সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। অন্তঃপুর হইতে এককালে অনেকগুলি বলয় কঙ্কণ-নূপুরের শব্দ শুনা গেল—তাহাই শুনিয়া শেখর আসন ছাড়িয়া উঠিলেন এবং ধীরে ধীরে সভাগৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর রাত্রি। ঘন অন্ধকার। ফুলের গন্ধ বহিয়া দক্ষিণের বাতাস উদার বিশ্ববন্ধুর ন্যায় মুক্ত বাতায়ন দিয়া নগরের ঘরে ঘরে প্রবেশ করিতেছে।

ঘরের কাষ্ঠমঞ্চ হইতে শেখর আপনার পুঁথিগুলি পাড়িয়া সম্মুখে স্তূপাকার করিয়া রাখিয়াছেন তাহার মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া নিজের রচিত গ্রন্থগুলি পৃথক্ করিয়া রাখিলেন।

অনেকদিনকার অনেক লেখা। তাহার মধ্যে অনেকগুলি রচনা তিনি নিজেই প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সেগুলি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া এখানে ওখানে পড়িয়া দেখিতে লাগিলেন। আজ তাঁহার কাছে ইহা সমস্তই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইল।

নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, সমস্ত জীবনের এই কি সঞ্চয়! কতকগুলা কথা এবং ছন্দ এবং মিল! ইহার মধ্যে যে, কোন সৌন্দর্য্য, মানবের কোন চির আনন্দ, কোন বিশ্বসঙ্গীতের প্রতিধ্বনি, তাঁহার আপনার হৃদয়ে কোন গভীর প্রকাশ নিবদ্ধ হইয়া আছে আজ তিনি তাহা দেখিতে পাইলেন না। রোগীর মুখে যেমন কোন খাদ্যই রুচে না, তেমনি আজ তাঁহার হাতের কাছে যাহা কিছু আসিল সমস্তই ঠেলিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন। রাজার মৈত্রী, লোকের খ্যাতি, হৃদয়ের দুরাশা, কল্পনার কুহক—আজ অন্ধকার রাত্রে সমস্তই শূন্য বিড়ম্বনা বলিয়া ঠেকিতে লাগিল।

তখন একটি একটি করিয়া তাঁহার পুঁথি ছিঁড়িয়া সম্মুখের জ্বলন্ত অগ্নিভাণ্ডে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ একটা উপহাসের কথা মনে উদয় হইল। হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"বড় বড় রাজারা অশ্বমেধ যজ্ঞ

করিয়া থাকেন—আজ আমার এ কাব্যমেধ যজ্ঞ!" কিন্তু তখনি মনে উদয় হইল, তুলনাটা ঠিক হয় নাই। অশ্বমেধের অশ্ব যখন সর্ব্বত্র বিজয়ী হইয়া আসে তখনি অশ্বমেধ হয়—আমার কবিত্ব যে দিন পরাজিত হইয়াছে আমি সেই দিন কাব্যমেধ করিতে বসিয়াছি—আরো বহুদিন পূর্ব্বে করিলেই ভাল হইত।

একে একে নিজের সকল গ্রন্থগুলিই অগ্নিতে সমর্পণ করিলেন। আগুন ধূধূ করিয়া জলিয়া উঠিলে কবি সবেগে দুই শূন্য হস্ত শূন্যে নিক্ষেপ করিতে করিতে বলিলেন—"তোমাকে দিলাম, তোমাকে দিলাম, তোমাকে দিলাম—হে সুন্দরি অগ্নিশিখা, তোমাকেই দিলাম। এতদিন তোমাকেই সমস্ত আহুতি দিয়া আসিতেছিলাম, আজ একেবারে শেষ করিয়া দিলাম। বহুদিন তুমি আমার হৃদয়ের মধ্যে জলিতেছিলে হে মোহিনী বহ্নিরূপিণি! যদি সোণা হইতাম ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিতাম—কিন্তু আমি তুচ্ছ তৃণ, দেবি, তাই আজ ভস্ম হইয়া গিয়াছি।"

রাত্রি অনেক হইল। শেখর তাঁহার ঘরের সমস্ত বাতায়ন খুলিয়া দিলেন। তিনি যে যে ফুল ভালবাসিতেন সন্ধ্যাবেলা বাগান হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। সবগুলি শাদা ফুল, যুঁই, বেল এবং গন্ধরাজ। তাহারই মুঠা মুঠা লইয়া নির্ম্মল বিছানার উপর ছড়াইয়া দিলেন। ঘরের চারিদিকে প্রদীপ জ্বালাইলেন।

তাহার পর মধুর সঙ্গে একটি উদ্ভিদের বিষরস মিশাইয়া নিশ্চিন্তমুখে পান করিলেন—এবং ধীরে ধীরে আপনার শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন। শরীর অবশ এবং নেত্র মুদ্রিত হইয়া আসিল।

নূপুর বাজিল! দক্ষিণের বাতাসের সঙ্গে কেশগুচ্ছের একটা সুগন্ধ ঘরে প্রবেশ করিল।

কবি নিমীলিত নেত্রে কহিলেন "দেবি, ভক্তের প্রতি দয়া করিলে কি? এতদিন পরে আজ কি দেখা দিতে আসিলে।"

একটি সুমধুর কণ্ঠে উত্তর শুনিলেন "কবি, আসিয়াছি।"

শেখর চমকিয়া উঠিয়া চক্ষু মেলিলেন—দেখিলেন শয্যার সম্মুখে এক অপরূপ রমণীমূর্ত্তি।

মৃত্যু-সমাচ্ছন্ন বাষ্পাকুলনেত্রে স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইলেন না। মনে হইল তাঁহার হৃদয়ের সেই ছায়াময়ী প্রতিমা অন্তর হইতে বাহির হইয়া মৃত্যুকালে তাঁহার মুখের দিকে স্থিরনেত্রে চাহিয়া আছে।

রমণী কহিলেন, "আমি রাজকন্যা অপরাজিতা।"

কবি প্রাণপণে উঠিয়া বসিলেন।

রাজকন্যা কহিলেন—"রাজা তোমার সুবিচার করেন নাই। তোমারই জয় হইয়াছে, কবি, তাই আমি আজ তোমাকে জয়মাল্য দিতে আসিয়াছি।"

বলিয়া অপরাজিতা নিজের কণ্ঠ হইতে স্বহস্তরচিত পুষ্পমালা খুলিয়া কবির গলায় পরাইয়া দিলেন। মরণাহত কবি শয্যার উপরে পড়িয়া গেলেন।

অসম্ভব কথা।

এক যে ছিল রাজা।

তখন ইহার বেশী কিছু জানিবার আবশ্যক ছিল না। কোথাকার রাজা, রাজার নাম কি, এ সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া গল্পের প্রবাহ রোধ করিতাম না। রাজার নাম শিলাদিত্য কি শালিবাহন, কাশী কাঞ্চি কনোজ কোশল অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের মধ্যে ঠিক কোন্‌খানটিতে তাঁহার রাজত্ব, এ সকল ইতিহাস ভূগোলের তর্ক আমাদের কাছে নিতান্তই তুচ্ছ ছিল;—আসল যে কথাটি শুনিলে অন্তর পুলকিত হইয়া উঠিত এবং সমস্ত হৃদয় এক মুহূর্ত্তের মধ্যে বিদ্যুদ্বেগে চুম্বকের মত আকৃষ্ট হইত, সেট হইতেছে—এক যে ছিল রাজা।

এখনকার পাঠক যেন একেবারে কোমর বাঁধিয়া বসে। গোড়াতেই ধরিয়া লয় লেখক মিথ্যা কথা বলিতেছে। সেইজন্য অত্যন্ত সেয়ানার মত মুখ করিয়া জিজ্ঞাসা করে—"লেখক মহাশয়, তুমি যে বলিতেছ এক যে ছিল রাজা, আচ্ছা বল দেখি, কে ছিল সেই রাজা!"

লেখকেরাও সেয়ানা হইয়া উঠিয়াছে; তাহারা প্রকাণ্ড প্রত্নতত্বপণ্ডিতের মত মুখমণ্ডল চতুর্গুণ মণ্ডলাকার করিয়া বলে, "এক যে ছিল রাজা, তাহার নাম ছিল অজাতশক্র।"

পাঠক চোখ টিপিয়া জিজ্ঞাসা করে, "অজাতশক্র? ভাল, কোন্‌ অজাতশক্র বল দেখি?"

লেখক অবিচলিত মুখভাব ধারণ করিয়া বলিয়া যায়, "অজাতশক্র ছিল তিন জন। একজন খৃষ্টজন্মের তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়া দুই বৎসর আটমাস বয়ঃক্রম কালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার জীবনের বিস্তারিত বিবরণ কোন গ্রন্থেই পাওয়া যায় না।" অবশেষে দ্বিতীয় অজাতশক্র সম্বন্ধে দশ জন ঐতিহাসিকের দশ বিভিন্ন মত সমালোচনা শেষ করিয়া যখন গ্রন্থের নায়ক তৃতীয় অজাতশক্র পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছায়, তখন পাঠক বলিয়া উঠে, "ওরে বাসরে, কি পাণ্ডিত্য! এক গল্প শুনিতে আসিয়া কত শিক্ষাই হইল! এ লোকটাকে আর অবিশ্বাস করা যাইতে পারে না! আচ্ছা লেখক মহাশয়, তার পরে কি হইল!"

হায়রে হায়, মানুষ ঠকিতেই চায়, ঠকিতেই ভালবাসে, অথচ পাছে কেহ নির্ব্বোধ মনে করে এ ভয়টুকুও ষোলআনা আছে; এইজন্য প্রাণপণে সেয়ানা হইবার চেষ্টা করে। তাহার ফল হয় এই যে, সেই শেষকালটা ঠকে কিন্তু বিস্তর আড়ম্বর করিয়া ঠকে।

ইংরাজিতে একটি প্রবাদ আছে, "প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও না, তাহা হইলে মিথ্যা জবাব শুনিতে হইবে না।" বালক সেইটি বোঝে, সে কোন প্রশ্ন করে না। এইজন্য রূপকথার সুন্দর মিথ্যাটুকু শিশুর মত উলঙ্গ, সত্যের মত সরল, সদ্য উৎসারিত উৎসের মত স্বচ্ছ—আর এখনকার দিনের সুচতুর মুখস্‌ পরা মিথ্যা। কোথাও যদি তিলমাত্র ছিদ্র থাকে অমনি ভিতর হইতে সমস্ত ফাঁকি ধরা পড়ে, পাঠক বিমুখ হয়, লেখক পালাইবার পথ পায় না।

শিশুকালে আমরা যথার্থ রসজ্ঞ ছিলাম, এইজন্য যখন গল্প শুনিতে বসিয়াছি তখন জ্ঞানলাভ করিবার জন্য আমাদের তিলমাত্র আগ্রহ উপস্থিত হইত না, এবং অশিক্ষিত সরল হৃদয়টি

ঠিক বুঝিত আসল কথাটি কোনটুকু। আর এখনকার দিনে এত বাহুল্য কথাও বকিতে হয়, এত অনাবশ্যক কথারও আবশ্যক হইয়া পড়ে! কিন্তু সবশেষে সেই আসল কথাটিতে গিয়া দাঁড়ায়—এক যে ছিল রাজা।

বেশ মনে আছে সেদিন সন্ধ্যাবেলা ঝড়বৃষ্টি হইতেছিল। কলিকাতা সহর একেবারে ভাসিয়া গিয়াছিল। গলির মধ্যে একহাঁটু জল। মনে,একান্ত আশা ছিল, আজ আর মাষ্টার আসিবে না। কিন্তু তবু তাঁহার আসার নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত ভীতচিত্তে পথের দিকে চাহিয়া বারান্দায় চৌকি লইয়া বসিয়া আছি। যদি বৃষ্টি একটু ধরিয়া আসিবার উপক্রম হয়, তবে একাগ্র চিত্তে প্রার্থনা করি, হে দেবতা আর একটুখানি কোনমতে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পার করিয়া দাও! তখন মনে হইত পৃথিবীতে বৃষ্টির আর কোন আবশ্যক নাই কেবল একটি-মাত্র সন্ধ্যায় নগরপ্রান্তের একটিমাত্র ব্যাকুল বালককে মাষ্টারের করাল হস্ত হইতে রক্ষা করা ছাড়া। পুরাকালে কোন একটি নির্ব্বাসিত যক্ষও ত মনে করিয়াছিল, আষাঢ়ে মেঘের বড় একটা কোন কাজ নাই,অতএব রামগিরিশিখরের একটিমাত্র বিরহীর দুঃখকথা বিশ্বপার হইয়া অলকার সৌধবাতায়নে কোন একটি বিরহিণীর কাছে লইয়া যাওয়া তাহার পক্ষে কিছুমাত্র গুরুতর নহে; বিশেষতঃ পথটি যখন এমন সুরম্য এবং তাহার হৃদয়বেদনা এমন দুঃসহ।

বালকের প্রার্থনামতে না হোক, ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতের বিশেষ কোন নিয়মানুসারে বৃষ্টি ছাড়িল না। কিন্তু হায়, মাষ্টারও ছাড়িল না। গলির মোড়ে ঠিক সময়ে একটি পরিচিত ছাতা দেখা দিল—সমস্ত আশাবাষ্প এক মুহূর্ত্তে ফাটিয়া বাহির হইয়া আমার বুকটি যেন প-রের মধ্যে মিলাইয়া গেল। পরপীড়ন পাপের যদি যথোপযুক্ত শাস্তি থাকে তবে নিশ্চয় পরজন্মে আমি মাষ্টার হইয়া এবং আমার মাষ্টার মহাশয় ছাত্র হইয়া জন্মিবেন। তাহার বিরুদ্ধে কেবল একটি আপত্তি এই যে, আমাকে মাষ্টার মহাশয়ের মাষ্টার হইতে গেলে অতিশয় অকালে ইহসংসার হইতে বিদায় লইতে হয়—অতএব আমি তাঁহাকে অন্তরের সহিত মার্জ্জনা করিলাম।

ছাতাটি দেখিবামাত্র ছুটিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম। মা তখন দিদিমার সহিত মুখোমুখী বসিয়া প্রদীপালোকে বিন্তি খেলিতেছিলেন। ঝুপ্ করিয়া একপাশে শুইয়া পড়িলাম। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে? আমি মুখ হাঁড়ির মত করিয়া কহিলাম, "আমার অসুখ করিয়াছে, আজ আর আমি মাষ্টারের কাছে পড়িতে যাইব না।"

আশা করি, অপ্রাপ্তবয়স্ক কেহ আমার এ লেখা পড়িবে না,এবং স্কুলের কোন সিলেক্‌শন বহিতে আমার এ লেখা উদ্ধৃত হইবে না। কারণ, আমি যে কাজ করিয়াছিলাম তাহা নীতিবিরুদ্ধ এবং সে জন্য কোন শাস্তিও পাই নাই। বরঞ্চ আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল।

মা চাকরকে বলিয়া দিলেন—"আজ তবে থাক্, মাষ্টারকে যেতে বলে' দে।"

কিন্তু তিনি যেরূপ নিরুদ্বিগ্নভাবে বিন্তি খেলিতে লাগিলেন, তাহাতে বেশ বোঝা গেল যে, মা তাঁহার পুত্রের অসুখের উৎকট লক্ষণগুলি মিলাইয়া দেখিয়া মনে মনে হাসিলেন; আমিও মনের সুখে বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া খুব হাসিলাম—আমাদের উভয়ের মন উভয়ের কাছে অগোচর রহিল না।

কিন্তু সকলেই জানেন, এ প্রকারের অসুখ

অধিকক্ষণ স্থায়ী করিয়া রাখা রোগীর পক্ষে বড়ই দুষ্কর। মিনিটখানেক না যাইতে যাইতে দিদিমাকে ধরিয়া পড়িলাম—দিদিমা, একটা গল্প বল। দুই চারিবার কোন উত্তর পাওয়া গেল না। মা বলিলেন; "রোস্ বাছা, খেলাটা আগে শেষ করি!"

আমি কহিলাম, "না, মা, খেলা তুমি কাল শেষ কোরো আজ দিদিমাকে গল্প বল্‌তে বল না!"

মা কাগজ ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, "বাও খুড়ি! উহার সঙ্গে এখন কে পারিবে!" মনে মনে হয় ত ভাবিলেন—আমার ত কাল মাষ্টার আসিবে না, আমি কালও খেলিতে পারিব।

আমি দিদিমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া একেবারে মশারির মধ্যে বিছানার উপরে গিয়া উঠিলাম। প্রথমে খানিকটা পাশ-বালিশ জড়াইয়া, পা ছুঁড়িয়া, নড়িয়াচড়িয়া মনের আনন্দ সম্বরণ করিতে গেল—তার পরে বলিলাম— গল্প বল।

তখনো ঝুপঝুপ্ করিয়া বাহিরে বৃষ্টি পড়িতেছিল—দিদিমা মৃদুস্বরে আরম্ভ করিলেন—এক যে ছিল রাজা।

তাহার এক রাণী। আঃ, বাঁচা গেল। সুয়ো এবং দুয়ো রাণী শুনিলেই বুকটা কাঁপিয়া উঠে—বুঝিতে পারি দুয়ো হতভাগিনীর বিপদের আর বড় বিলম্ব নাই। পূর্ব্ব হইতে মনে বিষম একটা উৎকণ্ঠা চাপিয়া থাকে।

যখন শোনা গেল আর কোন চিন্তার বিষয় নাই, কেবল রাজার পুত্রসন্তান হয় নাই বলিয়া রাজা ব্যাকুল হইয়া আছে এবং দেবতার নিকট প্রার্থনা করিয়া কঠিন তপস্যা করিবার জন্য বনগমনে উদ্যত হইয়াছে, তখন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। পুত্রসন্তান না হইলে যে, দুঃখের কোন কারণ আছে তাহা আমি বুঝিতাম না; আমি জানিতাম যদি কিছুর জন্যে বনে যাইবার কখনো আবশ্যক হয় সে কেবল মাষ্টারের কাছ হইতে পালাইবার অভিপ্রায়ে।

রাণী এবং একটি বালিকা-কন্যা ঘরে ফেলিয়া রাজা তপস্যা করিতে চলিয়া গেল। এক বৎসর দুই বৎসর করিয়া ক্রমে বারো বৎসর হইয়া যায় তবু রাজার আর দেখা নাই।

এ দিকে রাজকন্যা ষোড়শী হইয়া উঠিয়াছে। বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইয়া গেল কিন্তু রাজা ফিরিল না।

মেয়ের মুখের দিকে চায়, আর রাণীর মুখে আর অন্নজল রুচে না। আহা, আমার এমন সোণার মেয়ে কি চিরকাল আইবড় হইয়া থাকিবে? ওগো আমি কি কপাল করিয়াছিলাম?

অবশেষে রাণী রাজাকে অনেক অনুনয় করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, আমি আর কিছু চাহি না, তুমি একদিন কেবল আমার ঘরে আসিয়া খাইয়া যাও।

রাজা বলিলেন, আচ্ছা।

রাণী ত সেদিন বহুযত্নে চৌষট্টি ব্যঞ্জন স্বহস্তে রাঁধিলেন এবং সমস্ত সোণার থালে ও রূপার বাটিতে সাজাইয়া চন্দন কাষ্ঠের পিঁড়ি পাতিয়া দিলেন। রাজকন্যা চামর হাতে করিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজা আজ বারো বৎসর পরে অন্তঃপুরে ফিরিয়া আসিয়া খাইতে বসিলেন। রাজকন্যা রূপে আলো করিয়া দাঁড়াইয়া চামর করিতে লাগিলেন।

মেয়ের মুখের দিকে চায় আর খাওয়া হয় না। শেষে রাণীর দিকে চাহিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হাঁ গো রাণী এমন সোণার প্রতিমা লক্ষ্মী ঠাকরুণটির মত এ মেয়েটি কে গা? এ কাহাদের মেয়ে?

রাণী কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, হা আমার পোড়া কপাল! উহাকে চিনিতে পারিলে না? ও যে তোমারি মেয়ে।

রাজা বড় আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—আমার সেই সেদিনকার এতটুকু মেয়ে আজ এত বড়টি হইয়াছে?

রাণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—তা' আর হইবে না? বল কি, আজ বারো বৎসর হইয়া গেল! রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—মেয়ের বিবাহ দাও নাই?

রাণী কহিলেন—তুমি ঘরে নাই উহার বিবাহ কে দেয়? আমি কি নিজে পাত্র খুঁজিতে বাহির হইব?

রাজা শুনিয়া হঠাৎ ভারি শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বলিলেন—রোস্, আমি কাল সকালে উঠিয়া রাজদ্বারে যাহার মুখ দেখিব তাহারই সহিত উহার বিবাহ দিয়া দিব।

রাজকন্যা চামর করিতে লাগিলেন। তাঁহার হাতের বালাতে চুড়িতে ঠুংঠাং শব্দ হইতে লাগিল। রাজার আহার হইয়া গেল।

পরদিন ঘুম হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিয়া রাজা দেখিলেন একটি ব্রাহ্মণের ছেলে রাজবাড়ির বাহিরে জঙ্গল হইতে শুক্‌না কাঠ সংগ্রহ করিতেছে। তাহার বয়স বছর সাত আট হইবে।

রাজা বলিলেন, ইহারই সহিত আমার মেয়ের বিবাহ দিব। রাজার হুকুম কে লঙ্ঘন করিতে পারে, তখনি ছেলেটিকে ধরিয়া তাহার সহিত রাজকন্যার মালা বদল করিয়া দেওয়া হইল।

আমি এই জায়গাটাতে দিদিমার খুব কাছে ঘেঁষিয়া গিয়া নিরতিশয় ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম—তার পরে? নিজেকে সেই সাত আট বৎসরের সৌভাগ্যবান্ কাঠকুড়ানে ব্রাহ্মণের ছেলের স্থলাভিষিক্ত করিতে কি একটুখানি ইচ্ছা যায় নাই? যখন সেই রাত্রে ঝুপ্‌ঝুপ্ বৃষ্টি পড়িতেছিল, মিট্‌মিট্ করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছিল এবং গুন্‌গুন্ স্বরে দিদিমা মশারির মধ্যে গল্প বলিতেছিল, তখন কি বালকহৃদয়ের বিশ্বাসপরায়ণ রহস্যময় অনাবিষ্কৃত এক ক্ষুদ্র প্রান্তে এমন একটি অত্যন্ত সম্ভবপর ছবি জাগিয়া উঠে নাই যে, সেও একদিন সকাল বেলায় কোথায় এক রাজার দেশে রাজার দরজায় কাঠ কুড়াইতেছে, হঠাৎ একটি সোণার প্রতিমা লক্ষ্মীঠাকরুণটির মত রাজকন্যার সহিত তাহার মালা বদল হইয়া গেল; মাথায় তাহার সিঁথি, কাণে তাহার দুল, গলায় তাহার কণ্ঠী, হাতে তাহার কাঁকণ, কটিতে তাহার চন্দ্রহার এবং আল্‌তা পরা দুটি পায় নূপুর ঝম্ ঝম্ করিয়া বাজিতেছে!

কিন্তু আমার সেই দিদিমা যদি লেখকজন্ম ধারণ করিয়া আজ কালকার সেয়ানা পাঠকদের কাছে এই গল্প বলিতেন তবে ইতিমধ্যে তাঁহাকে কত হিসাব দিতে হইত? প্রথমতঃ রাজা যে বার বৎসর বনে বসিয়া থাকে এবং ততদিন রাজকন্যার বিবাহ হয় না, একবাক্যে সকলেই বলিত ইহা অসম্ভব। সেটুকুও যদি কোন গতিকে গোলমালে পার পাইয়া যাইত কিন্তু কন্যার বিবাহের জায়গায় বিষম একটা কলরব উঠিত। একত, এমন কখন হয় না, দ্বিতীয়তঃ, সকলেই আশঙ্কা করিত ব্রাহ্মণের ছেলের সহিত ক্ষত্রিয় কন্যার বিবাহ ঘটাইয়া লেখক নিশ্চয়ই ফাঁকি দিয়া সমাজবিরুদ্ধ মত প্রচার করিতেছেন। কিন্তু পাঠকরা তেমন ছেলেই নয়, তাহারা তাঁহার নাতি নয় যে, সকল কথা চুপ করিয়া শুনিয়া যাইবে। তাহারা কাগজে সমালোচনা করিবে। অতএব একান্তমনে প্রার্থনা করি, দিদিমা যেন পুনর্ব্বার

দিদিমা হইয়াই জন্মগ্রহণ করেন, হতভাগ্য নাতিটার মত তাঁহাকে গ্রহদোষে যেন লেখক হইতে না হয়।

আমি একেবারে পুলকিত কম্পান্বিত হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, তার পরে ?

দিদিমা বলিতে লাগিলেন—তার পরে রাজকন্যা মনের দুঃখে তাহার সেই ছোট স্বামীটিকে লইয়া চলিয়া গেল!

অনেক দূরদেশে গিয়া একটি বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণের ছেলেটিকে আপনার সেই অতি ক্ষুদ্র স্বামীটিকে, বড় যত্নে মানুষ করিতে লাগিল!

—আমি একটুখানি নড়িয়া-চড়িয়া পাশবালিশ আরএকটু সবলে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলাম, তার পরে ?

দিদিমা কহিলেন, তার পরে ছেলেটি পুঁথি হাতে প্রতিদিন পাঠশালে যায়।

এম্‌নি করিয়া গুরু মহাশয়ের কাছে নানা বিদ্যা শিখিয়া ছেলেটি ক্রমে যত বড় হইয়া উঠিতে লাগিল ততই তাহার সহপাঠীরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, ঐ যে সাতমহল বাড়িতে তোমাকে লইয়া থাকে সেই মেয়েটি তোমার কে হয় ?

ব্রাহ্মণের ছেলে ত ভাবিয়া অস্থির—কিছুতেই ঠিক করিয়া বলিতে পারে না মেয়েটি তাহার কে হয়! একটু একটু মনে পড়ে একদিন সকালে রাজবাড়ির দ্বারের সম্মুখে শুক্‌না কাঠ কুড়াইতে গিয়াছিল—কিন্তু সেদিন কি একটা মস্ত গোলমালে কাঠকুড়ানো হইল না। সে অনেক দিনের কথা, সে কি কিছু মনে আছে ? এমন করিয়া চারি পাঁচ বৎসর যায়। ছেলেটিকে রোজই তাহার সঙ্গীরা জিজ্ঞাসা করে আচ্ছা ঐ যে সাতমহলা বাড়িতে পরমা রূপসী মেয়েটি থাকে ও তোমার কে হয় ?

ব্রাহ্মণ একদিন পাঠশালা হইতে মুখ বড় বিমর্ষ করিয়া আসিয়া রাজকন্যাকে কহিল, আমাকে আমার পাঠশালার পোড়োরা প্রতিদিন জিজ্ঞাসা করে—ঐ যে সাতমহলা বাড়িতে যে পরমা সুন্দরী মেয়েটি থাকে সে তোমার কে হয় ? আমি তাহার কোন উত্তর দিতে পারি না। তুমি আমার কে হও, বল!

রাজকন্যা বলিল, আজিকার দিন থাক্ সে কথা আর এক দিন বলিব।

ব্রাহ্মণের ছেলে প্রতিদিন পাঠশালা হইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, তুমি আমার কে হও ?

রাজকন্যা প্রতিদিন উত্তর করে, সে কথা আজ থাক্ আর একদিন বলিব।

এম্‌নি করিয়া আরো চার পাঁচ বৎসর কাটিয়া যায়। শেষে ব্রাহ্মণ একদিন আসিয়া বড় রাগ করিয়া বলিল—আজ যদি তুমি না বল তুমি আমার কে হও তবে আমি তোমার এই সাতমহলা বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।

তখন রাজকন্যা কহিলেন—আচ্ছা কাল নিশ্চয়ই বলিব।

পরদিন ব্রাহ্মণ-তনয় পাঠশালা হইতে ঘরে আসিয়াই রাজকন্যাকে বলিল—আজ বলিবে বলিয়াছিলে, তবে বল ?

রাজকন্যা বলিলেন, আজ রাত্রে আহার করিয়া যখন তুমি শয়ন করিবে তখন বলিব।

ব্রাহ্মণ বলিল—আচ্ছা। বলিয়া সূর্য্যাস্তের অপেক্ষায় প্রহর গণিতে লাগিল।

এদিকে রাজকন্যা সোণার পালঙ্কে একটি ধব্‌ধবে ফুলের বিছানা পাতিলেন,—ঘরে সোণার প্রদীপে সুগন্ধ তেল দিয়া বাতি জ্বালাইলেন, এবং চুলটি বাঁধিয়া নীলাম্বরী কাপড়টি পরিয়া সাজিয়া বসিয়া প্রহর গণিতে লাগিলেন, কখন রাত্রি আসে!

রাত্রে তাঁহার স্বামী কোন মতে আহার

শেষ করিয়া শয়নগৃহে সোণার পালঙ্কে ফুলের বিছানায় গিয়া শয়ন করিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, আজ শুনিতে পাইব এই সাতমহলা বাড়িতে যে সুন্দরীটি থাকে সে আমার কে হয়।

রাজকন্যা তাঁহার স্বামীর পাত্রে প্রসাদ খাইয়া ধীরে ধীরে শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। আজ বহুদিন পরে প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে এই সাতমহলা অট্টালিকার একমাত্র অধীশ্বরী আমি তোমার কে হই।

বলিতে গিয়া বিছানায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন ফুলের মধ্যে সাপ ছিল, তাঁহার স্বামীকে কখন্ দংশন করিয়াছে। স্বামীর মৃত দেহখানি মলিন হইয়া সোণার পালঙ্কে পুষ্পশয্যায় পড়িয়া আছে!

—আমার যেন বক্ষঃস্পন্দন হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। আমি রুদ্ধস্বরে বিবর্ণমুখে জিজ্ঞাসা করিলাম—তার পরে কি হইল!

দিদিমা বলিতে লাগিলেন—তার পরে—কিন্তু সে কথায় আর কাজ কি? সে যে আরো অসম্ভব! গল্পের প্রধান নায়ক সর্পাঘাতে মারা গেল, তবুও তার পরে? বালক তখন জানিত না, মৃত্যুর পরেও একটা তার পরে থাকিতে পারে বটে, কিন্তু সে তার-পরের উত্তর কোন দিদিমার দিদিমাও দিতে পারে না। বিশ্বাসের বলে সাবিত্রী মৃত্যুরও অনুগমন করিয়াছিলেন। শিশুরও প্রবল বিশ্বাস এই জন্য সে মৃত্যুর অঞ্চল ধরিয়া ফিরাইতে চায়, কিছুতেই মনে করিতে পারে না যে, তাহার মাষ্টারবিহীন একসন্ধ্যা-বেলাকার এত সাধের গল্পটি হঠাৎ একটি সর্পাঘাতেই মারা গেল! কাজেই দিদিমাকে সেই মহাপরিণামের চিররুদ্ধ গৃহ হইতে গল্পটিকে আবার ফিরাইয়া আনিতে হয়। কিন্তু এত সহজে সেটি সাধন করেন, এমন অনায়াসে;—কেবল হয় ত একটা কলার ভেলায় ভাসাইয়া দিয়া গুটি দুই মন্ত্র পড়িয়া মাত্র—যে, সেই ঝুপ্‌ঝুপ্ বৃষ্টির রাত্রে স্তিমিত প্রদীপে বালকের মনে মৃত্যুর মূর্ত্তি অত্যন্ত অকঠোর হইয়া আসে, তাহাকে একরাত্রের সুখনিদ্রার চেয়ে বেশী মনে হয় না। গল্প যখন ফুরাইয়া যায়, আরামে শ্রান্ত দুটি চক্ষু আপনি মুদিয়া আসে, তখনো ত শিশুর ক্ষুদ্র প্রাণটিকে একটি স্নিগ্ধ নিস্তব্ধ নিস্তরঙ্গ স্রোতের মধ্যে সুষুপ্তির ভেলায় করিয়া ভাসাইয়া দেওয়া হয়, তার পরে ভোরের বেলায় কে দুটি মায়ামন্ত্র পড়িয়া তাহাকে এই জগতের মধ্যে জাগ্রৎ করিয়া তোলে!

কিন্তু যাহার বিশ্বাস নাই, যে ভীরু এ সৌন্দর্য্যরসাস্বাদনের জন্যও এক ইঞ্চি পরিমাণ অসম্ভবকে লঙ্ঘন করিতে পরাঙ্মুখ হয়, তাহার কাছে কোন কিছুর আর তার-পরে নাই, সমস্তই হঠাৎ অসময়ে এক অসমাপ্তিতে সমাপ্ত হইয়া গেছে। ছেলেবেলায় সাতসমুদ্র পার হইয়া মৃত্যুকেও লঙ্ঘন করিয়া গল্পের যেখানে যথার্থ বিরাম, সেখানে স্নেহময় সুমিষ্টস্বরে শুনিতাম—

আমার কথাটি ফুরালো,
নটে গাছটি মুড়োলো।

এখন বয়স হইয়াছে, এখন গল্পের ঠিক মাঝখানটাতে হঠাৎ থামিয়া গিয়া একটা নিষ্ঠুর কঠিন কণ্ঠে শুনিতে পাই—

আমার কথাটি ফুরোলো না,
নটে গাছটি মুড়োলো না।
কেনরে নটে মুড়োলিনে কেন,
তোর গরুতে—

দূর হোক্ গে, ঐ নিরীহ প্রাণীটির নাম করিয়া কাজ নাই, আবার কে কোন্ দিক হইতে গায়ে পাতিয়া লইবে।

—

কঙ্কাল।

আমরা তিন বাল্যসঙ্গী যে ঘরে শয়ন করিতাম, তাহার পাশের ঘরের দেয়ালে একটি আস্ত নরকঙ্কাল ঝুলান থাকিত। রাত্রে বাতাসে তাহার হাড়গুলা খট্‌খট্‌ শব্দ করিয়া নড়িত। দিনের বেলায় আমাদিগকে সেই হাড় নাড়িতে হইত। আমরা তখন পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট মেঘনাদবধ এবং ক্যাম্বেল স্কুলের এক ছাত্রের কাছে অস্থিবিদ্যা পড়িতাম। আমাদের অভিভাবকের ইচ্ছা ছিল আমাদিগকে সহসা সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী করিয়া তুলিবেন— তাঁহার অভিপ্রায় কতদূর সফল হইয়াছে যাঁহারা আমাদিগকে জানেন তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করা বাহুল্য এবং যাঁহারা জানেন না তাঁহাদের নিকট গোপন করাই শ্রেয়।

তাহার পর বহুকাল অতীত হইয়াছে। ইতিমধ্যে সেই ঘর হইতে কঙ্কাল এবং আমাদের মাথা হইতে অস্থিবিদ্যা কোথায় স্থানান্তরিত হইয়াছে অন্বেষণ করিয়া জানা যায় না।

অল্পদিন হইল একদিন রাত্রে কোন কারণে অন্যত্র স্থানাভাব হওয়াতে আমাকে সেই ঘরে শয়ন করিতে হয়। অনভ্যাসবশতঃ ঘুম হইতেছে না। এপাশ ওপাশ করিতে করিতে গির্জ্জার ঘড়িতে বড় বড় ঘণ্টাগুলো প্রায় সব ক'টা বাজিয়া গেল। এমন সময়ে ঘরের কোণে যে তেলের সেজ জ্বলিতেছিল সেটা প্রায় মিনিট পাঁচেক ধরিয়া খাবি খাইতে খাইতে একেবারে নিবিয়া গেল। ইতিপূর্ব্বেই আমাদের বাড়িতে দুই একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। তাই এই আলো নেবা হইতে সহজেই মৃত্যুর কথা মনে উদয় হইল। মনে হইল, এই যে রাত্রি দুই প্রহরে একটি দীপশিখা চিরান্ধকারে মিলাইয়া গেল, প্রকৃতির কাছে ইহাও যেমন, আর মানুষের ছোট ছোট প্রাণশিখা কখনো দিনে কখনো রাত্রে হঠাৎ নিবিয়া বিস্মৃত হইয়া যায় তাহাও তেমনি।

ক্রমে সেই কঙ্কালের কথা মনে পড়িল। তাহার জীবিতকালের বিষয় কল্পনা করিতে করিতে সহসা মনে হইল একটি চেতন পদার্থ অন্ধকারে ঘরের দেয়াল হাতড়াইয়া আমার মশারির চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহার ঘন ঘন নিশ্বাসের শব্দ শুনা যাইতেছে। সে যেন কি খুঁজিতেছে পাইতেছে না এবং দ্রুততরবেগে ঘরময় প্রদক্ষিণ করিতেছে। নিশ্চয় বুঝিতে পারিলাম সমস্তই আমার নিদ্রাহীন উষ্ণ মস্তিষ্কের কল্পনা। এবং আমারই মাথার মধ্যে বোঁ বোঁ করিয়া যে রক্ত ছুটিতেছে তাহাই দ্রুত পদশব্দের মত শুনাইতেছে। কিন্তু তবু গা ছম্‌ছম্‌ করিতে লাগিল। জোর করিয়া এই অকারণ ভয় ভাঙ্গিবার জন্য বলিয়া উঠিলাম "কেও!" পদশব্দ আমার মশারির কাছে আসিয়া থামিয়া গেল এবং একটা উত্তর শুনিতে পাইলাম "আমি। আমার সেই কঙ্কালটা কোথায় গেছে তাই খুঁজিতে আসিয়াছি।"

আমি ভাবিলাম, নিজের কাল্পনিক সৃষ্টির কাছে ভয় দেখান কিছু নয়—পাশবালিশটা সবলে আঁকড়িয়া ধরিয়া চিরপরিচিতের মত অতি সহজ স্বরে বলিলাম—"এই দুপর রাত্রে বেশ কাজটি বাহির করিয়াছ! তা, সে কঙ্কালে এখন আর তোমার আবশ্যক!"

অন্ধকারে মশারির অত্যন্ত নিকট হইতে উত্তর আসিল "বল কি! আমার বুকের

হাড় যে তাহারই মধ্যে ছিল! আমার ছাব্বিশ বৎসরের যৌবন যে তাহার চারিদিকে বিকশিত হইয়াছিল—একবার দেখিতে ইচ্ছা করে না।”

আমি তৎক্ষণাৎ বলিলাম “হাঁ। কথাটা সঙ্গত বটে। তা তুমি সন্ধান করগে যাও। আমি একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করি।”

সে বলিল “তুমি একলা আছ বুঝি। তবে একটু বসি। একটু গল্প করা যাক্। পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আমিও মানুষের কাছে বসিয়া মানুষের সঙ্গে গল্প করিতাম। এই পঁয়ত্রিশটা বৎসর আমি কেবল শ্মশানের বাতাসে হুহু শব্দ করিয়া বেড়াইয়াছি—আজ তোমার কাছে বসিয়া আর একবার মানুষের মত করিয়া গল্প করি।”

অনুভব করিলাম, আমার মশারির কাছে কে বসিল। নিরুপায় দেখিয়া আমি বেশ একটু উৎসাহের সহিত বলিলাম—“সেই ভাল। যাহাতে মন বেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠে এমন একটা কিছু গল্প বল।”

সে বলিল “সব চেয়ে মজার কথা যদি শুনিতে চাও ত আমার জীবনের কথা বলি।”

গির্জ্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দুটা বাজিল।

“যখন মানুষ ছিলাম এবং ছোট ছিলাম এক ব্যক্তিকে যমের মত ভয় করিতাম। তিনি আমার স্বামী। মাছকে বঁড়শি দিয়া ধরিলে তাহার যেমন মনে হয় আমারও সেইরূপ মনে হইত। অর্থাৎ কোন্ এক সম্পূর্ণ অপরিচিত জীব যেন বঁড়শিতে গাঁথিয়া আমাকে আমার স্নিগ্ধগভীর জন্ম-জলাশয় হইতে টান মারিয়া ছিনিয়া লইয়া যাইতেছে—কিছুতে তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ নাই। বিবাহের দুই মাস পরেই আমার স্বামীর মৃত্যু হইল এবং আমার আত্মীয় স্বজনেরা আমার হইয়া অনেক বিলাপ পরিতাপ করিলেন। আমার শ্বশুর অনেকগুলি লক্ষণ মিলাইয়া দেখিয়া শাশুড়ীকে কহিলেন, “শাস্ত্রে যাহাকে বলে বিষকন্যা, এ মেয়েটি তাই।” সে কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে।—শুনিতেছ? কেমন লাগিতেছে?

আমি বলিলাম—“বেশ। গল্পের আরম্ভটি বেশ মজার।”

“তবে শোন। আনন্দে বাপের বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। ক্রমে বয়স বাড়িতে লাগিল। লোকে আমার কাছে লুকাইতে চেষ্টা করিত কিন্তু আমি নিজে বেশ জানিতাম আমার মত রূপসী এমন যেখানে সেখানে পাওয়া যায় না। তোমার কি মনে হয়?”

“খুব সম্ভব। কিন্তু আমি তোমাকে কখন দেখি নাই।”

“দেখ নাই! কেন? আমার সেই কঙ্কাল! হি হি হি হি! আমি ঠাট্টা করিতেছি! তোমার কাছে কি করিয়া প্রমাণ করিব যে, সেই দুটো শূন্য চক্ষুকোটরের মধ্যে বড় বড় টানা দুটি কালো চোখ ছিল, এবং রাঙা ঠোঁটের উপরে যে মৃদু হাসিটুকু মাখানো ছিল এখনকার অনাবৃত দন্তসার বিকট হাস্যের সঙ্গে তার কোন তুলনাই হয় না। এবং সেই কয়খানা দীর্ঘ শুষ্ক অস্থিখণ্ডের উপর এত লালিত্য, এত লাবণ্য, যৌবনের এত কঠিন-কোমল নিটোল পরিপূর্ণতা প্রতিদিন প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতেছিল, তোমাকে তাহা বলিতে গেলে হাসি পায় এবং রাগও ধরে। আমার সেই শরীর হইতে যে অস্থিবিদ্যা শেখা যাইতে পারে তাহা তখনকার বড় বড় ডাক্তারেরাও বিশ্বাস করিত না। আমি জানি, একজন ডাক্তার তাঁহার কোন বিশেষ বন্ধুর কাছে আমাকে কনকচাঁপা বলিয়া-

ছিলেন। তাহার অর্থ এই, পৃথিবীর আর সকল মানুষই অস্থিবিদ্যা এবং শরীরতত্ত্বের দৃষ্টান্তস্থল ছিল কেবল আমিই সৌন্দর্য্যরূপী ফুলের মত ছিলাম। কনকচাঁপার মধ্যে কি একটা কঙ্কাল আছে?

"আমি যখন চলিতাম তখন আপনি বুঝিতে পারিতাম যে, একখণ্ড হীরা নড়াইলে তাহার চারিদিক হইতে যেমন আলো ঝক্‌মক্‌ করিয়া উঠে, আমার দেহের প্রত্যেক গতিতে সৌন্দর্য্যের ভঙ্গী নানা স্বাভাবিক হিল্লোলে চারিদিকে ভাঙ্গিয়া পড়িত। আমি মাঝে মাঝে অনেকক্ষণ ধরিয়া নিজের হাত দুখানি নিজে দেখিতাম—পৃথিবীর সমস্ত উদ্ধত পৌরুষের মুখে রাশ লাগাইয়া মধুরভাবে বাগাইয়া ধরিতে পারে এমন দুই খানি হাত। সুভদ্রা যখন অর্জ্জুনকে লইয়া দৃপ্ত ভঙ্গীতে আপনার বিজয়-রথ বিস্মিত তিন লোকের মধ্যে দিয়া চালাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার বোধ করি এইরূপ দুখানি অতুল সুডোল বাহু, আরক্ত করতল এবং লাবণ্যশিখার মত অঙ্গুলি ছিল।

"কিন্তু আমার সেই নির্লজ্জ, নিরাবরণ, নিরাভরণ চিরবৃদ্ধ কঙ্কাল তোমার কাছে আমার নামে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে। আমি তখন নিরুপায় নিরুত্তর ছিলাম। এই জন্য পৃথিবীর সব চেয়ে তোমার উপর আমার বেশী রাগ। ইচ্ছা করে আমার সেই ষোল বৎসরের জীবন্ত, যৌবনতাপে উত্তপ্ত আরক্তিম রূপখানি একবার তোমার চখের সামনে দাঁড় করাই, বহুকালের মত তোমার দুই চক্ষের নিদ্রা ছুটাইয়া দিই, তোমার অস্থিবিদ্যাকে অস্থির করিয়া দেশছাড়া করি।"—

আমি বলিলাম "তোমার গা যদি থাকিত ত গা ছুঁইয়া বলিতাম, সে বিদ্যার লেশমাত্র আমার মাথায় নাই। আর তোমার সেই ভুবনমোহন পূর্ণ যৌবনের রূপ রজনীর অন্ধকার-পটের উপরে জাজ্বল্যমান হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর অধিক বলিতে হইবে না।"

"আমার কেহ সঙ্গিনী ছিল না। দাদা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন বিবাহ করিবেন না। অন্তঃপুরে আমি একা। বাগানের গাছতলায় আমি একা বসিয়া ভাবিতাম সমস্ত পৃথিবী আমাকেই ভালবাসিতেছে। সমস্ত তারা আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। বাতাস ছল করিয়া বার বার দীর্ঘনিশ্বাসে পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেছে এবং যে তৃণাসনে পা দুটি মেলিয়া বসিয়া আছি তাহার যদি চেতনা থাকিত তবে সে পুনর্ব্বার অচেতন হইয়া যাইত। পৃথিবীর সমস্ত যুবাপুরুষ ঐ তৃণপুঞ্জরূপে দল বাঁধিয়া নিস্তব্ধে আমার চরণবর্ত্তী হইয়া দাঁড়াইয়াছে এইরূপ আমি কল্পনা করিতাম। হৃদয়ে অকারণে কেমন বেদনা অনুভব হইত।

"দাদার বন্ধু শশিশেখর যখন মেডিকাল কালেজ হইতে পাশ হইয়া আসিলেন তখন তিনিই আমাদের বাড়ির ডাক্তার হইলেন। আমি তাঁহাকে পূর্ব্বে আড়াল হইতে অনেকবার দেখিয়াছি। দাদা অত্যন্ত অদ্ভুত লোক ছিলেন—পৃথিবীটাকে যেন ভাল করিয়া চোখ মিলিয়া দেখিতেন না। সংসারটা যেন তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট ফাঁকা নয়—এই জন্য সরিয়া সরিয়া একেবারে প্রান্তে গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন।

"তাঁহার বন্ধুর মধ্যে এক শশিশেখর। এই জন্য বাহিরের যুবকদের মধ্যে আমি এই শশিশেখরকেই সর্ব্বদা দেখিতাম। এবং যখন আমি সন্ধ্যাকালে পুষ্পতরুতলে সাম্রাজ্ঞীর আসন গ্রহণ করিতাম, তখন পৃথিবীর সমস্ত পুরুষজাতি শশিশেখরের মূর্ত্তি ধরিয়া আমার

চরণাগত হইত।—শুনিতেছ? কি মনে হইতেছে?”

আমি সনিশ্বাসে বলিলাম “মনে হইতেছে শশিশেখর হইয়া জন্মিলে বেশ হইত।”

“আগে সবটা শোন।—একদিন বাদলার দিনে আমার জ্বর হইয়াছে। ডাক্তার দেখিতে আসিয়াছেন। সেই প্রথম দেখা।

“আমি জান্‌লারদিকে মুখ করিয়া ছিলাম, সন্ধ্যার লাল আভাটা পড়িয়া রুগ্ন মুখের বিবর্ণতা যাহাতে দূর হয়। ডাক্তার যখন ঘরে ঢুকিয়াই আমার মুখের দিকে একবার চাহিলেন তখন আমি মনে মনে ডাক্তার হইয়া কল্পনায় নিজের মুখের দিকে চাহিলাম। সেই সন্ধ্যালোকে কোমল বালিশের উপরে একটি ঈষৎ ক্লিষ্ট কুসুমপেলব মুখ; অসংযমিত চূর্ণ-কুন্তল ললাটের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে এবং লজ্জায় আনমিত বড় বড় চোখের পল্লব কপোলের উপর ছায়া বিস্তার করিয়াছে।

“ডাক্তার নম্র মৃদুস্বরে দাদাকে বলিলেন ‘একবার হাতটা দেখিতে হইবে।’

“আমি গাত্রাবরণের ভিতর হইতে ক্লান্ত সুগোল হাত খানি বাহির করিয়া দিলাম। একবার হাতের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, যদি নীলবর্ণ কাঁচের চুড়ি পরিতে পারিতাম ত আরো বেশ মানাইত! রোগীর হাত লইয়া নাড়ি দেখিতে ডাক্তারের এমন ইতস্তত: ইতিপূর্ব্বে কখন দেখি নাই। অত্যন্ত অসংলগ্নভাবে কম্পিত অঙ্গুলিতে নাড়ি দেখিলেন। তিনি আমার জ্বরের উত্তাপ বুঝিলেন, আমিও তাঁহার অন্তরের নাড়ি কিরূপ চলিতেছে কতকটা আভাস পাইলাম। বিশ্বাস হইতেছে না?”

আমি বলিলাম “অবিশ্বাসের কোন কারণ দেখিতেছি না—মানুষের নাড়ি সকল অবস্থায় সমান চলে না।”

“কালক্রমে আরো দুই চারিবার রোগ ও আরোগ্য হইবার পরে দেখিলাম, আমার সেই সন্ধ্যাকালের মানস-সভায় পৃথিবীর কোটি কোটি পুরুষসংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস হইয়া ক্রমে একটিতে আসিয়া ঠেকিল, আমার পৃথিবী প্রায় জনশূন্য হইয়া আসিল। জগতে কেবল একটি ডাক্তার এবং একটি রোগী অবশিষ্ট রহিল।

“আমি গোপনে সন্ধ্যাবেলায় একটি বাসন্তী রঙের কাপড় পরিতাম, ভাল করিয়া খোঁপা বাঁধিয়া মাথায় এক গাছি বেল ফুলের মালা পরিতাম, একটি আয়না হাতে লইয়া বাগানে গিয়া বসিতাম।

“কেন! আপনাকে দেখিয়া কি আর পরিতৃপ্ত হয় না! বাস্তবিকই হয় না। কেন না, আমি ত আপনি আপনাকে দেখিতাম না। আমি তখন একলা বসিয়া দুইজন হইতাম। আমি তখন ডাক্তার হইয়া আপনাকে দেখিতাম, মুগ্ধ হইতাম, এবং ভাল বাসিতাম এবং আদর করিতাম অথচ প্রাণের ভিতরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস সন্ধ্যাবাতাসের মত হুহু করিয়া উঠিত।

“সেই হইতে আমি আর একলা ছিলাম না; যখন চলিতাম, নতনেত্রে চাহিয়া দেখিতাম পায়ের অঙ্গুলিগুলি পৃথিবীর উপরে কেমন করিয়া পড়িতেছে, এবং ভাবিতাম এই পদক্ষেপ আমাদের নূতন পরীক্ষোত্তীর্ণ ডাক্তারের কেমন লাগে; মধ্যাহ্নে জান্‌লার বাহিরে ঝাঁ ঝাঁ করিত, কোথাও সাড়াশব্দ নাই, মাঝে মাঝে এক একটা চিল অতিদূর আকাশে শব্দ করিয়া উড়িয়া যাইত; এবং আমাদের উদ্যান-প্রাচীরের বাহিরে খেলেনাওয়ালা সুর ধরিয়া ‘চাই, খেলেনা চাই, চুড়ি চাই’ করিয়া ডাকিয়া যাইত; আমি একখানি ধবধবে চাদর পাতিয়া নিজের হাতে বিছানা করিয়া শয়ন করিতাম;

একখানি অনাবৃত বাহু কোমল বিছানার উপর যেন অনাদরে মেলিয়া দিয়া ভাবিতাম, এই হাতখানি এমনি ভঙ্গীতে কে যেন দেখিতে পাইল, কে যেন দুইখানি হাত দিয়া তুলিয়া লইল, কে যেন ইহার আরক্ত করতলের উপর একটি চুম্বন রাখিয়া দিয়া আবার ধীরে ধীরে ফিরিয়া যাইতেছে।—মনে কর এই খানেই গল্পটা যদি শেষ হয় তাহা হইলে কেমন হয়?"

আমি বলিলাম "মন্দ হয় না। একটু অসম্পূর্ণ থাকে বটে, কিন্তু সেইটুকু আপন মনে পূরণ করিয়া লইতে বাকি রাতটুকু বেশ কাটিয়া যায়।"

"কিন্তু তাহা হইলে গল্পটা যে বড় গম্ভীর হইয়া পড়ে। ইহার উপহাসটুকু থাকে কোথায়? ইহার ভিতরকার কঙ্কালটা তাহার সমস্ত দাঁত ক'টি মেলিয়া দেখা দেয় কই?—

"তবে পরে শোন। একটুখানি পসার হইতেই আমাদের বাড়ির একতলায় ডাক্তার তাঁহার ডাক্তারখানা খুলিলেন। তখন আমি তাঁহাকে মাঝে মাঝে হাসিতে হাসিতে ঔষধের কথা, বিষের কথা, কি করিলে মানুষ সহজে মরে এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতাম। ডাক্তারির কথায় ডাক্তারের মুখ খুলিয়া যাইত। শুনিয়া শুনিয়া মৃত্যু যেন পরিচিত ঘরের লোকের মত হইয়া গেল। ভালবাসা এবং মরণ কেবল এই দুটোকেই পৃথিবীময় দেখিলাম।

"আমার গল্প প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে—আর বড় বাকী নাই।"

আমি মৃদুস্বরে বলিলাম "রাত্রিও প্রায় শেষ হইয়া আসিল।"

"কিছুদিন হইতে দেখিলাম ডাক্তার বাবু বড় অন্যমনস্ক, এবং আমার কাছে যেন ভারি অপ্রতিভ। একদিন দেখিলাম তিনি কিছু বেশী রকম সাজসজ্জা করিয়া দাদার কাছে তাঁহার জুড়ি ধার লইলেন রাত্রে কোথায় যাইবেন।

"আমি আর থাকিতে পারিলাম না। দাদার কাছে গিয়া নানা কথার পর জিজ্ঞাসা করিলাম 'হাঁ দাদা, ডাক্তার বাবু আজ জুড়ি লইয়া কোথায় যাইতেছেন?"

"সংক্ষেপে দাদা বলিলেন, 'মরিতে'।

"আমি বলিলাম, 'না, সত্য করিয়া বল না।'

"তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ খোলসা করিয়া বলিলেন 'বিবাহ করিতে।'

"আমি বলিলাম 'সত্য না কি!' বলিয়া অনেক হাসিতে লাগিলাম।

"অল্পে অল্পে শুনিলাম এই বিবাহে ডাক্তার বারো হাজার টাকা পাইবেন।

"কিন্তু আমার কাছে এ সংবাদ গোপন করিয়া আমাকে অপমান করিবার তাৎপর্য্য কি? আমি কি তাঁহার পায়ে ধরিয়া বলিয়াছিলাম যে, এমন কাজ করিলে আমি বুক ফাটিয়া মরিব? পুরুষদের বিশ্বাস করিবার যো নাই। পৃথিবীতে আমি একটি মাত্র পুরুষ দেখিয়াছি এবং এক মুহূর্ত্তে সমস্ত জ্ঞান লাভ করিয়াছি।

"ডাক্তার রোগী দেখিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে ঘরে আসিলে আমি প্রচুর পরিমাণে হাসিতে হাসিতে বলিলাম 'কি ডাক্তার মহাশয়! আজ নাকি আপনার বিবাহ!'

"আমার প্রফুল্লতা দেখিয়া ডাক্তার যে কেবল অপ্রতিভ হইলেন তাহা নহে, ভারি বিমর্ষ হইয়া গেলেন।

"জিজ্ঞাসা করিলাম 'বাজনা বাদ্য কিছু নাই যে!'

"শুনিয়া তিনি ঈষৎ একটু নিশ্বাস ফেলিয়া

বলিলেন—বিবাহ ব্যাপারটা কি এতই আনন্দের ?'

"শুনিয়া আমি হাসিয়া অস্থির হইয়া গেলাম। এমন কথাও ত কখনো শুনি নাই। আমি বলিলাম, 'সে হইবে না বাজনা চাই, আলো চাই।'

"দাদাকে এমনি ব্যস্ত করিয়া তুলিলাম যে দাদা তখনি রীতিমত উৎসবের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

"আমি কেবলি গল্প করিতে লাগিলাম, বধূ ঘরে আসিলে কি হইবে, কি করিব। জিজ্ঞাসা করিলাম 'আচ্ছা ডাক্তার মহাশয়, তখনো কি আপনি রোগীর নাড়ি টিপিয়া বেড়াইবেন ?' হি হি হি হি! যদিও মানুষের বিশেষতঃ পুরুষের মনটা দৃষ্টিগোচর নয় তবু আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, কথাগুলি ডাক্তারের বুকে শেলের মত বাজিতেছিল।

"অনেক রাত্রে লগ্ন। সন্ধ্যাবেলায় ডাক্তার ছাতের উপর বসিয়া দাদার সহিত দুই এক পাত্র মদ খাইতেছিলেন। দুইজনেরই এই অভ্যাসটুকু ছিল। ক্রমে আকাশে চাঁদ উঠিল।

"আমি হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিলাম 'ডাক্তার মশায় ভুলিয়া গেলেন না কি ? যাত্রার যে সময় হইয়াছে।'

"এইখানে একটা সামান্য কথা বলা আবশ্যক। ইতিমধ্যে আমি গোপনে ডাক্তারখানায় গিয়া খানিকটা গুঁড়া সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম এবং সেই গুঁড়ার কিয়দংশ সুবিধামত অলক্ষিতে ডাক্তারের গ্লাসে মিশাইয়া দিয়াছিলাম। কোন্ গুঁড়া খাইলে মানুষ মরে ডাক্তারের কাছে শিখিয়াছিলাম।

"ডাক্তার এক চুমুকে গ্লাসটি শেষ করিয়া কিঞ্চিৎ আর্দ্র গদগদ কণ্ঠে আমার মুখের দিকে মর্ম্মান্তিক দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—'তবে চলিলাম।'

"বাঁশি বাজিতে লাগিল। আমি একটি বারাণসী সাড়ি পরিলাম; যতগুলি গহনা সিন্দুকে তোলা ছিল, সবগুলি বাহির করিয়া পরিলাম; সিঁথিতে বড় করিয়া সিঁদুর দিলাম। আমার সেই বকুলতলায় বিছানা পাতিলাম।

"বড় সুন্দর রাত্রি। ফুটফুটে জ্যোৎস্না! সুপ্তজগতের ক্লান্তি হরণ করিয়া দক্ষিণে বাতাস বহিতেছে। জুঁই আর বেলফুলের গন্ধে সমস্ত বাগান আমোদ করিয়াছে।

"বাঁশির শব্দ যখন ক্রমে দূরে চলিয়া গেল, জ্যোৎস্না যখন অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল, এই তরুপল্লব এবং আকাশ এবং আজন্মকালের ঘর দুয়ার লইয়া পৃথিবী যখন আমার চারিদিক হইতে মায়ার মত মিলাইয়া যাইতে লাগিল তখন আমি নেত্র নিমীলন করিয়া হাসিলাম।

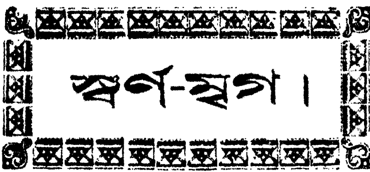
"ইচ্ছা ছিল যখন লোকে আসিয়া আমাকে দেখিবে তখন এই হাসিটুকু যেন রঙীন নেশার মত আমার ঠোঁটের কাছে লাগিয়ে থাকে! ইচ্ছা ছিল যখন আমার অনন্তরাত্রির বাসর ঘরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিব তখন এই হাসিটুকু এখান হইতেই মুখে করিয়া লইয়া যাইব। কোথায় বাসর ঘর! আমার সে বিবাহের বেশ কোথায়! নিজের ভিতর হইতে একটা খট্‌খট্ শব্দে জাগিয়া দেখিলাম আমাকে লইয়া তিনটি বালক অস্থিবিদ্যা শিখিতেছে। বুকের যেখানে সুখদুঃখ ধুক্‌ধুক্ করিত এবং যৌবনের পাপ্‌ড়ি প্রতিদিন একটি একটি করিয়া প্রস্ফুটিত হইত, সেইখানে বেত্র নির্দ্দেশ করিয়া কোন্ অস্থির কি নাম মাষ্টার শিখাইতেছে। আর সেই যে অন্তিম হাসিটুকু ওষ্ঠের কাছে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলাম, তাহার কোন চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছিলে কি ?

"গল্পটা কেমন লাগিল?"

আমি বলিলাম "গল্পটি বেশ প্রফুল্লকর।"

এমন সময় প্রথম কাক ডাকিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখনো আছ কি?" কোন উত্তর পাইলাম না।

ঘরের মধ্যে ভোরের আলো প্রবেশ করিল।



স্বর্ণ-মৃগ।

আদ্যনাথ এবং বৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী দুই সরিক। উভয়ের মধ্যে বৈদ্যনাথের অবস্থাই কিছু খারাপ। বৈদ্যনাথের বাপ মহেশচন্দ্রের বিষয়বুদ্ধি আদৌ ছিল না, তিনি দাদা শিবনাথের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকিতেন। শিবনাথ ভাইকে প্রচুর স্নেহ দিয়া তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার বিষয়সম্পত্তি সমস্ত আত্মসাৎ করিয়া লন। কেবল খানকতক কোম্পানির কাগজ অবশিষ্ট থাকে। জীবন-সমুদ্রে সেই কাগজ ক'খানি বৈদ্যনাথের একমাত্র অবলম্বন।

শিবনাথ বহু অনুসন্ধানে তাঁহার পুত্র আদ্যনাথের সহিত এক ধনীর একমাত্র কন্যার বিবাহ দিয়া বিষয়-বৃদ্ধির আর একটি সুযোগ করিয়া রাখিয়াছিলেন। মহেশচন্দ্র একটি সপ্ত-কন্যাভারগ্রস্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রতি দয়া করিয়া এক পয়সা পণ না লইয়া তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যাটির সহিত পুত্রের বিবাহ দেন। সাতটি কন্যাকেই যে ঘরে লন নাই তাহার কারণ, তাঁহার একটিমাত্র পুত্র এবং ব্রাহ্মণও সেরূপ অনুরোধ করে নাই। তবে, তাহাদের বিবাহের উদ্দেশে সাধ্যাতিরিক্ত অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর বৈদ্যনাথ তাঁহার কাগজ কয়খানি লইয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্টচিত্তে ছিলেন। কাজকর্ম্মের কথা তাঁহার মনেও উদয় হইত না। কাজের মধ্যে তিনি গাছের ডাল কাটিয়া বসিয়া বসিয়া বহুযত্নে ছড়ি তৈরি করিতেন। রাজ্যের বালক এবং যুবকগণ তাঁহার নিকট ছড়ির জন্য উমেদার হইত, তিনি দান করিতেন। ইহা ছাড়া বদান্যতার উত্তেজনায় ছিপ ঘুড়ি লাটাই নির্ম্মাণ করিতেও তাঁহার বিস্তর সময় যাইত। যাহাতে বহুযত্নে বহুকাল ধরিয়া চাঁচাছোলার আবশ্যক, অথচ সংসারের উপকারিতা দেখিলে যাহা সে পরিমাণে পরিশ্রম ও কালব্যয়ের অযোগ্য এমন একটা হাতের কাজ পাইলে তাঁহার উৎসাহের সীমা থাকে না।

পাড়ায় যখন দলাদলি এবং চক্রান্ত লইয়া বড় বড় পবিত্র বঙ্গীয় চণ্ডীমণ্ডপ ধূমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে তখন বৈদ্যনাথ একটি কলম-কাটা ছুরি এবং একখণ্ড গাছের ডাল লইয়া প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন এবং আহার ও নিদ্রার পর হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত নিজের দাওয়াটিতে একাকী অতিবাহিত করিতেছেন এমন প্রায় দেখা যাইত।

ষষ্ঠীর প্রসাদে শত্রুর মুখে যথাক্রমে ছাই দিয়া বৈদ্যনাথের দুইটি পুত্র এবং একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিল।

গৃহিণী মোক্ষদাসুন্দরীর অসন্তোষ প্রতিদিন বাড়িয়া উঠিতেছে। আদ্যনাথের ঘরে যেরূপ সমারোহ বৈদ্যনাথের ঘরে কেন সেরূপ না হয়। ও-বাড়ির বিন্ধ্যবাসিনীর যেমন গহনা পত্র, বেনারসী সাড়ি, কথাবার্ত্তার ভঙ্গী এবং

চালচলনের গৌরব মোক্ষদার যে ঠিক তেমনটা হইয়া ওঠে না ইহা অপেক্ষা যুক্তিবিরুদ্ধ ব্যাপার আর কি হইতে পারে! অথচ একই ত পরিবার! ভাইয়ের বিষয় বঞ্চনা করিয়া লইয়াই ত উঁহাদের এত উন্নতি! যত শোনে ততই মোক্ষদার হৃদয়ে নিজের শ্বশুরের প্রতি এবং শ্বশুরের একমাত্র পুত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং অবজ্ঞা আর ধরে না। নিজগৃহের কিছুই তাঁহার ভাল লাগে না! সকলি অসুবিধা এবং মানহানিজনক। শয়নের খাটটা মৃতদেহ বহনেরও যোগ্য নয়, যাহার সাতকুলে কেহ নাই এমন একটা অনাথ চামচিকেশাবকও এই জীর্ণ প্রাচীরে বাস করিতে চাহে না, এবং গৃহসজ্জা দেখিলে ব্রহ্মচারী পরমহংসের চখেও জল আসে। এ সকল অত্যুক্তির প্রতিবাদ করা পুরুষের ন্যায় কাপুরুষজাতির পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং বৈদ্যনাথ বাহিরের দাওয়ায় বসিয়া দ্বিগুণ মনোযোগের সহিত ছড়ি চাঁচিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু মৌনব্রত বিপদের একমাত্র পরিত্রাণ নহে। এক একদিন স্বামীর শিল্পকার্য্যে বাধা দিয়া গৃহিণী তাঁহাকে অন্তঃপুরে আহ্বান করিয়া আনিতেন। অত্যন্ত গম্ভীরভাবে অন্যদিকে চাহিয়া বলিতেন "গোয়ালার দুধ বন্ধ করিয়া দাও!

বৈদ্যনাথ কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া নম্রভাবে বলিতেন "দুধটা—বন্ধ করিলে কি চলিবে?—ছেলেরা খাইবে কি?"

গৃহিণী উত্তর করিতেন "আমানি।"

আবার কোন দিন ইহার বিপরীত ভাব দেখা যাইত—গৃহিণী বৈদ্যনাথকে ডাকিয়া বলিতেন "আমি জানি না। কি করিতে হয় তুমি কর।"

বৈদ্যনাথ ম্লানমুখে জিজ্ঞাসা করিতেন "কি করিতে হইবে?"

স্ত্রী বলিতেন "এমাসের মত বাজার করিয়া আন" বলিয়া এমন একটা ফর্দ্দ দিতেন যাহাতে একটা রাজসূয় যজ্ঞ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইতে পারিত।

বৈদ্যনাথ যদি সাহসপূর্ব্বক প্রশ্ন করিতেন "এত কি আবশ্যক আছে?"

উত্তর শুনিতেন "তবে ছেলেগুলা না খাইতে পাইয়া মরুক এবং আমিও যাই, তাহা হইলে তুমি একলা বসিয়া খুব সস্তায় সংসার চালাইতে পারিবে।"

এইরূপে ক্রমে ক্রমে বৈদ্যনাথ বুঝিতে পারিলেন ছড়ি চাঁচিয়া আর চলে না। একটা কিছু উপায় করা চাই। চাকরী করা অথবা ব্যবসা করা বৈদ্যনাথের পক্ষে দুরাশা। অতএব কুবেরের ভাণ্ডারে প্রবেশ করিবার একটা সংক্ষেপ রাস্তা আবিষ্কার করা চাই।

একদিন রাত্রে বিছানায় শুইয়া কাতরভাবে প্রার্থনা করিলেন "হে মা জগদম্বে, স্বপ্নে যদি একটা দুঃসাধ্য রোগের পেটেণ্ট ঔষধ বলিয়া দাও' কাগজে তাহার বিজ্ঞাপন লিখিবার ভার আমি লইব।"

সে রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন তাঁহার স্ত্রী তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া "বিধবাবিবাহ করিব" বলিয়া একান্ত পণ করিয়া বসিয়াছেন। অর্থাভাব সত্ত্বে উপযুক্ত গহনা কোথায় পাওয়া যাইবে বলিয়া বৈদ্যনাথ উক্ত প্রস্তাবে আপত্তি করিতেছেন; বিধবার গহনা আবশ্যক করে না বলিয়া পত্নী আপত্তি খণ্ডন করিতেছেন। তাহার কি একটা চূড়ান্ত জবাব আছে বলিয়া তাঁহার মনে হইতেছে অথচ কিছুতেই মাথায় আসিতেছে না, এমন সময় নিদ্রাভঙ্গ হইয়া দেখিলেন সকাল হইয়াছে; এবং কেন

যে তাঁহার স্ত্রীর বিধবাবিবাহ হইতেও পারে না তাহার সদুত্তর তৎক্ষণাৎ মনে পড়িয়া গেল, এবং সে জন্য বোধ করি কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইলেন।

প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া একাকী বসিয়া ঘুড়ির লখ্ তৈরি করিতেছেন এমন সময় এক সন্ন্যাসী জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া দ্বারে আগত হইল। সেই মুহূর্ত্তেই বিদ্যুতের মত বৈদ্যনাথ ভাবী ঐশ্বর্য্যের উজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। সন্ন্যাসীকে প্রচুর পরিমাণে আদর অভ্যর্থনা ও আহার্য্য যোগাইলেন। অনেক সাধ্যসাধনার পর জানিতে পারিলেন সন্ন্যাসী সোণা তৈরি করিতে পারে এবং সে বিদ্যা তাঁহাকে দান করিতেও অসম্মত হইল না।

গৃহিণীও নাচিয়া উঠিলেন। যকৃতের বিকার উপস্থিত হইলে লোকে যেমন সমস্ত হলুদবর্ণ দেখে তিনি সেইরূপ পৃথিবীময় সোণা দেখিতে লাগিলেন। কল্পনা-কারিকরের দ্বারা শয়নের খাট, গৃহসজ্জা এবং গৃহপ্রাচীর পর্য্যন্ত সোণা মণ্ডিত করিয়া মনে মনে বিন্ধ্যবাসিনীকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

সন্ন্যাসী প্রতিদিন দুইসের করিয়া দুগ্ধ এবং দেড় সের করিয়া মোহনভোগ খাইতে লাগিল এবং বৈদ্যনাথের কোম্পানীর কাগজ দোহন করিয়া অজস্র রৌপ্যরস নিঃসৃত করিয়া লইল।

ছিপ ছড়ি লাঠাইয়ের কাঙালরা বৈদ্যনাথের রুদ্ধদ্বারে নিষ্ফল আঘাত করিয়া চলিয়া যায়। ঘরে ছেলেগুলো যথাসময়ে খাইতে পায় না, পড়িয়া গিয়া কপাল ফলায়, কাঁদিয়া আকাশ ফাটাইয়া দেয়, কর্ত্তা গৃহিণী কাহারো ভ্রূক্ষেপ নাই। নিস্তব্ধভাবে অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে বসিয়া কটাহের দিকে চাহিয়া উভয়ের চোখে পল্লব নাই, মুখে বাক্য নাই। তৃষিত একাগ্র-নেত্রে অবিশ্রান্ত অগ্নিশিখার প্রতিবিম্ব পড়িয়া চোখের মণি যেন স্পর্শমণির গুণ প্রাপ্ত হইল। দৃষ্টিপথ সায়াহ্নের সূর্য্যাস্তপথের মত জ্বলন্ত সুবর্ণপ্রলেপে রাঙা হইয়া উঠিল।

দুখানা কোম্পানীর কাগজ এই স্বর্ণ-অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার পর একদিন সন্ন্যাসী আশ্বাস দিল "কাল সোণার রং ধরিবে।"

সেদিন রাত্রে কাহারো ঘুম হইল না। স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া সুবর্ণপুরী নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। তৎসম্বন্ধে মাঝে মাঝে উভয়ের মধ্যে মতভেদ এবং তর্কও উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু আনন্দ-আবেগে তাহার মীমাংসা হইতে বিলম্ব হয় নাই—পরস্পর পরস্পরের খাতিরে নিজ নিজ মত কিছু কিছু পরিত্যাগ করিতে অধিক ইতস্ততঃ করেন নাই। সে রাত্রে দাম্পত্য একীকরণ এত ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল।

পরদিন আর সন্ন্যাসীর দেখা নাই। চারদিক হইতে সোণার রং ঘুচিয়া গিয়া সূর্য্যকিরণ পর্য্যন্ত অন্ধকার হইয়া দেখা দিল। ইহার পর হইতে শয়নের খাট গৃহসজ্জা এবং গৃহপ্রাচীর চতুর্গুণ দারিদ্র্য এবং জীর্ণতা প্রকাশ করিতে লাগিল

এখন হইতে গৃহকার্য্যে বৈদ্যনাথ কোন একটা সামান্য মত প্রকাশ করিতে গেলে গৃহিণী তীব্রমধুর স্বরে বলেন "বুদ্ধির পরিচয় অনেক দিয়াছ এখন কিছুদিন ক্ষান্ত থাক!" বৈদ্যনাথ একেবারে নিবিয়া যায়।

মোক্ষদা এম্নি একটা শ্রেষ্ঠতার ভাব ধারণ করিয়াছে যেন এই স্বর্ণমরীচিকায় সে নিজে এক মুহূর্ত্তের জন্যও আশ্বস্ত হয় নাই।

অপরাধী বৈদ্যনাথ স্ত্রীকে কিঞ্চিৎ সন্তুষ্ট করিবার জন্য বিবিধ উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এক দিন একটি চতুষ্কোণ মোড়কে গোপন উপহার লইয়া স্ত্রীর নিকট গিয়া প্রচুর

হাস্যবিকাশপূর্ব্বক সাতিশয় চতুরতার সহিত ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন "কি আনিয়াছি বল দেখি!"

স্ত্রী কৌতূহল গোপন করিয়া উদাসীনভাবে কহিলেন "কেমন করিয়া বলিব! আমি ত আর 'জান' নহি!"

বৈদ্যনাথ অনাবশ্যক কালব্যয় করিয়া প্রথমে দড়ির গাঁঠ অতি ধীরে ধীরে খুলিলেন, তার পর ফুঁ দিয়া কাগজের ধুলা ঝাড়িলেন, তাহার পর অতি সাবধানে এক এক ভাঁজ করিয়া কাগজের মোড়ক খুলিয়া আর্ট-ষ্টুডিয়োর রংকরা দশমহাবিদ্যার ছবি বাহির করিয়া আলোর দিকে ফিরাইয়া গৃহিণীর সম্মুখে ধরিলেন।

গৃহিণীর তৎক্ষণাৎ বিন্ধ্যবাসিনীর শয়নকক্ষের বিলাতী তেলের ছবি মনে পড়িল—অপর্য্যাপ্ত অবজ্ঞার স্বরে কহিলেন "আ মরে যাই! এ তোমার বৈঠকখানায় রাখিয়া বসিয়া বসিয়া নিরীক্ষণ কর গে। এ আমার কাজ নাই।" বিমর্ষ বৈদ্যনাথ বুঝিলেন অন্যান্য অনেক ক্ষমতার সহিত স্ত্রীলোকের মন যোগাইবার দুরূহ ক্ষমতা হইতেও বিধাতা তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন।

এদিকে দেশে যত দৈবজ্ঞ আছে মোক্ষদা সকলকে হাত দেখাইলেন, কোষ্ঠি দেখাইলেন। সকলেই বলিল, তিনি সধবাবস্থায় মরিবেন। কিন্তু সেই পরমানন্দময় পরিণামের জন্য তিনি একান্ত ব্যগ্র ছিলেন না, অতএব ইহাতেও তাঁহার কৌতূহল নিবৃত্তি হইল না।

শুনিলেন তাঁহার সন্তানভাগ্য ভাল, পুত্রকন্যায় তাঁহার গৃহ অবিলম্বে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা আছে; শুনিয়া তিনি বিশেষ প্রফুল্লতা প্রকাশ করিলেন না।

অবশেষে একজন গণিয়া বলিল বৎসরখানেকের মধ্যে যদি বৈদ্যনাথ দৈবধন প্রাপ্ত না হন তাহা হইলে গণক তাহার পাঁজিপুঁথি সমস্তই পুড়াইয়া ফেলিবে। গণকের এইরূপ নিদারুণ পণ শুনিয়া মোক্ষদার মনে আর তিলমাত্র অবিশ্বাসের কারণ রহিল না।

গণৎকার ত প্রচুর পারিতোষিক লইয়া বিদায় হইয়াছেন, কিন্তু বৈদ্যনাথের জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল। ধন উপার্জ্জনের কতকগুলি সাধারণপ্রচলিত পথ আছে, যেমন চাষ, চাকরি, ব্যবসা, চুরি এবং প্রতারণা। কিন্তু দৈবধন উপার্জ্জনের সেরূপ নির্দ্দিষ্ট কোন উপায় নাই। এই জন্য মোক্ষদা বৈদ্যনাথকে যতই উৎসাহ দেন এবং ভর্ৎসনা করেন বৈদ্যনাথ ততই কোন দিকে রাস্তা দেখিতে পান না! কোন্খানে খুঁড়িতে আরম্ভ করিবেন, কোন্ পুকুরে ডুবারি নামাইবেন, বাড়ির কোন্ প্রাচীরটা ভাঙ্গিতে হইবে, কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না।

মোক্ষদা নিতান্ত বিরক্ত হইয়া স্বামীকে জানাইলেন যে, পুরুষমানুষের মাথায় যে মস্তিষ্কের পরিবর্ত্তে এতটা গোময় থাকিতে পারে তাহা তাঁহার পূর্ব্বে ধারণা ছিল না।

বলিলেন "একটু নড়িয়া চড়িয়া দেখ। হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিলে কি আকাশ হইতে টাকা বৃষ্টি হইবে?"

কথাটা সঙ্গত বটে, এবং বৈদ্যনাথের একান্ত ইচ্ছাও তাই, কিন্তু কোন্ দিকে নড়িবেন কিসের উপর চড়িবেন তাহা যে কেহ বলিয়া দেয় না। অতএব দাওয়ায় বসিয়া বৈদ্যনাথ আবার ছড়ি চাঁচিতে লাগিলেন।

এদিকে আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসব নিকটবর্ত্তী হইল। চতুর্থীর দিন হইতেই ঘাটে নৌকা আসিয়া লাগিতে লাগিল। প্রবাসীরা দেশে ফিরিয়া আসিতেছে। ঝুড়িতে মানকচু কুমড়া শুষ্ক নারিকেল; টিনের বাক্সের মধ্যে ছেলেদের

জন্ম জুতা ছাতা কাপড় এবং প্রেয়সীর জন্ম এসেন্স সাবান নূতন গল্পের বহি এবং সুবাসিত নাড়িকেল তৈল।

মেঘমুক্ত আকাশে শরতের সূর্য্যকিরণ উৎসবের হাস্যের মত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, পক্কোন্মুখ ধান্যক্ষেত্র থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে, বর্ষাধৌত সতেজ তরুপল্লব নব শীতবায়ুতে সির্ সির্ করিয়া উঠিতেছে—এবং তসরের চায়নাকোট পরিয়া কাঁধে একটি পাকানো চাদর ঝুলাইয়া ছাতি মাথায় প্রত্যাগত পথিকেরা মাঠের পথ দিয়া ঘরের মুখে চলিয়াছে।

বৈদ্যনাথ বসিয়া বসিয়া তাই দেখে এবং তাহার হৃদয় হইতে দীর্ঘনিশ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। নিজের নিরানন্দ গৃহের সহিত বাঙ্গালা দেশের সহস্র গৃহের মিলনোৎসবের তুলনা করে, এবং মনে মনে বলে "বিধাতা কেন আমাকে এমন অকর্ম্মণ্য করিয়া সৃজন করিয়াছ!"—

ছেলেরা ভোরে উঠিয়াই প্রতিমানির্ম্মাণ দেখিবার জন্য আদ্যনাথের বাড়ির প্রাঙ্গণে গিয়া হাজির হইয়াছিল। খাবার বেলা হইলে দাসী তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক গ্রেফ্তার করিয়া লইয়া আসিল। তখন বৈদ্যনাথ বসিয়া বসিয়া এই বিশ্বব্যাপী উৎসবের মধ্যে নিজের জীবনের নিষ্ফলতা স্মরণ করিতেছিলেন। দাসীর হাত হইতে ছেলে দুটিকে উদ্ধার করিয়া কোলের কাছে ঘনিষ্ঠভাবে টানিয়া বড়টিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁরে অবু, এবার পুজোর সময় কি চাস্ বল্ দেখি।"

অবিনাশ তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল "একটা নৌকো দিয়ো বাবা।"

ছোটটিও মনে করিল বড় ভাইয়ের চেয়ে কোন বিষয়ে ন্যূন হওয়া কিছু নয়, কহিল "আমাকেও একটা নৌকো দিয়ো বাবা।"

বাপের উপযুক্ত ছেলে! একটা অকর্ম্মণ্য কারুকার্য্য পাইলে আর কিছু চাহে না। বাপ বলিলেন আচ্ছা।"

এদিকে যথাকালে পূজার ছুটিতে কাশী হইতে মোক্ষদার এক খুড়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। তিনি ব্যবসায়ে উকীল। মোক্ষদা কিছুদিন ঘন ঘন তাঁহার বাড়ি যাতায়াত করিলেন।

অবশেষে একদিন স্বামীকে আসিয়া বলিলেন "ওগো, তোমাকে কাশী যাইতে হইতেছে।"

বৈদ্যনাথ সহসা মনে করিলেন, বুঝি তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত, গণক কোষ্ঠি হইতে আবিষ্কার করিয়াছে; সহধর্ম্মিণী সেই সন্ধান পাইয়া তাঁহার সদ্গতি করিবার যুক্তি করিতেছেন।

পরে শুনিলেন, এইরূপ জনশ্রুতি যে, কাশীতে একটি বাড়ি আছে সেখানে গুপ্তধন মিলিবার কথা, সেই বাড়ি কিনিয়া তাহার ধন উদ্ধার করিয়া আনিতে হইবে।

বৈদ্যনাথ বলিলেন—"কি সর্ব্বনাশ! আমি কাশী যাইতে পারিব না।"

বৈদ্যনাথ কখনও ঘর ছাড়িয়া কোথাও যান নাই। গৃহস্থকে কি করিয়া ঘরছাড়া করিতে হয় প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ লিখিতেছেন স্ত্রীলোকের সে সম্বন্ধে "অশিক্ষিত পটুত্ব" আছে। মোক্ষদা মুখের কথায় ঘরের মধ্যে যেন লঙ্কার ধোঁয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাতে হতভাগ্য বৈদ্যনাথ কেবল চোখের জলে ভাসিয়া যাইত, কাশী যাইবার নাম করিত না।

দিন দুই তিন গেল। বৈদ্যনাথ বসিয়া বসিয়া কতকগুলা কাষ্ঠখণ্ড কাটিয়া কুঁদিয়া যোড়া দিয়া দুইখানি খেলার নৌকা তৈরি করিলেন। তাহাতে মাস্তুল বসাইলেন, কাপড় কাটিয়া

পাল আটিয়া দিলেন; লাল শালুর নিশান উড়াইলেন, হাল ও দাঁড় বসাইয়া দিলেন। একটি পুতুল কর্ণধার এবং আরোহীও ছাড়িলেন না। তাহাতে বহুযত্ন এবং আশ্চর্য্য নিপুণতা প্রকাশ করিলেন। সে নৌকা দেখিয়া অসহ চিত্তচাঞ্চল্য না জন্মে এমন সংযতচিত্ত বালক সম্প্রতি পাওয়া দুর্লভ। অতএব বৈদ্যনাথ সপ্তমীর পূর্ব্বরাত্রে যখন নৌকা দুটি লইয়া ছেলেদের হাতে দিলেন তাহারা আনন্দে নাচিয়া উঠিল। একেত নৌকার খোলটাই যথেষ্ট, তাহাতে আবার হাল আছে, দাঁড় আছে, মাস্তুল আছে, পাল আছে, আবার যথাস্থানে মাঝি বসিয়া, ইহাই তাহাদের সমধিক বিস্ময়ের কারণ হইল।

ছেলেদের আনন্দকলরবে আকৃষ্ট হইয়া মোক্ষদা আসিয়া দরিদ্র পিতার পূজার উপহার দেখিলেন।

দেখিয়া, রাগিয়া কাঁদিয়া কপালে করাঘাত করিয়া খেলেনা দুটো কাড়িয়া জানলার বাহিরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। সোণার হার গেল, সাটিনের জামা গেল, জরির টুপি গেল, শেষে কিনা হতভাগ্য মনুষ্য দুইখানা খেলনা দিয়া নিজের ছেলেকে প্রতারণা করিতে আসিয়াছে! তাও আবার দুই পয়সা ব্যয় নাই, নিজের হাতে নির্ম্মাণ!

ছোট ছেলে ত উর্দ্ধশ্বাসে কাঁদিতে লাগিল, "বোকা ছেলে" বলিয়া তাহাকে মোক্ষদা ঠাস্ করিয়া চড়াইয়া দিলেন।

বড় ছেলেটি বাপের দিকে চাহিয়া নিজের দুঃখ ভুলিয়া গেল। উল্লাসের ভাণমাত্র করিয়া কহিল বাবা, আমি কাল ভোরে গিয়ে কুড়িয়ে নিয়ে আস্‌ব।"

বৈদ্যনাথ তাহার পরদিন কাশী যাইতে সমস্ত হইলেন। কিন্তু টাকা কোথায়! তাঁহার স্ত্রী গহনা বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করিলেন। বৈদ্যনাথের পিতামহীর আমলের গহনা, এমন খাঁটি সোণা এবং ভারী গহনা আজকালকার দিনে পাওয়াই যায় না।

বৈদ্যনাথের মনে হইল তিনি মরিতে যাইতেছেন। ছেলেদের কোলে করিয়া চুম্বন করিয়া সাশ্রুনেত্রে বাড়ি হইতে বাহির হইলেন। তখন মোক্ষদাও কাঁদিতে লাগিলেন।

কাশীর বাড়িওয়ালা বৈদ্যনাথের খুড়শ্বশুরের মক্কেল। বোধ করি সেই কারণেই বাড়ি খুব চড়া দামেই বিক্রয় হইল। বৈদ্যনাথ একাকী বাড়ি দখল করিয়া বসিলেন। একেবারে নদীর উপরেই বাড়ি। ভিত্তি ধৌত করিয়া নদীস্রোত প্রবাহিত হইতেছে।

রাত্রে বৈদ্যনাথের গা ছম্‌ছম্ করিতে লাগিল। শূন্য গৃহে শিয়রের কাছে প্রদীপ জ্বালাইয়া চাদর মুড়ি দিয়া শয়ন করিলেন। কিন্তু কিছুতেই নিদ্রা হয় না। গভীর রাত্রে যখন সমস্ত কোলাহল থামিয়া গেল তখন কোথা হইতে একটা ঝন্‌ঝন্ শব্দ শুনিয়া বৈদ্যনাথ চমকিয়া উঠিলেন। শব্দ মৃদু কিন্তু পরিষ্কার। যেন পাতালে বলিরাজের ভাণ্ডারে কোষাধ্যক্ষ বসিয়া বসিয়া টাকা গণনা করিতেছে।

বৈদ্যনাথের মনে ভয় হইল কৌতূহল হইল এবং সেই সঙ্গে দুর্জ্জয় আশার সঞ্চার হইল। কম্পিতহস্তে প্রদীপ লইয়া ঘরে ঘরে ফিরিলেন। এঘরে গেলে মনে হয় শব্দ ওঘর হইতে আসিতেছে—ওঘরে গেলে মনে হয় এঘর হইতে আসিতেছে। বৈদ্যনাথ সমস্ত রাত্রি কেবলই এঘর ওঘর করিলেন। দিনের বেলা সেই পাতালভেদী শব্দ অন্যান্য শব্দের সহিত মিশিয়া গেল, আর তাহাকে চিনা গেল না।

রাত্রি দুই তিন প্রহরের সময় যখন জগৎ নিদ্রিত হইল তখন আবার সেই শব্দ জাগিয়া

উঠিল। বৈদ্যনাথের চিত্ত নিতান্ত অস্থির হইল। শব্দ লক্ষ্য করিয়া কোন্ দিকে যাইবেন ভাবিয়া পাইলেন না মরুভূমির মধ্যে জলের কল্লোল শোনা যাইতেছে অথচ কোন্ দিক হইতে আসিতেছে নির্ণয় হইতেছে না; ভয় হইতেছে পাছে একবার ভুল পথ অবলম্বন করিলে গুপ্ত নির্ঝরিণী একেবারে আয়ত্তের অতীত হইয়া যায়; তৃষিত পথিক স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া প্রাণপণে কাণ খাড়া করিয়া থাকে, এদিকে তৃষ্ণা উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠে—বৈদ্যনাথের সেই অবস্থা হইল।

বহুদিন অনিশ্চিত অবস্থাতেই কাটিয়া গেল। কেবল অনিদ্রা এবং বৃথা আশ্বাসে তাঁহার সন্তোষস্নিগ্ধ মুখে ব্যগ্রতার তীব্রভাব রেখাঙ্কিত হইয়া উঠিল। কোটরনিবিষ্ট চকিত-নেত্রে মধ্যাহ্নের মরুবালুকার মত একটা জ্বালা প্রকাশ পাইল।

অবশেষে একদিন দ্বিপ্রহরে সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া ঘরের মেঝেময় শাবল ঠুকিয়া শব্দ করিতে লাগিলেন। একটি পার্শ্ববর্ত্তী ছোট কুঠরির মেঝের মধ্য হইতে ফাঁপা আওয়াজ দিল।

রাত্রি নিষুপ্ত হইলে পর বৈদ্যনাথ একাকী বসিয়া সেই মেঝে খনন করিতে লাগিলেন। যখন রাত্রি প্রভাতপ্রায়, তখন ছিদ্রখনন সম্পূর্ণ হইল।

বৈদ্যনাথ দেখিলেন নীচে একটা ঘরের মত আছে—কিন্তু সেই রাত্রের অন্ধকারে তাহার মধ্যে নির্ব্বিচারে পা নামাইয়া দিতে সাহস করিলেন না। গর্ত্তের উপর বিছানা চাপা দিয়া শয়ন করিলেন। কিন্তু শব্দ এমনি পরিস্ফুট হইয়া উঠিল যে ভয়ে সেখান হইতে উঠিয়া আসিলেন—অথচ গৃহ অরক্ষিত রাখিয়া দ্বার ছাড়িয়া দূরে যাইতেও প্রবৃত্তি হইল না। লোভ এবং ভয় দুই দিক হইতে দুই হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। রাত কাটিয়া গেল।

আজ দিনের বেলাও শব্দ শুনা যায়। ভৃত্যকে ঘরের মধ্যে ঢুকিতে না দিয়া বাহিরে আহারাদি করিলেন। আহারান্তে ঘরে ঢুকিয়া দ্বারে চাবি লাগাইয়া দিলেন।

দুর্গানাম উচ্চারণ করিয়া গহ্বরমুখ হইতে বিছানা সরাইয়া ফেলিলেন। জলের ছল্-ছল্ এবং ধাতুদ্রব্যের ঠংঠং খুব পরিষ্কার শুনা গেল।

ভয়ে ভয়ে গর্ত্তের কাছে আস্তে আস্তে মুখ লইয়া গিয়া দেখিলেন অনতি উচ্চ কক্ষের মধ্যে জলের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে—অন্ধকারে আর বিশেষ কিছু দেখিতে পাইলেন না।

একটা বড় লাঠি নামাইয়া দেখিলেন জল এক হাঁটুর অধিক নহে। একটি দিয়াশলাই ও বাতি লইয়া সেই অগভীর গৃহের মধ্যে অনায়াসে লাফাইয়া পড়িলেন। পাছে এক মুহূর্ত্তে সমস্ত আশা নিবিয়া যায় এই জন্য বাতি জ্বালাইতে হাত কাঁপিতে লাগিল। অনেক-গুলি দেশলাই নষ্ট করিয়া অবশেষে বাতি জ্বলিল।

দেখিলেন, একটি মোটা লোহার শিক্‌লিতে একটি বৃহৎ তাঁবার কলসী বাঁধা রহিয়াছে, এক একবার জলের স্রোত প্রবল হয় এবং শিক্‌লি কলসীর উপর পড়িয়া শব্দ করিতে থাকে।

বৈদ্যনাথ জলের উপর ছপ্‌ছপ্ শব্দ করিতে করিতে তাড়াতাড়ি সেই কলসীর কাছে উপস্থিত হইলেন। গিয়া দেখিলেন কলসী শূন্য।

তথাপি নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না—দুই হস্তে কলসী তুলিয়া খুব করিয়া ঝাঁকানি দিলেন। ভিতরে কিছুই নাই। —উপুড় করিয়া ধরিলেন। কিছুই পড়িল না।

দেখিলেন কলসীর গলা ভাঙ্গা। যেন এককালে এই কলসীর মুখ সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল কে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে।

তখন বৈদ্যনাথ জলের মধ্যে দুই হস্ত দিয়া পাগলের মত হাতড়াইতে লাগিলেন। কর্দ্দমস্তরের মধ্যে হাতে কি একটা ঠেকিল, তুলিয়া দেখিলেন মড়ার মাথা—সেটাও একবার কাণের কাছে লইয়া ঝাকাইলেন—ভিতরে কিছুই নাই। ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। অনেক খুঁজিয়া নরকঙ্কালের অস্থি ছাড়া আর কিছুই পাইলেন না।

দেখিলেন নদীর দিকে দেয়ালের এক জায়গা ভাঙ্গা; সেইখান দিয়া জল প্রবেশ করিতেছে এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী যে ব্যক্তির কোষ্ঠিতে দৈবধন লাভ লেখা ছিল সেও সম্ভবতঃ এই ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিয়াছিল।

অবশেষে সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া "মা" বলিয়া মস্ত একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন—প্রতিধ্বনি যেন অতীত কালের আরো অনেক হতাশ্বাস ব্যক্তির নিশ্বাস একত্রিত করিয়া ভীষণ গাম্ভীর্য্যের সহিত পাতাল হইতে স্তনিত হইয়া উঠিল।

সর্ব্বাঙ্গে জলকাদা মাখিয়া বৈদ্যনাথ উপরে উঠিলেন।

জনপূর্ণ কোলাহলময় পৃথিবী তাঁহার নিকটে আগ্নোপান্ত মিথ্যা এবং সেই শৃঙ্খলবদ্ধ ভগ্নঘটের মত শূন্য বোধ হইল।

আবার! যে জিনিষপত্র বাঁধিতে হইবে, টিকিট কিনিতে হইবে, গাড়ি চড়িতে হইবে, বাড়ি ফিরিতে হইবে, স্ত্রীর সহিত বাক্‌বিতণ্ডা করিতে হইবে, জীবন প্রতিদিন বহন করিতে হইবে সে তাঁহার অসহ্য বলিয়া বোধ হইল। ইচ্ছা হইল নদীর জীর্ণ পাড়ের মত ঝুপ করিয়া ভাঙ্গিয়া জলে পড়িয়া যান।

কিন্তু তবু সেই জিনিষপত্র বাঁধিলেন, টিকিট কিনিলেন, এবং গাড়িও চড়িলেন।

এবং একদিন শীতের সায়াহ্নে বাড়ির দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আশ্বিন মাসে শরতের প্রাতঃকালে দ্বারের কাছে বসিয়া বৈদ্যনাথ অনেক প্রবাসীকে বাড়ি ফিরিতে দেখিয়াছেন, এবং দীর্ঘশ্বাসের সহিত মনে মনে এই বিদেশ হইতে দেশে ফিরিবার সুখের জন্য লালায়িত হইয়াছেন—তখন আজিকার সন্ধ্যা স্বপ্নেরও অগম্য ছিল।

বাড়িতে প্রবেশ করিয়া প্রাঙ্গণের কাষ্ঠাসনে নির্ব্বোধের মত বসিয়া রহিলেন, অন্তঃপুরে গেলেন না। সর্ব্বপ্রথমে ঝি তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দকোলাহল বাধাইয়া দিল, ছেলেরা ছুটিয়া আসিল, গৃহিণী ডাকিয়া পাঠাইলেন।

বৈদ্যনাথের যেন একটা ঘোর ভাঙ্গিয়া গেল, আবার যেন তাঁহার সেই পূর্ব্বসংসারে জাগিয়া উঠিলেন।

শুষ্কমুখে ম্লানহাস্য লইয়া একটা ছেলেকে কোলে করিয়া একটা ছেলের হাত ধরিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

তখন ঘরে প্রদীপ জ্বালান হইয়াছে, এবং যদিও রাত হয় নাই তথাপি শীতের সন্ধ্যা রাত্রির মত নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে।

বৈদ্যনাথ খানিকক্ষণ কিছু বলিলেন না, তার পর মৃদুস্বরে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন আছ?"

স্ত্রী তাহার কোন উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইল?"

বৈদ্যনাথ নিরুত্তরে কপালে আঘাত করিলেন। মোক্ষদার মুখ ভার শক্ত হইয়া উঠিল।

ছেলেরা প্রকাণ্ড একটা অকল্যাণের ছায়া দেখিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল। ঝির

কাছে গিয়া বলিল "সেই নাপিতের গল্প বল্।' বলিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

রাত হইতে লাগিল কিন্তু দুজনের মুখে একটি কথা নাই। বাড়ির মধ্যে কি একটা যেন ছম্‌ছম্ করিতে লাগিল এবং মোক্ষদার ঠোঁটদুটি ক্রমশই বজ্রের মত আঁটিয়া আসিল।

অনেকক্ষণ পরে মোক্ষদা কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে শয়নগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

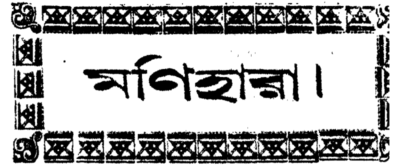
বৈদ্যনাথ চুপ করিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। চৌকিদার প্রহর হাঁকিয়া গেল। শ্রান্ত পৃথিবী অকাতর নিদ্রায় মগ্ন হইয়া রহিল। আপনার আত্মীয় হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্ত আকাশের নক্ষত্র পর্য্যন্ত কেহই এই লাঞ্ছিত ভগ্ননিদ্র বৈদ্যনাথকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

অনেক রাত্রে, বোধ করি কোন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া বৈদ্যনাথের বড় ছেলেটি শয্যা ছাড়িয়া আস্তে আস্তে বারান্দায় আসিয়া ডাকিল "বাবা"

তখন তাহার বাবা সেখানে নাই। অপেক্ষাকৃত উর্দ্ধকণ্ঠে রুদ্ধদ্বারের বাহির হইতে ডাকিল "বাবা!" কিন্তু কোন উত্তর পাইল না।

আবার ভয়ে ভয়ে বিছানায় গিয়া শয়ন করিল।

পূর্ব্বপ্রথানুসারে ঝি সকালবেলায় তামাক সাজিয়া তাঁহাকে খুঁজিল, কোথাও দেখিতে পাইল না। বেলা হইলে প্রতিবেশীগণ গৃহ-প্রত্যাগত বান্ধবের খোঁজ লইতে আসিল, কিন্তু বৈদ্যনাথের সহিত সাক্ষাৎ হইল না।



মণিহারা।

সেই জীর্ণপ্রায় বাঁধাঘাটের ধারে আমার বোট লাগানো ছিল। তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে।

বোটের ছাদের উপরে মাজি নমাজ করিতেছে। পশ্চিমের জ্বলন্ত আকাশপটে তাহার নীরব উপাসনা ক্ষণে ক্ষণে ছবির মত আঁকা পড়িতেছিল। স্থির রেখাহীন নদীর জলের উপর ভাষাতীত অসংখ্য বর্ণচ্ছটা দেখিতে দেখিতে ফিকা হইতে গাঢ় লেখায়, সোণার রং হইতে ইস্পাতের রঙে, এক আভা হইতে আর এক আভায়, মিলাইয়া আসিতেছিল।

জানালা ভাঙা, বারান্দা ঝুলিয়া পড়া জরাগ্রস্ত বৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে অশ্বত্থমূলবিদারিত ঘাটের উপরে ঝিল্লিমুখর সন্ধ্যাবেলায় একলা বসিয়া আমার শুষ্ক চক্ষুর কোণ ভিজিবে ভিজিবে করিতেছে এমন সময়ে মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া শুনিলাম, "মহাশয়ের কোথা হইতে আগমন?"

দেখিলাম ভদ্রলোকটী স্বল্পাহারশীর্ণ, ভাগ্যলক্ষ্মী কর্ত্তৃক নিতান্ত অনাদৃত। বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ বিদেশী চাকুরের যেমন একরকম বহুকাল জীর্ণসংস্কারবিহীন চেহারা ইহারও সেইরূপ। ধুতির উপরে একখানি মলিন তৈলাক্ত আসামী মটকার বোতামখোলা চাপকান—কর্ম্মক্ষেত্র হইতে যেন অল্পক্ষণ হইল ফিরিতেছেন। এবং যে সময় কিঞ্চিৎ জলপান খাওয়া উচিত ছিল সে সময় হতভাগ্য নদীতীরে কেবল সন্ধ্যার হাওয়া খাইতে আসিয়াছেন।

আগন্তুক সোপানপার্শ্বে আসনগ্রহণ করিলেন। আমি কহিলাম,আমি রাঁচি হইতে আসিতেছি।

কি করা হয়?

ব্যবসা করিয়া থাকি।

কি ব্যবসা?

হরীতকী, রেসমের গুটি এবং কাঠের ব্যবসা।

কি নাম?

ঈষৎ থামিয়া একটা নাম বলিলাম। কিন্তু সে আমার নিজের নাম নহে!

ভদ্রলোকের কৌতূহল নিবৃত্তি হইল না। পুনরায় প্রশ্ন হইল, এখানে কি করিতে আগমন?

আমি কহিলাম বায়ু পরিবর্ত্তন।

লোকটি কিছু আশ্চর্য্য হইল। কহিল,মহাশয় আজ প্রায় ছয় বৎসর ধরিয়া এখানকার বায়ু এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ গড়ে পনেরো গ্রেন্ করিয়া কুইনাইন্ খাইতেছি কিন্তু কিছু ত ফল পাই নাই।

আমি কহিলাম, একথা মানিতেই হইবে রাঁচি হইতে এখানে বায়ুর যথেষ্ট পরিবর্ত্তন দেখা যাইবে।

তিনি কহিলেন, আজ্ঞা হাঁ, যথেষ্ট। এখানে কোথায় বাসা করিবেন?

আমি ঘাটের উপকার জীর্ণবাড়ি দেখাইয়া কহিলাম, এই বাড়িতে।

বোধ করি লোকটির মনে সন্দেহ হইল আমি এই পোড়ো বাড়িতে কোন গুপ্তধনের সন্ধান পাইয়াছি। কিন্তু এ সম্বন্ধে আর কোন তর্ক তুলিলেন না—কেবল আজ পনেরো বৎসর পূর্ব্বে এই অভিশাপগ্রস্ত বাড়িতে যে ঘটনাটি ঘটিয়াছিল তাহারই বিস্তারিত বর্ণনা করিলেন।

লোকটি এখানকার ইস্কুলমাষ্টার। তাঁহার ক্ষুধা ও রোগশীর্ণ মুখে মস্ত একটা টাকের নীচে এক যোড়া বড় বড় চক্ষু আপন কোটরের ভিতর হইতে অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতায় জ্বলিতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়া ইংরাজ কবি কোল্‌রিজের সৃষ্ট প্রাচীন নাবিকের কথা আমার মনে পড়িল।

মাঝি নমাজ পড়া সমাধা করিয়া রন্ধনকার্য্যে মন দিয়াছে। সন্ধ্যার শেষ আভাটুকু মিলাইয়া আসিয়া ঘাটের উপরকার জনশূন্য অন্ধকার বাড়ি আপন পূর্ব্বাবস্থার প্রকাণ্ড প্রেতমূর্ত্তির মত নিস্তব্ধ দাঁড়াইয়া রহিল।

ইস্কুলমাষ্টার কহিলেন—আমি এই গ্রামে আসার প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে এই বাড়িতে ফণিভূষণ সাহা বাস করিতেন। তিনি তাঁহার অপুত্রক পিতৃব্য দুর্গামোহন সাহার বৃহৎ বিষয় এবং ব্যবসায়ের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

কিন্তু তাঁহাকে একালে ধরিয়াছিল। তিনি লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তিনি জুতা সমেত সাহেবের আপিসে ঢুকিয়া সম্পূর্ণ খাঁটি ইংরাজি বলিতেন। তাহাতে আবার দাড়ি রাখিয়াছিলেন,সুতরাং সাহেব সওদাগরের নিকট তাঁহার উন্নতির সম্ভাবনামাত্র ছিল না। তাঁহাকে দেখিবামাত্রই নব্যবঙ্গ বলিয়া ঠাহর হইত।

আবার ঘরের মধ্যেও এক উপসর্গ জুটিয়াছিল। তাঁহার স্ত্রীটি ছিলেন সুন্দরী। একে কালেজে পড়া, তাহাতে সুন্দরী স্ত্রী, সুতরাং সেকালের চালচলন আর রহিল না। এমন কি ব্যামো হইলে অ্যাসিষ্টাণ্ট্ সার্জ্জনকে ডাকা হইত। অশন বসন ভূষণও এই পরিমাণে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

মহাশয় নিশ্চয়ই বিবাহিত অতএব একথা আপনাকে বলাই বাহুল্য যে, সাধারণতঃ স্ত্রীজাতি কাঁচা আম, ঝাললঙ্কা এবং কড়া স্বামীই ভালবাসে। যে দুর্ভাগ্য পুরুষ নিজের

স্ত্রীর ভালবাসা হইতে বঞ্চিত সে যে কুশ্রী অথবা নির্দ্ধন তাহা নহে সে নিতান্ত নিরীহ।

যদি জিজ্ঞাসা করেন কেন এমন হইল, আমি এ সম্বন্ধে অনেক কথা ভাবিয়া রাখিয়াছি। যাহার যা প্রবৃত্তি এবং ক্ষমতা সেটার চর্চ্চা না করিলে সে সুখী হয় না। শিঙে শান দিবার জন্য হরিণ শক্ত গাছের গুঁড়ি খোঁজে, কলাগাছে তাহার শিং ঘষিবার সুখ হয় না। নরনারীর ভেদ হইয়া অবধি স্ত্রীলোক দুরন্ত পুরুষকে নানা কৌশলে ভুলাইয়া বশ করিবার বিদ্যা চর্চ্চা করিয়া আসিতেছে। যে স্বামী আপনি বশ হইয়া বসিয়া থাকে তাহার স্ত্রী বেচারা একেবারেই বেকার, সে তাহার মাতামহীদের নিকট হইতে শত লক্ষ বৎসরের শান্ দেওয়া যে উজ্জ্বল বরুণাস্ত্র, অগ্নিবাণ, ও নাগপাশবন্ধনগুলি পাইয়াছিল, তাহা সমস্ত নিষ্ফল হইয়া যায়। স্ত্রীলোক পুরুষকে ভুলাইয়া নিজের শক্তিতে ভালবাসা আদায় করিয়া লইতে চায়,—স্বামী যদি ভালমানুষ হইয়া সে অবসরটুকু না দেয় তবে স্বামীর অদৃষ্ট মন্দ এবং স্ত্রীরও ততোধিক।

নবসভ্যতার শিক্ষামন্ত্রে পুরুষ আপন স্বভাবসিদ্ধ বিধাতাদত্ত সুমহৎ বর্ব্বরতা হারাইয়া আধুনিক দাম্পত্য সম্বন্ধটাকে এমন শিথিল করিয়া ফেলিয়াছে অভাগা ফণিভূষণ আধুনিক সভ্যতার কল হইতে অত্যন্ত ভালমানুষটি হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিল,—ব্যবসায়েও সে সুবিধা করিতে পারিল না, দাম্পত্যেও তাহার তেমন সুযোগ ঘটে নাই।

ফণিভূষণের স্ত্রী মণিমালিকা, বিনা চেষ্টায় আদর, বিনা অশ্রুবর্ষণে ঢাকাইসাড়ি এবং বিনা দুর্জ্জয় মানে বাজুবন্ধ লাভ করিত। এইরূপে তাহার নারীপ্রকৃতি এবং সেই সঙ্গে তাহার ভালবাসা নিশ্চেষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সে কেবল গ্রহণ করিত, কিছু দিত না। তাহার নিরীহ এবং নির্ব্বোধ স্বামীটি মনে করিত দানই বুঝি প্রতিদান পাইবার উপায়। একেবারে উল্টা বুঝিয়াছিল আর কি!

ইহার ফল হইল এই যে স্বামীকে সে আপন ঢাকাইসাড়ি এবং বাজুবন্ধ যোগাইবার যন্ত্রস্বরূপ জ্ঞান করিত;—যন্ত্রটিও এমন সুচারু যে, কোন দিন তাহার চাকায় এক ফোঁটা তেল যোগাইবারও দরকার হয় নাই।

ফণিভূষণের জন্মস্থান ফুলবেড়ে, বাণিজ্যস্থান এখানে। কর্ম্মানুরোধে এখানেই তাহাকে অধিকাংশ সময় থাকিতে হইত। ফুলবেড়ের বাড়িতে তাহার মা ছিল না তবু পিসি মাসী ও অন্য পাঁচ জন ছিল। কিন্তু ফণিভূষণ পিসি মাসী ও অন্য পাঁচজনের উপকারার্থেই বিশেষ করিয়া সুন্দরী স্ত্রী ঘরে আনে নাই। সুতরাং স্ত্রীকে সে পাঁচ জনের কাছ থেকে আনিয়া এই কুঠিতে একলা নিজের কাছেই রাখিল। কিন্তু অন্যান্য অধিকার হইতে স্ত্রী অধিকারের প্রভেদ এই যে, স্ত্রীকে পাঁচজনের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একলা নিজের কাছে রাখিলেই যে সব সময় বেশী করিয়া পাওয়া যায় তাহা নহে।

স্ত্রীটি বেশী কথাবার্ত্তা কহিত না, পাড়াপ্রতিবেশিনীদের সঙ্গেও তাহার মেলামিশ বেশী ছিল না, ব্রত উপলক্ষ করিয়া দুটো ব্রাহ্মণকে খাওয়ানো, বা বৈষ্ণবীকে দুটো পয়সা ভিক্ষা দেওয়া কখনো তাহার দ্বারা ঘটে নাই। তাহার হাতে কোন জিনিষ নষ্ট হয় নাই; কেবল স্বামীর আদরগুলা ছাড়া আর যাহা পাইয়াছে সমস্তই জমা করিয়া রাখিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সে নিজের অপরূপ যৌবনশ্রী হইতেও যেন লেশমাত্র অপব্যয় ঘটিতে দেয় নাই। লোকে বলে, তাহার চব্বিশ বৎসর

বয়সের সময়ও তাহাকে চোদ্দ বৎসরের মত কাঁচা দেখিতে ছিল। যাহাদের হৃৎপিণ্ড বরফের পিণ্ড, যাহাদের বুকের মধ্যে ভালবাসার জ্বালাযন্ত্রণা স্থান পায় না তাহারা বোধ করি সুদীর্ঘকাল তাজা থাকে, তাহারা কৃপণের মত অন্তরে বাহিরে আপনাকে জমাইয়া রাখিতে পারে।

ঘনপল্লবিত অতিসতেজ লতার মত বিধাতা মণিমালিনীকে নিষ্ফলা করিয়া রাখিলেন, তাহাকে সন্তান হইতে বঞ্চিত করিলেন, অর্থাৎ তাহাকে এমন একটা কিছু দিলেন না যাহাকে সে আপন লোহার সিন্দুকের মণিমাণিক্য অপেক্ষা বেশী করিয়া বুঝিতে পারে, যাহা বসন্তপ্রভাতের নব সূর্য্যের মত আপন কোমল উত্তাপে তাহার হৃদয়ের বরফপিণ্ডটা গলাইয়া সংসারের উপর একটা স্নেহনির্ঝর বহাইয়া দেয়।

কিন্তু মণিমালিকা কাজকর্ম্মে মজবুৎ ছিল। কখনই সে লোকজন বেশী রাখে নাই। যে কাজ তাহার দ্বারা সাধ্য সে কাজে কেহ বেতন লইয়া যাইবে ইহা সে সহিতে পারিত না। সে কাহারো জন্য চিন্তা করিত না, কাহাকেও ভালবাসিত না, কেবল কাজ করিত এবং জমা করিত, এই জন্য তাহার রোগ শোক তাপ কিছুই ছিল না; অপরিমিত স্বাস্থ্য, অবিচলিত শান্তি এবং সঞ্চীয়মান সম্পদের মধ্যে সে সবলে বিরাজ করিত।

অধিকাংশ স্বামীর পক্ষে ইহাই যথেষ্ট; যথেষ্ট কেন, ইহা দুর্লভ। অঙ্গের মধ্যে কটিদেশ বলিয়া একটা ব্যাপার আছে তাহা কোমরে ব্যথা না হইলে মনে পড়ে না; —গৃহের আশ্রয়-স্বরূপে স্ত্রী যে একজন আছে ভালবাসার তাড়নায় তাহা পদে পদে এবং তাহা চব্বিশঘণ্টা অনুভব করার নাম ঘরকন্নার কোমরে ব্যথা। নিরতিশয় পাতিব্রত্যটা স্ত্রীর পক্ষে গৌরবের বিষয় কিন্তু পতির পক্ষে আরামের নহে, আমার ত এইরূপ মত।

মহাশয়, স্ত্রীর ভালবাসা ঠিক কতটা পাইলাম, ঠিক কতটুকু কম পড়িল অতিসূক্ষ্ম নিক্তি ধরিয়া তাহা অহরহ তৌল করিতে বসা কি পুরুষ মানুষের কর্ম্ম! স্ত্রী আপনার কাজ করুক্ আমি আপনার কাজ করি ঘরের মোটা হিসাবটা ত এই। অব্যক্তের মধ্যে কতটা ব্যক্ত, ভাবের মধ্যে কতটুকু অভাব, সুস্পষ্টের মধ্যেও কি পরিমাণ ইঙ্গিত, অণু পরমাণুর মধ্যে কতটা বিপুলতা,—ভালবাসাবাসির তত সুসূক্ষ্ম বোধশক্তি বিধাতা পুরুষ মানুষকে দেন নাই—দিবার প্রয়োজন হয় নাই। পুরুষ মানুষের তিল পরিমাণ অনুরাগ বিরাগের লক্ষণ লইয়া মেয়েরা বটে ওজন করিতে বসে। কথার মধ্য হইতে আসল ভঙ্গীটুকু, এবং ভঙ্গীর মধ্য হইতে আসল কথাটুকু চিরিয়া চিরিয়া চুনিয়া চুনিয়া বাহির করিতে থাকে। কারণ, পুরুষের ভালবাসাই তাহাদের বল, তাহাদের জীবনব্যবসায়ের মূলধন। ইহারই হাওয়ার গতিক লক্ষ্য করিয়া ঠিক সময়ে ঠিকমত পাল ঘুরাইতে পারিলে তবেই তাহাদের তরণী তরিয়া যায়। এই জন্যই বিধাতা ভালবাসামান যন্ত্রটি মেয়েদের হৃদয়ের মধ্যে ঝুলাইয়া দিয়াছেন, পুরুষদের দেন নাই।

কিন্তু বিধাতা যাহা দেন নাই সম্প্রতি পুরুষরা সেটি সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন। কবিরা বিধাতার উপর টেক্কা দিয়া এই দুর্লভ যন্ত্রটি, এই দিগ্‌দর্শন যন্ত্রশলাকাটি নির্ব্বিচারে সর্ব্বসাধারণের হস্তে দিয়াছেন। বিধাতার দোষ দিই না, তিনি মেয়ে পুরুষকে যথেষ্ট ভিন্ন করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু সভ্যতায় সে ভেদ আর থাকে না; এখন মেয়েও পুরুষ

হইতেছে, পুরুষও মেয়ে হইতেছে সুতরাং ঘরের মধ্য হইতে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিদায় লইল। এখন শুভ বিবাহের পূর্ব্বে, পুরুষকে বিবাহ করিতেছি, না, মেয়েকে বিবাহ করিতেছি তাহা কোন মতে নিশ্চয় করিতে না পারিয়া বরকন্যা উভয়েরই চিত্ত আশঙ্কায় দুরু দুরু করিতে থাকে।

আপনি বিরক্ত হইতেছেন। একলা পড়িয়া থাকি, স্ত্রীর নিকট হইতে নির্ব্বাসিত; দূর হইতে সংসারের অনেক নিগূঢ়তত্ত্ব মনের মধ্যে উদয় হয়।—এগুলো ছাত্রদের কাছে বলিবার বিষয় নয়, কথাপ্রসঙ্গে আপনাকে বলিয়া লইলাম, চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

মোট কথাটা এই যে, যদিচ রন্ধনে নুন্ কম হইত না এবং পানে চূণ বেশী হইত না তথাপি ফণিভূষণের হৃদয় "কি-যেন কি" নামক একটা দুঃসাধ্য উৎপাত অনুভব করিত। স্ত্রীর কোন দোষ ছিল না, কোন ভ্রম ছিল না, তবু স্বামীর কোন সুখ ছিল না। সে তাহার সহধর্ম্মিণীর শূন্য-গহ্বর হৃদয়লক্ষ্য করিয়া কেবলি হীরামুক্তার গহনা ঢালিত কিন্তু সে গুলা পড়িত গিয়া লোহার সিন্দুকে,—হৃদয় শূন্যই থাকিত। খুড়া দুর্গামোহন ভালবাসা এত সূক্ষ্ম করিয়া বুঝিত না, এত কাতর হইয়া চাহিত না, এত প্রচুর পরিমাণে দিত না অথচ খুড়ীর নিকট হইতে তাহা অজস্র পরিমাণে লাভ করিত। ব্যবসায়ী হইতে গেলে নব্যবাবু হইলে চলে না এবং স্বামী হইতে গেলে পুরুষ হওয়া দরকার, এ কথায় সন্দেহ মাত্র করিবে না।

ঠিক এই সময়ে শৃগালগুলা নিকটবর্ত্তী ঝোপের মধ্য হইতে অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। মাষ্টার মহাশয়ের গল্পস্রোতে মিনিট কয়েকের জন্য বাধা পড়িল। ঠিক মনে হইল সেই অন্ধকার সভাভূমিতে কৌতুকপ্রিয় শৃগালসম্প্রদায় ইস্কুলমাষ্টারের ব্যাখ্যাত দাম্পত্যনীতি শুনিয়াই হোক্ বা নবসভ্যতা-দুর্ব্বল ফণিভূষণের আচরণেই হোক রহিয়া রহিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিতে লাগিল। তাহাদের ভাবোচ্ছ্বাস নিবৃত্ত হইয়া জলস্থল দ্বিগুণতর নিস্তব্ধ হইলে পর মাষ্টার সন্ধ্যার অন্ধকারে তাঁহার বৃহৎ উজ্জ্বল চক্ষু পাকাইয়া গল্প বলিতে লাগিলেন।

ফণিভূষণের জটিল এবং বহুবিস্তৃত ব্যবসায়ে হঠাৎ একটা ফাঁড়া উপস্থিত হইল। ব্যাপারটা কি তাহা আমার মত অব্যবসায়ীর পক্ষে বোঝা এবং বোঝানো শক্ত। মোদ্দা কথা, সহসা কি কারণে বাজারে তাহার ক্রেডিট্ রাখা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। যদি কেবলমাত্র পাঁচটা দিনের জন্যও সে কোথাও হইতে লাখদেড়েক টাকা বাহির করিতে পারে, বাজারে একবার বিদ্যুতের মত এই টাকাটার চেহারা দেখাইয়া যায় তাহা হইলেই মুহূর্ত্তের মধ্যে সঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়া তাহার ব্যবসা পালভরে ছুটিয়া চলিতে পারে।

টাকাটার সুযোগ হইতেছিল না। স্থানীয় পরিচিত মহাজনদের নিকট হইতে ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে এরূপ জনরব উঠিলে তাহার ব্যবসায়ের দ্বিগুণ অনিষ্ট হইবে আশঙ্কায় তাহাকে অপরিচিত স্থানে ঋণের চেষ্টা দেখিতে হইতেছিল। সেখানে উপযুক্ত বন্ধক না রাখিলে চলে না।

গহনা বন্ধক রাখিলে লেখাপড়া এবং বিলম্বের কারণ থাকে না, চট্‌পট্ এবং সহজেই কাজ হইয়া যায়।

ফণিভূষণ একবার স্ত্রীর কাছে গেল। নিজের স্ত্রীর কাছে স্বামী যেমন সহজভাবে যাইতে পারে ফণিভূষণের তেমন করিয়া

যাইবার ক্ষমতা ছিল না। সে দুর্ভাগ্যক্রমে নিজের স্ত্রীকে ভালবাসিত যেমন ভালবাসা কাব্যের নায়ক কাব্যের নায়িকাকে বাসে; যে ভালবাসায় সন্তর্পণে পদক্ষেপ করিতে হয় এবং সকল কথা মুখে ফুটিয়া বাহির হইতে পারে না,—যে ভালবাসার প্রবল আকর্ষণ সূর্য্য এবং পৃথিবীর আকর্ষণের ন্যায় মাঝখানে একটা অতিদূর ব্যবধান রাখিয়া দেয়।

তথাপি তেমন-তেমন দায়ে পড়িলে কাব্যের নায়ককেও প্রেয়সীর নিকট হুণ্ডি এবং বন্ধক এবং হ্যাণ্ডনোটের প্রসঙ্গ তুলিতে হয়; কিন্তু সুর বাধিয়া যায় বাক্যস্খলন হয়, এমন সকল পরিষ্কার কাজের কথার মধ্যেও ভাবের জড়িমা ও বেদনার বেপথু আসিয়া উপস্থিত হয়। হতভাগ্য ফণিভূষণ স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিল না, ওগো, আমার দরকার হইয়াছে তোমার গহনাগুলো দাও!

কথাটা বলিল অথচ অত্যন্ত দুর্ব্বলভাবে বলিল। মণিমালিকা যখন কঠিন মুখ করিয়া হাঁ না কিছুই উত্তর করিল না তখন সে একটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর আঘাত পাইল কিন্তু আঘাত করিল না। কারণ, পুরুষোচিত বর্ব্বরতা লেশমাত্র তাহার ছিল না। যেখানে জোর করিয়া কাড়িয়া লওয়া উচিত ছিল সেখানে সে আপনার আন্তরিক ক্ষোভ পর্য্যন্ত চাপিয়া গেল। যেখানে ভালবাসার একমাত্র অধিকার, সর্ব্বনাশ হইয়া গেলেও সেখানে বলকে প্রবেশ করিতে দিবে না এই তাহার মনের ভাব। এ সম্বন্ধে তাহাকে যদি ভর্ৎসনা করা যাইত তবে সম্ভবতঃ সে এইরূপ সূক্ষ্ম তর্ক করিত যে, বাজারে যদি অন্যায় কারণেও আমার ক্রেডিট্ না থাকে তবে তাই বলিয়া বাজার লুটিয়া লইবার অধিকার আমার নাই, স্ত্রী যদি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিশ্বাস করিয়া আমাকে গহনা না দেয় তবে তাহা আমি কাড়িয়া লইতে পারি না। বাজারে যেমন ক্রেডিট্, ঘরে তেমনি ভালবাসা, বাহুবল কেবলমাত্র রণক্ষেত্রে! পদে পদে এইরূপ অত্যন্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তর্কসূত্র কাটিবার জন্যই কি বিধাতা পুরুষমানুষকে এরূপ উদার, এরূপ প্রবল, বৃহদাকার করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন? তাহার কি, বসিয়া বসিয়া অত্যন্ত সুকুমার চিত্তবৃত্তিকে নিরতিশয় তনিমার সহিত অনুভব করিবার অবকাশ আছে, না ইহা তাহাকে শোভা পায়?

যাহা হউক আপন উন্নত হৃদয়বৃত্তির গর্ব্বে স্ত্রীর গহনা স্পর্শ না করিয়া ফণিভূষণ অন্য উপায়ে অর্থ সংগ্রহের জন্য কলিকাতায় চলিয়া গেল।

সংসারে সাধারণতঃ স্ত্রীকে স্বামী যতটা চেনে স্বামীকে স্ত্রী তাহার চেয়ে অনেক বেশী চেনে; কিন্তু স্বামীর প্রকৃতি যদি অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয় তবে স্ত্রীর অনুবীক্ষণে তাহার সমস্তটা ধরা পড়ে না। আমাদের ফণিভূষণকে ফণিভূষণের স্ত্রী ঠিক বুঝিত না। স্ত্রীলোকের অশিক্ষিতপটুত্ব যে সকল বহুকালাগত প্রাচীন সংস্কারের দ্বারা গঠিত অত্যন্ত নব্য পুরুষেরা তাহার বাহিরে গিয়া পড়ে। ইহারা এক রকমের! ইহারা মেয়েমানুষের মতই রহস্যময় হইয়া উঠিতেছে। সাধারণ পুরুষমানুষের যে ক'টা বড় বড় কোটা আছে, অর্থাৎ কেহ বা বর্ব্বর, কেহ বা নির্ব্বোধ, কেহ বা অন্ধ, তাহার মধ্যে কোনটাতেই ইহাদিগকে ঠিকমত স্থাপন করা যায় না।

সুতরাং মণিমালিকা পরামর্শের জন্য তাহার মন্ত্রীকে ডাকিল। গ্রামসম্পর্কে অথবা দূরসম্পর্কে মণিমালিকার এক ভাই ফণিভূষণের কুঠিতে গোমস্তার অধীনে কাজ করিত। তাহার এমন স্বভাব ছিল না যে কাজের দ্বারা

উন্নতি লাভ করে,কোন একটা উপলক্ষ করিয়া আত্মীয়তার জোরে বেতন এবং বেতনেরও বেশী কিছু কিছু সংগ্রহ করিত।

মণিমালিকা তাহাকে ডাকিয়া সকল কথা বলিল ; জিজ্ঞাসা করিল, এখন পরামর্শ কি ?

সে অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মত মাথা নাড়িল,—অর্থাৎ গতিক ভাল নহে। বুদ্ধিমানেরা কখনই গতিক ভাল দেখে না। সে কহিল, বাবু কখনই টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবেন না, শেষকালে তোমার এ গহনাতে টান পড়িবেই।

মণিমালিকা মানুষকে যেরূপ জানিত তাহাতে বুঝিল এইরূপ হওয়াই সম্ভব এবং ইহাই সঙ্গত। তাহার দুশ্চিন্তা সুতীব্র হইয়া উঠিল। সংসারে তাহার সন্তান নাই ; স্বামী আছে বটে কিন্তু স্বামীর অস্তিত্ব সে অন্তরের মধ্যে অনুভব করে না,- অতএব যাহা তাহার একমাত্র যত্নের ধন, যাহা তাহার ছেলের মত ক্রমে ক্রমে বৎসরে বৎসরে বাড়িয়া উঠিতেছে, যাহা রূপকমাত্র নহে যাহা প্রকৃতই সোণা,যাহা মাণিক ; যাহা বক্ষের,যাহা কণ্ঠের,যাহা মাথার, সেই অনেক দিনের অনেক সাধের সামগ্রী এক মুহূর্ত্তেই ব্যবসায়ের অতলস্পর্শ গহ্বরের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে ইহা কল্পনা করিয়া তাহার সর্ব্ব-শরীর হিম হইয়া আসিল। সে কহিল, কি করা যায় ?

মধুসূদন কহিল গহনাগুলো লইয়া এইবেলা বাপের বাড়ি চল ! গহনার কিছু অংশ; এমন কি, অধিকাংশই যে তাহার ভাগে আসিবে বুদ্ধিমান মধু মনে মনে তাহার উপায় ঠাহরাইল।

মণিমালিকা এ প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল।

আষাঢ়শেষের সন্ধ্যাবেলায় এই ঘাটের ধারে একখানি নৌকা আসিয়া লাগিল। ঘনমেঘাচ্ছন্ন প্রত্যূষে নিবিড় অন্ধকারে নিদ্রাহীন ভেকের কলরবের মধ্যে একখানি মোটা চাদরে পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত আবৃত করিয়া মণিমালিকা নৌকায় উঠিল। মধুসূদন নৌকার মধ্য হইতে জাগিয়া উঠিয়া কহিল, গহনার বাক্সটা আমার কাছে দাও ! মণি কহিল, সে পরে হইবে, এখন নৌকা খুলিয়া দাও !

নৌকা খুলিয়া দিল, খরস্রোতে হুহু করিয়া ভাসিয়া গেল।

মণিমালিকা সমস্ত রাত ধরিয়া একটি একটি করিয়া তাহার সমস্ত গহনা সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া পরিয়াছে, মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত আর স্থান ছিল না। বাক্সে করিয়া গহনা লইলে সে বাক্স হাতছাড়া হইয়া যাইতে পারে এ আশঙ্কা তাহার ছিল। কিন্তু গায়ে পরিয়া গেলে তাহাকে না বধ করিয়া সে গহনা কেহ লইতে পারিবে না।

সঙ্গে কোন প্রকার বাক্স না দেখিয়া মধুসূদন কিছু বুঝিতে পারিল না—মোটা চাদরের নীচে যে মণিমালিকার দেহ-প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে দেহ-প্রাণের অধিক গহনাগুলি আচ্ছন্ন ছিল তাহা সে অনুমান করিতে পারে নাই। মণিমালিকা ফণিভূষণকে বুঝিত না বটে কিন্তু মধুসূদনকে চিনিতে তাহার বাকি ছিল না।

মধুসূদন গোমস্তার কাছে একখানা চিঠি রাখিয়া গেল যে সে কর্ত্রীকে পিত্রালয়ে পৌঁছাইয়া দিতে রওনা হইল। গোমস্তা ফণিভূষণের বাপের আমলের ; সে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া হ্রস্ব ইকারকে দীর্ঘ ঈকার এবং দন্ত্য স কে তালব্য শ করিয়া মনিবকে এক পত্র লিখিল,—ভাল বাঙ্গালা লিখিল না কিন্তু স্ত্রীকে অযথা প্রশ্রয় দেওয়া যে পুরুষোচিত নহে এ কথাটা ঠিক মতই প্রকাশ করিল।

ফণিভূষণ মণিমালিকার মনের কথাটা ঠিক

বুঝিল। তাহার মনে এই আঘাতটা প্রবল হইল যে, আমি গুরুতর ক্ষতি সম্ভাবনাসত্ত্বেও স্ত্রীর অলঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় অর্থ-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি—তবু আমাকে আজিও চিনিল না!

নিজের প্রতি যে নিদারুণ অন্যায়ে ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত ছিল, ফণিভূষণ তাহাতে ক্ষুব্ধ হইল মাত্র! পুরুষমানুষ বিধাতার ন্যায়দণ্ড; তাহার মধ্যে তিনি বজ্রাগ্নি নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন, নিজের প্রতি অথবা অপরের প্রতি অন্যায়ের সংঘর্ষে সে যদি দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতে না পারে, তবে ধিক্ তাহাকে! পুরুষমানুষ দাবাগ্নির মত রাগিয়া উঠিবে সামান্য কারণে, আর স্ত্রী লোক শ্রাবণ-মেঘের মত অশ্রুপাত করিতে থাকিবে বিনা উপলক্ষে, বিধাতা এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন—কিন্তু সে আর টেঁকে না!

ফণিভূষণ অপরাধিনী স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া মনে মনে কহিল এই যদি তোমার বিচার হয় তবে এইরূপ হোক, আমার কর্ত্তব্য আমি করিয়া যাইব!—আরো শতাব্দী পাঁচ ছয় পরে যখন কেবল অধ্যাত্মশক্তিতে জগৎ চলিবে তখন যাহার জন্মগ্রহণ করা উচিত ছিল সেই ভাবি-যুগের ফণিভূষণ উনবিংশ শতাব্দীতে অবতীর্ণ হইয়া সেই আদি যুগের স্ত্রীলোককে বিবাহ করিয়া বসিয়াছে শাস্ত্রে যাহার বুদ্ধিকে প্রলয়-ঙ্করী বলিয়া থাকে। ফণিভূষণ স্ত্রীকে এক অক্ষর পত্র লিখিল না এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল এসম্বন্ধে স্ত্রীর কাছে কখনো সে কোন কথার উল্লেখ করিবে না। কি ভীষণ দণ্ডবিধি।

দিনদশেক পরে কোনমতে যথোপযুক্ত টাকা সংগ্রহ করিয়া বিপদুত্তীর্ণ ফণিভূষণ বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি জানিতেন বাপের বাড়িতে গহনাপত্র রাখিয়া এতদিনে মণিমালিকা ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সেদিনকার দীন প্রার্থীভাব ত্যাগ করিয়া কৃত-কার্য্য কৃতিপুরুষ স্ত্রীর কাছে দেখা দিলে মণি যে কিরূপ লজ্জিত এবং অনাবশ্যক প্রয়াসের জন্য কিঞ্চিৎ অনুতপ্ত হইবে ইহাই কল্পনা করিতে করিতে ফণিভূষণ অন্তঃপুরে শয়নাগারের দ্বারের কাছে উপনীত হইল।

দেখিল দ্বার রুদ্ধ। তালা ভাঙ্গিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল ঘর শূন্য। কোণে লোহার সিন্দুক খোলা পড়িয়া আছে তাহাতে গহনা-পত্রের চিহ্নমাত্র নাই।

স্বামীর বুকের মধ্যে ধক্ করিয়া একটা ঘা লাগিল!—মনে হইল সংসার উদ্দেশ্যহীন এবং ভালবাসা ও বাণিজ্যব্যবসা সমস্তই ব্যর্থ। আমরা এই সংসারপিঞ্জরের প্রত্যেক শলাকায় উপরে প্রাণপাত করিতে বসিয়াছি, কিন্তু তাহার ভিতরে পাখী নাই, রাখিলেও সে থাকে না—তবে অহরহ হৃদয়খণির রক্তমাণিক ও অশ্রু-জলের মুক্তমালা দিয়া কি সাজাইতে বসিয়াছি! এই চিরজীবনের সর্ব্বস্বজড়ানো শূন্য সংসার খাঁচাটা ফণিভূষণ মনে মনে পদাঘাত করিয়া অতি দূরে ফেলিয়া দিল।

ফণিভূষণ স্ত্রীর সম্বন্ধে কোনরূপ চেষ্টা করিতে চাহিল না। মনে করিল, যদি ইচ্ছা হয় ত ফিরিয়া আসিবে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গোমস্তা আসিয়া কহিল, চুপ করিয়া থাকিলে কি হইবে—কর্ত্রীবধূর খবর লওয়া চাইত। এই বলিয়া মণি-মালিকার পিত্রালয়ে লোক পাঠাইয়া দিল। সেখান হইতে খবর আসিল মণি অথবা মধু এ পর্য্যন্ত সেখানে পৌঁছে নাই।

তখন চারিদিকে খোঁজ পড়িয়া গেল। নদীতীরে তীরে প্রশ্ন করিতে করিতে লোক ছুটিল। মধুর তল্লাস করিতে পুলিসে খবর দেওয়া হইল—কোন্ নৌকা, নৌকার মাঝি

কে, কোন্ পথে তাহারা কোথায় চলিয়া গেল তাহার কোন সন্ধান মিলিল না।

সর্ব্বপ্রকার আশা ছাড়িয়া দিয়া একদিন ফণিভূষণ সন্ধ্যাকালে তাহার পরিত্যক্ত শয়ন-গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। সে দিন জন্মাষ্টমী। সকাল হইতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে। উৎসব উপলক্ষে গ্রামের প্রান্তরে একটা মেলা বসে, সেখানে আটচালার মধ্যে বারোয়ারির যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। মুষল-ধারায় বৃষ্টিপাত শব্দে যাত্রার গানের সুর মৃদুতর হইয়া কাণে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। ঐ যে বাতায়নের উপরে শিথিলকব্জা দরজাটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে ঐখানে ফণিভূষণ অন্ধকারে একলা বসিয়াছিল,—বাদ্‌লার হাওয়া, বৃষ্টির ছাঁট এবং যাত্রার গান ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল, কোন খেয়ালই ছিল না। ঘরের দেওয়ালে আর্টষ্টুডিয়ো-রচিত লক্ষ্মী সরস্বতীর এক যোড়া ছবি টাঙ্গানো; আল্‌নার উপরে একটি গামছা ও তোয়ালে, একটি চুড়িপেড়ে ও একটি ডুরে শাড়ি, সদ্য ব্যবহারযোগ্যভাবে পাকানো ঝুলানো রহিয়াছে; ঘরের কোণে টিপাইয়ের উপরে পিতলের ডিবায় মণিমালিকার স্বহস্তরচিত গুটিকতক পান শুষ্ক হইয়া পড়িয়া আছে, কাচের আলমারির মধ্যে তাহার আবাল্যসঞ্চিত চীনের পুতুল, এসেন্সের শিশি, রঙীন্ কাঁচের ডিক্যাণ্টার, সৌখীন তাস, সমুদ্রের বড় বড় কড়ি, এমন কি, শূন্য সাবানের বাক্সগুলি পর্য্যন্ত অতি পরিপাটি করিয়া সাজানো; যে অতি ক্ষুদ্র গোলকবিশিষ্ট ছোট সখের কেরোসিন্ ল্যাম্প সে নিজে প্রতিদিন প্রস্তুত করিয়া স্বহস্তে জ্বালাইয়া কুলুঙ্গিটির উপর রাখিয়া দিত তাহা যথাস্থানে নির্ব্বাপিত এবং ম্লান হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, কেবল সেই ক্ষুদ্র ল্যাম্পটি এই শয়নকক্ষে মণিমালিকার শেষ মুহূর্ত্তের নিরুত্তর সাক্ষী; সমস্ত শূন্য করিয়া যে চলিয়া যায়, সেও এত চিহ্ন, এত ইতিহাস সমস্ত জড় সামগ্রীর উপর আপন সজীব হৃদয়ের এত স্নেহ-স্বাক্ষর রাখিয়া যায়! এস মণিমালিকা এস, তোমার দীপটি তুমি জ্বালাও তোমার ঘরটি তুমি আলো কর, আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তোমার যত্নকুঞ্চিত সাড়িটি তুমি পর, তোমার জিনিষগুলি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তোমার কাছ হইতে কেহ কিছু প্রত্যাশা করে না, কেবল তুমি উপস্থিত হইবামাত্র তোমার অক্ষয় যৌবন তোমার অম্লান সৌন্দর্য্য লইয়া চারিদিকের এই সকল বিপুল বিক্ষিপ্ত অনাথ জড় সামগ্রীরাশিকে একটি প্রাণের ঐক্যে সঞ্জীবিত করিয়া রাখ। এই সকল মূক প্রাণহীন পদার্থের অব্যক্ত ক্রন্দন গৃহকে শ্মশান করিয়া তুলিয়াছে!

গভীর রাত্রে কখন্ একসময়ে বৃষ্টির ধারা এবং যাত্রার গান থামিয়া গেছে। ফণিভূষণ জানালার কাছে যেমন বসিয়া ছিল তেমনি বসিয়া আছে। বাতায়নের বাহিরে এমন একটা জগদ্ব্যাপী নীরন্ধ্র অন্ধকার যে, তাহার মনে হইতেছিল যেন সম্মুখে যমালয়ের একটা অভ্রভেদী সিংহদ্বার,—যেন এইখানে দাঁড়াইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকিলে চিরকালের লুপ্ত জিনিস অচিরকালের মত একবার দেখা দিতেও পারে। এই মসীকৃষ্ণ মৃত্যুর পটে এই অতি কঠিন নিকষপাষাণের উপর সেই হারাণো সোণার একটা রেখা পড়িতেও পারে!

এমন সময় একটা ঠক্‌ঠক্ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গহনার ঝম্ ঝম্ শব্দ শোনা গেল। ঠিক মনে হইল শব্দটা নদীর ঘাটের উপর হইতে উঠিয়া আসিতেছে। তখন নদীর জল এবং রাত্রির অন্ধকার এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছিল।

পুলকিত ফণিভূষণ দুই উৎসুক চক্ষু দিয়া অন্ধকার ঠেলিয়া ঠেলিয়া ফুঁড়িয়া ফুঁড়িয়া দেখিতে চেষ্টা করিতে লাগিল,—স্ফীত হৃদয় এবং ব্যগ্র দৃষ্টি ব্যথিত হইয়া উঠিল, কিছুই দেখা গেল না। দেখিবার চেষ্টা যতই একান্ত বাড়িয়া উঠিল অন্ধকার ততই যেন ঘনীভূত, জগৎ ততই যেন ছায়াবৎ হইয়া আসিল। প্রকৃতি নিশিথরাত্রে আপন মৃত্যুনিকেতনের গবাক্ষদ্বারে অকস্মাৎ অতিথি সমাগম দেখিয়া দ্রুত হস্তে আরো একটা বেশী করিয়া পর্দ্দা ফেলিয়া দিল।

শব্দটা ক্রমে ঘাটের সর্ব্বোচ্চ সোপানতল ছাড়িয়া বাড়ির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বাড়ির সম্মুখে আসিয়া থামিল। দেউড়ি বন্ধ করিয়া দরোয়ান যাত্রা শুনিতে গিয়াছিল। তখন সেই রুদ্ধ দ্বারের উপর ঠক্‌ঠক্ ঝম্‌ঝম্ করিয়া ঘা পড়িতে লাগিল। যেন অলঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে একটা শক্ত জিনিষ দ্বারের উপর আসিয়া পড়িতেছে। ফণিভূষণ আর থাকিতে পারিল না। নির্ব্বাণদীপ কক্ষগুলি পার হইয়া অন্ধকার সিঁড়ি দিয়া নামিয়া রুদ্ধদ্বারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। দ্বার বাহির হইতে তালাবন্ধ ছিল। ফণিভূষণ প্রাণপণে দুই হাতে সেই দ্বার নাড়া দিতেই সেই সংঘাতে এবং তাহার শব্দে চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। দেখিতে পাইল সে নিদ্রিত অবস্থায় উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিয়াছিল। তাহার সর্ব্বশরীর ঘর্ম্মাক্ত, হাতপা বরফের মত ঠাণ্ডা এবং হৃৎপিণ্ড নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের মত স্ফুরিত হইতেছে। স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দেখিল বাহিরে আর কোন শব্দ নাই, কেবল শ্রাবণের ধারা তখনও ঝরঝর শব্দে পড়িতেছিল এবং তাহারি সহিত মিশ্রিত হইয়া শুনা যাইতেছিল যাত্রার ছেলেরা ভোরের সুরে তান ধরিয়াছে।

যদিচ ব্যাপারটা সমস্তই স্বপ্ন কিন্তু এত অধিক নিকটবর্ত্তী এবং সত্যবৎ যে ফণিভূষণের মনে হইল যেন অতি অল্পের জন্যই সে তাহার অসম্ভব আকাঙ্ক্ষার আশ্চর্য্য সফলতা হইতে বঞ্চিত হইল। সেই জলপতন শব্দের সহিত দূরাগত ভৈরবীর তান তাহাকে বলিতে লাগিল —এই জাগরণই স্বপ্ন, এই জগৎই মিথ্যা।

তাহার পরদিনেও যাত্রা ছিল এবং দরোয়ানেরও ছুটি ছিল। ফণিভূষণ হুকুম দিল আজ সমস্ত রাত্রি যেন দেউড়ির দরোজা খোলা থাকে। দরোয়ান কহিল মেলা উপলক্ষে নানা দেশ হইতে নানা প্রকার লোক আসিয়াছে—দরোজা খোলা রাখিতে সাহস হয় না। ফণিভূষণ সে কথা মানিল না। দরোয়ান কহিল, তবে আমি সমস্ত রাত্রি হাজির থাকিয়া পাহারা দিব। ফণিভূষণ কহিল, সে হইবে না, তোমাকে যাত্রা শুনিতে যাইতেই হইবে। দরোয়ান আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় দীপ নিভাইয়া দিয়া ফণিভূষণ তাহার শয়নকক্ষের সেই বাতায়নে আসিয়া বসিল। আকাশে অবৃষ্টিসংরব্ধ মেঘ এবং চতুর্দ্দিকে কোন একটি অনির্দ্দিষ্ট আসন্ন প্রতীক্ষার নিস্তব্ধতা। ভেকের অশ্রান্ত কলরব এবং যাত্রার গানের চীৎকারধ্বনি সেই স্তব্ধতা ভাঙ্গিতে পারে নাই কেবল তাহার মধ্যে একটা অসঙ্গত অদ্ভুতরস বিস্তার করিতেছিল।

অনেক রাত্রে এক সময়ে ভেক এবং ঝিল্লি এবং যাত্রার দলের ছেলেরা চুপ করিয়া গেল—এবং রাত্রের অন্ধকারের উপরে আরো একটা কিসের অন্ধকার আসিয়া পড়িল। বুঝা গেল এইবার সময় আসিয়াছে।

পূর্ব্ব দিনের মত নদীর ঘাটে একটা ঠক্‌ঠক্ এবং ঝম্‌ঝম্ শব্দ উঠিল। কিন্তু ফণিভূষণ

সে দিকে চোখ ফিরাইল না। তাহার ভয় হইল পাছে অধীর ইচ্ছা এবং অশান্ত চেষ্টায় তাহার সকল ইচ্ছা সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। পাছে আগ্রহের বেগ তাহার ইন্দ্রিয়-শক্তিকে অভিভূত করিয়া ফেলে। সে আপনার সকল চেষ্টা নিজের মনকে দমন করিবার জন্য প্রয়োগ করিল—কাঠের মূর্ত্তির মত শক্ত হইয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

শিঞ্জিত শব্দ আজ ঘাট হইতে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া মুক্ত দ্বারের মধ্যে প্রবেশ করিল। শুনা গেল অন্দর মহলের গোলসিঁড়ি দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে শব্দ উপরে উঠিতেছে। ফণিভূষণ আপনাকে আর দমন করিতে পারে না, তাহার বক্ষ তুফানের ডিঙ্গির মত আছাড় খাইতে লাগিল এবং নিশ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল। গোল সিঁড়ি শেষ করিয়া সেই শব্দ বারান্দা দিয়া ক্রমে ঘরের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। অবশেষে ঠিক সেই শয়নকক্ষের দ্বারের কাছে আসিয়া খট্ খট্ এবং ঝম্‌ঝম্ থামিয়া গেল। কেবল চৌকাঠটি পার হইলেই হয়।

ফণিভূষণ আর থাকিতে পারিল না। তাহার রুদ্ধ আবেগ এক মুহূর্ত্তে প্রবলবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—সে বিদ্যুদ্বেগে চৌকি হইতে উঠিয়া কাঁদিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—মণি! অমনি সচকিত হইয়া জাগিয়া দেখিল তাহারই সেই ব্যাকুল কণ্ঠের চীৎকারে ঘরের শাসিগুলা পর্য্যন্ত ধ্বনিত স্পন্দিত হইতেছে। বাহিরে সেই ভেকের কলরব এবং যাত্রার ক্লিষ্ট কণ্ঠের গান।

ফণিভূষণ নিজের ললাটে সবলে আঘাত করিল।

পরদিন মেলা ভাঙ্গিয়া গেছে। দোকানী এবং যাত্রার দল চলিয়া গেল। ফণিভূষণ হুকুম দিল সেদিন সন্ধ্যার পর তাহার বাড়িতে সে নিজে ছাড়া আর কেহই থাকিবে না। চাকররা স্থির করিল বাবু তান্ত্রিকমতে একটা কি সাধনে নিযুক্ত আছেন। ফণিভূষণ সমস্ত দিন উপবাস করিয়া রহিল।

জনশূন্য বাড়িতে সন্ধ্যাবেলায় ফণিভূষণ বাতায়নতলে আসিয়া বসিল। সে দিন আকাশের স্থানে স্থানে মেঘ ছিল না, এবং ধৌত নির্ম্মল বাতাসের মধ্য দিয়া নক্ষত্রগুলিকে অত্যুজ্জ্বল দেখাইতেছিল। কৃষ্ণপক্ষ দশমীর চাঁদ উঠিতে অনেক বিলম্ব আছে। মেলা উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়াতে পরিপূর্ণ নদীতে নৌকামাত্রই ছিল না এবং উৎসবজাগরণক্লান্ত গ্রাম দুইরাত্রি জাগরণের পর আজ গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন।

ফণিভূষণ একখানা চৌকিতে বসিয়া চৌকির পিঠের উপর মাথা উর্দ্ধমুখ করিয়া তারা দেখিতেছিল,—ভাবিতেছিল একদিন যখন তাহার বয়স ছিল উনিশ, যখন কলিকাতার কলেজে পড়িত, যখন সন্ধ্যাকালে গোলদীঘির তৃণশয়নে চিৎ হইয়া হাতের উপরে মাথা রাখিয়া ঐ অনন্তকালের তারাগুলির দিকে চাহিয়া থাকিত এবং মনে পড়িত তাহার সেই নদীকূলবর্ত্তী শ্বশুরবাড়ির একটি বিরলকক্ষে চোদ্দবৎসরের বয়ঃসন্ধিগতা মণির সেই উজ্জ্বল কাঁচা মুখখানি, তখনকার সেই বিরহ কি সুমধুর, তখনকার সেই তারাগুলির অলোকস্পন্দন হৃদয়ের যৌবনস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে কি বিচিত্র "বসন্তরাগেণ যতিতালাভ্যাং" বাজিয়া বাজিয়া উঠিত! আজ সেই একই তারা আগুন দিয়া আকাশে মোহমুদ্গারের শ্লোক কয়টা লিখিয়া রাখিয়াছে, বলিতেছে সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ!

দেখিতে দেখিতে তারাগুলি সমস্ত লুপ্ত

হইয়া গেল। আকাশ হইতে একখানা অন্ধকার নামিয়া এবং পৃথিবী হইতে একখানা অন্ধকার উঠিয়া চোখের উপরকার এবং নীচেকার পল্লবের মত একত্র আসিয়া মিলিত হইল। আজ ফণিভূষণের চিত্ত শান্ত ছিল। সে নিশ্চয় জানিত আজ তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, সাধকের নিকট মৃত্যু আপন রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া দিবে।

পূর্ব্বরাত্রির মত সেই শব্দ নদীর জলের মধ্য হইতে ঘাটের সোপানের উপর উঠিল। ফণিভূষণ দুই চক্ষু নিমীলিত করিয়া স্থির দৃঢ়চিত্তে ধ্যানাসনে বসিল। শব্দ দ্বারীশূন্য দেউড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল,—শব্দ জনশূন্য অন্তঃপুরের গোল সিঁড়ির মধ্য দিয়া ঘুরিয়া উঠিতে লাগিল শব্দ দীর্ঘ বারান্দা পার হইল,—এবং শয়নকক্ষের দ্বারের কাছে আসিয়া ক্ষণকালের জন্য থামিল।

ফণিভূষণের হৃদয় ব্যাকুল এবং সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, কিন্তু আজ সে চক্ষু খুলিল না। শব্দ চৌকাঠ পার হইয়া অন্ধকার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আলনায়,যেখানে শাড়ি কোঁচানো আছে, কুলুঙ্গিতে, যেখানে কেরোসিনের দীপ দাঁড়াইয়া, টিপাইয়ের ধারে যেখানে পানের বাটায় পান শুষ্ক এবং সেই বিচিত্র সামগ্রীপূর্ণ আলমারীর কাছে, প্রত্যেক জায়গায় এক একবার করিয়া দাঁড়াইয়া অবশেষে শব্দটা ফণিভূষণের অত্যন্ত কাছে আসিয়া থামিল।

তখন ফণিভূষণ চোখ মেলিল, এবং দেখিল যে নবোদিত দশমীর চন্দ্রালোক আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, এবং তাহার চৌকির ঠিক সম্মুখে একটি কঙ্কাল দাঁড়াইয়া। সেই কঙ্কালের আট আঙুলে আংটি, করতলে রতনচক্র, প্রকোষ্ঠে বালা, বাহুতে বাজুবন্ধ, গলায় কণ্ঠী, মাথায় সিঁথি, তাহার আপাদমস্তক অস্থিতে অস্থিতে এক একটি আভরণ সোণায় হীরায় ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। অলঙ্কারগুলি ঢিলা ঢলঢল করিতেছে কিন্তু অঙ্গ হইতে খসিয়া পড়িতেছে না। সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর, তাহার অস্থিময় মুখে তাহার দুই চক্ষু ছিল সজীব;—সেই কালো তারা, সেই ঘন দীর্ঘপক্ষ্ম, সেই সজল উজ্জ্বলতা,সেই অবিচলিত দৃঢ় শান্ত দৃষ্টি। আজ আঠারো বৎসর পূর্ব্বে একদিন আলোকিত সভাগৃহে নহবতের সাহানা আলাপের মধ্যে ফণিভূষণ যে দুটি আয়তসুন্দর কালো কালো ঢলঢল চোখ শুভদৃষ্টিতে প্রথম দেখিয়াছিল সেই দুটি চক্ষুই আজ শ্রাবণের অর্দ্ধরাত্রে কৃষ্ণপক্ষ দশমীর চন্দ্রকিরণে দেখিল—দেখিয়া তাহার সর্ব্বশরীরের রক্ত হিম হইয়া আসিল। প্রাণপণে দুই চক্ষু বুজিতে চেষ্টা করিল, কিছুতেই পারিল না; তাহার চক্ষু মৃত মানুষের চক্ষুর মত নির্ণিমেষ চাহিয়া রহিল।

তখন সেই কঙ্কাল স্তম্ভিত ফণিভূষণের মুখের দিকে তাহার দৃষ্টি স্থির রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া নীরবে অঙ্গুলি সঙ্কেতে ডাকিল। তাহার চার আঙুলের অস্থিতে হীরার আংটি ঝক্‌ঝক্ করিয়া উঠিল।

ফণিভূষণ মূঢ়ের মত উঠিয়া দাঁড়াইল। কঙ্কাল দ্বারের অভিমুখে চলিল; হাড়েতে হাড়েতে গহনায় গহনায় কঠিন শব্দ হইতে লাগিল। ফণিভূষণ পাশবদ্ধ পুত্তলীর মত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। বারান্দা পার হইল, নিবিড় অন্ধকার গোল সিঁড়ি ঘুরিয়া ঘুরিয়া খট্‌খট্ ঠক্‌ঠক্ ঝম্‌ঝম্ করিতে করিতে নীচে উত্তীর্ণ হইল। নীচেকার বারান্দা পার হইয়া জনশূন্য দীপহীন দেউড়িতে প্রবেশ করিল; অবশেষে দেউড়ি পার হইয়া ইটের খোয়া দেওয়া বাগানের রাস্তায়

বাহির হইয়া পড়িল। খোয়াগুলি অস্থিপাতে কড় কড় করিতে লাগিল। সেখানে ক্ষীণ জ্যোৎস্না ঘন ডালপালার মধ্যে আটক পাইয়া কোথাও নিষ্কৃতির পথ পাইতেছিল না; সেই বর্ষার নিবিড়গন্ধ অন্ধকার ছায়াপথে জোনাকির ঝাঁকের মধ্য দিয়া উভয়ে নদীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ঘাটের যে ধাপ বাহিয়া শব্দ উপরে উঠিয়াছিল সেই ধাপ দিয়া অলঙ্কৃত কঙ্কাল তাহার আন্দোলনহীন ঋজুগতিতে কঠিন শব্দ করিয়া এক পা এক পা নামিতে লাগিল। পরিপূর্ণ বর্ষানদীর প্রবল-স্রোত জলের উপর জ্যোৎস্নার একটি দীর্ঘরেখা ঝিক্‌ঝিক্ করিতেছে।

কঙ্কাল নদীতে নামিল, অনুবর্ত্তী ফণিভূষণও জলে পা দিল। জলস্পর্শ করিবামাত্র ফণি-ভূষণের তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। সম্মুখে আর পথপ্রদর্শক নাই—কেবল নদীর পরপারে গাছগুলা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া এবং তাহাদের মাথার উপরে খণ্ড চাঁদ শান্ত অবাক্‌ভাবে চাহিয়া আছে। আপাদমস্তক বারংবার শিহ-রিয়া শিহরিয়া স্খলিতপদে ফণিভূষণ স্রোতের মধ্যে পড়িয়া গেল। যদিও সাঁতার জানিত কিন্তু স্নায়ু তাহার বশ মানিল না,—স্বপ্নের মধ্য হইতে মুহূর্ত্তমাত্র জাগরণের প্রান্তে আসিয়া পরক্ষণে অতলস্পর্শ সুপ্তির মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গেল।

গল্প শেষ করিয়া ইস্কুলমাষ্টার খানিকক্ষণ থামিলেন। হঠাৎ থামিবামাত্র বোঝা গেল তিনি ছাড়া ইতিমধ্যে জগতের আর সকলই নীরব নিস্তব্ধ হইয়া গেছে। অনেকক্ষণ আমি একটি কথাও বলিলাম না এবং অন্ধকারে তিনি আমার মুখের ভাবও দেখিতে পাই-লেন না।

আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কি এ গল্প বিশ্বাস করিলেন না?

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম আপনি কি ইহা বিশ্বাস করেন?

তিনি কহিলেন—না। কেন করি না তাহার কয়েকটি যুক্তি দিতেছি। প্রথমতঃ প্রকৃতি ঠাকুরাণী উপন্যাসলেখিকা নহেন, তাঁহার হাতে বিস্তর কাজ আছে—

আমি কহিলাম, দ্বিতীয়তঃ আমারই নাম শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ সাহা।

ইস্কুলমাষ্টার কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া কহিলেন, আমি তাহা ঠিকই অনুমান করিয়া-ছিলাম। আপনার স্ত্রীর নাম কি ছিল?

আমি কহিলাম নৃত্যকালী।

একটা আষাঢ়ে গল্প।

দূর সমুদ্রের মধ্যে একটা দ্বীপ। সেখানে কেবল তাসের সাহেব, তাসের বিবি, টেক্কা এবং গোলামের বাস। দুরি তিরি হইতে নহলা দহলা পর্য্যন্ত আরো অনেক ঘর গৃহস্থ আছে কিন্তু তাহারা উচ্চ জাতীয় নহে।

টেক্কা সাহেব গোলাম এই তিনটেই প্রধান বর্ণ, নহলা দহলারা অন্ত্যজ, তাহাদের সহিত এক পংক্তিতে বসিবার যোগ্য নহে।

কিন্তু চমৎকার শৃঙ্খলা। কাহার কত মূল্য এবং মর্য্যাদা তাহা বহুকাল হইতে স্থির হইয়া গেছে, তাহার রেখামাত্র ইতস্ততঃ হইবার যো নাই। সকলেই যথানির্দ্দিষ্টমতে আপন আপন

কাজ করিয়া যায়। বংশাবলিক্রমে কেবল পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের উপর দাগ বুলাইয়া চলা।

সে যে কি কাজ তাহা বিদেশীর পক্ষে বোঝা শক্ত। হঠাৎ খেলা বলিয়া ভ্রম হয়। কেবল নিয়মে চলা ফেরা, নিয়মে যাওয়া আসা, নিয়মে ওঠাপড়া। অদৃশ্য হস্তে তাহাদিগকে চালনা করিতেছে এবং তাহারা চলিতেছে।

তাহাদের মুখে কোন ভাবের পরিবর্ত্তন নাই। চিরকাল একমাত্র ভাব ছাপ মারা রহিয়াছে। যেন ফ্যাল্ ফ্যাল্ ছবির মত। মান্ধাতার আমল হইতে মাথার টুপি অবধি পায়ের জুতা পর্য্যন্ত অবিকল সমভাবে রহিয়াছে।

কখনো কাহাকেও চিন্তা করিতে হয় না, বিবেচনা করিতে হয় না; সকলেই মৌন নির্জ্জীবভাবে নিঃশব্দে পদচারণা করিয়া বেড়ায়; পতনের সময় নিঃশব্দে পড়িয়া যায় এবং অবিচলিত মুখশ্রী লইয়া চিৎ হইয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে।

কাহারো কোন আশা নাই, অভিলাষ নাই, ভয় নাই, নূতন পথে চলিবার চেষ্টা নাই, হাসি নাই, কান্না নাই, সন্দেহ নাই, দ্বিধা নাই। খাঁচার মধ্যে যেমন পাখী ঝট্‌পট্ করে এই চিত্রিতবৎ মূর্ত্তিগুলির অন্তরে সেরূপ কোন একটা জীবন্ত প্রাণীর অশান্ত আক্ষেপের লক্ষণ দেখা যায় না।

অথচ এককালে এই খাঁচাগুলির মধ্যে জীবের বসতি ছিল—তখন খাঁচা দুলিত এবং ভিতর হইতে পাখার শব্দ এবং গান শুনা যাইত। গভীর অরণ্য এবং বিস্তৃত আকাশের কথা মনে পড়িত।—এখন কেবল পিঞ্জরের সঙ্কীর্ণতা এবং সুশৃঙ্খল-শ্রেণী-বিন্যস্ত লৌহ শলাকাগুলাই অনুভব করা যায়—পাখী উড়িয়াছে, কি মরিয়াছে, কি জীবন্মৃত হইয়া আছে তাহা কে বলিতে পারে!

আশ্চর্য্য স্তব্ধতা এবং শান্তি! পরিপূর্ণ স্বস্তি এবং সন্তোষ। পথে ঘাটে গৃহে সকলি সুসংযত, সুবিহিত,—শব্দ নাই, দ্বন্দ্ব নাই, উৎসাহ নাই, আগ্রহ নাই—কেবল নিত্য-নৈমিত্তিক ক্ষুদ্র কাজ এবং ক্ষুদ্র বিশ্রাম।

সমুদ্র অবিশ্রাম একতান শব্দপূর্ব্বক তটের উপর সহস্র ফেনশুভ্র কোমল করতলের আঘাত করিয়া সমস্ত দ্বীপকে নিদ্রাবেশে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে—পক্ষীমাতার দুই প্রসারিত নীল-পক্ষের মত আকাশ দিগ্‌দিগন্তের শান্তিরক্ষা করিতেছে। অতিদূর পরপারে গাঢ় নীল রেখার মত বিদেশের আভাস দেখা যায়—সেখান হইতে রাগদ্বেষের দ্বন্দ্বকোলাহল সমুদ্র পার হইয়া আসিতে পারে না।

২

সেই পরপারে সেই বিদেশে এক দুয়ারাণীর ছেলে এক রাজপুত্র বাস করে। সে তাহার নির্ব্বাসিত মাতার সহিত সমুদ্রতীরে আপন মনে বাল্যকাল যাপন করিতে থাকে।

সে একা বসিয়া বসিয়া মনে মনে এক অত্যন্ত বৃহৎ অভিলাষের জাল বুনিতেছে। সেই জাল দিগ্‌দিগন্তরে নিক্ষেপ করিয়া কল্পনায় বিশ্বজগতের নব নব রহস্যরাশি সংগ্রহ করিয়া আপনার দ্বারের কাছে টানিয়া তুলিতেছে। তাহার অশান্ত চিত্ত সমুদ্রের তীরে, আকাশের সীমায় ঐ দিগন্তরোধী নীল গিরিমালার পরপারে সর্ব্বদা সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে—খুঁজিতে চায় কোথায় পক্ষীরাজ ঘোড়া, সাপের মাথার মাণিক, পারিজাত পুষ্প, সোণার কাঠি রূপার কাঠি পাওয়া যায়, কোথায় সাত সমুদ্র তের নদীর পারে দুর্গম দৈত্যভবনে স্বপ্নসম্ভবা অলোকসুন্দরী রাজকুমারী ঘুমাইয়া রহিয়াছেন।

রাজপুত্র পাঠশালে পড়িতে যায়, সেখানে

পাঠান্তে সওদাগরের পুত্রের কাছে দেশবিদেশের কথা এবং কোটালের পুত্রের কাছে তাল বেতালের কাহিনী শোনে।

ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি পড়ে, মেঘে অন্ধকার হইয়া থাকে,—গৃহদ্বারে মায়ের কাছে বসিয়া সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রাজপুত্র বলে, মা,একটা খুব দূর দেশের গল্প বল। মা অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার বাল্যশ্রুত এক অপূর্ব্ব দেশের অপূর্ব্ব গল্প বলিতেন—বৃষ্টির ঝর্ ঝর্ শব্দের মধ্যে সেই গল্প শুনিয়া রাজপুত্রের হৃদয় উদাস হইয়া যাইত।

একদিন সওদাগরের পুত্র আসিয়া রাজপুত্রকে কহিল—"সাঙাৎ পড়াশুনা ত সাঙ্গ করিয়াছি, এখন একবার দেশভ্রমণে বাহির হইব তাই বিদায় লইতে আসিলাম।

রাজার পুত্র কহিল আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। কোটালের পুত্র কহিল আমাকে কি একা ফেলিয়া যাইবে? আমিও তোমাদের সঙ্গী।

রাজপুত্র দুঃখিনী মাকে গিয়া বলিল মা, আমি ভ্রমণে বাহির হইতেছি—এবার তোমার দুঃখমোচনের উপায় করিয়া আসিব।

তিন বন্ধুতে বাহির হইয়া পড়িল।

৩

সমুদ্রে সওদাগরের দ্বাদশতরী প্রস্তুত ছিল—তিন বন্ধু চড়িয়া বসিল। দক্ষিণের বাতাসে পাল ভরিয়া উঠিল—নৌকাগুলো রাজপুত্রের হৃদয়বাসনার মত ছুটিয়া চলিল।

শঙ্খদ্বীপে গিয়া এক নৌকা শঙ্খ, চন্দন দ্বীপে গিয়া এক নৌকা চন্দন, প্রবাল দ্বীপে গিয়া এক নৌকা প্রবাল বোঝাই হইল।

তাহার পর আর চারি বৎসরে গজদন্ত মৃগনাভি লবঙ্গ জায়ফলে যখন আর চারিটি নৌকা পূর্ণ হইল, তখন সহসা একটা বিপর্য্যয় ঝড় আসিল।

সব ক'টা নৌকা ডুবিল, কেবল একটি নৌকা তিন বন্ধুকে একটা দ্বীপে আছাড়িয়া ফেলিয়া খান্ খান্ হইয়া গেল।

এই দ্বীপে তাসের টেক্কা তাসের সাহেব, তাসের বিবি, তাসের গোলাম যথানিয়মে বাস করে এবং দহলা নহলাগুলোও তাহাদের পদানুবর্ত্তী হইয়া যথানিয়মে কাল কাটায়।

৪

তাসের রাজ্যে এতদিন কোন উপদ্রব ছিল না এই প্রথম গোলযোগের সূত্রপাত হইল।

এতদিন পরে এই একটা প্রথম তর্ক উঠিল—এই যে তিনটে লোক হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলায় সমুদ্র হইতে উঠিয়া আসিল ইহাদিগকে কোন্ শ্রেণীতে ফেলা যাইবে?

প্রথমতঃ ইহারা কোন্ জাতি—টেক্কা, সাহেব, গোলাম, না দহলা নহলা?

দ্বিতীয়তঃ ইহারা কোন্ গোত্র, ইস্কাবন, চিড়েতন হরতন অথবা রুহিতন?

এ সমস্ত স্থির না হইলে ইহাদের সহিত কোন রূপ ব্যবহার করাই কঠিন। ইহারা কাহার অন্ন খাইবে, কাহার সহিত বাস করিবে, ইহাদের মধ্যে অধিকারভেদে কেই বা বায়ু কোণে, কেই বা নৈঋত কোণে, কেই বা ঈশান কোণে মাথা রাখিয়া এবং কেই বা দণ্ডায়মান হইয়া নিদ্রা দিবে তাহার কিছুই স্থির হয় না।

এ রাজ্যে এতবড় বিষম দুশ্চিন্তার কারণ ইতিপূর্ব্বে আর কখনও ঘটে নাই।

কিন্তু ক্ষুধাকাতর বিদেশী বন্ধু তিনটির এ সকল গুরুতর বিষয়ে তিলমাত্র চিন্তা নাই তাহারা কোন গতিকে আহার পাইলে বাঁচে। যখন দেখিল তাহাদের আহারাদি দিতে সকলে

ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, এবং বিধান খুঁজিবার জন্য টেক্কারা বিরাট সভা আহ্বান করিল, তখন তাহারা যে যেখানে যে খাদ্য পাইল খাইতে আরম্ভ করিয়া দিল।

এই ব্যবহারে ছরি তিরি পর্য্যন্ত অবাক্। তিরি কহিল ভাই ছরি, ইহাদের বাচবিচার কিছুই নাই। ছরি কহিল, ভাই তিরি, বেশ দেখিতেছি ইহারা আমাদের অপেক্ষাও নীচ-জাতীয়।

আহারাদি করিয়া ঠাণ্ডা হইয়া তিন বন্ধু দেখিল, এখানকার মানুষগুলা কিছু নূতন রকমের। যেন জগতে ইহাদের কোথাও মূল নাই। যেন ইহাদের টিকি ধরিয়া কে উৎপাটন করিয়া লইয়াছে, ইহারা একপ্রকার হতবুদ্ধি-ভাবে সংসারের স্পর্শ পরিত্যাগ করিয়া দুলিয়া দুলিয়া বেড়াইতেছে। যাহা কিছু করিতেছে তাহা যেন আর একজন কে করাইতেছে। ঠিক যেন পুঁৎলা বাজির দোদুল্যমান পুতুলগুলির মত। তাই কাহারো মুখে ভাব নাই, ভাবনা নাই সকলেই নিরতিশয় গম্ভীর চালে যথা-নিয়মে চলাফেরা করিতেছে। অথচ সবসুদ্ধ ভারি অদ্ভুত দেখাইতেছে।

চারিদিকে এই জীবন্ত নির্জ্জীবতার পরম গম্ভীর রকম সকম দেখিয়া রাজপুত্র আকাশে মুখ তুলিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। এই আন্তরিক কৌতুকের উচ্চ হাস্যধ্বনি তাসরাজ্যের কলরবহীন রাজপথে ভারি বিচিত্র শুনাইল। এখানে সকলই এম্নি একান্ত যথাযথ, এম্নি পরিপাটি, এম্নি প্রাচীন, এম্নি সুগম্ভীর যে, কৌতুক আপনার অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত উচ্ছৃঙ্খল শব্দে আপনি চকিত হইয়া ম্লান হইয়া নির্ব্বাপিত হইয়া গেল—চারিদিকের লোকপ্রবাহ পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ স্তব্ধ গম্ভীর অনুভূত হইল।

কোটালের পুত্র এবং সওদাগরের পুত্র ব্যাকুল হইয়া রাজপুত্রকে কহিল "ভাই সাঙাৎ, এই নিরানন্দ ভূমিতে আর একদণ্ড নয়। এখানে আর দুই দিন থাকিলে মাঝে মাঝে আপনাকে স্পর্শ করিয়া দেখিতে হইবে জীবিত আছি কি না।"

রাজপুত্র কহিল, "না ভাই, আমার কৌতূহল হইতেছে। ইহারা মানুষের মত দেখিতে—ইহাদের মধ্যে এক ফোঁটা জীবন্ত পদার্থ আছে কি না একবার নাড়া দিয়া দেখিতে হইবে।"

৫

এম্নি ত কিছু কাল যায়। কিন্তু এই তিনটে বিদেশী যুবক কোন নিয়মের মধ্যেই ধরা দেয় না। যেখানে যখন ওঠা, বসা, মুখ ফেরানো, উপুড় হওয়া, চিৎ হওয়া, মাথা নাড়া, ডিগ্‌বাজি খাওয়া উচিত ইহারা তাহার কিছুই করে না, বরং সকৌতুকে নিরীক্ষণ করে এবং হাসে। এই সমস্ত যথাবিহিত অশেষ ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে যে একটি দিগ্‌গজ গাম্ভীর্য্য আছে ইহারা তদ্দ্বারা অভিভূত হয় না।

একদিন টেক্কা সাহেব গোলাম আসিয়া রাজপুত্র, কোটালের পুত্র এবং সওদাগরের পুত্রকে হাঁড়ির মত গলা করিয়া অবিচলিত গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা বিধানমতে চলিতেছ না কেন?"

তিন বন্ধু উত্তর করিলেন, "আমাদের ইচ্ছা।"

হাঁড়ির মত গলা করিয়া তাসরাজ্যের তিন অধিনায়ক স্বপ্নাভিভূতের মত বলিল "ইচ্ছা! সে বেটা কে?"

ইচ্ছা কি, সে দিন বুঝিল না কিন্তু ক্রমে ক্রমে বুঝিল। প্রতিদিন দেখিতে লাগিল, এমন করিয়া না চলিয়া অমন করিয়া চলাও

সম্ভব, যেমন এদিক আছে তেমনি ওদিকও আছে, বিদেশ হইতে তিনটে জীবন্ত দৃষ্টান্ত আসিয়া জানাইয়া দিল বিধানের মধ্যেই মানবের সমস্ত স্বাধীনতার সীমা নহে। এম্নি করিয়া তাহারা ইচ্ছা নামক একটা রাজশক্তির প্রভাব অস্পষ্ট ভাবে অনুভব করিতে লাগিল।

ঐ সেটি যেমনি অনুভব করা অমনি তাস-রাজ্যের আগাগোড়া অল্প অল্প করিয়া আন্দোলিত হইতে আরম্ভ হইল—গতনিদ্র প্রকাণ্ড অজগর সর্পের অনেকগুলা কুণ্ডলীর মধ্যে জাগরণ যেমন মন্দগতিতে সঞ্চলন করিতে থাকে সেইরূপ।

৬

নির্ব্বিকারমূর্ত্তি বিবি এতদিন কাহারো দিকে দৃষ্টিপাত করে নাই—নির্ব্বাক্, নিরুদ্বিগ্ন-ভাবে আপনার কাজ করিয়া গেছে। এখন একদিন বসন্তের অপরাহ্নে ইহাদের মধ্যে একজন চকিতের মধ্যে ঘনকৃষ্ণপক্ষ্ম ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া রাজপুত্রের দিকে মুগ্ধনেত্রের কটাক্ষপাত করিল। রাজপুত্র চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "এ কি সর্ব্বনাশ! আমি জানিতাম ইহারা এক একটা মূর্ত্তিবৎ তাহাত নহে, দেখিতেছি এ যে নারী!"

কোটালের পুত্র ও সওদাগরের পুত্রকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া রাজকুমার কহিল—"ভাই, ইহার মধ্যে বড় মাধুর্য্য আছে। তাহার সেই নবভাবোদ্দীপ্ত কৃষ্ণনেত্রের প্রথম কটাক্ষপাতে আমার মনে হইল যেন আমি এক নূতনসৃষ্ট জগতের প্রথম উষার প্রথম উদয় দেখিতে পাইলাম! এতদিন যে ধৈর্য্য ধরিয়া অবস্থান করিতেছি আজ তাহা সার্থক হইল।"

দুই বন্ধু পরম কৌতূহলের সহিত সহাস্যে কহিল, "সত্য না কি সাঙাৎ!"

সেই হতভাগিনী হরতনের বিবিটি আজ হইতে প্রতিদিন নিয়ম ভুলিতে লাগিল। তাহার যখন যেখানে হাজির হওয়া বিধান, মুহুর্মুহু তাহার ব্যতিক্রম হইতে আরম্ভ হইল। মনে কর, যখন তাহাকে গোলামের পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে—তখন সে হঠাৎ রাজপুত্রের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়ায়। গোলাম অবিচলিতভাবে সুগম্ভীর কণ্ঠে বলে, বিবি তোমার ভুল হইল। শুনিয়া হরতনের বিবির স্বভাবতঃ রক্তকপোল অধিকতর রক্তবর্ণ হইয়া উঠে, তাহার নির্নিমেষ প্রশান্ত দৃষ্টি নত হইয়া যায়। রাজপুত্র উত্তর দেয়—কিছু ভুল হয় নাই; আজ হইতে আমিই গোলাম।

নবপ্রস্ফুটিত রমণীহৃদয় হইতে এ কি অভূতপূর্ব্ব শোভা, একি অভাবনীয় লাবণ্য বিস্ফুরিত হইতে লাগিল। তাহার গতিতে এ কি সুমধুর চাঞ্চল্য, তাহার দৃষ্টিপাতে এ কি হৃদয়ের হিল্লোল, তাহার সমস্ত অস্তিত্ব হইতে এ কি একটি সুগন্ধি আরতি উচ্ছ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে!

এই নব অপরাধিনীর ভ্রম সংশোধনে সাতিশয় মনোযোগ করিতে গিয়া আজকাল সকলেরই ভ্রম হইতে লাগিল। টেক্কা আপনার চিরন্তন মর্য্যাদা রক্ষার কথা বিস্মৃত হইল, সাহেবে গোলামে আর প্রভেদ থাকে না, দহলা নহলাগুলারা পর্য্যন্ত কেমন হইয়া গেল!

এই পুরাতন দ্বীপে বসন্তের কোকিল অনেকবার ডাকিয়াছে কিন্তু সেইবার যেমন ডাকিল এমন আর কখনো ডাকে নাই। সমুদ্র চিরদিন একতান কলধ্বনিতে গান করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এতদিন সে সনাতন বিধানের অলঙ্ঘ্য মহিমা একস্বরে ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে, আজ সহসা দক্ষিণবায়ুচঞ্চল বিশ্বব্যাপী

দুরন্ত যৌবনতরঙ্গরাশির মত আলোতে ছায়াতে ভঙ্গীতে ভাষাতে আপনার অগাধ আকুলতা ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

৭

এই কি সেই টেক্কা, সেই সাহেব, সেই গোলাম! কোথায় গেল সেই পরিতুষ্ট পরিপুষ্ট সুগোল মুখচ্ছবি! কেহ বা আকাশের দিকে চায়, কেহ বা সমুদ্রের ধারে বসিয়া থাকে, কাহারো বা রাত্রে নিদ্রা হয় না, কাহারও বা আহারে মন নাই।

মুখে কাহারো ঈর্ষ্যা, কাহারো অনুরাগ, কাহারো ব্যাকুলতা, কাহারো সংশয়। কোথাও হাসি, কোথাও রোদন কোথাও সঙ্গীত। সকলেরই নিজের নিজের প্রতি এবং অন্যের প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে। সকলেই আপনার সহিত অন্যের তুলনা করিতেছে।

টেক্কা ভাবিতেছে, সাহেব ছোকরাটাকে দেখিতে নেহাৎ মন্দ না হোক্ কিন্তু উহার শ্রী নাই—আমার চালচলনের মধ্যে এমন একটা মাহাত্ম্য আছে যে কোন কোন ব্যক্তিবিশেষের দৃষ্টি আমার দিকে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না।

সাহেব ভাবিতেছে—টেক্কা সর্ব্বদা ভারি টক্‌টক্ করিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বেড়াইতেছে, মনে করিতেছে উহাকে দেখিয়া বিবিগুলা বুক ফাটিয়া মারা গেল!—বলিয়া ঈষৎ বক্র হাসিয়া দর্পণে মুখ দেখিতেছে।

দেশে যতগুলি বিবি ছিলেন সকলেই প্রাণপণে সাজসজ্জা করেন আর পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া বলেন "আ মরিয়া যাই! গর্ব্বিনীর এত সাজের ধূম কিসের জন্য গো বাপু! উহার রকমসকম দেখিয়া লজ্জা করে!" বলিয়া দ্বিগুণ প্রযত্নে হাবভাব বিস্তার করিতে থাকেন।

আবার কোথাও দুই সখায় কোথাও দুই সখীতে গলা ধরিয়া নিভৃতে বসিয়া গোপন কথাবার্ত্তা হইতে থাকে। কখন হাসে, কখন কাঁদে, কখন রাগ করে, কখন মান অভিমান চলে, কখন সাধাসাধি হয়!

যুবকগুলা পথের ধারে বনের ছায়ায় তরুমূলে পৃষ্ঠ রাখিয়া শুষ্কপত্ররাশির উপর পা ছড়াইয়া অলস ভাবে বসিয়া থাকে। বালা সুনীল বসন পরিয়া সেই ছায়াপথ দিয়া আপন মনে চলিতে চলিতে সেইখানে আসিয়া মুখ নত করিয়া চোখ ফিরাইয়া লয়, যেন কাহাকেও দেখিতে পায় নাই, যেন কাহাকেও দেখা দিতে আসে নাই, এমনি ভাব করিয়া চলিয়া যায়।

তাই দেখিয়া কোন কোন ক্ষেপা যুবক দুঃসাহসে ভর করিয়া তাড়াতাড়ি কাছে অগ্রসর হয়, কিন্তু মনের মত একটাও কথা যোগায় না, অপ্রতিভ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে, অনুকূল অবসর চলিয়া যায় এবং রমণীও অতীত মুহূর্ত্তের মত ক্রমে ক্রমে দূরে বিলীন হইয়া যায়।

মাথার উপরে পাখী ডাকিতে থাকে, বাতাস অঞ্চল ও অলক উড়াইয়া হু হু করিয়া বহিয়া যায়, তরুপল্লব ঝর্ ঝর্ মর্ মর্ করে, এবং সমুদ্রের অবিশ্রাম উচ্ছ্বসিত ধ্বনি হৃদয়ের অব্যক্ত বাসনাকে দ্বিগুণ দোদুল্যমান করিয়া তোলে।

একটা বসন্তে তিনটে বিদেশী যুবক আসিয়া মরা গাঙে এমনি একটা ভরা তুফান তুলিয়া দিল।

৮

রাজপুত্র দেখিলেন জোয়ার ভাঁটার মাঝখানে সমস্ত দেশটা থম্‌থম্ করিতেছে—কথা নাই কেবল মুখ চাওয়াচাওয়ি, কেবল এক পা এগোনো দুই পা পিছোনো, কেবল আপনার মনের বাসনা স্তূপাকার করিয়া বালির ঘর গড়া এবং বালির ঘর ভাঙ্গা। সকলেই যেন ঘরের কোণে বসিয়া আপনার অগ্নিতে আপনাকে

াহুতি দিতেছে, এবং প্রতিদিন কৃশ ও বাক্য-
ন হইয়া যাইতেছে। কেবল চোখ দুটা জ্বলি-
ছে অন্তর্নিহিত বাণীর আন্দোলনে ওষ্ঠাধর
মুকম্পিত পল্লবের মত স্পন্দিত হইতেছে।

রাজপুত্র সকলকে ডাকিয়া বলিলেন—বাঁশি
ান, তুরি ভেরী বাজাও, সকলে আনন্দধ্বনি
র, হর্তনের বিবি স্বয়ম্বরা হইবেন।

তৎক্ষণাৎ দহলা নহলা বাঁশিতে ফু দিতে
াগিল, দুরি তিরি তুরি-ভেরী লইয়া পড়িল!
ঠাৎ এই তুমুল আনন্দতরঙ্গে সেই কাণাকাণি
ওয়াচাওয়ি ভাঙ্গিয়া গেল।

উৎসবে নরনারী একত্র মিলিত হইয়া কত
থা, কত হাসি, কত পরিহাস! কত রহস্য-
লে মনের কথা বলা, কত ছল করিয়া অবি-
াস দেখানো, কত উচ্চ হাস্যে তুচ্ছ আলাপ।
ন অরণ্যে বাতাস উঠিলে যেমন শাখায়
াখায় পাতায় পাতায় লতায় বৃক্ষে নানা ভঙ্গীতে
হলাদোলা মেলামেলি হইতে থাকে ইহাদের
ধ্যে তেম্নি হইতে লাগিল।

এম্নি কলরব আন্দোৎসবের মধ্যে বাঁশিতে
াল হইতে বড় মধুস্বরে সাহানা বাজিতে
াগিল। আনন্দের মধ্যে গভীরতা, মিলনের
ধ্যে ব্যাকুলতা, বিশ্বদৃশ্যের মধ্যে সৌন্দর্য্য, এবং
দয়ে হৃদয়ে প্রীতির বেদনা সঞ্চার করিতে
াগিল। যাহারা ভাল করিয়া ভালবাসে নাই
াহারা ভালবাসিল, যাহারা ভালবাসিয়াছিল
াহারা আনন্দে উদাস হইয়া গেল।

হরতনের বিবি রাঙা বসন পরিয়া সমস্ত
দিন একটা গোপন ছায়াকুঞ্জে বসিয়াছিল!
াহার কাণেও দূর হইতে সাহানার তান
প্রবেশ করিতেছিল এবং তাহার দুটি চক্ষু
মুদ্রিত হইয়া আসিয়াছিল—হঠাৎ এক সময়ে
চক্ষু মেলিয়া দেখিল, সম্মুখে রাজপুত্র বসিয়া
তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে; সে অমনি
কম্পিতদেহে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ভূমিতে
লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

রাজপুত্র সমস্ত দিন একাকী সমুদ্রতীরে
পদচারণা করিতে করিতে সেই সন্ত্রস্ত নেত্রক্ষেপ
এবং সলজ্জ লুণ্ঠন মনে মনে আলোচনা করিতে
লাগিলেন।

৯

রাত্রে শত সহস্র দীপের আলোকে, মালার
সুগন্ধে বাঁশির সঙ্গীতে, অলঙ্কৃত সুসজ্জিত
সহাস্য শ্রেণীবদ্ধ যুবকদের সভায় একটি বালিকা
ধীরে ধীরে কম্পিতচরণে মালা হাতে করিয়া
রাজপুত্রের সম্মুখে আসিয়া নতশিরে দাঁড়াইল।
অভিলষিত কণ্ঠে মালাও উঠিল না, অভিলষিত
মুখে চোখও তুলিতে পারিল না। রাজপুত্র
তখন আপনি শির নত করিলেন এবং মাল্য
স্খলিত হইয়া তাঁহার কণ্ঠে পড়িয়া গেল। চিত্র-
বৎ নিস্তব্ধ সভা সহসা আনন্দ-উচ্ছ্বাসে আলো-
ড়িত হইয়া উঠিল।

সকলে বরকন্যাকে সমাদর করিয়া সিংহা-
সনে লইয়া বসাইল। রাজপুত্রকে সকলে
মিলি রাজ্যে অভিষেক করিল।

সমুদ্রপারে দুঃখিনী দুয়ারাণী সোণার
তরীতে চড়িয়া পুত্রের নবরাজ্যে আগমন
করিলেন।

ছবির দল হঠাৎ মানুষ হইয়া উঠিয়াছে।
এখন আর পূর্ব্বের মত সেই অবিচ্ছিন্ন শান্তি
এবং অপরিবর্ত্তনীয় গাম্ভীর্য্য নাই। সংসার-
প্রবাহ আপনার সুখ দুঃখ রাগ দ্বেষ বিপদ
সম্পদ লইয়া এই নবীন রাজার নব রাজ্যকে
পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। এখন কেহ ভাল,
কেহ মন্দ, কাহারো আনন্দ, কাহারো বিষাদ—
এখন সকলে মানুষ। এখন সকলে অলজ্জ্য

বিধানমতে নিরীহ না হইয়া নিজের ইচ্ছামতে সাধু এবং অসাধু ।

একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প ।

গল্প বলিতে হইবে? কিন্তু আর ত পারি না। এখন এই পরিশ্রান্ত অক্ষম ব্যক্তিটিকে ছুটি দিতে হইবে।

এ পদ আমাকে কে দিল বলা কঠিন। ক্রমে ক্রমে একে একে তোমরা পাঁচজন আসিয়া আমার চারিদিকে কখন্ জড় হইলে, এবং কেন যে তোমরা আমাকে এত অনুগ্রহ করিলে এবং আমার কাছে এত প্রত্যাশা করিলে, তাহা বলা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। অবশ্যই সে তোমাদের নিজগুণে; শুভাদৃষ্টক্রমে আমার প্রতি সহসা তোমাদের অনুগ্রহ উদয় হইয়াছিল। এবং যাহাতে সে অনুগ্রহ রক্ষা হয় সাধ্যমত আমার সে চেষ্টার ত্রুটি নাই।

কিন্তু পাঁচজনের অব্যক্ত অনির্দ্দিষ্ট সম্মতিক্রমে যে কার্য্যভার আমার প্রতি অর্পিত হইয়া পড়িয়াছে আমি তাহার যোগ্য নহি। ক্ষমতা আছে কি না আছে তাহা লইয়া বিনয় বা অহঙ্কার করিতে চাহি না কিন্তু প্রধান কারণ এই যে, বিধাতা আমাকে নির্জ্জনচর জীবরূপেই গঠিত করিয়াছিলেন, খ্যাতি যশ জনতার উপযোগী করিয়া আমার গাত্রে কঠিন চর্ম্মাবরণ দিয়া দেন নাই; তাঁহার এই বিধান ছিল যে, যদি তুমি আত্মরক্ষা করিতে চাও ত একটু নিরালার মধ্যে বাস করিয়ো।

চিত্তও সেই নিরালা বাসস্থানটুকুর জ সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে। কিন্তু পিত মহ অদৃষ্ট পরিহাস করিয়াই হৌক্ অথবা ভ্ বুঝিয়াই হৌক্, আমাকে একটি বিপুল জ সমাজের মধ্যে উত্তীর্ণ করিয়া এক্ষণে মু কাপড় দিয়া হাস্য করিতেছেন, আমি তাঁহ সেই হাস্যে যোগ দিবার চেষ্টা করিতেছি কি কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছি না।

পলায়ন করাও আমার কর্ত্তব্য বলিয়া ম হয় না। সৈন্যদলের মধ্যে এমন অনেক ব্যা আছে যাহারা স্বভাবতই যুদ্ধের অপে শান্তির মধ্যেই অধিকতর স্ফূর্ত্তি পাইতে পা কিন্তু যখন সে নিজের এবং পরের ভ্রমক্র যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া তখন হঠাৎ দল ভাঙ্গিয়া পলায়ন করা তাহা শোভা পায় না। অদৃষ্ট সুবিবেচনা পূর্ব্ব প্রাণিগণকে যথাযোগ্য কর্ম্মে নিয়োগ করে না, কিন্তু তথাপি নিযুক্ত কার্য্য দৃঢ় নিষ্ঠ সহিত সম্পন্ন করা মানুষের কর্ত্তব্য।

তোমরা আবশ্যক বোধ করিলে আমা নিকট আসিয়া থাক, এবং সম্মান দেখাইতে ত্রুটি কর না। আবশ্যক অতীত হইয়া গে সেবকাধমের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া কি আত্মগৌরব অনুভব করিবারও চেষ্টা করি থাক। পৃথিবীতে সাধারণতঃ ইহাই স্বাভাবি এবং এই কারণেই ‘সাধারণ’ নামক এক অকৃতজ্ঞ অব্যবস্থিতচিত্ত রাজাকে তাহার অনু চরবর্গ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে না। কিন্তু অনুগ্র নিগ্রহের দিকে তাকাইলে সকল সময় কা করা হইয়া উঠে না। নিরপেক্ষ হইয়া কা না করিলে কাজের গৌরব আর থাকে না।

অতএব যদি কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি আসিয়া থাক ত কিছু শুনাইব। শ্রান্তি মানি না এবং উৎসাহেরও প্রত্যাশা করিব না।

আজ কিন্তু অতি ক্ষুদ্র এবং পৃথিবীর ...ন্ত পুরাতন একটি গল্প মনে পড়িতেছে; ...হর না হইলেও সংক্ষেপবশতঃ শুনিতে ...চ্যুতি না হইবার সম্ভাবনা।

পৃথিবীতে একটি মহানদীর তীরে একটি ...রণ্য ছিল। সেই অরণ্যে এবং সেই নদী-...রে একটি কাঠঠোক্‌রা এবং একটি কাদা-...চা পক্ষী বাস করিত।

ধরাতলে কীট যখন সুলভ ছিল তখন ... নিরত্তিপূর্ব্বক সন্তুষ্টচিত্তে উভয়ে ধরাধামের ...কীর্ত্তন করিয়া পুষ্ট কলেবরে বিচরণ ...রিত।

কালক্রমে দৈবযোগে পৃথিবীতে কীট ...প্রাপ্য হইয়া উঠিল।

তখন নদীতীরস্থ কাদাখোঁচা শাখাসীন ...ঠোক্‌রাকে কহিল, "ভাই কাঠঠোক্‌রা, ...হির হইতে অনেকের নিকট এই পৃথিবী ...ীন শ্যামল সুন্দর বলিয়া মনে হয় কিন্তু ...মি বলিতেছি ইহা আদ্যোপান্ত জীর্ণ।"

শাখাসীন কাঠঠোক্‌রা নদীতটস্থ কাদা-...চাকে কহিল, "ভাই কাদাখোঁচা, অনেকে ...ই অরণ্যকে সতেজ শোভন বলিয়া বিশ্বাস ...রে কিন্তু আমি বলিতেছি ইহা একেবারে ...ন্তঃসারবিহীন।"—

তখন উভয়ে মিলিয়া তাহাই প্রমাণ করিয়া ...তে কৃতসঙ্কল্প হইল। কাদাখোঁচা নদীতীরে ...ম্ফ দিয়া পৃথিবীর কোমল কর্দ্দমে অনবরতই ...ু বিদ্ধ করিয়া বসুন্ধরার জীর্ণতা নির্দ্দেশ ...রিতে লাগিল এবং কাঠঠোক্‌রা বনস্পতির ...ঠিন শাখায় বারংবার চঞ্চু আঘাত করিয়া ...রণ্যের অন্তঃশূন্যতা প্রচার করিতে প্রবৃত্ত ...ইল।

বিধিবিড়ম্বনায় উক্ত দুই অধ্যবসায়ী পক্ষী ...ীতবিদ্যায় বঞ্চিত। অতএব কোকিল যখন ধরাতলে নব নব বসন্ত সমাগম পঞ্চমস্বরে ঘোষণা করিতে লাগিল, এবং শ্যামা যখন অরণ্যে নব নব প্রভাতোদয় কীর্ত্তন করিতে নিযুক্ত রহিল, তখন এই দুই ক্ষুধিত অসন্তুষ্ট মূক পক্ষী অশান্ত উৎসাহে আপন প্রতিজ্ঞা পালন করিতে লাগিল।

এ গল্প তোমাদের ভাল লাগিল না? ভাল লাগিবার কথা নহে। কিন্তু ইহার সর্ব্বাপেক্ষা মহৎগুণ এই যে, পাঁচ সাত পারাগ্রাফেই সম্পূর্ণ।

এ গল্পটা যে পুরাতন তাহাও তোমাদের মনে হইতেছেনা? তাহার কারণ পৃথিবীর ভাগ্যদোষে এ গল্প অতি পুরাতন হইয়াও চির-কাল নূতন রহিয়া গেল। বহুদিন হইতেই অকৃতজ্ঞ কাঠঠোক্‌রা পৃথিবীর দৃঢ় কঠিন অমর মহত্ত্বের উপর ঠক্‌ঠক্‌ শব্দে চঞ্চুপাত করিতেছে এবং কাদাখোঁচা পৃথিবীর সরস উর্ব্বর কোমল-ত্বের মধ্যে খচখচ শব্দে চঞ্চু বিদ্ধ করিতেছে আজও তাহার শেষ হইল না, মনের আক্ষেপ এখনও রহিয়া গেল।

গল্পটার মধ্যে সুখদুঃখের কথা কি আছে জিজ্ঞাসা করিতেছ? ইহার মধ্যে দুঃখের কথাও আছে সুখের কথাও আছে। দুঃখের কথা এই যে, পৃথিবী যতই উদার এবং অরণ্য যতই মহৎ হউক্‌ ক্ষুদ্র চঞ্চু আপনার উপযুক্ত খাদ্য না পাইবামাত্র তাহাদিগকে আঘাত করিয়া আসিতেছে। এবং সুখের বিষয় এই যে, তথাপি শত সহস্র বৎসর পৃথিবী নবীন এবং অরণ্য শ্যামল রহিয়াছে। যদি কেহ মরে ত সে ঐ দুটি বিদ্বেষবিষজর্জ্জর হতভাগ্য বিহঙ্গ, এবং জগতে কেহ সে সংবাদ জানিতেও পায় না।

তোমরা এ গল্পের মধ্যে মাথামুণ্ডু অর্থ কি আছে কিছু বুঝিতে পার নাই? তাৎপর্য্য

বিশেষ কিছুই জটিল নহে, হয় ত কিঞ্চিৎ বয়স প্রাপ্ত হইলেই বুঝিতে পারিবে।

যাহাই হউক সর্ব্বসুদ্ধ জিনিষটি তোমাদের উপযুক্ত হয় নাই? তাহার ত কোন সন্দেহ-মাত্র নাই।

ঘাটের কথা।

পাষাণে ঘটনা যদি অঙ্কিত হইত, তবে কতদিনকার কত কথা আমার সোপানে সোপানে পাঠ করিতে পারিতে। পুরাতন কথা যদি শুনিতে চাও, তবে আমার এই ধাপে বইস; মনোযোগ দিয়া জলকল্লোলে কাণ পাতিয়া থাক, বহুদিনকার কত বিস্মৃত কথা শুনিতে পাইবে।

আমার আরেকদিনের কথা মনে পড়িতেছে। সেও ঠিক এইরূপ দিন। আশ্বিন মাস পড়িতে আর দুই চারি দিন বাকী আছে। ভোরের বেলায় অতি ঈষৎ মধুর নবীন শীতের বাতাস নিদ্রোত্থিতের দেহে নূতন প্রাণ আনিয়া দিতেছে। তরুপল্লব অম্‌নি একটু একটু শিহরিয়া উঠিতেছে।

ভরা গঙ্গা। আমার চারিটিমাত্র ধাপ জলের উপরে জাগিয়া আছে। জলের সঙ্গে স্থলের সঙ্গে যেন গলাগলি। তীরে আম্র-কাননের নীচে যেখানে কচুবন জন্মিয়াছে, সেখান পর্য্যন্ত গঙ্গার জল গিয়াছে। নদীর ঐ বাঁকের কাছে তিনটে পুরাতন ইটের পাঁজা চারিদিকে জলের মধ্যে জাগিয়া রহিয়াছে। জেলেদের যে নৌকাগুলি ডাঙ্গায় বাবলা-গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা ছিল সেগুলি প্রভাতে জোয়ারের জলে ভাসিয়া উঠিয়া টলমল করিতেছে—দুরন্তযৌবন জোয়ারের জল রঙ্গ করিয়া তাহাদের দুই পাশে ছলছল আঘাত করিতেছে, তাহাদের কর্ণ ধরিয়া মধুর পরিহাসে নাড়া দিয়া যাইতেছে।

ভরা গঙ্গার উপরে শরৎ প্রভাতের যে রৌদ্র পড়িয়াছে, তাহার কাঁচা সোণার মত রং চাঁপা ফুলের মত রং। রৌদ্রের এমন রং, আর কোন সময়ে দেখা যায় না। চড়ার উপরে কাশবনের উপরে রৌদ্র পড়িয়াছে। এখনও কাশফুল সব ফুটে নাই, ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র।

রাম রাম বলিয়া মাঝিরা নৌকা খুলিয়া দিল। পাখীরা যেমন আলোতে পাখা মেলিয়া আনন্দে নীল আকাশে উড়িয়াছে ছোট ছোট নৌকাগুলি তেম্‌নি ছোট ছোট পাল ফুলাইয়া সূর্য্যকিরণে বাহির হইয়াছে। তাহাদের পাখী বলিয়া মনে হয়; তাহারা রাজহাঁসের মত জলে ভাসিতেছে, কিন্তু আনন্দে পাখাদুটি আকাশে ছড়াইয়া দিয়াছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঠিক নিয়মিত সময়ে কোশাকুশি লইয়া স্নান করিতে আসিয়াছেন। মেয়েরা দুই একজন করিয়া জল লইতে আসিয়াছে।

সে বড় বেশী দিনের কথা নহে। তোমাদের অনেক দিন বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু আমার মনে হইতেছে এই সে দিনের কথা! আমার দিনগুলি কি না গঙ্গার স্রোতের উপরে খেলাইতে খেলাইতে ভাসিয়া যায় বহুকাল ধরিয়া স্থিরভাবে তাহাই দেখিতেছি—এই জন্য সময় বড় দীর্ঘ বলিয়া মনে হয় না। আমার দিনের আলো রাত্রের ছায়া প্রতিদিন গঙ্গার উপরে পড়ে আবার প্রতিদিন গঙ্গার উপর হইতে মুছিয়া যায়, কোথাও তাহাদের

বি রাখিয়া যায় না। সেই জন্য, যদিও মাকে বৃদ্ধের মত দেখিতে হইয়াছে, আমার দয় চিরকাল নবীন। বহুবৎসরের স্মৃতির শবালভারে আচ্ছন্ন হইয়া আমার সূর্য্যকিরণ রা পড়ে নাই। দৈবাৎ একটা ছিন্ন শৈবাল সিয়া আসিয়া গায়ে লাগিয়া থাকে আবার াতে ভাসিয়া যায়। তাই বলিয়া যে কিছু ই এমন বলিতে পারি না। যেখানে গঙ্গার াত পৌঁছায় না, সেখানে আমার ছিদ্রে দ্রে যে লতা গুল্ম শৈবাল জন্মিয়াছে, তাহা- ই আমার পুরাতনের সাক্ষী, তাহারাই পুরা- ন কালকে স্নেহপাশে বাঁধিয়া চিরদিন শ্যামল ধুর চিরদিন নূতন করিয়া রাখিয়াছে। গঙ্গা তিদিন আমার কাছ হইতে এক এক ধাপ রিয়া যাইতেছেন, আমিও এক এক ধাপ রিয়া পুরাতন হইতেছি।

চক্রবর্ত্তীদের বাড়ির ঐ যে বৃদ্ধা স্নান করিয়া নাবলী গায়ে কাঁপিতে কাঁপিতে মালা জপিতে পিতে বাড়ি ফিরিয়া যাইতেছেন উঁহার তামহী তখন এতটুকু ছিল। আমার মনে াছে তাহার এক খেলা ছিল, সে প্রত্যহ কটা ঘৃতকুমারীর পাতা গঙ্গার জলে ভাসাইয়া ত। আমার দক্ষিণ বাহুর কাছে একটা াকের মত ছিল, সেই খানে পাতাটা ক্রমা- ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, সে কলসী রাখিয়া াড়াইয়া তাহাই দেখিত। যখন দেখিলাম কছুদিন বাদে সেই মেয়েটিই আবার ডাগর ইয়া উঠিয়া তাহার নিজের একটি মেয়ে সঙ্গে ইয়া জল লইতে আসিল, সে মেয়েও আবার ড় হইল, বালিকারা জল ছুঁড়িয়া দুরন্তপনা রিলে তিনিও আবার তাহাদিগকে শাসন রিতেন ও ভদ্রোচিত ব্যবহার শিক্ষা দিতেন খন আমার সেই ঘৃতকুমারীর নৌকা ভাসান নে পড়িত ও বড় কৌতুক বোধ হইত।

যে কথাটা বলিব মনে করি সে আর আসে না। একটা কথা বলিতে বলিতে স্রোতে আর একটা কথা ভাসিয়া আসে। কথা আসে কথা যায় ধরিয়া রাখিতে পারি না। কেবল এক একটা কাহিনী সেই ঘৃতকুমারীর নৌকাগুলির মত পাকে পড়িয়া অবিশ্রাম ফিরিয়া ফিরিয়া আসে। তেমনি একটা কাহিনী তাহার পসরা লইয়া আজ আমার কাছে ফিরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে কখন্ ডোবে কখন্ ডোবে। পাতাটুকুরই মত সে অতি ছোট, তাহাতে বেশী কিছু নাই, দুটি খেলার ফুল আছে। তাহাকে ডুবিতে দেখিলে কোমলপ্রাণা বালিকা কেবল মাত্র একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাড়ি ফিরিয়া যাইবে।

মন্দিরের পাশে যেখানে ঐ গোঁসাইদের গোয়াল ঘরের বেড়া দেখিতেছ, ঐখানে একটা বাবলা গাছ ছিল। তাহারই তলায় সপ্তাহে একদিন করিয়া হাট বসিত। তখনও গোঁসা- ইরা এখানে বসতি করে নাই যেখানে তাহা- দের চণ্ডীমণ্ডপ পড়িয়াছে, ঐখানে একটা গোলপাতার ছাউনি ছিল মাত্র।

এই যে অশথ গাছ আজ আমার পঞ্জরে পঞ্জরে বাহু প্রসারণ করিয়া সুবিকট সুদীর্ঘ কঠিন অঙ্গুলিজালের ন্যায় শিকড়গুলির দ্বারা আমার বিদীর্ণ পাষাণ প্রাণ মুঠা করিয়া রাখি- য়াছে, এ তখন এতটুকু একটুখানি চারা ছিল মাত্র। কচি কচি পাতাগুলি লইয়া মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল। রৌদ্র উঠিলে ইহার পাতার ছায়াগুলি আমার উপর সমস্ত দিন ধরিয়া খেলা করিত, ইহার নবীন শিকড়গুলি শিশুর অঙ্গু- লির ন্যায় আমার বুকের কাছে কিল্‌কিল্ করিত মাত্র! কেহ ইহার একটি পাতা ছিঁড়িলে আমার ব্যথা বাজিত।

যদিও বয়স অনেক হইয়াছিল তবু তখনও

আমি সিধা ছিলাম। আজ যেমন মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া অষ্টাবক্রের মত বাঁকিয়া চুরিয়া গিয়াছি, গভীর ত্রিবলিরেখার মত সহস্র জায়গায় ফাটল ধরিয়াছে, আমার গর্ভের মধ্যে বিশ্বের ভেক তাহাদের শীতকালের সুদীর্ঘ নিদ্রার আয়োজন করিতেছে, তখন আমার সে দশা ছিল না! কেবল আমার বামবাহুর বাহিরের দিকে দুইখানি ইঁটের অভাব ছিল, সেই গর্তটির মধ্যে একটা ফিঙ্গে বাসা করিয়াছিল। ভোরের বেলায় যখন সে উস্‌খুস্ করিয়া জাগিয়া উঠিত মৎস্যপুচ্ছের ন্যায় তাহার যোড়াপুচ্ছ দুই চারিবার দ্রুত নাচাইয়া শিষ দিয়া আকাশে উড়িয়া যাইত, তখন জানিতাম, কুসুমের ঘাটে আসিবার সময় হইয়াছে।

যে মেয়েটির কথা বলিতেছি ঘাটের অন্যান্য মেয়েরা তাহাকে কুসুম বলিয়া ডাকিত। বোধ করি কুসুমই তাহার নাম হইবে। জলের উপরে যখন কুসুমের ছোট ছায়াটি পড়িত, তখন আমার সাধ যাইত সে ছায়াটি যদি ধরিয়া রাখিতে পারি। সে ছায়াটি যদি আমার পাষাণে বাঁধিয়া রাখিতে পারি; এমনি তাহার একটি মাধুরী ছিল। সে যখন আমার পাষাণের উপরে পা ফেলিত, ও তাহার চারগাছি মল বাজিতে থাকিত, তখন আমার শৈবালগুচ্ছগুলি যেন পুলকিত হইয়া উঠিত। কুসুম যে খুব বেশী খেলা করিত বা গল্প করিত, বা হাসিতামাসা করিত, তাহা নহে, তথাপি, আশ্চর্য্য এই, তাহার যত সঙ্গিনী এমন আর কাহারও নয়। যত দুরন্ত মেয়েদের তাহাকে নহিলে চলিত না। কেহ তাহাকে বলিত কুসি, কেহ তাহাকে বলিত খুসি, কেহ তাহাকে বলিত রাক্কুসি। তাহার মা তাহাকে বলিত কুসমি। যখন্ তখন্ দেখিতাম কুসুম জলের ধারে বসিয়া আছে। জলের সঙ্গে তাহার হৃদয়ের সঙ্গে বিশেষ যেন কি মিল ছি[ল]। সে জল ভারি ভাল বাসিত।

কিছুদিন পরে আর কুসুমকে দেখিতে পা[ই] না। ভুবন আর স্বর্ণ ঘাটে আসিয়া কাঁদিত। শুনিলাম নাকি তাহাদের কুসীমুসীরাক্কুসী[কে] শ্বশুরবাড়ি লইয়া গিয়াছে। শুনিলা[ম] যেখানে তাহাকে লইয়া গেছে, সেখানে নাকি গঙ্গা নাই। সেখানে আবার কা'রা স[ব] নূতন লোক, নূতন ঘরবাড়ি, নূতন পথঘাট। জলের পদ্মটিকে কে যেন ডাঙ্গায় রোপ[ণ] করিতে লইয়া গেছে।

ক্রমে কুসুমের কথা এক রকম ভুলিয়[া] গেছি। এক বৎসর হইয়া গেছে। ঘাটে[র] মেয়েরা কুসুমের গল্পও বড় করে না। এক[দিন] সন্ধ্যার সময়ে বহুকালের পরিচিত পায়ে[র] স্পর্শে সহসা যেন চমক লাগিল। মনে হই[ল] যেন কুসুমের পা। তাহাই বটে, কিন্তু সে পায়ে আর মল বাজিতেছে না। সে পায়ে[র] সে সঙ্গীত নাই। কুসুমের পায়ের স্পর্শ [ও] মলের শব্দ চিরকাল একত্র অনুভব করিয়া আসিতেছি—আজ সহসা সেই মলের শব্দ[টি] না শুনিতে পাইয়া সন্ধ্যাবেলাকার জলে[র] কল্লোল কেমন বিষণ্ণ শুনাইতে লাগিল, আম্রবনের মধ্যে পাতা ঝর্‌ঝর্ করিয়া বাতাস কেমন হাহা করিয়া উঠিল।

কুসুম বিধবা হইয়াছে। শুনিলাম তাহার স্বামী বিদেশে চাকরী করিত; দুই একদিন ছাড়া স্বামীর সহিত সাক্ষাৎই হয় নাই। পত্রযোগে বৈধব্যের সংবাদ পাইয়া আট বৎসর বয়সে মাথার সিন্দুর মুছিয়া গায়ের গহনা ফেলিয়া আবার তাহার দেশে সেই গঙ্গার ধারে ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু, তাহার সঙ্গিনীদেরও বড় কেহ নাই। ভুবন স্বর্ণ অমলা শ্বশুরঘর করিতে গিয়াছে। কেবল শরৎ আছে, কিন্তু শুনিতেছি

গ্রহায়ণ মাসে তাহারও বিবাহ হইয়া যাইবে।
সুম নিতান্ত একলা পড়িয়াছে। কিন্তু, সে
ন দুটি হাঁটুর উপরে মাথা রাখিয়া চুপ
রিয়া আমার ধাপে বসিয়া থাকিত, তখন
মর মনে হইত যেন নদীর ঢেউগুলি সবাই
লিয়া হাত তুলিয়া তাহাকে কুসীখুসীরাক্কুসী
লয়া ডাকাডাকি করিত।

বর্ষার আরম্ভে গঙ্গা যেমন প্রতিদিন
খিতে দেখিতে ভরিয়া উঠে, কুসুম তেমনি
খিতে দেখিতে প্রতিদিন সৌন্দর্য্যে যৌবনে
রিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু তাহার মলিন
ন, করুণ মুখ, শান্ত স্বভাবে তাহার যৌবনের
র এমন একটি ছায়াময় আবরণ রচনা
রিয়া দিয়াছিল যে, সে যৌবন সে বিকশিত
সাধারণের চখে পড়িত না। কুসুম যে বড়
য়াছে এ যেন কেহ দেখিতে পাইত না।
মি ত পাইতাম না। আমি কুসুমকে সেই
লকাটির চেয়ে বড় কখন দেখি নাই।
হার মল ছিল না বটে, কিন্তু সে যখনি চলিত
মি সেই মলের শব্দ শুনিতে পাইতাম।
নি করিয়া দশবৎসর কখন্ কাটিয়া গেল
য়র লোকেরা কেহ যেন জানিতেও পারিল

এই আজ যেমন দেখিতেছি, সে বৎসরেও
মাসের শেষাশেষি এমনি এক দিন
সিয়াছিল। তোমাদের প্রপিতামহীরা সে
সকালে উঠিয়া এমনিতর মধুর সূর্য্যের
লো দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহারা
ন এতখানি ঘোমটা টানিয়া কলসী তুলিয়া
য়া আমার উপরে প্রভাতের আলো আরো
লোকময় করিবার জন্ত গাছপালার মধ্য দিয়া
মর উচুনিচু রাস্তার ভিতর দিয়া গল্প করিতে
তে চলিয়া আসিতেন, তখন তোমাদের
বনাও তাঁহাদের মনের একপার্শ্বে উদিত

হইত না। তোমরা যেমন ঠিক মনে করিতে
পার না, তোমাদের দিদিমারাও সত্য
সত্যই একদিন খেলা করিয়া বেড়াইতেন,
আজিকার দিন যেমন সত্য যেমন
জীবন্ত সেদিনও ঠিক তেমনি সত্য ছিল,
তোমাদের মত তরুণ হৃদয়খানি লইয়া
সুখে দুঃখে তাঁহারা তোমাদের মত টলমল
করিয়া দুলিয়াছেন, তেমনি আজিকার এই
শরতের দিন,—তাঁহারাহীন, তাঁহাদের সুখ
দুঃখের স্মৃতিলেশমাত্রহীন আজিকার এই
শরতের সূর্য্যকরোজ্জ্বল আনন্দচ্ছবি তাঁহাদের
কল্পনার নিকটে তদপেক্ষাও অগোচর ছিল।

সেই দিন ভোর হইতে প্রথম উত্তরের
বাতাস অল্প অল্প করিয়া বহিতে আরম্ভ করিয়া
ফুটন্ত বাবলা ফুলগুলি আমার উপরে এক
আধটা উড়াইয়া ফেলিতেছিল। আমার
পাষাণের উপরে একটু একটু শিশিরের রেখা
পড়িয়াছিল। সেই দিন সকালে কোথা হইতে
গৌরতনু সৌম্যোজ্জ্বলমুখচ্ছবি দীর্ঘকায় এক
নবীন সন্ন্যাসী আসিয়া আমার সম্মুখস্থ ঐ শিব-
মন্দিরে আশ্রয় লইলেন। সন্ন্যাসীর আগমন-
বার্ত্তা গ্রামে রাষ্ট্র হইয়াপড়িল। মেয়েরা
কলসী রাখিয়া বাবাঠাকুরকে প্রণাম করিবার
জন্য মন্দিরে গিয়া ভিড় করিল।

ভিড় প্রতিদিন বাড়িতে লাগিল। একে
সন্ন্যাসী, তাহাতে অনুপম রূপ, তাহাতে তিনি
কাহাকেও অবহেলা করিতেন না, ছেলেদের
কোলে লইয়া বসাইতেন, জননীদিগকে ঘর-
কন্নার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। নারী সমাজে
অল্প কালের মধ্যেই তাঁহার অত্যন্ত প্রতিপত্তি
হইল। তাঁহার কাছে পুরুষও বিস্তর আসিত।
কোন দিন ভাগবত পাঠ করিতেন কোন দিন
ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা করিতেন, কোন দিন
মন্দিরে বসিয়া নানা শাস্ত্র লইয়া আন্দোলন

করিতেন। তাঁহার নিকটে কেহ উপদেশ লইতে আসিত, কেহ মন্ত্র লইতে আসিত। কেহ রোগের ঔষধ জানিতে আসিত,—আহা, কি রূপ! মনে হয় যেন মহাদেব সশরীরে তাঁহার মন্দিরে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

যখন সন্ন্যাসী প্রতিদিন প্রত্যূষে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শুকতারাকে সম্মুখে রাখিয়া গঙ্গার জলে নিমগ্ন করিয়া ধীরগম্ভীর স্বরে সন্ধ্যাবন্দনা করিতেন, তখন আমি জলের কল্লোল শুনিতে পাইতাম না। তাঁহার সেই কণ্ঠস্বর শুনিতে শুনিতে প্রতিদিন গঙ্গার পূর্ব্ব উপকূলের আকাশ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিত, মেঘের ধারে ধারে অরুণ রঙের রেখা পড়িত, অন্ধকার যেন বিকাশোন্মুখ কুঁড়ির আবরণ-পটের মত ফাটিয়া চারিদিকে নামিয়া পড়িত ও আকাশ সরোবরে উষা-কুসুমের লাল আভা অল্প অল্প করিয়া বাহির হইয়া থাকিত। ক্রমে গাছের প্রান্তগুলি আকাশে ফুটিতে থাকিত, বাতাস জাগিত, আকাশের বর্ণ শুভ্র হইয়া আসিত, অবশেষে নেপথ্য হইতে বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরাল হইতে প্রাতঃস্নাত বিমল সূর্য্য ধীরে ধীরে সোপানে সোপানে আকাশে উত্থান করিতে থাকিত। আমার মনে হইত যে, এই মহাপুরুষ গঙ্গার জলে দাঁড়াইয়া পূর্ব্বের দিকে চাহিয়া যে এক মহামন্ত্র পাঠ করেন তাহারই এক একটি করিয়া শব্দ উচ্চারিত হইতে থাকে নিশীথিনীর কুহক ভাঙ্গিয়া যায়, চন্দ্র তারা পশ্চিমে নামিয়া পড়ে, সূর্য্য পূর্ব্বাকাশে উঠিতে থাকে, জগতের দৃশ্যপট পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এ কে মায়াবী! স্নান করিয়া যখন সন্ন্যাসী হোমশিখার ন্যায় তাঁহার দীর্ঘ শুভ্র পুণ্যতনু লইয়া জল হইতে উঠিতেন, তাঁহার জটাজুট হইতে জল ঝরিয়া পড়িত, তখন নবীন সূর্য্যকিরণ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে পড়িয়া প্রতিফলিত হইতে থাকিত।

এমন আরও কয়েক মাস কাটিয়া গেল চৈত্রমাসে সূর্য্যগ্রহণের সময় বিস্তর লোক গঙ্গা স্নানে আসিল। বাব্‌লা তলায় মস্ত হা[illegible] বসিল। এই উপলক্ষে সন্ন্যাসীকে দেখিবা[illegible] জন্যও লোক সমাগম হইল। যে গ্রা[illegible] কুসুমের শ্বশুড়বাড়ি সেখান হইতেও অনেক গুলি মেয়ে আসিয়াছিল।

সকালে আমার ধাপে বসিয়া সন্ন্যাসী জ[illegible] করিতেছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়াই সহসা একজ[illegible] মেয়ে আরেক জনের গা টিপিয়া বলিয়া উঠি[illegible] "ওলো এ যে আমাদের কুসুমের স্বামী!

আর একজন দুই আঙ্গুলে ঘোমটা কিছু ফাঁ[illegible] করিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—ওমা তাইত গা[illegible] "এ যে আমাদের চাটুয্যেদের বাড়ির ছো[illegible] দাদা বাবু।" আর একজন ঘোমটার বড় ঘট[illegible] করিত না, সে কহিল—"আহা, তেম্‌নি কপা[illegible] তেমনি নাক, তেমনি চোক্।"

আর একজন সন্ন্যাসীর দিকে মনোযো[illegible] না করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কলসী দিয়া জ[illegible] ঠেলিয়া বলিল, "আহা, সে কি আর আছে[illegible] সে কি আর আস্‌বে। কুসুমের কি তেমনি কপাল!"

তখন কেহ কহিল "তার এত দাড়ি ছিল না।"

কেহ বলিল "সে এমন একহারা ছিল না।"

কেহ কহিল—"সে যেন এতটা লম্বা নয়।"

এরূপে এই কথাটার একরূপ নিষ্পত্তি হইয়া গেল, আর উঠিতে পাইল না।

গ্রামের আর সকলেই সন্ন্যাসীকে দেখিয়াছিল, কেবল কুসুম দেখে নাই। অধিক লোক সমাগম হওয়াতে কুসুম আমার কাছে আসা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিল। একদিন সন্ধ্যাবেলা পূর্ণিমাতিথিতে চাঁদ উঠিতে দেখিয়া বুঝি আমাদের পুরাতন সম্বন্ধ তাহার মনে পড়িল।

তখন ঘাটে আর কেহ লোক ছিল না। ঝিঁ ঝিঁ পোকা ঝিঁ ঝিঁ করিতেছিল! মন্দিরের কাঁশর ঘণ্টা বাজা এই কিছুক্ষণ হইল শেষ হইয়া গেল—তাহার শেষ শব্দতরঙ্গ ক্ষীণতর হইয়া পরপারের ছায়াময় বনশ্রেণীর মধ্যে ছায়ার মত মিলাইয়া গেছে। পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না। জোয়ারের জল ছল্‌ছল্ করিতেছে। আমার উপরে ছায়াটি ফেলিয়া কুসুম বসিয়া আছে। বাতাস বড় ছিল না, গাছপালা নিস্তব্ধ। কুসুমের সম্মুখে গঙ্গার বক্ষে অবারিত প্রসারিত জ্যোৎস্না—কুসুমের পশ্চাতে আশেপাশে ঝোপে ঝাপে গাছে পালায়, মন্দিরের ছায়ায়, ভাঙ্গাঘরের ভিত্তিতে পুষ্করিণীর ধারে, তালবনে অন্ধকার গা ঢাকা দিয়া মুখে মুড়ি দিয়া বসিয়া আছে। ছাতিম গাছের শাখায় বাদুড় ঝুলিতেছে৷ মন্দিরের চূড়ায় বসিয়া পেচক কাঁদিয়া উঠিতেছে। লোকালয়ের কাছে শৃগালের উর্দ্ধচীৎকারধ্বনি উঠিল ও থামিয়া গেল।

সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে মন্দিরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। ঘাটে আসিয়া দুই এক সোপান নামিয়া একাকিনী রমণীকে দেখিয়া ফিরিয়া যাইবেন মনে করিতেছেন—এমন সময়ে সহসা কুসুম মুখ তুলিয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল।

তাহার মাথার উপর হইতে কাপড় পড়িয়া গেল। উর্দ্ধমুখ ফুটন্ত ফুলের উপরে যেমন জ্যোৎস্না পড়ে, মুখ তুলিতেই কুসুমের মুখের উপরে তেমনি জ্যোৎস্না পড়িল। সেই মুহূর্ত্তেই উভয়ের দেখা হইল। যেন চেনা শোনা হইল। মনে হইল যেন পূর্ব্বজন্মের পরিচয় ছিল। মুহূর্ত্তের জন্ম উভয়ের চিত্রার্পিতের মত ভাব দেখিয়া, আমার উপরে জ্যোৎস্নালোকে উভয়ের যে ছায়া পড়িয়াছিল সেই ছায়ায় ছায়ায় ক্ষণেকের জন্ম স্থিরভাবে একত্র মিলন দেখিয়া আমার এইরূপ মনে হইল—ইহা আমার কল্পনাও হইতে পারে।

মাথার উপর দিয়া পেচক ডাকিয়া চলিয়া গেল। শব্দে সচকিত হইয়া, আত্মসম্বরণ করিয়া কুসুম মাথার কাপড় তুলিয়া দিল। উঠিয়া সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে লুটাইয়া প্রণাম করিল।

সন্ন্যাসী আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি।

কুসুম কহিল—"আমার নাম কুসুম।"

সে রাত্রে আর কোন কথা হইল না। কুসুমের ঘর খুব কাছেই ছিল, কুসুম ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। সে রাত্রে সন্ন্যাসী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমার সোপানে বসিয়াছিলেন। অবশেষে যখন পূর্ব্বের চাঁদ পশ্চিমে আসিল, সন্ন্যাসীর পশ্চাতের ছায়া সম্মুখে আসিয়া পড়িল, তখন তিনি উঠিয়া মন্দিরে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

তাহার পরদিন হইতে আমি দেখিতাম কুসুম প্রত্যহ আসিয়া সন্ন্যাসীর পদধূলি লইয়া যাইত। সন্ন্যাসী যখন শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতেন তখন সে একধারে দাঁড়াইয়া শুনিত। সন্ন্যাসী প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন করিয়া কুসুমকে ডাকিয়া তাহাকে ধর্ম্মের কথা বলিতেন। সব কথা সে কি বুঝিতে পারিত! কিন্তু অত্যন্ত মনোযোগের সহিত সে চুপ করিয়া বসিয়া শুনিত—সে বুঝিতে চেষ্টা করিত। সন্ন্যাসী তাহাকে যেমন উপদেশ করিতেন সে অবিকল তাহাই পালন করিত। প্রত্যহ সে মন্দিরের কাজ করিত—দেবসেবায় আলস্য করিত না—পূজার ফুল তুলিত—গঙ্গা হইতে জল তুলিয়া মন্দির ধৌত করিত।

সন্ন্যাসী তাহাকে যে সকল কথা বলিয়া

দিতেন, আমার সোপানে বসিয়া সে তাহাই ভাবিত। ধীরে ধীরে তাহার যেন দৃষ্টি প্রসারিত হইয়া গেল হৃদয় উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল সে যাহা দেখে নাই তাহা দেখিতে লাগিল, যাহা শোনে নাই তাহা শুনিতে লাগিল। তাহার প্রশান্ত মুখে যে একটি ম্লান ছায়া ছিল, তাহা দূর হইয়া গেল, শিশির ধৌত পূজার ফুলের মত তাহাকে পবিত্র দেখাইতে লাগিল—এমন কি, সে যখন ভক্তিভরে প্রভাতে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িত, তখন তাহাকে দেবতার নিকটে উৎসর্গীকৃত ফুলের মতই দেখাইত। একটি সুবিমল প্রফুল্লতা তাহার সর্ব্বশরীর আলো করিয়া তুলিল।

শীতকালের এই অবসান সময়ে শীতের বাতাস বয়, আবার এক একদিন সন্ধ্যাবেলায় সহসা দক্ষিণ হইতে বসন্তের বাতাস দিতে থাকে। আকাশে হিমের ভাব একেবারে দূর হইয়া যায়—অনেক দিন পরে গ্রামের মধ্যে বাঁশি বাজিয়া উঠে, গানের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। মাঝিরা স্রোতে নৌকা ভাসাইয়া দাঁড় বন্ধ করিয়া শ্যামের গান গাহিতে থাকে। শাখা হইতে শাখান্তরে পাখীরা সহসা পরম উল্লাসে উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে আরম্ভ করে। সময়টা এইরূপ আসিয়াছে।

বসন্তের বাতাস লাগিয়া আমার পাষাণ হৃদয়ের মধ্যে অল্পে অল্পে যেন যৌবনের সঞ্চার হইতেছে; আমার প্রাণের ভিতরকার সেই নবযৌবনোচ্ছ্বাস আকর্ষণ করিয়াই যেন আমার লতাগুল্ম গুলি দেখিতে দেখিতে ফুলে ফুলে একেবারে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। এ সময়ে কুসুমকে আর দেখিতে পাই না। কিছু দিন হইতে সে আর মন্দিরেও আসে না, ঘাটেও আসে না, সন্ন্যাসীর কাছে তাহাকে আর দেখা যায় না।

ইতিমধ্যে কি হইল আমি কিছুই জানিতে পারি নাই। কিছুকাল পরে একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমারই সোপানে সন্ন্যাসীর সহিত কুসুমের সাক্ষাৎ হইল।

কুসুম মুখ নত করিয়া কহিল, "প্রভু, আমাকে কি ডাকিতে পাঠাইয়াছেন?"

হাঁ; তোমাকে দেখিতে পাই না কেন? "আজ কাল দেবসেবায় তোমার এত অবহেলা কেন!"

কুসুম চুপ করিয়া রহিল।

"আমার কাছে তোমার মনের কথা প্রকাশ করিয়া বল।" কুসুম ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া কহিল —"প্রভু, আমি পাপীয়সী সেই জন্যই এ অবহেলা!"

সন্ন্যাসী অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "কুসুম, তোমার হৃদয়ে অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে, আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি।"

কুসুম একটু যেন চমকিয়া উঠিল—সে হয় ত মনে করিল, সন্ন্যাসী কতটা না জানি বুঝিয়াছেন! তাহার চোখ অল্পে অল্পে জলে ভরিয়া আসিল—সে সেইখানে বসিয়া পড়িল; মুখে আঁচল ঢাকিয়া সোপানে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল!

সন্ন্যাসী কিছু দূরে সরিয়া গিয়া কহিলেন, তোমার অশান্তির কথা আমাকে সমস্ত ব্যক্ত করিয়া বল আমি তোমাকে শান্তির পথ দেখাইয়া দিব!"

কুসুম অটল ভক্তির স্বরে কহিল, কিন্তু মাঝে মাঝে থামিল, মাঝে মাঝে কথা বাধিয়া গেল—"আপনি আদেশ করেন ত অবশ্য বলিব। তবে, আমি ভাল করিয়া বলিতে পারিব না, কিন্তু আপনি বোধ করি মনে মনে সকলই জানিতেছেন। প্রভু আমি এক জনকে দেবতার মত ভক্তি করিতাম, আমি তাহাকে পূজা

করিতাম, সেই আনন্দে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম যেন তিনি আমার হৃদয়ের স্বামী, কোথায় যেন একটি বকুল বনে বসিয়া তাঁহার বামহস্তে আমার দক্ষিণ হস্ত লইয়া আমাকে তিনি প্রেমের কথা বলিতেছেন। এ ঘটনা আমার কিছুই অসম্ভব কিছুই আশ্চর্য্য মনে হইল না। স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, তবু স্বপ্নের ঘোর ভাঙ্গিল না। তাহার পরদিন যখন তাহাকে দেখিলাম আর পূর্ব্বের মত দেখিলাম না। মনে সেই স্বপ্নের ছবিই উদয় হইতে লাগিল। ভয়ে দূরে পলাইলাম কিন্তু সে ছবি আমার সঙ্গে সঙ্গে রহিল। সেই অবধি আমার হৃদয়ের অশান্তি আর দূর হয় না—আমার সমস্ত অন্ধকার হইয়া গেছে!"

যখন কুসুম অশ্রু মুছিয়া মুছিয়া এই কথাগুলি বলিতেছিল, তখন আমি অনুভব করিতেছিলাম সন্ন্যাসী সবলে তাঁহার দক্ষিণ পদতল দিয়া আমার পাষাণ চাপিয়াছিলেন।

কুসুমের কথা শেষ হইলে সন্ন্যাসী কহিলেন, "যাহাকে স্বপ্ন দেখিয়াছ, সে কে বলিতে হইবে।"

কুসুম যোড়হাতে কহিল, "তাহা বলিতে পারিব না।" সন্ন্যাসী কহিলেন "তোমার মঙ্গলের জন্ম জিজ্ঞাসা করিতেছি, সে কে স্পষ্ট করিয়া বল।

কুসুম সবলে নিজের কোমল হাত দুটি পীড়ন করিয়া হাতযোড় করিয়া বলিল, "নিতান্ত সে কি বলিতেই হইবে।"

সন্ন্যাসী কহিলেন "হাঁ বলিতেই হইবে।"

কুসুম তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, প্রভু, সে তুমি!"

যেমনি তাহার নিজের কথা তাহার নিজের কাণে গিয়া পৌঁছিল, অমনি সে মূর্চ্ছিত হইয়া আমার কঠিন কোলে পড়িয়া গেল। সন্ন্যাসী প্রস্তরের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

যখন মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া কুসুম উঠিয়া বসিল, তখন সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে কহিলেন—"তুমি আমার সকল কথাই পালন করিয়াছ; আর একটি কথা বলিব পালন করিতে হইবে। আমি আজই এখান হইতে চলিলাম, আমার সঙ্গে তোমার দেখা না হয়। আমাকে তোমার ভুলিতে হইবে। বল, এই সাধনা করিবে।" কুসুম উঠিয়া দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসীর মুখের পানে চাহিয়া ধীর স্বরে কহিল "প্রভু তাহাই হইবে!"

সন্ন্যাসী কহিলেন—"তবে আমি চলিলাম।"

কুসুম আর কিছু না বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইল। সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন।

কুসুম কহিল "তিনি আদেশ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাকে ভুলিতে হইবে।" বলিয়া ধীরে ধীরে গঙ্গার জলে নামিল।

এতটুকু বেলা হইতে সে এই জলের ধারে কাটাইয়াছে, শ্রান্তির সময়ে এ জল যদি তাহাকে হাত বাড়াইয়া কোলে করিয়া না লইবে, তবে আর কে লইবে! চাঁদ অস্ত গেল, রাত্রি ঘোর অন্ধকার হইল। জলের শব্দ শুনিতে পাইলাম, আর কিছু দেখিতে পাইলাম না। অন্ধকারে বাতাস হুহু করিতে লাগিল; পাছে তিলমাত্র কিছু দেখা যায় বলিয়া সে যেন ফুঁ দিয়া আকাশের তারাগুলিকে নিবাইয়া দিতে চায়!

আমার কোলে যে খেলা করিত সে আজ তাহার খেলা সমাপন করিয়া আমার কোল হইতে কোথায় সরিয়া গেল জানিতে পারিলাম না।

রাজপথের কথা।

আমি রাজপথ। অহল্যা যেমন মুনির শাপে পাষাণ হইয়া পড়িয়াছিল, আমিও যেন তেমনি কাহার শাপে চিরনিদ্রিত সুদীর্ঘ অজগর সর্পের ন্যায় অরণ্য পর্ব্বতের মধ্য দিয়া, বৃক্ষশ্রেণীর ছায়া দিয়া, সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের বক্ষের উপর দিয়া, দেশদেশান্তর বেষ্টন করিয়া বহুদিন ধরিয়া জড়শয়নে শয়ান রহিয়াছি। অসীম ধৈর্য্যের সহিত ধূলায় লুটাইয়া শাপান্ত কালের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছি। আমি চিরদিন স্থির অবিচল, চিরদিন একইভাবে শুইয়া আছি, কিন্তু তবুও আমার এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্রাম নাই। এতটুকু বিশ্রাম নাই যে, আমার এই কঠিন শুষ্ক শয্যার উপরে একটি মাত্র কচি স্নিগ্ধশ্যামল ঘাস উঠাইতে পারি; এতটুকু সময় নাই যে আমার শিয়রের কাছে অতি ক্ষুদ্র একটি নীলবর্ণের বনফুল ফুটাইতে পারি! কথা কহিতে পারি না, অথচ অন্ধভাবে সকলি অনুভব করিতেছি। রাত্রিদিন পদশব্দ; কেবলি পদশব্দ। আমার এই গভীর জড়নিদ্রার মধ্যে লক্ষ লক্ষ চরণের শব্দ অহর্নিশি দুঃস্বপ্নের ন্যায় আবর্ত্তিত হইতেছে। আমি চরণের স্পর্শে হৃদয় পাঠ করিতে পারি। আমি বুঝিতে পারি, কে গৃহে যাইতেছে, কে বিদেশে যাইতেছে, কে কাজে যাইতেছে, কে বিশ্রামে যাইতেছে, কে উৎসবে যাইতেছে, কে শ্মশানে যাইতেছে। যাহার সুখের সংসার আছে, স্নেহের ছায়া আছে, সে প্রতি পদক্ষেপে সুখের ছবি আঁকিয়া আঁকিয়া চলে; সে প্রতি পদক্ষেপে মাটিতে আশার বীজ রোপিয়া রোপিয়া যায়, মনে হয় যেখানে যেখানে তাহার পা পড়িয়াছে, সেখানে যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে একেকটি করিয়া লতা অঙ্কুরিত পুষ্পিত হইয়া উঠিবে। যাহার গৃহ নাই আশ্রয় নাই, তাহার পদক্ষেপের মধ্যে আশা নাই অর্থ নাই, তাহার পদক্ষেপের দক্ষিণ নাই বাম নাই, তাহার চরণ যেন বলিতে থাকে, আমি চলিই বা কেন থামিই বা কেন, তাহার পদক্ষেপে আমার শুষ্কধূলি যেন আরও শুকাইয়া যায়।

পৃথিবীর কোন কাহিনী আমি সম্পূর্ণ শুনিতে পাই না। আজ শতশত বৎসর ধরিয়া আমি কত লক্ষ লোকের কত হাসি কত গান কত কথা শুনিয়া আসিতেছি; কিন্তু কেবল খানিকটা মাত্র শুনিতে পাই। বাকিটুকু শুনিবার জন্য যখন আমি কাণ পাতিয়া থাকি, তখন দেখি সে লোক আর নাই। এমন কত বৎসরের কত ভাঙ্গা কথা ভাঙ্গা গান আমার ধূলির সহিত ধূলি হইয়া গেছে, আমার ধূলির সহিত উড়িয়া বেড়ায়, তাহা কি কেহ জানিতে পায়! ঐ শুন, একজন গাহিল, "তারে বলি বলি আর বলা হল না"—আহা, একটু দাঁড়াও, গানটা শেষ করিয়া যাও, সব কথাটা শুনি! কই আর দাঁড়াইল! গাহিতে গাহিতে কোথায় চলিয়া গেল, শেষটা শোনা গেল না। ঐ একটি মাত্র পদ অর্দ্ধেক রাত্রি ধরিয়া আমার কাণে ধ্বনিত হইতে থাকিবে। মনে মনে ভাবিব, ও কে গেল! কোথায় যাইতেছে না জানি! যে কথাটা বলা হইল না, তাহাই কি আবার বলিতে যাইতেছে! এবার যখন পথে আবার দেখা হইবে, সে যখন মুখ তুলিয়া ইহার মুখের দিকে চাহিবে, তখন বলি বলি করিয়া আবার যদি বলা না হয়! তখন নত শির করিয়া মুখ ফিরাইয়া অতি ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিবার

সময় আবার যদি গায় "তারে বলি বলি আর বলা হল না।"

সমাপ্তি ও স্থায়িত্ব হয়ত কোথাও আছে, কিন্তু আমিত দেখিতে পাই না। একটি চরণ-চিহ্নও ত আমি বেশীক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারি না। অবিশ্রাম চিহ্ন পড়িতেছে, আবার নূতন পদ আসিয়া অন্য পদের চিহ্ন মুছিয়া যাইতেছে। যে চলিয়া যায় সে ত পশ্চাতে কিছু রাখিয়া যায় না, যদি তাহার মাথার বোঝা হইতে কিছু পড়িয়া যায় সহস্র চরণের তলে অবিশ্রাম দলিত হইয়া কিছুক্ষণেই তাহা ধূলিতে মিশাইয়া যায়। তবে এখানেও দেখিয়াছি বটে, কোন কোন মহাজনের পুণ্য-স্তূপের মধ্য হইতে এমন সকল অমর বীজ পড়িয়া গেছে, যাহা ধূলিতে পড়িয়া অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইয়া আমার পার্শ্বে স্থায়ীরূপে বিরাজ করিতেছে, এবং নূতন পথিকদিগকে ছায়া দান করিতেছে।

আমি কাহারও লক্ষ্য নহি, আমি সকলের উপায় মাত্র। আমি কাহারও গৃহ নহি, আমি সকলকে গৃহে লইয়া যাই। আমার অহরহ এই শোক, আমাতে কেহ চরণ রাখে না, আমার উপরে কেহ দাঁড়াইতে চাহে না। যাহা-দের গৃহ সুদূরে অবস্থিত, তাহারা আমাকেই অভিশাপ দেয়, আমি যে পরম ধৈর্য্যে তাহা-দিগকে গৃহের দ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিই তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা কই পাই। গৃহে গিয়া বিরাম, গৃহে গিয়া আনন্দ, গৃহে গিয়া সুখ-সম্মিলন, আর আমার উপরে কেবল শ্রান্তির ভার, কেবল অনিচ্ছাকৃত শ্রম, কেবল বিচ্ছেদ। কেবল কি সুদূর হইতে, গৃহবাতায়ন হইতে মধুর হাস্যলহরী পাখা তুলিয়া সূর্য্যালোকে বাহির হইয়া আমার কাছে আসিবামাত্র সচকিতে শূন্যে মিলাইয়া যাইবে। গৃহের সেই আনন্দের কণা আমি একটুখানি পাইব না।

কখন কখন তাহাও পাই। বালক বালি-কারা হাসিতে হাসিতে কলরব করিতে করিতে আমার কাছে আসিয়া খেলা করে। তাহাদের গৃহের আনন্দ তাহারা পথে লইয়া আসে। তাহাদের পিতার আশীর্ব্বাদ মাতার স্নেহ গৃহ হইতে বাহির হইয়া পথের মধ্যে আসিয়াও যেন গৃহ রচনা করিয়া দেয়! আমার ধূলিতে তাহারা স্নেহ দিয়া যায়। আমার ধূলিকে তাহারা রাশীকৃত করে, ও তাহাদের ছোট ছোট হাতগুলি দিয়া সেই স্তূপকে মৃদু মৃদু আঘাত করিয়া পরম স্নেহে ঘুম পাড়াইতে চায়। বিমল হৃদয় লইয়া বসিয়া বসিয়া তাহার সহিত কথা কয়। হায় হায়, এত স্নেহ পাইয়াও সে তাহার উত্তর দিতে পারে না।

ছোট ছোট কোমল পা-গুলি যখন আমার উপর দিয়া চলিয়া যায়, তখন আপনাকে বড় কঠিন বলিয়া মনে হয়; মনে হয় উহাদের পায়ে বাজিতেছে। কুসুমের দলের ন্যায় কোমল হইতে সাধ যায়। রাধিকা বলিয়া-ছেন—

"যাঁহা যাঁহা অরুণ-চরণ চলি যাতা,
তাঁহা তাঁহা ধরণী হই এ মঝু গাতা।"

অরুণ চরণগুলি এমন কঠিন ধরণীর উপরে চলে কেন! কিন্তু তা' যদি না চলিত, তবে বোধ করি কোথাও শ্যামল তৃণ জন্মিত না!

প্রতিদিন যাহারা নিয়মিত আমার উপরে চলে, তাহাদিগকে আমি বিশেষরূপে চিনি। তাহারা জানে না তাহাদের জন্য আমি প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। আমি মনে মনে তাহাদের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া লইয়াছি। বহু দিন হইল, এমনি একজন কে তাহার কোমল চরণ দুখানি লইয়া প্রতিদিন অপরাহ্নে বহুদূর হইতে আসিত

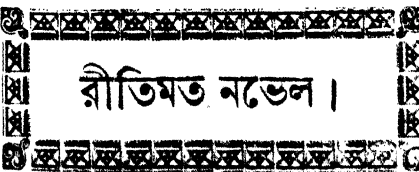
—ছোট দুটি নূপুর রুণুঝুনু করিয়া তাহার পায়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাজিত। বুঝি তাহার ঠোঁট দুটি কথা কহিবার ঠোঁট নহে, বুঝি তাহার বড় বড় চোখ দুটি সন্ধ্যার আকাশের মত বড় ম্লান ভাবে মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। যেখানে ঐ বাঁধান বটগাছের বামদিকে আমার একটি শাখা লোকালয়ের দিকে চলিয়া গেছে, সেখানে সে শ্রান্তদেহে গাছের তলায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত! আর এক জন কে দিনের কাজ সমাপন করিয়া অন্য মনে গান গাহিতে গাহিতে সেই সময়ে লোকালয়ের দিকে চলিয়া যাইত। সে বোধ করি, কোন দিকে চাহিত না, কোনখানে দাঁড়াইত না—হয় ত বা আকাশের তারার দিকে চাহিত, তাহার গৃহের দ্বারে গিয়া পূরবী গান সমাপ্ত করিত। সে চলিয়া গেলে বালিকা শ্রান্তপদে আবার যে পথ দিয়া আসিয়াছিল, সেই পথে ফিরিয়া যাইত। বালিকা যখন ফিরিত তখন জানিতাম অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে; সন্ধ্যার অন্ধকার-হিম-স্পর্শ সর্ব্বাঙ্গে অনুভব করিতে পারিতাম। তখন গোধূলির কাকের ডাক একেবারে থামিয়া যাইত; পথিকেরা আর বড় কেহ চলিত না। সন্ধ্যার বাতাসে থাকিয়া থাকিয়া বাঁশবন ঝর্‌ঝর্‌ ঝর্‌ঝর্‌ শব্দ করিয়া উঠিত। এমন কতদিন, এমন প্রতিদিন, সে ধীরে ধীরে আসিত ধীরে ধীরে যাইত। একদিন ফাল্গুন মাসের শেষাশেষি অপরাহ্ণে যখন বিস্তর আম্রমুকুলের কেশর বাতাসে ঝরিয়া পড়িতেছে—তখন আর একজন যে আসে সে আর আসিল না। সে দিন অনেক রাত্রে বালিকা বাড়িতে ফিরিয়া গেল। যেমন মাঝে মাঝে গাছ হইতে শুষ্ক পাতা ঝরিয়া পড়িতেছিল, তেমনি মাঝে মাঝে দুই এক ফোঁটা অশ্রুজল আমার নীরস তপ্ত ধূলির উপরে পড়িয়া মিলাইতেছিল। আবার তাহার পরদিন অপরাহ্ণে বালিকা সেইখানে সেই তরুতলে আসিয়া দাঁড়াইল কিন্তু সে দিনও আর একজন আসিল না। আবার রাত্রে সে ধীরে ধীরে বাড়িমুখে ফিরিল। কিছু দূরে গিয়া আর সে চলিতে পারিল না। আমার উপরে ধূলির উপরে লুটাইয়া পড়িল। দুই বাহুতে মুখ ঢাকিয়া বুক ফাটিয়া কাঁদিতে লাগিল! কে গো মা, আজি এই বিজন রাত্রে আমার বক্ষেও কি কেহ আশ্রয় লইতে আসে! তুই যাহার কাছ হইতে ফিরিয়া আসিলি সে কি আমার চেয়েও কঠিন! তুই যাহাকে ডাকিয়া যাহার সাড়া পাইলি না সে কি আমার চেয়েও মূক! তুই যাহার মুখের পানে চাহিলি সে কি আমার চেয়েও অন্ধ! বালিকা উঠিল, দাঁড়াইল, চোখ মুছিল—পথ ছাড়িয়া পার্শ্ববর্ত্তী বনের মধ্যে চলিয়া গেল। হয় ত সে গৃহে ফিরিয়া গেল, হয়ত এখনো সে প্রতিদিন শান্তমুখে গৃহের কাজ করে—হয় ত সে কাহাকেও কোন দুঃখের কথা বলে না; কেবল এক এক দিন সন্ধ্যাবেলায় গৃহের অঙ্গনে চাঁদের আলোতে পা ছড়াইয়া বসিয়া থাকে, কেহ ডাকিলেই আবার তখনই চমকিয়া উঠিয়া ঘরে চলিয়া যায়। কিন্তু তাহার পরদিন হইতে আজ পর্য্যন্তও আমি আর তাহার চরণস্পর্শ অনুভব করি নাই।

এমন কত পদশব্দ নীরব হইয়া গেছে, আমি কি এত মনে করিয়া রাখিতে পারি! কেবল সেই পায়ের করুণ নূপুরধ্বনি এখনও মাঝে মাঝে মনে পড়ে। কিন্তু আমার কি আর একদণ্ড শোক করিবার অবসর আছে! শোক কাহার জন্য করিব। এমন কত আসে কত যায়!

কি প্রখর রৌদ্র! উহু-হুহু! এক একবার

নিশ্বাস ফেলিতেছি আর তপ্তধূলা সুনীল আকাশ ধূসর করিয়া উড়িয়া যাইতেছে। ধনী দরিদ্র, সুখী দুঃখী, জরা যৌবনে, হাসি-কান্না, জন্ম মৃত্যু সমস্তই আমার উপর দিয়া একই নিশ্বাসে ধূলির স্রোতের মত উড়িয়া চলিয়াছে। এই জন্য পথের হাসিও নাই কান্নাও নাই। গৃহই অতীতের জন্য শোক করে, বর্ত্তমানের জন্য ভাবে, ভবিষ্যতের আশা-পথ চাহিয়া থাকে। কিন্তু পথ প্রতি বর্ত্তমান নিমেষের শত সহস্র নূতন অভ্যাগতকে লইয়াই ব্যস্ত। এমন স্থানে নিজের পদগৌরবের প্রতি বিশ্বাস করিয়া অত্যন্ত সদর্পে পদক্ষেপ করিয়া কে নিজের চির-চরণ-চিহ্ন রাখিয়া যাইতে প্রয়াস পাইতেছে! এখানকার বাতাসে যে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া যাইতেছ, তুমি চলিয়া গেলে কি, তাহারা তোমার পশ্চাতে পড়িয়া তোমার জন্য বিলাপ করিতে থাকিবে, নূতন অতিথিদের চক্ষে অশ্রু আকর্ষণ করিয়া আনিবে? বাতাসের উপরে বাতাস কি স্থায়ী হয়? না না বৃথা চেষ্টা! আমি কিছুই পড়িয়া থাকিতে দিই না, হাসিও না, কান্নাও না। আমিই কেবল পড়িয়া আছি।

—:*:—



রীতিমত নভেল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—•:*:•—

"আল্লা হো আকবর" শব্দে রণভূমি প্রতি-ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। একদিকে তিন লক্ষ যবন সেনা, অন্যদিকে তিন সহস্র আর্য্য সৈন্য। বন্যার মধ্যে একাকী অশ্বত্থ বৃক্ষের মত হিন্দু-বীরগণ সমস্ত রাত্রি এবং সমস্ত দিন যুদ্ধ করিয়া অটল দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু এইবার ভাঙ্গিয়া পড়িবে তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এবং সেই সঙ্গে ভারতের জয়ধ্বজা ভূমিসাৎ হইবে, এবং আজিকার ঐ অস্তাচলবর্ত্তী সহস্ররশ্মির সহিত হিন্দুস্থানের গৌরবসূর্য্য চিরদিনের মত অস্তমিত হইবে।

হর হর বোম্ বোম্! পাঠক, বলিতে পার, কে ঐ দৃপ্ত যুবা পঁয়ত্রিশ জন মাত্র অনুচর লইয়া মুক্ত অসি হস্তে অশ্বারোহণে ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর করনিক্ষিপ্ত দীপ্ত বজ্রের ন্যায় শত্রুসৈন্যের উপরে আসিয়া পতিত হইল! বলিতে পার, কাহার প্রতাপে এই অগণিত যবন সৈন্য প্রচণ্ড বাত্যাহত অরণ্যানীর ন্যায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। কাহার বজ্র-মন্দ্রিত "হর হর বোম্ বোম্" শব্দে তিন লক্ষ ম্লেচ্ছকণ্ঠের "আল্লা হো আকবর" ধ্বনি নিমগ্ন হইয়া গেল, কাহার উদ্যত অসির সম্মুখে ব্যাঘ্র-আক্রান্ত মেষযূথের ন্যায় শত্রুসৈন্য মুহূর্ত্তের মধ্যে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়নপর হইল! বলিতে পার, সেদিনকার আর্য্যস্থানের সূর্য্যদেব সহস্র রক্তকরস্পর্শে কাহার রক্তাক্ততরবারীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া অস্তাচলে বিশ্রাম করিতে গেলেন! বলিতে পার কি পাঠক?

ইনিই সেই ললিত সিংহ। কাঞ্চীর সেনাপতি। ভারতইতিহাসের ধ্রুব নক্ষত্র।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

আজ কাঞ্চীনগরে কিসের এত উৎসব? পাঠক জান কি? হর্ম্ম্যশিখরে জয়ধ্বজা কেন এত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে? কেবল কি বায়ুভরে না আনন্দভরে? দ্বারে দ্বারে কদলীতরু ও মঙ্গল ঘট, গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি, পথে পথে দীপমালা। পুরপ্রাচীরের উপর লোকে লোকারণ্য। নগরের লোক কাহার জন্য এমন উৎসুক হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। সহসা পুরুষকণ্ঠের জয়ধ্বনি এবং বামাকণ্ঠের হুলুধ্বনি একত্র মিশ্রিত হইয়া অভ্রভেদ করিয়া নির্নিমেষ নক্ষত্রলোকের দিকে উত্থিত হইল। নক্ষত্রশ্রেণী বায়ুব্যাহত দীপমালার ন্যায় কাঁপিতে লাগিল।

ঐ যে প্রমত্ত তুরঙ্গমের উপর আরোহণ করিয়া বীরবর পুরদ্বারে প্রবেশ করিতেছে, উঁহাকে চিনিয়াছ কি? ইনিই আমাদের সেই পূর্ব্বপরিচিত ললিত সিংহ, কাঞ্চীর সেনাপতি। শত্রু নিধন করিয়া স্বীয় প্রভু কাঞ্চীরাজপদতলে শত্রুরক্তাঙ্কিত খড়্গ উপহার দিতে আসিয়াছেন। তাই এত উৎসব।

কিন্তু এত যে জয়ধ্বনি, সেনাপতির সে দিকে কর্ণপাত নাই, গবাক্ষ হইতে পুরললনাগণ এত যে পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন সেদিকে তাঁহার দৃক্‌পাত নাই। অরণ্যপথ দিয়া যখন তৃষ্ণাতুর পথিক সরোবরের দিকে ধাবিত হয় তখন শুষ্ক পত্ররাশি তাঁহার মাথার উপর ঝরিতে থাকিলে তিনি কি ভ্রূক্ষেপ করেন? অধীরচিত্ত ললিত সিংহের নিকট এই অজস্র সম্মান সেই শুষ্ক পত্রের ন্যায় নীরস, লঘু ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইল।

অবশেষে অশ্ব যখন অন্তঃপুরপ্রাসাদের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল, তখন মুহূর্ত্তের জন্য সেনাপতি তাহার বল্গা আকর্ষণ করিলেন, অশ্ব মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হইল, মুহূর্ত্তের জন্য ললিত সিংহ একবার প্রাসাদবাতায়নে তৃষিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, মুহূর্ত্তের জন্য দেখিতে পাইলেন, দুইটি লজ্জানত নেত্র একবার চকিতের মত তাঁহার মুখের উপর পড়িল এবং দুইটি অনিন্দিত বাহু হইতে একটি পুষ্পমালা খসিয়া তাঁহার সম্মুখে ভূতলে পতিত হইল। তৎক্ষণাৎ অশ্ব হইতে নামিয়া সেই মালা কিরীটচূড়ায় তুলিয়া লইলেন এবং আর একবার কৃতার্থ দৃষ্টিতে ঊর্দ্ধে চাহিলেন। তখন দ্বার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, দীপ নির্ব্বাপিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—*—

সহস্র শত্রুর নিকট যে অবিচলিত, দুইটি চকিত হরিণনেত্রের নিকট সে পরাভূত! সেনাপতি বহুকাল ধৈর্য্যকে পাষাণদুর্গের মত হৃদয়ে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন গতকল্য সন্ধ্যাকালে দুটি কালো চোখের সলজ্জ সসম্ভ্রম দৃষ্টি সেই দুর্গের ভিত্তিতে গিয়া আঘাত করিয়াছে এবং এতকালের ধৈর্য্য মুহূর্ত্তে ভূমিসাৎ হইয়া গেছে! কিন্তু ছিছি সেনাপতি, তাই বলিয়া কি সন্ধ্যার অন্ধকারে চোরের মত রাজান্তঃপুরের উদ্যানপ্রাচীর লঙ্ঘন করিতে হয়! তুমিই না ভুবনবিজয়ী বীরপুরুষ!

কিন্তু যে উপন্যাস লেখে, তাহার কোথাও বাধা নাই, দ্বারীরাও দ্বারবোধ করে না, অসূর্য্যম্পশ্যরূপা রমণীরাও আপত্তি প্রকাশ করে না। অতএব এই সুরম্য বসন্তসন্ধ্যার দক্ষিণবায়ুবীজিত রাজান্তঃপুরের নিভৃত উদ্যানে একবার

প্রবেশ করা যাক্—হে পাঠিকা, তোমরাও আইস, এবং পাঠকগণ, ইচ্ছা করিলে তোমরাও অনুবর্ত্তী হইতে পার আমি অভয়দান করিতেছি।

একবার চাহিয়া দেখ, বকুলতলে তৃণশয্যায় সন্ধ্যাতারার প্রতিমার মত ঐ রমণী কে? হে পাঠক,হে পাঠিকা তোমরা উঁহাকে জান কি? অমন্ রূপ কোথাও দেখিয়াছ? রূপের কি কখন বর্ণনা করা যায়? ভাষা কি কখনও কোন মন্ত্রবলে এমন জীবন, যৌবন এবং লাবণ্যে ভরিয়া উঠিতে পারে! হে পাঠক! তোমার যদি দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ হয় তবে স্ত্রীর মুখ স্মরণ কর! হে রূপসি পাঠিকা, যে যুবতীকে দেখিয়া তুমি সঙ্গিনীকে বলিয়াছ "ইহাকে কি এমন ভাল দেখিতে ভাই! হোক্ সুন্দরী কিন্তু ভাই তেমন শ্রী নাই" তাহার মুখ মনে কর, ঐ তরুতলবর্ত্তিনী রাজকুমারীর সহিত তাহার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য উপলব্ধি করিবে। পাঠক এবং পাঠিকা, এবার চিনিলে কি? উনিই রাজকন্যা বিদ্যুন্মালা।

রাজকুমারী কোলের উপর ফুল রাখিয়া নতমুখে মালা গাঁথিতেছেন। গাঁথিতে গাঁথিতে এক একবার অঙ্গুলি আপনার সুকুমার কার্য্যে শৈথিল্য করিতেছে, উদাসীন দৃষ্টি কোন্ এক অতিদূরবর্ত্তী চিন্তারাজ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। রাজকুমারী কি ভাবিতেছেন?

কিন্তু হে পাঠক, সে প্রশ্নের উত্তর আমি দিব না। কুমারীর নিভৃত হৃদয়মন্দিরের মধ্যে আজি এই নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় কোন্ মর্ত্ত্যদেবতার আরতি হইতেছে, অপবিত্র কৌতূহল লইয়া সেখানে প্রবেশ করিতে পারিব না। ঐ দেখ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পূজার সুগন্ধি ধূপধূমের ন্যায় সন্ধ্যার বাতাসে মিশাইয়া গেল এবং দুই ফোঁটা অশ্রুজল দুইটি সুকোমল কুসুমকোরকের মত অজ্ঞাত দেবতার চরণের উদ্দেশে খসিয়া পড়িল।

এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে একটি পুরুষের কণ্ঠ গভীর আবেগভরে কম্পিত রুদ্ধ স্বরে বলিয়া উঠিল "রাজকুমারি!"

রাজকন্যা সহসা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। চারিদিক হইতে প্রহরী ছুটিয়া আসিয়া অপরাধীকে বন্দী করিল। রাজকন্যা তখন পুনরায় সসংজ্ঞ হইয়া দেখিলেন সেনাপতি বন্দী হইয়াছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এ অপরাধে প্রাণদণ্ড বিধান। কিন্তু পূর্ব্বোপকার স্মরণ করিয়া রাজা তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন। সেনাপতি মনে মনে কহিলেন "দেবি, তোমার নেত্রও যখন প্রতারণা করিতে পারে, তখন সত্য পৃথিবীতে কোথাও নাই। আজ হইতে আমি মানবের শত্রু।" একটি বৃহৎ দস্যুদলের অধিপতি হইয়া ললিত সিংহ অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

হে পাঠক, তোমার আমার মত লোক এরূপ ঘটনায় কি করিত? নিশ্চয়, যেখানে নির্ব্বাসিত হইত সেখানে আর একটা চাক্‌রীর চেষ্টা দেখিত, কিংবা একটা নূতন খবরের কাগজ বাহির করিত। কিছু কষ্ট হইত সন্দেহ নাই—সে অন্নাভাবে। কিন্তু সেনাপতির মত মহৎলোক, যাহারা উপন্যাসে সুলভ এবং পৃথিবীতে দুর্ল্লভ, তাহারা চাকরীও করে না, খবরের কাগজও চালায় না। তাহারা যখন সুখে থাকে,তখন এক নিঃশ্বাসে নিখিল জগতের উপকার করে এবং মনোবাঞ্ছা তিলমাত্র ব্যর্থ হইলেই আরক্তলোচনে বলে, "রাক্ষসী পৃথিবী, পিশাচ সমাজ, তোদের বুকে

পা দিয়া আমি ইহার প্রতিশোধ লইব” বলিয়া তৎক্ষণাৎ দস্যুব্যবসায় আরম্ভ করে, এইরূপ ইংরাজিকাব্যে পড়া যায় এবং অবশ্যই এ প্রথা রাজপুতদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

দস্যুর উপদ্রবে দেশের লোক ত্রস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু এই অসামান্য দস্যুরা অনাথের সহায়, দরিদ্রের বন্ধু, দুর্ব্বলের আশ্রয়, কেবল ধনী, উচ্চকুলজাত সম্রান্ত ব্যক্তি এবং রাজ-কর্ম্মচারীদের পক্ষে কালান্তক যম।

ঘোর অরণ্য। সূর্য্য অস্ত প্রায়। কিন্তু বন-চ্ছায়ায় অকাল রাত্রির আবির্ভাব হইয়াছে। তরুণ যুবক অপরিচিত পথে একাকী চলিতেছে। সুকুমার শরীর পথশ্রমে ক্লান্ত, কিন্তু তথাপি অধ্যবসায়ের বিরাম নাই। কটিদেশে যে তরবারী বদ্ধ রহিয়াছে তাহারই ভার দুঃসহ বোধ হইতেছে। অরণ্যে লেশমাত্র শব্দ হইলেই ভয়প্রবণ হৃদয় হরিণের মত চকিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু তথাপি এই আসন্ন রাত্রি এবং অজ্ঞাত অরণ্যের মধ্যে দৃঢ় সংকল্পের সহিত অগ্রসর হইতেছে।

দস্যুরা আসিয়া দস্যুপতিকে সংবাদ দিল, “মহারাজ, বৃহৎ শীকার মিলিয়াছে। মাথায় মুকুট, রাজবেশ, কটিদেশে তরবারী।”

দস্যুপতি কহিলেন “তবে এ শীকার আমার। তোরা এখানেই থাক্।”

পথিক চলিতে চলিতে সহসা একবার শুষ্ক পত্রের খস্ খস্ শব্দ শুনিতে পাইল। উৎকণ্ঠিত হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল।

সহসা বুকের মাঝখানে তীর আসিয়া বিঁধিল, পান্থ “মা” বলিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

দস্যুপতি নিকটে আসিয়া জানু পাতিয়া নত হইয়া আহতের মুখের দিকে নিরীক্ষণ করিলেন। ভূতলশায়ী পথিক দস্যুর হাত ধরিয়া কেবল একবার মৃদুস্বরে কহিল “ললিত!”

মুহূর্ত্তে দস্যুর হৃদয় যেন সহস্র খণ্ডে ভাঙ্গিয়া এক চীৎকার শব্দ বাহির হইল “রাজ-কুমারি!”

দস্যুরা আসিয়া দেখিল শীকার এবং শিকারী উভয়েই অন্তিম আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া মৃত পড়িয়া আছে।

রাজকুমারী একদিন সন্ধ্যাকালে তাঁহার অন্তঃপুরের উদ্যানে অজ্ঞানে ললিতের উপর রাজদণ্ড নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, ললিত আর একদিন সন্ধ্যাকালে অরণ্যের মধ্যে অজ্ঞানে রাজকন্যার প্রতি শরনিক্ষেপ করিল। সংসারের বাহিরে যদি কোথাও মিলন হইয়া থাকে ত আজ উভয়ের অপরাধ উভয়ে বোধ করি মার্জ্জনা করিয়াছে।



সমাপ্তি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।



অপূর্ব্বকৃষ্ণ বি, এ পাস্ করিয়া কলিকাতা হইতে দেশে ফিরিয়া আসিতেছেন।

নদীটি ক্ষুদ্র। বর্ষা অন্তে প্রায় শুকাইয়া যায়। এখন শ্রাবণের শেষে জলে ভরিয়া উঠিয়া একেবারে গ্রামের বেড়া ও বাঁশঝাড়ের তলদেশ চুম্বন করিয়া চলিয়াছে।

বহুদিন ঘন বর্ষার পরে আজ মেঘমুক্ত আকাশে রৌদ্র দেখা দিয়াছে।

নৌকায় আসীন অপূর্ব্বকৃষ্ণের মনের ভিতরকার এক খানি ছবি যদি দেখিতে পাই-

তাম তবে দেখিতাম সেখানেও এই যুবকের মানস-নদী নববর্ষায় কূলে কূলে ভরিয়া আলোকে জ্বল্‌জ্বল্‌ এবং বাতাসে ছল্‌ছল্‌ করিয়া উঠিতেছিল।

নৌকা যথাস্থানে ঘাটে আসিয়া লাগিল। নদীতীর হইতে অপূর্ব্বদের বাড়ির পাকা ছাদ গাছের অন্তরাল দিয়া দেখা যাইতেছে। অপূর্ব্বের আগমন সংবাদ বাড়ির কেহ জানিত না, সেই জন্য ঘাটে লোক আসে নাই। মাঝি ব্যাগ লইতে উদ্যত হইলে অপূর্ব্ব তাহাকে নিবারণ করিয়া নিজেই ব্যাগ হাতে লইয়া আনন্দভরে তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িল।

নামিবামাত্র, তীরে ছিল পিছল, ব্যাগ্‌-সমেত অপূর্ব্ব কাদায় পড়িয়া গেল। যেমন পড়া, অম্‌নি কোথা হইতে এক সুমিষ্ট উচ্চ-কণ্ঠে তরল হাস্যলহরী উচ্ছ্বসিত হইয়া নিকট-বর্ত্তী অশথগাছের পাখীগুলিকে সচকিত করিয়া দিল।

অপূর্ব্ব অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি আত্মসম্বরণ করিয়া চাহিয়া দেখিল। দেখিল, তীরে মহাজনের নৌকা হইতে নূতন ইঁট রাশীকৃত করিয়া নামাইয়া রাখা হইয়াছে, তাহারই উপরে বসিয়া একটি মেয়ে হাস্যবেগে এখনি শতধা হইয়া যাইবে এমনি মনে হইতেছে।

অপূর্ব্ব চিনিতে পারিল তাহাদেরই নূতন প্রতিবেশিনীর মেয়ে মৃণ্ময়ী। দূরে বড় নদীর ধারে ইহাদের বাড়ি ছিল, সেখানে নদীর ভাঙনে দেশ ত্যাগ করিয়া বছর দুই তিন হইল এই গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছে।

এই মেয়েটির অখ্যাতির কথা অনেক শুনিতে পাওয়া যায়। পুরুষ গ্রামবাসীরা স্নেহ-ভরে ইহাকে পাগ্‌লি বলে কিন্তু গ্রামের গৃহি-ণীরা ইহার উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবে সর্ব্বদা ভীত চিন্তিত শঙ্কান্বিত। গ্রামের যত ছেলেদের সহিত ইহার খেলা; সমবয়সী মেয়েদের প্রতি অবজ্ঞার সীমা নাই। শিশুরাজ্যে এই মেয়েটি একটি ছোটখাটো বর্গির উপদ্রব বলিলেই হয়।

বাপের আদরের মেয়ে কিনা সেই জন্য ইহার এতটা দুর্দ্দান্ত প্রতাপ। এই সম্বন্ধে বন্ধুদের নিকট মৃণ্ময়ীর মা স্বামীর বিরুদ্ধে সর্ব্বদা অভিযোগ করিতে ছাড়িত না, অথচ, বাপ ইহাকে ভালবাসে, বাপ কাছে থাকিলে মৃণ্ময়ীর চোখের অশ্রুবিন্দু তাহার অন্তরে বড়ই বাজিত ইহাই মনে করিয়া প্রবাসী স্বামীকে স্মরণ-পূর্ব্বক মৃণ্ময়ীর মা মেয়েকে কিছুতেই কাঁদাইতে পারিত না।

মৃণ্ময়ী দেখিতে শ্যামবর্ণ। ছোট কোঁকড়া চুল পিঠ পর্য্যন্ত পড়িয়াছে। ঠিক যেন বাল-কের মত মুখের ভাব। মস্ত মস্ত দুটি কালো চক্ষুতে না আছে লজ্জা, না আছে ভয়, না আছে হাবভাবলীলার লেশমাত্র। শরীর দীর্ঘ পরিপুষ্ট সুস্থ সবল, কিন্তু তাহার বয়স অধিক কি অল্প সে প্রশ্ন কাহারও মনে উদয় হয় না; যদি হইত, তবে এখনো অবিবাহিত আছে বলিয়া লোকে তাহার পিতামাতাকে নিন্দা করিত। গ্রামের বিদেশী জমিদারের নৌকা কালক্রমে যেদিন ঘাটে আসিয়া লাগে সেদিন গ্রামের লোকেরা সম্ভ্রমে শশব্যস্ত হইয়া উঠে, ঘাটের মেয়েদের মুখরঙ্গভূমিতে অকস্মাৎ নাসাগ্রভাগ পর্য্যন্ত যবনিকা পতন হয়, কিন্তু মৃণ্ময়ী কোথা হইতে একটা উলঙ্গ শিশুকে কোলে লইয়া কোঁক্‌ড়া চুলগুলি পিঠে দোলা-ইয়া ছুটিয়া ঘাটে আসিয়া উপস্থিত। যে দেশে ব্যাধ নাই বিপদ নাই সেই দেশের হরিণ-শিশুর মত নির্ভীক কৌতূহলে দাঁড়াইয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে থাকে, অবশেষে আপন দলের বালক-সঙ্গীদের নিকট ফিরিয়া গিয়া

এই নবাগত প্রাণীর আচারব্যবহার সম্বন্ধে বিস্তর-বাহুল্য বর্ণনা করে।

আমাদের অপূর্ব্ব ইতিপূর্ব্বে ছুটি উপলক্ষে বাড়ি আসিয়া এই বন্ধনবিহীন বালিকাটিকে দুই চারিবার দেখিয়াছে এবং অবকাশের সময় এমন কি অনবকাশের সময়ও ইহার সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছে। পৃথিবীতে অনেক মুখ চোখে পড়ে কিন্তু এক একটি মুখ বলাকহা নাই একেবারে মনের মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। সে কেবল সৌন্দর্য্যের জন্য নহে, আর একটা কি গুণ আছে। সে গুণটি বোধ করি স্বচ্ছতা। অধিকাংশ মুখের মধ্যেই মনুষ্যপ্রকৃতিটি আপনাকে অপরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করিতে পারে না; যে মুখে সেই অন্তরগুহাবাসী রহস্যময় লোকটি অবাধে বাহির হইয়া দেখা দেয়, সে মুখ সহস্রের মধ্যে চোখে পড়ে এবং এক পলকে মনে মুদ্রিত হইয়া যায়। এই বালিকার মুখে চক্ষে একটি দুরন্ত অবাধ্য নারীপ্রকৃতি উন্মুক্ত বেগবান্ অরণ্যমৃগের মত সর্ব্বদা দেখা দেয়, খেলা করে, সেইজন্য এই জীবনচঞ্চল মুখখানি একবার দেখিলে আর সহজে ভোলা যায় না।

পাঠকদিগকে বলা বাহুল্য মৃণ্ময়ীর কৌতুক হাস্যধ্বনি যতই সুমিষ্ট হউক্ দুর্ভাগা অপূর্ব্বের পক্ষে কিঞ্চিৎ ক্লেশদায়ক হইয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি মাঝির হাতে ব্যাগ সমর্পণ করিয়া রক্তিমমুখে দ্রুতবেগে গৃহ অভিমুখে চলিতে লাগিল।

আয়োজনটি অতি সুন্দর হইয়াছিল। নদীর তীর, গাছের ছায়া, পাখীর গান, প্রভাতের রৌদ্র, কুড়ি বৎসর বয়স; অবশ্য ইটের স্তূপটা তেমন উল্লেখযোগ্য নহে, কিন্তু যে ব্যক্তি তাহার উপর বসিয়াছিল সে এই শুষ্ক কঠিন আসনের প্রতিও একটি মনোরম শ্রী বিস্তার করিয়াছিল। হায়, এমন দৃশ্যের মধ্যে প্রথম পদক্ষেপমাত্রেই যে, সমস্ত কবিত্ব প্রহসনে পরিণত হয় ইহা অপেক্ষা অদৃষ্টের নিষ্ঠুরতা আর কি হইতে পারে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সেই ইষ্টকশিখর হইতে প্রবহমাণ হাস্যধ্বনি শুনিতে শুনিতে চাদরে ও ব্যাগে কাদা মাখিয়া গাছের ছায়া দিয়া অপূর্ব্ব বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইল।

অকস্মাৎ পুত্রের আগমনে তাহার বিধবা মাতা পুলকিত হইয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ ক্ষীর দধি রুইমাছের সন্ধানে দূরে নিকটে লোক দৌড়িল এবং পাড়া প্রতিবেশীর মধ্যেও একটা আন্দোলন উপস্থিত হইল।

আহারান্তে মা অপূর্ব্বর বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। অপূর্ব্ব সে জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। কারণ, প্রস্তাব অনেক পূর্ব্বেই ছিল কিন্তু পুত্র নব্যতন্ত্রের নূতন ধুয়া ধরিয়া জেদ করিয়া বসিয়াছিল যে, বি, এ, পাস না করিয়া বিবাহ করিব না। এতকাল জননী সেই জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন অতএব এখন আর কোনরূপ ওজর করা মিথ্যা। অপূর্ব্ব কহিল, আগে পাত্রী দেখা হউক তাহার পর স্থির হইবে। মা কহিলেন, পাত্রী দেখা হইয়াছে, সে জন্য তোকে ভাবিতে হইবে না। অপূর্ব্ব ঐ ভাবনাটা নিজে ভাবিতে প্রস্তুত হইল এবং কহিল মেয়ে না দেখিয়া বিবাহ করিতে পারিবে না। মা ভাবিলেন এমন সৃষ্টিছাড়া কথা কখনো শোনা যায় নাই, কিন্তু সম্মত হইলেন।

সে রাত্রে অপূর্ব্ব প্রদীপ নিবাইয়া বিছানায় শয়ন করিলে পর বর্ষানিশীথের সমস্ত শব্দ এবং সমস্ত নিস্তব্ধতার পরপ্রান্ত হইতে বিজন বিনিদ্র শয্যায় একটি উচ্ছ্বসিত উচ্চ মধুর কণ্ঠের হাস্যধ্বনি তাহার কাণে আসিয়া ক্রমাগত বাজিতে লাগিল। মন নিজেকে কেবলি এই বলিয়া পীড়া দিতে লাগিল যে, সকালবেলাকার সেই পদস্খলনটা যেন কোন একটা উপায়ে সংশোধন করিয়া লওয়া উচিত। বালিকা জানিল না যে, আমি অপূর্ব্বকৃষ্ণ অনেক বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছি, কলিকাতায় বহুকাল যাপন করিয়া আসিয়াছি, দৈবাৎ পিছলে পা দিয়া কাদার উপর পড়িয়া গেলেও আমি উপহাস্য উপেক্ষণীয় একজন যে-সে গ্রাম্য যুবক নহি।

পরদিন অপূর্ব্ব কনে দেখিতে যাইবে। অধিক দূর নহে পাড়াতেই তাহাদের বাড়ি। একটু বিশেষ যত্নপূর্ব্বক সাজ করিল। ধুতি চাদর ছাড়িয়া সিল্কের চাপকান জোব্বা, মাথায় একটা গোলাকার পাগ্‌ড়ি এবং বার্ণিশকরা নূতন একযোড়া জুতা পায়ে দিয়া সিল্কের ছাতা হস্তে সে প্রাতঃকালে বাহির হইল।

সম্ভাবিত শ্বশুরবাড়িতে পদার্পণ করিবামাত্র মহাসমারোহ সমাদরের ঘটা পড়িয়া গেল। অবশেষে যথাকালে কম্পিত হৃদয় মেয়েটিকে ঝাড়িয়া মুছিয়া রঙ করিয়া খোপায় রাঙতা জড়াইয়া একখানি পাতলা রঙীন কাপড়ে মুড়িয়া বরের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করা হইল। সে এক কোণে নীরবে মাথা প্রায় হাঁটুর কাছে ঠেকাইয়া বসিয়া রহিল এবং এক প্রৌঢ়া দাসী তাহাকে সাহস দিবার জন্য পশ্চাতে উপস্থিত রহিল। কনের এক বালক ভাই তাহাদের পরিবারের মধ্যে এই এক নূতন অনধিকারপ্রবেশোদ্যত লোকটির পাগ্‌ড়ি ঘড়ির চেন এবং নবোদ্গত শ্মশ্রু একমনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অপূর্ব্ব কিয়ৎকাল গোঁফে তা দিয়া অবশেষে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি পড়? বসনভূষণাচ্ছন্ন লজ্জাস্তূপের নিকট হইতে তাহার কোন উত্তর পাওয়া গেল না। দুই তিনবার প্রশ্ন এবং প্রৌঢ়া দাসীর নিকট হইতে পৃষ্ঠদেশে বিস্তর উৎসাহজনক করতাড়নের পর বালিকা মৃদুস্বরে এক নিশ্বাসে অত্যন্ত দ্রুত বলিয়া গেল, চারুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ, ব্যাকরণসার প্রথম ভাগ, ভূগোলবিবরণ, পাটিগণিত, ভারতবর্ষের ইতিহাস। এমন সময় বহির্দ্দেশে একটা অশান্ত গতির ধুপধাপ শব্দ শোনা গেল এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে দৌড়িয়া হাঁপাইয়া পিঠের চুল দোলাইয়া মৃণ্ময়ী ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। অপূর্ব্বকৃষ্ণের প্রতি দৃক্‌পাতমাত্র না করিয়া একবারে কনের ভাই রাখালের হাত ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল। রাখাল তখন আপন পর্য্যবেক্ষণ শক্তির চর্চ্চায় একান্তমনে নিযুক্ত ছিল, সে কিছুতেই উঠিতে চাহিল না। দাসীটি তাহার সংযত কণ্ঠস্বরের মৃদুতা রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যথাসাধ্য তীব্রভাবে মৃণ্ময়ীকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। অপূর্ব্বকৃষ্ণ আপনার সমস্ত গাম্ভীর্য্য এবং গৌরব একত্র করিয়া পাগ্‌ড়িপরা মস্তকে অভ্রভেদী হইয়া বসিয়া রহিল এবং পেটের কাছে ঘড়ির চেন নাড়িতে লাগিল। অবশেষে সঙ্গীটিকে কিছুতেই বিচলিত করিতে না পারিয়া তাহার পিঠে একটা সশব্দ চপেটাঘাত করিয়া এবং চট্ করিয়া কনের মাথার ঘোমটা টানিয়া খুলিয়া দিয়া ঝড়ের মত মৃণ্ময়ী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। দাসীটি গুমরিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং ভগ্নীর অকস্মাৎ অবগুণ্ঠন মোচনে রাখাল খিল্ খিল্ শব্দে হাসিতে আরম্ভ করিল। নিজের পৃষ্ঠের প্রবল চপেটাঘাতটি সে অন্যায় প্রাপ্য মনে

করিল না; কারণ, এরূপ দেনা পাওনা তাহাদের মধ্যে সর্ব্বদাই চলিতেছে। এমন কি, পূর্ব্বে মৃন্ময়ীর চুল কাঁধ ছাড়াইয়া পিঠের মাঝামাঝি আসিয়া পড়িত; রাখালই একদিন হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তাহার ঝুঁটির মধ্যে কাঁচি চালাইয়া দেয়। মৃন্ময়ী তখন অত্যন্ত রাগ করিয়া তাহার হাত হইতে কাঁচিটি কাড়িয়া লইয়া নিজের অবশিষ্ট পশ্চাতের চুল ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে নির্দ্দয়ভাবে কাটিয়া ফেলিল, তাহার কোঁকড়া চুলের স্তবকগুলি শাখাচ্যুত কালো আঙুরের স্তূপের মত গুচ্ছ গুচ্ছ মাটিতে পড়িয়া গেল। উভয়ের মধ্যে এইরূপ শাসনপ্রণালী প্রচলিত ছিল।

অতঃপর এই নীরব পরীক্ষা-সভা আর অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। পিণ্ডাকার কন্যাটি কোন মতে পুনশ্চ দীর্ঘাকার হইয়া দাসী সহকারে অন্তঃপুরে চলিয়া গেল। অপূর্ব্ব পরম গম্ভীরভাবে বিরল গুম্ফরেখায় তা দিতে দিতে উঠিয়া ঘরের বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল। দ্বারের নিকটে গিয়া দেখে বার্ণিশ-করা নূতন জুতাযোড়াটি যেখানে ছিল সেখানে নাই এবং কোথায় আছে তাহা বহুচেষ্টায় অবধারণ করা গেল না।

বাড়ির লোক সকলেই বিষম বিব্রত হইয়া উঠিল এবং অপরাধীর উদ্দেশে গালি ও ভর্ৎসনা অজস্র বর্ষিত হইতে লাগিল। অনেক খোঁজ করিয়া অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া বাড়ির কর্ত্তার পুরাতন ছিন্ন ঢিলা চটিযোড়াটা পরিয়া প্যাণ্টলুন চাপকান পাগ্‌ড়ি সমেত সুসজ্জিত অপূর্ব্ব কর্দ্দমাক্ত গ্রামপথে অত্যন্ত সাবধানে চলিতে লাগিল।

পুষ্করিণীর ধারে নির্জ্জন পথপ্রান্তে আবার হঠাৎ সেই উচ্চকণ্ঠের অজস্র হাস্যকলোচ্ছ্বাস। যেন তরুপল্লবের মধ্য হইতে কৌতুকপ্রিয়া বনদেবী অপূর্ব্বর ঐ অসঙ্গত চটিজুতাযোড়ার দিকে চাহিয়া হঠাৎ আর হাসি ধারণ করিয়া রাখিতে পারিল না।

অপূর্ব্ব অপ্রতিভভাবে থমকিয়া দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতেছে এমন সময় ঘন বন হইতে বাহির হইয়া একটি নির্লজ্জ অপরাধিনী তাঁহার সম্মুখে নূতন জুতাযোড়াটা রাখিয়াই পলায়নোদ্যত হইল। অপূর্ব্ব দ্রুতবেগে দুই হাত ধরিয়া তাহাকে বন্দী করিয়া ফেলিল।

মৃন্ময়ী আঁকিয়া বাঁকিয়া হাত ছাড়াইয়া পালাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। কোঁকড়া চুলে বেষ্টিত তাহার পরিপুষ্ট সহাস্য দুষ্ট মুখখানির উপরে শাখান্তরালচ্যুত সূর্য্যকিরণ আসিয়া পড়িল। রৌদ্রোজ্জ্বল নির্ম্মল চঞ্চল নির্ঝরিণীর দিকে অবনত হইয়া কৌতূহলী পথিক যেমন নিবিষ্ট দৃষ্টিতে তাহার তলদেশ দেখিতে থাকে অপূর্ব্ব তেমনি করিয়া গভীর গম্ভীর নেত্রে মৃন্ময়ীর ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত মুখের উপর তড়িত্তরল দুটি চক্ষুর মধ্যে, চাহিয়া দেখিল এবং অত্যন্ত ধীরে ধীরে মুষ্টি শিথিল করিয়া যেন যথাকর্ত্তব্য অসম্পন্ন রাখিয়া বন্দিনীকে ছাড়িয়া দিল। অপূর্ব্ব যদি রাগ করিয়া মৃন্ময়ীকে ধরিয়া মারিত তাহা হইলে সে কিছুই আশ্চর্য্য হইত না, কিন্তু নির্জ্জন পথের মধ্যে এই অপরূপ নীরব শাস্তির সে কোন অর্থ বুঝিতে পারিল না।

নৃত্যময়ী প্রকৃতির নূপুরনিক্কণের ন্যায় চঞ্চল হাস্যধ্বনিটি সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া বাজিতে লাগিল। এবং চিন্তানিমগ্ন অপূর্ব্বকৃষ্ণ অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:**:—

অপূর্ব্ব সমস্তদিন নানা ছুতা করিয়া অন্তঃপুরে মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল না। বাহিরে নিমন্ত্রণ ছিল খাইয়া আসিল। অপূর্ব্বর মত এমন একজন কৃতবিদ্য গম্ভীর ভাবুক লোক একটি সামান্য অশিক্ষিতা বালিকার কাছে আপনার লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিবার, আপনার আপনার আন্তরিক মাহাত্ম্যের পরিপূর্ণ পরিচয় দিবার জন্ত কেন যে এতটা বেশী উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিবে তাহা বুঝা কঠিন। একটি পাড়াগাঁয়ের চঞ্চল মেয়ে তাঁহাকে সামান্য লোক মনে করিলই বা! সে যদি মুহূর্ত্তকালের জন্ত তাঁহাকে হাস্যাস্পদ করিয়া তার পর তাঁহার অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া রাখাল নামক একটি নির্ব্বোধ নিরক্ষর বালকের সহিত খেলা করিবার জন্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করে তাহাতেই বা তাঁহার ক্ষতি কি? তাহার কাছে প্রমাণ করিবার আবশ্যক কি যে, তিনি বিশ্বদীপ নামক মাসিক পত্রে গ্রন্থ সমালোচনা করিয়া থাকেন, এবং তাঁহার তোরঙ্গের মধ্যে এসেন্স্ জুতা, রুবিনির ক্যাম্ফর, রঙীন চিঠির কাগজ এবং "হার্ম্মোনিয়ম্ শিক্ষা" বহির সঙ্গে একখানি পরিপূর্ণ খাতা নিশীথের গর্ভে ভাবী উষার ন্যায় প্রকাশের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে? কিন্তু মনকে বুঝানো কঠিন এবং এই পল্লিবাসিনী চঞ্চলা মেয়েটির কাছে শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ রায় বি, এ, কিছুতেই পরাভব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে।

সন্ধ্যার সময়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে মা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন রে অপু, মেয়ে কেমন দেখ্‌লি? পছন্দ হয় ত?

অপূর্ব্ব কিঞ্চিৎ অপ্রতিভভাবে কহিল, মেয়ে দেখেছি মা, ওর মধ্যে একটিকে আমার পছন্দ হয়েচে।

মা আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, তুই আবার ক'টি মেয়ে দেখ্‌লি?

অবশেষে অনেক ইতস্ততর পর প্রকাশ পাইল প্রতিবেশিনী শরতের মেয়ে মৃণ্ময়ীকে তাঁহার ছেলে পছন্দ করিয়াছে! এত লেখাপড়া শিখিয়া এমনি ছেলের পছন্দ!

প্রথমে অপূর্ব্বর পক্ষে অনেকটা পরিমাণ লজ্জা ছিল, অবশেষে মা যখন প্রবল আপত্তি করিতে লাগিলেন তখন তাহার লজ্জা ভাঙ্গিয়া গেল। সে রোখের মাথায় বলিয়া বসিল মৃণ্ময়ীকে ছাড়া আর কাহাকেও বিবাহ করিব না। অন্ত জড়পুত্তলী মেয়েটিকে সে যতই কল্পনা করিতে লাগিল ততই বিবাহ সম্বন্ধে তাহার বিষম বিতৃষ্ণার উদ্রেক হইল।

দুই তিনদিন উভয়পক্ষে মান অভিমান অনাহার অনিদ্রার পর অপূর্ব্বই জয়ী হইল। মা মনকে বোঝাইলেন যে, মৃণ্ময়ী ছেলেমানুষ এবং মৃণ্ময়ীর মা উপযুক্ত শিক্ষাদানে অসমর্থ; বিবাহের পর তাঁহার হাতে পড়িলেই তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইবে। এবং ক্রমশঃ ইহাও বিশ্বাস করিলেন যে, মৃণ্ময়ীর মুখখানি সুন্দর। কিন্তু তখনি আবার তাহার খর্ব্ব কেশরাশি তাঁহার কল্পনাপথে উদিত হইয়া হৃদয় নৈরাশ্যে পূর্ণ করিতে লাগিল তথাপি আশা করিলেন দৃঢ় করিয়া চুল বাঁধিয়া এবং জব্‌জবে করিয়া তেল লেপিয়া কালে এ ত্রুটিও সংশোধন হইতে পারিবে।

পাড়ার লোকে সকলেই অপূর্ব্বর এই পছন্দটিকে অপূর্ব্ব পছন্দ বলিয়া নামকরণ করিল। পাগ্‌লী মৃণ্ময়ীকে অনেকেই ভালবাসিত কিন্তু তাই বলিয়া নিজের পুত্রের বিবাহযোগ্যা বলিয়া কেহ মনে করিত না।

মৃণ্ময়ীর বাপ ঈশান মজুমদারকে যথাকালে সংবাদ দেওয়া হইল। সে কোন একটি ষ্টীমার কোম্পানির কেরাণীরূপে দূরে নদীতীরবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র ষ্টেশনে একটি ছোট টীনের ছাদ-বিশিষ্ট কুটিরে মাল ওঠানো নাবানো এবং টিকিট বিক্রয় কার্য্যে নিযুক্ত ছিল।

তাহার মৃণ্ময়ীর বিবাহ প্রস্তাবে দুই চক্ষু বহিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাহার মধ্যে কতখানি দুঃখ এবং কতখানি আনন্দ ছিল পরিমাণ করিয়া বলিবার কোন উপায় নাই।

কন্যার বিবাহ উপলক্ষে ঈশান হেড অফিসের সাহেবের নিকট ছুটি প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত দিল। সাহেব উপলক্ষটা নিতান্তই তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ছুটি নামঞ্জুর করিয়া দিলেন। তখন, পূজার সময় একসপ্তাহ ছুটি পাইবার সম্ভাবনা জানাইয়া সে পর্য্যন্ত বিবাহ স্থগিত রাখিবার জন্য দেশে চিঠি লিখিয়া দিল, কিন্তু অপূর্ব্বর মা কহিল, এই মাসে দিন ভাল আছে আর বিলম্ব করিতে পারিব না।

উভয়তই প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইলে পর ব্যথিত হৃদয়ে ঈশান আর কোন আপত্তি না করিয়া পূর্ব্বমত মাল ওজন এবং টিকিট বিক্রয় করিতে লাগিল।

অতঃপর মৃণ্ময়ীর মা এবং পল্লির যত বর্ষীয়সীগণ সকলে মিলিয়া ভাবী কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মৃণ্ময়ীকে অহর্নিশি উপদেশ দিতে লাগিল। ক্রীড়াসক্তি, দ্রুতগমন, উচ্চহাস্য, বালকদিগের সহিত আলাপ এবং ক্ষুধা অনুসারে ভোজন সম্বন্ধে সকলেই নিষেধ-পরামর্শ দিয়া বিবাহটাকে বিভীষিকারূপে প্রতিপন্ন করিতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইল। উৎকণ্ঠিত শঙ্কিতহৃদয় মৃণ্ময়ী মনে করিল তাহার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং তদবসানে ফাঁসির হুকুম হইয়াছে।

সে দুষ্ট পোনি ঘোড়ার মত ঘাড় বাঁকাইয়া পিছু হটিয়া বলিয়া বসিল, আমি বিবাহ করিব না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—•:•:•—

কিন্তু তথাপি বিবাহ করিতে হইল।

তার পরে শিক্ষা আরম্ভ হইল। এক রাত্রির মধ্যে মৃণ্ময়ীর সমস্ত পৃথিবী অপূর্ব্বর মার অন্তঃপুরে আসিয়া আবদ্ধ হইয়া গেল!

শাশুড়ী সংশোধনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। অত্যন্ত কঠিন মুখ করিয়া কহিলেন, দেখ বাছা, তুমি কিছু আর কচি খুঁকি নও, আমাদের ঘরে অমন বেহায়াপনা করিলে চলিবে না।

শাশুড়ী যে ভাবে বলিলেন মৃণ্ময়ী সে ভাবে কথাটা গ্রহণ করিল না। সে ভাবিল এঘরে যদি না চলে তবে বুঝি অন্যত্র যাইতে হইবে। অপরাহ্নে তাহাকে আর দেখা গেল না। কোথায় গেল কোথায় গেল খোঁজ পড়িল। অবশেষে বিশ্বাসঘাতক রাখাল তাহাকে তাহার গোপন স্থান হইতে ধরাইয়া দিল। সে বটতলায় রাধাকান্ত ঠাকুরের পরিত্যক্ত ভাঙ্গা রথের মধ্যে গিয়া বসিয়াছিল।

শাশুড়ী, মা এবং পাড়ার সমস্ত হিতৈষিণীগণ মৃণ্ময়ীকে যেরূপ লাঞ্ছনা করিল তাহা পাঠকগণ এবং পাঠিকাগণ সহজেই কল্পনা করিতে পারিবেন!

রাত্রে ঘন মেঘ করিয়া ঝুপ্ ঝুপ্ শব্দে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। অপূর্ব্বকৃষ্ণ বিছানার মধ্যে অতি ধীরে ধীরে মৃণ্ময়ীর নিকট ঈষৎ অগ্রসর হইয়া তাহার কাণে কাণে মৃদুস্বরে কহিল, "মৃণ্ময়ী তুমি আমাকে ভালবাস না?"

মৃণ্ময়ী সতেজে বলিয়া উঠিল, "না!, আমি তোমাকে কখনই ভাল বাসব না!" তাহার

যত রাগ এবং যত শাস্তিবিধান সমস্তই পুঞ্জীভূত বজ্রের ন্যায় অপূর্ব্বর মাথার উপর নিক্ষেপ করিল।

অপূর্ব্ব ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল, "কেন আমি তোমার কাছে কি দোষ করেছি?" মৃণ্ময়ী কহিল, "তুমি আমাকে বিয়ে করলে কেন?" এ অপরাধের সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দেওয়া কঠিন। কিন্তু অপূর্ব্ব মনে মনে কহিল, যেমন করিয়া হউক এই দুর্বাধ্য মনটিকে বশ করিতে হইবে।

পরদিন শাশুড়ী মৃণ্ময়ীর বিদ্রোহী ভাবের সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া তাহাকে ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিল। সে নূতন পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর মত প্রথম অনেকক্ষণ ঘরের মধ্যে ধড়্ ফড়্ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অবশেষে কোথাও পালাইবার কোনও পথ না দেখিয়া নিষ্ফল ক্রোধে বিছানার চাদরখানা দাঁত দিয়া ছিঁড়িয়া কুটি কুটি করিয়া ফেলিল—এবং মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া মনে মনে বাবাকে ডাকিতে ডাকিতে কাঁদিতে লাগিল।

এমন সময়ে ধীরে ধীরে কে তাহার পাশে আসিয়া বসিল। সস্নেহে তাহার ধূলিলুণ্ঠিত চুলগুলি কপোলের উপর হইতে তুলিয়া দিবার চেষ্টা করিল। মৃণ্ময়ী সবলে মাথা নাড়িয়া তাহার হাত সরাইয়া দিল। অপূর্ব্ব কানের কাছে মুখ নত করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "আমি লুকিয়ে দরজা খুলে দিয়েছি। এস আমরা খিড়কির বাগানে পালিয়ে যাই।" মৃণ্ময়ী প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া সতেজে সরোদনে কহিল, "না।" অপূর্ব্ব তাহার চিবুক ধরিয়া মুখ তুলিয়া দিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "একবার দেখ কে এসেছে!" রাখাল ভূপতিত মৃণ্ময়ীর দিকে চাহিয়া হতবুদ্ধির ন্যায় দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। মৃণ্ময়ী মুখ না তুলিয়া অপূর্ব্বর হাত ঠেলিয়া দিল। অপূর্ব্ব কহিল, "রাখাল তোমার সঙ্গে খেলা করতে এসেচে, খেলতে যাবে?" সে বিরক্তি-উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিল, "না।" রাখালও সুবিধা নয় বুঝিয়া কোন মতে ঘর হইতে পালাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। অপূর্ব্ব চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মৃণ্ময়ী কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল, তখন অপূর্ব্ব পা টিপিয়া বাহির হইয়া দ্বারে শিকল দিয়া চলিয়া গেল।

তাহার পর দিন মৃণ্ময়ী বাপের কাছ হইতে এক পত্র পাইল। তিনি তাঁহার প্রাণপ্রতিমা মৃণ্ময়ীর বিবাহের সময় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই বলিয়া বিলাপ করিয়া নব-দম্পতিকে অন্তরের আশীর্ব্বাদ পাঠাইয়াছেন।

মৃণ্ময়ী শাশুড়ীকে গিয়া কহিল, "আমি বাবার কাছে যাব।" শাশুড়ী অকস্মাৎ এই অসম্ভব প্রার্থনায় তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া উঠিলেন। "কোথায় ওর বাপ থাকে তার ঠিকানা নেই, বলে বাপের কাছে যাব! অনা-সৃষ্টি আবদার!" সে উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল। আপনার ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিতান্ত হতাশ ব্যক্তি যেমন করিয়া দেবতার কাছে প্রার্থনা করে তেমনি করিয়া বলিতে লাগিল, "বাবা, আমাকে তুমি নিয়ে যাও! এখানে আমার কেউ নেই! এখানে থাকলে আমি বাঁচব না।"

গভীর রাত্রে তাহার স্বামী নিদ্রিত হইলে ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া মৃণ্ময়ী গৃহের বাহির হইল যদিও এক একবার মেঘ করিয়া আসিতে-ছিল তথাপি জ্যোৎস্না-রাত্রে পথ দেখিবার মত আলোক যথেষ্ট ছিল। বাপের কাছে যাইতে হইলে কোন্ পথ অবলম্বন করিতে হইবে মৃণ্ময়ী তাহার কিছুই জানিত না। কেবল তাহার মনের বিশ্বাস ছিল যে পথ দিয়া

ডাকের পত্রবাহক "রানার"গণ চলে সেই পথ দিয়া পৃথিবীর সমস্ত ঠিকানায় যাওয়া যায়। মৃণ্ময়ী সেই ডাকের পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। চলিতে চলিতে শরীর শ্রান্ত হইয়া আসিল রাত্রিও প্রায় শেষ হইল। বনের মধ্যে যখন উস্‌খুস্‌ করিয়া অনিশ্চিন্ত স্বরে দুটো একটা পাখী ডাকিবার উপক্রম করিতেছে অথচ নিঃসংশয়ে সময় নির্ণয় করিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ করিতেছে তখন মৃণ্ময়ী পথের শেষে নদীর ধারে একটা বৃহৎ বাজারের মত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। অতঃপর কোন্‌দিকে যাইতে হইবে ভাবিতেছে এমন সময় পরিচিত ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ শুনিতে পাইল। চিঠির থলে কাঁধে করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ডাকের রানার আসিয়া উপস্থিত হইল। মৃণ্ময়ী তাড়াতাড়ি তাহার কাছে গিয়া কাতর শ্রান্তস্বরে কহিল, "কুশীগঞ্জে আমি বাবার কাছে যাব, আমাকে তুমি সঙ্গে নিয়ে চল না!" সে কহিল "কুশীগঞ্জ কোথায় আমি জানিনে।" এই বলিয়া ঘাটে বাঁধা ডাক-নৌকার মাঝিকে জাগাইয়া দিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। তাহার দয়া করিবার বা প্রশ্ন করিবার সময় নাই।

দেখিতে দেখিতে ঘাট এবং বাজার সজাগ হইয়া উঠিল। মৃণ্ময়ী ঘাটে নামিয়া একজন মাঝিকে ডাকিয়া কহিল, "মাঝি, আমাকে কুশীগঞ্জে নিয়ে যাবে?" মাঝি তাহার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই পাশের নৌকা হইতে একজন বলিয়া উঠিল, "আরে কেও? মিনু মা তুমি এখানে কোথা থেকে?" মৃণ্ময়ী উচ্ছ্বসিত ব্যগ্রতার সহিত বলিয়া উঠিল, "বনমালী, আমি কুশীগঞ্জে বাবার কাছে যাব, আমাকে তোর নৌকায় নিয়ে চল্‌।" বনমালী তাহাদের গ্রামের মাঝি; সে এই উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতি বালিকাটিকে বিলক্ষণ চিনিত, সে কহিল "বাবার কাছে যাবে? সেত বেশ কথা! চল আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি।" মৃণ্ময়ী নৌকায় উঠিল।

মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল। মেঘ করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ভাদ্রমাসের পূর্ণ নদী ফুলিয়া ফুলিয়া নৌকা দোলাইতে লাগিল, মৃণ্ময়ীর সমস্ত শরীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া আসিল; অঞ্চল পাতিয়া সে নৌকার মধ্যে শয়ন করিল, এবং দুরন্ত বালিকা নদী-দোলায় প্রকৃতির স্নেহপালিত শান্ত শিশুটির মত অকাতরে ঘুমাইতে লাগিল।

জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, সে তাহার শ্বশুর বাড়িতে খাটে শুইয়া আছে। তাহাকে জাগ্রৎ দেখিয়া ঝি বকিতে আরম্ভ করিল। ঝির কণ্ঠস্বরে শাশুড়ী আসিয়া অত্যন্ত কঠিন কঠিন করিয়া বলিতে লাগিলেন। মৃণ্ময়ী বিস্ফারিত নেত্রে নীরবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অবশেষে তিনি যখন তাহার বাপের শিক্ষাদোষের উপর কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, তখন মৃণ্ময়ী দ্রুতপদে পাশের ঘরে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে শিকল বন্ধ করিয়া দিল।

অপূর্ব্ব লজ্জার মাথা খাইয়া মাকে আসিয়া বলিল, "মা বৌকে দুই একদিনের জন্যে একবার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে দোষ কি?"

মা অপূর্ব্বকে ন ভূত ন ভবিষ্যতি ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন, এবং দেশে এত মেয়ে থাকিতে বাছিয়া বাছিয়া এই অস্থিদাহকারী দস্যু-মেয়েকে ঘরে আনার জন্য তাহাকে যথেষ্ট গঞ্জনা করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—*—

সে দিন সমস্ত দিন বাহিরে ঝড়বৃষ্টি এবং ঘরের মধ্যেও অনুরূপ দুর্য্যোগ চলিতে লাগিল।

তাহার পরদিন গভীর রাত্রে অপূর্ব্ব মৃণ্ময়ীকে ধীরে ধীরে জাগ্রৎ করিয়া কহিল, "মৃণ্ময়ী, তোমার বাবার কাছে যাবে?"

মৃণ্ময়ী সবেগে অপূর্ব্বর হাত চাপিয়া ধরিয়া সচকিত হইয়া কহিল "যাব।"

অপূর্ব্ব চুপিচুপি কহিল, "তবে এস আমরা দুজনে আস্তে আস্তে পালিয়ে যাই। আমি ঘাটে নৌকা ঠিক করে' রেখেছি।"

মৃণ্ময়ী অত্যন্ত সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। তাহার পর তাড়াতাড়ি উঠিয়া কাপড় ছাড়িয়া বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইল। অপূর্ব্ব তাহার মাতার চিন্তা দূর করিবার জন্য একখানি পত্র রাখিয়া দিয়া দুইজনে বাহির হইল।

মৃণ্ময়ী সেই অন্ধকার রাত্রে জনশূন্য নিস্তব্ধ নির্জ্জন গ্রামপথে এই প্রথম, স্বেচ্ছায় আন্তরিক নির্ভরের সহিত স্বামীর হাত ধরিল; তাহার হৃদয়ের আনন্দ-উদ্বেগ সেই সুকোমল স্পর্শ-যোগে তাহার স্বামীর শিরার মধ্যে সঞ্চারিত হইতে লাগিল!

নৌকা সেই রাত্রেই ছাড়িয়া দিল। অশান্ত হর্ষোচ্ছ্বাস সত্ত্বেও অনতিবিলম্বেই মৃণ্ময়ী ঘুমাইয়া পড়িল। পরদিন কি মুক্তি, কি আনন্দ! দুইধারে কত গ্রাম, বাজার, শস্যক্ষেত্র, বন, দুইধারে কত নৌকা যাতায়াত করিতেছে। মৃণ্ময়ী প্রত্যেক তুচ্ছ বিষয়ে স্বামীকে সহস্রবার করিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিল। ঐ নৌকায় কি আছে, উহারা কোথা হইতে আসিতেছে, এই জায়গার নাম কি এমন সকল প্রশ্ন যাহার উত্তর অপূর্ব্ব কোন কলেজের বহিতে পায় নাই এবং যাহা তাহার কলিকাতার অভিজ্ঞতায় কুলাইয়া উঠে না। বন্ধুগণ শুনিয়া লজ্জিত হইবেন, অপূর্ব্ব এই সকল প্রশ্নের প্রত্যেক-টারই উত্তর করিয়াছিল এবং অধিকাংশ উত্তরের সহিত সত্যের ঐক্য হয় নাই। যথা, সে তিলের নৌকাকে তিসির নৌকা, পাঁচ-বেড়েকে রায়নগর এবং মুন্সেফের আদালতকে জমিদারী কাছারি বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত বোধ করে নাই। এবং এই সমস্ত ভ্রান্ত উত্তরে বিশ্বস্তহৃদয় প্রশ্নকারিণীর সন্তোষের তিলমাত্র ব্যাঘাত জন্মায় নাই।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় নৌকা কুশীগঞ্জে গিয়া পৌঁছিল। টিনের ঘরে একখানি ময়লা চৌকা কাঁচের লণ্ঠনে তেলের বাতি জ্বালাইয়া ছোট ডেস্কের উপর একখানি চামড়ায় বাঁধা মস্ত খাতা রাখিয়া গা-খোলা ঈশানচন্দ্র টুলের উপর বসিয়া হিসাব লিখিতেছিলেন। এমন সময় নবদম্পতি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মৃণ্ময়ী ডাকিল, "বাবা!" সে ঘরে এমন কণ্ঠ-ধ্বনি এমন করিয়া কখনো ধ্বনিত হয় নাই।

ঈশানের চোখ দিয়া দরদর্ করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। সে কি বলিবে কি করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। তাহার মেয়ে এবং জামাই যেন সাম্রাজ্যের যুবরাজ এবং যুবরাজ-মহিষী; এই সমস্ত পাটের বস্তার মধ্যে তাহা-দের উপযুক্ত সিংহাসন কেমন করিয়া নির্ম্মিত হইতে পারে ইহাই যেন তাহার দিশাহারা বুদ্ধি ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না।

তাহার পর আহারের ব্যাপার—সেও এক চিন্তা। দরিদ্র কেরাণী নিজ হস্তে ডাল ভাতে ভাত পাক করিয়া খায়—আজ এই এমন আনন্দের দিনে সে কি করিবে কি খাওয়াইবে! মৃণ্ময়ী কহিল, "বাবা আজ আমরা সকলে

মিলিয়া রাঁধিব।" অপূর্ব্ব এই প্রস্তাবে সাতিশয় উৎসাহ প্রকাশ করিল।

ঘরের মধ্যে স্থানাভাব, লোকাভাব, অন্নাভাব, কিন্তু ক্ষুদ্র ছিদ্র হইতে ফোয়ারা যেমন চতুর্গুণ বেগে উত্থিত হয় তেমনি দারিদ্র্যের সঙ্কীর্ণ মুখ হইতে আনন্দ পরিপূর্ণ ধারায় উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল।

এমনি করিয়া তিন দিন কাটিল। দুই বেলা নিয়মিত ষ্টীমার আসিয়া লাগে, কত লোক কত কোলাহল; সন্ধ্যাবেলায় নদীতীর একেবারে নির্জ্জন হইয়া যায়, তখন কি অবাধ স্বাধীনতা! এবং তিন জনে মিলিয়া নানা প্রকার যোগাড় করিয়া, ভুল করিয়া, এক করিতে আরেক করিয়া তুলিয়া রাঁধা-বাড়া। তাহার পরে মৃণ্ময়ী বলয়ঝঙ্কৃত স্নেহহস্তের পরিবেশনে শ্বশুর জামাতার একত্রে আহার, এবং গৃহিণীপনার সহস্র ত্রুটি প্রদর্শনপূর্ব্বক মৃণ্ময়ীকে পরিহাস ও তাহা লইয়া বালিকার আনন্দকলহ এবং মৌখিক অভিমান।

অবশেষে অপূর্ব্ব জানাইল আর অধিক দিন থাকা উচিত হয় না। মৃণ্ময়ী করুণস্বরে আরও কিছু দিন সময় প্রার্থনা করিল। ঈশান কহিল কাজ নাই।

বিদায়ের দিন কন্যাকে বুকের কাছে টানিয়া তাহার মাথায় হাত রাখিয়া অশ্রুগদ্গদকণ্ঠে ঈশান কহিল, "মা, তুমি শ্বশুরঘর উজ্জ্বল করিয়া লক্ষ্মী হইয়া থাকিয়ো। কেহ যেন আমার মীনুর কোন দোষ না ধরিতে পারে!"

মৃণ্ময়ী কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর সহিত বিদায় হইল। এবং ঈশান সেই দ্বিগুণ নিরানন্দ সঙ্কীর্ণ ঘরের মধ্যে ফিরিয়া গিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস নিয়মিত মাল ওজন করিতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এই অপরাধীযুগল গৃহে ফিরিয়া আসিলে মা অত্যন্ত গম্ভীরভাবে রহিলেন, কোন কথাই কহিলেন না। কাহারও ব্যবহারের প্রতি এমন কোন দোষারোপ করিলেন না যাহা সে ক্ষালন করিবার চেষ্টা করিতে পারে। এই নীরব অভিযোগ এই নিস্তব্ধ অভিমান লৌহভারের মত সমস্ত ঘরকন্নার উপর অটলভাবে চাপিয়া রহিল।

অবশেষে অসহ্য হইয়া উঠিলে অপূর্ব্ব আসিয়া কহিল, "মা, কালেজ খুলেচে এখন আমাকে আইন পড়তে যেতে হবে।"

মা উদাসীন ভাবে কহিলেন "বৌয়ের কি করবে?"

অপূর্ব্ব কহিল "বৌ এখানেই থাক্।"

মা কহিলেন "না বাপু, কাজ নাই! তুমি তাকে তোমার সঙ্গেই নিয়ে যাও।" সচরাচর মা অপূর্ব্বকে তুই সম্ভাষণ করিয়া থাকেন।

অপূর্ব্ব অভিমানক্ষুণ্ণস্বরে কহিল "আচ্ছা!"

কলিকাতা যাইবার আয়োজন পড়িয়া গেল। যাইবার আগের রাত্রে অপূর্ব্ব বিছানায় আসিয়া দেখিল মৃণ্ময়ী কাঁদিতেছে।

হঠাৎ তাহার মনে আঘাত লাগিল। বিষণ্ণ কণ্ঠে কহিল "মৃণ্ময়ী, আমার সঙ্গে কলকাতায় যেতে তোমার ইচ্ছে করচে না?"

মৃণ্ময়ী কহিল—"না।"

অপূর্ব্ব জিজ্ঞাসা করিল "তুমি আমাকে ভালবাস না?"

এ প্রশ্নের কোন উত্তর পাইল না। অনেক সময় এই প্রশ্নটির উত্তর অতিশয় সহজ কিন্তু আবার এক এক সময় ইহার মধ্যে মনস্তত্ত্বঘটিত এত জটিলতার সংস্রব থাকে যে, বালিকার

নিকট হইতে তাহার উত্তর প্রত্যাশা করা যায় না।

অপূর্ব্ব প্রশ্ন করিল "রাখালকে ছেড়ে যেতে তোমার মন কেমন কর্‌চে ?"

মৃণ্ময়ী অনায়াসে উত্তর করিল "হাঁ।"

বালক রাখালের প্রতি এই বি, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ কৃতবিদ্য যুবকের সূচির মত অতি সূক্ষ্ম অথচ অতি সুতীক্ষ্ণ ঈর্ষ্যার উদয় হইল। কহিল "আমি অনেক কাল আর বাড়ি আস্‌তে পাব না।" এই সংবাদ সম্বন্ধে মৃণ্ময়ীর কোন বক্তব্য ছিল না। "বোধ হয় দু-বৎসর কিংবা তারো বেশী হতে পারে।" মৃণ্ময়ী আদেশ করিল "তুমি ফিরে আস্‌বার সময় রাখালের জন্যে একটা তিনমুখো রাজাসের ছুরি কিনে নিয়ে এসো।"

অপূর্ব্ব শয়ান অবস্থা হইতে ঈষৎ উত্থিত হইয়া কহিল "তুমি তা হলে এইখানেই থাক্‌বে ?"

মৃণ্ময়ী কহিল "হাঁ, আমি মায়ের কাছে গিয়ে থাক্‌ব!"

অপূর্ব্ব নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল "আচ্ছা, তাই থেকো! যত দিন না তুমি আমাকে আস্‌বার জন্যে চিঠি লিখ্‌বে, আমি আস্‌ব না। খুব খুসি হলে ?"

মৃণ্ময়ী এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বাহুল্য বোধ করিয়া ঘুমাইতে লাগিল, কিন্তু অপূর্ব্বর ঘুম হইল না। বালিশ উঁচু করিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়া রহিল।

অনেক রাত্রে হঠাৎ চাঁদ উঠিয়া চাঁদের আলো বিছানার উপর আসিয়া পড়িল। অপূর্ব্ব সেই আলোকে মৃণ্ময়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল। চাহিয়া চাহিয়া মনে হইল যেন রাজকন্যাকে কে রূপার কাঠি ছোঁয়াইয়া অচেতন করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। একবার কেবল সোণার কাঠি পাইলেই এই নিদ্রিত আত্মাটিকে জাগাইয়া তুলিয়া মালা বদল করিয়া লওয়া যায়। রূপার কাঠি হাস্য, আর সোণার কাঠি অশ্রুজল।

ভোরের বেলায় অপূর্ব্ব মৃণ্ময়ীকে জাগাইয়া দিল—কহিল, "মৃণ্ময়ী আমার যাইবার সময় হইয়াছে। চল তোমাকে তোমার মার বাড়ি রাখিয়া আসি।"—

মৃণ্ময়ী শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে অপূর্ব্ব তাহার দুটি হাত ধরিয়া কহিল, "এখন আমার একটি প্রার্থনা আছে। আমি অনেক সময় তোমার অনেক সাহায্য করিয়াছি আজ যাইবার সময় তাহার একটি পুরস্কার দিবে ?

মৃণ্ময়ী বিস্মিত হইয়া কহিল, "কি ?"

অপূর্ব্ব কহিল, "তুমি ইচ্ছা করিয়া ভাল বাসিয়া আমাকে একটি চুম্বন দাও।"

অপূর্ব্বর এই অদ্ভুত প্রার্থনা এবং গম্ভীর মুখভাব দেখিয়া মৃণ্ময়ী হাসিয়া উঠিল। হাস্য সম্বরণ করিয়া মুখ বাড়াইয়া চুম্বন করিতে উদ্যত হইল—কাছাকাছি গিয়া আর পারিল না, খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল—এমন দুইবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে নিরস্ত হইয়া মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল। শাসনচ্ছলে অপূর্ব্ব তাহার কর্ণমূল ধরিয়া নাড়িয়া দিল।

অপূর্ব্বর বড় কঠিন পণ। দস্যুবৃত্তি করিয়া কাড়িয়া লুঠিয়া লওয়া সে আত্মাবমাননা মনে করে। সে দেবতার ন্যায় সগৌরবে থাকিয়া স্বেচ্ছানীত উপহার চায়, নিজের হাত দিয়া কিছুই তুলিয়া লইবে না। অত্যধিক হৃদয়-রস-লালসায় হৃদয়ের সংযোগ ব্যতীত কোন সামগ্রীই তাহার মুখে রুচে না।

মৃণ্ময়ী আর হাসিল না। তাহাকে প্রত্যুষের আলোকে নির্জ্জন পথ দিয়া তাহার মার বাড়ি রাখিয়া অপূর্ব্ব গৃহে আসিয়া মাতাকে কহিল, "ভাবিয়া দেখিলাম, বৌকে আমার সঙ্গে কলি-

কাতায় লইয়া গেলে আমার পড়াশুনার ব্যাঘাত হইবে, সেখানে উহারও কেহ সঙ্গিনী নাই। তুমি ত তাহাকে এ বাড়িতে রাখিতে চাও না আমি তাই তাহার মার বাড়িতেই রাখিয়া আসিলাম।”

সুগভীর অভিমানের মধ্যে মাতাপুত্রের বিচ্ছেদ হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—*—

মার বাড়িতে আসিয়া মৃণ্ময়ী দেখিল কিছুতেই আর মন লাগিতেছে না! সে বাড়ির আগাগোড়া যেন বদল হইয়া গেছে। সময় আর কাটে না। কি করিবে কোথায় যাইবে কাহার সহিত দেখা করিবে ভাবিয়া পাইল না।

মৃণ্ময়ীর হঠাৎ মনে হইল যেন সমস্ত গৃহে এবং সমস্ত গ্রামে কেহ লোক নাই। যেন মধ্যাহ্নে সূর্য্যগ্রহণ হইল। কিছুতেই বুঝিতে পারিল না, আজ কলিকাতায় চলিয়া যাইবার জন্য এত প্রাণপণ ইচ্ছা করিতেছে কাল রাত্রে এই ইচ্ছা কোথায় ছিল! কাল সে জানিত না যে, জীবনের যে অংশ পরিহার করিয়া যাইবার জন্য এত মন-কেমন করিতেছিল তৎপূর্ব্বেই তাহার সম্পূর্ণ স্বাদ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। গাছের পক্বপত্রের ন্যায় আজ সেই বৃন্তচ্যুত অতীত জীবনটাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক অনায়াসে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিল।

গল্পে শুনা যায়, নিপুণ অস্ত্রকার এমন সূক্ষ্ম তরবারী নির্ম্মাণ করিতে পারে যে, তদ্দ্বারা মানুষকে দ্বিখণ্ড করিলেও সে জানিতে পারে না, অবশেষে নাড়া দিলে দুই অর্দ্ধখণ্ড ভিন্ন হইয়া যায়। বিধাতার তরবারী সেইরূপ সূক্ষ্ম, কখন্ তিনি মৃণ্ময়ীর বাল্য ও যৌবনের মাঝখানে আঘাত করিয়াছিলেন সে জানিতে পারে নাই; আজ কেমন করিয়া নাড়া পাইয়া বাল্য-অংশ যৌবন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িল এবং মৃণ্ময়ী বিস্মিত হইয়া ব্যথিত হইয়া চাহিয়া রহিল।

মাতৃগৃহে তাহার সেই পুরাতন শয়ন-গৃহকে আর আপনার বলিয়া মনে হইল না, সেখানে যে থাকিত সে হঠাৎ আর নাই। এখন হৃদয়ের সমস্ত স্মৃতি সেই আর একটা বাড়ি আর একটা ঘর আর একটা শয্যার কাছে গুন্‌গুন্ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

মৃণ্ময়ীকে আর কেহ বাহিরে দেখিতে পাইল না। তাহার হাস্যধ্বনি আর শুনা যায় না। রাখাল তাহাকে দেখিলে ভয় করে। খেলার কথা মনেও আসে না।

মৃণ্ময়ী মাকে বলিল, “মা আমাকে শ্বশুরবাড়ি রেখে আয়।”

এদিকে, বিদায়কালীন পুত্রের বিষণ্ণমুখ স্মরণ করিয়া অপূর্ব্বর মার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। সে যে রাগ করিয়া বৌকে বেহানের বাড়ি রাখিয়া আসিয়াছে ইহা তাঁহার মনে বড়ই বিঁধিতে লাগিল।

হেনকালে একদিন মাথায় কাপড় দিয়া মৃণ্ময়ী ম্লানমুখে শাশুড়ীর পায়ের কাছে পড়িয়া প্রণাম করিল। শাশুড়ী তৎক্ষণাৎ ছলছল-নেত্রে তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন! মুহূর্ত্তের মধ্যে উভয়ের মিলন হইয়া গেল। শাশুড়ী বধূর মুখের দিকে চাহিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। সে মৃণ্ময়ী আর নাই। এমন পরিবর্ত্তন সাধারণতঃ সকলের সম্ভব নহে। বৃহৎ পরিবর্ত্তনের জন্য বৃহৎ বলের আবশ্যক।

শাশুড়ী স্থির করিয়াছিলেন, মৃণ্ময়ীর দোষগুলির একটি একটি করিয়া সংশোধন করিবেন;

কিন্তু আর একজন অদৃশ্য সংশোধনকর্ত্তা একটি অজ্ঞাত সংক্ষেপ উপায় অবলম্বন করিয়া মৃণ্ময়ীকে যেন নূতন জন্মপরিগ্রহ করাইয়া দিলেন।

এখন শাশুড়ীকেও মৃণ্ময়ী বুঝিতে পারিল, শাশুড়ীও মৃণ্ময়ীকে চিনিতে পারিলেন; তরুর সহিত শাখাপ্রশাখার যেরূপ মিল, সমস্ত ঘরকন্না তেমনি পরস্পর অখণ্ডসম্মিলিত হইয়া গেল।

এই যে একটি গম্ভীর স্নিগ্ধ বিশাল রমণীপ্রকৃতি মৃণ্ময়ীর সমস্ত শরীরে ও সমস্ত অন্তরে রেখায় রেখায় ভরিয়া ভরিয়া উঠিল ইহাতে তাহাকে যেন বেদনা দিতে লাগিল। প্রথম আষাঢ়ের শ্যামসজল নব মেঘের মত তাহার হৃদয়ে একটি অশ্রুপূর্ণ বিস্তীর্ণ অভিমানের সঞ্চার হইল। সেই অভিমান তাহার চোখের ছায়াময় সুদীর্ঘ পল্লবের উপর আর একটি গভীরতর ছায়া নিক্ষেপ করিল। সে মনে মনে বলিতে লাগিল, আমি আমাকে বুঝিতে পারি নাই বলিয়া তুমি আমাকে বুঝিলে না কেন? তুমি আমাকে শাস্তি দিলে না কেন? তোমার ইচ্ছানুসারে আমাকে চালনা করাইলে না কেন? আমি রাক্ষসী যখন তোমার সঙ্গে কলিকাতায় যাইতে চাহিলাম না, তুমি আমাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গেলে না কেন? তুমি আমার কথা শুনিলে কেন, আমার অনুরোধ মানিলে কেন, আমার অবাধ্যতা সহিলে কেন?

তাহার পর, অপূর্ব্ব যেদিন প্রভাতে পুষ্করিণীতীরের নির্জ্জন পথে তাহাকে বন্দী করিয়া কিছু না বলিয়া একবার কেবল তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল সেই পুষ্করিণী সেই পথ সেই তরুতল সেই প্রভাতের রৌদ্র এবং সেই হৃদয়ভারাবনত গভীর দৃষ্টি তাহার মনে পড়িল এবং হঠাৎ সে তাহার সমস্ত অর্থ বুঝিতে পারিল। তাহার পর, সেই বিদায়ের দিনের যে চুম্বন অপূর্ব্বর মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, সেই অসম্পূর্ণ চুম্বন এখন মরুমরীচিকাভিমুখী তৃষার্ত্ত পাখীর ন্যায় ক্রমাগত সেই অতীত অবসরের দিকে ধাবিত হইতে লাগিল কিছুতেই তাহার আর পিপাসা মিটিল না। এখন থাকিয়া থাকিয়া মনে কেবল উদয় হয়, আহা, অমুক সময়টিতে যদি এমন করিতাম, অমুক প্রশ্নের যদি এই উত্তর দিতাম, তখন যদি এমন হইত!

অপূর্ব্বর মনে এই বলিয়া ক্ষোভ জন্মিয়াছিল যে, মৃণ্ময়ী আমার সম্পূর্ণ পরিচয় পায় নাই; মৃণ্ময়ীও আজ বসিয়া বসিয়া ভাবে, তিনি আমাকে কি মনে করিলেন, কি বুঝিয়া গেলেন! অপূর্ব্ব তাহাকে যে দুরন্ত চপল অবিবেচক নির্ব্বোধ বালিকা বলিয়া জানিল, পরিপূর্ণ হৃদয়ামৃতধারায় প্রেমপিপাসা মিটাইতে সক্ষম রমণী বলিয়া পরিচয় পাইল না ইহাতেই সে পরিতাপে লজ্জায় ধিক্কারে পীড়িত হইতে লাগিল। চুম্বনের এবং সোহাগের সে ঋণগুলি অপূর্ব্বর মাথার বালিশের উপর পরিশোধ করিতে লাগিল। এমনিভাবে কত দিন কাটিল।

অপূর্ব্ব বলিয়া গিয়াছিল, তুমি চিঠি না লিখিলে আমি বাড়ি ফিরিব না। মৃণ্ময়ী তাহাই স্মরণ করিয়া একদিন ঘরে দ্বাররুদ্ধ করিয়া চিঠি লিখিতে বসিল। অপূর্ব্ব তাহাকে যে সোনালি পাড়-দেওয়া রঙীন কাগজ দিয়াছিল তাহাই বাহির করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। খুব যত্ন করিয়া ধরিয়া লাইন বাঁকা করিয়া অঙ্গুলিতে কালি মাখিয়া অক্ষর ছোট বড় করিয়া উপরে কোন সম্বোধন না করিয়া একেবারে লিখিল—তুমি আমাকে চিঠি লেখ না কেন। তুমি কেমন আছ আর তুমি বাড়ি

এস। আর কি বলিবার আছে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। আসল বক্তব্য কথা সব গুলিই বলা হইয়া গেল বটে, কিন্তু মনুষ্যসমাজে মনের ভাব আর একটু বাহুল্য করিয়া প্রকাশ করা আবশ্যক। মৃণ্ময়ীও তাহা বুঝিল; এই জন্য আরো অনেকক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া আর কয়েকটি নূতন কথা যোগ করিয়া দিল—এইবার তুমি আমাকে চিঠি লিখো, আর কেমন আছ লিখো, আর বাড়ি এস, মা ভাল আছেন, বিশু পুঁটি ভাল আছে, কাল আমাদের কালোগরুর বাছুর হয়েছে।—এই বলিয়া চিঠি শেষ করিল। চিঠি লেফাফায় মুড়িয়া প্রত্যেক অক্ষরটির উপর একটি ফোঁটা করিয়া মনের ভালবাসা দিয়া লিখিল শ্রীযুক্ত বাবু অপূর্ব্বকৃষ্ণ রায়। ভালবাসা যতই দিক, তবু লাইন সোজা, অক্ষর সুছাঁদ এবং বানান শুদ্ধ হইল না।

লেফাফায় নামটুকু ব্যতীত যে কিছু লেখা আবশ্যক মৃণ্ময়ীর তাহা জানা ছিল না। পাছে শাশুড়ী অথবা আর কাহারও দৃষ্টিপথে পড়ে সেই লজ্জায় চিঠিখানি একটি বিশ্বস্ত দাসীর হাত দিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিল।

বলা বাহুল্য, এ পত্রের কোন ফল হইল না, অপূর্ব্ব বাড়ি আসিল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মা দেখিলেন ছুটি হইল তবু অপূর্ব্ব বাড়ি আসিল না। মনে করিলেন এখনো সে তাঁহার উপর রাগ করিয়া আছে।

মৃণ্ময়ীও স্থির করিল অপূর্ব্ব তাহার উপর বিরক্ত হইয়া আছে। তখন আপনার চিঠিখানি মনে করিয়া সে লজ্জায় মরিয়া যাইতে লাগিল। সে চিঠিখানা যে কত তুচ্ছ, তাহাতে যে কোন কথাই লেখা হয় নাই, তাহার মনের ভাব যে কিছুই প্রকাশ হয় নাই, সেটা পাঠ করিয়া অপূর্ব্ব যে মৃণ্ময়ীকে আরো ছেলেমানুষ মনে করিতেছে, মনে মনে আরো অবজ্ঞা করিতেছে, ইহা ভাবিয়া সে শরবিদ্ধের ন্যায় অন্তরে অন্তরে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। দাসীকে বারবার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে চিঠিখানা তুই কি ডাকে দিয়ে এসেছিস্?" দাসী তাহাকে সহস্রবার আশ্বাস দিয়া কহিল "হাঁগো, আমি নিজের হাতে বাক্সের মধ্যে ফেলে দিয়েছি। বাবু সে এত দিনে কোন কালে পেয়েছে।"

অবশেষে অপূর্ব্বর মা একদিন মৃণ্ময়ীকে ডাকিয়া কহিলেন, "বৌমা, অপু অনেক দিন ত বাড়ি এল না, তাই মনে করচি একবার কলকাতায় গিয়ে তাকে দেখে' আসি গে। তুমি সঙ্গে যাবে?" মৃণ্ময়ী সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল এবং ঘরের মধ্যে আসিয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া বিছানার উপর পড়িয়া বালিশখানা বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া হাসিয়া নড়িয়া চড়িয়া মনের আবেগ উন্মুক্ত করিয়া দিল; তাহার পর ক্রমে গম্ভীর হইয়া বিষণ্ণ হইয়া আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অপূর্ব্বকে কোন খবর না দিয়া এই দুটি অনুতপ্তা রমণী তাহার প্রসন্নতা ভিক্ষা করিবার জন্য কলিকাতায় যাত্রা করিল। অপূর্ব্বর মা সেখানে তাঁহার জামাইবাড়িতে গিয়া উঠিলেন।

সে দিন মৃণ্ময়ীর পত্রের প্রত্যাশায় নিরাশ হইয়া সন্ধ্যাবেলায় অপূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া নিজেই তাহাকে পত্র লিখিতে বসিয়াছে। কোন কথাই পছন্দমত হইতেছে না। এমন একটা সম্বোধন খুঁজিতেছে যাহাতে ভালবাসাও

প্রকাশ হয় অথচ অভিমানও ব্যক্ত করে ; কথা না পাইয়া মাতৃভাষার উপর অশ্রদ্ধা দৃঢ়তর হইতেছে। এমন সময় ভগ্নীপতির নিকট হইতে পত্র পাইল, মা আসিয়াছেন, শীঘ্র আসিবে এবং রাত্রে এইখানেই আহারাদি করিবে। সংবাদ সমস্ত ভাল।—শেষ আশ্বাসসত্ত্বেও অপূর্ব্ব অমঙ্গলশঙ্কায় বিমর্ষ হইয়া উঠিল। অবিলম্বে ভগ্নীর বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল।

সাক্ষাৎমাত্রই মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, সব ভাল ত?" মা কহিলেন, "সব ভাল। তুই ছুটিতে বাড়ি গেলি না, তাই আমি তোকে নিতে এসেচি।"

অপূর্ব্ব কহিল, সে জন্য এত কষ্ট করিয়া আসিবার কি আবশ্যক ছিল ; আইন পরীক্ষার পড়াশুনা ইত্যাদি ইত্যাদি।

আহারের সময় ভগ্নী জিজ্ঞাসা করিল, দাদা এবার বৌকে তোমার সঙ্গে আন্‌লে না কেন?

দাদা গম্ভীরভাবে কহিতে লাগিল—আইনের পড়াশুনা ইত্যাদি।

ভগ্নীপতি হাসিয়া কহিল—ও সমস্ত মিথ্যা ওজর! আমাদের ভয়ে আন্‌তে সাহস হয় না!

ভগ্নী কহিল, ভয়ঙ্কর লোকটাই বটে! ছেলেমানুষ হঠাৎ দেখ্‌লে আচম্‌কা আঁৎকে উঠ্‌তে পারে!

এই ভাবে হাস্য পরিহাস চলিতে লাগিল, কিন্তু অপূর্ব্ব অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া রহিল। কোন কথা তাহার ভাল লাগিতেছিল না। তাহার মনে হইতেছিল, সেই যখন মা কলিকাতায় আসিলেন তখন মৃন্ময়ী ইচ্ছা করিলে অনায়াসে তাঁহার সহিত আসিতে পারিত। বোধ হয় মা তাহাকে সঙ্গে আনিবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন কিন্তু সে সম্মত হয় নাই। এ সম্বন্ধে সঙ্কোচবশতঃ মাকে কোন প্রশ্ন করিতে পারিল না—সমস্ত মানবজীবন এবং বিশ্বরচনাটা আগাগোড়া ভ্রান্তিসঙ্কুল বলিয়া বোধ হইল।

আহারান্তে প্রবলবেগে বাতাস উঠিয়া বিষম বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

ভগ্নী কহিল, দাদা, আজ আমাদের এখানেই থেকে যাও।

দাদা কহিল, না বাড়ি যেতে হবে ; কাজ আছে।

ভগ্নীপতি কহিল, রাত্রে তোমার আবার এত কাজ কিসের? এখানে একরাত্রি থেকে গেলে তোমার ত কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না, তোমার ভাবনা কি?

অনেক পীড়াপীড়ির পর বিস্তর অনিচ্ছাসত্ত্বে অপূর্ব্ব সে রাত্রি থাকিয়া যাইতে সম্মত হইল।

ভগ্নী কহিল, দাদা তোমাকে শ্রান্ত দেখাচ্চে তুমি আর দেরি কোরো না, চল শুতে চল।

অপূর্ব্বরও সেই ইচ্ছা। শয্যাতলে অন্ধকারের মধ্যে একলা হইতে পারিলে বাঁচে, কথার উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে ভাল লাগিতেছে না।

শয়নগৃহের দ্বারে আসিয়া দেখিল ঘর অন্ধকার। ভগ্নী কহিল, বাতাসে আলো নিবে গেছে দেখ্‌চি, তা আলো এনে দেব কি দাদা?

অপূর্ব্ব কহিল, না দরকার নেই, আমি রাত্রে আলো রাখিনে।

ভগ্নী চলিয়া গেলে অপূর্ব্ব অন্ধকারে সাবধানে খাটের অভিমুখে গেল।

খাটে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইতেছে এমন সময় হঠাৎ বলয়নিক্কণশব্দে একটি সুকোমল বাহুপাশ তাহাকে সুকঠিন বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিল এবং একটি পুষ্পপুটতুল্য ওষ্ঠাধর দস্যুর

মত আসিয়া পড়িয়া অবিরল অশ্রুজলসিক্ত আবেগপূর্ণ চুম্বনে তাহাকে বিস্ময় প্রকাশের অবসর দিল না। অপূর্ব্ব প্রথমে চমকিয়া উঠিল তাহার পর বুঝিতে পারিল অনেক দিনের একটি হাস্যবাধায় অসম্পন্ন চেষ্ট' গা অশ্রুজলধারায় সমাপ্ত হইল।

উপহার।

শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী।

শ্রীচরণেষু।

দিদি,

তোমার স্নেহের কোলে আমার স্নেহের ধন
করিনু অর্পণ।
বিমল প্রশান্ত মুখে ফুটিবে স্নেহের হাস
দেখিবারে আশ।
সুদূর প্রবাস হতে আজি বহু দিন পরে
আসিতেছ ঘরে,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে আছি উপহার লয়ে করে
সমর্পণ তরে।
কাছে কিম্বা দূরে থাকি, দেখ আর নাই দেখ,
শুধু স্নেহ দাও;
স্নেহ ক'রে ভাল থাক', স্নেহ দিতে ভাল বাস'
কিছু নাহি চাও!
দূরে থেকে কাছে থাক,' আপনি হৃদয় তাহা
জানিবারে পায়!
সুদূর প্রবাস হ'তে স্নেহের বাতাস এসে
লাগে যেন গায়!
এত আছে, এত দাও, কথাটি নাহিক কও,
—স্নেহ-পারাবার,—
প্রভাত শিশির সম নীরবে পরাণে মম
ঝরে স্নেহ ধার!
তব স্নেহ চারি পাশে কেবল নীরবে ভাসে
সৌরভের প্রায়,
নীরবে বিমল হাসি, উষার কিরণ রাশি,
প্রাণেরে জাগায়!

রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী।

বৌ-ঠাকুরাণীর হাট।

—•:•:•—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাত্রি অনেক হইয়াছে। গ্রীষ্মকাল। বাতাস বন্ধ হইয়া গিয়াছে। গাছের পাতাটিও নড়িতেছে না। যশোহরের যুবরাজ, প্রতাপাদিত্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র, উদয়াদিত্য তাঁহার শয়ন-গৃহের বাতায়নে বসিয়া আছেন। তাঁহার পার্শ্বে তাঁহার স্ত্রী সুরমা।

সুরমা কহিলেন, "প্রিয়তম, সহ্য করিয়া থাক, ধৈর্য্য ধরিয়া থাক। এক দিন সুখের দিন আসিবে।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, আমি ত আর কোন সুখ চাই না, আমি চাই, আমি রাজপ্রাসাদে না যদি জন্মাইতাম, যুবরাজ না যদি হইতাম, যশোহর-অধিপতির ক্ষুদ্রতম তুচ্ছতম প্রজার প্রজা হইতাম, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, তাঁহার সিংহাসনের তাঁহার সমস্ত ধন মান যশ প্রভাব গৌরবের একমাত্র উত্তরাধিকারী না হইতাম! কি তপস্যা করিলে এ সমস্ত অতীত উল্টাইয়া যাইতে পারে।"

সুরমা অতি কাতর হইয়া যুবরাজের দক্ষিণ হস্ত দুই হাতে লইয়া চাপিয়া ধরিলেন, ও তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। যুবরাজের ইচ্ছা পুরাইতে প্রাণ দিতে পারেন, কিন্তু প্রাণ দিলেও এ ইচ্ছা পুরাইতে পারিবেন না, এই দুঃখ।

যুবরাজ কহিলেন, "সুরমা, রাজার ঘরে জন্মিয়াছি বলিয়াই সুখী হইতে পারিলাম না। রাজার ঘরে সকলে বুঝি কেবল উত্তরাধিকারী হইয়া জন্মায়, সন্তান হইয়া জন্মায় না। পিতা ছেলেবেলা হইতেই আমাকে প্রতি মুহূর্ত্তে পরখ করিয়া দেখিতেছেন, আমি তাঁহার উপার্জ্জিত যশোমান বজায় রাখিতে পারিব কি

না, বংশের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিব কি না, রাজ্যের গুরুভার বহন করিতে পারিব কি না। আমার প্রতি কার্য্য, প্রতি অঙ্গভঙ্গী তিনি পরীক্ষার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন, স্নেহের চক্ষে নহে। আত্মীয়বর্গ, মন্ত্রী, রাজসভাসদ্‌গণ, প্রজারা আমার প্রতি কথা প্রতি কাজ খুঁটিয়া খুঁটিয়া লইয়া আমার ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া আসিতেছে। সকলেই ঘাড় নাড়িয়া কহিল— না, আমার দ্বারা এ বিপদের রাজ্য রক্ষা হইবে না। আমি নির্ব্বোধ, আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। সকলেই আমাকে অবহেলা করিতে লাগিল, পিতা আমাকে ঘৃণা করিতে লাগিলেন। আমার আশা একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। একবার খোঁজও লইতেন না!"

সুরমার চখে জল আসিল। সে কহিল "আ—হা! কেমন করিয়া পারিত!" তাহার দুঃখ হইল, তাহার রাগ হইল, সে কহিল "তোমাকে যাহারা নির্ব্বোধ মনে করিত তাহারাই নির্ব্বোধ!"

উদয়াদিত্য ঈষৎ হাসিলেন, সুরমার চিবুক ধরিয়া তাহার রোষে আরক্তিম মুখ খানি নাড়িয়া দিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে গম্ভীর হইয়া কহিলেন।

"না সুরমা, সত্য সত্যই আমার রাজ্যশাসনের বুদ্ধি নাই। তাহার যথেষ্ট পরীক্ষা হইয়া গেছে। আমার যখন ষোল বৎসর বয়স, তখন মহারাজ কাজ শিখাইবার জন্য হোসেনখালী পরগণার ভার আমার হাতে সমর্পণ করেন। ছয় মাসের মধ্যেই বিষম বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। খাজনা কমিয়া গেল, প্রজারা আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল; কর্ম্মচারীরা আমার বিরুদ্ধে রাজার নিকটে অভিযোগ করিতে লাগিল। রাজসভার সকলেরই মত হইল, যুবরাজ প্রজাদের যখন অত প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িয়াছেন, তখনি বুঝা যাইতেছে উঁহার দ্বারা রাজ্যশাসন কখনো ঘটিতে পারিবে না। সেই অবধি মহারাজ আমার পানে আর বড় একটা তাকাইতেন না। বলিতেন "ও কুলাঙ্গার ঠিক রায়গড়ের খুড়া বসন্তরায়ের মত হইবে, সেতার বাজাইয়া নাচিয়া বেড়াইবে ও রাজ্য অধঃপাতে দিবে"।"

সুরমা আবার কহিলেন, "প্রিয়তম, সহ্য করিয়া থাক, ধৈর্য্য ধরিয়া থাক। হাজার হউন, পিতা ত বটেন। আজ কাল রাজ্য-উপার্জ্জন, রাজ্য-বৃদ্ধির একমাত্র দুরাশায় তাঁহার সমস্ত হৃদয় পূর্ণ রহিয়াছে, সেখানে স্নেহের ঠাঁই নাই। যতই তাঁহার আশা পূর্ণ হইতে থাকিবে, ততই তাঁহার স্নেহের রাজ্য বাড়িতে থাকিবে।"

যুবরাজ কহিলেন "সুরমা, তোমার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, দূরদর্শী, কিন্তু এইবারে তুমি ভুল বুঝিয়াছ। একত, আশার শেষ নাই; দ্বিতীয়তঃ, পিতার রাজ্যের সীমা যতই বাড়িতে থাকিবে, রাজ্য যতই লাভ করিতে থাকিবেন, ততই তাহা হারাইবার ভয় তাঁহার মনে বাড়িতে থাকিবে; রাজ-কার্য্য যতই গুরুতর হইয়া উঠিবে, ততই আমাকে তাহার অনুপযুক্ত মনে করিবেন।"

সুরমা ভুল বুঝে নাই, ভুল বিশ্বাস করিত মাত্র; বিশ্বাস বুদ্ধিকেও লঙ্ঘন করে। সে এক মনে আশা করিত, এই রূপই যেন হয়।

"চারিদিকে কোথাও বা কৃপাদৃষ্টি কোথাও বা অবহেলা সহ্য করিতে না পারিয়া আমি মাঝে মাঝে পালাইয়া রায়গড়ে দাদা মহাশয়ের কাছে যাইতাম। পিতা বড় একটা খোঁজ লইতেন না। আঃ, সে কি পরিবর্ত্তন। সেখানে গাছ পালা দেখিতে পাইতাম, গ্রামবাসীদের কুটিরে যাইতে পাইতাম, দিবানিশি

রাজবেশ পরিয়া থাকিতে হইত না। তাহা ছাড়া জান ত, যেখানে দাদা মহাশয় থাকেন, তাহার ত্রিসীমায় বিষাদ ভাবনা বা কঠোর গাম্ভীর্য্য তিষ্ঠিতে পারে না। গাহিয়া বাজাইয়া, আমোদ করিয়া চারিদিক পূর্ণ করিয়া রাখেন। চারিদিকে উল্লাস, সদ্ভাব, শান্তি। সেই খানে গেলেই আমি ভুলিয়া যাইতাম যে, আমি যশোহরের যুবরাজ। সে কি আরামের ভুল! অবশেষে আমার বয়স যখন ১৮ বৎসর, একদিন রায়গড়ে বসন্তের বাতাস বহিতেছিল, চারিদিকে সবুজ কুঞ্জবন ও সেই বসন্তে আমি রুক্মিণীকে দেখিলাম।"

সুরমা বলিয়া উঠিল "ও কথা অনেক বার শুনিয়াছি!"

উদয়াদিত্য, "আর একবার শুন। মাঝে মাঝে এক একটা কথা প্রাণের মধ্যে দংশন করিতে থাকে, সে কথা গুলা যদি বাহির করিয়া না দিই, তবে আর বাঁচিব কি করিয়া। সেই কথাটা তোমার কাছে এখনো বলিতে লজ্জা করে, কষ্ট হয়, তাই বারবার করিয়া বলি, যে দিন আর লজ্জা করিবে না, কষ্ট হইবে না, সে দিন বুঝিব আমার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইল, সে দিন আর বলিব না।"

সুরমা, "কিসের প্রায়শ্চিত্ত প্রিয়তম? তুমি যদি পাপ করিয়া থাক ত সে পাপের দোষ, তোমার দোষ নহে। আমি কি তোমাকে জানি না? অন্তর্যামী কি তোমার মন দেখিতে পান না?"

উদয়াদিত্য বলিতে লাগিলেন, "রুক্মিণীর বয়স আমার অপেক্ষা তিন বৎসরের বড়। সে একাকিনী বিধবা। দাদা মহাশয়ের অনুগ্রহে সে রায়গড়ে বাস করিতে পাইত। মনে নাই, সে আমাকে কি কৌশলে প্রথমে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গেল। তখন আমার মনের মধ্যে মধ্যাহ্নের কিরণ জ্বলিতেছিল।" এত প্রখর আলো যে, কিছুই ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছিলাম না, চারিদিকে জগৎ জ্যোতির্ম্ময় বাষ্পে আবৃত। সমস্ত রক্ত যেন মাথায় উঠিতেছিল; কিছুই আশ্চর্য্য কিছুই অসম্ভব মনে হইত না; পথ, বিপথ, দিক্ বিদিক্ সমস্ত এক আকার ধারণ করিয়াছিল। ইহার পূর্ব্বেও আমার এমন কখন হয় নাই, ইহার পরেও আমার এমন কখন হয় নাই। জগদীশ্বর জানেন, তাঁহার কি উদ্দেশ্য সাধন করিতে এই ক্ষুদ্র দুর্ব্বল বুদ্ধিহীন হৃদয়ের বিরুদ্ধে এক দিনের জন্যসমস্ত জগৎকে যেন উত্তেজিত করিয়া দিয়াছিলেন, বিশ্বচরাচর যেন একতন্ত্র হইয়া আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়টিকে মুহূর্ত্তে বিপথে লইয়া গেল। মুহূর্ত্তমাত্র—আর অধিক নয় সমস্ত বহির্জ্জগতের মুহূর্ত্তস্থায়ী এক নিদারুণ আঘাত, আর মুহূর্ত্তের মধ্যে একটি ক্ষীণ হৃদয়ের মূল বিদীর্ণ হইয়া গেল, বিদ্যুদ্বেগে সে ধূলিকে আলিঙ্গন করিয়া পড়িল। তাহার পরে যখন উঠিল তখন ধূলিধূসরিত, ম্লান, সে ধূলি আর মুছিল না, সে মলিনতার চিহ্ন আর উঠিল না। আমি কি করিয়াছিলাম, বিধাতা, যে পাপে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার জীবনের সমস্ত শুভ্রকে কালি করিলে? দিনকে রাত্রি করিলে? আমার হৃদয়ের পুষ্প-বনে মালতী ও জুঁই ফুলের মুখগুলিও যেন লজ্জায় কালো হইয়া গেল!"

বলিতে বলিতে উদয়াদিত্যের গৌরবর্ণ মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, আয়ত নেত্র অধিকতর বিস্ফারিত হইয়া উঠিল, মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত একটি বিদ্যুৎশিখা কাঁপিয়া উঠিল। সুরমা হর্ষে, গর্ব্বে, কষ্টে কহিল "আমার মাথা খাও, ওকথা থাক্।"

উদয়াদিত্য। "ধীরে ধীরে যখন রক্ত

শীতল হইয়া গেল সকলি যখন যথাযথ পরিমাণে দেখিতে পাইলাম; যখন জগৎকে উষ্ণ, ঘূর্ণিত মস্তিষ্ক, রক্ত-নয়ন মাতালের কুজ্ঝটিকাময় ঘূর্ণ্যমান স্বপ্ন দৃশ্য বলিয়া মনে না হইয়া প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্র বলিয়া মনে হইল, তখন মনের কি অবস্থা। কোথা হইতে কোথায় পতন! শত সহস্র লক্ষ ক্রোশ পাতালের গহ্বরে, অন্ধ-অন্ধতর অন্ধতম রজনীর মধ্যে একেবারে পলক না ফেলিতে পড়িয়া গেলাম। দাদা মহাশয় স্নেহভরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন; তাঁহার কাছে মুখ দেখাইলাম কি বলিয়া? কিন্তু সেই অবধি আমাকে রায়গড় ছাড়িতে হইল। দাদামহাশয় আমাকে না দেখিলে থাকিতে পারেন না; আমাকে ডাকিয়া পাঠাইতেন। আমার এমনি ভয় করিত যে, আমি কোন মতেই যাইতে পারিতাম না। তিনি স্বয়ং আমাকে ও ভগিনী বিভাকে দেখিতে আসিতেন। অভিমান নাই, কিছুই নাই। জিজ্ঞাসাও করিতেন না, কেন যাই নাই। আমাদের দেখিতেন, আমোদ উল্লাস করিতেন ও চলিয়া যাইতেন।"

উদয়াদিত্য ঈষৎ হাস্য করিয়া অতিশয় মৃদু কোমল প্রেমে তাঁহার বড় বড় চোক দুটি প্লাবিত করিয়া সুরমার মুখের দিকে চাহিলেন। সুরমা বুঝিল, এইবার কি কথা আসিতেছে। মুখ নত হইয়া আসিল; ঈষৎ চঞ্চল হইয়া পড়িল। যুবরাজ দুই হস্তে তাহার দুই কপোল ধরিয়া নত মুখ খানি তুলিয়া ধরিলেন; অধিকতর নিকটে গিয়া বসিলেন; মুখ খানি নিজের স্কন্ধে ধীরে ধীরে রাখিলেন। কটিদেশ বামহস্তে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন; ও গভীর প্রশান্ত প্রেমে তাহার কপাল চুম্বন করিয়া বলিলেন—

"তার পর কি হইল, সুরমা, বল দেখি? এই বুদ্ধিতে দীপ্যমান, স্নেহ প্রেমে কোমল, হাস্যে উজ্জ্বল ও প্রশান্ত ভাবে বিমল মুখখানি কোথা হইতে উদয় হইল? আমার সে গভীর অন্ধকার ভাঙ্গিবে আশা ছিল কি? তুমি আমার উষা, আমার আলো, আমার আশা, কি মায়ামন্ত্রে সে আঁধার দূর করিলে?" যুবরাজ বার-বার সুরমার মুখ চুম্বন করিলেন। সুরমা কিছুই কথা কহিল না, আনন্দে তাহার চোখ জলে পূরিয়া আসিল; যুবরাজ কহিলেন,—

"এতদিনের পরে আমি যথার্থ আশ্রয় পাইলাম। তোমার কাছে প্রথম শুনিলাম যে আমি নির্ব্বোধ নই, তাহাই বিশ্বাস করিলাম, তাহাই বুঝিতে পারিলাম। তোমারি কাছে শিখিলাম বুদ্ধি অন্ধকারময় ক্ষুদ্র গলির মত বাঁকাচোরা উচুনিচু নহে, রাজপথের ন্যায় সরল সমতল, প্রশস্ত। পূর্ব্বে আমি আপনাকে ঘৃণা করিতাম, আপনাকে অবহেলা করিতাম। কোন কাজ করিতে সাহস করিতাম না। মন যদি বলিত, ইহাই ঠিক, আত্ম-সংশয়ী সংস্কার বলিত, উহা ঠিক না হইতেও পারে। যে যেরূপ ব্যবহার করিত তাহাই সহিয়া থাকিতাম, নিজে কিছু ভাবিতে চেষ্টা করিতাম না। এতদিনের পরে আমার মনে হইল, আমি কিছু, আমি কেহ। এতদিন আমি অগোচর ছিলাম, তুমি আমাকে বাহির করিয়াছ, সুরমা, তুমি আমাকে আবিষ্কার করিয়াছ, এখন আমার মন যাহা ভাল বলে, তৎক্ষণাৎ তাহা আমি সাধন করিতে যাই। তোমার উপর আমার এমন বিশ্বাস আছে যে, তুমি যখন আমাকে বিশ্বাস কর, তখন আমিও আমাকে নির্ভয়ে বিশ্বাস করিতে পারি। এই সুকুমার শরীরে এত বল কোথায় ছিল যাহাতে আমাকেও তুমি বলীয়ান্ করিয়া তুলিয়াছ?

কি অপরিসীম নির্ভরের ভাবে সুরমা স্বামীর বক্ষ বেষ্টন করিয়া ধরিল! কি সম্পূর্ণ

আত্ম-বিসর্জ্জী দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল! তাহার চোক কহিল "আমার আর কিছুই নাই কেবল তুমি আছ, তাই আমার সব আছে!"

বাল্যকাল হইতে উদয়াদিত্য আত্মীয় স্বজনের উপেক্ষা সহিয়া আসিতেছেন, মাঝে মাঝে এক এক দিন নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে সুরমার নিকট সেই শতবার কথিত পুরাণো জীবন-কাহিনী খণ্ডে খণ্ডে সোপানে সোপানে আলোচনা করিতে তাঁহার বড় ভাল লাগে।

উদয়াদিত্য কহিলেন, "এমন করিয়া আর কত দিন চলিবে সুরমা? এদিকে রাজসভায় সভাসদ্গণ কেমন একপ্রকার কৃপাদৃষ্টিতে আমার প্রতি চায়, ওদিকে অন্তঃপুরে মা তোমাকে লাঞ্ছনা করিতেছেন; দাস দাসীরা পর্য্যন্ত তোমাকে তেমন মানে না। তুমি কাহাকেও ভাল করিয়া কিছু বলিতে পারি না, চুপ করিয়া থাকি, সহ্য করিয়া যাই। তোমার তেজস্বী স্বভাব, কিন্তু তুমিও নীরবে সহিয়া যাও। যখন তোমাকে সুখী করিতে পারিলাম না, আমা হইতে তোমাকে কেবল অপমান আর কষ্টই সহ্য করিতে হইল, তখন আমাদের এ বিবাহ না হইলেই ভাল ছিল!"

সুরমা,—সে কি কথা নাথ? এই সময়েই ত সুরমাকে আবশ্যক। সুখের সময় আমি তোমার কি করিতে পারিতাম? সুখের সময়ও সুরমা বিলাসের দ্রব্য, খেলিবার জিনিষ, সকল দুঃখ অতিক্রম করিয়া আমার মনে এই সুখ জাগিতেছে যে, আমি তোমার কাজে লাগিতেছি, তোমার জন্য দুঃখ সহিতে যে অতুল আনন্দ আছে, সেই আনন্দ উপভোগ করিতেছি। কেবল দুঃখ এই, তোমার সমুদায় কষ্ট কেন আমি বহন করিতে পারিলাম না?

যুবরাজ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন "আমি নিজের জন্য তেমন ভাবি না। সকলি সহিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমার জন্য তুমি কেন অপমান সহ্য করিবে? তুমি যথার্থ স্ত্রীর মত আমার দুঃখের সময় সান্ত্বনা দিয়াছ, শ্রান্তির সময় বিশ্রাম দিয়াছ, কিন্তু আমি স্বামীর মত তোমাকে অপমান হইতে লজ্জা হইতে রক্ষা করিতে পারিলাম না। তোমার পিতা শ্রীপুর-রাজ আমার পিতাকে প্রধান বলিয়া না মানাতে, আপনাকে যশোহরছত্রের অধীন বলিয়া স্বীকার না করাতে পিতা তোমার প্রতি অবহেলা দেখাইয়া নিজের প্রধানত্ব বজায় রাখিতে চান। তোমাকে কেহ অপমান করিলে তিনি কাণেই আনেন না। তিনি মনে করেন, তোমাকে যে পুত্রবধূ করিয়াছেন, ইহাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। এক একবার মনে হয়, আর পারিয়া উঠি না, সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে লইয়া চলিয়া যাই। এত দিনে হয় ত যাইতাম, তুমি কেবল আমাকে ধরিয়া রাখিয়াছ।"

রাত্রি গভীর হইল। অনেকগুলি সন্ধ্যার তারা অস্ত গেল, অনেকগুলি গভীর রাত্রের তারা উদিত হইল। প্রাকার-তোরণস্থিত প্রহরীদের পদশব্দ দূর হইতে শুনা যাইতেছে। সমুদয় জগৎ সুষুপ্ত। নগরের সমুদয় প্রদীপ নিবিয়া গিয়াছে; গৃহদ্বার রুদ্ধ; দৈবাৎ দুএকটা শৃগাল ছাড়া একটি জনপ্রাণীও নাই। উদয়াদিত্যের শয়নকক্ষের দ্বার রুদ্ধ ছিল। সহসা বাহির হইতে কে দুয়ারে আঘাত করিতে লাগিল। শশব্যস্ত যুবরাজ দুয়ার খুলিয়া দিলেন। "কেন? বিভা? কি হইয়াছে? এত রাত্রে এখানে আসিয়াছ কেন?"

পাঠকেরা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন বিভা উদয়াদিত্যের ভগিনী। বিভা কহিল—"এতক্ষণে বুঝি সর্ব্বনাশ হইল!" সুরমা ও উদয়াদিত্য

এক সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন, "কেন কি হইয়াছে ?" বিভা ভয়কম্পিত স্বরে চুপি চুপি কি কহিল। বা তে বলিতে আর থাকিতে পারিল না, কাঁদিয়া ঠিল, কহিল—"দাদা কি হবে ?

উদয়াদিত্য কহিলেন "আমি তবে চলি-লাম !" বিভা বলিয়া উঠিল "না না তুমি যাইও না।"

উদয়াদিত্য। "কেন বিভা ?"

বিভা "পিতা যদি জানিতে পারেন ? তোমার উপরে যদি রাগ করেন ?"

সুরমা কহিল, "ছিঃ বিভা ; এসময়ে কি তাহা ভাবিবার সময় ?"

উদয়াদিত্য বস্ত্রাদি পরিয়া কটিবন্ধে তর-বারী বাঁধিয়া প্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন। বিভা তাঁহার হাত ধরিয়া কহিল "দাদা তুমি যাইও না, তুমি লোক পাঠাইয়া দাও, আমার বড় ভয় করিতেছে।"

উদয়াদিত্য কহিলেন—"বিভা এখন বাধা দিসনে ; আর সময় নাই।" এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেলেন।

বিভা সুরমার হাত ধরিয়া কহিল "কি হবে ভাই ? বাবা যদি টের পান ?"

সুরমা কহিল "আর কি হবে ? স্নেহের বোধ করি আর কিছু অবশিষ্ট নাই। যেটুকু আছে সেটুকু গেলেও বড় একটা ক্ষতি হইবে না।"

বিভা কহিল "না ভাই, আমার বড় ভয় করিতেছে। পিতা যদি কোন প্রকার হানি করেন। যদি দণ্ড দেন ?"

সুরমা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"আমার বিশ্বাস—সংসারে যাহার কেহই সহায় নাই, নারায়ণ তাহার অধিক সহায়। হে প্রভু, তোমার নামে কলঙ্ক না হয় যেন, এ বিশ্বাস আমার ভাঙ্গিও না।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রী কহিলেন "মহারাজ, কাজটা কি ভাল হইবে ?"

প্রতাপাদিত্য জিজ্ঞাসা করিলেন "কোন্ কাজটা ?"

মন্ত্রী কহিলেন "কাল যাহা আদেশ করিয়া-ছিলেন।"

প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া কহিলেন "কাল কি আদেশ করিয়াছিলাম ?"

মন্ত্রী কহিলেন "আপনার পিতৃব্য সম্বন্ধে।"

প্রতাপাদিত্য। আরো বিরক্ত হইয়া কহিলেন "আমার পিতৃব্য সম্বন্ধে কি ?"

মন্ত্রী কহিলেন "মহারাজ আদেশ করিয়া-ছিলেন, যখন বসন্তরায় যশোহরে আসিবার পথে সিমুলতলীর চটিতে আশ্রয় লইবেন তখন—"

প্রতাপাদিত্য ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন "তখন কি ? কথাটা শেষ করিয়াই ফেল।"

মন্ত্রী—"তখন দুই জন পাঠান গিয়া—"

প্রতাপ—"হাঁ।"

মন্ত্রী "তাঁহাকে নিহত করিবে।"

প্রতাপাদিত্য রুষ্ট হইয়া কহিলন "মন্ত্রী হঠাৎ তুমি শিশু হইয়াছ না কি ? একটা কথা শুনিতে দশটা প্রশ্ন করিতে হয় কেন ? কথাটা মুখে আনিতে বুঝি সঙ্কোচ হইতেছে ! এখন বোধকরি, তোমার রাজকার্য্যে মনোযোগ দিবার বয়স গিয়াছে, এখন পরকাল চিন্তার সময় আসিয়াছে। এতদিন অবসর প্রার্থনা কর নাই কেন ?

মন্ত্রী—"মহারাজ আমার ভাবটা ভাল বুঝিতে পারেন নাই।"

প্রতাপ—"বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, আমি, যে কাজটা করিতে পারি, তুমি তাহা মুখে আনিতেও পার না? তোমার বিবেচনা করা উচিত ছিল, আমি যখন এ কাজটা করিতে যাইতেছি, তখন অবশ্য তাহার গুরুতর কারণ আছে; আমি অবশ্য ধর্ম্ম অধর্ম্ম সমস্তই ভাবিয়াছিলাম।"

মন্ত্রী—"আজ্ঞা মহারাজ; আমি—"

প্রতাপ—"চুপ কর, আমার সমস্ত কথাটা শোন আগে। আমি যখন এ কাজটা—আমি যখন নিজের পিতৃব্যকে খুন করিতে উদ্যত হইয়াছি, তখন অবশ্য তোমার চেয়ে ঢের বেশী ভাবিয়াছি। এ কাজে অধর্ম্ম নাই। আমার ব্রত এই—এই যে ম্লেচ্ছেরা আমাদের দেশে আসিয়া অনাচার আরম্ভ করিয়াছে, যাহাদের অত্যাচারে আমাদের দেশ হইতে সনাতন আর্য্য ধর্ম্ম লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে ক্ষত্রিয়েরা মোগলকে কন্যা দিতেছে, হিন্দুরা আচারভ্রষ্ট হইতেছে, এই ম্লেচ্ছদের আমি দূর করিয়া দিব, আমাদের আর্য্য-ধর্ম্মকে রাহুর গ্রাস হইতে মুক্ত করিব। এই ব্রত সাধন করিতে অনেক বলের আবশ্যক। আমি চাই, সমস্ত বঙ্গদেশের রাজারা আমার অধীনে এক হয়। যাহারা যবনের মিত্র, তাহাদের বিনাশ না করিলে ইহা সিদ্ধ হইবে না। পিতৃব্য বসন্তরায় আমার পূজ্যপাদ, কিন্তু যথার্থ কথা বলিতে পাপ নাই, তিনি আমাদের বংশের কলঙ্ক। তিনি আপনাকে ম্লেচ্ছের দাস বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, এমন লোকের সহিত প্রতাপাদিত্য রায়ের কোন সম্পর্ক নাই। ক্ষত হইলে নিজের বাহুকে কাটিয়া ফেলা যায়; আমার ইচ্ছা যায় বংশের ক্ষত, বঙ্গদেশের ক্ষত ঐ বসন্ত রায়কে কাটিয়া ফেলিয়া রায়বংশকে বাঁচাই, বঙ্গদেশকে বাঁচাই।

মন্ত্রী কহিলেন "এ বিষয়ে মহারাজের সহিত আমার অন্য মত ছিল না।"

প্রতাপাদিত্য কহিলেন—"হাঁ ছিল। ঠিক কথা বল। এখনো আছে। দেখ মন্ত্রী, যতক্ষণ আমার মতের সহিত তোমার মত না মিলিবে, ততক্ষণ তাহা প্রকাশ করিও; সে সাহস যদি না থাকে তবে এ পদ তোমার নহে। সন্দেহ থাকে ত বলিও; আমাকে বুঝাইবার অবসর দিও। তুমি মনে করিতেছ নিজের পিতৃব্যকে হনন করা সকল সময়েই পাপ। 'না' বলিও না, ঠিক এই কথাই তোমার মনে জাগিতেছে। ইহার উত্তর আছে। পিতার অনুরোধে ভৃগু নিজের মাতাকে বধ করিয়াছিলেন, ধর্ম্মের অনুরোধে আমি আমার পিতৃব্যকে বধ করিতে পারি না?"

এ বিষয়ে—অর্থাৎ ধর্ম্ম অধর্ম্ম বিষয়ে যথার্থই মন্ত্রীর কোন মতামত ছিল না। মন্ত্রী যতদূর তলাইয়াছিলেন, রাজা ততদূর তলাইতে পারেন নাই। মন্ত্রী বিলক্ষণ জানিতেন যে, উপস্থিত বিষয়ে তিনি যদি সঙ্কোচ দেখান, তাহা হইলে রাজা আপাততঃ কিছু রুষ্ট হইবেন বটে, কিন্তু পরিণামে তাহার জন্য মনে মনে সন্তুষ্ট হইবেন এইরূপ না করিলে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে এককালে-না-এককালে রাজার সন্দেহ ও আশঙ্কা জন্মিতে পারে।

মন্ত্রী কহিলেন "আমি বলিতেছিলাম কি, দিল্লীশ্বর এ সংবাদ শুনিয়া নিশ্চয়ই রুষ্ট হইবেন।"

প্রতাপাদিত্য জ্বলিয়া উঠিলেন "হাঁ হাঁ রুষ্ট হইবেন। রুষ্ট হইবার অধিকার ত সকলেরই আছে। দিল্লীশ্বর ত আর আমার ঈশ্বর নহেন। তিনি রুষ্ট হইলে থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকিবে এমন জীব যথেষ্ট আছে, মানসিংহ

আছে, বীরবল আছে, আমাদের বসন্ত রায় আছেন, আর সম্প্রতি দেখিতেছি তুমিও আছ; কিন্তু আত্মবৎ সকলকে মনে করিও না।"

মন্ত্রী হাসিয়া কহিলেন "আজ্ঞা, মহারাজ ফাঁকা রোষকে আমিও বড় একটা ডরাই না, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঢাল তলোয়ার যদি থাকে তাহা হইলে ভাবিতে হয় বৈ কি! দিল্লীশ্বরের রোষের অর্থ পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য।"

প্রতাপাদিত্য ইহার একটা সদুত্তর না দিতে পারিয়া কহিলেন "দেখ মন্ত্রী, দিল্লীশ্বরের ভয় দেখাইয়া আমাকে কোন কাজ হইতে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিও না, তাহাতে আমার নিতান্ত অপমান বোধ হয়।"

মন্ত্রী কহিলেন "প্রজারা জানিতে পারিলে কি বলিবে?"

প্রতাপ 'জানিতে পারিলে ত?'

মন্ত্রী—'এ কাজ অধিক দিন ছাপা রহিবে না।'

"এ সংবাদ রাষ্ট্র হইলে সমস্ত বঙ্গদেশ আপনার বিরোধী হইবে। যে উদ্দেশ্যে এই কাজ করিতে চান, তাহা সমূলে বিনাশ পাইবে। আপনাকে জাতিচ্যুত করিবে ও বিবিধ নিগ্রহ সহিতে হইবে।"

প্রতাপ—'দেখ, মন্ত্রী, আবার তোমাকে বলিতেছি, আমি যাহা করি তাহা বিশেষ ভাবিয়া করি। অতএব আমি কাজে প্রবৃত্ত হইলে মিছামিছি কতকগুলা ভয় দেখাইয়া আমাকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিও না; আমি শিশু নহি। প্রতিপদে আমাকে বাধা দিবার জন্য, তোমাকে আমার নিজের শৃঙ্খল স্বরূপে রাখি নাই।'

মন্ত্রী চুপ করিয়া গেলেন। তাঁহার প্রতি রাজার দুইটি আদেশ ছিল। এক যতক্ষণ মতের অমিল হইবে ততক্ষণ প্রকাশ করিবে, দ্বিতীয়তঃ বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া রাজাকে কোন কাজ হইতে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিবে না। মন্ত্রী আজ পর্য্যন্ত এই দুই আদেশের ভালরূপ সামঞ্জস্য করিতে পারেন নাই।

মন্ত্রী কিয়ৎক্ষণ পরে আবার কহিলেন "মহারাজ, দিল্লীশ্বর—" প্রতাপাদিত্য জ্বলিয়া উঠিয়া কহিলেন,—"আবার দিল্লীশ্বর? মন্ত্রী, দিনের মধ্যে তুমি যতবার দিল্লীশ্বরের নাম কর, ততবার যদি জগদীশ্বরের নাম করিতে, তাহা হইলে পরকালের কাজ গুছা-ইতে পারিতে। যতক্ষণে না আমার এই কাজটা শেষ হইবে, ততক্ষণ দিল্লীশ্বরের নাম মুখে আনিও না। যখন আজ বিকালে এই কাজ সমাধার সংবাদ পাইব, তখন আসিয়া আমার কাণের কাছে তুমি মনের সাধ মিটা-ইয়া দিল্লীশ্বরের নাম জপিও! ততক্ষণ একটু আত্মসংযম করিয়া থাক!

মন্ত্রী আবার চুপ করিয়া গেলেন। দিল্লী-শ্বরের কথা বন্ধ করিয়া কহিলেন—"মহারাজ, যুবরাজ উদয়াদিত্য—"

রাজা কহিলেন—"দিল্লীশ্বর গেল, প্রজারা গেল; এখন অবশেষে সেই স্ত্রৈণ বালকটার কথা বলিয়া ভয় দেখাইবে না কি?"

মন্ত্রী কহিলেন "মহারাজ, আপনি অত্যন্ত ভুল বুঝিতেছেন। আপনার কাজে বাধা দিবার অভিপ্রায় আমার মূলেই নাই।"

প্রতাপাদিত্য ঠাণ্ডা হইয়া কহিলেন 'তবে কি বলিতেছিলে বল!'

মন্ত্রী বলিলেন "কাল রাত্রে যুবরাজ সহসা অশ্বারোহণ করিয়া একাকী চলিয়া গিয়াছেন, এখনো ফিরিয়া আসেন নাই।"

প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "কোন্ দিকে গেছেন?"

মন্ত্রী কহিলেন "পূর্ব্বাভিমুখে।"

প্রতাপাদিত্য দাঁতে দাঁতে লাগাইয়া চহিলেন "কখন গিয়াছিল ?"

মন্ত্রী "কাল প্রায় অর্দ্ধরাত্রের সময়।"

প্রতাপাদিত্য কহিলেন "শ্রীপুরের জমীদারের মেয়ে কি এখানেই আছে ?"

মন্ত্রী "আজ্ঞা হাঁ !"

প্রতাপাদিত্য "সে তাহার পিত্রালয়ে থাকিলেই ত ভাল হয়।"

মন্ত্রী কোন উত্তর দিলেন না।

প্রতাপাদিত্য কহিলেন "উদয়াদিত্য কোন কালেই রাজার মত ছিল না। ছেলেবেলা হইতে প্রজাদের সঙ্গেই তাহার মেশামেশি। আমার সন্তান যে এমন হইবে তাহা কে জানিত ? সিংহ-শাবককে কি, কি করিয়া সিংহ হইতে হয়, তাহা শিখাইতে হয় ? তবে কিনা, নরাণাং মাতুলক্রমঃ। বোধ করি সে তাহার মাতামহদের স্বভাব পাইয়াছে। তাহার উপরে আবার সম্প্রতি শ্রীপুরের ঘরে বিবাহ দিয়াছি ; সেই অবধি বালকটা একেবারে অধঃপাতে গিয়াছে। ঈশ্বর করুন, আমার কনিষ্ঠ পুত্রটি যেন উপযুক্ত হয়, আমি যাহা আরম্ভ করিয়াছি তাহা শেষ যদি না করিতে পারি তাহা হইলে মরিবার সময়ে ভাবনা না থাকিয়া যায় যেন ! সে কি তবে এখনও ফিরিয়া আসে নাই ?"

মন্ত্রী—"না মহারাজ !"

ভূমিতে পদাঘাত করিয়া প্রতাপাদিত্য কহিলেন 'এক জন প্রহরী তাহার সঙ্গে কেন যায় নাই ?"

মন্ত্রী "এক জন যাইতে প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি বারণ করিয়াছিলেন।"

প্রতাপ—"অদৃশ্য ভাবে, দূরে দূরে থাকিয়া কেন যায় নাই ?

মন্ত্রী "তাহারা কোন প্রকার অন্যায় সন্দেহ করে নাই।"

প্র—"সন্দেহ করে নাই ! মন্ত্রী, তুমি কি আমাকে বুঝাইতে চাও, তাহারা বড় ভাল কাজ করিয়াছিল ? মন্ত্রী, তুমি আমাকে অনর্থক যাহা তাহা একটা বুঝাইতে চেষ্টা পাইও না। প্রহরীরা কর্ত্তব্য কাজে বিশেষ অবহেলা করিয়াছে। সে সময় দ্বারে কাহারা ছিল ডাকিয়া পাঠাও। এই ঘটনাটির জন্য যদি আমার কোন একটা ইচ্ছা বিফল হয়, তবে আমি সর্ব্বনাশ করিব। মন্ত্রী, তোমারও তাহা হইলে ভয়ের সম্ভাবনা আছে। আমার কাছে তুমি প্রমাণ করিতে আসিয়াছ, এ কাজের জন্য কেহই দায়ী নহে ! তবে এ দায় তোমার !"

প্রতাপাদিত্য প্রহরীদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। কিয়ৎক্ষণ গম্ভীর ভাবে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "হাঁ। দিল্লীশ্বরের কথা কি বলিতেছিলে ?"

মন্ত্রী "শুনিলাম আপনার নামে দিল্লীশ্বরের নিকট অভিযোগ করিয়াছে।"

প্রতাপ "কে ? তোমাদের যুবরাজ উদয়াদিত্য না কি ?"

মন্ত্রী "আজ্ঞা, মহারাজ, এমন কথা বলিবেন না। কে করিয়াছে সন্ধান পাই নাই।"

প্রতাপ "যেই করুক, তাহার জন্য অধিব ভাবিও না' আমিই দিল্লীশ্বরের বিচারকর্ত্তা আমিই তাহার দণ্ডের উদ্যোগ করিতেছি। ে পাঠানেরা এখনও ফিরিল না ? উদয়াদিত এখনো আসিল না ? শীঘ্র প্রহরীদিগে ডাক।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—*—

বিজন পথ দিয়া বিদ্যুদ্বেগে যুবরাজ অশ্ব ছুটাইয়া চলিয়াছেন। অন্ধকার রাত্রি, কিন্তু পথ দীর্ঘ সরল প্রশস্ত বলিয়া কোন ভয়ের আশঙ্কা নাই। স্তব্ধ রাত্রে অশ্বের খুরের শব্দে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইতেছে, দুই একটি কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিতেছে, দুই একটা শৃগাল চকিত হইয়া পথ ছাড়িয়া বাঁশঝাড়ের মধ্যে লুকাইতেছে। আলোকের মধ্যে আকাশে তারা ও পথপ্রান্তস্থিত গাছে জোনাকি; শব্দের মধ্যে ঝিঁঝিঁ পোকার অবিশ্রাম শব্দ; মনুষ্যের মধ্যে কঙ্কাল-অবশেষ একটি ভিখারী বৃদ্ধা গাছের তলায় ঘুমাইয়া আছে! পাঁচ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া, যুবরাজ পথ ছাড়িয়া একটা মাঠে নামিলেন। অশ্বের বেগ অপেক্ষাকৃত সংযম করিতে হইল! দিনের বেলায় বৃষ্টি হইয়াছিল, মাটি ভিজা ছিল, পদে পদে অশ্বের পা বসিয়া যাইতেছে। যাইতে যাইতে সম্মুখের পায়ে ভর দিয়া অশ্ব তিনবার পড়িয়া গেল। শ্রান্ত অশ্বের নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত, মুখে ফেন, পশ্চাতের পদদ্বয়ের ঘর্ষণে ফেন জন্মিয়াছে, পঞ্জরের ভিতর হইতে একটা শব্দ বাহির হইতেছে, সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মে প্লাবিত। এদিকে দারুণ গ্রীষ্ম, বাতাসের লেশ মাত্র নাই, এখনো অনেকটা পথ অবশিষ্ট রহিয়াছে। বহুতর জলা ও চষা মাঠ অতিক্রম করিয়া যুবরাজ অবশেষে একটা কাঁচা রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অশ্বকে আবার দ্রুতবেগে ছুটাইলেন। একবার তাহার স্কন্ধ চাপড়াইয়া উৎসাহ দিয়া ডাকিলেন,—"সুগ্রীব"—সে চকিতে একবার কাণ খাড়া করিয়া বড় বড় চোক, বঙ্কিম দৃষ্টিতে প্রভুর দিকে চাহিল, একবার গ্রীবা বাঁকাইয়া হ্রেষাধ্বনি করিল ও সবলে মুখ নামাইয়া রাশ শিথিল করিয়া লইল ও গ্রীবা নত করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। দুই পার্শ্বের গাছপালা চোখে ভাল দেখা যাইতেছে না, আকাশে চাহিলে মনে হইতেছে যেন দলে দলে নক্ষত্রেরা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত সবেগে উড়িয়া যাইতেছে এবং সেই স্তব্ধবায়ু আকাশে বায়ু তরঙ্গিত হইয়া কাণের কাছে সাঁ সাঁ করিতে লাগিল। রাত্রি যখন তৃতীয় প্রহর, লোকালয়ের কাছে শৃগালেরা যখন প্রহর ডাকিয়া গেল, তখন যুবরাজ, শিমুলতলীর চটির দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার অশ্ব তৎক্ষণাৎ গতজীবন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। নামিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইলেন, তাহার মুখ তুলিয়া ধরিলেন, "সুগ্রীব" বলিয়া কতবার ডাকিলেন, সে আর নড়িল না। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া যুবরাজ দ্বারে গিয়া আঘাত করিলেন। বার বার আঘাতের পর চটীর অধ্যক্ষ দ্বার না খুলিয়া জানলার মধ্য দিয়া কহিল "এতরাত্রে তুমি কেগো?" দেখিল একজন সশস্ত্র যুবক দ্বারে দাঁড়াইয়া।

যুবরাজ কহিলেন "একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব দ্বার খোল।"

সে কহিল, "দ্বার খুলিবার আবশ্যক কি, যাহা জিজ্ঞাসা করিবার আছে, জিজ্ঞাসা কর না।"

যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—"রায়গড়ের রাজা বসন্তরায় এখানে আছেন?"

সে কহিল—"আজ্ঞা সন্ধ্যার পর তাঁহার আসিবার কথা ছিল বটে, কিন্তু এখনো আসেন নাই। আজ বোধ করি, তাঁহার আসা হইল না।"

যুবরাজ দুইটি মুদ্রা লইয়া শব্দ করিয়া কহিলেন "এই লও।"

সে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া দ্বার খুলিয়া মুদ্রা দুইটি লইল। তখন যুবরাজ তাহাকে কহিলেন "বাপু আমি একবারটি তোমার চটি অনুসন্ধান করিয়া দেখিব, কে কে আছে?"

চটি-রক্ষক সন্দিগ্ধ ভাবে কহিল "না মহাশয় তাহা হইবেক না।"

উদয়াদিত্য কহিলেন "আমাকে বাধা দিও না। আমি রাজবাটির কর্ম্মচারী। দুই জন অপরাধীর অনুসন্ধানে আসিয়াছি"

এই কথা বলিয়াই তিনি প্রবেশ করিলেন। চটি-রক্ষক তাঁহাকে আর বাধা দিল না। তিনি সমস্ত অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন। না বসন্ত রায়, না তাঁহার অনুচর, না কোন পাঠানকে দেখিতে পাইলেন। কেবল দুই জন সুপ্তোত্থিতা প্রৌঢ়া চেঁচাইয়া উঠিল "আ মরণ মিন্সে অমন করিয়া তাকাইতেছিস্ কেন?"

চটি হইতে বাহির হইয়া পথে দাঁড়াইয়া যুবরাজ ভাবিতে লাগিলেন। একবার মনে করিলেন যে, ভালই হইয়াছে, হয়ত আজ দৈবক্রমে তিনি আসিতে পারেন নাই। আবার মনে করিলেন যদি ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন চটিতে থাকেন ও পাঠানেরা তাঁহার অনুসন্ধানে সেখানে গিয়া থাকে? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সেই পথ বাহিয়া চলিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গিয়া দেখিলেন, বিপরীত দিক্ হইতে একজন অশ্বারোহী আসিতেছে। নিকটে আসিলে কহিলেন "কেও? রতন নাকি?" সে অশ্ব হইতে তৎক্ষণাৎ নামিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল "আজ্ঞা হাঁ। যুবরাজ আপনি এতরাত্রে এখানে যে?"

যুবরাজ কহিলেন "তাহার কারণ পরে বলিব। এখন বল ত দাদা মহাশয় কোথায় আছেন।"

"আজ্ঞা, তাঁহার ত চটিতেই থাকিবার কথা।"

"সে কি? সেখানে ত তাঁহাকে দেখিলাম না।"

সে অবাক্ হইয়া কহিল "৩০ জন অনুচর সমেত মহারাজ যশোর উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছেন। আমি কার্য্য বশতঃ পিছাইয়া পড়িয়াছিলাম। এই চটিতে আজ সন্ধ্যাবেলা তাঁহার সহিত মিলিবার কথা।"

"পথে যেরূপ কাদা, তাহাতে পদচিহ্ন থাকিবার কথা, তাহাই অনুসরণ করিয়া আমি তাঁহার অনুসন্ধানে চলিলাম। তোমার ঘোটক লইলাম। তুমি পদব্রজে আইস!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—*—

বিজন পথের ধারে অশথ গাছের তলায় বাহকশূন্য ভূতলস্থিত এক শিবিকার মধ্যে বৃদ্ধ বসন্তরায় বসিয়া আছেন। কাছে আর কেহ নাই, কেবল একটি পাঠান শিবিকার বাহিরে। একটা জনকোলাহল দূরে মিলাইয়া গেল, রজনী স্তব্ধ হইয়া গেল। বসন্তরায় জিজ্ঞাসা করিলেন;—

খাঁ সাহেব, তুমি যে গেলে না?"

পাঠান কহিল 'হুজুর, কি করিয়া যাইব? আপনি আমাদের ধন প্রাণ রক্ষার জন্য আপনার সকল অনুচর গুলিকেই পাঠাইলেন। আপনাকে এই পথের ধারে রাত্রে অরক্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া যাইব, এত বড় অকৃতজ্ঞ আমাকে ঠাহরাইবেন না। আমাদের কবি বলেন, যে আমার অপকার করে সে আমার কাছে ঋণী, পরকালে সে ঋণ তাহাকে শোধ করিতে

হইবে ; যে আমার উপকার করে আমি তাহার কাছে ঋণী, কিন্তু কোন কালে তাহার সে ঋণ। শোধ করিতে পারিব না।

বসন্তরায় মনে মনে করিলেন, বাহবা, লোকটাত বড় ভাল। কিছু ক্ষণ বিতর্ক করিয়া পাল্কী হইতে তাঁহার টাক বিশিষ্ট মাথাটি বাহির করিয়া কহিলেন, 'খাঁ সাহেব তুমি বড় ভাল লোক।'

খাঁ সাহেব তৎক্ষণাৎ এক সেলাম করিলেন। এ বিষয়ে বসন্তরায়ের সহিত খাঁ সাহেবের কিছুমাত্র মতের অনৈক্য ছিল না। বসন্তরায় মশালের আলোকে তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন 'তোমাকে বড়ঘরের লোক বলিয়া মনে হইতেছে।'

পাঠান্ আবার সেলাম করিয়া কহিল 'কেয়া তাজ্জব, মহারাজ, ঠিক ঠাহরাইয়াছেন।'

বসন্তরায় কহিলেন "এখন তোমার কি করা হয়?"

পাঠান নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল "হুজুর দুরবস্থায় পড়িয়াছি, এখন চাস বাস করিয়া গুজরান্ চালাইতে হইতেছে। কবি বলিতেছেন —হে অদৃষ্ট, তুমি যে তৃণকে তৃণ করিয়া গড়িয়াছ, ইহাতে তোমার নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পায় না, কিন্তু তুমি যে, অশথ গাছকে অশথ গাছ করিয়া গড়িয়া অবশেষে ঝড়ের হাতে তাহাকে তৃণের সহিত সমতল করিয়া শোয়াও ইহাতেই আন্দাজ করিতেছি, তোমার মনটা পাথরে গড়া!"

বসন্তরায় নিতান্ত উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন 'বাহবা, বাহবা, কবি কি কথাই বলিয়াছেন। সাহেব, যে দুইটি বয়েৎ আজ বলিলে, ঐ দুইটি লিখিয়া দিতে হইবে।'

পাঠান ভাবিল, তাহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। বুড়া, লোক বড় সরেস ; গরীবের বহুৎ কাজে লাগিতে পারিবে। বসন্তরায় ভাবিলেন, আহা, এককালে যে ব্যক্তি বড়লোক ছিল আজ তাহার এমন দুরবস্থা! চপলা লক্ষ্মীর এ বড় অত্যাচার! মনে মনে তিনি কিছু কাতর হইলেন, পাঠানকে কহিলেন,

'তোমার যে রকম সুন্দর শরীর আছে, তাহাতে ত তুমি অনায়াসে সৈন্যশ্রেণীতে নিযুক্ত হইতে পার।'

পাঠান তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল 'হুজুর পারি বৈকি! সেইত আমাদের কাজ। আমার পিতা পিতামহেরা সকলেই তলোয়ার হাতে করিয়া মরিয়াছেন, আমারো সেই এক মাত্র সাধ আছে। কবি বলেন,—

বসন্তরায় হাসিতে হাসিতে কহিলেন "কবি যাহাই বলুন বাপু, আমার কাজ যদি গ্রহণ কর, তবে, তলোয়ার হাতে করিয়া মরিবার সাধ মিটিতেও পারে, কিন্তু সে তলোয়ার খাপ হইতে খোলা তোমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিবে না। বুড়া হইয়া পড়িয়াছি, প্রজারা সুখে স্বচ্ছন্দে আছে, ভগবান্ করুন, আর যেন লড়াই করিবার দরকার না হয়। বয়স গিয়াছে; তলোয়ার ত্যাগ করিয়াছি। এখন তলোয়ারের পরিবর্ত্তে আর একজন আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছে।' এই বলিয়াই পার্শ্বে শায়িত সহচরী সেতারটিকে দুই একটি ঝঙ্কার দিয়া একবার জাগাইয়া দিলেন।

পাঠান ঘাড় নাড়িয়া চোখ বুঁজিয়া কহিল, "আহা, যাহা বলিতেছেন, ঠিক বলিতেছেন। একটি বয়েৎ আছে যে, তলোয়ারে শত্রুকে জয় করা যায়, কিন্তু সঙ্গীতে শত্রুকে মিত্র করা যায়।"

বসন্তরায় বলিয়া উঠিলেন 'কি বলিলে খাঁ সাহেব? সঙ্গীতে শত্রুকে মিত্র করা যায়! কি চমৎকার!' চুপ করিয়া কিয়ৎক্ষণ ভাবিতে

লাগিলেন, যতই ভাবিতে লাগিলেন ততই যেন অধিকতর অবাক্‌ হইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বয়েৎটির ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'তলোয়ার যে এত বড় ভয়ানক দ্রব্য তাহাতেও শত্রুর শত্রুত্ব নাশ করা যায় না,—কেমন করিয়া বলিব নাশ করা যায়?—রোগীকে বধ করিয়া রোগ আরোগ্য করা সে কেমনতর আরোগ্য? কিন্তু সঙ্গীত যে এমন মধুর জিনিষ, তাহাতে শত্রু নাশ না করিয়াও শত্রুত্ব নাশ করা যায়। এ কি সাধারণ কবিত্বের কথা? বাঃ, কি তারিফ!' বৃদ্ধ এত দূর উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন যে, শিবিকার বাহিরে পা রাখিয়া বসিলেন, পাঠানকে আরো কাছে আসিতে বলিলেন ও কহিলেন 'তলোয়ারে শত্রুকে জয় করা যায়, কিন্তু সঙ্গীতে শত্রুকেও মিত্র করা যায়, কেমন খাঁ সাহেব?'

পাঠান—"আজ্ঞা হাঁ হুজুর।"

বসন্তরায় "তুমি একবার রায়গড়ে যাইও। আমি যশোর হইতে ফিরিয়া গিয়া তোমার যথাসাধ্য উপকার করিব!"

পাঠান উৎফুল্ল হইয়া কহিল "আপনি ইচ্ছা করিলে কি না করিতে পারেন!" পাঠান ভাবিল, একরকম বেশ গুছাইয়া লইয়াছি। জিজ্ঞাসা করিল "আপনার সেতার বাজান' আসে?"

বসন্তরায় কহিলেন "হাঁ।" ও তৎক্ষণাৎ সেতার তুলিয়া লইলেন। অঙ্গুলীতে মেজরাপ্‌ আঁটিয়া বেহাগ আলাপ করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে পাঠান মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল "বাহবা! খাসী।" ক্রমে উত্তেজনার প্রভাবে শিবিকার মধ্যে বসিয়া থাকা, বসন্তরায়ের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বাজাইতে লাগিলেন। মর্য্যাদা গাম্ভীর্য্য আত্মপর সমস্ত বিস্মৃত হইলেন ও বাজাইতে বাজাইতে অবশেষে গান ধরিলেন "কেয়সে কাটোঙ্গী রয়ন, সো পিয়া বিনা"

গান থামিলে পাঠান কহিল "বাঃ কি চমৎকার আওয়াজ!"

বসন্তরায় কহিলেন "তবে বোধ করি, নিস্তব্ধ রাত্রে, খোলা মাঠে সকলের আওয়াজই মিঠা লাগে। কারণ, গলা অনেক সাধিয়াছি বটে কিন্তু লোকে আমার আওয়াজেরত বড় প্রশংসা করে না। তবে কি না, বিধাতা যতগুলি রোগ দিয়াছেন তাহার সকল গুলিরই একটি না একটি ঔষধ দিয়াছেন, তেমনি যত গুলি গলা দিয়াছেন তাহার একটি না একটি শ্রোতা আছেই। আমার গলাও ভাল লাগে এমন ছুটো অর্ব্বাচীন আছে। নহিলে, এত দিনে সাহেব, এ গলার দোকানপাট বন্ধ করিতাম; সেই ছুটো আনাড়ি খরিদ্দার আছে, মাল চিনে না, তাহাদেরি কাছ হইতে বাহবা মিলে। অনেক দিন ছুটাকে দেখি নাই, গীত গানও বন্ধ আছে; তাই ছুটিয়া চলিয়াছি; মনের সাধে গান শুনাইয়া, প্রাণের বোঝা নামাইয়া বাড়ি ফিরিব।" বৃদ্ধের ক্ষীণজ্যোতি চোক ছুটি স্নেহে ও আনন্দে দীপ্যমান হইয়া উঠিল।

পাঠান মনে মনে কহিল "তোমার একটা সাধ মিটিয়াছে, গান শুনান' হইয়াছে, এখন প্রাণের বোঝাটা আমিই নামাইব কি? তোবা, তোবা, এমন কাজও করে! কাফেরকে মারিলে পুণ্য আছে বটে, কিন্তু সে পুণ্য এত উপার্জ্জন করিয়াছি যে, পরকালের বিষয়ে আর বড় ভাবনা নাই, কিন্তু ইহকালের সমস্তই যে প্রকার বেবন্দোবস্ত দেখিতেছি, তাহাতে এই কাফেরটাকে না মারিয়া যদি তাহার একটা বিলিবন্দেজ করিয়া লইতে পারি তাহাতে আপত্তি দেখিতেছি না।"

বসন্তরায় কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া আর থাকিতে পারিলেন না; তাঁহার কল্পনা উত্তেজিত হইয়া উঠিল; পাঠানের নিকটবর্ত্তী হইয়া অতি চুপি চুপি কহিলেন "কাহাদের কথা বলিতেছিলাম, সাহেব, জান? তাহারা আমার নাতি ও নাতনী।" বলিতে বলিতে অধীর হইয়া উঠিলেন, ভাবিলেন, "আমার অনুচরেরা কখন্ ফিরিয়া আসিবে।" আবার সেতার লইয়া গান আরম্ভ করিলেন।

একজন অশ্বারোহী পুরুষ নিকটে আসিয়া কহিল "আঃ বাঁচিলাম। দাদা মহাশয়, পথের ধারে এত রাত্রে কাহাকে গান শুনাইতেছ?"

আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত বসন্তরায় তৎক্ষণাৎ তাহার সেতার শিবিকা উপরে রাখিয়া উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া নামাইলেন ও তাঁহাকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন "খবর কি দাদা? দিদি ভাল আছে ত?"

উদয়াদিত্য কহিলেন "সমস্তই মঙ্গল।"

তখন বৃদ্ধ হাসিতে হাসিতে সেতার তুলিয়া লইলেন ও পা দিয়া তাল রাখিয়া মাথা নাড়িয়া গান আরম্ভ করিয়া দিলেন।

"বঁধুয়া অসময়ে কেন হে প্রকাশ?
সকলি যে স্বপ্ন বলে হতেছে বিশ্বাস।
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে ছিলে, সেথায় ত আদর মিলে?
এরি মধ্যে মিটিল কি প্রণয়েরি আশ!
এখনোত রয়েছে রাত এখনোত হয় নি প্রভাত,
এখনো এ রাধিকার ফুরায়নিত অশ্রুপাত।
চন্দ্রাবলীর কুসুমসাজ এখনি কি শুকাল' আজ?
চকোর হে, মিলাল, কি সে চন্দ্র-মুখের
মধুর হাস?"

উদয়াদিত্য পাঠানের দিকে চাহিয়া বসন্তরায়কে কাণে কাণে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা মহাশয় এ কাবুলী কোথা হইতে জুটিল?"

বসন্তরায় তাড়াতাড়ি কহিলেন "খাঁ সাহেব, বড় ভাল লোক। সমজ্‌দার ব্যক্তি। আজ রাত্রি বড় আনন্দে কাটান গিয়াছে।"

উদয়াদিত্যকে দেখিয়া খাঁ সাহেব মনে মনে বিশেষ চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিল, কি করিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না।

উদয়াদিত্য পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিলেন "চটিতে না গিয়া এখানে যে?"

পাঠান সহসা বলিয়া উঠিল 'হুজুর' আশ্বাস পাই ত একটা বলি। আমরা রাজা প্রতাপাদিত্যের প্রজা। মহারাজ আমাকে ও আমার ভাইকে আদেশ করেন যে, আপনি যখন যশোহরের মুখে আসিবেন, তখন পথে আপনাকে খুন করা হয়।

বসন্তরায় চমকিয়া কহিয়া উঠিলেন 'রাম, রাম, রাম।'

উদয়াদিত্য কহিলেন "বলিয়া যাও!"

পাঠান—"আমরা কখন এমন কাজ করি নাই, সুতরাং আপত্তি করাতে তিনি আমাদিগকে নানাপ্রকার ভয় দেখান্। সুতরাং বাধ্য হইয়া এই কাজের উদ্দেশে যাত্রা করিতে হইল। পথের মধ্যে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমার ভাই গ্রামে ডাকাতি পড়িয়াছে বলিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া আপনার অনুচরদের লইয়া গেলেন। আমার উপর এই কাজের ভার ছিল। কিন্তু মহারাজ যদিও রাজার আদেশ, তথাপি এমন কাজে আমার কোন মতেই প্রবৃত্তি হইল না। কারণ, আমাদের কবি বলেন, রাজার আদেশ প্রভুর আদেশে সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস করিতে পার কিন্তু সাবধান, তোমার স্বর্গের এক কোণও ধ্বংস করিও না। এখন গরীব মহারাজের শরণাপন্ন হইল। দেশে

ফিরিয়া গেলে আমার সর্ব্বনাশ হইবে। আপনি রক্ষা না করিলে আমার আর উপায় নাই!” বলিয়া যোড়হাত করিয়া দাঁড়াইল।

বসন্তরায় অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে পাঠানকে কহিলেন—“তোমাকে একটি পত্র দিতেছি তুমি রায়গড়ে চলিয়া যাও। আমি সেখানে ফিরিয়া গিয়া তোমার একটা সুবিধা করিয়া দিব।”

উদয়াদিত্য কহিলেন “দাদা, মহাশয়, আবার যশোহরে যাইবে না কি?”

বসন্তরায় কহিলেন “হাঁ ভাই!”

উদয়াদিত্য অবাক্ হইয়া কহিলেন “সে কি কথা!”

বসন্তরায়—“প্রতাপ আমার ত আর কেহ নয়, সহস্র অপরাধ করুক সে আমার নিতান্তই স্নেহভাজন! আমার নিজের কোন হানি হইবে বলিয়া ভয় করি না। (আমিত ভাই, ভব-সমুদ্রের কূলে দাঁড়াইয়া; একটা ঢেউ লাগিলেই আমার সমস্ত ফুরাইল) কিন্তু এই পাপকার্য্য করিলে, প্রতাপের ইহকালের ও পরকালের যে হানি হইত, তাহা ভাবিয়া কি আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি? তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া একবার সমস্ত বুঝাইয়া বলি।”

বলিতে বলিতে বসন্তরায়ের চোখে জল আসিল। উদয়াদিত্য দুই হস্তে তাঁহার চক্ষু আচ্ছাদন করিলেন।

এমন সময়ে কোলাহল করিতে করিতে বসন্তরায়ের অনুচরগণ ফিরিয়া আসিল।

“মহারাজ কোথায়? মহারাজ কোথায়?

“এইখানেই আছি বাপু, আর কোথায় যাইব?

সকলে সমস্বরে “সে নেড়ে বেটা কোথায়?”

বসন্তরায় বিব্রত হইয়া মাঝে পড়িয়া কহিলেন “হাঁ হাঁ বাপু, তোমরা খাঁ সাহেবকে কিছু বলিও না।”

১ম “আজ মহারাজ, বড় কষ্ট পাইয়াছি, আজ সে”—

২য় “তুই থাম্‌নারে; আমি সমস্ত ভাল করিয়া গুছাইয়া বলি। সে পাঠান বেটা আমাদের বরাবর সোজা লইয়া গিয়া অবশেষে বাঁহাতী একটা আম বাগানের মধ্যে”—

৩য় “নারে সেটা বাব্‌লাবন।”

৪র্থ “সেটা বাঁহাতী নহে সেটা ডানহাতী!’

২য় “দূর ক্ষেপা, সেটা বাঁহাতী।”

৪র্থ “তোর কথাতেই সেটা বাঁহাতী?”

২য় “বাঁহাতী না যদি হইবে তবে সে পুকুরটা”—

উদয়াদিত্য “হাঁ বাপু সেটা বাঁহাতী বলিয়াই বোধ হইতেছে তার পরে বলিয়া যাও।”

২য় “আজ্ঞা হাঁ! সেই বাঁহাতী আম বাগানের মধ্যে দিয়া একটা মাঠে লইয়া গেল। কত চষা মাঠ জমি জলা বাঁশঝাড় পার হইয়া গেলাম, কিন্তু গাঁয়ের নাম গন্ধও পাইলাম না। এমনি সময় তিন ঘণ্টা ঘুরিয়া গাঁয়ের কাছাকাছি হইতেই সে বেটা যে কোথায় পালাইল খোঁজ পাইলাম না।”

১ম “সে বেটাকে দেখিয়াই আমার ভাল ঠেকে নাই!”

২য় “আমিও মনে করিয়াছিলাম এই রকম একটা কিছু হইবেই।”

৩য় “যখনি দেখিয়াছি নেড়ে, তখনি আমার সন্দেহ হইয়াছে!”

অবশেষে সকলেই ব্যক্ত করিল যে তাহারা পূর্ব্বে হইতেই সমস্ত বুঝিতে পারিয়াছিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—*—

প্রতাপাদিত্য কহিলেন "দেখ দেখি মন্ত্রি, সে পাঠান দুটা এখনও আসিল না!"

মন্ত্রী ধীরে ধীরে কহিলেন, "সেটা ত আর আমার দোষ নয় মহারাজ!"

প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "দোষের কথা হইতেছে না। দেরী যে হইতেছে তাহার ত একটা কারণ আছে? তুমি কি অনুমান কর, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

মন্ত্রী। "শিমুলতলী এখান হইতে বিস্তর দুর। যাইতে, কাজ সমাধা করিতে ও ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইবার কথা।"

প্রতাপাদিত্য মন্ত্রীর কথায় অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি চান, তিনিও যাহা অনুমান করিতেছেন, মন্ত্রীও তাহাই অনুমান করেন। কিন্তু মন্ত্রী সে দিক্ দিয়া গেলেন না। প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "উদয়াদিত্য কাল রাত্রে বাহির হইয়া গেছে?"

মন্ত্রী। "আজ্ঞা হাঁ, সে ত পূর্ব্বেই জানাইয়াছি।"

প্রতাপাদিত্য।" পূর্ব্বেই জানাইয়াছি! কি উপযুক্ত সময়েই জানাইয়াছ। যে সময়ে হউক্ জানাইলেই বুঝি তোমার কাজ শেষ হইল?......উদয়াদিত্য ত পূর্ব্বে এমনতর ছিল না। শ্রীপুরের জমিদারের মেয়ে বোধ করি তাহাকে কুপরামর্শ দিয়া থাকিবে। কি বোধ হয়?"

মন্ত্রী। "কেমন করিয়া বলিব মহারাজ?"

প্রতাপাদিত্য বলিয়া উঠিলেন "তোমার কাছে কি আমি বেদবাক্য শুনিতে চাহিতেছি? তুমি কি আন্দাজ কর, তাই বল না!"

মন্ত্রী। "আপনি মহিষীর কাছে বধূমাতা ঠাকুরাণীর কথা সমস্তই শুনিতে পান, এ বিষয়ে আপনিই অনুমান করিতে পারেন, আমি কেমন করিয়া অনুমান করিব?"

একজন পাঠান গৃহে প্রবেশ করিল।

প্রতাপাদিত্য বলিয়া উঠিলেন—"কি হইল? কাজ নিকাশ করিয়াছ?"

পাঠান। "হাঁ মহারাজ, এতক্ষণে নিকাশ হইয়া গেছে।"

প্রতাপাদিত্য। সে কি রকম কথা। তবে তুমি জান না?"

পাঠান। "আজ্ঞা হাঁ, জানি। কাজ নিকাশ হইয়াছে, তাহাতে আর ভুল নাই, তবে আমি সে সময়ে উপস্থিত ছিলাম "

প্রতাপাদিত্য।" "তবে কি করিয়া ক.. নিকাশ হইল?"

পাঠান। "আপনার পরামর্শ মতে আমি তাঁহার লোক জনদের তফাৎ করিয়াই চলিয়া আসিতেছি, হোসেন খাঁ কাজ শেষ করিয়াছে"

প্রতাপাদিত্য! "যদি না করিয়া থাকে?"

পাঠান। "মহারাজ, আমার শির জামিন রাখিলাম।"

প্রতাপাদিত্য। "আচ্ছা ঐখানে হাজির থাক! তোমার ভাই ফিরিয়া আসিলে পুরস্কার মিলিবে।"

পাঠান দূরে দ্বারের নিকট প্রহরীদের জিম্মায় দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রতাপাদিত্য অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয় মন্ত্রীকে ধীরে ধীরে কহিলেন,—এটা যাহাতে প্রজারা কোন মতে না জানিতে পায় তাহা চেষ্টা করিতে হইবে।

মন্ত্রী কহিলেন—'মহারাজ, অসন্তুষ্ট ন হন যদি ত বলি ইহা প্রকাশ হইবেই।"

প্রতাপাদিত্য। "কিসে তুমি জানিতে পারিলে ?"

মন্ত্রী! "ইতিপূর্ব্বে আপনি প্রকাশ্য ভাবে আপনার পিতৃব্যের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করিয়াছেন। আপনার কন্যার বিবাহের সময় আপনি বসন্তরায়কে নিমন্ত্রণ করেন নাই, তিনি স্বয়ং অনিমন্ত্রিত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। আজ আপনি সহসা বিনা কারণে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন ও পথের মধ্যে কে তাঁহাকে হত্যা করিল। এমন অবস্থায় প্রজারা আপনাকেই এই ঘটনাটির মূল বলিয়া জানিবে।"

প্রতাপাদিত্য রুষ্ট হইয়া কহিলেন; "তোমার ভাব আমি কিছুই বুঝিতে পারি না মন্ত্রী! এই কথাটা প্রকাশ হইলেই তুমি যেন খুসী হও, আমার নিন্দা রটিলেই তোমার যেন মনস্কামনা পূর্ণ হয়। নহিলে দিন রাত্রি তুমি কেন বলিতেছ যে, কথাটা প্রকাশ হইবেই। প্রকাশ হইবার আমি ত কোন কারণ দেখিতেছি না। বোধ করি, আর কিছুতেই সংবাদটা রাষ্ট্র না হইলে তুমি নিজে গিয়া দ্বারে দ্বারে প্রকাশ করিয়া বেড়াইবে!"

মন্ত্রী কহিলেন—"মহারাজ, মার্জ্জনা করিবেন। আপনি আমার অপেক্ষা সকল বিষয়েই অনেক ভাল বুঝেন। আপনাকে মন্ত্রণা দেওয়া আমাদের মত ক্ষুদ্র-বুদ্ধি লোকের পক্ষে অত্যন্ত স্পর্দ্ধার বিষয়। তবে, আপনিই না কি আমাকে বাছিয়া মন্ত্রী রাখিয়াছেন, এই সাহসেই ক্ষুদ্র-বুদ্ধিতে যাহা মনে হয়, আপনাকে মাঝে মাঝে বলিয়া থাকি। মন্ত্রণায় রুষ্ট হন যদি তবে এ দাসকে এ কার্য্যভার হইতে অব্যাহতি দিন।"

প্রতাপাদিত্য সিধা হইলেন। মাঝে মাঝে মন্ত্রী যখন তাঁহাকে দুই এক শক্ত কথা শুনাইয়া দেন, তখন প্রতাপাদিত্য মনে মনে সন্তুষ্ট হন।

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "আমি বিবেচনা করিতেছি, ঐ পাঠান দুটাকে মারিয়া ফেলিলে এ বিষয়ে আর কোন ভয়ের কারণ থাকিবে না।"

মন্ত্রী কহিলেন "একটা খুন চাপিয়া রাখাই দায়, তিনটা খুন সামলান অসম্ভব। প্রজারা জানিতেই পারিবে।" মন্ত্রী বরাবর নিজের কথা বজায় রাখিলেন।

প্রতাপাদিত্য বলিয়া উঠিলেন, "তবে ত আমি ভয়ে সারা হইলাম! প্রজারা জানিতে পারিবে! যশোহর রায়গড় নহে; এখানে প্রজাদের রাজত্ব নাই! এখানে রাজা ছাড়া আর বাকী সকলেই রাজা নহে। অতএব আমাকে তুমি প্রজার ভয় দেখাইও না। যদি কোন প্রজা এবিষয়ে আমার বিরুদ্ধে কোন কথা কহে, তবে তাহার জিহ্বা তপ্ত লোহ দিয়া পুড়াইব।"

মন্ত্রী মনে মনে হাসিলেন। মনে মনে কহিলেন, প্রজার জিহ্বাকে এত ভয়। তথাপি মনকে প্রবোধ দিয়া থাকেন যে, কোন প্রজাকে ডরাই না!"

প্রতাপাদিত্য। "শ্রাদ্ধ শান্তি শেষ করিয়া লোক জন লইয়া একবার রায়গড়ে যাইতে হইবে। আমি ছাড়া সেখানকার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী আর ত কাহাকেও দেখিতেছি না।"

বৃদ্ধ বসন্তরায় ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রতাপাদিত্য চমকিয়া পিছু হটিয়া গেলেন। সহসা তাঁহার মনে হইল, বুঝি উপদেবতা। অবাক্ হইয়া একটি কথাও বলিতে পারিলেন না। বসন্তরায় নিকটে গিয়া তাঁহার গায়ে হাত বুলাইয়া মৃদুস্বরে কহিলেন—"আমাকে কিসের ভয় প্রতাপ? আমি তোমার পিতৃব্য। তাহাতেও যদি বিশ্বাস না হয়, আমি বৃদ্ধ, তোমার অনিষ্ট করিতে পারি এমন শক্তি আমার নাই।"

প্রতাপাদিত্যের চৈতন্য হইয়াছে, কিন্তু কথা বানাইয়া বলিতে তিনি নিতান্ত অপটু। নিরুত্তর হইয়া অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। পিতৃব্যকে প্রণাম করা পর্য্যন্ত হইল না।

বসন্তরায় আবার ধীরে ধীরে কহিলেন; "প্রতাপ, একটা যাহা হয় কথা কও। যদি দৈবাৎ এমন একটা কাজ করিয়া থাক, যাহাতে আমাকে দেখিয়া তোমার লজ্জা ও সঙ্কোচ উপস্থিত হয়, তবে তাহার জন্য ভাবিও না! আমি কোন কথা উত্থাপন করিব না। আইস বৎস, দুই জনে একবার কোলাকুলি করি। আজ অনেক দিনের পর দেখা হইয়াছে; আর ত অধিক দিন দেখা হইবে না।"

এতক্ষণের পর প্রতাপাদিত্য প্রণাম করিলেন ও উঠিয়া পিতৃব্যের সহিত কোলাকুলি করিলেন। ইতিমধ্যে মন্ত্রী আস্তে আস্তে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেছেন। বসন্তরায় ঈষৎ কোমল হাস্য হাসিয়া প্রতাপাদিত্যের গায়ে হাত দিয়া কহিলেন, "বসন্তরায় অনেক দিন বাঁচিয়া আছে; না প্রতাপ? সময় হইয়া আসিয়াছে, এখনো যে কেন ডাক পড়িল না বিধাতা জানেন। কিন্তু আর অধিক বিলম্ব নাই।"

বসন্তরায় কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, প্রতাপাদিত্য কোন উত্তর করিলেন না। বসন্তরায় আবার কহিলেন, "তবে স্পষ্ট করিয়া সমস্ত বলি। তুমি যে আমাকে ছুরি তুলিয়াছ, তাহাতে আমাকে ছুরির অপেক্ষা অধিক বাজিয়াছে। (বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষে জল আসিল) কিন্তু আমি কিছুমাত্র রাগ করি নাই। আমি কেবল তোমাকে দুটি কথা বলিব। আমাকে বধ করিও না প্রতাপ! তাহাতে তোমার ইহকাল পরকালের ভাল হইবে না। এত দিন পর্য্যন্ত যদি আমার মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারিলে, তবে আর দুটা দিন পারিবে না? এই টুকুর জন্য পাপের ভাগী হইবে?"

বসন্তরায় দেখিলেন, প্রতাপাদিত্য কোন উত্তর দিলেন না; দোষ অস্বীকার করিলেন না, বা অনুতাপের কথা কহিলেন না; তৎক্ষণাৎ তিনি অন্য কথা পাড়িলেন, কহিলেন,—"প্রতাপ, একবার রায়গড়ে চল। অনেক দিন সেখানে যাও নাই। অনেক পরিবর্ত্তন দেখিবে। সৈন্যেরা এখন তলোয়ার ছাড়িয়া লাঙ্গল ধরিয়াছে; যেখানে সৈন্যদের বাসস্থান ছিল সেখানে অতিথিশালা—"

এমন সময়ে প্রতাপাদিত্য দূর হইতে দেখিলেন পাঠানটা পালাইবার উদ্যোগ করিতেছে। আর থাকিতে পারিলেন না। মনের মধ্যে যে নিরুদ্ধ রোষ ফুটিতেছিল, তাহা আগ্নেয়-উৎসের ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বজ্র-স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"খবরদার উহাকে ছাড়িস্ না। পাকড়া করিয়া রাখ্।" বলিয়া ঘর হইতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন।

রাজা মন্ত্রীকে ডাকাইয়া কহিলেন;—"রাজকার্য্যে তোমার অত্যন্ত অমনোযোগ লক্ষিত হইতেছে।"

মন্ত্রী আস্তে আস্তে কহিলেন,—"মহারাজ, এ সম্বন্ধে আমার কোন দোষ নাই।"

প্রতাপাদিত্য তারস্বরে বলিয়া উঠিলেন "আমি কি কোন বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি! আমি বলিতেছি, রাজকার্য্যে তোমার অত্যন্ত অমনোযোগ লক্ষিত হইতেছে। সে দিন তোমার কাছে এক চিঠি রাখিতে দিলাম, তুমি হারাইয়া ফেলিলে।"

দেড় মাস পূর্ব্বে এইরূপ একটা ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু তখন মহারাজ মন্ত্রীকে একটি কথাও বলেন নি।

"আর এক দিন উমেশ রায়ের নিকট

তোমাকে যাইতে আদেশ করিলাম, তুমি লোক পাঠাইয়া কাজ সারিলে! চুপ কর! দোষ কাটাইবার জন্য মিছামিছি চেষ্টা করিও না! যাহা হউক, তোমাকে জানাইয়া রাখিলাম, রাজকার্য্যে তুমি কিছুমাত্র মনোযোগ দিতেছ না।"

রাজা প্রহরীদের ডাকাইলেন। পূর্ব্বে রাত্রের প্রহরীদের বেতন কাটিয়াছিলেন, এখন তাহাদের প্রতি কারাবাসের আদেশ হইল।

অন্তঃপুরে গিয়া মহিষীকে ডাকাইয়া কহিলেন,—"মহিষি! রাজপরিবারের মধ্যে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা দেখিতেছি! উদয়াদিত্য পূর্ব্বে ত এমনতর ছিল না। এখন সে যখন তখন বাহির হইয়া যায়। প্রজাদের কাজে যোগ দেয়। আমার বিরুদ্ধাচরণ করে। এ সকলের অর্থ কি?"

মহিষী ভীতা হইয়া কহিলেন, "মহারাজ, তাহার কোন দোষ নাই। এ সমস্ত অনর্থের মূল ঐ বড় বৌ! বাছা আমার ত আগে এমন ছিল না। যে দিন হইতে শ্রীপুরের ঘরে তাহার বিয়ে হইল, সেই দিন হইতে উদয় কেমন যে হইল কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।"

মহারাজ সুরমাকে শাসনে রাখিতে আদেশ করিয়া বাহিরে গেলেন। মহিষী উদয়াদিত্যকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। উদয়াদিত্য আসিলে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আহা, বাছা আমার রোগা, কালো হইয়া গিয়াছে! বিয়ের আগে বাছার রঙ কেমন ছিল! যেন তপ্ত-সোণার মত! তোর এমন দশা কে করিল? বাবা, বড় বৌ তোকে যা বলে তা' শুনিস্ না! তার কথা শুনিয়াই তোর এমন দশা হইয়াছে।" সুরমা ঘোমটা দিয়া চুপ করিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়াছিল। মহিষী বলিতে লাগিলেন "ওর ছোট বংশে জন্ম, ও কি তোর যোগ্য? ও কি তোকে পরামর্শ দিতে জানে? আমি যথার্থ কথা বলিতেছি ও কখন তোকে ভাল পরামর্শ দেয় না। তোর মন্দ হইলেই ও যেন বাঁচে! এমন রাক্ষসীর সঙ্গেও মহারাজ তোর বিবাহ দিয়াছিলেন!" মহিষী অশ্রুবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

উদয়াদিত্যের প্রশান্ত ললাটে ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দিল। তাঁহার মনের অধীরতা পাছে প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই নিমিত্ত তাঁহার আয়তনেত্র অন্য দিকে ফিরাইলেন।

একজন পুরাণ, বৃদ্ধ দাসী বসিয়াছিল, সে হাত নাড়িয়া বলিয়া উঠিল,—"শ্রীপুরের মেয়েরা যাদু জানে। নিশ্চয় বাছাকে ওষুধ করিয়াছে।" এই বলিয়া, উঠিয়া উদয়াদিত্যের কাছে গিয়া বলিল, "বাবা, ও তোমাকে ওষুধ করিয়াছে। ঐ যে মেয়েটি দেখতেছ, উনি বড় সামান্য মেয়ে নন! শ্রীপুরের ঘরের মেয়ে! ওরা ডাইনি! আহা বাছার শরীরে আর কিছু রাখিল না!" এই বলিয়া সে সুরমার দিকে তীরের মত এক কটাক্ষ বর্ষণ করিল ও আঁচল দিয়া দুই হস্তে দুই শুষ্ক চক্ষু রগড়াইয়া লাল করিয়া তুলিল। তাহা দেখিয়া আবার মহিষীর দুঃখ একেবারে উথলিয়া উঠিল। অন্তঃপুরে বৃদ্ধাদের মধ্যে ক্রন্দনের সংক্রামক ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। কাঁদিবার অভিপ্রায়ে সকলে রাণীর ঘরে আসিয়া সমবেত হইল। উদয়াদিত্য করুণনেত্রে একবার সুরমার মুখের দিকে চাহিলেন। ঘোমটার মধ্য হইতে সুরমা তাহা দেখিতে পাইল, ও চোক মুছিয়া একটি কথা না কহিয়া ধীরে ধীরে ঘরে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যাবেলা মহিষী প্রতাপাদিত্যকে কহিলেন, আজ উদয়কে সমস্ত বুঝাইয়া বলিলাম।

বাছা আমার তেমন নহে। বুঝাইয়া বলিলে বুঝে। আজ তাহার চোক ফুটিয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—*—

বিভার ম্লানমুখ দেখিয়া সুরমা আর থাকিতে পারিল না; তাহার গলা ধরিয়া কহিল, "বিভা তুই চুপ করিয়া থাকিস্ কেন? তোর মনে যখন যাহা হয়, বলিস্ না কেন?"

বিভা ধীরে ধীরে কহিল, "আমার আর কি বলিবার আছে?"

সুরমা কহিল, "অনেক দিন তাঁহাকে দেখিস্ নাই, তোর মন কেমন করিবেই ত! তুই তাঁহাকে আসিবার জন্য একখানা চিঠি লেখ্ না। আমি তোর দাদাকে দিয়া পাঠাইবার বিধি করিয়া দিব।"

বিভার স্বামী চন্দ্রদ্বীপপতি রামচন্দ্র রায়ের সম্বন্ধে কথা হইতেছে।

বিভা ঘাড় হেঁট করিয়া কহিতে লাগিল,—"এখানে কেহ যদি তাঁহাকে গ্রাহ্য না করে, কেহ যদি তাঁহাকে ডাকিবার আবশ্যক বিবেচনা না করে, তবে এখানে তিনি না আসিলেই ভাল। তিনি যদি আপনি আসেন তবে আমি বারণ করিব। তিনি রাজা, যেখানে তাঁহার আদর নাই, সেখানে তিনি কেন আসিবেন? আমাদের চেয়ে তিনি কিসে ছোট যে, পিতা তাঁহাকে অপমান করিবেন?" বলিতে বলিতে বিভা আর সামলাইতে পারিল না, তাহার মুখখানি লাল হইয়া উঠিল ও সে কাঁদিয়া ফেলিল।

সুরমা বিভার মুখ বুকে রাখিয়া তাহার চোখের জল মুছাইয়া কহিল;—"আচ্ছা, বিভা, তুই যদি পুরুষ হইতিস্ ত কি করিতিস্? নিমন্ত্রণ পত্র পাস্ নাই বলিয়া কি শ্বশুর বাড়ি যাইতিস্ না?"

বিভা বলিয়া উঠিল, "না, তাহা পারিতাম না। আমি যদি পুরুষ হইতাম ত এখনি চলিয়া যাইতাম; মান অপমান কিছুই ভাবিতাম না। কিন্তু তাহাই বলিয়া তাঁহাকে আদর করিয়া না ডাকিয়া আনিলে তিনি কেন আসিবেন?"

বিভা এত কথা কখন কহে নাই। আজ আবেগের মাথায় অনেক কথা বলিয়াছে। এতক্ষণে একটু লজ্জা করিতে লাগিল। মনে হইল, বড় অধিক কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। আবার, যে রকম করিয়া বলিয়াছি, বড় লজ্জা করিতেছে?" ক্রমে তাহার মনের উত্তেজনা হ্রাস হইয়া আসিল ও মনের মধ্যে একটা গুরুভার অবসাদ আস্তে আস্তে চাপিয়া পড়িতে লাগিল। বিভা বাহুতে মুখ ঢাকিয়া সুরমার কোলে মাথা দিয়া শুইয়া পড়িল; সুরমা মাথা নত করিয়া কোমল হস্তে তাহার ঘন কেশভার পৃথক্ করিয়া দিতে লাগিল। এমন কতক্ষণ গেল। উভয়ের মুখে একটি কথা নাই। বিভার চোক দিয়া এক এক বিন্দু করিয়া জল পড়িতেছে ও সুরমা আস্তে আস্তে মুছাইয়া দিতেছে।

অনেকক্ষণ বাদে যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিল তখন বিভা ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল ও চোখের জল মুছিয়া ঈষৎ হাসিল। সে হাসির অর্থ—"আজ কি ছেলেমানুষীই করিয়াছি!" ক্রমে মুখ ফিরাইয়া সরিয়া গিয়া পালাইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। সুরমা কিছু না বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া রহিল। পূর্ব্বকার কথা আর কিছু উত্থাপন না করিয়া কহিল, "বিভা শুনিয়াছিস্, দাদামহাশয় আসিয়াছেন?"

বিভা। "দাদামহাশয় আসিয়াছেন?"

সুরমা। "হাঁ।"

বিভা। আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল,
"কখন্ আসিয়াছেন ?"

সুরমা। "প্রায় চার প্রহর বেলার সময়।"

বিভা। "এখনো যে আমাদের দেখিতে আসিলেন না।"

বিভার মনে ঈষৎ অভিমানের উদয় হইল। দাদা মহাশয়ের দখল লইয়া বিভা অতিশয় সতর্ক। এমন কি, এক দিন বসন্তরায় উদয়াদিত্যের সহিত অনেকক্ষণ কথোপকথন করিয়া বিভাকে অন্তঃপুরে তিন দণ্ড অপেক্ষা করাইয়াছিলেন, একবারেই তাহার সহিত দেখা করিতে যান নাই, এই জন্য বিভার এমন কষ্ট হইয়াছিল যে, যদিও সে বিষয়ে সে কিছু বলে নাই বটে তবু প্রসন্ন মুখে দাদামহাশয়ের সঙ্গে কথা কহিতে পারে নাই।

বসন্তরায় ঘরে প্রবেশ করিয়াই হাসিতে হাসিতে গান ধরিলেন।

"আজ তোমারে দেখ্‌তে এলেম
অনেক দিনের পরে!
ভয় নাইক, সুখে থাক,
অধিক ক্ষণ থাক্‌ব নাক'
আসিয়াছি দুদণ্ডেরি তরে!
দেখ্‌ব শুধু মুখ খানি
শুন্‌ব দুটি মধুর বাণী
আড়াল থেকে হাসি দেখি
চলে যাব দেশান্তরে!

গান শুনিয়া বিভা মুখ নত করিয়া হাসিল। তাহার বড় আহ্লাদ হইয়াছে। অতটা আহ্লাদ পাছে ধরা পড়ে বলিয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে।

সুরমা বিভার মুখ তুলিয়া ধরিয়া কহিল, "দাদা মহাশয়, বিভার হাসি দেখিবার জন্য ত আড়ালে যাইতে হইল না ?"

বসন্তরায়। "না। বিভা মনে করিল, নিতান্তই না হাসিলে যদি বুড়া বিদায় না হয়, তবে না হয় একটু হাসি। ও ডাকিনীর মৎলব আমি বেশ বুঝি, আমাকে তাড়াইবার ফন্দি! কিন্তু শীঘ্র তাহা হইতেছে না। আসিলাম যদি ত ভাল করিয়া জ্বালাইয়া যাইব, আবার যত দিন না দেখা হয় মনে থাকিবে ?"

সুরমা হাসিয়া কহিল, "দেখ দাদা মহাশয়, বিভা আমার কাণে কাণে বলিল যে, "মনে রাখানই" যদি অভিপ্রায় হয়, তবে যা' জ্বালাইয়াছ তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে, আর নূতন করিয়া জ্বালাইতে হইবে না।"

কথাটা শুনিয়া বসন্তরায়ের বড়ই আমোদ বোধ হইল। তিনি হাসিতে লাগিলেন।

বিভা অপ্রতিভ হইয়া বলিয়া উঠিল, "না, আমি কখনো ওকথা বলি নাই। আমি কোন কথাই কই নাই।"

সুরমা কহিল, "দাদা মহাশয়, তোমার মনস্কামনা ত পূর্ণ হইল! তুমি হাসি দেখিতে চাহিলে তাহা দেখিলে, কথা শুনিতে চাহিয়াছিলে তাহাও শুনাইলাম, তবে এখন দেশান্তরে যাও।"

বসন্তরায়। "না ভাই, তাহা পারিলাম না! আমি গোটা-পনের' গান ও এক মাথা পাকা চুল আনিয়াছি, সে গুলি সমস্ত নিকাশ না করিয়া যাইতে পারিতেছি না!"

বিভা আর থাকিতে পারিল না, হাসিয়া উঠিল, কহিল,—"তোমার আধ মাথা বই চুল নাই যে দাদামহাশয়!"

দাদামহাশয়ের অভিসন্ধি সিদ্ধ হইল। অনেক দিনের পর প্রথম আলাপ বিভার মুখ খুলিতে কিছু আয়োজনের আবশ্যক করে, কিন্তু দাদা মহাশয়ের কাছে বিভার মুখ একবার খুলিলে তাহা বন্ধ করিতে আবার ততোধিক আয়ো

জনের আবশ্যক হয়। কিন্তু দাদামহাশয় ব্যতীত আর কাহারো কাছে কোন অবস্থাতেই বিভার মুখ খুলে না।

বসন্তরায় টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "সে এক দিন গিয়াছেরে ভাই! যে দিন বসন্তরায়ের মাথায় এক মাথা চুল ছিল, সে দিন কি আর এত রাস্তা হাঁটিয়া তোমাদের খোষামোদ করিতে আসিতাম? একগাছি চুল পাকিলে তোমাদের মত পাঁচটা রূপসী চুল তুলিবার জন্য উমেদার হইত ও মনের আগ্রহে দশটা কাঁচা চুল তুলিয়া ফেলিত!"

বিভা গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা দাদামহাশয়, তোমার যখন একমাথা চুল ছিল, তখন কি তোমাকে এখনকার চেয়ে ভাল দেখিতেছিল?

মনে মনে বিভার সে বিষয়ে বিষম সন্দেহ ছিল। দাদা মহাশয়ের টাকটি, তাঁহার গুম্ফ-সম্পর্কশূন্য অধরের প্রশস্ত হাসিটি, তাঁহার পাকা আম্রের ন্যায় ভাবটি, সে মনে মনে পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিল, কোন মতেই ভাল ঠেকিল না। সে দেখিল, সে টাকটি না দিলে তাহার দাদামহাশয়কে কিছুতে মানায় না। আর গোঁফ জুড়িয়া দিলে দাদামহাশয়ের মুখখানি একেবারে খারাপ দেখিতে হইয়া যায়। এত খারাপ হইয়া যায় যে, সে তাহা কল্পনা করিলে হাসি রাখিতে পারে না। দাদা-মহাশয়ের আবার গোঁফ! দাদামহাশয়ের আবার টাক নাই!

বসন্তরায় কহিলেন, "সে বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে! আমার নাতনীরা আমার টাক দেখিয়া মোহিত হয়, তাহারা আমার চুল দেখে নাই। আমার দিদিমারা আমার চুল দেখিয়া মোহিত হইতেন, তাঁহারা আমার টাক দেখেন নাই। যাহারা উভয়ই দেখিয়াছে, তাহারা এখনো একটা মত স্থির করিতে পারে নাই!"

বিভা কহিল, "কিন্তু তা বলিয়া দাদামহাশয় যতটা টাক পড়িয়াছে তাহার অধিক পড়িলে আর ভাল দেখাইবে না!

সুরমা কহিল, "দাদামহাশয়, টাকের আলোচনা পরে হইবে। এখন বিভার একটা যাহা হয় উপায় করিয়া দাও!"

বিভা তাড়াতাড়ি বসন্তরায়ের কাছে গিয়া বলিয়া উঠিল, "দাদামহাশয়—আমি তোমার পাকাচুল তুলিয়া দিই।"

সুরমা। "আমি বলি কি"—

বিভা। "শোননা দাদামহাশয়, তোমার—"

সুরমা। "বিভা চুপ কর। আমি বলি কি, তুমি গিয়ে একবার—"

বিভা। "দাদামহাশয়, তোমার মাথায় পাকাচুল ছাড়া যে আর কিছুই নেই, তুলে দিলে সমস্ত মাথায় টাক পড়্‌বে!"

বসন্তরায়। "আমাকে যদি কথা শুন্‌তে না দিস্ দিদি, আমাকে যদি বিরক্ত করিস্ তবে আমি রাগ হিন্দোল আলাপ করিব।"

বলিয়া তাঁহার ক্ষুদ্রায়তন সেতারটির কাণ মোচ্‌ড়াইতে আরম্ভ করিলেন। হিন্দোল রাগের উপর বিভার বিশেষ বিদ্বেষ ছিল।

বিভা বলিল, "কি সর্ব্বনাশ। তবে আমি পালাই বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।"

তখন সুরমা গম্ভীর হইয়া কহিল, "বিভা নীরব হইয়া দিনরাত্রি যে কষ্ট প্রাণের মধ্যে বহন করে তাহা জানিতে পারিলে বোধ করি মহারাজারও মনে দয়া হয়!"

"কেন! কেন! তাহার কি হয়েছে!" বলিয়া নিতান্ত আগ্রহের সহিত বসন্তরায় সুরমার কাছে গিয়া বসিলেন।

সুরমা কহিল, "বৎসরের মধ্যে একটি দিন

ঠাকুরজামাইকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইতেও কাহারো মনে পড়ে না?"

বসন্তরায় চিন্তা করিয়া কহিলেন, "ঠিক্ কথাই ত!"

সুরমা কহিল; "স্বামীর প্রতি এ অনাদর কয়জন মেয়ে সহিতে পারে বল ত? বিভা ভাল মানুষ, তাই কাহাকেও কিছু বলে না, আপনার মনে লুকাইয়া কাঁদে।"

বসন্তরায় ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিলেন "আপনার মনে লুকাইয়া কাঁদে?"

সুরমা। "আজ বিকালে আমার কাছে কত কাঁদিতে ছিল।"

বসন্তরায়। "বিভা আজ বিকালে কাঁদিতেছিল?"

সুরমা। "হাঁ!"

বসন্তরায়। "আহা, তাহাকে একবার ডাকিয়া আন, আমি দেখি!"

সুরমা বিভাকে ধরিয়া আনিল। বসন্তরায় তাহার চিবুক ধরিয়া কহিলেন, "তুই কাঁদিস্ কেন দিদি? যখন তোর যা' কষ্ট হয় তোর দাদা মহাশয়কে বলিস্ না কেন? তা হ'লে আমি আমার যথাসাধ্য করি? আমি এখনি যাই, প্রতাপকে বলিয়া আসি গে!"

বিভা বলিয়া উঠিল, "দাদামহাশয়, তোমার দুটি পায়ে পড়ি আমার বিষয়ে বাবাকে কিছু বলিও না। দাদামহাশয়, তোমার পায়ে পড়ি যাইও না!"

বলিতে বলিতে বসন্তরায় বাহির হইয়া গেলেন; প্রতাপাদিত্যকে গিয়া বলিলেন, "তোমার জামাতাকে অনেক দিন নিমন্ত্রণ কর নাই ইহাতে তাহার প্রতি নিতান্ত অবহেলা প্রকাশ করা হইতেছে। যশোহর-পতির জামাতাকে যতখানি সমাদর করা উচিত, ততখানি সমাদর যদি তাহাকে না করা হয়, তবে তাহাতে তোমারই অপমান। তাহাতে গৌরবের কথা কিছু নাই।"

প্রতাপাদিত্য পিতৃব্যের কথায় কিছু মাত্র দ্বিরুক্তি করিলেন না। লোকসহ নিমন্ত্রণ-পত্র চন্দ্রদ্বীপে পাঠাইবার হুকুম হইল।

অন্তঃপুরে বিভা ও সুরমার কাছে আসিয়া বসন্তরায়ের সেতার বাজাইবার ধুম পড়িয়া গেল।

"মলিন মুখে ফুটুক্ হাসি জুড়াক্ দু নয়ন!"

বিভা লজ্জিত হইয়া কহিল, "দাদা মহাশয়, বাবার কাছে আমার কথা সমস্ত বলিয়াছ?" বসন্তরায় গান গাহিতে লাগিলেন,

মলিন মুখে ফুটুক্ হাসি, জুড়াক দুনয়ন।
মলিন বসন ছাড় সখি, পর আভরণ।"

বিভা সেতারের তারে হাত দিয়া সেতার বন্ধ করিয়া আবার কহিল, "বাবার কাছে আমার কথা বলিয়াছ?"

এমন সময়ে উদয়াদিত্যের কনিষ্ঠ অষ্টমবর্ষীয় সমরাদিত্য ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া বলিয়া উঠিল, "অ্যা, দিদি! দাদামহাশয়ের সহিত গল্প করিতেছ! আমি মাকে বলিয়া দিয়া আসিতেছি।"

এস, এস, ভাই এস্!" বলিয়া বসন্তরায় তাহাকে পাক্‌ড়া করিলেন।

রাজ-পরিবারের বিশ্বাস এই যে, বসন্তরায় ও সুরমায় মিলিয়া উদয়াদিত্যের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। এই নিমিত্ত বসন্তরায় আসিলে সামাল্ সামাল্ পড়িয়া যায়। সমরাদিত্য বসন্তরায়ের হাত ছাড়াইবার জন্য টানা-হেঁচ্‌ড়া আরম্ভ করিল। বসন্তরায় তাহাকে সেতার দিয়া, তাহাকে কাঁধে চড়াইয়া, তাহাকে চস্‌মা পরাইয়া, দুই দণ্ডের মধ্যে এমনি বশ করিয়া লইলেন যে, সে সমস্ত দিন দাদা মহাশয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতে লাগিল ও অনবরত

সেতার বাজাইয়া তাঁহার সেতারের পাঁচটা তার ছিঁড়িয়া দিল ও মেজরাপ কাড়িয়া লইয়া আর দিল না!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—*—

চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র রায় তাঁহার রাজ-কক্ষে বসিয়া আছেন। ঘরটি অষ্টকোণ। কড়ি হইতে কাপড়ে মোড়া ঝাড় ঝুলিতেছে। দেয়ালের কুলঙ্গির মধ্যে একটাতে গণেশের ও বাকীগুলিতে শ্রীকৃষ্ণের নানা অবস্থার নানা প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত। সে গুলি বিখ্যাত কারীকর বটকৃষ্ণ কুম্ভকারের স্বহস্তে গঠিত। চারিদিকে চাদর পড়িয়াছে, মধ্যস্থলে জরিখচিত মছলন্দের গদি, তাহার উপর একটি বাজা ও একটা তাকিয়া। তাহার চারি কোণে জরির ঝালর। দেয়ালের চারিদিকে দিশি আয়না ঝুলান,' তাহাতে মুখ ঠিক দেখা যায় না। রাজার চারিদিকে যে সকল মনুষ্য-আয়না আছে, তাহাতেও তিনি মুখ ঠিক দেখিতে পান না, শরীরের পরিমাণ অত্যন্ত বড় দেখায়! রাজার বামপার্শ্বে এক প্রকাণ্ড আলবোলা ও মন্ত্রী হরিশঙ্কর। রাজার দক্ষিণে রমাই ভাঁড়, ও চস্‌মা-পরা সেনাপতি ফর্ণাণ্ডিজ্।

রাজা বলিলেন, "ওহে রমাই!"

রমাই বলিল, "আজ্ঞা, মহারাজ!"

রাজা হাসিয়া আকুল। মন্ত্রী রাজার অপেক্ষা অধিক হাসিলেন। ফর্ণাণ্ডিজ হাত-তালি দিয়া হাসিয়া উঠিল। সন্তোষে রমাই-য়ের চোখ মিট্‌মিট্ করিতে লাগিল। রাজা ভাবেন রমাইয়ের কথায় না হাসিলে অরসিকতা প্রকাশ পায়; মন্ত্রী ভাবেন, রাজা হাসিলে হাসা কর্ত্তব্য; ফর্ণাণ্ডিজ্ ভাবে অবশ্য হাসিবার কিছু আছে। তাহা ছাড়া যে দুর্ভাগ্য, রমাই ঠোঁট খুলিলে দৈবাৎ না হাসে, রমাই তাহাকে কাঁদাইয়া ছাড়ে। নহিলে রমাইয়ের মান্ধাতার সমবয়স্ক ঠাট্টাগুলি শুনিয়া অল্প লোকেই আমোদে হাসে। তবে, ভয়ে ও কর্ত্তব্য-জ্ঞানে সকলেরই বিষম হাসি পায়, রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বারী পর্য্যন্ত।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "খবর কি হে?"

রমাই ভাবিল রসিকতা করা আবশ্যক।

"পরম্পরায় শুনা গেল, সেনাপতি মহাশয়ের ঘরে চোর পড়িয়াছিল।"

সেনাপতি মহাশয় অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি বুঝিলেন একটা পুরাতন গল্প তাঁহার উপর দিয়া চালাইবার চেষ্টা হইতেছে। তিনি রমাইয়ের রসিকতার ভয়ে যেমন কাতর, রমাই প্রতিবাদে তেমনি তাঁহাকেই চাপিয়া ধরে। রাজার বড়ই আমোদ! রমাই আসিলেই ফর্ণাণ্ডিজ্‌কে ডাকিয়া পাঠান। রাজার জীবনে দুইটি প্রধান আমোদ আছে; এক ভেড়ার লড়াই দেখা, আর রমাইয়ের মুখের সামনে ফর্ণাণ্ডিজ্‌কে স্থাপন করা। রাজকার্য্যে প্রবেশ করিয়া অবধি সেনাপতির গায়ে একটা ছিটাগুলি বা তীরের আঁচড় লাগে নাই। অনবরত হাস্যের গোলাগুলি খাইয়া সে ব্যক্তি কাঁদ' কাঁদ' হইয়া আসিয়াছে। পাঠকেরা মার্জ্জনা করিবেন, আমরা রমাইয়ের সকল রসিকতাগুলি লিপি-বদ্ধ করিতে পারিব না, সুরুচির অনুরোধে অধিকাংশ স্থলই পরিত্যাগ করিতে হইবে।

রাজা চোক টিপিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার পরে?"

"নিবেদন করি মহারাজ। ফর্ণাণ্ডিজ

তাঁহার কোর্ত্তার বোতাম খুলিতে লাগিলেন ও পরিতে লাগিলেন।) আজ দিন তিন চার ধরিয়া সেনাপতি মহাশয়ের ঘরে রাত্রে চোর আনাগোনা করিতেছিল। সাহেবের ব্রাহ্মণী জানিতে পারিয়া কর্ত্তাকে অনেক ঠেলাঠেলি করেন, কিন্তু কোন মতেই কর্ত্তার ঘুম ভাঙ্গাইতে পারেন নাই।”

রাজা। “হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।”

মন্ত্রী। “হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ।”

সেনাপতি। “হিঃ হিঃ।”

“দিনের বেলা গৃহিণীর নিগ্রহ আর সহিতে না পারিয়া যোড়হস্তে কহিলেন, “দোহাই তোমার, আজ রাত্রে চোর ধরিব।” রাত্রি দুই দণ্ডের সময় গৃহিণী বলিলেন, “ওগো চোর আসিয়াছে!” কর্ত্তা বলিলেন, “ওই যাঃ, ঘরে যে আলো জ্বলিতেছে! চোর যে আমাদের দেখিতে পাইবে ও দেখিতে পাইলেই পলাইবে। চোরকে ডাকিয়া কহিলেন, “আজ তুই বড় বাঁচিয়া গেলি। ঘরে আলো আছে, আজ নিরাপদে পলাইতে পারিবি, কাল আসিস্ দেখি, অন্ধকারে কেমন না ধরা পড়িস্!”

রাজা “হা হা হা হা!”

মন্ত্রী “হোহোহোহোহো!”

সেনাপতি। “হি।”

রাজা বলিলেন, “তার পরে?”

রমাই দেখিল, এখনো রাজার তৃপ্তি হয় নাই। “জানি না, কি কারণে চোরের যথেষ্ট ভয় হইল না। তাহার পর রাত্রেও ঘরে আসিল। গিন্নি কহিলেন, ‘সর্ব্বনাশ হইল, ওঠ!’ কর্ত্তা কহিলেন ‘তুমি ওঠ না।’ গিন্নি কহিলেন ‘আমি উঠিয়া কি করিব?, কর্ত্তা বলিলেন ‘কেন; ঘরে একটা আলো জ্বালাও না। কিছু যে দেখিতে পাই না!’ গিন্নি বিষম ক্রুদ্ধ; কর্ত্তা ততোধিক ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, দেখ দেখি,তোমার জন্যই ত যথাসর্ব্বস্ব গেল! আলোটা জ্বালাও বন্দুকটা আন! ইতি মধ্যে চোর কাজকর্ম্ম সারিয়া কহিল, “মহাশয়, এক ছিলাম তামাকু খাওয়াইতে পারেন! বড় পরিশ্রম হইয়াছে।” কর্ত্তা বিষম ধমক দিয়া কহিলেন “রোস্ বেটা! আমি তামাক সাজিয়া দিতেছি। কিন্তু আমার কাছে আসিবি ত এই বন্দুকে তোর মাথা উড়াইয়া দিব।” তামাক খাইয়া চোর কহিল মহাশয়, আলোটা যদি জ্বালেন ত উপকার হয়। সিঁদকাটিটা পড়িয়া গিয়াছে খুঁজিয়া পাইতেছি না।’ সেনাপতি কহিলেন ‘বেটার ভয় হইয়াছে। তফাতে থাক্, কাছে আসিস্ না।” বলিয়া তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিয়া দিলেন। ধীরে সুস্থে জিনিষ পত্র বাঁধিয়া চোর চলিয়া গেল। কর্ত্তা গিন্নিকে কহিলেন ‘বেটা,বিষম ভয় পাইয়াছে।’

রাজা ও মন্ত্রী হাসি সামলাইতে পারেন না। ফর্ণাণ্ডিজ থামিয়া থাকিয়া মাঝে মাঝে “হিঃ হিঃ” করিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হাসি টানিয়া টানিয়া বাহির করিতে লাগিলেন।

রাজা কহিলেন, ‘রমাই, শুনিয়াছ আমি শ্বশুরালয়ে যাইতেছি?’

রমাই মুখভঙ্গী করিয়া কহিল, অসারং খলু সংসারং সারং শ্বশুরমন্দিরং (হাস্য। প্রথমে রাজা, পরে মন্ত্রী, পরে সেনাপতি।) কথাটা মিথ্যা নহে। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) শ্বশুরমন্দিরের সকলি সার,—আহারটা, সমাদরটা; দুধের সরটি পাওয়া যায়, মাছের মুড়টি পাওয়া যায়; সকলি সার পদার্থ। কেবল সর্ব্বাপেক্ষা অসার ঐ স্ত্রীটা!”

রাজা হাসিয়া কহিলেন ‘সে কিহে, তোমার অর্দ্ধাঙ্গ’—

রমাই যোড়হস্তে ব্যাকুলভাবে কহিল, “মহা-

রাজ তাঁহাকে অর্দ্ধাঙ্গ বলিবেন না। তিন জন্ম তপস্যা করিলে আমি বরঞ্চ, এক দিন তাহার অর্দ্ধাঙ্গ হইতে পারিব, এমন ভরসা আছে। আমার মত পাঁচটা অর্দ্ধাঙ্গ জুড়িলেও তাহার আয়তনে কুলায় না!" (যথাক্রমে হাস্য) কথাটার রস আর সকলেই বুঝিল, কেবল মন্ত্রী পারিলেন না, এই নিমিত্ত মন্ত্রীকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হাসিতে হইল।

রাজা কহিলেন, 'আমি ত শুনিয়াছি, তোমার ব্রাহ্মণী বড়ই শান্ত-স্বভাবা ও ঘরকন্নায় বিশেষ পটু।'

রমাই। "সে কথায় কাজ কি! ঘরে আর সকল রকম জঞ্জালই আছে, কেবল আমি তিষ্টিতে পারি না। প্রত্যুষে গৃহিণী এমন ঝাঁটাইয়া দেন যে, একেবারে মহারাজের দুয়ারে আসিয়া পড়ি!"

এইখানে কথাপ্রসঙ্গে রমাইয়ের ব্রাহ্মণীর পরিচয় দিই। তিনি অত্যন্ত কৃশাঙ্গী ও দিনে দিনে ক্রমেই আরো ক্ষীণ হইয়া যাইতেছেন। রমাই ঘরে আসিলে তিনি কোথায় যে আশ্রয় লইবেন ভাবিয়া পান না! রাজসভায় রমাই এক প্রকার ভঙ্গীতে দাঁত দেখায় ও ঘরে আসিয়া গৃহিণীর কাছে আর এক প্রকার ভঙ্গীতে দাঁত দেখায়। কিন্তু গৃহিণীর যথাথ স্বরূপ বর্ণনা করিলে নাকি হাস্যরস না আসিয়া করুণ রস আসে, এই নিমিত্ত রাজসভায় রমাই তাহার গৃহিণীকে স্থূলকায়া ও উগ্রচণ্ডা করিয়া বর্ণনা করেন, রাজা ও মন্ত্রীরা হাসি রাখিতে পারেন না?

হাসি থামিলে পর রাজা কহিলেন, "ওহে রমাই, তোমাকে যাইতে হইবে, সেনাপতিকেও সঙ্গে লইব।"

সেনাপতি বুঝিলেন, এইবার রমাই তাঁহার উপর দ্বিতীয় আক্রমণ করিবে। চস্‌মাটা চোখে তুলিয়া পরিলেন এবং বোতাম খুলিতে ও পরিতে লাগিলেন।

রমাই কহিল, "উৎসব স্থলে যাইতে সেনাপতি মহাশয়ের কোন আপত্তি থাকিতে পারে না, কারণ এ ত আর যুদ্ধস্থল নয়!"

রাজা ও মন্ত্রী ভাবিলেন, ভারি একটা মজার কথা আসিতেছে; আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

রমাই। "সাহেবের চক্ষে দিন রাত্রি চস্‌মা আঁটা। ঘুমাইবার সময়েও চস্‌মা পরিয়া শোন; নহিলে ভাল করিয়া স্বপ্ন দেখিতে পারেন না। সেনাপতি মহাশয়ের যুদ্ধে যাইতে আর কোন আপত্তি নাই, কেবল, পাছে চস্‌মার কাচে কামানের গোলা লাগে, ও কাচ ভাঙ্গিয়া চোখ কাণা হইয়া যায়, এই যা' ভয়! কেমন মহাশয়?"

সেনাপতি চোখ টিপিয়া কহিলেন, "তাহা নয়ত কি?" তিনি আসন হইতে উঠিয়া কহিলেন "মহারাজ, আদেশ করেন ত বিদায় হই।"

রাজা সেনাপতিকে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে কহিলেন, "যাত্রার সমস্ত উদ্যোগ কর। আমার ৬৪ দাঁড়ের নৌকা যেন প্রস্তুত থাকে।" মন্ত্রী ও সেনাপতি প্রস্থান করিলেন।"

রাজা কহিলেন, "রমাই, তুমি ত সমস্তই জানিয়াছ। গতবারে শ্বশুরালয়ে আমাকে বড়ই মাটি করিয়াছিল?"

রমাই। "আজ্ঞা হাঁ, মহারাজের লাঙ্গুল বানাইয়া দিয়াছিল।"

রাজা হাসিলেন, কিন্তু মুখে দন্তের বিদ্যুৎ-ছটা বিকাশ হইল বটে, মনের মধ্যে ঘোরতর মেঘ করিয়া উঠিল। এ সংবাদ রমাই জানিতে পারিয়াছে শুনিয়া তিনি বড় সন্তুষ্ট নহেন। আর কেহ জানিলে ততটা ক্ষতি ছিল না। অনবরত গুড় গুড়ি টানিতে লাগিলেন।

রমাই কহিল, আপনার এক শ্যালক

আসিয়া আমাকে কহিলেন 'বাসর ঘরে তোমাদের রাজার লেজ প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি রামচন্দ্র, না রামদাস? এমন ত পূর্ব্বে জানিতাম না।' আমি তৎক্ষণাৎ কহিলাম, পূর্ব্বে জানিবেন কিরূপে? পূর্ব্বেত ছিল না। আপনাদের ঘরে বিবাহ করিতে আসিয়াছেন, তাই যস্মিন্ দেশে যদাচার অবলম্বন করিয়াছেন।"

রাজা জবাব শুনিয়া বড়ই সুখী। ভাবিলেন রমাই হইতে তাঁহার এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের মুখ উজ্জ্বল হইল ও প্রতাপাদিত্যের আদিত্য একবারে চির-রাহুগ্রস্ত হইল। রাজা যুদ্ধবিগ্রহের বড় একটা ধার ধারেন না। এই সকল ছোটখাট ঘটনাগুলিকে তিনি যুদ্ধবিগ্রহের ন্যায় বিষম বড় করিয়া দেখেন। এত দিন তাঁহার ধারণা ছিল যে তাঁহার ঘোরতর অপমানসূচক পরাজয় হইয়াছে। এ কলঙ্কের কথা দিনরাত্রি তাঁহার মনে পড়িত ও তিনি লজ্জায় পৃথিবীকে দ্বিধা হইতে অনুরোধ করিতেন। আজ তাঁহার মন অনেকটা সান্ত্বনা লাভ করিল যে সেনাপতি রমাই রণে জিতিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তথাপি তাঁহার মন হইতে লজ্জার ভার একেবারে দূর হয় নাই।

রাজা রমাইকে কহিলেন 'রমাই, এবারে গিয়া জিতিয়া আসিতে হইবে। যদি জয় হয় তবে তোমাকে আমার অঙ্গুরী উপহার দিব।"

রমাই বলিল মহারাজ, জয়ের ভাবনা কি? রমাইকে যদি অন্তঃপুরে লইয়া যাইতে পারেন, তবে স্বয়ং শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে পর্য্যন্ত মনের সাধে ঘোল পান করাইয়া আসিতে পারি।"

রাজা কহিলেন, 'তাহার ভাবনা? তোমাকে আমি অন্তঃপুরেই লইয়া যাইব।'

রমাই কহিল "আপনার অসাধ্য কি আছে?"

রাজারও তাহাই বিশ্বাস। তিনি কি না করিতে পারেন? অনুগত-বর্গের কেহ যদি বলে, 'মহারাজের জয় হউক সেবকের বাসনা পূর্ণ করুন।' মহামহিম রামচন্দ্র রায় তৎক্ষণাৎ বলেন 'হাঁ, তাহাই হইবে।' কেহ যেন মনে না করে এমন কিছু কাজ আছে, যাহা তাঁহা দ্বারা হইতে পারে না। তিনি স্থির করিলেন, রমাই ভাঁড়কে প্রতাপাদিত্যের অন্তঃপুরে লইয়া যাইবেন, স্বয়ং মহিষী মাতার সঙ্গে বিদ্রূপ করাইবেন, তবে তাঁহার নাম রাজা রামচন্দ্র রায়। এত বড় মহৎ কাজটা যদি তিনি না করিতে পারিলেন, তবে আর তিনি কিসের রাজা।

চন্দ্রদ্বীপাধিপতি, রামমোহন মালকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রামমোহন মাল পরাক্রমে ভীমের মত ছিল। শরীর প্রায় সাড়ে চারি হাত লম্বা। সমস্ত শরীরে মাংসপেশী তরঙ্গিত। সে স্বর্গীয় রাজার আমলের লোক। রামচন্দ্রকে বাল্যকাল হইতে পালন করিয়াছে। রমাইকে সকলেই ভয় করে, রমাই যদি কাহাকেও ভয় করে সে এই রামমোহনকে। রামমোহন রমাইকে অত্যন্ত ঘৃণা করিত। রমাই তাহার ঘৃণার দৃষ্টিতে কেমন আপনাআপনি সঙ্কুচিত হইয়া পড়িত। রামমোহনের দৃষ্টি এড়াইতে পারিলে সে ছাড়িত না। রামমোহন আসিয়া দাঁড়াইল। রাজা কহিলেন, তাঁহার সঙ্গে ৫০ জন অনুচর যাইবে। রামমোহন তাহাদিগের সর্দ্দার হইয়া যাইবে।

রামমোহন কহিল "যে আজ্ঞা। রমাই ঠাকুর যাইবেন কি?" বিড়াল-চক্ষু খর্ব্বাকৃতি রমাই ঠাকুর সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—*—

যশোহর রাজবাটীতে আজ কর্ম্মচারীরা ভারি ব্যস্ত। জামাতা আসিবে, নানা প্রকার উদ্যোগ করিতে হইতেছে। আহারাদির বিস্তৃত আয়োজন হইতেছে। চন্দ্রদ্বীপের রাজ-বংশ যশোহরের তুলনায় যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎ-কর, সে বিষয়ে প্রতাপাদিত্যের সহিত মহি-ষীর কোন মতান্তর ছিল না, তথাপি জামাতা আসিবে বলিয়া আজ তাঁহার অত্যন্ত আহ্লাদ হইয়াছে। প্রাতঃকাল হইতে বিভাকে তিনি স্বহস্তে সাজাইতে আরম্ভ করিয়াছেন—বিভা বিষম গোলযোগে পড়িয়াছে। কারণ সাজাইবার পদ্ধতি সম্বন্ধে বয়স্কা মাতার সহিত যুবতী দুহি-তার নানা বিষয়ে রুচিভেদ আছে, কিন্তু হইলে হয় কি, বিভার কিসে ভাল হয়, মহিষী তাহা অবশ্য ভাল বুঝেন। বিভার মনে মনে ধারণা ছিল, তিনগাছি করিয়া পাতলা ফিরোজ রঙের চুড়ি পরিলে তাহার শুভ্র কচি হাতখানি বড় মানাইবে—মহিষী তাহাকে আটগাছা মোটা সোণার চুড়ি ও এক এক গাছা বৃহদা-কার হীরার বালা পরাইয়া এত অধিক আন-ন্দিত হইয়া উঠিলেন যে, সকলকে দেখাইবার জন্য বাড়ির সমুদয় বৃদ্ধা দাসী ও বিধবা পিসী-দিগকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। বিভা জানিত যে, তাহার ছোট সুকুমার মুখখানিতে নথ কোন মতেই মানায় না—কিন্তু মহিষী তাহাকে একটা বড় নথ পরাইয়া তাহার মুখখানি একবার দক্ষিণপার্শ্বে একবার বামপার্শ্বে ফিরাইয়া গর্ব্ব-সহকারে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইহা-তেও বিভা চুপ করিয়াছিল, কিন্তু মহিষী যে ছাঁদে তাহার চুল বাঁধিয়া দিলেন, তাহা তাহার একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল। সে গোপনে সুরমার কাছে গিয়া তাহার মনের মত চুল বাঁধিয়া আসিল। কিন্তু তাহা মহিষীর নজর এড়াইতে পারিল না। মহিষী দেখিলেন, কেবল চুল বাঁধার দোষে বিভার সমস্ত সাজ মাটি হইয়া গিয়াছে। তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন সুরমা হিংসা করিয়া বিভার চুল বাঁধা খারাপ করিয়া দিয়াছে;—সুরমার হীন উদ্দেশ্যের প্রতি বিভার চোক ফুটাইতে চেষ্টা করিলেন;—অনেক ক্ষণ বকিয়া যখন স্থির করিলেন কৃতকার্য্য হইয়াছেন তখন তাহার চুল খুলিয়া পুনরায় বাঁধিয়া দিলেন! এইরূপে বিভা তাহার খোপা, তাহার নথ, তাহার দুইবাহুপূর্ণ চুড়ি, তাহার এক হৃদয়-পূর্ণ আনন্দের ভার বহন করিয়া নিতান্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। সে বুঝিতে পারিয়াছে যে, দুরন্ত আহ্লাদকে কোন মতেই সে হৃদয়ের অন্তঃপুরে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিতেছে না, চোখে মুখে সে ক্রমিক বিদ্যুতের মত উঁকি মারিয়া যাইতেছে। তাহার মনে হইতেছে, বাড়ির দেয়াল গুলা পর্য্যন্ত তাহাকে উপহাস করিতে উদ্যত রহিয়াছে। যুবরাজ উদয়াদিত্য আসিয়া গভীর স্নেহপূর্ণ প্রশান্ত আনন্দের সহিত বিভার সলজ্জ হর্ষপূর্ণ মুখখানি দেখিলেন। বিভার হর্ষ দেখিয়া তাঁহার এমনি আনন্দ হইল যে, গৃহে গিয়া সস্নেহ মৃদু হাস্যে সুরমাকে চুম্বন করিলেন।

সুরমা জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

উদয়াদিত্য কহিলেন,—"কিছুই না!"

এমন সময়ে বসন্তরায় জোর করিয়া বিভাকে টানিয়া ঘরের মধ্যে আনিয়া হাজির করিলেন। চিবুক ধরিয়া তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন—"দেখ, দাদা আজ একবার তোমাদের বিভার মুখখানি দেখ! সুরমা,—ও সুরমা, একবার দেখে যাও!" আনন্দে গদ-গদ হইয়া বৃদ্ধ হাসিতে লাগিলেন। বিভার

খের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আহ্লাদ হয় ত গাল করেই হাস্ না ভাই দেখি !

"হাসিরে পায়ে ধরে রাখিবি কেমন করে, হাসির সে প্রাণের সাধ ঐ অধরে খেলা করে!" বয়স যদি না যাইত ত আজ তোর ঐ মুখখানি দেখিয়া এই খানে পড়িতাম আর মরিতাম ! হায়, হায়, মরিবার বয়স গিয়াছে ! যৌবন কালে ঘড়ি ঘড়ি মরিতাম। বুড়া বয়সে রোগ না হইলে আর মরণ হয় না !"

প্রতাপাদিত্যকে যখন তাঁহার শ্যালক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "জামাই বাবাজিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য কে গিয়াছে" তিনি কহিলেন "আমি কি জানি !" "আজ পথে অবশ্য আলো দিতে হইবে ?" নেত্র বিস্ফারিত করিয়া মহারাজা কহিলেন "অবশ্যই দিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই !" তখন রাজ-শ্যালক সসঙ্কোচে কহিলেন, "নহবৎ বসিবে না কি ?" "সে সকল বিষয় ভাবিবার অবসর নাই।" আসল কথা, বাজনা বাজাইয়া একটা জামাই ঘরে আনা প্রতাপাদিত্যের কার্য্য নহে।

রামচন্দ্র রায়ের মহা অভিমান উপস্থিত হইয়াছে। তিনি স্থির করিয়াছেন, তাঁহাকে ইচ্ছা পূর্ব্বক অপমান করা হইয়াছে। পূর্ব্বে দুই এক-বার তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া হইবার জন্য রাজবাটী হইতে চকদিহিতে লোক প্রেরিত হইত, এবারে চকদিহি পার হইয়া দুই ক্রোশ আসিলে পর বামনহাটিতে দেওয়ানজি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছেন। যদি বা দেওয়ানজি আসিলেন, তাঁহার সহিত দুই শত পঞ্চাশ জন বই লোক আসে নাই। কেন, সমস্ত যশোহরে কি আর পঞ্চাশ জন লোক মিলিল না ? রাজাকে লইতে যে হাতীটি আসিয়াছে রমাই ভাঁড়ের মতে স্থূলকায় দেওয়ানজি তাহার অপেক্ষা বৃহত্তর। দেওয়ানকে রমাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মহাশয় উটি বুঝি আপনার কনিষ্ঠ ?" ভালমানুষ দেওয়ানজি ঈষৎ বিস্মিত হইয়া উত্তর দিয়াছিলেন, "না ওটা হাতী।"

রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া দেওয়ানকে কহিলেন "তোমাদের মন্ত্রী যে হাতীটাতে চড়িয়া থাকে, সেটাও যে ইহা অপেক্ষা বড়।"

দেওয়ান কহিলেন, "বড় হাতীগুলি রাজ-কার্য্য উপলক্ষে দূরে পাঠান' হইয়াছে সহরে একটিও নাই।"

রামচন্দ্র স্থির করিলেন, তাঁহাকে অপমান করিবার জন্যই তাহাদের দূরে পাঠান' হইয়াছে। নহিলে আর কি কারণ থাকিতে পারে !

রাজাধিরাজ রামচন্দ্র রায় আরক্তিম হইয়া শ্বশুরের নাম ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন, প্রতাপা-দিত্য রায়ের চেয়ে আমি কিসে ছোট ?"

রমাই ভাঁড় কহিল, "বয়সে আর সম্পর্কে, নহিলে আর কিসে ?" তাহার মেয়েকে যে আপনি বিবাহ করিয়াছেন, ইহাতেই—"

কাছে রামমোহন মাল দাঁড়াইয়াছিল, তাহার আর সহ্য হইল না, বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল, "দেখ ঠাকুর, তোমার বড় বাড় বাড়িয়াছে। আমার মাঠাকরুণের কথ অমন করিয়া বলিও না। এই স্পষ্ট কথা বলিলাম।"

প্রতাপাদিত্যকে লক্ষ্য করিয়া রমাই কহিল, "অমন ঢের ঢের আদিত্য দেখিয়াছি। জানেন ত মহারাজ, আদিত্যকে যে ব্যক্তি বগলে ধরিয়া রাখিতে পারে, সে ব্যক্তি রামচন্দ্রের দাস।"

রাজা মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন। রামমোহন তখন ধীর পদক্ষেপে রাজার সম্মুখে আসিয়া যোড় হস্তে কহিল, "মহারাজ, ঐ বামুনা যে আপনার শ্বশুরের নামে যাহা ইচ্ছা তাই বলিবে, ইহাত আমার সহ্য হয় না; বলেন ত উহার মুখ বন্ধ করি !"

রাজা কহিলেন, "রামমোহন তুই থাম।"

তখন রামমোহন সেখান হইতে দূরে চলিয়া গেল।

রামচন্দ্র সে দিন বহু সহস্র খুঁটিনাটি পর্য্যালোচনা করিয়া স্থির করিলেন, প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে অপমান করিবার জন্ত বহু দিন ধরিয়া বিস্তৃত আয়োজন করিয়াছেন। অভিমানে তিনি নিতান্ত স্ফীত হইয়া উঠিয়াছেন। স্থির করিয়াছেন, প্রতাপাদিত্যের কাছে এমন মূর্ত্তি ধারণ করিবেন, যাহাতে প্রতাপাদিত্য বুঝিতে পারেন তাঁহার জামাতা কতবড় লোক।

যখন প্রতাপাদিত্যের সহিত রামচন্দ্র রায়ের দেখা হইল, তখন প্রতাপাদিত্য রাজকক্ষে তাঁহার মন্ত্রীর সহিত উপবিষ্ট ছিলেন। প্রতাপাদিত্যকে দেখিবামাত্রই রামচন্দ্র নতমুখে ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

প্রতাপাদিত্য কিছু মাত্র উল্লাস বা ব্যস্তভাব প্রকাশ না করিয়া শান্তভাবে কহিলেন। "এস ভাল আছ ত।"

রামচন্দ্র মৃদুস্বরে কহিলেন, "আজ্ঞা, হাঁ।"

মন্ত্রীর দিকে চাহিয়া প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "ভাঙ্গামাথী পরগরণার তহশীলদারের নামে যে অভিযোগ আসিয়াছে, তাহার কোন তদন্ত করিয়াছ?"

মন্ত্রী দীর্ঘ এক কাগজ বাহির করিয়া রাজার হাতে দিলেন, রাজা পড়িতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর পড়িয়া একবার চোখ তুলিয়া জামাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গত বৎসরের মত এবার ত তোমাদের ওখানে বন্তা হয় নাই?"

রামচন্দ্র "আজ্ঞা না। আশ্বিন মাসে একবার জল বৃদ্ধি—"

প্রতাপাদিত্য—"মন্ত্রি, এ চিঠিখানার অবশ্য একটা নকল রাখা হইয়াছে।" বলিয়া আবার পড়িতে লাগিলেন। পড়া শেষ করিয়া জামাতাকে কহিলেন, "যাও, বাপু, অন্তঃপুরে যাও।"

রামচন্দ্র ধীরে ধীরে উঠিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন তাঁহার অপেক্ষা প্রতাপাদিত্য কিসে বড়।

নবম পরিচ্ছেদ।

—*—

রামমোহন মাল যখন অন্তঃপুরে আসিয়া বিভাকে প্রণাম করিয়া কহিল, "মা তোমায় একবার দেখিতে আইলাম" তখন বিভার মনে বড় আহ্লাদ হইল। রামমোহনকে সে বড় ভাল বাসিত। কুটুম্বিতার নানাবিধ কার্য্যভার বহন করিয়া রামমোহন প্রায় মাঝে মাঝে চন্দ্রদ্বীপ হইতে যশোহরে আসিত। কোন আবশ্যক না থাকিলেও অবসর পাইলে সে এক একবার বিভাকে দেখিতে আসিত। রামমোহনকে বিভা কিছুমাত্র লজ্জা করিত না। বৃদ্ধ, বলিষ্ঠ, দীর্ঘ, রামমোহন যখন "মা" বলিয়া আসিয়া দাঁড়াইত তখন তাহার মধ্যে এমন একটা বিশুদ্ধ সরল, অলঙ্কারশূন্ত স্নেহের ভাব থাকিত যে বিভা তাহার কাছে আপনাকে নিতান্ত বালিকা মনে করিত। বিভা তাহাকে কহিল "মোহন, তুই এতদিন আসিস্ নাই কেন?

রামমোহন কহিল, "তা" মা, 'কুপুত্র যদি বা হয়, কুমাতা কখন নয়।' তুমি কোন আমাকে মনে করিলে? আমি মনে মনে কহিলাম, 'মা না ডাকিলে আমি যাব না; দেখি, কত দিনে তাঁর মনে পড়ে। তা' কৈ, একবারোত মনে পড়িল না।"

বিভা ভারি মুষ্কিলে পড়িল। সে কেন

ডাকে নাই, তাহা ভাল করিয়া বলিতে পারিল না। তাহা ছাড়া, ডাকে নাই বলিয়া যে মনে করে নাই, এই কথাটার মধ্যে এক জায়গায় কোথায় যুক্তির দোষ আছে বলিয়া মনে হইতেছে, অথচ ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিতে পারিতেছে না।

বিভার মুস্কিল দেখিয়া রামমোহন হাসিয়া কহিল, "না মা অবসর পাই নাই বলিয়া আসিতে পারি নাই।"

বিভা কহিল, "মোহন তুই বোস; তোদের দেশের গল্প আমায় বল্।"

রামমোহন বসিল। চন্দ্রদ্বীপের বর্ণনা করিতে লাগিল। বিভা গালে হাত দিয়া এক মনে শুনিতে লাগিল। চন্দ্রদ্বীপের বর্ণনা শুনিতে শুনিতে তাহার হৃদয় টুকুর মধ্যে কত কি কল্পনা জাগিয়া উঠিয়াছিল, সে দিন সে আসমানের উপর কত ঘর বাড়িই বাঁধিয়াছিল, তাহার আর ঠিকানা নাই। যখন রামমোহন গল্প করিল, গত বর্ষার বন্যায় তাহার ঘর বাড়ি সমস্ত ভাসিয়া গিয়াছিল; সন্ধ্যার প্রাক্কালে সে একাকী তাহার বৃদ্ধা মাতাকে পিঠে করিয়া সাঁতার দিয়া মন্দিরের চূড়ায় উঠিয়াছিল, ও দুই জনে মিলিয়া সমস্ত রাত্রি সেইখানে যাপন করিয়াছিল;—তখন বিভার ক্ষুদ্র বুকটির মধ্যে কি হৃৎকম্পই উপস্থিত হইয়াছিল!

গল্প ফুরাইলে পর রামমোহন কহিল "মা, তোমার জন্য চারগাছি শাঁখা আনিয়াছি, তোমাকে ঐ হাতে পরিতে হইবে, আমি দেখিব।"

বিভা তাহার চারগাছি সোণার চুড়ি খুলিয়া শাঁখা পরিল, ও হাসিতে হাসিতে মায়ের কাছে গিয়া কহিল,—"মা, মোহন তোমার চুড়ি খুলিয়া আমাকে চারগাছি শাঁখা পরাইয়া দিয়াছে।"

মহিষী কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট না হইয়া হাসিয়া কহিলেন, "তা,' বেশ ত সাজিয়াছে বেশ ত মানাইয়াছে।"

রামমোহন অত্যন্ত উৎসাহিত ও গর্ব্বিত হইয়া উঠিল। মহিষী তাহাকে ডাকাইয়া লইয়া গেলেন, নিজে উপস্থিত থাকিয়া তাহাকে আহার করাইলেন। সে তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করিলে পর তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন,—"মোহন, এই বারে তোর সেই আগমনীর গানটি গা।" রামমোহন বিভার দিকে চাহিয়া গাহিল;—

"সারা বরষ দেখিনে মা, মা তুই আমার
কেমন ধারা,
নয়ন-তারা হারিয়ে আমার অন্ধ হ'ল
নয়ন-তারা!
এলি কি পাষাণী ওরে,
দেখ্‌ব তোরে আঁখি ভোরে,
কিছুতেই থামেনা যে মা,
পোড়া এ নয়নের ধারা!"

রামমোহনের চোখে জল আসিল, মহিষীও বিভার মুখের দিকে চাহিয়া, চখের জল মুছিলেন। আগমনীর গানে তাঁহার বিজয়ার কথা মনে পড়িল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। পুরমহিলাদের জনতা বাড়িতে লাগিল। প্রতিবেশিনীরা জামাই দেখিবার জন্য ও সম্পর্ক অনুসারে জামাইকে উপহাস করিবার জন্য অন্তঃপুরে সমাগত হইল। আনন্দ লজ্জা, আশঙ্কা, একটা অনিশ্চিত, অনির্দ্দেশ্য না জানি-কি-হইবেক ভাবে বিভার হৃদয় তোলপাড় করিতেছে, তাহার মুখ কাণ লাল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার হাত পা শীতল হইয়া গিয়াছে। ইহা কষ্ট কি সুখ কে জানে!

জামাই অন্তঃপুরে আসিয়াছেন! হুল-

বিশিষ্ট সৌন্দর্য্যের ঝাঁকের ন্যায় রমণীগণ চারিদিক্ হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে। চারিদিকে হাসির কোলাহল উঠিল। চারিদিক্ হইতে কোকিল-কণ্ঠের তীব্র উপহাস মৃণাল-বাহুর কঠোর তাড়ন, চম্পক-অঙ্গুলির চক্র-নখরের তীক্ষ্ণ পীড়ন চলিতে লাগিল। রামচন্দ্র রায় যখন নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন, তখন একজন প্রৌঢ়া রমণী আসিয়া তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া বসিল। সে কঠোর কণ্ঠে এমনি কাটা কাটা কথা কহিতে লাগিল ও ক্রমেই তাহার মুখ দিয়া এমনি সকল রুচির বিকার বাহির হইতে লাগিল যে পুর-রমণীদের মুখ এক প্রকার বন্ধ হইয়া আসিল। তাহার মুখের কাছে থাক দিদিও চুপ করিয়া গেলেন। বিমলা দিদি ঘর হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। কেবল ভুতোর মা তাহাকে খুব এক কথা শুনাইয়াছিল। যখন উল্লিখিত ভুতোর মার মুখ খুব চলিতেছিল, তখন সেই প্রৌঢ়া তাহাকে বলিয়াছিল, "মাগো মা, তোমার মুখ নয়ত, এক গাছা ঝাঁটা!" ভুতোর মা তৎক্ষণাৎ কহিল, "আর মাগি,তোর মুখটা আঁস্তাকুড়, এত ঝাঁটাইলাম, তবুও সাফ হইল না!" বলিয়া গস্ গস্ করিয়া চলিয়া গেল। একে একে ঘর খালি হইল, রামচন্দ্ররায় বিরাম পাইলেন!

তখন সেই প্রৌঢ়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া মহিষীর কক্ষে উপস্থিত হইল। সেখানে মহিষী দাস দাসীদিগকে খাওয়াইতেছিলেন। রামমোহনও এক পার্শ্বে বসিয়া খাইতেছিল। সেই প্রৌঢ়া, মহিষীর কাছে আসিয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিল,—"এই যে নিকষা জননী!" শব্দটা শুনিবামাত্র রামমোহন চমকিয়া উঠিল, প্রৌঢ়ার মুখের দিকে চাহিল। তৎক্ষণাৎ আহার পরিত্যাগ করিয়া শার্দ্দূলের ন্যায় লম্ফ দিয়া তাহার দুই হস্ত বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া বজ্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আমি যে ঠাকুর তোমায় চিনি!" বলিয়া তাহার মস্তকের বস্ত্র উন্মোচন করিয়া ফেলিল। আর কেহ নহে, রমাই ঠাকুর! রামমোহন ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল, গাত্র হইতে চাদর খুলিয়া ফেলিল; দুই হস্তে অবলীলাক্রমে রমাইকে আকাশে তুলিল, কহিল "আজ আমার হাতে তোর মরণ আছে!" বলিয়া তাহাকে দুই এক পাক আকাশে ঘুরাইল। মহিষী ছুটিয়া আসিয়া কহিলেন, "রামমোহন তুই করিস্ কি?" রমাই কাতর স্বরে কহিল, "দোহাই বাবা, ব্রহ্মহত্যা করিস্ না!" চারিদিক্ হইতে বিষম একটা গোলযোগ উঠিল। তখন রামমোহন রমাইকে ভূমিতে নামাইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল, "হতভাগা, তোর কি আর মরিবার জায়গা ছিল না?"

রমাই, কহিল, "মহারাজ আমাকে আদেশ করিয়াছেন।" রামমোহন বলিয়া উঠিল, "কি বলিলি, নিমক হারাম? ফের অমন কথা বলিবি ত, এই সানের পাথরে তোর মুখ ঘষিয়া দিব!" বলিয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিল।

রমাই আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। তখন রামমোহন খর্ব্বকায় রমাইকে চাদর দিয়া বাঁধিয়া বস্তার মতন করিয়া ঝুলাইয়া অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে কথাটা অনেকটা রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। রাত্রি তখন দুই প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। রাজার শ্যালক আসিয়া সেই রাত্রে প্রতাপাদিত্যকে সংবাদ দিলেন যে, জামাতা রমাই ভাঁড়কে রমণীবেশে অন্তঃপুরে লইয়া গেছেন! সেখানে সে পুর-রমণীদের

সহিত এমন কি, মহিষীর সহিত বিদ্রূপ করিয়াছে।

তখন প্রতাপাদিত্যের মূর্ত্তি অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। রোষে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ আলোড়িত হইয়া উঠিল। স্ফীতজটা সিংহের ন্যায় শয্যা হইতে উঠিয়া বসিলেন। কহিলেন, "লছমন সর্দ্দারকে ডাক।" লছমন্ সর্দ্দারকে কহিলেন "আজ রাত্রে আমি রামচন্দ্র রায়ের ছিন্ন মুণ্ড দেখিতে চাই।" সে তৎক্ষণাৎ সেলাম করিয়া কহিল, "যো হুকুম মহারাজ!" তৎক্ষণাৎ তাঁহার শ্যালক তাঁহার পদতলে পড়িল, কহিল —"মহারাজ, মার্জ্জনা করুন, বিভার কথা একবার মনে করুন। অমন কাজ করিবেন না!" প্রতাপাদিত্য পুনরায় দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "আজ রাত্রের মধ্যেই আমি রামচন্দ্র রায়ের মুণ্ড চাই!" তাঁহার শ্যালক তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "মহারাজ, আজ তাঁহারা অন্তঃপুরে শয়ন করিয়াছেন, মার্জ্জনা করুন, মহারাজ মার্জ্জনা করুন!" তখন প্রতাপাদিত্য কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া কহিলেন—"লছমন্ শুন, কাল প্রভাতে যখন রামচন্দ্র রায় অন্তঃপুর হইতে বাহির হইবে, তখন তাহাকে বধ করিবে, তোমার উপর আদেশ রহিল।" শ্যালক দেখিলেন তিনি যত দূর মনে করিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক হইয়া গিয়াছে। তিনি সেই রাত্রে চুপি চুপি আসিয়া বিভার শয়ন-কক্ষের দ্বারে আঘাত করিলেন।

তখন দূর হইতে দুই প্রহরের নহবৎ বাজিতেছে। নিঃস্তব্ধ রাত্রে সেই নহবতের শব্দ, জ্যোৎস্নার সহিত, দক্ষিণা বাতাসের সহিত মিশিয়া ঘুমন্ত প্রাণের মধ্যে স্বপ্নসৃষ্টি করিতেছে। বিভার শয়ন-কক্ষের মুক্ত বাতায়ন ভেদ করিয়া জ্যোৎস্নার আলো বিছানায় আসিয়া পড়িয়াছে, রামচন্দ্র রায় নিদ্রায় মগ্ন! বিভা উঠিয়া বসিয়া চুপ করিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতেছে। জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়া তাহার চোখ দিয়া দুই এক বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছি। বুঝি যেমনটি কল্পনা করিয়াছিল ঠিক তেমনটি হয় নাই। তাহার প্রাণের মধ্যে কাঁদিতেছিল। এত দিন যাহার জন্য অপেক্ষা করিয়াছিল, সে দিন ত আজ আসিয়াছে!

রামচন্দ্র রায় শয্যায় শয়ন করিয়া অবধি বিভার সহিত একটি কথা কন নাই। প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে অপমান করিয়াছে—তিনি প্রতাপাদিত্যকে অপমান করিবেন কি করিয়া? না, বিভাকে অগ্রাহ্য করিয়া। তিনি জানাইতে চান, "তুমি ত যশোহরের প্রতাপাদিত্যের মেয়ে, চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রাজা রামচন্দ্র রায়ের পাশে কি তোমাকে সাজে?" এই স্থির করিয়া সেই যে পাশ ফিরিয়া শুইয়াছেন আর পার্শ্বপরিবর্ত্তন করেন নাই। যত মান অভিমান সমস্তই বিভার প্রতি। বিভা জাগিয়া বসিয়া ভাবিতেছে। একবার জ্যোৎস্নার দিকে চাহিতেছে, একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিতেছে। তাহার বুক কাঁপিয়া কাঁপিয়া এক একবার দীর্ঘ নিশ্বাস উঠিতেছে—প্রাণের মধ্যে বড় ব্যথা বাজিয়াছে। সহসা একবার রামচন্দ্রের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সহসা দেখিলেন বিভা চুপ করিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে। সেই নিদ্রোত্থিত অবস্থার প্রথম মুহূর্ত্তে যখন অপমানের স্মৃতি এখনো জাগিয়া উঠে নাই, গভীর নিদ্রার পরে মনের সুস্থ ভাব ফিরিয়া আসিয়াছে, রোষের ভাব চলিয়া গিয়াছে তখন সহসা বিভার সেই অশ্রুপ্লাবিত করুণ কচি মুখ খানি দেখিয়া সহসা তাঁহার মনে করুণা জাগিয়া উঠিল। বিভার হাত ধরিয়া কহিলেন, "বিভা, কাঁদিতেছ!" বিভা আকুল হইয়া উঠিল। বিভা কথা কহিতে পারিল না, বিভা চোখে

দেখিতে পাইল না, বিভা শুইয়া পড়িল। তখন রামচন্দ্র রায় উঠিয়া বসিয়া ধীরে ধীরে বিভার মাথাটি লইয়া কোলের উপরে রাখিলেন, তাহার অশ্রুজল মুছাইয়া দিলেন। এমন সময়ে দ্বারে কে আঘাত করিল। রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন "কেও ?" বাহির হইতে উত্তর আসিল, "অবিলম্বে দ্বার খোল!"

দশম পরিচ্ছেদ।

—*—

রামচন্দ্র রায় শয়ন-কক্ষের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া বাহিরে আসিলেন। রাজশ্যালক রমাপতি কহিলেন, "বাবা এখনি পালাও, মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিও না।"

সেই রাত্রে সহসা এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্র রায় একেবারে চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার মুখ শাদা হইয়া গেল, রুদ্ধ নিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, কেন কি হইয়াছে ?"

"কি হইয়াছে তাহা বলিব না এখনি পালাও।"

বিভা শয্যা ত্যাগ করিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মামা, কি হইয়াছে ?"

রমাপতি কহিলেন, সে কথা তোমার শুনিয়া কাজ নাই মা!"

বিভার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সে একবার বসন্তরায়ের কথা ভাবিল, একবার উদয়াদিত্যের কথা ভাবিল। বলিয়া উঠিল—"মামা, কি হইয়াছে বল!

রমাপতি তাহার কথার কোন উত্তর না দিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন, বাবা অনর্থক কাল বিলম্ব হইতেছে। এই বেলা গোপনে পালাইবার উপায় দেখ ?"

হঠাৎ বিভার মনে একটা দারুণ অশুভ আশঙ্কা জাগিয়া উঠিল। গমনোদ্যত মাতুলের পথরোধ করিয়া কহিল, "ওগো তোমার দুটি পায়ে পড়ি কি হইয়াছে বলিয়া যাও!"

রমাপতি সভয়ে চারিদিকে চাহিয়া কহিলেন,—গোল করিস্‌নে বিভা, চুপ কর, আমি সমস্তই বলিতেছি!"

যখন রমাপতি একেএকে সমস্তটা বলিলেন, তখন বিভা একেবারে চীৎকার করিয়া উঠিবার উপক্রম করিল। রমাপতি তাড়াতাড়ি তাহার মুখ চাপিয়া ধরিলেন—কহিলেন—"চুপ চুপ, সর্ব্বনাশ করিস্‌নে!" বিভা রুদ্ধশ্বাসে অর্দ্ধরুদ্ধ স্বরে সেই খানে বসিয়া পড়িল।

রামচন্দ্র রায় সকাতরে কহিলেন "এখন আমি কি উপায় করিব? পালাইবার কি পথ আছে, আমিত কিছুই জানি না!"

রমাপতি কহিলেন—আজ রাত্রে প্রহরীরা চারিদিকে সতর্ক আছে। আমি একবার চারিদিকে দেখিয়া আসি যদি কোথাও কোন উপায় থাকে।"

এই বলিয়া তিনি প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। বিভা তাঁহাকে ধরিয়া কহিল, "মামা, তুমি কোথায় যাও! তুমি যাইও না, তুমি আমাদের কাছে থাক।"

রমাপতি কহিলেন, "বিভা তুই পাগল হইয়াছিস্! আমি কাছে থাকিলে কোন উপকার দেখিবে না। ততক্ষণ আমি একবার চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া আসি।"

বিভা তখন বলপূর্ব্বক উঠিয়া দাঁড়াইল। হাত পা থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতেছে। কহিল "মামা, তুমি আর একটু এই খানে থাক। আমি একবার দাদার কাছে যাই।" বলিয়া বিভা তাড়াতাড়ি উদয়াদিত্যের শয়নকক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল।

তখন ক্ষীণ চন্দ্র অস্ত যায় যায়। চারিদিকে অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। কোথাও সাড়া শব্দ নাই। রামচন্দ্র রায় তাঁহার শয়নকক্ষের দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখিলেন দুই পার্শ্বে রাজঅন্তঃপুরের শ্রেণীবদ্ধ কক্ষে দ্বার রুদ্ধ, সকলেই নিঃশঙ্কচিত্তে ঘুমাইতেছে। সম্মুখের প্রাঙ্গণে চারিদিকের ভিত্তির ছায়া পড়িয়াছে, ও তাহার এক পার্শ্বে একটু খানি জ্যোৎস্না এখনো অবশিষ্ট রহিয়াছে। ক্রমে সে টুকুও মিলাইয়া গেল। অন্ধকার এক-পা এক-পা করিয়া সমস্ত জগৎ দখল করিয়া লইল। অন্ধকার দূরে বাগানের শ্রেণীবদ্ধ নারিকেল গাছ গুলির মধ্যে আসিয়া জমিয়া বসিল। অন্ধকার কোলঘেঁসিয়া অতি-কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। রামচন্দ্র রায় কল্পনা করিতে লাগিলেন,এই চারিদিকের অন্ধকারের মধ্যে না জানি কোথায় একটা ছুরি তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে? দক্ষিণে না বামে, সম্মুখে না পশ্চাতে? ঐ যে ইতস্ততঃ এক একটা কোণ দেখা যাইতেছে, উহার মধ্যে একটা কোণে ত কেহ মুখ গুঁজিয়া, সর্ব্বাঙ্গ চাদরে ঢাকিয়া চুপ করিয়া বসিয়া নাই? কি জানি, ঘরের মধ্যে যদি কেহ থাকে! খাটের নীচে, অথবা দেয়ালের এক পাশে! তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, কপাল দিয়া ঘাম পড়িতে লাগিল। একবার মনে হইল যদি মামা কিছু করেন, যদি তাঁহার কোন অভিসন্ধি থাকে? আস্তে আস্তে একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন। একটা বাতাস আসিয়া ঘরের প্রদীপ নিভিয়া গেল। রামচন্দ্র ভাবিলেন—কে একজন বুঝি প্রদীপ নিভাইয়া দিল—কে একজন বুঝি ঘরে আছে! রমাপতির কাছে ঘেঁসিয়া গিয়া ডাকিলেন—"মামা!" মামা কহিলেন, "কি বাবা?" রামচন্দ্র রায় মনে মনে কহিলেন, বিভা কাছে থাকিলে ভাল হইত,মামাকে ভাল বিশ্বাস হইতেছে না।

বিভা উদয়াদিত্যের কাছে একেবারে কাঁদিয়া গিয়া পড়িল, তাহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না। সুরমা তাহাকে উঠাইয়া বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,"কি হইয়াছে বিভা?" বিভা সুরমাকে দুই হস্তে জড়াইয়া ধরিয়া একটি কথাও বলিতে পারিল না। উদয়াদিত্য সস্নেহে বিভার মাথায় হাত দিয়া কহিলেন, "কেন, বিভা, কি হইয়াছে?" বিভা তাহার ভ্রাতার দুই হাত ধরিয়া কহিল, "দাদা আমার সঙ্গে এস, সমস্ত শুনিবে।"

তিন জনে মিলিয়া বিভার শয়ন-কক্ষের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে অন্ধকারে রামচন্দ্র বসিয়া, ও রমাপতি দাঁড়াইয়া আছেন। উদয়াদিত্য তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন "মামা, হইয়াছে কি?" রমাপতি একে একে সমস্তটা কহিলেন। উদয়াদিত্য তাঁহার আয়ত নেত্র বিস্ফারিত করিয়া সুরমার দিকে চাহিয়া কহিলেন "আমি এখনি পিতার কাছে যাই—তাঁহাকে কোন মতেই আমি এ কাজ করিতে দিব না! কোন মতেই না!"

সুরমা কহিল, "তাহাতে কি কোন ফল হইবে? তাহার চেয়ে বরং একবার দাদা মহাশয়কে তাঁহার কাছে পাঠাও, যদি কিছু উপকার দেখে।"

যুবরাজ কহিলেন, "আচ্ছা।"

বসন্তরায় তখন অগাধ নিদ্রা দিতেছিলেন। ঘুম ভাঙ্গিয়াই উদয়াদিত্যকে দেখিয়া ভাবিলেন, বুঝি ভোর হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ ললিতে একটা গান গাহিবার উপক্রম করিলেন,

"কবরীতে ফুল শুকাল কাননের ফুল ফুটল বনে,
দিনের আলো প্রকাশিল মনের সাধ রহিল মনে।"

উদয়াদিত্য বলিলেন—"দাদা মহাশয়, বিপদ ঘটিয়াছে!"

তৎক্ষণাৎ বসন্তরায়ের গান বন্ধ হইয়া গেল। ত্রস্ত ভাবে উঠিয়া উদয়াদিত্যের কাছে আসিয়া শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন—"অ্যাঁ! সে কি দাদা! কি হইয়াছে! কিসের বিপদ!"

উদয়াদিত্য সমস্ত বলিলেন। বসন্তরায় শয্যায় বসিয়া পড়িলেন। উদয়াদিত্যের মুখের দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন—"না, দাদা, না, এ কি কখনও হয়? এ কি কখনো সম্ভব?"

উদয়াদিত্য কহিলেন, আর সময় নাই, একবার পিতার কাছে যাও!"

বসন্তরায় উঠিলেন, চলিলেন, যাইতে যাইতে কতবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা এ কি কখনো হয়, এ কি কখনো সম্ভব?"

প্রতাপাদিত্যের গৃহে প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন; "বাবা প্রতাপ, একি কখন সম্ভব?" প্রতাপাদিত্য এখনও শয়নকক্ষে যান নাই—তিনি তাঁহার মন্ত্রগৃহে বসিয়া আছেন। একবার এক মুহূর্ত্তের জন্যে মনে হইয়াছিল লছমন্ সর্দ্দারকে ফিরিয়া ডাকিবেন! কিন্তু সে সঙ্কল্প তৎক্ষণাৎ মন হইতে দূর হইয়া গেল। প্রতাপাদিত্য কখনও দুইবার আদেশ করেন? যে মুখে আদেশ দেওয়া সেই মুখে আদেশ ফিরাইয়া লওয়া? আদেশ লইয়া ছেলেখেলা করা তাঁহার কার্য্য নহে। কিন্তু বিভা? বিভা বিধবা হইবে। রামচন্দ্র রায় যদি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক অগ্নিতে ঝাঁপ দিত, তাহা হইলেও ত বিভা বিধবা হইত—রামচন্দ্র রায় প্রতাপাদিত্য রায়ের রোষাগ্নিতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ঝাঁপ দিয়াছে, তাহার অনিবার্য্য ফল স্বরূপ বিভা বিধবা হইবে। ইহাতে প্রতাপাদিত্যের কি হাত আছে! কিন্তু এত কথাও তাঁহার মনে হয় নাই। মাঝে মাঝে যখনি সমস্ত ঘটনাট উজ্জ্বল রূপে তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিতেছে তখনি তিনি একেবারে অধীর হইয়া উঠিতে ছেন, ভাবিতেছেন, রাত কখন পোহাইবে ঠিক এমন সময়ে বৃদ্ধ বসন্তরায় ব্যস্ত সমস্ত হই গৃহে প্রবেশ করিলেন ও আকুল ভাবে-প্রতা পাদিত্যের দুই হাত ধরিয়া কহিলেন, "বাব প্রতাপ, ইহা কি কখনও সম্ভব?"

প্রতাপাদিত্য একেবারে জ্বলিয়া উঠিয় বলিলেন, "কেন সম্ভব নয়?"

বসন্তরায় কহিলেন, "ছেলে মানুষ, অপরি ণামদর্শী, সে কি তোমার ক্রোধের যোগ্য পাত্র?"

প্রতাপাদিত্য বলিয়া উঠিলেন, "ছে মানুষ! আগুনে হাত দিলে হাত পুড়িয়া যায় ইহা বুঝিবার বয়স তাহার হয় নাই। ছে মানুষ! কোথাকার একটা লক্ষ্মীছাড়া নির্ব্বো মূর্খ ব্রাহ্মণ, নির্ব্বোধদের কাছে দাঁত দেখাইয় যে রোজগার করিয়া খায়, তাহাকে স্ত্রীলো সাজাইয়া আমার মহিষীর সঙ্গে বিদ্রূপ করিবা জন্য আনিয়াছে;—এতটা বুদ্ধি যাহার যোগা ইতে পারে, তাহার ফল কি হইতে পারে সে বুদ্ধিটা আর তাহার মাথায় যোগাইল না দুঃখ এই, বুদ্ধিটা যখন মাথায় যোগাইবে, তখ তাহার মাথাও তাহার শরীরে থাকিবে না। যতই বলিতে লাগিলেন তাঁহার শরীর আর কাঁপিতে লাগিল, তাঁহার প্রতিজ্ঞা আরো দৃ হইতে লাগিল, তাঁহার অধীরতা আরো বাড়িয় উঠিল।

বসন্তরায় পুনশ্চ মাথা নাড়িয়া কহিলেন "আহা, সে, ছেলে মানুষ। সে কিছুই বুঝে না।"

প্রতাপাদিত্যের অসহ্য হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন,—"দেখ পিতৃব্য ঠাকুর, যশোহরে

রায়বংশের কিসে মান অপমান হয়, সে জ্ঞান যদি তোমার থাকিবে, তবে কি ঐ পাকা-চুলের উপর মোগল বাদশাহের শিরোপা জড়াইয়া বেড়াইতে পার! বাদশাহের প্রসাদ-গর্ব্বে তুমি মাথা তুলিয়া বেড়াইতেছ বলিয়া প্রতাপাদিত্যের মাথা একেবারে নত হইয়া পড়িয়াছে। যবন-চরণের মৃত্তিকা তুমি কপালে ফোঁটা করিয়া পরিয়া থাক'। তোমার ঐ যবনের পদধূলিময় অাকিঞ্চিৎকর মাথাটা ধূলিতে লুটাইবার সাধ ছিল, বিধাতার বিড়ম্বনায় তাহাতে বাধা পড়িল। এই তোমাকে স্পষ্টই বলিলাম। তুমি বলিয়াই বুঝিলে না, আজ রায় বংশের কত বড় অপমান হইয়াছে, তুমি বলিয়াই আজ রায়বংশের অপমানকারীর অশ্রু মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছ!"

বসন্তরায় তখন ধীরে ধীরে বলিলেন,—"প্রতাপ, আমি বুঝিয়াছি;—তুমি যখন একবার ছুরি তোল, তখন সে ছুরি এক জনের উপর পড়িতেই চায়। আমি তাহার লক্ষ্য হইতে সরিয়া পড়িলাম বলিয়া আর একজন তাহার লক্ষ্য হইয়াছে। ভাল প্রতাপ, তোমার মনে যদি দয়া না থাকে, তোমার ক্ষুধিত ক্রোধ একজনকে যদি গ্রাস করিতেই চায়, তবে আমাকেই করুক্! এই তোমার খুড়ার মাথা (বলিয়া বসন্তরায় মাথা নীচু করিয়া দিলেন) ইহা লইয়া যদি তোমার তৃপ্ত হয় তবে লও। ছুরি আন'। এ মাথায় চুল নাই, এ মুখে যৌবনের রূপ নাই; যম নিমন্ত্রণ-লিপি পাঠাইয়াছে, সে সভার উপযোগী সাজসজ্জাও শেষ হইয়াছে। (বসন্তরায়ের মুখে অতি মৃদু হাস্যরেখা দেখা দিল।) কিন্তু ভাবিয়া দেখ দেখি প্রতাপ, বিভা আমাদের দুধের মেয়ে, তার যখন দুটি চক্ষু দিয়ে অশ্রু পড়িবে তখন —" বলিতে বলিতে বসন্তরায় অধীর উচ্ছ্বাসে একেবারে কাঁদিয়া উঠিলেন—"আমাকে শেষ করিয়া ফেল প্রতাপ! আমার বাঁচিয়া সুখ নাই। তাহার চোখে জল দেখিবার আগে আমাকে শেষ করিয়া ফেল।"

প্রতাপাদিত্য এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন। যখন বসন্তরায়ের কথা শেষ হইল, তখন তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। বুঝিলেন কথাটা প্রকাশ হইয়াছে। নীচে গিয়া প্রহরী-দের ডাকাইয়া আদেশ করিলেন, রাজপ্রাসাদ-সংলগ্ন খাল এখনি যেন বড় বড় শাল কাষ্ঠ দিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। সেই খালে রামচন্দ্র রায়ের নৌকা আছে। প্রহরীদিগকে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিলেন, আজ রাত্রে অন্তঃপুর হইতে কেহ যেন বাহির হইতে না পারে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বসন্তরায় যখন অন্তঃপুরে ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া বিভা একেবারে কাঁদিয়া উঠিল। বসন্তরায় আর অশ্রু-সম্বরণ করিতে পারিলেন না, তিনি উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া কহিলেন, "দাদা, তুমি ইহার একটা উপায় করিয়া দাও।" রামচন্দ্র রায় একেবারে অধীর হইয়া উঠিলেন। তখন উদয়াদিত্য তাঁহার তরবারী হস্তে লইলেন। কহিলেন, "আইস, আমার সঙ্গে সঙ্গে আইস।" সকলে সঙ্গে সঙ্গে চলিল। উদয়াদিত্য কহিলেন—"বিভা তুই এখানে থাক্, তুই আসিস্ নে। বিভা শুনিল না। রামচন্দ্র রায়ও কহিলেন—"না, বিভা সঙ্গে সঙ্গেই আসুক।" সেই নিঃস্তব্ধ রাত্রে সকলে পা টিপিয়া চলিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল

বিভীষিকা চারিদিক্ হইতে তাহার অদৃশ্য হস্ত প্রসারিত করিতেছে। রামচন্দ্র রায় সম্মুখে পশ্চাতে পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। মামার প্রতি মাঝে মাঝে সন্দেহ জন্মিতে লাগিল। অন্তঃপুর অতিক্রম করিয়া বহির্দ্দেশে যাইবার দ্বারে আসিয়া উদয়াদিত্য দেখিলেন দ্বার রুদ্ধ। বিভা ভয়কম্পিত রুদ্ধকণ্ঠে কহিল "দাদা, নীচে যাইবার দরজা হয়ত বন্ধ করে নাই। সেইখানে চল! সকলে সেই দিকে চলিল। দীর্ঘ অন্ধকার সিঁড়ি বাহিয়া নীচে চলিতে লাগিল। রামচন্দ্র রায়ের মনে হইল, এ সিঁড়ি দিয়া নামিলে বুঝি আর কেহ উঠে না—বুঝি বাসুকী সাপের গর্ত্তটা এইখানে, পাতালে নামিবার সিঁড়ি এই। সিঁড়ি ফুরাইলে দ্বারের কাছে গিয়া দেখিলেন দ্বার বন্ধ। আবার সকলে ধীরে ধীরে উঠিল। অন্তঃপুর হইতে বাহির হইবার যতগুলি পথ আছে সমস্তই বন্ধ। সকলে মিলিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইল, প্রত্যেক দ্বারে ফিরিয়া ফিরিয়া দুই তিন বার করিয়া গেল। সকলগুলিই বন্ধ।

যখন বিভা দেখিল, বাহির হইবার কোন পথই নাই, তখন সে অশ্রু মুছিয়া ফেলিল। স্বামীর হাত ধরিয়া তাহার শয়ন-কক্ষে লইয়া গেল। দৃঢ় পদে দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া অকম্পিত স্বরে কহিল—"দেখিব, এ ঘর হইতে তোমাকে কে বাহির করিয়া লইতে পারে! তুমি যেখানে যাইবে, আমি তোমার আগে আগে যাইব, দেখিব আমাকে কে বাধা দেয়! উদয়াদিত্য দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া কহিলেন "আমাকে বধ না করিয়া কেহ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। সুরমা কিছু না বলিয়া স্বামীর পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ বসন্তরায় সকলের আগে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মামা ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। কিন্তু রামচন্দ্র রায়ের এ বন্দোবস্ত কিছুতেই ভাল লাগিল না। তিনি ভাবিতেছেন "প্রতাপাদিত্য যে রকম লোক দেখিতেছি তিনি কি না করিতে পারেন! বিভা ও উদয়াদিত্য যে মাঝে পড়িয়া কিছু করিতে পারিবেন, এমন ত ভরসা হয় না! এ বাড়ি হইতে কোন মতে বাহির হইতে পারিলেই বাঁচি।"

কিছুক্ষণ বাদে সুরমা উদয়াদিত্যকে মৃদুস্বরে কহিল, "আমাদের এখানে দাঁড়াইয়া থাকিলে যে কোন ফল হইবে তাহা ত বোধ হয় না; বরং উল্টা। পিতা যতই বাধা পাইবেন, ততই তাঁহার সংকল্প আরো দৃঢ় হইবে। আজ রাত্রেই কোন মতে প্রাসাদ হইতে পালাইবার উপায় করিয়া দেও!"

উদয়াদিত্য চিন্তিতভাবে কিয়ৎক্ষণ সুরমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন "তবে আমি, যাই, বল-প্রয়োগ করিয়া দেখিগে!"

সুরমা দৃঢ় ভাবে সম্মতি-সূচক ঘাড় নাড়িয়া কহিল "যাও।"

উদয়াদিত্য তাঁহার উত্তরীয় বসন ফেলিয়া দিলেন—চলিলেন। সুরমা সঙ্গে সঙ্গে কিছু দূর গেল। নিভৃত স্থানে গিয়া সে উদয়াদিত্যের বক্ষ আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। উদয়াদিত্য শির নতকরিয়া তাহাকে একটি দীর্ঘ চুম্বন করিলেন; ও মুহূর্ত্তের মধ্যে চলিয়া গেলেন। তখন সুরমা তাহার শয়ন-কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহার দুই চোখ বহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। যোড় হস্তে কহিল—"মাগো—যদি আমি পতিব্রতা সতী হই, তবে এবার আমার স্বামীকে তাঁহার পিতার হাত হইতে রক্ষা কর। আমি যে তাঁহাকে আজ এই বিপদের মধ্যে বিদায় দিলাম, সে কেবল তোর ভরসাতেই মা! তুই যদি আমাকে বিনাশ করিস্, তবে পৃথিবীতে তোকে আর কেহ বিশ্বাস করিবে

না।" বলিতে বলিতে কাঁদিয়া উঠিল। সুরমা সেই অন্ধকারে বসিয়া কতবার মনে মনে "মা" "মা" বলিয়া ডাকিল, কিন্তু মনে হইল যেন মা তাহার কথা শুনিতে পাইলেন না! মনে মনে তাঁহার পায়ে যে পুষ্পাঞ্জলি দিল মনে হইল যেন, তিনি তাহা লইলেন না, তাঁহার পা হইতে পড়িয়া গেল। সুরমা কাঁদিয়া কহিল "কেন মা, আমি কি করিয়াছি?" তাহার উত্তর শুনিতে পাইল না। সে সেই চারিদিকের অন্ধকারের মধ্যে দেখিতে পাইল, প্রলয়ের মূর্ত্তি নাচিতেছে! সুরমা চারিদিক শূন্যময় দেখিতে লাগিল। সে একাকী সে ঘরে আর বসিয়া থাকিতে পারিল না। বাহির হইয়া বিভার ঘরে আসিল।

বসন্তরায় কাতর স্বরে কহিলেন—"দাদা এখনো ফিরিল না, কি হইবে?"

সুরমা দেয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "বিধাতা যাহা করেন!"

রামচন্দ্র রায় তখন মনে মনে তাঁহার পুরাতন ভৃত্য রামমোহনের সর্ব্বনাশ করিতেছিলেন! কেন না, তাহা হইতেই এই সমস্ত বিপদ ঘটিল। তাহার যত প্রকার শাস্তি সম্ভব তাহার বিধান করিতেছিলেন। মাঝে মাঝে এক একবার চৈতন্য হইতেছে যে, শাস্তি দিবার বুঝি আর অবসর থাকিবে না।

উদয়াদিত্য তরবারী হস্তে অন্তঃপুর অতিক্রম করিয়া রুদ্ধদ্বারে গিয়া সবলে পদাঘাত করিলেন—কহিলেন "কে আছিস্?"

বাহির হইতে উত্তর আসিল "আজ্ঞা, আমি সীতারাম!"

যুবরাজ দৃঢ় স্বরে কহিলেন—"শীঘ্র দ্বার খোল!"

সে অবিলম্বে দ্বার খুলিয়া দিল। উদয়াদিত্য চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে সে যোড়হস্তে কহিল,—"যুবরাজ মাপ করুন—আজ রাত্রে অন্তঃপুর হইতে কাহারো বাহির হইবার হুকুম নাই।"

যুবরাজ কহিলেন; "সীতারাম, তবে কি তুমিও আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে? আচ্ছা তবে আইস!" বলিয়া অসি নিষ্কাশিত করিলেন।

সীতারাম যোড় হস্তে কহিল, "না যুবরাজ আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে পারিব না—আপনি দুইবার আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন।" বলিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইল।

যুবরাজ কহিলেন, "তবে কি করিতে চাও, শীঘ্র কর—আর সময় নাই!"

সীতারাম কহিল—"যে প্রাণ আপনি দুইবার রক্ষা করিয়াছেন, এবার তাহাকে বিনাশ করিবেন না। আমাকে নিরস্ত্র করুন। এই লউন আমার অস্ত্র। আমাকে আপাদমস্তক বন্ধন করুন। নহিলে মহারাজের নিকট কাল আমার রক্ষা নাই।"

যুবরাজ তাহার অস্ত্র লইলেন, তাহার কাপড় দিয়া তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিলেন। সে সেই খানে পড়িয়া রহিল, তিনি চলিয়া গেলেন। কিছু দূর গিয়া একটা অনতি উচ্চ প্রাচীরের মত আছে। সে প্রাচীরের একটি মাত্র দ্বার, ও সে দ্বার রুদ্ধ। সেই দ্বার অতিক্রম করিলেই একেবারে অন্তঃপুরের বাহিরে যাওয়া যায়। যুবরাজ দ্বারে আঘাত না করিয়া একেবারে প্রাচীরের উপর লাফ দিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, একজন প্রহরী প্রাচীরে ঠেসান্ দিয়া দিব্য আরামে নিদ্রা যাইতেছে। অতি সাবধানে তিনি নামিয়া পড়িলেন। বিদ্যুদ্বেগে সেই নিদ্রিত প্রহরীর উপর গিয়া পড়িলেন। তাহার অস্ত্র কাড়িয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন ও

সেই হত-বুদ্ধি অভিভূত প্রহরীকে আপদ মস্তক বাঁধিয়া ফেলিলেন। তাহার কাছে চাবি ছিল, সেই চাবি কাড়িয়া লইয়া দ্বার খুলিলেন। তখন প্রহরীর চৈতন্য হইল, বিস্মিত স্বরে কহিল "যুবরাজ, করেন কি?"

যুবরাজ কহিলেন, "অন্তঃপুরের দ্বার খুলিতেছি।"

প্রহরী কহিল,—"কাল মহারাজের কাছে কি জবাব দিব?"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "বলিস্, যুবরাজ বল পূর্ব্বক আমাদিগকে পরাভূত করিয়া অন্তঃপুরের দ্বার খুলিয়াছেন। তাহা হইলে খালাস পাইবি।"

উদয়াদিত্য অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া যে ঘরে জামাতার লোক জন থাকে সেইখানে উপস্থিত হইলেন। সে ঘরে কেবল রামমোহন ও রমাই ভাঁড় ঘুমাইতেছিল, আর বাকী সকলে আহারাদি করিয়া নৌকায় গিয়াছে। যুবরাজ ধীরে ধীরে রামমোহনকে স্পর্শ করিলেন। সে চমকিয়া লাফাইয়া উঠিল। বিস্মিত হইয়া কহিল —"এ কি যুবরাজ? যুবরাজ কহিলেন "বাহিরে আইস।" রামমোহন বাহিরে আসিল। রামমোহনকে যুবরাজ সমস্ত কহিলেন।

তখন রামমোহন মাথায় চাদর বাঁধিয়া লাঠি বাগাইয়া ধরিল, ক্রোধে স্ফীত হইয়া কহিল, "দেখিব লছমন্ সর্দ্দার কত বড় লোক। যুবরাজ আমাদের মহারাজকে একবার কেবল আমার কাছে আনিয়া দিন। আমি একা এই লাঠি লইয়া একশ জন লোক ভাগাইতে পারি!"

যুবরাজ কহিলেন, "সে কথা আমি মানি, কিন্তু যশোহরের রাজ-প্রাসাদে একশত অপেক্ষা অনেক অধিক লোক আছে! তুমি বলপূর্ব্বক কিছু করিতে পারিবে না। অন্য কোন উপায় দেখিতে হইবে।"

রামমোহন কহিল, "আচ্ছা, মহারাজকে একবার আমার কাছে আনুন, আমার পাশে তিনি দাঁড়াইলে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া উপায় ভাবিতে পারি। তখন অন্তঃপুরে গিয়া উদয়াদিত্য রামচন্দ্রকে আহ্বান করিলেন। তিনি এবং তাঁহার সঙ্গে সকলেই আসিল।

রামচন্দ্র রামমোহনকে দেখিয়াই ক্রোধে অভিভূত হইয়া কহিলেন—"তোকে আমি এখনি ছাড়াইয়া দিলাম—তুই দূর হইয়া যা' তুই পুরান লোক, তোকে আর অধিক কি শাস্তি দিব—যদি এ যাত্রা বাঁচিয়া যাই, তবে তোর মুখ আর আমি দেখিব না।" বলিতে বলিতে রামচন্দ্রের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। তিনি যথার্থই রামমোহনকে ভাল বাসিতেন, শিশুকাল হইতে রামমোহন তাঁহাকে পালন করিয়া আসিতেছে।

রামমোহন যোড় হাত করিয়া কহিল "তুমি আমাকে ছাড়াইবার কে মহারাজ? আমার এ চাকরি ভগবান্ দিয়াছেন। যে দিন যমের তলব পড়িবে, সে দিন ভগবান্ আমার এ চাকরি ছাড়াইবেন। তুমি আমাকে রাখ না রাখ আমি তোমার চাকর।" বলিয়া সে রামচন্দ্রকে আগলাইয়া দাঁড়াইল।

উদয়াদিত্য কহিলেন—রামমোহন, কি উপায় করিলে?' রামমোহন কহিল, "আপনার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে এই লাঠিই উপায়। আর মা কালীর চরণ ভরসা।"

উদয়াদিত্য ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন—"ও উপায় কোন কাজের নয়। আচ্ছা, রামমোহন তোমাদের নৌকা কোন্ দিকে আছে?"

রামমোহন কহিল, "রাজবাটির দক্ষিণ পার্শ্বের খালে।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "চল একবার ছাদে যাই।"

রামমোহনের মাথায় হঠাৎ একটা উপায় উদ্ভাবিত হইল—সে কহিল, "হাঁ, ঠিক কথা, সেই খানে চলুন।"

সকলে প্রাসাদের ছাদে উঠিলেন। ছাদ হইতে প্রায় ৭০ হাত নীচে খাল। সেই খালে রামচন্দ্রের ৬৪ দাঁড়ের নৌকা ভাসিতেছে। রামমোহন কহিল, রামচন্দ্র রায়কে পিঠে বাঁধিয়া লইয়া সে সেই খানে ঝাঁপাইয়া পাড়িবে।

বসন্তরায় তাড়াতাড়ি শশব্যস্ত হইয়া রামমোহনকে ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন—"না, না, না, সে কি হয়? রামমোহন তুমি অমন অসম্ভব কাজ করিতে যাইও না!"

বিভা চমকিয়া সত্রাসে বলিয়া উঠিল—"না, মোহন, তুই ও কি বলিতেছিস্!" রামচন্দ্র বলিলেন—"না রামমোহন, তাহা হইবে না।"

তখন উদয়াদিত্য অন্তঃপুরে গিয়া কতকগুলা খুব মোটা বৃহৎ চাদর সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। রামমোহন সে গুলি পাকাইয়া বাঁধিয়া বাঁধিয়া একটা প্রকাণ্ড রজ্জুর মত প্রস্তুত করিল। যে দিকে নৌকা ছিল, সেই দিককার ছাদের উপরের একটি ক্ষুদ্র স্তম্ভের সহিত রজ্জু বাঁধিল। রজ্জু নৌকার কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে গিয়া শেষ হইল। রামমোহন রামচন্দ্র রায়কে কহিল, "মহারাজ, আপনি আমার পিঠ জড়াইয়া ধরিবেন, আমি রজ্জু বাহিয়া নামিয়া পড়িব।" রামচন্দ্র তাহাতে অগত্যা সম্মত হইলেন। তখন রামমোহন সকলকে একে একে প্রণাম করিল, ও সকলের পদধূলি লইল, কহিল "জয় মা কালী।" রামচন্দ্রকে পিঠে তুলিয়া লইল, রামচন্দ্র চোখ বুঁজিয়া প্রাণপণে তাহার পিঠ আঁকড়িয়া ধরিলেন। বিভার দিকে চাহিয়া রামমোহন কহিল "মা, তবে আমি চলিলাম। তোমার সন্তান থাকিতে কোন ভয় করিও না।"

রামমোহন রজ্জু আঁকড়িয়া ধরিল। বিভা স্তম্ভে ভর দিয়া প্রাণপণে দাঁড়াইয়া রহিল। বৃদ্ধ বসন্ত রায় কম্পিত চরণে দাঁড়াইয়া চোখ বুঁজিয়া "দুর্গা" "দুর্গা" জপিতে লাগিলেন। রামমোহন রজ্জু বাহিয়া নামিয়া রজ্জুর শেষ প্রান্তে গেল। তখন সে হাত ছাড়িয়া দাঁত দিয়া রজ্জু কামড়াইয়া ধরিল, ও রামচন্দ্রকে পৃষ্ঠ হইতে ছাড়াইয়া দুই হস্তে ঝুলাইয়া অতি সাবধানে নৌকায় নামাইয়া দিল, ও নিজেও লাফাইয়া পড়িল। রামচন্দ্র যেমন নৌকায় নামিলেন অমনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন; রামচন্দ্র যেমন নৌকায় নামিলেন, অমনি বিভা গভীর ও সুদীর্ঘ এক নিশ্বাস ফেলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। বসন্ত রায় চোখ মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "দাদা কি হইল?" উদয়াদিত্য মূর্চ্ছিতা বিভাকে সস্নেহে কোলে করিয়া অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। সুরমা উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া কহিল, "এখন তোমার কি হইবে?" উদয়াদিত্য কহিলেন, "আমার জন্ত আমি ভাবি না।"

এদিকে নৌকা খানিক দূর গিয়া আটক পড়িল। বড় বড় শাল কাঠে খাল বন্ধ! এমন সময়ে সহসা প্রহরীরা দূর হইতে দেখিল, নৌকা পালাইয়া যায়। পাথর ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল, একটাও গিয়া পৌছিল না। প্রহরাদের হাতে তলোয়ার ছিল, বন্দুক ছিল না। এক জন বন্দুক আনিতে গেল। খোঁজ খোঁজ করিয়া বন্দুক জুটিল ত চকমকি জুটিল না—"ওরে বারুদ কোথায়—গুলি কোথায়" করিতে করিতে রামমোহন ও অনুচরগণ কাঠের উপর দিয়া নৌকা টানিয়া তুলিয়া লইয়া গেল। প্রহরিগণ অনুসরণ করিবার জন্ত একটা নৌকা ডাকিতে গেল। যাহার উপরে নৌকা ডাকিবার ভার পড়িল, পথের মধ্যে সে হরিখুদীর

দোকানে এক ছিলিম তামাক খাইয়া লইল ও রামশঙ্করকে তাহার বিছানা হইতে উঠাইয়া তাহার পাওনা টাকা শীঘ্র পাইবার জন্য তাগাদা করিয়া গেল। যখন নৌকার প্রয়োজন একেবারে ফুরাইল তখন হাঁক ডাক করিতে করিতে নৌকা আসিল। বিলম্ব দেখিয়া সকলে নৌকা-আহ্বানকারীকে সুদীর্ঘ ভৎ‍র্সনা করিতে আরম্ভ করিল। সে কহিল, "আমিত আর ঘোড়া নই!" একে একে সকলের যখন ভৎ‍র্সনা করা ফুরাইল, তখন তাহাদের চৈতন্য হইল যে, নৌকা ধরিবার আর কোন সম্ভাবনা নাই। নৌকা আনিতে যে বিলম্ব হইয়াছিল ভৎ‍র্সনা করিতে তাহার তিন গুণ বিলম্ব হইল। যখন রামচন্দ্রের নৌকা ভৈরব নদে গিয়া পৌঁছিল তখন ফর্ণাণ্ডিজ্ এক তোপের আওয়াজ করিল। প্রত্যূষে প্রতাপাদিত্যের নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছিল। সেই তোপের শব্দে সহসা ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি ডাকিয়া উঠিলেন "প্রহরি!" কেহই আসিল না। দ্বারের প্রহরিগণ সেই রাত্রেই পালাইয়া গেছে। প্রতাপাদিত্য উচ্চতর স্বরে ডাকিলেন—"প্রহরি!"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রতাপাদিত্য ঘুম ভাঙ্গিয়া উচ্চস্বরে ডাকিলেন "প্রহরি।" যখন প্রহরী আসিল না, তখন অবিলম্বে শয্যা ত্যাগ করিয়া তিনি বিদ্যুদ্বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। ডাকিলেন, "মন্ত্রী।" এক জন ভৃত্য ছুটিয়া গিয়া অবিলম্বে মন্ত্রীকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া আনিল।

"মন্ত্রী, প্রহরীরা কোথায় গেল?"

মন্ত্রী কহিলেন—"বহির্দ্বারের প্রহরীরা পলাইয়া গেছে। মন্ত্রী দেখিলেন, মাথার উপরে বিপদ ঘনাইয়া আসিয়াছে। এই নিমিত্ত প্রতাপাদিত্যের কথার স্পষ্ট, পরিষ্কার ও দ্রুত উত্তর দিলেন। যতই ঘুরাইয়া ও যতই বিলম্ব করিয়া তাঁহার কথার উত্তর দেওয়া হয়, ততই তিনি আগুন হইয়া উঠিতে থাকেন।

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "অন্তঃপুরের প্রহরীরা?"

মন্ত্রী কহিলেন—"আসিবার সময় দেখিলাম তাহারা হাত পা বাঁধা পড়িয়া আছে।" মন্ত্রী রাত্রির ব্যাপার কিছুই জানিতেন না। কি হইয়াছে কিছু অনুমান করিতে পারিতেছেন না, অথচ বুঝিয়াছেন, একটা কি ঘোরতর ব্যাপার ঘটিয়াছে। সে সময়ে মহারাজকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা অসম্ভব।

প্রতাপাদিত্য তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন "রামচন্দ্র রায় কোথায়? উদয়াদিত্য কোথায়? বসন্তরায় কোথায়?"

মন্ত্রী ধীরে ধীরে কহিলেন "বোধ করি তাঁহারা অন্তঃপুরেই আছেন।"

প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া কহিলেন, বোধ ত আমিও করিতে পারিতাম। তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম কি করিতে। যাহা বোধ করা যায় তাহা সকল সময়ে সত্য হয় না!"

মন্ত্রী কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। রমাপতির কাছে রাত্রের ঘটনা সমস্তই অবগত হইলেন। যখন শুনিলেন, রামচন্দ্র রায় পালাইয়া গেছেন, তখন তাঁহার বিশেষ ভাবনা উপস্থিত হইল। মন্ত্রী বাহিরে গিয়া দেখিলেন, খর্ব্বকায় রমাই ভাঁড় গুঁড়ি মারিয়া বসিয়া আছে। মন্ত্রীকে দেখিয়া রমাই ভাঁড় কহিল "এই যে মন্ত্রী জাম্বুবান!" বলিয়া দাঁত বাহির করিল। তাহার সেই

দন্তপ্রধান হাস্যকে রামচন্দ্রের সভাসদেরা রসিকতা বলিত, বিভীষিকা বলিত না! মন্ত্রী তাহার সাদর সম্ভাষণ শুনিয়া কিছুই বলিলেন না, তাহার প্রতি দৃক্‌পাতও করিলেন না। একজন ভৃত্যকে কহিলেন "ইহাকে লইয়া আয়!" মন্ত্রী ভাবিলেন, এই অপদার্থটাকে এই বেলা প্রতাপাদিত্যের ক্রোধের সামনে খাড়া করিয়া দিই। প্রতাপাদিত্যের বজ্র একজন না এক জনের উপরে পড়িবেই—তা' এই কলাগাছটার উপরেই পড়ুক, বাকী বড় বড় গাছ রক্ষা পাক্‌!

রমাইকে দেখিয়াই প্রতাপাদিত্য একেবারে জলিয়া উঠিলেন—বিশেষতঃ সে যখন প্রতাপাদিত্যকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য দাঁত বাহির করিয়া, অঙ্গভঙ্গী করিয়া একটা হাস্য রসের কথা কহিবার উপক্রম করিল, তখন প্রতাপাদিত্যের আর সহ্য হইল না, তিনি অবিলম্বে আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া, দুই হাত নাড়িয়া দারুণ ঘৃণায় বলিয়া উঠিলেন, "দূর কর, দূর কর, উহাকে এখনি দূর করিয়া দাও! ওটাকে আমার সম্মুখে আনিতে কে কহিল?" প্রতাপাদিত্যের রাগের সহিত যদি ঘৃণার উদয় না হইত, তবে রমাই ভাড় এ যাত্রা পরিত্রাণ পাইত না! কেন না ঘৃণ্য ব্যক্তিকে প্রহার করিতে গেলেও স্পর্শ করিতে হয়। রমাইকে তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়া দেওয়া হইল।

মন্ত্রী কহিলেন, মহারাজ, "রাজজামাতা,"

প্রতাপাদিত্য অধীর ভাবে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "রামচন্দ্র রায়—"

মন্ত্রী কহিলেন, "হাঁ, তিনি কাল রাত্রে রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।"

প্রতাপাদিত্য দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন, "পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন! প্রহরীরা গেল কোথায়?"

মন্ত্রী পুনরায় কহিলেন, "বহির্দ্বারের প্রহরীরা পালাইয়া গেছে।"

প্রতাপাদিত্য মুষ্টিবদ্ধ করিয়া কহিলেন "পালাইয়া গেছে? পালাইবে কোথায়? যেখানে থাকে তাহাদের খুঁজিয়া আনিতে হইবে! অন্তঃপুরের প্রহরীদের এখনি ডাকিয়া লইয়া আইস!" মন্ত্রী বাহির হইয়া গেলেন।

রামচন্দ্র রায় যখন নৌকায় চড়িলেন, তখনো অন্ধকার আছে। উদয়াদিত্য বসন্তরায়, সুরমা ও বিভা, সে রাত্রে আসিয়া আর বিছানায় শুইল না। বিভা একটি কথা না বলিয়া, একটি অশ্রু না ফেলিয়া অবসন্ন ভাবে শুইয়া রহিল, সুরমা তাহার কাছে বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। উদয়াদিত্য ও বসন্তরায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন! অন্ধকার ঘরে পরস্পরের মুখ অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাইতেছে। ঘরের মধ্যে যেন অদৃশ্য একজন কে—অন্ধকার বল, আশঙ্কা বল,' অদৃষ্ট বল'—বসিয়া আছে, তাহার নিশ্বাস পতনের শব্দ শুনা যাইতেছে। সদানন্দহৃদয় বসন্তরায় চারিদিকে নিরানন্দ দেখিয়া একেবারে আকুল হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি অনবরত টাকে হাত বুলাইতেছেন, চারিদিক দেখিতেছেন ও ভাবিতেছেন—এ কি হইল! তাঁহার গোলমাল ঠেকিয়াছে, চারিদিককার ব্যাপার ভালরূপ আয়ত্ত করিতে পারিতেছেন না। সমস্ত ঘটনাটা তাঁহার একটা জটিল দুঃস্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছে। এক একবার বসন্তরায় উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া কাতর স্বরে কহিতেছেন, "দাদা!" উদয়াদিত্য কহিতেছেন "কি দাদা মহাশয়?" তাহার উত্তরে বসন্তরায়ের আর কথা নাই। ঐ এক "দাদা" সম্বোধনের মধ্যে একটি আকুল দিশাহারা হৃদয়ের বাক্যহীন সহস্র অব্যক্ত প্রশ্ন প্রকাশ পাইবার

জন্ত আকুবাঁকু করিতেছে। তাঁহার বিশেষ একটা কোন প্রশ্ন নাই, তাঁহার সমস্ত কথার অর্থ এই—এ কি? চারিদিককার অন্ধকার এমনি গোলমাল করিয়া একটা কি ভাষায় তাঁহার কাণের কাছে কথা কহিতেছে, তিনি কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। এমন সময়ে উদয়াদিত্যের সাড়া পাইলেও তাঁহার মনটা একটু স্থির হয়। থাকিয়া থাকিয়া তিনি সকাতরে উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া কহিলেন, "দাদা, আমার জন্যই কি এ সমস্ত হইল?" তাঁহার বার বার মনে হইতেছে তাঁহাকে বিনাশ করিতে না পারাতেই এই সমস্ত ঘটিয়াছে। উদয়াদিত্যের তখন অধিক কথা কহিবার মত ভাব নহে। তিনি কোমল স্বরে কহিলেন, "না দাদা মহাশয়!" অনেক ক্ষণ ঘর নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। থাকিয়া থাকিয়া বসন্তরায় আবার কহিয়া উঠিলেন, "বিভা, দিদি আমার, তুই কথা কহিতেছিস্ না কেন?" বলিয়া বসন্তরায় বিভার কাছে গিয়া বসিলেন। কিছুক্ষণ পরে বসন্তরায় আবার বলিয়া উঠিলেন, "সুরমা, ও সুরমা!" সুরমা মুখ তুলিয়া চাহিল, আর কিছু বলিল না। বৃদ্ধ বসিয়া বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। একটা অনির্দ্দেশ্য বিপদের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। সুরমা তখন স্থিরভাবে বসিয়া বিভার কপালে হাত বুলাইতেছিল, কিন্তু সুরমার হৃদয়ে যাহা হইতেছিল, তাহা অন্তর্য্যামীই দেখিতেছিলেন। সুরমা সেই অন্ধকারে একবার উদয়াদিত্যের মুখের দিকে চাহিল। তখন উদয়াদিত্য দেয়ালে মাথা রাখিয়া এক মনে কি ভাবিতেছিলেন। সুরমার দুই চক্ষু বাহিয়া অশ্রুজল পড়িতে লাগিল। আস্তে আস্তে মুছিয়া ফেলিল, পাছে বিভা জানিতে পায়।

যখন চারিদিক আলো হইয়া আসিল তখন বসন্তরায় নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। তখন তাঁহার মন হইতে একটা অনির্দ্দেশ্য আশঙ্কার ভাব দূর হইল। তখন স্থির চিত্তে সমস্ত ঘটনা একবার আলোচনা করিয়া দেখিলেন। তিনি বিভার ঘর হইতে উঠিয়া গেলেন। অন্তঃপুরের দ্বারে হাত পা বাঁধা সীতারামের কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাকে কহিলেন, "দেখ সীতারাম, তোকে যখন প্রতাপ জিজ্ঞাসা করিবে, কে তোকে বাঁধিয়াছে, তুই আমার নাম করিস্। প্রতাপ জানে, এক কালে বসন্ত রায় বলিষ্ঠ ছিল, সে তোর কথা বিশ্বাস করিবে।"

সীতারাম, প্রতাপাদিত্যের কাছে কি জবাব দিবে, এতক্ষণ ধরিয়া তাহাই ভাবিতেছিল। এ সম্বন্ধে উদয়াদিত্যের নাম করিতে কোন মতেই তাহার মন উঠিতেছিল না। সে একটা বাঁকা পা, তিনচোখো তালবৃক্ষাকৃত ভূতকে আসামী করিবে বলিয়া একবার স্থির করিয়াছিল, কিন্তু বসন্তরায়কে পাইয়া নিরপরাধ ভূতটাকে খালাস দিল। বসন্ত রায়ের কথায় সে তৎক্ষণাৎ রাজি হইল। তখন তিনি দ্বিতীয় প্রহরীর নিকট গিয়া কহিলেন, ভাগবত, প্রতাপ জিজ্ঞাসা করিলে বলিও বসন্তরায় তোমাকে বাঁধিয়াছে।" সহসা ভাগবতের ধর্ম্মজ্ঞান অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল, অসত্যের প্রতি নিতান্ত বিরাগ জন্মিল; তাহার প্রধান কারণ, উদয়াদিত্যের প্রতি সে ভারি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

ভাগবত কহিল, "এমন কথা আমাকে আদেশ করিবেন না, ইহাতে আমার অধর্ম্ম হইবে।"

বসন্ত তাহার কাঁধে হাত দিয়া কহিলেন, "ভাগবত আমার কথা শুন, ইহাতে কোন অধর্ম্ম নাই। সাধু লোকের প্রাণ বাঁচাইতে মিথ্যা

কথা বলিতে যদি কোন অধর্ম্ম থাকিবে, তবে আমি কেন তোমাকে এমন অনুরোধ করিব ?' বসন্তরায় তাহার কাঁধে হাত দিয়া পিঠে হাত দিয়া বার বার করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, ইহাতে কোন অধর্ম্ম নাই। কিন্তু লোকের যখন ধর্ম্মজ্ঞান সহসা বিশেষ প্রবল হইয়া উঠে, তখন কোন যুক্তিই তাহার কাছে খাটে না। সে কহিল, "না, মহারাজ, মনিবের কাছে মিথ্যা কথা বলিব কি করিয়া!"

বসন্তরায় বিষম অস্থির হইয়া উঠিলেন; ব্যাকুল ভাবে কহিলেন, "ভাগবত, আমার কথা শুন, আমি তোমাকে বুঝাইয়া বলি, এ মিথ্যা কথায় কোন পাপ নাই। দেখ বাপু, আমি তোমাকে পরে খুব খুসী করিব, তুমি আমার কথা রাখ। এই লও আমার কাছে যাহা আছে, এই দিলাম।"

ভাগবত তৎক্ষণাৎ হাত বাড়াইল, ও সেই টাকাগুলি মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার ট্যাঁকে আশ্রয় লাভ করিল। বসন্তরায় কিয়ৎ পরিমাণে নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

প্রতাপাদিত্যের নিকট প্রহরীদিগের ডাক পড়িয়াছে। মন্ত্রী তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। প্রতাপাদিত্য তখন তাঁহার উচ্ছ্বসিত ক্রোধ দমন করিয়া স্থির গম্ভীর ভাবে বসিয়া আছেন। প্রত্যেক কথা ধীরে ধীরে স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করিয়া কহিলেন, "কাল রাত্রে অন্তঃপুরের দ্বার খোলা হইল কি করিয়া ?"

সীতারামের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, সে যোড়হস্তে কহিল, "দোহাই মহারাজ, আমার কোন দোষ নাই।"

মহারাজ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "সে কথা তোকে কে জিজ্ঞাসা করিতেছে ?"

সীতারাম তাড়াতাড়ি কহিল, "আজ্ঞা না, বলি মহারাজ; যুবরাজ—যুবরাজ আমাকে বল পূর্ব্বক বাঁধিয়া অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়াছিলেন।" যুবরাজের নাম তাহার মুখ দিয়া কেমন হঠাৎ বাহির হইয়া গেল। ঐ নামটা কোন মতে করিবে না বলিয়া সে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাবিয়াছিল, এই নিমিত্ত গোলমালে ঐ নামটাই সর্ব্বাগ্রে তাহার মুখাগ্রে উপস্থিত হইল। একবার যখন বাহির হইল তখন আর রক্ষা নাই।

এমন সময় বসন্তরায় শুনিলেন, প্রহরীদের ডাক পড়িয়াছে। তিনি ব্যস্তসমস্ত হইয়া প্রতাপাদিত্যের কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সীতারাম কহিতেছে "যুবরাজকে আমি নিষেধ করিলাম তিনি শুনিলেন না।"

বসন্তরায় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন "হাঁ হাঁ সীতারাম, কি কহিলি ? অধর্ম্ম করিস্‌নে, সীতারাম, ভগবান্ তোর পরে সন্তুষ্ট হইবেন। উদয়াদিত্যের ইহাতে কোন দোষ নাই।"

সীতারাম তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিল, "আজ্ঞা না, যুবরাজের কোন দোষ নাই।

প্রতাপাদিত্য দৃঢ় স্বরে কহিলেন "তবে তোর দোষ ?

সীতারাম কহিল "আজ্ঞা না।"

"তবে কার দোষ ?"

"আজ্ঞা যুবরাজ—"

ভাগবতকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল, তখন সে সমস্ত কথা ঠিক করিয়া কহিল, কেবল সে যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল সেইটে গোপন করিল। বৃদ্ধ বসন্তরায় চারিদিক ভাবিয়া কোন উপায় দেখিলেন না। তিনি চোখ বুঁজিয়া মনে মনে দুর্গা দুর্গা কহিলেন। প্রহরীদ্বয়কে তৎক্ষণাৎ কর্ম্মচ্যুত করা হইল। তাহাদের অপরাধ এই যে তাহাদের যদি বলপূর্ব্বক বাঁধিতে পারা যায় তবে তাহারা প্রহরী-বৃত্তি করিতে আসি-

াছে কি বলিয়া? এই অপরাধের জন্য তাহাদের প্রতি কষাঘাতের আদেশ হইল।

তখন প্রতাপাদিত্য বসন্তরায়ের মুখের কে চাহিয়া বজ্রগম্ভীর স্বরে কহিলেন, "উদয়াদিত্যের এ অপরাধের মার্জ্জনা নাই।" এমনি াবে বলিলেন যেন উদয়াদিত্যের সে অপরাধ সন্তরায়েরই। যেন তিনি উদয়াদিত্যকে ম্মুখে রাখিয়াই ভৎ'সনা করিতেছেন। বসন্তায়ের অপরাধ, তিনি উদয়াদিত্যকে প্রাণের অধিক ভাল বাসেন।

বসন্তরায় তাড়াতাড়ি কহিয়া উঠিলেন 'বাবা প্রতাপ উদয়ের ইহাতে কোন দোষ াই!"

প্রতাপাদিত্য আগুণ হইয়া কহিলেন 'দোষ নাই? তুমি 'দোষ নাই' বলিতেছ লিয়াই তাহাকে বিশেষরূপে শাস্তি দিব। তুমি মাঝে পড়িয়া মীমাংসা করিতে আসিয়াছ কেন?"

বসন্তরায় অত করিয়া উদয়াদিত্যের পক্ষ লইয়াছেন বলিয়াই প্রতাপাদিত্যের মন উদয়াদিত্যের বিশেষ বিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইল। বসন্তরায় দেখিলেন, তাঁহাকে শাস্তি দিবার জন্যই পাছে উদয়াদিত্যকে শাস্তি দেওয়া হয়। চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে শান্ত হইয়া প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "যদি জানিতাম, উদয়াদিত্যের কিছুমাত্র নিজের মনের জোর আছে, তাহার একটা মত আছে; একটা অভিপ্রায় আছে; যাহা করে, সব নিজে হইতেই করে; যদি না জানিতাম যে, সে নির্ব্বোধটাকে যে খুসী ফুঁদিয়া উড়াইয়া বেড়াইতে পারে, কটাক্ষের সঙ্কেতে ঘুরাইয়া মারিতে পারে, তাহা হইলে তাহার আজ আর রক্ষা ছিল না। আমি এখানে ঐ পালকটাকে উড়িতে দেখিয়াছি, নীচের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছি ফুঁ দিতেছে কে! এই জন্য উদয়াদিত্যকে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করে না। সে শাস্তিরও অযোগ্য। কিন্তু শোন,' পিতৃব্য ঠাকুর, তুমি যদি দ্বিতীয়বার যশোহরে আসিয়া উদয়াদিত্যের সহিত দেখা কর,' তবে তাহার প্রাণ বাঁচান' দায় হইবে।"

বসন্তরায় অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন; পরে ধীরে ধীরে উঠিয়া কহিলেন; "ভাল প্রতাপ, আজ সন্ধ্যা বেলায় তবে আমি চলিলাম।" আর, একটি কথা না বলিয়া বসন্তরায় ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন, বাহির হইয়া গিয়া গভীর এক নিশ্বাস ফেলিলেন।

প্রতাপাদিত্য স্থির করিয়াছেন, যে কেহ উদয়াদিত্যকে ভাল বাসে, উদয়াদিত্য যাহাদের বশীভূত, তাহাদিগকে উদয়াদিত্যের নিকট হইতে তফাৎ করিতে হইবে। মন্ত্রীকে কহিলেন "বউমাকে আর রাজপুরীতে থাকিতে দেওয়া হইবে না, কোন সূত্রে তাহাকে তাহার বাপের বাড়ি পাঠাইতে হইবে।" বিভার প্রতি প্রতাপাদিত্যের কোন আশঙ্কা হয় নাই হাজার হউক, সে বাড়ির মেয়ে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বসন্তরায় উদয়াদিত্যের ঘরে আসিয়া কহিলেন, "দাদা তোর সঙ্গে আর দেখা হইবে না।" বলিয়া উদয়াদিত্যকে বৃদ্ধ দুই হাতে জড়াইয়া ধরিলেন।

উদয়াদিত্য বসন্তরায়ের হাত ধরিয়া কহিলেন, "[illegible] দাদা মহাশয়?"

বসন্তরায় সমস্ত বলিলেন। কাঁদিয়া কহি-

লেন ভাই, তোকে আমি ভাল বাসি বলিয়াই তোর এত দুঃখ। তা, তুই যদি সুখে থাকিস্ ত এক'টা দিন আমি এক রকম কাটাইয়া দিব।"

উদয়াদিত্য মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "না, তাহা কখনই হইবে না। তোমাতে আমাতে দেখা হইবেই। তাহাতে কেহ বাধা দিতে পারিবে না। "তুমি গেলে দাদা মহাশয়, আমি আর বাঁচিব না।"

বসন্তরায় ব্যাকুল হইয়া কহিলেন "প্রতাপ আমাকে বধ করিল না, তোকে আমার কাছ হইতে কাড়িয়া লইল। দাদা, আমি যখন চলিয়া যাইব, আমার পানে ফিরিয়া চাহিস্‌নে, মনে করিস্ বসন্তরায় মরিয়া গেল!"

উদয়াদিত্য শয়নকক্ষে সুরমার নিকটে গেলেন। বসন্তরায় বিভার কাছে গিয়া বিভার চিবুক ধরিয়া কহিলেন, "বিভা দিদি আমার, একবার ওঠ! বুড়ার এই মাথাটায় একবার ঐ হাত বুলাইয়া দে।" বিভা উঠিয়া বসিয়া দাদা মহাশয়ের মাথা লইয়া পাকা চুল তুলিয়া দিতে লাগিল।

উদয়াদিত্য সুরমাকে সমস্ত কহিলেন ও বলিলেন,—"সুরমা, পৃথিবীতে আমার যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে তাহাই কাড়িয়া লইবার জন্ত যেন একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে।" সুরমার হাত ধরিয়া কহিলেন; "সুরমা, তোমাকে যদি কেহ আমার কাছ হইতে ছিনিয়া লইয়া যায়।"

সুরমা দৃঢ়ভাবে উদয়াদিত্যকে, আলিঙ্গন করিয়া দৃঢ়স্বরে কহিল, "সে যম পারে, আর কেহ পারে না।"

সুরমার মনেও অনেক ক্ষণ ধরিয়া সেই রূপ একটা আশঙ্কা জন্মিতেছে। সে যেন দেখিতে পাইতেছে একটা কঠোর হস্ত তাহার উদয়াদিত্যকে তাহার কাছ হইতে সরাইয়া দিবার জন্ত অগ্রসর হইতেছে। সে মনে মনে উদয়াদিত্যকে প্রাণপণে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল, মনে মনে কহিল, "আমি ছাড়িব না, আমাকে কেহ ছাড়াইতে পারিবে না।"

সুরমা আবার কহিল, "আমি অনেকক্ষণ হইতে ভাবিয়া রাখিয়াছি, আমাকে তোমার কাছ হইতে কেহই লইতে পারিবে না।"

সুরমা ঐ কথা বার বার করিয়া বলিল। সে মনের মধ্যে বল সঞ্চয় করিতে চায়, যে বলে সে উদয়াদিত্যকে দুই বাহু দিয়া এমন জড়াইয়া থাকিবে, যে কোন পার্থিব শক্তি তাহাদের বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। বার বার ঐ কথা বলিয়া মনকে সে মন্ত্রের বলে বাঁধিতেছে।

উদয়াদিত্য সুরমার মুখের দিকে চাহিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন "সুরমা, দাদা মহাশয়কে আর দেখিতে পাইব না।"

সুরমা নিশ্বাস ফেলিল।

উদয়াদিত্য কহিলেন, "আমি নিজের কষ্টের জন্ত ভাবি না সুরমা,—কিন্তু দাদা মহাশয়ের প্রাণে যে বড় বাজিবে। দেখি, বিধাতা আরো কি করেন! তাঁর আরও কি ইচ্ছা আছে।"

উদয়াদিত্য বসন্তরায়ের কত গল্প করিলেন;

বসন্তরায় কোথায় কি কহিয়াছিলেন, কোথায় কি করিয়াছিলেন সমুদায় তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। বসন্তরায়ের করুণ হৃদয়ের কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ, কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথা, তাঁহার স্মৃতির ভাণ্ডারে ছোট ছোট রত্নের মত জমা করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাই আজ একে একে সুরমার কাছে বাহির করিতে লাগিলেন।

সুরমা কহিল, "আ—হা, দাদা মহাশয়ের ত কি আর লোক আছে?"

সুরমা ও উদয়াদিত্য বিভার ঘরে গেলেন।

তখন বিভা তাহার দাদা মহাশয়ের পাকা তুলিতেছে, ও তিনি বসিয়া গান গাই-চ্ছেন,

"ওরে, যেতে হবে, আর দেরী নাই,
পিছিয়ে প'ড়ে র'বি কত, সঙ্গীরা তোর াল, সবাই।
আয়রে ভবের খেলা সেরে, আঁধার করে সেছেরে, (ওরে) পিছন ফিরে বারে বারে হার পানে চাহিস্‌রে ভাই।
খেল্‌তে এল ভবের নাটে, নতুন লোকে তুন খেলা,
হেথা হতে আয়রে সরে, নইলে তোরে রবে ঢেলা, নামিয়ে দেরে প্রাণের বোঝা, রেক দেশে চল্‌রে সোজা, (সেথা) নতুন র বাঁধবি বাসা, নতুন খেলা খেল্‌বি াই।

উদয়াদিত্যকে দেখিয়া বসন্তরায় হাসিয়া লেন, "দেখ ভাই, বিভা আমাকে ছাড়িতে না। কি জানি আমাকে উহার কিসের বশুক! এক কালে যে দুধ ছিল, বুড়া হইয়া ঘোল হইয়া উঠিয়াছে, তা, বিভা দুধের ঘোলে মিটাইতে চায় কেন? আমি যাব নিয়া বিভা কাঁদে! এমন আর কখন শুনি-? আমি, ভাই, বিভার কান্না দেখিতে পারি।" বলিয়া গাহিতে লাগিলেন,

"আমার যাবার সময় হল,
আমায় কেন রাখিস্‌ ধরে,'
চোখের জলের বাঁধন দিয়ে
বাঁধিস্‌নে আর মায়া-ডোরে।
ফুরিয়েছে জীবনের ছুটি;
ফিরিয়ে নে তোর নয়ন দুটি,
নাম ধরে আর ডাকিস্‌নে ভাই,
যেতে হবে ত্বরা করে!"

"ঐ দেখ, ঐ দেখ, বিভার রকম দেখ। দেখ্‌ বিভা, তুই যদি অমন করিয়া কাঁদবি ত —"বলিতে বলিতে বসন্তরায়ের আর কথা বাহির হইল না। তিনি বিভাকে শাসন করিতে গিয়া নিজেকে আর সামলাইতে পারি-লেন না, তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া হাসিয়া কহিলেন, "দাদা, ঐ দেখ ভাই সুরমা কাঁদিতেছে! এই বেলা ইহার প্রতিবিধান কর. নহিলে আমি সত্য সত্যই থাকিয়া যাইব; তোমার জায়গাটি দখল করিয়া বসিব। ঐ দুই হাতে পাকাচুল তোলাইব, ঐ কাণের কাছে এই ভাঙ্গা দাঁতের পাটির মধ্য হইতে ফিস্‌ফিস্‌ করিব, আর কাণের অত কাছে গিয়া আর যদি কোন প্রকার অঘটন সংঘটন হয় তবে তাহার দায়ী আমি হইব না!"

বসন্তরায় দেখিলেন, কেহ কো কথা কহিল না, তখন তিনি কাতর হইয়া তাঁহার সেতারটা তুলিয়া লইয়া ঝন্‌ ঝন্‌ করিয়া বিষম বেগে বাজাইতে সুরু করিলেন। কিন্তু বিভার চখের জল দেখিয়া তাঁহার সেতার বজাইবার বড়ই ব্যাঘাত হইতে লাগিল, তাঁহার চোখ মাঝে মাঝে ঝাপসা হইয়া আসিতে লাগিল, মাঝে মাঝে বিভাকে এবং উপস্থিত সকলকে তিরস্কারচ্ছলে রাশ রাশ কথা বলিবার বাসনা হইতে লাগিল, কিন্তু আর কথা যোগাইল না, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, সেতার বন্ধ করিয়া নামাইয়া রাখিতে হইল। অবশেষে বিদায়ের সময় আসিল।

উদয়াদিত্যকে দীর্ঘ কাল আলিঙ্গন করিয়া শেষ কথা এই বলিয়া গেলেন, "এই সেতার রাখিয়া গেলাম দাদা, আর সেতার বাজাইব না। সুরমা ভাই সুখে থাক; বিভা

—কথা শেষ হইল না, অশ্রু মুছিয়া পাল্কীতে উঠিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—*—

মঙ্গলার কুটীর যশোহরের এক প্রান্তে ছিল। সেইখানে বসিয়া সে মালা জপ করিতেছিল। এমন সময়ে শাকসব্‌জির চুব্‌ড়ি হাতে করিয়া রাজবাটীর দাসী মাতঙ্গিনী আসিয়া উপস্থিত হইল।

মাতঙ্গ কহিল, "আজ হাটে আসিয়াছিলাম, অমনি ভাবিলাম, অনেক দিন মঙ্গলা দিদিকে দেখি নাই, তা একবার দেখিয়া আসিগে। আজ ভাই অনেক কাজ আছে, অধিক ক্ষণ থাকিতে পারিব না।" বলিয়া চুব্‌ড়ি রাখিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে সেইখানে বসিল। "তা, দিদি তুমি ত সব জানই, সেই মিন্সে আমাকে বড় ভাল বাসিত, ভাল এখনো বাসে, তবে আর এক জন কা'র পরে তার মন গিয়াছে আমি টের পাইয়াছি—তা' সেই মাগীটার ত্রিরাত্রির মধ্যে মরণ হয় এমন করিতে পার না?"

মঙ্গলার নিকট গরু হারান' হইতে স্বামী হারান' পর্য্যন্ত সকল-প্রকার দুর্ঘটনারই ঔষধ আছে, তা' ছাড়া সে বশীকরণের এমন উপায় জানে যে, রাজবাটীর বড় বড় ভৃত্য মঙ্গলার কুটিরে কত গণ্ডা গণ্ডা গড়াগড়ি যায়! যে মাগী-টার ত্রিরাত্রির মধ্যে মরণ হইলে মাতঙ্গিনী বাঁচে, সে আর কেহ নহে স্বয়ং মঙ্গলা!

মঙ্গলা মনে মনে হাসিয়া কহিল, "সে মাগীর মরিবার জন্ত বড় তাড়াতাড়ি পড়ে নাই, যমের কাজ বাড়াইয়া তবে সে মরিবে!" মঙ্গলা হাসিয়া প্রকাশ্যে কহিল, "তোমার মতন রূপ-সীকে ফেলিয়া আর কোথাও মন যায় এমন অরসিক আছে নাকি?" "তা' নাতনী, তোমার ভাবনা নাই। তাহার মন তুমি ফিরিয়া পাইবে। তোমার চোখের মধ্যেই ঔষধ আছে, একটু বেশী করিয়া প্রয়োগ করিয়া দেখিও তাহাতেও না যদি হয়, তবে এই শিকড়টি তাহাকে পানের সঙ্গে খাওয়াইও।" বলিয়া এক শুক্‌ন শিকড় আনিয়া দিল।

মঙ্গলা মাতঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করিল; "বলি রাজবাটীর খবর কি?"

মাতঙ্গিনী হাত উল্টাইয়া কহিল, সে সব কথায় আমাদের কাজ কি ভাই?"

মঙ্গলা কহিল, "ঠিক কথা।" ঠিক কথা।"

মঙ্গলার যে এ বিষয়ে সহসা মতের এতটা ঐক্য হইয়া যাইবে, তাহা মাতঙ্গিনী আশা করে নাই। সে কিঞ্চিৎ ফাঁফরে পড়িয়া কহিল, "তা' তোমাকে বলিতে দোষ নাই; তবে আজ আমার বড় সময় নাই; আর এক দিন সমস্ত বলিব।" বলিয়া বসিয়া রহিল।

মঙ্গলা কহিল "তা' বেশ, আর এক দিন শুনা যাইবে।"

মাতঙ্গিনী অধীর হইয়া পড়িল, কহিল "তবে আমি যাই ভাই। দেরি করিলাম বলিয়া আবার কত বকনা খাইতে হইবে। দেখ ভাই, সে দিন আমাদের ওখানে, রাজার জামাই আসিয়াছিলেন, তা' তিনি যে দিন আসিয়া-ছিলেন সেই রাত্রেই কাহাকে না বলিয়া চলিয়া গিয়াছেন।"

মঙ্গলা কহিল, "সত্য নাকি? বটে; কেন বল দেখি; তাই বলি মাতঙ্গ না হইলে আমাকে ভিতরকার খবর কেহ দিতে পারে না।"

মাতঙ্গ প্রফুল্ল হইয়া কহিল "আসল কথা কি জান? আমাদের যে বৌঠাকরুণটি আছেন, তিনি দুটি চক্ষে কাহারো ভাল দেখিতে পারেন

না। তিনি কি মন্তর জানেন, সোয়ামীকে একেবারে ভেড়ার মতন করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি—না ভাই; কাজ নাই, কে কোথা দিয়া শুনিবে আর বলিবে মাতঙ্গ রাজবাড়ির কথা বাহিরে বলিয়া বেড়ায়।"

মঙ্গলা আর কৌতূহল সামালিতে পারিল না; যদিও সে জানিত, আর খানিক ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলে মাতঙ্গ আপনি সমস্ত বলিবে, তবু তাহার বিলম্ব সহিল না, কহিল, "এখানে কোন লোক নাই নাতনী। আর আপনা-আপনির মধ্যে কথা, ইহাতে আর দোষ কি? তা' তোমাদের বৌঠাকরুণ কি করিলেন?"

"তিনি আমাদের দিদিঠাকরুণের নামে জামাইয়ের কাছে কি সব লাগাইয়াছিলেন, তাই জামাই রাতারাতিই দিদিঠাকরুণকে ফেলিয়া চলিয়া গেছেন। দিদিঠাকরুণ ত কাঁদিয়া কাটিয়া অনাস্ত করিতেছেন। মহারাজা খাপা হইয়া উঠিয়াছেন, তিনি বৌঠাকরুণকে শ্রীপুরে বাপের বাড়ি পাঠাইতে চান। ঐ দেখ ভাই, তোমার সকল কথাতেই হাসি! ইহাতে হাসিবার কি পাইলে? তোমার যে আর হাসি ধরে না।"

রামচন্দ্র রায়ের পলায়ন বার্ত্তার যথার্থ কারণ, রাজবাটির প্রত্যেক দাস দাসী সটীক অবগত ছিল, কিন্তু কাহারো সহিত কাহারো কথার ঐক্য ছিল না।

মঙ্গলা কহিল, তোমাদের মাঠাকরুণকে বলিও যে, বৌঠাকরুণকে শীঘ্র বাপের বাড়ি পাঠাইয়া কাজ নাই। মঙ্গলা এমন ওষুধ দিতে পারে যাহাতে যুবরাজের মন তাঁহার উপর হইতে একেবারে চলিয়া যায়।" বলিয়া সে খল্ খল্ করিয়া হাসিতে লাগিল। মাতঙ্গ কহিল, "তা বেশ কথা!"

মঙ্গলা জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের বৌঠাকরুণকে কি যুবরাজ বড় ভাল বাসেন?"

"সে কথায় কাজ কি! এক দণ্ড না দেখিলে থাকিতে পারেন না। যুবরাজকে "তু" বলিয়া ডাকিলেই আসেন।"

"আচ্ছা, আমি ওষুধ দিব। দিনের বেলাও কি যুবরাজ তাহার কাছেই থাকেন?"

"হাঁ।"

মঙ্গলা কহিল "ওমা কি হইবে!" তা,' সে যুবরাজকে কি বলে, কি করে, দেখিয়াছিস্?

"না ভাই, তাহা দেখি নাই।"

"আমাকে একবার রাজবাটীতে লইয়া যাইতে পারিস্, আমি তাহা হইলে একবার দেখিয়া আসি!"

মাতঙ্গ কহিল "কেন ভাই, তোমার এত মাথাব্যথা কেন?"

মঙ্গলা কহিল, "বলি তা'নয়। একবার দেখিলেই বুঝিতে পারিব, কি মন্ত্রে সে বশ করিয়াছে, আমার মন্ত্র খাটিবে কি না!"

মাতঙ্গ কহিল, "তা' বেশ, আজ তবে আসি!" বলিয়া চুব্‌ড়ি লইয়া চলিয়া গেল।

মাতঙ্গ চলিয়া গেলে মঙ্গলা যেন ফুলিতে লাগিল, দাঁতে দাঁত লাগাইয়া চক্ষু-তারকা প্রসারিত করিয়া বিড় বিড়্ করিয়া বকিতে লাগিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বসন্তরায় চলিয়া গেলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। বিভা প্রাসাদের ছাদের উপর গেল। ছাদের উপর হইতে দেখিল, পাল্কী চলিয়া গেল। বসন্তরায় পাল্কীর মধ্য

হইতে মাথাটি বাহির করিয়া একবার মুখ ফিরাইয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে চোখের জলের মধ্য হইতে পরিবর্ত্তনহীন অবিচলিত, পাষাণহৃদয় রাজবাটীর দীর্ঘ কঠোর দেয়ালগুলা ঝাপ্সা ঝাপ্সা দেখিতে পাইলেন। পাল্কী চলিয়া গেল, কিন্তু বিভা সেই খানে দাঁড়াইয়া রহিল। পথের পানে চাহিয়া রহিল। তারাগুলি উঠিল, দীপ গুলি জ্বলিল, পথে লোক রহিল না। বিভা দাঁড়াইয়া চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। সুরমা তাহাকে সারাদেশ খুঁজিয়া, কোথাও না পাইয়া অবশেষে ছাদে গিয়া উপস্থিত হইল। বিভার গলা ধরিয়া স্নেহের স্বরে কহিল, "কি দেখিতেছিস্ বিভা? বিভা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,"কে জানে ভাই! বিভা সমস্তই শূন্যময় দেখিতেছে, তাহার প্রাণে সুখ নাই। সে, কেন যে ঘরের মধ্যে যায়, কেন যে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসে, কেন শুইয়া পড়ে, কেন উঠিয়া যায়, কেন দুই প্রহর মধ্যাহ্নে বাড়ির এ ঘরে ও ঘরে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার কারণ খুঁজিয়া পায় না। রাজবাড়ি হইতে তাহার বাড়ি চলিয়া গেছে যেন,রাজবাড়িতে যেন তাহার ঘর নাই। অতি ছেলেবেলা হইতে নানা খেলাধুলা, নানা সুখ দুঃখ,হাসি কান্নায় মিলিয়া রাজবাটীর মধ্যে তাহার জন্য যে একটি সাধের ঘর বাঁধিয়া দিয়াছিল, সে ঘরটি এক দিনে কে ভাঙ্গিয়া দিল রে! এঘর ত আর তাহার ঘর নয়! সে, এখন গৃহের মধ্যে গৃহহীন, তাহার দাদা মহাশয় ছিল, গেল, তাহার——চন্দ্রদ্বীপ হইতে বিভাকে লইতে কবে লোক আসিবে? হয়ত রামমোহন মাল রওনা হইয়াছে,এতক্ষণে তাহারা না জানি কোথায়! বিভার সুখের এখনো কিছু অবশিষ্ট আছে। তাহার অমন দাদা আছে, তাহার প্রাণের সুরমা আছে, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধেও যেন একটা কি বিপদ ছায়ার মত পশ্চাতে ফিরিতেছে। যে বাড়ির ভিটা ভেদ করিয়া একটা ঘন ঘোর গুপ্ত রহস্য অদৃশ্য ভাবে ধূমায়িত হইতেছে সে বাড়িকে কি আর ঘর বলিয়া মনে হয়?

উদয়াদিত্য শুনিলেন কর্ম্মচ্যুত হইয়া সীতারামের দুর্দ্দশা হইয়াছে। একে তাহার এক পয়সার সম্বল নাই,তাহার উপর তাহার অনেক গুলি গলগ্রহ জুটিয়াছে। কারণ যখন সে রাজবাড়ি হইতে মোটা মাহিয়ানা পাইত, তখন তাহার পিসা, সহসা স্নেহের আধিক্য বশতঃ কাজ কর্ম্ম সমস্ত ছাড়িয়া দিয়া তাহার স্নেহাস্পদের বিরহে কাতর হইয়া পড়িয়াছিল; মিলনের সুব্যবস্থা করিয়া লইয়া আনন্দে গদগদ হইয়া কহিল যে, সীতারামকে দেখিয়াই তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণা সমস্ত দূর হইয়াছে। ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হওয়ার বিষয়ে অনেক প্রমাণ আছে, কিন্তু কেবল সীতারামকে দেখিয়াই হইত কি না, সে বিষয়ে কোণ প্রমাণ নাই। সীতারামের এক দূর সম্পর্কের বিধবা ভগিনী তাহার এক পুত্রকে কাজ কর্ম্মে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময়ে সহসা তাহার চৈতন্য হইল যে, বাছাকে ছোট কাজে নিযুক্ত করিলে বাছার মামাকে অপমান করা হয়, এই বুঝিয়া সে বাছার মামার মান রক্ষা করিবার জন্য কোন মতে সে কাজ করিতে পারিল না। এইরূপে সে মান রক্ষা করিয়া সীতারামকে ঋণী করিল ও তাহার বিনিময়ে আপনার প্রাণরক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া লইল। ইহার উপর সীতারামের বিধবা মাতা আছে ও এক অবিবাহিতা বালিকা কন্যা আছে। এদিকে আবার সীতারাম লোকটি অতিশয় সৌখীন, আমোদ প্রমোদটি নহিলে তাহার চলে না। সীতারামের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, অথচ

তাহার সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক পরিবর্ত্তন কিছুই হয় নাই। তাহার পিসার ক্ষুধাতৃষ্ণা ঠিক সমান রহিয়াছে; তাহার ভাগিনেয়টির যতই বয়স বাড়িতেছে, ততই তাহার উদরের প্রসর ও মামার মান অপমানের প্রতি দৃষ্টি অধিক করিয়া বাড়িতেছে। সীতারামের টাকার থলি ব্যতীত আর কাহারো উদর কমিবার কোন লক্ষণ প্রকাশ করিতেছে না। সীতারামের অন্যান্য গলগ্রহের সঙ্গে সখটিও বজায় আছে, সেটী ধারের উপর বর্দ্ধিত হইতেছে, সুদও যে পরিমাণে পুষ্ট হইতেছে, সেও সেই পরিমাণে পুষ্ট হইয়া উঠিতেছে। উদয়াদিত্য সীতারামের দারিদ্র্য দশা শুনিয়া তাহার ও ভাগবতের মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। সীতারাম টাকাটা পাইয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িল। মহারাজার নিকট উদয়াদিত্যের নাম করিয়া অবধি সে নিজের কাছে ও উদয়াদিত্যের কাছে নিতান্ত অপরাধী হইয়া আছে। উদয়াদিত্যের টাকা পাইয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। এক দিন যুবরাজের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহাকে ভগবান্, জগদীশ্বর দয়াময় সম্বোধন করিয়া বিস্তর ক্ষমা চাহিল। ভাগবত লোকটা অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির! সে সতরঞ্চ খেলে, তামাক খায় ও প্রতিবেশীদিগকে স্বর্গ নরকের জমী বিলি করিয়া দেয়! সে যখন উদয়াদিত্যের টাকা পাইল, তখন মুখ বেঁকাইয়া নানা ভাব ভঙ্গীতে জানাইল যে, যুবরাজ তাহার যে সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, এ টাকাতে তাহার কি প্রতিশোধ হইবে! টাকাটা লইতে সে কিছুমাত্র আপত্তি করিল না।

যুবরাজ কর্ম্মচ্যুত প্রহরীদ্বয়কে মাসিক বৃত্তি দিতেছেন, একথা প্রতাপাদিত্যের কাণে গেল। আগে হইলে যাইত না। আগে তিনি উদয়াদিত্যকে এত অবহেলা করিতেন যে উদয়াদিত্য সম্বন্ধে সকল কথা তাঁহার কাণে যাইত না। মহারাজ জানিতেন যে, উদয়াদিত্য প্রজাদের সহিত মিশিতেন, এবং অনেক সময়ে প্রজাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহার নিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন, কিন্তু সে গুলি প্রায় এমন সামান্য ও এমন অল্পে অল্প তাহা তাঁহার সহিয়া আসিয়া ছিল যে, বিশেষ একটা কিছু না হইলে উদয়াদিত্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিত না। এই বার উদয়াদিত্যের প্রতি তাঁহার একটু বিশেষ মনোযোগ পড়িয়াছে, তাই উপরি-উক্ত ঘটনাটি অবিলম্বে তাঁহার কাণে গেল। শুনিয়া প্রতাপাদিত্য অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন। উদয়াদিত্যকে ডাকাইয়া আনিলেন, ও কহিলেন "আমি যে সীতারামকে ও ভাগবতকে কর্ম্মচ্যুত করিলাম, সে কি কেবল রাজকোষে তাহাদের বেতন দিবার উপযুক্ত অর্থ ছিল না বলিয়া? তবে যে তুমি নিজের হইতে তাহাদের মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছ?"

উদয়াদিত্য ধীরে ধীরে কহিলেন, "আমি দোষী। আপনি তাহাদের দণ্ড দিয়া আমাকে দণ্ডিত করিয়াছেন। আমি আপনার সেই বিচার অনুসারে মাসে মাসে তাহাদের নিকট দণ্ড দিয়া থাকি।"

ইতিপূর্ব্বে কখনই প্রতাপাদিত্যকে উদয়াদিত্যের কথা মনোযোগ দিয়া শুনিতে হয় নাই। উদয়াদিত্যের ধীর গম্ভীর বিনীত স্বর ও তাঁহার সুসংযত কথাগুলি প্রতাপাদিত্যের নিতান্ত মন্দ লাগিল না। উদয়াদিত্যের কথায় কোন উত্তর না দিয়া প্রতাপাদিত্য কহিলেন "আমি আদেশ করিতেছি, উদয়, ভবিষ্যতে তাহাদের যেন আর অর্থ সাহায্য না করা হয়।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "আমার প্রতি আরো গুরুতর শাস্তির আদেশ হইল।" কিন্তু হাত যোড় করিয়া কহিলেন "কিন্তু এমন কি অপরাধ করিয়াছি, যাহাতে এত বড় শাস্তি আমাকে বহন করিতে হইবে? আমি কি করিয়া দেখিব, আমার জন্য আট নয়টি ক্ষুধিত মুখে অন্ন জুটিতেছে না, আট নয়টি হতভাগা নিরাশ্রয় হইয়া পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতেছে; অথচ আমার পাতে অন্নের অভাব নাই? পিতা, আমার যাহা কিছু সব আপনারই প্রসাদে। আপনি আমার পাতে আবশ্যকের অধিক অন্ন দিতেছেন, কিন্তু আপনি যদি আমার আহারের সময় আমার সম্মুখে আট নয়টি ক্ষুধিত কাতরকে বসাইয়া রাখেন, অথচ তাহাদের মুখে অন্ন তুলিয়া দিতে বাধা দেন, তবে সে অন্ন যে আমার বিষ!"

উত্তেজিত উদয়াদিত্যকে প্রতাপাদিত্য কথা কহিবার সময় কিছু মাত্র বাধা দিলেন না, সমস্ত কথা শেষ হইলে পর আস্তে আস্তে কহিলেন, "তোমার যা বক্তব্য তাহা শুনিলাম, এক্ষণে আমার যা বক্তব্য পুনশ্চ বলি। ভাগবত ও সীতারামের বৃত্তি আমি বন্ধ করিয়া দিয়াছি, আর কেহ যদি তাহাদের বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়, তবে সে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারী বলিয়া গণ্য হইবে।" প্রতাপাদিত্যের মনে মনে বিশেষ একটু রোষের উদয় হইয়াছিল। সম্ভবতঃ তিনি নিজেও তাহার কারণ বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু তাহার কারণ এই "আমি যেন ভারি একটা নিষ্ঠুরতা করিয়াছি, তাই দয়ার শরীর উদয়াদিত্য তাহার প্রতিবিধান করিতে আইলেন। দেখি তিনি দয়া করিয়া কি করিতে পারেন! আমি যেখানে নিষ্ঠুর, সেখানে আর যে কেহ দয়ালু হইবে, এত বড় আস্পর্দ্ধা কাহার প্রাণে সয়!"

উদয়াদিত্য সুরমার কাছে গিয়া সমস্ত কহিলেন। সুরমা কহিল, "সে দিন সমস্ত দিন কিছু খাইতে পায় নাই, সন্ধ্যাবেলায় সীতারামের মা, সীতারামের ছোট মেয়েটিকে লইয়া আমার কাছে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। আমি সেই সন্ধ্যাবেলায় কিছু দিই, তবে তাহারা সমস্ত পরিবার খাইতে পায়। সীতারামের মেয়েটি দুধের মেয়ে, সমস্ত দিন কিছু খায় নাই, তাহার মুখপানে কি তাকান' যায়। ইহাদের কিছু কিছু না দিলে ইহারা যাইবে কোথায়?"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "বিশেষতঃ, রাজবাটী হইতে যখন তাহারা তাড়িত হইয়াছে, তখন পিতার ভয়ে অন্য কেহ তাহাদের কর্ম্ম দিতে বা সাহায্য করিতে সাহস করিবে না, এ সময়ে আমরাও যদি বিমুখ হই, তাহা হইলে তাহাদের আর সংসারে কেহই থাকিবে না। সাহায্য আমি করিবই, তাহার জন্য ভাবিও না সুরমা, কিন্তু অনর্থক পিতাকে অসন্তুষ্ট করা ভাল হয় না, যাহাতে এ কাজটা গোপনে সমাধা করা যায়, তাহার উপায় করিতে হইবে।"

সুরমা উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া কহিল, "তোমাকে আর কিছু করিতে হইবে না, আমি সমস্ত করিব, আমার উপরে ভার দাও।" সুরমা নিজেকে দিয়া উদয়াদিত্যকে ঢাকিয়া রাখিতে চায়! এই বৎসরটা উদয়াদিত্যের দুর্ব্বৎসর পড়িয়াছে। অদৃষ্ট তাঁহাকে যে কাজেই প্রবৃত্ত করাইতেছে, সবগুলিই তাঁহার পিতার বিরুদ্ধে; অথচ সে গুলি এমন কাজ যে, সুরমার মত স্ত্রী প্রাণ ধরিয়া স্বামীকে সে কাজ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে না। সুরমা তেমন স্ত্রী নহে; স্বামী যখন ধর্ম্মযুদ্ধে যান, তখন সুরমা নিজের হাতে তাঁহার বর্ম্ম বাঁধিয়া দেয়, তাহার পর ঘরে গিয়া সে কাঁদে। সুরমার প্রাণ প্রতিপদে ভয়ে আকুল হইয়াছে,

অথচ উদয়াদিত্যকে সে প্রতিপদে ভরসা দিয়াছে। উদয়াদিত্য ঘোর বিপদের সময় সুরমার মুখের দিকে চাহিয়াছেন, দেখিয়াছেন, সুরমার চোখে জল. কিন্তু সুরমার হাত কাঁপে নাই, সুরমার পদক্ষেপ অটল।

সুরমা তাঁহার এক বিশ্বস্তা দাসীর হাত দিয়া, সীতারামের মায়ের কাছে ও ভাগবতের স্ত্রীর কাছে বৃত্তি পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। দাসী বিশ্বস্তা বটে, কিন্তু মঙ্গলার কাছে একথা গোপন রাখিবার সে কোন আবশ্যক বিবেচনা করে নাই। এই নিমিত্ত মঙ্গলা ব্যতীত বাহিরের আর কেহ অবগত ছিল না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

যখন গোপনে বৃত্তি পাঠান'র কথা প্রতাপাদিত্যের কাণে গেল, তখন তিনি দ্বিতীয় কথা না কহিয়া অন্তঃপুরে আদেশ পাঠাইয়া দিলেন সুরমাকে পিত্রালয়ে যাইতে হইবে। উদয়াদিত্য বক্ষে দৃঢ় বল বাঁধিলেন। বিভা কাঁদিয়া সুরমার গলা জড়াইয়া কহিল, "তুমি যদি যাও, তবে এ শ্মশান-পুরীতে আমি কি করিব ?" সুরমা বিভার চিবুক ধরিয়া, বিভার মুখ চুম্বন করিয়া কহিল, "আমি কেন যাইব বিভা, আমার সর্ব্বস্ব এখানে রহিয়াছে।" সুরমা যখন প্রতাপাদিত্যের আদেশ শুনিল, তখন কহিল, "আমি পিত্রালয়ে যাইবার কোন কারণ দেখিতেছি না। সেখান হইতে আমাকে লইতে লোক আসে নাই, আমার স্বামীরও এবিষয়ে মত নাই। অতএব বিনা কারণে সহসা পিত্রালয়ে যাইবার আমি কোন আবশ্যক দেখিতেছি না।' শুনিয়া প্রতাপাদিত্য জ্বলিয়া গেলেন। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলেন, কোন উপায় নাই। সুরমাকে কিছু বলপূর্ব্বক বাড়ি হইতে বাহির করা যায় না, অন্তঃপুরে শারীরিক বল খাটে না। প্রতাপাদিত্য মেয়েদের বিষয়ে নিতান্ত আনাড়ি ছিলেন, বলের প্রতি বল প্রয়োগ করিতে তিনি জানিতেন, কিন্তু এই অবলাদের সম্বন্ধে কিরূপ চাল চালিতে হয়, তাহা তাঁহার মাথায় আসিত না। তিনি বড় বড় কাছি টানিয়া ছিঁড়িতে পারেন, কিন্তু তাঁহার মোটা মোটা অঙ্গুলি দিয়া ক্ষীণ সূত্রের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গ্রন্থি মোচন করিতে পারেন না। এই মেয়ে গুলা তাঁহার মতে, নিতান্ত দুর্জ্ঞেয় ও জানিবার অনুপযুক্ত সামগ্রী। ইহাদের সম্বন্ধে যখনি কোন গোল বাধে, তিনি তাড়াতাড়ি মহিষীর প্রতি ভার দেন। ইহাদের বিষয়ে ভাবিতে বসিতে তাঁহার অবসরও নাই, ইচ্ছাও নাই এবং যোগ্যতাও নাই। ইহা তাঁহার নিতান্ত অনুপযুক্ত কাজ। এবারেও প্রতাপাদিত্য মহিষীকে ডাকিয়া কহিলেন, "সুরমাকে বাপের বাড়ি পাঠাও।" মহিষী কহিলেন, "তাহা হইলে বাবা উদয়ের কি হইবে ?" প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "উদয় ত আর ছেলেমানুষ নয়, আমি রাজকার্য্যের অনুরোধে সুরমাকে রাজপুরী হইতে দূরে পাঠাইতে চাই, এই আমার আদেশ।"

মহিষী উদয়াদিত্যকে ডাকাইয়া কহিলেন, "বাবা উদয়, সুরমাকে বাপের বাড়ি পাঠান যাক্।" উদয়াদিত্য কহিলেন, "কেন মা, সুরমা কি অপরাধ করিয়াছে ?"

মহিষী কহিলেন, "কি জানি বাছা, আমরা মেয়ে মানুষ, কিছু বুঝি না, বউমাকে বাপের বাড়ি পাঠাইয়া মহারাজার রাজকার্য্যে যে কি সুযোগ হইবে, তা মহারাজই জানেন।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "মা, আমাকে কষ্ট দিয়া আমাকে দুঃখী করিয়া রাজকার্য্যের কি উন্নতি হইল? যতদূর কষ্ট সহিবার তাহাত সহিয়াছি, কোন্ সুখ আমার অবশিষ্ট আছে? সুরমা যে বড় সুখে আছে তাহা নয়। দুই সন্ধ্যা সে ভৎর্সনা সহিয়াছে, দুরছাই সে অঙ্গ-আভরণ করিয়াছে, অবশেষে কি রাজবাড়িতে তাঁহার জন্য একটুকু স্থানও কুলাইল না! তোমাদের সঙ্গে কি তাহার কোন সম্পর্ক নাই মা? সে কি ভিখারী অতিথ, যে যখন খুসী রাখিবে, যখন খুসী তাড়াইবে? তাহা হইলে মা আমার জন্যও রাজবাড়িতে স্থান নাই, আমাকেও বিদায় করিয়া দেও!"

মহিষী কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন, কহিলেন "কি জানি বাবা! মহারাজা কখন কি যে করেন, কিছু বুঝিতে পারি না। কিন্তু, তাও বলি বাছা, আমাদের বৌমাও বড় ভাল মেয়ে নয়। ও রাজবাড়িতে প্রবেশ করিয়া অবধি এখানে আর শান্তি নাই। হাড় জ্বালাতন হইয়া গেল। তা,' ও দিনকতক বাপের বাড়িতেই যাক্ না কেন, দেখা যাক্, কি বল বাছা। ও দিন কতক এখান হইতে গেলেই দেখিতে পাইবে, বাড়ির শ্রী ফেরে কি না!"

উদয়াদিত্য এ কথার আর কোন উত্তর করিলেন না, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, তাহার পরে উঠিয়া চলিয়া গেলেন!

মহিষী কাঁদিয়া প্রতাপাদিত্যের কাছে গিয়া পড়িলেন, কহিলেন "মহারাজ, রক্ষা কর! সুরমাকে পাঠাইলে উদয় বাঁচিবে না। বাছার কোন দোষ নাই, ঐ সুরমা, ঐ ডাইনীটা তাহাকে কি মন্ত্র করিয়াছে।" বলিয়া মহিষী কাঁদিয়া আকুল হইলেন।

প্রতাপাদিত্য বিষম রুষ্ট হইয়া কহিলেন, "সুরমা যদি না যায় ত আমি উদয়াদিত্যকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিব!"

মহিষী মহারাজার কাছ হইতে আসিয়া সুরমার কাছে গিয়া কহিলেন, "পোড়ামুখি, আমার বাছাকে তুই কি করিলি? আমার বাছাকে আমাকে ফিরাইয়া দে! আসিয়া অবধি তুই তাহার কি সর্ব্বনাশ না করিলি? অবশেষে—সে রাজার ছেলে—তা'র হাতে বেড়ী না দিয়া কি তুই ক্ষান্ত হইবি না?"

সুরমা শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, "আমার জন্য তাঁর হাতে বেড়ী পড়িবে? সে কি কথা মা! আমি এখনি চলিলাম!"

সুরমা বিভার কাছে গিয়া সমস্ত কহিল; বিভার গলা ধরিয়া কহিল, "বিভা, এই যে চলিলাম, আর বোধ করি আমাকে এখানে ফিরিয়া আসিতে দিবে না।" বিভা কাঁদিয়া সুরমাকে জড়াইয়া ধরিল। সুরমা সেই খানে বসিয়া পড়িল। অনন্ত ভবিষ্যতের অনন্ত প্রান্ত হইতে একটা কথা আসিয়া তাহার প্রাণে বাজিতে লাগিল, "আর হইবে না!" আর আসিতে পাইব না, আর হইবে না, আর কিছু রহিবে না! এমন একটা মহাশূন্য ভবিষ্যৎ তাহার সমুখে প্রসারিত হইল,—যে ভবিষ্যতে সে মুখ নাই, সে হাসি নাই, সে আদর নাই, চোখে চোখে বুকে বুকে প্রাণে প্রাণে মিলন নাই, সুখ দুঃখের বিনিময় নাই, বুক ফাটিয়া গেলেও এক মুহূর্ত্তের জন্যও এক বিন্দু প্রেম নাই, স্নেহ নাই, কিছু নাই, কি ভয়ানক ভবিষ্যৎ! সুরমার বুক ফাটিতে লাগিল মাথা ঘুরিতে লাগিল, চোখের জল শুকাইয়া গেল! উদয়াদিত্য আসিবামাত্র সুরমা তাঁহার পা দুটি জড়াইয়া বুকে চাপিয়া বুক ফাটিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সুরমা এমন করিয়া কখন কাঁদে নাই! তাহার বলিষ্ঠ হৃদয়

আজ শতধা হইয়া গিয়াছে। উদয়াদিত্য সুরমার মাথা কোলে তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হইয়াছে সুরমা? সুরমা উদয়াদিত্যের মুখের দিকে চাহিয়া আর কি কথা কহিতে পারে? মুখের দিকে চায় আর কাঁদিয়া ওঠে। বলিল, "ঐ মুখ আমি দেখিতে পাইব না? সন্ধ্যা হইবে, তুমি বাতায়নে আসিয়া বসিবে, আমি পাশে নাই? ঘরে দীপ জ্বালাইয়া দিবে, তুমি ঐ দ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইবে, আর আমি হাসিতে হাসিতে তোমার হাত ধরিয়া আনিব না? তুমি যখন এখানে, আমি তখন কোথায়? সুরমা যে বলিল "কোথায়" তাহাতে কতখানি নিরাশা! তাহাতে কত দূর দুরান্তরের বিচ্ছেদের ভাব। যখন কেবল মাত্র চোখে চোখেই মিলন হইতে পারে তখন মধ্যে কত দূর! যখন তাহাও হইতে পারে না, তখন আরো কত দূর! যখন বার্ত্তা লইতে বিলম্ব হয়, তখন আরো কতদূর! যখন প্রাণান্তিক ইচ্ছা হইলেও এক মুহূর্ত্তের জন্যও দেখা হইবে না, তখন—তখন ঐ পা দুখানি ধরিয়া এমনি করিয়া বুকে চাপিয়া এই মুহূর্ত্তেই মরিয়া যাওয়াতেই সুখ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

—*—

উপাখ্যানের আরম্ভ ভাগে রুক্মিণীর উল্লেখ করা হইয়াছে, বোধ করি পাঠকেরা তাহাকে বিস্মৃত হন নাই। এই মঙ্গলাই সেই রুক্মিণী। সে রায়গড় পরিত্যাগ করিয়া নাম পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক যশোহরের প্রান্তদেশে বাস করিতেছে। রুক্মিণীর মধ্যে অসাধারণ কিছুই নাই। সাধারণ নীচ প্রকৃতির স্ত্রীলোকের ন্যায় সে ইন্দ্রিয়পরায়ণ, ঈর্ষাপরায়ণ, মনোরাজ্য-অধিকার-লোলুপ। হাসি কান্না তাহার হাতধরা, আবশ্যক হইলে বাহির করে, আবশ্যক হইলে তুলিয়া রাখে। যখন সে রাগে, তখন সে অতি প্রচণ্ডা; মনে হয় যেন রাগের পাত্রকে দাঁতে নখে ছিঁড়িয়া ফেলিবে। তখন অধিক কথা কয় না, চোখ দিয়া আগুন বাহির হইতে থাকে, থর্‌থর্ করিয়া কাঁপে। গলিত লোহের মত তাহার হৃদয়ের কটাহে রাগ টগবগ করিতে থাকে। তাহার মনের মধ্যে ঈর্ষা সাপের মত ফোঁস্ ফোঁস্ করে ও ফুলিয়া ফুলিয়া লেজ আছড়াইতে থাকে। এদিকে সে নানাবিধ ব্রত করে, নানাবিধ তান্ত্রিক অনুষ্ঠান করে। যে শ্রেণীর লোকদের সহিত সে মেশে, তাহাদের মন সে আশ্চর্য্য রূপে বুঝিতে পারে। যুবরাজ যখন সিংহাসনে বসিবেন তখন সে যুবরাজের হৃদয়ের উপর সিংহাসন পাতিয়া তাঁহার হৃদয়রাজ্য ও যশোহর রাজ্য একত্রে শাসন করিবে, এ আশা শয়নে স্বপ্নে তাহার হৃদয়ে জাগিতেছে। ইহার জন্য সে কি না করিতে পারে! বহুদিন ধরিয়া অনবরত চেষ্টা করিয়া রাজবাটির সমস্ত দাস দাসীর সহিত সে ভাব করিয়া লইয়াছে। রাজবাটির প্রত্যেক ক্ষুদ্র খবরটি পর্য্যন্ত সে রাখে। সুরমার মুখ কবে মলিন হইল তাহাও সে শুনিতে পায়, প্রতাপাদিত্যের সামান্য পীড়া হইলেও তাহার কাণে যায়, ভাবে এইবার বুঝি আপদটার মরণ হইবে। প্রতাপাদিত্য ও সুরমার মরণোদ্দেশে সে নানা অনুষ্ঠান করিয়াছে, কিন্তু এখনোত কিছুই সফল হয় নাই। প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া সে মনে করে আজ হয় ত শুনিতে পাইব, প্রতাপাদিত্য অথবা সুরমা বিছানায় পড়িয়া মরিয়া আছে। প্রতিদিন তাহার অধীরতা বাড়িয়া উঠিতেছে। ভাবিতেছে মন্ত্র তন্ত্র চুলায় যাক্ একবার হাতের

কাছে পাই ত মনের সাধ মিটাই। ভাবিতে ভাবিতে এমন অধর দংশন করিতে থাকে যে অধর কাটিয়া রক্ত পড়িবার উপক্রম হয়।

রুক্মিণী দেখিল যে, প্রতিদিন সুরমার প্রতি রাজার ও রাজমহিষীর বিরাগ বাড়িতেছে। অবশেষে এতদূর পর্য্যন্ত হইল যে, সুরমাকে রাজবাটি হইতে বিদায় করিয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। তাহার আর আনন্দের সীমা নাই। যখন সে দেখিল তবুও সুরমা গেল না, তখন সে বিদায় করিয়া দিবার সহজ উপায় অবলম্বন করিল।

রাজমহিষী যখন শুনিলেন মঙ্গলা নামক একজন বিধবা তন্ত্র মন্ত্র ঔষধ নানাপ্রকার জানে, তখন তিনি ভাবিলেন সুরমাকে রাজবাটি হইতে বিদায় করিবার আগে যুবরাজের মনটা তাহার কাছ হইতে আদায় করিয়া লওয়া ভাল। মাতঙ্গিনীকে মঙ্গলার নিকট হইতে গোপনে ঔষধ আনাইতে পাঠাইলেন।

মঙ্গলা নানাবিধ শিকড় লইয়া সমস্ত রাত ধরিয়া কাটিয়া, ভিজাইয়া, বাঁটিয়া, মিশাইয়া মন্ত্র পড়িয়া বিষ প্রস্তুত করিতে লাগিল।

সেই নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে, নির্জ্জন নগর-প্রান্তে, প্রচ্ছন্ন কুটির মধ্যে হামানদিস্তার শব্দ উঠিতে লাগিল, সেই শব্দই তাহার এক মাত্র সঙ্গী হইল, সেই অবিশ্রাম একঘেয়ে শব্দ তাহার নর্ত্তনশীল উৎসাহের তালে তালে করতালি দিতে লাগিল, তাহার উৎসাহ দ্বিগুণ নাচিতে লাগিল, তাহার চখে আর ঘুম রহিল না।

ঔষধ প্রস্তুত করিতে পাঁচদিন লাগিল। বিষ প্রস্তুত করিতে পাঁচ দিন লাগিবার আবশ্যক করে না। কিন্তু সুরমা মরিবার সময় যাহাতে যুবরাজের মনে দয়া না হয়, এই উদ্দেশে মন্ত্র পড়িতে ও অনুষ্ঠান করিতে অনেক সময় লাগিল।

প্রতাপাদিত্যের মত লইয়া মহিষী সুরমাকে আরো কিছু দিন রাজবাটিতে থাকিতে দিলেন সুরমা চলিয়া যাইবে, বিভা চারিদিকে অকূল পাথার দেখিতেছে। এ কয় দিন সে অনবরত সুরমার কাছে বসিয়া আছে। একটি মলিন ছায়ার মত সে চুপ করিয়া সুরমার সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। এক একটা দিন যায়, সন্ধ্যা আইসে, বিভা ততই যেন ঘনিষ্ঠতর ভাবে সুরমাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া রাখিতে চায়। দিনগুলিকে কে যেন তাহার প্রাণপণ আকর্ষণ হইতে টানিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া যাইতেছে বিভার চারিদিকে অন্ধকার। সুরমার চক্ষেও সমস্তই শূন্য। তাহার আর উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম নাই, সংসারের দিগ্‌বিদিক্ সমস্ত মিশাইয়া গেছে। সে উদয়াদিত্যের পায়ের কাছে পড়িয়া থাকে, কোলের উপর শুইয়া থাকে, তাঁহার মুখের পানে চুপ করিয়া চাহিয়া থাকে, আর কিছু করে না। বিভাকে বলে "বিভা, তোর কাছে আমার সমস্ত রাখিয়া গেলেম" বলিয়া দুই হাতে মুখ আচ্ছাদন করিয়া কাঁদিয়া ফেলে।

অপরাহ্ণ হইয়া আসিয়াছে; কাল প্রত্যুষে সুরমার বিদায়ের দিন। তাহার গার্হস্থ্যের যাহা কিছু সমস্ত একে একে বিভার হাতে সমর্পণ করিল। উদয়াদিত্য প্রশান্ত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবে বসিয়া আছেন। তিনি স্থির করিয়াছেন, হয় সুরমাকে রাজপুরীতে রাখিবেন, নয় তিনিও চলিয়া যাইবেন। যখন সন্ধ্যা হইল, তখন সুরমা আর দাঁড়াইতে পারিল না, তাহার পা কাঁপিতে লাগিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল। সে শয়নগৃহে গিয়া শুইয়া পড়িল, কহিল, "বিভা, বিভা, শীঘ্র একবার তাঁহাকে ডাক্ আর বিলম্ব নাই!"

উদয়াদিত্য দ্বারের কাছে আসিতেই সুরমা

বলিয়া উঠিল "এস, এস, আমার প্রাণ কেমন করিতেছে!" বলিয়া দুই বাহু বাড়াইয়া দিল। উদয়াদিত্য কাছে আসিতেই তাঁহার পা দুটি জড়াইয়া ধরিল। উদয়াদিত্য বসিলেন, তখন সুরমা বহু কষ্টে নিঃশ্বাস লইতেছে, তাহার হাত পা শীতল হইয়া আসিয়াছে। উদয়াদিত্য ভীত হইয়া ডাকিলেন, "সুরমা" সুরমা অতি ধীরে মাথা তুলিয়া উদয়াদিত্যের মুখের পানে চাহিয়া কহিল, "কি নাথ!" উদয়াদিত্য ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, "কি হইয়াছে সুরমা!" সুরমা কহিল, "বোধ করি আমার সময় হইয়া আসিয়াছে," বলিয়া উদয়াদিত্যের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিবার জন্য হাত উঠাইতে চাহিল, মাথা উঠিল না! কেবল মুখের দিকে সে চাহিয়া রহিল। উদয়াদিত্য দুই হাতে সুরমার মুখ তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন, "সুরমা, সুরমা, তুমি কোথায় যাইবে সুরমা! আমার আর কে রহিল?" সুরমার দুই চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে কেবল বিভার মুখের দিকে চাহিল! বিভা তখন হতচেতন হইয়া বোধশূন্য নয়নে সুরমার দিকে চাহিয়া আছে। যেখানে প্রতি সন্ধ্যায় সুরমা ও উদয়াদিত্য বসিয়া থাকিতেন, সম্মুখে সেই বাতায়ন উন্মুক্ত। আকাশের তারা দেখা যাইতেছে, ধীরে ধীরে বাতাস বহিতেছে, চারিদিক স্তব্ধ। ঘরে প্রদীপ জ্বালাইয়া গেল। রাজবাটিতে পূজার শাঁক ঘণ্টা বাজিয়া ক্রমে থামিয়া গেল। সুরমা উদয়াদিত্যকে মৃদুস্বরে কহিল, "একটা কথা কও, আমি চোখে ভাল দেখিতে পাইতেছি না!"

ক্রমে রাজবাটিতে রাষ্ট্র হইল যে, সুরমা নিজ হস্তে বিষ খাইয়া মরিতেছে। রাজমহিষী ছুটিয়া আসিলেন, সকলে ছুটিয়া আসিল। সুরমার মুখ দেখিয়া মহিষী কাঁদিয়া উঠিয়া কহিলেন "সুরমা ম আমার তুই এইখানেই থাক্, তোকে কোথাও যাইতে হইবে না। তুই আমাদের ঘরের লক্ষ্মী, তোকে কে যাইতে বলে?" সুরমা শাশুড়ীর পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইল। মহিষী দ্বিগুণ কাঁদিয়া উঠিয়া কহিলেন, "মা তুই কি রাগ করিয়া গেলি রে?" তখন সুরমার কণ্ঠরোধ হইয়াছে, কি কথা বলিতে গেল, বাহির হইল না। রাত্রি যখন চারি দণ্ড আছে, তখন চিকিৎসক কহিলেন "শেষ হইয়া গেছে!" "দাদা, কি হইল গো" বলিয়া বিভা সুরমার বুকের উপরে পড়িয়া সুরমাকে জড়াইয়া ধরিল। প্রভাত হইয়া গেল, উদয়াদিত্য সুরমার মাথা কোলে রাখিয়া বসিয়া রহিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

সুরমা কি আর নাই? বিভার কিছুতেই তাহা মনে হয় না কেন? যেন সুরমার দেখা পাইবে, যেন সুরমা ঐদিকে কোথায় আছে। বিভা ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার প্রাণ যেন সুরমাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। সে চুল বাঁধিবার সময় চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, যেন এখনি সুরমা আসিবে, তাহার চুল বাঁধিয়া দিবে, তাহারি জন্য অপেক্ষা করিতেছে। না রে না, সন্ধ্যা হইয়া আসিল, রাত্রি হইয়া আইসে, সুরমা বুঝি আর আসিল না, চুল বাঁধা আর হইল না। আজ বিভার মুখ এত মলিন হইয়া গিয়াছে, আজ বিভা এত কাঁদিতেছে. তবু কেন সুরমা আসিল না, সুরমা ত কখন এমন করে না! বিভার মুখ একটু মলিন হইলেই অমনি সুরমা তাহার কাছে আইসে, তাহার গলা ধরে, প্রাণ জুড়াইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকে, আর আজ—ওরে, আজ বুক ফাটিয়া গেলেও সে আসিবে না।

উদয়াদিত্যের অর্দ্ধেক বল অর্দ্ধেক প্রাণ চলিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক কাজে যে তাঁহার আশা ছিল, উৎসাহ ছিল, যাহার মন্ত্রণা তাঁহার একমাত্র সহায় ছিল, যাহার হাসি তাঁহার একমাত্র পুরস্কার ছিল—সেই চলিয়া গেল! তিনি তাঁহার শয়ন-গৃহে যাইতেন, যেন কি ভাবিতেন, একবার চারিদিক্ দেখিতেন, দেখিতেন—কেহ নাই!—ধীরে ধীরে সেই বাতায়নে আসিয়া বসিতেন; যেখানে সুরমা বসিত সেইখানটি শূন্য রাখিয়া দিতেন, আকাশে সেই জ্যোৎস্না, সম্মুখে সেই কানন, তেমনি করিয়া বাতাস বহিতেছে—মনে করিতেন, এমন সন্ধ্যায় সুরমা কি না আসিয়া থাকিতে পারিবে?

সহসা তাঁহার মনে হইত, যেন সুরমার মত কার গলার স্বর শুনিতে পাইলাম, চমকিয়া উঠিতেন, যদিও অসম্ভব মনে হইত, তবু একবার চারিদিকে দেখিতেন, একবার বিছানায় যাইতেন, দেখিতেন—কেহ আছে কি না! যে উদয়াদিত্য সমস্ত দিন শত শত ক্ষুদ্র কাজে ব্যস্ত থাকিতেন, দরিদ্র প্রজারা তাহাদের ক্ষেতের ও বাগানের ফল মূল শাক সবজি উপহার লইয়া তাঁহার কাছে আসিত, তিনি তাহাদের জিজ্ঞাসা পড়া করিতেন, তাহাদের পরামর্শ দিতেন; আজ কাল আর সে সব কিছুই করিতে পারেন না, তবুও সন্ধ্যা-বেলায় শ্রান্ত হইয়া পড়েন—শ্রান্তপদে শয়নালয়ে আইসেন, মনের মধ্যে যেন একটা আশা থাকে যে, সহসা শয়ন-কক্ষের দ্বার খুলিলেই দেখিতে পাইব—সুরমা সেই বাতায়নে বসিয়া আছে। উদয়াদিত্য যখন দেখিতে পান, বিভা একাকী ম্লান মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তখন তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। বিভাকে কাছে ডাকেন, তাহাকে আদর করেন, তাহাকে কত কি স্নেহের কথা বলেন, অবশেষে দাদার হাত ধরিয়া বিভা কাঁদিয়া উঠে, উদয়াদিত্যেরও চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে। এক দিন উদয়াদিত্য বিভাকে ডাকিয়া কহিলেন, "বিভা, এ বাড়িতে আর তোর কে রহিল? তোকে এখন শ্বশুর বাড়ি পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিই। কি বলিস্? আমার কাছে লজ্জা করিস্ না বিভা! তুই আর কার কাছে তোর মনের সাধ প্রকাশ করিবি বল্?" বিভা চুপ করিয়া রহিল। কিছু বলিল না। এ কথা কি আর জিজ্ঞাসা করিতে হয়? পিতৃ-ভবনে কি আর তাহার থাকিতে ইচ্ছা করে? পৃথিবীতে যে তাহার একমাত্র জুড়াইবার স্থল আছে, সেই খানে—সেই চন্দ্রদ্বীপে যাইবার জন্য তাহার প্রাণ অস্থির হইবে না ত কি? কিন্তু তাহাকে লইতে পর্য্যন্ত একটিও ত লোক আসিল না! কেন আসিল না?

বিভাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাইবার প্রস্তাব উদয়াদিত্য একবার পিতার নিকট উত্থাপন করিলেন। প্রতাপাদিত্য কহিলেন "বিভাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাইতে আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু তাহাদের নিকট যদি বিভার কোন আদর থাকিত, তবে তাহারা বিভাকে লইতে নিজে হইতে লোক পাঠাইত। আমাদের অত ব্যস্ত হইবার আবশ্যক দেখি না!"

রাজমহিষী বিভাকে দেখিয়া কান্নাকাটি করেন। বিভার সধবাবস্থায় বৈধব্য কি চোখে দেখা যায়? বিভার করুণ মুখখানি দেখিলে তাঁহার প্রাণে শেল বাজে। তাহা ছাড়া মহিষী তাঁহার জামাতাকে অত্যন্ত ভাল বাসেন, সে একটা কি ছেলেমানুষী করিয়াছে বলিয়া তাহার ফল যে এত দূর পর্য্যন্ত হইবে, ইহা তাঁহার কিছুতেই ভাল লাগে নাই। তিনি

মহারাজের কাছে গিয়া মিনতি করিয়া বলিলেন, "মহারাজ বিভাকে শ্বশুর বাড়ি পাঠাও!" মহারাজা রাগ করিলেন, কহিলেন "ঐ এক কথা আমি অনেক বার শুনিয়াছি, আর আমাকে বিরক্ত করিও না। যখন তাহারা বিভাকে ভিক্ষা চাহিবে, তখন তাহারা বিভাকে পাইবে!" মহিষী কহিলেন, "মেয়ে অধিক দিন শ্বশুর বাড়ি না গেলে দশ জনে কি বলিবে?" প্রতাপাদিত্য কহিলেন "আর—প্রতাপাদিত্য নিজে সাধিয়া যদি মেয়েকে পাঠায় আর রামচন্দ্র রায় যদি তাহাকে দ্বার হইতে দূর করিয়া দেয়, তাহা হইলেই বা দশ জনে কি বলিবে?"

মহিষী কাঁদিতে কাঁদিতে ভাবিলেন, মহারাজা এক এক সময় কি যে করেন তাহার কোন ঠিকানা থাকে না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

—*—

মান অপমানের প্রতি রাজা রামচন্দ্র রায়ের অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টি। রাজা এক দিন চতুর্দ্দোলায় করিয়া রাস্তায় বাহির হইয়াছিলেন, দুই জন অনভিজ্ঞ তাঁতী তাহাদের কুটীরের সম্মুখে বসিয়া তাঁত বুনিতেছিল, চতুর্দ্দোল দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়ায় নাই, রাজা তাহাই লইয়া হুলস্থূল করিয়া তুলিয়াছিলেন। একবার যশোহরে তাঁহার শ্বশুরবাড়ির এক চাকরকে তিনি একটা কি কাজের জন্য আদেশ করিয়াছিলেন, সে বেচারা এক শুনিতে আর শুনিয়াছিল, কাজে ভুল করিয়াছিল, মহামানী রামচন্দ্র রায় তাহা হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, শ্বশুরবাড়ির ভৃত্যেরা তাঁহাকে মানে না, তাহারা অবশ্য তাহাদের মনিবদের কাছেই এইরূপ শিখিয়াছে, নহিলে তাহারা সাহস করিত না। বিশেষতঃ সেই দিন প্রাতঃকালেই তিনি দেখিয়াছিলেন যুবরাজ উদয়াদিত্য সেই চাকরকে চুপি চুপি কি একটা কথা বলিতেছিলেন—অবশ্য তাঁহাকে অপমান করিবার পরামর্শই চলিতেছিল, নহিলে আর কি হইতে পারে'! একদিন কয়েক জন বালক মাটির ঢিপির সিংহাসন গড়িয়া, রাজা, মন্ত্রী ও সভাসদ সাজিয়া রাজসভার অনুকরণে খেলা করিতেছিল, রাজার কাণে যায়, তিনি তাহাদের পিতাদের ডাকিয়া বিলক্ষণ শাসন করিয়া দেন।

আজ মহারাজা গদির উপরে তাকিয়া ঠেসান দিয়া গুড়গুড়ি টানিতেছেন। সম্মুখে এক ভীরু দরিদ্র অপরাধী খাড়া রহিয়াছে, তাহার বিচার চলিতেছে। সে ব্যক্তি কোন সূত্রে প্রতাপাদিত্য ও রামচন্দ্র রায় সংক্রান্ত ঘটনা শুনিতে পায়, ও তাহাই লইয়া আপনা-আপনির মধ্যে আলোচনা করে, তাহাই শুনিয়া তাহার শত্রুপক্ষের এক জন সে কথাটা রাজার কাণে উত্থাপন করে। রাজা মহা খাপা হইয়া তাহাকে তলব করেন। তাহাকে ফাঁসিই দেন, কি নির্ব্বাসনই দেন, এমনি একটা কাণ্ড বাধিয়া গেছে।

রাজা বলিতেছেন, "বেটা, তোর এত বড় যোগ্যতা!"

সে কাঁদিয়া কহিতেছে, "দোহাই মহারাজ, আমি এমন কাজ করি নাই!"

মন্ত্রী কহিতেছেন, "বেটা, প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে আর আমাদের মহারাজের তুলনা।"

দেওয়ান কহিতেছেন, "বেটা, জানিস্ না, যখন প্রতাপাদিত্যের বাপ প্রথম রাজা হয়, তখন তাহাকে রাজটীকা পরাইবার জন্য সে আমাদের মহারাজার স্বর্গীয় পিতামহের কাছে

বেদন করে। অনেক কাঁদাকাটা করাতে ন তাঁহার বাঁ পায়ের ক'ড়ে আঙুল দিয়া হাকে টীকা পরাইয়া দেন।"

রমাই ভাড় কহিতেছে, "বিক্রমাদিত্যের লে প্রতাপাদিত্য, উহারা ত দুই পুরুষে গ্না! প্রতাপাদিত্যের পিতামহ ছিল কেঁচো, চোর পুত্র হইল জোঁক, বেটা প্রজার রক্ত ইয়া খাইয়া বিষম ফুলিয়া উঠিল, সেই াকের পুত্র আজ মাথা খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া াটা কুলোপানা করিয়া তুলিয়াছে ও সাপের চক্র ধরিতে শিখিয়াছে। আমরা পুরুষানু-ম রাজসভায় ভাঁড়বৃত্তি করিয়া আসিতেছি, মরা বেদে, আমরা জাত সাপ চিনি না?"

জা রামচন্দ্র রায় আজ বিষম সন্তুষ্ট হইয়া প্রফুল্ল বদনে গুড়গুড়ি টানিতে লাগিলেন। আজকাল প্রত্যহ সভায় প্রতাপাদিত্যের উপর বার করিয়া আক্রমণ হয়। প্রতাপাদিত্যের লক্ষ্য পূর্ব্বক শব্দভেদী বচন-বাণ বর্ষণ রিয়া সেনানীদের তূণ নিঃশর হইলে সভা হয়। যাহা হউক, আজিকার বিচারে পরাধী অনেক কাঁদাকাটি করাতে দোর্দ্দণ্ড-তাপ রামচন্দ্র রায় কহিলেন—"আচ্ছা যা' এ যাত্রা বাঁচিয়া গেলি, ভবিষ্যতে সাবধান কিস্!"

অন্যান্য সভাসদ চলিয়া গেল, কেবল মন্ত্রী রমাই ভাঁড় রাজার কাছে রহিল। প্রতা-দিত্যের কথাই চলিতে লাগিল।

রমাই কহিল, "আপনি ত চলিয়া আই-ন, এদিকে যুবরাজ বাবাজি বিষম গোলে ড়লেন। রাজার অভিপ্রায় ছিল, কন্যাটি বা হইলে হাতের লোহা ও বালা দুগাছি ক্রয় করিয়া রাজকোষে কিঞ্চিৎ অর্থাগম হয়। রাজ তাহাতে ব্যাঘাত করিলেন। তাহা ইয়া তন্বী কত?"

রাজা হাসিতে লাগিলেন, কহিলেন "বটে!"

মন্ত্রী কহিলেন, "মহারাজ, শুনিতে পাই, প্রতাপাদিত্য আজকাল আপশোষে সারা হইতেছেন। এখন কি উপায়ে মেয়েকে শ্বশুর বাড়ি পাঠাইবেন, তাহাই ভাবিয়া তাঁহার আহার নিদ্রা নাই।"

রাজা কহিলেন "সত্য নাকি!" বলিয়া হাসিতে লাগিলেন, তামাক টানিতে লাগিলেন, বড়ই আনন্দ বোধ হইল!

মন্ত্রী "আমি বলিলাম, আর মেয়েকে শ্বশুর বাড়ি পাঠাইয়া কাজ নাই! তোমাদের ঘরে মহারাজ বিবাহ করিয়াছেন, ইহাতেই তোমাদের সাত পুরুষ উদ্ধার হইয়া গেছে। তাহার পরে আবার তোমাদের মেয়েকে ঘরে আনিয়া ঘর নীচু করা, এত পুণ্য এখনও তোমরা কর নাই! কেমন হে ঠাকুর!"

রমাই কহিল, "তাহার সন্দেহ আছে! মহারাজ, আপনি যে, পাঁকে পা দিয়াছেন, সে ত পাঁকের বাবার ভাগ্য, কিন্তু তাই বলিয়া ঘরে ঢুকিবার সময় পা ধুইয়া আসিবেন না ত কি!"

এইরূপে হাস্য পরিহাস চলিতে লাগিল। প্রতাপাদিত্য ও উদয়াদিত্যের কাল্পনিক মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া তাহাদিগকে ক্ষতবিক্ষত করা হইতে লাগিল। উদয়াদিত্যের যে কি অপরাধ তাহা বুঝিতে পারি না। তিনি যে নিজে বিপদকে অগ্রাহ্য করিয়া রামচন্দ্র রায়ের প্রাণরক্ষা করিলেন, সে সকল কথা ভুলায় গেল, আর, তিনি প্রতাপাদিত্যের সন্তান হইয়াছেন, এই অপরাধে রামচন্দ্র রায় তাঁহার কথা তুলিয়া অকাতরে হাস্য পরিহাস করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র রায় যে নিষ্ঠুর তাহা নহে, তিনি একজন লঘুহৃদয়, সঙ্কীর্ণপ্রাণ

লোক। উদয়াদিত্য যে তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি কৃতজ্ঞ নহেন। তিনি মনে করেন, ইহাত হইবেই, ইহা না হওয়াই অন্যায়। রামচন্দ্র রায় বিপদে পড়িলে তাঁহাকে সকলে মিলিয়া বাঁচাইবে না ত কি! তাঁহার মনে হয়, রামচন্দ্র রায়ের পায়ে কাঁটা ফুটিলে সমস্ত জগৎসংসারের প্রাণে বেদনা লাগে। তিনি মনে করিতে পারেন না যে, পৃথিবীর একজন অতি ক্ষুদ্রতম লোকেরও নিজের বিপদের কাছে মহারাজাধিরাজ রামচন্দ্র রায় কিছুই নহে। দিবারাত্রি শত শত স্তুতিবাদকের দাঁড়ি-পাল্লায় একদিকে জগৎকে ও একদিকে নিজেকে চড়াইয়া তিনি নিজকেই ওজনে ভারী বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, এইজন্য সহজে আর কাহরো উপরে তাঁর কৃতজ্ঞতার উদয় হয় না। তাহা ছাড়া উদয়াদিত্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা উদয় না হইবার আর এক কারণ এই যে, তিনি মনে করেন উদয়াদিত্য নিজের ভগিনীর জন্যই তাঁহাকে বাঁচাইয়াছেন, তাঁহার প্রাণরক্ষাই উদয়াদিত্যের উদ্দেশ্য ছিল না। তাহা ছাড়া, যদি বা রামচন্দ্রের হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার সঞ্চার হইত, তবুও তিনি উদয়াদিত্যকে লইয়া হাস্য পরিহাসের ক্রটি করিতেন না। কারণ যেখানে দশজনে মিলিয়া একজনকে লইয়া হাসিতামাসা করিতেছে, বিশেষতঃ রমাই ভাঁড় যাহাকে লইয়া বিদ্রূপ করিতেছে, সেখানে তিনি তাহাদের মুখ বন্ধ করেন বা তাহাদের সহিত যোগ না দেন, এমন তাহার মনের জোর নাই। তাহার মনে হয়, তাহা হইলে সকলে কি মনে করিবে।

এখনো বিভার প্রতি রামচন্দ্র রায়ের আসক্তির মত একটা ভাব আছে। বিভা সুন্দরী, বিভা সবে মাত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে, রামচন্দ্র রায়ের সহিত বিভার অতি অল্প দিনই সাক্ষাৎ হইয়াছে। প্রতাপাদিত্যের প্রতি অ[বহেলা] প্রদর্শন করিয়াছেন—কিন্তু যখন সে রাত্রে প্রথম নিদ্রা ভাঙ্গিয়া সহসা তিনি দেখি[লেন], বিভা শয্যায় বসিয়া কাঁদিতেছে, তাহা[র] মুখে জ্যোৎস্না পড়িয়াছে তাহার অর্দ্ধ-অনাবৃ[ত] বক্ষ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, তাহার মধু[র] করুণ দুটি চক্ষু বহিয়া জল পড়িতেছে, তাহা[র] ক্ষুদ্র দুটি অধর কচি কিশলয়ের মত কাঁপিতেছে তখন তাঁহার মনে সহসা একটা কি উচ্ছ্বা[স] হইল, বিভার মাথা কোলে রাখিলেন, বিভা[র] চোখের জল মুছাইয়া দিলেন, বিভার কর[ুণ] অধর চুম্বন করিবার জন্যে হৃদয়ে একটা আবে[গ] উপস্থিত হইল, তখনই প্রথমতঃ তাঁহার শরী[রে] মুহূর্ত্তের জন্য বিদ্যুৎ সঞ্চার হইল, তখন প্রথম তিনি বিভার নববিকাশিত যৌবনে[র] লাবণ্যরাশি দেখিতে পাইলেন, সেই প্রথ[ম] তাঁহার বিশ্বাস বেগে বহিল, অর্দ্ধ-নিমীলি[ত] নেত্রপল্লবে জলের রেখা দেখা দিল, হৃদ[য়] বেগে উঠিতে পড়িতে লাগিল। বিভাকে চুম্বন করিতে গেলেন। এমন সময়ে দ্বারে আঘাত পড়িল, এমন সময়ে বিপদের সংবা[দ] শুনিতে পাইলেন। সেই যে হৃদয়ের প্রথ[ম] বিকাশ, সেই যে বাসনার প্রথম উচ্ছ্বা[স] সেই যে নয়নের মোহ দৃষ্টি, তাহা পরিতৃপ্ত হইল না বলিয়া তাহারা তৃষা কাতর হইয়া রামচন্দ্র রায়ের স্মৃতি অধিকার করিয়া রহিল ইহা স্থায়ী প্রেমের ভাব নহে, কারণ রামচন্দ্র রায়ের লঘু হৃদয়ের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে একটা বিলাস দ্রব্যের প্রতি সৌখীন হৃদয়ে[র] যেমন সহসা একটা টান পড়ে সৌখীন রামচন্দ্র রায়েরও বিভার প্রতি সেইরূপ একটা ভা[ব] জন্মিয়াছিল। যাহা হউক, যে কারণেই হউক রামচন্দ্র রায়ের যৌবন-স্বপ্নে বিভা জাগিতে[ছি]ল। বিভাকে পাইবার জন্য তাঁহার একটা

...লায় উদয় হইয়াছিল। কিন্তু যদি বিভাকে ...নতে পাঠান, তাহা হইলে সকলে কি মনে ...বে। সভাসদেরা যে তাঁহাকে স্ত্রৈণ মনে ...বে, মন্ত্রী যে মনে মনে অসন্তুষ্ট হইবে, ...ই ভাঁড় যে মনে মনে হাসিবে। তাহা ...া, প্রতাপাদিত্যের তাহা হইলে কি শাস্তি ...? শ্বশুরের উপর প্রতিহিংসা তোলা ... কৈ? এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া বিভাকে ...নতে পাঠাইতে তাঁহার ভরসা হয় না, ...ত্তি হয় না। এমন কি, বিভাকে লইয়া হাস্য ...হাস চলিতে থাকে, তাহাতে বাধা দিতে ...র সাহস হয় না, এবং প্রতাপাদিত্যের ... মনে করিয়া, তাহাতে বাধা দিতে তাঁহার ...ও হয় না।

...রমাই ভাঁড় ও মন্ত্রী চলিয়া গেলে রাম-...হন মাল আসিয়া যোড় হাতে কহিল ...হারাজ!"

রাজা কহিলেন, "কি রামমোহন!"

রামমোহন "মহারাজ, আজ্ঞা দিন, আমি ...রাণীকে আনিতে যাই।"

রাজা কহিলেন, "সে কি কথা!"

রামমোহন কহিল, "আজ্ঞা হাঁ। অন্তঃপুর ... হইয়া আছে, আমি তাহা দেখিতে পারিব ...। অন্তঃপুরে যাই মহারাজের ঘরে কাহা-...ও দেখিতে পাই না, আমার যেন প্রাণ ...মন করিতে থাকে। আমার মা লক্ষ্মী গৃহে ...সিয়া গৃহ উজ্জ্বল করুন আমরা দেখিয়া চক্ষু ...র্থক করি।"

রাজা কহিলেন, "রামমোহন, তুমি ...গল হইয়াছ? সে মেয়েকে আমি ঘরে ...নি?"

রামমোহন নেত্র বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "...ন মহারাজ, আমার মা ঠাকুরাণী কি অপ-...ধ করিয়াছেন?"

রাজা কহিলেন, "বল কি রামমোহন? প্রতাপাদিত্যের মেয়েকে আমি ঘরে আনিব?"

রামমোহন কহিল, "কেন আনিবেন না? প্রতাপাদিত্যের সহিত তাঁহার সম্পর্ক কিসের? যত দিন বিবাহ না হয় তত দিন মেয়ে বাপের; বিবাহ হইলে পর আর তাহাতে বাপের অধিকার থাকে না। এখন আপনার মহিষী আপনার— আপনি যদি তাঁহাকে ঘরে না আনেন আপনি যদি তাঁহাকে সমাদর না করেন, তবে আর কে করিবে?"

রাজা কহিলেন, "প্রতাপাদিত্যের মেয়েকে যে আমি বিবাহ করিয়াছি, ইহাই যথেষ্ট হইয়াছে, আবার তাহাকে ঘরে আনিব? তাহা হইলে মান রক্ষা হইবে কি করিয়া?"

রামমোহন কহিল, "মান রক্ষা? আপনার নিজের মহিষীকে আপনি পরের ঘরে ফেলিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার উপর আপনার কোন অধিকার নাই, তাঁহার উপর অন্য লোক যাহা ইচ্ছা প্রভুত্ব করিতে পারে, ইহাতেই কি আপনার মান রক্ষা হইতেছে?"

রাজা কহিলেন, "যদি প্রতাপাদিত্য মেয়েকে না দেয়?"

রামমোহন বিশাল বক্ষ ফুলাইয়া কহিল, "কি বলিলেন মহারাজ? যদি না দেয়? এত-বড় সাধ্য কাহার যে দিবে না? আমার মা জননী, আমাদের ঘরের মা লক্ষ্মী কার সাধ্য তাঁহাকে আমাদের কাছ হইতে রাখিতে পারে? যত বড় প্রতাপাদিত্যই হউন না কেন, তাঁহার হাত হইতে কাড়িয়া লইব। এই বলিয়া গেলেম। আমার মাকে আমি আনিব, তুমি বারণ করিবার কে?" বলিয়া রামমোহন প্রস্থানের উপক্রম করিল।

রাজা। তাড়াতাড়ি কহিলেন—'রামমোহন, যেও না, শোন শোন। আচ্ছা তুমি

মহিষীকে আনিতে যাও তাহাতে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু—দেখ—এ কথা যেন কেহ শুনিতে না পায়! রমাই কিংবা মন্ত্রীর কাণে যেন এ কথা না উঠে!"

রামমোহন কহিল, "যে আজ্ঞা মহারাজ! বলিয়া চলিয়া গেল।

যদিও মহিষী রাজপুরে আসিলেই সকলে জানিতে পারিবে, তথাপি সে অনেক বিলম্ব আছে, তাহার জন্য প্রস্তুত হইবার সময় আছে. আপাততঃ উপস্থিত লজ্জার হাত এড়াইতে পারিলেই রামচন্দ্র রায় বাঁচেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

—*—

উদয়াদিত্য কিসে সুখে থাকেন, দিনরাত বিভার সেই একমাত্র চেষ্টা। নিজের হাতে সে তাঁহার সমস্ত কাজ করে। সে নিজে তাহার খাবার আনিয়া দেয়, আহারের সময় সম্মুখে বসিয়া থাকে, সামান্য বিষয়েও ত্রুটি হইতে দেয় না। যখন সন্ধ্যার সময় উদয়াদিত্য তাঁহার ঘরে আসিয়া বসেন, দুই হাতে চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন—বুঝি চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে, তখন বিভা আস্তে আস্তে তাঁহার পায়ের কাছে আসিয়া বসে—কথা উত্থাপন করিতে চেষ্টা করে, কিছুই কথা যোগায় না। দুই জনে শুব্ধ, কাহারও মুখে কথা নাই, মলিন দীপের আলো মাঝে মাঝে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ালের উপরে একটা আঁধারের ছায়া কাঁপিতেছে, বিভা অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া সেই ছায়ার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বুক ফাটিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কাঁদিয়া উঠে,"দাদা সে কোথায় গেল?" উদয়াদিত্য চমকিয়া উঠে চক্ষুর আচ্ছাদন অপসারণ করিয়া বিভার মুখে দিকে চাহিয়া থাকেন, যেন বিভা কি বলি ভাল বুঝিতে পারেন নাই, যেন তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন, সহসা চৈতন্য হয়, তাড়া তাড়ি চোখের জল মুছিয়া বিভার কাছে আসিয়া বলেন, "আয়, বিভা একটা গল্প বলি শোন!"

বর্ষার দিন—খুব মেঘ করিয়াছে; সমস্ত দি ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। দিনটা আঁধা করিয়া রহিয়াছে, বাগানের গাছপালাগু স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া ভিজিতেছে। এক এক বার বাতাস দিতেছে ও ঘরের মধ্যে বৃষ্টির ছাঁ আসিতেছে। উদয়াদিত্য চুপ করিয়া বসি আছেন; আকাশে মেঘ ডাকিতেছে, দিগে বিদ্যুৎ হানিতেছে। বৃষ্টির অবিশ্রাম শ কেবল যেন বলিতেছে, "সুরমা নাই—নাই।" মাঝে মাঝে আর্দ্রবাতাস হুহু করি আসিয়া যেন বলিয়া যায়, "সুরমা কোথায়! বিভা ধীরে ধীরে উদয়াদিত্যের কাছে আসি কহে—"দাদা!" দাদা আর উত্তর দিতে পারে না, বিভাকে দেখিয়াই তিনি মুখ ঢাকিয়া বা য়নের উপরে মাথা রাখিয়া পড়েন, মাথা উপরে বৃষ্টি পড়িতে থাকে। এমনি করি দিন চলিয়া যায়, সন্ধ্যা হইয়া আসে, রাত্রি হইতে থাকে। বিভা উদয়াদিত্যের আহা রের আয়োজন করিয়া আবার আসিয়া বলে 'দাদা, খাবার আসিয়াছে, খাও'সে!" উদয় দিত্য কোন উত্তর করেন না। রাত্রি অধি হইতে লাগিল। বিভা কাঁদিয়া কহে, "দাদা উঠ," রাত হইল।" উদয়াদিত্য মুখ তুলি দেখেন বিভা কাঁদিতেছে; তাড়াতাড়ি উঠি বিভার চোখ মুছাইয়া খাইতে যান। ভা করিয়া খান না। বিভা তাই দেখিয়া নিশ

য়া শুইতে যায়, সে আর আহার স্পর্শ না।

বিভা কথা কহিতে, গল্প করিতে চেষ্টা করে, বিভা অধিক কথা কহিতে পারে না; াদিত্যকে কি করিয়া যে সুখে রাখিবে য়া পায় না। সে কেবল ভাবে, আহা দাদা মহাশয় থাকিতেন! •

আজ কাল উদয়াদিত্যের মনে কেমন টা ভয় উপস্থিত হইয়াছে। তিনি প্রতাপা-ত্যকে অত্যন্ত ভয় করেন। আর সে পূর্ব্বে-। সাহস নাই। বিপদকে তৃণজ্ঞান করিয়া ্যাচারের বিরুদ্ধে প্রাণপণ করিতে এখন ় পারেন না। সকল কাজেই ইতস্ততঃ রেন, সকল বিষয়েই সংশয় উপস্থিত হয়।

একদিন উদয়াদিত্য শুনিলেন, ছাপরার মদারের কাছারীতে রাত্রিযোগে লাঠিয়াল ঠাইয়া কাছারী লুঠ করিবার ও কাছারী টতে আগুণ লাগাইয়া দিবার আদেশ হই-ছে। উদয়াদিত্য তৎক্ষণাৎ তাঁহার অশ্ব স্তত করিতে কহিয়া অন্তঃপুরে গেলেন। নগৃহে প্রবেশ করিয়া একবার চারিদিক খিলেন। কি ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে বিতে অন্যমনস্ক হইয়া বেশ পরিবর্ত্তন রিতে লাগিলেন। বাহিরে আসিলেন। ভৃত্য সিয়া কহিল "যুবরাজ অশ্ব প্রস্তুত হইয়াছে। াথায় যাইতে হইবে?" যুবরাজ কিছুক্ষণ ন্যমনস্ক হইয়া ভৃত্যের মুখের দিকে চাহিয়া হলেন ও অবশেষে কহিলেন, "কোথাও না। ম অশ্ব লইয়া যাও।"

এক দিন এক ক্রন্দনের শব্দ শুনিতে পাইয়া য়াদিত্য বাহির হইয়া আসিলেন, দেখি-ন রাজকর্ম্মচারী এক প্রজাকে গাছে বাঁধিয়া রিতেছে। প্রজা কাঁদিয়া যুবরাজের মুখের কে চাহিয়া কহিল, "দোহাই যুবরাজ।" যুব-রাজ তাহার যন্ত্রণা দেখিতে পারিলেন না, তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করি-লেন। আগে হইলে ফলাফল বিচার না করিয়া কর্ম্মচারীকে বাধা দিতেন, প্রজাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন।

ভাগবত ও সীতারামের বৃত্তি বন্ধ হইয়া গেছে। তাহাদিগকে প্রকাশ্যে অথবা গোপনে অর্থ সাহায্য করিতে যুবরাজের আর সাহস হয় না। যখনি তাহাদের কষ্টের কথা শুনেন, তখনি মনে করেন "আজই আমি টাকা পাঠাইয়া দেব।" তাহার পরেই ইতস্ততঃ করিতে থাকেন, পাঠান' আর হয় না।

কেহ যেন না মনে করেন, উদয়াদিত্য প্রাণের ভয়ে এরূপ করিতেছেন। সম্প্রতি জীবনের প্রতি তাঁহার যে পূর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ আসক্তি জন্মিয়াছে, তাহা নহে। তাঁহার মনে একটা অন্ধ ভয় উপস্থিত হইয়াছে। প্রতাপা-দিত্যকে তিনি যেন রহস্যময় কি-একটা মনে করেন? যেন উদয়াদিত্যের অদৃষ্ট, উদয়া-দিত্যের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্ত প্রতাপাদিত্যের মুষ্টির মধ্যে রহিয়াছে। উদয়াদিত্য যখন মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছেন, জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে অবস্থান করিতেছেন, তখনও যদি প্রতাপাদিত্য ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বাঁচিতে আদেশ করেন, তাহা হইলে যেন তখনো তাঁহাকে মৃত্যুর মুখ হইতে ফিরিয়া আসিতে হইবে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

—*—

বিধবা রুক্মিণীর(মঙ্গলার) কিঞ্চিৎ নগদ টাকা আছে। সেই টাকা খাটাইয়া সুদ লইয়া সে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। রূপ এবং রূপা এই দুয়ের জোরে সে অনেককে বশে রাখিয়াছে। সীতারাম সৌখীন লোক, অথচ ঘরে এক পয়সার সংস্থান নাই, এই জন্য রুক্মিণীর রূপ ও রূপা উভয়ের প্রতিই তাহার আন্তরিক টান আছে। যে দিন ঘরে হাঁড়ি কাঁদিতেছে, সে দিন সীতারামকে দেখ, দিব্য নিশ্চিন্ত মুখে হাতে লাঠি লইয়া পাতলা চাদর উড়াইয়া বুক ফুলাইয়া রাস্তা দিয়া চলিতেছে, মঙ্গলার বাড়ি যাইবে। পথে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, "কেমন হে সীতারাম, সংসার কেমন চলিতেছে?" সীতারাম তৎক্ষণাৎ অম্লানবদনে বলে, "বেশ চলিতেছে! কাল আমাদের ওখানে তোমার নিমন্ত্রণ রহিল!" সীতারামের বড় বড় কথাগুলা কিছুমাত্র কমে নাই, বরঞ্চ অবস্থা যতই মন্দ হইতেছে কথার পরিমাণ লম্বা ও চওড়ার দিকে ততই বাড়িতেছে। সীতারামের অবস্থাও বড় মন্দ হইতে চলিল। সম্প্রতি এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, পিসা তাঁহার অনারারি পিসা-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে মানস করিতেছেন।

আজ টাকার বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে, সীতারাম রুক্মিণীর বাড়িতে আসিয়াছে। হাসিয়া, কাছে ঘেঁসিয়া কহিল'—

"ভিক্ষা যদি দেবে রাই,
(আমার) সোণা রূপায় কাজ নাই,
(আমি) প্রাণের দায়ে এসেছি হে,
মান রতন ভিক্ষা চাই।"

না, ভাই, ছড়াটা ঠিক খাটিল না। মান রতনে আমার আপাততঃ তেমন আবশ্যক নাই, যদি আবশ্যক হয় পরে দেখা যাইবে; আপাততঃ কিঞ্চিৎ সোণা রূপা পাইলে কাজ লাগে!"

রুক্মিণী সহসা বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিয়া কহিল, "তা' তোমার যদি আবশ্যক হইয়া থাকে ত তোমাকে দিব না ত' কাহাকে দিব?"

সীতারাম তাড়াতাড়ি কহিল "নাঃ—আবশ্যক এমনিই কি! তবে কি জান ভাই, আমার মার কাছে টাকা থাকে, আমি নিজের হাতে টাকা রাখি না। আজ সকালে মা ঘোড়াঘাটায় তাঁর জামাইয়ের বাড়ি গিয়াছেন। টাকা বাহির করিয়া দিতে ভুলিয়া গেছেন। তা আমি কালই শোধ করিয়া দিব!"

মঙ্গলা মনে মনে হাসিয়া কহিল "তোমার অত তাড়াতাড়ি করিবার আবশ্যক কি? যখন সুবিধা হয় শোধ দিলেই হইবে। তোমার হাতে দিতেছি, এ ত আর জলে ফেলিয়া দিতেছি না?" জলে ফেলিয়া দিলেও বরঞ্চ পাইবার সম্ভাবনা আছে, সীতারামের হাতে দিলে সে সম্ভাবনা টুকুও নাই, এই প্রভেদ।

মঙ্গলার এইরূপ অনুরাগের লক্ষণ দেখিয়া সীতারামের ভালবাসা একেবারে উথলিত হইয়া উঠিল। সীতারাম রসিকতা করিবার উদ্যোগ করিল। বিনা টাকায় নবাবী করা ও বিনা হাস্যরসে রসিকতা করা সীতারামের স্বভাবসিদ্ধ। সে যাহা মুখে আসে তাহাই বলে, ও আর কাহারো অপেক্ষা না করিয়া নিজেই হাসিতে থাকে। তাহার হাসি দেখিয়া হাসি পায়! সে যখন রাজবাড়ির প্রহরী ছিল, তখন অন্যান্য প্রহরীদের সহিত সীতারামের প্রায় মাঝে মাঝে দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিবার উদ্যোগ হইত, তাহার প্রধান কারণ, সীতা-

রাম যাহাকে মজা মনে করিত, আর সকলে তাহাকে মজা মনে করিত না। হনুমানপ্রসাদ তেওয়ারি পাহারা দিতে দিতে ঢুলিতে ছিল, সীতারাম আস্তে আস্তে তাহার পশ্চাতে গিয়া হঠাৎ পিঠে এমন এক কিল মারিল যে, সেই হাড়ভাঙ্গা রসিকতার জ্বালায় তাহার পিঠ ও পিত্ত এক সঙ্গে জ্বলিয়া উঠিল। সীতারাম উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে লাগিল; কিন্তু হনুমানপ্রসাদ সে হাসিতে যোগ না দিয়া, কিলের সহিত হাস্যরসের প্রভেদ ও করুণ রসের সম্বন্ধ উদাহরণ দ্বারা সীতারামকে অতিশয় স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিল। সীতারামের রসিকতার এমন আরো শত শত গল্প এইখানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সীতারামের অনুরাগ সহসা উথলিত হইয়া উঠিল, সে রুক্মিণীর কাছে ঘেঁসিয়া প্রীতিভরে কহিল "তুমি আমার সুভদ্রা, আমি তোমার জগন্নাথ।"

রুক্মিণী কহিল, মর্ মিন্সে। 'সুভদ্রা যে জগন্নাথের বোন্!'

সীতারাম কহিল, "তাহা কেমন করিয়া হইবে? তাহা হইলে সুভদ্রাহরণ হইল কি করিয়া!"

রুক্মিণী হাসিতে লাগিল, সীতারাম বুক ফুলাইয়া কহিল, "না, তা হইবে না, হাসিলে হইবে না, জবাব দাও। সুভদ্রা যদি বোনই হইল তবে সুভদ্রা হরণ হইল কি করিয়া।"

সীতারামের বিশ্বাস যে, সে এমন প্রবল যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছে যে, ইহার উপরে আর কথা কহিবার যো নাই।

রুক্মিণী অতি মিষ্টস্বরে কহিল, "দূর মূর্খ।"

সীতারাম গলিয়া গিয়া কহিল মূর্খই ত বটে তোমার কাছে আমি ত ভাই হারিয়াই আছি, তোমার কাছে আমি চিরকাল মূর্খ।"

সীতারাম মনে মনে ভাবিল, খুব জবাব দিয়াছি, বেশ কথা যোগাইয়াছে!

আবার কহিল, "আচ্ছা ভাই, কথাটা যদি তোমার পছন্দ না হইল, কি বলিয়া ডাকিলে তুমি খুসী হইবে, আমাকে বল!"

রুক্মিণী হাসিয়া কহিল, "বল প্রাণ।"

সীতারাম কহিল "প্রাণ!"

রুক্মিণী কহিল, "বল প্রিয়ে!"

সীতারাম কহিল "প্রিয়ে!"

রুক্মিণী কহিল "বল প্রিয়তমে!"

সীতারাম কহিল "প্রিয়তমে!"

রুক্মিণী কহিল "বল প্রাণপ্রিয়ে!"

সীতারাম কহিল "প্রাণপ্রিয়ে!"

"আচ্ছা ভাই প্রাণ-প্রিয়ে, তুমি যে টাকাটা দিলে, তাহার সুদ কত লইবে?

রুক্মিণী রাগ করিল, মুখ বাঁকাইয়া কহিল, "যাও যাও, এই বুঝি তোমার ভালবাসা! সুদের কথা কোন্ মুখে জিজ্ঞাসা করিলে?"

সীতারাম আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল, "না না, সে কি হয়? আমি কি ভাই সত্য বলিতেছিলাম? আমি যে ঠাট্টা করিতেছিলাম, এইটে আর বুঝিতে পারিলে না? ছি প্রিয়তমে!

সীতারামের মায়ের কি রোগ হইল, জানি না, আজ কাল প্রায় মাঝে মাঝে সে জামাই বাড়ি যাইতে লাগিল ও টাকা বাহির করিয়া দিবার বিষয়ে তাহার স্মরণশক্তি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল! কাজেই সীতারামকে প্রায় মাঝে মাঝে রুক্মিণীর কাছে আসিতে হইত। আজ কাল দেখা যায় সীতারাম ও রুক্মিণীতে মিলিয়া অতি গোপনে কি একটা বিষয় লইয়া পরামর্শ চলিতেছে। অনেক দিন পরামর্শের পর সীতারাম কহিল, "আমার ভাই অত ফান্দ

আসে না। এ বিষয়ে ভাগবতের সাহায্য না লইলে চলিবে না!”

সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় অত্যন্ত ঝড় হইতেছে। রাজবাড়ির ইতস্ততঃ দুমদাম করিয়া দরজা পড়িতেছে। বাতাস এমন বেগে বহিতেছে যে, বাগানের বড় বড় গাছের শাখা হেলিয়া ভূমিস্পর্শ করিতেছে। বন্যার মুখে ভগ্ন চূর্ণ গ্রামপল্লীর মত, ঝড়ের মুখে ছিন্নভিন্ন মেঘ ছুটিয়া চলিয়াছে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ, ঘন ঘন গর্জ্জন। উদয়াদিত্য চারি দিকের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ছোট একটি মেয়েকে কোলে লইয়া বসিয়া আছেন। ঘরের প্রদীপ নিভাইয়া দিয়াছেন। ঘর অন্ধকার। মেয়েটি কোলের উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সুরমা যখন বাঁচিয়াছিল, এই মেয়েটিকে অত্যন্ত ভালবাসিত। সুরমার মৃত্যুর পর ইহার মা ইহাকে আর রাজবাড়িতে পাঠায় নাই। অনেক দিনের পর সে আজ একবার রাজবাড়িতে বেড়াইতে আসিয়াছিল। সহসা উদয়াদিত্যকে দেখিয়া “কাকা” “কাকা” বলিয়া সে তাঁহার কোলের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। উদয়াদিত্য তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া তাঁহার শয়নগৃহে লইয়া আসিয়াছেন। উদয়াদিত্যের মনের ভাব এই যে, “সুরমা এই মেয়েটিকে যদি একবার দেখিতে আসে! ইহাকে যে সে বড় ভালবাসিত! এত স্নেহের ছিল, সে কি না আসিয়া থাকিতে পারিবে!” মেয়েটি একবার জিজ্ঞাসা করিল, “কাকা কাকী মা কোথায়?”

উদয়াদিত্য রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন—একবার তাঁহাকে ডাক্ না, মেয়েটি “কাকী মা কাকী মা” করিয়া ডাকিতে লাগিল। উদয়াদিত্যের মনে হইল, ঐ যেন কে সাড়া দিল। দূর হইতে ঐ যেন কে বলিয়া উঠিল, “এই যাই রে!” যেন স্নেহের মেয়েটির করুণ আহ্বান শুনিয়া স্নেহময়ী আর থাকিতে পারিল না, তাহাকে বুকে তুলিয়া লইতে আসিতেছে। বালিকা কোলের উপর ঘুমাইয়া পড়িল। উদয়াদিত্য প্রদীপ নিভাইয়া দিলেন। একটি ঘুমন্ত মেয়েকে কোলে করিয়া অন্ধকার ঘরে একাকী বসিয়া রহিলেন। বাহিরে হুহু করিয়া বাতাস বহিতেছে। ইতস্ততঃ খট্ খট্ করিয়া শব্দ হইতেছে। ঐ না পদশব্দ শুনা গেল? পদশব্দই বটে। বুক এমন দুড়্‌দুড়্ করিতেছে যে, শব্দ ভাল শুনা যাইতেছে না। দ্বার খুলিয়া গেল, ঘরের মধ্যে দীপালোক প্রবেশ করিল ইহাও কি কখনো সম্ভব! দীপ হস্তে চুপিচুপি ঘরে একটি স্ত্রীলোক প্রবেশ করিল; উদয়াদিত্য চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কহিলেন “সুরমা কি?” পাছে সুরমাকে দেখিলেই সুরমা চলিয়া যায়! পাছে সুরমা না হয়।

রমণী প্রদীপ রাখিয়া কহিল “কেন গা, আমাকে কি আর মনে পড়ে না?”

বজ্রধ্বনি শুনিয়া যেন স্বপ্ন ভাঙ্গিল। চমকিয়া উঠিয়া চক্ষু চাহিলেন। মেয়েটি জাগিয়া উঠিয়া কাকা কাকা বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহাকে বিছানার উপরে ফেলিয়া উদয়াদিত্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কি করিবেন কোথায় যাইবেন যেন ভাবিয়া পাইতেছে না। রুক্মিণী কাছে আসিয়া মুখ নাড়িয়া কহিল “বলি, এখন ত মনে পড়িবেই না। তবে এককালে কেন আশা দিয়া আকাশে তুলিয়াছিলে?” উদয়াদিত্য চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, কিছুই বলিতে পারিলেন না।

তখন রুক্মিণী তাহার ব্রহ্মাস্ত্র বাহির করিল। কাঁদিয়া কহিল, আমি তোমার কি দোষ করিয়াছি, যাহাতে তোমার চক্ষুশূল হইলাম। তুমিইত আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ। যে রমণী যুবরাজকে একদিন দেহ প্রাণ বিকাইয়াছে সে

আজ ভিখারিণীর মত পথে পথে বেড়াইতেছে এ পোড়াকপালে বিধাতা কি এই লিখিয়াছিল?

এইবার উদয়াদিত্যের প্রাণে গিয়া আঘাত লাগিল। সহসা তাঁহার মনে হইল আমিই বুঝি ইহার সর্ব্বনাশ করিয়াছি। অতীতের কথা ভুলিয়া গেলেন। ভুলিয়া গেলেন যৌবনের প্রমত্ত অবস্থায় রুক্মিণী কি করিয়া পদে পদে তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইয়াছে, প্রতিদিন তাঁহার পথের সম্মুখে জাল পাতিয়া বসিয়াছিল, আবর্ত্তের মত তাঁহাকে তাহার দুই মোহময় বাহু দিয়া বেষ্টন করিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে পাতালের অন্ধকারে নিক্ষেপ করিয়াছিল—সে সমস্তই ভুলিয়া গেলেন। দেখিলেন রুক্মিণীর বসন মলিন, ছিন্ন, রুক্মিণী কাঁদিতেছে। করুণ হৃদয় উদয়াদিত্য কহিলেন "তোমার কি চাই?"

রুক্মিণী কহিল"আমার আর কিছু চাই না, আমার ভালবাসা চাই। আমি ঐ বাতায়নে বসিয়া তোমার বুকে মুখ রাখিয়া তোমার সোহাগ পাইতে চাই। কেন গা, সুরমার চেয়ে কি এ মুখ কালো? যদি কালোই হইয়া থাকে ত সে তোমার জন্যই পথে পথে ভ্রমণ করিয়া। আগে ত কালো ছিল না।

এই বলিয়া রুক্মিণী উদয়াদিত্যের শয্যার উপর বসিতে গেল। উদয়াদিত্য আর থাকিতে পারিলেন না। কাতর হইয়া বলিয়া উঠিলেন "ওবিছানায় বসিও না, বসিও না।"

রুক্মিণী আহত ফণিনীর মত মাথা তুলিয়া বলিল "কেন বসিব না?"

উদয়াদিত্য তাহার পথ রোধ করিয়া কহিলেন "না ও বিছানার কাছে তুমি যাইও না। তুমি কি চাও আমি এখনি দিতেছি।"

রুক্মিণী কহিল "আচ্ছা তোমার আঙুলের ঐ আংটিটি দাও।"

উদয়াদিত্য তৎক্ষণাৎ তাঁহার হাত হইতে আংটি খুলিয়া ফেলিয়া দিলেন। রুক্মিণী কুড়াইয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল। মনে ভাবিল ডাকিনীর মন্ত্রমোহ এখন দূর হয় নি, আরো কিছুদিন যাক্, তাহার পর আমার মন্ত্র খাটিবে। রুক্মিণী চলিয়া গেলে উদয়াদিত্য শয্যার উপরে আসিয়া পড়িলেন। দুই বাহুতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া কহিলেন, "কোথায় সুরমা কোথায়। আজ আমার এ দগ্ধ বজ্রাহত হৃদয়ে শান্তি দিবে কে?"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

ভাগবতের অবস্থা বড় ভাল নহে। সে চুপচাপ বসিয়া কয়দিন ধরিয়া অনবরত তামাক ফুঁকিতেছে। ভাগবত যখন মনোযোগের সহিত তামাক ফুঁকিতে থাকে, তখন প্রতিবেশীদের আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হয়। কারণ, তাহার মুখ দিয়া কালো কালো ধোঁয়া পাকাইয়া পাকাইয়া উঠিতে থাকে, তাহার মনের মধ্যেও তেমনি একটা কৃষ্ণবর্ণ পাকচক্রের কারখানা চলিতে থাকে। কিন্তু ভাগবত লোকটা বড় ধর্ম্মনিষ্ঠ। সে কাহারো সঙ্গে মেশে না 'এই যা' তাহার দোষ, হরিনামের মালা লইয়া থাকে, অধিক কথা কয় না, পরচর্চ্চায় থাকে না। কিন্তু কেহ যখন ঘোরতর বিপদে পড়ে, তখন ভাগবতের মত পাকা পরামর্শ দিতে আর কেহ পারে না। ভাগবত কখন ইচ্ছা করিয়া পরের অনিষ্ট করে না, কিন্তু আর কেহ যদি তাহার অনিষ্ট করে, তবে ভাগবত ইহজন্মে তাহা কখন ভোলে না, তাহার শোধ তুলিয়া তবে সে হুঁকা নামাইয়া রাখে। এক কথায়—সংসারে

যাহাকে ভাল বলে, ভাগবত তাহাই। পাড়ার লোকেরাও তাহাকে মান্য করে, দুরবস্থায় ভাগবত ধার করিয়াছিল, কিন্তু ঘটি বাটি বেচিয়া তাহা শোধ করিয়াছে।

এক দিন সকালে সীতারাম আসিয়া ভাগবতকে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, কেমন আছ হে ?"

ভাগবত কহিল, "ভাল না।"

সীতারাম কহিল, "কেন বল দেখি ?"

ভাগবত কিয়ৎক্ষণ তামাক টানিয়া সীতারামের হাতে হুকা দিয়া কহিল "বড় টানাটানি পড়িয়াছে।"

সীতারাম কহিল "বটে ? তা কেমন করিয়া হইল ?"

ভাগবত মনে মনে কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া কহিল, "কেমন করিয়া হইল ? তোমাকেও তাহা বলিতে হইবে নাকি ? আমি ত জানিতাম আমারো যে দশা তোমারো সেই দশা !"

সীতারাম কিছু অপ্রস্তুত হইয়া কহিল, "না, হে, আমি সে কথা কহিতেছি না, আমি বলিতেছি তুমি ধার কর না কেন ?"

ভাগবত কহিল, "ধার করিলে ত শুধিতে হইবে। শুধিব কি দিয়া ? বিক্রি করিবার ও বাঁধা দিবার জিনিষ বড় অধিক নাই।"

সীতারাম সগর্ব্বে কহিল, তোমার কত টাকা ধার চাই, আমি দিব।"

ভাগবত কহিল, "বটে ? তা এতই যদি তোমার টাকা হইয়া থাকে যে, এক মুঠা জলে ফেলিয়া দিলেও কিছু না আসে যায়, তা হইলে আমাকে গোটা দশেক দিয়া ফেল। কিন্তু আগে হইতে বলিয়া রাখিতেছি, আমার শুধিবার শক্তি নাই।"

সীতারাম কহিল, "সে জন্যে, দাদা তোমাকে ভাবিতে হইবে না।"

সীতারামের কাছে এইরূপ সাহায্যপ্রাপ্তির আশা পাইয়া ভাগবত বন্ধুতার উচ্ছ্বাসে যে নিতান্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা নহে। আর এক ছিলিম তামাক সাজিয়া চুপ করিয়া বসিয়া টানিতে লাগিল।

সীতারাম আস্তে আস্তে কথা পাড়িল—"দাদা, রাজার অন্যায় বিচারে আমাদের ত "অন্ন মারা গেল "

ভাগবত কহিল—"কই, তোমার ভাবে ত তাহা বোধ হইল না !" সীতারামের বদান্যতা ভাগবতের বড় সহ্য হয় নাই, মনে মনে কিছু চটিয়াছিল।

সীতারাম কহিল, "না, ভাই কথার কথা বলিতেছি। আজ না যায় ত দশদিন পরে ত যাইবে।"

ভাগবত কহিল—"তা, রাজা যদি অন্যায় বিচার করেন ত আমরা কি করিতে পারি !"

সীতারাম কহিল "আহা যুবরাজ যখন রাজা হইবে, তখন যশোরে রামরাজত্ব হইবে ততদিন যেন আমরা বাঁচিয়া থাকি।"

ভাগবত চটিয়া গিয়া কহিল, "ওসব কথায় আমাদের কাজ কি ভাই ? তুমি বুড়মানুষ লোক, তুমি নিজের ঘরে বসিয়া রাজা উজীর মার, সে শোভা পায়—আমি গরীব মানুষ, আমার অতটা ভরসা হয় না।"

সীতারাম কহিল, "রাগ কর কেন দাদা? কথাটা মন দিয়া শোনই না কেন ? বলিয়া চুপি চুপি কি বলিতে লাগিল।

ভাগবত মহাক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "দেখ সীতারাম আমি তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, আমার কাছে অমন কথা তুমি মুখে উচ্চারণ করিও না।"

সীতারাম সে দিন ত চলিয়া গেল। ভাগবত ভারি মনোযোগ দিয়া সমস্ত দিন কি একটা

ভাবিতে লাগিল, তাহার পরদিন সকাল বেলায় সে নিজে সীতারামের কাছে গেল। সীতারামকে কহিল "কাল যে কথাটা বলিয়াছিলে বড় পাকা কথা বলিয়াছিলে।"

সীতারাম গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়া কহিল "কেমন দাদা বলি নাই।"

ভাগবত কহিল "আজ সেই বিষয়ে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করিতে আসিয়াছি।"

সীতারাম আরো গর্ব্বিত হইয়া উঠিল। কয়দিন ধরিয়া ক্রমিক পরামর্শ চলিতে লাগিল।

পরামর্শ করিয়া যাহা স্থির হইল, তাহা এই, একটা জাল দরখাস্ত লিখিতে হইবে, যেন যুবরাজ প্রতাপাদিত্যের নামে সম্রাট-বিদ্রোহিতার অভিযোগ করিয়া নিজে রাজ্য পাইবার জন্ত দরখাস্ত করিতেছেন। তাহাতে যুবরাজের শীল-মোহর মুদ্রিত থাকিবে। রুক্মিণী যে আংটিটি লইয়া আসিয়াছে, তাহাতে যুবরাজের নাম মুদ্রাঙ্কিত শীল আছে, অতএব কাজ অনেকটা অগ্রসর হইয়া আছে।

পরামর্শমত কাজ হইল। একখানা জাল দরখাস্ত লেখা হইল, তাহাতে যুবরাজের নাম মুদ্রিত রহিল। নির্ব্বোধ সীতারামের উপর নির্ভর করা যায় না, অতএব স্থির হইল, ভাগবত নিজে দরখাস্ত লইয়া দিল্লীশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিবে।

ভাগবত সেই দরখাস্ত খানি লইয়া দিল্লীর দিকে না গিয়া প্রতাপাদিত্যের কাছে গেল। মহারাজকে কহিল উদয়াদিত্যের এক ভৃত্য এই দরখাস্তটি লইয়া দিল্লীর দিকে যাইতেছিল, আমি কোন সূত্রে জানিতে পারি। ভৃত্যটা দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া গেছে, দরখাস্তটি লইয়া আমি মহারাজার নিকট আসিতেছি। ভাগবত সীতারামের নাম করে নাই। দরখাস্ত পাঠ করিয়া প্রতাপাদিত্যের কি অবস্থা হইল তাহা আর বলিবার আবশুক করে না। ভাগবতের পুনর্ব্বার রাজবাড়িতে চাকরী হইল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিভার প্রাণের মধ্যে আঁধার করিয়া আসিয়াছে। ভবিষ্যতে কি যেন একটা মর্ম্মভেদী দুঃখ, একটা মরুময়ী নিরাশা, জীবনের সমস্ত সুখের জলাঞ্জলি, তাহার জন্ত অপেক্ষা করিয়া আছে, প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার কাছে কাছে সরিয়া আসিতেছে। সেই যে জীবনশূন্তকারী চরাচরগ্রাসী শুষ্ক সীমাহীন ভবিষ্যৎ অদৃষ্টের আশঙ্কা, তাহারি একটা ছায়া আসিয়া যেন বিভার প্রাণের মধ্যে পড়িয়াছে। বিভার মনের ভিতরে কেমন করিতেছে। বিভা বিছানায় একেলা পড়িয়া আছে। এ সময়ে বিভার কাছে কেহ নাই। বিভা নিশ্বাস ফেলিয়া বিভা কাঁদিয়া বিভা আকুল হইয়া কহিল, "আমাকে কি তবে পরিত্যাগ করিলে? আমি তোমার কি অপরাধ করিয়াছি?" কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিতে লাগিল, আমি কি অপরাধ করিয়াছি? দুটি হাতে মুখ ঢাকিয়া বালিশ বুকে লইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বার বার করিয়া কহিল "আমি কি করিয়াছি?" একখানি পত্র, না, একটি লোকও আসিল না, কাহারো মুখে সংবাদ শুনিতে পাই না। আমি কি করিব? বুক ফাটিয়া ছট্‌ ফট্‌ করিয়া সমস্ত দিন ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, কেহ তোমার সংবাদ বলে না, কাহারো মুখে তোমার নাম শুনিতে পাই না। মা গো মা দিন কি করিয়া কাটিবে।"

এমন কত দিন গেল। এমন কত মধ্যাহ্নে কত অপরাহ্নে কত রাত্রে সঙ্গীহীন বিভা রাজবাড়ির শূন্য ঘরে ঘরে একখানি শীর্ণ ছায়ার মত ঘুরিয়া বেড়ায়!

এমন সময় একদিন প্রাতঃকালে রামমোহন আসিয়া "মা গো জয় হোক্" বলিয়া প্রণাম করিল, বিভা এমনি চমকিয়া উঠিল,যেন তাহার মাথায় একটা সুখের বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার চোখ দিয়া জল বাহির হইল। সে সচকিত হইয়া কহিল "মোহন, তুই এলি!"

"হাঁ মা, দেখিলাম, মা আমাদের ভুলিয়া গেছেন, তাঁহাকে একবার স্মরণ করাইয়া আসি!"

বিভা কত কি জিজ্ঞাসা করিবে মনে করিল কিন্তু লজ্জায় পারিল না—বলে বলে করিয়া হইয়া উঠিল না—অথচ শুনিবার জন্য প্রাণটা ব্যাকুল হইয়া রহিল!

রামমোহন বিভার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "কেন মা, তোমার মুখখানি অমন মলিন কেন? তোমার চোখে কালি পড়িয়াছে। মুখে হাসি নাই। চুল রুক্ষ। এস মা, আমাদের ঘরে এস। এখানে বুঝি তোমাকে যত্ন করিবার কেহ নাই!"

বিভা ম্লান হাসি হাসিল; কিছু কহিল না! হাসিতে হাসিতে হাসি আর রহিল না। দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল—শীর্ণ বিবর্ণ দুটি কপোল প্লাবিত করিয়া জল পড়িতে লাগিল, অশ্রু আর থামে না! বহু দিন অনাদরের পর একটু আদর পাইলে যে অভিমান উথলিয়া উঠে, বিভা সেই অতি কোমল, মৃদু, অনন্ত প্রীতিপূর্ণ অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিল। মনে মনে কহিল, "এত দিন পরে কি আমাকে মনে পড়িল?"

রামমোহন আর থাকিতে পারিল না, তাহার চোখে জল আসিল, কহিল—"একি অলক্ষণ! মা লক্ষ্মী, তুমি হাসি মুখে আমাদের ঘরে এস। আজ শুভ দিনে চোখের জল মোছ!"

মহিষীর মনে মনে ভয় ছিল, পাছে জামাই তাঁর মেয়েকে গ্রহণ না করে। রামমোহন বিভাকে লইতে আসিয়াছে শুনিয়া তাঁহার অত্যন্ত আনন্দ হইল। তিনি রামমোহনকে ডাকাইয়া জামাই বাড়ির কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, বিশেষ যত্নে রামমোহনকে আহার করাইলেন, রামমোহনের গল্প শুনিলেন, আনন্দে দিন কাটিল! কাল যাত্রার দিন ভাল; কাল প্রভাতেই বিভাকে পাঠাইবেন স্থির হইল। প্রতাপাদিত্য এ বিষয়ে আর কিছু আপত্তি করিলেন না।

যাত্রার যখন সমস্তই স্থির হইয়া গেছে, তখন বিভা একবার উদয়াদিত্যের কাছে গেল। উদয়াদিত্য একাকী বসিয়া কি একটা ভাবিতেছিলেন।

বিভাকে দেখিয়া সহসা ঈষৎ চমকিত হইয়া কহিলেন, "বিভা, তবে তুই চলিলি? তা' ভালই হইল। তুই সুখে থাকিতে পারিবি। আশীর্ব্বাদ করি—লক্ষ্মীস্বরূপা হইয়া স্বামীর ঘর উজ্জ্বল করিয়া থাক!"

বিভা উদয়াদিত্যের পায়ের কাছে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল! উদয়াদিত্যের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল;—বিভার মাথায় হাত দিয়া তিনি কহিলেন,—"কেন কাঁদিতেছিস্? এখানে তোর কি সুখ ছিল বিভা; চারিদিকে কেবল দুঃখ কষ্ট শোক। এ কারাগার হইতে পালাইলি—তুই বাঁচিলি!"

বিভা যখন উঠিল, তখন উদয়াদিত্য কহিলেন, "যাইতে ছিস্? তবে আয়। স্বামীগৃহে গিয়া আমাদের একেবারে যেন ভুলিয়া যাস্‌নে।

এক এক বার মনে করিস্, মাঝে মাঝে যেন সংবাদ পাই!"

বিভা রামমোহনের কাছে গিয়া কহিল "এখন আমি যাইতে পারিব না!"

রামমোহন বিস্মিত হইয়া কহিল "সে কি কথা মা?"

বিভা কহিল "না, আমি যাইতে পারিব না। দাদাকে আমি এখন একলা ফেলিয়া যাইতে পারিব না। আমা হইতেই তাঁহার এত কষ্ট এত দুঃখ, আর আমি আজ তাঁহাকে এখানে ফেলিয়া রাখিয়া সুখ ভোগ করিতে যাইব? যত দিন তাঁহার মনে তিল মাত্র কষ্ট থাকিবে, তত দিন আমিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব। এখানে আমার মত তাঁহাকে কে যত্ন করিবে?" বলিয়া বিভা কাঁদিয়া চলিয়া গেল।

অন্তঃপুরে একটা গোলযোগ বাধিয়া উঠিল। মহিষী আসিয়া বিভাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন; তাহাকে অনেক ভয় দেখাইলেন, অনেক পরামর্শ দিলেন; বিভা কেবল কহিল—"না মা, আমি পারিব না।"

মহিষী রোষে বিরক্তিতে কাঁদিয়া কহিলেন "এমন মেয়েও ত কোথাও দেখি নাই!" তিনি মহারাজের কাছে গিয়া সমস্ত কহিলেন। মহারাজ প্রশান্ত ভাবে কহিলেন, "তা, বেশ ত, বিভার যদি ইচ্ছা না হয় ত কেন যাইবে?"

মহিষী অবাক্ হইয়া, হাত উল্টাইয়া, হাল ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন,—"তোমাদের যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, আমি আর কিছুতে থাকিব না।"

উদয়াদিত্য সমস্ত শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি বিভাকে আসিয়া অনেক করিয়া বুঝাইলেন; বিভা চুপ করিয়া কাঁদিতে লাগিল, ভাল বুঝিল না।

হতাশ্বাস রামমোহন আসিয়া ম্লানমুখে কহিল, "মা, তবে চলিলাম। মহারাজকে গিয়া কি বলিব?"

বিভা কিছু বলিতে পারিল না, অনেক ক্ষণ নিরুত্তর হইয়া রহিল।

রামমোহন কহিল "তবে বিদায় হই মা!" বলিয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেল। বিভা একেবারে আকুল হইয়া কাঁদিয়া উঠিল, কাতর স্বরে ডাকিল "মোহন!"

মোহন ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "কি মা?"

বিভা কহিল "মহারাজকে বলিও, আমাকে যেন মার্জ্জনা করেন। তিনি স্বয়ং ডাকিতেছেন, তবু আমি যাইতে পারিলাম না, সে কেবল নিতান্তই আমার দুরদৃষ্ট?"

রামমোহন শুষ্কভাবে কহিল "যে আজ্ঞা!"

রামমোহন আবার প্রণাম করিয়া বিদায় হইয়া গেল। বিভা দেখিল, রামমোহন বিভার ভাব কিছুই বুঝিতে পারে নাই, তাহার ভারি গোলমাল ঠেকিয়াছে। একেত বিভার প্রাণ যেখানে যাইতে চায়, বিভা সেখানে যাইতে পারিল না;—তাহার উপর রামমোহন, যাহাকে সে যথার্থ স্নেহ করে, সে আজ রাগ করিয়া চলিয়া গেল। বিভার প্রাণে যাহা হইল তাহা বিভাই জানে!

বিভা রহিল। চোখের জল মুছিয়া প্রাণের মধ্যে পাষাণ ভার বহিয়া সে তাহার দাদার কাছে পড়িয়া রহিল। ম্লান, শীর্ণ একখানি ছায়ার মত সে নীরবে সমস্ত ঘরের কাজ করে। উদয়াদিত্য স্নেহ করিয়া, আদর করিয়া কোন কথা কহিলে চোখ নীচু করিয়া একটু খানি হাসে। সন্ধ্যাবেলায় উদয়াদিত্যের পায়ের কাছে বসিয়া একটু কথা কহিতে চেষ্টা করে। যখন মহিষী তিরস্কার করিয়া কিছু বলেন, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া শোনে, ও অব-

শেষে এক খণ্ড মলিন মেঘের মত ভাসিয়া চলিয়া যায়। যখন কেহ বিভার চিবুক ধরিয়া বলে "বিভা তুই এত রোগা হ'তেছিস্ কেন" বিভা কিছু বলে না, কেবল একটু হাসে।

এই সময়ে ভাগবত পূর্ব্বোক্ত জাল দরখাস্তটি লইয়া প্রতাপাদিত্যকে দেখায়, প্রতাপাদিত্য আগুন হইয়া উঠিলেন—পরে অনেক বিবেচনা করিয়া উদয়াদিত্যকে কারারুদ্ধ করিবার আদেশ দিলেন। মন্ত্রী কহিলেন "মহারাজ, যুবরাজ যে একাজ করিয়াছেন, ইহা কোন মতেই বিশ্বাস হয় না।" যে শোনে সেই জিভ কাটিয়া বলে, "একথা কাণে আনিতে নাই। যুবরাজ একাজ করিবেন ইহা বিশ্বাস-যোগ্য নহে।" প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "আমারো ত বড় একটা বিশ্বাস হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া কারাগারে থাকিতে দোষ কি? সেখানে কোন প্রকার কষ্ট না দিলেই হইল। কেবল গোপনে কিছু না করিতে পারে তাহার জন্ত পাহারা নিযুক্ত থাকিবে।"

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

যখন রামমোহন চন্দ্রদ্বীপে ফিরিয়া গিয়া একাকী যোড়হস্তে অপরাধীর মত রাজার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, তখন রামচন্দ্র রায়ের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি স্থির করিয়া ছিলেন, বিভা আসিলে পর তাহাকে প্রতাপাদিত্য ও তাহার বংশ সম্বন্ধে খুব দুচারিটা খরধার কথা শুনাইয়া তাঁহার শ্বশুরের উপর শোধ তুলিবেন। কি কি কথা বলিবেন, কেমন করিয়া বলিবেন, কখন্ বলিবেন, সমস্ত তিনি মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। রামচন্দ্র রায় গোঁয়ার নহেন, বিভাকে যে কোন প্রকারে পীড়ন করিবেন, ইহা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না। কেবল, বিভাকে তাহার পিতার সম্বন্ধে মাঝে মাঝে খুব লজ্জা দিবেন এই আনন্দেই তিনি অধীর ছিলেন। এমন কি, এই আনন্দের প্রভাবে তাঁহার মনেই হয় নাই যে, বিভার আসিবার পক্ষে কোন বাধা থাকিতে পারে। এমন সময় রামমোহনকে একাকী আসিতে দেখিয়া রামচন্দ্র রায় নিতান্ত বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন "কি হইল, রামমোহন?"

রামমোহন কহিল, "সকলি নিষ্ফল হইয়াছে!"

রাজা চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, "আনিতে পারিলে নে?"

রামমোহন—"আজ্ঞা, না মহারাজ! কুলগ্নে যাত্রা করিয়াছিলাম!"

রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন "বেটা তোকে যাত্রা করিতে কে বলিয়াছিল? তখন তোকে বার বার করিয়া বারণ করিলাম, তখন যে তুই বুক ফুলাইয়া গেলি, আর, আজ—"

রামমোহন কপালে হাত দিয়া ম্লান মুখে কহিল, "মহারাজ, আমারি অদৃষ্টের দোষ!"

রামচন্দ্র রায় আরো ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "রামচন্দ্র রায়ের অপমান। তুই বেটা আমার নাম করিয়া ভিক্ষা চাহিতে গেলি, আর প্রতাপাদিত্য দিল না। এত বড় অপমান আমাদের বংশে আর কখন হয় নাই।"

তখন রামমোহন নতশির তুলিয়া ঈষৎ গর্ব্বিতভাবে কহিল, "ও কথা বলিবেন না। প্রতাপাদিত্য যদি না দিত, আমি কাড়িয়া আনিতাম। আপনার কাছে তাহাত বলিয়াই গিয়াছিলাম। মহারাজ, যখন আপনার আদেশ পালন করিতে যাই, তখন কি আর

প্রতাপাদিত্যকে ভয় করি? প্রতাপাদিত্য রাজা বটে, কিন্তু আমার রাজা ত সে নয়।”

রাজা কহিলেন, “তবে হইল না কেন?”

রামমোহন অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার চোখে জলের রেখা দিল।

রাজা অধীর হইয়া কহিলেন, “রামমোহন, শীঘ্র বল্।”

রামমোহন যোড় হাতে কহিল—“মহারাজ”—

রাজা কহিলেন—“কি বল্।”

রামমোহন—“মহারাজ, মাঠাকরুণ আসিতে চাহিলেন না। বলিয়া রামমোহনের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। বুঝি এ সন্তানের অভিমানের অশ্রু। বোধ করি এ অশ্রুজলের অর্থ—“মায়ের প্রতি আমার এত বিশ্বাস ছিল যে, সেই বিশ্বাসের জোরে আমি বুক ফুলাইয়া, আনন্দ করিয়া মাকে আনিতে গেলাম, আর মা আসিলেন না; মা আমার সম্মান রাখিলেন না।” কি জানি কি মনে করিয়া বৃদ্ধ রামমোহন চোখের জল সামলাইতে পারিল না।

রাজা কথাটা শুনিয়াই একেবারে দাঁড়াইয়া উঠিয়া চোখ পাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, “বটে—! অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

“আসিতে চাহিলেন না বটে! বেটা, তুই বেরো, বেরো আমার সুমুখ হইতে এখনি বেরো।”

রামমোহন একটি কথা না কহিয়া বাহির হইয়া গেল। সে জানিত তাহারি সমস্ত দোষ, অতএব সমুচিত দণ্ড পাওয়া কিছু অন্যায় নহে।

রাজা কি করিয়া যে ইহার শোধ তুলিবেন কিছুতেই ভাবিয়া পাইলেন না। প্রতাপাদিত্যের কিছু করিতে পারিবেন না, বিভাকেও হাতেরকাছে পাইতেছেন না। রামচন্দ্র রায় অধীর হইয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

দিন দুয়েকের মধ্যে সংবাদটা নানা আকারে নানা দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। এমন অবস্থা হইয়া দাঁড়াইল যে, প্রতিশোধ না হইলে আর মুখরক্ষা হয় না। এমন কি, প্রজারা পর্য্যন্ত প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্যস্ত হইল। তাহারা কহিল “আমাদের মহারাজার অপমান!” অপমানটা যেন সকলের গায়ে লাগিয়াছে! একেত প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি রামচন্দ্র রায়ের মনে স্বভাবতই বলবান্ আছে, তাহার উপরে তাঁহার মনে হইতে লাগিল, প্রতিহিংসা না হইলে প্রজারা কি মনে করিবে। ভৃত্যেরা কি মনে করিবে! রমাই ভাঁড় কি মনে করিবে। তিনি যখন কল্পনায় মনে করেন, এই কথা লইয়া রমাই আর একজন ব্যক্তির কাছে হাসি টিট্‌কারী করিতেছে, তখন তিনি অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়েন।

একদিন সভায় মন্ত্রী প্রস্তাব করিলেন, “মহারাজ, আপনি আর একটি বিবাহ করুন!”

রমাই ভাঁড় কহিল, “আর প্রতাপাদিত্যের মেয়ে তাহার ভাইকে লইয়া থাকুক!”

রাজা রমাইয়ের দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিলেন “ঠিক বলিয়াছ রমাই।”

রাজাকে হাসিতে দেখিয়া সকল সভাসদই হাসিতে লাগিল। কেবল ফর্ণাণ্ডিজ বিরক্ত হইল, সে হাসিল না। রামচন্দ্র রায়ের মত লোকেরা সম্ভ্রম রক্ষার জন্য সততই ব্যস্ত, কিন্তু সম্ভ্রম কাহাকে বলে ও কি করিয়া সম্ভ্রম রাখিতে হয় সে জ্ঞান তাহাদের নাই।

দেওয়ানজি কহিলেন, “মন্ত্রী মহাশয় ঠিক বলিয়াছেন। তাহা হইলে প্রতাপাদিত্যকে ও তাঁহার কন্যাকে বিলক্ষণ শিক্ষা দেওয়া হইবে।”

রমাই ভাঁড় কহিল—"এ শুভকার্য্যে আপনার বর্ত্তমান শ্বশুর মহাশয়কে একখানা নিমন্ত্রণ পত্র পাঠাইতে ভুলিবেন না, নহিলে কি জানি তিনি মনে দুঃখ করিতে পারেন!" বলিয়া রমাই চোক টিপিল। সভাস্থ সকলে হাসিতে লাগিল; যাহারা দূরে বসিয়াছিল, কথাটা শুনিতে পায় নাই, তাহারাও না হাসিয়া কিছুতেই থাকিতে পারিল না।

রমাই কহিল, "বরণ করিবার নিমিত্তে এয়োস্ত্রীদের মধ্যে যশোরে আপনার শাশুড়ী-ঠাকুরুণকে ডাকিয়া পাঠাইবেন। আর মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ, প্রতাপাদিত্যের মেয়েকে যখন একথাল মিষ্টান্ন পাঠাইবেন, তখন তাহার সঙ্গে দুটো কাঁচা রম্ভা পাঠাইয়া দিবেন!"

রাজা হাসিয়া অস্থির হইলেন। সভাসদেরা মুখে চাদর দিয়া মুখ ঢাকাইয়া হাসিতে লাগিল। ফর্ণাণ্ডিজ অলক্ষিতভাবে উঠিয়া চলিয়া গেল।

দেওয়ানজি একবার রসিকতা করিবার চেষ্টা করিলেন, কহিলেন,"মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ, যদি ইতর লোকের ভাগ্যেই মিষ্টান্ন থাকে,তাহা হইলে ত যশোহরেই সমস্ত মিষ্টান্ন খরচ হইয়া যায়, চন্দ্রদ্বীপে আর মিষ্টান্ন খাইবার উপযুক্ত লোক থাকে না!"

কথাটা শুনিয়া কাহারও হাসি পাইল না। রাজা চুপ করিয়া গুড়গুড়ি টানিতে লাগিলেন, সভাসদেরা গম্ভীর হইয়া রহিল, রমাই দেওয়ানের দিকে একবার অবাক্ হইয়া চাহিল, এমন কি, একজন অমাত্য বিস্ময়ভাবে জিজ্ঞাসা করিল —"সে কি কথা দেওয়ানজি মহাশয়? রাজার বিবাহে মিষ্টান্নের বন্দোবস্ত কি এত কম হইবে?" দেওয়ানজি মহাশয় মাথা চুলকাইতে লাগিলেন।

বিবাহের কথা সমস্ত স্থির হইয়া গেল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

উদয়াদিত্যকে যেখানে রুদ্ধ করা হইয়াছে, তাহা প্রকৃত কারাগার নহে; তাহা প্রাসাদ-সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র অট্টালিকা। বাটির ঠিক ডানপাশেই এক রাজপথ, ও তাহার পূর্ব্বদিকে প্রশস্ত এক প্রাচীর আছে, তাহার উপর প্রহরীরা পায়চারি করিয়া পাহারা দিতেছে। ঘরেতে একটি অতি ক্ষুদ্র জানালা কাটা। তাহার মধ্যদিয়া খানিকটা আকাশ, একটা বাঁশঝাড় ও একটি শিবমন্দির দেখা যায়। উদয়াদিত্য প্রথম যখন কারাগারে প্রবেশ করিলেন, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। জানালার কাছে মুখ রাখিয়া ভূমিতে গিয়া বসিলেন। বর্ষাকাল। আকাশে মেঘ জমিয়া আছে। রাস্তায় জল দাঁড়াইয়াছে। নিস্তব্ধ রাত্রে দৈবাৎ দুই একজন পথিক চলিতেছে, ছপ্‌ছপ্ করিয়া তাহাদের পায়ের শব্দ হইতেছে। পূর্ব্বদিক্ হইতে, কারাগারের হৃৎস্পন্দন ধ্বনির মত প্রহরীদের পদশব্দ অনবরত কাণে আসিতেছে। এক এক প্রহর অতীত হইতে লাগিল, দূর হইতে এক একটা হাঁক শুনা যাইতেছে। আকাশে একটি মাত্র তারা নাই, যে বাঁশঝাড়ের দিকে উদয়াদিত্য চাহিয়া আছেন, তাহা জোনাকীতে একেবারে ছাইয়া ফেলিয়াছে। সে রাত্রে উদয়াদিত্য আর শয়ন করিলেন না, জানলার কাছে বসিয়া প্রহরীদের অবিরাম পদশব্দ শুনিতে লাগিলেন।

বিভা আজ সন্ধ্যাবেলায় একবার অন্তঃপুরের বাগানে গিয়াছে। প্রাসাদে, বোধ হয় অনেক লোক। চারিদিকে দাস দাসী, চারিদিকেই পিসি মাসী, কথায় কথায় "কি হইয়াছে, কি বৃত্তান্ত" জিজ্ঞাসা করে, প্রতি অশ্রু-

বিন্দু হিসাব দিতে হয়, প্রতি দীর্ঘ নিঃশ্বাসের বিস্তৃত ভাষ্য ও সমালোচনা বাহির হইতে থাকে। বিভা বুঝি আর পারে নাই, ছুটিয়া বাগানে আসিয়াছে। সূর্য্য আজ মেঘের মধ্যেই উঠিয়াছে, মেঘের মধ্যেই অস্ত গেল। কখন যে দিনের অবসান হইল, ও সন্ধ্যার আরম্ভ হইল বুঝা গেল না। বিকালের দিকে পশ্চিমের মুখে একটুখানি সোণার রেখা ফুটিয়াছিল, কিন্তু দিন শেষ হইতে না হইতেই মিলাইয়া গেল। আঁধারের উপর আঁধার ঘনাইতে লাগিল। দিগন্ত হইতে দিগন্ত আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ঘন-শ্রেণী ঝাউ গাছ গুলির মাথার উপর অন্ধকার এমনি করিয়া জমিয়া আসিল যে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা ব্যবধান আর দেখা গেল না, ঠিক মনে হইতে লাগিল যেন সহস্র দীর্ঘ পায়ের উপর ভর দিয়া একটা প্রকাণ্ড বিস্তৃত নিস্তব্ধ অন্ধকার দাঁড়াইয়া আছে। রাত হইতে লাগিল, রাজবাড়ির প্রদীপ একে একে নিবিয়া গেল। বিভা ঝাউ-গাছের তলায় বসিয়া আছে। বিভা স্বভাবতই ভীরু, কিন্তু আজ তাহার ভয় নাই। কেবল, যতই আঁধার বাড়িতেছে, ততই তাহার মনে হইতেছে যেন পৃথিবীকে কে তাহার কাছ হইতে কাড়িয়া লইতেছে; যেন সুখ হইতে, শান্তি হইতে জগৎ সংসারের উপকূল হইতে কে তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়াছে, অতলস্পর্শ অন্ধকারের সমুদ্রের মধ্যে সে পড়িয়া গিয়াছে; ক্রমেই ডুবিতেছে, ক্রমেই নামিতেছে, মাথার উপরে অন্ধকার ক্রমেই বাড়িতেছে, পদতলে ভূমি নাই, চারিদিকে কিছুই নাই, আশ্রয়, উপকূল, জগৎ সংসার ক্রমেই দূর হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছে। তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন, একটু একটু করিয়া তাহার সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড ব্যবধান আকাশের দিকে উঠিতেছে। তাহার ওপারে কত কি পড়িয়া রহিল। প্রাণ যেন আকুল হইয়া উঠিল। যেন ওপারের সকলি দেখা যাইতেছে; সেখানকার সূর্য্যালোক, খেলাধূলা, উৎসব সকলি দেখা যাইতেছে; কে যেন নিষ্ঠুর ভাবে, কঠোর হস্তে তাহাকে ধরিয়া রাখিয়াছে, তাহার বাছে বুকের শিরা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেও সে যেন সে দিকে যাইতে দিবে না। বিভা যেন আজ দিব্য চক্ষু পাইয়াছে; এই চরাচরব্যাপী ঘন ঘোর অন্ধকারের উপর বিধাতা যেন বিভার ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট লিখিয়া দিয়াছেন, অনন্ত জগৎ-সংসারে একাকী বসিয়া বিভা যেন তাহাই পাঠ করিতেছে; তাই তাহার চক্ষে জল নাই, দেহ নিস্পন্দ, নেত্র নির্নিমেষ। রাত্রি দুই প্রহরের পর একটা বাতাস উঠিল; অন্ধকারে গাছপালা গুলা হা হা করিয়া উঠিল। বাতাস অতিদূরে হু—হু করিয়া শিশুর কণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল। বিভার মনে হইতে লাগিল যেন দূর—দূর—দূরান্তরে সমুদ্রের তীরে বসিয়া বিভার সাধের, স্নেহের, প্রেমের শিশুগুলি দুই হাত বাড়াইয়া কাঁদিতেছে, আকুল হইয়া তাহারা বিভাকে ডাকিতেছে, তাহারা কোলে আসিতে চায়, সম্মুখে তাহারা পথ দেখিতে পাইতেছে না; যেন তাহাদের ক্রন্দন এই শত যোজন, লক্ষ যোজন গাঢ় রুদ্ধ অন্ধকার ভেদ করিয়া বিভার কাণে আসিয়া পৌঁছিল। বিভার প্রাণ যেন কাতর হইয়া কহিল, "কেরে, তোরা কে, তোরা কে কাঁদিতেছিস্, তোরা কোথায়!" বিভা মনে মনে যেন এই লক্ষ যোজন অন্ধকারের পথে একাকিনী যাত্রা করিল। সহস্র বৎসর ধরিয়া যেন অবিশ্রান্ত ভ্রমণ করিল, পথ শেষ হইল না, কাহাকেও দেখিতে পাইল না; কেবল সেই বায়ুহীন, শব্দহীন দিনরাত্রিহীন, জনশূন্য তারাশূন্য দিক্-

দিগন্তশূন্য মহান্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া মাঝে মাঝে চারিদিক্ হইতে ক্রন্দন শুনিতে পাইল, কেবল বাতাস দূর হইতে করিতে লাগিল হু—হু!

সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটিয়া গেল। পর দিন বিভা কারাগারে উদয়াদিত্যের নিকট যাইবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিল, সেখানে তাহার যাওয়া নিষেধ। সমস্ত দিন ধরিয়া অনেক কাঁদাকাটি করিল। এমন কি স্বয়ং প্রতাপাদিত্যের কাছে গেল। বিভা তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিল। অনেক কষ্টে সম্মতি পাইল। পর দিন প্রভাত হইতে না হইতেই বিভা শয্যা হইতে উঠিয়া কারাগৃহে প্রবেশ করিল। গিয়া দেখিল, উদয়াদিত্য বিছানায় শোন নাই। ভূমিতলে বসিয়া, বাতায়নের উপরে মাথা দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। দেখিয়া বিভার প্রাণ যেন বুক ফাটিয়া কাঁদিয়া উঠিতে চাহিল। অনেক কষ্টে রোদন সম্বরণ করিল। অতি ধীরে নিঃশব্দে উদয়াদিত্যের কাছে গিয়া বসিল। ক্রমে প্রভাত পরিষ্কার হইয়া আসিল। নিকটের বন হইতে পাখীরা গাহিয়া উঠিল। পাশের রাজপথ হইতে পান্থেরা গান গাহিয়া উঠিল দুই একটি রাত্রি জাগরণে ক্লান্ত প্রহরী আলো দেখিয়া মৃদুঃস্বরে গান গাহিতে লাগিল। নিকটস্থ মন্দির হইতে শাঁক ঘণ্টার শব্দ উঠিল। উদয়াদিত্য সহসা চমকিয়া জাগিয়া উঠিলেন। বিভাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন "একি বিভা, এত সকালে যে?" ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন—"এ কি—আমি কোথায়?" মুহূর্ত্তের মধ্যে মনে পড়িল, তিনি কোথায়! বিভার দিকে চাহিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন "আঃ—বিভা, তুই আসিয়াছিস্? কাল তোকে সমস্ত দিন দেখি নাই, মনে হইয়াছিল, বুঝি তোদের আর দেখিতে পাইব না।"

বিভা উদয়াদিত্যের কাছে আসিয়া চোখ মুছিয়া কহিল, "দাদা, মাটিতে বসিয়া কেন? খাটে বিছানা পাতা রহিয়াছে। দেখিয়া বোধ হইতেছে, একবারো তুমি খাটে বস নাই। এ দুদিন কি তবে ভূমিতেই আসন করিয়াছ?" বলিয়া বিভা কাঁদিতে লাগিল।

উদয়াদিত্য ধীরে ধীরে কহিলেন, "খাটে বসিলে আমি যে, আকাশ দেখিতে পাই না বিভা। জানলার ভিতর দিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া যখন পাখীদের উড়িতে দেখি, তখন মনে হয়, আমারো একদিন খাঁচা ভাঙ্গিবে, আমিও একদিন ঐ পাখীদের মত ঐ অনন্ত আকাশে প্রাণের সাধে সাঁতার দিয়া বেড়াইব। এ জানালা হইতে যখন সরিয়া যাই, তখন চারিদিকে অন্ধকার দেখি, যখন ভুলিয়া যাই যে, আমার একদিন মুক্তি হইবে, একদিন নিষ্কৃতি হইবে, মনে হয় না জীবনের বেড়ী একদিন ভাঙ্গিয়া যাইবে, এ কারাগার হইতে একদিন খালাস পাইব। বিভা এ কারাগারের মধ্যে এই দুই হাত জমি আছে, যেখানে আসিলেই আমি জানিতে পারি যে, আমি স্বভাবতই স্বাধীন; কোন রাজা মহারাজা আমাকে বন্দী করিতে পারে না। আর ঐ খানে ঐ ঘরের মধ্যে ঐ কোমল শয্যা, ঐ খানেই আমার কারাগার।"

আজ বিভাকে সহসা দেখিয়া উদয়াদিত্যের মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল। বিভা যখন তাঁহার চক্ষে পড়িল, তখন তাঁহার কারাগারের সমুদায় দ্বার যেন মুক্ত হইয়া গেল। সে দিন তিনি বিভাকে কাছে বসাইয়া আনন্দে এত কথা বলিয়াছিলেন যে, কারা-প্রবেশের পূর্ব্বে বোধ করি এত কথা কখন বলেন নাই। বিভা উদয়াদিত্যের সে আনন্দ মনে মনে বুঝিতে পারিয়াছিল। জানি না, এক প্রাণ হইতে

আর এক প্রাণে কি করিয়া বার্ত্তা যায়, এক প্রাণে তরঙ্গ উঠিলে আর এক প্রাণে কি নিয়মে তরঙ্গ উঠে। বিভার হৃদয় পুলকে পূরিয়া উঠিল। তাহার অনেক দিনের উদ্দেশ্য আজ সফল হইল। বিভা সামান্য বালিকা, উদয়াদিত্যকে সে যে আনন্দ দিতে পারে অনেক দিনের পর ইহা সে সহসা আজ বুঝিতে পারিল। হৃদয়ে সে বল পাইল। এত দিন সে চারিদিকে অন্ধকার দেখিতেছিল, কোথাও কিনারা পাইতেছিল না, নিরাশার গুরুভারে একেবারে নত হইয়া পড়িয়াছিল। নিজের উপর তাহার বিশ্বাস ছিল না; অনবরত সে উদয়াদিত্যের কাজ করিত, কিন্তু বিশ্বাস করিতে পারিত না যে, তাঁহাকে সুখী করিতে পারিব। আজ সে সহসা একটা পথ দেখিতে পাইয়াছে, এতদিনকার সমস্ত শ্রান্তি একেবারে ভুলিয়া গেল। আজ তাহার চোখে প্রভাতের শিশিরের মত অশ্রুজল দেখা দিল, আজ তাহার অধরে অরুণ কিরণের নির্ম্মল হাসি ফুটিয়া উঠিল।

বিভাও প্রায় কারাবাসিনী হইয়া উঠিল। গৃহের বাতায়নের মধ্য দিয়া যখনি প্রভাত প্রবেশ করিত, কারাদ্বার খুলিয়া গিয়া তখনি বিভার বিমল মূর্ত্তি দেখা দিত। বিভা বেতনভোগী ভৃত্যদের কিছুই করিতে দিত না, নিজের হাতে সমুদায় কাজ করিত, নিজে আহার আনিয়া দিত, নিজে শয্যা রচনা করিয়া দিত। একটি টিয়াপাখী আনিয়া ঘরে টাঙ্গাইয়া দিল ও প্রতিদিন সকালে অন্তঃপুরের বাগান হইতে ফুল তুলিয়া আনিয়া দিত। ঘরে একটি মহাভারত ছিল, উদয়াদিত্য বিভাকে কাছে বসাইয়া তাহাই পড়িয়া শুনাইতেন।

কিন্তু উদয়াদিত্যের মনের ভিতরে একটি কষ্ট জাগিয়া আছে। তিনি ত ডুবিতেই বসিয়াছেন, তবে কেন এমন সময়ে এই অসম্পূর্ণ সুখ, অতৃপ্ত-আশা সুকুমার বিভাকে আশ্রয় স্বরূপে আলিঙ্গন করিয়া, তাহাকে পর্য্যন্ত ডুবাইতেছেন? প্রতিদিন মনে করেন, বিভাকে বলিবেন "তুই যা বিভা;" কিন্তু বিভা যখন উষার বাতাস লইয়া উষার আলোক লইয়া তরুণী উষার হাত ধরিয়া কারার মধ্যে প্রবেশ করে, যখন সেই স্নেহের ধন সুকুমার মুখখানি লইয়া কাছে আসিয়া বসে, কত যত্ন কত আদরের দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখে, কত মিষ্ট স্বরে কত কথা জিজ্ঞাসা করে, তখন তিনি আর কোন মতেই প্রাণ ধরিয়া বলিতে পারেন না, "বিভা, তুই যা, তুই আর আসিস্ না, তোকে আর দেখিব না।" প্রত্যহ মনে করেন, কাল বলিব। কিন্তু সে কাল আর কিছুতেই আসিতে চায় না! অবশেষে একদিন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন। বিভা আসিল, বিভাকে বলিলেন, "বিভা তুই আর এখানে থাকিস্‌নে। তুই না গেলে আমি কিছুতেই শান্তি পাইতেছি না। প্রতিদিন সন্ধ্যা বেলায় এই কারাগৃহের অন্ধকারে কে আসিয়া আমাকে যেন বলে, বিভার বিপদ কাছে আসিতেছে। বিভা, আমার কাছ হইতে তোরা শীঘ্র পালাইয়া যা! আমি শনিগ্রহ, আমার দেখা পাইলেই চারিদিক্ হইতে দেশের বিপদ ছুটিয়া আসে। তুই শ্বশুর বাড়ি যা'। মাঝে মাঝে যদি সংবাদ পাই, তাহা হইলেই আমি সুখে থাকিব।"

বিভা চুপ করিয়া রহিল।

উদয়াদিত্য মুখ নত করিয়া বিভার সেই মুখখানি অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া ঝরঝর করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। উদয়াদিত্য বুঝিলেন,

"আমি কারাগার হইতে না মুক্ত হইলে বিভা কিছুতেই আমাকে ছাড়িয়া যাইবে না, কি করিয়া মুক্ত হইতে পারিব!"

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

রামচন্দ্র রায় ভাবিলেন, বিভা যে চন্দ্রদ্বীপে আসিল না, সে কেবল প্রতাপাদিত্যের শাসনে ও উদয়াদিত্যের মন্ত্রণায়। বিভা যে নিজের ইচ্ছায় আসিল না, তাহা মনে করিলে তাঁহার আত্ম-গৌরবে অত্যন্ত আঘাত লাগে। তিনি ভাবিলেন, প্রতাপাদিত্য আমাকে অপমান করিতে চাহে, অতএব সে কখন বিভাকে আমার কাছে পাঠাইবে না। কিন্তু এ অপমান আমিই তাহাকে ফিরাইয়া দিই না কেন? আমিই তাহাকে এক পত্র লিখি না কেন যে, তোমার মেয়েকে আমি পরিত্যাগ করিলাম, তাহাকে যেন আর চন্দ্রদ্বীপে পাঠান না হয়। এই রূপ সাতপাঁচ ভাবিয়া পাঁচ জনের সহিত মন্ত্রণা করিয়া প্রতাপাদিত্যকে ওই মর্ম্মে এক পত্র লেখা হইল। প্রতাপাদিত্যকে এরূপ চিঠি লেখা বড় সাধারণ সাহসের কর্ম্ম নহে। রামচন্দ্র রায়ের মনে মনে বিলক্ষণ ভয় হইতেছিল। কিন্তু ঢালু পর্ব্বতে বেগে নাবিতে নাবিতে হাজার ভয় হইলেও যেমন মাঝে মাঝে থামা যায় না, রামচন্দ্র রায়ের মনেও সেইরূপ একটা ভাবের উদয় হইয়াছিল!—সহসা একটা দুঃসাহসিকতায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, শেষ পর্য্যন্ত না পৌঁছিয়া যেন দাঁড়াইতে পারিতেছেন না। রামমোহনকে ডাকিয়া কহিল—"এই পত্র যশোহরে লইয়া যা।" রামমোহন যোড়হস্তে কহিল, "আজ্ঞা, না মহারাজ, আমি পারিব না। আমি স্থির করিয়াছি, আর যশোহরে যাইব না। এক যদি পুনরায় মা-ঠাকুরাণীকে আনিতে যাইতে বলেন ত আর একবার যাইতে পারি নতুবা, এ চিঠি লইয়া যাইতে পারিব না।" রামমোহনকে আর কিছু না বলিয়া বৃদ্ধ নয়ানচাঁদের হাতে রাজা সেই পত্রখানি দিলেন। সে সেই পত্র লইয়া যশোহরে যাত্রা করিল।

পত্র লইয়া গেল বটে, কিন্তু নয়ানচাঁদের মনে বড় ভয় হইল। প্রতাপাদিত্যের হাতে এ পত্র পড়িলে না জানি তিনি কি করিয়া বসেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মহিষীর হাতে সে এই পত্র দিতে সংকল্প করিল। মহিষীর মনের অবস্থা বড় ভাল নয়। একদিকে বিভার জন্য তাঁহার ভাবনা, আর এক দিকে উদয়াদিত্যের জন্যে তাঁহার কষ্ট। সংসারের গোলেমালে তিনি যেন একবারে ঝালাফালা হইয়া গিয়াছেন। মাঝে মাঝে প্রায় তাঁহাকে কাঁদিতে দেখা যায়। তাঁহার যেন আর ঘরকন্নায় মন লাগে না। এইরূপ অবস্থায় তিনি এই পত্রখানি পাইলেন—কি যে করিবেন কিছু ভাবিয়া পাইলেন না। বিভাকে কিছু বলিতে পারেন না; তাহা হইলে সুকুমার বিভা আর বাঁচিবে না। মহারাজের কাণে এ চিঠির কথা উঠিলে কি যে অনর্থপাত হইবে তাহার ঠিকানা নাই। অথচ এমন সঙ্কটের অবস্থায় কাহাকে কিছু না বলিয়া, কাহারো নিকট কোন পরামর্শ না লইয়া মহিষী বাঁচিতে পারেন না, চারিদিক অকূল পাথার দেখিয়া মহিষী কাঁদিতে কাঁদিতে একবার প্রতাপাদিত্যের কাছে গেলেন। কহিলেন—"মহারাজ, বিভার ত যাহা হয় একটা কিছু করিতে হইবে?"

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "কেন বল দেখি?"

মহিষী কহিলেন, "নাঃ, কিছু যে হইয়াছে তাহা নহে—তবে বিভাকে ত এক সময়ে না এক সময়ে শ্বশুরবাড়ি পাঠাইতেই হইবে।"

প্রতাপাদিত্য—"সে ত বুঝিলাম, তবে এত দিন পরে আজ যে সহসা তাহা মনে পড়িল ?"

মহিষী ভীত হইয়া কহিলেন—"ঐ তোমার এক কথা, আমি কি বলিতেছি যে কিছু হইয়াছে ? যদি কিছু হয়—"

প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া কহিলেন "হইবে আর কি ?"

মহিষী—"এই মনে কর যদি জামাই বিভাকে একেবারে ত্যাগ করে।" বলিয়া মহিষী রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

প্রতাপাদিত্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার চোখ দিয়া অগ্নিকণা বাহির হইল।

মহারাজের সেই মূর্ত্তি দেখিয়া মহিষী জল মুছিয়া তাড়াতাড়ি কহিলেন "তাই বলিয়া জামাই কি আর সত্য সত্যই লিখিয়াছে যে, ওগো তোমাদের বিভাকে আমি ত্যাগ করিলাম, তাহাকে আর চন্দ্রদ্বীপে পাঠাইও না, তাহা ত নহে—তবে কথা এই, যদি কোন দিন তাই লিখিয়া বসে!"

প্রতাপাদিত্য কহিলেন—"তখন তাহার বিহিত বিধান করিব, এখন তাহার জন্য ভাবিবার অবসর নাই।"

মহিষী কাঁদিয়া কহিলেন,—"মহারাজ তোমার পায়ে পড়ি, আমার একটি কথা রাখ'। একবার ভাবিয়া দেখ বিভার কি হইবে! আমার পাষাণ প্রাণ বলিয়া আজও রহিয়াছে, নহিলে আমাকে যতদূর যন্ত্রণা দিবার তা' দিয়াছ—উদয়কে—আমার বাছাকে—রাজার ছেলেকে—সামান্য অপরাধীর মত রুদ্ধ করিয়াছ—সে-আমার কাহারো কোন অপরাধ করে না, কিছুতেই লিপ্ত থাকে না, দোষের মধ্যে সে কিছু বোঝে সোঝে না, রাজকার্য্য শেখে নাই, প্রজা শাসন করিতে জানে না, তাহার বুদ্ধি নাই, তা' ভগবান তাহাকে যা করিয়াছেন, তাহার দোষ কি।"—বলিয়া মহিষী দ্বিগুণ কাঁদিতে লাগিলেন।

প্রতাপাদিত্য ঈষৎ বিরক্ত হইয়া কহিলেন "ও কথাত অনেকবার হইয়া গিয়াছে। যে কথা হইতেছিল তাহাই বল না।"

মহিষী কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন "আমারি পোড়া কপাল! বলিব আর কি? বলিলে কি তুমি কিছু শোন ? এক বার বিভার মুখপানে চাও মহারাজ! সে যে কাহাকেও কিছু বলে না—সে কেবল দিনে দিনে শুকাইয়া যায়, ছায়ার মত হইয়া আসে, কিন্তু সে কথা কহিতে জানে না! তাহার একটা উপায় কর।"

প্রতাপাদিত্য বিরক্ত হইয়া উঠিলেন—মহিষী আর কিছু না বলিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

—•—

ইতিমধ্যে এক ঘটনা ঘটিয়াছে; যখন সীতারাম দেখিল, উদয়াদিত্যকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছে, তখন সে আর হাত পা আছড়াইয়া বাঁচে না। প্রথমেই ত সে রুক্মিণীর বাড়ি গেল. তাহাকে যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিল। তাহাকে মারিতে যায় আর কি! কহিল, "সর্ব্বনাশী, তোর ঘরে আগুন জ্বালাইয়া দিব, তোর ভিটায় ঘুঘু চরাইব, আর যুবরাজকে খালাস করিব, তবে আমার নাম সীতারাম! আজই আমি রায়গড়ে চলিলাম,

রায়গড় হইতে আসি, তার পরে তোর ওই কালামুখ লইয়া এই শানের উপরে ঘষিব, তোর মুখে চূণ কালি মাখাইয়া সহর হইতে বাহির করিয়া দিব, তবে জলগ্রহণ করিব!"

রুক্মিণী কিয়ৎক্ষণ অনিমেষ নেত্রে সীতারামের মুখের দিকে চাহিয়া শুনিল, ক্রমে তাহার দাঁতে দাঁতে লাগিল, ঠোঁটে ঠোঁট চাপিল, তাহার হাতের মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ হইল, তাহার ঘন কৃষ্ণ ভ্রূযুগলের উপর মেঘ ঘনাইয়া আসিল, তাহার ঘন-কৃষ্ণ চক্ষু-তারকায় বিদ্যুৎ সঞ্চিত হইতে লাগিল, তাহার সমস্ত শরীর নিষ্পন্দ হইয়া গেল; ক্রমে তাহার স্থূল অধরোষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল, ঘন ভ্রূ তরঙ্গিত হইল, অন্ধকার চক্ষে বিদ্যুৎ খেলাইতে লাগিল, কেশরাশি ফুলিয়া উঠিল, হাত পা থর থর করিয়া কাঁপিতে আরম্ভ করিল। একটা পৈশাচিক অভিশাপ, একটা সর্ব্বাঙ্গস্ফীত কম্পমান হিংসা সীতারামের মাথার উপরে যেন পড়ে পড়ে। সেই মুহূর্ত্তে সীতারাম কুটীর হইতে বাহির হইয়া গেল। ক্রমে যখন রুক্মিণীর মুষ্টি শিথিল হইয়া আসিল, দাঁত খুলিয়া গেল, অধরোষ্ঠ পৃথক্ হইল, কুঞ্চিত ভ্রূ প্রসারিত হইল, তখন সে বসিয়া পড়িল, কহিল, "বটে! যুবরাজ তোমারই বটে। যুবরাজের বিপদ হইয়াছে বলিয়া তোমার গায়ে বড় লাগিয়াছে—যেন যুবরাজ আমার কেহ নয়। পোড়ারমুখো, এটা জানিস্ না সে যে আমারই যুবরাজ, আমিই তাহার ভাল করিতে পারি আর আমিই তাহার মন্দ করিতে পারি। আমার যুবরাজকে তুই কারামুক্ত করিতে চাহিস্। দেখিব কেমন তাহা পারিস্।"

সীতারাম সেই দিনই রায়গড়ে চলিয়া গেল।

বিকালবেলা বসন্তরায় রায়গড়ের প্রাসাদের বারান্দায় বসিয়া রহিয়াছেন। সম্মুখে এক প্রশস্ত মাঠ দেখা যাইতেছে। মাঠের প্রান্তে খালের পরপারে একটি আম্রবনের মধ্যে সূর্য্য অস্ত যাইতেছেন। বসন্তরায়ের হাতে তাঁহার চির সহচর সে সেতারটি আর নাই। বৃদ্ধ সেই অস্তমান সূর্য্যের দিকে চাহিয়া আপনার মনে গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতেছেন—

আমিই শুধু রৈনু বাকী।
যা ছিল তা গেল চলে, রইল যা' তা, কেবল ফাঁকী।
আমার ব'লে ছিল যারা,
আর ত তারা দেয় না সাড়া,
কোথায় তা'রা, কোথায় তা'রা? কেঁদে কেঁদে কারে ডাকি'।
বল্ দেখি মা, শুধাই তোরে,
"আমার" কিছু রাখ্‌লি নে রে?
আমি কেবল আমায় নিয়ে কোন্ প্রাণেতে বেঁচে থাকি।

কে জানে কি ভাবিয়া বৃদ্ধ এই গান গাহিতে ছিলেন। বুঝি তাঁহার মনে হইতেছিল, গান গাহিতেছি, কিন্তু যাহাদের গান শুনাইতাম, তাহারা যে নাই। গান আপনি আসে, কিন্তু গান গাহিয়া যে আর সুখ নাই। এখনো আনন্দ ভুলি নাই, কিন্তু যখনি আনন্দ জন্মিত, তখনি যাহাদের আলিঙ্গন করিতে সাধ যাইত, তাহারা কোথায়? যে দিন প্রভাতে রায়গড়ে ঐ তাল গাছটার উপরে মেঘ করিত, মনটা আনন্দে নাচিয়া উঠিত, সেই দিনই আমি যাহাদের দেখিতে যশোরে যাত্রা করিতাম, তাহাদের কি আর দেখিতে পাইব না? এখনো এক একবার মনটা তেমনি আনন্দে নাচিয়া উঠে কিন্তু হা—এইসব বুঝি ভাবিয়া আজ বিকাল বেলায় অস্তমান সূর্য্যের দিকে চাহিয়া বৃদ্ধ বসন্তরায়ের মুখে আপনা-আপনি গান উঠিয়াছে—"আমিই শুধু রৈনু বাকী।

এমন সময়ে খাঁ সাহেব আসিয়া এক মস্ত সেলাম করিল। খাঁ সাহেবকে দেখিয়া বসন্তরায় উৎফুল্ল হইয়া কহিলেন—"খাঁ সাহেব, আইস আইস!" অধিকতর নিকটে গিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া কহিলেন "সাহেব তোমার মুখ অমন মলিন দেখিতেছি কেন? মেজাজ ভাল আছে ত?"

খাঁ সাহেব—"মেজাজের কথা আর জিজ্ঞাসা করিবেন না, মহারাজ। আপনাকে মলিন দেখিয়া আমাদের মনে আর সুখ নাই! একটি বয়েদ আছে—রাত্রি বলে আমি কেহই নই, আমি যাহাকে মাথায় করিয়া রাখিয়াছি সেই চাঁদ, তাহারি সহিত আমি একত্রে হাসি, একত্রে ম্লান হইয়া যাই!—মহারাজ, আমরাই বা কে, আপনি না হাসিলে আমাদের হাসিবার ক্ষমতা কি? আমাদের আর সুই নাই, জনাব!"

বসন্তরায় ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, "সে কি কথা সাহেব? আমার ত অসুখ কিছুই নাই,—আমি নিজেকে দেখিয়া নিজে হাসি—নিজের আনন্দে নিজে থাকি—আমার অসুখ কি খাঁ সাহেব?"

খাঁ—"মহারাজ এখন আপনার আর তেমন গান বাজ শুনা যায় না।"

বসন্তরায় সহসা ঈষৎ গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "আমার গান শুনিবে সাহেব?"

"আমিই সুধু রইনু বাকী,।
যা ছিল তা' গেল চলে,
রইল যা' তা' কেবল ফাঁকী।"

খাঁ—"আপনি আর সে সেতার বাজান কই? আপনার সে সেতার কোথায়?"

বসন্তরায় ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—"সে সেতার কি নাই, তাহা নয়। সেতার আছে, শুধু তাহার তার ছিঁড়িয়া গেছে, তাহাতে আর সুর মেলে না।" বলিয়া আম্রবনের দিকে চাহিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে বসন্তরায় বলিয়া উঠিলেন, খাঁ সাহেব একটা গান গাও না—একটা গান গাও, গাও "তাজবে তাজ নওবে নও।"

খাঁ সাহেব গান ধরিলেন।

"তাজবে তাজ নওবে নও।"

দেখিতে দেখিতে বসন্তরায় মাতিয়া উঠিলেন—আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। উঠিয়া দাঁড়াইলেন, একত্রে গাহিতে লাগিলেন, "তাজবে তাজ, নওবে নও।" ঘন ঘন তাল দিতে লাগিলেন, এবং বারবার করিয়া গাইতে লাগিলেন। গাহিতে গাহিতে সূর্য্য অস্ত গেল, অন্ধকার হইয়া আসিল, রাখালেরা বাড়ি মুখে আসিতে আসিতে গান ধরিল। এমন সময়ে আসিয়া সীতারাম "মহারাজের জয় হোক" বলিয়া প্রণাম করিল। বসন্তরায় একেবারে চমকিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ গান বন্ধ করিয়া তাড়াতাড়ি তাহার কাছে আসিয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া কহিলেন "আরে সীতারাম যে! ত ভাল আছিস্? দাদা কেমন আছে? দিদি কোথায়? খবর ভাল ত?"

খাঁ সাহেব চলিয়া গেল। সীতারাম কহিল "একে একে নিবেদন করিতেছি মহারাজ।" বলিয়া একে একে যুবরাজের কারারোধের কথা কহিল। সীতারাম আগাগোড়া সত্য কথা বলে নাই। যে কারণে উদয়াদিত্যের কারারোধ ঘটিয়াছিল, সে কারণটা তেমন স্পষ্ট করিয়া বলে নাই।

বসন্তরায়ের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, তিনি সীতারামের হাত দৃঢ় করিয়া ধরিলেন। তাঁহার ভ্রূ ঊর্দ্ধে উঠিল, তাঁহার চক্ষু প্রসারিত হইয়া গেল, তাঁহার অধরৌষ্ঠ বিভিন্ন হইয়া গেল

—নির্নিমেষ নেত্রে সীতারামের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "অঁ্যা ?"

সীতারাম কহিল, "আজ্ঞা হাঁ মহারাজ।" কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া বসন্তরায় কহিলেন "সীতারাম।"

সীতারাম—"মহারাজ"

বসন্তরায় "তাহা হইলে দাদা এখন কোথায় ?"

সীতারাম "আজ্ঞা তিনি কারাগারে !"

বসন্তরায় মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। উদয়াদিত্য কারাগারে, এ কথাটা বুঝি তাঁহার মাথায় ভাল করিয়া বসিতেছে না, কিছুতেই কল্পনা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। আবার কিছুক্ষণ বাদে সীতারামের হাত ধরিয়া কহিলেন—"সীতারাম।"

সীতারাম—"আজ্ঞা মহারাজ !"

বসন্তরায়—"তাহা হইলে দাদা এখন কি করিতেছে ?"

সীতারাম "কি আর করিবেন ! তিনি কারাগারেই আছেন।"

বসন্তরায় "তাঁহাকে কি সকলে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে ?"

সীতারাম "আজ্ঞা হাঁ মহারাজ।"

বসন্তরায় "তাহাকে কি কেহ একবার বাহির হইতে দেয় না ?"

সীতারাম "আজ্ঞা না।"

বসন্তরায় "সে একলা কারাগারে বসিয়া আছে ?"

বসন্তরায় একথাগুলি বিশেষ কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন নাই আপনা-আপনি বলিতেছিলেন। সীতারাম তাহা বুঝিতে পারে নাই—সে উত্তর করিল—"হাঁ মহারাজ।"

বসন্তরায় বলিয়া উঠিলেন—"দাদা, তুই আমার কাছে আয়রে। তোকে কেহ চিনিল না।"

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

বসন্তরায় তাহার পর দিনই যশোহরে যাত্রা করিলেন, কাহারো নিষেধ মানিলেন না। যশোহরে পৌঁছিয়াই একেবারে রাজবাটির অন্তঃপুরে গেলেন। বিভা সহসা তাহার দাদা মহাশয়কে দেখিয়া যেন কি হইয়া গেল। কিছুক্ষণ, কি যে করিবে কিছু যেন ভাবিয়া পাইল না। কেবল চোখে বিস্ময়, অধরে আনন্দ, মুখে কথা নাই, শরীর নিস্পন্দ—খানিকটা দাঁড়াইয়া রহিল—তাহার পর তাঁহার পায়ের কাছে পড়িয়া প্রণাম করিল, পায়ের ধূলা মাথায় লইল। বিভা উঠিয়া দাঁড়াইলে পর বসন্তরায় একবার নিতান্ত একাগ্র দৃষ্টে বিভার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বিভা ?" আর কিছু বলিলেন না কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন "বিভা ?" যেন তাঁহার মনে একটি অতিক্ষীণ আশা জাগিয়াছিল যে, সীতারাম যাহা বলিয়াছিল, তাহা সত্য না হইতেও পারে। সমস্তটা স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিতে ভয় হইতেছে পাছে বিভা তাহার উত্তর দিয়া ফেলে ! তাঁহার ইচ্ছা নয় যে বিভা তৎক্ষণাৎ তাঁহার এ প্রশ্নের উত্তর দেয়। তাই তিনি অতি ভয়ে ভয়ে বিভার মুখপানিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বিভা ?" তাই তিনি অতি একাগ্র দৃষ্টে তাহার মুখের দিকে একবার চাহিলেন। বিভা বুঝিল এবং বিভা উত্তর দিতেও পারিল না। তাহার প্রথম আনন্দ-উচ্ছ্বাস ফুরাইয়া গেছে। আগে যখন দাদা মহাশয় আসিতেন, সেই সব দিন তাঁহার

মনে পড়িয়াছে! সে এক কি উৎসবের দিনই গিয়াছে! তিনি আসিলে কি একটা আনন্দই পড়িত! সুরমা হাসিয়া তামাসা করিত, বিভা হাসিত কিন্তু তামাসা করিতে পারিত না, দাদা প্রশান্ত আনন্দ মূর্ত্তিতে দাদা মহাশয়ের গান শুনিতেন; আজ দাদা মহাশয় আসিলেন, কিন্তু আর কেহ তাঁহার কাছে আসিল না, কেবল এই আঁধার সংসারে একলা বিভা—সুখের সংসারের একমাত্র ভগ্নাবশেষের মত একলা—দাদা মহাশয়ের কাছে দাঁড়াইয়া আছে। দাদা মহাশয় আসিলে যে ঘরে আনন্দ-ধ্বনি উঠিত—সেই সুরমার ঘর আজ এমন কেন; সে আজ স্তব্ধ, অন্ধকার, শূন্যময়—দাদা মহাশয়কে দেখিলেই সে ঘরটা যেন এখনি কাঁদিয়া উঠিবে! বসন্তরায় একবার কি যেন কিসের আশ্বাসে সেই ঘরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন—দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ঘরের মধ্যে মাথা লইয়া একবার চারিদিক দেখিলেন, তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া বুকফাটা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"দিদি, ঘরে কি কেহই নাই?"

বিভা কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "না দাদা মহাশয়, কেহই না!"

স্তব্ধ ঘরটা যে হা হা করিয়া বলিয়া উঠিল—"আগে যাহারা ছিল তাহারা কেহই নাই!"

বসন্তরায় অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, অবশেষে বিভার হাত ধরিয়া আস্তে আস্তে গাহিয়া উঠিলেন—

"আমি শুধু রৈনু বাকী!"

বসন্তরায় প্রতাপাদিত্যের কাছে গিয়া নিতান্ত মিনতি করিয়া কহিলেন—"বাবা প্রতাপ, উদয়কে আর কেন কষ্ট দাও—সে তোমাদের কি করিয়াছে? তাহাকে যদি তোমরা ভাল না বাস', পদে পদেই যদি সে তোমাদের কাছে অপরাধ করে—তবে তাহাকে এই বুড়ার কাছে দাও না। আমি তাহাকে লইয়া যাই—আমি তাহাকে রাখিয়া দিই—তাহাকে আর তোমাদের দেখিতে হইবে না—সে আমার কাছে থাকিবে!"

প্রতাপাদিত্য অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধরিয়া চুপ করিয়া বসন্তরায়ের কথা শুনিলেন, অবশেষে বলিলেন—"খুড়া মহাশয়, আমি যাহা করিয়াছি তাহা অনেক বিবেচনা করিয়াই করিয়াছি—এবিষয়ে আপনি অবশ্যই আমার অপেক্ষা অনেক কম জানেন—অথচ আপনি পরামর্শ দিতে আসিয়াছেন, আপনার এ সকল কথা আমি গ্রাহ্য করিতে পারি না।"

তখন বসন্তরায় উঠিয়া প্রতাপাদিত্যের কাছে আসিয়া প্রতাপাদিত্যের হাত ধরিয়া কহিলেন—"বাবা প্রতাপ, মনে কি নাই? তোকে যে আমি ছেলেবেলায় কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিলাম, সে কি আর মনে পড়ে না? স্বর্গীয় দাদা যে দিন তোকে আমার হাতে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, সে দিন হইতে আমি কি এক মুহূর্ত্তের জন্য তোকে কষ্ট দিয়াছি? অসহায় অবস্থায় যখন তুই আমার হাতে ছিলি, এক দিনও কি তুই আপনাকে পিতৃহীন বলিয়া মনে করিতে পারিয়াছিলি? প্রতাপ, বল্-দেখি, আমি তোর কি অপরাধ করিয়াছিলাম যাহাতে আমার এই বৃদ্ধ বয়সে তুই আমাকে এত কষ্ট দিতে পারিলি? এমন কথা আমি বলি না যে, তোকে পালন করিয়াছিলাম বলিয়া তুই আমার কাছে ঋণী—তোদের মানুষ করিয়া আমিই আমার দাদার স্নেহ ঋণ শোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। অতএব প্রতাপ, আমি প্রাপ্য বলিয়া তোর কাছে কিছুই চাহি না, কখনো চাহিও নাই, আমি কেবল তোর কাছে ভিক্ষা চাহিতেছি—তাও দিবি না?"

বসন্তরায়ের চোখে জল পড়িতে লাগিল, প্রতাপাদিত্য পাষাণ মূর্ত্তির ন্যায় বসিয়া রহিলেন।

বসন্তরায় আবার কহিলেন—"তবে আমার কথা শুনিবি না,—আমার ভিক্ষা রাখিবি না—? কথার উত্তর দিবিনে প্রতাপ?"—দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন "ভাল—আমার আর একটি ক্ষুদ্র প্রার্থনা আছে, একবার আমি উদয়কে দেখিতে চাই—আমাকে তাহার সেই কারাগৃহে প্রবেশ করিতে কেহ যেন নিষেধ না করে—এই অনুমতি দাও!"

প্রতাপাদিত্য তাহাও দিলেন না। তাঁহার বিরুদ্ধে উদয়াদিত্যের প্রতি এতখানি স্নেহ প্রকাশ করাতে প্রতাপাদিত্য মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার যতই মনে হয় লোকে তাঁহাকেই অপরাধী করিয়া তুলিতেছে, ততই তিনি আরো বাঁকিয়া দাঁড়ান!

বসন্তরায় নিতান্ত ম্লান মুখে অন্তঃপুরে ফিরিয়া গেলেন—তাঁহার মুখ দেখিয়া বিভার অত্যন্ত কষ্ট হইল। বিভা দাদা মহাশয়ের হাত ধরিয়া কহিল—"দাদা মহাশয় আমার ঘরে এস।" বসন্তরায় নীরবে বিভার সঙ্গে সঙ্গে বিভার ঘরে প্রবেশ করিলেন। তিনি ঘরে বসিলে পর বিভা তাঁহার কোমল অঙ্গুলি দিয়া তাঁহার পাকা চুলগুলি নাড়িয়া দিয়া কহিল—দাদা মহাশয়, এস, তোমার পাকাচুল তুলিয়া দিই।" বসন্তরায় কহিলেন, "দিদি, সে পাকাচুল কি আর আছে? যখন বয়স হয় নাই তখন সে সব ছিল, তখন তোদের পাকাচুল তুলিতে বলিতাম—আজ আমি বুড়া হইয়া গিয়াছি—আজ আর আমার পাকাচুল নাই।"

বসন্তরায় দেখিলেন বিভার মুখখানি মলিন হইয়া আসিল, তাহার চোখ ছলছল্ করিয়া আসিল। অমনি তাড়াতাড়ি কহিলেন—"আয় বিভা, আয়। গোটাকতক চুল তুলিয়া দে। তোদের পাকাচুল সরবরাহ করিয়া উঠিতে আর ত আমি পারি না ভাই। বয়স হইতে চলিল, ক্রমেই মাথায় টাক পড়িতে চলিল—এখন আর একটা মাথার অনুসন্ধান কর—আমি জবাব দিলাম।" বলিয়া বসন্ত রায় হাসিতে লাগিলেন।

একজন দাসী আসিয়া বসন্তরায়কে কহিল "রাণী মা আপনাকে একবার প্রণাম করিতে চান।"

বসন্তরায় মহিষীর ঘরে গেলেন, বিভা কারাগারে গেল।

মহিষী বসন্তরায়কে প্রণাম করিলেন। বসন্তরায় আশীর্ব্বাদ করিলেন "মা, আয়ুষ্মতী হও।"

মহিষী কহিলেন "কাকা মশায় ও আশীর্ব্বাদ আর করিবেন না! এখন আমার মরণ হইলেই আমি বাঁচি।"

বসন্তরায় ব্যস্ত হইয়া কহিলেন "রাম, রাম! ও কথা মুখে আনিতে নাই।"

মহিষী কহিলেন "আর কি বলিব কাকা মহাশয়, আমার ঘরকন্নায় যেন শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে।"

বসন্তরায় অধিকতর ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

মহিষী কহিলেন, "বিভার মুখ খানি দেখিয়া আমার মুখে আর অন্ন জল রুচে না। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কিছু বলে না, কেবল দিনে দিনে তাহার শরীর ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। তাহাকে লইয়া যে আমি কি করিব কিছু ভাবিয়া পাই না।"

বসন্তরায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

"এই দেখুন কাকা মহাশয়, এক সর্ব্বনেশে

চিঠি আসিয়াছে।” বলিয়া এক চিঠি বসন্ত রায়ের হস্তে দিলেন।

বসন্তরায় সে চিঠি পড়িতে না পড়িতে মহিষী কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন—“আমার কিসের সুখ আছে? উদয়—বাছা আমার কিছু জানে না তাথাকে ত মহারাজ—সে যেন রাজার মতই হয় নাই, কিন্তু তাহাকে ত আমি গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম, সে ত আমার আপনার সন্তান বটে। জানি না, বাছা সেখানে কি করিয়া থাকে, একবার আমাকে দেখিতেও দেয় না! মহিষী আজ কাল যে যে কথাই পাড়েন, উদয়াদিত্যের কথা তাহার মধ্যে একস্থলে আসিয়া পড়ে। ঐ কষ্টটাই তাঁহার প্রাণের মধ্যে যেন দিনরাত জাগিয়া আছে!

চিঠি পড়িয়া বসন্তরায় একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন—চুপ করিয়া বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বসন্তরায় মহিষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন “চিঠি ত কাহাকেও দেখাও নি মা?”

মহিষী কহিলেন “মহারাজ এ চিঠির কথা শুনিলে কি আর রক্ষা রাখিবেন, বিভাও কি তাহা হইলে আর বাঁচিত!”

বসন্তরায় কহিলেন “ভাল করিয়াছ। এ চিঠি আর কাহাকেও দেখাইও না বউ মা। তুমি বিভাকে শীঘ্র তাহার শ্বশুর বাড়ি পাঠাইয়া দাও। মান অপমানের কথা ভাবিও না!”

মহিষী কহিলেন—“আমিও তাহাই মনে করিয়াছি। মান লইয়া আমার কাজ নাই, আমার বিভা সুখী হইলেই হইল। কেবল ভয় হয় পাছে বিভাকে তাহারা অযত্ন করে।”

বসন্তরায় কহিলেন—“বিভাকে অযত্ন করিবে! বিভা কি অযত্নের ধন! বিভা যেখানে যাইবে সেই খানেই আদর পাইবে। অমন লক্ষ্মী অমন সোণার প্রতিমা আর কোথায় আছে! রামচন্দ্র কেবল তোমাদের উপর রাগ করিয়াই এই চিঠি লিখিয়াছে, আবার পাঠাইয়া দিলেই তাহার রাগ পড়িয়া যাইবে!” বসন্তরায় তাঁহার সরল হৃদয়ে সরল বুদ্ধিতে এই বুঝিলেন। মহিষীও তাহাই বুঝিলেন।

বসন্তরায় কহিলেন “বাড়িতে রাষ্ট্র করিয়া দাও যে বিভাকে চন্দ্রদ্বীপে পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া রামচন্দ্র এক চিঠি লিখিয়াছে। তাহা হইলে বিভা নিশ্চয়ই সেখানে যাইতে আর অমত করিবে না।”

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার পর বসন্তরায় একাকী বহির্বাটিতে বসিয়া আছেন। এমন সময়ে সীতারাম তাঁহাকে আসিয়া প্রণাম করিল।

বসন্তরায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“কি সীতারাম, কি খবর?”

সীতারাম কহিলেন, “সে পরে বলিব, আপনাকে আমার সঙ্গে আসিতে হইবে।

বসন্তরায় কহিলেন, “কেন, কোথায় সীতারাম?”

সীতারাম তখন কাছে আসিয়া বসিল। চুপি চুপি ফিস্ ফিস্ করিয়া কি বলিল। বসন্তরায় চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন “সত্য নাকি?”

সীতারাম কহিল, “আজ্ঞা হাঁ মহারাজ।”

বসন্তরায় মনে মনে অনেক ইতস্ততঃ

করিতে লাগিলেন। কহিলেন—"এখনি যাইতে হইবে না কি।"

সীতারাম "আজ্ঞা হাঁ।"

বসন্তরায়—"একবার বিভার সঙ্গে দেখা করিয়া আসিব না?"

সীতারাম—"আজ্ঞা—না—আর সময় নাই।"

বসন্তরায়—"কোথায় যাইতে হইবে?"

সীতারাম—"আমার সঙ্গে আসুন, আমি লইয়া যাইতেছি।"

বসন্তরায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন—"একবার বিভার সঙ্গে দেখা করিয়া আসি না কেন?"

সীতারাম—"আজ্ঞা না, মহারাজ! দেরী হইলে সমস্ত নষ্ট হইয়া যাইবে!"

বসন্তরায় তাড়াতাড়ি কহিলেন "তবে কাজ নাই—কাজ নাই!" উভয়ে চলিলেন।

আবার কিছু দূর গিয়া কহিলেন "একটু বিলম্ব করিলে কি চলে না?"

সীতারাম—"না মহারাজ তাহা হইলে বিপদ হইবে!"

"দুর্গা বল" বলিয়া বসন্তরায় প্রাসাদের বাহির হইয়া গেলেন।

বসন্তরায় যে আসিয়াছেন, তাহা উদয়াদিত্য জানেন না। বিভা তাঁহাকে বলে নাই। কেন না যখন উভয়ের দেখা হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, তখন এ সংবাদ তাঁহার কষ্টের কারণ হইত। সন্ধ্যার পর বিদায় লইয়া বিভা কারাগার হইতে চলিয়া গিয়াছে। উদয়াদিত্য একটি প্রদীপ লইয়া একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ পড়িতেছেন। জানালার ভিতর দিয়া বাতাস আসিতেছে, দীপের ক্ষীণ শিখা কাঁপিতেছে, অক্ষর ভাল দেখা যাইতেছে না। কীট পতঙ্গ আসিয়া দীপের উপর পড়িতেছে। এক একবার দীপ নিভ' নিভ' হইতেছে। একবার বাতাস বেগে আসিল—দীপ নিভিয়া গেল। উদয়াদিত্য পুঁথি ঝাঁপিয়া তাঁহার খাটে গিয়া বসিলেন। একে একে কত কি ভাবনা আসিয়া পড়িল। বিভার কথা মনে আসিল। আজ বিভা কিছু দেরী করিয়া আসিয়াছিল, কিছু সকাল সকাল চলিয়া গিয়াছিল। আজ বিভাকে কিছু বিশেষ ম্লান দেখিয়াছিলেন;—তাহাই লইয়া মনে মনে আলোচনা করিতেছিলেন। পৃথিবীতে যেন তাঁহার আর কেহ নাই—সমস্ত দিন বিভাকে ছাড়া আর কাহাকেও দেখিতে পান না—বিভাই তাঁহার একমাত্র আলোচ্য। বিভার প্রত্যেক হাসিটি প্রত্যেক কথাটি তাঁহার মনে সঞ্চিত হইতে থাকে—তৃষিত ব্যক্তি তাহার পানীয়ের প্রত্যেক বিন্দুটি পর্য্যন্ত যেমন উপভোগ করে, তেমনি বিভার প্রীতির অতি সামান্য চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত তিনি প্রাণ-মনে উপভোগ করেন। আজ তাই এই বিজন ক্ষুদ্র অন্ধকার ঘরের মধ্যে একলা শুইয়া স্নেহের প্রতিমা বিভার ম্লান মুখখানি ভাবিতে ছিলেন। সেই অন্ধকারে বসিয়া তাঁহার একবার মনে হইল—"বিভার কি ক্রমেই বিরক্ত ধরিতেছে? এই নিরানন্দ কারাগারের মধ্যে এক বিষন্ন অন্ধকার মূর্ত্তির সেবা করিতে আর কি তাহার ভাল লাগিতেছে না? আমাকে কি ক্রমেই সে তাহার সুখের বাধা—তাহার সংসার পথের কণ্টক বলিয়া দেখিবে? আজ দেরী করিয়া আসিয়াছে—কাল হয় ত আরো দেরী করিয়া আসিবে—তাহার পরে এক দিন হয় ত সমস্ত দিন বসিয়া আছি কখন্ বিভা আসিবে—বিকাল হইল—সন্ধ্যা হইল—রাত্রি হইল, বিভা আর আসিল না!—তাহার পর হইতে আর হয় ত বিভা আসিবে না।" উদয়াদিত্যের মনে যতই এই কথা উদয় হইতে লাগিল, ততই

তাঁহার মনটা হা-হা করিতে লাগিল—তাঁহার কল্পনা-রাজ্যের চারিদিক কি ভয়ানক শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন। এক দিন আসিবে যে দিন বিভা তাঁহাকে স্নেহশূন্য নয়নে তাঁহার সুখের কণ্টক বলিয়া দেখিবে—সেই অতি দূর কল্পনার আভাস মাত্র লাগিয়া তাঁহার হৃদয় একেবারে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। একবার মনে করিতেছেন "আমি কি ভয়ানক স্বার্থপর! আমি বিভাকে ভালবাসি বলিয়া তাহার যে ঘোরতর শত্রুতা করিতেছি, কোন শত্রুও বোধ করি এমন পারে না।" বার বার করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছেন আর বিভার উপর নির্ভর করিবেন না—কিন্তু যখনি কল্পনা করিতেছেন তিনি বিভাকে হারাইয়াছেন, তখনি তাঁহার মনে সে বল চলিয়া যাইতেছে, তখন তিনি অকূল পাথারে পড়িয়া যাইতেছেন—মরণাপন্ন মজ্জমান ব্যক্তির মত বিভার কাল্পনিক মূর্ত্তিকে আকুল ভাবে আঁকড়িয়া ধরিতেছেন।

এমন সময় চারিদিকে সহসা "আগুন আগুন" বলিয়া এক ঘোরতর কোলাহল উঠিল। উদয়াদিত্যের বুক কাঁপিয়া উঠিল—বাহিরে শত শত কণ্ঠস্বর একত্রে উঠিল, সহসা নানা বর্ণের নানাবিধ চীৎকার সহিত আকাশে শত লোকের দ্রুত পদশব্দ শুনা গেল। উদয়াদিত্য বুঝিলেন, প্রাসাদের কাছাকাছি কোথাও আগুন লাগিয়াছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া গোলমাল চলিতে লাগিল—তাঁহার মন অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিল।—সহসা দ্রুতবেগে তাঁহার কারাগারের দ্বার খুলিয়া গেল। কে একজন তাঁহার অন্ধকার গৃহে প্রবেশ করিল—তিনি চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে ও?"

সে উত্তর করিল "আমি সীতারাম আপনি বাহির হইয়া আসুন।"

উদয়াদিত্য কহিলেন—"কেন?"

সীতারাম কহিল—"যুবরাজ কারাগৃহে আগুন লাগিয়াছে, শীঘ্র বাহির হইয়া আসুন!" বলিয়া তাঁহাকে ধরিয়া প্রায় তাঁহাকে বহন করিয়া কারাগারের বাহিরে লইয়া গেল।

অনেক দিনের পর উদয়াদিত্য আজ মুক্ত স্থানে আসিলেন—মাথার উপরে সহসা অনেকটা আকাশ দেখিতে পাইলেন, বাতাস যেন তাঁহার বিস্তৃত বক্ষ প্রসারিত করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। চোখের বাধা চারিদিক হইতে খুলিয়া গেল। সেই অন্ধকার রাত্রে, আকাশের অসংখ্য তারকার দৃষ্টির নিম্নে, বিস্তৃত মাঠের মধ্যে কোমল তৃণজালের উপর দাঁড়াইয়া সহসা তাঁহার মনের মধ্যে এক অপরিসীম অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হইল। সেই আনন্দে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া তাহার পর সীতারামকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি করিব, কোথায় যাইব?" অনেক দিন সঙ্কীর্ণ স্থানে বদ্ধ ছিলেন, চলেন ফেরেন নাই—আজ এই বিস্তৃত মাঠের মধ্যে আসিয়া অসহায় ভাবে সীতারামকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি করিব? কোথায় যাইব?" সীতারাম কহিল "আসুন আমার সঙ্গে আসুন!"

এদিকে আগুন খুব জ্বলিতেছে। বৈকালে কতকগুলি প্রজা প্রধান কর্ম্মচারীদের নিকট কি-একটা নিবেদন করিবার জন্য আসিয়াছিল। তাহারা প্রাসাদের প্রাঙ্গণে একত্রে বসিয়াছিল—তাহারাই প্রথমে আগুনের গোল তোলে। প্রহরীদের বাসের জন্য কারাগারের কাছে একটি দীর্ঘ কুটীরশ্রেণী ছিল—সেই খানেই তাহাদের চারপাই, বাসন, কাপড়চোপড় জিনিষপত্র সমস্তই থাকে। অগ্নির সংবাদ পাইয়াই যত প্রহরী পারিল সকলেই ছুটিয়া গেল, যাহারা নিতান্তই পারিল না, তাহারা হাত পা আছড়াইতে লাগিল। উদয়াদিত্যের

গৃহদ্বারেও দুই একজন প্রহরী ছিল বটে, কিন্তু সেখানে কড়াকড় পাহারা দিবার কোন প্রয়োজনই ছিল না; দস্তুর ছিল বলিয়া তাহারা পাহারা দিত মাত্র। কারণ উদয়াদিত্য এমন শান্ত ভাবে তাঁহার গৃহে বসিয়া থাকিতেন যে বোধ হইত না যে তিনি কখন পলাইবার চেষ্টা করিবেন বা তাঁহার পলাইবার ইচ্ছা আছে। এই জন্য তাঁহার দ্বারে প্রহরীরা সর্ব্বাগ্রে ছুটিয়া গিয়াছিল। রাত হইতে লাগিল, আগুন নেবে না—কেহ বা জিনিষ পত্র সরাইতে লাগিল, কেহ বা জল ঢালিতে লাগিল, কেহ বা কিছুই না করিয়া কেবল গোলমাল করিয়াই বেড়াইতে লাগিল, আগুন নিবিলে পর তাহারাই সকলের অপেক্ষা অধিক বাহবা পাইয়াছিল। এইরূপ সকলে ব্যস্ত আছে, এমন সময়ে একজন স্ত্রীলোক তাহাদের মধ্যে ছুটিয়া আসিল, সে কি-একটা বলিতে চায়—কিন্তু তাহার কথা শোনে কে? কেহ তাহাকে গালাগালি দিল, কেহ তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল—কেহই তাহার কথা শুনিল না। যে শুনিল সে কহিল "যুবরাজ পলাইলেন তাতে আমার কি মাগি, তোরই বা কি? সে দয়াল সিংহ জানে—আমার ঘর ফেলিয়া এখন আমি কোথাও যাইতে পারি না।"

বলিয়া সে ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল। এইরূপ বারবার প্রতিহত হইয়া সেই রমণী অতি প্রচণ্ডা হইয়া উঠিল। একজন যাহাকে সম্মুখে পাইল তাহাকেই সবলে ধরিয়া কহিল—"পোড়ারমুখো, তোমরা কি চোখের মাথা খাইয়াছ? রাজার চাকরী কর সে জ্ঞান কি নাই? কাল রাজাকে বলিয়া হেঁটোয় কাঁটা উপরে কাঁটা দিয়া তোমাদের মাটিতে পুঁতিব তবে ছাড়িব। যুবরাজ যে পলাইয়া গেল!"

"ভালই হইয়াছে—তোর তাহাতে কি?" বলিয়া সে তাহাকে উত্তমরূপে প্রহার করিল—যাহারা ঘরে আগুন লাগাইয়াছিল, এ ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে একজন। প্রহার খাইয়া সেই রমণীর মূর্ত্তি অতি ভীষণ হইয়া উঠিল—ক্রুদ্ধ বাঘিনীর মত তাহার চোখ দুটা জ্বলিতে লাগিল, তাহার চুল গুলা ফুটিয়া উঠিল; সে দাঁতে দাঁতে কিড়মিড় করিতে লাগিল, তাহার সেই মুখের উপর বহ্নিশিখার আভা পড়িয়া তাহার মুখ পিশাচীর মত দেখিতে হইল। সম্মুখে একটা কাষ্ঠখণ্ড জ্বলিতেছিল, সেইটি তুলিয়া লইল, হাত পুড়িয়া গেল, কিন্তু তাহা ফেলিল না, সেই জ্বলন্ত কাষ্ঠ লইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। কিছুতে ধরিতে না পারিয়া—সেই কাষ্ঠ তাহার প্রতি ছুড়িয়া মারিল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সীতারাম যুবরাজকে সঙ্গে করিয়া খালের ধারে লইয়া গেল; সেখানে একখানা বড় নৌকা বাঁধা ছিল, সেই নৌকার সম্মুখে উভয়ে গিয়া দাঁড়াইলেন। তাহাদের দেখিয়া নৌকা হইতে এক ব্যক্তি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া কহিল "দাদা, আসিয়াছিস্?" উদয়াদিত্য একেবারে চমকিয়া উঠিলেন—সেই চির পরিচিত স্বর, যে স্বর বাল্যের স্মৃতির সহিত, যৌবনের সুখ দুঃখের সহিত জড়িত—পৃথিবীতে যতটুকু সুখ আছে, যতটুকু আনন্দ আছে যে স্বর তাহারি সহিত অবিচ্ছিন্ন—এক এক দিন কারাগারে গভীর রাত্রে বিনিদ্র নয়নে বসিয়া সহসা স্বপ্নে বংশিধ্বনির ন্যায় যে স্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিতেন—সেই স্বর—বিস্ময় ভাঙিতে না ভাঙিতে বসন্তরায় আসিয়া তাহাকে

আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন। উভয়ের দুই চক্ষু বাষ্পে পূরিয়া গেল। উভয়ে সেই খানে তৃণের উপর বসিয়া পড়িলেন। অনেক ক্ষণের পর উদয়াদিত্য কহিলেন "দাদা" মহাশয়!" বসন্ত-রায় কহিলেন "কি দাদা!" আর কিছু কথা হইল না। আবার অনেক ক্ষণের পর উদয়াদিত্য চারিদিকে চাহিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া বসন্তরায়ের মুখের দিকে চাহিয়া আকুল কণ্ঠে কহিলেন—"দাদা মহাশয় আজ আমি স্বাধীনতা পাইয়াছি,—তোমাকে পাই-য়াছি, আমার আর সুখের কি অবশিষ্ট আছে? এ মুহূর্ত্ত আর কতক্ষণ থাকিবে?" কিয়ৎক্ষণ পরে সীতারাম যোড়হাত করিয়া কহিল "যুব রাজ, নৌকায় উঠুন।"

যুবরাজ চমক ভাঙ্গিয়া কহিলেন—"কেন, নৌকায় কেন?"

সীতারাম কহিল—"নহিলে এখনি আবার প্রহরীরা আসিবে।"

উদয়াদিত্য বিস্মিত হইয়া বসন্তরায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন "দাদা মহাশয়, আমরা কি পলাইয়া যাইতেছি?"

বসন্তরায় উদয়াদিত্যের হাত ধরিয়া কহি-লেন, "হাঁ ভাই, আমি তোকে চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছি! এ যে পাষাণ হৃদয়ের দেশ—এরা যে তোকে ভাল বাসে না! তুই হরিণ শিশু এ ব্যাধের রাজ্যে বাস করিস্—আমি তোকে প্রাণের মধ্যে লুকাইয়া রাখিব, সেখানে নিরা-পদে থাকিবি!" বলিয়া উদয়াদিত্যকে বুকের কাছে টানিয়া আনিলেন—যেন তাঁহাকে কঠোর সংসার হইতে কাড়িয়া আনিয়া স্নেহের রাজ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চান্।

উদয়াদিত্য অনেক ক্ষণ ভাবিয়া কহি-লেন "না দাদা মহাশয়, আমি পলাইতে পারিব না।"

বসন্তরায় কহিলেন "কেন দাদা, এ বুড়াকে কি ভুলিয়া গেছিস্।"

উদয়াদিত্য কহিলেন "আমি যাই—একবার পিতার পা ধরিয়া কাঁদিয়া ভিক্ষা চাই গে, তিনি হয়ত রায়গড়ে যাইতে সম্মতি দিবেন!"

বসন্তরায় অস্থির হইয়া উঠিয়া কহিলেন "দাদা, আমার কথা শোন্—সেখানে যাস্‌নে,সে চেষ্টা করা নিষ্ফল।"

উদয়াদিত্য নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—"তবে যাই—আমি কারাগারে ফিরিয়া যাই!"

বসন্তরায় তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহি-লেন "কেমন যাইবি যা দেখি। আমি যাইতে দিব না।"

উদয়াদিত্য কহিলেন "দাদা মহাশয়, এ হতভাগ্যকে লইয়া কেন বিপদকে ডাকিতেছ! আমি যেখানে থাকি সেখানে কি তিলেক শান্তির সম্ভাবনা আছে?"

বসন্তরায় কহিলেন—"দাদা তোর জন্য যে বিভাও কারাবাসিনী হইয়া উঠিল। এই তাহার নবীন বয়সে সে কি তাহার সমস্ত জীবনের সুখ জলাঞ্জলি দিবে?" বসন্তরায়ের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

তখন উদয়াদিত্য তাড়াতাড়ি কহিলেন "তবে চল চল দাদা মহাশয়।" সীতারামের দিকে চাহিয়া কহিলেন "সীতারাম, প্রাসাদে তিন খানি পত্র পাঠাইতে চাই!"

সীতারাম কহিল—"নৌকাতেই কাগজ-কলম আছে, আনিয়া দিতেছি। শীঘ্র করিয়া লিখিবেন অধিক সময় নাই।" লেখা আনিয়া দিল।

উদয়াদিত্য পিতার কাছে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিলেন। মাতাকে লিখিলেন;—মা আমাকে গর্ভে ধরিয়া তুমি কখনো সুখী হইতে পার নাই। এইবার নিশ্চিন্ত হও মা—আমি দাদা

মহাশয়ের কাছে যাইতেছি, সেখানে আমি সুখে থাকিব, স্নেহে থাকিব, তোমার কোন ভাবনার কারণ থাকিবে না। বিভাকে লিখিলেন "চিরায়ুষ্মতীষু—তোমাকে আর কি লিখিব—তুমি জন্ম জন্ম সুখে থাক—স্বামিগৃহে গিয়া সুখের সংসার পাতিয়া সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া যাও।" লিখিতে লিখিতে উদয়াদিত্যের চোখে জল পুরিয়া আসিল। সীতারাম সেই চিঠি তিন খানি একজন দাঁড়ির হাত দিয়া প্রাসাদে পাঠাইয়া দিল। সকলে নৌকাতে উঠিতেছেন—এমন সময়ে দেখিলেন কে এক জন ছুটিয়া তাহাদের দিকে আসিতেছে। সীতারাম চমকিয়া বলিয়া উঠিল "ঐরে—সেই ডাকিনী আসিতেছে! দেখিতে দেখিতে রুক্মিণী কাছে আসিয়া পৌঁছিল। তাহার চুল এলোথেলো—তাহার অঞ্চল খসিয়া পড়িয়াছে, তাহার জ্বলন্ত অঙ্গারের মত চোখ দুটা অগ্নি উদ্গার করিতেছে—তাহার বার বার প্রতিহত বাসনা, অপরিতৃপ্ত প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির যন্ত্রণায় অধীর হইয়া সে যেন যাহাকে সম্মুখে পায়, তাহাকেই খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া রোষ মিটাইতে চায়। যেখানে প্রহরীরা আগুন নিবাইতেছিল, সেখানে বার বার ধাক্কা খাইয়া ক্রোধে অধীর হইয়া পাগলের মতন প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করে—একেবারে প্রতাপাদিত্যের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য বার বার নিষ্ফল চেষ্টা করে, প্রহরীরা তাহাকে পাগল মনে করিয়া মারিয়া ধরিয়া তাড়াইয়া দেয়। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সে প্রাসাদ হইতে ছুটিয়া আসিতেছে। বাঘিনীর মত সে উদয়াদিত্যের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবার চেষ্টা করিল। সীতারাম মাঝে আসিয়া পড়িল—চীৎকার করিয়া সে সীতারামের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, প্রাণপণে তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল—সহসা সীতারাম চীৎকার করিয়া উঠিল, দাঁড়ি মাঝিরা তাড়াতাড়ি আসিয়া বলপূর্ব্বক রুক্মিণীকে ছাড়াইয়া লইল। আত্মঘাতী বৃশ্চিক যেমন নিজের সর্ব্বাঙ্গে হুল ফুটাইতে থাকে, তেমনি সে অধীর হইয়া নিজের বক্ষ নখে আঁচড়াইয়া চুল ছিঁড়িয়া চীৎকার করিয়া কহিল "কিছুই হইল না, কিছুই হইল না—এই আমি মরিলাম এ স্ত্রী হত্যার পাপ তোদের হইবে।" সেই অন্ধকার রাত্রে এই অভিশাপ দিকে দিকে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে বিদ্যুৎবেগে রুক্মিণী জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। বর্ষায় খালের জল অত্যন্ত বাড়িয়াছিল—কোথায় সে তলাইয়া গেল ঠিকানা রহিল না। সীতারামের কাঁধ হইতে রক্ত পড়িতেছিল, চাদর জলে ভিজাইয়া কাঁধে বাঁধিল। নিকটে গিয়া দেখিল, উদয়াদিত্যের কপালে ঘর্ম্মবিন্দু দেখা গিয়াছে, তাঁহার হাত পা শীতল হইয়া গিয়াছে, তিনি প্রায় অজ্ঞান হইয়া গিয়াছেন—বসন্তরায়ও যেন দিশাহারা হইয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছেন; দাঁড়িগণ উভয়কে ধরিয়া নৌকায় তুলিয়া তৎক্ষণাৎ নৌকা ছাড়িয়া দিল। সীতারাম ভীত হইয়া ভাবিল "যাত্রার সময় কি অমঙ্গল!"

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

উদয়াদিত্যের নৌকা খাল অতিক্রম করিয়া নদীতে গিয়া পৌঁছিল, তখন সীতারাম নৌকা হইতে নামিয়া সহরে ফিরিয়া আসিল। আসিবার সময় যুবরাজের নিকট হইতে তাঁহার তলোয়ারটি চাহিয়া লইল।

উদয়াদিত্যের তিন খানি পত্র একটি লোকের হাত দিয়া সীতারাম প্রাসাদে প্রেরণ

করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে চিঠি কয়খানি কাহারো হাতে দিতে তাহাকে গোপনে বিশেষ-রূপে নিষেধ করিয়াছিল। নৌকা হইতে প্রাসাদে ফিরিয়া আসিয়া সীতারাম সেই চিঠি কয়খানি ফিরাইয়া লইল। কেবল মহিষী ও বিভার চিঠিখানি রাখিয়া বাকী পত্রখানি নষ্ট করিয়া ফেলিল।

তখন আগুন আরো ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। রাত্রে শয্যা হইতে উঠিয়া কৌতুক দেখিবার জন্য অনেক লোক জড় হইয়াছে। তাহাদে নির্ব্বাণের ব্যাঘাত হইতেছে বই সুবিধা হইতেছে না।

এই অগ্নিকাণ্ডে যে সীতারামের হাত ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। উদয়াদিত্যের প্রতি আসক্ত কয়েক জন প্রজা ও প্রাসাদের ভৃত্যের সাহায্যে সে কীর্ত্তি করিয়াছে। সন্ধ্যাবেলায় একেবারে পাঁচ ছয়টা ঘরে যে বিনা কারণে আগুন ধরিয়া উঠিল, ইহা কখন দৈবের কর্ম্ম নহে, এতক্ষণ এত চেষ্টা করিয়া আগুন নিবিবাও যে নিবিতেছে না, তাহারো কারণ আছে। যাহারা আগুন নিবাইতে যোগ দিয়াছে, তাহাদের মধ্যেই দুই এক জন করিয়া সীতারামের লোক আছে। যেখানে আগুন নাই তাহারা সেইখানে জল ঢালে, জল আনিতে গিয়া আনে না, কৌশলে কলসী ভাঙ্গিয়া ফেলে, গোলমাল করিয়া এ ওর ঘাড়ের উপর গিয়া পড়ে। আগুন আর নেবে না।

এদিকে যখন এইরূপে গোলযোগ চলিতেছে, তখন সীতারামের দলস্থ লোকেরা উদয়াদিত্যের শূন্য কারাগারে আগুন লাগাইয়া দিল। একে একে জানালা দরজা, কড়ি, বরগা, চৌকাঠ, কাঠের বেড়া প্রভৃতিতে আগুন ধরাইয়া দিল। সেই কারাগৃহে যে, কোন সূত্রে আগুন ধরিতে পারে, ইহা সকলের স্বপ্নেরও অগোচর, সুতরাং সে দিকে আর কাহারো মনোযোগ পড়ে নাই। সীতারাম ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, আগুন বেশ রীতিমত ধরিয়াছে। কতকগুলা হাড় মড়ার মাথা, ও উদয়াদিত্যের তলোয়ারটি সীতারাম কোন প্রকারে উদয়াদিত্যের সেই ঘরের মধ্যে ফেলিয়া দিল।

এদিকে যাহারা প্রহরী শালার আগুন নিভাইতে ছিল, কারাগারের দিক হইতে সহসা তাহারা এক চীৎকার শুনিতে পাইল। সকলে চমকিয়া একবাক্যে বলিয়া উঠিল—"ও কি রে!" একজন ছুটিয়া আসিয়া কহিল—"ওরে, যুবরাজের ঘরে আগুন ধরিয়াছে!" প্রহরীদের রক্ত জল হইয়া গেল, দয়াল সিংহের মাথা ঘুরিয়া গেল। কলসী হাত হইতে পড়িয়া গেল, জিনিষ পত্র ভূমিতে ফেলিয়া দিল। এমন সময়ে আর এক জন সেই দিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া কহিল;—"কারাগৃহের মধ্য হইতে যুবরাজ চীৎকার করিতেছেন শুনা গেল।"—তাহার কথা শেষ না হইতে হইতেই সীতারাম ছুটিয়া আসিয়া কহিল—"ওরে তোরা শীঘ্র আয়! যুবরাজের ঘরের ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, আরত তাঁহার সাড়া পাওয়া যাইতেছে না।" যুবরাজের কারাগৃহের দিকে সকলে ছুটিল। গিয়া দেখিল গৃহ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—চারিদিকে আগুন—ঘরে প্রবেশ করিবার উপায় নাই। তখন সেই খানে দাঁড়াইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিতে লাগিল। কাহার অসাবধানতায় এই ঘটনাটি ঘটিল, সকলেই তাহা স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঘোরতর বিবাদ বাধিয়া উঠিল, পরস্পর পরস্পরকে গালাগালি দিতে লাগিল, এমন কি, মারামারী হইবার উপক্রম হইল।

সীতারাম ভাবিল, গৃহদাহে যুবরাজের মৃত্যু হইয়াছে এই সংবাদ রাষ্ট্র করিয়া আপাততঃ কিছু দিন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব। যখন সে দেখিল, ঘরে বেশ করিয়া আগুন লাগিয়াছে, অভিপ্রেত জনরব বিশেষ রূপ রাষ্ট্র হইয়াছে, তখন সে মাথায় চাদর বাঁধিয়া আনন্দ মনে তাহার কুটীরাভিমুখে চলিল; প্রাসাদ হইতে অনেক দূরে আসিল। তখন রাত্রি অনেক, পথে লোক নাই, চারিদিকে স্তব্ধ—বাঁশগাছের পাতা ঝর্ ঝর্ করিয়া মাঝে মাঝে দক্ষিণা বাতাস বহিতেছে;—সীতারামের সৌখীন প্রাণ উল্লাসিত হইয়া উঠিয়াছে, সে একটি রস-গর্ভ গান ধরিয়াছে। সেই জনশূন্য স্তব্ধ পথ দিয়া একাকী পান্থ মনের উল্লাসে গান গাহিতে গাহিতে চলিল। কিছু দূর গিয়া তাহার মনের মধ্যে এক ভাবনা উপস্থিত হইল। সে ভাবিল, যশোহর হইতে ত সপরিবার পলাইতেই হইবে, অমনি বিনা মেহনতে কিঞ্চিৎ টাকার সংস্থান করিয়া লওয়া যাক্ না। মঙ্গলা পোড়ামুখীত মরিয়াছে—বালাই গিয়াছে—একবার তাহার বাড়ি হইয়া যাওয়া যাক্—বেটির টাকা আছে ঢের—তাহার ত্রিসংসারে কেহই নাই—সে-টাকা আমি না লই ত আর এক জন লইবে,—তায় কাজ কি, একবার চেষ্টা করিয়া দেখা যাক্! এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া সীতারাম রুক্মিণীর বাড়ির মুখে চলিল—প্রফুল্ল মনে আবার গান ধরিল। যাইতে যাইতে পথে এক-জন অভিসারিণীকে দেখিতে পাইল। সীতারামের নজরে এ সকল কিছুই এড়াইতে পায় না। ছুট, রসিকতা করিবার জন্য তাহার মনে অনিবার্য্য আবেগ উপস্থিত হইল—কিন্তু সময় নাই দেখিয়া সে আবেগ দমন করিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিল।

সীতারাম রুক্মিণীর কুটিরের নিকটে গিয়া দেখিল, দ্বার খোলাই আছে। হৃষ্টচিত্তে কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একবার চারি-দিকে নিরীক্ষণ করিল। ঘোরতর অন্ধকার, কিছুই দেখা যাইতেছে না। একবার চারি-দিক হাতড়াইয়া দেখিল। একটা সিন্দুকের উপর হুঁচট খাইয়া পড়িয়া গেল, দুই একবার দেয়ালে মাথা ঠুকিয়া গেল। সীতারামের গা ছম্‌ছম্ করিতে লাগিল। মনে হইল, কে যেন ঘরে আছে। কাহার যেন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস শুনা যাইতেছে—আস্তে আস্তে পাশের ঘরে গেল। গিয়া দেখিল, রুক্মিণীর শয়ন-গৃহ হইতে আলো আসিতেছে। প্রদীপটা এখনো জ্বলিতেছে মনে করিয়া সীতারামের অত্যন্ত আনন্দ হইল। তাড়াতাড়ি সেই ঘরের দিকে গেল। ও কে ও! ঘরে বসিয়া কে! বিনিদ্র নয়নে চুপ করিয়া বসিয়া কেও রমণী থরথর্ করিয়া কাঁপিতেছে! অর্দ্ধাবৃত দেহে ভিজা কাপড় জড়ানো, এলোচুল দিয়া ফোঁটা ফোঁটা করিয়া জল পড়িতেছে। কাঁপিতে কাঁপিতে তাহার দাঁত ঠক্‌ঠক্ করিতেছে। ঘরে একটি মাত্র প্রদীপ জ্বলিতেছে। সেই প্রদীপের ক্ষীণ আলো তাহার পাংশু বর্ণ মুখের উপর পড়িতেছে—পশ্চাতে সেই রমণীর অতি বৃহৎ এক ছায়া দেয়ালের উপর পড়িয়াছে। ঘরে আর কিছুই নাই—কেবল সেই পাংশু মুখশ্রী—সেই দীর্ঘ ছায়া আর এক ভীষণ নিস্তব্ধতা! ঘরে প্রবেশ করিয়াই সীতারামের শরীর হিম হইয়া গেল। দেখিল ক্ষীণ আলোক, এলোচুল, ভিজা কাপড়ে সেই মঙ্গলা বসিয়া আছে! সহসা দেখিয়া, তাহাকে প্রেতনী বলিয়া মনে হইল। অগ্রসর হইতেও সীতারামের সাহস হইল না—ভরসা বাঁধিয়া পিছন ফিরিতেও পারিল না। সীতারাম

নিতান্ত ভীরু ছিল না; অল্পক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া অবশেষে একপ্রকার বাহ্যিক সাহসও মৌখীক উপহাসের স্বরে কহিল—"তুই কোথা হইতে! মাগী, তোর মরণ নাই না কি!" রুক্মিণী কটমট করিয়া খানিকক্ষণ সীতারামের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—তখন সীতারামের প্রাণটা তাহার কণ্ঠের কাছে আসিয়া ধুক্‌ধুক্ করিতে লাগিল। অবশেষে রুক্মিণী সহসা বলিয়া উঠিল "বটে! তোদের এখনো সর্ব্বনাশ হইল না, আর আমি মরিব!" উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া কহিল, "যমের দুয়ার হইতে ফিরিয়া আসিলাম। আগে, তোকে, আর যুবরাজকে চুলায় শুয়াইব, তোদের চুলা হইতে দু মুটা ছাই লইয়া গায়ে মাখিয়া দেহ সার্থক করিব—তার পরে যমের সাধ মিটাইব—তাহার আগে যমালয়ে আমার ঠাই নাই।"

রুক্মিণীর গলা শুনিয়া সীতারামের অত্যন্ত সাহস হইল। সে সহসা অত্যন্ত অনুরাগ দেখাইয়া রুক্মিণীর সহিত ভাব করিয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। খুব যে কাছে ঘেঁসিয়া গেল, তাহা নহে, অপেক্ষাকৃত কাছে আসিয়া কোমল স্বরে কহিল,—"মইরি ভাই, ঐ জন্যই ত রাগ ধরে! তোমার কখন্ যে কি মতি হয়, ভাল বুঝিতে পারি না! বল্ত মঙ্গলা, আমি তোর কি করেছি! অধীনের প্রতি এত অপ্রসন্ন কেন? মান করেছিস্ বুঝি ভাই? সেই গানটা গাব?"

সীতারাম যতই অনুরাগের ভাণ করিতে লাগিল রুক্মিণী ততই ফুলিয়া উঠিতে লাগিল —তাহার আপাদমস্তক রাগে জ্বলিতে লাগিল —সীতারাম যদি তাহার নিজের মাথার চুল হইত, তবে তাহা দুই হাতে পট্‌পট্ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারিত, সীতারাম যদি তাহার নিজের চোখ হইত, তবে তৎক্ষণাৎ তাহা নখ দিয়া উপাড়াইয়া পা দিয়া দলিয়া ফেলিতে পারিত। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কিছুই হাতের কাছে পাইল না! দাঁতে দাঁতে লাগাইয়া কহিল, "একটু রোস; তোমার মুণ্ডপাত করিতেছি" বলিয়া থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে একটা বঁটির অন্বেষণে পাশের ঘরে চলিয়া গেল। এই কিছুক্ষণ হইল—সীতারাম গলায় চাদর বাঁধিয়া রূপক অলঙ্কারে মরিবার প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছিল, কিন্তু রুক্মিণীর চেহারা দেখিয়া তাহার রূপক ঘুরিয়া গেল, এবং চৈতন্য হইল যে, সত্যকার বঁটির আঘাতে মরিতে এখনো সে প্রস্তুত হইতে পারে নাই—এই নিমিত্ত অবসর বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ কুটীরের বাহিরে সরিয়া পড়িল। রুক্মিণী বঁটি হস্তে শূন্য গৃহে আসিয়া ঘরের মেজেতে সীতারামের উদ্দেশে বারবার করিয়া আঘাত করিল।

রুক্মিণী এখন "মরিয়া" হইয়াছে। যুবরাজের আচরণে তাহার দুরাশা একবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—তাহার সমস্ত উপায় সমস্ত উদ্দেশ্য একবারে ভূমিসাৎ হইয়াছে। এখন রুক্মিণীর আর সেই তীক্ষ্ণ শাণিত হাস্য নাই, বিদ্যুদ্বর্ষী কটাক্ষ নাই, তাহার সেই ভাদ্র মাসের জাহ্নবীর ঢলঢল তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস নাই—রাজবাটির যে সকল ভৃত্যেরা তাহার কাছে আসিত, তাহাদের সহিত ঝগড়া করিয়া, তাহাদিগকে গালাগালি দিয়া ভাগাইয়া দিয়াছে। দেওয়ানজির জ্যেষ্ঠ পুত্রটি সে দিন পান চিবাইতে চিবাইতে তাহার সহিত রসিকতা করিতে আসিয়াছিল, রুক্মিণী তাহাকে ঝাঁটাইয়া তাড়াইয়াছে। এখন আর কেহ তাহার কাছে ঘেঁসিতে পারে না। পাড়ার সকলেই তাহাকে ভয় করে।

সীতারাম কুটীর হইতে বাহির হইয়া

আসিয়া ভাবিল—মঙ্গলা যুবরাজের পলায়ন বৃত্তান্ত সমস্তই অবগত হইয়াছে; অতএব ইহার দ্বারাই সব ফাঁস হইবে—সর্ব্বনাশীকে গলা টিপিয়া মারিয়া আসিলাম না কেন! যাহা হউক—আমার আর যশোহরে এক মুহূর্ত্ত থাকা শ্রেয়ঃ নয়। আমি এখনই পালাই। সেই রাত্রেই সীতারাম সপরিবারে যশোহর ছাড়িয়া রায়গড়ে পলাইল।

শেষ রাত্রে মেঘ করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল—আগুনও ক্রমে নিবিয়া গেল। যুবরাজের মৃত্যুর জনরব প্রতাপাদিত্যের কাণে গেল। শুনিয়া তৎক্ষণাৎ প্রতাপাদিত্য বহির্দ্দেশে তাঁহার সভাভবনে আসিয়া বসিলেন। প্রহরীদের ডাকাইয়া আনিলেন, মন্ত্রী আসিল, আর দুই এক জন সভাসদ আসিল। এক জন সাক্ষ্য দিল, যখন আগুন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছিল, তখন সে যুবরাজকে জানালার মধ্য হইতে দেখিয়াছে। আর কয়েক জন কহিল, তাহারা যুবরাজের চীৎকার শুনিতে পাইয়াছিল। আর এক জন যুবরাজের গৃহ হইতে তাঁহার গলিত দগ্ধ তলোয়ারের অবশিষ্টাংশ আনিয়া উপস্থিত করিল। প্রতাপাদিত্য জিজ্ঞাসা করিলেন—"খুড়া কোথায়?" রাজ-বাটী অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইল না। কেহ কহিল—যখন আগুন লাগিয়াছিল, তখন তিনিও কারাগারে ছিলেন, কেহ কহিল না, রাত্রেই তিনি সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, গৃহদাহে যুবরাজের মৃত্যু হইয়াছে ও তাহা শুনিয়াই তিনি তৎক্ষণাৎ যশোর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। প্রতাপাদিত্য এইরূপে যখন সভায় বসিয়া সকলের সাক্ষ্য শুনিতেছেন, এমন সময়ে গৃহদ্বারে এক কলরব উঠিল। এক জন স্ত্রীলোক ঘরে প্রবেশ করিতে চায়, কিন্তু প্রহরীরা তাহাকে নিষেধ করিতেছে। শুনিয়া প্রতাপাদিত্য তাহাকে ঘরে লইয়া আসিতে আদেশ করিলেন। একজন প্রহরী রুক্মিণীকে সঙ্গে করিয়া আনিল। রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি চাও?" সে হাত নাড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল "আমি আর কিছু চাই না—তোমার ঐ প্রহরীদিগকে, সকলকে একে একে ছয় মাস গারদে পচাইয়া ডালকুত্তা দিয়া খাওয়াও এই আমি দেখিতে চাই। ওরা কি তোমাকে মানে, না তোমাকে ভয় করে!" এই কথা শুনিয়া প্রহরীরা চারিদিক্ হইতে গোল করিয়া উঠিল। রুক্মিণী পিছন ফিরিয়া চোখ পাকাইয়া তীব্র এক ধমক দিয়া কহিল "চুপ কর্ মিন্‌সেরা। কাল যখন তোদের হাতে পায় ধরিয়া, পই পই করিয়া বলিলাম—ওগো তোমাদের যুবরাজ তোমাদের রায়গড়ের বুড়া রাজার সঙ্গে পালায়—তখন যে তোরা পোড়ার মুখোরা আমার কথায় কাণ দিলে নে? রাজার বাড়ি চাকরি কর, তোমাদের বড় অহঙ্কার হইয়াছে তোমরা সাপের পাঁচ পা দেখিয়াছ! পিপড়ের পাখা উঠে মরিবার তরে!"

প্রতাপাদিত্য কহিলেন, "যাহা যাহা ঘটিয়াছে সমস্ত বল।"

রুক্মিণী কহিল "বলিব আর কি! তোমাদের যুবরাজ কাল রাত্রে বুড়া রাজার পলাইয়াছে।"

প্রতাপাদিত্য জিজ্ঞাসা করিলেন "ঘরে কে আগুন দিয়াছে জান?"

রুক্মিণী কহিল—"আমি আর জানি না! সেই যে তোমাদের সীতারাম। তোমাদের যুবরাজের সঙ্গে যে তার বড় পীরিত—আর কেউ যেন তাঁর কেউ নয় সীতারামই যেন তাঁর সব। এ সমস্ত সেই সীতারামের কাজ। বুড়া রাজা, সীতারাম, আর তোমাদের যুবরাজ, এই তিন জনে মিলিয়া পরামর্শ

করিয়া ইহা করিয়াছে—এই তোমাকে স্পষ্ট বলিলাম!"

প্রতাপাদিত্য অনেকক্ষণ ধরিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন! জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এসব কি করিয়া জানিতে পারিলে?" রুক্মিণী কহিল —"সে কথায় কাজ কি গা! আমার সঙ্গে লোক দাও, আমি স্বয়ং গিয়া তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া দিব। তোমার রাজবাড়ির চাকররা সব ভেড়া—উহারা এ কাজ করিবে না।"

প্রতাপাদিত্য রুক্মিণীর সহিত লোক দিতে আদেশ করিলেন ও প্রহরীদিগের প্রতি যথাবিহিত শাস্তির বিধান করিলেন। একে একে সভাগৃহ শূন্য হইয়া গেল। কেবল মন্ত্রী ও মহারাজ অবশিষ্ট রহিলেন। মন্ত্রী মনে করিলেন, মহারাজ অবশ্য তাঁহাকে কিছু বলিবেন। কিন্তু প্রতাপাদিত্য কিছুই বলিলেন না, স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। মন্ত্রী একবার কি বলিবার অভিপ্রায়ে অতি ধীরস্বরে কহিলেন"মহারাজ!" মহারাজ তাহার কোন উত্তর করিলেন না। মন্ত্রী ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন।

সেই দিনই সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রতাপাদিত্য এক জন জেলের মুখে উদয়াদিত্যের পলায়ন সংবাদ পাইলেন। নৌকা করিয়া নদী বাহিয়া উদয়াদিত্য চলিয়াছিলেন সে তাঁহাকে দেখিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য নানা লোকের মুখ হইতে সংবাদ পাইতে লাগিলেন। রুক্মিণীর সহিত যে লোকেরা গিয়াছিল, তাহারা এক সপ্তাহ পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল—যুবরাজকে রায়গড়ে দেখিয়া আসিলাম। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "সেই স্ত্রীলোকটি কোথায়?" তাহারা কহিল, "সে আর ফিরিয়া আসিল না, সে সেই খানেই রহিল।"

তখন প্রতাপাদিত্য মুক্তিয়ার খাঁ নামক তাঁহার এক পাঠান সেনাপতিকে ডাকিয়া তাহার প্রতি গোপনে কি একটা আদেশ করিলেন। সে সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

প্রতাপাদিত্যের পূর্ব্বেই মহিষী ও বিভা উদয়াদিত্যের পলায়ন সংবাদ অবগত হইয়াছিলেন। উভয়েই ভয়ে অভিভূত হইয়া ভাবিতেছিলেন যে, মহারাজ যখন জানিতে পারিবেন, তখন না জানি কি করিবেন? প্রতিদিন মহারাজ যখন এক একটী করিয়া সংবাদ পাইতেছিলেন, আশঙ্কায় উভয়ের প্রাণ ততই আকুল হইয়া উঠিতেছিল। এই রূপে সপ্তাহ গেল, অবশেষে মহারাজ বিশ্বাসযোগ্য যথার্থ সংবাদ পাইলেন। কিন্তু তিনি কিছুই করিলেন না। ক্রোধের আভাস মাত্র প্রকাশ করিলেন না। মহিষী আর সংশয়ে থাকিতে না পারিয়া একবার প্রতাপাদিত্যের কাছে গেলেন। কিন্তু অনেকক্ষণ উদয়াদিত্য সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিলেন না। মহারাজও সে বিষয়ে কোন কথা উত্থাপিত করিলেন না। অবশেষে আর থাকিতে না পারিয়া মহিষী বলিয়া উঠিলেন— "মহারাজ, আমার এক ভিক্ষা রাখ, এবার উদয়কে মাপ কর! বাছাকে আরো যদি কষ্ট দাও তবে আমি বিষ খাইয়া মরিব!"

প্রতাপাদিত্য ঈষৎ বিরক্তিভাবে কহিলেন, —"আগে হইতে যে তুমি কাঁদিতে বসিলে! আমিত কিছুই করি নাই!"

পাছে প্রতাপাদিত্য আবার সহসা বাঁকিয়া দাঁড়ান, এই নিমিত্ত মহিষী ও-কথা আর দ্বিতীয় বার উত্থাপিত করিতে সাহস করিলেন

না। ভীত মনে ধীরে ধীরে চলিয়া আইলেন। এক দিন, দুই দিন, তিন দিন গেল, মহারাজের কোন প্রকার ভাবান্তর লক্ষিত হইল না। তাহাই দেখিয়া মহিষী ও বিভা আশ্বস্তা হইলেন! মনে করিলেন, উদয়াদিত্য স্থানান্তরে যাওয়ায় মহারাজ মনে মনে বুঝি সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

এখন কিছু দিনের জন্য মহিষী এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন।

ইতিপূর্ব্বেই মহিষী বিভাকে বলিয়াছেন ও বাড়িতে রাষ্ট্র করিয়া দিয়াছেন যে বিভাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া রামচন্দ্র রায় এক পত্র লিখিয়াছেন। বিভার মনে আর আহ্লাদ ধরে না। রামমোহনকে বিদায় করিয়া অবধি বিভার মনে আর এক মুহূর্ত্তের জন্য শস্তি ছিল না। যখনি সে অবসর পাইত, তখনি ভাবিত "তিনি কি মনে করিতেছেন? তিনি কি আমার অবস্থা ঠিক বুঝিতে পারিয়াছেন? হয় ত তিনি রাগ করিয়াছেন! তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলে তিনি আমাকে কি মাপ করিবেন না? হা জগদীশ্বর, বুঝাইয়া বলিব কবে? কবে আবার দেখা হইবে?" উলটিয়া পালটিয়া বিভা ক্রমিক এই কথাই ভাবিত। দিবানিশি তাহার মনের মধ্যে একটা আশঙ্কা চাপিয়াছিল। মহিষীর কথা শুনিয়া বিভার কি অপরিসীম আনন্দ হইল, তাহার মন হইতে কি ভয়ানক একটা গুরুভার তৎক্ষণাৎ দূর হইয়া গেল। লজ্জাসরম দূর করিয়া হাসিয়া কাঁদিয়া সে তাহার মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া কতক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার মা কাঁদিতে লাগিলেন। বিভা যখন মনে করিল তাহার স্বামী তাহাকে ভুল বুঝেন নাই, তাহার মনের কথা ঠিক বুঝিয়াছেন—তখন তাহার চক্ষে সমস্ত জগৎ নন্দন কানন হইয়া উঠিল। তাহার স্বামীর হৃদয়কে কি প্রশস্ত বলিয়াই মনে হইল। তাহার স্বামীর ভালবাসার উপর কত খানি বিশ্বাস, কতখানি আস্থা জন্মিল! সে মনে করিল, তাহার স্বামীর ভালবাসা এ জগতে তাহার অটল আশ্রয়। সে যে এক বলিষ্ঠ মহাপুরুষের বিশাল স্কন্ধে তাহার ক্ষুদ্র সুকুমার লতাটির মত বাহু জড়াইয়া নির্ভয়ে অসীম বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া রহিয়াছে, সে নির্ভর হইতে কিছুতেই সে বিচ্ছিন্ন হইবে না। বিভা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার প্রাণ মেঘমুক্ত শরতের আকাশের মত প্রসারিত, নির্ম্মল হইয়া গেল। সে এখন তাহার ভাই সমরাদিত্যের সঙ্গে ছেলেমানুষের মত কত কি খেলা করে। ছোট মেয়ের মেয়েটির মত তাহার মায়ের কাছে কত কি আবদার করে, তাহার মায়ের গৃহকার্য্যে সাহায্য করে। আগে যে তাহার একটি বাক্যহীন, নিস্তব্ধ; বিষণ্ণ ছায়ার মত ভাব ছিল, তাহা ঘুচিয়া গেছে—এখন তাহার প্রফুল্ল হৃদয় খানি পরিস্ফুট প্রভাতের মত তাহার সর্ব্বাঙ্গে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। আগেকার মত সে সঙ্কোচ, সে লজ্জা, সে বিষাদ, সে অভিমান, সেই নীরব ভাব আর নাই। সে এখন আনন্দভরে, বিশ্বস্ত ভাবে মায়ের সহিত এত কথা বলে যে আগে হইলে বলিতে লজ্জা করিত, ইচ্ছাই হইত না। মেয়ের এই আনন্দ দেখিয়া মায়ের অসীম স্নেহ উথলিয়া উঠিল। মনের ভিতরে ভিতরে একটা ভাবনা জাগিতেছে বটে—কিন্তু বিভার নিকট আভাসেও সে ভাবনা কখন প্রকাশ করেন নাই। মা হইয়া আবার কোন্ প্রাণে বিভার সেই বিমল প্রশান্ত হাসিটুকু একতিল মলিন করিবেন! এই জন্য মেয়েটি প্রতিদিন চোখের সামনে

হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়, মা হাস্য মুখে, অপরিতৃপ্ত নয়নে তাহাই দেখেন।

মহিষীর মনের ভিতর নাকি একটা ভয়, একটা সন্দেহ বর্ত্তমান ছিল, তারই জন্য আজ কাল করিয়া এ পর্য্যন্ত বিভাকে আর প্রাণ ধরিয়া শ্বশুরালয়ে পাঠাতে পারিতেছেন না। দুই এক সপ্তাহ চলিয়া গেল, উদয়াদিত্যের বিষয়ে সকলেই এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। কেবল বিভার যে কি করিবেন, মহিষী এখনো তাহার একটা স্থির করিতে পারিতেছেন না। এমন আরো কিছু দিন গেল। যতই বিলম্ব হইতেছে—ততই বিভার অধীরতা বাড়িতেছে। বিভা মনে করিতেছে—যতই বিলম্ব হইতেছে, ততই সে যেন তাহার স্বামীর নিকট অপরাধী হইতেছে। তিনি যখন ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন—তখন আর কিসের জন্য বিলম্ব করা! এক বার তিনি মার্জ্জনা করিয়াছেন, আবার—। কয়েক দিন বিভা আর কিছু বলিল না—অবশেষে একদিন আর থাকিতে পারিল না; মায়ের কাছে গিয়া মায়ের গলা ধরিয়া, মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বিভা কহিল "মা।" ঐ কথাতেই তাহার মা সমস্ত বুঝিতে পারিলেন, বিভাকে বুকে টানিয়া লইয়া কহিলেন, "কি বাছা!" বিভা কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে কহিল, "মা, তুই আমাকে কবে পাঠাইবি মা!" বলিতে বলিতে বিভার মুখ কাণ লাল হইয়া উঠিল। মা ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথায় পাঠাইব বিভু!" বিভা মিনতির স্বরে কহিল—"বল না মা"। মহিষী কহিলেন,"আর কিছু দিন সবুর কর বাছা। শীঘ্রই পাঠাইব।" বলিতে বলিতে তাঁহার চখে জল আসিল।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—*—

বহুদিনের পর উদয়াদিত্য রায়গড়ে আসিলেন, কিন্তু আগেকার মত তেমন আনন্দ আর পাইলেন না। মনের মধ্যে একটা ভাবনা চাপিয়া ছিল, তাই কিছুই তেমন ভাল লাগিল না। তিনি ভাবিতেছিলেন, দাদা মহাশয় যে কাজ করিয়াছেন, তাঁহার যে কি হইবে তাহার ঠিকানা নাই, পিতা যে সহজে নিষ্কৃতি দিবেন এমন ত বোধ হয় না। আমার কি কুক্ষণেই জন্ম হইয়াছিল! তিনি বসন্তরায়ের কাছে গিয়া কহিলেন, "দাদামহাশয়, আমি যাই, যশোহরে ফিরিয়া যাই।" প্রথম প্রথম বসন্তরায় গান গাহিয়া হাসিয়া এ কথা উড়াইয়া দিলেন; তিনি গাহিলেন—

আর কি আমি ছাড়ব তোরে!
মন দিয়ে মন নাইবা পেলেম
জোর করে রাখব ধোরে।
শূন্য ক'রে হৃদয় পুরী প্রাণ যদি করিলে চুরী
তুমিই তবে থাক সেথায়
শূন্য হৃদয় পূর্ণ কোরে।

অবশেষে উদয়াদিত্য বার বার কহিলে পর বসন্তরায়ের মনে আঘাত লাগিল, তিনি গান বন্ধ করিয়া বিষণ্ণমুখে কহিলেন, "কেন দাদা, আমি কাছে থাকিলে তোর কিসের অসুখ?" উদয়াদিত্য আর কিছু বলিতে পারিলেন না।

উদয়াদিত্যকে উন্মনা দেখিয়া বসন্তরায় তাঁহাকে সুখী করিবার জন্য দিনরাত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। সেতার বাজাইতেন, সঙ্গে করিয়া লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন—উদয়াদিত্যের জন্য প্রায় তাঁহার রাজকার্য্য বন্ধ হইল। বসন্তরায়ের ভয়, পাছে উদয়াদিত্যকে না রাখিতে পারেন, পাছে উদয়াদিত্য আবার

যশোহরে চলিয়া যান। দিন রাত তাঁহাকে চোখে চোখে রাখেন, তাঁহাকে বলেন, "দাদা, তোকে আর সে পাষাণ হৃদয়ের দেশে যাইতে দিব না।"

দিন কতক থাকিতে থাকিতে উদয়াদিত্যের মনের ভাবনা অনেকটা শিথিল হইয়া আসিল। অনেক দিনের পর স্বাধীনতা লাভ করিয়া, সঙ্কীর্ণপ্রসর পাষাণময় চারিটি কারাভিত্তি হইতে মুক্ত হইয়া বসন্তরায়ের কোমল হৃদয়ের মধ্যে, তাঁহার অসীম স্নেহের মধ্যে বাস করিতেছেন। অনেক দিনের পর চারিদিকে গাছ পালা দেখিতেছেন, আকাশ দেখিতেছেন, দিগ্‌দিগন্তে পরিব্যাপ্ত উন্মুক্ত উষার আলো দেখিতেছেন, পাখীর গান শুনিতেছেন, দূর দিগন্ত হইতে হু হু করিয়া সর্ব্বাঙ্গে বাতাস লাগিতেছে, রাত্রি হইলে সমস্ত আকাশময় তারা দেখিতে পান, জ্যোৎস্নার প্রবাহের মধ্যে ডুবিয়া যান, ঘুমন্ত স্তব্ধতার প্রাণের মধ্যে বিরাজ করিতে থাকেন। যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারেন, যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, কিছুতেই আর বাধা নাই। ছেলেবেলা যে সকল প্রজারা উদয়াদিত্যকে চিনিত, তাহারা দূর দূরান্তর হইতে উদয়াদিত্যকে দেখিবার জন্য আসিল। গঙ্গাধর আসিল, ফটিক আসিল, হবিচাচা ও করিম্‌ উল্লা আসিল, মথুর তাহার তিনটি ছেলে সঙ্গে করিয়া আসিল, পরাণ ও হরি দুই ভাই আসিল, শীতল সর্দ্দার খেলা দেখাইবার জন্য পাঁচ জন লাঠিয়াল সঙ্গে লইয়া আসিল। প্রত্যহ যুবরাজের কাছে প্রজারা আসিতে লাগিল। যুবরাজ তাহাদের কত কি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। এখনো যে উদয়াদিত্য তাহাদিগকে ভোলেন নাই, তাহা দেখিয়া প্রজারা অত্যন্ত আনন্দিত ও বিস্মিত হইল। মথুর কহিল, "মহারাজ, আপনি যে মাসে রায়গড়ে আসিয়াছিলেন সেই মাসে আমার এই ছেলেটি জন্মায়, আপনি দেখিয়া গিয়াছিলেন, তার পরে আপনার আশীর্ব্বাদে আমার আরো দুটি সন্তান জন্মিয়াছে।" বলিয়া সে তাহার তিন ছেলেকে যুবরাজের কাছে আনিয়া কহিল, "প্রণাম কর।" তাহারা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। পরাণ আসিয়া কহিল, "এখান হইতে যশোরে যাইবার সময় হুজুর যে নৌকায় গিয়াছিলেন, আমি সেই নৌকায় মাঝি ছিলাম, মহারাজ।" শীতল সর্দ্দার আসিয়া কহিল, "মহারাজ, আপনি যখন রায়গড়ে ছিলেন, তখন আমার লাঠি খেলা দেখিয়া বক্‌সিস্‌ দিয়াছিলেন, আজ ইচ্ছা আছে একবার আমার ছেলেদের খেলা মহারাজকে দেখাইব। এস ত বাপধন, তোমরা এগোও ত।" বলিয়া ছেলেদের ডাকিল। এইরূপ প্রত্যহ সকাল হইলে উদয়াদিত্যের কাছে দলে দলে প্রজারা আসিত ও সকলে একত্রে মিলিয়া কথা কহিত।

এইরূপ স্নেহের মধ্যে, গাছপালার মধ্যে, আনন্দের মধ্যে গীতোচ্ছ্বাসের মধ্যে থাকিয়া স্বভাবতই উদয়াদিত্যের মন হইতে ভাবনা অনেকটা শিথিল হইয়া আসিল। তিনি চোখ বুজিয়া মনে করিলেন, পিতা হয়ত রাগ করেন নাই, তিনি হয়ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন, নহিলে এত দিন আর কি কিছু করিতেন না!

কিন্তু এরূপ চোখ-বাঁধা বিশ্বাসে বেশী দিন মনকে ভুলাইয়া রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার দাদা মহাশয়ের জন্য মনে কেমন একটা ভয় হইতে লাগিল। যশোহরে ফিরিয়া যাইবার কথা দাদামহাশয়কে বলা বৃথা; তিনি স্থির করিলেন একদিন লুকাইয়া যশোহরে পলাইয়া যাইব। আবার সেই কারাগার মনে পড়িল। কোথায় এই আনন্দের স্বাধীনতা, আর কোথায় সেই সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র কারাগারের একঘেয়ে জীবন!

কারাগারের সেই প্রতি মুহূর্ত্তকে এক এক বৎসর রূপে মনে পড়িতে লাগিল। সেই নিরালোক, নির্জ্জন, বায়ুহীন, বদ্ধ ঘরটি কল্পনায় স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, শরীর শিহরিয়া উঠিল। তবুও স্থির করিলেন, এখান হইতে একদিন সেই কারাগারের অভিমুখে পলাইতে হইবে। আজই পলাইব, এমন কথা মনে করিতে পারিলেন না—"একদিন পলাইব" মনে করিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

আজ বৃহস্পতিবার, বারবেলা, আজ যাত্রা হইতে পারে না, কাল হইবে। আজ দিন বড় খারাপ। সকাল হইতে ক্রমাগত টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। সমস্ত আকাশ লেপিয়া মেঘ করিয়া আছে। আজ সন্ধ্যাবেলায় রায়গড় ছাড়িয়া যাইতেই হইবে বলিয়া উদয়াদিত্য স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। সকালে যখন বসন্তরায়ের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইল, তখন বসন্তরায় উদয়াদিত্যকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, "দাদা, কাল রাত্রে আমি একটা বড় দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি। স্বপ্নটা ভাল মনে পড়িতেছে না, কেবল মনে আছে, তোতে আমাতে যেন—যেন জন্মের মত ছাড়াছাড়ি হইতেছে।"

উদয়াদিত্য বসন্তরায়ের হাত ধরিয়া কহিলেন, "না, দাদামহাশয়।—ছাড়াছাড়ি যদি বা হয়, ত জন্মের মত কেন হইবে?"

বসন্তরায় অন্য দিকে চাহিয়া ভাবনার ভাবে কহিলেন, "তা' নয়ত আর কি। কত দিন আর বাঁচিব বল্, বুড়া হইয়াছি!"

গত রাত্রের দুঃস্বপ্নের শেষ তান এখনো বসন্তরায়ের মনের গুহার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, তাই তিনি অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিলেন।

উদয়াদিত্য কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—"দাদামহাশয়, আবার যদি আমাদের ছাড়াছাড়ি হয় ত কি হইবে!"

বসন্তরায় উদয়াদিত্যের গলা ধরিয়া কহিলেন, "কেন ভাই, কেন ছাড়াছাড়ি হইবে? তুই আমাকে ছাড়িয়া যাস্‌নে। এ বুড়া বয়সে তুই আমাকে ফেলিয়া পালাস্‌নে ভাই!"

উদয়াদিত্যের চখে জল আসিল। তিনি বিস্মিত হইলেন;—তাঁহার মনের অভিসন্ধি যেন বসন্তরায় কি করিয়া টের পাইয়াছেন। নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "আমি কাছে থাকিলেই যে তোমার বিপদ ঘটিবে দাদা মহাশয়!"

বসন্তরায় হাসিয়া কহিলেন—"কিসের বিপদ ভাই? এ বয়সে কি আর বিপদকে ভয় করি! মরণের বাড়া ত আর বিপদ নাই! তা, মরণ যে আমার প্রতিবেশী; সে নিত্য আমার তত্ত্ব লইতে পাঠায়, তাহাকে আমি ভয় করি না। যে ব্যক্তি জীবনের সমস্ত বিপদ অতিক্রম করিয়া বুড়া বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তীরে আসিয়া তাহার নৌকাডুবি হইলই বা?"

উদয়াদিত্য আজ সমস্ত দিন বসন্তরায়ের সঙ্গে সঙ্গে রহিলেন। সমস্ত দিন টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল।

বিকালবেলায় বৃষ্টি ধরিয়া গেল, উদয়াদিত্য উঠিলেন। বসন্তরায় কহিলেন—"দাদা, কোথায় যাস্!"

উদয়াদিত্য কহিলেন—"একটু বেড়াইয়া আসি।"

বসন্তরায় কহিলেন—"আজ নাই বা গেলি।"

উদয়াদিত্য কহিলেন—"কেন, দাদা মহাশয়?"

বসন্তরায় উদয়াদিত্যকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন "আজ তুই বাড়ি হইতে বাহির হ'স্ নে, আজ তুই আমার কাছে থাক্ ভাই!"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "আমি অধিক দূর

যাব না দাদা মহাশয়,এখনি ফিরিয়া আসিব।” বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

প্রাসাদের বহির্দ্বারে যাইতেই একজন প্রহরী কহিল,“মহারাজ আপনার সঙ্গে যাইব।”

যুবরাজ কহিলেন—“না আবশ্যক নাই।”

প্রহরী কহিল—“মহারাজের হস্তে অস্ত্র নাই!”

যুবরাজ কহিলেন “অস্ত্রের প্রয়োজন কি?’ উদয়াদিত্য প্রাসাদের বাহিরে গেলেন। একটি দীর্ঘ বিস্তৃত মাঠ আছে, সেই মাঠের মধ্যে গিয়া পড়িলেন। একলা বেড়াইতে লাগিলেন। ক্রমে, দনের আলো মিলাইয়া আসিতে ল গিল। মনে কত কি ভাবনা উঠিল। যুবরাজ তাঁহার এই লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্যহীন জীবনের কথা ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া দেখিলেন, তাঁহার কিছুই স্থির নাই, কোথাও স্থিতি নাই—পরের মুহূর্ত্তেই কি হইবে তাহার ঠিকানা নাই। বয়স অল্প, এখনো জীবনের অনেক অবশিষ্ট আছে—কোথাও ঘর বাড়ি না বাধিয়া কোথাও স্থায়ী আশ্রয় না পাইয়া এই সুদূর-বিস্তৃত ভবিষ্যৎ এমন করিয়া কিরূপে কাটিবে? তাহার পর মনে পড়িল—বিভা। বিভা এখন কোথায় আছে? এত কাল আমিই তাহার সুখের সূর্য্য আড়াল করিয়া বসিয়াছিলাম—এখন কি সে সুখী হইয়াছে? বিভাকে মনে মনে কত আশীর্ব্বাদ করিলেন!

মাঠের মধ্যে রৌদ্রে রাখালদের বসিবার নিমিত্ত অশথ, বট, খেজুর, সুপারি প্রভৃতির এক বন আছে—যুবরাজ তাহার মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। অন্ধকার করিয়াছে। যুবরাজের আজ পলাইবার কথা ছিল—সেই সংকল্প লইয়া তিনি মনে মনে আন্দোলন করিতেছিলেন। বসন্তরায় যখন শুনিবেন, উদয়াদিত্য পলাইয়া গেছেন, তখন তাঁহার কিরূপ অবস্থা হইবে—তখন তিনি হৃদয়ে আঘাত পাইয়া করুণ মুখে কেমন করিয়া বলিবেন—“অ্যাঁ। দাদা, আমার কাছ হইতে পলাইয়া গেল” সে ছবি তিনি যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন;—

এমন সময়ে একজন রমণী কর্কশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—“এই যে গা, এইখানে তোমাদের যুবরাজ এই খানে!”

দুই জন সৈন্য মশাল হাতে করিয়া যুবরাজের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিতে দেখিতে আরো অনেকে আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তখন সেই রমণী তাঁহার কাছে আসিয়া কহিল“আমাকে চিনতে পার! কি গা! একবার এইদিকে তাকাও! একবার এই দিকে তাকাও।” যুবরাজ মশালের আলোকে দেখিলেন, রুক্মিণী। সৈন্যগণ রুক্মিণীর ব্যবহার দেখিয়া তাহাকে ধমক দিয়া কহিল, “দূর হ মাগী!” সে তাহাতে কর্ণপাতও না করিয়া কহিতে লাগিল—“এ সব কে করিয়াছে? আমি করিয়াছি। এ সব কে করিয়াছে? আমি করিয়াছি। এ সব সৈন্যদের এখানে কে আনিয়াছে! আমি আনিয়াছি! আমি তোমার লাগিয়া এত করিলাম,আর তুমি—”যুবরাজ ঘৃণায় রুক্মিণীর দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন! সৈন্যগণ রুক্মিণীকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া তফাৎ করিয়া দিল। তখন মুক্তিয়ার খাঁ সম্মুখে আসিয়া যুবরাজকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। যুবরাজ বিস্মিত হইয়া কহিলেন- “মুক্তিয়ার খাঁ কি খবর?”

মুক্তিয়ার খাঁ বিনীতভাবে কহিল “জনাব, আমাদের মহারাজের নিকট হইতে আদেশ লইয়া আসিতেছি!”

যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন “কি আদেশ!”

মুক্তিয়ার খাঁ প্রতাপাদিত্যের স্বাক্ষরিত

আদেশ পত্র বাহির করিয়া যুবরাজের হাতে দিল।

যুবরাজ পড়িয়া কহিলেন, "ইহার জন্য এত সৈন্যের প্রয়োজন কি? আমাকে একখানা পত্র লিখিয়া আদেশ করিলেইত আমি যাইতাম! আমিত আপনিই যাইতে ছিলাম, যাইব বলিয়াই স্থির করিয়াছি। তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন কি? এখনি চল। এখনি যশোহরে ফিরিয়া যাই।" মুক্তিয়ার খাঁ হাত যোড় করিয়া কহিল —"এখনি ফিরিতে পারিব না।"

যুবরাজ ভীত হইয়া কহিলেন—"কেন?" মুক্তিয়ার খাঁ কহিল—"আরেকটি আদেশ আছে, তাহা পালন না করিয়া যাইতে পারিব না।"

যুবরাজ ভীত স্বরে কহিলেন—"কি আদেশ!"

মুক্তিয়ার খাঁ কহিল—"রায়গড়ের রাজার প্রতি মহারাজ প্রাণদণ্ডের আদেশ করিয়াছেন।"

যুবরাজ চমকিয়া উচ্চস্বরে কহিয়া উঠিলেন "না, করেন নাই, মিথ্যা কথা!"

মুক্তিয়ার খাঁ কহিল—"আজ্ঞা যুবরাজ, মিথ্যা নহে। আমার নিকট মহারাজের স্বাক্ষরিত পত্র আছে।"

যুবরাজ সেনাপতির হাত ধরিয়া ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, "মুক্তিয়ার খাঁ, তুমি ভুল বুঝিয়াছ। মহারাজ আদেশ করিয়াছেন যে যদি উদয়াদিত্যকে না পাও, তাহা হইলে বসন্তরায়ের—আমি যখন আপনি ধরা দিতেছি, তখন আর কি! আমাকে এখনি লইয়া চল, এখনি লইয়া চল—আমাকে বন্দী করিয়া লইয়া চল, আর বিলম্ব করিও না!"

মুক্তিয়ার খাঁ কহিল—"যুবরাজ, আমি ভুল বুঝি নাই। মহারাজ স্পষ্ট আদেশ করিয়াছেন।"

যুবরাজ অধীর হইয়া কহিলেন—"তুমি নিশ্চয়ই ভুল বুঝিয়াছ। তাঁহার অভিপ্রায় এরূপ নহে। আচ্ছা, চল, যশোহরে চল। আমি মহারাজার সম্মুখে তোমাদের বুঝাইয়া দিব, তিনি যদি দ্বিতীয় বার আদেশ করেন তবে আদেশ সম্পন্ন করিও।"

মুক্তিয়ার যোড় হস্তে কহিল. কহিলেন মার্জ্জনা করুন, তাহা পারিব না।স্যা নাই, এস

যুবরাজ অধিকতর অধীর হইয়া।"

"মুক্তিয়ার, মনে আছে, আমি সেলাম করিয়া সিংহাসন পাইব। আমার কথাঙ্, আমাকে সন্তুষ্ট কর!" দেশ পালন

মুক্তিয়ার নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল।"

যুবরাজের মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল, তাঁহার কপালে ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দিল। তিনি সেনাপতির হাত দৃঢ়ভাবে ধরিয়া কহিলেন— "মুক্তিয়ার খাঁ, বৃদ্ধ, নিরপরাধ, পুণ্যাত্মাকে বধ করিলে নরকেও তোমার স্থান হইবে না!"

মুক্তিয়ার খাঁ কহিল—"মনিবের আদেশ পালন করিতে পাপ নাই।"

উদয়াদিত্য উচ্চৈঃস্বরে কহিয়া উঠিলেন "মিথ্যা কথা। যে ধর্ম্মশাস্ত্রে তাহা বলে, সে ধর্ম্মশাস্ত্র মিথ্যা। নিশ্চয় জানিও মুক্তিয়ার, পাপ আদেশ পালন করিলে পাপ।"

মুক্তিয়ার নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল।

উদয়াদিত্য চারি দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তবে আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমি গড়ে ফিরিয়া যাই। তোমার সৈন্যসামন্ত লইয়া সেখানে যাও—আমি তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি। সেখানে রণক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়া তার পরে তোমার আদেশ পালন করিও!"

মুক্তিয়ার নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। সৈন্যগণ অধিকতর ঘেঁসিয়া আসিয়া যুবরাজকে

ঘিরিল। যুবরাজ কোন উপায় না দেখিয়া সেই অন্ধকারে প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিলেন "দাদা মহাশয়, সাবধান!" স্বন কাঁপিয়া উঠিল—মাঠের প্রান্তে গিয়া সে স্বর মিলাইয়া গেল। সৈন্যরা আসিয়া উদয়া- ...ক ধরিল। উদয়াদিত্য আর এক বার ... করিয়া উঠিলেন—"দাদা মহাশয়, ... একজন পথিক মাঠ দিয়া যাইতে- ...নিয়া কাছে আসিয়া কহিল "কে ... দিত্য তাড়াতাড়ি কহিলেন- ...—গড়ে ছুটিয়া যাও—মহারাজকে ... করিয়া দাও," দেখিতে দেখিতে সেই ...ককে সৈন্যেরা গ্রেফতার করিল। যে ... সেই মাঠ দিয়া চলিয়াছিল— সন্যেরা অবিলম্বে তাহাকে বন্দী করিল।

কয়েক জন সৈন্য উদয়াদিত্যকে বন্দী করিয়া রহিল, মুক্তিয়ার খাঁ এবং অবশিষ্ট সৈন্যগণ সৈনিকের বেশ পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্র শস্ত্র লুকাইয়া সহজ বেশে গড়ের অভিমুখে গেল। রায়গড়ের শতাধিক দ্বার ছিল, ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়া তাহারা গড়ের মধ্যে প্রবেশ করিল।

তখন সন্ধ্যাকালে বসন্তরায় বসিয়া আহ্নিক করিতেছিলেন। ওদিক রাজবাড়ির ঠাকুর ঘরে সন্ধ্যাপূজার শাঁক ঘণ্টা বাজিতেছে। বৃহৎ রাজবাটিতে কোন কোলাহল নাই, চারি- দিক নিস্তব্ধ। বসন্তরায়ের নিয়মানুসারে অধিকাংশ ভৃত্য সন্ধ্যাবেলায় কিছু ক্ষণের জন্য ছুটি পাইয়াছে।

আহ্নিক করিতে করিতে বসন্তরায় সহসা দেখিলেন, তাঁহার ঘরের মধ্যে মুক্তিয়ার খাঁ প্রবেশ করিল। ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিয়া উঠি- লেন—"খাঁ সাহেব, এ ঘরে প্রবেশ করিও না। আমি এখনি আহ্নিক সারিয়া আসিতেছি।"

মুক্তিয়ার খাঁ ঘরের বাহিরে গিয়া দুয়ারের নিকট দাঁড়াইয়া রহিল। বসন্তরায় আহ্নিক সমাপন করিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া মুক্তিয়ার খাঁর গায়ে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করি- লেন "খাঁ সাহেব, ভাল আছ ত?"

মুক্তিয়ার সেলাম করিয়া সংক্ষেপে কহিল, "হাঁ মহারাজ!"

বসন্তরায় কহিলেন—"আহারাদি হই- য়াছে?"

মুক্তিয়ার—"আজ্ঞা হাঁ।"

বসন্তরায়—"আজ তবে, তোমার এখানে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিই!"

মুক্তিয়ার কহিল—"আজ্ঞা না, প্রয়োজন নাই। কাজ সারিয়া এখনি যাইতে হইবে।"

বসন্তরায়—"না, তা হইবে না খাঁ সাহেব, আজ তোমাদের ছাড়িব না, আজ এখানে থাকিতেই হইবে।"

মুক্তিয়ার—"না, মহারাজ শীঘ্রই যাইতে হইবে।"

বসন্তরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন বল দেখি? বিশেষ কাজ আছে বুঝি? প্রতাপ ভাল আছে ত?"

মুক্তিয়ার—"মহারাজ ভাল আছেন।"

বসন্তরায়—"তবে, কি তোমার কাজ, শীঘ্র বল। বিশেষ জরুরি শুনিয়া উদ্বেগ হইতেছে প্রতাপের ত কোন বিপদ ঘটে নাই!"

মুক্তিয়ার—"আজ্ঞা না, তাঁহার কোন বিপদ ঘটে নাই। মহারাজার একটি আদেশ পালন করিতে আসিয়াছি।"

বসন্তরায় তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন "কি আদেশ—এখনি বল।"

মুক্তিয়ার খাঁ একটি আদেশ পত্র বাহির করিয়া বসন্তরায়ের হাতে দিল। বসন্তরা... আলোর কাছে লইয়া পড়িতে লাগিলেন

ইতিমধ্যে একে একে সমুদয় সৈন্য দরজার নিকট আসিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইল।

পড়া শেষ করিয়া বসন্তরায় ধীরে ধীরে মুক্তিয়ার খাঁর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কি প্রতাপের লেখা?"

মুক্তিয়ার কহিল, "হাঁ।"

বসন্তরায় আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "খাঁ সাহেব, এ কি প্রতাপের স্বহস্তে লেখা?"

মুক্তিয়ার কহিল—"হাঁ মহারাজ!"

তখন বসন্তরায় কাঁদিয়া বলিয়া উঠিলেন, "খাঁ সাহেব, আমি প্রতাপকে নিজের হাতে মানুষ করিয়াছি!"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন—অবশেষে আবার কহিলেন, "প্রতাপ যখন এতটুকু ছিল, আমি তাহাকে দিনরাত কোলে করিয়া থাকিতাম—সে আমাকে এক মুহূর্ত্ত ছাড়িয়া থাকিতে চাহিত না! সেই প্রতাপ, বড় হইল, তাহার বিবাহ দিয়া দিলাম, তাহাকে সিংহাসনে বসাইলাম—তাহার সন্তানদের কোলে [illegible] — সেই প্রতাপ আজ স্বহস্তে [illegible] য়াছে খাঁ সাহেব?"

মুক্তিয়া[illegible] ভিজিয়া আসিল, [illegible] দাঁড়াইয়া রহিল।

বসন্তরায় জিজ্ঞাসা করি[illegible]লেন—"দাদা কোথায়? উদয় কোথায়?"

মুক্তিয়ার খাঁ কহিল, "তিনি বন্দী হইয়াছেন—মহারাজের নিকট বিচারের নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছেন।"

বসন্তরায় বলিয়া উঠিলেন—"উদয় বন্দী হইয়াছে? বন্দী হইয়াছে খাঁ সাহেব? আমি একবার তাহাকে কি দেখিতে পাইব না?"

মুক্তিয়ার খাঁ যোড়হাত করিয়া কহিল—"না জনাব, হুকুম নাই।"

বসন্তরায় সাশ্রুনেত্রে মুক্তিয়ার খাঁর হাত ধরিয়া কহিলেন—"একবার আমাকে দেখিতে দিবে না খাঁ সাহেব?"

মুক্তিয়ার কহিল—"আমি আদেশ-পালক ভৃত্য মাত্র।"

বসন্তরায় গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—"এ সংসারে কাহারো দয়ামায়া নাই, এস সাহেব তোমার আদেশ পালন কর!"

মুক্তিয়ার তখন মাটি ছুঁইয়া সেলাম করিয়া যোড় হস্তে কহিল—"মহারাজ, আমাকে মার্জ্জনা করিবেন—আমি প্রভুর আদেশ পালন করিতেছি মাত্র, আমার কোন দোষ নাই।"

বসন্তরায় কহিলেন—"না সাহেব তোমার দোষ কি? তোমার কোন দোষ নাই। তোমাকে আর মার্জ্জনা করিব কি?" বলিয়া মুক্তিয়ার খাঁর কাছে গিয়া তাহার সহিত কোলাকুলি করিলেন—কহিলেন, "প্রতাপকে বলিও, আমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া মরিলাম। আর দেখ খাঁ সাহেব, আমি মরিবার সময় তোমার উপরেই উদয়ের ভার দিয়া গেলাম, সে নিরপরাধ—দেখিও অন্যায় বিচারে সে যেন আর কষ্ট না পায়।"

বলিয়া বসন্তরায় চোখ বুজিয়া ইষ্ট দেবতার নিকট ভূমিষ্ট হইয়া রহিলেন, দক্ষিণ হস্তে মালা জপিতে লাগিলেন—ও কহিলেন "সাহেব এইবার!"

মুক্তিয়ার খাঁ ডাকিল, "আবদুল।" আবদুল মুক্ত তলোয়ার হস্তে আসিল। মুক্তিয়ার মুখ ফিরাইয়া সরিয়া গেল। মুহূর্ত্ত পরেই রক্তাক্ত অসি হস্তে আবদুল গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিল—গৃহে রক্তস্রোত বহিতে লাগিল!

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—*—

মুক্তিয়ার খাঁ ফিরিয়া আসিল। রায়গড়ে অধিকাংশ সৈন্য রাখিয়া উদয়াদিত্যকে লইয়া তৎক্ষণাৎ যশোহরে যাত্রা করিল। পথে যাইতে দুই দিন উদয়াদিত্য খাদ্য দ্রব্য স্পর্শ করিলেন না—কাহারো সহিত একটি কথাও কহিলেন না—কেবল চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় স্থির—তাঁহার নেত্রে নিদ্রা নাই, নিমেষ নাই, অশ্রু নাই, দৃষ্টি নাই—কেবলি ভাবিতেছেন। নৌকায় উঠিলেন—নৌকা হইতে মুখ বাড়াইয়া জলের দিকে চাহিয়া রহিলেন, নৌকা চলিতে লাগিল—দাঁড়ে শব্দ শুনিতে লাগিলেন, জলের কল্লোল কাণে প্রবেশ করিল তবুও কিছুই শুনিলেন না, কিছুই দেখিলেন না, কেবলি ভাবিতে লাগিলেন। রাত্রি হইল, আকাশে তারা উঠিল, মাঝিরা নৌকা বাঁধিয়া রাখিল, নৌকায় সকলেই ঘুমাইল কেবল জলের শব্দ শুনা যাইতেছে, নৌকার উপর ছোট ছোট তরঙ্গ আসিয়া আঘাত করিতেছে—যুবরাজ এক দৃষ্টে সম্মুখে চাহিয়া—সুদূর প্রসারিত শুভ্র বালির চড়ার দিকে চাহিয়া কেবলি ভাবিতে লাগিলেন। প্রত্যূষে মাঝিরা জাগিয়া উঠিল—নৌকা খুলিয়া দিল—উষার বাতাস বহিল—পূর্ব্বদিক রাঙা হইয়া উঠিল, যুবরাজ ভাবিতে লাগিলেন। তৃতীয় দিবসে যুবরাজের দুই চক্ষু ভাসিয়া হুহু করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল—হাতের উপর মাথা রাখিয়া জলের দিকে চাহিয়া রহিলেন—আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নৌকা চলিতে লাগিল—তীরে গাছপালাগুলি মেঘের মত চোখের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল, চোখ দিয়া সহস্র ধারায় অশ্রু পড়িতে লাগিল। অনেক ক্ষণের পর অবসর বুঝিয়া মুক্তিয়ার খাঁ ব্যথিত হৃদয়ে যুবরাজের নিকট আসিয়া বসিল, বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"যুবরাজ, কি ভাবিতেছেন।" যুবরাজ চমকিয়া উঠিলেন—অনেকক্ষণ স্তব্ধভাবে অবাক হইয়া মুক্তিয়ারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মুক্তিয়ারের মুখে মমতার ভাব দেখিয়া সহসা রুদ্ধপ্রাণ খুলিয়া যুবরাজ বলিয়া উঠিলেন—"ভাবিতেছি, পৃথিবীতে জন্মাইয়া আমি কি করিলাম! আমার জন্য কি সর্ব্বনাশই হইল। হে বিধাতা, যাহারা দুর্ব্বল এ পৃথিবীতে তাহারা কেন জন্মায়? যাহারা নিজের বলে সংসারে দাঁড়াইতে পারে না—যাহারা পদে পদে পরকে জড়াইয়া ধরে—তাহাদের দ্বারা পৃথিবীর কি উপকার হয়? তাহারা যাহাকে ধরে, তাহাকেই ডুবায়, পৃথিবীর সকল কাজেই বাধা দেয়—নিজেও দাঁড়াইতে পারে না, আর সকলকেও ভারাক্রান্ত করে।—আমি একজন দুর্ব্বল [illegible] আমাকেই বাঁচাইলেন, আর যাহা[illegible] বন্দ ছিল, সংসারের ভরসা ছিল—[illegible] বিনাশ করিলেন? [illegible] ল আ[illegible]তে আমি [illegible] তোমার [illegible] বিদায় হইলা[illegible]ম।

উদয়াদিত্য বন্দীভাবে প্রতাপাদিত্যের সম্মুখে [illegible] আনীত হইলেন। প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে অন্তঃপুরের [illegible] কক্ষে লইয়া গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। প্রতাপাদিত্যের কাছে আসিতেই উদয়াদিত্যের শরীর যেন শিহরিয়া উঠিল অনিবার্য্য ঘৃণায় তাঁহার সর্ব্বশরীরের মাংস যেন কুঞ্চিত হইয়া আসিল—তিনি পিতার মুখের দিকে আর চাহিতে পারিলেন না।

প্রতাপাদিত্য গম্ভীর স্বরে কহিলেন—"কোন্ শাস্তি তোমার উপযুক্ত?"

উদয়াদিত্য অবিচলিত ভাবে কহিলেন, "আপনি যাহা আদেশ করেন।"

প্রতাপাদিত্য কহিলেন—"তুমি আমার এ রাজ্যের যোগ্য নহ।"

উদয়াদিত্য কহিলেন—"না মহারাজ, আমি যোগ্য নহি। আমি আপনার রাজ্য চাহি না—আপনার সিংহাসন হইতে আমাকে অব্যাহতি দিন—এই ভিক্ষা।"

প্রতাপাদিত্যও তাহাই চান, তিনি কহিলেন—"তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা যে সত্যই তোমার হৃদয়ের ভাব তাহা কি করিয়া জানিব?"

উদয়াদিত্য কহিলেন—"দুর্ব্বলতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত নিজের স্বার্থের জন্য কখনো মিথ্যা কথা বলি নাই। বিশ্বাস না করেন যদি, আজ আমি মা কালীর চরণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিব—আপনার রাজ্যের এক সূচ্যগ্রভূমিও আমি কখনো শাসন করিব না—সমরাদিত্যই আপনার রাজ্যের উত্তরাধিকারী।"

প্রতাপাদিত্য সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন—"তুমি তবে কি চাও?"

উদয়াদিত্য কহিলেন—"মহারাজ, আমি আর কিছুই চাই না—কেবল আমাকে পিঞ্জররুদ্ধ পশুর মত গারদে পুরিয়া রাখিবেন না! আমাকে পরিত্যাগ করুন, আমি এখনি কাশী চলিয়া যাই। আর একটি ভিক্ষা—আমাকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিন—আমি সেখানে দাদামহাশয়ের নামে এক অতিথিশালা ও একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিব।"

প্রতাপাদিত্য কহিলেন—"আচ্ছা, তাহাই স্বীকার করিতেছি।"

সেই দিনই উদয়াদিত্য মন্দিরে গিয়া প্রতাপাদিত্যের সম্মুখে শপথ করিয়া কহিলেন—"মা কালী, তুমি সাক্ষী থাক, তোমার পা ছুঁইয়া আমি শপথ করিতেছি—যত দিন আমি বাঁচিয়া থাকিব, যশোহরের মহারাজের রাজ্যের এক তিলও আমি আমার বলিয়া গ্রহণ করিব না—যশোহরের সিংহাসনে আমি বসিব না, যশোহরের রাজদণ্ড আমি স্পর্শও করিব না। যদি কখনো করি, তবে এই দাদা মহাশয়ের হত্যার পাপ সমস্ত যেন আমারই হয়?" বলিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

মহারাণী যখন শুনিলেন, উদয়াদিত্য কাশী চলিয়া যাইতেছেন, তখন উদয়াদিত্যের কাছে আসিয়া কহিলেন, "বাবা উদয়, আমাকেও তোর সঙ্গে লইয়া চল্।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "সে কি কথা মা! তোমার সমরাদিত্য আছে, তোমার সমস্ত সংসার এখানে রহিল, তুমি যদি এখান হইতে যাও, তবে যশোরে রাজলক্ষ্মী থাকিবে না।"

মহিষী কাঁদিয়া কহিলেন, "বাছা, এই বয়সে তুই যদি সংসার ছাড়িয়া গেলি, আমি কোন্ প্রাণে সংসার লইয়া থাকিব? রাজ্য সংসার পরিত্যাগ করিয়া তুই সন্ন্যাসী হইয়া থাকিবি—তোকে সেখানে কে দেখিবে? তোর পিতা পাষাণ বলিয়া আমি তোকে ছাড়িতে পারিব না।" মহিষী তাঁহার সকল সন্তানের মধ্যে উদয়াদিত্যকে অধিক ভাল বাসিতেন, উদয়াদিত্যের জন্য তিনি বুক ফাটিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

উদয়াদিত্য মায়ের হাত ধরিয়া অশ্রুনেত্রে কহিলেন, "মা, তুমি ত জানই রাজবাড়িতে থাকিলে আমার পদে পদে আশঙ্কার কারণ থাকিবে—তুমি নিশ্চিন্ত হও মা, আমি বিশ্বেশ্বরের চরণে গিয়া নিরাপদ হই।"

উদয়াদিত্য বিভার কাছে গিয়া কহিলেন, "বিভা, দিদি আমার, কাশী যাইবার আ

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—*—

মুক্তিয়ার খাঁ ফিরিয়া আসিল। রায়গড়ে অধিকাংশ সৈন্য রাখিয়া উদয়াদিত্যকে লইয়া তৎক্ষণাৎ যশোহরে যাত্রা করিল। পথে যাইতে দুই দিন উদয়াদিত্য খাদ্য দ্রব্য স্পর্শ করিলেন না—কাহারো সহিত একটি কথাও কহিলেন না—কেবল চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় স্থির—তাঁহার নেত্রে নিদ্রা নাই, নিমেষ নাই, অশ্রু নাই, দৃষ্টি নাই—কেবলি ভাবিতেছেন। নৌকায় উঠিলেন—নৌকা হইতে মুখ বাড়াইয়া জলের দিকে চাহিয়া রহিলেন, নৌকা চলিতে লাগিল—দাঁড়ে শব্দ শুনিতে লাগিলেন, জলের কল্লোল কাণে প্রবেশ করিল তবুও কিছুই শুনিলেন না, কিছুই দেখিলেন না, কেবলি ভাবিতে লাগিলেন। রাত্রি হইল, আকাশে তারা উঠিল, মাঝিরা নৌকা বাঁধিয়া রাখিল, নৌকায় সকলেই ঘুমাইল কেবল জলের শব্দ শুনা যাইতেছে, নৌকার উপর ছোট ছোট তরঙ্গ আসিয়া আঘাত করিতেছে—যুবরাজ এক দৃষ্টে সম্মুখে চাহিয়া—সুদূর প্রসারিত শুভ্র বালির চড়ার দিকে চাহিয়া কেবলি ভাবিতে লাগিলেন। প্রত্যূষে মাঝিরা জাগিয়া উঠিল—নৌকা খুলিয়া দিল—ঊষার বাতাস বহিল—পূর্ব্বদিক রাঙা হইয়া উঠিল, যুবরাজ ভাবিতে লাগিলেন! তৃতীয় দিবসে যুবরাজের দুই চক্ষু ভাসিয়া হুহু করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল—হাতের উপর মাথা রাখিয়া জলের দিকে চাহিয়া রহিলেন—আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নৌকা চলিতে-লাগিল—তীরে গাছপালাগুলি মেঘের মত চোখের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল, চোখ দিয়া সহস্র ধারায় অশ্রু পড়িতে লাগিল। অনেক ক্ষণের পর অবসর বুঝিয়া মুক্তিয়ার খাঁ ব্যথিত হৃদয়ে যুবরাজের নিকট আসিয়া বসিল, বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"যুবরাজ, কি ভাবিতেছেন!" যুবরাজ চমকিয়া উঠিলেন—অনেকক্ষণ স্তব্ধভাবে অবাক হইয়া মুক্তিয়ারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মুক্তিয়ারের মুখে মমতার ভাব দেখিয়া সহসা রুদ্ধপ্রাণ খুলিয়া যুবরাজ বলিয়া উঠিলেন—"ভাবিতেছি, পৃথিবীতে জন্মাইয়া আমি কি করিলাম! আমার জন্য কি সর্ব্বনাশই হইল! হে বিধাতা, যাহারা দুর্ব্বল এ পৃথিবীতে তাহারা কেন জন্মায়? যাহারা নিজের বলে সংসারে দাঁড়াইতে পারে না—যাহারা পদে পদে পরকে জড়াইয়া ধরে—তাহাদের দ্বারা পৃথিবীর কি উপকার হয়? তাহারা যাহাকে ধরে, তাহাকেই ডুবায়, পৃথিবীর সকল কাজেই বাধা দেয়—নিজেও দাঁড়াইতে পারে না, আর সকলকেও ভারাক্রান্ত করে।—আমি একজন দুর্ব্বল [illegible] আমাকেই বাঁচাইলেন, আর যাহ।[illegible] বন্দ ছিল, সংসারের ভরসা ছিল—[illegible] বিনাশ করিলেন? [illegible] চল আ:স্তে আমি বিদায় হইলা ম। [illegible] তোমার

উদয়াদিত্য বন্দীভাবে প্রতাপাদিত্যের সম্মুখে আনীত হইলেন। প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে অন্তঃপুরের কক্ষে লইয়া গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। প্রতাপাদিত্যের কাছে আসিতেই উদয়াদিত্যের শরীর যেন শিহরিয়া উঠিল, অনিবার্য্য ঘৃণায় তাঁহার সর্ব্বশরীরের মাংস যেন কুঞ্চিত হইয়া আসিল—তিনি পিতার মুখের দিকে আর চাহিতে পারিলেন না।

প্রতাপাদিত্য গম্ভীর স্বরে কহিলেন—"কোন্ শাস্তি তোমার উপযুক্ত?"

উদয়াদিত্য অবিচলিত ভাবে কহিলেন, "আপনি যাহা আদেশ করেন।"

প্রতাপাদিত্য কহিলেন—"তুমি আমার এ রাজ্যের যোগ্য নহ।"

উদয়াদিত্য কহিলেন—"না মহারাজ, আমি যোগ্য নহি। আমি আপনার রাজ্য চাহি না—আপনার সিংহাসন হইতে আমাকে অব্যাহতি দিন – এই ভিক্ষা।"

প্রতাপাদিত্যও তাহাই চান, তিনি কহিলেন—"তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা যে সত্যই তোমার হৃদয়ের ভাব তাহা কি করিয়া জানিব ?"

উদয়াদিত্য কহিলেন—"দুর্ব্বলতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত নিজের স্বার্থের জন্ত কখনো মিথ্যা কথা বলি নাই। বিশ্বাস না করেন যদি, আজ আমি মা কালীর চরণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিব—আপনার রাজ্যের এক সূচ্যগ্রভূমিও আমি কখনো শাসন করিব না—সমরাদিত্যই আপনার রাজ্যের উত্তরাধিকারী।"

প্রতাপাদিত্য সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন—"তুমি তবে কি চাও ?"

উদয়াদিত্য কহিলেন—"মহারাজ, আমি আর কিছুই চাই না—কেবল আমাকে পিঞ্জররুদ্ধ পশুর মত গারদে পুরিয়া রাখিবেন না! আমাকে পরিত্যাগ করুন, আমি এখনি কাশী চলিয়া যাই। আর একটি ভিক্ষা—আমাকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিন—আমি সেখানে দাদামহাশয়ের নামে এক অতিথিশালা ও একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিব।"

প্রতাপাদিত্য কহিলেন—"আচ্ছা, তাহাই স্বীকার করিতেছি।"

সেই দিনই উদয়াদিত্য মন্দিরে গিয়া প্রতাপাদিত্যের সম্মুখে শপথ করিয়া কহিলেন—"মা কালী, তুমি সাক্ষী থাক, তোমার পা ছুঁইয়া আমি শপথ করিতেছি—যত দিন আমি বাঁচিয়া থাকিব, যশোহরের মহারাজের রাজ্যের এক তিলও আমি আমার বলিয়া গ্রহণ করিব না—যশোহরের সিংহাসনে আমি বসিব না, যশোহরের রাজদণ্ড আমি স্পর্শও করিব না। যদি কখনো করি, তবে এই দাদা মহাশয়ের হত্যার পাপ সমস্ত যেন আমারই হয় ?" বলিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

মহারাণী যখন শুনিলেন, উদয়াদিত্য কাশী চলিয়া যাইতেছেন, তখন উদয়াদিত্যের কাছে আসিয়া কহিলেন, "বাবা উদয়, আমাকেও তোর সঙ্গে লইয়া চল্।"

উদয়াদিত্য কহিলেন, "সে কি কথা মা! তোমার সমরাদিত্য আছে, তোমার সমস্ত সংসার এখানে রহিল, তুমি যদি এখান হইতে যাও, তবে যশোরে রাজলক্ষ্মী থাকিবে না।"

মহিষী কাঁদিয়া কহিলেন, "বাছা, এই বয়সে তুই যদি সংসার ছাড়িয়া গেলি, আমি কোন্ প্রাণে সংসার লইয়া থাকিব ? রাজ্য সংসার পরিত্যাগ করিয়া তুই সন্ন্যাসী হইয়া থাকিবি—তোকে সেখানে কে দেখিবে ? তোর পিতা পাষাণ বলিয়া আমি তোকে ছাড়িতে পারিব না!" মহিষী তাঁহার সকল সন্তানের মধ্যে উদয়াদিত্যকে অধিক ভাল বাসিতেন, উদয়াদিত্যের জন্ত তিনি বুক ফাটিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

উদয়াদিত্য মায়ের হাত ধরিয়া অশ্রুনেত্রে কহিলেন, "মা, তুমি ত জানই রাজবাড়িতে থাকিলে আমার পদে পদে আশঙ্কার কারণ থাকিবে—তুমি নিশ্চিন্ত হও মা, আমি বিশ্বেশ্বরের চরণে গিয়া নিরাপদ হই!"

উদয়াদিত্য বিভার কাছে গিয়া কহিলেন, "বিভা, দিদি আমার, কাশী যাইবার আ

তোকে আমি সুখী করিয়া যাইব। আমি নিজে সঙ্গে করিয়া তোকে শ্বশুর বাড়ি লইয়া যাইব, এই আমার একমাত্র সাধ আছে!"

বিভা উদয়াদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিল,"দাদা, দাদামহাশয় কেমন আছেন?"

"দাদা মহাশয় ভাল আছেন।" বলিয়াই উদয়াদিত্য তাড়াতাড়ি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

উদয়াদিত্য ও বিভার যাত্রার উদ্যোগ হইতে লাগিল। বিভা মায়ের গলা ধরিয়া কাঁদিল। অন্তঃপুরে যে যেখানে ছিল, শ্বশুরালয়ে যাইবার আগে সকলেই বিভাকে নানা প্রকার সদুপদেশ দিতে লাগিল।

মহিষী একবার উদয়াদিত্যকে ডাকিয়া পাঠাইলেন—কহিলেন, "বাবা, বিভাকে ত লইয়া যাইতেছ, যদি তাহারা অযত্ন করে!"

উদয়াদিত্য চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, "কেন মা, তাহারা অযত্ন করিবে কেন?"

মহিষী কহিলেন, "কি জানি তাহারা যদি বিভার উপর রাগ করিয়া থাকে!"

উদয়াদিত্য কহিলেন—"না, মা, বিভা ছেলে মানুষ, বিভার উপর কি তাহারা কখন রাগ করিতে পারে?"

মহিষী কাঁদিয়া কহিলেন—"বাছা, সাবধানে লইয়া যাইও, যদি তাহারা অনাদর করে, তবে আর বিভা বাঁচিবে না!"

উদয়াদিত্যের মনে একটা আশঙ্কা জাগিয়া উঠিল। বিভাকে যে শ্বশুরালয়ে অনাদর করিতে পারে, আগে তাহা তাঁহার মনেই হয় নাই। উদয়াদিত্য মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার কর্ম্মফল সমস্তই বুঝি শেষ হইয়া গিয়াছে—দেখিলেন এখনো শেষ হয় নাই। বিভাকে তিনি আশ্রয় করিয়াছেন, তাহার পরিণাম স্বরূপে বিভার অদৃষ্টে কি আছে তা' কে জানে!

যাত্রার সময় উদয়াদিত্য ও বিভা মাকে আসিয়া প্রণাম করিলেন—পাছে যাত্রার বিঘ্ন হয়, মহিষী তখন কাঁদিলেন না, তাঁহারা চলিয়া যাইতেই তিনি ভূমে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। উদয়াদিত্য ও বিভা পিতাকে প্রণাম করিয়া আসিলেন, বাড়ির অন্যান্য গুরুজনদের প্রণাম করিলেন। উদয়াদিত্য সমরাদিত্যকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহাকে চুম্বন করিলেন ও আপনার মনে কহিলেন—"বৎস, যে সিংহাসনে তুমি বসিবে, সে সিংহাসনের অভিশাপ তোমাকে স্পর্শ যেন না করে!" রাজ বাড়ির ভৃত্যেরা উদয়াদিত্যকে বড় ভাল বাসিত, তাহারা একে একে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, সকলে কাঁদিতে লাগিল। অবশেষে মন্দিরে গিয়া উভয়ে দেবতাকে প্রণাম করিয়া যাত্রা করিলেন।

শোক বিপদ অত্যাচারের রঙ্গভূমি পশ্চাতে পড়িয়া রহিল—জীবনের কারাগার পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। উদয়াদিত্য মনে করিলেন, এ বাড়িতে এ জীবনে আর প্রবেশ করিব না। একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন। দেখিলেন রক্তপিপাসু কঠোর হৃদয় রাজবাটি আকাশের মধ্যে মাথা তুলিয়া দৈত্যের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। পশ্চাতে ষড়যন্ত্র, যথেচ্ছাচারিতা, রক্তলালসা, দুর্ব্বলের পীড়ন, অসহায়ের অশ্রুজল পড়িয়া রহিল, সম্মুখে অনন্ত স্বাধীনতা, প্রকৃতির অকলঙ্ক সৌন্দর্য্য, হৃদয়ের স্বাভাবিক স্নেহ মমতা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য দুই হাত বাড়াইয়া দিল। তখন সবে প্রভাত

হইয়াছে। নদীর পূর্ব্ব পারে বনান্তের মধ্য হইতে কিরণের ছটা উর্দ্ধশিখা হইয়া উঠিয়াছে; গাছ পালার মাথার উপরে সোনার আভা পড়িয়াছে—লোক জন জাগিয়া উঠিয়াছে, মাঝিরা আনন্দে গান গাহিতে গাহিতে পাল তুলিয়া নৌকা খুলিয়া দিয়াছে। প্রকৃতির এই বিমল, প্রশান্ত, পবিত্র প্রভাত-মুখশ্রী দেখিয়া উদয়াদিত্যের প্রাণ পাখীদের সহিত স্বাধীনতার গান গাহিয়া উঠিল। মনে মনে কহিলেন, "জন্ম জন্ম যেন প্রকৃতির এই বিমল শ্যামল ভাবের মধ্যে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে পাই, আর সরল প্রাণদের সহিত একত্রে বাস করিতে পারি।"

নৌকা ছাড়িয়া দিল। মাঝিদের গান ও জলের কল্লোল শুনিতে শুনিতে উভয়ে অগ্রসর হইলেন। বিভার প্রশান্ত হৃদয়ে আনন্দের উষালোক বিরাজ করিতেছিল, তাহার মুখ চক্ষে অরুণের দীপ্তি। সে যেন এত দিনের পর একটা দুঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিয়া জগতের মুখ দেখিয়া আশ্বস্ত হইল। বিভা যাইতেছে। কাহার কাছে যাইতেছে? কে তাহাকে ডাকিতেছে? অনন্ত অচল প্রেম তাহাকে ডাকিয়াছে—বিভা ছোট পাখীটির মত ডানা ঢাকিয়া সেই কোমল প্রেমের স্তরের মধ্যে আরামে বিশ্বস্ত হৃদয়ে লুকাইয়া থাকিবে। জগতের চারিদিকে সে আজ স্নেহের সমুদ্র দেখিতে পাইতেছে। উদয়াদিত্য বিভাকে কাছে ডাকিয়া জলের কল্লোলের ন্যায় মৃদুস্বরে তাহাকে কত কি কাহিনী শুনাইতে লাগিলেন। যাহা শুনিল—বিভার তাহাই ভাল লাগিল।

রামচন্দ্র রায়ের রাজ্যের মধ্যে নৌকা প্রবেশ করিল। চারিদিক দেখিয়া বিভার মনে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হইল। কি সুন্দর শোভা! কুটীরগুলি দেখিয়া লোকজনদের দেখিয়া বিভার মনে হইল সকলে কি সুখেই আছে। বিভার ইচ্ছা হইতে লাগিল, প্রজাদিগকে কাছে ডাকিয়া তাহাদের রাজার কথা একবার জিজ্ঞাসা করে। প্রজাদিগকে দেখিয়া তাহার মনে মনে কেমন এক প্রকার অপূর্ব্ব স্নেহের উদয় হইল। যাহাকে দেখিল, সকলকেই তাহার ভাল লাগিল। মাঝে মাঝে দুই একজন দরিদ্র দেখিতে পাইল, বিভা মনে মনে কহিল, "আহা, ইহার এমন দশা কেন? আমি অন্তঃপুরে গিয়া ইহাকে ডাকাইয়া পাঠাইব। যাহাতে ইহার দুঃখ মোচন হয়, তাহাই করিব।" সকলই তাহার আপনার বলিয়া মনে হইল। এ রাজ্যে যে দুঃখ দারিদ্র্য আছে, ইহা তাহার প্রাণে সহিল না। বিভার ইচ্ছা করিতে লাগিল, প্রজারা তাহার কাছে আসিয়া একবার তাহাকে মা বলিয়া ডাকে, তাহার কাছে নিজের নিজের দুঃখ নিবেদন করে ও সে সেই দুঃখ দূর করিয়া দেয়।

রাজধানীর নিকটবর্ত্তী গ্রামে উদয়াদিত্য নৌকা লাগাইলেন। তিনি স্থির করিয়াছেন, রাজবাটীতে তাঁহাদের আগমন বার্ত্তা বলিয়া পাঠাইবেন ও তাহারা অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদের লইয়া যাইবে। যখন নৌকা লাগাইলেন, তখন বিকাল হইয়া গিয়াছে। উদয়াদিত্য মনে করিলেন কাল প্রাতে লোক পাঠান যাইবে—বিভার মনের ইচ্ছা—আজই সংবাদ দেওয়া হয়।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আজ লোকজনেরা ভারি ব্যস্ত। চারিদিকে বাজনা বাজিতেছে। গ্রামে যেন একটি উৎসব পড়িয়াছে। একে বিভার প্রাণে অধীর

আনন্দ জাগিতেছে, তাহার পরে চারিদিকে বাজনার শব্দ শুনিয়া তাহার হৃদয় যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। পাছে উদয়াদিত্যের কাছে তাহার এই অত্যধিক আনন্দ প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই জন্য কত কষ্টে সে হাসি নিবারণ করিয়া রাখিয়াছে! উদয়াদিত্য নদী তীরে উৎসবের ভাব দেখিয়া কি হইতেছে জানিবার জন্য গ্রামে বেড়াইতে গেলেন।

এমন কিছুক্ষণ গেল। একজন তীর হইতে জিজ্ঞাসা করিল—"কাহাদের নৌকা গা?" নৌকা হইতে রাজবাটীর ভৃত্যেরা বলিয়া উঠিল।—"কেও? রামমোহন যে? আরে, এস এস!" রামমোহন তাড়াতাড়ি নৌকায় প্রবেশ করিল। নৌকায় একলা বিভা বসিয়া আছে রামমোহনকে দেখিয়া হর্ষে উচ্ছ্বলিত হইয়া কহিল—"মোহন।"

রামমোহন—"মা।"

রামমোহন বিভার সেই সরল আনন্দে পরিপূর্ণ, হাসি হাসি মুখ খানি অনেক ক্ষণ দেখিয়া ম্লান মুখে কহিল—"মা তুমি আজ আসিলে?"

বিভা তাড়াতাড়ি কহিল—"হাঁ মোহন। মহারাজ কি ইহারি মধ্যে সংবাদ পাইয়াছেন? তুই কি আমাকে লইতে আসিয়াছিস্?"

রামমোহন কহিল—"না মা, অত ব্যস্ত হইও না—আজ থাক্—আর একদিন লইয়া যাইব।"

রামমোহনের ভাব দেখিয়া বিভা একেবারে মলিন হইয়া গিয়া কহিল—"কেন মোহন—আজ কেন যাইব না!"

রামমোহন কহিল—"আজ সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে—আজ থাক না!"

বিভা নিতান্ত ভীত হইয়া কহিল, "সত্য করিয়া বল মোহন কি হইয়াছে?"

রামমোহন থাকিতে পারিল না। আত্মগোপন করা তাহার অভ্যাস নাই। সেই খানেই সে বসিয়া পড়িল—কাঁদিয়া কহিল—"মা জননী, আজ তোমার রাজ্যে তোমার স্থান নাই—তোমার রাজবাটীতে তোমার গৃহ নাই। আজ মহারাজ বিবাহ করিতেছেন।"

বিভার মুখ একেবারে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। তাহার হাত পা হিম হইয়া গেল!—রামমোহন কহিতে লাগিল, "মা, যখন তোর এই অধম সন্তান তোকে ডাকিতে গিয়াছিল, তখন তুই কেন আসিলি না মা? তখন তুই নিষ্ঠুর পাষাণী হইয়া আমাকে কেন ফিরাইয়া দিলি মা? মহারাজের কাছে আমার যে আর মুখ রহিল না! বুক ফাটিয়া গেল, তবু যে তোর হইয়া একটি কথাও কহিতে পারিলাম না!"

বিভা আর চোখে কিছু দেখিতে পাইল না,—মাথা ঘুরিয়া সেইখানে পড়িয়া গেল। রামমোহন তাড়াতাড়ি জল আনিয়া বিভার মুখে চোখে ছিটা দিল। কিছুক্ষণ পরে বিভা উঠিয়া বসিল। এক আঘাতে বিভার সমস্ত জগৎ ভাঙ্গিয়া গেছে। স্বামীর রাজ্যের মধ্যে আসিয়া রাজধানীর কাছে পৌঁছিয়া, রাজপুরীর দুয়ারে আসিয়া তৃষার্ত্ত-হৃদয় বিভার সমস্ত সুখের আশা মরীচিকার মত মিলাইয়া গেল।

বিভা আকুল ভাবে কহিল—"মোহন, তিনি যে আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন—আমার আসিতে কি বড় বিলম্ব হইয়াছে?"

মোহন কহিল, "বিলম্ব হইয়াছে বৈকি।"

বিভা অধীর হইয়া কহিল—"আর কি মার্জ্জনা করিবেন না?"

মোহন কহিল—"মার্জ্জনা আর করিলেন কই?"

বিভা কহিল—"মোহন, আমি কেবল

একবার তাঁহাকে দেখিতে যাইব।" বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে কাঁদিয়া উঠিল।

রামমোহন চোখ মুছিয়া কহিল—"আজ থাক্ না মা।"

বিভা কহিল—"না মোহন, আমি আজই একবার তাঁহাকে দেখিয়া আসিব।"

রামমোহন কহিল—"যুবরাজ আগে গ্রাম হইতে ফিরিয়া আসুন।"

বিভা কহিল—"না মোহন, আমি এখনি একবার যাই।"

বিভা মনে করিয়াছিল, উদয়াদিত্য এ সংবাদ শুনিলে অপমানের ভয়ে পাছে না যাইতে দেন।

রামমোহন কহিল—"তবে একখানি শিবিকা আনাই।"

বিভা কহিল—"শিবিকা কেন? আমি কি রাণী, যে শিবিকা চাই! আমি একজন সামান্য প্রজার মত, একজন ভিখারিণীর মত যাইব—আমার শিবিকায় কাজ কি?"

রামমোহন কহিল—"আমার প্রাণ থাকিতে আমি তাহা দেখিতে পারিব না।"

বিভা কাতর স্বরে কহিল—"মোহন, তোর পায়ে পড়ি আমাকে আর বাধা দিস্ নে—বিলম্ব হইয়া যাইতেছে!"

রামমোহন ব্যথিত হৃদয়ে কহিল—"আচ্ছা মা, তাহাই হউক্।"

বিভা সামান্য রমণীর বেশে নৌকা হইতে বাহির হইল। নৌকার ভৃত্যেরা আসিয়া কহিল—"এ কি মা, এমন করিয়া এ বেশে কোথাও যাও।"

রামমোহন কহিল—"এ ত মায়েরি রাজ্য, যেখানে ইচ্ছা সেই খানেই যাইতে পারেন!"

ভৃত্যেরা আপত্তি করিতে লাগিল, রামমোহন তাহাদের ভাগাইয়া দিল।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

চারিদিকে লোক জন, চারিদিকেই ভিড়। আগে হইলে বিভা সঙ্কোচে মরিয়া যাইত, আজ কিছুই যেন তাহার চোখে পড়িতেছে না। যাহা কিছু দেখিতেছে সমস্তই যেন বিভার মিথ্যা বলিয়া মনে হইতেছে। চারিদিকে যেন একটা কোলাহলময় স্বপ্নের ঘেঁসাঘেঁসি—কিছুই যেন কিছু নয়। চারিদিকে একটা ভিড় চোখে পড়িতেছে এই পর্য্যন্ত—চারিদিক হইতে একটা কোলাহল শোনা যাইতেছে এই পর্য্যন্ত—তাহার যেন একটা কোন অর্থ নাই।

ভিড়ের মধ্য দিয়া রাজপুরীর দ্বারের নিকট আসিতেই একজন দ্বারী সহসা বিভার হাত ধরিয়া বিভাকে নিবারণ করিল—তখন সহসা বিভা এক মূহূর্ত্তে বাহ্য জগতের মধ্যে আসিয়া পড়িল—চারিদিক দেখিতে পাইল—লজ্জায় মরিয়া গেল। তাহার ঘোমটা খুলিয়া গিয়াছিল, তাড়াতাড়ি মাথার ঘোমটা তুলিয়া দিল। রামমোহন আগে আগে যাইতেছিল, সে পশ্চাৎ ফিরিয়া দ্বারীর প্রতি চোখ পাকাইয়া দাঁড়াইল—অদূরে ফর্ণাণ্ডিজ ছিল, সে আসিয়া দ্বারীকে ধরিয়া বিলক্ষণ শাসন করিল। বিভা প্রাসাদে প্রবেশ করিল। অন্যান্য দাস দাসীর ন্যায় বিভা প্রাসাদে প্রবেশ করিল—কেহ তাহাকে সমাদর করিল না!

ঘরে কেবল রাজা ও রমাই ভাড় বসিয়াছিলেন। বিভা গৃহে প্রবেশ করিয়া রাজার মুখের দিকে চাহিয়াই রাজার পায়ের কাছে ভূমিতে পড়িয়া গেল। রাজা শশব্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুই? ভিখারিণী ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছিস্?"

বিভা নত মুখ তুলিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে রাজার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "না মহা-

রাজ, আমার সর্ব্বস্ব দান করিতে আসিয়াছি। আমি তোমাকে পরের হাতে সমর্পণ করিয়া বিদায় লইতে আসিয়াছি!"

রামমোহন থাকিতে পারিল না, কাছে আসিয়া কহিল—"মহারাজ, আপনার মহিষী যশোহরের রাজকুমারী।"

সহসা রামচন্দ্ররায়ের প্রাণ যেন কেমন চম্‌কিয়া উঠিল—কিন্তু তৎক্ষণাৎ রমাই ভাঁড় হাসিয়া রাজার দিকে কটাক্ষ করিয়া কঠোর কণ্ঠে কহিল, "কেন এখন কি আর দাদাকে মনে ধরে না নাকি?

রামচন্দ্ররায়ের হৃদয়ে করুণার আভাস জাগিয়া উঠিয়াছিল, তথাপি রমাইয়ের কথায় তিনি নিষ্ঠুর হাস্য করিয়া উঠিলেন—তিনি ভাবিলেন—বিভাকে এখন মমতা দেখাইলে পাছে উপহাসাস্পদ হইতে হয়।

বিভার মাথায় একেবারে সহস্র বজ্রাঘাত হইল—সে লজ্জায় একেবারে মরিয়া গেল—চোখ বুজিয়া মনে মনে কহিল—মা গো, বসুন্ধরা, তুমি দ্বিধা হও! কাতর হইয়া চারিদিকে চাহিল—রামমোহনের মুখের দিকে একবার অসহায় দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল!

রামমোহন ছুটিয়া আসিয়া সবলে রমাই ভাঁড়ের ঘাড় টিপিয়া ধরিয়া তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিল।

রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন—"রামমোহন, তুই আমার সম্মুখে বেয়াদবি করিস্!"

রামমোহন কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল—"মহারাজ, আমি বেয়াদবি করিলাম! তোমার মহিষীকে আমার মাঠাকরুণকে বেটা অপমান করিল—উহার হইয়াছে কি, আমি উহার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া সহর হইতে বাহির করিয়া দিব, তবে আমার নাম রামমোহন্!"

রাজা রামমোহনকে ধমক দিয়া কহিলেন—"কে আমার মহিষী? আমি উহাকে চিনি না!"

বিভার মুখ নীল হইয়া গেল, সে মুখে আঁচল চাপিয়া ধরিল, থর থর করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, ও অবশেষে কাঁপিতে কাঁপিতে বিভা মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমিতে পড়িল। তখন রামমোহন যোড় হস্তে রাজাকে কহিল—"মহারাজ, আজ চার পুরুষে তোমার বংশে আমরা চাকরী করিয়া আসিতেছি। বাল্যকাল হইতে তোমাকে পালন করিয়াছি। আজ তুমি আমার মাঠাকরুণকে অপমান করিলে, তোমার রাজ্য-লক্ষ্মীকে দূর করিয়া দিলে—আজ আমিও তোমার চাকরী ছাড়িয়া দিয়া চলিলাম—আমার মাঠাকরুণের সেবা করিয়া জীবন কাটাইব। ভিক্ষা করিয়া খাইব তবুও এ রাজবাটির ছায়া মাড়াইব না।" বলিয়া রামমোহন রাজাকে প্রণাম করিল ও বিভাকে কহিল—"আয় মা, আয়! এখান হইতে শীঘ্র চলিয়া আয়! আর এক মুহূর্ত্তও এখানে থাকা নয়।" বলিয়া বিভাকে ধরিয়া তুলিয়া আনিল। দ্বারের নিকট অনেকগুলি শিবিকা ছিল, তাহার মধ্যে একটিতে হতজ্ঞান অবসন্ন বিভাকে তুলিয়া নৌকায় ফিরিয়া আসিল।

বিভা উদয়াদিত্যের সহিত কাশী চলিয়া গেল। সেই খানে দান, ধ্যান, দেবসেবা ও তাহার ভ্রাতার সেবায় জীবন কাটাইতে লাগিল। রামমোহন যতদিন বাঁচিয়া ছিল, তাহাদের সঙ্গে ছিল। সীতারামও সপরিবারে কাশীতে আসিয়া উদয়াদিত্যের আশ্রয় লইল।

চন্দ্রদ্বীপের যে হাটের সম্মুখে বিভার নৌকা লাগিয়াছিল, অদ্যাপি তাহার নাম রহিয়াছে—

"বৌ-ঠাকুরাণীর হাট।"

সমাপ্ত।



প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ –

ভুবনেশ্বরী মন্দিরের পাথরের ঘাট গোমতী নদীতে গিয়া প্রবেশ করিয়াছে। ত্রিপুরার মহারাজ গোবিন্দ-মাণিক্য একদিন গ্রীষ্মকালের প্রভাতে স্নান করিতে আসিয়াছেন, সঙ্গে তাঁহার ভাই নক্ষত্র রায়ও আসিয়াছেন। এমন সময়ে একটি ছোট মেয়ে তাহার ছোট ভাইকে সঙ্গে করিয়া সেই ঘাটে আসিল। রাজার কাপড় টানিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কে?"

রাজা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "মা, আমি তোমার সন্তান।"

মেয়েটি বলিল, "আমাকে পূজার ফুল পাড়িয়া দাও না।"

রাজা বলিলেন, "আচ্ছা চল।"

অনুচরগণ অস্থির হইয়া উঠিল। তাহারা কহিল, "মহারাজ, আপনি কেন যাইবেন, আমরা পাড়িয়া দিতেছি।"

রাজা বলিলেন "না, আমাকে যখন বলিয়াছে আমিই পাড়িয়া দিব।"

রাজা সেই মেয়েটির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। সেদিনকার বিমল উষার সঙ্গে তাহার মুখের সাদৃশ্য ছিল। রাজার হাত ধরিয়া যখন সে মন্দির-সংলগ্ন ফুলবাগানে বেড়াইতেছিল তখন চারিদিকের শুভ্র বেলফুলগুলির মত তাহার ফুটফুটে মুখখানি হইতে যেন

একটি বিমল সৌরভের ভাব উত্থিত হইয়া প্রভাতের কাননে ব্যাপ্ত হইতেছিল। ছোট ভাইটি দিদির কাপড় ধরিয়া দিদির সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেছিল। সে কেবল একমাত্র দিদিকেই জানে, রাজার সঙ্গে তাহার বড় একটা ভাব হইল না।

রাজা মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নাম কি মা?" মেয়ে বলিল "হাসি!"

রাজা ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?" ছেলেটি বড়বড় চোখ মেলিয়া দিদির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কিছু উত্তর করিল না।

হাসি তাহার গায়ে হাত দিয়া কহিল "বল্ না ভাই, আমার নাম তাতা।"

ছেলেটি তাহার অতি ছোট দুইখানি ঠোঁট একটুখানি খুলিয়া গম্ভীরভাবে দিদির কথার প্রতিধ্বনির মত বলিল, "আমার নাম তাতা।" বলিয়া দিদির কাপড় আরও শক্ত করিয়া ধরিল।

হাসি রাজাকে বুঝাইয়া বলিল, "ও কি না ছেলে মানুষ, তাই ওকে সকলে তাতা বলে।" ছোট ভাইটির দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "আচ্ছা বল্ দেখি মন্দির।"

ছেলেটি দিদির দিকে চাহিয়া কহিল "লদন্দ।"

হাসি হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "তাতা মন্দির বলিতে পারে না, বলে লদন্দ।—আচ্ছা, বল দেখি কড়াই।"

ছেলেটি গম্ভীর হইয়া বলিল, "বলাই।"

হাসি আবার হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "তাতা আমাদের কড়াই বলিতে পারে না, বলে বলাই।" বলিয়া তাতাকে ধরিয়া চুমো খাইয়া খাইয়া অস্থির করিয়া দিল।

তাতা সহসা দিদির এত হাসি ও এত আদরের কোনই কারণ খুঁজিয়া পাইল না, সে কেবল মস্ত চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিল। বাস্তবিকই মন্দির এবং কড়াই শব্দ উচ্চারণ সম্বন্ধে তাতার সম্পূর্ণ ত্রুটি ছিল, ইহা অস্বীকার করা যায় না; তাতার বয়সে হাসি মন্দিরকে কখনই লদন্দ বলিত না, সে মন্দিরকে বলিত পালু, আর সে কড়াইকে বলাই বলিত কি না জানি না, কিন্তু কড়িকে বলিত ঘয়ি, সুতরাং তাতার এরূপ বিচিত্র উচ্চারণ শুনিয়া তাহার যে অত্যন্ত হাসি পাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! তাতা সম্বন্ধে নানা ঘটনা সে রাজাকে বলিতে লাগিল। একবার একজন বুড়োমানুষ কম্বল জড়াইয়া আসিয়াছিল, তাতা তাহাকে ভাল্লুক বলিয়াছিল, এম্নি তাতার মন্দ বুদ্ধি! আর একবার তাতা গাছের আতা ফলগুলিকে পাখী মনে করিয়া মোটামোটা ছোট দুটি হাতে তালি দিয়া তাহাদিগকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাতা যে হাসির চেয়ে অনেক ছেলেমানুষ, ইহা তাতার দিদি বিস্তর উদাহরণ দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে প্রমাণ করিয়া দিল। তাতা নিজের বুদ্ধির পরিচয়ের কথা সম্পূর্ণ অবিচলিত চিত্তে শুনিতেছিল, যতটুকু বুঝিতে পারিল তাহাতে ক্ষোভের কারণ কিছুই দেখিতে পাইল না। এইরূপে সেদিনকার সকালে ফুলতোলা শেষ হইল। ছোট মেয়েটির আঁচল ভরিয়া যখন ফুল দিলেন, তখন রাজার মনে হইল যেন তাঁহার পূজা শেষ হইল; এই দুইটি সরল প্রাণের স্নেহের দৃশ্য দেখিয়া এই পবিত্র হৃদয়ের আশ মিটাইয়া ফুল তুলিয়া দিয়া তাঁহার যেন দেব পূজার কাজ হইল!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তাহার পরদিন হইতে ঘুম ভাঙিলে সূর্য্য উঠিলেও রাজার প্রভাত হইত না, ছোট দুটি

ভাইবোনের মুখ দেখিলে তবে তাঁহার প্রভাত হইত। প্রতিদিন তাহাদিগকে ফুল তুলিয়া দিয়া তবে তিনি স্নান করিতেন; দুই ভাই-বোনে ঘাটে বসিয়া তাঁহার স্নান দেখিত। যে দিন সকালে এই দুটি ছেলে মেয়ে না আসিত, সে দিন তাঁহার সন্ধ্যা আহ্নিক যেন সম্পূর্ণ হইত না।

হাসি ও তাতার বাপ মা কেহ নাই। কেবল একটি কাকা আছে। কাকার নাম কেদারেশ্বর। এই দুটি ছেলে মেয়েই তাহার জীবনের এক মাত্র সুখ ও সম্বল।

এক বৎসর কাটিয়া গেল। তাতা এখন মন্দির বলিতে পারে কিন্তু এখনও কড়াই বলিতে বলাই বলে। অধিক কথা সে কয় না। গোমতী নদীর ধারে নাগকেশর গাছের তলায় পা ছড়াইয়া তাহার দিদি তাহাকে যে কোন গল্পই করিত, সে তাহাই ড্যাবাড্যাবা চোখে অবাক হইয়া শুনিত। সে গল্পের কোন মাথামুণ্ড ছিল না। কিন্তু সে যে কি বুঝিত সেই জানে; গল্প শুনিয়া সেই গাছের তলায় সেই সূর্য্যের আলোতে, সেই মুক্ত সমীরণে একটি ছোট ছেলের ছোট হৃদয়টুকুতে যে কত কথা এত ছবি উঠিত, তাহা আমরা কি জানি! তাতা আর কোন ছেলের সঙ্গে খেলা করিত না, কেবল তাতার দিদির সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত বেড়াইত।

আষাঢ় মাস। সকাল হইতে ঘন মেঘ করিয়া রহিয়াছে। এখনও বৃষ্টি পড়ে নাই কিন্তু বাদ্‌লা হইবার উপক্রম দেখা যাইতেছে। দূর দেশের বৃষ্টির কণা বহিয়া শীতল বাতাস বহিতেছে। গোমতী নদীর জলে এবং গোমতী নদীর উভয় পারের অরণ্যে অন্ধকার আকাশের ছায়া পড়িয়াছে। কাল রাত্রে অমাবস্যা ছিল, কাল ভুবনেশ্বরীর পূজা হইয়া গিয়াছে।

যথাসময়ে হাসি ও তাতার হাত ধরিয়া রাজা স্নান করিতে আসিয়াছেন। একটি রক্ত স্রোতের রেখা শ্বেত প্রস্তরের ঘাটের সোপান বাহিয়া জলে গিয়া শেষ হইয়াছে। কাল রাত্রে যে একশ-এক মহিষ বলি হইয়াছে, তাহারই রক্ত। হাসি সেই রক্তের রেখা দেখিয়া সহসা এক প্রকার সঙ্কোচে সরিয়া গিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কিসের দাগ বাবা!" রাজা বলিলেন "রক্তের দাগ মা!" সে কহিল, "এত রক্ত কেন?" এমন এক প্রকার কাতর স্বরে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল "এত রক্ত কেন" যে, রাজারও হৃদয়ের মধ্যে ক্রমাগত এই প্রশ্ন উঠিতে লাগিল, "বাস্তবিক এত রক্ত কেন!" তিনি সহসা শিহরিয়া উঠিলেন। বহুদিন ধরিয়া প্রতি বৎসর রক্তের স্রোত দেখিয়া আসিতেছেন, একটি ছোট মেয়ের প্রশ্ন শুনিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল "এত রক্ত কেন?" তিনি উত্তর দিতে ভুলিয়া গেলেন। অন্যমনে স্নান করিতে করিতে ঐ প্রশ্নই ভাবিতে লাগিলেন, মনে মনে বলিলেন, "গোমতী, তুই প্রতি বৎসর কত শত অসহায় নির্দ্দোষ জীবের রক্ত বহন করিয়া আসিতেছিস, তোর জল এমন বিমল কেন?" হাসি জলে আঁচল ভিজাইয়া সিঁড়িতে বসিয়া ধীরে ধীরে রক্তের রেখা মুছিতে লাগিল, তাহার দেখাদেখি ছোট হাত দুটি দিয়া তাতাও তাহাই করিতে লাগিল! হাসির আঁচল খানি রক্তে লাল হইয়া গেল। রাজার যখন স্নান হইয়া গেল, তখন দুই ভাই-বোনে মিলিয়া রক্তের দাগ মুছিয়া ফেলিয়াছে।

সেই দিন বাড়ি ফিরিয়া গিয়া হাসির জ্বর হইল। তাতা কাছে বসিয়া দুটি ছোট আঙ্গুলে দিদির মুদ্রিত চোখের পাতা খুলিয়া দিবার

চেষ্টা করিয়া মাঝে মাঝে ডাকিতেছে, "দিদি।" দিদি অম্‌নি সকচিতে একটুখানি জাগিয়া উঠিতেছে। "কি তাতা!" বলিয়া তাতাকে কাছে টানিয়া লইতেছে; আবার তাহার চোখ ঢুকিয়া পড়িতেছে। তাতা অনেক ক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া দিদির মুখের দিকে চাহিয়া থাকে, কোন কথাই বলে না। অবশেষে অনেক ক্ষণ পরে ধীরে ধীরে দিদির গলা জড়াইয়া ধরিয়া দিদির মুখের কাছে মুখ দিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "দিদি তুই উঠ্‌বিনে!" হাসি চমকিয়া জাগিয়া তাতাকে বুকে চাপিয়া কহিল—"কেন উঠ্‌বনা ধন?" কিন্তু দিদির উঠিবার আর সাধ্য নাই। তাতার ক্ষুদ্র হৃদয় যেন অত্যন্ত অন্ধকার হইয়া গেল। তাহার সমস্ত দিনের খেলা ধুলা আনন্দের আশা একেবারে ম্লান হইয়া গেল। আকাশ অত্যন্ত অন্ধকার, ঘরের চালের উপর ক্রমাগতই বৃষ্টির শব্দ শুনা যাইতেছে, প্রাঙ্গণের তেঁতুল গাছ জলে ভিজিতেছে, পথে পথিক নাই। কেদারেশ্বর একজন বৈদ্যকে সঙ্গে করিয়া আনিল। বৈদ্য নাড়ি টিপিয়া ভাল বোধ করিল না।

তাহার পরদিন স্নান করিতে আসিয়া রাজা দেখিলেন মন্দিরে দুইটি ভাইবোন তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া নাই। মনে করিলেন এই ঘোরতর বর্ষায় তাহারা আসিতে পারে নাই। স্নান তর্পণ শেষ করিয়া শিবিকায় চড়িয়া রাজা বাহকদিগকে কেদারেশ্বরের কুটীরে যাইতে আজ্ঞা দিলেন। অনুচরেরা সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গেল, কিন্তু রাজাজ্ঞার উপরে আর কথা কহিতে পারিল না। রাজার শিবিকা প্রাঙ্গণে গিয়া পৌছিলে কুটীরে অত্যন্ত গোলযোগ পড়িয়া গেল। সে গোলমালে রোগীর রোগের কথা সকলেই ভুলিয়া গেল। কেবল তাতা নড়িল না, সে অচেতন দিদির কোলের কাছে বসিয়া, দিদির কাপড়ের এক প্রান্ত মুখের ভিতর পুরিয়া চুপ করিয়া রহিল। রাজাকে ঘরে আসিতে দেখিয়া তাতা জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে!" উদ্বিগ্ন হৃদয় রাজা কিছুই উত্তর দিলেন না। তাতা ঘাড় নাড়িয়া নাড়িয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "দিদির নেগেছে?" খুড়ো কেদারেশ্বর কিছু বিরক্ত হইয়া উত্তর দিলেন "হাঁ, লেগেছে।" অমনি তাতা দিদির কাছে গিয়া দিদির মুখ তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়া গলা জড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল "দিদি, তোমার কোথায় নেগেছে?" মনের অভিপ্রায় এই যে সেই জায়গাটাতে ফুঁদিয়া হাত বুলাইয়া দিদির সমস্ত বেদনা-দূর করিয়া দিবে। কিন্তু যখন দিদি কোন উত্তর দিল না, তখন তাহার আর সহ্য হইল না—ছোট দুইটি ঠোঁট উত্তরোত্তর ফুলিতে লাগিল, অভিমানে কাঁদিয়া উঠিল। কাল হইতে বসিয়া আছে, একটি কথা নাই কেন? তাতা কি করিয়াছে, যে তাহার উপর এত অনাদর! রাজার সম্মুখে তাতার এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া কেদারেশ্বর অত্যন্ত শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। সে বিরক্ত হইয়া তাতার হাত ধরিয়া অন্য ঘরে টানিয়া লইয়া গেল। তবুও দিদি কিছু বলিল না।

রাজবৈদ্য আসিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিয়া গেল। রাজা স্বয়ং বালিকার শিয়রের কাছে বসিয়া রহিলেন। সন্ধ্যার সময় বালিকা প্রলাপ বকিতে লাগিল। বলিতে লাগিল, "ও মাগো, এত রক্ত কেন!" রাজা কহিলেন, "মা, এ রক্তস্রোত আমি নিবারণ করিব।" বালিকা বলিল—"আয় ভাই তাতা, আমরা দুজনে এ রক্ত মুছে ফেলি।" সন্ধ্যার কিছু পরেই হাসি একবার চোখ খুলিয়াছিল। একবার চারিদিকে চাহিয়া কাহাকে যেন খুঁজিল। তখন তাতা অন্য ঘরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুমা-

ইয়া পড়িয়াছে। কাহাকে যেন না দেখিতে পাইয়া হাসি চোখ বুজিল। চক্ষু আর খুলিল না। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় রাজার কোলে হাসির মৃত্যু হইল।

হাসিকে যখন চিরদিনের জন্য কুটীর হইতে লইয়া গেল,তখন তাতা অজ্ঞান হইয়া ঘুমাইতেছিল। সে যদি জানিতে পাইত তবে সেও বুঝি দিদির সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছায়াটির মত চলিয়া যাইত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজার সভা বসিয়াছে। ভুবনেশ্বরী দেবীমন্দিরের পুরোহিত কার্য্যবশতঃ রাজ-দর্শনে আসিয়াছেন।

পুরোহিতের নাম রঘুপতি। এদেশে পুরোহিতকে চোন্তাই বলিয়া থাকে। ভুবনেশ্বরী দেবী পূজার চোদ্দ দিন পরে গভীর রাত্রে চতুর্দ্দশ দেবতার এক পূজা হয়। এই পূজার সময় একদিন দুই রাত্রি কেহ ঘরের বাহির হইতে পারে না, রাজাও না। রাজা যদি বাহির হন তবে চোন্তাইয়ের নিকটে তাঁহাকে অর্থদণ্ড দিতে হয়। প্রবাদ আছে এই পূজার রাত্রে মন্দিরে নরবলি হয়। এই পূজা উপলক্ষে সর্ব্বপ্রথমে যে সকল পশু বলি হয়, তাহা রাজবাড়ির দান বলিয়া গৃহীত হয়। এই বলির পশু গ্রহণ করিবার জন্য চোন্তাই রাজসমীপে আসিয়াছেন। পূজার আর বারো দিন বাকী আছে।

রাজা বলিলেন—"এ বৎসর হইতে মন্দিরে জীব বলি আর হইবে না।"

সভাসুদ্ধ লোক অবাক্ হইয়া গেল। রাজভ্রাতা নক্ষত্র রায়ের মাথার চুল পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া উঠিল!

চোন্তাই রঘুপতি বলিলেন, "আমি এ কি স্বপ্ন দেখিতেছি!"

রাজা বলিলেন, "না ঠাকুর, এতদিন আমরা স্বপ্ন দেখিতেছিলাম. আজ আমাদের চেতনা হইয়াছে। একটি বালিকার মূর্ত্তি ধরিয়া মা আমাকে দেখা দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া গেছেন, করুণাময়ী জননী হইয়া মা তাঁহার জীবের রক্ত আর দেখিতে পারেন না।"

রঘুপতি কহিলেন, "মা তবে এতদিন ধরিয়া জীবের রক্তপান করিয়া আসিতেছেন কি করিয়া।"

রাজা কহিলেন, "না, পান করেন নি। তোমরা যখন রক্তপাত করিতে তখন তিনি মুখ ফিরাইয়া থাকিতেন।"

রঘুপতি বলিলেন, "মহারাজ, রাজকার্য্য আপনি ভাল বুঝেন সন্দেহ নাই কিন্তু পূজা সম্বন্ধে আপনি কিছুই জানেন না। দেবীর যদি কিছুতে অসন্তোষ হইত, আমিই আগে জানিতে পারিতাম।"

নক্ষত্ররায় অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মত ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "হাঁ এ ঠিক কথা। দেবীর যদি কিছুতে অসন্তোষ হইত, ঠাকুর মহাশয় জানিতে পাইতেন।"

রাজা বলিলেন, "হৃদয় যার কঠিন হইয়া গিয়াছে দেবীর কথা সে শুনিতে পায় না।"

নক্ষত্ররায় পুরোহিতের মুখের দিকে চাহিলেন—ভাবটা এই যে, "এ কথার একটা উত্তর দেওয়া আবশ্যক!"

রঘুপতি আগুন হইয়া উঠিয়া বলিলেন, "মহারাজ আপনি পাষণ্ড নাস্তিকের মত কথা কহিতেছেন।"

নক্ষত্র রায় মৃদু প্রতিধ্বনির মত বলিলেন, "হাঁ নাস্তিকের মত কথা কহিতেছেন!"

গোবিন্দমাণিক্য উদ্দীপ্তমূর্ত্তি পুরোহিতের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলে', "ঠাকুর, রাজসভায় বসিয়া আপনি মিথ্যা সময় নষ্ট করিতেছেন। মন্দিরের কাজ বহিয়া যাইতেছে, আপনি মন্দিরে যান। যাইবার সময় পথে প্রচার করিয়া দিবেন যে, আমার রাজ্যে যে ব্যক্তি দেবতার নিকট জীব বলি দিবে তাহার নির্ব্বাসন দণ্ড হইবে।"

তখন রঘুপতি কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া পৈতা স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "তবে তুমি উচ্ছন্ন যাও—"চারিদিক হইতে হাঁ হাঁ করিয়া সভাসদগণ পুরোহিতের উপর গিয়া পড়িলেন। রাজা ইঙ্গিতে সকলকে নিষেধ করিলেন, সকলে সরিয়া দাঁড়াইলেন্। রঘুপতি বলিতে লাগিলেন, "তুমি রাজা তুমি ইচ্ছা করিলে প্রজার সর্ব্বস্ব হরণ করিতে পার তাই বলিয়া তুমি মায়ের বলি হরণ করিবে বটে! কি তোমার সাধ্য! আমি রঘুপতি মায়ের সেবক থাকিতে কেমন তুমি পূজার ব্যাঘাত কর দেখিব!"

মন্ত্রী রাজার স্বভাব বিলক্ষণ অবগত আছেন। তিনি জানেন সঙ্কল্প হইতে রাজাকে শীঘ্র বিচলিত করা যায় না। তিনি ধীরে ধীরে সভয়ে কহিলেন, "মহারাজ, আপনার স্বর্গীয় পিতৃপুরুষগণ বরাবর দেবীর নিকটে নিয়মিত বলি দিয়া আসিতেছেন। কখনও এক দিনের জন্ম ইহার অন্যথা হয় নাই।" মন্ত্রী থামিলেন।

রাজা চুপ করিয়া রহিলেন। মন্ত্রী বলিলেন, "আজ এত দিন পরে আপনার পিতৃ-পুরুষদের প্রতিষ্ঠিত সেই প্রাচীন পূজার ব্যাঘাত সাধন করিলে স্বর্গে তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইবেন।"

মহারাজ ভাবিতে লাগিলেন। নক্ষত্র রায় বিজ্ঞতাসহকারে বলিলেন, "হাঁ, স্বর্গে তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইবেন।"

মন্ত্রী আবার বলিলেন, "মহারাজ, এক কাজ করুন, যেখানে সহস্র বলি হইয়া থাকে সেখানে একশত বলির আদেশ করুন!"

সভাসদেরা বজ্রাহতের মত অবাক্ হইয়া রহিল, গোবিন্দমাণিক্যও বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। ক্রুদ্ধ পুরোহিত অধীর হইয়া সভা হইতে উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।

এমন সময়ে কেমন করিয়া প্রহরীদের হাত এড়াইয়া খালি গায়ে খালি পায়ে একটি ছোট ছেলে সভায় প্রবেশ করিল। রাজসভার মাঝখানে দাঁড়াইয়া রাজার মুখের দিকে বড় বড় চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি কোথায়!"

বৃহৎ রাজসভার সমস্ত যেন সহসা নিস্তব্ধ হইয়া গেল। দীর্ঘগৃহে কেবল একটি ছেলের কণ্ঠধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল, "দিদি কোথায়!"

রাজা তৎক্ষণাৎ সিংহাসন হইতে নামিয়া ছেলেকে কোলে করিয়া দৃঢ়স্বরে মন্ত্রীকে বলিলেন, "আজ হইতে আমার রাজ্যে বলিদান হইতে পারিবে না। ইহার উপর আর কথা কহিও না"

মন্ত্রী কহিলেন—"যে আজ্ঞা।"

তাতা রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল—"আমার দিদি কোথায়?"

রাজা বলিলেন—"মায়ের কাছে!"

তাতা অনেকক্ষণ মুখে আঙুল দিয়া চুপ করিয়া রহিল, একটা যেন ঠিকানা পাইল এমনি তাহার মনে হইল। আজ হইতে রাজা তাতাকে নিজের কাছে রাখিলেন। বুড়ো কেদারেশ্বর রাজবাড়িতে স্থান পাইল।

সভাসদেরা আপনা-আপনি বলাবলি

করিতে লাগিল, "এ যে মগের মুল্লুক হইয়া দাঁড়াইল। আমরাত জানি বৌদ্ধ মগেরাই রক্তপাত করে না, অবশেষে আমাদের হিন্দুদের দেশেও কি সেই নিয়ম চলিবে না কি!"

নক্ষত্ররায়ও তাহাদের মতে সম্পূর্ণ মত দিয়া কহিলেন, "হাঁ, শেষে হিন্দুদের দেশেও কি সেই নিয়ম চলিবে না কি!"

সকলেই ভাবিল অবনতির লক্ষণ ইহা হইতে আর কি হইতে পারে! মগে হিন্দুতে তফাৎ রহিল কি?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভুবনেশ্বরী দেবীমন্দিরের ভৃত্য জয়সিংহ জাতিতে রাজপুত, ক্ষত্রিয়। তাঁহার বাপ সুচেৎ সিং ত্রিপুরার রাজবাটির একজন পুরাতন ভৃত্য ছিলেন। সুচেৎ সিংহের মৃত্যুকালে জয়সিংহ নিতান্ত বালক ছিলেন। এই অনাথ বালককে রাজা মন্দিরের কাজে নিযুক্ত করেন। জয়সিংহ মন্দিরের পুরোহিত রঘুপতির দ্বারাই পালিত ও শিক্ষিত হইয়াছেন। ছেলেবেলা হইতে মন্দিরে পালিত হইয়া জয়সিংহ মন্দিরকে গৃহের মত ভাল বাসিতেন, মন্দিরের প্রত্যেক সোপান, প্রত্যেক প্রস্তর-খণ্ডের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। তাঁহার মা ছিল না, ভুবনেশ্বরী প্রতিমাকেই তিনি মায়ের মত দেখিতেন, প্রতিমার সম্মুখে বসিয়া তিনি কথা কহিতেন তাঁহার এ কলা বোধ হইত না। তাঁহার আরও সঙ্গী ছিল। মন্দিরের বাগানের অনেকগুলি গাছকে যিনি নিজের হাতে মানুষ করিয়াছেন। তাঁহার চারিদিকে প্রতিদিন তাঁহার গাছগুলি বাড়িতেছে, লতাগুলি জড়াইতেছে, শাখা পুষ্পিত হইতেছে, ছায়া বিস্তৃত হইতেছে, শ্যামল বল্লবস্তবকে যৌবনগর্ব্বে নিকুঞ্জ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু জয়সিংহের এ সকল প্রাণের কথা, ভালবাসার কথা বড় একটা কেহ জানিত না; তাঁহার বিপুল বল ও সাহসের জন্যই তিনি বিখ্যাত ছিলেন।

মন্দিরের কাজ কর্ম্ম শেষ করিয়া জয়সিংহ তাঁহার কুটীরের দ্বারে বসিয়া আছেন। সম্মুখে মন্দিরের কানন। বিকাল হইয়া আসিয়াছে। অত্যন্ত ঘন মেঘ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। নব বর্ষার জলে জয়সিংহের গাছগুলি স্নান করিতেছে, বৃষ্টিবিন্দুর নৃত্যে পাতায় পাতায় উৎসব পড়িয়া গিয়াছে, বর্ষাজলের ছোট ছোট শত শত প্রবাহ ঘোলা হইয়া কল্‌কল্‌ করিয়া গোমতী নদীতে গিয়া পড়িতেছে—জয়সিংহ পরমানন্দে তাঁহার কাননের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। চারিদিকে মেঘের স্নিগ্ধ অন্ধকার, বনের ছায়া ঘন পল্লবের শ্যামশ্রী, ভেকের কোলাহল, বৃষ্টির অবিশ্রাম ঝর্‌ঝর শব্দ—কাননের মধ্যে এইরূপ নববর্ষার ঘোরঘটা দেখিয়া তাঁহার প্রাণ জুড়াইয়া যাইতেছে।

ভিজিতে ভিজিতে রঘুপতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জয়সিং তাড়াতাড়ি উঠিয়া পা ধুইবার জল ও শুক্‌ন কাপড় আনিয়া দিলেন। রঘুপতি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তোমাকে কাপড় আনিতে কে বলিল?" বলিয়া কাপড় গুলা লইয়া ঘরের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। জয়সিং পা ধুইবার জল লইয়া অগ্রসর হইলেন। রঘুপতি বিরক্তির স্বরে কহিলেন—"থাক্ থাক্, তোমার ও জল রাখিয়া দাও!" বলিয়া পা দিয়া জলের ঘটি

ঠেলিয়া ফেলিলেন। জয়সিং সহসা এরূপ ব্যবহারের কারণ বুঝিতে না পারিয়া অবাক্ হইলেন—কাপড় ভূমি হইতে তুলিয়া যথাস্থানে রাখিতে উদ্যত হইলেন—রঘুপতি পুনশ্চ বিরক্ত ভাবে কহিলেন—"থাক্ থাক্, ও কাপড়ে তোমার হাত দিতে হইবে না।" বলিয়া, নিজে গিয়া কাপড় ছাড়িয়া আসিলেন। জল লইয়া পা ধুইলেন। জয়সিংহ ধীরে ধীরে কহিলেন, "প্রভু, আমি কি কোন অপরাধ করিয়াছি?" রঘুপতি কিঞ্চিৎ উগ্রস্বরে কহিলেন, "কে বলিতেছে যে তুমি অপরাধ করিয়াছ!" জয়সিংহ ব্যথিত হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। রঘুপতি অস্থির ভাবে কুটীরের দাওয়ায় বেড়াইতে লাগিলেন। এইরূপে রাত্রি অনেক হইল; ক্রমাগত বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। অবশেষে রঘুপতি জয়সিংহের পিঠে হাত দিয়া কোমলস্বরে কহিলেন, "বৎস, শয়ন করিতে যাও, রাত্রি অনেক হইল।" জয়সিং রঘুপতির স্নেহের স্বরে বিচলিত হইয়া কহিলেন, "প্রভু আগে শয়ন করিতে যান তার পরে আমি যাই।" রঘুপতি কহিলেন, "আমার বিলম্ব আছে। দেখ পুত্র, তোমার প্রতি আমি আজ কঠোর ব্যবহার করিয়াছি, কিছু মনে করিও না। আমার মন ভাল ছিল না। সবিশেষ বৃত্তান্ত তোমাকে কাল প্রভাতে বলিব। আজ তুমি শয়ন কর'গে।" জয়সিং কহিলেন, "যে আজ্ঞে।" বলিয়া শয়ন করিতে গেলেন। রঘুপতি সমস্ত রাত বেড়াইতে লাগিলেন।

প্রভাতে জয়সিং গুরুকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। রঘুপতি কহিলেন, "জয়সিং, মায়ের বলি বন্ধ হইয়াছে।" জয়সিং বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"সে কি কথা প্রভু?"

রঘুপতি—"রাজার এইরূপ আদেশ।"

জয়সিং—"কোন্ রাজার।"

রঘুপতি বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "এখানে রাজা আবার কয়গণ্ডা আছে? মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য আদেশ করিয়াছেন মন্দিরে জীব-বলি হইতে পারিবে না।"

জয়সিংহ—"নরবলি?"

রঘুপতি—"আঃ কি উৎপাত! আমি বলিতেছি জীববলি, তুমি শুনিতেছ নরবলি!"

জয়সিং—"কোন জীববলিই হইতে পারিবে না?"

রঘুপতি। "না।"

জয়সিং। "মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য এইরূপ আদেশ করিয়াছেন?"

রঘুপতি। "হাঁ গো, এক কথা কতবার বলিব।"

জয়সিং অনেকক্ষণ কিছুই বলিলেন না, কেবল আপন মনে বলিতে লাগিলেন "মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য!" গোবিন্দমাণিক্যকে জয়সিং ছেলেবেলা হইতে দেবতা বলিয়া জানিতেন। আকাশের পূর্ণচন্দ্রের প্রতি শিশুদের যেমন একপ্রকার আসক্তি আছে, গোবিন্দমাণিক্যের প্রতি জয়সিংহের সেইরূপ মনের ভাব ছিল। গোবিন্দমাণিক্যের প্রশান্ত সুন্দর মুখ দেখিয়া জয়সিং প্রাণ বিসর্জন করিতে পারিতেন।

রঘুপতি কহিলেন—"ইহার একটা প্রতিবিধান করিতে হইবে।"

জয়সিংহ কহিলেন—"তা অবশ্য। আমি মহারাজের কাছে যাই, তাঁহাকে মিনতি করিয়া বলি—"

রঘুপতি—"সে বৃথা চেষ্টা।"

জয়সিংহ—"তবে কি করিতে হইবে।"

রঘুপতি কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, "সে কাল বলিব। কাল তুমি প্রভাতে কুমার

নক্ষত্ররায়ের নিকটে গিয়া তাঁহাকে গোপনে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিবে।”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রভাতে নক্ষত্ররায় আসিয়া রঘুপতিকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঠাকুর কি আদেশ করেন?”

রঘুপতি কহিলেন,“ তোমার প্রতি মায়ের আদেশ আছে। আগে মাকে প্রণাম করিবে চল।”

উভয়ে মন্দিরে গেলেন। জয়সিংহও সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। নক্ষত্ররায় ভুবনেশ্বরী প্রতিমার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন।

রঘুপতি নক্ষত্ররায়কে কহিলেন, “কুমার, তুমি রাজা হইবে।”

নক্ষত্ররায় কহিলেন, “আমি রাজা হইব? ঠাকুর মশায় যে কি বলেন তার ঠিক নাই!” বলিয়া নক্ষত্ররায় অত্যন্ত হাসিতে লাগিলেন।

রঘুপতি কহিলেন, “আমি বলিতেছি তুমি রাজা হইবে।” নক্ষত্ররায় কহিলেন, “আপনি বলিতেছেন আমি রাজা হইব?” বলিয়া রঘুপতির মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

রঘুপতি কহিলেন, “আমি কি মিথ্যা কথা বলিতেছি?”

নক্ষত্ররায় কহিলেন, “আপনি কি মিথ্যা কথা বলিতেছেন, সে কেমন করিয়া হইবে? দেখুন ঠাকুর মশায় আমি কাল ব্যাঙের স্বপ্ন দেখিয়াছি। আচ্ছা ব্যাঙের স্বপ্ন দেখিলে কি হয় বলুন দেখি!”

রঘুপতি হাস্য সম্বরণ করিয়া কহিলেন, “কেমনতর ব্যাং বল দেখি? তাহার মাথায় দাগ আছে ত?”

নক্ষত্র সগর্ব্বে কহিলেন,“তাহার মাথায় দাগ আছে বৈ কি। দাগ না থাকিলে চলিবে কেন?”

রঘুপতি কহিলেন,“বটে! তবে ত তোমার রাজটীকা লাভ হইবে!”

নক্ষত্ররায় কহিলেন, “তবে আমার রাজটীকা লাভ হইবে! আপনি বলিতেছেন আমার রাজটীকা লাভ হইবে? আর যদি না হয়?”

রঘুপতি কহিলেন, “আমার কথা ব্যর্থ হইবে? বল কি!”

নক্ষত্ররায় কহিলেন, “না না সে কথা হইতেছে না। আপনি কি না বলিতেছেন আমার রাজটীকা লাভ হইবে, মনে করুন যদিই না হয়! দৈবাৎ কি এমন হয় না যে—”

রঘুপতি কহিলেন, “না না, ইহার অন্যথা হইবে না।”

নক্ষত্ররায়—“ইহার অন্যথা হইবে না। আপনি বলিতেছেন ইহার অন্যথা হইবে না। দেখুন ঠাকুর মশায়, আমি রাজা হইলে আপনাকে মন্ত্রী করিব।”

রঘুপতি “মন্ত্রিত্বের পদে আমি পদাঘাত করি।”

নক্ষত্ররায় অত্যন্ত উদার ভাবে কহিলেন, “আচ্ছা রাজসিংহকে মন্ত্রী করিব।”

রঘুপতি কহিলেন, “সে কথা পরে হইবে। রাজা হইবার আগে কি করিতে হইবে সেটা শোন আগে। মা রাজরক্ত দেখিতে চান, স্বপ্নে আমার প্রতি এই আদেশ হইয়াছে।”

নক্ষত্ররায় কহিলেন, “মা রাজরক্ত দেখিতে চান, স্বপ্নে আপনার প্রতি এই আদেশ হইয়াছে। এ ত বেশ কথা!”

রঘুপতি কহিলেন, “তোমাকে গোবিন্দ মাণিক্যের রক্ত আনিতে হইবে।”

নক্ষত্ররায় খানিকটা হাঁ করিয়া রহিলেন। এ কথাটা তত “বেশ” বলিয়া মনে হইল না।

রঘুপতি তীব্র স্বরে কহিলেন, "সহসা ভ্রাতৃস্নেহের উদয় হইল না কি ?"

নক্ষত্ররায় কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন, "হাঃ, হাঃ, ভ্রাতৃস্নেহ! ঠাকুর মহাশয় বেশ বলিলেন যাহোক্ ভ্রাতৃস্নেহ!"—এমন মজার কথা এমন হাসিবার কথা যেন আর হয় না! ভ্রাতৃস্নেহ! কি লজ্জার বিষয়! কিন্তু অন্তর্য্যামী জানেন নক্ষত্ররায়ের প্রাণের ভিতরে ভ্রাতৃস্নেহ জাগিতেছে, তাহা হাসিয়া উড়াইবার যো নাই।

রঘুপতি কহিলেন, "তা হইলে কি করিবে বল।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "কি করিব বলুন!"

রঘুপিত—"কথাটা ভাল করিয়া শোন। তোমাকে গোবিন্দমাণিক্যের রক্ত মায়ের দর্শনার্থ আনিতে হইবে।"

নক্ষত্ররায় মন্ত্রের মত বলিয়া গেলেন—'গোবিন্দমাণিক্যের রক্ত মায়ের দর্শনার্থ আনিতে হইবে।"

রঘুপতি নিতান্ত ঘৃণার সহিত বলিয়া উঠিলেন—"নাঃ,তোমার দ্বারা কিছু হইবে না।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন, "কেন হইবে না? যাহা বলিবেন তাহাই হইবে। আপনি ত আদেশ করিতেছেন ?"

রঘুপতি—"হাঁ, আমি আদেশ করিতেছি।"

নক্ষত্ররায়—"কি আদেশ করিতেছেন ?"

রঘুপতি বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "মায়ের ইচ্ছা তিনি রাজরক্ত দর্শন করিবেন। তুমি গোবিন্দমাণিক্যের রক্ত দেখাইয়া তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিবে এই আমার আদেশ।"

নক্ষত্ররায়—"আমি আজই গিয়া ফতেখাঁকে এই কাজে নিযুক্ত করিব।"

রঘুপতি—"না না, আর কোন লোককে ইহার বিন্দু বিসর্গ জানাইও না। কেবল জয়সিংহকে তোমার সাহায্যে নিযুক্ত করিব কাল প্রাতে আসিও, কি উপায়ে এ কার্য্য সাধন করিতে হইবে কাল বলিব।"

নক্ষত্ররায় রঘুপতির হাত এড়াইয়া বাঁচিলেন। যত শীঘ্র পারিলেন বাহির হইয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নক্ষত্ররায় চলিয়া গেলে জয়সিংহ কহিলেন, "গুরুদেব, এমন ভয়ানক কথা কখন শুনি নাই। আপনি মায়ের সম্মুখে মায়ের নাম করিয়া ভাইকে দিয়া ভ্রাতৃহত্যার প্রস্তাব করিলেন আর আমাকে তাই দাঁড়াইয়া শুনিতে হইল।"

রঘুপতি বলিলেন, "আর কি উপায় আছে বল!"

জয়সিং কহিলেন—"উপায়!—কিসের উপায়!"

রঘুপতি—"তুমিও যে নক্ষত্ররায়ের মত হইলে দেখিতেছি! এতক্ষণ তবে কি শুনিলে!"

জয়সিং—"যাহা শুনিলাম তাহা শুনিবার যোগ্য নহে, তাহা শুনিলে পাপ আছে।"

রঘুপতি—"পাপ পুণ্যের তুমি কি বুঝ?"

জয়সিং—"এতকাল আপনার কাছে শিক্ষা পাইলাম পাপ পুণ্যের কিছুই বুঝি না কি?"

রঘুপতি—"শোন বৎস, তোমাকে তবে আর এক শিক্ষা দিই। পাপ পুণ্য কিছুই নাই! কেই বা পিতা, কেই বা ভ্রাতা, কেই বা কে! হত্যা যদি পাপ হয় ত সকল হত্যাই সমান। কিন্তু কে বলে হত্যা পাপ! কত পিপীলিকা আমরা প্রত্যহ পদতলে দলন করিয়া

যাইতেছি, আমরা তাহাদের অপেক্ষা এম্‌নিই কি বড়! হত্যা ত প্রতিদিনই হইতেছে। কেহ বা মাথায় একখণ্ড পাথর পড়িয়া হত হইতেছে, কেহ বা বন্যায় ভাসিয়া গিয়া হত হইতেছে, কেহ বা মড়কের মুখে পড়িয়া হত হইতেছে, কেহ বা মনুষ্যের ছুরিকাঘাতে হত হইতেছে। এই সকল ক্ষুদ্র প্রাণীদের জীবন মৃত্যু খেলা বই ত নয়—মহাশক্তির মায়া বৈ ত নয়। কালরূপিণী মহামায়ার নিকটে প্রতিদিন এমন কত লক্ষ-কোটি প্রাণীর বলিদান হইতেছে—জগতের চতুর্দ্দিক্‌ হইতে জীবশোণিতের স্রোত তাঁহার মহাখর্পরে আসিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে—আমিই না হয় সেই স্রোতে আরেকটি কণা যোগ করিয়া দিলাম। তাঁহার বলি তিনিই এককালে গ্রহণ করিতেন, আমি না হয় মাঝখানে থাকিয়া উপলক্ষ হইলাম।"

তখন জয়সিংহ প্রতিমার দিকে ফিরিয়া কহিতে লাগিলেন "এই, জন্যই কি তোকে সকলে মা বলে, মা! তুই এমন পাষাণী! রাক্ষসি, সমস্ত জগৎ হইতে রক্ত নিষ্পেষণ করিয়া লইয়া উদরে পূরিবার জন্য তুই ঐ লোল জিহ্বা বাহির করিয়াছিস্‌। স্নেহ প্রেম মমতা সৌন্দর্য্য ধর্ম্ম সমস্তই মিথ্যা, সত্য কেবল তোর ঐ অনন্ত রক্তুতৃষা! তোরই উদরপূরণের জন্য মানুষ মানুষের গলায় ছুরি বসাইবে, ভাই ভাইকে খুন করিবে, পিতা পুত্রে কাটাকাটি করিবে! নিষ্ঠুর, সত্য সত্যই এই যদি তোর ইচ্ছা তবে মেঘ রক্তবর্ষণ করে না কেন, করুণাস্বরূপিণী নদী রক্তস্রোত লইয়া রক্তসমুদ্রে গিয়া পড়ে না কেন? তবে কেন এ জগতে কেবল মাত্র হিংসা দ্বেষ মারী ও বিভীষিকার রাজত্ব হইল না?—না না মা, তুই প্রকাশ করিয়া বল্‌—এ শিক্ষা মিথ্যা, এ শাস্ত্র মিথ্যা—আমার মাকে মা বলে না সন্তানরক্তপিপাসু রাক্ষসী বলে—একথা আমি সহিতে পারিব না!" জয়সিংহের চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল—তিনি নিজের কথা লইয়া নিজে ভাবিতে লাগিলেন। এত কথা ইতিপূর্ব্বে কখন তাঁহার মনে হয় নাই, রঘুপতি যদি তাঁহাকে নূতন শাস্ত্র শিক্ষা দিতে না আসিতেন, তবে কখনই তাঁহার এত কথা মনেই আসিত না।

রঘুপতি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তবে ত বলিদানের পালা একেবারে উঠাইয়া দিতে হয়!"

জয়সিংহ অতি শৈশব কাল হইতে প্রতিদিন বলিদান দেখিয়া আসিতেছেন এই জন্য মন্দিরে যে বলিদান কোন কালে বন্ধ হইতে পারে কিংবা বন্ধ হওয়া উচিত এ কথা কিছুতেই তাঁহার মনে লাগে না। এমন কি এ কথা মনে করিতে তাঁহার হৃদয়ে আঘাত লাগে এই জন্য রঘুপতির কথার উত্তরে জয়সিং কহিলেন, "সে স্বতন্ত্র কথা। তাহার অন্য কোন অর্থ আছে। তাহাতে ত কোন পাপ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ভাইকে ভাই হত্যা করিবে! তাই বলিয়া মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যকে—প্রভু, আপনার পায়ে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করি, আমাকে প্রবঞ্চনা করিবেন না, সত্যই কি মা স্বপ্নে কহিয়াছেন—রাজরক্ত নহিলে তাঁর তৃপ্তি হইবে না?"

রঘুপতি কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন—"সত্য নহিলে কি মিথ্যা কহিতেছি? তুমি কি আমাকে অবিশ্বাস কর?"

জয়সিংহ রঘুপতির পদধূলি লইয়া কহিলেন —"গুরুদেবের প্রতি আমার বিশ্বাস শিথিল না হয় যেন। কিন্তু নক্ষত্ররায়েরও ত রাজকুলে জন্ম।"

রঘুপতি কহিলেন "দেবতাদের স্বপ্ন ইঙ্গিত মাত্র; সকল কথা শুনা যায় না,

অনেকটা বুঝিয়া লইতে হয়। স্পষ্টই দেখা যাই-তেছে, গোবিন্দমাণিক্যের প্রতি দেবীর অসন্তোষ হইয়াছে, অসন্তোষের সম্পূর্ণ কারণও জন্মিয়াছে। অতএব দেবী যখন রাজরক্ত চাহিয়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে তাহা গোবিন্দমাণিক্যেরই রক্ত।"

জয়সিং কহিলেন—"তা যদি সত্য হয় তবে আমিই রাজরক্ত আনিব—নক্ষত্ররায়কে পাপে লিপ্ত করিব না।"

রঘুপতি কহিলেন—"দেবীর আদেশ পালন করিতে কোন পাপ নাই।"

জয়সিং—"পুণ্য আছেত প্রভু। সে পুণ্য আমিই উপার্জ্জন করিব।"

রঘুপতি কহিলেন—"তবে সত্য করিয়া বলি বৎস। আমি তোমাকে শিশুকাল হইতে পুত্রের অধিক যত্নে প্রাণের অধিক ভাল বাসিয়া পালন করিয়া আসিয়াছি, আমি তোমাকে হারাইতে পারিব না। নক্ষত্ররায় যদি গোবিন্দমাণিক্যকে বধ করিয়া রাজা হয়, তবে কেহ তাহাতে একটি কথা কহিবে না—কিন্তু তুমি যদি রাজার গায়ে হাত তোলো ত তোমাকে আর আমি ফিরিয়া পাইব না।"

জয়সিং কহিলেন—"আমার স্নেহে! পিতা, আমি অপদার্থ, আমার স্নেহে তুমি একটি পিপীলিকারও হানি করিতে পারিবে না। আমার প্রতি স্নেহে তুমি যদি পাপে লিপ্ত হও, তবে তোমার সে স্নেহ আমি বেশী দিন ভোগ করিতে পারিব না, সে স্নেহের পরিণাম কখনই ভাল হইবে না।"

রঘুপতি তাড়াতাড়ি কহিলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, সে কথা পরে হইবে। কাল নক্ষত্ররায় আসিলে যা হয় একটা ব্যবস্থা হইবে।"

জয়সিং মনে মনে, প্রতিজ্ঞা করিলেন—"আমিই রাজরক্ত আনিব। মায়ের নামে, গুরুদেবের নামে ভ্রাতৃহত্যা ঘটিতে দিব না।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

জয়সিংহের সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। গুরুর সহিত যে কথা লইয়া আলোচনা হইয়াছিল দেখিতে দেখিতে তাহার শাখা প্রশাখা বাহির হইতে লাগিল। অধিকাংশ সময়েই আরম্ভ আমাদের আয়ত্তাধীন, শেষ আমাদের আয়ত্তাধীন নহে। চিন্তা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। জয়সিংহের মনে অনিবার্য্য বেগে এমন সকল কথা উঠিতে লাগিল যাহা তাঁহার আশৈশব বিশ্বাসের মূলে অবিশ্রাম আঘাত করিতে লাগিল। জয়সিং পীড়িত ক্লিষ্ট হইতে লাগিলেন। কিন্তু দুঃস্বপ্নের মত ভাবনা কিছুতেই ক্ষান্ত হইতে চায় না। যে কালীকে জয়সিং এতদিন মা বলিয়া জানিতেন, গুরুদেব আজ কেন তাঁহার মাতৃত্ব অপহরণ করিলেন, কেন তাঁহাকে হৃদয়হীন শক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন! শক্তির সন্তোষই কি আর অসন্তোষই কি! শক্তির চক্ষুই বা কোথায় কর্ণই বা কোথায়! শক্তি ত মহারথের ন্যায় তাহার সহস্র চক্রের তলে জগৎ বর্ষিত করিয়া ঘর্ঘর শব্দে চলিয়া যাইতেছে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া কে চলিল, তাহার তলে পড়িয়া কে চূর্ণ হইল, তাহার উপরে উঠিয়া কে উৎসব করিতেছে, তাহার নিম্নে পড়িয়া কে আর্ত্তনাদ করিতেছে, সে তাহার কি জানিবে!—তাহার সারথি কি কেহ নাই? পৃথিবীর নিরীহ অসহায় ভীরু জীবদিগের রক্ত বাহির করিয়া কালরূপিণী নিষ্ঠুর শক্তির তৃষা

নির্ব্বাণ করিতে হইবে এই কি আমার ব্রত। কন? সে ত আপনার কাজ আপনিই করিতছে—তাহার দুর্ভিক্ষ আছে, বন্যা আছে, ভূমিকম্প আছে, জরামারী অগ্নিদাহ আছে, নির্দ্দয় মানব-হৃদয়স্থিত হিংসা আছে, ক্ষুদ্র আমাকে তাহার আবশ্যক কি!

তাহার পরদিন যে প্রভাত হইল তাহা অতি মনোহর প্রভাত। বৃষ্টির শেষ হইয়াছে। পূর্ব্বদিকে মেঘ নাই। সূর্য্যকিরণ যেন বর্ষার জলে ধৌত ও স্নিগ্ধ। বৃষ্টিবিন্দু ও সূর্য্যকিরণে দশদিক ঝল্‌মল্‌ করিতেছে। শুভ্র আনন্দপ্রভা আকাশে প্রান্তরে অরণ্যে নদীস্রোতে বিকশিত শ্বেত শতদলের ন্যায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। নীল আকাশে চীল ভাসিয়া যাইতছে—ইন্দ্রধনুর তোরণের নীচে দিয়া বকের শ্রেণী উড়িয়া চলিয়াছে। কাঠবিড়ালীরা গাছে গাছে ছুটাছুটি করিতেছে! দুই একটি অতি ভীরু খরগোষ সচকিতে ঝোপের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আবার আড়াল খুঁজিতেছে। ছাগশিশুরা অতি দুর্গম পাহাড়ে উঠিয়া ঘাস ছিঁড়িয়া খাইতেছে। গরুগুলি আজ মনের আনন্দে মাঠময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রাখাল গান ধরিয়াছে। কলসকক্ষ মায়ের আঁচল ধরিয়া আজ ছেলে মেয়েরা বাহির হইয়াছে। বৃদ্ধ পূজার জন্য ফুল তুলিতেছে। স্নানের জন্য নদীতে আজ অনেক লোক সমবেত হইয়াছে, কলকল স্বরে তাহারা গল্প করিতেছে —নদীর কলধ্বনিরও বিরাম নাই আষাঢ়ের প্রভাতে এই জীবময়ী আনন্দময়ী ধরণীর দিকে চাহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া জয়সিং মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

জয়সিং প্রতিমার দিকে চাহিয়া যোড়হস্তে কহিলেন—"কেন মা, আজ এমন অপ্রসন্ন কেন? এক দিন তোমার জীবের রক্ত তুমি দেখিতে পাও নাই বলিয়া এত ভ্রূকুটী! আমাদের হৃদয়ের মধ্যে চাহিয়া দেখ, ভক্তির কি কিছু অভাব দেখিতেছ? ভক্তের হৃদয় পাইলেই কি তোমার তৃপ্তি হয় না, নিরপরাধের শোণিত চাই? আচ্ছা মা, সত্য করিয়া বল্‌ দেখি, পুণ্যের শরীর গোবিন্দমাণিক্যকে পৃথিবী হইতে অপসৃত করিয়া এখানে দানবের রাজত্ব স্থাপন করাই কি তোর অভিপ্রায়? রাজরক্ত কি নিতান্তই চাই? তোর মুখের উত্তর না শুনিলে আমি কখনই রাজহত্যা ঘটিতে দিব না, আমি ব্যাঘাত করিব। বল, হাঁ কি না!"

সহসা বিজন মন্দিরে শব্দ উঠিল "হাঁ"। জয়সিং চমকিয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, মনে হইল যেন ছায়ার মত কি একটা কাঁপিয়া গেল। স্বর শুনিয়া প্রথমেই তাঁহার মনে হইয়াছিল যেন তাঁর গুরুর কণ্ঠস্বর! পরে মনে করিলেন মা তাঁহাকে তাঁহার গুরুর কণ্ঠস্বরেই আদেশ করিলেন—ইহাই সম্ভব। তাঁহার গাত্র লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রতিমাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া সশস্ত্রে বাহির হইয়া পড়িলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

গোমতী নদীর দক্ষিণ দিকের এক স্থানের পাড় অতিশয় উচ্চ। বর্ষার ধারা ও ছোট ছোট স্রোত এই উন্নত ভূমিকে নানা গুহা গহ্বরে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। ইহার কিছু দূরে প্রায় অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে বড় বড় শাল ও গাম্ভারী গাছে এই শতধা বিদীর্ণ ভূমিখণ্ডকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু মাঝখানের এই জমি টুকুর মধ্যে বড় গাছ একটিও নাই। কেবল স্থানে স্থানে ঢিপির উপর ছোট ছোট শাল গাছ বাড়িতে পারিতেছে না, বাঁকিয়া কালো

হইয়া পড়িয়াছে। বিস্তর পাথর ছড়ানো। এক হাত দুই হাত প্রশস্ত ছোট ছোট জল-স্রোত কত শত আঁকা বাঁকা পথে ঘুরিয়া ফিরিয়া মিলিয়া বিভক্ত হইয়া, নদীতে গিয়া পড়িতেছে। এই স্থান অতি নির্জ্জন—এখান-কার আকাশ গাছের দ্বারা অবরুদ্ধ নহে। এখান হইতে গোমতী নদী এবং তাহার পরপারের বিচিত্রবর্ণ শস্যক্ষেত্র সকল অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। প্রতি দিন প্রাতে রাজা গোবিন্দমাণিক্য এইখানে বেড়াইতে আসিতেন, সঙ্গে একটি সঙ্গী বা একটি অনুচরও আসিত না। জেলেরা কখন কখন গোমতীতে মাছ ধরিতে আসিয়া দূর হইতে দেখিতে পাইত, তাঁহাদের সৌম্য-মূর্ত্তি রাজা যোগীর ন্যায় স্থিরভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার মুখে প্রভাতের জ্যোতি কি তাঁহার আত্মার জ্যোতি বুঝা যাইত না। আজকাল বর্ষার দিনে প্রতিদিন এখানে আসিতে পারিতেন না কিন্তু বর্ষা উপশমে যে দিন আসিতেন,সে দিন ছোট তাতাকে সঙ্গে করিয়া আনিতেন।

তাতাকে আর তাতা বলিতে ইচ্ছা করে না। একমাত্র যাহার মুখে তাতা সম্বোধন মানাইত সে ত আর নাই। পাঠকদের কাছে তাতা শব্দের কোন অর্থই নাই—কিন্তু হাসি যখন সকাল বেলায় শালবনে দুষ্টুমি করিয়া শাল গাছের আড়ালে লুকাইয়া তাহার সুমিষ্ট তীক্ষ্ণস্বরে "তাতা" বলিয়া ডাকিত এবং তাহার উত্তরে গাছেগাছে দোয়েল ডাকিয়া উঠিত—দূর কানন হইতে প্রতিধ্বনি ফিরিয়া আসিত, তখন সেই তাতা শব্দ অর্থে পরিপূর্ণ হইয়া কানন ব্যাপ্ত করিত, তখন সেই তাতা সম্বোধন একটি বালি-কার ক্ষুদ্র হৃদয়ের অতি কোমল স্নেহনীড় পরি-ত্যাগ করিয়া পাখীর মত স্বর্গের দিকে উড়িয়া যাইত—তখন সেই একটি স্নেহসিক্ত মধুর সম্বোধন প্রভাতের সমুদয় পাখীর গান লুটিয়া লইত—প্রভাত প্রকৃতির আনন্দময় সৌন্দর্য্যের সহিত একটি ক্ষুদ্র বালিকার আনন্দময় স্নেহের ঐক্য দেখাইয়া দিত। এখন সে বালিকা নাই—বালকটি আছে কিন্তু "তাতা" নাই, বালকটি এ সংসারের সহস্র লোকের, সহস্র বিষয়ের, কিন্তু "তাতা" কেবল মাত্র সেই বালিকারই।

মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য এই বালককে ধ্রুব বলিয়া ডাকিতেন আমরাও তাহাই বলিয়া ডাকিব।

মহারাজ পূর্ব্বে একা গোমতী তীরে আসি-তেন, এখন ধ্রুবকে সঙ্গে করিয়া আনেন। তাহার পবিত্র সরল মুখচ্ছবিতে তিনি দেব-লোকের ছায়া দেখিতে পান। মধ্যাহ্নে সংসারের আবর্ত্তের মধ্যে রাজা যখন প্রবেশ করেন, তখন বৃদ্ধ বিজ্ঞ মন্ত্রীরা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়, তাঁহাকে পরামর্শ দেয়—আর প্রভাত হইলে একটি শিশু তাঁহাকে সংসারের বাহিরে লইয়া আসে—তাঁহার বড় বড় দুটি নীরব চক্ষের সম্মুখে বিষয়ের সহস্র কুটিলতা সঙ্কুচিত হইয়া যায়—শিশুর হাত ধরিয়া মহারাজ বিশ্বজগতের মধ্যবর্ত্তী অন্তরের দিকে প্রসারিত একটি উদার সরল বিস্তৃত রাজপথে গিয়া দাঁড়ান, সেখানে অনন্ত সুনীল আকাশ-চন্দ্রাতপের নিম্নস্থিত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মহাসভা দেখিতে পাওয়া যায় সেখানে ভূর্লোক ভুবর্লোক স্বর্লোক সপ্তলোকে সঙ্গীতের আভাস শুনা যায়, সেখানে সর[ল] পথে সকলই সরল সহজ শোভন বলিয়া বো[ধ] হয়,কেবলই অগ্রসর হইতে উৎসাহ হয়—উৎ[ক]ট ভাবনা চিন্তা অসুখ অশান্তি দূ[র] হইয়া যায়। মহারাজ সেই প্রভা[তে] নির্জ্জনে বনের মধ্যে, নদীর তীরে, মু[ক্ত] আকাশে একটি শিশুর প্রেমে নিমগ্ন হই[য়া] অসীম প্রেমসমুদ্রের পথ দেখিতে পান।

গোবিন্দমাণিক্য ধ্রুবকে কোলে করিয়া লইয়া তাঁহাকে ধ্রুবোপাখ্যান শুনাইতেছেন, স যে বড় একটা কিছু বুঝিতেছে তাহা নহে —কিন্তু রাজার ইচ্ছা ধ্রুবের মুখে আধ আধ রে এই ধ্রুবোপাখ্যান আবার ফিরিয়া শুনেন।

গল্প শুনিতে শুনিতে ধ্রুব বলিল—"আমি নে যাব।"

রাজা বলিলেন—"কি কর্ত্তে বনে যাবে?"

ধ্রুব বলিল—"হরিকে দেখ্‌তে যাব।"

রাজা বলিলেন—"আমরাত বনে এসেছি, হরিকে দেখ্‌তে এসেছি।"

ধ্রুব—"হরি কোথায়!"

রাজা—"এই খানেই আছেন।"

ধ্রুব কহিল—"দিদি কোথায়!" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া পিছনে চাহিয়া দেখিল—তাহার মনে হইল দিদি যেন আগেকার মত পিছন হইতে সহসা তাহার চোখ টিপিবার জন্য আসিতেছে, কাহাকেও না পাইয়া ঘাড় নামাইয়া চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি কোথায়?"

রাজা কহিলেন—"হরি তোমার দিদিকে ডেকে নিয়েচেন।"

ধ্রুব কহিল—"হরি কোথায়?"

রাজা কহিলেন—"তাঁকে ডাক বৎস। তোমাকে সেই যে শ্লোক শিখিয়ে দিয়েছিলেম সেইটে বল।"

ধ্রুব দুলিয়া দুলিয়া বলিতে লাগিল!

হরি তোমায় ডাকি—বালক একাকী,
আঁধার অরণ্যে ধাই হে।
গহন তিমিরে নয়নের নীরে
পথ খুঁজে নাহি পাইহে।
সদা মনে হয় কি করি কি করি,
কখন আসিবে কাল-বিভাবরী,
তাই ভয়ে মরি ডাকি হরি হরি
হরি বিনা কেহ নাই হে।
নয়নের জল হবে না বিফল,
তোমায় সবে বলে ভকতবৎসল,
সেই আশা মনে করেছি সম্বল,
বেঁচে আছি আমি তাই হে।
আঁধারেতে জাগে তোমার আঁখিতারা,
তোমার ভক্ত কভু হয় না পথহারা,
ধ্রুব তোমায় চাহে তুমি ধ্রুবতারা
আর কার পানে চাই হে॥

"র"য়ে "ল"য়ে "ড"য়ে "দ"য়ে উলট্‌ পালট্‌ করিয়া অর্দ্ধেক কথা মুখের মধ্যে রাখিয়া অর্দ্ধেক কথা উচ্চারণ করিয়া ধ্রুব দুলিয়া দুলিয়া সুধাময় কণ্ঠে এই শ্লোক পাঠ করিল। শুনিয়া রাজার প্রাণ আনন্দে নিমগ্ন হইয়া গেল। প্রভাত দ্বিগুণ মধুর হইয়া উঠিল। চারিদিকে নদী-কানন তরুলতা হাসিতে লাগিল। কনকসুধা-সিক্ত নীলাকাশে তিনি কাহার অনুপম সুন্দর সহাস্য মুখচ্ছবি দেখিতে পাইলেন। ধ্রুব যেমন তাঁহার কোলে বসিয়া আছে—তাঁহাকেও তেমনি কে যেন বাহুপাশের মধ্যে কোলের মধ্যে তুলিয়া লইল। তিনি আপনাকে,আপনার চারিদিকের সকলকে, বিশ্বচরাচরকে কাহার কোলের উপর দেখিতে পাইলেন। তাঁহার আনন্দ ও প্রেম সূর্য্যকিরণের ন্যায় দশদিকে বিকীরিত হইয়া আকাশ পূর্ণ করিল।

এমন সময়ে সশস্ত্র জয়সিং গুহাপথ দিয়া সহসা রাজার সম্মুখে আসিয়া উত্থিত হইলেন। রাজাতাঁহাকে দুই হাত বাড়াইয়া দিলেন, কহি-লেন, "এস, জয়সিং, এস।" রাজা তখন শিশুর সহিত মিশিয়া শিশু হইয়াছেন, তাঁহার রাজ-মর্য্যাদা কোথায়! জয়সিং রাজাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। রাজা তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কহিলেন—"জয়সিং, তুমিইত

আমার প্রণম্য। তোমার রাজবংশে জন্ম, তুমি ক্ষত্রিয়।”

জয়সিং কহিলেন—“মহারাজ এক নিবেদন আছে।”

রাজা কহিলেন—“কি বল।”

জয়সিংহ—“মা আপনার প্রতি অপ্রসন্ন হইয়াছেন!”

রাজা—“কেন, আমি তাঁর অসন্তোষের কাজ কি করিয়াছি?”

জয়সিংহ—“মহারাজ বলি বন্ধ করিয়া দেবীর পূজার ব্যাঘাত করিয়াছেন।”

রাজা বলিয়া উঠিলেন—“কেন, জয়সিং—কেন এ হিংসার লালসা! আজি এই সুমধুর প্রভাতে কেন এ হিংসার উচ্ছ্বাস! চাহিয়া দেখদেখি, মায়ের কোলে সমুদয় জীবজন্তু কি আরামে নিঃশঙ্কে আনন্দে বিচরণ করিতেছে, ঐ কোলে ত্রাস শোক হাহাকার তুলিয়া ঐ মাতৃক্রোড়ে সন্তানের রক্তপাত করিয়া তুমি মাকে প্রসন্ন করিতে চাও! জগতের শান্তিনাশ করিতে কেন এত বাসনা! কেন হিংসা বিষ-কণ্টকের মূলে জীবশোণিত ঢালিয়া তাহাকে সযত্নে বর্দ্ধিত করিতেছ! কোথায় করুণার কল্পতরু, কোথায় প্রেমের পারিজাত!”

জয়সিং ধীরে ধীরে রাজার পায়ের কাছে বসিলেন। ধ্রুব তাঁহার তলোয়ার লইয়া খেলা করিতে লাগিল।

জয়সিং কহিলেন—“কেন মহারাজ, শাস্ত্রেত বলিদানের ব্যবস্থা আছে!”

রাজা কহিলেন,“শাস্ত্রের যথার্থ বিধি কেই বা পালন করে! আপনার প্রবৃত্তি অনুসারে সকলেই শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া থাকে।—যখন কালীর সম্মুখে আর্ত্ত অসহায় জীবের বলিদান হয়, সেই বলির সকর্দ্দম রক্ত সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া যখন সকলে উৎকট চীৎকারে ভীষণ উল্লাসে প্রাঙ্গণে নৃত্য করিতে থাকে,তখন কি তাহারা মায়ের পূজা করে! না নিজের হৃদয়ের মধ্যে যে হিংসা রাক্ষসী আছে সেই রাক্ষসীটার পূজা করে, সেই রাক্ষসীকে মা বলে, সেই রাক্ষসীটাকে রক্ত খাওয়াইয়া পরিপুষ্ট করিয়া তোলে! হিংসার নিকটে বলিদান দেওয়া শাস্ত্রের বিধি নহে, হিংসাকে বলি দেওয়াই শাস্ত্রের বিধি।”

জয়সিংহ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন কল্য রাত্রি হইতে তাঁহার মনেও এমন অনেক কথা তোলপাড় হইয়াছে। অবশেষে বলিলেন “আমি মায়ের সম্মুখে শুনিয়াছি—এ বিষয়ে আর কোন সংশয় থাকিতে পারে না। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন তিনি মহারাজের রক্ত চান।’ বলিয়া জয়সিং প্রভাতের মন্দিরের ঘটনা রাজাকে বলিলেন। রাজা হাসিয়া বলিলেন, “এত মায়ের আদেশ নয় এ রঘুপতির আদেশ রঘুপতিই অন্তরাল হইতে তোমার কথার উত্তর দিয়াছিলেন।”

রাজার মুখে এই কথা শুনিয়া জয়সিং একেবারে চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার মনেও এইরূপ সংশয় একবার চকিতের মত উঠিয়াছিল কিন্তু আবার বিদ্যুতের মত অন্তর্হিত হইয়াছিল। রাজার কথায় সেই সন্দেহে আবার আঘাত লাগিল। জয়সিংহ অত্যন্ত কাতর হইয়া বলিয়া উঠিলেন,“না মহারাজ, আমাকে ক্রমাগত সংশয় হইতে সংশয়ান্তরে লইয়া যাইবেন না—আমাকে তীর হইতে ঠেলিয়া সমুদ্রে ফেলিবেন না—আপনার কথায় আমার চারিদিকের অন্ধকার কেবল বাড়িতেছে। আমার যে বিশ্বাস যে ভক্তি ছিল, তাই থাক্—তাহার পরিবর্ত্তে এ কুয়াশা আমি চাই না। মায়ের আদেশই হউক্, আর গুরুর আদেশই হউক্, সে একই কথা—

আমি পালন করিব।" বলিয়া বেগে উঠিয়া তাঁহার তলোয়ার খুলিলেন—তলোয়ার রৌদ্রকিরণে বিদ্যুতের মত চকমক্ করিয়া উঠিল। ইহা দেখিয়া ধ্রুব ঊর্দ্ধ-স্বরে কাঁদিয়া উঠিল—তাহার ছোট দুইটি হাতে রাজাকে জড়াইয়া রাজাকে প্রাণপণে আচ্ছাদন করিয়া ধরিল—রাজা জয়সিংহের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া ধ্রুবকেই বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন।

জয়সিং তলোয়ার দূরে ফেলিয়া দিলেন। ধ্রুবের পিঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন,"কোন ভয় নেই বৎস, কোন ভয় নেই। আমি এই চলিলাম। তুমি ঐ মহৎ আশ্রয়ে থাক, ঐ বিশাল বক্ষে বিরাজ কর—তোমাকে কেহ বিচ্ছিন্ন করিবে না।" বলিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। সহসা আবার কি ভাবিয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন —"মহারাজকে সাবধান করিয়া দিই—আপনার ভ্রাতা নক্ষত্ররায় আপনাকে বিনাশের পরামর্শ করিয়াছেন। ২৯শে আষাঢ় চতুর্দ্দশ দেবতার পূজার রাত্রে আপনি সতর্ক থাকিবেন।"

রাজা হাসিয়া কহিলেন, "নক্ষত্র কোন মতেই আমাকে বধ করিতে পারিবে না, সে আমাকে ভালবাসে।" জয়সিং বিদায় হইয়া গেলেন।

রাজা ধ্রুবের দিকে চাহিয়া ভক্তিভাবে কহিলেন, "তুমিই আজ রক্তপাত হইতে ধরণীকে রক্ষা করিলে, সেই উদ্দেশেই তোমার দিদি তোমাকে রাখিয়া গিয়াছেন।" বলিয়া ধ্রুবের অশ্রুসিক্ত দুইটি কপোল মুছাইয়া দিলেন।

ধ্রুব গম্ভীর মুখে কহিল, "দিদি কোথায়?"

এমন সময়ে মেঘ আসিয়া সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। নদীর উপর কালো ছায়া পড়িল। দূরের বনান্ত মেঘের মতই কালো হইয়া উঠিল। বৃষ্টিপাতের লক্ষণ দেখিয়া রাজা প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন

নবম পরিচ্ছেদ।

—*—

মন্দির অনেক দূরে নয়। কিন্তু জয়সিং বিজন নদীর ধার দিয়া অনেক ঘুরিয়া ধীরে ধীরে মন্দিরের দিকে চলিলেন। বিস্তর ভাবনা তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল। এক জায়গায় নদীর তীরে গাছের তলায় বসিয়া পড়িলেন। দুই হস্তে মুখ আচ্ছাদন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন—"একটা কাজ করিয়া ফেলিয়াছি, অথচ সংশয় যাইতেছে না। আজ হইতে কেই বা আমার সংশয় ঘুচাইবে। কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ আজ হইতে কে তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিবে? সংসারের সহস্র কোটি পথের মোহানায় দাঁড়াইয়া কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব কোন্‌টা যথার্থ পথ! প্রান্তরের মধ্যে আমি অন্ধ একাকী দাঁড়াইয়া আছি, আজ আমার যষ্ঠি ভাঙ্গিয়া গেছে।" জয় সিং যখন উঠিলেন তখন বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে মন্দিরের দিকে চলিলেন। দেখিলেন বিস্তর লোক কোলাহল করিতে করিতে মন্দিরের দিক্ হইতে দল বাঁধিয়া চলিয়া আসিতেছে।

বুড়া বলিতেছে—'বাপ পিতামহর কাল থেকে এই ত চলে আস্‌চে জানি, আজ রাজার বুদ্ধি কি তাঁদের সকলকেই ছাড়িয়ে উঠ্‌ল!"

যুবা বলিতেছে—"এখন আর মন্দিরে আস্‌তে ইচ্ছে করে না, পূজার সে ধুম নেই।"

কেহ কহিল—"এ যেন নবাবের রাজত্ব হয়ে দাঁড়াল।" তাহার মনের ভাব এই যে

বলিদান সম্বন্ধে দ্বিধা একজন মুসলমানের মনেই জন্মাইতে পারে, কিন্তু একজন হিন্দুর মনে জন্মান অত্যন্ত আশ্চর্য্য!

মেয়েরা বলিতে লাগিল—"এ রাজ্যের মঙ্গল হবে না।" একজন কহিল—"পুরুত ঠাকুর ত স্বয়ং বল্লেন যে মা স্বপ্নে বলেছেন তিন মাসের মধ্যে এ দেশ মড়কে উচ্ছন্ন যাবে।"

হারু বলিল—"এই দেখ না কেন, মোধো আজ দেড় বৎসর ধরে ব্যাম ভুগে বরাবর বেঁচে এসেছে, বলি বন্ধ হল অম্‌নি সে মারা গেল!"

ক্ষান্ত বলিল—"তা কেন, আমার ভাসুরপো, সে যে মরবে এ কে জান্‌ত! তিন দিনের জ্বর। যেমন কবিরাজের বড়িটি খাওয়া অম্‌নি চোখ উল্‌টে গেল!" ভাসুরপোর শোকে এবং রাজ্যের অমঙ্গল আশঙ্কায় ক্ষান্ত কাতর হইয়া পড়িল।

তিনকড়ি কহিল—"সে দিন মধুরহাটির গঞ্জে আগুন লাগ্‌ল একখানা চালা বাকি রইল না।"

চিন্তামণি চাষা তাহার একজন সঙ্গী চাষাকে কহিল "অত কথায় কাজ কি, দেখ না কেন এ বছর যেমন ধান শস্তা হয়েছে এমন অস্ত কোন বছর হয়নি। এ বছর চাষার কপালে কি আছে কে জানে!"

বলিদান বন্ধ হইবার পরে এবং পূর্ব্বেও যাহার যাহা কিছু ক্ষতি হইয়াছে সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহার একমাত্র কারণ নির্দ্দিষ্ট হইল। এদেশ পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াই ভাল এইরূপ সকলের মত হইল। এ মত কিছুতেই পরিবর্ত্তিত হইল না বটে কিন্তু দেশেই সকলে বাস করিতে লাগিল।

জয়সিং অন্যমনস্ক ছিলেন। ইহাদের প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ না করিয়া তিনি মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন পূজা শেষ করিয়া রঘুপতি মন্দিরের বাহিরে বসিয়া আছেন।

দ্রুতগতি রঘুপতির নিকটে গিয়াই জয়সিং কাতর অথচ দৃঢ়স্বরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"গুরুদেব, মায়ের আদেশ গ্রহণ করিবার জন্য আজ প্রভাতে আমি যখন মাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম আপনি কেন তাহার উত্তর দিলেন?"

রঘুপতি একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—"মা ত আমার দ্বারাই তাঁহার আদেশ প্রচার করিয়া থাকেন, তিনি নিজ মুখে কিছু বলেন না।"

জয়সিং কহিলেন—"আপনি সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন না কেন? অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া আমাকে ছলনা করিলেন কেন?"

রঘুপতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "চুপ কর! আমি কি ভাবিয়া কি করি তুমি তাহার কি বুঝিবে? বাচালের মত যাহা মুখে আসে তাহাই বলিও না। আমি যাহা আদেশ করিব তুমি কেবল তাহাই পালন করিবে, কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও না!"

জয়সিং চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহার সংশয় বাড়িল বৈ কমিল না। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "আজ প্রাতে আমি মায়ের কাছে বলিয়াছিলাম যে তিনি যদি স্বমুখে আমাকে আদেশ না করেন তবে আমি কখনই রাজহত্যা ঘটিতে দিব না; তাহার ব্যাঘাত করিব। যখন স্থির বুঝিলাম মা আদেশ করেন নাই, তখন মহারাজার নিকট নক্ষত্ররায়ের সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়া দিতে হইল, তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিলাম।"

রঘুপতি কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। উদ্বেলিত ক্রোধ দমন করিয়া

দৃঢ়স্বরে জয়সিংহকে বলিলেন—"মন্দিরে প্রবেশ কর।"

উভয়ে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

রঘুপতি কহিলেন—"মায়ের চরণ স্পর্শ করিয়া শপথ কর—বল যে ২৯শে আষাঢ়ের মধ্যে আমি রাজরক্ত আনিয়া এই চরণে উপহার দিব।"

জয়সিং ঘাড় হেঁট করিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। পরে একবার গুরুর মুখের দিকে একবার প্রতিমার মুখের দিকে চাহিলেন। প্রতিমা স্পর্শ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—"২৯শে আষাঢ়ের মধ্যে আমি রাজরক্ত আনিয়া এই চরণে উপহার দিব।"

দশম পরিচ্ছেদ।

গৃহে ফিরিয়া আসিয়া মহারাজ নিয়মিত রাজকার্য্য সমাপন করিলেন। প্রাতঃকালের সূর্য্যালোক আচ্ছন্ন হইয়া গেছে। মেঘের ছায়ায় দিন আবার অন্ধকার হইয়া আসিয়ছে। মহারাজ অত্যন্ত বিমনা আছেন। অন্যদিন রাজ-সভায় নক্ষত্ররায় উপস্থিত থাকিতেন, আজ তিনি উপস্থিত ছিলেন না। রাজা তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, তিনি ওজর করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, তাঁহার শরীর অসুস্থ। রাজা স্বয়ং নক্ষত্ররায়ের কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নক্ষত্র মুখ তুলিয়া রাজার মুখের দিকে চাহিতে পারিলেন না। একখানা লিখিত কাগজ লইয়া কাজে ব্যস্ত আছেন এমনি ভাণ করিলেন। রাজা বলিলেন—"নক্ষত্র, তোমার কি অসুখ করিয়াছে?"

নক্ষত্র কাগজের এপিঠ ওপিঠ উল্টাইয়া হাতের অঙ্গুরী নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "অসুখ? না, অসুখ ঠিক নয়—এই, একটুখানি কাজ ছিল—হাঁ হাঁ অসুখ হয়েছিল—কতকটা অসুখের মতন বটে।"

নক্ষত্ররায় নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন, গোবিন্দমাণিক্য অতিশয় বিষণ্ণ মুখে নক্ষত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—হায় হায়, স্নেহের নীড়ের মধ্যেও হিংসা ঢুকিয়াছে, সে সাপের মত লুকাইতে চায়, মুখ দেখাইতে চায় না। আমাদের অরণ্যে কি হিংস্র পশু যথেষ্ট নাই, শেষে কি মানুষও মানুষকে ভয় করিবে, ভাইও ভাইয়ের পাশে গিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে বসিতে পাইবে না? এই আমার ভাই, ইহার সহিত প্রতিদিন এক গৃহে বাস করি, একাসনে বসিয়া থাকি, হাসিমুখে কথা কই—এও আমার পাশে বসিয়া মনের মধ্যে ছুরি শানাইতেছে!—গোবিন্দমাণিক্যের নিকট তখন সংসার হিংস্রজন্তুপূর্ণ অরণ্যের মত বোধ হইতে লাগিল। ঘন অন্ধকারের মধ্যে কেবল চারিদিকে দন্ত ও নখরের ছটা দেখিতে পাইলেন। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া মহারাজ মনে করিলেন এই স্নেহপ্রেমহীন হানাহানির রাজ্যে বাঁচিয়া থাকিয়া আমার স্বজাতির আমার ভাইদের মনে কেবল হিংসা লোভ ও দ্বেষের অনল জ্বালাইতেছি—আমার সিংহাসনের চারিদিকে আমার প্রাণাধিক আত্মীয়েরা আমার দিকে চাহিয়া মনে মনে মুখ বক্র করিতেছে, দন্ত ঘর্ষণ করিতেছে, শৃঙ্খলবদ্ধ ভীষণ কুকুরের মত চারিদিক্ হইতে আমার উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িবার অবসর খুঁজিতেছে। ইহা অপেক্ষা ইহাদের খর নখরাঘাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া ইহাদের রক্তের তৃষা মিটাইয়া এখান হইতে অপসৃত হওয়াই ভাল! প্রভাত-আকাশে গোবিন্দমাণিক্য যে প্রেমমুখচ্ছবি দেখিয়া ছিলেন তাহা কোথায় মিলাইয়া গেল!

উঠিয়া দাঁড়াইয়া মহারাজ গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "নক্ষত্র, আজ অপরাহ্ণে গোমতী তীরের নির্জ্জন অরণ্যে আমরা দুই জনে বেড়াইতে যাইব।"

রাজার এই গম্ভীর আদেশবাণীর বিরুদ্ধে নক্ষত্রের মুখে কথা সরিল না, কিন্তু সংশয়ে ও আশঙ্কায় তাঁহার মন আকুল হইয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল - মহারাজ এতক্ষণ নীরবে দুই চক্ষু তাঁহারই মনের দিকে নিবিষ্ট করিয়া বসিয়াছিলেন—সেখানে অন্ধকার গর্ত্তের মধ্যে যে ভাবনা গুলো কীটের মত কিল্‌বিল্‌ করিতেছিল, সে গুলো যেন সহসা আলো দেখিয়া অস্থির হইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ভয়ে ভয়ে নক্ষত্ররায় রাজার মুখের দিকে একবার চাহিলেন—দেখিলেন তাঁহার মুখে কেবল সুগভীর বিষণ্ণ শান্তির ভাব, সেখানে রোষের রেখা মাত্র নাই। মানবহৃদয়ের কঠিন নিষ্ঠুরতা দেখিয়া কেবল সুগভীর শোক তাঁহার হৃদয়ে বিরাজ করিতেছিল।

বেলা পড়িয়া আসিল। তখনও মেঘ করিয়া আছে। নক্ষত্ররায়কে সঙ্গে লইয়া মহারাজ পদব্রজে অরণ্যের দিকে চলিলেন। এখনও সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব আছে, কিন্তু মেঘের অন্ধকারে সন্ধ্যা বলিয়া ভ্রম হইতেছে—কাকেরা অরণ্যের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া অবিশ্রাম চীৎকার করিতেছে—কিন্তু দুই একটা চিল এখনও আকাশে সাঁতার দিতেছে। দুই ভাই যখন নির্জ্জন বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন নক্ষত্ররায়ের গা ছম্‌ছম্‌ করিতে লাগিল। বড় বড় প্রাচীন গাছ জটলা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে —তাহারা একটি কথা কহে না, কিন্তু স্থির হইয়া যেন কীটের পদশব্দটুকু পর্য্যন্তও শোনে, তাহারা কেবল নিজের ছায়ার দিকে, তলস্থিত অন্ধকারের দিকে অনিমেষ নেত্রে চাহিয়া থাকে। অরণ্যের সেই জটিল রহস্যের ভিতরে পদক্ষেপ করিতে নক্ষত্ররায়ের পা যেন আর উঠে না—চারিদিকে সুগভীর নিস্তব্ধতার ভ্রূকুটি দেখিয়া হৃৎকম্প উপস্থিত হইতে লাগিল। নক্ষত্ররায়ের অত্যন্ত সন্দেহ ও ভয় জন্মিল। ভীষণ অদৃষ্টের মত নীরব রাজা এই সন্ধ্যাকালে এই পৃথিবীর অন্তরাল দিয়া তাঁহাকে কোথায় লইয়া যাইতেছেন কিছুই ঠাহর পাইলেন না। নিশ্চয় মনে করিলেন রাজার কাছে ধরা পড়িয়াছেন—এবং গুরুতর শাস্তি দিবার জন্যই রাজা তাঁহাকে এই অরণ্যের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছেন। নক্ষত্ররায় ঊর্দ্ধশ্বাসে পালাইতে পারিলে বাঁচেন, কিন্তু মনে হইল কে যেন তাঁহার হাত পা বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে। কিছুতেই আর পরিত্রাণ নাই।

অরণ্যের মধ্যস্থলে কতকটা ফাঁকা। একটি স্বাভাবিক জলাশয়ের মত আছে, বর্ষাকালে তাহা জলে পরিপূর্ণ। সেই জলাশয়ের ধারে সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রাজা বলিলেন, "দাঁড়াও!" নক্ষত্ররায় চমকিয়া দাঁড়াইলেন। মনে হইল রাজার আদেশ শুনিয়া সেই মুহূর্ত্তে কালের স্রোত যেন বন্ধ হইল—সেই মুহূর্ত্তেই যেন অরণ্যের বৃক্ষগুলি যে যেখানে ছিল ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল—নীচে হইতে ধরণী এবং উপর হইতে আকাশ যেন নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। কাকের কোলাহল থামিয়া গেছে, বনের মধ্যে একটি শব্দ নাই—কেবল সেই "দাঁড়াও" শব্দ অনেক ক্ষণ ধরিয়া যেন গম্‌ গম্‌ করিতে লাগিল—সেই "দাঁড়াও" শব্দ যেন তড়িৎপ্রবাহের মত বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে শাখা হইতে প্রশাখায় প্রবাহিত হইতে লাগিল, অরণ্যের প্রত্যেক পাতাটা যেন সেই শব্দের কম্পনে ঝাঁ ঝাঁ করিতে লাগিল। নক্ষত্ররায়ও যেন গাছের মতই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন।

রাজা তখন নক্ষত্ররায়ের মুখের দিকে মর্ম্ম-
দী স্থির বিষণ্ণ দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া প্রশান্ত
ীর স্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন, "নক্ষত্র,তুমি
মাকে মারিতে চাও!"

নক্ষত্র বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া রহি-
ন, উত্তর দিবার চেষ্টাও করিতে পারি-
ন না।

রাজা কহিলেন-"কেন মারিবে ভাই?
জ্যের লোভে? তুমি কি মনে কর রাজ্য
বল সোণার সিংহাসন, হীরার মুকুট, ও
জচ্ছত্র? এই মুকুট, এই রাজছত্র, এই
জ দণ্ডের ভার কত তাহা জান? শত সহস্র
াকের চিন্তা এই হীরার মুকুট দিয়া ঢাকিয়া
খিয়াছি। রাজ্য পাইতে চাও ত সহস্র লোকের
খকে আপনার দুঃখ বলিয়া গ্রহণ কর, সহস্র
াকের বিপদকে আপনার বিপদ বলিয়া বরণ
, সহস্র লোকের দারিদ্র্যকে আপনার
রিদ্র্য বলিয়া স্কন্ধে বহন কর—এ যে করে
ই রাজা, সে পর্ণকুটীরেই থাক্ আর
াসাদেই থাক্। যে ব্যক্তি সকল লোককে
পনার বলিয়া মনে করিতে পারে, সকল
াক ত তাহারই! তাহার ঐশ্বর্য্য তাহার
ৌরব,তাহার সুখ, অক্ষৌহিণী সৈন্য আসিয়া
ড়িতে পারে না। পৃথিবীর দুঃখ হরণ যে
রে সেই পৃথিবীর রাজা, পৃথিবীর অর্থ ও
ক্ত শোষণ যে করে সে ত দস্যু—সহস্র অভা-
র অশ্রুজল তাহার মস্তকে অহর্নিশি বর্ষিত
তেছে, সেই অভিশাপধারা হইতে কোন
জছত্র তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না।
াহার প্রচুর রাজভোগের মধ্যে শত শত উপ-
সীর ক্ষুধা লুকাইয়া আছে, অনাথের দারিদ্র্য
াইয়া সে সোণার অলঙ্কার করিয়া পরে,
াহার ভূমিবিস্তৃত রাজবস্ত্রের মধ্যে শত শত
তাতুরের মলিন ছিন্ন কন্থা। রাজাকে বধ
করিয়া রাজত্ব মেলে না ভাই—পৃথিবীকে বশ
করিয়া রাজা হইতে হয়!"

গে বিন্দমাণিক্য থামিলেন। নক্ষত্ররায়
মাথা নত করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

মহারাজ খাপ হইতে তরবারি খুলিলেন।
নক্ষত্ররায়ের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন—"ভাই,
এখানে লোক নাই, সাক্ষ্য নাই, কেহ নাই—
ভাইয়ের বক্ষে ভাই যদি ছুরি মারিতে চায়
তবে তাহার স্থান এই,সময় এই—এখানে কেহ
তোমাকে নিবারণ করিবে না, কেহ তোমাকে
নিন্দা করিবে না। তোমার শিরায় আর আমার
শিরায় একই রক্ত বহিতেছে,একই পিতা একই
পিতামহের রক্ত—তুমি সেই রক্তপাত করিতে
চাও, কিন্তু মনুষ্যের আবাসস্থলে করিও না।
কারণ,যেখানে এই রক্তের বিন্দু পড়িবে, সেই
স্থানেই অলক্ষ্যে ভ্রাতৃত্বের পবিত্র বন্ধন শিথিল
হইয়া যাইবে। পাপের শেষ কোথায় গিয়া
হয় কে জানে! পাপের একটি বীজ যেখানে
পড়ে, সেখানে দেখিতে দেখিতে গোপনে কেমন
করিয়া সহস্র বৃক্ষ জন্মায়, কেমন করিয়া অল্পে
অল্পে সুশোভন মানবসমাজ অরণ্যে পরিণত
হইয়া যায়-তাহা কেহ জানিতে পারে না।
অতএব নগরে, গ্রামে, যেখানে নিশ্চিন্ত চিত্তে
পরম স্নেহে ভাইয়ে ভাইয়ে গলাগলি করিয়া
আছে, সেই ভাইদের নীড়ের মধ্যে ভাইয়ের
রক্তপাতকরিও না! এই জন্য তোমাকে আজ
অরণ্যে ডাকিয়া আনিয়াছি।"

এই বলিয়া রাজা নক্ষত্ররায়ের হাতে তর-
বারি দিলেন। নক্ষত্ররায়ের হাত হইতে তর-
বারি ভূমিতে পড়িয়া গেল! নক্ষত্ররায় দুই
হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া রুদ্ধকণ্ঠে
কহিলেন, "দাদা, আমি দোষী নই—
এ কথা আমার মনে কখনও উদয় হয়
নাই"—

রাজা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া বলিলেন—"আমি তাহা জানি। তুমি কি কখন আমাকে আঘাত করিতে পার!—তোমাকে পাঁচ জনে মন্দ পরামর্শ দিয়াছে!"

নক্ষত্ররায় বলিলেন—"আমাকে রঘুপতি কেবল এই উপদেশ দিতেছে!"

রাজা বলিলেন—"রঘুপতির কাছ হইতে দূরে থাকিও।"

নক্ষত্ররায় বলিলেন—"কোথায় যাইব বলিয়া দিন্! আমি এখানে থাকিতে চাই না! আমি এখান হইতে—রঘুপতির কাছ হইতে পালাইতে চাই।"

রাজা বলিলেন—"তুমি আমারই কাছে থাক—আর কোথাও যাইতে হইবে না—রঘুপতি তোমার কি করিবে!"

নক্ষত্ররায় রাজার হাত দৃঢ় করিয়া ধরিলেন, যেন রঘুপতি তাঁহাকে টানিয়া লইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নক্ষত্ররায় রাজার হাত ধরিয়া অরণ্যের মধ্য দিয়া যখন গৃহে ফিরিয়া আসিতেছেন, তখনও আকাশ হইতে অল্প অল্প আলো আসিতেছিল—কিন্তু অরণ্যের নীচে অত্যন্ত অন্ধকার হইয়াছে। যেন অন্ধকারের বন্যা আসিয়াছে, কেবল গাছ গুলোর মাথা উপরে জাগিয়া আছে। ক্রমে তাহাও ডুবিয়া যাইবে—তখন অন্ধকারে পূর্ণ হইয়া আকাশে পৃথিবীতে এক হইয়া যাইবে।

প্রাসাদের পথে না গিয়া রাজা মন্দিরের দিকে গেলেন। মন্দিরের সন্ধ্যা আরতি সমাপন করিয়া একটি দীপ জ্বালিয়া রঘুপতি ও জয়সিং কুটীরে বসিয়া আছেন। উভয়েই নীরবে আপনাপন ভাবনা লইয়া আছেন। দীপের ক্ষীণ আলোকে কেবল তাঁহাদের দুই জনের মুখের অন্ধকার দেখা যাইতেছে। নক্ষত্ররায় রঘুপতিকে দেখিয়া মুখ তুলিতে পারিলেন না। রাজার ছায়ায় দাঁড়াইয়া মাটির দিকে চাহিয় রহিলেন—রাজা তাঁহাকে পাশে টানিয়া লইয় দৃঢ়রূপে তাঁহার হাত ধরিয়া দাঁড়াইলেন ও স্থির নেত্রে রঘুপতির মুখের দিকে একবার চাহিলেন রঘুপতি তীব্র দৃষ্টিতে নক্ষত্ররায়ের প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন। অবশেষে রাজা রঘুপতিকে প্রণাম করিলেন, নক্ষত্ররায়ও তাঁহার অনুসরণ করিলেন—রঘুপতি প্রণাম গ্রহণ করিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন "জয়োস্তু—রাজ্যের কুশল?"

রাজা একটুখানি থামিয়া বলিলেন, "ঠাকুর আশীর্বাদ করুন, রাজ্যের অকুশল না ঘটুক! এরাজ্যে মায়ের সকল সন্তান যেন সদ্ভাবে প্রেমে মিলিয়া থাকে, এ রাজ্যে ভাইয়ের কাছ হইতে ভাইকে কেহ যেন কাড়িয়া না লয়, যেখানে প্রেম আছে সেখানে কেহ যেন হিংসার প্রতিষ্ঠা না করে। রাজ্যের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়াই আসিয়াছি। পাপ সংকল্পের সঙ্ঘর্ষণে দাবানল জ্বলিয়া উঠিতে পারে—নির্ব্বাণ করুন, শান্তির বারি বর্ষণ করুন, পৃথিবী শীতল করুন।"

রঘুপতি কহিলেন, "দেবতার রোষানল জ্বলিয়া উঠিলে কে তাহা নির্ব্বাণ করিবে? এক অপরাধীর জন্য সহস্র নিরপরাধ সে অনলে দগ্ধ হয়।"

রাজা বলিলেন—"সেই ত ভয়, সেই জন্যই ত কাঁপিতেছি! সে কথা কেহ বুঝিয়াও বোঝে না কেন? আপনি কি জানেন না এ রাজ্যে দেবতার নাম করিয়া দেবতার নিয়ম লঙ্ঘন করা হইতেছে? সেই জন্যই অমঙ্গল আশঙ্কায় আজ সন্ধ্যাবেলায় এখানে আসিয়াছি—এখানে

পাপের বৃক্ষ রোপণ করিয়া আমার এই ধনধান্যময় সুখের রাজ্যে দেবতার বজ্র আহ্বান করিয়া আনিবেন না—আপনাকে এই কথা বলিয়া গেলাম, এই কথা বলিবার জন্যই আমি আজ আসিয়াছিলাম।” বলিয়া মহারাজ রঘুপতির মুখের উপর তাঁহার মর্ম্মভেদী দৃষ্টি স্থাপন করিলেন। রাজার সুগম্ভীর দৃঢ়স্বর রুদ্ধ ঝটিকার মত কুটীরের মধ্যে কাঁপিতে লাগিল। রঘুপতি একটী উত্তর দিলেন না, পৈতা লইয়া নাড়িতে লাগিলেন। রাজা প্রণাম করিয়া নক্ষত্ররায়ের হাত ধরিয়া বাহির হইয়া আসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে জয়সিংহও বাহির হইলেন। ঘরের মধ্যে কেবল একটি দীপ, রঘুপতি এবং রঘুপতির বৃহৎ ছায়া রহিল।

তখন আকাশের আলো নিবিয়া গেছে। মেঘের মধ্যে তারা নিমগ্ন। আকাশের কানায় কানায় অন্ধকার। পূবে বাতাসে সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে কোথা হইতে কদম ফুলের গন্ধ পাওয়া যাইতেছে এবং অরণ্যের মর্ম্মর শব্দ শুনা যাইতেছে। ভাবনায় নিমগ্ন হইয়া পরিচিত পথ দিয়া রাজা চলিতেছেন, সহসা পশ্চাৎ হইতে শুনিলেন, কে ডাকিল—“মহারাজ!”

রাজা ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে তুমি?”

পরিচিত স্বর কহিল,“আমি আপনার অধম সেবক, আমি জয়সিং। মহারাজ, আপনি আমার গুরু, আমার প্রভু। আপনি ছাড়া আমার আর কেহ নাই। যেমন আপনি আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতার হাত ধরিয়া অন্ধকারের মধ্যে দিয়া লইয়া যাইতেছেন, তেমনি আমারও হাত ধরুন, আমাকেও সঙ্গে লইয়া যান; আমি গুরুতর অন্ধকারের মধ্যে পড়িয়াছি; আমার কিসে ভাল হইবে—কিসে মন্দ হইবে আমি কিছুই জানি না। আমি একবার বামে যাইতেছি, একবার দক্ষিণে যাইতেছি, আমার কর্ণধার কেহ নাই।” সেই অন্ধকারে অশ্রু পড়িতে লাগিল, কেহ দেখিতে পাইল না, কেবল আবেগভরে জয়সিংহের আর্দ্র স্বর কাঁপিতে কাঁপিতে রাজার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। স্তব্ধ স্থির অন্ধকার, বায়ু চঞ্চল সমুদ্রের মত কাঁপিতে লাগিল। রাজা জয়সিংহের হাত ধরিয়া বলিলেন,“চল, আমার সঙ্গে প্রাসাদে চল।”

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

তাহার পর দিন যখন জয়সিং মন্দিরে ফিরিয়া আসিলেন, তখন পূজার সময় অতীত হইয়া গিয়াছে! রঘুপতি বিমর্ষ মুখে একাকী বসিয়া আছেন। ইহার পূর্ব্বে কখন এরূপ অনিয়ম হয় নাই!

জয়সিং আসিয়া গুরুর কাছে না গিয়া তাঁহার বাগানের মধ্যে গেলেন। তাঁহার গাছপালাগুলির মধ্যে গিয়া বসিলেন। তাহারা তাঁহার চারিদিকে কাঁপিতে লাগিল, নড়িতে লাগিল, ছায়া নাচাইতে লাগিল। তাঁহার চারিদিকে পুষ্পখচিত পল্লবের স্তর, শ্যামল স্তরের উপর স্তর, ছায়াপূর্ণ সুকোমল স্নেহের আচ্ছাদন, সুমধুর, আহ্বান,প্রকৃতির প্রীতিপূর্ণ আলিঙ্গন! এখানে সকলে অপেক্ষা করিয়া থাকে, কথা জিজ্ঞাসা করে না, ভাবনার ব্যাঘাত করে না, চাহিলে তবে চায়, কথা কহিলে তবে কথা কয়। এই নীরব শুশ্রূষার মধ্যে, প্রকৃতির এই অন্তঃপুরের মধ্যে বসিয়া জয়সিং ভাবিতে লাগিলেন; রাজা তাঁহাকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে ধীরে ধীরে রঘুপতি আসিয়া তাঁহার পিঠে হাত দিলেন। জয়সিং সচকিত হইয়া উঠিলেন। রঘুপতি তাঁর পাশে বসি-

লেন। "জয়সিংহের মুখের দিকে চাহিয়া কম্পিতস্বরে কহিলেন–বৎস, তোমার এমন ভাব দেখিতেছি কেন? আমি তোমার কি করিয়াছি যে তুমি অল্পে অল্পে আমার কাছ হইতে সরিয়া যাইতেছ?"

জয়সিং কি বলিতে চেষ্টা করিলেন, রঘুপতি তাহাতে বাধা দিয়া বলিতে লাগিলেন—"এক মুহূর্ত্তের জন্য কি আমার স্নেহের অভাব দেখিয়াছ? আমি কি তোমার কাছে কোন অপরাধ করিয়াছি জয়সিং? যদি করিয়া থাকি—তবে আমি তোমার গুরু, তোমার পিতৃতুল্য, আমি তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাহিতেছি আমাকে মার্জ্জনা কর।"

জয়সিং সহসা বজ্রবিদ্ধের ন্যায় চমকিয়া উঠিলেন—গুরুর চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন—বলিলেন "পিতা,আমি কিছুই জানি না, আমি কিছুই বুঝিতে পারি না, আমি কোথায় যাইতেছি, দেখিতে পাইতেছি না।"

রঘুপতি জয়সিংহের হাত ধরিয়া বলিলেন–"বৎস, আমি তোমাকে তোমার শৈশব হইতে মাতার ন্যায় স্নেহে পালন করিয়াছি, পিতার ন্যায় যত্নে শাস্ত্রশিক্ষা দিয়াছি–তোমার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সখার ন্যায় তোমাকে আমার সমুদায় মন্ত্রণার সহযোগী করিয়াছি। আজ তোমাকে কে আমার পাশ হইতে টানিয়া লইতেছে, এতদিনকার স্নেহ মমতার বন্ধন কে বিচ্ছিন্ন করিতেছে? তোমার উপর যে আমার দেবদত্ত অধিকার জন্মিয়াছে সেই পবিত্র অধিকারে কে হস্তক্ষেপ করিয়াছে? বল,বৎস, সেই মহাপাতকীর নাম বল।"

জয়সিং বলিলেন–"প্রভু,আপনার কাছ হইতে আমাকে কেহ বিচ্ছিন্ন করে নাই--আপনিই আমাকে দূর করিয়া দিয়াছেন। আমি ছিলাম গৃহের মধ্যে আপনি সহসা পথের মধ্যে আমাকে বাহির করিয়া দিয়াছেন। আপনি বলিয়াছেন কেহই বা পিতা,কেহই বা মাতা, কেহই বা ভ্রাতা। আপনি বলিয়াছেন পৃথিবীতে কোন বন্ধন নাই,স্নেহ প্রেমের পবিত্র অধিকার নাই। যাহাকে মা বলিয়া জানিতাম আপনি তাঁহাকে বলিয়াছেন শক্তি। যে যেখানে হিংসা করিতেছে,যে যেখানে রক্তপাত করিতেছে,যেখানেই ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ, যেখানেই দুই জন মানুষে যুদ্ধ, সেইখানেই এই তৃষিত শক্তি রক্তলালসায় তাঁহার খর্পর লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন! আপনি মায়ের কোল হইতে আমাকে এ কি রাক্ষসীর দেশে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছেন!"

রঘুপতি অনেক ক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। অবশেষে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন-"তবে তুমি স্বাধীন হইলে, বন্ধনমুক্ত হইলে, তোমার উপর হইতে আমার সমস্ত অধিকার আমি প্রত্যাহরণ করিলাম, তাহাতেই যদি তুমি সুখী হও, তবে তাই হউক!" বলিয়া উঠিবার উদ্যোগ করিলেন।

জয়সিং তাঁহার পা ধরিয়া বলিলেন,"না না না প্রভু—আপনি আমাকে ত্যাগ করিলেও আমি আপনাকে ত্যাগ করিতে পারি না। আমি রহিলাম—আপনার পদতলেই রহিলাম, আপনি যাহা ইচ্ছা করিবেন। আপনার পথছাড়া আমার অন্য পথ নাই!"

রঘুপতি তখন জয়সিংহকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন—তাঁহার অশ্রু প্রবাহিত হইয়া জয়সিংহের স্কন্ধে পড়িতে লাগিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—*—

তাহার পরদিন ২৯শে আষাঢ়। আজ রাত্রে চতুর্দ্দশ দেবতার পূজা। আজ প্রভাতে তালবনের আড়ালে সূর্য্য যখন উঠিতেছেন, তখন পূর্ব্বদিকে মেঘ নাই। কনককিরণ-প্লাবিত আনন্দময় কাননের মধ্যে গিয়া জয়সিং যখন বসিলেন তখন তাঁহার পুরাতন স্মৃতি সকল মনে উঠিতে লাগিল। এই বনের মধ্যে এই পাষাণ মন্দিরের পাষাণ সোপানাবলীর মধ্যে, এই গোমতীতীরে সেই বৃহৎ বটের ছায়ায়, সেই ছায়া দিয়া ঘেরা পুকুরের ধারে তাঁহার বাল্যকাল সুমধুর স্বপ্নের মত মনে পড়িতে লাগিল। যে সকল মধুর দৃশ্য তাঁহার বাল্যকালকে সস্নেহে ঘিরিয়া থাকিত, তাহারা আজ হাসিতেছে, তাঁহাকে আবার আহ্বান করিতেছে, কিন্তু তাঁহার মন বলিতেছে "আমি যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছি, আমি বিদায় লইয়াছি, আমি আর ফিরিব না!" শ্বেত পাষাণের মন্দিরের উপরে সূর্য্যকিরণ পড়িয়াছে এবং তাহার বামদিকের ভিত্তিতে কম্পিত বকুলশাখার কম্পিত ছায়া পড়িয়াছে! ছেলেবেলায় এই পাষাণমন্দিরকে যেমন সচেতন বোধ হইত—এই সোপানের মধ্যে একলা বসিয়া যখন খেলা করিতেন, তখন এই সোপানগুলির মধ্যে যেমন সঙ্গ পাইতেন, আজ প্রভাতের সূর্য্যকিরণে মন্দিরকে তেমনি সচেতন, তাহার সোপানগুলিকে তেমনি শৈশবের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। মন্দিরের ভিতরে মাকে আজ আবার মা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কিন্তু অভিমানে তাঁহার হৃদয় পূরিয়া গেল, তাঁহার দুই চক্ষু ভাসিয়া জল পড়িতে লাগিল।

রঘুপতিকে আসিতে দেখিয়া জয়সিং চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিলেন। গুরুকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। রঘুপতি কহিলেন—"আজ পূজার দিন। মায়ের চরণ স্পর্শ করিয়া কি শপথ করিয়াছিলে মনে আছে!"

জয়সিংহ কহিলেন—আছে।"

রঘুপতি "শপথ পালন করিবে ত!"

জয়সিং "হাঁ।"

রঘুপতি "দেখিও বৎস, সাবধানে কাজ করিও। বিপদের আশঙ্কা আছে। আমি তোমাকে রক্ষা করিবার জন্যই প্রজাদিগকে রাজার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছি।"

জয়সিং চুপ করিয়া রঘুপতির মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিছুই উত্তর করিলেন না। রঘুপতি তাঁহার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন "আমার আশীর্ব্বাদে নির্ব্বিঘ্নে তুমি তোমার কার্য্য সাধন করিতে পারিবে, মায়ের আদেশ পালন করিতে পারিবে!" এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

অপরাহ্নে একটি ঘরে বসিয়া রাজা ধ্রুবের সহিত খেলা করিতেছেন। ধ্রুবের আদেশ মতে একবার মাথায় মুকুট দিতেছেন, একবার মাথা হইতে মুকুট খুলিতেছেন—ধ্রুব মহারাজের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া হাসিয়া অস্থির হইতেছে। রাজা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "আমি অভ্যাস করিতেছি। তাঁহার আদেশে এ মুকুট যেমন সহজে পরিতে পারিয়াছি, তাঁহার আদেশে এ মুকুট যেন তেম্নি সহজে খুলিতে পারি। মুকুট পরা শক্ত কিন্তু মুকুট ত্যাগ করা আরও কঠিন।"

ধ্রুবের মনে সহসা একটা ভাবোদয় হইল—কিয়ৎক্ষণ রাজার মুখের দিকে চাহিয়া মুখে আঙুল দিয়া বলিল—"তুমি আজা!" "রাজা শব্দ হইতে "র" অক্ষর একেবারে সমূলে লোপ করিয়া দিয়াও ধ্রুবের মনে কিছুমাত্র অনুতাপের উদয় হইল না। রাজার মুখের সাম্নে

রাজাকে আজা বলিয়া সে সম্পূর্ণ আত্মপ্রসাদ লাভ করিল।

রাজা ধ্রুবের এই ধৃষ্টতা সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন "তুমি আজা।"

ধ্রুব বলিল "তুমি আজা!"

এ বিষয়ে তর্কের শেষ হইল না। কোন পক্ষে কোন প্রমাণ নাই, তর্ক কেবলই গায়ের জোরে! অবশেষে রাজা নিজের মুকুট লইয়া ধ্রুবের মাথায় চড়াইয়া দিলেন। তখন ধ্রুবের আর কথাটি কহিবার যো রহিল না, তাহার সম্পূর্ণ হার হইল। ধ্রুবের মুখের আধখান সেই মুকুটের নীচে ডুবিয়া গেল। মুকুট সমেত মস্ত মাথা দুলাইয়া ধ্রুব মুকুটহীন রাজার প্রতি আদেশ করিল "একটা গল্প বল?"

রাজা বলিলেন "কি গল্প বলিব?"

ধ্রুব কহিল "দিদির গল্প বল" গল্প মাত্রকেই ধ্রুব দিদির গল্প বলিয়া জানিত। সে জানিত দিদি তাহাকে যে সকল গল্প করিত তাহা ছাড়া পৃথিবীতে আর গল্প নাই।

রাজা তখন মস্ত এক পৌরাণিক গল্প ফাঁদিয়া বসিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন "হিরণ্যকশিপু নামে এক রাজা ছিল।"

আজা শুনিয়া ধ্রুব বলিয়া উঠিল "আমি আজা!" মস্ত ঢিলে মুকুটের জোরে হিরণ্যকশিপুর রাজপদ সে একেবারে অগ্রাহ্য করিল।

চাটুভাষী সভাসদের ন্যায় গোবিন্দমাণিক্য সেই কিরীটি শিশুকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বলিলেন "তুমিও আজা সেও আজা।"

ধ্রুব তাহাতেও সুস্পষ্ট অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিল "না, আমি আজা!"

অবশেষে মহারাজ যখন বলিলেন "হিরণ্যকশিপু আজা নয় সে আক্কস্ (রাক্ষস)" তখন ধ্রুব তাহাতে আপত্তি করিবার কিছুই দেখিল না।

এমন সময়ে নক্ষত্র রায় গৃহে প্রবেশ করিলেন—কহিলেন, "শুনিলাম, রাজকার্য্যোপলক্ষে মহারাজ আমাকে ডাকিয়াছেন। আদেশের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছি।"

রাজা কহিলেন, "আরেকটু অপেক্ষা কর, গল্পটা শেষ করিয়া লই।" বলিয়া গল্পটা সমস্ত শেষ করিলেন। "আক্কস্ দুষ্টু।" গল্প শুনিয়া সংক্ষেপে ধ্রুব এইরূপ মত প্রকাশ করিল।

ধ্রুবের মাথায় মুকুট দেখিয়া নক্ষত্ররায়ের ভাল লাগে নাই। ধ্রুব যখন দেখিল নক্ষত্ররায়ের দৃষ্টি তাহার দিকে স্থাপিত রহিয়াছে, তখন সে নক্ষত্র রায়কে গম্ভীর ভাবে জানাইয়া দিল "আমি আজা।"

নক্ষত্র বলিলেন "ছি ও কথা বলিতে নাই" বলিয়া ধ্রুবের মাথা হইতে মুকুট তুলিয়া লইয়া রাজার হাতে দিতে উদ্যত হইলেন। ধ্রুব মুকুট হরণের সম্ভাবনা দেখিয়া সত্যকার রাজাদের মত চীৎকার করিয়া উঠিল। গোবিন্দমাণিক্য তাহাকে এই আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন, নক্ষত্রকে নিবারণ করিলেন।

অবশেষে গোবিন্দমাণিক্য নক্ষত্ররায়কে কহিলেন—"শুনিয়াছি, রঘুপতি ঠাকুর অসৎ উপায়ে প্রজাদের অসন্তোষ উদ্রেক করিয়া দিতেছেন। তুমি স্বয়ং নগরের মধ্যে গিয়া এ বিষয়ে তদারক করিয়া আসিবে এবং সত্য মিথ্যা অবধারণ করিয়া আমাকে জানাইবে।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন "যে আজ্ঞে!" বলিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু ধ্রুবের মাথায় মুকুট তাহার কিছুতেই ভাল লাগিল না।

প্রহরী আসিয়া কহিল "পুরোহিত ঠাকুরের সেবক জয়সিং সাক্ষাৎ প্রার্থনায় দ্বারে দাঁড়াইয়া।"

রাজা তাহাকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন।

জয়সিং মহারাজকে প্রণাম করিয়া কর-যোড়ে কহিলেন "মহারাজ, আমি বহু দূর দেশে চলিয়া যাইতেছি। আপনি আমার রাজা, আমার পিতা, আমার গুরু, আপনার আশীর্ব্বাদ লইতে আসিয়াছি।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাইবে জয়সিং?

জয়সিং কহিলেন "জানি না মহারাজ কোথায় তাহা কেহ বলিতে পারে না!" রাজা কথা কহিতে উদ্যত দেখিয়া জয়সিং কহিলেন "নিষেধ করিবেন না মহারাজ! আপনি নিষেধ করিলে আমার যাত্রা শুভ হইবে না। আশীর্ব্বাদ করুন এখানে আমার যে সকল সংশয় ছিল, সেখানে যেন সে সকল সংশয় দূর হইয়া যায়! এখানকার মেঘ সেখানে যেন কাটিয়া যায়! যেন আপনার মত রাজার রাজত্বে যাই, যেন শান্তি পাই!"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "কবে যাইবে?"

জয়সিং কহিলেন "আজ সন্ধ্যাকালে। অধিক সময় নাই মহারাজ, আজ আমি তবে বিদায় হই।" বলিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া রাজার পদধূলি লইলেন, রাজার চরণে দুই ফোঁটা অশ্রুজল পড়িল।

জয়সিং উঠিয়া যখন যাইতে উদ্যত হইলেন তখন ধ্রুব ধীরে ধীরে গিয়া তাঁহার কাপড় টানিয়া কহিল "তুমি যেওনা!"

জয়সিং হাসিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। ধ্রুবকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহাকে চুম্বন করিয়া কহিলেন "কার কাছে থাকিব বৎস? আমার কে আছে?"

ধ্রুব কহিল "আমি আজা!"

জয়সিং কহিলেন "তোমরা রাজার রাজা, তোমরাই সকলকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছ!" ধ্রুবকে কোল হইতে নামাইয়া জয়সিংহ গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। মহারাজ গম্ভীর মুখে অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

চতুর্দ্দশী তিথি। মেঘও করিয়াছে চাঁদও উঠিয়াছে। আকাশের কোথাও আলো কোথাও অন্ধকার। কখনও চাঁদ বাহির হইতেছে, কখনও চাঁদ লুকাইতেছে। গোমতী তীরের অরণ্যগুলি চাঁদের দিকে চাহিয়া তাহাদের গভীর অন্ধকার রাশির মর্ম্মভেদ করিয়া মাঝে মাঝে নিশ্বাস ফেলিতেছে।

আজ রাত্রে পথে লোক বাহির হওয়া নিষেধ। রাত্রে পথে লোক কেই বা বাহির হয়! কিন্তু নিষেধ আছে বলিয়া পথের বিজনতা আজ আরও গভীরতর বোধ হইতেছে। নগরবাসীরা সকলেই আপনার ঘরের দীপ নিভাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। পথে একটি প্রহরী নাই। চোরও আজ পথে বাহির হয় না। যাহারা শ্মশানে শবদাহ করিতে যাইবে তাহারা মৃতদেহ ঘরে লইয়া প্রভাতের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে। ঘরে যাহাদের সন্তান মুমূর্ষু তাহারা বৈদ্য ডাকিতে বাহির হয় না। যে ভিক্ষুক পথপ্রান্তে বৃক্ষতলে শয়ন করিত সে আজ গৃহস্থের গোশালায় আশ্রয় লইয়াছে।

সে রাত্রে শৃগাল কুকুর নগরের পথে বিচরণ করিতেছে, দুই একটা চিতাবাঘ গৃহস্থের দ্বারের কাছে আসিয়া ডাক মারিতেছে। মানুষের মধ্যে কেবল একজন মাত্র আজ গৃহের বাহিরে আছে—আর মানুষ নাই। সে এক খানা ছুরি লইয়া নদীতীরে পাথরের উপর শাণ দিতেছে, এবং অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছে।

ছুরিতে ধার যথেষ্ট ছিল, কিন্তু সে বোধ করি ছুরির সঙ্গে সঙ্গে ভাবনাতেও শাণ দিতেছিল, তাই তার শাণ দেওয়া আর শেষ হইতেছিল না। প্রস্তরের ঘর্ষণে তীক্ষ্ণ ছুরি হিস্ হিস্ শব্দ করিয়া হিংসার লালসায় তপ্ত হইয়া উঠিতেছে। অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকার নদী বহিয়া যাইতেছিল। জগতের উপর দিয়া অন্ধকার রজনীর প্রহর বহিয়া যাইতেছিল। মাথায় আকাশের উপর দিয়া অন্ধকার ঘন মেঘের স্রোত ভাসিয়া যাইতেছিল।

অবশেষে যখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল, তখন জয়সিংহের চেতনা হইল। তপ্ত ছুরি খাপের মধ্যে পুরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পূজার সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। তাঁহার শপথের কথা মনে পড়িয়াছে। আর একদণ্ডও বিলম্ব করিলে চলিবে না।

মন্দির আজ সহস্র দীপে আলোকিত। ত্রয়োদশ দেবতার মাঝখানে কালী দাঁড়াইয়া নররক্তের জন্য জিহ্বা মেলিয়াছেন। মন্দিরের সেবকদিগকে বিদায় করিয়া দিয়া চতুর্দ্দশ দেবপ্রতিমা সম্মুখে করিয়া রঘুপতি একাকী মন্দিরে বসিয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখে এক দীর্ঘ খাঁড়া। উলঙ্গ উজ্জ্বল খড়্গ দীপালোকে বিভাসিত হইয়া স্থির বজ্রের ন্যায় দেবীর আদেশের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে।

অর্দ্ধরাত্রে পূজা। সময় নিকটবর্ত্তী। রঘুপতি অত্যন্ত অস্থির চিত্তে জয়সিংহের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন। সহসা ঝড়ের মত বাতাস উঠিয়া মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। বাতাসে মন্দিরের সহস্র দীপশিখা কাঁপিতে লাগিল, উলঙ্গ খড়্গের উপর বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল। চতুর্দ্দশ দেবতা এবং রঘুপতির ছায়া যেন জীবন পাইয়া দীপশিখার নৃত্যের তালে তালে মন্দিরের ভিত্তিময় নাচিতে লাগিল। একটা নর-কপাল ঝড়ের বাতাসে ঘরময় গড়াইতে লাগিল। মন্দিরের মধ্যে দুইটা চামচিকা আসিয়া শুষ্কপত্রের মত ক্রমাগত উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল—দেয়ালে তাহাদের ছায়া উড়িতে লাগিল।

দ্বিপ্রহর হইল। প্রথমে নিকটে পরে দূর দূরান্তরে শৃগাল ডাকিয়া উঠিল। ঝড়ের বাতাসও তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া হু হু করিয়া কাঁদিতে লাগিল। পূজার সময় হইয়াছে। রঘুপতি অমঙ্গল আশঙ্কায় অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন।

এমন সময়ে জীবন্ত ঝড়বৃষ্টিবিদ্যুতের মত জয়সিং নিশীথের অন্ধকারের মধ্যে হইতে সহসা মন্দিরের আলোকের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দীর্ঘ চাদরে দেহ আচ্ছাদিত, সর্ব্বাঙ্গ বাহিয়া বৃষ্টিধারা পড়িতেছে, নিশ্বাস বেগে বহিতেছে, চক্ষুতারকায় অগ্নিকণা জ্বলিতেছে।

রঘুপতি তাঁহাকে ধরিয়া কাণের কাছে মুখ দিয়া কহিলেন "রাজরক্ত আনিয়াছ ?"

জয়সিং তাঁহার হাত ছাড়াইয়া উচ্চস্বরে কহিলেন "আনিয়াছি ! রাজরক্ত আনিয়াছি ! আপনি সরিয়া দাঁড়ান্, আমি দেবীকে নিবেদন করি !" শব্দে মন্দির কাঁপিয়া উঠিল।

কালীর প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন—"সত্যই কি তবে তুই সন্তানের রক্ত চাস্ মা ! রাজরক্ত নহিলে তোর তৃষা মিটিবে না ! জন্মাবধি আমি তোকেই মা বলিয়া আসিয়াছি, আমি তোরই সেবা করিয়াছি, আমি আর কাহারও দিকে চাই নাই, আমার জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। আমি রাজপুত, আমি ক্ষত্রিয়, আমার প্রপিতামহ রাজা ছিলেন, আমার মাতামহবংশীয়েরা আজও রাজত্ব করিতেছেন

এই নে তবে তোর সন্তানের রক্ত, তোর রাজরক্ত এই নে!" গাত্র হইতে চাদর পড়িয়া গেল। কটিবন্ধ হইতে ছুরি বাহির করিলেন —বিদ্যুৎ নাচিয়া উঠিল—চকিতের মধ্যে সেই ছুরি আমূল তাঁহার হৃদয়ে নিহিত করিলেন, মরণের তীক্ষ্ণ জিহ্বা তাঁহার বক্ষে বিদ্ধ হইল। প্রতিমার পদতলে পড়িয়া গেলেন; পাষাণ-প্রতিমা বিচলিত হইল না।

রঘুপতি চীৎকার করিয়া উঠিলেন—জয়সিংকে তুলিবার চেষ্টা করিলেন, তুলিতে পারিলেন না। তাঁহার মৃতদেহের উপর পড়িয়া রহিলেন। রক্ত গড়াইয়া মন্দিরের শ্বেত প্রস্তরের উপর প্রবাহিত হইতে লাগিল। ক্রমে দীপগুলি একে একে নিবিয়া গেল। অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত রাত্রি একটি প্রাণীর নিশ্বাসের শব্দ শুনা গেল। রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় ঝড় থামিয়া চারিদিক্ নিস্তব্ধ হইয়া গেল। রাত্রি চতুর্থ প্রহরের সময় মেঘের ছিদ্র দিয়া চন্দ্রালোক মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিল। চন্দ্রালোক জয়সিংহের পাণ্ডুবর্ণ মুখের উপর পড়িল। চতুর্দ্দশ দেবতা শিয়রে দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতে লাগিল। প্রভাতে বন হইতে যখন পাখী ডাকিয়া উঠিল তখন রঘুপতি মৃতদেহ ছাড়িয়া উঠিয়া গেলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

রাজার আদেশমত প্রজাদের অসন্তোষের কারণ অনুসন্ধানের জন্য নক্ষত্ররায় স্বয়ং প্রাতঃকালে বাহির হইয়াছেন। তাঁহার ভাবনা হইতে লাগিল, মন্দিরে কি করিয়া যাই। রঘুপতির সম্মুখে পড়িলে তিনি কেমন অস্থির হইয়া পড়েন, আত্মসম্বরণ করিতে পারেন না। রঘুপতির সম্মুখে পড়িতে তাঁহার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা। এই জন্য তিনি স্থির করিয়াছেন, রঘুপতির দৃষ্টি এড়াইয়া গোপনে জয়সিংহের কক্ষে গিয়া তাঁহার নিকট হইতে সবিশেষ বিবরণ অবগত হইতে পারিবেন।

নক্ষত্ররায় ধীরে ধীরে জয়সিংহের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই মনে করিলেন, ফিরিতে পারিলে বাঁচি। দেখিলেন, জয়সিংহের পুঁথি, তাঁহার বসন, তাঁহার গৃহসজ্জা চারিদিকে ছড়ান রহিয়াছে, মাঝখানে রঘুপতি বসিয়া। জয়সিংহ নাই। রঘুপতির লোহিত চক্ষু অঙ্গারের ন্যায় জ্বলিতেছে, তাঁহার কেশপাশ বিশৃঙ্খল। তিনি নক্ষত্ররায়কে দেখিয়াই দৃঢ়মুষ্টিতে তাঁহার হাত ধরিলেন। বলপূর্ব্বক তাঁহাকে মাটিতে বসাইলেন। নক্ষত্ররায়ের প্রাণ উড়িয়া গেল। রঘুপতি তাঁহার অঙ্গার নয়নে নক্ষত্ররায়ের মর্ম্মস্থান পর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া পাগলের মত বলিলেন "রক্ত কোথায়?" নক্ষত্ররায়ের হৃৎপিণ্ডে রক্তের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, মুখ দিয়া কথা সরিল না।

রঘুপতি উচ্চস্বরে বলিলেন "তোমার প্রতিজ্ঞা কোথায়! রক্ত কোথায়!"

নক্ষত্ররায় হাত নাড়িলেন, পা নাড়িলেন, বামে সরিয়া বসিলেন, কাপড়ের প্রান্ত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন, তাঁহার ঘর্ম্ম বহিতে লাগিল, তিনি শুষ্কমুখে বলিলেন—"ঠাকুর—"

রঘুপতি কহিলেন—"এবার মা যে স্বয়ং খড়্গ তুলিয়াছেন—এবার চারিদিকে যে রক্তের স্রোত বহিতে থাকিবে—এবার তোমাদের বংশে এক কোঁটা রক্ত যে বাকী থাকিবে না। তখন দেখিব নক্ষত্ররায়ের ভ্রাতৃস্নেহ!"

"ভ্রাতৃস্নেহ! হাঃ হাঃ হাঃ!—ঠাকুর"—নক্ষত্ররায়ের হাসি আর বাহির হইল না—গলা শুকাইয়া গেল।

রঘুপতি কহিলেন—"আমি গোবিন্দমাণিক্যের রক্ত চাই না। পৃথিবীতে গোবিন্দমাণিক্যের যে প্রাণের অপেক্ষা প্রিয় আমি তাহাকেই চাই! তাহার রক্ত লইয়া আমি গোবিন্দমাণিক্যের গায়ে মাখাইতে চাই—তাহার বক্ষঃস্থল রক্তবর্ণ হইয়া যাইবে—সে রক্তের চিহ্ন কিছুতেই মুছিবে না! এই দেখ—চাহিয়া দেখ!" বলিয়া উত্তরীয় মোচন করিলেন, তাঁহার দেহ রক্তে লিপ্ত, তাঁহার বক্ষদেশে স্থানে স্থানে রক্ত জমিয়া আছে।

নক্ষত্ররায় শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার হাত পা কাঁপিতে লাগিল।

রঘুপতি বজ্রমুষ্টিতে নক্ষত্ররায়ের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—"সে কে? কে গোবিন্দমাণিক্যের প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়? কে চলিয়া গেলে গোবিন্দমাণিক্যের চক্ষে পৃথিবী শ্মশান হইয়া যাইবে, তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য চলিয়া যাইবে? সকালে শয্যা হইতে উঠিয়াই কাহার মুখ তাঁহার মনে পড়ে, কাহার স্মৃতি সঙ্গে করিয়া তিনি রাত্রে শয়ন করিতে যান, তাঁহার হৃদয়ের নীড় সমস্তটা পরিপূর্ণ করিয়া কে বিরাজ করিতেছে! সে কে? সে কি তুমি?" বলিয়া, ব্যাঘ্র লম্ফ দিবার পূর্ব্বে কম্পিত হরিণ-শিশুর দিকে যেমন একদৃষ্টিতে চায়, রঘুপতি তেমনি নক্ষত্রের দিকে চাহিলেন।

নক্ষত্ররায় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—"না, আমি না!" কিন্তু কিছুতেই রঘুপতির মুষ্টি ছাড়াইতে পারিলেন না।

রঘুপতি বলিলেন—"তবে, বল সে কে?"

নক্ষত্ররায় বলিয়া ফেলিলেন—"সে ধ্রুব।"

রঘুপতি বলিলেন—"ধ্রুব কে?"

নক্ষত্ররায়—"সে একটি শিশু—"

রঘুপতি বলিলেন—"আমি জানি, তাহাকে জানি। রাজার নিজের সন্তান নাই, তাহাকেই সন্তানের মত পালন করিতেছেন। নিজের সন্তানকে লোকে কেমন ভালবাসে জানি না, কিন্তু পালিত সন্তানকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসে, তাহা জানি। আপনার সমুদয় সম্পদের চেয়ে তাহার সুখ রাজার বেশী মনে হয়। আপনার মাথায় মুকুটের চেয়ে তাহার মাথায় মুকুট দেখিলে রাজার বেশী আনন্দ হয়।"

নক্ষত্ররায় আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"ঠিক কথা।"

রঘুপতি কহিলেন—"ঠিক কথা নয় ত কি? রাজা তাহাকে কতখানি ভালবাসেন তাহা কি আমি জানি না? আমি কি বুঝিতে পারি না? আমিও তাহাকেই চাই।"

নক্ষত্ররায় হাঁ করিয়া রঘুপতির দিকে চাহিয়া রহিলেন। আপন মনে বলিলেন "তাহাকেই চাই।"

রঘুপতি কহিলেন—"তাহাকে আনিতেই হইবে—আজই আনিতে হইবে—আজ রাত্রেই চাই।" নক্ষত্ররায় প্রতিধ্বনির মত কহিলেন "আজ রাত্রেই চাই।"

নক্ষত্ররায়ের মুখের দিকে কিছু ক্ষণ চাহিয়া গলার স্বর নামাইয়া রঘুপতি বলিলেন—"এই শিশুই তোমার শত্রু, তাহা জান? তুমি রাজবংশে জন্মিয়াছ—কোথাকার এক অজ্ঞাতকুলশীল শিশু তোমার মাথা হইতে মুকুট কাড়িয়া লইতে আসিয়াছে তাহা কি জান? যে সিংহাসন তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, সেই সিংহাসনে তাহার জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা কি দুটো চক্ষু থাকিতে দেখিতে পাইতেছ না?"

নক্ষত্ররায়ের কাছে এ সকল কথা নূতন নহে। তিনিও পূর্ব্বে এইরূপ ভাবিয়াছিলেন। সগর্ব্বে বলিলেন "তা' কি আর বলিতে হইবে

ঠাকুর? আমি কি আর এইটে দেখিতে পাই না!"

রঘুপতি কহিলেন—"তবে আর কি! তবে তাহাকে আনিয়া দেও। তোমার সিংহাসনের বাধা দূর করি! এই ক'টা প্রহর কোন মতে কাটিবে, তার পরে—তুমি কখন আনিবে?"

নক্ষত্ররায়—"আজ সন্ধ্যাবেলায়—অন্ধকার হইলে?"

পৈতা স্পর্শ করিয়া রঘুপতি বলিলেন—"যদি না আনিতে পার ত ব্রাহ্মণের অভিশাপ লাগিবে। তা হইলে, যে মুখে তুমি প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করিয়া পালন না কর, ত্রিরাত্রি না পোহাইতে সেই মুখের মাংস শকুনি ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইবে!"

শুনিয়া নক্ষত্ররায় চমকিয়া মুখে হাত বুলাইলেন—কোমল মাংসের উপরে শকুনির চঞ্চুপাত কল্পনা তাঁহার নিতান্ত দুঃসহ বোধ হইল। রঘুপতিকে প্রণাম করিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বিদায় হইলেন। সে ঘর হইতে আলোক বাতাস ও জনকোলাহলের মধ্যে গিয়া নক্ষত্ররায় পুনর্জীবন লাভ করিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় নক্ষত্ররায়কে দেখিয়া ধ্রুব "কাকা" বলিয়া ছুটিয়া আসিল, ছোট ছোট হাতে তাঁহার গলা জড়াইয়া তাঁহার কপোলে কপোল দিয়া মুখের কাছে মুখ রাখিল। চুপি চুপি বলিল "কাকা।"

নক্ষত্র কহিলেন—"ছি, ও কথা বোলো না, আমি তোমার কাকা না।"

ধ্রুব তাঁহাকে এতকাল বরাবর কাকা বলিয়া আসিতেছিল, আজ সহসা বারণ শুনিয়া সে ভারি আশ্চর্য্য হইয়া গেল। গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল—তার পরে নক্ষত্রের মুখের দিকে বড় বড় চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কে?"

নক্ষত্ররায় কহিলেন "আমি তোমার কাকা নই।"

শুনিয়া সহসা ধ্রুবের অত্যন্ত হাসি পাইল—এত বড় অসম্ভব কথা সে ইতিপূর্ব্বে আর কখনই শুনে নাই—সে হাসিয়া বলিল "তুমি কাকা!" নক্ষত্র যত নিষেধ করিতে লাগিলেন, সে ততই বলিতে লাগিল "তুমি কাকা।" তাহার হাসিও তত উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। সে নক্ষত্ররায়কে কাকা বলিয়া ক্ষেপাইতে লাগিল। নক্ষত্র বলিলেন "ধ্রুব তোমার দিদিকে দেখিতে যাইবে?"

ধ্রুব তাড়াতাড়ি নক্ষত্রের গলা ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল "দিদি কোথায়?"

নক্ষত্র বলিলেন "মায়ের কাছে।"

ধ্রুব কহিল—"মা কোথায়?"

নক্ষত্র—"মা আছেন এক জায়গায়। আমি সেখানে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি।"

ধ্রুব হাততালি দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কখন্ নিয়ে যাবে কাকা?"

নক্ষত্র—"এখনি।"

ধ্রুব আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিয়া সজোরে নক্ষত্রের গলা জড়াইয়া ধরিল। নক্ষত্র তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া চাদরে আচ্ছাদন করিয়া গুপ্ত দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

আজ রাত্রেও পথে লোক বাহির হওয়া নিষেধ। এই জন্য পথে প্রহরী নাই, পথিক নাই। আকাশে পূর্ণচন্দ্র।

মন্দিরে গিয়া নক্ষত্ররায় ধ্রুবকে রঘুপতির হাতে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইলেন। রঘুপতিকে দেখিয়া ধ্রুব সবলে নক্ষত্ররায়কে জড়া-

ইয়া ধরিল, কোন মতে ছাড়িতে চাহিল না। রঘুপতি তাহাকে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইলেন। ধ্রুব "কাকা" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নক্ষত্র রায়ের চখে জল আসিল—কিন্তু রঘুপতির কাছে এই হৃদয়ের দুর্ব্বলতা দেখাইতে তাঁহার নিতান্ত লজ্জা করিতে লাগিল। তিনি ভাণ করিলেন যেন তিনি পাষাণে গঠিত। তখন ধ্রুব কাঁদিয়া কাঁদিয়া "দিদি" "দিদি" বলিয়া ডাকিতে লাগিল, দিদি আসিল না। রঘুপতি বজ্রস্বরে এক ধমক দিয়া উঠিলেন। ভয়ে ধ্রুবের কান্না থামিয়া গেল। কেবল তাহার কান্না ফাটিয়া ফাটিয়া বাহির হইতে লাগিল। চতুর্দ্দশ দেবমূর্ত্তি চাহিয়া রহিল।

গোবিন্দমাণিক্য নিশীথে স্বপ্নে ক্রন্দন শুনিয়া জাগিয়া উঠিলেন। সহসা শুনিতে পাইলেন, তাঁহার বাতায়নের নীচে হইতে কে কাতর স্বরে ডাকিতেছে "মহারাজ—মহারাজ!"

রাজা সত্বর উঠিয়া গিয়া চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইলেন—ধ্রুবের পিতৃব্য কেদারেশ্বর। জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইয়াছে!"

কেদারেশ্বর কহিলেন—"মহারাজ, আমার ধ্রুব কোথায়?

রাজা কহিলেন—"কেন, তাহার শয্যাতে নাই!"

"না।"

কেদারেশ্বর বলিতে লাগিলেন—"অপরাহ্ণ হইতে ধ্রুবকে না দেখিতে পাওয়ায় জিজ্ঞাসা করাতে যুবরাজ নক্ষত্ররায়ের ভৃত্য কহিল ধ্রুব অন্তঃপুরে যুবরাজের কাছে আছে- শুনিয়া আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। অনেক রাত হইতে দেখিয়া আমার আশঙ্কা জন্মিল—অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, যুবরাজ নক্ষত্ররায় প্রাসাদে নাই। আমি মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনার জন্ম অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু প্রহরীরা কিছুতেই আমার কথা গ্রাহ্য করিল না—এই জন্ম বাতায়নের নীচে হইতে মহারাজকে ডাকিয়াছি, আপনার নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছি, আমার এই অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।"

রাজার মনে একটা ভাব বিদ্যুতের মত চমকিয়া উঠিল। তিনি চারিজন প্রহরীকে ডাকিলেন, কহিলেন "সশস্ত্রে আমার অনুসরণ কর।"

একজন কহিল "মহারাজ, আজ রাত্রে পথে বাহির হওয়া নিষেধ।"

রাজা কহিলেন "আমি আদেশ করিতেছি!"

কেদারেশ্বর সঙ্গে যাইতে উদ্যত হইলেন, রাজা তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে কহিলেন। বিজন পথে চন্দ্রালোকে রাজা মন্দিরাভিমুখে চলিলেন।

মন্দিরের দ্বার যখন সহসা খুলিয়া গেল—দেখা গেল খড়্গ সম্মুখে করিয়া নক্ষত্র এবং রঘুপতি মদ্যপান করিতেছেন। আলোক অধিক নাই—একটি দীপ জ্বলিতেছে। ধ্রুব কোথায়? ধ্রুব কালী প্রতিমার পায়ের কাছে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—তাহার কপোলের অশ্রু রেখা শুকাইয়া গেছে—ঠোঁট দুটি একটু খুলিয়া গেছে—মুখে ভয় নাই, ভাবনা নাই—এ যেন পাষাণ শয্যা নয়, যেন সে দিদির কোলের উপরে শুইয়া আছে। দিদি যেন চুমো খাইয়া তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিয়াছে।

মদ খাইয়া নক্ষত্রের প্রাণ খুলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু রঘুপতি স্থির হইয়া বসিয়া পূজার লগ্নের জন্ম অপেক্ষা করিতেছিলেন—নক্ষত্রের প্রলাপে কিছুমাত্র কাণ দিতে ছিলেন না। নক্ষত্র বলিতেছিলেন—"ঠাকুর, তোমার মনে

মনে ভয় হচ্চে। তুমি মনে করচ আমিও ভয় করচি! কিন্তু ভয় নেই ঠাকুর! ভয় কিসের! ভয় কা'কে! আমি তোমাকে রক্ষা করব। তুমি কি মনে কর আমি রাজাকে ভয় করি! আমি সাসুজাকে ভয় করিনে, আমি সাজাহানকে ভয় করিনে! ঠাকুর তুমি বল্লে না কেন, আমি রাজাকে ধরে আনতুম্, দেবীকে সন্তুষ্ট করে দেওয়া যেত! ওইটুকু ছেলের কতটুকুই বা রক্ত!"

এমন সময়ে সহসা মন্দিরের ভিত্তির উপরে ছায়া পড়িল। নক্ষত্ররায় পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন রাজা। চকিতের মধ্যে নেশা সম্পূর্ণ ছুটিয়া গেল। নিজের ছায়ার চেয়ে নিজে মলিন হইয়া গেলেন। দ্রুতবেগে নিদ্রিত ধ্রুবকে কোলে তুলিয়া লইয়া গোবিন্দমাণিক্য প্রহরীদিগকে কহিলেন "ইহাদের দুজনকে বন্দী কর।"

চারিজন প্রহরী রঘুপতি ও নক্ষত্ররায়ের দুই হাত ধরিল। ধ্রুবকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বিজন পথে জ্যোৎস্নালোকে রাজা প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন। রঘুপতি ও নক্ষত্ররায় সে রাত্রে কারাগারে রহিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

—•—

তাহার পরদিন বিচার। বিচারশালা লোকে লোকারণ্য। বিচারাসনে রাজা বসিয়াছেন, সভাসদেরা চারিদিকে বসিয়াছেন। সম্মুখে দুইজন বন্দী। কাহারও হাতে শৃঙ্খল নাই। কেবল সশস্ত্র প্রহরী তাঁহাদিগকে ঘেরিয়া আছে। রঘুপতি পাষাণ মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া আছেন—নক্ষত্ররায়ের মাথা নত।

রঘুপতির দোষ সপ্রমাণ করিয়া রাজা তাঁহাকে বলিলেন—"তোমার কি বলিবার আছে!"

রঘুপতি কহিলেন—"আমাকে বিচার করিবার অধিকার আপনার নাই।"

রাজা কহিলেন—"তবে তোমার বিচার কে করিবে?"

রঘুপতি—"আমি ব্রাহ্মণ, আমি দেবসেবক, দেবতা আমার বিচার করিবেন।"

রাজা—"ঈশ্বর ত সকলেরই বিচার করিয়া থাকেন। আমরা তাঁহার রাজদণ্ড। আমাদের দ্বারাই তিনি অপরাধীকে শাস্তিবিধান করিয়া থাকেন। পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার দিবার জন্য জগতে তাঁহার সহস্র অনুচর আছে। আমরাও তাহার একজন। সে কথা লইয়া আমি তোমার সহিত বিচার করিতে চাই না—আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি—কাল সন্ধ্যাকালে বলির মানসে তুমি একটি শিশুকে হরণ করিয়াছিলে কি না?"

রঘুপতি কহিলেন—"হাঁ।"

রাজা কহিলেন—"তুমি অপরাধ স্বীকার করিতেছ?"

রঘুপতি—"অপরাধ! অপরাধ কিসের! আমি মায়ের আদেশ পালন করিতেছিলাম, মায়ের কার্য্য করিতেছিলাম, তুমি তাহার ব্যাঘাত করিয়াছ—অপরাধ তুমি করিয়াছ—আমি মায়ের সমক্ষে তোমাকে অপরাধী করিতেছি, তিনি তোমার বিচার করিবেন।"

"রাজা তাঁহার কথার কোন উত্তর না দিয়া কহিলেন—"আমার রাজ্যের নিয়ম এই—যে ব্যক্তি দেবতার উদ্দেশে জীব বলি দিবে বা দিতে উদ্যত হইবে, তাহার নির্ব্বাসন দণ্ড। সেই দণ্ড আমি তোমার প্রতি প্রয়োগ করিলাম। আট বৎসরের জন্য তুমি নির্ব্বাসিত

হইলে। প্রহরীরা তোমাকে আমার রাজ্যের বাহিরে রাখিয়া আসিবে।"

প্রহরীরা রঘুপতিকে সভাগৃহ হইতে লইয়া যাইতে উদ্যত হইল।—রঘুপতি তাহাদিগকে কহিলেন "স্থির হও।" রাজার দিকে চাহিয়া কহিলেন—"তোমার বিচার শেষ হইল, এখন আমি তোমার বিচার করিব, তুমি অবধান কর। চতুর্দ্দশ দেবতা পূজার দুই রাত্রে যে কেহ পথে বাহির হইবে, পুরোহিতের কাছে সে দণ্ডিত হইবে, এই আমাদের মন্দিরের নিয়ম। সেই প্রাচীন নিয়ম অনুসারে তুমি আমার নিকটে দণ্ডার্হ।"

রাজা কহিলেন—"আমি তোমার দণ্ডগ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।"

সভাসদেরা কহিলেন—"এ অপরাধের কেবল অর্থ দণ্ড হইতে পারে।"

পুরোহিত কহিলেন—"আমি তোমার দুই লক্ষ মুদ্রা দণ্ড করিতেছি। এখনি দিতে হইবে।"

রাজা কিয়ৎক্ষণ ভাবিলেন—পরে বলিলেন "তথাস্তু।" কোষাধ্যক্ষকে ডাকিয়া দুই লক্ষ মুদ্রা আদেশ করিয়া দিলেন। প্রহরীরা রঘুপতিকে বাহিরে লইয়া গেল।

রঘুপতি চলিয়া গেলে নক্ষত্ররায়ের দিকে চাহিয়া রাজা দৃঢ়স্বরে কহিলেন "নক্ষত্ররায়, তোমার অপরাধ তুমি স্বীকার কর কি না?"

নক্ষত্ররায় বলিলেন "মহারাজ আমি অপরাধী, আমাকে মার্জ্জনা করুন!" বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া রাজার পা জড়াইয়া ধরিলেন।

মহারাজ বিচলিত হইলেন—কিছুক্ষণ বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। অবশেষে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন—"নক্ষত্ররায়, ওঠ, আমার কথা শোন। আমি মার্জ্জনা করিবার কে? আমি আপনার শাসনে আপনি বদ্ধ। বন্দীও যেমন বদ্ধ বিচারকও তেমনি বদ্ধ। একই অপরাধে আমি একজনকে দণ্ড দিব, একজনকে মার্জ্জনা করিব, এ কি করিয়া হয়? তুমিই বিচার কর!"

সভাসদেরা বলিয়া উঠিল—"মহারাজ, নক্ষত্ররায় আপনার ভাই, আপনার ভাইকে মার্জ্জনা করুন।"

রাজা দৃঢ়স্বরে কহিলেন "তোমরা সকলে চুপ কর। যতক্ষণ আমি এই আসনে আছি, ততক্ষণ আমি কাহারও ভাই নহি, কাহারও বন্ধু নহি।"

সভাসদেরা চারিদিকে চুপ করিলেন। রাজা গম্ভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন—"তোমরা সকলেই শুনিয়াছ—আমার রাজ্যের নিয়ম এই যে—যে ব্যক্তি দেবতার উদ্দেশে জীব বলি দিবে, বা দিতে উদ্যত হইবে তাহার নির্ব্বাসন দণ্ড। কাল সন্ধ্যাকালে নক্ষত্ররায় পুরোহিতের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া বলির মানসে একটি শিশুকে হরণ করিয়াছিলেন। এই অপরাধ সপ্রমাণ হওয়াতে আমি তাঁহার আট বৎসর নির্ব্বাসন দণ্ড বিধান করিলাম।"

প্রহরীরা যখন নক্ষত্ররায়কে লইয়া যাইতে উদ্যত হইল, তখন রাজা আসন হইতে নামিয়া নক্ষত্ররায়কে আলিঙ্গন করিলেন, রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন "বৎস, কেবল তোমার দণ্ড হইল না, আমারও দণ্ড হইল। না জানি পূর্ব্বজন্মে কি অপরাধ করিয়াছিলাম! যতদিন তুমি বন্ধুদের কাছ হইতে দূরে থাকিবে দেবতা তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকুন, তোমার মঙ্গল করুন!"

সংবাদ দেখিতে দেখিতে রাষ্ট্র হইল। অন্তঃপুরে ক্রন্দন ধ্বনি উঠিল। রাজা নিভৃত কক্ষে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। যোড়-হাতে কহিতে লাগিলেন—"প্রভু, আমি যদি

কখনও অপরাধ করি, আমাকে মার্জ্জনা করিও না, আমাকে কিছুমাত্র দয়া করিও না। আমাকে আমার পাপের শাস্তি দাও। পাপ করিয়া শাস্তি বহন করা যায় কিন্তু মার্জ্জনা ভার বহন করা যায় না প্রভু।"

নক্ষত্ররায়ের প্রেম রাজার মনে দ্বিগুণ জাগিতে লাগিল। নক্ষত্ররায়ের ছেলেবেলা-কার মুখ তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। সে যে সকল খেলা করিয়াছে, কথা কহিয়াছে, কাজ করিয়াছে, তাহা একে একে তাঁহার মনে উঠিতে লাগিল। এক একটা দিন, এক একটা রাত্রি, তাহার সূর্য্যালোকের মধ্যে তাহার তারাখচিত আকাশের মধ্যে শিশু নক্ষত্ররায়কে লইয়া তাঁহার সম্মুখে উদয় হইল। রাজার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

—*—

নির্ব্বাসনাদ্যত রঘুপতিকে যখন প্রহরীরা জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর, কোন্ দিকে যাইবেন?" তখন রঘুপতি উত্তর করিলেন "পশ্চিম দিকে যাইব।'

নয় দিন পশ্চিম মুখে যাত্রার পর বন্দী ও প্রহরীরা ঢাকা সহরের কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিল। তখন প্রহরীরা রঘুপতিকে ছাড়িয়া দিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিল।

রঘুপতি মনে মনে বলিলেন "কলিতে ব্রহ্ম-পাপ ফলে না—দেখা যাক্ ব্রাহ্মণের বুদ্ধিতে কতটা হয়। দেখা যাক্, গোবিন্দমাণিক্যই বা কেমন রাজা, আর আমিই বা কেমন পুরোহিত ঠাকুর।"

ত্রিপুরার প্রান্তে মন্দিরের কোণে মোগল রাজ্যের সংবাদ বড় পৌঁছিত না। এই নিমিত্ত রঘুপতি ঢাকা সহরে গিয়া মোগলদিগের রীতি নীতি ও রাজ্যের অবস্থা জানিতে কৌতূহলী হইলেন।

তখন মোগল সম্রাট্ শাজাহানের রাজত্ব-কাল। তখন তাঁহার তৃতীয় পুত্র ঔরঙ্গজীব দাক্ষিণাত্যে বিজাপুর আক্রমণে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সুজা বাঙ্গালার অধিপতি ছিলেন—রাজমহলে তাঁহার রাজধানী। কনিষ্ঠপুত্র কুমার মুরাদ গুজরাটের শাসনকর্ত্তা। জ্যেষ্ঠ যুবরাজ দারা রাজধানী দিল্লীতেই বাস করিতেছেন। সম্রাটের বয়স ৬৭ বৎসর। তাঁহার শরীর অসুস্থ বলিয়া দারার উপরেই সাম্রাজ্যের ভার পড়িয়াছে।

রঘুপতি কিয়ৎকাল ঢাকায় বাস করিয়া উর্দ্দু ভাষা শিক্ষা করিলেন—ও অবশেষে রাজ-মহল অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রাজমহলে যখন পৌঁছিলেন তখন ভারত বর্ষে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। সংবাদ রাষ্ট্র হইয়াছে যে শাজাহান মৃত্যুশয্যায় শয়ান। এই সংবাদ পাইবামাত্র সুজা সৈন্য সহিত দিল্লী অভিমুখে ধাবমান হইয়াছেন। সম্রাটের চারিপুত্রই মুমূর্ষু শাজাহানের মাথার উপর হইতে মুকুটটা একেবারে ছোঁ মারিয়া উড়াইয়া লইবার উদ্যোগ করিতেছেন।

ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ অরাজক রাজমহল ত্যাগ করিয়া সুজার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। লোকজন, বাহক প্রভৃতিদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন। সঙ্গে যে দুই লক্ষ টাকা ছিল তাহা রাজমহলের নিকটবর্ত্তী এক বিজন প্রান্তরে পুঁতিয়া ফেলিলেন। তাহার উপরে এক চিহ্ন রাখিয়া গেলেন। অতি অল্প টাকাই সঙ্গে লইলেন। দগ্ধ কুটীর, পরিত্যক্ত গ্রাম, মর্দ্দিত শস্যক্ষেত্র লক্ষ্য করিয়া রঘুপতি অবিশ্রাম

অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রঘুপতি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসীর বেশ সত্ত্বেও আতিথ্য পাওয়া দুর্ঘট। কারণ পঙ্গপালের ন্যায় সৈন্যেরা যে পথ দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহার উভয় পার্শ্বে কেবল দুর্ভিক্ষ বিরাজ করিতেছে। সৈন্যেরা অশ্ব ও হস্তীপালের জন্য অপক্ব শস্য কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। কৃষকের মরাইয়ে একটি কণা অবশিষ্ট নাই। চারি দিক কেবল লুণ্ঠনাবশিষ্ট বিশৃঙ্খলা। অধিকাংশ লোক গ্রাম ছাড়িয়া পালাইয়াছে। দৈবাৎ যে দুয়েক জনকে দেখা যায় তাহাদের মুখে হাস্য নাই। তাহারা চকিত হরিণের ন্যায় সতর্ক, কাহাকেও তাহারা বিশ্বাস করে না, দয়া করে না। বিজন পথের পার্শ্বে গাছের তলায় লাঠিহাতে দুইচারি জনকে বসিয়া থাকিতে দেখা যায়—পথিক শিকারের জন্য তাহারা সমস্ত দিন অপেক্ষা করিয়া আছে। ধূমকেতুর পশ্চাদ্বর্ত্তী উল্কারাশির ন্যায় দস্যুরা সৈনিকদের অনুসরণ করিয়া লুণ্ঠনাবশেষ লুঠিয়া লইয়া যায়। এমন কি, মৃত দেহের উপর শৃগাল কুকুরের ন্যায় মাঝে মাঝে সৈন্যদল ও দস্যুদলে লড়াই বাধিয়া যায়। নিষ্ঠুরতা সৈন্যদের খেলা হইয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী নিরীহ পথিকের পেটে খপ্ করিয়া একটা তলোয়ারের খোঁচা বসাইয়া দেওয়া বা তাহার মুণ্ড হইতে পাগড়ি সমেত খানিকটা খুলি উড়াইয়া দেওয়া তাহারা সামান্য উপহাস মাত্র মনে করে। গ্রামের লোকেরা তাহাদের দেখিয়া ভয় পাইতেছে দেখিলে তাহাদের পরম কৌতুক বোধ হয়। লুণ্ঠনাবশেষে তাহারা গ্রামের লোকদের উৎপীড়ন করিয়া আনন্দ উপভোগ করে। দুই জন মান্য ব্রাহ্মণকে পিঠে পিঠে সংলগ্ন করিয়া টিকিতে টিকিতে বাঁধি। উভয়ের নাকে নস্য প্রয়োগ করে। দুই ঘোড়ার পিঠে এক জন মানুষকে চড়াইয়া ঘোড়া ছুটাকে চাবুক মারে, দুই ঘোড়া দুই বিপরীত দিকে ছুটিয়া যায়, মাঝখানে মানুষটা পড়িয়া গিয়া হাত পা ভাঙ্গে। এইরূপ প্রতিদিন নূতন নূতন খেলা তাহারা আবিষ্কার করে। অকারণে গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়া যায়। বলে যে বাদশাহের সম্মানার্থে বাজি পুড়াইতেছে। সৈন্যদের পথে এইরূপ অত্যাচারের শত শত চিহ্ন পড়িয়া আছে। এখানে রঘুপতি আতিথ্য পাইবেন কোথায়। কোন দিন অনাহারে কোন দিন স্বল্পাহারে কাটিতে লাগিল। রাত্রে অন্ধকারে এক ভগ্ন পরিত্যক্ত কুটীরে শ্রান্তদেহে শয়ন করিয়াছিলেন, সকালে উঠিয়া দেখেন এক ছিন্নশির মৃতদেহকে সমস্ত রাত্রি বালিশ করিয়া শুইয়াছিলেন। একদিন মধ্যাহ্নে রঘুপতি ক্ষুধিত হইয়া কোন কুটীরে গিয়া দেখিলেন একজন লোক তাহার ভাঙ্গা খোলা সিন্দুকের উপরে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া আছে, বোধ হয় তাহার লুণ্ঠিত ধনের জন্য শোক করিতেছিল, কাছে গিয়া ঠেলিতেই সে গড়াইয়া পড়িয়া গেল। মৃত দেহ মাত্র—তাহার জীবন অনেক কাল হইল চলিয়া গিয়াছে।

একদিন রঘুপতি এক কুটীরে শুইয়া আছেন।—রাত্রি অবসান হয় নাই। প্রহরখানেক বিলম্ব আছে। এমন সময়ে ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া গেল। শরতের চন্দ্রালোকের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি ছায়া ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িল। ফিস্ ফিস্ শব্দ শুনা গেল। রঘুপতি চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন। তিনি উঠিতেই কতকগুলি স্ত্রীকণ্ঠ সভয়ে বলিয়া উঠিল "ও মা গো!" একজন পুরুষ অগ্রসর হইয়া বলিল "কোন্ হ্যায় রে!"

রঘুপতি কহিলেন "আমি ব্রাহ্মণ, পথিক। তোমরা কে?"

"আমাদের এই ঘর। আমরা ঘর ছাড়িয়া পালাইয়াছিলাম। মোগলসৈন্য চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া তবে এখানে আসিয়াছি।"

রঘুপতি জিজ্ঞাসা করিলেন "মোগলসৈন্য কোন্ দিকে গিয়াছে।"

তাহারা কহিল "বিজয়গড়ের দিকে। এতক্ষণ বিজয়গড়ের বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।"

রঘুপতি আর অধিক কিছু না বলিয়া তৎক্ষণাৎ যাত্রা আরম্ভ করিয়া দিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিজয়গড়ের দীর্ঘ বন ঠগীদের আড্ডা। বনের মধ্যে দিয়া যে পথ গিয়াছে, সেই পথের দুই পার্শ্বে কত মনুষ্যকঙ্কাল নিহিত আছে, তাহাদের উপরে কেবল বনফুল ফুটিতেছে, আর কোন চিহ্ন নাই। বনের মধ্যে বট আছে, বাবলা আছে, নীম আছে, শত শত প্রকারের লতা ও গুল্ম আছে। স্থানে স্থানে ডোবা অথবা পুকুরের মত দেখা যায়। অবিশ্রাম পাতা পচিয়া পচিয়া তাহার জল একেবারে সবুজ হইয়া উঠিয়াছে। ছোট ছোট সুঁড়ি পথ এদিকে ওদিকে আঁকিয়া বাঁকিয়া সাপের মত অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। গাছের ডালে ডালে পালে পালে হনুমান। বটগাছের ডালের উপর হইতে শত শত শিকড় এবং হনুমানের লেজ ঝুলিতেছে। ভাঙা মন্দিরের প্রাঙ্গণে শিউলি ফুলের গাছ শাদা শাদা ফুলে এবং হনুমানের দন্তবিকাশে একেবারে আচ্ছন্ন। সন্ধ্যাবেলায় বড় বড় ঝাঁকড়া গাছের উপরে ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়া পাখীর চীৎকারে অন্ধকার বনের ঘোর অন্ধকার যেন দীর্ণ বিদীর্ণ হইতে থাকে। আজ এই বৃহৎ বনের মধ্যে প্রায় কুড়িহাজার সৈন্য প্রবেশ করিয়াছে। এই ডালে পালায় লতায় পাতায় তৃণে গুল্মে জড়িত বৃহৎ গোলাকার অরণ্য, কুড়ি হাজার খর-নখ-চঞ্চু সৈনিক বাজপক্ষীদের একটিমাত্র নীড় বলিয়া বোধ হইতেছে। সৈন্যসমাগম দেখিয়া অসংখ্য কাক কা কা করিয়া দল বাঁধিয়া আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছে—সাহস করিয়া ডালের উপর আসিয়া বসিতেছে না। কোন প্রকার গোলমাল করিতে সেনাপতির নিষেধ আছে। সৈন্যেরা সমস্ত দিন চলিয়া সন্ধ্যাবেলায় বনে আসিয়া শুষ্ক কাঠ কুড়াইয়া রন্ধন করিতেছে ও পরস্পর চুপি চুপি কথা কহিতেছে—তাহাদের সেই গুন্ গুন্ শব্দে সমস্ত অরণ্য গম্‌গম্ করিতেছে, সন্ধ্যাবেলায় ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক শোনা যাইতেছে না। গাছের গুঁড়িতে বাঁধা অশ্বেরা মাঝে মাঝে খুর দিয়া মাটি খুঁড়িতেছে ও হ্রেষাধ্বনি করিয়া উঠিতেছে—সমস্ত বনের তাহাতে চমক লাগিতেছে। ভাঙা মন্দিরের কাছে ফাঁকা জায়গায় শা সুজার শিবির পড়িয়াছে। আর সকলের আজ বৃক্ষতলেই অবস্থান।

সমস্ত দিন অবিশ্রাম চলিয়া রঘুপতি যখন বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন রাত্রি হইয়াছে। অধিকাংশ সৈন্য নিস্তব্ধে ঘুমাইতেছে, অল্প মাত্র সৈন্য নীরবে পাহারা দিতেছে। মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় আগুন জ্বলিতেছে—অন্ধকার যেন রক্তবর্ণ নিদ্রাক্লান্ত রাঙা চক্ষু মেলিয়াছে। রঘুপতি বনের মধ্যে পা দিয়াই কুড়িহাজার সৈনিকের নিশ্বাস প্রশ্বাস যেন শুনিতে পাইলেন। বনের সহস্র গাছ শাখা বিস্তার করিয়া পাহারা

দিতেছে। কালপেচক তাহার সদ্যোজাত শাবকের উপরে যেমন বক্ষ প্রসারিত করিয়া বসিয়া থাকে, তেমনি অরণ্যের বাহিরকার বিরাট রাত্রি অরণ্যের ভিতরকার গাঢ়তর রাত্রির উপর চাপিয়া ডানা ঝাঁপিয়া নীরবে বসিয়া আছে—অরণ্যের ভিতরে এক রাত্রি মুখ গুঁজিয়া ঘুমাইয়া আছে, অরণ্যের বাহিরে একরাত্রি মাথা তুলিয়া জাগিয়া আছে। রঘুপতি সে রাত্রে বনপ্রান্তে শুইয়া রহিলেন।

সকালে গোটাছুইচার খোঁচা খাইয়া ধড়্‌ফড়্ করিয়া জাগিয়া উঠিলেন। দেখিলেন জনকত পাগড়ি-বাঁধা দাড়িপরিপূর্ণ তুরাণী সৈন্য বিদেশী ভাষায় তাঁহাকে কি বলিতেছে শুনিয়া তিনি নিশ্চয় অনুমান করিয়া লইলেন গালি। তিনিও বঙ্গভাষায় তাহাদের শ্যালক সম্বন্ধ প্রচার করিয়া দিলেন। তাহারা তাঁহাকে টানাটানি করিতে লাগিল। রঘুপতি বলিলেন "ঠাট্টা পেয়েছিস্?" কিন্তু তাহাদের আচরণে ঠাট্টার লক্ষণ কিছুমাত্র প্রকাশ পাইল না। বনের মধ্য দিয়া তাহারা তাঁহাকে অরণ্যান্তরে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। তিনি সবিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"টানাটানি কর কেন? আমি আপনিই যাচ্ছি। এত পথ আমি এলুম কি করতে?" সৈন্যেরা হাসিতে লাগিল ও তাঁহার বাঙ্গালা কথা নকল করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিস্তর সৈন্য জড় হইল, তাঁহাকে লইয়া ভারি গোল পড়িয়া গেল। উৎপীড়নেরও সীমা রহিল না। একজন সৈন্য একটা কাঠবিড়ালীর লেজ ধরিয়া তাঁহার মুণ্ডিত মাথায় ছাড়িয়া দিল—দেখিবার ইচ্ছা ফল মনে করিয়া খায় কি না। একজন সৈন্য তাঁহার নাকের সম্মুখে একটা মোটা বেত বাঁকাইয়া ধরিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল, সেটা ছাড়িয়া দিলে রঘুপতির মুখের উপর হইতে নাকের সমুন্নত মহিমা একেবারে সমূলে লোপ হইবার সম্ভাবনা। সৈন্যদের হাস্যে কানন ধ্বনিত হইতে লাগিল। মধ্যাহ্নে আজ যুদ্ধ করিতে হইবে, সকালে এই রঘুপতিকে লইয়া তাহাদের ভারি খেলা পড়িয়া গেল। খেলার সাধ মিটিলে পর ব্রাহ্মণকে সুজার শিবিরে লইয়া গেল।

সুজাকে দেখিয়া রঘুপতি সেলাম করিলেন না। তিনি দেবতা ও স্বর্ণ ছাড়া আর কাহারও কাছে কখনও মাথা নত করেন নাই। মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন—হাত তুলিয়া বলিলেন "শাহেন শার জয় হউক!" সুজা মদের পেয়ালা লইয়া সভাসদ সমেত বসিয়াছিলেন; আলস্য-বিজড়িত স্বরে নিতান্ত উপেক্ষা-ভরে কহিলেন—"কি, ব্যাপার কি?"

সৈন্যেরা কহিল "জনাব, শত্রুপক্ষের চর গোপনে আমাদের বলাবল জানিতে আসিয়াছিল; আমরা তাহাকে প্রভুর কাছে ধরিয়া আনিয়াছি।"

সুজা কহিলেন "আচ্ছা আচ্ছা; বেচারা দেখিতে আসিয়াছে, উহাকে ভাল করিয়া সমস্ত দেখাইয়া ছাড়িয়া দাও। দেশে গিয়া গল্প করিবে।"

রঘুপতি বদ্ হিন্দুস্থানীতে কহিলেন "সরকারের অধীনে আমি কর্ম্ম প্রার্থনা করি।"

সুজা আলস্য ভরে হাত নাড়িয়া তাঁহাকে দ্রুত চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। বলিলেন "গরম।" যে বাতাস করিতেছিল, সে দ্বিগুণ জোরে বাতাস করিতে লাগিল।

দারা তাঁহার পুত্র সুলেমানকে রাজা জয়সিংহের অধীনে সুজার আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পাঠাইয়াছেন। তাঁহাদের বৃহৎ সৈন্যদল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, সংবাদ আসিয়াছে।

তাই বিজয়গড়ের কেল্লা অধিকার করিয়া সেইখানে সৈন্য সমবেত করিবার জন্য সুজা ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সুজার হাতে কেল্লা এবং সরকারী খাজানা সমর্পণ করিবার প্রস্তাব লইয়া বিজয়গড়ের অধিপতি বিক্রমসিংহের নিকট দূত গিয়াছিল। বিক্রমসিংহ সেই দূতমুখে বলিয়া পাঠাইলেন—"আমি কেবল দিল্লীশ্বর শাজাহান এবং জগদীশ্বর ভবানীপতিকে জানি, সুজা কে? আমি তাহাকে জানি না।"

সুজা জড়িতস্বরে কহিলেন "ভারি বেআদব! নাহক্ আবার লড়াই করিতে হইবে! ভারি হাঙ্গাম!"

রঘুপতি এই সমস্ত শুনিতে পাইলেন। সৈন্যদের হাত এড়াইবামাত্র বিজয়গড়ের দিকে চলিয়া গেলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

—*—

পাহাড়ের উপরে বিজয়গড়। বিজয়গড়ের অরণ্য গড়ের কাছাকাছি গিয়া শেষ হইয়াছে। অরণ্য হইতে বাহির হইয়া রঘুপতি সহসা দেখিলেন দীর্ঘ পাষাণ দুর্গ যেন নীল আকাশে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অরণ্য যেমন তাহার সহস্র তরুজালে প্রচ্ছন্ন, দুর্গ তেমনি আপনার পাষাণের মধ্যে আপনি রুদ্ধ। অরণ্য সাবধানী, দুর্গ সতর্ক। অরণ্য ব্যাঘ্রের মত গুঁড়ি মারিয়া লেজ পাকাইয়া বসিয়া আছে, দুর্গ সিংহের মত কেশর ফুলাইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। অরণ্য মাটিতে কাণ পাতিয়া শুনিতেছে, দুর্গ আকাশে মাথা তুলিয়া দেখিতেছে।

রঘুপতি অরণ্য হইতে বাহির হইবামাত্র দুর্গপ্রাকারের উপরে সৈন্যেরা সচকিত হইয়া উঠিল। শৃঙ্গ বাজিয়া উঠিল। দুর্গ যেন সহসা সিংহনাদ করিয়া দাঁত নখ মেলিয়া ভ্রূকুটি করিয়া দাঁড়াইল। রঘুপতি পৈতা দেখাইয়া হাত তুলিয়া ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন। সৈন্যেরা সতর্ক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রঘুপতি যখন দুর্গ-প্রাচীরের কাছাকাছি গেলেন, তখন সৈন্যেরা জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল "তুমি কে?" রঘুপতি বলিলেন "আমি ব্রাহ্মণ, অতিথি।"

দুর্গাধিপতি বিক্রমসিংহ পরম ধর্মনিষ্ঠ। দেবতা ব্রাহ্মণ ও অতিথিসেবায় নিযুক্ত। পৈতা থাকিলে দুর্গপ্রবেশের জন্য আর কোন পরিচয়ের আবশ্যক ছিল না। কিন্তু আজ যুদ্ধের দিনে কি করা উচিত সৈন্যেরা ভাবিয়া পাইতেছিল না। রঘুপতি কহিলেন "তোমরা আশ্রয় না দিলে মুসলমানেদের হাতে আমাকে মরিতে হইবে।" বিক্রমসিংহের কাণে যখন এ কথা গেল তখন তিনি ব্রাহ্মণকে দুর্গের মধ্যে আশ্রয় দিতে অনুমতি করিলেন। প্রাচীরের উপর হইতে একটা মই নামান' হইল, রঘুপতি দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দুর্গের মধ্যে যুদ্ধের প্রতীক্ষায় সকলেই নিতান্ত ব্যস্ত। বৃদ্ধ খুড়া সাহেব ব্রাহ্মণ অভ্যর্থনার ভার স্বয়ং লইলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম খড়্গ সিং কিন্তু তাঁহাকে কেহ বলে খুড়াসাহেব, কেহ বলে সুবাদার সাহেব—কেন যে বলে তাহার কোন কারণ পাওয়া যায় না। পৃথিবীতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র নাই, ভাই নাই, তাঁহার খুড়া হইবার কোন অধিকার বা সুদূর সম্ভাবনা নাই এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র যতগুলি তাঁহার সুবা তাহার অপেক্ষা অধিক নহে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেহ তাঁহার উপাধি সম্বন্ধে কোন প্রকার আপত্তি অথবা সন্দেহ উত্থাপিত করে নাই। যাহারা বিনা ভাইপোয় খুড়া,

বিনা সুবায় সুবাদার, সংসারের অনিত্যতা ও লক্ষ্মীর চপলতা নিবন্ধন তাহাদের পদচ্যুতির কোন আশঙ্কা নাই।

খুড়াসাহেব আসিয়া কহিলেন "বাহবা, এইত ব্রাহ্মণ বটে!" বলিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। রঘুপতির একপ্রকার তেজীয়ান দীপ্তশিখার মত আকৃতি ছিল, যাহা দেখিয়া সহসা পতঙ্গেরা মুগ্ধ হইয়া যাইত।

খুড়াসাহেব জগতের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থায় বিষণ্ণ হইয়া কহিলেন "ঠাকুর, তেমন ব্রাহ্মণ আজ কাল ক'টা মেলে!"

রঘুপতি কহিলেন "অতি অল্প।"

খুড়াসাহেব কহিলেন "আগে ব্রাহ্মণের মুখে অগ্নি ছিল এখন সমস্ত অগ্নি জঠরে আশ্রয় লইয়াছে।"

রঘুপতি কহিলেন "তাও কি আগেকার মত আছে!"

খুড়াসাহেব মাথা নাড়িয়া কহিলেন "ঠিক কথা! অগস্ত্যমুনি যে আন্দাজ পান করিয়াছিলেন সে আন্দাজ যদি আহার করিতেন তাহা হইলে একবার বুঝিয়া দেখুন।"

রঘুপতি কহিলেন "আরও দৃষ্টান্ত আছে।"

খুড়াসাহেব "হাঁ আছে বৈ কি! জহ্নুমুনির পিপাসার কথা শুনা যায় তাঁহার ক্ষুধার কথা কোথাও লেখে নাই কিন্তু একটা অনুমান করা যাইতে পারে। হর্ত্তকী খাইলেই যে কম খাওয়া হয় তাহা নহে, ক'টা করিয়া হর্ত্তকী তাঁহারা রোজ খাইতেন তাহার একটা হিসাব থাকিলে তবু বুঝিতে পারিতাম।"

রঘুপতি ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া গম্ভীর ভাবে কহিলেন "না সাহেব, আহারের প্রতি তাঁহাদের যথেষ্ট মনোযোগ ছিল না!"

খুড়াসাহেব জিভ কাটিয়া কহিলেন "রাম রাম, বলেন কি ঠাকুর! তাঁহাদের জঠরানল যে অত্যন্ত প্রবল ছিল তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে। দেখুন্ না কেন, কালক্রমে আর সকল অগ্নিই নিবিয়া গেল, হোমের অগ্নিও আর জ্বলে না, কিন্তু"—

রঘুপতি কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন, "হোমের অগ্নি আর জ্বলিবে কি করিয়া? দেশে ঘি রহিল কই? পাষণ্ডেরা সমস্ত গরু পার করিয়া দিতেছে, এখন হব্য পাওয়া যায় কোথায়? হোমাগ্নি না জ্বলিলে ব্রহ্মতেজ আর কত দিন টেকে!" বলিয়া রঘুপতি নিজের প্রচ্ছন্ন দাহিকাশক্তি অত্যন্ত অনুভব করিতে লাগিলেন।

খুড়াসাহেব কহিলেন "ঠিক বলিয়াছেন ঠাকুর, গরুগুলো মরিয়া আজকাল মনুষ্য-লোকে জন্মগ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে কিন্তু তাহাদের কাছ হইতে ঘি পাইবার প্রত্যাশা করা যায় না। মগজের সম্পূর্ণ অভাব! ঠাকুরের কোথা হইতে আসা হইতেছে!"

রঘুপতি কহিলেন "ত্রিপুরার রাজবাটি হইতে।"

বিজয়গড়ের বহিস্থিত ভারতবর্ষের ভূগোল অথবা ইতিহাস সম্বন্ধে খুড়াসাহেবের অতি যৎ-সামান্য জানা ছিল। বিজয়গড় ছাড়া ভারত-বর্ষে জানিবার যোগ্য যে আর কিছু আছে তাহাও তাঁহার বিশ্বাস নহে। সম্পূর্ণ অনু-মানের উপর নির্ভর করিয়া বলিলেন "আহা, ত্রিপুরার রাজা মস্ত রাজা।"

রঘুপতি তাঁহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি-লেন।

খুড়াসাহেব "ঠাকুরের কি করা হয়?"

রঘুপতি "আমি ত্রিপুরার রাজপুরোহিত।"

খুড়াসাহেব চোখ বুজিয়া মাথা নাড়িয়া কহিলেন "আহা!" রঘুপতির উপরে তাঁহার

চক্তি অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। "কি করিতে আসা হইয়াছে!"

রঘুপতি কহিলেন "তীর্থদর্শন করিতে!"

"ধুম্" করিয়া আওয়াজ হইল। শত্রুপক্ষ দুর্গ আক্রমণ করিয়াছে। খুড়াসা'হেব হাসিয়া চোখ টিপিয়া কহিলেন "ও কিছু নয়, ঢেলা ছুঁড়িতেছে। বিজয়গড়ের উপরে খুড়াসাহেবের বিশ্বাস যত দৃঢ়, বিজয়গড়ের পাষাণ তত দৃঢ় নহে। বিদেশী পথিক দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিলেই খুড়াসাহেব তাহাকে সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া বসেন এবং বিজয়গড়ের মাহাত্ম্য তাহার মনে বদ্ধমূল করিয়া দেন। ত্রিপুরার রাজবাটি হইতে রঘুপতি আসিয়াছেন; এমন অতিথি সচরাচর মেলে না, খুড়াসাহেব অত্যন্ত উল্লাসে আছেন। অতিথির সঙ্গে বিজয়গড়ের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, ব্রহ্মার অণ্ড এবং বিজয়গড়ের দুর্গ যে প্রায় একই সময়ে উৎপন্ন হইয়াছে এবং ঠিক মনুর পর হইতেই মহারাজ বিক্রমসিংহের পূর্ব্বপুরুষেরা যে এই দুর্গ ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন সে বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না।" এই দুর্গের প্রতি শিবের কি বর আছে এবং এই দুর্গে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন যে কিরূপে বন্দী হইয়াছিলেন তাহাও রঘুপতির অগোচর রহিল না।

সন্ধ্যার সময় সংবাদ পাওয়া গেল শত্রুপক্ষ দুর্গের কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই। তাহারা কামান পাতিয়াছিল কিন্তু কামানের গোলা দুর্গে আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই। খুড়াসাহেব হাসিয়া রঘুপতির দিকে চাহিলেন। মর্ম্ম এই যে, দুর্গের প্রতি শিবের যে অমোঘ বর আছে তাহার এমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর কি হইতে পারে। বোধ করি, নন্দী স্বয়ং আসিয়া কামানের গোলাগুলি লুফিয়া লইয়া গিয়াছে কৈলাসে গণপতি ও কার্ত্তিকেয় ভাঁটা খেলিবেন!

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

শাসুজাকে কোন মতে হস্তগত করাই রঘুপতির উদ্দেশ্য ছিল। তিনি যখন শুনিলেন সুজা দুর্গ আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তখন মনে করিলেন মিত্রভাবে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি কোনরূপে সুজার দুর্গ আক্রমণে সাহায্য করিবেন—কিন্তু ব্রাহ্মণ যুদ্ধ বিগ্রহের কোন ধার ধারেন না, কি করিলে যে সুজার সাহায্য হইতে পারে কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না।

পরদিন আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বিপক্ষ পক্ষ বারুদ দিয়া দুর্গ-প্রাচীরের কিয়দংশ উড়াইয়া দিল কিন্তু ঘন ঘন গুলি বর্ষণের প্রভাবে দুর্গে প্রবেশ করিতে পারিল না। ভগ্ন অংশ দেখিতে দেখিতে গাঁথিয়া তোলা হইল। আজ মাঝে মাঝে দুর্গের মধ্যে গোলাগুলি আসিয়া পড়িতে লাগিল, দুই চারিজন করিয়া দুর্গ-সৈন্য হত ও আহত হইতে লাগিল।

"ঠাকুর, কিছু ভয় নাই, এ কেবল খেলা হইতেছে" বলিয়া খুড়াসাহেব রঘুপতিকে লইয়া দুর্গের চারিদিকে দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কোথায় অস্ত্রাগার, কোথায় ভাণ্ডার, কোথায় আহতদের চিকিৎসাগৃহ, কোথায় বন্দীশালা, কোথায় দরবার, এই সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইতে লাগিলেন ও বার বার রঘুপতির মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। রঘুপতি কহিলেন "চমৎকার কারখানা! ত্রিপুরার গড় ইহার কাছে লাগিতে পারে না। কিন্তু সাহেব গোপনে পলায়নের জন্য ত্রিপুরার গড়ে একটি

আশ্চর্য্য সুরঙ্গ পথ আছে, এখানে সেরূপ কিছুই দেখিতেছি না

খুড়াসাহেব কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, সহসা আত্মসম্বরণ করিয়া কহিলেন "না এ দুর্গে সেরূপ কিছুই নাই।"

রঘুপতি নিতান্ত আশ্চর্য্য প্রকাশ করিয়া কহিলেন "এতবড় দুর্গে একটা সুরঙ্গ পথ নাই, এ কেমন কথা হইল!"

খুড়াসাহেব কিছু কাতর হইয়া কহিলেন "নাই, এ কি হইতে পারে? অবশ্যই আছে, তবে আমরা হয়ত কেহ জানি না!"

রঘুপতি হাসিয়া কহিলেন "তবে ত না থাকারই মধ্যে। যখন আপনিই জানেন না তখন আর কেই বা জানে?

খুড়াসাহেব অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তার পরে সহসা "হরি হে রাম রাম" বলিয়া তুড়ি দিয়া হাই তুলিলেন, তার পরে মুখে গোঁফে দাড়িতে দুই একবার হাত বুলাইয়া হঠাৎ বলিলেন "ঠাকুর, পূজা অর্চ্চনা লইয়া থাকেন আপনাকে বলিতে কোন দোষ নাই—দুর্গপ্রবেশের এবং দুর্গ হইতে বাহির হইবার দুইটা গোপন পথ আছে, কিন্তু বাহিরের কোন লোককে তাহা দেখান নিষেধ।"

রঘুপতি কিঞ্চিৎ সন্দেহের স্বরে কহিলেন "বটে! তা হবে!"

খুড়াসাহেব দেখিলেন তাঁহারই দোষ, একবার "নাই" একবার "আছে" বলিলে লোকের স্বভাবতই সন্দেহ হইতে পারে। বিদেশীর চোখে ত্রিপুরার গড়ের কাছে বিজয়গড় কোন অংশে খাটো হইয়া যাইবে ইহা খুড়াসাহেবের পক্ষে অসহ্য।

তিনি কহিলেন "ঠাকুর, বোধ করি, আপনার ত্রিপুরা অনেক দূরে এবং আপনি ব্রাহ্মণ, দেবসেবাই আপনার একমাত্র কাজ, আপনার দ্বারা কিছুই প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা নাই!"

রঘুপতি কহিলেন "কাজ কি সাহেব, সন্দেহ হয় ত ও সব কথা থাক্ না! আমি ব্রাহ্মণের ছেলে আমার দুর্গের খবরে কাজ কি!"

খুড়াসাহেব জিভ কাটিয়া কহিলেন "আরে রাম রাম, আপনাকে আবার সন্দেহ কিসের! চলুন্ একবার দেখাইয়া লইয়া আসি!"

এদিকে সহসা দুর্গের বাহিরে সুজার সেনাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে। অরণ্যের মধ্যে সুজার শিবির ছিল, সুলেমান এবং জয়সিংহের সৈন্য আসিয়া সহসা তাঁহাকে বন্দী করিয়াছে, এবং অলক্ষ্যে দুর্গ আক্রমণকারীদের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে। সুজার সৈন্যরা লড়াই না করিয়া কুড়িটা কামান পশ্চাতে ফেলিয়া ভঙ্গ দিল।

দুর্গের মধ্যে ধূম পড়িয়া গেল। বিক্রমসিংহের নিকট সুলেমানের দূত পৌঁছিতেই তিনি দুর্গের দ্বার খুলিয়া দিলেন। স্বয়ং অগ্রসর হইয়া সুলেমান ও রাজা জয়সিংহকে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। দিল্লীশ্বরের সৈন্য ও অশ্ব গজে দুর্গ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। নিশান উড়িতে লাগিল, শঙ্খ ও রণবাদ্য বাজিতে লাগিল এবং খুড়াসাহেবের শ্বেত গুম্ফের নীচে শ্বেত হাস্য পরিপূর্ণ রূপে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

খুড়াসাহেবের কি আনন্দের দিন! আজ দিল্লীশ্বরের রাজপুত সৈন্যরা বিজয়গড়ে অতিথি হইয়াছে—প্রবল প্রতাপান্বিত শা সুজা আজ বিজয়গড়ের বন্দী। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পর হইতে বিজয়গড়ে এমন বন্দী আর মেলে নাই।

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের বন্ধন-দশা স্মরণ করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া খুড়াসাহেব রাজপুত সুচেৎ-সিংহকে বলিলেন "মনে করিয়া দেখ হাজারটা হাতে শিকুলি পরাইতে কি আয়োজনটাই করিতে হইয়াছিল! কলিযুগ পড়িয়া অবধি ধুমধাম বিলকুল্ কমিয়া গিয়াছে। রাজার ছেলেই হউক্ আর বাদশাহের ছেলেই হউক রাজারে দুখানার বেশী হাত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বাঁধিয়া সুখ নাই।"

সুচেৎসিং হাসিয়া নিজের হাতের দিকে চাহিয়া কহিলেন "এই দুইখানা হাতই যথেষ্ট!"

খুড়াসাহেব কিঞ্চিৎ ভাবিয়া বলিলেন "তা বটে, সেকালে কাজ ছিল ঢের বেশী। আজ কাল কাজ এত কম পড়িয়াছে যে এই দুই খানা হাতেরই কোন কৈফিয়ৎ দেওয়া যায় না। আরো হাত থাকিলে আরও গোঁফে তা দিতে হইত।"

আজ খুড়াসাহেবের বেশ ভূষার ত্রুটি ছিল না। চিবুকের নীচে হইতে পাকা দাড়ি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া তাঁহার দুই কাণে লটকাইয়া দিয়াছেন। গোঁফ যোড়া পাকাইয়া কর্ণরন্ধ্রের কাছাকাছি লইয়া গিয়াছেন। মাথায় বাঁকা পাগ্‌ড়ি; কটিদেশে বাঁকা তলোয়ার। জরির জুতার সম্মুখ ভাগ শিঙের মত বাঁকিয়া পাকাইয়া উঠিয়াছে। আজ খুড়াসাহেবের চলিবার এমনি ভঙ্গী, যেন বিজয়গড়ের মহিমা তাঁহারই সর্ব্বাঙ্গে তরঙ্গিত হইতেছে। আজ এই সমস্ত সমজ্‌দার লোকের নিকটে বিজয়গড়ের মাহাত্ম্য প্রমাণ হইয়া যাইবে এই আনন্দে তাঁহার আহার নিদ্রা নাই।

সুচেৎ সিংকে লইয়া প্রায় সমস্ত দিন দুর্গ পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। সুচেৎ সিং যেখানে কোন প্রকার আশ্চর্য্য প্রকাশ না করেন সেখানে খুড়াসাহেব স্বয়ং "বাহবা, বাহবা" করিয়া নিজের উৎসাহ রাজপুত বীরের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিতে চেষ্টা করেন। বিশেষতঃ দুর্গ-প্রাকারের গাঁথুনি সম্বন্ধে তাঁহাকে সবিশেষ পরিশ্রম করিতে হইল। দুর্গপ্রাকার যেরূপ অবিচলিত সুচেৎ সিংহও ততোধিক—তাঁহার মুখে কোন প্রকারই ভাব প্রকাশ পাইল না। খুড়াসাহেব ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহাকে একবার দুর্গপ্রাকারের বামে একবার দক্ষিণে, একবার উপরে একবার নীচে আনিয়া উপস্থিত করিতে লাগিলেন—বারবার বলিতে লাগিলেন—"কি তারিফ!" কিন্তু কিছুতেই সুচেৎ সিংহের হৃদয়-দুর্গ অধিকার করিতে পারিলেন না। অবশেষে সন্ধ্যাবেলায় শ্রান্ত হইয়া সুচেৎ সিং বলিয়া উঠিলেন "আমি ভরতপুরের গড় দেখিয়াছি আর কোনও গড় আমার চোখে লাগেই না!"

খুড়াসাহেব কাহারও সঙ্গে কখনও বিবাদ করেন না—নিতান্ত ম্লান হইয়া বলিলেন অবশ্য—অবশ্য! এ কথা বলিতে পার বটে!"

নিশ্বাস ফেলিয়া দুর্গ সম্বন্ধে আলোচনা পরিত্যাগ করিলেন। বিক্রমসিংহের পূর্ব্ব-পুরুষ দুর্গাসিংহের কথা উঠাইলেন। তিনি বলিলেন—"দুর্গাসিংহের তিন পুত্র ছিল। কনিষ্ঠ পুত্র চিত্রসিংহের এক আশ্চর্য্য অভ্যাস ছিল। তিনি প্রতি দিন প্রাতে আধসের আন্দাজ ছোলা দুধে সিদ্ধ করিয়া খাইতেন। তাঁহার শরীরও তেমনি ছিল।—আচ্ছা জি তুমি যে ভরতপুরের গড়ের কথা বলিতেছ, সে অবশ্য খুব মস্ত গড়ই হইবে—কিন্তু কে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ত তাহার কোন উল্লেখ নাই।"

সুচেৎ সিং হাসিয়া কহিলেন "তাহার জন্য কাজের কোন ব্যাঘাত হইতেছে না!"

খুড়াসাহেব ঈষৎ কষ্টে হাসিয়া বলিলেন "হা হা হা তা ঠিক, তা ঠিক!—তবে কি জান ত্রিপুরার গড়ও বড় কম গড় নহে কিন্তু বিজয়-গড়ের"—

সুচেৎ সিং—"ত্রিপুরা আবার কোন্ মুলুকে?"

খুড়াসাহেব "সে ভারি মুলুক! অত কথায় কাজ কি, সেখানকার রাজপুরোহিত ঠাকুর আমাদের গড়ে অতিথি আছেন, তুমি তাঁহার মুখে সমস্ত শুনিবে!"

কিন্তু ব্রাহ্মণকে আজ কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। খুড়াসাহেবের প্রাণ সেই ব্রাহ্মণের জন্য কাঁদিতে লাগিল। তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন "এই রাজপুত গ্রাম্যগুলোর চেয়ে সে ব্রাহ্মণ অনেক ভাল।" সুচেৎ সিংহের নিকটে শতমুখে রঘুপতির প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং বিজয়গড় সম্বন্ধে রঘুপতির কি মত তাহাও ব্যক্ত করিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

—*—

খুড়াসাহেবের হাত এড়াইতে সুচেৎ সিংকে আর অধিক প্রয়াস পাইতে হইল না। কাল প্রাতে বন্দীসমেত সম্রাট-সৈন্যের যাত্রার দিন স্থির হইয়াছে, যাত্রার আয়োজনে সৈন্যেরা নিযুক্ত হইল। বন্দীশালায় শা সুজা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে কহিতেছেন "ইহারা কি বেয়াদব! শিবির হইতে আমার অল্‌-বোলাটা আনিয়া দিবে,তাহাও ইহাদের মনে উদয় হইল না!"

বিজয়গড়ের পাহাড়ের নিম্নভাগে এক গভীর খাল আছে। সেই খালের ধারে এক স্থানে একটি বজ্রদগ্ধ অশথের গুঁড়ি আছে। সেই গুঁড়ির কাছ বরাবর রঘুপতি গভীর রাত্রে ডুব দিলেন ও অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

গোপনে দুর্গ প্রবেশের জন্য যে সুরঙ্গ পথ আছে এই খালের গভীর তলেই তাহার প্রবেশের মুখ। এই পথ বাহিয়া সুরঙ্গ প্রান্তে পৌঁছিয়া নীচে হইতে সবলে ঠেলিলেই একটি পাথর উঠিয়া পড়ে,উপর হইতে তাহাকে কিছুতেই উঠান যায় না। সুতরাং যাহারা দুর্গের ভিতরে আছে তাহারা এ পথ দিয়া বাহির হইতে পারে না।

বন্দীশালার পালঙ্কের উপরে সুজা নিদ্রিত। পালঙ্ক ছাড়া গৃহে আর কোন সজ্জা নাই। একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। সহসা গৃহে ছিদ্র প্রকাশ পাইল। অল্পে অল্পে মাথা তুলিয়া পাতাল হইতে রঘুপতি উঠিয়া পড়িলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ভিজা। সিক্ত বস্ত্র হইতে জলধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। রঘুপতি ধীরে ধীরে সুজাকে স্পর্শ করিলেন।

সুজা চমকিয়া উঠিয়া চক্ষু রগ্‌ড়াইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন, তার পরে আলস্য-জড়িত স্বরে কহিলেন "কি হাঙ্গাম! ইহারা কি আমাকে রাত্রেও ঘুমাইতে দিবে না! তোমাদের ব্যবহারে আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি।"

রঘুপতি মৃদুস্বরে কহিলেন "শাহাজাদা, উঠিতে আজ্ঞা হউক। আমি সেই ব্রাহ্মণ। আমাকে স্মরণ করিয়া দেখুন। ভবিষ্যতেও আমাকে স্মরণ রাখিবেন।"

পরদিন প্রাতে সম্রাট্-সৈন্য যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। সুজাকে নিদ্রা হইতে জাগাইবার জন্য রাজা জয়সিংহ স্বয়ং বন্দীশালায় প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সুজা তখনো শয্যা হইতে উঠেন নাই। কাছে গিয়া স্পর্শ করিলেন। দেখিলেন, সুজা নহে, তাঁহার বস্ত্র পড়িয়া আছে। সুজা নাই। ঘরের মেজের

উপরে সুরঙ্গ গহ্বর, তাহার প্রস্তর আবরণ উন্মুক্ত পড়িয়া আছে।

বন্দীর পলায়ন বার্ত্তা দুর্গে রাষ্ট্র হইল। সন্ধানের জন্য চারিদিকে লোক ছুটিল। রাজা বিক্রমসিংহের শির নত হইল। বন্দী কিরূপে পলাইল, তাহার বিচারের জন্য সভা বসিল।

খুড়াসাহেবের সেই গর্ব্বিত সহর্ষভাব কোথায় গেল। তিনি পাগলের মত "ব্রাহ্মণ কোথায় "ব্রাহ্মণ কোথায়" করিয়া রঘুপতিকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। ব্রাহ্মণ কোথাও নাই। পাগ্‌ড়ি খুলিয়া খুড়া সাহেব কিছুকাল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিলেন। সুচেৎ সিং পাশে আসিয়া বসিলেন, কহিলেন—"খুড়াসাহেব, কি আশ্চর্য্য কারখানা। এ কি সমস্ত ভূতের কাণ্ড?" খুড়াসাহেব বিষণ্ণ ভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন—"না এ ভূতের কাণ্ড নয় সুচেৎ সিং এ একজন নিতান্ত নির্ব্বোধ বৃদ্ধের কাণ্ড ও আরেক জন বিশ্বাসঘাতক পাষণ্ডের কাজ।"

সুচেৎ সিং আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন "তুমি যদি তাহাদের জানই তবে তাহাদের গ্রেফতার করিয়া দাও না কেন?"

খুড়াসাহেব কহিলেন "তাহাদের মধ্যে একজন পালাইয়াছে। আর একজনকে গ্রেফতার করিয়া রাজসভায় লইয়া যাইতেছি।" বলিয়া পাগ্‌ড়ি পরিলেন ও সভার বেশ ধরিলেন।

সভায় তখন প্রহরীদের সাক্ষ্য লওয়া হইতেছিল। খুড়াসাহেব নতশিরে সভায় প্রবেশ করিলেন। বিক্রম সিংহের পদতলে তলোয়ার খুলিয়া রাখিয়া কহিলেন, "আমাকে বন্দী করিতে আদেশ করুন, আমি অপরাধী।"

রাজা বিস্মিত হইয়া কহিলেন 'খুড়াসাহেব, ব্যাপার কি!"

খুড়াসাহেব কহিলেন "সেই ব্রাহ্মণ। এ সমস্ত সেই বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের কাজ।"

রাজা জয়সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে!"

খুড়াসাহেব কহিলেন "আমি বিজয়গড়ের বৃদ্ধ খুড়াসাহেব।"

জয়সিংহ—"তুমি কি করিয়াছ?"

খুড়াসাহেব—"আমি বিজয়গড়ের সন্ধান-ভেদ করিয়া বিশ্বাসঘাতকার কাজ করিয়াছি। আমি নিতান্ত নির্ব্বোধের মত বিশ্বাস করিয়া-বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকে সুরঙ্গপথের কথা বলিয়া-ছিলাম"—

বিক্রমসিংহ সহসা জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন "খড়্গসিং!"

খুড়াসাহেব চমকিয়া উঠিলেন—তিনি প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহার নাম খড়্গ সিং।

বিক্রম সিংহ কহিলেন "খড়্গ সিং, এতদিন পরে তুমি কি আবার শিশু হইয়াছ!"

খুড়া সাহেব নতশিরে চুপ করিয়া রহিলেন।

বিক্রম সিং "খুড়াসাহেব, তুমি এই কাজ করিলে? তোমার হাতে আজ বিজয়গড়ের অপমান হইল!"

খুড়াসাহেব চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার হাত থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কম্পিত হস্তে কপাল স্পর্শ করিয়া মনে মনে কহিলেন "অদৃষ্ট!"

বিক্রম সিংহ কহিলেন "আমার দুর্গ হইতে দিল্লীশ্বরের শত্রু পলায়ন করিল। জান, তুমি আমাকে দিল্লীশ্বরের নিকটে অপরাধী করিয়াছ!"

খুড়াসাহেব কহিলেন "আমিই একা অপরাধী। মহারাজ অপরাধী এ কথা দিল্লীশ্বর বিশ্বাস করিবেন না।"

বিক্রম সিং বিরক্ত হইয়া কহিলেন "তুমি কে! তোমার খবর দিল্লীশ্বর কি রাখেন! তুমি ত আমারই লোক। এ যেন আমি

নিজের হাতে বন্দীর বন্ধন মোচন করিয়া দিয়াছি!"

খুড়াসাহেব নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। তিনি চোখের জল আর সামলাইতে পারিলেন না।

বিক্রম সিংহ কহিলেন "তোমাকে কি দণ্ড দিব!"

খুড়াসাহেব "মহারাজের যেমন ইচ্ছা!"

বিক্রম সিং "তুমি বুড়া মানুষ, তোমাকে অধিক আর কি দণ্ড দিব! নির্ব্বাসন দণ্ডই তোমার পক্ষে যথেষ্ট।"

খুড়াসাহেব বিক্রম সিংহের পা জড়াইয়া ধরিলেন, কহিলেন "বিজয়গড় হইতে নির্ব্বাসন। না মহারাজ! আমি বৃদ্ধ, আমার মতিভ্রম হইয়াছিল। আমাকে বিজয়গড়েই মরিতে দিন। মৃত্যুদণ্ডের আদেশ করিয়া দিন। এই বুড়াবয়সে শেয়াল কুকুরের মত আমাকে বিজয়গড় হইতে খেদাইয়া দিবেন না!"

রাজা জয়সিংহ কহিলেন "মহারাজ' আমার অনুরোধে ইহার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমি সম্রাটকে সমস্ত অবস্থা অবগত করিব।"

খুড়াসাহেবের মার্জ্জনা হইল। সভা হইতে বাহির হইবার সময় খুড়াসাহেব কাঁপিয়া পড়িয়া গেলেন। সে দিন হইতে খুড়াসাহেবকে আর বড় দেখা যাইত না। তিনি ঘর হইতে বাহির হইতেন না। তাঁহার মেরুদণ্ড যেন ভাঙ্গিয়া গেল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

গুজুরপাড়া ব্রহ্মপুত্রের তীরে ক্ষুদ্র গ্রাম। একজন ক্ষুদ্র জমিদার আছেন—নাম পীতাম্বর রায়—বাসিন্দা অধিক নাই। পীতাম্বর আপনার পুরাতন চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া আপনাকে রাজা বলিয়া থাকেন। তাঁহার প্রজারাও তাঁহাকে রাজা বলিয়া থাকেন। তাঁহার রাজ-মহিমা এই আম্রপিয়ালবনবেষ্টিত ক্ষুদ্র গ্রামটুকুর মধ্যেই বিরাজমান। তাঁহার যশ এই গ্রামের নিকুঞ্জগুলির মধ্যে ধ্বনিত হইয়া এই গ্রামের সীমানার মধ্যেই বিলীন হইয়া যায়। জগতের বড় বড় রাজাধিরাজের প্রখর প্রতাপ এই ছায়াময় নীড়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে পায় না। কেবল, তীর্থস্নানের উদ্দেশে নদীতীরে ত্রিপুরার রাজাদের এক বৃহৎ প্রাসাদ আছে, কিন্তু অনেক কাল হইতে রাজারা কেহ স্নানে আসেন নাই, সুতরাং ত্রিপুরার রাজার সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের মধ্যে একটা অস্পষ্ট জনশ্রুতি প্রচলিত আছে মাত্র।

একদিন ভাদ্র মাসের দিনে গ্রামে সংবাদ আসিল ত্রিপুরার এক রাজকুমার নদীতীরের পুরাতন প্রাসাদে বাস করিতে আসিতেছেন। কিছু দিন পরে বিস্তর পাগড়িবাঁধা লোক আসিয়া প্রাসাদে ভারি ধুম লাগাইয়া দিল। তাহার প্রায় এক সপ্তাহ পরে হাতি ঘোড়া লোক লস্কর লইয়া স্বয়ং নক্ষত্ররায় গুজুরপাড়া গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমারোহ দেখিয়া গ্রামবাসীদের মুখে যেন রা সরিল না। পীতাম্বরকে এত দিন ভারি রাজা বলিয়া মনে হইত কিন্তু আজ আর তাহা কাহারও মনে হইল না—নক্ষত্ররায়কে দেখিয়া সকলেই একবাক্যে বলিল "হাঁ রাজপুত্র এই রকমই হয় বটে!"

এইরূপে পীতাম্বর তাঁহার পাকা দালান ও চণ্ডীমণ্ডপসুদ্ধ একেবারে লুপ্ত হইয়া গেলেন বটে, কিন্তু তাঁহার আনন্দের আর সীমা রহিল না। নক্ষত্ররায়কে তিনি এমনি রাজা বলিয়া অনুভব করিলেন যে নিজের ক্ষুদ্র রাজমহিমা নক্ষত্ররায়ের চরণে সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়া তিনি

রম সুখী হইলেন। নক্ষত্ররায় কদাচিৎ তি চড়িয়া বাহির হইলে পীতাম্বর আপনার জাদের ডাকিয়া বলিতেন "রাজা দেখেছিস্? দেখ্ রাজা দেখ্।" মাছ তরকারী াহার্য্য দ্রব্য উপহার লইয়া পীতাম্বর প্রতিদিন ক্ষত্ররায়কে দেখিয়া আসিতেন—নক্ষত্ররায়ের রূপ সুন্দর মুখ দেখিয়া পীতাম্বরের স্নেহ চ্ছুসিত হইয়া উঠিত! নক্ষত্ররায়ই গ্রামের াজা হইয়া উঠিলেন। পীতাম্বর প্রজাদের াধ্যে গিয়া ভর্ত্তি হইলেন।

প্রতিদিন তিন বেলা নহবৎ বাজিতে াগিল, গ্রামের পথে হাতি ঘোড়া চলিতে াগিল, রাজদ্বারে মুক্ত তরবারির বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল, হাটবাজার বসিয়া গেল। পীতাম্বর এবং তাঁহার প্রজারা পুলকিত হইয়া উঠিলেন। নক্ষত্ররায় এই নির্ব্বাসনের রাজা হইয়া উঠিয়া সমস্ত দুঃখ ভুলিলেন। এখানে াজত্বের ভার কিছুমাত্র নাই অথচ রাজত্বের সুখ সম্পূর্ণ আছে। এখানে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন, স্বদেশে তাঁহার এত প্রবল প্রতাপ ছিল না। তাহা ছাড়া, এখানে রঘুপতির ছায়া নাই। মনের উল্লাসে নক্ষত্র-ায় বিলাসে মগ্ন হইলেন। ঢাকা নগরী হইতে নটনটী আসিল, নৃত্যগীতবাদ্যে নক্ষত্র-ায়ের তিলেক অরুচি নাই।

নক্ষত্ররায় ত্রিপুরার রাজ অনুষ্ঠান সমস্তই অবলম্বন করিলেন। ভৃত্যদের মধ্যে কাহারও াম রাখিলেন মন্ত্রী, কাহারও নাম রাখিলেন সেনাপতি, পীতাম্বর দেওয়ানজি নামে চলিত হইলেন। রীতিমত রাজদরবার বসিত। নক্ষত্র ায় পরম আড়ম্বরে বিচার করিতেন। নকুড় আসিয়া নালিশ করিল মথুর আমায় কুত্তো'ক'য়েছে" তাহার বিধিমত বিচার বসিল। বিবিধ প্রমাণ সংগ্রহের পর মথুর দোষী সাব্যস্ত হইলে নক্ষত্ররায় পরম গম্ভীর ভাবে বিচারাসন হইতে আদেশ করিলেন—নকুড় মথুরকে দুই কানমলা দেয়। এইরূপে সুখে সময় কাটিতে লাগিল। এক এক দিন হাতে নিতান্ত কাজ না থাকিলে সৃষ্টিছাড়া একটা কোন নূতন আমোদ উদ্ভাবনের জন্য মন্ত্রীকে তলব পড়িত। মন্ত্রী রাজসভাসদদিগকে সমবেত করিয়া নিতান্ত উদ্বিগ্ন ব্যাকুলভাবে নূতন খেলা বাহির করিতে প্রবৃত্ত হই[illegible]ভীর চিন্তা এবং পরামর্শের অবধি থাকিত না। এক দিন সৈন্য সামন্ত লইয়া পীতাম্বরের চণ্ডীমণ্ডপ আক্রমণ করা হইয়াছিল—এবং তাঁহার পুকুর হইতে মাছ ও তাঁহার বাগান হইতে ডাব ও পালংশাক লুঠের দ্রব্যের স্বরূপ অত্যন্ত ধুম করিয়া বাদ্য বাজা-ইয়া প্রাসাদে আনা হইয়াছিল। এইরূপ খেলাতে নক্ষত্ররায়ের প্রতি পীতাম্বরের স্নেহ আরও গাঢ় হইত।

আজ প্রাসাদে বিড়ালশাবকের বিবাহ। নক্ষত্ররায়ের একটি শিশু বিড়ালী ছিল, তাহার সহিত মণ্ডলদের বিড়ালের বিবাহ হইবে। চূড়ামণি ঘটক ঘটকালির স্বরূপ তিন শত টাকা ও একটা শাল পাইয়াছে। গায়ে-হলুদ প্রভৃতি সমস্ত উপক্রমণিকা হইয়া গিয়াছে। আজ শুভলগ্নে সন্ধ্যার সময়ে বিবাহ হইবে। এ কয়দিন রাজবাটীতে কাহারও তিলার্দ্ধ অব-সর নাই।

সন্ধ্যার সময় পথঘাট আলোকিত হইল, নহবৎ বসিল। মণ্ডলদের বাড়ি হইতে চতু-র্দ্দোলায় চড়িয়া কিংখাবের বেশ পরিয়া পাত্র অতি কাতর স্বরে মিউ মিউ করিতে করিতে যাত্রা করিয়াছে। মণ্ডলদের বাড়ির ছোট ছেলেটি মিৎবরের মত তাহার গলার দড়িটি ধরিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। উলু-

শঙ্খধ্বনির মধ্যে পাত্র সভাস্থ হইল। পুরোহিতের নাম কেনারাম—কিন্তু নক্ষত্ররায় তাহার নাম রাখিয়াছেন রঘুপতি। নক্ষত্ররায় আসল রঘুপতিকে ভয় করিতেন এই জন্য নকল রঘুপতিকে লইয়া খেলা করিয়া সুখী হইতেন,—এমন কি, কথায় কথায় তাঁহাকে উৎপীড়ন করিতেন—গরীব কেনারাম সমস্ত নীরবে সহ্য করিত। আজ দৈবদুর্ব্বিপাকে কেনারাম সভায় অনুপস্থিত—তাহার ছেলেটি জ্বরবিকারে মরিতেছে। নক্ষত্ররায় অধীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "রঘুপতি কোথায়।" ভৃত্য বলিল—"তাঁহার বাড়িতে ব্যাম।" নক্ষত্ররায় দ্বিগুণ হাঁকিয়া বলিলেন "বোলাও উস্‌কো।" লোক ছুটিল। ততক্ষণ রোরুদ্যমান বিড়ালের সমক্ষে নাচ গান চলিতে লাগিল। নক্ষত্ররায় বলিলেন "সাহানা গাও।" সাহানা গান আরম্ভ হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে ভৃত্য আসিয়া নিবেদন করিল "রঘুপতি আসিয়াছেন।" নক্ষত্ররায় সরোষে বলিলেন "বোলাও!" তৎক্ষণাৎ পুরোহিত গৃহে প্রবেশ করিলেন। পুরোহিতকে দেখিয়াই নক্ষত্ররায়ের ভ্রূকুটি কোথায় মিলাইয়া গেল, তাঁহার সম্পূর্ণ ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, কপালে ঘর্ম্ম দেখা দিল। সাহানা গান, সারঙ্গ ও মৃদঙ্গ সহসা বন্ধ হইল, কেবল বিড়ালের কাতর মিউ মিউ ধ্বনি নিস্তব্ধ ঘরে দ্বিগুণ জাগিয়া উঠিল।

এ রঘুপতিই বটে। তাহার আর সন্দেহ নাই। দীর্ঘ, শীর্ণ, তেজস্বী, বহুদিনের ক্ষুধিত কুকুরের মত চক্ষু দুটো জ্বলিতেছে। ধূলায় পরিপূর্ণ দুই পা তিনি কিংখাব মছলন্দের উপর স্থাপন করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন—"নক্ষত্ররায়!" নক্ষত্ররায় চুপ করিয়া রহিলেন। রঘুপতি বলিলেন "তুমি রঘুপতিকে ডাকিয়াছ। আমি আসিয়াছি" নক্ষত্ররায় অস্পষ্ট স্বরে কহিলেন "ঠাকুর—ঠাকুর!" রঘুপতি কহিলেন "উঠিয়া এস!" নক্ষত্ররায় ধীরে ধীরে সভা হইতে উঠিয়া গেলেন। বিড়ালের বিয়ে, সাহানা এবং সারং একেবারে বন্ধ হইল।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

রঘুপতি জিজ্ঞাসা করিলেন "এ সব কি হইতেছিল?"

নক্ষত্ররায় মাথা চুলকাইয়া কহিলেন "নাচ হইতেছিল।"

রঘুপতি ঘৃণায় কুঞ্চিত হইয়া কহিলেন "ছি ছি!" নক্ষত্ররায় অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রঘুপতি কহিলেন "কাল এখান হইতে যাত্রা করিতে হইবে। তাহার উদ্যোগ কর।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন "কোথায় যাইতে হইবে!"

রঘুপতি "সে কথা পরে হইবে। আপাততঃ আমার সঙ্গে বাহির হইয়া পড়।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন "আমি এখানে বেশ আছি।"

রঘুপতি "বেশ আছি! তুমি রাজবংশে জন্মিয়াছ, তোমার পূর্ব্বপুরুষেরা সকলে রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। তুমি কি না আজ এই বনগাঁয়ে শেয়াল রাজা হইয়া বসিয়াছ আর বলিতেছ 'বেশ আছি'!"

রঘুপতি তীব্র বাক্যে ও তীক্ষ্ণ কটাক্ষে প্রমাণ করিয়া দিলেন যে নক্ষত্ররায় ভাল নাই। নক্ষত্ররায়ও রঘুপতির মুখের তেজে কতকটা সেই রকমই বুঝিলেন। তিনি বলিলেন

"বেশ আর কি এমনি আছি। কিন্তু আর কি করিব। উপায় কি আছে!"

রঘুপতি "উপায় ঢের আছে—উপায়ের অভাব নাই। আমি তোমাকে উপায় দেখাইয়া দিব—তুমি আমার সঙ্গে চল।"

নক্ষত্ররায় "একবার দাওয়ানজিকে জিজ্ঞাসা করি!"

রঘুপতি "না!"

নক্ষত্ররায়—"আমার এই সব জিনিষ পত্র"

রঘুপতি "কিছু আবশ্যক নাই।"

নক্ষত্ররায়—"লোক জন—"

রঘুপতি—"দরকার নাই।"

নক্ষত্ররায়—"আমার হাতে এখন যথেষ্ট নগদ টাকা নাই।"

রঘুপতি "আমার আছে। আর অধিক ওজর আপত্তি করিও না। আজ শয়ন করিতে যাও, কাল প্রাতঃকালেই যাত্রা করিতে হইবে।" বলিয়া রঘুপতি কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেলেন।

তাহার পরদিন ভোরে নক্ষত্ররায় উঠিয়াছেন। তখন বন্দীরা ললিত রাগিণীতে মধুর গান গাহিতেছে। নক্ষত্ররায় বিহির্ভবনে আসিয়া জানলা হইতে বাহিরে চাহিয়া দেখিলেন। পূর্ব্বতীরে সূর্য্যোদয় হইতেছে, অরুণ রেখা দেখা দিয়াছে। উভয় তীরের ঘন তরুস্রোতের মধ্য দিয়া, ছোট ছোট নিদ্রিত গ্রামগুলির দ্বারের কাছ দিয়া ব্রহ্মপুত্র তাহার বিপুল জলরাশি লইয়া অবাধে বহিয়া যাইতেছে। প্রাসাদের জানলা হইতে নদীতীরের একটী ছোট কুটীর দেখা যাইতেছে। একটি মেয়ে প্রাঙ্গণ ঝাঁট দিতেছে—এক জন পুরুষ তাহার সঙ্গে দুই একটা কথা কহিয়া মাথায় চাদর বাঁধিয়া, একটা বড় বাঁশের লাঠির অগ্রভাগে পুঁটুলি বাঁধিয়া নিশ্চিন্তমনে কোথায় বাহির হইল। শ্যামা ও দোয়েল শিশ দিতেছে, বেনেবউ বড় কাঁঠালগাছের ঘন পল্লবের মধ্যে বসিয়া গান গাহিতেছে। বাতায়নে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া নক্ষত্ররায়ের হৃদয় হইতে এক গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস উঠিল, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে রঘুপতি আসিয়া নক্ষত্ররায়কে স্পর্শ করিলেন। নক্ষত্ররায় চমকিয়া উঠিলেন। রঘুপতি মৃদুগম্ভীর স্বরে কহিলেন "যাত্রার সমস্ত প্রস্তুত।"

নক্ষত্ররায় যোড়হাতে অত্যন্ত কাতর স্বরে কহিলেন "ঠাকুর, আমাকে মাপ কর ঠাকুর—আমি কোথাও যাইতে চাহি না! আমি এখানে বেশ আছি।"

রঘুপতি একটি কথা না বলিয়া নক্ষত্ররায়ের মুখের দিকে তাঁহার অগ্নিদৃষ্টি স্থির রাখিলেন। নক্ষত্ররায় চোখ নামাইয়া কহিলেন "কোথায় যাইতে হইবে?"

রঘুপতি—"সে কথা এখন হইতে পারে না।"

নক্ষত্র 'দাদার বিরুদ্ধে আমি কোন চক্রান্ত করিতে পারিব না।"

রঘুপতি জ্বলিয়া উঠিয়া কহিলেন "দাদা তোমার কি মহৎ উপকারটা করিয়াছেন শুনি!"

নক্ষত্র মুখ ফিরাইয়া, জানলার উপর আঁচড় কাটিয়া বলিলেন "আমি জানি, তিনি আমাকে ভাল বাসেন।"

রঘুপতি তীব্র শুষ্ক হাস্যের সহিত কহিলেন, "হরি হরি, কি প্রেম! তাই বুঝি নির্ব্বিঘ্নে ধ্রুবকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্যে মিছা ছুতা করিয়া দাদা তোমাকে রাজ্য হইতে তাড়াইলেন—পাছে রাজ্যের গুরুভারে ননীর পুতলি স্নেহের ভাই কখনও ব্যথিত হইয়া পড়ে। সে রাজ্যে আর কি কখন সহজে প্রবেশ করিতে পারিবে? নির্ব্বোধ!"

নক্ষত্ররায় তাড়াতাড়ি বলিলেন “আমি কি এই সামান্ত কথাটা আর বুঝি না? আমি সমস্তই বুঝি—কিন্তু আমি কি করিব বল ঠাকুর, উপায় কি!”

রঘুপতি “সেই উপায়ের কথাইত হইতেছে। সেই জন্তইত আসিয়াছি। ইচ্ছা হয়ত আমার সঙ্গে চলিয়া আইস, নয়ত এই বাঁশবনের মধ্যে বসিয়া বসিয়া তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী দাদার ধ্যান কর। আমি চলিলাম।”

বলিয়া রঘুপতি প্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন। নক্ষত্ররায় তাড়াতাড়ি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া কহিলেন “আমিও যাইব ঠাকুর, কিন্তু দেওয়ানজি যদি যাইতে চান তাঁহাকে আমাদের সঙ্গে লইয়া যাইতে কি আপত্তি আছে?”

রঘুপতি কহিলেন “আমি ছাড়া আর কেহ সঙ্গে যাইবে না।”

বাড়ি ছাড়িয়া নক্ষত্ররায়ের পা সরিতে চায় না। এই সমস্ত সুখের খেলা ছাড়িয়া দেওয়ানজিকে ছাড়িয়া রঘুপতির সঙ্গে একলা কোথায় যাইতে হইবে! কিন্তু রঘুপতি যেন তাঁহার কেশ ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন। তাহা ছাড়া নক্ষত্ররায়ের মনে এক প্রকার ভয়মিশ্রিত কৌতূহলও জন্মিতে লাগিল। তাহারও একটা ভীষণ আকর্ষণ আছে।

নৌকা প্রস্তুত আছে। নদীতীরে উপস্থিত হইয়া নক্ষত্ররায় দেখিলেন কাঁধে গামছা ফেলিয়া পীতাম্বর স্নান করিতে আসিয়াছেন নক্ষত্রকে দেখিয়াই পীতাম্বর হাস্য বিকশিত মুখে কহিলেন “জয়োস্তু মহারাজ; শুনিলাম না কি কাল কোথা হইতে এক অলক্ষণমন্ত বিটল ব্রাহ্মণ আসিয়া শুভ বিবাহের ব্যাঘাত করিয়াছে!”

নক্ষত্ররায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। রঘুপতি গম্ভীর ভাবে কহিলেন “আমিই সে বিটল ব্রাহ্মণ।”

পীতাম্বর হাসিয়া উঠিলেন কহিলেন “তবে ত আপনার সাক্ষাতে আপনার বর্ণনা করা ভাল হয় নাই! জানিলে কোন্ পিতার পু এমন্ কাজ করিত! কিছু মনে করিবেন ঠাকুর, অসাক্ষাতে লোকে কি না বলে আমাকে যাহারা সমুখে বলে রাজা, তাহা আড়ালে বলে পীতু। মুখের সাম্নে কিছু বলিলেই হইল, আমিত এই বুঝি। আস কথা কি জানেন আপনার মুখটা কেমন ভা অপ্রসন্ন দেখাইতেছে, কাহারও এমন মুখে ভাব দেখিলে লোকে তাহার নামে নিন্দ রটায়!—মহারাজ এত প্রাতে যে নদীতীরে!”

নক্ষত্ররায় কিছু করুণ স্বরে কহিলেন “আমি যে চলিলাম দেওয়ানজি!”

পীতাম্বর—“চলিলেন? কোথায়? নগ ড়ায়, মণ্ডলদের বাড়ি?

নক্ষত্র “না দেওয়ানজি, মণ্ডলদের বা নয়। অনেক দূর।”

পীতা—“অনেক দূর? তবে কি পাইক ঘাটায় শিকারে যাইতেছেন?”

নক্ষত্ররায় একবার রঘুপতির মুখের দিবে চাহিয়া কেবল বিষন্ন ভাবে ঘাড় নাড়িলেন রঘুপতি কহিলেন “বেলা বহিয়া যায়, নৌকা উঠা হোক।” পীতাম্বর অত্যন্ত সন্দিগ্ধ ক্রুদ্ধভাবে ব্রাহ্মণের মুখের দিকে চাহিলে কহিলেন “তুমি কে হে ঠাকুর? আমাদে মহারাজাকে হুকুম করিতে আসিয়াছ।”

নক্ষত্র ব্যস্ত হইয়া পীতাম্বরকে একপা টানিয়া লইয়া কহিলেন “উনি আমাদের গু ঠাকুর।”

পীতাম্বর বলিয়া উঠিলেন “হোক্‌না গু ঠাকুর। উনি আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে থাকু

…স কলা বরাদ্দ করিয়া দিব, সমাদরে থাকিবেন—মহারাজাকে উঁহার কিসের আবশ্যক ?”

রঘুপতি—“বৃথা সময় নষ্ট হইতেছে—আমি তবে চলিলাম।”

পীতাম্বর “যে আজ্ঞে, বিলম্বে ফল কি, …ণায় চট্‌পট্‌ সরিয়া পড়ুন। মহারাজকে লইয়া আমি প্রাসাদে যাইতেছি।”

নক্ষত্ররায় একবার রঘুপতির মুখের দিকে চাহিয়া একবার পীতাম্বরের মুখের দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন “না দেওয়ানজি আমি যাই।”

পীতাম্বর—“তবে আমিও যাই, লোক জন সঙ্গে লউন্‌। রাজার মত চলুন্‌। রাজা যাইবেন, সঙ্গে দেওয়ানজি যাইবে না ?”

নক্ষত্ররায় কেবল রঘুপতির মুখের দিকে চাহিলেন। রঘুপতি কহিলেন “কেহ সঙ্গে যাইবে না।”

পীতাম্বর উগ্র হইয়া উঠিয়া কহিলেন—“দেখ ঠাকুর তুমি—” নক্ষত্ররায় তাঁহাকে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলেন “দেওয়ানজি, আমি যাই, দেরি হইতেছে।”

পীতাম্বর ম্লান হইয়া নক্ষত্রের হাত ধরিয়া কহিলেন “দেখ বাবা, আমি তোমাকে রাজা বলি, কিন্তু আমি তোমাকে সন্তানের মত ভালবাসি—আমার সন্তান কেহ নাই। তোমার উপর আমার জোর খাটে না। তুমি চলিয়া যাইতেছ, আমি জোর করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারি না। কিন্তু আমার একটি অনুরোধ এই আছে যেখানেই যাও আমি মরিবার আগে ফিরিয়া আসিতে হইবে। আমি স্বহস্তে আমার রাজত্ব সমস্ত তোমার হাতে দিয়া যাইব। আমার এই একটি সাধ আছে।”

নক্ষত্ররায় ও রঘুপতি নৌকায় উঠিলেন। নৌকা দক্ষিণমুখে চলিয়া গেল। পীতাম্বর স্নান ভুলিয়া আমছা কাঁধে অন্যমনস্কে বাড়ি ফিরিয়া গেলেন। গুজুরপাড়া যেন শূন্য হইয়া গেল—তাহার আমোদ উৎসব সমস্ত অবসান। কেবল প্রতি দিন প্রকৃতির নিত্য উৎসব, প্রাতে পাখীর গান, পল্লবের মর্ম্মর ধ্বনি ও নদীতরঙ্গের করতালির বিরাম নাই।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

—*—

দীর্ঘ পথ। কোথাও বা নদী, কোথাও বা ঘন অরণ্য, কোথাও বা ছায়াহীন প্রান্তর—কখন বা নৌকায়, কখন বা পদব্রজে, কখন বা টাটু ঘোড়ায়—কখন রৌদ্র, কখন বৃষ্টি, কখন কোলাহলময় দিন, কখন নিশীথিনীর নিস্তব্ধ অন্ধকার—নক্ষত্ররায় অবিশ্রাম চলিয়াছেন। কত দেশ, কত বিচিত্র দৃশ্য, কত বিচিত্র লোক—কিন্তু নক্ষত্ররায়ের পার্শ্বে ছায়ার ন্যায় ক্ষীণ, রৌদ্রের ন্যায় দীপ্ত সেই একমাত্র রঘুপতি অবিশ্রাম লাগিয়া আছেন। দিনে রঘুপতি, রাত্রে রঘুপতি, স্বপ্নেও রঘুপতি বিরাজ করেন। পথে পথিকেরা যাতায়াত করিতেছে, পথপার্শ্বে ধূলায় ছেলেরা খেলা করিতেছে, হাটে শত শত লোক কেনাবেচা করিতেছে, গ্রামে বৃদ্ধেরা পাশা খেলিতেছে, ঘাটে মেয়েরা জল তুলিতেছে, নৌকায় মাঝীরা গান গাহিয়া চলিয়াছে—কিন্তু নক্ষত্ররায়ের পার্শ্বে এক শীর্ণ রঘুপতি সর্ব্বদা জাগিয়া আছে। জগতে চারিদিকে বিচিত্র খেলা হইতেছে, বিচিত্র ঘটনা ঘটিতেছে—কিন্তু এই রঙ্গভূমির বিচিত্র লীলার মাঝখান দিয়া নক্ষত্ররায়ের দুরদৃষ্ট তাঁহাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে—সজন তাঁহার পক্ষে বিজন, লোকালয় কেবল শূন্য মরুভূমি। নক্ষত্র

রায় শ্রান্ত হইয়া তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী ছায়াকে জিজ্ঞাসা করেন "আর কতদূর যাইতে হইবে।" ছায়া উত্তর করে "অনেক দূর।" 'কোথায় যাইতে হইবে ?" তাহার উত্তর নাই। নক্ষত্র-রায় নিশ্বাস ফেলিয়া চলিতে থাকেন। তরু-শ্রেণীর মধ্যে পাতা দিয়া ছাওয়া নিভৃত পরিচ্ছন্ন কুটীর দেখিলে তাঁহার মনে হয় আমি যদি কুটীরের অধিবাসী হইতাম ! গোধূলির সময় যখন রাখাল লাঠি কাঁধে করিয়া মাঠ দিয়া গ্রামপথ দিয়া ধুলা উড়াইয়া গোরু বাছুর লইয়া চলে, নক্ষত্ররায়ের মনে হয় "আমি যদি ইহার সঙ্গে যাইতে পাইতাম, সন্ধ্যাবেলায় গৃহে গিয়া বিশ্রাম করিতে পাইতাম ? মধ্যাহ্নে প্রচণ্ড রৌদ্রে চাষা চাষ করিতেছে, তাহাকে দেখিয়া নক্ষত্ররায় মনে করেন "আহা এ কি সুখী।" পথকষ্টে নক্ষত্ররায় বিবর্ণ শীর্ণ মলিন হইয়া গিয়াছেন—রঘুপতিকে বলেন "ঠাকুর, আমি আর বাঁচিব না" রঘুপতি বলেন 'এখন তোমাকে মরিতে দিবে কে।" নক্ষত্ররায়ের মনে হইল রঘুপতি অবকাশ না দিলে তাঁহার মরিবারও সুবিধা নাই। একজন স্ত্রীলোক নক্ষত্ররায়কে দেখিয়া বলিয়াছিল "আহা, কাদের ছেলে গো। এ'কে পথে কে বাহির করিয়াছে।" শুনিয়া নক্ষত্ররায়ের প্রাণ গলিয়া গেল, তাঁহার চোখে জল আসিল ; তাঁহার ইচ্ছা করিল সেই স্ত্রীলোকটিকে মা বলিয়া তাহার সঙ্গে তাহার ঘরে চলিয়া যান।

কিন্তু নক্ষত্ররায় রঘুপতির হাতে যতই কষ্ট পাইতে লাগিলেন রঘুপতির ততই বশ হইতে লাগিলেন—রঘুপতির অঙ্গুলির ইঙ্গিতে তাঁহার সমস্ত অস্তিত্ব পরিচালিত হইতে লাগিল।

চলিতে চলিতে ক্রমে নদীর বাহুল্য কমিয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে ভূমি দৃঢ় হইয়া আসিল, মৃত্তিকা লোহিতবর্ণ, কঙ্করময়, লোকালয় দূরে দূরে স্থাপিত, গাছপালা বিরল, নারিকেল বনের দেশ ছাড়িয়া দুই পথিক তালবনের দেশে আসিয়া পড়িলেন। মাঝে মাঝে বড় বড় বাঁধ, শুষ্ক নদীর পথ, দূরে মেঘের মত পাহাড় দেখা যাইতেছে। ক্রমে শাসুজার রাজধানী রাজমহল নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

—*—

অবশেষে রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরাজয় ও পলায়নের পরে সুজা নূতন সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন —কিন্তু রাজকোষে অধিক অর্থ নাই। প্রজাগণ করভারে পীড়িত। ইতিমধ্যে দারাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া ঔরংজেব দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়াছেন। সুজা এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। কিন্তু সৈন্য সামন্ত কিছুই প্রস্তুত ছিল না—এই জন্য কিছু সময় হাতে পাইবার আশায় তিনি ছল করিয়া ঔরঙ্গজেবের নিকট এক দূত পাঠাইয়া দিলেন। বলিয়া পাঠাইলেন যে নয়নের জ্যোতি হৃদয়ের আনন্দ পরম স্নেহাস্পদ প্রিয়তম ভ্রাতা ঔরঙ্গজেব সিংহাসন লাভে কৃতকার্য্য হইয়াছেন ইহাতে সুজা মৃতদেহে প্রাণ পাইয়াছেন—একণে সুজার বাঙ্গালা শাসন ভার নূতন সম্রাট মঞ্জুর করিলেই আনন্দের আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। ঔরঙ্গজেব অত্যন্ত সমাদরের সহিত দূতকে আহ্বান করিলেন। সুজার শরীর মনের স্বাস্থ্য, এবং সুজার পরিবারের মঙ্গল সংবাদ জানিবার জন্য সবিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন, এবং বলিলেন যখন

স্বয়ং সম্রাট শাজাহান সুজাকে বাঙ্গালার শাসনকার্য্যে নিয়োগ করিয়াছেন, তখন আর দ্বিতীয় মঞ্জুরী পত্রের কোন আবশ্যক নাই।—এই সময়ে রঘুপতি সুজার সভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন।

সুজা কৃতজ্ঞতা ও সমাদরের সহিত তাঁহার উদ্ধার কর্ত্তাকে আহ্বান করিলেন। বলিলেন "খবর কি?"

রঘুপতি বলিলেন "বাদশাহের কাছে কিছু নিবেদন আছে।"

সুজা মনে মনে ভাবিলেন "নিবেদন আবার কিসের? কিছু অর্থ চাহিয়া না বসিলে বাঁচি!"

রঘুপতি কহিলেন "আমার প্রার্থনা এই যে—"

সুজা কহিলেন—"ব্রাহ্মণ, তোমার প্রার্থনা আমি নিশ্চয় পূরণ করিব। কিন্তু কিছু দিন সবুর কর। এখন রাজকোষে অধিক অর্থ নাই।"

রঘুপতি কহিলেন "শাহেন শা, রূপা সোণা বা আর কোন ধাতু চাহি না আমি এখন শাণিত ইস্পাত চাই। আমার, নালিষ শুনুন্ আমি বিচার প্রার্থনা করি!"

সুজা কহিলেন "ভারি মুস্কিল! এখন আমার বিচার করিবার সময় নহে। ব্রাহ্মণ তুমি বড় অসময়ে আসিয়াছ।"

রঘুপতি কহিলেন—"শাহজাদা, সময় অসময় সকলেরই আছে। আপনি বাদশাহ আপনারও আছে এবং আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমারও আছে। আপনার সময়মত আপনি বিচার করিতে বসিলে আমার সময় থাকে কোথা!"

সুজা হাল ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন "ভারি হাঙ্গাম। এত কথা শোনার চেয়ে তোমার নালিশ শোনা ভাল। বলিয়া যাও!"

রঘুপতি কহিলেন "ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্য তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নক্ষত্ররায়কে বিনা অপরাধে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন—"

সুজা বিরক্ত হইয়া কহিলেন "ব্রাহ্মণ, তুমি পরের নালিষ লইয়া কেন আমার সময় নষ্ট করিতে আসিয়াছ! এখন এ সমস্ত বিচার করিবার সময় নয়!"

রঘুপতি কহিলেন, "ফরিয়াদী রাজধানীতে হাজির আছেন।"

সুজা কহিলেন "তিনি আপনি উপস্থিত থাকিয়া আপনার মুখে যখন নালিশ উত্থাপন করিবেন তখন বিবেচনা করা যাইবে।"

রঘুপতি কহিলেন "তাঁহাকে কবে এখানে হাজির করিব!"

সুজা কহিলেন"—ব্রাহ্মণ কিছুতেই ছাড়ে না! আচ্ছা এক সপ্তাহ পরে আনিও!"

রঘুপতি কহিলেন "বাদশাহ যদি হুকুম করেন ত আমি তাঁহাকে কাল আনিব।"

সুজা বিরক্ত হইয়া কহিলেন "আচ্ছা কালই আনিও।" আজিকার মত নিষ্কৃতি পাইলেন। রঘুপতি বিদায় হইলেন।

নক্ষত্ররায় কহিলেন "নবাবের কাছে যাইব কিন্তু নজরের জন্য কি লইব!"

রঘুপতি কহিলেন "সে জন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না।" নজরের জন্য তিনি দেড় লক্ষ মুদ্রা উপস্থিত করিলেন।

পরদিন প্রভাতে রঘুপতি কম্পিতহৃদয় নক্ষত্ররায়কে লইয়া সুজার সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যখন দেড় লক্ষ টাকা নবাবের পদতলে স্থাপিত হইল তখন তাঁহার মুখশ্রী তেমন অপ্রসন্ন বোধ হইল না। নক্ষত্ররায়ের নালিশ অতি সহজেই তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। তিনি কহিলেন "এক্ষণে তোমাদের কি অভিপ্রায় আমাকে বল!"

রঘুপতি কহিলেন "গোবিন্দমাণিক্যকে

নির্ব্বাসিত করিয়া তাঁহার স্থলে নক্ষত্ররায়কে রাজা করিয়া দিতে আজ্ঞা হোক!"

যদিও সুজা নিজে ভ্রাতার সিংহাসনে হস্তক্ষেপ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন না, তথাপি এস্থলে তাঁহার মনে কেমন আপত্তি উপস্থিত হইল। কিন্তু রঘুপতির প্রার্থনা পূরণ করাই তাঁহার আপাতত সকলের চেয়ে সহজ বোধ হইল—নহিলে রঘুপতি বিস্তর বকাবকি করিবে এই তাঁহার ভয়। বিশেষতঃ ছয় লক্ষ টাকা নজরের উপরেও অধিক আপত্তি করা ভাল দেখায় না এইরূপ তাঁহার মনে হইল। তিনি বলিলেন—"আচ্ছা, গোবিন্দমাণিক্যের নির্ব্বাসন এবং নক্ষত্ররায়ের রাজ্যপ্রাপ্তির পরোয়ানা পত্র তোমাদের সঙ্গে দিব তোমরা লইয়া যাও।"

রঘুপতি কহিলেন "বাদশাহের কতিপয় সৈন্যও সঙ্গে দিতে হইবে।"

সুজা দৃঢ়স্বরে কহিলেন "না, না, না—তাহা হইবে না—যুদ্ধ বিগ্রহ করিতে পারিব না।"

রঘুপতি কহিলেন "যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ আর ছত্রিশ হাজার টাকা আমি রাখিয়া যাইতেছি। এবং ত্রিপুরায় নক্ষত্ররায় রাজা হইবামাত্র এক বৎসরের খাজনা সেনাপতির হাত দিয়া পাঠাইয়া দিব।"

এ প্রস্তাব সুজার অতিশয় যুক্তিসঙ্গত বোধ হইল, এবং অমাত্যেরাও তাঁহার সহিত একমত হইল। একদল মোগল সৈন্য সঙ্গে লইয়া রঘুপতি ও নক্ষত্ররায় ত্রিপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

এই উপন্যাসের আরম্ভ কাল হইতে এখন দুই বৎসর হইয়া গিয়াছে। ধ্রুব তখন দুই বৎসরের বালক ছিল এখন তাহার বয়স চার বৎসর। এখন সে বিস্তর কথা শিখিয়াছে। এখন তিনি আপনাকে ভারি মস্তলোক জ্ঞান করেন। সকল কথা যদিও স্পষ্ট বলিতে পারেন না, কিন্তু অত্যন্ত জোরের সহিত বলিয়া থাকেন। রাজাকে প্রায় তিনি পুঁতুল দেব বলিয়া পরম প্রলোভন ও সান্ত্বনা দিয়া থাকেন, এবং রাজা যদি কোন প্রকার দুষ্টুমির লক্ষণ প্রকাশ করেন, তবে ধ্রুব তাঁকে "ঘরে বন্ধ করে রাখ্‌ব" ব'লে অত্যন্ত শঙ্কিত করিয়া তুলেন। এইরূপে রাজা এখন বিশেষ শাসনে আছেন—ধ্রুবের অনভিমত কোন কাজ করিতে তিনি বড় একটা ভরসা করেন না।

ইতিমধ্যে হঠাৎ ধ্রুবের একটি সঙ্গী যুটিয়া গেল। একটি প্রতিবেশীর মেয়ে ধ্রুব অপেক্ষা ছয়মাসের ছোট। মিনিট দশেকের ভিতরে উভয়ের মধ্যে চিরস্থায়ী ভাব হইয়া গেল। মাঝে একটুখানি মনান্তর হইবারও সম্ভাবনা হইয়াছিল। ধ্রুবের হাতে একটা বড় বাতাসা ছিল। প্রথম প্রণয়ের উচ্ছ্বাসে ধ্রুব তাহার দুইটি ছোট আঙ্গুল দিয়া অতি সাবধানে ক্ষুদ্র একটু কণা ভাঙ্গিয়া একেবারে তাহার সঙ্গিনীর মুখে পূরিয়া দিল ও পরম অনুগ্রহের সহিত ঘাড় নাড়িয়া কহিল "তুমি খাও।" সঙ্গিনী মিষ্ট পাইয়া পরম পরিতৃপ্ত হইয়া কহিল "আরও খাব।" তখন ধ্রুব কিছু কাতর হইয়া পড়িল। বন্ধুত্বের উপরে এত অধিক দাবী ন্যায়সঙ্গত বোধ হইল না—ধ্রুব তাহার স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য্য ও গৌরবের সহিত ঘাড় নাড়িয়া

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল "ছি—আর কেতে নেই—অছুখ কোবে, বাবা মা'বে!" বলিয়াই অধিক বিলম্ব না করিয়া সমস্ত বাতাসাটা নিজের মুখের মধ্যে একেবারে পূরিয়া দিয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলিল। সহসা বালিকার মুখের মাংসপেশীর মধ্যে পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল—ওষ্ঠাধর ফুলিতে লাগিল, ভ্রূযুগ উপরে উঠিতে লাগিল—আসন্ন ক্রন্দনের সমস্ত লক্ষণ ব্যক্ত হইল। ধ্রুব কাহারও ক্রন্দন সহিতে পারিত না, তাড়াতাড়ি সুগভীর সান্ত্বনার স্বরে কহিল "কাল দেবো।"

রাজা আসিবামাত্র ধ্রুব অত্যন্ত বিজ্ঞ হইয়া নূতন সঙ্গিনীর প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, "এ'কে কিছু বোলো না, এ কাঁদ্‌বে! ছি, মার্‌তে নেই, ছি!" রাজার কোন প্রকার দুরভিসন্ধি ছিল না সত্য তথাপি গায়ে পড়িয়া রাজাকে সাবধান করিয়া দেওয়া ধ্রুব অত্যন্ত আবশ্যক বিবেচনা করিল। বড়রা যেমন সহসা অত্যন্ত সাধুভাব ধারণ করিয়া ধ্রুবকে উপদেশ দিত ও দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত করিবার জন্য ভৎর্সনা করিত, ধ্রুবও পৃথিবীর হিতার্থে সেই সকল উপদেশ ও ভৎর্সনা সেইরূপ ভঙ্গীতে প্রত্যর্পণ করা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য জ্ঞান করিত। রাজা মেয়েটিকে মারিলেন না, ধ্রুব স্পষ্টই দেখিল তাহার উপদেশ নিষ্ফল নহে।

তার পরে ধ্রুব মুরুব্বির ভাব ধারণ করিয়া কোন প্রকার বিপদের আশঙ্কা নাই জানাইয়া মেয়েটিকে পরম গাম্ভীর্য্যের সহিত আশ্বাস দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহারও কিছু মাত্র আবশ্যক ছিল না। কারণ মেয়েটি আপনা হইতে নির্ভীক ভাবে রাজার কাছে গিয়া অত্যন্ত কৌতূহল ও লোভের সহিত তাঁহার হাতের কঙ্কণ ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এইরূপে ধ্রুব কেবলমাত্র নিজের যত্নে ও পরিশ্রমে পৃথিবীতে শান্তি ও প্রেম স্থাপন করিয়া প্রসন্ন চিত্তে রাজার মুখের কাছে আপনার বেলফুলের মত মোটা গোল কোমল পবিত্র মুখখানি বাড়াইয়া দিল—রাজার সদ্ব্যবহারের পুরস্কার—রাজা চুম্বন করিলেন। তখন ধ্রুব তাহার সঙ্গিনীর মুখ তুলিয়া ধরিয়া রাজাকে অনুমতি ও অনুরোধের মাঝামাঝি-স্বরে কহিল "এ'কে চুমো কাও!" রাজা ধ্রুবের আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহস করিলেন না। মেয়েটি তখন নিমন্ত্রণের কিছুমাত্র অপেক্ষা না রাখিয়া নিতান্ত অভ্যস্ত ভাবে অম্লান বদনে রাজার কোলের উপরে চড়িয়া বসিল। এতক্ষণ জগতে কোন প্রকার অশান্তি বা উচ্ছৃঙ্খলতাব লক্ষণ ছিল না, কিন্তু এইবার ধ্রুবের সিংহাসনে টান পড়িতেই তাহার সার্ব্বভৌমিক প্রেম টলমল করিয়া উঠিল। রাজার কোলের পরে তাহার নিজের একমাত্র স্বত্ব সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা বলবতী হইয়া উঠিল। মুখ অত্যন্ত ভার হইল, মেয়েটিকে দুই একবার টানিল, এমন কি নিজের পক্ষে অবস্থা বিশেষে ছোট মেয়েকে মারাও ততটা অন্যায় বোধ হইল না। রাজা তখন মিট্‌মাট্ করিবার উদ্দেশে ধ্রুবকেও তাঁহার আধখানা কোলে টানিয়া লইলেন। কিন্তু তাহাতেও ধ্রুবের আপত্তি দূর হইল না। অপরার্দ্ধ অধিকার করিবার জন্য নূতন আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিল। এমন সময়ে নূতন রাজপুরোহিত বিল্বন ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিলেন। রাজা উভয়কেই কোল হইতে নামাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ধ্রুবকে বলিলেন "ঠাকুরকে প্রণাম কর।" ধ্রুব তাহা আবশ্যক বোধ করিল না—মুখে আঙুল পূরিয়া বিদ্রোহী ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। মেয়েটি আপনা হইতেই রাজার দেখাদেখি পুরোহিতকে প্রণাম করিল।

বিল্বন ঠাকুর ধ্রুবকে কাছে টানিয়া লইয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার এ সঙ্গী জুটিল কোথা হইতে?

ধ্রুব খানিকক্ষণ ভাবিয়া কহিল "আমি টক্‌টক্‌ চ'ব।" টক্‌টক্‌ অর্থে ঘোড়া। চড়ব শব্দের মধ্যবর্ত্তী ড় লুপ্ত, বঙ্গভাষার উপরে এরূপ যথেচ্ছ হস্তক্ষেপ করিতে ধ্রুব কুণ্ঠিত হইত না।

পুরোহিত কহিলেন—"বাহবা, প্রশ্ন এবং উত্তরের মধ্যে কি সামঞ্জস্য।"

সহসা মেয়েটির দিকে ধ্রুবের চক্ষু পড়িল, তাহার সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে আপনার মত ও অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিল "ও দুষ্টু, ওকে মা'ব!" বলিয়া আকাশে আপনার ক্ষুদ্র মুষ্টি নিক্ষেপ করিল।

রাজা গম্ভীর ভাবে কহিলেন "ছি ধ্রুব!"

একটি ফুঁয়ে যেমন প্রদীপ নিবিয়া যায় তেমনি তৎক্ষণাৎ ধ্রুবের মুখ ম্লান হইয়া গেল। প্রথমে সে অশ্রু নিবারণের জন্য দুই মুষ্টি দিয়া দুই চক্ষু রগড়াইতে লাগিল—অবশেষে দেখিতে দেখিতে ক্ষুদ্র স্ফীত হৃদয় আর ধারণ করিতে পারিল না কাঁদিয়া উঠিল। বিল্বন ঠাকুর তাহাকে নাড়িয়া চাড়িয়া কোলে লইয়া আকাশে তুলিয়া ভূমিতে নামাইয়া অস্থির করিয়া তুলিলেন, উচ্চৈঃস্বরে ও দ্রুত উচ্চারণে বলিলেন "শোন শোন ধ্রুব, শোন—তোমাকে শ্লোক বলি শোন—

কলহ কটকটাং কাঠ কাঠিন্ত কাট্যং
কটন কিটন কীটং কুট্মলং খট্টমট্টং—

অর্থাৎ বিনা যে ছেলে কাঁদে তাকে কলহ কটকটাঙ্গের মধ্যে পুরে খুব করে কাঠ কাঠিন্ত-কাট্যং দিতে হয়, তার পরে এতগুলো কটন কিটন কীটং নিয়ে একেবারে তিন দিন ধ'রে কুট্মলং খট্টমট্টং—"পুরোহিত ঠাকুর এইরূপ অনর্গল বকিয়া গেলেন। ধ্রুবের ক্রন্দন অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই একেবারে লুপ্ত হইয়া গেল। সে প্রথমে গোলেমালে বিব্রত ও অবাক্‌ হইয়া বিল্বন ঠাকুরের মুখের দিকে সজল চক্ষু তুলিয়া চাহিয়া রহিল। তার পরে তাঁর হাত মুখনাড়া দেখিয়া তাহার অত্যন্ত কৌতুক বোধ হইল। সে ভারি খুসী হইয়া বলিল "আবার বল।" পুরোহিত আবার বকিয়া গেলেন। ধ্রুব অত্যন্ত হাসিতে হাসিতে বলিল "আবার বল।" রাজা ধ্রুবের অশ্রুসিক্ত কপোলে এবং হাসি ভরা অধরে বারবার চুম্বন করিলেন। তখন রাজা রাজপুরোহিত ও দুটি ছেলে মেয়ে মিলিয়া খেলা পড়িয়া গেল।

বিল্বন ঠাকুর রাজাকে কহিলেন—"মহারাজ ইহাদের লইয়া বেশ আছেন। দিনরাত প্রখর বুদ্ধিমানদের সঙ্গে থাকিলে বুদ্ধি লোপ পায়। ছুরিতে অবিশ্রাম শাণ পড়িলে ছুরি ক্রমেই সূক্ষ্ম হইয়া অন্তর্ধান করে। একটা মোটা বাঁট কেবল অবশিষ্ট থাকে!"

রাজা হাসিয়া কহিলেন "এখনো তবে বোধ করি আমার সূক্ষ্ম বুদ্ধির লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই।"

বিল্বন—"না। সূক্ষ্মবুদ্ধির একটা লক্ষণ এই যে তাহা সহজ জিনিষকে শক্ত করিয়া তুলে। পৃথিবীতে বিস্তর বুদ্ধিমান না থাকিলে পৃথিবীর কাজ অনেকটা সোজা হইত। নানা রূপ সুবিধা ক'রতে গিয়াই নানা রূপ অসুবিধা ঘটে। অধিক বুদ্ধি লইয়া মানুষ কি করিবে ভাবিয়া পায় না।"

রাজা কহিলেন—"পাঁচটা আঙুলেই বেশ কাজ চলিয়া যায়—দুর্ভাগ্য ক্রমে সাতটা আঙুল পাইলে ইচ্ছা করিয়া কাজ বাড়াইতে হয়।" রাজা ধ্রুবকে ডাকিলেন। ধ্রুব তাহার সঙ্গিনীর সহিত পুনরায় শান্তি স্থাপন করিয়া খেলা করিতেছিল। রাজার ডাক শুনিয়া তৎক্ষণা

খেলা ছাড়িয়া রাজার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা তাহাকে সম্মুখে বসাইয়া কহিলেন "ধ্রুব সেই নূতন গানটি ঠাকুরকে শোনাও কিন্তু ধ্রুব নিতান্ত আপত্তির ভাবে ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিল। রাজা লোভ দেখাইয়া বলিলেন—"তোমাকে টকটক্ চড়তে দেব।" ধ্রুব তাহার আধ আধ উচ্চারণে বলিতে লাগিল—

(আমায়) ছ'জনায় মিলে পথ দেখায় বলে
পদে পদে পথ ভুলিহে।
নানা কথার ছলে নানান্ মুনি বলে
সংশয়ে তাই দুলি হে।
তোমার কাছে যাব এই ছিল সাধ,
তোমার বাণী শুনে ঘুচাব প্রমাদ,
কাণের কাছে সবাই করিছে বিবাদ
শত লোকের শত বুলি হে !
কাতর প্রাণে আমি তোমায় যখন যাচি
আড়ল ক'রে সবাই দাঁড়ায় কাছাকাছি,
ধরণীর ধূলো তাই নিয়ে আছি
পাইনে চরণ-ধূলি হে !
শত ভাগ মোর শত দিকে ধায়,
আপনা আপনি বিবাদ বাধায়,
কারে সামালিব এ কি হল দায়
একা যে অনেক গুলিহে !
আমায় এক কর তোমার প্রেমে বেঁধে,
এক পথ আমায় দেখও অবিচ্ছেদে—
ধাঁদার মাঝে পড়ে কত মরি কেঁদে
চরণেতে লহ তুলি হে !

ধ্রুবের মুখে আধ আধ স্বরে এই কবিতা শুনিয়া বিল্বন ঠাকুর নিতান্ত বিগলিত হইয়া গেলেন। তিনি বলিলেন "আশীর্ব্বাদ করি তুমি চিরজীবী হইয়া থাক।" ধ্রুবকে কোলে তুলিয়া লইয়া ঠাকুর অনেক মিনতি করিয়া বলিলেন "আরেকবার শুনাও।"

ধ্রুব সুদৃঢ় মৌন আপত্তি প্রকাশ করি[illegible]। পুরোহিত চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া কহিলেন "তবে আমি কাঁদি।"

ধ্রুব ঈষৎ বিচলিত হইয়া কহিল—"কাল শোনাব। ছি কাঁদ্‌তে নেই। তুমি একন্ বামি (বাড়ি) যাও। বাবা মা'বে।"

বিল্বন হাসিয়া কহিলেন "মধুর গলাধাক্কা।" রাজার নিকটে বিদায় লইয়া পুরোহিত ঠাকুর পথে বাহির হইলেন।

পথে দুই জন পথিক যাইতেছিল। এক-জন আরেক জনকে কহিতেছিল "তিন দিন তার দরোজায় মাথা ভেঙ্গে মলুম একপয়সা বের করতে পারলুম না—এইবার সে পথে বেরোলে তার মাথা ভাঙ্গবো দেখি তা'তে কি হয়।"

পিছন হইতে বিল্বন কহিলেন। "তাতেও কোন ফল হবে না। দেখ্‌তেই ত পাচ্ছ বাপু মাথার মধ্যে কিছুই থাকে না কেবল দুর্ব্বুদ্ধি আছে! বরঞ্চ নিজের মাথা ভাঙ্গা ভাল, কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না।"

পথিকদ্বয় শশব্যস্ত ও অপ্রতিভ হইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিল। বিল্বন কহিলেন "বাপু তোমরা যে কথা বল্‌ছিলে, সে কথা-গুলো ভাল নয়।"

পথিকদ্বয় কহিল "যে আজ্ঞে ঠাকুর, আর এমন কথা বল্‌ব না।" পুরোহিত ঠাকুরকে পথে ছেলেরা ঘিরিল। তিনি কহিলেন "আজ বিকালে আমার ওখেনে যাস্ আমি আজ গল্প শোনাব।" আনন্দে ছেলেরা লাফালাফি চেঁচামেচি বাধাইয়া দিল। বিল্বন ঠাকুর এক একদিন অপরাহ্নে রাজ্যের ছেলে জড় করিয়া তাহাদিগকে সহজ ভাষায় রামায়ণ মহাভারত ও পৌরাণিক গল্প শোনাইতেন। মাঝে মাঝে দুই একটা নীরস কথাও যথাসাধ্য রসসিক্ত করিয়া বলিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু যখন

দেখিতেন ছেলেদের মধ্যে হাই তোলা সংক্রামক হইয়া উঠিতেছে—তখন তাহাদের মন্দিরের বাগানে ছাড়িয়া দিতেন। সেখানে ফলের গাছ অসংখ্য আছে। ছেলে গুলো আকাশভেদী চীৎকার শব্দে বানরের মত ডালে ডালে লুঠপাট বাধাইয়া দিত—বিল্বন আমোদ দেখিতেন।

বিল্বন সন্ন্যাসী পরমহংস। তিনি কোন দেশী লোক কেহ জানে না। ব্রাহ্মণ, কিন্তু উপবীত ত্যাগ করিয়াছেন। বলিদান প্রভৃতি বন্ধ করিয়া এক প্রকার নূতন অনুষ্ঠানে কালীর পূজা করিয়া থাকেন—প্রথম প্রথম তাহাতে লোকেরা সন্দেহ ও আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু এখন সমস্ত সহিয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ বিল্বনের কথায় সকলে বশ। বিল্বন সকলের বাড়ি বাড়ি গিয়া সকলের সঙ্গে আলাপ করেন, সকলের সংবাদ লন, এবং রোগীকে যাহা ঔষধ দেন তাহা আশ্চর্য্য খাটিয়া যায়। বিপদে আপদে সকলেই তাঁহার পরামর্শমতে কাজ করে—তিনি মধ্যবর্ত্তী হইয়া কাহারো বিবাদ মিটাইয়া দিলে বা কিছুর মীমাংসা করিয়া দিলে তাহার উপরে আর কেহ কথা কহে না।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

এই বৎসরে ত্রিপুরায় এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিল। উত্তর হইতে সহসা পালে পালে ইঁদুর ত্রিপুরার শস্যক্ষেত্রে আসিয়া পড়িল। শস্য সমস্ত নষ্ট করিয়া ফেলিল, এমন কি, কৃষকের ঘরে শস্য যত কিছু সঞ্চিত ছিল তাহাও অধিকাংশ খাইয়া ফেলিল—রাজ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। দেখিতে দেখিতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। বন হইতে ফল মূল আহরণ করিয়া লোকে প্রাণ ধারণ করিতে লাগিল। বনের অভাব নাই, এবং বনে নানা প্রকার আহার্য্য উদ্ভিজ্জও আছে। মৃগয়ালব্ধ মাংস বাজারে মহার্ঘ মূল্যে বিক্রয় হইতে লাগিল। লোকে বুনো মহিষ, হরিণ, খরগোষ সজারু কাঠবিড়ালি, বরা, বড় বড় স্থলকচ্ছপ শিকার করিয়া খাইতে লাগিল—হাতি পাইলে হাতিও খায়—অজগর সাপ খাইতে লাগিল—বনে আহার্য্য পাখীর অভাব নাই—গাছের কোটরের মধ্যে মৌচাক ও মধু পাওয়া যায়—স্থানে স্থানে নদীর জল বাঁধিয়া তাহাতে মাদক লতা ফেলিয়া দিলে মাছেরা অবশ হইয়া ভাসিয়া উঠে, সেই সকল মাছ ধরিয়া লোকেরা খাইতে লাগিল এবং শুকাইয়া সঞ্চয় করিল। বিল্বন ঠাকুর কুটিরে কুটিরে ভ্রমণ করিয়া সকলকে অভয় দিতে লাগিলেন এবং আহার্য্য সংগ্রহের নানা উপায় বলিয়া দিতে লাগিলেন—তিনি দেখাইয়া দিলেন বনে একপ্রকার গুল্ম পাওয়া যায় তাহার ছোট ছোট বীজ সিদ্ধ করিলে দুধের মত শ্বেত পদার্থ বাহির হয়, তাহা অল্প পরিমাণে খাইলেই অতি শীঘ্র ক্ষুধা নিবারণ হইয়া যায়। আহার এখনো কোন ক্রমে চলিয়া যাইতেছে বটে কিন্তু অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। স্থানে স্থানে চুরি ডাকাতি আরম্ভ হইল; প্রজারা বিদ্রোহের লক্ষণ প্রকাশ করিল। তাহারা বলিতে লাগিল, মায়ের বলি বন্ধ করাতে মায়ের অভিশাপে এই সকল দুর্ঘটনা ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিল্বন ঠাকুর সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। তিনি উপহাসচ্ছলে কহিলেন—কৈলাসে কার্ত্তিক গণেশের মধ্যে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, কার্ত্তিকের ময়ূর গণেশের ইঁদুরদের তাড়া করিয়াছে, তাই ইঁদুরগুলো ত্রিপুরায় ত্রিপুরেশ্বরীর কাছে নালিশ করিতে আসিয়াছে। প্রজারা এ কথা

নিতান্ত উপহাসের ভাবে গ্রহণ করিল না। তাহারা দেখিল বিল্বন ঠাকুরের কথামত ইঁদুরের স্রোত যেমন দ্রুতবেগে আসিল তেমনি দ্রুতবেগে সমস্ত শস্য নষ্ট করিয়া কোথায় অন্তর্ধান করিল—তিন দিনের মধ্যে তাহাদের আর চিহ্নমাত্র রহিল না। বিল্বন ঠাকুরের অগাধ জ্ঞানের সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ রহিল না। কৈলাসে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ সম্বন্ধে গান রচিত হইতে লাগিল—মেয়েরা ছেলেরা ভিক্ষুকেরা সেই গান গাহিতে লাগিল, পথে ঘাটে সেই গান প্রচলিত হইল। কিন্তু রাজার প্রতি বিদ্বেষভাব ভাল করিয়া ঘুচিল না। বিল্বন ঠাকুরের পরামর্শ মতে গোবিন্দমাণিক্য দুর্ভিক্ষগ্রস্ত প্রজাদের একবৎসর খাজনা মাপ করিলেন। তাহার কতকটা ফল হইল। কিন্তু তবুও অনেকে মায়ের অভিশাপ এড়াইবার জন্য চট্টগ্রামে পার্ব্বত্য প্রদেশে পলায়ন করিতে লাগিল। এমন কি রাজার মনে সন্দেহের উদয় হইতে লাগিল। তিনি বিল্বনকে ডাকিয়া কহিলেন "ঠাকুর, রাজার পাপেই প্রজা কষ্ট পায়। আমি কি মায়ের বলি বন্ধ করিয়া পাপ করিয়াছি? তাহারই কি এই শাস্তি?"

বিল্বন সমস্ত কথা একেবারে উড়াইয়া দিলেন। তিনি কহিলেন "মায়ের কাছে যখন হাজার নরবলি হইত তখন আপনার অধিক প্রজাহানি হইয়াছে, না এই দুর্ভিক্ষে অধিক হইয়াছে?"

রাজা নিরুত্তর হইয়া রহিলেন কিন্তু তাঁহার মনের মধ্য হইতে সংশয় সম্পূর্ণ দূর হইল না। প্রজারা তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছে, তাঁহার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করিতেছে, ইহাতে তাঁহার হৃদয়ে আঘাত লাগিয়াছে, তাঁহার নিজের প্রতিও নিজের সন্দেহ জন্মিয়াছে। তিনি নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন "কিছুই বুঝিতে পারি না।"

বিল্বন কহিলেন "অধিক বুঝিবার আবশ্যক কি? কেন কতকগুলো ইঁদুর আসিয়া শস্য খাইয়া গেল তাহা নাই বুঝিলাম! আমি অন্যায় করিব না, আমি সকলের হিত করিব, এইটুকু স্পষ্ট বুঝিলেই হইল। তার পরে বিধাতার কাজ বিধাতা করিবেন, তিনি আমাদের হিসাব দিতে আসিবেন না।"

রাজা কহিলেন "ঠাকুর তুমি গৃহে গৃহে ফিরিয়া অবিশ্রাম কাজ করিতেছ—পৃথিবীর যতটুকু হিত করিতেছ ততটুকুই তোমার পুরস্কার হইতেছে; এই আনন্দে তোমার সমস্ত সংশয় চলিয়া যায়। আমি কেবল দিনরাত্রি একটা মুকুট মাথায় করিয়া সিংহাসনের উপরে চড়িয়া বসিয়া আছি—কেবল কতকগুলো চিন্তা ঘাড়ে করিয়া আছি, তোমার কাজ দেখিলে আমার লোভ হয়।"

বিল্বন কহিলেন "মহারাজ, আমি তোমারই ত এক অংশ; তুমি ঐ সিংহাসনে চড়িয়া না থাকিলে আমি কি কাজ করিতে পারিতাম! তোমাতে আমাতে মিলিয়া আমরা উভয়ে সম্পূর্ণ হইয়াছি!"

এই বলিয়া বিল্বন বিদায় গ্রহণ করিলেন—রাজা মুকুট মাথায় করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। মনে মনে কহিলেন "আমার কাজ যথেষ্ট রহিয়াছে, আমি তাহার কিছুই করি না। আমি কেবল আমার চিন্তা লইয়াই নিশ্চিন্ত রহিয়াছি। সেই জন্যই আমি প্রজাদের বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে পারি না। রাজ্যশাসনের আমি যোগ্য নই।"

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

মোগল সৈন্যের কর্ত্তা হইয়া নক্ষত্ররায় পথের মধ্যে তেঁতুলে নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে বিশ্রাম করিতেছিলেন। প্রভাতে রঘুপতি আসিয়া কহিলেন "যাত্রা করিতে হইবে, মহারাজ প্রস্তুত হোন্।"

সহসা রঘুপতির মুখে মহারাজ শব্দ অত্যন্ত মিষ্ট শুনাইল। নক্ষত্ররায় উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। তিনি কল্পনায় পৃথিবীসুদ্ধ লোকের মুখ হইতে মহারাজ সম্ভাষণ শুনিতে লাগিলেন—তিনি মনে মনে ত্রিপুরার উচ্চ সিংহাসনে চড়িয়া সভা উজ্জ্বল করিয়া বসিলেন। মনের আনন্দে বলিলেন—"ঠাকুর আপনাকে কখনই ছাড়া হইবে না। আপনাকে সভায় থাকিতে হইবে। আপনি কি চান্ সেইটে আমাকে বলুন।" নক্ষত্ররায় মনে মনে রঘুপতিকে তৎক্ষণাৎ বৃহৎ একখণ্ড জায়গীর অবলীলাক্রমে দান করিয়া ফেলিলেন।

রঘুপতি কহিলেন "আমি কিছু চাহি না।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন "সে কি কথা! তা হইবে না ঠাকুর। কিছু লইতেই হইবে। কয়লাসর পরগণা আমি আপনাকে দিলাম—আপনি লেখাপড়া করিয়া লউন।"

রঘুপতি কহিলেন "সে সকল পরে দেখা যাইবে।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন "পরে কেন, আমি এখনি দিব। সমস্ত কয়লাসর পরগণা আপনারই হইল; আমি এক পয়সা খাজনা লইব না।" বলিয়া নক্ষত্ররায় মাথা তুলিয়া অত্যন্ত সোজা হইয়া বসিলেন।

রঘুপতি কহিলেন—"মরিবার জন্ত তিন হাত জমি মিলিলেই আমি সুখী হইব। আমি আর কিছু চাহি না।" বলিয়া রঘুপতি চলিয়া গেলেন। তাঁহার জয়সিংহকে মনে পড়িয়াছে। জয়সিংহ যদি থাকিত তবে পুরস্কারের স্বরূপ কিছু লইতেন—জয়সিংহ যখন নাই তখন সমস্ত ত্রিপুরারাজ্য মৃত্তিকার সমষ্টি ছাড়া আর কিছু মনে হইল না।

রঘুপতি এখন নক্ষত্ররায়কে রাজাভিমানে মত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার মনের মধ্যে ভয় আছে পাছে এত আয়োজন করিয়া সমস্ত ব্যর্থ হয়; পাছে দুর্ব্বলস্বভাব নক্ষত্ররায় ত্রিপুরায় গিয়া বিনাযুদ্ধে রাজার নিকট ধরা দেন। কিন্তু দুর্ব্বল হৃদয়ে একবার রাজ্যমদ জন্মিলে আর ভাবনা নাই। রঘুপতি নক্ষত্ররায়ের প্রতি আর অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন না, কথায় কথায় তাঁহার সম্মান দেখাইয়া থাকেন। সকল বিষয়ে তাঁহার মৌখিক আদেশ লইয়া থাকেন। মোগল-সৈন্যেরা তাঁহাকে মহারাজা সাহেব বলে, তাঁহাকে দেখিলে শশব্যস্ত হইয়া উঠে—বায়ু বহিলে যেমন সমস্ত শস্যক্ষেত্র নত হইয়া যায় তেমনি নক্ষত্ররায় আসিয়া দাঁড়াইলে সারি সারি মোগল সেনা এক সঙ্গে মাথা নত করিয়া সেলাম করে। সেনাপতি সসম্ভ্রমে তাঁহাকে অভিবাদন করেন। শত শত মুক্ত তরবারির জ্যোতির মধ্যে বৃহৎ হস্তীর পৃষ্ঠে রাজচিহ্ন অঙ্কিত স্বর্ণমণ্ডিত হাওদায় চড়িয়া তিনি যাত্রা করেন, সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসজনক বাদ্য বাজিতে থাকে—সঙ্গে সঙ্গে নিশানধারী রাজনিশান ধরিয়া চলে। তিনি যেখান দিয়া যান, সেখানকার গ্রামের লোক সৈন্যের ভয়ে ঘর বাড়ি ছাড়িয়া পালাইয়া যায়। তাহাদের ত্রাস দেখিয়া নক্ষত্ররায়ের মনে গর্ব্বের উদয় হয়। তাঁহার মনে হয় আমি দিগ্বিজয় করিয়া চলিয়াছি। ছোট ছোট জমিদারগণ নানাবিধ উপঢৌকন লইয়া আসিয়া

তাঁহাকে সেলাম করিয়া যায়—তাহাদিগকে পরাজিত নৃপতি বলিয়া বোধ হয়—মহাভারতের দিগ্বিজয়ী পাণ্ডবদের কথা মনে পড়ে।

এক দিন সৈন্যেরা আসিয়া সেলাম করিয়া কহিল "মহারাজ সাহেব!" নক্ষত্ররায় খাড়া হইয়া বসিলেন "আমরা মহারাজের জন্য জান দিতে আসিয়াছি—আমরা জানের পরোয়া রাখি না। বরাবর আমাদের দস্তুর আছে—লড়াইয়ে যাইবার পথে আমরা গ্রাম লুঠ করিয়া যাই—কোন শাস্ত্রে ইহাতে দোষ লিখে না।"

নক্ষত্ররায় মাথা নাড়িয়া কহিলেন "ঠিক কথা, ঠিক কথা, !"

সৈন্যেরা কহিল "ব্রাহ্মণ ঠাকুর আমাদের লুঠ করিতে বারণ করিয়াছেন। আমরা জান্ দিতে যাইতেছি অথচ একটু লুঠ করিতে পারব না এ বড় অবিচার!"

নক্ষত্ররায় পুনশ্চ মাথা নাড়িয়া কহিলেন "ঠিক কথা, ঠিক কথা।"

"মহারাজার যদি হুকুম মিলে ত আমরা ব্রাহ্মণ ঠাকুরের কথা না মানিয়া লুঠ করিতে যাই।"

নক্ষত্ররায় অত্যন্ত স্পর্দ্ধার সহিত কহিলেন "ব্রাহ্মণ ঠাকুর কে? ব্রাহ্মণ ঠাকুর কি জানে! আমি তোমাদিগকে হুকুম দিতেছি তোমরা লুঠপাট করিতে যাও" বলিয়া একবার ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিলেন—কোথাও রঘুপতিকে দেখিতে না পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু রঘুপতিকে এইরূপে অকাতরে লঙ্ঘন করিয়া তিনি মনের মধ্যে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন। ক্ষমতামদ মদিরার মত তাঁহার শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হইতে লাগিল। পৃথিবীকে নূতন চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। কাল্পনিক বেলুনের উপরে চড়িয়া পৃথিবীটা যেন অনেক নিম্নে মেঘের মত মিলাইয়া গেল। এমন কি, মাঝে মাঝে কদাচ কখনো রঘুপতিকেও কিছুই না বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সহসা বলপূর্ব্বক গোবিন্দমাণিক্যের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। মনে মনে বার বার করিয়া বলিতে লাগিলেন "আমাকে নির্ব্বাসন! একটা সামান্য প্রজার মত আমাকে বিচার সভায় আহ্বান! এবার দেখি কে কাহাকে নির্ব্বাসিত করে। এবার ত্রিপুরাসুদ্ধ লোক নক্ষত্ররায়ের প্রতাপ অবগত হইবে!" নক্ষত্ররায় ভারি উৎফুল্ল ও স্ফীত হইলেন। নিরীহ গ্রামবাসীদের প্রতি অনর্থক উৎপীড়ন ও লুঠপাটের প্রতি রঘুপতির বিশেষ বিরাগ ছিল। নিবারণ করিবার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সৈন্যেরা নক্ষত্ররায়ের আজ্ঞা পাইয়া তাঁহাকে অবহেলা করিল। তিনি নক্ষত্ররায়ের কাছে বলিলেন "অসহায় গ্রামবাসীদের উপরে কেন এ অত্যাচার!"

নক্ষত্ররায় কহিল "ঠাকুর এসব বিষয়ে তুমি ভাল বোঝ না। যুদ্ধ বিগ্রহের সময় সৈন্যদের লুঠপাটে নিষেধ করিয়া নিরুৎসাহ করা ভাল না।"

নক্ষত্ররায়ের কথা শুনিয়া রঘুপতি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন। সহসা নক্ষত্ররায়ের শ্রেষ্ঠত্বাভিমান দেখিয়া তিনি মনে মনে হাসিলেন। কহিলেন "এখন লুঠপাট করিতে দিলে পরে ইহাদিগকে সামলান দায় হইবে। সমস্ত ত্রিপুরা লুঠিয়া লইবে।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন "তাহাতে হানি কি? আমি ত তাহাই চাই। ত্রিপুরা একবার বুঝুক নক্ষত্ররায়কে নির্ব্বাসিত করার ফল কি। ঠাকুর এসব বিষয়ে তুমি কিছু বুঝ না— তুমি ত কখন যুদ্ধ কর নাই।

রঘুপতি মনে মনে অত্যন্ত আমোদ বোধ করিলেন। কিছু উত্তর না করিয়া চলিয়া গেলেন। নক্ষত্ররায় নিতান্ত পুত্তলিকার মত না হইয়া একটু শক্ত মানুষের মত হন, এই তাঁহার ইচ্ছা ছিল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

ত্রিপুরায় ইন্দুরের উৎপাত যখন আরম্ভ হয় তখন শ্রাবণ মাস। তখন ক্ষেত্রে কেবল ভুট্টা ফলিয়াছিল এবং পাহাড়ে জমিতে ধান্য ক্ষেত্রেও পাক ধরিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তিনমাস কোনমতে কাটিয়া গেল—অগ্রহায়ণ মাসে নিম্ন ভূমিতে যখন ধান কাটিবার সময় আসিল তখন দেশে আনন্দ পড়িয়া গেল। চাষারা * স্ত্রীলোক বালক যুবক বৃদ্ধ সকলে মিলিয়া দা হাতে লইয়া ক্ষেত্রে গিয়া পড়িল। হৈয়া হৈয়া শব্দে পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান করিতে লাগিল—জুমিয়া রমণীদের গানে মাঠ বাট ধ্বনিত হইয়া উঠিল। রাজার প্রতি অসন্তোষ দূর হইয়া গেল—রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইল। এমন সময়ে সংবাদ আসিল, নক্ষত্ররায় রাজ্য আক্রমণের উদ্দেশে বহুসংখক সৈন্য লইয়া ত্রিপুরা রাজ্যের সীমানায় আসিয়া পৌছিয়াছেন—এবং অত্যন্ত লুঠপাট উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। এই সংবাদে সমস্ত রাজ্য সশঙ্কিত হইয়া উঠিল।

এ সংবাদ রাজার বক্ষে ছুরীর মত বিদ্ধ হইল। সমস্ত দিনই তাঁহাকে বিঁধিতে লাগিল। থাকিয়া থাকিয়া কেবলি প্রত্যেকবার নূতন করিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল নক্ষত্ররায় তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। নক্ষত্র রায়ের সরল সুন্দর মুখ শতবার তাঁহার স্নেহ-চক্ষের সম্মুখে দেখিতে লাগিলেন এবং সেই সঙ্গেই মনে হইতে লাগিল সেই নক্ষত্ররায় কতকগুলো সৈন্যসংগ্রহ করিয়া তলোয়ার হাতে লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। এক একবার তাঁহার মনে মনে ইচ্ছা করিতে লাগিল—একটি সৈন্যও না লইয়া নক্ষত্ররায়ের সম্মুখে বৃহৎ রণক্ষেত্রে একা দাঁড়াইয়া সমস্ত বক্ষঃস্থল আবরিত করিয়া নক্ষত্ররায়ের সহস্র সৈনিকের তরবারি এককালে তাঁহার হৃদয়ে গ্রহণ করেন। তিনি ধ্রুবকে কাছে টানিয়া বলিলেন "ধ্রুব, তুইও কি এই মুকুটখানার জন্য আমার সঙ্গে ঝগড়া করিতে পারিস্?" বলিয়া মুকুট ভূমিতে ফেলিয়া দিলেন, একটি বড় মুক্তা ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল।

ধ্রুব আগ্রহের সহিত হাত বাড়াইয়া কহিল "আমি নেব।"

রাজা ধ্রুবের মাথায় মুকুট পরাইয়া তাহাকে কোলে লইয়া কহিলেন "এই লও—আমি কাহারও সহিত ঝগড়া করিতে চাই না।" বলিয়া অত্যন্ত আবেগের সহিত ধ্রুবকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। তাহার পরে সমস্ত দিন ধরিয়া "এ কেবল আমারই পাপের শাস্তি" বলিয়া রাজা নিজের সহিত তর্ক করিতে লাগিলেন। নহিলে ভাই কখনও ভাইকে আক্রমণ করে না। ইহা মনে করিয়া তাঁহার কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা হইল। তিনি মনে করিলেন ইহা ঈশ্বরের বিধান। জগৎপতির দরবার হইতে আদেশ আসিয়াছে, ক্ষুদ্র নক্ষত্ররায় কেবল

---

* প্রকৃত পক্ষে ইহাদের চাষা বলা যায় না—কারণ ইহারা রীতি ত চাষ করে না। জঙ্গল দগ্ধ করিয়া বর্ষাস্তে বীজ বপন করে মাত্র। এইরূপ ক্ষেত্রকে জুম বলে—কৃষকদিগকে জুমিয়া বলে।

তাহার মানব হৃদয়ের প্ররোচনায় তাহা লঙ্ঘন করিতে পারে না। এই মনে করিয়া তাঁহার আহত স্নেহ কিছু শান্তি পাইল। পাপ তিনি নিজের স্কন্ধে লইতে রাজি আছেন—নক্ষত্র রায়ের পাপের ভার যেন তাহাতে কতকটা কমিয়া যায়।

বিল্বন আসিয়া কহিলেন "মহারাজ, এ সময় কি আকাশের দিকে তাকাইয়া ভাবিবার সময় ?

রাজা কহিলেন "ঠাকুর, এ সকল আমারই পাপের ফল !"

বিল্বন কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া কহিলেন "মহারাজ, এই সকল কথা শুনিলে আমার ধৈর্য্য থাকে না। দুঃখ যে পাপেরই ফল তাহা কে বলিল, পুণ্যের ফলও হইতে পারে। কত ধর্ম্মাত্মা আজীবন দুঃখে কাটাইয়া গিয়াছেন। সুখ পুণ্যের ফল নহে, পুণ্যই পুণ্যের ফল।"

রাজা নিরুত্তর হইয়া রহিলেন।

বিল্বন জিজ্ঞাসা করিলেন "মহারাজ কি পাপ করিয়াছিলেন যাহার ফলে এই ঘটনা ঘটিল !"

রাজা কহিলেন "আপন ভাইকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলাম।"

বিল্বন কহিলেন "আপনি ভাইকে নির্ব্বাসিত করেন নাই। দোষীকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন।"

রাজা কহিলেন "দোষী হইলেও তথাপি ভাইকে নির্ব্বাসনের পাপ আছেই। তাহার ফল হইতে নিস্তার পাওয়া যায় না। কৌরবেরা দুরাচারী হইলেও পাণ্ডবেরা তাঁহাদিগকে বধ করিয়া প্রসন্নচিত্তে রাজ্যসুখভোগ করিতে পারিলেন না। যজ্ঞ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলেন! পাণ্ডবেরা কৌরবদের নিকট হইতে রাজ্য লইলেন, কৌরবেরা মরিয়া গিয়া পাণ্ডবদের রাজ্য হরণ করিলেন। আমি নক্ষত্রকে নির্ব্বাসিত করিয়াছি নক্ষত্র আমাকে নির্ব্বাসিত করিতে আসিতেছে।"

বিল্বন কহিলেন—"পাণ্ডবেরা পাপের শাস্তি দিবার জন্য কৌরবদের সহিত যুদ্ধ করেন নাই, তাঁহারা রাজ্যলাভের জন্য করিয়াছিলেন। কিন্তু মহারাজ পাপের শাস্তি দিয়া নিজের সুখ দুঃখ উপেক্ষা করিয়া ধর্ম্মপালন করিয়াছিলেন। ইহাতে আমি ত পাপ কিছুই দেখিতেছি না। তবে প্রায়শ্চিত্তের বিধি দিতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। আমি ব্রাহ্মণ উপস্থিত আছি, আমাকে সন্তুষ্ট করিলেই প্রায়শ্চিত্ত হইবে।"

রাজা ঈষৎ হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। বিল্বন কহিলেন "সে যাহাই হউক্—এখন যুদ্ধের আয়োজন করুন। আর বিলম্ব করিবেন না।"

রাজা কহিলেন—"আমি যুদ্ধ করিব না।"

বিল্বন কহিলেন "সে হইতেই পারে না। আপনি বসিয়া বসিয়া ভাবুন। আমি ততক্ষণ সৈন্যসংগ্রহের চেষ্টা করিগে। সকলেই এখন জুমে গিয়াছে, যথেষ্ট সৈন্য পাওয়া কঠিন।"

বলিয়া আর কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া বিল্বন চলিয়া গেলেন। ধ্রুবের সহসা কি মনে হইল; সে রাজার কাছে আসিয়া রাজার মুখের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কাকা কোথায়!" নক্ষত্ররায়কে ধ্রুব কাকা বলিত।

রাজা কহিলেন "কাকা আসিতেছেন ধ্রুব।" তাঁহার চোখের পাতা ঈষৎ আর্দ্র হইয়া গেল।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।



বিল্বন ঠাকুরের বিস্তর কাজ পড়িয়া গেল। তিনি চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে নানা উপহার সমেত দ্রুতগামী দূত পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে কুকী-গ্রামপতিদের নিকটে কুকী-সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। যুদ্ধের নাম শুনিয়া তাহারা নাচিয়া উঠিল। কুকীদের যত লাল (গ্রামপতি) ছিল তাহারা যুদ্ধের সংবাদস্বরূপ লাল বস্ত্রখণ্ডে বাঁধা দা দূতহস্তে গ্রামে গ্রামে পাঠাইয়া দিল। দেখিতে দেখিতে কুকীর স্রোত চট্টগ্রামের শৈলশৃঙ্গ হইতে ত্রিপুরার শৈলশৃঙ্গে আসিয়া পড়িল। তাহাদিগকে কোন নিয়মের মধ্যে সংযত করিয়া রাখাই দায়। বিল্বন স্বয়ং ত্রিপুরার গ্রামে গ্রামে গিয়া জুম হইতে বাছিয়া বাছিয়া সাহসী যুবা পুরুষদিগকে সৈন্যশ্রেণীতে সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। অগ্রসর হইয়া মোগল-সৈন্যদিগকে আক্রমণ করা বিল্বন ঠাকুর সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। যখন তাহারা সমতলক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া অপেক্ষাকৃত দুর্গম শৈলশৃঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন অরণ্য, পর্ব্বত ও নানা দুর্গম গুপ্ত স্থান হইতে তাহাদিগকে সহসা আক্রমণ করিয়া চকিত করিবেন স্থির করিলেন। বড় বড় শিলাখণ্ডের দ্বারা গোমতী নদীর জল বাঁধিয়া রাখিলেন—নিতান্ত পরাভবের আশঙ্কা দেখিলে সেই বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিয়া জলপ্লাবনের দ্বারা মোগল সৈন্যদিগকে ভাসাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

এদিকে নক্ষত্ররায় দেশ লুণ্ঠন করিতে করিতে ত্রিপুরার পার্ব্বত্য প্রদেশে আসিয়া পৌঁছিলেন। তখন জুম কাটা শেষ হইয়া গেছে। জুমিয়ারা সকলেই দা ও তীরধনু হাতে করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। কুকীদলকে উচ্ছ্বাসোন্মুখ জলপ্রপাতের মত আর বাঁধিয়া রাখা যায় না।

গোবিন্দমাণিক্য বলিলেন "আমি যুদ্ধ করিব না।"

বিল্বন ঠাকুর কহিলেন "এ কোন কাজের কথাই নহে।"

রাজা কহিলেন "আমি রাজত্ব করিবার যোগ্য নহি তাহারই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। সেই জন্য আমার প্রতি প্রজাদের বিশ্বাস নাই, সেই জন্যই দুর্ভিক্ষের সূচনা, সেই জন্যই যুদ্ধ। রাজ্য পরিত্যাগের জন্য এ সকল ভগবানের আদেশ।"

বিল্বন কহিলেন "এ কখনই ভগবানের আদেশ নহে। ঈশ্বর তোমার উপরে রাজ্যভার অর্পণ করিয়াছেন; যত দিন রাজকার্য্য নিঃসঙ্কট ছিল ততদিন তোমার সহজ কর্ত্তব্য অনায়াসে পালন করিয়াছ, যখনি রাজ্যভার গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে তখনই তাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়া তুমি স্বাধীন হইতে চাহিতেছ—এবং ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া আপনাকে ফাঁকি দিয়া সুখী করিতে চাহিতেছ।"

কথাটা গোবিন্দমাণিক্যের মনে লাগিল। তিনি নিরুত্তর হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। অবশেষে নিতান্ত কাতর হইয়া বলিলেন "মনে কর না ঠাকুর আমার পরাজয় হইয়াছে, নক্ষত্র আমাকে বধ করিয়া রাজা হইয়াছে।"

বিল্বন কহিলেন "যদি সত্য তাহাই ঘটে তাহা হইলে আমি মহারাজের জন্য শোক করিব না। কিন্তু মহারাজ যদি কর্ত্তব্যে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করেন, তবেই আমাদের শোকের কারণ ঘটিবে।"

রাজা কিঞ্চিৎ অধীর হইয়া কহিলেন "আপনার ভাইয়ের রক্তপাত করিব!"

বিল্বন কহিলেন "কর্ত্তব্যের কাছে ভাইবন্ধু কেহই নাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কি উপদেশ দিয়াছিলেন স্মরণ করিয়া দেখুন।"

রাজা কহিলেন "ঠাকুর, তুমি কি বল আমি স্বহস্তে এই তরবারি লইয়া নক্ষত্ররায়কে আঘাত করিব!"

বিল্বন কহিলেন "হাঁ।"

সহসা ধ্রুব আসিয়া অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে কহিল "ছি, ও কথা বল্‌তে নেই!" ধ্রুব খেলা করিতেছিল, দুই পক্ষের কি একটা গোলমাল শুনিয়া সহসা তাহার মনে হইল দুই জনে অবশ্যই একটা দুষ্টামি করিতেছে, অতএব সময় থাকিতে দুই জনকে কিঞ্চিৎ শাসন করিয়া আসা আবশ্যক এই সকল বিবেচনা করিয়া তিনি হঠাৎ আসিয়া ঘাড়নাড়িয়া কহিলেন "ছি ও কথা বল্‌তে নেই।" পুরোহিত ঠাকুরের অত্যন্ত আমোদ বোধ হইল; তিনি হাসিয়া উঠিলেন; ধ্রুবকে কোলে লইয়া চুমো খাইতে লাগিলেন। কিন্তু রাজা হাসিলেন না। তাঁহার মনে হইল যেন বালকের মুখে তিনি দৈববাণী শুনিলেন। তিনি অসন্দিগ্ধ স্বরে বলিয়া উঠিলেন "ঠাকুর, আমি স্থির করিয়াছি, এ রক্তপাত আমি ঘটিতে দিব না, আমি যুদ্ধ করিব না।"

বিল্বন ঠাকুর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। অবশেষে কহিলেন "মহারাজের যদি যুদ্ধ করিতেই আপত্তি থাকে তবে আর এক কাজ করুন। আপনি নক্ষত্ররায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধ হইতে বিরত করুন।"

গোবিন্দমাণিক্য কহিলেন "ইহাতে আমি সম্মত আছি।"

বিল্বন কহিলেন "তবে সেইরূপ প্রস্তাব লিখিয়া নক্ষত্ররায়ের নিকট পাঠান হউক্!" অবশেষে তাহাই স্থির হইল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নক্ষত্ররায় সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন, কোথাও তিলমাত্র বাধা পাইলেন না। ত্রিপুরার যে গ্রামেই তিনি পদার্পণ করিলেন, সেই গ্রামই তাঁহাকে রাজা বলিয়া বরণ করিতে লাগিল। পদে পদে রাজত্বের আস্বাদ পাইতে লাগিলেন—ক্ষুধা আরও বাড়িতে লাগিল—চারি দিকের বিস্তৃত ক্ষেত্র, গ্রাম, পর্ব্বতশ্রেণী, নদী সমস্তই আমার বলিয়া মনে হইতে লাগিল, এবং সেই অধিকারব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে নিজেও যেন অনেকদূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া অত্যন্ত প্রশস্ত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। মোগল-সৈন্যেরা যাহা চায় তিনি তাহাই তাহাদিগকে লইতে আজ্ঞা হুকুম দিয়া দিলেন। মনে হইল এ সমস্তই আমার এবং ইহারা আমারই রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। ইহাদিগকে কোন সুখ হইতে বঞ্চিত করা হইবে না—স্বস্থানে ফিরিয়া গিয়া মোগলেরা তাঁহার আতিথ্যের ও রাজবৎ উদারতা ও বদান্যতার অনেক প্রশংসা করিবে—বলিবে "ত্রিপুরার রাজা বড় কম নহে।" মোগল-সৈন্যদের নিকট হইতে খ্যাতি লাভ করিবার জন্য তিনি সতত্তই উৎসুক হইয়া রহিলেন। তাহারা তাঁহাকে কোন প্রকার ক্রকমধুর সম্ভাষণ করিলে তিনি নিতান্ত জল হইয়া যান। সর্ব্বদাই ভয় হয় পাছে কোন নিন্দার কারণ ঘটে।

রঘুপতি আ

যুদ্ধের ত কোন উদ্যোগ দেখা যাইতেছে না।”

নক্ষত্ররায় কহিলেন “না ঠাকুর, ভয় পাই-য়াছে।” বলিয়া অত্যন্ত হাসিতে লাগিলেন।

রঘুপতি হাসিবার বিশেষ কোন কারণ দেখিলেন না, কিন্তু তথাপিও হাসিলেন।

নক্ষত্ররায় কহিলেন “নক্ষত্ররায় নবাবের সৈন্য লইয়া আসিয়াছে। বড় সহজ ব্যাপার নহে!”

রঘুপতি কহিলেন “দেখি এবার কে কাহাকে নির্ব্বাসনে পাঠায়! কেমন?”

নক্ষত্ররায় কহিলেন “আমি ইচ্ছা করিলে নির্ব্বাসন দণ্ড দিতে পারি, কারারুদ্ধ করিতেও পারি—বধের হুকুম দিতেও পারি! এখনও স্থির করি নাই কোনটা করিব।” বলিয়া অতিশয় বিজ্ঞভাবে অনেক বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

রঘুপতি কহিলেন—“অত ভাবিবেন না মহারাজ! এখনও অনেক সময় আছে। কিন্তু আমার ভয় হইতেছে, গোবিন্দমাণিক্য যুদ্ধ না করিয়াই আপনাকে পরাভূত করিবেন।”

নক্ষত্ররায় কহিলেন “সে কেমন করিয়া হইবে।”

রঘুপতি কহিলেন “গোবিন্দমাণিক্য সৈন্য-গুলোকে আড়ালে রাখিয়া নিস্তর ভ্রাতৃস্নেহ দেখাইবেন। গলা ধরিয়া বলিবেন—ছোট ভাই আমার, এস ঘরে এস, দুধসর খাওসে। মহারাজ কাঁদিয়া বলিবেন—যে আজ্ঞে আমি এখনি যাইতেছি। অধিক বিলম্ব হইবে না।—বলিয়া নাগরা জুতা যোড়াটা পায়ে দিয়া দাদার পিছনে পিছনে মাথা নীচু করিয়া টাট্টু ঘোড়-টির মত চলিবেন। বাদশাহের মোগল ফৌজ তামাসা দেখিয়া হাসিয়া ঘরে ফিরিয়া যাইবে।”

নক্ষত্ররায় রঘুপতির মুখে এই তীব্র বিদ্রূপ শুনিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। কিঞ্চিৎ হাসিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া বলিলেন “আমাকে কি ছেলে মানুষ পাইয়াছে যে এম্‌নি করিয়া ভুলাইবে! তাহার যো নাই। সে হবে না ঠাকুর! দেখিয়া লইও!”

সেই দিন গোবিন্দমাণিক্যের চিঠি আসিয়া পৌঁছিল। সে চিঠি রঘুপতি খুলিলেন। রাজা অত্যন্ত স্নেহ প্রকাশ করিয়া সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়াছেন। চিঠি নক্ষত্ররায়কে দেখাইলেন না। দূতকে বলিয়া দিলেন “কষ্ট স্বীকার করিয়া গোবিন্দমাণিক্যের এতদূর আসিবার দরকার নাই। সৈন্য ও তরবারি লইয়া মহারাজ নক্ষত্রমাণিক্য শীঘ্রই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। গোবিন্দমাণিক্য এই অল্প কাল যেন প্রিয় ভ্রাতৃবিরহে অধিক কাতর হইয়া না পড়েন। আট বৎসর নির্ব্বাসনে থাকিলে ইহা অপেক্ষা আরো অনেক অধিক কাল বিচ্ছেদের সম্ভাবনা ছিল।”

রঘুপতি নক্ষত্ররায়কে গিয়া কহিলেন “গোবিন্দমাণিক্য নির্ব্বাসিত ছোট ভাইকে অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ একখানি চিঠি লিখিয়াছেন।”

নক্ষত্ররায় পরম উপেক্ষার ভাণ করিয়া হাসিয়া বলিলেন “সত্য না কি! কি চিঠি! কই দেখি!” বলিয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন।

রঘুপতি কহিলেন “সে চিঠি মহারাজকে দেখান আমি আবশ্যক বিবেচনা করি নাই। তখনই ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি। বলিয়াছি যুদ্ধ ছাড়া ইহার আর কোন উত্তর নাই।”

নক্ষত্ররায় হাসিতে হাসিতে বলিলেন “বেশ করিয়াছ ঠাকুর। তুমি বলিয়াছ যুদ্ধ ছাড়া ইহার আর কোন উত্তর নাই? বেশ উত্তর দিয়াছ।”

রঘুপতি কহিলেন “গোবিন্দমাণিক্য উত্তর শুনিয়া ভাবিবে যে, যখন নির্ব্বাসন দিয়াছিলাম

তখন ত ভাই বেশ সহজে গিয়াছিল, কিন্তু সেই ভাই ঘরে ফিরিয়া আসিবার সময় ত কম গোল যোগ করিতেছে না।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন "মনে করিবেন ভাইটি বড় সহজ লোক নয়! মনে করিলেই যে যখন ইচ্ছা নির্ব্বাসন দিব এবং যখন ইচ্ছা ডাকিয়া লইব, সেটি হইবার যো নাই।" বলিয়া অত্যন্ত আনন্দে দ্বিতীয় বার হাসিতে লাগিলেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

নক্ষত্ররায়ের উত্তর শুনিয়া গোবিন্দমাণিক্য অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। বিল্বন মনে করিলেন এবারে হয়ত মহারাজ আপত্তি প্রকাশ করিবেন না। কিন্তু গোবিন্দমাণিক্য বলিলেন "এ কথা কখনই নক্ষত্ররায়ের কথা নহে। এ সেই পুরোহিত বলিয়া পাঠাইয়াছে। নক্ষত্রের মুখ দিয়া এমন কথা কখনই বাহির হইতে পারে না।"

বিল্বন কহিলেন "মহারাজ এক্ষণে কি উপায় স্থির করিলেন।"

রাজা কহিলেন "আমি নক্ষত্রের সঙ্গে কোন ক্রমে একবার দেখা করিতে পাই, তাহা হইলে সমস্ত মিটমাট করিয়া দিতে পারি।"

বিল্বন কহিলেন "আর দেখা যদি না হয়?"

রাজা "তাহা হইলে আমি রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইব।"

বিল্বন কহিলেন "আচ্ছা আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।"

পাহাড়ের উপর নক্ষত্ররায়ের শিবির। ঘন জঙ্গল। বাঁশ বন, বেত বন, খাগড়ার বন। নানাবিধ লতাগুল্মে ভূমি আচ্ছন্ন। সৈন্যেরা বন্য হস্তীদের চলিবার পথ অনুসরণ করিয়া শিখরে উঠিয়াছে। তখন অপরাহ্ণ। সূর্য্য পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্তে হেলিয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্ব প্রান্তে অন্ধকার করিয়াছে। গোধূলির ছায়া ও তরুর ছায়ায় মিলিয়া বনের মধ্যে অকালে সন্ধ্যার আবির্ভাব হইয়াছে। শীতের সায়াহ্নে ভূমিতল হইতে কোয়াশার মত বাষ্প উঠিতেছে। ঝিল্লির শব্দে নিস্তব্ধ বন মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। বিল্বন যখন শিবিরে গিয়া পৌঁছিলেন তখন সূর্য্য সম্পূর্ণ অস্ত গেছেন কিন্তু পশ্চিম আকাশে স্বর্ণ রেখা মিলাইয়া যায় নাই। পশ্চিম দিকের সমতল উপত্যকায় স্বর্ণচ্ছায়ায় রঞ্জিত ঘন বন নিস্তব্ধ সবুজ সমুদ্রের মত দেখাইতেছে। সৈন্যেরা কাল প্রভাতে যাত্রা করিবে। রঘুপতি একদল সেনা ও সেনাপতিকে সঙ্গে লইয়া পথ অন্বেষণে বাহির হইয়াছেন, এখনও ফিরিয়া আসেন নাই। যদিও রঘুপতির অজ্ঞাতসারে নক্ষত্ররায়ের নিকটে কোন লোক আসা নিষেধছিল, তথাপি সন্ন্যাসীবেশধারী বিল্বনকে কেহই বাধা না। বিল্বন নক্ষত্ররায়কে গিয়া কহিলেন "মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য আপনাকে স্মরণ করিয়া এই পত্র লিখিয়াছেন।" বলিয়া পত্র নক্ষত্ররায়ের হস্তে দিলেন। নক্ষত্ররায় কম্পিত হস্তে পত্রগ্রহণ করিলেন। সে পত্র খুলিতে তাঁহার লজ্জা ও ভয় হইতে লাগিল। যতক্ষণ রঘুপতি, গোবিন্দমাণিক্য ও তাঁহার মধ্যে আড়াল করিয়া দাঁড়ায় ততক্ষণ নক্ষত্ররায় বেশ নিশ্চিন্ত থাকেন। তিনি কোন মতেই গোবিন্দমাণিক্যকে যেন দেখিতে চান না। গোবিন্দমাণিক্যের এই দূত একেবারে নক্ষত্ররায়ের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে নক্ষত্ররায় কেমন যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন, এবং মনে মনে ঈষৎ বিরক্ত হইলেন। ইচ্ছা হইতে লাগিল রঘুপতি যদি উপস্থিত

থাকিতেন এবং এই দূতকে তাঁহার কাছে আসিতে না দিতেন। মনের মধ্যে নানা ইতস্ততঃ করিয়া পত্র খুলিলেন। তাহার মধ্যে কিছুমাত্র ভর্ৎসনা ছিল না। গোবিন্দমাণিক্য তাঁহাকে লজ্জা দিয়া একটি কথাও বলেন নাই। ভাইয়ের প্রতি লেশমাত্র অভিমান প্রকাশ করেন নাই। নক্ষত্ররায় যে, সৈন্য সামন্ত লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছেন সে কথার উল্লেখ মাত্র করেন নাই। উভয়ের মধ্যে পূর্ব্বে যেমন ভাব ছিল, এখনও অবিকল যেন সেই ভাবই আছে। অথচ সমস্ত পত্রের মধ্যে একটি সুগভীর স্নেহ ও গম্ভীর বিষাদের ভাব প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে—তাহা কোন স্পষ্ট কথায় ব্যক্ত হয় নাই বলিয়া নক্ষত্ররায়ের হৃদয়ে অধিক আঘাত লাগিল। চিঠি পড়িতে পড়িতে অল্পে অল্পে তাঁহার মুখভাবের পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। হৃদয়ের পাষাণ আবরণ দেখিতে দেখিতে ফাটিয়া গেল। চিঠি তাঁহার কম্পমান হাতে কাঁপিতে লাগিল। সে চিঠি লইয়া কিয়ৎক্ষণ মাথায় ধারণ করিয়া রাখিলেন। সে চিঠির মধ্যে ভ্রাতার যে আশীর্ব্বাদ ছিল তাহা যেন শীতল নির্ঝরের মত তাঁহার তপ্ত হৃদয়ে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত স্থির হইয়া সুদূর পশ্চিমের সন্ধ্যাসাগরমগ্ন শ্যামল বনভূমির দিকে অনিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। চারিদিকে নিস্তব্ধ সন্ধ্যা অতলস্পর্শ শব্দহীন শান্ত সমুদ্রের মত জাগিয়া রহিল। ক্রমে তাঁহার চক্ষে জল দেখা দিল; দ্রুতবেগে অশ্রু পড়িতে লাগিল। সহসা লজ্জায় ও অনুতাপে নক্ষত্ররায় দুই হাতে মুখ প্রচ্ছন্ন করিয়া ধরিলেন। কাঁদিয়া বলিলেন "আমি এ রাজ্য চাই না! দাদা আমার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া আমাকে তোমার পদতলে স্থান দাও। আমাকে তোমার কাছে রাখিয়া দাও। আমাকে দূরে তাড়াইয়া দিও না।" বিল্বন একটি কথাও বলিলেন না—আর্দ্র হৃদয়ে চুপ করিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে নক্ষত্ররায় যখন প্রশান্ত হইলেন তখন বিল্বন কহিলেন "যুবরাজ আপনার পথ চাহিয়া গোবিন্দমাণিক্য বসিয়া আছেন আর বিলম্ব করিবেন না।"

নক্ষত্ররায় জিজ্ঞাসা করিলেন "আমাকে তিনি কি মাপ করিবেন?

বিল্বন কহিলেন "তিনি যুবরাজের প্রতি কিছুমাত্র রাগ করেন নাই। অধিক রাত্রি হইলে পথে কষ্ট হইবে শীঘ্র একটি অশ্ব লউন। পর্ব্বতের নীচে মহারাজের লোক অপেক্ষা করিয়া আছে।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন "আমি গোপনে পলায়ন করি সৈন্যদের কিছু জানাইয়া কাজ নাই। আর তিলমাত্র বিলম্ব করিয়া কাজ নাই, যত শীঘ্র এখান হইতে বাহির হইয়া পড়া যায় ততই ভাল।"

বিল্বন কহিলেন "ঠিক কথা।"

তিনমুড়া পাহাড়ে সন্ন্যাসীর সহিত শিবলিঙ্গের পূজা করিতে যাইতেছেন বলিয়া নক্ষত্ররায় বিল্বনের সহিত অশ্বারোহণে যাত্রা করিলেন। অনুচরগণ সঙ্গে যাইতে চাহিল। তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেন।

সবে বাহির হইয়াছেন মাত্র, এমন সময়ে অশ্বের খুরধ্বনি ও সৈন্যদের কোলাহল শুনিতে পাইলেন। নক্ষত্ররায় নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া গেলেন। দেখিতে দেখিতে রঘুপতি সৈন্য লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন "মহারাজ কোথায় যাইতেছেন?" নক্ষত্ররায় কিছুই উত্তর দিতে পারিলেন না।

নক্ষত্ররায়কে নিরুত্তর দেখিয়া বিল্বন কহিলেন "মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন।"

রঘুপতি বিল্বনের আপাদ মস্তক একবার নিরীক্ষণ করিলেন। একবার ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন, তার পরে আত্মসম্বরণ করিয়া কহিলেন "আজ এমন অসময়ে আমরা আমাদের মহারাজকে দায় দিতে পারি না। ব্যস্ত হইবার ত কোন কারণ নাই। কাল প্রাতঃকালে যাত্রা করিলেই ত হইবে! কি বলেন মহারাজ?"

নক্ষত্ররায় মৃদুস্বরে কহিলেন "কাল সকালেই যাইব, আজ রাত হইয়া গেছে।"

বিল্বন নিরাশ হইয়া সে রাত্রি শিবিরেই যাপন করিলেন। পরদিন প্রভাতে নক্ষত্ররায়ের নিকটে যাইবার চেষ্টা করিলেন, সৈন্যেরা বাধা দিল। দেখিলেন চতুর্দ্দিকে পাহারা। কোন দিকে ছিদ্র নাই। অবশেষে রঘুপতির নিকট গিয়া কহিলেন "যাত্রার সময় হইয়াছে যুবরাজকে সংবাদ দিন।"

রঘুপতি কহিলেন "মহারাজ যাইবেন না স্থির করিয়াছেন।"

বিল্বন কহিলেন "আমি একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি।"

রঘুপতি "সাক্ষাৎ হইবে না তিনি বলিয়া দিয়াছেন।"

বিল্বন কহিলেন "মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যের পত্রের উত্তর চাই।"

রঘুপতি "পত্রের উত্তর ইতিপূর্ব্বে অনেকবার দেওয়া হইয়াছে।"

বিল্বন "আমি তাঁহার নিজ মুখে উত্তর শুনিতে চাই।"

রঘুপতি "তাহার কোন উপায় নাই।"

বিল্বন বুঝিলেন বৃথা চেষ্টা; কেবল সময় ও বাক্যব্যয়। যাইবার সময় রঘুপতিকে বলিয়া গেলেন—"ব্রাহ্মণ, এ কি সর্ব্বনাশ সাধনে তুমি প্রবৃত্ত হইয়াছ! এ ত ব্রাহ্মণের কাজ নয়!"

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—*—

বিল্বন ফিরিয়া গিয়া দেখিলেন, ইতিমধ্যে রাজা অনেক চেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে কুকীদলকে বিদায় করিয়া দিয়াছেন। তাহারা রাজ্যমধ্যে উপদ্রব আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। সৈন্যদল প্রায় ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। যুদ্ধের উদ্যোগ বড় একটা কিছু নাই। বিল্বন ফিরিয়া আসিয়া রাজাকে সমস্ত বিবরণ বলিলেন।

রাজা কহিলেন "তবে ঠাকুর, আমি বিদায় হই; নক্ষত্রের জন্য রাজ্য ধন রাখিয়া দিয়া চলিলাম।"

বিল্বন কহিলেন—"অসহায় প্রজাদিগকে পরহস্তে ফেলিয়া দিয়া তুমি পলায়ন করিবে, ইহা স্মরণ করিয়া আমি কোন মতেই প্রসন্ন মনে বিদায় দিতে পারি না, মহারাজ। বিমাতার হস্তে পুত্রকে সমর্পণ করিয়া ভারমুক্ত মাতা শান্তিলাভ করিলেন—ইহা কি কল্পনা করা যায়!"

রাজা কহিলেন "ঠাকুর, তোমার বাক্য আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া প্রবেশ করে। কিন্তু এবার আমাকে মার্জ্জনা কর, আমাকে আর অধিক কিছু বলিও না। আমাকে বিচলিত করিবার চেষ্টা করিও না। তুমি জান ঠাকুর, আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম রক্তপাত আর করিব না, সে প্রতিজ্ঞা আমি ভাঙ্গিতে পারি না।"

বিল্বন কহিলেন "তবে এখন মহারাজ কি করিবেন?"

রাজা কহিলেন "তবে তোমাকে সমস্ত বলি। আমি ধ্রুবকে সঙ্গে করিয়া বনে যাইব। ঠাকুর, আমার জীবন অত্যন্ত অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। যাহা মনে করিয়াছিলাম তাহার

কিছুই করিতে পারি নাই—জীবনের যত খানি চলিয়া গেছে তাহা ফিরিয়া পাইয়া আর নূতন করিয়া গড়িতে পারিব না—আমার মনে হইতেছে ঠাকুর অদৃষ্ট যেন আমাদিগকে তীরের মত নিক্ষেপ করিয়াছে, লক্ষ্য হইতে যদি একবার একটু বাঁকিয়া গিয়া থাকি, তবে আর যেন সহস্র চেষ্টায় লক্ষ্যের মুখে ফিরিতে পারি না। জীবনের আরম্ভ সময়ে আমি সেই যে বাঁকিয়া গিয়াছি জীবনের শেষকালে আমি আর লক্ষ্য খুঁজিয়া পাইতেছি না। যাহা মনে করি তাহা আর হয় না। যে সময়ে জাগিলে আত্মরক্ষা করিতে পারিতাম, সে সময়ে জাগি নাই, যে সময়ে ডুবিয়াছি তখন চৈতন্য হইয়াছে। সমুদ্রে পড়িলে লোকে যে ভাবে কাষ্ঠখণ্ড অবলম্বন করে আমি বালক ধ্রুবকে সেইভাবে অবলম্বন করিতেছি। আমি ধ্রুবের মধ্যে আত্মসমাধান করিয়া ধ্রুবের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করিব। আমি প্রথম হইতে ধ্রুবকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিব। ধ্রুবের সহিত তিলে তিলে আমিও বাড়িতে থাকিব। আমার মানব জন্ম সম্পূর্ণ করিব। ঠাকুর, আমি মানুষের মত নই আমি রাজা হইয়া কি করিব!”

শেষ কথাটা রাজা অত্যন্ত আবেগের সহিত উচ্চারণ করিলেন—শুনিয়া ধ্রুব রাজার হাঁটুর উপর তাহার মাথা ঘসিয়া ঘসিয়া কহিল “আমি রাজা।”

বিল্বন হাসিয়া ধ্রুবকে কোলে তুলিয়া লই-লেন। অনেকক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অবশেষে রাজাকে কহিলেন “বনে কি কখন মানুষ গড়া যায়! বনে কেবল একটা উদ্ভিদ্ পালন করিয়া তোলা যাইতে পারে। মানুষ মনুষ্য সমাজেই গঠিত হয়।”

রাজা কহিলেন “আমি নিতান্তই বনবাসী হইব না, মনুষ্যসমাজে হইতে কিঞ্চিৎ দূরে থাকিব মাত্র, অথচ সমাজের সহিত সমস্ত যোগবিচ্ছিন্ন করিব না। এ কেবল দিনকতকের জন্য।”

এদিকে নক্ষত্ররায় সৈন্যসমেত রাজধানীর নিকটবর্ত্তী হইলেন। প্রজাদিগের ধন ধান্য লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। প্রজারা কেবল গোবিন্দ-মাণিক্যকেই অভিশাপ দিতে লাগিল। তাহারা কহিল এ সমস্তই কেবল রাজার পাপে ঘটি-য়াছে! রাজা একবার রঘুপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। রঘুপতি উপ-স্থিত হইলে তাহাকে কহিলেন—“আর কেন প্রজাদিগকে কষ্ট দিতেছ! আমি নক্ষত্ররায়কে রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছে। তোমার মোগল-সৈন্যদের বিদায় করিয়া দাও।”

রঘুপতি কহিলেন “যে আজ্ঞা, আপনি বিদায় হইলেই আমি মোগল-সৈন্যদের বিদায় করিয়া দিব—ত্রিপুরা লুণ্ঠিত হয় ইহা আমার ইচ্ছা নহে।”

১ সেই দিনই রাজা ছাড়িয়া যাত্রার উদ্যোগ করিলেন, তাঁহার রাজবেশ ত্যাগ করিলেন। গেরুয়া বসন পরিলেন। নক্ষত্র-রায়কে রাজার সমস্ত কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া এক দীর্ঘ আশীর্ব্বাদ পত্র লিখিলেন। অবশেষে রাজা ধ্রুবকে কোলে তুলিয়া বলিলেন “ধ্রুব, আমার সঙ্গে বনে যাবে বাছা?”

ধ্রুব তৎক্ষণাৎ রাজার গলা জড়াইয়া কহিল “যাব!”

এমন সময়ে রাজার সহসা মনে হইল ধ্রুবকে সঙ্গে লইয়া যাইতে হইলে তাহার খুড়া কেদারেশ্বরের সম্মতি আবশ্যক! কেদারে-শ্বরকে ডাকাইয়া রাজা কহিলেন “কেদারেশ্বর, তোমার সম্মতি পাইলে আমি ধ্রুবকে আমার সঙ্গে লইয়া যাই।”

ধ্রুব দিন রাত্রি রাজার কাছেই থাকিত, তাহার খুড়ার সহিত তাহার বড় একটা সম্পর্ক ছিল না, এই জন্যই বোধ করি রাজার কখন মনে হয় নাই যে ধ্রুবকে সঙ্গে লইয়া গেলে কেদারেশ্বরের কোন আপত্তি হইতে পারে। রাজার কথা শুনিয়া কেদারেশ্বর কহিল "সে আমি পারিব না মহারাজ।"

শুনিয়া রাজার চমক ভাঙ্গিয়া গেল! সহসা তাঁহার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন "কেদারেশ্বর তুমিও আমাদের সঙ্গে চল।"

কেদারেশ্বর "না মহারাজ বনে যাইতে পারিব না।"

রাজা কাতর হইয়া কহিলেন "আমি বনে যাইব না; আমি ধন জন লইয়া লোকালয়ে থাকিব।"

কেদারেশ্বর কহিল "আমি দেশ ছাড়িয়া যাইতে পারিব না।"

রাজা কিছু না বলিয়া গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। তাঁহার সমস্ত আশা ম্রিয়মাণ হইয়া গেল। নিমেষের মধ্যে সমস্ত ধরণীর মুখ যেন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। ধ্রুব আপন মনে খেলা করিতেছিল—অনেক ক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন অথচ তাহাকে যেন চোখে দেখিতে পাইলেন না। ধ্রুব তাঁহার কাপড়ের প্রান্ত ধরিয়া টানিয়া কহিল "খেলা কর।" রাজার সমস্ত হৃদয় গলিয়া অশ্রু হইয়া চোখের কাছে আসিল। অনেক কষ্টে অশ্রুজল দমন করিলেন। মুখ ফিরাইয়া ভগ্ন-হৃদয়ে কহিলেন "তবে ধ্রুব রহিল! আমি একাই যাই।" অবশিষ্ট জীবনের সুদীর্ঘ মরুময় পথ যেন নিমেষের মধ্যে বিদ্যুদালোকে তাঁহার চক্ষু-তারকায় অঙ্কিত হইল।

কেদারেশ্বর ধ্রুবর খেলা ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহাকে বলিল "আয় আমার সঙ্গে আয়!" বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিল।

ধ্রুব ক্রন্দনের স্বরে বলিয়া উঠিল "না।" রাজা সচকিত হইয়া ধ্রুবের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। ধ্রুব ছুটিয়া আসিয়া রাজাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকাইল। রাজা ধ্রুবকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া রাখিলেন। বিশাল হৃদয় বিদীর্ণ হইতে চাহিতেছিল, ক্ষুদ্র ধ্রুবকে বুকের কাছে চাপিয়া হৃদয়কে দমন করিলেন। ধ্রুবকে সেই অবস্থায় কোলে রাখিয়া তিনি দীর্ঘ কক্ষে পদচারণ করিতে লাগিলেন। ধ্রুব কাঁধে মাথা রাখিয়া অত্যন্ত স্থির হইয়া পড়িয়া রহিল!

অবশেষে যাত্রার সময় হইল। ধ্রুব রাজার কোলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ঘুমন্ত ধ্রুবকে ধীরে ধীরে কেদারেশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিয়া রাজা যাত্রা করিলেন।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—*—

পূর্ব্বদ্বার দিয়া সৈন্য সামন্ত লইয়া নক্ষত্রমাণিক্য রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন, কিঞ্চিৎ অর্থ ও গুটিকতক অনুচর লইয়া পশ্চিম দ্বারাভিমুখে গোবিন্দমাণিক্য যাত্রা করিলেন। নগরের লোক বাঁশি বাজাইয়া ঢাক ঢোলের শব্দ করিয়া হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনির সহিত নক্ষত্ররায়কে অভ্যর্থনা করিল। গোবিন্দমাণিক্য যে পথ দিয়া অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন সে পথে কেহই তাঁহাকে সমাদর করা আবশ্যক বিবেচনা করিল না। দুই পার্শ্বের কুটীরবাসিনী রমণীরা তাঁহাকে শুনাইয়া গালি দিতে লাগিল, ক্ষুধা ও ক্ষুধিত সন্তানের ক্রন্দনে তাহাদের

জিহ্বা শাণিত হইয়াছে। পরশ্ব গুরুতর দুর্ভিক্ষের সময় যে বৃদ্ধা রাজদ্বারে গিয়া আহার পাইয়াছিল এবং রাজা স্বয়ং যাহাকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন, সে তাহার শীর্ণ হস্ত তুলিয়া রাজাকে অভিশাপ দিতে লাগিল। ছেলেরা জননীর কাছ হইতে শিক্ষা পাইয়া বিদ্রূপ করিয়া চীৎকার করিতে করিতে রাজার পিছন পিছন চলিল। দক্ষিণে বামে কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া সম্মুখে চাহিয়া রাজা ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। এক জন জুমিয়া ক্ষেত্র হইতে আসিতেছিল, সে রাজাকে দেখিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিল। রাজার হৃদয় আর্দ্র হইয়া গেল, তিনি তাহার নিকটে স্নেহ আকুল কণ্ঠে বিদায় প্রার্থনা করিলেন। কেবল এই একটি জুমিয়া তাঁহার সমুদয় সন্তান প্রজাদের হইয়া তাঁহার রাজত্বের অবসানে তাঁহাকে ভক্তিভরে ম্লানহৃদয়ে বিদায় দিল। রাজার পশ্চাতে ছেলের পাল চীৎকার করিতেছে দেখিয়া সে মহা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে তাড়া করিয়া গেল। রাজা তাহাকে নিষেধ করিলেন। অবশেষে পথের যে অংশে কেদারেশ্বরের কুটীর ছিল, রাজা সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন একবার দক্ষিণে ফিরিয়া চাহিলেন। এখন শীতের প্রাতঃকাল। কুয়াশা কাটিয়া সূর্য্যরশ্মি সবে দেখা দিয়াছে। কুটীরের দিকে চাহিয়া রাজার গত বৎসরের আষাঢ় মাসের এক প্রাতঃকাল মনে পড়িল। তখন ঘনমেঘ ঘন বর্ষা। দ্বিতীয়ার ক্ষীণ চন্দ্রের ন্যায় বালিকা হাসি অচেতনে শয্যার প্রান্তে মিলাইয়া শুইয়া আছে। ক্ষুদ্র ধ্রুব তাহা কিছুই না বুঝিতে পারিয়া কখন বা দিদির অঞ্চলের প্রান্ত মুখে পূরিয়া দিদির মুখের দিকে চাহিয়া আছে, কখন বা তাহার গোলগোল ছোট ছোট মোটা মোটা হাত দিয়া আস্তে আস্তে দিদির মুখ চাপড়াইতেছে। আজিকার এই অগ্রহায়ণ মাসের শিশিরসিক্ত শুভ্র প্রাতঃকাল সেই আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন প্রভাতের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। রাজার কি মনে পড়িল যে, যে অদৃষ্ট আজ তাঁহাকে রাজ্যত্যাগী ও অপমানিত করিয়া গৃহ হইতে বিদায় করিয়া দিতেছে, সেই অদৃষ্ট এই ক্ষুদ্র কুটীরদ্বারে সেই আষাঢ়ের অন্ধকার প্রাতঃকালে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া ছিল? এই খানেই তাহার সহিত সেই প্রথম সাক্ষাৎ। রাজা অন্যমনস্ক হইয়া এই কুটীরের সম্মুখে কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন। তাঁহার অনুচরগণ ছাড়া তখন পথে আর কেহ লোক ছিল না। জুমিয়ার নিকট তাড়া খাইয়া ছেলে গুলো পালাইয়াছে। কিন্তু জুমিয়া দূরবর্ত্তী হইতেই আবার তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের চীৎকারে চেতনা লাভ করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া রাজা আবার ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। সহসা বালকদিগের চীৎকারের মধ্যে একটি সুমিষ্ট পরিচিত কণ্ঠ তাঁহার কাণে আসিয়া প্রবেশ করিল। দেখিলেন ছোট ধ্রুব তাহার ছোট ছোট পা ফেলিয়া দুই হাত তুলিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিতেছে। কেদারেশ্বর নূতন রাজাকে আগেভাগে সম্মান প্রদর্শন করিতে গিয়াছে, কুটিরে কেবল ধ্রুব এবং এক বৃদ্ধা পরিচারিকা ছিল। গোবিন্দমাণিক্য ঘোড়া থামাইয়া হাসিয়া একেবারে তাহার উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িল, তাঁহার কাপড় ধরিয়া টানিয়া তাঁহার হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া তাহার প্রথম আনন্দের উচ্ছ্বাস অবসান হইলে পর, সে গম্ভীর হইয়া রাজাকে বলিল "আমি টক্‌টক্ চ'ব।" রাজা তাহাকে ঘোড়ায় চড়াইয়া দিলেন। ঘোড়ার উপরে চড়িয়া সে রাজার গলা জড়াইয়া ধরিল, এবং তাহার কোমল

কপোলখানি রাজার কপোলের উপরে নিবিষ্ট করিয়া রাখিল। ধ্রুব তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে রাজার মধ্যে কি একটা পরিবর্ত্তন অনুভব করিতে লাগিল। গভীর ঘুম ভাঙ্গাইবার জন্য লোকে যেমন নানারূপ চেষ্টা করে—ধ্রুব তেমনি তাঁহাকে টানিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া তাঁহাকে চুমো খাইয়া কোন ক্রমে তাঁহার পূর্ব্বভাব ফিরাইয়া আনিবার অনেক চেষ্টা করিল। অবশেষে অকৃতকার্য্য হইয়া মুখের মধ্যে গোটা দুয়েক আঙ্গুল পুরিয়া দিয়া বসিয়া রহিল। রাজা ধ্রুবের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাহাকে বারবার চুম্বন করিলেন। অবশেষে কহিলেন "ধ্রুব আমি তবে যাই।"

ধ্রুব রাজার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল "আমি যাব।"

রাজা কহিলেন "তুমি কোথায় যাবে বাবা, তুমি তোমার বাপের কাছে থাক।"

ধ্রুব কহিল "না, আমি যাব।"

এমন সময় কুটীর হইতে বৃদ্ধা পরিচারিকা বিড়বিড় করিয়া বকিতে বকিতে উপস্থিত হইল, সবেগে ধ্রুবের হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল "চল্!"

ধ্রুব অমনি সভয়ে সবলে দুই হাতে রাজাকে জড়াইয়া রাজার বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া রাখিল। রাজা কাতর হইয়া ভাবিলেন বক্ষের শিরা টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলা যায় তবু এ দুটি হাতের বন্ধন কি ছেঁড়া যায়! কিন্তু তাও ছিঁড়িতে হইল। আস্তে আস্তে ধ্রুবের দুই হাত খুলিয়া বলপূর্ব্বক ধ্রুবকে পরিচারিকার হাতে দিলেন। ধ্রুব প্রাণপণে কাঁদিয়া উঠিল, হাত তুলিয়া কহিল "বাবা, আমি যাব!" রাজা আর পিছনে না চাহিয়া দ্রুত ঘোড়ায় চড়িয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন। যতদূর যান ধ্রুবের আকুল ক্রন্দন শুনিতে পাইলেন—ধ্রুব কেবল তাহার দুই হাত তুলিয়া বলিতে লাগিল "বাবা আমি যাব।" অবশেষে রাজার প্রশান্ত চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল—তিনি আর পথঘাট কিছু দেখিতে পাইলেন না। বাষ্পজলে সূর্য্যালোক এবং সমস্ত জগৎ যেন আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ঘোড়া যে দিকে ইচ্ছা ছুটিতে লাগিল।

পথের মধ্যে একজায়গায় একদল মোগলসৈন্য আসিয়া রাজাকে লক্ষ্য করিয়া হাসিতে লাগিল, এমন কি তাঁহার অনুচরদের সহিত কিঞ্চিৎ কঠোর বিদ্রূপ আরম্ভ করিল। রাজার একজন সভাসদ অশ্বারোহণে যাইতেছিলেন, তিনি এই দৃশ্য দেখিয়া রাজার নিকটে ছুটিয়া আসিলেন। কহিলেন "মহারাজ এ অপমান ত আর সহ্য হয় না। মহারাজের এই দীনবেশ দেখিয়া ইহারা এরূপ সাহসী হইয়াছে। এই লউন তরবারি, এই লউন উষ্ণীষ। মহারাজ কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করুন, আমি আমার লোক লইয়া আসিয়া এই বর্ব্বরদিগকে একবার শিক্ষা দিই।"

রাজা কহিলেন "না নয়নরায় আমার তরবারি উষ্ণীষে প্রয়োজন নাই। ইহারা আমার কি করিবে! আমি এখন ইহা অপেক্ষা অনেক গুরুতর অপমান সহ্য করিতে পারি। মুক্ত তরবারি তুলিয়া আমি এ পৃথিবীর লোকের নিকট হইতে আর সম্মান আদায় করিতে চাহি না। পৃথিবীর সর্ব্বসাধারণে যেরূপ সুসময়ে দুঃসময়ে মান অপমান সুখ দুঃখ সহ্য করিয়া থাকে আমিও জগদীশ্বরের মুখ চাহিয়া সেইরূপ সহ্য করিব! বন্ধুরা বিপক্ষ হইতেছে, আশ্রিতেরা কৃতঘ্ন হইতেছে, প্রণতেরা দুর্ব্বিনীত হইয়া উঠিতেছে, এককালে হয়ত ইহা আমার অসহ্য হইত, কিন্তু এখন ইহা সহ্য করিয়াই আমি হৃদয়ের মধ্যে আনন্দ লাভ করিতেছি। যিনি আমার বন্ধু তাঁহাকে আমি জানিয়াছি!

যাও নয়নরায়, তুমি ফিরিয়া যাও, নক্ষত্রকে সমাদরপূর্ব্বক আহ্বান করিয়া আন; আমাকে যেমন সম্মান করিতে নক্ষত্রকেও তেমনি সম্মান করিও। তোমরা সকলে মিলিয়া সর্ব্বদা নক্ষত্রকে সুপথে এবং প্রজার কল্যাণে রক্ষা কর, তোমাদের কাছে আমার বিদায় কালের এই প্রার্থনা। দেখিও ভ্রমেও কখন যেন আমার কথার উল্লেখ করিয়া বা আমার সহিত তুলনা করিয়া তাহার তিলমাত্র নিন্দা করিও না। তবে আমি বিদায় হই" বলিয়া রাজা তাঁহার সভাসদের সহিত কোলাকুলি করিয়া অগ্রসর হইলেন। সভাসদ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অশ্রুজল মুছিয়া চলিয়া গেলেন।

যখন গোমতী তীরের উচ্চ পাড়ের কাছে গিয়া পৌঁছিলেন তখন বিল্বন ঠাকুর অরণ্য হইতে বাহির হইয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া অঞ্জলি তুলিয়া কহিলেন "জয় হোক।" রাজা অশ্ব হইতে নামিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। বিল্বন কহিলেন "আমি তোমার কাছে বিদায় লইতে আসিয়াছি।"

রাজা কহিলেন "ঠাকুর, তুমি নক্ষত্রের কাছে থাকিয়া তাহাকে সৎপরামর্শ দাও। রাজ্যের হিতসাধন কর।"

বিল্বন কহিলেন "না। তুমি যেখানে রাজা নও, সেখানে আমি অকর্ম্মণ্য। এখানে থাকিয়া আমি আর কোন কাজ করিতে পারিব না।"

রাজা কহিলেন—"তবে কোথায় যাইবে ঠাকুর! আমাকে তবে দয়া কর, তোমাকে পাইলে আমি দুর্ব্বল হৃদয়ে বল পাই।"

বিল্বন কহিলেন "কোথায় আমার কাজ আছে, আমি তাহাই অনুসন্ধান করিতে চলিলাম। আমি কাছে থাকি আর দূরে থাকি তোমার প্রতি আমার প্রেম কখনও বিচ্ছিন্ন হইবে না জানিও। কিন্তু তোমার সহিত বনে গিয়া আমি কি করিব?"

রাজা মৃদুস্বরে কহিলেন "তবে আমি বিদায় হই।" বলিয়া দ্বিতীয় বার প্রণাম করিলেন। বিল্বন একদিকে চলিয়া গেলেন রাজা অন্যদিকে চলিয়া গেলেন।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নক্ষত্ররায় ছত্রমাণিক্য নাম ধারণ করিয়া মহা সমারোহে রাজপদ গ্রহণ করিলেন। রাজকোষে অর্থ অধিক ছিল না। প্রজাদের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া প্রতিশ্রুত অর্থ দিয়া মোগলসৈন্যদের বিদায় করিতে হইল। ঘোরতর দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য লইয়া ছত্রমাণিক্য রাজত্ব করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক্ হইতে অভিশাপ ও ক্রন্দন বর্ষিত হইতে লাগিল।

যে আসনে গোবিন্দমাণিক্য বসিতেন, যে শয্যায় গোবিন্দমাণিক্য শয়ন করিতেন, যে সকল লোক গোবিন্দমাণিক্যের প্রিয় সহচর ছিল, তাহারা যেন রাত্রিদিন নীরবে ছত্রমাণিক্যকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। ছত্রমাণিক্যের ক্রমে তাহা অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। তিনি চোখের সম্মুখ হইতে গোবিন্দমাণিক্যের সমস্ত চিহ্ন মুছিতে আরম্ভ করিলেন। গোবিন্দমাণিক্যের ব্যবহার্য্য সামগ্রী নষ্ট করিয়া ফেলিলেন, এবং তাঁহার প্রিয় অনুচরদিগকে দূর করিয়া দিলেন। গোবিন্দমাণিক্যের নামগন্ধ তিনি আর সহ্য করিতে পারিতেন না। গোবিন্দমাণিক্যের কোন উল্লেখ হইলেই তাঁহার মনে হইত তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই এই উল্লেখ হইতেছে। সর্ব্বদা মনে হইত সকলে

তাঁহাকে রাজা বলিয়া যথেষ্ট সম্মান করিতেছে না—এই জন্য সহসা অকারণে ক্ষাপা হইয়া উঠিতেন। সভাসদদিগকে শশব্যস্ত থাকিতে হইত। তিনি রাজকার্য্য কিছুই বুঝিতেন না, কিন্তু কেহ পরামর্শ দিতে আসিলে তিনি চটিয়া উঠিয়া বলিতেন "আমি আর এইটে বুঝিনে—তুমি কি আমাকে নির্ব্বোধ পাইয়াছ!" তাঁহার মনে হইত সকলে তাঁহাকে সিংহাসনে অনধিকারী রাজ্যাপহারক জ্ঞান করিয়া মনে মনে তাচ্ছিল্য করিতেছে, এই জন্য সজোরে অত্যধিক রাজা হইয়া উঠিলেন। যথেচ্ছাচরণ করিয়া সর্ব্বত্র তাঁহার একাধিপত্য প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি যে রাখিলে রাখিতে পারেন, মারিলে মারিতে পারেন, ইহা বিশেষরূপে প্রমাণ করিবার জন্য যাহাকে রাখা উচিত নহে তাহাকে রাখিলেন, যাহাকে মারা উচিত নহে তাহাকে মারিলেন। প্রজারা অন্নাভাবে মরিতেছে, কিন্তু তাঁহার দিনরাত্রি সমারোহের শেষ নাই—অহরহ নৃত্যগীতবাদ্যভোজ। ইতিপূর্ব্বে আর কোন রাজা সিংহাসনে চড়িয়া বসিয়া রাজত্বের পেখম সমস্তটা ছড়াইয়া দিয়া এমন অপূর্ব্ব নৃত্য করে নাই।

প্রজারা চারিদিকে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল—ছত্রমাণিক্য তাহাতে অত্যন্ত জ্বলিয়া উঠিলেন—তিনি মনে করিলেন এ কেবল রাজার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন। তিনি অসন্তোষের দ্বিগুণ কারণ জন্মাইয়া দিয়া বল পূর্ব্বক পীড়ন পূর্ব্বক ভয় দেখাইয়া সকলের মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন—সমস্ত রাজ্য নিদ্রিত নিশীথের মত নীরব হইয়া গেল। সেই শান্ত নক্ষত্ররায় ছত্রমাণিক্য হইয়া যে সহসা এরূপ আচরণ করিবেন ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। অনেক যে দুর্ব্বল-হৃদয়েরা প্রভুত্ব পাইলে এইরূপ প্রচণ্ড ও যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠে।

রঘুপতির কাজ শেষ হইয়া গেল। শেষ পর্য্যন্ত যে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি তাঁহার হৃদয়ে সমান জাগ্রৎ ছিল তাহা নহে। ক্রমে প্রতিহিংসার ভাব ঘুচিয়া গিয়া যে কাজে হাত দিয়াছেন সেই কাজটা সম্পন্ন করিয়া তোলা তাঁহার একমাত্র ব্রত হইয়া উঠিয়াছিল। নানা কৌশলে বাধা-বিপত্তি সমস্ত অতিক্রম করিয়া দিন রাত্রি একটা উদ্দেশ্য সাধনে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি এক প্রকার মাদক সুখ অনুভব করিতেছিলেন। অবশেষে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া গেল। পৃথিবীতে আর কোথাও সুখ নাই।

রঘুপতি তাঁহার মন্দিরে গিয়া দেখিলেন সেখানে জনপ্রাণী নাই। যদিও রঘুপতি বিলক্ষণ জানিতেন যে জয়সিংহ নাই, তথাপি মন্দিরে প্রবেশ করিয়া যেন দ্বিতীয়বার নূতন করিয়া জানিলেন যে জয়সিংহ নাই। এক একবার মনে হইতে লাগিল যেন আছে, তার পরে স্মরণ হইতে লাগিল যে নাই। সহসা বায়ুতে কপাট খুলিয়া গেল তিনি চমকিয়া ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন জয়সিংহ আসিল না। জয়সিংহ যে ঘরে থাকিত, মনে হইল সে ঘরে জয়সিংহ থাকিতেও পারে—কিন্তু অনেক ক্ষণ সে ঘরে প্রবেশ করিতে পারিলেন না—মনে ভয় হইতে লাগিল পাছে গিয়া দেখি জয়সিংহ সেখানে নাই। অবশেষে যখন গোধূলির ঈষৎ অন্ধকারে বনের ছায়া গাঢ়তর ছায়ায় মিলাইয়া গেল, তখন রঘুপতি ধীরে ধীরে জয়সিংহের গৃহে প্রবেশ করিলেন—শূন্য বিজন গৃহ সমাধিভবনের মত নিস্তব্ধ। ঘরের মধ্যে একপাশে একটি কাঠের সিন্দুক এবং সিন্দুকের পার্শ্বে জয়সিংহের এক যোড়া খড়ম ধূলিমলিন হইয়া পড়িয়া আছে।

ভিত্তিতে জয়সিংহের স্বহস্তে আঁকা কালীর মূর্ত্তি। ঘরের পূর্ব্ব কোণে একটি ধাতু প্রদীপ ধাতু-আধারের উপর দাঁড়াইয়া আছে, গত বৎসর হইতে সে প্রদীপ কেহ জ্বালায় নাই—মাকড়ষার জালে সে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। নিকটবর্ত্তী দেয়ালে প্রদীপশিখার কালো দাগ পড়িয়া আছে। গৃহে পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি দ্রব্য ছাড়া আর কিছুই নাই। রঘুপতি গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। সে নিশ্বাস শূন্য গৃহে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। ক্রমে অন্ধকারে আর কিছুই দেখা যায় না। একটা টিকটিকি মাঝে মাঝে কেবল টিক্‌টিক্ শব্দ করিতে লাগিল। মুক্ত দ্বার দিয়া ঘরের মধ্যে শীতের বায়ু প্রবেশ করিতে লাগিল। রঘুপতি সিন্দুকের উপরে বসিয়া কাঁপিতে লাগিলেন।

এইরূপে একমাস এই নির্জ্জন মন্দিরে কাটাইলেন, কিন্তু এমন করিয়া আর দিন কাটে না। পৌরোহিত্য ছাড়িতে হইল। রাজসভায় গেলেন। রাজ্য শাসন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন অবিচার উৎপীড়ন ও বিশৃঙ্খলা ছত্রমাণিক্য নাম ধরিয়া রাজত্ব করিতেছে। তিনি রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপনের চেষ্টা করিলেন। ছত্রমাণিক্যকে পরামর্শ দিতে গেলেন। ছত্রমাণিক্য চটিয়া উঠিয়া বলিলেন "ঠাকুর রাজশাসনকার্য্যের তুমি কি জান। এসব বিষয় তুমি কিছু বুঝ না!" রঘুপতি রাজার প্রতাপ দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। দেখিলেন সে নক্ষত্ররায় আর নাই। রঘুপতির সহিত রাজার ক্রমাগত খিটিমিটি বাধিতে লাগিল। ছত্রমাণিক্য মনে করিলেন যে, রঘুপতি কেবলই ভাবিতেছে যে, রঘুপতিই তাঁহাকে রাজা করিয়া দিয়াছে। এই জন্য রঘুপতিকে দেখিলে তাঁহার অসহ্য বোধ হইত। অবশেষে একদিন স্পষ্ট বলিলেন "ঠাকুর, তুমি তোমার মন্দিরের কাজ করগে। রাজসভায় তোমার কোন প্রয়োজন নাই।" রঘুপতি ছত্রমাণিক্যের প্রতি জ্বলন্ত তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ছত্রমাণিক্য ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেলেন।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

নক্ষত্ররায় যে দিন নগর প্রবেশ করেন, কেদারেশ্বর সেই দিনই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়, কিন্তু বহুচেষ্টাতেও সে তাঁহার নজরে পড়িল না। সৈন্যেরা ও প্রহরীরা তাহাকে ঠেলিয়া ঠুলিয়া তাড়া নাড়া দিয়া বিব্রত করিয়া তুলিল। অবশেষে সে প্রাণ লইয়া পলাইয়া যায়। গোবিন্দমাণিক্যের আমলে সে রাজভোগে পরম পরিতৃপ্ত হইয়া প্রাসাদে বাস করিত—যুবরাজ নক্ষত্ররায়ের সহিত তাহার বিশেষ প্রণয়ও ছিল। কিছুকাল প্রাসাদচ্যুত হইয়া তাহার জীবনধারণ করা দায় হইয়া উঠিয়াছে; যখন সে রাজার ছায়ায় ছিল তখন সকলে তাহাকে সভয়ে সম্মান করিত কিন্তু এখন তাহাকে কেহই আর গ্রাহ্য করে না। পূর্ব্বে রাজসভায় কাহারো কিছু প্রয়োজন হইলে তাহাকে হাতে পায়ে আসিয়া ধরিত, এখন পথ দিয়া চলিবার সময় কেহ তাহার সঙ্গে দুটো কথা কহিবার অবসর পায় না। ইহার উপরে আবার অন্নকষ্টও হইয়াছে। এমন অবস্থায় প্রাসাদে পুনর্ব্বার প্রবেশ করিতে পারিলে তাহার বিশেষ সুবিধা হয়। সে একদিন অবসরমত কিছু ভেট সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ্য রাজদরবারে ছত্রমাণিক্যের সহিত দেখা করিতে গেল। পরম পরিতোষ প্রকাশ পূর্ব্বক অত্যন্ত

পোষ-মানা বিনীত হাস্য হাসিতে হাসিতে রাজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। রাজা তাহাকে দেখিয়াই জ্বলিয়া উঠিলেন।—বলিলেন —"হাসি কিসের জন্য! তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা পাইয়াছ। তুমি এ কি রহস্য করিতে আসিয়াছ!"

অমনি চোপদার জমাদার বরকন্দাজ মন্ত্রী অমাত্য সকলেই হাঁকার দিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ কেদারেশ্বরের বিকশিত দন্তপংক্তির উপর যবনিকাপতন হইল।

ছত্রমাণিক্য কহিলেন "তোমার কি বলিবার আছে শীঘ্র বলিয়া চলিয়া যাও।"

কেদারেশ্বরের কি বলিবার ছিল মনে পড়িল না। অনেক কষ্টে সে মনে মনে যে বক্তৃতাটুকু গড়িয়া তুলিয়াছিল তাহা পেটের মধ্যেই চুরমার হইয়া গেল। অবশেষে রাজা যখন বলিলেন "তোমার যদি কিছু বলিবার না থাকে ত চলিয়া যাও।" তখন কেদারেশ্বর চট্‌পট্ একটা যা হয় কিছু বলা আবশ্যক বিবেচনা করিল। চোখে মুখে কণ্ঠস্বরে সহসা প্রচুর পরিমাণে করুণ রস সঞ্চার করিয়া বলিল "মহারাজ, ধ্রুবকে কি ভুলিয়া গিয়াছেন?"

ছত্রমাণিক্য অত্যন্ত আগুণ হইয়া উঠিলেন। মূর্খ কেদারেশ্বর কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কহিল "সে যে মহারাজের জন্য কাকা কাকা করিয়া কাঁদিয়া সারা হইতেছে।"

ছত্রমাণিক্য কহিলেন "তোমার আস্পর্দ্ধা ত কম নয় দেখিতেছি! তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাকে কাকা বলে? তুমি তাহাকে এই শিক্ষা দিয়াছ!"

কেদারেশ্বর অত্যন্ত কাতর ভাবে যোড়হস্তে কহিল—"মহারাজ—"

ছত্রমাণিক্য কহিলেন "কে আছ হে— ইহাকে আর সেই ছেলেটাকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দাও ত!" সহসা স্কন্ধের উপর এতগুলো প্রহরীর হাত আসিয়া পড়িল যে কেদারেশ্বর তীরের মত একেবারে বাহিরে ছিট্‌কাইয়া পড়িল। হাত হইতে তাহার ডালি কাড়িয়া লইয়া প্রহরীরা তাহা ভাগ করিয়া লইল। ধ্রুবকে লইয়া কেদারেশ্বর ত্রিপুরা পরিত্যাগ করিল।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

—*—

রঘুপতি আবার মন্দিরে ফিরিয়া গেলেন। গিয়া দেখিলেন কোন প্রেমপূর্ণ হৃদয় বস্ত্রাদি লইয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া নাই। পাষাণ মন্দির দাঁড়াইয়া আছে তাহার মধ্যে কোথাও হৃদয়ের লেশমাত্র নাই। তিনি গিয়া গোমতী তীরের শ্বেত সোপানের উপর বসিলেন। সোপানের বামপার্শ্বে জয়সিংহের স্বহস্তে রোপিত শেফালিকা গাছে অসংখ্য ফুল ফুটিয়াছে। এই ফুলগুলি দেখিয়া জয়সিংহের সুন্দর মুখ, সরল হৃদয়, সরল জীবন এবং অত্যন্ত সহজ বিশুদ্ধ উন্নত ভাব তাঁহার স্পষ্ট মনে পড়িতে লাগিল। সিংহের ন্যায় সবল তেজস্বী এবং হরিণ-শিশুর মত সুকুমার জয়সিংহ রঘুপতির হৃদয়ে সম্পূর্ণ আবির্ভূত হইল—তাঁহার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া লইল। ইতিপূর্ব্বে তিনি আপনাকে জয়সিংহের চেয়ে অনেক বড় জ্ঞান করিতেন, এখন জয়সিংহকে তাঁহার নিজের চেয়ে অনেক বড় মনে হইতে লাগিল। তাঁহার প্রতি জয়সিংহের সেই সরল ভক্তি স্মরণ করিয়া জয়সিংহের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ভক্তির উদয় হইল, এবং নিজের প্রতি তাঁহার অভক্তি জন্মিল। জয়-

সিংহকে যে সকল অন্যায় তিরস্কার করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল—তিনি মনে মনে কহিলেন জয়সিংহকে ভর্ৎসনার আমি অধিকারী নই—জয়সিংহের সহিত যদি এক মুহূর্ত্তের জন্য একটিবার দেখা হয়, তবে আমি আমার হীনত্ব স্বীকার করিয়া তাহার নিকট একবার মার্জ্জনা প্রার্থনা করিয়া লই। জয়সিংহ যখন যাহা যাহা বলিয়াছে করিয়াছে সমস্ত তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। জয়সিংহের সমস্ত জীবন সংহত ভাবে তাঁহারি মধ্যে বিরাজ করিতে লাগিল। তিনি এইরূপ একটি মহৎ চরিত্রের মধ্যে আত্মবিস্মৃত হইয়া সমস্ত বিবাদ বিদ্বেষ ভুলিয়া গেলেন। চরিদিকের গুরুভার সংসার লঘু হইয়া গিয়া তাঁহাকে পীড়ন করিতে বিরত হইল। যে নক্ষত্রমাণিক্যকে তিনিই রাজা করিয়া দিয়াছেন সে যে রাজা হইয়া আজ তাঁহাকেই অপমান করিয়াছে ইহা স্মরণ করিয়া তাঁহার কিছুমাত্র রোষ জন্মিল না। এই মান অপমান সমস্তই সামান্য মনে করিয়া তাঁহার ঈষৎ হাসি আসিল। কেবল তাঁহার ইচ্ছা করিতে লাগিল জয়সিংহ যাহাতে যথার্থ সন্তুষ্ট হয় এমন একটা কিছু কাজ করেন। অথচ চতুর্দ্দিকে কাজ কিছুই দেখিতে পাইলেন না—চতুর্দ্দিকে শূন্য হাহাকার করিতেছে। এই বিজন মন্দির তাঁহাকে যেন চাপিয়া ধরিল—তাঁহার যেন নিশ্বাস রোধ করিল। একটা কিছু বৃহৎ কাজ করিয়া তিনি হৃদয়বেদনা শান্ত করিয়া রাখিবেন কিন্তু এই সকল নিস্তব্ধ নিরুদ্যম নিরালয় মন্দিরের দিকে চাহিয়া পিঞ্জরবদ্ধ পাখীর মত তাঁহার হৃদয় অধীর হইয়া উঠিল। তিনি উঠিয়া বনের মধ্যে অধীর ভাবে পদচারণ করিতে লাগিলেন। মন্দিরের ভিতরকার অসাড় অচেতন অকর্ম্মণ্য জড় প্রতিমাগুলির প্রতি তাঁহার অতিশয় ঘৃণার উদয় হইল। হৃদয় যখন বেগে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে তখন কতকগুলি নিরুদ্যম স্থূল পাষাণ মূর্ত্তির নিরুদ্যম সহচর হইয়া চিরদিন অতিবাহিত করা তাঁহার নিকটে অত্যন্ত হেয় বলিয়া বোধ হইল! যখন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর হইল, রঘুপতি চকমকি ঠুকিয়া একটি প্রদীপ জ্বালাইলেন। দীপহস্তে চতুর্দ্দশ দেবতার মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গিয়া দেখিলেন চতুর্দ্দশ দেবতা সমান ভাবেই দাঁড়াইয়া আছে। গত বৎসর আষাঢ়ের কালরাত্রে ক্ষীণ দীপালোকে ভক্তের মৃতদেহের সম্মুখে রক্তপ্রবাহের মধ্যে যেমন বুদ্ধিহীন হৃদয়হীনের মত দাঁড়াইয়াছিল, আজও তেমনি দাঁড়াইয়া আছে। রঘুপতি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন "মিথ্যা কথা! সমস্ত মিথ্যা! হা বৎস জয়সিংহ, তোমার অমূল্য হৃদয়ের রক্ত কাহাকে দিলে? এখানে কোন দেবতা নাই! কোন দেবতা নাই! পিশাচ রঘুপতি সে রক্ত পান করিয়াছে!" বলিয়া কালীর প্রতিমা রঘুপতি আসন হইতে টানিয়া তুলিয়া লইলেন। মন্দিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া সবলে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। অন্ধকারে পাষাণ সোপানের উপর পড়িয়া পাষাণ প্রতিমা শব্দ করিয়া গড়াইতে গড়াইতে গোমতীর জলের মধ্যে পড়িয়া গেল। অজ্ঞান রাক্ষসী পাষাণ আকৃতি ধারণ করিয়া এতদিন রক্ত পান করিতেছিল সে আজ গোমতীগর্ভের সহস্র পাষাণের মধ্যে অদৃশ্য হইল, কিন্তু মানবের কঠিন হৃদয়াসন কিছুতেই পরিত্যাগ করিল না। রঘুপতি দীপ নিবাইয়া দিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িলেন, সেই রাত্রেই রাজধানী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।



নোয়াখালির নিজামৎপুরে বিধন ঠাকুর কিছু দিন হইতে বাস করিতেছেন। সেখানে ভয়ঙ্কর মড়কের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

ফাল্গুন মাসের শেষাশেষি এক দিন সমস্ত দিন মেঘ করিয়া থাকে, মাঝে মাঝে অল্প অল্প বৃষ্টিও হয়। অবশেষে সন্ধ্যার সময় রীতিমত ঝড় আরম্ভ হয়। প্রথমে পূর্ব্বদিক্ হইতে বায়ু বহিতে থাকে। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় উত্তর ও উত্তরপূর্ব্ব হইতে প্রবল বেগে ঝড় বহিতে লাগিল। অবশেষে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া ঝড়ের বেগ কমিয়া গেল। এমন সময়ে রব উঠিল বন্যা আসিতেছে। কেহ ঘরের চালে উঠিল, কেহ পুষ্করিণীর পাড়ের উপর গিয়া দাঁড়াইল, কেহ বৃক্ষশাখায়, কেহ মন্দিরের চূড়ায় আশ্রয় লইল। অন্ধকার রাত্রি—অবিশ্রাম বৃষ্টি—বন্যার গর্জ্জন ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইল—আতঙ্কে গ্রামের লোকেরা দিশাহারা হইয়া গেল। এমন সময় বন্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। উপরি উপরি দুইবার তরঙ্গ আসিল, দ্বিতীয় বারের পরে গ্রামে প্রায় আট হাত জল দাঁড়াইল। পরদিন যখন সূর্য্য উঠিল এবং জল নামিয়া গেল, তখন দেখা গেল—গ্রামে গৃহ অল্পই অবশিষ্ট আছে, এবং লোক নাই—অন্য গ্রাম হইতে মানুষ, গোরু, মহিষ, ছাগল এবং শৃগাল কুকুরের মৃত দেহ ভাসিয়া আসিয়াছে। সুপারির গাছগুলা ভাঙ্গিয়া ভাসিয়া গেছে, গুঁড়ির কিয়দংশমাত্র অবশিষ্ট আছে। বড় বড় আম কাঁঠালের গাছ সমূলে উৎপাটিত হইয়া কাৎ হইয়া পড়িয়া আছে। অন্য গ্রামের গৃহের চাল ভাসিয়া আসিয়া ভিত্তির শোকে ইতস্ততঃ উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। অনেকগুলো হাঁড়ি কলসী বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। অধিকাংশ কুটীরই বাঁশঝাড় আম কাঁঠাল মাদার প্রভৃতি বড় বড় গাছের দ্বারা আবৃত ছিল, এই জন্য অনেকগুলি মানুষ একেবারে ভাসিয়া না গিয়া গাছে আট্‌কাইয়া গিয়াছিল। কেহ বা সমস্ত রাত্রি বন্যাবেগে দোদুল্যমান বাঁশঝাড়ে দুলিয়াছে, কেহ বা মাদারের কণ্টকে ক্ষত বিক্ষত, কেহ বা উৎপাটিত বৃক্ষসমেত ভাসিয়া গেছে। জল সরিয়া গেলে জীবিত ব্যক্তিরা নামিয়া আসিয়া মৃতের মধ্যে বিচরণ করিয়া আত্মীয়দিগকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। অধিকাংশ মৃত দেহই অপরিচিত এবং ভিন্ন গ্রাম হইতে আগত। কেহই তাহাদিগকে সৎকার করিল না। পালে পালে শকুনি আসিয়া মৃত দেহ ভক্ষণ করিতে লাগিল। শৃগাল কুকুরের সহিত তাহাদের কোন বিবাদ নাই, কারণ শৃগাল কুকুরও সমস্ত মরিয়া গিয়াছে। বারো ঘর পাঠান গ্রামে বাস করিত; তাহারা অনেক উচ্চ জমিতে বাস করিত বলিয়া তাহাদের প্রায় কাহারও কোন ক্ষতি হয় নাই। অবশিষ্ট জীবিতব্যক্তিদের মধ্যে যাহারা গৃহ পাইল তাহারা গৃহে আশ্রয় লইল—যাহারা পাইল না তাহারা আশ্রয় অন্বেষণে অন্যত্র গেল। যাহারা বিদেশে ছিল তাহারা দেশে ফিরিয়া আসিয়া নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিল। ক্রমে অল্পে অল্পে গ্রামে পুনশ্চ লোকের বসতি আরম্ভ হইল। এই সময়ে মৃতদেহে পুষ্করিণীর জল দূষিত হইয়া এবং অন্যান্য নানা কারণে গ্রামে মড়ক আরম্ভ হইল। পাঠানদের পাড়ায় মড়কের প্রথম আরম্ভ হইল। মৃত দেহের গোর দিবার বা পরস্পরকে সেবা করিবার অবসর কাহারও রহিল না। হিন্দুরা কহিল মুসলমানেরা গোহত্যা পাপের

ফল ভোগ করিতেছে। জাতি-বৈরিতায় এবং জাতিচ্যুতিভয়ে কোন হিন্দু তাহাদিগকে জল দিল না বা কোন প্রকার সাহায্য করিল না। বিশ্বন সন্ন্যাসী যখন গ্রামে আসিলেন তখন গ্রামের এইরূপ অবস্থা। বিশ্বনের কতকগুলি চেলা জুটিয়াছিল মড়কের ভয়ে তাহারা পালাই-বার চেষ্টা করিল। বিশ্বন ভয় দেখাইয়া তাহাদিগকে বিরত করিলেন। তিনি পীড়িত পাঠানদিগকে সেবা করিতে লাগিলেন—তাহাদিগকে পথ্য পানীয় ঔষধ এবং তাহাদের মৃত দেহ গোর দিতে লাগিলেন। হিন্দুরা হিন্দু সন্ন্যাসীর অনাচার দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। বিশ্বন কহিতেন "আমি সন্ন্যাসী, আমার কোন জাত নাই। আমার জাত মানুষ। মানুষ যখন মরিতেছে তখন কিসের জাত! ভগবানের সৃষ্টি মানুষ যখন মানুষের প্রেম চাহিতেছে তখনই বা কিসের জাত!" হিন্দুরা বিশ্বনের অনাসক্ত পরহিতৈষা দেখিয়া তাঁহাকে ঘৃণা বা নিন্দা করিতে যেন সাহস করিল না। বিশ্বনের কাজ ভাল কি মন্দ তাহারা স্থির করিতে পারিল না। তাহাদের অসম্পূর্ণ শাস্ত্রজ্ঞান সন্দিগ্ধভাবে বলিল "ভাল নহে।" কিন্তু তাহাদের হৃদয়ের ভিতরে যে মনুষ্য বাস করিতেছে সে বলিল "ভাল।" যাহা হউক, বিশ্বন অন্য লোকের ভাল মন্দের দিকে না তাকাইয়া কাজ করিতে লাগিলেন। মুমূর্ষু পাঠানেরা তাঁহাকে দেবতা জ্ঞান করিতে লাগিল। পাঠানের ছোট ছেলেদের তিনি মড়ক হইতে দূরে রাখিবার জন্য হিন্দুদের কাছে লইয়া গেলেন। হিন্দুরা বিষম শশব্যস্ত হইয়া উঠিল, কেহ তাহাদিগকে আশ্রয় দিল না। তখন বিশ্বন একটা বড় পরিত্যক্ত ভাঙ্গা মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার ছেলের পাল সেইখানে রাখিলেন। প্রাতে উঠিয়া বিশ্বন তাঁহার ছেলেদের জন্য ভিক্ষা করিতে বাহির হইতেন। কিন্তু ভিক্ষা কে দিবে? দেশে শস্য কোথায়! অনাহারে কত লোক মরিবার উপক্রম করিতেছে। গ্রামের মুসলমান জমিদার অনেক দূরে বাস করিতেন। বিশ্বন তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। বহু-কষ্টে তাঁহাকে রাজি করিয়া তিনি ঢাকা হইতে চাউল আমদানী করিতে লাগিলেন। তিনি পীড়িতদের সেবা করিতেন এবং তাঁহার চেলারা চাউল বিতরণ করিত। মাঝে মাঝে বিশ্বন ছেলেদের সঙ্গে গিয়া খেলা করিতেন। তাহারা তাঁহাকে দেখিলে তুমুল কোলাহল উত্থাপন করিত—সন্ধ্যার সময় মন্দিরের পাশ দিয়া গেলে মনে হইত যেন মন্দিরে সহস্র টিয়া পাখী বাসা করিয়াছে। বিশ্বনের এস্রাজের আকারের একপ্রকার যন্ত্র ছিল, যখন অত্যন্ত শ্রান্ত হইতেন তখন তাহাই বাজাইয়া গান করিতেন। ছেলেগুলো তাঁহাকে ঘিরিয়া কেহবা গান শুনিত, কেহবা যন্ত্রের তার টানিত, কেহবা তাঁহার অনুকরণে গান করি-বার চেষ্টা করিয়া বিষম চীৎকার করিত।

অবশেষে মড়ক মুসলমান পাড়া হইতে হিন্দুপাড়ায় আসিল। গ্রামে এক প্রকার অরাজকতা উপস্থিত হইল—চুরি ডাকাতির শেষ নাই—যে যাহা পায় লুঠ করিয়া লয়। মুসলমানেরা দল বাঁধিয়া ডাকাতি আরম্ভ করিল। তাহারা পীড়িতদিগেকে শয্যা হইতে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া তক্তা মাদুর বিছানা পর্য্যন্ত হরণ করিয়া লইয়া যাইত। বিশ্বন প্রাণপণে তাহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগি-লেন। বিশ্বনের কথা তাহারা অত্যন্ত মান্য করিত—লঙ্ঘন করিতে সাহস করিত না। এইরূপে বিশ্বন যথাসাধ্য গ্রামের শান্তি রক্ষা করিতেন।

একদিন সকালে বিল্বনের এক চেলা আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল যে, একটি ছেলে সঙ্গে লইয়া একজন বিদেশী গ্রামের অশথ-তলায় আশ্রয় লইয়াছে, তাহাকে মড়কে ধরিয়াছে, বোধ করি সে আর বাঁচিবে না। বিল্বন দেখিলেন কেদারেশ্বর অচেতন হইয়া পড়িয়া; ধ্রুব ধুলায় শুইয়া ঘুমাইয়া আছে। কেদারেশ্বরের মুমূর্ষু অবস্থা—পথকষ্টে এবং অনাহারে সে দুর্ব্বল হইয়াছিল, এই জন্য পীড়া তাহাকে বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিয়াছে, কোন ঔষধে কিছু ফল হইল না, সেই বৃক্ষ-তলেই তাহার মৃত্যু হইল। ধ্রুবকে দেখিয়া বোধ হইল যেন বহুক্ষণ অনাহারে ক্ষুধায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বিল্বন অতি সাবধানে তাহাকে কোলে তুলিয়া তাঁহার শিশুশালায় লইয়া গেলেন।

দ্বাচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

চট্টগ্রাম এখন আরাকানের অধীন। গোবিন্দমাণিক্য নির্ব্বাসিত ভাবে চট্টগ্রামে আসিয়াছেন শুনিয়া আরাকানের রাজা মহা-সমারোহ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। বলিয়া পাঠাইলেন যদি সিংহাসন পুনরায় অধিকার করিতে চান তাহা হইলে আরাকানপতি তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারেন। গোবিন্দমাণিক্য কহিলেন "না, আমি সিংহাসন চাই না।" দূত কহিল "তবে আরাকান রাজসভায় পূজনীয় অতিথি হইয়া মহারাজ কিছুকাল বাস করুন।" রাজা কহিলেন "আমি রাজসভায় থাকিব না। চট্টগ্রামের এক পার্শ্বে আমাকে স্থান দান করিলে আমি আরাকানরাজের নিকটে ঋণী হইয়া থাকিব।" দূত কহিল "মহারাজের যেথানে অভিরুচি সেইখানেই থাকিতে পারেন। এ সমস্ত আপনারই রাজ্য মনে করিবেন।" আরাকানের কতকগুলি অনুচর রাজার সঙ্গে সঙ্গেই রহিল। গোবিন্দমাণিক্য তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন না, তিনি মনে করিলেন হয়ত বা আরাকান তাঁহাকে সন্দেহ করিয়া তাঁহার নিকটে লোক রাখিতে ইচ্ছা করেন।

ময়ানী নদীর ধারে মহারাজ কুটীর বাঁধিয়াছেন। স্বচ্ছসলিলা ক্ষুদ্র নদী ছোট বড় শিলাখণ্ডের উপর দিয়া দ্রুতবেগে চলিয়াছে। দুই পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণের পাহাড় খাড়া হইয়া আছে—কালো পাথরের উপর বিচিত্র বর্ণের শেবাল ঝুলিতেছে—মাঝে মাঝে ছোট ছোট গহ্বর আছে তাহার মধ্যে পাখী বাসা করিয়াছে। স্থানে স্থানে দুই পার্শ্বের পাহাড় এত উচ্চ যে অনেক বিলম্বে সূর্য্যের দুই একটি কর নদীর জলে আসিয়া পতিত হয়। বড় বড় গুল্ম বিবিধ আকারের পল্লব বিস্তার করিয়া পাহাড়ের গাত্রে ঝুলিতেছে। মাঝে মাঝে নদীর দুই তীরে ঘন জঙ্গলের বাহু অনেক দূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। একটা দীর্ঘ শাখাহীন শ্বেত গর্জ্জন বৃক্ষ পাহাড়ের উপরে হেলিয়া রহিয়াছে, নীচে নদীর চঞ্চল জলে তাহার ছায়া নাচিতেছে, বড় বড় লতা তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ঝুলিয়া রহিয়াছে। ঘন সবুজ জঙ্গলের মাঝে মাঝে স্নিগ্ধ শ্যামল কদলী বন। মাঝে মাঝে দুই তীর বিদীর্ণ করিয়া ছোট ছোট নির্ঝর শিশুদিগের ন্যায় আকুল বাহু; চঞ্চল আবেগ ও কলকল শুভ্র হাস্য লইয়া নদীতে আসিয়া পড়িতেছে। নদী কিছু দূর সমভাবে গিয়া স্থানে স্থানে শিলা-সোপান বাহিয়া ফেনাইয়া নিম্নাভিমুখে ঝরিয়া পড়ি-

তেছে। সেই অবিশ্রাম ঝর্ঝর শব্দ নিস্তব্ধ শৈলপ্রাচীরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

এই ছায়া শীতল প্রবাহ, স্নিগ্ধ ঝর্ঝর শব্দের মধ্যে স্তব্ধ শৈলতলে গোবিন্দমাণিক্য বাস করিতে লাগিলেন। হৃদয় বিস্তারিত করিয়া দিয়া হৃদয়ের মধ্যে শান্তি সঞ্চয় করিতে লাগিলেন—নির্জ্জন প্রকৃতির সান্ত্বনাময় গভীর প্রেম নানাদিক্ দিয়া সহস্র নির্ঝরের মত তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে পড়িতে লাগিল। তিনি আপনার হৃদয়ের গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেখান হইতে ক্ষুদ্র অভিমান সকল মুছিয়া ফেলিতে লাগিলেন—দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া আপনার মধ্যে বিমল আলোক ও বায়ুর প্রবাহ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কে তাঁহাকে দুঃখ দিয়াছে ব্যথা দিয়াছে, কে তাঁহার স্নেহের বিনিময় দেয় নাই, কে তাঁহার নিকট হইতে এক হস্তে উপকার গ্রহণ করিয়া অপর হস্তে কৃতঘ্নতা অর্পণ করিয়াছে, কে তাঁহার নিকট সমাদৃত হইয়া তাঁহাকে অপমান করিয়াছে, সমস্ত তিনি ভুলিয়া গেলেন। এই শৈলাসন বাসিনী অতি পুরাতন প্রকৃতির অবিশ্রাম কার্য্যশীলতা অথচ চিরনিশ্চিন্ত প্রশান্ত নবীনতা দেখিয়া তিনি নিজেও যেন সেইরূপ পুরাতন সেইরূপ বৃহৎ সেইরূপ প্রশান্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি যেন সুদূর জগৎ পর্য্যন্ত আপনার কামনাশূন্য স্নেহ বিস্তারিত করিয়া দিলেন—সমস্ত বাসনা দূর করিয়া দিয়া যোড়-হস্তে কহিলেন "হে ঈশ্বর, পতনোন্মুখ সম্পৎ-শিখর হইতে তোমার ক্রোড়ের মধ্যে ধারণ করিয়া আমাকে এ যাত্রা রক্ষা করিয়াছ। আমি মরিতে বসিয়াছিলাম আমি বাঁচিয়া গিয়াছি। যখন রাজা হইয়াছিলাম, তখন আমি আমার মহত্ত্ব জানিলাম না, আজ সমস্ত পৃথিবীময় আমার মহত্ত্ব অনুভব করিতেছি।" অবশেষে দুই চক্ষে জল পড়িতে লাগিল—বলিলেন "মহারাজ, তুমি আমার স্নেহের ধ্রুবকে কাড়িয়া লইয়াছ, সে বেদনা এখনো হৃদয় হইতে সম্পূর্ণ যায় নাই। যদিও আজ আমি বুঝিয়াছি যে, তুমি ভালই করিয়াছ। আমি সেই বালকের প্রতি স্বার্থপর স্নেহে আমার সমুদয় কর্ত্তব্য আমার জীবন বিসর্জ্জন দিতে-ছিলাম। তুমি আমাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছ। আমি ধ্রুবকে আমার সমস্ত পুণ্যের পুরস্কার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম—তুমি তাহাকে কাড়িয়া লইয়া শিক্ষা দিতেছ যে, পুণ্যের পুরস্কার পুণ্য। তাই আজ সেই ধ্রুবের পবিত্র বিরহদুঃখকে সুখ বলিয়া তোমার প্রসাদ বলিয়া অনুভব করিতেছি। আমি বেতন লইয়া ভৃত্যের মত কাজ করিব না প্রভু, আমি তোমার প্রেমের বশ হইয়া তোমার সেবা করিব।"

গোবিন্দমাণিক্য দেখিলেন নির্জ্জনে ধ্যান-পরায়ণা প্রকৃতি যে স্নেহধারা সঞ্চয় করিতেছে, সজনে লোকালয়ের মধ্যে তাহা নদীরূপে প্রেরণ করিতেছে—যে তাহা গ্রহণ করিতেছে, তাহার তৃষ্ণানিবারণ হইতেছে, যে করিতেছে না তাহার প্রতিও প্রকৃতির কোন অভিমান নাই। গোবিন্দমাণিক্য কহিলেন "আমিও আমার এই বিজনে সঞ্চিতপ্রেম সজনে বিত-রণ করিতে বাহির হইব।" বলিয়া তাঁহার পর্ব্বতাশ্রম ছাড়িয়া তিনি বাহির হইলেন।

সহসা রাজত্ব ছাড়িয়া দিয়া উদাসীন হওয়া লেখায় যতটা সহজ মনে হয়—বাস্তবিক ততটা সহজ নহে। রাজবেশ ছাড়িয়া দিয়া গেরুয়া বস্ত্র পরা নিতান্ত অল্পকথা নহে। বরঞ্চ রাজ্য পরিত্যাগ করা সহজ, কিন্তু আমাদের আজন্ম কালের ছোট ছোট অভ্যাস আমরা অনায়াসে

ছাড়িতে পারি না, তাহারা তাহাদের তীব্র ক্ষুধাতৃষ্ণা লইয়া আমাদের অস্থিমাংসের সহিত লিপ্ত হইয়া আছে; তাহাদিগকে নিয়মিত খোরাক না যোগাইলে তাহারা আমাদের রক্তশোষণ করিতে থাকে। কেহ যেন মনে না করেন যে গোবিন্দমাণিক্য যতদিন তাঁহার বিজন কুটীরে বাস করিতেছিলেন ততদিন কেবলং অবিচলিত চিত্তে স্থাণুর মত বসিয়াছিলেন! তিনি পদে পদে আপনার সহস্র ক্ষুদ্র অভ্যাসের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। যখনি কিছুর অভাবে তাঁহার হৃদয় কাতর হইতেছিল তখনি তিনি তাহাকে ভর্ৎসনা করিতেছিলেন। তিনি তাঁহার মনের সহস্রমুখী ক্ষুধাকে কিছু না খাইতে দিয়া বিনাশ করিতেছিলেন। পদে পদে এই শত শত অভাবের উপরে জয়ী হইয়া তিনি সুখ লাভ করিতেছিলেন। যেমন দুরন্ত অশ্বকে দ্রুতবেগে ছুটাইয়া শান্ত করিতে হয়, তেমনি তিনি তাঁহার অভাবকাতর অশান্ত হৃদয়কে অভাবের মরুময় প্রান্তরের মধ্যে অবিশ্রাম দৌড় করাইয়া শান্ত করিতেছিলেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত এক মুহূর্ত্তও তাঁহার বিশ্রাম ছিল না।

পার্ব্বত্য প্রদেশ ছাড়িয়া গোবিন্দমাণিক্য দক্ষিণে সমুদ্রাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। সমস্ত বাসনার দ্রব্য বিসর্জ্জন দিয়া তিনি হৃদয়ের মধ্যে আশ্চর্য্য স্বাধীনতা অনুভব করিতে লাগিলেন। কেহ তাঁহাকে আর বাঁধিতে পারে না, অগ্রসর হইবার সময় কেহ তাঁহাকে আর বাধা দিতে পারে না। প্রকৃতিকে অত্যন্ত বৃহৎ দেখিলেন এবং আপনাকেও তাহার সহিত এক বলিয়া মনে হইল। বৃক্ষ লতার সে এক নূতন শ্যামল বর্ণ, সূর্য্যের সে এক নূতন কনককিরণ, প্রকৃতির সে এক নূতন মুখশ্রী দেখিতে লাগিলেন। গ্রামে গিয়া মানবের প্রত্যেক কাজের মধ্যে তিনি এক নূতন সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন। মানবের হাস্যালাপ ওঠা বসা চলা ফেরার মধ্যে তিনি এক অপূর্ব্ব নৃত্যগীতের মাধুরী দেখিতে পাইলেন। যাহাকে দেখিলেন তাহাকে কাছে ডাকিয়া কথা কহিয়া সুখ পাইলেন—যে তাঁহাকে উপেক্ষা প্রদর্শন করিল তাহার নিকট হইতে তাঁহার হৃদয় দূরে গমন করিল না। সর্ব্বত্র দুর্ব্বলকে সাহায্য করিতে এবং দুঃখীকে সান্ত্বনা দিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল! তাঁহার মনে হইতে লাগিল আমার নিজের সমস্ত বল এবং সমস্ত সুখ আমি পরের জন্য উৎসর্গ করিলাম, কেন না আমার নিজের কোন কাজ নাই কোন বাসনা নাই। সচরাচর যে সকল দৃশ্য কাহারো চোখে পড়ে না, তাহা নূতন আকার ধারণ করিয়া তাঁহার চোখে পড়িতে লাগিল। যখন দুই ছেলেকে পথে বসিয়া খেলা করিতে দেখিতেন, দুই ভাইকে, পিতাপুত্রকে, মাতা ও শিশুকে একত্র দেখিতেন, তাহারা ধূলিলিপ্ত হউক, দরিদ্র হউক, কদর্য্য হউক, তিনি তাহাদের মধ্যে দূরদূরান্তব্যাপী মানবহৃদয়সমুদ্রের অনন্ত গভীর প্রেম দেখিতে পাইতেন। একটি শিশুক্রোড়া জননীর মধ্যে তিনি যেন অতীত ও ভবিষ্যতের সমস্ত মানবশিশুর জননীকে দেখিতে পাইতেন। দুই বন্ধুকে একত্রে দেখিলেই তিনি সমস্ত মানবজাতীকে বন্ধুপ্রেমে সহায়বান্ অনুভব করিতেন। পূর্ব্বে যে পৃথিবীকে মাঝে মাঝে মাতৃহীনা বলিয়া বোধ হইত, সেই পৃথিবীকে আনতনয়না চিরজাগ্রৎ জননীর কোলে দেখিতে পাইলেন। পৃথিবীর দুঃখ শোক দারিদ্র্য বিবাদ বিদ্বেষ দেখিলেও তাঁহার মনে আর নৈরাশ্য জন্মিত না। একটি মাত্র মঙ্গলের চিহ্ন দেখিলেই তাঁহার আশা সহস্র অমঙ্গল ভেদ করিয়া স্বর্গাভিমুখে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিত। আমা-

দের সকলের জীবনেই কি কোন না কোন দিন এমন এক অভূতপূর্ব্ব নূতন প্রেম ও নূতন স্বাধীনতার প্রভাত উদিত হয় নাই যে দিন সহসা এই হাস্তক্রন্দনময় জগৎকে এক সুকোমল নবকুমারের মত এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য প্রেম ও মঙ্গলের ক্রোড়ে বিকশিত দেখিয়াছি! যে দিন কেহ আমাদিগকে ক্ষুব্ধ করিতে পারে না, কেহ আমাদিগকে জগতের কোন সুখ হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না, কেহ আমাদিগকে কোন প্রাচীরের মধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না! যে দিন এক অপূর্ব্ব বাঁশি বাজিয়া উঠে, এক অপূর্ব্ব বসন্ত জাগিয়া উঠে, চরাচর চির যৌবনের আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া যায়! যেদিন সমস্ত দুঃখ দারিদ্র্য বিপদকে কিছুই মনে হয় না! নূতন স্বাধীনতার আনন্দে প্রসারিত হৃদয় গোবিন্দমাণিক্যের জীবনে সেই দিন উপস্থিত হইয়াছে।

দক্ষিণ চট্টগ্রামের রামু সহর এখনও দশ ক্রোশ দূরে। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে গোবিন্দমাণিক্য যখন আলমখাল নামক ক্ষুদ্র গ্রামে গিয়া পৌঁছিলেন তখন গ্রামপ্রান্তবর্ত্তী একটি কুটীর হইতে ক্ষীণকণ্ঠ বালকের ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইলেন। গোবিন্দমাণিক্যের হৃদয় সহসা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই কুটীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন—দেখিলেন যুবক কুটিরস্বামী একটি শীর্ণ বালককে কোলে করিয়া লইয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতেছে। বালক থরথর করিয়া কাঁপিতেছে এবং থাকিয়া থাকিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কাঁদিতেছে। কুটীরস্বামী তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া ঘুমপাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। সন্ন্যাসবেশী গোবিন্দমাণিক্যকে দেখিয়া সে শশব্যস্ত হইয়া পড়িল। কাতরস্বরে কহিল "ঠাকুর ইহাকে আশীর্ব্বাদ কর।" গোবিন্দমাণিক্য আপনার কম্বল বাহির করিয়া কম্পমান বালকের চারিদিকে জড়াইয়া দিলেন। বালক একবার কেবল তাহার শীর্ণমুখ তুলিয়া গোবিন্দমাণিক্যের দিকে চাহিল! তাহার চোখের নীচে কালি পড়িয়াছে—তাহার ক্ষীণ মুখের মধ্যে দুখানি চোখ ছাড়া আর কিছু নাই যেন। একবার গোবিন্দমাণিক্যকে দেখিয়াই দুইখানি পাণ্ডুবর্ণ পাৎলা ঠোঁট নাড়িয়া ক্ষীণ অব্যক্ত শব্দ করিল। আবার তখনি তাহার পিতার স্কন্ধের উপর মুখ রাখিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। তাহার পিতা তাহাকে কম্বল সমেত ভূমিতে রাখিয়া রাজাকে প্রণাম করিল এবং রাজার পদধূলি লইয়া ছেলের গায়ে মাথায় দিল। রাজা ছেলেকে তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ছেলেটির বাপের নাম কি?" কুটির স্বামী কহিল "আমি ইহার বাপ' আমার নাম যাদব। ভগবান্ একে একে আমার সকল কটিকে লইয়াছেন, কেবল একটি এখনো বাকি আছে" বলিয়া গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল। রাজা কুটিরস্বামীকে বলিলেন "আজ রাত্রে আমি তোমার এখানে অতিথি। আমি কিছুই খাইব না, অতএব আমার জন্য আহারাদির উদ্যোগ করিতে হইবে না। কেবল এখানে রাত্রিযাপন করিব।" বলিয়া সে রাত্রি সেইখানে রহিলেন। অনুচরগণ গ্রামের এক ধনী কায়স্থের বাড়ি আতিথ্য গ্রহণ করিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। নিকটে একটা পানা পুকুর ছিল, তাহার উপর হইতে বাষ্প উঠিতে লাগিল। গোয়াল ঘর হইতে খড় এবং শুষ্ক পত্র জ্বালানর গুরুতর ধোঁয়া আকাশে উঠিতে পারিল না, গুড়ি মারিয়া সমুখের বিস্তৃত জলামাঠকে আচ্ছন্ন করিয়া ধরিল। আসশেওড়ার বেড়ার কাছ হইতে কর্কশ স্বরে ঝিঁঝিঁ ডাকিতে লাগিল। বাতাস একেবারে বন্ধ, গাছের

পাতাটি নড়িতেছে না। পুকুরের অপর পারে ঘন বাঁশঝাড়ের মধ্য হইতে একটা পাখী থাকিয়া থাকিয়া টিটী করিয়া ডাকিয়া উঠিতেছে। ক্ষীণালোকে গোবিন্দমাণিক্য সেই রুগ্নবালকের বিবর্ণ শীর্ণ মুখ দেখিতেছেন। তিনি তাহাকে ভালরূপ কম্বলে আবৃত করিয়া তাহার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া তাহাকে নানাবিধ গল্প শুনাইতে লাগিলেন। সন্ধ্যা অতীত হইল, দূরে শৃগাল ডাকিয়া উঠিল। বালক গল্প শুনিতে শুনিতে রোগের কষ্ট ভুলিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। রাজা তাহার পার্শ্বের ঘরে আসিয়া শয়ন করিলেন। রাত্রে তাঁহার ঘুম হইল না। কেবল ধ্রুবকে মনে পড়িতে লাগিল। রাজা কহিলেন "ধ্রুবকে হারাইয়া সকল বালককেই আমার ধ্রুব বলিয়া বোধ হয়।"

খানিক রাত্রে শুনিলেন পাশের ঘরে ছেলেটি জাগিয়া উঠিয়া তাহার বাপকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "বাবা ও কি বাজে?"

বাপ কহিল "বাঁশি বাজিতেছে।"

বালক "বাঁশি কেন বাজে?"

বাপ "কাল যে পূজা, বাপ আমার!"

ছেলে "কাল পূজা? পূজার দিন আমাকে কিছু দেবে না?

বাপ "কি দেবো বাবা?"

ছেলে "আমাকে একটা রাঙা শাল দেবে না?"

বাপ "আমি শাল কোথায় পাব? আমার যে কিছুই নেই, মাণিক আমার!"

ছেলে "বাবা তোমার কিছুই নেই বাবা?"

বাপ "কিছুই নেই বাবা কেবল তুমি আছ" ভগ্নহৃদয় পিতার গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস পাশের ঘর হইতে শুনা গেল।

ছেলে আর কিছুই বলিল না। বোধ করি বাপকে জড়াইয়া ধরিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

রাত্রি শেষ না হইতে হইতেই গোবিন্দমাণিক্য গৃহস্বামীর নিকট বিদায় না লইয়াই অশ্বারোহণে রামু সহরের অভিমুখে চলিয়া গেলেন। আহার করিলেন না, বিশ্রাম করিলেন না! পথের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র নদী ছিল—ঘোড়াশুদ্ধ নদী পার হইলেন। প্রখর রৌদ্রের সময় রামুতে গিয়া পৌঁছিলেন। সেখানে অধিক বিলম্ব করিলেন না। আবার সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই যাদবের কুটিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যাদবকে আড়ালে ডাকিয়া আনিলেন। তাঁহার ঝুলির মধ্য হইতে একখানি লাল শাল বাহির করিয়া যাদবের হাতে দিয়া কহিলেন 'আজ পূজার দিনে এই শালটি তোমার ছেলেকে দাও।"

যাদব কাঁদিয়া গোবিন্দমাণিক্যের পা জড়াইয়া ধরিল। কহিল "প্রভু তুমি আনিয়াছ তুমিই দাও।"

রাজা কহিলেন "না আমি দিব না, তুমি দাও। আমি দিলে কোন ফল নাই। আমার নাম করিও না। আমি কেবল তোমার ছেলের মুখে আনন্দের হাসি দেখিয়া চলিয়া যাইব।"

রুগ্ন বালকের অতি শীর্ণ ম্লান মুখ প্রফুল্ল দেখিয়া রাজা চলিয়া গেলেন। রাজা বিষণ্ণ হইয়া মনে মনে কহিলেন, "আমি কোন কাজ করিতে পারি না। আমি কেবল কয়টা বৎসর রাজত্বই করিয়াছি, কিছুই শিক্ষা করি নাই। কি করিলে একটি ক্ষুদ্র বালকের রোগের কষ্ট একটু নিবারণ হইবে তাহা জানি না। আমি কেবল অসহায় অকর্ম্মণ্য ভাবে শোক করিতেই জানি। বিল্বন ঠাকুর যদি থাকিতেন ত ইহাদের কিছু উপকার করিয়া যাইতেন। আমি যদি বিল্বন ঠাকুরের মত হইতাম।"

গোবিন্দমাণিক্য বলিলেন "আমি আর ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইব না, লোকালয়ের মধ্যে বাস করিয়া কাজ করিতে শিখিব।"

রামুর দক্ষিণে রাজাকুলের নিকটে মগদিগের যে দুর্গ আছে, আরাকানরাজের অনুমতি লইয়া সেইখানে তিনি বাস করিতে লাগিলেন।

গ্রামবাসীদের যতগুলো ছেলে পিলে ছিল, সকল গুলোই দুর্গে গোবিন্দমাণিক্যের নিকটে আসিয়া জুটিল। গোবিন্দমাণিক্য তাহাদিগকে লইয়া একটা বড় পাঠশালা খুলিলেন। তিনি তাহাদিগকে পড়াইতেন, তাহাদের সহিত খেলিতেন, তাহাদের বাড়িতে গিয়া তাহাদের সহিত বাস করিতেন, পীড়া হইলে তাহাদিগকে দেখিতে যাইতেন। ছেলেপিলেরা সাধারণতঃ যে নিতান্তই স্বর্গ হইতে আসিয়াছে এবং তাহারা যে দেবশিশু তাহা নহে, তাহাদের মধ্যে মানব এবং দানবভাবের কিছুমাত্র অপ্রতুল নাই। স্বার্থপরতা ক্রোধ লোভ দ্বেষ হিংসা তাহাদের মধ্যে সম্পূর্ণ বলবান, তাহার উপর আবার বাড়িতে পিতামাতার নিকট হইতেও সকল সময়ে ভাল শিক্ষা পায় যে তাহা নহে। এই জন্ত মগের দুর্গে মগের রাজত্ব হইয়া উঠিল —দুর্গের মধ্যে যেন উনপঞ্চাশ বায়ু এবং চৌষট্টি ভূতে একত্র বাসা করিয়াছে। গোবিন্দমাণিক্য এই সকল উপকরণ লইয়া ধৈর্য্য ধরিয়া মানুষ গড়িতে লাগিলেন। একটি মানুষের জীবন যে কত মহৎ ও কি প্রাণপণ যত্নে পালন ও রক্ষা করিবার দ্রব্য তাহা গোবিন্দমাণিক্যের হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক। তাঁহার চারিদিকে অনন্ত ফলপরিপূর্ণ মনুষ্যজন্ম সার্থক হয়, ইহাই দেখিয়া এবং নিজের চেষ্টায় ইহাই সাধন করিয়া গোবিন্দমাণিক্য নিজের অসম্পূর্ণ জীবন বিসর্জ্জন করিতে চান। ইহার জন্ত তিনি সকল কষ্ট ও সকল উপদ্রব সহ্য করিতে পারেন। কেবল মাঝে মাঝে এক একবার হতাশ্বাস হইয়া দুঃখ করিতেন যে, "আমার কার্য্য আমি নিপুণরূপে সম্পন্ন করিতে পারিতেছি না। বিল্বন থাকিলে ভাল হইত।"

এইরূপে গোবিন্দমাণিক্য একশত ধ্রুবকে লইয়া দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

ত্রিচত্ব বিংশ পরিচ্ছেদ।*

এদিকে সা সুজা তাঁহার ভ্রাতা ঔরঙ্গজীবের সৈন্ত কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া পলায়ন করিতেছেন। এলাহাবাদের নিকটে যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার পরাজয় হয়। বিপক্ষ পরাক্রান্ত, এবং এই বিপদের সময় সুজা স্বপক্ষীয়দেরও বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি অপমানিত ও ভীত ভাবে ছদ্মবেশে সামান্ত লোকের মত একাকী পলায়ন করিতে লাগিলেন। যেখানেই যান পশ্চাতে শত্রুসৈন্তের ধূলিধ্বজা ও তাহাদের অশ্বের খুরধ্বনি তাঁহাকে অনুসরণ করিতে লাগিল। অবশেষে পাটনায় পৌঁছিয়া তিনি পুনর্ব্বার নবাববেশে আপন পরিবার ও প্রজাদের নিকটে আগমনসংবাদ ঘোষণা করিলেন। তিনিও যেমন পাটনায় পৌঁছিয়াছেন, তাহার কিছুকাল পরেই ঔরঙ্গজীবের পুত্র কুমার মহম্মদ সৈন্ত সহিত পাটনার দ্বারে আসিয়া পৌঁছিলেন। সুজা পাটনা ছাড়িয়া মুঙ্গেরে পালাইলেন।

মুঙ্গেরে তাঁহার বিক্ষিপ্ত দলবল কতক কতক তাঁহার নিকট আসিয়া জুটিল এবং সেখানে তিনি নূতন সৈন্তও সংগ্রহ করিলেন। তেরিয়াগড়া ও শিকলিগলীর দুর্গসংস্কার করিয়া এবং নদীতীরে পাহাড়ের উপরে প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া তিনি দৃঢ় হইয়া বসিলেন।

* ষ্টুয়ার্ট কৃত বাঙ্গালার ইতিহাস হইতে এই পরিচ্ছেদ সংগৃহীত।

এদিকে ঔরঙ্গজীব তাঁহার বিচক্ষণ সেনাপতি মীর জুম্লাকে কুমার মহম্মদের সাহায্যে পাঠাইলেন। কুমার মহম্মদ প্রকাশ্য ভাবে মুঙ্গেরের দুর্গের অনতিদূরে আসিয়া শিবির স্থাপন করিলেন, এবং মীর-জুম্লা অন্য গোপন-পথ দিয়া মুঙ্গেরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যখন সুজা কুমার মহম্মদের সহিত ছোট খাট যুদ্ধে ব্যাপৃত আছেন এমন সময়ে সহসা সংবাদ পাইলেন যে, মীর-জুম্লা বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া বসন্তপুরে আসিয়া পৌছিয়াছেন। সুজা ব্যস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমস্ত সৈন্য লইয়া মুঙ্গের ছাড়িয়া রাজমহলে পলায়ন করিলেন। সেইখানেই তাঁহার সমস্ত পরিবার বাস করিতেছিল। সম্রাটসৈন্য অবিলম্বে সেখানেও তাঁহার অনুসরণ করিল। সুজা ছয় দিন ধরিয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া শত্রুসৈন্যকে অগ্রসর হইতে দিলেন না। কিন্তু যখন দেখিলেন আর রক্ষা হয় না, তখন একদিন অন্ধকার ঝড়ের রাত্রে তাঁহার পরিবার সকল ও যথাসম্ভব ধন সম্পত্তি লইয়া নদীপার হইয়া তোণ্ডায় পলায়ন করিলেন এবং অবিলম্বে সেখানকার দুর্গসংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই সময়ে ঘন বর্ষা আসিল, নদী অত্যন্ত স্ফীত এবং পথ দুর্গম হইয়া উঠিল। সম্রাটসৈন্যেরা অগ্রসর হইতে পারিল না।

এই যুদ্ধ বিগ্রহের পূর্ব্বে কুমার মহম্মদের সহিত সুজার কন্যার বিবাহের সমস্ত স্থির হইয়াছিল। কিন্তু এই যুদ্ধের উপদ্রবে সে প্রস্তাব উভয় পক্ষই বিস্মৃত হইয়াছিল।

বর্ষায় যখন যুদ্ধ স্থগিত আছে, এবং মীরজুম্লা রাজমহল হইতে কিছুদূরে তাঁহার শিবির লইয়া গেছেন, এমন সময় সুজার একজন সৈনিক তোণ্ডার শিবির হইতে আসিয়া গোপনে কুমার মহম্মদের হস্তে একখানি পত্র দিল। কুমার খুলিয়া দেখিলেন সুজার কন্যা লিখিতেছেন। "কুমার, এই কি আমার অদৃষ্টে ছিল! যাঁহাকে মনে মনে স্বামী রূপে বরণ করিয়া আমার সমগ্র হৃদয় সমর্পণ করিয়াছি, যিনি অঙ্গুরীয় বিনিময় করিয়া আমাকে গ্রহণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন—তিনি আজ নিষ্ঠুর তরবারি হস্তে আমার পিতার প্রাণ লইতে আসিয়াছেন এই কি আমাকে দেখিতে হইল। কুমার, এই কি আমাদের বিবাহ উৎসব! তাই কি এত সমারোহ! তাই কি আমাদের রাজমহল আজ রক্তবর্ণ। তাই কি, কুমার দিল্লী হইতে লোহার শৃঙ্খল হাতে করিয়া আনিয়াছেন! এই কি প্রেমের শৃঙ্খল!"

এই পত্র পড়িয়া সহসা প্রবল ভূমিকম্পে যেন কুমার মহম্মদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। তিনি এক মুহূর্ত্ত আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তৎক্ষণাৎ সাম্রাজ্যের আশা, বাদশাহের অনুগ্রহ সমস্ত তিনি তুচ্ছ জ্ঞান করিলেন। প্রথম যৌবনের দীপ্ত হুতাশনে তিনি ক্ষতি লাভের বিবেচনা সমস্ত বিসর্জ্জন করিলেন। তাঁহার পিতার সমস্ত কার্য্য তাঁহার অত্যন্ত অন্যায় ও নিষ্ঠুর বলিয়া বোধ হইল। পিতার ষড়যন্ত্রপ্রবণ নিষ্ঠুর নীতির বিরুদ্ধে ইতিপূর্ব্বে তিনি পিতার সমক্ষেই আপন মত স্পষ্ট ব্যক্ত করিতেন, এবং কখন কখন তিনি সম্রাটের বিরাগভাজন হইতেন। আজ তিনি তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষদের মধ্যে কয়েক জন প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে ডাকিয়া সম্রাটের নিষ্ঠুরতা খলতা ও অত্যাচার সম্বন্ধে বিরাগ প্রকাশ করিয়া কহিলেন—"আমি তোণ্ডায় আমার পিতৃব্যের সহিত যোগ দিতে যাইব। তোমরা যাহারা আমাকে ভালবাস আমার অনুবর্ত্তী হও।" তাহারা দীর্ঘ সেলাম করিয়া তৎক্ষণাৎ কহিল "সাহজাদা যাহা বলিতেছেন তাহা অতি যথার্থ,

কালই দেখিবেন অর্দ্ধেক সৈন্য তোণ্ডার শিবিরে সাহজাদার সহিত মিলিত হইবে।" মহম্মদ সেই দিনই নদী পার হইয়া সুজার শিবিরে উপস্থিত হইলেন।

তোণ্ডায় উৎসব পড়িয়া গেল। যুদ্ধ বিগ্রহের কথা সকলে একেবারেই ভুলিয়া গেল। এতদিন কেবল পুরুষেরাই ব্যস্ত ছিল, এখন সুজার পরিবারে রমণীদের হাতে কাজের আর অন্ত রহিল না। সুজা অত্যন্ত স্নেহ ও আনন্দের সহিত মহম্মদকে গ্রহণ করিলেন। অবিশ্রাম রক্তপাতের পরে রক্তের টান যেন আরও বাড়িয়া উঠিল। নৃত্যগীত বাদ্যের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। নৃত্যগীত শেষ হইতে না হইতেই সংবাদ আসিল সম্রাট-সৈন্য নিকটবর্ত্তী হইয়াছে।

মহম্মদ যেমনি সুজার শিবিরে গেছেন, সৈন্যেরা অমনি মীরজুম্লার নিকট সংবাদ প্রেরণ করিল। একটি সৈন্যও মহম্মদের সহিত যোগ দিল না, তাহারা বুঝিয়াছিল মহম্মদ ইচ্ছাপূর্ব্বক বিপদসাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন, সেখানে তাঁহার দলভুক্ত হইতে যাওয়া বাতুলতা।

সুজা এবং মহম্মদের বিশ্বাস ছিল যে সম্রাট্‌সৈন্যের অধিকাংশই যুদ্ধক্ষেত্রে কুমার মহম্মদের সহিত যোগ দিবে। এই আশায় মহম্মদ নিজের নিশান উড়াইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। বৃহৎ একদল সম্রাট্‌সৈন্য তাঁহার দিকে অগ্রসর হইল। মহম্মদ আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। নিকটে আসিয়াই তাহারা মহম্মদের সৈন্যদলের উপরে গোলা বর্ষণ করিল। তখন মহম্মদ সমস্ত অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু তখন আর সময় নাই। সৈন্যেরা পলায়নতৎপর হইল। সুজার জ্যেষ্ঠ পুত্র যুদ্ধে মারা পড়িল।

সেই রাত্রেই হতভাগ্য সুজা এবং তাঁহার জামাতা সপরিবারে দ্রুতগামী নৌকায় চড়িয়া ঢাকায় পলায়ন করিলেন। জুম্লা ঢাকায় সুজার অনুসরণ করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না। তিনি বিজিত দেশে শৃঙ্খলা স্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন।

দুর্দ্দশার দিনে বিপদের সময় যখন বন্ধুরা একে একে বিমুখ হইতে থাকে তখন মহম্মদ ধন প্রাণ মান তুচ্ছ করিয়া সুজার পক্ষাবলম্বন করাতে সুজার হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। তিনি প্রাণের সহিত মহম্মদকে ভাল বাসিলেন। এমন সময়ে ঢাকা সহরে ঔরঙ্গজীবের একজন পত্রবাহক চর ধরা পড়িল। সুজার হাতে তাহার পত্র গিয়া পড়িল। ঔরঙ্গজীব মহম্মদকে লিখিতেছেন "প্রিয়তম পুত্র মহম্মদ, তুমি তোমার কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়া পিতৃবিদ্রোহী হইয়াছ, এবং তোমার অকলঙ্ক যশে কলঙ্ক নিক্ষেপ করিয়াছ। রমণীর ছলনাময় হাস্যে মুগ্ধ হইয়া আপন ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়াছ। ভবিষ্যতে সমস্ত মোগল সাম্রাজ্য শাসনের ভার যাঁহার হস্তে, তিনি আজ এক রমণীর দাস হইয়া আছেন। যাহা হউক্ ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া মহম্মদ যখন অনুতাপ প্রকাশ করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে মাপ করিলাম। কিন্তু যে কার্য্যের জন্য গিয়াছেন সেই কার্য্য সাধন করিয়া আসিলে তবে তিনি আমাদের অনুগ্রহের অধিকারী হইবেন।"

সুজা এই পত্র পাঠ করিয়া বজ্রাহত হইলেন। মহম্মদ বার বার করিয়া বলিলেন তিনি কখনই পিতার নিকটে অনুতাপ প্রকাশ করেন নাই। এ সমস্তই তাঁহার পিতার কৌশল। কিন্তু সুজার সন্দেহ দূর হইল না। সুজা তিন দিন ধরিয়া চিন্তা করিলেন, অবশেষে চতুর্থ দিনে কহিলেন "বৎস, আমাদের মধ্যে বিবা-

সের বন্ধন শিথিল হইয়াছে, অতএব আমি অনুরোধ করিতেছি তুমি তোমার স্ত্রীকে লইয়া প্রস্থান কর, নহিলে আমাদের মনে আর শান্তি থাকিবে না। আমার রাজকোষের দ্বার মুক্ত করিয়া দিলাম, শ্বশুরের উপহার স্বরূপ যত ইচ্ছা ধনরত্ন লইয়া যাও।"

মহম্মদ অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া বিদায় হইলেন। তাঁহার স্ত্রী তাঁহার সঙ্গে গেলেন।

সুজা কহিলেন "আর যুদ্ধ করিব না। চট্টগ্রামের বন্দর হইতে জাহাজ লইয়া মক্কায় চলিয়া যাইব।" বলিয়া ঢাকা ছাড়িয়া ছদ্মবেশে চলিয়া গেলেন।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

যে দুর্গে গোবিন্দমাণিক্য বাস করিতেন, একদিন বর্ষার অপরাহ্ণে সেই দুর্গের পথে এক জন ফকীর, সঙ্গে তিন বালক ও একজন প্রাপ্তবয়স্ক অনুচর লইয়া চলিয়াছেন। বালকদের অত্যন্ত ক্লান্ত দেখাইতেছে। বাতাস বেগে বহিতেছে এবং অবিশ্রাম বর্ষার ধারা পড়িতেছে। সকলের চেয়ে ছোট বালকটির বয়স চৌদ্দর অধিক হইবে না, সে শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে কাতর স্বরে কহিল "পিতা, আর ত পারি না।" বলিয়া অধীর ভাবে কাঁদিতে লাগিল। ফকীর কিছু না বলিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইলেন। বড় বালকটি ছোটকে তিরস্কার করিয়া কহিল "পথের মধ্যে এমন করিয়া কাঁদিয়া ফল কি?" চুপ্ কর্! অনর্থক পিতাকে কাতর করিস্ নে!" ছোট বালকটি তখন তাহার উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন দমন করিয়া শান্ত হইল। মধ্যম বালকটি ফকীরকে জিজ্ঞাসা করিল "পিতা আমরা কোথায় যাইতেছি।

ফকীর কহিলেন "ঐ যে দুর্গের চূড়া দেখা যাইতেছে ঐ দুর্গে যাইতেছি।"

"ওখেনে কে আছে পিতা?"

"শুনিয়াছি কোথাকার একজন রাজা সন্ন্যাসী হইয়া ওখানে বাস করেন!"

"রাজা সন্ন্যাসী কেন হইল পিতা?"

ফকীর কহিল "জানি না বাছা। হইত তাঁহার আপনার সহোদর ভ্রাতা সৈন্য লইয়া তাঁহাকে একটা গ্রাম্য কুকুরের মত দেশ হইতে দেশান্তরে তাড়া করিয়াছে। রাজ্য ও সুখ সম্পৎ হইতে তাঁহাকে পথে বাহির করিয়া দিয়াছে। এখন হয়ত কেবল দারিদ্র্যের অন্ধকার ক্ষুদ্র গহ্বর ও সন্ন্যাসীর গেরুয়া বসন পৃথিবীর মধ্যে তাঁহার এক মাত্র লুকাইবার স্থান। আপনার ভ্রাতার বিদ্বেষ হইতে বিষদন্ত হইতে আর কোথাও রক্ষা নাই!"

বলিয়া ফকীর দৃঢ়রূপে আপন ওষ্ঠাধর চাপিয়া হৃদয়ের আবেগ দমন করিলেন। বড় ছেলেটি জিজ্ঞাসা করিল "পিতা, এই সন্ন্যাসী কোন্ দেশের রাজা ছিল।"

ফকীর কহিলেন "তাহা জানি না বাছা।"

"যদি আমাদের আশ্রয় না দেয়।"

"তবে আমরা বৃক্ষতলে শয়ন করিব। আর আমাদের স্থান কোথায়!"

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে দুর্গে সন্ন্যাসী ও ফকীরে দেখা হইল। উভয়েই উভয়কে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। গোবিন্দমাণিক্য চাহিয়া দেখিলেন ফকীরকে ফকীর বলিয়া বোধ হইল না, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থপর বাসনা হইতে হৃদয়কে প্রত্যাহরণ করিয়া একমাত্র বৃহৎ উদ্দেশ্যের মধ্যে স্থাপন করিলে মুখে যে একপ্রকার জ্বালাবিহীন বিমল জ্যোতি প্রকাশ পায় ফকীরের

মুখে তাহা দেখিতে পাইলেন না। ফকীর সর্ব্বদা সতর্কিত সচকিত। তাঁহার হৃদয়ের তৃষিত বাসনা সকল তাঁহার দুই জলন্ত নেত্র হইতে যেন অগ্নি পান করিতেছে। অধীর হিংসা তাঁহার দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধর এবং দৃঢ়লগ্ন দন্তের মধ্যে বিফলে প্রতিহত হইয়া পুনরায় যেন হৃদয়ের অন্ধকার গহ্বরে প্রবেশ করিয়া আপনাকে আপনি দংশন করিতেছে। সঙ্গে তিন জন বালক, তাহাদের অত্যন্ত সুকুমার সুন্দর শ্রান্ত ক্লিষ্ট দেহ ও একপ্রকার গর্ব্বিত সঙ্কোচ দেখিয়া মনে হইল যেন তাহারা আজন্মকাল অতি সযত্নে সম্মানের শিকার উপরে তোলা ছিল এই প্রথম তাহাদের ভূমিতলে পদার্পণ। চলিতে গেলে যে চরণের অঙ্গুলিতে ধূলি লাগে ইহা যেন পূর্ব্বে তাহাদের প্রত্যক্ষ জানা ছিল না। পৃথিবীর এই ধূলিময় মলিন দারিদ্র্যে প্রতিপদে যেন পৃথিবীর উপরে তাহাদের ঘৃণা জন্মিতেছে। মছলন্দ ও মাটির প্রভেদ দেখিয়া প্রতিপদে তাহারা যেন পৃথিবীকে তিরস্কার করিতেছে। পৃথিবী যেন তাহাদেরই প্রতি বিশেষ আড়ি করিয়া আপনার বড় মছলন্দ খানা গুটাইয়া রাখিয়াছে। সকলেই যেন তাহাদের নিকটে অপরাধ করিতেছে। দরিদ্র যে ভিক্ষা করিবার জন্য তাহার মলিন বসন লইয়া তাহাদের কাছে ঘেঁসিতে সাহস করিতেছে এ কেবল তাহার স্পর্দ্ধা-ঘৃণ্য কুকুর পাছে কাছে আসে এই জন্ত লোকে যেমন খাদ্যখণ্ড দূর হইতে ছুঁড়িয়া দেয়, ইহারাও যেন তেমনি ক্ষুধার্ত্ত মলিন ভিক্ষুককে দেখিলে দূর হইতে মুখ ফিরাইয়া একমুঠা মুদ্রা অনায়াসে ফেলিয়া দিতে পারে। তাহাদের চক্ষে অধিকাংশ পৃথিবীর একপ্রকার যৎসামান্ত ভাব ও ছিন্নবস্ত্র অকিঞ্চনতা যেন কেবল একটা মস্ত বেয়াদবি। তাহারা যে পৃথিবীতে সুখী ও সম্মানিত হইতেছে না একেবল পৃথিবীর দোষ। গোবিন্দমাণিক্য যে ঠিক এতটা ভাবিয়াছিলেন তাহা নহে। তিনি লক্ষণ দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন যে, এই ফকীর, এ যে আপনার বাসনা সকল বিসর্জ্জন দিয়া স্বাধীন ও সুস্থ হইয়া জগতের কাজ করিতে বাহির হইয়াছে তাহা নহে, এ কেবল আপনার বাসনা তৃপ্ত হয় নাই বলিয়া রাগ করিয়া সমস্ত জগতের প্রতি বিমুখ হইয়া বাহির হইয়াছে। তিনি যাহা চান তাহাই তাঁহার পাওনা এইরূপ ফকীরের বিশ্বাস, এবং জগৎ তাঁহার নিকটে যাহা চায় তাহা সুবিধামত দিলেই চলিবে এবং না দিলেও কোন ক্ষতি নাই। ঠিক এই বিশ্বাস অনুসারে কাজ হয় নাই বলিয়া তিনি জগৎকে একঘোরে করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছেন।

গোবিন্দমাণিক্যকে দেখিয়া ফকীরের রাজা বলিয়াও মনে হইল সন্ন্যাসী বলিয়াও বোধ হইল। তিনি ঠিক এরূপ আশা করেন নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন হয় একটা লম্বোদর পাগড়ীপরা স্ফীত মাংসপিণ্ড দেখিবেন নয় ত একটা দীনবেশধারী মলিন সন্ন্যাসী অর্থাৎ ভস্মাচ্ছাদিত ধূলিশয্যাশায়ী উদ্ধত স্পর্দ্ধা দেখিতে পাইবেন। কিন্তু দুয়ের মধ্যে কোনটাই দেখিতে পাইলেন না। গোবিন্দমাণিক্যকে দেখিয়া বোধ হইল তিনি যেন সমস্ত ত্যাগ করিয়াছেন, তবু যেন সমস্তই তাঁহারই। তিনি কিছুই চান না বলিয়াই যেন পাইয়াছেন—তিনি আপনাকে দিয়াছেন বলিয়া পাইয়াছেন। তিনি যেমন আত্মসমর্পণ করিয়াছেন তেমনি সমস্ত জগৎ আপন ইচ্ছায় তাঁহার নিকটে ধরা দিয়াছে। কোন প্রকার আড়ম্বর নাই বলিয়া তিনি রাজা, এবং সমস্ত সংসারের নিতান্ত নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন বলিয়া তিনি সন্ন্যাসী। এই জন্য

তাঁহাকে রাজাও সাজিতে হয় নাই, সন্ন্যাসীও সাজিতে হয় নাই।

রাজা তাঁহার অতিথিদিগকে সযত্নে সেবা করিলেন। তাঁহারা তাঁহার সেবা পরম অবহেলার সহিত গ্রহণ করিলেন। ইহাতে যেন তাঁহাদের সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। তাঁহাদের আরামের জন্য কি কি দ্রব্য আবশ্যক তাহাও রাজাকে জানাইয়া দিলেন। রাজা বড় ছেলেটিকে স্নেহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন "পথশ্রমে অত্যন্ত শ্রান্তিবোধ হইয়াছে কি?"

বালক তাহার ভালরূপ উত্তর না দিয়া ফকীরের কাছে ঘেঁসিয়া বসিল। রাজা তাহাদের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "তোমাদের এই সুকুমার শরীর ত পথে চলিবার জন্য নহে। তোমরা আমার এই দুর্গে বাস কর আমি তোমাদিগকে যত্ন করিয়া রাখিব।"

রাজার এই কথার উত্তর দেওয়া উচিত কি না এবং এই সকল লোকদের সহিত ঠিক কিরূপ ভাবে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহা বালকেরা ভাবিয়া পাইল না—তাহারা ফকীরের অধিকতর কাছে ঘেঁসিয়া বসিল, যেন মনে করিল কোথাকার এই ব্যক্তি মলিন হাত বাড়াইয়া তাহাদিগকে এখনই আত্মসাৎ করিতে আসিতেছে।

ফকীর গম্ভীর হইয়া বলিলেন "আচ্ছা, আমরা কিছুকাল তোমার এই দুর্গে বাস করিতে পারি।" রাজাকে যেন অনুগ্রহ করিলেন। মনে মনে কহিলেন "আমি কে তাহা যদি জানিতে তবে এই অনুগ্রহে তোমার আর আনন্দের সীমা থাকিত না।"

তিনটি বালককে রাজা কিছুতেই পোষ মানাইতে পারিলেন না। এবং ফকীর নিতান্ত যেন নির্লিপ্ত হইয়া রহিলেন।

ফকীর গোবিন্দমাণিক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন "শুনিয়াছি তুমি এককালে রাজা ছিলে; কোথাকার রাজা?"

গোবিন্দমাণিক্য কহিলেন "ত্রিপুরার।"

শুনিয়া বালকেরা তাঁহাকে অত্যন্ত ছোট বিবেচনা করিল। তাহারা কোন কালে ত্রিপুরার নাম শুনে নাই। কিন্তু ফকীর ঈষৎ বিচলিত হইয়া উঠিলেন। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার রাজত্ব গেল কি করিয়া?"

গোবিন্দমাণিক্য কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। অবশেষে কহিলেন "বাঙ্গালার নবাব শা সুজা আমাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছেন।" নক্ষত্ররায়ের কোন কথা বলিলেন না।

এই কথা শুনিয়া বালকেরা সকলে চমকিয়া উঠিয়া ফকীরের মুখের দিকে চাহিল। ফকীরের মুখ যেন বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি সহসা বলিয়া ফেলিলেন "এ সকল বুঝি তোমার ভাইয়ের কাজ! তোমার ভাই বুঝি তোমাকে রাজ্য হইতে তাড়া করিয়া সন্ন্যাসী করিয়াছে!"

রাজা আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন কহিলেন "তুমি এত সংবাদ কোথায় পাইলে সাহেব!" পরে মনে করিলেন "আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই, কাহারো নিকট হইতে শুনিয়া থাকিবেন।"

ফকীর তাড়াতাড়ি কহিলেন "আমি কিছুই জানি না। আমি কেবল অনুমান করিতেছি।"

রাত্রি হইলে সকলে শয়ন করিতে গেলেন। সে রাত্রে ফকীরের আর ঘুম হইল না। জাগিয়া দুঃস্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন এবং প্রত্যেক শব্দে চমকিয়া উঠিলেন।

পরদিন ফকীর গোবিন্দমাণিক্যকে কহিলেন "বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ এখানে আর থাকা হইল না। আমরা আজ বিদায় হই।"

গোবিন্দমাণিক্য কহিলেন "বালকেরা পথের কষ্টে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, উহাদিগকে

আর কিছুকাল বিশ্রাম করিতে দিলে ভাল হয়।"

বালকেরা কিছু বিরক্ত হইল—তাহাদের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠটি ফকীরের দিকে চাহিয়া কহিল—"আমরা কিছু নিতান্ত শিশু না, যখন আবশ্যক তখন অনায়াসে কষ্ট সহ্য করিতে পারি।" গোবিন্দমাণিক্যের নিকট হইতে তাহারা স্নেহ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহে। গোবিন্দমাণিক্য আর কিছু বলিলেন না।

ফকীর যখন যাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে দুর্গে আর একজন অতিথি আগমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজা ও ফকীর ভয়ে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। ফকীর কি করিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। রাজা তাঁহার অতিথিকে প্রণাম করিলেন। অতিথি আর কেহ নহেন রঘুপতি। রঘুপতি রাজার প্রণাম গ্রহণ করিয়া কহিলেন "জয় হোক্।"

রাজা কিঞ্চিৎ ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "নক্ষত্রের নিকট হইতে আসিতেছ ঠাকুর? বিশেষ কোন সংবাদ আছে?"

রঘুপতি কহিলেন "নক্ষত্ররায় ভাল আছেন তাঁহার জন্য ভাবিবেন না।" আকাশের দিকে হাত তুলিয়া কহিলেন "আমাকে জয়সিংহ তোমার কাছে পাঠাইয়া দিয়াছে। সে বাঁচিয়া নাই। তাহার ইচ্ছা আমি সাধন করিব নহিলে আমার শান্তি নাই। তোমার কাছে থাকিয়া তোমার সঙ্গী হইয়া তোমার সকল কার্য্যে আমি যোগ দিব।"

রাজা প্রথমে রঘুপতির ভাব কিছু বুঝিতে পারিলেনা। তিনি একবার মনে করিলেন—রঘুপতি বুঝি পাগল হইয়া থাকিবেন। রাজা চুপ করিয়া রহিলেন।

রঘুপতি কহিলেন আমি সমস্ত দেখিয়াছি কিছুতেই সুখ নাই। হিংসা করিয়া সুখ নাই, আধিপত্য করিয়া সুখ নাই, তুমি যে পথ অবলম্বন করিয়াছ তাহাতেই সুখ। আমি তোমার পরম শত্রুতা করিয়াছি, আমি তোমাকে হিংসা করিয়াছি, তোমাকে আমার কাছে বলি দিতে চাহিয়াছিলাম, আজ আমাকে তোমার কাছে সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে আসিয়াছি।"

গোবিন্দমাণিক্য কহিলেন "ঠাকুর তুমি আমার পরম উপকার করিয়াছ, আমার শত্রু আমার ছায়ার মত আমার সঙ্গে সঙ্গেই লিপ্ত হইয়াছিল, তাহার হাত হইতে তুমি আমাকে পরিত্রাণ করিয়াছ।"

রঘুপতি সে কথায় বড় একটা কাণ না দিয়া কহিলেন "মহারাজ, আমি জগতের রক্তপাত করিয়া যে পিশাচীকে এতকাল সেবা করিয়া আসিয়াছি, সে অবশেষে আমারই হৃদয়ের সমস্ত রক্ত শোষণ করিয়া পান করিয়াছে। সেই শোণিতপিপাসী জড়তা মূঢ়তাকে আমি দূর করিয়া আসিয়াছি, সে এখন মহারাজের রাজ্যের দেবমন্দিরে নাই, এখন সে রাজসভায় প্রবেশ করিয়া সিংহাসনে চড়িয়া বসিয়াছে।"

রাজা কহিলেন "দেবমন্দির হইতে যদি সে দূর হয় ত ক্রমে মানবের হৃদয় হইতেও দূর হইতে পারিবে।"

পশ্চাৎ হইতে একটি পরিচিত স্বর কহিল "না মহারাজ, মানব হৃদয়ই প্রকৃত মন্দির, সেইখানেই খড়্গ শাণিত হয় এবং সেইখানেই শত সহস্র নরবলি হয়। দেবমন্দিরে তাহার সামান্য অভিনয় হয় মাত্র।"

রাজা সচকিত হইয়া ফিরিয়া দেখিলেন সহাস্য সৌম্যমূর্ত্তি বিল্বন। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন "আজ আমার কি আনন্দ!"

বিল্বন কহিলেন "মহারাজ আপনাকে জয় করিয়াছেন বলিয়া সকলকেই জয় করিয়াছেন।"

তাই আজ আপনার দ্বারে শত্রুমিত্র সকলে একত্র হইয়াছে।

ফকীর অগ্রসর হইয়া কহিলেন "মহারাজ, আমিও তোমার শত্রু আমিও তোমার হাতে ধরা দিলাম।" রঘুপতির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন "এই ব্রাহ্মণ ঠাকুর আমাকে জানেন। আমিই সুজা, বাঙ্গালার নবাব, আমিই তোমাকে বিনাপরাধে নির্ব্বাসিত করিয়াছি এবং সে পাপের শাস্তিও পাইয়াছি —আমার ভ্রাতার হিংসা আজ পথে পথে আমার অনুসরণ করিতেছে, আমার রাজ্যে আমার আর দাঁড়াইবার স্থান নাই। ছদ্মবেশে আমি আর থাকিতে পারি না, তোমার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া আমি বাঁচিলাম।"

তখন রাজা ও নবাব উভয়ে কোলাকুলি করিলেন, রাজা কেবলমাত্র কহিলেন "আমার কি সৌভাগ্য!"

রঘুপতি কহিলেন "মহারাজ, তোমার সহিত শত্রুতা করিলেও লাভ আছে। তোমার শত্রুতা করিতে গিয়াই তোমার কাছে ধরা পড়িয়াছি, নহিলে কোন কালে তোমাকে জানিতাম না।"

বিল্বন হাসিয়া কহিলেন "যেমন ফাঁসের মধ্যে পড়িয়া ফাঁস ছিঁড়িতে গিয়া গলায় আরও অধিক বাধিয়া যায়!"

রঘুপতি কহিলেন "আমার আর দুঃখ নাই —আমি শান্তি পাইয়াছি।"

বিল্বন কহিলেন "শান্তি সুখ আপনার মধ্যেই আছে কেবল জানিতে পাই না। ভগবান্ এ যেন মাটির হাঁড়িতে অমৃত রাখিয়াছেন, অমৃত আছে বলিয়া কাহারও বিশ্বাস হয় না। আঘাত লাগিয়া হাঁড়ি ভাঙ্গিলে তবে অনেক সময়ে সুধার আস্বাদ পাই। হায় হায়, এমন জিনিষও এমন জায়গায় থাকে!"

এমন সময়ে একটা অভ্রভেদী হো হো শব্দ উঠিল। দেখিতে দেখিতে দুর্গের মধ্যে ছোট বড় নানাবিধ ছেলে আসিয়া পড়িল। রাজা বিল্বনকে কহিলেন "এই দেখ ঠাকুর আমার ধ্রুব।" বলিয়া ছেলেদের দেখাইয়া দিলেন।

বিল্বন কহিলেন "যাহার প্রসাদে তুমি এতগুলি ছেলে পাইয়াছ সেও তোমাকে ভোলে নাই, তাহাকেও আনিয়া দিই।" বলিয়া বাহিরে গেলেন। কিঞ্চিৎ বিলম্বে ধ্রুবকে কোলে করিয়া রাজার কোলে দিলেন।

রাজা তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া ডাকিলেন "ধ্রুব।"

ধ্রুব কিছুই বলিল না, গম্ভীর ভাবে নীরবে রাজার কাঁধে মাথা দিয়া পড়িয়া রহিল। বহুদিন পরে প্রথম মিলনে বালকের ক্ষুদ্র হৃদয়ের মধ্যে যেন এক প্রকার অস্ফুট অভিমান ও লজ্জার উদয় হইল। রাজাকে জড়াইয়া মুখ লুকাইয়া রহিল।

রাজা বলিলেন "আর সব হইল, কেবল নক্ষত্র আমাকে ভাই বলিল না।"

সুজা তীব্রভাবে কহিলেন "মহারাজ, আর সকলেই অতি সহজেই ভাইয়ের মত ব্যবহার করে কেবল নিজের ভাই করে না।"

সুজার হৃদয় হইতে এখনও শেল উৎপাটিত হয় নাই।

উপসংহার।

এইখানে বলা আবশ্যক তিনটি বালক সুজার তিন ছদ্মবেশী কন্যা। সুজা মক্কা যাইবার উদ্দেশে চট্টগ্রাম বন্দরে গিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে গুরুতর বর্ষার প্রাদুর্ভাবে একখানিও জাহাজ পাইলেন না। অবশেষে হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিবার পথে গোবিন্দমাণিক্যের সহিত দুর্গে দেখা হয়। কিছুদিন দুর্গে বাস করিয়া সুজা সংবাদ পাইলেন এখনও সম্রাট-সৈন্য তাঁহাকে সন্ধান করিতেছে। গোবিন্দমাণিক্য যানাদি ও বিস্তর অনুচর সমেত তাঁহার বন্ধু আরাকানপতির নিকটে তাঁহাকে প্রেরণ করেন। যাইবার সময় সুজা তাঁহাকে বহুমূল্য তরবারি উপহার স্বরূপ দান করেন।

ইতিমধ্যে রাজা, রঘুপতি ও বিল্বনে মিলিয়া সমস্ত গ্রামকে যেন সচেতন করিয়া তুলিলেন। রাজার দুর্গ সমস্ত গ্রামের প্রাণ হইয়া উঠিল।

এইরূপে ছয় বৎসর কাটিয়া গেলে ছত্রমাণিক্যের মৃত্যু হইল। গোবিন্দমাণিক্যকে সিংহাসনে ফিরাইয়া লইবার জন্য ত্রিপুরা হইতে দূত আসিল।

গোবিন্দমাণিক্য প্রথমে বলিলেন "আমি রাজ্যে ফিরিব না।"

বিল্বন কহিলেন "সে হইবে না মহারাজ। ধর্ম্ম যখন স্বয়ং দ্বারে আসিয়া আহ্বান করিতেছেন তখন তাঁহাকে অবহেলা করিবেন না।"

রাজা তাঁহার ছাত্রদের দিকে চাহিয়া কহিলেন "আমার এতদিনকার আশা অসমাপ্ত এতদিনকার কার্য্য অসম্পূর্ণ রহিবে?"

বিল্বন কহিলেন "এখানে তোমার কার্য্য আমি করিব।" রাজা কহিলেন "তুমি যদি এখানে থাক তাহা হইলে আমার সেখানকার কার্য্য অসম্পূর্ণ হইবে।"

বিল্বন কহিলেন "না মহারাজ, এখন আমাকে আর তোমার আবশ্যক নাই। তুমি এখন আপনার প্রতি আপনি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পার। আমি যদি সময় পাই ত মাঝে মাঝে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব।"

রাজা ধ্রুবকে সঙ্গে লইয়া রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। ধ্রুব এখন আর নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। সে বিল্বনের প্রসাদে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া শাস্ত্র অধ্যয়নে মন দিয়াছে। রঘুপতি পুনর্ব্বার পৌরোহিত্য গ্রহণ করিলেন। এবার মন্দিরে আসিয়া যেন মৃত জয়সিংহকে পুনর্ব্বার জীবিতভাবে প্রাপ্ত হইলেন।

এদিকে বিশ্বাসঘাতক আরাকানপতি সুজাকে হত্যা করিয়া তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ কন্যাকে বিবাহ করেন। "দুর্ভাগা সুজার প্রতি আরাকানপতির নৃশংসতা স্মরণ করিয়া গোবিন্দমাণিক্য দুঃখ করিতেন। সুজার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তিনি তরবারের বিনিময়ে বহুতর অর্থ দ্বারা কুমিল্লা নগরীতে একটি উৎকৃষ্ট মস্‌জিদ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাহা অদ্যাপি সুজা-মস্‌জিদ্ বলিয়া বর্ত্তমান আছে।

গোবিন্দমাণিক্যের যত্নে মেহেরকুল আবাদ হইয়াছিল। তিনি ব্রাহ্মণগণকে বিস্তর ভূমি তাম্রপত্রে সনন্দ লিখিয়া দান করেন। মহারাজ গোবিন্দ কুমিল্লার দক্ষিণে বাতিসা গ্রামে একটি দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। তিনি অনেক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, কিন্তু সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। এই জন্য অনুতাপ করিয়া ১৬৬৯ খৃঃ অব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন।"*

সমাপ্ত।

* শেষ দুই পারাগ্রাফ শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত ত্রিপুরার ইতিহাস হইতে উদ্ধৃত

নষ্টনীড়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—•—

ভূপতির কাজ করিবার কোন দরকার ছিল না। তাঁহার টাকা যথেষ্ট ছিল, এবং দেশটাও গরম। কিন্তু গ্রহবশতঃ তিনি কাজের লোক হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন! এই জন্য তাঁহাকে একটা ইংরাজি খবরের কাগজ বাহির করিতে হইল। ইহার পরে সময়ের দীর্ঘতার জন্য তাঁহাকে আর বিলাপ করিতে হয় নাই।

ছেলেবেলা হইতেই তাঁহার ইংরাজি লিখিবার এবং বক্তৃতা দিবার সখ ছিল। কোন প্রকার প্রয়োজন না থাকিলেও ইংরাজি খবরের কাগজে তিনি চিঠি লিখিতেন, এবং বক্তব্য না থাকিলেও সভাস্থলে দুকথা না বলিয়া ছাড়িতেন না।

তাঁহার মত ধনী লোককে দলে পাইবার জন্য রাষ্ট্রনৈতিক দলপতিরা অজস্র স্তুতিবাদ করাতে নিজের ইংরাজি রচনাশক্তি সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা যথেষ্ট পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

অবশেষে তাঁহার উকীল শ্যালক উমাপতি ওকালতি ব্যবসায়ে হতোদ্যম হইয়া ভগিনীপতিকে কহিল, ভূপতি তুমি একটা ইংরাজি খবরের কাগজ বাহির কর! তোমার যে রকম অসাধারণ ইত্যাদি।

ভূপতি উৎসাহিত হইয়া উঠিল। পরের কাগজে পত্র প্রকাশ করিয়া গৌরব নাই,— নিজের কাগজে স্বাধীন কলমটাকে পূরাদমে ছুটাইতে পারিবে। ভাগিনীপতিকে সহকারী করিয়া নিতান্ত অল্প বয়সেই ভূপতি সম্পাদকের গদীতে আরোহণ করিল।

অল্প বয়সে সম্পাদকী নেশা এবং রাজনৈতিক নেশা অত্যন্ত জোর করিয়া ধরে। ভূপ-

তিকে মাতাইয়া তুলিবার লোকও ছিল অনেক।

এইরূপে সে যতদিন কাগজ লইয়া ভোর হইয়াছিল, ততদিনে তাহার বালিকা বধূ চারুলতা ধীরে ধীরে যৌবনে পদার্পণ করিল। খবরের কাগজের সম্পাদক এই মস্ত খবরটি ভাল করিয়া টের পাইল না। ভারত গবর্ণমেণ্টের সীমান্ত নীতি ক্রমশই স্ফীত হইয়া সংযমের বন্ধন বিদীর্ণ করিবার দিকে যাইতেছে ইহাই তাহার প্রধান লক্ষ্যের বিষয় ছিল।

ধনী গৃহে চারুলতার কোন কর্ম্ম ছিল না। ফলপরিণামহীন ফুলের মত পরিপূর্ণ অনাবশ্যকতার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠাই তাহার চেষ্টাশূন্য দীর্ঘ দিনরাত্রির একমাত্র কাজ ছিল। তাহার কোন অভাব ছিল না।

এমন অবস্থার সুযোগ পাইলে বধূ স্বামীকে লইয়া অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করিয়া থাকে, দাম্পত্য লীলার সীমান্ত নীতি সংসারের সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করিয়া সময় হইতে অসময়ে এবং বিহিত হইতে অবিহিতে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। চারুলতার সে সুযোগ ছিল না। কাগজের আবরণ ভেদ করিয়া স্বামীকে অধিকার করা তাহার পক্ষে দুরূহ হইয়াছিল।

যুবতী স্ত্রীর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া কোন আত্মীয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিলে ভূপতি একবার সচেতন হইয়া কহিল—তাইত চারুর একজন কেউ সঙ্গিনী থাকা উচিত, ও বেচারার কিছুই করিবার নাই।

শ্যালক উমাপতিকে কহিল—তোমার স্ত্রীকে আমাদের এখানে আনিয়া রাখ না—সমবয়সী স্ত্রীলোক কেহ কাছে নাই চারুর নিশ্চয়ই ভারি ফাঁকা ঠেকে।

স্ত্রীসঙ্গের অভাবই চারুর পক্ষে অত্যন্ত শোকাবহ সম্পাদক এইরূপ বুঝিল এবং শ্যালক-জায়া মন্দাকিনীকে বাড়িতে আনিয়া সে নিশ্চিন্ত হইল।

যে সময়ে স্বামী স্ত্রী, প্রেমোন্মেষের প্রথম অরুণালোকে পরস্পরের কাছে অপরূপ মহিমায় চিরনূতন বলিয়া প্রতিভাত হয় দাম্পত্যের সেই স্বর্ণপ্রভামণ্ডিত প্রত্যূষকাল অচেতন অবস্থায় কখন অতীত হইয়া গেল কেহ জানিতে পারিল না। নূতনত্বের স্বাদ না পাইয়াই উভয়ে উভয়ের কাছে পুরাতন পরিচিত অভ্যস্ত হইয়া গেল।

লেখা পড়ার দিকে চারুলতার একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল বলিয়া তাহার দিনগুলা নিতান্ত বোঝা হইয়া উঠে নাই। সে নিজের চেষ্টায় নানাকৌশলে পড়িবার বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিল। ভূপতির পিস্তুত ভাই অমল থার্ড ইয়ারে পড়িতেছিল, চারুলতা তাহাকে ধরিয়া পড়া করিয়া লইত, এই কর্ম্মটুকু আদায় করিয়া লইবার জন্ম অমলের অনেক আবদার তাহাকে সহ্য করিতে হইত। তাহাকে প্রায়ই হোটেলে খাইবার খোরাকী এবং ইংরাজি সাহিত্যগ্রন্থ কিনিবার খরচা যোগাইতে হইত। অমল মাঝে মাঝে বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইত, সেই যজ্ঞ সমাধার ভার গুরুদক্ষিণার স্বরূপ চারুলতা নিজে গ্রহণ করিত। ভূপতি চারুলতার প্রতি কোন দাবী করিত না, কিন্তু সামান্য একটু পড়াইয়া পিস্তুত ভাই অমলের দাবীর অন্ত ছিল না। তাহা লইয়া চারুলতা প্রায় মাঝে মাঝে কৃত্রিম কোপ এবং বিদ্রোহ প্রকাশ করিত; কিন্তু কোন একটা লোকের কোন কাজে আসা এবং স্নেহের উপদ্রব সহ্য করা তাহার পক্ষে অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল।

অমল কহিল, বৌঠান, আমাদের কালেজের রাজবাড়ির জামাই বাবু রাজ অন্তঃপুরের খাস্ হাতের বুননি কার্পেটের জুতো পরে

আসে, আমার ত সহ্য হয় না,—এক যোড়া কার্পেটের জুতো চাই, নইলে কোন মতেই পদমর্য্যাদা রক্ষা করতে পারচিনে!

চারু। হাঁ, তাই বই কি! আমি বসে বসে তোমার জুতো সেলাই করে মরি! দাম দিচ্চি বাজার হতে কিনে আনগে যাও!

অমল বলিল— সেটি হচ্চে না!

চারু জুতা সেলাই করিতে জানে না, এবং অমলের কাছে সে কথা স্বীকার করিতেও চাহে না। অমল চায় সংসারে সেই একমাত্র প্রার্থীর প্রার্থনা রক্ষা না করিয়া সে থাকিতে পারে না। অমল যে সময় কালেজে যাইত সেই সময়ে সে লুকাইয়া বহু যত্নে কার্পেটের শেলাই শিখিতে লাগিল। এবং অমল নিজে যখন তাহার জুতার দরবার সম্পূর্ণ ভুলিয়া বসিয়াছে এমন সময় এক দিন সন্ধ্যাবেলায় তাহাকে নিমন্ত্রণ করিল।

গ্রীষ্মের সময় ছাদের উপর আসন করিয়া অমলের আহারের জায়গা করা হইয়াছে। বালি উড়িয়া পড়িবার ভয়ে পিতলের ঢাকনায় থালা ঢাকা রহিয়াছে। অমল কালেজের বেশ পরিত্যাগ করিয়া মুখ ধুইয়া ফিট্‌ফাট্ হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

অমল আসনে বসিয়া ঢাকা খুলিল দেখিল। থালায় এক যোড়া নূতন বাঁধানো পশমের জুতা সাজানো রহিয়াছে! চারুলতা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

জুতা পাইয়া অমলের আশা আরো বাড়িয়া উঠিল। এখন গলাবন্ধ চাই, রেশমের রুমালে ফুলকাটা পাড় শেলাই করিয়া দিতে হইবে, তাহার বাহিরের ঘরে বসিবার বড় কেদারায় তেলের দাগ নিবারণের জন্ত একটা কাজ করা আবরণ আবশুক।

প্রত্যেকবারেই চারুলতা আপত্তি প্রকাশ করিয়া কলহ করে এবং প্রত্যেকবারেই বহু যত্নে বহু স্নেহে সৌখীন অমলের সখ মিটাইয়া দেয়! অমল মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে, বৌঠান কত দূর হইল।

চারুলতা মিথ্যা করিয়া বলে, কিছুই হয় নি! কখনো বলে, সে আমার মনেই ছিল না।

কিন্তু অমল ছাড়িবার পাত্র নয়! প্রতিদিন স্মরণ করাইয়া দেয় এবং আবদার করে। নাছোড়বান্দা অমলের সেই সকল উপদ্রব উদ্রেক করাইয়া দিবার জন্তই চারু ঔদাসীন্ত প্রকাশ করিয়া বিরোধের সৃষ্টি করে এবং হঠাৎ এক দিন তাহার প্রার্থনা পূরণ করিয়া দিয়া কৌতুক দেখে।

ধনীর সংসারে চারুকে আর কাহারো জন্ত কিছুই করিতে হয় না—কেবল অমল তাহাকে কাজ না করাইয়া ছাড়ে না। এই সকল ছোট খাট সখের খাটুনিতেই তাহার হৃদয়বৃত্তির চর্চ্চা এবং চরিতার্থতা হইত।

ভূপতির অন্তঃপুরে যে একখণ্ড জমি পড়িয়া ছিল তাহাকে বাগান বলিলে অনেকটা অত্যুক্তি করা হয়। সেই বাগানের প্রধান বনস্পতি ছিল একটা বিলাতী আমড়া গাছ।

এই ভূখণ্ডের উন্নতি সাধনের জন্ত চারু এবং অমলের মধ্যে একটা কমিটি বসিয়াছে। উভয়ে মিলিয়া কিছুদিন হইতে ছবি আঁকিয়া প্ল্যান করিয়া মহা উৎসাহে এই জমিটার উপরে একটা বাগানের কল্পনা ফলাও করিয়া তুলিয়াছে।

অমল বলিল, বৌঠান, আমাদের এই বাগানে সেকালের রাজকন্তার মত তোমাকে নিজের হাতে গাছে জল দিতে হবে।

চারু কহিল, আর ঐ পশ্চিমের কোণটাতে একটা কুঁড়ে তৈরি করে নিতে হবে, হরিণের বাচ্ছা থাক্‌বে।

অমল কহিল, আর একটি ছোটখাট ঝিলের মত করতে হবে তাতে হাঁস চর্‌বে।

চারু সে প্রস্তাবে উৎসাহিত হইয়া কহিল, আর তাতে নীলপদ্ম দেব, আমার অনেক দিন থেকে নীলপদ্ম দেখবার সাধ আছে।

অমল কহিল, সেই ঝিলের উপর একটি সাঁকো বেঁধে দেওয়া যাবে, আর ঘাটে একটি বেশ ছোট ডিঙ্গি থাক্‌বে।

চারু কহিল, ঘাট অবশ্য সাদা মার্ব্বেলের হবে!

অমল পেন্সিল কাগজ লইয়া রুল কাটিয়া কম্পাস ধরিয়া মহা আড়ম্বরে বাগানের একটা ম্যাপ আঁকিল।

উভয়ে মিলিয়া দিনে দিনে কল্পনার সংশোধন পরিবর্ত্তন করিতে করিতে বিশ পঁচিশখানা নূতন ম্যাপ্ আঁকা হইল।

ম্যাপ্ খাড়া হইলে কত খরচ হইতে পারে তাহার একটা এষ্টিমেট তৈরি হইতে লাগিল। প্রথমে সংকল্প ছিল,—চারু নিজের বরাদ্দ মাসহারা হইতে ক্রমে ক্রমে বাগান তৈরি করিয়া তুলিবে, ভূপতি ত বাড়িতে কোথায় কি হইতেছে তাহা চাহিয়া দেখে না, বাগান তৈরি হইলে তাহাকে সেখানে নিমন্ত্রণ করিয়া আশ্চর্য্য করিয়া দিবে ; সে মনে করিবে আলাদিনের প্রদীপের সাহায্যে জাপান দেশ হইতে একটা অস্তি বাগান তুলিয়া আনা হইয়াছে!

কিন্তু এষ্টিমেট যথেষ্ট কম করিয়া ধরিলেও চারুর সঙ্গতিতে কুলায় না। অমল তখন পুনরায় ম্যাপ পরিবর্ত্তন করিতে বসিল। কহিল —তা হলে বৌঠান, ঐ ঝিলটা বাদ দেওয়া যাক্।

চারু কহিল, না না দিদি ঝিল বাদ দিলে কিছুতেই চল্‌বে না, ওতে আমার নীলপদ্ম থাক্‌বে।

অমল কহিল, তোমার হরিণের ঘরে টালির ছাদ নাই দিলে। ওটা অমনি একটা সাদা সিধে খোড়ো চাল করলেই হবে।

চারু অত্যন্ত রাগ করিয়া কহিল—তাহলে আমার ও ঘরে দরকার নেই—ও থাক্!

মরিশস্ হইতে লবঙ্গ, কর্ণাট হইতে চন্দন এবং সিংহল হইতে দারচিনির চারা আনাইবার প্রস্তাব ছিল, অমল তাহার পরিবর্ত্তে মাণিকতলা হইতে সাধারণ দিশি ও বিলাতী গাছের নাম করিতেই চারু মুখ ভার করিয়া বসিল, কহিল তা'হলে আমার বাগানে কাজ নেই!

এষ্টিমেট কমাইবার এরূপ প্রথা নয়। এষ্টিমেটের সঙ্গে সঙ্গে কল্পনাকে খর্ব্ব করা চারুর পক্ষে অসাধ্য এবং অমল মুখে যাহাই বলুক্ তাহারও সেটা রুচিকর নয়।

অমল কহিল—তবে বৌঠান তুমি দাদার কাছে বাগানের কথাটা পাড়—তিনি নিশ্চয় টাকা দেবেন।

চারু কহিল—না, তাঁকে বল্লে মজা কি হল। আমরা দুজনে বাগান তৈরি করে তুল্‌ব। তিনি ত সাহেব বাড়িতে ফরমাস দিয়ে ইডেন্ গার্ডেন্ বানিয়ে দিতে পারেন—তা'হলে আমাদের প্লানের কি হবে?

আমড়া গাছের ছায়ায় বসিয়া চারু এবং অমল অসাধ্য সংকল্পের কল্পনাসুখ বিস্তার করিতেছিল। চারুর ভাজ মন্দা দোতলা হইতে ডাকিয়া কহিল, এত বেলায় বাগানে তোরা কি করচিস্?

চারু কহিল, পাকা আমড়া খুঁজ্‌চি।

লুব্ধ মন্দা কহিল, পাস্ যদি আমার জন্মে আনিস্।

চারু হাসিল, অমল হাসিল। তাহাদের সমস্ত সঙ্কল্পগুলির প্রধান সুখ এবং গৌরব এই ছিল যে, সেগুলি তাহাদের দুজনের মধ্যেই

বদ্ধ। মন্দার আর যা কিছু গুণ থাক্ কল্পনা ছিল না, সে এ সকল প্রস্তাবের রস গ্রহণ করিবে কি করিয়া? সে এই দুই সভ্যের সকল প্রকার কমিটি হইতে একেবারে বর্জ্জিত।

অগত্যা বাগানের এষ্টিমেটও কমিল না, কল্পনাও কোন অংশে হার মানিতে চাহিল না। সুতরাং আমড়াতলার কমিটি এই ভাবেই কিছু দিন চলিল। বাগানের যেখানে ঝিল হইবে যেখানে হরিণের ঘর হইবে, যেখানে পাথরের বেদী হইবে, অমল সেখানে চিহ্ন কাটিয়া রাখিল।

তাহাদের সংকল্পিত বাগানে এই আমড়াতলার চারদিক কি ভাবে বাঁধাইতে হইবে অমল একটি ছোট কোদাল লইয়া তাহারই দাগ কাটিতেছিল—এমন সময় চারু গাছের ছায়ায় বসিয়া বলিল, অমল তুমি যদি লিখ্‌তে পারতে তা'হলে বেশ হত।

অমল জিজ্ঞাসা করিল,—কেন বেশ হত?

চারু। তা'হলে আমাদের এই বাগানের বর্ণনা করে তোমাকে দিয়ে একটা গল্প লেখাতুম। এই ঝিল, এই হরিণের ঘর, এই আমড়াতলা সমস্তই তাতে থাক্‌ত,—আমরা দুজনে ছাড়া কেউ বুঝতে পারত না, বেশ মজা হত! অমল তুমি একবার লেখবার চেষ্টা করে দেখ না, নিশ্চয় তুমি পারবে!

অমল কহিল আচ্ছা, যদি লিখ্‌তে পারি ত আমাকে কি দেবে? চারু কহিল, তুমি কি চাও?

অমল কহিল, আমার মশারির চালে আমি নিজে লতা এঁকে দেব সেইটে তোমাকে আগাগোড়া রেশম দিয়ে কাজ করে দিতে হবে।

চারু কহিল তোমার সমস্ত বাড়াবাড়ি! মশারির চালে আবার কাজ!

মশারি জিনিষটাকে একটা শ্রীহীন কারাগারের মত করিয়া রাখার বিরুদ্ধে অমল অনেক কথা বলিল। সে কহিল সংসারের পনেরো আনা লোকের যে সৌন্দর্য্য বোধ নাই এবং কুশ্রীতা তাহাদের কাছে কিছুমাত্র পীড়াকর নহে ইহাই তাহার প্রমাণ।

চারু সেকথা তৎক্ষণাৎ মনে মনে মানিয়া লইল এবং আমাদের এই দুটি লোকের নিভৃত কমিটি যে সেই পনেরো আনার অন্তর্গত নহে ইহা মনে করিয়া সে খুসি হইল।

কহিল, আচ্ছা বেশ, আমি মশারির চাল তৈরি করে দেব তুমি লেখ।

অমল রহস্যপূর্ণভাবে কহিল, তুমি কি মনে কর আমি লিখ্‌তে পারিনে?

চারু অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া কহিল—তবে নিশ্চয় তুমি কিছু লিখেছ, আমাকে দেখাও!

অমল। আজ থাক্ বৌঠান!

চারু। না আজই দেখাতে হবে—মাথা খাও, তোমার লেখা নিয়ে এসগে!

চারুকে তাহার লেখা শোনাইবার অতি-ব্যগ্রতাতেই অমলকে এত দিন বাধা দিতেছিল। পাছে চারু না বোঝে, পাছে তাহার ভাল না লাগে, এ সঙ্কোচ সে তাড়াইতে পারিতেছিল না।

আজ খাতা আনিয়া একটুখানি লাল হইয়া একটুখানি কাশিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। চারু গাছের গুড়িতে হেলান্ দিয়া ঘাসের উপর পা ছড়াইয়া শুনিতে লাগিল।

প্রবন্ধের বিষয়টা ছিল, "আমার খাতা"! অমল লিখিয়াছিল—হে আমার শুভ্র খাতা, আমার কল্পনা এখনো তোমাকে স্পর্শ করে নাই। সূতিকাগৃহে ভাগ্যপুরুষ প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে শিশুর ললাটপট্টের ন্যায় তুমি নির্ম্মল, তুমি রহস্যময়। যেদিন তোমার শেষ পৃষ্ঠার শেষ ছত্রে উপসংহার লিখিয়া দিব, সে দিন

আজ কোথায়! তোমার এই শুভ্র শিশু পত্রগুলি সেই চিরদিনের জন্ম মসীচিহ্নিত সমাপ্তির কথা আজ স্বপ্নেও কল্পনা করিতেছে না!—ইত্যাদি অনেকখানি লিখিয়াছিল।

চারু তরুচ্ছায়ায় বসিয়া স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল। পড়া শেষ হইলে ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—তুমি আবার লিখিতে পার না!

সে দিন সেই গাছের তলায় অমল সাহিত্যের মাদকরস প্রথম পান করিল;—সাকী ছিল নবীনা, রসনাও ছিল নবীন এবং অপরাহ্নের আলোক দীর্ঘ ছায়াপাতে রহস্যময় হইয়া আসিয়াছিল।

চারু বলিল, অমল গোটাকতক আমড়া পেড়ে নিয়ে যেতে হবে। নইলে মন্দাকে কি হিসেব দেব?

মূঢ় মন্দাকে তাহাদের পড়াশুনা এবং আলোচনার কথা বলিতে প্রবৃত্তিই হয় না, সুতরাং আমড়া পাড়িয়া লইয়া যাইতে হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—•*•—

বাগানের সংকল্প তাহাদের অন্যান্য অনেক সংকল্পের ন্যায় সীমাহীন কল্পনাক্ষেত্রের মধ্যে কখন্ হারাইয়া গেল তাহা অমল এবং চারু লক্ষ্যও করিতে পারিল না।

এখন অমলের লেখাই তাহাদের আলোচনা ও পরামর্শের প্রধান বিষয় হইয়া উঠিল। অমল আসিয়া বলে—বৌঠান, একটা বেশ চমৎকার ভাব মাথায় এসেছে।

চারু উৎসাহিত হইয়া উঠে, বলে,—চল আমাদের দক্ষিণের বারান্দায়,—এখানে এখনি মন্দা পান সাজ্তে আস্বে

চারু কাশ্মীরী বারান্দায় একটি জীর্ণ বেতের কেদারায় আসিয়া বসে এবং অমল রেলিংয়ের নীচেকার উচ্চ অংশের উপর বসিয়া পা ছড়াইয়া দেয়।

অমলের লিখিবার বিষয়গুলি প্রায়ই সুনির্দ্দিষ্ট নহে—তাহা পরিষ্কার করিয়া বলা শক্ত। গোলমাল করিয়া সে যাহা বলিত তাহা স্পষ্ট বুঝা কাহারো সাধ্য নহে। অমল নিজেই বারবার বলিত, বৌঠান, তোমাকে ভাল বোঝাতে পারচিনে।

চারু বলিত, না, আমি অনেকটা বুঝিতে পেরেছি, তুমি এইটে লিখে ফেল—দেরি কোরো না।

সে খানিকটা বুঝিয়া খানিকটা না বুঝিয়া অনেকটা কল্পনা করিয়া অনেকটা অমলের ব্যক্ত করিবার আবেগের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া মনের মধ্যে কি একটা খাড়া করিয়া তুলিত, তাহাতেই সে সুখ পাইত এবং আগ্রহে অধীর হইয়া উঠিত।

চারু সেইদিন বিকালেই জিজ্ঞাসা করিত, কতটা লিখলে?

অমল বলিত, এরি মধ্যে কি লেখা যায়?

চারু পরদিন সকালে ঈষৎ কলহের স্বরে জিজ্ঞাসা করিত—কই তুমি সেটা লিখলে না?

অমল বলিত—রোস্, আর একটু ভাবি।

চারু রাগ করিয়া বলিত—তবে যাও!

বিকালে সেই রাগ ঘনীভূত হইয়া চারু যখন কথা বন্ধ করিবার যো করিত, তখন অমল লেখা কাগজের একটা অংশ রুমাল বাহির করিবার ছলে পকেট হইতে একটুখানি বাহির করিত।

মুহূর্ত্তে চারুর মৌন ভাঙিয়া গিয়া বলিয়া উঠিত ঐ যে তুমি লিখেছ! আমায় ফাঁকি! দেখাও!

অমল বলিত—এখনো শেষ হয় নি, আর একটু লিখে শোনাব!

চারু। না, এখনি শোনাতে হবে?

অমল এখনি শোনাইবার জন্যই ব্যস্ত—কিন্তু চারুকে কিছুক্ষণ কাড়াকাড়ি না করাইয়া সে শোনাইত না। তারপরে অমল কাগজখানি হাতে করিয়া বসিয়া প্রথমটা একটুখানি পাতা ঠিক করিয়া লইত, পেন্সিল লইয়া দুই এক জায়গায় দুটো একটা সংশোধন করিতে থাকত, ততক্ষণ চারুর চিত্ত পুলকিত কৌতূহলে জলভারনত মেঘের মত সেই কাগজ কয়খানির দিকে ঝুঁকিয়া রহিত।

অমল দুইচারি প্যারাগ্রাফ যখন যাহা লেখে তাহা যতটুকুই হোক্ চারুকে সদ্য সদ্য শোনাইতে হয়। বাকী অলিখিত অংশটুকু আলোচনা এবং কল্পনায় উভয়ের মধ্যে মথিত হইতে থাকে।

এতদিন দুজনে আকাশ-কুসুমের চয়নে নিযুক্ত ছিল এখন কাব্যকুসুমের চাষ আরম্ভ হইয়া উভয়ে আর সমস্তই ভুলিয়া গেল।

একদিন অপরাহ্ণে অমল কালেজ হইতে ফিরিলে তাহার পকেটটা কিছু অতিরিক্ত ভরা বলিয়া বোধ হইল। অমল যখন বাড়িতে প্রবেশ করিল তখনি চারু অন্তঃপুরের গবাক্ষ হইতে তাহার পকেটের পূর্ণতার প্রতি লক্ষ্য করিয়াছিল।

অমল অন্যদিন কালেজ হইতে ফিরিয়া বাড়ির ভিতরে আসিতে দেরি করিত না, আজ সে তাহার ভরা পকেট লইয়া বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিল, শীঘ্র আসিবার নাম করিল না।

চারু অন্তঃপুরের সীমান্তদেশে আসিয়া অনেকবার তালি দিল, কেহ শুনিল না। চারু কিছু রাগ করিয়া তাহার বারান্দায় মন্মথ দত্তর এক বই হাতে করিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

মন্মথ দত্ত নূতন গ্রন্থকার। তাহার লেখার ধরণ অনেকটা অমলেরই মত এই জন্য অমল তাহাকে কখন প্রশংসা করিত না; মাঝে মাঝে চারুর কাছে তাহার লেখা বিকৃতি উচ্চারণে পড়িয়া বিদ্রূপ করিত—চারু অমলের নিকট হইতে সে বই কাড়িয়া লইয়া অবজ্ঞাভরে দূরে ফেলিয়া দিত।

আজ যখন অমলের পদশব্দ শুনিতে পাইল তখন সেই মন্মথ দত্তর "কলকণ্ঠ" নামক বই মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া চারু অত্যন্ত একাগ্রভাবে পড়িতে আরম্ভ করিল।

অমল বারান্দায় প্রবেশ করিল,চারু লক্ষ্যও করিল না। অমল কহিল—কি বৌঠান, কি পড়া হচ্চে?

চারুকে নিরুত্তর দেখিয়া অমল চৌকির পিছনে আসিয়া বইটা দেখিল। কহিল—মন্মথ দত্তর গলগণ্ড!

চারু কহিল,আঃ বিরক্ত কোরো না,আমাকে পড়তে দাও! পিঠের কাছে দাঁড়াইয়া অমল ব্যঙ্গস্বরে পড়িতে লাগিল, আমি তৃণ, ক্ষুদ্র তৃণ; —ভাই রক্তাম্বর রাজবেশধারী অশোক, আমি তৃণমাত্র! আমার ফুল নাই, আমার ছায়া নাই, আমার মস্তক আমি আকাশে তুলিতে পারি না, বসন্তের কোকিল আমাকে আশ্রয় করিয়া কুহু স্বরে জগৎ মাতায় না—তবু ভাই অশোক, তোমার ঐ পুষ্পিত উচ্চশাখা হইতে তুমি আমাকে উপেক্ষা করিও না—তোমার পায়ে পড়িয়া আছি আমি তৃণ, তবু আমাকে তুচ্ছ করিও না!

অমল এই টুকু বই হইতে পড়িয়া তারপরে বিদ্রূপ করিয়া বানাইয়া বলিতে লাগিল—আমি কলার কাঁদি, কাঁচকলার কাঁদি, ভাই কুষ্মাণ্ড,

ভাই গৃহচালবিহারী কুষ্মাণ্ড, আমি নিতান্তই কাঁচকলার কাঁদি!

চারু কৌতুহলের তাড়নায় রাগ রাখিতে পারিল না—হাসিয়া উঠিয়া বই ফেলিয়া দিয়া কহিল—তুমি ভারি হিংসুকে, নিজের লেখা ছাড়া কিছু পছন্দ হয় না!

অমল কহিল—তোমার ভারি উদারতা, তৃণটি পেলেও গিলে খেতে চাও!

চারু। আচ্ছা মশায়,ঠাট্টা করতে হবেনা—পকেটে কি আছে বের করে ফেল!

অমল। কি আছে আন্দাজ কর!

অনেকক্ষণ চারুকে বিরক্ত করিয়া অমল পকেট হইতে সরোরুহ নামক বিখ্যাত মাসিক পত্র বাহির করিল।

চারু দেখিল কাগজে অমলের সেই "খাতা" নামক প্রবন্ধটি বাহির হইয়াছে।

চারু দেখিয়া চুপ করিয়া রহিল। অমল মনে করিয়াছিল তাহার বৌঠান খুব খুসি হইবে। কিন্তু খুসির বিশেষ কোন লক্ষণ না দেখিয়া বলিল—সরোরুহ পত্রে যে সে লেখা বের হয় না।

অমল এটা কিছু বেশী বলিল। যে কোন প্রকার চলনসই লেখা পাইলে সম্পাদক ছাড়েন না। কিন্তু অমল চারুকে বুঝাইয়া দিল, সম্পাদক বড়ই কড়া লোক, এক শো প্রবন্ধের মধ্যে একটা বাছিয়া লন।

শুনিয়া চারু খুসি হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু খুসি হইতে পারিল না। কিসে যে সে মনের মধ্যে আঘাত পাইল তাহা বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল—কোন সঙ্গত কারণ বাহির হইল না।

অমলের লেখা অমল এবং চারু দুজনের সম্পত্তি। অমল লেখক এবং চারু পাঠক। তাহার গোপনতাই তাহার প্রধান রস। সেই লেখা সকলে পড়িবে এবং অনেকই প্রশংসা করিবে ইহাতে চারুকে যে কেন এতটা পীড়া দিতেছিল তাহা সে ভাল করিয়া বুঝিল না।

কিন্তু লেখকের আকাঙ্ক্ষা একটিমাত্র পাঠকে অধিক দিন মেটে না। অমল তাহার লেখা ছাপাইতে আরম্ভ করিল। প্রশংসাও পাইল।

মাঝে মাঝে ভক্তের চিঠিও আসিতে লাগিল। অমল সেগুলি তাহার বৌঠানকে দেখাইত। চারু তাহাতে খুসিও হইল কষ্টও পাইল। এখন অমলকে লেখায় প্রবৃত্ত করাইবার জন্য একমাত্র তাহারই উৎসাহ ও উত্তেজনার প্রয়োজন রহিল না। অমল মাঝে মাঝে কদাচিৎ নাম-স্বাক্ষরবিহীন রমণীর চিঠিও পাইতে লাগিল। তাহা লইয়া চারু তাহাকে ঠাট্টা করিত কিন্তু সুখ পাইত না। হঠাৎ তাহাদের কমিটির রুদ্ধদ্বার খুলিয়া বাঙ্গালাদেশের পাঠকমণ্ডলী তাহাদের দুজনকার মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

ভূপতি একদিন অবসর কালে কহিল তাই ত চারু, আমাদের অমল যে এমন ভাল লিখতে পারে তা'ত আমি জানতুম না।

ভূপতির প্রশংসায় চারু খুসি হইল। অমল ভূপতির আশ্রিত, কিন্তু অন্য আশ্রিতদের সহিত তাহার অনেক প্রভেদ আছে এ কথা তাহার স্বামী বুঝিতে পারিলে চারু যেন গর্ব্ব অনুভব করে। তাহার ভাবটা এই যে, অমলকে কেন যে আমি এতটা স্নেহ আদর করি এতদিনে তোমরা তাহা বুঝিলে—আমি অনেক দিন আগেই অমলের মর্য্যাদা বুঝিয়াছিলাম, অমল কাহারো অবজ্ঞার পাত্র নহে।

চারু জিজ্ঞাসা করিল, তুমি তার লেখা পড়েছ?

ভূপতি কহিল—হাঁ—না, ঠিক পড়িনি। সময় পাই নি। কিন্তু আমাদের নিশিকান্ত

পড়ে খুব প্রশংসা করছিল। সে বাঙ্গালা লেখা বেশ বোঝে।

ভূপতির মনে অমলের প্রতি একটি সম্মানের ভাব জাগিয়া উঠে ইহা চারুর একান্ত ইচ্ছা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

উমাপদ ভূপতিকে তাহার কাগজের সঙ্গে অন্য পাঁচ রকম উপহার দিবার কথা বুঝাইতেছিল। উপহারে যে কি করিয়া লোকসান কাটাইয়া লাভ হইতে পারে তাহা ভূপতি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছিল না।

চারু একবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই উমাপদকে দেখিয়া চলিয়া গেল। আবার কিছুক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া ঘরে আসিয়া দেখিল দুই জনে হিসাব লইয়া তর্কে প্রবৃত্ত।

উমাপদ চারুর অধৈর্য্য দেখিয়া কোন ছুতা করিয়া বাহির হইয়া গেল। ভূপতি হিসাব লইয়া মাথা ঘুরাইতে লাগিল।

চারু ঘরে ঢুকিয়া বলিল, এখনো বুঝি তোমার কাজ শেষ হল না! দিন রাত ঐ একখানা কাগজ নিয়ে যে তোমার কি করে কাটে আমি তাই ভাবি!

ভূপতি হিসাব সরাইয়া রাখিয়া একটুখানি হাসিল। মনে মনে ভাবিল, বাস্তবিক চারুর প্রতি আমি মনোযোগ দিবার সময়ই পাই না, বড় অন্যায়। ও বেচারার পক্ষে সময় কাটাইবার কিছুই নাই।

ভূপতি স্নেহস্বরে কহিল—আজ যে তোমার পড়া নেই! মাষ্টারটি বুঝি পালিয়েছেন? তোমার পাঠশালার সব উল্টো নিয়ম—ছাত্রীটি পুঁথিপত্র নিয়ে প্রস্তুত, মাষ্টার পলাতক! আজ কাল অমল তোমাকে আগেকার মত নিয়মিত পড়ায় বলে ত বোধ হয় না!

চারু কহিল—আমাকে পড়িয়ে অমলের সময় নষ্ট করা কি উচিত? অমলকে তুমি বুঝি একজন সামান্য প্রাইভেট টিউটার পেয়েছ?

ভূপতি চারুর কটিদেশ ধরিয়া কাছে টানিয়া কহিল—এটা কি সামান্য প্রাইভেট টিউটারি হল? তোমার মত বৌঠানকে যদি পড়াতে পেতুম তা হলে—

চারু। ইস্ ইস্ তুমি আর বোলো না! স্বামী হয়েই রক্ষে নেই ত আরো কিছু!

ভূপতি ঈষৎ একটু আহত হইয়া কহিল, আচ্ছা, কাল থেকে আমি নিশ্চয় তোমাকে পড়াব। তোমার বইগুলো আন দেখি, কি তুমি পড় একবার দেখে নিই।

চারু। ঢের হয়েছে, তোমার আর পড়াতে হবে না! এখনকার মত তোমার খবরের কাগজের হিসাবটা একটু রাখবে? এখন আর কোন দিকে মন দিতে পারবে কিনা বল?

ভূপতি কহিল—নিশ্চয় পারব। এখন তুমি আমার মনকে যেদিকে ফেরাতে চাও সেই দিকেই ফিরবে।

চারু। আচ্ছা বেশ তা হলে অমলের এই লেখাটা একবার পড়ে দেখ কেমন চমৎকার হয়েছে। সম্পাদক অমলকে লিখেছে এই লেখা পড়ে নবগোপাল বাবু তাকে বাঙ্গালার রাস্কিন্ নাম দিয়েছেন।

শুনিয়া ভূপতি কিছু সঙ্কুচিত ভাবে কাগজখানা হাতে করিয়া লইল। খুলিয়া দেখিল, লেখাটির নাম "আষাঢ়ের চাঁদ।" গত দুই সপ্তাহ ধরিয়া ভূপতি ভারতগবর্ণমেণ্টের বজেট সমালোচনা লইয়া বড় বড় অঙ্কপাত করিতে-

ছিল, সেই সকল অঙ্ক বহুপদ কীটের মত তাহার মস্তিকের নানা বিবরের মধ্যে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছিল—এমন সময়ে হঠাৎ বাঙ্গালা ভাষায় আষাঢ়ের চাঁদ প্রবন্ধ আগাগোড়া পড়িবার জন্ম তাহার মন প্রস্তুত ছিল না। প্রবন্ধটিও নিতান্ত ছোট নহে।

লেখাটা এইরূপে সুরু হইয়াছে ; "আজ কেন আষাঢ়ের চাঁদ সারারাত মেঘের মধ্যে এমন করিয়া লুকাইয়া বেড়াইতেছে! যেন স্বর্গলোক হইতে সে কি চুরি করিয়া আনিয়াছে, যেন তাহার কলঙ্ক ঢাকিবার স্থান নাই। ফাল্গুন মাসে যখন আকাশের একটি কোণেও মুষ্টিপরিমাণ মেঘ ছিল না তখন ত জগতের চক্ষের সম্মুখে সে নির্লজ্জের মত উন্মুক্ত আকাশে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিল—আর আজ তাহার সেই ঢল ঢল হাসিখানি—শিশুর স্বপ্নের মত, প্রিয়ার স্মৃতির মত, সুরেশ্বরী শচীর অলকবিলম্বিত মুক্তার মালার মত—"

ভূপতি মাথা চুলকাইয়া কহিল—বেশ লিখেছে! কিন্তু আমাকে কেন?—এ সব কবিত্ব কি আমি বুঝি?

চারু সঙ্কুচিত হইয়া ভূপতির হাত হইতে কাগজ খানা কাড়িয়া কহিল—তুমি তবে কি বোঝ?

ভূপতি কহিল—আমি সংসারের লোক, আমি মানুষ বুঝি।

চারু কহিল—মানুষের কথা বুঝি সাহিত্যের মধ্যে লেখে না?

ভূপতি। ভুল লেখে। তা ছাড়া মানুষ যখন সশরীরে বর্ত্তমান তখন বানানো কথার মধ্যে তাকে খুঁজে বেড়াবার দরকার?

বলিয়া চারুলতার চিবুক ধরিয়া কহিল—এই যেমন আমি তোমাকে বুঝি,—কিন্তু সে জন্ম কি মেঘনাদবধ কবিকঙ্কণ চণ্ডী আগাগোড়া পড়ার দরকার আছে?

ভূপতি কাব্য বোঝে না বলিয়া অহঙ্কার করিত। কিন্তু তবু অমলের লেখা ভাল করিয়া না পড়িয়াও তাহার প্রতি মনে মনে ভূপতির একটা শ্রদ্ধা ছিল। ভূপতি ভাবিত, বলিবার কথা কিছুই নাই অথচ এত কথা অনর্গল বানাইয়া বলা সে ত আমি মাথা কুটিয়া মরিলেও পারিতাম না। অমলের পেটে যে এত ক্ষমতা ছিল তাহা কে জানিত?

ভূপতি নিজের রসজ্ঞতা অস্বীকার করিত কিন্তু সাহিত্যের প্রতি তাহার কৃপণতা ছিল না। দরিদ্র লেখক তাহাকে ধরিয়া পড়িলে বই ছাপিবার খরচ ভূপতি দিত, কেবল বিশেষ করিয়া বলিয়া দিত, আমাকে যেন উৎসর্গ করা না হয়। বাঙ্গালা ছোট বড় সমস্ত সাপ্তাহিক এবং মাসিক পত্র, খ্যাত অখ্যাত পাঠ্য অপাঠ্য সমস্ত বই সে কিনিত। বলিত একে পড়ি না, তারপরে যদি না কিনি, তবে পাপও করিব প্রায়শ্চিত্তও হইবে না। পড়িত না বলিয়াই মন্দ বইয়ের প্রতি তাহার লেশমাত্র বিদ্বেষ ছিল না সেই জন্ম তাহার বাঙ্গালা লাইব্রেরী গ্রন্থে পরিপূর্ণ ছিল।

অমল ভূপতির ইংরাজি প্রুফ সংশোধন কার্য্যে সাহায্য করিত—কোন একটা কাপির দুর্ব্বোধ্য হস্তাক্ষর দেখাইয়া লইবার জন্ম সে একতাড়া কাগজপত্র লইয়া ঘরে ঢুকিল।

ভূপতি হাসিয়া কহিল, অমল, তুমি আষাঢ়ের চাঁদ আর ভাদ্র মাসের পাকা তালের উপর যত খুসি লেখ আমি তাতে কোন আপত্তি করিনে—আমি কারো স্বাধীনতায় হাত দিতে চাইনে—কিন্তু আমার স্বাধীনতায় কেন হস্তক্ষেপ? সেগুলো আমাকে না

পড়িয়ে ছাড়বেন না, তোমার বৌঠানের একি অত্যাচার?

অমল হাসিয়া কহিল, তাই ত বৌঠান—আমার লেখাগুলো নিয়ে তুমি যে দাদাকে জুলুম করবার উপায় বের করবে এমন জান্‌লে আমি লিখতুম না।

সাহিত্যরসে বিমুখ ভূপতির কাছে আনিয়া তাহার অত্যন্ত দরদের লেখাগুলিকে অপদস্থ করাতে অমল মনে মনে চারুর উপর রাগ করিল এবং চারু তৎক্ষণাৎ তাহা বুঝিতে পারিয়া বেদনা পাইল। কথাটাকে অন্যদিকে লইয়া যাইবার জন্য ভূপতিকে কহিল—তোমার ভাইটিকে একটি বিয়ে দিয়ে দাও দেখি তা'হলে আর লেখার উপদ্রব সহ্য করতে হবে না।

ভূপতি কহিল—এখনকার ছেলেরা আমাদের মত নির্ব্বোধ নয়! তাদের যত কবিত্ব লেখায়, কাজের বেলায় সেয়ানা! কই তোমার দেওরকে ত বিয়ে করতে রাজি করাতে পার্‌লে না!

চারু চলিয়া গেলে ভূপতি অমলকে কহিল, অমল, আমাকে এই কাগজের হাঙ্গামে থাকৃতে হয়, চারু বেচারা বড় একলা পড়েছে। কোন কাজকর্ম্ম নেই, মাঝে মাঝে আমার এই লেখবার ঘরে উঁকি মেরে চলে যায়। কি করব বল। তুমি অমল ওকে একটু পড়াশুনোয় নিযুক্ত রাখ্‌তে পার্‌লে ভাল হয়। মাঝে মাঝে চারুকে যদি ইংরাজি কাব্য থেকে তর্জ্জমা করে শোনাও তা'হলে ওর উপকারও হয় ভালও লাগে। চারুর সাহিত্যে বেশ রুচি আছে!

অমল কহিল, তা আছে। বৌঠান যদি আরো একটু পড়াশুনো করেন তা হলে আমার বিশ্বাস উনি নিজে বেশ ভাল লিখ্‌তে পারবেন?

ভূপতি হাসিয়া কহিল, ততটা আশা করিনে, কিন্তু চারু বাঙ্গালা লেখার ভালমন্দ আমার চেয়ে ঢের বুঝতে পারে।

অমল। ওঁর কল্পনাশক্তি বেশ আছে, স্ত্রীলোকের মধ্যে এমন দেখা যায় না।

ভূপতি। পুরুষের মধ্যেও কম দেখা যায়—তার সাক্ষী আমি। আচ্ছা তুমি তোমার বৌঠাকরুণকে যদি গড়ে তুল্‌তে পার আমি তোমাকে পারিতোষিক দেব।

অমল। কি দেবে শুনি!

ভূপতি। তোমার বৌঠাকরুণের জুড়ি একটি খুঁজে পেতে এনে দেব।

অমল। আবার তাকে নিয়ে পড়তে হবে! চিরজীবন কি গড়ে তুল্‌তেই কাটাব?

দুটি ভাই আজ কালকার ছেলে—কোন কথা তাহাদের মুখে বাধে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পাঠকসমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিয়া অমল এখন মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে। আগে সে স্কুলের ছাত্রটির মত থাকিত এখন সে যেন সমাজের গণ্যমান্য মানুষের মত হইয়া উঠিয়াছে। মাঝে মাঝে সভায় সাহিত্য প্রবন্ধপাঠ করে—সম্পাদক ও সম্পাদকের দূত তাহার ঘরে আসিয়া বসিয়া থাকে, তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ায়, নানাসভার সভ্য ও সভাপতি হইবার জন্য তাহার নিকট অনুরোধ আসে, ভূপতির ঘরে দাসদাসী আত্মীয়স্বজনের চক্ষে তাহার প্রতিষ্ঠাস্থান অনেকটা উপরে উঠিয়া গেছে।

মন্দাকিনী এতদিন তাহাকে বিশেষ একটা কেহ বলিয়া মনে করে নাই। অমল ও

চারুর হাস্যালাপ আলোচনাকে সে ছেলেমানুষী বলিয়া উপেক্ষা করিয়া পান সাজিত ও ঘরের কাজ কর্ম্ম করিত—নিজেকে সে উহাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং সংসারের পক্ষে আবশ্যক বলিয়াই জানিত।

অমলের পান খাওয়া অপরিমিত ছিল। মন্দার উপর পান সাজিবার ভার থাকাতে সে পানের অযথা অপব্যয়ে বিরক্ত হইত। অমলে চারুতে ষড়যন্ত্র করিয়া মন্দার পানের ভাণ্ডার প্রায়ই লুঠ করিয়া আনা তাহাদের একটা আমোদের মধ্যে ছিল। কিন্তু এই সৌখীন চোর দুটির চৌর্য্য পরিহাস মন্দার কাছে আমোদজনক বোধ হইত না।

আসল কথা, একজন আশ্রিত অন্য আশ্রিতকে প্রসন্ন চক্ষে দেখে না। অমলের জন্য মন্দাকে যেটুকু গৃহকর্ম্ম অতিরিক্ত করিতে হইবে সেটুকুতে সে যেন কিছু অপমান বোধ করিত। চারু অমলের পক্ষপাতী ছিল বলিয়া মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিত না, কিন্তু অমলকে অবহেলা করিবার চেষ্টা তাহার সর্ব্বদাই ছিল। সুযোগ পাইলেই দাসদাসীদের কাছেও গোপনে অমলের নামে খোঁচা দিতে সে ছাড়িত না। তাহারাও যোগ দিত।

কিন্তু অমলের যখন অভ্যুত্থান আরম্ভ হইল তখন মন্দার একটু চমক লাগিল। সে অমল এখন আর নাই। এখন তাহার সঙ্কুচিত নম্রতা একেবারে ঘুচিয়া গেছে, অপরকে অবজ্ঞা করিবার অধিকার এখন যেন তাহারই হাতে। সংসারে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া যে পুরুষ অসংশয়ে অকুণ্ঠিতভাবে নিজেকে প্রচার করিতে পারে, যে লোক একটা নিশ্চিত অধিকার লাভ করিয়াছে, সেই সমর্থ পুরুষ সহজেই নারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। মন্দা যখন দেখিল অমল চারিদিক হইতেই শ্রদ্ধা পাইতেছে তখন সেও অমলের উচ্চ মস্তকের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল। অমলের তরুণ মুখে নবগৌরবের গর্ব্বোজ্জ্বল দীপ্তি মন্দার চক্ষে মোহ আনিল, সে যেন অমলকে নূতন করিয়া দেখিল।

এখন আর পান চুরি করিবার প্রয়োজন রহিল না। অমলের খ্যাতিলাভে চারুর এই আর একটা লোকসান; তাহাদের ষড়যন্ত্রের কৌতুক বন্ধনটুকু বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, পান এখন অমলের কাছে আপনি আসিয়া পড়ে, কোন অভাব হয় না।

তাহা ছাড়া, তাহাদের দুই জনে গঠিত দল হইতে মন্দাকিনীকে নানা কৌশলে দূরে রাখিয়া তাহারা যে আমোদ বোধ করিত তাহাও নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। মন্দাকে তফাতে রাখা কঠিন হইল। অমল যে মনে করিবে চারুই তাহার একমাত্র বন্ধু ও সমজদার ইহা মন্দার ভাল লাগিত না। পূর্ব্বকৃত অবহেলা সে সুদে আসলে শোধ দিতে উদ্যত। সুতরাং অমলে চারুতে মুখোমুখি হইলেই মন্দা কোন ছলে মাঝখানে আসিয়া ছায়া ফেলিয়া গ্রহণ লাগাইয়া দিত। হঠাৎ মন্দার এই পরিবর্ত্তন লইয়া চারু তাহার অসাক্ষাতে যে পরিহাস করিবে সে অবসর টুকু পাওয়া শক্ত হইল।

মন্দার এই অনাহূত প্রবেশ চারুর কাছে যত বিরক্তিকর বোধ হইত অমলের কাছে ততটা বোধ হয় নাই একথা বলা বাহুল্য। বিমুখ রমণীর মন ক্রমশঃ তাহার দিকে যে ফিরিতেছে ইহাতে ভিতরে ভিতরে সে একটা আগ্রহ অনুভব করিতেছিল।

কিন্তু চারু যখন দূর হইতে মন্দাকে দেখিয়া তীব্র মৃদু স্বরে বলিত, "ঐ আসচেন"—"তখন অমলও বলিত, "তাইত, জ্বালালে দেখ্‌চি।" পৃথিবীর অন্য সকল সঙ্গের প্রতি অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করা তাহাদের একটা দস্তুর ছিল,

অমল সে হঠাৎ কি বলিয়া ছাড়ে! অবশেষে মন্দাকিনী নিকটবর্ত্তিনী হইলে অমল যেন বলপূর্ব্বক সৌজন্য করিয়া বলিত, "তার পরে, মন্দা বৌঠান, আজ তোমার পানের বাটায় বাটপাড়ির লক্ষণ কিছু দেখ্‌লে!"

মন্দা। যখন চাইলেই পাও, ভাই, তখন চুরি করবার দরকার?

অমল। চেয়ে পাওয়ার চেয়ে তাতে সুখ বেশী।

মন্দা। তোমরা কি পড়ছিলে পড় না ভাই! থাম্‌লে কেন? পড়া শুন্‌তে আমার বেশ লাগে!

ইতিপূর্ব্বে পাঠানুরাগের জন্য খ্যাতি অর্জ্জন করিতে মন্দার কিছুমাত্র চেষ্টা দেখা যায় নাই, কিন্তু "কালোহি বলবত্তরঃ।"

চারুর ইচ্ছা নহে অরসিকা মন্দার কাছে অমল পড়ে, অমলের ইচ্ছা মন্দাও তাহার লেখা শোনে।

চারু। অমল কমলাকান্তের দপ্তরের সমালোচনা লিখে এনেচে, সে কি তোমার—

মন্দা। হলেমই বা মূর্খ—তবু, শুনলে কি একেবারেই বুঝতে পারিনে?

তখন আর একদিনের কথা অমলের মনে পড়িল। চারুতে মন্দাতে বিন্তি খেলিতেছে, সে তাহরে লেখা হাতে করিয়া খেলা সভায় প্রবেশ করিল। চারুকে শুনাইবার জন্য সে অধীর, খেলা ভাঙ্গিতেছে না দেখিয়া সে বিরক্ত। অবশেষে বলিয়া উঠিল, তোমরা তবে খেল বৌঠান, আমি অখিল বাবুকে লেখাটা শুনিয়ে আসিগে!

চারু অমলের চাদর চাপিয়া কহিল, আঃ বোস না, যাও কোথায়?—বলিয়া তাড়াতাড়ি হারিয়া খেলা শেষ করিয়া দিল।

মন্দা বলিল—তোমাদের পড়া আরম্ভ হবে বুঝি? তবে আমি উঠি!

চারু ভদ্রতা করিয়া কহিল, কেন, তুমিও শোন না ভাই!

মন্দা। না ভাই, আমি তোমাদের ওসব ছাই পাঁশ কিছুই বুঝিনে—আমার কেবল ঘুম পায়! বলিয়া সে অকালে খেলাভঙ্গে উভয়ের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল।

সেই মন্দা আজ কমলাকান্তের সমালোচনা শুনিবার জন্য উৎসুক। অমল কহিল, তা বেশত, মন্দা বৌঠান, তুমি শুনবে সেত আমার সৌভাগ্য!—বলিয়া পাত উল্টাইয়া আবার গোড়া হইতে পড়িবার উপক্রম করিল, লেখার আরম্ভে সে অনেকটা পরিমাণ রস ছড়াইয়াছিল, সেটুকু বাদ দিয়া পড়িতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

চারু তাড়াতাড়ি বলিল, ঠাকুরপো, তুমি যে বলেছিলে জাহ্নবী লাইব্রেরি থেকে পুরোণো মাসিক পত্র কতকগুলো এনে দেবে!

অমল। সেত আজ নয়।

চারু। আজইত। বেশ! ভুলে গেছ বুঝি!

অমল। ভুল্‌ব কেন? তুমি যে বলেছিলে—

চারু। আচ্ছা বেশ, এনো না! তোমরা পড়—আমি যাই, পরেশকে লাইব্রেরীতে পাঠিয়ে দিইগে!—বলিয়া চারু উঠিয়া পড়িল!

অমল বিপদ আশঙ্কা করিল। মন্দা মনে মনে বুঝিল এবং মুহূর্ত্তের মধ্যেই চারুর প্রতি তাহার মন বিষাক্ত হইয়া উঠিল। চারু চলিয়া গেলে অমল যখন, উঠিবে কি না ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতেছিল, মন্দা ঈষৎ হাসিয়া কহিল, যাও ভাই, মান ভাঙ্গাওগে—চারু রাগ

করেছে। আমাকে লেখা শোনালে মুস্কিলে পড়বে!

ইহার পরে অমলের পক্ষে ওঠা অত্যন্ত কঠিন। অমল চারুর প্রতি কিছু রুষ্ট হইয়া কহিল—কেন, মুস্কিল কিসের?—বলিয়া লেখা বিস্তৃত করিয়া ধরিয়া পড়িবার উপক্রম করিল।

মন্দা দুই হাতে তাহার লেখা আচ্ছাদন করিয়া বলিল—কাজ নেই ভাই পোড়ো না!

বলিয়া, যেন অশ্রু সম্বরণ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

চারু নিমন্ত্রণে গিয়াছিল! মন্দা ঘরে বসিয়া চুলের দড়ি বিনাইতেছিল। "বৌঠান" বলিয়া অমল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মন্দা নিশ্চয় জানিত যে, চারুর নিমন্ত্রণ যাওয়ার সংবাদ অমলের অগোচর ছিল না। হাসিয়া কহিল, আহা অমল বাবু, কাকে খুঁজতে এসে কার দেখা পেলে? এম্‌নি তোমার অদৃষ্ট! অমল কহিল—বাঁ দিকের বিচালিও যেমন ডান দিকের বিচালিও ঠিক তেমনি, গর্দ্দভের পক্ষে দুই সমান আদরের!—বলিয়া সেই খানে বসিয়া গেল।

অমল। মন্দা বৌঠান, তোমাদের দেশের গল্প বল আমি শুনি।

লেখার বিষয় সংগ্রহ করিবার জন্য অমল সকলের সব কথা কৌতূহলের সহিত শুনিত। সেই কারণে মন্দাকে এখন সে আর পূর্ব্বের ন্যায় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিত না। মন্দার মনস্তত্ত্ব মন্দার ইতিহাস এখন তাহার কাছে ঔৎসুক্যজনক। কোথায় তাহার জন্মভূমি, তাহাদের গ্রামটি কিরূপ, ছেলে বেলা কেমন করিয়া কাটিত, বিবাহ হইল কবে ইত্যাদি সকল কথাই সে খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। মন্দার ক্ষুদ্র জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে এত কৌতূহল কেহ কখনও প্রকাশ করে নাই। মন্দা আনন্দে নিজের কথা বকিয়া যাইতে লাগিল, মাঝে মাঝে কহিল কি বক্‌চি তার ঠিক নাই!

অমল উৎসাহ দিয়া কহিল—না, আমার বেশ লাগ্‌চে বলে যাও! মন্দার বাপের এক কাণা গোমস্তা ছিল, সে তাহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া এক একদিন অভিমানে অনশনব্রত গ্রহণ করিত, অবশেষে ক্ষুধার জ্বালায় মন্দাদের বাড়িতে কিরূপে গোপনে আহার করিতে আসিত এবং দৈবাৎ এক দিন স্ত্রীর কাছে কিরূপে ধরা পড়িয়াছিল সেই গল্প যখন হইতেছে এবং অমল মনোযোগের সহিত শুনিতে শুনিতে সকৌতুকে হাসিতেছে এমন সময় চারু ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল।

গল্পের সূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। তাহার আগমনে হঠাৎ একটা জমাট সভা ভাঙ্গিয়া গেল, চারু তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিল।

অমল জিজ্ঞাসা করিল, বৌঠান, এত সকাল সকাল ফিরে এলে যে!

চারু কহিল—তাইত দেখ্‌ছি! বেশী সকাল সকালই ফিরেছি—বলিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল।

অমল কহিল ভালই করেচ, বাঁচিয়েচ আমাকে। আমি ভাবছিলুম, কখন্ না জানি ফিরবে! মন্মথ দত্তর "সন্ধ্যার পাখী" বলে নূতন বইটা তোমাকে পড়ে শোনাব বলে এনেছি!

চারু। এখন থাক্ আমার কাজ আছে!

অমল। কাজ থাকেত আমাকে হুকুম কর আমি করে দিচ্ছি।

চারু জানিত অমল আজ বই কিনিয়া

আনিয়া তাহাকে শুনাইতে আসিবে; চারু ঈর্ষা জন্মাইবার জন্য, মন্মথর লেখার প্রচুর প্রশংসা করিবে এবং অমল সেই বইটাকে বিকৃত করিয়া পড়িয়া বিদ্রূপ করিতে থাকিবে। এই সকল কল্পনা করিয়াই অধৈর্য্যবশতঃ সে অকালে নিমন্ত্রণ গৃহের সমস্ত অনুনয় বিনয় লঙ্ঘন করিয়া অসুখের ছুতায় গৃহে চলিয়া আসিতেছে। এখন বার বার মনে করিতেছে, সেখানে ছিলাম ভাল, চলিয়া আসা অন্যায় হইয়াছে!

মন্দাও ত কম বেহায়া নয়! একলা অমলের সহিত এক ঘরে বসিয়া দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে! লোকে দেখিলে কি বলিবে? কিন্তু মন্দাকে একথা লইয়া ভর্ৎসনা করা চারুর পক্ষে বড় কঠিন। কারণ মন্দা যদি তাহারই দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া জবাব দেয়! কিন্তু সে হইল এক, আর এ হইল এক! সে অমলকে রচনায় উৎসাহ দেয়, অমলের সঙ্গে সাহিত্যালোচনা করে, কিন্তু মন্দার ত সে উদ্দেশ্য আদবেই নয়। মন্দা নিঃসন্দেহই সরল যুবককে মুগ্ধ করিবার জন্য জাল বিস্তার করিতেছে। এই ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে বেচারা অমলকে রক্ষা করা তাহারই কর্ত্তব্য। অমলকে এই মায়াবিনীর মৎলব কেমন করিয়া বুঝাইবে? বুঝাইলে তাহার প্রলোভনের নিবৃত্তি না হইয়া যদি উল্টা হয়।

বেচারা দাদা। তিনি তাঁহার স্বামীর কাগজ লইয়া দিন রাত খাটিয়া মরিতেছেন, আর মন্দা কিনা কোণটিতে বসিয়া অমলকে ভুলাইবার জন্য আয়োজন করিতেছে। দাদা বেশ নিশ্চিন্ত আছেন। মন্দার উপরে তাঁর অগাধ বিশ্বাস। এ সকল ব্যাপার চারু কি করিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া স্থির থাকিবে। ভারি অন্যায়।

কিন্তু আগে অমল বেশ ছিল—যে দিন হইতে লিখিতে আরম্ভ করিয়া নাম করিয়াছে সেই দিন হইতেই যত অনর্থ দেখা যাইতেছে। চারুইত তাহার লেখার গোড়া। কুক্ষণে সে অমলকে রচনায় উৎসাহ দিয়াছিল। এখন কি আর অমলের পরে তাহার পূর্ব্বের মত জোর খাটিবে? এখন অমল পাঁচ জনের আদরের স্বাদ পাইয়াছে অতএব এক জনকে বাদ দিলে তাহার আসে যায় না।

চারু স্পষ্টই বুঝিল, তাহার হাত হইতে গিয়া পাঁচজনের হাতে পড়িয়া অমলের সমূহ বিপদ। চারুকে অমল এখন ঠিক সমকক্ষ বলিয়া জানে না—চারুকে সে ছাড়াইয়া গেছে। এখন সে লেখক, চারু পাঠক। ইহার প্রতিকার করিতেই হইবে।

আহা, সরল অমল, মায়াবিনী মন্দা, বেচারা দাদা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—*—

সে দিন আষাঢ়ের নবীন মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন। ঘরের মধ্যে অন্ধকার ঘনীভূত হইয়াছে বলিয়া চারু তাহার খোলা জানলার কাছে একান্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি একটা লিখিতেছে।

অমল কখন্ নিঃশব্দ পদে পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল তাহা সে জানিতে পারিল না। বাদ্‌লার স্নিগ্ধ আলোকে চারু লিখিয়া গেল অমল পড়িতে লাগিল। পাশে অমলেরই দুই একটা ছাপানো লেখা খোলা পড়িয়া আছে; চারুর কাছে সেই গুলিই রচনায় একমাত্র আদর্শ।

"তবে যে বলে তুমি লিখ্‌তে পারনা!"

হঠাৎ অমলের কণ্ঠ শুনিয়া চারু অত্যন্ত

চমকিয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি খাতা লুকাইয়া ফেলিল—কহিল তোমার ভারি অন্যায়।

অমল। কি অন্যায় করেছি?

চারু। লুকিয়ে লুকিয়ে দেখ ছিলে কেন?

অমল। প্রকাশ্যে দেখ তে পাইনে বলে।

চারু তাহার লেখা ছিঁড়িয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। অমল ফস করিয়া তাহার হাত হইতে খাতা কাড়িয়া লইল। চারু কহিল, তুমি যদি পড় তোমার সঙ্গে জন্মের মত আড়ি।

অমল। যদি পড়তে বারণ কর তা'হলে তোমার সঙ্গে জন্মের মত আড়ি।

চারু। আমার মাথা খাও ঠাকুরপো, পোড়ো না।

অবশেষে চারুকেই হার মানিতে হইল। কারণ অমলকে তাহার লেখা দেখাইবার জন্য মন ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল, অথচ দেখাইবার বেলায় যে তাহার এত লজ্জা করিবে তাহা সে ভাবে নাই! অমল যখন অনেক অনুনয় করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল তখন লজ্জায় চারুর হাত পা বরফের মত হিম হইয়া গেল। কহিল, আমি পান নিয়ে আসিগে। বলিয়া তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে পান সাজিবার উপলক্ষ করিয়া চলিয়া গেল।

অমল পড়া সাঙ্গ করিয়া চারুকে গিয়া কহিল, চমৎকার হয়েছে।

চারু পানে খয়ের দিতে ভুলিয়া কহিল, যাও, আর ঠাট্টা করতে হবে না! দাও, আমার খাতা দাও!

অমল কহিল, খাতা এখন দেব না, লেখাটা কপি করে নিয়ে কাগজে পাঠাব!

চারু। হাঁ, কাগজে পাঠাবে বৈকি! সে হবে না।

চারু ভারি গোলমাল করিতে লাগিল। অমলও কিছুতে ছাড়িল না। সে যখন বার বার শপথ করিয়া কহিল কাগজে দিবার উপযুক্ত হইয়াছে তখন চারু যেন নিতান্ত হতাশ হইয়া কহিল, তোমার সঙ্গে ত পেরে ওঠ্‌বার যো নেই! যেটা ধরবে সে আর কিছুতেই ছাড়বে না!

অমল কহিল, দাদাকে একবার দেখাতে হবে।

শুনিয়া চারু পান সাজা ফেলিয়া আসন হইতে বেগে উঠিয়া পড়িল, খাতা কাড়িবার চেষ্টা করিয়া কহিল,—না, তাঁকে শোনাতে পাবে না! তাঁকে যদি আমার লেখার কথা বল তা'হলে আমি আর এক অক্ষর লিখ বনা।

অমল। বৌঠান তুমি ভারি ভুল বুঝ্‌চ! দাদা মুখে যাই বলুন তোমার লেখা দেখ্‌লে খুব খুসি হবেন!

চারু। তা হোক্‌, আমার খুসিতে কাজ নেই!

চারু প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছিল সে লিখিবে অমলকে আশ্চর্য্য করিয়া দিবে, মন্দার সহিত তাহার যে অনেক প্রভেদ এ কথা প্রমাণ না করিয়া সে ছাড়িবে না। এ কয় দিন বিস্তর লিখিয়া সে ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে। যাহা লিখিতে যায় তাহা নিতান্ত অমলের লেখার মত হইয়া উঠে—মিলাইতে গিয়া দেখে এক একটা অংশ অমলের রচনা হইতে প্রায় অবিকল উদ্ধৃত হইয়া আসিয়াছে। সেইগুলিই ভাল, বাকিগুলা কাঁচা। দেখিলে অমল নিশ্চয়ই মনে মনে হাসিবে, ইহাই কল্পনা করিয়া চারু সে সকল লেখা কুটি কুটি করিয়া ছিঁড়িয়া পুকুরের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে, পাছে তাহার একটা খণ্ডও দৈবাৎ অমলের হাতে আসিয়া পড়ে।

প্রথমে সে লিখিয়াছিল, "শ্রাবণের মেঘ" মনে করিয়াছিল, ভাবাশ্রুজলে অভিষিক্ত খুব

একটা নূতন লেখা লিখিয়াছি। হঠাৎ চেতনা হইয়া দেখিল জিনিষটা অমলের "আষাঢ়ের চাঁদ" এর এ পিঠ ও পিঠ মাত্র। অমল লিখিয়াছেন, ভাই চাঁদ তুমি মেঘের মধ্যে চোরের মত লুকাইয়া বেড়াইতেছ কেন—চারু লিখিয়াছিল, সখী কাদম্বিনী, হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া তোমার নীলাঞ্চলের তলে চাঁদকে চুরি করিয়া পলায়ন করিতেছ ইত্যাদি।

কোন মতেই অমলের গণ্ডি এড়াইতে না পারিয়া অবশেষে চারু রচনার বিষয় পরিবর্ত্তন করিল। চাঁদ, মেঘ শেফালী, বউ-কথাকও এ সমস্ত ছাড়িয়া সে "কালীতলা" বলিয়া একটা লেখা লিখিল। তাহাদের গ্রামে ছায়ায় অন্ধকার পুকুরটির ধারে কালীর মন্দির ছিল—সেই মন্দিরটি লইয়া তাহার বাল্যকালের কল্পনা ভয় ঔৎসুক্য, সেই সম্বন্ধে তাহার বিচিত্র স্মৃতি, সেই জাগ্রৎ ঠাকুরাণীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে গ্রামে চিরপ্রচলিত প্রাচীন গল্প—এই সমস্ত লইয়া সে একটি লেখা লিখিল। তাহার আরম্ভ ভাগ অমলের লেখার ছাঁদে কাব্যাড়ম্বরপূর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু খানিকটা অগ্রসর হইতেই তাহার লেখা সহজেই সরল এবং পল্লীগ্রামের ভাষা, ভঙ্গী, আভাসে অরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

এই লেখাটা অমল কাড়িয়া লইয়া পড়িল! তাহার মনে হইল গোড়ার দিকটা বেশ সরস হইয়াছে, কিন্তু কবিত্ব শেষ পর্য্যন্ত রক্ষিত হয় নাই। যাহা হউক্ প্রথম রচনার পক্ষে লেখিকার উদ্যম প্রশংসনীয়!

চারু কহিল ঠাকুরপো, এস আমরা একটা মাসিক কাগজ বের করি। কি বল!

অমল অনেকগুলি রৌপ্যচক্র না হলে সে কাগজ চলবে কি করে?

চারু। আমাদের এ কাগজে কোন খরচ নেই। ছাপা হবে না ত,—হাতের অক্ষরে লিখ্‌ব। তাতে তোমার আমার ছাড়া আর কারো লেখা বেরবে না, কাউকে পড়তে দেওয়া হবে না। কেবল দু'কপি করে বের হবে—একটি তোমার জন্যে একটি আমার জন্যে।

কিছু দিন পূর্ব্বে হইলে অমল এ প্রস্তাবে মাতিয়া উঠিত, এখন গোপনতার উৎসাহ তাহার চলিয়া গেছে। এখন দশজনকে উদ্দেশ না করিয়া কোন রচনায় সে সুখ পায় না। তবু সাবেক কালের ঠাট বজায় রাখিবার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করিল। কহিল, সে বেশ মজা হবে!

চারু কহিল, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিতে হবে, আমাদের কাগজ ছাড়া আর কোথাও তুমি লেখা বের করতে পারবে না!

অমল। তা'হলে সম্পাদকরা যে মেরেই ফেল্‌বে!

চারু। আর আমার হাতে বুঝি মারের অস্ত্র নেই?

সেই রূপ কথা হইল। দুই সম্পাদক, দুই লেখক এবং দুই পাঠকে মিলিয়া কমিটি বসিল। অমল কহিল কাগজের নাম দেওয়া যাক চারুপাঠ। চারু কহিল, না, এর নাম অমলা।

এই নূতন বন্দোবস্তে চারু মাঝের কয় দিনের দুঃখ বিরক্তি ভুলিয়া গেল। তাহাদের মাসিক পত্রটিতে ত মন্দার প্রবেশ করিবার কোন পথ নাই এবং বাহিরের লোকেরও প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ভূপতি একদিন আসিয়া কহিল, চারু তুমি যে লেখিকা হয়ে উঠ্‌বে পূর্ব্বে এমন ত কোন কথা ছিল না!

চারু চমকিয়া লাল হইয়া উঠিয়া কহিল, আমি লেখিকা! কে বল্লে তোমাকে! কখ্‌খনো না!

ভূপতি। বামাল সুদ্ধ গ্রেফ্‌তার। প্রমাণ হাতে হাতে! বলিয়া ভূপতি একখণ্ড সরোরুহ বাহির করিল। চারু দেখিল যে সকল লেখা সে তাহাদের গুপ্ত সম্পত্তি মনে করিয়া নিজেদের হস্তলিখিত মাসিক পত্রে সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছিল তাহাই লেখক লেখিকার নামসুদ্ধ সরোরুহে প্রকাশ হইয়াছে।

কে যেন তাহার খাঁচার বড় সাধের পোষা পাখীগুলিকে দ্বার খুলিয়া উড়াইয়া দিয়াছে এমনি তাহার মনে হইল। ভূপতির নিকট ধরা পড়িবার লজ্জা ভুলিয়া গিয়া বিশ্বাসঘাতী অমলের উপর তাহার মনে মনে অত্যন্ত রাগ হইতে লাগিল।

"আর এইটে দেখ দেখি!" বলিয়া বিশ্ববন্ধু খবরের কাগজ খুলিয়া ভূপতি চারুর সম্মুখে ধরিল। তাহাতে "হাল্‌ বাঙ্গা" লেখার ঢং" বলিয়া একটা প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে।

চারু হাত দিয়া ঠেলিয়া দিয়া কহিল এ পড়ে আমি কি করব! তখন অমলের উপর অভিমানে আর কোন দিকে সে মন দিতে পারিতেছিল না। ভূপতি জোর করিয়া কহিল, একবার পড়ে' দেখই না!

চারু অগত্যা চোখ বুলাইয়া গেল। আধুনিক কোন কোন লেখক শ্রেণীর ভাবাড়ম্বরে পূর্ণ গদ্য লেখাকে গালি দিয়া লেখক খুব কড়া প্রবন্ধ লিখিয়াছে। তাহার মধ্যে অমল এবং মন্মথ দত্তর লেখার ধারাকে সমালোচক তীব্র উপহাস করিয়াছে—এবং তাহারই সঙ্গে তুলনা করিয়া নবীনা লেখিকা শ্রীমতী চারুবালার ভাষার অকৃত্রিম সরলতা, অনায়াস সরসতা এবং চিত্ররচনানৈপুণ্যের বহুল প্রশংসা করিয়াছে। লিখিয়াছে এইরূপ রচনা-প্রণালীর অনুকরণ করিয়া সফলতা লাভ করিলে তবেই অমল কোম্পানির নিস্তার, নচেৎ তাহারা সম্পূর্ণ ফেল করিবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই!

ভূপতি হাসিয়া কহিল—এ'কেই বলে গুরুমারা বিদ্যে!

চারু তাহার লেখার এই প্রশংসায় এক একবার খুসি হইতে গিয়া তৎক্ষণাৎ পীড়িত হইতে লাগিল। তাহার মন যেন কোন মতেই খুসি হইতে চাহিল না! প্রশংসার লোভনীয় সুধাপাত্র মুখের কাছ পর্য্যন্ত আসিতেই ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল।

সে বুঝিতে পারিল, তাহার লেখা কাগজে ছাপাইয়া অমল হঠাৎ তাহাকে বিস্মিত করিয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল। অবশেষে ছাপা হইলে পর স্থির করিয়াছিল কোন একটা কাগজে প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা বাহির হইলে দুইটা একসঙ্গে দেখাইয়া চারুর রোষশান্তি ও উৎসাহ বিধান করিবে। যখন প্রশংসা বাহির হইল তখন অমল কেন আগ্রহের সহিত তাহাকে দেখাইতে আসিল না? এ সমালোচনায় অমল আঘাত পাইয়াছে এবং চারুকে ইহা দেখাইতে চাহে না বলিয়াই এ কাগজ গুলি সে একেবারে গোপন করিয়া গেছে। চারু আরামের জন্য অতি নিভৃতে যে একটি ক্ষুদ্র সাহিত্যনীড় রচনা করিতেছিল হঠাৎ প্রশংসা শিলাবৃষ্টির একটা বড় রকমের শিলা আসিয়া সেটাকে একেবারে স্খলিত করিবার যো

রিল। চারুর ইহা একেবারেই ভাল লাগিল া।

ভূপতি চলিয়া গেলে চারু তাহার শোবার রের খাটে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল—সম্মুখে রোরুহ এবং বিশ্ববন্ধু খোলা পড়িয়া আছে।

খাতাহাতে অমল চারুকে সহসা চকিত রিয়া দিবার জন্ম পশ্চাৎ হইতে নিঃশব্দপদে বেশ করিল। কাছে আসিয়া দেখিল, বিশ্ব-ন্ধুর সমালোচনা খুলিয়া চারু নিমগ্ন চিত্তে সিয়া আছে!

পুনরায় নিঃশব্দপদে অমল বাহির হইয়া গল। "আমাকে গালি দিয়া চারুর লেখাকে প্রশংসা করিয়াছে বলিয়া আনন্দে চারুর আর চতন্ত নাই!" মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার সমস্ত চত্ত যেন তিক্তস্বাদ হইয়া উঠিল। চারু যে র্খের সমালোচনা পড়িয়া নিজেকে আপন গুরুর চেয়ে মস্ত মনে করিয়াছে ইহা নিশ্চয় স্থির করিয়া অমল চারুর উপর ভারি রাগ রিল। চারুর উচিত ছিল কাগজ খানা করো টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া আগুনে ছাই রিয়া পুড়াইয়া ফেলা!

চারুর উপর রাগ করিয়া অমল মন্দার রের দ্বারে দাঁড়াইয়া সশব্দে ডাকিল—মন্দা-বোঠান!

মন্দা। এস ভাই এস! না চাইতেই যে দেখা পেলুম! আজ আমার কি ভাগ্যি!

অমল। আমার নতুন লেখা দুই একটা শুনবে?

মন্দা। কতদিন থেকে শোনাব শোনাব রে আশা দিয়ে রেখেছ কিন্তু শোনাও না ত! াজ নেই ভাই, আবার কে কোন্ দিক থেকে াগ করে বসলে তুমিই বিপদে পড়বে—আমার কি!

অমল কিছু তীব্রস্বরে কহিল—রাগ করবেন কে! কেনই বা রাগ করবেন! আচ্ছা সে দেখা যাবে, তুমি এখন শোনইত!

মন্দা যেন অত্যন্ত আগ্রহে তাড়াতাড়ি সংযত হইয়া বসিল। অমল সুর করিয়া সমা-রোহের সহিত পড়িতে আরম্ভ করিল।

অমলের লেখা মন্দার পক্ষে নিতান্তই বিদেশী, তাহার মধ্যে কোথাও সে কোন কিনারা দেখিতে পায় না। সেই জন্তই সমস্ত মুখে আনন্দের হাসি আনিয়া অতিরিক্ত ব্যগ্র তার ভাবে সে শুনিতে লাগিল। উৎসাহে অমলের কণ্ঠ উত্তরোত্তর উচ্চ হইয়া উঠিল।

সে পড়িতেছিল—অভিমন্যু যেমন গর্ভবাসকালে কেবল ব্যূহে প্রবেশ করিতে শিখিয়াছিল, ব্যূহ হইতে নির্গমন শেখে নাই —নদীর স্রোত সেইরূপ গিরিদরীর পাষাণ জঠরের মধ্যে থাকিয়া কেবল সম্মুখেই চলিতে শিখিয়াছিল পশ্চাতে ফিরিতে শেখে নাই! হায় নদীর স্রোত, হায় যৌবন, হায় কাল, হায় সংসার, তোমরা কেবল সম্মুখেই চলিতে পার —যে পথে স্মৃতির স্বর্ণমণ্ডিত উপলখণ্ড ছড়া-ইয়া আস, সে পথে আর কোনদিন ফিরিয়া যাওনা! মানুষের মনই কেবল পশ্চাতের দিকে চায়, অনন্ত জগৎসংসার সেদিকে ফিরিয়াও তাকায় না!

এমন সময় মন্দার দ্বারের কাছে একটি ছায়া পড়িল, সে ছায়া মন্দা দেখিতে পাইল। কিন্তু যেন দেখে নাই এইরূপ ভাণ করিয়া অনিমেষ দৃষ্টিতে অমলের মুখের দিকে চাহিয়া নিবিড় মনোযোগের সহিত পড়া শুনিতে লাগিল।

ছায়া তৎক্ষণাৎ সরিয়া গেল।

চারু অপেক্ষা করিয়াছিল অমল আসিলেই তাহার সম্মুখে বিশ্ববন্ধু কাগজটাকে যথোচিত লাঞ্ছিত করিবে, এবং প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়া

তাহাদের লেখা মাসিক পত্রে বাহির করিয়াছে বলিয়া অমলকেও ভর্ৎসনা করিবে।

অমলের আসিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তবু তাহার দেখা নাই। চারু একটা লেখা ঠিক করিয়া রাখিয়াছে; অমলকে শুনাইবার ইচ্ছা; তাহাও পড়িয়া আছে!

এমন সময়ে কোথা হইতে অমলের কণ্ঠস্বর শুনা যায়! এ যেন মন্দার ঘরে! শরবিদ্ধের মত সে উঠিয়া পড়িল। পায়ের শব্দ না করিয়া সে দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। অমল যে লেখা মন্দাকে শুনাইতেছে এখনো চারু তাহা শোনে নাই। অমল পড়িতেছিল—মানুষের মনই কেবল পশ্চাতের দিকে চায়—অনন্ত জগৎসংসার সে দিকে ফিরিয়াও তাকায় না!

চারু যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল, তেমন নিঃশব্দে আর ফিরিয়া যাইতে পারিল না। আজ পরে পরে দুই তিনটা আঘাতে তাহাকে একেবারে ধৈর্য্যচ্যুত করিয়া দিল। মন্দা যে এক বর্ণও বুঝিতেছে না এবং অমল যে নিতান্ত নির্ব্বোধ মূঢ়ের মত তাহাকে পড়িয়া শুনাইয়া তৃপ্তিলাভ করিতেছে এ কথা তাহার চীৎকার করিয়া বলিয়া আসিতে ইচ্ছা করিল। কিন্তু না বলিয়া সক্রোধে পদশব্দে তাহা প্রচার করিয়া আসিল। শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া চারু দ্বার সশব্দে বন্ধ করিল।

অমল ক্ষণকালের জন্য পড়ায় ক্ষান্ত দিল। মন্দা হাসিয়া চারুর উদ্দেশে ইঙ্গিত করিল। অমল মনে মনে কহিল, বৌঠানের এ কি দৌরাত্ম্য। তিনি কি ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন আমি তাঁহারই ক্রীতদাস! তাঁহাকে ছাড়া আর কাহাকেও পড়া শুনাইতেও পারিব না! এ যে ভয়ানক জুলুম! এই ভাবিয়া সে আরো উচৈঃস্বরে মন্দাকে পড়িয়া শুনাইতে লাগিল।

পড়া হইয়া গেলে চারুর ঘরের সম্মুখ দিয়া সে বাহিরে চলিয়া গেল। একবার চাহিয়া দেখিল ঘরের দ্বার রুদ্ধ।

চারু পদশব্দে বুঝিল, অমল তাহার ঘরের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল—একেবারো থামিল না। রাগে ক্ষোভে তাহার কান্না আসিল না। নিজের নূতন-লেখা খাতা খানি বাহির করিয়া তাহার প্রত্যেক পাতা বসিয়া বসিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া স্তুপাকার করিল। হায় কি কুক্ষণেই এই সমস্ত লেখা লেখি আরম্ভ হইয়াছিল!

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার সময় বারান্দার টব হইতে জুঁইফুলের গন্ধ আসিতেছিল। ছিন্ন মেঘের ভিতর দিয়া স্নিগ্ধ আকাশে তারা দেখা যাইতেছিল। আজ চারু চুল বাঁধে নাই, কাপড় ছাড়ে নাই। জান্‌লার কাছে অন্ধকারে বসিয়া আছে, মৃদু বাতাসে আস্তে আস্তে তাহার খোলা চুল উড়াইতেছে, এবং তাহার চোখ দিয়া এমন ঝর্‌ঝর্ করিয়া কেন জল বহিয়া যাইতেছে তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিতেছে না।

এমন সময় ভূপতি ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার মুখ অত্যন্ত ম্লান, হৃদয় ভারাক্রান্ত। ভূপতির আসিবার সময় এখন নহে। কাগজের জন্য লিখিয়া প্রুফ দেখিয়া অন্তঃপুরে আসিতে প্রায়ই তাহার বিলম্ব হয়। আজ সন্ধ্যার পরেই যেন কোন সান্ত্বনা প্রত্যাশায় চারুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।

ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছিল না। খোলা জালনার ক্ষীণ আলোকে ভূপতি চারুকে বাতায়নের কাছে অস্পষ্ট দেখিতে পাইল;

ধীরে ধীরে পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। পদশব্দ শুনিতে পাইয়াও চারু মুখ ফিরাইল না—মূর্ত্তিটির মত স্থির হইয়া কঠিন হইয়া বসিয়া রহিল।

ভূপতি কিছু আশ্চর্য্য হইয়া ডাকিল—চারু!

ভূপতির কণ্ঠস্বরে সচকিত হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। ভূপতি আসিয়াছে সে তাহা মনে করে নাই। ভূপতি চারুর মাথার চুলের মধ্যে অঙ্গুলি বুলাইতে বুলাইতে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—অন্ধকারে তুমি যে একলাটি বসে আছ চারু? মন্দা কোথায় গেল?

চারু যেমনটি আশা করিয়াছিল আজ সমস্ত দিন তাহার কিছুই হইল না। সে নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল অমল আসিয়া ক্ষমা চাহিবে—সে জন্য প্রস্তুত হইয়া সে প্রতীক্ষা করিতেছিল। এমন সময় ভূপতির অপ্রত্যাশিত কণ্ঠস্বরে সে যেন আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না—একেবারে কাঁদিয়া ফেলিল।

ভূপতি ব্যস্ত হইয়া ব্যথিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—চারু, কি হয়েছে চারু!

কি হইয়াছে তাহা বলা শক্ত। এমনি কি হয়েছে! বিশেষ ত কিছুই হয় নাই! অমল নিজের নূতন লেখা প্রথমে তাহাকে না শুনাইয়া মন্দাকে শুনাইয়াছে, এ কথা লইয়া ভূপতির কাছে কি নালিশ করিবে! শুনিলে কি ভূপতি হাসিবে না? এই তুচ্ছ ব্যাপারের মধ্যে গুরুতর নালিশের বিষয় যে কোন্ খানে লুকাইয়া আছে তাহা খুঁজিয়া বাহির করা চারুর পক্ষে অসাধ্য। অকারণে সে যে কেন এত অধিক কষ্ট পাইতেছে ইহাই সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিয়া তাহার কষ্টের বেদনা আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে।

ভূপতি। বল না, চারু, তোমার কি হয়েছে! আমি কি তোমার উপর কোন অন্যায় করেছি? তুমি ত জানই, কাজের ঝঞ্জাট নিয়ে আমি কি রকম ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছি, যদি তোমার মনে কোন আঘাত দিয়ে থাকি সে আমি ইচ্ছে করে দিইনি।

ভূপতি এমন বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছে যাহার একটিও জবাব দিবার নাই, সেই জন্য চারু ভিতরে ভিতরে অধীর হইয়া উঠিল,—মনে হইতে লাগিল ভূপতি এখন তাহাকে নিষ্কৃতি দিয়া ছাড়িয়া গেলে সে বাঁচে।

ভূপতি দ্বিতীয় বার কোন উত্তর না পাইয়া পুনর্ব্বার স্নেহসিক্ত স্বরে কহিল, আমি সর্ব্বদা তোমার কাছে আসতে পারিনে চারু, সে জন্যে আমি অপরাধী, কিন্তু আর হবে না! এখন থেকে দিনরাত কাগজ নিয়ে থাকব না।—আমাকে তুমি যতটা চাও ততটাই পাবে।

চারু অধীর হইয়া বলিল—সে জন্যে নয়।

ভূপতি কহিল—তবে কি জন্যে?—বলিয়া খাটের উপর বসিল।

চারু বিরক্তির স্বর গোপন করিতে না পারিয়া কহিল—সে এখন থাক্, রাত্রে বলব।

ভূপতি মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ থাকিয়া কহিল, আচ্ছা এখন থাক!—বলিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। তাহার নিজের একটা কি কথা বলিবার ছিল, সে আর বলা হইল না!

ভূপতি যে একটা ক্ষোভ পাইয়া গেল চারুর কাছে তাহা অগোচর রহিল না। মনে হইল ফিরিয়া ডাকি। কিন্তু ডাকিয়া কি কথা বলিবে? অনুতাপে তাহাকে বিদ্ধ করিল, কিন্তু কোন প্রতিকার সে খুঁজিয়া পাইল না।

রাত্রি হইল। চারু আজ সবিশেষ যত্ন করিয়া ভূপতির রাত্রের আহার সাজাইল এবং নিজে পাখা হাতে করিয়া বসিয়া রহিল।

এমন সময় শুনিতে পাইল মন্দা উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছে—ব্রজ, ব্রজ!—ব্রজ চাকর সাড়া দিলে জিজ্ঞাসা করিল—অমল বাবুর খাওয়া হয়েছে কি?—ব্রজ উত্তর করিল, হয়েছে! মন্দা কহিল, খাওয়া হয়ে গেছে অথচ পান নিয়ে গেলিনে যে,—মন্দা ব্রজকে অত্যন্ত তিরস্কার করিতে লাগিল!

এমন সময়ে ভূপতি অন্তঃপুরে আসিয়া আহারে বসিল,—চারু পাখা করিতে লাগিল।

চারু আজ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, ভূপতির সঙ্গে প্রফুল্ল স্নিগ্ধভাবে নানা কথা কহিবে! কথাবার্ত্তা আগে হইতে ভাবিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিল। কিন্তু মন্দার কণ্ঠস্বরে তাহার বিস্তৃত আয়োজন সমস্ত ভাঙ্গিয়া দিল, আহার কালে ভূপতিকে সে একটি কথাও বলিতে পারিল না। ভূপতিও অত্যন্ত বিমর্ষ অন্যমনস্ক হইয়াছিল, সে ভাল করিয়া খাইল না, চারু একবার কেবল জিজ্ঞাসা করিল, কিছু খাচ্চনা যে!

ভূপতি প্রতিবাদ করিয়া কহিল কেন? কম খাইনি ত!

শয়ন ঘরে উভয়ে একত্র হইলে ভূপতি কহিল, আজ রাত্রে তুমি কি বল্‌বে বলেছিলে!

চারু কহিল, দেখ কিছু দিন থেকে মন্দার ব্যবহার আমার ভাল বোধ হচ্চে না। ওকে এখানে রাখ্‌তে আমার আর সাহস হয় না!

ভূপতি। কেন, কি করেছে।

চারু। অমলের সঙ্গে ও এমনি ভাবে চলে, যে, সে দেখ্‌লে লজ্জা হয়! ভূপতি হাসিয়া উঠিয়া কহিল হঃ তুমি পাগল হয়েছ! অমল ছেলে মানুষ, সে দিনকার ছেলে—

চারু। তুমি ত ঘরের খবর কিছুই রাখ না, কেবল বাইরের খবর কুড়িয়ে বেড়াও! যাই হোক্, বেচারা দাদার জন্যে আমি ভাবি! তিনি কখন খেলেন না খেলেন মন্দা তার কোন খোঁজও রাখে না,' অথচ অমলের পান থেকে চুণ খসে গেলেই চাকরবাকরদের সঙ্গে বকাবকি করে অনর্থ করে।

ভূপতি। তোমরা মেয়েরা কিন্তু ভারি সন্দিগ্ধ, তা বল্‌তে হয়! চারু রাগিয়া বলিল, আচ্ছা, বেশ, আমরা সন্দিগ্ধ কিন্তু বাড়িতে আমি এ সমস্ত বেহায়াপনা হতে দেব না, তা বলে রাখ্‌চি!

চারুর এই সমস্ত অমূলক আশঙ্কায় ভূপতি মনে মনে হাসিল, খুসিও হইল। গৃহ যাহাতে পবিত্র থাকে, দাম্পত্যধর্ম্মে আনুমানিক কাল্পনিক কলঙ্কও লেশমাত্র স্পর্শ না করে এজন্য সাধ্বী স্ত্রীদের যে অতিরিক্ত সতর্কতা, যে সন্দেহাকুল দৃষ্টিক্ষেপ, তাহার মধ্যে একটি মাধুর্য্য এবং মহত্ত্ব আছে।

ভূপতি শ্রদ্ধায় এবং স্নেহে চারুর ললাট চুম্বন করিয়া কহিল এ নিয়ে আর কোন গোল করবার দরকার হবে না। উমাপদ ময়মন্‌সিংহে প্র্যাক্‌টিস্ করতে যাচ্চে, মন্দাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে।

অবশেষে নিজের দুশ্চিন্তা এবং এই সকল অপ্রীতিকর আলোচনা দূর করিয়া দিবার জন্য ভূপতি টেবিল হইতে একটা খাতা তুলিয়া লইয়া কহিল—তোমার লেখা আমাকে শোনাওনা চারু!

চারু খাতা কাড়িয়া লইয়া কহিল—এ তোমার ভাল লাগ্‌বে না, তুমি ঠাট্টা করবে।

ভূপতি এই কথায় কিছু ব্যথা পাইল—কিন্তু তাহা গোপন করিয়া হাসিয়া কহিল—আচ্ছা, আমি ঠাট্টা করব না, এম্‌নি স্থির হয়ে শুন্‌ব যে তোমার ভ্রম হবে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি!

কিন্তু ভূপতি আমল পাইল না—দেখিতে দেখিতে খাতাপত্র নানা আবরণ আচ্ছাদনের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ।

—*—

সকল কথা ভূপতি চারুকে বলিতে পারে

কর্ম্মা-ধ্যক্ষ ছিল। চাঁদা আদায় ছাপাখানা ও বাজারের দেনা শোধ, চাকরদের বেতন দেওয়া এ সমস্তই উমাপদের উপর ভার ছিল।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন কাগজওয়ালার নিকট হইতে উকিলের চিঠি পাইয়া ভূপতি আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ভূপতির নিকট হইতে তাহাদের ২৭০০ টাকা পাওনা জানাইয়াছে। ভূপতি উমাপদকে ডাকিয়া কহিল, এ কি ব্যাপার? এ টাকা ত আমি তোমকে দিয়ে দিয়েছি। কাগজের দেনা চার পাঁচশোর বেশী ত হবার কথা নয়।

উমাপদ কহিল, নিশ্চয় এরা ভুল করে করেছে।

কিন্তু আর চাপা রহিল না। কিছুকাল হইতে উমাপদ এইরূপ ফাঁকি দিয়া আসিতেছে। কেবল কাগজ সম্বন্ধে নহে, ভূপতির নামে উমাপদ বাজারে অনেক দেনা করিয়াছে। গ্রামে সে যে একটি পাকা বাড়ি নির্ম্মাণ করিতেছে তাহার মালমসলার কতক ভূপতির নামে লিখাইয়াছে, অধিকাংশই কাগজের টাকা হইতে শোধ করিয়াছে।

যখন নিতান্তই ধরা পড়িল—তখন সে রুক্ষ স্বরে কহিল—আমি ত আর নিরুদ্দেশ হচ্চিনে! কাজ করে আমি ক্রমে ক্রমে শোধ দেব—তোমার সিকি পয়সার দেনা যদি বাকি থাকে তবে আমার নাম উমাপদ নয়।

তাহার নামের ব্যত্যয়ে ভূপতির কোন সান্ত্বনা ছিল না। অর্থের ক্ষতিতে ভূপতি তত ক্ষুণ্ণ হয় নাই, কিন্তু অকস্মাৎ এই বিশ্বাস-ঘাতকতায় সে যেন ঘর হইতে শূন্যের মধ্যে পা ফেলিল।

সেইদিন সে অকালে অন্তঃপুরে গিয়াছিল। পৃথিবীতে একটা যে নিশ্চয় বিশ্বাসের স্থান আছে সেইটে ক্ষণকালের জন্য অনুভব করিয়া আসিতে তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছিল। চারু তখন নিজের দুঃখে সন্ধ্যা দীপ নিবাইয়া জানলার কাছে অন্ধকারে বসিয়া ছিল।

উমাপদ পর দিনেই ময়মনসিংহে যাইতে প্রস্তুত। বাজারের পাওনাদাররা খবর পাই-বার পূর্ব্বেই সে সরিয়া পড়িতে চায়। ভূপতি ঘৃণা পূর্ব্বক উমাপদর সহিত কথা কহিল না—ভূপতির সেই মৌনাবস্থা উমাপদ সৌভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করিল।

অমল আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মন্দা-বৌঠান, একি ব্যাপার? জিনিষপত্র গোছা-বার ধুম যে?

মন্দা। আর ভাই, যেতে ত হবেই! চির-কাল কি থাক্‌ব?

অমল। যাচ্চ কোথায়?

মন্দা। দেশে।

অমল। কেন? এখানে অসুবিধাটা কি হল?

মন্দা। অসুবিধে আমার কি বল? তোমাদের পাঁচ জনের সঙ্গে ছিলুম সুখেই ছিলুম! কিন্তু অন্যের অসুবিধে হতে লাগ্‌ল যে!—বলিয়া চারুর ঘরের দিকে কটাক্ষ করিল।

অমল গম্ভীর হইয়া চুপ করিয়া রহিল। মন্দা কহিল—ছি ছি কি লজ্জা! বাবু কি মনে করলেন।

অমল একথা লইয়া আর অধিক আলোচনা করিল না। এটুকু স্থির করিল, চারু তাহাদের সম্বন্ধে দাদার কাছে এমন কথা বলিয়াছে যাহা বলিবার নহে।

অমল বাড়ি হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় বেড়াইতে লাগিল। তাহার ইচ্ছা হইল এ বাড়িতে আর ফিরিয়া না আসে। দাদা যদি বৌঠানের কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহাকে অপরাধী মনে করিয়া থাকেন তবে মন্দা যে পথে গিয়াছে তাহাকেও সেই পথে যাইতে হয়। মন্দাকে বিদায় এক হিসাবে অমলের প্রতিও নির্ব্বাসনের আদেশ—সেটা কেবল মুখ ফুটিয়া বলা হয় নাই মাত্র। ইহার পরে কর্ত্তব্য খুব সুস্পষ্ট—আর এক দণ্ডও এখানে থাকা নয়! কিন্তু দাদা যে তাহার সম্বন্ধে কোন প্রকার অন্যায় ধারণা মনে মনে পোষণ করিয়া রাখিবেন সে হইতেই পারে না। এত দিন তিনি অক্ষুণ্ণ বিশ্বাসে তাহাকে ঘরে স্থান দিয়া পালন করিয়া আসিতেছেন, সে বিশ্বাসে যে অমল কোন অংশে আঘাত দেয় নাই সে কথা দাদাকে না বুঝাইয়া সে কেমন করিয়া যাইবে?

ভূপতি তখন আত্মীয়ের কৃতঘ্নতা, পাওনাদারের তাড়না, উচ্ছৃঙ্খল হিসাবপত্র এবং শূন্য তহবিল লইয়া মাথায় হাত দিয়া ভাবিতেছিল। তাহার এই শুষ্ক মনোদুঃখের কেহ দোসর ছিল না—চিত্তবেদনা এবং ঋণের সঙ্গে একলা দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য ভূপতি প্রস্তুত হইতেছিল।

এমন সময় অমল ঝড়ের মত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ভূপতি নিজের অগাধ চিন্তার মধ্য হইতে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া চাহিল। কহিল, খবর কি অমল?—অকস্মাৎ মনে হইল অমল বুঝি আর একটা কি গুরুতর দুঃসংবাদ লইয়া আসিল।

অমল কহিল—দাদা, আমার উপরে তোমার কি কোন রকম সন্দেহের কারণ হয়েছে?

ভূপতি আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—তোমার উপরে সন্দেহ! মনে মনে ভাবিল, সংসার যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে কোনদিন অমলকেও সন্দেহ করিব আশ্চর্য্য নাই!

অমল। বৌঠান কি আমার চরিত্র সম্বন্ধে তোমার কাছে কোন রকম দোষারোপ করেছেন?

ভূপতি ভাবিল—ওঃ এই ব্যাপার! বাঁচা গেল! স্নেহের অভিমান! সে মনে করিয়াছিল, সর্ব্বনাশের উপর বুঝি আর একটা কিছু সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, কিন্তু গুরুতর সঙ্কটের সময়েও এই সকল তুচ্ছ বিষয়ে কর্ণপাত করিতে হয়! সংসার এদিকে সাঁকোও নাড়াইবে অথচ সেই সাঁকোর উপর দিয়া তাহার শাকের আঁটিগুলো পার করিয়া দিবার জন্য তাগিদ করিতেও ছাড়িবে না।

অন্যসময় হইলে ভূপতি অমলকে পরিহাস করিত, কিন্তু আজ তাহার সে প্রফুল্লতা ছিল না। সে বলিল, পাগল হয়েছ না কি?

অমল আবার জিজ্ঞাসা করিল—বৌঠান কিছু বলেন নি?

ভূপতি। তোমাকে ভালবাসেন, বলে

যদি কিছু বলে থাকেন তাতে রাগ করবার কোন কারণ নেই।

অমল। কাজ কর্ম্মের চেষ্টায় এখন আমার অন্যত্র যাওয়া উচিত!

ভূপতি ধমক দিয়া কহিল—অমল, তুমি কি ছেলেমানুষী করচ তার ঠিক নেই! এখন পড়া শুনো কর, কাজকর্ম্ম পরে হবে।

অমল বিমর্ষ মুখে চলিয়া আসিল, ভূপতি তাহার কাগজের গ্রাহকদের মূল্য প্রাপ্তির তালিকার সহিত তিন বৎসরের জমা খরচের হিসাব মিলাইতে বসিয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ।

অমল স্থির করিল বৌঠানের সঙ্গে মোকাবিলা করিতে হইবে, একথাটার শেষ না করিয়া ছাড়া হইবে না। বৌঠানকে যে সকল শক্ত শক্ত কথা শুনাইবে মনে মনে তাহা আবৃত্তি করিতে লাগিল।

মন্দা চলিয়া গেলে চারু সংকল্প করিল অমলকে সে নিজে হইতে ডাকিয়া পাঠাইয়া তাহার রোষ শান্তি করিবে। কিন্তু একটা লেখার উপলক্ষ করিয়া ডাকিতে হইবে। অমলেরই একটা লেখার অনুকরণ করিয়া "অমাবস্যার আলো" নামে সে একটা প্রবন্ধ ফাঁদিয়াছে। চারু এটুকু বুঝিয়াছে যে তাহার স্বাধীন ছাঁদের লেখা অমল পছন্দ করে না।

পূর্ণিমা তাহার সমস্ত আলোক প্রকাশ করিয়া ফেলে বলিয়া চারু তাহার নূতন রচনায় পূর্ণিমাকে অত্যন্ত ভর্ৎসনা করিয়া লজ্জা দিতেছে। লিখিতেছে—অমাবস্যার অতলস্পর্শ অন্ধকারের মধ্যে ষোলকলা চাঁদের সমস্ত আলোক স্তরে স্তরে আবদ্ধ হইয়া আছে, তাহার এক রশ্মিও হারাইয়া যায় নাই—তাই পূর্ণিমার উজ্জ্বলতা অপেক্ষা অমাবস্যার কালিমা পরিপূর্ণতর—ইত্যাদি। অমল নিজের সকল লেখাই সকলের কাছে প্রকাশ করে এবং চারু তাহা করে না—পূর্ণিমা অমাবস্যার তুলনার মধ্যে কি সেই কথাটার আভাস আছে?

এদিকে এই পরিবারের তৃতীয় ব্যক্তি ভূপতি কোন আসন্ন ঋণের তাগিদ হইতে মুক্তি লাভের জন্য তাহার পরম বন্ধু মোতিলালের কাছে গিয়াছিল।

মোতিলালকে সঙ্কটের সময় ভূপতি কয়েক হাজার টাকা ধার দিয়া ছিল—সে দিন অত্যন্ত বিব্রত হইয়া সেই টাকাটা চাহিতে গিয়াছিল। মোতিলাল স্নানের পর গা খুলিয়া পাখার হাওয়া লাগাইতেছিল এবং একটা কাঠের বাক্সর উপর কাগজ মেলিয়া অতি ছোট অক্ষরে সহস্র দুর্গা নাম লিখিতেছিল। ভূপতিকে দেখিয়া অত্যন্ত হৃদ্যতার স্বরে কহিল, এস এস—আজ কাল ত তোমার দেখাই পাবার যো নেই।

মোতিলাল টাকার কথা শুনিয়া আকাশ পাতাল চিন্তা করিয়া কহিল, কোন্ টাকার কথা বল্‌চ? এর মধ্যে তোমার কাছ থেকে কিছু নিয়েছি না কি?

ভূপতি সাল তারিখ স্মরণ করাইয়া দিলে মোতিলাল কহিল ওঃ, সেটাত অনেক দিন হল তামাদি হয়ে গেছে!

ভূপতির চক্ষে তাহার চতুর্দ্দিকের চেহারা সমস্ত যেন বদল হইয়া গেল। সংসারের যে অংশ হইতে মুখস্ খসিয়া পড়িল সে দিকটা দেখিয়া আতঙ্কে ভূপতির শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। হঠাৎ বন্যা আসিয়া পড়িলে ভীত ব্যক্তি যেখানে সকলের চেয়ে উচ্চচূড়া দেখে

সেইখানে যেমন ছুটিয়া যায়, সংশয়াক্রান্ত বহিঃ-সংসার হইতে ভূপতি তেমনি বেগে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল, মনে মনে কহিল আর যাই হোক্ চারু ত আমাকে বঞ্চনা করিবে না।

চারু তখন খাটে বসিয়া কোলের উপর বালিশ এবং বালিশের উপর খাতা রাখিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া এক মনে লিখিতেছিল। ভূপতি যখন নিতান্ত তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল তখনি তাহার চেতনা হইল, তাড়াতাড়ি তাহার খাতাটা পায়ের নীচে চাপিয়া বসিল।

মনে যখন বেদনা থাকে তখন অল্প আঘাতেই গুরুতর ব্যথা বোধ হয়। চারু এমন অনাবশ্যক সত্বরতার সহিত তাহার লেখা গোপন করিল দেখিয়া ভূপতির মনে বাজিল।

ভূপতি ধীরে ধীরে খাটের উপর চারুর পাশে বসিল। চারু তাহার রচনাস্রোতে অনপেক্ষিত বাধা পাইয়া এবং ভূপতির কাছে হঠাৎ খাতা লুকাইবার ব্যস্ততায় অপ্রতিভ হইয়া কোন কথাই যোগাইয়া উঠিতে পারিল না।

সে দিন ভূপতির নিজের কিছু দিবার বা কহিবার ছিল না। সে রিক্তহস্তে চারুর নিকটে প্রার্থী হইয়া আসিয়াছিল। চারুর কাছ হইতে আশঙ্কাধর্ম্মী ভালবাসার একটা কোন প্রশ্ন একটা কিছু আদর পাইলেই তাহার ক্ষতযন্ত্রণায় ঔষধ পড়িত। কিন্তু "হ্যাদে লক্ষ্মী হৈল লক্ষ্মী ছাড়া," এক মুহূর্ত্তের প্রয়োজনে প্রীতিভাণ্ডারের চাবি চারু যেন কোন খানে খুঁজিয়া পাইল না! উভয়ের সুকঠিন মৌনে ঘরের নীরবতা অত্যন্ত নিবিড় হইয়া আসিল।

খানিকক্ষণ নিতান্ত চুপচাপ থাকিয়া ভূপতি নিশ্বাস ফেলিয়া খাট ছাড়িয়া উঠিল এবং ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া আসিল।

সেই সময় অমল বিস্তর শক্ত শক্ত কথা মনের মধ্যে বোঝাই করিয়া লইয়া চারুর ঘরে দ্রুতপদে আসিতেছিল, পথের মধ্যে অমল ভূপতির অত্যন্ত শুষ্ক বিবর্ণ মুখ দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া থামিল, জিজ্ঞাসা করিল, দাদা, তোমার অসুখ করেছে?

অমলের স্নিগ্ধস্বর শুনিবামাত্র হঠাৎ ভূপতির সমস্ত হৃদয় তাহার অশ্রুরাশি লইয়া বুকের মধ্যে যেন ফুলিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ কোন কথা বাহির হইল না। সবলে আত্মসম্বরণ করিয়া ভূপতি আর্দ্রস্বরে কহিল কিছু হয়নি—অমল! এবারে কাগজে তোমার কোন লেখা বেরচ্চে কি?

অমল শক্ত শক্ত কথা যাহা সঞ্চয় করিয়াছিল তাহা কোথায় গেল? তাড়াতাড়ি চারুর ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বৌঠান, দাদার কি হয়েছে বল দেখি?

চারু কহিল, কই তা'ত কিছু বুঝ্‌তে পারলুম না। অন্য কাগজে বোধ হয় ওঁর কাগজকে গাল দিয়া থাক্‌বে!

অমল মাথা নাড়িল।

না ডাকিতেই অমল আসিল এবং সহজ ভাবে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়া দিল দেখিয়া চারু অত্যন্ত আরাম পাইল। একেবারেই লেখার কথা পাড়িল—কহিল, আজ আমি "অমাবস্যার আলো" বলে একটা লেখা লিখ্‌ছিলুম আর একটু হলেই তিনি সেটা দেখে' ফেল্‌ছিলেন।

চারু নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল, তাহার নূতন লেখাটা দেখিবার জন্য অমল পীড়াপীড়ি করিবে। সেই অভিপ্রায়ে খাতা খানা একটু নাড়াচাড়াও করিল। কিন্তু অমল একবার তীব্রদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চারুর মুখের দিকে চাহিল—কি বুঝিল কি ভাবিল জানি

না। চকিত হইয়া উঠিয়া পড়িল। পর্ব্বতপথে চলিতে চলিতে হঠাৎ এক সময়ে মেঘের কুয়াশা কাটিবামাত্র পথিক যেন চমকিয়া দেখিল সে সহস্র হস্ত গভীর গহ্বরের মধ্যে পা বাড়াইতে যাইতেছিল! অমল কোন কথা না বলিয়া একেবারে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

চারু অমলের এই অভূতপূর্ব্ব ব্যবহারের কোন তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিল না।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—:০—

পর দিন ভূপতি আবার অসময়ে শয়ন ঘরে আসিয়া চারুকে ডাকাইয়া আনাইল। কহিল—চারু, অমলের বেশ একটি ভাল বিবাহের প্রস্তাব এসেছে।

চারু অন্তমনস্ক ছিল। কহিল—ভাল কি এসেছে?

ভূপতি। বিয়ের সম্বন্ধ।

চারু। কেন, আমাকে কি পছন্দ হল না?

ভূপতি উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। কহিল—তোমাকে পছন্দ হল কি না সে কথা এখনো অমলকে জিজ্ঞাসা করা হয় নি! যদিই বা হয়ে থাকে আমার ত একটা ছোটখাট দাবী আছে, সে আমি ফস্ করে ছাড়চিনে!

চারু! আঃ কি বকচ তার ঠিক নেই! তুমি যে বল্লে তোমার বিয়ের সম্বন্ধে এসেছে। —চারুর মুখ লাল হইয়া উঠিল।

ভূপতি। তা'হলে কি ছুটে তোমাকে খবর দিতে আস্‌তুম? বকশিষ পাবার ত আশা ছিল না।

চারু। অমলের সম্বন্ধ এসেছে? বেশত। তা হলে আর দেরি কেন?

ভূপতি। বর্দ্ধমানের উকীল রঘুনাথ বাবু তাঁর মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিয়া অমলকে বিলেত পাঠাতে চান।

চারু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—বিলেত?

ভূপতি। হাঁ বিলেত!

চারু। অমল বিলেত যাবে? বেশ মজা ত? বেশ হয়েছে, ভালই হয়েছে। তা তুমি তাকে একবার বলে দেখ।

ভূপতি। আমি বলবার আগে তুমি তাকে একবার ডেকে বুঝিয়ে বল্লে ভাল হয় না?

চারু। আমি ত তিন হাজার বার বলেছি। সে আমার কথা রাখে না। আমি তাকে বল্‌তে পারব না।

ভূপতি। তোমার কি মনে হয় সে কর্‌বে না?

চারু। আরো ত অনেকবার চেষ্টা দেখা গেছে, কোন মতে ত রাজি হয় নি।

ভূপতি। কিন্তু এবারকার এ প্রস্তাবটা তার পক্ষে ছাড়া উচিত হবে না। আমার অনেক দেনা হয়ে গেছে, অমলকে আমি ত আর সে রকম করে আশ্রয় দিতে পারব না।

ভূপতি অমলকে ডাকিয়া পাঠাইল। অমল আসিলে তাহাকে বলিল—বর্দ্ধমানের উকিল রঘুনাথ বাবুর মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ের প্রস্তাব এসেছে। তাঁর ইচ্ছে বিবাহ দিয়ে তোমাকে বিলেতে পাঠিয়ে দেবেন। তোমার কি মত?

অমল কহিল—তোমার যদি অনুমতি থাকে আমার এতে কোন অমত নেই।

অমলের কথা শুনিয়া উভয়ে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সে যে বলিবামাত্রই রাজি হইবে এ কেহ মনে করে নাই।

চারু তীব্রস্বরে ঠাট্টা করিয়া কহিল—

দাদার অনুমতি থাক্‌লেই উনি মত দেবেন! কি আমার কথার বাধ্য ছোট ভাই। দাদার পরে ভক্তি এতদিন কোথায় ছিল ঠাকুরপো?

অমল উত্তর না দিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিল।

অমলের নিরুত্তরে চারু যেন তাহাকে চেতাইয়া তুলিবার জন্য দ্বিগুণতর ঝাঁজের সঙ্গে বলিল—তার চেয়ে বলনা কেন, নিজের ইচ্ছে গেছে! এতদিন ভাণ করে থাক্‌বার কি দরকার ছিল যে বিয়ে করতে চাও না? পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ!

ভূপতি উপহাস করিয়া কহিল—অমল তোমার খাতিরেই এতদিন ক্ষিদে চেপে রেখেছিল—পাছে ভাজের কথা শুনে তোমার হিংসে হয়!

চারু এই কথায় লাল হইয়া উঠিয়া কোলাহল করিয়া বলিতে লাগিল—হিংসে! তা বইকি! কখ্‌খনো আমার হিংসে হয় না। ওরকম করে বলা তোমার ভারি অন্যায়।

ভূপতি। ঐ দেখ! নিজের স্ত্রীকে ঠাট্টাও কর্‌তে পারব না।

চারু। না, ওরকম ঠাট্টা আমার ভাল লাগে না।

ভূপতি। আচ্ছা, গুরুতর অপরাধ করেছি। মাপ কর! যা হোক্‌ বিয়ের প্রস্তাবটা তা'হলে স্থির?

অমল কহিল—হাঁ!

চারু! মেয়েটি ভাল কি মন্দ তাও বুঝি একবার দেখ্‌তে যাবারও তর সইল না! তোমার যে এমন দশা হয়ে এসেছে তা একটু আভাসেও প্রকাশ কর নি!

ভূপতি। অমল, মেয়ে দেখ্‌তে চাও ত তার বন্দোবস্ত করি। খবর নিয়েছি মেয়েটি সুন্দরী!

অমল। না, দেখবার দরকার দেখিনে!

চারু। ওর কথা শোন কেন! সে কি হয়? কনে না দেখে বিয়ে হবে? ও না দেখ্‌তে চায় আমরা ত দেখে নেব!

অমল। না দাদা, ঐ নিয়ে মিথ্যে দেরি করবার দরকার দেখি নে।

চারু। কাজ নেই বাপু—দেরি হলে বুক ফেটে যাবে! তুমি টোপর মাথায় দিয়ে এখনি বেরিয়ে পড়! কি জানি, তোমার সাত রাজার ধন মাণিকটিকে যদি আর কেউ কেড়ে নিয়ে যায়!

অমলকে চারু কোন ঠাট্টাতেই কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না।

চারু। বিলেত পালাবার জন্যে তোমার মনটা বুঝি দৌড়চ্ছে? কেন, এখানে আমরা তোমাকে মারছিলুম, না ধরছিলুম? হ্যাটকোট পরে সায়েব না সাজ্‌লে এখনকার ছেলেদের মন ওঠে না। ঠাকুরপো, বিলেত থেকে ফিরে এসে আমাদের মত কালা আদ্‌মিদের চিন্‌তে পারবে ত?

অমল কহিল—তা'হলে আর বিলেত যাওয়া কি করতে?

ভূপতি হাসিয়া কহিল—কালোরূপ ভোলবার জন্যেই ত সাত সমুদ্র পেরনো! তা ভয় কি চারু, আমরা রইলুম, কালোর ভক্তের অভাব হবে না!

ভূপতি খুসি হইয়া তখনি বর্দ্ধমানে চিঠি লিখিয়া পাঠাইল। বিবাহের দিনস্থির হইয়া গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—•—

ইতিমধ্যে কাগজখানা তুলিয়া দিতে হইল। পতি খরচ আর যোগাইয়া উঠিতে পারিল না। লোকসাধারণ নামক একটা বিপুল নির্ম্মল পদার্থের যে সাধনায় ভূপতি দীর্ঘকাল দিন রাত্রি একান্ত মনে নিযুক্ত ছিল সেটা এক মুহূর্ত্তে বিসর্জ্জন দিতে হইল। ভূপতির জীবনের সমস্ত চেষ্টা যে অভ্যস্ত পথে গত বারোবৎসর অবিচ্ছেদে চলিয়া আসিতেছে সেটা হঠাৎ এক জায়গায় যেন জলের মাঝখানে আসিয়া পড়িল। ইহার জন্য ভূপতি কিছুমাত্র প্রস্তুত ছিল না। অকস্মাৎ বাধা প্রাপ্ত তাহার এতদিনকার সমস্ত উদ্যমকে সে কোথায় ফিরাইয়া লইয়া যাইবে? তাহারা যেন উপবাসী অনাথ শিশুসন্তানদের মত ভূপতির মুখের দিকে চাহিল; ভূপতি তাহাদিগকে আপন অন্তঃপুরে করুণাময়ী শুশ্রূষাপরায়ণা নারীর কাছে আনিয়া দাঁড় করাইল।

নারী তখন কি ভাবিতেছিল? সে মনে মনে বলিতেছিল—একি আশ্চর্য্য! অমলের বিবাহ হইবে সেত খুব ভালই! কিন্তু এতকাল পরে আমাদের ছাড়িয়া পরের ঘরে বিবাহ করিয়া বিলাত চলিয়া যাইবে, ইহাতে তাহার মনে একবারো একটু খানির জন্য দ্বিধাও জন্মিল না? এত দিন ধরিয়া তাহাকে যে আমরা এত যত্ন করিয়া রাখিলাম, আর যেম্নি বিদায় লইবার একটু খানি ফাঁক পাইল অমনি কোমর বাঁধিয়া প্রস্তুত হইল, যেন এত দিন সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিল! অথচ মুখে কতই মিষ্ট, কতই ভালবাসা! মানুষকে চিনিবার যো নাই! কে জানিত যে লোক এত লিখিতে পারে তাহার হৃদয় কিছু মাত্র নাই!

নিজের হৃদয় প্রাচুর্য্যের সহিত তুলনা করিয়া অমলের শূন্য হৃদয়কে অত্যন্ত অবজ্ঞা করিতে অনেক চেষ্টা করিল। কিন্তু পারিল না। ভিতরে ভিতরে নিয়ত একটা বেদনার উদ্বেগ তপ্ত শূলের মত তাহার অভিমানকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া তুলিতে লাগিল।

অমল আজ বাদে কাল চলিয়া যাইবে তবু এ কয় দিন তাহার দেখা নাই। আমাদের মধ্যে যে পরস্পর একটা মনান্তর হইয়াছে সেটা মিটাইয়া লইবার আর অবসরও হইল না। চারু প্রতিক্ষণে মনে করে অমল আপনি আসিবে—তাহাদের এত দিনকার খেলাধুলা এমন করিয়া ভাঙ্গিবে না, কিন্তু অমল আর আসেই না! অবশেষে যখন যাত্রার দিন অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল, তখন চারু নিজেই অমলকে ডাকিয়া পাঠাইল।

অমল বলিল—আর একটু পরে যাচ্চি। চারু তাহাদের সেই বারান্দার চৌকিটাতে গিয়া বসিল। সকাল বেলা হইতে ঘন মেঘ করিয়া গুমট হইয়া আছে—চারু তাহার খোলা চুল এলো করিয়া মাথায় জড়াইয়া একটা হাতপাখা লইয়া ক্লান্ত দেহে অল্প অল্প বাতাস করিতে লাগিল।

অত্যন্ত দেরি হইল। ক্রমে তাহার হাতপাখা আর চলিল না। রাগ, দুঃখ অধৈর্য্য তাহার বুকের ভিতরে ফুটিয়া উঠিল। মনে মনে বলিল—নাই আসিল অমল, তা'তেই বা কি!—কিন্তু তবু পদশব্দ মাত্রেই তাহার মন দ্বারের দিকে ছুটিয়া যাইতে লাগিল!

দূর গির্জ্জায় এগারোটা বাজিয়া গেল। স্নানান্তে এখনি ভূপতি খাইতে আসিবে! এখনো আধঘণ্টা সময় আছে, এখনো অমল

যদি আসে! যেমন করিয়া হোক্ তাহাদের কয় দিনকার নীরব ঝগড়া আজ মিটাইয়া ফেলিতেই হইবে—অমলকে এমন ভাবে বিদায় দেওয়া যাইতে পারে না! এই সমবয়সী দেওর-ভাজের মধ্যে যে চিরন্তন মধুর সম্বন্ধটুকু আছে—অনেক ভাব আড়ি অনেক স্নেহের দৌরাত্ম্য অনেক বিশ্রব্ধ সুখালোচনায় বিজড়িত একটি চিরচ্ছায়াময় লতাবিতান—অমল সে কি আজ ধূলায় লুটাইয়া দিয়া বহু দিনের জন্ম বহুদূরে চলিয়া যাইবে? একটু পরিতাপ হইবে না? তাহার তলে কি শেষ জলও সিঞ্চন করিয়া যাইবে না,—তাহাদের অনেক দিনের দেওর-ভাজ সম্বন্ধের শেষ অশ্রুজল।

আধঘণ্টা প্রায় অতীত হয়। এলো খোঁপা খুলিয়া খানিকটা চুলের গুচ্ছ চারু দ্রুতবেগে আঙুলে জড়াইতে এবং খুলিতে লাগিল। অশ্রু সম্বরণ করা আর যায় না! চাকর আসিয়া কহিল—মাঠাকরুণ বাবুর জন্মে ডাব বের করে দিতে হবে।

চারু আঁচল হইতে ভাঁড়ারের চাবি খুলিয়া ঝন্ করিয়া চাকরের পায়ের কাছে।ফেলিয়া দিল—সে আশ্চর্য্য হইয়া চাবি লইয়া চলিয়া গেল।

চারুর বুকের কাছ হইতে কি একটা ঠেলিয়া কণ্ঠের কাছে উঠিয়া আসিতে লাগিল।

যথাসময়ে ভূপতি সহাস্য মুখে খাইতে আসিল। চারু পাখা হাতে আহার স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, অমল ভূপতির সঙ্গে আসিয়াছে। চা তাহার মুখের দিকে চাহিল না।

অমল জিজ্ঞাসা।করিল—বৌঠান আমাকে ডাকছ।

চারু কহিল—না, এখন আর দরকার নেই।

অমল। তা হলে আমি যাই, আমার আবার অনেক গোছাবার আছে।

চারু তখন দীপ্তচক্ষে একবার অমলের মুখের দিকে চাহিল—কহিল, যাও।

অমল চারুর মুখের দিকে একবার চাহিয়া চলিয়া গেল।

আহারান্তে ভূপতি কিছুক্ষণ চারুর কাছে বসিয়া থাকে। আজ দেনাপাওনা হিসাবপত্রের হাঙ্গামে ভূপতি অত্যন্ত ব্যস্ত,—তাই আজ অন্তঃপুরে বেশীক্ষণ থাকিতে পারিবে না বলিয়া কিছু ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল,—আজ আর আমি বেশীক্ষণ বস্‌তে পারচিনে…আজ অনেক ঝঞ্ঝাট।

চারু বলিল, তা যাও না।

ভূপতি ভাবিল চারু অভিমান করিল। বলিল, তাই বলে যে এখনি যেতে হবে তা নয়—একটু জিরিয়ে যেতে হবে।—বলিয়া বসিল। দেখিল চারু বিমর্ষ হইয়া আছে। ভূপতি অনুতপ্তচিত্তে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল কিন্তু কোন মতেই কথা জমাইতে পারিল না। অনেকক্ষণ কথোপকথনের বৃথা চেষ্টা করিয়া ভূপতি কহিল—অমল ত কাল চলে যাচ্চে, কিছুদিন তোমার বোধ হয় খুব একলা বোধ হবে।

চারু তাহার কোন উত্তর না দিয়া যেন কি একটা আনিতে চট্ করিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল। ভূপতি কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বাহিরে প্রস্থান করিল।

চারু আজ অমলের মুখের দিকে চাহিয়া লক্ষ্য করিয়াছিল অমল এই কয়দিনেই অত্যন্ত রোগা হইয়া গেছে—তাহার মুখে তরুণতার সেই স্ফূর্ত্তি একেবারেই নাই। ইহাতে চারু সুখও পাইল বেদনাও বোধ করিল। আসন্ন বিচ্ছেদেই

যে অমলকে ক্লিষ্ট করিতেছে চারুর তাহাতে সন্দেহ রহিল না—কিন্তু তবু অমলের এমন ব্যবহার কেন? কেন সে দূরে দূরে পালাইয়া বেড়াইতেছে? বিদায়কালকে কেন সে ইচ্ছা-পূর্ব্বক এমন বিরোধতিক্ত করিয়া তুলিতেছে?

বিছানায় শুইয়া ভাবিতে ভাবিতে সে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া বসিল। হঠাৎ মন্দার কথা মনে পড়িল। যদি এমন হয়, অমল মন্দাকে ভাল বাসে। মন্দা চলিয়া গেছে বলিয়াই যদি অমল এমন করিয়া—ছি! অমলের মন কি এমন হইবে? এত ক্ষুদ্র? এমন কলুষিত? বিবাহিত রমণীর প্রতি তাহার মন যাইবে? অসম্ভব! সন্দেহকে একান্ত চেষ্টায় দূর করিয়া দিতে চাহিল—কিন্তু সন্দেহ তাকে সবলে দংশন করিয়া রহিল।

এমনি করিয়া বিদায়কাল আসিল—মেঘ পরিষ্কার হইল না। অমল আসিয়া কম্পিত-কণ্ঠে কহিল—বৌঠান, আমার যাবার সময় হয়েছে। তুমি এখন থেকে দাদাকে দেখো! তাঁর বড় সঙ্কটের অবস্থা—তুমি ছাড়া তাঁর আর সান্ত্বনার কোন পথ নেই।

অমল ভূপতির বিষণ্ণ ম্লান ভাব দেখিয়া সন্ধান দ্বারা তাহার দুর্গতির কথা জানিতে পারিয়াছিল। ভূপতি যে কিরূপ নিঃশব্দে আপন দুঃখ দুর্দ্দশার সহিত একলা লড়াই করিতেছে, কাহারো কাছে সাহায্য বা সান্ত্বনা পায় নাই, অথচ আপন আশ্রিত পালিত আত্মীয় স্বজন-দিগকে এই প্রলয় সঙ্কটে বিচলিত হইতে দেয় নাই ইহা সে চিন্তা করিয়া চুপ করিয়া রহিল। তারপরে সে চারুর কথা ভাবিল, নিজের কথা ভাবিল—কর্ণমূল লোহিত হইয়া উঠিল—সবেগে বলিল, চুলায় যাক্ আষাঢ়ের চাঁদ আর অমাবস্যার আলো! আমি ব্যারিষ্টার হয়ে এসে দাদাকে যদি সাহায্য কর্ত্তে পারি তবেই আমি পুরুষ মানুষ!

গত রাত্রি সমস্ত রাত জাগিয়া চারু ভাবিয়া রাখিয়াছিল অমলকে বিদায়কালে কি কথা বলিবে,—সহাস্য অভিমান এবং প্রফুল্ল ঔদাসীন্যের দ্বারা মাজিয়া মাজিয়া সেই কথাগুলিকে সে মনে মনে উজ্জ্বল ও শাণিত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু বিদায় দিবার সময় চারুর মুখে কোন কথাই বাহির হইল না। সে কেবল বলিল—চিঠি লিখ্‌বে ত অমল?

অমল ভূমিতে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল—চারু ছুটিয়া শয়নঘরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ভূপতি বর্দ্ধমানে গিয়া অমলের বিবাহ অন্তে তাহাকে বিলাতে রওনা করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল।

নানা দিক্ হইতে ঘা খাইয়া বিশ্বাসপরায়ণ ভূপতির মনে বহিঃসংসারের প্রতি একটা বৈরাগ্যের ভাব আসিয়াছিল। সভাসমিতি মেলা মেশা কিছুই তাহার ভাল লাগিত না। মনে হইল এই সব লইয়া আমি এতদিন কেবল নিজেকেই ফাঁকি দিলাম—জীবনের সুখের দিন বৃথা বহিয়া গেল এবং সারভাগ আবর্জ্জনা-কুণ্ডে ফেলিলাম।

ভূপতি মনে মনে কহিল—যাক্, কাগজটা গেল, ভালই হইল! মুক্তিলাভ করিলাম। সন্ধ্যার সময় আঁধারের সূত্রপাত দেখিলেই পাখী যেমন করিয়া নীড়ে ফিরিয়া আসে, ভূপতি সেইরূপ তাহার দীর্ঘদিনের সঞ্চরণক্ষেত্র

পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরে চারুর কাছে চলিয়া আসিল। মনে মনে স্থির করিল বাস্, এখন আর কোথাও নয়—এই খানেই আমার স্থিতি। যে কাগজের জাহাজটা লইয়া সমস্ত দিন খেলা করিতাম, সেটা ডুবিল, এখন ঘরে চলি।

বোধ করি ভূপতির একটা সাধারণ সংস্কার ছিল স্ত্রীর উপর অধিকার কাহাকেও অর্জ্জন করিতে হয় না; স্ত্রী ধ্রুবতারার মত নিজের আলো নিজেই জ্বালাইয়া রাখে,—হাওয়ায় নেবে না, তেলের অপেক্ষা রাখে না। বাহিরে যখন ভাঙ্গচুর আরম্ভ হইল তখন অন্তঃপুরে কোনো খিলানে ফাটল ধরিয়াছে কি না তাহা একবার পরখ করিয়া দেখার কথাও ভূপতির মনে স্থান পায় নাই।

ভূপতি সন্ধ্যার সময় বর্দ্ধমান হইতে বাড়ি ফিরিয়া আসিল। তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া সকাল সকাল খাইল। অমলের বিবাহ ও বিলাত যাত্রার আদ্যোপান্ত বিবরণ শুনিবার জন্ম স্বভাবতই চারু একান্ত উৎসুক হইয়া আছে স্থির করিয়া ভূপতি আজ কিছু মাত্র বিলম্ব করিল না। ভূপতি শোবার ঘরে বিছানায় গিয়া শুইয়া গুড়গুড়ির সুদীর্ঘ নল টানিতে লাগিল। চারু এখনো অনুপস্থিত, বোধ করি গৃহকার্য্য করিতেছে। তামাক পুড়িয়া শ্রান্ত ভূপতির ঘুম আসিতে লাগিল। ক্ষণে ক্ষণে ঘুমের ঘোর ভাঙ্গিয়া চমকিয়া জাগিয়া উঠিয়া সে ভাবিতে লাগিল এখনো চারু আসিতেছে না কেন? অবশেষে ভূপতি থাকিতে না পারিয়া চারুকে ডাকিয়া পাঠাইল। ভূপতি জিজ্ঞাসা করিল, চারু আজ যে এত দেরি করলে?

চারু তাহার জবাবদিহী না করিয়া কহিল, হাঁ, আজ দেরি হয়ে গেল!

চারুর আগ্রহপূর্ণ প্রশ্নের জন্ম ভূপতি অপেক্ষা করিয়া রহিল; চারু কোন প্রশ্ন করিল না। ইহাতে ভূপতি কিছু ক্ষুণ্ণ হইল। তবে কি চারু অমলকে ভালবাসে না? অমল যত দিন উপস্থিত ছিল তত দিন চারু তাহাকে লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিল আর যেই চলিয়া গেল অমনি তাহার সম্বন্ধে উদাসীন! এইরূপ বিসদৃশ ব্যবহারে ভূপতির মনে খট্‌কা লাগিল, সে ভাবিতে লাগিল—তবে কি চারুর হৃদয়ের গভীরতা নাই? কেবল সে আমোদ করিতেই জানে, ভাল বাসিতে পারে না? মেয়ে মানুষের পক্ষে এরূপ নিরাসক্তভাব ত ভাল নয়।

চারু ও অমলের সখিত্বে ভূপতি আনন্দ বোধ করিত। এই দুই জনের ছেলেমানুষী আড়ি ও ভাব, খেলা ও মন্ত্রণা তাহার কাছে সুমিষ্ট কৌতুকাবহ ছিল; অমলকে চারু সর্ব্বদা যে যত্ন আদর করিত তাহাতে চারুর সুকোমল হৃদয়ালুতার পরিচয় পাইয়া ভূপতি মনে মনে খুসি হইত। আজ আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে লাগিল, সে সমস্তই কি ভাসা ভাসা হৃদয়ের মধ্যে তাহার কোন ভিত্তি ছিল না? ভূপতি ভাবিল, চারুর হৃদয় যদি না থাকে তবে কোথায় ভূপতি আশ্রয় পাইবে?

অল্পে অল্পে পরীক্ষা করিবার জন্ম ভূপতি কথা পাড়িল, চারু তুমি ভাল ছিলে ত? তোমার শরীর খারাপ নেই?

চারু সংক্ষেপে উত্তর করিল, ভালই আছি।

ভূপতি। অমলের ত বিয়ে চুকে গেল।

এই বলিয়া ভূপতি চুপ করিল। চারু তৎকালোচিত একটা কোন সঙ্গত কথা বলিতে অনেক চেষ্টা করিল—কোন কথাই বাহির হইল না—সে আড়ষ্ট হইয়া শুইয়া রহিল।

ভূপতি স্বভাবতই কখনো কিছু লক্ষ্য করিয়া

দেখে না—কিন্তু অমলের বিদায়শোক তাহার নিজের মনে লাগিয়া আছে বলিয়াই চারুর ঔদাসীন্য তাহাকে আঘাত করিল। তাহার ইচ্ছা ছিল সমবেদনায় ব্যথিত চারুর সঙ্গে অমলের কথা আলোচনা করিয়া সে হৃদয়ভার লাঘব করিবে।

ভূপতি। মেয়েটিকে দেখ্‌তে বেশ। চারু ঘুমুচ্চ?

চারু কহিল—না।

ভূপতি। বেচারা অমল একলা চলে গেল! যখন তাকে গাড়িতে উঠিয়ে দিলুম, সে ছেলেমানুষের মত কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল—দেখে এই বুড়ো বয়সে আমি আর চোখের জল রাখ্‌তে পারলুম না। গাড়িতে দুজন সাহেব ছিল, পুরুষমানুষের কান্না দেখে তাদের ভারি আমোদ বোধ হল।

নির্ব্বাণদীপ শয়নঘরে বিছানার অন্ধকারের মধ্যে চারু প্রথমে পাশ ফিরিয়া শুইল, তাহার পরে হঠাৎ তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

ভূপতি চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, চারু, অসুখ করেছে?

কোন উত্তর না পাইয়া সেও উঠিল। পাশের বারান্দা হইতে চাপা কান্নার শব্দ শুনিতে পাইয়া দ্রুতপদে গিয়া দেখিল—চারু মাটিতে পড়িয়া উপুড় হইয়া কান্না রোধ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

এরূপ দুরন্ত শোকোচ্ছ্বাস দেখিয়া ভূপতি আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ভাবিল, চারুকে কি ভুল বুঝিয়াছিলাম! চারুর স্বভাব এতই চাপা যে, আমার কাছেও হৃদয়ের কোন বেদনা প্রকাশ করিতে চাহে না। যাহাদের প্রকৃতি এইরূপ তাহাদের ভালবাসা সুগভীর এবং তাহাদের বেদনাও অত্যন্ত বেশী। চারুর প্রেম সাধারণ স্ত্রীলোকদের ন্যায় বাহির হইতে তেমন পরিদৃশ্যমান নহে ভূপতি তাহা মনে মনে ঠাহর করিয়া দেখিল। ভূপতি চারুর ভালবাসার উচ্ছ্বাস কখনো দেখে নাই, আজ বিশেষ করিয়া বুঝিল তাহার কারণ অন্তরের দিকেই চারুর ভালবাসার গোপন প্রসার। ভূপতি নিজেও বাহিরে প্রকাশ করিতে অপটু; চারুর প্রকৃতিতেও হৃদয়াবেগের সুগভীর অন্তঃশীলতার পরিচয় পাইয়া সে একটা তৃপ্তি অনুভব করিল।

ভূপতি তখন চারুর পাশে বসিয়া কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। কি করিয়া সান্ত্বনা করিতে হয় ভূপতির তাহা জানা ছিল না—ইহা সে বুঝিল না, শোককে যখন কেহ অন্ধকারে কণ্ঠ চাপিয়া হত্যা করিতে চাহে তখন সাক্ষী বসিয়া থাকিলে ভাল লাগে না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

ভূপতি যখন তাহার খবরের কাগজ হইতে অবসর লইল তখন নিজের ভবিষ্যতের একটা ছবি নিজের মনের মধ্যে আঁকিয়া লইয়াছিল। প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল কোন প্রকার দুরাশা দুশ্চেষ্টায় যাইবে না, চারুকে লইয়া পড়া শুনা, ভালবাসা, এবং প্রতিদিনের ছোটখাট গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য পালন করিয়া চলিবে। মনে করিয়াছিল যে, সকল ঘোরো সুখ সব চেয়ে সুলভ অথচ সুন্দর, সর্ব্বদাই নাড়াচাড়ার যোগ্য অথচ পবিত্র নির্ম্মল, সেই সহজলভ্য সুখগুলির দ্বারা তাহার জীবনের গৃহকোণটিতে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালাইয়া নিভৃত শান্তির অবতারণা করিবে।

হাসি গল্প পরিহাস, পরস্পরের মনোরঞ্জনের জন্য প্রত্যহ ছোটখাটো আয়োজন, ইহাতে অধিক চেষ্টা আবশ্যক হয় না অথচ সুখ অপর্য্যাপ্ত হইয়া উঠে।

কার্য্যকালে দেখিল সহজ সুখ সহজ নহে। যাহা মূল্য দিয়া কিনিতে হয় না তাহা যদি আপনি হাতের কাছে না পাওয়া যায় তবে আর কোনমতেই কোথাও খুঁজিয়া পাইবার উপায় থাকে না।

ভূপতি কোনমতেই চারুর সঙ্গে বেশ করিয়া জমাইয়া লইতে পারিল না। ইহাতে সে নিজেকেই দোষ দিল। ভাবিল বারো বৎসর কেবল খবরের কাগজ লিখিয়া, স্ত্রীর সঙ্গে কি করিয়া গল্প করিতে হয় সে বিদ্যা একেবারে খোয়াইয়াছি। সন্ধ্যাদীপ জ্বালিতেই ভূপতি আগ্রহের সহিত ঘরে যায়,—সে দুই একটা কথা বলে, চারু দুই একটা কথা বলে, তার পরে কি বলিবে, ভূপতি কোনমতেই ভাবিয়া পায় না। নিজের এই অক্ষমতায় স্ত্রীর কাছে সে লজ্জা বোধ করিতে থাকে। স্ত্রীকে লইয়া গল্প করা সে এতই সহজ মনে করিয়াছিল অথচ মূঢ়ের নিকট ইহা এতই শক্ত! সভাস্থলে বক্তৃতা করা ইহার চেয়ে সহজ।

যে সন্ধ্যাবেলাকে ভূপতি হাস্যে কৌতুকে প্রণয়ে আদরে রমণীয় করিয়া কল্পনা করিয়াছিল, সেই সন্ধ্যাবেলা কাটানো তাহাদের পক্ষে সমস্যার স্বরূপ হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ চেষ্টাপূর্ণ মৌনের পর ভূপতি মনে করে উঠিয়া যাই—কিন্তু উঠিয়া গেলে চারু কি মনে করিবে এই ভাবিয়া উঠিতেও পারে না। বলে, চারু তাস্ খেল্‌বে?—চারু অন্য কোন গতি না দেখিয়া বলে, আচ্ছা! বলিয়া অনিচ্ছাক্রমে তাস পাড়িয়া আনে, নিতান্ত ভুল করিয়া অনায়াসেই হারিয়া যায়—সে খেলায় কোন সুখ থাকে না!

ভূপতি অনেক ভাবিয়া একদিন চারুকে জিজ্ঞাসা করিল—চারু মন্দাকে আনিয়ে নিলে হয় না? তুমি নিতান্ত একলা পড়েচ!

চারু মন্দার নাম শুনিয়াই জ্বলিয়া উঠিল। বলিল—না মন্দাকে আমার দরকার নেই!

ভূপতি হাসিল। মনে মনে খুসি হইল। সাধ্বীরা যেখানে সতীধর্ম্মের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখে সেখানে ধৈর্য্য রাখিতে পারে না!

বিদ্বেষের প্রথম ধাক্কা সাম্‌লাইয়া চারু ভাবিল, মন্দা থাকিলে সে হয় ত ভূপতিকে অনেকটা আমোদে রাখিতে পারিবে। ভূপতি তাহার নিকট হইতে যে মনের সুখ চায় সে তাহা কোনমতে দিতে পারিতেছে না ইহা চারু অনুভব করিয়া পীড়া বোধ করিতেছিল। ভূপতি জগৎসংসারের আর সমস্ত ছাড়িয়া একমাত্র চারুর নিকট হইতেই তাহার জীবনের সমস্ত আনন্দ আকর্ষণ করিয়া লইতে চেষ্টা করিতেছে, সেই একাগ্র চেষ্টা দেখিয়া ও নিজের অন্তরের দৈন্য উপলব্ধি করিয়া চারু ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। এমন করিয়া কতদিন কিরূপে চলিবে? ভূপতি আর কিছু অবলম্বন করে না কেন? আর একটা খবরের কাগজ চালায় না কেন? ভূপতির চিত্তরঞ্জন করিবার অভ্যাস এ পর্য্যন্ত চারুকে কখনো করিতে হয় নাই, ভূপতি তাহার কাছে কোন সেবা দাবী করে নাই, কোন সুখ প্রার্থনা করে নাই, চারুকে সে সর্ব্বতোভাবে নিজের প্রয়োজনীয় করিয়া তোলে নাই; আজ হঠাৎ তাহার জীবনের সমস্ত প্রয়োজন চারুর নিকট চাহিয়া বসাতে সে কোথাও কিছু যেন খুঁজিয়া পাইতেছে না। ভূপতির কি চাই, কি হইলে সে তৃপ্ত হয়, তাহা চারু ঠিকমত জানেনা, এবং

জানিলেও তাহা চারুর পক্ষে সহজে আয়ত্ত-গম্য নহে।

ভূপতি যদি অল্পে অল্পে অগ্রসর হইত তবে চারুর পক্ষে হয় ত এত কঠিন হইত না—কিন্তু হঠাৎ একরাত্রে দেউলিয়া হইয়া রিক্ত ভিক্ষা-পাত্র পাতিয়া বসাতে সে যেন বিব্রত হইয়াছে!

চারু কহিল—আচ্ছা, মন্দাকে আনিয়ে নাও; সে থাকলে তোমার দেখাশুনোর অনেক সুবিধে হতে পারবে!

ভূপতি হাসিয়া কহিল—আমার দেখা-শুনো! কিছু দরকার নেই।

ভূপতি ক্ষুণ্ণ হইয়া ভাবিল, আমি বড় নীরসলোক, চারুকে কিছুতেই আমি সুখী করিতে পারিতেছি না।

এই ভাবিয়া সে সাহিত্য লইয়া পড়িল। বন্ধুরা কখনো বাড়ি আসিলে বিস্মিত হইয়া দেখিত ভূপতি টেনিসন্, বাইরন্, বঙ্কিমের গল্প এই সমস্ত লইয়া আছে। ভূপতির এই অকাল কাব্যানুরাগ দেখিয়া বন্ধুবান্ধবেরা অত্যন্ত ঠাট্টা বিদ্রূপ করিতে লাগিল। ভূপতি হাসিয়া কহিল, ভাই! বাঁশের ফুলও ধরে, কিন্তু কখন্ ধরে তার ঠিক নেই!

একদিন্ সন্ধ্যাবেলায় শোবার ঘরে বড় বাতি জ্বালাইয়া ভূপতি প্রথমে লজ্জায় একটু ইতস্ততঃ করিল—পরে কহিল, একটা কিছু পড়ে" শোনাব?

চারু কহিল, শোনাও না!

ভূপতি। কি শোনাব?

চারু। তোমার যা ইচ্ছে!

ভূপতি চারুর অধিক আগ্রহ না দেখিয়া একটু দমিল। তবু সাহস করিয়া কহিল—টেনিসন্ থেকে একটা কিছু তর্জ্জমা করে তোমাকে শোনাই!

চারু কহিল, শোনাও!

সমস্তই মাটি হইল। সঙ্কোচে ও নিরুৎ-সাহে ভূপতির পড়া বাধিয়া যাইতে লাগিল, ঠিকমত বাঙ্গালা প্রতিশব্দ যোগাইল না। চারুর শূন্যদৃষ্টি দেখিয়া বোঝা গেল, সে মন দিতেছে না। সেই দীপালোকিত ছোট ঘরটি, সেই সন্ধ্যাবেলাকার নিভৃত অবকাশটুকু তেমন করিয়া ভরিয়া উঠিল না!

ভূপতি আরো দুই একবার এই ভ্রম করিয়া অবশেষে স্ত্রীর সহিত সাহিত্যচর্চ্চার চেষ্টা পরিত্যাগ করিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

যেমন গুরুতর আঘাতে স্নায়ু অবশ হইয়া যায় এবং প্রথমটা বেদনা টের পাওয়া যায় না; সেইরূপ বিচ্ছেদের আরম্ভকালে অমলের অভাব চারু ভাল করিয়া যেন উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

অবশেষে যতই দিন যাইতে লাগিল ততই অমলের অভাবে সাংসারিক শূন্যতার পরিমাপ ক্রমাগতই যেন বাড়িতে লাগিল। এই ভীষণ আবিষ্কারে চারু হতবুদ্ধি হইয়া গেছে। নিকুঞ্জবন হইতে বাহির হইয়া সে হঠাৎ এ কোন্ মরুভূমির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে—দিনের পর দিন যাইতেছে, মরুপ্রান্তর ক্রমা-গতই বাড়িয়া চলিয়াছে। এ মরুভূমির কথা সে কিছুই জানিত না!

ঘুম থেকে উঠিয়াই হঠাৎ বুকের মধ্যে ধক্ করিয়া উঠে—মনে পড়ে অমল নাই। সকালে যখন বারান্দায় পান সাজিতে বসে ক্ষণে ক্ষণে কেবলি মনে হয় অমল পশ্চাৎ হইতে আসিবে না। এক এক সময় অন্যমনস্ক হইয়া

বেশী পান সাজিয়া ফেলে, সহসা মনে পড়ে বেশী পান খাইবার লোক নাই। যখনই ভাঁড়ার ঘরে পদার্পণ করে মনে উদয় হয় অমলের জন্য জলখাবার দিতে হইবে না। মনের অধৈর্য্যে অন্তঃপুরের সীমান্তে আসিয়া মাকে স্মরণ করাইয়া দেয়, অমল কলেজ হইতে আসিবে না। কোন একটা নূতন বই, নূতন লেখা, নূতন খবর, নূতন কৌতুক প্রত্যাশা করিবার নাই, কাহারো জন্য কোন শেলাই করিবার, কোন লেখা লিখিবার, কোন সৌখীন জিনিষ কিনিয়া রাখিবার নাই।

নিজের অসহ্য কষ্টে ও চাঞ্চল্যে চারু নিজে বিস্মিত। মনোবেদনার অবিশ্রাম পীড়নে তাহার ভয় হইল। নিজে কেবলি প্রশ্ন করিতে লাগিল—কেন? এত কষ্ট কেন হইতেছে? অমল আমার এতই কি, যে, তাহার জন্য এত দুঃখ ভোগ করিব! আমার কি হইল, এতদিন পরে আমার একি হইল! দাসী চাকর, রাস্তার মুটে মজুর গুলাও নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিতেছে, আমার এমন হইল কেন? ভগবান্ হরি, আমাকে এমন বিপদে কেন ফেলিলে?

কেবলি প্রশ্ন করে, এবং আশ্চর্য্য হয় কিন্তু দুঃখের কোন উপশম হয় না। অমলের স্মৃতিতে তাহার অন্তর বাহির এমনি পরিব্যাপ্ত যে, কোথাও সে পালাইবার স্থান পায় না।

ভূপতি কোথায় অমলের স্মৃতির আক্রমণ হইতে তাহাকে রক্ষা করিবে তাহা না করিয়া সেই বিচ্ছেদব্যথিত স্নেহশীল মূঢ় কেবলই অমলের কথাই মনে করাইয়া দেয়!

অবশেষে চারু একেবারে হাল ছাড়িয়া দিল—নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করায় ক্ষান্ত হইল—হার মানিয়া নিজের অবস্থাকে অবিরোধে গ্রহণ করিল। অমলের স্মৃতিকে যত্নপূর্ব্বক হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইল।

ক্রমে এমনি হইয়া উঠিল, একাগ্রচিত্তে অমলের ধ্যান তাহার গোপন গর্ব্বের বিষয় হইল—সেই স্মৃতিই যেন তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরব!

গৃহকার্য্যের অবকাশে একটা সময় সে নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইল। সেই সময় নির্জ্জনে গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া অমলের সহিত তাহার নিজ জীবনের প্রত্যেক ঘটনা চিন্তা করিত। উপুড় হইয়া পড়িয়া বালিশের উপর মুখ রাখিয়া বারবার করিয়া বলিত, অমল, অমল, অমল! সমুদ্র পার হইয়া যেন শব্দ আসিত—বৌঠান, কি বৌঠান। চারু সিক্তচক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিত—অমল, তুমি রাগ করিয়া চলিয়া গেলে কেন? আমি ত কোন দোষ করি নাই! তুমি যদি ভাল মুখে বিদায় লইয়া যাইতে, তাহা হইলে বোধ হয় আমি এত দুঃখ পাইতাম না। অমল সম্মুখে থাকিলে যেমন কথা হইত চারু ঠিক তেমনি করিয়া কথাগুলি উচ্চারণ করিয়া বলিত। অমল, তোমাকে আমি একদিনও ভুলি নাই! এক দিনও না, এক দণ্ডও না। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পদার্থ সমস্ত তুমিই ফুটাইয়াছ, আমার জীবনের সারভাগ দিয়া প্রতিদিন তোমার পূজা করিব!

এইরূপে চারু তাহার সমস্ত ঘরকন্না তাহার সমস্ত কর্ত্তব্যের অন্তঃস্তরের তলদেশে সুরঙ্গ খনন করিয়া সেই নিরালোক নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে অশ্রুমালাসজ্জিত একটি গোপন শোকের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া রাখিল। সেখানে তাহার স্বামী বা পৃথিবীর আর কাহারও কোন অধিকার রহিল না। সেই স্থানটুকু যেমন গোপনতম, তেমনি গভীরতম। তেমনি প্রিয়তম। তাহারই দ্বারে সে সংসারের সমস্ত ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া নিজের অনাবৃত আত্মস্বরূপে প্রবেশ করে এবং সেখান

হইতে বাহির হইয়া মুখসুখানা আবার মুখে দিয়া পৃথিবীর হাস্যালাপ ও ক্রিয়াকর্ম্মের রঙ্গভূমির মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

—*—

এইরূপে মনের সহিত দ্বন্দ্ববিবাদ ত্যাগ করিয়া চারু তাহার বৃহৎ বিষাদের মধ্যে এক-প্রকার শান্তিলাভ করিল এবং একনিষ্ঠ হইয়া স্বামীকে ভক্তি ও যত্ন করিতে লাগিল। ভূপতি যখন নিদ্রিত থাকিত চারু তখন ধীরে ধীরে তাহার পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া পায়ের ধূলা সীমান্তে তুলিয়া লইত। সেবাশুশ্রূষায় গৃহকর্ম্মে স্বামীর লেশমাত্র ইচ্ছা সে অসম্পূর্ণ রাখিত না। আশ্রিত প্রতিপালিত ব্যক্তিদের প্রতি কোন প্রকার অযত্নে ভূপতি দুঃখিত হইত জানিয়া চারু তাহাদের প্রতি আতিথ্যে তিল-মাত্র ত্রুটি ঘটিতে দিত না। এইরূপে সমস্ত কাজকর্ম্ম সারিয়া ভূপতির উচ্ছিষ্ট প্রসাদ খাইয়া চারুর দিন শেষ হইয়া যাইত।

এই সেবা ও যত্নে ভগ্নশ্রী ভূপতি যেন নব-যৌবন ফিরিয়া পাইল। স্ত্রীর সহিত পূর্ব্বে যেন তাহার নব বিবাহ হয় নাই, এতদিন পরে যেন হইল। সাজ সজ্জায় হাস্যে পরিহাসে বিক-শিত হইয়া সংসারের সমস্ত দুর্ভাবনাকে ভূপতি মনের একপাশে ঠেলিয়া রাখিয়া দিল। রোগ আরামের পর যেমন ক্ষুধা বাড়িয়া উঠে; শরীরে ভোগশক্তির বিকাশকে সচেতন ভাবে অনুভব করা যায়, ভূপতির মনে এতকাল পরে সেইরূপ একটা অপূর্ব্ব এবং প্রবল ভাবাবেশের সঞ্চার হইল। বন্ধুদিগকে, এমন কি, চারুকে লুকাইয়া ভূপতি কেবল কবিতা পড়িতে লাগিল। মনে মনে কহিল, কাগজখানা গিয়া এবং অনেক দুঃখ পাইয়া এতদিন পরে আমি আমার স্ত্রীকে আবিষ্কার করিতে পারিয়াছি!

ভূপতি চারুকে বলিল, চারু তুমি আজকাল লেখা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছ কেন!

চারু বলিল ভারিত আমার লেখা!

ভূপতি। সত্যি কথা বলচি, তোমার মত অমন বাঙ্গালা এখনকার লেখকদের মধ্যে আমিত আর কারো দেখিনি! বিশ্ববন্ধুতে যা লিখেছিল আমারও ঠিক তাই মত।

চারু। আঃ থাম।

ভূপতি "এই দেখনা" বলিয়া একখণ্ড সরোরুহ বাহির করিয়া চারু ও অমলের ভাষার তুলনা করিতে আরম্ভ করিল। চারু আরক্ত-মুখে ভূপতির হাত হইতে কাগজ কাড়িয়া লইয়া অঞ্চলের মধ্যে আচ্ছাদন করিয়া রাখিল।

ভূপতি মনে মনে ভাবিল, লেখার সঙ্গী একজন না থাকিলে লেখা বাহির হয় না; রোস, আমাকে লেখাটা অভ্যাস করিতে হইবে, তাহা হইলে ক্রমে চারুরও লেখার উৎসাহ সঞ্চার করিতে পারিব।

ভূপতি অত্যন্ত গোপনে খাতা লইয়া লেখা অভ্যাস আরম্ভ করিল। অভিধান দেখিয়া পুনঃপুনঃ কাটিয়া, বার বার কাপি করিয়া ভূপতির বেকার অবস্থার দিনগুলি কাটিতে লাগিল। এত কষ্টে এত চেষ্টায় তাহাকে লিখিতে হইতেছে যে, সেই বহু দুঃখের রচনা-গুলির প্রতি ক্রমে তাহার বিশ্বাস ও মমতা জন্মিল।

অবশেষে একদিন তাহার লেখা আর একজনকে দিয়া নকল করাইয়া ভূপতি স্ত্রীকে লইয়া দিল। কহিল, আমার এক বন্ধু নতুন লিখ্‌তে আরম্ভ করেছে। আমিত কিছু বুঝিনে, তুমি একবার পড়ে দেখ দেখি তোমার কেমন লাগে।

খাতা খানা চারুর হাতে দিয়া সাধ্বসে ভূপতি বাহিরে চলিয়া গেল। সরল ভূপতির এই ছলনাটুকু চারুর বুঝিতে বাকি রহিল না।

পড়িল; লেখার ছাঁদ এবং বিষয় দেখিয়া একটুখানি হাসিল। হায়! চারু তাহার স্বামীকে ভক্তি করিবার জন্য এত আয়োজন করিতেছে সে কেন এমন ছেলেমানুষী করিয়া পূজার অর্ঘ্য ছড়াইয়া ফেলিতেছে। চারুর কাছে বাহবা আদায় করিবার জন্য তাহার এত চেষ্টা কেন! সে যদি কিছুই না করিত, চারুর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য সর্ব্বদাই তাহার যদি প্রয়াস না থাকিত তবে স্বামীর পূজা চারুর পক্ষে সহজসাধ্য হইত। চারুর একান্ত ইচ্ছা, ভূপতি কোন অংশেই নিজেকে চারুর অপেক্ষা ছোট না করিয়া ফেলে!

চারু খাতাখানা মুড়িয়া বালিশে হেলান দিয়া দূরের দিকে চাহিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতে লাগিল। অমলও তাহাকে নূতন লেখা পড়িবার জন্য আনিয়া দিত।

সন্ধ্যাবেলায় উৎসুক ভূপতি শয়নগৃহের সম্মুখবর্ত্তী বারান্দায় ফুলের টব পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত হইল, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না।

চারু আপনি বলিল, এ কি তোমার বন্ধুর প্রথম লেখা?

ভূপতি কহিল—হাঁ।

চারু। এ'ত চমৎকার হয়েছে—প্রথম লেখা বলে মনেই হয় না।

ভূপতি অত্যন্ত খুসী হইয়া ভাবিতে লাগিল, বেনামী লেখাটায় নিজের নামজারি করা যায় কি উপায়ে?

ভূপতির খাতা ভয়ঙ্কর দ্রুতগতিতে পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। নাম প্রকাশ হইতেও বিলম্ব হইল না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

—*—

বিলাত হইতে চিঠি আসিবার দিন কবে এ খবর চারু সর্ব্বদাই রাখিত। প্রথমে এডেন্ হইতে ভূপতির নামে একখানা চিঠি আসিল তাহাতে অমল বৌঠানকে প্রণাম নিবেদন করিয়াছে। সুয়েজ হইতেও ভূপতির চিঠি আসিল, বৌঠান তাহার মধ্যেও প্রণাম পাইল। মাল্টা হইতে যে চিঠি পাওয়া গেল তাহাতেও পুনশ্চ নিবেদনে বৌঠানের প্রণাম আসিল।

চারু অমলের একখানা চিঠিও পাইল না। ভূপতির চিঠিগুলি চাহিয়া লইয়া চারু উল্টিয়া পাল্টিয়া বারবার করিয়া পড়িয়া দেখিল—প্রণাম জ্ঞাপন ছাড়া আর কোথাও তাহার সম্বন্ধে আভাসমাত্রও নাই।

চারু এই কয় দিন যে একটি শান্ত বিষাদের চন্দ্রাতপচ্ছায়ার আশ্রয় লইয়াছিল অমলের এই উপেক্ষায় তাহা ছিন্ন হইয়া গেল। অন্তরের মধ্যে তাহার হৃৎপিণ্ডটা লইয়া আবার যেন ছেঁড়াছেঁড়ি আরম্ভ হইল। তাহার সংসারের কর্ত্তব্য স্থিতির মধ্যে আবার ভূমিকম্পের আন্দোলন জাগিয়া উঠিল।

এখন ভূপতি এক একদিন অর্দ্ধরাত্রে উঠিয়া দেখে চারু বিছানায় নাই। খুঁজিয়া খুঁজিয়া দেখে চারু দক্ষিণের ঘরের জানলায় বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া চারু তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলে, ঘরে আজ যে গরম, তাই একটু বাতাসে এসেছি!

ভূপতি উদ্বিগ্ন হইয়া বিছানায় পাখা টানার বন্দোবস্ত করিয়া দিল, এবং চারুর স্বাস্থ্যভঙ্গ আশঙ্কা করিয়া সর্ব্বদাই তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিল। চারু হাসিয়া বলিত, আমি বেশ আছি, তুমি কেন মিছামিছি ব্যস্ত হও?

এই হাসিটুকু ফুটাইয়া তুলিতে তাহার ক্ষের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে হইত।

অমল বিলাতে পৌঁছিল। চারু স্থির রিয়াছিল, পথে তাহাকে স্বতন্ত্র চিঠি লিখিবার থেষ্ট সুযোগ হয়ত ছিল না, বিলাতে পৌঁছিয়া মল লম্বা চিঠি লিখিবে। কিন্তু সে লম্বা চিঠি আসিল না।

প্রত্যেক মেল আসিবার দিনে চারু তাহার সমস্ত কাজকর্ম্ম কথাবার্ত্তার মধ্যে ভিতরে ভিতরে ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকিত। পাছে ভূপতি বলে তোমার নামে চিঠি নাই এই জন্য সাহস করিয়া ভূপতিকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারিত না।

এমন অবস্থায় একদিন চিঠি আসিবার দিনে ভূপতি মন্দগমনে আসিয়া মৃদুহাস্যে কহিল, একটা জিনিষ আছে দেখ্‌বে?

চারু ব্যস্ত সমস্ত চমকিত হইয়া কহিল, কই, দেখাও!

ভূপতি পরিহাসপূর্ব্বক দেখাইতে চাহিল না।

চারু অধীর হইয়া উঠিয়া ভূপতির চাদরের মধ্যে হইতে বাঞ্ছিত পদার্থ কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল। সে মনে মনে ভাবিল, সকাল হইতেই আমার মন বলিতেছে আজ আমার চিঠি আসিবেই—এ কখনও ব্যর্থ হইতে পারে না।

ভূপতির পরিহাসস্পৃহা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিল—সে চারুকে এড়াইয়া খাটের চারিদিকে ফিরিতে লাগিল।

তখন চারু একান্ত বিরক্তির সহিত খাটের উপর বসিয়া চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া তুলিল।

চারুর একান্ত আগ্রহে ভূপতি অত্যন্ত খুসি হইয়া চাদরের ভিতর হইতে নিজের রচনার খাতাখানা বাহির করিয়া তাড়াতাড়ি চারুর কোলে দিয়া কহিল—রাগ কোরো না! এই নাও!

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

—*—

অমল যদিও ভূপতিকে জানাইয়াছিল যে, পড়াশুনার তাড়ায় সে দীর্ঘকাল পত্র লিখিতে সময় পাইবে না তবু দুই এক মেল তাহার পত্র না আসাতে সমস্ত সংসার চারুর পক্ষে কণ্টক-শয্যা হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যাবেলায় পাঁচ কথার মধ্যে চারু অত্যন্ত উদাসীন ভাবে শান্তস্বরে তাহার স্বামীকে কহিল—আচ্ছা দেখ, বিলেতে একটা টেলিগ্রাফ করে জান্‌লে হয় না অমল কেমন আছে?

ভূপতি কহিল—দুইহপ্তা আগে তার চিঠি পাওয়া গেছে সে এখন পড়ায় ব্যস্ত।

চারু। ওঃ, তবে কাজ নেই। আমি ভাবছিলুম, বিদেশে আছে, যদি ব্যামোস্যামো হয়—বলাও যায় না।

ভূপতি। নাঃ তেমন কোন ব্যামো হলে খবর পাওয়া যেত। টেলিগ্রাফ করাও ত কম খরচা নয়।

চারু। তাই না কি! আমি ভেবেছিলুম বড় জোর একটাকা কি দুটাকা লাগ্‌বে।

ভূপতি। বল কি প্রায় একশো টাকার ধাক্কা!

চারু। তা'হলে ত কথাই নেই!

দিন দুয়েক পরে চারু ভূপতিকে বলিল, আমার বোন, এখন চুঁচড়োয় আছে আজ একবার তার খবর নিয়ে আসিতে পার?

ভূপতি। কেন? কোন অসুখ করেছে না কি?

চারু। না, অসুখ না, জানইত তুমি গেলে তারা কত খুসী হয়।

ভূপতি চারুর অনুরোধে গাড়ি চড়িয়া হাবড়া ষ্টেশন অভিমুখে ছুটিল। পথে একসার গরুরগাড়ি আসিয়া তাহার গাড়ি আটক করিল।

এমন সময় পরিচিত টেলিগ্রাফের হরকরা ভূপতিকে দেখিয়া তাহার হতে একখানা টেলিগ্রাফ লইয়া দিল। বিলাতের টেলিগ্রাম দেখিয়া ভূপতি ভারি ভয় পাইল। ভাবিল অমলের হয় ত অসুখ করিয়াছে। ভয়ে ভয়ে খুলিয়া দেখিল টেলিগ্রামে লেখা আছে আমি ভাল আছি!

ইহার অর্থ কি? পরীক্ষা করিয়া দেখিল, ইহা প্রী-পেড্ টেলিগ্রামের উত্তর।

হাওড়া যাওয়া হইল না। গাড়ি ফিরাইয়া ভূপতি বাড়ি আসিয়া স্ত্রীর হাতে টেলিগ্রাম দিল। ভূপতির হাতে টেলিগ্রাম দেখিয়া চারুর মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল!

ভূপতি কহিল, আমি এর মানে কিছুই বুঝতে পারচিনে। অনুসন্ধানে ভূপতি মানে বুঝিল। চারু নিজের গহনা বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার করিয়া টেলিগ্রাফ পাঠাইয়াছিল।

ভূপতি ভাবিল, এত করিবার ত দরকার ছিল না! আমাকে একটু অনুরোধ করিয়া ধরিলেই ত আমি টেলিগ্রাফ করিয়া দিতাম। চাকরকে দিয়া গোপনে বাজারে গহনা বন্ধক দিতে পাঠানো—এত ভাল হয় নাই!

থাকিয়া থাকিয়া ভূপতির মনে কেবলি এই প্রশ্ন হইতে লাগিল, চারু কেন এত বাড়াবাড়ি করিল! একটা অস্পষ্ট সন্দেহ অলক্ষ্য ভাবে তাহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। সে সন্দেহটাকে ভূপতি প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে চাহিল না, ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করিল—কিন্তু বেদনা কোন মতে ছাড়িল না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

—*—

অমলের শরীর ভাল আছে, তবু সে চিঠি লেখে না। একেবারে এমন নিদারুণ ছাড়াছাড়ি হইল কি করিয়া? একবার মুখোমুখি এই প্রশ্নটার জবাব লইয়া আসিতে ইচ্ছা হয় কিন্তু মধ্যে সমুদ্র। পার হইবার কোন পথ নাই। নিষ্ঠুর বিচ্ছেদ, নিরুপায় বিচ্ছেদ, সকল প্রশ্ন, সকল প্রতিকারের অতীত বিচ্ছেদ।

চারু আপনাকে আর খাড়া রাখিতে পারে না। কাজকর্ম্ম পড়িয়া থাকে, সকল বিষয়েই ভুল হয়, চাকর বাকর চুরি করে; লোকে তাহার দীনভাব লক্ষ্য করিয়া নানা প্রকার কাণাকাণি করিতে থাকে, কিছুতেই তা[ঁর] চেতনা মাত্র নাই।

এমনি হইল, হঠাৎ চারু চমকিয়া উঠিত, কথা কহিতে কহিতে তাহাকে কাঁদিবার জন্য উঠিয়া যাইতে হইত, অমলের নাম শুনিবামাত্র তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া যাইত।

অবশেষে ভূপতিও সমস্ত দেখিল, এবং যাহা মুহূর্ত্তের জন্য ভাবে নাই তাহাও ভাবিল —সংসার একেবারে তাহার কাছে বৃদ্ধ ও জীর্ণ হইয়া গেল।

মাঝে যে কয় দিন আনন্দের উন্মেষে ভূপতি অন্ধ হইয়াছিল সেই কয় দিনের স্মৃতি তাহাকে লজ্জা দিতে লাগিল। যে অনভিজ্ঞ বানর জহর চেনেনা তাহাকে ঝুঁটা পাথর দি[য়া] কি এমনি করিয়াই ঠকাইতে হয়!

চারুর যে সকল কথায় আদরে ব্যবহারে ভূপতি ভুলিয়াছিল সে গুলা মনে আসি[য়া]

তাহাকে "মূঢ়, মূঢ়, মূঢ়" বলিয়া বেত মারিতে লাগিল!

অবশেষে তাহার বহু কষ্টের বহু যত্নের রচনাগুলির কথা যখন মনে উদয় হইল তখন ভূপতি ধরণীকে দ্বিধা হইতে বলিল। অঙ্কুশ তাড়িতের মত চারুর কাছে দ্রুতপদে গিয়া ভূপতি কহিল—আমার সেই লেখাগুলো কোথায়?

চারু কহিল, আমার কাছেই আছে!

ভূপতি কহিল—সেগুলো দাও!

চারু তখন ভূপতির জন্য ডিমের কচুরি ভাজিতে ছিল, কহিল—তোমার কি এখনই চাই?

ভূপতি কহিল, হাঁ এখনই চাই।

চারু কড়া নামাইয়া রাখিয়া আলমারী হইতে খাতা ও কাগজগুলি বাহির করিয়া আনিল।

ভূপতি অধীরভাবে তাহার হাত হইতে সমস্ত টানিয়া লইয়া খাতাপত্র একেবারে উনানের মধ্যে ফেলিয়া দিল।

চারু ব্যস্ত হইয়া সেগুলা বাহির করিবার চেষ্টা করিয়া কহিল—একি করলে?

ভূপতি তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিল—থাক্!

চারু বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সমস্ত লেখা নিঃশেষে পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গেল।

চারু বুঝিল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। কচুরি-ভাজা অসমাপ্ত রাখিয়া ধীরে ধীরে অন্যত্র চলিয়া গেল।

চারুর সম্মুখে খাতা নষ্ট করিবার সঙ্কল্প ভূপতির ছিল না। কিন্তু ঠিক সামনেই আগুনটা জ্বলিতেছিল দেখিয়া কেমন যেন তাহার খুন চাপিয়া উঠিল। ভূপতি আত্ম-সম্বরণ করিতে না পারিয়া প্রবঞ্চিতের নির্ব্বোধের সমস্ত চেষ্টা বঞ্চনাকারিণীর সম্মুখেই আগুনে ফেলিয়া দিল।

সমস্ত ছাই হইয়া গেলে ভূপতির আকস্মিক উদ্দামতা যখন শান্ত হইয়া আসিল, তখন চারু আপন অপরাধের বোঝা বহন করিয়া যেরূপ গভীর বিষাদে নীরব নতমুখে চলিয়া গেল তাহা ভূপতির মনে জাগিয়া উঠিল—সম্মুখে চাহিয়া দেখিল ভূপতি বিশেষ করিয়া ভালবাসে বলিয়াই চারু স্বহস্তে যত্ন করিয়া খাবার তৈরি করিতেছিল।

ভূপতি বারান্দার রেলিঙের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল—তাহার জন্য চারুর এই যে সকল অশ্রান্ত চেষ্টা, এই যে সমস্ত প্রাণপণ বঞ্চনা ইহা অপেক্ষা সকরুণ ব্যাপার জগৎসংসারে আর কি আছে? এই সমস্ত বঞ্চনা, এ ত ছলনাকারিণীর হেয় ছলন মাত্র নহে; এই ছলনাগুলির জন্য ক্ষতহৃদয়ের ক্ষতযন্ত্রণা চতুর্গুণ বাড়াইয়া অভাগিনীকে এতদিন প্রতিমুহূর্ত্তে হৃৎপিণ্ড হইতে রক্ত নিষ্পেষণ করিয়া বাহির করিতে হইয়াছে। ভূপতি মনে মনে কহিল—হায় অবলা, হায় দুঃখিনী! দরকার ছিল না, আমার এ সব কিছুই দরকার ছিল না! এতকাল আমিত ভালবাসা না পাইয়াও পাই নাই বলিয়া জানিতেও পারি নাই—আমার ত কেবল প্রুফ দেখিয়া কাগজ লিখিয়াই চলিয়া গিয়াছিল—আমার জন্য এত করিবার কোন দরকার ছিল না!

তখন আপনার জীবনকে চারুর জীবন হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া,—ডাক্তার যেমন সাংঘাতিক ব্যাধিগ্রস্ত রোগীকে দেখে—ভূপতি তেমনি করিয়া নিঃসম্পর্ক লোকের মত চারুকে দূর হইতে দেখিল। ঐ একটি ক্ষীণশক্তি নারীর হৃদয় কি প্রবল সংসারের দ্বারা চারি-

দিকে আক্রান্ত হইয়াছে। এমন লোক নাই যাহার কাছে সকল কথা ব্যক্ত করিতে পারে, এমন কথা নহে যাহা ব্যক্ত করা যায়, এমন স্থান নাই যেখানে সমস্ত হৃদয় উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়া সে হাহাকার করিয়া উঠিতে পারে,—অথচ এই অপ্রকাশ্য, অপরিহার্য্য, অপ্রতিবিধেয়, প্রত্যহপুঞ্জীভূত দুঃখভার বহন করিয়া নিতান্ত সহজ লোকের মত, তাহার সুস্থচিত্ত প্রতিবেশিনীদের মত তাহাকে প্রতিদিনের গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইতেছে।

ভূপতি তাহার শয়নগৃহে গিয়া দেখিল—জানলার গরাদে ধরিয়া অশ্রুহীন অনিমেষ দৃষ্টিতে চারু বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে! ভূপতি আস্তে আস্তে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল—কিছু বলিল না—তাহার মাথার উপরে হাত রাখিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

বন্ধুরা ভূপতিকে জিজ্ঞাসা করিল—ব্যাপারখানা কি? এত ব্যস্ত কেন?

ভূপতি কহিল—খবরের কাগজ—

বন্ধু। আবার খবরের কাগজ? ভিটেমাটি খবরের কাগজে মুড়ে গঙ্গার জলে ফেল্‌তে হবে নাকি?

ভূপতি। না, আর নিজে কাগজ করচিনে।

বন্ধু। তবে?

ভূপতি। মৈশুরে একটা কাগজ বের হবে, আমাকে তার সম্পাদক করেছে।

বন্ধু। বাড়িঘর ছেড়ে একেবারে মৈশুরে যাবে? চারুকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্চ?

ভূপতি। না, মামারা এখানে এসে থাক্‌বেন।

বন্ধু। সম্পাদকী নেশা তোমার আর কিছুতেই ছুট্‌ল না।

ভূপতি। মানুষের যাহোক্ একটা কিছু নেশা চাই।

বিদায়কালে চারু জিজ্ঞাসা করিল—কবে আস্‌বে?

ভূপতি কহিল—তোমার যদি একলা বোধ হয় আমাকে লিখো আমি চলে আস্‌ব।

বলিয়া বিদায় লইয়া ভূপতি যখন দ্বারের কাছ পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিল তখন হঠাৎ চারু ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল, কহিল—আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাও! আমাকে এখানে ফেলে রেখে যেওনা!

ভূপতি থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া চারুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মুষ্টি শিথিল হইয়া ভূপতির হাত হইতে চারুর হাত খুলিয়া আসিল। ভূপতি চারুর নিকট হইতে সরিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

ভূপতি বুঝিল, অমলের বিচ্ছেদস্মৃতি যে বাড়িকে বেষ্টন করিয়া জ্বলিতেছে চারু দাবানলগ্রস্ত হরিণীর মত সে বাড়ি পরিত্যাগ করিয়া পালাইতে চায়। কিন্তু আমার কথা সে একবার ভাবিয়া দেখিল না? আমি কোথায় পালাইব? যে স্ত্রী হৃদয়ের মধ্যে নিয়ত অন্যকে ধ্যান করিতেছে, বিদেশে গিয়াও তাহাকে ভুলিতে সময় পাইবনা? নির্জ্জন বন্ধুহীন প্রবাসে প্রত্যহ তাহাকে সঙ্গদান করিতে হইবে? সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যায় যখন ঘরে ফিরিব, তখন নিস্তব্ধ শোকপরায়ণা নারীকে লইয়া সেই সন্ধ্যা কি ভয়ানক হইয়া উঠিবে! যাহার অন্তরের মধ্যে মৃতভার,

তাহাকে বক্ষের কাছে ধরিয়া রাখা সে আমি কতদিন পারিব! আরো কতবৎসর প্রত্যহ আমাকে এমনি করিয়া বাঁচিতে হইবে! যে আশ্রয় চূর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া গেছে তাহার ভাঙ্গা ইটকাটগুলা ফেলিয়া যাইতে পারিব না, কাঁধে করিয়া বহিয়া বেড়াইতে হইবে?

ভূপতি চারুকে আসিয়া কহিল—না, সে আমি পারিব না।

মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত রক্ত নামিয়া গিয়া চারুর মুখ কাগজের মত শুষ্ক শাদা হইয়া গেল, চারু মুঠা করিয়া খাট চাপিয়া ধরিল।

তৎক্ষণাৎ ভূপতি কহিল, চল, চারু আমার সঙ্গেই চল।

চারু বলিল না থাক্!

সমাপ্ত।

নাটকের পাত্রগণ।

বিক্রমদেব।	জালন্ধরের রাজা।
দেবদত্ত।	রাজার বাল্যসখা ব্রাহ্মণ।
জয়সেন। যুধাজিৎ।	রাজ্যের প্রধান নায়ক।
ত্রিবেদী।	বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।
মিহিরগুপ্ত।	জয়সেনের অমাত্য।
চন্দ্রসেন।	কাশ্মীরের রাজা।
কুমার।	কাশ্মীরের যুবরাজ। চন্দ্রসেনের ভ্রাতুষ্পুত্র।
শঙ্কর।	কুমারের পুরাতন বৃদ্ধ ভৃত্য।
অমরুরাজ।	ত্রিচূড়ের রাজা।
সুমিত্রা।	জালন্ধরের মহিষী। কুমারের ভগিনী।
নারায়ণী।	দেবদত্তের স্ত্রী।
রেবতী	চন্দ্রসেনের মহিষী।
ইলা	অমরুর কন্যা। কুমারের সহিত বিবাহপণে বদ্ধ।

রাজা ও রাণী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য

জালন্ধর। প্রাসাদের এক কক্ষ।

বিক্রমদেব ও দেবদত্ত

দেব। মহারাজ, এ কি উপদ্রব!
বিক্র। হয়েছে কি!
দেব। আমারে বরিবে না কি
পুরোহিত পদে?
কি দোষ করেছি প্রভো? কবে শুনিয়াছ
ত্রিষ্টুভ অনুষ্টুভ এই পাপমুখে?
তোমার সংসর্গে পড়ে ভুলে বসে আছি
যত যাগযজ্ঞবিধি! আমি পুরোহিত?
শ্রুতিস্মৃতি ঢাকিয়াছি বিস্মৃতির জলে।
এক বই পিতা নয় তাঁরি নাম ভুলি
দেবতা তেত্রিশ কোটি গড় করি সবে।
স্কন্ধে ঝুলে পড়ে আছে শুধু পৈতে খানা
তেজহীন ব্রহ্মণ্যের নির্ব্বিষ খোলষ!
বি। তাইত নির্ভয়ে আমি দিয়েছি তোমারে
পৌরোহিত্য ভার। শাস্ত্র নাই, মন্ত্র নাই,
নাই কোন ব্রহ্মণ্য বালাই।
দে। তুমি চাও
নখদন্তভাঙ্গা এক পোষা পুরোহিত!
বি। পুরোহিত, একেকটা ব্রহ্মদৈত্য যেন!
একেত আহার করে রাজস্কন্ধে চেপে
সুখে বার মাস, তার পরে দিন রাত
অনুষ্ঠান, উপদ্রব, নিষেধ, বিধান,
অনুযোগ—অনুস্বর বিসর্গের ঘটা—
দক্ষিণায় পূর্ণ হস্তে শূন্য আশীর্ব্বাদ!
দে। শাস্ত্রহীন ব্রাহ্মণের প্রয়োজন যদি,
আছেন ত্রিবেদী; অতিশয় সাধুলোক,
সর্ব্বদাই রয়েছেন জপমালা হাতে
ক্রিয়াকর্ম্ম নিয়ে; শুধু মন্ত্র উচ্চারণে
লেশমাত্র নাই তাঁর ক্রিয়াকর্ম্মজ্ঞান!
বি। অতি ভয়ানক! সখা, শাস্ত্র নাই যার
শাস্ত্রের উপদ্রব তার চতুর্গুণ।
নাই যার বেদবিদ্যা, ব্যাকরণ-বিধি,
নাই তার বাধাবিঘ্ন,—শুধু বুলি ছোটে
পশ্চাতে ফেলিয়া রেখে তড়িৎ প্রভায়

অমর পাণিনি! এক সঙ্গে নহি সয়
রাজা আর ব্যাকরণ দোঁহারে পীড়ন।

দে। আমি পুরোহিত? মহারাজ, এ সংবাদে
ঘন আন্দোলিত হবে কেশলেশহীন
যতেক চিক্কণ মাথা; অমঙ্গল স্মরি
রাজ্যের টিকি যত হবে কণ্টকিত!

বি। কেন অমঙ্গলশঙ্কা?

দে। কর্ম্মকাণ্ডহীন
এ দীন বিপ্রের দোষে কুলদেবতার
রোষ হুতাশন—

বি। রেখে দাও বিভীষিকা।
কুলদেবতার রোষ নতশির পাতি
সহিতে প্রস্তুত আছি;—সহেনা কেবল
কুল-পুরোহিত-আস্ফালন। জান সখা,
দীপ্ত সূর্য্য সহ্য হয় তপ্ত বালি চেয়ে!
দূর কর মিছে তর্ক যত। এস করি
কাব্য আলোচনা। কাল বলেছিলে তুমি
পুরাতন কবি বাক্য—"নাহিক বিশ্বাস
রমণীরে"—আর বার বল শুনি

দে। "শাস্ত্রং—"

বি। রক্ষা কর—ছেড়ে দাও অনুস্বর গুলো!

দে। অনুস্বর ধনুঃশর নহে, মহারাজ,
কেবল টঙ্কারমাত্র! হে বীরপুরুষ,
ভয় নাই! ভাল, আমি ভাষায় বলিব।
"যত চিন্তা কর শাস্ত্র চিন্তা আরো বাড়ে,
যত পূজা কর ভূপে, ভয় নাহি ছাড়ে।
কোলে থাকিলেও নারী রেখো সাবধানে,
শাস্ত্র নৃপ, নারী কভু বশ নাহি মানে!"

বি। বশ নাহি মানে! ধিক্ স্পর্দ্ধা, কবি তব!
চাহে কে করিতে বশ? বিদ্রোহী সে জন!
বশ করিবার নহে নৃপতি, রমণী!

দে। তা বটে! পুরুষ রবে রমণীর বশে!

বি। রমণীর হৃদয়ের রহস্য কে জানে?
বিধির বিধান সম অজ্ঞেয়—তা ব'লে
অবিশ্বাস জন্মে যদি বিধির বিধানে,
রমণীর প্রেমে,—আশ্রয় কোথায় পাবে?
নদী ধায়, বায়ু বহে কেমনে কে জানে?
সেই নদী দেশের কল্যাণ-প্রবাহিনী,
সেই বায়ু জীবের জীবন।

দে। বন্যা আনে
সেই নদী; সেই বায়ু ঝঞ্চা নিয়ে আসে।

বি। প্রাণ দেয়, মৃত্যু দেয়, লই শিরে তুলি;
তাই বলে কোন মূর্খ চাহে তাহাদের
বশ করিবারে! বদ্ধ নদী, বদ্ধ বায়ু
রোগ, শোক, মৃত্যুর নিদান। হে ব্রাহ্মণ,
নারীর কি জান তুমি?

দে। কিছু না রাজন!
ছিলাম উজ্জ্বল করে পিতৃমাতৃকুল
ভদ্র ব্রাহ্মণের ছেলে। তিনসন্ধ্যা ছিল
আহ্নিক তর্পণ;—শেষে তোমারি সংসর্গে
বিসর্জ্জন করিয়াছি সকল দেবতা
কেবল অনঙ্গদেব রয়েছেন বাকি।
ভুলেছি মাহম্মস্তব—শিখেছি গাহিতে
নারীর মহিমা; সেও বিদ্যা পুঁথিগত,
তার পরে মাঝে মাঝে চক্ষু রাঙাইলে
সে বিদ্যাও ছুটে যায় স্বপ্নের মতন!

বি। না না ভয় নাই সখা, মৌন রহিলাম;
তোমার নূতন বিদ্যা বলে যাও তুমি!

দে। শুন তবে—বলিছেন কবি ভর্ত্তৃহরি,—
"নারীর বচনে মধু, হৃদয়েতে হলাহল,
অধরে পিয়ায় সুধা, চিত্তে জ্বালে দাবানল!"

বি। সেই পুরাতন কথা!

দে। সত্য পুরাতন।
কি কহিব মহারাজ, যত পুঁথি খুলি
ওই এক কথা! যত প্রাচীন পণ্ডিত
প্রেয়সীরে ঘরে নিয়ে এক দণ্ড কভু
ছিল না সুস্থির! আমি শুধু ভাবি, যার
ঘরের ব্রাহ্মণী ফিরে পরের সন্ধানে,

সে কেমনে কাব্য লেখে ছন্দ গেঁথে গেঁথে
পরম নিশ্চিন্ত মনে ?

বি। মিথ্যা অবিশ্বাস!
ও কেবল ইচ্ছাকৃত আত্মপ্রবঞ্চনা!
ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রেম নিতান্ত বিশ্বাসে
হয়ে আসে মৃত জড়বৎ—তাই তারে
জাগায়ে তুলিতে হয় মিথ্যা অবিশ্বাসে।
হের, ওই আসিছেন মন্ত্রী! স্তূপাকার
রাজ্যভার স্কন্ধে নিয়ে! পলায়ন করি!

দে। রাণীর রাজত্বে তুমি লওগে আশ্রয়!
যাও অন্তঃপুরে! অসম্পূর্ণ রাজকার্য্য
দুয়ার বাহিরে পড়ে থাক্; স্ফীত হোক্
যত যায় দিন! তোমার দুয়ার ছাড়ি
ক্রমে উঠিবে সে, ঊর্দ্ধদিকে; দেবতার
বিচার আসন পানে!

বি। এ কি উপদেশ?

দে। না রাজন্! প্রলাপ বচন! যাও তুমি,
কাল নষ্ট হয়!

রাজার প্রস্থান

মন্ত্রীর প্রবেশ।

ম। ছিলেন না মহারাজ?

দে। করেছেন অন্তর্দ্ধান অন্তঃপুর পানে।

ম। (বসিয়া পড়িয়া)
হা বিধাতঃ, এ রাজ্যের কি দশা করিলে?
কোথা রাজা, কোথা দণ্ড, কোথা সিংহাসন!
শ্মশানভূমির মত বিষণ্ণ বিশাল
রাজ্যের বক্ষের পরে সগর্ব্বে দাঁড়ায়ে
বধির পাষাণ-রুদ্ধ অন্ধ অন্তঃপুর!
রাজশ্রী দুয়ারে বসি অনাথার বেশে
কাঁদে হাহাকার রবে!

দে। দেখে হাসি আসে।
রা করে পলায়ন—রাজ্য ধায় পিছে;—
হল ভাল মন্ত্রিবর; অহর্নিশি যেন
রাজ্য ও রাজায় মিলে লুকোচুরি খেলা!

ম। এ কি হাসিবার কথা ব্রাহ্মণ ঠাকুর?

দে। না হাসিয়া করিব কি! অরণ্যে ক্রন্দন
সে ত বালকের কাজ;—দিবস রজনী
বিলাপ না হয় সহ্য তাই মাঝে মাঝে
রোদনের পরিবর্ত্তে শুষ্ক শ্বেত হাসি
জমাট অশ্রুর মত তুষার কঠিন!
কি ঘটেছে বল শুনি!

ম। জান ত সকলি!
রাণীর কুটুম্ব যত বিদেশী কাশ্মীরী
দেশ জুড়ে বসিয়াছে; রাজার লক্ষ্মীরে
ভাগ করে লইয়াছে খণ্ড খণ্ড করি,
বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন মৃত সতী-দেহ সম।
বিদেশীর অত্যাচারে জর্জ্জর কাতর
কাঁদে প্রজা। অরাজক রাজসভামাঝে
মিলায় ক্রন্দন। বিদেশী অমাত্য যত
বসে বসে হাসে। শূন্য সিংহাসন পার্শ্বে
বিদীর্ণ-হৃদয় মন্ত্রী বসি নতশিরে!

দে। বহে ঝড়, ডোবে তরী, কাঁদে যাত্রী যত,
রিক্তহস্তে কর্ণধার উচ্চে একা বসি
বলে 'কর্ণ কোথা গেল!' মিছে খুঁজে মর,
রমণী নিয়েছে টেনে রাজকর্ণখানা,
বাহিছে প্রেমের তরী লীলা সরোবরে
বসন্ত পবনে—রাজ্যের বোঝাই নিয়ে
মন্ত্রীটা মরুক্ ডুবে অকূল পাথারে!

ম। হেসো না ঠাকুর! ছি ছি, শোকের সময়ে
হাসি অকল্যাণ!

দে। আমি বলি মন্ত্রিবর
রাজারে ডিঙায়ে, একেবারে পড় গিয়ে
রাণীর চরণে!

ম। আমি পারিব না তাহা!
আপন আত্মীয় জনে করিবে বিচার
রমণী, এমন কথা, শুনি নাই কভু!

দে। শুধু শাস্ত্র জ্ঞান মন্ত্রী! চেন না মানুষ!
বরঞ্চ আপন জনে আপনার হাতে
দণ্ড দিতে পারে নারী; পারে না সহিতে
পরের বিচার!

ম। ওই শোন কোলাহল!

দে। এ কি প্রজার বিদ্রোহ?

ম। চল, দেখে আসি।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজপথ। লোকারণ্য।

কিনু নাপিত। ওরে ভাই কান্নার দিন নয়! অনেক কেঁদেছি তাতে কিছু হল কি?

মনসুখ চাষা। ঠিক বলেছিস্‌রে, সাহসে সব কাজ হয়—ওই যে কথায় বলে "আছে যার বুকের পাটা, যম্‌রাকে সে দেখায় ঝাঁটা।"

কুঞ্জরলাল কামার। ভিক্ষে করে কিছু হবে না আমরা লুঠ কর্ব্ব।

কিনু নাপিত। ভিক্ষেং নৈম নৈমচং। কি বল খুড়ো, তুমিত স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণের ছেলে, লুঠপাটে দোষ আছে কি?

নন্দলাল। কিছু না, ক্ষিদের কাছে পাপ নেই রে বাবা। জানিস্‌ত অগ্নিকে বলে পাবক, অগ্নিতে সকল পাপ নষ্ট করে। জঠরাগ্নির বাড়া ত আর অগ্নি নেই।

অনেকে। আগুন! তা ঠিক বলেছ। বেঁচে থাক ঠাকুর! তবে তাই হবে! তা আমরা আগুনই লাগিয়ে দেব। ওরে আগুনে পাপ নেইরে। এবার ওদের বড় বড় ভিটেতে ঘুঘু চরাব!

কুঞ্জর। আমার তিনটে সড়কি আছে।

মনসুক। আমার এক গাছা লাঙ্গল আছে, এবার তাজপরা মাথা-গুলো মাটির ঢেলার মত চষে ফেল্‌ব!

শ্রীহর কলু। আমার এক গাছ বড় কুড়ুল আছে, কিন্তু পালাবার সময় সেটা বাড়িতে ফেলে এসেচি!

হরিদীন কুমোর। ওরে তোরা মর্ত্তে বসেচিস্ না কি? বলিস্ কিরে! আগে রাজাকে জানা, তার পরে যদি না শোনে তখন অন্ত পরামর্শ হবে।

কিনুনাপিত। আমিও ত সেই কথা বলি।

কুঞ্জর। আমিও ত তাই ঠাওরাচ্চি।

শ্রীহর। আমি বরাবর বলে আস্‌চি, ঐ কায়স্থের পোকে বল্‌তে দাও। আচ্ছা, দাদা, তুমি রাজাকে ভয় করবে না?

মনুরাম কায়স্থ। ভয় আমি কাউকে করিনে। তোরা লুঠ কর্ত্তে যাচ্চিস্ আর আমি দুটো কথা বল্‌তে পারিনে?

মনসুক। দাঙ্গা করা এক আর কথা বলা এক। এই ত বরাবর দেখে আস্‌চি, হাত চলে কিন্তু মুখ চলে না।

কিনু। মুখের কোন কাজটাই হয় না—অন্নও জোটে না কথাও ফোটে না।

কুঞ্জর। আচ্ছা তুমি কি বল্‌বে বল।

মনু। আমি ভয় করে বলব না; আমি প্রথমেই শাস্ত্র বল্‌ব।

শ্রীহর। বল কি? তোমার শাস্তর জানা আছে? আমি ত তাই গোড়াগুড়িই বল্‌ছিলুম কায়স্থর পোকে বল্‌তে দাও—ও জানে শোনে।

মনু। আমি প্রথমেই বল্‌ব—
অতিদর্পে হতা লঙ্কা, অতি মানে চ কৌরবঃ
অতি দানে বলির্বদ্ধঃ সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতং।

হরিদীন। হাঁ এ শাস্ত্র বটে!

কিনু। (ব্রাহ্মণের প্রতি) কেমন খুড়ো,

তুমিত ব্রাহ্মণের ছেলে, এ শাস্ত্র কি না? তুমি ত এ সমস্তই বোঝ।

নন্দ। হাঁ—তা—ইয়ে—ওর নাম কি—তা বুঝি বই কি! কিন্তু রাজা যদি না বোঝে, তুমি কি করে বুঝিয়ে দেবে বলত শুনি!

মনু। অর্থাৎ বাড়াবাড়িটে কিছু নয়।

জওহর। ঐ অত বড় কথাটার এইটুকু মানে হল?

শ্রীহর। তা না হলে আর শাস্তর কিসের?

নন্দ। চাষাভূষোর মুখে যে কথাটা ছোট্ট, বড় লোকের মুখে সেইটেই কত বড় শোনায়।

মনসুখ। কিন্তু কথাটা ভাল, "বাড়াবাড়ি কিছু নয়" শুনে রাজার চোখ ফুটবে।

জওহর। কিন্তু ঐ একটাতে হবে না আরো শাস্তর চাই।

মনু। তা আমার পুঁজি আছে আমি বলব—

"লালনে বহবো দোষা স্তাড়নে বহবো গুণাঃ
তস্মাৎ মিত্রঞ্চ পুত্রঞ্চ তাড়য়েৎ নতু লালয়েৎ।"

তা আমরা কি পুত্র নই? হে মহারাজ, আমাদের তাড়না করবে না—ঐটে ভাল নয়।

হরিদীন। এ ভাল কথা, মস্ত কথা, ঐ যে কি বল্লে ও কথাগুলো শোনাচ্চে ভাল।

শ্রীহর। কিন্তু কেবল শাস্তর বল্লেত চলবে না—আমার ঘানির কথাটা কখন্ আস্‌বে? অম্‌নি ঐ সঙ্গে যুড়ে দিলে হয় না?

নন্দ। বেটা তুমি ঘানির সঙ্গে শাস্তর জুড়বে? এ কি তোমার গরু পেয়েছ?

জওহর তাঁতি। কলুর ছেলে ওর আর কত বুদ্ধি হবে?

কুঞ্জর। দু ঘা না পিঠে পড়লে ওর শিক্ষা হবে না। কিন্তু আমার কথাটা কখন্ পাড়বে? মনে থাকবে ত? আমার নাম কুঞ্জরলাল। কাঞ্জিলাল নয়—সে আমার ভাইপো, সে বুধকোটে থাকে—সে যখন সবে তিন বছর তখন তাকে—

হরিদীন। সব বুঝলুম কিন্তু যে রকম কাল পড়েছে, রাজা যদি শাস্তর না শোনে!

কুঞ্জর। তখন আমরাও শাস্তর ছেড়ে অস্তর ধরব।

কিনু। সাবাস্ বলেছ শাস্তর ছেড়ে অস্তর।

মনসুখ। কে বল্লেহে? কথাটা কে বল্লে?

কুঞ্জর। (সগর্ব্বে) আমি বলেছি। আমার নাম কুঞ্জরলাল, কাঞ্জিলাল আমার ভাইপো।

কিনু। তা ঠিক বলেছ ভাই—শাস্তর আর অস্তর—কখন শাস্তর কখন অস্তর—আবার কখন অস্তর কখন শাস্তর।

জওহর। কিন্তু বড় গোলমাল হচ্চে। কথাটা কিসে স্থির হল বুঝ্‌তে পারছিনে। শাস্তর না অস্তর?

শ্রীহর কলু। বেটা তাঁতি কি না, এইটে আর বুঝ্‌তে পাল্লিনে? তবে এতক্ষণ ধরে কথাটা হল কি? স্থির হল যে শাস্তরের মহিমা বুঝ্‌তে ঢের দেরি হয় কিন্তু অস্তরের মহিমা খুব চট্‌পট্ বোঝা যায়।

অনেকে। (উচ্চস্বরে) তবে শাস্তর চুলোয় যাক্— অস্তর ধর।

দেবদত্তের প্রবেশ

দে। বেশী ব্যস্ত হবার দরকার করে না। চুলোতেই যাবে শীগ্‌গির। তার আয়োজন হচ্চে। বেটা তোরা কি বলছিলিরে?

শ্রীহর। আমরা ঐ ভদ্রলোকের ছেলেটির কাছে শাস্তর শুনছিলুম ঠাকুর!

দেব। এম্নি মন দিয়েই শাস্তর শোনে বটে! চীৎকারের চোটে রাজ্যের কাণে তালা ধরিয়ে দিলে। যেন ধোবাপাড়ায় আগুন লেগেছে।

কিনু। তোমার কি ঠাকুর! তুমি ত রাজ-বাড়ির সিধে খেয়ে খেয়ে কুলচ—আমাদের পেটে নাড়িগুলো জ্বলে জ্বলে মল—আমরা কি বড় সুখে চেঁচাচ্চি?

মনসুক। আজকালের দিনে আস্তে বল্লে শোনে কে? এখন চেঁচিয়ে কথা কইতে হয়।

কুঞ্জর। কান্নাকাটি ঢের হয়েছে এখন দেখ্‌চি অন্য উপায় আছে কি না।

দেব। কি বলিস্‌রে! তোদের বড় আস্পর্দ্ধা হয়েচে। তবে শুনবি? তবে বল্‌ব? "নসমানসমানসমানসমাগমমাপসমীক্ষ্য বসন্তনভ ভ্রমদভ্রমদভ্রমদ ভ্রমরচ্ছলতঃ খলু কামিজনঃ।"

হরিদীন। ও বাবা, শাপ দিচ্চে না কি?

দেব। (মনুর প্রতি) তুমি ত ভদ্র-লোকের ছেলে তুমি ত শাস্তর বোঝ—কেমন, এ ঠিক কথা কি না? "নস মানস মানস মানসং।"

মনু। আহা ঠিক। শাস্ত্র যদি চাও ত এই বটে! তা আমিও ত ঠিক ঐ কথাটাই বোঝাচ্ছিলুম।

দেব। (নন্দর প্রতি) নমস্কার! তুমি ত ব্রাহ্মণ দেখ্‌চি। কি বল ঠাকুর, পরিণামে এই সব মূর্খরা "ভ্রমদভ্রমদভ্রমৎ" হয়ে মরবে না?

নন্দ। বরাবর তাই বলচি কিন্তু বোঝে কে? ছোট লোক কিনা!

দেব। (মনসুকের প্রতি) তোমাকেই এর মধ্যে বুদ্ধিমানের মত দেখাচ্চে, আচ্ছা তুমিই বল দেখি কথাগুলো কি ভাল হচ্ছিল? (কুঞ্জরের প্রতি) আর তোমাকেও ত বেশ ভালমানুষ দেখ্‌ছি হে তোমার নাম কি?

কুঞ্জর। আমার নাম কুঞ্জরলাল—কাঞ্জি-লাল আমার ভাইপোর নাম।

দেব। ওঃ—তোমারই ভাইপোর নাম কাঞ্জিলাল বটে? তা আমি রাজার কাছে বিশেষ করে তোমাদের নাম করব।

হরিদীন। আর আমাদের কি হবে?

দেব। তা আমি বল্‌তে পারিনে বাপু। এখন ত তোরা কান্না ধরেচিস্—এই একটু আগে আর এক সুর বের করেছিলি। সে কথাগুলো কি রাজা শোনেনি? রাজা সব শুনতে পায়।

অনেকে। দোহাই ঠাকুর, আমরা কিছু বলিনি ঐ কাঞ্জুলাল না মাঞ্জুলাল অস্তরের কথা পেড়েছিল।

কুঞ্জর। চুপ কর্। আমার নাম খারাপ করিস্‌নে। আমার নাম কুঞ্জরলাল। তা মিছে কথা বল্‌ব না—আমি বল্‌ছিলুম "যেমন শাস্তর আছে তেম্‌নি অস্তরও আছে—রাজা যদি শাস্তরের দোহাই না মানে তখন অস্তর আছে।" কেমন বলেছি ঠাকুর?

দেব। ঠিক বলেচ—তোমার উপযুক্ত কথাই বলেচ। অস্ত্র কি? না, বল। তা তোমাদের বল কি? না "দুর্ব্বলস্য বলং রাজা" কি না, রাজাই দুর্ব্বলের বল। আবার "বালানাং রোদনং বলং" রাজার কাছে তোমরা বালক বই নও। অতএব এখানে কান্নাই তোমাদের অস্ত্র। অতএব শাস্তর যদি না খাটে ত তোমাদের অস্ত্র আছে কান্না। বড় বুদ্ধিমানের মত কথা বলেচ—প্রথমে আমাকেই ধাঁদা লেগে গিয়েছিল। তোমার নামটা মনে রাখ্‌তে হবে। কি হে তোমার নাম কি?

কুঞ্জর। আমার নাম কুঞ্জরলাল। কাঞ্জি-লাল আমার ভাইপো।

অন্ত সকলে। ঠাকুর, আমাদের মাপ কর, ঠাকুর মাপ কর—

দেব। আমি মাপ করবার কে? তবে দেখ, কান্নাকাটি করে দেখ, রাজা যদি মাপ করে।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

অন্তঃপুর। প্রমোদকানন।

বিক্রমদেব। সুমিত্রা।

বিক্রম। মৌন মুগ্ধ সন্ধ্যা ওই মন্দ মন্দ আসে
কুঞ্জবন মাঝে, প্রিয়তমে, লজ্জানম্র
নববধূ সম; সম্মুখে গম্ভীর নিশা
বিস্তার করিয়া অন্তহীন অন্ধকার
এ কনক-কান্তিটুকু চাহে গ্রাসিবারে।
তেমনি দাঁড়ায়ে আছি হৃদয় প্রসারি
ওই হাসি, ওই রূপ, ওই তব জ্যোতি
পান করিবারে; দিবালোক-তট হতে
এস, নেমে এস, কনক চরণ দিয়ে
এ অগাধ হৃদয়ের নিশীথ সাগরে।
কোথা ছিলে প্রিয়ে?

সুমিত্রা। নিতান্ত তোমারি আমি
সদা মনে রেখো এ বিশ্বাস। থাকি যবে
গৃহ-কাজে—জেনো, নাথ, তোমারি সে
গৃহ, তোমারি সে কাজ।

বিক্রম। থাক্ গৃহ, গৃহকাজ।
সংসারের কেহ নহ, অন্তরের তুমি;
অন্তরে তোমার গৃহ—আর গৃহ নাই—
বাহিরে কাঁদুক্ পড়ে বাহিরের কাজ!

সুমিত্রা। কেবল অন্তরে তব? নহে,নাথ, নহে
রাজন্, তোমারি আমি অন্তরে বাহিরে।
অন্তরে প্রেয়সী তব বাহিরে মহিষী।

বিক্রম। হায়, প্রিয়ে, আজ কেন স্বপ্ন মনে হ
সে সুখের দিন? সেই প্রথম মিলন;—
প্রথম প্রেমের ছটা;—দেখিতে দেখিতে
সমস্ত হৃদয়ে দেহে যৌবন-বিকাশ;—
সেই নিশি-সমাগমে দুরুদুরু হিয়া;
নয়ন-পল্লবে লজ্জা, ফুলদলপ্রান্তে
শিশির বিন্দুর মত;—অধরের হাসি
নিমেষে জাগিয়া উঠে, নিমেষে মিলায়,
সন্ধ্যার বাতাস লেগে কাতর কম্পিত
দীপশিখাসম; নয়নে-নয়নে হয়ে
ফিরে আসে আঁখি; বেধে যায় হৃদয়ের
কথা; হাসে চাঁদ কৌতুকে আকাশে; চা
নিশীথের তারা, লুকায়ে জানালা পাশে।
সেই নিশি-অবসানে আঁখি ছলছল,
সেই বিরহের ভয়ে বদ্ধ আলিঙ্গন;
তিলেক বিচ্ছেদ লাগি কাতর হৃদয়!
কোথা ছিল গৃহকাজ! কোথা ছিল, প্রিয়ে
সংসার ভাবনা!

সুমিত্রা। তখন ছিলাম শুধু
ছোট দুটি বালক বালিকা; আজ মোরা
রাজা রাণী!

বিক্রম। রাজা রাণী! কে রাজা? কে রাণী
নহি আমি রাজা! শূন্য সিংহাসন কাঁদে
জীর্ণ রাজকার্য্যরাশি চূর্ণ হয়ে যায়
তোমার চরণতলে ধূলির মাঝারে!

সুমিত্রা। শুনিয়া লজ্জায় মরি! ছিছি মহারাজ
এ কি ভালবাসা? এ যে মেঘের মতন
রেখেছে আচ্ছন্ন করে মধ্যাহ্ন আকাশে
উজ্জ্বল প্রতাপ তব! শোন প্রিয়তম,
আমার সকলি তুমি, তুমি মহারাজা,
তুমি স্বামী—আমি শুধু অনুগত ছায়া,

তার বেশী নহে;—আমারে দিওনা লাজ,
আমারে বেসো না ভাল রাজশ্রীর চেয়ে!

বিক্রম। চাহ না আমার প্রেম?

সুমিত্রা। কিছু চাই নাথ;
সব নহে। স্থান দিয়ো হৃদয়ের পাশে,
সমস্ত হৃদয় তুমি দিয়ো না আমারে।

বিক্রম। আজো রমণীর মন নারিনু বুঝিতে।

সুমিত্রা। তোমরা পুরুষ, দৃঢ় তরুর মতন
আপনি অটল রবে আপনার পরে
স্বতন্ত্র উন্নত; তবে ত আশ্রয় পাব
আমরা লতার মত তোমাদের শাখে।
তোমরা সকল মন দিয়ে ফেল যদি
কে রহিবে আমাদের ভালবাসা নিতে,
কে রহিবে বহিবারে সংসারের ভার?
তোমরা রহিবে কিছু স্নেহময়, কিছু
উদাসীন; কিছু মুক্ত, কিছু বা জড়িত;
সহস্র পাখীর গৃহ, পান্থের বিশ্রাম,
তপ্ত ধরণীর ছায়া, মেঘের বান্ধব,
ঝটিকার প্রতিদ্বন্দ্বী, লতার আশ্রয়!

বিক্রম। কথা দূর কর প্রিয়ে; হের সন্ধেবেলা
মৌন-প্রেমসুখে সুপ্ত বিহঙ্গের নীড়,
নীরব কাকলি! তবে মোরা কেন দোঁহে
কথার উপরে কথা করি বরিষণ?
অধর অধরে বসি প্রহরীর মত
চপল কথার দ্বার রাখুক্ রুধিয়া!

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চুকী। এখনি দর্শনপ্রার্থী মন্ত্রীমহাশয়,
গুরুতর রাজকার্য্য, বিলম্ব সহে না।

বিক্রম। ধিক্ তুমি! ধিক্ মন্ত্রী! ধিক্ রাজ্যকার্য্য?
রাজ্য রসাতলে যাক্ মন্ত্রী লয়ে সাথে!

কঞ্চুকীর প্রস্থান।

সুমিত্রা। যাও, নাথ, যাও!

বিক্রম। বার বার এক কথা!
নির্ম্মম, নিষ্ঠুর! কাজ, কাজ, যাও, যাও।
যেতে কি পারিনে আমি?
কে চাহে থাকিতে?
সবিনয় করপুটে কে মাগে তোমার
সযত্নে ওজন-করা বিন্দু বিন্দু কৃপা?
এখনি চলিনু।
অয়ি হৃদিলগ্ন লতা!
ক্ষম মোরে, ক্ষম অপরাধ; মোছ আঁখি,
ম্লান মুখে হাসি আন, অথবা ভ্রূকুটি;
দাও শাস্তি, কর তিরস্কার!

সুমিত্রা। মহারাজ,
এখন সময় নয়,—আসিয়োনা কাছে;
এই মুছিয়াছি অশ্রু, যাও রাজ-কাজে।

বিক্রম। হায় নারী, কি কঠিন হৃদয় তোমার!
কোন কাজ নাই প্রিয়ে, মিছে উপদ্রব!
ধান্যপূর্ণ বসুন্ধরা, প্রজা সুখে আছে,
রাজকার্য্য চলিছে অবাধে; এ কেবল
সামান্য কি বিঘ্ন নিয়ে, তুচ্ছ কথা তুলে
বিজ্ঞ বৃদ্ধ অমাত্যের অতি-সাবধান!

সুমিত্রা। ওই শোন ক্রন্দনের ধ্বনি—সকাতরে
প্রজার আহ্বান! ওরে বৎস, মাতৃহীন
ন'স্ তোরা কেহ, আমি আছি—
আমি আছি—
আমি এ রাজ্যের রাণী, জননী তোদের!

প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

—:*:—

অন্তঃপুরের কক্ষ।

সুমিত্রা।

সুমিত্রা। এখনো এল না কেন?
কোথায় ব্রাহ্মণ?
ওই ক্রমে বেড়ে ওঠে ক্রন্দনের ধ্বনি!

—০:০—

দেবদত্তের প্রবেশ।

দেব। জয় হোক্!
সুমিত্রা। ঠাকুর, কিসের কোলাহল?
দেব। শোন কেন মাতঃ!
শুনিলেই কোলাহল?
সুখে থাক, রুদ্ধ কর কাণ। অন্তঃপুরে?
সেথাও কি পশে কোলাহল? শান্তি নেই
সেখানেও? বল ত এখনি সৈন্য লয়ে
তাড়া করে নিয়ে যাই পথ হতে পথে
জীর্ণচীর ক্ষুধিত তৃষিত কোলাহল।
সুমিত্রা। বল শীঘ্র কি হয়েছে।
দেব। কিছু না—কিছু না।
শুধু ক্ষুধা, হীন ক্ষুধা, দরিদ্রের ক্ষুধা।
অভদ্র অসভ্য যত বর্ব্বরের দল
মরিছে চীৎকার করি ক্ষুধার তাড়নে
কর্কশ ভাষায়। রাজকুঞ্জে ভয়ে মৌন
কোকিল পাপিয়া যত।
সুমিত্রা। আহা, কে ক্ষুধিত?
দেব। অভাগ্যের দুরদৃষ্ট। দীন প্রজা যত
চিরদিন কেটে গেছে অর্দ্ধাশনে যার
আজো তার অনশন হল না অভ্যাস,
এমনি আশ্চর্য্য!
সুমিত্রা। হে ঠাকুর, এ কি শুনি।
ধান্যপূর্ণ বসুন্ধরা, তবু প্রজা কাঁদে
অনাহারে?
দেব। ধান্য তার বসুন্ধরা যার।
দরিদ্রের নহে বসুন্ধরা। এরা শুধু
যজ্ঞভূমে কুক্কুরের মত, লোলজিহ্বা
একপাশে পড়ে থাকে; পায় ভাগ্যক্রমে
কভু যষ্টি, উচ্ছিষ্ট কখনো। বেঁচে যায়
দয়া হয় যদি, নহে ত কাঁদিয়া ফেরে
পথপ্রান্তে মরিবার তরে।
সুমিত্রা। কি বলিলে,
রাজা কি নির্দ্দয় তবে। দেশ অরাজক।
দেব। অরাজক কে বলিবে। সহস্ররাজক।
সুমিত্রা। রাজকার্য্যে অমাত্যের দৃষ্টি নাই বুঝি।
দেব। দৃষ্টি নাই। সে কি কথা! বিলক্ষণ আছে।
গৃহপতি নিদ্রাগত. তা' বলিয়া গৃহে
চোরের কি দৃষ্টি নাই। সে যে শনিদৃষ্টি।
তাদের কি দোষ। এসেছে বিদেশ হতে
রিক্ত হস্তে, সে কি শুধু দীন প্রজাদের
আশীর্ব্বাদ করিবারে দুই হাত তুলে?
সুমিত্রা। বিদেশী? কে তোরা?
তবে আমার আত্মীয়?
দেব। রাণীর আত্মীয় তারা, প্রজার মাতুল,
যেমন মাতুল কংস মামা কালনেমী।
সুমিত্রা। জয়সেন
দেব। ব্যস্ত তিনি প্রজা সুশাসনে।
প্রবল শাসনে তাঁর সিংহগড় দেশে
যত উপসর্গ ছিল অন্নবস্ত্র আদি
সব গেছে—আছে শুধু অস্থি আর চর্ম্ম।
সুমিত্রা। শিলাদিত্য?
দেব। তাঁর দৃষ্টি বাণিজ্যের প্রতি।
বণিকের ধনভার করিয়া লাঘব
নিজস্কন্ধে করেন বহন।
সুমিত্রা। যুধাজিৎ?

ব। নিতান্তই ভদ্র লোক, অতি মিষ্টভাষী।
থাকেন বিজয়কোটে, মুখে লেগে আছে
বাপু বাছা, আড়চক্ষে চাহেন চৌদিকে,
আদরে বুলান্ হাত ধরণীর পিঠে ;
যাহা কিছু হাতে ঠেকে যত্নে লন তুলি।

মিত্র। একি লজ্জা! একি পাপ! আমার আত্মীয়!
পিতৃকুল অপযশ! ছিছি একলঙ্ক
করিব মোচন। তিলেক বিলম্ব নহে!

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

দেবদত্তের গৃহ।

নারায়ণী গৃহকার্য্যে নিযুক্ত।

দেবদত্তের প্রবেশ।

দেব। প্রিয়ে বলি ঘরে কিছু আছে কি?

নারা। তোমার থাকার মধ্যে আছি আমি। তাও না থাকুলেই আপদ চোকে!

দেব। ও আবার কি —

নারা। তুমি রাস্তা থেকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে ত রাজ্যের ভিক্ষুক যুটিয়ে আন, ঘরে ক্ষুদ্ কুড়ো আর বাকী রইল না। খেটে খেটে আমার শরীরও আর থাকে না।

দেব। আমি সাধে আনি? হাতে কাজ কলে তুমি থাক ভাল, সুতরাং আমিও ভাল থাকি। আর কিছু না হোক্ তোমার ঐ মুখখানি বন্ধ থাকে।

নারা। বটে? তা আমি এই চুপ করলুম। আমার কথা যে তোমার এত অসহ্য হয়ে উঠেছে তা কে জানৃত? তা' কে বলে আমার কথা শুনতে—

দেব। তুমিই বল, আবার কে বল্‌বে? এক কথা না শুন্‌লে দশ কথা শুনিয়ে দাও।

নারা। বটে! আমি দশ কথা শোনাই। তা আমি এই চুপ করলুম। আমি একেবারে থাম্‌লেই তুমি বাঁচ। এখন কি আর সে দিন আছে—সে দিন গেছে। এখন আবার নতুন মুখের নতুন কথা শুনতে সাধ গিয়েছে—এখন আমার কথা পুরোণো হয়ে গেছে!

দেব। বাপ্‌রে! আবার নতুন মুখের নতুন কথা! শুনলে আতঙ্ক হয়! তবু পুরোণো কথাগুলো অনেকটা অভ্যেস হয়ে এসেছে।

নারা। আচ্ছা, বেশ! এতই জ্বালাতন হয়ে থাক ত আমি এই চুপ করলুম। আমি আর একটি কথাও কব না। আগে বল্লেই হত—আমি ত জানতুম না। জান্‌লে কে তোমাকে—

দেব। আগে বলিনি? কতবার বলেছি! কৈ, কিছু হল না ত।

নারা। বটে! তা বেশ, আজ থেকে তবে এই চুপ করলুম। তুমিও সুখে থাক্‌বে, আমিও সুখে থাক্‌ব। আমি সাধে বকি? তোমার রকম দেখে—

দেব। এই বুঝি তোমার চুপ করা!

নারা। আচ্ছা। (বিমুখ)

দেব। প্রিয়ে! প্রেয়সী! মধুরভাষিণী! কোকিলগঞ্জিনী!

নারা। চুপ কর।

দেব। রাগ কোরোনা প্রিয়ে—কোকিলের মত রং বল্‌চিনে কোকিলের মত পঞ্চম স্বর।

নারা। যাও যাও বোকো না! কিন্তু তা বল্‌ছি, তুমি যদি আরো ভিখিরী জুটিয়ে আন

তা হলে হয় তাদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করব, নয় নিজে বনবাসিনী হয়ে বেরিয়ে যাব।

দেব। তা হলে আমিও তোমার পিছনে পিছনে যাব—এবং ভিক্ষুকগুলোও যাবে।

নারা। মিছে না। ঢেঁকির স্বর্গেও সুখ নেই।

নারায়ণীর প্রস্থান।

ত্রিবেদীর মালা জপিতে জপিতে প্রবেশ।

ত্রিবেদী। শিব শিব শিব। তুমি রাজ-পুরোহিত হয়েছ?

দেব। তা হয়েছি। কিন্তু রাগ কেন ঠাকুর? কোন দোষ ছিল না। মালাও জপিনে ভগবানের নামও করিনে। রাজার মর্জ্জি!

ত্রি। পিপীলিকার-পক্ষচ্ছেদ হয়েছে শ্রীহরি!

দেব। আমার প্রতি রাগ করে শব্দশাস্ত্রের প্রতি উপদ্রব কেন? পক্ষচ্ছেদ নয় পক্ষোদ্ভেদ।

ত্রি। তা ও একই কথা। ছেদ যা' ভেদও তা। কথায় বলে ছেদভেদ। হে ভব-কাণ্ডারী। যাহোক্ তোমার যতদূর বার্দ্ধক্য হবার তা হয়েছে।—

দেব। ব্রাহ্মণী সাক্ষী এখনো আমার যৌবন পেরোয়নি!

ত্রিবে। আমিও তাই বল্‌চি। যৌবনের দর্পেই তোমার এতটা বার্দ্ধক্য হয়েছে। তা তুমি মরবে। হরিহে দীনবন্ধু!

দেব। ব্রাহ্মণবাক্য মিথ্যে হবে না—তা আমি মরব। কিন্তু সে জন্যে তোমার বিশেষ আয়োজন কর্ত্তে হবে না; স্বয়ং যম রয়েছেন। ঠাকুর, তোমার চেয়ে আমার সঙ্গে যে তাঁর বেশী কুটুম্বিতে তা নয়—সকলেরই প্রতি তাঁর সমান নজর।

ত্রি। তোমার সময় নিতান্ত এগিয়ে এসেচে। দয়াময় হরি।

দেব। তা কি করে জান্‌ব? দেখেছি বটে আজ কাল মরে ঢের লোক—কেউবা গলায় দড়ি দিয়ে মরে, কেউ বা গলায় কলসী বেঁধে মরে, আবার সর্পাঘাতেও মরে কিন্তু ব্রহ্মশাপে মরে না। ব্রাহ্মণের লাঠিতে কেউ কেউ মরেছে শুনেছি কিন্তু ব্রাহ্মণের কথায় কেউ মরে না। অতএব যদি শীঘ্র না মরে উঠ্‌তে পারি ত রাগ কোরো না ঠাকুর—সে আমার দোষ নয়, সে কালের দোষ!

ত্রি। প্রণিপাত। শিব শিব শিব।

দেব। আর কিছু প্রয়োজন আছে?

ত্রি। না। কেবল এই খবরটা দিতে এলুম। দয়াময়। তা তোমার চালে যদি দু একটা বেশী কুমড়ো ফলে থাকে ত দিতে পার—আমার দরকার আছে।

দেব। এনে দিচ্চি। (প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

অন্তঃপুর। পুষ্পোদ্যান।

বিক্রমদেব। রাজমাতুল বৃদ্ধ অমাত্য।

বিক্রম। শুনোনা অলীক কথা, মিথ্যা অভিযোগ
যুধাজিৎ, জয়সেন, উদয়ভাস্কর,
সুযোগ্য সুজন। একমাত্র অপরাধ
বিদেশী তাহারা—তাই এ রাজ্যের মনে
বিদ্বেষ অনল উদ্গারিছে রুক্ষ সুরে
নিন্দা রাশি রাশি।

মাত্য। সহস্র প্রমাণ আছে,
বিচার করিয়া দেখ।

বক্রম। কি হবে প্রমাণ?
চলিছে বৃহৎ রাজ্য বিশ্বাসের বলে;
যার পরে রয়েছে যে ভার, সযতনে
তাই সে পালিছে! প্রতিদিন তাহাদের
বিচার করিতে হবে নিন্দাবাক্য শুনে,
নহে ইহা রাজকর্ম্ম। আর্য্য, যাও, ঘরে,
করিয়ো না বিশ্রামে ব্যাঘাত।

মাত্য। পাঠায়েছে
মন্ত্রী মোরে; সানুনয়ে করিছে প্রার্থনা
দর্শন তোমার, গুরু রাজকার্য্য তরে।

বক্রম। চিরকাল আছে রাজ্য,আছে রাজকার্য্য;
সুমধুর অবসর শুধু মাঝে মাঝে
দেখা দেয়, অতি ভীরু, অতি সুকুমার;
ফুটে ওঠে পুষ্পটির মত, টুটে যায়
বেলা না ফুরাতে; কে তারে ভাঙ্গিতে চাহে
অকালে চিন্তার ভারে? বিশ্রামেরে জেনো
কর্ত্তব্য কাজের অঙ্গ।

মাত্য। যাই মহারাজ! (প্রস্থান)

রাণীর আত্মীয় অমাত্যের প্রবেশ।

মাত্য। বিচারের আজ্ঞা হোক্।

বক্রম। কিসের বিচার?

মাত্য। শুনি না কি, মহারাজ, নির্দ্দোষের নামে
মিথ্যা অভিযোগ—

বক্রম। সত্য হবে। কিন্তু যতক্ষণ
বিশ্বাস রেখেছি আমি তোমাদের পরে
ততক্ষণ থাক মৌন হয়ে। এ বিশ্বাস
ভাঙ্গিবে যখন, তখন আপনি আমি
সত্য মিথ্যা করিব বিচার। যাও চলে!
অমাত্যের প্রস্থান।

বিক্রম। হায় কষ্ট মানব জীবন! পদে পদে
নিয়মের বেড়া। আপন রচিত জালে
আপনি জড়িত। অশান্ত আকাঙ্ক্ষা পাখী
মরিতেছে মাথা খুঁড়ে পঞ্জর পিঞ্জরে।
কেন এ জটিল অধীনতা? কেন এত
আত্মপীড়া? কেন এ কর্ত্তব্য কারাগার?
তুই সুখী অয়ি মাধবিকা! বসন্তের
আনন্দময়ী! শুধু প্রভাতের আলো,
নিশির শিশির, শুধু গন্ধ, শুধু মধু,
শুধু মধুপের গান—বায়ুর হিল্লোল—
স্নিগ্ধ পল্লব শয়ন,—প্রস্ফুট শোভায়
সুনীল আকাশ পানে নীরবে উত্থান,
তার পরে ধীরে ধীরে শ্যাম দূর্ব্বাদল
নীরবে পতন। নাই তর্ক, নাই বিধি,
বিনিদ্র নিশায় মর্ম্মে সংশয় দংশন,
নিরাশ্বাস প্রণয়ের নিষ্ফল আবেগ!

সুমিত্রার প্রবেশ।

এসেছ পাষাণি! দয়া হয়েছে কি মনে?
হল সারা সংসারের যত কাজ ছিল?
মনে কি পড়িল তবে অধীন এ জনে
সংসারের সব শেষে? জাননা কি, প্রিয়ে,
সকল কর্ত্তব্য চেয়ে প্রেম গুরুতর?
প্রেম এই হৃদয়ের স্বাধীন কর্ত্তব্য।

সুমি। হায়,ধিক্ মোরে! কেমনে বোঝাব, নাথ,
তোমারে যে ছেড়েযাই সে তোমারি প্রেমে।
মহারাজ, অধীনীর শোন নিবেদন—
এ রাজ্যের প্রজার জননী আমি! প্রভু,
পারিনে শুনিতে আর কাতর অভাগা
সন্তানের করুণ ক্রন্দন! রক্ষা কর
পীড়িত প্রজারে।

বিক্রম। কি করিতে চাহ রাণী?

সুমিত্রা। আমার প্রজারে যারা করিছে পীড়ন
রাজ্য হতে দূর করে দাও তাহাদের।

বিক্রম। কে তাহারা জান ?
সুমিত্রা। জানি।
বিক্রম। তোমার আত্মীয় !
সুমিত্রা। নহে মহারাজ। আমার সন্তান চেয়ে
নহে তারা অধিক আত্মীয়। এ রাজ্যের
অনাথ আতুর যত তাড়িত ক্ষুধিত
তারাই আমার আপনার। সিংহাসন
রাজচ্ছত্রচ্ছায়ে ফিরে যারা গুপ্তভাবে
শিকারসন্ধানে—তারা দস্যু, তারা চোর।
বিক্রম। যুধাজিৎ, শিলাদিত্য, জয়সেন তারা।
সুমিত্রা। এই দণ্ডে তাহাদের দাও দূর করে।
বিক্রম। আরামে রয়েছে তারা, যুদ্ধ ছাড়া কভু
নড়িবে না এক পদ।
সুমিত্রা। তবে যুদ্ধ কর।
বিক্রম। যুদ্ধ কর। হায় নারী, তুমি কি রমণী ?
ভাল, যুদ্ধে যাব আমি। কিন্তু তার আগে
তুমি মান' অধীনতা, তুমি দাও ধরা;
ধর্ম্মাধর্ম্ম, আত্মপর, সংসারের কাজ
সব ছেড়ে হও তুমি আমারি কেবল।
তবেই ফুরাবে কাজ,—তৃপ্তমন হয়ে
বাহিরিব বিশ্বরাজ্য জয় করিবারে।
অতৃপ্ত রাখিবে মোরে যতদিন তুমি
তোমার অদৃষ্ট সম রব তব সাথে।
সুমিত্রা। আজ্ঞা কর মহারাজ, মহিষী হইয়া
আপনি প্রজারে আমি করিব রক্ষণ।
(প্রস্থান)
বিক্রম। এমনি করেই মোরে করেছ বিকল।
আছ তুমি আপনার মহত্ত্ব-শিখরে
বসি একাকিনী; আমি পাইনে তোমারে!
দিবানিশি চাহি তাই! তুমি যাও কাজে,
আমি ফিরি তোমারে চাহিয়া। হায় হায়,
তোমায় আমায় কভু হবে কি মিলন ?

দেবদত্তের প্রবেশ।

দেব। জয় হোক্ মহারাণী—কোথা মহারাণী ?
একা তুমি মহারাজ ?
বিক্রম। তুমি কেন হেথা ?
ব্রাহ্মণের ষড়যন্ত্র অন্তঃপুর মাঝে ?
কে দিয়েছে মহিষীরে রাজ্যের সংবাদ ?
দেব। রাজ্যের সংবাদ রাজ্য আপনি দিয়েছে।
উচ্চস্বরে কেঁদে মরে রাজ্য উৎপীড়িত
নিতান্ত প্রাণের দায়ে—সে কি ভাবে কভু
পাছে তব বিশ্রামের হয় কোন ক্ষতি ?
ভয় নাই, মহারাজ, এসেছি, কিঞ্চিৎ
ভিক্ষা মাগিবার তরে রাণী মার কাছে।
ব্রাহ্মণী বড়ই রুক্ষ, গৃহে অন্ন নাই,
অথচ ক্ষুধার কিছু নাই অপ্রতুল। (প্রস্থান)
বিক্রম। সুখী হোক্, সুখে থাক্ এরাজ্যের সবে !
কেন দুঃখ, কেন পীড়া, কেন এ ক্রন্দন ?
অত্যাচার, উৎপীড়ন, অন্যায় বিচার,
কেন এ সকল ? কেন মানুষের পরে
মানুষের এত উপদ্রব ? দুর্ব্বলের
ক্ষুদ্র সুখ, ক্ষুদ্র শান্তিটুকু, তার পরে
সবলের শ্যেনদৃষ্টি কেন ? যাই, দেখি,
যদি কিছু খুঁজে পাই শান্তির উপায়।

সপ্তম দৃশ্য।

মন্ত্রগৃহ।

বিক্রমদেব ও মন্ত্রী।

বিক্রম। এই দণ্ডে রাজ্য হতে দাও দূর করে
যত সব বিদেশী দস্যুরে। সদা দুঃখ,
সদা ভয়, রাজ্য জুড়ে কেবল ক্রন্দন।
আর যেন একদিন না শুনিতে হয়
পীড়িত প্রজার এই নিত্য কোলাহল।

মন্ত্রী। মহারাজ, ধৈর্য্য চাই। কিছু দিন ধরে
রাজার নিয়ত-দৃষ্টি সর্ব্বত্র পড়ুক,
ভয় শোক বিশৃঙ্খলা তবে দূর হবে।
অন্ধকারে বাড়িয়াছে বহুকাল ধরে
অমঙ্গল—একদিনে কি করিবে তার ?
বিক্রম। একদিনে চাহি তারে সমূলে নাশিতে।
শত বরষের শাল যেমন সবলে
একদিনে কাঠুরিয়া করে ভূমিসাৎ।
মন্ত্রী। অস্ত্র চাই, লোক চাই—
বিক্রম। সেনাপতি কোথা ?
মন্ত্রী। সেনাপতি নিজেই বিদেশী।
বিক্রম। বিড়ম্বনা।
তবে ডেকে নিয়ে এস দীন প্রজাদের,
খাদ্য দিয়ে তাহাদের বন্ধ কর মুখ,
অর্থ দিয়ে করহ বিদায়! রাজ্য ছেড়ে
যাক্ চলে, যেথা গিয়ে সুখী হয় তারা!
(প্রস্থান।)

দেবদত্তের সহিত সুমিত্রার প্রবেশ।

সুমিত্রা। আমি এ রাজ্যের রাণী—তুমি মন্ত্রী বুঝি ?
মন্ত্রী। প্রণাম জননি! দাস আমি। কেন মাতঃ,
অন্তঃপুর ছেড়ে আজ মন্ত্রগৃহে কেন ?
সুমিত্রা। প্রজার ক্রন্দন শুনে পারিনে তিষ্টিতে
অন্তঃপুরে। এসেছি করিতে প্রতিকার!
মন্ত্রী। কি আদেশ মাতঃ ?
সুমি। বিদেশী নায়ক
এ রাজ্যে যতেক আছে করহ আহ্বান
মোর নামে ত্বরা করি।
মন্ত্রী। সহসা আহ্বানে
সংশয় জন্মিবে মনে—কেহ আসিবে না।
সুমি। মানিবে না রাণীর আদেশ ?
দেব। রাজা রাণী
ভুলে গেছে সবে। কদাচিৎ জনশ্রুতি
শোনা যায়।
সুমি। কালভৈরবের পূজোৎসবে
কর নিমন্ত্রণ। সে দিন বিচার হবে।
গর্ব্বে অন্ধ দণ্ড যদি না করে স্বীকার
সৈন্যবল কাছাকাছি রাখিয়ো প্রস্তুত!
দেব। কাহারে পাঠাবে দূত ?
মন্ত্রী। ত্রিবেদী ঠাকুরে।
নির্ব্বোধ সরল মন ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ,
তার পরে কারো আর সন্দেহ হবে না।
দেবী। ত্রিবেদী সরল ? নির্ব্বুদ্ধিই বুদ্ধি তার,
সরলতা বক্রতার নির্ভরের দণ্ড।

অষ্টম দৃশ্য।

ত্রিবেদীর কুটীর।

মন্ত্রী ও ত্রিবেদী।

মন্ত্রী। বুঝেছ ঠাকুর, এ কাজ তোমাকে ছাড়া আর কাউকে দেওয়া যায় না।

ত্রি। তা বুঝেছি। হরিহে! কিন্তু মন্ত্রী, কাজের সময় আমাকে ডাক, আর পৌরোহিত্যের বেলায় দেবদত্তর খোঁজ পড়ে।

মন্ত্রী। তুমি ত জান ঠাকুর, দেবদত্ত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, ওঁকে দিয়ে আর ত কোন কাজ হয় না! উনি কেবল মন্ত্র পড়তে আর ঘণ্টা নাড়তে পারেন।

ত্রি। কেন, আমার কি বেদের উপর কম ভক্তি ? আমি বেদ পূজো করি, তাই বেদ পাঠ করবার সুবিধে হয়ে ওঠে না। চন্দনে আর সিঁদুরে আমার বেদের একটা অক্ষরও

দেখ্‌বার যো নেই। আজিই আমি যাব! হে মধুসূদন!

মন্ত্রী। কি বল্‌বে?

ত্রি। তা আমি বল্‌ব কালভৈরবের পূজো, তাই রাজা তোমাদের নিমন্ত্রণ করেচেন—আমি খুব বড় রকম সালঙ্কার দিয়েই বল্‌ব—সব কথা এখন মনে আসচে না—পথে যেতে যেতে ভেবে নেব। হরি হে তুমিই সত্য।

মন্ত্রী। যাবার আগে একবার দেখা করে যেয়ো ঠাকুর।

(প্রস্থান)

ত্রি। আমি নির্ব্বোধ, আমি শিশু, আমি সরল, আমি তোমাদের কাজ উদ্ধার করবার গরু! পিঠে বস্তা, নাকে দড়ি, কিছু বুঝ্‌ব না শুধু ল্যাজে মোড়া খেয়ে চল্‌ব—আর সন্ধেবেলায় দুটি খানি শুক্‌নো বিচিলি খেতে দেবে! হরি হে তোমারি ইচ্ছে! দেখা যাবে কে কতখানি বোঝে! ওরে এখনো পূজোর সামগ্রী দিলিনে? বেলা যায় যে! নারায়ণ নারায়ণ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সিংহগড়। জয়সেনের প্রাসাদ।

জয়সেন, ত্রিবেদী, মিহির গুপ্ত।

ত্রি। তা বাপু, তুমি যদি চক্ষু অমন রক্তবর্ণ কর তা হলে আমার আগুবিস্মৃতি হবে। ভক্তবৎসল হরি! দেবদত্ত আর মন্ত্রী আমাকে অনেক করে শিখিয়ে দিয়েছে—কি বল্‌ছিলেম ভাল? আমাদের রাজা, কালভৈরবের পূজো নামক একটা উপলক্ষ করে—

জয়। উপলক্ষ করে?

ত্রি। হাঁ, তা নয় উপলক্ষই হল, তাতে দোষ হয়েছে কি? মধুসূদন। তা তোমার চিন্তা হতে পারে বটে। উপলক্ষ শব্দটা কিঞ্চিৎ কাঠিন্যরসাসক্ত হয়ে পড়েছে—ওর যা' যথার্থ অর্থ সেটা নিরাকার করতে অনেকেরই গোল ঠেকে দেখেছি।

জয়। তাইত ঠাকুর, ওর যথার্থ অর্থটাই ঠাওরাচ্চি!

ত্রি। রাম নাম সত্য! তা না হয় উপলক্ষ না বলে উপসর্গ বলা গেল। শব্দের অভাব কি বাপু? শাস্ত্রে বলে শব্দ ব্রহ্ম। অতএব উপলক্ষই বল আর উপসর্গই বল অর্থ সমানই রইল।

জয়। তা বটে। রাজা যে আমাদের আহ্বান করেচেন তার উপলক্ষ এবং উপসর্গ পর্য্যন্ত বোঝা গেল—কিন্তু তার যথার্থ কারণটা কি খুলে বল দেখি।

ত্রি। ঐটে বল্‌তে পার্‌লুম না বাপু—ঐটে আমায় কেউ বুঝিয়ে বলেনি। হরিহে।

জয়। ব্রাহ্মণ, তুমি বড় কঠিন স্থানে এসেছ, কথা গোপন কর ত বিপদে পড়বে।

ত্রি। হে ভগবান! বাপু দেখ বাপু তুমি রাগ কোরো না, তোমার স্বভাবটা নিতান্ত যে মধুমত্ত মধুকরের মত তা বোধ হচ্চে না।

জয়। বেশী বোকোনা, ঠাকুর, যথার্থ কারণ যা জান বলে ফেল।

ত্রি। বাসুদেব! সকল জিনিষেরই কি যথার্থ কারণ থাকে? যদি বা থাকে ত সকল লোকে কি টের পায়? যারা গোপনে পরামর্শ করেছে তারাই জানে, মন্ত্রী জানে, দেবদত্ত

জানে। তা বাপু, তুমি অধিক ভেবোনা, বোধ করি সেখেনে যাবামাত্রই যথার্থ কারণ অবিলম্বে টের পাবে।

জয়। মন্ত্রী তোমাকে আর কিছু বলেনি?

ত্রিবে। নারায়ণ, নারায়ণ। তোমার দিব্যি কিছু বলেনি। মন্ত্রী বল্লে—"ঠাকুর, যা বল্লুম, তা ছাড়া একটি কথা বোলোনা। দেখো, তোমাকে যেন একটুও সন্দেহ, না করে।" আমি বল্লুম, "হে রাম সন্দেহ কেন কর্ব্বে? তবে বলা যায় না। আমি ত সরলচিত্তে বলে যাব, যিনি সন্দগ্ধ হবেন তিনি হবেন।" হরি হে তুমিই সত্য।

জয়। পূজো উপলক্ষে নিমন্ত্রণ, এ ত সামান্য কথা,—এতে সন্দেহ হবার কি কারণ থাক্‌তে পারে?

ত্রি। তোমরা বড় লোক, তোমাদের এই রকমই হয়। নইলে "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতি" বল্‌বে কেন? যদি তোমাদের কেউ এসে বলে "আয় ত যে পাবণ্ড তোর মুণ্ডটা টান মেরে ছিঁড়ে ফেলি" অমনি তোমাদের উপলব্ধি হয় যে, আর যাই হোক্ লোকটা প্রবঞ্চনা করচে না, মুণ্ডটার উপরে বাস্তবিক তার নজর আছে বটে। কিন্তু যদি কেঁউ বলে "এস ত বাপধন, আস্তে আস্তে তোমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিই," অম্‌নি তোমাদের সন্দেহ হয়। যেন আস্ত মুণ্ডুটা ধরে টান মারার চেয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দেওয়া শক্ত কাজ। হে ভগবান্ যদি রাজা স্পষ্ট করেই বল্‌ত—একবার হাতের কাছে এস ত, তোমাদের একেকটাকে ধরে রাজ্য থেকে নির্ব্বাসন করে পাঠাই—তা হলে এটা কখনও সন্দেহ কর্ত্তে না যে, হয় ত বা রাজকন্যার সঙ্গে পরিণাম বন্ধন করবার জন্তেই রাজা ডেকে থাকবেন। কিন্তু রাজা বলেছেন নাকি হে বন্ধু সকল, "রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধব" অতএব তোমরা পূজো উপলক্ষে এখেনে এসে কিঞ্চিৎ ফলাহার করবে"—অম্‌নি তোমাদের সন্দেহ হয়েছে সে ফলাহারটা কি রকমের না জানি! হে মধুসূদন! তা এম্‌নি হয় বটে! বড় লোকের সামান্য কথায় সন্দেহ হয়, আবার সামান্য লোকের বড় কথায় সন্দেহ হয়।

জয়। ঠাকুর, তুমি অতি সরল প্রকৃতির লোক। আমার যে টুকু বা সন্দেহ ছিল, তোমার কথায় সমস্ত ভেঙ্গে গেছে।

ত্রি। তা লেহ্য কথা বলেছ। আমি তোমাদের মত বুদ্ধিমান নই—সকল কথা তলিয়ে বুঝতে পারিনে—কিন্তু, বাবা, সরল—পুরাণ সংহিতায় যাকে বলে "অন্যে পরে কা কথা" অর্থাৎ অন্যের কথা নিয়ে কখনো থাকিনে!

জয়। আর কাকে কাকে তুমি নিমন্ত্রণ কর্ত্তে বেরিয়েছ?

ত্রি। তোমাদের পোড়া নাম আমার মনে থাকে না। তোমাদের কাশ্মীরী স্বভাব যেমন তোমাদের নাম গুলোও ঠিক তেম্‌নি শ্রুতি পৌরুষ! তা এরাজ্যে তোমাদের গুষ্টির যেখেনে যে আছে সকলকেই ডাক পড়েছে। শূলপাণি! কেউ বাদ যাবে না!

জয়। যাও, ঠাকুর, এখন বিশ্রাম করগে।

ত্রি। যাহোক্, তোমার মন থেকে যে সমস্ত সন্দেহ দূর হয়েছে মন্ত্রী এ কথা শুনলে ভারী খুসী হবে। মুকুন্দ মুরহর মুরারে।

(প্রস্থান)

জয়। মিহির গুপ্ত, সমস্ত অবস্থা বুঝলে ত? এখন গৌরসেন, যুধাজিৎ, উদয়ভাস্কর ওঁদের কাছে শীঘ্র লোক পাঠাও। বল,

অবিলম্বে সকলে একত্র মিলে একটা পরামর্শ করা আবশ্যক।

মিহির। যে আজ্ঞা।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অন্তঃপুর।

বিক্রমদেব, রাণীর আত্মীয় সভাসদ।

সভাসদ। ধন্য মহারাজ।

বিক্রম। কেন এত ধন্যবাদ?

সভা। মহত্ত্বের এই ত লক্ষণ—দৃষ্টি তার
সকলের পরে। ক্ষুদ্র প্রাণ ক্ষুদ্র জনে
পায় না দেখিতে। প্রবাসে পড়িয়া আছে
সেবক যাহারা; জয়সেন, যুধাজিৎ—
মহোৎসবে তাহাদের করেছ স্মরণ।
আনন্দে বিহ্বল তারা। সত্বর আসিছে
দলবল নিয়ে।

বিক্রম। যাও, যাও। তুচ্ছ কথা,
তার লাগি এত যশোগান। জানিও সে
আহূত হয়েছে কারা পূজার উৎসবে।

সভা। রবির উদয় মাত্রে আলোকিত হয়
চরাচর, নাই চেষ্টা, নাই পরিশ্রম,
নাই তাহে ক্ষতি বৃদ্ধি তার। জানেও না
কোথা কোন্ তৃণতলে কোন বনফুল
আনন্দে ফুটিছে তার কনককিরণে।
কৃপাবৃষ্টি কর অবহেলে, যে পায় সে
ধন্য হয়।

বিক্রম। থাম, থাম, যথেষ্ট হয়েছে।
আমি যত অবহেলে কৃপাবৃষ্টি করি
তার চেয়ে অবহেলে সভাসদ্‌গণ
করে স্তুতিবৃষ্টি। বলা ত হয়েছে শেষ
যত কথা করেছ রচনা। যাও এবে।

সভাসদের প্রস্থান।

সুমিত্রার প্রবেশ।

কোথা যাও একবার ফিরে চাও রাণী।
রাজা আমি পৃথিবীর কাছে, তুমি শুধু
জান মোরে দীন বলে। ঐশ্বর্য্য আমার
বাহিরে বিস্তৃত—শুধু তোমার নিকটে
ক্ষুধার্ত্ত কঙ্কালসার কাঙাল বাসনা।
তাই কি ঘৃণার দর্পে চলে যাও দূরে
মহারাণী, রাজরাজেশ্বরী?

সুমিত্রা। মহারাজ,
যে প্রেম করিছে ভিক্ষা সমস্ত বসুধা
একা আমি সে প্রেমের যোগ্য নই কভু!

বিক্রম। অপদার্থ আমি। দীন কাপুরুষ আমি!
কর্ত্তব্যবিমুখ আমি, অন্তঃপুরচারী!
কিন্তু মহারাণী, সে কি স্বভাব আমার?
আমি ক্ষুদ্র, তুমি মহীয়সী? তুমি উচ্চে,
আমি ধূলি মাঝে? নহে তাহা। জানি আমি
আপন ক্ষমতা। রয়েছে দুর্জ্জয় শক্তি
এ হৃদয় মাঝে; প্রেমের আকারে তাহা
দিয়েছি তোমারে। বজ্রাগ্নিরে করিয়াছি
বিদ্যুতের মালা; পরায়েছি কণ্ঠে তব।

সুমিত্রা। ঘৃণা কর, মহারাজ, ঘৃণা কর মোরে
সেও ভাল—একেবারে ভুলে যাও যদি
সেও সহ্য হয়—ক্ষুদ্র এ নারীর পরে
করিও না বিসর্জন সমস্ত পৌরুষ।

বিক্রম। এত প্রেম, হায় তার এত অনাদর।
চাহ না এ প্রেম? না চাহিয়া দস্যুসম
নিতেছ কাড়িয়া।—উপেক্ষার ছুরি দিয়া
কাটিয়া তুলিছ, রক্তসিক্ত তপ্ত প্রেম
মর্ম্মবিদ্ধ করি। ধূলিতে দিতেছ ফেলি
নির্ম্মম নিষ্ঠুর। পাষাণ প্রতিমা তুমি,
যত বক্ষে চেপে ধরি অনুরাগভরে,
তত বাজে বুকে।

সুমিত্রা। চরণে পতিত দাসী।

কি করিতে চাও কর। কেন তিরস্কার?
নাথ, কেন আজি এত কঠিন বচন?
কত অপরাধ তুমি করেছ মার্জ্জনা,
কেন রোষ বিনা অপরাধে?

বিক্রম। প্রিয়তমে,
উঠ, উঠ,—এস বুকে—স্নিগ্ধ আলিঙ্গনে
এ দীপ্ত হৃদয়জ্বালা করহ নির্ব্বাণ।
কত সুধা, কত ক্ষমা ওই অশ্রুজলে,
অয়ি প্রিয়ে, কত প্রেম, কতই নির্ভর!
কোমল হৃদয়তলে তীক্ষ্ণ কথা বিঁধে
প্রেম-উৎস ছুটে—অর্জ্জুনের শরাঘাতে
মর্ম্মাহত ধরণীর ভোগবতী সম!

নেপথ্যে। মহারাণী।

সুমিত্রা। (অশ্রু মুছিয়া) দেবদত্ত। আর্য্য, কি সংবাদ?

দেবদত্তের প্রবেশ।

দেব। রাজ্যের নায়কগণ রাজনিমন্ত্রণ
করিয়াছে অবহেলা;—বিদ্রোহের তরে
হয়েছে প্রস্তুত।

সুমিত্রা। শুনিতেছ মহারাজ?

বিক্রম। দেবদত্ত, অন্তঃপুর নহে মন্ত্রগৃহ!

দেব। মহারাজ, মন্ত্রগৃহ অন্তঃপুর নহে
তাই সেথা নৃপতির পাইনে দর্শন।

সুমিত্রা। স্পর্দ্ধিত কুক্কুর যত বর্দ্ধিত হয়েছে
রাজ্যের উচ্ছিষ্ট অন্নে। রাজার বিরুদ্ধে
বিদ্রোহ করিতে চাহে। এ কি অহঙ্কার?
মহারাজ, মন্ত্রণার আছে কি সময়?
মন্ত্রণার কি আছে বিষয়। সৈন্য লয়ে
যাও অবিলম্বে, রক্তশোষী কীটদের
দলন করিয়া ফেল চরণের তলে।

বিক্রম। সেনাপতি জয়সেন,—

সুমি। নিজে যাও তুমি।

বিক্রম। আমি কি তোমার উপদ্রব, অভিশাপ,
দুরদৃষ্ট, দুঃস্বপন, কণ্ঠলগ্ন কাঁটা?
হেথা হতে একপদ নড়িব না, রাণি,
পাঠাইব সন্ধির প্রস্তাব। কে ঘটালে
এই উপদ্রব? ব্রাহ্মণে নারীতে মিলে
বিবরের সুপ্তসর্প জাগাইয়া তুলি
এ কি খেলা। আত্মরক্ষা-অসমর্থ যারা
নিশ্চিন্তে ঘটায় তারা পরের বিপদ!

সুমিত্রা। ধিক্ এ অভাগা রাজ্য, হতভাগ্য প্রজা!
ধিক্ আমি, এ রাজ্যের রাণী!

(প্রস্থান)

বিক্রম। দেবদত্ত
বন্ধুত্বের এই পুরস্কার? বৃথা আশা!
রাজার অদৃষ্টে বিধি লেখেনি প্রণয়;
ছায়াহীন সঙ্গীহীন পর্ব্বতের মত
একা মহাশূন্য মাঝে দগ্ধ উচ্চ শিরে
প্রেমহীন নীরস মহিমা; ঝঞ্ঝাবায়ু
করে আক্রমণ, বজ্র এসে বিঁধে, সূর্য্য
রক্তনেত্রে চাহে; ধরণী পড়িয়া থাকে
চরণ ধরিয়া! কিন্তু ভালবাসা কোথা
রাজার হৃদয় সেও হৃদয়ের তরে
কাঁদে; হায় বন্ধু, মানব জীবন লয়ে
রাজত্বের ভাণ করা শুধু বিড়ম্বনা!
দম্ভ-উচ্চ সিংহাসন চূর্ণ হয়ে গিয়ে
ধরা সাথে হোক্ সমতল; একবার
হৃদয়ের কাছাকাছি পাই তোমাদের!
বাল্যসখা, রাজা বলে ভুলে যাও মোরে,
একবার ভাল করে কর অনুভব
বান্ধব-হৃদয়-ব্যথা বান্ধব হৃদয়ে।

দেব। সখা, এ হৃদয় মোর জানিয়ো তোমা
কেবল প্রণয় নয়, অপ্রণয় তব
সেও আমি স'ব অকাতরে; রোষানল
লব বক্ষ পাতি,—যেমন অগাধ সিন্ধু
আকাশের বজ্র লয় বুকে।

বিক্র। দেবদত্ত,
সুখনীড় মাঝে কেন হানিছ বিরহ ?
সুখস্বর্গ মাঝে কেন আনিছ বহিয়া
হাহাধ্বনি ?

দেব। সখা, ঘরে আগুন লেগেছে
আমি শুধু এনেছি সংবাদ! সুখনিদ্রা
দিয়েছি ভাঙ্গায়ে!

বিক্র। এর চেয়ে সুখস্বপ্নে
মৃত্যু ছিল ভাল!

দেব। ধিক্ লজ্জা, মহারাজ,
রাজ্যের মৃত্যুর চেয়ে তুচ্ছ স্বপ্নসুখ
বেশী হল ?

বি। যোগাসনে লীন যোগীবর
তার কাছে কোথা আছে বিশ্বের প্রলয় ?
স্বপ্ন এ সংসার! অর্দ্ধশত বর্ষ পরে
আজিকার সুখ দুঃখ কার মনে রবে ?
যাও যাও, দেবদত্ত, যেথা ইচ্ছা তব!
আপন সান্ত্বনা আছে আপনার কাছে।
দেখে আসি স্বপ্নাভরে কোথা গেল রাণী!
(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

মন্দির।

পুরুষ বেশে রাণী সুমিত্রা।

সুমিত্রা। জগৎ-জননী মাতা, দুর্ব্বল হৃদয়
তনয়ারে করিয়ো মার্জ্জনা! আজ সব
পূজা ব্যর্থ হল,—শুধু সে সুন্দর মুখ
পড়ে মনে, সেই প্রেমপূর্ণ চক্ষু দুটি,
সেই শয্যাপরে একা সুপ্ত মহারাজ!
হায় মা, নারীর প্রাণ এত কি কঠিন ?
দক্ষালয়ে তুই যবে গিয়েছিলি, সতি,
প্রতিপদে আপন হৃদয়খানি তোর
আপন চরণ দুটি জড়ায়ে কাতরে
বলে নি কি ফিরে যেতে পতিগৃহ পানে ?
সেই কৈলাসের পথে আর ফিরিল না
ও রাঙা চরণ। মাগো, সে দিনের কথা
দেখ্ মনে করে। জননি, এসেছি আমি
রমণীহৃদয় বলি দিতে, রমণীর
ভালবাসা, ছিন্ন শতদল সম, দিতে
পদতলে। নারী তুমি, নারীর হৃদয়
জান তুমি; বল দাও জননী আমারে!
থেকে থেকে ওই শুনি রাজগৃহ হতে
"ফিরে এস, ফিরে এস রাণী" প্রেমপূর্ণ
পুরাতন সেই কণ্ঠস্বর। খড়্গ নিয়ে
তুমি এস, দাঁড়াও রুধিয়া পথ, বল,
"তুমি যাও, রাজধর্ম্ম উঠুক্ জাগিয়া,
ধন্য হোক্ রাজা, প্রজা হোক্ সুখী,রাজ্যে
ফিরে আসুক্ কল্যাণ. দূর হোক্ যত
অত্যাচার, ভূপতির যশোরাশি হতে
ঘুচে যাক্ কলঙ্ককালিমা। তুমি নারী
ধরাপ্রান্তে যেথা স্থান পাও—একাকিনী
বসে বসে, নিজ দুঃখে মর বুক ফেটে।"
পিতৃসত্য পালনের তরে, রামচন্দ্র
গিয়েছেন বনে, পতিসত্য পালনের
লাগি আমি যাব। যে সত্যে আছেন বাঁধা
মহারাজ রাজ্যলক্ষ্মী কাছে—কভু তাহা
সামান্য নারীর তরে ব্যর্থ হইবে না।
(প্রস্থান।)

ত্রিবেদীর প্রবেশ।

হে হরি, কি দেখ্লুম! পুরুষমূর্ত্তি ধরে রাণী সুমিত্রা ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন। মন্দিরে দেবপূজোর ছলে এসে রাজ্য ছেড়ে পালিয়েছেন। আমাকে দেখে বড় খুসী! খাঁ-

সূদন। ভাব্‌লে ব্রাহ্মণ বড় সরল হৃদয়, মাথার তেলোয় যেমন একগাছি চুল দেখা যায় না, তলায় তেমনি বুদ্ধির লেশমাত্র নাই—একে দিয়ে একটা কাজ করিয়ে নেওয়া যাক্‌। এর মুখ দিয়ে রাজাকে দুটো মিষ্টি কথা পাঠিয়ে দেওয়া যাক্‌। বাবা, তোমরা বেঁচে থাক। যখনি তোমাদের কিছু দরকার পড়বে বুড়ো ত্রিবেদীকে ডেকো, আর দান-দক্ষিণের বেলায় দেবদত্ত আছেন। দয়াময়। তা' বল্‌ব। খুব মিষ্টি মিষ্টি করেই বল্‌ব। আমার মুখে মিষ্টি কথা আরো বেশী মিষ্টি হয়ে ওঠে। কমল-লোচন। রাজা কি খুসীই হবে। কথাগুলো যত বড় বড় করে বল্‌ব রাজার মুখের হাঁ তত বেড়ে যাবে। দেখেছি, আমার মুখে বড় কথা-গুলো শোনায় ভাল—লোকের বিশেষ আমোদ বোধ হয়। বলে, ব্রাহ্মণ বড় সরল। পতিত-পাবন। এবারে কতটা আমোদ হবে বল্‌তে পারিনে। কিন্তু শত্রুশাস্ত্র একেবারে উলোট পালট করে দেব। আঃ কি দুর্য্যোগ। আজ সমস্ত দিন দেবপূজো হয় নি, এই বার একটু পূজো অর্চ্চনায় মন দেওয়া যাক্‌। দীনবন্ধু, ভক্তবৎসল।

(প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য।

প্রাসাদ।

বিক্রমদেব, মন্ত্রী ও দেবদত্ত।

বিক্রম। পলায়ন! রাজ্য ছেড়ে পলায়ন। এ রাজ্যেতে
যত সৈন্য যত দুর্গ, যত কারাগার,
যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে
পারে না কি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ় বলে
ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয়? এই রাজা?
এই কি মহিমা তার? বৃহৎ প্রতাপ,
লোকবল অর্থবল নিয়ে, পড়ে থাকে
শূন্য স্বর্ণপিঞ্জরের মত, ক্ষুদ্র পাখী
উড়ে চলে যায়।

মন্ত্রী। হায় হায়, মহারাজ,
লোকনিন্দা, ভগ্নবাঁধ জলস্রোত সম,
ছুটে চারিদিক্‌ হতে।

বিক্রম। চুপ কর মন্ত্রী।
লোকনিন্দা, লোকনিন্দা সদা! নিন্দাভারে
রসনা খসিয়া যাক্‌ অলস লোকের!
দিবা যদি গেল, উঠুক্‌ না চুপি চুপি
ক্ষুদ্র পঙ্ককুণ্ড হতে, দুষ্ট বাষ্পরাশি;
আমার আঁধার তাহে বাড়িবে না কিছু।
লোকনিন্দা।

দেব। মন্ত্রি, পরিপূর্ণ সূর্য্যপানে
কে পারে তাকাতে? তাই গ্রহণের বেলা
ছুটে আসে যত মর্ত্ত্যলোক, দীননেত্রে
চেয়ে দেখে দুর্দ্দিনের দিনপতি পানে;
আপনার কালিমাখা কাচখণ্ড দিয়ে
কালো দেখে গগনের আলো। মহারাণী
মা জননী, এই ছিল অদৃষ্টে তোমার?
তব নাম ধূলায় লুটায়? তব নাম
ফিরে মুখে মুখে? একি এ দুর্দ্দিন আজি?
তবু তুমি তেজস্বিনী সতী? এরা সব
পথের কাঙ্গাল।

বি। ত্রিবেদী কোথায় গেল?
মন্ত্রী, ডেকে আন তারে। শোনা হয় নাই
তার সব কথা; ছিনু অন্য মনে।

মন্ত্রী। যাই
ডেকে আনি তাঁরে। (প্রস্থান)

বিক্রম। এখনো সময় আছে;
এখনো ফিরাতে পারি পাইলে সন্ধান।

যাবার সন্ধান? এমনি কি চিরদিন
কাটিবে জীবন? সে দিবে না ধরা, আমি
ফিরিব পশ্চাতে? প্রেমের শৃঙ্খল হাতে
রাজ্য কাজকর্ম্ম ফেলে শুধু রমণীর
পলাতক হৃদয়ের সন্ধানে ফিরিব?
পলাও, পলাও নারী, চির দিনরাত
কর পলায়ন; গৃহহীন, প্রেমহীন,
বিশ্রাম বিহীন, অনাবৃত পৃথ্বি মাঝে
কেবল পশ্চাতে লয়ে আপনার ছায়া!

ত্রিবেদীর প্রবেশ।

চলে যাও, দূর হও, কে ডাকে তোমারে?
বারবার তার কথা কে চাহে শুনিতে
প্রগল্‌ভ ব্রাহ্মণ মূর্খ?

ত্রি। হে মধুসূদন।
(প্রস্থানোদ্যম)

বিক্রম। শোন, শোন, দুটো কথা শুধাবার
আছে।
চোখে অশ্রু ছিল?

ত্রি। চিন্তা নেই বাপু। অশ্রু
দেখি নাই।

বিক্রম। মিথ্যা করে বল। অতিক্ষুদ্র
সকরুণ দুটি মিথ্যে কথা। হে ব্রাহ্মণ।
বৃদ্ধ তুমি ক্ষীণদৃষ্টি, কি করে জানিলে
চোখে তার অশ্রু ছিল কি না? বেশী নয়
একবিন্দু জল। নহে ত নয়ন-প্রান্তে
ছলছল ভাব; কম্পিত কাতর কণ্ঠে
অশ্রুবদ্ধ বাণী! তাও নয়? সত্য বল
মিথ্যা বল! বোলোনা বোলোনা চলে যাও।

ত্রিবেদী। হরি হে তুমিই সত্য! (প্রস্থান)

বিক্রম। অন্তর্য্যামী দেব,
তারে ভালবাসা; পুণ্য গেল, স্বর্গ গেল,
রাজ্য যায়, অবশেষে সেও চলে গেল।
তবে দাও ফিরে দাও ক্ষাত্রধর্ম্ম মোর;
রাজধর্ম্ম ফিরে দাও; পুরুষ হৃদয়
মুক্ত করে দাও এই বিশ্বরঙ্গ মাঝে।
কোথা কর্ম্মক্ষেত্র। কোথা জনস্রোত! কোথা
জীবন মরণ! কোথা সেই মানবের
অবিশ্রাম সুখ দুঃখ, বিপদ সম্পদ,
তরঙ্গ উচ্ছ্বাস?—

মন্ত্রীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। মহারাজ, অশ্বারোহী
পাঠায়েছি চারিদিক রাজ্ঞীর সন্ধানে!

বিক্রম। ফিরাও, ফিরাও মন্ত্রী! স্বপ্ন ছুটে গেছে,
অশ্বারোহী কোথা তারে পাইবে খুঁজিয়া!
সৈন্যদল করহ প্রস্তুত? যুদ্ধে যাব,
নাশিব বিদ্রোহ!

মন্ত্রী। যে আদেশ মহারাজ। (প্রস্থান)

বিক্র। দেবদত্ত, কেন নত মুখ, ম্লান দৃষ্টি?
ক্ষুদ্র সান্ত্বনার কথা বোলোনা ব্রাহ্মণ!
আমারে পশ্চাতে ফেলে চলে গেছে চোর,
আপনারে পেয়েছি কুড়ায়ে! আজি, সখা,
আনন্দের দিন! এস আলিঙ্গন পাশে।
(আলিঙ্গন করিয়া) বন্ধু, বন্ধু, মিথ্যা কথা,
মিথ্যা এই ভাণ।
থেকে থেকে বজ্রশেল ছুটিছে বিঁধিছে
মর্ম্মে। এস, এস, একবার অশ্রুজল
ফেলি, বন্ধুর হৃদয়ে। মেঘ যাক্ কেটে।

তৃতীয় অঙ্ক।

—*—

প্রথম দৃশ্য।

—*—

কাশ্মীর। প্রাসাদ সম্মুখে রাজপথ।

দ্বারে শঙ্কর।

শঙ্কর। এতটুকু ছিল, আমার কোলে খেলা করত। যখন কেবল চারটি দাঁত উঠেছে তখন সে আমাকে সঙ্কল দাদা বলত। এখন বড় হয়ে উঠেছে এখন সঙ্কল দাদার কোলে আর ধরে না, এখন সিংহাসন চাই। স্বর্গীয় মহারাজ মরবার সময় তোদের দুটি ভাই বোনকে আমার কোলে দিয়ে গিয়েছিল। বোনটিত দুদিন বাদে স্বামীর কোলে গেল। মনে করেছিলুম কুমারসেনকে আমার কোলে থেকে একেবারে সিংহাসনে উঠিয়ে দেব। কিন্তু খুড়ো মহারাজ আর সিংহাসন থেকে নাবেন না। শুভলগ্ন কতবার হল, কিন্তু আজ কাল করে আর সময় হল না। কত ওজর কত আপত্তি! আরে ভাই সঙ্কলের কোল এক, আর সিংহাসন এক। বুড়ো হয়ে গেলুম—তোকে কি আর রাজাসনে দেখে যেতে পারব?

দুইজন সৈনিকের প্রবেশ।

১। আমাদের যুবরাজ কবে রাজা হবেরে ভাই? সে দিন আমি তোদের সকলকে মহুয়া খাওয়াব।

২। আরে,তুই ত মহুয়া খাওয়াবি—আমি জান্ দেব, আমি লড়াই করে করে বেড়াব, আমি পাঁচটা গাঁ লুঠ করে আন্‌ব। আমি আমার মহাজন বেটার মাথা ভেঙ্গে দেব।

বলিস্ ত, আমি খুসী হয়ে যুবরাজের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অম্‌নি মরে পড়ে যাব।

১। তা কি আমি পারিনে? মরবার কথা কি বলিস। আমার যদি শওয়া শ বরষ পরমায়ু থাকে আমি যুবরাজের জন্য রোজ নিয়মিত দু সন্ধে দুবার করে মর্ত্তে পারি। তা ছাড়া উপরি আছে।

২। ওরে যুবরাজ ত আমাদেরই—স্বর্গীয় মহারাজ তাকে আমাদেরই হাতে দিয়ে গেছেন। আমরা তাকে কাঁধে করে, ঢাক বাজিয়ে রাজা করে দেব। তা, কাউকে ভয় করব না,—

১। খুড়ো মহারাজকে গিয়ে বলব, তুমি নেমে এস; আমরা আমাদের রাজপুত্তুরকে সিংহাসনে চড়িয়ে আনন্দ কর্ত্তে চাই।

২। শুনেছিস পূর্ণিমা তিথিতে যুবরাজের বিয়ে।

১। সে ত আজ পাঁচ বৎসর ধরে শুনে আস্‌চি।

২। এইবার পাঁচ বৎসর পূর্ণ হয়ে গেছে। ত্রিচূড়ের রাজবংশে নিয়ম চলে আস্‌চে যে, পাঁচ বৎসর রাজকন্যার অধীন হয়ে থাকৃতে হবে। তার পর তার হুকুম হলে বিয়ে হবে।

১। বাবা, এ আবার কি নিয়ম। আমরা ক্ষত্রিয়, আমাদের চিরকাল চলে আস্‌চে শ্বশুরের গালে চড় মেরে মেয়েটার ঝুঁটি ধরে টেনে নিয়ে আসি—ঘণ্টা দুয়ের মধ্যে সমস্ত পরিষ্কা হয়ে যায়—তার পরে আবার দশটা বিয়ে কর বার ফুরসৎ পাওয়া যায়!

২। যোধমল, সে দিন কি করবি ব দেখি?

১। সে দিন আমিও আরেকটা বিয়ে ক ফেল্‌ব।

২। সাবাস্ বলেছিস্ রে ভাই!

১। মহিচাঁদের মেয়ে! খাসা দেখতে ভাই! কি চোখ্ রে। সে দিন বিতস্তায় জল আনতে যাচ্ছিল, দুটো কথা বল্‌তে গেলুম কঙ্কণ তুলে মারতে এল। দেখ্‌লুম চোখের চেয়ে তার কঙ্কণ ভয়ানক। চট্‌পট্ সরে পড়তে হল।

গান।

খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

ঐ আঁখিরে।
ফিরে ফিরে চেয়োনা চেয়োনা, ফিরে যাও
কি আর রেখেছ বাকি রে!
মরমে কেটেছ সিঁধ, নয়নের কেড়েছ নীদ্
কি সুখে পরাণ আর রাখিবে!

২। সাবাস্ ভাই!

১। ঐ দেখ শঙ্কর দাদা। যুবরাজ এখেনে নেই—তবু বুড়ো সাজসজ্জা করে সেই দুয়োরে বসে আছে। পৃথিবী যদি উলট্‌পালট্ হয়ে যায় তবু বুড়োর নিয়মের ত্রুটি হবে না।

১। আয় ভাই ওকে যুবরাজের দুটো কথা জিজ্ঞাসা করা যাক্।

১। জিজ্ঞাসা করলে ও কি উত্তর দেবে? ও তেমন বুড়ো নয়। যেন ভরতের রাজত্বে রামচন্দ্রের জুতো যোড়াটার মত পড়ে আছে মুখে কথাটি নেই।

২। (শঙ্করের নিকটে গিয়া) হাঁ দাদা, বলনা দাদা, যুবরাজ রাজা হবে কবে?

শঙ্কর। তোদের সে খবরে কাজ কি?

১। না, না, বলচি আমাদের যুবরাজের বয়স হয়েছে এখন খুড়ো রাজা নাবচে না কেন?

শঙ্কর। তাতে দোষ হয়েছে কি? হাজার হোক্, খুড়ো ত বটে?

২। তা ত বটেই। কিন্তু যে দেশের যেমন নিয়ম—আমাদের নিয়ম আছে যে—

শঙ্কর। নিয়ম তোরা মান্‌বি, আমরা মান্‌ব, বড় লোকের আবার নিয়ম কি? সবাই যদি নিয়ম মান্‌বে তবে নিয়ম গড়বে কে?

১। আচ্ছা, দাদা, তা যেন হল—কিন্তু এই পাঁচ বছর ধরে বিয়ে করা এ কেমন নিয়ম দাদা? আমি ত বলি, বিয়ে করা বাণ খাওয়ার মত—চট্ করে লাগ্‌ল তীর তার পরে ইহ-জন্মের মত বিঁধে রইল। আর ভাবনা রইল না। কিন্তু দাদা, পাঁচ বৎসর ধরে এ কি রকম কারখানা।

শঙ্কর। তোদের আশ্চর্য্য ঠেক্‌বে বলে কি যে দেশের যা নিয়ম তা উল্‌টে যাবে? নিয়ম ত কারো ছাড়াবার যো নেই। এ সংসার নিয়মেই চল্‌চে। যা যা আর বকিস্‌নে যা। এ সকল কথা তোদের মুখে ভাল শোনায় না।

১। তা চল্লুম। আজ কাল আমাদের দাদার মেজাজ ভাল নেই। একেবারে শুকিয়ে যেন খড় খড় করচে। (প্রস্থান।)

পুরুষবেশী সুমিত্রার প্রবেশ।

সুমি। তুমি কি শঙ্কর দাদা?

শঙ্কর। কে তুমি ডাকিলে
পুরাতন পরিচিত স্নেহভরা স্বরে?
কে তুমি পথিক?

সুমি। এসেছি বিদেশ হতে।

শঙ্কর। এ কি স্বপ্ন দেখি আমি? কি মন্ত্র-কুহকে
কুমার আবার এল বালক হইয়া
শঙ্করের কাছে? যেন সেই সন্ধ্যেবেলা
খেলাশ্রান্ত সুকুমার বালা তনুখানি,
চরণ কমল ক্লিষ্ট, বিবর্ণ কপোল;—

ক্লান্ত শিশুহিয়া, বৃদ্ধ শঙ্করের বুকে
বিশ্রাম মাগিছে।

সুমি। জালন্ধর হতে আমি
এসেছি সংবাদ লয়ে কুমারের কাছে।

শঙ্কর। কুমারের বাল্যকাল এসেছে আপনি
কুমারের কাছে। শৈশবের খেলাধূলা
মনে করে দিতে, ছোট বোন পাঠায়েছে
তারে! দূত তুমি এ মূর্ত্তি কোথায় পেলে?
মিছে বকিতেছি কত। ক্ষমা কর মোরে।
বল বল কি সংবাদ। রাণী দিদি মোর
ভাল আছে, সুখে আছে, পতির সোহাগে
মহিষী গৌরবে? সুখে প্রজাগণ তারে
মা বলিয়া করে আশীর্ব্বাদ? রাজলক্ষ্মী
অন্নপূর্ণা বিতরিছে রাজ্যের কল্যাণ?
ধিক্ মোরে, শ্রান্ত তুমি পথশ্রমে, চল
গৃহে চল! বিশ্রামের পরে একে একে
বোলো তুমি সকল সংবাদ। গৃহে চল!

সুমিত্রা। শঙ্কর, মনে কি আছে এখনো রাণীরে?

শঙ্কর। সেই কণ্ঠস্বর। সেই গভীর গম্ভীর
দৃষ্টি স্নেহভারনত। এ কি মরীচিকা?
এনেছ কি চুরি করে মোর সুমিত্রার
ছায়া খানি? মনে নাই তারে? তুমি বুঝি
তাহারি অতীত স্মৃতি বাহিরিয়া এলে
আমারি হৃদয় হতে আমারে ছলিতে?
বার্দ্ধক্যের মুখরতা ক্ষমা কর যুবা।
বহুদিন মৌন ছিনু—আজ কত কথা
আসে মুখে, চোখে আসে জল। নাহি জানি
কেন এত স্নেহ আসে মনে, তোমা পরে।
যেন তুমি চিরপরিচিত। যেন তুমি
চিরজীবনের মোর আদরের ধন।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ত্রিচূড়, ক্রীড়াকানন।

কুমারসেন; ইলা, সখীগণ।

ইলা। যেতে হবে? কেন যেতে হবে যুবরাজ?
ইলারে লাগে না ভাল দুদণ্ডের বেশি,
ছিছি চঞ্চল হৃদয়?

কুমার। প্রজাগণ সবে—

ইলা। তারা কি আমার চেয়ে হয় ম্রিয়মাণ
তব অদর্শনে? রাজ্যে তুমি চলে গেলে
মনে হয়, আর আমি নেই। যতক্ষণ
তুমি মোরে মনে কর ততক্ষণ আছি,
একাকিনী কেহ নই আমি। রাজ্যে তব
কত লোক, কত চিন্তা, কত কার্য্যভার
কত রাজ আড়ম্বর, আর সব আছে,
শুধু সেথা ক্ষুদ্র ইলা নাই।

কুমার। সব আছে
তবু কিছু নাই, তুমি না থেকেও আছ
প্রাণতমে।

ইলা। মিছে কথা বোলোনা কুমার!
তুমি রাজা আপন রাজত্বে, এ অরণ্যে
আমি রাণী, তুমি প্রজা মোর। কোথা
যাবে?
যেতে আমি দিব না তোমারে। সখি তোরা
আয়; এরে বাঁধ ফুলপাশে, কর্ গান,
কেড়ে নে সকলে মিলে রাজ্যের ভাবনা

সখীদের গান।

মিশ্রমোল্লার—একতালা।

যদি আসে তবে কেন যেতে চায়?
দেখা দিয়ে তবে কেন গো লুকায়?

চেয়ে থাকে ফুল হৃদয় আকুল,
বায়ু বলে এসে ভেসে যাই।
ধরে রাখ, ধরে রাখ,
সুখ পাখী ফাঁকি দিয়ে উড়ে যায়!
পথিকের বেশে সুখনিশি এসে
বলে হেসে হেসে, মিশে যাই।
জেগে থাক, জেগে থাক,
বরষের সাধ নিমেষে মিলায়।
র। আমারে কি করেছিস্ অয়ি কুহকিনি?
নির্ব্বাপিত আমি। সমস্ত জীবন, মন,
নয়ন, বচন, ধাইছে তোমার পানে
কেবল বাসনাময় হয়ে। যেন আমি
আমারে ভাঙ্গিয়ে দিয়ে ব্যাপ্ত হয়ে যাব
তোমার মাঝারে প্রিয়ে। যেন মিশে রব
সুখস্বপ্ন হয়ে ওই নয়ন-পল্লবে।
হাসি হয়ে ভাসিব অধরে। বাহু দুটি
দলিত লাবণ্য সম রহিব বেড়িয়া,
মিলন সুখের মত কোমল হৃদয়ে
রহিব মিলায়ে!
ইলা। তার পরে অবশেষে
সহসা টুটিবে স্বপ্নজাল, আপনারে
পড়িবে স্মরণে।—গীতহীনা বীণাসম
আমি পড়ে রব ভূঁয়ে, তুমি চলে যাবে
গুন্ গুন্ গাহি অন্য মনে। না, না, সখা,
স্বপ্ন নয়, মোহ নয়, এ মিলন পাশ
কখন্ বাঁধিয়া যাবে বাহুতে বাহুতে,
চোখে চোখে, মর্ম্মে মর্ম্মে, জীবনে জীবনে।
। সে ত আর দেরি নাই—আজি সপ্তমীর
অর্দ্ধ চাঁদ ক্রমে ক্রমে পূর্ণ শশী হবে
দেক আমাদের পূর্ণ সে মিলন।
ক্ষীণ বিচ্ছেদের বাধা মাঝখানে রেখে
কম্পিত আগ্রহবেগে মিলনের সুখ—
আজি তার শেষ। দূরে থেকে কাছাকাছি
কাছে থেকে তবু দূর, আজি তার শেষ।

সহসা সাক্ষাৎ, সহসা বিস্ময় রাশি,
সহসা মিলন, সহসা বিরহব্যথা—,
বনপথ দিয়ে, ধীরে ধীরে ফিরে যাওয়া
শূন্য গৃহ পানে, সুখস্মৃতি সঙ্গে নিয়ে,
প্রতি কথা, প্রতি হাসিটুকু শতবার
উলটি পালটি মনে, আজি তার শেষ।
মৌনলজ্জা প্রতিবার প্রথম মিলনে,
অশ্রুজল প্রতিবার বিদায়ের বেলা
আজি তার শেষ।
ইলা। আহা তাই যেন হয়।
সুখের ছায়ার চেয়ে সুখ ভাল, দুঃখ
সেও ভাল। তৃষ্ণা ভাল মরীচিকা চেয়ে।
কখন্ তোমারে পাব, কখন্ পাব না,
তাই সদা মনে হয়—কখন্ হারাব।
একা বসে বসে ভাবি, কোথা আছ তুমি,
কি করিছ, কল্পনা কাঁদিয়া ফিরে আসে
অরণ্যের প্রান্ত হতে। বনের বাহিরে
তোমারে জানিনে আর, পাইনে সন্ধান।
সমস্ত ভুবনে তব রহিব সর্ব্বদা,
কিছুই রবে না আর অচেনা, অজানা,
অন্ধকার। ধরা দিতে চাহ না কি নাথ?
কুমার। ধরা ত দিয়েছি আমি আপন ইচ্ছায়,
তবু কেন বন্ধনের পাশ? বল দেখি
কি তুমি পাওনি, কোথা রয়েছে অভাব?
ইলা। যখন তোমার কাছে সুমিত্রার কথা
শুনি বসে, মনে মনে ব্যথা যেন বাজে।
মনে হয় সে যেন আমায় ফাঁকি দিয়ে
চুরি করে রাখিয়াছে শৈশব তোমার
গোপনে আপন কাছে। কভু মনে হয়
যদি সে ফিরিয়া আসে, বাল্য সহচরী
ডেকে নিয়ে যায় সেই সুখশৈশবের
খেলাঘরে সেথা তারি তুমি! সেথা মোর
নাই অধিকার। মাঝে মাঝে সাধ যায়
তোমার সে সুমিত্রারে দেখি একবার।

কুমার। সে যদি আসিত, আহা, কত সুখ হত।
উৎসবের আনন্দ-কিরণখানি হয়ে
দীপ্তি পেত পিতৃগৃহে শৈশবভবনে।
অলঙ্কারে সাজাত তোমারে, বাহুপাশে
বাঁধিত সাদরে, চুরি করে হাসিমুখে
দেখিত মিলন। আর কি সে মনে করে
আমাদের। পরগৃহে পর হয়ে আছে?

ইলার গান।

পিলু বাঁরোয়া—আড়খেম্‌টা।

এরা, পরকে আপন করে, আপনারে পর,
বাহিরে বাঁশির রবে ছেড়ে যায় ঘর।
ভাল বাসে সুখে দুঃখে
ব্যথা সহে হাসি মুখে,
মরণেরে করে চির-জীবন-নির্ভর।

কুমার। কেন এ করুণ সুর? কেন দুঃখগান?
বিষণ্ণ নয়ন কেন?

ইলা। এ কি দুঃখগান?
শোনায় গভীর সুখ দুঃখেরি মতন
উদার উদাস। সুখ দুঃখ ছেড়ে দিয়ে
আত্মবিসর্জ্জন করা রমণীর সুখ।

কুমার। পৃথিবী করিব বশ তোমার এ প্রেমে।
আনন্দে জীবন মোর উঠে উচ্ছ্বসিয়া
বিশ্বমাঝে। শ্রান্তিহীন কর্ম্মসুখতরে
ধায় হিয়া। চিরকীর্ত্তি করিয়া অর্জ্জন
তোমারে করিব তার অধিষ্ঠাত্রী দেবী।
বিরলে বিলাসে বসে এ অগাধ প্রেম
পারিনে করিতে ভোগ অলসের মত।

ইলা। ওই দেখ রাশি রাশি মেঘ উঠে আসে
উপত্যকা হতে, ঘিরিতে পর্ব্বত শৃঙ্গ,—
সৃষ্টির বিচিত্র লেখা মুছিয়া ফেলিতে।

কুমার। দক্ষিণে চাহিয়া দেখ—অস্তরবিকরে
সুবর্ণ সমুদ্র সম সমতলভূমি
গেছে চলে নিরুদ্দেশ কোন্ বিশ্বপানে।
শস্যক্ষেত্র, বনরাজি, নদী, লোকালয়
অস্পষ্ট সকলি—যেন স্বর্ণ চিত্রপটে
শুধু নানা বর্ণ সমাবেশ, চিত্ররেখা
এখনো ফোটেনি। যেন আকাঙ্ক্ষা আমারি
শৈল অন্তরাল ছেড়ে ধরণীর পানে
চলেছে বিস্তৃত হয়ে, হৃদয়ে বহিয়া
কল্পনার স্বর্ণলেখা ছায়াস্ফুট ছবি।
আহা হোথা কত দেশ, নব দৃশ্য কত,
কত নব কীর্ত্তি, কত নব রঙ্গভূমি।

ইলা। অনন্তের মূর্ত্তি ধরে ওই মেঘ আসে
মোদের করিতে গ্রাস। নাথ কাছে এস।
আহা যদি চিরকাল এই মেঘমাঝে
লুপ্ত বিশ্বে থাকিতাম তোমাতে আমাতে।
দুটি পাখী একমাত্র মহামেঘনীড়ে।
পারিতে থাকিতে তুমি? মেঘআবরণ
ভেদ ক'রে কোথা হতে পশিত শ্রবণে
ধরার আহ্বান; তুমি ছুটে চলে যেতে
আমারে ফেলিয়া রেখে প্রলয়ের মাঝে।

পরিচারিকার প্রবেশ।

পরি। কাশ্মীরে এসেছে দূত জালন্ধর হতে
গোপন সংবাদ লয়ে।

কুমার। তবে যাই, প্রিয়ে,
আবার আসিব ফিরে পূর্ণিমার রাতে
নিয়ে যাব হৃদয়ের চিরপূর্ণিমারে—
হৃদয়দেবতা আছ, গৃহলক্ষ্মী হবে।

ইলা। যাও তুমি, আমি একা কেমনে পারিব
তোমারে রাখিতে ধরে। হায়, কত ক্ষুদ্র,
কত ক্ষুদ্র আমি। কি বৃহৎ এ সংসার,
কি উদ্দাম তোমার হৃদয়। কে জানিবে
আমার বিরহ? কে গণিবে অশ্রু মোর?
কে মানিবে এ নিভৃত বনপ্রান্তভাগে
শুকাইয়া বালিকার মর্ম্মকাতরতা।

তৃতীয় দৃশ্য।

—*—

কাশ্মীর। যুবরাজের প্রাসাদ।

কুমারসেন ও ছদ্মবেশী সুমিত্রা।

কু। কত যে আগ্রহ মোর কেমনে দেখাব
তোমারে ভগিনী? আমারে ব্যথিছে যেন
প্রত্যেক নিমেষ পল,—যেতে চাই আমি
এখনি লইয়া সৈন্য—দুর্বিনীত সেই
দস্যুদের করিতে দমন;—কাশ্মীরের
কলঙ্ক করিতে দূর কিন্তু পিতৃব্যের
পাইনে আদেশ। ছদ্মবেশ দূর কর
বোন। চল মোরা যাই দোঁহে,—পড়ি গিয়ে
রাজার চরণে।

সুমি। সে কি কথা, ভাই? আমি
এসেছি তোমার কাছে, জানাতে তোমারে
ভগিনীর মনোব্যথা। আমি কি এসেছি
জালন্ধর রাজ্য হতে ভিখারিণী রাণী
ভিক্ষা মাগিবার তরে কাশ্মীরের কাছে?
ছদ্মবেশ দহিছে হৃদয়। আপনার
পিতৃগৃহে আসিলাম এতদিন পরে
আপনারে করিয়া গোপন। কতবার
বৃদ্ধ শঙ্করের কাছে কণ্ঠরুদ্ধ হল
অশ্রুভরে,—কতবার মনে করেছিনু
কাঁদিয়া তাহারে বলি—"শঙ্কর, শঙ্কর,
তোদের সুমিত্রা সেই ফিরিয়া এসেছে
দেখিতে তোদের।" হায়, বৃদ্ধ, কতঅশ্রু
ফেলে গিয়েছিনু সেই বিদায়ের দিনে,
মিলনের অশ্রুজল নারিলাম দিতে।
শুধু আমি নহি আর কন্যা কাশ্মীরের
আজ আমি জালন্ধর রাণী।

কুমার। বুঝিয়াছি
বোন্। যাই দেখি, অন্য কি উপায় আছে।

চতুর্থ দৃশ্য।

—*—

কাশ্মীর প্রাসাদ। অন্তঃপুর।

রেবতী, চন্দ্রসেন।

রেবতী। যেতে দাও—মহারাজ! কি ভাবিছ
বসি? ভাবিছ কি লাগি? যাক্ যুদ্ধে,—
তার পরে দেবতা কৃপায়, আর যেন নাহি
আসে ফিরে।

চন্দ্র। ধীরে, রাণি, ধীরে।

রেব। ক্ষুধিত মার্জ্জার
বসেছিলে এত দিন সময় চাহিয়া,
আজ ত সময় এল—তবু আজো কেন
সেই বসে আছ?

চন্দ্র। কে বসিয়াছিল, রাণি,
কিসের লাগিয়া?

রেব। ছি, ছি, আবার ছলনা?
লুকাবে আমার কাছে? কোন্ অভিপ্রায়ে
এতদিন কুমারের দাওনি বিবাহ?
কেনবা সম্মতি দিলে ত্রিচূড় রাজ্যের
এই অনার্য্য প্রথায়? পঞ্চবর্ষ ধরে
কন্যার সাধনা।

চন্দ্র। ধিক্। চুপ কর রাণী—
কে বোঝে কাহার অভিপ্রায়?

রেবতী। তবে, বুঝে
দেখ ভাল করে। যে কাজ করিতে চাও
জেনে শুনে কর। আপনার কাছ হতে
রেখো না গোপন করে উদ্দেশ্য আপন।
দেবতা তোমার হয়ে অলক্ষ্য সন্ধানে
করিবে না তব লক্ষ্যভেদ। নিজ হাতে

উপায় রচনা কর অবসর বুঝে ।
বাসনার পাপ সেই হতেছে সঞ্চয়
তার পরে কেন থাকে অসিদ্ধির ক্লেশ ?
কুমারে পাঠাও যুদ্ধে ।

চন্দ্র । বাহিরে রয়েছে
কাশ্মীরের যত উপদ্রব । পররাজ্যে
আপনার বিষদন্ত করিতেছে ক্ষয় ।
ফিরায়ে আনিতে চাও তাদের আবার ?

রেব । অনেক সময় আছে সে কথা ভাবিতে ।
আপাতত পাঠাও কুমারে । প্রজাগণ
ব্যগ্র অতি যৌবরাজ্য অভিষেক তরে
তাদের থামাও কিছুদিন । ইতিমধ্যে
কত কি ঘটিতে পারে পরে ভেবে দেখো ।

কুমারের প্রবেশ ।

রেব । (কুমারের প্রতি) যাও যুদ্ধে, পিতৃব্যের
হয়েছে আদেশ ।
বিলম্ব কোরোনা আর, বিবাহ উৎসব
পরে হবে । দীপ্ত যৌবনের তেজ ক্ষয়
করিও না, গৃহে বসে আলস্য-উৎসবে !

কুমার । জয় হোক্ জয় হোক্ জননি তোমার !
এ কি আনন্দ সংবাদ ! নিজমুখে তাত,
করহ আদেশ !

চন্দ্র । যাও তবে ; দেখো, বৎস,
থেকো সাবধানে । দর্পমদে ইচ্ছা করে
বিপদে দিয়োনা ঝাঁপ । আশীর্বাদ করি
ফিরে এসো জয়গর্ব্বে অক্ষত শরীরে
পিতৃসিংহাসন পরে ।

কুমার । মাগি জননীর
আশীর্ব্বাদ ।

রেব । কি হইবে মিথ্যা আশীর্ব্বাদে !
আপনারে রক্ষা করে আপনার বাহু ।

পঞ্চম দৃশ্য ।

—*—

ত্রিচুড় । ক্রীড়া-কানন ।

ইলার সখীগণ ।

১ । আলো কোথায় কোথায় দেবে ভাই ?

২ । আলোর জন্যে ভাবিনে । আলো ত কেবল একরাত্রি জ্বল্বে । কিন্তু বাঁশি এখনো এল না কেন ? বাঁশি না বাজলে আমোদ নেই ভাই !

৩ । বাঁশি কাশ্মীর থেকে আন্‌তে গেছে এতক্ষণে এল বোধ হয় । কখন্ বাজ্‌বে ভাই ?

১ । বাজ্‌বে লো বাজ্‌বে । তোর অদৃষ্টেও একদিন বাজ্‌বে !

৩ । পোড়াকপাল আর কি ! আমি সেই জন্যেই ভেবে মরচি ।

প্রথমার গান ।

ঝিঁঝিঁট খাম্বাজ—একতালা ।

বাজিবে, সখি, বাঁশি বাজিবে ।
হৃদয়রাজ হৃদে রাজিবে ।
বচন রাশি রাশি, কোথা যে যাবে ভাসি,
অধরে লাজ হাসি সাজিবে !
নয়নে আঁখিজল করিবে ছলছল,
সুখবেদনা মনে বাজিবে ।
মরমে মুরছিয়া মিলাতে চাবে হিয়া
সেই চরণ-যুগ-রাজীবে ।

২ । তোর গান রেখে দে ! এক একবার মন কেমন হুহু করে উঠ্‌চে । মনে পড়চে কেবল একটি রাত আলো, হাসি, বাঁশি, আর গান । তার পরদিন থেকে সমস্ত অন্ধকার ।

১ । কাঁদবার সময় ঢের আছে বোন্ ।

এই দুটো দিন একটু হেসে আমোদ করে নে। ফুল যদি না শুকোত তা হলে আমি আজ থেকেই মালা গাঁথ্‌তে বস্‌তুম।

২। আমি বাসরঘর সাজাব।

১। আমি সখীকে সাজিয়ে দেব।

৩। আর, আমি কি করব?

১। ওলো, তুই আপনি সাজিস্‌। দেখিস্‌ যদি যুবরাজের মন ভোলাতে পারিস।

৩। তুই ত ভাই চেষ্টা করতে ছাড়িস্‌নি। তা তুই যখন পারলিনে তখন কি আর আমি পারব? ওলো, আমাদের সখীকে যে একবার দেখেছে—তার মন কি আর অম্‌নি পথেঘাটে চুরি যায়? ঐ বাঁশি এসেছে। ঐ শোন্‌ বেজে উঠেছে।

প্রথমার গান।

মিশ্র সিন্ধু—একতালা।

ঐ বুঝি বাঁশি বাজে।
বনমাঝে, কি মনমাঝে?
বসন্ত বায় বহিছে কোথায়
কোথায় ফুটেছে ফুল!
বল গো সজনি, এ সুখ রজনী
কোন্‌খানে উদিয়াছে?
বন মাঝে কি মন মাঝে?
যাব কি যাবনা মিছে এ ভাবনা
মিছে মরি লোকলাজে!
কে জানে কোথা সে বিরহ হুতাশে
ফিরে অভিসার-সাজে,
বন মাঝে কি মন মাঝে?

২। ওলো থাম্‌—ঐ দেখ্‌ যুবরাজ কুমার সেন এসেচেন।

৩। চল্‌ চল্‌ ভাই, আমরা একটু আড়ালে দাঁড়াইগে। তোরা পারিস, কিন্তু কে জানে, ভাই, যুবরাজের সাম্‌নে যেতে আমার কেমন করে?

২। কিন্তু কুমার আজ হঠাৎ অসময়ে এলেন কেন?

১। ওলো এর কি আর সময় অসময় আছে? রাজার ছেলে বলে কি পঞ্চশর ওকে ছেড়ে কথা কয়? থাক্‌তে পারবে কেন?

৩। চল্‌ ভাই আড়ালে চল্‌।

(অন্তরালে গমন।)

কুমার সেন ও ইলার প্রবেশ।

ইলা। থাক্‌ নাথ, আর বেশী বোলো না
আমারে।
কাজ আছে, যেতে হবে রাজ্য ছেড়ে, তাই
বিবাহ স্থগিত রবে কিছু কাল, এর
বেশী কি আর শুনিব?

কুমার। এমনি বিশ্বাস
মোর পরে রেখো চিরদিন। মন দিয়ে
মন বোঝা যায়; গভীর বিশ্বাস শুধু
নীরব প্রাণের কথা টেনে নিয়ে আসে।
প্রবাসীরে মনে কোরো এই উপবনে,
এই নির্ঝরিণী তীরে, এই লতাগৃহে,
এই সন্ধ্যালোকে, পশ্চিম গগনপ্রান্তে
ওই সন্ধ্যা তারা পানে চেয়ে। মনে কোরো,
আমিও প্রদোষে, প্রবাসে তরুর তলে
একেলা বসিয়া ওই তারকার পরে
তোমারি আঁখির তারা পেতেছি দেখিতে।
মনে কোরো মিশিতেছে এই নীলাকাশে
পুষ্পের সৌরভ সম তোমার আমার
প্রেম। এক চন্দ্র উঠিয়াছে উভয়ের
বিরহ রজনী পরে।

ইলা। জানি, জানি, নাথ,
জানি আমি তোমার হৃদয়।

কুমার। যাই তবে,
অয়ি তুমি অন্তরের ধন, জীবনের
মর্ম্মস্বরূপিণী, অয়ি সবার অধিক।
(প্রস্থান)

সখীগণের প্রবেশ।

২। হায়, এ কি শুনি?
৩। সখি, কেন যেতে দিলে?
১। ভালই করেছে। স্বেচ্ছায় না দিলে ছাড়ি
বাঁধন ছিঁড়িয়া যায় চিরদিন তরে।
হায়, সখি, হায়, শেষে নিবাতে হল কি
উৎসবের দীপ?
ইলা। সখি, তোরা চুপ কর,
টুটিছে হৃদয়। ভেঙ্গে দে, ভেঙ্গে দে ওই
দীপমালা। বল্ সখি কে দিবে নিবায়ে
লজ্জাহীনা পূর্ণিমার আলো? কেন আজ
মনে হয়, আমার এ জীবনের সুখ
আজি দিবসের সাথে ডুবিল পশ্চিমে?
অমনি ইলারে কেন অস্তপথপানে
সঙ্গে নাহি নিয়ে গেল ছায়ার মতন?

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

জালন্ধর। রণক্ষেত্র। শিবির।

বিক্রমদেব, সেনাপতি।

সেনা। বন্দীকৃত শিলাদিত্য, উদয়ভাস্কর;
শুধু যুধাজিৎ পলাতক—সঙ্গে লয়ে
সৈন্যদলবল।
বিক্রম। চল তবে অবিলম্বে
তাহার পশ্চাতে। উঠাও শিবির তবে!
ভালবাসি আমি এই ব্যগ্র ঊর্দ্ধশ্বাস
মানব মৃগয়া; গ্রাম হতে গ্রামান্তরে,
বন গিরি নদী তীরে দিবারাত্রি এই
কৌশলে কৌশলে খেলা। বাকী আছে আর
কেবা বিদ্রোহী দলের?
সেনা। শুধু জয়সেন।
কর্ত্তা সেই বিদ্রোহের। সৈন্যবল তার
সব চেয়ে বেশী।
বিক্রম। চল তবে সেনাপতি,
তার কাছে। আমি চাই উদগ্র সংগ্রাম,
বুকে বুকে বাহুতে বাহুতে—অতি তীব্র
প্রেম আলিঙ্গন সম। ভাল নাহি লাগে
অস্ত্রে অস্ত্রে মৃদু ঝন্ঝনি—ক্ষুদ্র যুদ্ধে
ক্ষুদ্র জয় লাভ!
সেনা। কথা ছিল আসিবে সে
গোপনে সহসা; করিবে পশ্চাৎ হতে
আক্রমণ; বুঝি শেষে জাগিয়াছে মনে
বিপদের ভয়, সন্ধির প্রস্তাব তরে
হয়েছে উন্মুখ।
বিক্রম। ধিক্! ভীরু, কাপুরুষ!
সন্ধি নহে—যুদ্ধ চাই আমি! রক্তে রক্তে
মিলনের স্রোত—অস্ত্রে অস্ত্রে সঙ্গীতের
ধ্বনি। চল সেনাপতি!
সেনা। যে আদেশ প্রভু! (প্রস্থান)
বিক্রম। এ কি মুক্তি! এ কি পরিত্রাণ!
কি আনন্দ
হৃদয় মাঝারে! অবলার ক্ষীণ বাহু
কি প্রচণ্ড সুখ হতে রেখেছিল মোরে
বাঁধিয়া বিবর মাঝে? উদ্দাম হৃদয়
অপ্রশস্ত অন্ধকার গভীরতা খুঁজে
ক্রমাগত যেতেছিল রসাতল পানে।
মুক্তি! মুক্তি আজি! শৃঙ্খল বন্দীরে

ছেড়ে আপনি পলায়ে গেছে। এতদিন
এ জগতে কত যুদ্ধ, কত সন্ধি, কত
কীর্ত্তি, কত রঙ্গ—কত কি চলিতেছিল
কর্ম্মের প্রবাহ—আমি ছিনু অন্তঃপুরে
পড়ে; রুদ্ধদল চম্পক-কোরক মাঝে
সুপ্তকীট সম। কোথা ছিল লোকলাজ,
কোথা ছিল বীরপরাক্রম। কোথা ছিল
এ বিপুল বিশ্বতটভূমি! কোথা ছিল
হৃদয়ের তরঙ্গতর্জ্জন। কে বলিবে
আজি মোরে দীন কাপুরুষ। কে বলিবে
অন্তঃপুরচারী। মৃদু গন্ধবহ আজি
জাগিয়া উঠেছে বেগে ঝঞ্ঝাবায়ু রূপে।
এ প্রবল হিংসা ভাল, ক্ষুদ্র প্রেম চেয়ে!
প্রলয় ত বিধাতার চরম আনন্দ।
হিংসা এই হৃদয়ের বন্ধন-মুক্তির
সুখ। হিংসা জাগরণ। হিংসা স্বাধীনতা।

সেনাপতির প্রবেশ।

সেনা। আসিছে বিদ্রোহী সৈন্য।
বিক্রম। চল তবে চল।

চরের প্রবেশ।

চর। রাজন্, বিপক্ষদল নিকটে এসেছে।
নাই বাদ্য, নাই জয়ধ্বজা, নাই কোন
যুদ্ধ আস্ফালন; মার্জ্জনা-প্রার্থনা তরে
আসিতেছে যেন।
বিক্রম। চাহিনা শুনিতে
মার্জ্জনার কথা। আগে আমি আপনারে
করিব মার্জ্জনা;—অপযশ রক্তস্রোতে
করিব ক্ষালন। যুদ্ধে চল সেনাপতি।

—•:•:•—

২য় চরের প্রবেশ।

২। বিপক্ষ শিবির হতে আসিছে শিবিকা
বোধ করি সন্ধিদূত লয়ে।
সেনা। মহারাজ,
তিলেক অপেক্ষা কর—আগে শোনা যাক্
কি বলে বিপক্ষদূত—
বিক্রম। যুদ্ধ তার পরে।

সৈনিকের প্রবেশ।

সৈ। মহারাণী এসেছেন বন্দী করে লয়ে
যুধাজিৎ আর জয়সেনে।
বিক্রম। কে এসেছে?
সৈ। মহারাণী।
বিক্রম। মহারাণী! কোন্ মহারাণী?
সৈনিক। আমাদের মহারাণী।
বিক্রম। বাতুল উন্মাদ!
যাও সেনাপতি। দেখে এস কে এসেছে।
(সেনাপতি প্রভৃতির প্রস্থান।)
মহারাণী এসেছেন বন্দী করে লয়ে
যুধাজিৎ জয়সেনে! একি স্বপ্ন না কি!
এ কি রণক্ষেত্র নয়? এ কি অন্তঃপুর?
এতদিন ছিলাম কি যুদ্ধের স্বপনে
মগ্ন? সহসা জাগিয়া আজ দেখিব কি
সেই ফুলবন, সেই মহারাণী, সেই
পুষ্পশয্যা, সেই সুদীর্ঘ অলস দিন,
দীর্ঘনিশি বিজড়িত ঘুমে জাগরণে?
বন্দী? কারে বন্দী? কি শুনিতে কি
শুনেছি?
এসেছে কি আমারে করিতে বন্দী?
দূত! সেনাপতি! কে এসেছে? কারে
বন্দী লয়ে?

সেনাপতির প্রবেশ।

সেনা। মহারাণী এসেছেন লয়ে কাশ্মীরের
সৈন্যদল—সোদর কুমারসেন সাথে!
এনেছেন পথ হতে যুদ্ধে বন্দী করে
পলাতক যুধাজিৎ আর জয়সেনে।
আছেন শিবিরদ্বারে সাক্ষাতের তরে
অভিলাষী।

বিক্রম। সেনাপতি পালাও, পালাও!
চল, চল, সৈন্য লয়ে—আর কি কোথাও
নাই শত্রু—আর কেহ নাহি কি বিদ্রোহী
সাক্ষাৎ? কাহার সাথে? রমণীর সনে
সাক্ষাতের এ নহে সময়!

সেনাপতি। মহারাজ—

বিক্রম। চুপ কর সেনাপতি;—শোন যাহা
বলি।
রুদ্ধ কর দ্বার—এ শিবিরে শিবিকার
প্রবেশ নিষেধ!

সেনা। যে আদেশ মহারাজ!

দ্বিতীয় দৃশ্য।

দেবদত্তের কুটীর।

দেবদত্ত, নারায়ণী।

দেব। প্রিয়ে, তবে অনুমতি কর—দাস বিদায় হয়।

নারা। তা যাওনা, আমি তোমাকে বেঁধে রেখেছি না কি?

দেব। ঐ ত—ঐ জন্যেই ত কোথাও যাওয়া হয়ে ওঠে না—বিদায় নিয়েও সুখ নেই। যা' বলি তা' কর। ঐ খানটায় আছাড় খেয়ে পড়। বল হা হতোহস্মি, হা ভগবতি ভবিতব্যতে! হা ভগবন্ মকরকেতন!

নারা। মিছে বোকো না! মাথা খাও, সত্যি করে বল, কোথায় যাবে?

দে। রাজার কাছে।

নারা। রাজা ত যুদ্ধ কর্ত্তে গেছে। তুমি যুদ্ধ কর্ব্বে না কি? দ্রোণাচার্য্য হয়ে উঠেছ?

দেব। তুমি থাক্‌তে আমি যুদ্ধ করব?-যাহোক্, এবার যাওয়া যাক।

নারা। সেই অবধি ত ঐ এক কথাই বল্‌চ। তা যাওনা। কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে ধরে রেখেছে?

দেব। হায় মকরকেতন, এখেনে তোমার পুষ্পশরের কর্ম্ম নয়—একেবারে আস্ত শক্তিশেল না ছাড়লে মর্ম্মে গিয়ে পৌঁছয় না! বলি, ও শিখরদশনা, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী, চোখ দিয়ে জল্‌টল্ কিছু বেরোবে কি? সে গুলো শীঘ্র শীঘ্র সেরে ফেল—আমি উঠি।

নারা। পোড়া কপাল! চোখের জল ফেল্‌ব কি দুঃখে? হাঁ গা, তুমি না গেলে কি রাজার যুদ্ধ চল্‌বে না? তুমি কি মহাবীর ধূম্রলোচন হয়েছ?

দেব। আমি না গেলে রাজার যুদ্ধ থাম্‌বে না। মন্ত্রী বারবার লিখে পাঠাচ্ছে রাজ্য ছারখারে যায় কিন্তু মহারাজ কিছুতেই যুদ্ধ ছাড়তে চান না। এদিকে বিদ্রোহ সমস্ত থেমে গেছে।

নারা। বিদ্রোহই যদি থেমে গেল ত মহারাজ কার সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে যাবেন?

দেব। মহারাণীর ভাই কুমারসেনের সঙ্গে।

নারা। হাঁ গা, সে কি কথা! শ্যালার সঙ্গে যুদ্ধ? বোধ করি রাজায় রাজায় এই রকম করেই ঠাট্টা চলে। আমরা হলে শুধু কাণ মলে দিতুম। কি বল?

দেব। বড় ঠাট্টা নয়। মহারাণী কুমার-

সেনের সাহায্যে জয়সেন ও যুধাজিৎকে যুদ্ধে বন্দী করে মহারাজের কাছে নিয়ে আসেন। মহারাজ তাঁকে শিবিরে প্রবেশ কর্ত্তে দেননি।

নারা। হাঁ গা, বল কি! তা তুমি এতদিন যাওনি কেন? এ খবর শুনেও বসে আছ? যাও, যাও, এখনি যাও। আমাদের রাণীর মত অমন সতী লক্ষ্মীকে অপমান করলে? রাজার শরীরে কলি প্রবেশ করেচে।

দেব। বন্দী বিদ্রোহীরা রাজাকে বলেচে— মহারাজ, আমরা তোমারই প্রজা—অপরাধ করে থাকি তুমি শাস্তি দেবে। একজন বিদেশী এসে আমাদের অপমান করবে এতে তোমা-কেই অপমান করা হল—যেন তোমার নিজ রাজ্য নিজে শাসন করবার ক্ষমতা নেই। একটা সামান্য যুদ্ধ, এর জন্যে অমনি কাশ্মীর থেকে সৈন্য এল, এর চেয়ে উপহাস আর কি হতে পরে? এই শুনে মহারাজ আগুন হয়ে কুমারসেনকে পাঁচটা ভর্ৎসনা করে এক দূত পাঠিয়ে দেন। কুমারসেন উদ্ধত যুবা পুরুষ, সহ্য কর্ত্তে পারবে কেন? বোধ করি সেও দূতকে দু কথা শুনিয়ে দিয়ে থাক্‌বে।

না। তা বেশত—কুমারসেন ত রাজার পর নয় আপনার লোক, তা কথা চলছিল বেশ তাই চলুক। তুমি কাছে না থাক্‌লে রাজার ঘটে কি দুটো কথাও যোগায় না? কথা বন্ধ করে অস্ত্র চালানার দরকার কি বাপু! ঐ ওতেই ত হার হল!

দেব। আসল কথা, একটা যুদ্ধ করবার ছুতো। রাজা এখন কিছুতেই যুদ্ধ ছাড়তে পারচেন না। নানা ছল অন্বেষণ করচেন। রাজাকে সাহস করে দুটো ভাল কথা বলে এমন বন্ধু কেউ নেই। আমি ত আর থাক্‌তে পারচিনে আমি চল্লুম।

নারা। যেতে ইচ্ছে হয় যাও আমি কিন্তু একলা তোমার ঘরকন্না করতে পারব না। তা আমি বলে রাখলুম। এই রইল তোমার সমস্ত পড়ে রইল। আমি বিবাগী হয়ে বেরিয়ে যাব।

দেব। রোসো আগে আমি ফিরে আসি তার পরে যেয়ো। বল ত আমি থেকে যাই।

না। না না তুমি যাও! আমি কি আর তোমাকে সত্যি থাক্‌তে বল্‌চি? ওগো তুমি চলে গেলে আমি একেবারে বুক ফেটে মরব না, সে জন্যে ভেবো না। আমার বেশ চলে যাবে।

দেব। তা কি আর আমি জানিনে? মলয় সমীরণ তোমার কিছু কর্ত্তে পারবে না। বিরহ ত সামান্য, বজ্রাঘাতেও তোমার কিছু হয় না। (প্রস্থানোন্মুখ)

নারা। হে ঠাকুর, রাজাকে সুবুদ্ধি দাও ঠাকুর! শীঘ্র শীঘ্র ফিরিয়ে আন।

দেব। এ ঘর ছেড়ে কখন কোথাও যাইনি। হে ভগবান্ এদের সকলের উপর তোমার দৃষ্টি রেখো।

(প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য।

জালন্ধর। কুমারসেনের শিবির।

কুমারসেন ও সুমিত্রা।

সুমি। ভাই রাজাকে মার্জ্জনা কর; কর রোষ
আমার উপরে। আমি মাঝে না থাকিলে
যুদ্ধ করে বীর নাম করিতে উদ্ধার!
যুদ্ধের আহ্বান শুনে অটল রহিলে
তবু তুমি; জানি না কি অসম্মান শেল
চিরজীবী মৃত্যুসম মানীর হৃদয়ে?
আপন ভায়ের হৃদে দুর্ভাগিনী আমি,

হানিতে দিলাম হেন অপমান শর
যেন আপনারি হস্তে! মৃত্যু ভাল ছিল,
ভাই, মৃত্যু ভাল ছিল!

ার। জানিস্ত বোন,
যুদ্ধ বীরধর্ম্ম বটে, ক্ষমা তার চেয়ে
বীরত্ব অধিক। অপমান অবহেলা
কে পারে করিতে মানী ছাড়া?

। ধন্য, ভাই,
ধন্য তুমি! স'পিলাম এ জীবন মোর
তোমার লাগিয়া। তোমার এ স্নেহঋণ
প্রাণ দিয়ে কেমনে করিব পরিশোধ?
বীর তুমি, মহাপ্রাণ, তুমি নরপতি
এ নরসমাজ মাঝে—

র। আমি ভাই তোর।
চল্ বোন, আমাদের সেই শৈলগৃহে
তুষাররশিখরঘেরা শুভ্র সুশীতল
আনন্দ কাননে। দুটি নির্ঝরের মত
একত্রে করেছি খেলা দুই ভাই বোনে,—
এখন আর কি ফিরে যেতে পারিবিনে
সেই উচ্চ, সেই শুভ্র শৈশব শিখরে?

। চল, ভাই চল। যে ঘরেতে ভাইবোনে
করিতাম খেলা, সেই ঘরে নিয়ে এসো
প্রেয়সী নারীরে;—সন্ধেবেলা বসে তারে
তোমার মনের মত সাজাব যতনে।
শিখাইয়া দিব তারে তুমি ভালবাস
কোন্ ফুল, কোন্ গান, কোন্ কাব্য রস।
শুনাব বাল্যের কথা; শৈশব মহত্ব
তব শিশু হৃদয়ের।

ার। মনে পড়ে মোর,
গৈাহে শিখিতাম বীণা; আমি ধৈর্য্যহীন
যেতেম পালায়ে। তুই শয্যাপ্রান্তে বসে
কেশবেশ ভুলে গিয়ে সারা সন্ধেবেলা
বাজাতিস্ গম্ভীর আনন্দ মুখখানি।

সঙ্গীতেরে করে তুলেছিলি, তোর সেই
ছোট ছোট অঙ্গুলির বশ।

সুমিত্রা। মনে আছে,
খেলা হতে ফিরে এসে শোনাতে আমারে
অদ্ভুত কল্পনা কথা; কোথা দেখেছিলে
অজ্ঞাত নদীর ধারে স্বর্ণ স্বর্গ পুর;
অলৌকিক কল্পকুঞ্জে কোথায় ফলিত
অমৃতমধুর ফল; ব্যথিত হৃদয়ে
সবিস্ময়ে শুনিতাম; স্বপ্নে দেখিতাম
সেই কিন্নর কানন।

কুমার। বলিতে বলিতে
নিজেরে কল্পনা শেষে নিজেরে ছলিত।
সত্য মিথ্যা হত একাকার, মেঘ আর
গিরির মতন; দেখিতে পেতেম যেন
দূর শৈল পরপারে রহস্য নগরী।
শঙ্কর আসিছে ওই ফিরে। শোনা যাক্
কি সংবাদ!

শঙ্করের প্রবেশ।

শঙ্কর। প্রভু তুমি, তুমি মোর রাজা,
ক্ষমা কর বৃদ্ধ এ শঙ্করে। ক্ষমা কর
রাণি, দিদি মোর! মোরে কেন পাঠাইলে
দূত করে রাজার শিবিরে? আমি বৃদ্ধ,
নহি পটু সাবধান বচন বিন্যাসে,
আমি কি সহিতে পারি তব অপমান?—
শান্তির প্রস্তাব শুনে যখন হাসিল
ক্ষুদ্র জয়সেন, হাসিমুখে ভৃত্য যুধাজিৎ
করিল সুতীব্র উপহাস,—সভ্রভঙ্গে
কহিলা বিক্রমদেব জালন্ধররাজ
তোমারে বালক, ভীরু, মনে হল যেন
চারিদিকে হাসিতেছে সভাসদ যত
পরস্পর মুখ চেয়ে, হাসিতেছে দূরে
দ্বারের প্রহরী—পশ্চাতে আছিল যারা

তাদের নীরব হাসি ভুজঙ্গের মত
যেন পৃষ্ঠে আসি মোর দংশিতে লাগিল।
তখন ভুলিয়া গেনু শিখেছিনু যত
শান্তিপূর্ণ মৃদুবাক্য, কহিলাম রোষে
কলঙ্কেরে জান তুমি বীরত্ব বলিয়া
নারী তুমি, নহ ক্ষত্রবীর, সেই খেদে
মোর রাজা কোষে লয়ে কোষরুদ্ধ অসি
ফিরে যেতেছেন দেশে, জানাইনু সবে।”
শুনিয়া কম্পিততনু জালন্ধরপতি,
প্রস্তুত হতেছে সৈন্য।

সুমিত্রা। ক্ষমা কর ভাই।

শঙ্কর। এই কি উচিত তব, কাশ্মীর তনয়া
তুমি, ভারতে রটায়ে যাবে কাশ্মীরের
অপমান কথা? বীরের স্বধর্ম্ম হতে
বিরত কোরো না তুমি আপন ভ্রাতারে,
রাখ এ মিনতি!

সু। বোলো না, বোলো না, আর
শঙ্কর!—মার্জ্জনা কর ভাই! পদতলে
পড়িলাম,—ওই তব রুদ্ধ কম্পমান
রোষানল নির্ব্বাণ করিতে চাও? আছে
মোর হৃদয় শোণিত! মৌন কেন ভাই?
বাল্যকাল হতে আমি ভালবাসা তব
পেয়েছি না চেয়ে, আজ আমি ভিক্ষা মাগি
ওই রোষ তব, দাও তাহা।

শঙ্কর। শোন্ প্রভু।

কুমার। চুপ কর বৃদ্ধ। যাও তুমি, সৈন্যদের
জানাও আদেশ—এখনি ফিরিতে হবে
কাশ্মীরের পথে।

শঙ্কর। হায় এ কি অপমান,
পলাতক ভীরু বলে রটিবে অখ্যাতি!

সুমিত্রা। শঙ্কর, বারেক তুই মনে করে দেখ্‌
সেই ছেলেবেলা! দুটি ছোট ভাই বোনে
কোলে বেঁধে রেখেছিলি এক স্নেহপাশে
তার চেয়ে বেশী হল খ্যাতি ও অখ্যাতি
প্রাণের সম্পর্ক এযে চির জীবনের—
পিতা মাতা বিধাতার আশীর্ব্বাদে ঘেরা
পুণ্য স্নেহতীর্থ খানি;—বাহির হইতে
হিংসানলশিখা আনি এ কল্যাণ-ভূমি
শঙ্কর, করিতে চাস্‌ অঙ্গার-মলিন?

শঙ্কর। চল্‌ দিদি, চল্‌ ভাই, ফিরে চলে যাই
সেই শান্তিসুধাস্নিগ্ধ বাল্যকাল মাঝে।

চতুর্থ দৃশ্য।

বিক্রমদেবের শিবির।

বিক্রম; যুধাজিৎ; জয়সেন।

বিক্রম। পলাতক অরাতিরে আক্রমণ করা
নহে ক্ষাত্রধর্ম্ম।

যুধা। পলাতক অপরাধী
সহজে নিষ্কৃতি পায় যদি, রাজদণ্ড
ব্যর্থ হয় তবে।

বিক্রম। বালক সে, শাস্তি তার
যথেষ্ট হয়েছে। পলায়ন, অপমান,
আর শাস্তি কিবা?

যুধা। গিরিরুদ্ধ কাশ্মীরের
বাহিরে পড়িয়া রবে যত অপমান।
সেথায় সে যুবরাজ, কে জানিবে তার
কলঙ্কের কথা?

জয়। চল, মহারাজ চল
সেই কাশ্মীরের মাঝে যাই,—সেথা গিয়ে
দোষীরে শাসন করে আসি; সিংহাসনে
দিয়ে আসি কলঙ্কের ছাপ।

বিক্রম। তাই চল।
বাড়ে চিন্তা যত চিন্তা কর। কার্য্যস্রোতে

আপনারে ভাসাইয়া দিনু, দেখি কোথা
গিয়ে পড়ি, কোথা পাই কূল।

প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। মহারাজ,
এসেছে সাক্ষাৎ তরে ব্রাহ্মণতনয়
দেবদত্ত।

বিক্রম। দেবদত্ত? নিয়ে এস, নিয়ে
এস তাঁরে। না, না, রোস, থাম ভেবে
দেখি।
কি লাগিয়ে এসেছে ব্রাহ্মণ? জানি তারে
ভাল মতে। এসেছে সে যুদ্ধক্ষেত্র হতে
ফিরাতে আমারে। হায়, বিপ্র, তোমরাই
ভাঙ্গিয়াছ বাঁধ, এখন প্রবল স্রোত
শুধু কি শস্যের ক্ষেত্রে জলসেক করে
ফিরে যাবে তোমাদের আবশ্যক বুঝে
পোষ-মানা প্রাণীর মতন। চূর্ণিবে সে
লোকালয়, উচ্ছন্ন করিবে দেশগ্রাম।
সকল্পিত পরামর্শ উপদেশ নিয়ে
তোমরা চাহিয়া থাক, আমি ধেয়ে চলি
কার্য্যবেগে, অবিশ্রাম গতিসুখে; মত্ত
মহানদী যে আনন্দে শিলারোধ ভেঙ্গে
ছুটে চিরদিন। প্রচণ্ড আনন্দ অন্ধ;
মুহূর্ত্ত তাহার পরমায়ু; তারি মধ্যে
উৎপাটিয়া নিয়ে আসে অনন্তের সুখ
মত্ত করীশুণ্ডে ছিন্ন রক্তপদ্ম সম।
বিচার বিবেক পরে হবে। চিরকাল
জড় সিংহাসনে পড়ি করিব মন্ত্রণা।
চাহি না কারতে দেখা ব্রাহ্মণের সনে।

জয়। যে আদেশ।

যুধা। (জনান্তিকে জয়সেনের প্রতি)
ব্রাহ্মণেরে জেনো শত্রু ব'লে।
বন্দী করে রাখ।

জয়। বিলক্ষণ জানি তারে।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কাশ্মীর প্রাসাদ।

রেবতী ও চন্দ্রসেন।

রেবতী। যুদ্ধসজ্জা? কেন যুদ্ধসজ্জা?
শত্রু কোথা?
মিত্র আসিতেছে! সমাদরে ডেকে আন
তারে! করুক সে অধিকার কাশ্মীরের
সিংহাসন! রাজ্যরক্ষা তরে তুমি এত
ব্যস্ত কেন? এ কি তব আপনার ধন?
আগে তারে নিতে দাও, তার পরে ফিরে
নিয়ো বন্ধুভাবে! তখন এ পররাজ্য
হবে আপনার।

চন্দ্র। চুপ কর, চুপ কর,
বোলো না অমন করে! কর্ত্তব্য আমার
করিব পালন; তার পরে দেখা যাবে
অদৃষ্ট কি করে!

রেবতী। তুমি কি করিতে চাও
আমি জানি তাহা। যুদ্ধের ছলনা করে
পরাজয় মানিবারে চাও। তার পর
চারিদিক রক্ষা করে সুবিধা বুঝিয়া
কৌশলে করিতে চাও উদ্দেশ্য সাধন!

চন্দ্র। ছি ছি রাণি, এ সকল কথা শুনি যবে
তব মুখে, ঘৃণা হয় আপনার পরে!
মনে হয় সত্য বুঝি এমনি পাষণ্ড
আমি! আপনারে ছদ্মবেশী চোর বলে
সন্দেহ জনমে। কর্ত্তব্যের পথ হতে
ফিরায়োনা মোরে!

রেবতী। আমিও পালিব তবে
কর্ত্তব্য আপন। নিশ্বাস করিয়া রোধ

বধিব আপন হস্তে সন্তান আপন।
রাজা যদি না করিবে তারে, কেন তবে
রোপিলে সংসারে পরাধীন ভিক্ষুকের
বংশ? অরণ্যে গমন ভাল, মৃত্যু ভাল,
রিক্তহস্তে পরের সম্পদছায়ে ফেরা
ধিক্ বিড়ম্বনা! জেনো তুমি, রাজভ্রাতা,
আমার গর্ভের ছেলে সহিবে না কভু
পরের শাসনপাশ; সমস্ত জীবন
পদদত্ত সাজ প'রে রহিবে না বসে
রাজসভা—পুত্তলিকা হয়ে। আমি তারে
দিয়েছি জনম, আমি তারে সিংহাসন
দিব,—নহে আমি নিজ হস্তে মৃত্যু দিব
তারে। নতুবা সে কুমাতা বলিয়া মোরে
দিবে অভিশাপ!

কঞ্চুকীর প্রবেশ।

কঞ্চু। যুবরাজ এসেছেন
রাজধানী মাঝে! আসিছেন অবিলম্বে
রাজসাক্ষাতের তরে। (প্রস্থান)

রেবতী। অন্তরালে রব
আমি। তুমি তারে বোলো, অস্ত্রশস্ত্র ছাড়ি
জালন্ধর রাজপদে অপরাধী ভাবে
করিতে হইবে তারে আত্মসমর্পণ।

চন্দ্র। যেয়ো না চলিয়া।

রেবতী। পারিনে লুকাতে আমি
হৃদয়ের ভাব। স্নেহের ছলনা করা
অসাধ্য আমার! তার চেয়ে অন্তরালে
গুপ্ত থেকে শুনি বসে তোমাদের কথা।
(প্রস্থান)

কুমার ও সুমিত্রার প্রবেশ।

কুমার। প্রণাম!

সুমিত্রা। প্রণাম তাত।

চন্দ্র। দীর্ঘজীবী হও।

কুমার। বহুপূর্ব্বে পাঠায়েছি সংবাদ, রাজন
শত্রুসৈন্য আসিছে পশ্চাতে, আক্রমণ
করিতে কাশ্মীর। কই রণসজ্জা কই?
কোথা সৈন্যবল?

চন্দ্র। শত্রুপক্ষ কারে বল?
বিক্রম কি শত্রু হল? জননি, সুমিত্রা,
বিক্রম কি নহে বৎসে কাশ্মীর জামাত
সে যদি আসিল গৃহে এত কাল পরে,
অসি দিয়ে তারে কি করিব সম্ভাষণ?

সুমিত্রা। হায় তাত, মোরে কিছু কোরো
জিজ্ঞাসা
আমি দুর্ভাগিনী নারী কেন আসিলাম
অন্তঃপুর ছাড়ি? কোথা লুকাইয়া ছিল
এত অকল্যাণ? অবলা নারীর ক্ষীণ
ক্ষুদ্র পদক্ষেপে সহসা উঠিল রুষি
সর্প শতফণা। মোরে কিছু শুধায়ো না
বুদ্ধিহীনা আমি! তুমি সব জান তাই!
তুমি জ্ঞানী, তুমি বীর, আমি পদপ্রা
মৌন ছায়া। তুমি জান সংসারের গতি
আমি শুধু তোমারেই জানি।

কুমার। মহারাজ,
আমাদের শত্রু নহে জালন্ধরপতি;
নিতান্তই আপনার জন! কাশ্মীরের
শত্রু তিনি, আসিছেন শত্রুভাব ধরি।
অকাতরে সহিয়াছি নিজ অপমান,
কেমনে উপেক্ষা করি রাজ্যের বিপদ।

চন্দ্র। সে জন্য ভেবো না বৎস, যথেষ্ট রয়েছে
বল! কাশ্মীরের তরে আশঙ্কা কিছুই
না

কুমার। মোর হাতে দাও সৈন্যভার!

চন্দ্র। দেখা
যাবে পরে। আগে হতে প্রস্তুত হইলে
অকারণে জেগে ওঠে যুদ্ধের কারণ।
আবশ্যক কালে তুমি পাবে সৈন্যভার।

রেবতীর প্রবেশ।

রেবতী। কে চাহিছে সৈন্যভার?

সুমিত্রা ও কুমার। প্রণাম জননী।

রেবতী। যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়ে তুমি এসেছ পলায়ে,
নিতে চাও অবশেষে ঘরে ফিরে এসে
সৈন্যভার? তুমি রাজপুত্র? তুমি চাও
কাশ্মীরের সিংহাসন? ছিছি লজ্জাহীন!
বনে গিয়ে থাক লুকাইয়া। সিংহাসনে
বস যদি, বিশ্বসুদ্ধ সকলে দেখিবে
কনক কিরীট চূড়া কলঙ্কে অঙ্কিত।

কুমার। জননি, কি অপরাধ করেছি চরণে?
কি কঠিন বচন তোমার। এ কি মাতা
স্নেহের ভর্ৎসনা? বহুদিন হতে তুমি
অপ্রসন্ন অভাগার পরে। রোষদীপ্ত
দৃষ্টি তব বিঁধে মোর মর্ম্মস্থলে সদা;
কাছে গেলে চলে যাও কথা না কহিয়া
অন্য ঘরে; অকারণে কহ তীব্র বাণী।
বল মাতা কি করিলে আমারে তোমার
আপন সন্তান বলে হইবে বিশ্বাস?

রেবতী। বলি তবে?

চন্দ্র। ছিছি, চুপ কর রাণি।

কুমার। মাতঃ,
অধিক কহিতে কথা নাহিক সময়।
দ্বারে এল শত্রুদল আমারে করিতে
আক্রমণ। তাই আমি সৈন্য ভিক্ষা মাগি।

রেবতী। তোমারে করিয়া বন্দী অপরাধী ভাবে
জালন্ধর রাজকরে করিব অর্পণ।
মার্জ্জনা করেন ভাল, নতুবা যেমন
বিধান করেন শাস্তি নিয়ো নতশিরে।

কু। কাল যায়, মহারাজ, কহ কি আদেশ?

চ। বৎস তুমি অনভিজ্ঞ মনে কর তাই
শুধু ইচ্ছামাত্রে সব কার্য্য সিদ্ধ হয়
চক্ষের নিমেষে। রাজকার্য্য মনে রেখো
সুকঠিন অতি। সহস্রের শুভাশুভ
কেমনে করিব স্থির মুহূর্ত্তের মাঝে?

কু। নির্দ্দয় বিলম্ব তব পিতঃ। বিপদের
মুখে মোরে ফেলি, অনায়াসে, স্থির ভাবে
বিচার মন্ত্রণা? প্রণাম, বিদায় হই।
(সুমিত্রাকে লইয়া প্রস্থান।)

চ। তোমার নিষ্ঠুর বাক্য শুনে দয়া হয়
কুমারের পরে; প্রাণে বাজে, ইচ্ছা করে
ডেকে নিয়ে বেঁধে রাখি বক্ষমাঝে,
স্নেহ দিয়ে দূর করি আঘাত বেদনা।

রে। শিশু তুমি! মনে কর আঘাত না করে
আপনি ভাঙ্গিবে বাধা? পুরুষের মত
যদি তুমি কার্য্যে দিতে হাত আমি তবে
দয়া মায়া করিতাম ঘরে বসে বসে
অবসর বুঝে। এখন সময় নাই।
(প্রস্থান)

চ। অতি-ইচ্ছা চলে অতি-বেগে। দেখিতে না
পায় পথ, আপনারে করে সে নিষ্ফল।
বায়ুবেগে ছুটে গিয়ে মত্ত অশ্ব যথা
চূর্ণ করে ফেলে রথ পাষাণ-প্রাচীরে।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কাশ্মীর। হাট

লোকসমাগম।

১। কেমন হে খুড়ো, গোলা ভরে ভরে যে গম জমিয়ে রেখেছিলে আজ বেচবার জন্যে এত তাড়াতাড়ি কেন?

২। না বেচ্‌লে কি আর রক্ষে আছে? এদিকে জালন্ধরের সৈন্য এল বলে। সমস্ত লুঠে নেবে। আমারের এই মহাজনদের বড় বড় গোলা আর মোটা মোটা পেট বেবাক্ ফাঁসিয়ে দেবে। গম আর রুটির দুয়েরই জায়গা থাক্‌বে না।

মহাজন। আচ্ছা ভাই আমোদ করে নে। কিন্তু শীঘ্‌ঘির তোদের ঐ দাঁতের পাটি ঢাক্‌তে হবে। গুঁতো সকলেরই উপর পড়বে।

১। সেই সুখেই ত হাস্‌চি বাবা! এবারে তোমায় আমায় এক সঙ্গে মরব। তুমি রাখ্‌তে গম জমিয়ে আর আমি মর্ত্তুম পেটের জ্বালায়। সেইটে হবে না। এবারে তোমাকেও জ্বালা ধরবে। সেই শুক্‌নো মুখখানি দেখে যেন মর্ত্তে পারি!

২। আমাদের ভাবনা কি ভাই! আমাদের আছে কি? প্রাণখানা এম্‌নেও বেশীদিন টিঁক্‌বে না অম্‌নেও বেশী দিন টিক্‌বে না। এ কটা দিন বসে মজা করে নেরে ভাই!

১। ও জনার্দ্দন, এতগুতি থলে এনেছ কেন? কিছু কিন্‌বে না কি?

জনা। একেবারে বছরখানেকের মত গম কিনে রাখবে।

২। কিন্‌লে যেন, রাখ্‌বে কোথায়?

জ। আজ রাত্তিরেই মামার বাড়ি পালাচ্ছি।

১। মামার বাড়ি পর্য্যন্ত পৌঁছলে ত! পথে অনেক মামা বসে আছে, আদর করে ডেকে নেবে!

কোলাহল করিতে করিতে একদল লোকের প্রবেশ।

৫। ওরে কে তোরা লড়াই কর্ত্তে চাস্ আয়!

১। রাজি আছি; কার সঙ্গে লড়তে হবে বলে দে।

৫। খুড়ো রাজা জালন্ধরের সঙ্গে ষড়্‌ করে যুবরাজকে ধরিয়ে দিতে চায়।

২। বটে! খুড়ো রাজার দাড়িতে আমরা মশাল ধরিয়ে দেব।

অনেক। আমাদের যুবরাজকে আমরা রক্ষে করব।

৫। খুড়ো রাজা গোপনে যুবরাজকে বন্দী কর্ত্তে চেষ্টা করেছিল তাই আমরা যুবরাজকে লুকিয়ে রেখেছি।

১। চল্ ভাই খুড়ো রাজাকে গুঁড়ো করে দিয়ে আসি গে!

২। চল্ ভাই তার মুণ্ডুখানা খসিয়ে তাকে মুড়ো করে দিই গে।

৫। সে সব পরে হবে রে। আপাতত লড়তে হবে।

১। তা লড়ব। এই হাট থেকেই লড়াই সুরু করে দেওয়া যাক্ না। প্রথমে ওই মহাজনদের গমের বস্তাগুলো লুঠে নেওয়া যাক্। তার পরে ঘি আছে, চাম্‌ড়া আছে, কাপড় আছে।

ষষ্ঠের প্রবেশ।

৬। শুনেছিস্—যুবরাজ লুকিয়েছেন শুনে ালন্ধরের রাজা রটিয়েছে যে তার সন্ধান বলে ়বে তাকে পুরস্কার দেবে।

৫। তোর এ সব খবরে কাজ কি?

২। তুই পুরস্কার নিবি নাকি?

১। আয় না ভাই, ওকে সবাই মিলে রস্কার দিই। যা হয় একটা কাজ আরম্ভ করে ওয়া যাক্। চুপ করে বসে থাকৃতে ারিনে।

৮। আমাকে মারিস্নে ভাই, দোহাই াপসকল! আমি তোদের সাবধান করে দিতে এসেছি।

২। বেটা তুই আপনি সাবধান হ।

৫। এ খবর যদি তুই রটাবি তা হলে তার জিব টেনে ছিঁড়ে ফেল্‌ব।

দূরে কোলাহল।

অনেকে মিলিয়া। এসেছে—এসেছে।

সকলে। ওরে; এসেছেরে; জালন্ধরের সৈন্য এসে পৌচেছে।

১। তবে আর কি! এবারে লুঠ কর্ত্তে ুম। ঐ, জনার্দ্দন থলে ভরে গরুর পিঠে বোঝাই করচে! এই বেলা চল্। ঐ জনার্দ্দনটাকে বাদ দিয়ে বাকী কটা গরু বোঝাইসুদ্ধ তাড়া করা যাক্।

২। তোরা যা ভাই! আমি তামাসা দেখে আসি। সার বেঁধে খোলা তলোয়ার হাতে যখন সৈন্য আসে আমার দেখ্‌তে বড় মজা লাগে।

তৃতীয় দৃশ্য।

ত্রিচূড়। প্রাসাদ।

অমরুরাজ, কুমারসেন।

অমরু। পালাও, পালাও। এসোনা আমার
রাজ্যে! আপনি মজিবে তুমি আমারে
মজাবে। তোমারে আশ্রয় দিয়ে চাহিনে
হইতে অপরাধী জালন্ধর রাজকাছে।
হেথা তব নাহি স্থান!

কুমার। আশ্রয় চাহিনে আমি।
অনিশ্চিত অদৃষ্টের পারাবার মাঝে
ভাসাইব জীবন তরণী,—তার আগে
ইলারে দেখিয়া যাব একবার শুধু
এই ভিক্ষা মাগি।

অম। আমি তারে জানায়েছি
কাশ্মীরে রয়েছ তুমি রাজমর্য্যাদায়
ক্ষুদ্র বলে আমাদের অবহেলা করে।
বিদেশে সংগ্রামযাত্রা মিছে ছল শুধু
বিবাহ ভাঙ্গিতে।

কু। ধিক্—ধিক্ প্রতারণা!
সরল বালিকা সে কি তোমারি দুহিতা?
এ নিষ্ঠুর মিথ্যা তারে কহিলে যখন
বিধাতা কি ঘুমাইতেছিল? শিরে তব
বজ্র পড়িল না ভেঙ্গে? এখনো সে বেঁচে
রয়েছে কি? যেতে দাও, যেতে দাও
মোরে—দিবে না কি যেতে? হান তবে
তরবারি—বোলো তারে মরে গেছি
আমি। প্রতারণা কোরো না তাহারে।

শঙ্করের প্রবেশ।

শঙ্কর। আসিছে সন্ধানে তব
শত্রুচর, পেয়েছি সংবাদ। এই বেলা
চল যাই।

কুমার। কোথা যাব? কি হবে লুকায়ে?
এ জীবন পারিনে বহিতে!

শঙ্কর। বনপ্রান্তে
তোমার অপেক্ষা করি আছেন সুমিত্রা।

কুমার। চল, যাই চল। ইলা, কোথা আছ ইলা!
ফিরে গেনু দুয়ারে আসিয়া! দুর্ভাগ্যের
দিনে, জগতের চারিদিকে রুদ্ধ হয়
আনন্দের দ্বার! প্রিয়ে, হতভাগ্য আমি,
তাই বলে নহি অবিশ্বাসী! চল, যাই!

চতুর্থ দৃশ্য।

ত্রিচূড়। অন্তঃপুর।

ইলা ও সখীগণ।

ইলা। মিছে কথা, মিছে কথা! তোরা চুপ কর!
আমি তার মন জানি। সখি ভাল করে
বেঁধে দে কবরী মোর ফুলমালা দিয়ে!
নিয়ে আয় সেই নীলাম্বর! স্বর্ণথালে
আন্ তুলে শুভ্র ফুল্ল মালতীর ফুল।
নির্ঝরিণীতীরে ওই বকুলের তলা
ভাল সে বাসিত; ওইখেনে শিলাতলে
পেতে দে আসনখানি। এমনি যতনে
প্রতিদিন করি সাজ; এমনি করিয়া
প্রতিদিন থাকি বসে; কে জানে কখন্
সহসা আসিবে ফিরে প্রিয়তম মোর!
এসেছিল আমাদের মিলন দেখিতে
পরে পরে দুটি পূর্ণিমার রাত, অস্ত
গেছে নিরাশ হইয়া। মনে স্থির জানি
এবার পূর্ণিমা নিশি হবে না নিষ্ফল।
আসিবে সে দেখা দিতে। নাই যদি
তোদের কি! আমারে সে ভুলে যা
আমিই সে বুঝিব অন্তরে। কেনই ব
না ভুলিবে, কি আছে আমার! ভুলে
সুখী হয় সেই ভাল—ভালবেসে যদি
সুখী হয় সেও ভাল! তোরা, সখি,
বকিস্‌নে আর! একটুকু চুপ কর!

গান।

গৌরী—কাওয়ালি।

আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি
তুমি অবসর মত বাসিয়ো!
আমি নিশিদিন হেথায় বসে আছি
তোমার যখন্ মনে পড়ে আসিয়ো!
আমি সারানিশি তোমা লাগিয়া
রব' বিরহ শয়নে জাগিয়া,
তুমি নিমেষের তরে প্রভাতে
এসে মুখপানে চেয়ে হাসিয়ো!
তুমি চিরদিন মধুপবনে
চির-বিকশিত বন-ভবনে
যেয়ো মনোমত পথ ধরিয়া
তুমি নিজ সুখ-স্রোতে ভাসিয়ো!
যদি তার মাঝে পড়ি আসিয়া
তবে আমিও চলিব ভাসিয়া,
যদি দূরে পড়ি তাহে ক্ষতি কি,
মোর স্মৃতি মন হতে নাশিয়ো!

পঞ্চম দৃশ্য।

কাশ্মীর। শিবির।

বিক্রমদেব, জয়সেন, যুধাজিৎ

জয়। কোথায় সে পালাবে রাজন্! ধরে
দিব তারে রাজপদে। বিবর দুয়ারে

অগ্নি দিলে বাহিরিয়া আসে ভুজঙ্গম
উত্তাপকাতর। সমস্ত কাশ্মীর ঘিরি
লাগাব আগুন; আপনি সে ধরা দিবে।

বিক্রম। এতদূর এনু পিছে পিছে,—কত বন,
কত নদী, কত তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ ভাঙ্গি;—
আজ সে পালাবে হাত ছেড়ে? চাহি তারে,
চাহি তারে আমি! সে না হলে সুখ নাই
নিদ্রা নাই মোর। শীঘ্র না পাইলে তারে
সমস্ত কাশ্মীর আমি খণ্ড দীর্ণ করি!
দেখিব কোথা সে আছে!

যুধা। ধরিবারে তারে
পুরস্কার করেছি ঘোষণা।

বিক্র। তারে পেলে
অন্য কার্য্যে দিতে পারি হাত। রাজ্য মোর
রয়েছে পড়িয়া; শূন্যপ্রায় রাজকোষ;
দুর্ভিক্ষ হয়েছে রাজ্য অরাজক দেশে
ফিরিতে পারিনে তবু। এ কি দৃঢ় পাশে
আমারে করেছে বন্দী শত্রু পালতক!
সচকিতে সদা মনে হয়, এই এল,
এই হল, ওই দেখা যায়, ওই বুঝি
উড়ে ধূলা, আর দেরি নাই, এই বার
বুঝি পাব তারে ধাবমান ঘনশ্বাস
ত্রস্ত আঁখি মৃগসম। শীঘ্র আন তারে
জীবিত কি মৃত! ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাক
মায়াপাশ! নতুবা যা কিছু আছে মোর
সব যাবে অধঃপাতে।

প্রহরীর প্রবেশ।

প্র। রাজা চন্দ্রসেন,
মহিষী রেবতী, এসেছেন ভেটিবার তরে।

বিক্রম। তোমরা সরিয়া যাও! (প্রহরীকে)
নিয়ে এস তাঁহাদের প্রণাম জানায়ে।
(অন্য সকলের প্রস্থান।)

কি বিপদ!
আসিছেন শাশুড়ী আমার! কি বলিব
শুধাইলে কুমারের কথা? কি করিব
মার্জ্জনা চাহেন যদি যুবরাজ তরে
সহিতে পারিনে আমি অশ্রু রমণীর!

চন্দ্রসেন ও রেবতীর প্রবেশ।

প্রণাম! প্রণাম আর্য্যা।

চন্দ্র। চিরজীবী হও!

রেব। জয়ী হও পূর্ণ হোক্ মনস্কাম তব।

চন্দ্র। শুনেছি তোমার কাছে কুমার হয়েছে
অপরাধী।

বিক্রম। অপমান করেছে আমারে।

চন্দ্র। বিচারে কি শাস্তি তার করেছ বিধান?

বিক্র। বন্দীভাবে অপমান করিলে স্বীকার,
করিব মার্জ্জনা।

রেবতী। এই শুধু? আর কিছু
নয়? অবশেষে মার্জ্জনা করিবে যদি
তবে কেন এত ক্লেশে এত সৈন্য লয়ে
এত দূরে আসা?

বিক্রম। ভৎর্সনা কোরোনা মোরে।
রাজার প্রধান কাজ আপনার মান
রক্ষা করা। যে মস্তক মুকুট বহিছে
অপমান পারে না বহিতে। মিছে কাজে
আসিনি হেথায়।

চন্দ্র। ক্ষমা তারে কর, বৎস,
বালক সে অল্পবুদ্ধি। ইচ্ছা কর যদি
রাজ্য হতে করিয়ো বঞ্চিত—কেড়ে নিয়ো
সিংহাসন-অধিকার। নির্ব্বাসন সেও
ভাল, প্রাণে বধিয়ো না!

বিক্রম। চাহিনা বধিতে

রেবতী। তবে কেন এত অস্ত্র এনেছ বহিয়া?
এত অসি শর? নির্দ্দোষ সৈনিকদের

বধ করে যাবে, যথার্থ যেজন দোষী
ক্ষমিবে তাহারে ?
বি। বুঝিতে পারিনে দেবি,
কি বলিছ তুমি।
চন্দ্র। কিছু নয়, কিছু নয়।
আমি তবে বলি বুঝাইয়া। সৈন্য যবে
মোর কাছে মাগিল কুমার—আমি তারে
কহিলাম, বিক্রম স্নেহের পাত্র মোর,
তার সনে যুদ্ধ নাহি সাজে। সেই ক্ষোভে
ক্রুদ্ধ যুবা প্রজাদের ঘরে ঘরে গিয়া
বিদ্রোহে করিল উত্তেজিত! অসন্তুষ্ট
মহারাণী তাই; রাজবিদ্রোহীর শাস্তি
করিছে প্রার্থনা তোমা কাছে। গুরু দণ্ড
দিয়ো না তাহারে, সে যে অবোধ বালক।
বিক্রম। আগে তারে বন্দী করে আনি। তার
পরে যথাযোগ্য করিব বিচার।
রেবতী। প্রজাগণ
লুকায়ে রেখেছে তারে। আগুন জ্বালাও
ঘরে ঘরে তাহাদের। শস্যক্ষেত্র কর
ছারখার। ক্ষুধা রাক্ষসীর হাতে সঁপি
দাও দেশ, তবে তারে করিবে বাহির!
চন্দ্র। চুপ কর চুপ কর রাণী। চল বৎস
শিবির ছাড়িয়া চল কাশ্মীর প্রাসাদে।
বিক্রম। পরে যাব অগ্রসর হও মহারাজ।
(চন্দ্রসেন ও রেবতীর প্রস্থান।)
ওরে হিংস্র নারী! ওরে নরকাগ্নি শিখা!
বন্ধুত্ব আমার সনে! এতদিন পরে
আপনার হৃদয়ের প্রতিমূর্ত্তিখানা
দেখিতে পেলেম ওই রমণীর মুখে!
অমনি শাণিত ক্রূর বক্র জ্বালারেখা
আছে কি ললাটে মোর? রুদ্ধ হিংসাভারে
অধরের দুই প্রান্ত পড়েছে কি নুয়ে?
অমনি কি তীক্ষ্ণ মোর উগ্র তিক্ত বাণী
ক্ষুধীর ছুরির মত বাঁকা বিষমাখা?
নহে নহে কভু নহে! এ হিংসা আমার
চোর নহে, ক্রূর নহে, নহে ছদ্মবেশী।
প্রচণ্ড প্রেমের মত প্রবল এ জ্বালা
অভ্রভেদী সর্ব্বগ্রাসী উদ্দাম উন্মাদ
দুর্নিবার! নহি আমি তোদের আত্মীয়।
হে বিক্রম, ক্ষান্ত কর এ সংহার খেলা!
এ শ্মশাননৃত্য তব থামাও থামাও;
নিবাও এ চিতা! পিশাচ পিশাচী যত
অতৃপ্ত হৃদয়ে লয়ে দীপ্ত হিংসাতৃষা
ফিরে যাক্ রুদ্ধরোষে, লালায়িত লোভে।
একদিন দিব বুঝাইয়া, নহি আমি
তোমাদের কেহ। নিরাশ করিব এই
গুপ্ত লোভ, বক্র রোষ, দীপ্ত হিংসাতৃষা!
দেখিব কেমন করে আপনার বিষে
আপনি জ্বলিয়া মরে নর-বিষধর!
রমণীর হিংস্রমুখ সূচিময় যেন—
কি ভীষণ, নিষ্ঠুর, একান্ত কুৎসিত!

চরের প্রবেশ।

চর। ত্রিচূড়ের অভিমুখে গেছেন কুমার।
বিক্রম। এ সংবাদ রাখিয়ো গোপনে! একা
আমি যাব সেথা মৃগয়ার ছলে।
চর। যে আদেশ।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

অরণ্য।

শুষ্ক পর্ণশয্যায় কুমার শয়ান। সুমিত্রা আসীন।

কুমার। কত রাত্রি?
সুমি। রাত্রি আর নাই ভাই। রাঙা
হয়ে উঠেছে আকাশ। শুধু বনচ্ছায়া
অন্ধকার রাখিয়াছে বেঁধে।

কুমার। সারারাত্রি
জেগে বসে আছ, বোন, ঘুম নেই চোখে?
সুমি। আগিয়াছি দুঃস্বপন দেখে। সারারাত
মনে হয় শুনি যেন পদশব্দ কার
শুষ্ক পল্লবের পরে। তরু-অন্তরালে
শুনি যেন কাহাদের চুপি চুপি কথা
বিজন মন্ত্রণা। শ্রান্ত আঁখি যদি কভু
মুদে আসে, দারুণ দুঃস্বপ্ন দেখে কেঁদে
জেগে উঠি; সুখসুপ্ত মুখখানি তব
দেখে পুন প্রাণ পাই প্রাণে!
কুমার। দুর্ভাবনা
দুঃস্বপ্ন-জননী। ভেবোনা আমার তরে
বোন্! সুখে আছি। মগ্ন হয়ে জীবনের
মাঝখানে, কে জেনেছে জীবনের সুখ?
মরণের তটপ্রান্তে বসে, এ যেন গো
প্রাণপণে জীবনের একান্ত সম্ভোগ।
এ সংসারে যত সুখ, যত শোভা, যত
প্রেম আছে, সকলি প্রগাঢ় হয়ে যেন
আমারে করিছে আলিঙ্গন। জীবনের
প্রতি বিন্দুটিতে যত মিষ্ট আছে, সব
আমি পেতেছি আস্বাদ! ঘন বন,
তুঙ্গ শৃঙ্গ, উদার আকাশ, উচ্ছ্বসিত
নির্ঝরিণী, আশ্চর্য্য এ শোভা। অযাচিত
ভালবাসা অরণ্যের পুষ্পবৃষ্টিসম
অবিশ্রাম হতেছে বর্ষণ। চারিদিকে
ভক্ত প্রজাগণ। তুমি আছ প্রীতিময়ী
শিয়রে বসিয়া। উড়িবার আগে বুঝি
জীবন বিহঙ্গ তার বিচিত্রবরণ
পাখা করিছে বিস্তার। ওই কাঠুরিয়া
গান গায়; শোনা যাবে রাজ্যের সংবাদ

কাঠুরিয়ার প্রবেশ ও গান।

বিভাস—একতালা।

বঁধু, তোমায় করব রাজা তরুতলে।
বনফুলের বিনোদ-মালা দেব গলে।
সিংহাসনে বসাইতে
হৃদয়খানি দেব পেতে,
অভিষেক করব তোমায় আঁখিজলে!

কুমার। (অগ্রসর হইয়া) বন্ধু আজি কি সংবাদ?
কাঠু। ভাল নয় প্রভু!
জয়সেন কাল রাত্রে জ্বালায়ে দিয়েছে
নন্দীগ্রাম; আজ আসে পাণ্ডুপুর পানে।
কুমার। হায়, ভক্ত প্রজা মোর, কেমনে
তোদের রক্ষা করি? ভগবান্, নির্দ্দয় কেন গো
নির্দ্দোষ দীনের পরে?
কাঠুরিয়া। (সুমিত্রার প্রতি) জননি, এনেছি
কাষ্ঠভার, রাখি শ্রীচরণে!
সুমিত্রা। বেঁচে থাক্!
(কাঠুরিয়ার প্রস্থান)

মধুজীবীর প্রবেশ।

কুমার। কি সংবাদ?
মধু। সাবধানে থেকো যুবরাজ।
তোমারে ধরে দেবে জীবিত কি মৃত
পুরস্কার পাইবে সে, ঘোষণা করেছে
যুধাজিৎ। বিশ্বাস কোরো না কারে প্রভু।
কুমা। বিশ্বাস করিয়া মরা ভাল;—অবিশ্বাস
কাহারে করিব? তোরা সব অনুরক্ত
বন্ধু মোর সবল হৃদয়।
মধু। মা জননি,
এনেছি সঞ্চয় করে কিছু বনমধু
দয়া করে কর মা গ্রহণ।
সুমি। ভগবান্
মঙ্গল করুন তোর।
(মধুজীবীর প্রস্থান)

শিকারীর প্রবেশ।

শি। জয় হোক্ প্রভু।
ছাগ শিকারের তরে যেতে হবে দূর
গিরিদেশে, দুর্গম সে পথ। তব পদে
প্রণাম করিয়া যাব। জয়সেন গৃহ
মোর দিয়াছে জ্বালায়ে।

কুমার। ধিক্ সে পিশাচ!

শিকা। আমার শিকারী। যতদিন বন আছে
আমাদের কে পারে করিতে গৃহহীন?
কিছু খাদ্য এনেছি জননী, দরিদ্রের
তুচ্ছ উপহার। আশীর্ব্বাদ কর যেন
ফিরে এসে আমাদের যুবরাজে দেখি
সিংহাসনে।

কু। (বাহু বাড়াইয়া)এস তুমি, এস আলিঙ্গনে।
(শিকারীর প্রস্থান।)
ওই দেখ পল্লব ভেদিয়া, পড়িতেছে
রবিকররেখা। যাই নির্ঝরের ধারে
স্নান সন্ধ্যা করি সমাপন! শিলাতটে
বসে বসে কতক্ষণ দেখি আপনার
ছায়া, আপনারে ছায়া বলে মনে হয়।
নদী হয়ে গেছে চলে এই নির্ঝরিণী
ত্রিচূড় প্রমোদবন দিয়ে। ইচ্ছা করে
ছায়া মোর ভেসে যায় স্রোতে, যেথা যাই
সন্ধ্যাবেলা বসে থাকে তীরতরুতলে
ইলা;—তার ম্লান ছায়াখানি সঙ্গে নিয়ে
চিরকাল ভেসে যায় সাগরের পানে!
থাক্ থাক্ কল্পনা স্বপন। চল, বোন,
যাই নিত্য কাজে! ওই শোন চারিদিকে
অরণ্য উঠেছে জেগে বিহঙ্গের গানে।

সপ্তম দৃশ্য।

ত্রিচূড়। প্রমোদবন।

বিক্রমদেব অমরুরাজ।

অমরু। তোমারে করিনু সমর্পণ, যাহা আছে
মোর। তুমি বীর, তুমি রাজ অধিরাজ
তব যোগ্য কন্যা মোর, তারে লহ তুমি!
সহকার মাধবিকালতার আশ্রয়।
ক্ষণেক বিলম্ব কর, মহারাজ, তারে
দিই পাঠাইয়া। (প্রস্থান

বিক্রম। কি মধুর শান্তি হেথা!
চিরন্তন অরণ্য আবাস, সুখসুপ্ত
ঘনচ্ছায়া, নির্ঝরিণী নিরন্তর-ধ্বনি।
শান্তি যে শীতল এত, এমন গম্ভীর,
এমন নিস্তব্ধ তবু এমন প্রবল
উদার সমুদ্রসম, বহুদিন ভুলে
ছিনু যেন! মনে হয়, আমার প্রাণের
অনন্ত অনল দাহ, সেও যেন হেথা
হারাইয়া ডুবে যায়, না থাকে নির্দ্দেশ,
এত ছায়া, এত স্থান, এত গভীরতা!
এমনি নিভৃত সুখ ছিল আমাদের,
গেল কার অপরাধে? আমার, কি তার?
যারি হোক্—এ জনমে আর কি পাব না!
যাও তবে! একেবারে চলে যাও দূরে!
জীবনে থেকোনা জেগে অনুতাপরূপে!
দেখা যাক যদি এইখানে—সংসারের
নির্জ্জন নেপথ্য দেশে পাই নব প্রেম,
তেমনি অতলস্পর্শ, তেমনি মধুর!

সখীর সহিত ইলার প্রবেশ।

একি অপরূপ মূর্ত্তি! চরিতার্থ আমি!
আসন গ্রহণ কর দেবি। কেন মৌন,
নতশির, কেন ম্লানমুখ, দেহলতা
কম্পিত কাতর? কিসের বেদনা তব?

ইলা। (নতজানু) শুনিয়াছি মহারাজ-অধিরাজ
তুমি, সসাগরা ধরণীর পতি। ভিক্ষা আছে
তোমার চরণে!

বিক্রম। উঠ উঠ হে সুন্দরি!
তব পদ-স্পর্শযোগ্য নহে এ ধরণী
তুমি কেন ধূলায় পতিত? চরাচরে
কিবা আছে অদেয় তোমারে?

ইলা। মহারাজ,
পিতা মোরে দিয়াছেন সঁপি তব হাতে;
আপনারে ভিক্ষা চাহি আমি। ফিরাইয়া
দাও মোরে। কত ধন, রত্ন, রাজ্য, দেশ,
আছে তব, ফেলে রেখে যাও মোরে এই
ভূমিতলে; তোমার অভাব কিছু
নাই!

বিক্রম। আমার অভাব নাই? কেমনে দেখাব
গোপন হৃদয়? কোথা সেথা ধনরত্ন?
কোথা সসাগরা ধরা? সব শূন্যময়!
রাজ্য ধন না থাকিত যদি,—শুধু তুমি
থাকিতে আমার—

ইলা। (উঠিয়া) লহ তবে এ জীবন।
তোমরা যেমন করে বনের হরিণী
নিয়ে যাও, বুকে তার তীক্ষ্ণতীর বিঁধে,
তেমনি হৃদয় মোর বিদীর্ণ করিয়া
জীবন কাড়িয়া আগে, তার পরে মোরে
নিয়ে যাও।

বিক্রম। কেন দেবি মোর পরে এত
অবহেলা? আমি কি নিতান্ত তব যোগ্য
নহি? এত রাজ্য, দেশ, করিলাম জয়,
প্রার্থনা করেও আমি পাবনা কি তবু
হৃদয় তোমার?

ইলা। সে কি আর আছে মোর?
সমস্ত সঁপেছি যারে, বিদায়ের কালে
হৃদয় সে নিয়ে চলে গেছে, বলে গেছে—
ফিরে এসে দেখা দেবে এই উপবনে।
কতদিন হল! বনপ্রান্তে দিন আর
কাটেনাক! পথ চেয়ে সদা প'ড়ে আছি;
যদি এসে দেখিতে না পায়, ফিরে যায়,
আর যদি ফিরিয়া না আসে! মহারাজ,
কোথা নিয়ে যাবে? রেখে যাও তার তরে
যে আমারে ফেলে রেখে গেছে।

বিক্রম। না জানি সে
কোন্ ভাগ্যবান্। সাবধান, অতি-প্রেম
সহে না বিধির। শুন তবে মোর কথা।
এককালে চরাচর তুচ্ছ করি আমি
শুধু ভালবাসিতাম; সে প্রেমের পরে
পড়িল বিধির হিংসা; জেগে দেখিলাম
চরাচর পড়ে আছে, প্রেম গেছে ভেঙ্গে!
বসে আছ যার তরে কি নাম তাহার?

ইলা। কাশ্মীরের যুবরাজ—কুমার তাহার
নাম।

বিক্রম। কুমার?

ইলা। তারে জান তুমি! কেই বা
না জানে। সমস্ত কাশ্মীর তারে দিয়েছে
হৃদয়।

বিক্রম। কুমার? কাশ্মীরের যুবরাজ?

ইলা। সেই বটে মহারাজ! তার নাম সদা
ধ্বনিছে চৌদিকে। তোমারি সে বন্ধু বুঝি।
মহৎ সে ধরণীর যোগ্য অধিপতি।

বিক্রম। তাহার সৌভাগ্যরবি গেছে অস্তাচলে,
ছাড় তার আশা! শিকারের মৃগসম
সে আজ তাড়িত, ভীত, আশ্রয়বিহীন,
গোপন অরণ্যছায়ে রয়েছে লুকায়ে।

কাশ্মীরের দীনতম ভিক্ষাজীবী আজ
সুখী তার চেয়ে।

ইলা। কি বলিলে মহারাজ?

বিক্রম। তোমরা বসিয়া থাক ধরাপ্রান্তভাগে;
শুধু ভালবাস। জাননা বাহিরে বিশ্বে
গরজে সংসার; কর্ম্মস্রোতে কে কোথায়
ভেসে যায়; ছল ছল বিশাল নয়নে
তোমরা চাহিয়া থাক! বৃথা তার আশা!

ইলা। সত্য বল মহারাজ। ছলনা কোরো না।
জেনো এই অতি ক্ষুদ্র রমণীর প্রাণ,
শুধু আছে তারি তরে, তারি পথ চেয়ে।
কোন্ গৃহহীন পথে কোন্ বনমাঝে
কোথা ফিরে কুমার আমার? আমি যাব,
বলে দাও—গৃহ ছেড়ে কখনো যাইনি,
কোথা যেতে হবে? কোন্ দিকে, কোন্
পথে?

বিক্রম। বিদ্রোহী সে, রাজসৈন্য ফিরিতেছে
সদা সন্ধানে তাহার।

ইলা। তোমরা কি বন্ধু নহ তার?
তোমরা কি রক্ষা করিবে না তারে?
রাজপুত্র ফিরিতেছে বনে, তোমরা কি
রাজা হয়ে দেখিবে চাহিয়া? এতটুকু
দয়া নেই কারো? প্রিয়তম, প্রিয়তম,
আমি ত জানিনে, নাথ, সঙ্কটে পড়েছ
আমি হেথা বসে আছি তোমার লাগিয়া।
অনেক বিলম্ব দেখে মাঝে মাঝে মনে
চকিত বিদ্যুৎ সম বেজেছে সংশয়।
শুনেছিনু এতলোক ভালবাসে তারে
কোথা তারা বিপদের দিনে? তুমি না কি
পৃথিবীর রাজা। বিপন্নের কেহ নহ?
এত সৈন্য, এত যশ, এত বল নিয়ে
দূরে বসে রবে। তবে পথ বলে দাও।
জীবন সঁপিব একা অবলা রমণী!

বিক্রম। কি প্রবল প্রেম! ভালবাস' ভালবাস'
এমনি সবেগে চির দিন। যে তোমার
হৃদয়ের রাজা, শুধু তারে ভালবাস।
প্রেমস্বর্গচ্যুত আমি, তোমাদের দেখে
ধন্য হই। দেখি চাহিনে তোমার প্রেম;
শুষ্ক শাখে ঝরে ফুল, অন্য তরু হতে
ফুল ছিঁড়ে নিয়ে তারে কেমনে সাজাব?
আমারে বিশ্বাস কর—আমি বন্ধু তব;
চল মোর সাথে, আমি তারে এনে দেব,
সিংহাসনে বসায়ে কুমারে—তার হাতে
সঁপি দিব তোমারে কুমারী!

ইলা। মহারাজ,
প্রাণ দিলে মোরে। যেথা যেতে বল যাব।

বিক্রম। এস তবে প্রস্তুত হইয়া। যেতে হবে
কাশ্মীরের রাজধানী মাঝে

(ইলা ও সখীর প্রস্থান।)

যুদ্ধ নাহি
ভাল লাগে। শান্তি আরো অসহ দ্বিগুণ।
গৃহহীন পলাতক, তুমি সুখী মোর
চেয়ে! এ সংসারে যেথা যাও, সাথে থাকে
রমণীর অনিমেষ প্রেম, দেবতার
ধ্রুবদৃষ্টিসম; পবিত্র কিরণে তারি
দীপ্তি পায় বিপদের মেঘ, স্বর্ণময়
সম্পদের মত। আমি কোন্ সুখে ফিরি
দেশ দেশান্তরে, স্কন্ধে ব'হে জয়ধ্বজা,
অন্তরেতে অভিশপ্ত হিংসাতপ্ত প্রাণ।
কোথা আছে কোন্ স্নিগ্ধ হৃদয়ের মাঝে
প্রস্ফুটিত শুভ্রপ্রেম শিশির-শীতল।
ধুয়ে দাও, প্রেমময়ি, পুণ্য অশ্রুজলে
এ মলিন হস্ত মোর রক্তকলুষিত।

প্রহরীর প্রবেশ।

প্র। ব্রাহ্মণ এসেছে মহারাজ, তব সাথে
সাক্ষাতের তরে।

বিক্রম। নিয়ে এস দেখা যাক্।

দেবদত্তের প্রবেশ।

দেব। রাজার দোহাই। ব্রাহ্মণেরে রক্ষা কর!
বিক্রম। এ কি! তুমি। কোথা হতে এলে?
অনুকূল দৈব মোর পরে। তুমি বন্ধুরত্ন মোর!
দেব। তাই বটে, মহারাজ, রত্ন বটে আমি!
অতি যত্নে বন্ধ করে রেখেছিলে তাই।
ভাগ্যবলে পলায়েছি খোলা পেয়ে দ্বার।
আবার দিয়ো না সঁপি প্রহরীর হাতে
রত্নভ্রমে। আমি শুধু বন্ধুরত্ন নহি,
ব্রাহ্মণীর স্বামীরত্ন আমি। সে কি হায়
এতদিন বেঁচে আছে আর?
বিক্রম। এ কি কথা!
আমিত জানিনে কিছু, এত দিন রুদ্ধ
আছ তুমি!
দে। তুমি কি জানিবে মহারাজ!
তোমার প্রহরী দুটো জানে! কত শাস্ত্র
বলি তাহাদের, কত কাব্যকথা, শুনে
মূর্খ দুটো হাসে! একদিন বর্ষা দেখে
বিরহ-ব্যথায় মেঘদূত কাব্যখানা
শুনালেম দোঁহে ডেকে; গ্রাম্য মূর্খ দুটো
পড়িল কাতর হয়ে নিদ্রার আবেশে।
তখনি ধিক্কারভরে কারাগার ছাড়ি
আসিনু চলিয়া। বেছে বেছে ভাল লোক
দিয়েছিলে বিরহী এ ব্রাহ্মণের পরে!
এত লোক আছে সখা অধীনে তোমার
শাস্ত্র বোঝে এমন কি ছিল না দুজন?
বিক্রম। বন্ধুবর, বড় কষ্ট দিয়েছে তোমারে!
সমুচিত শাস্তি দিব তারে, যে পাষণ্ড
রেখেছিল রুধিয়া তোমায়! নিশ্চয় সে
ক্রূরমতি জয়সেন
দে। শাস্তি পরে হবে।
আপাতত যুদ্ধ রেখে, অবিলম্বে দেশে
ফিরে চল। সত্য কথা বলি, মহারাজ,
বিরহ সামান্য ব্যথা নয়; এবার তা
পেরেছি বুঝিতে! আগে আমি ভাবিতাম
শুধু বড় বড় লোক বিরহেতে মরে;
এবার দেখেছি, সামান্য এ ব্রাহ্মণের
ছেলে, এরেও ছাড়ে না পঞ্চবাণ; ছোট
বড় বরে না বিচার!
বিক্রম। যম আর প্রেম
উভয়েরি সমদৃষ্টি সর্ব্বভুতে। বন্ধু
ফিরে চল দেশে। কেবল, যাবার আগে
এক কাজ বাকী আছে। তুমি লহ ভার!
অরণ্যে কুমারসেন আছে লুকাইয়া,
ত্রিচূড়রাজের কাছে সন্ধান পাইবে
সখে, তার কাছে যেতে হবে। বোলো
তারে আর আমি শত্রু নহি। অস্ত্র ফেলে
দিয়ে বসে আছি প্রেমে বন্দী করিবারে
তারে! আর সখা,—আর কেহ যদি থাকে
সেথা—যদি দেখা পাও কারো—
দেব। জানি, জানি—
তাঁর কথা জাগিতেছে হৃদয়ে সতত!
এতক্ষণ বলি নাই কিছু। মুখে যেন
সরে না বচন। এখন তাঁহার কথা
বচনের অতীত হয়েছে। সাধ্বী তিনি,
তাই এত দুঃখ তাঁর। তাঁরে মনে করে
মনে পড়ে পুণ্যবতী জানকীর কথা!
চলিলাম তবে!
বিক্রম। বসন্ত না আসিতেই
আগে আসে দক্ষিণ পবন, তার পরে
পল্লবে কুসুমে বনশ্রী প্রফুল্ল হয়ে
ওঠে। তোমারে হেরিয়া আশা হয় মনে
আবার আসিবে ফিরে সেই পুরাতন
দিন মোর, নিয়ে তার সব সুখ ভার!

নবম দৃশ্য।

—:*:—

অরণ্য।

কুমারের দুইজন অনুচর।

১। হ্যা দেখ্ মাধু, কাল যে স্বপ্নটা দেখলুম তার কোন মানে ভেবে পাচ্চিনে। সহরে গিয়ে দৈবিজ্ঞি ঠাকুরের কাছে শুনিয়ে নিয়ে আস্‌তে হবে।

২। কি স্বপ্নটা বল্‌ত শুনি।

১। যেন একজন মহাপুরুষ ঐ জল থেকে উঠে আমাকে তিনটে বড় বড় বেল দিতে এল। আমি দুটো দুহাতে নিলুম,—আর একটা কোথায় নেব ভাবনা পড়ে গেল।

২। দূর মূর্খ, তিনটেই চাদরে বেঁধে নিতে হয়।

১। আরে জেগে থাকলে ত সকলেরই বুদ্ধি যোগায় —সে সময়ে তুই কোথায় ছিলি? তার পরে শোন্‌না; সেই বাকী বেলটা মাটিতে পড়েই গড়াতে আরম্ভ করলে, আমি তার পিছন পিছন ছুটলুম। হঠাৎ দেখি যুবরাজ অশথতলায় বসে আহ্নিক করচেন। বেলটা ধপ্ করে তাঁর কোলের উপরে গিয়ে লাফিয়ে উঠ্‌ল। আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

২। এটা আর বুঝ্‌তে পারলিনে। কিন্তু যুবরাজ শীগ্‌গির রাজা হবে?

২। আমিও তাই ঠাউরেছিলুম। কিন্তু আমি যে দুটো বেল পেলুম আমার কি হবে।

তোর আবার হবে কি? এ বৎসর তোর ক্ষেতে বেগুন বেশী করে ফল্‌বে।

১। না ভাই, আমি ঠাউরে রেখেছি আমার দুই পুত্তুর সন্তান হবে।

২। হা ভাগ ভাই বল্লে পিত্তয় যাবিনে কাল ভারি আশ্চর্য্য কাণ্ড হয়ে গেছে। ঐ জলের ধারে বসে রামচরণে আমাতে চিঁড়ে ভিজিয়ে খাচ্ছিলুম তা আমি কথায় কথায় বলুম আমাদের দোবেজী গুণে বলেছে যুবরাজের ফাঁড়া প্রায় কেটে এসেছে। আর দেরি নেই। এবার শীগ্‌গির রাজা হবে। হঠাৎ মাথার উপর কে তিনবার বলে উঠল "ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্,"—উপরে চেয়ে দেখি, ডুমুরের ডালে এত বড় একটা টিক্‌টিকি!

——

রামচরণের প্রবেশ।

১। কি খবর রামচরণ!

রা। ওরে ভাই আজ একটা ব্রাহ্মণ এই বনের আশেপাশে যুবরাজের সন্ধান নিয়ে ফিরছিল। আমাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কত কথাই জিগ্‌গেসা করলে। আমি তেমনি বোকা আর কি? আমিও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জবাব দিতে লাগলুম। অনেক খোঁজ করে শেষকালে চলে গেল। তাঁকে আমি চিত্তলের রাস্তা দেখিয়ে দিলুম। ব্রাহ্মণ না হলে তাকে আজ আর আমি আস্ত রাখ্‌তুম না।

২। কিন্তু তাহলে ত এ বন ছাড়তে হচ্চে। বেটারা সন্ধান পেয়েছে দেখ্‌চি।

১। এইখেনে বসে পড় না ভাই রামচরণ —দুটো গল্প করা যাক্।

রাম। যুবরাজের সঙ্গে আমাদের মাঠাক্‌রুণ এই দিকে আস্‌চেন। চল্ ভাই, ওফাতে গিয়ে বসিগে।

(প্রস্থান)

——

কুমারসেন ও সুমিত্রার প্রবেশ।

কুমার। শঙ্কর পড়েছে ধরা। রাজ্যের
সংবাদ নিতে গিয়েছিল বৃদ্ধ, গোপনে ধরিয়া

ছদ্মবেশ। শত্রুচর ধরেছে তাহারে।
নিয়ে গেছে জয়সেন কাছে। শুনিয়াছি
চলিতেছে নিষ্ঠুর পীড়ন তা'র পরে—
তবু সে অটল। একটি কথাও তারা
পারে নাই মুখ হতে করিতে বাহির!

সুমি। হায় বৃদ্ধ প্রভুবৎসল! প্রাণাধিক
ভালবাস যারে সেই কুমারের কাজে
সঁপি দিলে তোমার কুমারগত প্রাণ!

কুমার। এ সংসারে সব চেয়ে বন্ধু সে আমার,
আজন্মের সখা। আপনার প্রাণ দিয়ে
আড়াল করিয়া, চাহে সে রাখিতে মোরে
নিরাপদে। অতি বৃদ্ধ ক্ষীণ জীর্ণ দেহ,
কেমনে সে সহিছে যন্ত্রণা? আমি হেথা
সুখে আছি লুকায়ে বসিয়া!

সুমিত্রা। আমি যাই,
ভাই! ভিখারিণীবেশে সিংহাসন তলে
গিয়া—শঙ্করের প্রাণভিক্ষা মেগে আসি!

কুমার। বাহির হইতে তারা আবার
তোমারে দিবে ফিরাইয়া। তোমার
পিতার রাজ্য হবে নতশির। বজ্রসম
বাজিবে সে মর্ম্মে গিয়ে মোর।

চরের প্রবেশ।

চর। গত রাত্রে গীধকূট
জ্বালায়ে দিয়েছে জয়সন। গৃহহীন
গ্রামবাসিগণ আশ্রয় নিয়েছে গিয়ে
মন্দুর অরণ্যমাঝে।

(প্রস্থান)

কুমার। আর ত সহেনা।
ঘৃণা হয় এ জীবন করিতে বহন
সহস্রের জীবন করিয়া ক্ষয়।

সুমি। চল
মোরা দুইজনে যাই রাজসভা মাঝে;
দেখিব কেমনে, কোন ছলে জালন্ধর
স্পর্শ করে কেশ তব।

কুমার। শঙ্কর বলিত,—
"প্রাণ যায় সেও ভাল, তবু বন্দীভাবে
কখনো দিওনা ধরা।" পিতৃসিংহাসনে
বসি বিদেশের রাজা, দণ্ড দিবে মোরে
বিচারের ছল করি—এ কি সহ্য হবে?
অনেক সহেছি বোন্, পিতৃপুরুষের
অপমান সহিব কেমনে।

সুমিত্রা। তার চেয়ে
মৃত্যু ভাল।

কুমার। বল, বোন, বল "তার চেয়ে
মৃত্যু ভাল।" এই ত তোমার যোগ্য কথা।
তার চেয়ে মৃত্যু ভাল। ভাল করে ভেবে
দেখ! বেঁচে থাকা ভীরুতা কেবল। বল
এ কি সত্য নয়? থেকো না নীরব হয়ে,
বিষাদ-আনত নেত্রে চেয়ো না ভূতলে।
মুখ তোল, স্পষ্ট করে বল একবার
ঘৃণিত এ প্রাণ লয়ে লুকায়ে লুকায়ে
নিশিদিন মরে থাকা এক দণ্ড এ কি
উচিত আমার।

সুমি। ভাই—

কুমার! আমি রাজপুত্র,
ছারখার হয়ে যায় সোণার কাশ্মীর,
পথে পথে বনে বনে ফিরে গৃহহীন
প্রজা,—কেঁদে মরে পতিপুত্রহীন নারী।
তবু আমি কোন মতে বাঁচিব গোপনে।

সুমি। তার চেয়ে মৃত্যু ভাল।

কুমা। বল, তাই বল।
ভক্ত যারা অনুরক্ত মোর—প্রতিদিন
সঁপিছে আপন প্রাণ নির্য্যাতন সহি।
তবু আমি তাহাদের পশ্চাতে লুকায়ে
জীবন করিব ভোগ—একি বেঁচে থাকা!

সুমি। এর চেয়ে মৃত্যু ভাল।

কুমার। বাঁচিলাম শুনে।
কোন মতে রেখেছিনু তোমারি লাগিয়া
এ হীন জীবন, প্রত্যেক নিশ্বাসে মোর
নির্দ্দোষের প্রাণবায়ু করিয়া শোষণ।
আমার চরণ ছুঁয়ে করহ শপথ
যে কথা বলিব তাহা করিবে পালন
যতই কঠিন হোক!
সুমি। করিনু শপথ!

কুমা। এ জীবন দিব বিসর্জ্জন। তার পরে
তুমি মোর ছিন্নমুণ্ড নিয়ে, নিজহস্তে
জালন্ধররাজকরে দিবে উপহার।
বলিও তাহারে—"কাশ্মীরে অতিথি তুমি;
ব্যাকুল হয়েছে এত যে দ্রব্যের তরে
কাশ্মীরের যুবরাজ দিতেছেন তাহা
আতিথ্যের অর্ঘ্যরূপে তোমারে পাঠায়ে"
মৌন কেন বোন। সঘনে কাঁপিছে কেন
চরণ তোমার। বস এই তরুতলে!
পারিবে না তুমি। একান্ত অসাধ্য এ কি!
তবে কি ভৃত্যের হস্তে পাঠাইতে হবে
তুচ্ছ উপহার সম এ রাজমস্তক?
সমস্ত কাশ্মীর তারে ফেলিবে যে রোষে
ছিন্ন ভিন্ন করি। (সুমিত্রার মূর্চ্ছা)
ছি ছি বোন। উঠ, উঠ!
পাষাণে হৃদয় বাঁধ। হোয়ো না বিহ্বল।
দুঃসহ এ কাজ—তাইত তোমার পরে
দিতেছি দুরূহ ভার। অয়ি প্রাণাধিকে,
মহৎ হৃদয় ছাড়া কাহারে সহিবে
জগতের মহাক্লেশ যত। বল, বোন,
পারিবে করিতে?

সু। পারিব।

কুমার। দাঁড়াও তবে।
ধর বল, তোল শির। উঠাও জাগায়ে
সমস্ত হৃদয় মন। ক্ষুদ্র নারী সম
আপন বেদনা ভারে পোড়ো না ভাঙিয়া।

সুমিত্রা। অভাগিনী ইলা!

কুমার। তারে কি জানিনে আমি?
হেন অপমান লয়ে সে কি মোরে কভু
বাঁচিতে বলিত? সে আমার ধ্রুবতারা
মহৎ মৃত্যুর দিকে দেখাইছে পথ।
কাল পূর্ণিমার তিথি মিলনের রাত!
জীবনের গ্লানি হতে মুক্ত ধৌত হয়ে
চির মিলনের বেশ করিব ধারণ!
চল বোন। আগে হতে সংবাদ পাঠাই
দূতমুখে রাজসভা মাঝে, কাল আমি
যাব ধরা দিতে। তাহা হলে অবিলম্বে
শঙ্কর পাইবে ছাড়া—বান্ধব আমার।

দশম দৃশ্য।

—•:•:•—

কাশ্মীর রাজসভা।

বিক্রমদেব, চন্দ্রসেন।

বিক্রম। আর্য্য, তুমি কেন আজ নীরব এমন?
মার্জ্জনা ত করেছি কুমারে!

চন্দ্র। তুমি তারে
মার্জ্জনা করেছ। আমি ত এখনো তার
বিচার করিনি। বিদ্রোহী সে মোর
কাছে। এবার তাহার শাস্তি দিব।

বিক্রম। কোন্ শাস্তি
করিয়াছ স্থির।

চন্দ্র। সিংহাসন হতে তারে
করিব বঞ্চিত।

বিক্রম। অতি অসম্ভব কথা!
সিংহাসন দিব তারে নিজ হস্তে আমি।

চন্দ্র। কাশ্মীরের সিংহাসনে তোমার কি আছে
অধিকার!

বিক্রম। বিজয়ীর অধিকার।
চন্দ্র। তুমি
হেথা আছ বন্ধুভাবে অতিথির মত।
কাশ্মীরের সিংহাসন কর নাই জয়।
বিক্রম। বিনা যুদ্ধে করিয়াছে কাশ্মীর আমারে
আত্মসমর্পণ। যুদ্ধ চাও, যুদ্ধ কর,
রয়েছি প্রস্তুত। আমার এ সিংহাসন।
যারে ইচ্ছা দিব।
চন্দ্র। তুমি দিবে। জানি আমি
গর্ব্বিত কুমারসেনে জন্মকাল হতে।
সে কি লবে আপনার পিতৃসিংহাসন
ভিক্ষার স্বরূপে। প্রেম দাও প্রেম লবে
হিংসা দাও প্রতিহিংসা লবে, ভিক্ষা দাও
ঘৃণাভরে পদাঘাত করিবে তাহাতে।
বিক্রম। এত গর্ব্ব যদি তার তবে সে কি কভু
ধরা দিতে মোর কাছে আপনি আসিত?
চন্দ্র। তাই ভাবিতেছি, মহারাজ, নহে ইহা
কুমারসেনের মত কাজ। দৃপ্ত যুবা
সিংহসম। সে কি আজ স্বেচ্ছায় আসিবে
শৃঙ্খল পরিতে গলে? জীবনের মায়া
এতই কি বলবান্‌।

প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহ। শিবিকার দ্বার
রুদ্ধ করি প্রাসাদে আসিছে যুবরাজ।
বিক্রম। শিবিকার দ্বার রুদ্ধ?
চন্দ্র। সে কি আর কভু
দেখাইবে মুখ? আপনার পিতৃরাজ্যে
আসিছে সে স্বেচ্ছাবন্দী হয়ে; রাজপথে
লোকারণ্য চারিদিকে, সহস্রের আঁখি
রয়েছে তাকায়ে। কাশ্মীর ললনা যত
গবাক্ষে দাঁড়ায়ে। উৎসবের পূর্ণচন্দ্র
চেয়ে আছে আকাশের মাঝখান হতে!
সেই চিরপরিচিত গৃহ পথ হাট
সরোবর মন্দির কানন; পরিচিত
প্রত্যেক প্রজার মুখ—কোন্‌ লাজে আজি
দেখা দিবে সবারে সে? মহারাজ, শোন
নিবেদন। গীতবাদ্য বন্ধ করে দাও!
এ উৎসব উপহাস মনে হবে তার!
আজ রাত্রে দীপালোক দেখে, ভাবিবে সে
নিশীথ তিমিরে পাছে লজ্জা ঢাকা পড়ে
তাই এত আলো! এ আলোক শুধু বুঝি
অপমান-পিশাচের পরিহাস-হাসি!

দেবদত্তের প্রবেশ।

দেব। জয়োস্তু রাজন্‌! কুমারের অন্বেষণে
বনে বনে ফিরিয়াছি, পাই নাই দেখা।
আজ শুনিলাম নাকি আসিছেন তিনি
স্বেচ্ছায় নগরে ফিরি। তাই চলে এনু।
বিক্র। করিব রাজার মত অভ্যর্থনা তারে।
তুমি হবে পুরোহিত অভিষেক কালে।
পূর্ণিমা নিশীথে আজ কুমারের সনে
ইলার বিবাহ হবে, করেছি তাহার
আয়োজন।

নগরের ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ।

সকলে। মহারাজ, জয় হক্‌।
প্রথম। করি
আশীর্ব্বাদ, ধরণীর অধীশ্বর হও।
লক্ষ্মী হোন্‌ অচলা তোমার গৃহে সদা।
আজ যে আনন্দ তুমি দিয়েছ সবারে
বলিতে শকতি নাহি—লহ মহারাজ
কৃতজ্ঞ এ কাশ্মীরের কল্যাণ আশিষ।
(রাজার মস্তকে ধান্য দূর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ)
বিক্র। ধন্য আমি কৃতার্থ জীবন।
(ব্রাহ্মণগণের প্রস্থান।)

যষ্টিহস্তে কষ্টে শঙ্করের প্রবেশ।

শঙ্কর। (চন্দ্রসেনের প্রতি) মহারাজ!
এ কি সত্য? যুবরাজ আসিছেন নিজে
শত্রুকরে করিবারে আত্মসমর্পণ?
বল, এ কি সত্য কথা?
চন্দ্র। সত্য বটে!
শঙ্কর। ধিক্!
সহস্র মিথ্যার চেয়ে এই সত্যে ধিক্!
হায় যুবরাজ, বৃদ্ধ ভৃত্য আমি তব,
সহিলাম এত যে যন্ত্রণা, জীর্ণ অস্থি
চূর্ণ হয়ে গেল, মূক সম রহিলাম
তবু, সে কি এরি তরে? অবশেষে তুমি
আপনি ধরিলে বন্দীবেশ, কাশ্মীরের
রাজপথ দিয়ে চলে এলে নত শিরে
বন্দিশালা মাঝে? এই কি সে রাজসভা
পিতামহদের? যেথা বসি পিতা তব
উঠিতেন ধরণীর সর্ব্বোচ্চ শিখরে
সে আজ তোমার কাছে ধরার ধূলার
চেয়ে নীচে! তার চেয়ে নিরাশ্রয় পথ
গৃহ তুল্য, অরণ্যের ছায়া সমুজ্জ্বল,
কঠিন পর্ব্বতশৃঙ্গ অনুর্ব্বর মরু
রাজার সম্পদে পূর্ণ! চিরভৃত্য তব
আজি দুর্দ্দিনের আগে মরিল না কেন?
বিক্রম। ভাল হতে মন্দটুকু নিয়ে, বৃদ্ধ, মিছে
এ তব ক্রন্দন!
শঙ্কর। রাজন্, তোমার কাছে
আসিনি কাঁদিতে। স্বর্গীয় রাজেন্দ্রগণ
রয়েছেন জাগি ওই সিংহাসন কাছে
আজি তাঁরা ম্লানমুখ, লজ্জানত শির,
তাঁরা বুঝিবেন মোর হৃদয়-বেদনা।
বিক্রম। কেন মোরে শত্রু বলে করিতেছ ভ্রম?
মিত্র আমি আজি।
শঙ্কর। অতিশয় দয়া তব
জালন্ধরপতি! মার্জ্জনা করেছ তুমি!
দণ্ড ভাল মার্জ্জনার চেয়ে!
বিক্রম। এর মত
হেন ভক্ত বন্ধু হায় কে আমার আছে?
দেব। আছে বন্ধু, আছে মহারাজ!
(বাহিরে হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, কোলাহল।)
(শঙ্করের দুই হস্তে মুখ আচ্ছাদন)

—

প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহ। আসিয়াছে
দুয়ারে শিবিকা।
বিক্রম। বাদ্য কোথা, বাজাইতে
বল! চল, সখা, অগ্রসর হয়ে তারে
অভ্যর্থনা করি! (বাস্তোত্থম)

—

সভামধ্যে শিবিকার প্রবেশ

বিক্রম। (অগ্রসর হইয়া) এস, এস, বন্ধু এস!
(স্বর্ণথালে ছিন্নমুণ্ড লইয়া সুমিত্রার শিবিকা-
বাহিরে আগমন। সহসা সমস্ত বাদ্য নীরব)
বিক্রম। সুমিত্রা! সুমিত্রা!
চন্দ্র। এ কি, জননি, সুমিত্রা!
সুমি। ফিরেছ সন্ধানে যার রাত্রিদিন ধরে
কাননে, প্রান্তরে, শৈলে, রাজ্য, ধর্ম্ম, দয়া,
রাজলক্ষ্মী সব বিসর্জ্জিয়া; যার লাগি
দিগ্বিদিকে হাহাকার করেছ প্রচার;
মূল্য দিয়ে চেয়েছিলে কিনিবারে যারে,
লহ, মহারাজ, ধরণীর রাজবংশে
শ্রেষ্ঠ সেই শির; আতিথ্যের উপহার
আপনি ভেটিলা যুবরাজ। পূর্ণ তব
মনস্কাম, এবে শান্তি হোক্, শান্তি হোক্
এ জগতে, নিবে যাক্ নরকাগ্নিরাশি,
সুখী হও তুমি! (উর্দ্ধস্বরে) মাগো,
জগৎজননি,

দয়াময়ি, স্থান দাও কোলে।

(পতন ও মৃত্যু)

ছুটিয়া ইলার প্রবেশ।

ইলা। এ কি, এ কি,
মহারাজ, কুমার আমার— (মূর্চ্ছা)

শঙ্কর। (অগ্রসর হইয়া) প্রভু স্বামি,
বৎস, প্রাণাধিক, বৃদ্ধের জীবনধন,
এই ভাল এই ভাল ; মুকুট পরেছ
তুমি ; এসেছ রাজার মত আপনার
সিংহাসনে ; মৃত্যুর অমর রশ্মিরেখা
উজ্জ্বল করেছে তব ভাল ; এতদিন
এ বৃদ্ধেরে রেখেছিল বিধি, আজি তব
এ মহিমা দেখাবার তরে ! গেছ তুমি
পুণ্যধামে—ভৃত্য আমি চিরজনমের
আমিও যাইব সাথে !

চন্দ্রসেন। (মাথা হইতে মুকুট ভূমে ফেলিয়া)
ধিক্ এ মুকুট !
ধিক্ এই সিংহাসন ! (সিংহাসনে পদাঘাত)

রেবতীর প্রবেশ।

চন্দ্র। রাক্ষসী, পিশাচী
দূর হ দূর হ—আমারে দিসনে দেখা
পাপীয়সি !

রেবতী। এ রোষ রবে না চিরদিন !

(প্রস্থান)

বিক্রম। (নতজানু) দেবি, যোগ্য নহি আমি
তোমার প্রেমের,
তাই বলে মার্জ্জনাও করিলে না ? রেখে
গেলে চির অপরাধী করে ? ইহজন্ম
নিত্য-অশ্রু-জলে লইতাম ভিক্ষা মাগি
ক্ষমা তব ; তাহারো দিলে না অবকাশ ?
দেবতার মত তুমি নিশ্চল নিষ্ঠুর,
অমোঘ তোমার দণ্ড, কঠিন বিধান।

সমাপ্ত।

উৎসর্গ।

—•—

শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রাণাধিকেষু—

তোরি হাতে বাঁধা খাতা, তারি শ-খানেক পাতা
অক্ষরেতে ফেলিয়াছি ঢেকে,
মস্তিষ্ককোটরবাসী চিন্তাকীট রাশি রাশি
পদচিহ্ন গেছে যেন রেখে।
প্রবাসে প্রত্যহ তোরে হৃদয়ে স্মরণ ক'রে
লিখিয়াছি নির্জ্জন প্রভাতে,
মনে করি অবশেষে শেষ হলে ফিরে দেশে
জন্মদিনে দিব তোর হাতে।
বর্ণনাটা করি শোন্, একা আমি, গৃহ কোণ,
কাগজ পত্তর ছড়াছড়ি,
দশ দিকে বইগুলি সঞ্চয় করিছে ধূলি
আলস্যে যেতেছে গড়াগড়ি।
শয্যাহীন খাটখানা এক পাশে দেয় থানা
প্রকাশিয়া কাঠের পাঁজর।
তারি পরে অবিচারে যাহা-তাহা ভারে ভারে
স্তূপাকারে সহে অনাদর।
চেয়ে দেখি জানালায় খাল খানা শুষ্কপ্রায়,
মাঝে মাঝে বেঁধে আছে জল,
একধারে রাশ রাশ অর্দ্ধমগ্ন দীর্ঘ বাঁশ,
তারি পরে বালকের দল।
ধরে মাছ, মারে ঢেলা সারাদিন করে খেলা
উভচর মানব-শাবক।
মেয়েরা মাজিছে গাত্র অথবা কাঁশার পাত্র,
রূপার মতন ঝক্ ঝক্!
উত্তরে যেতেছে দেখা পড়েছে পথের রেখা
শুষ্ক সেই জলপথ মাঝে,

বহুকষ্টে ডাক ছাড়ি চলেছে গরুর গাড়ি,
ঝিনি ঝিনি ঘণ্টা তারি বাজে!
কেহ দ্রুত, কেহ ধীরে, কেহ যায় নতশিরে,
কেহ যায় বুক ফুলাইয়া,
কেহ জীর্ণ টাট্টু চড়ি চলিয়াছে তড়বড়ি
দুই ধারে দু'পা দুলাইয়া।
পরপারে গায়ে-গায় অভ্রভেদী মহাকায়
স্তব্ধচ্ছায় বট অশথেরা;
স্নিগ্ধ বন-অঙ্কে তারি সুপ্তপ্রায় সারি সারি
কুঁড়েগুলি বেড়া দিয়ে ঘেরা।
বিহঙ্গে মানবে মিলি আছে হোথা নিরিবিলি,
ঘনশ্যাম পল্লবের ঘর;
সন্ধেবেলা হোথা হতে ভেসে আসে বায়ুস্রোতে
গ্রামের বিচিত্র গীত স্বর।
পূর্ব্ব প্রান্তে বন শিরে সূর্য্যোদয় ধীরে ধীরে,
চারিদিকে পাখীর কূজন;
শঙ্খঘণ্টা ক্ষণ পরে দূর মন্দিরের ঘরে
প্রচারিছে শিবের পূজন।
যে প্রত্যূষে মধুমাছি বাহিরায় মধু যাচি
কুসুমকুঞ্জের দ্বারে দ্বারে,
সেই ভোর বেলা আমি মানস কুহরে নামি
আয়োজন করি লিখিবারে।
লিখিতে লিখিতে মাঝে পাখী গান কাণে বাজে,
মনে আনে কাল পুরাতন
ওই গান, ওই ছবি, তরুশিরে রাঙা রবি
ওরা প্রকৃতির নিত্য ধন।
আদি কবি বাল্মীকিরে এই সমীরণ ধীরে
ভক্তি ভরে করেছে বিজন,

ওই, মায়া চিত্রবৎ তরুলতা ছায়াপথ,
ছিল তাঁর পুণ্য তপোবন।
রাজধানী কলিকাতা তুলেছে স্পর্দ্ধিত মাথা,
পুরাতন নাহি ঘেঁসে কাছে।
কাষ্ঠ লোষ্ট্র চারিদিক ; বর্ত্তমান আধুনিক
আড়ষ্ট হইয়া যেন আছে।
"আজ" "কাল" ছুটি ভাই মরিতেছে জন্মিয়াই,
কলরব করিতেছে কত।
নিশিদিন ধূলি প'ড়ে দিতেছে আচ্ছন্ন ক'রে
চিরসত্য আছে যেথা যত।
জীবনের হানাহানি, প্রাণ নিয়ে টানাটানি,
মত নিয়ে বাক্য বরিষণ,
বিদ্যা নিয়ে রাতারাতি পুঁথির প্রাচীন গাঁথি
প্রকৃতির গণ্ডী বিরচন,
কেবলি নূতনে আশ, সৌন্দর্য্যেতে অবিশ্বাস,
উন্মাদনা চাহি দিনরাত,
• সে সকল ভুলে গিয়ে কোণে বসে খাতা নিয়ে
মহানন্দে কাটিছে প্রভাত।
দক্ষিণের বারান্দায় বেড়াই মুগ্ধের প্রায়,
অপরাহ্ণে পড়ে তরুচ্ছায়া,
কল্পনার ধনগুলি হৃদয়-দোলায় দুলি
প্রতিক্ষণে লভিতেছে কায়া।
সেবি বাহিরের বায়ু বাড়ে তাহাদের আয়ু,
ভোগ করে চাঁদের অমিয়,
ভেদ করি মোর প্রাণ জীবন করিয়া পান
হইতেছে জীবনের প্রিয়।
এত তারা জেগে [illegible]ছে নিশিদিন কাছে কাছে
এত কথা [illegible] শত স্বরে,
তাহাদের তুচ্ছ—এই আর সবে ছায়াপ্রায়
আ[illegible]ল, এ নয়নের পরে।
আজ সব হল [illegible] বিদায় লয়েছে তারা,
নূতন বেঁধেছে ঘরবাড়ি,
এখন স্বাধীন বলে বাহিরে এসেছে চলে
অন্তরের পিতৃগৃহ ছাড়ি।

তাই এত দিন পরে আজি নিজমূর্ত্তি ধরে
প্রবাসের বিরহ-বেদনা,
তোদের কাছেতে যেতে তোদিকে নিকটে পেতে
জাগিতেছে একান্ত বাসনা।
সম্মুখে দাঁড়াব যবে "কি এনেছ" বলি সবে
যদ্যপি শুধাস্ হাসিমুখ,
"খাতাখানি বের ক'রে বলিব "এ পাতা ভরে
আনিয়াছি প্রবাসের সুখ।"
সেই ছবি মনে আসে, টেবিলের চারিপাশে
গুটিকত চৌকি টেনে আনি,
শুধু জন দুই তিন উর্দ্ধে জ্বলে কেরোসিন,
কেদারায় বসি ঠাকুরাণী।
দক্ষিণের দ্বার দিয়ে বায়ু আসে গান নিয়ে,
কেঁপে কেঁপে উঠে দীপশিখা,
খাতা হাতে সুর ক'রে অবাধে যেতেছি প'ড়ে
কেহ নাই করিবারে টীকা!
ঘণ্টা বাজে, বাড়ে রাত, ফুরায় ব'য়ের পাত,
বাহিরে নিস্তব্ধ চারিধার ;
তোদের নয়নে জল করে আসে ছলছল
শুনিয়া কাহিনী করুণার।
তাই দেখে শুতে যাই, আনন্দের শেষ নাই,
কাটে রাত্রি স্বপ্ন রচনায়,
মনে মনে প্রাণ ভরি' অমরতা লাভ করি
নীরব সে সমালোচনায়।
তার পরে দিনকত কেটে যায় এই মত,
তার পরে ছাপাবার পালা।
মুদ্রাযন্ত্র হতে শেষে বাহিরায় ভদ্রবেশে,
তার পরে মহা ঝালাপালা।
রক্তমাংস-গন্ধ পেয়ে ক্রিটিকেরা আসে ধেয়ে,
চারিদিকে করে বাড়াবাড়ি,
কেহ বলে, "ড্রামাটিক্ বলা নাহি যায় ঠিক্,
লিরিকের বড় বাড়াবাড়ি।"
শির নাড়ি কেহ বহে, "সব সুদ্ধ মন্দ নহে,
ভাল হ'ত আরো ভাল হলে!"

কেহ বলে "আয়ুহীন বাঁচিবে দুচারি দিন,
চির দিন রবে না তা বলে!"
কেহ বলে "এ বহিটা লাগিতে পারিত মিঠা
হত যদি অন্য কোনরূপ!"
যার মনে যাহা লয় সকলেই কথা কয়
আমি শুধু বসে আছি চুপ।
লয়ে নাম লয়ে জাতি বিদ্বানের মাতামাতি
ও সকল আনিস্‌নে কাণে।
আইনের লৌহ ছাঁচে কবিতা কভু না বাঁচে
প্রাণ শুধু পায় তাহা প্রাণে।
হাসি মুখে স্নেহভরে সঁপিলাম তোর করে
বুঝিয়া পড়িবি অনুরাগে। [খোঁজে।
কে বোঝে কে নাই বোঝে ভাবুক তা নাহি
ভাল যার লাগে তার লাগে।

রবি কাকা।

নাটকের পাত্রগণ।

গোবিন্দমাণিক্য।	ত্রিপুরার রাজা।
নক্ষত্র রায়।	গোবিন্দমাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।
রঘুপতি।	রাজ পুরোহিত।
জয়সিংহ।	রঘুপতির পালিত রাজপুত যুবক। রাজ মন্দিরের সেবক।
চাঁদপাল।	দেওয়ান।
নয়ন রায়।	সেনাপতি।
ধ্রুব।	রাজার পালিত বালক।
মন্ত্রী।	
পৌরগণ।	

গুণবতী।	মহিষী।
অপর্ণা।	ভিখারিণী।

বিসর্জ্জন।

প্রথম অঙ্ক।

—*—

প্রথম দৃশ্য। মন্দির।

গুণবতী।

গুণ। মা'র কাছে কি করেছি দোষ! ভিখারী যে
সন্তান বিক্রয় করে উদরের দায়ে
তারে দাও শিশু—পাপিষ্ঠা যে লোকলাজে
সন্তানেরে বধ করে, তার গর্ভে দাও
পাঠাইয়া—অসহায় জীব। আমি হেথা
সোণার পালঙ্কে মহারাণী শত শত
দাসদাসী সৈন্য প্রজা লয়ে, বসে আছি
তপ্তবক্ষে শুধু এক শিশুর পরশ
লালসিয়া, আপনার প্রাণের ভিতরে
আরেকটি প্রাণাধিক প্রাণ করিবারে
অনুভব;—এই বক্ষ, এই বাহু দুটি,
এই কোল, এই দৃষ্টি দিয়ে, বিরচিতে
নিবিড় জীবন্ত নীড়, শুধু একটুকু
প্রাণকণিকার তরে! হেরিবে আমারে
একটি নূতন আঁখি প্রথম আলোকে,
ফুটিবে আমার কোলে কথাহীন মুখে
অকারণ আনন্দের প্রথম হাসিটি।
কুমারজননী মাতঃ কোন পাপে মোরে
করিলি বঞ্চিত মাতৃস্বর্গ হতে?

রঘুপতির প্রবেশ।

প্রভু,
চিরদিন মা'র পূজা করি। জেনে শুনে
কিছুত করিনি দোষ। পুণ্যের শরীর
মোর স্বামী মহাদেবসম—তবে কোন্
দোষ দেখে আমারে করিল মহামায়া
নিঃসন্তান-শ্মশানচারিণী?

রঘু। মা'র খেলা
কে বুঝিতে পারে বল? পাষাণ-তনয়া
ইচ্ছাময়ী—সুখ দুঃখ তাঁরি ইচ্ছা। ধৈর্য্য
ধর! এবার তোমার নামে মা'র পূজা
হবে। প্রসন্ন হইবে শ্যামা।

গুণ। এবৎসর
পূজার বলির পশু আমি নিজে দিব।
করিনু মানৎ যদি মা দেন্ সন্তান
বর্ষে বর্ষে দিব তাঁরে একশ' মহিষ,
তিন শত ছাগ।

রঘু। পূজার সময় হল। (উভয়ের প্রস্থান।)

গোবিন্দমাণিক্য অপর্ণা ও জয়সিংহের প্রবেশ।

জয়। কি আদেশ মহারাজ।

গোবিন্দ। ক্ষুদ্র ছাগশিশু
দরিদ্র এ বালিকার স্নেহের পুত্তলি,
তারে না কি কেড়ে আনিয়াছ মার কাছে
বলি দিতে? এ দান কি নেবেন জননী
প্রসন্ন দক্ষিণ হস্তে?

জয়। কেমনে জানিব,
মহারাজ, কোথা হতে অনুচরগণ
আনে পশু দেবীর পূজার তরে।—হাঁ গা,
কেন তুমি কাঁদিতেছ? আপনি নিয়েছে
যারে বিশ্বমাতা, তার তরে ক্রন্দন কি
শোভা পায়?

অপর্ণা। কে তোমার বিশ্বমাতা। মোর
শিশু চিনিবে না তারে। মা হারা শাবক
জানে না সে আপন মায়েরে। আমি যদি
বেলা ক'রে আসি, খায় না সে তৃণদল,
ডেকে ডেকে চায় পথপানে—কোলে ক'রে
নিয়ে তারে, ভিক্ষা অন্ন কয় জনে ভাগ
ক'রে খাই। আমি তার মাতা?

জয়। মহারাজ,
আপনার প্রাণঅংশ দিয়ে, যদি তারে
বাঁচাইতে পারিতাম দিতাম বাঁচায়ে।
মা তাহারে নিয়েছেন—আমি তারে আর
ফিরাব কেমনে?

অপর্ণা। মা তাহারে নিয়েছেন?
মিছে কথা। রাক্ষসী নিয়েছে তারে।

জয়। ছিছি!
ও কথা এনো না মুখে।

অপর্ণা। মা, তুমি নিয়েছ
কেড়ে দরিদ্রের ধন। রাজা যদি চুরি
করে শুনিয়াছি না কি, আছে জগতের
রাজা, তুমি যদি চুরি কর, কে তোমার
করিবে বিচার। মহারাজ বল তুমি—

রাজা। বৎসে; আমি বাক্যহীন. এত ব্যথা কেন,
এত রক্ত কেন, কে বলিয়া দিবে মোরে?

অপর্ণা। এই যে সোপান বেয়ে রক্তচিহ্ন দেখি
একি তারি রক্ত? ওরে বাছনি আমার!
মরি মরি, মোরে ডেকে কেঁদেছিল কত,
চেয়েছিল চারিদিকে ব্যাকুল-নয়নে
কম্পিত কাতর বক্ষে, মোর প্রাণ কেন
যেথা ছিল সেথা হতে ছুটিয়া এলনা?

জয়সিংহ। (প্রতিমার প্রতি)
আজন্ম পূজিনু তোরে তবু তোর মায়া
বুঝিতে পারিনে। করুণায় কাঁদে প্রাণ
মানবের,—দয়া নাই বিশ্বজননীর!

অপর্ণা। (জয়সিংহের প্রতি)
তুমি ত নিষ্ঠুর নহ—আঁখি-প্রান্তে তব
অশ্রু ঝরে মোর দুখে। তবে এস তুমি,
এ মন্দির ছেড়ে এস। তবে ক্ষম মোরে,
মিথ্যা আমি অপরাধী করেছি তোমায়!

জয়সিংহ। (প্রতিমার প্রতি)
তোমার মন্দিরে এ কি নূতন সঙ্গীত
ধ্বনিয়া উঠিল আজি হে গিরি-নন্দিনী,
করুণাকাতর কণ্ঠস্বরে! ভক্ত হৃদি
অপরূপ বেদনায় উঠিল ব্যাকুলি!—
হে শোভনে, কোথা যাব এ মন্দির ছেড়ে।
কোথায় আশ্রয় আছে?

রাজা। (জনান্তিক হইতে) যেথা আছে প্রেম।
(প্রস্থান)

জয়সিংহ। কোথা আছে প্রেম!—অয়ি ভদ্রে,
এস তুমি
আমার কুটীরে। অতিথিরে দেবীরূপে
আজিকে করিব পূজা করিয়াছি পণ।
(উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজসভা। সভাসদ্‌গণ।

রাজা, রঘুপতি ও নক্ষত্ররায়ের প্রবেশ।

সকলে উঠিয়া। জয় হোক্ মহারাজ!

রঘু। রাজার ভাণ্ডারে
এসেছি বলির পশু সংগ্রহ করিতে!

গোবিন্দ। মন্দিরেতে জীববলি এ বৎসর হতে
হইল নিষেধ।

নয়ন। বলি নিষেধ।

মন্ত্রী। নিষেধ।

নক্ষত্র। তাইত। বলি নিষেধ।

রঘু। এ কি স্বপ্নে শুনি?

গোবিন্দ। স্বপ্ন নহে প্রভু। এতদিন স্বপ্নে ছিনু, আজ জাগরণ। বালিকার মূর্ত্তি ধ'রে স্বয়ং জননী মোরে ব'লে গিয়েছেন জীবরক্ত সহে না তাঁহার!

রঘু। এতদিন
সহিল কি ক'রে? সহস্র বৎসর ধরে
রক্ত করেছেন পান আজি এ অরুচি?

গোবিন্দ। করেন নি পান। মুখ ফিরাতেন দেবী করিতে শোণিতপাত তোমরা যখন।

রঘু। মহারাজ, কি করিছ ভাল করে ভেবে দেখ। শাস্ত্রবিধি তোমার অধীন নহে!

গোবিন্দ। সকল শাস্ত্রের বড় দেবীর আদেশ।

রঘু। একে ভ্রান্তি, তাহে অহঙ্কার। অজ্ঞ নর, তুমি শুধু শুনিয়াছ দেবীর আদেশ, আমি শুনি নাই।

নক্ষত্র। তাইত কি বল মন্ত্রী, এ বড় আশ্চর্য্য ঠাকুর শোনেন নাই?

গোবিন্দ। দেবী আজ্ঞা নিত্যকাল ধ্বনিছে জগতে, সেইত বধিরতম যে জন সে বাণী শুনেও শুনে না।

রঘু। পাষণ্ড, নাস্তিক তুমি।

গোবিন্দ। ঠাকুর, সময় নষ্ট হয়। যাও এবে মন্দিরের কাজে। প্রচার করিয়া দিয়ো পথে যেতে যেতে, আমার ত্রিপুররাজ্যে যে করিবে জীবহত্যা জীবজননীর পূজাচ্ছলে, তারে দিব নির্ব্বাসন দণ্ড।

রঘু। এই কি হইল স্থির?

গোবিন্দ। স্থির এই!

রঘু। (উঠিয়া) তবে
উচ্ছন্ন! উচ্ছন্ন যাও!

চাঁদ। (ছুটিয়া আসিয়া) হাঁ হাঁ। থাম! থাম!

গোবিন্দ। বোস চাঁদপাল। ঠাকুর বলিয়া যাও!
মনোব্যথা লঘু ক'রে যাও নিজ কাজে।

রঘু। তুমি কি ভেবেছ মনে ত্রিপুর ঈশ্বরী ত্রিপুরার প্রজা? প্রচারিবে তাঁর পরে তোমার নিয়ম? হরণ করিবে তাঁর বলি? হেন সাধ্য নাই তব। আমি আছি মায়ের সেবক।

(প্রস্থান।)

নয়ন। ক্ষমা কর অধীনের স্পর্দ্ধা মহারাজ!
কোন অধিকারে, প্রভু, জননীর বলি—

চাঁদ। শান্ত হও সেনাপতি।

মন্ত্রী। মহারাজ, একেবারে করেছ কি স্থির?
আজ্ঞা আর ফিরিবে না?

গোবিন্দ। আর নহে মন্ত্রী; বিলম্ব উচিত নহে বিনাশ করিতে পাপ!

মন্ত্রী। পাপের কি এত পরমায়ু হবে? কত শত বর্ষ ধরে যে প্রাচীন প্রথা দেবতাচরণতলে বৃদ্ধ হয়ে এল সে কি পাপ হতে পারে?

(রাজার নিরুত্তরে চিন্তা।)

নক্ষত্র। তাইত হে মন্ত্রি,
সে কি পাপ হতে পারে?

মন্ত্রী। পিতামহগণ
এসেছে পালন করে যত্নে ভক্তিভরে

সনাতন রীতি। তাঁহাদের অপমান তার অপমানে।

(রাজার চিন্তা।)

নয়ন। ভেবে দেখ মহারাজ, যুগে যুগে যে পেয়েছে শত সহস্রের ভক্তির সম্মতি, তাহারে করিতে নাশ তোমার কি আছে অধিকার।

গোবিন্দ। (সনিঃশ্বাসে) থাক্ তর্ক। যাও মন্ত্রী আদেশ প্রচার কর গিয়ে আজ হতে বন্ধ বলিদান।

(প্রস্থান।)

মন্ত্রী। এ কি হল।

নক্ষ। তাইত হে মন্ত্রি,এ কি হল। শুনেছিনু মগের মন্দিরে বলি নেই; অবশেষে মগেতে হিন্দুতে ভেদ রহিল না কিছু। কি বল হে চাঁদপাল, তুমি কেন চুপ?

চাঁদ। ভীরু আমি ক্ষুদ্র প্রাণী, বুদ্ধি কিছু কম, না বুঝে পালন করি রাজার আদেশ।

—*—

তৃতীয় দৃশ্য

মন্দির—জয়সিংহ।

জয়। মাগো, শুধু তুই আর আমি। এ মন্দিরে সারাদিন আর কেহ নাই। সারা দীর্ঘ দিন! মাঝে মাঝে কে আমারে ডাকে যেন! তোর কাছে থেকে তবু একা মনে হয়।

নেপথ্যে গান।

আমি একলা চলেছি এ ভবে—
আমায় পথের সন্ধান কে কবে?

জয়। মাগো এ কি মায়া। দেবতারে প্রাণ দেয় মানবের প্রাণ! এইমাত্র ছিলে তুমি নির্ব্বাক্ নিশ্চল—উঠিলে জীবন্ত হয়ে, সন্তানের কণ্ঠস্বরে সজাগ জননী।

গান গাহিতে গাহিতে অপর্ণার প্রবেশ।

আমি একলা চলেছি এ ভবে,
আমায় পথের সন্ধান কে কবে?
ভয় নেই, ভয় নেই,
যাও আপন মনেই,
যেমন একলা মধুপ ধেয়ে যায়
কেবল ফুলের সৌরভে!

জয়। কেবলি একেলা! যদি দক্ষিণ বাতাস বন্ধ হয়ে যায়, যদি ফুলের সৌরভ নাহি আসে, দশদিক্ জেগে ওঠে যদি দশটি সন্দেহ সম, তখন কোথায় সুখ, কোথা পথ? জান কি একেলা কারে বলে?

অপর্ণা। জানি। যবে বসে আছি ভরা মনে দিতে চাই নিতে কেহ নাই।

জয়। সৃজনের আগে দেবতা যেমন একা। তাই বটে! তাই বটে! মনে হয় এ জীবন বড় বেশী আছে,—যত বড় তত শূন্য, তত আবশ্যকহীন।

অপর্ণা। জয়সিংহ, তুমি বুঝি একা। তাই দেখিয়াছি, কাঙাল যে জন তাহারো কাঙাল তুমি। যে তোমার সব নিতে পারে, তারে তুমি খুঁজিতেছ যেন! ভ্রমিতেছ দীনদুঃখী সকলের দ্বারে। এতদিন ভিক্ষা মেগে ফিরিতেছি—কত লোক দেখি, কত মুখপানে চাই, লোকে ভাবে শুধু বুঝি ভিক্ষা তরে,—দূর হতে দেয় তাই মুষ্টি ভিক্ষা ক্ষুদ্র দয়াভরে; এত দয়া পাইনে কোথাও যাহা পেয়ে আপনার দৈন্য আর মনে নাহি পড়ে।

জয়। যথার্থ যে দাতা, সেত নিজে নেমে আসে
দানরূপে দরিদ্রের পানে, ভূমিতলে।
যেমন আকাশ হতে বৃষ্টিরূপে মেঘ
নেমে আসে মরুভূমে, দেবী নেমে আসে
মানবী হইয়া, যারে ভালবাসি তার
মুখে। দরিদ্র ও দাতা, দেবতা মানব
সমান হইয়া যায়। ওই আসিছেন
মোর গুরুদেব!
অপর্ণা। আমি তবে সরে যাই
অন্তরালে। ব্রাহ্মণেরে বড় ভয় করি!
কি কঠিন তীব্রদৃষ্টি! কঠিন ললাট
পাষাণ সোপানে যেন দেবী মন্দিরের!
(অপর্ণার প্রস্থান।)
জয়। কঠিন? কঠিন বটে! বিধাতার মত!
কঠিনতা নিখিলের অটল নির্ভর!

রঘুপতির প্রবেশ।

জয়। (পা ধুইবার জল প্রভৃতি অগ্রসর করিয়া)
গুরুদেব!
রঘু। যাও, যাও!
জয়। আনিয়াছি জল!
রঘু। থাক্, রেখে দাও জল!
জয়। বসন!
রঘু। কে চাহে
বসন!
জয়। অপরাধ করেছি কি?
রঘু। আবার!
কে নিয়েছে অপরাধ তব? ঘোর কলি
এসেছে ঘনা'য়ে! বাহুবল রাহুসম
ব্রহ্মতেজ গ্রাসিবারে চায়—সিংহাসন
তোলে শির যজ্ঞবেদী পরে! হায়, হায়,
কলির দেবতা, তোমরাও চাটুকর
সভাসদসম, নতশিরে রাজআজ্ঞা
বহিতেছ? চতুর্ভুজা, চারিহস্ত আছ
যোড় করি'! বৈকুণ্ঠ কি আবার নিয়েছে
কেড়ে দৈত্যগণ? গিয়েছে দেবতা যত
রসাতলে? শুধু দানবে মানবে মিলে
বিশ্বের রাজত্ব দর্পে করিতেছে ভোগ?
দেবতা না যদি থাকে ব্রাহ্মণ রয়েছে!
ব্রাহ্মণের রোষযজ্ঞে দগ্ধ সিংহাসন
হবি-কাষ্ঠ হবে!
(জয়সিংহের নিকটে গিয়া সস্নেহে) বৎস,
আজ করিয়াছি রুক্ষ আচরণ তোমাপরে, চিত্ত
বড় ক্ষুব্ধ মোর!
জয়। কি হয়েছে প্রভু?
রঘু। কি হয়েছে?
শুধাও অপমানিত ত্রিপুরেশ্বরীরে!
এই মুখে কেমনে বলিব কি হয়েছে?
জয়। কে করেছে অপমান?
রঘু। গোবিন্দমাণিক্য।
জয়। গোবিন্দমাণিক্য! প্রভু, কারে অপমান?
রঘু। কারে! তুমি, আমি, সর্ব্বশাস্ত্র, সর্ব্বদেশ,
সর্ব্বকাল, সর্ব্বদেশকাল-অধিষ্ঠাত্রী
মহাকালী, সকলেরে করে অপমান,
ক্ষুদ্র সিংহাসনে বসি!
জয়। গোবিন্দমাণিক্য!
রঘু। হাঁগো, হাঁ, তোমার রাজা গোবিন্দ-
মাণিক্য!
তোমার সকল শ্রেষ্ঠ—তোমার প্রাণের
অধীশ্বর! অকৃতজ্ঞ! পালন করিনু
এত যত্নে স্নেহে তোরে শিশুকাল হতে,
আমা চেয়ে প্রিয়তর আজ তোর কাছে
গোবিন্দমাণিক্য?
জয়। প্রভু, পিতৃকোলে বসি
আকাশে বাড়ায় হাত ক্ষুদ্র মুগ্ধ শিশু
পূর্ণচন্দ্রপানে—দেব, তুমি পিতা মোর,
পূর্ণশশী মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য।

কিন্তু এ কি বকিতেছি ? কি কথা শুনিনু ?
মায়ের পূজার বলি নিষেধ করেছে
রাজা ? এ আদেশ কে মানিবে ?
রঘু। না মানিলে
নির্ব্বাসন।
জয়। মাতৃপূজাহীন রাজ্য হতে
নির্ব্বাসন দণ্ড নহে। এ প্রাণ থাকিতে
অসম্পূর্ণ নাহি রবে জননীর পূজা !

চতুর্থ দৃশ্য।

অন্তঃপুর। গুণবতী। পরিচারিকা।

গুণ। কি বলিস্ ? মন্দিরের দুয়ার হইতে
রাণীর পূজার বলি ফিরায়ে দিয়াছে ?
একদেহে কত মুণ্ড আছে তার ? কে সে
দুরদৃষ্ট ?
পরি। বলিতে সাহস নাহি মানি—
গুণ। বলিতে সাহস নাহি ? এ কথা বলিলি
কি সাহসে ? আমাচেয়ে কারে তোর
ভয় ?
পরি। ক্ষমা কর !
গুণ। কাল সন্ধ্যাবেলা ছিনু রাণী,
কাল সন্ধেবেলা বন্দিগণ ক'রে গেছে
স্তব, বিপ্রগণ করে গেছে আশীর্ব্বাদ,
ভৃত্যগণ করযোড়ে আজ্ঞা লয়ে গেছে,
একরাত্রে উলটিল সকল নিয়ম ?
দেবী পাইল না পূজা, রাণীর মহিমা
অবনত ? ত্রিপুরা কি স্বপ্নরাজ্য ছিল ?
ত্বরা করে ডেকে আন ব্রাহ্মণ ঠাকুরে !
(পরিচারিকার প্রস্থান।)

গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ।

গুণ। মহারাজ, শুনিতেছ ? মার দ্বার হতে
আমার পূজার বলি ফিরায়ে দিয়েছে।
গোবি। জানি তাহা !
গুণ। জান তুমি ? নিষেধ করনি
তবু ? জ্ঞাতসারে মহিষীর অপমান ?
গোবি। তারে ক্ষমা কর প্রিয়ে ?
গুণ। দয়ার শরীর
তব, কিন্তু মহারাজ, এ ত দয়া নয়,
এ শুধু কাপুরুষতা ! দয়ায় দুর্ব্বল
নিজ হাতে দণ্ড দিতে নাহি পার যদি,
আমি দণ্ড দিব তারে। বল মোরে কে সে
অপরাধী !
গোবি। দেবি, আমি ! অপরাধ আর
কিছু নহে, তোমারে দিয়েছি ব্যথা এই
অপরাধ !
গুণ। কি বলিছ প্রভু !
গোবি। আজ হতে
দেবতার পুণ্য নামে জীবরক্তপাত
আমার ত্রিপুররাজ্যে হয়েছে নিষেধ।
গুণ। কাহার নিষেধ ?
গোবি। জননীর।
গুণ। কে শুনেছে ?
গোবি। আমি।
গুণ। তুমি ? মহারাজ, শুনে হাসি আসে !
রাজদ্বারে এসেছেন ভুবন-ঈশ্বরী
জানাইতে আবেদন !
গোবি। হেসোনা মহিষী !
জননী আপনি এসে সন্তানের প্রাণে
বেদনা জানায়েছেন, আবেদন নহে !
গুণ। বৃথা কথা রেখে দাও ! মন্দির বাহিরে
তব রাজ্য। যেথা তব আজ্ঞা নাহি চলে,
সেথায় দিয়োনা আজ্ঞা !

গোবি। মার আজ্ঞা সে যে,
মোর আজ্ঞা নহে রাণী !
গুণ। কেমনে জানিলে ?
গোবি। ক্ষীণদীপালোকে গৃহ কোণে থেকে যায়
অন্ধকার ; সব পারে, আপনার ছায়া
কিছুতে ঘুচাতে নারে দীপ। মানবের
বুদ্ধি দীপসম, যত আলো করে দান
তত রাখে সংশয়ের ছায়া, স্বর্গ হতে
নামে যবে জ্ঞান নিমেষে সংশয় টুটে।
সংশয় কিছুই নাই আমার হৃদয়ে।
গুণ। শুনিয়াছি আপনার পাপপুণ্য শুধু
আপনার কাছে। তুমি থাক আপনার
অসংশয় নিয়ে—আমারে দুয়ার ছাড়
আমার পূজার বলি আমি নিয়ে যাই
আমার মায়ের কাছে।
গোবি। দেবি ! জননীর
আজ্ঞা পারি না লঙ্ঘিতে।
গুণ। আমিও পারি না !
মা'র কাছে আছি প্রতিশ্রুত। সেই মত
যথাশাস্ত্র যথাবিধি পূজিব তাঁহারে
যাও, তুমি যাও !
গোবি। যে আদেশ মহারাণী !
(প্রস্থান।)

রঘুপতির প্রবেশ।

গুণ। ঠাকুর, আমার পূজা ফিরায়ে দিয়েছে
মাতৃদ্বার হতে !
রঘু। মহারাণী, মা'র পূজা
ফিরে গেছে, নহে সে তোমার ! উঞ্ছবৃত্ত
দরিদ্রের ভিক্ষালব্ধ পূজা, রাজেন্দ্রাণী,
তোমার পূজার চেয়ে ন্যূন নহে ! কিন্তু
এই বড় সর্ব্বনাশ, মা'র পূজা ফিরে
গেছে ! এই বড় সর্ব্বনাশ, রাজদর্প
ক্রমে স্ফীত হয়ে করিতেছে অতিক্রম
পৃথিবীর রাজত্বের সীমা—বসিয়াছে
দেবতার দ্বার রোধ করি—দুই আঁখি
রাঙাইয়া জননীর ভক্তদের প্রতি !
গুণ। কি হবে ঠাকুর ?
রঘু। জানেন্ তা' মহামায়া !
এই শুধু জানি—যে সিংহাসনের ছায়া
পড়েছে মায়ের দ্বারে—ফুৎকারে ফাটিবে
সেই দম্ভমঞ্চখানি জলবিম্বসম !
যুগে যুগে রাজপিতাপিতামহ মিলে
উর্দ্ধপানে তুলিয়াছে যে রাজমহিমা
অভ্রভেদী করে, মুহূর্ত্তে হইয়া যাবে
ধূলিসাৎ বজ্রদীর্ণ দগ্ধ ঝঞ্ঝাহত।
গুণ। রক্ষা কর, রক্ষা কর প্রভু !
রঘু। হা, হা, আমি
রক্ষা করিব তোমারে ! যে প্রবল রাজা
স্বর্গে মর্ত্ত্যে প্রচারিছে আপন শাসন
তুমি তাঁরি রাণী ! দেব ব্রাহ্মণেরে যিনি—
ধিক্, ধিক্ শতবার ! ধিক্ লক্ষ বার !
কলির ব্রাহ্মণে ধিক্ ! ব্রহ্মশাপ কোথা !
ব্যর্থ ব্রহ্মতেজ শুধু বক্ষে আপনার
অহিত বৃশ্চিক সম আপনি দংশিছে !
মিথ্যা ব্রহ্ম আড়ম্বর !
(পৈতা ছিঁড়িতে উদ্যত)
গুণ। কি কর, কি কর
দেব ! রাখ, রাখ, দয়া কর নির্দ্দোষেরে !
রঘু। ফিরায়ে দে ব্রাহ্মণের অধিকার !
গুণ। দিব !
যাও প্রভু পূজা কর মন্দিরেতে গিয়ে,
হবে নাক' পূজার ব্যাঘাত !
রঘু। যে আদেশ
রাজ অধীশ্বরী ! দেবতা কৃতার্থ হল
তোমারি আদেশবলে, ফিরে পেল পুন
ব্রাহ্মণ আপন তেজ ! ধন্য তোমরাই,
যত দিন নাহি জাগে কল্কিঅবতার !
(প্রস্থান।)

গোবিন্দমাণিক্যের পুনঃ প্রবেশ।

গোবিন্দ। অপ্রসন্ন প্রেয়সীর মুখ, বিশ্বমাঝে
সব আলো সব সুখ লুপ্ত করে রাখে।
উন্মনা উৎসুক চিত্তে ফিরে ফিরে আসি।
গুণ। যাও, যাও, এসোনা এ গৃহে! অভিশাপ
আনিয়োনা হেথা!
গোবিন্দ। প্রিয়তমে! প্রেমে করে
অভিশাপ নাশ, দয়া করে অকল্যাণ
দূর! সতীর হৃদয় হতে প্রেম গেলে
পতিগৃহে লাগে অভিশাপ। যাই তবে
দেবি!
গুণ। যাও! ফিরে আর দেখায়োনা মুখ!
গোবিন্দ। স্মরণ করিবে যবে, আবার আসিব।
(প্রস্থানোন্মুখ)
গুণ। (পায়ে পড়িয়া) ক্ষমা কর, ক্ষমা কর নাথ!
এতই কি হয়েছ নিষ্ঠুর, রমণীর অভিমান
ঠেলে চলে যাবে? জাননা কি প্রিয়তম,
ব্যর্থ প্রেম দেখা দেয় রোষের ধরিয়া।
ছদ্মবেশ? ভাল আপনার অভিমানে
আপনি করিনু অপমান—ক্ষমা কর!
গোবিন্দ। প্রিয়তমে তোমাপরে টুটিলে বিশ্বাস
সেই দণ্ডে টুটিত জীবনবন্ধ। জানি
প্রিয়ে মেঘ ক্ষণিকের, চিরদিবসের
সূর্য্য!
গুণ। মেঘ ক্ষণিকের! এ মেঘ কাটিয়া
যাবে নিখিলের উদ্যত বজ্র ফিরে যাবে,
চিরদিবসের সূর্য্য উঠিবে আবার
চিরদিবসের প্রথা জাগায়ে জগতে,
অভয় পাইবে সর্ব্বলোক—ভুলে যাবে
ক্ষণেকের দুঃস্বপন! সেই আজ্ঞা কর!
ব্রাহ্মণ ফিরিয়া পাক নিজ অধিকার,
দেবী নিজ পূজা, রাজদণ্ড ফিরে যাক
নিজ অপ্রমত্ত মর্ত্ত্য অধিকার মাঝে!
গোবিন্দ। ধর্ম্মহানি ব্রাহ্মণের নহে অধিকার
অসহায় জীবরক্ত নহে জননীর
পূজা! দেবতার আজ্ঞা পালন করিতে
রাজা বিপ্র সকলেরি আছে অধিকার!
গুণ। ভিক্ষা! ভিক্ষা চাই। একান্ত মিনতি
করি চরণে তোমার প্রভু! চিরাগত প্রথা
চিরপ্রবাহিত মুক্ত সমীরণসম,
নহে তা রাজার ধন,—তা'ও যোড় করে
সমস্ত প্রজার নামে ভিক্ষা মাগিতেছে
মহিষী তোমার! প্রেমের দোহাই মান
প্রিয়তম! বিধাতাও করিবেন ক্ষমা
প্রেম আকর্ষণবশে কর্ত্তব্যের ত্রুটি!
গোবিন্দ। এই কি উচিত মহারাণী? নীচস্বার্থ,
নিষ্ঠুর ক্ষমতাদর্প অন্ধ অজ্ঞানতা,
চিররক্তপানে স্ফীত হিংস্র বৃদ্ধ প্রথা,
সহস্র শত্রুর সাথে একা যুদ্ধ করি;
শ্রান্তদেহে আসি গৃহে নারীচিত্ত হতে
অমৃত করিতে পান; সেথাও কি নাই
দয়াসুধা? গৃহমাঝে পুণ্য প্রেম বহে—
তারো সাথে মিশিয়াছে রক্তধারা? এত
রক্তস্রোত কোন্ দৈত্য দিয়েছে খুলিয়া,
ভক্তিতে প্রেমেতে রক্ত মাখামাখি হয়,
ক্রূর হিংসা দয়াময়ী রমণীর প্রাণে
দিয়ে যায় শোণিতের ছাপ! এ শোণিত
তবু করিব না রোধ?
গুণ। (মুখ ঢাকিয়া) যাও যাও তুমি!
গোবিন্দ। হায় মহারাণী, কর্ত্তব্য কঠিন হয়
তোমরা ফিরালে মুখ। (প্রস্থান।)
গুণবতী। (কাঁদিয়া উঠিয়া) ওরে অভাগিনী,
এত দিন এ কি গর্ব্ব হয়েছিল মনে।
ছিল না কি দর্পভার, ব্যর্থ হবে আজ
এত অনুরোধ, এত অনুনয়, এত
অভিমান! ধিক্, কি সোহাগে পূজাহীনা
পতিরে জানায় অভিমান? ছাই হোক

অভিমান তোর! ছাই এ কপাল! ছাই
মহিষী গরব। আর নহে প্রেমখেলা
সোহাগক্রন্দন। বুঝিয়াছি আপনার
স্থান—হায় ধূলিতলে নতশির—নয়
উর্দ্ধফণা ভুজঙ্গিনী আপনার তেজে!

পঞ্চম দৃশ্য।

—:*:—

মন্দির।

একদল লোকের প্রবেশ।

নেপাল। কোথায় হে, তোমাদের তিন শো পাঁঠা, একশোএক মোষ! একটা টিকটিকির ছেঁড়া লেজটুকু পর্য্যন্ত দেখবার যো নেই! বাজনাবাদ্যি গেল কোথায়,সব যে হাঁ হাঁ করচে! খরচপত্র করে পূজো দেখ্‌তে এলুম, আচ্ছা শাস্তি হয়েছে!

গণেশ। দেখ্‌ মন্দিরের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে অমন করে বলিস্‌নে! মা পাঁঠা পায় নি, এবার জেগে উঠে তোদের একএকটাকে ধরে ধরে মুখে পুরবে!

হারু। কেন! গেল বছরে, বাছারা সব ছিলে কোথায়? আর সেই ওবছর, যখন ব্রতসাঙ্গ করে রাণীমা পূজো দিয়েছিল, তখন কি তোদের পায়ে কাঁটা ফুটেছিল? তখন একবার দেখে যেতে পারনি? রক্তে যে গোমতী রাঙা হয়ে গিয়েছিল? আর অলুক্ষণে বেটারা এসেছিস্ আর মায়ের খোরাক্ পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। তোদের একেকটাকে ধরে মা'র কাছে নিবেদন করে দিলে মনের খেদ মেটে!

কানু। আর ভাই, মিছে রাগ করিস্! আমাদের কি আর বল্‌বার মুখ আছে! তা'হলে কি আর দাঁড়িয়ে ওর কথা শুনি!

হারু। তা যা বলিস্ ভাই, অল্পেতেই আমার রাগ হয় সে কথা সত্যি! সে দিন ওব্যক্তি শালা পর্য্যন্ত উঠেছিল তা'র বেশী যদি একটা কথা বল্‌ত, কিংবা আমার গায়ে হাত দিত, মাইরি বল্‌চি, তা'হলে আমি—

নেপাল। তা চল্ না দেখি, কার হাড়ে কত শক্তি আছে!

হারু। তা আয় না! জানিস্, এখানকার দফাদার আমার মামাতো ভাই হয়!

নেপাল। তা নিয়ে আয়—তোর মামাকে সুদ্ধ নিয়ে আয়, তোর দফাদারের দফা নিকেশ করে দিই!

হারু। তোমরা সকলেই শুনলে!

গণেশ কানু। আঃ দূর কর ভাই, ঘরে চল। আজ আর কিছুতে গা লাগ্‌চে না। এখন তোদের তামাসা তুলে, রাখ্।

হারু। এ কি তামাসা হল? আমার মামাকে নিয়ে তামাসা! আমাদের দফাদারের আপনার বাবাকে নিয়ে—

গণেশ কানু। আর রেখেদে। তোর আপনার বাবা নিয়ে তুই আপনি মর!

(প্রস্থান।)

রঘুপতি, নয়নরায় ও জয়সিংহের প্রবেশ।

রঘু। মা'র পরে ভক্তি নাই তব?

নয়ন। হেন কথা
কার সাধ্য বলে? ভক্তবংশে জন্ম মোর!

রঘু। সাধু, সাধু! তবে তুমি মায়ের সেবক,
আমাদেরি লোক।

নয়ন। প্রভু, মাতৃভক্ত যাঁরা
আমি তাঁহাদেরি দাস!

রঘু। সাধু! ভক্তি তব
হউক্ অক্ষয়! ভক্তি তব বাহুমাঝে
করুক্ সঞ্চার অতি দুর্জ্জয় শকতি!
ভক্তি তব তরবারি করুক্ শাণিত,
বজ্রসম দিক্ তাহে তেজ! ভক্তি তব
হৃদয়েতে করুক্ বসতি, পদমান
সকলের উচ্চে।

নয়ন। ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ
ব্যর্থ হইবে না।

রঘু। শুন তবে সেনাপতি,
তোমার সকল বল কর একত্রিত
মা'র কাজে! নাশ কর মাতৃবিদ্রোহীরে!

নয়ন। যে আদেশ প্রভু! কে আছে মায়ের
শত্রু!

রঘু। গোবিন্দমাণিক্য।

নয়ন। আমাদের মহারাজ?

রঘু। লয়ে যত সৈন্য দল, আক্রমণ কর
তারে!

নয়ন। ধিক্ পাপপরামর্শ! প্রভু, এ কি
পরীক্ষা আমারে?

রঘু। পরীক্ষাই বটে! কার
ভৃত্য তুমি, এবার পরীক্ষা হবে তার।
ছাড় চিন্তা, ছাড় দ্বিধা, কাল নাহি আর,
ত্রিপুরেশ্বরীর আজ্ঞা হতেছে ধ্বনিত,
প্রলয়ের শৃঙ্গসম—ছিন্ন হয়ে গেছে
আজি সকল বন্ধন।

নয়ন। নাই চিন্তা, নাই
কোন দ্বিধা। যে পদে রেখেছে দেবী,
আমি তাহে রয়েছি অটল।

রঘু। সাধু!

নয়ন। এত আমি
নরাধম জননীর সেবকের মাঝে,
মোর পরে হেন আজ্ঞা? আমি হব
বিশ্বাসঘাতক? আপনি দাঁড়ায়ে আছে
বিশ্বমাতা—হৃদয়ের বিশ্বাসের পরে,
সেই তাঁর অটল আসন, আপনি তা'
ভাঙ্গিতে বলিবে দেবী আপনার মুখে?
তাহা হলে আজ যাবে রাজা, কাল দেবী,
মনুষ্যত্ব ভেঙ্গে পড়ে যাবে, জীর্ণভিত্তি
অট্টালিকা সম!

জয়। ধন্য, সেনাপতি ধন্য!

রঘু। ধন্য বটে তুমি! কিন্তু এ কি ভ্রান্তি তব।
যে রাজা বিশ্বাসঘাতী জননীর কাছে,
তার সাথে বিশ্বাসের বন্ধন কোথায়?

নয়ন! কি হইবে মিছে তর্কে! বুদ্ধির বিপাকে
চাহিনা পড়িতে। আমি জানি এক পথ
আছে—সেই পথ বিশ্বাসের পথ। সেই
সিধে পথ বেয়ে চিরদিন চলে যাবে
অবোধ অধমভৃত্য এ নয়ন রায়!

(প্রস্থান।)

জয়। চিন্তা কেন দেব? এমনি বিশ্বাস-বলে
মোরাও করিব কাজ। কারে ভয় প্রভু?
সৈন্য-বলে কোন্ কাজ? অস্ত্র কোন্ ছার!
যার পরে রয়েছে যে ভার—বল তার
আছে সে কাজের। করিবই মা'র পূজা
যদি সত্য মায়ের সেবক হই মোরা!
চল প্রভু,—বাজাই মায়ের ডঙ্কা, ডেকে
আনি পুরবাসিগণে। মন্দিরের দ্বার
খুলে দিই!—ওরে আয় তোরা, আয়, আয়,
অভয়ার পূজা হবে—নির্ভয়ে আয়রে
তোরা মায়ের সন্তান! আয় পুরবাসী!

(প্রস্থান।)

পুরবাসিগণ।

অক্রুর। ওরে আয়রে আয়!

সকলে। জয় মা!

হারু। আয়রে মায়ের সামনে বাহু তুলে নৃত্য
করি।

ভৈরোঁ—একতালা।
উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে।
আমরা নৃত্য করি সঙ্গে!
দশদিক্ আঁধার করে মাতিল দিক্ বসনা,
জলে বহ্নিশিখা রাঙা রসনা,
দেখে মরিবারে ধাইছে পতঙ্গে!
কালো কেশ উড়িল আকাশে,
রবি সোম লুকাল তরাসে!
রাঙা রক্তধারা ঝরে কালো অঙ্গে,
ত্রিভুবন কাঁপে ভুরুভঙ্গে!

সকলে। জয় মা!

গণেশ। আর ভয় নেই!

কানু। ওরে, সেই দক্ষিণদ'র মানুষগুলো খন গেল কোথায়!

গণেশ। মায়ের ঐশ্বর্য্য বেটাদের সইল না। রা ভেগেছে!

হারু। কেবল মায়ের ঐশ্বর্য্য নয়, আমি াদের এম্নি শাসিয়ে দিয়েছি তারা আর মুখো হবে না। বুঝ্লে অক্রূর দা, আমার ামাতো ভাই দফাদারের নাম কর্বামাত্র াদের মুখ চূণ হয়ে গেল!

অক্রূর। আমাদের নিতাই সেদিন তাদের ব কড়া কড়া ছুটো কথা শুনিয়ে দিয়েছিল। াই যার সেই ছুচপারা মুখ সেই বেটা তেড়ে ত্তর দিতে এসেছিল; আমাদের নিতাই লে, "ওরে, তোরা দক্ষিণদেশে থাকিস্ তোরা ত্তরের কি জানিস্? উত্তর দিতে এসেছিস্ ত্তরের জানিস্ কি?" শুনে আমরা হেসে ক কার গায়ে পড়ি!

গণেশ। ঈদিকে ঐ ভালমানুষটি কিন্তু নতাইয়ের সঙ্গে কথায় আঁটবার যো নেই!

হারু। নিতাই আমার পিসে হয়।

কানু। শোন একবার কথা শোন! নিতাই আবার তোর পিসে হল কবে?

হারু। তোমরা আমার সকল কথাই ধরতে আরম্ভ করেছ! আচ্ছা, পিসে নয়ত পিসে নয়! তাতে তোমার সুখটা কি হল? আমার হল না, বলে কি তোমারি পিসে হল?

রঘুপতি জয়সিংহের প্রবেশ।

রঘু। শুন্লুম সৈন্য আস্‌চে। জয়সিংহ অস্ত্র নিয়ে তুমি এইখানে দাঁড়াও। তোরা আয়, তোরা এইখানে দাঁড়া! মন্দিরের দ্বার আগ্‌লাতে হবে। আমি তোদের অস্ত্র এনে দিচ্ছি।

গণেশ। অস্ত্র কেন ঠাকুর?

রঘু। মায়ের পূজো বন্ধ করবার জন্যে রাজার সৈন্য আস্‌চে।

হারু। সৈন্য আস্‌চে! প্রভু তবে আমরা প্রণাম হই!

কানু। আমরা ক'জনা, সৈন্য এলে কি কর্‌তে পারব?

হারু। কর্ত্তে সবই পারি—কিন্তু সৈন্য এলে এখেনে জায়গা হবে কোথায়? লড়াইত পরের কথা, এখানে দাঁড়াব কোন্‌খানে?

অক্রূর। তোর কথা রেখে দে! দেখ্‌চিস্‌নে প্রভু রাগে কাঁপচেন। তা ঠাকুর অনুমতি করেন ত আমাদের দলবল সমস্ত ডেকে নিয়ে আসি।

হারু। সেই ভাল। অম্‌নি আমার মামাতো ভাইকে ডেকে আনি। কিন্তু আর এক্‌টুও বিলম্ব করা উচিত নয়।

(সকলের প্রস্থানোদ্যম!)

রঘু। (সরোষে) দাঁড়া তোরা!

জয়। (করযোড়ে) যেতে দাও প্রভু—
প্রাণভয়ে ভীত এরা,
বুদ্ধিহীন—আগে হতে রয়েছে মরিয়া।
আমি আছি মায়ের সৈনিক। এক দেহে

সহস্র সৈন্যের বল। অস্ত্র থাক্ পড়ে!
ভীরুদের যেতে দাও!

রঘু। (স্বগত) সে কাল গিয়েছে!
অস্ত্র চাই—অস্ত্র চাই—শুধু ভক্তি নয়!
(প্রকাশ্যে) জয়সিংহ, তবে বলি আন, করি পূজা!

(বাহিরে বাদ্যোদ্যম।)

জয়। সৈন্য নহে প্রভু, আসিছে রাণীর পূজা!

রাণীর অনুচর ও পুরবাসিগণের প্রবেশ।

সকলে। ওরে ভয় নেই—সৈন্য কোথায়!
মা'র পূজা আস্‌চে।

হারু। আমরা আছি খবর পেয়েছে, সৈন্যেরা শীঘ্র এ দিকে আস্‌চে না!

অনু। ঠাকুর, রাণীমা পূজো পাঠিয়েছেন।

রঘু। জয়সিংহ, শীঘ্র পূজার আয়োজন কর।

(জয়সিংহ প্রস্থান।)

পুরবাসিগণের নৃত্য গীত।

গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ।

গোবিন্দ। চলে যাও হেথা হতে—নিয়ে যাও বলি!
রঘুপতি, শোন নাই আদেশ আমার?

রঘু। শুনি নাই।

গোবিন্দ। তবে তুমি এ রাজ্যের নহ।

রঘু। নহি আমি! আমি আছি যেথা, সেথা
এলে রাজদণ্ড খসে যায় রাজহস্ত হতে,
মুকুট ধূলায় পড়ে লুটে! কে আছিস্,
আন্ মা'র পূজা। (বাদ্যোদ্যম)

গোবিন্দ। চুপ কর! (অনুচরের প্রতি)
কোথা আছে সেনাপতি, ডেকে আন!
হায়, রঘুপতি, অবশেষে সৈন্য দিয়ে ঘিরিতে
হইল ধর্ম্ম! লজ্জা হয় ডাকিতে সৈনিকদল
বাহুবল দুর্ব্বলতা করায় স্মরণ!

রঘু। অবিশ্বাসী, সত্যই কি হয়েছে ধারণা
কলিযুগে ব্রহ্মতেজ গেছে—তাই এত
দুঃসাহস? যায় নাই! যে দীপ্ত অনল
জ্বলিছে অন্তরে, সে তোমার সিংহাসনে
নিশ্চয় লাগিবে! নতুবা এ মনানলে
ছাই ক'রে পুড়াইব সব শাস্ত্র, সব
ব্রহ্মগর্ব্ব, সমস্ত তেত্রিশকোটী মিথ্যা!
আজ নহে মহারাজ রাজ অধিরাজ,
এই দিন মনে কোরো আর একদিন!

নয়নরায় ও চাঁদপালের প্রবেশ।

গোবিন্দ। (নয়নের প্রতি) সৈন্য লয়ে থাক
হেথা নিষেধ করিতে জীববলি।

নয়ন। ক্ষমা কর অধম কিঙ্করে।
অক্ষম রাজার ভৃত্য দেবতা মন্দিরে।
যতদূর যেতে পারে রাজার প্রতাপ
মোরা ছায়া সঙ্গে যাই!

চাঁদ। থাম সেনাপতি,
দীপশিখা থাকে এক ঠাঁই, দীপালোক
যায় বহুদূরে। রাজইচ্ছা যেথা যাবে
সেথা যাব মোরা।

গোবিন্দ। সেনাপতি, মোর আজ্ঞা
তোমার বিচারাধীন নহে! ধর্ম্মাধর্ম্ম
লাভক্ষতি রহিল আমার, কার্য্য শুধু
তব হাতে!

নয়ন। এ কথা হৃদয় নাহি মানে
মহারাজ, ভৃত্য বটে তবুও মানুষ
আমি। আছে বুদ্ধি, আছে ধর্ম্ম, আছে
প্রভু, আছেন দেবতা!

গোবিন্দ। তবে ফেল অস্ত্র তব।
চাঁদপাল, তুমি হলে সেনাপতি, দুই
পদ রহিল তোমার। সাবধানে সৈন্য
লয়ে মন্দির করিবে রক্ষা!

চাঁদ। যে আদেশ

মহারাজ!

গোবিন্দ। নয়ন, তোমার অস্ত্র দাও

চাঁদপালে!

নয়ন। চাঁদপালে? কেন মহারাজ?

এ অস্ত্র, তোমার পূর্ব্ব রাজপিতামহ
দিয়াছেন আমাদের পিতামহে। ফিরে
নিতে চাও যদি, তুমি লও! স্বর্গে আছ
তোমরা হে পিতৃপিতামহ, সাক্ষী থাক
এতদিন যে রাজবিশ্বাস পালিয়াছ
বহু যত্নে, সাগ্নিকের পুণ্য অগ্নি সম,
যার ধন তারি হাতে ফিরে দিনু আজ
কলঙ্কবিহীন।

চাঁদ। কথা আছে ভাই!

নয়ন। ধিক্!

চুপ কর! মহারাজ, বিদায় হলেম!

(প্রণামপূর্ব্বক প্রস্থান।)

গোবিন্দ। ক্ষুদ্র স্নেহ নাই রাজকাজে! দেবতার
কার্য্যভার তুচ্ছ মানবের পরে, হায়
কি কঠিন!

রঘু। এমনি করিয়া ব্রহ্মশাপ
ফলে শেষে, বিশ্বাসী হৃদয় দূরে যায়,
ভেঙ্গে যায় দাঁড়াবার স্থান।

জয়সিংহের প্রবেশ।

জয়। আয়োজন।

হয়েছে পূজার। প্রস্তুত রয়েছে বলি।

গোবিন্দ। বলি কার তরে?

জয়। মহারাজ তুমি হেথা!

তবে শোন নিবেদন—একান্ত মিনতি
যুগল চরণতলে, প্রভু, ফিরে লও
তব গর্ব্বিত আদেশ! মানব হইয়া
দাঁড়ায়োনা দেবীরে আচ্ছন্ন করি—

রঘু। ধিক্

জয়সিংহ, ওঠ, ওঠ! চরণে পতিত
কার কাছে? আমি যার গুরু, এ সংসারে
এই পদতলে তার একমাত্র স্থান!
মূঢ়, ফিরে দেখ্,—গুরুর চরণ ধ'রে
ক্ষমা ভিক্ষা কর! রাজার আদেশ নিয়ে
করিব দেবীর পূজা,—করাল কালিকা,
এত কি হয়েছে তোর অধঃপাত? থাক্
পূজা, থাক্ বলি,—দেখিব রাজার দর্প
কতদিন থাকে। চলে এস জয়সিংহ।

(উভয়ের প্রস্থান।)

গোবিন্দ। এ সংসারে বিনয় কোথায়?

মহাদেবী,
যারা করে বিচরণ তব পদতলে
তারাও শেখেনি হায় কত ক্ষুদ্র তারা।
হরণ করিয়া লয়ে তোমার মহিমা
আপনার দেহে বহে, এত অহঙ্কার!

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—*—

প্রথম দৃশ্য।

মন্দির। রঘুপতি। জয়সিংহ। নক্ষত্ররায়।

নক্ষত্র। কি জন্য ডেকেছ গুরুদেব?

রঘু। কাল রাত্রে

স্বপন দিয়েছে দেবি, তুমি হবে রাজা।

নক্ষত্র। আমি হব রাজা! হা, হা! বল কি
ঠাকুর!

রাজা হব? এ কথা নূতন শোনা গেল!

রঘু। তুমি রাজা হবে।

নক্ষত্র। বিশ্বাস না হয় মোর!

রঘু। দেবীর স্বপন সত্য। রাজটীকা পাবে
তুমি, নাহিক সন্দেহ!
নক্ষত্র। নাহিক সন্দেহ!
কিন্তু যদি নাই পাই!
রঘু। আমার কথায়
অবিশ্বাস!
নক্ষত্র। অবিশ্বাস কিছুমাত্র নেই,
কিন্তু দৈবাতের কথা—যদি নাই হয়!
রঘু। অন্যথা হবে না কভু!
নক্ষত্র। অন্যথা হবে না!
দেখো প্রভু, কথা যেন ঠিক থাকে শেষে!
রাজা হয়ে মন্ত্রীটারে দেব দূর করে,
সর্ব্বদাই দৃষ্টি তার রয়েছে পড়িয়া
আমা পরে, যেন সে বাপের পিতামহ!
বড় ভয় করি তারে—বুঝেছ ঠাকুর,
তোমারে করিব মন্ত্রী।
রঘু। মন্ত্রিত্বের পদে
পদাঘাত করি আমি!
নক্ষত্র। আচ্ছা, জয়সিংহ
মন্ত্রী হবে। কিন্তু হে ঠাকুর, সবি যদি
জান তুমি, বল দেখি কবে রাজা হব!
রঘু। রাজরক্ত চান্ দেবী।
নক্ষত্র। রাজরক্ত চান্!
রঘু। রাজরক্ত আগে আন পরে রাজা হবে।
নক্ষত্র। পাব কোথা!
রঘু। ঘরে আছে গোবিন্দমাণিক্য।
তাঁরি রক্ত চাই!
নক্ষত্র। তাঁরি রক্ত চাই!
রঘু। স্থির
হয়ে থাক জয়সিংহ, হোয়োনা চঞ্চল!
—বুঝেছ কি? শোন তবে,—
গোপনে তাঁহারে
বধ ক'রে, আনিবে সে তপ্তরাজরক্ত
দেবীর চরণে। জয়সিংহ, স্থির যদি
না থাকিতে পার, চলে যাও অন্য ঠাঁই!
—বুঝেছ নক্ষত্ররায়, দেবীর আদেশ
রাজরক্ত চাই—শ্রাবণের শেষ রাত্রে!
তোমরা রয়েছ দুই রাজভ্রাতা—জ্যেষ্ঠ
যদি অব্যাহতি পায়—তোমার শোণিত
আছে। তৃষিত হয়েছে যবে মহাকালী,
তখন সময় আর নাই বিচারের।
নক্ষত্র। সর্ব্বনাশ! হে ঠাকুর কাজ কি রাজত্বে!
রাজরক্ত থাক্ রাজদেহে, আমি যাহা
আছি সেই ভাল।
রঘু। মুক্তি নাই! মুক্তি নাই
কিছুতেই! রাজরক্ত আনিতেই হবে!
নক্ষত্র। বলে দাও, হে ঠাকুর, কি করিতে
হবে।
রঘু। প্রস্তুত হইয়া থাক। যখন যা' বলি
অবিলম্বে সাধন করিবে। কার্য্যসিদ্ধি
যত দিন নাহি হয় বন্ধ রেখো মুখ!
এখন বিদায় হও।
নক্ষত্র। হে মা কাত্যায়নী!
(প্রস্থান।)

জয়। এ কি কথা শুনিলাম! দয়াময়ি, এ কি
কথা! তোর আজ্ঞা! ভাই দিয়ে
ভ্রাতৃহত্যা!
বিশ্বের জননি! গুরু দেব! হেন আজ্ঞা
মাতৃআজ্ঞা ব'লে করিলে প্রচার!
রঘু। আর
কি উপায় আছে বল!
জয়। উপায়! কিসের
উপায় প্রভু! হাধিক্! জননী, তোমার
হস্তে খড়্গ নাই? রোষে তব বজ্রানল
নাহি চণ্ডি? তব ইচ্ছা উপায় খুঁজিছে,
খুঁড়িছে সুরঙ্গপথ চোরের মতন
রসাতলগামী? এ কি পাপ!

রঘু। পাপপুণ্য
তুমি কিবা জান।
জয়। শিখেছি তোমারি কাছে!
রঘু। তবে এস বৎস, আর এক শিক্ষা দিই!
পাপপুণ্য কিছু নাই। কেবা ভ্রাতা, কেবা
আত্মপর। কে বলিল হত্যাকাণ্ড পাপ!
এ জগৎ মহা হত্যাশালা। জাননা কি
প্রত্যেক পলকপাতে লক্ষকোটি প্রাণী
চির আঁখি মুদিতেছে। সে কাহার খেলা?
হত্যায় খচিত এই ধরণীর ধূলি।
প্রতিপদে চরণে দলিত শত কীট;
তাহারা কি জীব নহে? রক্তের অক্ষরে
অবিশ্রাম লিখিতেছে বৃদ্ধ মহাকাল
বিশ্বপত্রে জীবের ক্ষণিক ইতিহাস।
হত্যা অরণ্যের মাঝে, হত্যা লোকালয়ে,
হত্যা বিহঙ্গের নীড়ে, কীটের গহ্বরে,
অগাধ সাগর জলে, নির্ম্মল আকাশে,
হত্যা জীবিকার তরে, হত্যা খেলাচ্ছলে
হত্যা অকারণে, হত্যা অনিচ্ছার বশে,
চলেছে নিখিল বিশ্ব হত্যার তাড়নে
ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রাণপণে—ব্যাঘ্রের আক্রমে
মৃগসম, মুহূর্ত্ত দাঁড়াতে নাহি পারে!
মহাকালী কালস্বরূপিণী, রয়েছেন
দাঁড়াইয়ী, তৃষাতীক্ষ্ণ লোলজিহ্বা মেলি,—
বিশ্বের চৌদিক বেয়ে চিররক্তধারা
ফেটে পড়িতেছে, নিষ্পেষিত দ্রাক্ষা হতে
রসের মতন, অনন্ত খর্পরে তাঁর—
জয়। থাম, থাম, থাম! মায়াবিনি, পিশাচিনি,
মাতৃহীন এ সংসারে এসেছিস্ তুই
মা'র ছদ্মবেশ ধরে রক্তপান লোভে!
ক্ষুধিত বিহঙ্গশিশু অরক্ষিত নীড়ে
চেয়ে থাকে মা'র প্রত্যাশায়, কাছে আসে
লুব্ধকাক, ব্যগ্রকণ্ঠে অন্ধশাবকেরা
মা মনে করিয়া তারে করে ডাকাডাকি,
হারায় কোমল প্রাণ হিংস্রচঞ্চুঘাতে,
তেমনি কি তোর ব্যবসায়? প্রেম মিথ্যা,
স্নেহ মিথ্যা, দয়া মিথ্যা, মিথ্যা আর সব,
সত্য শুধু অনাদি অনন্ত হিংসা! তবে
কেন মেঘ হতে, ঝরে আশীর্ব্বাদ সম
বৃষ্টিধারা দগ্ধ ধরণীর বক্ষ পরে,
গলে আসে পাষাণ হইতে দয়াময়ী
স্রোতস্বিনী মরুমাঝে, কোটি কণ্টকের
শিরোভাগে কেন ফুল ওঠে বিকশিয়া?
ছলনা করেছ মোরে প্রভু! দেখিতেছ
মাতৃভক্তি রক্তসম হৃদয় টুটিয়া
ফেটে পড়ে কিনা! আমারি হৃদয় বলি
দিলে মাতৃপদে। ওই দেখ হাসিতেছে
মা আমার স্নেহ পরিহাসবশে! বটে,
তুই রাক্ষসী পাষাণী বটে, মা আমার
রক্ত পিয়াসিনী! নিবি মা আমার রক্ত—
ঘুচাবি সন্তানজন্ম এ জন্মের তরে,
দিব ছুরি বুকে? এই শিরা-ছেঁড়া রক্ত
বড় কি লাগিবে ভাল? ওরে মা আমার
রাক্ষসী পাষাণী বটে! ডাকিছ কি মোরে
গুরুদেব? ছলনা বুঝেছি আমি তব!
ভক্তহিয়া-বিদারিত এই রক্ত চাও!
দিয়েছিলে এই যে বেদনা, তারি পরে
জননীর স্নেহ হস্ত পড়িয়াছে। দুঃখ
চেয়ে সুখ শতগুণ। কিন্তু রাজভক্ত!
ছিছি! ভক্তিপিপাসিতা মাতা, তাঁরে বল
রক্তপিপাসিনী!
রঘু। বন্ধ হোক্ বলিদান
তবে!
জয়। হোক্ বন্ধ! না না, গুরুদেব, তুমি
জান ভালমন্দ! সরল ভক্তির বিধি
শাস্ত্রবিধি নহে। আপন আলোকে আঁখি
দেখিতে না পায়, আলোক আকাশ হতে
আসে। প্রভু, ক্ষমা কর—ক্ষমা কর দাসে!

ক্ষমা কর স্পর্দ্ধা মূঢ়তার! ক্ষমা কর
নিতান্ত বেদনাবশে উদ্ভ্রান্ত প্রলাপ!
বল প্রভু, সত্যই কি রাজরক্ত চান্
মহাদেবী?

রঘু। হায় বৎস, হায়! অবশেষে
অবিশ্বাস মোর প্রতি?

জয়। অবিশ্বাস! কভু
নহে! তোমারে ছাড়িলে বিশ্বাস আমার
দাঁড়াবে কোথায়? বাসুকীর শিরশ্চ্যুত
বসুধার মত, শূন্য হতে শূন্যে পাবে
লোপ! রাজরক্ত চায় তবে মহামায়া,
সে রক্ত আনিব আমি। দিব না ঘটিতে
ভ্রাতৃহত্যা!

রঘু। দেবতার আজ্ঞা পাপ নহে।

জয়। পুণ্য তবে, আমিই সে করিব অর্জ্জন!

রঘু। সত্য ক'রে বলি বৎস তবে। তোরে আমি
ভালবাসি প্রাণের অধিক—পালিয়াছি
শিশুকাল হতে তোরে, মায়ের অধিক
স্নেহে, তোরে আমি নারিব হারাতে!

জয়। মোর
স্নেহে ঘটিতে দিব না পাপ, অভিশাপ
আনিব না এ স্নেহের পরে।

রঘু। ভাল ভাল
সে কথা হইবে পরে,—কল্য হবে স্থির।

(উভয়ের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মন্দির। অপর্ণা।

গান।

ওগো পুরবাসী!

আমি দ্বারে দাঁড়ায়ে আছি উপবাসী।
জয়সিংহ, কোথা জয়সিংহ! কেহ নাই
এ মন্দিরে! তুমি কে দাঁড়ায়ে আছ হোথা
অচল মূরতি,—কোন কথা না বলিয়া
হরিতেছ জগতের সারধন যত!
আমরা যাহার লাগি কাতর কাঙাল
ফিরে মরি পথে পথে, সে আপনি এসে
তব পদতলে করে আত্মসমর্পণ!
তাহে তোর কোন্ প্রয়োজন! কেন তারে
কৃপণের ধন সম রেখে দিস্ পুঁতে
মন্দিরের তলে—দরিদ্র এ সংসারের
সর্ব্ব ব্যবহার হতে করিয়া গোপন!
জয়সিংহ, এ পাষাণী কোন্ সুখ দেয়,
কোন্ কথা বলে তোমা কাছে, কোন্ চিন্তা
করে তোমা তরে,—প্রাণের গোপন পাত্রে
কোন সান্ত্বনার সুধা চির রাত্রি দিন
রেখে দেয় করিয়া সঞ্চিত! ওরে চিত্ত
উপবাসী, কার রুদ্ধ দ্বারে আছ বসে?

গান।

ওগো পুরবাসী,
আমি দ্বারে দাঁড়ায়ে আছি উপবাসী।
হেরিতেছি সুখমেলা, ঘরে ঘরে কত খেলা,
শুনিতেছি সারাবেলা সুমধুর বাঁশি!

রঘুপতির প্রবেশ।

রঘু। কে রে তুই এ মন্দিরে!

অপর্ণা। আমি ভিখারিণী
জয়সিংহ কোথা!

য়। দূর হ এখান হতে
মায়াবিনী! জয়সিংহে চাহিস্ কাড়িতে
দেবীর নিকট হতে ওরে উপদেবী!
পর্ণা। আমা হতে দেবীর কি ভয়? আমি ভয়
করি তারে, পাছে মোর সব করে গ্রাস!
(গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।)
চাহিনা অনেক ধন, রবনা অধিক ক্ষণ
যেথা হতে আসিয়াছি সেথা যাব ভাসি!
তোমরা আনন্দে রবে নব নব উৎসবে
কিছু ম্লান নাহি হবে গৃহভরা হাসি!

তৃতীয় দৃশ্য।

মন্দির সম্মুখে পথ। জয়সিংহ।

য়। দূর হোক চিন্তা জাল! দ্বিধা দূর হোক্!
চিন্তার নরক চেয়ে কার্য্য ভাল, যত
ক্রূর, যতই কঠোর হোক্! কার্য্যের ত
শেষ আছে, চিন্তার সীমানা নাই কোথা;—
ধরে সে সহস্র মূর্ত্তি পলকে পলকে
বাষ্পের মতন,—চারিদিকে যতই সে
পথ খুঁজে মরে, পথ তত লুপ্ত হয়ে
যায়। এক ভাল অনেকের চেয়ে! তুমি
সত্য, গুরুদেব, তোমারি আদেশ সত্য—
সত্যপথ তোমারি ইঙ্গিত মুখে। হত্যা
পাপ নহে, ভ্রাতৃহত্যা পাপ নহে, নহে
পাপ রাজহত্যা!—সেই সত্য, সেই সত্য!
পাপ পুণ্য নাই, সেই সত্য! থাক্ চিন্তা,
থাক্ আত্মদাহ, থাক্ বিচারবিবেক!
কোথা যায় ভাই সব, মেলা আছে বুঝি
নিশিপুরে!—কুকী-রমণীর নৃত্য হবে?
আমিও যেতেছি!—এ ধরায় কত সুখ
আছে—নিশ্চিন্ত আনন্দসুখে নৃত্য করে
নারীদল,—মধুর অঙ্গে রঙ্গভঙ্গ
উচ্ছ্বসিয়া উঠে চারিদিকে তটপ্লাবী
তরঙ্গিণীসম। নিশ্চিন্ত আনন্দে সবে
ধায় চারিদিক হতে—উঠে গীত গান,
বহে হাস্য পরিহাস, ধরণীর শোভা
উজ্জ্বল মুরতি ধরে! আমিও চলিনু!

গান।

বাউলের সুর।

আমারে, কে নিবি ভাই,
সঁপিতে চাই আপনারে!
আমার এই মন গলিয়ে কাজ ভুলিয়ে
সঙ্গে তোদের নিয়ে যা'রে।

দূরে অপর্ণার প্রবেশ।

ওকিও অপর্ণা! দূরে দাঁড়াইয়া কেন?
শুনিতেছ অবাক্ হইয়া, জয়সিংহ
গান গাহে? সব মিথ্যা, বৃহৎ বঞ্চনা,
তাই হাসিতেছি—তাই গাহিতেছি গান,
ওই দেখ পথ দিয়ে তাই চলিতেছে
লোক নির্ভাবনা, তাই ছোটকথা নিয়ে
এতই কৌতুক হাসি, এত কুতূহল,
তাই এত যত্নভরে সেজেছে যুবতী!
সত্য যদি হত, তবে হত কি এমন?
সহজে আনন্দ এত বহিত কি হেথা?
তাহা হলে বেদনায় বিদীর্ণ ধরায়
বিশ্বব্যাপী ব্যাকুল ক্রন্দন থেমে গিয়ে,
মূক হয়ে রহিত অনন্তকাল ধরি!
বাঁশি যদি সত্যই কাঁদিত বেদনায়—
ফেটে গিয়ে সঙ্গীত নীরব হত তার।
মিথ্যা ব'লে তাই এত হাসি; শ্মশানের
কোলে বসে খেলা, বেদনার পাশে শুয়ে
গান, হিংসা ব্যাঘ্রিণীর খর নখতলে
চলিতেছে প্রতিদিবসের কর্ম্মকাজ!

সত্য হ'লে এমন কি হত। হা অপর্ণা
তুমি আমি কিছু সত্য নই—তাই জেনে
সুখী হও,—বিষণ্ণ বিস্ময়ে মুগ্ধ আঁখি
তুলে কেন রয়েছিস্ চেয়ে! আয় সখি,
চিরদিন চ'লে যাই দুই জনে মিলে
সংসারের পর দিয়ে—শূন্য নভস্তলে
দুই লঘু মেঘখণ্ড সম!

রঘুপতির প্রবেশ

রঘু। জয়সিংহ!
জয়। তোমারে চিনিনে আমি! স্বামি
চলিয়াছি আমার অদৃষ্টভরে ভেসে নিজ
পথে,—পথের সহস্র লোক যেমন চলেছে।
তুমি কে বলিছ মোরে দাঁড়াইতে? তুমি
চলে যাও—আমি চলে যাই।
রঘু। জয়সিংহ।
জয়। ওইত সম্মুখে পথ চলেছে সরল—
চলে যাব ভিক্ষাপাত্র হাতে, সঙ্গে লয়ে
ভিখারিণী সখী মোর!—কে বলিল এই
সংসারের রাজপথ দুরূহ জটিল!
যেমন ক'রেই যাই, দিবা-অবসানে
পঁহুছিব জীবনের অন্তিম পলকে;
আচার বিচার তর্ক বিতর্কের জাল
কোথা মিশে যাবে! ক্ষুদ্র এই পরিশ্রান্ত
নরজন্ম সমর্পিব ধরণীর কোলে;
দু'চারি দিনের এই সমষ্টি আমার,
দুচারিটা ভুল-ভ্রান্তি ভয় দুঃখ সুখ
ক্ষীণ হৃদয়ের আশা, দুর্ব্বলতা বশে
ভ্রষ্ট ভগ্ন এ জীবনভার, ফিরে দিয়ে
অনন্তকালের হাতে গভীর বিশ্রাম!
এইত সংসার! কি কাজ শাস্ত্রের বিধি,
কি কাজ গুরুতে!—প্রভু, পিতা, গুরুদেব,
কি বলিতেছিনু! স্বপ্নে ছিনু এতক্ষণ।
এই সে মন্দির—ওই সেই মহাবট
দাঁড়ায়ে রয়েছে, অটল কঠিন দৃঢ়
নিষ্ঠুর সত্যের মত! কি আদেশ দেব!
ভুলি নাই কি করিবে হবে। এই দেখ
(ছুরি দেখাই
তোমার আদেশ স্মৃতি অন্তরে বাহিরে
হতেছে শাণিত। আরো কি আদেশ অ
প্রভু!
রঘু। দূর ক'রে দাও বালিকারে
মন্দির হইতে! মায়াবিনী, জানি আমি
তোদের কুহক! দূর করে দাও ওরে!
জয়। দূর ক'রে দিব? দরিদ্র, আমারি মত
মন্দির আশ্রিত, আমারি মতন হায়
সঙ্গিহীন, অকণ্টক পুষ্পের মতন
নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ, শুভ্র, সুন্দর, সরল,
সুকোমল, বেদনাকাতর, দূর করে
দিতে হবে ওরে? তাই দিব গুরুদেব!
চলে যা' অপর্ণা! দয়ামায়া স্নেহ প্রেম
সব মিছে! মরে যা' অপর্ণা! সংসারের
বাহিরেতে কিছুই না থাকে যদি, আছে
তবু দয়াময় মৃত্যু! চলে যা' অপর্ণা!
অপর্ণা। তুমি চলে এস জয়সিংহ, এ মন্দির
ছেড়ে, দুই জনে চলে যাই!
জয়। দুইজনে
চলে যাই! এ ত স্বপ্ন নয়! একবার
স্বপ্নে মনে করেছিনু স্বপ্ন এ জগৎ!
তাই হেসেছিনু, সুখে গান গেয়েছিনু।
কিন্তু সত্য এ যে! বোলো না সুখের ব
আর—দেখায়ো না স্বাধীনতা প্রলোভন
বন্দী আমি সত্য কারাগারে!
রঘু। জয়সিংহ,
কাল নাই মিষ্ট আলাপের! দূর করে
দাও ওই বালিকারে!
জয়। চলে যা অপর্ণা
অপর্ণা। কেন যাব?

জয়। এই নারী—অভিমান তোর ?

অপর্ণা। অভিমান কিছু নাই আর। জয়সিংহ,
তোমার বেদনা আমার সকল ব্যথা
সব গর্ব্ব চেয়ে বেশী। কিছু মোর নাই
অভিমান।

জয়। তবে আমি যাই। মুখ তোর
দেখিব না যতক্ষণ রহিবি হেথায়!
চলে যা অপর্ণা।

অপর্ণা। নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ। ধিক্ থাক্ ব্রাহ্মণত্বে
তব! আমি ক্ষুদ্র নারী,
অভিশাপ দিয়ে গেনু তোরে, এ বন্ধনে
জয়সিংহ পারিবি না বাঁধিয়া রাখিতে।
(প্রস্থান।)

রঘু। বৎস, তোল মুখ কথা কও একবার।
প্রাণপ্রিয় প্রাণাধিক, আমার কি প্রাণে
অগাধ সমুদ্রসম স্নেহ নাই! আরো
চাস্? আমি আজন্মের বন্ধু, দুদণ্ডের
মায়াপাশ ছিন্ন হয়ে যায় যদি, তাহে
এত ক্লেশ!

জয়। থাক্ প্রভু, বোলো না স্নেহের
কথা আর! কর্ত্তব্য রহিল শুধু, মনে।
স্নেহপ্রেম তরুলতাপত্রপুষ্পসম
ধরণীর উপরেতে শুধু, আসে যায়
শুকায় মিলায় নব নব স্বপ্নবৎ!
নিয়ে থাকে শুষ্ক রূঢ় পাষাণের স্তূপ
রাত্রিদিন, অনন্ত হৃদয়ভারসম!
(প্রস্থান।)

রঘু। জয়সিংহ, কিছুতে পাইনে তোর মন,
এত যে সাধনা করি নানা ছলে বলে!
(প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য।

—*—

মন্দির প্রাঙ্গণ। জনতা।

গণেশ। এবারে মেলায় তেমন লোক হল না!

অক্রূর। এবারে আর লোক হবে কি করে? এ ত আর হিঁদুর রাজত্ব রইল না। এ যেন নবাবের রাজত্ব হয়ে উঠ্‌ল! ঠাক্‌রুণের বলিই বন্ধ হয়ে গেল, ত মেলায় লোক আস্‌বে কি!

কানু। ভাই, রাজার ত এ বুদ্ধি ছিল না, বোধ হয় কিসে তাকে পেয়েছে।

অক্রূর। যদি পেয়ে থাকে ত মুসলমানের ভূতে পেয়েছে, নইলে বলি উঠিয়ে দেবে কেন?

গণেশ। কিন্তু যাই বল, এ রাজ্যের মঙ্গল হবে না!

কানু। পুরুত ঠাকুর ত স্বয়ং বলে দিয়েছেন তিনি মাসের মধ্যে মড়কে দেশ উচ্ছন্ন যাবে।

হারু। তিন মাস কেন যে রকম দেখ্‌চি তাতে তিন দিনের ভর সইবে না। এই দেখ না কেন, আমাদের মোধো এই আড়াই বছর ধ'রে ব্যাম ভুগে ভুগে বরাবরই ত বেঁচে এসেছে ঐ যেমন বলি বন্ধ হল অমনি মারা গেল।

অক্রূর। না রে, সে ত আজ তিন মাস হল মরেছে!

হারু। না হয় তিন মাসই হল কিন্তু এই বছরেই ত মরেচে বটে!

ক্ষান্তমণি। ওগো, তা কেন, আমার ভাসুরপো, সে যে মরবে কে জান্ত! তিন দিনের জ্বর। ঐ যেমনি কবিরাজের বড়িটি খাওয়া অমনি চোখ উল্‌টে গেল!

গণেশ। সে দিন মথুরহাটির গঞ্জে আগুন লাগ্‌ল, একখানি চালা বাকী রইল না!

চিন্তামণি। অত কথায় কাজ কি! দেখ না কেন, এ বছর ধান যেমন শস্তা হয়েছে এমন আর কোন বছরে হয় নি। এ বছর চাষার কপালে কি আছে কে জানে!

হারু। ঐ রে রাজা আস্‌চে: সকালবেলাতেই আমাদের এমন রাজার মুখ দেখ্‌লুম, দিন কেমন যাবে কে জানে! চল এখান থেকে সরেপড়ি!

(সকলের প্রস্থান।)

চাঁদপাল ও গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ।

চাঁদ। মহারাজ, সাবধানে থেকো! চারিদিকে চক্ষুকর্ণ পেতে আছি, রাজইষ্টানিষ্ট কিছু না এড়ায় মোর কাছে। মহারাজ, তব প্রাণ হত্যা তরে গুপ্ত আলোচনা স্বকর্ণে শুনেছি।

গোবিন্দ। প্রাণহত্যা! কে করিবে?

চাঁদ। বলিতে সঙ্কোচ মানি। ভয় হয় পাছে সত্যকার ছুরি চেয়ে নিষ্ঠুর সংবাদ অধিক আঘাত করে রাজার হৃদয়ে!

গোবিন্দ। অসঙ্কোচে বলে যাও। রাজার হৃদয় সতত প্রস্তুত থাকে আঘাত সহিতে। কে করেছে হেন পরামর্শ?

চাঁদ। যুবরাজ নক্ষত্ররায়।

গোবিন্দ। নক্ষত্র?

চাঁদ। স্বকর্ণে শুনেছি মহারাজ, রঘুপতি যুবরাজে মিলে গোপনে মন্দিরে বসে স্থির হয়ে গেছে সব কথা।

গোবিন্দ। দুই দণ্ডে স্থির হয়ে গেল আজন্মের বন্ধন টুটিতে! হায় বিধি!

চাঁদ। দেবতার কাছে তব রক্ত এনে দেবে—

গোবিন্দ। দেবতার কাছে। তবে আর নক্ষত্রের নাই দোষ। জানিয়াছি, দেবতার নামে মনুষ্যত্ব হারায় মানুষ। ভয় নাই যাও তুমি কাজে। সাবধানে রব আমি!

(চাঁদপালের প্রস্থান।)

রক্ত নহে, ফুল আনিয়াছি, মহাদেবী,
ভক্তি শুধু, হিংসা নহে, বিভীষিকা নহে;
এ জগতে দুর্ব্বলেরা বড় অসহায়
মা জননি, বাহুবল বড়ই নিষ্ঠুর,
স্বার্থ বড় ক্রূর, লোভ বড় নিদারুণ,
অজ্ঞান একান্ত অন্ধ, গর্ব্ব চ'লে যায়
অকাতরে ক্ষুদ্রজনে দলি পদতলে!
হেথা স্নেহ প্রেম অতি ক্ষীণবৃন্তে থাকে
পলকে খসিয়া পড়ে স্বার্থের পরশে।
তুমিও জননী যদি খড়্গ উঠাইলে,
মেলিলে রসনা, তবে সব অন্ধকার।
ভাই তাই ভাই নহে আর, পতি প্রতি
সতী বাম, বন্ধু শত্রু, শোণিতে পঙ্কিল
মানবের বাসগৃহ হিংসা পুণ্য, দয়া
নির্ব্বাসিত। আর নহে, আর নহে, ছাড়
ছদ্মবেশে! এখনো কি হয়নি সময়?
এখনো কি রহিবে প্রলয় রূপ তব?
এই যে উঠিছে খড়্গ চারিদিক হতে
মোর শির লক্ষ্য করি, মাতঃ একি তোরি
চারিভুজ হতে? তাই হবে! তবে তাই
হোক্‌। বুঝি মোর রক্তপাতে হিংসানল
নিবে যাবে। ধরণীর সহিবে না এত
হিংসা! রাজহত্যা! ভাই দিয়ে ভ্রাতৃহত্যা!
সমস্ত প্রজার বুকে লাগিবে বেদনা,
সমস্ত ভা'য়ের প্রাণ উঠিবে কাঁদিয়া!
মোর রক্তে হিংসার ঘুচিবে মাতৃবেশ,

প্রকাশিবে রাক্ষসী আকার! এই যদি
দয়ার বিধান তোর, তবে তাই হোক্।

জয়সিংহের প্রবেশ।

য়। বল্ চণ্ডি, সত্যই কি রাজরক্ত চাই?
এই বেলা বল্—বল্ নিজ মুখে, বল্
মানব ভাষায়, বল্ শীঘ্র, সত্যই কি
রাজরক্ত চাই?

নেপথ্যে) চাই!

য়। তবে মহারাজ,
নাম লহ ইষ্ট দেবতার! কাল তব
নিকটে এসেছে!

াবিন্দ। কি হয়েছে জয়সিংহ?

য়। শুনিলে না নিজ কর্ণে? দেবীরে শুধানু,
সত্যই কি রাজরক্ত চাই—দেবী নিজে
কহিলেন—চাই!

াবিন্দ। দেবী নহে জয়সিংহ,
কহিলেন রঘুপতি অন্তরাল হতে,
পরিচিত স্বর।

য়। কহিলেন রঘুপতি?
অন্তরাল হতে? নহে নহে, আর নহে।
কেবলি সংশয় হতে সংশয়ের মাঝে
নামিতে পারিনে আর! যখনি কূলের
কাছে আসি—কে মোরে ঠেলিয়া
ফেলে দেয়
অতলের মাঝে! সে যে অবিশ্বাস দৈত্য।
আর নহে! গুরু হোক্, কিংবা দেবী হোক্
একই কথা। (ছুরিকা উন্মোচন)
(ছুরি ফেলিয়া) ফুল নে মা! নে মা।
ফুল নে মা!
পায়ে ধরি, শুধু ফুল নিয়ে হোক্ তোর
পরিতোষ! আর রক্ত না মা, আর রক্ত
নয়! এও যে রক্তের মত রাঙা, দুটি
জবাফুল! পৃথিবীর মাতৃবক্ষ ফেটে
উঠিয়াছে ফুটে, সন্তানের রক্তপাতে
ব্যথিত ধরার স্নেহবেদনার মত।।
নিতে হবে! এই নিতে হবে! আমি
নাহি ডরি তোর রোষ। রক্ত নাহি দিব!
রাঙা' তোর আঁখি! তোল তোর খড়্গ!
আন্ তোর শ্মশানের দল! আমি নাহি ডরি!
(জয়সিংহ ব্যতীত সকলের প্রস্থান)
এ কি হল হায়! দেবী গুরু যাহা ছিল
এক দণ্ডে বিসর্জ্জন দিনু—বিশ্ব-মাঝে
কিছু রহিল না আর!

রঘুপতির প্রবেশ।

রঘু। সকল শুনেছি
আমি! সব পণ্ড হল! কি করিলি, ওরে
অকৃতজ্ঞ!

জয়। দণ্ড দাও প্রভু!

রঘু। সব ভেঙ্গে
দিলি! ব্রহ্মশাপ ফিরাইলি অর্দ্ধপথ।।
হতে! লঙ্ঘিলি গুরুর বাক্য! ব্যর্থ করে
দিলি দেবীর আদেশ! আপন বুদ্ধিরে
করিলি সকল হতে বড়! আজন্মের
স্নেহঋণ সুধিলি এমনি করে!

জয়। দণ্ড
দাও পিতা!

রঘু। কোন্ দণ্ড দিব?

জয়। প্রাণদণ্ড!

রঘু। নহে। তার চেয়ে গুরুদণ্ড চাই! স্পর্শ
কর্ দেবীর চরণ!

জয়। করিনু পরশ!

রঘু। বল্ তবে, রাজরক্ত আমি এনে দিব
শ্রাবণের শেষ রাত্রে দেবীর চরণে!

জয়। রাজরক্ত আমি এনে দিব, শ্রাবণের
শেষ রাত্রে দেবীর চরণে।

রঘু। চলে যাও!

—

তৃতীয় অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম দৃশ্য।

—*—

মন্দির।

জনতা। রঘুপতি। জয়সিংহ।

রঘু। তোরা এখেনে সব কি করতে এলি?

সকলে। আমরা ঠাকরুণ দর্শন কর্ত্তে এসেছি।

রঘু। বটে! দর্শন করতে এসেচ? এখনো তোমাদের চোখ দুটো যে আছে সে কেবল বাপের পুণ্যে! ঠাকরুণ কোথায়? ঠাকরুণ এ রাজ্য ছেড়ে চলে গেছেন! তোরা ঠাকরুণকে রাখ্‌তে পারলি কৈ? তিনি চলে গেছেন।

সকলে। কি সর্ব্বনাশ। সে কি কথা ঠাকুর! আমরা কি অপরাধ করেছি!

নিস্তারিণী। আমার বোনপোর ব্যাম ছিল বলেই যা আমি ক'দিন পূজো দিতে আস্‌তে পারিনি।

গোবর্দ্ধন। আমার পাঁঠা দুটো ঠাকরুণকেই দেব বলে অনেক দিন থেকে মনে করে রেখেছিলুম, এরি মধ্যে রাজা বলি বন্ধ করে দিলে ত আমি কি করব!

হারু। এই আমাদের গন্ধমাদন যা মানৎ করেছিল তা মাকে দেয় নি বটে কিন্তু মাও ত তেম্‌নি তাকে শাস্তি দিয়েচেন! তার পিলে বেড়ে ঢাক্‌ হয়ে উঠেছে—আজ ছ'টি মাস বিছানায় প'ড়ে! তা' বেশ হয়েছে, আমাদেরি যেন সে মহাজন তাই বলে কি মা'কে ফাঁকি দিতে পারবে!

অক্রূর। চুপ কর্ তোরা! মিছে গোল করিস্‌নে! আচ্ছা ঠাকুর, মা যেন চলে গেলেন আমাদের কি অপরাধ হয়েছিল?

রঘু। মা'র জন্যে এক ফোঁটা রক্ত দিতে পারিস্‌নে এই ত তোদের ভক্তি?

অনেকে। রাজার আজ্ঞা, তা আমরা কি করব!

রঘু। রাজা কে! মা'র সিংহাসন তবে কি রাজার সিংহাসনের নীচে? তবে এই মাতৃহীন দেশে তোদের রাজাকে নিয়েই থাক্, দেখি তোদের রাজা কি ক'রে রক্ষে করে!

(সকলের সভয়ে গুন্‌গুন্ স্বরে কথা)

অক্রূর। চুপ কর্! সন্তান যদি অপরাধ করে থাকে মা তাকে দণ্ড দিক্ কিন্তু একেবারে ছেড়ে চলে যাবে এ কি মা'র মত কাজ? বলে দাও, কি করলে মা ফিরবে!

রঘু। তোদের রাজা যখন রাজ্য ছেড়ে যাবে মাও তখন রাজ্যে ফিরে পদার্পণ করবে।

নিস্তব্ধভাবে পরস্পরের মুখাবলোকন।

রঘু। তবে তোরা দেখ্‌বি! এইখেনে আয়! অনেক দূর থেকে অনেক আশা ক'রে ঠাকরুণকে দেখ্‌তে এসেছিস্, তবে একবার চেয়ে দেখ!

মন্দিরের দ্বার-উদ্‌ঘাটন। প্রতিমার পশ্চাৎ-ভাগ দৃশ্যমান।

সকলে। ওকি! মা'র মুখ কোন্ দিকে?

অক্রূর। ওরে, মা বিমুখ হয়েছেন।

সকলে। ওমা, ফিরে দাঁড়া মা, ফিরে দাঁড়া মা, ফিরে দাঁড়া মা! একবার ফিরে দাঁড়া! মা কোথায়! মা কোথায়! আমরা তোকে ফিরিয়ে আনব মা! আমরা তোকে ছাড়ব না! চাইনে আমাদের রাজা! যাক রাজা! মরুক্ রাজা!

জয়। (রঘুপতির নিকটে আসিয়া) প্রভু, আমি কি একটি কথাও কব না?

রঘু। না!

জয়। সন্দেহের কি কোন কারণ নেই!

রঘু। না!

জয়। সমস্তই কি বিশ্বাস করিব?

রঘু। হাঁ!

অপর্ণা। (পার্শ্বে আসিয়া) জয়সিংহ, এস জয়সিংহ, শীঘ্র এস এ মন্দির ছেড়ে!

জয়। বিদীর্ণ হইল বক্ষ!

(রঘুপতি অপর্ণা জয়সিংহের প্রস্থান।)

রাজার প্রবেশ।

প্রজাগণ। রক্ষা কর মহারাজ, আমাদের
রক্ষা কর—মাকে ফিরে দাও!

গোবি। বৎসগণ, কর
অবধান! সেই মোর প্রাণপণ সাধ,
জননীরে ফিরে এনে দেব!

প্রজা। জয় হোক্
মহারাজ, জয় হোক্ তব!

গোবি। একবার
শুধাই তোদের, তোরা কি মায়ের গর্ভে
নিস্নি জনম? মাতৃগণ, তোমরা ত
অনুভব করিয়াছ কোমল হৃদয়ে
মাতৃস্নেহসুধা; বল দেখি মা কি নেই?
মাতৃস্নেহ সব হতে পবিত্র প্রাচীন;
সৃষ্টির প্রথম দণ্ডে মাতৃস্নেহ শুধু
একেলা জাগিয়া বসে ছিল, নতনেত্রে
তরুণ বিশ্বেরে কোলে লয়ে! আজিও সে
পুরাতন মাতৃস্নেহ রয়েছে বসিয়া
ধৈর্য্যের প্রতিমা হয়ে! সহিয়াছে কত
উপদ্রব, কত শোক, কত ব্যথা, কত
অনাদর,—চখের সম্মুখে ভায়ে ভায়ে
কত রক্তপাত, কত নিষ্ঠুরতা, কত
অবিশ্বাস! বাক্যহীন বেদনা বহিয়া
তবু সে জননী আছে বসে, দুর্ব্বলের
তরে কোল পাতি, একান্ত যে নিরুপায়
তারি তরে সমস্ত হৃদয় দিয়ে! আজ
কি এমন অপরাধ করিয়াছি মোরা
যার লাগি সে অসীম স্নেহ চলে গেল
চিরমাতৃহীন ক'রে অনাথ সংসার!
বৎসগণ, মাতৃগণ, বল, খুলে বল,
কি এমন করিয়াছি অপরাধ?

কেহ কেহ। মা'র
বলি নিষেধ করেছ। বন্ধ মা'র পূজা।

গোবি। নিষেধ করেছি বলি, সেই অভিমানে
বিমুখ হয়েছে মাতা। আসিছে মড়ক,
উপবাস, অনাবৃষ্টি, অগ্নি, রক্তপাত,
মা তোদের এমনি মা বটে। দণ্ডে দণ্ডে
ক্ষীণ শিশুটিরে স্তন্য দিয়ে বাঁচাইয়ে
তোলে মাতা, সে কি তার রক্তপান লোভে?
হেন মাতৃঅপমান মনে স্থান দিলি
যবে, আজন্মের মাতৃস্নেহস্মৃতি মাঝে
ব্যথা বাজিল না? মনে পড়িল না মা'র
মুখ?—রক্ত চাই, রক্ত চাই, গরজন
করিছে জননী, অবোলা দুর্ব্বল জীব
প্রাণভয়ে কাঁপে থরথর,—নৃত্য করে
দয়াহীন নরনারী রক্তমত্ততায়,
এই কি মায়ের পরিবার? পুত্রগণ
এই কি মায়ের স্নেহছবি?

প্রজাগণ। মূর্খ মোরা
বুঝিতে পারিনে।

গোবি। বুঝিতে পার না। শিশু
দুদিনের, কিছু যে বোঝেনা আর, সেও
তার জননীরে বোঝে! সেও বোঝে, ভয়
পেলে নির্ভয় মায়ের কাছে, সেও বোঝে
ক্ষুধা পেলে দুগ্ধ আছে মাতৃস্তনে, সেও
ব্যথা পেলে কাঁদে মা'র মুখ চেয়ে।—তোরা
এমন কি ভুলে ভ্রান্ত হলি, মা'কে গেলি
ভুলে? বুঝিতে পার না মাতা দয়াময়ী?

বুঝিতে পার না জীবজননীর পূজা
জীব রক্ত দিয়ে নহে, ভালবাসা দিয়ে।
বুঝিতে পার না—ভয় যেথা মা সেখানে
নয়, হিংসা যেথা মা সেখানে নাই, রক্ত
যেথা মা'র সেথা অশ্রুজল। ওরে বৎস,
কি করিয়া দেখাব তোদের, কি বেদনা
দেখেছি মায়ের মুখে, কি কাতর দয়া,
কি ভর্ৎসনা অভিমানভরা ছল্‌ছল
নেত্রে তাঁর। দেখাইতে পারিতাম যদি,
সেই দণ্ডে চিনিতিস্ আপনার মাকে।
দয়া এল দীনবেশে মন্দিরের দ্বারে,
অশ্রুজলে মুছে দিতে কলঙ্কের দাগ
মার সিংহাসন হতে, সেই অপরাধে
মাতা চলে গেল রোষভরে, এই তোরা
করিলি বিচার?

প্রজা। আপনি চাহিয়া দেখ,
বিমুখ হয়েছে মাতা সন্তানের পরে।

অপর্ণা। (মন্দির দ্বারে উঠিয়া)
বিমুখ হয়েছে মাতা। আয় ত মা, দেখি,
আয় ত সমুখে একবার। (প্রতিমা ফিরাইয়া)
এই দেখ,
মুখ ফিরায়েছে মাতা।

সকলে। ফিরেছে জননী।
জয়হোক্ জয়হোক্।

ভৈরবী। একতালা।

থাক্‌তে আর ত পারলি নে মা, পারলি কৈ?
কোলের সন্তানেরে ছাড়্‌লি কৈ?
দোষী আছি অনেক দোষে,
ছিলি বসে ক্ষণিক রোষে,
মুখ ত ফিরালি শেষে, অভয় চরণ কাড়লি কৈ?
(সকলের প্রস্থান।)

জয়সিংহ ও রঘুপতির প্রবেশ।

জয়। সত্য বল প্রভু, তোমারি এ কাজ।

রঘু। সত্য
কেন না বলিব? আমি কি ডরাই সত্য
বলিবারে? আমারি এ কাজ। প্রতিমার
মুখ ফিরায়ে দিয়েছি আমি। কি বলিতে
চাও, বল। হয়েছ গুরুর গুরু তুমি,
কি ভর্ৎসনা করিবে আমারে?
দিবে কোন্ উপদেশ?

জয়। বলিবার কিছু নাই মোর।

রঘু। কিছু নাই? কোন প্রশ্ন নাই মোর কাছে?
সন্দেহ জন্মিলে মনে মীমাংসার তরে
চাহিবে না গুরু উপদেশ? এত দূরে
গেছ? মনে এতই কি ঘটেছে বিচ্ছেদ?
মূঢ়, শোন। সত্যই ত বিমুখ হয়েছে
দেবী, কিন্তু তাই বলে প্রতিমার মুখ
নাহি ফিরে। মন্দিরে যে রক্তপাত করি
দেবী তাহা করে পান, প্রতিমার মুখে
সে রক্ত উঠে না। দেবতার অসন্তোষ
প্রতিমার মুখে প্রকাশ না পায়। কিন্তু
মূর্খদের কেমনে বুঝাব। চোখে চাহে
দেখিবারে, চোখে যাহা দেখিবার নয়।
মিথ্যা দিয়ে সত্যেরে বুঝাতে হয় তাই।
মূর্খ! তোমার আমার হাতে সত্য নাই।
সত্যের প্রতিমা সত্য নহে, কথা সত্য
নহে, লিপি সত্য নহে, মূর্ত্তি সত্য নহে,
চিন্তা সত্য নহে। সত্য কোথা আছে, কেহ
নাহি জানে তারে, কেহ নাহি পায় তারে!
সেই সত্য কোটি মিথ্যা রূপে চারিদিকে
ফাটিয়া পড়েছে; সত্য তাই নাম ধরে
মহামায়া, অর্থ তার মহামিথ্যা! সত্য
মহারাজ বসে থাকে রাজঅন্তঃপুরে—
শত মিথ্যা প্রতিনিধি তার, চতুর্দ্দিকে
মরে খেটে খেটে!—শিরে হাত দিয়ে, ভাব,
বসে বসে—আমার অনেক কাজ আছে।
আবার গিয়াছে ফিরে প্রজাদের মন।

জয়। যে তরঙ্গ তীরে নিয়ে আসে; সেই ফিরে
অকূলের মাঝখানে টেনে নিয়ে যায়!
সত্য নহে, সত্য নহে, সত্য নহে; সবি
মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা! দেবী নাই প্রতিমার
মাঝে, তবে কোথা আছে? কোথাও
সে নাই!
দেবী নাই! ধন্য ধন্য ধন্য মিথ্যা তুমি!

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রাসাদ-কক্ষ।

রাজা। চাঁদপাল।

চাঁদ। প্রজারা করিছে কুমন্ত্রণা। মোগলের
সেনাপতি চলিয়াছে আসামের দিকে
যুদ্ধ লাগি,—নিকটেই আছে, দুই চারি
দিবসের পথে। প্রজারা তাহারি কাছে
পাঠাবে প্রস্তাব—তোমারে করিতে দূর
সিংহাসন হতে!

গোবিন্দ। আমারে করিবে দূর?
মোর পরে এত অসন্তোষ?

চাঁদ। মহারাজ,
সেবকের অনুনয় রাখ—পশুরক্ত
এত যদি ভাল লাগে নিষ্ঠুর প্রজার,
দাও তাহাদের পশু,—রাক্ষসী প্রবৃত্তি
পশুর উপর দিয়া যাক্! সর্ব্বদাই
ভয়ে ভয়ে আছি কখন্ কি হয়ে পড়ে।

গোবিন্দ। আছে ভয় জানি চাঁদপাল। রাজকার্য্য
সেও আছে! পাথার ভীষণ, তবু তরী
তীরে নিয়ে যেতে হবে। গেছে কি প্রজার
দূত মোগলের কাছে?

চাঁদ। এতক্ষণে গেছে।

গোবিন্দ। চাঁদপাল, তুমি তবে যাও এই বেলা,
মোগলের শিবিরের কাছাকাছি থেকো—
যখন যা ঘটে সেথা পাঠায়ো সংবাদ!

চাঁদ। মহারাজ! সাবধানে থেকো হেথা প্রভু,
অন্তরে বাহিরে শত্রু!

(প্রস্থান)

গুণবতীর প্রবেশ।

গোবিন্দ। প্রিয়ে, বড় শুষ্ক,
বড় শূন্য এ সংসারে! অন্তরে বাহিরে
শত্রু। তুমি এসে ক্ষণেক দাঁড়াও হেসে,
ভালবেসে চাও মুখ পানে। প্রেমহীন
অন্ধকার ষড়যন্ত্র বিপদ বিদ্বেষ
সবার উপরে হোক্ তব সুধাময়
আবির্ভাব, ঘোর নিশীথের শিরোদেশে
নির্নিমেষ চন্দ্রের মতন। প্রিয়তমে,
নিরুত্তর কেন? অপরাধ বিচারের
এই কি সময়? তৃষার্ত্ত হৃদয় যবে
মুমূর্ষুর মত চাহে মরুভূমি মাঝে
সুধাপাত্র হাতে নিয়ে চলে যাবে?
চলে গেলে? হায়, দুর্ব্বহ জীবন!

(গুণবতীর প্রস্থান।)

নক্ষত্রের প্রবেশ।

নক্ষত্র। (স্বগত) যেথা যাই সকলেই বলে
"রাজা হবে?"
"রাজা হবে?" এ বড় আশ্চর্য্য কাণ্ড! একা
বসে থাকি তবু শুনি কে যেন বলিছে
রাজা হবে? রাজা হবে? দুই কাণে যেন
বাসা করিয়াছে দুই টিয়ে পাখী—এক
বুলি জানে শুধু—রাজা হবে? রাজা হবে?
ভাল বাপু তাই হব,—কিন্তু রাজরক্ত
সে কি তোরা এনে দিবি?

গোবিন্দ। নক্ষত্র ! (নক্ষত্র সচকিত)
নক্ষত্র !
আমারে মারিবে তুমি ? বল, সত্য বল,
আমারে মারিবে ? এই কথা জাগিতেছে
হৃদয়ে তোমার নিশিদিন ? এই কথা
মনে নিয়ে মোর সাথে হাসিয়া বলেছ
কথা, প্রণাম করেছ পায়ে, আশীর্ব্বাদ
করেছ গ্রহণ, মধ্যাহ্নে আহার কালে
এক অন্ন ভাগ ক'রে করেছ ভোজন,
এই কথা নিয়ে ? বুকে ছুরি দেবে ? ওরে
ভাই, এই বুকে টেনে নিয়েছিনু তোরে
এ কঠিন মর্ত্ত্যভূমি প্রথম চরণে
তোর বেজেছিল যবে,—এই বুক মাঝে
টেনে নিয়েছিনু তোরে, যে দিন জননী,
তোর শিরে শেষ স্নেহ হস্ত রেখে, গেল
ধরাধাম শূন্য করি—আজ সেই তুই
সেই বুকে ছুরি দিবি ? এক রক্ত ধারা
বহিতেছে দোঁহার শরীরে, সেই রক্ত
পিতৃপিতামহ হতে বহিয়া এসেছে
চিরদিন, ভাইদের শিরায় শিরায়,
সেই শিরা ছিন্ন করে দিয়ে, সেই রক্ত
ফেলিবে ভূতলে ?—এই বন্ধ করে দিনু
দ্বার, এই নে আমার তরবারি, মার্
অবারিত বক্ষে, পূর্ণ হোক মনস্কাম !

নক্ষত্র। ক্ষমা কর ! ক্ষমা কর ভাই ! ক্ষমা কর !

গোবিন্দ। এস বৎস ফিরে এস ! সেই বক্ষে
ফিরে এস ! ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছ ?
এসংবাদ শুনেছি যখন, ক্ষমা তখনি
করেছি ! তোরে ক্ষমা না করিতে অক্ষম
যে আমি !

নক্ষত্র। রঘুপতি দেয় কুমন্ত্রণা ! রক্ষ মোরে
তার কাছ হতে !

গোবিন্দ। কোন ভয় নেই ভাই !

তৃতীয় দৃশ্য।

—*—

অন্তঃপুর কক্ষ।

গুণবতী।

গুণ। তবু ত হল না ! আশা ছিল মনে মনে
কঠিন হইয়া থাকি কিছু দিন যদি
তাহা হলে আপনি আসিবে ধরা দিতে
প্রেমের তৃষায়। এত অহঙ্কার ছিল
মনে ! মুখ ফিরে থাকি, কথা নাহি কই,
অশ্রুও ফেলিনে, শুধু শুষ্ক রোষ, শুধু
অবহেলা, এমন ত কতদিন গেল !
শুনেছি নারীর রোষ পুরুষের কাছে
শুধু শোভা আভাময়, তাপ নাহি তাহে
হীরকের দীপ্তিসম ! ধিক্ থাক্ শোভা !
এ রোষ বজ্রের মত হত যদি, তবে
পড়িত প্রাসাদ পরে, ভাঙ্গিত রাজার
নিদ্রা, চূর্ণ হত রাজ অহঙ্কার, পূর্ণ
হ'ত রাণীর মহিমা ! আমি রাণী, কেন
জন্মাইলে এ মিথ্যা বিশ্বাস ! হৃদয়ের
অধীশ্বরী তব—এই মন্ত্র প্রতিদিন
কেন দিলে কাণে ? কেন না জানালে মোরে
আমি ক্রীতদাসী, রাজার কিঙ্করী শুধু
রাণী নহি, তাহা হলে আজিকে সহসা
এ আঘাত, এ পতন সহিতে হত না !

ধ্রুবের প্রবেশ।

কোথা যাস্ তুই ?

ধ্রুব। আমারে ডেকেছে রাজা।
(প্রস্থান।)

গুণ। রাজার হৃদয় রত্ন এই সে বালক !
ওরে শিশু, চুরি করে নিয়েছিস্ তুই
আমার সন্তান তরে যে আসন ছিল !

না আসিতে আমার বাছারা, তাহাদের
পিতৃস্নেহ পরে তুই বসাইলি ভাগ!
রাজ হৃদয়ের সুধাপাত্র হতে, তুই
নিলি প্রথম অঞ্জলি, রাজপুত্র এসে
তোরি,কি প্রসাদ পাবে ও রাজদ্রোহী!
মাগো মহামায়া এ কি তোর অবিচার!
এত সৃষ্টি, এত দয়া তোর—খেলাচ্ছলে
দে আমারে এক সন্তান, দে জননি,
শুধু এই টুকু শিশু, কোলটুকু ভ'রে
যায় যাহে! তুই যা' বাসিস্ ভাল, তাই
দিব তোরে।

নক্ষত্রের প্রবেশ।

নক্ষত্র, কোথায় যাও। ফিরে
যাও কেন। এত ভয় কারে তব। আমি
নারী, অস্ত্রহীন, বলহীন, নিরুপায়,
অসহায়, আমি কি ভীষণ এত।

নক্ষত্র। না, না,
মোরে ডাকিয়ো না।

গুণ। কেন কি হয়েছে!

নক্ষত্র। আমি
রাজা নাহি হব।

গুণ! নাই হ'লে! তাই বলে
এত আস্ফালন কেন?

নক্ষত্র। চিরকাল বেঁচে
থাক্ রাজা, আমি যেন যুবরাজ থেকে
মরি!

গুণ। তাই মর। শীঘ্র মর। পূর্ণ হোক্ মনো-
রথ। আমি কি তোমার পায়ে ধরে
রেখেছি বাঁচিয়ে?

নক্ষত্র। তবে কি বলিবে বল।

গুণ। যে চোর করিছে চুরি তোমারি মুকুট
তাহারে সরায়ে দাও। বুঝেছ কি।

নক্ষত্র। সব
বুঝিয়াছি, শুধু কে সে চোর বুঝি নাই!

গুণ। ওই যে বালক ধ্রুব। বাড়িছে রাজার
কোলে, দিনে দিনে উঁচু হয়ে উঠিতেছে
মুকুটের পানে।

নক্ষত্র। তাই বটে! এতক্ষণে
বুঝিলাম সব। মুকুট দেখেছি বটে
ধ্রুবের মাথায়। আমি বলি শুধু খেলা।

গুণ। মুকুট লইয়া খেলা? বড় কাল খেলা!
এইবেলা ভেঙ্গে দাও—নহে তুমি শেষে
সে খেলার হইবে খেলেনা!

নক্ষত্র। তাই বটে।
এ ত ভাল খেলা নয়।

গুণ। অন্ধকারে আজি
গোপনে লইয়া তারে দেবীর চরণে
মোর নামে কর নিবেদন। তার রক্তে
নিবে যাবে দেবরোষানল, স্থায়ী হবে
সিংহাসন এই রাজবংশে—পিতৃলোক
গাহিবেন কল্যাণ তোমার। বুঝেছ কি?

নক্ষত্র। বুঝিয়াছি!

গুণ। তবে যাও। যা বলিনু কর!
মনে রেখো,মোর নামে কোরো নিবেদন!

নক্ষত্র। তাই হবে। মুকুট লইয়া খেলা। এ কি
সর্ব্বনাশ। দেবীর সন্তোষ, রাজ্যরক্ষা,
পিতৃলোক—বুঝিতে কিছুই বাকী নেই।

চতুর্থ দৃশ্য।

—:০—

মন্দির সোপান। জয়সিংহ।

জয়। দেবি আছ, আছ তুমি। দেবি, থাক
তুমি। এ অসীম রজনীর সর্ব্ব প্রান্তশেষে
যদি থাক কণামাত্র হয়ে, সেথা হতে
ক্ষীণতম স্বরে সাড়া দাও, বল মোরে

"বৎস আছি"।—নাই! নাই! দেবি নাই।
নাই? দয়া করে থাক। অয়ি মায়াময়ী
মিথ্যা, দয়া কর, দয়া কর, জয়সিংহে
সত্য হয়ে ওঠ্। আশৈশব ভক্তি মোর,
আজন্মের প্রেম তোরে প্রাণ দিতে নারে?
এত মিথ্যা তুই? এ জীবন কারে দিলি
জয়সিংহ! সব ফেলে দিলি সত্য শূন্য
দয়া শূন্য, মাতৃশূন্য সর্ব্বশূন্য মাঝে!

অপর্ণার প্রবেশ।

অপর্ণা, আবার এসেছিস্? তাড়ালেম
মন্দির বাহিরে, তবু তুই অনুক্ষণ
আশে পাশে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াস্
সুখের দুরাশা সম দরিদ্রের মনে?
সত্য আর মিথ্যায় প্রভেদ শুধু এই!
মিথ্যারে রাখিয়া দিই মন্দিরের মাঝে
বহুযত্নে, তবুও সে থেকেও থাকে না।
সত্যেরে তাড়ায়ে দিই মন্দির বাহিরে
অনাদরে, তবুও সে ফিরে ফিরে আসে!
অপর্ণা, যাস্‌নে তুই, তোরে আমি আর
ফিরাবনা! আয়, এইখানে বসি দোঁহে!
অনেক হয়েছে রাত! কৃষ্ণপক্ষশশী
উঠিতেছে তরু অন্তরালে। চরাচর
সুপ্তিমগ্ন, শুধু মোরা দোঁহে নিদ্রাহীন।
অর্পণা, বিষাদময়ি, তোরেও কি গেছে
ফাঁকিদিয়ে মায়ার দেবতা? দেবতায়
কোন্ আবশ্যক! কেন তারে ডেকে আনি
আমাদের ছোট খাট সুখের সংসারে?
তারা কি মোদের ব্যথা বুঝে? পাষাণের
মত শুধু চেয়ে থাকে। আপন ভায়েরে
প্রেমহতে বঞ্চিত করিয়া, সেই প্রেম
দিই তারে,সে কি তার কোন কাজে লাগে?
এ সুন্দরী সুখময়ী ধরণী হইতে
মুখ ফিরাইয়া, তার দিকে চেয়ে থাকি,
সে কোথায় চায়? তার কাছে ক্ষুদ্র বটে
তুচ্ছ বটে, তবু ত আমার মাতৃধরা;
তার কাছে কীটবৎ তবু ত আমার
ভাই; অবহেলে অন্ধরথচক্রতলে
দলিয়া চলিয়া যায়, তবু সে দলিত
উপেক্ষিত, তারাত আমার আপনার!
আয় ভাই নির্ভয়ে দেবতাহীন হয়ে
আরো কাছাকাছি সবে বেঁধে বেঁধে থাকি।
রক্ত চাই! স্বরগের ঐশ্বর্য্য ত্যেজিয়া
এ দরিদ্র ধরাতলে তাই কি এসেছ?
সেথায় মানব নেই, জীব নেই কেহ,
রক্ত নেই, ব্যথা পাবে হেন কিছু নেই,
তাই স্বর্গে হয়েছে অরুচি! আসিয়াছ
মৃগয়া করিতে নির্ভয় বিশ্বাস সুখে
যেথা বাসা বেঁধে আছে মানবের ক্ষুদ্র
পরিবার! অপর্ণা, বলিকা, দেবী নাই!

অপর্ণা। জয়সিংহ, তবে চলে এস, এ মন্দির
ছেড়ে।

জয়। যাব, যাব, তাই যাব, ছেড়ে চলে
যাব! হায়রে অপর্ণা, তাই যেতে হবে।
তবু যে রাজত্বে আজন্ম করেছি বাস
পরিশোধ করে দিয়ে তার রাজকর
তবে যেতে পাব! থাক্ ও সকল কথা!
দেখ্ চেয়ে, গোমতীর শীর্ণ জলরেখা
জ্যোৎস্নালোকে পুলকিত,—কলধ্বনি তার
এক কথা শতবার করিছে প্রকাশ!
আকাশেতে অর্দ্ধচন্দ্র পাণ্ডুমুখচ্ছবি
শ্রান্তিক্ষীণ—বহু রাত্রিজাগরণে যেন
পড়েছে চাঁদের চোখে আধেক পল্লব
ঘুমভারে! সুন্দর জগৎ! হা অপর্ণা,
এমন রাত্রির মাঝে দেবী নাই! থাক্
দেবী! অপর্ণা, জানিস্ কিছু সুখভরা
সুধাভরা কোন কথা? শুধু তাই বল্!
যা শুনিলে মুহূর্ত্তে অতলে মগ্ন হয়ে

ভুলে যাব জীবনের তাপ, মরণ যে
কত মধুরতাময় আগে হতে পাব
তার স্বাদ ! অপর্ণা, এমন কিছু বল্
ওই মধুকণ্ঠে তোর, ওই মধু আঁখি
রেখে মোর মুখপানে, এই জনহীন
স্তব্ধরজনীতে, এই বিশ্বজগতের
নিদ্রামাঝে, বল্‌রে অপর্ণা, যা শুনিলে
মনে হবে চারিদিকে আর কিছু নাই,
শুধু ভালবাসা ভাসিতেছে, পূর্ণিমার
সুপ্তরাত্রে রজনীগন্ধার গন্ধসম !

অপর্ণা। হায় জয়সিংহ, বলিতে পারিনে
কিছু, বুঝি মনে আছে কত কথা।

জয়। তবে আরো
কাছে আয়, মন হতে মনে যাক্ কথা !
—এ কি করিতেছি আমি ! অপর্ণা, অপর্ণা,
চলে যা মন্দির ছেড়ে, গুরুর আদেশ !

অপর্ণা। জয়সিংহ, হোয়োনা নিষ্ঠুর ! বারবার
ফিরায়োনা ! কি সয়েছি অন্তর্যামী
জানে।

জয়। তবে আমি যাই ! এক দণ্ড হেথা নহে !
(কিয়দ্দুর গিয়া ফিরিয়া)
অপর্ণা, নিষ্ঠুর আমি ? এই কি রহিবে
তোর মনে, জয়সিংহ নিষ্ঠুর, কঠিন !
কখনো কি হাসিমুখে কহি নাই কথা ?
কখনো কি ডাকি নাই কাছে ? কখনো কি
ফেলি নাই অশ্রুজল তোর অশ্রু দেখে ?
অপর্ণা, সে সব কথা পড়িবে না মনে,
শুধু মনে রহিবে জাগিয়া জয়সিংহ
নিষ্ঠুর পাষাণ ? যেমন পাষাণ ওই
পাষাণের ছবি, দেবী বলিতাম যারে !
হায় দেবী, তুই যদি দেবী হইতিস্,
তুই যদি বুঝিতিস্ এই অন্তর্দাহ !

অপর্ণা। বুদ্ধিহীন ব্যথিত এ ক্ষুদ্র নারী হিয়া,
ক্ষমা কর এরে ! এই বেলা এস,
জয়সিংহ, এস মোরা এ মন্দির ছেড়ে
যাই !

জয়। রক্ষা কর ! অপর্ণা, করুণা কর !
দয়া করে মোরে ফেলে চলে যাও ! এক
কাজ বাকী আছে এ জীবনে, সেই হোক্
প্রাণেশ্বর, তার স্থান তুমি কাড়িয়ো না !
(দ্রুত প্রস্থান।)

অপর্ণা। শতবার সহিয়াছি, আজ কেন আর
নাহি সহে ! আজ কেন ভেঙ্গে পড়ে প্রাণ !

পঞ্চম দৃশ্য।

মন্দির। নক্ষত্ররায়। রঘুপতি।
নিদ্রিত ধ্রুব।

রঘু। কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। জয়সিংহ
এসেছিল মোর কোলে অমনি শৈশবে
পিতৃমাতৃহীন। সেদিন অমনি করে
কেঁদেছিল নূতন দেখিয়া চারিদিক ;
হুতাশ্বাস শ্রান্ত শোকে অমনি করিয়া
ঘুমায়ে পড়িয়াছিল সন্ধ্যা হয়ে গেলে
ওইখানে দেবীর চরণে ! ওরে দেখে
তার সেই শিশু মুখ শিশুর ক্রন্দন
মনে পড়ে।

নক্ষত্র। ঠাকুর কোরো না দেরী আর,
ভয় হয় কখন্ সংবাদ পাবে রাজা !

রঘু। সংবাদ কেমন করে পাবে ? চারিদিক
নিশীথের নিদ্রা দিয়ে ঘেরা !

নক্ষত্র। একবার
মনে হল যেন দেখিলাম কার ছায়া !

রঘু। আপন ভয়ের !

নক্ষত্র। শুনিলাম যেন কার
ক্রন্দনের স্বর !

রঘু। আপনার হৃদয়ের !
দূর হোক্ নিরানন্দ ! এস পান করি
কারণ সলিল। (মদ্যপান) মনোভাব যতক্ষণ
মনে থাকে, ততক্ষণ দেখায় বৃহৎ,—
কার্য্যকালে ছোট হয়ে আসে ! বহু বাষ্প
গ'লে গিয়ে একবিন্দু জল ! কিছুই না !
শুধু মুহূর্ত্তের কাজ ! শুধু শীর্ণশিখা
প্রদীপ নিভাতে যতক্ষণ ! ঘুম হতে
চকিতে মিলায়ে যাবে গাঢ়তর ঘুমে
ওই প্রাণরেখাটুকু,—শ্রাবণ নিশীথে
বিজুলী ঝলক সম শুধু বজ্র তার
চিরদিন বিঁধে রবে রাজদন্তমাঝে !
এস, এস যুবরাজ, ম্লান হয়ে কেন
বসে আছ একপাশে—মুখে কথা নেই,
হাসি নেই, নির্ব্বাপিতপ্রায়। এস, পান
করি আনন্দ সলিল !

নক্ষত্র। অনেক বিলম্ব
হয়ে গেছে। আমি বলি আজ থাক্ !
কাল পূজা হবে।

রঘু। বিলম্ব হয়েছে বটে। রাত্রি
শেষ হয়ে আসে।

নক্ষত্র। ওই শোন পদধ্বনি।

রঘু। কই ! নাহি শুনি !

নক্ষত্র। ওই শোন। ওই দেখ
আলো !

রঘু। সংবাদ পেয়েছে রাজা। আর তবে
এক পল দেরী নয়। জয় মহাকালী !
(খড়্গ উত্তোলন)

রাজা ও প্রহরিগণের দ্রুত প্রবেশ।

রাজার নির্দ্দেশক্রমে প্রহরীর দ্বারা রঘুপতি ও নক্ষত্ররায় ধৃত হইল।

গোবিন্দ। নিয়ে যাও কারাগারে ! বিচার
হইবে

চতুর্থ অঙ্ক।

—*—

প্রথম দৃশ্য।

—*—

বিচার সভা।

গোবিন্দ। (রঘুপতিকে) আর কিছু বলিবার
আছে ?

রঘু। কিছু নাই !

গোবিন্দ। অপরাধ করিছ স্বীকার ?

রঘু। অপরাধ ?
অপরাধ করিয়াছি বটে ! দেবীপূজা
করিতে পারিনি শেষ,—মোহে মূঢ় হয়ে
বিলম্ব করেছি অকারণে ! তার শাস্তি
দিতেছেন দেবী, তুমি উপলক্ষ শুধু !

গোবিন্দ। শুন সর্ব্বলোক, আমার নিয়ম এই—
পবিত্র পূজার ছলে দেবতার কাছে
যে মোহান্ধ দিবে জীববলি, কিংবা তারি
করিবে উদ্যোগ, [illegible]-আজ্ঞা তুচ্ছ করি,
নির্ব্বাসনদণ্ড তার [illegible]ত। রঘুপতি,
অষ্টবর্ষ নির্ব্বাসনে [illegible]বে যাপন ;
তোমারে আসিবে [illegible]খ সৈন্য চারিজন
রাজ্যের বাহিরে !

রঘু। দেবী ছাড়া, এ জগতে
এ জানু হয় নি নত আর কারো কাছে।
আমি বিপ্র তুমি শূদ্র, তবু যোড় করে,
নত জানু আজ আমি প্রার্থনা করিব
তোমা কাছে, দুইদিন দাও অবসর,
শ্রাবণের শেষ দুইদিন ! তার পরে
শরতের প্রথম প্রত্যুষে চলে যাব
তোমার এ অভিশপ্ত দগ্ধ রাজ্য ছেড়ে
আর ফিরাবনা মুখ !

গোবিন্দ। দুই দিন দিনু
অবসর।

[নক্ষত্র]। মহারাজ রাজ অধিরাজ,
মহিমাসাগর তুমি কৃপা অবতার!
ধূলির অধম আমি, দীন অভাজন।

(প্রস্থান ।)

গোবিন্দ। নক্ষত্র, স্বীকার কর অপরাধ তব।

নক্ষত্র। মহারাজ, দোষী আমি! সাহস না হয়
মার্জ্জনা করিতে ভিক্ষা। (পদতলে পতন)

গোবিন্দ। বল, তুমি কার
মন্ত্রণায় ভুলে এ কাজে দিয়েছ হাত?
স্বভাবকোমল তুমি, নিদারুণ বুদ্ধি
এ তোমার নহে।

নক্ষত্র। আর কারে দিব দোষ
লব না এ পাপমুখে আর কারো নাম!
আমি শুধু একা অপরাধী! আপনার
পাপমন্ত্রণায় আপনি ভুলেছি। শত
দোষ ক্ষমা করিয়াছ নির্ব্বোধ ভ্রাতার,
আরবার ক্ষমা কর!

গোবিন্দ। নক্ষত্র, চরণ
ছেড়ে ওঠ! শোন কথা! ক্ষমা কি আমার
কাজ? বিচারক আপন শাসনে বদ্ধ,
বন্দী হতে বেশী বন্দী! এক অপরাধে
দণ্ড পাবে একজনে, মুক্তি পাবে আর
এমন ক্ষমতা নাই বিধাতার, আমি
কোথা আছি!

সকলে। ক্ষমা কর, ক্ষমা কর প্রভু.
নক্ষত্র তোমার ভাই!

গোবিন্দ। স্থির হও সবে।
ভাই বন্ধু কেহ নাই মোর, এ আসনে
যতক্ষণ আছি। প্রমাণ হইয়া গেছে
অপরাধ। ছাড়ায়ে ত্রিপুররাজ্যসীমা
ব্রহ্মপুত্র নদীতীরে আছে রাজগৃহ
তীর্থস্নানতরে, সেথায় নক্ষত্ররায়
অষ্টবর্ষ নির্ব্বাসন করিবে যাপন।

প্রহরিগণ নক্ষত্রকে লইয়া যাইতে উদ্যত।
রাজার সিংহাসন হইতে অবরোহণ।

গোবিন্দ। দিয়ে যাও বিদায়ের আলিঙ্গন! ভাই,
এ দণ্ড তোমার শুধু একেলার নহে,
এ দণ্ড আমার! আজ হতে রাজগৃহ
সূচিকণ্টকিত হয়ে বিঁধিবে আমায়!
রহিল তোমার সাথে আশীর্ব্বাদ মোর;
যতদিন দূরে র'বে রাখিবেন তোরে
দেবগণ!

(নক্ষত্রের প্রস্থান ।)

গোবিন্দ। (সভাসদ্‌গণের প্রতি) সভাগৃহ
ছেড়ে যাও সবে!
ক্ষণেক একেলা র'ব আমি!

(সকলের প্রস্থান ।)

দ্রুত নয়নরায়ের প্রবেশ।

নয়ন। মহারাজ,
সমূহ বিপদ!

গোবিন্দ। রাজা কি মানুষ নহে?
হায় বিধি, হৃদয় তাহার গড়নি কি
অতি দীন দরিদ্রের সমান করিয়া?
দুঃখ দিবে সবার মতন, অশ্রুজল
ফেলিবারে অবসর দিবে না কি শুধু?
কিসের বিপদ, বলে যাও শীঘ্র করি।

নয়ন। মোগলের সৈন্য সাথে আসে চাঁদপাল,
নাশিতে ত্রিপুরা।

গোবিন্দ। এ নহে নয়নরায়
তোমার উচিত! শত্রু বটে চাঁদপাল
তাই ব'লে তার নামে হেন অপবাদ?

নয়ন। অনেক দিয়েছ দণ্ড দীন অধীনেরে,
আজ এই অবিশ্বাস সব চেয়ে বেশী!
শ্রীচরণচ্যুত হয়ে আছি, তাই বলে
গিয়েছি কি এত অধঃপাতে

গোবিন্দ। ভাল করে
বল আরবার, বুঝে দেখি সব।
নয়ন। যোগ
দিয়ে মোগলের সাথে চাহে চাঁদপাল
তোমারে করিতে রাজ্যচ্যুত।
গোবিন্দ। তুমি কোথা
পেলে এ সংবাদ?
নয়ন। যে দিন আমারে প্রভু
নিরস্ত্র করিলে, অস্ত্রহীন লাজে, গেনু
দেশান্তরে;—শুনিলাম আসামের সাথে
মোগলের বাধিছে বিবাদ; তাই আমি
চলেছিনু সেথাকার রাজসন্নিধানে
মাগিতে সৈনিকপদ। পথে দেখিলাম
আসিছে মোগলসৈন্য ত্রিপুরার পানে
সঙ্গে চাঁদপাল। সন্ধানে জেনেছি তার
অভিসন্ধি। ছুটিয়া এসেছি রাজপদে!
গোবিন্দ। সহসা এ কি হল সংসারে, হে বিধাতঃ!
সুধু দুই চারিদিন হল, ধরণীর
কোনখানে ছিদ্রপথ হয়েছে বাহির,
সমুদয় নাগবংশ রসাতল হতে
উঠিতেছে চারিদিকে পৃথিবীর পরে,
পদে পদে তুলিতেছে ফণা। এসেছে কি
প্রলয়ের কাল! এখন সময় নহে
বিস্ময়ের! সেনাপতি, লহ সৈন্যভার!

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মন্দির-প্রাঙ্গণ।

জয়সিংহ। রঘুপতি।

রঘু। গেছে গর্ব্ব, গেছে তেজ, গেছে ব্রাহ্মণত্ব!
ওরে বৎস, আমি তোর গুরু নহি আর।
কাল আমি অসংশয়ে করেছি আদেশ
গুরুর গৌরবে,—আজ শুধু সানুনয়ে
ভিক্ষা মাগিবার মোর আছে অধিকার!
অন্তরেতে সে দীপ্তি নিভেছে, যার বলে
তুচ্ছ করিতাম আমি ঐশ্বর্য্যের জ্যোতি,
রাজার প্রতাপ। নক্ষত্র পড়িলে খসি
তার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর মাটির প্রদীপ!
তাহারে খুঁজিয়া ফিরে পরিহাসভরে
খদ্যোৎ ধূলির মাঝে, খুঁজিয়া না পায়
দীপ প্রতিদিন নেভে, প্রতিদিন জ্বলে,
বারেক নিবিলে তারা চিরঅন্ধকার!
আমি সেই চিরদীপ্তিহীন! সামান্য এ
পরমায়ু, দেবতার অতি ক্ষুদ্র দান,
ভিক্ষা মেগে লইয়াছি তারি দুটো দিন
রাজদ্বারে নতজানু হয়ে! জয়সিংহ,
সেই দুই দিন যেন ব্যর্থ নাহি হয়!
সেই দুই দিন যেন আপন কলঙ্ক
ঘুচায়ে মরিয়া যায়! কালামুখ তার
রাজরক্তে রাঙা করে তবে যায় যেন!
বৎস, কেন নিরুত্তর! গুরুর আদেশ
নাহি আর। তবু তোরে করেছি পালন
আশৈশব, কিছু নহে তার অনুরোধ?
নহি কিরে আমি তোর পিতার অধিক
পিতৃহীনের পিতা ব'লে? এই দুঃখ,
এত ক'রে স্মরণ করাতে হল! কৃপা
ভিক্ষা সহ্য হয়, ভালবাসা ভিক্ষা করে
যে অভাগ্য, ভিক্ষুকের অধম ভিক্ষুক
সে যে! বৎস, তবু নিরুত্তর। জানু তবে
আর বার নত হোক্! কোলে এসেছিল
যবে, ছিল এতটুকু, এ জানুর চেয়ে
ছোট, তার কাছে নত হোক্ জানু; পুত্র,
ভিক্ষা চাই আমি!
জয়। পিতা, এ বিদীর্ণ বুকে
আর হানিয়োনা বজ্র! রাজরক্ত চাহে
দেবী, তাই তারে এনে দিব! যাহা চা

সব দিব ! সব ঋণ শোধ করে দিয়ে
যাব ! তাই হবে ! তাই হবে ! (প্রস্থান।)

রঘু। তবে, তাই
হোক্ ! দেবী চাহে, তাই বলে দিস্ ! আমি
কেহ নই ! হায় অকৃতজ্ঞ ! দেবী তোর
কি করেছে ! শিশুকাল হতে দেবী তোরে
প্রতিদিন করেছে পালন ? রোগ হলে
করিয়াছে সেবা ? ক্ষুধায় দিয়েছে অন্ন ?
মিটায়েছে জ্ঞানের পিপাসা ? অবশেষে
এই অকৃতজ্ঞতার ব্যথা নিয়েছে কি
দেবী বুক পেতে ? হায়, কলিকাল ! থাক !

তৃতীয় দৃশ্য।

—*—

প্রাসাদ-কক্ষ। রাজা।

নয়নরায়ের প্রবেশ।

নয়ন। বিদ্রোহী সৈনিকদের এনেছি ফিরায়ে,
যুদ্ধ সজ্জা হয়েছে প্রস্তুত। আজ্ঞা দাও
মহারাজ, অগ্রসর হই, আশীর্ব্বাদ কর—

গোবিন্দ। চল সেনাপতি, নিজে আমি যাব
রণক্ষেত্রে।

নয়ন। যতক্ষণ এ দাসের দেহে
প্রাণ আছে, ততক্ষণ মহারাজ, ক্ষান্ত
থাক, বিপদের মুখে গিয়ে—

গোবিন্দ। সেনাপতি,
সবার বিপদ অংশ হতে মোর অংশ
নিতে চাই আমি ! মোর রাজঅংশ সব
চেয়ে বেশী। এস সৈন্যগণ, লহ মোরে
তোমাদের মাঝে ! তোমাদের নৃপতিরে
দূর সিংহাসনচূড়ে নির্ব্বাসিত ক'রে
সমরগৌরব হতে বঞ্চিত কোরো না !

চরের প্রবেশ।

চর। নির্ব্বাসনপথ হতে লয়েছে কাড়িয়া
কুমার নক্ষত্ররায়ে মোগলের সেনা;
রাজপদে বরিয়াছে তাঁরে। আসিছেন
সৈন্য লয়ে রাজধানী পানে।

গোবিন্দ। চুকে গেল।
আর ভয় নাই ! যুদ্ধ তবে গেল মিটে !

প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। বিপক্ষ শিবির হতে পত্র আসিয়াছে।

গোবিন্দ। নক্ষত্রের হস্তলিপি। শান্তির সংবাদ
হবে বুঝি।—এই কি স্নেহের সম্ভাষণ !
এ ত নহে নক্ষত্রের ভাষা ! চাহে মোর
নির্ব্বাসন, নতুবা ভাসাবে রক্তস্রোতে
সোণার ত্রিপুরা—দগ্ধ করে দিবে দেশ,
বন্দী হবে মোগলের অন্তঃপুরতরে
ত্রিপুর রমণী ?—দেখি, দেখি, এই বটে
তারি লিপি ! "মহারাজ নক্ষত্রমাণিক্য !"
মহারাজ ! দেখ সেনাপতি—এই দেখ
রাজদণ্ডে নির্ব্বাসিত দিয়েছে রাজারে
নির্ব্বাসন দণ্ড ! এমনি বিধির খেলা !

নয়ন। নির্ব্বাসন ! এ কি স্পর্দ্ধা ! এখনোত যুদ্ধ
শেষ হয় নাই !

গোবিন্দ। এ ত নহে মোগলের
দল ! ত্রিপুরার রাজপুত্র রাজা হতে
করিয়াছে সাধ, তার তরে যুদ্ধ কেন ?

নয়ন। রাজ্যের মঙ্গল—

গোবিন্দ। রাজ্যের মঙ্গল হবে ?
দাঁড়াইয়া মুখোমুখী দুই ভাই হানে
ভ্রাতৃবক্ষ লক্ষ্য ক'রে মৃত্যুমুখী ছুরি—
রাজ্যের মঙ্গল হবে তাহে ? রাজ্যে শুধু
সিংহাসন আছে,—গৃহস্থের ঘর নেই,
ভাই নেই, ভ্রাতৃবন্ধন নেই হেথা ?
দেখি দেখি আরবার—এ কি তার লিপি ?

নক্ষত্রের নিজের রচনা নহে! আমি
দস্যু! আমি দেবদ্বেষী, আমি অবিচারী,
এ রাজ্যের অকল্যাণ আমি!—নহে, নহে,
এ তার রচনা নহে!—রচনা যাহারি
হোক্, অক্ষর ত তারি বটে! নিজ হস্তে
লিখেছে ত সেই। যে সর্পেরি বিষ হোক্,
নিজের আপন মুখে মুখ খায়ে দিয়েছে—
হেনেছে আমার বুকে। বিধি,এ তোমার
শাস্তি,—তার নহে! নির্ব্বাসন! তাই হোক।
তার নির্ব্বাসন দণ্ড তার হয়ে আমি
নীরবে বিনম্রশিরে করিব বহন!

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রাসাদ।

গোবিন্দমাণিক্য। নয়নরায়।

গোবিন্দ। এখনি আনন্দধ্বনি! এখনি পরেছে
দীপমালা নির্লজ্জ প্রাসাদ! উঠিয়াছে
রাজধানী বহির্দ্বারে বিজয় তোরণ
পুলকিত নগরের আনন্দ উত্থিত
দুই বাহুসম! এখনো প্রাসাদ হতে
বাহিরে আসিনি—ছাড়ি নাই সিংহাসন।
এতদিন রাজা ছিনু—কাহারে কি করিনি
উপকার? কোনো অবিচার করি নাই
দূর? কোন অত্যাচার করিনি শাসন?
ধিক্ ধিক্ নির্ব্বাসিত রাজা! আপনারে
আপনি বিচার করি আপনার শোকে
আপনি ফেলিস্ অশ্রু!—মর্ত্ত্যরাজ্য গেল,
আপনার রাজা তবু আমি। মহোৎসব
হোক্ আজি অন্তরের সিংহাসন তলে।

গুণবতীর প্রবেশ।

গুণ। প্রিয়তম, প্রাণেশ্বর আর কেন নাথ!
এইবার শুনেছ ত দেবীর নিষেধ!
এস প্রভু, আজ রাত্রে শেষ পূজা করে
রামজানকীর মত যাই নির্ব্বাসনে!।
গোবিন্দ। অয়ি প্রিয়তমে, আজি শুভদিন মোর!
রাজ্য গেল, তোমারে পেলেম ফিরে! এস
প্রিয়ে, যাই দোঁহে দেবীর মন্দিরে, শুধু
প্রেম নিয়ে, শুধু পুষ্প নিয়ে, মিলনের
অশ্রু নিয়ে, বিদায়ের বিশুদ্ধ বিষাদ
নিয়ে, আর রক্ত নয়, হিংসা নয়।
গুণ। ভিক্ষা
রাখ নাথ।
গোবিন্দ। বল দেবি!
গুণ। হোয়ো না পাষাণ!
রাজগর্ব্ব ছেড়ে দাও! দেবতার কাছে
পরাভব না মানিতে চাও যদি তবু
আমার যন্ত্রণা দেখে গলুক্ হৃদয়!
তুমি ত নিষ্ঠুর কভু ছিলেনাক প্রভু,
কে তোমারে করিল পাষাণ! কে তোমারে
আমার সৌভাগ্য হতে লইল কাড়িয়া!
করিল আমারে রাজ্যহীন রাণী!
গোবিন্দ। প্রিয়ে,
আমারে বিশ্বাস কর একবার শুধু!
না বুঝিয়া বোঝ মোর পানে চেয়ে! অশ্রু
দেখে বোঝ, আমারে যে ভালবাস, সেই
ভালবাসা দিয়ে বোঝ,—আর রক্তপাত
নহে! মুখ ফিরায়োনা দেবী, আর মোরে
ছাড়িয়ো না! নিরাশ কোরো না
আশা দিয়ে!
যাবে যদি মার্জ্জনা করিয়া যাও তবে।

গেলে চলি!—কি কঠিন নিষ্ঠুর সংসার!—
ওরে কে আছিস্?—কেহ নাই। চলিলাম!
বিদায় হে সিংহাসন! হে পুণ্য প্রাসাদ,
আমার পৈতৃক ক্রোড় নির্ব্বাসিত পুত্র
তোমারে প্রণাম ক'রে লইল বিদায়!
(প্রস্থান।)

গুণবতীর পুনঃপ্রবেশ।

গুণ। বাজা' বাজ্ বাজা'! আজ রাত্রে পূজা হবে!
আজ মোর প্রতিজ্ঞা পূরিবে। আন বলি!
আন্ জবাফুল! রহিলি দাঁড়ায়ে? আজ্ঞা
শুনিবিনে? আমি কেহ নই? রাজ্য গেছে
তাই ব'লে এতটুকু রাণী বাকি নেই
আদেশ শুনবে যার কিঙ্কর কিঙ্করী!
এই নে কঙ্কণ, এই নে হীরার কণ্ঠী—
এই নে যতেক আভরণ! ত্বরা করে
কর গিয়ে আয়োজন দেবীর পূজার!
মহামায়া এ দাসীরে রাখিয়ো চরণে!

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—*—

মন্দির বাহিরে ঝড়।

পূজোপকরণ লইয়া রঘুপতি।

রঘু। এতদিনে আজ বুঝি জাগিয়াছ দেবি!
ওই রোষ হুহুঙ্কার! অভিশাপ হাঁকি
নগরের পর দিয়া ধেয়ে চলিয়াছ
তিমিররূপিণী! ওই বুঝি তোর
প্রলয় সঙ্গিনীগণ দারুণ ক্ষুধায়
প্রাণপণে নাড়া দেয় বিশ্বমহাতরু!
আজ মিটাইব তোর দীর্ঘ উপবাস!
ভক্তেরে সংশয়ে ফেলি এত দিন ছিলি
কোথা দেবি? তোর খড়্গ তুই না তুলিলে
আমরা কি পারি? আজ কি আনন্দ, তোর
চণ্ডীমূর্ত্তি দেখে! সাহসে ভরেছে চিত্ত,
সংশয় গিয়াছে; হতমান নতশির
উঠেছে নূতন তেজে! ওই পদধ্বনি
শুনা যায়, ওই আসে তোর পূজা! জয়
মহাদেবী!

অপর্ণার প্রবেশ।

দূর হ,' দূর হ' মায়াবিনী!
জয়সিংহে চাস্ তুই! আরে সর্ব্বনাশী
মহাপাতকিনী!
(অপর্ণার প্রস্থান।)
এ কি অকাল-ব্যাঘাত!
জয়সিংহ যদি নাই আসে! কভু নহে!
সত্যভঙ্গ কভু নাহি হবে তার!—জয়
মহাকালী, সিদ্ধিদাত্রী, জয় ভয়ঙ্করী!—
যদি বাধা পায়—যদি ধরা পড়ে শেষে—
যদি প্রাণ যায় তার প্রহরীর হাতে!
জয় মা অভয়া! জয় ভক্তের সহায়!
জয় মা জাগ্রতী দেবী! জয় সর্ব্বজয়ী!
ভক্তবৎসলার যেন দুর্নাম না রটে
এ সংসারে! শত্রুপক্ষ নাহি হাসে যেন
নিঃশঙ্ক কৌতুকে! মাতৃঅহঙ্কার যদি
চূর্ণ হয় সন্তানের, মা বলিয়া তবে
কেহ ডাকিবে না তোরে! ওই পদধ্বনি!
জয়সিংহ বটে! জয় নৃমুণ্ডমালিনী!
পাষণ্ডদলনী মহাশক্তি!

জয়সিংহের দ্রুত প্রবেশ।

জয়সিংহ,
রাজরক্ত কই?

জয়। আছে আছে! ছাড় মোরে!
নিজে আমি করি নিবেদন!—রাজরক্ত

চাই তোর, দয়াময়ী, জগৎপালিনী
মাতা? নহিলে কিছুতে তোর মিটিবে না
তৃষা?—আমি রাজপুত, পূর্ব্ব পিতামহ
ছিল রাজা, এখনো রাজত্ব করে মোর
মাতামহবংশ—রাজরক্ত আছে দেহে!
এই রক্ত দিব! এই যেন শেষ রক্ত
হয় মাতা! এই রক্তে শেষ মিটে যেন
অনন্ত পিপাসা তোর, রক্ততৃষাতুরা!
(বক্ষে ছুরি বিন্ধন)

রঘু। জয়সিংহ! জয়সিংহ! নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর!
এ কি সর্ব্বনাশ করিলিরে? জয়সিংহ
অকৃতজ্ঞ, গুরুদ্রোহী, পিতৃমর্ম্মঘাতী,
স্বেচ্ছাচারী! জয়সিংহ, কুলিশকঠিন!
ওরে জয়সিংহ, মোর একমাত্র প্রাণ,
প্রাণাধিক, জীবন মন্থন করা-ধন।
জয়সিংহ, বৎস মোর গুরুবৎসল!
ফিরে আয়, ফিরে আয়, তোরে ছাড়া আর
কিছু নাহি চাহি; অহঙ্কার অভিমান
দেবতা ব্রাহ্মণ সব যাক্! তুই আয়!

অপর্ণার প্রবেশ।

অপর্ণা। পাগল করিবে মোরে! জয়সিংহ,
কোথা
জয়সিংহ!

রঘু। আয় মা অমৃতময়ি!
ডাক্ তোর সুধাকণ্ঠে, ডাক্ ব্যগ্রস্বরে, ডাক্
প্রাণপণে! ডাক্ জয়সিংহে! তুই তারে
নিয়ে যা'মা আপনার কাছে, আমি নাহি
চাহি! (অপর্ণার মূর্চ্ছা)
(প্রতিমার পদতলে মাথা রাখিয়া)
ফিরে দে! ফিরে দে! ফিরে দে!
ফিরে দে!
(উঠিয়া) দেখ, দেখ, কি করে দাঁড়ায়ে
আছে, জড়
পাষাণের স্তূপ! মূঢ় নির্ব্বোধের মত!
মূক, পঙ্গু, অন্ধ ও বধির! তোরি কাছে
সমস্ত ব্যথিত বিশ্ব কাঁদিয়া মরিছে!
পাষাণ চরণে তোর, মহৎ হৃদয়
আপনারে ভাঙ্গিছে আছাড়ি! হা হা হা হা!
কোন্ দানবের এই ক্রুর পরিহাস
জগতের মাঝখানে রয়েছে বসিয়া!
মা বলিয়া ডাকে যত জীব—হাসে তত
ঘোরতর অট্টহাস্যে নির্দ্দয় বিদ্রূপ!
দে ফিরায়ে জয়সিংহে মোর! দে ফিরায়ে!
দে ফিরায়ে রাক্ষসী পিশাচী! (নাড়া দিয়ে)
শুনিতে কি
পা'স্? আছে কর্ণ? জানিস্ কি করেছিস্?
কার রক্ত করেছিস্ পান? কোন্
জীবনের? কোন্ স্নেহ দয়া প্রীতিভরা
মহা হৃদয়ের?
থাক্ তুই চিরকাল
এই মত—এই মন্দিরের সিংহাসনে,
সরল ভক্তির প্রতি গুপ্ত উপহাস!
দিব তোর পূজা প্রতিদিন, পদতলে
করিব প্রণাম, দয়াময়ী মা বলিয়া
ডাকিব তোমারে! তোর পরিচয় কারো
কাছে নাহি প্রকাশিব, শুধু ফিরায়ে দে
মোর জয়সিংহে!—কার কাছে কাঁদিতেছি!
দূর কর, দূর কর, দূর করে দাও
হৃদয়-দলনী পাষাণীরে! লঘু হোক্
জগতের বক্ষ! (দূরে গোমতীর জলে
নিক্ষেপ)

মশাল লইয়া বাদ্য বাজাইয়া গুণবতীর প্রবেশ।

গুণ। জয় জয় মহাদেবী!
দেবী কই?

রঘু। দেবী নাই

গুণ। ফিরাও দেবীরে
গুরুদেব, এনে দাও তাঁরে, রোষ শান্তি
করিব তাঁহার! আনিয়াছি মার পূজা!
রাজ্য পতি সব ছেড়ে পালিয়াছি শুধু
প্রতিজ্ঞা আমার! দয়া কর, দয়া ক'রে
দেবীরে ফিরায়ে আন শুধু আজি এই
একরাত্রি তরে! কোথা দেবী!

রঘু। কোথাও সে
নাই! উর্দ্ধে নাই, নিম্নে নাই, কোথাও সে
নাই, কোথাও সে ছিল না কখনো!

গুণ। প্রভু,
এইখানে ছিল না কি দেবী?

রঘু। দেবী বল
তারে? এ সংসারে কোথাও থাকিত দেবী
—তবে সেই পিশাচীরে দেবী বলা কভু
সহ্য কি করিত দেবী? মহত্ত্ব কি তবে
ফেলিত নিষ্ফল-রক্ত হৃদয় বিদারি'
মূঢ় পাষাণের পদে! দেবী বল তারে?
পুণ্য রক্ত পান ক'রে, সে মহারাক্ষসী
ফেটে মরে গেছে!

গুণ। গুরুদেব, বধিয়োনা
মোরে! সত্য করে বল আরবার! দেবী
নাই?

রঘু। নাই!

গুণ। দেবী নাই?

রঘু। নাই!

গুণ। দেবী নাই?
তবে কে রয়েছে?

রঘু। কেহ নাই! কিছু নাই!

গুণ। নিয়ে যা—নিয়ে যা পূজা! ফিরে যা,
ফিরে যা! বল্ শীঘ্র কোন্ পথে গেছে
মহারাজ!

(প্রস্থান।)

অপর্ণার প্রবেশ।

অপর্ণা। পিতা!

রঘু। জননী, জননী, জননী আমার!
পিতা! এ ত নহে ভর্ৎসনার নাম! পিতা!
মা জননী, পিতা বলে এ পুত্রঘাতীরে
যে জন ডাকিত, সেই রেখে গেছে, ওই
সুধামাখা নাম তোর কণ্ঠে, এইটুকু
দয়া করে গেছে! আহা, ডাক্ আরবার!

অপর্ণা। পিতা! এস এ মন্দির ছেড়ে যাই
মোরা!

পুষ্প অর্ঘ্য লইয়া রাজার প্রবেশ।

রাজা। দেবী কই।

রঘু। দেবী নাই!

রাজা। এ কি রক্তধারা!

রঘু। এই শেষ পুণ্য রক্ত এ পাপ মন্দিরে।
জয়সিংহ নিবায়েছে নিজ রক্ত দিয়ে
হিংসারক্ত শিখা!

রাজা। ধন্য ধন্য জয়সিংহ,
এ পূজার পুষ্পাঞ্জলি সঁপিনু তোমারে!

গুণ। মহারাজ!

রাজা। প্রিয়তমে!

গুণ। আজ দেবী নাই—
তুমি মোর একমাত্র রয়েছ দেবতা!

(প্রণাম)

রাজা। গেছে পাপ! দেবী আজ এসেছে
ফিরিয়া আমার দেবীর মাঝে!

অপর্ণা। পিতা চলে এস!

রঘু। পাষাণ ভাঙ্গিয়া গেল,—জননী আমার
এবারে দিয়েছে দেখা প্রত্যক্ষ প্রতিমা!
জননী অমৃতময়ী!

অপর্ণা। পিতা চলে এস

সমাপ্ত।

গোড়ায় গলদ্।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

চন্দ্রকান্তের বাসা।

বিনোদবিহারী। নলিনাক্ষ।

চন্দ্রকান্ত।

চন্দ্র। আচ্ছা বিনুদা, সত্যি বলনা, ভাই, জগৎটা কি বেবাক্ শূন্য মনে হয়?

নলি। তুমি একেবারে আকাশ থেকে পড়লে যে! তোমার হয় না না কি? আমাদের ত হয়!

চন্দ্র। তবু কি রকমটা হয় শুনিই না!

নলি। বুঝ্তে পারচ না? সমস্ত কেমন যেন শূন্য—যেন ফাঁকা—যেন মরুভূমি—

চন্দ্র। যেন নেড়া মাথার মত! আমারো বোধ করি ঐ রকমই মনে হয় কিন্তু ঠিক বুঝ্তে পারিনে—আচ্ছা, বিনুদা, জগৎটা যদি মরুভূমিই হল—

বিনোদ। বড্ড বেজার কল্লে যে হে! কে বলচে মরুভূমি! তা হলে পৃথিবীসুদ্ধ এতগুলো গরু চরে বেড়াচ্ছে কোন্ খানে! জগতে গরুর খাবার ঘাসও যথেষ্ট আছে এবং ঘাস খাবার গরুরও অভাব নেই!

চন্দ্র। দিব্যি গুছিয়ে বলেছ বিনু! ঐ যা বল্লে ভাই! সবাই কেবল চিবচ্চে আর জাওর কাট্চে আর ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে আছে—কিছু এ টা হচ্চে না—

বিনোদ। কিছু না কিছু না! দেখ না, দুটি ব্রাহ্মণ এবং একটি কায়স্থকুলতিলক বসে বসে খোপের মধ্যে দুপুর বেলাকার পায়রার মত সমস্ত ক্ষণ কেবল বক্‌বক্ করচি তার না আছে অর্থ, না আছে তাৎপর্য্য!

নলি। ঠিক! না আছে অর্থ, না আছে কিছু!

চন্দ্র। কিন্তু সত্যি কথা বলচি, ভাই নলিন, রাগ করিস্‌নে, এ সব কথা বিন্দার মুখে যেমন মানায় তোর মুখে তেমন মানায় না! তুই কেমন ঠিক সুরটি লাগাতে পারিস্‌নে! বীনু যখন বলে জগৎটা শূন্য—তখন দেখ্‌তে দেখ্‌তে চোকের সাম্‌নে সমস্ত পৃথিবীটা যেন একটা ঘষা পয়সার মত চেহারা বের করে।

বিনোদ। চন্দ্র, তোমার কাছে কথা কয়ে সুখ আছে, তার মধ্যে দুটো নতুন সুর লাগাতে পার! নইলে নিজের প্রতিধ্বনি শুনে শুনে নিজের উপর বিরক্ত ধরে গেল।

নলি। ঠিক বলেচ। বিরক্ত ধরে গেছে। প্রাণের কথা কেউ বুঝ্‌তে পারে না—

বিনোদ। নলিন সকাল বেলাটায় আর তোমার প্রাণের কথা তুলো না—একটু চুপ কর ত দাদা! আজ রবিবারটা আছে, আজ একটা কিছু করা যাক্, যাতে মনটা বেশ তাজা হয়ে ধড়ফড়িয়ে ওঠে।

চন্দ্র। ঠিক বলেচ! ওষুধের শিশির মত নিদেন হপ্তার মধ্যে একটা দিন নিজেকে খানিকটা ঝাঁকানি দিয়ে নেওয়া আবশ্যক—নইলে শরীরে যা কিছু পদার্থ ছিল সমস্তই তলায় থিতিয়ে গেল! কি করা যায় বল দেখি! চল, গড়ের মাঠে বেড়িয়ে আসা যাক্।

বিনোদ। হাঁ—গড়ের মাঠে কে যায়! তুমিও যেমন!

চন্দ্র। তবে ক্লাবে চল!

বিনোদ। রাম! কেবল কতকগুলো মনুষ্যমূর্ত্তি দেখে আসা, তাও আবার প্রায়ই চেনা লোক!

চন্দ্র। তবে এক কাজ করা যাক্। চল আমরা বোষ্টম্ ভিক্ষুক সেজে বেরিয়ে পড়ি—দেখি তিনটে প্রাণী সমস্ত দিন সহরে কত ভিক্ষে কুড়তে পারি

বিনোদ। কথাটা মন্দ নয়, কিন্তু বড় ল্যাঠা!

চন্দ্র। তা হলে আর একটা প্ল্যান্ মাথায় এসেচে—

বিনোদ। কি বল দেখি!

চন্দ্র। যেমন আছি এম্‌নিই বসে থাকি!

বিনোদ। ঠিক বলেচ! সেটা এতক্ষণ আমার মাথায় আসেনি। আজ তবে এম্‌নি বসে থাকাই যাক্।—দেখ দেখি চন্দর, এ'কে কি বেঁচে থাকা বলে! সোমবার থেকে শনিবার পর্য্যন্ত কেবল কালেজ যাচ্চি আইন পড়চি আর সেই পটলডাঙ্গার বাসার মধ্যে পড়ে পড়ে ট্রামের ঘড়ঘড় শুনচি। হপ্তার মধ্যে একটার বেশী রবিবার আসে না তাও কিসে খরচ করব ভেবে পাওয়া যায় না!

চন্দ্র। আচ্ছা বর্ষার দিনে যেমন চাল-কড়াইভাজা তেমনি রবিবার দিনে কি হলে ঠিক হ'ত বল দেখি বিন্দা!

বিনোদ। তবে সত্যি কথা বল্‌ব! অ্যাঁ! একটি রাঙা পাড়, একটু মিষ্টি হাসি, দুটো নরম কথা,—তার থেকে ক্রমে দীর্ঘ নিঃশ্বাস, ক্রমে অশ্রুজল, ক্রমে ছট্‌ফটানি—

চন্দ্র। এমন কি, আত্মহত্যা পর্য্যন্ত—

বিনোদ। হাঁ—এই হলে জীবনটার একটুখানি স্বাদ পাওয়া যায়! ভাই, ঐ কালো চোখ, টুকটুকে ঠোঁট, মিষ্টিমুখের সঙ্গে মাঝে মাঝে মিশল না হলে এই রোজ রোজ নিরিমিষ দিনগুলো আর ত মুখে রোচে না! কেবল এই শুক্‌নো বইয়ের বোঝা টেনে এই পঁচিশটা বৎসর কি করে কাট্‌ল বল দেখি?

চন্দ্র। এর চেয়ে সাধের মানব জন্ম একেবারেই ঘুচিয়ে দিয়ে যদি কোন পতিকে একটা ইংরেজ নভেলিষ্টের মাথার মধ্যে সেঁধতে পারা যেত, বেশ দিব্যি সোণার জলে বাঁধানো একখানি তক্‌তকে বয়ের মধ্যে ছাপা হয়ে

বেরতুম—কখনো ঈডিথ, কখনো এলেন, কখনো লিওনোরার সঙ্গে বেশ ভাল ইংরিজিতে প্রেমালাপ করচি—মেয়ের বাপ বিয়ে দিতে চাচ্চে না, মেয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে মরতে চাচ্চে, শেষকালে নভেলের শেষ পাতায় বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে দুটিতে মিলে ঘরকন্না করচি—হুহু করে এডিশনের পর এডিশন্ উঠে যাচ্চে আর পাঁচ পাঁচ সিলিঙে বিক্রি হচ্চি!

বিনোদ। চমৎকার! কত মেরি, ফ্যানি, ল্যুসির হাতে হাতে কোলে কোলে দিনপাত করা যাচ্চে! যে সব নীল চোখ কোন জন্মে আমাদের প্রতি কটাক্ষপাতও করত না তারা হুহু শব্দে আমাদের জন্যে অশ্রুবর্ষণ করচে। তা না হয়ে জন্মালুম বাঙ্গালীর ঘরে—কেবল একুইটি আর এভিডেন্স অ্যাক্ট মুখস্থ করে করেই দুর্লভ জীবনটা কাটালুম!

নলিনাক্ষ। চল্লুম ভাই বিনোদ। আমি থাকলে তোমার ভাল লাগে না, তোমাদের গল্প জমে না—চন্দর ছাড়া আর কারো সঙ্গে তোমার প্রাণের কথা হয় না—"ভালবাসা ভুলে যাব, মনেরে বুঝাইব পৃথিবীতে আর যেন কেউ কারেও ভালবাসে না!" (দ্রুত প্রস্থান)

বিনোদ। এই দেখ। রোম্যান্সের কথা হচ্ছিল এই এক রোম্যান্স। পোড়া অদৃষ্ট এমনি, ভালবাসা বল যা বল সবই জুটল কেবল বিধির বিপাকে একটু ব্যাকরণের ভুল হয়েই সব মাটি করে দিয়েচে!

চন্দ্র। কেবল একটা দীর্ঘ ঈর জন্যে। নলিনাক্ষ না হয়ে যদি নলিনাক্ষী হত। হায় হায়! কিন্তু তা হলে এই মিস্সে চন্দ্রবিন্দুটাকে লোপ করে দেবার জায়গা পেতে না!

নিমাই কি হচ্চে।

বিনোদ। যা রোজ হয় তাই হচ্চে।

নিমাই। সেন্টিমেন্টাল আলোচনা! তোমাদের আচ্ছা এক কাজ হয়েছে যা হোক্। ওটা একটা শারীরিক ব্যামো তা জান। বেশ ভাল করে আহারটি করলে এবং সেটি হজম করতে পারলে কবিত্বরোগ কাছে ঘেঁষ্‌তে পারে না। আর, আধপেটা করে খাও, আর অম্বলের ব্যামোটি বাধাও, আর অমনি কোথায় আকাশের চাঁদ, কোথায় দক্ষিণের বাতাস, কোথায় কোকিল পক্ষীর ডাক, এই নিয়ে ভারি মাথাব্যথা পড়ে যায়—জান্‌লার কাছে বসে বসে মনে হয় কি যেন চাও—যা চাও সেটি যে হচ্চে বাইকার্বোনেট অফ সোডা তা কিছুতেই বুঝতে পার না।

বিনোদ। তা যদি বল তা হলে জীবনটাই ত একটা প্রধান রোগ, এবং সকল রোগের গোড়া। জড়পদার্থ কেমন সুস্থ আছে—মাঝের থেকে হঠাৎ প্রাণ নামক একটা ব্যাধি জুটে প্রাণীগুলোকে ক্ষেপিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চে। বাতাসে একটা ঢেউ উঠল অমনি কাণের মধ্যে ভোঁ করে উঠল ঈথর একটু নড়ে উঠল অমনি চোখের মধ্যে চিক্‌মিক্ করতে লাগল, সকালবেলায় উঠেই পেটের মধ্যে চোঁ চোঁ করতে আরম্ভ করেচে—এ কি কখনো স্বাভাবিক অবস্থা হতে পারে।* স্বাভাবিক যদি বল্‌তে চাও সে কেবল কাঠ পাথর মাটি—

নিমাই। আরে, অতটা দূরে গেলে ত কথাই নেই। কিন্তু তোমরা ঐ যে যাকে ভালবাসা বল সেটা যে স্রেফ একটা স্নায়ুর ব্যামো, তার আর সন্দেহ নেই। আমার বিশ্বাস অন্যান্য ব্যামোর মত তারো একটা ওষুধ বের হবে। বালক বালিকাদের যেমন হাম হয়, যুবক যুবতীদের তেমনি ঐ একটা স্নায়ুর উৎপাত ঘটে, কারো বা খুব উৎকট, কারো বা একটু মৃদু রকমের। যখন ও রোগটা চিকিৎসাশাস্ত্রের

অধীনে আস্‌বে তখন লক্ষণ মিলিয়ে ঔষধ ঠিক করতে হবে—ডাক্তার রোগীকে জিজ্ঞাসা করবে—আচ্ছা, তাঁকে কি তোমার সর্ব্বদাই মনে পড়ে? তার কাছে থাক্‌লে বেশী ভালবাসা বোধ হয়, না দূরে গেলে? তাকে দেখতে আস না, দেখা দিতে আস? এই সমস্ত নির্ণয় করে তবে ওষুধ আন্‌তে হবে।

চন্দ্র। কাগজে বিজ্ঞাপন বেরবে—"হৃদয়-বেদনার জন্য অতি উত্তম মালিশ, উত্তম মালিশ, উত্তম মালিশ। বিরহ-নিবারিণী বটিকা। রাত্রে একটি সকালে একটি সেবন করিলে সমস্ত বিরহ দূর হইয়া অন্তঃকরণ পরিষ্কার হইয়া যাইবে!"

বিনোদ। আবার প্রশংসা পত্র বেরবে—কেউ লিখবে "আমি একাদিক্রমে আড়াইমাস কাল আমার প্রতিবেশিনীর প্রেমে ভুগিতেছিলাম—নানারূপ চিকিৎসায় কোন আরাম না পাইয়া অবশেষে আপনার জগদ্বিখ্যাত প্রেমাঙ্কুশ রস পান করিয়া প্রায় সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছি—এক্ষণে উক্ত প্রতিবেশিনীর জন্য ভ্যালুপেয়েবেল বড় এক শিশি পাঠাইয়া বাধিত করিবেন, তাঁহার ব্যাধিটা আমার অপেক্ষাও অনেক প্রবল জানিবেন। ইতি

নিমাই। ওহে চন্দর, তামাক্ ডাক। তোমরা ধোঁয়ার মধ্যে বাস কর তোমাদের আর তামাকের দরকার হয় না, আমরা পৃথিবীতে থাকি আমাদের তামাকটা পানটা, এমন কি, সামান্য ভাতটা ডালটারও আবশ্যক ঠেকে।

চন্দ্র। বটে বটে, ভুল হয়ে গেছে, মাপ কর নিমাই। ওরে ভূতো,—আবাগের বেটা ভূত—তামাক দিয়ে যা।—আচ্ছা ভাই বিনু, মেয়েমানুষের কথা যে বলছিলে কি রকম মেয়েমানুষ তোমার পছন্দসই? তোমার আইডিয়ালটি কি আমাকে বল দেখি।

বিনোদ। আমি কি রকম চাই জান? যাকে কিছু বোঝবার যো নেই। যাকে ধরতে গেলে পালিয়ে যায়—পালাতে গেলে ধরে টেনে নিয়ে আসে। যে শরতের আকাশের মত এদিকে বেশ নির্ম্মল কিন্তু কখন্ রোদ্ উঠবে, কখন্ মেঘ করবে, কখন্ বৃষ্টি হবে, কখন্ বিদ্যুৎ দেখা দেবে, তা স্বয়ং বিজ্ঞানশাস্ত্রের পিতৃপিতামহও ঠিক করে বল্‌তে পারে না।

চন্দ্র। বুঝেছি—যে কোনকালেই পুরোণো হবে না। মনের কথা টেনে বলেচ ভাই! কিন্তু পাওয়া শক্ত। আমরা ভুক্তভোগী, জানি কি না, বিয়ে করলেই মেয়েগুলো দুদিনে বহুকেলে পড়া পুঁথির মত হয়ে আসে; মলাটটা আধখানা ছিঁড়ে ঢল্‌ঢল্ করচে, পাতাগুলো দাগী হয়ে খুলে খুলে আস্‌চে—কোথায় সে আঁটসাঁট বাঁধুনি, কোথায় সে সোণার জলের ছাপ—তা ছাড়া যেখানে খুলে দেখ সেই এক কথা—"কমলিনী অতি সুবোধ মেয়ে, সে ঘরকন্নায় কদাচ আলস্য করে না; সে প্রত্যূষে উঠিয়াই গৃহমার্জ্জন এবং গোময় লেপন করে; যথা সময়ে স্বামীর অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া রাখে, যাহাতে তাঁহার আপিসে যাইতে বিলম্ব না হয়; আপিস হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার গাড়ু গামছা ঠিক করিয়া রাখে এবং রাত্রিকালে তাঁহার মশারি ঝাড়িয়া দেয়!" আগাগোড়া একটা নীতি উপদেশের মত। স্ত্রী হবে কেমন,—রোজ এক এক পাতা ওল্টাব আর এক-একটা নতুন চ্যাপ্টার বেরবে!

নিমাই। অর্থাৎ কোন দিন বা গৃহমার্জ্জন করবে, কোন দিন বা স্বামীর পৃষ্ঠমার্জ্জন করবে! একদিন বা মেজেতে গোময় লেপন করলে একদিন বা স্বামীর পবিত্র মাথায় উপর

ঘোল সেচন করলে—পূর্ব্বাহ্ণে কিছুই ঠিক করবার যো নেই।

চন্দ্র। সে যেন হল—আর চেহারাটা কি রকম হবে?

বিনোদ। চেহারাটি বেশ ছিপ্‌ছিপে, মাটির সঙ্গে অতি অল্পই সম্পর্ক, যেন "সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব।" অর্থাৎ যাকে দেখে মনে হবে অতি ক্ষীণ বল—অস্তিত্বটুকু কেবল নামমাত্র—অথচ ঐটুকুর মধ্যে যে এত লীলা এত বল এত কৌতুক তাই দেখে পলকে পলকে আশ্চর্য্য বোধ হবে। যেন বিদ্যুতের মত, একটি মাত্র আলোর রেখা—কিন্তু তার ভিতরে কত চাঞ্চল্য, কত হাসি, কত বজ্রতেজ!

চন্দ্র। আর বেশী বল্‌তে হবে না—আমি বুঝে নিয়েছি। তুমি চাও পদ্যর মত চোদ্দটি অক্ষরে বাঁধাসাঁধা, ছিপ্‌ছিপে অমনি, চল্‌তে ফিরতে ছন্দটি রেখে চলে, কিন্তু এদিকে মল্লিনাথ, ভরত শিরোমণি, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিত তার টীকে ভাষ্য করে থই পায় না! বুঝেছ বিন্দা, আমিও তাই চাই, কিন্তু চাইলেই ত পাওয়া যায় না—

বিনোদ। কেন, তোমার কপালে ত মন্দ জোটেনি!

চন্দ্র। মন্দ বল্‌তে সাহস করিনে—কিন্তু ভাই পদ্য নয় সে গদ্য,—বিধাতা অক্ষর মিলিয়ে তাকে তৈরি করেন নি, কলমে যা এসেচে তাই বসিয়ে গেছেন—এই প্রতি দিন যে ভাষায় কথাবার্ত্তা চলে তাই আর কি! ওর মধ্যে বেশ একটি ছাঁদ পাওয়া যাচ্চে না!

নিমাই। আর ছাঁদে কাজ নেই ভাই। আবার তোমার কি রকম ছাঁদ সেটাও ত দেখতে হবে! বিনোদ লেখক মানুষ ওর মুখে সকল রকম ক্ষ্যাপামিই শোভা পায়, ও যদি হঠাৎ মাঝের থেকে বিদ্যুৎ কিংবা অনুষ্টুভ ছন্দকে বিয়ে করে বসে ও তাদের সাম্‌লাতে পারে, বরঞ্চ ওকে নিয়েই তারা কিছু ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু চন্দর দা, তোমার সঙ্গে একটি আস্ত পদ্য জুড়ে দিলে কি আর রক্ষে ছিল! একলাইন পদ্য আর এক লাইন গদ্যে কখনো মিল হয়?

চন্দ্র। সে কথা অস্বীকার করবার যো নেই। কিন্তু আমাকে বাইরে থেকে যা দেখিস্ নিমাই, ভিতরে যে কিছু পদ্য নেই তা বল্‌তে পারিনে। আমি, যাকে বলে, চম্পূকাব্য! গঙ্গাজল ছুঁয়ে বল্লেও কেউ বিশ্বাস করেনা, কিন্তু মাইরি বল্‌চি আমারো মন এক এক দিন উড়ু উড়ু করে—এমন কি, চাঁদের আলোয় শুয়ে পড়ে পড়ে এমনো ভেবেচি আহা, এই সময় প্রেয়সী যদি চুলটি বেঁধে গাটি ধুয়ে একখানি বাসন্তীরঙের কাপড় পরে' একগাছি বেলফুলের মালা হাতে করে' নিয়ে এসে গলায় পরিয়ে দেয়, আর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে বল্‌তে থাকে—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু নয়ন না
তিরপিত ভেল,
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়ে
জুড়ন না গেল।

প্রেয়সীও আসে, দুচার কথা বলেও থাকে কিন্তু আমার ঐ বর্ণনার সঙ্গে ঠিকটি মেলে না!

নিমাই দেখ বিনোদ, তোমাদের সঙ্গে একটা বিষয়ে, আমার ভারি মতের অনৈক্য হয়। মেয়ে মানুষ যদি বড্ড বেশী জ্যান্ত গোছের হয় তাকে নিয়ে পুরুষের কখনই পোষায় না। দুজন জ্যান্ত লোকে কখনো রীতিমত মিল হতে পারে? তোমার কাপড়টি যেমন বেশ নির্ব্বিবাদে গায়ে লেগে রয়েচে স্ত্রীটি ঠিক তেমনি হওয়া চাই—এ বিষয়ে আমি ভাই

সম্পূর্ণ রক্ষণশীল কিংবা স্থিতিশীল, কিংবা যা' বল!

চন্দ্র। তা বটে! মনে কর তোমার জামাটা'ও যদি জ্যান্ত হত, প্রতি কথায় দুজনে আপোষ কর্ত্তে কর্ত্তেই দিন যেত, ফস করে যে মাথাটা গলিয়ে দিয়ে পরে' ফেল্‌বে তার যো থাক্‌ত না! তুমি যখন বোতাম আঁটতে চাও সে হয়ত তার গর্ত্তগুলো প্রাণপণে এঁটে বসে রইল! তোমার নেমন্তন্ন আছে, ক্ষিধের পেট চোঁ চোঁ করচে, তোমার শাল অভিমান করে বসে আছেন; যতই টানাটানি কর কিছুতেই তাঁহার আর ভাঁজ খোলে না!

নিমাই। সেই কথাই বল্‌চি। দেখিস্, আমি যাকে বিয়ে করব সে মাটি থেকে মুখ তুল্‌বে না, তার হাসি ঘোমটার মধ্যেই মিলিয়ে যাবে, তার পায়ের মলের শব্দ শুন্‌তে কাণে দূরবীন্ কষতে হবে। যাহোক্ বিনোদ, তুমি একটা বিয়ে করে ফেল! সর্ব্বদা তুমি যে মনটা গুড়ে বসে রয়েছ, সে কেবল গৃহলক্ষ্মীর অভাবে। পূর্ব্বকালে সে ছিল ভাল, বাপমায়ে ছেলেবেলায় বিয়ে দিয়ে দিত—একেবারে শিশুকালেই প্রেমরোগের টীকে দিয়ে রাখা হত।

চন্দ্র। আমিও বিনুকে এক একবার সে কথা বলেচি। একটি স্ত্রী সহস্র দুশ্চিন্তার জায়গা জুড়ে বসে থাকেন—বেদনার উপরে যেমন বেলেস্তারা, অন্যান্য ভবযন্ত্রণার উপরে স্ত্রীর প্রয়োগটাও তেম্‌নি!

পাশের বাড়ি হইতে গানের শব্দ।

বিনোদ। ঐ শোন, সেই গান হচ্চে।

নিমাই। কার গান হে?

চন্দ্র। চুপ করে খানিকটা শোনই না; পরে পরিচয় দেব।

(গান)

বিনোদ। চন্দ্র, আজ কি করব ভাবছিলুম, একটা মৎলব মাথায় এসেচে!

চন্দ্র। কি বল দেখি!

বিনোদ। চল—যে মেয়েটি গান গায় ওর সঙ্গে আজই আমার বিয়ের সম্বন্ধ করে আসিগে।

চন্দ্র। বল কি!

বিনোদ। একটা ত কিছু করা চাই! আর ত বসে বসে ভাল লাগ্‌চে না। বিয়ে করে আসা যাক্ গে? অমনতর গান শুন্‌লে মানুষ খামকা সকল রকম দুঃসাহসিক কাজই করে ফেল্‌তে পারে।

চন্দ্র। কিন্তু দেখাশুনো ত করবে, আলাপ পরিচয় ত করতে হবে? আমাদের মত ত আর বাপমায়ে দু'হাতে চোখ কাণ বুজে ধরে বিয়ে গিলিয়ে দেবে না!

বিনোদ। না, আমি তাকে দেখতে চাইনে? মনে কর আমি কেবল ঐ গানকেই বিয়ে করচি। গান ত দৃষ্টিগোচর নয়।

চন্দ্র। বিনু, এ কথাটা তোর মুখেও একটু বাড়াবাড়ি শোনাচ্চে? কেবল গান বিয়ে কর্ত্তে চাস্ ত একটা আর্গিন কেন্ না? এ যে ভাই মানুষ-বড় সহজ জন্তু নয়? এ যেমন গান গাইতে পারে তেমনি পাঁচ কথা শুনিয়ে দিতেও পারে। একই কণ্ঠ থেকে দু' রকম বিপরীত সুর বের করতে পারে। গানটি পেতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে আস্ত স্ত্রীলোকটিকেও নিতে হয় এবং তাঁকে নিতে গেলেই একটু দেখেশুনে নেওয়া ভাল।

বিনোদ। না ভাই আসল রত্নটুকুর অনুসন্ধান পাওয়া গেছে, এখন চোখ কাণ বুজে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আহা, একবার

ভেবে দেখ দেখি চন্দ্র, প্রত্যেক দিনটির সঙ্গে সকালে সন্ধে দুটি একটি করে তেমন-তেমন্ মিষ্টি সুর যদি লাগে, তা হলে জীবনের এক একটা দিন এক এক পাত্র মদের মত এক চুমুকে নিঃশেষ করে ফেলা যায়—

চন্দ্র। এখন বুঝি কেবল মুখ সিট্‌কে চিরেতা খাচ্চিস্?

বিনোদ। তা নয় ত কি? তুমি যে দেখে নিতে বল্‌চ, দেখব কাকে? মানুষ কি চোখ চাইলেই চেনা যায়? দৈবাৎ হাতে ঠেকে! তুমিও যেমন? যায় জীবনটা বাজি—চক্ষু বুজে দান তুলে নাও, তার পরে হয় রাজা নয় ফকীর—এ'কেই ত বলে খেলা?

চন্দ্র। উ! কি সাহস! তোমার কথা শুনলে আমার মত মরচে-পড়া বিবাহিত লোকেরও বুক সাত হাত হয়ে ওঠে—ফের আর একটা বিয়ে কর্‌তে ইচ্ছে করে! সত্যি, তোমাদের দেখে হিংসে হয়! একেবারে আঠারো আনা কবিত্ব করে নিলে হে! না দেখে বিয়ে ত আমরাও করেচি কিন্তু তার মধ্যে এমনতর নেশা ছিল না! এ যে একেবারে দেখতে না দেখতে এক মুহূর্ত্তে ভোঁ হয়ে ওঠল!

নিমাই। তা বলি, বিয়ে যদি করতে হয় নিজে না দেখে করাই ভাল। যেমন ডাক্তারের পক্ষে নিজের কিংবা আত্মীয়ের চিকিৎসে করাটা কিছু নয়। কিন্তু বন্ধু বান্ধবদের দেখে শুনে নেওয়া উচিত। মেয়েটি কে বল ত হে চন্দর দা!

চন্দ্র। আমাদের নিবারণ বাবুর বাড়িতে থাকেন, নাম কমলমুখী। আদিত্য বাবু আর নিবারণ বাবু পরমবন্ধু ছিলেন। আদিত্য মরবার সময় মেয়েটিকে নিবারণ বাবুর হাতে সমর্পণ করে দিয়ে গেছেন। নিবারণ বাবু লোকটি কিছু নতুন ধরণের। যেমন কাঁচাপাকা মাথা, তেম্‌নি কাঁচাপাকা স্বভাবের মানুষটিও অনেক বিষয়ে সেকেলে অথচ অনেক গুলো একেলে ভাবও আছে। মেয়ে দুটির বয়স হয়েছে, শুনেচি লেখাপড়াও কিছু অতিরিক্ত রকম শেখানো হয়েছে! বিনু যখন মুখ নাড়া খাবেন তার মধ্যে ব্যাকরণের ভুল বের কর্ত্তে পারবেন না। মনে কর আমার গৃহিণী যখন উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হন তখন প্রায়ই তাঁর দুটো চারটে গ্রাম্যতা দোষ সংশোধন করে দিতে হয় কিন্তু—

নিমাই। যাই হোক্ একবার দেখে আস্‌তে হচ্চে।

বিনোদ। ক্ষেপেচ নিমাই! সে ত আর কচি মেয়ে নয় যে, ক'টি দাঁত উঠেছে গুণতে যাবে কিংবা বর্ণপরিচয়ের পরীক্ষা নেবে!

নিমাই। তা বটে, গিয়ে নিজেই অপ্রতিভ হয়ে বসে থাক্‌তে হবে, ভয় হবে পাছে আমাকেই একজামিন করে বসে!

বিনোদ। আচ্ছা একটা বাজি রাখা যাক্! কি রকম তাকে দেখতে? গান শুনে আমার মনে একটা চেহারা উঠচে রং গৌরবর্ণ, পাৎলা শরীর, চোখ দুটো খুব চঞ্চল, উজ্জ্বল হাসি এবং কথা মুখে বাধে না। চুল খুব যে বড় তা নয় কিন্তু কুঁকড়ে কুঁকড়ে মুখের চারদিকে পড়েচে!

নিমাই। আচ্ছা, আমি বল্‌চি সে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, দোহারা আকৃতি, বেশ ধীর সুগম্ভীর ভাব, বড় বড় স্থির চক্ষু, বেশী কথা কইতে ভাল বাসে না, প্রশান্তভাবে ঘরকন্নার কাজ করে খুব দীর্ঘ ঘন চুল পিঠ আচ্ছন্ন করে পড়েছে।

চন্দ্র। আচ্ছা, আমি বলব! রংটি দুধে আল্‌তায়, সর্ব্বদা প্রফুল্ল, অন্যের ঠাট্টায় খুব হাসে কিন্তু নিজে ঠাট্টা করতে পারে না, সরল অথচ বুদ্ধির অভাব নেই,—একটু সামান্য আঘাতে মুখখানি ম্লান হয়ে আসে—যেমন আর

চ্ছ্বাসেই গান গেয়ে ওঠে তেমনি অল্প াধাতেই গান বন্ধ হয়ে যায়, ঠিক যাকে চঞ্চল লে তা নয় কিন্তু বেশ একটি যেন হিল্লোল যাছে।

নিমাই। তুমি তোমার প্রতিবেশিনীকে াগে থাক্‌তেই দেখ নি ত?

চন্দ্র। মাইরি বলচি, না! আমার কি ার আশপাশে দেখ্‌বার যো আছে! আমার এ দুটি চক্ষুই একেবারে দস্তখতী শিলমোহর করা, অন হার ম্যাজিষ্টিস্ সর্ভিস! তবে শুনেচি টে দেখতে ভাল এবং স্বভাবটিও ভাল।

নিমাই। আচ্ছা, এখন তা হলে আমরা কেউ দেখব না; একেবারে সেই বিবাহের াত্রে মিলিয়ে দেখা যাবে!

চন্দ্র। এ কিন্তু বড় মজা হচ্চে ভাই— আমার লাগ্‌চে বেশ! সত্যি সত্যি একটা গুরুতর যে কিছু হচ্চে তা মনেই হচ্চে না! বাস্তবিক, নীরদের যদি বিয়ে কর্‌তে হয় ত এই রকম বিয়েই ভাল! নইলে, ও যে গম্ভীর ভাবে রীতিমত প্রণালীতে ঘটকালী দিয়ে দর-দাম ঠিক করে একটি ছিঁচকাঁদুনে দুধের মেয়ে বিয়ে করে এনে মানুষ করতে বসবে, সে কিছুতেই মনে করতে পারিনে।

তোমরা একটু বোস ভাই আমি অম্‌নি বাড়ির ভিতর থেকে চট করে চাদরটা পরে' আসি!

(প্রস্থান।)

—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—

চন্দ্রের অন্তঃপুর।

চন্দ্র ও ক্ষান্তমণি।

চন্দ্র। বড় বৌ, ও বড় বৌ! চাবিটা দাও দেখি!

ক্ষান্ত। কেন জীবনসর্ব্বস্ব নয়নমণি, দাসীকে কেন মনে পড়ল?

চন্দ্র। ও আবার কি!

ক্ষান্ত। নাথ, একটু বোস, তোমার ঐ মুখচন্দ্রমা বসে বসে একটু নিরীক্ষণ করি—

চন্দ্র। ব্যাপারটা কি! যাত্রার দল খুল্‌বে না কি? আপাততঃ একটা সাফ দেখে চাদর বের করে দাও দেখি, এখনি বেরতে হবে—

ক্ষান্ত। (অগ্রসর হইয়া) আদর চাই! প্রিয়তম! তা আদর করচি!

চন্দ্র। (পশ্চাতে হঠিয়া) আরে ছি ছি ছি! ও কিও?

ক্ষান্ত। নাথ, বেলফুলের মালা গেঁথে রেখেচি এখন কেবল চাঁদ উঠলেই হয়—কিন্তু সেই শোলোকটি লিখে দিয়ে যাও, আমি তত-ক্ষণ মুখস্থ করে রাখি—

চন্দ্র। ওঃ! শুণবর্ণনা আড়াল থেকে সমস্ত শোনা হয়েচে দেখচি! বড়বৌ, কাজটা ভাল হয়নি! ওটা বিধাতার অভিপ্রায় নয়— তিনি মানুষের শ্রবণশক্তির একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট করে দিয়েচেন—তার কারণই হচ্চে পাছে অসাক্ষাতে যে কথাগুলো হয় তাও মানুষ শুনতে পায়; তাহলে পৃথিবীতে বন্ধুত্ব বল, আত্মীয়তা বল কিছুই টিঁকতে পারে না!

ক্ষান্ত। ঢের হয়েচে গোঁসাই ঠাকুর,

আর ধর্ম্মোপদেশ দিতে হবে না! আমাকে তোমার পছন্দ হয় না, না?

চন্দ্র। কে বল্লে পছন্দ হয় না?

ক্ষান্ত। আমি গণ্ড আমি পণ্ড, নই, আমি শোলোক পড়িনে, আমি বেলফুলের মালা পরাইনে—

চন্দ্র। আমি গললগ্নীকৃতবস্ত্র হয়ে বল্‌চি দোহাই তোমার, তুমি শোলোক পোড়োনা, তুমি মালা পরিয়োনা, ওগুলো সবাইকে মানায়না—

ক্ষান্ত। কি বল্লে?

চন্দ্র। আমি বল্লুম যে, বেলফুলের মালা আমাকে মানায় না, তার চেয়ে সাক চাদরে ঢের বেশী শোভা হয়—পরীক্ষা করে দেখ!

ক্ষান্ত। যাও যাও আর ঠাট্টা ভাল লাগে না। (অঞ্চলে মুখ আবরণ করিয়া) আমি গণ্ড, আমি বেলেস্তারা!
(রোদন)

চন্দ্র। । (নিকটে আসিয়া) কথাটা বুঝলে না ভাই! কেবল রাগই করলে। ওটা, শুদ্ধ অভিমানের কথা, আর কিছুই নয়! ভালবাসা থাক্‌লেই মানুষ অমন কথা বলে। আচ্ছা, তুমি আমার গা ছুঁয়ে বল, তুমি ঘাটে পদ্মঠাকুরঝিকে বলনি—"আমার এমনি পোড়াকপাল যে, বিয়ে করে ইস্তিক সুখ কাকে বলে একদিনের তরে জানলুম না!" আমি কি সে কথা শুন্‌তে গিয়েছিলুম, না শুনলে রাগ করতুম!

ক্ষান্ত। আমি কখখনো পদ্মঠাকুরঝিকে ও কথা বলিনি!

চন্দ্র। আহা, পদ্মঠাকুরঝিকে না বল্‌তে পার, আর ঠিক ঐ কথাটিই না হতেও পারে কিন্তু কাউকে কিছু বলনি? আচ্ছা, আমার গা ছুঁয়ে বল।

ক্ষান্ত। তা আমি সৌরভীদিদিকে বলেছিলুম—

চন্দ্র। কি বলেছিলে?

ক্ষান্ত। আমি বলেছিলুম—

চন্দ্র। বলেই ফেল না! দেখো, আমি রাগ করব না।

ক্ষান্ত। আমার গায়ে গয়না দেখতে পায় না বলে' সৌরভীদিদি দুঃখু করছিল তাই আমি কথায় কথায় বলেছিলুম—গয়না কোথথেকে হবে! হাতে যা থাকে বই কিন্‌তে আর বই বাঁধাতেই সব যায়। তাঁর যত সখ সব বইয়েতেই মিটেছে। বউ না হয়ে বই হলে আদর বেশী পাওয়া যেত! তা আমি বলেছিলুম সত্যি কথা বল্‌চি!

চন্দ্র। (স্ত্রীর মুখে) হাটে ঘাটে যেখানে সেখানে বলে বেড়াও তোমার স্বামী গরীব, তোমাকে একখানা গয়না দিতে পারে না—স্ত্রী ওরকম অপবাদ রটিয়ে বেড়ানর চেয়ে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাওয়া ভাল।

ক্ষান্ত। তোমার পায়ে পড়ি ও রকম করে বোলো না। আমার দোষ হয়েছিল মানচি—আমি আর কখন এমন বলুব না।

চন্দ্র। মুখে বল আর, না বল মনে মনে আছে ত! মনে মনে ভাব ত এই লক্ষ্মীছাড়াটার সঙ্গে বিয়ে হয়ে আমার গায়ে একখানা গয়না চড়লনা—তার চেয়ে যদি মুখুয্যেদের বড় ছেলে কেবলকৃষ্ণর সঙ্গে—

ক্ষান্ত। (চন্দ্রের মুখ চাপা দিয়া) অমন কথা তুমি ঠাট্টা করেও বোলো না, আমার ভাল লাগে না—আমার গয়নায় কাজ নেই—আমি জন্ম জন্ম শিব পূজো করেছিলুম তাই তোমার মত এমন স্বামী পেয়েছি—

চন্দ্র। আচ্ছা, তা হলে আমার চাদরখানা দাও!

ক্ষান্ত। (চাদর আনিয়া দিয়া) তুমি বাইরে বেরচ্চ যদি, চুলগুলো অমন কাগের বাসার মত করে বেরিয়োনা। একটু বোসো তোমার চুল ঠিক করে দিই! (চিরুনি ব্রস লইয়া আঁচড়াইতে প্রবৃত্ত)।

চন্দ্র। হয়েচে, হয়েচে!

ক্ষান্ত। না হয়নি—একদণ্ড মাথাটা স্থির করে রাখ দেখি!

চন্দ্র। তোমার সাম্‌নে আমার মাথার ঠিক থাকে না, দেখতে দেখতে ঘুরে যায়—

ক্ষান্ত। অত ঠাট্টায় কাজ কি! না হয় আমার রূপ নেই গুণ নেই—যে তোমার মাথা ঘোরাতে পারে এমন একটা খোঁজ কর্‌গে—আমি চল্লুম। (চিরুনি ব্রস ফেলিয়া দ্রুত প্রস্থান)—

চন্দ্র। এখন আর সময় নেই, ফিরে এসে রাগ ভাঙ্গাতে হবে।

বিনোদ। (নেপথ্য হইতে) ওহে! আর কতক্ষণ বসিয়ে রাখবে? তোমাদের প্রেমাভিনয় সাঙ্গ হল কি?

চন্দ্র। এই মাত্র পঞ্চমাঙ্কের যবনিকা পতন হয়ে গেল! হৃদয় বিদারক ট্র্যাজেডি!

(প্রস্থান)—

তৃতীয় দৃশ্য।

নিবারণের বাড়ি।

নিবারণ। শিবচরণ।

নিবা। তবে তাই ঠিক রইল? এখন আমার ইন্দুমতীকে তোমার নিমাইয়ের পছন্দ হলে হয়।

শিব। সে বেটার আবার পছন্দ কি! বিয়েটা ত আগে হয়ে যাক্, তার পর পছন্দ সময়মত পরে কর্‌লেই হবে!

নিবা। না ভাই, কালের যে রকম গতি সেই অনুসারেই চল্‌তে হয়!

শিব। তা হোক্ না কালের গতি—অসম্ভব কখনো সম্ভব হতে পারে না। একটু ভেবেই দেখ না, যে ছোঁড়া পূর্ব্বে একবারো বিবাহ করে নি সে স্ত্রী চিন্‌বে কি করে? সকল কাজেইত অভিজ্ঞতা চাই! পাট না চিন্‌লে পাটের দালালি করা যায় না আর স্ত্রীলোক কি পাটের চেয়ে সীধে জিনিষ! আজ পঁয়ত্রিশ বৎসর হল আমি নিমাইয়ের মাকে বিবাহ করেচি তার থেকে পাঁচটা বৎসর বাদ দাও—তিনি গত হয়েচেন সে আজ বছর পাঁচেকের কথা হবে—যাহোক তিরিশটা বৎসর তাঁকে নিয়ে চালিয়ে এসেচি—আমি আমার ছেলের বৌ পছন্দ কর্‌তে পারব না আর সে ছোঁড়া ভূমিষ্ঠ হয়েই আমার চেয়ে পেকে উঠল? তবে যদি তোমার মেয়ের কোন ধনুকভঙ্গপণ থাকে, আমার নিমাইকে যাচিয়ে নিতে চান সে আলাদা কথা!

নিবারণ। নাঃ, আমার মেয়ে কোন আপত্তিই করবে না, তাকে যা বল্‌ব সে তাই শুন্‌বে। কিন্তু তোমার নিমাইকে আমি একবার দেখতে চাই।

ইন্দুমতী। (অন্তরাল হইতে) তাই বই কি! আমি কখনো শুন্‌ব না! নিমাই! মাগো, নাম শুন্‌লে গায়ে জ্বর আসে! আমি তাকে বিয়ে করলুম বলে!

নিবারণ। আর একটা কথা আছে—জান ত আদিত্য মরবার সময় তার মেয়ে কমলমুখীকে আমার হাতে সমর্পণ করে গেছে

-তার বিয়ে না দিয়ে আমি আমার মেয়ের বিয়ে দিতে পারিনে।

শিব। আমার হাতে তুই একটি পাত্র আছে আমিও সন্ধান দেখচি।

নিবারণ। আর একটি কথা তোমাকে বলা উচিত। আমার মেয়েটির কিছু বয়স হয়েচে।

শিব। আমিও তাই চাই। ঘরে যদি গিন্নি থাক্‌তেন তা হলে বৌমা ছোট হলে ক্ষতি ছিল না—তিনি দেখিয়ে শুনিয়ে ঘরকন্না শিখিয়ে ক্রমে তাকে মানুষ করে তুল্‌তেন। এখন এই বুড়োটাকে দেখেশোনে আর ছেলেটাকে বেশ শাসনে রাখতে পারে এমন একটি মেয়ে না হলে সংসারটি গেল। ছেলেটা কালেজে যায়, আমি ত সহরের নাড়ি টিপে ঘুরে বেড়াই বাড়িতে কেউ নেই—ঘরে ফিরে এলে মনে হয় না ঘরে এলুম—মনে হয় যেন বাসা ভাড়া করে আছি।

নিবা। তা হলে তোমার একটি অভিভাবকের নিতান্ত দরকার দেখচি।

শিব। হাঁ ভাই, মা ইন্দুকে বোলো, আমার নিমাইয়ের ঘরে এলে এই বুড়ো নাবালকটিকে প্রতিপালনের ভার তাঁকেই নিতে হবে। তখন দেখব তিনি কেমন মা!

নিবা। তা ইন্দুর সে অভ্যাস আছে! বহুকাল একটি আস্ত বুড়ো বাপ তারি হাতে পড়েচে। দেখতেই ত পাচ্চ, ভাই, খাইয়ে দাইয়ে বেশ এক রকম ভাল অবস্থাতেই রেখেচে।

শিব। তাইত। তাঁর হাতের কাজটিকে দেখে তারিফ করতে হয়। তাই বটে, তোমার এখনো আধ মাথা কাঁচা চুল দেখা যাচ্চে—হায় হায়, আমার মাথাটা কেবল অযত্নেই আগাগোড়া পেকে গেল—নইলে, বয়েস এমনিই কি বেশী হয়েচে। যাহোক্ আজ তবে আসি। গুটিদুয়েক রুগী এখনো মরতে বাকি আছে।

(প্রস্থান।)

ইন্দুমতীর প্রবেশ।

ইন্দু। ও বুড়োটা কে এসেছিল বাবা?

নিবা। কেন মা বুড়ো বুড়ো কর্‌চিস—তোর বাবাও ত বুড়ো।

ইন্দু। (নিবারণের পাকাচুলের মধ্যে হাত বুলাইয়া) তুমি ত আমাদের আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ো, তোমার সঙ্গে কার তুলনা! কিন্তু ওটা কে! ওকে ত কখনো দেখি নি।

নিবা। ওর সঙ্গে ক্রমে খুবই পরিচয় হবে-

ইন্দু। আমি খুব পরিচয় করতে চাইনে!

নিবা। তোর এ বাবা ত ক্রমে পুরোণো ঝর্ ঝরে হয়ে এসেচে এখন্ একবার বাবা বদল করে দেখবিনে ইন্দু?

ইন্দু। তবে আমি চল্লুম।

নিবা। না না, শোন্ না। তুই ত তোর বাবার মা হয়ে উঠেচিস্ এখন একটা কথা বলি একটু ভাল করে বুঝে দেখ দেখি। তোরই যেন বাবার দরকার নেই, আমার ত একটি বাপের পদ খালি আছে—তাই আমি একটি সন্ধান করে বের করেচি মা—এখন আমার নতুন বাপের হাতে আমার পুরোণো মা-টিকে সমর্পণ করে আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম শেষ করে যাই।

ইন্দু। তুমি কি বক্‌চ আমি বুঝতে পারচি নে!

নিবা। নাঃ, তুমি আমার তেমনি হাবা মেয়ে কি না। সব বুঝতে পেরেচিস্, কেবল দুষ্টুমি! তবে বলি শোন্—যে বুড়োটি এসেছিল ও আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু, কলেজ ছাড়ার পর থেকে ওর সঙ্গে আমার এই প্রথম

সাক্ষাৎ। ওর নিমাই বলে একটি ছেলে আছে।

ইন্দু। আমাদের নিমাই গয়লা?

নিবা। দূর পাগ্‌লি!

ইন্দু। চন্দর বাবুদের বাড়িতে যে তাঁতিনী আসে তার সেই ন্যাংলা ছেলেটা।

ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। তিনটি বাবু এসেচে দেখা করতে।

ইন্দু। তাদের যেতে বলে দে! সকাল থেকে কেবলই বাবু আস্‌চে!

নিবা। না না, ভদ্রলোক এসেচে, দেখা করা চাই!

ইন্দু। তোমার যে নাবার সময় হয়েচে।

নিবা। একবার শুনে নিই কি জন্যে এসেচেন, বেশী দেরি হবে না—

ইন্দু। তুমি একবার গল্প পেলে আর উঠতে চাইবে না, আবার কালকের মত খেতে দেরি করবে। আচ্ছা আমি ঐ পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে রইলুম, পাঁচ মিনিট বাদে ডেকে পাঠাব!

নিবা। তোর শাসনের জ্বালায় আমি আর বাঁচিনে। চাণক্যের শ্লোক জানিস্ ত!

"প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ।"

তা আমার কি সে বয়স পেরয় নি?

ইন্দু। তোমার রোজ বয়স কমে আস্‌চে। আর দেখ, তোমার ঐ ভদ্রলোকদের বোলো, তাদের কারো যদি নিমাই কিংবা বলাই বলে ছেলে থাকে ত সে কথা ভুলে তোমার নাবার দেরি করে দেবার দরকার নেই। তাদের ছেলে আছে তাদেরই থাক্ না বাপু! আদরে থাক্‌বে!

(প্রস্থান)

নিবারণ। (ভৃত্যের প্রতি) বাবুদের ডেকে নিয়ে আয়।

চন্দ্রকান্ত, বিনোদবিহারী ও নিমাইয়ের প্রবেশ।

নিবারণ। এই যে চন্দ্র বাবু! আস্‌তে আজ্ঞে হোক্! আপনারা সকলে বসুন। ওরে তামাক দিয়ে যা!

চন্দ্র। আজ্ঞে না, তামাক্ থাক্!

নিবা। তা, ভাল আছেন চন্দ্র বাবু?

চন্দ্র। আজ্ঞে হাঁ, আপনার আশীর্ব্বাদে একরকম আছি ভাল।

নিবা। আপনাদের কোথায় থাকা হয়?

বিনোদ। আমরা কলকাতাতেই থাকি!

চন্দ্র। মহাশয়ের কাছে আমাদের একটি প্রস্তাব আছে।

নিবা। (শশব্যস্ত হইয়া) কি বলুন!

চন্দ্র। মহাশয়ের ঘরে আদিত্য বাবুর যে অবিবাহিত কন্যাটি আছেন তাঁর জন্যে একটি সৎপাত্র পাওয়া গেছে—মশায় যদি অভিপ্রায় করেন—

নিবা। অতি উত্তম কথা। শুনে বড় সন্তোষ লাভ করলেম। পাত্রটি কে?

চন্দ্র। আপনি বিনোদবিহারী বাবুর নাম শুনেচেন বোধ করি?

নিবা। বিলক্ষণ! তা আর শুনিনি! তিনি আমাদের দেশের একজন প্রধান লেখক! জ্ঞানরত্নাকর ত তাঁরি লেখা!

চন্দ্র। আজ্ঞে না! সে বৈকুণ্ঠ বসাক বলে একটি লোকের লেখা!

নিবা। তাই বটে! আমার ভুল হয়েচে। তবে "প্রবোধ লহরী" তাঁর লেখা হবে! আমি ঐ দুটোতে বরাবর ভুল করে থাকি!

চন্দ্র। আজ্ঞে না। প্রবোধ লহরী তাঁর লেখা নয়—সেটা কার বল্‌তে পারিনে! ও বইটার নাম পূর্ব্বে কখনো শুনিনি!

নিবা। তবে তাঁর একখানা বইয়ের নাম করুন দেখি।

চন্দ্র। "কানন কুসুমিকা" দেখেছেন কি?

নিবা। "কানন কুসুমিকা" না আমি দেখিনি! অবশ্য খুব ভাল বই হবে! নামটি অতি সুললিত। বাঙ্গালা বই বহুকাল পড়িনি—সেই বাল্যকালে পড়তেম—তখন অবশ্যই কানন কুসুমিকা পড়ে থাক্‌ব কিন্তু স্মরণ হচ্চে না। যাই হোক্ বিনোদ বাবুর পুত্রের কথা বল্‌চেন বুঝি? তা তাঁর বয়স কত হল এবং ক'টি পাশ করেচেন?

চন্দ্র। মশায় ভুল করচেন। বিনোদ বাবুর বয়স অতি অল্প। তিনি এম-এ পাশ করে বি-এল্ পড়চেন! তাঁর বিবাহ হয় নি। তাঁরই কথা মহাশয়কে বল্‌ছিলুম। তা আপনার কাছে প্রকাশ করে বলাই ভাল—এই এঁর নাম বিনোদ বাবু।

নিবারণ। আপনি বিনোদ বাবু! আজ আমার কি সৌভাগ্য! বাঙ্গালা দেশে আপনাকে কে না জানে! আপনার রচনা কে না পড়েচে! আপনারা হচ্চেন ক্ষণজন্মা লোক—

বিনোদ। আজ্ঞে ও কথা বলে আর লজ্জা দেবেন না! বাঙ্গালা দেশে মতিহালদারের বই সকলে পড়ে বটে, আমার লেখা ত সকলের পড়বার মতন নয়!

নিবা! মতি হালদার? যাঁর পাঁচালি? হাঁ! তাঁর রচনার ক্ষমতা আছে বটে! তা আপনারও লেখা মন্দ হবে না। আমি মেয়েদের কাছে শুনেছি আপনি দিব্যি লিখতে পারেন। যাহোক্ আপনার বিনয়গুণে বড় মুগ্ধ হলেম!

চন্দ্র। তা, এঁর সঙ্গে আপনার ভাইঝির বিবাহ দিতে যদি আপত্তি না থাকে—

নিবা। আপত্তি! আমার পরম সৌভাগ্য!

চন্দ্র। তা হলে এ সম্বন্ধে যা যা স্থির করবার আছে কাল এসে, মহাশয়ের সঙ্গে কথা হবে!

নিবা। যে আজ্ঞে। কিন্তু একটা কথা বলে রাখি—মেয়েটির বাপ টাকা কড়ি কিছুই রেখে যেতে পারেন নি। তবে এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি এমন লক্ষ্মী মেয়ে আর পাবেন না।

ইন্দু। (অন্তরালে কমলমুখীকে টানিয়া আনিয়া) দিদি, ও দিদি, ঐ দেখ ভাই তোর পরম সৌভাগ্য ঐ মাঝখানটিতে বসে রয়েছেন—মেঝের ভিতর থেকে কবিত্ব বেরতে পারে কি না, তাই নিরীক্ষণ করে দেখচেন!

কমল। তুই যে বল্লি বোসেদের বাড়ির নতুন জামাই এসেচে তাইত আমি ছুটে দেখতে এলুম!

ইন্দু। সত্যি কথাটা শুন্‌লে আরো বেশী ছুটে আস্‌তিস্। যা দেখতে এসেছিলি তার চেয়ে ভাল জিনিষ দেখাল ত ভাই! আর পরের বাড়ির জামাই দেখে কি হবে এখন্ নিজের সন্ধান দেখ!

কমল। তোর আবশ্যক হয়ে থাকে তুই দেখ্। এখন আমার অন্য কাজ আছে।

(প্রস্থান)—

চন্দ্র। মশায় অনুমতি হয়ত এখন আসি!

নিরা। এত শীঘ্র যাবেন? বলেন কি? আর একটু বসুন না!

চন্দ্র। আপনার এখনো নাওয়া খাওয়া হয় নি—

নিবা। সে এখনো ঢের সময় আছে! বেলা ত বেশী হয় নি—

চন্দ্র। আজ্ঞে বেলা নিতান্ত কম হয় নি—এখন যদি আজ্ঞা করেন ত উঠি—

নিবা। তবে আসুন। দেখুন চন্দর বাবু, মতি হালদারের ঐ যে কুসুমকানন, না কি বইখানা বল্লেন, ওটা লিখে দিয়ে যাবেন ত—

চন্দ্র। কানন কুসুমিকা? বইখানা পাঠিয়ে দেব কিন্তু সেটা মতিহালদারের নয়—

নিবা। তবে থাক্। বরঞ্চ বিনোদ বাবুর একখানা প্রবোধলহরী যদি থাকে ত একবার—

চন্দ্র। প্রবোধ লহরী ত বিনোদ বাবুর—

বিনোদ। আঃ থাম না। তা, যে আজ্ঞে, আমিই পাঠিয়ে দেব! আমার প্রবোধলহরী, বারবেলাকথন, তিথিদোষখণ্ডন, প্রায়শ্চিত্তবিধি এবং নূতন পঞ্জিকা আপনাকে পাঠিয়ে দেব—আজ তবে আসি!

(প্রস্থান।)

নিবা। নাঃ লোকটার বিদ্যে আছে। বাঁচা গেল, একটি মনের মত সৎপাত্র পাওয়া গেল। কমলের জন্যে আমার বড় ভাবনা ছিল!

ইন্দুর প্রবেশ।

ইন্দু। বাবা, তোমার হল?

নিবা। ও ইন্দু, তুইত দেখলিনে—তোরা সেই যে বিনোদ বাবুর লেখার এত প্রশংসা করিস্ তিনি আজ এসেছিলেন।

ইন্দু। আমার ত আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তোমার এখানে যত রাজ্যির অকেজো লোক এসে জোটে আর আমি আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের দেখি! আচ্ছা বাবা, চন্দ্র বাবু বিনোদ বাবু ছাড়া আর একটি যে লোক এসেছিল—বদ্‌চেহারা লক্ষ্মীছাড়ার মত দেখতে, সে কে?

নিবা। তবে তুই যে বলছিলি তুই আড়াল থেকে দেখিস্ নে? বদ চেহারা আবার কার দেখলি। বাবুটিত দিব্যি বেশ ফুটফুটে কার্ত্তিকটির মত দেখতে। তাঁর নামটি কি জিজ্ঞাসা করা হয় নি!

ইন্দু। তাকে আবার ভাল দেখতে হল? দিনে দিনে তোমার কি যে পছন্দ হচ্চে বাবা। এখন নাইতে চল! (নিবারণের প্রস্থান)

ইন্দু। না, সত্যি দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। যদি কার্ত্তিককে এঁর মতন দেখতে হয় তাহলে কার্ত্তিককে ভাল দেখতে বল্‌তে হবে।—মুখে একটি কথা ছিল না, কিন্তু কেমন বসে বসে সব দেখছিল আর মজা করে মুখ টিপে টিপে হাস্‌ছিল—না সত্যি, বেশ হাসি খানি। বাবা যেমন, একবার জিজ্ঞাসাও করলেন না তার নাম কি, বাড়ি কোথায়। আর কোথা থেকে যত সব নিমাই নেপাল নীলু জুটিয়ে নিয়ে আসেন! বাবা যখন মতি হাল্‌দারের সঙ্গে বিনোদ বাবুর তুলনা করছিলেন তখন সে বিনোদ বাবুর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে কেমন হাস্‌ছিল! আর, বাবা যখন বিনোদ বাবুর ছেলের কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন তখন কেমন—আমি কখখনো নিমাই গয়লাকে—সেই বুড়ো ডাক্তারের ছেলে বিয়ে করব না। কখখনো না। সেই বুড়োটার উপর আমার এমন রাগ ধরচে!—আজ একবার ক্ষান্ত দিদির কাছে যেতে হচ্চে, তাঁর কাছ থেকে সমস্ত সন্ধান পাওয়া যাবে।

কমলের প্রবেশ।

ইন্দু। দিদিভাই, তুমি যে বল্‌তে কাননকুসুমিকা তোমার আদবে ভাললাগেনা, তা হলে বইখানা আর একবার ত ফিরে পড়তে হবে—এবারে বোধ করি মত একটু আধটু বদ্‌লাতেও পারে।

কমল। আমি ভাই, দরকার বুঝে মত বদ্‌লাতে পারিনে!

ইন্দু। ভাই শুনেচি স্বামীর জন্তে সবই করতে হয়—জীবনের অনেকখানি নতুন করে বদ্‌লে ফেল্‌তে হয়। বিধাতা ত আর আমাকে ঠিক তাঁর শ্রীচরণকমলের মাপ নিয়ে বানান নি! স্বামীরা আবার কোথাও একটু আঁট সইতে পারেন না।—

কমল। তা আমরা তাঁদের মনের মত মত বদ্‌লাতে না পারলে তাঁরা ত আমাদের বদ্‌লে ফেল্‌তে পারেন—তাতে ত কেউ বাধা দেবার নেই। আমি যা আছি তা আছি,এতদিন পরে যে কারো মনোরঞ্জনের জন্তে আবার ধারকরা মালমস্‌লা নিয়ে আপনাকে ফরমাসে গড়তে হবে সে ত ভাই আর পারব না। এতে যদি কারো পছন্দ না হয় ত সে আমার অদৃষ্টের দোষ!

ইন্দু। কিন্তু তোর ত সে কথা বল্‌বার যো নেই, তাঁকে ত তোর পছন্দ করতেই হবে!

কমল। আমি ত আর স্বয়ম্বরা হতে যাচ্চিনে বোন্, তা আমার আবার পছন্দ! দুটো একটা কাপড়চোপড় ছাড়া জীবনের ক'টা জিনিষই বা নিজের পছন্দ অনুসারে পাওয়া গেছে! বিধাতা কোন বিষয়ে কারো ত মত জিজ্ঞাসা করেন না! আপনাকেই আপনি পছন্দ করে নিতে পারি নি! যদি পারতুম তা হলে বোধ হয় এর চেয়ে ঢের ভাল মানুষটিকে পেতুম—কিন্তু তবু ত আপনাকে কম ভাল বাসিনে—তাকেও বোধ হয় তেমনি ভাল বাসব!

ইন্দু। তুই ভাই কথায় কথায় বড় বেশী গম্ভীর হয়ে পড়িস্, বিনোদের কাছে যদি অমনি করে থাকিস্ তা হলে সে তোর সঙ্গে প্রেমালাপ করতে সাহস করবে না—

কমল। সে জন্ত না হয় তুই নিযুক্ত থাকিস্।

ইন্দু। তা হলে যে তোর গাম্ভীর্য্য আরো সাতগুণ বেড়ে যাবে! দেখ ভাই তুইত একটা পোষা কবি হাতে পেলি এবার তাকে দিয়ে তোর নিজের নামে কবিতা লিখিয়ে নিস্—যতক্ষণ পছন্দ না হয় ছাড়িস্‌নে—চাই কি, দুটো একটা খুব মিষ্টি সম্বোধন নিজে বসিয়ে দিতে পারিস্! নিজের নামে কবিতা দেখলে কি রকম লাগে কে জানে।

কমল। মনে হয় আমার নাম করে আর কাকে লিখচে! তোর যদি সখ থাকে আমি তোর নামে একটা লিখিয়ে নেব—

ইন্দু। তুমি কেন, সে আমি নিজে করে নেব। আমার যে সম্পর্ক আমি যে কাণ ধরে লিখিয়ে নিতে পারি। তুমি ত তা পারবে না।

কমল। সে যখনকার কথা তখন হবে এখন তোর চুলটা বেঁধে দিই চল্।

ইন্দু। আজ থাক্ ভাই। আমি এখন ক্ষান্ত দিদির ওখানে যাচ্চি। আমার ভারি দরকার আছে।

চতুর্থ দৃশ্য।

চন্দ্রের অন্তঃপুর।

ক্ষান্তমণি। ইন্দুমতি।

ক্ষান্ত। তোমরা ভাই নানা রকম বই পড়েচ তোমরা বল্‌তে পার কি করলে ভাল হয়।

ইন্দু। তোমার স্বামী ঠাট্টা করে বলে, সে কি আর সত্যি?

ক্ষান্ত। না ভাই, ঠাট্টা কি সত্যি ঠিক বুঝতে পারিনে। আর সত্যি হবারই বা আটক কি। আমার বাপ মা আমাকে ঘরকন্না ছাড়া আর ত কিছুই শেখায় নি। এদানিং বাঙ্গালা বইগুলো সব পড়ে নিয়েচি, তাতে অনেক রকম কথাবার্ত্তা আছে কিন্তু সেগুলো নিয়ে কোন সুবিধে করতে পারচিনে। আমার স্বামী যে রকম চায় সে ভাই আমাকে কিছুতেই মানায় না।

ইন্দু। তোমার স্বামীর আবার তেমনি সব বন্ধু জুটেচে তারাই পাঁচজনে পাঁচ কথা কয়ে তাঁর মন উতলা করে দেয়। বিশেষ, সেদিন বিনোদ বাবু আর তোমার স্বামীর সঙ্গে আর একটি কে বাবু আমাদের বাড়িতে গিয়েছিল তাকে দেখে আমার আদবে ভাল লাগল না। লোকটা কে ভাই?

ক্ষান্ত। কি জানি ভাই। বন্ধু একটি আধটি ত নয় সব গুলোকে আবার চিনিও নে। ললিত বাবু হবে বুঝি।

ইন্দু। (স্বগত) নিশ্চয় ললিত বাবু হবে। নাম শুনেই মনে হচ্চে তাঁর নাম বটে।

ক্ষান্ত। কি রকম বল্ দেখি? সুন্দর হানো? পাৎলা?

ইন্দু। হাঁ—

ক্ষান্ত। চোখে চস্মা আছে?

ইন্দু। হাঁ হাঁ, চস্মা আছে—আর সকল কথাতেই মুচকে মুচকে হাসে—দেখে গা জলে যায়!

ক্ষান্ত। তবে আমাদের ললিত চাটুর্য্যে তার আর সন্দেহ নেই।

ইন্দু। ললিত চাটুর্য্যে!

ক্ষান্ত। জাননা? ঐ কলুটোলার নৃত্যকালী চাটুর্য্যের ছেলে। ছোকরাটি কিন্তু মন্দ না ভাই। এম, এ, পাশ করে জলপানী পাচ্চে।

ইন্দু। ওদের ঘরে স্ত্রীপুত্র পরিবার কেউ নেই নাকি! অমনতর লক্ষ্মীছাড়ার মত যেখানে সেখানে টোটো করে ঘুরে বেড়ায় কেন?

ক্ষান্ত। স্ত্রীপুত্র থেকেই বা কি হয়! ওর ত তবু নেই। ললিত আবার বাপকে বলেচে রোজকার না করে সে বিয়ে করবে না। সে কথা যাক্! এখন আমাকে একটা পরামর্শ দেনা ভাই!

ইন্দু। আচ্ছা, এক কাজ করা যাক্। মনে কর আমি চন্দ্র বাবু; আপিস্ থেকে ফিরে এসেচি, ক্ষিধেয় প্রাণ বেরিয়ে যাচ্চে—তার পরে তুমি কি করবে বল দেখি?—রোস ভাই চন্দ্রবাবুর ঐ চাপকান আর শামলাটা পরে' নিই, নইলে আমাকে চন্দ্রবাবু মনে হবে না। (আপিসের বেশ পরিধান ও ক্ষান্তের উচ্চহাস্য।)

ইন্দু। (গম্ভীর ভাবে) ক্ষান্তমণি, স্বামীর প্রতি এরূপ পরিহাস অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য! কোন পতিব্রতা রমণী স্বামীর সমক্ষে কদাপি উচ্চহাস্য করেন না। যদি দৈবাৎ কোন কারণে হাস্য অনিবার্য্য হইয়া উঠে তবে সাধ্বী স্ত্রী প্রথমে স্বামীর অনুমতি লইয়া পরে বদনে অঞ্চল দিয়া ঈষৎ হাসিতে পারেন।—যাহোক্ আমি আপিস থেকে ফিরে এসেচি—এখন তোমার কি কর্ত্তব্য বল!

ক্ষান্ত। প্রথমে তোমার চাপকানটি এবং শামলাটি খুলে দিই, তার পরে জলখাবার—

ইন্দু। নাঃ, তোমার কিছু শিক্ষা হয় নি। আমি তোমাকে সে দিন এত করে দেখিয়ে দিলুম কিছু মনে নেই?

ক্ষান্ত। সে ভাই আমি ভাল পারিনে।

ইন্দু। সেই জন্যেই ত এত করে মুখস্থ

করাচ্চি। আচ্ছা, তুমি তবে চন্দ্র বাবু সাজ আমি তোমার স্ত্রী সাজ্‌চি—

ক্ষান্ত। না ভাই সে আমি পারব না—

ইন্দু। তবে যা বলে দিয়েছি তাই কর! আচ্ছা, তবে আরম্ভ হোক্।—বড় বৌ, চাপকানটা খুলে আমার ধুতি চাদরটা এনে দাওত!

ক্ষান্ত। (উঠিয়া এই দিচ্চি।

ইন্দু। ও কি কর্‌চ!—তুমি ঐখানে হাতের উপর মাথা রেখে বসে থাক—বল—নাথ, আজ সন্ধেবেলায় কি সুন্দর বাতাস দিচ্চে! আজ আর কিছুতে মন লাগ্‌চে না, ইচ্ছে করচে পাখী হয়ে উড়ে যাই।

ক্ষান্ত। (যথাশিক্ষামত) নাথ আজ সন্ধেবেলায় কি সুন্দর বাতাস দিচ্চে! আজ আর কিছুতে মন লাগ্‌চে না, ইচ্ছে করচে পাখী হয়ে উড়ে যাই!

ইন্দু। কোথায় উড়ে যাবে? তার আগে আমায় লুচি দিয়ে যাও ভারি ক্ষিধে পেয়েচে—

ক্ষান্ত। (তাড়াতাড়ি উঠিয়া) এই দিচ্চি—

ইন্দু। এই দেখ, সব মাটি করলে! তুমি যেমন ছিলে তেমনি থাক—বল, লুচি? কই, লুচি ত আজ ভাজিনি! মনে ছিল না। আচ্ছা, লুচি কাল হবে এখন! আজ, এস, এখানে এই মধুর বাতাসে বসে—

চন্দ্র। (নেপথ্য হইতে) বড় বৌ!

ইন্দু।—ঐ চন্দ্রবাবু আস্‌চেন! আমাকে দেখতে পেয়েচেন বোধ হল! তুমি বোলোত ভাই, বাগবাজারের চৌধুরীদের কাদম্বিনী। আমার পরিচয় দিয়ো না লক্ষীটি মাথা খাও।

(পলায়ন।)

পঞ্চম দৃশ্য।

পার্শ্বের ঘর।

নিমাই আসীন।

(চাপকান শামলাপরা ইন্দুর ছুটিয় প্রবেশ।)

নিমাই। এ কি!

ইন্দু। ছি ছি আর একটু হলেই চন্দ্রবাবু কাছে এই বেশে ধরা পড়তুম। তিনি কি মনে করতেন? আমাকে বোধ হয় দেখতে পা নি? (হঠাৎ নিমাইকে দেখিয়া) ওমা এযে সেই ললিত বাবু। আর ত পালাবার পথ নেই সামলাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে চাপকান শামল খুলিয়া নিমাইয়ের প্রতি) তোমার বাবুর এই শাম্‌লা, আর এই চাপকান। সাবধান করে রেখো, হারিয়োনা। আর শীগ্‌গির দেখে এসো দেখি বাগ্‌বাজারের চৌধুরী বাবুদের বাড়ি থেকে পাল্কী এসেচে কি না!

নিমাই। (ঈষৎ হাসিয়া) যে আজ্ঞে।

(প্রস্থান।)

ইন্দু। ছি ছি! লজ্জায় ললিত বাবুকে ভাল করে দেখে নিতেও পারলুম না! আজ কি করলুম! ললিত বাবু কি মনে করলেন! যা হোক্, আমাকে ত চেনেন না! ভাগ্যিস্ হঠাৎ বুদ্ধি যোগাল, বাগ্‌বাজারের চৌধুরীদের নাম করে দিলুম। চন্দ্র বাবুর এবাসাটিও হয়েচে তেম্‌নি। অন্দর বাহির সব এক! এখন আমি কোন্ দিক দিয়ে পালাই। ওই আবার আস্‌চে! মানুষটি ত ভাল নয়! অন্য কোন লোক হলে অবস্থা বুঝে চলে যেত! ও আবার ছল করে যে ফিরে আসে? কেন বাপু, দেখ্‌বার জিনিষ এখানে কি এমন আছে?

নিমাইয়ের প্রবেশ।

নিমাই। ঠাকরুণ, পাল্কীত আসে নি। এখন কি আজ্ঞা করেন!

ইন্দু। এখন তুমি তোমার কাজে যেতে পার। না, না, ঐ যে তোমার মনিব এ দিকে আস্‌চেন! ওঁকে আমার সম্বন্ধে খবর দেবার কোন দরকার নেই, আমার পাল্কী নিশ্চয় এসেচে?

(প্রস্থান।)

নিমাই। কি চমৎকার রূপ! আর কি উপস্থিত বুদ্ধি! চোখে কেমন উজ্জ্বল জীবন্ত ভাব! বা, বা! আমাকে হঠাৎ চাকর বানিয়ে দিয়ে গেল—সেও আমার পরম ভাগ্যি! বাঙ্গালীর ছেলে চাকরী করতেই জন্মেছি কিন্তু এমন মনিব কি অদৃষ্টে জুটবে! পুরুষের কাপড়ও যেমন মানিয়েছিল ঐ টুকু নির্লজ্জতাও ওকে কেমন বেশ শোভা পেয়েছিল। আহা, এই শাম্‌লা আর এই চাপকান চন্দরকে ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছে করচে না। বাগবাজারের চৌধুরী! সন্ধান নিতে হচ্চে!

চন্দ্রের প্রবেশ।

চন্দ্র। তুমি এ ঘরে ছিলে না কি? তবে ত দেখেচ?

নিমাই। চক্ষু থাক্‌লেই দেখতে হয়—কিন্তু কে বল দেখি?

চন্দ্র। বাগবাজারের চৌধুরীদের মেয়ে কাদম্বিনী। আমার স্ত্রীর একটী বন্ধু।

নিমাই। ওর স্বামী বোধ করি স্বাধীনতা ওয়ালা?

চন্দ্র। ওঁর আবার স্বামী কোথায়?

নিমাই। মরেচে বুঝি? আপদ গেছে? কিন্তু বিধবার মত বেশ নয় ত—

চন্দ্র। বিধবা নয় হে—কুমারী। যদি হঠাৎ স্নায়ুর ব্যামো ঘটে থাকে ত বল, ঘটকালি করি।

নিমাই। তেমন স্নায়ু হলে এতদিনে গলায় দড়ি দিয়ে মরতুম!

চন্দ্র। তা হলে চল একবার বিনোদকে দেখে আসা যাক্। তার বিশ্বাস সে ভারি একটা অসমসাহসিক কাজ কর্‌তে প্রবৃত্ত হয়েচে, তাই একেবারে সপ্তমে চড়ে রয়েচে—যেন তার পূর্ব্বে বঙ্গদেশে বিবাহ আর কেউ করে নি?

নিমাই। মেয়েমানুষকে বিয়ে কর্‌তে হবে তার আবার ভয় কিসের? এমন যদি হত, না দেখে বিয়ে কর্‌তে গিয়ে দৈবাৎ একটা পুরুষমানুষ বেরিয়ে পড়ত তা হলে বটে?

চন্দ্র। বল কি নিমাই? বিধাতার আশীর্ব্বাদে জন্মালুম পুরুষ মানুষ হয়ে, কি জানি কার শাপে বিয়ে কর্‌তে গেলুম মেয়েমানুষকে, এ কি কম সাহসের কথা?

নলিনাক্ষের প্রবেশ।

চন্দ্র। আরে, আরে, এস নলিন দা! ভাল ত?

নলি। (নিমাইয়ের প্রতি) বিনোদ কোথায়?

চন্দ্র। বিনোদ যেখানেই থাক্, আপাততঃ আমার মত এতবড় লোকটা কি তোমার নলিনাক্ষগোচর হচ্চেনা? তোমার ভাব দেখে হঠাৎ ভয় হয় তবে আমি হয় ত বা নেই?

নলি। আমি বিনোদকে খুঁজচি?

চন্দ্র। ইচ্ছে করলে অমনি ইতিমধ্যে আমার সঙ্গেও দুটো একটা কথা কয়ে নিতে পার। তা চল, আমরাও তার কাছে যাচ্চি।

নলি। তা হলে তোমরা এগোও। আমি পরে যাব এখন।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—*—

প্রথম দৃশ্য।

—*—

নিমাইয়ের ঘর।

নিমাই লিখিতে প্রবৃত্ত।

নিমাই। মুখে এত কথা অনর্গল বকে যাই কিছু বাধে না, সেই গুলোই চোদ্দটা অক্ষরে ভাগ করা যে এত মুস্কিল তা জানতুম না?

কাদম্বিনা যেমনি আমায় প্রথম দেখিলে,
কেমন করে ভৃত্য বলে তখনি চিনিলে?

ভাবটা বেশ নতুন রকমের হয়েছে কিন্তু কিছুতেই এই হতভাগা ছন্দ বাগাতে পারচিনে (গণনা করিয়া) প্রথম লাইনটা হয়েচে ষোলো, দ্বিতীয়টা হয়ে গেছে পনেরো। ওর মধ্যে একটা অক্ষরও ত বাদ দেবার যো দেখচি নে? (চিন্তা) "অমায়" কে "আমা" বল্লে কেমন শোনায়? কাদম্বিনা যেমনি আমা প্রথম দেখিলে—আমার কাণে ত খারাপ ঠেকচে না? কিন্তু তবু একটা অক্ষর বেশী থাকে। কাদম্বিনীর "নী" টা কেটে যদি সংক্ষেপ করে দেওয়া যায়? পূরো নামের চেয়ে সে ত আরো আদরের শুনতে হবে? "কাদম্বি"—না; —কই তেমন আদরের শোনাচ্চে না ত? „কদম্ব„—ঠিক হয়েচে—

কদম্ব যেমনি আমা প্রথম দেখিলে
কেমন করে ভৃত্য বলে তখনি চিনিলে।

উঁহুঁ, ও হচ্চে না। দ্বিতীয় লাইনটাকে কাবু করি কি করে? "কেমন করে" কথাটাকে ত কমাবার যো নেই—এক "কেমন করিয়া" হয়—কিন্তু তাতে আরো একটা অক্ষর বেড়ে যায়? "তখনি চিনিলে"র জায়গায় "তৎক্ষণাৎ চিনিলে" বসিয়ে দিতে পারি কিন্তু তাতে বড় সুবিধে হয় না, এক দমে শতকগুলো অক্ষর বেড়ে যায়? ভাষাটা আমাদের বহু পূর্ব্বে তৈরি হয়ে গেছে কিছুই নিজে বানাবার যো নেই—অথচ ওরি মধ্যে আবার কবিতা লিখতে হবে? দূর হোক্‌গে, এ পনেরো অক্ষরই ঠিক্—কাণে খারাপ না লাগ্‌লেই হল। ও পনেরো'ও যা ষোল'ও তা সতেরো'ও তাই, কাণে সমানই ঠেকে, কেবল পড়বার দোষেই খারাপ শুনতে হয়। চোদ্দ অক্ষর, ও একটা প্রেজুডিস্।

শিবচরণের প্রবেশ।

শিব। কি হচ্চে নিমাই?

নিমাই। আজ্ঞে অ্যানাটমির নোটগুলো একবার দেখে নিচ্চি, একজামিন খুব কাছে এসেছে—

শিব। দেখ বাপু, একটা কথা আছে। তোমার বয়স হয়েচে, তাই আমি তোমার জন্যে একটি কন্যা ঠিক করেছি।

নিমাই। কি সর্ব্বনাশ।

শিব। নিবারণ বাবুকে জান বোধ করি—

নিমাই। আজ্ঞে হাঁ জানি।

শিব। তাঁরই কন্যা ইন্দুমতী। মেয়েটি দেখতে শুনতে ভাল। বয়সেও তোমার যোগ্য। দিনও একরকম স্থির করা হয়েচে।

নিমাই। একেবারে স্থির করেচেন? কিন্তু এখন ত হতে পারে না?

শিব। কেন বাপু?

নিমাই। আমার এখন একজামিন কাছে এসেচে—

শিব। তা হোক্ না একজামিন। বিয়ের সঙ্গে একজামিনের যোগটা কি? বৌমাকে বাপের বাড়ি রেখে দেব তার পরে তোমার একজামিন হয়ে গেলে ঘরে আনব।

নিমাই। ডাক্তারিটা পাশ না করে বিয়ে করাটা ভাল বোধ হয় না।—

শিব। কেন বাপু, তোমার সঙ্গে ত একটা শক্ত ব্যামরামের বিয়ে দিচ্চিনে। মানুষ ডাক্তারি না জেনেও বিয়ে করে। কিন্তু তোমার আপত্তিটা কিসের জন্যে হচ্চে?

নিমাই। উপার্জ্জনক্ষম না হয়ে বিয়ে করাটা—

শিব। উপার্জ্জন? আমি কি তোমাকে আমার বিষয় থেকে বঞ্চিত করতে যাচ্চি? তুমি কি সাহেব হয়েচ যে বিয়ে করেই স্বাধীন ঘরকন্না করতে যাবে? (নিমাই নিরুত্তর) তোমার হল কি? বিয়ে করবে তার আবার এত ভাবনা কি? আমি কি তোমার ফাঁসির হুকুম দিলুম?

নিমাই। বাবা, আপনার পায়ে পড়ি আমাকে এখন বিয়ে করতে অনুরোধ করবেন না।

শিব। (সরোষে) অনুরোধ কি বেটা? হুকুম করব। আমি বলচি তোকে বিয়ে করতেই হবে!

নিমাই। আমাকে মাপ করুন, আমি এখন কিছুতেই বিয়ে করতে পারব না।

শিব। (উচ্চস্বরে) কেন পারবিনে? তোর বাপ পিতামহ তোর চোদ্দপুরুষ বরাবর বিয়ে করে এসেচে আর তুই বেটা দুপাতা ইংরাজি উল্টে আর বিয়ে করতে পারবিনে! এর শক্তটা কোন্ খানে। কনের বাপ সম্প্রদান করবে আর তুই মন্ত্র পড়ে হাত পেতে নিবি— তোকে গড়ের বাদ্যিও বাজাতে হবে না, ময়ূরপংখীও বইতে হবে না, আর বাতি জ্বালাবার ভারও তোর উপর দিচ্চিনে।

নিমাই। আমি মিনতি করে বলচি বাবা —একেবারে মর্ম্মান্তিক অনিচ্ছে না থাকলে আমি কখনই আপনার প্রস্তাবে না বল্‌তুম না।

শিব। কই বাপু, বিয়ে করতে ত কোন ভদ্রলোকের ছেলের এতদূর অনিচ্ছে দেখা যায় না, বরঞ্চ অবিবাহিত থাক্‌তে আপত্তি হতেও পারে। আর তুমি বেটা আমার বংশে জন্মগ্রহণ করে হঠাৎ একদিনে এতবড় বৈরাগী হয়ে উঠলে কোথা থেকে। এমন সৃষ্টিছাড়া অনিচ্ছেটা হল কেন সেটা ত শোনা আবশ্যক।

নিমাই। আচ্ছা, আমি মাসীমাকে সব কথা বল্‌ব, আপনি তাঁর কাছে জান্‌তে পারবেন।

শিব। আচ্ছা। (স্বগত) লোকের কাছে শুনলুম, নিমাই বাগবাজারের রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়—গেরস্তর বাড়ির দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে—সেই শুনেইত আরো আমি ওর বিয়ের জন্যে এত তাড়াতাড়ি করচি।

(প্রস্থান।)

নিমাই। আমার ছন্দমিল ভাব সমস্ত ঘুলিয়ে গেল, এখন যে আর একলাইনও মাথায় আস্‌বে এমন সম্ভাবনা দেখিনে।

চন্দ্রের প্রবেশ।

চন্দ্র। এই যে নিমাই। একা একা বসে রয়েচ! তোমার হল কি বল দেখি? আজকাল তোমার যে দেখা পাবারই যো নেই!

নিমাই। আর ভাই, এক্‌জামিনের যে তাড়া পড়েচে—

চন্দ্র। সে দিন সন্ধ্যাবেলায় ট্র্যামে করে আস্‌তে আসতে দেখি, তুমি বাগবাজারের রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাঁ করে তারা দেখচ। আজকাল কি তুমি ডাক্তারি ছেড়ে অ্যাষ্ট্রনমি ধরেচ? যাহোক আজ বিনোদের বিয়ে মনে আছেত?

নিমাই। তাইত ভুলে গিয়েছিলুম বটে!

চন্দ্র। তোমার স্মরণ শক্তির যে রকম অবস্থা দেখচি, একজামিনের পক্ষে সুবিধে নয়! তা চল।

নিমাই। আজ শরীরটা তেমন ভাল ঠেক্‌চে না, আজ থাক্—

চন্দ্র। বিনোদের বিয়েটা ত বছরের মধ্যে সদাসর্ব্বদা হবে না নিমাই! যা হবার আজই চুকে যাবে। অতএব আজ তোমাকে ছাড়চিনে চল।

নিমাই। চল।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

চন্দ্রের অন্তঃপুর।

ক্ষান্ত ও ইন্দু।

ক্ষান্ত। তোমাদের বাড়ির আয়োজন সব হল?

ইন্দু। হাঁ ভাই একরকম হল। এখন তোমাদের বাড়ি কি হচ্চে তাই দেখতে এসেচি। আমি বরের ঘরেও আছি, কনের ঘরেও আছি। বর ত তোমাদের এখান থেকেই বেরোবেন? তাঁর তিনকুলে আর কেউ নেই না কি?

ক্ষান্ত। ঐ ত ভাই, ওদের কথা বুঝবে কে? বাপমা নেই বটে, কিন্তু শুনেচি দেশে পিসি মাসী সব আছে—কিন্তু তাদের খবরও দেয়নি! বলে, যে, বিয়ে করচি হাট বসাচ্চিনে ত! ওঁকে বল্লুম তুমি তাদের খবর দাও—উনি বল্লেন তাতে খরচপত্র বিস্তর বেড়ে যাবে—বিয়ে করতেই যদি বেবাক্ খরচ হয়ে যায় ত ঘরকন্না করতে বাকি থাক্‌বে কি?—শুনেচ একবার কথা! আবার বলে কি—এ ত আর শুম্ভ নিশুম্ভর যুদ্ধ হচ্চেনা, কেবল দু'টি মাত্র প্রাণীর বিয়ে, এরজন্যে এত সোরসরাবৎ লোকলস্করের দরকার কি?

ইন্দু। কিচ্ছু ধুমধাম নেই আমার ভাই এ মন উঠচে না। আমাদের হাতে একবার পড়লে তাকে আচ্ছা করে শিক্ষা দিতে হবে—দুটিমাত্র প্রাণীর বিয়ে যে কত বড় ব্যাপার তা তাঁকে একরকম মোটামুটি বুঝিয়ে দেব।—আজ যে তুমি বাইরের ঘরে?

ক্ষান্ত! এই ঘরে সব বরযাত্রী জুটবে। দেখনা ভাই ঘরের অবস্থা খানা? তারা আসবার আগে একটুখানি গুছিয়ে নেবার চেষ্টায় আছি!

ইন্দু। তোমার একলার কর্ম্ম নয় এসি ভাই দুজনে এ জঞ্জাল সাফ করা যাক্। এগুলো দরকারী নাকি?

ক্ষান্ত। কিচ্ছু না। যত রাজ্যির পুরোণো খবরের কাগজ জমেচে! কাগজগুলো যেখানে পড়া হয়ে যায় সেইখানেই পড়ে থাকে। ওগুলো যে ফেলে দেওয়া কি গুছিয়ে রাখা তার নাম নেই।

ইন্দু। তবে ঐ সঙ্গে এগুলোও ফেলে দিই?—

ক্ষান্ত। না না ওগুলো ওঁর মকদ্দমার কাগজ—হারাতে পারলে বাঁচেন বোধ হয়, মক্কেলদের হাত থেকে উদ্ধার পান। কেন যে হারায় না তাওত বুঝতে পারিনে। কতকগুলো গদীর নীচে গোঁজা, কতক আলমারীর মাথায়, কতক ময়লা চাপকানের পকেটে,—যখন কোনটার দরকার পড়ে বাড়ি মাথায় করে বেড়ান—আঁস্তাকুড় থেকে আর বাড়ির ছাত

পর্য্যন্ত এমন জায়গা নেই যেখানে না খুঁজতে হয়।

ইন্দু। এর সঙ্গে যে ইংরাজি নভেলও আছে—তারো আবার পাতা ছেঁড়া! কতকগুলো চিঠি—এ কি দরকারী?

কান্ত। ওর মধ্যে দরকারীও আছে অদরকারীও আছে কিচ্ছু বলবার যো নেই! খুব গোপনীয়ও আছে, সে গুলো চারিদিকে ছড়ানো। খুব বেশী দরকারী চিঠি সাবধান করে রাখবার জন্যে বইয়ের মধ্যে গুঁজে রাখা হয় সে আর কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যায় না, ভুলেও যেতে হয়। বন্ধুরা বই পড়তে নিয়ে যায়, তারপরে কোন্ চিঠি কোন্ বইয়ের সঙ্গে কোন্ বন্ধুর বাড়ি গিয়ে পৌঁছয় তা কিছুই বলবার যো নেই। এক এক দিন বড় আবশ্যকের সময় গাড়িভাড়া করে বন্ধুদের বাড়িবাড়ি খোঁজ করে বেড়ান।

ইন্দু। এক কাজ কর না ভাই! কাউকে দিয়ে বন্ধুদের গাল দিয়ে কতকগুলো চিঠি লেখাও না—সেগুলো বইয়ের মধ্যে গোঁজা থাক্‌বে—বন্ধুরা যখন বই ধার করে পড়বেন নিজেদের সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান লাভ করবেন এবং সেই সুযোগে দুটি পাঁচটি ঝরে যেতেও পারেন।

কান্ত। আঃ তা হলে ত হাড় জুড়োয়!

ইন্দু। এ সব কি? কতকগুলো লেখা—কতকগুলো প্রুফ, খালি দেশালাইয়ের বাক্স, কানন কুসুমিকা, কাগজের পুঁটুলির মধ্যে ছাতাধরা মস্‌লা, একখানা তোয়ালে, গোটাকতক দাবার ঘুঁটি, একটি ইস্কাবনের গোলাম, ছাতার বাঁট,—এ চাবির গোচ্ছা বোধ হয় ফেলে দিলে চলবে না—

কান্ত। এই দেখ! এই চাবির মধ্যে ওঁর যথাসর্ব্বস্ব আছে। আজ সকালে একবার খোঁজ পড়েছিল, কোথাও সন্ধান না পেয়ে শেষে উমাপতিদের বাড়ি থেকে সতেরোটা টাকা ধার করে নিয়ে এলেন। দাও ত ভাই, এ চাবি ওঁকে সহজে দেওয়া হবে না! ঐ ভাই ওরা আস্‌চে—চল্ ওঘরে পালাই।

(প্রস্থান।)

বিনোদ, চন্দ্রকান্ত, নিমাই, নলিনাক্ষ, শ্রীপতি, ভূপতির প্রবেশ।

বিনোদ। (টোপর পরিয়া) সং ত সাজলাম, এখন তোমরা পাঁচজনে মিলে হাততালি দাও—উৎসাহ হোক্, নইলে থেকে থেকে মনটা দমে যাচ্চে।

চন্দ্র। এখন ত কেবল নেপথ্যবিধান চল্‌বে, আগে অভিনয় আরম্ভ হোক্ তার পরে হাততালি দেবার সময় হবে।

বিনোদ। আচ্ছা চন্দর, অভিনয়টা হবে কিসের বল ত হে? কি সাজব আমাকে বুঝিয়ে দাও দেখি?

চন্দ্র। মহারাণীর বিদূষক সাজতে হবে আর কি! যাতে তিনি একটু প্রফুল্ল থাকেন আজ রাত্রি থেকে এই তোমার একমাত্র কাজ হল।

বিনোদ। তা সাজটিও যথোপযুক্ত হয়েচে। এই টোপরটা দেখলে মনে পড়ে সেকেলে ইংরেজ রাজাদের যে "ফুল্" গুলো ছিল তাদেরও টুপিটা এই আকারের।

চন্দ্র। সেজের বাতি নিবিয়ে দেবার ঠোঙা গুলোরও ঐরকম চেহারা। এই পঁচিশটা বৎসর যা কিছু শিক্ষা দীক্ষা হয়েচে, যা কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা জন্মেছিল,—ভারতের ঐক্য, বাণিজ্যের উন্নতি, সমাজের সংস্কার, সাহেবের ছেলে পিটোনো, প্রভৃতি যে সকল উঁচু

উঁচু ভাবের পল্‌তে মগজের ঘি খেয়ে খুব উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে উঠেছিল সে গুলিকে ঐ টোপরটা চাপা দিয়ে এক দমে নিবিয়ে সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা হয়ে বস্‌তে হবে—

নলি। আর আমাদেরও মনে থাক্‌বে না—একেবারে ভুলে যাবে—দেখা করতে এলে বল্‌বে সময় নেই—

চন্দ্র। কিংবা মহারাণীর হুকুম নেই। কিন্তু সেটা তোমার ভারি ভুল। বন্ধুত্ব তখন আরো প্রগাঢ় হয়ে উঠবে। ওঁর জীবনের মধ্যাহ্ন সূর্য্যটি যখন ঠিক ব্রহ্মরন্ধ্রের উপর ঝাঁঝাঁ করতে থাক্‌বেন, তখন এই কালো কালো ছায়াগুলিকে নিতান্ত খারাপ লাগ্‌বে না। কিন্তু দেখ বিনোদ, কিছু মনে করিস্‌নে—আরম্ভেতে একটুখানি দমিয়ে দেওয়া ভাল—তা হলে আসল ধাক্কা সাম্‌লাবার বেলায় নিতান্ত অসহ্য বোধ হবে না। তখন মনে হবে, চন্দর যতটা ভয় দেখাত আসলে ততটা কিছু নয়। সে বলেছিল আগুনে ঝল্‌সাবার কথা কিন্তু এ ত কেবল মাত্র উল্টেপাল্টে তাওয়ায় সেঁকা—তখন কি অনির্ব্বচনীয় আরাম বোধ হবে!

শ্রীপতি। চন্দরদা, ও কি তুমি বক্‌চ! আজ বিয়ের দিনে কি ওসব কথা শোভা পায়! একে ত বাজনা নেই, আলো নেই, হুলু নেই, শাঁখ নেই, তার পরে যদি আবার অশ্বিনকালের বোলচাল দিতে আরম্ভ কর তা হলে ত আর বাঁচিনে!

ভূপতি। মিছে না! চন্দরদার ও সমস্ত মুখের আস্ফালন বেশ জানি—এদিকে রাত্তির দশটার পর যদি আর এক মিনিট ধরে রাখা যায় তা হলে ব্রাহ্মণ বিরহের জ্বালায় একেবারে অস্থির হয়ে পড়ে—

চন্দ্র। ভূপতির আর কোন গুণ না থাক্‌ ও মানুষ চেনে তা স্বীকার করতে হয়। ঘড়িতে ঐ যে ছুঁচোলো মিনিটের কাঁটা দেখ্‌চ উনি যে কেবল কাণের কাছে টিক্ টিক্ করে সময় নির্দ্দেশ করেন তা নয় অনেক সময় প্যাট্ প্যাট্ করে বেঁধেন—মনমাতঙ্গকে অঙ্কুশের মত গৃহাভিমুখে তাড়না করেন। রাত্তির দশটার পর আমি যদি বাইরে থাকি তা হলে প্রতি মিনিট আমাকে একটি করে খোঁচা মেরে মনে করিয়ে দেন ঘরে আমার অন্ন ঠাণ্ডা। এবং গৃহিণী গরম হচ্চেন।—বিনুদার ঘড়ির সঙ্গে আজকাল কোন সম্পর্কই নেই—এবার থেকে ঘড়ির ঐ চন্দ্রবদনে নানা রকম ভাব দেখতে পাবেন—কখন প্রসন্ন কখন ভীষণ।(নিমাইয়ের প্রতি) আচ্ছা ভাই বৈজ্ঞানিক তুমি আজ অমন চুপচাপ কেন? এমন করলে ত চল্‌বে না!

শ্রীপতি। সত্যি নীরু যে বিয়ে করতে যাচ্চে তা মনে হচ্চে না। আমরা কতকগুলো পুরুষ মানুষে জটলা করেচি—কি করতে হবে কেউ কিছু জানিনে—মহা মুস্কিল! চন্দরদা, তুমি ত বিয়ে করেচ, বল না কি করতে হবে—হাঁ করে সবাই মিলে বসে থাক্‌লে কি বিয়ে-বিয়ে মনে হয়?

চন্দ্র। আমার বিয়ে সে যে পুরাতত্ত্বের কথা হল—আমার স্মরণশক্তি ততদূর পৌঁছয় না। কেবল বিবাহের যেটি সর্ব্বপ্রধান আয়োজন যেটিকে কিছুতে ভোলবার যো নেই সেইটিই অন্তরে বাহিরে জেগে আছে, মন্তর তন্তর পুরুত ভাট সে সমস্ত ভুলে গেছি।

ভূপতি। বাসর ঘরে শ্যালীর কাণমলা?

চন্দ্র। হায় পোড়াকপাল! শ্যালীই নেই ত শ্যালীর কাণমলা—মাথা নেই তার মাথাব্যথা! শ্যালী থাক্‌লে তবু ত বিবাহের সঙ্কীর্ণতা অনেকটা দূর হয়ে যায়—ওরি মধ্যে একটুখানি নিঃশ্বেস ফেলবার, পাশ ফেরবার জায়গা পাওয়া যায়—শ্বশুরমশায় একেবারে কড়ায়

গণ্ডায় ওজন করে দিয়েছেন শিকিপয়সার ফাউ দেন নি!

বিনোদ। বাস্তবিক—বর মনোনীত করবার সময় যেমন জিজ্ঞাসা করে ক'টি পাশ আছে, কনে বাছবার সময় তেমনি খোঁজ নেওয়া উচিত ক'টি ভগ্নী আছে।

চন্দ্র। চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে—ঠিক বিয়ের দিনটিতে বুঝি তোমার চৈতন্য হল? তা তোমারও একটি আছে শুনেছি তাঁর নামটি হচ্চে ইন্দুমতী—স্বভাবের পরিচয় ক্রমে পাবে।

নিমাই। (স্বগত) যাঁকে আমার স্কন্ধের উপর ন্যস্ত করা হয়েচে—সর্ব্বনাশ আর কি!

শ্রীপতি। এ দিকে যে বেরোবার সময় হয়ে এল তা দেখ্‌চ! এতক্ষণ কি যে হল তার ঠিক নেই! নিদেন ইংরেজ ছোঁড়াগুলোর মত খুব খানিকটা হো হো করতে পারলেও আসর গরম হয়ে উঠত! খানিকটা চেঁচিয়ে বেসুরো গান গাইলেও একটু জমাট হত—

(উচ্চৈঃস্বরে)—

"আজ তোমায় ধরব চাঁদ আঁচল পেতে!"

চন্দ্র। আরে থাম্ থাম্—তোর পায়ে পড়ি ভাই থাম্; দেখ আর্য্য ঋষিগণ যে রাগ রাগিণীর সৃষ্টি করেছিলেন সে কেবল লোকের মনোরঞ্জনের জন্যে—কোন রকম নিষ্ঠুর অভিপ্রায় তাঁদের ছিল না।

ভূপতি। এস তবে বর কনের উদ্দেশে থ্রী চিয়ার্স্ দিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক্। হিপ্ হিপ্ হুরে—

চন্দ্র। দেখ, আমার প্রিয় বন্ধুর বিয়েতে আমি কখনই এ রকম অনাচার হতে দেব না; শুভকর্ম্মে অমন বিলিতী শেয়াল ডাক ডেকে বেরোলে নিশ্চয় অযাত্রা হবে! তার চেয়ে সবাই মিলে হুলু দেবার চেষ্টা কর না! ঘরে একটি মাত্র স্ত্রীলোক আছেন তিনি শাঁখ বাজাবেন এখন! আহা, এই সময় থাক্‌ত তাঁর গুটি দুই তিন সহোদরা তাহলে কোকিল কণ্ঠের হুলু শুনে আজ কাণ জুড়িয়ে যেত!—

বিনোদ। তা হলে তোমার দুটি কাণ সাম্‌লাতেই দিন বয়ে যেত।

ভূপতি। বিনোদ তবে ওঠ, সময় হল!

নলিন। এই তবে আমাদের অবিমিশ্রিত বন্ধুত্বের শেষ মিলন। জীবনস্রোতে তুমি একদিকে যাবে আমি একদিকে যাব। প্রার্থনা করি তুমি সুখে থাক! কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যে ভেবে দেখো বিনু এই মরুময় জগতে তুমি কোথায় যাচ্চ—

চন্দ্র। বিনু তুই বল্, মা আমি তোর জন্যে দাসী আন্‌তে যাচ্চি। তা হলে কনসাগুলিটা হয়ে যায়!

শ্রীপতি। এইবার তবে হুলু আরম্ভ হোক্! (সকলে হুলুর চেষ্টা)

(নেপথ্যে হুলু ও শঙ্খধ্বনি)

নিমাই। ঐ যে হুলুর যোগাড় করে রেখেচ, এতক্ষণে একটু খানি বিয়ের সুর লাগল! নইলে কতকগুলো মিন্সে মিলে যে রকম বেসুরো লাগিয়েছিলে বরযাত্রা কি গঙ্গাযাত্রা কিছু বোঝবার যো ছিল না।

(সকলের প্রস্থান)

ইন্দু ও ক্ষান্তর প্রবেশ।

ক্ষান্ত। শুনলি ত ভাই আমার কর্ত্তাটির মধুর কথাগুলি?

ইন্দু। কেন ভাই আমার ত মন্দ লাগে নি!

ক্ষান্ত। তোর মন্দ লাগবে কেন? তোর ত আর বাজে নি! যার বেজেচে সেই জানে!

ইন্দু। তুমি যে আবার একেবারে ঠাট্টা সইতে পার না। তোমার স্বামী কিন্তু ভাই তোমাকে সত্যি ভালবাসে। দিনকত বাপের বাড়ি গিয়ে বরং পরীক্ষা করে' দেখ না—

কান্ত। তাই একবার ইচ্ছে করে কিন্তু জানি থাক্‌তে পারব না।—তা যা হোক—এখন তোদের ওখানে যাই। ওরা ত বৌবাজারের রাস্তা ঘুরে যাবে সে এখনো ঢের দেরি আছে।

ইন্দু। তুমি এগোও ভাই, আমি তোমার স্বামীর এই বইগুলি গুছিয়ে দিয়ে যাই। (কান্তর প্রস্থান) আজ ললিত বাবু এমন চুপ-চাপ গম্ভীর হয়ে বসেছিলেন! কি কথা ভাব-ছিলেন কে জানে! সত্যি আমার জানতে ইচ্ছে করে! থেকে থেকে একটা খাতা খুলে দেখছি-লেন। সেই খাতাটা ঐ ভুলে ফেলে গেছেন' ওটা আমাকে দেখতে হচ্চে। (খাতা খুলিয়া)—ওমা! এ যে কবিতা! কাদম্বিনীর প্রতি! আ মরণ! সে পোড়ার মুখী আবার কে!

জল দিবে অথবা বজ্র, ওগো কাদম্বিনী,
হতভাগ্য চাতক তাই ভাবিছে দিন রজনী!

ইস্! ভারি যে অবস্থা খারাপ দেখচি! এত বেশী ভাবনায় কাজ কি! আমি যদি পোড়া কপালী কাদম্বিনী হতুম তাহলে জলও দিতুম না বজ্রও দিতুম না, হতভাগা চাতকের মাথায় খানিকটা কবিরাজের তেল ঢেলে দিতুম। খেয়ে দেয়ে ত কাজ নেই—কোথাকার কাদ ম্বিনীর নামে কবিতা, তাও আবার দুটো লাইন ছন্দ মেলে নি! এর চেয়ে আমি ভাল লিখতে পারি!

আর কিছু দাও বা না দাও অয়ি অবলে সরলে,
বাঁচি সেই হাসিভরা মুখ আর একবার দেখিলে।

আহা হা হা হা! অবলে সরলে! কোন্ একটা বেহায়া মেয়ে ওঁকে হাসিভরা কালামুখ দেখিয়ে দিয়েছিল এক তিল লজ্জাও করে নি! বাস্তবিক পুরুষগুলো ভারি বোকা। মনে করলে ওঁর প্রতি ভারি অনুগ্রহ করে সে হেসে গেল—হাস্‌তে না কি সিকি পয়সার খরচ হয়! দাঁতগুলো বোধ হয় একটু ভাল দেখতে ছিল তাই একটা ছুতো করে দেখিয়ে দিয়ে গেল! কই আমাদের কাছে ত কোন কাদম্বিনী সাত পুরুষে এমন করে হাস্‌তে আসে না! অবলে সরলে! সত্যি বাপু, মেয়ে জাতটাই ভাল নয়! এত ছলও জানে! ছি ছি! এ কবিতাও তেমনি হয়েছে। আমি যদি কাদম্বিনী হতুম ত এমন পুরুষের মুখ দেখতুম না! যে লোক চোদ্দটা অক্ষর সামলে চলতে পারে না, তার সঙ্গে আবার প্রণয়! এ খাতা আমি ছিঁড়ে ফেলব—পৃথিবীর একটা উপকার করব—কাদম্বিনীর দেমাক্ বাড়তে দেব না!

পুরুষের বেশে হরিলে পুরুষের মন,
(এবার) নারীবেশে কেড়ে নিয়ে যাও জীবন মরণ!

এর মানে কি!

কদম্ব যেমনি আমা প্রথম দেখিলে,
কেমন করে ভৃত্য বলে তখনি চিনিলে!

ওমা! ওমা! ওমা! এ যে আমারই কথা! এইবার বুঝেছি পোড়ারমুখী কাদম্বিনী কে (হাস্য) তাই বলি, এমন করে কাকে লিখ-লেন! ওমা, কত কথাই বলেচেন! আর এক-বার ভাল করে সমস্তটা পড়ি! কিন্তু কি চমৎ-কার হাতের অক্ষর! একেবারে যেন মুক্তো বসিয়ে গেছে!

(নীরবে পাঠ।)

পশ্চাৎ হইতে খাতা অন্বেষণে বিনা-য়ের প্রবেশ।

কিন্তু ছন্দ থাক্ না থাক্ পড়তে ত কিছুই খারাপ হয় নি। সত্যি, ছন্দ নেই বলে আরো মনের সরল ভাবটা ঠিক যেন প্রকাশ হয়েচে। আমার ত বেশ লাগচে। আমারও বোধ হয়

ছেলেদের প্রথম ভাঙ্গা কথা যেমন মিষ্টি লাগে, কবিদের প্রথম ভাঙ্গা ছন্দ তেমনি মিষ্টি লাগে; পড়তে গেলে বুককম ভিতরটা কি একরকম করে ওঠে বড় বড় কবিতা পড়ে এমন হয় না। মেঘনাদবধ বৃত্রসংহার পলাশির যুদ্ধ, সে সব যেন ইস্কুলের বই—এমন সত্যিকার না। (খাতা-বুকে চাপিয়া) এ খাতা আমি নিয়ে যাব—এ ত আমাকেই লিখেচেন! আমার এমনি আনন্দ হচ্চে! ইচ্ছে করচে এখনি দিদিকে গিয়ে জড়িয়ে ধরিগে! আহা, দিদি যাকে বিয়ে করচে তাকে নিয়ে যেন খুব খুব খুব সুখে থাকে—যেন চির জীবন আদরে সোহাগে কাটাতে পারে! (প্রস্থানোদ্যম। পশ্চাতে ফিরিয়া নিমাইকে দেখিয়া) ওমা! (মুখ আচ্ছাদন।)—

নিমাই। ঠাকরুণ, আমি একখানা খাতা খুঁজতে এসেছিলুম—(ইন্দুমতীর দ্রুত পলায়ন)—জন্ম জন্ম সহস্র বার আমার সহস্র খাতা হারাক্—কবিতার বদলে যা পেয়েছি কালিদাস তার কুমারসম্ভব শকুন্তলা বাঁধা রেখে এমন জিনিষ পায় না! (মহা উল্লাসে প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

বিবাহ-সভা।

লোকারণ্য। শঙ্খ, হুলুধ্বনি। শানাই।

নিবারণ। কানাই! ও কানাই! কি করি বল দেখি! কানাই গেল কোথায়?

শিবু। তুমি ব্যস্ত হোয়ো না, ভাই! এ ব্যস্ত হবার কাজ নয়! আমি সমস্ত ঠিক করে দিচ্চি। তুমি পাত পাড়া হল কি না দেখে এস দেখি!

ভৃত্য। বাবু, আসন এসে পৌঁচেছে সে গুলো রাখি কোথায়?

নিবা। এসেচে! বাঁচা গেছে! তা সে গুলো ছাতে—

শিবু। ব্যস্ত হচ্চ কেন দাদা! কি হয়েচে বল দেখি? কিরে বেটা, তুই হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েচিস্ কেন? কাজ কর্ম্ম কিছু হাতে নেই না কি!

ভৃত্য। আসন এসেচে সে গুলো রাখি কোথায় তাই জিজ্ঞাসা করচি।

শিবু। আমার মাথায়! একটু গুছিয়ে গাছিয়ে নিজের বুদ্ধিতে কাজ করা তা তোদের দ্বারা হবে না! চল্ আমি দেখিয়ে দিচ্চি! ওরে বাতিগুলো যে এখনো জ্বালালে না! এখানে কোন কাজেরই একটা বিলিব্যবস্থা নেই—সমস্ত বেবন্দোবস্ত! নিবারণ, তুমি ভাই একটু ঠাণ্ডা হয়ে বস দেখি—ব্যস্ত হয়ে বেড়ালে কোন কাজই হয় না! আঃ বেটা-দের কেবল ফাঁকি! বেহারা বেটারা সবাই পালিয়েছে দেখচি—আচ্ছা করে তাদের কাণ-মলা না দিলে—

নিবা। পালিয়েচে না কি! কি করা যায়!

শিবু। ব্যস্ত হয়ো না ভাই—সব ঠিক হয়ে যাবে। বড় বড় ক্রিয়া কর্ম্মের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখা ভারি দরকার। কিন্তু এই রেখো বেটার সঙ্গে ত আর পারিনে! আমি তাকে পই পই করে বল্লুম তুমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে লুচিগুলো ভাজিয়ে, কিন্তু কাল থেকে হতভাগা বেটার চুলের টিকি দেখবার যো নেই! লুচি যেন কিছু কম পড়েচে বোধ হচ্চে।

নিবা। বল কি শিবু! তাহলে ত সর্ব্বনাশ!

শিবু। ভয় কি দাদা! তুমি নিশ্চিন্ত থাক, সে আমি করে নিচ্চি! একবার রাঁধুনির দেখা পেলে হয় তাকে আচ্ছা করে শুনিয়ে দিতে হবে!

চন্দ্র নিমাই প্রভৃতির প্রবেশ।

নিবা। আহার প্রস্তুত, চন্দ্র বাবু কিছু খাবেন চলুন।

চন্দ্র। আমাদের পরে হবে, আগে সকলের হোক্!

শিবু। না, না একে একে সব হয়ে যাক্! চল চন্দর তোমাদের খাইয়ে আনি। নিবারণ, তুমি কিচ্ছু ব্যস্ত হোয়ো না, আমি সব ঠিক করে নিচ্চি! কিন্তু লুচিটা কিছু কম পড়বে বোধ হচ্চে।

নিবা। তা হলে কি হবে শিবু!

শিবু। ঐ দেখ! মিছি মিছি ভাব কেন! সে সব ঠিক হয়ে যাবে! এখন কেবল সন্দেশ গুলো এসে পৌঁছলে বাঁচি! আমার ত বোধ হচ্চে ময়রা বেটা বায়না নিয়ে ফাঁকি দিলে।

নিবা। বল কি ভাই!

শিবু। ব্যস্ত হোয়োনা আমি সব দেখে শুনে নিচ্চি।

(সকলকে ডাকিয়া লইয়া প্রস্থান।)

চতুর্থ দৃশ্য।

বাসরঘর।

বিনোদ। কমলমুখী ও অন্য স্ত্রীগণ।

(সম্মুখবর্ত্তী পথ দিয়া আহারার্থী বরযাত্রিগণ যাতায়াত করিতেছে।)

ইন্দু। এতক্ষণে বুঝি তোমার মুখ ফুটলো।

বিনোদ। আপনার ওহাতের স্পর্শে বোবার মুখ খুলে যায় আমি ত কেবল বর!

কান্ত। দেখেচিস্ ভাই, আমরা এতক্ষণ এত চেষ্টা করে একটা কথা কওয়াতে পারলুম না আর ইন্দুর হাতের কাণমলা খেয়ে তবে ওর কথা বেরল!

প্রথমা। ও ইন্দু, তোর কাছে ওর কথার চাবি ছিল না কি! তুই কি, বল ঘুরিয়ে দিলি লো?

দ্বিতীয়া। তা দে ভাই, তবে আর এক পাক দে! ওর পেটে যত কথা আছে বেরিয়ে যাক্! (মৃদুস্বরে) জিগ্‌গেস কর না, আমাদের নাতনিকে লাগচে কেমন—

ইন্দু। কি বল ঠাকুরজামাই, তবে আর একবার দম দিয়ে নিই!

কমল। (মৃদুস্বরে) ইন্দু, তুই আর জ্বালাস্‌নে ভাই—একটু থাম্!

ইন্দু। দিদি, ওর কাণে একটু মোচড় দিলেই অম্‌নি তোমার প্রাণে দ্বিগুণ বেজে উঠচে কেন? তুমি কি ওর তানপূরোর তার!

প্রথমা। ওলো ও কমল, তোর রকম দেখে ত আর বাঁচিনে! হ্যাঁলো, এরি মধ্যে ওর কাণের পরে তোর এত দরদ হয়েচে! তা ভাবিস্‌নে ভাবিস্‌নে—আমরা ওর দুটো কাণ কেটে নিচ্চি নে, নিলেও একটা তোর জন্যে রেখে দেবো!

চন্দ্র (জানলা হইতে মুখ বাড়াইয়া) দরদ হবে না কেন! আজ থেকে উনি আমাদের বিনুদার কর্ণধার হলেন—সে কর্ণ উনি যদি না সাম্‌লাবেন ত কে সাম্‌লাবে?

দ্বিতীয়া। ও মিন্সে আবার কে ভাই!

কান্ত। (তাড়াতাড়ি) ও বরের ভাই হয়।—ওগো, মশায়, তোমার বিনুদার হয়ে জবাব দিতে হবে না। উনি বেশ সেয়ানা

য়েচেন—এখন দিব্যি কথা ফুটেচে! তুমি এখন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে যাও।

চন্দ্র। যে আজ্ঞে, আদেশ পেলেই নির্ভয়ে যেতে পারি। এখন বোধ করি কিছুক্ষণ ঘরে টিঁকতে পারব!

(প্রস্থান)

ইন্দু। না ভাই, এখানে বড্ড আনাগোনার রাস্তা—বাইরে ঐ দরজাটা দিয়ে আসি! (উঠিয়া দ্বারের নিকট আগমন)

নিমাই। একবার উঁকি মেরে বিনুদার অবস্থাটা দেখে যেতে হচ্চে! (ইন্দুর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত।)

ইন্দু! আপনারা বেশী ব্যস্ত হবেন না, আপনাদের প্রাণের বন্ধুটি জলে পড়েন নি।

নিমাই। সে জন্যে আমি কিছু ব্যস্ত হই নি। আমার নিজের একটা জিনিষ হারিয়েচে আমি তারই খোঁজ করে বেড়াচ্চি।

ইন্দু। হারাবার মত জিনিষ যেখানে সেখানে ফেলে রাখেন কেন?

নিমাই। সে আমাদের জাতের স্বধর্ম্ম—আমরা সাবধান হতে শিখিনি। সে খাতাটা যদি আপনার হাতে পড়ে থাকে—

ইন্দু। খাতা? হিসাবের খাতা?

নিমাই। তাতে কেবল খরচের হিসেবটাই ছিল, জমার হিসেবটা যদি বসিয়ে দেন ত আপনার কাছেই থাক্!

ইন্দু। ছি ছি, আজ আমি যে কোবকি করচি তার ঠিক নেই! আজ আমার কি হয়েচে! (দ্রুত দ্বার রোধ)—

তৃতীয় অঙ্ক।

—০:*:০—

প্রথম দৃশ্য।

—*—

বাগবাজারের রাস্তা।

নিমাই।

নিমাই। আহা, এই বাড়িটা আমার শরীর থেকে আমার মনটুকুকে যেন শুষে নিচ্চে—ব্লটিং যেমন কাগজ থেকে কালি শুষে নেয়! কিন্তু কোন্‌দিকে সে থাকে এ পর্য্যন্ত কিছুই সন্ধান করতে পারলুম না! ঐ যে পশ্চিমের জান্‌লার ভিতর দিয়ে একটা শাদা কাপড়ের মতন যেন দেখা গেল—না না ও ত নয়—ও ত একজন দাসী দেখচি—ও কি করচে? একটা ভিজে শাড়ি শুকতে দিচ্চে। বোধ হয় তাঁরি শাড়ি! আহা, নাগাল পেলে একবার স্পর্শ করে নিতুম! তা হলে এতক্ষণে তাঁর স্নান হল। পিঠের উপরে ভিজে চুল ফেলে সাফ কাপড়টি পরে এখন কি করচেন?—একবার কিছুতেই কি দেখা হতে পারে না? আমরা কি বনের জন্তু? আমাদের কেন এত ভয়? এত করে এতগুলো দেয়াল গেঁথে এতগুলো দরজা-জান্‌লা বন্ধ করে মানুষের কাছ থেকে মানুষ লুকিয়ে থাকে কেন?

পাল্কীতে শিবচরণের প্রবেশ

শিব। (বেহারার প্রতি

রাখ। (পাল্কী হইতে অব

হুঁস নেই! দেখ না।

দেখ না! যেন

ইঁট কাঠগুলো গিলে খাবে! ছোঁড়ার হল কি? খাঁচার পাখীর দিকে বেড়াল যেমন তাকিয়ে থাকে তেমনি করে উপরের দিকে তাকিয়ে আছে। রোস, এবারে ওকে জব্দ করচি—বাবাজি হাতে হাতে ধরা পড়েচেন! হতভাগা কালেজে যাঁবার নাম করে রোজ বাগবাজারে এসে ঘুর ঘুর করে। (নিকটে আসিয়া) বাপু, মেডিকেল কালেজটা কোন-দিকে একবার দেখিয়ে দাও দেখি!

নিমাই। কি সর্ব্বনাশ! এ যে বাবা!

শিব। শুনচ? কালেজ কোন্‌দিকে! তোমার অ্যানাটমির নোট কি ঐ দেয়ালের গায়ে লেখা আছে? তোমার সমস্ত ডাক্তারি শাস্ত্র কি ঐ জানলার গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলচে! (নিমাই নিরুত্তর) মুখে কথা নেই যে! লক্ষ্মীছাড়া এই তোর একজামিন! এইখানে তোর মেডিকেল কালেজ!

নিমাই। খেয়েই কলেজে গেলে আমার অসুখ করে তাই একটুখানি বেড়িয়ে নিয়ে—

শিব। বাগবাজারে তুমি হাওয়া খেতে এস? সহরের আর কোথাও বিশুদ্ধ বায়ু নেই! এ তোমার দার্জ্জিলিং সিম্‌লেপাহাড়! বাগবাজারের হাওয়া খেয়ে খেয়ে আজ কাল যে চেহারা বেরিয়েচে! একবার আয়নাতে দেখা হয় কি? আমি বলি ছোঁড়াটা এক-জামিনের তাড়াতেই শুকিয়ে যাচ্চে—তোমাকে যে ভূতে তাড়া করে বাগবাজারে ঘোরাচ্চে তা' ত জানতুম না!

নিমাই। আজকাল বেশী পড়তে হয় বলে

…কটা করে এক্‌সেসাইজ করে নিই—

…স্বার ধারে কাঠের পুঁতুলের

… থেকে তোমার এক্কে-

…পার দাঁড়াবার জায়গা

নিমাই। অনেকটা চলে এসে শ্রান্ত হয়ে ছিলুম তাই একটু বিশ্রাম করা যাচ্ছিল।

শিব। শ্রান্ত হয়েছিস্, তবে ওঠ আমার পাল্কীতে! যা এখনি কালেজ যা! গেরস্তর বাড়ির সাম্‌নে দাঁড়িয়ে শ্রান্তি দূর করতে হবে না!

নিমাই। সে কি কথা! আপনি কি করে যাবেন?

শিব। আমি যেমন করে হোক্ যাব তুই এখন পাল্কীতে ওঠ! ওঠ্ বলচি!

নিমাই। অনেকটা জিরিয়ে নিয়েচি—এখন আমি অনায়াসে হেঁটে যেতে পারব!

শিব। না, সে হবে না—তুই ওঠ আমি দেখে যাই—।

নিমাই। আপনার যে ভারি কষ্ট হবে!

শিব। সে জন্যে তোকে কিছু ভাবতে হবে না—তুই ওঠ পাল্কীতে!

নিমাই। কি করি—পাল্কীতে ওঠা যাক্ আজ সকাল বেলাটা মাটি হল!

(পাল্কী আরোহণ)

শিব (বেহারার প্রতি) দেখ, একেবারে সেই পটলডাঙ্গার কালেজে নিয়ে যাবি কোথাও থামাবিনে!

(পাল্কী লইয়া বেহারাগণ প্রস্থানোন্মুখ।)

নিমাই (জনান্তিকে বেহারাদের প্রতি) মির্জাপুর চন্দ্রবাবুর বাসায় চল্ তোদের এক টাকা বক্‌শিস্ দেব, ছুটে চল্। (প্রস্থান)—

শিব। আজ আর কবী দেখা হল না! আমার সকালবেলাটা মাটি করে দিলে!

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—*—

চন্দ্রকান্তের বাসা।

চন্দ্রকান্ত।

চন্দ্র। নাঃ! এ আগাগোড়া কেবল ছেলেমানুষী করা হয়েচে: আমার এমন অনুতাপ হচ্চে! মনে হচ্চে যেন আমিই এ সমস্ত কাণ্ডটি ঘটিয়েচি! ইদিকে এত কল্পনা, এত কবিত্ব, এত মাতামাতি, আর বিয়ের দুদিন না যেতে যেতেই কিছু আর মনে ধরচে না! ওঁদের জন্যে একটি আলাদা জগৎ ফরমাস দিতে হবে! একটি শান্তিপুরে ফিন্‌ফিনে জগৎ—কেবল চাঁদের আলো, ঘুমের ঘোর আর পাগলের পাগলামী দিয়ে তৈরি!

নিমাইয়ের প্রবেশ।

নিমাই। কি হচ্চে চন্দরদা!

চন্দ্র। না, নিমাই, তোরা আর বিয়ে থাওয়া করিস্‌নে।

নিমাই। কেন বল দেখি—তোমার ঘাড়ে ম্যাল্‌থসের ভূত চাপ্‌ল নাকি?

চন্দ্র। এখনকার ছেলেরা তোরা মেয়েমানুষকে বিয়ে করবার যোগ্য নস্! তোরা কেবল লম্বা চওড়া কথা ক'বি আর কবিতা লিখবি তাতে যে পৃথিবীর কি উপকার হবে ভগবান্ জানেন!

নিমাই। কবিতা লিখে পৃথিবীর কি উপকার হয় বলা শক্ত, কিন্তু এক এক সময় নিজের কাজে লেগে যায় সন্দেহ নেই! যাহোক্ এত রাগ কেন!

চন্দ্র। শুনেচ ত সমস্তই! আমাদের বিনুর তাঁর স্ত্রীকে পছন্দ হচ্চে না!

নিমাই। বাস্তবিক, এরকম গুরু ব্যাপার নিয়ে খেলা করাটা ভাল হয় নি!

চন্দ্র। বিনুটা যে এত অপদার্থ তা কি জানতুম? একটা স্ত্রীলোককে ভালবাসবার ক্ষমতা টুকুও নেই? একবার ভেবে দেখ দেখি ভাই—একটি বালিকা হঠাৎ একদিন রাত্রে তার আশৈশব আত্মীয় স্বজনের বন্ধন বিচ্ছিন্ন করে সমস্ত ইহকাল পরকাল তোমার বাম হস্তে তুলে দিলে, আর তার পর দিন সকালবেলা উঠে কি না তাকে তোমার পছন্দ হল না! এ কি পছন্দর কথা!

নিমাই। সেই জন্য ত ভাই গোড়ায় একবার দেখে শুনে নেওয়া উচিত ছিল! তা এখন কি করবে বল দেখি?

চন্দ্র। আমি ত আর তার মুখ দর্শন করচিনে! এই নিয়ে তার সঙ্গে আমার ভারি ঝগড়া হয়ে গেছে!

নিমাই। তুমি তাকে ছাড়লে সে যে নেহাৎ অধঃপাতে যাবে!

চন্দ্র। না তার সঙ্গে আমি কিছুতেই মিশচিনে, সে যদি আমার পায়ে ধরে এসে পড়ে তবু না! তুমি ঠিক বলেছিলে নিমাই, আজকাল সবাই যাকে ভালবাসা বলে সেটা একটা স্নায়ুর ব্যামো—হঠাৎ কাঁপুনি দিয়ে ধরে, আবার হঠাৎ ঘাম দিয়ে ছেড়ে যায়!

নিমাই। সে সব বিজ্ঞান শাস্ত্রের কথা পরে হবে, আপাততঃ আমার একটি কাজ করে দিতে হচ্চে।

চন্দ্র। যে কাজ বল তাতেই রাজি আছি কিন্তু ঘট্‌কালি আর করচিনে!

নিমাই। ঐ ঘট্‌কালিই করতে হবে!

চন্দ্র। (ব্যগ্রভাবে) কি রকম শুনি।

নিমাই। বাগবাজারের চৌধুরীদের বাড়ির কাদম্বিনী তার সঙ্গে আমার—

চন্দ্র। (উচ্চস্বরে) নিমাই, তোমারও কবিত্ব! তবে তোমারও স্নায়ু বলে একটা বালাই আছে!

নিমাই। তা আছে ভাই! বোধ হয় একটু বেশী পরিমাণেই আছে। অবস্থা এমনি হয়েচে কিছুতেই একৃজামিনের পড়ায় মন দিতে পারিনে—শীগ্‌গির আমার একটি সদ্গতি না করলে—

চন্দ্র। বুঝেচি। কিন্তু নিমাই, আমার ঘাড়ে পাপের বোঝা আর চাপাস্‌নে! ভেবে দেখ, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে দুটি অবলার সর্ব্বনাশ করেচি—একটিকে স্বহস্তে নিয়েচি, আর একটিকে প্রিয় বন্ধুর হাতে সমর্পণ করেচি—আর স্ত্রীহত্যার পাতকে আমাকে লিপ্ত করিস্‌নে!

নিমাই। কিচ্ছু ভেবোনা ভাই! এবার যা করবে, তাতে তোমার পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে!

চন্দ্র। ভ্যালা মোর দাদা! এ বেশ কথা বলেচিস্ ভাই। সকাল থেকে মরে ছিলুম এখন একটু প্রাণ পাওয়া গেল। আমি এখখনি যাচ্চি। চাদরখানা নিয়ে আসি। অমনি বড় বৌয়ের পরামর্শটাও জানা ভাল।

(প্রস্থান)

(অনতিবিলম্বে ছুটিয়া আসিয়া।)

চন্দ্র। বড় বৌ রাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেছে। এ সমস্তই কেবল তোদের জন্তে! না, আমি আর তোদের কারো সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখচিনে! তোরা পাঁচজনে এসে জুটিস্, আমিও ছেলেমানুষদের সঙ্গে মিশে যা মুখে আসে তাই বকি, আর এই সমস্ত অনর্থ বাধে। আমার চিরকালের ঘরের স্ত্রীটিকেই যদি ঘরে না রাখতে পারব ত তোদের স্ত্রী জুটিয়ে দিয়ে আমার কি এমন পরমার্থ লাভ হবে বল্ দেখি। না—তোদের কারো সঙ্গে আমি আর বাক্যালাপ করচিনে!

বিনোদ ও নলিনাক্ষের প্রবেশ।

বিনোদ। চন্দর দা, তুমি আমার উপর রাগ করে চলে এলে ভাই আর থাকতে পারলুম না।

চন্দ্র। না ভাই, তোদের উপর কি আমি রাগ করতে পারি। তবে মনে একটু দুঃখ হয়েছিল তা স্বীকার করি।

বিনোদ। কি করব চন্দর দা! আমি এত চেষ্টা করচি কিছুতেই পেরে উঠ্‌চিনে—

চন্দ্র। কেন বল্ দেখি? ওর মধ্যে শক্তটা কি? মেয়ে মানুষকে ভাল বাস্‌তে পারিস্‌নে? তুই কি কাঠের পুঁতুল?

নলিন। চন্দ্র বাবুর সঙ্গে কিন্তু আমার মতের একটুও মিল হচ্চে না। ভালবাসা কখনো জোর করে হয় না। একটা গান আছে

"ভাল বাসিবে বলে ভাল বাসিনে!
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে!"

আমি কিন্তু বিনু সম্পূর্ণ তোমার দিকে!

বিনোদ। নলিন একটু থাম্ তুই—এই বড় দুঃখের সময় আর হাসাস্‌নে! চন্দর দা, কি জানি ভাই, একাদিক্রমে পঁচিশ বৎসরকাল বিয়ে না করে' বিয়ে না করাটা যেন একেবারে মুখস্থ হয়ে গেছে। এখন হঠাৎ এই বিয়েটা কিছুতেই মনের মধ্যে গ্রহণ করতে পারচিনে!

চন্দ্র। তোর পায়ে পড়ি বিনু; তুই আমার গা ছুঁয়ে বল্ নিদেন আমার খাতিরে তোর স্ত্রীকে ভাল বাস্‌বি! মনে কর তুই আমার বোনকে বিয়ে করেছিস্!

নলি। চন্দ্রবাবুর এ নিতান্ত অন্যায় কথা! বিনুর প্রতি উনি—

বিনোদ। তুই আর জ্বালাস্‌নে নলিন্‌! বুঝেছ চন্দর দা, যা কিছু মনে করবার তা করেচি—তাকে আমি চোখ বুজে পরি অপ্সরী রম্ভা তিলোত্তমা বলে কল্পনা করি কিন্তু তাতে ফল পাইনে। তবে সত্যি কথা বলি চন্দর, আসল হয়েচে কি, আজকাল টাকার বড় টানাটানি—বই থেকে কিছু পাইনে, দেশে যা বিষয় আছে মামাতো ভাইরা লুঠ করে খেলে—নিজে পাড়াগাঁয়ে পড়ে থেকে বিষয় দেখা সে মরে গেলেও পারব না—ওকালতি ব্যবসা সবে ধরেচি, ঘর থেকে কেবল গাড়িভাড়াই দিচ্চি। একলা যখন থাকৃতুম, আমার কোণের ঘরের ভাঙ্গা চৌকিটিতে এসে বস্‌তুম আপনাকে রাজা মনে হত। এখন নড়তে চড়তে কেবল মনে হয় আমার এই ভাঙ্গাঘর ছেঁড়া বিছানা-টুকুও বেদখল হয়ে গেছে—আমাকে আর কোথাও ভাল করে ধরে না! নিমাই, তুমি শুনে রাগ করচ, কিন্তু একটু বুঝে দেখো, একটা জুতোর মধ্যে দুটো পা ঢোকে না, তা দুই পায়ে যতই প্রণয় থাক্‌!

নলি। বিনু যা বল্‌চে ওর সমস্ত কথাই আমি মানি।

নিমাই। তা হলে তোমার ভালবাসার অভাব নেই, কেবল টাকার অভাব।

বিনোদ। কথাটা যে প্রায় একই দাঁড়ায়—

নিমাই। কি বল! কথাটা একই! ভালবাসাকে তুমি একেবারে উড়িয়ে দিতে চাও—

বিনোদ। না ভাই, আমি ভালবাসাটাকে বায়ুর ব্যামো কিংবা মিথ্যে বল্‌চিনে; আমি বল্‌চি ও জিনিষটা কিছু সৌখীন জাতের। ওর বিস্তর আস্‌বাবের দরকার। টানাটানির বাজারে ওকে নিয়ে বড় বিব্রত হয়ে পড়তে হয়! আমি বেশ বুঝ্‌তে পারি, চতুর্দ্দিকটি বেশ মনের মত হত, ট্রামের ঘড়্‌ঘড়্‌ না থাকৃত, দাসীমাগী ঝগড়া না করত, গয়লা ঠিক নিয়মিত দুধ যোগাত এবং দাম না চাইত, মাসান্তে বাড়িওয়ালা একবার করে অপমান করে না যেত, জজ সাহেব বিচারাসনে বসে আমার ইংরিজি ভুল সংশোধন করে না দিত, তাহলে আমিও ক্রমে ক্রমে ভাল বাস্‌তে পার্‌-তুম—কিন্তু এখন সঙ্গীত, চাঁদের আলো, প্রেমালাপ এ কিছুই রুচচেনা—আমার পটল-ডাঙ্গার সেই বাসার মধ্যে এ সমস্ত সৌখীন জিনিষ পুষতে পারচিনে!

চন্দ্র। ভালবাসা যে এতবড় ফুলবাবু তা জানতুম না—কি করেই বা জান্‌ব, ওঁর সঙ্গে আমার কখনই পরিচয় নেই!

নিমাই। ছিছি বিনোদ, তোমার এতদিন-কার কবিত্ব শেষকালে পয়সার থলির মধ্যে গুঁজলে হে!

বিনোদ। নিমাই, তুমি এমন কথাটা বল্লে! আমি দুর্গন্ধ পয়সার কাঙাল! ছোঃ! অভাবকে কি আমি অভাব বলে ডরাই তা নয় কিন্তু তার চেহারাটা অতি বিশ্রী, জীর্ণ শীর্ণ মলিন কুৎসিত কদাকার হাড়-বের-করা নিতান্ত গায়ের কাছে তাকে সর্ব্বদা সহ্য হয় না। তার ময়লা হাতে সে পৃথিবীর যা কিছু ছোঁয় তাই দাগী হয়ে যায়, তা চাঁদের আলোই বল, আর প্রেয়সীর হাসিই বল! এতদিন আমার টাকা ছিল না অভাবও ছিল না—বিয়ের পর থেকে দারিদ্র্য বলে একটা কদর্য্য মড়াখেকো শ্মশানের কুকুর জিব বের করে সর্ব্বদা আমার চোখের সাম্‌নে হাঁহাঁ করে বেড়াচ্চে—তাকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারিনে। আসল কথা, আমার চারিদিকে আমি একটি সৌন্দর্য্যের

সামঞ্জস্য দেখতে চাই—জীবনটি বেশ একটি অখণ্ড রাগিণীর মত হবে তবে আমার মধ্যে যা কিছু পদার্থ আছে তা ভাল করে প্রকাশ পাবে। কিন্তু আমার এই নতুন স্ত্রীর সঙ্গে আমার পুরোণো অবস্থার ঠিক সুর মেলাতে পারচিনে, আমার কোন জিনিষ তাঁকে কমন খাপ খাচ্ছে না, আর তাই ক্রমাগত আমাকে ছুঁচের মত বিঁধচে। থাকৃত যদি আরব্য উপন্যাসের একটি পোষা দৈত্য, স্ত্রী ঘরে পদার্পণ করলেন অমনি একটি কিঙ্করী সোণার থালে হ্যামিল্টনের দোকানের সমস্ত ভাল ভাল গয়না এনে তাঁর পায়ের কাছে রেখে গেল, দুজন দাসী বসবার ঘরে মছলন্দ বিছিয়ে চামর হাতে করে দুই দিকে দাঁড়াল, চারিদিক থেকে সঙ্গীত উঠচে, বাগান থেকে ফুলের গন্ধ আসচে—যে দিকে চোখ পড়চে তক্ তক্ ঝক্ ঝক্ করচে—সে হলে এক রকম হত—আর এই এক জীর্ণ ঘরে ছেঁড়া মাদুরে উঠতে বসতে লজ্জিত হয়ে আছি! যা বলিস ভাই, স্ত্রীর কাছে মান রাখতে সকলেরই সাধ যায়, এমন কি, সেই জন্যে মনু বলে গেছেন স্ত্রীর কাছে মিথ্যা বল্‌তে পাপ নাই। তা ভাই, মিথ্যা কথা দিয়ে যদি আমার পটলডাঙ্গার বাসাটা ঢেকে ফেল্‌তে পারতুম আমার বর্ত্তমান অবস্থা আগাগোড়া গিল্টি করে দিতে পারতুম, তা হলে মিথ্যে আমার মুখে বাধত না—কিন্তু এতখানি ছেঁড়া বেরিয়ে পড়েচে যে কেবল কথা দিয়ে আর রিফু চলে না। এখন এ অবস্থায় সে কি আমাকে মনে মনে শ্রদ্ধা করতে পারে! আমার মধ্যে যে টুকু পদার্থ আছে সে কি আমি তার কাছে প্রকাশ করতে পেরেচি? আমার সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই সে আমাকে কি হীনতার মধ্যে দেখচে বল দেখি! তুমি কি বল এ অবস্থায় মানুষের বসে বসে প্রেমালাপ করতে সখ যায়? এই ত ভাই আমার যে রকম স্বভাব তা খুলে বল্লুম, খুব যে উঁচুদরের বীরত্বময় মহত্ত্বপূর্ণ তা নয়—কিন্তু উঁচু নীচু মাঝারি এই তিনরকমেরই মানুষ আছে, ওর মধ্যে আমাকে যে দলেই ফেল আমার আপত্তি নেই—কিন্তু ভুল বুঝোনা!

চন্দ্র। তোমার সঙ্গে বক্তৃতায় কে পারবে বল! যা হোক্ এখন কর্ত্তব্য কি বল দেখি!

বিনোদ। আমি তাঁকে তাঁর বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েচি।

চন্দ্র। তুমি নিজে চেষ্টা করে? না তিনি রাগ করে গেছেন?

বিনোদ। না, আমি তাঁকে একরকম বুঝিয়ে দিলুম—

চন্দ্র। যে, এখানে তিনি টিক্‌তে পারবেন না! তুমি সব পারো! যদি বন্ধুত্ব রাখতে চাও ত ও আলোচনায় আর কাজ নেই তোমার যা কর্ত্তব্য বোধ হয় তুমি কোরো। নিমাই ভাই, তোমার সে কথাটা মনে রইল — আগে একবার নিজের শ্বশুর বাড়িটা ঘুরে আসি তার পরে বেশ উৎসাহের সঙ্গে কাজটায় লাগ্‌তে পারব।— বিনু, আজ আমার মনটা কিছু অস্থির আছে, আজ আর থাক্‌তে পারচিনে— কাল তোমার বাসায় একবার খাওয়া যাবে।

(প্রস্থান।)

নলিন। চল ভাই বিনু আমরা দুজনে মিলে গোলদীঘির ধারে বেড়াতে যাইগে?

বিনোদ। আমার এখন গোলদীঘি বেড়াবার সখ নেই নলিন। সেখানে যখন যাব একেবারে দড়ি কলসী হাতে করে নিয়ে যাব।

নলিন। কেন ভাই অনর্থক তুমি ওরকম মন খারাপ করেচ? একে ত এই পোড়া সংসারে যথেষ্ট অসুখ আছে তার পরে আবার—

বিনোদ। বন্ধু লাগ্‌লে আরো অসহ্য হয়ে ওঠে।

নলিন। কি করলে তোমার দগ্ধ হৃদয়ে আমি একটুখানি সান্ত্বনা দিতে পারি ভাই?

বিনোদ। নলিন, তোর দুটি পায়ে পড়ি আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে এত অবিশ্রাম চেষ্টা করিস্‌নে, মাঝে মাঝে একটু একটু হাঁফ ছাড়তে দিস্‌?

নলিন। তুমি এখন কোথায় যাচ্চ?

বিনোদ। বাড়ি যাচ্চি।

নলি। তবে আমিও তোমার সঙ্গে যাই। এখন তুমি সেখানে একলা, মনে করচি কিছু দিন তোমার সঙ্গে একত্র থেকে—

বিনোদ। না না, আমি শীঘ্রই আমার স্ত্রীকে ঘরে আন্‌চি—নলিন, আজ ভাই তুমি চন্দ্রকে নিয়ে গোলদীঘিতে বেড়াতে যাও—আমাকে আজ একটু ছুটি দিতেই হচ্চে।

নলিন। (সনিঃশ্বাসে) তবে বিদায় ভাই! কিন্তু এই শেষ কথা বলে যাচ্চি, যাঁদের তুমি তোমার প্রাণের বন্ধু বলে জান, তাঁরা তোমাকে হয় ত এক কথায় ত্যাগ করতে পারেন কিন্তু নলিনাক্ষ তোমাকে কখনই ছাড়বে না।

বিনোদ। সে আমি খুবই জানি নলিন্‌।

নলিন। আর এটা নিশ্চয় মনে রোখো, তুমি যা কর আমি তোমার পক্ষে আছি।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—:*:—

নিবারণের অন্তঃপুর।

ইন্দু ও কমল।

কমল। না ভাই ইন্দু, ওরকম করে তুই বলিস্‌নে। তুই যতটা বাড়িয়ে দেখচিস আসলে ততটা কিছু নয়—

ইন্দু। না তা কিছু নয়? তিনি অতি উত্তম কাজ করেচেন—বাঙ্গালীর ঘরে এত বড় মহাপুরুষ আর জন্ম গ্রহণ করেন্‌ নি—ওঁর মহত্বের কথা সোণার জলে ছাপিয়ে কপালে মেরে ওঁকে একবার ঘরে ঘরে দেখিয়ে আন্‌লে হয়? দিদি, এই ক'দিনে তোর বুদ্ধি খারাপ হয়ে গেছে। তুই কি বল্‌তে চাস্‌ আমাদের বিনোদ বাবু ভারি উদার স্বভাবের পরিচয় দিয়েচেন?

কমল। তুই ভাই সব কথা বড় বেশী বাড়িয়ে বলিস্‌, ওটা তোর একটা দোষ ইন্দু। একবার ভাল করে ভেবে দেখ দেখি, হঠাৎ একজন লোককে বলা গেল আজ থেকে তুমি অমুক লোকটাকে ভালবাস্‌বে, সে যদি অম্‌নি তখ্‌খনি ঘোড়ায় চড়ে আদেশ পালন করতে না পারে তা হলে তাকে কি দোষ দেওয়া যায়? বিয়ের মন্তর সত্যি যদি ভালবাসার মন্তর হত তা হলে ক্ষেমা পিসির এমন দুর্দ্দশা কেন, তা হলে বিরাজ দিদি এত কাল কেঁদে মরচেন কেন?

ইন্দু। ভাই, তোকে দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। বিয়ের মন্তর যে ভালবাসার মন্তর নয় তা কে বল্‌বে? আচ্ছা দিদি, এক রাত্তিরে তোর এত ভালবাসা জন্মাল কোথা থেকে—বিয়ে হলে কি রকম মনে হয় আমাকে সত্যি করে বল্‌ দেখি?

কমল। কি জানি, বিয়ের পরেই মনে হয়, বিধাতা সমস্ত জগৎ থেকে একটি মানুষকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে তার সমস্ত সুখ দুঃখের ভার আমার উপর দিলেন—আমি তাকে দেখব, সেবা করব, যত্ন করব, তার সংসারের ভার লাঘব করব, আর সকলের কাছ থেকে তার সমস্ত দোষ দুর্ব্বলতা আবরণ করে রেখে দেব! এইমাত্র যে তাকে বিয়ে করলুম তা মনে হয় না; মনে হয় আজন্ম কাল এবং জন্মাবার পূর্ব্বে থেকে এই একমাত্র মানুষের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ হয়েছিল—

ইন্দু। তোমার যদি এতটা হল, ত বিনোদ বাবুর কিছু হয় না কেন?

কমল। তুই বুঝিস্‌নে ইন্দু, ওরা যে পুরুষ মানুষ। আমাদের এক ভাব ওদের আর এক ভাব। জানিস্‌নে, মার কোলে ছেলেটি হবা মাত্রই সে কালোই হোক্ আর সুন্দরই হোক্ তাকে সেই মুহূর্ত্ত থেকে ভালবাস্‌তে না পারলে এ সংসার চলে না—তেমনি স্ত্রীর অদৃষ্টে যে স্বামীই জোটে তখনি যদি সে তাকে ভাল-বাস্‌তে না পারে তা হলে সে স্ত্রীরই বা কি দশা হয় আর এই পৃথিবীই বা টেঁকে কি করে! মেয়ে মানুষের ভালবাসা সবুর করতে পারে না, বিধাতা তার হাতে সে অবসর দেন নি। পুরুষ মানুষ রয়ে বসে' অনেক ঠেকে' অনেক ঘা খেয়ে তার পরে ভাল বাস্‌তে শেখে, ততদিন পৃথিবী সবুর করে' থাকে, কাজের ব্যাঘাত হয়না!

ইন্দু। ইস্! কি সব নবাব! আচ্ছা, দিদি, তুই কি বলিস্ নিমে গয়লার সঙ্গে আজই যদি আমার বিয়ে হয় অম্‌নি কাল ভোর থেকেই তাড়াতাড়ি তার চরণ দুটো ধরে সেবা করতে বসে' যাব—মনে করব ইনি আমার চিরকালের গয়লা, আমার পূর্ব্বজন্মের গয়লা, বিধাতা এঁকে এবং এঁর অন্য গরুগুলিকে গোয়ালসুদ্ধ আমারই হাতে সমর্পণ করে দিয়েছেন!

কমল। ইন্দু, তুই যা যে বকিস্ আমি তোর সঙ্গে পেরে উঠিনে! নিমে গয়লাকে তুই বিয়ে করতে যাবি কেন—সে একে গয়লা তাতে আবার তার দুই বিয়ে।

ইন্দু। আচ্ছা না হয় নিমে গয়লা নাই হল —পৃথিবীতে নিমাইচন্দ্রের ত অভাব নেই!

কমল। তা তোর অদৃষ্টে যদি কোন নিমাই থাকে তা হলে অবিশ্যি তাকে ভাল বাসবি—

ইন্দু। কখ্‌খনো বাসব না! আচ্ছা তুমি দেখো! বিয়ে করেচি বলেই যে অমনি তার পর দিন থেকে নিমাই নিমাই করে ক্ষেপে বেড়াব আমাকে তেমন মেয়ে পাওনি! আমি দিদি, তোর মতন না ভাই! তোরা ঐ রকম করিস্ বলেই ত পুরুষগুলোর দেমাক বেড়ে যায়! নইলে তাদের আছে কি? যেমন মূর্ত্তি তেমনি স্বভাব! সাধে তাঁদের পায়া ভারি হয় —তোদের যে সেই পায়ে তেল দিতে এক দণ্ড তর সয় না।—তুই হাস্‌চিস্ দিদি, কিন্তু আমি সত্যি বল্‌চি, ঐ দাড়িমুখগুলো না হলে কি আর আমাদের একে বারে চলে না! কেন ভাই তোতে আমাতে ত বেশ ছিলুম! আমা-দের কিসের অভাব ছিল! মাঝখানে একজন অপরিচিত পুরুষ এসে আমাদের অপমান করে যায় কেন! যেন আমরা ওঁদের বাড়ির বাগা-নের বেগুন, ইচ্ছে করলেই তুলে নিতে পারেন, ইচ্ছে করলেই ফেলে দিতে পারেন! আচ্ছা, মনে কর্ না, আমিই তোর স্বামী। আমি তোকে যত যত্ন করব যত ভাল বাস্‌ব তোর সাতগণ্ডা গোঁফ দাড়ি অমন পারবে না!

কমল। আসল জিনিষ ইন্দু ওদের না হলে আমাদের চল্‌তে পারে কিন্তু আমাদের না হলে পুরুষ মানুষের চলে না, সেই জন্যে

ওদের আমরা ভালবাসি। ওরা নিজের যত্ন নিজে করতে জানে না—ওদের সর্ব্বদা সাম্‌লে রাখবার এবং দেখবার লোক একজন চাই। মনে হয় যেন আমাদের চেয়ে ওদের ঢের বেশী জিনিষের দরকার ওদের মস্ত শরীর, মস্ত ক্ষিদে, মস্ত আবদার! আমাদের সব তাতেই চলে যায় ওদের একটু কিছু হলেই একেবারে অস্থির হয়ে পড়ে! আমাদের মত ওদের এমন মনের জোর নেই—ওরা এত সহ্য করতে পারে না। সেই জন্তেই ত ওদের এতটা বেশী ভালবাসতে হয়, নইলে ওদের কি দশা হত!

নিবারণের প্রবেশ।

নিবা। মা, তোমাকে দেখলে আমি চোখের জল রাখতে পারিনে। আমার মার কাছে আমি অপরাধী—তোমার কাছে আমার দাঁড়ানো উচিত হয় না!

কমল। কাকা, আপনি অমন করে বল্‌বেন না, আমার অদৃষ্টে যা ছিল তাই হয়েচে—

ইন্দু। বাবা, আসলে যার অপরাধ তাকে কিছু না বলে তার অপরাধ তোমরা পাঁচজনে কেন ভাগ করে নিচ্চ, আমি ত বুঝতে পারিনে।

নিবা। থাক্ মা, সে সব আলোচনা থাক্ —এখন একটা কাজের কথা বলি কমল মন দিয়ে শোন। তোমাকে এতদিন গরীবের মেয়ে বলে পরিচয় দিয়ে এসেচি, সে কথাটা ঠিক নয়। তোমার বাপের বিষয় সম্পত্তি নিতান্ত সামান্ত ছিল না—আমারই হাতে সে সমস্ত আছে—ইতিমধ্যে অনেক টাকা জমেচে এবং সুদেও বেড়েচে। তোমার বাপ বলে গিয়েছিলেন তোমার কুড়ি বৎসর বয়স হলে তবে এই সমস্ত বিষয় সম্পত্তি তোমার হাতে দেওয়া হয়। তাঁর আশঙ্কা ছিল পাছে তোমার বিষয়ের লোভে কেউ তোমাকে বিবাহ করে, তার পরে মদ খেয়ে অসৎ ব্যয় করে উড়িয়ে দেয়! তোমার বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে বিষয় পেলে তুমি তার ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারবে। যদিও তোমার সে বয়স হয় নি কিন্তু সুবুদ্ধিতে তোমার সমান আর কে আছে মা! অতএব তোমার সমস্ত বিষয় তুমি এখনি নাও। খুব সম্ভব তা হলে তোমার স্বামীও তোমার কাছে আপনি এসে ধরা দেবে।

ইন্দু। (কাণে কাণে) বেশ হয়েচে ভাই, এইবার তুই খুব জব্দ করে নিস্!

কমল। কাকা, তাঁকে আপনি এ সংবাদ দেবেন না! আর এ কথাটা যাতে কেউ টের না পায় আপনাকে তাই করতে হবে!

নিবা। কেন বল দেখি মা?

কমল। একটু কারণ আছে। সমস্তটা ভেবে সে আপনাকে পরে বল্‌ব।

নিবারণ। আচ্ছা।

(প্রস্থান।)

ইন্দু। তোর মৎলবটা কি আমাকে বল্ ত!

কমল। আমি আর একটা বাড়ি নিয়ে ছদ্মবেশে ওঁর কাছে অন্ত স্ত্রীলোক বলে পরিচয় দেব—

ইন্দু। সে ত বেশ হবে ভাই! তা হলে আবার তোর সঙ্গে তার ভাব হবে! ওরা ঠিক নিজের স্ত্রীকে ভালবেসে সুখ পায় না। কিন্তু বরাবর রাখতে পারবি ত?

কমল। বরাবর রাখবার ইচ্ছে ত আমার নেই বোন্—

ইন্দু। ফের আবার একদিন স্বামী স্ত্রী সাজতে হবে না কি?

কমল। হাঁ ভাই, যতদিন যবনিকা পতন না হয়।

তৃতীয় দৃশ্য।

—*—

নিমাইয়ের ঘর।

নিমাই ও শিবচরণ।

শিব। এই বুড়ো বয়সে তুই যে একটা সামান্য বিষয়ে আমাকে এত দুঃখ দিবি তা কে জানত!

নিমাই। বাবা, এটা কি সামান্য বিষয় হল?

শিব। আরে বাপু, সামান্য না ত কি! বিয়ে করা বৈ ত নয়। রাস্তার মটে মজুর গুলোও যে বিয়ে করচে। ওতে ত খুব বেশী বুদ্ধি খরচ করতে হয় না, বরঞ্চ কিছু টাকা খরচ আছে, তা সেও বাপমায়ে যোগায়। তুই এমন বুদ্ধিমান ছেলে, এতগুলো পাশ করে' শেষকালে এইখানে এসে ঠেক্‌ল?

নিমাই। আপনি ত সব শুনেচেন আমি ত বিয়ে করতে অসম্মত নই—

শিব। আরে, তাতেই ত আমার বুঝতে আরো গোল বেধেচে! যদি বিয়ে কর্ত্তেই আপত্তি না থাকে তবে না হয় একটাকে না করে আর একটাকেই করলি! নিবারণকে কথা দিয়েছি—আমি তার কাছে মুখ দেখাই কি করে!

নিমাই নিবারণ বাবুকে ভাল করে বুঝিয়ে বল্লেই সব—

শিব। আরে,আমি নিজে বুঝতে পারিনে, নিবারণকে বোঝাব কি! আমি যদি তোর মাকে বিয়ে না করে তোর মাসীকে বিয়ে করবার প্রস্তাব মুখে আন্‌তুম, তা হলে তোর ঠাকুর দাদা কি আমার দুখানা হাড় একত্র রাখত! পড়েচিস্ ভাল মানুষের হাতে—

নিমাই। শুনেচি আমার ঠাকুর্দ্দা মশায়ের মেজাজ ভাল ছিল না—

শিব। কি বলিস্ ব্যাটা! মেজাজ ভাল ছিল না। তোর বাবার চেয়ে তিনশো গুণে ভাল ছিল। কিছু বলিনে বলে বটে! সে যাহোক্, এখন যা হয় একটা কথা ঠিক করেই বল্!

নিমাই। আমি ত বরাবর এক কথাই বলে আস্‌চি।

শিব। (সরোষে) তুই ত বল্‌চিস্ এক কথা। আমিই কি এক কথার বেশী বল্‌চি। মাঝের থেকে কথা যে আপনিই দুটো হয়ে যাচ্চে। আমি এখন নিবারণকে বলি কি? এসে যাহোক্, তুই তা হলে নিবারণের মেয়ে ইন্দুমতীকে কিছুতেই বিয়ে করবিনে? যা বল্‌বি এক কথা বল্!

নিমাই। কিছুতেই না বাবা!

শিব। একমাত্র বাগবাজারের কাদম্বিনীকেই বিয়ে করবি? ঠিক করে বলিস্!

নিমাই। সেই রকমই স্থির করেচি—

শিব। বড় উত্তম কাজ করেচ—এখন আমি নিবারণকে কি বল্‌ব।

নিমাই। বল্‌বেন, আপনার অবাধ্য ছেলে তাঁর কন্যা ইন্দুমতীর যোগ্য নয়।

শিব। কোথাকার নির্লজ্জ! আমাকে আর তোর শেখাতে হবে না। কি বল্‌তে হবে তা আমি বিলক্ষণ জানি। তবে ওর আর কিছুতেই নড়চড় হবে না?

নিমাই। না বাবা, সে জন্যে আপনি ভাববেন না।

শিব। আরে বোকা! আমি সেই জন্যেই ভেবে মরচি আর কি! আমি ভাবচি নিবারণকে বলি কি!

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সুসজ্জিত গৃহ।

বিনোদ।

বিনোদ। এরা বেছে বেছে এতদেশ থাক্‌তে আমাকে উকিল পাক্‌ড়ালে কি করে আমি তাই ভাবচি! আমার অদৃষ্ট ভাল বলতে হবে। এখন টিক্‌তে পারলে হয়। যখন মেয়ে প্রভু তখন একটু একটু আশা হয়—একবার কোন সুযোগে মনটি যোগাড় করতে পারলে স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আর কোন ভাবনা নেই। তা বলি, স্ত্রীলোকের থাকবার স্থান এই বটে। ওরা যে রাণীর জাত, দারিদ্র্য ওদের আদবে শোভা পায় না। পুরুষ মানুষ জন্মগরীব—সাজসজ্জা ঐশ্বর্য্য অলঙ্কার আমাদের তেমন মানায় না। সেই জন্তেই ত লক্ষ্মী যেমন সৌন্দর্য্যের দেবতা তেমনি ধনের দেবতা। শিবটা হল ভিক্ষুক আর দুর্গা হলেন অন্নপূর্ণা। মেয়ে মানুষ একেবারে ভরা ভাণ্ডারের মাঝখানে এসে দাঁড়াবে চারিদিক ঝল্‌সে দেবে—কোথাও যে কিছু অভাব আছে তা কারো চোখে পড়বে না, মনে থাকবে না। আর আমরা গোলাম ওঁদের জন্তে দিনরাত্রি মজুরী করে মরব! বাস্তবিক, ভেবে দেখতে গেলে পুরুষরা যে এত বেশী খেটে মরে সে কেবল মেয়েরা খাটবার জন্তে হয় নি বলে,—

পাছে ওদেরও খাটতে হয়, সেই জন্তে পুরুষকে পুরুষ আর মেয়ে দুয়ের জন্তেই একলা খেটে দিতে হয়—এই জন্তেই পুরুষের চেহারা এবং ভাবখানা এমন চোয়াড়ের মত—কেবল খেটে খাবার উপযুক্ত—খাটুনির মত এমন আর কিছু ত কে শোভা পায় না। রাণী বসন্তকুমারীকে বোধ করি এই অতুল ঐশ্বর্য্যেরই উপযুক্ত দেখতে হবে। আমি বেশ দেখতে পাচ্চি তাঁর এমন একটি মহিমা আছে যে, তাঁর পায়ের নীচে পৃথিবী নিজের ধুলোমাটির জন্তে ভারি অপ্রতিভ হয়ে পড়ে আছে। কি করবে বেচারার নড়ে বসবার জায়গা নেই!

ঘোমটা পরিয়া কমলের প্রবেশ।

বিনোদ। যা মনে করেছিলুম তাই বটে। আহা, মুখটি দেখতে পেলে বেশ হত। আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েচেন?

কমল। হাঁ। আপনি বোধ হয় আমার অবস্থা সবই জানেন।

বিনোদ। কিছু কিছু শুনেছি। গলাটা যে তারই মত শোনাচ্চে। সব মেয়েরই গলা প্রায় এক রকম দেখচি। কিন্তু তার চেয়ে কত মিষ্টি!

কমল। আমার পুরুষ অভিভাবক কেউ নেই—বিবাহ করিনি পাছে স্বামী আমার চেয়ে আমার বিষয় সম্পত্তির বেশী আদর করেন—পাছে শাঁসটুকু নিয়ে আমাকে খোলার মত ফেলে দেন।

বিনোদ। আপনি আমাকে বৈষয়িক পরামর্শের জন্তে ডেকেচেন, অন্য কোন বিষয়ে কথা বলা আমার উচিত হয় না; কিন্তু মানুষের মানসিক বিষয়েও আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। আপনি বোধ হয় শুনে থাকবেন আমি অবসর মত কিঞ্চিৎ সাহিত্য চর্চ্চাও করে থাকি।—আমাকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধে আপনি যে রকম ভাবচেন ওটা আপনার ভুল। যেমন বোঁটার সঙ্গে ফুল তেমনি ধনের সঙ্গে

স্ত্রী। অর্থাৎ ধন থাক্‌লে স্ত্রীকে গ্রহণ করবার সুবিধে হয়—নইলে তাকে বেশ সুচারুরূপে ধরে রাখবার সুযোগ হয় না। অনেক সময় বোঁটা নেই বলে ফুল হাত থেকে পড়ে যায় কিন্তু এত বড় অরসিক মূর্খ কে আছে যে ফুল ফেলে দিয়ে বোঁটাটি রেখে দেয়।

কমল। আমি পুরুষ জাতকে ভাল চিনিনে, কাজেই সাহস পাইনে। যাই হোক, সংসার কার্য্যে পুরুষেরা যতই অনাবশ্যক হোক্ বিষয় কর্ম্ম তাদের না হলে চলে না। তাই আমি আমার সমস্ত বিষয় সম্পত্তির অধ্যক্ষতার ভার আপনার উপর দিতে ইচ্ছে করি—

বিনোদ। আমার প্রাণপণ সাধ্যে আমি আপনার কাজ করে দিব। সে যে কেবল বেতনের প্রত্যাশায়, অনুগ্রহ করে তা মনে করবেন না। আমাকে কেবলমাত্র আপনার ভৃত্য বলে জানবেন না, আমি—

কমল। না, না, আপনি ভৃত্যের ভাবে থাকবেন কেন,—আপনাকে আমার বন্ধুর স্বরূপ জ্ঞান করব—আপনি মনে করবেন যেন আপনারই কাজ আপনি করচেন—

বিনোদ। তার চেয়ে ঢের বেশী মনে করব —কারণ, এ পর্য্যন্ত কখনো আপনার কাজে আপনি যথেষ্ট মন দিইনি। নিজের স্বার্থরক্ষার চেয়ে উচ্চতর মহত্তর কর্ত্তব্য যেমন ভাবে সম্পন্ন করতে হয় আমি তেম্‌নি ভাবে কাজ করব—দেবতার কাজ যেমন প্রাণপণে—

কমল। না, না, আপনি অতটা বেশী কিছু ভাববেন না। আমার সম্পত্তি আপনি দেবোত্তর সম্পত্তি মনে করবেন না। কেবল এইটুকু মনে করলেই যথেষ্ট হবে, যে একজন অনাথা অবলা একান্ত বিশ্বাসপূর্ব্বক আপনার হাতে তার যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করচে—

বিনোদ। আপনি আমার উপর এই বিশ্বাস স্থাপন করে আমাকে যে কতখানি অনুগ্রহ করলেন তা আমি বলতে পারিনে। আপনাকে তবে সত্যি কথা বলি, আমি নিতান্ত একটা লক্ষ্মীছাড়া অকর্ম্মণ্য লোক, বোধ হয় শূন্য অহঙ্কারে ফুলে উঠে স্রোতের ফেনার মত মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কেবল ভেসে ভেসে বেড়াতুম—আপনার এই বিশ্বাসে আমাকে মানুষ করে তুলবে, আমার জীবনের একটা উদ্দেশ্য হবে—আমি—

কমল। আপনি এত কথা কেন বল্‌চেন আমি বুঝতে পারচিনে—আমার এ অতি সামান্য কাজ—এর সঙ্গে আপনার জীবনের উদ্দেশ্যের সঙ্গে যোগ কি?

বিনোদ। কাজ যেমনই হোক্ না, আপনাদের বিশ্বাস আমাদের যে কত বল দেয় তা আপনারা জানেন না। এই একজন অজ্ঞাত অপরিচিত পুরুষের প্রতি আপনি যে এমন অসন্দিগ্ধভাবে নির্ভর স্থাপন করলেন এ জন্যে আপনাকে কখনই এক মুহূর্ত্তের জন্যও এক তিল অনুতাপ করতে হবে না।

কমল। আপনার কথায় আমি বড় নিশ্চিন্ত হলুম। আমার একটা মস্ত ভার দূর হল। আপনাকে আর বেশীক্ষণ আবদ্ধ করে রাখতে চাইনে, আপনার বোধ করি অনেক কাজ আছে—

বিনোদ। না, না, সে জন্যে আপনি ভাববেন না। আমার সহস্র কাজ থাকলেও সমস্ত পরিত্যাগ করে' আমি—

কমল। তা হলে আমার কর্ম্মচারীদের কাছে থেকে আপনি সমস্ত বুঝে পড়ে নিন। নিবারণ বাবু এখনি আসবেন, তিনি এলে তাঁর কাছ থেকেও অনেকটা জেনেশুনে নিতে পারবেন!

বিনোদ। নিবারণ বাবু?

কমল। আপনি তাঁকে চেনেন বোধ হয়, কারণ, তিনিই প্রথমে আপনার জন্তে আমার কাছে অনুরোধ করে দিয়েচেন।

বিনোদ। (স্বগত) ছিছিছি বড় লজ্জা বোধ হচ্চে। আমি কালই আমার স্ত্রীকে ঘরে নিয়ে আসব। এখন ত আমার কোন অভাব নেই!

কমল। তবে আমি আসি। (প্রস্থান।)

বিনোদ। না—এরকম স্ত্রীলোক আমি কখনো দেখিনি! কেমন বুদ্ধি, কেমন বেশ আপনাকে আপনি যেন ধারণ করে রেখেচে। জড়সড় নির্ব্বোধ কাঁচুমাচু ভাব কিছু নেই অথচ কেমন সলজ্জ সসম্ভ্রম ব্যবহার! আমার মত একজন অপরিচিত পুরুষের প্রতি এতটা পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভরের কথা বল্লেন অথচ সেটা কেমন স্বাভাবিক সরল শুনতে হল—কিছুমাত্র বাড়াবাড়ি মনে হল না! এই রকম স্ত্রীলোক দেখলে পুরুষগুলোকে নিতান্ত আনাড়ি জড়ভরত মনে হয়। এই দুটি চারটি কথা কয়েই মনে হচ্চে যেন ওঁর সঙ্গে আমার চিরকালের জানাশোনা আছে—যেন ওঁর কাজ করা, ওঁর সেবা করা আমার একটা পরম কর্ত্তব্য। কিন্তু নিবারণ বাবুর সঙ্গে রাণীর আলাপ আছে শুনে আমার ভয় হচ্চে পাছে আমার স্ত্রীর কথা সমস্ত শুনতে পান্! ছি ছি, সে বড় লজ্জার বিষয় হবে। উনি হয়ত ঠিক আমার মনের ভাবটা বুঝতে পারবেন না, আমাকে কি মনে করবেন কে জানে। আমি আজই নিবারণ বাবুর বাড়ি গিয়ে আমার স্ত্রীকে নিয়ে আসব।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—*—

কমলের গৃহ।

নিবারণ ও কমলমুখী।

কমল। আমার জন্তে আপনি আর কিছু ভাববেন না—এখন ইন্দুর এই গোলটা চুকে গেলেই বাঁচা যায়!

নিবা। তাইত মা, আমাকে ভারি ভাবনা ধরিয়ে দিয়েচে। আমি এদিকে শিবু ডাক্তারের সঙ্গে কথাবার্ত্তা একরকম স্থির করে বসে আছি, এখন তাকেই বা কি বলি, ললিত চাটুর্য্যেকেই বা কোথায় পাওয়া যায়, আর, সে বিয়ে করতে রাজি হয় কি না তাই বা কে জানে!

কমল। সে জন্তে ভাববেন না কাকা। আমাদের ইন্দুকে চোখে দেখলে বিয়ে করতে নারাজ হবে এমন ছেলে কেউ জন্মায়নি।

নিবা। ওদের দেখা শুনো হয় কি করে?

কমল। সে আমি সব ঠিক করেচি।

নিবা। তুমি কি করে ঠিক করলে মা?

কমল। আমি ওঁকে বলে দিয়েচি ওঁর সমস্ত বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে। তা হলে সেই সঙ্গে ললিত বাবুও আসবেন তারপর একটা কোন উপায় বের করা যাবে।

নিবা। তা সব যেন হল, আমি ভাবচি শিবুকে কি বলব!

কমল। ঐ উনি আসচেন। আমি তবে যাই।

(প্রস্থান।)

বিনোদের প্রবেশ।

বিনোদ। এই যে, আমি এখনি আপনার ওখানেই যাচ্ছিলুম!

নিবা। কেন বাপু, আমার থানে ত তোমার কোন মক্কেল নেই।

বিনোদ। আজ্ঞে, আমাকে আর লজ্জা দেবেন না—আপনি বুঝতেই পারচেন—

নিবা। না বাপু, আমি এখনকার কিছুই বুঝতে পারিনে—একটু পরিষ্কার করে খুলে না বল্লে তোমাদের কথাবার্ত্তা রকমসকম আমার ভালরূপ ধারণা হয় না।

বিনোদ। আমার স্ত্রী আপনার ওখানে আছেন—

নিবা। তা অবশ্য—তাঁকে ত আমরা ত্যাগ কর্ত্তে পারিনে—

বিনোদ। আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে তাঁকে যদি আমার ওখানে পাঠিয়ে দেন—

নিবা। বাপু, আবার কেন পাল্কীভাড়াটা লাগাবে?

বিনোদ। আপনারা আমাকে কিছু ভুল বুঝ্চেন। আমার অবস্থা খারাপ ছিল বলেই আমার স্ত্রীকে আপনার ওখানে পাঠিয়েছিলুম, নইলে তাঁকে ত্যাগ করবার অভিপ্রায় ছিল না। এখন আপনারি অনুগ্রহে আমার অবস্থা অনেকটা ভাল হয়েচে—এখন অনায়াসে—

নিবা। বাপু, এ ত তোমার পোষা পাখী নয়। সে যে সহজে তোমার ওখানে যেতে রাজি হবে—এমন আমার বোধ হয় না।

বিনোদ। আপনি অনুমতি দিলে আমি নিজে গিয়ে তাঁকে অনুনয় বিনয় করে নিয়ে আস্তে পারি।

নিবা। আচ্ছা সে বিষয় বিবেচনা করে পরে বল্‌ব?

(প্রস্থান।)

বিনোদ। বুড়োও ত কম একগুঁয়ে নয় দেখচি। যাহোক এ পর্য্যন্ত রাণীকে কিছু বলেনি বোধ হয়।

চন্দ্রের প্রবেশ।

বিনোদ। কি হে চন্দর!

চন্দ্র। আর ভাই, মহা বিপদে পড়েচি।

বিনোদ। কেন, কি হয়েচে?

চন্দ্র। কি জানি ভাই, কখন্ তোদে[র] সাক্ষাতে কথায় কথায় কি কতকগুলো মি[থ্যে] কথা বলেছিলুম তাই শুনে ব্রাহ্মণী, বাপে[র] বাড়ি এমনি গা-ঢাকা হয়েচেন যে, কিছুতে তাঁর আর নাগাল পাচ্চিনে।

বিনোদ। বল কি দাদা! তোমার বাড়ি[তে] ত এ দণ্ডবিধি পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না।

চন্দ্র। না ভাই, কালক্রমে কতই যে হচ[্ছে] কিছু বুঝতে পারচিনে! ইদিকে আবার দাস[ী] পাঠিয়ে দু'বেলা খোঁজ নেওয়া আছে তা আ[মি] জান্‌তে পাই! আমার শাশুড়ী ঠাকরুণের[ও] না[...] করে যথাসময়ে অন্নব্যঞ্জনও আসে। মনে ক[রি] রাগ করে খাব না কিন্তু ভাই খিদের স[ময়] আমি না খেয়ে থাকতে পারিনে তা যতই রা[গ] হোক্।

বিনোদ। তবে তোমার ভাবনা কি? য[...] শ্বশুর বাড়ি থেকে আর সমস্তই পাচ্চ, না হ[য়] একটি বাকি রইল।

চন্দ্র। না বিনু, তোরা ঠিক বুঝতে পারবিনে[।] তুই সেদিন বল্‌ছিলি বিয়ে না করাটা[ই] তোর মুখস্থ হয়ে গেছে। আমার ঠিক তা[র] উল্টো। প্রায় সমস্ত জীবন ধরে ঐ স্ত্রীটি[কে] এমনি বিশ্রী অভ্যেস করে ফেলেচি যে, হঠা[ৎ] বুকের হাড় ক'খানা খসে' গেলে যেমন এক[...] খালি খালি ঠেকে, ঐ স্ত্রীটি আড়াল হ[য়ে] তেমনি নেহাৎ ফাঁকা বোধ হয়। যাই[...] সন্ধের পর আমার সে ঘরে আর ঢুকতে ই[চ্ছে] করে না।

বিনোদ। এখন উপায় কি!

চন্দ্র। মনে করচি আমি উল্টে রাগ করব। আমিও ঘর ছেড়ে চলে আসব। তোর এখা-নেই থাকব। আমার বন্ধুদের মধ্যে তোকেই সে সব চেয়ে বেশী ভয় করে। তাঁর বিশ্বাস তুই আমার মাথাটি খেয়েছিস্,—আমি তাকে বলি, আমার এ ঝুনো মাথায় বিনুর দন্তস্ফুট করবার যো নেই, কিন্তু সে বোঝে না। সে যদি খবর পায় আমি চব্বিশ ঘণ্টা তোর সংসর্গে কাটিয়েছি, তা হলে পতিত উদ্ধারের জন্যে পতিতপাবনী অমনি তৎক্ষণাৎ ছুটে চলে আসবে।

বিনোদ। তা বেশ কথা। তুমি এখানেই থাক, যতক্ষণ তোমারি সঙ্গ পাওয়া যায়, ততক্ষণই লাভ। কিন্তু আমাকে যে আবার শ্বশুর বাড়ি যেতে হচ্চে!

চন্দ্র। কার শ্বশুর বাড়ি?

বিনোদ। আমার নিজের আবার কার!

চন্দ্র। (সানন্দে বিনুর পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া) সত্যি বলচিস্ বিনু?

বিনোদ। হাঁ ভাই, নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়ার মত থাকতে আর ইচ্ছে করচে না। স্ত্রীকে ঘরে এনে একটু ভদ্রলোকের মত হতে হচ্চে। বিবাহ করে আইবড় থাক্‌লে লোকে বল্‌বে কি!

চন্দ্র। সে আর আমাকে বোঝাতে হবে না—কিন্তু এতদিন তোর এ আক্কেল ছিল কোথায়? যতকাল আমার সংসর্গে ছিলি এমন সব সদালাপ সৎপ্রসঙ্গ ত শুন্‌তে পাইনি, দুদিন আমার দেখা পাস্‌নি আর তোর বুদ্ধি এতদূর পরিষ্কার হয়ে এল? যাহোক, তা হলে আর বিলম্বে কাজ নেই—এখনি চল্—শুভবুদ্ধি মানুষের মাথায় দৈবাৎ উদয় হয় তখন তাকে অবহেলা করা কিছু নয়।

তৃতীয় দৃশ্য।

—*—

কমলমুখীর গৃহ।

ইন্দু ও কমল।

কমল। তোর জ্বালায় ত আর বাঁচিনে ইন্দু! তুই আবার এ কি জটা পাকিয়ে বসে আছিস্। ললিত বাবুর কাছে তোকে কাদম্বিনী বলে উল্লেখ করতে হবে না কি?

ইন্দু। তা কি করব দিদি। কাদম্বিনী না বল্লে যদি সে না চিন্‌তে পারে তা হলে ইন্দু বলে পরিচয় দিয়ে লাভটা কি?

কমল। ইতি মধ্যে তুই এতকাণ্ড কখন্ করে তুল্লি তা ত জানিনে। একটা যে আস্ত নাটক বানিয়ে বসেচিস্!

ইন্দু। তোমার বিনোদ বাবুকে বোলো, তিনি লিখে ফেলবেন এখন, তারপর মেট্‌পলি-টান থিয়েটারে অভিনয় দেখতে যাব।

কমল। তোমার ললিত বাবু সাজতে পারে এমন ছোকরা কি তারা কোথাও খুঁজে পাবে? তুই হয় ত মাঝখান থেকে "ও হয় নি, ও হয় নি" বলে চেঁচিয়ে উঠবি!

ইন্দু। ঐ ভাই, তোমার বিনোদ বাবু আস্‌চেন, আমি পালাই।

(প্রস্থান।)

বিনোদের প্রবেশ।

বিনোদ। মহারাণী, আমার বন্ধুরা এলে কোথায় তাঁদের বসাব?

কমল। এই ঘরেই বসাবেন।

বিনোদ। ললিতের সঙ্গে আপনার যে বন্ধুর বিবাহ স্থির করতে হবে—তাঁর নামটি কি?

কমল। কাদম্বিনী। বাগবাজারের চৌধুরী-দের মেয়ে।

বিনোদ। আপনি যখন আদেশ করচেন আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। কিন্তু ললিতের কথা আমি কিছুই বল্‌তে পারিনে। সে যে এ সব প্রস্তাবে আমাদের কারো কথায় কর্ণপাত করবে এমন বোধ হয় না—

কমল। আপনাকে সে জন্য বোধ হয় বেশী চেষ্টা করতেও হবে না—কাদম্বিনীর নাম শুনলেই তিনি আর বড় আপত্তি করবেন না।

বিনোদ। তা হলে ত আর কথাই নেই।

কমল। মাপ করবেন যদি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা কর্ত্তে চাই।

বিনোদ। এখনি। (স্বগত) স্ত্রীর কথা না তুল্‌লে বাঁচি!

কমল। আপনার স্ত্রী নেই কি?

বিনোদ। কেন বলুন দেখি? স্ত্রীর কথা কেন জিজ্ঞাসা করচেন?

কমল। আপনি ত অনুগ্রহ করে এই বাড়িতেই বাস করচেন, তা হলে আপনার স্ত্রীকে আমি আমার সঙ্গিনীর মত করে রাখতে চাই। অবিশ্যি যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে।

বিনোদ। আপত্তি! কোন আপত্তিই থাক্‌তে পারে না। এ ত আমার সৌভাগ্যের কথা!

কমল। আজ সন্ধের সময় তাঁকে আন্‌তে পারেন না?

বিনোদ। আমি বিশেষ চেষ্টা করব। (কমলের প্রস্থান) কিন্তু কি বিপদেই পড়েচি! এদিকে আবার আমার স্ত্রী কিছুতেই আমার বাড়ি আস্‌তে চায় না—আমার সঙ্গে দেখা করতেই চায় না। কি যে করি ভেবে পাইনে। অনুনয় করে একখানা চিঠি লিখতে হচ্চে।

ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। একটি সাহেব বাবু এসেচেন।

বিনোদ। এইখানেই ডেকে নিয়ে আয়।

সাহেবী বেশে ললিতের প্রবেশ।

ললিত। (শেক্‌হাণ্ড করিয়া) Well How goes the world? ভাল ত?

বিনোদ। একরকম ভালয় মন্দয়। তোমার কি রকম চল্‌চে?

ললিত। Pretty well! জান, I am going in for studentship next year!

বিনোদ। ওহে, আর কত দিন এক-জামিন দিয়ে মরবে? বিয়েথাওয়া করতে হবে না না কি? এদিকে যৌবনটা যে ভাঁটিয়ে গেল!

ললিত। Hallo! you seem to have queer ideas on the subject। কেবল যৌবনটুকু নিয়ে one can't marry! I suppose first of all you must get a girl whom you—

বিনোদ। আহা তা ত বটেই। আমি কি বল্‌চি তুমি তোমার নিজের হাতপা গুলোকে বিয়ে করবে? অবিশ্যি মেয়ে একটি আছে।

ললিত। I know that! একটি কেন? মেয়ে there is enough and to spare! কিন্তু তা নিয়ে ত কথা হচ্চে না!

বিনোদ। আহা, তোমাকে নিয়ে ত ভাল বিপদে পড়া গেল। পৃথিবীর সমস্ত কন্যাদায় তোমাকে হরণ কর্ত্তে হবে না। কিন্তু যদি একটি বেশ সুন্দরী সুশিক্ষিত বয়ঃপ্রাপ্ত মেয়ে তোমাকে দেওয়া যায় তা হলে কি বল!

ললিত। I admire your cheek বিনু! তুমি wife select করবে আর আমি marry করব! I don't see any rhyme or reason in such co operation! পোলিটিক্যাল ইকনমিতে division of labour আছে কিন্তু there is no such thing in marriage.

বিনোদ। তা বেশ ত, তুমি দেখ, তারপরে তোমার পছন্দ না হয় বিয়ে কোরো না—

ললিত। My dear fellow, you are very kind! কিন্তু আমি বলি কি, you need not bother yourself about my happiness! আমার বিশ্বাস আমি যদি কখনো কোন girlকে love করি I will love her without your help এবং তার পরে যখন বিয়ে করব you'll get your invitation in due form!

বিনোদ। আচ্ছা ললিত, যদি সে মেয়েটির নাম শুনলেই তোমার পছন্দ হয়?

ললিত। The idea! নাম শুনে পছন্দ! যদি মেয়েটিকে বাদ দিয়ে simply নামটিকে বিয়ে করতে বল, that's a safe proposition

নীরদ। আগে শোনো, তার পর যা বল্‌তে হয় বোলো—মেয়েটির নাম—কাদম্বিনী!

ললিত। কাদম্বিনী! She may be all that is nice and good কিন্তু I must confess তার নাম নিয়ে তাকে congratulate করা যায় না! যদি তার নামটাই তার best qualification হয় তা হলে I should try my luck in someother quarter!

বিনোদ। (স্বগত) এর মানে কি! তবে যে রাণী বল্লেন কাদম্বিনীর নাম শুনলেই লাফিয়ে উঠবে! দূর হোক্‌ গে? এ'কে খাওয়ানটাই বাজে খরচ হল—আবার এই ম্লেচ্ছটার সঙ্গে আরো আমাকে নিদেন দুঘণ্টা কাল কাটাতে হবে দেখচি!

ললিত। I say, it's infernally hot here—চল না বারান্দায় গিয়ে বসা যাক্‌!

পঞ্চম অঙ্ক।

—*—

প্রথম দৃশ্য।

—*—

কমলমুখীর অন্তঃপুর।

কমল ও ইন্দু।

ইন্দু। দিদি, আর বলিস্‌নে, দিদি, আর বলিস্‌নে! পুরুষ মানুষকে আমি চিনেচি! তুই বাবাকে বলিস আমি আর কাউকে বিয়ে করব না!

কমল। তুই ললিতবাবু থেকে সব পুরুষ চিন্‌লি কি করে ইন্দু!

ইন্দু। আমি জানি, ওরা কেবল কবিতায় ভালবাসে, তা ছন্দ মিলুক্‌ আর না মিলুক্‌। তার পরে যখন সুখ দুঃখ সমেত ভালবাসার সমস্ত কর্ত্তব্যভার মাথায় করবার সময় আসে তখন ওঁদের আর সাড়া পাওয়া যায় না। ছি ছি ছি ছি, দিদি, আমার এম্‌নি লজ্জা করচে! ইচ্ছে করচে মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে মিশে যাই! বাবাকে আমার এ মুখ দেখাবো কি করে! কাদম্বিনীকে সে চেনে না? মিথ্যেবাদী! কাদম্বিনীর নামে কবিত লিখেচে সে খাতা এখনো আমার কাছে আছে!

কমল। যা হয়ে গেছে তা নিয়ে ভেবে আর করবি কি! এখন কাকা যাকে বলচেন তাকে বিয়ে কর্! তুই কি সেই মিথ্যাবাদী অবিশ্বাসীর জন্যে চিরজীবন কুমারী হয়ে থাক্‌বি? একে বেশী বয়স পর্য্যন্ত মেয়ে রাখার জন্যে কাকাকে প্রায় একঘরে করেচে!

ইন্দু। তা, দিদি, কলাগাছ ত আছে! সে ত কোন উৎপাত করে না! ঐ বাবা আস্‌চেন, আমি যাই ভাই।

(প্রস্থান।)

নিবারণের প্রবেশ।

নিবা। কি করি বল্‌ত মা! ললিত চাটুয্যে যা বলেচে সে ত সব শুনেচিস্! সে বিনোদকে কেবল মারতে বাকি রেখেচে, অপমান যা হবার তা হয়েচে—

কমল। না কাকা, তার কাছে ইন্দুর নাম করা হয় নি, আপনার মেয়ের কথা হচ্চে তাও সে জানে না!

নিবা। ইদিকে আবার শিবুকে কথা দিয়েচি তাকেই বা কি বলি! আমার মেয়ের পছন্দ না হলে জোর করে বিয়ে দেওয়া সে আমি পারব না—একটি যা হয়ে গেছে তারই অনুতাপ রাখবার জায়গা পাচ্চিনে! তুমি, মা, ইন্দুকে বলেকয়ে ওদের দুজনে দেখা করিয়ে দিতে পার ত বড় ভাল হয়! আমি নিশ্চয় জানি ওরা পরস্পরকে একবার দেখলে পছন্দ না করে থাক্‌তে পার্ব্বে না। নিমাই ছেলে টিকে বড় ভাল দেখতে—তাকে দর্শনমাত্রেই স্নেহ জন্মায়।

কমল। নিমাইয়ের মনের ইচ্ছে কি সেটাও ত জানতে হবে কাকা! আবার কি এই রকম একটি কাণ্ড বাধানো ভাল?

নিবা। সে আমি তার বাপের কাছে শুনেচি। সে বলে আমি উপার্জ্জন না করে বিয়ে করব না। সে ত আমার মেয়েকে কখনো চক্ষে দেখেনি। একবার দেখলে ও সব কথা ছেড়ে দেবে। বিশেষ তার বাপ তাকে খুব পীড়াপীড়ি করচে। আমি চন্দ্র বাবুকে বলে তাকে একবার ইন্দুর সঙ্গে দেখা করতে রাজি করব। চন্দ্র বাবুর কথা সে খুব মানে।

কমল। তা ইন্দুকে আমি সম্মত করাতে পারব।

(নিবারণের প্রস্থান।)

ইন্দুর প্রবেশ।

কমল। লক্ষ্মী দিদি আমার, আমার একটি অনুরোধ তোকে রাখতে হবে!

ইন্দু। কি বল্‌না ভাই!

কমল। একবার নিমাই বাবুর সঙ্গে তুই দেখা কর্!

ইন্দু। কেন দিদি, তাতে আমার কি প্রায়শ্চিত্তটা হবে!

কমল। দেখ ইন্দু, এ ত ভাই ইংরেজের ঘর নয়, তোকে ত বিয়ে করতেই হবে। মনটাকে অমন করে বন্ধ করে রাখিস্‌নে—তুই যা মনে করিস্ ভাই, পুরুষ মানুষ নিতান্তই বাঘ ভাল্লুকের জাত নয়—বাইরে থেকে খুব ভয়ঙ্কর দেখায় কিন্তু ওদের বশ করা খুব সহজ! একবার পোষ মান্‌লে ঐ মস্ত প্রাণীগুলো এম্‌নি গরীব গোবেচারা হয়ে থাকে সে দেখে হাসি পায়। পুরুষ মানুষের মধ্যে তুই কি ভদ্রলোক দেখিস্‌নি? কেন ভাই, কাকার কথা একবার ভেবে দেখনা।

ইন্দু। তুই আমাকে এত কথা বল্‌চিস কেন দিদি? আমি কি পুরুষ মানুষের দ্বারে

াগুন দিতে যাচ্চ? তারা খুব ভাল লোক, ামি তাদের কোন অনিষ্ট করিতে চাইনে।

কমল। তোর যখন যা ইচ্ছে তাই করে-স্ ইন্দু, কাকা তাতে কোন বাধা দেন্‌নি। াজ কাকার একটি অনুরোধ রাখবিনে?

ইন্দু। রাখব ভাই—তিনি যা বল্‌বেন াই শুনব।

কমল। তবে চল্, তোর চুলটা একটু াল করে দিই। নিজের উপরে এতটা রযত্ন করিস্‌নে।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কমলমুখীর গৃহ।

নিমাই।

নিমাই। চন্দর যখন পীড়াপীড়ী করচে া না হয় একবার ইন্দুমতীর সঙ্গে দেখা রাই যাক্। শুনেচি তিনি বেশ বুদ্ধিমতী ্শিক্ষিতা মেয়ে—তাঁকে আমার অবস্থা ্ঝিয়ে বল্লে তিনি নিজেই আমাকে বিবাহ রতে অসম্মত হবেন। তা হলে আমার াড় থেকে দায়টা যাবে—বাবাও আর পীড়া-ীড়ী করবেন না।

ঘোমটা পরিয়া ইন্দুর প্রবেশ।

ইন্দু। বাবা যখন বল্‌চেন তখন দেখা রতেই হবে। কিন্তু কারো অনুরোধে ত াছন্দ হয় না। বাবা কখনোই আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দেবেন না।

নিমাই। (নতশিরে ইন্দুর প্রতি) আমা-দের মা বাপ আমাদের পরস্পরের বিবাহের জন্যে পীড়াপীড়ি করচেন কিন্তু আপনি যদি ক্ষমা করেন ত আপনাকে একটি কথা বলি—

ইন্দু। এ কি! এ যে ললিতবাবু! (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) ললিতবাবু, আপনাকে বিবাহের জন্যে যাঁরা পীড়াপীড়ি করচেন তাঁদের আপনি জানাবেন বিবাহ এক পক্ষের সম্মতিতে হয় না। আমাকে আপনার বিবা-হের কথা বলে কেন অপমান করচেন!

নিমাই। এ কি! এ যে কাদম্বিনী! (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আপনি এখানে আমি ত জানতুম না! আমি মনে করেছিলুম নিবারণ বাবুর কন্যা ইন্দুমতীর সঙ্গে আমি কথা কচ্চি—কিন্তু আমার যে এমন সৌভাগ্য হবে—

ইন্দু। ললিত বাবু, আপনার সৌভাগ্য আপনি মনে মনে রেখে দেবেন সে কথা আমার কাছে প্রচার করবার দরকার দেখিনে!

নিমাই। আপনি কাকে ললিতবাবু বল্‌চেন? ললিত বাবু বারান্দায় বিনোদের সঙ্গে গল্প করচেন—যদি আবশ্যক থাকে তাঁকে ডেকে নিয়ে আসি।

ইন্দু। না, না, তাঁকে ডাক্‌তে হবে না। —আপনি তা হলে কে?

নিমাই। এর মধ্যেই ভুলে গেলেন? চন্দ্রবাবুর বাসায় আপনি নিজে আমাকে চাকরি দিয়েচেন, আমি তৎক্ষণাৎ তা মাথায় করে নিয়েচি—ইতিমধ্যে বরখাস্ত হবার মত কোন অপরাধ করিনিত!

ইন্দু। আপনার নাম কি ললিত বাবু নয়?

নিমাই। যদি পছন্দ করেন ত ঐ নামই শিরোধার্য্য করে নিতে পারি কিন্তু বাপ মায়ে আমার নাম রেখেছিলেন নিমাই।

ইন্দু। নিমাই?—ছিছি একথা আমি আগে জান্‌তে পারলুম না কেন?

নিমাই। তা হলে কি চাকরি দিতেন না? তবে ত না জেনে ভালই হয়েচে! এখন কি আদেশ করেন?

ইন্দু। আমি আদেশ করচি ভবিষ্যতে যখন আপনি কবিতা লিখবেন তখন কাদম্বিনীর পরিবর্ত্তে ইন্দুমতী নামটি ব্যবহার করবেন এবং ছন্দ মিলিয়ে লিখবেন।

নিমাই। যে দুটো আদেশ করলেন ও দুটোই যে আমার পক্ষে সমান অসাধ্য।

ইন্দু। আচ্ছা, ছন্দ মেলাবার ভার আমি নেব এখন, নামটা আপনি বদ্‌লে নেবেন—

নিমাই। এমন নিষ্ঠুর আদেশ কেন করচেন? চোদ্দটা অক্ষরের জায়গায় সতেরোটা বসানো কি এমনি গুরুতর অপরাধ যে সে জন্যে ভৃত্যকে একেবারে—

ইন্দু। না, সে অপরাধ আমি সহস্রবার মার্জ্জনা করতে পারি কিন্তু ইন্দুমতীকে কাদম্বিনী বলে ভুল করলে আমার সহ্য হবে না—

নিমাই। আপনার নাম তবে—

ইন্দু। ইন্দুমতী। তার প্রধান কারণ, আপনার বাপ মা যেমন আপনার নাম রেখেচেন নিমাই, তেমনি আমার বাপ মা আমার নাম রেখেচেন ইন্দুমতী।

নিমাই। হায় হায়, আমি এতদিন কি ভুলটাই করেচি! বাগবাজারের রাস্তায় রাস্তায় বৃথা ঘুরে বেড়িয়েছি, বাবা আমাকে উঠতে বসতে দু'বেলা বাপান্ত করেচেন, কাদম্বিনী নামটা ছন্দের ভিতর পুরতে মাথা ভাঙ্গাভাঙ্গি করেচি—(মৃদুস্বরে)

যেমনি আমার ইন্দু প্রথম দেখিলে

কেমন করে চকোর বলে তখনি চিনিলে—কিংবা

কেমন করে চাকর বলে তখনি চিনিলে!

আহা সে কেমন হত!

ইন্দু। তবে, এখন ভ্রম সংশোধন করুন—এই নিন্ আপনার খাতা। আমি চল্লুম!

(প্রস্থানোদ্যম)—

নিমাই। আপনারও বোধ হচ্চে যেন একটা ভ্রম হয়েছিল—সেটাও অনুগ্রহ করে সংশোধন করে নেবেন—আপনার একটা সুবিধে আছে, আপনাকে আর সেই সঙ্গে ছন্দ বদ্‌লাতে হবে না।

(ইন্দুমতীর প্রস্থান।)

নিবারণের প্রবেশ।

নিবা। দেখ বাপু, শিবু আমার বাল্যকালের বন্ধু—আমার বড় ইচ্ছে তাঁর সঙ্গে আমার একটা পারিবারিক বন্ধন হয়। এখন তোমাদের ইচ্ছের উপরেই সমস্ত নির্ভর করচে।

নিমাই। আমার ইচ্ছের জন্যে আপনি কিছু ভাববেন না, আপনার আদেশ পেলেই আমি কৃতার্থ হই।

নিবা। (স্বগত) যা মনে করেছিলুম তাই। বুড়ো বাপ মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করে যা করতে না পারলে, একবার ইন্দুকে দেখবামাত্র সমস্ত ঠিক হয়ে গেল। বুড়োরাই শাস্ত্র মেনে চলে—যুবোদের শাস্ত্রই এক আলাদা।—তা বাপু তোমার কথা শুনে বড় আনন্দ হল। তা হলে একবার আমার মেয়েকে তার মতটা জিজ্ঞাসা করে আসি। তোমরা শিক্ষিত লোক, বুঝতেই পার, বয়ঃপ্রাপ্ত মেয়ে তার সম্মতি না নিয়ে তাকে বিবাহ দেওয়া যায় না।

নিমাই। তা অবশ্য।

নিবা। তা হলে আমি একবার আসি। চন্দ্র বাবুদের এই ঘরে ডেকে দিয়ে যাই।

(প্রস্থান।)

শিবচরণের প্রবেশ।

শিব। তুই এখানে বসে রয়েচিস্, আমি তোকে পৃথিবীসুদ্ধ খুঁজে বেড়াচ্চি।

নিমাই। কেন বাবা!

শিব। তোকে যে আজ তারা দেখতে আস্‌বে।

নিমাই। কারা?

শিব। বাগবাজারের চৌধুরীরা।

নিমাই। কেন?

শিব। কেন! না দেখে না শুনে অমনি ফস্ করে বিয়ে হয়ে যাবে? তোর বুঝি আর সবুর সইচে না?

নিমাই। বিয়ে কার সঙ্গে হবে?

শিব। ভয় নেইরে বাপু, তুই যাকে চাস তারই সঙ্গে হবে! আমার ছেলে হয়ে তুই যে এত টাকা চিনেচিস তাত জানতুম না; তা, সেই বাগবাজারের ট্যাকশালের সঙ্গেই তোর বিয়ে স্থির করে এসেচি।

নিমাই সে কি বাবা? আপনার মতের বিরুদ্ধে আমি বিয়ে করতে চাইনে—বিশেষ আপনি নিবারণ বাবুকে কথা দিয়েচেন—

শিব। (অনেকক্ষণ হাঁ করিয়া নিমাইয়ের মুখের দিকে নিরীক্ষণ) তুই ক্ষেপেচিস না আমি ক্ষেপেচি আমাকে কে বুঝিয়ে দেবে। কথাটা একটু পরিষ্কার করে বল্ আমি ভাল করে বুঝি।

নিমাই। আমি সে চৌধুরীদের মেয়ে বিয়ে করব না।

শিব। চৌধুরীদের মেয়ে বিয়ে করবিনে। তবে কাকে করবি!

নিমাই। নিবারণ বাবুর মেয়ে ইন্দুমতীকে।

শিব। (উচ্চৈঃস্বরে) কি! হতভাগা পাজি লক্ষ্মীছাড়া বেটা! যখন ইন্দুমতীর সঙ্গে তোর সম্বন্ধ করি তখন বলিস্ কাদম্বিনীকে বিয়ে করবি, আবার যখন কাদম্বিনীর সঙ্গে সম্বন্ধ করি, তখন বলিস্ ইন্দুমতীকে বিয়ে করবি—তুই তোর বুড়ো বাপকে একবার বাগবাজার একবার মির্জাপুর ক্ষেপিয়ে নিয়ে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াতে চাস্!

নিমাই। আমাকে মাপ কর বাবা, আমার একটা মস্ত ভুল হয়ে গিয়েছিল—

শিব। ভুল কিরে বেটা! তোকে সেই বাগবাজারে বিয়ে করতেই হবে! তাদের কোন পুরুষে চিনিনে, আমি নিজে গিয়ে তাদের স্তুতিমিনতি করে এলুম, যেন আমারি কন্যেদায় হয়েচে—তার পর যখন সমস্ত ঠিকঠাক হয়ে গেল, আজ তারা আশীর্ব্বাদ করতে আস্‌বে তখন বলে কি না আমি বিয়ে করব না! আমি এখন চৌধুরীদের বলি কি।

চন্দ্রের প্রবেশ।

চন্দ্র। (নিমাইয়ের প্রতি) সমস্ত শুনলুম। ভাল একটি গোল বাধিয়েচ যা হোক?—এই এই যে ডাক্তার বাবু, ভাল আছেন ত?

শিব। ভাল আর থাকতে দিলে কই? এই দেখ না চন্দর, ওঁর নিজেরই কথা মত একটি পাত্রী স্থির করলুম—যখন সমস্ত স্থির হয়ে গেল তখন বলে কি না, তাকে বিয়ে করব না! আমি এখন চৌধুরীদের বলি কি?

নিমাই। বাবা, তুমি তাদের একটু বুঝিয়ে বল্লেই—

শিব। তোমার মাথা! তাদের বোঝাতে হবে আমার ভীমরতি ধরেচে আর আমার ছেলেটি একটি আস্ত ক্ষেপা—তা তাদের বুঝতে বিলম্ব হবে না!

চন্দ্র। আপনি কিছু ভাববেন না। সে

মেয়েটির আর একটি পাত্র জুটিয়ে দিলেই হবে।

শিব। সে তেমন মেয়েই নয়। তার টাকা আছে ঢের কিন্তু চেহারা দেখে পাত্র এগোয় না। আমার বংশের এই অকাল কুষ্মাণ্ডের মত হঠাৎ এত বড় হতভাগা তুমি দ্বিতীয় আর কোথায় পাবে যে তাকে বিয়ে করতে রাজি হবে!

চন্দ্র। সে আমার উপর ভার রইল। আমি সমস্ত ঠিকঠাক করে দেব। এখন নিশ্চিন্ত মনে নিবারণ বাবুর মেয়ের সঙ্গে বিবাহ স্থির করুন।

শিব। যদি পার চন্দর ত বড় উপকার হয়। এই বাগবাজারের হাত থেকে মানে মানে নিস্তার পেলে বাঁচি। এ দিকে আমি নিবারণের কাছে মুখ দেখাতে পারচি নে, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্চি

চন্দ্র। সে জন্যে কোন ভাবনা নেই। আমি প্রায় অর্দ্ধেক কাজ গুছিয়ে এসে তবে আপনাকে বল্‌চি! এখন বাকিটুকু সেরে আসি!

(প্রস্থান)

নিবারণের প্রবেশ।

শিব। আরে এস ভাই এস!

নিবা। ভাল আছ ভাই?—যা হোক শিবু, কথা ত স্থির?

শিব। সে ত বরাবরই স্থির আছে, এখন তোমার মর্জ্জি হলেই হয়!

নিবা। আমারো ত সমস্ত ঠিক হয়ে আছে এখন হয়ে গেলেই চুকে যায়।

শিব। তবে আর কি দিনক্ষণ দেখে—

নিবা। সে সব কথা পরে হবে—এখন কিছু মিষ্টি মুখ করবে চল!

শিব। না ভাই, এখন আমার খাওয়াটা অভ্যেস নেই, এখন থাক—অসময়ে খেয়েচি কি, আর আমার মাথা ধরেচে—

নিবা। না, না, সে হবে না, কিছু খেতে হচ্চে। বাপু তুমিও এস।

তৃতীয় দৃশ্য।

কমলের অন্তঃপুর।

কমল ও ইন্দু।

কমল। ছি, ছি, ইন্দু, তুই কি কাণ্ডটাই করলি বল্‌ দেখি?

ইন্দু। তা বেশ করেচি! ভাই, পরে গোল বাধার চেয়ে আগে গোল চুকে যাওয়া ভাল!

কমল। এখন পুরুষ জাতটাকে কি রকম লাগচে?

ইন্দু। মন্দ না ভাই, একরকম চলনসই।

কমল। তুই যে বলেছিলি ইন্দু, নিমাই গয়লাকে তুই কখ্‌খনো বিয়ে করবিনে!

ইন্দু। না ভাই নিমাই নামটি খারাপ নয় তা তোমরা যাই বল। তোমার নলিনীকান্ত, ললনামোহন, রমণীরঞ্জনের চেয়ে সহস্রগুণে ভাল। নিমাই নামটি খুব আদরের নাম, অথচ পুরুষ মানুষকে বেশ মানায়। রাগ করিস্‌নে দিদি তোর বিনোদের চেয়ে ঢের ভাল—

কমল। কি হিসেবে ভাল শুনি!

ইন্দু। বিনোদবিহারী নামটা যেন টাট্‌কা নভেল নাটক থেকে পেড়ে এনেচে—বড্ড বেশী গায়ে-পড়া কবিত্ব। মানুষের চেয়ে নামটা জাঁকালো। আর নিমাই নামটি কেমন বেশ সাদা

সিদে, কোন দেমাক্ নেই, ভঙ্গিমে নেই—বেশ নিতান্ত আপনার লোকটির মত।

কমল। কিন্তু যখন বই ছাপাবে, বইয়ে ও নাম ত মানাবে না।

ইন্দু। আমি ত ওকে ছাপতে দেব না, খাতাখানি আগে আটক করে রাখ্‌ব। আমার ততটুকু বুদ্ধি আছে দিদি—

কমল। তা যে নমুনা দেখিয়েছিলি!—তোর সেটুক্ বুদ্ধি আছে জানি কিন্তু শুনেচি বিয়ে করলে আবার স্বামীর লেখা সম্বন্ধে মত বদ্‌লাতে হয়।

ইন্দু। আমার ত তার দরকার হবে না। সে লেখা তোদের ভাল লাগে না—আমার ভাল লেগেচে। সে আরও ভাল—আমার কবি কেবল আমারই কবি থাকবে, পৃথিবীতে তাঁর কেবল একটি মাত্র পাঠক থাক্‌বে—

কমল। ছাপ্‌বার খরচ বেঁচে যাবে—

ইন্দু। সবাই তাঁর কবিত্বের প্রশংসা করলে আমার প্রশংসার মূল্য থাক্‌বে না।

কমল। সে ভয় তোকে করতে হবে না! যা হোক্ তোর গুয়লাটিকে তোর পছন্দ হয়েছে তা নিয়ে তোর সঙ্গে ঝগড়া করতে চাইনে। তাকে নিয়ে তুই চিরকাল সুখে থাক্ বোন! তোর গোয়াল দিনে দিনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক!

ইন্দু। ঐ বিনোদ বাবু আসচেন। মুখটা ভারি বিমর্ষ দেখ্‌চি।

(ইন্দুর প্রস্থান।)

বিনোদের প্রবেশ।

কমল। তাঁকে এনেচেন?

বিনোদ। তিনি তাঁর বাপের বাড়ি গেছেন, তাঁকে আনবার তেমন সুবিধে হচ্চে না!

কমল। আমার বোধ হচ্চে তিনি যে আমার সঙ্গিনী ভাবে এখানে থাকেন সেটা আপনার আন্তরিক ইচ্ছে নয়।

বিনোদ। আপনাকে আমি বলতে পারিনে, তিনি এখানে আপনার কাছে থাক্‌লে আমি কত সুখী হই! আপনার দৃষ্টান্তে তাঁর কত শিক্ষা হয়! যথার্থ ভদ্র স্ত্রীলোকের কি রকম আচার ব্যবহার কথাবার্ত্তা হওয়া উচিত তা আপনার কাছে থাকলে তিনি বুঝতে পারবেন। বেশ সম্ভ্রম রক্ষা করে চলা অথচ নিতান্ত জড়সড় হয়ে না থাকা, বেশ শোভন লজ্জাটুকু রাখা অথচ সহজ ভাবে চলা ফেরা, একদিকে উদার সহৃদয়তা আর একদিকে উজ্জ্বল বুদ্ধি, এমন দৃষ্টান্ত তিনি আর কোথায় পাবেন!

কমল। আমার দৃষ্টান্ত হয় ত তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। শুনেচি আপনি তাঁকে অল্পদিন হল বিবাহ করেচেন, হয়ত তাঁকে ভাল করে জানেন না—

বিনোদ। তা বটে। কিন্তু যদিও তিনি আমার স্ত্রী তবু একথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে আপনার সঙ্গে তাঁর তুলনা হতে পারে না।

কমল। ওকথা বল্‌বেন না। আপনি হয়ত জানেন না আমি তাঁকে বাল্যকাল হতে চিনি। তাঁর চেয়ে আমি যে কোন অংশে শ্রেষ্ঠ এমন আমার বোধ হয় না!

বিনোদ। আপনি তাঁকে চেনেন?

কমল। খুব ভালরকম চিনি।

বিনোদ। আমার সম্বন্ধে তিনি আপনার কাছে কোন কথা বলেচেন?

কমল। কিছু না। কেবল বলেচেন, তিনি আপনার ভালবাসার যোগ্য নন। আপনাকে সুখী করতে না পেরে এবং আপনার ভালবাসা না পেয়ে তাঁর সমস্ত জীবনটা ব্যর্থ হয়ে আছে।

বিনোদ। এ তাঁর ভারি ভ্রম! তবে আপনার কাছে স্পষ্ট স্বীকার করি, আমিই তাঁর ভালাবাসার যোগ্য নই। আমি তাঁর প্রতি বড় অন্যায় করেছি, কিন্তু সে তাঁকে ভাল-বাসিনে বলে নয়। আমি দরিদ্র, বিবাহের পূর্ব্বে সে কথা ভাল বুঝতে পারতুম না—কিন্তু লক্ষ্মীকে ঘরে এনেই যেন অলক্ষ্মীকে দ্বিগুণ স্পষ্ট দেখতে পেলুম; মনটা প্রতি মুহূর্ত্তে অসুখী হতে লাগ্‌ল। সেই ক্ষনেই আমি তাঁকে বাপের বাড়ি পাঠিয়েছিলুম। তার পরে আপনার অনুগ্রহে আমার অবস্থা স্বচ্ছল হয়ে অবধি তাঁর অভাব আমি সর্ব্বদাই অনুভব করি—তাঁকে আনাবার অনেক চেষ্টা করচি কিন্তু কিছুতেই তিনি আস্‌চেন না। অবশ্য তিনি রাগ করতে পারেন কিন্তু আমি কি এত বেশী অপরাধ করেছি!

কমল। তবে আর একটি সংবাদ আপনাকে দিই। আপনার স্ত্রীকে আমি এখানে আনিয়ে রেখেচি।

বিনোদ। (আগ্রহে) কোথায় আছেন তিনি, আমার সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দিন্‌

কমল। তিনি ভয় করচেন পাছে আপনি তাঁকে ক্ষমা না করেন—যদি অভয় দেন—

বিনোদ। বলেন কি, আমি তাঁকে ক্ষমা করব! তিনি যদি আমাকে ক্ষমা করতে পারেন—

কমল। তিনি কোনকালেই আপনাকে অপরাধী করেন নি, সে জন্ত আপনি ভাববেন না—

বিনোদ। তবে এত মিনতি করচি তিনি আমাকে দেখা দিচ্চেন না কেন?

কমল। আপনি সত্যিই যে তাঁর দেখা চা'ন এ জানতে পারলে তিনি এক মুহূর্ত্ত গোপনে থাক্‌তেন না। তবে নিতান্ত যদি সেই পোড়ার মুখ দেখতে চান্‌ ত দেখুন।

(মুখ উদ্ঘাটন)—

বিনোদ। আপনি! তুমি! কমল! আমাকে মাপ করলে!

ইন্দুর প্রবেশ।

ইন্দু। মাপ করিস্‌নে দিদি! আগে উপযুক্ত শাস্তি হোক্ তার পরে মাপ!

বিনোদ। তা হলে অপরাধীকে আর একবার বাসর-ঘরে আপনার হাতে সমর্পণ করতে হয়।

ইন্দু। দেখেচিস্ ভাই—কত বড় নির্লজ্জ! এরি মধ্যে মুখে কথা ফুটেচে! ওদের একটু আদর দিয়েচিস্ কি আর ওদের সাম্‌লে রাখবার যো নেই। মেয়েমানুষের হাতে প্রায়েই ওঁদের উপযুক্তমত শাসন হয় না। যদি ওঁদের নিজের জাতের সঙ্গে ঘরকন্না করতে হত তাহলে দেখতুম ওঁদের এত আদর থাক্‌তো কোথায়!

বিনোদ। তা হলে ভূভার হরণের জন্তে মাঝে মাঝে অবতারের আবশ্যক হত না; পরস্পরকে কেটেকুটে সংসারটা অনেকটা সংক্ষেপ করে আন্‌তে পারতুম।

কমল। ঐ ক্ষান্ত দিদি আসচেন। (বিনোদের প্রতি) তোমার সাক্ষাতে উনি বেরবেন না।

(বিনোদের প্রস্থান)

ক্ষান্তর প্রবেশ।

ক্ষান্ত। তা বেশ হয়েচে ভাই, বেশ হয়েচে! এই বুঝি তোর নতুন বাড়ি! এ যে রাজার ঐশ্বর্য্য! তা বেশ হয়েচে! এখন তোর স্বামী ধরা দিলেই আর কোন খেদ থাকে না।

ইন্দু। সে বুঝি আর বাকি আছে। স্বামীরত্নটিকে ভাঁড়ারে পূরেচেন।

ক্ষান্ত। আহা, তা বেশ হয়েচে, বেশ হয়েচে। কমলের মত এমন লক্ষ্মীমেয়ে কি কখনো অসুখী হতে পারে!

ইন্দু। ক্ষান্তদিদি তুমি যে এই ভরসন্ধের সময় ঘরকন্না ফেলে এখানে ছুটে এসেচ?

ক্ষান্ত। আর ভাই ঘরকন্না! আমি দু দিন বাপের বাড়ি গিয়েছিলুম, এই ওঁর আর সহ্য হল না। রাগ করে ঘর ছেড়ে শুনলুম তোমাদের এই বাড়িতে এসে রয়েচেন! তা ভাই, বিয়ে করেচি বলেই কি বাপ মা একেবারে পর হয়ে গেছে। দুদিন সেখানে থাক্‌তে পাব না! যাহোক্ খবরটা পেয়ে চলে আস্‌তে হল।

ইন্দু। আবার তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে বুঝি!

ক্ষান্ত। তা ভাই, একলা ত আর ঘরকন্না হয় না। ওঁদের যে চাই, ওঁদের যে নইলে নয়। নইলে আমার কি সাধ ওঁদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখি।

ইন্দু। তোমার কর্ত্তাটিকে দেখবে ত এস ঐ ঘর থেকে দেখা যাবে।

চতুর্থ দৃশ্য।

ঘর।

শিবচরণ, নিমাই, নিবারণ, চন্দ্র।

চন্দ্র। সমস্ত ঠিক হয়ে গেছে।

শিব। কি হল বল দেখি।

চন্দ্র। ললিতের সঙ্গে কাদম্বিনীর বিবাহ স্থির হয়ে গেল।

নিবা। সে কি। সে যে বিবাহ করবে না শুনলুম।

চন্দ্র। সে ত স্ত্রীকে বিবাহ করচে না। তার টাকা বিয়ে করে টাকাটি সঙ্গে নিয়ে বিলেত যাবে। যাহোক্, এখন আর একবার আমাদের নিমাই বাবুর মত নেওয়া উচিত—ইতোমধ্যে যদি আবার বদল হয়ে থাকে।

শিব। (ব্যস্তভাবে) না, না, আর মত বদ্‌লাতে সময় দেওয়া হবে না! তার পূর্ব্বেই আমরা পাঁচজনে পড়ে কোনগতিকে ওর বিয়েটা দিয়ে দিতে হচ্চে। চল নিমাই অনেক আয়োজন করবার আছে। নিবারণের প্রতি তবে চল্লেম ভাই।

নিবারণ। এস। (নিমাই ও শিবচরণের প্রস্থান) চন্দর বাবু, আপনার ত খাওয়া হল না, কেবল ঘুরে ঘুরেই অস্থির হলেন—একটু বসুন, আপনার জন্যে জলখাবারের আয়োজন করে আসিগে।

(প্রস্থান)

ক্ষান্তর প্রবেশ।

ক্ষান্ত। এখন বাড়ি যেতে হবে? না কি?

চন্দ্র। (দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া) নাঃ, আমি এখানে বেশ আছি!

ক্ষান্ত। তা ত দেখতে পাচ্ছি। তা চিরকাল এইখানেই কাটাবে না কি?

চন্দ্র। বিনুর সঙ্গে আমার ত সেই রকমই কথা হয়েছে!

ক্ষান্ত। বিনু তোমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কি না; বিনুর সঙ্গে কথা হয়েচে! এখন ঢের হয়েচে চল!

চন্দ্র। (জিব কাটিয়া মাথা নাড়িয়া) সে কি হয়! বন্ধু মানুষকে কথা দিয়েচি এখন কি সে ভাঙ্গতে পারি!

ক্ষান্ত। আমার ঘাট হয়েচে, আমাকে মাপ কর তুমি। আমি আর কখনো বাপের বাড়ি গিয়ে থাকব না। তা তোমার ত অযত্ন হয় নি—আমি ত সেখান থেকে সমস্ত রেঁধে তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েচি!

চন্দ্র। বড় বৌ, আমি কি তোমার রান্নার জন্যে তোমাকে বিয়ে করেছিলুম? যে বৎসর তোমার সঙ্গে অভাগার শুভ বিবাহ হয় সে বৎসর কলকাতা সহরে কি রাঁধুনি বামুনের মড়ক হয়েছিল?

ক্ষান্ত। আমি বল্‌চি আমার একশোবার ঘাট হয়েচে আমাকে মাপ কর, আমি আর কখনো এমন কাজ করব না। এখন তুমি ঘরে চল!

চন্দ্র। তবে একটু রোসো! নিবারণ বাবু আমার জলখাবারের ব্যবস্থা করতে গেছেন—উপস্থিত ত্যাগ করে যাওয়াটা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ!

ক্ষান্ত। আমি সেখানে সব ঠিক করে রেখেচি তুমি এখনি চল!

চন্দ্র। বল কি, নিবারণ বাবু—

ক্ষান্ত। সে আমি নিবারণ বাবুকে বলে পাঠাব এখন, তুমি চল!

চন্দ্র। তবে চল! সকল গরুগুলিইত একে একে গোষ্ঠে গেল! আমিও যাই!

বন্ধুগণ। (নেপথ্য হইতে) চন্দর দা!

ক্ষান্ত। ঐরে, আবার ওরা আস্‌চে! ওদের হাতে পড়লে আর তোমার রক্ষে নেই!

চন্দ্র। ওদের হাতে তুমি আমি দুজনেই পড়ার চেয়ে একজনে পড়া ভাল। শাস্ত্রে লিখচে "সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ" অতএব এস্থলে আমার অর্দ্ধাঙ্গের সরাই ভাল।

ক্ষান্ত। তোমার ঐ বন্ধুগুলোর জ্বালায় আমি কি মাথামোড় খুঁড়ে মরব?

(প্রস্থান)

বিনোদ নিমাই নলিনাক্ষের প্রবেশ।

চন্দ্র। কেমন মনে হচ্চে বিনু?

বিনোদ। সে আর কি বলব দাদা!

চন্দ্র। নিমাই, তোর স্নায়ুরোগের বর্ত্তমান লক্ষণটা কি বল্ দেখি!

নিমাই। অত্যন্ত সাংঘাতিক। ইচ্ছে করচে দিগ্বিদিকে নেচে বেড়াই।

চন্দ্র। ভাই নাচতে হয় ত দিকে নেচো, আবার বিদিকে নেচো না! পূর্ব্বে তোমার যে রকম দিগ্‌ভ্রম হয়েছিল—কোথায় মির্জ্জাপুর আর কোথায় বাগবাজার!

নিমাই। এখন তোমার খবরটা কি চন্দর দা?

চন্দ্র। আমি কিছু দ্বিধায় পড়ে গেছি। এখানেও আহার তৈরি হচ্চে ঘরেও আহার প্রস্তুত—কিন্তু ঘরের দিকে ডবল্ টান পড়েচে।

নলিন। বিনু, এই মরুজগৎ তোমার কাছে ত আবার নন্দনকানন হয়ে উঠল—তুমি ত তাই সুখী হলে—

চন্দ্র। সে জন্যে ওকে আর লজ্জা দিস্‌নে নলিন, সে ওর দোষ নয়। সুখী না হবার জন্যে ও যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল, এমন কি প্রায় সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হয়েছিল; এমন সময় বিধাতা ওর সঙ্গে লাগ্‌লেন—নিতান্ত ওকে কাণে ধরে সুখী করে দিলেন! সে জন্যে ওকে মাপ করতে হবে!

বিনোদ। দেখ নলিন্, তুই আমাকে ত্যাগ কর্! দুধের সাধ আর ঘোলে মেটাস্‌নে তুইও একটা বিয়ে করে ফেল্—আর এ জগৎটাকে সখের মরুভূমি করে রাখিস্‌নে!

চন্দ্র। একদিন করেছিলুম,
ন্, জীবনে আর কখনো ঘট্‌কালি করব না
আজ তোর খাতিরে সে প্রতিজ্ঞা আমি
নি ভঙ্গ করতে প্রস্তুত আছি!

নিমাই। এখনি?

চন্দ্র। হাঁ। এখনি! একবার কেবল বাড়ি
ক চাদরটা বদলে আস্‌তে হবে।

নিমাই। সেই কথাটা খুলে বল। আর
র্য্যন্ত তোমার প্রতিজ্ঞা যে কি রকম রক্ষা
র এসেচ সে আর প্রকাশ করে কাজ নেই!

বিনু। নলিন্, আমার গা ছুঁয়ে বল্‌দেখি
় বিয়ে করবি!

নলিন। তুমি যদি বল বিনু, তা'হলে আমি
চয় করব! এপর্য্যন্ত আমি তোমার কোন্
রোধটা রাখিনি বল!

বিনোদ। চন্দর দা তবে আর কি!
টা খোঁজ কর! একটি সৎ কায়স্থের মেয়ে।
দের আবার একটু সুবিধে আছে—খাস্তের
় হজমিগুলিটুকু পান, রাজকন্যার সঙ্গে
র্দ্ধেক রাজত্বের যোগাড় হয়।

চন্দ্র। তা বেশ কথা! আমি এই সংসার-
দ্রে দিব্যি একটি খেয়া জমিয়েচি—একে
ক তোদের দুটিকে আইবড় কুল থেকে
বাহ কূলে পার করে দিয়েচি—মিষ্টার চাটু-
কেও এক হাঁটু কাদার মধ্যে নাবিয়ে
য়ে এসেচি, এখন আর কে কে যাত্রী আছে
ক দাও—

বিনোদ। এখন এই অনাথ যুবকটিকে
র করে দাও!

নলিন। বিনু ভাই, আর কেউ নয়, কেবল
মি যাকে পছন্দ করে দেবে আমি তাকেই
ব। দেখেচি তোমার সঙ্গে আমার রুচির
ল হয়!

বিনোদ। তাই সই। তবে আমিই সন্ধানে
বেরব। চন্দরদার আবার চাদর বদ্‌লাতে বড়
বিলম্ব হয় দেখ্‌চি। ততক্ষণ আমিই খেয়া দেব।

নিমাই। আজ তবে সভাভঙ্গ হোক—
ওদিকে যতই রাত বয়ে যাচ্চে আমাদের চন্দ্র
ততই ম্লান হয়ে আস্‌চেন।

চন্দর। উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু আগে
আমাদের ভাগ্যলক্ষ্মীদের একটি বন্দনা গেয়ে
তার পরে বে'রানো যাবে। এটি বিরহকালে
আমার নিজের রচনা—বিরহ না হলে গান
বাঁধবার অবসর পাওয়া যায় না। মিলনের
সময় মিলনটা নিয়েই কিছু ব্যতিব্যস্ত হয়ে
থাকতে হয়।

(গান।)

(প্রথমে চন্দ্র পরে সকলে মিলিয়া)—

বাউলের সুর।

যার অদৃষ্টে যেমনি জুটুক তোমরা সবাই ভাল
আমাদের এই আঁধার ঘরে
সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালো!
কেউবা অতি জ্বল জ্বল, কেউবা ম্লান ছল-ছল,
কেউবা কিছু দহন করে, কেউবা স্নিগ্ধ আলো।
নূতন প্রেমে নূতন বধূ আগাগোড়া কেবল মধু,
পুরাতনে অম্লমধুর একটুকু ঝাঁঝালো!
বাক্য যখন বিদায় করে চক্ষু এসে পায়ে ধরে,
রাগের সঙ্গে অনুরাগে সমান ভাগে ঢালো।
আমরা তৃষ্ণা তোমরা সুধা,
তোমরা তৃপ্তি আমরা ক্ষুধা,
তোমার কথা বল্‌তে কবির কথা ফুরালো!
যে মূর্ত্তি নয়নে জাগে সবই আমার ভাল লাগে
কেউ বা দিব্যি গৌরবরণ,
কেউবা দিব্যি কালো!

যবনিকা পতন।

সমাপ্ত।

চিত্রাঙ্গদা।

অনঙ্গ আশ্রম।

চিত্রাঙ্গদা। মদন। বসন্ত।

চিত্রাঙ্গদা। তুমি পঞ্চশর ?

মদন। আমি সেই মনসিজ,
নিখিলের নরনারী হিয়া টেনে আনি
বেদনা বন্ধনে।

চিত্রাঙ্গদা। কি বেদনা কি বন্ধন
জানে তাহা দাসী। প্রণমি তোমার পদে।
প্রভু, তুমি কোন্ দেব ?

বসন্ত। আমি ঋতুরাজ।
জরা মৃত্যু দুই দৈত্য নিমেষে নিমেষে
বাহির করিতে চাহে বিশ্বের কঙ্কাল ;
আমি পিছে পিছে ফিরে' পদে পদে তারে
করি আক্রমণ ; রাত্রিদিন সে সংগ্রাম।
আমি অখিলের সেই অনন্ত যৌবন।

চিত্রাঙ্গদা। প্রণাম তোমারে ভগবন্ ! চরিতার্থ
দাসী দেব-দরশনে।

মদন। কল্যাণি, কি লাগি'
এ কঠোর ব্রত তব ? তপস্যার তাপে
করিছ মলিন খিন্ন যৌবন কুসুম,
অনঙ্গ পূজার নহে এমন বিধান।
কে তুমি, কি চাও ভদ্রে।

চিত্রাঙ্গদা। দয়া কর যদি,
শোন মোর ইতিহাস। জানাব প্রার্থনা
তার পরে।

মদন। শুনিবারে রহিনু উৎসুক

চিত্রাঙ্গদা। আমি চিত্রাঙ্গদা। মণিপুর-রাজ-
সুতা। মোর পিতৃবংশে কভু কন্যা জ[নি]
না—দিয়াছিলা হেন বর দেব উমাপ[তি]
তপে তুষ্ট হয়ে। আমি সেই মহাবর
ব্যর্থ করিয়াছি। অমোঘ দেবতা-বাক্য
মাতৃগর্ভে পশি, দুর্ব্বল প্রারম্ভ মোর
পারিল না পুরুষ করিতে শৈবতেজে,
এমনি কঠিন নারী আমি।

মদন। শুনি[য়াছি]
বটে। তাই তব পিতা পুত্রের সমান
পালিয়াছে তোমা। শিখায়েছে ধনুর্বি[দ্যা]
রাজদণ্ডনীতি।

চিত্রাঙ্গদা। তাই পু[রুষের]
বেশে, যুবরাজরূপে, করি রাজকাজ,
ফিরি স্বেচ্ছামতে ; নাহি জানি লজ্জ[া]
অন্তঃপুরবাস ; নাহি জানি হাব ভা[ব]
বিলাস-চাতুরী ; শিখিয়াছি ধনুর্বিদ্[যা]

শুধু শিখি নাই, দেব, তব পুষ্পধনুঃ
কেমনে বাঁকাতে হয় নয়নের কোণে।
[মদ]ন। সুনয়নে,সে বিদ্যা শিখে না কোন নারী ;
নয়ন আপনি করে আপনার কাজ,
বুকে যার বাজে সেই বোঝে।
[চিত্রা]ঙ্গদা। একদিন
গিয়েছিনু মৃগ অন্বেষণে একাকিনী
ঘন বনে, পূর্ণা নদীতীরে। তরুমূলে
বাঁধি, অশ্ব দুর্গম কুটিল বনপথে
পশিলাম মৃগপদচিহ্ন অনুসরি'।
ঝিল্লিমন্দ্রমুখরিত নিত্যঅন্ধকার
লতাগুল্মে-গহন গম্ভীর মহারণ্যে
কিছুদূর অগ্রসরি' দেখিনু সহসা
রোধিয়া সঙ্কীর্ণ পথ রয়েছে শয়ান
ভূমিতলে, চীরধারী মলিন পুরুষ।
উঠিতে কহিনু তারে অবজ্ঞার স্বরে
সরে' যেতে,—নড়িল না, চাহিল না ফিরে'।
উদ্ধত অধীর রোষে ধনু-অগ্রভাগে
করিনু তাড়না ;—সরল সুদীর্ঘ দেহ
মুহূর্ত্তেই তীরবেগে উঠিল দাঁড়ায়ে
সম্মুখে আমার,—ভস্মসুপ্ত অগ্নি যথা
ঘৃতাহুতি পেয়ে শিখারূপে উঠে ঊর্দ্ধে
চক্ষের নিমেষে। শুধু ক্ষণেকের তরে
চাহিয়া আমার মুখপানে,—রোষদৃষ্টি
পলকে মিলায়ে গেল, ক্ষুদ্র কৌতুকের
মৃদুহাস্যরেখা নাচিল অধরপ্রান্তে,
বুঝি সে বালক-মূর্ত্তি হেরিয়া আমার।
শিখে' পুরুষের বিদ্যা, পরে, পুরুষের
বেশ, পুরুষের সাথে থেকে, এতদিন
ভুলে ছিনু যাহা, সেই মুখ চেয়ে, সেই
আপনাতে-আপনি-অটল-মূর্ত্তি হেরি,
সেই মুহূর্ত্তেই জানিলাম মনে, নারী
আমি। সেই মুহূর্ত্তেই প্রথম দেখিনু
সম্মুখে পুরুষ মোর।

মদন। সে শিক্ষা আমারি
সুলক্ষণে! আমিই চেতন করে' দিই
এক দিন জীবনের শুভ পুণ্যক্ষণে
নারীরে হইতে নারী, পুরুষে পুরুষ।
কি ঘটিল পরে।

চিত্রাঙ্গদা। সভয় বিস্ময়কণ্ঠে
শুধানু "কে তুমি?" শুনিনু উত্তর "আমি
পার্থ, কুরুবংশধর।" রহিনু দাঁড়ায়ে
চিত্রপ্রায়, ভুলে' গেনু প্রণাম করিতে।
এই পার্থ? আজন্মের বিস্ময় আমার!
শুনেছিনু বটে, সত্য পালনের তরে
দ্বাদশ বৎসর বনে বনে ব্রহ্মচর্য্য
পালিছে অর্জ্জুন। এই সেই পার্থবীর!
বাল্য-দুরাশায় কতদিন করিয়াছি
মনে, পার্থকীর্ত্তি করিব নিষ্প্রভ আমি
নিজ ভুজবলে ; সাধিব অব্যর্থ লক্ষ্য ;
পুরুষের ছদ্মবেশে মাগিব সংগ্রাম
তাঁর সাথে, বীরত্বের দিব পরিচয়।
হারে মুগ্ধে, কোথায় চলিয়া গেল সেই
স্পর্দ্ধা তোর! যে ভূমিতে আছেন দাঁড়ায়ে
সে ভূমির তৃণদল হইতাম যদি,
শৌর্য্যবীর্য্য যাহা কিছু ধূলায় মিলায়ে
দিয়ে, লভিতাম দুর্লভ মরণ, সেই
চরণের তলে!—কি ভেবেছিনু, মনে
নাই। দেখিনু চাহিয়া, ধীরে চলি' গেলা
বীর বন-অন্তরালে। উঠিনু চমকি ;
সেইক্ষণে জন্মিল চেতনা ; আপনারে
দিলাম ধিক্কার শতবার! ছিছি মূঢ়ে,
না করিলি সম্ভাষণ, না শুধালি কথা,
না চাহিলি ক্ষমা ভিক্ষা,—বর্ব্বরের মত
রহিলি দাঁড়ায়ে—হেলা করি' চলি' গেলা
বীর! বাঁচিতাম, সে মুহূর্ত্তে মরিতাম
যদি!—
পরদিন প্রাতে দূরে ফেলে' দিনু

পুরুষের বেশ। পরিলাম রক্তাম্বর,
কঙ্কণ কিঙ্কিণী কাঞ্চি। অনভ্যস্ত সাজ
লজ্জায় জড়ায়ে অঙ্গ রহিল একান্ত
সসঙ্কোচে।
গোপনে গেলাম সেই বনে।
অরণ্যের শিবালয়ে দেখিলাম তাঁরে।—

ম। বলে' যাও বালা। মোর কাছে,করিয়োনা
লাজ। আমি মনসিজ; মানসের
সকল রহস্য জানি।

চি। মনে নাই ভাল,
তার পরে কি কহিনু আমি, কি উত্তর
শুনিলাম। আর শুধায়োনা, ভগবন্।
মাথায় পড়িল ভেঙ্গে লজ্জা বজ্ররূপে
তবু মোরে পারিল না শতধা করিতে—
নারী হয়ে এমনি পুরুষপ্রাণ মোর!
নাহি জানি কেমনে এলেম ঘরে ফিরে'
দুঃস্বপ্নবিহ্বলসম! শেষ কথা তাঁর
কর্ণে মোর বাজিতে লাগিল তপ্ত শূল
"ব্রহ্মচারি-ব্রতধারী আমি। পতিযোগ্য
নহি বরাঙ্গনে!" পুরুষের ব্রহ্মচর্য্য!
ধিক্ মোরে, তাও আমি নারিনু টলাতে!
তুমি জান, মীনকেতু, কত ঋষি মুনি
করিয়াছে বিসর্জ্জন নারীপদতলে
চিরার্জ্জিত তপস্যার ফল। ক্ষত্রিয়ের
ব্রহ্মচর্য্য!—গৃহে গিয়ে ভাঙ্গিয়ে ফেলিনু
ধনুঃশর যাহা কিছু ছিল;—কিণাঙ্কিত
এ কঠিন করতল—ছিল যা' গর্ব্বের
ধন এতকাল—লাঞ্ছনা করিনু তারে
নিষ্ফল আক্রোশভরে। এতদিন পরে
বুঝিলাম, নারী হয়ে পুরুষের মন
না যদি জিনিতে পারি বৃথা বিদ্যা যত!
অবলার কোমল মৃণাল বাহুদুটি
এ বাহুর চেয়ে ধরে শতগুণ বল!
ধন্য সেই মুগ্ধ মূর্খ ক্ষীণ-তনুলতা
পরাবলম্বিতা, লজ্জাভয়ে লীনাঙ্গিনী
সামান্য ললনা, যার ত্রস্ত নেত্রপাতে
মানে পরাভব বীর্য্যবল, তপস্যার
তেজ!—হে অনঙ্গদেব, সব দম্ভ মোর
একদণ্ডে লয়েছ ছিনিয়া—সব বিদ্যা
সব বল করেছ তোমার পদানত।
এখন তোমার বিদ্যা শিখাও আমায়,
দাও মোরে অবলার বল, নিরস্ত্রের
অস্ত্র যত।

মদন। আমি হব সহায় তোমার।
অয়ি শুভে, বিশ্বজয়ী অর্জ্জুনে করিয়া
জয়, বন্দী করি' আনিব সম্মুখে তব!
রাজ্ঞী হয়ে দিয়ো তারে দণ্ড পুরস্কার
যথা ইচ্ছা; বিদ্রোহীরে করিয়ো শাসন।

চিত্রাঙ্গদা। সময় থাকিত যদি একাকিনী আমি
তিলে তিলে হৃদয় তাহার করিতাম
অধিকার, নাহি চাহিতাম দেবতার
সহায়তা। সঙ্গীরূপে থাকিতাম সাথে,
রণক্ষেত্রে হতেম সারথী, মৃগয়াতে
রহিতাম অনুচর, শিবিরের দ্বারে
জাগিতাম রাত্রির প্রহরী, ভৃত্যরূপে
করিতাম সেবা, ক্ষত্রিয়ের আর্ত্তত্রাণ-
মহাব্রতে হইতাম সহায় তাঁহার।
একদিন কৌতূহলে দেখিতেন চাহি,
ভাবিতেন মনে মনে "এ কোন্ বালক,
পূর্ব্বজনমের কোন্ চিরদাস, সঙ্গ
লইয়াছে এ জনমে সুকৃতির মত!"
ক্রমে খুলিতাম তাঁর হৃদয়ের দ্বার,
চিরস্থান লভিতাম সেথা। জানি আমি
এ প্রেম আমার শুধু ক্রন্দনের নহে;
যে নারী নির্ব্বাক্ ধৈর্য্যে চির মর্ম্মব্যথা
নিশীথনয়নজলে করয়ে পালন,
দিবালোকে ঢেকে রাখে ম্লান হাসিতলে,
আজন্ম বিধবা, আমি সে রমণী নহি;

আমার কামনা কভু না নিষ্ফল হবে!
আপনারে একবার দেখাইতে পারি
যদি, নিশ্চয় সে দিবে ধরা! হায় বিধি,
সে দিন কি দেখেছিল! সরমে কুঞ্চিত
এক শঙ্কিত কম্পিত নারী, আত্মহারা
প্রলাপবাদিনী! কিন্তু আমি যথার্থ কি
তাই! যেমন সহস্র নারী পথে গৃহে
চারিদিকে, শুধু ক্রন্দনের অধিকারী,
তার চেয়ে বেশী নই আমি! কিন্তু হায়
আপনার পরিচয় দেওয়া, বহু ধৈর্য্যে
বহুদিনে ঘটে, চির জীবনের কাজ,
জন্ম জন্মান্তের ব্রত। তাই আসিয়াছি
দ্বারে তোমাদের, করেছি কঠোর তপ!
হে ভুবনজয়ী দেব, হে মহাসুন্দর
ঋতুরাজ, শুধু এক দিবসের তরে
ঘুচাইয়া দাও, জন্মদাতা বিধাতার
বিনাদোষে অভিশাপ, নারীর কুরূপ!
কর মোরে অপূর্ব্ব সুন্দরী! দাও মোরে
সেই এক দিন—তার পরে চিরদিন
রহিল আমার হাতে।—যখন প্রথম
তারে দেখিলাম যেন মুহূর্ত্তের মাঝে
অনন্ত বসন্ত পশিল হৃদয়ে! বড়
ইচ্ছা হয়েছিল, সে যৌবন-সমীরণে
সমস্ত শরীর যদি দেখিতে দেখিতে
অপূর্ব্ব পুলকভরে উঠে প্রস্ফুটিয়া
লক্ষ্মীর চরণশায়ী পদ্মের মতন!
হে বসন্ত, হে বসন্ত সখে! সে বাসনা
পূরাও আমার শুধু দিনেকের তরে!

মদন। তথাস্তু!

বসন্ত। তথাস্তু! শুধু একদিন নহে,
এক বর্ষ ধরি' বসন্তের পুষ্পশোভা
ঘেরিয়া তোমার তনু রহিবে বিকশি!

মণিপুর। অরণ্যে শিবালয়। অর্জ্জুন।

অর্জ্জুন। কাহারে হেরিনু? সে কি সত্য,
কিংবা মায়া?
নিবিড় নির্জ্জন বনে নির্ম্মল সরসী;—
এমনি নিভৃত নিরালয়, মনে হয়
নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে সেথা বনলক্ষ্মীগণ
স্নান ক'রে যায়; গভীর পূর্ণিমা রাত্রে,
সেই সুপ্ত সরসীর স্নিগ্ধ শষ্পতটে
শয়ন করেন সুখে নিঃশঙ্ক বিশ্রামে
স্খলিত অঞ্চলে। সেথা তরু অন্তরালে
অপরাহ্ণ বেলা, ভাবিতেছিলাম কত
আশৈশব জীবনের কথা; সংসারের
মূঢ় খেলা দুঃখ সুখ উলটি পালটি;
জীবনের অসন্তোষ; অসম্পূর্ণ আশা,
অনন্ত দারিদ্র্য এই মর্ত্ত্য মানবের।
হেন কালে ঘন তরু অন্ধকার হতে
ধীরে ধীরে বাহিরিয়া, কে আসি দাঁড়াল,
সরোবর-সোপানের শ্বেত শিলাপটে!
কি অপূর্ব্ব রূপ! কোমল চরণতলে
ধরাতল কেমনে নিশ্চল হয়ে ছিল?
উষার কনক মেঘ, দেখিতে দেখিতে
যেমন মিলায়ে যায়, পূর্ব্ব পর্ব্বতের
শুভ্র শিরে অকলঙ্ক নগ্ন শোভা করি'
বিকাশিত, তেমনি বসন খানি তার
অঙ্গের লাবণ্যে মিলাতে চাহিতেছিল
মহাসুখে। নামি' ধীরে সরোবর তীরে
কৌতুহলে দেখিল সে নিজ মুখচ্ছায়া;
উঠিল চমকি,। ক্ষণ পরে মৃদু হাসি,
হেলাইয়া বাম বাহুখানি, হেলাভরে
এলাইয়া দিলা কেশপাশ; মুক্তকেশ
পড়িল বিহ্বল হয়ে চরণের কাছে।
অঞ্চল খসায়ে দিয়ে হেরিল আপন
অনিন্দিত বাহুখানি—পরশের রসে

কোমল কাতর, প্রেমের করুণা মাখা।
নিরখিলা নত করি' শির পরিস্ফুট
দেহতটে যৌবনের উন্মুখ বিকাশ।
দেখিলা চাহিয়া, নব গৌরতনুতলে
আরক্তিম আলজ্জ আভাস; সরোবরে
পা দুখানি ডুবাইয়া দেখিলা আপন
চরণের আভা—বিস্ময়ের নাই সীমা।
সেই যেন প্রথম দেখিল আপনারে।
শ্বেত শতদল যেন কোরক বয়স
যাপিল নয়ন মুদি',—যে দিন প্রভাতে
প্রথম লভিল পূর্ণ শোভা, সেই দিন
হেলাইয়া গ্রীবা, নীল সরোবর জলে
প্রথম হেরিল আপনারে, সারাদিন
রহিল চাহিয়া সবিস্ময়ে। ক্ষণ পরে,
কি জানি কি দুঃখে, হাসি মিলাইল মুখে,
ম্লান হ'ল দুটি আঁখি; বাঁধিয়া তুলিল
কেশপাশ; অঞ্চলে ঢাকিল দেহখানি;
নিঃশ্বাস ফেলিয়া, ধীরে ধীরে চলে' গেল;
সোণার সায়াহ্ন যথা ম্লান মুখ করি'
আঁধার রজনী পানে ধায় মৃদু পদে।
ভাবিলাম মনে, ধরণী দেখায়ে দিল
ঐশ্বর্য্য আপন। কামনার সম্পূর্ণতা
ক্ষণতরে দেখা দিয়ে গেল।—ভাবিলাম
কত যুদ্ধ, কত হিংসা, কত আড়ম্বর,
পুরুষের পৌরুষ গৌরব, বীরত্বের
নিত্য কীর্ত্তিতৃষা, শান্ত হয়ে লুটাইয়া
পড়ে ভূমে, ওই পূর্ণ সৌন্দর্য্যের কাছে;
পশুরাজ সিংহ যথা সিংহবাহিনীর
ভুবনবাঞ্ছিত অরুণ-চরণতলে।
আর একবার যদি—কে দুয়ার ঠেলে!

(দ্বার খুলিয়া)

এ কি! সেই মূর্ত্তি! শান্ত হও হে হৃদয়!
কোন ভয় নাই মোরে বরাননে! আমি
ক্ষত্রকুলজাত, ভয়ভীত দুর্ব্বলের ভয়হারী।

চিত্রাঙ্গদা। আর্য্য, তুমি অতিথি আমার!
এ মন্দির আমার আশ্রম। নাহি জানি
কেমনে করিব অভ্যর্থনা, কি সৎকারে
তোমারে তুষিব আমি!

অর্জ্জুন। অতিথি-সৎকার
তব দরশনে, হে সুন্দরি! শিষ্টবাক্য
সমূহ সৌভাগ্য মোর। যদি নাহি লহ
অপরাধ, প্রশ্ন এক শুধাইতে চাহি,
চিত্ত মোর কুতূহলী।

চিত্রাঙ্গদা। শুধাও নির্ভয়ে।

অর্জ্জুন। শুচিস্মিতে, কোন্ সুকঠোর ব্রত লাগি
হেন রূপরাশি জনহীন দেবালয়ে
হেলায় দিতেছ বিসর্জ্জন, হতভাগ্য
মর্ত্ত্যজনে করিয়া বঞ্চিত!

চিত্রাঙ্গদা। গুপ্ত এক
কামনা সাধনা তরে, এক মনে করি
শিবপূজা।

অর্জ্জুন। হায়, কারে করিছে কামনা
জগতের কামনার ধন!—সুদর্শনে,
উদয়শিখর হতে অস্তাচল-ভূমি
ভ্রমণ করেছি আমি; সপ্তদ্বীপ মাঝে
যেখানে যা কিছু আছে দুর্লভ সুন্দর,
অচিন্ত্য মহান্, সকলি দেখেছি চখে;
কি চাও, কাহারে চাও, যদি বল মোরে
মোর কাছে পাইবে বারতা।

চিত্রাঙ্গদা। ত্রিভুবনে
পরিচিত তিনি আমি যাঁরে চাহি।

অর্জ্জুন। হেন
নর কে আছে ধরায়! কার যশোরাশি
অমর-অকাঙ্ক্ষিত তব মনোরাজ্য মাঝে
করিয়াছে অধিকার দুর্লভ আসন।
কহ নাম তার, শুনিয়া কৃতার্থ হই।

চিত্রাঙ্গদা। জন্ম তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতিকুলে
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর।

অর্জ্জুন। মিথ্যা খ্যাতি বেড়ে ওঠে
মুখে মুখে কথায় কথায়; ক্ষণস্থায়ী
বাষ্প যথা উষারে ছলনা করে' ঢাকে
যতক্ষণ সূর্য্য নাহি ওঠে। হে সরলে,
মিথ্যারে কোরো না উপাসনা, এ দুর্লভ
সৌন্দর্য্য সম্পদে। কহ শুনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
কোন্ বীর, ধরণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলে!

চিত্রাঙ্গদা। পরকীর্ত্তি-অসহিষ্ণু কে তুমি সন্ন্যাসি!
কে না জানে এ ভুবনে কুরুবংশ সর্ব্ব
রাজবংশচূড়া।

অর্জ্জুন। কুরুবংশ!

চিত্রাঙ্গদা। সেই বংশে
কে আছে অক্ষয়যশ বীরেন্দ্রকেশরী
নাম শুনিয়াছ?

অর্জ্জুন। বল, শুনি তব মুখে।

চিত্রাঙ্গদা। অর্জ্জুন, গাণ্ডীবধনু, ভুবনবিজয়ী।
সে অক্ষয় নাম, সমস্ত জগৎ হতে
করিয়া লুণ্ঠন, লুকায়ে রেখেছি যত্নে
কুমারী-হৃদয় পূর্ণ করি'। ব্রহ্মচারি,
কেন এ অধৈর্য্য তব? তবে মিথ্যা এ কি!
মিথ্যা সে অর্জ্জুন নাম? কহ এই বেলা
মিথ্যা যদি হয় তবে হৃদয় ভাঙ্গিয়া
ছেড়ে দিই তারে, বেড়াক্ সে উড়ে উড়ে
মুখে মুখে বাতাসে বাতাসে, তার স্থান
নহে নারীর অন্তরাসনে।

অর্জ্জুন। বরাঙ্গনে,
সে অর্জ্জুন, সে পাণ্ডব, সে গাণ্ডীবধনু,
সেই ভাগ্যবান্ চরণে শরণাগত।
নাম তার, খ্যাতি তার, বীর্য্য তার, মিথ্যা
হোক্ সত্য হোক্, যে দেবদুর্লভ লোকে
করেছ তাহারে স্থান দান, সেথা হতে
আর তারে কোরো না বিচ্যুত, ক্ষীণপুণ্য
হৃতস্বর্গ হতভাগ্যসম।

চিত্রাঙ্গদা। তুমি পার্থ?

অর্জ্জুন। আমি পার্থ, দেবি, তোমার হৃদয়দ্বারে
প্রেমার্ত্ত অতিথি।

চিত্রাঙ্গদা। শুনেছিনু ব্রহ্মচর্য্য
পালিছে অর্জ্জুন দ্বাদশবরষব্যাপী।
সেই বীর কামিনীরে করিছে কামনা
ব্রত ভঙ্গ করি'! হে সন্ন্যাসি, তুমি পার্থ!

অর্জ্জুন। তুমি ভাঙ্গিয়াছ ব্রত মোর। চন্দ্র উঠি'
যেমন নিমেষে ভেঙ্গে দেয় নিশীথের
যোগনিদ্রা-অন্ধকার।

চিত্রাঙ্গদা। ধিক্, পার্থ, ধিক্!
কে আমি, কি আছে মোর, কি দেখেছ তুমি,
কি জান আমারে! কার লাগি আপনারে
হতেছ বিস্মৃত! মুহূর্ত্তেকে সত্য ভঙ্গ
করি, অর্জ্জুনেরে করিতেছ অনর্জ্জুন
কার তরে? মোর তরে নহে। এই দুটি
নীলোৎপল নয়নের তরে; এই দুটি
নবনীনিন্দিত বাহুপাশে সব্যসাচী
অর্জ্জুন দিয়াছে ধরা, দুই হস্তে ছিন্ন
করে' ফেলে' সত্যের বন্ধন। কোথা গেল
প্রেমের মর্য্যাদা! কোথায় রহিল পড়ে'
নারীর সম্মান! হায়, আমারে করিল
অতিক্রম আমার এ তুচ্ছ দেহখানা,
মৃত্যুহীন অন্তরের এই ছদ্মবেশ
ক্ষণস্থায়ী! এতক্ষণে পারিনু জানিতে
মিথ্যা খ্যাতি, বীরত্ব তোমার!

অর্জ্জুন। খ্যাতি মিথ্যা,
বীর্য্য মিথ্যা আজ বুঝিয়াছি। আজ মোরে
সপ্তলোক স্বপ্ন মনে হয়! শুধু একা
পূর্ণ তুমি, সর্ব্ব তুমি, বিশ্বের ঐশ্বর্য্য
তুমি, এক নারী, সকল দৈন্যের তুমি
মহা অবসান, সকল কর্ম্মের তুমি
বিশ্রাম রূপিণী। কেন জানি অকস্মাৎ
তোমারে হেরিয়া—বুঝিতে পেরেছি আমি
কি আনন্দ কিরণেতে প্রথম প্রত্যূষে

অন্ধকার মহার্ণবে সৃষ্টি শতদল
দিগ্বিদিকে উঠেছিল উন্মেষিত হয়ে
এক মুহূর্ত্তের মাঝে! আর সকলেরে
পলে পলে তিলে তিলে তবে জানা যায়
বহু দিনে;—তোমা পানে যেমনি চেয়েছি
অমনি সমস্ত তব পেয়েছি দেখিতে
তবু পাই নাই শেষ।—কৈলাস-শিখরে
একদা মৃগয়াশ্রান্ত তৃষিত তাপিত
গিয়েছিনু দ্বিপ্রহরে কুসুমবিচিত্র
মানসের তীরে। যেমনি দেখিনু চেয়ে
সেই সুর-সরসীর সলিলের পানে
অমনি পড়িল চোখে অনন্ত অতল।
স্বচ্ছ জল, যত নিম্নে চাই। মধ্যাহ্নের
রবিরশ্মিরেখাগুলি স্বর্ণ নলিনীর
সুবর্ণ মৃণাল সাথে মিশি' নেমে গেছে
অগাধ অসীমে; কাঁপিতেছে আঁকি বাঁকি
জলের হিল্লোলে, লক্ষ কোটি অগ্নিময়ী
নাগিনীর মত। মনে হল ভগবান্
সূর্য্যদেব সহস্র অঙ্গুলি নির্দ্দেশিয়া
দি'ছেন দেখায়ে জন্মশ্রান্ত কর্ম্মক্লান্ত
মর্ত্ত্যজনে, কোথা আছে সুন্দর মরণ
অনন্ত শীতল। সেই স্বচ্ছ অতলতা
দেখেছি তোমার মাঝে। চারিদিক হতে
দেবের অঙ্গুলি যেন দেখায়ে দিতেছে
মোরে, ওই তব অলোক আলোক মাঝে
কীর্ত্তিক্লিষ্ট জীবনের পূর্ণনির্ব্বাপণ।

চিত্রা। আমি নহি, আমি নহি, হায়,পার্থ, হায়,
কোন্ দেবের ছলনা! যাও যাও ফিরে
যাও, ফিরে যাও বীর মিথ্যারে কোরো না
উপসনা। শৌর্য্য বীর্য্য মহত্ত্ব তোমার
দিয়ো না মিথ্যার পদে! যাও,ফিরে যাও!

তরুতলে চিত্রাঙ্গদা।

চিত্রা। হায়,হায়, সে কি ফিরাইতেপারি! সেই
থরথর ব্যাকুলতা বীর হৃদয়ের,
তৃষার্ত্ত কম্পিত এক স্ফুলিঙ্গনিঃশ্বাসী
হোমাগ্নি শিখার মত; সেই, নয়নের
দৃষ্টি যেন অন্তরের বাহু হয়ে, কেড়ে
নিতে আসিছে আমায়; উত্তপ্ত হৃদয়
ছুটিয়া আসিতে চাহে সর্ব্বাঙ্গ টুটিয়া,
তাহার ক্রন্দনধ্বনি প্রতি অঙ্গে শুনা
যায় যেন! এ তৃষ্ণা কি ফিরাইতে পারি!

বসন্ত ও মদনের প্রবেশ।

হে অনঙ্গদেব, এ কি রূপ-হুতাশনে
ঘিরেছ আমারে, দগ্ধ হই, দগ্ধ করে'
মরি!

মদন। বল, তম্বি, কালিকার বিবরণ।
মুক্ত পুষ্পশর মো'র কোথা কি সাধিল
কাজ, শুনিতে বাসনা।

চিত্রাঙ্গদা। কাল সন্ধ্যাবেলা,
সরসীর তৃণপুঞ্জ তীরে, পেতেছিনু
পুষ্পশয্যা, বসন্তের ঝরা ফুল দিয়ে।
শ্রান্ত কলেবরে, শুয়েছিনু আপনার
মনে, বামবাহুপরে রাখিয়া অলস
শির; ভাবিতেছিলাম দিবসের কথা।
শুনেছিনু যেই স্তুতি অর্জ্জুনের মুখে,
আনিতেছিলাম মনে প্রতি ক্ষুদ্র কথা
তার, একাকিনী শুয়ে শুয়ে; দিবসের
সঞ্চিত অমৃত হ'তে বিন্দু বিন্দু লয়ে
করিতেছিলাম পান; ভুলিতেছিলাম
পূর্ব্ব ইতিহাস, গতজন্মকথা সম;
যেন আমি রাজকন্যা নহি; যেন মো'র
নাই পূর্ব্বাপর; যেন আমি ধরাতলে
একদিনে উঠেছি ফুটিয়া, অরণ্যের

পিতৃমাতৃহীন ফুল ; একটি প্রভাত
শুধু পরমায়ু, তারি মাঝে শুনে নিতে
হবে—ভ্রমর গুঞ্জনগীতি, বনান্তের
আনন্দ মর্ম্মর ; তার পরে নীলাম্বর
হ'তে নামাইয়া আঁখি, নামাইয়া গ্রীবা,
বায়ুস্পর্শভরে টুটিয়া লুটিয়া যাব
ক্রন্দনবিহীন, মাঝখানে ফুরাইয়া
যাবে কুসুমকাহিনী আদিঅন্তহারা।

বসন্ত। একটি প্রভাতে ফুটে অনন্ত জীবন,
হে সুন্দরি,

মদন। সঙ্গীতে যেমন, ক্ষণিকের
তানে, গুঞ্জরি কাঁদিয়া উঠে অন্তহীন
কথা। তার পরে বল।

চিত্রাঙ্গদা। ভাবিতে ভাবিতে
সর্ব্বাঙ্গে হানিতেছিল ঘুমের হিল্লোল
দক্ষিণের বায়ু। সপ্তপর্ণ শাখা হতে
ফুল্ল মালতীর লতা টুপ্ টাপ্ করি,
মোর গৌর তনুপরে পাঠাইতেছিল
শত নিঃশব্দ চুম্বন ; ফুলগুলি কেহ
চুলে, কেহ পদমূলে, কেহ স্তনতটে
বিছাইল আপনার মরণ শয়ন।
অচেতনে গেল কতক্ষণ। হেন কালে
জানি না কখন্ ঘুমঘোরে, অনুভব
হল, যেন কার মুগ্ধ নয়নের দৃষ্টি
দশ অঙ্গুলির মত পরশ করিছে
রভস-লালসে মোর নিদ্রালস তনু।
চমকি' উঠিনু জাগি'। দেখিনু সন্ন্যাসী
পদপ্রান্তে নির্নিমেষ দাঁড়ায়ে রয়েছে
স্থির প্রতিমূর্ত্তি সম। পূর্ব্বাচল হতে
ধীরে ধীরে সরে' এসে পশ্চিমে হেলিয়া
দ্বাদশীর শশী সমস্ত হিমাংশু রাশি
দিয়াছে ঢালিয়া, স্খলিতবসন মোর
অম্লাননূতন শুভ্র সৌন্দর্য্যের পরে।
পুষ্পগন্ধে পূর্ণ তরুতল ; ঝিল্লিরবে
তন্দ্রামগ্ন-নিশীথিনী ; স্বচ্ছ সরোবরে
অকম্পিত চন্দ্রকরচ্ছায়া ; সুপ্ত বায়ু ;
শিরে লয়ে জ্যোৎস্নালোকে মসৃণ চিক্কণ
রাশি রাশি অন্ধকার পল্লবের ভার
স্তম্ভিত অটবী। সেই মত চিত্রার্পিত
দাঁড়াইয়া দীর্ঘকায় বনস্পতিসম,
দণ্ডধারী ব্রহ্মচারী ছায়াসহচর!
প্রথম সে নিদ্রাভঙ্গে চারিদিকে চেয়ে
মনে হল, কবে কোন্ বিস্মৃত প্রদোষে
জীবন ত্যজিয়া, স্বপ্নজন্ম করিয়াছি
লাভ, কোন্ এক অপরূপ নিদ্রালোকে,
জনশূন্য ম্লানজ্যোৎস্না বৈতরিণী তীরে।
দাঁড়ানু উঠিয়া। মিথ্যা সরম সঙ্কোচ
খসিয়া পড়িল শ্লথ বসনের মত
পদতলে। শুনিলাম, "প্রিয়ে! প্রিয়তমে!"
গম্ভীর আহ্বানে, জন্ম জন্ম শত জন্ম
মোর, উঠিল জাগিয়া এক দেহ মাঝে।
কহিলাম "লহ, লহ, যাহা আছে, সব
লহ জীবন বল্লভ!" দিলাম বাড়ায়ে,
দুই বাহু!—চন্দ্র অস্ত গেল বনান্তরে।
অন্ধকারে ঝাঁপিল মেদিনী। স্বর্গ মর্ত্ত্য
দেশকাল দুঃখসুখ জীবন মরণ
অচেতন হয়ে গেল অসহ্য পুলকে।
প্রভাতের প্রথম কিরণে, বিহঙ্গের
প্রথম সঙ্গীতে, বাম করে দিয়া ভর
ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিনু শয্যাতলে।
দেখিনু চাহিয়া, সুখসুপ্ত বীরবর।
শ্রান্ত হাস্য লেগে আছে ওষ্ঠপ্রান্তে তাঁর
প্রভাতের চন্দ্রকলাসম, রজনীর
আনন্দের শীর্ণ অবশেষ। নিপতিত
উন্নত ললাট-পটে অরুণের আভা ;
মর্ত্ত্যলোকে যেন নব উদয় পর্ব্বতে
নবকীর্ত্তি-সূর্য্যোদয় পাইবে প্রকাশ।
নিঃশ্বাস ফেলিয়া, উঠিনু শয়ন ছাড়ি'

মালতীর লতাজাল দিলাম নামায়ে
সাবধানে, রবিকর করি' অন্তরাল
সুপ্তমুখ হতে।—দেখিলাম চতুর্দ্দিকে
সেই পূর্ব্বপরিচিত প্রাচীন পৃথিবী।
আপনারে আরবার মনে পড়ে' গেল,
ছুটিয়া পলায়ে এনু, নব প্রভাতের
শেফালি-বিকীর্ণ তৃণ বনস্থলী দিয়ে,
আপনার ছায়াত্রস্তা হরিণীর মত।
বিজন বিতানতলে বসি,' করপুটে
মুখ আবরিয়া, কাঁদিবারে চাহিলাম,
এলনা ক্রন্দন।

মদন। হায় মানবনন্দিনি,
স্বর্গের সুখের দিন স্বহস্তে ভাঙ্গিয়া
ধরণীর এক রাত্রি পূর্ণ করি তাহে
যত্নে ধরিলাম তব অধর সম্মুখে;
শচীর প্রসাদসুধা, রতির চুম্বিত,
নন্দনবনের গন্ধে মোদিত-মধুর,
তোমা'রে করানু পান, তবু এ ক্রন্দন!

চি। কারে, দেব, করাইলে পান! কার তৃষা
মিটাইলে! সে চুম্বন, সে প্রেমসঙ্গম
এখনো উঠিছে কাঁপি যে অঙ্গ ব্যাপিয়া
বীণার ঝঙ্কার সম, সে ত মোর নহে!
বহুকাল সাধনায় এক দণ্ড শুধু
পাওয়া যায় প্রথম মিলন, সে মিলন
কে লইল লুঠি' আমারে বঞ্চিত করি'!
সে চিরদুর্লভ মিলনের সুখস্মৃতি
সঙ্গে করে' ঝরে' পড়ে' যাবে, অতিস্ফুট
পুষ্পদল সম, এ মায়া-লাবণ্য মোর;
অন্তরের দরিদ্র রমণী, রিক্তদেহে
বসে' র'বে চির দিনরাত! মীনকেতু,
কোন্ মহা রাক্ষসীরে দিয়াছ বাঁধিয়া
অঙ্গসহচরী করি ছায়ার মতন—
কি অভিসম্পাৎ! চিরন্তন তৃষ্ণাতুর
লোলুপ ওষ্ঠের কাছে আসিল চুম্বন,
সে করিল পান! সেই প্রেমদৃষ্টিপাত
এমনি আগ্রহপূর্ণ, যে অঙ্গেতে পড়ে
সেথা যেন অঙ্কিত করিয়া রেখে যায়
বাসনার রাঙা চিহ্নরেখা, সেই দৃষ্টি
রবিরশ্মিসম, চিররাত্রিতাপসিনী
কুমারীহৃদয়পদ্মপানে ছুটে এল,
সে তাহারে লইল ভুলায়ে!

মদন। কল্য নিশি
ব্যর্থ গেছে তবে! শুধু, কূলের সম্মুখে
এসে আশার তরণী গেছে ফিরে' ফিরে'
তরঙ্গ আঘাতে?

চিত্রাঙ্গদা। কাল'রাত্রে কিছু নাহি
মনে ছিল দেব! সুখস্বর্গ এত কাছে
দিয়েছিল ধরা, পেয়েছি কি না পেয়েছি
করিনি গণনা আত্মবিস্মরণসুখে!
আজ প্রাতে উঠে,' নৈরাশ্যধিক্কারবেগে
অন্তরে অন্তরে টুটিছে হৃদয়! মনে
পড়িতেছে একে একে রজনীর কথা।
বিদ্যুৎবেদনাসহ হতেছে চেতনা
অন্তরে বাহিরে মোর হয়েছে সতীন,
আর তাহা নারিব ভুলিতে। সপত্নীরে
স্বহস্তে সাজায়ে সযতনে, প্রতিদিন
পাঠা'ইতে হবে, আমার আকাঙ্ক্ষা তীর্থ
বাসর-শয্যায়; অবিশ্রাম সঙ্গে রহি'
প্রতিক্ষণ দেখিতে হইবে চক্ষু মেলি'
তাহার আদর। ওগো, দেহের সোহাগে
অন্তর জ্বলিবে হিংসানলে, হেন শাপ
নরলোকে কে পেয়েছে আর! হে অতনু,
বর তব ফিরে' লও!

মদন। যদি ফিরে' লই—
ছলনার আবরণ খুলে' ফেলে' দিয়ে
কাল প্রাতে কোন্ লাজে দাঁড়াইবে আসি
পার্থের সম্মুখে, কুসুম পল্লবহীন
হেমন্তের হিমশীর্ণ লতা? প্রমোদের

প্রথম আস্বাদটুকু দিয়ে,মুখ হতে
সুধাপাত্র কেড়ে নিয়ে চূর্ণ করে' ফেল
যদি ভূমিতলে, কি আঘাতে উঠিবে সে
চমকিয়া, কি আক্রোশে হেরিবে তোমায়!

চিত্রাঙ্গদা। সেও ভাল দেব! এই ছদ্মরূপিণীর
চেয়ে শ্রেষ্ঠ আমি শতগুণে! আপনারে
করিব প্রকাশ; ভাল যদি নাই লাগে,
ঘৃণাভরে চলে' যান যদি, বুক ফেটে
মরি যদি আমি, তবু আমি, আমি র'ব!
সেও ভাল ইন্দ্রসখা!

বসন্ত। শোন মোর কথা!
ফুলের ফুরায় যবে ফুটিবার কাজ
তখন প্রকাশ পায় ফল। যথাকালে
আপনি ঝরিয়া পড়ে' যাবে, তাপক্লিষ্ট
লঘু লাবণ্যের দল; আপন গৌরবে
তখন বাহির হবে; হেরিয়া তোমারে
নূতন সৌভাগ্য বলি' মানিবে ফাল্গুনী!
যাও, ফিরে' যাও, বৎসে, যৌবন উৎসবে!

অর্জ্জুন। চিত্রাঙ্গদা।

চিত্রাঙ্গদা। কি দেখিছ বীর!

অর্জ্জুন। দেখিতেছি পুষ্পবৃন্ত
ধরি', কোমল অঙ্গুলিগুলি রচিতেছে
মালা; নিপুণতা চারুতায় দুই বোনে
মিলি, খেলা করিতেছে যেন, সারাবেলা
চঞ্চল উল্লাসে, অঙ্গুলির আগে আগে।
দেখিতেছি, আর ভাবিতেছি।

চিত্রাঙ্গদা। কি ভাবিছ?

অর্জ্জুন। ভাবিতেছি অমনি সুন্দর করে' ধরে'
সরসিয়া ওই রাঙা পরশের রসে
প্রবাস দিবসগুলি গেঁথে গেঁথে প্রিয়ে
অমনি রচিবে মালা; মাথায় পরিয়া
অক্ষয় আনন্দ হার গৃহে ফিরে' যাব।

চিত্রাঙ্গদা। এ প্রেমের গৃহ আছে?

অর্জ্জুন। গৃহ নাই?

চিত্রাঙ্গদা। নাই।
গৃহে নিয়ে যাবে। বোলো না গৃহের কথা!
গৃহ চির বরষের। নিত্য যাহা থাকে তাই
গৃহে নিয়ে যেয়ো। অরণ্যের ফুল যবে
শুকাইবে, গৃহে কোথা ফেলে' দিবে তারে,
অনাদরে পাষাণের মাঝে! তার চেয়ে
অরণ্যের অন্তঃপুরে, নিত্য নিত্য যেথা
মরিছে অঙ্কুর, পড়িছে পল্লব রাশি,
ঝরিছে কেশর, খসিছে কুসুমদল,
ক্ষণিক জীবনগুলি ফুটিছে টুটিছে
প্রতি পলে পলে,—দিনান্তে আমার খেলা
সাঙ্গ হলে ঝরিব সেথায়, কাননের
শত শত সমাপ্ত সুখের সাথে। কোন
খেদ রহিবে না কারো মনে!

অর্জ্জুন। এই শুধু!

চিত্রাঙ্গদা। শুধু এই। আর কিছু নয়। বীরবর,
তাহে দুঃখ কেন! আলস্যের দিনে যাহা
ভাল লাগে, আলস্যের দিনে তাহা শেষ
করে' ফেল! সুখেরে রাখিলে ধরে'-বেঁধে'
তার বেশী একদণ্ড কাল, দুঃখ হয়ে
ওঠে। যাহা আছে তাই লও, যতক্ষণ
আছে ততক্ষণ রাখ। কামনার কালে
যতটুকু চেয়েছিলে, তৃপ্তির সন্ধ্যায়
তার বেশী আশা করিয়ো না।
দিন গেল।
এই মালা পর' গলে। শ্রান্ত মোর তনু
ওই তব বাহু পরে টেনে লও বীর।
সন্ধি হোক্ অধরের সুখ-সম্মিলনে
ক্ষান্ত করি' মিথ্যা অসন্তোষ। বাহুবন্ধে
এস বন্দী করি দোঁহে দোঁহা প্রণয়ের
সুধাময় চির-পরাজয়ে।

অর্জ্জুন। ওই শোন
প্রিয়তমে, বনান্তের দূর লোকালয়ে
আরতির শান্তিশঙ্খ উঠিল বাজিয়া।

মদন ও বসন্ত।

মদন। আমি পঞ্চশর, সখা; এক শরে হাসি,
অশ্রু এক শরে; এক শরে আশা, অন্য
শরে ভয়; এক শরে বিরহ-মিলন-
আশা-ভয়-দুঃখ-সুখ এক নিমেষেই।

বসন্ত। শ্রান্ত আমি, ক্ষান্ত দাও সখা! হে অনঙ্গ,
সাঙ্গ কর রণরঙ্গ তব। রাত্রিদিন
সচেতন থেকে, তব হুতাশনে আর
কতকাল করিব ব্যজন! মাঝে মাঝে
নিদ্রা আসে চোখে, নত হয়ে পড়ে পাখা
ভস্মে ম্লান হয়ে আসে তপ্তদীপ্তরাশি।
চমকিয়া জেগে, আবার নূতনশ্বাসে
জাগাইয়া তুলি তার নব-উজ্জ্বলতা।
এবার বিদায় দাও সখা!

মদন। জানি তুমি
অনন্ত অস্থির, চিরশিশু। নিত্য তুমি
বন্ধনবিহীন হয়ে দ্যুলোকে ভূর্লোকে
করিতেছ খেলা। একান্ত যতনে যারে
তুলিছ সুন্দর করি' বহুকাল ধরে'
নিমেষে যেতেছ তারে ফেলি' ধূলিতলে
পিছে না ফিরিয়া। আর বেশী দিন নাই;
আনন্দচঞ্চল দিনগুলি, লঘুবেগে,
তব পক্ষ-সমীরণে, হুহু করি' কোথা
যেতেছে উড়িয়া, চ্যুত পল্লবের মত।
হর্ষ অচেতন বর্ষ শেষ হয়ে এল।

অরণ্যে।

অর্জ্জুন। আমি যেন পাইয়াছি, প্রভাতে জাগিয়া
ঘুম হ'তে, স্বপ্নলব্ধ অমূল্য রতন।
রাখিবার স্থান তার নাহি এ ধরার
মৃত্তিকায়; ধরে' রাখে এমন কিরীট
নাই, গেঁথে রাখে হেন সূত্র নাই, ফেলে'
যাই হেন নরাধম নহি; তারে ল'য়ে
চিররাত্রি চিরদিন ক্ষত্রিয়ের বাহু
বদ্ধ হয়ে পড়ে' আছে কর্ত্তব্যবিহীন।

চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ।

চিত্রাঙ্গদা। কি ভাবিছ?

অর্জ্জুন। ভাবিতেছি মৃগয়ার কথা।
ওই দেখ বৃষ্টিধারা আসিয়াছে নেমে
পর্ব্বতের পরে; অরণ্যেতে ঘনঘোর
ছায়া; নির্ঝরিণী উঠেছে দুরন্ত হয়ে,
কলগর্ব্ব-উপহাসে তটের তর্জ্জন
করিতেছে অবহেলা; মনে পড়িতেছে
এমনি বর্ষার দিনে, পঞ্চভ্রাতা মিলে
চিত্রক অরণ্যতলে যেতেম শিকারে।
সারাদিন রৌদ্রহীন স্নিগ্ধ অন্ধকারে
কাটিত উৎসাহে; গুরু গুরু মেঘমন্দ্রে
নৃত্য করি' উঠিত হৃদয়; ঝরঝর
বৃষ্টিজলে, মুখর নির্ঝর কলোল্লাসে
সাবধান পদশব্দ শুনিতে পেত না
মৃগ; চিত্রব্যাঘ্র পঞ্চনখচিহ্নরেখা
রেখে যেত পথপঙ্কপরে, দিয়ে যেত
আপনার গৃহের সন্ধান। কেকারবে
ধ্বনিত' অরণ্যভূমি। শিকার সমাধা
হলে পঞ্চসঙ্গী পণ করি' সন্তরণে
হইতাম পার, বর্ষার সৌভাগ্যগর্ব্বে
স্ফীত তরঙ্গিনী। সেই মত বাহিরিব
মৃগয়ায়, করিয়াছি মনে।

চিত্রাঙ্গদা। হে শিকারি,
যে মৃগয়া আরম্ভ করেছ, আগে তাই
হোক্ শেষ! তবে কি জেনেছ স্থির
এই স্বর্ণ মায়ামৃগ তোমারে দিয়েছে
ধরা! নহে, তাহা নহে। এ বন্য-হরিণী
আপনি রাখিতে নারে আপনারে ধরি'!
চকিতে ছুটিয়া যায় কে জানে কখন্
স্বপনের মত। ক্ষণিকের খেলা সহে,

চিরদিবসের পাশ বহিতে পারে না।
ওই চেয়ে দেখ, যেমন করিছে খেলা
বায়ুতে বৃষ্টিতে,—শ্যাম বর্ষা হানিতেছে
নিমেষে সহস্র শর বায়ুপৃষ্ঠপরে,
তবু সে দুরন্ত মৃগ মাতিয়া বেড়ায়
অক্ষত অজেয়;—তোমাতে আমাতে, নাথ,
সেই মত খেলা, আজি বরষার দিনে ;—
চঞ্চলারে করিবে শিকার, প্রাণপণ
করি' ; যত শর, যত অস্ত্র আছে তূণে
একাগ্র আগ্রহভরে করিবে বর্ষণ।
কভু অন্ধকার, কভু বা চকিত আলো
চমকিয়া হাসিয়া মিলায়, কভু স্নিগ্ধ
বৃষ্টি বরিষণ, কভু দীপ্ত বজ্রজ্বালা।
মায়ামৃগী ছুটিয়া বেড়ায়, মেঘাচ্ছন্ন
জগতের মাঝে, বাধাহীন চিরদিন।

মদন ও চিত্রাঙ্গদা।

চি। হে মন্মথ, কি জানি কি দিয়েছ মাখায়ে
সর্ব্বদেহে মোর ! তীব্র মদিরার মত
রক্ত সাথে মিশে', উন্মাদ করেছে মোরে !
আপনার গতিগর্ব্বে মত্ত মৃগী আমি,
ধাইতেছি মুক্তকেশে, উচ্ছ্বসিত বেশে
পৃথিবী লঙ্ঘিয়া। ধনুর্দ্ধর ঘনশ্যাম
ব্যাধেরে আমার, করিয়াছি পরিশ্রান্ত
আশাহত প্রায়, ফিরাতেছি পথে পথে
বনে বনে তারে। নির্দ্দয় বিজয়সুখে
হাসিতেছি কৌতুকের হাসি। এ খেলায়
ভঙ্গ দিতে হইতেছে ভয়, একদণ্ড
স্থির হলে পাছে, ক্রন্দনে হৃদয় ভরে'
ফেটে' পড়ে' যায় !

মদন। থাক্ ! ভাঙিয়োনা খেলা।
এ খেলা আমার ! ছুটুক্ ছুটুক্ বাণ,
টুটুক্ হৃদয় ! আমার মৃগয়া আজি
অরণ্যের মাঝখানে নবীন বর্ষায় !
দাও দাও শ্রান্ত করে' দাও ; কর তারে
পদানত; বাঁধ তারে দৃঢ়পাশে ; দয়া
করিয়ো না, হাসিতে জর্জ্জর করে' দাও,
অমৃতে-বিষেতে-মাখা খর বাক্যবাণ
হান বুকে ! শিকারে দয়া'র বিধি নাই !

অর্জ্জুন। চিত্রাঙ্গদা।

অর্জ্জুন। কোন গৃহ নাই তব প্রিয়ে, যে ভবনে
কাঁদিছে বিরহে তবে প্রিয় পরিজন ?
নিত্য স্নেহ-সেবা দিয়ে যে আনন্দপুরী
রেখেছিলে সুধামগ্ন করে', যেথাকার
প্রদীপ নিবায়ে দিয়ে এসেছ চলিয়া
অরণ্যের মাঝে ? আপন শৈশবস্মৃতি
যেথায় কাঁদিতে যায় হেন স্থান নাই ?

চিত্রাঙ্গদা। প্রশ্ন কেন ? তবে কি আনন্দ
মিটে গেছে ?
যা' দেখিছ তাই আমি, আর কিছু নাই
পরিচয় ! প্রভাতে এই যে দুলিতেছে
কিংশুকের একটি পল্লব প্রান্তভাগে
একটি শিশির, এর কোন নামধাম
আছে ? এর কি শুধায় কেহ পরিচয় ?
তুমি যারে ভালবাসিয়াছ, সে এমনি
শিশিরের কণা, নামধামহীন।

অর্জ্জুন। কিছু
তার নাই কি বন্ধন পৃথিবীতে ? এক
বিন্দু স্বর্গ শুধু ভূমিতলে ভুলে' পড়ে'
গেছে ?

চিত্রাঙ্গদা। তাই বটে। শুধু নিমেষের তরে
দিয়েছে আপন উজ্জ্বলতা অরণ্যের
কুসুমেরে।

অর্জ্জুন। তাই সদা হারাই হারাই
করে প্রাণ, তৃপ্তি নাহি পাই, শান্তি নাহি
মানি। সুদুর্লভে, আরো কাছাকাছি এস !
মানুষের মত, নামধামগোত্রগৃহ-

দেহমনবাক্যে, সহস্র বন্ধনে দাও
ধরা। চারিপার্শ্ব হ'তে পরশি তোমারে,
নির্ভয় নির্ভরে করি বাস। নাম নাই?
তবে কোন্ প্রেমমন্ত্রে জপিব তোমারে
হৃদয় মন্দির মাঝে? গোত্র নাই? তবে
কি মৃণালে এ কমল ধরিয়া রাখিব?

চিত্রাঙ্গদা। নাই, নাই, নাই!—যারে বাঁধিবারে চাও
কখনো সে বন্ধন জানেনি। সে কেবল
মেঘের সুবর্ণছটা, গন্ধ কুসুমের,
তরঙ্গের গতি।

অর্জ্জুন। তাহারে যে ভালবাসে
অভাগা সে। প্রিয়ে, দিয়ো না প্রেমের হাতে
আকাশকুসুম। বুকে রাখিবার ধন
দাও তারে, সুখে দুঃখে সুদিনে দুর্দ্দিনে।

চিত্রা। এখনো যে বর্ষ যায় নাই, শ্রান্তি এরি
মাঝে? হায় হায় এখন বুঝিনু, পুষ্প
স্বল্প-পরমায়ু দেবতার আশীর্ব্বাদে।
গত বসন্তের যত মৃত পুষ্প সাথে
ঝরিয়া পড়িত যদি এ মোহন তনু
আদরে মরিত তবে। বেশী দিন নহে
পার্থ! যে ক'দিন আছে, আশা মিটাইয়া
কুতূহলে, আনন্দের মধুটুকু তার
নিঃশেষ করিয়া কর পান। এর পরে
বারবার আসিয়ো না স্মৃতির কুহকে
ফিরে, ফিরে,' গত সায়াহ্নের চ্যুতবৃন্ত
মাধবীর আশে, তৃষিত ভৃঙ্গের মত।

বনচরগণ। অর্জ্জুন।

বনচর। হায় হায় কে রক্ষা করিবে!

অর্জ্জুন। কি হয়েছে?

বনচর। উত্তর পর্ব্বত হতে আসিছে ছুটিয়া
দস্যুদল, বরষার পার্ব্বত্য বন্যার
মত বেগে, বিনাশ করিতে লোকালয়।

অর্জ্জুন। এ রাজ্যে রক্ষক কেহ নাই?

বনচর। রাজকন্যা
চিত্রাঙ্গদা আছিলেন দুষ্টের দমন;
তাঁর ভয়ে রাজ্যে নাহি ছিল কোন ভয়,
যমভয় ছাড়া। শুনেছি গেছেন তিনি
তীর্থ-পর্য্যটনে, অজ্ঞাত ভ্রমণব্রত।

অর্জ্জুন। এ রাজ্যের রক্ষক রমণী?

বনচর। এক দেহে
তিনি পিতামাতা অনুরক্ত প্রজাদের।
স্নেহে তিনি রাজমাতা, বীর্য্যে যুবরাজ।

(প্রস্থান

চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ।

চিত্রাঙ্গদা। কি ভাবিছ নাথ?

অর্জ্জুন। রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা,
কেমন না জানি তাই ভাবিতেছি মনে।
প্রতিদিন শুনিতেছি শতমুখ হতে
তারি কথা, নব নব অপূর্ব্ব কাহিনী।

চিত্রা। কুৎসিত, কুরূপ! এমন বঙ্কিম ভুরু
নাই তার, এমন নিবিড় কৃষ্ণতারা।
কঠিন সবল বাহু বিঁধিতে শিখেছে
লক্ষ্য, বাঁধিতে পারে না বীরতনু, হেন
সুকোমল নাগপাশে।

অর্জ্জুন। কিন্তু শুনিয়াছি,
স্নেহে নারী বীর্য্যে সে পুরুষ।

চিত্রাঙ্গদা। ছিছি, সেই
তার মন্দভাগ্য! নারী যদি নারী হয়
শুধু, শুধু ধরণীর শোভা, শুধু আলো,
শুধু ভালবাসা, শুধু সুমধুর ছলে,
শতরূপ ভঙ্গিমায় পলকে পলকে
লুটায়ে জড়ায়ে বেঁকে বেঁধে' হেসে কেঁদে
সেবায় সোহাগে ছেয়ে চেয়ে থাকে সদা

তবে তার সার্থক জনম ! কি হইবে
কর্ম্মকীর্ত্তি বীর্য্যবল শিক্ষা দীক্ষা তার !
হে পৌরব, কাল যদি দেখিতে তাহারে
এই বন-পথপার্শ্বে, এই পূর্ণাতীরে,
ওই দেবালয় মাঝে—হেসে চলে' যেতে !
হায় হায়, আজ এত হয়েছে অরুচি
নারীর সৌন্দর্য্যে, নারীতে খুঁজিতে চাও
পৌরুষের স্বাদ !
এস নাথ, ওই দেখ
গাঢ়চ্ছায়া শৈলগুহামুখে, বিছাইয়া
রাখিয়াছি আমাদের মধ্যাহ্ন-শয়ন,
কচি কচি পীত শ্যাম কিশলয় তুলি'
আর্দ্র করি' ঝরনার শীকরনিকরে।
গভীর পল্লবছায়ে বসি,' ক্লান্তকণ্ঠে
কাঁদিছে কপোত, "বেলা যায়" "বেলা যায়"
বলি'। কুলু কুলু বহিয়া চলেছে নদী
ছায়াতল দিয়া। শিলাখণ্ডে স্তরে স্তরে
সরস সুস্নিগ্ধ সিক্ত শ্যামল শৈবাল
নয়ন চুম্বন করে কোমল অধরে।
এস নাথ বিরল বিরামে !

অর্জ্জুন। আজ নহে প্রিয়ে !

চিত্রাঙ্গদা। কেন নাথ ?

অর্জ্জুন। শুনিয়াছি দস্যুদল
আসিছে নাশিতে জনপদ। ভীতজনে
করিব রক্ষণ।

চিত্রাঙ্গদা। কোন ভয় নাই প্রভু !
তীর্থযাত্রাকালে, রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা
স্থাপন করিয়া গেছে সতর্ক প্রহরী
দিকে দিকে; বিপদের যত পথ ছিল
বন্ধ করে' দিয়ে গেছে বহু তর্ক করি'।

অর্জ্জুন। তবু আজ্ঞা কর, প্রিয়ে, স্বল্পকালতরে
করে' আসি কর্ত্তব্য সন্ধান। বহুদিন
রয়েছে অলস হয়ে ক্ষত্রিয়ের বাহু।
সুমধামে, ক্ষীণকীর্ত্তি এই ভুজদ্বয়
পুনর্ব্বার নবীন গৌরবে ভরি' আনি'
তোমার মস্তকতলে যতনে রাখিয়া
দিব, হবে তব যোগ্য উপধান।

চিত্রাঙ্গদা। যদি
নাই যেতে দিই ? যদি বেঁধে রাখি ? ছিন্ন
করে' যাবে ? তাই যাও ! কিন্তু মনে রেখো
ছিন্ন লতা যোড়া নাহি লাগে। যদি তৃপ্তি
হয়ে থাকে, তবে যাও করিব না মানা ;
যদি তৃপ্তি নাহি হয়ে থাকে, তবে মনে
রেখো, চঞ্চলা সুখের লক্ষ্মী, কারো তরে
বসে' নাহি থাকে ! সে কাহারো
সেবাদাসী
নহে। তার সেবা করে নরনারী, অতি
ভয়ে ভয়ে, নিশিদিন রাখে চোখে চোখে
যতদিন প্রসন্ন সে থাকে। রেখে যাবে
যারে সুখের কলিকা, কর্ম্মক্ষেত্র হতে
ফিরে এসে সন্ধ্যাকালে দেখিবে তাহার
দলগুলি ফুটে' ঝরে' পড়ে' গেছে ভূমে ;
সব কর্ম্ম ব্যর্থ মনে হবে ! চিরদিন
রহিবে জীবন মাঝে জীবন্ত অতৃপ্তি
ক্ষুধাতুরা। এস, নাথ, বস। কেন আজি
এত অন্যমন ? কার কথা ভাবিতেছ ?
চিত্রাঙ্গদা ? আজ তার এত ভাগ্য কেন ?

অর্জ্জুন। ভাবিতেছি বীরাঙ্গনা কিসের লাগিয়া
ধরেছে দুষ্কর ব্রত ? কি অভাব তার ?

চিত্রা। কি অভাব তার ? কি ছিল সে অভাগীর
বীর্য্য তার অভ্রভেদী দুর্গ সুদুর্গম
রেখেছিল চতুর্দ্দিকে অবরুদ্ধ করি'
ক্রন্দমান রমণীহৃদয়। রমণী ত
সহজেই অন্তরবাসিনী ; সঙ্গোপনে
থাকে আপনাতে ; কে তারে দেখিতে পায়,
হৃদয়ের প্রতিবিম্ব দেহের শোভায়
প্রকাশ না পায় যদি ! কি অভাব তার ?
অরুণ-লাবণ্য-লেখা-চিরনির্ব্বাপিত

উষার মতন, যে রমণী আপনার
শতস্তর তিমিরের তলে বসে' থাকে
বীর্য্যশৈলশৃঙ্গপরে নিত্য-একাকিনী
কি অভাব তার! থাক্, থাক্, তার কথা।
পুরুষের শ্রুতি-সুমধুর নহে, তার
ইতিহাস।

অর্জ্জুন। বল বল। শ্রবণলালসা
ক্রমশ বাড়িছে মোর। হৃদয় তাহার
করিতেছি অনুভব হৃদয়ের মাঝে।
যেন পান্থ আমি, প্রবেশ করেছি গিয়া
কোন্ অপরূপ দেশে অর্দ্ধ রজনীতে।
নদী গিরি বনভূমি সুপ্তিনিমগন,
শুভ্রসৌধকিরীটিনী উদার নগরী
ছায়াসম অর্দ্ধস্ফুট দেখা যায়, শুনা
যায় সাগর গর্জ্জন; প্রভাত প্রকাশে
বিচিত্র বিস্ময়ে যেন ফুটিবে চৌদিক;
প্রতীক্ষা করিয়া আছি উৎসুক হৃদয়ে
তারি তরে।' বল বল শুনি তার কথা!

চিত্রাঙ্গদা। কি আর শুনিবে?

অর্জ্জুন। দেখিতে পেতেছি তারে!
অশ্বারোহী, অবহেলে বাম করে বল্গা
ধরি' দক্ষিণেতে শরাসন, নগরের
বিজয়লক্ষ্মীর মত, আর্ত্ত প্রজাগণে
করিছেন বরাভয় দান। দরিদ্রের
সঙ্কীর্ণ দুয়ারে, রাজার মহিমা যেথা
নত হয় প্রবেশ করিতে, মাতৃরূপ
ধরি' সেথা, করিছেন দয়া বিতরণ।
সিংহিনীর মত, চারিদিকে আপনার
বৎসগণে রয়েছেন আগলিয়া, শত্রু
কেহ কাছে নাহি আসে ডরে। ফিরিছেন
মুক্তলজ্জা, ভয়হীনা, প্রসন্নহাসিনী,
বীর্য্যসিংহ পরে চড়ি' জগদ্ধাত্রী দয়া।
রমণীর কমনীয় দুই বাহু পরে
স্বাধীন সে অসঙ্কোচ বল, ধিক্ থাক্
তার কাছে রুনুঝুনু কঙ্কণ কিঙ্কিণী!
অয়ি বরারোহে! বহুদিন কর্ম্মহীন
এ পরাণ মোর, উঠিছে অশান্ত হয়ে
দীর্ঘ শীত-সুপ্তোত্থিত ভুজঙ্গের মত।
এস এস দোঁহে দুই মত্ত অশ্ব লয়ে
পাশাপাশি ছুটে চলে যাই, মহাবেগে
দুই দীপ্ত জ্যোতিষ্কের মত। বাহিরিয়া
যাই, এই রুদ্ধ সমীরণ, এই তিক্ত
পুষ্পগন্ধমদিরায় নিদ্রাঘনঘোর
অরণ্যের অন্ধগর্ত্ত হতে।

চিত্রাঙ্গদা। হে কৌন্তেয়!
যদি এ লালিত্য, এই কোমল ভীরুতা,
স্পর্শক্লেশসকাতর শিরীষপেলব
এই রূপ, ছিন্ন করে' ঘৃণাভরে ফেলি
পদতলে, পরের বসনখণ্ড সম,—
সে ক্ষতি কি সহিতে পারিবে? কামিনীর
ছলাকলা মায়ামন্ত্র দূর করে' দিয়ে
উঠিয়া দাঁড়াই যদি সরল উন্নত
বীর্য্যমন্ত অন্তরের বলে, পর্ব্বতের
তেজস্বী তরুণ তরুসম, বায়ুভরে
আনম্র সুন্দর, কিন্তু লতিকার মত
নহে নিত্য কুণ্ঠিত লুণ্ঠিত;—সেকি ভাল
লাগিবে পুরুষ চোখে।—থাক্ থাক্ তার
চেয়ে এই ভাল। আপন যৌবনখানি
দুদিনের বহুমূল্য ধন, সাজাইয়া
সযতনে, পথচেয়ে বসিয়া রহিব;
অবসরে আসিবে যখন, আপনার
সুধাটুকু দেহপাত্রে আকর্ণ পূরিয়া
করাইব পান; সুখস্বাদে শ্রান্তি হলে
চলে' যাবে কর্ম্মের সন্ধানে; পুরাতন
হলে, যেথা স্থান দিবে, সেথায় রহিব
পার্শ্বে পড়ি'! যামিনীর নর্ম্মসহচরী
যদি হয় দিবসের কর্ম্মসহচরী,
সতত প্রস্তুত থাকে বামহস্ত সম

দক্ষিণ হস্তের অনুচর, সে কি ভাল
লাগিবে বীরের প্রাণে?
অৰ্জ্জুন। বুঝিতে পারিনে
আমি রহস্য তোমার! এতদিন আছি,
তবু যেন পাইনি সন্ধান! তুমি যেন
বঞ্চিত করিছ মোরে গুপ্ত থেকে সদা;
তুমি যেন দেবীর মতন, প্রতিমার
অন্তরালে থেকে, আমারে করিছ দান
অমূল্য চুম্বন রত্ন, আলিঙ্গন সুধা;
নিজে কিছু চাহ না, লহ না! অঙ্গহীন
ছন্দোহীন প্রেম প্রতিক্ষণে পরিতাপ
জাগায় অন্তরে! তেজস্বিনি, পরিচয়
পাই তব মাঝে মাঝে কথায় কথায়।
তার কাছে এ সৌন্দর্য্যরাশি, মনে হয়
মৃত্তিকার মূর্ত্তি শুধু, নিপুণ চিত্রিত
শিল্প যবনিকা। মাঝে মাঝে মনে হয়
তোমারে তোমার রূপ ধারণ করিতে
পারিছে না আর, কাঁপিতেছে টলমল
করি'। নিত্যদীপ্ত হাসিটির মাঝে
ভরা অশ্রু করিতেছে বাস, মাঝে মাঝে
ছলছল করে' ওঠে, মুহূর্ত্তের মাঝে
ফাটিয়া পড়িবে যেন আবরণ টুটি'।
সাধকের কাছে, প্রথমেতে ভ্রান্তি আসে
মনোহর মায়া-কায়া ধরি'; তার পরে
সত্য দেখা দেয়, ভূষণবিহীনরূপে
আলো করি' অন্তর বাহির! সেই সত্য
কোথা আছে তোমার মাঝারে, দাও তারে!
আমার যে সত্য তাই লও! শ্রান্তিহীন
সে মিলন চিরদিবসের। অশ্রু কেন
প্রিয়ে? বাহুতে লুকায়ে মুখ কেন এই
ব্যাকুলতা! বেদনা দিয়েছি প্রিয়তমে?
তবে থাক্ তবে থাক্! ওই মনোহর
রূপ পুণ্যফল মোর! এই যে সঙ্গীত
শোনা যায় মাঝে মাঝে বসন্ত সমীরে
এ যৌবন যমুনার পরপারে হতে,
এই মোর বহুভাগ্য! এ বেদনা মোর
সুখের অধিক সুখ, আশার অধিক
আশা, হৃদয়ের চেয়ে বড়, তাই তারে
হৃদয়ের ব্যথা বলে'—মনে হয় প্রিয়ে।

মদন। বসন্ত। চিত্রাঙ্গদা।

মদন। শেষ রাত্রি আজি!
বসন্ত। আজ রাত্রি অবসানে
তব অঙ্গ-শোভা, ফিরে' যাবে বসন্তের
অক্ষয় ভাণ্ডারে। পার্থের চুম্বনস্মৃতি
ভুলে' গিয়ে, তব ওষ্ঠ-রাগ, দুটি নব
কিশলয়ে মঞ্জরি' উঠিবে লতিকায়।
অঙ্গের বরণ তব, শত শ্বেত ফুলে
ধরিয়া নূতন তনু, গতজন্মকথা
ত্যজিবে স্বপ্নের মত নব জাগরণে
চিত্রাঙ্গদা। হে অনঙ্গ, হে বসন্ত, আজ রাত্রে তবে
এ মুমূর্ষু রূপ মোর, শেষ রজনীতে
শ্রান্ত প্রদীপের অন্তিম শিখার মত—
আচম্বিতে উঠুক্ উজ্জ্বলতম হয়ে।
মদন। তবে তাই হোক্! সখা দক্ষিণ পবন
দাও ভরে নিঃশ্বসিয়া প্রাণপূর্ণ বেগে।
অঙ্গে অঙ্গে উঠুক্ উচ্ছ্বসি পুনর্ব্বার
নবোল্লাসে যৌবনের ক্লান্ত মন্দ স্রোত।
আমি মোর পঞ্চ পুষ্পশরে নিশীথের
নিদ্রাভেদ করি', ভোগবতী তটিনীর
তরঙ্গ উচ্ছ্বাসে প্লাবিত করিয়া দিব
বাহুপাশে বদ্ধ দুটি প্রেমিকের তনু।

শেষ রাত্রি। অৰ্জ্জুন। চিত্রাঙ্গদা।

চিত্রাঙ্গদা। প্রভু, মিটিয়াছে সাধ? এই সুললিত
সুগঠিত নবনী কোমল সৌন্দর্য্যের
যত গন্ধ যত মধু ছিল, সকলি কি
করিয়াছ পান! আর কিছু বাকি আছে?

আর কিছু চাও? আমার যা কিছু ছিল
সব হয়ে গেছে শেষ?—হয় নাই প্রভু!
ভাল হোক্, মন্দ হোক্, আরো কিছু বাকী
আছে, সে আজিকে দিব।
প্রিয়তম, ভাল
লেগেছিল বলে' করেছিনু নিবেদন
এ সৌন্দর্য্য-পুষ্পরাশি চরণকমলে—
নন্দনকানন হতে তুলে' নিয়ে এসে
বহু সাধনায়! যদি সাঙ্গ হল পূজা
তবে আজ্ঞা কর প্রভু, নির্ম্মাল্যের ডালি
ফেলে দিই মন্দির বাহিরে! এইবার
প্রসন্ন নয়নে চাও সেবিকার পানে!
যে ফুলে করেছি পূজা, নহি আমি কভু
সে ফুলের মত প্রভু এত সুমধুর,
এত সুকোমল, এত সম্পূর্ণ সুন্দর!
দোষ আছে, গুণ আছে, পাপ আছে, পুণ্য
আছে; কত দৈন্য আছে; আছে আজন্মের
কত অতৃপ্ত তিয়াষা! সংসার-পথের
পান্থ, ধূলিলিপ্ত বাস, বিক্ষত চরণ;
কোথা পাব কুসুম-লাবণ্য, দুদণ্ডের
জীবনের অকলঙ্ক শোভা! কিন্তু আছে
অক্ষয় অমর এক রমণী হৃদয়!
দুঃখ সুখ আশা ভয় লজ্জা দুর্ব্বলতা—
ধূলিময়ী ধরণীর কোলের সন্তান,
তার কত ভ্রান্তি, তার কত ব্যথা তার
কত ভালবাসা, মিশ্রিত জড়িত হয়ে
আছে এক সাথে!—আছে এক সীমাহীন
অপূর্ণতা, অনন্ত মহৎ। কুসুমের
সৌরভ মিলায়ে থাকে যদি এইবার
সেই জন্ম জন্মান্তের সেবিকার পানে
চাও!

সূর্য্যোদয়। (অবগুণ্ঠন খুলিয়া)

আমি চিত্রাঙ্গদা! রাজেন্দ্রনন্দিনী।
হয় ত পড়িবে মনে, সেই একদিন
সেই সরোবরতীরে, শিবালয়ে, দেখা
দিয়েছিল এক নারী, বহু আভরণে
ভারাক্রান্ত করি' তার রূপহীন তনু।
কি জানি কি বলেছিল নির্লজ্জ মুখরা,
পুরুষের করেছিল পুরুষ প্রথায়
আরাধনা; প্রত্যাখ্যান করেছিলে তারে।
ভালই করেছ। সামান্য সে নারীরূপে
গ্রহণ করিতে যদি তারে, অনুতাপ
বিঁধিত তাহার বুকে আমরণ কাল।
প্রভু আমি সেই নারী। তবু আমি সেই
নারী নহি; সে আমার হীন ছদ্মবেশ।
তার পরে পেয়েছিনু বসন্তের বরে
বর্ষ কাল অপরূপ রূপ। দিয়েছিনু
শ্রান্ত করি' বীরের হৃদয়, ছলনায়
ভারে। সেও আমি নহি।
আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি' রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই, অবহেলা করি' পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সঙ্কটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর'
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর' সহচরী
আমার পাইবে তবে পরিচয়। গর্ভে
আমি ধরেছি যে সন্তান তোমার, যদি
পুত্র হয়, আশৈশব বীরশিক্ষা দিয়ে
দ্বিতীয় অর্জ্জুন করি' তারে একদিন
পাঠাইয়া দিব যবে পিতার চরণে,
তখন জানিবে মোরে প্রিয়তম!
আজ
শুধু নিবেদি চরণে, আমি চিত্রাঙ্গদা,
রাজেন্দ্রনন্দিনী।

অর্জ্জুন। প্রিয়ে, আজ ধন্য আমি।

বিদায়-অভিশাপ।

[দেবগণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া বৃহস্পতিপুত্র কচ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের নিকট হইতে সঞ্জী-বনী বিদ্যা শিখিবার নিমিত্ত তৎসমীপে গমন করেন। সেখানে সহস্র বৎসর অতিবাহ- করিয়া এবং নৃত্যগীতবাদ্য দ্বারা শুক্রদুহিতা দেবযানীর মনোরঞ্জনপূর্ব্বক সিদ্ধকাম হইয়া ক- দেবলোকে প্রত্যাগমন করেন। দেবযানীর নিকট হইতে বিদায়কালীন ব্যাপার প- বিবৃত হইল।]

কচ ও দেবযানী।

কচ। দেহ আজ্ঞা, দেবযানী, দেবলোকে দাস
করিবে প্রয়াণ। আজি গুরুগৃহবাস
সমাপ্ত আমার। আশীর্ব্বাদ কর মোরে
যে বিদ্যা শিখিনু তাহা চিরদিন ধরে'
অন্তরে জাজ্বল্য থাকে উজ্জ্বল রতন,
সুমেরুশিখরশিরে সূর্য্যের মতন,
অক্ষয় কিরণে।

দেবযানী। মনোরথ পুরিয়াছে,
পেয়েছ দুর্লভ বিদ্যা আচার্য্যের কাছে,
সহস্রবর্ষের তব দুঃসাধ্য সাধনা
সিদ্ধ আজি; আর কিছু নাহি কি কামনা
ভেবে দেখ মনে মনে!

কচ। আর কিছু নাহি।

দেবযানী। কিছু নাই? তবু আরবার দেখ চাহি
অবগাহি হৃদয়ের সীমান্ত অবধি
করহ সন্ধান; অন্তরের প্রান্তে যদি
কোন বাঞ্ছা থাকে, কুশের অঙ্কুরসম
ক্ষুদ্র দৃষ্টি-অগোচর, তবু তীক্ষ্ণতম!

কচ। আজি পূর্ণ কৃতার্থ জীবন। কোন ঠাঁ-
মোর মাঝে কোন দৈন্য কোন শূন্য নাই
সুলক্ষণে!

দেবযানী। তুমি সুখী ত্রিজগৎ মাঝে!
যাও তবে ইন্দ্রলোকে আপনার কাজে
উচ্চশিরে গৌরব বহিয়া! স্বর্গপুরে
উঠিবে আনন্দধ্বনি, মনোহর সুরে
বাজিবে মঙ্গল-শঙ্খ, সুরাঙ্গনাগণ
করিবে তোমার শিরে পুষ্প বরিষণ
সদ্যছিন্ন নন্দনের মন্দার-মঞ্জরী।
স্বর্গপথে কলকণ্ঠে অপ্সরী কিন্নরী
দিবে হুলুধ্বনি। আহা, বিপ্র, বহুক্লেশে
কেটেছে তোমার দিন বিজনে বিদেশে
সুকঠোর অধ্যয়নে! নাহি ছিল কেহ

স্মরণ করায়ে দিতে সুখময় গেহ,
নিবারিতে প্রবাস বেদনা। অতিথিরে
যথাসাধ্য পূজিয়াছি দরিদ্রকুটীরে
যাহা ছিল দিয়ে। তাই বলে' স্বর্গসুখ
কোথা পাব, কোথা হেথা অনিন্দিত মুখ
সুরললনার! বড় আশা করি মনে
আতিথ্যের অপরাধ রবে না স্মরণে
ফিরে গিয়ে সুখলোকে!

কচ। সুকল্যাণ হাসে
প্রসন্ন বিদায় আজি দিতে হবে দাসে!

দেব। হাসি? হায় সখা, এত স্বর্গপুরী নয়!
পুষ্পে কীটসম হেথা তৃষ্ণা জেগে রয়
মর্ম্মমাঝে, বাঞ্ছা ঘুরে বাঞ্ছিতেরে ঘিরে,
লাঞ্ছিত ভ্রমর যথা বারংবার ফিরে
মুদ্রিত পদ্মের কাছে। হেথা সুখ গেলে'
স্মৃতি একাকিনী বসি দীর্ঘশ্বাস ফেলে
শূন্যগৃহে; হেথায় সুলভ নহে হাসি।
যাও বন্ধু, কি হইবে মিথ্যা কাল নাশি,
উৎকণ্ঠিত দেবগণ।—যেতেছ চলিয়া?
সকলি সমাপ্ত হল দু'কথা বলিয়া!
দশশত বর্ষ পরে এই কি বিদায়?

কচ। দেবযানী, কি আমার অপরাধ!

দেবযানী। হায়!
সুন্দরী অরণ্যভূমি সহস্র বৎসর
দিয়েছে বল্লভ ছায়া, পল্লবমর্ম্মর,
শুনায়েছে বিহঙ্গকূজন,—তারে আজি
এতই সহজে ছেড়ে যাবে? তরুরাজি
ম্লান হয়ে আছে যেন, হের আজিকার
বনচ্ছায়া গাঢ়তর শোকে অন্ধকার,
কেঁদে ওঠে বায়ু, শুষ্ক পত্র ঝরে' পড়ে,
তুমি শুধু চলে' যাবে সহাস্য অধরে
নিশান্তের সুখস্বপ্নসম?

কচ। দেবযানী,
এ বনভূমিরে আমি মাতৃভূমি মানি,
হেথা মোর নবজন্মলাভ। এর পরে
নাহি মোর অনাদর,—চির প্রীতিভরে
চিরদিন করিব স্মরণ।

দেবযানী। এই সেই
বটতল, যেথা তুমি প্রতি দিবসেই
গোধন চরাতে এসে পড়িতে ঘুমায়ে
মধ্যাহ্নের খরতাপে; ক্লান্ত তব কায়ে
অতিথিবৎসল তরু দীর্ঘ ছায়াখানি
দিত বিছাইয়া, সুখসুপ্তি দিত আনি
ঝর্ঝর পল্লবদলে করিয়া বীজন
মৃদুস্বরে;—যেয়ো সখা, তবু কিছুক্ষণ
পরিচিত তরুতলে বস শেষবার
নিয়ে যাও সম্ভাষণ এ স্নেহছায়ার;—
দুই দণ্ড থেকে যাও, সে বিলম্বে তব
স্বর্গের হবে না কোন ক্ষতি!

কচ। অভিনব
বলে' যেন মনে হয় বিদায়ের ক্ষণে
এই সব চিরপরিচিত বন্ধুগণে;
পলাতক প্রিয়জনে বাঁধিবার তরে
করিছে বিস্তার সবে ব্যগ্র স্নেহভরে
নূতন বন্ধনজাল, অন্তিম মিনতি,
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরাশি। ওগো বনস্পতি,
আশ্রিতজনের বন্ধু, করি নমস্কার!
কত পান্থ বসিবেক ছায়ায় তোমার,
কত ছাত্র কত দিন আমার মতন
প্রচ্ছন্ন প্রচ্ছায়তলে নীরব নির্জ্জন
তৃণাসনে, পতঙ্গের মৃদুগুঞ্জস্বরে,
করিবেক অধ্যয়ন; প্রাতঃস্নান পরে
ঋষিবালকেরা আসি সজল বল্কল
শুকাবে তোমার শাখে; রাখালের দল
মধ্যাহ্নে করিবে খেলা, ওগো তারি মাঝে
এ পুরাণো বন্ধু যেন স্মরণে বিরাজে!

দেব। মনে রেখো আমাদের হোমধেনুটিরে;

স্বর্গসুধা পান করে' সে পুণ্য গাভীরে
ভুলো না গরবে!
কচ। সুধা হতে সুধাময়
দুগ্ধ তার; দেখে তারে পাপক্ষয় হয়,
মাতৃরূপা, শান্তিস্বরূপিণী, শুভ্রকান্তি
পয়স্বিনী। না মানিয়া ক্ষুধ'তৃষা শ্রান্তি
তারে করিয়াছি সেবা; গহন কাননে
শ্যামশষ্প স্রোতস্বিনী তীরে, তারি সনে
ফিরিয়াছি দীর্ঘ দিন; পরিতৃপ্তিভরে
স্বেচ্ছামতে ভোগ করি' নিম্নতট পরে
অপর্য্যাপ্ত তৃণরাশি সুস্নিগ্ধ কোমল—
আলস্য-মন্থর তনু লভি' তরুতল
রোমন্থ করেছে ধীরে শুয়ে তৃণাসনে
সারাবেলা; মাঝে মাঝে বিশাল নয়নে
সকৃতজ্ঞ শান্ত দৃষ্টি মেলি,' গাঢ়স্নেহ
চক্ষু দিয়া লেহন করেছে মোর দেহ।
মনে রবে সেই দৃষ্টি স্নিগ্ধ অচঞ্চল,
পরিপুষ্ট শুভ্র তনু চিক্কণ পিচ্ছল।
দেব। আর মনে রেখো, আমাদের কলস্বনা
স্রোতস্বিনী বেণুমতী।
কচ। তারে ভুলিব না।
বেণুমতী কত কুসুমিত কুঞ্জ দিয়ে
মধুকণ্ঠে আনন্দিত কলগান নিয়ে
আসিছে শুশ্রূষা বহি গ্রাম্যবধূসম
সদা ক্ষিপ্রগতি প্রবাসসঙ্গিনী মম
নিত্য শুভব্রতা।
দেবযানী। হায় বন্ধু, এ প্রবাসে
আরো কোন সহচরী ছিল তব পাশে,
পরগৃহবাসদুঃখ ভুলাবার তরে
যত্ন তার ছিল মনে রাত্রি দিন ধরে';—
হায় রে দুরাশা!
কচ। চিরজীবনের সনে
তার নাম গাঁথা হয়ে গেছে।
দেবযানী। আছে মনে
যেদিন প্রথম তুমি আসিলে হেথায়
কিশোর ব্রাহ্মণ, তরুণ অরুণপ্রায়
গৌরবর্ণ তনুখানি স্নিগ্ধ দীপ্তিঢালা,
চন্দনে চর্চ্চিত ভাল, কণ্ঠে পুষ্পমালা,
পরিহিত পট্টবাস, অধরে নয়নে
প্রসন্ন সরল হাসি, হোথা পুষ্পবনে
দাঁড়ালে আসিয়া—
কচ। তুমি সদ্য স্নান করি
দীর্ঘ আর্দ্র কেশজালে, নব শুক্লাম্বরী
জ্যোতিস্নান মূর্ত্তি উষা, হাতে সাজী
একাকী তুলিতেছিলে নব পুষ্পরাজি
পূজার লাগিয়া। কহিনু করি বিনতি
"তোমারে সাজে না শ্রম, দেহ অনুমতি
ফুল তুলে দিব দেবী"!
দেবযানী। আমি সবিস্ময়
সেই ক্ষণে শুধানু তোমার পরিচয়।
বিনয়ে কহিলে,—আসিয়াছি তব দ্বারে
তোমার পিতার কাছে শিষ্য হইবারে
আমি বৃহস্পতিসুত।
কচ। শঙ্কা ছিল মনে
পাছে দানবের গুরু স্বর্গের ব্রাহ্মণে
দেন ফিরাইয়া।
দেবযানী। আমি গেনু তাঁর কাছে।
হাসিয়া কহিনু—পিতা, ভিক্ষা এক আছে
চরণে তোমার।—স্নেহে বসাইয়া পাশে
শিরে মোর দিয়ে হাত শান্ত মৃদু ভাষে
কহিলেন—কিছু নাহি অদেয় তোমারে।
কহিলাম—বৃহস্পতিপুত্র তব দ্বারে
এসেছেন, শিষ্য করি লহ তুমি তাঁরে
এ মিনতি।—সে আজিকে হল কত কাল
তবু মনে হয় যেন সেদিন সকাল!
কচ। ঈর্ষাভরে তিনবার দৈত্যগণ মোরে
করিয়াছে বধ, তুমি দেবী দয়া করে'
ফিরায়ে দিয়েছ মোর প্রাণ, সেই কথা

হৃদয়ে জাগায়ে রবে চির-কৃতজ্ঞতা!

দেবযানী। কৃতজ্ঞতা! ভুলে যেয়ো, কোন দুঃখ নাই!

উপকার যা করেছি হয়ে যাক্ ছাই—
নাহি চাই দান প্রতিদান! সুখস্মৃতি
নাহি কিছু মনে? যদি আনন্দের গীতি
কোন দিন বেজে থাকে অন্তরে বাহিরে,
যদি কোন সন্ধ্যাবেলা বেণুমতী তীরে
অধ্যয়ন-অবসরে বসি পুষ্পবনে
অপূর্ব্ব পুলকরাশি জেগে থাকে মনে;
ফুলের সৌরভসম হৃদয় উচ্ছ্বাসে
ব্যাপ্ত করে' দিয়ে থাকে সায়াহ্ন আকাশ,
ফুটন্ত নিকুঞ্জতল, সেই সুখকথা
মনে রেখো—দূর হয়ে যাক্ কৃতজ্ঞতা!
যদি সখা হেথা কেহ গেয়ে থাকে গান
চিত্তে যাহা দিয়েছিল সুখ; পরিধান
করে' থাকে কোন দিন হেন বস্ত্রখানি
যাহা দেখে মনে তব প্রশংসার বাণী
জেগেছিল, ভেবেছিলে প্রসন্ন অন্তর
তৃপ্ত চোখে, আজি এরে দেখায় সুন্দর;
সেই কথা মনে কোরো অবসরক্ষণে
সুখস্বর্গধামে! কতদিন এই বনে
দিক্ দিগন্তরে, আষাঢ়ের নীল জটা
শ্যামস্নিগ্ধ বরষার নবঘনঘটা
নেবেছিল, অবিরল বৃষ্টিজলধারে
কর্ম্মহীন দিনে সঘন কল্পনাভারে
পীড়িত হৃদয়; এসেছিল কতদিন
অকস্মাৎ বসন্তের বাধাবন্ধহীন
উল্লাস হিল্লোলাকুল যৌবন-উৎসাহ,
সঙ্গীত-মুখর সেই আবেগ প্রবাহ
লতায় পাতায় পুষ্পে বনে বনান্তরে
ব্যাপ্ত করি দিয়াছিল লহরে লহরে
আনন্দপ্লাবন; ভেবে দেখ একবার
কত উষা, কত জোৎস্না, কত অন্ধকার
পুষ্পগন্ধঘন অমানিশা, এই বনে
গেছে মিশে সুখে দুঃখে তোমার জীবনে,—
তারি মাঝে হেন প্রাতঃ, হেন সন্ধ্যাবেলা
হেন মুগ্ধরাত্রি, হেন হৃদয়ের খেলা,
হেন সুখ, হেন মুখ দেয় নাই দেখা
যাহা মনে আঁকা রবে চির চিত্ররেখা
চিররাত্রি চিরদিন? শুধু উপকার!
শোভা নহে, প্রীতি নহে, কিছু নহে আর?

কচ। আর যাহা আছে তাহা প্রকাশের নয়
সখি! বহে যাহা মর্ম্মমাঝে রক্তময়
বাহিরে তা কেমনে দেখাব?

দেবযানী। জানি সখে,
তোমার হৃদয় মোর হৃদয়-আলোকে
চকিতে দেখেছি কতবার, শুধু যেন
চক্ষের পলকপাতে; তাই আজি হেন
স্পর্দ্ধা রমণীর! থাক তবে, থাক তবে,
যেওনাকো! সুখ নাই যশের গৌরবে!
হেথা বেণুমতীতীরে মোরা দুই জন
অভিনব স্বর্গলোক করিব সৃজন
এ নির্জ্জন বনচ্ছায়া সাথে মিশাইয়া
নিভৃত বিশ্রব্ধ মুগ্ধ দুইখানি হিয়া
নিখিল-বিস্মৃত! ওগো বন্ধু, আমি জানি
রহস্য তোমার!

কচ। নহে, নহে, দেবযানী!

দেবযানী। নহে? মিথ্যা প্রবঞ্চনা! দেখি নাই আমি
মন তব? জান না কি প্রেম অন্তর্যামী?
বিকশিত পুষ্প থাকে পল্লবে বিলীন,
গন্ধ তার লুকাবে কোথায়? কতদিন
যেমনি তুলেছ মুখ, চেয়েছ যেমনি,
যেমনি শুনেছ তুমি মোর কণ্ঠধ্বনি
অমনি সর্ব্বাঙ্গে তব কম্পিয়াছে হিয়া,—
নড়িলে হীরক যথা পড়ে ঠিকরিয়া
আলোক তাহার! সে কি আমি দেখি নাই?

ধরা পড়িয়াছ বন্ধু বন্দী তুমি তাই
মোর কাছে! এ বন্ধন নারিবে কাটিতে!
ইন্দ্র আর তব ইন্দ্র নহে!

কচ। শুচিস্মিতে,
সহস্র বৎসর ধরি এ দৈত্যপুরীতে
এরি লাগি করেছি সাধনা?

দেবযানী। কেহ নহে?
বিদ্যারি লাগিয়া শুধু লোকে দুঃখ সহে
এ জগতে? করেনি কি রমণীর লাগি
কোন নর মহাতপ? পত্নীবর মাগি
করেন নি সংবরণ তপতীর আশে
প্রখর সূর্য্যের পানে তাকায়ে আকাশে
অনাহারে কঠোর সাধনা কত? হায়,
বিদ্যাই দুর্লভ শুধু. প্রেম কি হেথায়
এতই সুলভ? সহস্র বৎসর ধরে'
সাধনা করেছ তুমি কি ধনের তরে
আপনি জান না তাহা। বিদ্যা একধারে
আমি একধারে—কভু মোরে কভু তারে
চেয়েছ সোৎসুকে; তব অনিশ্চিত মন
দোঁহারেই করিয়াছে যত্নে আরাধন
সঙ্গোপনে। আজ মোরা দোঁহে একদিনে
আসিয়াছি ধরা দিতে। লহ সখা চিনে
যারে চাও! বল যদি সরল সাহসে
"বিদ্যায় নাহিক সুখ, নাহি সুখ যশে,
দেবযানী, তুমি শুধু সিদ্ধি মূর্ত্তিমতী,
তোমারেই করিনু বরণ," নাহি ক্ষতি
নাহি কোন লজ্জা তাহে! রমণীর মন
সহস্রবর্ষেরি সখা সাধনার ধন।

কচ। দেবসন্নিধানে শুভে করেছিনু পণ
মহাসঞ্জীবনী বিদ্যা করি' উপার্জ্জন
দেবলোকে ফিরে যাব; এসেছিনু তাই,
সেই পণ মনে মোর জেগেছে সদাই,
পূর্ণ সেই প্রতিজ্ঞা আমার, চরিতার্থ
এতকাল পরে এ জীবন; কোন স্বার্থ
করি না কামনা আজি!

দেবযানী। ধিক্ মিথ্যাভাষী!
শুধু বিদ্যা চেয়েছিলে? গুরুগৃহে আসি
শুধু ছাত্ররূপে তুমি আছিলে নির্জ্জনে
শাস্ত্রগ্রন্থে রাখি আঁখি রত অধ্যয়নে
অহরহ? উদাসীন আর সবা পরে?
ছাড়ি অধ্যয়নশালা বনে বনান্তরে
ফিরিতে পুষ্পের তরে, গাঁথি মাল্যখানি
সহাস্য প্রফুল্ল মুখে কেন দিতে আনি
এ বিদ্যাহীনারে? এই কি কঠোর ব্রত?
এই তব ব্যবহার বিদ্যার্থীর মত?
প্রভাতে রহিতে অধ্যয়নে, আমি আসি
শূন্য সাজি হাতে লয়ে দাঁড়াতেম হাসি,
তুমি কেন গ্রন্থ রাখি উঠিয়া আসিতে,
প্রফুল্ল শিশিরসিক্ত কুসুমরাশিতে
করিতে আমার পূজা? অপরাহ্নকালে
জলসেক করিতাম তরু-আলবালে,
আমারে হেরিয়া শ্রান্ত কেন দয়া করি'
দিতে জল তুলে? কেন পাঠ পরিহরি
পালন করিতে মোর মৃগশিশুটিকে?
স্বর্গ হতে যে সঙ্গীত এসেছিলে শিখে
কেন তাহা শুনাইতে, সন্ধ্যাবেলা যবে
নদীতীরে অন্ধকার নামিত নীরবে
প্রেমনত নয়নের স্নিগ্ধচ্ছায়াময়
দীর্ঘ পল্লবের মত? আমার হৃদয়
বিদ্যা নিতে এসে কেন করিলে হরণ
স্বর্গের চাতুরীজালে? বুঝেছি এখন,
আমারে করিয়া বশ পিতার হৃদয়ে
চেয়েছিলে পশিবারে—কৃতকার্য্য হ'য়ে
আজ যাবে মোরে কিছু দিয়ে কৃতজ্ঞতা;
লব্ধমনোরথ অর্থী রাজদ্বারে যথা
দ্বারীহস্তে দিয়ে যায় মুদ্রা দুই চারি
মনের সন্তোষে?—

কচ। হা অভিমানিনী নারী!

সত্য শুনে কি হইবে সুখ? ধর্ম্ম জানে,
প্রতারণা করি নাই; অকপট প্রাণে
আনন্দ অন্তরে তব সাধিয়া সন্তোষ,
সেবিয়া তোমারে যদি করে' থাকি দোষ
তার শাস্তি দিতেছেন বিধি। ছিল মনে
কব না সে কথা। বল কি হইবে জেনে
ত্রিভুবনে কারো যাহে নাই উপকার,
একমাত্র শুধু যাহা নিতান্ত আমার
আপনার কথা। ভালবাসি কি না আজ
সে তর্কে কি ফল? আমার যা আছে কাজ
সে আমি সাধিব। স্বর্গ আর স্বর্গ বলে'
যদি মনে নাহি লাগে, দূর বনতলে
যদি ঘুরে মরে চিত্তবিদ্ধ মৃগসম
চিরতৃষ্ণা লেগে থাকে দগ্ধ প্রাণে মম
সর্ব্বকার্য্য মাঝে—তবু চলে যেতে হবে
সুখশূন্য সেই স্বর্গধামে। দেব সবে
এই সঞ্জীবনী বিদ্যা করিয়া প্রদান
নূতন দেবত্ব দিয়া তবে মোর প্রাণ
সার্থক হইবে; তার পূর্ব্বে নাহি মানি
আপনার সুখ। ক্ষম মোরে, দেবযানী,
ক্ষম অপরাধ!

দেবযানী। ক্ষমা কোথা মনে মোর!
করেছ এ নারীচিত্ত কুলিশ-কঠোর
হে ব্রাহ্মণ! তুমি চলে' যাবে স্বর্গলোকে
সগৌরবে, আপনার কর্ত্তব্য-পুলকে
সর্ব্ব দুঃখশোক করি দূর-পরাহত;
আমার কি আছে কাজ, কি আমার ব্রত!
আমার এ প্রতিহত নিষ্ফল জীবনে
কি রহিল, কিসের গৌরব? এই বনে
বসে রব নতশিরে নিঃসঙ্গ একাকী
লক্ষ্যহীনা! যে দিকেই ফিরাইব আঁখি
সহস্র স্মৃতির কাঁটা বিঁধিবে নিষ্ঠুর;
লুকায়ে বক্ষের তলে লজ্জা অতি ক্রূর
বারংবার করিবে দংশন! ধিক্ ধিক্,
কোথা হতে এলে তুমি, নির্ম্মম পথিক,
বসি মোর জীবনের বনচ্ছায়াতলে
দণ্ড দুই অবসর কাটাবার ছলে
জীবনের সুখগুলি—ফুলের মতন
ছিন্ন করে' নিয়ে—মালা করেছ গ্রন্থন
একখানি সূত্র দিয়ে; যাবার বেলায়
সে মালা নিলে না গলে, পরম হেলায়
সেই সূক্ষ্ম সূত্রখানি দুই ভাগ করে'
ছিঁড়ে দিয়ে গেলে! লুটাইল ধূলিপরে
এ প্রাণের সমস্ত মহিমা! তোমা পরে
এই মোর অভিশাপ—যে বিদ্যার তরে
মোরে কর অবহেলা, সে বিদ্যা তোমার
সম্পূর্ণ হবে না বশ;—তুমি শুধু তার
ভারবাহী হয়ে রবে, করিবে না ভোগ,
শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ!

কচ। আমি বর দিনু, দেবী, তুমি সুখী হবে!
ভুলে যাবে সর্ব্বগ্লানি বিপুল গৌরবে!

সমাপ্ত।

নাটকের পাত্রগণ।

বৈকুণ্ঠ।	
অবিনাশ।	বৈকুণ্ঠের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।
ঈশান।	বৈকুণ্ঠের ভৃত্য।
কেদার।	অবিনাশের সহপাঠী।
তিনকড়ি।	কেদারের সহচর।
বিপিন।	অবিনাশের খুড়া-শ্বশুর।

বৈকুণ্ঠের খাতা।

প্রথম দৃশ্য।

কেদার ও তিনকড়ি।

কেদার। দেখ তিনকড়ে—অবিনাশ ত আমার গন্ধ পেলেই তেড়ে আসে—

তিনকড়ি। মানুষ চেনে দেখচি, আমার মত অবোধ নয়!

কেদার। কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, আমার শ্যালীর সঙ্গে তার বিবাহ দিয়ে এই জায়গাটাতেই বসবাস করব, আর ঘুরে বেড়াতে পারিনে—

তিনকড়ি। টিঁকতে পারবে না দাদা। তোমার মধ্যে একটা ঘূর্ণি আছেন তিনিই বরাবর ঘুরিয়েছেন এবং শেষ পর্য্যন্ত ঘোরাবেন।

কেদার। এখন অবিনাশের দাদা বৈকুণ্ঠকে বশ করতে এসে আমার কি দুর্গতি হয়েছে দেখ। কে জানত বুড়ো বই লেখে! এত বড় একখানা খাতা আমাকে পড়তে দিয়ে চলে গেছে—

তিনকড়ি। ওরে বাবা! ইঁদুরের মত চুরি করে খেতে এসে খাতার জাতাকলের মধ্যে পড়ে গেছ দেখচি।

কেদার। কিন্তু তিনকড়ে, তুইই আমার সব প্ল্যান্ মাটি করবি।

তিনকড়ি। কিছু দরকার হবে না দাদা, তুমি একলাই মাটি করতে পারবে!

কেদার। দেখ তিনু, এসব ব্যস্ত হবার কাজ নয়। গণেশকে সিদ্ধিদাতা বলে কেন—তিনি মোটা লোকটি, খুব চেপে বসে থাক্‌তে জানেন, দেখে মনে হয় না যে তাঁর কিছুতে কোন গরজ আছে—

তিনকড়ি। কিন্তু তাঁর ইঁদুরটি—

কেদার। ফের বক্‌চিস। লক্ষ্মীছাড়া, তুই একটু আড়ালে যা!

তিন। চল্লুম দাদা। কিন্তু ফাঁকি দিয়ো না। সময় কালে অভাগা তিনকড়েকে মনে রেখো।

(তিনকড়ির প্রস্থান)

বৈকুণ্ঠের প্রবেশ।

বৈকুণ্ঠ। দেখ্‌চেন কেদার বাবু?

কেদার। আজ্ঞে হাঁ, দেখচি বই কি? কিন্তু আমার মতে—ওর নাম কি—বইয়ের নামটা যেন কিছু বড় হয়ে পড়েচে।

বৈকুণ্ঠ। বড় হোক, কিন্তু বিষয়টা বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্চে। "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রাচীন ও প্রচলিত সঙ্গীত শাস্ত্রের আদিম উৎপত্তি ও ইতিহাস এবং নূতন সার্ব্বভৌমিক স্বরলিপির সংক্ষিপ্ত ও সরল আদর্শ প্রকরণ।" এতে আর কোন কথাটি বাদ গেল না।

কেদার। তা বাদ যায় নি। কিন্তু, ওর নাম কি, মাপ করবেন বৈকুণ্ঠ বাবু—কিছু বাদসাদ্ দিয়েই নাম রাখ্‌তে হয়। কিন্তু লেখা যা হয়েছে সে পড়তে পড়তে, ওর নাম কি—শরীর রোমাঞ্চ হয়ে ওঠে।

বৈকুণ্ঠ। হা হা হাহা! রোমাঞ্চ আপনি ঠাট্টা করচেন।

কেদার। সে ক কথা!

বৈকুণ্ঠ। ঠাট্টার বিষয় বটে! ও আমার একটা পাগ্‌লামী। হাহাহাহা! সঙ্গীতের উৎপত্তি ও ইতিহাস—মাথা আর মুণ্ডু! দিন্ খাতাটা। বুড়ো মানুষকে পরিহাস করবেন না কেদার বাবু!

কেদার। পরিহাস! ওর নাম কি, পরিহাস কি মশায় দু ঘণ্টা ধরে কেউ করে! ভেবে দেখুন্ দেখি, কখন্ থেকে আপনার খাতা নিয়ে পড়েছি! তা হলে ত রামের বনবাসকেও—ওর নাম কি—কৈকেয়ীর পরিহাস বল্‌তে পারেন!

বৈকুণ্ঠ। হাহাহাহা! আপনি বেশ কথাগুলি বলেন!

কেদার। কিন্তু হাসির কথা নয় বৈকুণ্ঠ বাবু, ওর নাম কি—আপনার লেখার স্থানে স্থানে যথার্থই রোমাঞ্চ হয়—তা, কি বলে; আপনার মুখের সাম্‌নেই বল্লুম।

বৈকুণ্ঠ। বুঝেছি আপনি কোন্ জায়গার কথা বল্‌চেন, সেখানটা লেখবার সময় আমারই চোখে জল এসেছিল! যদি আপনার বিরক্তি বোধ না হয় ত সেই জায়গাটা একবার পড়ে শোনাই।

কেদার। বিরক্তি! বিলক্ষণ! ওর নাম কি, আমি আপনাকে ঐ জায়গাটা পড়বার জন্যে অনুরোধ করতে যাচ্ছিলুম। (স্বগত) শ্যালীটিকে পার করা পর্য্যন্ত, হে ভগবন্, আমাকে ধৈর্য্য দাও—তার পরে আমারও একদিন আস্‌বে!

বৈকুণ্ঠ। কি বল্‌চেন কেদার বাবু?

কেদার। বলছিলুম যে,—ওর নাম কি—সাহিত্যের কামড় কচ্ছপের কামড়, যাকে একবার ধরে—ওর নাম কি—তাকে আর সহজে ছাড়তে চায় না। আহা, অমন জিনিষ কি আর আছে?

বৈকুণ্ঠ। হাহাহাহা। কচ্ছপের কামড়! আপনার কথাগুলি বড় চমৎকার!—এই যে সেই জায়গাটা! তবে শুনুন্।—হে ভারতভূমি, এক সময়ে তুমি প্রবীণ বীর্য্যবান্ পুরুষদিগের তপোভূমি ছিলে; তখন রাজার রাজত্বও তপস্যা ছিল, কবির কবিত্বও তপস্যারই নামান্তর ছিল। তখন তাপস জনক রাজ্যশাসন করিতেন, তখন তাপস বাল্মীকি রামায়ণ গানে তপঃপ্রভাব উৎসারিত করিয়া দিতেন; তখন সকল জ্ঞান, সকল বিদ্যা, সংসারের সকল কর্ত্তব্য, জীবনের সকল আনন্দ সাধনার সামগ্রী ছিল। তখন গৃহাশ্রমও আশ্রম ছিল, অরণ্যাশ্রমও আশ্রম ছিল। আজ যে কুলত্যাগিনী সঙ্গীত বিদ্যা নাট্যশালায় বিদেশী বংশীর কাংস্যকণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিতেছে, প্রমোদালয়ে সুরা-সরোবরে স্খলিতচরণে আত্মহত্যা করিয়া মরিতেছে, সেই সঙ্গীত একদিন ভরতমুনির তপোবনে মূর্ত্তিমান্ হইয়া মর্ত্যকে স্বর্গীয় করিয়া তুলিয়াছিল, সেই সঙ্গীত সাধকশ্রেষ্ঠ নারদের বীণাতন্ত্রী হইতে ভক্তরশ্মিরাশির

ন্যায় বিচ্ছুরিত হইয়া বৈকুণ্ঠাধিপতির বিগলিত পাদপদ্মনিস্যন্দিত পুণ্য নির্ঝরিণীকে ম্লান মর্ত্ত্যলোকে প্রবাহিত করিয়াছিল। হে দুর্ভাগিণী ভারতভূমি, আজ তুমি কৃশকায় দীনপ্রাণ রোগজীর্ণ শিশুদিগের ক্রীড়াভূমি, আজ তোমার যজ্ঞবেদীর পুণ্য মৃত্তিকা লইয়া অবোধগণ পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করিতেছে; আজ সাধনাও নাই সিদ্ধিও নাই; আজ বিদ্যার স্থলে বাচালতা; বীর্য্যের স্থলে অহঙ্কার এবং তপস্যার স্থলে চাতুরী বিরাজ করিতেছে। যে বজ্রবক্ষ বিপুল তরণী একদিন উত্তাল তরঙ্গভেদ করিয়া মহাসমুদ্র পার হইত, আজ সে তরণীর কর্ণধার নাই, আমরা কয়েকজন বালকে তাহারই কয়েকখণ্ড জীর্ণ কাষ্ঠ লইয়া ভেলা বাঁধিয়া আমাদের পল্লিপ্রান্তের পঙ্কপল্বলে ক্রীড়া করিতেছি এবং শিশুসুলভ মোহে অজ্ঞানসুলভ অহঙ্কারে কল্পনা করিতেছি এই ভগ্ন ভেলাই সেই অর্ণবতরী, আমরাই সেই আর্য্য, এবং আমাদের গ্রামের এই জীর্ণপত্রকলুষিত জলকুণ্ডই সেই অতলস্পর্শ সাধনসমুদ্র।

ঈশানের প্রবেশ।

ঈশান। বাবু, খাবার এসেছে।

বৈকুণ্ঠ। তাঁকে একটু বস্‌তে বল।

ঈশান। বস্‌তে বল্‌ব কাকে? খাবার এসেছে।

কেদার। তাহলে আমি উঠি! ওর নাম কি, স্বার্থপর হয়ে আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি—

বৈকুণ্ঠ। কেন, আপনি উঠচেন কেন?

ঈশান। নাঃ, ওঁর আর উঠে কাজ নেই! তামাম রাত ধরে তোমার ঐ লেখা শুনুন! (কেদারের প্রতি) যাও বাবু তুমি ঘরে যাও। আমাদের বাবুকে আর ক্ষেপিয়ে তুলোনা।

(প্রস্থান)

কেদার। ইনি আপনার কে হন?

বৈকুণ্ঠ। ঈশেন, আমার চাকর।

কেদার। ওঃ, ওর নাম কি, এঁর কথাগুলি বেশ স্পষ্ট স্পষ্ট!

বৈকুণ্ঠ। হাহাহাহা। ঠিক বলেচেন। তা কিছু মনে করবেন না—অনেকদিন থেকে আছে—আমাকে মানে টানে না।

কেদার। ওর নাম কি, অল্পক্ষণের আলাপ যদিচ তবু আমাকেও বড় মানে না দেখলুম। কিন্তু ওর কথাটা আপনি কাণে তোলেন নি। খাবার এসেছে!

বৈকুণ্ঠ। তা হোক্, রাত হয় নি—এই অধ্যায়টা শেষ করে ফেলি।

কেদার। বৈকুণ্ঠ বাবু, খাবার আপনার ঘরে আসে এবং এসে বসেও থাকে—ওর নাম কি—আমাদের ঘরে তাঁর ব্যবহার অন্য রকমের। দেখুন্ যখন ছেলেবেলায় কালেজে পড়তুম তখন—ওর নাম কি—খুব উচ্চ মাচার উপরেই আশালতা চড়িয়েছিলুম—তাতে বড় বড় লাউয়ের মত দেড় হাত দু হাত ফলও ঝুলে পড়ে ছিল—কিন্তু—কি বলে—গোড়ায় জল পেলে না—ভিতরে রস প্রবেশ করলে না—ওর নাম কি—সব ফাঁকা হয়ে রইল। এখন্ কোথায় পয়সা, কোথায় অন্ন, এই করেই মরচি! ভিতরে সার যা ছিল সব চুপসে—ওর নাম কি—শুকিয়ে গেল!

বৈকুণ্ঠ। আহা হাহা! এত বড় দুঃখের বিষয় আর কিছু হতে পারে না! অথচ সর্ব্বদাই প্রফুল্ল আছেন—আপনি মহানুভব ব্যক্তি! (কেদারের হাত চাপিয়া ধরিয়া) দেখুন্ আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যদি আপনার কোন সাহায্য করতে পারি খুলে বলবেন—কিছুমাত্র সঙ্কোচ—

কেদার। মাপ করবেন বৈকুণ্ঠ বাবু—

ওর নাম কি—আমাকে টাকার প্রত্যাশী মনে করবেন না—আজ যে আনন্দ দিয়েছেন এর তুলনায়—ওর নাম কি—টাকার তোড়া—

তিনকড়ির প্রবেশ।

তিনকড়ি। (জনান্তিকে) খুসি হয়ে দিতে চাচ্চে, নে না—

কেদার। সব মাটি করলে লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর কোথাকার—

বৈকুণ্ঠ। এ ছেলেটি কে?

কেদার। দেনার সঙ্গে যেমন সুদ—ওর নাম কি—উনি আমার তেম্‌নি! নিজের দায়ই সাম্‌লাতে পারিনে—তার উপর আবার ভগবান্—কি বলে—ঢাকের উপর ঢেঁকি চড়িয়েছেন।

তিনকড়ি। উনি যদি হন গোরু আমি হই ওঁর ল্যাজ! যখন চরে খান্ আমি পিঠের মাছি তাড়াই, আবার যখন চাষার হাতে লাঙ্গনা খেতে হয় তখন মজাটা আমার উপর দিয়েই যায়।

বৈকুণ্ঠ। হাহাহাহাঃ। এ ছোকরাটি বেড়ে পেয়েছেন। এর যে খুব চোকে মুখে কথা!—দেখুন্ বিলম্ব হয়ে গেছে, আজ আমার এখানেই আহারাদি হোক্ না!

কেদার। না, না, সে আপনার অসুবিধা করে কাজ নেই।

তিনকড়ি। বিলক্ষণ। শুভকার্য্যে বাধা দিতে নেই! খাওয়াতে ওঁর সামান্য অসুবিধে, না খেতে পেলে আমাদের অসুবিধে ঢের বেশী! ক্ষিধে পেয়েছে মশায়!

বৈকুণ্ঠ। বেশ বাবা, তুমি পেট ভরে খেয়ে যাও। তৃপ্তির সঙ্গে খেতে দেখ্‌লে আমার বড় আনন্দ হয়।

কেদার। এই ছোঁড়াটাকে ভগবান্—ওর নাম কি—অন্তরিন্দ্রিয়ের মধ্যে কেবল একটি জঠর দিয়েছেন মাত্র! আপনার এই আশ্রমটিতে এলে পেট বলে যে একটা গম্ভীর গহ্বর আছে—কি বলে—সে কথা একেবারে ভুলে যেতে হয়। মনে হয় যেন কেবল একযোড়া হৃৎপিণ্ডের উপরে, ওর নাম কি, এক, খান মুণ্ড নিয়ে বসে আছি!

বৈকুণ্ঠ। হাহাহাহাঃ। আপনি বড় সুন্দর রস দিয়ে কথা বল্‌তে পারেন—বা, বা, আপনার চমৎকার ক্ষমতা!

তিনকড়ি। কথায় মত্ত হয়ে প্রতিজ্ঞে ভুল্‌বেন না বৈকুণ্ঠবাবু। ক্ষিধে ক্রমেই বাড়চে।

বৈকুণ্ঠ। বটে, বটে। ঈশেন, ঈশেন, একবার এই দিকে শুনে যাও ত ঈশেন!

ঈশানের প্রবেশ।

ঈশান। একটি ছিল, দুটি জুটেছে!

তিনকড়ি। রেগো না দাদা, তোমাকেও ভাগ দেব!

ঈশান। এখনো লেখা শোনানো চল্‌চে বুঝি!

বৈকুণ্ঠ। (লজ্জিতভাবে খাতা আড়াল করিয়া) না, না, লেখা কোথায়! দেখ ঈশেন, উঁয়ে হয়েছে—এই দুটি বাবু—বুঝেছ, এঁদের জন্যে কিছু খাবার এনে দিতে হচ্চে।

ঈশান। খাবার এখন কোথায় যোগাড় করব!

তিনকড়ি। ও বাবা!

বৈকুণ্ঠ। ঈশেন, বুঝেছ, তুমি একবার বাড়ির মধ্যে গিয়ে আমার মাকে বলে এস গে যে—

ঈশান। সে হবে না বাবু,—দিদি ঠাক্‌রুণকে আমি আবার এই দিবানিদ্রে থেকে

রাতে পারব না—তিনি তোমার ভাত কোলে নিয়ে সেই অবধি বসে আছেন—

বৈকুণ্ঠ। তা এঁদের না খাইয়ে ত আমি খেতে পারব না, তুমি একবার মাকে বল্লেই—

ঈশান। তা জানি, তাঁকে বল্লেই তিনি ছুটে যাবেন—কিন্তু আজ সমস্ত দিন একাদশী করে আছেন। বাবু, আজকের মত তোমরা ঘরে গিয়ে খাওগে!

তিনকড়ি। দাদা, পরামর্শ দেওয়া সহজ, কিন্তু খাবার না থাক্‌লে কি করে খাওয়া যায় সে সমিস্যে ত কেউ মেটাতে পারলে না!

কেদার। তিনকড়ে, থাম্! বৈকুণ্ঠ বাবু, ব্যস্ত হবেন না—ওর নাম কি---আজ থাক্ না—

বৈকুণ্ঠ। দেখ্ ঈশেন, তোর জ্বালায় কি আমি বাড়ি ঘর দোর ছেড়ে বনে গিয়ে পালাব! বাড়িতে, দুজন ভদ্রলোক এলে তাদের দুমুঠো খেতে দিবিনে! হারামজাদা লক্ষ্মীছাড়া বেটা! বেরো তুই আমার ঘর থেকে—

(ঈশানের প্রস্থান।)

তিনকড়ি। আহা রাগ করবেন না! আমি ঠাউরেছিলুম খাওয়াতে আপনার কোন অসুবিধে নেই—ঠিক বুঝতে পারিনি—একটু অসুবিধে আছে বৈ কি! ঐ লোকটিকে ইতিপূর্ব্বে দেখি নি—তা ছাড়া আপনার বুড়ো মা—

বৈকুণ্ঠ। না না সেটি আমার একমাত্র বিধবা মেয়ে, আমার নীরু, আমার মা নেই।

তিনকড়ি। মা নেই! ঠিক আমারি মত! কেদার। বৈকুণ্ঠ বাবু—ওর নাম কি—আজ তবে উঠি—ঈশান-কোণে ঝড়ের লক্ষণ দেখা যাচ্চে।

তিনকড়ি। দাঁড়াও না—যাবে কোথায়? —দেখুন বৈকুণ্ঠ বাবু লজ্জা পাবেন না—এই তিনকড়ের পোড়াকপালের আঁচ পেলে অন্নপূর্ণার হাঁড়ির তলা ফুটো হয়ে যায়। যা হোক্ আমার উপর সম্পূর্ণ ভার দিন আমি বাজার থেকে আহারের যোগাড় করে আন্‌চি! আপনাকে আর কিছু দেখতে হবে না।

কেদার। (কৃত্রিম রোষে) দেখ তিনকড়ি! এত দিন—ওর নাম কি—আমার সহবাসে এবং দৃষ্টান্তে তোর এই—কি বলে—হেয় জঘন্য লুব্ধ প্রবৃত্তি ঘুচল না! আজ থেকে—ওর নাম কি—তোর মুখ দর্শন করব না!

(প্রস্থান)

বৈকুণ্ঠ। আহা, আহা, রাগ করে যাবেন না কেদার বাবু—কেদার বাবু শুনে যান্—

তিনকড়ি। কিছু ভাববেন না! কেদারদাকে আমি বেশ জানি। ওকে আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে জুড়িয়ে ঠাণ্ডা করে আপনার এখানে হাজির করে দেব। বুঝ্‌চেন না, পেটে আগুন জ্বল্‌লেই বাক্যিগুলো কিছু গরম গরম আকারে মুখ থেকে বেরতে থাকে।

বৈকুণ্ঠ। হাঃহাঃহাঃ! বাবা, তোমার কথাগুলি বেশ! তা দেখ, এই তোমাকে কিঞ্চিৎ জলপানি দিচ্চি (নোট দিয়া) কিছু মনে কোরো না!

তিনকড়ি। কিচ্ছু না কিচ্ছু না! এর চেয়ে বেশী দিলেও কিছু মনে করতুম না—আমার সে রকম স্বভাবই নয়!

(প্রস্থান)

ঈশানের প্রবেশ।

ঈশান। বাবু! (বৈকুণ্ঠ নিরুত্তর) বাবু! (নিরুত্তর) বাবু খাবার এসেছে! (নিরুত্তর) খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে!

বৈকুণ্ঠ। (রাগিয়া) যা—আমি খাব না!

ঈশান। আমায় মাপ কর—খাবার জুড়িয়ে গেল।

বৈকুণ্ঠ। না আমি খাব না।

ঈশান। পায়ে ধরি বাবু—খেতে চল—রাগ কোরো না!

বৈকুণ্ঠ। যাঃ বেরো তুই—বিরক্ত করিস্ নে!

ঈশান। দাও আমার কাণ মলে দাও—বাবু—

অবিনাশের প্রবেশ।

অবিনাশ। কি দাদা! এখনো বসে বসে লিখচ বুঝি?

বৈকুণ্ঠ। না না কিচ্ছু না—এখন লিখ্‌তে যাব কেন?—ঈশানের সঙ্গে বসে বসে গল্প করচি।—ঈশেন তুই যা, আমি যাচ্চি (ঈশানের প্রস্থান)

অবিনাশ। দাদা মাইনের টাকাগুলো এনেছি—এই কুড়ি টাকার পাঁচ কেতা নোট—আর এই পাঁচশো টাকার একখানা!

বৈকুণ্ঠ। ঐ পাঁচশো টাকার খানা তুমিই রাখ না অবু!

অবিনাশ। কেন দাদা!

বৈকুণ্ঠ। যদি কোন আবশ্যক হয়—খরচ পত্র—

অবিনাশ। আবশ্যক হলে চেয়ে নেব—

বৈকুণ্ঠ। তবে এইখানে রাখ। তোমার হাতে টাকা দিলেও ত থাকে না। যে আসে তাকেই বিশ্বাস করে বস! টাকা রাখতে হলে লোক চিন্‌তে হয় ভাই।

অবিনাশ। (হাসিয়া) সেই জন্যেই ত তোমার হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই দাদা!

বৈকুণ্ঠ। অবি, হাস্‌চিস্ যে! কেন, আমাকে কেউ ঠকিয়েছে বল্‌তে পারিস্? সে দিন সেই স্বরসূত্রসার বই কিন্‌লেম তোরা নিশ্চয় মনে করেছিস্ ঠকেছি—কিন্তু সঙ্গীত সম্বন্ধে অমন প্রাচীন বই আর আছে? হীরে দিয়ে ওজন করলেও ওর দাম হয় না। তিনশো টাকায় ত অম্‌নি পেয়েছি?

অবিনাশ। ও বই সম্বন্ধে আমি কি কিছু বলেছি?

বৈকুণ্ঠ। তাতেই ত বুঝতে পারলুম তোরা মনে মনে করচিস্ বুড়ো ঠকেছে। নইলে একবার জিজ্ঞাসা করতে হয়, একবার নেড়েচেড়ে দেখতে হয়—

অবিনাশ। ওর আর আছে কি দাদা! নাড়তে চাড়তে গেলে যে গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যাবে!

বৈকুণ্ঠ। সেই ত ওর দাম! ও ধুলো কি আজকের ধুলো! ও ধুলো লাখটাকা দিয়ে মাথায় রাখতে হয়!

অবিনাশ। দাদা, এ মাসে আমাকে পঁচাত্তর টাকা দিতে হবে।

বৈকুণ্ঠ। কেন কি করবি? (অবিনাশ নিরুত্তর) নিলেম থেকে বিলিতি গাছ কিন্‌বি বুঝি? ঐ তোর এক গাছ পোঁতা বাতিক হয়েছে, দিনরাত যত রাজ্যের উড়েমালী নিয়ে কারবার! কত মিথ্যে গাছের নাম করে কত লোক যে তোমাকে ঠকিয়ে নিয়ে যাচ্চে তার আর সংখ্যে করা যায় না—অবু তুই বিয়ে থাওয়া করবিনে।

অবিনাশ। তার চেয়ে অন্য বাতিকগুলো যে ভাল! বয়স প্রায় চল্লিশ হল আর কেন?

বৈকুণ্ঠ। সে কি, এরি মধ্যে চল্লিশ?

অবিনাশ। এরি মধ্যে আর কই? ঠিক পুরো সময়ই লেগেছে—যেমন অন্য লোকের হয়ে থাকে।

বৈকুণ্ঠ। আমারি অন্যায় হয়েছে। ছি, ছি! লোকে স্বার্থপর বল্‌বে! আর দেরি করা নয়!

অবিনাশ। একটি লোক বসে আছে আমি তবে চল্লুম। (প্রস্থান।)

বৈকুণ্ঠ। নিশ্চয় সেই মাণিকতলার মালী! একেই বলে বাতিক!

কেদারের প্রবেশ।

বৈকুণ্ঠ। এই যে কেদার বাবু ফিরে এসেছেন—বড় খুসি হলুম—তা হলে-

কেদার। দেখুন—ওরনাম কি—আপনার লাইব্রেরিতে সকল রকম সঙ্গীতের বই আছে, কিন্তু—কি বলে—চীনেদের সঙ্গীত পুস্তক বোধ করি নেই!

বৈকুণ্ঠ। (ব্যস্ত হইয়া) আজ্ঞে না! আপনি কোথাও সন্ধান পেয়েছেন?

কেদার। একখানি যোগাড় করে এনেছি- আপনাকে উপহার দিতে চাই। বইখানি, ওরনাম কি, বহুমূল্য। এই দেখুন।—(স্বগত) বেটা চীনেম্যানের কাছ থেকে তার পুরাণো-জুতোর হিসেব চেয়ে এনেছি!

বৈকুণ্ঠ। তাইত! এ যে আদৎ চীনে ভাষা দেখছি! কিছু বোঝবার যো নেই! আশ্চর্য্য! একেবারে সোজা অক্ষর। বা, বা, চমৎকার! তা এর দাম—

কেদার। মাপ করবেন্ ওর নাম কি—

বৈকুণ্ঠ। না, সে হবে না! আপনি যে কষ্ট করে বইখানি খুঁজে এনেছেন এতেই আমি আপনার কেনা হয়ে রইলুম—আমার ঋণ আর বাড়াবেন না!

কেদার। (নিশ্বাস ফেলিয়া) কিন্তু কি বল্‌ব—দামটা বোধ হয় ঠকেছি।

বৈকুণ্ঠ। আজ্ঞে না—তা কখনো হতেই পারে না। আমি জানি কিনা—এ সব জিনিষের দাম বেশী।

কেদার। আজ্ঞে, বেটাত পঁয়ত্রিশ টাকা চেয়ে বসেছে—বোধকরি—ওর নাম কি—ত্রিশেই রফা হবে!

বৈকুণ্ঠ। পঁয়ত্রিশ! এ ত জলের দর। টাকাটা এখনি নিয়ে দিন্—আবার যদি মত বদ্‌লায়! চীনেম্যান্ বোধ হয় নিতান্ত দায়ে পড়েছে।

কেদার। দায় বলে দায়। শুন্‌লুম দেশে তার তিন শ্যালী আছে—তিনটিকেই এক কুলীন চীনেম্যানের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে। কন্যাদায় দায় কিন্তু—কি বলে ভাল—শ্যালী দায়ের সঙ্গে তার তুলনাই হয় না!

বৈকুণ্ঠ। (হাসিয়া) বল কি কেদার বাবু!

কেদার। সাধে বলি। ভুক্তভোগীর কথা! ওর নাম কি—শ্বশুর বাড়িতে শ্যালী অতি উত্তম জিনিষ—অমন জিনিষ আর হয় না!—কিন্তু সেখান থেকে চ্যুত হয়ে হঠাৎ স্কন্ধের উপর এসে পড়লে, ওর নাম কি, সকলে সাম্‌লাতে পারে না।

বৈকুণ্ঠ। সাম্‌লাতে পারে না! হাহা হাহা!

কেদার। আজ্ঞে আমি ত পারচিনে একে শ্যালী, তাতে নিখুঁৎসুন্দরী, তাতে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছেন, ওর নাম কি ঘরে ত আর টেঁকা যায় না! চোখ মেলে চাইলে স্ত্রী ভাবে শ্যালীকে খুঁজচি, ওর নাম কি—চোখ বুজে থাক্‌লে স্ত্রী ভাবে আমি শ্যালীর ধ্যান করচি! কাশলে মনে করে কাশীর মধ্যে একটা অর্থ আছে—আবার, কি বলে ভাল—প্রাণপণে কাশি চেপে থাক্‌লে মনে করে তার অর্থ আরও সন্দেহজনক!

অবিনাশের প্রবেশ।

অবিনাশ। কি দাদা! খাবার ঠাণ্ডা হয়ে এল, এখনো লেখা নিয়ে বসে আছ!

বৈকুণ্ঠ। না, না, লেখাটেখা কিছু নয়, কেদার বাবুর সঙ্গে গল্প করচি।

অবিনাশ। তাই ত, কেদারকে দেখ্‌চি! কি সর্ব্বনাশ! তুমি কোথা থেকে হে! দাদাকে পেয়ে বসেছ বুঝি!

কেদার। হাঃহাঃহাঃ! অবিনাশ, চিরকালই তুমি ছেলে মানুষ রয়ে গেলে হে!

অবিনাশ। দাদা, তোমার লেখা শোনাবার আর লোক পেলে না! শেষকালে কেদারকে ধরেছ? ও যে তোমাকে ধরলে আর ছাড়বে না!

বৈকুণ্ঠ। আঃ অবিনাশ—ছিঃ, কি বক্‌চ?

কেদার। বৈকুণ্ঠ বাবু আপনি ব্যস্ত হবেন না—ওর নাম কি—অবিনাশের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়েছি—আমার সঙ্গে দেখা হলেই ওর আর ঠাট্টা ছাড়া কথা নেই!

অবিনাশ। তোমার ঠাট্টা যে আমার ঠাট্টার চেয়ে গুরুতর! এই সে দিন আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে গেলে আবার বুঝি দরকার পড়েছে তাই দাদার বই শুন্‌তে এসেছ?

কেদার। ভাই অবিনাশ, ওর নাম কি—এক এক সময় তোমার কথা শুনে হঠাৎ ভ্রম হয় যে, যা বল্‌চ বুঝি বা সত্যিই বল্‌চ! কি জানি বৈকুণ্ঠ বাবু মনে ভাবতেও পারেন যে, কি বলে ভাল—

বৈকুণ্ঠ। (ব্যস্ত হইয়া) না, না, কেদার বাবু! আমি কিছু মনে ভাবচিনে! কিন্তু অবিনাশ, সত্যি কথা বল্‌তে কি, তোমার ঠাট্টাগুলো কিছু রূঢ় হয়ে পড়চে! বন্ধুকেও—

অবিনাশ। আমি ত ঠাট্টা করচিনে—

বৈকুণ্ঠ। অ্যাঁ! ঠাট্টা নয়! অভদ্র কোথাকার। কেদার বাবু আমার ঘরে আসেন সে আমার সৌভাগ্য! তুই আমার সাম্‌নে তাঁর অপমান করিস্‌!

কেদার। আহা, রাগ করবেন না বৈকুণ্ঠবাবু—

অবিনাশ। দাদা মিথ্যা রাগ করচ কেন? কেদারের আবার অপমান কিসের?

বৈকুণ্ঠ। আবার! তোর সঙ্গে আর আমি কথা কবনা!

অবিনাশ। মাপ কর দাদা! (বৈকুণ্ঠ নিরুত্তর) মাপ কর আমার অপরাধ হয়েছে! (নিরুত্তর) দাদা রাগ করে থেকো না—

বৈকুণ্ঠ। তবে শোন্‌! কেদার বাবুর একটি বিবাহযোগ্যা পরমাসুন্দরী বয়ঃপ্রাপ্তা শ্যালী আছে, তোরও ত বিবাহযোগ্য বয়স হয়েছে—এখন

কেদার। যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ।

বৈকুণ্ঠ। ঠিক বলেছেন, আমার মনের কথাটি বলেছেন!

কেদার। আমারও ঠিক ঐ মনের কথা!

অবিনাশ। কিন্তু দাদা, আমার মনের কথা একটু স্বতন্ত্র! আমার বিবাহ করবার ইচ্ছে নেই—

কেদার। অবিনাশ তুমি হাসালে! বিবাহ করবার পূর্ব্বেই অনিচ্ছে! ওর নাম কি, করবার পরে যদি হত ত মানে পাওয়া যেত!

বৈকুণ্ঠ। মেয়েটি ত সুন্দরী—

অবিনাশ। তাকে দেখেচ না কি?

বৈকুণ্ঠ। দেখ্‌তে হবে কেন? কেদার বাবু যে বল্‌চেন! (অবিনাশ নিরুত্তর)

কেদার। বিশ্বাস হল না? কি বলে, আমার আকৃতি দেখেই ভয় পেলে—কিন্তু ওর

নাম কি—সে যে আমার শ্যালী, আমার স্ত্রীর সহোদরা, আমার বংশের কেউ নয়। একবার স্বচক্ষে দেখে এলে হয় না ?

বৈকুণ্ঠ। সে ত বেশ কথা—দেখে এস না অবিনাশ।

অবিনাশ। দেখে আর করব কি ? ঘরের মধ্যে বাইরের লোক আনতে চাইনে—

কেদার। তা এনোনা—কিন্তু ওর নাম কি, বাইরের লোকের পানে একবার তাকাতে দোষ কি—কি বলে,—একবার দেখে এলে ঘরেরও ক্ষতি নেই, ওর নাম কি, বাইরেরও বিশেষ ক্ষয় হবে না।

অবিনাশ। আচ্ছা তাই হবে। এখন খেতে যাও দাদা। নীরু আমাকে পাঠিয়ে দিলে।

বৈকুণ্ঠ। এই যে, কেদার বাবু কখনো—আগে ওঁর—

কেদার। বিলক্ষণ!

অবিনাশ। তা খাবার না বলে দিলে খাবার আসবে কোথা থেকে। ঈশেনকে একবার ডাকা যাক।

কেদার। ঈশেনকে ডেকোনা ভাই—ওর নাম কি—তাঁর সঙ্গে পূর্ব্বেই দুটো একটা কথা-বার্ত্তা হয়ে গেছে।

খাবার চাঙারি হস্তে তিনকড়ির প্রবেশ।

তিনকড়ি। এই নাও—বসে যাও—আমি পরিবেশন করচি।

বৈকুণ্ঠ। তুমিও বসনা বাপু—পরিবেশনের ব্যবস্থা আমি করচি।

তিনকড়ি। ব্যস্ত হবেন না মশায়—নিজে আগে খেয়ে নিয়েছি।

কেদার। দূর্ লক্ষ্মীছাড়া পেটুক!

তিন। ভাই তিনকড়ের ভাগ্যে বিধি চের আছে বরাবর দেখে আস্‌চি। জন্মাবামাত্র দুধ খাবার জন্যে কান্না ধরলুম, তার ঠিক পূর্ব্বেই মা গেল মরে! তাই সবুর করতে আর সাহস হয় না।

অবিনাশ। এ ছোকরাটিকে কোথায় যোগাড় করলে কেদার!

কেদার। ওর নাম কি—দেশ দেশান্তর খুঁজতে হয় নি, আপনি জুটেছে। এখন এঁকে থোব কোথায়—কি বলে ভাল—তাই খুঁজচি।

অবিনাশ। দাদা তাহলে তুমি এখন খেতে যাও।

বৈকুণ্ঠ। বিলক্ষণ! আগে এঁদের হোক্।

কেদার। সে কি কথা বৈকুণ্ঠ বাবু—

বৈকুণ্ঠ। কেদার বাবু, আপনি কিছু সঙ্কোচ করবেন না—খেতে দেখতে আমার বড় আনন্দ!

তিনকড়ি। বেশ ত আবার কাল দেখবেন! আমরা ত পালাচ্চিনে! কিছুতেই না।

কেদার। তিনকড়ে, বরঞ্চ তুই ঐ চাঙারিটা বাড়ি নিয়ে চল্। কি বলে—এঁদের আর কেন মিছে বিরক্ত করা!

তিনকড়ি। আজ ত আর দরকার দেখিনে। আবার কাল আছে।

(অবিনাশের হাস্য।)

বৈকুণ্ঠ। এ ছোকরাটি বেশ কথা কয়। একে আমার বড় ভাল লাগচে। কিন্তু আহারটা এই খানেই করতে হচ্চে সে আমি কিছুতেই ছাড়চিনে—

ঈশানের প্রবেশ।

ঈশান। বাবু!

বৈকুণ্ঠ। আরে শুনেছি; এই যে যাচ্চি!

আপনারা তাহলে যাবেন দেখ্‌চি! তবে আর ধরে রাখ্‌ব না।

তিনকড়ি। আজ্ঞে না, তাহলে বিপদে পড়বেন।

(বৈকুণ্ঠ অবিনাশ ও ঈশানের প্রস্থান।)

(কেদারের প্রতি) এই নে ভাই—টাকা কটা বেঁচেছে—এ জিনিষ আমার হাতে টেকে না।

কেদার। তোর বাবা তোর নাম দিয়েছে তিনকড়ি—আমি তোকে ডাক্‌ব মাণিক। লাখো টাকা তোর দাম!

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—:০—

কেদার ও অবিনাশ।

কেদার। ওর নাম কি—আজ তবে উঠি—অনেক বিরক্ত করা গেছে—

অবি। বিলক্ষণ! বিরক্ত আবার কিসের! একটু বসে যাওনা! শোন না—আমি চলে আসার পর সে দিন মনোরমা আমার কথা কিছু বল্লে?

কেদার। সে আবার কিছু বল্‌বে! তোমার নাম করবামাত্র তার গাল—ওর নাম কি—বিলিতি বেগুনের মত টক্‌টক্‌ করে ওঠে!

অবিনাশ। (হাসিতে হাসিতে) বল কি কেদার—এত লজ্জা!

কেদার। কি বলে, ঐটেইত হল খারাপ লক্ষণ!

অবিনাশ। (ধাক্কা দিয়া) দূর! কি বলিস্‌ তার ঠিক নেই! খারাপ লক্ষণটা কি হল শুনি!

কেদার। ওর্‌ নাম কি—ওটা স্বভাবের নিয়ম। যেমন তীর ছোঁড়া—গোড়ায় পিছনের দিকে প্রাণপণে পড়ে টান—তার পরে—ওর নাম কি—ছাড়া পাবামাত্রই সামনের দিকে একেবারে বোঁ করে দেয় ছুট্‌! গোড়ায় যেখানে বেশী লজ্জা দেখা যাচ্চে—ওর নাম কি—ভালবাসার দৌড়টাও সেখানে বড্ড বেশী হবে।

অবিনাশ। বল কি কেদার! তা কি রকম লজ্জাটা তার দেখ্‌লে, শুনিই না! তোমরা বুঝি আমার নাম করে তাকে ঠাট্টা করেছিলে?

কেদার। ভাই সে অনেক কথা। আজ একটু কাজ আছে—আজ তবে—

অবিনাশ। আঃ বোসনা কেদার! শোননা—একটা কথা আছে। বুঝেছ কেদার—একটা আংটি কেনা গেছে। বুঝেছ?

কেদার। খুব সহজ কথা ওর নাম কি—বুঝেছি?

অবিনাশ। সহজ? আচ্ছা কি বুঝেছ বল দেখি।

কেদার। টাকা থাক্‌লে আংটি কেনা সহজ—ওর নাম কি—এই বুঝেছি।

অবিনাশ। কিছু বোঝনি। এই আংটিটি আমি তোমার হাত দিয়ে মনোরমাকে উপহার পাঠাতে চাই! তাতে কিছু দোষ আছে!

কেদার। আমি ত কিছু দেখিনে! যদি বা থাকে ত দোষটুকু বাদ দিয়ে—ওর নাম কি—আংটিটুকু নিলেই হবে।

অবি। আঃ তোমার ঠাট্টা রাখ! শোননা কেদার—ঐ সঙ্গে একটা চিঠিও দিই না!

কেদার। সে আর বেশী কথা কি!

অবিনাশ। তবে চট্‌ করে লিখে দিই। (লিখিতে প্রবৃত্ত)।

কেদার। আংটিটা ত লাভ করা গেল। কিন্তু দুই ভাইয়ের মাঝখানে পড়ে মেহন্নৎটাও বড্ড বেশী হচ্চে। এখন, বিবাহটা শীঘ্র চুকে গেলে একটু জিরোবার সময় পাওয়া যায়।

বৈকুণ্ঠের প্রবেশ।

বৈকুণ্ঠ। (উঁকি মারিয়া স্বগত) এই যে ভায়া আমার কেদার বাবুকে নিয়ে পড়েচে! কনে দেখে ইস্তিক ওঁকে আর এক মুহূর্ত্ত ছাড়ে না। বাতিকগ্রস্ত মানুষ কি না, সকল বিষয়েই বাড়াবাড়ি! কেদার বাবু বোধ হয় একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছেন! বেচারাকে আমি উদ্ধার না করলে উপায় নেই। (ঘরে ঢুকিয়া) এই যে কেদার বাবু আমার সেই নতুন পরিচ্ছেদটি শোনাবার জন্যে আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্চি।

কেদার। আর ত বাঁচিনে!—

অবি। (চিঠি ঢাকিয়া) দাদা, কেদার বাবুর সঙ্গে একটা কাজের কথা ছিল।

বৈকুণ্ঠ। কাজের ত সীমা নেই। ছোঁড়াটার মাথা একেবারে ঘুরে গেছে—কিন্তু কেদার বাবুকে না পেলেত আমার চলবে না!

ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। বাবু, মাণিকতলা থেকে মালি এসেছে!

অবিনাশ। এখন যেতে বলে দে! (ভৃত্যের প্রস্থান।)

বৈকুণ্ঠ। যাওনা, একবার শুনেই এস না! ততক্ষণ আমি কেদার বাবুর কাছে আছি—

কেদার। আমার জন্যে ব্যস্ত হবেন না—ওর নাম কি আমি আজ ভবে—

অবিনাশ। না কেদার, একটু বোস।

বৈকুণ্ঠ। না, না, আপনি বসুন্! দেখ অবিনাশ গাছপালা সম্বন্ধে তোমার যে আলোচনাটা ছিল সেটা অবহেলা কোরো না! সেটা বড় স্বাস্থ্যকর, বড়ই আনন্দজনক।

অবিনাশ। কিছু অবহেলা করব না দাদা—কিন্তু এখন একটা বড় দরকারী কাজ আছে।

বৈকুণ্ঠ। আচ্ছা, তাহলে তোমরা একটু বোস। ভালমানুষ পেয়ে বেচারা কেদার বাবুকে ভারি মুস্কিলে ফেলেছে—একটু বিবেচনা নেই—বয়সের ধর্ম্ম!

তিনকড়ির প্রবেশ।

কেদার। আবার এখানে কি কর্ত্তে এলি?

তিনকড়ি। ভয় কি দাদা, দুজন আছে—একটিকে তুমি নাও, একটি আমাকে দাও!

বৈকুণ্ঠ। বেশ কথা বাবা, এস আমার ঘরে এস!

কেদার। তিনকড়ে তুই আমাকে মাটি করলি!

তিনকড়ি। সব্বাই বলে তুমিই আমাকে মাটি করেচ। (কাছে গিয়া) রাগ কর কেন দাদা—যে অবধি তোমাকে দেখেছি সেই অবধি আপন বাপ দাদা খুড়ো কাউকে চক্ষে দেখতে পারিনে! এত ভালবাসা!

কেদার। বাজে বকিস্ কেন—তোর আবার বাপ দাদা কোথা!

তিনকড়ি। বল্লে বিশ্বাস করবিনে কিন্তু আছে ভাই। ওতেত খরচও নেই মাহাত্মিও নেই—তিনকড়েরও বাপ দাদা থাকে—যদি আমার নিজে করে নিতে হত তবে কি আর থাকত? কখ্‌খন না!

বৈকুণ্ঠ। হাহাহাহাঃ। ছেলেটি বেশ কথা কয়! চল বাবা, আমার ঘরে চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

অবিনাশ। খুব সংক্ষেপে লিখলুম, বুঝেছ কেদার—কেবল একটি লাইন—"দেবী পদতলে মুগ্ধ ভক্তের পূজোপহার।"

কেদার। তা কোন কথাটিই বাদ দেওয়া হয় নি—দিব্যি হয়েছে—তবে আজ উঠি!

অবিনাশ। কিন্তু "পদতলে" কথাটা কি ঠিক খাটেল—ওটা কিনা আংটি—

কেদার। কি বলে ভাল—তা "করতলে"ই লিখে দাও না।

অবিনাশ। কিন্তু করতলে পূজোপহারটা কেমন শোনাচ্চে।

কেদার। তা না হয় পূজোপহার নাই হল—ওর নাম কি—

অবিনাশ। শুধু "উপহার" লিখলে বড় ফাঁকা শোনায়, "পূজোপহার"ই থাক্—

কেদার। তা থাক্ না—

অবিনাশ। কিন্তু তা হলে "করতলে"টা কি করা যায়—

কেদার। ওটা পদতলেই করে দাও না ওর নাম কি—তাতে ক্ষতি কি! আমি তা হলে উঠি!

অবিনাশ। একটু বোস্ না—আংটি সম্বন্ধে পদতলে কথাটা খাপছাড়া শোনাচ্চে।

কেদার। খাপছাড়া কেন হবে! তুমিত পদতলে দিয়ে খালাস্—তার পরে ওর নাম কি—তিনি করতলে তুলে নেবেন কি বলে—যদি স্বয়ং না নেন্ ত অন্য লোক আছে!

অবিনাশ। আচ্ছা পূজোপহার না লিখে যদি প্রণয়োপহার লেখা যায়!

কেদার। সেটা যদি খুব চড় করে লেখা যায় ত সেইটেই ভাল।

অবিনাশ। কিন্তু বোস একটু ভেবে দেখি!

ঈশানের প্রবেশ।

ঈশান। খাবার ঠাণ্ডা হয়ে এল যে।

অবিনাশ। আচ্ছা সে হবে এখন—তুই যা!

ঈশান। দিদি ঠাকরুণ বসে আছে—

অবিনাশ। আচ্ছা আচ্ছা তুই এখন পালা—

ঈশান। (কেদারের প্রতি) বড় বাবুর ত আহার নিদ্রা বন্ধ, আবার ছোট বাবুকেও ক্ষেপিয়ে তুলেছ?

কেদার। ভাই ঈশেন, যদিচ আমার নিমক খাওনা, তবু—ওর নাম কি—আমার কথাটাও একবার ভেবে দেখো! তোমার বড় বাবু খুব বিস্তারিত করে লিখে থাকেন আর তোমার ছোট বাবু—কি বলে—অত্যন্ত সংক্ষেপেই লেখেন—কিন্তু আমার কপালক্রমে দুইই সমান হয়ে ওঠে। অবিনাশ, তোমার খাবার এসেছে—ওর নাম কি—আমি উঠি!

অবিনাশ। বিলক্ষণ! তুমিও খেয়ে যাও না। ঈশেন, বাবুর জন্যে খাবার ঠিক কর।

ঈশান। সময় মত বল না, এখন আমি খাবার ঠিক করি কোত্থেকে!

অবিনাশ। তোর মাথা থেকে! বেটা ভূত!

ঈশান। এও যে ঠিক বড় বাবুর মত হয়ে এল, আমাকে আর টিকতে দিলে না।

(প্রস্থান)

অবিনাশ। এখানে "প্রণয়োপহার" লিখলে "দেবী" কথাটা বদ্লাতে হয়। দেবীর সঙ্গে প্রণয় হবে কি করে!

কেদার। কেন হবে না! তা হলে দেবতাগুলো—ওর নাম কি, বাঁচে কি করে? ভাই

অবিনাশ, স্ত্রীজাতি স্বর্গে মর্ত্ত্যে পাতালে যেখানেই থাকুক—ওর নাম কি—তাদের সঙ্গে প্রণয় হতে পারে—কি বলে—ভাল—হয়েও থাকে। তুমি অত ভেবো না! (স্বগত) এখন ছাড়লে বাঁচি।

তিনকড়ির প্রবেশ।

তিনকড়ি। ও দাদা! তোমার বদল ভেবে নাও! তুমি সেখানে যাও, আমি বরঞ্চ এখানে একবার চেষ্টা দেখি!

কেদার। কেনরে কি হয়েছে!

তিনকড়ি। ওরে বাস্‌রে! সে কি খাতা! আমি তার মধ্যে সেঁধলে আমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না! সেইটে পড়তে দিয়ে বুড়ো কোথায় উঠে গেল—আমি ত এক দৌড়ে পালিয়ে এসেছি!

বৈকুণ্ঠের প্রবেশ।

বৈকুণ্ঠ। কি তিনকড়ি পালিয়ে এলে যে!

তিনকড়ি। আপনি অত বড় একখানা বই লিখলেন আর এইটুকু বুঝলেন না!

বৈকুণ্ঠ। কেদার বাবু, আপনি যদি এক-বার আসেন তাহলে—

কেদার। চলুন! (স্বগত) রামে মারলেও মরব, রাবণে মারলেও মরব—কিন্তু অবি-নাশের ঐ একটি লাইন নিয়েত আর পারিনে!

অবিনাশ। কেদার তুমি যাও কোথায়! দাদা, আমার সেই কাজটা!

বৈকুণ্ঠ। (রাগিয়া উঠিয়া) দিন রাত্তির তোমার কাজ! কেদার বাবু, ভদ্রলোক—ওঁকে একটু বিশ্রাম দেবে না! তোমাদের একটু বিবেচনা নেই! আসুন কেদার বাবু!

কেদার। ওর নাম কি, চলুন। (উভয়ের প্রস্থান)

অবিনাশ। মনোরমা তোমার কে হন তিনকড়ি?

তিনকড়ি। তিনি আমার দূর সম্পর্কে বোন্ হন—কিন্তু সে পরিচয় প্রকাশ হলে তিনি ভারি লজ্জা পাবেন!

অবিনাশ। তাঁর খুব লজ্জা—না তিন-কড়ি!

তিনকড়ি। আমার সম্বন্ধে ভারি লজ্জা! কাউকে মুখ দেখাবার যো নেই!

অবিনাশ। না, তোমার সম্বন্ধে বল্‌চিনে—আমার সম্বন্ধে! জান ত তিনকড়ি, আমার সঙ্গে তাঁর একটা সম্বন্ধ—

তিনকড়ি। ওঃ বুঝেছি! তা ত হতেই পারে! আমার সঙ্গেও একটি কন্যের সম্বন্ধ হয়েছিল—বিবাহের পূর্ব্বে সেত লজ্জায় মরেই গেল!

অবিনাশ। আঃ, কি বক তিনকড়ি!

তিনকড়ি। শুধু লজ্জা নয় শুনলুম তার যকৃৎও ছিল!

অবিনাশ। মনোরমার—

তিনকড়ি। যকৃতের দোষ নেই।

অবিনাশ। আঃ সে কথা আমি জিজ্ঞাসা করচিনে—আমি হৃদয়ের কথা বল্‌চি—

তিনকড়ি। মশায় ও সব বড় শক্ত শক্ত কথা—আমি বুঝিনে। মেয়ে মানুষের হৃদয় তিনকড়ি কখনো পায়নি কখনো প্রত্যাশাও করেনি। দিব্যি আছি।

অবিনাশ। আচ্ছা সে থাক্—কিন্তু দেখ তিনকড়ি মনোরমাকে আমি একটি আংটি উপহার দেব—বুঝলে? সেই সঙ্গে এক লাইন চিঠি দিতে চাই—

তিনকড়ি। ক্ষতি কি! একটা লাইন বই ত নয় চট্ করে হয়ে যাবে!

অবিনাশ। এই দেখ না—আমি লিখে-

ছিলুম—"দেবী পদতলে বিমুগ্ধ ভক্তের পূজোপহার।" তুমি কি বল?

তিনকড়ি। তোমার কথা তুমি বল্‌বে—ওর মধ্যে আমার কিছু বলা ভাল হয় না—সে হল আমার ভগ্নী!

অবিনাশ। না, না, তা বলচিনে। আংটি কি ঠিক পদতলে দেওয়া যায়! করতলে লিখলে—

তিনকড়ি। তা ওটা লেখা বইত না—পদতলে লিখে করতলে দিলেই হবে—সে জন্মে ত কেউ আদালতে নালিশ করবে না!

অবিনাশ। না হে না, লেখার ত একটা মানে থাকা চাই—

তিনকড়ি। আংটি থাকলে আর মানে থাকার দরকার কি? ওতেই ত বোঝা গেল।

অবিনাশ। আংটির চেয়ে কথার দাম বেশী—তা জান?

তিনকড়ি। তা হলে আজ আর তিনকড়েকে হাহাকার করে বেড়াতে হত না।

অবিনাশ। আঃ কি বকচ তুমি তার ঠিক নেই। একটু মন দিয়ে শোন দেখি। ও লাইনটা যদি এই রকম লেখা যায় ত কেমন হয়—"প্রেয়সীর করপদ্মে অনুরক্ত সেবকের প্রণয়োপহার!"

তিনকড়ি। বেশ হয়!

অবিনাশ। বেশ হয়! একটা কথা বলে দিলেই হল "বেশ হয়!" একটু ভেবে চিন্তে বল না!

তিনকড়ি। ও বাবা! এ যে আবার রাগ করে! বুড়োর শরীরে কিন্তু রাগ নেই। (প্রকাশ্যে) তা ভেবে চিন্তে দেখলে বোধ হয় গোড়ারটাই ছিল ভাল!

অবিনাশ। কেন বল দেখি! এটাতে কি দোষ হয়েছে!

তিনকড়ি। ও বাবা! এটাতে যদি দোষই না থাক্‌বে ত খামকা আমাকে ভাবতে বল্লে কেন? এ ত বড় মুস্কিলেই পড়া গেল দেখচি!—দোষ কি জানেন্ অবিনাশ বাবু, ও ভাবতে গেলেই দোষ—না ভাবলে কিছুতেই দোষ নেই আমি ত এই বুঝি!

অবিনাশ। ওঃ বুঝেছি—তুমি বল্‌চ, আগে থাকৃতে ঐ প্রেয়সী সম্বোধনটায় লোকে কিছু মনে ভাবতে পারে—

তিনকড়ি। বাঁচা গেল!—হাঁ তাই বটে! কিন্তু কি জানেন আপনা আপনির মধ্যে না হয় তাকে প্রেয়সীই বল্লেন! তা কি আর অন্য কেউ বলে না! ঐটেই লিখে ফেলুন!

অবিনাশ। কাজ নেই গোড়ায় যেটা ছিল সেইটেই—

তিনকড়ি। সেইটেইত আমার পছন্দ—

অবিনাশ। কিন্তু একটু ভেবে দেখ্‌, দেবী, ওটা যেন—

তিনকড়ি। ও বাবা! আবার ভাবতে বলে! দেখ অবিনাশ বাবু, শিশুকাল থেকে আমিও কারো জন্মে ভাবি নি, আমার জন্মেও কেউ ভাবে নি, ওটা আমার আর অভ্যাস হলই না! এরকম আরো আমার অনেকগুলি শিক্ষার দোষ আছে—

অবিনাশ। আঃ তিনকড়ি, তুমি একটু থাম্‌লে বাঁচি! নিজের কথা নিয়েই কেবল বক্‌বক্ করে মরচ, আমাকে একটু ভাবতে দাও দেখি!

তিনকড়ি। আপনি ভাবুন না? আমাকে ভাবতে বলেন কেন? একটু বসুন অবিনাশ বাবু—আমি কেদারদাকে ডেকে আনি। সে আমার চেয়ে ভাবতেও জানে ভেবে কিনারা কর্‌তেও পারে!—আমার পক্ষে বুড়োই ভাল! (প্রস্থান।)

কেদার, বৈকুণ্ঠ এবং তিনকড়ির প্রবেশ

বৈকুণ্ঠ। অবিনাশ, কেদার বাবুকে আবার তোমার কি দরকার হল! আমি ওঁকে আমার নতুন পরিচ্ছেদটা শোনাচ্ছিলুম—তিনকড়ি কিছুতেই ছাড়লে না—শেষকালে হাতে পায়ে ধরতে লাগল।—

অবিনাশ। আমার সেই কাজটা শেষ হয় নি, তাই।

বৈকুণ্ঠ। (রাগিয়া) তোমার ত কাজ শেষ হয় নি, আমারি সে পরিচ্ছেদটা শেষ হয়েছিল না কি?

অবিনাশ। তা দাদা, ওঁকে নিয়ে যাওনা—

কেদার। (ব্যস্ত হইয়া) ওর নাম কি অবিনাশ—তোমারও সে কাজটাত জরুরি—কি বলে—আর ত দেরী করা চলে না!

বৈকুণ্ঠ। বিলক্ষণ! আপনি সে জন্যে ভাববেন না। নিজের কাজ নিয়ে কেদার বাবুকে এরকম কষ্ট দেওয়া উচিত হয় না অবিনাশ! অমন করলে উনি আর এখানে আস্‌বেন না!

তিনকড়ি। সে ভয় করবেন না বৈকুণ্ঠ বাবু—আমাদের ছুটিকে না চাইলেও পাওয়া যায়, তাড়ালেও ফিরে পাবেন—মলেও ফিরে আস্‌ব এম্‌নি সকলে সন্দেহ করে!

কেদার। তিনকড়ে! ফের!

তিনকড়ি। ভাই, আগে থাকতে বলে রাখাই ভাল—শেষকালে ওঁয়ারা কি মনে করবেন!

ঈশানের প্রবেশ।

ঈশান। (অবিনাশ ও কেদারের প্রতি) বাবু, তোমাদের দুজনেরই খাবার জায়গা হয়েছে!

তিনকড়ি। আর আমাকে বুঝি ফাঁকি! জন্মাবামাত্র যার নিজের মা ফাঁকি দিয়ে মল, বন্ধুরা তার আর কি করবে! কিন্তু দাদা, তিনকড়ে তোমাকে ভাগ না দিয়ে খায় না!

কেদার। তিনকড়ে, ফের!

তিনকড়ি। তা যা ভাই, চট্ করে খেয়ে আয় গে! দেরী করলে বড্ড লোভ হবে—মনে হবে ছত্রিশ ব্যঞ্জন লুঠচিস্!

বৈকুণ্ঠ। সে কি কথা তিনকড়ি! তুমি না খেয়ে যাবে! সে কি হয়! ঈশেন!

ঈশান। আমি জানিনে! আমি চল্লুম!

(প্রস্থান।)

অবিনাশ। চলনা তিনকড়ি! একরকম করে হয়ে যাবে!

তিনকড়ি। টানাটানি করে দরকার কি। আপনারা এগোন্! খাওয়াবার রাস্তা বৈকুণ্ঠ বাবু জানেন—সেদিন টের পেয়েছি।

(তিনকড়ি ও বৈকুণ্ঠের প্রস্থান।)

অবিনাশ। তা হলে ও লাইনটা—

কেদার। ওর নাম কি। খেয়ে এসে হবে!

তৃতীয় দৃশ্য।

কেদার।

কেদার। শ্যালীর বিবাহত নির্ব্বিঘ্নে হয়ে গেছে। কিন্তু বৈকুণ্ঠ থাক্‌তে এখানে বাস করে সুখ হচ্ছে না। উপদ্রবত করা যাচ্চে কিন্তু বুড়ো নড়ে না!

বৈকুণ্ঠের প্রবেশ।

বৈকুণ্ঠ। এই যে কেদার বাবু, আপনাকে শুক্‌নো দেখাচ্চে যে? অসুখ করেনি ত?

কেদার। ওর নাম কি—ডাক্তারে সকল রকম মানসিক পরিশ্রম নিষেধ করেছে—

বৈকুণ্ঠ। আহা কি দুঃখের বিষয়! আপনি এখানেই কিছুদিন বিশ্রাম করুন!

কেদার। সেই রকমইত স্থির করেছি!

বৈকুণ্ঠ। তা দেখুন—বেণী বাবুকে—

কেদার। বেণী বাবু নয়, বিপিন বাবুর কথা বল্চেন বোধ হয়—

বৈকুণ্ঠ। হাঁ হাঁ, বিপিন বাবুই বটে—ঐ যে তিনি ছোট বৌমার কে হন—

কেদার। খুড়ো হন—

বৈকুণ্ঠ। খুড়োই হবেন। তা তাঁকে আমার এই ঘরে থাক্‌তে দিয়েছেন—সেকি ওঁর—

কেদার। না, ওর নাম কি, তাঁর কোন অসুবিধে হয় নি—তিনি বেশ আছেন—

বৈকুণ্ঠ। জানেন ত কেদার বাবু, আমি এই ঘরেই লিখে থাকি—

কেদার। তা বেশ ত, আপনি লিখবেন—ওর নাম কি—আপনি লিখবেন—তাতে বিপিন বাবুর কোন আপত্তি নেই।

বৈকুণ্ঠ। না, আপত্তি কেন করবেন, লোকটি বেশ—কিন্তু তাঁর একটি অভ্যাস আছে, তিনি বিছানায় শুয়ে শুয়ে প্রায় সর্ব্বদাই গুন্ গুন্ করে গান করেন—তাতে লেখবার সময়—

কেদার। কি বল্লে—সে জন্যে ভাবনা কি! আপনি তাঁকে ডেকেই বলুন না—

বৈকুণ্ঠ। না না না না! সে থাক। তিনি ভদ্রলোক—

কেদার। ওর নাম কি, আমিই তাঁকে ডেকে খুব করে ভর্ৎসনা করে দিচ্চি—

বৈকুণ্ঠ। না না কেদার বাবু, সে করবেন না—লেখার সময় গান ত আমার ভালই লাগে। কিন্তু আমি ভাবছিলুম হয় ত আর কোনো ঘরে বেণী বাবু একলা থাক্‌লে বেশ মন খুলে গাইতে পারেন।

কেদার। ওর নাম কি—ঠিক উল্টো। বিপিন বাবুর একটি লোক সর্ব্বদাই চাই—

বৈকুণ্ঠ। তা দেখেছি—বড় মিশুক্—হয় গান নয় গল্প, করচেনই—তা আমি তাঁর কথা মন দিয়ে শুনে থাকি!—কিন্তু দেখ কেদার বাবু কিছু মনে কোরো না ভাই—একটা বড় গুরুতর বেদনা পেয়েছি, সে কথা তোমাকে না বলে থাক্‌তে পাচ্চিনে। ভাই আমার সেই স্বরসারসার পুঁথিখানি কে নিয়েছে!

কেদার। কোথায় ছিল বলুন দেখি!

বৈকুণ্ঠ। সে ত আপনি জানেন। এইঘরে ঐ শেল্‌ফের উপর ছিল। আজকাল এ ঘরে সর্ব্বদা লোক আনাগোনা করচেন আমি কাউকে কিছুই বল্‌তে পারচিনে—কিন্তু শেল্‌ফের ঐ জায়গাটা শূন্য দেখচি আর মনে হচ্চে আমার বুকের ক'খানা পাঁজর খালি হয়ে গেছে!

কেদার। তবে আপনাকে—ওর নাম কি খুলে বলি—অবিনাশ আপনার লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে যায়!

বৈকুণ্ঠ। অবু! সেত এ সব বই পড়ে না!

কেদার। পড়ে না—ওর নাম কি—বিক্রি করে!

বৈকুণ্ঠ। বিক্রি করে!

কেদার। নতুন প্রণয়—নতুন সখ—ওর নাম কি—খরচ বেশী। আমি তাকে বলি, অবু—কি বলে ভাল—মাইনের টাকা থেকে কিছু কিছু কেটে নিয়ে দাদাকে দিলেই হয়! অবু বলে লজ্জা করে।

বৈকুণ্ঠ। ছেলেমানুষ! প্রণয়ের খাতিরও এড়াতে পারে না, আবার দাদার সম্মানটিও রাখতে হবে!

কেদার। ওর নাম কি? আমি আপনার ইখানি উদ্ধার করে আনব—

বৈকুণ্ঠ। তা যত টাকা লাগে! আপনার কাছে আমি চিরঋণী হয়ে থাকব।

কেদার। (স্বগত) বাজারে ত তার চার পয়সা দামও হল না—এ আরও হল ভাল—ধর্ম্মও রইল, কিছু পাওয়াও গেল। (প্রস্থান।)

অবিনাশের প্রবেশ।

অবিনাশ। দাদা!

বৈকুণ্ঠ। কি ভাই অবু!

অবিনাশ। আমার কিছু টাকার দরকার হয়েছে—

বৈকুণ্ঠ। তাতে লজ্জা কি অবু! আমি বল্‌চি কি এখন থেকে তোমার টাকা তুমিই রাখ না ভাই. আমি বুড়ো হয়ে গেলুম—হারিয়েই ফেলি কি ভুলেই যাই—আমার কি মনের ঠিক আছে!

অবিনাশ। এ আবার কি নতুন কথা হল দাদা!

বৈকুণ্ঠ। নতুন কথা নয় ভাই, তুমি বিয়ে থাওয়া করে সংসারী হয়েছ আমি ত সন্ন্যাসী মানুষ—

অবিনাশ। তুমিইত দাদা, আমার বিয়ে দিয়ে দিলে তাতেই যদি পর হয়ে থাকি, তবে থাক্—টাকা কড়ির কথা আর আমি বলব না! (প্রস্থান)

বৈকুণ্ঠ। আহা অবু রাগ কোরো না—শোনো আমার কথাটা,—আহা শুনে যাও!

("ভাব্‌তে পারিনে পরের ভাবনা" গাহিতে গাহিতে বিপিনের প্রবেশ।)

বৈকুণ্ঠ। এই যে বেণী বাবু

বিপিন। আমার নাম বিপিনবিহারী।

বৈকুণ্ঠ। হাঁহাঁ, বিপিন বাবু। আপনার বিছানায় ঐ যে বইগুলি রেখেচেন, ও গুলি পড়চেন বুঝি?

বিপিন। নাঃ পড়িনে, বাজাই।

বৈকুণ্ঠ। বাজান? তা আপনাকে যদি বাঁয়া তবলা, কি মৃদঙ্গ—

বিপিন। সে ত আমার আসে না—আমি বই বাজাই। দেখুন্ বৈকুণ্ঠ বাবু, আপনাকে রোজ বল্‌ব মনে করি ভুলে যাই—আপনার এই ডেক্‌সো আর ঐ গোটাকতক শেল্‌ফ এখান থেকে সরাতে হচ্চে—আমার বন্ধুরা সর্ব্বদাই আস্‌চে তাদের বসাবার জায়গা পাচ্চিনে—

বৈকুণ্ঠ। আর ত ঘর দেখিনে—দক্ষিণের ঘরে কেদার বাবু আছেন—ডাক্তার তাঁকে বিশ্রাম করতে বলেচে—পূবের ঘরটায় কে কে আছেন আমি ঠিক চিনিনে—তা বেণী বাবু—

বিপিন। বিপিন বাবু।

বৈকুণ্ঠ। হাঁহাঁ বিপিন বাবু—তা যদি ওগুলো এই এক পাশে সরিয়ে রাখি তাহলে কি কিছু অসুবিধে হয়?

বিপিন। অসুবিধা আর কি, থাকবার কষ্ট হয়। আমি আবার বেশ একটু ফাঁকা না হলে থাকতে পারিনে। "ভাবতে পারিনে পরের ভাবনা লো সই।"—

ঈশানের প্রবেশ।

বৈকুণ্ঠ। ঈশেন, এ ঘরে বেণী বাবুর—

বিপিন। বিপিন বাবুর—

বৈকুণ্ঠ। হাঁ, বিপিন বাবুর থাকার কিছু কষ্ট হচ্চে।

ঈশান। কষ্ট হয়ে থাকে ত আর আবশ্যক কি, ওঁর বাপের ঘর দুয়োর কিছু নেই, না কি।

বৈকুণ্ঠ। ঈশেন, চুপ্ কর!

বিপিন। কি রাস্কেল্ তুই এত বড় কথা বলিস্?

ঈশান। দেখ, গাল মন্দ দিয়ো না বল্‌চি—

বৈকুণ্ঠ। আঃ ঈশেন, থাম্—

বিপিন। আমি তোদের এ ঘরে পায়ের ধূলো মুছতে চাইনে—আমি এখনি চল্লুম।

বৈকুণ্ঠ। যাবেন না বেণী বাবু—আমি গলবস্ত্র হয়ে বল্‌চি মাপ করবেন—(বৈকুণ্ঠকে ঠেলিয়া বিপিনের প্রস্থান) ঈশেন, তুই কি করলি বল্ দেখি—তুই আর আমাকে বাড়িতে টিক্‌তে দিলিনে দেখ্‌চি!

ঈশান। আমিই দিলুম না বটে!

বৈকুণ্ঠ। দেখ ঈশেন, অনেক কাল থেকে আছিস্ তোর কথাবার্ত্তাগুলো আমাদের অভ্যাস হয়ে এসেছে—এরা নতুন মানুষ এরা সইতে পারবে কেন? তুই একটু ঠাণ্ডা হয়ে কথা কইতে পারিস্‌নে?

ঈশান। আমি ঠাণ্ডা থাকি কি করে! এদের রকম দেখে আমার সর্ব্বশরীর জ্বল্‌তে থাকে!

বৈকুণ্ঠ। ঈশেন, ওরা আমাদের নতুন কুটুম্ব—ওরা কিছুতে ক্ষুণ্ণ হলে অবিনাশের গায়ে লাগবে—সে আমাকেও কিছু বল্‌তে পারবে না—অথচ তার হল—

ঈশান। সে ত সব বুঝেছি। সেই জন্যেই ত ছোট বয়সে ছোট বাবুকে বিয়ে দেবার জন্যে কতবার বলেছি—সময়কালে বিয়ে হলে এতটা বাড়াবাড়ি হয় না।

বৈকুণ্ঠ। যা আর বকিস্‌নে ঈশেন—এখন যা—আমি সকল কথা একবার ভেবে দেখি।

ঈশান। ভেবে দেখো! এখন যে কথাটা বল্‌তে এসেছিলুম বলে নিই। আমাদের ছোট বাবুর খুড়ি না পিসি, না কে এক বুড়ি এসে দিদি ঠাকরুণকে যে দুঃখ দিচ্চে সে ত আমার আর সহ্য হয় না!

বৈকুণ্ঠ। আমার নীরুমাকে। সে ত কারো কিছুতে থাকে না!

ঈশান। তাঁকে ত দিনরাত্তির দাসীর মত খাটিয়ে মারচে—তার পরে আবার মাগী তোমার নামে খোঁটা দিয়ে তাঁকে বলে কি না যে, তুমি তোমার ছোট ভাইয়ের টাকায় গায়ে ফুঁ দিয়ে বড়মানুষী করে বেড়াচ্চ। মাগীর যদি দাঁত থাকৃত ত নোড়া দিয়ে ভেঙে দিতুম না!

বৈকুণ্ঠ। তা নীরু কি বলে?

ঈশান। তিনি ত তাঁর বাপেরই মেয়ে—মুখখানি যেন ফুলের মত শুকিয়ে যায়—একটি কথা বলে না—

বৈকুণ্ঠ। (কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া) একটা কথা আছে, যে সয় তারই জয়—

ঈশান। সে কথাটা আমি ভাল বুঝিনে। আমি একবার ছোট বাবুকে—

বৈকুণ্ঠ। খবরদার ঈশেন আমার মাথার দিব্যি দিয়ে বল্‌চি—অবিনাশকে কোন কথা বল্‌তে পারবিনে।

ঈশান। তবে চুপ করে বসে থাক্‌ব?

বৈকুণ্ঠ। না, আমি একটা উপায় ঠাউরেছি। এখানে জায়গাতেও আর কুলচ্চেনা—এঁদের সকলেরই অসুবিধে হচ্চে দেখতে পাচ্চি—তা ছাড়া অবিনাশের এখন ঘর-সংসার হল—তার টাকা কড়ির দরকার, তার উপরে ভার চাপাতে আমার আর ইচ্ছে নেই—আমি এখান থেকে যেতে চাই—

ঈশান। সে ত মন্দ কথা নয়—কিন্তু—

বৈকুণ্ঠ। ওর আর কিন্তু টিন্তু নেই ঈশেন। সময় উপস্থিত হলেই প্রস্তুত হতে হয়।

ঈশান। তোমার লেখা পড়ায় কি হবে?

বৈকুণ্ঠ। (হাসিয়া) আমার লেখা! সে আবার একটা জিনিষ! সবাই হাসে আমি কি তা জানিনে ঈশেন? ওসব রইল পড়ে। সংসারে লেখায় কারো কোন দরকার নেই!

ঈশান। ছোট বাবুকে ত বলে কয়ে যেতে হবে?

বৈকুণ্ঠ। তা হলে সে কিছুতেই যেতে দেবে না। সে ত আর আমাকে যাও বল্‌তে পারবে না ঈশেন! গোপনেই যেতে হবে—তার পরে তাকে লিখে জানাব। যাই আমার নীরুকে একবার দেখে আসিগে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

তিনকড়ি ও কেদারের প্রবেশ।

তিনকড়ি। দাদা, তুইত আমাকে ফাঁকি দিয়ে হাঁসপাতালে পাঠালি—সেখান থেকেও আমি ফাঁকি দিয়ে ফিরেছি—কিছুতেই মলেম না!

কেদার। তাইতরে দিবি্য টিঁকে আছিস্ যে!

তিনকড়ি। ভাগ্যে দাদা একদিনও দেখতে যাও নি—

কেদার। কেনরে!

তিনকড়ি। যম বেটা ঠাউরালে এ ছোঁড়ার দুনিয়ায় কেউ নেই—নেহাৎ তাচ্ছিল্য করে নিলে না। ভাই তোকে বল্‌ব কি, এই তিনকড়ের ভিতরে কতটা পদার্থ আছে সেইটে দেখ্‌বার জন্যে মেডিক্যাল কলেজের ছোকরাগুলো সব ছুরি উঁচিয়ে বসে ছিল—দেখে আমার অহঙ্কার হত! যাই হোক্ দাদা তুমি ত এখানে দিব্যি জমিয়ে বসেচ।

কেদার। যা, যা, মেলা বকিস্‌নে। এখন এ আমার আত্মীয় বাড়ি তা জানিস?

তিনকড়ি। সমস্তই জানি—আমার অগোচর কিছুই নেই। কিন্তু বুড়ো বৈকুণ্ঠকে দেখ্‌চিনে যে! তাকে বুঝি ঠেলে দিয়েছিস্? ঐটে তোর দোষ! কাজ ফুরলেই—

কেদার। তিনকড়ে! ফের! কাণমলা খাবি!

তিনকড়ি। তা দে মলে। কিন্তু সত্যি কথা বল্‌তে হয়, বৈকুণ্ঠকে যদি তুই ফাঁকি দিস্ তা হলে অধর্ম্ম হবে—আমার সঙ্গে যা করিস্ সে আলাদা—

কেদার। ইস্ এত ধর্ম্ম শিখে এলি কোথা!

তিনকড়ি। তা যা বলিস্ ভাই—যদিচ তুমি আমি এত দিন টিঁকে আছি তবু ধর্ম্ম বলে একটা কিছু আছে। দেখ কেদার দা, আমি যখন হাঁসপাতালে পড়েছিলুম, বুড়োর কথা আমার সর্ব্বদা মনে হত—পড়ে পড়ে ভাবতুম, তিনকড়ি নেই এখন কেদারদার হাত থেকে বুড়োকে কে ঠেকাবে! বড় দুঃখ হত।

কেদার। দেখ তিনকড়ে তুই যদি এখানে আমাকে জ্বালাতে আসিস্ তা হলে—

তিনকড়ি। মিথ্যে ভয় করচ দাদা! আমাকে আর হাঁসপাতালে পাঠাতে হবে না। এখানে তুমি একলাই রাজত্ব করবে। আমি দুদিনের বেশী কোথাও টিক্‌তে পারিনে, এ জায়গাও আমার সহ্য হবে না।

কেদার। তাহলে আর আমাকে দগ্ধাস্ কেন—না হয় দুটো দিন আগেই গেলি।

তিনকড়ি। বৈকুণ্ঠের খাতাখানা না চুকিয়ে যেতে পারচিনে—তুমি তাকে ফাঁকি দেবে জানি। অদৃষ্টে যা থাকে ওটা এই অভাগাকেই শুনতে হবে।

কেদার। এ ছোঁড়াটাকে মেরে ধরে গাল দিয়ে কিছুতেই তাড়াবার যো নেই।—তিনকড়ে তোর খিদে পেয়েছে?

তিনকড়ি। কেন আর মনে করিয়ে দাও ভাই ?

কেদার। চল্ তোকে কিছু পয়সা দিই গে—বাজার থেকে জলখাবা কিনে এনে খাবি।

তিনকড়ি। এ কি হল। তেমনও ধর্ম্ম জ্ঞান ! হঠাৎ ভালমন্দ একটা কিছু হবেনাত ?

(উভয়ের প্রস্থান)

ঈশান ও বৈকুণ্ঠের প্রবেশ।

বৈকুণ্ঠ। ভেবেছিলুম, খাতাপত্র গুলো আর সঙ্গে নেব না—শুনে মা নীরু কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো—ভাবলে বুড়োবয়সের খেলাগুলো বাবা কোথায় ফেলে যাচ্চে। এগুলো নে ঈশেন।—ঈশেন।

ঈশান। কি বাবু।

বৈকুণ্ঠ। ছোটর উপর বড়র যে রকম স্নেহ, বড়র উপর ছোটর সে রকম হয় না—না ঈশেন !

ঈশান। ও ইত দেখতে পাই।

বৈকুণ্ঠ। আমি চলে গেলে অবু বোধ হয় বিশেষ কষ্ট পাবে না !

ঈশান। না পাবারই সম্ভব। বিশেষ—

বৈকুণ্ঠ। হাঁ, বিশেষ তার নতুন সংসার হয়েছে—আর ত আত্মীয় স্বজনের অভাব নেই—কি বলিস্ ঈশেন—

ঈশান। আমিও তাই বল্‌ছিলুম।

বৈকুণ্ঠ। বোধ হয় নীরুমার জন্মে তার মনটা—নীরুকে অবু বড় ভালবাসে; না ঈশেন।

ঈশান। আগে ত তাই বোধ হত, কিন্তু,—

বৈকুণ্ঠ। অবিনাশ কি এ সব জানে ?

ঈশান। তা কি আর জানেন না ? তিনি যদি এর মধ্যে না থাকতেন, তা হলে কি আর বুড়িটা সাহস করত—

বৈকুণ্ঠ। দেখ ঈশেন, তোর কথাগুলো বড় অসহ্য। তুই একটা মিষ্টি কথা বানিয়ে বল্‌তে পারিস্‌নে ? এতটুকু বেলা থেকে আমি তাকে মানুষ করলুম,—একদিনের জন্যে চোখের আড়াল করি নি,—আমি চলে গেলে তার কষ্ট হবে না—এমন কথা তুই মুখে আনিস্ হারামজাদা বেটা! সে জেনে শুনে আমার নীরুকে কষ্ট দিয়েছে। লক্ষ্মীছাড়া পাজি, তোর কথা শুন্‌লে বুক ফেটে যায়!

("ভাবতে পারিনে পরের ভাবনা" গাহিতে গাহিতে বিপিনের প্রবেশ।)

বিপিন। ভেবেছিলুম ফিরে ডাকবে। ডাকে না যে! এই যে বুড়ো এইখেনেই আছে। বৈকুণ্ঠ বাবু আমার জিনিষপত্র নিতে এলুম। আমার ঐ হুঁকোটা, আর ঐ ক্যাম্বিসের ব্যাগটা। ঈশেন শীগ্‌গির মুটে ডাক্।

বৈকুণ্ঠ। সে কি কথা—আপনি এখানেই থাকুন! আমি করযোড় করে বল্‌চি আমাকে মাপ করুন বেণী বাবু।

বিপিন। বিপিন বাবু।

বৈকুণ্ঠ। হাঁ, হাঁ, বিপিন বাবু। আপনি থাকুন—আমরা এখনি ঘর খালি করে দিচ্চি।

বিপিন। এ বইগুলো কি হবে ?

বৈকুণ্ঠ। সমস্তই সরাচ্চি। (শেল্ফ হইতে বই ভূমিতে নাবাইতে প্রবৃত্ত)

ঈশান। এ বইগুলিকে বাবু যেন নিজের পুত্রসন্তানের মত দেখত—ধুলো নিজের হাতে ঝাড়ত—আজ ধুলোয় ফেলে দিচ্চে! (চক্ষু মোচন)

বিপিন। কেদারের ঘরে আফিমের কৌটা ফেলে এসেছি—নিয়ে আসিগে। "ভাবতে পারিনে পরের ভাবনা লো সই!"

(প্রস্থান।)

তিনকড়ির প্রবেশ।

তিনকড়ি। এই যে পেয়েছি, বৈকুণ্ঠ বাবু! ভাল ত?

বৈকুণ্ঠ। কি বাবা, তুমি ভাল আছ? অনেক দিন দেখিনি।

তিনকড়ি। ভয় কি বৈকুণ্ঠ বাবু আবার অনেক দিন দেখতে পাবেন। ধরা দিয়েছি; এখন আপনার খাতাপত্র বের করুন!

বৈকুণ্ঠ। সে সব আর নেই তিনকড়ি—তুমি এখন নিশ্চিন্ত মনে এখানে থাকতে পারবে।

তিনকড়ি। তা হলে আর লিখবেন না?

বৈকুণ্ঠ। না, সে সব খেয়াল ছেড়ে দিয়েছি।

তিনকড়ি। ছেড়ে দিয়েছেন সত্যি বল্‌চেন?

বৈকুণ্ঠ। হাঁ ছেড়ে দিয়েছি।

তিনকড়ি। আঃ বাঁচলেম! তা হলে ছুটি—আমি যেতে পারি?

বৈকুণ্ঠ। কোথায় যাবে বাপ্?

তিনকড়ি। অলক্ষ্মী যেখানে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ান্! ভেবেছিলুম মেয়াদ ফুরোয়নি—খাতা এখনো অনেকখানি বাকি আছে—শুনে যেতে হবে। তা হলে প্রণাম হই।

বৈকুণ্ঠ। এস বাবা, ঈশ্বর তোমার ভাল করুন!

তিনকড়ি। উঁহুঁ! একটা কি গোল হয়েছে—ঠিক বুঝতে পারচিনে! ভাই ঈশেন এতদিন পরে দেখা, তুমিও ত আমাকে মার মার শব্দে খেদিয়ে এলে না—তোমার জন্তে ভাবনা হচ্চে!

অবিনাশের প্রবেশ।

অবিনাশ। দাদা, কোথা থেকে তুমি যত সব লোক জুটিয়েছ—বাড়ির মধ্যে বাইরে কোথাও ত আর টিঁক্‌তে দিলে না।

বৈকুণ্ঠ। তারা কি আমার লোক অবু? তোমারই ত সব—

অবিনাশ। আমার কে! আমি তাদের চিনিনে! কেদারের সব আত্মীয়—তুমিই ত তাদের স্থান দিয়েছ! সেই জন্তেই ত আমি তাদের কিছু বল্‌তে পারিনে। তা, তুমি যদি পার ত তাদের সাম্‌লাও দাদা—আমি ছেড়ে চল্লুম।

বৈকুণ্ঠ। আমিই ত যাব মনে করছিলুম।

তিনকড়ি। তার চেয়ে তাঁরা গেলেই ত ভাল হয়। আপনারা দুজনেই গেলে তাঁদের আদর অভ্যর্থনা করবে কে?

অবিনাশ। বাড়ির মধ্যে একটা কে বুড়ি এসেছে, সে ত ঝগড়া করে একটাও দাসী টিঁক্‌তে দিলে না—তাও সয়েছিলুম—কিন্তু আজ আমি স্বচক্ষে দেখ্‌লুম, সে নীরুর গায়ে হাত তুল্‌লে—আর সহ্য হল না—তাকে এইমাত্র গঙ্গা পার করে দিয়ে আসচি!

ঈশান। বেঁচে থাক ছোট বাবু—বেঁচে থাক!

বৈকুণ্ঠ। অবিনাশ, তিনি ছোট বৌমার আত্মীয়া হন্—তাঁকে—

তিনকড়ি। কেউ না, কেউ না, ও বুড়ি কেদারদার পিসি। ওকে বিবাহ করে কেদারের পিসে আর বাঁচতে পারলে না—বিধবা হয়ে ভাইয়ের বাড়ি আস্‌তে ভাইও মরে' বাঁচ্‌ল, এখন কেদারদা নিজের প্রাণ রক্ষে করতে ওকে তোমাদের এখানে চালান করেছে!

অবিনাশ। দাদা, তোমার এ বইগুলো মাটিতে নাবাচ্চ কেন? তোমার ডেক্‌সো গেল কোথায়?

ঈশান। এ ঘরে যে বাবুটি থাকেন বই থাক্‌লে তাঁর থাক্‌বার অসুবিধে হয়, বড় বাবুকে তিনি নুটিস্ দিয়েছেন—

অবিনাশ। কি! দাদাকে ঘর ছেড়ে যেতে হবে!

বিপিনের প্রবেশ।

বিপিন। "ভাব্‌তে পারিনে পরের ভাবনা"—

অবিনাশ। (তাড়া করিয়া গিয়া) বেরও, বেরও, বেরও, বল্‌চি, বেরও এখান থেকে—বেরও এখনি—

বৈকুণ্ঠ। আহা, থাম অবু, থাম, থাম, কি কর—বেণী বাবুকে—

বিপিন। বিপিন বাবুকে—

বৈকুণ্ঠ। হাঁ, বিপিন বাবুকে অপমান কোর না—

তিনকড়ি। কেদারদাকে ডেকে আন্‌তে হচ্চে—এ তামাসা দেখা উচিত। (প্রস্থান)

(ঈশান বিপিনকে বলপূর্ব্বক বাহির করিল)

বিপিন। ঈশেন একটা মুটে ডাক—আমার হুঁকো আর ক্যাম্বিসের ব্যাগটা—

(প্রস্থান)

বৈকুণ্ঠ। ঈশেন, হারামজাদা কোথাকার—ভদ্রলোককে তুই—তোকে আর—

ঈশান। আজ আমাকে গাল দাও, ধরে মার, আমি কিছু বল্‌ব না—প্রাণ বড় খুসি হয়েছে!

কেদারকে লইয়া তিনকড়ির প্রবেশ।

কেদার। ওর নাম কি, অবিনাশ ডাক্‌চ?

অবিনাশ। হাঁ—তোমার চুলো প্রস্তুত হয়েছে, এখন ঘর থেকে নাব্‌তে হবে!

কেদার। তোমার ঠাট্টাটা অবিনাশ অন্য লোকের ঠাট্টার চেয়ে—ওর নাম কি—কিছু কড়া হয়!

বৈকুণ্ঠ। আহা, অবিনাশ, তুমি থাম! কেদার বাবু, অবিনাশের উদ্ধত বয়েস—আপনার আত্মীয়দের সঙ্গে ওঁর ঠিক—

অবিনাশ। বন্‌ছিল না! তাই তিনি তাঁদের হাত ধরে সদর দরজার বার করে দিয়ে এসেছেন—

তিনকড়ি। এতক্ষণে আবার তাঁরা খিড়কির দরজা দিয়ে ঢুকেচেন—সাবধান থাক্‌বেন—

অবিনাশ। এখন তোমাকেও তাঁদের পথে—

তিনকড়ি। ওঁকে দোস্‌রা পথ দেখাবেন, সব কটিকে একত্রে মিল্‌তে দেবেন না—

কেদার। অবু—ওর নাম কি—তা হলে আমার সম্বন্ধে করতলের পরিবর্ত্তে পদতলেই স্থির হল—

অবিনাশ। হাঁ যার যেখানে স্থান—

কেদার। ঈশেন, তা হলে একটা ভাল দেখে সেকেণ্ডক্লাস্ গাড়ি ডেকে দাওত!

তিনকড়ি। ভেবেছিলুম এবার বুঝি একলা বেরতে হবে—শেষ, দাদাও জুট্‌ল। বরাবর দেখে আস্‌চি কেদারদা, শেষকালটা তুমি ধরা পড়ই, আমি সর্ব্বাগ্রেই সেটা সেরে রাখি—আমার আর ভাবনা থাকে না!

কেদার। তিনকড়ে! ফের!—

বৈকুণ্ঠ। কেদার বাবু, এখনি যাচ্চেন কেন? আসুন, কিঞ্চিৎ জলযোগ করে নিন্—

তিন। তা বেশ ত, আমাদের তাড়া নেই।

বৈকুণ্ঠ। ঈশেন।

সমাপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

—•—

সখীসমিতির মহিলাশিল্পমেলায় অভিনীত হইবার উপলক্ষে এই গ্রন্থ উক্ত সমিতি-কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল। ইহাতে সমস্তই কেবল গান, পাঠোপযোগী কবিতা অতি অল্প।

মাননীয়া শ্রীমতী সরলা রায়ের অনুরোধে এই নাট্য রচিত হয় এবং তাঁহাকেই সাদর উপহার স্বরূপে সমর্পণ করিলাম।

ইহার আখ্যান ভাগ কোন সমাজবিশেষে দেশবিশেষে বদ্ধ নহে। সঙ্গীতের কল্পরাজ্যে সমাজনিয়মের প্রাচীর তুলিবার আবশ্যক বিবেচনা করি নাই। কেবল বিনীতভাবে ভরসা করি এই গ্রন্থে সাধারণ মানবপ্রকৃতি-বিরুদ্ধ কিছু নাই।

আমার পূর্ব্বরচিত একটি অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র নাটিকার সহিত এ গ্রন্থের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। পাঠকেরা ইহাকে তাহারি সংশোধন স্বরূপে গ্রহণ করিলে বাধিত হইব।

এই গ্রন্থের তিনটি গান ইতিপূর্ব্বে আমার অন্য কাব্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

পাঠক ও দর্শকদিগকে বুঝিতে হইবে যে, মায়াকুমারীগণ এই কাব্যের অন্যান্য পাত্রগণের দৃষ্টি বা শ্রুতিগোচর নহে।

এই নাট্যকাব্যের সংক্ষিপ্ত আখ্যায়িকা পর পৃষ্ঠায় বিবৃত হইল। নতুবা বিচ্ছিন্ন গানের মধ্য হইতে ইহার আখ্যান সংগ্রহ করা সহসা পাঠকদের পক্ষে দুরূহ বোধ হইতে পারে।

———

প্রথম দৃশ্য।

প্রথম দৃশ্যে মায়াকুমারীগণের আবির্ভাব। মায়াকুমারীগণ কুহকশক্তিপ্রভাবে মানবহৃদয়ে নানাবিধ মায়া সৃজন করে। হাসি, কান্না, মিলন, বিরহ, বাসনা, লজ্জা, প্রেমের মোহ এ সমস্ত মায়াকুমারীদের ঘটনা। একদিন নববসন্তের রাত্রে তাহারা স্থির করিল প্রমোদ-পুরের যুবক যুবতাদের নবীনহৃদয়ে নবীন প্রেম রচনা করিয়া তাহারা মায়ার খেলা খেলিবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নবযৌবন বিকাশে গ্রন্থের নায়ক অমর সহসা হৃদয়ের মধ্যে এক অপূর্ব্ব আকাঙ্ক্ষা অনুভব করিতেছে! সে উদাসভাবে জগতে আপন মানসী মূর্ত্তির অনুরূপ প্রতিমা খুঁজিতে বাহির হইতেছে। এদিকে শান্তা আপন প্রাণমন অমরকেই সমর্পণ করিয়াছে। কিন্তু চিরদিন নিতান্ত নিকটে থাকাতে শান্তার প্রতি অমরের প্রেম জন্মিতে অবসর পায় নাই। অমর শান্তার হৃদয়ের ভাব না বুঝিয়া চলিয়া গেল। মায়াকুমারীগণ পরিহাসচ্ছলে গাহিল—

কাছে আছে দেখিতে না পাও,
কাহার সন্ধানে দূরে যাও।

———

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রমদার কুমারী হৃদয়ে প্রেমের উন্মেষ হয় নাই। সে কেবল মনের আনন্দে হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়। নীরাশ ভালবাসার কথা বলিলে সে অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দেয়। অশোক ও কুমার তাহার নিকটে আপন প্রেম ব্যক্ত করে কিন্তু সে তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করে না। মায়াকুমারীগণ হাসিয়া বলিল তোমার এ গর্ব্ব চিরদিন থাকিবে না।

প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে!
গরব সব হায় কখন টুটে যায়,
সলিল বহে যায় নয়নে!

চতুর্থ দৃশ্য।

অমর পৃথিবী খুঁজিয়া কাহারো সন্ধান পাইল না। অবশেষে প্রমদার ক্রীড়াকাননে আসিয়া দেখিল প্রমদার প্রেম লাভে অকৃতার্থ হইয়া অশোক আপন মর্ম্মব্যথা পোষণ করিতেছে। অমর বলিল যদি ভালবাসিয়া কেবল কষ্টই সার তবে ভালবাসিবার প্রয়োজন কি? কেন যে লোকে সাধ করিয়া ভালবাসে অমর বুঝিতেই পারিল না। এমন সময়ে সখীদের লইয়া প্রমদা কাননে প্রবেশ করিল। প্রমদাকে দেখিয়া অমরের মনে সহসা এক নূতন আনন্দ নূতন প্রাণের সঞ্চার হইল।— প্রমদা দেখিল আর সকলেই তৃষিত ভ্রমরের ন্যায় তাহার চারিদিকে ফিরিতেছে, কেবল অমর একজন অপরিচিত যুবক দূরে দাঁড়াইয়া আছে। সে আকৃষ্টহৃদয়ে সখীদিগকে বলিল "উহাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া আয় ও কি চায়!" সখীদের প্রশ্নের উত্তরে অমরের অনতিস্ফুট হৃদয়ের ভাব স্পষ্ট ব্যক্ত হইল না। সখীরা কিছু বুঝিল না। কেবল মায়াকুমারীগণ বুঝিল এবং গাহিল—

প্রেম পাশে ধরা পড়েছে দুজনে
দেখ দেখ সখি চাহিয়া!
দুটি ফুল খসে ভেসে গেল ওই
প্রণয়ের স্রোতে বাহিয়া!

পঞ্চম দৃশ্য।

অমরের মনে ক্রমে প্রমদার প্রতি প্রেম প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রমদারও হৃদয়ের ব্যাকুলতা বাড়িয়া উঠিল, বাহিরের চঞ্চলতা দূর হইয়া গেল। সখীরা প্রমদার অবস্থা বুঝিতে পারিল—কিন্তু পূর্ব্বদৃশ্যে অমরের অস্পষ্ট উত্তর এবং ভাবগতিক দেখিয়া অমরের প্রতি সখীদের বিশ্বাস নাই। এবং সখীদের নিকট হইতে সখীর হৃদয় হরণ করিয়া লইতেছে জানিয়া অমরের প্রতি হয়ত অলক্ষ্যে তাহাদের ঈষৎ মৃদুবিদ্বেষের ভাবও জন্মিয়াছে অমর যখন প্রমদার নিকট আপনার প্রেম ব্যক্ত করিল প্রমদা কিছু বলিতে না বলিতে সখীরা তাড়াতাড়ি আসিয়া অমরকে প্রচুর ভর্ৎসনা করিল। সরল হৃদয় অমর প্রকৃত অবস্থা কিছু না বুঝিয়া হতাশ্বাস হইয়া ফিরিয়া গেল—ব্যাকুলহৃদয় প্রমদা লজ্জায় বাধা দিবার অবসর পাইল না। মায়াকুমারীগণ গাহিল—

নিমেষের তরে সরমে বাধিল
মরমের কথা হল না।
জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে
রহিল মরম বেদনা!

ষষ্ঠ দৃশ্য।

অমরের অসুখী অশান্ত আশ্রয়হীন হৃদয় হঠাৎই শান্তার প্রতি ফিরিল। এই দীর্ঘ বিরহে এবং অন্য সকলের প্রেম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অমর শান্তার প্রতি নিজের এবং নিজের প্রতি শান্তার অচ্ছেদ্য গূঢ় বন্ধন অনুভব করিবার অবসর পাইল। শান্তার নিকটে আসিয়া আত্মসমর্পণ করিল।—এদিকে প্রমদার সখীরা দেখিল অমর আর ফিরে না; তাহারা প্রত্যাশা করিয়াছিল বাধা পাইয়া অমরের প্রেমানল দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে; তাহাতে নিরাশ হইয়া তাহারা নানা কথার ছলে অমরকে আহ্বান করিতে লাগিল—অমর ফিরিল না; সখীদের ইঙ্গিত বুঝিতেই পারিল না। ভগ্নহৃদয়া প্রমদা অমরের প্রেমের আশা একেবারেই পরিত্যাগ করিল। মায়াকুমারীগণ গাহিল—

বিদায় করেছ যারে নয়ন জলে,
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে!

সপ্তম দৃশ্য।

শান্তা ও অমরের মিলনোৎসবে পুরনরনারীগণ কাননে সমাগত হইয়া আনন্দগান গাহিতেছে। অমর যখন পুষ্পমালা লইয়া শান্তার গলে আরোপণ করিতে যাইতেছে এমন সময় ম্লান ছায়ার ন্যায় প্রমদা কাননে প্রবেশ করিল। সহসা অনপেক্ষিত ভাবে উৎসবের মধ্যে বিষাদ-প্রতিমা প্রমদার নিতান্ত করুণ দীন ভাব অবলোকন করিয়া নিমেষের মত আত্মবিস্মৃত অমরের হস্ত হইতে পুষ্পমালা খসিয়া পড়িয়া গেল। উভয়ের এই অবস্থা দেখিয়া শান্তা ও আর সকলের মনে বিশ্বাস হইল যে, অমর ও প্রমদার হৃদয় গোপনে প্রেমের বন্ধনে বাঁধা আছে। তখন শান্তা ও সখীগণ অমর ও প্রমদার মিলন সংঘটনে প্রবৃত্ত হইল। প্রমদা কহিল—"আর কেন! এখন বেলা গিয়াছে, খেলা ফুরাইয়াছে, এখন আর আমাকে কেন! এখন এ মালা তোমরা পর, তোমরা সুখে থাক।" অমর শান্তার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিল "আমি মায়ার চক্রে পড়িয়া আপনার সুখ নষ্ট করিয়াছি এখন আমার এই ভগ্ন সুখ এই ম্লান মালা কাহাকে দিব, কে লইবে?" শান্তা ধীরে ধীরে কহিল "আমি লইব। তোমার দুঃখের ভার আমি বহন করিব। তোমার সাধের ভুল প্রেমের মোহ দূর হইয়া জীবনের সুখ-নিশা অবসান হইয়াছে—এই ভুলভাঙা দিবালোকে তোমার মুখের দিকে চাহিয়া আমার হৃদয়ের গভীর প্রশান্ত সুখের কথা তোমাকে শুনাইব।" অমর ও শান্তার এইরূপে মিলন হইল। প্রমদা শূন্যহৃদয় লইয়া কাঁদিয়া চলিয়া গেল। মায়াকুমারীগণ গাহিল—

এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মিলে না,
শুধু সুখ চলে যায়,
এমনি মায়ার ছলনা!

মায়ার খেলা।

গীতিনাট্য।

—০*০—

প্রথম দৃশ্য।

—:*:—

কানন।

মায়াকুমারীগণ।

পিলু। একতালা।

সকলে। (মোরা) জলে স্থলে কত ছলে
মায়াজাল গাঁথি।

প্রথমা। (মোরা) স্বপন রচনা করি
অলস নয়ন ভরি।

দ্বিতীয়া। গোপনে হৃদয়ে পশি কুহক-
আসন পাতি।

তৃতীয়া। (মোরা) মদির তরঙ্গ তুলি
বসন্ত-সমীরে।

প্রথমা। দুরাশা জাগায় প্রাণে প্রাণে
আধ তানে ভাঙ্গা গানে
ভ্রমর গুঞ্জরাকুল বকুলের পাঁতি।

সকলে। মোরা মায়াজাল গাঁথি।

দ্বিতীয়া। নরনারী হিয়া মোরা বাঁধি
মায়াপাশে।

তৃতীয়া। কত ভুল করে তারা কত
কাঁদে হাসে।

প্রথমা। মায়া করে ছায়া ফেলি মিলনের মাঝে
আনি মান অভিমান।

দ্বিতীয়া। বিরহী স্বপনে পায় মিলনের সাথী

সকলে। মোরা মায়াজাল গাঁথি।

প্রথমা। চল, সখি, চল। কুহক স্বপন
খেলা খেলাবে চল।

দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া।
নবীন হৃদয়ে রচি নব প্রেম ছল
প্রমোদে কাটাব নব বসন্তের রাতি।

সকলে। মোরা মায়াজাল গাঁথি।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গৃহ।

গমনোন্মুখ অমর। শান্তার প্রবেশ।

ইমন কল্যাণ—একতালা।

শান্তা।
পথহারা তুমি পথিক যেন গো সুখের কাননে,
ওগো যাও, কোথা যাও!
সুখে ঢল ঢল বিবশ বিভল পাগল নয়নে
তুমি চাও কারে চাও!
কোথা গেছে তব উদাস হৃদয়,
কোথা পড়ে আছে ধরণী!
মায়ার তরণী বাহিয়া যেন গো
মায়াপুরী পানে ধাও!
কোন্ মায়াপুরী পানে ধাও!

মিশ্র বাহার কাওয়ালি।

অমর। জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত।
নবীন বাসনা ভরে
হৃদয় কেমন করে,
নবীন জীবনে হল জীবন্ত!
সুখভরা এ ধরায়
মন বাহিরিতে চায়,
কাহারে বসাতে চায় হৃদয়ে!
তাহারে খুঁজিব দিগ্‌-দিগন্ত!

কুমারীগণের প্রবেশ।

কাফি। খেম্‌টা।

সকলে। কাছে আছে দেখিতে না পাও!
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও।

মিশ্র বাহার। কাওয়ালি।

অমর। (শান্তার প্রতি।)
যেমন দখিণে বায়ু ছুটেছে!
কে জানে কোথায় ফুল ফুটেছে।
তেমনি আমিও সখি যাব,
না জানি কোথায় দেখা পাব।
কার্ সুধাস্বর মাঝে
জগতের গীত বাজে,
প্রভাত জাগিছে কার্ নয়নে!
কাহার প্রাণের প্রেম অনন্ত!
তাহারে খুঁজিব দিক্ দিগন্ত!

(প্রস্থান।)

কাফি। খেম্‌টা।

মায়াকুমারীগণ। মনের মত কারে খুঁজে মর,
সে কি আছে ভুবনে।
সে ত রয়েছে মনে।
ওগো, মনের মত সেইত হবে
তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও।

মিশ্র কানাড়া। কাওয়ালি।

শান্তা। (নেপথ্যে চাহিয়া।)
আমার পরাণ যাহা চায়,
তুমি তাই, তুমি তাই গো।
তোমা ছাড়া আর এজগতে
মোর, কেহ নাই কিছু নাই গো।
তুমি সুখ যদি নাহি পাও,
যাও, সুখের সন্ধানে যাও,
আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয় মাঝে
আর কিছু নাহি চাই গো!
আমি, তোমার বিরহে রহিব বিলীন,
তোমাতে করিব বাস,
দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী
দীর্ঘ বরষ মাস!
যদি আর কারে ভাল বাস,
যদি আর ফিরে নাহি আস,
তবে, তুমি যাহা চাও, তাই যেন পাও,
আমি ত দুখ পাই গো।

কাফি। খেম্‌টা।

মায়াকুমারীগণ। (নেপথ্যে চাহিয়া)
কাছে আছে দেখিতে না পাও।
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও!

প্রথমা। মনের-মত কারে খুঁজে মর'!

দ্বিতীয়া। সে কি আছে ভুবনে!
সে যে রয়েছে মনে!

তৃতীয়া। ওগো মনের মত সেই ত হবে
তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও!

প্রথমা। তোমার আপনার যে জন
দেখিলে না তারে!

দ্বিতীয়া। তুমি যাবে কার দ্বারে!

তৃতীয়া। যারে চাবে তারে পাবে না,
যে মন তোমার আছে যাবে তাও!

তৃতীয় দৃশ্য।

কানন।

প্রমদার সখীগণ।

বেহাগ। খেম্‌টা।

প্রথমা। সখি, সে গেল কোথায়।
তারে ডেকে নিয়ে আয়!

সকলে। দাঁড়াব ঘিরে তারে তরুতলায়।

প্রথমা। আজি এ মধুর সাঁঝে
কাননে ফুলের মাঝে,
হেসে হেসে বেড়াবে সে দেখিব তায়।

দ্বিতীয়া। আকাশে তারা ফুটেছে,
দখিনে বাতাস ছুটেছে।
পাখীটি ঘুমঘোরে গেয়ে উঠেছে।

প্রথমা। আয়লো আনন্দময়ি,
মধুর বসন্ত লয়ে।

সকলে। লাবণ্য ফুটাবিলো তরুতলায়।

প্রমদার প্রবেশ।

দেশ। কাওয়ালি।

প্রমদা। দে লো, সখি, দে, পরাইয়ে গলে
সাধের বকুলফুলহার।
আধফুট' জুঁইগুলি
যতনে আনিয়া তুলি
গাঁথি গাঁথি সাজায়ে দে মোরে
কবরী ভরিয়ে ফুলভার।
তুলে দে লো চঞ্চল কুন্তল
কপোলে পড়িছে বারেবার।

প্রথমা। আজি এত শোভা কেন!
আনন্দে বিবশা যেন!

দ্বিতীয়া। বিম্বাধরে হাসি নাহি ধরে!
লাবণ্য ঝরিয়া পড়ে ধরাতলে!

প্রথমা। সখি তোরা দেখে যা, দেখে যা,
তরুণ তনু এত রূপরাশি
বহিতে পারে না বুঝি আর!

মিশ্র ভূপালী। একতালা।

তৃতীয়া সখী।
সখি, বহে গেল বেলা, শুধু হাসি খেলা,
এ কি আর ভাল লাগে।
আকুল তিয়াষ প্রেমের পিয়াস
প্রাণে কেন নাহি জাগে।
কবে আর হবে থাকিতে জীবন।
আঁখিতে আঁখিতে মদির মিলন,
মধুর হুতাশে মধুর দহন
নিত-নব অনুরাগে।
তরল কোমল নয়নের জল
নয়নে উঠিবে ভাসি।
সে বিষাদ নীরে নিবে যাবে ধীরে
প্রখর চপল হাসি।
উদাস নিশ্বাস আকুলি উঠিবে
আশা নিরাশায় পরাণ টুটিবে,

মরমের আলো কপোলে ফুটিবে
সরম-অরুণ-রাগে।

—•—

খাম্বাজ। একতালা।

প্রমদা। ওলো রেখে দে, সখি, রেখে দে,
মিছে কথা ভালবাসা!
সুখের বেদনা সোহাগ যাতনা
বুঝিতে পারি না তাহা।
ফুলের বাঁধন, সাধের কাঁদন,
পরাণ সঁপিতে প্রাণের সাধন,
"লহ" "লহ" ব'লে পরে আরাধন
পরের চরণে আশা।
তিলেক দরশ পরশ মাগিয়া,
বরষ বরষ কাতরে জাগিয়া,
পরের মুখের হাসির লাগিয়া
অশ্রু সাগরে ভাসা'।
জীবনের সুখ খুঁজিবারে গিয়া
জীবনের সুখ নাশা'।

—•—

ঝিঁঝিট। ঝাঁপতাল।

মায়াকুমারীগণ। প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,
কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে।
গরব সব হায় কখন্ টুটে যায়
সলিল ব'হে যায় নয়নে!

—

কুমারের প্রবেশ।

ছায়ানট। ঝাঁপতাল।

কুমার। (প্রমদার প্রতি)
যেওনা, যেওনা ফিরে;
দাঁড়াও, বারেক দাঁড়াও হৃদয়-আসনে!
চঞ্চল সমীর সম ফিরিছ কেন
কুসুমেকুসুমে কাননেকাননে!

তোমায় ধরিতে চাহি ধরিতে পারিনে,
তুমি গঠিত যেন স্বপনে,
এসহে, তোমারে বারেক দেখি ভরিয়ে আঁখি
ধরিয়ে রাখি যতনে।
প্রাণের মাঝে তোমারে ঢাকিব,
ফুলের পাশে বাঁধিয়ে রাখিব,
তুমি দিবস নিশি রহিবে মিশি
কোমল প্রেম শয়নে!

—

বসন্তবাহার। কাওয়ালি।

প্রমদা।
কে ডাকে! আমি কভু ফিরে নাহি চাই।
কত ফুল ফুটে উঠে, কত ফুল যায় টুটে,
আমি শুধু বহে চলে যাই।
পরশ পুলক-রস-ভরা
রেখে যাই, নাহি দিই ধরা।
উড়ে আসে ফুলবাস,
লতাপাতা ফেলে শ্বাস,
বনে বনে উঠে হা হুতাশ,
চকিতে শুনিতে শুধু পাই,
চলে যাই।
আমি কভু ফিরে নাহি চাই।

—

অশোকের প্রবেশ।

পিলু। খেমটা।

অশোক।
এসেছিগো এসেছি, মন দিতে এসেছি,
যারে ভাল বেসেছি।
ফুল দলে ঢাকি
মন যাব রাখি চরণে,
পাছে কঠিন ধরণী পায়ে বাজে
রেখ রেখ চরণ হৃদি মাঝে,
না হয় দ'লে যাবে প্রাণ ব্যথা পাবে,
আমি ত ভেসেছি, অকূলে ভেসেছি।

বেহাগ। খেমটা।

প্রমদা।

ওকে বল, সখি, বল, কেন মিছে করে ছল,
মিছে হাসি কেন, সখি, মিছে আঁখিজল!
জানিনে প্রেমের ধারা, ভয়ে তাই হই সারা
কে জানে কোথায় সুধা, কোথা হলাহল!

সখিগণ।

কাঁদিতে জানেনা এরা কাঁদাইতে জানে কল,
মুখের বচন শুনে মিছে কি হইবে ফল।
প্রেম নিয়ে শুধু খেলা,
প্রাণ নিয়ে হেলাফেলা,
ফিরে যাই এই বেলা, চল, সখি, চল।

(প্রস্থান।)

ঝিলক। রূপক।

মায়াকুমারীগণ।

প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে।
কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে!
গরব সব হায় কখন্ টুটে যায়
সলিল বহে যায় নয়নে!
এ সুখ-ধরণীতে কেবলি চাহ নিতে,
জান না হবে দিতে আপনা,
সুখের ছায়া ফেলি কখন্ যাবে চলি
বরিবে সাধ করি বেদনা।
কখন্ বাজে বাঁশী গরব যায় ভাসি'
পরাণ পড়ে আসি বাঁধনে।

চতুর্থ দৃশ্য।

কানন।

অমর, কুমার, অশোক।

বেলাবলী। ঢিমে তেতালা।

অমর। মিছে ঘুরি এ জগতে কিসের পাকে,
মনের বাসনা যত মনেই থাকে।
বুঝিয়াছি এ নিখিলে
চাহিলে কিছু না মিলে,
এরা, চাহিলে আপন মন গোপনে রাখে।
এত লোক আছে কেহ কাছে না ডাকে।

জয়জয়ন্তী। ঝাঁপতাল।

অশোক। তারে দেখাতে পারিনে কেন প্রাণ
(খুলে গো।
কেন বুঝাতে পারিনে হৃদয় বেদনা!
কেমনে সে হেসে চলে যায়,
কোন্ প্রাণে ফিরেও না চায়,
এত সাধ এত প্রেম করে অপমান!
এত ব্যথাভরা ভালবাসা কেহ দেখে না,
প্রাণে গোপনে রহিল!
এ প্রেম কুসুম যদি হত প্রাণ হতে ছিঁড়ে লইতাম,
তার, চরণে করিতাম দান!
বুঝি সে তুলে নিত না, শুকাত অনাদরে,
তবু তার সংশয় হত অবসান!

ভৈরবী। রূপক।

কুমার। সখা, আপন মন নিয়ে কাঁদিয়ে মরি,
পরের মন নিয়ে কি হবে!
আপন মন যদি বুঝিতে নারি
পরের মন বুঝে কে কবে!

অমর। অবোধ মন লয়ে ফিরি ভবে
বাসনা কাঁদে প্রাণে হাহা রবে,
এ মন দিতে চাও দিয়ে ফেল
কেন গো নিতে চাও মন তবে?
স্বপন সম সব জানিয়ো মনে,
তোমার কেহ নাই এ ত্রিভুবনে;
যে জন ফিরিতেছে আপন আশে,
তুমি ফিরিছ কেন তাহার পাশে!
নয়ন মেলি শুধু দেখে যাও,

হৃদয় দিয়ে শুধু শান্তি পাও!
কুমার। তোমারে মুখে তুলে চাহে না যে
থাক্ সে আপনার গরবে!

মল্লার। রূপক।

অশোক।
আমি, জেনে শুনে বিষ করেছি পান।
প্রাণের আশা ছেড়ে সঁপেছি প্রাণ।
যতই দেখি তারে ততই দহি,
আপন মনোজ্বালা নীরবে সহি,
তবু পারিনে দূরে যেতে, মরিতে আসি,
লইগো বুক পেতে অনল বাণ!
যতই হাসি দিয়ে দহন করে
ততই বাড়ে তৃষা প্রেমের তরে,
প্রেম-অমৃত ধারা ততই যাচি,
যতই করে প্রাণে অশনি দান!

কাফি বাওয়ালি।

অমর। ভালবেসে যদি সুখ নাহি
তবে কেন,
তবে কেন মিছে ভালবাসা!
অশোক। মন দিয়ে মন পেতে চাহি।
অমর ও কুমার। ওগো কেন,
ওগো কেন মিছে এ দুরাশা!
অশোক। হৃদয়ে জ্বালায়ে বাসনার শিখা,
নয়নে সাজায়ে মায়া-মরীচিকা,
শুধু ঘুরে মরি মরুভূমে।
অমর ও কুমার। ওগো কেন,
ওগো কেন মিছে এ পিপাসা!
অমর। আপনি যে আপনার কাছে
নিখিল জগতে কি অভাব আছে!
আছে মন্দ সমীরণ, পুষ্পবিভূষণ
কোকিল-কূজিত কুঞ্জ!

অশোক। বিশ্বচরাচর লুপ্ত হয়ে যায়,
এ কি ঘোর প্রেম অন্ধ রাহু প্রায়
জীবন যৌবন গ্রাসে!
অমর ও কুমার। তবে কেন,
তবে কেন মিছে এ কুয়াশা!

বেহাগড়া। ঝাঁপতাল।
মায়াকুমারীগণ।
দেখ চেয়ে দেখ ঐ কে আসিছে।
চাঁদের আলোতে কার হাসি হাসিছে!
হৃদয় দুয়ার খুলিয়ে দাও,
প্রাণের মাঝারে তুলিয়ে লও,
ফুলগন্ধ সাথে তার সুবাস ভাসিছে!

প্রমদা ও সখীগণের প্রবেশ।

মিশ্র ঝিঁঝিট। খেমটা।
প্রমদা। সুখে আছি সুখে আছি,
(সখা, আপন মনে!)
প্রমদা ও সখীগণ।
কিছু চেয়ো না, দূরে যেয়ো না,
শুধু চেয়ে দেখ, শুধু ঘিরে থাক কাছাকাছি!
প্রমদা। সখা, নয়নে শুধু জানাবে প্রেম,
নীরবে দিবে প্রাণ।
রচিয়া ললিত মধুর বাণী
আড়ালে গাবে গান।
গোপনে তুলিয়া কুসুম গাঁথিয়া
রেখে যাবে মালা গাছি;
প্রমদা ও সখীগণ।
মন চেয়ো না, শুধু চেয়ে থাক,
শুধু ঘিরে থাক কাছাকাছি!
প্রমদা। মধুর জীবন, মধুর রজনী,
মধুর মলয় বায়!
এই মাধুরী ধারা বহিছে আপনি,
কেহ কিছু নাহি চায়।

আমি আপনার মাঝে আপনি হারা,
আপন সৌরভে সারা,
যেন আপনার মন আপনার প্রাণ
আপনারে সঁপিয়াছি!

মূলতান। একতালা।

অশোক। ভালবেসে দুখ সেও সুখ,
সুখ নাহি আপনাতে।

প্রমদা ও সখীগণ।
না না না সখা ভুলিনে ছলনাতে।

কুমার। মন দাও, দাও, দাও,
সখি দাও পরের হাতে।

প্রমদা ও সখীগণ।
না না না মোরা ভুলিনে ছলনাতে!

অশোক। সুখের শিশির নিমেষে শুকায়
সুখ চেয়ে দুখ ভাল,
আন, সজল বিমল প্রেম ছল ছল
নলিন নয়ন পাতে!

প্রমদা ও সখীগণ।
না না না, মোরা, ভুলিনে ছলনাতে।

কুমার। রবির কিরণে ফুটিয়া নলিনী
আপনি টুটিয়া যায়,
সুখ পায় তায় সে!
চির-কলিকা জনম কে করে বহন
চির-শিশির রাতে!

প্রমদা ও সখীগণ।
না না না মোরা ভুলিনে ছলনাতে।

হাম্বীর কাওয়ালি।

অমর।
ওই কে গো হেসে চায়! চায় প্রাণের পানে!
গোপন হৃদয় তলে
কি জানি কিসের ছলে
আলোক হানে!
এ প্রাণ নূতন ক'রে
কে যেন দেখালে মোরে,
বাজিল মরম-বীণা নূতন তানে!
এ পুলক কোথা ছিল, প্রাণভরি বিকশিল,
তৃষা-ভরা তৃষা-হরা এ অমৃত কোথা ছিল।
কোন্ চাঁদ হেসে চাহে!
কোন্ পাখী গান গাহে!
কোন্ সমীরণ বহে লতা-বিতানে!

মিশ্র রামকেলী। তাল ফেরতা।

প্রমদা। দূরে দাঁড়ায়ে আছে,
কেন আসে না কাছে।
যা তোরা যা সখি যা শুধাগে
ঐ আকুল অধর আঁখি কি ধন যাচে।

সখীগণ। ছি ওলো ছি, হল কি, ওলো সখি

প্রথমা। লাজ বাঁধ কে ভাঙিল,
এত দিনে সরম টুটিল!

তৃতীয়া। কেমনে যাব, কি শুধাব!

প্রথমা। লাজে মরি কি মনে করে পাছে।

প্রমদা। যা তোরা যা সখি যা শুধাগে
ওই আকুল অধর আঁখি কি ধন যাচে।

কালাংড়া। খেমটা।

মায়াকুমারীগণ।
প্রেম পাশে ধরা পড়েছে দুজনে
দেখ দেখ সখি চাহিয়া;
দুটি ফুল খসে ভেসে-গেল ওই,
প্রণয়ের স্রোত বাহিয়া।

মিশ্র সুরট। একতালা।

সখীগণ (অমরের প্রতি)।
ওগো, দেখি, আঁখি তুলে চাও,
তোমার চোখে কেন ঘুমঘোর!

মর। আমি কি যেন করেছি পান,
কোন্ মদিরা রস-ভোর।
আমার চোখে তাই ঘুমঘোর!

খীগণ। ছি ছি ছি!

মর। সখি ক্ষতি কি!
এ ভবে) কেহ জ্ঞানী অতি, কেহ ভোলা মন,
কেহ সচেতন কেহ অচেতন,
কাহারো নয়নে হাসির কিরণ,
কাহারো নয়নে লোর।
আমার চোখে শুধু ঘুমঘোর!

খীগণ। সখা, কেন গো অচলপ্রায়
হেথা, দাঁড়ায়ে তরুছায়!

মর। অবশ হৃদয়ভারে চরণ
চলিতে নাহি চায়,
তাই দাঁড়ায়ে তরুছায়।

খীগণ। ছি, ছি, ছি!

অমর। সখি ক্ষতি কি!
এ ভবে) কেহ পড়ে থাকে, কেহ চলে যায়,
কেহ বা আলসে চলিতে না চায়
কেহ বা আপনি স্বাধীন, কাহারো
চরণে পড়েছে ডোর,
কাহারো নয়নে লেগেছে ঘোর!

ঝিঁঝিট। কাওয়ালি।

সখীগণ। ওকে বোঝা গেল না—
চলে আয়, চলে আয়।
ও কি কথা যে বলে সখি
কি চোখে যে চায়!
চলে আয় চলে আয়।
লাজ টুটে শেষে মরি লাজে,
মিছে কাজে,
ধরা দিবে না যে বল কে পারে তায়!
আপনি সে জানে তার মন কোথায়!
চলে আয় চলে আয়!

প্রস্থান।

কালাংড়া। খেম্‌টা।

মায়াকুমারীগণ। প্রেমপাশে ধরা পড়েছে দুজনে
দেখ দেখ সখি চাহিয়া!
দুটি ফুল খসে ভেসে গেল ঐ
প্রণয়ের স্রোত বাহিয়া।
চাঁদিনী যামিনী, মধু সমীরণ,
আধ ঘুম ঘোর, আধ জাগরণ,
চোখোচোখী হতে ঘটালে প্রমাদ,
কুহু স্বরে পিক গাহিয়া।
দেখ দেখ সখি চাহিয়া!

পঞ্চম দৃশ্য।

কানন।

মিশ্র সিন্ধু। একতালা।

অমর। দিবস রজনী আমি যেন কার
আশায় আশায় থাকি!
(তাই) চমকিত মন চকিত শ্রবণ
তৃষিত আকুল আঁখি!
চঞ্চল হয়ে ঘুরিয়ে বেড়াই,
সদা মনে হয় যদি দেখা পাই,
"কে আসিছে" বলে চমকিয়ে চাই
কাননে ডাকিলে পাখী।
জাগরণে তারে না দেখিতে পাই
থাকি স্বপনের আশে,
ঘুমের আড়ালে যদি ধরা দেয়
বাঁধিব স্বপন পাশে।
এত ভালবাসি, এত যারে চাই
মনে হয় না ত সে যে কাছে নাই,

যেন এ বাসনা ব্যাকুল আবেগে
তাহারে আনিবে ডাকি!

প্রমদা, সখীগণ, অশোক ও কুমারের প্রবেশ।

বাহার। ফের্‌তা।

কুমার। সখি সাধ করে যাহা দেবে
তাই লইব।
সখীগণ। আহা মরি মরি সাধের ভিখারী
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণ মন।
কুমার। দাও যদি ফুল শিরে তুলে রাখিব,
সখী। দেয় যদি কাঁটা!
কুমার। তাও সহিব।
সখীগণ। আহা মরি মরি সাধের ভিখারী
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণ মন।
কুমার। যদি একবার চাও সখি মধুর নয়ানে,
ওই আঁখি-সুধাপানে
চির জীবন মাতি রহিব।
সখীগণ। যদি কঠিন কটাক্ষ মিলে!
কুমার। তাও হৃদয়ে বিধায়ে চিরজীবন রহিব!
সখীগণ। আহা মরি মরি সাধের ভিখারী
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণ মন।

মিশ্র সিন্ধু। একতালা।

প্রমদা। আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল
শুধাইল না কেহ!
সে ত এল না, যারে সঁপিলাম
এই প্রাণ মন দেহ!
সে কি মোর তরে পথ চাহে,
সে কি বিরহ গীত গাহে,
যার বাঁশরী ধ্বনি শুনিয়ে
আমি ত্যজিলাম গেহ।

সিন্ধু। কাওয়ালি।

মায়াকুমারীগণ।
নিমেষের তরে সরমে বাধিল,
মরমের কথা হল না।
জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে
রহিল মরম বেদনা।

পিলু। আড়খেম্‌টা।

অশোক। (প্রমদার প্রতি)
ওগো, সখি দেখি, দেখি, মন কোথা আছে।
সখীগণ।
কত কাতর হৃদয় ঘুরে ঘুরে হের কারে যাচে।
অশোক। কি মধু কি সুধা কি সৌরভ
কি রূপ রেখেছ লুকায়ে।
সখীগণ। কোন্ প্রভাতে, কোন্ রবির আলো
দিয়ে খুলিয়ে কাহার কাছে।
অশোক। সে যদি না আসে এ জীবনে
এ কাননে পথ না পায়।
সখীগণ। যারা এসেছে তারা বসন্ত ফুরালে
নিরাশ প্রাণে ফেরে পাছে।

সরফর্দা। কাওয়ালি।

প্রমদা। এ ত খেলা নয়। খেলা নয়।
এ যে হৃদয়-দহন-জ্বালা সখি!
এ যে, প্রাণভরা ব্যাকুলতা,
গোপন মর্ম্মের ব্যথা,
এ যে, কাহার চরণোদ্দেশে জীবন মরণ ঢালা।
কে যেন সতত মোরে
ডাকিয়ে আকুল করে,
যাই যাই করে প্রাণ, যেতে পারিনে।
যে কথা বলিতে চাহি
তা বুঝি বলিতে নাহি,
কোথায় নামায়ে রাখি সখি এ প্রেমের ডালা
যতনে গাঁথিয়ে শেষে পরাতে পারিনে মালা।

মিশ্র দেশ। খেমটা।

প্রথম সখী। সে জন কে, সখী বোঝা গেছে,
আমাদের সখী যারে মন প্রাণ সঁপেছে।
দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া। ও সে কে, কে কে,!
প্রথমা। ওই যে তরুতলে বিনোদ মালা গলে
না জানি কোন্ ছলে বসে রয়েছে।
দ্বিতীয়া। সখি কি হবে।
ও কি কাছে আসিবে বঁধু, কথা কবে!
তৃতীয়া। ও কি প্রেম জানে, ওকি বাঁধন মানে?
ওকি মায়াগুণে মন লয়েছে!
দ্বিতীয়া। বিভল আঁখি তুলে আঁখি পানে চায়,
যেন কি পথ ভুলে এল কোথায়! (ওগো)
তৃতীয়া।
যেন কি গানের স্বরে শ্রবণ আছে ভরে,
যেন কোন্ চাঁদের আলোয় মগ্ন হয়েছে।

মিশ্র ভৈরবী। একতালা।

অমর। ওই মধুর মুখ জাগে মনে!
ভুলিব না এজীবনে।
কি স্বপনে কি জাগরণে!
তুমি জান বা না জান
মনে সদা যেন মধুর বাঁশরী বাজে
হৃদয়ে সদা আছ ব'লে।
আমি প্রকাশিতে পারিনে,
শুধু চাহি কাতর নয়নে।

মিশ্র ভৈঁরো। কাওয়ালি।

সখীগণ।
তারে কেমনে ধরিবে সখি, যদি ধরা দিলে
প্রথমা।
তারে কেমনে কাঁদাবে, যদি আপনি কাঁদিলে!
দ্বিতীয়া। যদি মন পেতে চাও মন রাখ গোপনে।
তৃতীয়া।
কে তারে বাঁধিবে তুমি আপনায় বাঁধলে?
সকলে।
কাছে আসিলে ত কেহ কাছে রহে না!
কথা কহিলে ত কেহ কথা রহে না।
প্রথমা।
হাতে পেলে ভূমিতলে ফেলে চলে যায়!
দ্বিতীয়া। হাসিয়ে ফিরায় মুখ কাঁদিয়ে সাধিলে।

অমর। (নিকটে আসিয়া প্রমদার প্রতি।)
মিশ্র কানাড়া। ঢিমা তেতালা।
সকল হৃদয় দিয়ে ভালবেসেছি যারে,
সে কি ফিরাতে পারে সখি!
সংসার বাহিরে থাকি
জানিনে কি ঘটে সংসারে!
কেজানে, হেথায় প্রাণপণে প্রাণ যারে চায়
তারে পায় কিনা পায়, (জানিনে')
ভয়ে ভয়ে তাই এসেছি গো
অজানা হৃদয় দ্বারে!
তোমার সকলি ভালবাসি,
ওই রূপ রাশি!
ওই খেলা, ওই গান, ওই মধু হাসি!
ওই দিয়ে আছ ছেয়ে জীবন আমারি,!
কোথায় তোমার সীমা ভুবন মাঝারে!

সখীগণ।

কেদারা। খেমটা।

তুমি কে গো, সখীরে কেন জানাও বাসনা!
দ্বিতীয়া।
কে জানিতে চায়,তুমি ভালবাস,কি ভালবাস না
প্রথমা।
হাসে চন্দ্র, হাসে সন্ধ্যা, ফুল্ল কুঞ্জকানন,
হাসে হৃদয় বসন্তে বিকচ যৌবন।
তুমি কেন ফেল শ্বাস, তুমি কেন হাস না!

সকলে। এসেছ কি ভেঙ্গে দিতে খেলা!
সখীতে সখীতে এই হৃদয়ের মেলা!
দ্বিতীয়া। আপন দুঃখ আপন ছায়া লয়ে যাও!
প্রথমা। জীবনের আনন্দ পথ ছেড়ে দাঁড়াও!
তৃতীয়া। দূর হতে কর পূজা হৃদয়-কমল-আসনা!

বেহাগ কাওয়ালি।

অমর। তবে সুখে থাক, সুখে থাক,
আমি যাই—যাই।
প্রমদা। সখী ওরে ডাক,
মিছে খেলায় কাজ নাই!
সখীগণ। অধীরা হোয়ো না সখী,
আশ মেটালে ফেরে না কেহ,
আশ রাখিলে ফেরে!
অমর। ছিলাম একেলা সেই আপন ভুবনে,
এসেছি এ কোথায়!
হেথাকার পথ জানিনে
ফিরে যাই!
যদি সেই বিরাম ভবন ফিরে পাই!
প্রস্থান।
প্রমদা। সখী ওরে ডাক ফিরে!
মিছে খেলা মিছে হেলা কাজ নাই!
সখী। অধীরা হোয়ো না সখী,
আশ মেটালে ফেরে না কেহ,
আশ রাখিলে ফেরে!
প্রস্থান।

সিন্ধু। কাওয়ালি।

মায়াকুমারীগণ। নিমেষের তরে সরমে বাধিল
মরমের কথা হল না!
জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে
রহিল মরম বেদনা!
চোখে চোখে সদা রাখিবার সাধ,
পলক পড়িল, ঘটিল বিষাদ,
মেলিতে নয়ন মিলাল স্বপন,
এমনি প্রেমের ছলনা।

—•—

ষষ্ঠ দৃশ্য।

গৃহ।

শান্তা। অমরের প্রবেশ।

কাফি। কাওয়ালি।

অমর। সেই শান্তিভবন ভুবন কোথা গেল!
সেই রবি শশী তারা,
সেই শোকশান্ত সন্ধ্যা সমীরণ,
সেই শোভা, সেই ছায়া,
সেই স্বপন!
সেই আপন হৃদয়ে আপন বিরাম কোথা গেল
গৃহহারা হৃদয় লবে কাহার শরণ!
(শান্তার প্রতি)
এসেছি ফিরিয়ে, জেনেছি তোমারে,
এনেছি হৃদয় তব পায়—
শীতল স্নেহসুধা কর দান;
দাও প্রেম, দাও শান্তি,
দাও নূতন জীবন!

—•—

আলাইয়া। আড়খেম্‌টা।

মায়াকুমারী।
কাছে ছিলে দূরে গেলে, দূর হতে এস কাছে
ভুবন ভ্রমিলে তুমি, সে এখনো বসে আছে
ছিল না প্রেমের আলো,
চিনিতে পারনি ভাল,
এখন বিরহানলে প্রেমানল জ্বলিয়াছে

—•—

কুকভ। কাওয়ালি।

শান্তা। দেখো, সখা, ভুল করে ভালবেস না!
আমি ভালবাসি বলে কাছে এস না! *
তুমি যাহে সুখী হও তাই কর সখা,
আমি সুখী হব বলে যেন হেস না!
আপন বিরহ লয়ে আছি আমি ভাল,
কি হবে চির আঁধারে নিমেষের আলো!
আশা ছেড়ে ভেসে যাই, যা হবার হবে তাই,
আমার অদৃষ্ট স্রোতে তুমি ভেসো না!

ললিতবসন্ত। কাওয়ালি।

অমর। ভুল করেছিনু ভুল ভেঙেছে!
এবার জেগেছি, জেনেছি,
এবার আর ভুল নয় ভুল নয়!
ফিরেছি মায়ার পিছে পিছে,
জেনেছি স্বপন সব মিছে!
বিঁধেছে বাসনা কাঁটা প্রাণে
এত ফুল নয় ফুল নয়!
পাই যদি ভালবাসা হেলা করিব না,
খেলা করিব না লয়ে মন!
ওই প্রেমময় প্রাণে লইব আশ্রয় সখী,
অতল সাগর এ সংসার,
এ ত কূল নয় কূল নয়!

(প্রমদার সখীগণের প্রবেশ)

সখীগণ (দূর হইতে)

মিশ্র দেশ। খেমটা।

অলি বার বার ফিরে যায়
অলি বার বার ফিরে আসে,
তবেত ফুল বিকাশে!
প্রথমা। কলি ফুটিতে চাহে ফোটে না,
মরে লাজে মরে ত্রাসে!
ভুলি মান অপমান, দাও মন প্রাণ,
নিশি দিন রহ পাশে!
দ্বিতীয়া।
ওগো, আশা ছেড়ে তবু আশা রেখে দাও,
হৃদয় রতন আশে!
সকলে। ফিরে এস, ফিরে এস,
বন মোদিত ফুলবাসে!
আজি বিরহ রজনী, ফুল্ল কুসুম
শিশির সলিলে ভাসে!

পূরবী। কাওয়ালি।

অমর। ঐ, কে আমায় ফিরে ডাকে!
ফিরে যে এসেছে তারে কে মনে রাখে!

কানাড়া। যৎ।

মায়াকুমারীগণ। বিদায় করেছ যারে নয়ন জলে,
এখন্ ফিরাবে তারে কিসের ছলে!
আজি মধু সমীরণে
নিশীথে কুসুম বনে
তারে কি পড়েছে মনে
বকুল তলে?
এখন ফিরাবে আর
কিসের ছলে!

পূরবী। কাওয়ালি।

অমর। আমি চলে এনু বলে কার বাজে ব্যথা।
কাহার মনের কথা মনেই থাকে!
আমি শুধু বুঝি সখী সরল ভাষা,
সরল হৃদয় আর সরল ভালবাসা!
তোমাদের কত আছে কত মন প্রাণ,
আমায় হৃদয় নিয়ে ফেলো না বিপাকে

কানাড়া। খং।

মায়াকুমারীগণ। সে দিনো ত মধুনিশি
প্রাণে গিয়েছিল মিশি,
মুকুলিত দশদিশি
কুসুম দলে।
দুটি সোহাগের বাণী
যদি হত কাণাকাণী,
যদি ঐ মালাখানি
পরাতে গলে।
এখন ফিরাবে তারে
কিসের ছলে!

—•—

শান্তা। (অমরের প্রতি)

ভূপালী। কাওয়ালি।

না বুঝে কারে তুমি ভাসালে আঁখিজলে।
ওগো কে আছে চাহিয়া শূন্য পথপানে,
কাহার জীবনে নাহি সুখ,
কাহার পরাণ জলে।
পড়নি কাহার নয়নের ভাষা,
বোঝনি কাহার মরমের আশা,
দেখনি ফিরে,
কার ব্যাকুল প্রাণের সাধ এসেছ দ'লে।

—•—

বেহাগ। আড়াঠেকা।

অমর।
আমি কারেও বুঝিনে শুধু বুঝেছি তোমারে।
তোমাতে পেয়েছি আলো সংশয় আঁধারে।
ফিরিয়াছি এ ভুবন,
পাইনি ত কারো মন,
গিয়েছি তোমারি শুধু মনের মাঝারে।
এ সংসারে কে ফিরাবে, কে লইবে ডাকি,
আজিও বুঝিতে নারি, ভয়ে ভয়ে থাকি।
কেবল তোমারে জানি,
বুঝেছি তোমার বাণী,
তোমাতে পেয়েছি কূল অকূল পাথারে।
(প্রস্থান।)

———

বিভাস। আড়াঠেকা।

সখীগণ। প্রভাত হইল নিশি কানন ঘুরে,
বিরহ-বিধুর হিয়া মরিল ঝুরে।
ম্লান শশী অস্তে গেল,
ম্লান হাসি মিলাইল,
কাঁদিয়া উঠিল প্রাণ কাতর সুরে।

———

প্রমদার প্রবেশ।

প্রমদা। চল্ সখী চল্ তবে ঘরেতে ফিরে,
যাক্ ভেসে ম্লান আঁখি নয়ন-নীরে!
যাক্ ফেটে শূন্য প্রাণ,
হোক্ আশা অবসান,
হৃদয় যাহারে ডাকে থাকসে দূরে!
(প্রস্থান।)

———

কানাড়া। খং।

মায়াকুমারীগণ। মধুনিশি পূর্ণিমার
ফিরে আসে বারবার, সে জন ফেরে না আর
যে গেছে চলে! ছিল তিথি অনুকূল,
শুধু নিমেষের ভুল, চির দিন তৃষাকুল
পরাণ জলে! এখন ফিরাবে আর
কিসের ছলে!

———

সপ্তম দৃশ্য।

কানন।

অমর, শান্তা ও অন্যান্য পুরনারী ও পৌরজন।

মিশ্র বসন্ত। রূপক।

স্ত্রীগণ। এস এস বসন্ত ধরাতলে;
আন কুহুতান, প্রেমগান,
আন গন্ধমদভরে অলস সমীরণ;
আন নবযৌবন হিল্লোল, নব প্রাণ,
প্রফুল্ল নবীন বাসনা ধরাতলে।
পুরুষগণ। এস থরথর-কম্পিত, মর্ম্মর-মুখরিত,
নব-পল্লব-পুলকিত
ফুল-আকুল মালতী-বল্লি-বিতানে,
সুখছায়ে, মধুবায়ে,
এস, এস!
এস অরুণ-চরণ কমল-বরণ
তরুণ উষার কোলে।
এস জ্যোৎস্না-বিবশ-নিশীথে,
কল-কল্লোল তটিনী তীরে,
সুখসুপ্ত সরসী-নীরে,
এস, এস!
স্ত্রীগণ। এস যৌবন-কাতর হৃদয়ে,
এস মিলন-সুখালস নয়নে,
এস মধুর সরম মাঝারে,
দাও বাহুতে বাহু বাঁধি,
নবীন কুসুম পাশে রচি দাও
নবীন মিলন বাঁধন।

অমর (শান্তার প্রতি)

সাহানা। ঝৎ।

মধুর বসন্ত এসেছে
মধুর মিলন ঘটাতে।
মধুর মলয়-সমীরে
মধুর মিলন রটাতে।
কুহক লেখনী ছুটায়ে
কুসুম তুলিছে ফুটায়ে,
লিখিছে প্রণয় কাহিনী
বিবিধ বরণ ছটাতে।
হের পুরাণ প্রাচীন ধরণী
হয়েছে শ্যামল বরণী,
যেন যৌবন প্রবাহ ছুটেছে
কালের শাসন টুটাতে;
পুরাণ বিরহ হানিছে,
নবীন মিলন আনিছে,
নবীন বসন্ত আইল
নবীন জীবন ফুটাতে!

মিশ্র মূলতান। কাওয়ালি।

স্ত্রীগণ। আজি আঁখি জুড়াল হেরিয়ে,
মনোমোহন মিলন মাধুরী যুগল মূরতি!
পুরুষগণ। ফুলগন্ধে আকুল করে,
বাজে বাঁশরী উদাস স্বরে,
নিকুঞ্জ প্লাবিত চন্দ্রকরে;—
স্ত্রীগণ। তারি মাঝে,
মনোমোহন মিলন মাধুরী যুগল মূরতি।
আন আন ফুলমালা, দাও দোঁহে বাঁধিয়ে!
পুরুষ। হৃদয়ে পশিবে ফুলপাশ,
অক্ষয় হবে প্রেমবন্ধন।
স্ত্রীগণ। চির দিন হেরিবহে
মনোমোহন মিলনমাধুরী যুগল মূরতি।

(প্রমদা ও সখীগণের প্রবেশ।)

কানেরা বেহাগ। কাওয়ালি।

অমর। এ কি স্বপ্ন! এ কি মায়া!
এ কি প্রমদা! এ কি প্রমদার ছায়া!

শান্তা (প্রমদার প্রতি।)

আহা কেগো তুমি মলিন বয়নে,
আধ-নিমীলিত নলিন নয়নে,
যেন আপনারি হৃদয় শয়নে
আপনি রয়েছ লীন!

পুরুষগণ। তোমা তরে সবে রয়েছে চাহিয়া,
তোমা লাগি পিক উঠিছে গাহিয়া,
ভিখারী সমীর কানন বাহিয়া
ফিরিতেছে সারাদিন

অমর। এ কি স্বপ্ন! এ কি মায়া!
এ কি প্রমদা! এ কি প্রমদার ছায়া

শান্তা। যেন শরতের মেঘখানি ভেসে
চাঁদের সভাতে দাঁড়ায়েছ এসে,
এখনি মিলাবে ম্লান হাসি হেসে,
কাঁদিয়া পড়িবে ঝরি।

পুরুষগণ। জাগিছে পূর্ণিমা পূর্ণ নীলাম্বরে,
কাননে চামেলি ফুটে থরে থরে,
হাসিটি কখন ফুটিবে অধরে
রয়েছি তিয়াষ ধরি।

অমর। এ কি স্বপ্ন! এ কি মায়া!
এ কি প্রমদা! এ কি প্রমদার ছায়া!

মিশ্র। ঝিঁঝিট।

সখীগণ।
আহা, আজি এ বসন্তে এত ফুল ফুটে,
এত বাঁশী বাজে, এত পাখী গায়,
সখীর হৃদয় কুসুম কোমল
কার অনাদরে আজি ঝরে যায়।
কেন কাছে আস, কেন মিছে হাস,
কাছে যে আসিত সেত আসিবে না, হায়!
সুখে আছে যারা, সুখে থাক্ তারা,
সুখের বসন্ত সুখে হোক্ সারা,
দুখিনী নারীর নয়নের নীর
সুখী জনে যেন দেখিতে না পায়
তারা দেখেও দেখে না
তারা বুঝেও বোঝে না,
তারা ফিরেও না চায়!

ঝিঁঝিট। ঝাঁপতাল।

শান্তা।
আমি ত বুঝেছি সব যে বোঝে না বোঝে
গোপনে হৃদয় দুটি কে কাহারে খোঁজে।
আপনি বিরহ গড়ি
আপনি রয়েছ পড়ি,
বাসনা কাঁদিছে বসি হৃদয় সরোজে।
আমি কেন মাঝে থেকে
দুজনারে রাখি ঢেকে,
এমন ভ্রমের তলে কেন থাকি ম'জে।

অশোক। (প্রমদার প্রতি।)

গৌড় সারং। ষৎ।

এতদিন বুঝি নাই, বুঝেছি ধীরে।
ভাল যারে বাস, তারে আনিব ফিরে।
হৃদয়ে হৃদয় বাঁধা
দেখিতে না পায় আঁধা,
নয়ন রয়েছে ঢাকা নয়ন-নীরে।

শান্তা ও স্ত্রীগণ।

সোহিনী খেমটা।

চাঁদ হাস, হাস।
হারা হৃদয় দুটি ফিরে এসেছে!

পুরুষ। কত দুখে কত দূরে
আঁধার সাগর ঘুরে,
সোনার তরণী দুটি তীরে এসেছে!
মিলন দেখিবে বলে
ফিরে বায়ু কুতূহলে,
চারিধারে ফুলগুলি ঘিরে এসেছে।

সকলে। চাঁদ হাস হাস!
হারা হৃদয় দুটি ফিরে এসেছে!

ভৈরবী। আড়াঠেকা।

প্রমদা। আর কেন, আর কেন।
দলিত কুসুমে বহে সমস্ত সমীরণ।
ফুরায়ে গিয়াছে বেলা,
এখন্ এ মিছে খেলা,
নিশান্তে মলিন দীপ কেন জ্বলে অকারণ।
সখীগণ।
অশ্রু যবে ফুরায়েছে তখন্ মুছাতে এলে।
অশ্রুভরা হাসিভরা নবীন নয়ন ফেলে!
প্রমদা। এই লও, এই ধর,
এ মালা তোমরা পর,
এ খেলা তোমরা খেল সুখে থাক অনুক্ষণ!

—*—

মিশ্রখট। ঝাঁপতাল।

অমর। এ ভাঙ্গা সুখের মাঝে নয়নজলে
এ মলিন মালা কে লইবে!
ম্লান আলো ম্লান আশা হৃদয়তলে
এ চির বিষাদ কে বহিবে!
সুখনিশি অবসান,
গেছে হাসি, গেছে গান,
এখন্ এ ভাঙ্গা প্রাণ লইয়া গলে
নীরব নিরাশা কে সহিবে!

—*—

রামকেলি। কাওয়ালি।

শান্তা। যদি কেহ নাহি চায়,
আমি লইব।
তোমার সকল দুখ
আমি সহিব।
আমার হৃদয় মন
সব দিব বিসর্জ্জন,
তোমার হৃদয় ভার
আমি বহিব।
ভুল ভাঙা দিবালোকে
চাহিব তোমার চোখে,
প্রশান্ত সুখের কথা
আমি কহিব।
উভয়ের (প্রস্থান।)

—*—

টোড়ী। ঝাঁপতাল।

মায়াকুমারীগণ। দুখের মিলন টুটিবার নয়।
নাহি আর ভয় নাহি সংশয়।
নয়ন সলিলে যে হাসি ফুটে গো
রয় তাহা রয় চিরদিন রয়

—*—

ভৈরবী। ঝাঁপতাল

প্রমদা। কেন এলি রে, ভালবাসিলি,
ভালবাসা পেলি নে।
কেন সংসারেতে উঁকি মেরে
চলে গেলিনে!
সখীগণ।
সংসার কঠিন বড় কারেও সে ডাকে না,
কারেও সে ধরে রাখে না।
যে থাকে সে থাকে, আর যে যায় সে যায়,
কারো তরে ফিরেও না চায়!
প্রমদা। হায় হায় এ সংসারে যদি না পূরিল
আজন্মের প্রাণের বাসনা,
চলে যাও ম্লানমুখে ধীরে ধীরে ফিরে যাও,
থেকে যেতে কেহ বলিবে না।
তোমার ব্যথা তোমার অশ্রু তুমি নিয়ে যাবে
আর ত কেহ অশ্রু ফেলিবে না!
(প্রস্থান।)

—**—

মায়াকুমারীগণ।

মিশ্র বিভাস। একতালা।

সকলে।

এরা, সুখের লাগি চাহে প্রেম,প্রেম মেলে না,

প্রথমা। শুধু সুখ চলে যায়!

দ্বিতীয়া। এমনি মায়ার ছলনা।

তৃতীয়া।

এরা ভুলে যায় কারে ছেড়ে কারে চায়।

সকলে।

তাই কেঁদে কাটে নিশি, তাই দহে প্রাণ,

তাই মান অভিমান,

প্রথমা। তাই এত হায় হায়।

দ্বিতীয়া। প্রেমে সুখ দুখ ভুলে তবে সুখ ?

সকলে। সখী চল, গেল নিশি, স্বপন ফুরা

মিছে আর কেন বল।

প্রথমা। শশী ঘুমের কুহক নিয়ে গেল অস্তা

সকলে। সখী চল।

প্রথমা। প্রেমের কাহিনী গান,

হয়ে গেল অবসান।

দ্বিতীয়া।

এখন্ কেহ হাসে কেহ বসে ফেলে অশ্রুজ

সমাপ্ত।

গানের বহি।

মিশ্র বাহার। কাওয়ালি।

(জীবনে) আজ কি প্রথম এল বসন্ত

নবীন বাসনা ভরে

হৃদয় কেমন করে,

নবীন জীবনে হল জীবন্ত।

সুখভরা এ ধরায়

মন বাহিরিতে চায়,

কাহারে বসাতে চায় হৃদয়ে!

তাহারে খুঁজিব দিগ্-দিগন্ত!

জীবনে আজ কি প্রথম এল বসন্ত।

যেমন দখিণে বায়ু ছুটেছে!

কে জানে কোথায় ফুল ফুটেছে!

তেমনি আমিও সখী যাব,

না জানি কোথায় দেখা পাব।

কার্ সুধাস্বর মাঝে

জগতের গীত বাজে,

প্রভাত জাগিছে কার্ নয়নে!

কাহার প্রাণের প্রেম অনন্ত।

তাহারে খুঁজিব দিগ্-দিগন্ত। ১॥

মিশ্র কানাড়া। কাওয়ালি।

আমার পরাণ যাহা চায়,

তুমি তাই, তুমি তাই গো।

তোমা ছাড়া আর এ জগতে

মোর, কেহ নাই কিছু নাই গো!

তুমি সুখ যদি নাহি পাও,

যাও, সুখের সন্ধানে যাও,

আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয় মাঝে

আর কিছু নাহি চাই গো!
আমি, তোমার বিরহে রহিব বিলীন.
তোমাতে করিব বাস,
দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী
দীর্ঘ বরষ মাস!
যদি আর কারে ভালবাস,
যদি আর ফিরে নাহি আস,
তবে, তুমি যাহা চাও, তাই যেন পাও,
আমি যত দুখ পাই গো! ২ ॥

—

কাফি। খেম্‌টা।

কাছে আছে দেখিতে না পাও!
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও!
মনের-মত কারে খুঁজে মর',
সে কি আছে ভুবনে,
সে যে রয়েছে মনে,
ওগো মনের মত সেই ত হবে
তুমি শুভক্ষণে যাহার পানে চাও;
তোমার আপনার যে জন
দেখিলে না তারে!
তুমি যাবে কার দ্বারে!
যারে চাবে তারে পাবে না,
যে মন তোমার আছে যাবে তাও! ৩ ॥

মিশ্র ভূপালী। একতালা।

সখি, বহে গেল বেলা, শুধু হাসি খেলা,
এ কি আর ভাল লাগে!
আকুল তিয়াষ প্রেমের পিয়াস
প্রাণে কেন নাহি জাগে!
কবে আর হবে থাকিতে জীবন
আঁখিতে আঁখিতে মদির মিলন,
মধুর হুতাশে মধুর দহন
নিত-নব অনুরাগে!
তরল কোমল নয়নের জল
নয়নে উঠিবে ভাসি।
সে বিষাদ-নীরে নিবে যাবে ধীরে
প্রখর চপল হাসি।
উদাস নিশ্বাস আকুলি উঠিবে
আশা নিরাশায় পরাণ টুটিবে,
মরমের আলো কপোলে ফুটিবে.
সরম-অরুণ রাগে! ৪ ॥

খাম্বাজ। একতালা।

ওলো রেখে দে, সখি, রেখে দে,
মিছে কথা ভালবাসা!
সুখের বেদনা সোহাগ যাতনা
বুঝিতে পারি না ভাষা।
ফুলের বাঁধন, সাধের কাঁদন,
পরাণ সঁপিতে প্রাণের সাধন,
"লহ" "লহ" বলে' পরে আরাধন
পরের চরণে আশা।
তিলেক দরশ পরশ মাগিয়া,
বরষ বরষ কাতরে জাগিয়া,
পরের মুখের হাসির লাগিয়া
অশ্রু সাগরে ভাসা'।
জীবনের সুখ খুঁজিবারে গিয়া
জীবনের সুখ নাশা'! ৫॥

ছায়ানট। ঝাঁপতাল।

যেওনা, যেওনা ফিরে;
দাঁড়াও, বারেক দাঁড়াও হৃদয়-আসনে!
চঞ্চল সমীর সম ফিরিছ কেন
কুসুমে কুসুমে কাননে কাননে!
তোমায় ধরিতে চাহি ধরিতে পারিনে,
তুমি গঠিত যেন স্বপনে,
এসহে, তোমারে বারেক দেখি ভরিয়ে আঁখি
ধরিয়ে রাখি যতনে।
প্রাণের মাঝে তোমারে ঢাকিব,
ফুলের পাশে বাঁধিয়ে রাখিব,
তুমি দিবস নিশি রহিবে মিশি
কোমল প্রেম শয়নে! ৬॥

বসন্তবাহার। কাওয়ালি।

কে ডাকে! আমি কভু ফিরে নাহি চাই!
কত ফুল ফুটে উঠে কত ফুল যায় টুটে,
আমি শুধু বহে চলে যাই!
পরশ পুলক-রস ভরা
রেখে যাই, নাহি দিই ধরা;
উড়ে আসে ফুলবাস,
লতাপাতা ফেলে শ্বাস,
বনে বনে উঠে হা হুতাশ,
চকিতে শুনিতে শুধু পাই, চলে যাই।
আমি কভু ফিরে নাহি চাই! ৭॥

পিলু। খেমটা।

এসেছিগো এসেছি, মন দিতে এসেছি,
যারে ভালবেসেছি!
ফুল দলে ঢাকি
মন যাব রাখি চরণে,
পাছে কঠিন ধরণী পায়ে বাজে
রেখো রেখো চরণ হৃদিমাঝে,
না হয় দলে' যাবে প্রাণ ব্যথা পাবে,
আমি ত ভেসেছি, অকূলে ভেসেছি! ৮॥

বেহাগ। খেমটা।

ওকে বল, সখি বল, কেন মিছে করে ছল,
মিছে হাসি কেন, সখি মিছে আঁখিজল!
জানিনে প্রেমের ধারা, ভয়ে তাই হই সারা,
কে জানে কোথায় সুধা, কোথা হলাহল!
কাঁদিতে জানেনা এরা কাঁদাইতে জানে কল,
মুখের বচন শুনে মিছে কি হইবে ফল!
প্রেম নিয়ে শুধু খেলা,
প্রাণ নিয়ে হেলাফেলা,
ফিরে যাই এই বেলা, চল, সখি, চল! ৯॥

জিলফ। রূপক।

প্রেমের ফাঁদপাতা ভুবনে,
কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে!
গরব সব হায় কখন্ টুটে যায়
সলিল বহে যায় নয়নে!
এ সুখ-ধরণীতে কেবলি চাহ নিতে
জান না হবে দিতে আপনা,
সুখের ছায়া ফেলি কখন্ যাবে চলি
বরিবে সাধ করি বেদনা!
কখন্ বাজে বাঁশী গরব যায় ভাসি
পরাণ পড়ে আসি বাঁধনে! ১০।

বেলাবলী। ঢিমেতেতালা।

মিছে ঘুরি এ জগতে কিসের পাকে,
মনের বাসনা যত মনেই থাকে।
বুঝিয়াছি এ নিখিলে
চাহিলে কিছু না মিলে,
এরা, চাহিলে আপন মন গোপনে রাখে।
এত লোক আছে কেহ কাছে না ডাকে! ১১

জয়জয়ন্তী। ঝাঁপতাল।

তারে দেখাতে পারিনে কেন প্রাণ খুলে গো
কেন বুঝাতে পারিনে হৃদয়-বেদনা!
কেমনে সে হেসে চলে যায়,
কোন্ প্রাণে ফিরেও না চায়,
এত সাধ এত প্রেম করে অপমান
এত ব্যথাভরা ভালবাসা কেহ দেখে না,
প্রাণে গোপনে রহিল!
এ প্রেম কুসুম যদি হত
প্রাণ হতে ছিঁড়ে লইতাম,
তার, চরণে করিতাম দান!
বুঝি সে তুলে নিত না,
শুকাত অনাদরে,
তবু তার সংশয় হত অবসান! ১২॥

ভৈরবী। রূপক।

সখা, আপন মন নিয়ে কাঁদিয়ে মরি,
পরের মন নিয়ে কি হবে!
আপন মন যদি বুঝিতে নারি

পরের মন বুঝে কে কবে!
অবোধ মন লয়ে ফিরি ভবে
বাসনা কাঁদে প্রাণে হাহা রবে,
এ মন দিতে চাও দিয়ে ফেল
কেন গো নিতে চাও মন তবে!
স্বপন সম সব জেনো মনে,
তোমার কেহ নাই ত্রিভুবনে;
যে জন ফিরিতেছে নিজ আশে,
তুমি ফিরিছ কেন তার পাশে!
নয়ন মেলি শুধু দেখে যাও,
হৃদয় দিয়ে শুধু শান্তি পাও!
তোমারে মুখ তুলে চাহে না যে
থাক সে আপনার গরবে! ১৩ ॥

মল্লার। রূপক।

আমি, জেনে শুনে বিষ করেছি পান।
প্রাণের আশা ছেড়ে সঁপেছি প্রাণ।
যতই দেখি তারে ততই দহি,
আপন মনোজ্বালা নীরবে সহি,
তবু পারিনে দূরে যেতে, মরিতে আসি,
লইগো বুক পেতে অনল বাণ!
যতই হাসি দিয়ে দহন করে
ততই বাড়ে তৃষা প্রেমের তরে,
প্রেম-অমৃত ধারা ততই যাচি,
যতই করে প্রাণে অশনি দান। ১৪ ॥

কাফি। কাওয়ালি।

ভালবেসে যদি সুখ নাহি।
তবে কেন, তবে কেন মিছে ভালবাসা!
মন দিয়ে মন পেতে চাহি, ওগো কেন,
ওগো কেন মিছে এ দুরাশা।
হৃদয়ে জ্বালায়ে বাসনার শিখা,
নয়নে সাজায়ে মায়া-মরীচিকা,
শুধু ঘুরে মরি মরুভূমে।
ওগো কেন, ওগো কেন মিছে এ পিপাসা।
আপনি যে আছে আপনার কাছে
নিখিল জগতে কি অভাব আছে।
আছে মন্দ সমীরণ পুষ্পবিভূষণ
কোকিল-কূজিত কুঞ্জ।
বিশ্বচরাচর লুপ্ত হয়ে যায়,
এ কি ঘোর প্রেম অন্ধ রাহু প্রায়
জীবন যৌবন গ্রাসে!
তবে কেন, তবে কেন মিছে এ কুয়াশা। ১৫ ॥

মিশ্র ঝিঁঝিট। খেম্‌টা।

সুখে আছি সুখে আছি, (সখা, আপন মনে!)
কিছু চেয়ো না, দূরে যেয়ো না,
শুধু চেয়ে দেখ, শুধু ঘিরে থাক কাছাকাছি!
সখা, নয়নে শুধু জানাবে প্রেম,
নীরবে দিবে প্রাণ।
রচিয়া ললিত মধুর বাণী
আড়ালে গাবে গান।
গোপনে তুলিয়া কুসুম গাঁথিয়া
রেখে যাবে মালা গাছি;
মন চেয়ো না, শুধু চেয়ে থাক,
শুধু ঘিরে থাক কাছাকাছি।
মধুর জীবন, মধুর রজনী,
মধুর মলয় বায়!
এই মাধুরী ধারা বহিছে আপনি,
কেহ কিছু নাহি চায়।
আমি আপনার মাঝে আপনি হারা,
আপন সৌরভে সারা,
যেন আপনার মন আপনার প্রাণ
আপনারে সঁপিয়াছি। ১৬ ॥

হাম্বীর। কাওয়ালি।

ওই কে গো হেসে চায়। চায় প্রাণের পানে।
গোপন হৃদয় তলে
কি জানি কিসের ছলে
আলোক হানে।

এ প্রাণ নূতন করে'
কে যেন দেখালে মোরে,
বাজিল মরম-বীণা নূতন তানে।
এ পুলক কোথা ছিল,
প্রাণ ভরি বিকশিল,
তৃষা-ভরা তৃষা-হরা এ অমৃত কোথা ছিল!
কোন্ চাঁদ হেসে চাহে!
কোন্ পাখী গান গাহে!
কোন সমীরণ বহে লতা-বিতানে! ১৭ ॥

ঝিঁঝিট। কাওয়ালি।

ওকে বোঝা গেল না—
চলে আয়, চলে আয়।
(ও) কি কথা যে বলে সখী
কি চোখে যে চায়!
লাজ টুটে শেষে মরি লাজে,
মিছে কাজে,
ধরা দিবে না যে বল কে পারে তায়!
আপনি সে জানে তার মন কোথায়!
চলে আয় চলে আয়! ১৮ ॥

কালাংড়া খেম্‌টা।

প্রেমপাশে ধরা পড়েছে দুজনে
দেখ দেখ সখী চাহিয়া!
দুটি ফুল খসে ভেসে গেল ওই
প্রণয়ের স্রোত বাহিয়া।
চাঁদিনী যামিনী মধু-সমীরণ,
আধ ঘুম ঘোর, আধ জাগরণ,
চোখোচোখী হতে ঘটালে প্রমাদ,
কুহু স্বরে পিক গাহিয়া।
দেখ দেখ সখী চাহিয়া। ১৯ ॥

মিশ্র সিন্ধু। একতালা।

দিবস রজনী আমি যেন কার
আশায় আশায় থাকি
(তাই) চমকিত মন চকিত শ্রবণ
তৃষিত আকুল আঁখি।
চঞ্চল হয়ে ঘুরিয়ে বেড়াই,
সদা মনে হয় যদি দেখা পাই,
"কে আসিছে" বলে চমকিয়ে চাই
কাননে ডাকিলে পাখী।
জাগরণে তারে না দেখিতে পাই
থাকি স্বপনের আশে,
ঘুমের আড়ালে যদি ধরা দেয়
বাঁধিব স্বপন পাশে।
এত ভালবাসি, এত যারে চাই
মনে হয় না ত সে যে কাছে নাই,
যেন এ বাসনা ব্যাকুল আবেগে
তাহারে আনিবে ডাকি। ২০

মিশ্র সিন্ধু। একতালা।

আমি হৃদয়ের কথা বলিতে ব্যাকুল
শুধাইল না কেহ!
সে ত এল না, যারে সঁপিলাম
এই প্রাণ মন দেহ!
সে কি মোর তরে পথ চাহে,
সে কি বিরহ গীত গাহে, যার বাঁশরী ধ্বনি শুনিয়ে
আমি ত্যজিলাম গেহ! ২১ ॥

পিলু। আড়খেম্‌টা।

ওগো, সখি, দেখি, দেখি, মন কোথা আছে!
কত কাতর হৃদয় ঘুরে ঘুরে হের কারে যাচে!
কি মধু কি সুধা কি সৌরভ
কি রূপ রেখেছে লুকায়ে!
কোন প্রভাতে, কোন্ রবির আলোকে
দিবে খুলিয়ে কাহার কাছে!
সে যদি না আসে এ জীবনে
এ কাননে পথ না পায়!
যারা এসেছে, তারা বসন্ত ফুরালে
নিরাশ প্রাণে ফেরে পাছে! ২২ ॥

সরফর্দ্দা। কাওয়ালি।

এ ত খেলা নয়! খেলা নয়!
এ যে হৃদয়-দহন-জ্বালা, সখি!
এ যে, প্রাণভরা ব্যাকুলতা,
গোপন মর্ম্মের ব্যথা,
এ যে কাহার চরণোদ্দেশে জীবন মরণ ঢালা'!
কে যেন সতত মোরে
ডাকিয়ে আকুল করে,
যাই যাই করে প্রাণ যেতে পারিনে!
যে কথা বলিতে চাহি তা বুঝি বলিতে নাহি,
কোথায় নামায়ে রাখি সখী এ প্রেমের ডালা!
যতনে গাঁথিয়ে শেষে পরাতে পারিনে মালা! ২৩

মিশ্র ভৈরবী। একতালা।

ওই মধুর মুখ জাগে মনে!
ভুলিব না এ জীবনে!
কি স্বপনে কি জাগরণে!
তুমি জান বা না জান
মনে সদা যেন মধুর বাঁশরী বাজে,
হৃদয়ে সদা আছ বলে'।
আমি প্রকাশিতে পারিনে,
শুধু চাহি কাতর নয়নে। ২৪ ॥

মিশ্র ভেঁরো। কাওয়ালি।

তারে কেমনে ধরিবে, সখি, যদি ধরা দিলে!
তারে কেমনে কাঁদাবে, যদি আপনি কাঁদিলে!
যদি মন পেতে চাও মন রাখ গোপনে!
কে তারে বাঁধিবে তুমি আপনায় বাঁধিলে?
কাছে আসিলে ত কেহ কাছে রহে না!
কথা কহিলে ত কেহ কথা কহে না!
হাতে পেলে ভূমিতলে ফেলে চলে যায়!
হাসিয়ে ফিরায় মুখ কাঁদিয়ে সাধিলে! ২৫ ॥

মিশ্র কানাড়া। ঢিমা তেতালা।

সকল হৃদয় দিয়ে ভালবেসেছি যারে,
সে কি ফিরাতে পারে সখী!
সংসার বাহিরে থাকি
জানিনে কি ঘটে সংসারে!
কে জানে, হেথায় প্রাণপণে প্রাণ যারে চায়,
তারে পায় কি না পায়, (জানিনে')
ভয়ে ভয়ে তাই এসেছি গো
অজানা হৃদয় দ্বারে!
তোমার সকলি ভালবাসি, ওই রূপ রাশি!
ওই খেলা, ওই গান, ওই মধু হাসি!
ওই দিয়ে আছ ছেয়ে জীবন আমারি,
কোথায় তোমার সীমা ভুবন মাঝারে! ২৬!

কেদারা। খেমটা।

তুমি কে গো, সখীরে কেন জানাও বাসনা!
কে জানিতে চায়, তুমি ভালবাস,
কি ভালবাস না!
হাসে চন্দ্র, হাসে সন্ধ্যা, ফুল্ল কুঞ্জকানন,
হাসে হৃদয় বসন্তে বিকচ যৌবন।
তুমি কেন ফেল শ্বাস, তুমি কেন হাস না!
এসেছ কি ভেঙ্গে দিতে খেলা!
সখীতে সখীতে এই হৃদয়ের মেলা!
আপন দুঃখ আপন ছায়া লয়ে যাও!
জীবনের আনন্দ পথ ছেড়ে দাঁড়াও!
দূর হতে কর পূজা হৃদয়-কমল-আসনা! ২৭

সিন্ধু। কাওয়ালি।

নিমেষের তরে সরমে বাধিল
মরমের কথা হোল না!
জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে
রহিল মরম-বেদনা!
চোখে চোখে সদা রাখিবারে সাধ,
পলক পড়িল, ঘটিল বিষাদ,
মেলিতে নয়ন মিলাল স্বপন,
এমনি প্রেমের ছলনা। ২৮ ॥

কাফি। কাওয়ালি।

সেই শান্তিভবন ভুবন কোথা গেল!
সেই রবি শশী তারা,

সেই শোকশান্ত সন্ধ্যা সমীরণ,
সেই শোভা, সেই ছায়া,
সেই স্বপন!
সেই আপন হৃদয়ে আপন বিরাম কোথা গেল,
গৃহহারা হৃদয় লবে কাহার শরণ!
এসেছি ফিরিয়ে, জেনেছি তোমারে,
এনেছি হৃদয় তব পায়—
শীতল স্নেহসুধা কর দান;
দাও প্রেম দাও শান্তি,
দাও নূতন জীবন! ২৯।

আলাইয়া। আড়খেম্‌টা।

কাছে ছিলে দূরে গেলে, দূর হতে এস কাছে!
ভুবন ভ্রমিলে তুমি, সে এখনো বসে আছে!
ছিল না প্রেমের আলো,
চিনিতে পারিনি ভাল,
এখন বিরহানলে প্রেমানল জ্বলিয়াছে! ৩০।

কুকুভ। কাওয়ালি।

দেখো, সখা, ভুল করে ভালবেস না!
আমি ভালবাসি বলে কাছে এস না!
তুমি যাহে সুখী হও তাই কর সখা,
আমি সুখী হব বলে যেন হেস না!
আপন বিরহ লয়ে আছি আমি ভাল,
কি হবে চির আঁধারে নিমেষের আলো!
আশা ছেড়ে ভেসে যাই, যা হবার হবে তাই,
আমার অদৃষ্ট স্রোতে তুমি ভেসো না! ৩১॥

ললিতবসন্ত। কাওয়ালি।

ভুল করেছিনু ভুল ভেঙেছে!
এবার জেগেছি, জেনেছি,
এবার আর ভুল নয় ভুল নয়!
ফিরেছি মায়ার পিছে পিছে,
জেনেছি স্বপন সব মিছে!
বিঁধেছে বাসনা কাঁটা প্রাণে
এ ত ফুল নয় ফুল নয়!
পাই যদি ভালবাসা হেলা করিব না,
খেলা করিব না লয়ে মন!
ওই প্রেমময় প্রাণে লইব আশ্রয় সখী,
অতল সাগর এ সংসার,
এ ত কূল নয় কূল নয়! ৩২॥

মিশ্র দেশ। খেম্‌টা।

অলি বার বার ফিরে যায়
অলি বার বার ফিরে আসে,
তবে ত ফুল বিকাশে!
কলি ফুটিতে চাহে ফোটে না,
মরে লাজে মরে ত্রাসে!
ভুলি মান অপমান, দাও মন প্রাণ,
নিশিদিন রহ পাশে!
ওগো, আশা ছেড়ে তবু আশা রেখে দাও,
হৃদয় রতন আশে!
ফিরে এস, ফিরে এস,
বন মোদিত ফুলবাসে
আজি বিরহ রজনী, ফুল্ল কুসুম
শিশির সলিলে ভাসে! ৩৩॥

ভূপালী। কাওয়ালি।

না বুঝে কারে তুমি ভাসালে আঁখিজলে!
ওগো কে আছে চাহিয়া শূন্য পথপানে,
কাহার জীবনে নাহি সুখ,
কাহার পরাণ জ্বলে।
পড়নি কাহার নয়নের ভাষা,
বোঝনি কাহার মরমের আশা,
দেখনি ফিরে,
কার ব্যাকুল প্রাণের সাধ এসেছ দলে'! ৩৪॥

বেহাগ। আড়াঠেকা।

আমি কারেও বুঝিনে শুধু বুঝেছি তোমারে।
তোমাতে পেয়েছি আলো সংশয় আঁধারে।
ফিরিয়াছি এ ভুবন,
পাইনি ত কারো মন,

গিয়েছি তোমারি শুধু মনের মাঝারে।
এ সংসারে কে ফিরাবে, কে লইবে ডাকি,
আজিও বুঝিতে নারি, ভয়ে ভয়ে থাকি!
কেবল তোমারে জানি,
বুঝেছি তোমার বাণী,
তোমাতে পেয়েছি কূল অকূল পাথারে! ৩৫ ॥

বিভাস। আড়াঠেকা।

প্রভাত হইল নিশি কানন ঘুরে,
বিরহ-বিধুর হিয়া মরিল ঝুরে!
ম্লান শশী অস্তে গেল, ম্লান হাসি মিলাইল,
কাঁদিয়া উঠিল প্রাণ কাতর স্বরে!
চল্ সখী চল্ তবে ঘরেতে ফিরে,
যাক্ ভেসে ম্লান আঁখি নয়ন-নীরে!
যাক্ ফেটে শূন্য প্রাণ,
হোক্ আশা অবসান,
হৃদয় যাহারে ডাকে থাক্ সে দূরে! ৩৬ ॥

মিশ্র বসন্ত। রূপক।

এস এস বসন্ত ধরাতলে!
আন কুহুতান প্রেমগান,
আন গন্ধমদভরে অলস সমীরণ;
আন নবযৌবনহিল্লোল, নব প্রাণ,
প্রফুল্ল নবীন বাসনা ধরাতলে।
এস থরথর-কম্পিত, মর্ম্মর-মুখরিত,
নব-পল্লব-পুলকিত
ফুল-আকুল মালতীবল্লি-বিতানে,
সুখছায়ে, মধুবায়ে,
এস, এস! এস অরুণ-চরণ কমল-বরণ
তরুণ উষার কোলে!
এস জ্যোৎস্না-বিবশ-নিশীথে,
কল-কল্লোল তটিনী তীরে,
সুখসুপ্ত সরসী-নীরে,
এস, এস! এস যৌবন-কাতর হৃদয়ে,
এস মিলন-সুখালস নয়

এস মধুর সরম মাঝারে,
দাও বাহুতে বাহু বাঁধি,
নবীন কুসুমপাশে রচি দাও
নবীন মিলন বাঁধন। ৩৭ ॥

সাহানা। যৎ।

মধুর বসন্ত এসেছে
মধুর মিলন ঘটাতে।
মধুর মলয়-সমীরে
মধুর মিলন রটাতে।
কুহক লেখনী ছুটায়ে
কুসুম তুলিছে ফুটায়ে,
লিখিছে প্রণয়-কাহিনী
বিবিধ বরণ ছটাতে।
হের পুরাণ প্রাচীন ধরণী
হয়েছে শ্যামল বরণী,
যেন যৌবন-প্রবাহ ছুটেছে
কালের শাসন টুটাতে,
পুরাণ বিরহ হানিছে,
নবীন মিলন আনিছে,
নবীন বসন্ত আইল
নবীন জীবন ফুটাতে। ৩৮ ॥

মিশ্র মূলতান। কাওয়ালি।

আজি আঁখি জুড়াল হেরিয়ে,
মনোমোহন মিলনমাধুরী যুগল মুরতি!
ফুলগন্ধে আকুল করে,
বাজে বাঁশরী উদাস স্বরে,
নিকুঞ্জ প্লাবিত চন্দ্রকরে;—
তারি মাঝে, মনোমোহন মিলন মাধুরী যুগল
মুরতি।
আন আন ফুলমালা, দাও দোঁহে বাঁধিয়ে!
হৃদয়ে পশিবে ফুলপাশ, অক্ষয় হবে প্রেমবন্ধন,
চিরদিন হেরিবহে
মনোমোহন মিলনমাধুরী যুগল মুরতি। ৩৯ ॥

ভৈরবী। আড়াঠেকা।

আর কেন, আর কেন!
দলিত কুসুমে বহে বসন্ত-সমীরণ।
ফুরায়ে গিয়েছে বেলা,
এখন এ মিছে খেলা,
নিশান্তে মলিন দীপ কেন জ্বলে অকারণ!
অশ্রু যবে ফুরায়েছে তখন্ মুছাতে এলে!
অশ্রুভরা হাসিভরা নবীন নয়ন ফেলে!
এই লও, এই ধর, এ মালা তোমরা পর,
এ খেলা তোমরা খেল সুখে থাক অনুক্ষণ ৪০

ভৈরবী। ঝাঁপতাল।

কেন এলি রে, ভালবাসিলি,
ভালবাসা পেলি নে!
কেন সংসারেতে উঁকি মেরে
চলে গেলিনে!
সংসার কঠিন বড় কারেও সে ডাকে না,
কারেও সে ধরে রাখে না।
যে থাকে সে থাকে, আর যে যায় সে যায়,
কারো তরে ফিরেও না চায়!
হায় হায় এ সংসারে যদি না পূরিল
আজন্মের প্রাণের বাসনা,
চলে যাও ম্লানমুখে ধীরে ধীরে ফিরে যাও,
থেকে যেতে কেহ বলিবে না।
তোমার ব্যথা তোমার অশ্রু তুমি নিয়ে যাবে
আর ত কেহ অশ্রু ফেলিবে না। ৪১ ॥

মিশ্র বিভাস। একতালা।

এরা, সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না,
শুধু সুখ চলে যায়!
এমনি মায়ার ছলনা।
এরা ভুলে যায় কারে ছেড়ে কারে চায়।
তাই কেঁদে কাটে নিশি, তাই দহে প্রাণ,
তাই মান অভিমান,
তাই এত হায় হায়!
প্রেমে সুখ দুখ ভুলে তবে সুখ পায়।
সখী চল, গেল নিশি, স্বপন ফুরাল,
মিছে আর কেন বল!
শশী ঘুমের কুহক নিয়ে গেল অস্তাচল।
প্রেমের কাহিনী গান,
হয়ে গেল অবসান।
এখন্ কেহ হাসে কেহ বসে ফেলে অশ্রুজল!৪২

সিন্ধু ভৈরবী। আড়াঠেকা।

কখন্ বসন্ত গেল, এবার হল না গান?
কখন্ বকুল-মূল ছেয়েছিল ঝরা ফুল,
কখন্ যে ফুল-ফোটা হয়ে গেল অবসান!
কখন্ বসন্ত গেল এবার হল না গান?
এবার বসন্তে কিরে যুঁথীগুলি জাগে নিরে!
অলিকুল গুঞ্জরিয়া করে নি কি মধুপান!
এবার কি সমীরণ জাগায় নি ফুলবন!
সাড়া দিয়ে গেল না ত, চলে গেল ম্রিয়মাণ
কখন্ বসন্ত গেল, এবার হল না গান!
যতগুলি পাখী ছিল গেয়ে বুঝি চলে গেল,
সমীরণে মিলে গেল বনের বিলাপ তান।
ভেঙ্গেছে ফুলের মেলা, চলে গেছে হাসি-খেলা,
এতক্ষণে সন্ধে বেলা জাগিয়া চাহিল প্রাণ!
কখন্ বসন্ত গেল এবার হলনা গান!
বসন্তের শেষ রাতে এসেছিরে শূন্য হাতে,
এবার গাঁথিনি মালা কি তোমারে করি দান!
কাঁদিছে নীরব বাঁশী, অধরে মিলায় হাসি,
তোমার নয়নে ভাসে ছল ছল অভিমান!
এবার বসন্ত গেল, হলনা, হলনা গান! ৪৩

বেহাগ। আড়খেমটা।

ওগো শোন কে বাজায়!
বন-ফুলের মালার গন্ধ
বাঁশির তানে মিশে যায়।
অধর ছুঁয়ে বাঁশী খানি
চুরি করে হাসি খানি, বঁধুর হাসি মধুর গানে

প্রাণের পানে ভেসে যায়!
ওগো শোন কে বাজায়!
কুঞ্জবনের ভ্রমর বুঝি
বাঁশীর মাঝে গুঞ্জরে,
বকুল গুলি আকুল হয়ে
বাঁশীর গানে মুঞ্জরে!
যমুনারি কলতান
কাণে আসে, কাঁদে প্রাণ,
আকাশে ঐ মধুর বিধু
কাহার পানে হেসে চায়!
ওগো শোন কে বাজায়! ৪৪ ॥

ভৈরবী। একতালা।

নিশি নিশি কত রচিব শয়ন
আকুল নয়নরে!
নিতি নিতি বনে করিব যতনে
কুসুম চয়ন রে!
শরদ যামিনী হইবে বিফল,
বসন্ত যাবে চলিয়া!
উদিবে তপন আশার স্বপন
প্রভাতে যাইবে ছলিয়া!
যৌবন কত রাখিব বাঁধিয়া,
মরিব কাঁদিয়া রে!
চরণ পাইলে মরণ মাগিব
সাধিয়া সাধিয়া রে!
কার পথ চাহি এ জনম বাহি
কার দরশন যাচিরে!
আসিবে বলিয়া কে গেছে চলিয়া
তাই আমি বসে আছিরে!
মালাটি গাঁথিয়া পরেছি মাথায়
নীলবাসে তনু ঢাকিয়া,
বিজন আলয়ে প্রদীপ জ্বালায়ে
একেলা রয়েছি জাগিয়া!
তাই কত নিশি চাঁদ ওঠে হাসি,
তাই কেঁদে যায় প্রভাতে।

ওগো তাই ফুল-বনে মধু-সমীরণে
ফুটে ফুল কত শোভাতে!
ওই বাঁশি-স্বর তার আসে বারবার
সেই শুধু কেন আসে না!
এই হৃদয়-আসন শূন্য পড়ে থাকে
কেঁদে মরে শুধু বাসনা!
মিছে পরশিয়া কায় বায়ু বহে যায়
বহে যমুনার লহরী,
কেন কুহু কুহু পিক কুহরিয়া ওঠে
যামিনী যে ওঠে শিহরি!
ওগো যদি নিশি-শেষে আসে হেসে হেসে,
মোর হাসি আর রবে কি!
এই জাগরণে ক্ষীণ বদন মলিন
আমারে হেরিয়া কবে কি!
আমি সারা রজনীর গাঁথা ফুলমালা
প্রভাতে চরণে ঝরিব,
ওগো আছে সুশীতল যমুনার জল
দেখে তারে আমি মরিব। ৪৫ ॥

ঝিঁঝিট। একতালা।

ওগো এত প্রেম আশা প্রাণের তিয়াষা
কেমনে আছে সে পাশরি!
তবে সেথা কি হাসে না চাঁদিনী যামিনী,
সেথা কি বাজেনা বাঁশরী!
সখি হেথা সমীরণ লুঠে ফুলবন
সেথা কি পবন বহে না!
সে যে তার কথা মোরে কহে অনুক্ষণ
মোর কথা তারে কহে না!
যদি আমারে আজি সে ভুলিবে সজনি,
আমারে ভুলালে কেন সে!
ওগো এ চির জীবন করিব রোদন
এই ছিল তার মানসে!
যবে কুসুম শয়নে নয়নে নয়নে
কেটেছিল সুখ রাতিরে,

তবে কে জানিত তার বিরহ আমার
হবে জীবনের সাথীরে!
যদি মনে নাহি রাখে সুখে যদি থাকে
তোরা একবার দেখে আয়,
এই নয়নের তৃষা পরাণের আশা
চরণের তলে রেখে আয়!
আর নিয়ে যা' রাধার বিরহের ভার
কত আর ঢেকে রাখি বল্!
আর পারিস্ যদি ত আনিস্ হরিয়ে
এক ফোঁটা তার আঁখি জল!
না না এত প্রেম সখি ভুলিতে যে পারে!
তারে আর কেহ সেধ না
আমি কথা নাহি কব, দুখ লয়ে রব,
মনে মনে সব' বেদনা!
ওগো মিছে, মিছে সখি, মিছে এই প্রেম,
মিছে পরাণের বাসনা!
ওগো সুখ দিন হায় যবে চলে যায়
আর ফিরে আর আসে না! ৪৬॥

মিশ্র ভৈরবী। আড়খেমটা।

হেলাফেলা সারা বেলা
এ কি খেলা আপন সনে!
এই বাতাসে ফুলের বাসে
মুখখানি কার পড়ে মনে!
আঁখির কাছে বেড়ায় ভাসি
কে জানে গো কাহার হাসি!
দুটি ফোঁটা নয়ন সলিল
রেখে যায় এই নয়ন-কোণে!
কোন্ ছায়াতে কোন্ উদাসী
দূরে বাজায় অলস বাঁশী,
মনে হয় কার মনের বেদন
কেঁদে বেড়ায় বাঁশীর গানে!
সারা দিন গাঁথি গান
কারে চাহে গাহে প্রাণ,

তরু তলের ছায়ার মতন
বসে আছি ফুল বনে! ৪৭॥

যোগিয়া বিভাস—একতালা।

আজি শরত তপনে প্রভাত স্বপনে
কি জানি পরাণ কি যে চায়
ওই শেফালির শাখে কি বলিয়া ডাকে
বিহগ বিহগী কি যে গায়!
আজি মধুর বাতাসে হৃদয় উদাসে
রহে না আবাসে মন হায়
কোন্ কুসুমের আশে, কোন ফুলবাসে
সুনীল আকাশে মন ধায়
আজি কে যেন গো নাই এ প্রভাতে
জীবন বিফল হয় গো
তাই চারিদিকে চায় মন কেঁদে গায়
"এ নহে, এ নহে, নয় গো!"
কোন্ স্বপনের দেশে আছে এলোকেশে
কোন্ ছায়াময়ী অমরায়!
আজি কোন্ উপবনে বিরহ-বেদনে
আমারি কারণে কেঁদে যায়!
আমি যদি গাঁথি গান অথির পরাণ
সে গান শুনাব কারে আর!
আমি যদি গাঁথি মালা লয়ে ফুল ডালা
কাহারে পরাব ফুলহার!
আমি আমার এ প্রাণ যদি করি দান
দিব প্রাণ তবে কার পায়!
সদা ভয় হয় মনে পাছে অযতনে
মনে মনে কেহ ব্যথা পায়! ৪৮॥

মিশ্র বারোয়াঁ। আড়খেমটা।

তুমি কোন্ কাননের ফুল,
তুমি কোন্ গগনের তারা!
তোমায় কোথায় দেখেছি
যেন কোন্ স্বপনের পারা!
কবে তুমি গেয়েছিলে,

খির পানে চেয়েছিলে ভুলে গিয়েছি!
শুধু মনের মধ্যে জেগে আছে,
ঐ নয়নের তারা!
তুমি কথা কোয়ো না,
তুমি, চেয়ে চলে যাও!
এই চাঁদের আলোতে
তুমি হেসে গলে যাও!
আমি ঘুমের ঘোরে চাঁদের পানে
চেয়ে থাকি মধুর প্রাণে,
তোমার আঁখির মতন দুটি তারা
ঢালুক কিরণ ধারা! ৪৯ ॥

কানাড়া। খং।

বিদায় করেছ যারে নয়নজলে,
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে!
আজি মধু-সমীরণে নিশীথে কুসুম-বনে,
তাহারে পড়েছে মনে বকুল তলে!
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে!
সেদিনো ত মধুনিশি প্রাণে গিয়েছিল মিশি,
মুকুলিত দশদিশি কুসুম দলে;
দুটি সোহাগের বাণী যদি হত কাণাকাণী,
যদি ওই মালাখানি পরাতে গলে!
এখন ফিরাবে আর কিসের ছলে!
মধুরাতি পূর্ণিমার ফিরে আসে বারবার,
সে জন ফেরে না আর যে গেছে চ'লে!
ছিল তিথি অনুকূল, শুধু নিমেষের ভুল,
চিরদিন তৃষাকুল পরাণ জ্বলে!
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে! ৫০ ॥

ইমন কল্যাণ। একতালা।

কো তুঁহু বোলবি মোয়!
হৃদয় মাহ মঝু জাগসি অনুখণ'
আঁখ উপর তুঁহু রচলহি আসন,
অরুণ নয়ন তব মরম সঙে মম
নিমিখ ন অন্তর হোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়!
হৃদয় কমল, তব চরণে টলটল,
নয়ন যুগল মম উছলে ছলছল,
প্রেমপূর্ণ তনু পুলকে ঢলমল
চাহে মিলাইতে তোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়!
বাঁশরি-ধ্বনি তুহ অমিয়-গরলরে,
হৃদয় বিদারয়ি হৃদয় হরলরে,
আকুল-কাকলি ভুবন ভরলরে,
উতল প্রাণ উতরোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়!
হেরি হাসি তব মধু ঋতু ধাওল,
শুনয়ি বাঁশী তব পিককুল গাওল,
বিকল ভ্রমর সম ত্রিভুবন আওল,
চরণ-কমল যুগ ছোঁয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়!
গোপবধূজন বিকশিত যৌবন,
পুলকিত যমুনা, মুকুলিত উপবন,
নীল নীর পর ধীর সমীরণ,
পলকে প্রাণমন খোয়!
কো তুঁহু বোলবি মোয়!
তৃষিত আঁখি, তব মুখপর বিহরই,
মধুর পরশ তব, রাধা শিহরই,
প্রেম-রতন ভরি হৃদয় প্রাণ লই,
পদতলে অপনা থোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়!
কো তুঁহু কো তুঁহু সব জন পুছয়ি,
অনুদিন সঘন নয়ন জল মুছয়ি,
যাচে ভানু' সব সংশয় ঘুচয়ি
জনম চরণপর গোয়।
কো তুঁহু বোলবি মোয়! ৫১ ॥

মিশ্র খাম্বাজ—একতালা।

ওই জানালার কাছে বসে আছে
করতলে রাখি মাথা।

তার কোলে ফুল পড়ে রয়েছে,
সে যে ভুলে গেছে মালাগাঁথা।
শুধু ঝুরু ঝুরু বায়ু বহে যায়
তার কাণে কাণে কি যে কহে যায়
তাই আধ শুয়ে আধ বসিয়ে
ভাবিতেছে কত কথা।
চোকের উপরে মেঘ ভেসে যায়
উড়ে উড়ে যায় পাখী,
সারাদিন ধরে বকুলের ফুল
ঝরে পড়ে থাকি থাকি।
মধুর আলস মধুর আবেশ
মধুর মুখের হাসিটি
মধুর স্বপনে প্রাণের মাঝারে
বাজিছে মধুর বাঁশীটি। ৫২ ॥

বেহাগড়া—কাওয়ালি।

ধীরি ধীরি প্রাণে আমার এসহে!
মধুর হাসিয়ে ভাল বেসহে।
হৃদয়-কাননে ফুল ফুটাও
আধ নয়নে সখি চাও চাও,
পরাণ কাঁদিয়ে দিয়ে হাসিখানি হেসহে।৫৩

মল্লার—কাওয়ালি।

ঝিম্ ঝিম্ ঘন ঘনরে বরিষে!
গগণে ঘন ঘটা, শিহরে তরু লতা
ময়ুর ময়ুরী নাচিছে হরষে।
দিশি দিশি সচকিত, দামিনী চমকিত
চমকি উঠিছে হরিণী তরাসে। ৫৪ ॥

সিন্ধু খাম্বাজ—খেমটা।

দেখ ঐ কে এসেছে চাও সখি চাও।
আকুল পরাণ ওর, আঁখি হিল্লোলে নাচায় সখি
তৃষিত নয়ানে চাহে মুখপানে
হাসি সুধাদানে বাঁচাও সখি!৫৫ ॥

পিলু—খেমটা।

ও কেন ভালবাসা জানাতে আসে
ওলো সজনি!
হাসি খেলিরে মনের সুখে
ও কেন সাথে ফিরে আঁধার মুখে
দিন রজনী। ৫৬ ॥

কালাংড়া—খেমটা।

ভালবাসিলে যদি সে ভাল না বাসে
কেন সে দেখা দিল।
মধু অধরের মধুর হাসি
প্রাণে কেন বরষিল!
দাঁড়িয়ে ছিলেম পথের ধারে
সহসা দেখিলেম তারে নয়ন দুটি তুলে কেন
মুখের পানে চেয়ে গেল। ৫৭ ॥

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

বনে এমন ফুল ফুটেছে।
মান করে থাকা আজ কি সাজে।
মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে—
চল চল কুঞ্জ মাঝে।
আজ কোকিলে গেয়েছে কুহু
মুহুর্মুহু
কাননে ঐ বাঁশী বাজে।
মান করে থাকা আজ কি সাজে।
আজ মধুরে মিশাবি মধু
পরাণ বঁধু
চাঁদের আলোয় ঐ বিরাজে।
মান করে থাকা আজ কি সাজে।৫৮

ভৈরবী—আড়খেমটা।

কেনরে চাস্ ফিরে ফিরে চলে আয়রে চলে আ
এরা প্রাণের কথা, বোঝে না যে—
হৃদয় কুসুম দলে যায়।
হেসে হেসে গেয়ে গান দিতে এসেছিলি প্রাণ
নয়নের জল সাথে নিয়ে চলে আয় চলে আয়।

বেহাগড়া—কাওয়ালি।

মনে রয়ে গেল মনের কথা
শুধু চোখের জল প্রাণের ব্যথা।

মনে করি দুটি কথা বলে যাই
কেন মুখের পানে চেয়ে চলে যাই
সে যদি চাহে মরি যে তাহে
কেন মুদে আসে আঁখির পাতা।
ম্লান মুখে সখি সে যে চলে যায়,
ও তারে ফিরায়ে ডেকে নিয়ে আয়
বুঝিল না সে যে কেঁদে গেল
ধূলা'য় লুটাইল হৃদয়-লতা। ৬০ ॥

বেহাগ—কাওয়ালি।

প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন
তবু প্রাণ কেন কাঁদেরে।
চারিদিকে হাসি রাশি
তবু প্রাণ কেন কাঁদেরে!
আন সখী বীণা আন, প্রাণ খুলে কর গান
নাচ সবে মিলে ঘিরি ঘিরি ঘিরিয়ে,
তবু প্রাণ কেন কাঁদেরে?
বীণা তবে রেখে দে, গান আর গাস্‌নে
কেমনে যাবে বেদনা?
কাননে কাটাই রাতি, তুলি ফুল মালা গাঁথি
জ্যোছনা কেমন ফুটেছে
তবু প্রাণ কেন কাঁদেরে। ৬১ ॥

মূলতান—আড়খেমটা।

বুঝি বেলা বহে যায়,
কাননে আয় তোরা আয়।
আলোতে ফুল উঠল ফুটে
ছায়ায় ঝরে পড়ে যায়।
সাধ ছিলরে পরিয়ে দেব
মনের মতন মালা গেঁথে,
কই সে হল মালা গাঁথা
কই সে এল হায়!
যমুনার ঢেউ যাচ্ছে ব'য়ে
বেলা বহে যায়। ৬২ ॥

মিশ্র কালাংড়া—খেমটা।

এত ফুল কে ফুটালে (কাননে)
লতা পাতায় এত হাসিতরঙ্গ মরি কে উঠালে।
সজনীর বিয়ে হবে, ফুলেরা শুনেছে সবে
সে কথা কে রটালে ॥ ৬৩ ॥

মিশ্র জয়জয়ন্তী—খেমটা।

আমাদের সখীরে কে নিয়ে যাবেরে!
তারে কেড়ে নেব ছেড়ে দেবনা।
কে জানে কোথা হতে কে এসেছে
কেন সে মোদের সখী নিতে আসে দেব না।
সখীরা পথে গিয়ে দাঁড়াব,
হাতে তার ফুলের বাঁধন জড়াব,
বেঁধে তায় রেখে দিব কুসুম বনে
সখিরে নিয়ে যেতে দেবনা ॥ ৬৪ ॥

মিশ্রবেহাগ—খেমটা।

সখি সে গেল কোথায়, তারে ডেকে নিয়ে আয়
দাঁড়াব ঘিরে তারে তরুতলায়।
আজি এ মধুর সাঁঝে, কাননে ফুলের মাঝে
হেসে হেসে বেড়াবে সে দেখিব তায়।
আকাশে তারা ফুটেছে, দখিণে বাতাস ছুটেছে
পাখিটি ঘুমঘোরে গেয়ে উঠেছে।
আয়লো আনন্দময়ি মধুর বসন্ত লয়ে
লাবণ্য ফুটাবিলো তরুলতায় ॥ ৬৫ ॥

মূলতালি—কাওয়ালি।

কোথা ছিলি সজনিলো,
মোরা যে তোরি তরে বসে আছি কাননে
এস সখি এস হেথা বসি বিজনে
আঁখি ভরিয়ে হেরি হাসি মুখানি।
আজি সাজাব সখীরে সাধ মিটায়ে
ঢাকিব তনুখানি কুসুমেরি ভূষণে
গগণে হাসিবে বিধু গাহিব মৃদু মৃদু
কাটাব প্রমোদে চাঁদিনী যামিনী ॥ ৬৬ ॥

বেহাগ—তাল ফেরতা।

মধুর মিলন।
হাসিতে মিলেছে হাসি নয়নে নয়ন।
মরমর মৃদুবাণী মর-মর মরমে
কপোলে মিলায় হাসি সুমধুর সরমে;
নয়নে স্বপন।
তারাগুলি চেয়ে আছে, কুসুম গাছে গাছে,
বাতাস চুপি চুপি ফিরিছে কাছে কাছে;
মালাগুলি গেঁথে নিয়ে আড়ালে লুকাইয়ে
সখীরা নেহারিব দোঁহার আনন
হেসে আকুল হল বকুল কানন
(আমরি মরি)॥ ৬৭॥

কালাংড়া। আড়খেমটা।

দেখে যা দেখে যা দেখে যালো তোরা
সাধের কাননে মোর
(আমার) সাধের কুসুম উঠেছে ফুটিয়া
মলয় বহিছে সুরভি লুটিয়ারে—
(হেথা) জোছনা ফুটে তটিনী ছুটে
প্রমোদে কানন ভোর।
আয় আয় সখি আয়লো-হেথা
দুজনে কহিব মনের কথা
তুলিব কুসুম দুজনে মিলি রে,
(সুখে) গাঁথিব মালা গণিব তারা
করিব রজনী ভোর।
এ কাননে বসি গাহিব গান
সুখের স্বপনে কাটাব প্রাণ,
খেলিব দুজনে মনের খেলা রে
(প্রাণে) রহিবে মিশি দিবস নিশি
আধো আধো ঘুম ঘোর॥ ৬৮॥

ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

মা একবার দাঁড়াগো হেরি চন্দ্রানন।
আঁধার করে কোথায় যাবি শূন্য ভবন!
মধুর মুখ হাসি হাসি, অমিয় রাশি রাশি মা
ও হাসি কোথায় নিয়ে যাসরে,
আমরা কি দেখে জুড়াব জীবন॥ ৬৯॥

ভৈরবী।

শুনলো শুনলো বালিকা,
রাখ কুসুম মালিকা,
কুঞ্জ কুঞ্জ ফেরনু সখি শ্যামচন্দ্র নাহিরে।
দুলই কুসুম-মঞ্জরী,
ভ্রমর ফিরই গুঞ্জরি,
অলস যমুন বহয়ি যায় ললিত গীত গাহিরে।
শশি-সনাথ যামিনী,
বিরহ-বিধুর কামিনী,
কুসুমহার ভইল ভার হৃদয় তার দাহিছে,
অধর উঠই কাঁপিয়া,
সখি-করে কর আপিয়া,
কুঞ্জভবনে পাপিয়া কাহে গীত গাহিছে।
মৃদু সমীর সঞ্চলে
হরয়ি শিথিল অঞ্চলে,
বালি হৃদয় চঞ্চলে কানন-পথ চাহিরে;
কুঞ্জপানে হেরিয়া, অশ্রুবারি ডারিয়া
ভানু গায় শূন্যকুঞ্জ শ্যামচন্দ্র নাহিরে! ৭০॥

মাজ। কাওয়ালি।

সজনি সজনি রাধি কালো দেখ অবহুঁ চাহি
মৃদুল গমন শ্যাম আওয়ে মৃদুল গান গাহিয়া।
পিনহ ঝটিত কুসুম হার, পিনহ নীল আঙিয়া
সুন্দরি সিন্দুর দেকে সীঁথি করহ রাঙিয়া।
সহচরি সব নাচ নাচ মধুর গীত গাওরে,
চঞ্চল মঞ্জীর রাব কুঞ্জ গগন ছাওরে।
সজনি অব উজার মঁদির কনক দীপ জ্বালিয়া
সুরভি করহ কুঞ্জভবন গন্ধ সলিল ঢালিয়া।
মল্লিকা চামেলি বেলি কুসুম তুলহ বালিকা,
গাঁথ যূথী, গাঁথ জাতি, গাঁথ বকুল মালিকা।
তৃষিত-নয়ন ভানুসিংহ কুঞ্জ-পথম চাহিয়া
মৃদুল গমন শ্যাম আওয়ে, মৃদুল গান
গাহিয়া॥ ৭

ঝিঁঝিট। কাওয়ালি।

গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে
মৃদুল মধুর বংশী বাজে,
বিসরি ত্রাসি লোকলাজে
সজনি, আও আও লো।
পিনহ চারু নীল বাস,
হৃদয়ে প্রণয় কুসুম রাশ,
হরিণ নেত্রে বিমল হাস,
কুঞ্জ বনমে আও লো॥
ঢালে কুসুম সুরভ-ভার,
ঢালে বিহগ সুরব-সার,
ঢালে ইন্দু অমৃতধার
বিমল রজত ভাতিরে।
মন্দ মন্দ ভৃঙ্গ গুঞ্জে,
অযুত কুসুম কুঞ্জে কুঞ্জে,
ফুটল সজনি পুঞ্জে পুঞ্জে
বকুল যূথী জাতিরে॥
দেখলো সখি শ্যামরায়,
নয়নে প্রেম উথল যায়,
মধুর বদন অমৃত সদন
চন্দ্রমায় নিন্দিছে,
আও আও সজনি-বৃন্দ,
হেরব সখি শ্রীগোবিন্দ,
শ্যামকো পদারবিন্দ—
ভানুসিংহ বন্দিছে॥ ৭২॥

মূলতান।

বজাও রে মোহন বাঁশী!
সারা দিবসক বিরহ দহন-দুখ,
মরমক তিয়াষ নাশি।
রিঝ-মন-ভেদন বাঁশরী-বাদন।
কঁহা শিখলিরে কান?
হানে থির থির, মরম অবশকর
লহু লহু মধুময় বাণ।
ধস্ ধস্ করতহ উরহ বিয়াকুলু
ঢুলু ঢুলু অবশ-নয়ান।
কত কত বরষক বাত সোঁয়ারয়
অধীর করয় পরাণ।
কত শত আশা পূরল না বঁধু
কত সুখ করল পয়ান।
পহুগো কত শত পিরীত-যাতন
হিয়ে বিঁধাওল বাণ।
হৃদয় উদাসয়, নয়ন উছাসয়
দারুণ মধুময় গান।
সাধ যায় বঁধু, যমুনা বারিম
ডারিব দগধ-পরাণ
সাধ যায় পহু, রাখি চরণ তব
হৃদয় মাঝ হৃদয়েশ,
হৃদয়-জুড়াওন বদন-চন্দ্র তব
হেরব জীবন শেষ।
সাধ যায় ইহ চন্দ্রম-কিরণে,
কুসুমিত কুঞ্জ বিতানে,
বসন্ত বায়ে প্রাণ মিশায়ব,
বাঁশিক সুমধুর গানে।
প্রাণ ভৈবে মঝু বেণু-গীতময়,
রাধাময় তব বেণু।
জয় জয় মাধব, জয় জয় রাধা,
চরণে প্রণমে ভানু। ৭৩॥

মিশ্র বেহাগ।

আজি সখি মুহু মুহু, গাহে পিক কুহুকুহু,
কুঞ্জ বনে দুঁহু দুঁহু দোঁহার পানে চায়।
যুবন-মদ-বিলসিত, পুলকে হিয়া উলসিত,
অবশ তনু অলসিত মূরছি জনু যায়!
আজু মধু চাঁদনী প্রাণ-উনমাদিনী,
শিথিল সব বাঁধনি, শিথিল ভই লাজ।
বচন মৃদু মর মর, কাঁপে রিঝ থর থর
শিহরে তনু জরজর কুসুম-বন মাঝ!
মলয় মৃদু কলয়িছে, চরণ নাহি চলয়িছে,

বচন মুহু খলয়িছে, অঞ্চল লুটায় !
আধ ফুট শতদল, বায়ুভরে টলমল
আঁখি জনু ঢলঢল চাহিতে নাহি চায়।
অলকে ফুল কাঁপয়ি কপোলে পড়ে ঝাঁপয়ি,
মধু অনলে তাপয়ি, খসয়ি পড়ু পায় !
ঝরই শিরে ফুলদল, যমুনা বহে কলকল,
হাসে শশী ঢলঢল ভানু মরি যায় ! ৭৪ ॥

মিশ্র কালাংড়া।

আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে
বসন্তের বাতাসটুকুর মত !
সে যে ছুঁয়ে গেল নুয়ে গেল রে
ফুল ফুটিয়ে গেল শত শত !
সে চলে গেল, বলে গেল না,
সে কোথায় গেল ফিরে এল না,
সে যেতে যেতে চেয়ে গেল,
কি যেন গেয়ে গেল,
তাই আপন মনে বসে আছি
কুসুম বনেতে !
সে ঢেউয়ের মত ভেসে গেছে,
চাঁদের আলোর দেশে গেছে,
যেখেন দিয়ে হেসে গেছে
হাসি তার রেখে গেছে রে,
মনে হল আঁখির কোণে
আমায় যেন ডেকে গেছে সে !
আমি কোথায় যাব কোথায় যাব,
ভাবতেছি তাই একলা ব'সে !
সে চাঁদের চোখে বুলিয়ে গেল
ঘুমের ঘোর !
সে প্রাণের কোথা দুলিয়ে গেল
ফুলের ডোর।
সে কুসুম বনের উপর দিয়ে
কি কথা যে বলে গেল,
ফুলের গন্ধ পাগল হয়ে
সঙ্গে তারি চলে গেল !

হৃদয় আমার আকুল হল,
নয়ন আমার মুদে এল,
কোথা দিয়ে কোথায় গেল সে ! ৭৫ ॥

ভৈরবী। একতালা।

ফুলটি ঝরে গেছে রে !
বুঝি সে উষার আলো উষার দেশে চলে গেছে !
শুধু সে পাখীটি, মুদিয়া আঁখিটি,
সারাদিন একলা ব'সে গান গাহিতেছে !
প্রতিদিন দেখ্‌তে যারে আর ত তারে দেখতে না পায়,
তবু সে নিত্য আসে গাছের শাখে,
সেই খেনেতেই ব'সে থাকে,
সারা দিন সেই গানটি গায়,
সন্ধে হলে কোথায় চলে যায় ! ৭৬ ॥

ভৈরবী। একতালা।

মরণরে, তুহুঁ মম শ্যাম সমান !
মেঘ বরণ তুঝ মেঘ জটাজুট,
রক্ত কমল কর রক্ত অধরপুট,
তাপ বিমোচন করুণ কোর তব,
মৃত্যু অমৃত করে দান !
তুহুঁ মম শ্যাম সমান।
মরণরে, শ্যাম তোঁহারই নাম,
চির বিসরল যব নিরদয় মাধব
তুঁহু ন ভইবি মোয় বাম !
আকুল রাধা রিঝ, অতি জর জর,
ঝরই নয়ন দউ অনুখণ ঝর ঝর,
তুঁহু মম মাধব, তুঁহু মম দোসর
তুঁহু মম তাপ ঘুচাও,
মরণ তু আওরে আও !
ভুজ পাশে তব লহ সম্বোধয়ি,
আঁখিপাত মঝু আসব মোদয়ি,
কোর উপর তুঝ রোদয়ি রোদয়ি
নীদ ভরব সব দেহ।

তুঁহু নহি বিসরবি, তুঁহুঁ নহি ছোড়বি
রাধা-হৃদয় তু কবহুঁ ন তোড়বি,
হিয়-হিয় রাখবি অনুদিন অনুখণ
অতুলন তোঁহার লেহ।
দূর সঙে তুঁহুঁ বাঁশী বাজাওসি,
অনুখণ ডাকসি, অনুখণ ডাকসি
রাধা রাধা রাধা,
দিবস ফুরাওল অবহুঁ ম যাওব,
বিরহ তাপ তব অবহুঁ ঘুচাওব,
কুঞ্জ-বাট পর অবহুঁ ম ধাওব
সব কছু টুটইব বাধা!
গগন সঘন অব, তিমির মগন ভব,
তড়িত চকিত অতি, ঘোর মেঘ রব,
শাল তাল তরু সভয় তবধ সব,
পন্থ বিজন অতি ঘোর,
একলি যাওব তুঝ অভিসারে,
যা'ক পিয়া তুঁহুঁ কি ভয় তাহারে,
ভয় বাধা সব অভয় মূরতি ধরি,
পন্থ দেখাওব মোর।
ভানু সিংহ কহে, "ছিয়ে ছিয়ে রাধা
চঞ্চল হৃদয় তোহারি,
মাধব পহু মম, প্রিয় স মরণসে
অব তুঁহুঁ দেখ বিচারি।" ৭৭ ॥

ভৈরবী। একতালা।

হেদেগো নন্দরাণী,
আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও॥
আমরা রাখাল বালক দাঁড়িয়ে দ্বারে
আমাদের শ্যামকে দিয়ে যাও॥
হের গো, প্রভাত হল সূর্য্যি ওঠে
ফুল ফুটেছে বনে,
আমরা শ্যামকে নিয়ে গোষ্ঠে যাব
আজ করেছি মনে।
ওগো পীতধড়া পরিয়ে তারে
কোলে নিয়ে আয়,
তার হাতে দিয়ো মোহনবেণু
নূপুর দিয়ো পায়।
রোদের বেলায় গাছের তলায়
নাচব মোরা সবাই মিলে
বাজবে নূপুর রুণুঝুনু
বাজবে বাঁশী মধুর বোলে।
বনফুলের গাঁথব মালা
পরিয়ে দেব শ্যামের গলে॥ ৭৮॥

মূলতান। আড়খেমটা।

বুঝি বেলা বহে যায়।
কাননে আয় তোরা আয়।
আলোতে ফুল উঠল ফুটে
ছায়ায় ঝরে পড়ে যায়।
সাধ ছিলরে পরিয়ে দেব
মনের মতন মালা গেঁথে,
কই সে হল মালা গাঁথা,
কই সে এল হায়!
যমুনার ঢেউ যাচ্ছে বয়ে বেলা চলে যায়॥৭৯॥

গৌড়সারং। একতালা।

আয়রে আয়রে সাঁঝের বা,
লতাটিরে দুলিয়ে যা।
ফুলের গন্ধ দেব তোরে
আঁচলটি তোর ভোরে ভোরে।
আয়রে আয়রে মধুকর,
ডানা দিয়ে বাতাস কর,
ভোরের বেলা গুন্‌গুনিয়ে
ফুলের মধু যাবি নিয়ে।
আয়রে চাঁদের আলো আয়,
হাত বুলিয়ে দেরে গায়,
পাতার কোলে মাথা থুয়ে
ঘুমিয়ে পড়বি শুয়ে শুয়ে।
পাখীরে, তুই কোস্‌নে কথা
ঐ যে ঘুমিয়ে প'ল লতা। ৮০॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ। আড়খেমটা।

বনে এমন ফুল ফুটেছে
মান করে থাকা আজ কি সাজে!
মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে
চল চল কুঞ্জমাঝে!
আজ কোকিলে গেয়েছে কুহু
মুহুমুহু, কাননে ঐ বাঁশী বাজে।
আজ মধুরে মিশাবি মধু,
পরাণ বঁধু চাঁদের আলোয় ঐ বিরাজে॥ ৮১॥

মিশ্র পূরবী। একতালা।

মরিলো মরি,
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে!
ভেবেছিলাম ঘরে রব কোথাও যাব না,
ঐ যে বাহিরে বাজিল বাঁশী বল কি করি!
শুনেছি কোন্ কুঞ্জবনে যমুনাতীরে
সাঁঝের বেলায় বাজে বাঁশী ধীর সমীরে
ওগো তোরা জানিস যদি পথ বলে দে!
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে!
দেখিগে তার মুখের হাসি,
তারে ফুলেরমালা পরিয়ে আসি,
তারে বলে আসি তোমার বাঁশী
আমার প্রাণে বেজেছে।
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে! ৮২॥

বিভাস। কাওয়ালি।

ঝর ঝর রক্ত ঝরে কাটামুণ্ড বেয়ে।
ধরণী রাঙা হল রক্তে নেয়ে!
ডাকিনী নৃত্য করে প্রসাদ-রক্ত তরে,
তৃষিত ভক্ত তোমার আছে চেয়ে! ৮৩॥

দেশ। কাওয়ালি।

আমি একলা চলেছি এ ভবে,
আমায় পথের সন্ধান কে কবে?
ভয় নেই, ভয় নেই,
যাও আপন মনেই,
যেমন, একলা মধুপ ধেয়ে যায়
কেবল ফুলের সৌরভে! ৮৪॥

ভৈরোঁ। একতালা।

উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে।
আমরা নৃত্য করি সঙ্গে।
দশদিক্ আঁধার করে মাতিল দিগ্‌বসনা,
জ্বলে বহ্নিশিখা রাঙা রসনা,
দেখে মরিবারে ধাইছে পতঙ্গে!
কালো কেশ উড়িল আকাশে,
রবি সোম লুকাল তরাসে!
রাঙা রক্ত ধারা ঝরে কালো অঙ্গে,
ত্রিভুবন কাঁপে ভুরুভঙ্গে! ৮৫॥

কীর্ত্তনের সুর।

আমারে, কে নিবি ভাই,
সঁপিতে চাই আপনারে!
আমার এই মন গলিয়ে কাজ ভুলিয়ে
সঙ্গে তোদের নিয়ে যা'রে।
তোরা কোন রূপের হাটে,
চলেছিস্ ভবের বাটে,
পিছিয়ে আছি আমি আপন ভারে,
তোদের ঐ হাসি খুসী দিবানিশি
দেখে মন কেমন করে!
আমার এই বাঁধা টুটে নিয়ে যা' লুটেপুটে,
পড়ে থাক্ মনের বোঝা ঘরের দ্বারে!
যেমন ঐ এক নিমেষে বন্যা এসে
ভাসিয়ে নে যায় পারাবারে?
এত যে আনাগোনা, কে আছে জানাশোনা
কে আছে নাম ধ'রে মোর ডাকতে পারে!
যদি সে বারেক এসে দাঁড়ায় হেসে
চিনতে পারি দেখে তারে। ৮৬॥

ভৈরবী। একতালা।

থাকতে আর ত পারলি নে মা, পারলি কৈ?
কোলের সন্তানেরে ছাড়লি কৈ?

দোষী আছি অনেক দোষে,
ছিলি বসে ক্ষণিক রোষে,
া ত ফিরালি শেষে,
অভয়চরণ কাড়লি কৈ ? ৮৭ ॥

পাম্বাজ। ঝাপতাল।
ঐ আঁখিরে।
ফিরে ফিরে চেয়োনা চেয়োনা, ফিরে যাও,
কি আর রেখেছ বাকি রে!
মরমে কেটেছ সিঁধ, নয়নের কেড়েছ নীদ্,
কি সুখে পরাণ আর রাখিবে! ৮৮ ॥

মিশ্র মোল্লার। একতালা।
যদি আসে তবে কেন যেতে চায়?
দেখা দিয়ে তবে কেন গো লুকায়!
চেয়ে থাকে ফুল হৃদয় আকুল,
বায়ু বলে এসে ভেসে যাই,
ধরে রাখ, ধরে রাখ,
সুখ পাখী ফাঁকি দিয়ে উড়ে যায় ॥
পথিকের বেশে সুখ নিশি এসে
বলে হেসে হেসে, মিশে যাই!
জেগে থাক, জেগে থাক,
বরষের সাধ নিমেষে মিলায়। ৮৯ ॥

পিলু বাঁরোয়া। আড়খেমটা।
এরা, পরকে আপন করে, আপনারে পর,
বাহিরে বাঁশির রবে ছেড়ে যায় ঘর।
ভালবাসে সুখে দুখে
ব্যথা সহে হাসিমুখে
মরণেরে করে চির-জীবন নির্ভর! ৯০ ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ। একতালা।
বাজিবে, সখি, বাঁশী বাজিবে।
হৃদয়রাজ হৃদে রাজিবে।
বচন রাশি রাশি, কোথা যে যাবে ভাসি,
অধরে লাজ হাসি সাজাবে!
নয়নে আঁখিজল করিবে ছল ছল,
সুখ বেদনা মনে বাজিবে।
মরমে মুরছিয়া মিলাতে চাবে হিয়া
সেই চরণ-যুগ রাজীবে! ৯১ ॥

মিশ্র সিন্ধু। একতালা।
ঐ বুঝি বাঁশী বাজে!
বনমাঝে, কি মনমাঝে?
বসন্ত বায় বহিছে কোথায়
কোথায় ফুটেছে ফুল!
বল গো সজনি, এ সুখ রজনী
কোন্খানে উদিয়াছে?
বনমাঝে কি মনমাঝে?
যাব কি যাবনা মিছে এ ভাবনা
মিছে মরি লোকলাজে!
কে জানে কোথা সে বিরহ হুতাশে
ফিরে অভিসার-সাজে,
বনমাঝে কি মনমাঝে? ৯২ ॥

মিশ্র। একতালা।
এবার যমের দুয়োর খোলা পেয়ে
ছুটেছে সব ছেলে মেয়ে!
হরিবোল্ হরিবোল্!
রাজ্য জুড়ে মস্ত খেলা,
মরণ-বাঁচন অবহেলা,
ও ভাই, সবাই মিলে প্রাণটা দিলে
সুখ আছে কি মরার চেয়ে!
হরিবোল্ হরিবোল্!
বেজেছে ঢোল বেজেছে ঢাক,
ঘরে ঘরে পড়েছে ডাক,
এখন কাজ কর্ম্ম চুলোতে যাক্
কেজো লোক সব আয়রে ধেয়ে!
হরিবোল হরিবোল্!
রাজা প্রজা হবে জড়,
থাক্‌বে না আর ছোট বড়,
একই স্রোতের মুখে ভাস্‌বে সুখে

বৈতরণীর নদী বেয়ে!
হরিবোল হরিবোল! ৯৩॥

গৌরী। কাওয়ালি।

আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি
তুমি অবসর মত বাসিয়ো!
আমি নিশিদিন হেতায় বসে আছি
তোমার যখন মনে পড়ে আসিয়ো!
আমি সারানিশি তোমা লাগিয়া
রব' বিরহ শয়নে জাগিয়া,
তুমি নিমেষের তরে প্রভাতে
এসে মুখপানে চেয়ে হাসিয়ো।
তুমি চিরদিন মধুপবনে
চির বিকশিত বন-ভবনে
যেয়ো মনোমত পথ ধরিয়া
তুমি নিজ সুখ-স্রোতে ভাসিয়ো!
যদি তার মাঝে পড়ি আসিয়া
তবে আমিও চলিব ভাসিয়া,
যদি দূরে পড়ি তাহে ক্ষতি কি,
মোর স্মৃতি মন হতে নাশিয়ো! ৯৪॥

বিভাস। একতালা।

বঁধু, তোমায় করব রাজা তরুতলে
বনফুলের বিনোদ মালা দেব গলে।
সিংহাসনে বসাইতে
হৃদয়খানি দেব পেতে,
অভিষেক করব তোমায় আঁখিজলে। ৯৫॥

সিন্ধু। খেমটা।

আজ আসবে শ্যাম গোকুলে ফিরে।
আবার বাজবে বাঁশী যমুনাতীরে।
আমরা কি করব? কি বেশ ধরব?
কি মালা পরব?
বাঁচব কি মরব সুখে?
কি তারে বলব?
কথা কি রবে মুখে?

শুধু তার মুখপানে চেয়ে চেয়ে দাঁড়ায়ে
ভাস্‌ব নয়ন নীরে! ৯৬॥

বেলাবলী। ঢিমা তেতালা।

মনে যে আশা লয়ে এসেছি
হল না হল না হে,
ওই মুখপানে চেয়ে ফিরিনু লুকাতে আঁখিজল
বেদনা রহিল মনে মনে।
তুমি কেন হেসে চাও, হেসে যাও হে
আমি কেন কেঁদে ফিরি,
কেন আনি কম্পিত হৃদয় খানি;
কেন যাও দূরে না দেখে! ৯৭॥

ভৈরবী। কাওয়ালি।

কেন নয়ন আপনি ভেসে যায় (জলে)।
কেন মন কেন এমন করে।
যেন সহসা কি কথা মনে পড়ে,
মনে পড়ে না গো, তবু মনে পড়ে।
চারিদিকে সব মধুর নীরব
কেন আমারি পরাণ কেঁদে মরে,
কেন মন কেন এমন কেন রে।
যেন কাহার বচন দিয়েছে বেদন,
যেন কে ফিরে গিয়েছে অনাদরে,
বাজে তারি অযতন প্রাণের পরে।
যেন সহসা কি কথা মনে পড়ে
মনে পড়ে না গো তবু মনে পড়ে। ৯৮॥

মিশ্র ইমন। কাওয়ালি।

এখনো তারে চোখে দেখিনি,
শুধু বাঁশী শুনেছি,
মন প্রাণ যাহা ছিল দিয়ে ফেলেছি।
শুনেছি মুরতি কালো,
তারে না দেখাই ভালো,
সখি বল, আমি জল আনিতে যমুনায় যাব কি!
শুধু স্বপনে এসেছিল সে,
নয়ন কোণে হেসেছিল সে,

সে অবধি, সই, ভয়ে ভয়ে রই,
আঁখি মেলিতে ভেবে সারা হই।
কানন পথে যে খুসি সে যায়,
কদমতলে যে খুসি সে চায়,
বল,
য় আঁখি তুলে কারো পানে চাব কি ! ৯৮॥

মিশ্র। কাওয়ালি।

ওগো তোরা কে যাবি পারে।
আমি তরী নিয়ে বসে আছি নদীকিনারে।
ওপারেতে উপবনে কত খেলা কত জনে,
এপারেতে ধুধু মরু বারি বিনা রে।
এইবেলা বেলা আছে আয় কে যাবি।
মিছে কেন কাটে কাল কত কি ভাবি।
। পাটে যাবে নেমে, সুবাতাস যাবে থেমে,
খেয়া বন্ধ হয়ে যাবে সন্ধ্যা আঁধারে।৯৯॥

সিন্ধু। একতালা।

তবে শেষ করে দাও শেষ গান
তার পরে যাই চলে।
তুমি ভুলে যেয়ো এ রজনী
আজ রজনী ভোর হলে।
হু ডোরে বাঁধি কারে, স্বপ্ন কভু বাঁধা পড়ে?
ক শুধু বাজে ব্যথা, আঁখি ভাসে জলে।১০০

ইমন কল্যাণ। ঝাঁপতাল।

যাহা পাও তাই লও, হাসি মুখে ফিরে যাও
র চাও কেন চাও, আশা কে পূরাতে পারে।
সবে চায় কেবা পায়, সংসার চলে যায়
যেবা হাসে যেবা কাঁদে
যেবা পড়ে থাকে দ্বারে ॥ ১০১ ॥

কেদারা। কাওয়ালি।

সখি, আমারি দুয়ারে কেন আসিল,
নিশি ভোরে যোগী ভিখারী,
কেন করুণস্বরে বীণা বাজিল।
ম আসি যাই যতবার, চোখে পড়ে মুখ তার,
তারে ডাকিব কি ফিরাইব তাই ভাবিলো।
শ্রাবণে আঁধার দিশি শরতে বিমল নিশি,
বসন্তে দখিণ বায়ু বিকশিত উপবন।
কত ভাবে কত গীতি গাহিতেছে নিতি নিতি
মন নাহি লাগে কাজে আঁখি জলে ভাসিল ১০২

বেহাগ। একতালা।

শুধু যাওয়া আসা।
শুধু স্রোতে ভাসা।
শুধু আলো আঁধারে কাঁদা হাসা।
শুধু দেখা পাওয়া শুধু ছুঁয়ে যাওয়া,
শুধু দূরে যেতে যেতে কেঁদে চাওয়া,
শুধু নব দুরাশায় আগে চলে যায়
পিছে ফেলে যায় মিছে আশা।
অশেষ বাসনা লয়ে ভাঙ্গা বল,
প্রাণপণে কাজে পায় ভাঙ্গা ফল,
ভাঙ্গা তরী ধরে ভাসে পারাবারে
ভাব কেঁদে মরে ভাঙ্গা ভাষা।
হৃদয়ে হৃদয়ে আধ পরিচয়
আধ খানি কথা সাঙ্গ নাহি হয়,
লাজে ভয়ে ত্রাসে আধ বিশ্বাসে
শুধু আধখানি ভালবাসা। ১০৩ ॥

মিশ্র। একতালা।

তবু মনে রেখো, যদি দূরে যাই চলে।
যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায়
নব প্রেমজালে।
যদি থাকি কাছাকাছি,
দেখিতে না পাও ছায়ার মতন
আছি না আছি।
তবু মনে রেখো।
যদি জল আসে আঁখি পাতে,
একদিন যদি খেলা থেমে যায়
মধুরাতে,
একদিন যদি বাধা পড়ে কাজে

শরদ প্রান্তে।

তবু মনে রেখো।

যদি পড়িয়া মনে,
ছল ছল জল নাই দেখা দেয়
নয়নকোণে,
তবু মনে রেখো। ১০৪ ॥

বাউলের সুর।

তোমরা সবাই ভাল।

(যার অদৃষ্টে যেমনি জুটেছে,
সেই আমাদের ভালো।)
আমাদের এই আঁধার ঘরে
সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালো।
কেউবা অতি জ্বল জ্বল,
কেউবা ম্লান ছল ছল,
কেউবা কিছু দহন করে কেউবা স্নিগ্ধ আলো।
নূতন প্রেমে নূতন বধূ
আগাগোড়া কেবল মধু,
পুরাতনে অম্ল-মধুর একটুকু ঝাঁঝালো।
বাক্য যখন বিদায় করে
চক্ষু এসে পায়ে ধরে,
রাগের সঙ্গে অনুরাগে সমান ভাগে ঢালো।
আমরা তৃষ্ণা তোমরা সুধা,
তোমরা তৃপ্তি আমরা ক্ষুধা,
তোমার কথা বলতে কবির কথা ফুরালো।
যে মূর্তি নয়নে জাগে
সবই আমার ভাল লাগে,
কেউবা দিব্যি গৌরবরণ
কেউবা দিব্যি কালো। ১০৫ ॥

কানাড়া। কাওয়ালি।

আমার পরাণ লয়ে কি খেলা খেলাবে, ওগো
পরাণ-প্রিয়।
কোথা হতে ভেসে কূলে লেগেছে চরণ মূলে,
তুলে দেখিয়ো।
এ নহে গো তৃণ দল ভেসে আসা ফুল ফল,
এ যে ব্যথাভরা মন, মনে রাখিয়ো।
কেন আসে কেন যায় কেহ না জানে,
কেবা আসে কার পাশে কিসের টানে!
রাখ যদি ভালবেসে চিরপ্রাণ পাইবে সে,
ফেলে যদি যাও তবে বাঁচিবে কি ও! ১০৬॥

বাউলের সুর।

ক্ষ্যাপা তুই, আছিস্ আপন খেয়াল ধরে।
যে আসে তোমার পাশে
সবাই হাসে দেখে তোরে।
জগতে যে যার আছে আপন কাজে দিবানিশি,
তারা পায়না বুঝে তুই কি খুঁজে
ক্ষেপে বেড়াস্ জনম ভোরে।
তোর নাই অবসর নাইক দোসর ভবের মাঝে,
তোরে চিনতে যে চাই সময় না পাই নানান্ কাজে।
ওরে তুই কি শুনাতে এত প্রাতে মরিস ডেকে,
এ যে বিষম জ্বালা ঝালাপালা,
দিবি সবায় পাগল করে।
ওরে তুই, কি এনেছিস্ কি টেনেছিস্ ভাবের জালে,
তার কি মূল্য আছে কারো কাছে কোনো কালে!
আমরা লাভের কাজে হাটের মাঝে ডাকি তোমায়,
তুমি কি সৃষ্টিছাড়া নাইক সাড়া
রয়েছ কোন্ নেশার ঘোরে।
এ জগৎ আপন মতে আপন পথে চলে যাবে,
বসে তুই আরেক কোণে নিজের মনে নিজের ভাবে,
ওরে ভাই ভাবের সাথে ভবের মিলন হবে কবে!
মিছে তুই ভাবি লাগি আছিস্ জাগি
না জানি কোন আশার জোরে; ১০৭।

পিলু বাঁরোয়া। একতালা।

মোরা জলেস্থলে কতই ছলে মায়াজাল গাঁথি।
মোরা স্বপন রচনা করি,
অলস নয়ন ভরি,
গোপন হৃদয়ে পশি কুহক আসন পাতি।
মোরা মদির তরঙ্গ তুলি বসন্ত-সমীরে,
দুরাশা জাগায় প্রাণে প্রাণে
আধ তানে ভাঙ্গা গানে
ভ্রমর গুঞ্জরাকুল বকুলের পাঁতি।
নরনারী হিয়া মোরা বাঁধি মায়া পাশে
কত ভুল করে, তারা কত কাঁদে হাসে।
মায়া করে ছায়া ফেলি মিলনের মাঝে,
আনি মান অভিমান,
বিরহী স্বপনে পায় মিলনের সাথী।
চল সখি চল,
কুহক স্বপন খেলা খেলাবে চল।
নবীন হৃদয়ে রচি নব প্রেম ছল
প্রমোদে কাটাব নব বসন্তের রাতি ॥১০৮॥

মুলতান। একতালা।

(উত্তর প্রত্যুত্তর)

১। ভালবেসে দুখ সেও সুখ, সুখ নাহি আপনাতে
২। না না না, মোরা ভুলিনে ছলনাতে।
১। মন দাও দাও দাও, সখি দাও পরের হাতে।
২। না না না, মোরা ভুলিনে ছলনাতে।
১। সুখের শিশির নিমেষে শুকায়
সুখ চেয়ে দুখ ভাল,
আন সজল বিমল প্রেম ছল ছল
নলিন-নয়ন-পাতে।
২। না, না, না, মোরা ভুলিনে ছলনাতে।
১। রবির কিরণে ফুটিয়া নলিনী
আপনি টুটিয়া যায়—
সুখ পায় তায় সে,
চির-কলিকা-জনম কে করে বহন
চির-শিশির-রাতে।
২। না নানা মোরা ভুলিনে ছলনাতে ॥ ১০৯ ॥

সোহিনী। একতালা।

(উত্তর প্রত্যুত্তর)

১। ওগো, দেখি আঁখি তুলে চাও,
তোমার চোখে কেন ঘুমঘোর!
২। আমি কি যেন করেছি পান,
কোন্ মদিরা রসে ভোর,
আমার চোখে তাই ঘুমঘোর ॥
১। ছি ছি ছি!
২। সখি, ক্ষতি কি!
এ ভবে, কেহ জ্ঞানী অতি, কেহ ভোলা মন,
কেহ সচেতন, কেহ অচেতন,
কারো বা নয়নে হাসির কিরণ,
কারো বা নয়নে লোর।
আমার চোখে শুধু ঘুম ঘোর।
১। ওগো, কেন গো অচল প্রায়,
হেথা, দাঁড়ায়ে তরুছায়!
২। অবশ হৃদয় ভারে চরণ
চলিতে নাহি চায় তাই দাঁড়ায়ে তরুছায়।
১। ছি ছি ছি!
২। সখি! ক্ষতি কি!
এ ভবে, কেহ পড়ে থাকে, কেহ চলে যায়,
কেহ বা আলসে চলিতে না চায়,
কেহ বা আপনি স্বাধীন, কাহারো
চরণে পড়েছে ডোর,
কাহারো নয়নে লেগেছে ঘোর ॥ ১১০ ॥

বাহার। ফেরতা।

(প্রশ্নোত্তর)

১। সখি, সাধ করে যাহা দেবে তাই লইব।
২। আহা মরি মরি সাধের ভিখারী
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণ মন।

১। যদি দাও ফুল শিরে তুলে রাখিব।
২। দেয় যদি কাঁটা ?
১। তাও সহিব !
২। আহা, মরি মরি, সাধের ভিখারী
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণ মন।
১। একবার চাও যদি মধুর নয়ানে,
আঁখি সুধা পানে চির জীবন মাতি রহিব !
২। যদি কঠিন কটাক্ষ মিলে ?
১। তাও হৃদয়ে বিঁধায়ে চির জীবন বহিব !
২। আহা মরি মরি সাধের ভিখারী
তুমি মনে মনে চাহ প্রাণ মন। ১১১ ॥

মিশ্র দেশ। একতালা।
(কথোপকথন)

১। সেজন কে সখি বোঝা গেছে,
আমাদের সখি যারে মনপ্রাণ সঁপেছে !
২। ও সে কে, কে, কে !
১। ওই যে তরুতলে বিনোদ মালা গলে
না জানি কোন ছলে বসে রয়েছে !
২। সখি কি হবে !
ওকি কাছে আসিবে কভু কথা কবে !
ওকি প্রেম জানে, ওকি বাঁধন মানে,
ওকি মায়াগুণে মন লয়েছে !
১। বিভল আঁখি তুলে আঁখি পানে চায়।
যেন কোন্ পথ ভুলে এল কোথায় !
যেন কোন গানের স্বরে শ্রবণ আছে ভরে,
যেন কোন্ চাঁদের আলোয় মগ্ন হয়েছে।
সকলে। সে জন কে সখি বোঝা গেছে ! ১১২॥

মিশ্র মোল্লার। রূপক।

এমন দিনে তারে বলা যায়।
এমন ঘন ঘোর বরিষায় !
এমন মেঘ স্বরে বাদল ঝরঝরে
তপনহীন ঘন তমসায়,
এমন দিনে মন খোলা যায়।
সে কথা শুনিবে না কেহ আর,
নিভৃত নির্জ্জন চারিধার !
দুজনে মুখোমুখী গভীর দুখে দুখী
আকাশে জল ঝরে অনিবার
জগতে কেহ যেন নাহি আর।
সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব,
কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয় দিয়ে হৃদি-অনুভব,
জগতে মিশে গেছে আর সব।
তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কার !
নামাতে পারি যদি মনোভার !
একদা গৃহ কোণে শ্রাবণ বরিষণে
দু'কথা বলি যদি কাছে তার,
তাহাতে আসে যাবে কিবা কার !
আছে ত তার পরে বারো মাস,
উঠিবে কত কথা কত হাস,
আসিবে কত লোক কত না দুখ শোক,
সে কথা কোন্ খানে পাবে নাশ,
জগৎ চলে যাবে বারোমাস।
ব্যাকুল বেগে আজি বহে বায়
বিজুলি থেকে থেকে চমকায়,
যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে
সে কথা আজি যেন বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরিষায় ॥ ১১৩ ॥

কীর্ত্তনের সুর। ঝাঁপতাল।

আবার মোরে পাগল করে দিবে কে !
হৃদয় যেন পাষাণ হেন বিরাগভরা বিবেকে।
আবার প্রাণে নূতন টানে প্রেমের নদী
পাষাণ হতে উছল স্রোতে বহায় যদি
আবার দুটি নয়নে লুটি হৃদয় হরে নিবে কে
আবার মোরে পাগল করে দিবে কে !
আবার কবে ধরণী হবে তরুণা !

কাহার প্রেমে আসিবে নেমে স্বরগ হতে করুণা।
নিশীথ নভে শুনিব কবে গভীর গান,
যে দিকে চাব দেখিতে পাব নবীন প্রাণ,
নূতন প্রীতি আনিবে নিতি কুমারী উষা অরুণা;
আবার কবে ধরণী হবে তরুণা?
অনেক দিন পরাণহীন ধরণী।
বসনাবৃত খাঁচার মত তামস ঘন বরণী।
নাই সে শাখা, নাই সে পাখা, নাই সে পাতা,
নাই সে ছবি, নাই সে রবি, নাই সে গাথা;
জীবন চলে আঁধার জলে আলোকহীন তরণী;
অনেক দিন পরাণ হীন ধরণী।
পাগল করে দিবে সে মোরে চাহিয়া।
হৃদয়ে এসে মধুর হেসে প্রাণের গান গাহিয়া।
আপনা থাকি ভাসিবে আঁখি আকুল নীরে;
ঝরণা সম জগৎ মম ঝরিবে শিরে।

তাহার বাণী দিবে গো আনি
সকল বাণী বাহিয়া;
পাগল করে দিবে সে মোরে চাহিয়া॥ ১১৪॥

কীর্ত্তনের সুর। রূপক।

খাঁচার পাখী ছিল সোণার খাঁচা টিতে
বনের পাখী ছিল বনে।
একদা কি করিয়া মিলন হল দোঁহে
কি ছিল বিধাতার মনে!
বনের পাখী বলে খাঁচার পাখী ভাই
বনেতে যাই দোঁহে মিলে,
খাঁচার পাখী বলে বনের পাখী আয়,
খাঁচায় থাকি নিরিবিলে।
বনের পাখী বলে— না,
আমি শিকলে ধরা নাহি দিব।
খাঁচার পাখী বলে হায়,
আমি কেমনে বনে বাহিরিব!
বনের পাখী গাহে বাহিরে বসি বসি
বনের গান ছিল যত,
খাঁচার পাখী পড়ে শিখানো বুলি তার
দোঁহার ভাষা দুই মত।
বনের পাখী বলে খাঁচার পাখী ভাই
বনের গান গাও দিখি!
খাঁচার পাখী বলে বনের পাখী তুমি
খাঁচার গান লহ শিখি!
বনের পাখী বলে—না,
আমি শিখানো গান নাহি চাই!
খাঁচার পাখী বলে—হায়
আমি কেমনে বনগান গাই।
বনের পাখী বলে আকাশ ঘননীল,
কোথাও বাধা নাহি তার।
খাঁচার পাখী বলে খাঁচাটি পরিপাটি
কেমন ঢাকা চারিধার!
বনের পাখী কহে আপনা ছাড়ি দাও
মেঘের মাঝে একেবারে।
খাঁচার পাখী কয় নিরালা কোণে বসে
বাঁধিয়া রাখ আপনারে
বনের পাখী গাহে—না,
সেথা, কোথায় উড়িবারে পাই!
খাঁচার পাখী কহে, হায়
মেঘে কোথায় বসিবার ঠাঁই!
এমান দুই পাখী দোঁহারে ভালবাসে
তবুও কাছে নাহি পায়!
খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে পরশে মুখে মুখে
নীরবে চোখে চোখে চায়।
দুজনে কেহ কারে বুঝিতে নাহি পারে
বুঝাতে নারে আপনায়!
দুজনে একা একা ঝাপটি মারে পাখা,
কাতরে কহে, কাছে আয়!
বনের পাখী বলে—না,
কবে খাঁচার রুধি দিবে দ্বার!
খাঁচার পাখী বলে—হায়
মোর শকতি নাহি উড়িবার॥ ১১৫॥

ইমন কল্যাণ। ঝাঁপতাল।

বঁধুয়া অসময়ে কেন হে প্রকাশ !
সকলি যে স্বপ্ন বলে হতেছে বিশ্বাস।
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে ছিলে সেথায় ত সোহাগ মিলে
এরি মধ্যে মিটিল কি প্রণয়েরি আশ !
এখনো ত নিশিশেষে উঠেনিকো শুকতারা।
এখনো ত রাধিকার শুকায়নি অশ্রুধারা !
সেথাকার কুঞ্জগৃহে পুষ্প ঝরে গেল কিহে,
চকোর হে, সেই চন্দ্রমুখে ফুরায়ে কি গেল হাস ? ১১৭ ॥

ভৈরবী। ঝাঁপতাল।

আজ তোমারে দেখতে এলেম
অনেক দিনের পরে।
ভয় নাইকো সুখে থাক
অধিকক্ষণ থাক্‌ব নাক,
আসিয়াছি দু' দণ্ডের তরে।
দেখ্‌ব শুধু মুখখানি
শুনব দুটি মধুর বাণী
আড়াল থেকে হাসি দেখে
চলে যাব দেশান্তরে ॥ ১১৮ ॥

বিভাস। একতালা।

সারা বরষ দেখিনে, মা, মা তুই আমার কেমন ধারা।
নয়নতারা হারিয়ে আমার অন্ধ হল নয়ন তারা।
এলি কি পাষাণী ওরে
দেখ্‌ব তোরে আঁখি ভোরে,
কিছুতেই থামে না যে মা, পোড়া এ নয়নের ধারা। ১১৮ ॥

বারোঁয়া। ঝাঁপতাল।

মা, আমি তোর কি করেছি !
শুধু তোরে জন্ম তোরে মা বলেরে ডেকেছি !
চির জীবন পাষাণীরে, কাঙালি আঁখিনীরে
চিরজীবন দুঃখানলে দহেছি।
আঁধার দেখে তরাসেতে চাহিলাম তোর কোলে যেতে,
আমারে ত কোলে তুলে নিলিনে !
মা-হারা বালকের মত কেঁদে বেড়াই অবিরত
এ চোখের জল মুছায়ে ত দিলিনে !
সন্তানেরে ব্যথা দিয়ে যদি মা তোর জুড়ায় হিয়ে
ভাল, ভাল, তাই তবে হোক্‌, অনেক দুঃখ সয়েছি ॥ ১১৯ ॥

রামপ্রসাদী সুর।

আমিই শুধু রইনু বাকি !
যা ছিল তা গেল চলে, রৈল যা' তা' কেবল ফাঁকি !
আমার বলে ছিল যারা
আর ত তারা দেয় না সাড়া,
কোথায় তারা কোথায় তারা কেঁদে কেঁদে কারে ডাকি।
বল্‌ দেখি মা শুধাই তোরে
আমার কিছু রাখলি নেরে,
আমি কেবল আমার নিয়ে কোন্‌ প্রাণেতে বেঁচে থাকি ॥ ১২০ ॥

টোড়ী। ঝাঁপতাল।

আর কি আমি ছাড়বো তোরে !
মন দিয়ে মন নাইবা পেলেম, জোর করে রাখিব ধরে।
শূন্য করে হৃদয়পুরি,
মন যদি করিলে চুরি,
তুমিই তবে থাক সেথায় শূন্য হৃদয় পূর্ণ করে ॥ ১২১ ॥

ললিত। একতালা।

যেতে হবে আর দেরি নাই।
পিছিয়ে পড়ে র'বি কত সঙ্গীরা যে গেল সবাই

আয়রে ভবের খেলা সেরে,
আঁধার করে এসেছেরে,
পিছন ফিরে বারে বারে কাহার পানে
চাহিস্‌রে ভাই।
খেলতে এল ভবের নাটে নতুন লোকে নতুন খেলা,
হেথা হতে আয়রে সরে'
নইলে তোরে মারবে ঢেলা।
নামিয়ে দেরে প্রাণের বোঝা,
আরেক দেশে চল্‌রে সোজা,
নতুন করে বাঁধবি বাসা, নতুন খেলা খেলবি সে ঠাই॥ ১২২॥

খট। ঝাঁপতাল।

আমার যাবার সময় হল আমায় কেন রাখিস্‌ ধরে,
চোখের জলের বাঁধন দিয়ে বাঁধিস্‌নে আর মায়া ডোরে।
ফুরিয়েছে জীবনের ছুটি,
ফিরিয়ে নে তোর নয়ন দুটি,
নাম ধরে আর ডাকিস্‌নে ভাই যেতে হবে ত্বরা করে॥ ১২৩॥

ইমন কল্যাণ। একতালা।

পথহারা তুমি পথিক যেন গো সুখের কাননে
ওগো যাও কোথা যাও!
সুখে ঢলঢল বিবশ বিভল পাগল নয়নে
ওগো চাও কারে চাও!
কোথা চলে গেছে উদাস হৃদয়
কোথা পড়ে আছে ধরণী।
মায়ার তরণী বাহিয়া যেন গো
মায়াপুরী পানে ধাও!
কোন্‌ মায়াপুরী পানে ধাও॥ ১২৪॥

দেশ। একতালা।
(কথোপকথন।)

১। দে লো সখী দে, পরাইয়া চুলে
সাধের বকুল ফুল হার!
আধফুটো জুঁইগুলি যতনে আনিয়া তুলি
দেলো দেলো ফুলময় সাজে
সাজায়ে আমারে সখি আজ!
তুলে দেলো চঞ্চলকুন্তল কপোলে পড়িছে বারবার।
২। আজি এত শোভা কেন,
আনন্দে বিবশা হেন,
বিম্বাধরে হাসি নাহি ধরে লাবণ্য ঝরিয়া পড়ে ধরাতলে।
সখী তোরা দেখে যা দেখে যা,
তরুণ তনু এত রূপ রাশি বহিতে পারে না বুঝি আর॥ ১২৫॥

হাম্বীর। কাওয়ালি।

ফিরায়ো না মুখখানি, রাণী, ওগো রাণী।
ভ্রূভঙ্গ তরঙ্গ কেন আজি সুনয়নি,
হাসিরাশি গেছে ভাসি,
কোন দুখে সুধামুখে নাহি বাণী।
আমারে মগন কর তোমার মধুর করপরশে
সুধাসরসে!
প্রাণমন পূরিয়া দাও নিবিড় হরষে;
হের শশী সুশোভন, সজনি,
সুন্দর রজনী,
তৃষিত মধুপসম কাতর হৃদয় মম,—
কোন্‌ প্রাণে আজি ফিরাবে তারে পাষাণী?১২৬

হাম্বীর। চৌতাল।

গহন ঘন বনে, পিয়াল তমাল সহকার ছায়ে,
সন্ধ্যা বায়ে, তৃণ শয়নে মুগ্ধ নয়নে রয়েছি বসি।
শ্যামল পল্লব ভার আঁধারে মর্ম্মরিছে,
বায়ুভরে কাঁপে শাখা, বকুল দল পড়ে খসি।
স্তব্ধ নীড়ে নীরব বিহগ,
নিস্তরঙ্গ নদী প্রান্তে অরণ্যের নিবিড় ছায়া

ঝিল্লিমন্দ্রে তন্দ্রাপূর্ণ জলস্থল শূন্যতল,
চরাচরে স্বপনের মায়া।
নির্জ্জন হৃদয়ে মোর জাগিতেছে সেই মুখশশী॥১২৭

নট্‌কিন্নর। ধামার।

সাজাব তোমারে হে ফুল দিয়ে দিয়ে,
নানা বরণের বনফুল দিয়ে দিয়ে;
আজি বসন্ত রাতে পূর্ণিমা-চন্দ্র করে,
দক্ষিণ পবনে প্রিয়ে,
সাজাব তোমারে হে ফুল দিয়ে দিয়ে॥ ১২৮॥

নট। চৌতাল।

মন জানে মনোমোহন আইল, মন জানে সখি!
তাই কেমন করে আজি আমার প্রাণে।
তারি সৌরভ বহি বহিল কি সমীরণ
আমার পরাণ পানে॥ ১২৯॥

জয়জয়ন্তী। ধামার।

হিয়া কাঁপিছে সুখে কি দুখে সখি,
কেন নয়নে আসে বারি।
আজি প্রিয়তম আসিবে মোর ঘরে,
বল কি করিব আমি সখি!
দেখা হলে সখী সেই প্রাণ বঁধুরে কি বলিব
নাহি জানি,
সে কি না জানিবে সখী রয়েছে যা হৃদয়ে,
না বুঝে কি ফিরে যাবে সখী॥ ১৩০॥

মিশ্র। আড়াঠেকা।

নীরব রজনী দেখ মগ্ন জোছনায়।
ধীরে ধীরে অতি ধীরে অতি ধীরে গাও গো!
ঘুম-ঘোরময় গান বিভাবরী গায়,
রজনীর কণ্ঠ সাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো!
নিশার কুহক বলে নীরবতা-সিন্ধুতলে
মগ্ন হয়ে ঘুমাইছে বিশ্ব চরাচর;
প্রশান্ত সাগরে হেন, তরঙ্গ না তুলে যেন
অধীর-উচ্ছাসময় সঙ্গীতের স্বর।
তটিনী কি শান্ত আছে! ঘুমাইয়া পড়িয়াছে
বাতাসের মৃদু হস্ত পরশে এমনি,
ভুলে যদি ঘুমে ঘুমে তটের চরণ চুমে
সে চুম্বন ধ্বনি শুনে চমকে আপনি!
তাই বলি অতি ধীরে—অতি ধীরে গাও গো!
রজনীর কণ্ঠ সাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো! ১৩১॥

কালাংড়া—খেমটা।

দেখে যা—দেখে যা—দেখে যালো তোরা
সাধের কাননে মোর
(আমার) সাধের কুসুম উঠেছে ফুটিয়া,
মলয় বহিছে সুরভি লুটিয়া রে—
(হেথা) জোছনা ফুটে তটিনী ছুটে
প্রমোদে কানন ভোর।
আয় আয় সখি আয় লো হেথা
দুজনে কহিব মনের কথা,
তুলিব কুসুম দুজনে মিলি রে—
(সুখে) গাঁথিব মালা, গণিব তারা,
করিব রজনী ভোর!
একাসনে বসি গাহিব গান
সুখের স্বপনে কাটাব প্রাণ,
খেলিব দুজনে মনেরি খেলা রে
(প্রাণে) রহিবে মিশি দিবস নিশি
আধো আধো ঘুম ঘোর॥ ১৩২॥

ঝিঁঝিট সিন্ধু। কাওয়ালি।

সমুখেতে বহিছে তটিনী, দুটি তারা আকাশে ফুটিয়া
বায়ু বহে পরিমল লুটিয়া।
সাঁঝের অধর হতে, ম্লান হাসি পড়িছে টুটিয়া।
দিবস বিদায় চাহে, যমুনা বিলাপ গাহে
সায়াহ্নেরি রাঙা পায়ে কেঁদে
কেঁদে পড়েছি লুটিয়া।
এস বঁধু তোমায় ডাকি, দোঁহে হেথা বসে থাকি
আকাশের পানে চেয়ে জলদের খেলা দেখি,
আঁখি পরে তারাগুলি একে
একে উঠিবে ফুটিয়া। ১৩৩॥

বেহাগ। কাওয়ালি।

চরাচর সকলি মিছে মায়া, ছলনা,
কিছুতেই ভুলিনে আর, আর আর নারে,
মিছে ধূলিরাশি লয়ে কি হবে ?
সকলি আমি জেনেছি, সবি শূন্য
শূন্য শূন্য ছায়া। সবি ছলনা!
দিন রাত যার লাগি সুখ দুখ না করিনু জ্ঞান,
পরাণ মন সকলি দিয়েছি,
তা হতেরে কিবা পেনু ?
কিছু না, সকলি ছলনা ! ১৩৪ ॥

মিশ্র। একতালা।

ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে বহে কিবা মৃদুবায়—
তটিনী হিল্লোল তুলে কল্লোলে চলিয়া যায়।
পিক কিবা কুঞ্জে কুঞ্জে কুহু কুহু কুহু গায়—
কি জানি কিসের লাগি প্রাণ করে হায় হায়১৩৫

বাহার। কাওয়ালি।

হায়রে সেইত বসন্ত ফিরে এল,
হৃদয়ের বসন্ত ফুরায় !
সব মরুময়, মলয় অনিল এসে কেঁদে শেষে
ফিরে চলে যায়।
কত শত ফুল ছিল হৃদয়ে, ঝরে গেল,
আশালতা শুকাল,
পাখীগুলি দিকে দিকে চলে যায়।
শুকান পাতায় ঢাকা
বসন্তের মৃত কায়, প্রাণ করে হায় হায়।
ফুরাইল সকলি !
প্রভাতের মৃদু হাসি, ফুলের রূপরাশি,
ফিরিবে কি আর ?
কিবা জ্যোছনা ফুটিত রে ! কি যামিনী !
সকলি হারাল,
সকলি গেলরে চলিয়া,প্রাণ করে হায় হায় !১৩৬

বাহার। কাওয়ালি।

খুলে দে তরণী খুলে দে তোরা, স্রোত বহে
যায় যে। মন্দ মন্দ অঙ্গ ভঙ্গে নাচিছে তরঙ্গ
রঙ্গে, এই বেলা খুলে দে !
ভাঙ্গিয়ে ফেলেছি হাল, বাতাসে পূরেছে
পাল স্রোতমুখে প্রাণ মন যাক্ ভেসে যাক্,
যে যাবি আমার সাথে এই বেলা আয় রে !১৩৭

বাহার। আড়াঠেকা।

এ কি হরষ হেরি কাননে !
পরাণ আকুল, স্বপন বিকসিত
মোহ মদিরাময় নয়নে !
ফুলে ফুলে করিছে কোলাকুলি,
বনে বনে বহিছে সমীরণ
নব পল্লবে হিল্লোল তুলিয়ে,
বসন্ত পরশে বন শিহরে,
কি জানি কোথা পরাণ মন
ধাইছে বসন্ত-সমীরণে !
ফুলেতে শুয়ে জ্যোছনা,
হাসিতে হাসি মিলাইছে,
মেঘ ঘুমায়ে ঘুমায়ে ভেসে যায়,
ঘুমভারে অলস বসুন্ধরা—
দূরে পাপিয়া পিউ পিউ রবে
ডাকিছে সঘনে। ১৩৮ ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ একতালা।

সকলি ফুরাল স্বপন প্রায় !
কোথা সে লুকাল' কোথা সে হায় !
কুসুম কানন হয়েছে ম্লান
পাখীরা কেন রে গাহে না গান,
(ও) সব হেরি শূন্যময়—কোথা সে হায় !
কাহার তরে আর ফুটিবে ফুল,
মাধবী মালতী কেঁদে আকুল !
সেই যে আসিত তুলিতে ফুল
সেই যে আসিত পাড়িতে জল
(ও) সে আর আসিবে না—কোথা
সে হায় ! ১৩৯ ॥

গৌড় মল্লার। চৌতাল।

গহন ঘন ছাইল গগন ঘনাইয়া;
স্তিমিত দশ দিশি, স্তম্ভিত কানন,
সব চরাচর আকুল—কি হবে কে জানে,
ঘোরা রজনী, দিকললনা ভয়বিভলা।
চমকে চমকে সহসা দিক উজলি,
চকিতে চকিতে মাতি ছুটিল বিজলী,
থর থর চরাচর পলকে ঝলকিয়া,
ঘোর তিমিরে ছায় গগন মেদিনী;
গুরু গুরু নীরদ গরজনে স্তব্ধ আঁধার ঘুমাইছে,
সহসা উঠিল জেগে প্রচণ্ড
সমীরণ কড় কড় বাজ। ১৪০ ॥

মল্লার। কাওয়ালি।

আয়লো সজনি সবে মিলে।
ঝর ঝর বারিধারা, মৃদু মৃদু গুরু গুরু গর্জন,
এ বরষা দিনে, হাতে হাতে ধরি ধরি
গাব মোরা লতিকা দোলায় দুলে!
ফুলায় যতনে কেতকী কদম্ব অগণন,
মাথায় বরণ ফুলে ফুলে—
পিয়াব নবীন সলিল, পিয়াসিত তরুলতা,
লতিকা বাঁধিব গাছে তুলে।
বনেরে সাজায়ে দিব গাঁথিব মুকুতাকণা
পল্লব শ্যাম দুকূলে,
নাচিব সখী সবে নব ঘন উৎসবে,
বিকচ বকুল তরুমূলে! ১৪১ ॥

পূরবী। কাওয়ালি।

যে ফুল ঝরে সেইত ঝরে ফুল ত থাকে ফুটিতে,
বাতাস তারে উড়িয়ে নে যায়
মাটি মেশায় মাটিতে!

গন্ধ দিলে হাসি দিলে,
ফুরিয়ে গেল খেলা!
ভালবাসা দিয়ে গেল,
তাই কি হেলাফেলা! ১৪২॥

ভৈরবী। ঝাঁপতাল।

কেন এলি রে, ভাল বাসিলি, ভালবাসা
পেলিনে।
কেন সংসারেতে উঁকি মেরে চলে গেলিনে!
সংসার কঠিন বড় কারেও সে ডাকে না,
কারেও সে ধরে রাখে না,
যে থাকে সে থাকে, আর যে যায় সে যায়
কারো তরে ফিরেও না চায়।
হায় হায় এ সংসারে যদি না পূরিল
আজন্মের প্রাণের বাসনা,
চলে যাও, ম্লানমুখে ধীরে ধীরে ফিরে যাও
থেকে যেতে কেহ বলিবে না!
তোমার ব্যথা তোমার অশ্রু তুমি নিয়ে যাবে
আর ত কেহ অশ্রু ফেলিবে না॥ ১৪৩॥

মিশ্র। কাওয়ালি।

কতবার ভেবেছিনু আপনা ভুলিয়া,
তোমার চরণে দিব হৃদয় খুলিয়া।
চরণে ধরিয়া তব কহিব প্রকাশি,
গোপনে তোমারে সখা কত ভালবাসি!
ভেবেছিনু কোথা তুমি স্বর্গের দেবতা
কেমনে তোমারে কব প্রণয়ের কথা?
ভেবেছিনু মনে মনে দূরে দূরে থাকি
চিরজন্ম সঙ্গোপনে পূজিব একাকী;
কেহ জানিবে না মোর গভীর প্রণয়
কেহ দেখিবে না মোর অশ্রুবারি চয়।
আপনি আজিকে যবে শুধাইছ আসি
কেমনে প্রকাশি কব কত ভালবাসি॥ ১৪৪॥

দেশ। আড়াঠেকা।

দেখায়ে দে কোথা আছে একটু বিরল!
এই ম্রিয়মাণ মুখে তোমাদের এত সুখে
বল দেখি কোন প্রাণে ঢালিব গরল?
কি না করিয়াছি তব বাড়াতে আমোদ
কত কষ্টে করেছিনু অশ্রুবারি রোধ!

কিন্তু পারিনে যে সখা যাতনা থাকে না ঢাকা
মর্ম্ম হ'তে উচ্ছ্বসিয়া উঠে অশ্রুজল!
ব্যথায় পাইয়া ব্যথা যদি গো সুধাতে কথা
অনেক নিভিত তবু এ হৃদি অনল।
কেবল উপেক্ষা সহি বলগো কেমনে রহি
কেমনে বাহিরে মুখ হাসিব কেবল? ১৪৫॥

বাগেশ্রী। আড়াঠেকা।

অনন্ত সাগর মাঝে দাও তরী ভাসাইয়া,
গেছে দুখ, গেছে সুখ, গেছে আশা ফুরাইয়া।
সম্মুখে অনন্ত রাত্রি, আমরা দুজনে যাত্রী,
সম্মুখে শয়ান সিন্ধু, দিগ্বিদিক হারাইয়া!
জলধি রয়েছে স্থির, ধূ ধূ করে সিন্ধুতীর,
প্রশান্ত সুনীল নীর নীল শূন্যে মিশাইয়া।
নাহি সাড়া নাহি শব্দ, মন্ত্রে যেন সব স্তব্ধ,
রজনী আসিছে ধীরে, দুই বাহু প্রসারিয়া।১৪৬

মিশ্র বাহার। আড়াঠেকা।

গা সখী, গাইলি যদি আমার সে গান,
কত দিন শুনি নাই ও পুরাণো তান।
কখনো কখনো যবে নীরব নিশীথে
একেলা রয়েছি বসি চিন্তা-মগ্ন চিতে,—
চমকি উঠিত প্রাণ কে যেন গায় সে গান
দুই একটি কথা তার পেতেছি শুনিতে!
হাহা সখী সে দিনের সব কথা গুলি
প্রাণের ভিতরে যেন উঠিছে আকুলি—
যে দিন মরিব সখী গাস্ ওই গান
শুনিতে শুনিতে যেন যায় এই প্রাণ। ১৪৭॥

গৌড়সারং। ঝং।

আঁধার শাখা উজল করি,
হরিত পাতা ঘোমটা পরি,
বিজন বনে, মালতী বালা
আছিস্ কেন ফুটিয়া?
শোনাতে তোরে মনের ব্যথা
শুনিতে তোর মনের কথা
পাগল হয়ে মধুপ কভু
আসে না হেথা ছুটিয়া।
মলয় তব প্রণয় আশে
ভ্রমে না হেথা আকুল শ্বাসে,
পায় না চাঁদ দেখিতে তোর
সরমে মাখা মুখানি!
শিয়রে তোর বসিয়া থাকি
মধুর স্বরে বনের পাখী
লভিয়া তোর সুরভি শ্বাস
যাবে না তোরে বাখানি! ১৪৮॥

গৌড়সারং। ঝং।

হৃদয় মোর কোমল অতি
সহিতে নারি রবির জ্যোতি
লাগিলে আলো সরমে ভয়ে
মরিয়া যায় মরমে,
ভ্রমর মোর বসিলে পাশে
তরাসে আঁখি মুদিয়া আসে,
ভূতলে ঝরে পড়িতে চাহি
আকুল হয়ে সরমে।
কোমল দেহে লাগিলে বায়
পাপড়ি মোর খসিয়া যায়
পাতার মাঝে ঢাকিয়া দেহ
রয়েছি তাই লুকায়ে।
আঁধার বনে রূপের হাসি
ঢালিব সদা সুরভি রাশি
আঁধার এই বনের কোলে
মরিব শেষে শুকায়ে। ১৪৯॥

সিন্ধু ঝিঁঝিট। কাওয়ালি।

হাসি কেন নাই ও নয়নে!
ভ্রমিতেছ মলিন আননে!
দেখ সখী আঁখি তুলি
ফুলগুলি ফুটেছে কাননে।
তোমারে মলিন দেখি ফুলেরা কাঁদিছে সখী,

সুধাইছে বনলতা কত কথা আকুল বচনে।
এস সখী এস হেথা, একটি কহগো কথা,
বল সখী কার লাগি পাইয়াছ মনোব্যথা,
বল সখী মন তোর আছে ভোর
কাহার স্বপনে? ১৫০॥

* ছায়ানট। কাওয়ালি।

আয় তবে সহচরি, হাতে হাতে ধরি ধরি
নাচিবি ঘিরি ঘিরি, গাহিবি গান।
আন্ তবে বীণা, সপ্তম সুরে বাঁধ তবে তান।
পাশরিব ভাবনা, পাশরিব যাতনা,
রাখিব প্রমোদে ভরি মনপ্রাণ দিবানিশি,
আন্ তবে বীণা, সপ্ত সুরে বাধ তবে তান্।
ঢাল' ঢাল' শশধর ঢাল' ঢাল' জোছনা!
সমীরণ বহে যা'রে ফুলে ফুলে ঢলি ঢলি;
উলসিত তটিনী,—
উথলিত গীতরবে খুলে দেরে মন প্রাণ। ১৫১॥

গৌরী। কাওয়ালি।

আমি, স্বপনে রয়েছি ভোর,
সখী, আমারে জাগায়োনা।
আমার সাধের পাখী—
যারে, নয়নে নয়নে রাখি
তারি, স্বপনে রয়েছি ভোর
আমার, স্বপন ভাঙ্গায়ো না।
কাল, ফুটিবে রবির হাসি,
কাল, ছুটিবে তিমির রাশি,
কাল, আসিবে আমার পাখী
ধীরে, বসিবে আমার পাশ।
ধীরে, গাহিবে সুখের গান,
ধীরে, ডাকিবে আমার নাম,
ধীরে, বয়ান তুলিয়া, নয়ন খুলিয়া
হাসিবে সুখের হাস! আমার কপোল ভরে
শিশির পড়িবে ঝরে, নয়নেতে জল,
অধরেতে হাসি, মরমে রহিব মরে।
তাহারি স্বপনে আজি মুদিয়া রয়েছি আঁখি
কখন আসিবে প্রাতে আমার সাধের পাখি
কখন জাগাবে মোরে
আমার নামটী ডাকি। ১৫২॥

পিলু। খেমটা।

বল্ গোলাপ মোরে বল্,
তুই ফুটিবি সখী কবে?
ফুল, ফুটেছে চারি পাশ
চাঁদ, হাসিছে সুধা হাস,
বায়ু, ফেলিছে মৃদু শ্বাস,
পাখী, গাইছে মধুরবে,
তুই ফুটিবি, সখী, কবে?
প্রাতে, পড়েছে শিশির-কণা,
সাঁঝে, বহিছে দখিণা বায়,
কাছে, ফুলবালা সারি সারি,
দূরে, পাতার আড়ালে সাঁজের তারা
মুখানি দেখিতে চায়।
বায়ু, দূর হতে আসিয়াছে—
যত ভ্রমর ফিরিছে কাছে,
কচি কিশলয় গুলি রয়েছে নয়ন তুলি,
তুই ফুটিবি সখী কবে? ১৫৩॥

বেহাগ। খেমটা।

বলি, ও আমার গোলাপ বালা,
বলি, ও আমার গোলাপ বালা,
তোল' মুখানি, তোল' মুখানি,
কুসুম কুঞ্জ কর আলো।
বলি, কিসের সরম এত?
সখি, কিসের সরম এত?
সখি, পাতার মাঝারে লুকায়ে মুখানি
কিসের সরম এত?
বালা, ঘুমায়ে পড়েছে ধরা,
সখি, ঘুমায় চন্দ্র তারা,
প্রিয়ে, ঘুমায় দিক্ বালারা,

প্রিয়ে, ঘুমায় জগৎ যত।
সখি, বলিতে মনের কথা
বল, এমন সময় কোথা ?
প্রিয়ে, তোল' মুখানি আছে গো আমার
প্রাণের কথা কত !
আমি, এমন সুধীর স্বরে
সখি, কহিব তোমার কাণে,
প্রিয়ে, স্বপনের মত সে কথা আসিয়ে
পশিবে তোমার প্রাণে।
তবে, মুখানি তুলিয়া চাও !
সুধীরে, মুখানি তুলিয়া চাও !
সখি, একটি চুম্বন দাও !
গোপনে একটি চুম্বন চাও !
সখি, তোমারি বিহগ আমি,
বালা, কাননের কবি তুমি,
আমি, সারারাত ধরে, প্রাণ,
করিয়া, তোমারি প্রণয় পান,
সুখে, সারাদিন ধরে গাহিব সজনি,
তোমারি প্রণয় গান।
সখি, এমন মধুর স্বরে
আমি, গাহিব সে সব গান,
দূরে, মেঘের মাঝারে আবরি তনু
ঢালিব প্রেমের তান—
তবে, মজিয়া সে প্রেম-গানে,
সবে, চাহিবে আকাশ পানে,
তা'রা, ভাবিবে গাইছে অপসর কবি
প্রেয়সীর গুণ গান।
তবে, মুখানি তুলিয়া চাও !
সুধীরে, মুখানি তুলিয়া চাও !
নীরবে, একটি চুম্বন দাও,
গোপনে একটি চুম্বন চাও ! ১৫৪ ॥

বেহাগ।

মেঘেরা চলে চলে যায়,
চাঁদেরে ডাকে "আয় আয়"
ঘুম ঘোরে বলে চাঁদ, কোথায় —কোথায় !
না জানি কোথা চলিয়াছে।
কি জানি কি যে সেথা আছে !
আকাশের মাঝে চাঁদ চারিদিকে চায়।
সুদূরে—অতি—অতিদূরে,
বুঝিরে কোন সুর পুরে
তারাগুলি ঘিরে বসে বাঁশরী বাজায়।
মেঘেরা তাই হেসে হেসে
আকাশে চলে ভেসে ভেসে,
লুকিয়ে চাঁদের হাসি চুরি করে যায়। ১৫৫ ॥

পিলু। খং।

গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে
মধুপ হোতা যাস্‌নে—
ফুলের মধু লুটিতে গিয়ে
কাঁটার ঘা খাস্‌নে !
হেথায় বেলা, হোথায় চাঁপা,
শেফালী হেথা ফুটিয়ে—
ওদের কাছে মনের ব্যথা
বল্‌রে মুখ ফুটিয়ে !
ভ্রমর কহে "হোথায় বেলা
হোথায় আছে নলিনী—
ওদের কাছে বলিবনাকো
আজিও যাহা বলিনি !
মরমে যাহা গোপন আছে
গোলাপে তাহা বলিব,
বলিতে যদি জ্বলিতে হয়
কাঁটারি ঘায়ে জ্বলিব !" ১৫৬ ॥

কেদারা। একতালা।

যোগিহে, কে তুমি হৃদি-আসনে।
বিভূতি ভূষিত শুভ্র দেহ,
নাচিছ দিক্‌-বসনে।
মহা-আনন্দে পুলক কায়,
গঙ্গা উথলি উছলি যায়,

ভালে শিশুশশী হাসিয়া চায়,
জটজুট ছায় গগনে ॥ ১৫৭ ॥

বেহাগড়া। ঝাঁপতাল।

দেখ চেয়ে দেখ ঐ কে এসেছে!
চাঁদের আলোতে কার হাসি হাসিছে!
হৃদয় দুয়ার খুলিয়ে দাও
প্রাণের মাঝারে তুলিয়ে লও,
ফুলগন্ধ সাথে তার সুবাস ভাসিছে ॥ ১৫৮ ॥

পূরবী। কাওয়ালি।

ঐ কে আমায় ফিরে ডাকে!
ফিরে যে এসেছে তারে কে মনে রাখে!
আমি চলে এনু বলে কার বাজে ব্যথা!
কাহার মনের কথা মনেই থাকে!
আমি শুধু বুঝি সখী সরল ভাষা!
সরল হৃদয় সরল ভালবাসা
তোমাদের কত আছে কত মন প্রাণ,
আমার হৃদয় নিয়ে ফেলোনা বিপাকে। ১৫৯ ॥

বেহাগ। কাওয়ালি।

এ কি স্বপ্ন! এ কি মায়া!
এ কি প্রমদা! এ কি প্রমদার ছায়া!
আহা কে গো তুমি মলিন বয়নে,
আধ-নিমীলিত নলিন-নয়নে,
যেন আপনারি হৃদয়শয়নে
আপনি রয়েছ লীন।
তোমা তরে সবে রয়েছে চাহিয়া,
তোমা লাগি পিক উঠিছে গাহিয়া,
ভিখারী সমীর কানন বাহিয়া
ফিরিতেছে সারাদিন!
যেন শরতের মেঘখানি ভেসে
চাঁদের সভাতে দাঁড়ায়েছে এসে
এখনি মিলাবে ম্লান হাসি হেসে
কাঁদিয়া পড়িবে ঝরি।
জাগিছে পূর্ণিমা পূর্ণ নীলাম্বরে
কাননে চামেলি ফুটে থরে থরে
হাসিটি কখন্ ফুটিবে অধরে
রয়েছি তিয়াষ ধরি'! ১৬০ ॥

মিশ্র ঝিঁঝিট। কাওয়ালি।

আহা, আজি এ বসন্তে এত ফুল ফুটে,
এত বাঁশী বাজে, এত পাখী গায়।
সখীর হৃদয় কুসুমকোমল
কার অনাদরে আজি ঝরে যায়।
কেন কাছে আস, কেন মিছে হাস,
কাছে যে আসিত সে ত আসিতে না চায়!
সুখে আছে যারা, সুখে থাক্ তারা,
সুখের বসন্ত সুখে হোক্ সারা,
দুখিনী নারীর নয়নের নীর
সুখীজনে যেন দেখিতে না পায়।
তারা দেখেও দেখে না, তারা বুঝেও বুঝে না,
তারা ফিরেও না চায়! ১৬১ ॥

সোহিনী। খেমটা।

চাঁদ হাসে হাসে হারা হৃদয় দুটি ফিরে এসেছে!
কত দুখে কত দূরে আঁধার সাগর ঘুরে
সোণার তরণী দুটি তীরে এসেছে!
মিলন দেখিবে বলে ফিরে বায়ু কুতূহলে,
চারিধারে ফুলগুলি ঘিরে এসেছে। ১৬২।

টোড়ী। ঝাঁপতাল।

ওদের মিলন টুটিবার নয়।
নাহি আর ভয় নাহি সংশয়।
নয়ন সলিলে যে হাসি ফুটে গো
রয় তাহা রয়, চিরদিন রয়। ১৬৩ ॥

সিন্ধু কাফি। কাওয়ালি।

ওই কথা বল সখী, বল আর বার,
ভালবাস মোরে তাহা বল বার বার!
কতবার শুনিয়াছি তবুও আবার যাচি,
ভাল বাস মোরে তাহা বলগো আবার। ১৬৪।

মূলতান। আড়াঠেকা।

ক তুমি গো খুলিয়াছ স্বর্গের দুয়ার?
ালিতেছ এত সুখ, ভেঙ্গে গেল—গেল বুক
-যেন এত সুখ হৃদে ধরে না গো আর!
তামার চরণে দিনু প্রেম-উপহার,
। যদি চাও গো দিতে প্রতিদান তার,
াই বা দিলে তা' মোরে,থাক'হৃদি আলো করে
দয়ে থাকুক্ জেগে সৌন্দর্য্য তোমার! ১৬৫॥

ঝিঝিট! আড়াঠেকা।

কছুই ত হোল না!
সেই সব—সেই সব—সেই হাহাকার রব
সেই অশ্রু বারিধারা, হৃদয়-বেদনা।
কছুতে মনের মাঝে শান্তি নাহি পাই
কছুই না পাইলাম যাহা কিছু চাই!
ালত গো বাসিলাম—ভালবাসা পাইলাম,
খনতো ভালবাসি—তবুও কি নাই! ১৬৬।

ললিত। খেমটা।

ান, নলিনী খোলগো আঁখি,
ম এখনো ভাঙ্গিল না কি!
দখ, তোমারি দুয়ার পরে
খী এসেছে তোমারি রবি।
নি প্রভাতের গাথা মোর
দখ ভেঙ্গেছে ঘুমের ঘোর,
দখ জগৎ উঠেছে নয়ন মেলিয়া
নূতন জীবন লভি!
বে তুমি কি সজনি, জাগিবে না কো
আমি যে তোমারি কবি।
প্রতিদিন আসি, প্রতিদিন হাসি,
প্রতিদিন গান গাহি,
প্রতিদিন প্রাতে শুনিয়া সে গান
ধীরে ধীরে উঠ চাহি।
আজিও এসেছি চেয়ে দেখ দেখি,
আর ত রজনী নাহি।
আজিও এসেছি উঠ উঠ সখী,
আর ত রজনী নাহি।
সখি—শিশিরে মুখানি মাজি,
সখি—লোহিত বসনে সাজি,
দেখ—বিমল সরসী আরসীর পরে
অপরূপ রূপ রাশি।
থেকে থেকে ধীরে হেলিয়া পড়িয়া
নিজ মুখ ছায়া আধেক হেরিয়া,
ললিত অধরে উঠিবে ফুটিয়া
সরমের মৃদু হাসি॥ ১৬৭॥

সিন্ধু। ঝাপতাল।

ওকি সখা কেন মোরে কর তিরস্কার?
একটু বসি বিরলে, কাঁদিব যে মন খুলে
তাতেও কি আমি বল করিনু তে মার?
মুছাতে এ অশ্রুবারি বলিনি তোমায়—
একটু আদরের তরে ধরিনি ত পায়—
তবে আর কেন সখা এমন বিরাগ-মাখা
ভ্রুকুটি এ ভগ্নবুকে হান বার বার!
জানি জানি এ কপাল ভেঙ্গেছে যখন
অশ্রুবারি পারিবে না গলাতে ও মন—
পথের পথিকো যদি মোরে হেরি যায় কাঁদি
তবুও অটল রবে হৃদয় তোমার। ১৬৮॥

বাহার। ঝাঁপতাল।

গেল গেল নিয়ে গেল এ প্রণয় স্রোতে!
যাব না যাবনা করি—ত সায় দিলাম তরী
উপায় না দেখি আর এ তরঙ্গ হোতে।
দাঁড়াতে পাইনে স্থান, ফিরিতে না পারে প্রাণ
বায়ুবেগে চলিয়াছি সাগরের পথে।
জানিনুনা শুনিনুনা কিছুনা ভাবিনু
অন্ধ হোয়ে একেবারে তাহে ঝাঁপ দিনু!
এতদূরে ভেসে এসে, ভ্রম যে বুঝেছি শেষে,
এখন ফিরিতে কেন হয়গো বাসনা?
আগে ভাগে অভাগিনী কেন ভাবিলি না?

এখন যে দিকে চাই কূলের উদ্দেশ নাই
সম্মুখে আসিছে রাত্রি আঁধার করিছে ঘোর।
স্রোত-প্রতিকূলে যেতে, বল যে নাই এ চিতে
শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন হোয়েছে হৃদয় মোর।১৬৯॥

মিশ্র ছায়ানট। কাওয়ালি।

কেন গো সে মোরে যেন করে না বিশ্বাস?
কেন গো বিষণ্ণ আঁখি আমি যবে কাছে থাকি?
কেন উঠে মাঝে মাঝে আকুল নিশ্বাস?
আদর করিতে মোরে চায় কতবার
সহসা কি ভেবে যেন ফেরে সে আবার!
নত করি দুনয়নে, কি যেন বুঝায় মনে
মন সে কিছুতে যেন পায় না আশ্বাস!
আমি যবে ব্যগ্র হোয়ে ধরি তার পাণি—
সে কেন চমকি উঠি লয় তাহা টানি।
আমি কাছে গেলে হায়,
সে কেন গো সোরে যায়?
মলিন হইয়া আসে অধর সহাস। ১৭০॥

বেহাগড়া। কাওয়ালি।

ধীরে ধীরে প্রাণে আমার এসহে।
মধুর হাসিয়ে ভালবেস হে।
হৃদয় কাননে ফুল ফুটাও
আধ নয়নে সখি চাও, চাও,
পরাণ কাঁদিয়ে দিয়ে হাসিখানি হেস হে। ১৭১॥

বেলোয়ার—কাওয়ালি।

ওকি সখা মুছ আঁখি আমার
তরেও কাঁদিবে কি
কে আমি বা, আমি অতি অভাগিনী,
আমি মরি, তাহে দুখ কিবা!
পড়েছিনু চরণতলে, দ’লে গেছ দেখনি চেয়ে,
গেছ’ গেচ’, ভাল, ভাল,
তাহে দুখ কিবা! ১৭২॥

ভৈরবী। একতালা।

সোণার পিঞ্জর ভাঙিয়ে আমার
প্রাণের পাখীটি উড়িয়ে যাক্!
সে যে হেথা গান গাহে না,
সে যে মোরে আর চাহে না,
সুদূর কানন হইতে সে’যে
শুনেছে কাহার ডাক,
পাখীটি উড়িয়ে যাক্!
মুদিত নয়ন খুলিয়ে আমার
সাধের স্বপন যায়রে যায়;
হাসিতে অশ্রুতে গাঁথিয়া গাঁথিয়া
দিয়েছিনু তার বাহুতে বাঁধিয়া
আপনার মনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ছিঁড়িয়া ফেলেছে হায়রে হায়
সাধের স্বপন যায়রে যায়!
যে যায় সে যায় ফিরিয়ে না চায়,
যে থাকে সে শুধু করে হায় হায়
নয়নের জল নয়নে শুকায়,
মরমে লুকায় আশা।
বাঁধিতে পারে না আদরে সোহাগে,
রজনী পোহায়, ঘুম হতে জাগে,
হাসিয়া কাঁদিয়া বিদায় সে মাগে,
আকাশে তাহার বাসা। যায় যদি তবে যাক,
একবার তবু ডাক্!
কি জানি যদিরে প্রাণ কাঁদে তার—
তবে থাক্ তবে থাক্।১৭৩॥

আসোয়ারি।

না সজনি না, আমি জানি জানি,
সে আসিবে না!
এমনি কাঁদিয়ে পোহাইবে যামিনী,
বাসনা তবু পূরিবে না;
জনমেও এ পোড়া ভালে কোন আশা মিটিল ন
যদি বা সে আসে সখি, কি সুখ আমার তায়,
সে ত মোরে, সজনি গো,
ভাল কভু বাসে না, জানি গো।

ভাল ক'রে কবে না কথা, চেয়েও না দেখিবে,
বড় আশা ক'রে শেষে পুরিবে না কামনা।১৭৪

সিন্ধু কাফি। আড়াঠেকা।

কেহ কারো মন বুঝে না কাছে এসে সরে যায়,
সোহাগের হাসিটি কেন চোখের জলে মরে যায়;
বাতাস যখন কেঁদে গেল
প্রাণ খুলে ফুল ফুটিল না,
সাঁজের বেলায় একাকিনী
কেনরে ফুল ঝরে যায়।
মুখের পানে চেয়ে দেখ, আঁখিতে মিলাও আঁখি,
মধুর প্রাণের কথা প্রাণেতে রেখনা ঢাকি।
এ রজনী রহিবে না, আর কথা হইবে না
প্রভাতে রহিবে শুধু হৃদয়ের হায় হায়! ১৭৫॥

ললিত। আড়াঠেকা।

তোরা বসে গাঁথিস্ মালা, তারা গলায় পরে!
কখন যে শুকায়ে যায়, ফেলে দেয়রে অনাদরে।
তোরা সুধা করিস্ দান, তারা শুধু করে পান,
সুধায় অরুচি হলে ফিরেও ত নাহি চায়
হৃদয়ের পাত্রখানি ভেঙ্গে দিয়ে চলে যায়!
তোরা কেবল হাসি দিবি
তারা কেবল বসে আছে,
চোখের জল দেখিলে
তারা আরত রবে না কাছে!
প্রাণের ব্যথা প্রাণে রেখে
প্রাণের আগুন প্রাণে ঢেকে
পরাণ ভেঙ্গে মধু দিবি অশ্রুঢাকা হাসি হেসে,
বুক ফেটে কথা না বলে,
শুকায়ে পড়িবি শেষে! ১৭৬॥

ভৈরবী। আড়খেম্‌টা।

কেনরে চাস্ ফিরে ফিরে চলে
আয়রে চলে আয়, এরা—প্রাণের কথা,
বোঝে না যে হৃদয় কুসুমদলে যায়।
হেসে হেসে শেষে গান দিতে এসেছিলি প্রাণ

নয়নের জল সাথে নিয়ে
চলে আয়রে চলে আয়! ১৭৭॥

খট্ ললিত ঝাঁপতাল।

ওকে কেন কাঁদালি! ও যে কেঁদে চলে যায়—
ওর হাসি মুখ যে আর দেখা যাবে না!
শূন্য প্রাণে চলে গেল—নয়নেতে অশ্রুজল
এ জনমে আর ফিরে চাবে না!
দুদিনের এ বিদেশে কেন এল ভালবেসে
কেন নিয়ে গেল প্রাণে বেদনা।
হাসি খেলা ফুরালো রে
হাসিব আর কেমনে!
হাসিতে তার কান্নামুখ পড়ে যে মনে!
ডাক্ তারে একবার কঠিন নহে প্রাণ তার!—
আর বুঝি তার সাড়া পাবে না। ১৭৮॥

আলাইয়া। আড়খেম্‌টা।

যাই যাই, ছেড়ে দাও,
স্রোতের মুখে ভেসে যাই।
যা হবার হবে আমার ভেসেছিত ভেসে যাই।
ছিল যত সহিবার সহেছি ত অনিবার
এখন কিসের আশা আর,
ভেসেছিত ভেসে যাই। ১৭৯॥

বেহাগ। কাওয়ালি।

সখি বল দেখিলো,
নিরদয় লাজ তোর টুটিবে কিলো?
চেয়ে আছি ললনা,
মুখানি তুলিবি কিলো,
ঘোমটা খুলিবি কিলো,
আধফুট' অধরে হাসি টুটিবে কিলো?
সরমের মেঘে ঢাকা বিধু মুখানি
মেঘ টুটে জ্যোৎস্না ফুটে উঠিবে কিলো?
তৃষিত আঁখির আশা পুরাবি কিলো?
তবে, ঘোমটা খোল, মুখটি তোল,
আঁখি মেল লো! ১৮০॥

গৌড় মোল্লার। কাওয়ালি।

গেল গো—ফিরিল না, চাহিল না, পাষাণ সে,
কথাটিও কহিল না, চলে গেল গো!
না যদি থাকিতে চায়, যাক যেথা সাধ যায়,
একেলা আপন মনে দিন কি কাটিবে না?
তাই হোক্ হোক্ তবে,
আর তারে সাধিব না! চ'লে গেল গো।১৮১॥

হাম্বীর। কাওয়ালি।

হোলনা লো হলোনা সই! (হায়)
মরমে মরমে লুকান' রহিল, বলা হ'লনা,
বলি বলি বলি তারে কত মনে করিনু
হ'লনা লো হ'লনা সই।
না কিছু কহিল, চাহিয়া রহিল,
গেল সে চলিয়া, আর সে ফিরিল না,
ফিরাব ফিরাব ব'লে কত মনে করিনু
হ'লনা লো হ'লোনা সই! ১৮২॥

সিন্ধু ভৈরবী। কাওয়ালি।

হা' সখী ও আদরে আরো বাড়ে মনোব্যথা!
ভাল যদি নাহি বাসে,
কেন তবে কহে প্রণয়ের কথা!
মিছে প্রণয়ের হাসি,
বোলো তারে ভাল নাহি বাসি,
চাইনে মিছে আদর তাহার, ভালবাসা চাইনে,
বোলো বোলো সজনি লো তারে, আর যেন
সে লো আসে নাকো হেথা॥ ১৮৩॥

খাম্বাজ। কাওয়ালি।

হৃদয়ের মণি আদরিণী মোর,
আয়লো কাছে আয়।
মিশাবি জোছনা হাসি রাশি রাশি,
মৃদু মধু জোছনায়।
মলয় কপোল চুমে, ঢলিয়া পড়িছে ঘুমে,
কপোলে নয়নে জোছনা মরিয়া যায়,
যূনা-লহরীগুলি চরণে কাঁদিতে চায়॥ ১৮৪॥

বেহাগ। কাওয়ালি।

সহেনা যাতনা! দিবস গণিয়া গণিয়া বিরলে,
নিশিদিন বসে আছি,
আখি মেলি পথ পানে চেয়ে, সখা হে এলে না!
দিন যায়, রাত যায়, সব যায়, আমি বসে হায়!
দেহে বল নাই, চোখে ঘুম নাই,
শুকায়ে গিয়াছে আঁখি জল।
একে একে সব আশা,
ঝোরে ঝোরে পড়ে যায়, সহে না। ১৮৫॥

সরফর্দা। কাওয়ালি।

এমন আর কত দিন চলে যাবে রে!
জীবনের ভার বহিব কত? হায় হায়!
যে আশা মনে ছিল, সকলি ফুরাইল,
কিছু হলনা জীবনে,
জীবন ফুরায়ে এল! হায় হায়! ১৮৬॥

দেশ। কাওয়ালি।

দাঁড়াও, মাথা খাও, যেওনা সখা;
শুধু সখা, ফিরে চাও, অধিক কিছু নয়,
কত দিন পরে আজি পেয়েছি দেখা।
আরত চাহিনে কিছু, কিছু না, কিছু না,
শুধু ওই মুখখানি জন্মশোধ দেখিব,
তাও কি হবে না গো সখা গো?
শুধু একবার ফিরে চাও! ১৮৭॥

মিশ্র ঝিঁঝিট। কাওয়ালি।

সখাহে, কি দিয়ে আমি তুষিব তোমায়?
জর জর হৃদয় আমার মর্ম্ম-বেদনায়,
দিবানিশি অশ্রু ঝরিছে সেথায়।
তোমার মুখে সুখের হাসি আমি ভালবাসি,
অভাগিনীর কাছে পাছে সে হাসি লুকায়॥১৮৮॥

জয় জয়ন্তী। কাওয়ালি।

এতদিন পরে সখি,
সত্য সে কি হেথা ফিরে এল?

দীনবেশে ম্লানমুখে কেমনে অভাগিনী
যাবে তার কাছে সখীরে ?
শরীর হয়েছে ক্ষীণ, নয়ন জ্যোতিহীন,
সবি গেছে, কিছু নাই, রূপ নাই হাসি নাই,
সুখ নাই, আশা নাই,
সে আমি আর আমি নাই,
না যদি চেনে সে মোরে, তা'হলে কি হবে? ১৮৯

বেহাগ। কাওয়ালি।

প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন
তবু প্রাণ কেন কাঁদেরে ?
চারি দিকে হাসি রাশি,
তবু প্রাণ কেন কাঁদেরে ?
আন্ সখি বীণা আন, প্রাণ খুলে কর গান
নাচ সবে মি'ল ঘিরি ঘিরি ঘিরিয়ে,
তবু প্রাণ কেন কাঁদেরে ?
বীণা তবে রেখে দে, গান তবে গাস্‌নে,
কেমনে যাবে বেদনা ?
কাননে কাটাই রাতি, তুলি ফুল মালা গাঁথি,
জোছনা কেমন ফুটেছে,
তবু প্রাণ কেন কাঁদেরে ? ॥ ১৯০ ॥

মিশ্র। খেমটা।

পুরাণো সে দিনের কথা ভুলবি কি রে হায়।
(ও সেই) চোখের দেখা, প্রাণের কথা,
সে কি ভোলা যায়।
(আয়) আরেকটিবার আয়রে সখা,
প্রাণের মাঝে আয়।
(মোরা) সুখের দুখের কথা কব,
প্রাণ জুড়াবে তায়।
(মোরা) ভোরের বেলায় ফুল তুলেছি,
দুলেছি দোলায়,
বাজিয়ে বাঁশী গান গেয়েছি, বকুলের তলায়।
মাঝে হল ছাড়াছাড়ি গেলেম কে কোথায়—
(আবার) দেখা যদি হল সখা,
প্রাণের মাঝে আয়॥ ১৯১ ॥

বেহাগ। খেমটা।

ও কেন চুরি ক'রে চায়।
লুকোতে গিয়ে হাসি, হেসে পলায়!
বনপথে ফুলের মেলা, হেলে দুলে করে খেলা—
চকিতে সে চমকিয়ে কোথা দিয়ে যায়।
কি যেন গানের মত বেজেছে কাণের কাছে,
যেন তার প্রাণের কথা আধেক খানি
শোনা গেছে।
পথেতে যেতে চলে, মালাটি গেছে ফেলে—
পরাণের আশা গুলি গাঁথা যেন তায়। ১৯২ ॥

বেহাগ। আড়খেমটা।

দুজনে দেখা হল—মধু যামিনীরে!—
কেন কথা কহিল না—চলিয়া গেল ধীরে!
নিকুঞ্জে দখিণা বায়, করিছে হায় হায়—
লতা পাতা দুলে দুলে ডাকিছে ফিরে ফিরে।
দুজনের আঁখি বারি গোপনে গেল ঝরে—
দুজনের প্রাণের কথা প্রাণেতে গেল মরে।
আর ত হলনা দেখা জগতে দোঁহে একা
চিরদিন ছাড়াছাড়ি যমুনা তীরে। ১৯৩ ॥

বেহাগড়া। কাওয়ালি।

মনে রয়ে গেল মনের কথা,
শুধু চোখের জল প্রাণের ব্যথা!
মনে করি দুটি কথা বলে যাই,
কেন মুখের পানে চেয়ে চলে যাই,
সে যদি চাহে, মরি যে তাহে,
কেন মুদে আসে আঁখির পাতা।
ম্লান মুখে সখী সে যে চলে যায়,
ও তারে ফিরায়ে ডেকে নিয়ে আয়,
বুঝিল না সে যে কেঁদে গেল,
ধূলায় লুঠাইল হৃদয়-লতা! ১৯৪ ॥

কালাংড়া। খেমটা।

ভাল বাসিলে যদি সে ভাল না বাসে
কেন সে দেখা দিল।
মধু অধরের মধুর হাসি প্রাণে কেন বরষিল।

দাঁড়িয়েছিলাম পথের ধারে
সহসা দেখিলেম তারে,
নয়ন দুটি তুলে কেন
মুখের পানে চেয়ে গেল ! ১৯৫ ॥

পিলু। খেমটা।

ও কেন ভালবাসা জানাতে আসে,
ওগো সজনি !
হাসি খেলিয়ে মনের সুখে
ও কেন সাথে ফেরে আঁধার মুখে
দিন রজনী ! ১৯৬ ॥

পিলু। কাওয়ালি।

হা কে বলে দেবে সে ভাল বাসে কি মোরে !
কভু বা সে হেসে চায়, কভু মুখ ফিরায়ে লয়
কভু বা সে লাজে সারা, কভু বা বিষাদময়ী,
যাব কি কাছে তার শুধাব চরণ ধোরে ! ১৯৭

মিশ্র খাম্বাজ। একতালা

ওই জানালার কাছে বসে আছে
করতলে রাখি মাথা।
তার কোলে ফুল পড়ে রয়েছে—
সে যে ভুলে গেছে মালা গাঁথা।
শুধু ঝুরু ঝুরু বায়ু বহে যায়
তার কাণে কাণে কি যে কহে যায়,
তাই আধ' শুয়ে আধ' বসিয়ে
ভাবিতেছে কত কথা !
অধরের কোণে হাসিটি আধখানি মুখ ঢাকিয়া,
কাননের পানে চেয়ে আছে
আধ মুকুলিত আঁখিয়া !
সুদূর স্বপন ভেসে ভেসে
চোখে এসে যেন লাগিছে,
ঘুমঘোরময় সুখের আবেশ
প্রাণের কোথায় জাগিছে !
চোখের উপরে মেঘ ভেসে যায়,
উড়ে উড়ে যায় পাখী,
সারাদিন ধরে বকুলের ফুল
ঝ'রে পড়ে থাকি থাকি।
মধুর আলস, মধুর আবেশ,
মধুর মুখের হাসিটি,
মধুর স্বপনে প্রাণের মাঝারে
বাজিছে মধুর বাঁশীটি। ১৯৮ ॥

মিশ্রসিন্ধু। একতালা।

কি হল আমার? বুঝি বা সখী
হৃদয় আমার হারিয়েছি !
পথের মাঝেতে খেলাতে গিয়ে
হৃদয় আমার হারিয়েছি !
প্রভাত-কিরণে সকাল বেলাতে
মন লয়ে সখী গে ছিনু খেলাতে,
মন কুড়াইতে, মন ছড়াইতে,
মনের মাঝারে খেলি বেড়াইতে,
মন-ফুল দলি চলি বেড়াইতে,
সহসা সজনি চেতনা পেয়ে
সহসা সজনি দেখিনু চেয়ে,
রাশি রাশি ভাঙ্গা হৃদয় মাঝারে
হৃদয় আমার হারিয়েছি !
যদি কেহ, সখী, দলিয়া যায়।
তার পর দিয়া চলিয়া যায় !
শুকায়ে পড়িবে ছিঁড়িয়া পড়িবে
দলগুলি তার ঝরিয়া পড়িবে
যদি কেহ সখী দলিয়া যায় !
আমার কুসুম-কোমল হৃদয়
কখনো সহেনি রবির কর,
আমার মনের কামিনী-পাপড়ি
সহেনি ভ্রমর-চরণ-ভর,
চিরদিন সখি হাসিত খেলিত
জোছনা আলোকে নয়ন মেলিত
সহসা আজ সে হৃদয় আমার
কোথায় সজনি হারিয়েছি। ১৯৯ ॥

রাগিণী মিশ্র। খেমটা।

সখা সাধিতে সাধাতে কত সুখ,
তাহা বুঝিলে না তুমি,
মনে রয়ে গেল দুখ!
অভিমান আঁখি জল নয়ন ছলছল
মুছাতে লাগে ভাল কত,
তাহা বুঝিলে না তুমি
মনে রয়ে গেল দুখ! ২০০ ॥

মিশ্র। একতালা।

যে ভাল বাসুক—সে ভাল বাসুক,
সজনি লো আমরা কে!
দীনহীন এই হৃদয় মোদের
কাছেও কি কেহ ডাকে?
তবে কেন বল ভেবে মরি মোরা
কে কাহারে ভাল বাসে,
আমাদের কিবা আসে যায় বল'
কেবা কাঁদে কেবা হাসে!
যদি, সখী, কেহ ভুলে
মনখানি লয় তুলে,
উলটি পালটি ক্ষণেক ধরিয়া
পরখ করিয়া দেখিতে চায়,
তখনি ধূলিতে ছুঁড়িয়া ফেলিবে
নিদারুণ উপেখায়।
কাজ কি লো, মন লুকান' থাক্
প্রাণের ভিতরে ঢাকিয়া রাখ।
হাসিয়া খেলিয়া ভাবনা ভুলিয়া
হরষে প্রমোদে মাতিয়া থাক্। ২০১ ॥

টৌড়ী। ঝাঁপতাল।

কাছে তার যাই যদি কত যেন পায় নিধি
তবু হরষের হাসি ফুটে ফুটে ফুটে না।
কখন বা মৃদু হেসে আদর করিতে এসে
সহসা সরমে বাধে মন উঠে উঠে না!
রাষের ছলনা করি দূরে যাই, চাই ফিরি,
চরণ বারণ তরে উঠে উঠে উঠে না ॥
কাতর নিশ্বাস ফেলি, আকুল নয়ন মেলি,
চাহি থাকে, লাজ বাঁধ তবু টুটে টুটে না!
যখন ঘুমায়ে থাকি মুখ পানে মেলি আঁখি
চাহি থাকে, দেখি দেখি সাধ যেন মিটে না,
সহসা উঠিলে জাগি, তখন কিসের লাগি
সরমেতে মরে গিয়ে কথা যেন ফুটে না!
লাজময়ী! তোর চেয়ে দেখিনি লাজুক মেয়ে,
প্রেম বরিষার স্রোতে লাজ তবু টুটে না। ২০২ ॥

বেহাগ খাম্বাজ। একতালা।

সখী, ভাবনা কাহারে বলে?
সখী, যাতনা কাহারে বলে?
তোমরা যে বল' দিবস রজনী
ভালবাসা ভালবাসা
সখী ভালবাসা কারে কয়?
সে কি কেবলি যাতনাময়?
তাহে কেবলি চোখের জল?
তাহে কেবলি দুখের শ্বাস?
লোকে তবে করে কি সুখের তরে
এমন দুখের আশ?
আমার চোখেত সকলি শোভন,
সকলি নবীন, সকলি বিমল,
সুনীল আকাশ, শ্যামল কানন,
সকলি আমারি মত!
(তারা) কেবলি হাসে, কেবলি গায়,
হাসিয়া খেলিয়া মরিতে চায়,
না জানে, বেদন, না জানে রোদন,
না জানে সাধের যাতনা যত!
ফুল সে হাসিতে হাসিতে ঝরে,
জোছনা হাসিয়া মিলায়ে যায়,
হাসিতে হাসিতে আলোক সাগরে
আকাশের তারা তেয়াগে কায়!
আমার মতন সুখী কে আছে!
আয় সখী, আয় আমার কাছে!

দাঁড়িয়েছিলাম পথের ধারে
সহসা দেখিলেম তারে,
নয়ন দুটি তুলে কেন
মুখের পানে চেয়ে গেল ! ১৯৫ ॥

পিলু। খেম্‌টা।

ও কেন ভালবাসা জানাতে আসে,
ওগো সজনি !
হাসি খেলিবে মনের সুখে
ও কেন সাথে ফেরে আঁধার মুখে
দিন রজনী। ১৯৬ ॥

পিলু। কাওয়ালি।

হা কে বলে দেবে সে ভাল বাসে কি মোরে!
কভু বা সে হেসে চায়, কভু মুখ ফিরায়ে লয়
কভু বা সে লাজে সারা, কভু বা বিষাদময়ী,
যাব কি কাছে তার শুধাব চরণ ধোরে ! ১৯৭

মিশ্র খাম্বাজ। একতালা

ওই জানালার কাছে বসে আছে
করতলে রাখি মাথা।
তার কোলে ফুল পড়ে রয়েছে—
সে যে ভুলে গেছে মালা গাঁথা।
শুধু ঝুরু ঝুরু বায়ু বহে যায়
তার কাণে কাণে কি যে কহে যায়,
তাই আধ' শুয়ে আধ' বসিয়ে
ভাবিতেছে কত কথা।
অধরের কোণে হাসিটি আধখানি মুখ ঢাকিয়া,
কাননের পানে চেয়ে আছে
আধ মুকুলিত আঁখিয়া।
সুদূর স্বপন ভেসে ভেসে
চোখে এসে যেন লাগিছে,
ঘুমঘোরময় সুখের আবেশ
প্রাণের কোথায় জাগিছে।
চোখের উপরে মেঘ ভেসে যায়,
উড়ে উড়ে যায় পাখী,
সারাদিন ধরে বকুলের ফুল
ঝ'রে পড়ে থাকি থাকি।
মধুর আলস, মধুর আবেশ,
মধুর মুখের হাসিটি,
মধুর স্বপনে প্রাণের মাঝারে
বাজিছে মধুর বাঁশীটি। ১৯৮ ॥

মিশ্রসিন্ধু। একতালা।

কি হল আমার? বুঝি বা সখী
হৃদয় আমার হারিয়েছি !
পথের মাঝেতে খেলাতে গিয়ে
হৃদয় আমার হারিয়েছি !
প্রভাত-কিরণে সকাল বেলাতে
মন লয়ে সখী গে ছিনু খেলাতে,
মন কুড়াইতে, মন ছড়াইতে,
মনের মাঝারে খেলি বেড়াইতে,
মন-ফুল দলি চলি বেড়াইতে,
সহসা সজনি চেতনা পেয়ে
সহসা সজনি দেখিনু চেয়ে,
রাশি রাশি ভাঙ্গা হৃদয় মাঝারে
হৃদয় আমার হারিয়েছি !
যদি কেহ, সখী, দলিয়া যায়।
তার পর দিয়া চলিয়া যায় !
শুকায়ে পড়িবে ছিঁড়িয়া পড়িবে
দলগুলি তার ঝরিয়া পড়িবে
যদি কেহ সখী দলিয়া যায় !
আমার কুসুম-কোমল হৃদয়
কখনো সহেনি রবির কর,
আমার মনের কামিনী-পাপড়ি
সহেনি ভ্রমর-চরণ-ভর,
চিরদিন সখি হাসিত খেলিত
জোছনা আলোকে নয়ন মেলিত
সহসা আজ সে হৃদয় আমার
কোথায় সজনি হারিয়েছি। ১৯৯ ॥

রাগিণী মিশ্র। খেম্‌টা।

সখা সাধিতে সাধাতে কত সুখ,
তাহা বুঝিলে না তুমি,
মনে রয়ে গেল দুখ!
অভিমান আঁখি জল নয়ন ছলছল
মুছাতে লাগে ভাল কত,
তাহা বুঝিলে না তুমি
মনে রয়ে গেল দুখ! ২০০ ॥

মিশ্র। একতালা।

যে ভাল বাসুক—সে ভাল বাসুক,
সজনি লো আমরা কে!
দীনহীন এই হৃদয় মোদের
কাছেও কি কেহ ডাকে?
তবে কেন বল ভেবে মরি মোরা
কে কাহারে ভাল বাসে,
আমাদের কিবা আসে যায় বল'
কেবা কাঁদে কেবা হাসে!
যদি, সখী, কেহ ভুলে
মনখানি লয় তুলে,
উলটি পালটি ক্ষণেক ধরিয়া
পরখ করিয়া দেখিতে চায়,
তখনি ধূলিতে ছুঁড়িয়া ফেলিবে
নিদারুণ উপেখায়।
কাজ কি লো, মন লুকান' থাক্
প্রাণের ভিতরে ঢাকিয়া রাখ।
হাসিয়া খেলিয়া ভাবনা ভুলিয়া
হরষে প্রমোদে মাতিয়া থাক্। ২০১ ॥

টৌড়ী। ঝাঁপতাল।

কাছে তার যাই যদি কত যেন পায় নিধি
তবু হরষের হাসি ফুটে ফুটে ফুটে না।
কখন বা মৃদু হেসে আদর করিতে এসে
সহসা সরমে বাধে মন উঠে উঠে না!
রাষের ছলনা করি দূরে যাই, চাই ফিরি,
চরণ বারণ তরে উঠে উঠে উঠে না ॥
কাতর নিশ্বাস ফেলি, আকুল নয়ন মেলি,
চাহি থাকে, লাজ বাঁধ তবু টুটে টুটে না!
যখন ঘুমায়ে থাকি মুখ পানে মেলি আঁখি
চাহি থাকে, দেখি দেখি সাধ যেন মিটে না,
সহসা উঠিলে জাগি, তখন কিসের লাগি
সরমেতে মরে গিয়ে কথা যেন ফুটে না!
লাজময়ী! তোর চেয়ে দেখিনি লাজুক মেয়ে,
প্রেম বরিষার স্রোতে লাজ তবু টুটে না। ২০২॥

বেহাগ খাম্বাজ। একতালা।

সখী, ভাবনা কাহারে বলে?
সখী, যাতনা কাহারে বলে?
তোমরা যে বল' দিবস রজনী
ভালবাসা ভালবাসা
সখী ভালবাসা কারে কয়?
সে কি কেবলি যাতনাময়?
তাহে কেবলি চোখের জল?
তাহে কেবলি দুখের শ্বাস?
লোকে তবে করে কি সুখের তরে
এমন দুখের আশ?
আমার চোখেত সকলি শোভন,
সকলি নবীন, সকলি বিমল,
সুনীল আকাশ, শ্যামল কানন,
সকলি আমারি মত!
(তারা) কেবলি হাসে, কেবলি গায়,
হাসিয়া খেলিয়া মরিতে চায়,
না জানে, বেদন, না জানে রোদন,
না জানে সাধের যাতনা যত!
ফুল সে হাসিতে হাসিতে ঝরে,
জোছনা হাসিয়া মিলায়ে যায়,
হাসিতে হাসিতে আলোক সাগরে
আকাশের তারা তেয়াগে কায়!
আমার মতন সুখী কে আছে!
আয় সখী, আয় আমার কাছে!

সুখী হৃদয়ের সুখের গান
শুনিয়া তোদের জুড়াবে প্রাণ।
প্রতিদিন যদি কাঁদিবি কেবল
একদিন নয় হাসিবি তোরা,
একদিন নয় বিষাদ ভুলিয়া
সকলে মিলিয়া গাহিব মোরা! ২০৩॥

খাম্বাজ।

নাচ্ শ্যামা, তালে তালে।
বাঁকায়ে গ্রীবাটি, তুলি পাখা দুটি,
এ পাশে ও পাশে করি ছুটাছুটি
নাচ্ শ্যামা, তালে তালে।
রুণু রুণু ঝুনু বাজিছে নূপুর,
মৃদু মৃদু মধু উঠে গীত সুর,
বলয়ে বলয়ে বাজে ঝিনি ঝিনি,
তালে তালে উঠে করতালি ধ্বনি,
নাচ্ শ্যামা, নাচ্ তবে!
নিরালয় তোর বনের মাঝে
সেথা কি এমন নূপুর বাজে?
বনে তোর পাখী আছিল যত
গাহিত কি তারা মোদের মত
এমন মধুর গান?
এমন মধুর তান?
কমল-করের করতালি হেন
দেখিতে পেতিস বনে?
নাচ্ শ্যামা নাচ্ তবে! ২০৪॥

জয়জয়ন্তী। ঝাঁপতাল।

সখী আর, কত দিন সুখহীন, শান্তিহীন,
হাহা করে বেড়াইব, নিরাশ্রয় মন লয়ে!
পারিনে, পারিনে আর— পাষাণ মনের ভার
বহিয়া পড়েছি, সখী, অতি শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে।
সম্মুখে জীবন মম হেরি মরুভূমি সম,
নিরাশা বুকেতে বসি ফেলিতেছে বিষশ্বাস।
উঠিতে শকতি নাই, যে দিকে ফিরিয়া চাই
শূন্য—শূন্য—মহাশূন্য নয়নেতে পরকাশ।
কে আছে, কে আছে সখী, এ শ্রান্ত মস্তক মম
বুকেতে রাখিবে ঢাকি যতনে জননী সম!
মন, যত দিন যায়, মুদিয়া আসিছে হায়,
শুকায়ে শুকায়ে শেষে মাটিতে পড়িবে ঝরি। ২০৫।

খট্। একতালা।

বলি গো সজনি যেও না যেও না,
তার কাছে আর যেও না যেও না,
সুখে সে রয়েছে সুখে সে থাকুক,
মোর কথা তারে বোলো না বোলো না!
আমারে যখন ভাল সে না বাসে
পায়ে ধরিলেও বাসিবে না সে,
কাজ কি কাজ কি কাজ কি সজনি,
মোর তরে তারে দিও না বেদনা! ২০৬॥

সিন্ধু। একতালা।

বাঁশরী বাজাতে চাহি
বাঁশরী বাজিল কই?
বিহরিছে সমীরণ
কুহরিছে পিকগণ,
মথুরার উপবন
কুসুমে সাজিল ওই।
বাঁশরী বাজাতে চাহি
বাঁশরী বাজিল কই!
বিকচ বকুল ফুল
দেখে যে হতেছে ভুল,
কোথাকার অলিকুল
গুঞ্জরে কোথায়!
এ নহে কি বৃন্দাবন?
কোথা সেই চন্দ্রানন,
ওই কি নূপুর-ধ্বনি
বন-পথে শুনা যায়?
একা আছি বনে বসি,
পীতধড়া পড়ে খসি,

সোঙরি সে মুখ শশী
পরাণ মজিল, সই!
বাঁশরী বাজাতে চাহি
বাঁশরী বাজিল কই?
একবার রাধে রাধে
ডাক্ বাঁশী মনোসাধে,
আজি এ মধুর চাঁদে
মধুর যামিনী ভায়।
কোথা সে বিধুরা বালা,
মলিন মালতী মালা,
হৃদয়ে বিরহ-জালা
এ নিশি পোহায়, হায়!
কবি যে হল আকুল,
এ কি রে বিধির ভুল!
মথুরায় কেন ফুল
ফুটেছে আজি, লো সই!
বাঁশরী বাজাতে গিয়ে
বাঁশরী বাজিল কই? ২০৭॥

বেহাগড়া।

ও গান গাস্‌নে—গাস্‌নে—গাস্‌নে
যে দিন গিয়াছে, সে আর ফিরিবে না
তবে ও গান গাস্‌নে।
হৃদয়ে যে কথা লুকানো রয়েছে
সে আর জাগাস্‌নে! ২০৮॥

টৌড়ী। কাওয়ালি।

[illegible]ফুরাইল। যামিনী পোহাইল।
যে যেখানে সবে চলে গেল।
[illegible]নীতে হাসি খুসি হবে প্রমোদ কত
[illegible]শেষে আকুল মনে চোখের জলে
সকলে বিদায় হ'ল॥ ২০৯॥

বেহাগ।

আগে চল্, আগে চল্ ভাই!
পড়ে থাকা পিছে মরে থাকা মিছে,
বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই।
আগে চল্ আগে চল্ ভাই।
প্রতি নিমেষেই যেতেছে সময়,
দিনক্ষণ চেয়ে থাকা কিছু নয়,
সময় সময় ক'রে পাঁজি পুঁথি ধরে
সময় কোথা পাবি বল্ ভাই!
আগে চল্ আগে চল্ ভাই!
অতীতের স্মৃতি, তারি স্বপ্ন নিতি,
গভীর ঘুমের আয়োজন,
(এযে) স্বপনের সুখ, সুখের ছলনা,
আর নাহি তাহে প্রয়োজন;
দুঃখ আছে কত, বিঘ্ন শত শত,
জীবনের পথে সংগ্রাম সতত,
চলিতে হইবে পুরুষের মত
হৃদয়ে বহিয়া বল ভাই।
আগে চল্ আগে চল্ ভাই!
দেখ যাত্রী যত জয় গান গায়
রাজপথে গলাগলি।
এ আনন্দ স্বরে কে রয়েছে ঘরে
কোণে করে দলাদলি।
বিপুল এ ধরা, চঞ্চল সময়,
মহাবেগবান্ মানব হৃদয়,
যারা বসে আছে তারা বড় নয়,
ছাড় ছাড় মিছে ছল ভাই।
আগে চল আগে চল্ ভাই!
পিছায়ে যে আছে তারে ডেকে নাও
নিয়ে যাও সাথে করে,
কেহ নাহি আসে একা চলে যাও
মহত্বের পথ ধ'রে।
পিছু হতে ডাকে মায়ার কাঁদন,
ছিঁড়ে চলে যাও মোহের বাঁধন,
সাধিতে হইবে প্রাণের সাধন

মিছে নয়নের জল ভাই।
আগে চল্ আগে চল্ ভাই!
চির দিন আছি ভিখারীর মত
জগতের পথ পাশে,
যারা চলে যায় কৃপা চক্ষে চায়,
পদ ধূলা উড়ে আসে।
ধূলিশয্যা ছাড়ি ওঠ ওঠ সবে,
মানবের সাথে যোগ দিতে হবে,
তা যদি না পার চেয়ে দেখ তবে
ওই আছে রসাতল ভাই।
আগে চল্ আগে চল্ ভাই! ২১০ ॥

সিন্ধু।

(তবু) পারিনে সঁপিতে প্রাণ।
পলে পলে মরি সেও ভাল,
সহি পদে পদে অপমান।
আপনারে শুধু বড় বলে জানি,
করি হাসাহাসি, করি কাণাকাণি,
কোটরে রাজত্ব ছোট ছোট প্রাণী
ধরা করি সরাজ্ঞান।
অগাধ আলস্যে বসি ঘরের কোণে
ভায়ে ভায়ে করি রণ।
আপনার জনে ব্যথা দিতে মনে
তার বেলা প্রাণপণ।
আপনার দোষে পরে করি দোষী,
আনন্দে সবার গায়ে ছড়াই মসী,
(হেথা) আপন কলঙ্ক উঠেছে উচ্ছ্বসি
রাখিবার নাহি স্থান।
(মিছে) কথার বাঁধুনী কাঁদুনীর পালা
চোখে নাই কারো নীর,
আবেদন আর নিবেদনের থালা
ব'হে ব'হে নত শির।
কাঁদিয়ে সোহাগ ছি ছি এ কি লাজ,
জগতের মাঝে ভিখারীর সাজ,
আপনি করিনে আপনার কাজ,
(করি) পরের পরে অভিমান!
(ছিছি) পরের কাছে অভিমান।
(ওগো) আপনি নামাও কলঙ্ক পসরা
যেওনা পরের দ্বার;
পরের পায়ে ধরে মান ভিক্ষা করা
সকল ভিক্ষার ছার।
দাও দাও ব'লে পরের পিছু পিছু
কাঁদিয়ে বেড়ালে মেলে না ত কিছু,
(যদি) মান পেতে চাও, প্রাণ পেতে চাও
প্রাণ আগে কর দান। ২১১ ॥

জয়জয়ন্তী।

তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ
তোমারি তরে মা সঁপিনু প্রাণ
তোমারি শোকে এ আঁখি বরষিবে,
এ বীণা তোমারি গাইবে গান!
যদিও এ বাহু অক্ষম দুর্ব্বল
তোমারি কার্য্য সাধিবে,
যদিও এ অসি কলঙ্কে মলিন
তোমারি পাশ নাশিবে।
যদিও হে দেবি শোণিতে আমার
কিছুই তোমার হবে না—
তবুও গো মাতা পারি তা ঢালিতে,
এক তিল তব কলঙ্ক ক্ষালিতে,
নিভাতে তোমার যাতনা!
যদিও জননি, যদিও আমার
এ বীণায় কিছু নাহিক বল,
কি জানি যদি মা একটি সন্তান
জাগি ওঠে শুনি এ বীণা তান! ২১২ ॥

রাগিণী প্রভাতী। তাল একতালা।

এ কি অন্ধকার এ ভারত-ভূমি,
বুঝি পিতা তারে ছেড়ে গেছ তুমি,
প্রতি পলে পলে ডুবে রসাতলে
কে তারে উদ্ধার করিবে!

চারিদিকে চাই নাহি হেরি গতি,
নাহি যে আশ্রয় অসহায় অতি,
আজি এ আঁধারে বিপদ পাথারে
কাহার চরণ ধরিবে।
তুমি চাও পিতা ঘুচাও এ দুখ,
অভাগা দেশেরে হয়োনা বিমুখ,
নহিলে আঁধারে বিপদ পাথারে
কাহার চরণ ধরিবে।
দেখ চেয়ে তব সহস্র সন্তান
লাজে নত শির, ভয়ে কম্পমান,
কাঁদিছে সহিছে শত অপমান
লাজ মান আর থাকে না!
হীনতা লয়েছে মাথায় তুলিয়া,
তোমারেও তাই গিয়াছে ভুলিয়া,
দয়াময় বলে আকুল হৃদয়ে
তোমারেও তারা ডাকে না।
তুমি চাও পিতা তুমি চাও চাও,
এ হীনতা, পাপ, এ দুঃখ ঘুচাও,
ললাটের কলঙ্ক মুছাও মুছাও
নহিলে এ দেশ থাকে না!
তুমি যবে ছিলে এ পুণ্য ভবনে
কি সৌরভ সুধা বহিত পবনে,
কি আনন্দ গান উঠিত গগনে
কি প্রতিভা জ্যোতি জ্বলিত!
ভারত অরণ্যে ঋষিদের গান
অনন্ত সদনে করিত প্রয়াণ,
তোমারে চাহিয়া পুণ্যপথ দিয়া
সকলে মিলিয়া চলিত।
আজি কি হয়েছে চাও পিতা চাও,
এ তাপ, এ পাপ, এ দুখ ঘুচাও,
মোরা ত রয়েছি তোমারি সন্তান
যদিও হয়েছি পতিত। ২১৩॥

বাহার। কাওয়ালি।

দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখ-গান গাহিয়ে,
নগরে, প্রান্তরে, বনে বনে, অশ্রু ঝরে দুনয়নে।
পাষাণ-হৃদয় কাঁদে সে কাহিনী শুনিয়ে।
জ্বলিয়া উঠে অযুত প্রাণ, এক সাথে মিলি এক
গান গায়,
নয়নে অনল ভায়, শূন্য কাঁপে অভ্রভেদী বজ্র
নির্ঘোষে,
ভয়ে সবে নীরবে চাহিয়ে।
তাই বন্ধু তোমা বিনা আর মোর কেহ নাই,
তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি মোর সকলি।
তোমারি দুঃখে কাঁদিব মাতা, তোমারি দুঃখে
কাঁদিব,
তোমারি তরে রেখেছি প্রাণ, তোমারি তরে
ত্যজিব
সকল দুঃখ সহিব সুখে তোমারি মুখ চাহিয়ে।
॥ ২১৪ ॥

মিশ্র দেশ খাম্বাজ। ঝাঁপতাল।

শোন শোন আমাদের ব্যথা
দেব দেব প্রভু দয়াময়।
আমাদের ঝরিছে নয়ন,
আমাদের ফাটিছে হৃদয়।
চিরদিন আঁধার না রয়
রবি উঠে নিশি দূর হয়,
এদেশের মাথার উপরে,
এ নিশীথ হবেনা কি ক্ষয়!
চিরদিন ঝরিবে নয়ন?
চিরদিন ফাটিবে হৃদয়?
মরমে লুকান কত দুখ,
ঢাকিয়া রয়েছি ম্লান মুখ,
কাঁদিবার নাই অবসর
কথা নাই শুধু ফাটে বুক!
সঙ্কোচে ম্রিয়মাণ প্রাণ
দশদিশি বিভীষিকাময়,
হেন হীন দীনহীন দেশে
বুঝি তব হবেনা আলয়।

চিরদিন ঝরিবে নয়ন
চিরদিন ফাটিবে হৃদয় ?
কোন কালে তুলিব কি মাথা !
জাগিবে কি অচেতন প্রাণ ?
ভারতের প্রভাত গগনে
উঠিবে কি তব জয় গান ?
আশ্বাস বচন কোন ঠাঁই
কোন দিন শুনিতে না পাই,
শুনিতে তোমার বাণী তাই—
মোরা সবে রয়েছি চাহিয়া !
বল প্রভু মুছিবে এ আঁখি
চিরদিন ফাটিবেনা হিয়া। ২১৫ ॥

হাম্বির। তাল ফেরতা।

আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে !
কে আছ জাগিয়া পূরবে চাহিয়া
বল উঠ উঠ সঘনে, গভীর নিদ্রা মগনে।
বল তিমির রজনী যায় ওই,
আসে উষা নব জ্যোতির্ম্ময়ী
নব আনন্দে নব জীবনে,
ফুল্ল কুসুমে মধুর পবনে বিহগকল কূজনে।
হের আশার আলোকে জাগে শুকতারা
উদয় অচল পথে, কিরণ কিরীটে তরুণ তপন
উঠিছে অরুণ রথে।
চল যাই কাজে মানবসমাজে,
চল বাহিরিয়া জগতের মাঝে,
থেকো না মগন শয়নে,
থেকো না মগন স্বপনে !
যায় লাজ ত্রাস আলস বিলাস কুহক মোহ যায়
ঐ দূর হয় শোক সংশয় দুঃখ স্বপন প্রায়।
ফেল জীর্ণ চীর পর নব সাজ
আরম্ভ কর জীবনের কাজ
সরল সবল আনন্দ মনে
অমল অটল জীবনে। ২১৬ ॥

কাফি। কাওয়ালি।

কেন চেয়ে আছ গো মা মুখপানে !
এরা চাহে না তোমারে চাহে না যে,
আপন মায়েরে নাহি জানে।
এরা তোমায় কিছু দেবে না দেবে না
মিথ্যা কহে শুধু কত কি ভাণে !
তুমিত দিতেছ মা যা আছে তোমারি
স্বর্ণ শস্য তব, জাহ্নবীবারি,
জ্ঞান ধর্ম্ম কত পুণ্য-কাহিনী,
এরা কি দেবে তোরে, কিছু না কিছু না
মিথ্যা কবে শুধু হীন পুরাণে।
মনের বেদনা রাখ মা মনে,
নয়ন বারি নিবারি' নয়নে,
মুখ লুকাও মা ধূলি শয়নে,
ভুলে থাক যত হীন সন্তানে।
শূন্যপানে চেয়ে প্রহর গণি গণি
দেখ কাটে কি না দীর্ঘ রজনী,
দুঃখ জানায়ে কি হবে জননী,
নির্ম্মম চেতনাহীন পাষাণে ! ১২৭ ॥

সিন্ধু কাওয়ালি।

আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না !
এ কি শুধু হাসি খেলা প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা ছলনা !
আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না।
এ যে নয়নের জল, হতাশের শ্বাস,
কলঙ্কের কথা দরিদ্রের আশ,
এ যে বুকফাটা দুখে গুমরিছে বুকে
গভীর মরম বেদনা !
এ কি শুধু হাসি খেলা প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা ছলনা !
আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না।
এসেছি কি হেথা যশের কাঙালি,
কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি,
মিছে কথা কয়ে মিছে যশ লয়ে

মিছে কাজে নিশি যাপনা ।
কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ,
কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ,
কাতরে কাঁদিবে, মায়ের পায়ে দিবে
সকল প্রাণের কামনা ।
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা, ছলনা !
আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না ।২১৮॥

বাল্মীকি প্রতিভা ।

প্রথম দৃশ্য । অরণ্য । বনদেবীগণ

সিন্ধু । কাফি ।

সহে না সহে না কাঁদে পরাণ !
সাধের অরণ্য হল শ্মশান ।
দস্যুদলে আসি শান্তি করে নাশ
ত্রাসে সকল দিশ কম্পমান ।
আকুল কানন কাঁদে সমীরণ
চকিত মৃগ, পাখী গাহে না গান ।
শ্যামল তৃণদল শোণিতে ভাসিল,
কাতর রোদন রবে ফাটে পাষাণ,
দেবি দুর্গে চাহ ত্রাহি এ বনে,
রাখ অধীনী জনে কর শান্তি দান ।২১৯॥

(প্রস্থান ।)

মিশ্র সিন্ধু ।

আঃ বেঁচেছি এখন !
শর্ম্মা ও দিকে আর নন !
গোলমালে ফাঁক তালে পালিয়েছি কেমন !
লাঠালাঠি কাটাকাটি ভাবতে লাগে দাঁতকপাটি,
(তাই) মনটা রেখে প্রাণটা নিয়ে সট্‌কেছি কেমন ।
আসুক তারা আসুক আগে, ফলোফলি নেন ভাগে,
[illegible]ামিতে আমার কাছে দেখব কে কেমন !
শুধু মুখের জোরে গলার চোটে লুঠ-করা ধন নব লুঠে
শুধু দুলিয়ে ভুঁড়ি বাজিয়ে তুড়ি
করবে সরগরম । ২২০ ॥

লুঠের দ্রব্য লইয়া দস্যুগণের প্রবেশ ।

মিশ্র ঝিঁঝিট ।

এনেছি মোরা এনেছি মোরা রাশি রাশি
লুঠের ভার ! করেছি ছারখার !
কত গ্রাম পল্লী লুঠেপুটে করেছি একাকার ২২১

কাফি ।

১ম দস্যু ।
আজকে তবে মিলে সবে করব লুঠের ভাগ,
এ সব আনতে কত লণ্ডভণ্ড করনু যজ্ঞযাগ ।

২য় দস্যু ।
কাজের বেলায় উনি কোথা যে ভাগেন,
ভাগের বেলায় আসেন আগে (আরে দাদা) ।

১ম ।—
এতবড় আস্পর্দ্ধা তোদের, মোরে নিয়ে এ কি হাসি তামাসা ।
এখনি মুণ্ড করিব খণ্ড খবরদার রে খবরদার ।
২য় ।—হাঃ হাঃ ভায়া খাপ্পা বড়, এ কি ব্যাপার !
আজি বুঝিবা বিশ্ব করবে নস্য এম্‌নি যে আ[illegible]র !
৩য় ।—এম্‌ন [illegible],
[illegible] —
১ম ।—আর যে এসব সহে না প্রাণে,
নাহি কি তোদের প্রাণের মায়া ?
দারুণ রাগে কাঁপিছে অঙ্গ,
কোথারে লাঠি কোথা রে ঢাল ?
সকলে ।—
হাঃ হাঃ ভায়া খাপ্পা বড়, এ কি ব্যাপার !
আজি বুঝিবা বিশ্ব করবে নস্য এম্‌নি যে আকার । ২২২ ॥

[বাল্মীকির প্রবেশ।]

খাম্বাজ।

সকলে।—এক ডোরে বাঁধা আছি মোরা সকলে।
না মানি বারণ, না মানি শাসন, না মানি কাহারে।
কেবা রাজা কার রাজ্য মোরা কি জানি?
প্রতি জনেই রাজা মোরা, বনই রাজধানী!
রাজা প্রজা, উচু নীচু, কিছু না গণি!
ত্রিভুবন মাঝে আমরা সকলে কাহারে না করি ভয়,
মাথার উপরে র'য়েছেন কালী, সমুখে রয়েছে জয়! ২২৩॥

পিলু।

১ম দস্যু।—এখন কর্ব্ব' কি বল্!
সকলে।—(বাল্মীকির প্রতি) এখন কর্ব্ব'কি বল্!
১ম দস্যু।—হো রাজা, হাজির র'য়েছে দল!
সকলে।—
বল রাজা, কর্ব্ব' কি বল্, এখন কর্ব্ব' কি ব'ল্!
১ম দস্যু।—
পেলে মুখেরি কথা, আনি যমেরি মাথা,
ক'রে দিই রসাতল।
সকলে।—ক'রে দিই রসাতল।
সকলে।—হো রাজা, হাজির র'য়েছে দল,
বল্ রাজা, কর্ব্ব' কি বল্,
এখন কর্ব্ব' কি বল্! ২২৪॥

ঝিঁঝিট।

বাল্মীকি।—শোন্ তোরা তবে শোন্।
অমানিশা আজিকে পূজা দেব কালীকে,
ত্বরা করি যা' তবে, সবে মিলি যা' তোরা,
বলি নিয়ে আয়। ২২৫॥

(বাল্মীকির প্রস্থান)

রাগিণী বেলাবতী।

সকলে মিলিয়া।—
তবে আয় সবে আয়, তবে আয় সবে আয়,
তবে ঢাল্ সুরা, ঢাল্ সুরা, ঢাল্ ঢাল্ ঢাল্!
দয়া মায়া কোন্ ছার ছারখার হোক্!
কেবা কাঁদে কার তরে, হাঃ হাঃ হাঃ!
তবে আন্ তলোয়ার, আন্ আন্ তলোয়ার,
তবে আন্ বরষা, আন্ আন্ দেখি ঢাল্,
১ম দস্যু।
আগে পেটে কিছু ঢাল, পরে পিঠে নিবি ঢাল,
হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ,
হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ! ২২৬

ঝংলা ভূপালী।

সকলে।—(উঠিয়া) কালী কালী বলোরে আজ,
বল হো, হো হো, বল হো, হো হো, বল হো,
নামের জোরে সাধিব কাজ,
বল হো হো বল হো বল হো!
ঐ ঘোর মত্ত করে নৃত্য রঙ্গমাঝারে,
ঐ লক্ষ লক্ষ যক্ষ রক্ষ ঘেরি শ্যামারে,
ঐ লট্ট পট্ট কেশ, অট্ট অট্ট হাসেরে;
হাহা হাহাহা হাহাহা!
আরে বল্‌রে শ্যামা মায়ের জয়, জয় জয়,
জয় জয়, জয় জয়, জয় জয়, জয় জয়,
আরে বল্‌রে শ্যামা মায়ের জয়, জয় জয়।
আরে বল্‌রে শ্যামা মায়ের জয়! ২২৭॥

[গমনোদ্যম ও একটি বালিকার প্রবেশ]

মিশ্র মল্লার।

বালিকা।—ঐ মেঘ করে বুঝি গগনে!
আঁধার ছাইল রজনী আইল,
ঘরে ফিরে যাব কেমনে!
চরণ অবশ হায়, শ্রান্ত ক্লান্ত কায়,
সারা দিবস বন ভ্রমণে!
ঘরে ফিরে যাব কেমনে! ২২৮॥

দেশ।

বালিকা।—এ কি এ ঘোর বন!—এনু
কোথায়!
পথ যে জানি না, মোরে দেখায়ে দেনা।
কি করি এ আঁধার রাতে।
কি হবে মোর, হায়!
ঘন ঘোর মেঘ ছেয়েছে গগনে,
চকিতে চপলা চমকে সঘনে,
একেলা বালিকা
তরাসে কাঁপে কায়! ২২৯॥

পিলু।

১ম দস্যু।—(বালিকার প্রতি)
পথ ভুলেছিস্ সত্যি বটে?
সিধে রাস্তা দেখতে চাস্?
এমন জায়গায় পাঠিয়ে দেব,
সুখে থাক্‌বি বার মাস!
সকলে।—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।
২য় দস্যু।—(প্রথমের প্রতি) কেমন হে ভাই?
কেমন সে ঠাঁই?
১ম।— মন্দ নহে বড়,
এক দিন না এক দিন সবাই সেথায় হব জড়।
সকলে।— হাঃ হাঃ হাঃ।
৩য়।— আয় সাথে আয়,
রাস্তা তোরে দেখিয়ে দিইগে তবে,
আর তা' হ'লে রাস্তা ভুলে ঘুরতে নাহি হবে!
সকলে।— হাঃ হাঃ হাঃ। ২৩০॥
(সকলের প্রস্থান।)

বনদেবীগণের প্রবেশ।

মিশ্র ঝিঁঝিট।

মরি ও কাহার বাছা, ওকে কোথায় নিয়ে যায়!
আহা ঐ করুণ চোখে ও কার পানে চায়!
বাঁধা কঠিন পাশে অঙ্গ কাঁপে ত্রাসে,
আঁখি জলে ভাসে একি দশা হায়!
এ বনে কে আছে যাব কার কাছে
কে ওরে বাঁচায়! ২৩১॥

দ্বিতীয় দৃশ্য। অরণ্যে কালী-প্রতিমা।
বাল্মীকি স্তবে আসীন।

বাগেশ্রী।

রাঙা পদ পদ্মযুগে প্রণমি গো ভবদারা।
আজি এ ঘোর নিশীথে পূজিব তোমারে তারা।
সুরনর থরহর'—ব্রহ্মাণ্ড বিপ্লব কর,'
রণরঙ্গে মাতো মা গো ঘোরা উন্মাদিনী পারা।
ঝলসিয়ে দিশি দিশি ঘুরাও তড়িৎ অসি,
ছুটাও শোণিত স্রোত ভাসাও বিপুল ধরা।
উর কালী কপালিনী, মহাকাল-সীমন্তিনী,
লহ জবা পুষ্পাঞ্জলি মহাদেবী পরাৎপরা।২৩২॥

(বালিকারে লইয়া দস্যুগণের প্রবেশ)

কাফি।

দস্যুগণ। দেখ, হো ঠাকুর, বলি এনেছি মোরা।
বড় সরেস, পেয়েছি বলি সরেস,
এমন সরেস মছলি রাজা জালে না পড়ে ধরা।
দেরী কেন ঠাকুর সেরে ফেল' ত্বরা! ২৩৩॥

কানেড়া।

বাল্মীকি।—
নিয়ে আয় কৃপাণ, রয়েছে তৃষিতা শ্যামা মা,
শোণিত পিয়াও, যা' ত্বরায়।
লোলজিহ্বা লকলকে, তড়িৎ খেলে চোখে,
করিয়ে খণ্ড দিগ্ দিগন্ত, ঘোর দন্ত ভায়!২৩৪॥

ঝিঁঝিট।

বালিকা।—
কি দোষে বাঁধিলে আমায়, আনিলে কোথায়!
পথহারা একাকিনী বনে অসহায়,
রাখ রাখ রাখ বাঁচাও আমায়।
দয়া কর অনাথারে কে আমার আছে,

বন্ধনে কাতর তনু মরি যে ব্যথায়।

বনদেবী।

(নেপথ্যে) দয়া কর অনাথারে দয়া
কর গো

বন্ধনে কাতর তনু জর্জ্জর ব্যথায়! ২৩৫ ॥

সিন্ধু ভৈরবী।

বাল্মীকি।—এ কেমন হ'ল মন আমার!
কি ভাব এ যে কিছুই বুঝিতে যে পারিনে।
পাষাণ হৃদয়ে গলিল কেমনে,
কেন আজি আঁখিজল দেখা দিল নয়নে।
কি মায়া এ জানে গো,
পাষাণের বাঁধ এ যে টুটিল,
সব ভেসে গেল গো—সব ভেসে গেল গো—
মরুভূমি ডুবে গেল করুণার প্লাবনে! ২৩৬ ॥

পরজ।

১ম দস্যু।—
আরে, কি এত ভাবনা, কিছুত বুঝি না,

২য় দস্যু।—সময় ব'হে যায় যে!

৩য় দস্যু।—
কখন্ এনেছি মোরা এখনো ত হল না,

৪র্থ দস্যু।—এ কেমন রীতি তব বাহরে!

বাল্মীকি। না না হবে না, এ বলি হবে না,
অন্য বলির তরে য'রে যা'!

১ম দস্যু।
অন্য বলি এ রাতে কোথা মোরা পাব?

২য় দস্যু।—এ কেমন কথা কও বাহরে। ২৩৭

দেওগিরী।

বাল্মীকি।—শোন্ তোরা শোন্ এ আদেশ
কৃপাণ খর্পর ফেলে দে দে।
বাঁধন কর ছিন্ন,
মুক্ত কর' এখনি রে। ২৩৮ ॥

(যথাদিষ্ট কৃত)

তৃতীয় দৃশ্য। অরণ্য। বাল্মীকি।

খাম্বাজ।

বাল্মীকি। ব্যাকুল হ'য়ে বনে বনে
ভ্রমি একেলা শূন্য মনে।
কে পূরাবে মোর কাতর প্রাণ,
জুড়াবে হিয়া সুধা বরিষণে? ২৩৯ ॥

(প্রস্থান।)

(দস্যুগণ বালিকাকে পুনর্ব্বার ধরিয়া
আনিয়া।)

মিশ্র দেওগিরী।

ছাড়ব না ভাই ছাড়ব না ভাই
এমন শিকার ছাড়ব না!
হাতের কাছে অম্নি এল, অম্নি যাবে!
অম্নি যেতে দেবে কেরে!
রাজাটা খেপেছেরে তার কথা আর মানব না
আজ রাতে ধুম হবে, ভারি,
নিয়ে আয় কারণ-বারি,
জেলে দে মশালগুলো মনের মতন পূজো দেব
নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে—রাজাটা খেপেছে রে
তার কথা আর মানব না! ১৪০ ॥

কানাড়া।

প্রথম দস্যু।—
রাজা মহারাজা কে জানে আমিই রাজাধিরাজ
তুমি উজীর কোতোয়াল তুমি,
ঐ ছোঁড়াগুলো বর্কন্দাজ।
যত সব কুঁড়ে আছে ঠাঁই জুড়ে,
কাজের বেলায় বুদ্ধি যায় উড়ে!
পা ধোবার জল নিয়ে আয় ঝট্,
কর তোরা সব যে যার কাজ। ২৪১

খাম্বাজ।

দ্বিতীয় দস্যু।
আছে তোমার বিদ্যে সাধ্যি জানা!
রাজত্ব করা এ কি তামাসা পেয়েছ

প্রথম। জানিস্ না কেটা আমি!
দ্বিতীয়। ঢের্ ঢের্ জানি—ঢের্ ঢের্ জানি—
প্রথম। হাসিস্‌নে হাসিস্‌নে মিছে যা যা—
সব আপনা কাজে যা যা,
যা আপন কাজে!
দ্বিতীয়। খুব তোমার লম্বা চৌড়া কথা।
নিতান্ত দেখি তোমায় কৃতান্ত ডেকেছে ২৪২॥

মিশ্র সিন্ধু।

তৃতীয়। আঃ কাজ কি গোলমালে।
না হয় রাজাই সাজালে!
মরবার বেলায় মর্‌বে ওটাই
আমরা থাক্‌ব ফাঁকতালে!
প্রথম। রাম রাম হরি হরি,
ওরা থাক্‌তে আমি মরি!
তেমন তেমন দেখ্‌লে বাবা ঢুক্‌ব আড়ালে।
সকলে। ওরে চল্ তবে শীগ্‌গিরি,
আনি পূজোর সামিগ্‌গিরি!
কথায় কথায় রাত পোহালো
এম্‌নি কাজের ছিরি! ২৪৩॥
(প্রস্থান।)

গারা ভৈরবী।

বালিকা। হা কি দশা হল আমার।
কোথা গো মা করুণাময়ী
অরণ্যে প্রাণ যায় গো!
মুহূর্তের তরে মাগো দেখা দাও আমারে
জনমের মত বিদায়। ২৪৪॥

পূজার উপকরণ লইয়া দস্যুগণের প্রবেশ।
ও কালী প্রতিমা ঘিরিয়া নৃত্য।

জাটিয়ারি।

এত রঙ্গ শিখেছ কোথা মুণ্ডমালিনী।
তোমার নৃত্য দেখে চিত্ত কাঁপে চমকে ধরণী।
ক্ষান্ত দে মা শান্ত হ মা সন্তানের মিনতি।
রাঙা নয়ন দেখে নয়ন মুদে ওমা ত্রিনয়নী। ২৪৫

বাল্মীকির প্রবেশ।

বেহাগ।

বাল্মীকি। অহো আস্পর্দ্ধা এ কি তোদের
নরাধম!
তোদের কারেও চাহিনে আর, আর আর নারে
দূর্ দূর্ দূর্ আমারে আর ছুঁস্‌নে।
এসব কাজ আর না, এ পাপ আর না,
আর না আর না, ত্রাহি, সব ছাড়িনু!

প্রথম।

দীন হীন এ অধম আমি কিছুই জানিনে রাজা।
এরাইত যত বাধালে জঞ্জাল,
এত করে বোঝাই বোঝে না।
কি করি, দেখি বিচারি।
দ্বিতীয়। বাঃ——এওত বড় মজা, বাহবা।
যত কুয়ের গোড়া ওইত, আবার বল্ নারে!
প্রথম। দূর্ দূর্ দূর্ নির্লজ্জ আর বকিস্‌নে।
বাল্মীকি। তফাতে সব সরে যা। এ পাপ আর
না, আর না, আর না, ত্রাহি, সব ছাড়িনু। ২৪৬॥
(দস্যুগণের প্রস্থান)

ভৈরবী।

বাল্মীকি।
আয় মা আমার সাথে কোন ভয় নাহি আর।
কত দুঃখ পেলি বনে আহা মা আমার।
নয়নে ঝরিছে বারি, একি মা সহিতে পারি!
কোমল কাতর তনু কাঁপিতেছে বার বার।
॥ ২৪৭ ॥
(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য। বনদেবীগণের প্রবেশ।

মল্লার।

ঝিম্ ঝিম্ ঘন ঘনরে বরষে।
গগনে ঘনঘটা শিহরে তরু লতা,

ময়ূর ময়ূরী নাচিছে হরষে।
দিশি দিশি সচকিত দামিনী চমকিত,
চমকে উঠিছে হরিণী তরাসে।২৪৮॥
(প্রস্থান)

বাল্মীকির প্রবেশ।

বেহাগ।

কোথায় জুড়াতে আছে ঠাঁই।
কেন প্রাণ কেন কাঁদে রে!
যাই দেখি শিকারেতে, রহিব আমোদে মেতে,
ভুলি সব জ্বালা বনে বনে ছুটিয়ে
কেন প্রাণ কেন কাঁদেরে।
আপনা ভুলিতে চাই ভুলিব কেমনে।
কেমনে যাবে বেদনা!
ধরি ধনু আনি বাণ, গাহিব ব্যাধের গান,
দলবল লয়ে মাতিব।
কেন প্রাণ কেন কাঁদেরে। ২৪৯॥

(শৃঙ্গধ্বনি পূর্ব্বক দস্যুদের আহ্বান)

দস্যুগণের প্রবেশ।

সুরট।

দস্যু। কেন রাজা ডাকিস কেন,এসেছি সবে!
বুঝি আবার শ্যামা মায়ের পূজো হবে।
বাল্মীকি। শিকারে হবে যেতে আয়রে সাথে!
প্রথম। ওরে রাজা কি বলচে শোন!
সকলে। শিকারে চল্ তবে।
সবারে আন ডেকে যত দলবল সবে। ২৫০॥
(বাল্মীকির প্রস্থান)

ইমন কল্যাণ।

এই বেলা সবে মিলে চলহো, চলহো,
ছুটে আয়, শিকারে কেরে যাবি আয়,
এমন রজনী বহে যায় যে,
ধনুর্ব্বাণ বল্লম লয়ে হাতে আয় আয় আয় আয়।
বাজা শিঙ্গা ঘন ঘন শব্দে কাঁপিবে বন
আকাশ ফেটে যাবে,চমকিবে পশু পাখী সবে,
ছুটে যাবে কাননে চারিদিকে ঘিরে
যাব পিছে পিছে হো হো হো হো। ২৫১

বাল্মীকির প্রবেশ।

বাহার।

বাল্মীকি।—
গহনে গহনে যারে তোরা নিশি বহে যায় যে
তন্ন তন্ন করি অরণ্য করি বরাহ খোঁজ গে,
এই বেলা যারে
নিশাচর পশু সবে, এখনি বাহির হবে,
ধনুর্ব্বাণ নেরে হাতে চল্ ত্বরা চল্।
জ্বালায়ে মশাল আলো এই বেলা আয়রে।২৫২
(প্রস্থান)

অহং

প্রথম।
চল চল ভাই ত্বরা করে মোরা আগে যাই
দ্বিতীয়। প্রাণপণ খোঁজ এ বন্ সে বন,
চল মোরা ক'জন ওদিকে যাই।
প্রথম। না না ভাই, কাজ নাই,
হোথা কিছু নাই কিছু নাই,
ওই ঝোপে যদি কিছু পাই।
দ্বিতীয়। বরা' বরা'—
প্রথম।
আরে দাঁড়া দাঁড়া অত ব্যস্ত হলে ফস্কাবে শিকার
চুপি চুপি আয়, চুপি চুপি আয়, অশথ তলায়,
এবার ঠিক ঠাক হয়ে সবে থাক,
সাবধান ধর বাণ, সাবধান ছাড় বাণ,
গেল গেল ঐঐ পালায় পালায় চল্ চল্
ছোট্‌রে পিছে আয়রে ত্বরা যাই। ২৫৩।

বনদেবীগণের প্রবেশ।

মিশ্র মোল্লার।

কে এল আজি এ ঘোর নিশীথে।
সাধের কাননে শান্তি নাশিতে।
মত্ত করী যত পদ্মবন দলে,

বিমল সরোবর মন্থিয়া,
ঘুমন্ত বিহগে কেন বধেরে,
সঘনে খর-শর সন্ধিয়া,
তরাসে চমকিয়ে হরিণ হরিণী
স্খলিত চরণে ছুটিছে।
স্খলিত চরণে ছুটিছে কাননে
করুণ নয়নে চাহিছে—
আকুল সরসী, সারস সারসী
শর-বনে পশি কাঁদিছে।
তিমির দিগ্‌ভরি ঘোর যামিনী
বিপদ ঘন ছায়া ছাইয়া—
কি জানি কি হবে আজি এ নিশীথে,
তরাসে প্রাণ ওঠে কাঁপিয়া। ২৫৪॥

প্রথম দস্যুগণের প্রবেশ।

দেশ।

ণ নিয়েত সট্‌কেছিরে করবি এখন কি।
ওরে বরা' করবি এখন কি।
বাবারে, আমি চুপ ক'রে এই
কচুবনে লুকিয়ে থাকি।
এই মরদের মুরদখানা দেখেও
কিরে ভড়কালি না,
বাহবা সাবাস্‌ তোরে, সাবাস্‌ রে
তোর ভরসা দেখি। ২৫৫॥

খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আরেকজন
দস্যুর প্রবেশ।]

গৌরী।

দস্যু। বল্‌ব কি আর বল্‌ব খুড়ো—উঁউ
আমার যা হয়েছে, বলি কার কাছে,
ক্‌টা বুনো ছাগল তেড়ে এসে মেরেছে ঢুঁ।
থম। তখন যে ভারি ছিল জারি জুরি,
এখন কেন কচ্চ বাপু উ উঁ উ—
কান্‌ খানে লেগেছে বাবা দিই একটু ফুঁ ২৫৭॥

দস্যুগণের প্রবেশ।

শঙ্করা।

দস্যুগণ। সর্দ্দার মশায় দেরী না সয়,
তোমার আশায় সবাই বসে।
শিকারেতে হবে যেতে
মিহী কোমর বাঁধ ক'সে।
বনবাদাড় সব ঘেঁটে ঘুটে
আমরা মরি খেটে খুটে
তুমি কেবল লুঠে পুটে
পেট পোরাবে ঠেসে ঠুসে।
প্রথম। কাজ কি খেয়ে তোফা আছি,
আমায় কেউ না খেলেই বাঁচি,
শিকার কর্ত্তে যায় কে ম'র্ত্তে,
ঢুঁসিয়ে দেবে বরা' মোষে!
ঢুঁ খেয়ে ত পেট ভরে না—
সাধের পেট্‌টি যাবে ফেঁসে। ২৫৮॥

(হাসিতে হাসিতে প্রস্থান ও শিকারের পশ্চাৎ পুনঃপ্রবেশ।)

বাল্মীকির দ্রুত প্রবেশ।

বাহার।

বাল্মীকি। রাখ রাখ ফেল্‌ ধনু, ছাড়িস্‌নে বাণ।
হরিণশাবক দুটি প্রাণভয়ে ধায় ছুটি,
চাহিতেছে ফিরে ফিরে করুণ নয়ান।
কোন দোষ করেনিত, সুকুমার কলেবর,
কেমনে কোমল দেহে বিঁধিবি কঠিন শর!
থাক্‌ থাক্‌ ওরে থাক্‌, এ দারুণ খেলা রাখ,
আজ হতে বিসর্জ্জিনু এ ছার ধনুক বাণ ॥২৫৯॥

(প্রস্থান।)

[দস্যুগণের প্রবেশ।]

নটনারায়ণ।

দস্যুগণ। আর না আর না এখানে আর না,
আয় রে সকলে চলিয়া যাই!

ধনুক বাণ ফেলেছে রাজা,
এখানে কেমনে থাকিব ভাই!
চল চল চল এখনি যাই।

[বাল্মীকির প্রবেশ।]

দস্যুগণ। তোর দশা, রাজা, ভাল ত নয়,
রক্ত পাতে পাস্ রে ভয়,
লাজে মোরা ম'রে যাই!
পাখীটি মারিলে কাঁদিয়া খুন,
না জানি কে তোরে করিল গুণ,
হেন কভু দেখি নাই! ২৬০॥

(দস্যুগণের প্রস্থান।)

পঞ্চম দৃশ্য

ছায়ানট।

বাল্মীকি।—জীবনের কিছু হ'ল না, হায়!—
হ'ল না গো হ'ল না হায়, হায়,
গহনে গহনে কত আর ভ্রমিব নিরাশার
এ আঁধারে?
শূন্য হৃদয় আর বহিতে যে পারি না,
পারিনা গো পারি না আর।
কি ল'য়ে এখন ধরিব জীবন,
দিবস রজনী চলিয়া যায়,
দিবস রজনী চলিয়া যায়,
কতকি করিব বলি কত উঠে বাসনা,
কি করিব জানি না গো!
সহচর ছিল যারা ত্যজিয়া গেল তারা;
ধনুর্ব্বাণ ত্যেজেছি;
কোন আর নাহি কায!
কি করি কি করি বলি হাহা করি ভ্রমি গো,
কি করিব জানি না যে! ২৬১॥

ব্যাধগণের প্রবেশ।

মিশ্র পূরবী।

প্রথম। দেখ দেখ দুটো পাখী বসেছে গাছে।
দ্বিতীয়। আয় দেখি চুপি চুপি আয়রে কাছে।
প্রথম। আরে ঝট্ করে এইবারে ছেড়ে
দেরে বাণ।
দ্বিতীয়। রোস্ রোস্ আগে আমি করিরে
সন্ধান। ২৬২।

সিন্ধু ভৈরবী।

বাল্মীকি।
থাম্ থাম্ কি করিবি বধি পাখীটির প্রাণ।
দুটিতে র'য়েছে সুখে, মনের উল্লাসে
গাহিতেছে গান।
১ম ব্যাধ। রাখ'মিছে ওসব কথা,
কাছে মোদের এসনাক হেথা,
চাইনে ওসব শাস্তর কথা, সময় ব'হে যায় যে।
বাল্মীকি। শোন শোন মিছে রোষ কোর না।
ব্যাধ। থাম থাম ঠাকুর এই ছাড়ি বাণ

[একটি ক্রৌঞ্চকে বধ।]

বাল্মীকি।
মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ,
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।
॥২৬৩॥

বাহার।

কি বলিনু আমি!—এ কি সুললিত বাণীরে!
কিছু না জানি কেমনে যে আমি প্রকাশিনু
দেবভাষা,
এমন কথা কেমনে শিখিনুরে।
পুলকে পূরিল মনপ্রাণ,মধু বরষিল শ্রবণে,
এ কি!—হৃদয়ে এ কি এ দেখি!—
ঘোর অন্ধকার মাঝে এ কি জ্যোতি ভায়
অবাক!—করুণা এ কার? ২৬৪॥

[সরস্বতীর আবির্ভাব।]

ভূপালী।

বাল্মীকি। এ কি এ, এ কি এ, স্থির চপলা!
কিরণে কিরণে হ'ল সব দিক উজলা!

কি প্রতিমা দেখি এ, জোছনা মাখিয়ে
কে রেখেছে আঁকিয়ে,
আমরি কমল পুতলা! ২৬৫ ॥
(ব্যাধগণের প্রস্থান।)

বনদেবীগণের প্রবেশ।

বনদেবী। নমি নমি ভারতী তব কমল চরণে,
পুণ্য হল বনভূমি ধন্য হল প্রাণ।
বাল্মীকি। পূর্ণ হল বাসনা, দেবী কমলাসনা,
ধন্য হল দস্যুপতি গলিল পাষাণ।
বনদেবী। কঠিন ধরাভূমি এ, কমলালয়া তুমি যে
হৃদয় কমলে চরণ কমল কর দান!
বাল্মীকি। তব কমল পরিমলে রাখ হৃদি ভরিয়ে
চির দিবস করিব তব চরণ সুধা পান। ২৬৬॥
(দেবীগণের অন্তর্ধান।)

বাল্মীকি কালী প্রতিমার প্রতি।

রামপ্রসাদী সুর।

শ্যামা এবার ছেড়ে চলেছি মা!
পাষাণের মেয়ে পাষাণী, না বুঝে মা বলেছি মা!
এতদিন কি ছল করে তুই পাষাণ করে
রেখেছিলি!
(আজ) আপন মায়ের দেখা পেয়ে নয়নজলে
গলেছি মা!
কালো দেখে ভুলিনে আর, আলো দেখে
ভুলেছে মন,
আমায় তুমি ছলেছিলে, (এবার) আমি
তোমায় ছলেছি মা।
মায়ার মায়া কাটিয়ে এবার মায়ের কোলে
চলেছি মা। ২৬৭ ॥

ষষ্ঠ দৃশ্য।

টৌড়ী।

বাল্মীকি।—কোথা লুকাইলে?
সব আশা নিভিল, দশদিশি অন্ধকার
সবে গেছে চ'লে তেয়াজিয়ে আমারে,
তুমিও কি তেয়াগিলে? ২৬৮ ॥

লক্ষ্মীর আবির্ভাব।

সিন্ধু।

লক্ষ্মী।—
কেন গো আপন মনে, ভ্রমিছ বনে বনে সলিল
দুনয়নে
কিসের দুখে?
কমলা দিতেছে আসি, রতন রাশি রাশি,
ফুটুক্ তবে হাসি
মলিন মুখে।
কমলা যারে চায়, বল সে কি না পায়, দুখের
এ ধরায়
থাকে সে সুখে।
ত্যজিয়া কমলাসনে, এসেছি ঘোর বনে,
আমারে শুভক্ষণে
হের গো চোখে। ২৬৯ ॥

টৌড়ী।

বাল্মীকি।—
(আমার) কোথায় সে ঊষাময়ী প্রতিমা!
তুমিত নহো সে দেবী, কমলাসনা,
কোরোনা আমারে ছলনা!
কি এনেছ ধন মান! তাহা যে চাহেনা প্রাণ;
দেবি গো, চাহিনা চাহিনা, মণিময় ধূলিরাশি
চাহি না,
তাহা লোয়ে সুখী যারা হয় হোক্—হয় হোক্
আমি, দেবি, সে সুখ চাহি না।
যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এ বনে এসনা এসনা,
না এ দীন জন কুটিরে!
শুনেছি কাণে, মনপ্রাণ আছে ভোর,
আর কিছু চাহিনা চাহিনা। ২৭০ ॥
(লক্ষ্মীর অন্তর্ধান বাল্মীকির প্রস্থান।)

বনদেবীগণের প্রবেশ।

ভৈরবী।

বাণী বীণাপাণি করুণাময়ী।
অন্ধজনে নয়ন দিয়ে অন্ধকারে ফেলিলে,
দরশ দিয়ে লুকালে কোথা দেবি অয়ি!
স্বপন সম মিলাবে যদি কেন গো দিলে চেতনা,
চকিতে শুধু দেখা দিয়ে চির মরম বেদনা,
তোমারে চাহি ফিরিছে হের কাননে কাননে
ওই। ২৭১॥

[বনদেবীগণের প্রস্থান বাল্মীকির প্রবেশ। সরস্বতীর আবির্ভাব।]

বাহার।

বাল্মীকি। এই যে হেরি গো দেবী আমারি।
সব কবিতাময় জগৎ চরাচর,
সব শোভাময় নেহারি।
ছন্দে উঠিছে চন্দ্রমা, ছন্দে কনক রবি উদিছে।
ছন্দে জগ-মণ্ডল চলিছে,
জলন্ত কবিতা তারকা সবে;
এ কবিতার মাঝারে তুমি কে গো দেবি
আলোকে আলো আঁধারি!
আজি মলয় আকুল, বনে বনে একি
এ গীত গাহিছে,
ফুল কহিছে প্রাণের কাহিনী,
নব রাগ রাগিণী উছাসিছে,
এ আনন্দে আজ গীত গাহে মোর হৃদয় সব
আবরি
তুমিই কি দেবী ভারতী,
কৃপাগুণে অন্ধ আঁখি ফুটালে,
ঊষা আনিলে প্রাণের আঁধারে,
প্রকৃতির রাগিণী শিখাইলে?
তুমি ধন্য গো,
রব' চিরকাল চরণ ধরি তোমারি। ২৭২॥

গৌড় মল্লার।

হৃদয়ে রাখ' গো দেবি, চরণ তোমার।
এস, মা করুণারাণী, ও বিধুবদন খানি
হেরি হেরি আঁখি ভরি হেরিব আবার।
এস আদরিণী বাণী সমুখে আমার।
মৃদু মৃদু হাসি হাসি, বিলাও অমৃত রাশি,
আলোয় ক'রেছ আলো, জ্যোতি-প্রতিমা,
তুমি গো লাবণ্য-লতা, মূর্ত্তি মধুরিমা।
বসন্তের বনমালা, অতুল রূপের ডালা,
মায়া'র মোহিনী মেয়ে ভাবের আধার,
ঘুচাও মনের মোর সকল আঁধার।
অদর্শন হ'লে তুমি ত্যেজি লোকালয় ভূমি
অভাগা বেড়াবে কেঁদে গহনে গহনে,
হেরে মোরে তরুলতা, বিষাদে কবে না কথা
বিষণ্ণ কুসুমকুল নবফুল-বনে।
"হা দেবী, হা দেবী" বলি,
গুঞ্জরি কাঁদিবে অলি;
ঝরিবে ফুলের চোখে শিশির-আসার,
হেরিব জগৎ শুধু আঁধার—আঁধার।
সরস্বতী। দীনহীন বালিকার সাজে,
এসেছিনু এ ঘোর বনমাঝে,
গলাতে পাষাণ তোর মন,
কেন, বৎস, শোন্ তাহা, শোন্।
আমি বীণাপাণি, তোরে এসেছি শিখাতে গান
তোর গানে গ'লে যাবে সহস্র পাষাণ-প্রাণ।
যে রাগিণী শুনে তোর গ'লেছে কঠোর মন,
সে রাগিণী তোরি কণ্ঠে বাজিবে রে অনুক্ষণ
অধীর হইয়া সিন্ধু কাঁদিবে চরণ-তলে
চারিদিকে দিক-বধূ আকুল নয়ন-জলে।
মাথার উপরে তোর কাঁদিবে সহস্র তারা,
অশনি গলিয়া গিয়া হইবে অশ্রুর ধারা।
যে করুণ রসে আজি ডুবিল রে ও হৃদয়,
শতস্রোতে তুই তাহা ঢালিবি জগৎময়।
যেথায় হিমাদ্রি আছে সেথা তোর নাম র'বে,

যেথায় জাহ্নবী বহে তোর কাব্য-স্রোত ব'বে।
সে জাহ্নবী বহিবেক অযুত হৃদয় দিয়া,
শ্মশান পবিত্র করি মরুভূমি উর্বরিয়া।
শুনিতে শুনিতে বৎস, তোর সে অমর গীত,
জগতের শেষ দিনে রবি হবে অস্তমিত।
যত দিন আছে শশী, যতদিন আছে রবি,
তুই বাজাইবি বীণা তুই আদি মহা কবি।
মোর পদ্মাসন তলে রহিবে আসন তোর।
নিত্য নব নব গীতে সতত রহিবি ভোর।
বসি তোর পদতলে কবি বালকেরা যত
শুনি তোর কণ্ঠস্বর শিখিবে সঙ্গীত কত।
এই নে আমার বীণা, দিনু তোরে উপহার!
যে গান গাহিতে সাধ ধ্বনিবে ইহার তার ২৭৩॥

ব্রহ্মসঙ্গীত।

রাগিণী খট্—তাল ঝাঁপতাল।

আমরা যে, শিশু অতি, অতি ক্ষুদ্রমন, পদে পদে হয় পিতা চরণস্খলন।

রুদ্র মুখ কেন তবে, দেখাও মোদের সবে, কেন হেরি মাঝে মাঝে ভ্রূকুটি ভীষণ?

ক্ষুদ্র আমাদের পরে করিও না রোষ, স্নেহবাক্যে বল পিতা, কি করেছি দোষ, শত-বার লও তুলে, শতবার পড়ি ভুলে, কি আর করিতে পারে দুর্ব্বল যে জন!

পৃথ্বীর ধূলিতে দেব মোদের ভবন, পৃথ্বীর ধূলিতে অন্ধ মোদের নয়ন, জন্মিয়াছি শিশু হোয়ে, খেলা করি ধূলি লোয়ে, মোদের অভয় দাও দুর্ব্বল-শরণ।

একবার ভ্রম হোলে আর কি লবে না কোলে, অমনি কি দূরে তুমি করিবে গমন?

তা হ'লে যে আর কভু উঠিতে নারিব প্রভু, ভূমিতলে চির দিন রব অচেতন। ২৭৪॥

রাগিণী ইমন ভূপালী—তাল কাওয়ালি।

এ কি এ সুন্দর শোভা, কি মুখ হেরি এ!
আজি মোর ঘরে আইল হৃদয়-নাথ,
প্রেম-উৎস উথলিল আজি—
বল হে প্রেমময় হৃদয়ের স্বামী,
কি ধন তোমারে দিব উপহার?
হৃদয় প্রাণ লহ লহ তুমি কি বলিব,
যাহা কিছু আছে মম, সকলি লও হে নাথ॥২৭৫॥

গুজরাটী ভজন—তাল একতালা।

কোথা আছ প্রভু? এসেছি দীন হীন
আলয় নাহি মোর অসীম সংসারে।
অতি দূরে দূরে ভ্রমিছি আমি হে,
প্রভু প্রভু ব'লে ডাকি কাতরে।
সাড়া কি দিবে না, দীনে কি চাবে না,
রাখিবে ফেলিয়ে অকূল আঁধারে?
পথ যে জানিনে, রজনী আসিছে
একেলা আমি যে এ বন মাঝারে,
জগৎ-জননী, লহ' লহ' কোলে,
বিরাম মাগিছে শ্রান্ত শিশু এ,
পিয়াও অমৃত, তৃষিত সে অতি,
জুড়াও তাহারে স্নেহ বরষিয়ে।
ত্যজি সে তোমারে, গেছিল চলিয়ে
কাঁদিছে আজিকে পথ হারাইয়ে,
আর সে যাবে না, রহিবে সাথ সাথ,
ধরিয়ে তব হাত ভ্রমিবে নির্ভয়ে।
এস তবে প্রভু, স্নেহ-নয়নে
এমুখ পানে চাও, ঘুচিবে যাতনা,
পাইব নব বল, মুছিব অশ্রুজল,
চরণ ধরিয়ে পূরিবে কামনা। ২৭৬॥

রাগ ভয়রোঁ—তাল কাওয়ালি।

তুমি কি গো পিতা আমাদের, ওই যে নেহারি মুখ অতুল স্নেহের।

ওই যে নয়ন তব, অরুণ কিরণ নব, বিমল চরণ-তলে ফুল ফুটে প্রভাতের।

ওই কি স্নেহের রবে, ডাকিছ মোদের সবে, তোমার আসন ঘেরি দাঁড়াব কি কাছে গিয়া ?

হৃদয়ের ফুলগুলি যতনে ফুটায়ে তুলি, দিবে কি বিমল করি প্রসাদ সলিল দিয়া ? ২৭৭

রাগিণী আল্যাইয়া—তাল ঝাঁপতাল।

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুব তারা;
এ সমুদ্রে আর কভু হবনাক পথহারা,
যেথা আমি যাইনাক, তুমি প্রকাশিত থাক,
আকুল নয়ন জলে ঢাল গো কিরণ ধারা।
তব মুখ সদা মনে জাগিতেছে সঙ্গোপনে,
তিলেক অন্তর হ'লে না হেরি কূল-কিনারা।
কখন বিপথে যদি ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি
অমনি ও মুখ হেরি সরমে সে হয় সারা। ২৭৮

রাগিণী ধুন—তাল কাওয়ালি।

দিবানিশি করিয়া যতন,
হৃদয়েতে রচেছি আসন,
জগৎপতি হে কৃপা করি
হেথা কি করিবে আগমন ?
অতিশয় বিজন এ ঠাঁই,
কোলাহল কিছু হেথা নাই,
হৃদয়ের নিভৃত নিলয়
করেছি যতনে প্রক্ষালন।
বাহিরের দীপ রবি-তারা
ঢালে না সেথায় কর-ধারা,
তুমিই করিবে শুধু, দেব,
সেথায় কিরণ বরিষণ।
দূরে বাসনা চপল,
দূরে প্রমোদ কোলাহল
বিষয়ের মান অভিমান,
করেছে সুদূরে পলায়ন
কেবল আনন্দ বসি সেথা,
মুখে নাই একটিও কথা,
তোমারি সে পুরোহিত, প্রভু,
করিবে তোমারি আরাধন,
নীরবে বসিয়া অবিরল
চরণে দিবে সে অশ্রুজল
দুয়ারে জাগিয়া রবে একা
মুদিয়া সজল দুনয়ন। ২৭৯ ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঝাঁপতাল।

মহা সিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্ব-পিতঃ
তোমারি রচিত ছন্দ মহান্ বিশ্বের গীত।
মর্ত্ত্যের মৃত্তিকা হোয়ে ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ লোয়ে
আমিও দুয়ারে তব হ'য়েছি হে উপনীত।
কিছু নাহি চাহি দেব, কেবল দর্শন মাগি,
তোমারে শুনাব গীত এসেছি তাহারি লাগি
গাহে যেথা রবি শশী, সেই সভা মাঝে বসি,
একান্তে গাহিতে চাহে এই ভকতের চিত।২

রাগিণী দেশ—তাল আড়াঠেকা।

অনিমেষ আঁখি সেই কে দেখেছে,
সে আঁখি জগৎ পানে চেয়ে রয়েছে।
রবি শশী গ্রহ তারা, হয়নাক দিশে হারা,
সেই আঁখি পরে তারা আঁখি রেখেছে।
তরাসে আঁধারে কেন কাঁদিয়া বেড়াই,
হৃদয়-আকাশ পানে কেন না তাকাই।
ধ্রুব-জ্যোতি সে নয়ন জাগে সেথা অনুক্ষণ,
সংসারের মেঘে বুঝি দৃষ্টি ঢেকেছে। ২৮১

রাগিণী টোড়ী—তাল ঝাঁপতাল।

আজি এনেছে তাঁহারি আশীর্বাদ
প্রভাত কিরণে।
পবিত্র কর-পরশ পেয়ে
ধরণী লুটিছে তাঁহারি চরণে।
আনন্দে তরুলতা নোয়াইছে মাথা
কুসুম ফোটাইছে শত বরণে।

রাগিণী কর্ণাটী খাম্বাজ—তাল ফের্‌তা।

আজি শুভ দিনে, পিতার ভবনে
অমৃত সদনে চল যাই।
চল্ চল চল ভাই।
না জানি সেথা কত সুখ মিলিবে
আনন্দের নিকেতনে,
চল চল চল ভাই।
মহোৎসবে ত্রিভুবন মাতিল,
কি আনন্দ উথলিল,
চল চল চল ভাই।
দেবলোকে উঠিয়াছে জয় গান,
গাহ সবে একতান, বল সবে জয় জয়। ২৮৩ ॥

রাগিণী খট্—তাল একতালা।

আঁধার রজনী পোহাল জগৎ পূরিল পুলকে,
বিমল প্রভাত কিরণে
মিলিল দ্যুলোক ভূলোকে।
জগৎ নয়ন তুলিয়া, হৃদয় দুয়ার খুলিয়া
হেরিছে হৃদয়নাথেরে
আপন হৃদয়-আলোকে।
প্রেম মুখহাসি তাঁহারি,
পড়িছে ধরার আননে,
কুসুম বিকশি উঠিছে,
সমীর বহিছে কাননে।
সুধীরে আঁধার টুটিছে
দশ দিক্ ফুটে উঠিছে—
জননীর কোলে যেন রে
জাগিছে বালিকা বালকে।
জগৎ যে দিকে চাহিছে
সে দিকে দেখিনু চাহিয়া,
হেরি সে অসীম মাধুরী
হৃদয় উঠিছে গাহিয়া।
নবীন আলোকে ভাতিছে,
নবীন আশায় মাতিছে, জীবন জীবন লভিয়া
জয় জয় উঠে ত্রিলোকে। ২৮৪ ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি,
দিবস কাটে বৃথায় হে—
আমি যেতে চাই তব পথ পানে
কত বাধা পায় পায় হে।
চারিদিকে হে ঘিরেছে কা'রা
শত বাঁধনে জড়ায় হে,
আমি, ছাড়াতে চাহি, ছাড়ে না কেন গো
ডুবায়ে রাখে মায়ায় হে।
দাও ভেঙ্গে দাও এ ভবের সুখ,
কাজ নেই এ খেলায় হে,
আমি ভুলে থাকি যত অবোধের মত
বেলা ব'হে তত যায় হে।
হান তব বাজ হৃদয় গহনে,
দুখানল জ্বাল' তায় হে,
নয়নের জলে ভাসায়ে আমারে
সে জল দাও মুছায়ে হে।
শূন্য করে দাও হৃদয় আমার
আসন পাত' সেথায় হে,
তুমি এস এস নাথ হ'য়ে বস,
ভুলো না আর আমায় হে। ২৮৫ ॥

কীর্ত্তনের সুর।

(আমার) হৃদয় সমুদ্রতীরে কে তুমি দাঁড়ায়ে!
কাতর পরাণ ধায় বাহু বাড়ায়ে।
(হৃদয়ে) উথলে তরঙ্গ চরণ পরশের তরে
(তারা) চরণ-কিরণ লয়ে কাড়াকাড়ি করে।
মেতেছে হৃদয় আমার ধৈরজ না মানে,
তোমারে ঘেরিতে চায় নাচে সঘনে।
(সখা) ঐ খেনেতে থাক তুমি যেয়োনা চলে
(আজি) হৃদয় সাগরের বাঁধ ভাঙ্গি সবলে!
কোথা হতে আজি প্রেমের পবন ছুটেছে
(আমার) হৃদয়ে তরঙ্গ কত নেচে উঠেছে!
তুমি দাঁড়াও তুমি যেয়োনা—

(আমার) হৃদয়ে তরঙ্গ
আজি নেচে উঠেছে ॥ ১৮৬ ॥

রাগিণী মিশ্র—তাল ঝাঁপতাল।

এ কি সুগন্ধ-হিল্লোল বহিল
আজি প্রভাতে, জগৎ মাতিল তায়।
হৃদয়-মধুকর ধাইছে দিশি দিশি পাগল প্রায়!
বরণ বরণ পুষ্প রাজি, হৃদয় খুলিয়াছে আজি,
সেই সুরভি-সুধা করিছে পান,
পূরিয়া প্রাণ, সে সুধা করিছে দান,
সে সুধা অনিলে উথলি যায়। ২৮৭॥

রাগিণী প্রভাতী—তাল একতালা।

এ কি অন্ধকার এ ভারতভূমি,
বুঝি পিতা তারে ছেড়ে গেছ তুমি,
প্রতি পলে পলে ডুবে রসাতলে
কে তারে উদ্ধার করিবে
চারিদিকে চাই নাহি হেরি গতি,
নাহি যে আশ্রয় অসহায় অতি,
আজি এ আঁধারে বিপদ পাথারে
কাহার চরণ ধরিবে!
তুমি চাও পিতা ঘুচাও এ দুখ,
অভাগা দেশেরে হয়োনা বিমুখ,
নহিলে আঁধারে বিপদ পাথারে
কাহার চরণ ধরিবে।
দেখ চেয়ে তব সহস্র সন্তান
লাজে নতশির, ভয়ে কম্পমান,
কাঁদিছে সহিছে শত অপমান
লাজমান আর থাকে না!
হীনতা লয়েছে মাথায় তুলিয়া
তোমারেও তাই গিয়েছে ভুলিয়া,
দয়াময় বলে আকুল হৃদয়ে
তোমারেও তারা ডাকে না।
তুমি চাও পিতা তুমি চাও চাও,
এ পাপ, হীনতা, এ দুঃখ ঘুচাও,
ললাটের কলঙ্ক মুছাও মুছাও
নহিলে এ দেশে থাকে না।
তুমি যবে ছিলে এ পুণ্য ভবনে,
কি সৌরভ সুধা বহিত পবনে,
কি আনন্দ গান উঠিত গগনে,
কি প্রতিভা জ্যোতি জ্বলিত!
ভারত অরণ্যে ঋষিদের গান
অনন্ত সদনে করিতে প্রয়াণ
তোমারে চাহিয়া পুণ্যপথ দিয়া
সকলে মিলিয়া চলিত!
আজ কি হয়েছে চাও পিতা চাও,
এ তাপ, এ পাপ, এ দুখ ঘুচাও,
মোরা ত তোমারি রয়েছি সন্তান
যদিও আমরা পতিত। ২৮৮ ॥

রাগিণী আসাবরি—তাল চৌতাল।

এখনো আঁধার রয়েছে, হে নাথ,
এ প্রাণ দীন মলিন, চিত অধীর, সব শূন্যময়।
চারিদিকে চাহি পথ নাহি নাহি,
শান্তি কোথা, কোথা আলয়।
কোথা তাপহারী পিপাসার বারি
হৃদয়ের চির আশ্রয়।২৮৯ ॥

রাগিণী সিন্ধু—তাল মধ্যমান।

এ পরবাসে রবে কে হায়!
কে রবে এ সংশয়ে সন্তাপে শোকে।
হেথা কে রাখিবে দুখ ভয় সঙ্কটে
তেমন আপন কেহ নাহি এ প্রান্তরে,
হায়রে। ২৯০ ॥

রাগিণী ইমন—তাল আড়াঠেকা।

এ মোহ আবরণ খুলে দাও দাও হে।
সুন্দর মুখ তব দেখি নয়ন ভরি,
চাও হৃদয় মাঝে চাও হে। ২৯১ ॥

রাগিণী হাম্বীর—তাল চৌতাল।
এসেছে সকলে কত আশে, দেখ চেয়ে।
হে প্রাণেশ, ডাকে সবে ঐ তোমারে।
এস হে মাঝে এস কাছে এস,
তোমায় ঘিরিব চারি ধারে।
উৎসবে মাতিব হে তোমায় লয়ে
ডুবিব আনন্দ পারাবারে। ২৯২ ॥

রাগিণী বিভাস। তাল চৌতাল।
ওঠরে—বিফলে প্রভাত বহে যায় যে,
আঁখি জাগ জাগো, থেকনারে অচেতন।
লই তাঁর কাজে ধাইল জগৎ মাঝে,
াস প্রভাত বায়ু, ভানু ধাইল আকাশ পথে।
একে নাম ধরে ডাকিছেন বুঝি প্রভু—
একে ফুলগুলি তাই ফুটিয়া উঠিছে বনে।
সে আহ্বান বাণী—চাই সেই মুখপানে—
ার আশীষ লয়ে, চলরে যাই সবে
তাঁর কাজে ॥ ২৯৩ ॥

গণী মিশ্র বেলাবতী—তাল কাওয়ালি।
দয়াময় নিখিল আশ্রয় এ ধরা পানে চাও॥
পতিত যে জন করিছে রোদন,
পতিতপাবন তাঁহারে উঠাও।
ণ যে জন করেছে বরণ তাহারে বাঁচাও॥
দুখ শোক,কাঁদে কত লোক, নয়ন মুছাও।
য়া আলয় হেরে শূন্যময় কোথায় আশ্রয়,
(তারে) ঘরে ডেকে নাও।
প্রেমের তৃষায় হৃদয় শুকায়
দাও প্রেম সুধা দাও॥
কোথা যায় কার পানে চায় নয়নে আঁধার
নাহি হেরে দিক আকুল পথিক
চাহে চারি ধার।
সে ঘোর গহনে অন্ধ সে নয়নে
তোমার কিরণে আঁধার ঘুচাও।
াষা জনে রাখিয়া চরণে বাসনা পূরাও॥

কলঙ্কের রেখা প্রাণে দেয় দেখা প্রতিদিন হায়।
হৃদয় কঠিন হল দিন দিন লজ্জা দূরে যায়।
দেহগো বেদনা করাও চেতনা,
রেখনা রেখনা এ পাপ তাড়াও।
সংসারের রণে পরাজিত জনে
দাও নববল দাও ॥ ২৯৪ ॥

ভজন—তাল ঠুংরি।
কি করিলি মোহের ছলনে।
গৃহ তেয়াগিয়া প্রবাসে ভ্রমিলি
পথ হারাইলি গহনে।
(ঐ) সময় চলে গেল আঁধার হয়ে এল
মেঘ ছাইল গগনে।
শ্রান্ত দেহ আর চলিতে চাহে না
বিঁধিছে কণ্টক চরণে।
গৃহে ফিরে যেতে প্রাণ কাঁদিছে
এখন ফিরিব কেমনে,
পথ বলে দাও পথ বলে দাও
কে জানে কারে ডাকি সঘনে।
বন্ধু যাহারা ছিল সকলে চলে গেল
কে আর রহিল এ বনে।
(ওরে) জগৎ-সখা আছে, যা'রে তাঁর কাছে
বেলা যে যায় মিছে রোদনে।
দাঁড়ায়ে গৃহ-দ্বারে জননী ডাকিছে
আয়রে ধরি তাঁর চরণে,
পথের ধূলি লেগে অন্ধ আঁখি মোর
মায়েরে দেখেও দেখিলিনে।
কোথাগো কোথা তুমি, জননি, কোথা তুমি,
ডাকিছ কোথা হতে এ জনে,
হাতে ধরিয়ে [illegible] লয়ে চল
তোমার অমৃত-ভব [illegible] ২৯৫ ॥

রাগিণী আলাইয়া—তাল ধামার।
কেরে ওই ডাকিছে,
স্নেহের রব উঠিছে জগতে জগতে,

তোরা আয়, আয়, আয়, আয়!
তাই আনন্দে বিহঙ্গ গান গাহে,
প্রভাতে, সে সুধাস্বর প্রচারে।
বিষাদ তবে কেন, অশ্রু বহে চোখে
শোককাতর আকুল কেন আজি!
কেন নিরানন্দ, চল সবে যাই—
পূর্ণ হবে আশা! ২৯৬॥

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

চলিয়াছি গৃহপানে, খেলাধূলা অবসান।
ডেকে লও, ডেকে লও, বড় শ্রান্ত মন প্রাণ।
ধূলায় মলিন বাস, আঁধারে পেয়েছি ত্রাস,
মিটাতে প্রাণের তৃষা বিষাদ করেছি পান।
খেলিতে সংসারের খেলা কাতরে কেঁদেছি হায়,
হারায়ে আশার ধন অশ্রুবারি ব'হে যায়;
ধূলাঘর গড়ি যত ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে তত,
চলেছি নিরাশ মনে,সান্ত্বনা কর গো দান॥২৯৭॥

রাগিণী মিশ্র মল্লার—তাল রূপক।

চলেছে তরণী প্রসাদ পবনে,
কে যাবে এসহে শান্তি ভবনে।
এ ভব সংসারে ঘিরেছে আঁধারে
কেনরে ব'সে হেথা ম্লান মুখ!
প্রাণের বাসনা হেথায় পূরে না,
হেথায় কোথা প্রেম কোথা সুখ!
এ ভব কোলাহল, এ পাপ হলাহল,
এ দুখ শোকানল দূরে যাক,
সমুখে চাহিয়ে পুলকে গাহিয়ে
চলরে শুনে চলি তাঁর ডাক,
বিষয় ভাবনা লইয়া যাব না,
তুচ্ছ সুখ দুখ পড়ে থাক্।
ভবের নিশীথিনী ঘিরিবে ঘনঘোরে
তখন্ কার মুখ চাহিবে!
সাধের ধনজন দিয়ে বিসর্জ্জন,
কিসের আশে প্রাণ রাখিবে। ২৯৮॥

রাগিণী ইমনকল্যাণ—তাল চৌতাল।

ডাকি তোমারে কাতরে, দয়া কর দীনে
রাখহে রাখহে অভয় চরণে।
ধন জন তুচ্ছ সকলি, সকলি মোহমায়া;
বৃথা বৃথা জানিহে,প্রাণ চাহে যে তোমা পানে
॥ ২৯৯॥

রাগিণী ললিত—তাল চৌতাল।

ডুবি অমৃত পাথারে,—যাই ভুলে চরাচর,
মিলায় রবি শশী।
নাহি দেশ, নাহি কাল, নাহি হেরি সীমা,
প্রেমমূরতি হৃদয়ে জাগে
আনন্দ নাহি ধরে। ৩০০॥

রাগিণী সাহানা। তাল ঝাঁপতাল।

ডেকেছেন প্রিয়তম, কে রহিবে ঘরে!
ডাকিতে এসেছি তাই চল' ত্বরা করে।
তাপিত হৃদয় যারা মুছিবি নয়ন-ধারা,
ঘুচিবে বিরহ তাপ কতদিন পরে।
আজি এ আকাশ মাঝে কি অদ্ভূত বীণা বাজে
পুলকে জগৎ আজি কি মধু শোভায় সাজে।
আজি এ মধুর ভবে, মধুর মিলন হবে,
তাঁহার সে প্রেম মুখ জেগেছে অন্তরে। ৩০১

রাগিণী দেশী টৌড়ী—তাল চিমা তেতালা।

ভবে কি ফিরিব ম্লান মুখে সখা,
জর জর প্রাণ কি জুড়াবে না।
আঁধার সংসারে আবার ফিরে যাব?
হৃদয়ের আশা পুরাবে না? ৩০২॥

রাগিণী কেদারা—তাল ঝাঁপতাল।

তুমি ধন্য ধন্যহে, ধন্য তব প্রেম,
ধন্য তোমার জগৎ রচনা।
এ কি অমৃতরসে চন্দ্র বিকাশিলে,
এ সমীরণ পূরিলে প্রাণ-হিল্লোলে।
এ কি প্রেমে তুমি ফুল ফুটাইলে,

কুসুমবন ছাইলে শ্যাম পল্লবে।
এ কি গভীর বাণী শিখালে সাগরে,
কি মধুগীতি তুলিলে নদী-কল্লোলে।
এ কি ঢালিছ সুধা মানব হৃদয়ে,
তাই হৃদয় গাইছে প্রেম-উল্লাসে। ৩০৩ ॥

রাগিণী দেশ—তাল একতালা।

তুমি ছেড়ে ছিলে ভুলে ছিলে বলে
হের গো কি দশা হয়েছে।
মলিন বদন মলিন হৃদয়
শোকে প্রাণ ডুবে রয়েছে।
বিরহীর বেশে এসেছি হেথায়,
জানাতে বিরহ বেদনা।
দরশন নেব তবে চলে যাব
অনেক দিনের বাসনা।
নাথ নাথ বলে ডাকিব তোমারে
চাহিব হৃদয়ে রাখিতে,
কাতর প্রাণের রোদন শুনিলে
আর কি পারিবে থাকিতে।
ও অমৃতরূপ দেখিব যখন
মুছিব নয়ন বারি হে।
আর উঠিব না, পড়িয়া রহিব
চরণতলে তোমারি হে। ৩০৪ ॥

ভজন—তাল ছেপকা।

তোমারেই প্রাণের আশা কহিব।
সুখে দুখে শোকে আঁধারে আলোকে
চরণে চাহিয়া রহিব।
কেন এ সংসারে পাঠালে আমারে
তুমিই জান তা' প্রভুগো!
তোমারি আদেশে রহিব এ দেশে
সুখ দুখ যাহা দিবে সহিব।
যদি বনে কভু পথ হারাই প্রভু
তোমারি নাম লয়ে ডাকিব,
বড়ই প্রাণ যবে আকুল হইবে
চরণ হৃদয়ে লইব,
তোমারি জগতে প্রেম বিলাইব,
তোমারি কার্য্য যা সাধিব,
শেষ হয়ে গেলে ডেকে নিয়ো কোলে
বিরাম আর কোথা পাইব! ৩০৫ ॥

রাগিণী দেশ খাম্বাজ—তাল ঝাঁপতাল।

তোমায় যতনে রাখিব হে, রাখিব কাছে।
প্রেম কুসুমের মধু সৌরভে
নাথ তোমারে ভুলাব হে।
তোমার প্রেমে সখা সাজিব সুন্দর,
হৃদয়হারী, তোমারি পথ রহিব চেয়ে।
আপনি আসিবে, কেমনে ছাড়িবে আর?
মধুর হাসি বিকাশি রবে হৃদয়াকাশে। ৩০৬ ॥

রাগিণী বড় হংস সারঙ্গ—তাল চৌতাল।

(তাঁহারে) আরতি করে চন্দ্র তপন,
দেবমানব বন্দে চরণ,
আসীন সেই বিশ্ব-শরণ
তাঁর জগৎ-মন্দিরে।
অনাদি কাল অনন্ত গগন
সেই অসীম মহিমা মগন,
তাহে তরঙ্গ উঠে সঘন
আনন্দ নন্দ নন্দ রে।
হাতে লয়ে ছয় ঋতুর ডালি,
পায়ে দেয় ধরা কুসুম ঢালি,
কতই বরণ কতই গন্ধ
কত গীত কত ছন্দ রে।
বিহগগীত গগন ছায়,
জলদ গায়, জলধি গায়,
মহা পবন হরষে ধায়
গাহে গিরিকন্দরে।
কত কত শত ভকত প্রাণ
হেরিছে পুলকে, গাহিছে গান,
পুণ্য কিরণে ফুটিছে প্রেম
টুটিছে মোহ বন্ধ রে। ৩০৭ ॥

রাগ ভৈরোঁ—তাল একতালা।

তাঁহার প্রেমে কে ডুবে আছে ?
চাহে না সে তুচ্ছ সুখ ধন মান।
বিরহ নাহি তার নাহিরে দুখ তাপ
সে প্রেমের নাহি অবসান। ৩০৮ ॥

রাগিণী বাহার—তাল আড়াঠেকা।

তাঁহার আনন্দধারা জগতে যেতেছে বয়ে,
এস সবে নরনারী আপন হৃদয় লয়ে।
সে আনন্দে উপবন, বিকসিত অনুক্ষণ,
সে আনন্দে ধায় নদী আনন্দ বারতা কয়ে।
সে পুণ্য নির্ঝর স্রোতে বিশ্ব করিতেছে স্নান,
রাখ সে অমৃত ধারা পূরিয়া হৃদয় প্রাণ।
তোমরা এসেছ তীরে শূন্য কি যাইবে ফিরে
শেষে কি নয়ননীরে ডুবিবে তৃষিত হ'য়ে,
চিরদিন এ আকাশ নবীন নীলিমাময়,
চিরদিন এ ধরণী যৌবনে ফুটিয়া রয়।
সে আনন্দরস পানে চিরপ্রেম জাগে প্রাণে,
দহেনা সংসার তাপ সংসার মাঝারে র'য়ে। ৩০৯

রাগিণী রামকেলী—তাল কাওয়ালি।

দাও হে হৃদয় ভরে দাও
তরঙ্গ উঠে উথলিয়া সুধাসাগরে
সুধারসে মাতোয়ারা করে দাও।
যেই সুধারস পানে ত্রিভুবন মাতে
তাহা মোরে দাও। ৩১০ ॥

রাগিণী আসাবরি টৌড়ী—তাল ভেওট।

দিন ত চলি গেল প্রভু বৃথা,
কাতরে কাঁদে হিয়া।
জীবন অহরহ হতেছে ক্ষীণ,
কি হল এ শূন্য জীবনে।
দেখাব কেমনে এই ম্লান মুখ
কাছে যাব কি লইয়া।
প্রভু হে যাইবে ভয়, পাব ভরসা,
তুমি যদি ডাক এ অধমে। ৩১১ ॥

রাগিণী টৌড়ী—তাল ঝাপতাল।

দুখ দিয়েছ, দিয়েছ ক্ষতি নাই
কেন গো একেলা ফেলে রাখ।
ডেকে নিলে, ছিল যারা কাছে,
তুমি তবে কাছে কাছে থাক';
প্রাণ কারো সাড়া নাহি পায়,
রবি শশী দেখা নাহি যায়,
এ পথে চলে যে অসহায়
তারে তুমি ডাক, প্রভু ডাক।
সংসারের আলো নিভাইলে,
বিষাদের আঁধার ঘনায়,
দেখাও তোমার বাতায়নে
চির-আলো জ্বলিছে কোথায়!
শুষ্ক নিঝরের ধারে রই,
পিপাসিত প্রাণ কাঁদে ওই,
অসীম প্রেমের উৎস কই,
আমারে তৃষিত রেখনাক।
কে আমার আত্মীয় স্বজন
আজ আসে, কাল চলে যায়!
চরাচর ঘুরিছে কেবল
জগতের বিশ্রাম কোথায়।
সবাই আপনা নিয়ে রয়,
কে কাহারে দিবে গো আশ্রয়,
সংসারের নিরাশ্রয় জনে
তোমার স্নেহেতে, নাথ ঢাক'। ৩১২ ॥

রাগিণী কামোদ—তাল ধামার।

দুয়ারে বসে আছি প্রভু সারা বেলা,
নয়নে বহে অশ্রুবারি।
সংসারে কি আছে হে হৃদয় না পূরে;
প্রাণের বাসনা প্রাণে লয়ে,
ফিরেছি হেথা দ্বারে দ্বারে।
সকল কেলি আমি এসেছি এখানে
বিমুখ হোয়ো না দীন হীনে
যা' ক'র হে রব পড়ে। ৩১৩ ।

রাগিণী রামকেলী—তাল ঝাঁপতাল।

দূর করিলে, দরশন দিয়ে মোহিলে প্রাণ!
লোক ভুলে শোক তোমারে চাহিয়ে
থায় আছি আমি দীন অতি দীন। ৩১৪ ॥

রাগ ভয়রোঁ—তাল ঝাঁপতাল।

দেখ চেয়ে দেখ্ তোরা জগতের উৎসব,
নরে, অনন্তকাল উঠে জয় জয় রব।
জগতের যত কবি, গ্রহতারা শশী রবি,
ন্ত আকাশে ফিরি গান গাহে নব নব।
সৌন্দর্য্য অনুপম না জানি দেখেছে তারা,
জানি করেছে পান কি মহা অমৃতধারা।
জানি কাহার কাছে, ছুটে তারা চলিয়াছে,
নন্দে ব্যাকুল যেন হয়েছে নিখিল ভব।
দেখ্‌রে আকাশে চেয়ে—কিরণে কিরণময়,
খ্‌রে জগতে চেয়ে— সৌন্দর্য্য-প্রবাহ বয়।
খি মোর কার দিকে চেয়ে আছে অনিমিখে;
কথা জাগিছে প্রাণে কেমনে প্রকাশি কব।
৩১৫ ॥

রাগিণী বেলাবলী—তাল কাওয়ালি।

দেখা যদি দিলে ছেড়োনা আর,।|
আমি অতি দীন হীন।|
নাহি কি হেথা পাপ মোহ বিপদ রাশি?
তোমা বিনা একেলা নাহি ভরসা। ৩১৬॥

রাগিণী বাহার—তাল একতালা।

পিতার দুয়ারে দাঁড়াইয়া সবে
ভুলে যাও অভিমান।
এস ভাই এস প্রাণে প্রাণে আজি
রেখোনারে ব্যবধান।
সংসারের ধুলা ধুয়ে ফেলে এস
মুখে লয়ে এস হাসি,
হৃদয়ের থালে লয়ে এস ভাই
প্রেম ফুল রাশি রাশি।
নীরস হৃদয়ে আপনা লইয়ে
রহিলে তাঁহারে ভুলে,
অনাথ জনের মুখপানে আহা
চাহিলে না মুখ তুলে
কঠোর আঘাতে ব্যথা পেলে কত
ব্যথিলে পরের প্রাণ!
তুচ্ছ কথা নিয়ে বিবাদে মাতিয়ে
দিবা হল অবসান।
তাঁর কাছে এসে তবুও কি আজি
আপনারে ভুলিবে না।
হৃদয় মাঝারে ডেকে নিতে তাঁরে
হৃদয় কি খুলিবে না।
লইব বাঁটিয়া সকলে মিলিয়া
প্রেমের অমৃত তাঁরি,
পিতার অসীম ধন রতনের
সকলেই অধিকারী। ৩১৭ ॥

রাগিণী আলাইয়া—তাল আড়াঠেকা।

প্রভু এলেম কোথায়!
কখন্ বরষ গেল, জীবন বহে গেল,
কখন কি যে হল জানিনে হায়!
আসিলাম কোথা হতে, যেতেছি কোন্ পথে,
ভাসি যে কাল স্রোতের তৃণের প্রায়!
মরণ-সাগর পানে চলেছি প্রতিক্ষণ,
তবুও দিবানিশি মোহেতে অচেতন!
এ জীবন অবহেলে আঁধারে দিনু ফেলে,
কত কি গেল চলে, কত কি যায়!
শোকে তাপে জরজর অসহ যাতনায়,
শুকায়ে গেছে প্রেম, হৃদয় মরু প্রায়—
কাঁদিয়া হলেম সারা, হয়েছি দিশাহারা,
কোথাগো ধ্রুব তারা, কোথাগো হায়।৩১৮

রাগিণী আশা ভৈরবী—তাল ঠুংরি।

বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি।
শুষ্ক হৃদয় লয়ে আছে দাঁড়াইয়ে
ঊর্দ্ধ মুখে নরনারী।

না থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহ পাশ,
না থাকে শোক পরিতাপ।
হৃদয় বিমল হোক্, প্রাণ সবল হোক্,
বিঘ্ন দাও অপসারি।
কেন এ হিংসা দ্বেষ, কেন এ ছদ্মবেশ,
কেন এ মান অভিমান!
বিতর বিতর প্রেম পাষাণ-হৃদয়ে
জয় জয় হোক্ তোমারি! ৩১৯ ॥

রাগিণী পূরবী—তাল আড়াঠেকা।

বর্ষ ওই গেল চলে।
কত দোষ করেছি যে, ক্ষমা কর, লহ কোলে।
শুধু আপনারে ল'য়ে সময় গিয়েছে ব'য়ে,
চাহিনি তোমার পানে ডাকি নাই পিতা বোলে!
অসীম তোমার দয়া, তুমি সদা আছ কাছে
অনিমেষ আঁখি তব মুখপানে চেয়ে আছে;
স্মরিয়ে তোমার স্নেহ, পুলকে পূরিছে দেহ,
প্রভুগো তোমারে কভু আর না রব ভুলে।
৩২০ ॥

রাগিণী কর্ণাটী ঝিঁঝিট—তাল কাওয়ালি।

বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকে লও,
ফিরায়ো না জননি!
দীনহীনে কেহ চাহে না,
তুমি তারে রাখিবে জানি গো,
আর আমি যে কিছু চাহিনে
চরণ-তলে বসে থাকিব,
আর আমি যে কিছু চাহিনে
জননী ব'লে শুধু ডাকিব।
তুমি না রাখিলে গৃহ আর পাইব কোথা,
কেঁদে কেঁদে কোথা বেড়াব!
ঐ যে হেরি তমস-ঘন-ঘোরা গহন রজনী। ৩২১

রাগিণী কাফি কানাড়া—তাল চিমাতেতালা।

বেঁধেছ প্রেমের পাশে ওহে প্রেমময়!
তব প্রেম লাগি দিবানিশি জাগি, ব্যাকুল হৃদয়।
তব প্রেমে কুসুম হাসে,
তব প্রেমে চাঁদ বিকাশে,
প্রেম হাসি তব উষা নব নব,
প্রেমে নিমগন নিখিল নীরব,
তব প্রেম তরে ফিরে হা হা ক'রে উদাসী ম
আকুল প্রাণ মম ফিরিবে না সংসারে,
ভুলেছে তোমার রূপে নয়ন আমারি।
জলে স্থলে গগনতলে,
তব সুধা বাণী সতত উথলে,
শুনিয়া পরাণ শান্তি না মানে,
ছুটে যেতে চায় অনন্তেরি পানে,
আকুল হৃদয় খোঁজে বিশ্বময়, ও প্রেম
আলয়। ৩২:

রাগিণী দরবারি টোড়ী—তাল চিমাতেতাল

ভব-কোলাহল ছাড়িয়ে বিরলে এসেছি হে
জুড়াব হিয়া তোমায় দেখি,
সুধা রসে মগন হব হে! ৩২৩।

রাগিণী কাফি—তাল একতালা।

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই,
চির দিন কেন পাই না!
কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে
তোমারে দেখিতে দেয় না!
ক্ষণিক আলোকে আঁখির পলকে
তোমায় যবে পাই দেখিতে,
হারাই হারাই সদা হয় ভয়
হারাইয়া ফেলি চকিতে।
কি করিলে বল পাইব তোমারে,
রাখিব আঁখিতে আঁখিতে,
এত প্রেম আমি কোথা পাব নাথ
তোমারে হৃদয়ে রাখিতে।
আর কারো পানে চাহিব না আর
করিব হে আমি প্রাণপণ,

তুমি যদি বল এখনি করিব
বিষয় বাসনা বিসর্জ্জন। ৩২৪ ॥

রাগিণী বিভাস—তাল ঝাঁপতাল।

রজনী পোঁহাইল, চলেছে যাত্রীদল
আকাশ পূরিল কলরবে,
সবাই যেতেছে মহোৎসবে।
কুসুম ফুটেছে বনে, গাহিছে পাখিগণে,
এমন প্রভাত কি আর হবে!
নিদ্রা আর নাই চোখে, বিমল অরুণালোকে
জাগিয়া উঠেছে আজি সবে।
চল গো পিতার ঘরে সাম্বাৎসরের তরে
প্রসাদ-অমৃত ভিক্ষা লবে।
ওই হের তাঁর দ্বার, জগতের পরিবার
হোথায় মিলেছে আজি সবে।
ভাই বন্ধু সবে মিলি করিতেছে কোলাকুলি
মাতিয়াছে প্রেমের উৎসবে।
যত চায় তত পায়, হৃদয় পূরিয়া যায়
গেহে ফিরে জয় জয় রবে,
সবার মিটেছে সাধ, লভিয়াছে আশীর্ব্বাদ
সংবৎসর আনন্দে কাটিবে। ৩২৫ ॥

মিশ্র দেশ খাম্বাজ। ঝাঁপতাল।

শোন শোন আমাদের ব্যথা
দেব দেব প্রভু দয়াময়,
আমাদের ঝরিছে নয়ন,
আমাদের ফাটিছে হৃদয়!
চিরদিন আঁধার না রয়
রবি উঠে নিশি দূর হয়
এ দেশের মাথার উপরে
এ নিশীথ হবে না কি ক্ষয়!
চিরদিন ঝরিবে নয়ন?
চিরদিন ফাটিবে হৃদয়?
মরমে লুকান' কত দুখ,
ঢাকিয়া রয়েছি ম্লান মুখ,
কাঁদিবার নাই অবসর
কথা নাই শুধু ফাটে বুক!
সঙ্কোচে ম্রিয়মাণ প্রাণ
দশদিশি বিভীষিকাময়,
হেন হীন দীনহীন দেশে
বুঝি তব হবে না আলয়।
চিরদিন ঝরিবে নয়ন
চিরদিন ফাটিবে হৃদয়!
কোন কালে তুলিব কি মাথা?
জাগিবে কি অচেতন প্রাণ?
ভারতের প্রভাত গগনে
উঠিবে কি তব জয় গান?
আশ্বাস বচন কোন ঠাঁই
কোন দিন শুনিতে না পাই,
শুনিতে তোমার বাণী তাই
মোরা সবে রয়েছি চাহিয়া!
বল প্রভু মুছিবে এ আঁখি
চিরদিন ফাটিবে না হিয়া! ৩২৬ ॥

রাগ ভৈরব—তাল আড়া চৌতাল।

শুভ্র আসনে বিরাজ অরুণ ছটামাঝে,
নীলাম্বরে, ধরণী পরে
কিবা মহিমা তব বিকাশিল।
দীপ্ত সূর্য্য তব মুকুটোপরি,
চরণে কোটি তারা মিলাইল,
আলোকে প্রেমে আনন্দে
সকল জগৎ বিভাসিল। ৩২৭ ॥

রাগ ভৈরব—তাল ঝাঁপতাল।

সকলেরে কাছে ডাকি, আনন্দ-আলয়ে থাকি
অমৃত করিছ বিতরণ,
পাইয়া অনন্ত প্রাণ জগৎ গাহিছে গান
গগনে করিয়া বিচরণ।
সূর্য্য শূন্য পথে ধায়, বিশ্রাম সে নাহি চায়
সঙ্গে ধায় গ্রহ পরিজন,

লভিয়া অসীম বল, ছুটিছে নক্ষত্র দল
চারিদিকে চলেছে কিরণ।
পাইয়া অমৃতধারা নব নব গ্রহ তারা
বিকাশিয়া উঠে অনুক্ষণ,
জাগে নব নব প্রাণ, চির জীবনের গান
পূরিতেছে অনন্ত গগন।
পূর্ণ লোক লোকান্তর, প্রাণে মগ্ন চরাচর,
প্রাণের সাগরে সন্তরণ,
জগতে যে দিকে চাই, বিনাশ বিরাম নাই,
অহরহ চলে যাত্রিগণ
মোরা সবে কীটবৎ, সম্মুখে অনন্ত পথ
কি করিয়া করিব ভ্রমণ!
অমৃতের কণা তব পাথেয় দিয়েছ প্রভো,
ক্ষুদ্র প্রাণে অনন্ত জীবন। ৩২৮ ॥

দক্ষিণী সুর—তাল একতালা।

সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে
শোন শোন পিতা।
কহ কাণে কাণে শুনাও প্রাণে প্রাণে
মঙ্গল বারতা।
ক্ষুদ্র আশা নিয়ে, রয়েছে বাঁচিয়ে,
সদাই ভাবনা—
যা কিছু পায় হারায়ে যায়,
না মানে সান্ত্বনা।
সুখ আশে দিশে দিশে
বেড়ায় কাতরে—
মরীচিকা ধরিতে চায়
এ মরু প্রান্তরে।
ফুরায় বেলা ফুরায় খেলা
সন্ধ্যা হয়ে আসে,
কাঁদে তখন আকুল মন
কাঁপে তরাসে।
কি হবে গতি বিশ্বপতি,
শান্তি কোথা আছে।

তোমারে দাও আশা পূরাও
তুমি এস কাছে। ৩২৯ ॥

রাগিণী টৌড়ী—তাল একতালা।

সখা, তুমি আছ কোথা,
সারা বরষের পরে জানাতে এসেছি ব্যথা
কত মোহ, কত পাপ, কত শোক, কত তাপ
কত যে সয়েছি আমি, তোমারে কব সে ক
যে শুভ্র জীবন তুমি মোরে দিয়েছিলে সখা
দেখ আজি কত তাহে পড়েছে কলঙ্ক রেখা
এনেছি তোমারি কাছে, দাও তাহা, দাও মু
নয়নে ঝরিছে বারি, সভয়ে এসেছি পিতা
দেখ, দেব চেয়ে দেখ, হৃদয়েতে নাহি বল,
সংসারের বায়ুবেগে করিতেছে টলমল,
লহ সে হৃদয় তুলে, রাখ' তব পদমূলে,
সারাটি বরষ যেন নির্ভয়ে সে রহে সেথা।৩

রাগিণী দেশ সিন্ধু—তাল ঠুংরি।

সংশয় তিমির মাঝে না হেরি গতি হে।
প্রেম-আলোকে প্রকাশ' জগপতি হে।
বিপদে সম্পদে থেকো না দূরে
সতত বিরাজ হৃদয় পুরে—
তোমাবিনে অনাথ আমি অতি হে।
মিছে আশা লয়ে সতত ভ্রান্ত,
তাই প্রতিদিন হতেছি শ্রান্ত,
তবু চঞ্চল বিষয়ে মতি হে—
নিবার' নিবার' প্রাণের ক্রন্দন
কাট হে কাট হে এ মায়া বন্ধন,
রাখ রাখ চরণে এ মিনতি হে। ৩৩১ ॥

রাগিণী আলাইয়া—তাল আড়াঠেকা।

সংসারেতে চারিধার করিয়াছে অন্ধকার,
নয়নে তোমার জ্যোতি অধিক ফুটেছে তা
চৌদিকে বিষাদ ঘোরে ঘেরিয়া ফেলেছে মো
তোমার আনন্দ মুখ হৃদয়ে দেখিতে পাই।

ফেলিয়া শোকের ছায়া মৃত্যু ফিরে পায় পায়,
যতনের ধন যত কেড়ে কেড়ে নিয়ে যায়।
তবু সে মৃত্যুর মাঝে অমৃত মুরতি রাজে
মৃত্যুশোক পরিহরি ওই মুখ পানে চাই।
তোমার আশ্বাস বাণী শুনিতে পেয়েছি প্রভু
মিছে ভয় মিছে শোক আর করিব না কভু।
হৃদয়ের ব্যথা কব, অমৃত যাচিয়া লব,
তোমার অভয় কোলে
পেয়েছি পেয়েছি ঠাঁই। ৩৩২ ॥

রাগিণী মিশ্র—তাল ঝাঁপতাল।

হাতে লয়ে দীপ অগণন চরাচর কার সিংহাসন
নীরবে করিছে প্রদক্ষিণ ?
চারি দিকে কোটি কোটি লোক,
লয়ে নিজ সুখ দুঃখ শোক
চরণে চাহিয়া চিরদিন !
সূর্য্য তাঁরে কহে অনিবার
"মুখ পানে চাহ একবার,
ধরণীরে আলো দিব আমি।"
চন্দ্র কহিতেছে গান গেয়ে,
"হাস প্রভু মোর পানে চেয়ে।
জ্যোৎস্নাসুধা বিতরিব আমি।"
মেঘ গাহে চরণে তাঁহার
"দেহ প্রভু করুণা তোমার,
ছায়া দিব, দিব বৃষ্টি জল !
বসন্ত গাহিছে অনুক্ষণ
"কহ তুমি আশ্বাস বচন
শুষ্ক শাখে দিব ফুল ফল।"
করযোড়ে কহে নর নারী
"হৃদয়ে দেহ গো প্রেম-বারি,
জগতে বিলাব ভালবাসা।"

"পুরাও পুরাও মনস্কাম"—
কাহারে ডাকিছে অবিশ্রাম
জগতের ভাষাহীন ভাষা। ৩৩৩ ॥

রাগিণী আসাবরি—তাল কাওয়ালি।

অনেক দিয়েছ নাথ,
আমার বাসনা তবু পূরিল না।
দীন দশা ঘুচিল না অশ্রুবারি মুছিল না,
গভীর প্রাণের তৃষা মিটিল না মিটিল না।
দিয়েছ জীবন মন প্রাণপ্রিয় পরিজন
সুধাস্নিগ্ধ সমীরণ, নীলকান্ত অম্বর
শ্যাম শোভা ধরণী।
এত যদি দিলে সখা আরো দিতে হবে হে,
তোমারে না পেলে আমি ফিরিব না ফিরিব না
॥ ৩৩৪॥

রাগিণী ধুন—তাল ঠুংরি।

অন্ধ জনে দেহ আলো
মৃত জনে দেহ প্রাণ।
তুমি করুণামৃত সিন্ধু
কর করুণা-কণা দান।
শুষ্ক হৃদয় মম, কঠিন পাষাণসম,
প্রেম-সলিল-ধারে
সিঞ্চহ শুষ্ক নয়ান।
যে তোমারে ডাকে না হে
তারে তুমি ডাক ডাক।
তোমা হতে দূরে যে যায়
তারে তুমি রাখ' রাখ'।
তৃষিত যে জন ফিরে
তব সুধাসাগর তীরে,
জুড়াও তাহারে স্নেহ-নীরে
সুধা করাও হে পান !
তোমারে পেয়েছিনু যে
কখন্ হারানু অবহেলে,
কখন্ ঘুমাইনু হে
আঁধার হেরি আঁখি মেলে।
বিরহ জানাইব কায়,
সান্ত্বনা কে দিবে হায়,

বরষ বরষ চলে যায় হেরিনি প্রেম বয়ান,—
দরশন দাও হে দাও হে দাও
কাঁদে হৃদয় ম্রিয়মাণ। ৩৩৫ ॥

রাগিণী কেদারা—তাল আড়াঠেকা।

আইল আজি প্রাণসখা দেখরে নিখিল জন।
আসন বিছাইল নিশীথিনী গগনতলে,
গ্রহতারা সভা ঘেরিয়া দাঁড়াইল।
নীরবে বনগিরি আকাশে রহিল চাহিয়া,
থামাইল ধরা দিবস কোলাহল। ৩৩৬ ॥

রাগিণী সাহানা—তাল কাওয়ালি।

আজ বুঝি আইল প্রিয়তম,
চরণে সকলে আকুল ধাইল।
কত দিন পরে মন মাতিল গানে
পূর্ণ আনন্দ জাগিল প্রাণে,
ভাই বলে ডাকি সবারে,
ভুবন সুমধুর প্রেমে ছাইল। ৩৩৭ ॥

রাগিণী বাহার—তাল তেওরা।

আজি বহিছে বসন্ত পবন সুমন্দ
তোমারি সুগন্ধ হে।
কত আকুল প্রাণ আজি গাহিছে গান
চাহে তোমারি পানে আনন্দে হে ॥
জ্বলে তোমার আলোক দ্যুলোক ভূর্লোকে
গগন উৎসব প্রাঙ্গণে—
চির-জ্যোতি পাইছে চন্দ্র তারা
আঁখি পাইছে অন্ধ হে ॥
তব মধুর মুখ-ভাতি-বিহসিত
প্রেম-বিকশিত অন্তরে—
কত ভকত ডাকিছে "নাথ যাচি
দিবস রজনী তব সঙ্গ হে"।
উঠে সজনে প্রান্তরে লো' লোকান্তরে
যশোগাথা কত ছন্দ হে।
ঐ ভবশরণ প্রভু অভয়পদ তব
সুর মানব মুনি বন্দে হে ॥ ৩৩৮ ॥

রাগিণী হাম্বীর—তাল চৌতাল।

আনন্দ রয়েছে জাগি ভুবনে তোমার
তুমি সদা নিকটে আছ বলে।
স্তব্ধ অবাক নীলাম্বরে রবি শশী তারা
গাঁথিছে হে শুভ্র কিরণ মালা।
বিশ্ব পরিবার তোমার ফেরে সুখে আকাশে,
তোমার ক্রোড় প্রসারিত ব্যোমে ব্যোমে।
আমি দীন সন্তান আছি সেই তব আশ্রয়ে,
তব স্নেহ মুখ পানে চাহি চিরদিন। ৩৩৯

রাগিণী দেশ সিন্ধু—তাল একতালা।

আমার যা আছে আমি সকল দিতে পারিনি তোমারে নাথ।
আমার লাজভয় আমার মান অপমান সুখ দুখ ভাবনা।
মাঝে রয়েছে আবরণ কত শত কত মত
তাই কেঁদে ফিরি, তাই তোমারে না পাই,
মনে থেকে যায় তাই মনের বেদনা।
যাহা রেখেছি তাহে কি সুখ, তাহে কেঁদে মরি তাহে ভেবে মরি!
তাই দিয়ে যদি তোমারে পাই (জানি না) কেন তা দিতে পারি না,
আমার জগতের সব তোমারে দেব,
দিয়ে তোমায় নেব বাসনা ॥ ৩৪০ ॥

রাম প্রসাদী সুর।

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে
ঘরের হয়ে পরের মতন
ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে
প্রাণের মাঝে থেকে থেকে
আয় বলে ওই ডেকেছে কে!
সেই গভীর স্বরে উদাস করে
আর কে কারে ধরে রাখে।
যেথায় থাকি যে যেখানে,
বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে,

সেই প্রাণের টানে টেনে আনে
সেই প্রাণের বেদন জানে না কে!
মান অপমান গেছে ঘুচে,
নয়নের জল গেছে মুছে,
নবীন আসে হৃদয় ভাসে
ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে।
কত দিনের সাধন ফলে
মিলেছি আজ দলে দলে
আজ ঘরের ছেলে সবাই মিলে
দেখা দিয়ে আয় রে মাকে ॥ ৩৪১ ॥

রাগিণী ভৈরো—তাল ঝাঁপতাল।

আমারেও কর মার্জ্জনা।
আমারেও দেহ নাথ অমৃতের কণা।
গৃহ ছেড়ে পথে এসে, বসে আছি ম্লান বেশে,
আমারো হৃদয়ে কর আসন রচনা।
জানি আমি, আমি তব মলিন সন্তান।
আমারেও দিতে হবে পদতলে স্থান।
আপনি ডুবেছি পাপে কাঁদিতেছি মনস্তাপে।
শুনগো আমারো এই মরম-বেদনা। ৩৪২ ॥

রাগিণী রামকেলী—তাল ঝাঁপতাল।

আমি দীন অতি দীন—
কেমনে শুধিব নাথ হে তব করুণা-ঋণ!
তব স্নেহ শত ধারে ডুবাইছে সংসারে
তাপিত হৃদি মাঝে ঝরিছে নিশি দিন।
হৃদয়ে যা আছে, দিব তব কাছে,
তোমারি এ প্রেম দিব তোমারে—
চিরদিন তব কাজে, রহিব জগৎ মাঝে
জীবন করেছি তোমার চরণতলে লীন। ৩৪৩ ॥

রাগিণী মূলতান—তাল একতালা।

আমায় ছ'জনায় মিলে পথ দেখায় বলে!
পদে পদে পথ ভুলি হে।
নানা কথার ছলে নানান্ মুনি বলে
সংশয়ে তাই দুলি হে!
তোমার কাছে যাব এই ছিল সাধ,
তোমার বাণী শুনে ঘুচাব প্রমাদ,
কাণের কাছে সবাই করিছে বিবাদ
শত লোকের শত বুলি হে।
কাতর প্রাণে আমি তোমায় যখন যাচি
আড়াল করে সবাই দাঁড়ায় কাছাকাছি,
ধরণীর ধূলো তাই নিয়ে আছি
পাইনে চরণ ধূলি হে।
শত ভাগ মোর শত দিকে ধায়
আপনা আপনি বিবাদ বাধায়,
কারে সামালিব, এ কি হল দায়,
একা যে অনেক গুলি হে!
আমায় এক কর তোমার প্রেমে বেঁধে
এক পথ আমায় দেখাও অবিচ্ছেদে,
ধাঁধার মাঝে পড়ে কত মরি কেঁদে
চরণেতে লহ তুলি হে। ৩৪৪ ॥

ঝিঁঝিট। একতালা।

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্,
জগৎ জনের শ্রবণ জুড়াক্,
হিমাদ্রি পাষাণ কেঁদে গলে যাক্,
মুখ তুলে আজি চাহরে।
দাঁড়া দেখি তোরা আত্মপর ভুলি,
হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক্ বিজুলি,
প্রভাত গগনে কোটি শির তুলি
নির্ভয়ে আজি গাহরে।
বিশ কোটি কণ্ঠে মা বলে ডাকিলে
রোমাঞ্চ [illegible] অনন্ত নিখিলে,
বিশ [illegible] মায়েরে ঘেরিলে
দশদিক্ সুখে হাসবে।
সে দিন প্রভাতে নূতন তপন
নূতন জীবন করিবে বপন,
এ নহে কাহিনী এহে স্বপন
আসিবে সে দিন আসিবে।

আপনার মায়ে মা বলে ডাকিলে,
আপনার ভায়ে হৃদয়ে রাখিলে,
সব পাপ তাপ দূরে যায় চলে
পুণ্য প্রেমের বাতাসে।
সেথায় বিরাজে দেব আশীর্ব্বাদ
না থাকে কলহ না থাকে বিবাদ,
ঘুচে অপমান, জেগে ওঠে প্রাণ,
বিমল প্রতিভা বিকাশে ॥ ৩৪৫ ॥

রাগিণী বাহার—তাল ধামার।

এত আনন্দ ধ্বনি উঠিল কোথায়!
জগৎপুরবাসী সবে কোথায় ধায়!
কোন্ অমৃত ধনের পেয়েছে সন্ধান!
কোন সুধা করে পান!
কোন্ আলোকে আঁধার দূরে যায়! ৩৪৬ ॥

রাগিণী মিশ্র বিভাস—তাল আড়াঠেকা।

এবার বুঝেছি সখা এ খেলা কেবলি খেলা।
মানব জীবন লয়ে এ কেবলি অবহেলা।
তোমারে নহিলে আর ঘুচিবেনা হাহাকার
কি দিয়ে ভুলায়ে রাখ কি দিয়ে কাটাও বেলা।
বৃথা হাসে রবি শশী বৃথা আসে দিবানিশি,
সহসা পরাণ কাঁদে শূন্য হেরি দশদিশি!
তোমারে খুঁজিতে এসে কি লয়ে রয়েছি শেষে,
ফিরিগো কিসের লাগি এ অসীম
মহামেলা ॥ ৩৪৭ ॥

রাগিণী শঙ্কর—তাল ঝাঁপতাল।

কি ভয় অভয় ধামে, তুমি মহারাজা,
ভয় যায় তব নামে।
নির্ভয়ে অযুত সহস্র লোক ধায় হে
গগনে গগনে সেই অভয় নাম গায় হে।
তব বলে কর বলী যারে কৃপাময়
লোকভয় বিপদ মৃত্যু ভয় দূর হয় তার,
আশা বিকাশে সব বন্ধন ঘুচে,
নিত্য অমৃতরস পায় হে। ৩৪৮ ॥

রাগিণী ভৈরোঁ—তাল ঝাঁপতাল।

কেন বাণী তব নাহি শুনি নাথ হে।
অন্ধ জনে নয়ন দিয়ে অন্ধকারে ফেলিলে,
বিরহে তব কাটে দিন রাত হে।
স্বপন সম মিলাবে যদি কেন গো দিলে চেতনা,
চকিতে শুধু দেখা দিয়ে চির মরম-বেদনা,
আপনাপানে চাহি শুধু নয়ন জলপাত হে।
পরশে তব জীবন নব সহসা যদি জাগিল,
কেন জীবন বিফল কর মরণ শরঘাত হে।
অহঙ্কার চূর্ণ কর প্রেমে মন পূর্ণ কর
হৃদয় মন হরণ করি রাখ তব সাথে হে। ৩৪৯ ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল যৎ।

কেন জাগে না জাগে না অবশ পরাণ।
নিশিদিন অচেতন ধূলি-শয়ান।
জাগিছে তারা নিশীথ আকাশে
জাগিছে শত অনিমেষ নয়ান।
বিহগ গাহে বনে ফুটে ফুলরাশি,
চন্দ্রমা হাসে সুধাময় হাসি।
তব মাধুরী কেন জাগেনা প্রাণে
কেন হেরি না তব প্রেম বয়ান!
পাই জননীর অযাচিত স্নেহ
ভাই ভগিনী মিলি মধুময় গেহ।
কত ভাবে সদা তুমি আছ হে কাছে
কেন করি তোমা হতে দূরে প্রয়াণ। ৩৫০ ॥

রাগিণী টোড়ী—তাল একতালা।

গাও বীণা, বীণা গাওরে।—
অমৃত মধুর তাঁর প্রেম গান
মানব সবে শুনাওরে।
মধুর তানে নীরস প্রাণে
মধুর প্রেম জাগাওরে।
ব্যথা দিওনা কাহারে ব্যথিতেরে ওরে
পাষাণ প্রাণ কাঁদাওরে!
নিরাশেরে কত আশার কাহিনী

প্রাণে নববল দাওরে।
আনন্দময়ের আনন্দ আলয়
নব নব,তানে ছাওরে,
পড়ে থাক সদা বিভুর চরণে,
আপনারে ভুলে যাওরে। ৩৫১ ॥

রাগিণী কানেড়া—তাল কাওয়ালি।
ঘোরা রজনী এ, মোহ ঘনঘটা
কোথা গৃহ হায়, পথে বসে।
সারাদিন করি খেলা খেলা যে ফুরাইল,
গৃহ চাহিয়া প্রাণ কাঁদে। ৩৫২ ॥

রাগিণী মিশ্র ঝিঁঝিট—তাল কাওয়ালি।
চাহিনা সুখে থাকিতে হে।
হের কত দীন জন কাঁদিছে।
কত শোকের ক্রন্দন গগনে উঠিছে,
জীবন বন্ধন নিমেষে টুটিছে;
কত ধূলিশায়ী জন মলিন জীবন
সরমে চাহে ঢাকিতে হে।
শোকে হাহাকারে বধির শ্রবণ
শুনিতে না পাই তোমার বচন,
হৃদয়-বেদন করিতে মোচন
কারে ডাকি কারে ডাকিতে হে।
আশার অমৃত ঢালি দাও প্রাণে,
আশীর্ব্বাদ কর আতুর সন্তানে,
পথহারা জনে ডাকি গৃহ পানে
চরণে হবে রাখিতে হে।
প্রেম দাও, শোকে করিতে সান্ত্বনা,
ব্যথিত জনের ঘুচাতে যন্ত্রণা,
তোমার কিরণ করহ প্রেরণ
অশ্রু আকুল আঁখিতে হে। ৩৫৩ ॥

রাগিণী নট মল্লার—তাল চৌতাল।
চির দিবস নব মাধুরী নব শোভা তব বিশ্বে
নব কুসুম-পল্লব নব গীত নব আনন্দ।
নব জ্যোতি বিভাসিত, নব প্রাণ বিকশিত,
নব প্রীতি প্রবাহ হিল্লোলে।
চারিদিকে চিরদিন নবীন লাবণ্য
তব প্রেম নয়ন ছটা।
হৃদয়-স্বামী তুমি চির প্রবীণ,
তুমি চির নবীন,চির মঙ্গল চির সুন্দর।৩৫৪॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ধামার।
ডাকিছ কে তুমি তাপিত জনে
তাপ হরণ স্নেহ কোলে।
নয়ন-সলিলে ফুটেছে হাসি
ডাক শুনে সবে ছুটে চলে
তাপ হরণ স্নেহ কোলে!
ফিরিছে যারা পথে পথে
ভিক্ষা মাগিছে দ্বারে দ্বারে,
শুনেছে তাহারা তব করুণা,
দুখী জনে তুমি নেবে তুলে
তাপ হরণ স্নেহ কোলে। ৩৫৫ ॥

মিশ্র ললিত—তাল একতালা।
ডাকিছ শুনি জাগিনু প্রভু
আসিনু তব পাশে।
আঁখি ফুটিল চাহি উঠিল
চরণ-দরশ আশে।
খুলিল দ্বার, তিমির ভার
দূর হইল ত্রাসে।
হেরিল পথ বিশ্ব জগৎ
ধাইল নিজ বাসে।
বিমল-কিরণ প্রেম আঁখি
সুন্দর পরকাশে।
নিখিল তায় অভয় পায়
সকল জগৎ হাসে।
কানন সব ফুল্ল আজি
সৌরভ তব ভাসে।
মুগ্ধ-হৃদয় মত্ত মধুপ
প্রেম-কুসুম-বাসে।
উজ্জ্বল যত ভকতহৃদয়
মোহ-তিমির নাশে।

দাও নাথ প্রেম-অমৃত
বঞ্চিত তব দাসে।৩৫৬॥

রাগিণী পরজ—তাল কাওয়ালি।

তব প্রেম সুধারসে মেতেছি,
ডুবেছে মন ডুবেছে।
কোথা কে আছে নাহি জানি,
তোমার মাধুরী পানে মেতেছি
ডুবেছে মন ডুবেছে। ৩৫৭ ॥

রাগিণী গৌড়—তাল চৌতাল।

তুমি জাগিছ কে!
তব আঁখি জ্যোতি ভেদ করে সঘন গহন
তিমির রাতি!
চাহিছ হৃদয়ে অনিমেষ নয়নে,
সংশয়-চপল প্রাণ কম্পিত ত্রাসে।
কোথা লুকাব তোমা হতে স্বামী,
এ কলঙ্কিত জীবন তুমি দেখিছ জানিছ,
প্রভু ক্ষমা কর হে!
তব পদ প্রান্তে বসি একান্তে দাও কাঁদিতে
আমায় আর কোথা যাই! ৩৫৮ ॥

রাগিণী মিশ্র জয়জয়ন্তী—তাল একতালা।

তুমি বন্ধু, তুমি নাথ, নিশিদিন তুমি আমার,
তুমি সুখ, তুমি শান্তি, তুমি হে অমৃত পাথার।
তুমিইত আনন্দ লোক জুড়াও প্রাণ, নাশ শোক
তাপ হরণ তোমার চরণ অসীম শরণ
দীন জনার। ৩৫৯ ॥

রাগিণী পূরবী—তাল চৌতাল।

তোমা লাগি নাথ জাগি জাগিছে
সুখ নাই জীবনে তোমা বিনা।
সকলে চলে যায় ফেলে চির শরণ হে,
তুমি কাছে থাক সুখে দুখে নাথ
পাপে তাপে আর কেহ নাহি।৩৬০

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঝাঁপতাল।

তোমারে জানিনে হে তবু মন তোমাতে ধায়।
তোমারে না জেনে বিশ্ব তবু তোমাতে বিরাম
পায়।
অসীম সৌন্দর্য্য তব কে করেছে অনুভব হে,
সে মাধুরী চির নব,
আমি না জেনে প্রাণ সঁপেছি তোমায়।
তুমি জ্যোতির জ্যোতি আমি অন্ধ আঁধারে,
তুমি মুক্ত মহীয়ান্ আমি মগ্ন পাথারে,
তুমি অন্তহীন আমি ক্ষুদ্র দীন,
কি অপূর্ব্ব মিলন তোমায় আমায়! ৩৬১ ॥

রাগিণী ইমন ভূপালী—তাল একতালা।

তোমার কথা হেথা কেহত বলে না,
করে শুধু মিছে কোলাহল।
সুধাসাগরের তীরেতে বসিয়া
পান করে শুধু হলাহল।
আপনি কেটেছে আপনার মূল,
না জানে সাঁতার নাহি পায় কূল,
স্রোতে যায় ভেসে, ডোবে বুঝি শেষে,
করে দিবানিশি টলমল।
আমি কোথা যাব কাহারে শুধাব,
নিয়ে যায় সবে টানিয়া,
একেলা আমারে ফেলে যাবে শেষে
অকূল পাথারে আনিয়া!
সুহৃদের তরে চাই চারিধারে,
আঁখি করিতেছে ছলছল্।
আপনার ভারে মরি যে আপনি
কাঁপিছে হৃদয় হীনবল। ৩৬২ ॥

রাগিণী গৌড় মল্লার। তাল কাওয়ালি।

তোমায় দেখা পাব বলে এসেছি যে সখা
শুন প্রিয়তম হে, কোথা আছ লুকাইয়ে,
তব গোপন বিজন গৃহে লয়ে যাও।
দেহগো সরায়ে তপন তারকা'
আবরণ সব দূর কর হে,
মোচন কর তিমির,

জগৎ আড়ালে থেক না বিরলে
লুকায়োনা আপনারি মহিমা মাঝে,
তোমার গৃহের দ্বার খুলে দাও। ৩৬৩ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল চৌতাল।

তোমারি মধুর রূপে ভরেছ ভুবন,
মুগ্ধ নয়ন মম পুলকিত মোহিত মন।
তরুণ অরুণ নবীন ভাত,
পূর্ণিমা প্রসন্ন রাতি,
রূপ রাশি বিকশিত তনু কুসুম বন।
তোমা পানে চাহি সকলে সুন্দর,
রূপ হেরি আকুল অন্তর,
তোমারে ঘেরিয়া ফিরে নিরন্তর তোমার
প্রেম চাহি।
উঠে সঙ্গীত তোমার পানে,
গগন পূর্ণ প্রেম গানে,
তোমার চরণ করেছে বরণ
নিখিল জন। ৩৬৪ ॥

রাগিণী কাফি—তাল যৎ।

তার' তার' হরি দীন জনে।
ডাক তোমার পথে করুণাময়
পূজন-সাধন-হীন জনে।
অকূল সাগরে না হেরি ত্রাণ,
পাপে তাপে জীর্ণ এ প্রাণ,
মরণ মাঝারে শরণ দাও হে
রাখ এ দুর্ব্বল ক্ষীণ জনে।
ঘেরিল যামিনী নিভিল আলো,
বৃথা কাজে মম দিন ফুরালো,
পথ নাহি প্রভু পাথেয় নাহি,
ডাকি তোমারে প্রাণপণে
দিকহারা সদা মরি যে ঘুরে
যাই তোমা হতে দূর সুদূরে,
পথ হারাই রসাতল পুরে
অন্ধ এ লোচন মোহ ঘনে। ৩৬৫ ॥

রাগিণী আসাবরি—তাল ঝাঁপতাল।

দীর্ঘ জীবন পথ, কত দুঃখ তাপ,
কত শোক দহন—
গেয়ে চলি তবু তাঁর করুণার গান।
খুলে রেখেছেন তাঁর অমৃত ভবন দ্বার
শ্রান্তি ঘুচিবে অশ্রু মুছিবে
এ পথের হবে অবসান।
অনন্তের পানে চাহি আনন্দের গান গাহি
ক্ষুদ্র শোক তাপ নাহি নাহি রে—
অনন্ত আলয় যার কিসের ভাবনা তার
নিমেষের তুচ্ছ ভারে হব নারে ম্রিয়মাণ। ৩৬৬ ॥

গৌড়সারং—তাল একতালা।

দুখের কথা তোমায় বলিব না,
দুখ ভুলেছি ও কর-পরশে।
যা-কিছু দিয়েছ তাই পেয়ে নাথ,
সুখে আছি আছি হরষে।
আনন্দ-আলয় এ মধুর ভব,
হেথা আমি আছি, এ কি স্নেহ তব,
তোমার চন্দ্রমা তোমার তপন
মধুর কিরণ বরষে।
কত নব হাসি ফুটে ফুল বনে
প্রতিদিন নব প্রভাতে,
প্রতি নিশি কত গ্রহ কত তারা
তোমার নীরব সভাতে।
জননীর স্নেহ সুহৃদের প্রীতি
শতধারে সুধা ঢালে নিতি নিতি,
জগতের প্রেম, মধুর মাধুরী,
ডুবায় অমৃত-সরসে।
ক্ষুদ্র মোরা তবু না জানি মরণ,
দিয়েছ তোমার অভয় শরণ,
শোক তাপ সব হয় হে হরণ
তোমার চরণ দরশে।
প্রতি দিন যেন বাড়ে ভালবাসা,

প্রতিদিন মিটে প্রাণের পিপাসা,
পাই নব প্রাণ, জাগে নব আশা
নব নব নব-বরষে। ৩৬৭ ॥

রাগিণী দেওগিরি—তাল সুরফাকতাল।

দেবাধিদেব মহাদেব।
অসীম সম্পদ অসীম মহিমা।
মহাসভা তব অনন্ত আকাশে
কোটি কণ্ঠ গাহে জয় জয় জয় হে। ৩৬৮ ॥

যোগিয়া বিভাস—একতালা।

নয়ন তোমারে পায়না দেখিতে
রয়েছে নয়নে নয়নে।
হৃদয় তোমারে পায়না জানিতে
হৃদয়ে রয়েছ গোপনে।

বাসনার বশে মন অবিরত
ধায় দশদিশে পাগলের মত,
স্থির আঁখি তুমি মরমে সতত
জাগিছ শয়নে স্বপনে।
সবাই ছেড়েছে নাই যার কেহ,
তুমি আছ তার আছে তব স্নেহ,
নিরাশ্রয় জন পথ যার গেহ,
সেও আছে তব ভবনে।
তুমি ছাড়া কেহ সাথী নাই আর
সমুখে অনন্ত জীবন বিস্তার,
কাল পারাবার করিতেছে পার,
কেহ নাহি জানে কেমনে।
জানি শুধু তুমি আছ তাই আছি,
তুমি প্রাণময় তাই আমি বাঁচি,
যত পাই তোমায় আরো তত যাচি,
যত জানি তত জানিনে।
জানি আমি তোমায় পাব নিরন্তর,
লোক লোকান্তরে যুগ যুগান্তর,
তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই,
কোন বাধা নাই ভুবনে। ৩৬৯ ॥

যোগিয়া—তাল কাওয়ালি।

নিশি দিন চাহরে তাঁর পানে।
বিকশিবে প্রাণ তাঁর গুণ-গানে।
হেররে অন্তরে সে মুখ সুন্দর
ভোল দুখ তাঁর প্রেম মধু পানে। ৩৭০ ॥

রাগিণী রামকেলী—তাল কাওয়ালি।

নিকটে দেখিব তোমারে করেছি বাসনা মনে
চাহিব নাহে চাহিব নাহে দূর দূরান্তর গগনে।
দেখিব তোমারে গৃহ মাঝারে, জননী স্নেহে
ভ্রাতৃ প্রেমে, শত সহস্র মঙ্গল বন্ধনে।
হেরিব উৎসব মাঝে, মঙ্গল কাজে,
প্রতিদিন হেরিব জীবনে।
হেরিব উজ্জ্বল বিমল মূর্ত্তি তব
শোকে দুঃখে মরণে,
হেরিব সজনে নরনারী মুখে হেরিব বিজনে
বিরলে হে গভীর অন্তরে আসনে। ৩৭১।

গৌড়সারং—তাল চৌতাল।

পেয়েছি সন্ধান তব অন্তর্যামী,
অন্তরে দেখেছি তোমারে।
চকিতে চপল আলোকে হৃদয় শতদল মাঝে
হেরিনু এ কি অপরূপ রূপ।
কোথা ফিরিতেছিলাম পথে, পথে দ্বারে দ্বারে,
মাতিয়া কলরবে।
সহসা কোলাহল মাঝে শুনেছি তব আহ্বান,
নিভৃত হৃদয় মাঝে
মধুর গভীর শান্তবাণী। ৩৭২ ॥

রাগিণী খট্—তাল ঝাঁপতাল।

পেয়েছি অভয়পদ আর ভয় কারে।
আনন্দে চলেছি ভবপারাবার পারে।
মধুর শীতল ছায়, শোক তাপ দূরে যায়,
করুণা কিরণ তাঁর অরুণ বিকাশে।
জীবনে মরণে আর কভু না ছাড়িব তাঁরে। ৩৭৩

গুর্জরী তোড়ি—তাল চৌতাল।

প্রভাতে বিমল আনন্দে বিকশিত কুসুমগন্ধে
বিহঙ্গম গীত ছন্দে তোমার আভাস পাই।
জাগে বিশ্ব তব ভবনে প্রতি দিন নব জীবনে,
অগাধ শূন্য পূরে কিরণে,
খচিত নিখিল বিচিত্র বরণে,
বিরল আসনে বসি তুমি সব দেখিছ চাহি।
চারি দিকে করে খেলা,
বরণ কিরণ জীবন মেলা,
কোথা তুমি অন্তরালে,
অন্ত কোথায়, অন্ত কোথায়,
অন্ত তোমার নাহি নাহি। ৩৭৪ ॥

রাগিণী টোড়ী ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

ফিরোনা ফিরোনা আজি, এসেছ দুয়ারে,
শূন্য হাতে কোথা যাও শূন্য সংসারে।
আজ তাঁরে যাও দেখে, হৃদয়ে আনগো ডেকে,
অমৃত ভরিয়া লও মরম মাঝারে।
শুষ্ক প্রাণ শুষ্ক রেখে কার পানে চাও—
শূন্য দুটো কথা শুনে কোথা চলে যাও।
তোমার কথা তাঁরে কয়ে তাঁর কথা যাও লয়ে,
চলে যাও তাঁর কাছে রেখে আপনারে। ৩৭৫॥

রাগিণী আলাইয়া—তাল একতালা।

বসে আছি হে কবে শুনিব তোমার বাণী।
কবে বাহির হইব জগতে মম জীবন ধন্য মানি।
কবে প্রাণ জাগিবে তব প্রেম গাহিবে,
দ্বারে দ্বারে ফিরি সবার হৃদয় চাহিবে,
নর নারী মন করিয়া হরণ চরণে দিবে আনি।
কেহ শুনে না গান জাগে না প্রাণ
বিফলে গীত অবসান,
তোমার বচন করিব রচন সাধ্য নাহি নাহি।
তুমি না কহিলে কেমনে কব,
প্রবল অজেয় বাণী তব,
তুমি যা বলিবে তাই বলিব,
আমি কিছুই না জানি,
তব নামে আমি সবারে ডাকিব
হৃদয়ে লইব টানি। ৩৭৬ ॥

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

বর্ষ গেল, বৃথা গেল, কিছুই করিনি হায়,
আপন শূন্যতা লয়ে, জীবন বহিয়া যায়।
তবুত আমার কাছে, নব রবি উদিয়াছে,
তবুত জীবন ঢালি বহিছে নবীন বায়।
বহিছে বিমল উষা তোমার আশীষ বাণী,
তোমার করুণা-সুধা হৃদয়ে দিতেছে আনি।
রেখেছ জগৎ পুরে, মোরেত ফেলনি দূরে,
অসীম আশ্বাসে তাই পুলকে শিহরে কায় ৩৭৭

রাগিণী ভৈরোঁ—তাল একতালা।

ভয় হয় পাছে তব নামে আমি
আমারে করি প্রচার হে।
মোহবশে পাছে ঘিরে আমায়, তব
নাম-গান অহঙ্কার হে।
তোমার কাছে কিছু নাহিত লুকানো,
অন্তরের কথা তুমি সব জানো,
আমি কত দীন, আমি কত হীন,
কেহ নাহি জানে আর হে।
ক্ষুদ্র কণ্ঠে যবে উঠে তব নাম,
বিশ্ব শুনে তোমায় করে গো প্রণাম,
তাই আমার পাছে জাগে অভিমান,
গ্রাসে আমায় আঁধার হে।
পাছে প্রতারণা করি আপনারে,
তোমার আসনে বসাই আমারে,
রাখ মোহ হতে রাখ তম হতে
রাখ রাখ বার বার হে। ৩৭৮ ॥

আশা ভৈরবী—তাল ঠুংরি।

মিটিল সব ক্ষুধা, তাঁহার প্রেম-সুধা
চলরে ঘরে লয়ে যাই।

সেথা যে কত লোক, পেয়েছে কত শোক
তৃষিত আছে কত ভাই।
ডাকরে তাঁর নামে সবারে নিজধামে
সকলে তাঁর গুণ গাই।
দুখী কাতর জনে রেখোরে রেখো মনে
হৃদয়ে সবে দেহ ঠাঁই।
সতত চাহি তাঁরে ভোলরে আপনারে
সবারে কররে আপন।
শান্তি আহরণে শান্তি বিতরণে
জীবন কররে যাপন।
এত যে সুখ আছে কে তাহা শুনিয়াছে
চলরে সবারে শুনাই—
বলরে ডেকে বল "পিতার ঘরে চল
হেথায় শোক তাপ নাই।" ৩৭৯ ॥

রাগিণী মিশ্র কেদারা—তাল একতালা।

যাদের চাহিয়া তোমারে ভুলেছি
তারা ত চাহে না আমারে।
তারা আসে তারা চলে যায় দূরে
ফেলে যায় মরু মাঝারে!
দুদিনের হাসি দুদিনে ফুরায়
দীপ নিভে যায় আঁধারে।
কে রহে তখন মুছাতে নয়ন
ডেকে ডেকে মরি কাহারে।
যাহা পাই তাই ঘরে নিয়ে যাই
আপনার মন ভুলাতে,
শেষে দেখি হায় সব ভেঙ্গে যায়
ধূলা হয়ে যায় ধূলাতে;—
সুখের আশায় মরি পিপাসায়
ডুবে মরি দুখ পাথারে,
রবি শশী তারা কোথা হয় হারা
দেখিতে না পাই তোমারে। ৩৮০ ॥

রাগিণী টৌড়ী—তাল চিমা তেতালা।

শান্তি সমুদ্র তুমি গভীর
অতি অগাধ আনন্দ রাশি।
তোমাতে সব দুঃখ জ্বালা করিব নির্ব্বাণ,
ভুলিব সংসার—
অসীম সুখ সাগরে ডুবে যাব। ৩৮১ ॥

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল চৌতাল।

শোন তাঁর সুধাবাণী শুভ মুহূর্ত্তে শান্ত প্রাণে,
ছাড় ছাড় কোলাহল, ছাড়রে আপন কথা।
আকাশে দিবানিশি উথলে সঙ্গীত ধ্বনি তাঁহার
কে শুনে সে মধুবীণারব—
অধীর বিশ্ব শূন্য পথে হল বাহির। ৩৮২ ॥

রাগিণী মিশ্র বেলাওল—তাল ঝাঁপতাল।

শুনেছে তোমার নাম, অনাথ আতুর জন,
এসেছে তোমার দ্বারে, শূন্য ফেরে না যেন।
কাঁদে যারা নিরাশায় আঁখি যেন মুছে যায়,
যেন গো অভয় পায় ত্রাসে কম্পিত মন।
কত শত আছে দীন, অভাগা আলয় হীন
শোকে জীর্ণ প্রাণ কত কাঁদিতেছে নিশিদিন।
পাপে যারা ডুবিয়াছে, যাবে তারা কার কাছে
কোথা হায় পথ আছে, দাও তারে দরশন। ৩৮৩

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

সখা মোদের বেঁধে রাখ প্রেম-ডোরে।
আমাদের ডেকে নিয়ে চরণ তলে রাখ' ধরে।
বাঁধ হে প্রেম-ডোরে।
কঠোর পরাণে কুটিল বয়ানে
তোমার এ প্রেমের রাজ্য রেখেছি আঁধার করে।
আপনার অভিমানে দুয়ার দিয়ে প্রাণে
গরবে আছি বসে চাহি আপনা পানে।
বুঝি এমনি করে হারাব তোমারে
ধূলিতে লুটাইব আপনার পাষাণভারে।
তখন কারে ডেকে কাঁদিব কাতর স্বরে। ৩৮৪

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল তেওরা।

সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি
ধ্রুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে,

তুমি সদা যার হৃদে বিরাজো
দুখ জ্বালা সেই পাশরে,
সব দুখ জ্বালা সেই পাশরে।
তোমার জ্ঞানে তোমার ধ্যানে
তব নামে কত মাধুরী
যেই ভকত সেই জানে,
তুমি জানাও যারে সেই জানে
ওহে তুমি জানাও যারে সেই জানে। ৩৮৫

হেমখেম—তাল চৌতাল।

সবে মিলি গাওরে, মিলি মঙ্গলাচরো,
ডাকি লহ হৃদয়ে প্রিয়তমে।
মঙ্গল গাও আনন্দ মনে,
মঙ্গল প্রচারো বিশ্ব মাঝে। ৩৮৬ ॥

রাগিণী শঙ্করাভরণ—তাল আড়াঠেকা।

সুমধুর শুনি আজি প্রভু তোমার নাম।
প্রেমসুধা পানে প্রাণ বিহ্বল প্রায়
রসনা অলস অবশ অনুরাগে। ৩৮৭ ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল চৌতাল।

স্বামী তুমি এস আজ, অন্ধকার হৃদয় মাঝ,
পাপে ম্লান পাই লাজ, ডাকি হে তোমারে।
ক্রন্দন উঠিছে প্রাণে, মন শান্তি নাহি মানে,
পথ তবু নাহি জানে আপন আঁধারে।
ধিক ধিক জনম মম, বিফল বিষয় শ্রম,
বিফল ক্ষণিক প্রেম টুটিয়া যায় বারবার।
সন্তাপে হৃদয় দহে নয়নে অশ্রুবারি বহে,
বাড়িছে বিষয় পিপাসা বিষম বিষ বিকারে।
৩৮৮ ॥

রাগিণী দেশ—তাল কাওয়ালি।

হায় কে দিবে আর সান্ত্বনা,
সকলে গিয়েছে হে তুমি যেওনা,
চাহ প্রসন্ন নয়নে প্রভু দীন অধীন জনে।
চারি দিকে চাই হেরি না কাহারে,
কেন গেলে ফেলে একেলা আঁধারে,
হের হে, শূন্য ভবন মম। ৩৮৯ ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঝাঁপতাল।

হেরি তব বিমল মুখভাতি
দূর হল গহন দুখ-রাতি।
ফুটিল মন প্রাণ মম তব চরণ-লালসে
দিনু হৃদয়-কমলদল পাতি।
তব নয়ন-জ্যোতিকণ লাগি,
তরুণ রবি-কিরণ উঠে জাগি।
নয়ন খুলি বিশ্বজন বদন তুলি চাহিল,
তব দরশ পরশ সুখ মাগি।
গগন-তল মগন হল শুভ্র তব হাসিতে
উঠিল ফুটি কত কুসুম পাঁতি,
হেরি তব বিমল মুখ ভাতি।
ধ্বনিত বন বিহগ কল তানে,
গীত সব ধায় তব পানে।
পূর্ব্ব গগনে জগৎ জাগি উঠি গাহিল
পূর্ণ সব তব রচিত গানে।
প্রেম-রস পান করি গান করি কাননে,
উঠিল মনপ্রাণ মম মাতি—
হেরি তব বিমল মুখ ভাতি। ৩৯০ ॥

ভৈরোঁ—কাওয়ালি।

তুমি আপনি জাগাও মোরে তব সুধা পরশে,
হৃদয়নাথ, তিমির রজনী অবসানে হেরি
তোমারে।
ধীরে ধীরে বিকাশো হৃদয় গগনে
বিমল তব মুখভাতি। ৩৯১ ॥

নাচারী তোড়ি—ধামার।

নূতন প্রাণ দাও প্রাণসখা, আজি সুপ্রভাতে।
বিষাদ সব কর দূর নবীন আনন্দে,
প্রাচীন রজনী নাশো নূতন উষালোকে। ৩৯২॥

বিভাস চৌতাল।

জাগ্রৎ বিশ্ব-কোলাহলমাঝে
তুমি গম্ভীর, স্তব্ধ, শান্ত, নির্ব্বিকার,

পরিপূর্ণ মহাজ্ঞান।
তোমাপানে ধায় প্রাণ
সব কোলাহল ছাড়ি,
চঞ্চল নদী যেমন ধায় সাগরে। ৩৯৩ ॥

ভৈরবী—চৌতাল।

কেমনে ফিরিয়া যাও না দেখি তাঁহারে।
কেমনে জীবন কাটে চির অন্ধকারে।
মহান্ জগতে থাকি বিস্ময়বিহীন আঁখি,
বারেক না দেখ তাঁরে এ বিশ্ব মাঝারে!
যতনে জাগায়ে জ্যোতি ফিরে কোটি সূর্য্যলোক
তুমি কেন নিভায়েছ আত্মার আলোক!
তাঁহার আহ্বান রবে আনন্দে চলিছে সবে,
তুমি কেন বসে আছ ক্ষুদ্র এ সংসারে। ৩৯৪ ॥

দেওগির বেলাবলী—আড়া চৌতাল।

সবে আনন্দ করো
প্রিয়তম নাথে লয়ে যতনে হৃদয়ধামে।
সঙ্গীতধ্বনি জাগাও জগতে প্রভাতে
স্তব্ধ গগন পূর্ণ কর ব্রহ্ম নামে। ৩৯৫ ॥

বেলাবলী। রূপক।

হে মন তাঁরে দেখ আঁখি খুলিয়ে
যিনি আছেন সদা অন্তরে।
সবারে ছাড়ি প্রভু কর তাঁরে,
দেহ মন ধন যৌবন রাখ তাঁর
অধীনে। ৩৯৬ ॥

বেলাবলী। চৌতাল।

আজি হেরি সংসার অমৃতময়,
মধুর পবন, বিমল কিরণ, ফুল্লবন,
মধুর বিহগকলধ্বনি।
কোথা হতে বহিল সহসা
প্রাণভরা প্রেম-হিল্লোল, আহা,
হৃদয়কুসুম উঠিল ফুটি পুলকভরে।
অতি আশ্চর্য্য দেখ সবে
দীনহীন ক্ষুদ্র হৃদয়মাঝে
অসীম জগৎস্বামী বিরাজে
সুন্দর শোভন।
ধন্য এই মানব জীবন, ধন্য বিশ্ব জগৎ
ধন্য তাঁর প্রেম তিনি ধন্য ধন্য। ৩৯৭ ॥

ভৈরবী। একতালা।

তোমারি ইচ্ছা হোক পূর্ণ
করুণাময় স্বামী।
তোমারি প্রেম স্মরণে রাখি
চরণে রাখি আশা,
দাও দুঃখ দাও তাপ,
সকলি সহিব আমি।
তব প্রেম আঁখি সতত জাগে
জেনেও জানি না,
ঐ, মঙ্গল রূপ ভুলি তাই
শোকসাগরে নামি।
আনন্দময় তোমার বিশ্ব
শোভাসুখ পূর্ণ,
আমি আপন দোষে দুঃখ পাই
বাসনা অনুগামী।
মোহ বন্ধ ছিন্ন কর কঠিন আঘাতে,
অশ্রুসলিলধৌত হৃদয়ে
থাক দিবস-যামী। ৩৯৮ ॥

রাগিণী টোড়ী—তাল কাওয়ালি।

নব আনন্দে জাগো আজি, নবরবিকিরণে,
শুভ্র সুন্দর প্রীতি উজ্জ্বল নির্ম্মল জীবনে।
উৎসারিত নবজীবন নির্ঝর,
উচ্ছ্বসিত আশাগীতি, অমৃত পুষ্প গন্ধ বহে
আজি এই শান্তিপবনে। ৩৯৯ ।

রাগিণী আলাইয়া—তাল কাওয়ালি।

ঐ পোহাইল তিমির রাতি;
পূর্ব্বগগনে দেখা দিল নব প্রভাতচ্ছটা,
জীবনে, যৌবনে, হৃদয়ে বাহিরে
প্রকাশিল অতি অপরূপ মধুর ভাতি।

কে পাঠালে এ শুভদিন নিদ্রা মাঝে,
মহা মহোল্লাসে জাগাইলে চরাচর,
সুমঙ্গল আশীর্ব্বাদ বরষিলে করি প্রচার
সুখ বারতা তুমি চির সাথের সাথী। ৪০০ ॥

পূরবী—কাওয়ালি।

শ্রান্ত কেন ওহে পান্থ, পথপ্রান্তে বসে
এ কি খেলা।
আজি বহে অমৃত সমীরণ চল চল এই বেলা।
তাঁর দ্বারে হের ত্রিভুবন দাঁড়ায়ে,
সেথা অনন্ত উৎসব জাগে,
সকল শোভা গন্ধ সঙ্গীত আনন্দের মেলা।৪০১

কল্যাণ—চৌতাল।

পূর্ণ আনন্দ পূর্ণ মঙ্গলরূপে হৃদয়ে এস, এস মনোরঞ্জন।

আলোকে আঁধার হোক চূর্ণ, অমৃতে মৃত্যু কর পূর্ণ, কর গভীর দারিদ্র্য ভঞ্জন।

সকল সংসার দাঁড়াবে সরিয়া, তুমি হৃদয়ে আসিছ দেখি;

জ্যোতির্ম্ময় তোমার প্রকাশে, শশী তপন পায় লাজ,

সকলের তুমি গর্ব্বগঞ্জন। ৪০২ ॥

মারু কেদারা—চৌতাল।

অসীম আকাশে অগণ্য কিরণ,কত গ্রহ উপগ্রহ,
কত চন্দ্র তপন ফিরিছে বিচিত্র আলোক জ্বালায়ে,
তুমি কোথায় তুমি কোথায়!
হায় সকলি অন্ধকার চন্দ্র, সূর্য্য, সকল কিরণ,
আঁধার নিখিল বিশ্বজগৎ,
তোমার প্রকাশ হৃদয় মাঝে সুন্দর মোর নাথ,
মধুর প্রেম আলোকে,
তোমারি মাধুরী তোমারে প্রকাশে। ৪০৩ ॥

কাফি—চৌতাল।

আছ অন্তরে চিরদিন, তবু কেন কাঁদি!
তবু কেন হেরি না তোমার জ্যোতি,
কেন দিশাহারা অন্ধকারে!
অকূলের কূল তুমি আমার,
তবু কেন ভেসে যাই মরণের পারাবারে!
আনন্দঘন বিভু, তুমি যার স্বামী,
সে কেন ফিরে পথে দ্বারে দ্বারে! ৪০৪ ॥

কানাড়া—চৌতাল।

জগতে তুমি রাজা, অসীম প্রতাপ,
হৃদয়ে তুমি হৃদয়নাথ হৃদয়হরণরূপ।
নীলাম্বর জ্যোতখচিত চরণপ্রান্তে প্রসারিত,
ফিরে সভয়ে নিয়মপথে অনন্ত লোক।
নিভৃত হৃদয় মাঝে কিবা প্রসন্ন মুখচ্ছবি
প্রেমপরিপূর্ণ মধুর ভাতি।
ভকত হৃদয়ে তব করুণারস সতত বহে,
দীনজনে সতত কর অভয় দান। ৪০৫ ॥

শঙ্করা—চৌতাল।

জাগিতে হবে রে!
মোহ নিদ্রা কভু না রবে চিরদিন,
ত্যজিতে হইবে সুখ-শয়ন অশনি-ঘোষণে।
জাগে তাঁর ন্যায় দণ্ড সর্ব্বভুবনে।
ফিরে তাঁর কালচক্র অসীম গগনে;
জ্বলে তাঁর রুদ্র-নেত্র পাপ তিমিরে। ৪০৬ ॥

সুহাকানাড়া—কাওয়ালি।

নাথ হে, প্রেমপথে সব বাধা ভাঙিয়া দাও।
মাঝে কিছু রেখোনা রেখোনা,
থেকোনা থেকোনা দূরে।
নির্জ্জনে সজনে অন্তরে বাহিরে,
নিত্য তোমারে হেরিব। ৪০৭ ॥

সিন্ধু—ঠুংরি।

হৃদয় বেদনা বহিয়া
প্রভু, এসেছি তব দ্বারে।
তুমি অন্তর্য্যামী হৃদয়স্বামী
সকলি জানিছ হে,
যত দুঃখ লাজ দারিদ্র্য সঙ্কট

আর জানাইব কারে।
অপরাধ কত করেছি নাথ,
মোহ পাশে পড়ে,
তুমি ছাড়া, প্রভু, মার্জ্জনা, কেহ
করিবে না সংসারে।
সব বাসনা দিব বিসর্জ্জন,
তোমার প্রেম পাথারে,
সব বিরহ বিচ্ছেদ ভুলিব,
তব মিলন অমৃত ধারে।
আর আপন ভাবনা পারিনা ভাবিতে
তুমি লহ মোর ভার,
পরিশ্রান্ত জনে প্রভু লয়ে যাও
সংসার-সাগর পারে। ৪০৮ ॥

রাগিণী সিন্ধু—তাল একতালা।

শূন্য প্রাণ কাঁদে সদা প্রাণেশ্বর,
দীনবন্ধু দয়াসিন্ধু,প্রেম বিন্দু কাতরে কর দান।
কোরোনা সখা কোরোনা
চির-নিষ্ফল এই জীবন,
প্রভু জনমে মরণে তুমি গতি,
চরণে দাও স্থান। ৪০৯ ॥

রাগিণী ভূপালী—তাল তালফেরতা।

জয় রাজরাজেশ্বর!
জয় অরূপ সুন্দর।
জয় প্রেম-সাগর, জয় ক্ষেম আকর,
তিমির তিরস্কর হৃদয়-গগন-ভাস্কর! ৪১০ ॥

রাগিণী মহিশূরী খাম্বাজ—তাল ঠুংরি।

চির বন্ধু, চির নির্ভর,চিরশান্তি তুমি হে প্রভু!
তুমি চিরমঙ্গল সখা হে (তোমার জগতে)
চিরসঙ্গী চির জীবনে।
চির প্রীতিসুধানির্ঝর তুমি হে হৃদয়েশ!
তব জয় সঙ্গীত ধ্বনিছে (তোমার জগতে)
চির দিবা চিররজনী। ৪১২ ॥

রাগিণী পূর্ণ ষড়জ—তাল একতালা।

(একি) লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ প্রাণেশ হে!
(আনন্দ বসন্ত সমাগমে)
বিকশিত প্রীতি কুসুম হে
(আনন্দ বসন্ত সমাগমে)
পুলকিত চিত কাননে।
জীবনলতা অবনতা তব চরণে।
হরষ গীত উচ্ছ্বসিত হে
(আনন্দ বসন্ত সমাগমে)
কিরণ মগন গগনে। ৪১৩ ॥

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালি।

হৃদয় মন্দিরে, প্রাণাধীশ, আছ গোপনে!
অমৃত সৌরভে আকুল প্রাণ (হায়)
ভ্রমিয়া জগতে না পায় সন্ধান,
কে পারে পশিতে আনন্দ ভবনে
তোমার করুণা-কিরণ বিহনে। ৪১৪ ॥

মহিশূরী ভজন।

আনন্দ লোকে মঙ্গলালোকে
বিরাজ সত্য সুন্দর।
মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগন মাঝে।
বিশ্বজগৎ মণিভূষণ বেষ্টিত চরণে।
গ্রহতারক চন্দ্রতপন ব্যাকুল দ্রুতবেগে
করিছে পান করিছে স্নান অক্ষয় কিরণে।
ধরণী পর ঝরে নির্ঝর মোহন মধু শোভা,
ফুল পল্লব গীত গন্ধ সুন্দর বরণে।
বহে জীবন রজনী দিন চির নূতন ধারা
করুণা তব অবিশ্রাম জনমে মরণে।
স্নেহ প্রেম দয়াভক্তি কোমল করে প্রাণ;
কত সান্ত্বনা কর বর্ষণ সন্তাপ হরণে।
জগতে তব কি মহোৎসব বন্দন করে বিশ্ব
শ্রীসম্পদ ভূমাস্পদ নির্ভয় শরণে। ৪১৫ ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

জগতের পুরোহিত তুমি,

তোমার এ জগৎ মাঝারে
এক চায় একেরে পাইতে,
দুই চায় এক হইবারে।
ফুলে ফুলে করে কোলাকুলি,
গলাগলি অরুণে উষায়,
মেঘ দেখে মেঘ ছুটে আসে,
তারাটি তারার পানে চায়।
পূর্ণ হল তোমার নিয়ম,
প্রভু হে! তোমারি হল জয়,
তোমার কৃপায় এক হল,
আজি এই যুগল হৃদয়।
যে হাতে দিয়েছ তুমি বেঁধে,
শশধরে ধরার প্রণয়ে,
সেই হাতে বাঁধিয়াছ তুমি,
এই দুটি হৃদয়ে হৃদয়ে।
জগৎ গাহিছে জয় জয়,
উঠেছে হরষ কোলাহল,
প্রেমের বাতাস বহিতেছে,
ছুটিতেছে প্রেম-পরিমল।
পাখীরা গাও গো সবে গান,
কহ বায়ু চরাচর ময়
মহেশের প্রেমের জগতে,
প্রেমের হইল আজি জয়॥ ৪১৬॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

[তু]মি হে প্রেমের রবি আলো করি চরাচর।
[য]ত কর বিতরণ অক্ষয় তোমার কর।
[দু]জনের আঁখি পরে, তুমি থাক আলো করে,
[ত]া'হলে আঁধারে আর বলহে কিসের ডর!
[তো]মারে হারায় যদি, দু'জনে হারা'বে দোঁহে,
[দু]'জনে কাঁদিবে বসি অন্ধ হয়ে ঘন মোহে।
এমনি আঁধার হবে, পাশাপাশি বসে র'বে
তবুও দোঁহার মুখ চিনিবেনা পরস্পর।
[দে]'খো প্রভু চিরদিন, আঁখি পরে থেকো জেগে,
তোমারে ঢাকেনা যেন সংসারের ঘনমেঘে।
তোমারি আলোকে বসি উজ্জ্বল আনন-শশী
উভয়ে উভয়ে হেরে পুলকিত কলেবর। ৪১৭॥

রাগিণী সাহানা—তাল ঝাঁপতাল।

দুই হৃদয়ের নদী, একত্র মিলিল যদি
বল দেব! কার পানে আগ্রহে ছুটিয়া যায়।
সম্মুখে রয়েছে তার, তুমি প্রেম পারাবার,
তোমারি অনন্ত হৃদে দুটিতে মিলিতে চায়।
সেই এক আশা করি দুইজনে মিলিয়াছে,
সেই এক লক্ষ্য ধরি দুইজনে চলিয়াছে,
পথে বাধা শত শত, পাষাণ পর্ব্বত কত,
দুই বলে এক হয়ে, ভাঙ্গিয়া ফেলিবে তায়।
অবশেষে জীবনের মহাযাত্রা ফুরাইলে,
তোমারি স্নেহের কোলে যেনগো আশ্রয় মিলে।
দুটি হৃদয়ের সুখ, দুটি হৃদয়ের দুখ,
দুটি হৃদয়ের আশা, মিশায় তোমার পায়।৪১৮

মিশ্র ছায়ানট—ঝাঁপতাল।

দুটি প্রাণ এক ঠাই তুমিত এনেছ ডাকি,
শুভকার্য্যে জাগিতেছে তোমার প্রসন্ন আঁখি।
এ জগৎ চরাচরে বেঁধেছ যে প্রেমডোরে
সে প্রেমে বাঁধিয়া দোঁহে স্নেহছায়ে রাখ ঢাকি
তোমারি আদেশ লয়ে সংসারে পশিবে দোঁহে,
তোমারি আশীষ বলে এড়াইবে মায়া মোহে।
সাধিতে তোমার কাজ দুজনে চলিবে আজ,
হৃদয়ে মিলাবে হৃদি তোমারে হৃদয়ে রাখি।৪১৯

প্রভাতী—ঝাঁপতাল।

যাওরে অনন্ত ধামে মোহ মায়া পাসরি
দুঃখ আঁধার যেথা কিছুই নাহি।
জরা নাহি, মরণ নাহি, শোক নাহি যে লোকে,
কেবলি আনন্দ স্রোত চলেছে প্রবাহি॥
যাওরে অনন্ত ধামে, অমৃত নিকেতনে,
অমরগণ লইবে তোমা উদার প্রাণে।
দেবঋষি, রাজঋষি, ব্রহ্মঋষি যে লোকে

ধ্যানভরে গান করে একতানে।
যাওরে অনন্তধামে জ্যোতির্ম্ময় আলয়ে
শুভ্র সেই চির বিমল পুণ্যকিরণে
যায় যেথা দানব্রত, সত্যব্রত, পুণ্যবান,
যাও বৎস, যাও সেই দেব-সদনে। ৪২০ ॥

বেহাগ।

শুভদিনে এসেছে দোঁহে চরণে তোমার,
শিখাও প্রেমের শিক্ষা, কোথা যাবে আর।
যে প্রেম সুখেতে কভু, মলিন না হয় প্রভু,
যে প্রেম দুঃখেতে ধরে উজ্জ্বল আকার।
যে প্রেম সমান ভাবে রবে চিরদিন,
নিমেষে নিমেষে যাহা হইবে নবীন.
যে প্রেমের শুভ্র হাসি, প্রভাত কিরণ রাশি,
যে প্রেমের অশ্রুজল শিশির উষার।
যে প্রেমের পথ গেছে অমৃত সদনে,
সে প্রেম দেখায়ে দাও পথিক দুজনে,
যদি কভু শ্রান্ত হয় কোলে নিয়ো দয়াময়,
যদি কভু পথ ভোলে দেখায়ো আবার। ৪২১ ॥

রাগিণী সাহানা—তাল যৎ।

শুভদিনে শুভক্ষণে, পৃথিবী আনন্দ মনে,
দুটি হৃদয়ের ফুল উপহার দিল আজ।
ওই চরণের কাছে, দেখগো পড়িয়া আছে,
তোমার দক্ষিণ হস্তে তুলে লও রাজ-রাজ।
এক সূত্রে দিয়ে দেব, গেঁথে রাখ এক সাথে,
টুটেনা ছিঁড়েনা যেন, থাকে যেন ওই হাতে।
তোমার শিশির দিয়ে, রাখ তারে বাঁচাইয়ে,
কি জানি শুকায় পাছে
সংসার রৌদ্রের মাঝে ॥ ৪২২ ॥

ইমন ভূপালী—কাওয়ালি।

সুখে থাক আর সুখী কর সবে
তোমাদের প্রেম ধন্য হোক্ ভবে।
মঙ্গলের পথে থেকো নিরন্তর,
মহত্ত্বের পরে রাখিও নির্ভর,
ধ্রুব সত্য তাঁরে ধ্রুবতারা কর
সংশয় নিশীথে সংসার অর্ণবে।
চিরসুধাময় প্রেমের মিলন
মধুর করিয়া রাখুক জীবন,
দুজনার বলে সবল দুজন
জীবনের কাজ সাধিও নীরবে।
কত দুখ আছে, কত অশ্রুজল,
প্রেমবলে তবু থাকিও অটল,
তাঁহারি ইচ্ছা হউক সফল
বিপদে সম্পদে শোকে উৎসবে। ৪২৩।

তোমারি রাগিণী জীবন কুঞ্জে।
বাজে যেন সদা বাজে গো!
তোমারি আসন হৃদয় পদ্মে
রাজে যেন সদা রাজে গো!
তব নন্দন গন্ধ-মোদিত
ফেরি সুন্দর ভুবনে,
তব পদরেণু মাখি লয়ে তনু
সাজে যেন সদা সাজে গো!
সব বিদ্বেষ দূরে যায় যেন
তব মঙ্গল মন্ত্রে,
বিকাশে মাধুরী হৃদয়ে বাহিরে
তব সঙ্গীত ছন্দে!
তব নির্ম্মল নীরব হাস্য
হেরি অম্বর ব্যাপিয়া
তব গৌরবে সকল গর্ব্ব
লাজে যেন সদা লাজে গো! ৪২৪ ॥

সমাপ্ত।

সমালোচনা।

অনাবশ্যক।

আমরা বর্ত্তমানের জীব। কোন জিনিষ
র্ত্তমানের পরপারে প্রত্যক্ষের বাহিরে
লেই আমাদের হাতছাড়া হইবার যো হয়।
হা পাইতেছি তাহা প্রত্যহই হারাইতেছি।
াজ যে ফুলের আঘ্রাণ লইয়াছি, কাল
কালে তাহা আর রহিল না, কাল বিকালে
াহার স্মৃতিও চলিয়া গেল। এমন কত ফুলের
ণ লইয়াছি, কত পাখীর গান শুনিয়াছি,
ত মুখ দেখিয়াছি, কত কথা কহিয়াছি, কত
খ দুঃখ অনুভব করিয়াছি, তাহারা নাই, এবং
াহারা এককালে ছিল বলিয়া মনেও নাই।
দি বা মনে থাকে সে কি আর প্রত্যক্ষের
ত আছে? তাহা একটি নিরাকার অথবা
েবল মাত্র ছায়ার মত জ্ঞানে পর্য্যবসিত
ইয়াছে। অমুক ঘটনা ঘটিয়াছে, এইরূপ
কটা জ্ঞান আছে মাত্র, অমুককে জানিতাম
ইরূপ একটা সত্য অবগত আছি বটে।
েবল মাত্র জ্ঞানে যাহাকে জানি তাহাকে
ে আর জানা বলে, তাহাকে মানিয়া লওয়া
বলে। অনেক সময়ে আমাদের কাণে শব্দ আসে, কিন্তু তাহাকে শোনা বলি না; কারণ সে শব্দটা আমাদের কাণ আছে বলিয়াই শুনিতেছি, আমাদের মন আছে বলিয়া শুনিতেছি না। কাণ বেচারার না শুনিয়া থাকিবার যো নাই, কিন্তু মনটা তখন ছুটি লইয়া গিয়াছিল। তেমনি আমরা যাহা জ্ঞানে জানি তাহা না জানিয়া থাকিবার যো নাই বলিয়াই জানি; সাক্ষী আনিয়া প্রমাণ করিয়া দিলেই জ্ঞানকে জানিতেই হইবে—সে যত বড় লোকটাই হউক না কেন, এ আইনের কাছে তাহার নিষ্কৃতি নাই। কিন্তু উহার ঊর্দ্ধে আর জোর খাটে না। তেমনি আমরা অনেক অপ্রত্যক্ষ অতীত ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া জানি, কিন্তু আর তাহা অনুভব করিতে পারি না। মাঝে মাঝে অনুভব করিতে চেষ্টা করি, ভাণ করি, কিন্তু বৃথা।

কিন্তু মাঝে মাঝে এমন হয় না কি, যখন অতীত ঘটনার নামে বহুবিধ ওয়ারেণ্ট জারি করিয়াও কিছুতেই মনের সম্মুখে তাহাকে আনিতে পারা গেল না, এমন কি যখন তাহার

অস্তিত্বের বিষয়েই সন্দেহ উপস্থিত হইল, তখন হয়ত সেদিনকার একটি চিঠির একটু-খানি ছেঁড়া টুক্‌রা [illegible] উপর বহুদিনকার পুরাণ একটি পেন্সিলের দাগ দেখিবামাত্র সে যেন তৎক্ষণাৎ সশরীরে বিদ্যুতের মত আমার সমুখে আসিয়া উপস্থিত হয়! ঐ কাগজের টুক্‌রাটি, পেন্সিলের দাগটি তাহাকে যেন যাদু করিয়া রাখিয়াছিল; তোমার চারিদিকে আরও ত কত শত জিনিষ আছে, কিন্তু সেই অতীত ঘটনার পক্ষে ঐ ছেঁড়া কাগজ টুকু ও সেই পেন্সিলের দাগটুকু ছাড়া আর সকল গুলিই Non-conductor। অর্থাৎ আমরা এমনি ভয়ানক প্রত্যক্ষবাদী, যে, বর্ত্তমানের গায়ের উপর অতীতের একটা স্পষ্ট চিহ্ন থাকা চাই, তবেই তাহার সহিত আমাদের তালরূপ আদান প্রদান চলিতে পারে। যাহার অতীত-জীবন বহুবিধ কার্য্য-ভার বহন করিয়া ধনবান বণিকের মত সময়ের পথ দিয়া চলিয়া গিয়াছিল, সে নিশ্চয়ই পথ চলিতে চলিতে একটা-না-একটা টুক্‌রা ফেলিতে ফেলিতে গিয়াছিল, সেই গুলি ধরিয়া ধরিয়া অনায়াসেই সে তাহার অতীতের পথ খুঁজিয়া লইতে পারে। আর আমাদের মত যাহারা অলস অতীত রিক্তহস্তে পথ চলিতেছিল, সে আর কি চিহ্ন রাখিয়া যাইবে। সুতরাং তাহাকে আর খুঁজিয়া পাইবার সম্ভা-বনা নাই, সে একেবারে হারাইয়া গেল।

ইতিহাস সম্বন্ধেও এইরূপ বলা যায়। বর্ত্তমানের গায়ে অতীতকালের একটা নাম সই থাকা নিতান্তই আবশ্যক। কালিদাস যে এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা আমি অস্বী-কার করি না, কিন্তু আজ যদি আমি দৈবাৎ তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত মেঘদূত পুঁথিখানি পাই, তবে তাঁহার অস্তিত্ব আমার পক্ষে কি রূপ জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে! আমরা কল্পনায় যেন তাঁহার স্পর্শ পর্য্যন্ত অনুভব করিতে পারি। ইহা [illegible]যাত্রার একটি প্রধান ফল অনুমান করা যায়। আমি একজন বুদ্ধের ভক্ত। বুদ্ধেরর অস্তিত্বের বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন আমি সেই তীর্থে যাই, যেখানে বুদ্ধের দন্ত রক্ষিত আছে, সেই [illegible] দেখি যাহার উপর [illegible]র পদচিহ্ন অঙ্কিত আছে, তখন আমি বুদ্ধকে কতখানি প্রাপ্ত হই! যখন দেখি, ফুটন্ত, ছুটন্ত বর্ত্তমান স্রোতের উপর পুরাতন কালের একটি প্রাচীন জীর্ণ অবশেষ নিশ্চল ভাবে বসিয়া তাহার অমরতার অভিশাপের জন্য শোক করিতেছে অতীতের দিকে অনিমেষনেত্রে চাহিয়া আছে, অতীতের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে, তখন এমন হৃদয়হীন পাষাণ কে আছে যে মুহূর্ত্তের জন্য থামিয়া একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া সেই মহা অতীতের দিকে চাহিয়া না দেখে!

কিছুইত থাকে না, সবইত চলিয়া যায়, তথাপি এই যে দুটিএকটি চিহ্ন অতীত রাখিয়া গিয়াছে, ইহাও মুছিয়া ফেলিতে চায়, এমন কে আছে? সময়ের অরণ্য অসীম। এই অন্ধ-কার অসীম মহারণ্যের মধ্য দিয়া আমরা একটি মাত্র পায়ের চিহ্ন রাখিয়া আসিতেছি, সে চিহ্ন মুছিয়া মুছিয়া আসিবার আবশ্যকটা কি? পথের মধ্যে যে গাছের তলায় বসিয়া খেলা করিয়াছ, যে অতিথিশালায় বসিয়া আমোদ প্রমোদে বন্ধুবান্ধবদের সহিত রাত্রিযাপন করিয়াছ, একবারও কি ফিরিয়া যাইয়া সেই তরুর তলে বসিতে ইচ্ছা যাইবে না, সেই অতিথিশালার দ্বারে দাঁড়াইতে সাধ যাইবে না? কি ফিরিবে কেমন করিয়া যদি সে পথের চি মুছিয়া ফেল! যে স্থান, যে গৃহ, যে ছায়া যে আশ্রয় এককালে নিতান্তই তোমার ছি

তাহার অধিকার যদি একেবারে চিরকালের জন্য হারাইয়া ফেল!

দেশ ও কালেই আমরা বাস করি। অথচ দেশের উপরেই আমাদের যত অনুরাগ। এক কাঠা জমির জন্য আমরা লাঠালাঠি করি, কিন্তু সুদূর-বিস্তৃত সময়ের স্বত্ব অনায়াসেই ছাড়িয়া দিই, একবারও তাহার জন্য দুঃখ করি না!

পুরাতন দিনের একখানি চিঠি, একটি আংটি, একটি গানের সুর, একটা যা হয় কিছু অত্যন্ত যত্ন পূর্ব্বক রাখিয়া দেয় নাই, এমন কেহ আছে কি? যাহার জ্যোৎস্নার মধ্যে পুরাতন দিনের জ্যোৎস্না, যাহার বর্ষার মধ্যে পুরাতন দিনের মেঘ লুকায়িত নাই, এতবড় অপৌত্তলিক কেহ আছে কি? পৌত্তলিকতার কথা বলিলাম, কেন না প্রত্যক্ষ দেখিয়া অপ্রত্যক্ষকে মনে আনাই পৌত্তলিকতা। জগৎকে দেখিয়া জগদতীতকে মনে আনা পৌত্তলিকতা. একটি চিঠি দেখিয়া যদি আমার অতীতকালের কথা মনে পড়ে তবে তাহা পৌত্তলিকতা নহে ত কি? ঐ চিঠিটুকু আমার অতীত কালের প্রতিমা। উহার কোন মূল্য নাই, কেবল উহার মধ্যে আমার অতীত কাল প্রতিষ্ঠিত আছে বলিয়াই উহার এত সমাদর। জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, এমন কোন লোক কি আছে যে তাহার পুরাতন দিবসের একটা কোনও চিহ্নও রাখিয়া দেয় নাই? আছে বৈকি! তাহারা অত্যন্ত কাজের লোক, তাহারা অতিশয় জ্ঞানী লোক। তাহাদের কিছুমাত্র কুসংস্কার নাই। যতটুকু দরকার আছে কেবল মাত্র ততটুকুকেই তাহারা খাতির করে। বোধ করি দশ বৎসর পর্য্যন্ত তাহারা মা-কে মা বলে, তাহার পর তাঁর নাম ধরিয়া ডাকে। কারণ, সন্তান-পালনের জন্য যত দিন মায়ের বিশেষ আবশ্যক তত দিনই তিনি মা, তাহার পর অন্য বৃদ্ধার সহিত তাঁহার তফাৎ কি?

আমি যে সম্প্রদায়ের কথা বলিতেছি, তাঁহারা যে সত্য সত্যই বয়স হইলে মাকে মা বলেন না তাহা নহে। অনাবশ্যক মাকেও ইহাঁরা মা বলিয়া আদর করিয়া থাকেন। কিন্তু অতীত মাতার প্রতি ইহাঁদের ব্যবহার স্বতন্ত্র। মায়ের কাছ হইতে ইহাঁরা যাহা কিছু পাইয়াছেন, অতীতের কাছ হইতে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী পাইয়াছেন, তবে কেন অতীতের প্রতি ইহাঁদের এমনতর অকৃতজ্ঞ অবহেলা! অতীতের অনাবশ্যক যাহা কিছু, তাহা সমস্তই ইহাঁরা কেন কুসংস্কার বলিয়া একেবারে ঝাঁটাইয়া ফেলিতে চান? তাঁহারা ইহা বুঝেন না, শুষ্ক জ্ঞানের চক্ষে সমস্ত আবশ্যক অনাবশ্যক ধরা পড়ে না। আমাদের আচার ব্যবহারে কতকগুলি চিরন্তন প্রথা প্রচলিত আছে, সে গুলি ভালও নয়, মন্দও নয়, কেবল দোষের মধ্যে তাহারা অনাবশ্যক, তাহাদের দেখিয়া কঠোর জ্ঞানবান লোকের মুখে হাসি আসে, এই ছুতায় তুমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিলে। মনে করিলে, তুমি কতকগুলি অর্থহীন অনাবশ্যক হাস্যরসোদ্দীপক অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিলে মাত্র—কিন্তু আসলে কি করিলে! সেই অর্থহীন প্রথার মন্দির মধ্যে অধিষ্ঠিত সুমহৎ অতীত দেবকে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে, একটি জীবন্ত ইতিহাসকে বধ করিলে, তোমার পূর্ব্বপুরুষদিগের একটি স্মরণচিহ্ন ধ্বংস করিয়া ফেলিলে। তোমার কাছে তোমার মায়ের যদি একটি স্মরণ-চিহ্ন থাকে, বাজারে তাহার দাম নাই বলিয়া তোমার কাছেও যদি তাহার দাম না থাকে তবে তুমি মহাপাতকী! তেমনি

অনেকগুলি অর্থহীন প্রথা পূর্ব্বপুরুষদিগের ইতিহাস বলিয়াই মূল্যবান। তুমি যদি তাহার মূল্য না দেখিতে পাও, তাহা অকাতরে ফেলিয়া দাও, তবে তোমার শরীরে দয়া-ধর্ম্ম কোন্‌খানে থাকে তাহাই আমি ভাবি! যাহাদের বুট-তরি আশ্রয় করিয়া তোমরা ভবসমুদ্র পার হইতে চাও, সেই ইংরাজ মহাপুরুষেরা কি করেন একবার দেখ না। তাঁহাদের রাজসভায়, তাঁহাদের পার্ল্যামেণ্ট সমিতিতে, এবং অন্যান্য নানা স্থলে কতশত প্রকার অর্থহীন অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে, তাহা কে না জানে!

অতীত কাল ধরণীর মত আমাদের অচল-প্রতিষ্ঠ করিয়া রাখে। যখন বাহিরে রৌদ্রের খরতর তাপ, আকাশ হইতে বৃষ্টি পড়ে না, তখন শিকড়ের প্রভাবে আমরা অতীতের অন্ধকার নিম্নতন দেশ হইতে রস আকর্ষণ করিতে পারি। যখন সকল সুখ ফুরাইয়া গেছে তখন আমরা পিছন ফিরিয়া অতীতের ভগ্নাবশিষ্ট চিহ্ন সকল অনুসরণ করিয়া অতীতে যাইবার পথ অনুসন্ধান করিয়া লই। বর্ত্তমানে যখন নিতান্ত দুর্ভিক্ষ নিতান্ত উৎপীড়ন দেখি তখন অতীতের মাতৃক্রোড়ে বিশ্রাম করিতে যাই। বাঙ্গালা সাহিত্যে যে এত পুরাতত্ত্বের আলোচনা দেখা যাইতেছে, তাহার প্রধান কারণ আমাদের একমাত্র সান্ত্বনার স্থল অতীত কালকে জীবন্ত করিয়া তুলিবার চেষ্টা হইতেছে। সে পথও যদি কেহ বন্ধ করিতে চায়, অতীতের যাহা কিছু অবশেষ আমাদের ঘরে ঘরে পড়িয়া রহিয়াছে তাহাকে দূর করিয়া যদি কেহ অতীতকে আরও অতীতে ফেলিতে চায়, তবে সে সমস্ত জাতির অভিশাপের পাত্র হইবে।

যদি আমরা অতীতকে হারাই তবে আমরা কতখানি হারাই! আমাদের কতটুকু প্রাণ থাকে! একটি নিমেষ মাত্র লইয়া কিসের সুখ! আমাদের জীবন যদি কতকগুলি বিচ্ছিন্ন জলবিন্দু মাত্র হয়, তবে তাহা অত্যন্ত দুর্ব্বল জীবন। কিন্তু আমাদের জীবনের জন্ম শিখর হইতে আরম্ভ করিয়া সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত যদি যোগ থাকে তবে তাহার কত বল! তবে তাহা পাষাণের বাধা মানিবে না, কথায় কথায় রৌদ্রতাপে শুকাইয়া বাষ্প হইয়া যাইবে না। আমি কিছু পরগাছা নহি, গাছ হইতে গাছে ঝুলিয়া বেড়াই না। বাহিরের রৌদ্র, বাহিরের বাতাস, বাহিরের বৃষ্টি আমি ভোগ করিতেছি, কিন্তু মাটির ভিতরে ভিতরে প্রসারিত আমার অতীতের উপর আমি দাঁড়াইয়া আছি। আমার অতীতের মধ্যে আমার কতকগুলি তীর্থস্থান প্রতিষ্ঠিত আছে, যখন বর্ত্তমানে পাপে তাপে শোকে কাতর হইয়া পড়ি তখন সেই তীর্থস্থানে গমন করি, সরল বাল্যকালের সমীরণ ভোগ করি, নবজীবনের প্রথম সঙ্কল্প, মহৎ উদ্দেশ্য, তরুণ আশা সকল পুনরায় দেখিতে পাই। আমার এ অতীতের পথ যদি মুছিয়া যাইত, তাহা হইলে আজ আমি কি হইতাম! একটি জরাজীর্ণ কঠোর-হৃদয়, অবিশ্বাসী বিদ্রূপপরায়ণ বৃদ্ধ হইয়া উদাস-নেত্রে সংসারের দিকে চাহিয়া থাকিতাম।

এই জন্যই আমি এই সকল অতিশয় তুচ্ছ দ্রব্যগুলিকে, অতীতকালের অতি সামান্য চিহ্নটুকুকেও যত্ন করিয়া রাখিয়াছি; অত্যধিক জ্ঞান লাভ করিয়া, কুসংস্কারের অত্যন্ত অভাবে সে গুলিকে অনাবশ্যক বোধে ফেলিয়া দিই নাই।

তার্কিক।

কেহ কেহ বলেন, যাঁহাদের সঙ্গে মতের মিল নাই, প্রতি কথায় যুক্তির লাঠালাঠি চলে, তর্কবিতর্ক না করিয়া যাঁহারা এক পা অগ্রসর হইতে দেন না, তাঁহাদের সহবাসে উপকার আছে। তাঁহাদের উৎপাতে কাঁচা কথা বলিবার যো থাকে না, দুর্ব্বল মত ত্রাহি ত্রাহি করিতে থাকে, খুব খাঁটি মত না হইলে টঁকিতে পারে না। বুদ্ধিরাজ্যে Survival of the Fittest নিয়ম খুব ভালরূপে বজায় থাকে। এ কথাটা আমার ত ঠিক মনে হয় না।

আমাদের কোন ভাব অহিরাবণের মত একেবারে জন্মিয়াই কিছু যুদ্ধ আরম্ভ করিতে পারে না। কিছু দিন ধরিয়া প্রশংসা, বন্ধুদিগের মমতা, ও অনুকূল যুক্তির লঘুপাক ও পুষ্টিকর খাদ্য তাহাকে রীতিমত সেবন করান' আবশ্যক। যখন সে পায়ের উপর দাঁড়াইতে পারিবে, তখন বরঞ্চ, মাঝে মাঝে হুঁচট খাওয়া, মাথা ঠোকা, পড়িয়া যাওয়া মন্দ নহে। কিন্তু যেমনি আমার ভাবটি জন্মগ্রহণ করিল, অমনি যদি আমার নৈয়ায়িক কুস্তিওয়ালা ধ্যাক্ করিয়া তাহার গলা চাপিয়া ধরেন তবে ত তাহার আর বাঁচিবার সম্ভাবনা থাকে না।

বন্ধুবান্ধবের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদের নূতন নূতন মত জন্মগ্রহণ করিতে থাকে। কোন বিষয়ে আমাদের যথার্থ মত কি, আমাদের যথার্থ বিশ্বাস কি, তাহা সহসা জিজ্ঞাসা করিলে আমরা বলিতে পারি না, আমরা নিজেই হয়ত জানি না, বন্ধুদিগের সহিত কথোপকথনের আন্দোলনে তাহারা জাগিয়া উঠে। তখন আমরা তাহাদিগকে প্রথম দেখিতে পাই। সুতরাং তখনো আমরা আমাদের সেই কচি ভাবগুলিকে যুক্তির বর্ম্ম দিয়া আচ্ছাদন করিবার অবসর পাই নাই, তখনো তাহাদিগকে সংসারের কঠোর মাটির উপরে হাঁটাইতে শিখাই নাই, নানাশাস্ত্র হইতে আহরণ করিয়া তাহাদের অনুকূল মতগুলিকে বডি-গার্ডের মত তাহাদের চারদিকে খাড়া করিয়া দিই নাই। এমন সময়ে যদি নৈয়ায়িক শিকারীর ইঙ্গিতে দেশী বিলাতী, আধুনিক প্রাচীন, যত দেশের, যত ন্যায়শাস্ত্রের, যতগুলা যুক্তির ক্ষুধিত খেঁকি কুকুর আছে, সকলগুলা একবারে দাঁত খিঁচাইয়া সেই অসহায়দের উপর আসিয়া পড়ে, Facts নামক ছোট ছোট ইট পাটকেল চারদিক হইতে তাহাদের উপর বর্ষিত হইতে থাকে, তবে সে বেচারীরা দাঁড়ায় কোথায়?

তুমি নৈয়ায়িক, Facts নামক গোটাকতক সরকারী লাঠিয়াল তোমার হাতধরা আছে, তোমার যাহা কিছু আছে মান্ধাতার আমল হইতে তাহার যোগাড় হইয়া আসিতেছে, আর আমার এই ভাবশিশু এই মুহূর্ত্তে সবে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইহার প্রতি আক্রমণ করিয়া তোমার পৌরুষ কি? আর একটু রোস' এখনো ইহা কথোপকথনের কোলে কোলে ফিরিতেছে, যখন এ সাহিত্য ক্ষেত্রে রণভূমিতে দাঁড়াইবে, তখন ইহাতে তোমাতে বোঝাপড়া চলিতে পারিবে।

এই সকল ন্যায়শাস্ত্রবিদেরা রসিকতার কৈফিয়ৎ চাহেন, বিদ্রূপ করিয়া একটা অসঙ্গত সঙ্গত কথা কহিলে তর্কের দ্বারায় তাহার অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করাইয়া দেন, কথায় কথায় যদি একটা ঐতিহাসিক Fact-এর উল্লেখ করি, সেটা আর সকল বিষয়ে যেমনই সঙ্গত

হউক না কেন, তাহার তারিখের একটু ইতস্ততঃ হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহার পাঁচ Volume ইতিহাসের চাপে সেটাকে ছারপোকার মত মারিয়া ফেলেন; মুখে মুখে যদি একটা কিছুর সহিত কিছুর তুলনা করি, অমনি তিনি ফিতা হাতে করিয়া অত্যন্ত পরিশ্রমে তাহার মাপজোক করিতে আরম্ভ করেন; আমি বলিলাম, অমুক লোকটা নিতান্ত গাধার মত, তিনি অমনি বলিলেন, সে কেমন কথা, তাহার ত চারটে পা নাই, আর তাহার কাণ দুটা কিছু নিতান্তই বড় নয়, তাহার গলার আওয়াজ ভাল নহে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া কি গাধার সঙ্গে তাহার তুলনা হয়? আমি বলিলাম হে বুদ্ধিমান, গাধার বুদ্ধির সহিত আমি তাহার বুদ্ধির তুলনা করিতেছিলাম, আর কোন বিষয়ে সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনে হয় নাই। তিনি অমনি বলিলেন, তাহাও কি ঠিক মেলে? পশু বস্তুই দেখিতে পায়, কিন্তু বস্তুর বস্তুত্ব কি সে মনে করিতে পারে? সে শ্বেতবর্ণ পদার্থ মনে আনিতেও পারে, কিন্তু শ্বেতবর্ণ নামক পদার্থ-অতিরিক্ত একটা ভাবমাত্র সে কি মনে ধারণা করিতে পারে? ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি কাতর হইয়া বলিলাম, দোহাই মাপ কর, আমার অপরাধ হইয়াছে, এবার হইতে গাধার সহিত তাহার বুদ্ধির তুলনা না দিয়া তোমার সহিত দিব! শুনিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইলেন।

এইরূপ যাহারা তার্কিক বন্ধুদিগের সহবাসে থাকেন, তাঁহাদের ভাবের উৎস-মুখে পাথর চাপান' থাকে। বন্ধুত্বের দক্ষিণা বাতাস বন্ধুদিগের অনুকূল হাস্যের সূর্য্যকিরণের অভাবে তাঁহাদের হৃদয়কাননের ভাবগুলি ফুটিয়া উঠিতে পারে না। যে সকল বিশ্বাস তাঁহাদের হৃদয়ের অতি প্রিয় সামগ্রী, পাছে সেগুলিকে লইয়া যুক্তির কাকচিলগুলা ছেঁড়াছিঁড়ি করিতে আরম্ভ করে এই ভয়ে তাহাদিগকে হৃদয়ের অন্ধকারের মধ্যেই লুকাইয়া রাখেন, তাহারা আর সূর্য্যকিরণ পায় না, তাহারা ক্রমশঃই রুগ্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কুসংস্কারের আকার ধারণ করে! কথায় কথায় যে সকল মত গঠিত হইয়া উঠিল, তাহারা চারিদিকে তর্কবিতর্কের ছোরাছুরি দেখিয়া ভয়ে আত্মহত্যা করিয়া মরে।

তার্কিক বন্ধুদিগের সহবাসে থাকিলে প্রাণের উদারতা সঙ্কীর্ণ হইতে থাকে। আমি কাল্পনিক লোক, আমার জগৎ লাখেরাজ জমি, আমি কাহাকেও এক পয়সা খাজনা দিই না, অথচ জগতের যেখানে ইচ্ছা বিচরণ করিতে পারি, যাহা ইচ্ছা উপভোগ করিতে পারি। তুমি যুক্তি মহারাজের প্রজা, যুক্তিকে যতটুকু জমির খাজনা দিবে, ততটুকু জমি তোমার, যখনি খাজনা দিতে না পারিবে, তখনি তোমার জমি নিলামে বিক্রয় হইয়া যাইবে। তোমার তার্কিক বন্ধু পাশে বসিয়া ক্রমাগত তোমার জমি মার্কে করিতেছেন, ও তাহার সীমাবন্দী করিয়া দিতেছেন; প্রতিদিন এক বিঘা, দুই বিঘা করিয়া তোমার অধিকার কমিয়া আসিতেছে।

আমি যখন রাত্রিকালে অসংখ্য তারার দিকে চাহিয়া আমার অনন্ত জীবন কল্পনা করিতেছি, জগতের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত আমার প্রাণের বিচরণভূমি হইয়া গিয়াছে, আমি যখন নূতন নূতন আলোক, নূতন নূতন গ্রহ মাড়াইয়া নূতন নূতন জীবকে স্বজাতি করিয়া, বিস্ময়-বিহ্বল পথিকের মত অনন্ত বৈচিত্র্য দেখিতে দেখিতে অনন্ত পথে যাত্রা করিয়াছি, বিচিত্র জগৎপূর্ণ অনন্ত আকাশের মধ্যে যখন আমার জীবনের

আদি অন্ত হারাইয়া গিয়াছে, যখন আমি মনে করিতেছি এই কাঠাত্তিনেক জমির চারিদিকে পাঁচিল তুলিয়া এই খানেই ধূলির মধ্যে ধূলি-মুষ্ট হইয়া থাকা আমার চরম গতি নহে, জল-বায়ু আকাশ, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র বিশ্ব চরাচর আমার অনন্ত জীবনের ক্রীড়া-ভূমি,—তখন দূর কর তোমার যুক্তি, তোমার তর্ক—তোমার ন্যায়শাস্ত্র গলায় বাঁধিয়া যুক্তির শানবাঁধান কুয়োর মধ্যে পরমানন্দে তুমি ডুবিয়া মর'। তখন তোমাকে কৈফিয়ৎ দিতে আমার ইচ্ছাও থাকে না অবসরও থাকে না। তুমি যে আমার অতখানি কাড়িতে চাও তাহার বদলে আমাকে কি দিতে পার? তোমার আছে কি? আমি যে জায়গায় বেড়াইতে ছিলাম, তুমি তাহার কিছু ঠিকানা করিয়াছ? সেখানকার মেরু-প্রদেশের মহা সমুদ্রে তোমার এই বুদ্ধির ফুটো নারিকেল মালায় চড়িয়া কখনো কি আবিষ্কার করিতে বাহির হইয়াছিলে? পৃথিবীর মাটির উপর তুমি রেল পাতিয়াছ, এই ৮০০০ মাইলের ভূগোল তুমি ভালরূপ শিখিয়াছ, অতএব যদি আমি ম্যাডাগাস্কারের জায়গায় কামস্কাট্কা কল্পনা করি, তাহা হইলে না হয় আমাকে তোমাদের স্কুলের এক ক্লাস নামাইয়া দিও কিন্তু যে অনন্তের মধ্যে তোমাদের ঐ রেলগাড়িটা চলে নাই, কোন কালে চলিবে বলিয়া ভরসা নাই, সেখানে আমি একটু হাওয়া খাইয়া বেড়াইতেছি ইহাতে তোমাদের মহাভারত কি অশুদ্ধ হইল?

তোমরা ত আবশ্যকবাদী, আবশ্যকের এক ইঞ্চি এদিকে ওদিকে যাও না। তোমাদেরই আবশ্যকের দোহাই দিয়া তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, আমি যে অনন্তরাজ্যে বিচরণ করিতেছি, যুক্তির কারাগারে পুরিয়া আমাকে সে রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিবার আবশ্যকটা কি? যাহাতে মানুষের সুখ, উন্নতি, উপকার হয়, তাহাইত সকল জ্ঞানের সকল কার্য্যের উদ্দেশ্য! আমি যে অসীম সুখে মগ্ন হইতেছিলাম, আমার যে প্রাণের অধিকার বাড়িতেছিল, আমার যে প্রেম জগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল, ইহা সংক্ষেপ করিয়া দিয়া তোমাদের কি প্রয়োজন সাধন করিলে? মনুষ্যের কি উপকার করিলে, কি সুখ বাড়াইলে? মানুষের সুখের আশা, কল্পনার অধিকার এতটাই যদি হ্রাস হয়, তবে তোমার এই মহামূল্য যুক্তিটা কিছুক্ষণের জন্য শিকায় তোলা থাক্না কেন?

যুক্তির মানে কি? যোজনা করা ত? এক-টার সঙ্গে আর একটার যোগ করা। পতনের সঙ্গে হাত পা ভাঙ্গার যোগ আছে, সুতরাং পতনের পর হাত পা ভাঙ্গা যুক্তিসিদ্ধ। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে যে হাত পা ভাঙ্গিবে ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে, কারণ এই কার্য্যকারণের মধ্যে একটা যোগ পাওয়া যায় না। কিন্তু একটু ভাবিলেই দেখা যায়, আমরা কেবল কতকগুলি ঘটনাই দেখিতে বা জানিতে পাই, কোন্ কার্য্য কারণের যোগ আমাদের চোখে পড়ে! ঈথর নামক সূক্ষ্ম পদার্থে ঢেউ উঠিলে আমরা যে আলো দেখিতে পাই, ইহার যুক্তি কি? এ দুইটি ঘটনার মধ্যে যোগ কোথায়? আমাদের মস্তিষ্কের কতকগুলি পরমাণু ঘোড়ার সঙ্গে, আমাদের স্মৃতির, ভাবনার, মনোবৃত্তির কি যোগ থাকিতে পারে? এমন কি কার্য্যকারণশৃঙ্খল আছে, যাহার পদে পদে Missing links নাই এইত তোমার যুক্তি! এই তৃণটি ধরিয়া তুমি অনন্ত নামক অকূল অতলস্পর্শ সমুদ্রে কি বলিয়া ভাসিতে চাও। যুক্তির গোটাকতক কাজ আছে তার আর ভুল নাই, কিন্তু তাই বলিয়া ঐ ম্যাজিকটা যে যেখানে সেখানে মোড়লি করিয়া বেড়াইবে সে কাহার প্রাণে সয়? ত

নিজের কাজই ঢের বাকি পড়িয়া আছে, পরের কাজে ব্যাঘাত করিয়া সময় নষ্ট করিবার আবশ্যক ? –

জগতের যেমন একদিকে সীমা, আর এক-দিকে অনন্ত, একদিকে তীর আর একদিকে সমুদ্র, আমাদের মনেরও তেমনি একদিকে সীমা আর-একদিকে অসীম ; সীমার রাজ্যে যুক্তির শাসন, অতএব সে রাজ্যে যুক্তির শাসন লঙ্ঘন করিলে পদে পদে তাহার ফল ভোগ করিতে হয় ; কিন্তু যখনি অসীমের রাজ্যে পদার্পণ করিলাম' তখনি আমরা আর যুক্তির প্রজা নহি, অতএব হে বন্ধু হে তার্কিক, আমি যখন অসীমের রাজ্যে আছি, তখন আমাকে যুক্তির আইনের ভয় দেখাইলে আমি মানিব কেন ?

তাই বলিতেছি, তুমি যে কথায় কথায় আমার সঙ্গে তর্ক করিতে আইস, সেটা আমার ভাল লাগে না, এবং তাহাতে কোন কাজও হয় না। তুমি আমি একত্র থাকাটাই অযৌ-ক্তিক, কারণ, তোমাতে আমাতে কোন যোগই নাই! তোমাকে আমি হীন বলিতেছি না, তুমি হয়ত মস্ত লোক, তুমি হয়ত রাজা, কিন্তু শার্ঙ্গ-রব দুষ্মন্তকে যেরূপ চক্ষে দেখিয়াছিলেন আমিও হয়ত তোমাকে সেইরূপ চক্ষে দেখিব:—

"অভ্যক্তমিব স্নাতঃ, শুচিরশুচিমিব, প্রবুদ্ধ-ইব সুপ্তম্" ইত্যাদি যুক্তির সৈন্য লইয়া তুমি তোমার নিজ রাজ্যে একজন দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ লোক, উহারই সাহায্যে তুমি কতরাজ্য অধিকার করিলে, কত রাজ্য ধ্বংস করিলে, কিন্তু আমার বিস্তৃত রাজ্যের একতিলও তুমি কাড়িয়া লইতে পার না! তুমি আমাকে হাজার চোখ রাঙাও না কেন আমি ডরাই না। আমার অধিকারে আসিবার ক্ষমতা তুমি হারাইয়াছ, কিন্তু তোমার অধিকারে আমি অনায়াসেই যাইতে পারি। তোমাতে আমাতে বিস্তর প্রভেদ।

আমার তার্কিক বন্ধু এই বলিয়া আমার নিন্দা করেন যে, আমি এক সময়ে যাহা বলিয়াছি আর এক সময়ে তাহার বিপরীত কথা বলি ; সে কথাটা ঠিক। কিন্তু তাহার একটা কারণ আছে। আমি যাহা বলি, তাহা প্রাণের ভিতর হইতে বলি, যুক্তি অযুক্তি খতাইয়া হিসাব পত্র করিয়া বলি না। আমি যাহার কথা বলি, মম-তার প্রভাবে তাহার সহিত একবারে মিশাইয়া যাই, সুতরাং কেবল মাত্র তাহার কথাই বলি তাহার উল্টাদিকের কথাটা বলি না। প্রকৃতি-তেও তাহাই হয়' প্রকৃতির দিন প্রকৃতির রাত্রের বিপরীত কথা বলিয়া থাকে, প্রকৃতির পূর্ব্বদিক প্রকৃতির পশ্চিমদিকের কথা বলে না। প্রকৃতির পদে পদে বিরোধী উক্তি দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু তাহারা কি বাস্তবিকই বিরোধী ? তাহারা দুই বিপরীত সত্য। আমি আলো হইয়া আলোর কথা বলি, অন্ধকার হইয়া অন্ধকারের কথা বলি। আমার দুটা কথাই সত্য। আমি কিছু এমন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসি নাই যে একে বারে বিরোধী কথা বলিব না ; যে ব্যক্তি কোন কালে বিরোধী কথা বলে নাই তাহার বুদ্ধি ত জড়পদার্থ ; তাহার কোন কথার কোন মূল্য আছে কি ? আমরা যে বিরোধের মধ্যে বাস করি। আমাদের অন্ত আমাদের কল্যকার বিরোধী, আমাদের বৃদ্ধকাল আমাদের বাল্য-কালের বিরোধী ; সকালে যাহা সত্য বিকালে তাহা সত্য নহে। এত বিরোধের মধ্যে থাকি-য়াও যাহার কথার পরিবর্ত্তন হয় না, যাহার মত অবিরোধে থাকে, তাহার বুদ্ধিটাও একটা কলের পুতুল, যতবার দম দিবে ততবার একই নাচন নাচিবে।

উপসংহারে আর গুটিদুই কথা বলিয়া শেষ করি।

যে পাড়ার ক্রোশ তিনেকের মধ্যে তার্কিক লোকের গন্ধ আছে, সেখানে বোধ করি, কোন ভাবুক লোক তিষ্ঠিতে পারেন না। বোধ করি, তার্কিক লোকের মুখ দেখিলেই ভাবের বিকাশ বন্ধ হইয়া যায়। অতএব যাহারা ভাবের চর্চ্চা করিতে চান তাঁহারা কাছাকাছি এমন বন্ধু রাখিবেন, যাঁহাদের সহিত মতের মিল আছে। অনুরাগের আবহাওয়ার মধ্যে থাকিলে মনের গূঢ় ক্ষমতাগুলি যেমন সতেজে মাটি ফুঁড়িয়া উঠে, এমন আর কোথাও নয়।

একটা গাছে কতশত বীজ জন্মে। তাহার মধ্যে সবগুলা কিছু গাছ হয় না। কিন্তু গুটিকত গাছ জন্মাইবার উদ্দেশ্যে বিস্তর নিষ্ফল বীজ জন্মান আবশ্যক। আমাদেরও সকল ভাব কিছু সফল হইবে না। কিন্তু ভাবের প্রচুরতা আবশ্যক। গোটাকতক থাকিবে, অনেকগুলি মরিবে। কিন্তু প্রতিকূলতার প্রখর প্রভাবে যদি ভাবের বিকাশ একবারেই বন্ধ হয় তবে আর কি হইল?

তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি সাহিত্যে প্রতিকূল সমালোচনা কি ভাল? ভাল বইয়ের ভাল সমালোচনা ভাল, কুরুচি-বিকাশক হানিজনক বইয়ের নিন্দা করাও দোষের নহে, কিন্তু লেখকের ক্ষমতার অভাবে বা বুদ্ধির দোষে অসম্পূর্ণ গ্রন্থগুলিকে কঠোর ভাবে সমালোচনা করিলে তাহাতে কি ভাল হয় বুঝিতে পারি না।

সত্যের অংশ।

সত্যের আংশিক ভাবে দেখিলে অনেক সময়ে তাহা মিথ্যার রূপান্তর ধারণ করে। একপাশ হইতে একটা জিনিষকে দেখিয়া যাহা সহসা মনে হয়, তাহা একপেশে সত্য, তাহা বাস্তবিক সত্য না হইতেও পারে। আবার অপর পক্ষেও একটা বলিবার কথা আছে। কেহ সত্যকে সর্ব্বতোভাবে দেখিতে পায় না। সত্যকে যথাসম্ভব সর্ব্বতোভাবে দেখিতে গেলে প্রথমে তাহাকে আংশিক ভাবে দেখিতে হইবে, তাহা ব্যতীত আমাদের আর গতি নাই। ইহা আমাদের অসম্পূর্ণতার ফল। আমরা কিছু একেবারেই একটা চারি-কোণা দ্রব্যের সবটা দেখিতে পাই না—ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিতে হয়। এই নিমিত্ত উচিত যে, যে যে-দিকটা দেখিয়াছে সে সেই দিকটাই সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করুক, অবশেষে সকলের কথা গাঁথিয়া একটা সম্পূর্ণ সত্য পাওয়া যাইবে। আমাদের এক-চোখো মন লইয়া সম্পূর্ণ সত্য জানিবার আর কোন উপায় নাই। আমরা একদল অন্ধ, আর সত্য একটি হস্তী। স্পর্শ করিয়া করিয়া সকলেই হস্তীর এক একটি অংশের অধিক জানিতে পারি না; এই জন্যই কিছু দিন ধরিয়া, হস্তীকে কেহ বা স্তম্ভ, কেহ বা সর্প, কেহ বা কুলা বলিয়া ঘোরতর বিবাদ করিয়া থাকি, অবশেষে সকলের কথা মিলাইয়া বিবাদ মিটাইয়া লই। আমি যে ভূমিকাচ্ছলে এতটা পুরাতন কথা বলিলাম, তাহার কারণ এই—আমি জানাইতে চাই—একপেশে লেখার উপর আমার কিছুমাত্র বিরাগ নাই। এবং আমার মতে, যাহারা একেবারে

সত্যের চারিদিক দেখাইতে চায়, তাহারা কোন দিকই ভাল করিয়া দেখাইতে পারে না—তাহারা কতকগুলি কথা বলিয়া যায়, কিন্তু একটা ছবি দেখাইতে পারে না। একটা উদাহরণ দিলেই আমার কথা বেশ স্পষ্ট হইবে। একটা ছবি আঁকিতে হইলে, যথার্থতঃ যে দ্রব্য যেরূপ ঠিক সেরূপ আঁকা উচিত নহে। যখন চিত্রকর নিকটের গাছ বড় করিয়া আঁকে ও দূরের গাছ ছোট করিয়া আঁকে, তখন তাহাতে এমন বুঝায় না যে বাস্তবিকই দূরের গাছগুলি আয়তনে ছোট। একজন যদি কোন ছবিতে সব গাছগুলি প্রায় সম-আয়তনে আঁকে, তবে তাহাতে সত্য বজায় থাকে বটে, কিন্তু সে ছবি আমাদের সত্য বলিয়া মনে হয় না—অর্থাৎ তাহাতে সত্য আমাদের মনে অঙ্কিত হয় না। লেখার বিষয়েও তাহাই বলা যায়। আমি যে ভাবটা নিকটে দেখিতে পাই, সেই ভাবটাই যদি বড় করিয়া না আঁকি, ও তাহার বিপরীত দিকের সীমান্ত যদি অনেকটা ক্ষুদ্র, অনেকটা ছায়াময়, অনেকটা অদৃশ্য করিয়া না দিই—তবে তাহাতে কোন উদ্দেশ্যই ভাল করিয়া সাধিত হয় না; না সমস্তটার ভাল ছবি পাওয়া যায়, না একাংশের ভাল ছবি পাওয়া যায়। এই জন্যই লেখক-চিত্রকরদিগকে পরামর্শ দেওয়া যায়, যে যে ভাবটাকে কাছে দেখিতেছ, তাহাই বড় করিয়া আঁক; ভাবিয়া চিন্তিয়া, বিচার করিয়া, সত্যের সহিত পরামর্শ করিয়া—ন্যায়কে বজায় রাখিবার জন্য তাহাকে খাট করিবার কোন আবশ্যক নাই।

বিজ্ঞতা।

সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠানের অনেক বাধা আছে কিন্তু সকলের চেয়ে বোধ করি একটি গুরুত বাধা আছে! যখন বড় বড় বিজ্ঞগণ ঠোঁ টিপিয়া, চোখে চসমা আঁটিয়া শিশু অনুষ্ঠানটিবে ঘিরিয়া বসেন, সোজা সোজা কাজের মধ হইতে বাঁকা বাঁকা উদ্দেশ্য বাহির করিতে থাকেন, ও পরস্পর চোখ-টেপাটিপি করিয়া বলিতে থাকেন "ওহে, বুঝেছ এ সমস্ত কেন!" তখন বোধ করি উৎসাহের রক্ত জল হইয়া যায়, উদ্যমের হাত পা শিথিল হইয়া পড়ে এই সকল তীক্ষ্ণনাসিকা ক্ষুরোজ্জ্বলচক্ষু, ধারাল পেঁসাল-বুদ্ধিগণ তিল হইতে তাল, সামান্য হইতে অসামান্য, সৎ হইতে অসৎ আবিষ্কার করিয়া সদনুষ্ঠানের প্রাণে বাঁকা কটাক্ষপাত করিয়া তাহার চোখ দিয়া জল তাহার বুক দিয়া রক্ত বাহির করিয়া দেন। সর্প জাতি, বোধ করি, বড় বুদ্ধিমান হইবে, নহিলে তাহারা বাঁকিয়া চলে কেন? হে বিজ্ঞগণ, তোমরাও খুব বুদ্ধিমান, কিন্তু একটা বিষয় তোমাদের জানা নাই, পৃথিবীতে সিধা জিনিষও অনেক আছে; তোমাদের প্রাণের বাঁকা আর্শিতে যে একটা বাঁকা ছায়া দেখিতেছ, জগতের চেহারা খানা নিতান্তই অমনতর না। হায় হায়! জন্মেজয় যখন সর্পসত্র করিয়া ছিলেন তখন কি গোটাকত ঢোঁড়া সাপ মরিয়াছিল, তোমাদের মত বিষাক্ত বুদ্ধিমা সাপগুলা ছিল কোথায়?

তুমি সৎকার্য্য করিতেছ বলিয়া বি লোকেরাও যে তাহাকে সৎ মনে করিবে, কি করিয়া আশা করা যায়? তাহা হইা বিধাতা তাহাদিগকে বিজ্ঞ করিয়াই গড়িতে

কেন? বসন্ত আসিয়াছে বলিয়া কি কাক মিঠা ডাকিবে? তাহা হইলে বিধাতা তাহাকে কাক করিলেন কেন? সে যে বুদ্ধিমান পক্ষী! যখন কোকিল ডাকিতে থাকে, ফুল ফুটিয়া উঠে, বাতাস প্রাণ খুলিয়া দেয়, তখন সে শাখায় বসিয়া বুদ্ধিপূর্ণ ক্ষুদ্র চক্ষু মিটমিট করিতে থাকে, অবিশ্বাসের সহিত চারিদিকে চাহিয়া দেখে ও বেসুরে ডাকিয়া উঠে কা। বসন্তের সহিত তাহার সুর মেলে না বলিয়া সে কি চুপ করিয়া থাকিবে? সে যে বুদ্ধিমান জীব! সে বলে, বসন্তের সুর বেসুরা বলিতেছে! যখন কোকিল ডাকে, অমনি সে ঘাড় নাড়িয়া বলে, কা,—যখন ফুল ফুটে অমনি সে ঘাড় নাড়িয়া বলে কা—অর্থাৎ কিছুতেই সে সায় দিতে পারে না, সে বলে যে, আগাগোড়া সুর মিলিতেছে না! শুনা গেছে, মনুষ্যলোকে এমন অঙ্গহীন দেখা যায়, যাহার একটা কাণ নাই, এমন কি, দুইটা কাণই খরচ হইয়া গেছে; হে কাক, স্বভাবতই—জন্মাবধিই তোমার কাণের অভাব—অতএব কে তোমার কাণ ধরিয়া শিখাইবে যে, তোমার গলাটাই বেসুরা! কিন্তু তবুও ফুল ফোটে কেন, তবুও কোকিল ডাকে কেন? বসন্তের প্রাণের মধ্যে বসিয়া কে এমন একটা তানপূরা বাজাইতেছে, যাহাতে এত বেসুরের মধ্যেও সে অমন সুর ঠিক রাখিতেছে! কিন্তু সুর কি ঠিক থাকে? সাধ কি যায় না গান বন্ধ করি? ক'জনের প্রাণ এমন আছে, যাহারা বেতালা বেসুরা সঙ্গতের সহিত—অর্থাৎ অসঙ্গত সঙ্গতের সহিত গান গাহিয়া উঠিতে পারে? কোকিলও তাহা পারে না;—যখন বর্ষার সময় ভেকগুলা অসম্ভব ফুলিয়া উঠিয়া জগৎসংসারে ভাঙ্গা গলায় নিজের মত জারি করিতে থাকে—তখন কোকিল চুপ করিয়া যায়। আচ্ছা, স্বীকার করিলাম—হে ভেকগণ, তোমাদেরই জয়! তোমরা আরো ফুলিতে থাক—আরো লম্ফ দাও—আরো মক্ মক্ কর! তোমরা কর্কশ কণ্ঠ লইয়া জগতের গান বন্ধ করিতে পারিয়াছ; অতএব তোমরাই জিতিলে!

হে বিধাতঃ, জগতে কাক সৃষ্টি করিয়াছ বলিয়া তোমার দোষ দিই না। কাকের অনেক কাজ আছে। কিন্তু তাহাকে যে কাজ দিয়াছ, সেই কাজেই সে লিপ্ত থাকে না কেন? সৌন্দর্য্যপূর্ণ বসন্তের প্রাণের মধ্যে সে কেন তাহার কঠোর কণ্ঠের চঞ্চু বিঁধিতে থাকে?

কেন? তাহার কারণ বড় বড় বুদ্ধিমান লোকের সৌন্দর্য্যের উপর বড় একটা বিশ্বাস নাই, সৎ-উদ্দেশ্যের প্রতি অকাট্য সংশয় বিদ্যমান। এই জন্য সৎকার্য্যের নাম শুনিলেই ইহাঁদের সংশয়কুঞ্চিত অধরোষ্ঠের চারিদিকে পাণ্ডুবর্ণ মড়কের মত একটা বিষাক্ত হাসি ফুটিয়া ওঠে। অতি-বুদ্ধিমান জীবের সম্মুখের দাঁতের পাটিতে যে একটা দারুণ হাস্যবিষ আছে—হে জগদীশ্বর, সেই বিষ হইতে পৃথিবীর সমুদয় সৎকার্য্যকে রক্ষা কর। ইহাঁরা যখন পরস্পর টেপাটিপি করিয়া বলিতে থাকেন "এই লোকটার মতলব বুঝিয়াছ? কেবল আমাদের খোষামোদ করা" বা "অমুকের নিন্দা করা" বা "সাধারণের কাছে নাম পাইবার প্রয়াস"—তখন সৎলোকের জীবনের মূলে গিয়া কুঠারাঘাত পড়ে তাহার সমস্ত জীবনের আশা ম্রিয়মাণ হইয়া যায়।

সকল কাজ, সকল বিষয় হইতেই একটা গূঢ় মৎলব বাহির করিবার চেষ্টা অনেক কারণে হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, কেহ কেহ এমন আত্মাভিমানী আছে যে, নিজেকেই সমস্ত কথা, সমস্ত কাজের লক্ষ্য মনে করে।

সমস্ত জগৎ যেন তাহার দিকেই আঙুল বাড়াইয়া আছে। সে যে কথা শুনে, আত্মম্ভরিতার ব্যাকরণ ও অভিধানের সহিত মিলাইয়া তাহার একটা গূঢ় অর্থ ব্যাখ্যা করিতে থাকে। সে যে কাজ দেখে আত্মাভিমানের চাবি দিয়া সেই কাজের গূঢ় কবাট উদ্‌ঘাটন করিয়া তাহার মধ্যে নিজের প্রতিমা দেখিতে পায়। সে মনে করে বিশ্বচরাচর খাওয়াদাওয়া বন্ধ করিয়া তাহার অনিষ্ট বা তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই দিন রাত্রি একটা পরামর্শ করিতেছে! সে পথপার্শ্বস্থিত সাপের মত সর্ব্বদাই মনে করে, পান্থগণ তাহারই লেজ মাড়াইবার জন্য পাকচক্র করিতেছে, এই জন্য সে ভীত হইয়া আগে হইতেই ছোবল মারে! এই সকল কীটগণ মনে করে ফুলেরা যে সুন্দর হইয়া ফুটিয়া উঠে সে কেবল ইহাদের দংশন-সুখ অনুভব করিবার জন্যই! এই সকল পেচকেরা মনে করে যে, সূর্য্য যে কিরণ দান করেন, সে কেবল পেঁচার সহিত তাঁহার শত্রুতা আছে বলিয়াই।

আর এক দল লোক আছেন, তাঁহারা চিরকাল মৎলব খাটাইয়া আসিতেছেন, তাঁহারা সহজে বিশ্বাস করিতে পারেন না পৃথিবীতে কাহারো উদারতা আছে। সিধা কথা, সামান্য কাজের মধ্য হইতে একটা ঘোরতর গূঢ় মৎলব বাহির করিতে ইহাঁদের বুদ্ধি অত্যন্ত আমোদ পায়। একটা দুরন্ত অস্থির চঁচাল বক্রবুদ্ধি ইহাঁদের মনের মধ্যে দিন-রাত ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, তাহাকেত একটা কাজ দিতে হইবে—সিধা কাজে সে খেলাইতে পায় না—এই নিমিত্ত সিধার মধ্যেও সে একটা বাঁকা রাস্তা গড়িয়া লয়। খেলাইবার জায়গা চাই! একজন লোকের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, একমাত্র আশা, যাহার কাছে সে তাহার দুর্দ্দান্ত স্বার্থপরতাকে বলিদান দিয়াছে, মান অপমানকে তৃণ জ্ঞান করিয়াছে তাহাই লইয়া খেলা! এক জন লোক যখন পরের দুঃখ দেখিয়া, দারিদ্র্য দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে, তখন তাহার সেই অশ্রুবিন্দু লইয়া সমালোচনা! একজন সহৃদয় লোক যখন উচ্ছ্বসিত আবেগে প্রাণের কথা বলিতেছে, তখন তাহার সেই কথা গুলিকে বাঁকা ছাঁচে ঢালিয়া তাহাদের আকৃতি সম্পূর্ণ বদল করিয়া দেওয়া। এ সকল কেমনতর হৃদয়হীন খেলা। ইহাতে যে তোমার নিজের হৃদয়ের সর্ব্বনাশ করা হয়। ফুল মৎলব করিয়া সুন্দর হইয়াছে, পাখী মৎলব করিয়া সুস্বর গাহিতেছে,—সর্ব্বদা পাহারা দিতে থাক, পাছে মৎলব ধরা না পড়ে—পাছে যাহার মৎলব আছে তাহাকে সরল মনে করিয়া তুমি ঠকিয়া যাও, তুমি নির্ব্বোধ বনিয়া যাও। আমার বুদ্ধিমান হইয়া কাজ নাই, আমি চিরকাল ঠকিব, আমি চিরকাল নির্ব্বোধ হইয়া থাকিব। আমি সুন্দরকে উপভোগ করিতে চাই, আমি সৌন্দর্য্যকে বিশ্বাস করিতে চাই। আমি ঠকিতে চাই, কারণ এ স্থলে ঠকিলেও লাভ। আর, সব চেয়ে লোকসান হয় তোমারই! তোমার ঐ বুদ্ধির টেরা চোখ দুটার উপর অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া প্রকৃতিকে বাঁকা দেখিতেছ—সে কি তোমার বড় সুখের কারণ হইয়াছে? তাহার চেয়ে কি তোমার ঐ চোখ দুটা অন্ধ হইলেই ভাল ছিল না?

তোমাদের মুখ ত ভারি দেখিতেছি! তোমরা প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পার না, প্রাণ খুলিয়া প্রশংসা করিতে পার না, প্রাণ খুলিয়া পরকে বিশ্বাস করিতে পার না। "যদি" "কিন্তু" "কদাচ" "কিঞ্চিৎ" প্রভৃতি কথাগুলা ব্যবহার করিয়া কৃপণের দড়ি-বাঁধা টাকার

ধলির মুখের মত তোমাদের ভাষাকে কুঞ্চিত সঙ্কুচিত করিয়া তুলিয়াছ! ইহাকেই তোমরা বিজ্ঞতার লক্ষণ মনে কর। ভাল লোককে "হম্বগ্" মনে করা, ভদ্রতাকে হীনতা মনে করা, যে তোমাদের নিজের মতাবলম্বী নয় তাহাকে অশিক্ষিত অপদার্থ মনে করা, যশস্বী লোকের যশকে ফাঁকি মনে করা, তোমাদের অপেক্ষা শতগুণে বিদ্বান্ লোকের বিদ্যার গভীরতা নাই বলিয়া লোকের কাছে প্রচার করা, কিঞ্চিৎ হাতে রাখিয়া মত ব্যক্ত করা, নিজেকে ভারি একজন মস্ত লোক মনে করা, এই সকলকে তোমরা বিজ্ঞতার লক্ষণ বলিয়া জান। তোমরা সিংহাসনস্থ বড় বড় রাজা মহারাজার চেয়ে নিজেকে উঁচু মনে করিতেছ—তাহার কারণ, তোমাদের আত্মম্ভরিতা নামক লাঙ্গুলের প্রসরটা অত্যন্ত অধিক—নিজ রচিত কুণ্ডলিত লাঙ্গুল-সিংহাসনের উপর বসিয়া দূরবীক্ষণের উল্‌টা দিক দিয়া জগৎ সংসারকে দেখিতেছ। তোমাদের শরীরের আয়তন অধিক নহে, কিন্তু লেজ হইতে মাপিলে অনেকটা হয়। বিজ্ঞতার হৃদয় যদি এতটা প্রশস্ত হয় যে পরকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলে তাহার বক্ষে স্থান কুলায়, কুঞ্চিত-চর্ম্ম সংশয়ের নাম যদি বিজ্ঞতা না হয়, তবে সেই বিজ্ঞতা উপার্জ্জনের জন্য চেষ্টা করিব। তোমাদের বিজ্ঞতায় যে সূর্য্যের আলো নাই, বসন্ত কাননের শ্যামল বর্ণ নাই। তোমাদের বিজ্ঞতা সমুদয় জগৎকে অবিশ্বাস করিয়া অবশেষে একটি দুই হাত পরিমাণ ডোবার মধ্যে নিজেকে বদ্ধ করিয়াছে ও আপনাকে সমুদ্রের চেয়ে গভীর মনে করিতেছে, চন্দ্র সূর্য্যের হাসিকে চপলতা জ্ঞান করিতেছে, অনবরত পচিয়া উঠিতেছে, ও মুখটা আঁধার করিয়া সুগম্ভীর চেহারা বাহির করিতেছে! তোমাদের বিজ্ঞতার প্রাণটা একরত্তি, তাহাকে ছুঁইলেই কচ্ছপের মত সে নিজের পেটের মধ্যে প্রবেশ করে; তোমাদের বিজ্ঞতার হাসিতে কৃপণতা, তাহার ভাষায় দুর্ভিক্ষ, তাহার আলিঙ্গন কাঁকড়ার আলিঙ্গনের মত, জিনিষ কিনিয়া সে কাণাকড়ি দিয়া তাহার দাম শোধ করে! এ বিজ্ঞতা লইয়া তোমরাই গর্ব্ব কর!

যে বিজ্ঞ সদনুষ্ঠানকে উপহাস করে, তাহা অপেক্ষা যে সরল ব্যক্তি সদনুষ্ঠানে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছে সে মহৎ; যে মশক হস্তীকে বিব্রত করিয়া তোলে সে মশক হস্তীর চেয়ে বড় নহে—যে পাঁকে সৎপথগামী সাধুর পা বসিয়া গেছে, সে পাঁকের জাঁক করিবার বিষয় কিছুই নাই। সংশয় করিয়া, বিদ্রূপ করিয়া অসৎ অভিসন্ধি আবিষ্কার করিয়া অনেক বিজ্ঞ অনেক সৎকার্য্যকে অঙ্কুরে দলিত করিয়া দিয়াছেন, অনেক তরুণ হৃদয়ের নবীন আশাকে তাঁহাদের হাস্যের বিদ্যুদাঘাতে চিরকালের জন্য দগ্ধ করিয়াছেন, অনেক উন্মুখ প্রতিভাকে নিষ্ঠুরভাবে পীড়ন করিয়া হয়ত পৃথিবীর একটা শতাব্দীকে অনুর্ব্বর মরুময় করিয়া দিয়াছেন—ইঁহারা যদি এই সকল দলিত অঙ্কুর, দগ্ধ আশা, ভগ্ন হৃদয়, স্তূপাকৃতি করিয়া নিজের কীর্ত্তিস্তম্ভ রচনা করেন তবে কি কোন পিরামিড্ আয়তনে তাহার সমকক্ষ হইতে পারে? রোগ দুর্ভিক্ষের সহোদর বিজ্ঞতা শ্মশানের ভয় দিয়া একটা উৎসবাগার নির্ম্মাণ করিয়াছে, সেখানে অস্থিকঙ্কালের নৃত্য হইতেছে, হৃদয় শোণিতের মদ্যপান চলিতেছে, খরধার রসনা-খড়্গে আশা উদ্যমের বলি হইতেছে; আইস, যাহাদের হৃদয় আছে, আমরা প্রকৃতি মাতার উৎসবালয়ে যাই; সেখানে জীবনের অভিনয় হইতেছে, সেখানে সৌন্দর্য্যের উৎস উৎসারিত হইতেছে,

সেখানে মাপাজোকা কার্পণ্য নাই, সেখানে বাঁকাচোরা অনুদারতা নাই—সেখানে দুইমুখা প্রাণ নাই। এ সকল বিজ্ঞলোকেদের সহিত আমাদের পোষাইবে না—আমরা ইহাদের চিনিতে পারিব না, ইহাদের কথা ভাল বুঝিতে পারিব না—ইহারা উপদেশ দিবার সময় বড় বড় নীতিকথা বলে, কিন্তু ইহাদের মনে পাপ আছে, ইহাদের সর্ব্বাঙ্গে সংক্রামক রোগ!

মেঘনাদবধ কাব্য।

সকলেই কিছু নিজের মাথা হইতে গড়িতে পারে না, এই জন্যই ছাঁচের আবশ্যক হয়। সকলেই কিছু কবি নহে এই জন্য অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রয়োজন। গানের গলা অনেকেরই আছে, কিন্তু গানের প্রতিভা অল্প লোকেরই আছে, এই জন্যই অনেকেই গান গাহিতে পারেন না, রাগ রাগিণী গাহিতে পারেন।

হৃদয়ের এমন একটা স্বভাব আছে যে, যখনি তাহার ফুল-বাগানে বসন্তের বাতাস বয়, তখনি তার গাছে গাছে ডালে ডালে আপনি কুঁড়ি ধরে, আপনি ফুল ফুটিয়া উঠে। কিন্তু যার প্রাণে ফুল বাগান নাই, যার প্রাণে বসন্তের বাতাস বয় না, সে কি করে? সে প্যাটার্ণ কিনিয়া চোখে চসমা দিয়া পশমের ফুল তৈরি করে।

আসল কথা এই, যে সৃজন করে তাহার ছাঁচ থাকে না, যে গড়ে তাহার ছাঁচ চাই। অতএব উভয়কে এক নামে ডাকা উচিত হয় না।

কিন্তু প্রভেদ জানা যায় কি করিয়া? উপায় আছে। যিনি সৃজন করেন, তিনি আপনাকেই নানা আকারে ব্যক্ত করেন; তিনি নিজেকেই কখন বা রামরূপে, কখন বা রাবণরূপে কখন বা হ্যাম্‌লেটরূপে কখন বা ম্যাক্‌বেথরূপে পরিণত করিতে পারেন—সুতরাং অবস্থা-বিভেদে প্রকৃতিবিভেদ প্রকাশ করিতে পারেন! আর যিনি গড়েন, তিনি পরকে গড়েন, সুতরাং তাঁর একচুল এদিক ওদিক করিবার ক্ষমতা নাই;—ইঁহাদের কেবল কেরাণীগিরি করিতে হয়, পাকা হাতে পাকা অক্ষর লিখেন, কিন্তু অনুস্বর বিসর্গ নাড়াচাড়া করিতে ভরসা হয় না। আমাদের শাস্ত্র ঈশ্বরকে কবি বলেন, কারণ আমাদের ব্রহ্মবাদীরা অদ্বৈতবাদী। এই জন্যই তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর কিছুই গঠিত করেন নাই, ঈশ্বর নিজেকেই সৃষ্টরূপে বিকশিত করিয়াছেন। কবিদেরও তাহাই কাজ, সৃষ্টির অর্থ ই তাহাই।

নকল-নবিশেরা যাহা হইতে নকল করেন, তাহার মর্ম্ম সকল সময়ে বুঝিতে না পারিয়াই ধরা পড়েন। বাহ্য আকারের প্রতিই তাঁহাদের অত্যন্ত মনোযোগ, তাহাতেই তাহাদের চেনা যায়।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। আমরা যত-গুলি ট্র্যাজেডি দেখিয়াছি, সকল গুলিতেই প্রায় শেষকালে একটা না একটা মৃত্যু আছে। তাহা হইতেই সাধারণতঃ লোকে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছে, শেষকালে মরণ না থাকিলে আর ট্র্যাজেডি হয় না। শেষকালে মিলন হইলেই আর ট্র্যাজেডি হইল না। পাত্রগণের মিলন অথবা মরণ, সে ত কাব্যের বাহ্য আকার মাত্র, তাহাই লইয়া কাব্যের শ্রেণীনির্দ্দেশ করিতে যাওয়া দূরদর্শীর লক্ষণ নহে। যে অনিবার্য্য নিয়মে সেই মিলন বা মরণ সংঘটিত হইল, তাহারি প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে।

মহাভারতের অপেক্ষা মহান্ ট্র্যাজেডি কে কোথায় দেখিয়াছ? স্বর্গারোহণকালে দ্রৌপদী ও ভীমার্জ্জুন প্রভৃতির মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়াই যে মহাভারত ট্র্যাজেডি তাহা নহে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভীষ্ম কর্ণ দ্রোণ এবং শত সহস্র রাজা ও সৈন্য মরিয়াছিল বলিয়াই যে মহাভারত ট্র্যাজেডি তাহা নহে—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যখন পাণ্ডবদিগের জয় হইল, তখনই মহাভারতের যথার্থ ট্র্যাজেডি আরম্ভ হইল। তাঁহারা দেখিলেন জয়ের মধ্যেই পরাজয়। এত দুঃখ, এত যুদ্ধ, এত রক্তপাতের পর দেখিলেন, হাতে পাইয়া কোন সুখ নাই, পাইবার জন্য উদ্যমেই সমস্ত সুখ; যতটা করিয়াছেন তাহার তুলনায়, যাহা পাইলেন তাহা অতি সামান্য; এত দিন যুঝাযুঝি করিয়া হৃদয়ের মধ্যে একটা বেগবান অনিবার উদ্যমের সৃষ্টি হইয়াছে, যখনি ফল লাভ হইল, তখনি সে উদ্যমের কার্য্যক্ষেত্র মরুময় হইয়া গেল, হৃদয়ের মধ্যে সেই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত উদ্যমের হাহাকার উঠিতে লাগিল; কয়েক হস্ত জমি মিলিল বটে, কিন্তু হৃদয়ের দাঁড়াইবার স্থান তাহার পদতল হইতে ধসিয়া গেল, বিশাল জগতে এমন স্থান সে দেখিতে পাইল না, যেখানে সে তাহার উপার্জ্জিত উদ্যম নিক্ষেপ করিয়া সুস্থ হইতে পারে; ইহাকেই বলে ট্র্যাজেডি। আরো নাবিয়া আসা যাক্, ঘরের কাছে একটা উদাহরণ মিলিবে। সূর্য্যমুখীর সহিত নগেন্দ্রের শেষকালে মিলন হইয়া গেল বলিয়াই কি বিষবৃক্ষ ট্র্যাজেডি নহে? সেই মিলনের মধ্যেই কি চিরকালের জন্য একটা অভিশাপ জড়িত হইয়া গেল না? যখন মিলনের মুখে হাসি নাই, যখন মিলনের বুক ফাটিয়া যাইতেছে, যখন উৎসবের কোলের উপরে শোকের কঙ্কাল তখন তাহার অপেক্ষা আর ট্র্যাজেডি কি আছে? কুন্দনন্দিনীর সমস্ত শেষ হইয়া গেল বলিয়া বিষবৃক্ষ ট্র্যাজেডি নহে—কুন্দনন্দিনীত এ ট্র্যাজেডির উপলক্ষ মাত্র। নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখীর মিলনের বুকের মধ্যে কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু চিরকাল বাঁচিয়া রহিল—মিলনের সহিত বিয়োগের চিরস্থায়ী বিবাহ হইল;—আমরা বিষবৃক্ষের শেষে এই নিদারুণ অশুভ-বিবাহের প্রথম বাসরের রাত্রিমাত্র দেখিতে পাইলাম—বাকিটুকু কেবল চোখ বুজিয়া ভাবিলাম—ইহাই ট্র্যাজেডি। অনেকে জানেন না, সমস্তটা নিকাশ করিয়া ফেলিলে অনেক সময় ট্র্যাজেডির ব্যাঘাত হয়। অনেক সময়ে সেমিকোলনে যতটা ট্র্যাজেডি থাকে দাঁড়িতে ততটা থাকে না। কিন্তু যাঁহারা না বুঝিয়া ট্র্যাজেডি লিখিতে যান; তাঁহারা কাব্যের আরম্ভ হইতেই বিষ ফরমাস দেন ছুরি শানাইতে থাকেন, ও চিতা সাজাইতে সুরু করেন।

এপিক্ (Epic) শব্দটা লইয়াও এইরূপ গোলযোগ হইয়া থাকে। এপিক্ বলিতে লোকে সাধারণতঃ বুঝিয়া থাকে, একটা মারামারী কাটাকাটীর ব্যাপার! যাহাতে যুদ্ধ নাই, তাহা আর এপিক্ হইবে কি করিয়া? আমরা যতগুলি বিখ্যাত এপিক্ দেখিয়াছি তাহার প্রায় সব গুলিতেই যুদ্ধ আছে সত্য, কিন্তু তাহাই বলিয়া এমন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসা ভাল হয় না, যে, যুদ্ধ ছাড়িয়া দিয়া যদি কেহ এপিক্ লেখে, তবে তাহাকে এপিক্ বলিব না। এপিক্ কাব্য লেখার আরম্ভ হইল কি হইতে? কবিরা এপিক্ লেখেন কেন? এখনকার কবিরা যেমন "এস, একটা এপিক্ লেখা যাক্" বলিয়া সরস্বতীর সহিত বন্দোবস্ত করিয়া এপিক্ লিখিতে বসেন, প্রাচীন কবিদের মধ্যে অবশ্য সে ফেসিয়ান ছিল না।

মনের মধ্যে যখন একটা বেগবান অনুভাবের উদয় হয়, তখন কবিরা তাহা গীতিকাব্যে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না; তেমনি মনের মধ্যে যখন একটি মহৎ ব্যক্তির উদয় হয়, সহসা যখন এক জন পরমপুরুষ কবিদের কল্পনার রাজ্য অধিকার করিয়া বসেন, মনুষ্য চরিত্রের উদার-মহত্ত্ব তাঁহাদের মনশ্চক্ষের সম্মুখে অধিষ্ঠিত হয়, তখন তাঁহারা উন্নতভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া সেই পরম পুরুষের প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ভাষার মন্দির নির্ম্মাণ করিতে থাকেন; সে মন্দিরের ভিত্তি পৃথিবীর গভীর অন্তর্দ্দেশে নিহিত থাকে, সে মন্দিরের চূড়া আকাশের মেঘ ভেদ করিয়া উঠে। সেই মন্দিরের মধ্যে যে প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হন, তাঁহার দেবভাবে মুগ্ধ হইয়া, পুণ্য-কিরণে অভিভূত হইয়া নানা দিগ্‌দেশ হইতে যাত্রীরা তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসে। ইহাকেই বলে মহাকাব্য! মহাকাব্য পড়িয়া আমরা তাহার রচনা কালের যথার্থ উন্নতি অনুমান করিয়া লইতে পারি। আমরা বুঝিতে পারি সেই সময়কার উচ্চতম আদর্শ কি ছিল। কাহাকে তখনকার লোকেরা মহত্ত্ব বলিত। আমরা দেখিতেছি, হোমরের সময়ে শারীরিক বলকেই বীরত্ব বলিত, শারীরিক বলের নামই ছিল মহত্ত্ব। বাহুবলদৃপ্ত একিলিসই ইলিয়ডের নায়ক ও যুদ্ধ বর্ণনাই তাহার আদ্যোপান্ত। আর আমরা দেখিতেছি, বাল্মীকির সময়ে ধর্ম্মবলই যথার্থ মহত্ত্ব বলিয়া গণ্য ছিল—কেবল মাত্র দাম্ভিক বাহুবলকে তখন ঘৃণা করিত। হোমরে দেখ, একিলিসের ঔদ্ধত্য, একিলিসের বাহুবল, একিলিসের হিংস্র-প্রবৃত্তি; আর রামায়ণে দেখ, একদিকে রামের, সত্যের অনুরোধে আত্মত্যাগ, একদিকে লক্ষ্মণের, প্রেমের অনুরোধে আত্মত্যাগ, একদিকে বিভীষণের ন্যায়ের অনুরোধে সংসার ত্যাগ। রামও যুদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু সেই যুদ্ধ ঘটনাই তাঁহার সমস্ত চরিত্র ব্যাপ্ত করিয়া থাকে নাই, তাহা তাঁহার চরিত্রের সামান্য এক অংশ মাত্র। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে, হোমরের সময়ে বলকেই ধর্ম্ম বলিয়া জানিত ও বাল্মীকির সময়ে ধর্ম্মকেই বল বলিয়া জানিত। অতএব দেখা যাইতেছে, কবিরা স্ব স্ব সময়ের উচ্চতম আদর্শের কল্পনায় উত্তেজিত হইয়াই মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন, ও সেই উপলক্ষে ঘটনাক্রমে যুদ্ধের বর্ণনা অবতারিত হইয়াছে—যুদ্ধের বর্ণনা করিবার জন্যই মহাকাব্য লেখেন নাই।

কিন্তু আজকাল যাঁহারা মহাকবি হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া মহাকাব্য লেখেন, তাঁহারা যুদ্ধকেই মহাকাব্যের প্রাণ বলিয়া জানিয়াছেন; রাশিরাশি খটমট শব্দ সংগ্রহ করিয়া একটা যুদ্ধের আয়োজন করিতে পারিলেই মহাকাব্য লিখিতে প্রবৃত্ত হন। পাঠকেরাও সেই যুদ্ধবর্ণনামাত্রকে মহাকাব্য বলিয়া সমাদর করেন। হয়ত কবি স্বয়ং শুনিলে বিস্মিত হইবেন, এমন আনাড়িও অনেক আছে, যাহারা পলাশীর যুদ্ধকে মহাকাব্য বলিয়া থাকে।

হেম বাবুর বৃত্র-সংহারকে আমরা এইরূপ নাম-মাত্র-মহাকাব্যের শ্রেণীতে গণ্য করি না, কিন্তু মাইকেলের মেঘনাদবধকে আমরা তাহার অধিক আর কিছু বলিতে পারি না। মহাকাব্যের সর্ব্বত্রই কিছু আমরা কবিত্বের বিকাশ প্রত্যাশা করিতে পারি না। কারণ আট নয় সর্গ ধরিয়া, সাত আটশ পাতা ব্যাপিয়া প্রতিভার স্ফূর্ত্তি সমভাবে প্রস্ফুটিত হইতে পারেই না। এই জন্যই আমরা মহাকাব্যের সর্ব্বত্র

চরিত্র বিকাশ, চরিত্র-মহত্ত্ব দেখিতে চাই। মেঘনাদবধে অনেক স্থলেই হয়ত কবিত্ব আছে—কিন্তু কবিত্বগুলির মেরুদণ্ড কোথায়! কোন্ অটল অচলকে আশ্রয় করিয়া সেই কবিত্বগুলি দাঁড়াইয়া আছে! যে একটি মহান্ চরিত্র মহাকাব্যের বিস্তীর্ণ রাজ্যের মধ্যস্থলে পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ হইয়া উঠে, যাহার শুভ্র তুষারললাটে সূর্য্যের কিরণ প্রতিফলিত হইতে থাকে, যাহার কোথাও বা কবিত্বের শ্যামল কানন, কোথাওবা অনুর্ব্বর বন্ধুর পাষাণস্তূপ, যাহার অন্তর্গূঢ় আগ্নেয় আন্দোলনে সমস্ত মহাকাব্যে ভূমিকম্প উপস্থিত হয়, সেই অভ্রভেদী বিরাট মূর্ত্তি মেঘনাদবধকাব্যে কোথায়! কতকগুলি ঘটনাকে সুসজ্জিত করিয়া ছন্দোবন্ধে উপন্যাস লেখাকে মহাকাব্য কে বলিবে? মহাকাব্যে মহৎ চরিত্র দেখিতে চাই ও সেই মহৎ চরিত্রের একটি মহৎ কার্য্য মহৎ অনুষ্ঠান দেখিতে চাই।

হীন, ক্ষুদ্র তস্করের ন্যায় হইয়া নিরস্ত্র ইন্দ্রজিৎকে বধ করা, অথবা পুত্র শোকে অধীর হইয়া লক্ষ্মণের প্রতি শক্তিশেল নিক্ষেপ করাই কি একটি মহাকাব্যের বর্ণনীয় হইতে পারে? এইটুকু যৎসামান্য ক্ষুদ্র ঘটনাই কি একজন কবির কল্পনাকে এতদূর উদ্দীপ্ত করিয়া দিতে পারে যাহাতে তিনি উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে একটি মহাকাব্য লিখিতে স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইতে পারেন? রামায়ণ মহাভারতের সহিত তুলনা করাই অন্যায়, বৃত্রসংহারের সহিত তুলনা করিলেই আমাদের কথার প্রমাণ হইবে। স্বর্গ-উদ্ধারের জন্য নিজের অস্থিদান, এবং অধর্ম্মের ফলে বৃত্রের সর্ব্বনাশ—যথার্থ মহাকাব্যের উপযোগী বিষয়। আর, একটা যুদ্ধ, একটা জয় পরাজয় মাত্র কখন মহাকাব্যের উপযোগী বিষয় হইতে পারে না। গ্রীসীয়দিগের সহিত যুদ্ধে ট্রয়নগরীর ধ্বংসঘটনায় গ্রীসীয়দিগের জাতীয়-গৌরব কীর্ত্তিত হয়—গ্রীসীয় কবি হোমরকে সেই জাতীয় গৌরবকল্পনায় উদ্দীপিত করিয়াছিল, কিন্তু মেঘনাদবধে বর্ণিত ঘটনায় কোন্ খানে সেই উদ্দীপনী মূলশক্তি লক্ষিত হয় আমরা জানিতে চাই। দেখিতেছি, মেঘনাদবধকাব্যে ঘটনার মহত্ত্ব নাই, একটা মহৎ অনুষ্ঠানের বর্ণনা নাই। তেমন মহৎ চরিত্রও নাই। কার্য্য দেখিয়াই আমরা চরিত্র কল্পনা করিয়া লই। যেখানে মহৎ অনুষ্ঠানের বর্ণনা নাই, সেখানে কি আশ্রয় করিয়া মহৎ চরিত্র দাঁড়াইতে পারিবে! মেঘনাদবধ কাব্যের পাত্রগণের চরিত্রে অনন্যসাধারণতা নাই, অমরতা নাই। মেঘনাদবধের রাবণে অমরতা নাই, রামে অমরতা নাই, লক্ষ্মণে অমরতা নাই, এমন কি, ইন্দ্রজিতেও অমরতা নাই। মেঘনাদবধ কাব্যের কোন পাত্র আমাদের সুখ দুঃখের সহচর হইতে পারেন না, আমাদের কার্য্যের প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তক হইতে পারেন না। কখনো কোন অবস্থায় মেঘনাদবধ কাব্যের পাত্রগণ আমাদের স্মরণপথে পড়িবে না। পদ্যকাব্যে যাইবার প্রয়োজন নাই—চন্দ্রশেখর উপন্যাস দেখ। প্রতাপের চরিত্রে অমরতা আছে—যখন মেঘনাদবধের রাবণ রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতিরা বিস্মৃতির চিরস্তব্ধ সমাধি-ভবনে শায়িত তখনো প্রতাপ, চন্দ্রশেখর, হৃদয়ে বিরাজ করিবে।

একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, যেমন আমরা এই দৃশ্যমান জগতে বাস করিতেছি, তেমনি আর একটি অদৃশ্য জগৎ অলক্ষিত ভাবে আমাদের চারিদিকে রহিয়াছে। বহুদিন ধরিয়া বহুতর কবি মিলিয়া আমাদের সেই জগৎ রচনা করিয়া আসিতেছেন। আমি যদি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ না করিয়া আফ্রিকায়

জন্মগ্রহণ করিতাম; তাহা হইলে আমি যেমন একটি স্বতন্ত্র প্রকৃতির লোক হইতাম; তেমনি আমি যদি বাল্মীকি ব্যাস প্রভৃতির কবিত্ব জগতে না জন্মিয়া ভিন্ন দেশীয় কবিত্ব জগতে জন্মিতাম, তাহা হইলেও আমি ভিন্ন প্রকৃতির লোক হইতাম। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে কত শত অদৃশ্য লোক রহিয়াছেন; আমরা সকল সময়ে তাহা জানিতেও পারি না—অবিরত তাঁহাদের কথোপকথন শুনিয়া আমাদের মতামত কত নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, আমাদের কার্য্য কত নিয়মিত হইতেছে, তাহা আমরা বুঝিতেই পারি না, জানিতেই পাই না। সেই সকল অমর সহচর সৃষ্টিই মহাকবিদের কাজ। এখন জিজ্ঞাসা করি, আমাদের চতুর্দ্দিকব্যাপী সেই কবিত্বজগতে মাইকেল কয় জন নূতন অধিবাসীকে প্রেরণ করিয়াছেন? না যদি করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার কোন্ লেখাটাকে মহাকাব্য বল?

আর একটা কথা বক্তব্য আছে—মহৎ চরিত্র যদিবা নূতন সৃষ্টি করিতে না পারিলেন —তবে কবি কোন্ মহৎ কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া অন্যের সৃষ্ট মহৎচরিত্র বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন? কবি বলেন "I despise Ram and his rabble" সেটা বড় যশের কথা নহে—তাহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে, তিনি মহাকাব্য রচনার যোগ্য কবি নহেন। মহত্ব দেখিয়া তাঁহার কল্পনা উত্তেজিত হয় না। নহিলে তিনি কোন্ প্রাণে রামকে স্ত্রীলোকের অপেক্ষা ভীরু ও লক্ষ্মণকে চোরের অপেক্ষা হীন করিতে পারিলেন! দেবতাদিগকে কাপুরুষের অধম ও রাক্ষসদিগকেই দেবতা হইতে উচ্চ করিলেন! এমনতর প্রকৃতি-বহির্ভূত আচরণ অবলম্বন করিয়া কোন কাব্য কি অধিক দিন বাঁচিতে পারে? ধূমকেতু কি ধ্রুব-জ্যোতি সূর্য্যের ন্যায় চিরদিন পৃথিবীকে কিরণদান করিতে পারে? সে দুই দিনের জন্য তাহার বাষ্পময় লঘু পুচ্ছ লইয়া পৃথিবীর পৃষ্ঠে উল্কাবর্ষণ করিয়া বিশ্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আবার কোন্ অন্ধকারের রাজ্যে গিয়া প্রবেশ করে!

এ'টি মহৎ চরিত্র হৃদয়ে আপনা হইতে আবির্ভূত হইলে কবি যেরূপ আবেগের সহিত তাহা বর্ণনা করেন, মেঘনাদবধ কাব্যে তাহাই নাই। এখনকার যুগের মনুষ্যচরিত্রের উচ্চ আদর্শ কল্পনায় উদিত হইলে, তিনি তাহা আর এক ছাঁদে লিখিতেন। তিনি হোমরের পশুবলগত আদর্শকেই চোখের সমুখে খাড়া রাখিয়াছেন। হোমর তাঁহার কাব্যারম্ভে যে সরস্বতীকে আহ্বান করিয়াছেন, সেই আহ্বান সঙ্গীত তাঁহার নিজ হৃদয়েরই সম্পত্তি, হোমর তাঁহার বিষয়ের গুরুত্ব ও মহত্ব অনুভব করিয়া যে সরস্বতীর সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার নিজের হৃদয় হইতে উত্থিত হইয়াছিল;—মাইকেল ভাবিলেন মহাকাব্য লিখিতে হইলে গোড়ায় সরস্বতীর বর্ণনা করা আবশ্যক, কারণ হোমর তাহাই করিয়াছেন অমনি সরস্বতীর বন্দনা সুরু করিলেন। মাইকেল জানেন, অনেক মহাকাব্যে স্বর্গ নরক বর্ণনা আছে, অমনি জোর-জবরদস্তি করিয়া কোন প্রকারে কায়ক্লেশে অতি সঙ্কীর্ণ, অতি বস্তুগত, অতি পার্থিব, অতি বীভৎস এক স্বর্গ নরক বর্ণনায় অবতারণ করিলেন। মাইকেল জানেন, কোন কোন বিখ্যাত মহাকাব্যে পদে পদে রূপাকার উপমার ছড়াছড়ি দেখা যায়, অমনি তিনি তাঁহার কাতর পীড়িত কল্পনার কাছ হইতে টানা হেঁচ্‌ড়া করিয়া গোটাকতক দীনদরিদ্র উপমা ছিঁড়িয়া আনিয়া একত্র জোড়াতাড়া লাগাইয়াছেন।

তাহা ছাড়া, ভাষাকে কৃত্রিম ও দুরূহ করিবার জন্য যত প্রকার পরিশ্রম করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত, তাহা তিনি করিয়াছেন। একবার বাল্মীকির ভাষা পড়িয়া দেখ দেখি বুঝিতে পারিবে মহাকবির ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত, হৃদয়ের সহজ ভাষা কাহাকে বলে? যিনি পাঁচ জায়গা হইতে সংগ্রহ করিয়া অভিধান খুলিয়া মহাকাব্যের একটা কাঠাম প্রস্তুত করিয়া মহাকাব্য লিখিতে বসেন; যিনি সহজভাবে উদ্দীপ্ত না হইয়া সহজ ভাষায় ভাব প্রকাশ না করিয়া পরের পদচিহ্ন ধরিয়া কাব্য রচনায় অগ্রসর হন—তাঁহার রচিত কাব্য লোকে কৌতূহল বশতঃ পড়িতে পারে, বাঙ্গালা ভাষায় অনন্যপূর্ব্ব বলিয়া পড়িতে পারে, বিদেশী ভাবের প্রথম আমদানী বলিয়া পড়িতে পারে, কিন্তু মহাকাব্য ভ্রমে পড়িবে কয় দিন? কাব্যে কৃত্রিমতা অসহ্য এবং সে কৃত্রিমতা কখনও হৃদয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে পারে না।

আমি মেঘনাদবধের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লইয়া সমালোচনা করিলাম না—আমি তাহার মূল লইয়া তাহার প্রাণের আধার লইয়া সমালোচনা করিলাম, দেখিলাম, তাহার প্রাণ নাই। দেখিলাম তাহা মহাকাব্য নয়।

হে বঙ্গ মহাকবিগণ! লড়াই বর্ণনা তোমাদের ভাল আসিবে না, লড়াই বর্ণনার তেমন প্রয়োজনও দেখিতেছি না। তোমরা কতকগুলি মনুষ্যত্বের আদর্শ সৃজন করিয়া দাও, বাঙ্গালীদের মানুষ হইতে শিখাও।

নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি।

একটা কথা উঠিয়াছে, মানুষ মাত্রেই কবি। যাহার মনে ভাব আছে, যে দুঃখে কাঁদে, সুখে হাসে, সেই কবি। কথাটা খুব নূতনতর। সচরাচর লোকে কবি বলিতে এমন বুঝে না। সচরাচর লোকে যাহা বলে তাহার বিপরীত একটা কথা শুনিলে অনেক সময় আমাদিগের ভারি ভাল লাগিয়া যায়। যাহার মনোবৃত্তি আছে সেই কবি, এ কথাটা এখনকার যুবকদের মধ্যে অনেকেরই মুখে শুনা যায়। কবি শব্দের ঐরূপ অতি বিস্তৃত অর্থ এখন একটা ফ্যাষাণ হইয়াছে বলিলে অধিক বলা হয় না। এমন কি নীরব কবি বলিয়া একটা কথা বাহির হইয়া গিয়াছে, ও সে কথা দিনে দিনে খুব চলিত হইয়া আসিতেছে। এতদূর পর্য্যন্ত চলিত হইয়াছে যে, আজ যদি আমি এমন একটা পুরাতন কথা বলি যে, নীরব-কবি বলিয়া একটা কোন পদার্থই নাই, তাহা হইলে আমার কথাটাই লোকের নূতন বলিয়া ঠেকে। আমি বলি কি, যে নীরব সেই কবি নয়। দুর্ভাগ্য ক্রমে আমার যা' মত অধিকাংশ লোকেরই আন্তরিক তাহাই মত। লোকে বলিবে "ও কথা ত সকলেই বলে, উহার উল্টাটা যদি কোন প্রকারে প্রমাণ করাইয়া দিতে পার, তাহা হইলে বড় ভাল লাগে।" ভাল ত লাগে, কিন্তু বিষয়টা এমনতর যে তাহাতে একটা বই দুইটা কথা উঠিতে পারে না। কবি কথাটা এমন একটা সমস্যা নয় যে, তাহাতে বুদ্ধির মারপ্যাঁচ খেলান যায়, "বীজ হইতে বৃক্ষ কি বৃক্ষ হইতে বীজ" এমন একটা তর্কের খেলেনা নয়। ভাবপ্রকাশের সুবিধার জন্য লোকসাধারণে একটি বিশেষ পদার্থের একটি বিশেষ নামকরণ করিয়াছে,

সেই নামে তাহাকে সকলে ডাকিয়া থাকে ও অনেক দিন হইতে ডাকিয়া আসিতেছে, তাহা লইয়া আর তর্ক কি হইতে পারে? লোক কাহাকে কবি বলে? যে ব্যক্তি বিশেষ শ্রেণীর ভাব সমূহ(যাহাকে আমরা কবিতা বলি)ভাষায় প্রকাশ করে।* নীরব ও কবি দুটি অন্যোন্য-বিরোধী কথা,তথাপি যদি তুমি বিশেষণ নীরবের সহিত বিশেষ্য কবির বিবাহ দিতে চাও, তবে এমন একটি পরস্পর-ধ্বংসী দম্পতির সৃষ্টি হয়, যে, শুভদৃষ্টির সময় পরস্পর চোখোচোখি হইবামাত্রেই উভয়ে প্রাণত্যাগ করে। উভয়েই উভয়ের পক্ষে ভস্মলোচন। এমনতর চোখোচোখিকে কি অশুভ দৃষ্টি বলাই সঙ্গত নয়,অতএব এমনতর বিবাহ কি না দিলেই নয়? এমন হয় বটে যে,তুমি যাহাকে কবি বল, আমি তাহাকে কবি বলি না; এই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া তুমি বলিতে পার বটে যে, "যখন বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্ন লোকে কবি বলিয়া থাকে তখন কি করিয়া বলা যাইতে পারে যে, কবি বলিতে সকলেই এক অর্থ বুঝে?" আমি বলি কি, একই অর্থ বুঝে। যখন পদ্মপুণ্ডরীকের গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত রাম বাবুকে তুমি কবি বলিতেছ, আমি কবি বলিতেছি না, ও কবিতাচন্দ্রিকার গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত শ্যাম বাবুকে আমি কবি বলিতেছি তুমি বলিতেছ না,তখন তোমাতে আমাতে এই তর্ক যে "রাম বাবু কি এমন কবি যে তাঁহাকে কবি বলা যাইতে পারে?" বা "শ্যাম বাবু কি এমন কবি যে তাঁহাকে কবি বলা যাইতে পারে?" রাম বাবু ও শ্যামবাবু এক স্কুলে পড়েন, তবে তাঁহাদের মধ্যে কে ফার্ষ্টক্লাসে পড়েন, কে লাস্ট ক্লাসে পড়েন তাহাই লইয়া কথা। রামবাবু ও শ্যামবাবু যে এক স্কুলে পড়েন, সে স্কুলটি কি? নাপ্রকাশ করা। তাঁহাদের মধ্যে সাদৃশ্য কোথায় না প্রকাশ করা লইয়া বৈসাদৃশ্য কোথায়? কিরূপে প্রকাশ করা হয়, তাহা লইয়া। তবে ভাল কবিতাকেই আমরা কবিতা বলি, কবিতা খারাপ হইলে তাহাকে আমরা মন্দ কবিতা বলি, সুকবিতা হইতে আরও দূরে গেলে তাহাকে আমরা কবিতা না বলিয়া শ্লোক বলিতে পারি, ছড়া বলিতে পারি,যাহা ইচ্ছা। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীবকে আমরা মানুষ বলি, তাহার কাছাকাছি যে আসে তাহাকে বনমানুষ বলি, মানুষ হইতে আরো তফাতে গেলে তাহাকে মানুষও বলি না, বনমানুষও বলিনা, তাহাকে বানর বলি। এমন তর্ক কখনো শুনিয়াছ যে Wordsworth শ্রেষ্ঠ কবি না ভজহরি (যে ব্যক্তি লেখনীর আকার কিরূপ জানে না) শ্রেষ্ঠ কবি? অতএব এটা দেখিতেছ, কবিতা প্রকাশ না করিলে কাহাকেও কবি বলা যায় না। তোমার মতে ত বিশ্ব-সুদ্ধ লোককে চিত্রকর বলা যাইতে পারে। এমন ব্যক্তি নাই যাহার মনে অসংখ্য চিত্র অঙ্কিত না রহিয়াছে, তবে কেন মনুষ্যজাতির আর এক নাম রাখ না চিত্রকর? আমার কথাটি অতি সহজ কথা। আমি বলি যে, যে ভাববিশেষ ভাষায় প্রকাশ হয় নাই তাহা কবিতা নহে, ও যে ব্যক্তি ভাববিশেষ ভাষায় প্রকাশ করে না,সেও কবি নহে। যাঁহারা নীরব কবি কথার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা বিশ্বচরাচরকে কবিতা বলেন। এসকল কথা কবিতাতেই শোভা পায়। কিন্তু অলঙ্কারশূন্য গদ্যে অথবা তর্কস্থলে বলিলে কি ভাল শুনায়? একটা নামকে এরূপ নানা অর্থে ব্যবহার করিলে দোষ হয় এই যে, তাহার দুইটা ডানা বাহির হয়,এক স্থানে ধরিয়া রাখা যায় না

---

* প্রবন্ধটির মধ্যে আড়ম্বর করিয়া কবিতা কথাটির একটি দুরূহ সংজ্ঞা নির্ণয় করিতে বসা সাজে না বলিয়া আমরা নিরস্ত হইলাম।

ও ক্রমে ক্রমে হাতছাড়া এবং সকল কাজের বাহির হইয়া বুনো হইয়া দাঁড়ায়, "আয়" বলিয়া ডাকিলেই খাঁচার মধ্যে আসিয়া বসে না। আমার কথাটা এই যে, আমার মনে আমার প্রেয়সীর ছবি আঁকা আছে বলিয়াই আমি কিছু চিত্রকর নই, ও ক্ষমতা থাকিলেই আমার প্রেয়সীকে আঁকা যাইতে পারিত বলিয়া আমার প্রেয়সী একটি চিত্র নহে।

অনেকে বলেন, সমস্ত মনুষ্যজাতি সাধারণতঃ কবি, বালকেরা ও অশিক্ষিত লোকেরা বিশেষরূপে কবি। এ মতের পূর্ব্বোক্ত মতটির ন্যায় তেমন বহুল প্রচার হয় নাই। তথাপি তর্ককালে অনেকেরই মুখে এ কথা শুনা যায়। বালকেরা যে কবি নয়, তাহার প্রমাণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। তাহারা কবিতাময় ভাষায় ভাব প্রকাশ করে না। অনেকে কবিত্ব অনুভব করেন, কবিত্ব উপভোগ করেন, যদিবা বলপূর্ব্বক তুমি তাঁহাদিগকেও কবি বল তথাপি বালকদিগকে কবি বলা যায় না। বালকেরা কবিত্ব অনুভব করে না, কবিত্ব উপভোগ করে না, অর্থাৎ বয়স্ক লোকদের মত করে না। অনুভব ত সকলেই করিয়া থাকে, পশুরাও ত সুখ দুঃখ অনুভব করে। কিন্তু কবিত্ব অনুভব কয়জন লোকে করে? যথার্থ সুন্দর ও যথার্থ কুৎসিত কয়জন ব্যক্তি পরখ করিয়া তফাৎ করিয়া দেখে ও বুঝে? অধিকাংশ লোক সুন্দর চিনিতে ও উপভোগ করিতেই জানে না। সুন্দর বস্তু কেন সুন্দর তাহা বুঝিতে পারা, অন্য সমস্ত সুন্দর বস্তুর সহিত তুলনা করিয়া তাহাকে তাহার যথাযোগ্য আসন দেওয়া, একটা সুন্দর বস্তু হইতে দশটা সুন্দর বস্তুর কথা মনে পড়া, অবস্থা-বিভেদে একটি সুন্দর বস্তুর সৌন্দর্য্য-বিভেদ কল্পনা করিতে পারা কি সকলের সাধ্য? সকল চক্ষুই কি শরীরী পদার্থের মধ্যে অশরীরী কি-একটি দেখিতে পায়? অল্পই হউক আর অধিক হউক কল্পনাত সকলেরই আছে। উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির অপেক্ষা কল্পনা কাহার আছে? কল্পনা প্রবল হইলেই কবি হয় না। সুমার্জ্জিত, সুশিক্ষিত ও উচ্চ শ্রেণীর কল্পনা থাকা আবশ্যক। কল্পনাকে যথাপথে নিয়োগ করিবার নিমিত্ত বুদ্ধি ও রুচি থাকা আবশ্যক করে। পূর্ণচন্দ্র যে হাসে, বা জ্যোৎস্না যে ঘুমায়, এ কয়জন বালকের কল্পনায় উদিত হয়? একজন বালক যদি অসাধারণ কাল্পনিক হয়, তবে পূর্ণচন্দ্রকে একটি আস্ত লুচি বা অর্দ্ধচন্দ্রকে একটা ক্ষীরপুলি মনে করিতে পারে। তাহাদের কল্পনা সুসংলগ্ন নহে; কাহার সহিত কাহার যোগ হইতে পারে, কোন্ কোন্ দ্রব্যকে পাশাপাশি বসাইলে পরস্পর পরস্পরের আলোকে অধিকতর পরিস্ফুট হইতে পারে, কোন্ দ্রব্যকে কি ভাবে দেখিলে তাহার মর্ম্ম, তাহার সৌন্দর্য্য চক্ষে বিকাশ পায়, এ সকল জানা অনেক শিক্ষার কাজ। একটি দ্রব্য অনেক ভাবে দেখা যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিকেরা এক ভাবে জগৎ দেখেন, দার্শনিকেরা একভাবে দেখেন ও কবিরা আর এক ভাবে দেখেন। তিন জনে তিন প্রকার পদ্ধতিতে একই বস্তু দেখিতে পারেন। তুমি কি বল, উহার মধ্যে দুই প্রকার পদ্ধতি আয়ত্ত করিতে শিক্ষার আবশ্যক করে, আর তৃতীয়টিতে করে না? শুদ্ধ করে না তাহাই নয় শিক্ষাতেই তাহার বিনাশ! কোন্ দ্রব্য কোন্ শ্রেণীর, কিসের সহিত তাহার ঐক্য ও কিসের সহিত তাহার অনৈক্য, তাহা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে নির্ণয় করা দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও কবি তিন জনেরই কাজ। তবে একটা দ্রব্যের তিনটি দিক

আছে, তিন জন তিন বিভিন্ন দিকের ভার লইয়াছেন। তিন জনের মধ্যে এই মাত্র প্রভেদ, আর কিছু প্রভেদ আছে কি? অনেক ভাল ভাল কবি যে ভাবের পার্শ্বে যে ভাব বসানো উচিত, স্থানে স্থানে তাহার ব্যতিক্রম করিয়া শিক্ষার অসম্পূর্ণতা প্রকাশ করিয়াছেন। Marlowর Come live with me and be my love" নামক সুবিখ্যাত কবিতাতে ইহা লক্ষিত হয়।

"হ'বি কি আমার প্রিয়া, র'বি মোর সাথে?
অরণ্য, প্রান্তর, নদী, পর্ব্বত গুহাতে
যত কিছু, প্রিয়তমে, সুখ পাওয়া যায়,
দুজনে মিলিয়া তাহা ভোগ করি আয়!
শুনিব শিখরে বসি পাখী গায় গান,
নদীর শবদ সাথে মিশাইয়া তান;
দেখিব চাহিয়া সেই তটিনীর তীরে
রাখাল গরুর পাল চরাইয়া ফিরে।
রচি দিব গোলাপের শয্যা মনোমত;
সুরভি ফুলের তোড়া দিব কত শত;
গড়িব ফুলের টুপি পরিবি মাথায়,
আঁটিয়া রচিয়া দিব গাছের পাতায়।
লয়ে মেষশিশুদের কোমল পশম
বসন বুনিয়া দিব অতি অনুপম;
সুন্দর পাদুকা এক করিয়া রচিত,
খাঁটি সোণা দিয়ে তাহা করিব খচিত।
কটি বন্ধ গড়ি দিব গাঁথি তৃণ-জাল,
মাঝেতে বসায়ে দিব একটি প্রবাল।
এই সব সুখ যদি তোর মনে ধরে
হ' আমার প্রিয়তমা, আয় মোর ঘরে।
হস্তি-দন্তে গড়া এক আসনের পরে,
আহার আনিয়া দিবে দুজনের তরে,
দেবতার উপভোগ্য, মহার্ঘ্য এমন,
রজতের পাত্রে দোঁহে করিব ভোজন।
রাখাল বালক যত মিলি একত্তরে
নাচিবে গাইবে তোর আমোদের তরে।
এই সব সুখ যদি মনে ধরে তব,
হ' আমার প্রিয়তমা, এক সাথে রব'।

এ কবিতাতে একটি বিশেষ ভাবকে সমগ্র রাখা হয় নাই। মাঝখানে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। যে বিশাল কল্পনায় একটি ভাব সমগ্র প্রতিবিম্বিত হয়, যাহাতে যোড়াতাড়া দিতে হয় না, সে কল্পনা ইহাতে প্রকাশিত হয় নাই। অরণ্য, পর্ব্বত, প্রান্তরে যত কিছু সুখ পাওয়া যায়, তাহাই যে রাখালের আয়ত্তাধীন, যে ব্যক্তি গোলাপের শয্যা ফুলের টুপি ও পাতার আঁটিয়া নির্ম্মাণ করিয়া দিবার লোভ দেখাইতেছে সে স্বর্ণ-খচিত পাদুকা রজতের পাত্র, হস্তি-দন্তের আসন পাইবে কোথায়? তৃণ-নির্ম্মিত কটিবন্ধের মধ্যে কি প্রবাল শোভা পায়? কবিকঙ্কণের কমলে-কামিনীতে একটি রূপসী ষোড়শী হস্তি-গ্রাস ও উদ্গীরণ করিতেছে, ইহাতে এমন পরিমাণ সামঞ্জস্যের অভাব হইয়াছে যে, আমাদের সৌন্দর্য্য জ্ঞানে অত্যন্ত আঘাত দেয়।*

* অনেকে তর্ক করেন যে, গণেশকে দুর্গা এক একবার কোলে করিয়া চুম্বন করিতেছিলেন, তাহাই দূর হইতে দেখিয়া ধনপতি গজাহার ও উদ্গিরণ কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা যথার্থ নহে! কারণ কবিকঙ্কণচণ্ডীতেই আছে যে, চৌষট্টি যোগিনী পদ্মের দলরূপ ধারণ করিল ও জয়া হস্তিনী রূপে রূপান্তরিত হইল। অতএব গণেশের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। কেহ বা তর্ক করেন যে, যখন কবির উদ্দেশ্য বিস্ময় ভাবের উদ্দীপন করে, তখন বর্ণনা যাহাতে অদ্ভুত হয়, তাহারই প্রতি কবির লক্ষ্য। কিন্তু এ কথার কোন অর্থ নাই। সুকল্পনার সহিত বিস্ময় রসের কোন মনান্তর নাই।

ক্ষিত, সংযত, মার্জ্জিত কল্পনায় একটি যুবতীর সহিত শিঙ্গাহার ও উদ্গিরণ তেই একত্র উদয় হতে পারে না।

নারও শিক্ষা আবশ্যক করে। যাহাদের শিক্ষিত নহে, তাহারা অতিশয় অসম্ভব ক কল্পনা করিতে ভাল বাসে; বক্র মুখ দেখিলে নাসিকা পরিমাণাধিক বৃহৎ কপাল ও চিবুক নিতান্ত হ্রস্ব দেখায়। ক্ষতদের কুগঠিত কল্পনা-দর্পণে স্বাভাবিক াহা কিছু পড়ে তাহার পরিমাণ ঠিক না; তাহার নাসা বৃহৎ ও তাহার কপাল ইয়া পড়ে। তাহারা অসঙ্গত পদার্থের তাড়া দিয়া এক একটা বিকৃতাকার পদার্থ তোলে। তাহারা শরীরী পদার্থের মধ্যে ারী ভাব দেখিতে পায় না। তথাপি স' বালকেরা কবি, তবে নিতান্ত বালমত কথা বলা হয়। প্রাচীন কালে ক ভাল কবিতা রচিত হইয়া গিয়াছে াই বোধ হয়, এই মতের সৃষ্ট হইয়া থাকিবে অশিক্ষিত ব্যক্তিরা বিশেষ রূপে কবি। তুমি দেখি, ওটাহিটি দ্বীপবাসী বা এস্কুইমোদের য় কয়টা পাঠ্য কবিতা আছে? এমন কোন্ জাতির মধ্যে ভাল কবিতা আছে, যে জাতি সভ্য হয় নাই। যখন রামায়ণ মহাভারত রচিত হইয়াছিল, তখন প্রাচীনকাল বটে, কিন্তু অশিক্ষিত কাল কি? রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিয়া কাহারো মনে কি সে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে? উনবিংশ শতাব্দীতে যে মহা মহা কবিরা ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কবিতায় কি উনবিংশ শতাব্দীর প্রভাব লক্ষিত হয় না? Copleston কহেন "Never has there been a city of which its people might be more justly proud Whether they looked to its past or its future than Athens in the days of Fschylus"

অনেকে কল্পনা করেন যে, অশিক্ষিত অবস্থায় কবিত্বের বিশেষ স্ফূর্ত্তি হয়, তাহার একটি কারণ এই যে, তাঁহাদের মতে একটি বস্তুর যথার্থ স্বরূপ না জানিলে তাহাতে কল্পনার বিচরণের সহস্র পথ থাকে। সত্য একটি মাত্র, মিথ্যা অগণ্য। অতএব মিথ্যায় কল্পনার যে রূপ উদরপূর্ত্তি হয়, সত্যে সে রূপ হয় না। পৃথিবীতে অখাদ্য যত আছে, তাহা অপেক্ষা খাদ্য বস্তু অত্যন্ত পরিমিত। একটি খাদ্য যদি থাকে ত সহস্র অখাদ্য আছে। অতএব এমন মত কি কোন পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছ যে, অখাদ্য বস্তু আহার না করিলে মনুষ্য বংশ ধ্বংস হইবার কথা?

প্রকৃত কথা এই যে, সত্যে যত কবিতা আছে, মিথ্যায় তেমন নাই। শত সহস্র মিথ্যার দ্বারে দ্বারে কল্পনা বিচরণ করিতে পারে, কিন্তু এক মুষ্টি কবিতা সঞ্চয় করিতে পারে কি না সন্দেহ, কিন্তু একটি সত্যের কাছে যাও, তাহার দশগুণ অধিক কবিতা পাও কি না দেখ দেখি? কেনই বা তাহার ব্যতিক্রম হইবে বল? আমরা

যখন কবি অগাধ সমুদ্রের মধ্যে মরালভিত কুমুদ কহ্লার পদ্ম বনের মধ্যে এক সী ষোড়শী প্রতিষ্ঠিত করিলেন; সমস্তই র, নীল জল, সুকুমার পদ্ম, পুষ্পের সুগন্ধ, রের গুঞ্জন ইত্যাদি, তখন মধ্য হইতে এক াহার আনিয়া আমাদের কল্পনায় অমন টা নিদারুণ আঘাত দিবার তাৎপর্য্য কি? দর পদার্থ যেমন কবিত্ব পূর্ণ বিস্ময় উৎপন্ন রতে পারে, এমন কি আর কিছুতে পারে? পার সমুদ্রের মধ্যে পদ্মাসীনা ষোড়শী াীই কি যথেষ্ট বিস্ময়ের কারণ নহে?

ত প্রকৃতির কাছেই কবিতা শিক্ষা করিয়াছি, প্রকৃতি কখনো মিথ্যা কহেন না। আমরা কি কখনো কল্পনা করিতে পারি যে, লোহিত বর্ণ ঘাসে আমাদের চক্ষু জুড়াইয়া যাইতেছে? বল দেখি, পৃথিবী নিশ্চল রহিয়াছে ও আকাশে অগণ্য তারকারাজি নিশ্চল ভাবে খচিত রহিয়াছে, ইহাতে অধিক কবিত্ব, কি সমস্ত তারকা নিজের পরিবার লইয়া ভ্রমণ করিতেছে তাহাতে অধিক কবিত্ব; এমনি তাহাদের তালে তালে পদক্ষেপ যে, এক জন জ্যোতির্ব্বিদ্ বলিয়া দিতে পারেন, কাল যে গ্রহ অমুক স্থানে ছিল আজ সে কোথায় আসিবে। প্রথম কথা এই যে, আমাদের কল্পনা প্রকৃতি অপেক্ষা কবিত্বপূর্ণ বস্তু সৃজন করিতে অসমর্থ; দ্বিতীয় কথা এই যে, আমরা যে অবস্থার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছি তাহার বহির্ভূত সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারি না।

অনেক মিথ্যা কবিতা আমাদের মিষ্ট লাগে। তাহার কারণ এই যে, যখন সেগুলি প্রথম লিখিত হয়, তখন তাহা সত্য মনে করিয়া লিখিত হয়, ও সেই অবধি বরাবর সত্য বলিয়া চলিয়া আসিতেছে। আজ তাহা আমি মিথ্যা বলিয়া জানিয়াছি, অর্থাৎ জ্ঞান হইতে তাহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছি; কিন্তু হৃদয়ে সে এমনি শিকড় বসাইয়াছে যে, সেখান হইতে তাহাকে উৎপাটন করিবার যো নাই। কবি যে ভূত বিশ্বাস না করিয়াও ভূতের বর্ণনা করেন, তাহার তাৎপর্য্য কি? তাহার অর্থ এই যে, ভূত বস্তুতঃ সত্য না হইলেও আমাদের হৃদয়ে সে সত্য! ভূত আছে বলিয়া কল্পনা করিলে যে, আমাদের মনের কোন্ খানে আঘাত লাগে, কত কথা জাগিয়া উঠে, অন্ধকার, বিজনতা, শ্মশান, এক অলৌকিক পদার্থের নিঃশব্দ অনুসরণ, ছেলেবেলাকার কত কথা মনে উঠে এ সকল সত্য না কবি না দেখেন ত কে দেখিবে?

সত্য এক হইলেও যে, দশ জন কবি সে এক সত্যের মধ্যে দশ প্রকার বিভিন্ন কবি দেখিতে পাইবেন না তাহা ত নহে। এক সূর্য্য কিরণে পৃথিবী কত বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করিয়াছে দেখ দেখি! নদী যে বহিতেছে, এই সত্য টুকুই কবিতা নহে। কিন্তু এই বহমানা নদী দেখিয়া আমাদের হৃদয়ে যে ভাববিশেষের জন্ম হয় সেই সত্যই যথার্থ কবিতা। এখন বল দেখি, এক নদী দেখিয়া সময়ভেদে কত বিভিন্ন ভাবের উদ্রেক হয়! কখনো নদীর কণ্ঠ হইতে বিষণ্ণ গীতি শুনিতে পাই, কখনো বা তাহার উল্লাসের কলস্বর, তাহার শত তরঙ্গের নৃত্য আমাদের মনকে মাতাইয়া তোলে। জ্যোৎস্না কখনো সত্য সত্যই ঘুমায় না, অর্থাৎ সে, দুটি চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া থাকে না, ও জ্যোৎস্নার নাসিকা-ধ্বনিও কেহ কখনো শুনে নাই। কিন্তু নিস্তব্ধ রাত্রে জ্যোৎস্না দেখিলে মনে হয় যে জ্যোৎস্না ঘুমাইতেছে ইহা সত্য। জ্যোৎস্নার বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব তন্ন তন্ন রূপে আবিষ্কৃত হউক; এমনো প্রমাণ হউক্ যে জ্যোৎস্না একটা পদার্থই নহে, তথাপি লোকে বলিবে জ্যোৎস্না ঘুমাইতেছে। তাহাকে কোন্ বৈজ্ঞানিক-চূড়ামণি মিথ্যা কথা বলিতে সাহস করিবে?

সঙ্গীত ও কবিতা।

বলা বাহুল্য, আমরা যখন একটি কবিতা পড়ি, তখন তাহাকে শুদ্ধ মাত্র কথার সমষ্টি স্বরূপে দেখি না—কথার সহিত ভাবের সম্বন্ধ বিচার করি। ভাবই মুখ্য লক্ষ্য। কথা ভাবের

্রেয় স্বরূপ। আমরা সঙ্গীতকেও সেইরূপে খিতে চাই। সঙ্গীত সুরের রাগ রাগিণী হ, সঙ্গীত ভাবের রাগ রাগিণী। আমাদের খা এই যে,—কবিতা যেমন ভাবের ভাষা, ীতও তেমনি ভাবের ভাষা। তবে, কবিতা সঙ্গীতে প্রভেদ কি? আলোচনা করিয়া খা যাক্।

আমরা সচরাচর যে ভাষায় কথা কহিয়া কি, তাহা যুক্তির ভাষা। "হাঁ" কি "না," হা লইয়াই তাহার কারবার। "আজ খানে গেলাম," কাল সেখানে গেলাম," আজ সে আসিয়াছিল," "কাল সে াসে নাই," "ইহা রূপা," "উহা সোণা।" ত্যাদি। এ সকল কথার উপর যুক্তি চলে। আজ আমি অমুক জায়গায় গিয়াছিলাম," হা আমি নানা যুক্তির দ্বারা প্রমাণ করিতে ারি। দ্রব্যবিশেষ রূপা কি সোণা ইহাও না যুক্তির সাহায্যে আমি অন্যকে বিশ্বাস রাইয়া দিতে পারি। অতএব সচরাচর ামরা যে সকল বিষয়ে কথোপকথন করি, াহা বিশ্বাস করা না করা যুক্তির ন্যূনাধিক্যের ়পর নির্ভর করে। এই সকল কথোপকথনের ন্য আমাদের প্রচলিত ভাষা—অর্থাৎ গদ্য নযুক্ত রহিয়াছে।

কিন্তু বিশ্বাস করাইয়া দেওয়া এক, আর উদ্রেক করাইয়া দেওয়া স্বতন্ত্র। বিশ্বাসের শকড় মাথায়, আর উদ্রেকের শিকড় হৃদয়ে। এই জন্য বিশ্বাস করাইবার জন্য যে াষা উদ্রেক করাইবার জন্য সে ভাষা নহে। ুক্তির ভাষা গদ্য আমাদের বিশ্বাস করায়, আর কবিতার ভাষা পদ্য আমাদের উদ্রেক করায়। যে সকল কথায় যুক্তি খাটে, তাহা অন্যকে বুঝান অতিশয় সহজ, কিন্তু যাহাতে যুক্তি খাটে না, যাহা যুক্তির আইন কানুনের মধ্যে ধরা দেয় না, তাহাকে বুঝান, সহজ ব্যাপার নহে। "কেন" নামক একটা চস্‌মা-চক্ষু, দুর্দ্দান্ত রাজাধিরাজ যেমনি কৈফিয়ৎ তলব করেন, অমনি সে আসিয়া হিসাব নিকাশ করিবার জন্য হাজির হয় না। যে সকল সত্য মহারাজ "কেন"র প্রজা নহে, তাহাদের বাস-স্থান কবিতায়। আমাদের হৃদয়-গত সত্য সকল "কেন"কে বড় একটা কেয়ার করে না। যুক্তির একটা ব্যাকরণ আছে, অভিধান আছে কিন্তু আমাদের রুচির অর্থাৎ সৌন্দর্য্যজ্ঞানের আজ পর্য্যন্ত একটা ব্যাকরণ তৈয়ারি হইল না। তাহার প্রধান কারণ, সে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে নির্ভয়ে বাস করিয়া থাকে—এবং সে দেশে "কেন" আদালতের ওয়ারেণ্ট জারী হইতে পারে না। একবার যদি তাহাকে যুক্তির সামনে খাড়া করিতে পারা যাইত, তাহা হইলেই তাহার ব্যাকরণ বাহির হইত। অতএব যুক্তি যে সকল সত্য বুঝাইতে পারে না বলিয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছে, কবিতা সেই সকল সত্য বুঝাইবার ভার নিজস্কন্ধে লইয়াছে। এই নিমিত্ত স্বভাবতই যুক্তির ভাষা ও কবিতার ভাষা স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। অনেক সময় এমন হয় যে, শত সহস্র প্রমাণের সাহায্যে একটা সত্য আমরা বিশ্বাস করি মাত্র কিন্তু আমাদের হৃদয়ে সে সত্যের উদ্রেক হয় না। আবার অনেক সময়ে একটি সত্যের উদ্রেক হইয়াছে, শত সহস্র প্রমাণে তাহা ভাঙ্গিতে পারে না। একজন নৈয়ায়িক যাহা পারেন না, একজন বাগ্মী তাহা পারেন। নৈয়ায়িক ও বাগ্মীতে প্রভেদ এই, নৈয়ায়িকের হস্তে যুক্তির কুঠার ও বাগ্মীর হস্তে কবিতার চাবী। নৈয়ায়িক কোপের উপর কোপ বসাইতেছেন, কিন্তু হৃদয়ের দ্বার ভাঙ্গিল না, আর বাগ্মী

কোথায় একটু চাবী ঘুরাইয়া দিলেন, দ্বার খুলিয়া গেল। উভয়ের অস্ত্র বিভিন্ন।

আমি যাহা বিশ্বাস করিতেছি, তোমাকে তাহাই বিশ্বাস করান' আর আমি যাহা অনুভব করিতেছি, তোমাকে তাহাই অনুভব করান'— এ দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার। আমি বিশ্বাস করিতেছি, একটি গোলাপ সুগোল, আমি তাহার চারিদিক মাপিয়া জুকিয়া তোমাকে বিশ্বাস করাইতে পারি যে গোলাপ সুগোল,— আর আমি অনুভব করাইতে পারিনা যে, গোলাপ সুন্দর। তখন কবিতার সাহায্য অবলম্বন করিতে হয়। গোলাপের সৌন্দর্য্য আমি যে উপভোগ করিতেছি, তাহা এমন করিয়া প্রকাশ করিতে হয়, যাহাতে তোমার মনেও সে সৌন্দর্য্য ভাবের উদ্রেক হয়। এই রূপ প্রকাশ করাকেই বলে কবিতা। চোখে চোখে চাহনির মধ্যে যে যুক্তি আছে, যাহাতে করিয়া প্রেম ধরা পড়ে, অতিরিক্ত যত্ন করার মধ্যে যে যুক্তি আছে যাহাতে করিয়া প্রেমের অভাব ধরা পড়ে, কথা না কহার মধ্যে যে যুক্তি আছে যাহাতে অসীম কথা প্রকাশ করে, কবিতা সেই সকল যুক্তি ব্যক্ত করে।

সচরাচর কথোপকথনে যুক্তির যতটুকু আবশ্যক, তাহারই চূড়ান্ত আবশ্যক দর্শনে বিজ্ঞানে। এই নিমিত্ত দর্শন বিজ্ঞানের গদ্য কথোপকথনের গদ্য হইতে অনেক তফাৎ। কথোপকথনের গদ্যে দর্শন বিজ্ঞান লিখিতে গেলে যুক্তির বাঁধুনি আল্‌গা হইয়া যায়। এই নিমিত্ত খাঁটি নির্ভাঁজ যুক্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য এক প্রকার চুল-চেরা তীক্ষ্ণ পরিষ্কার ভাষা নির্ম্মাণ করিতে হয়। কিন্তু তথাপি সে ভাষা গদ্য বই আর কিছুই নয়। কারণ যুক্তির ভাষাই নিরলঙ্কার সরল পরিষ্কার গদ্য।

আর আমরা সচরাচর কথোপকথনে যতটা অনুভাব প্রকাশ করি, তাহারই চূড়ান্ত প্রকাশ করিতে হইলে কথোপকথনের ভাষা হইতে একটা স্বতন্ত্র ভাষার আবশ্যক করে। তাহাই কবিতার ভাষা—পদ্য। অনুভাবের ভাষাই অলঙ্কারময়, তুলনাময় পদ্য। সে আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য আঁকুবাঁকু করিতে থাকে —তাহার যুক্তি নাই, তর্ক নাই, কিছুই নাই। আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য তাহার তেমন সোজা রাস্তা নাই। সে নিজের উপযোগী নূতন রাস্তা তৈয়ারি করিয়া লয়। যুক্তির অভাব মোচন করিবার জন্য সৌন্দর্য্যের শরণাপন্ন হয়। সে এমনি সুন্দর করিয়া সাজে যে, যুক্তির অনুমতি পত্র না থাকিলেও সকলে তাহাকে বিশ্বাস করে। এমনি তাহার মুখখানি সুন্দর যে, কেহই তাহাকে "কে" "কি বৃত্তান্ত" "কেন" জিজ্ঞাসা করে না কেহ তাহাকে সন্দেহ করে না, সকলে হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া ফেলে, সে সৌন্দর্য্যের বলে তাহার মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু নিরলঙ্কার যৌক্তিক সত্যকে প্রতিপদে বহুবিধ প্রমাণ সহকারে আত্মপরিচয় দিয়া আত্মস্থাপনা করিতে হয়, দ্বারীর সন্দেহভঞ্জন করিতে হয়, তবে সে প্রবেশের অনুমতি পায়। অনুভাবের ভাষা ছন্দোবদ্ধ। পূর্ণিমার সমুদ্রের মত তালে তালে তাহার হৃদয়ের উত্থান পতন হইতে থাকে, তালে তালে তাহার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে থাকে। নিশ্বাসের ছন্দে, হৃদয়ের উত্থান পতনের ছন্দে তাহার তাল নিয়মিত হইতে থাকে। কথা বলিতে বলিতে তাহার বাধিয়া যায়, কথার মাঝে মাঝে অশ্রু পড়ে, নিশ্বাস পড়ে, লজ্জা আসে, ভয় হয়, থামিয়া যায়। সরল যুক্তির এমন তাল নাই, আবেগের দীর্ঘনিশ্বাস পদে পদে তাহাকে বাধা দেয় না। তাহার ভয় নাই, লজ্জা নাই, কিছু নাই। এই নিমিত্ত,

চূড়ান্ত যুক্তির ভাষা গদ্য, চূড়ান্ত অনুভাবের ভাষা পদ্য।

আমাদের ভাব প্রকাশের দুটি উপকরণ আছে—কথা ও সুর। কথাও যতখানি ভাব প্রকাশ করে, সুরও প্রায় ততখানি ভাবপ্রকাশ করে। এমন কি, সুরের উপরেই কথার ভাব নির্ভর করে। একই কথা নানা সুরে নানা অর্থ প্রকাশ করে। অতএব ভাবপ্রকাশের অঙ্গের মধ্যে কথা ও সুর উভয়কেই পাশাপাশি ধরা যাইতে পারে। সুরের ভাষা ও কথার ভাষা উভয় ভাষায় মিশিয়া আমাদের ভাবের ভাষা নির্ম্মাণ করে। কবিতায় আমরা কথার ভাবকে প্রধান্য দিই ও সঙ্গীতে সুরের ভাষাকে প্রাধান্য দিই। যেমন, কথোপকথনে আমরা যে সকল কথা যেরূপ শৃঙ্খলায় ব্যবহার করি, কবিতায় আমরা সে সকল কথা সেরূপ শৃঙ্খলায় ব্যবহার করি না, কবিতায় আমরা বাছিয়া বাছিয়া কথা লই, সুন্দর করিয়া বিন্যাস করি—তেমনি কথোপকথনে আমরা যে সকল সুর যেরূপ নিয়মে ব্যবহার করি, সঙ্গীতে সে সকল সুর সেরূপ নিয়মে ব্যবহার করি না, সুর বাছিয়া বাছিয়া লই, সুন্দর করিয়া বিন্যাস করি। কবিতায় যেমন বাছা, বাছা, সুন্দর কথায় ভাব প্রকাশ করে, সঙ্গীতেও তেমনি বাছা বাছা সুন্দর সুরে ভাব প্রকাশ করে। যুক্তির ভাষায় প্রচলিত কথোপকথনের সুর ব্যতীত আর কিছু আবশ্যক করে না। কিন্তু যুক্তির অতীত আবেগের ভাষায় সঙ্গীতের সুর আবশ্যক করে। এ বিষয়েও সঙ্গীত অবিকল কবিতার ন্যায়। সঙ্গীতেও ছন্দ আছে। তালে তালে তাহার সুরের লীলা নিয়মিত হইতেছে। কথোপকথনের ভাষায় সুশৃঙ্খল ছন্দ নাই, কবিতায় ছন্দ আছে, তেমনি কথোপকথনের সুরে সুশৃঙ্খল তাল নাই, সঙ্গীতে তাল আছে। সঙ্গীত ও কবিতা উভয়ে ভাব প্রকাশের দুইটি অঙ্গ ভাগাভাগী করিয়া লইয়াছে। তবে, কবিতা ভাব প্রকাশ সম্বন্ধে যতখানি উন্নতি লাভ করিয়াছে, সঙ্গীত ততখানি করে নাই। তাহার একটি প্রধান কারণ আছে। শূন্যগর্ভ কথার কোন আকর্ষণ নাই, না তাহার অর্থ আছে, না তাহা কাণে তেমন মিঠা লাগে। কিন্তু ভাবশূন্য সুরের একটা আকর্ষণ আছে, তাহা কাণে মিষ্ট শুনায়। এই জন্য ভাবের অভাব হইলেও একটা ইন্দ্রিয়-সুখ তাহা হইতে পাওয়া যায়। এই নিমিত্ত সঙ্গীতে ভাবের প্রতি তেমন মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। উত্তরোত্তর আস্কারা পাইয়া সুর বিদ্রোহী হইয়া ভাবের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। এক কালে যে দাস ছিল, আর এক কালে সেই প্রভু হইয়াছে। "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ"—কিন্তু এ চক্র কি আর ফিরিবে না? যেমন ভারতবর্ষের ভূমি উর্ব্বরা হওয়াতেই ভারতবর্ষের অনেক দুর্দ্দশা, তেমনি সঙ্গীতের ভূমি উর্ব্বরা হওয়াতেই সঙ্গীতের এমন দুর্দ্দশা। মিষ্টসুর শুনিবামাত্রই ভাল লাগে, সেই নিমিত্ত সঙ্গীতকে আর পরিশ্রম করিয়া ভাব কর্ষণ করিতে হয় নাই—কিন্তু শুদ্ধ মাত্র কথার যথেষ্ট মিষ্টতা নাই বলিয়া কবিতাকে প্রাণের দায়ে ভাবের চর্চ্চা করিতে হইয়াছে, সেই নিমিত্তই কবিতার এমন উন্নতি ও সঙ্গীতের এমন অবনতি।

অতএব দেখা যাইতেছে, যে, কবিতা ও সঙ্গীতে আর কোন তফাৎ নাই, কেবল ইহা ভাব প্রকাশের একটা উপায়, উহা ভাব প্রকাশের আর একটা উপায় মাত্র। কেবল অবস্থার তারতম্যে কবিতা উচ্চ শ্রেণীতে উঠি-

য়াছে ও সঙ্গীত নিম্ন-শ্রেণীতে পড়িয়া রহিয়াছে; কবিতায় বায়ুর ন্যায় সূক্ষ্ম ও প্রস্তরের ন্যায় স্থূল সমুদয় ভাবই প্রকাশ করা যায়, কিন্তু সঙ্গীতে এখনো তাহা করা যায় না। কবি Matthew Arnold তাঁহার "Epilogue to Lessing's Laocoon" নামক কবিতায় চিত্র, সঙ্গীত ও কবিতার যে প্রভেদ স্থির করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহার মর্ম্ম নিজ ভাষায় নিম্নে প্রকাশ করিলাম। তিনি বলেন—চিত্রে প্রকৃতির এক মুহূর্ত্তের বাহ্য অবস্থা প্রকাশ করা যায় মাত্র। যে মুহূর্ত্তে একটি সুন্দর মুখে হাসি দেখা দিয়াছে, সেই মুহূর্ত্তটি মাত্র চিত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার পর মুহূর্ত্তট আর তাহাতে নাই। যে মুহূর্ত্তটি তাঁহার শিল্পের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা শুভ মুহূর্ত্ত সেই মুহূর্ত্তট অবিলম্বে বাছিয়া লওয়া প্রকৃত চিত্রকরের কাজ। তেমনি মনের একটি মাত্র স্থায়ীভাব বাছিয়া লওয়া, ভাব-শৃঙ্খলের একটি মাত্র অংশের উপর অবস্থান করিয়া থাকা সঙ্গীতের কাজ। মনে কর,' আমি বলিলাম, "হায়!" কথাটা ঐখানেই ফুরাইল, কথায় উহার অপেক্ষা আর অধিক প্রকাশ করিতে পারে না। আমার হৃদয়ের একটি অবস্থা-বিশেষ ঐ একটি মাত্র ক্ষুদ্র কথায় প্রকাশ হইয়া অবসান হইল। সঙ্গীত সেই "হায়" শব্দট লইয়া তাহাকে বিস্তার করিতে থাকে, "হায়" শব্দের হৃদয় উদ্‌ঘাটন করিতে থাকে, "হায়" শব্দের হৃদয়ের মধ্যে যে গভীর দুঃখ, যে অতৃপ্ত বাসনা, যে আশার জলাঞ্জলি প্রচ্ছন্ন আছে, সঙ্গীত তাহাই টানিয়া টানিয়া বাহির করিতে থাকে, "হায়" শব্দের প্রাণের মধ্যে যতটা কথা ছিল সবটা তাহাকে দিয়া বলাইয়া লয়। কিন্তু কবিতার কাজ আরো বিস্তৃত। চিত্রকরের ন্যায় মুহূর্ত্তের বাহ্যশ্রীও তাঁহার বর্ণনীয়, গায়কের ন্যায় ক্ষণকালের ভাবোচ্ছ্বা[সও] তাঁহার গেয়। তাহা ছাড়া—জীবনের গতি[শীল] স্রোত তাঁহার বর্ণনীয় বিষয়। ভাব হই[তে] ভাবান্তরে তাঁহাকে গমন করিতে হ[য়,] ভাবের গঙ্গোত্রী হইতে ভাবের সাগর-স[ঙ্গম] পর্য্যন্ত তাঁহাকে অনুসরণ করিতে হয়। কেব[ল] মাত্র স্থির আকৃতি তিনি চিত্র করেন না, এ[ক] সময়ের স্থায়ী ভাব মাত্র তিনি বর্ণনা কর[েন] না, গম্যমান শরীর, প্রবহমাণ ভাব, পরিবর্ত্ত[]মান অবস্থা তাঁহার কবিতার বিষয়।—অত[এব] ম্যাথিউ আর্ণল্‌ডের মতে চলনশীল ভাবে[র] প্রত্যেক ছায়ালোক সঙ্গীতে প্রতিবিম্বি[ত] হইতে পারে না। সঙ্গীত একটি স্থায়ী [] ভাবের ব্যাখ্যা করে মাত্র। কিন্তু আমরা [] বলি যে, গতিশীল ভাব যে সঙ্গীতের প[ক্ষে] একবারে অননুসরণীয় তাহা নহে, অ[] এখনো সঙ্গীতের সে বয়স হয় নাই। সঙ্গী[ত] ও কবিতায় আমরা আর কিছু প্রভেদ দেখি[না] কেবল উন্নতির তারতম্য। উভয়ে য[মজ] ভ্রাতা, এক মায়ের সন্তান, কেবল উভয়ে[র] শিক্ষার বৈলক্ষণ্য হইয়াছে মাত্র।

দেখা গেল সঙ্গীত ও কবিতা এক শ্রেণী[র,] কিন্তু উভয়ের সহিত আমরা কতখানি [] আচরণ করি, তাহা মনোযোগ দিয়া দেখিলেই প্রতীতি হইবে। এখন সঙ্গীত যেরূপ হইয়াছে, কবিতা যদি সেইরূপ হইত, তাহা হইলে কি হইত? মনে কর এমন যদি নিয়ম হইত যে, কবিতায় চতুর্দ্দশ ছত্রের মধ্যে, বসন্ত, মলয়ানিল, কোকিল, সুধাকর, রজনীগন্ধা, টগর ও তুরস্ত এই কয়েকটি শব্দ বিশেষ শৃঙ্খলা অনুসারে পাঁচ বার করিয়া বসিবে, তাহারই নাম হইবে কবিতা বসন্ত,—ও যদি কবিতা-প্রিয় ব্যক্তিগণ কবিদিগকে ফরমাস করিতেন, "ওহে চণ্ডিদাস, একটা কবিতা বসন্ত ছন্দ

া আওড়াও ত!" অমনি যদি চণ্ডিদাস ড়াইতেন—

স্ত মলয়ানিল; রজনীগন্ধা কোকিল,
দুরন্ত টগর সুধাকর—
লয়ানিল বসন্ত, রজনীগন্ধা দুরন্ত,
সুধাকর কোকিল টগর।

ও চারিদিক হইতে "আহা" "আহা" য়া যাইত, কারণ কথাগুলি ঠিক নিয়মানু- বসান হইয়াছে; তাহা হইলে কবিতা টা আধুনিক গানের মত হইত। ঐ কটি কথা ব্যতীত আর একটি কথা যদি পতি বসাইতে চেষ্টা করিতেন, তাহা ন কবিতাপ্রিয় ব্যক্তিগণ ধিক্ ধিক্ করি- ও তাঁহার কবিতার নাম হইত "কবিতা া বসন্ত।" এরূপ হইলে আমাদের কবি- কি দ্রুত উন্নতিই হইত! কবিতার ছয় ছত্রিশ রাগিণী বাহির হইত, বিদেশ- য়নী জাতীয়-ভাবোন্মত্ত আর্য্যপুরুষগণ গর্ব্ব য়া বলিতেন, উঃ, আমাদের কবিতায় গুলা রাগ রাগিণী আছে, আর অসভ্য দের কবিতায় রাগরাগিণীর লেশ মাত্র ।

আমরা যেমন আজ কাল নব-রসের ই মারামারি করিয়া কবিতাকে বদ্ধ করিয়া না, অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত আড়ম্বর-পূর্ণ মর প্রতি দৃষ্টি করি না—তেমনি সঙ্গীতে কগুলা নাম ও নিয়মের মধ্যেই যেন বদ্ধ য়া না থাকি। কবিতারও যে স্বাধীনতা ছে সঙ্গীতেরও সেই স্বাধীনতা হউক, কারণ ীত কবিতার ভাই। যেমন সন্ধ্যার বিষয়ে বতা রচনা করিতে গেলে কবি সন্ধ্যার ভাব না করিতে থাকেন ও তাঁহার প্রতি কথায় া মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠে, তেমনি সন্ধ্যার ষয়ে গান রচনা করিতে গেলে রচয়িতা যেন চোখ কাণ বুজিয়া পূরবী না গাহিয়া যান, যেন সন্ধ্যার ভাব কল্পনা করেন, তাহা হইলে অবসান দিবসের ন্যায় তাঁহার সুরও আপনা-আপনি নামিয়া আসিবে, মুদিয়া আসিবে, ফুরাইয়া আসিবে। প্রত্যেক গীতিকবিদের রচনায় গানের নূতন রাজ্য আবিষ্কার হইতে থাকিবে। তাহা হইলে গানের বাল্মীকি গানের কালিদাস জন্ম গ্রহণ করিবেন।

বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা।

চারিদিকে লোক জন, চারিদিকেই হাট বাজার, সদা সর্ব্বদাই কাজকর্ম্ম, বিষয় আশয়ের চিন্তা। সম্মুখে দেনাদার, পশ্চাতে পাওনা-দার, দক্ষিণে বিষয় কর্ম্ম, বামে লোক-লৌকি-কতা, পদতলে গত কল্যের খরচ, মাথার উপরে আগামী কল্যের জন্য জমা। যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি,—পৃথিবীর মৃত্তিকা; দীর্ঘ, প্রস্থ, বেধ; স্বাদ, ঘ্রাণ, স্পর্শ; আরম্ভ, স্থিতি ও অবসান। মানুষের মন কোথায় গিয়া বিশ্রাম করিবে? এমন ঠাঁই কোথায় মিলিবে, যেখানে জড়দেহ পোষণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা নাই, এক মুঠা আহারের জন্য লক্ষ লক্ষ আকৃতিধারীর কোলাহল নাই, যেখানকার ভূমি ও অধিবাসী মাটি ও মাংসে নির্ম্মিত নয়; অর্থাৎ চব্বিশ ঘণ্টা আমরা যে অবস্থার মধ্যে নিমগ্ন থাকি, সে অবস্থা হইতে আমরা বিরাম চাই। কোথায় যাইব?

পৃথিবী কিছু বিশ্রামের জন্য নহে, পৃথি-বীর পদে পদে অভাব। পৃথিবীর উপরে চলিতে গেলে মৃত্তিকার সহিত সংগ্রাম করিতে হয়, পৃথিবীর উপরে বাঁচিতে গেলে শত

প্রকার আয়োজন করিতে হয়। যাহার আকার আছে, তাহার বিশ্রাম নাই। আমাদের হৃদয় আকার আয়তনছাড়া স্থানে বিশ্রামের জন্য যাইতে চায়। বস্তুর রাজ্য হইতে ভাবের রাজ্যে যাইতে চায়। কেবল বস্তু! দিন রাত্রি বস্তু, বস্তু, বস্তু! হৃদয় ভাবের আকাশে গিয়া বলে, "আঃ, বাঁচিলাম আমার বিচরণের স্থান ত এই!"

এমন লোকও আছেন যাঁহারা ভাবিয়া পান না যে, ভাবগত কবিতা বস্তুগত কবিতা অপেক্ষা কেন উচ্চ শ্রেণীর। তাঁহারা বলেন ইহাও ভাল উহাও ভাল। আবার এমন লোকও আছেন যাঁহারা বস্তুগত কবিতা অধিকতর উপভোগ করেন। উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সুরুচিবান্ লোকদের আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, ইন্দ্রিয়-সুখ ভাল, না অতীন্দ্রিয় সুখ ভাল? রূপ ভাল, না গুণ ভাল? ভাবগত কবিতা আর কিছুই নহে, তাহা অতীন্দ্রিয় কবিতা। তাহা ব্যতীত অন্য সমুদয় কবিতা ইন্দ্রিয়গত কবিতা।

আমরা সমুদ্র-তীরবাসী লোক। সম্মুখে চাহিয়া দেখি, সীমা নাই; পদতলে চাহিয়া দেখি, সেই খানেই সীমার আরম্ভ। আমরা যে উপকূলে দাঁড়াইয়া আছি, তাহাই বস্তু, তাহাই ইন্দ্রিয়। তাহার চতুর্দ্দিকে ভাবার অনধিগম্য সমুদ্র। এ ক্ষুদ্র উপকূলে আমাদের হৃদয়ের বাসস্থান নয়। যখন রাজকর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া সন্ধ্যা বেলা এই সমুদ্রের তীরে আসিয়া দাঁড়াই, তখন মনে হয় যেন, ওই সমুদ্রের পরপারে কোথায় আমাদের জন্মভূমি,—কে জানে কোথায়? ওই যে, দূর দিগন্তে সূর্য্যের মৃদু রশ্মি-রেখা দেখা যাইতেছে, তাহা যেন আমাদের জন্মভূমির দিক্ হইতে আসিতেছে। সে জন্মভূমির সকল কথা ভুলিয়া গেছি, অথচ তাহার ভাবটা মাত্র মনে আছে—অতি স্বপ্নময়, অতি অস্ফুট ভাব। ইচ্ছা করে ঐ সমুদ্রে সাঁতার দিই, সেই দূর দ্বীপ হইতে বাতাস ধীরে ধীরে আসিয়া আমাদের গাত্র স্পর্শ করে, সেই দূরদিগন্তের অস্ফুট সূর্য্য-কিরণের দিকে আমাদের নেত্র থাকে, আর আমাদের পশ্চাতে এই ধূলিময়, কীটময়, কোলাহলময় উপকূল পড়িয়া থাকে। সাঁতার দিতে দিতে মনে হয় যেন পশ্চাতের উপকূল আর দেখা যাইতেছে না ও সম্মুখে সেই দূর দেশের তট রেখা যেন এক এক বার দেখা যাইতেছে ও আবার মিলাইয়া যাইতেছে। সমস্ত দিন কাজ কর্ম্ম করিয়া আমরা বিশ্রামের জন্য কোথায় আসিব? এই সমুদ্রকূলেই কি নহে? সমস্ত দিন দোকান বাজারের মধ্যে, রাস্তা গলির মধ্যে থাকিয়া দুই দণ্ড কি মুক্ত-বায়ু সেবন করিতে আসিব না? আমরা জানি যে, যেখানে সীমা আরম্ভ সেই খানেই আমাদের কাজকর্ম্ম, বুঝাবুঝি ও অসীমের দিকে আমাদের বিশ্রামের স্থল আছে, সেই দিকেই কি আমরা মাঝে মাঝে নেত্র ফিরাইব না? সে অসীমের দিকে চাহিলে যে অবিমিশ্রিত সুখ হয় তাহা নহে, কোমল বিষাদ মনে আসে। কারণ, সে দিকে চাহিলে আমাদের ক্ষুদ্রতা আমাদের অসম্পূর্ণতা চোখে পড়ে, সংশয়ান্ধকারে আচ্ছন্ন প্রকাণ্ড রহস্যের মধ্যে নিজেকে রহস্য বলিয়া বোধ হয়—সে রহস্য ভেদ করিতে গিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসি। সমুদ্রে সাঁতার দিতে ইচ্ছা হয়, অথচ তাহা আমাদের সাধ্যের অতীত। অনেক উপকূলবাসী চিরজীবন এই উপকূলের কোলাহলে কাটাইয়াছেন, অথচ এই সমুদ্র-তীরে আসেন নাই, সমুদ্রের বায়ু সেবন করেন নাই। তাঁহাদের হৃদয় যখন

স্বাস্থ্য লাভ করে না। হৃদয়কে এই সমুদ্রতীরে আনয়ন করা, এই সমুদ্রের বক্ষে ভাসমান করা ভাবগত কবিতার কাজ। ভাবগত কবিতায় হৃদয়ের স্বাস্থ্য সম্পাদন করে। ইন্দ্রিয়জগৎ হইতে মনকে আর এক জগতে লইয়া যায়। দৃশ্যমান জগতের সহিত সে জগতের সাদৃশ্য থাকুক বা না থাকুক্ সে জগৎ সত্যজগৎ, অলীক জগৎ নহে।

ভাবুক লোক মাত্রে অনুভব করিয়াছেন, যে, আমরা মাঝে মাঝে এক প্রকার বিষণ্ণ সুখের ভাব উপভোগ করি, তাহা কোমল বিষাদ সম্প্রথর সুখ। তাহা আর কিছু নয়, সীমা হইতে অসীমের প্রতি নেত্রপাত মাত্র। কোন্ কোন্ সময়ে আমাদের হৃদয়ে ঐপ্রকার ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলেই উক্ত বাক্যের সত্যতা প্রমাণ হইবে। জ্যোৎস্না রাত্রে দূর হইতে সঙ্গীতের সুর শুনিলে, সুখস্পর্শ বসন্তের বাতাস বহিলে, পুষ্পের ঘ্রাণে, আমাদের হৃদয় কেমন আকুল হইয়া উঠে, উদাস হইয়া যায়। কিন্তু জ্যোৎস্না, সঙ্গীত, বসন্ত-বায়ু, সুগন্ধের ন্যায় সুখসেব্য পদার্থের উপভোগে আমাদের হৃদয় অমন আকুল হয় কি কারণে? কেন, সুমিষ্ট দ্রব্য আহার করিলে বা সুস্নিগ্ধ জলে স্নান করিলে ত আমাদের মন ঐ রূপ উদাস ও আকুল হইয়া উঠে না! যখন আহার করি তখন সুস্বাদ ও উদরপূর্ত্তির সুখ মাত্র অনুভব করি, আর কিছু নয়। কিন্তু জ্যোৎস্না রাত্রে কেবল মাত্র যে, নয়নের পরিতৃপ্তি হয় তাহা নহে, জ্যোৎস্নায় একটা কি অপরিস্ফুট ভাব মনে আনয়ন করে। যতটুকু সম্মুখে আছে কেবল ততটুকু মাত্রই যে উপভোগ করি তাহা নহে, একটা অবর্ত্তমান রাজ্যে গিয়া পৌঁছাই। তাহার কারণ এই যে, জ্যোৎস্না উপভোগ করিয়া আমাদের তৃপ্তি হয় না। চারিদিকে জ্যোৎস্না দেখিতেছি অথচ জ্যোৎস্না আমরা পাইতেছি না। ইচ্ছা করে, জ্যোৎস্নাকে আমরা সর্ব্বতোভাবে উপভোগ করি, জ্যোৎস্নাকে আমরা আলিঙ্গন করি, কিন্তু জ্যোৎস্নাকে ধরিবার উপায় নাই। বসন্ত বায়ু হুহু করিয়া বহিয়া যায়। কে জানে কোথা হইতে বহিল! কোন্ অদৃশ্য দেশ হইতে আসিল, কোন্ অদৃশ্য দেশে চলিয়া গেল! আসিল, চলিয়া গেল, বড়ই ভাল লাগিল; কিন্তু তাহাকে দেখিলাম না শুনিলাম না, সর্ব্বতোভাবে আয়ত্ত করিতেই পারিলাম না। শরীরে যে স্পর্শ হইল, তাহা অতি মৃদুস্পর্শ, কোমল স্পর্শ, কঠিন ঘন স্পর্শ নহে, কাজেই উপভোগে নানা প্রকার অভাব রহিয়া গেল। মধুর সঙ্গীতে মন কাঁদিয়া ওঠে সেই জন্যেই। আবার জ্যোৎস্না রাত্রে সে সঙ্গীত পুষ্পের গন্ধের সঙ্গে, বসন্তের বাতাসের সঙ্গে দূর হইতে আসিলে মন উন্মত্ত করিয়া তুলে। অন্যান্য অনেক ঋতু অপেক্ষা বসন্ত ঋতুতে সকলি অপরিস্ফুট মৃদু, কিছুই অধিক মাত্রায় নহে;—

দক্ষিণের দ্বার খুলি মৃদু মন্দ গতি
বাহির হয়েছে কিবা ঋতুকুলপতি।
লতিকার গাঁটে গাঁটে ফুটাইছে ফুল,
অঙ্গে ঘেরি পরাইছে পল্লব দুকুল।
কি জানি কিসের লাগি হইয়া উদাস
ঘরের বাহির হল মলয় বাতাস,
ভয়ে ভয়ে পদার্পয়ে তবু পথ ভুলে,
গন্ধমদে ঢলি পড়ে এ কুলে ও কুলে।
মনের আনন্দ আর নাহি পারি রাখিতে,
কোথা হতে ডাকে পিক রসাল শাখিতে,
কুহু কুহু কুহু কুহু কুঞ্জে কুঞ্জে ফিরে
ক্রমে মিলাইয়া যায় কানন গভীরে।
কোথা হইতে বাতাস উদাস হইয়া বাহির

হইল, কোথায় সে যাইবে তাহার ঠিক নাই, অতি ভয়ে ভয়ে অতি ধীরে ধীরে তাহার পদক্ষেপ। কোকিল কোথা হইতে সহসা ডাকিয়া উঠিল এবং তাহার স্বর কোথায় যে মিলাইয়া গেল, তাহার ঠিকানা পাওয়া গেল না। এক-দিকে উপভোগ করিতেছি আর এক দিকে তৃপ্তি হইতেছে না, কেন না উপভোগ্য সামগ্রী সকল আমাদের আয়ত্তের মধ্যে নহে। একদিকে মাত্র সীমা, অন্য দিকে অসীম সমুদ্র। মনে হয়, যদি ঐ সমুদ্র পার হইতে পারি তবে আমাদের বিশ্রামের রাজ্যে, সুখের রাজ্যে গিয়া পৌঁছাই। যদি জ্যোৎস্নাকে যদি ফুলের গন্ধকে, যদি সঙ্গীতকে ও বসন্তের বাতাসকে পাই তবে আমাদের সুখের সীমা থাকে না। এই জন্যই যখন কবিরা জ্যোৎস্না, সঙ্গীত, পুষ্পের গন্ধকে শরীরবদ্ধ করেন, তখন আমাদের এক প্রকার আরাম অনুভব হয়; মনে হয় যেন এইরূপই বটে, যেন এইরূপ হলেই ভাল হয়!

So young muser, I sat listening
To my Fancy's wildest word—
On a sudden, through the glistening
Leaves around a little stirred,
Came a sound a sense of music,
Which was rather felt than heard.
Softly, finely, it enwound me—
From the wored it shut me in—
Like a fountain falling round me
Which with silver water thin
Holds a little marble Naiad
sitting smilingly whithin.

সঙ্গীত যদি এইরূপ নির্ঝর হইত ও আমরা যদি তাহার মধ্যে বসিতে পারিতাম, তাহা হইলে কি আনন্দই হইত; মুহূর্তের জন্য কল্পনা করি যেন এইরূপই হইতেছে এইরূপই হয়! পৃথিবীতে না কি সকল সুখই প্রায় উপভোগ করিয়াই ফুরাইয়া যায়, ও অবশেষে অসন্তোষ মাত্র অবশিষ্ট থাকে; এই জন্যই যে সুখ আমরা ভাল করিয়া পাই না, যে সুখ আমরা শেষ করিতে পারি না, মনে হয় যেন সেই সুখ যদি পাইতাম, তবেই আমরা সন্তুষ্ট হইতাম। এমন লোক দেখা গিয়াছে যে, দূর হইতে সুকণ্ঠ শুনিয়া প্রেমে পড়িয়া গিয়াছে। কেননা তাহার মন এই বলে যে, অমন যাহার গলা না জানি তাহাকে কেমন দেখিতে, ও তাহার মনটিও কত কোমল হইবে! ভাল করিয়া দেখিলে পৃথিবীর দ্রব্যে না কি নানা প্রকার অসম্পূর্ণতা দেখা যায়; কাহারো বা গলা ভাল মন ভাল নহে, নাক ভাল চোখ ভাল নহে, তাই আমরা বড় বিরক্ত, বড় অসন্তুষ্ট হইয়া আছি; সেই জন্যই দূর হইতে আমরা আধখানা ভাল দেখিলে তাড়াতাড়ি আশা করিয়া বসি বাকিটুকু নিশ্চয়ই ভাল হইবে। ইহা যদি সত্য হয় তবে দূরেই থাকি না কেন, কল্পনায় পূর্ণতার প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করি না কেন, রক্ত মাংসের অত কাছে ঘেঁসিবার আবশ্যক কি? শরীর ও আয়তন যতই কম দেখি, অশরীরী ভাব যতই কল্পনা করি, বস্তুগত কবিতা যতই কম আহার করি ও ভাবগত কবিতা যতই সেবন করি ততই ত ভাল।

ডি প্রোফণ্ডিস্।

টেনিস্‌নের রচিত উক্ত কবিতাটির যথেষ্ট আদর হয় নাই। কোন কোন ইংরাজ সমালোচক ইহাকে টেনিস্‌নের অযোগ্য বলিয়া

মনে করেন, অনেক বাঙ্গালী পাঠক ইংরাজ সমালোচকদের ছাড়াইয়া উঠেন। ইংলণ্ডের হাস্যরসাত্মক সাপ্তাহিক পত্র "পঞ্চে" এই কবিতা টিকে বিদ্রূপ করিয়া De-Rotundis নামক একটি পদ্য প্রকাশিত হয়। আমরা এরূপ বিদ্রূপ কোন মতেই অনুমোদন করি না। এরূপ ভাব ইংরাজদের ভাব। কোন একটি বিখ্যাত মহান্ ভাবের কবিতাকে বিদ্রূপ করা তাঁহারা আমোদের মনে করেন। তাঁহাদের কেহ কেহ বলেন, যে, কোন কবির সম্ভ্রান্ত পূজনীয় কবিতাকে অঙ্গহীন করিয়া রং চং মাখাইয়া ভাঁড় সাজাইয়া, রাস্তায় দাঁড় করাইয়া, দশ জন অলস লঘু-হৃদয় পথিকের দুই পাটি দাঁত বাহির করাইলে সে কবির পক্ষে অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয়, ইহাতে ইংরাজ হৃদয়ের এক অংশের শোচনীয় অঙ্গহীনতা প্রকাশ পায়। আমাদের জাতীয় ভাব এরূপ নহে। যদি একজন বৃদ্ধ পূজনীয় ব্যক্তিকে অপদস্থ করিবার জন্য সভা মধ্যে কেহ তাঁহার হৃদয়-নিঃসৃত কথাগুলি বিকৃত স্বরে উচ্চারণ করিয়া মুখভঙ্গী করিতে থাকে, তবে তাহাকে দেখিয়া রসিক পুরুষ মনে করিয়া যাহারা হাসে, তাহাদের ধোবা নাপিত বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত।

টেনিসনের De Profundis কবিতাটি যে সমাদৃত হয় নাই, তাহার একটা কারণ, বিষয়টি অত্যন্ত গভীর গুরুতর। আর একটা কারণ, ইহাতে এমন কতকগুলি ভাব আছে, যাহা সাধারণতঃ ইংরাজেরা বুঝিতে পারেন না, আমরাই সে সকল ভাব যথার্থ বুঝিবার উপযুক্ত। ইংরাজীবাগীশ শিক্ষিত বাঙ্গালীদের অনেকে ইংরাজী কাব্য দেশী ভাবে সমালোচনা করিতে ভয় পান! তাঁহারা বলেন, যদি ইংরাজ সমালোচকদের উক্তির সহিত দৈবাৎ অমিল হইয়া যায়! না হয়, তাহা হইল। ইংরাজ সমালোচকের কথা ইংরাজী হিসাবে যেরূপ সত্য, আমাদের দেশীয় সমালোচকের কথা আমাদের দেশী হিসাবে তেমনি সত্য। উভয়ই বিভিন্ন অথচ উভয়ই সত্য হইতে পারে। গোলাপ ফুল যদি তাহার প্রতিবেশী পাতাকে সূর্য্যকিরণে সবুজ হইতে দেখিয়া মনে করে, সূর্য্যকিরণে আমারও সবুজ হওয়া উচিত ও সবুজ হইয়া উঠাই যদি তাহার জীবনের একমাত্র ব্রত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ফুল-মণ্ডলী তাহাকে পাগল বলিয়া আশঙ্কা করে।

De Profundis কবিতাটি কবির সন্তানের জন্মোপলক্ষে লিখিত। সন্তানের জন্মোপলক্ষে লিখিত কবিতা সাধারণতঃ লোকে যে ভাবে পড়িতে যায়, এই কবিতায় সহসা তাহাতে বাধা পায়। কচি মুখ, মিষ্টহাসি, আধ-আধ কথা ইহার বিষয় নহে। একটি ক্ষুদ্রকায়া সদ্যোজাত শিশুর মধ্যে মিষ্ট ভাব, কচিভাব ব্যতীত আরেকটি ভাব প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা সকলের চোখে পড়ে না। কিন্তু তাহা ভাবুক কবির চক্ষে পড়ে। সদ্যোজাত শিশুর মধ্যে একটি অপরিসীম মহান্ ভাব, অপরিমেয় রহস্য আবদ্ধ আছে, টেনিসন তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন, সাধারণ পাঠকেরা তাহা বুঝিতে পারিতেছে না অথবা এই অচেনা ভাব হৃদয়ের মধ্যে আয়ত্ত করিতে পারিতেছে না।

Tennyson এই কবিতাটিকে "The Two Greetings" কহিয়াছেন। অর্থাৎ, ইহাতে তাঁহার সন্তানটিকে দুই ভাবে তিনি সম্ভাষণ করিয়াছেন। প্রথমতঃ তাঁহার নিজের সন্তান বলিয়া, দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার আপনাকে তফাৎ করিয়া। এক, তাহার মর্ত্ত্য জীবন ধরিয়া আর এক তাহার অস্তিত্ব ধরিয়া। একটিতে, তাহাকে আংশিক ভাবে দেখিয়া,

আর একটিকে তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে দেখিয়া। তাঁহার সন্তানের মধ্যে তিনি দুইটি ভাগ দেখিতে পাইয়াছেন; একটি ভাগকে তিনি স্নেহ করেন আর একটী ভাগকে তিনি ভক্তি করেন। প্রথম সম্ভাষণ স্নেহের সম্ভাষণ, দ্বিতীয় সম্ভাষণ ভক্তির। তাঁহার কবিতার এই উভয় ভাগেই কবি অনেক দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত করিয়াছেন; এক দিগন্ত হইতে আর এক দিগন্তে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন।

প্রথম ভাগ। প্রথম, শিশু জন্মাইতেই তিনি ভাবিলেন, এ কোথা হইতে আসিল? বৈদিক ঋষি-কবিরা মহা অন্ধকারের রাজ্য হইতে দিগন্তপ্রসারিত সমুদ্র-গর্ভ হইতে তরুণ সূর্য্যকে উঠিতে দেখিয়া যেমন সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিতেন, এ কোথা হইতে আসিল, তেমনি সসম্ভ্রমে কবি জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কোথা হইতে আসিল? তিনি বর্ত্তমান দেশকালের বন্ধন সীমা অতিক্রম করিয়া, কত দূরে, কত উচ্চে অতীতের মহা গঙ্গোত্রী-শিখরের দিকে ধাবমান হইলেন। কবির বিচরণের স্থান এমন আর কোথায়? তিনি দেখিলেন, এই শিশুটি যে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই পৃথিবীরই সহোদর। মহা সৌরজগতের যমজ ভ্রাতা। তিনি তাহাকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন "বৎস আমার, মহা-সমুদ্র হইতে যেখানে যাহা কিছু-ছিল, তার মধ্যে যাহা কিছু হইবে (অর্থাৎ অতীতের মধ্যে ভবিষ্যৎ, অপরিস্ফুটতার মধ্যে পরিস্ফুটতা) কোটি কোটি যুগ যুগান্তর ধরিয়া অগণ্য আবর্ত্তমান জ্যোতিঃপুঞ্জের মহা মরুর মধ্যে ঘূর্ণমান হইতেছিল, তুমি সেইখান হইতে আসিতেছ। সেইখান হইতেই সূর্য্য আসিয়াছে, পৃথিবী ও চন্দ্র আসিয়াছে, এবং তাহার অন্যান্য গ্রহ সহোদরগণ আসিয়াছে।" অতীতের সেই উষা-গর্ভে কবি প্রবেশ করিয়াছেন দেখিলে অপরিস্ফুট পৃথিবীর কারণপুঞ্জ যেখা আবর্ত্তিত হইতেছে, আজিকার সদ্যোজা শিশুটির কারণপুঞ্জ সেই খানে ঘুরিতেছে উভয়ের বয়স এক; কেবল 'একজন' স্বরা আমাদের চক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে, আ একজন প্রকাশিত হইতে বিলম্ব করিয়াছে।

Out of the deep,
my child, out of the deep,
Where all that was to be,
in all that was,
Whirl'd for a million
aeions thro the vast
Waste dawn of multi tudinous
eddying light—
Out of the deep, my child,
out of the deep,
Thro' all this changing world
of changeless law,
And every phase of every-heighteni
life,
And nine long months
of antenatal gloom,
With this last moon,
this crescent—her dark o
Touched with earth's light—
thou comest darling boy

অতীতের কথা শেষ হইয়াছে, এখন মানের কথা আসিতেছে। কবি শিশুটির প চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, অতীত যাহাকে এত যত্নে লালন পালন করিয়া অ য়াছে, সে কে? সে তাঁহারই প্রাণাধিক তাঁহারই পুত্রকে সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ তাহার অতীত মাতা গর্ভে ধারণ করিয়াছে,

জ্যোতির্ম্ময় দোলায় দোলাইয়াছে, এক স্তন্য পান করাইয়া পুষ্ট করিয়াছে, আজ তাঁহারই হস্তে সমর্পণ করিল। তাঁহার আজকার এই প্রাণাধিক বৎস প্রকৃতির এত দিনকার যত্নের ধন। তাহাকে কহিলেন "তুই আমাদের আপনার ধন। তোর সর্ব্বাংশসুন্দর অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ও গঠন ভাবী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বয়স্ক পুরুষের ভবিষ্যৎসূচনা করিতেছে। আমার স্ত্রীর ও আমার মুখ ও গঠন তোর মুখের ও গঠনের মধ্যে অচ্ছেদ্য-বন্ধনে বিবাহিত হইয়াছে।" কবি দেখিলেন, সে নিতান্তই তাঁহাদের। তাহার শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাঁহাদের উভয়ের হইতে গঠিত হইয়াছে। অবশেষে তাহার ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়াদেখিলেন ও কহিলেন ;—

Live and be happy in thyself
and serve
This mortal race thy kin so well,
that man
May bless thee as we bless
thee O young lfie
Breaking with laughter from
the dark ; and may
The fated channel whre thy
motion lives
rosperously shaped,
and sway thy cousre
Along the years of haste
and random youth
Unshattered ; then full current
thro full man ;
And last in kindly curves with
gentlest fall,
By quiet fields a slowly
dying power,
To that last deep where we
and thou are still ;

এখন আর সে নিতান্তই তাঁহাদের নহে ! এখন তাহার নিজত্ব বিকশিত হইয়াছে। এখন তাহার নিজের কাজ আছে। কবি তাহার মর্ত্ত্য জীবনের তিনটি অবস্থা সমালোচনা করিয়াছেন। প্রথমে মর্ত্ত্য জীবনের আদি কারণ আলোচনা করিলেন, পরে তাহার জন্ম অর্থাৎ মনুষ্য শরীর ধারণ আলোচনা করিলেন ও পরে তাহার পার্থিব জীবন আলোচনা করিলেন। এই খানেই সমস্ত ফুরাইল। প্রথম সম্ভাষণ শেষ হইল। এই সম্ভাষণে কবি একটি মর্ত্ত্যের মনুষ্যকে সম্ভাষণ করিয়াছেন। যতক্ষণ সে মনুষ্য, ততক্ষণ সে তাঁহার। তাঁহাকে সমর্পণ করিবার জন্যই অতীত ইহাকে গড়িয়াছে ! গঠিত অবস্থায় দেখিলেন সে তাঁহারই মত। ইহাতে কেবল শরীর ও জীবনের কথাই আছে। "তুমি বাঁচিয়া থাক, তুমি কাজ কর, তোমার জীবন পূর্ণতা প্রাপ্ত হউক ও অবশেষে যথা সময়ে অতি ধীরক্রমে তাহার অবসান হউক্।" ইহাই কবির সমস্ত সম্ভাষণের মর্ম্ম। কবি তাঁহার সন্তানের মর্ত্ত্য অংশকে সম্ভাষণ করিতেছেন, সুতরাং উপরি-উক্ত আশীর্ব্বচন মর্ত্ত্য জীবনেরপ্রতি সর্ব্বতোভাবে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যাহা হউক, এই খানেই সমস্ত শেষ হইয়া যায়, জীবন আরম্ভ হইল জীবন শেষও হইল। তখন জীবনের সমাধি স্তম্ভের উপর কবি দাঁড়াইয়া দূর দূরান্তরে দৃষ্টি-চালনা করিলেন, দেখিলেন, জীবন শেষ হইল, তাঁহার সন্তান শেষ হইল, কিন্তু যে সূত্র বাহিয়া এই সন্তান আসিয়াছে, সেই সূত্রের শেষ হইল না। তিনি এখন দেখিলেন, অনন্ত পথের একজন পথিক, পথের মধ্যে অবস্থিত তাঁহার গৃহে, পৃথিবীতলে অতিথি

হইয়াছে। এই আতিথ্য জীবনকে সন্তান বলে, মনুষ্য বলে। আতিথ্য জীবন ফুরায়, সন্তানও ফুরায়, মনুষ্যও ফুরায় কিন্তু পথিক ফুরায় না। প্রথমে তিনি সেই অতিথিকে সম্ভাষণ করিলেন, এখন সেই মহাপান্থকে সম্ভাষণ করিতেছেন। এখন পৃথিবীর অতিথিকে নহে, মহাকালের অতিথিকে সম্ভাষণ করিলেন। এখন তিনি দেখিতেছেন যে, এই পথিক সৌর জগতেরও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। প্রথম সম্ভাষণে তিনি কোটি কোটি যুগ আবর্ত্তমান আলোকের নির্ম্মাণ-শালার উল্লেখ করিয়াছেন, অপরিবর্ত্তনীয় পরিবর্ত্তনের জগতে ক্রমোত্থানশীল জীবনের উল্লেখ করিয়াছেন—এবং কহিয়াছেন—

With this last moon, this crescent,-her dark orb
Touched with earth's light-thou comest,"

অর্থাৎ মনুষ্যের জন্মও এইরূপ চন্দ্রকলার ন্যায়; তাহার একাংশ পৃথিবীর জীবন, পৃথিবীর বুদ্ধি পাইয়া আলোকিত হয়। দ্বিতীয় ভাগে যাহাকে সম্ভাষণ করিতেছেন, তাহার কারণ আলোচনা করিতে গিয়া কবি সময়ের সংখ্যা গণনা করেন নাই, নির্ম্মাণের উপাদান উল্লেখ করেন নাই। এইবার তিনি কহিতেছেন—

Out of the deep, my child, out of the deep,
From that great deep, before our world begins,
Wherein the sirit of God moves as he will---
Out of the deep, my child, out of the deep,
From that true world within the world we see,
Whereof our world is but the bounding shore---
Out of the deep, my child, out of the deep,
With this ninth moon, that sends the hidden sun
Down yon dark [sea, thou comest darling boy,

এবার কবি যে সমুদ্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আলোকের সমুদ্র নহে, অতীত বা ভবিষ্যৎ কালের দিকে তাহার উপকূল নাই, তাহা তিন কাল মগ্ন করিয়া বিরাজ করিতেছে। জগতের আত্মাকে তিনি উল্লেখ করিতেছেন। জগতের অন্তরস্থিত যথার্থ জগতের কথা বলিতেছেন। বাহ্য জগৎ সেই অন্তর্জগতেকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে মাত্র।

"Out of the deep,spirit, out of the deep.
With this ninth moon, that sends the hidden sun
Down yon dark sea, thou comest, darling boy,

সেই সমুদ্র হইতে তুমি আসিতেছ। জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যকে সমুদ্রলে বিসর্জ্জন দিয়া ক্ষীণালোকে চন্দ্র উদিত হইল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে তুমিও উদিত হইলে, তুমিও মহাজ্যোতিকে বিসর্জ্জন করিয়া আসিলে। পূর্ব্বে যে মনুষ্যকে কবি সম্ভাষণ করিয়াছিলেন, সে অপরিস্ফুটতর অবস্থা হইতে পরিস্ফুটতা প্রাপ্ত হইয়াছে, এবারে যে আত্মাকে সম্ভাষণ করিতেছেন সে পূর্ণ অবস্থা হইতে অপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

For in the world which is not ours, They said
'Let us make man, and that which should be man,
From that one light no man can look upon,

Drew to this shore lit by suns and moons
And all the shadows.

কি মহা রহস্য পূর্ণ উক্তি! কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না, কিছুরই সীমা পাইতেছি না। "সে জগৎ আমাদের নহে।" সে কোন্ জগৎ? কে জানে কোন্ জগৎ। মহাকবি আদি কবির মনোজগৎ কি?"They said" তাহারা কহিল। কাহারা? কে জানে কাহারা! তাঁহার মনোরাজ্যের অধিবাসীরা? তাঁহার ভাবসমূহ, তাঁহার কল্পনা? এখানে সমস্তই রহস্য। কবি আলোকের রাজ্যে অন্ধ হইয়া দিশাহারা হইয়া গিয়াছেন, স্পষ্ট করিয়া কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। এই নিমিত্ত তাঁহার কথা অস্পষ্ট অথচ মহান্ ভাবপূর্ণ। আমরা কল্পনায় দেখিতে পাইতেছি একটি মর্ত্ত্যের শিশু বর্ণনার অতীত মহাজ্যোতির্ময় অনন্ত রাজ্যের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে, কোথায় কি, ঠাহর পাইতেছে না, চোখে ধাঁধা লাগিয়াছে, মন অভিভূত হইয়া গিয়াছে, মুখে কথা ফুটিতেছে না। তিনি কহিতেছেন। "যে জগৎ আমাদের নহে, সেই জগতে তাহারা কহিল—আইস, আমরা মনুষ্য হই।" ভাবী মনুষ্য, মনুষ্য চক্ষুর অসহনীয় সেই এক আলোক হইতে এই ছায়ালোকিত উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইল।" One ight এক পরমজ্যোতি হইতে তাহারা আসিতেছে। সেই জ্যোতির তাহারা অংশ। খৃষ্টান্ সমালোচকগণ এ সকল ভাব বুঝিবে কি রূপে?

O dear spirit half lost
In thine own shadow and this fleshly sign
That thou art thou—who wailest being born
And banished into mystery, and the pain
Of this divisible indivisible world,
Among the numerable innumerable
Sun, sun, and sun, thro' finite infinite space
In finite infinite Time--our mortal veil
And shattered phantom of that infinite one,
Who made thee unconceivably Thyself
Out of this World-self and all in all---
Live thou;

হে আত্মা, তুমি কোথা হইতে কোথা আসিয়াছ? তুমি কি হইতে কি হইয়াছ! তুমি যে জগতে আসিয়াছ, তাহাকে ভাগ করিয়া শেষ করা যায়। তখন যে এক জগতে ছিলে, তাহা গণনার জগৎ নহে। এখন যে জগতে আসিয়াছ, এখানে সূর্য্য নক্ষত্র গণনা করিয়া শেষ করা যায় না, তথাপি গণনা করা যায়। তখন অসীম দেশে অসীম কালে ছিলে, এখন যে দেশে যে কালে নির্ব্বাসিত হইয়াছ তাহার সীমা পাইতেছি না অথচ সীমা আছে। তাহা সীমাবিভক্ত অসীম।

তুমি কি ছিলে কি হইয়াছ! তুমি ছিলে এক অসীমের মধ্যে, এখন তুমি তাঁহার চূর্ণ বিচূর্ণ উপচ্ছায়া মাত্র। কিন্তু এই খানেই তোমার শেষ নহে। তুমি অসীমের নিকট হইতে অসীম দূরে আসিয়াছ; তুমি অনন্তকাল ধরিয়া ক্রমশঃ তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিবে। তোমাকে আর কি কহিব!—

"Live thou; and of the grain and husk, the grape
And ivyberry choose; and still depart
From death to death thro' li
life and life find

Nearer and ever nearer Him who wrought
Not matter, nor the finite infinite
But this main miracle that thou art thou,
With power on thine own act and on the world"

প্রথম সম্ভাষণে মনুষ্য-ভাবে তোমাকে কহিয়াছিলাম।

"Live and be happy in thyself, and serve
This mortal race thy kin"

বাঁচিয়া থাক, তুমি সুখী হও, তোমার স্বজাতীয় জীবদিগকে সুখী কর ও অবশেষে বিনা কষ্টে ধীরে ধীরে মৃত্যু লাভ কর! মানুষের পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর কি আশীর্ব্বাদ আছে। কিন্তু দ্বিতীয় সম্ভাষণে তোমাকে কহিতেছি—"বাঁচিয়া থাক।" এখানে বাঁচিয়া থাকার অর্থে মর্ত্ত্য জীবন নহে, অনন্ত চেতনা। জন্মে জন্মে যাহা ভাল তাহাই গ্রহণ কর, যাহা মন্দ তাহাই পরিত্যাগ কর। ও পদে পদে মৃত্যুর দ্বার সমূহ অতিক্রম করিয়া অমৃতের দিকে ধাবমান হও। দুইটি সম্ভাষণে দুই প্রকারের বিভিন্ন আশীর্ব্বাদ কেন করিলাম? না প্রথম বারে আমি বস্তু (matter) ও সসীম অসীমকে সম্বোধন করিয়াছিলাম। দ্বিতীয় বারে আমি তোকে সম্ভাষণ করিতেছি Who art "not matter, nor the finite infinite, but this main-miracle, that thou art thou, with power on thineown act and on the world."

সন্তানের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কবি কি এক অনন্ত রাজ্যের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন! এই অনন্ত মন্দিরে গিয়া তিনি কাহাকে দেখিতে পাইলেন? কি গান গাহিয়া উঠিলেন? বৈদিক ঋষিরা যেন গান গাইয়াছেন।

Hallowed be Thy name—
Halleluiah—
Infinite Ideality!
Immeasurable Reality:
Infinite Personality;
Hallowed be thy name—
Halleluiah;
We feel we are nothing—
For all is thou and in Thee
We feel we are some thing—
That also has come from thee;
We know we are nothing—
But thou wilt help us to be.
Hallowed be thy name—
Halleluiah:

অনন্ত ভাব। অপরিমেয় সত্তা। অপরিসীম পুরুষ। অনন্ত ভাব আমাদের হইতে অত্যন্ত দূরবর্ত্তী। কিছুতেই তাহার কাছে যাইতে পারি না। অবশেষে সেই ভাব যাহাকে যখন সত্য বলিয়া জানিলাম, তখন তিনি আমাদের আরো কাছে আসিলেন। কিন্তু তাঁহাকে কেবলমাত্র সত্য বলিয়া জানিয়া তৃপ্তি হয় না। কেবল মাত্র একটি অন্ধ কারণ, অন্ধ শক্তি, অন্ধ সত্তা বলিয়া জানিলে সম্পূর্ণ জানা হয় না। যখন জানিলাম তিনি অসীম পুরুষ, তাঁহার নিজত্ব আছে, তখন তিনি আমাদের কাছে আসিলেন, তখন তাঁহাকে আমরা প্রীতি করিতে পারিলাম। তখন তাঁহাকে কহিলাম তোমার জয় হউক!

"We feel we are nothing—for all

is Thou and in thee" ইহা অতীতের কথা। যখন আমরা তোমার মধ্যে ছিলাম তখন আমরা অনুভব করিতাম না যে আমরা কিছু, সকলি তুমি। ইহাই আমাদের ভাব মাত্র। তোমার মধ্যে আমরা ভাব মাত্রে ছিলাম। অবশেষে তোমার কাছ হইতে যখন আসিলাম, তখন অনুভব করিতে লাগিলাম, আমরা কিছু we feel we are something—that also has come from thee ইহা বর্ত্তমানের কথা, ইহাই আমাদের সত্য। এখন আমরা কিছু হইয়াছি, আমরা সত্য হইয়াছি, "We know we are nothing—but Thou wilt help us to be." ইহা ভবিষ্যতের কথা। আমরা জানি আমরা কিছুই নই—তুমি আমাদের ক্রমশই গঠিত করিয়া তুলিতেছ, আমাদের ব্যক্ত করিয়া তুলিতেছ। মৃত্যুর মধ্য দিয়া নূতন নূতন সত্য, নূতন নূতন জ্ঞান শিখাইয়া আমাদের পূর্ণ ব্যক্তি করিয়া তুলিতেছ। কোনও কালেই তাহা হইতে পারিব না, চিরকালই "Thou wilt help us to be" অপূর্ণতা হইতে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইবার আনন্দ আমরা চিরকাল ভোগ করিব। তোমার জয় হউক। মর্ত্ত্যজীবনেও এই ক্রমোন্নতির তুলনা মিলে। মনুষ্য প্রথমে এক মহা বাষ্প রাশির মধ্যে, সমস্ত জগতের আদি-ভূতের মধ্যে মিলিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে পৃথক্ হইয়া মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিল! অবশেষে যতই সে বড় হইতে লাগিল, অভিজ্ঞতা লাভ করিতে লাগিল, ততই তাহার ব্যক্তিত্ব জন্মিতে লাগিল। এই ক্রম অনুসারেই কবি ঈশ্বরকে প্রথমে অনন্ত ভাব, পরে অপরিমেয় সত্য ও তৎপরে অপরিসীম পুরুষ বলিয়াছেন। এইখানে কবিতা শেষ হইল। ইহার পরে আর কোথায় যাইবে? ইহাই চূড়ান্ত সীমা। যাঁহারা একটা দৈত্যকে পর্ব্বত বলিলে, দৈত্যের যষ্টিকে শালবৃক্ষ কহিলে মহান্ ভাবে হাঁ করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে, এত বড় কবিতার মহান্ ভাব উপলব্ধি করিতে পারেন না ইহাই আশ্চর্য্য। বস্তুগত মহান্‌ভাব পর্য্যন্তই বোধ করি তাঁহাদের কল্পনার সীমা, বস্তুর অতীত মহান্ ভাব তাঁহারা আয়ত্ত করিতে পারেন না। তাহা যদি পারিতেন, তবে তাঁহারা এই ক্ষুদ্র কবিতাটিকে সমস্ত Paradise lost-এর অপেক্ষা মহান্ বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

কাব্যের অবস্থা পরিবর্ত্তন।

য়ুরোপের সাহিত্যে মহাকাব্য লিখিবার কাল চলিয়া গিয়াছে। কোন কবি মহাকাব্য লিখেন না, অনেক পাঠক মহাকাব্য পড়েন না, অনেকে বিদ্যালয়ের পাঠ্য বলিয়া পড়েন, অনেকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া পড়েন। অনেক সমালোচক দুঃখ করিতেছেন, এখন আর মহাকাব্য লিখা হয় না, কবিত্বের যুগ চলিয়া গিয়াছে। অনেক পণ্ডিতের মত এই যে, সভ্যতার পাড়ে যতই চর পড়িবে, কবিত্বের পাড়ে ততই ভাঙ্গন ধরিবে! প্রমাণ কি? না, সভ্যতার অপরিণত অবস্থায় মহাকাব্য লেখা হইয়াছে, এখন আর মহাকাব্য লেখা হয় না। তাঁহাদের মতে, বোধ করি, এমন সময় আসিবে, যখন কোন কাব্যই লেখা হইবে না।

সভ্যতার সমস্ত অঙ্গে যেরূপ পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে, কবিতার অঙ্গেও যে সেইরূপ পরিবর্ত্তন হইবে, ইহাই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। কবিতা সভ্যতা-ছাড়া একটা আকাশ-কুসুম নহে। কবিতা নিতান্তই আসমানদার

নয়। তাহার সমস্ত ঘর বাড়িই আসমানে নহে। তাহার জমিদারীও যথেষ্ট আছে।

সভ্যতার একটা লক্ষণ এই যে, দেশের সভ্য অবস্থায় এক জন ব্যক্তিই সর্ব্বেসর্ব্বা হয় না। দেশ বলিলেই একজন বা দুই জন বুঝায় না, শাসনতন্ত্র বলিলে এক জন বা দুই জন বুঝায় না। ব্যক্তি নামিয়া আসিতেছে ও মণ্ডলী বিস্তৃত হইতেছে। এখন এক এক জন ব্যক্তিই লক্ষলোকের সমষ্টি নহে। এখন শাসন-তন্ত্র আলোচনা করিতে হইলে একটি রাজার খেয়াল, শিক্ষা ও মনোভাব আলোচনা করিলে চলিবে না; এখন অনেকটা দেখিতে হইবে, অনেককে দেখিতে হইবে। এখন যদি তুমি একটা যন্ত্রের একটা অংশ মাত্র দেখিয়া বল যে, এ ত খুব অল্প কাজই করিতেছে, তাহা হইলে তুমি ভ্রমে পড়িবে। সে যন্ত্রের সকল অঙ্গই পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে।

এখনকার সভ্যসমাজে দশটাকে মনে মনে তেরিজ করিয়া একটাতে পরিণত কর। কবিতাও সে নিয়মের বহিষ্কৃত নহে। সভ্য দেশের কবিতা এখন যদি তুমি আলোচনা করিতে চাও, তবে একটা কাব্য, একটি কবির দিকে চাহিও না। যদি চাও তবে বলিবে "এ কি হইল! এ ত যথেষ্ট হইল না! এদেশে কি তবে এই কবিতা?" বিরক্ত হইয়া হয়ত প্রাচীন সাহিত্য অন্বেষণ করিতে যাইবে। যদি মহাভারত, কি রামায়ণ, কি গ্রিসীয় একটা কোন মহাকাব্য নজরে পড়ে, তবে বলিবে "পর্য্যাপ্ত হইয়াছে, প্রচুর হইয়াছে!" এক মহাভারত বা এক রামায়ণ পড়িলেই তুমি প্রাচীন সাহিত্যের সমস্ত ভাবটি পাইলে। কিন্তু এখন সে দিন গিয়াছে। এখন একখানা কবিতার বইকে আলাদা করিয়া পড়িলে পাঠের অসম্পূর্ণতা থাকিয়া যায়। মনে কর ইংলণ্ড। ইংলণ্ডে যত কবি আছে সকলকে মিলাইয়া লইয়া এক বলিয়া ধরিতে হইবে। ইংলণ্ডে যে কবিতা-পাঠক-শ্রেণী আছেন, তাঁহাদের হৃদয়ে এক একটা মহাকাব্য রচিত হইতেছে। তাঁহারা বিভিন্ন কবির বিভিন্ন কাব্য গুলি মনের মধ্যে একত্রে বাঁধাইয়া রাখিতেছেন। ইংলণ্ডের সাহিত্যে মানব-হৃদয় নামক একটা বিশাল মহাকাব্য রচিত হইতেছে, অনেক দিন হইতে অনেক কবি তাহার একটু একটু করিয়া লিখিয়া আসিতেছেন। পাঠকেরাই এই মহাকাব্যের বেদ-ব্যাস। তাঁহারা মনের মধ্যে সংগ্রহ করিয়া সন্নিবেশ করিয়া তাহাকে একত্রে পরিণত করিতেছেন। যে কেহ ইহার একটি মাত্র অংশ দেখেন অথবা সকল অংশ গুলিকে আলাদা করিয়া দেখেন, তিনি নিতান্ত ভ্রমে পড়েন। তিনি বলেন, সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে কাব্য অগ্রসর হইতেছে না। তিনি কি করেন? না, একটি সাধারণ তন্ত্রের শাসন প্রণালীর প্রতিনিধিগণের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করিয়া দেখেন। দেখেন রাজার মত প্রভূত ক্ষমতা কাহারো হস্তে নাই, রাজার মত একাধিপত্য কেহ করিতে পায় না ও তৎক্ষণাৎ এই সিদ্ধান্ত করিয়া বসেন যে, "দেশের রাজ্য প্রণালী ক্রমশই অবনত হইয়া আসিতেছে। সভ্যতা বাড়িতেছে বটে কিন্তু রাজ্যতন্ত্রের উন্নতি কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। বরঞ্চ উল্টা!" কিন্তু সভ্যতা বাড়িতেছে বলিলেই বুঝায় যে, জ্ঞানও বাড়িতেছে কবিতাও বাড়িতেছে।

রাজ্যতন্ত্র যখন খুব জটিল ও বিস্তৃত হয়, তখন সাধারণতন্ত্রের বিশেষ আবশ্যকতা বাড়ে। যতদিন ছোটখাট সোয়ার্য্যজ্য একত্র থাকে, ততদিন সাধারণতন্ত্রের তায় অতবড় বিস্তৃত

রাজ্যপ্রণালীর তেমন আবশ্যকতা, থাকে না। এক রাজায় আর যখন চলে না, তখন সে রাজার দিন ফুরায়। য়ুরোপে তাহাই হইয়া আসিয়াছে। কবিতার রাজ্য অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া উঠিয়াছে। বৃহত্তম অনুভাব হইতে অতি সূক্ষ্মতম অনুভাব, জটিলতম অনুভাব হইতে অতি বিশদতম অনুভাব সকল কবিতার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। এখনকার কবিতায় এমন সকল ছায়া-শরীরী মৃদুস্পর্শ কল্পনা খেলায়, যাহা পুরাতন লোকদের মনেই আসিত না ও সাধারণ লোকেরা ধরিতে ছুঁইতে পারে না; এমন সকল গূঢ়তম তত্ত্ব কবিতায় নিহিত থাকে, যাহা সাধারণতঃ সকলে কবিতার অতীত বলিয়া মনে করে। প্রাচীনকালে কবিতায় কেবল নলিনী মালতী মল্লিকা যূঁথী জাতি প্রভৃতি কতকগুলি বাগানের ফুল ফুটিত, আর কোন ফুলকে যেন কেহ কবিতার উপযুক্ত বলিয়াই মনে করিত না, আজ কাল কবিতায় অতি ক্ষুদ্র-কায়, সাধারণতঃ চক্ষুর অগোচর, তৃণের মধ্যে প্রস্ফুটিত সামান্য বন ফুলটি পর্য্যন্ত ফুটে। এক কথায়—যাহাকে লোকে, অভ্যস্ত হইয়াছে বলিয়াই হউক্‌ বা চক্ষুর দোষেই হউক, অতি সামান্য বলিয়া দেখে, বা একেবারে দেখেই না, এখনকার কবিতা তাহার অতি বৃহৎ গূঢ়ভাব খুলিয়া দেখায়। আবার যাহাকে অতি বৃহৎ, অতি অনায়ত্ত বলিয়া লোকে ছুঁইতে ভয় করে, এখানকার কবিতায় তাহাকেও আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া দেয়। অতএব এখানকার উপযোগী মহাকাব্য এক জনে লিখিতে পারে না, একজনে লিখেও না।

এখন শ্রম-বিভাগের কাল। সভ্যতার প্রধান ভিত্তিভূমি শ্রমবিভাগ। কবিতাতেও শ্রম-বিভাগ আরম্ভ হইয়াছে। শ্রম-বিভাগের আবশ্যক হইয়াছে।

পূর্ব্বে একজন পণ্ডিত না জানিতেন এমন বিষয় ছিল না। লোকেরা যে বিষয়েই প্রশ্ন উত্থাপন করিত, তাঁহাকে সেই বিষয়েই উত্তর দিতে হইত, নহিলে আর তিনি পণ্ডিত কিসের? এক অরিষ্টটল দর্শনও লিখিয়াছেন, রাজ্য-নীতিও লিখিয়াছেন, আবার ডাক্তারিও লিখিয়াছেন। তখনকার সমস্ত বিদ্যাগুলি হ-য-ব র-ল হইয়া একত্রে ঘেঁসাঘেঁষি করিয়া থাকিত। বিদ্যাগুলি একান্নবর্ত্তী পরিবারে বাস করিত, এক একটা করিয়া পণ্ডিত তাহাদের কর্ত্তা। পরস্পরের মধ্যে চরিত্রের সহস্র প্রভেদ থাক্‌, এক অন্ন খাইয়া তাহারা সকলে পুষ্ট। এখন ছাড়াছাড়ি হইয়াছে, সকলেরই নিজের নিজের পরিবার হইয়াছে; একত্রে থাকিবার স্থান নাই; একত্রে থাকিলে সুবিধা হয় না ও বিভিন্ন চরিত্রের ব্যক্তি সকল একত্রে থাকিলে পরস্পরের হানি হয়। কেহ যেন ইহাদের মধ্যে একটা মাত্র পরিবারকে দেখিয়া বিদ্যার বংশ কমিয়াছে বলিয়া না মনে করেন। বিদ্যার বংশ অত্যন্ত বাড়িয়াছে, একটা মাথায় তাহাদের বাসস্থান কুলাইয়া উঠে না। আগে যাহারা ছোট ছিল, এখন তাহারা বড় হইয়াছে। আগে যাহারা একা ছিল, এখন তাহাদের সন্তানাদি হইয়াছে।

যখন জটিল, লীলাময়, গাঢ়, বিচিত্র, বেগবান মনোবৃত্তি সকল সভ্যতা বৃদ্ধির সহিত, ঘটনা বৈচিত্র্যের সহিত, অবস্থার জটিলতার সহিত হৃদয়ে জন্মিতে থাকে, তখন আর মহাকাব্যে পোষায় না। তখনকার উপযোগী মহাকাব্য লিখিয়া উঠাও এক জনের পক্ষে সম্ভবপর নহে। সুতরাং তখন খণ্ডকাব্য ও গীতিকাব্য আবশ্যক হয়। গীতিকাব্য মহাকাব্যের পূর্ব্বেও ছিল কি না সে পরে আলোচিত

হইবে। এক মহাকাব্যের মধ্যে সংক্ষেপে, অপরিস্ফুট ভাবে অনেক গীতিকাব্য, খণ্ডকাব্য থাকে, অনেক কবি সেইগুলি পরিস্ফুট করিয়াছেন। শকুন্তলা, উত্তররামচরিত প্রভৃতি তাহার উদাহরণ স্থল। গীতিকাব্য, খণ্ডকাব্য যখন এতদুর বিস্তৃত হইয়া উঠে, যে, মহাকাব্যের অল্পায়তন স্থানে তাহারা ভাল স্ফূর্ত্তি পায় না, তখন তাহারা পৃথক্ হইয়া পড়ে। অতএব ইহাতে কবিতার অশুভ আশঙ্কা করিবার কিছুই নাই।

প্রথমে সৌরজগৎ একটি বাষ্পচক্র ছিল মাত্র, পরে তাহা হইতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গ্রহ উপগ্রহ সকল সৃজিত হইল। এখনকার মতন তখন বৈচিত্র্য ছিল না। আমাদের এই বিচিত্রতাময় খণ্ড ও গীতিকাব্য সমূহের বীজ মাত্র সেই সৌর মহাকাব্যের মধ্যে ছিল। কিন্তু তাহাই বলিয়া আমাদের মত বসন্ত বর্ষা ছিল না; কানন, পর্ব্বত, সমুদ্র ছিল না; পশু পক্ষী পতঙ্গ ছিল না; সকলেরই মূল কারণ মাত্র ছিল। এখন বিচ্ছিন্ন হইয়া সৌর-জগৎ পরিপূর্ণতর হইয়াছে। ইহার কোন অংশ সেই মহা সৌর-চক্রের সমান নহে বলিয়া কেহ যেন না বলেন যে জগৎ ক্রমশই অসম্পূর্ণতর হইয়া আসিয়াছে। এখন সৌর জগতের মহত্ত্ব অনুধাবন করিতে হইলে এই বিচ্ছিন্ন, অথচ আকর্ষণ সূত্রে বদ্ধ মহারাজ্য-তন্ত্রকে একত্র করিয়া দেখিতে হইবে; তাহা হইলে আর কাহারো সন্দেহ থাকিবে না যে, এখনকার সৌরজগৎ পরিস্ফুটতর উন্নততর। জগতেরও উন্নতি পর্য্যায়ের মধ্যে শ্রম-বিভাগ আছে। সৌরজগতের কাজ এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, পৃথক্ পৃথক্ হইয়া কাজের ভাগ না করিলে কোন মতেই চলে না। যদি আধুনিক বিজ্ঞান রাজ্যের সীমা ছাড়াইয়াও কিয়দ্দুর যাওয়া যায়, যদি এই একত্র সম্মিলিত বাষ্পরাশিগত অবস্থার পূর্ব্বেও আর কোন অবস্থা থাকে এমন অনুমান করা যায়, তবে তাহা নানা স্বতন্ত্র আদিভূত সমূহের অস্ফুট ভাবে পৃথক্ ভাবে বিশৃঙ্খল সঞ্চরণ, পরস্পর সংঘর্ষ। যাহাকে ইংরাজিতে chaos বলিয়া থাকে। প্রথমে বিশৃঙ্খল পার্থক্য, পরে একত্রে সম্মিলন, ও তাহার পরে শৃঙ্খলা-বদ্ধ বিচ্ছেদ। আমাদের বুদ্ধির রাজ্যেও এই নিয়ম। প্রথমে কতকগুলা বিশৃঙ্খল পৃথক্ সত্য, পরে তাহাদের এক শ্রেণী বদ্ধ করা, ও তৎপরে তাহাদের পরিস্ফুট বিভাগ। সমাজেও এই নিয়ম। প্রথমে বিশৃঙ্খল পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি, পরে তাহাদের এক শাসনে দৃঢ়রূপে একত্রীকরণ, তাহার পরে প্রত্যেক ব্যক্তির অপেক্ষাকৃত ও যথোপযুক্ত পরিমাণে সুশৃঙ্খল স্বাতন্ত্র্য, সুসংযত স্বাধীনতা; কবিতাতেও এ নিয়ম খাটে। প্রথমে ছাড়া ছাড়া বিশৃঙ্খল অস্ফুট গীতোচ্ছ্বাস, পরে পুঞ্জীভূত মহাকাব্য, তাহার পরে বিচ্ছিন্ন পরিস্ফুট গীত সমূহ। সৌর জগতের কবিতাকে যে ভাবে দেখা আবশ্যক, উন্নততর সাহিত্যের কবিতাকেও সেই ভাবে দেখা কর্ত্তব্য। নহিলে ভ্রমে পড়িতে হয়।

সভ্যতার জোয়ারের মুখে সমস্ত সমাজ তীরের মত অগ্রসর হইতেছে, কেবল কবিতাই যে, উজান বাহিয়া উঠিতেছে এমন কেহ না মনে করেন। এখন বিশেষ ব্যক্তির (individual) গুরুত্ব লোপ পাইতেছে বলিয়া কেহ যেন না মনে করেন যে, সংসার খাট হইয়া আসিতেছে। কারণ Tennyson বলিতেছেন—

"The individual withers and the world
is more and more."

একদল পণ্ডিত বলেন যে যতদিন অজ্ঞানের প্রাদুর্ভাব থাকে ততদিন কবিতার শ্রীবৃদ্ধি হয়। অতএব সভ্যতার দিবসালোকে কবিতা ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইয়া যাইবে। আচ্ছা, তাহাই মানিলাম। মনে কর কবিতা নিশাচর পক্ষী! কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, জ্ঞানের অনুশীলন যতই হইতেছে, অজ্ঞানের অন্ধকার ততই বাড়িতেছে, ইহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন? বিজ্ঞানের আলো আর কি করেন, কেবল "makes the darkness visible" বিজ্ঞান প্রত্যহ অন্ধকার আবিষ্কার করিতেছেন! অন্ধকারের মানচিত্র ক্রমেই বাড়িতেছে, বড় বড় বৈজ্ঞানিক কলম্বস্ সমূহ নূতন নূতন অন্ধকারের মহাদেশ বাহির করিতেছেন। নিশাচরী কবিতার পক্ষে এমন সুখের সময় আর কি হইতে পারে! সে রহস্য-প্রিয় কিন্তু এত রহস্য কি আর কোন কালে ছিল! এখন একটা রহস্যের আবরণ খুলিতে গিয়া দশটা রহস্য বাহির হইয়া পড়িতেছে। বিধাতা রহস্য দিয়া রহস্য আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। একটা রহস্যের রক্তবীজকে হত্যা করিতে গিয়া তাহার লক্ষ লক্ষ রক্ত বিন্দুতে লক্ষ লক্ষ রক্তবীজ জন্মিতেছে। মহাদেব রহস্য রাক্ষসকে এইরূপ বর দিয়া রাখিয়াছেন, সে তাঁহার বরে অমর।

যেমন, এমন ঘোরতর অজ্ঞ কেহ কেহ আছে, যে, নিজের অজ্ঞতার বিষয়েও অজ্ঞ, তেমনি প্রাচীন অজ্ঞানের সময় আমরা রহস্যকে রহস্য বলিয়াই জানিতাম না। অজ্ঞানের একটা বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, সে রহস্যের একটা কল্পিত আকার আয়তন ইতিহাস ঠিকুজি কুষ্টি পর্য্যন্ত তৈরি করিয়া ফেলে, এবং তাহাই সত্য বলিয়া মনে করে। অর্থাৎ প্রাচীন কবিরা রহস্যের পৌত্তলিকতা সেবা করিতেন। এখনকার কবিরা জ্ঞানের অস্ত্রে তাহার আকার আয়তন ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাহাকে আরও রহস্য করিয়া তুলিতেছেন। এই নিমিত্ত প্রাচীন কালের অজ্ঞান অবস্থা কবিতার পক্ষে তেমন উপযোগী ছিল না। পৌরাণিক সৃষ্টি সমূহ দেখিলে আমাদের কথার প্রমাণ হইবে। বহুকাল চলিয়া আসিয়া এখন তাহা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, সুতরাং এখন তাহা কবিতা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কারণ এখন তাহাতে আমাদের মনে নানা ভাবের উদ্রেক করে। কিন্তু পাঠকেরা যদি ভাবিয়া দেখেন, যে, এখনকার কোন কবি যথার্থ সত্য মনে করিয়া যেরূপ করিয়া উষা বা সন্ধ্যার একটা গড়ন বাঁধিয়া দেন, সকল লোকেই যদি তাহাই অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া শিরোধার্য্য করিয়া লয়, তাহা হইলে কবিতার রাজ্য কি সঙ্কীর্ণ হইয়া আসে! কত লোকে সন্ধ্যা ও উষাকে কল্পনায় কত ভাবে কত আকারে দেখে, এক সময় একরকম দেখে, আর এক সময়ে আর এক রকমে দেখে, কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপ করিলে তাহাদের সকলেরই কল্পনার মধ্যে একটা বিশেষ ছাঁচ তৈরি করিয়া রাখা হয়; উষা ও সন্ধ্যা যখনি তাহার মধ্যে গিয়া পড়ে তখনি একটা বিশেষ আকার ধারণ করিয়া বাহির হয়।

যতই জ্ঞান বাড়িতেছে ততই কবিতার রাজ্য বাড়িতেছে। কবিতা যতই বাড়িতেছে কবিতার ততই শ্রম-বিভাগের আবশ্যক হইতেছে, ততই খণ্ডকাব্য গীতিকাব্যের সৃষ্টি হইতেছে।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি।

—:০—

নিজের প্রাণের মধ্যে, পরের প্রাণের মধ্যে ও প্রকৃতির প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিবার ক্ষমতাকেই বলে কবিত্ব। যাহারা প্রকৃতির বহির্দ্বারে বসিয়া কবি হইতে যায়, তাহারা কতকগুলা বড় বড় কথা, টানাবোনা তুলনা ও কাল্পনিক ভাব লইয়া ছন্দ নির্ম্মাণ করে। মর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য যে কল্পনা আবশ্যক করে, তাহাই কবির কল্পনা; আর গোঁজামিলন দিবার কল্পনা, না পড়িয়া পণ্ডিত হইবার, না অনুভব করিয়া কবি হইবার এক প্রকার গিল্‌টি করা কল্পনা আছে, তাহা জালিয়াতের কল্পনা। যিনি প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কবি হইয়াছেন, তিনি সহজ কথার কবি, সহজ ভাবের কবি। কারণ যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে তাহাকে দশকথা বলিতে হয়, আর যিনি সত্য বলেন, তাঁহাকে এক কথার বেশী বলিতে হয় না। তেমনি যিনি অনুভব করিয়া বলেন তিনি দুটি কথা বলেন, আর যে অনুভব না করিয়া বলে সে পাঁচ কথা বলে অথচ ভাব প্রকাশ করিতে পারে না। অতএব সহজ ভাষার, সহজ ভাবের, সহজ কবিতা লেখাই শক্ত, কারণ তাহাতে প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিতে হয়; সকলের প্রাণের মধ্যেই যে ব্যক্তি আতিথ্য পায়, ফুল বল, মেঘ বল, দুঃখী বল, সুখী বল, সকলের প্রাণের মধ্যেই যাহার আসন আছে, সেই তাহা পারে। আর বড় বড় কথায় মোটা মোটা ভাবের কবিতা লেখা সহজ, কারণ প্রাণের মধ্যে প্রবেশ না করিয়াও তাহা গরা যায়। বড় বড় কবির কবিতা অনেকের পক্ষে কুহেলিকাময়ী কেন? কারণ তাঁহারা যাহা অনুভব করিয়াছেন, অধিক বকিয়া যে তাহা সহজ করিতে হইবে, ইহা তাঁহাদের মনেও হয় না, এবং তাঁহারা যাহা অনুভব করিয়াছেন, তাহা সকলে অনুভব করে নাই; কাজেই সকলের কাছে তাঁহাদের সে সহজ কথা নিতান্ত শক্ত হইয়া পড়ে। সহজ কথা লিখিয়াছেন বলিয়াই শক্ত। সহজ কথার গুণ এই যে, তাহা যতটুকু বলে, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক বলে। সে সমস্তটা বলে না। পাঠকদিগকে কবি হইবার পথ দেখাইয়া দেয়, যে দিকে কল্পনা ছুটাইতে হইবে, সেই দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেয় মাত্র, আর অধিক কিছু করে না। নিজে যাহা আবিষ্কার করিয়াছে, পাঠকদিগকেও তাহাই আবিষ্কার করাইয়া দেয়। যাহাদের কল্পনা কম, যাহাদের চোখে আঙুল দিয়া দেখাইতে হয়, তাহারা এরূপ কবিতার পাঠক নহে।

আমাদের চণ্ডীদাস সহজ ভাষার সহজ ভাবের কবি, এই গুণে তিনি বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদের মধ্যে প্রধান কবি। তিনি যে সকল কবিতা লেখেন নাই, তাহরাই অল্প কবি। তিনি এক ছত্র লেখেন ও দশ ছত্র পাঠকদের দিয়া লিখাইয়া লন। দুই একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দিলেই আমাদের কথা পরিস্ফুট হইবে।

"এ ঘোর রজনী, মেঘের ঘটা,
কেমনে আইল বাটে?
আঙ্গিনার কোণে তিতিছে বঁধুয়া,
দেখিয়া পরাণ ফাটে।
সই কি আর বলিব তোরে,
বহু পুণ্য ফলে সে হেন বঁধুয়া,
আসিয়া মিলিল মোরে।
ঘরে গুরুজন ননদী দারুণ,
বিলম্বে বাহির হৈনু,

আহা মরি মরি, সঙ্কেত করিয়া
কত না যাতনা দিনু।
বঁধুর পিরীতি আরতি দেখিয়া
মোর মনে হেন করে,
কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া
আনল ভেজাই ঘরে!"

রাধা শ্যামকে প্রথম দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন,

"এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা
কেমনে আইল বাটে,
আঙ্গিনার কোণে তিতিছে বঁধুয়া
দেখিয়া পরাণ ফাটে।"

কিন্তু তাহার পরেই যে তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া সখীদের ডাকিয়া কহিলেন,

"সই, কি আর বলিব তোরে,
বহু পুণ্য ফলে সে হেন বঁধুয়া
আসিয়া মিলল মোরে!"

ইহার মধ্যে কতটা কথা রাধার মনের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে! কতটা কথা একেবারে বলাই হয় নাই! প্রথমেই শ্যামকে ভিজিতে দেখিয়া দুঃখ, তাহার পরেই সখীদের ডাকিয়া তাহাদের কাছে সুখের উচ্ছ্বাস ইহার মধ্যে শৃঙ্খলটি কোথায়? সে শৃঙ্খল পাঠকদিগকে গড়িয়া লইতে হয়। রাধা যা' কহিল তাহাত সামান্য, কিন্তু রাধা যা; কহিল না তাহা কতখানি! যাহা বলা হইল না পাঠকদিগকে তাহাই শুনিতে হইবে। শ্যামকে ভিজিতে দেখিয়া রাধার দুঃখ ও শ্যামকে ভিজিতে দেখিয়াই রাধার সুখ, উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব হইতেছে। রাধার হৃদয়ের এই তরঙ্গ-ভঙ্গ, এই উত্থানপতন, কত অল্প কথায় কত সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। প্রথম দুই ছত্রে শ্যামকে দেখিয়া দুঃখ, দ্বিতীয় দুই ছত্রে সুখ, তৃতীয় দুই ছত্রে আবার দুঃখ, চতুর্থ, দুই ছত্রে আবার সুখ। রাধা হাসিবে কি কাঁদিবে ভাবিয়া পাইতেছে না। রাধা সুখে দুঃখে আকুল হইয়া পড়িয়াছে। শেষে রাধা এই মীমাংসা করিল, শ্যাম আমার জন্য কত কষ্ট পাইয়াছে, আমি শ্যামের জন্য ততোধিক কষ্ট স্বীকার করিয়া শ্যামের সে ঋণ পরিশোধ করিব।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত।—

"সই, কেমনে ধরিব হিয়া?
আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায়!
আমার আঙ্গিনা দিয়া
সে বঁধু কালিয়া না চায় ফিরিয়া,
এমতি করিল কে?
আমার অন্তর যেমন করিছে
তেমনি হউক্ সে!
যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিনু
লোকে অপযশ কয়,
সেই গুণনিধি ছাড়িয়া পিরীতি
আর জানি কার হয়!
যুবতী হইয়া শ্যাম ভাঙ্গাইয়া
এমতি করিল কে?
আমার পরাণ যেমতি করিছে
সেমতি হউক্ সে!"

"আমার পরাণ যেমতি করিছে তেমতি হউক্ সে!" এই কথাটার মধ্যে কতটা কথা আছে! রাধা সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আর অভি-শাপ খুঁজিয়া পাইল না। শত সহস্র অভিশাপের পরিবর্ত্তে সে কেবল একটি কথা কহিল। সে কহিল, "আমার পরাণ যেমন করিছে, তেমনি হউক্ সে!" ইহাতেই বুঝিতে পারিয়াছি রাধার পরাণ কেমন করিতেছে! ঐ এক "যেমন করিছে" শব্দের মধ্যে নিদারুণ কষ্ট প্রচ্ছন্ন আছে, সে কষ্ট বর্ণনা না করিলে যতটা বর্ণিত হয়, এমন আর কিছুতে না! উপরি উক্ত পদটির মধ্যে রাধা দুইবার অভিশাপ দিতে গিয়াছে, কিন্তু উহার অপেক্ষা গুরুতর

অভিশাপ সে আর কোন মতে খুঁজিয়া পাইল না। ইহাতেই রাধার সমস্ত হৃদয় দেখিতে পাইলাম।

বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডীদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন, চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি, চণ্ডীদাস সহ্য করিবার কবি। চণ্ডীদাস সুখের মধ্যে দুঃখ ও দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার সুখের মধ্যেও ভয় এবং দুঃখের প্রতিও অনুরাগ। বিদ্যাপতি কেবল জানেন যে মিলনে সুখ ও বিরহে দুঃখ, কিন্তু চণ্ডীদাসের হৃদয় আরো গভীর, তিনি উহা অপেক্ষা আরো অধিক জানেন। তাঁহার প্রেম, "কিছু কিছু সুধা, বিষগুণা আধা," তাঁহার কাছে শ্যাম যে মুরলী বাজান, তাহাও "বিষামৃতে একত্র করিয়া।"

"কহে চণ্ডীদাস, "শুন বিনোদিনী,
সুখ দুখ দুটি ভাই,
সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি,
দুখ যায় তার ঠাঁই।"

চণ্ডীদাস শতবার করিয়া বলিতেছেন,

"যার যত জ্বালা তার ততই পিরীতি।"

"সদা জ্বালা যার, তবে সে তাহার মিলয়ে পিরীতিধন।" "অধিক জ্বালা যার তার অধিক পিরীতি।" ইত্যাদি। কিন্তু সেই চণ্ডীদাস আবার কহিয়াছেন,

"সই পিরীতি না জানে যারা,
এ তিন ভুবনে জনমে জনমে
কি সুখ জানয়ে তারা!"

পিরীতি নামক যে জ্বালা, পিরীতি নামক যে দুঃখ, এ দুঃখ যাহারা না জানিয়াছে, তাহারা পৃথিবীতে কি সুখ পাইয়াছে! যখন রাধা কহিলেন,

বিধি যদি শুনিত, মরণ হইত,
ঘুচিত সকল দুখ"।

তখন

"চণ্ডীদাস কয়, এমতি হইলে
পিরীতির কিবা সুখ!"

দুখই যদি ঘুচিল তবে আর সুখ কিসের? এত গম্ভীর কথা, বিদ্যাপতি কোথাও প্রকাশ করেন নাই! যখন মিলন হইল তখন বিদ্যাপতির রাধা কহিলেন,

"দারুণ ঋতুপতি যত দুখ দেল,
হরিমুখ হেরইতে সব দূর গেল।
যতহুঁ আছিল মঝু হৃদয়ক সাধ,
সো সব পূরল পিয়া পরসাদ।
রভস-আলিঙ্গনে পুলকিত ভেল,
অধরক পান বিরহ দূর গেল।
চিরদিনে বিহি আজু পূরল আশ,
হেরইতে নয়নে নাহি অবকাশ।
ভনহ বিদ্যাপতি আর নহ আধি,
সমুচিত ঔখদে না রহে বেয়াধি।"

চিকিৎসক চণ্ডীদাসের মতে বোধ করি ঔষধেও এ ব্যাধির উপশম হয় না, অথবা এ ব্যাধির সমুচিত ঔষধ নাই। কারণ চণ্ডীদাসের রাধা শ্যামে যখন মিলন হয় তখন "দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।" কিছুতেই তৃপ্তি নাই,

"নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দূর মানি!"

যখন কোন ভাবনা নাই, যখন শ্যামকে পাইয়াছেন, তখনো রাধার ভয় যায় না;—

এই ভয় উঠে মনে, এই ভয় উঠে,
না জানি কানুর প্রেম তিলে জনি ছুটে।
গড়ন ভাঙ্গিতে সই আছে কত খল,
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল।

যথা তথা যাই আমি যত দূর পাই,
চাঁদ মুখের মধুর হাসে তিলেকে জুড়াই।
সে হেন বঁধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়,
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়!
চণ্ডীদাস কহে, রাই, ভাবিছ অনেক,
তোমার পিরীতি বিনে সে জীয়ে তিলেক।"

রাধা আগেভাগে অভিশাপ দিয়া রাখে, রাধা শূন্যের সহিত ঝগড়া করিতে থাকে। এমনি তাহার ভয় যে, তাহার মনে হয় যেন সত্যই তাহার শ্যামকে কে লইল। একটা অলীক আশঙ্কা মাত্রও প্রাণ পাইয়া তাহার সম্মুখে জীবন্ত হইয়া দাঁড়ায়, কাজেই রাধা তাহার সহিত বিবাদ করে। সে বলে,

"সে হেন বঁধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়।"

যদিও তাহার বঁধুকে এখনো কেহ ভাঙ্গায় নি, কিন্তু তা বলিয়া সে সুস্থির হইতে পারিয়েছে কৈ?

যখন শ্যাম তাহার সম্মুখে রহিয়াছে, তখনো সে শ্যামকে কহিতেছে,—

"কি মোহিনী জান বঁধু, কি মোহিনী জান;
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন!
রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি,
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরীতি!
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর,
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর।
কোন্ বিধি সিরজিল সোতের সে ওলি,
এমন ব্যথিত নাই ডাকি বন্ধু বলি।
বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও,
মরিব তোমার আগে, দাঁড়াইয়া রও।

রাধার আর সোয়াস্তি নাই। শ্যাম সম্মুখে রহিয়াছেন, শ্যাম রাধার প্রতি কোন উপেক্ষা প্রকাশ করেন নাই, তবুও রাধা একটা "যদি"কে গড়িয়া তুলিয়া, একটা "যদি"-কে জীবন দিয়া কাঁদিয়া সারা হইল। কহিল—

"বঁধু, যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও,
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও।"

বঁধু নিদারুণ না হইতে হইতেই সে ভয়ে সশঙ্কিত। রাধার কি আর সুখ আছে?

এক দিন রাধা গৃহে গঞ্জনা খাইয়া শ্যামের কাছে আসিয়া কাঁদিয়া কহিতেছে,

"তোমারে বুঝাই বঁধু, তোমারে বুঝাই,
ডাকিয়া শুধায় মোরে হেন কেহ নাই।"

এত করিয়া বুঝাইবার আবশ্যক কি? শ্যাম কি বুঝেন না? কিন্তু তবু রাধার সর্ব্বদাই মনে হয়, "কি জানি!" মনে হয়, শ্যামও পাছে আমাকে ডাকিয়া শুধায়। যদিও শ্যামের সেরূপ ভাব দেখে নাই, তবুও ভয় হয়। তাই অত করিয়া আজ বুঝাইতে আসিয়াছে,—

"তোমারে বুঝাই বঁধু, তোমারে বুঝাই,
ডাকিয়া শুধায় মোরে হেন কেহ নাই।
অনুক্ষণ গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে,
নিচয় জানিও মুঞি ভখিমু গরলে।
এ ছার পরাণে আর কিবা আছে সুখ?
মোর আগে দাঁড়াও, তোমার দেখিব
চাঁদ মুখ।

খাইতে সোয়াস্তি নাই, নাহি টুটে ভুক,
কে মোর ব্যথিত আছে, কারে কব দুখ!

রাধার এই উক্তির মধ্যে কত কথাই অব্যক্ত আছে। যেখানে রাধা বলিতেছেন,

"অনুক্ষণ গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে,
নিচয় জানিও মুঞি ভখিমু গরলে।"

এ দুই ছত্রের অর্থ এই, "আমাকে গৃহে সকলে গঞ্জনা করে, অতএব—" সে অতএব কি, তাহা কি কাহাকেও বলিতে হইবে? সেই অতএব যদি পূর্ণ না হয় তবে রাধা বিষ

খাইবে। "কে মোর ব্যথিত আছে, কারে কব দুখ?" রাধা শ্যামের মুখ হইতে শুনিতে চায়, আমি তোমার ব্যথিত, আমি তোমার দুঃখ শুনিব। রাধা শ্যামকে কহিল না যে, তুমি আমার দুঃখে দুঃখ পাও, তুমি আমার ব্যথার ব্যথী হও, সে শুধু শ্যামের মুখ চাহিয়া কহিল, "কে মোর ব্যথিত আছে, কারে কব দুখ?"

চণ্ডীদাসের কথা এই যে, প্রেমে দুঃখ আছে বলিয়া প্রেম ত্যাগ করিবার নহে। প্রেমের যা' কিছু সুখ সমস্ত দুঃখের যন্ত্রে নিংড়াইয়া বাহির করিতে হয়।

"যেন মলয়জ ঘষিতে শীতল, অধিক সৌরভময়,
শ্যাম বঁধুয়ার পিরীতি ঐছন,
দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়!"

দুঃখের পাষাণে ঘর্ষণ করিয়া প্রেমের সৌরভ বাহির করিতে হয়। যতই ঘর্ষিত হইবে, ততই সৌরভ বাহির হইবে। চণ্ডীদাস কহেন প্রেম কঠোর সাধনা। কঠোর দুঃখের তপস্যায় প্রেমের স্বর্গীয় ভাব প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে।

"পিরীতি পিরীতি সব জন কহে,
পিরীতি সহজ কথা?
বিরিখের ফল নহেত পিরীতি,
নাহি মিলে যথা তথা।
পিরীতি অন্তরে পিরীতি মন্তরে
পিরীতি সাধিল যে,
পিরীতি রতন লভিল সে জন,
বড় ভাগ্যবান্ সে।
পিরীতি লাগিয়া আপনা ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে,
পরকে আপন করিতে পারিলে,
পিরীতি মিলয়ে তারে।
পিরীতি সাধন বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস,
দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও,
থাকিলে পিরীতি আশ।"

পরকে আপন করিতে হইলে যে সাধনা করিতে হয়, যে তপস্যা করিতে হয়, সে কি সাধারণ তপস্যা? যে তোমার অধীন নহে তোমার নিজেকে তাহার অধীন করা, যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তোমার নিজেকে তাহার কাছে পরতন্ত্র করা, যাহার সকল বিষয়ে স্বাধীন ইচ্ছা আছে, তোমার নিজের ইচ্ছাকে তাহার আজ্ঞাকারী করা; সে কি কঠোর সাধন!

যখন রাধিকা কহিলেন,

"পিরীতি, পিরীতি, কি রীতি মুরতি
হৃদয়ে লাগল সে,
পরাণ ছাড়িলে পিরীতি না ছাড়ে,
পিরীতি গড়ল কে?
পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
না জানি আছিল কোথা।
পিরীতি কণ্টক হিয়ায় ফুটল,
পরাণ পুতলী যথা।
পিরীতি পিরীতি পিরীতি অনল
দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল,
বিষম অনল নিবাইলে নহে
হিয়ায় রহল শেল!"

তখন চণ্ডীদাস কহিলেন,

"চণ্ডীদাস বাণী শুন বিনোদিনি,
পিরীতি না কহে কথা,
পিরীতি লাগিয়ে পরাণ ছাড়িলে
পিরীতি মিলয়ে তথা।"

বিদ্যাপতির ন্যায় কবিগণ যাঁহারা সুখের জন্য প্রেম চান, তাঁহারা প্রেমের জন্য এতটা কষ্ট সহ্য করিতে অক্ষম। কিন্তু চণ্ডীদাস জগতের চেয়ে প্রেমকে অধিক দেখেন,

"পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর,
এ তিন ভুবন সার।"

কিন্তু ইহা বলিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হইল না, দ্বিতীয় ছত্রে কহিলেন,

"এই যোথ মনে হয় রাতি দিনে
ইহা বই নাহি আর !"

প্রেমের আড়ালে জগৎ ঢাকা পড়ে। শুধু তাহাই নহে,—

পরাণ সমান পিরীতি রতন
জুকিনু হৃদয়তুলে
পিরীতি রতন অধিক হইল।
পরাণ উঠিল চুলে।

চণ্ডীদাস হৃদয়ের তুলা-দণ্ডে মাপিয়া দেখিলেন, প্রাণের অপেক্ষা প্রেম অধিক হইল। এইত জগৎপ্রাণী, প্রাণ হইতে গুরুতর প্রেম ইহা আবার নিতাই বাড়িতেছে, বাড়িবার স্থান নাই, তথাপি বাড়িতেছে,

"নিতই নূতন পিরীতি দু জন,
তিলে তিলে বাড়ি যায় ;
ঠাঞি নাহি পায়, তথাপি বাড়ায়,
পরিণামে নাহি থায়।"

ইহার আর পরিণাম নাই।

এত বড় প্রেমের ভাব চণ্ডীদাস ব্যতীত আর কোন্ প্রাচীন কবির কবিতায় পাওয়া যায় ? বিদ্যাপতির সমস্ত পদাবলীতে একটি মাত্র কবিতা আছে, চণ্ডীদাসের কবিতার সহিত যাহার তুলনা হইতে পারে। তাহা শতবার উদ্ধৃত হইয়াছে, আবার উদ্ধৃত করি।

সখিহে, কি পুছসি অনুভব মোয়।।
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়।
জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল,
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল।
কত মধু-যামিনী রভসে গোয়ায়নু,
না বুঝনু কৈছন কেল,
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।
যত যত রসিক জন রস অনুগমন,
অনুভব কহে, না পেখে,
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলিল একে।"

বিদ্যাপতির অনেক স্থলে ভাষার মাধুর্য্য, বর্ণনার সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু চণ্ডীদাসের নূতনত্ব আছে, ভাবের মহত্ত্ব আছে, আবেগের গভীরতা আছে। যে বিষয় তিনি লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি একেবারে মগ্ন হইয়া লিখিয়াছেন। তিনি নিজের রজকিনী প্রণয়িনী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করি,—

শুন রজকিনী রামি,
ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া
শরণ লইনু আমি।
তুমি বেদ-বাদিনী, হরের ঘরণী,
তুমি সে নয়নের তারা,
তোমার ভজনে ত্রিসন্ধ্যা যাজনে,
তুমি সে গলার হার।
রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ
কামগন্ধ নাহি তায়,
রজকিনী-প্রেম নিকষিত হেম
বড়ু চণ্ডীদাসে গায়।

চণ্ডীদাসের প্রেম কি বিশুদ্ধ প্রেম ছিল ! তিনি প্রেম ও উপভোগ উভয়কে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে পারিয়াছেন। তাই তিনি প্রণয়িনীর রূপ সম্বন্ধে কহিয়াছেন "কামগন্ধ নাহি তায়।"

আর এক স্থলে চণ্ডীদাস কহিয়াছেন,

"রজনী দিবসে হব পরবশে,
স্বপনে রাখিব লেহা,

একত্র থাকিব নাহি পরশিব
ভাবিনী ভাবের দেহা।"

দিবস রজনী পরবশে থাকিব, অথচ প্রেমকে স্বপ্নের মধ্যে রাখিয়া দিব। একত্র থাকিব অথচ তাহার দেহ স্পর্শ করিব না।—অর্থাৎ এ প্রেম বাহ্য জগতের দর্শন-স্পর্শনের প্রেম নহে, ইহা স্বপনের ধন, স্বপ্নের মধ্যে আবৃত থাকে, জাগ্রৎ জগতের সহিত ইহার সম্পর্ক নাই। ইহা শুদ্ধ মাত্র প্রেম, আর কিছুই নহে। যে কালে চণ্ডীদাস ইহা লিখিয়াছিলেন, ইহা সে কালের কথা নয়।

কঠোর ব্রত সাধনা স্বরূপে প্রেম সাধনা করা চণ্ডীদাসের ভাব, সে ভাব তাঁহার সময়-কার লোকের মনোভাব নহে, সে ভাব এখন-কার সময়ের ভাবও নহে, সে ভাবের কাল ভবিষ্যতে আসিবে। যখন প্রেমের জগৎ হইবে, যখন প্রেমের বিতরণ করাই জীবনের একমাত্র ব্রত হইবে; পূর্ব্বে যেমন যে যত বলিষ্ঠ ছিল সে ততই গণ্য হইত, তেমনি এমন সময় যখন আসিবে, যখন যে যত প্রেমিক হইবে সে ততই আদর্শস্থল হইবে, যাহার হৃদয়ে অধিক স্থান থাকিবে, যে যত অধিক লোককে হৃদয়ে প্রেমের প্রজা করিয়া রাখিতে পারিবে সে ততই ধনী বলিয়া খ্যাত হইবে, যখন হৃদয়ের দ্বার দিবারাত্রি উদ্‌ঘাটিত থাকিবে ও কোন অতিথি রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিয়া বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া না যাইবে, তখন কবিরা গাইবেন,

পিরীতি নগরে বসতি করিব,
পিরীতে বাঁধিব ঘর,
পিরীতি দেখিয়া পড়শি করিব,
তা' বিনু সকলি পর।

বসন্তরায়।

—•:•:•—

কেহ কেহ অনুমান করেন, বসন্তরায় আর বিদ্যাপতি একই ব্যক্তি। এই মতের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণ কিছু আছে কি না জানি না, কিন্তু উভয়ের লেখা পড়িয়া দেখিলে উভয়কে স্বতন্ত্র কবি বলিয়া আর সংশয় থাকে না। প্রথমতঃ, উভয়ের ভাষায় অনেক তফাৎ। বিদ্যা-পতির লেখায়—ব্রজভাষায় বাঙ্গালা মেশান, আর রায়বসন্তের লেখায়—বাঙ্গালায় ব্রজভাষা মেশান। ভাবে বোধ হয় যেন ব্রজভাষা আমা-দের প্রাচীন কবিদের, কবিতার আফিসের বস্ত্র ছিল। শ্যামের বিষয় বর্ণনা করিতে হইলেই অমনি সে আটপৌরে ধুতি চাদর ছাড়িয়া বৃন্দাবনী চাপকানে বত্রিশটা বোতাম আঁটিত ও বৃন্দাবনী শাম্‌লা মাথায় চড়াইয়া একটা বোঝা বহিয়া বেড়াইত। রায় বসন্ত প্রায় ইহা বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। তিনি খানিক-ক্ষণ বৃন্দাবনী পোষাক পরিয়াই অমনি—"দূর কর" বলিয়া ফেলিতেন। বসন্তরায়ের কবিতার ভাষাও যেমন, কবিতার ভাবও তেমন। সাদাসিধা; উপমার ঘনঘটা নাই; সরল প্রাণের সরল কথা; সে কথা বিদেশী ভাষায় প্রকাশ করিতে যাওয়াই মিথ্যা। কারণ, সরল প্রাণ বিদেশী ভাষায় কথা কহিতে পারেই না; তাহার ছোট ছোট সুকুমার কথাগুলি, তাহার সুখ, স্পর্শ কাতর ভাবগুলি বিদেশী ভাষার গোলেমালে একেবারে ভুল করিয়া যায়, বিদেশী ভাষার জটিলতার মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলে। তখন আমরা তাহাই শুনিতে

পাই, উপমাই শুনিতে পাই, সে সুকুমার ভাব-গুলির প্রাণ ছোঁয়া কথা আর শুনিতে পাই না। এমন মানুষত সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের দেখিলে মনে হয়, মনুষটা পোষাক পরে নাই, পোষাকটাই মানুষ পরিয়া বসিয়াছে। পোষাককে এমনি সে সমীহ করিয়া চলে যে, তাহাকে দেখিলে মনে হয়, আপনাকে সে পোষাক ঝুলাইয়া রাখিবার আল্না মাত্র মনে করে, পোষাকের দামেই তাহার দাম! আমার ত বোধ হয়, অনেক স্ত্রীলোকের অলঙ্কার ঘোমটার চেয়ে অধিক কাজ করে, তাহার হীরার সিঁথিটার দিকে লোকে এতক্ষণ চাহিয়া থাকে যে তাহার মুখ দেখিবার আর অবসর থাকে না। কবিতারও সেই দশা আমরা প্রায় মাঝে মাঝে দেখিতে পাই। বিদ্যাপতির সহিত চণ্ডীদাসের তুলনা করিলেই টের পাওয়া যাইবে যে, বিদ্যাপতির অপেক্ষা চণ্ডীদাস কত সহজে সরল ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। আবার বিদ্যাপতির সহিত বসন্ত-রায়ের তুলনা করিলেও দেখা যায়, বিদ্যাপতির অপেক্ষা বসন্তরায়ের ভাষা ও ভাব কত সরল! বসন্তরায়ের কবিতায় প্রায় কোন খানেই টানা-বোনা তুলনা নাই, তাহার মধ্যে কেবল সহজ কথার যাদুগিরি আছে। যাদুগিরি নহেত কি? কিছুই বুঝিতে পারি না, এ গান শুনিয়া প্রাণের মধ্যে কেন এমন মোহ উপস্থিত হইল—কথা গুলিও ত খুব পরিষ্কার, ভাব গুলি ও ত খুব সোজা, তবে উহার মধ্যে এমন কি আছে, যাহাতে, আমার প্রাণে একটা আনন্দ, একটা সৌন্দর্য আনিয়া দেয়? এইখানে দুই একটি উদাহরণ দেওয়া যাক্। প্রথমে বিদ্যাপতির রাধা, শ্যামের রূপ কিরূপে বর্ণনা করিতেছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিই,—

এ সখি কি দেখনু এক অপরূপ,
শুনাইতে মানবি স্বপন স্বরূপ।
কমল যুগল পর চাঁদকি মাল,
তা পর উপজল তরুণ তমাল।
তা পর বেড়ল বিজুরী লতা,
কালিন্দী তীর ধীর চলি যাতা।
শাখা-শিখর সুধাকর পাঁতি,
তাহে নব পল্লব অরুণক ভাতি।
বিমল বিম্বফল যুগল বিকাশ,
তা পর কির থির করু বাস।
তা পর চঞ্চল খঞ্জন যোড়,
তা পর সাপিনী ঝাপল মোড়।

আর বসন্তরায়ের রাধা শ্যামকে দেখিয়া কি বলিতেছেন?

সজনি, কি হেরনু ও মুখ শোভা!
অতুল কমল সৌরভ শীতল,
অরুণ নয়ন অলি আভা।
প্রফুল্লিত ইন্দীবর বর সুন্দর
মুকুর-কান্তি মনোৎসাহা।
রূপ বরণিব কত ভাবিতে থকিত চিত,
কিয়ে নিরমল শশি-শোহা।
বরিহা বকুল ফুল অলিকুল আকুল
চূড়া হেরি জুড়ায় পরাণ!
অধর বান্ধুলী ফুল শ্রুতি মণি কুণ্ডল
প্রিয় অবতংস বনান।
হাসখানি তাহে ভায়, অপাঙ্গ ইঙ্গিতে চায়,
বিদগধ মোহন রায়!
মুরলীতে কিবা গায় শুনি আন নাহি ভায়
জাতি কুলশীল দিনু তায়।
না দেখিলে প্রাণ কাঁদে দেখিলে না হিয়া বাঁধে,
অনুখণ মদন-তরঙ্গ।
হেরইতে চাঁদ মুখ মরমে পরম সুখ,
সুন্দর শ্যামের অঙ্গ।
চরণে নূপুর মণি সুমধুর ধ্বনি শুনি
ধরণীক ধৈরজ ভঙ্গ।

ও রূপ সাগরে রস— হিলোলে নয়ন মন
আটকল রায় বসন্ত ॥

বিদ্যাপতি হইতে উদ্ধৃত কবিতাটি পড়িয়াই বুঝা যায়, এই কবিতাটি রচনা করিবার সময় কবির হৃদয়ে ভাবের আবেশ উপস্থিত হয় নাই। কতকগুলি টানাবোনা বর্ণনা করিয়া গোটাকতক ছত্র মিলাইয়া দিয়াছেন। আমার বোধ হয় যেন, বিদ্যাপতি কৃষ্ণ হইয়া রাধার রূপ উপভোগ করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু রাধা হইয়া কৃষ্ণের রূপ উপভোগ করিতে পারেন নাই। বিদ্যাপতির যে কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়াছি, উহা ব্যতীত প্রাচীন কাব্য সংগ্রহে বিদ্যাপতি-রচিত আর একটি মাত্র কৃষ্ণের রূপবর্ণনা আছে, তাহাও অতি যৎ-সামান্য। বসন্তরায়ের কৃষ্ণের বর্ণনা পড়িয়া দেখ। কবি এমনি ভাবে মুগ্ধ হইয়া গাহিয়া উঠিয়াছেন যে, প্রথম ছত্র পড়িয়াই আমাদের প্রাণের তার বাজিয়া ওঠে। "সজনি, কি হেরিনু ও মুখ শোভা!" শ্যামকে দেখিবামাত্রই যে বন্যার মত এক সৌন্দর্য্যের স্রোত রাধার মনে আসিয়া পড়িয়াছে; রাধার হৃদয়ে সহসা যেন একটা সৌন্দর্য্যের আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—একেবারে সহসা অভিভূত হইয়া রাধা বলিয়া উঠিয়াছে—"সজনি কি হেরনু ও মুখ শোভা!" আমরা রাধার সেই সহসা উচ্ছ্বসিত ভাব প্রথম ছত্রেই অনুভব করিতে পারিলাম। শ্যামকে দেখিবামাত্রই তাঁহার প্রথম মনের ভাব মোহ। প্রথম ছত্রে তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। ইহার সমস্তটা আপ্লুত করিয়া একটা সৌন্দর্য্যের ভাব মাত্র বিরাজ করিতেছে। রাধা মাঝে মাঝে রূপ বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু মনঃপূত না হওয়ায় ছাড়িয়া দিয়াছেন, বলিয়াছেন—"রূপ বরণিব কত কহিতে থকিত চিত।" তাহার রূপ কেমন তাহা আমি কি জানি, তাহার রূপ দেখিয়া আমার চিত্ত কেমন হইল, তাহাই আমি জানি। রাধা মাঝে মাঝে বর্ণনা করিতে যায়, অমনি বুঝিতে পারে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বর্ণনা করিলে খুব অল্পই বলা হয়, আমি যে কি আনন্দ পাইতেছি, সেটা তাহাতে কিছুই ব্যক্ত হয় না। শ্যামের রূপের আকৃতিত সজনিরা সকলেই দেখিতে পাইতেছে, কিন্তু রাধা যে সেই রূপের মধ্যে আরো অনেকটা দেখিতে পাইয়াছে, যাহা দেখিয়া তাহার মনে কথার অতীত কথা সকল জাগিয়া উঠিয়াছে সেই অধিক দেখাটা ব্যক্ত করিবে কিরূপে? সে কি তিল তিল বর্ণনা করিয়া? বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিয়া হতাশ হইয়া বর্ণনা বন্ধ করিয়া কেবল ভাব গুলি মাত্র ব্যক্ত করিতে হয়। হাসি বর্ণনা করিতে গিয়া "হাসি খানি" বলিতে হয়, রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া মুরলির গান মনে পড়ে। শ্যামের ভাব—রূপেতে হাসিতে গানেতে জড়িত একটি ভাব, পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমষ্টিগত একটি ভাব নহে! রাধা যেব লিয়াছেন, "হেরইতে চাঁদমুখ মরমে পরম সুখ" ঐ কথাটাই সত্য, নহিলে "ভুরু বঁকা" বা "চোখ টানা" বা "নাক সোজা" ও সব কথা কোন কাজের কথাই নয়।

বিদ্যাপতি রচিত রূপবর্ণনার সহিত বসন্ত-রায়-রচিত রূপবর্ণনার একটি বিশেষ প্রভেদ আছে। বিদ্যাপতি রূপকে একরূপ চক্ষে দেখিতেছেন, আর বসন্ত রায় তাহাকে আর এক চক্ষে দেখিতেছেন। বিদ্যাপতি কহিতে-ছেন, রূপ উপভোগ্য বলিয়া সুন্দর; আর বসন্তরায় কহিতেছেন, রূপসুন্দর বলিয়া উপভোগ্য। ইহা সত্য বটে, সৌন্দর্য্য ও ভোগ একত্রে থাকে, কিন্তু ইহাও সত্য উভয়ে এক নহে। বসন্তরায় তাঁহার রূপবর্ণ-

নায় যাহা কিছু সুন্দর তাহাই দেখাইয়াছেন, আর বিদ্যাপতি তাঁহার রূপ-বর্ণনায় যাহা কিছু ভোগ্য তাহাই দেখাইয়াছেন। উদাহরণ দেওয়া যাক্। বিদ্যাপতির—যেখান হইতে খুসী—একটি রূপ-বর্ণনা বাহির করা যাক্—

গেলি কামিনী গজবর গামিনী,
বিহসি পালটি নেহারি।
ইন্দ্রজালক কুসুমসায়ক
কুহকী ভেল বর-নারী।
জোরি ভুজ যুগ মোর বেড়ল
ততহি বয়ান সুছন্দ।
দাম-চম্পকে কাম পূজল
যৈছে শারদ চন্দ॥
উরহি অঞ্চল ঝাপি চঞ্চল,
আধ পয়োধর হেরু।
পবন পরভাবে শরদ ঘন জনু
বেকত কয়ল সুমেরু॥
পুনহি দরশনে জীবন জুড়ায়ব,
টুটব বিরহ কওর।
চরণ যাবক হৃদয় পাবক
দহই সব অঙ্গ মোর॥

এমন, একটা কেন, এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। আবার রায়বসন্ত হইতে দুই একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাক্।

সই লো কি মোহন রূপ সুঠাম,
হেরইতে মানিনী তেজই মান॥
উজর নীলমণি মরকত ছবি জিনি
দলিতাঞ্জন হেন ভাল।
জিনিয়া যমুনার জল নিরমল চলচল
নবঘন নবীন রসাল॥
কিয়ে নবনীল নলিনী, কিয়ে উতপল
জলধর নহত সমান।
কমনীয়া কিশোর কুসুম অতি সুকোমল
কেবল রস নিরমাণ॥
অমল শশধর জিনি মুখ সুন্দর
সুরঙ্গ অধর পরকাশ,
ঈষৎ মধুর হাস সরসহি সম্ভাষ,
রায় বসন্ত পহু রঙ্গিণী বিলাস॥

ইহাতে কেবল ফুল, কেবল মধুর হাসি ও সরস সম্ভাষণ আছে, কেবল সৌন্দর্য্য আছে। এক শ্যামের সৌন্দর্য্য দেখিয়া জগতের সৌন্দর্য্যের রাজ্য উদ্ঘাটিত হইতে চাহে। যমুনার নিরমল চলচল ভাব ফুটিয়া উঠে, একে একে একেকটি ফুল শ্যামের মুখের কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, (কারণ সৌন্দর্য্য সৌন্দর্য্যকে কাছে ডাকিয়া আনে) ফুলের যাহা প্রাণের ভাব সে তাহা উন্মুক্ত করিয়া দেয়। বসন্তরায় এ সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ নেত্রে দেখিয়াছেন, লালসা তৃষিত নেত্রে দেখেন নাই! এমন, একটি কেন—রায় বসন্ত হইতে তাঁহার সমুদয় রূপবর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যায়—দেখান যায় যে, যাহা তাঁহার সুন্দর লাগিয়াছে, তাহাই তিনি বর্ণনা করিয়াছেন রূপ-বর্ণনা ত্যাগ করা যাক্—সম্ভোগ-বর্ণনা দেখা যাক্। বিদ্যাপতি কেবল সম্ভোগ মাত্রই বর্ণনা করিয়াছেন, বসন্তরায় সম্ভোগের মাধুর্য্যটুকু, সম্ভোগের কবিত্ব-টুকুমাত্র বর্ণনা করিয়াছেন। বিদ্যাপতিরচিত "বিগলিত চিকুর মিলিত মুখমণ্ডল" ইত্যাদি পদটির সহিত পাঠকেরা বসন্তরায়-রচিত নিম্ন লিখিত পদটির তুলনা করুন।

বড় অপরূপ দেখিনু সজনি
নয়লি কুঞ্জের মাঝে,
ইন্দ্রনীল মণি কেতকে জড়িত
হিয়ার উপরে সাজে॥
কুসুম শয়ানে মিলিত নয়ানে
উলসিত অরবিন্দ,
শ্যাম-সোহাগিনী কোরে ঘুমায়লি
চাঁদের উপরে চন্দ॥

কুঞ্জ কুসুমিত সুধাকরে রঞ্জিত,
তাহে পিককুল গান,
মরমে মদন বাণ দুঁহে অগেয়ান,
কি বিধি কৈল নিরমাণ ॥
মন্দ মলয়জ পবন বহে মৃদু
ও সুখ কো করু অন্ত।
সরবস-ধন দোঁহার দুঁহু জন,
কহয়ে রায় বসন্ত ॥

মৃদু বাতাস বহিতেছে, কুঞ্জে জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে, চাঁদনী রাত্রে কোকিল ডাকিতেছে, এবং সেই কুঞ্জে, সেই বাতাসে, সেই জ্যোৎস্নায় সেই কোকিলের কুহুরবে, কুসুম শয়ানে মুদিত নয়ানে, দুটি উলসিত অলসিত অরবিন্দের মত শ্যামের কোলে রাধা— চাঁদের উপর চাঁদ ঘুমাইয়া আছে। কি মধুর! কি সুন্দর! এত সৌন্দর্য্য স্তরে স্তরে একত্রে গাঁথা হইয়াছে—সৌন্দর্য্যের পাপ্‌ড়ির উপরে পাপ্‌ড়ি বিন্যাস হইয়াছে, যে সবসুদ্ধ লইয়া একটি সৌন্দর্য্যের ফুল, একটি সৌন্দর্য্যের শতদল ফুটিয়া উঠিয়াছে। "ও সুখ কো করু অন্ত" এমন মিলন কোথায় হইয়া থাকে!

বসন্তরায়ের কবিতায় আর একটি মোহমন্ত্র আছে, যাহা বিদ্যাপতির কবিতায় সচরাচর দেখা যায় না। বসন্তরায় প্রায় মাঝে মাঝে বস্তুগত বর্ণনা দূর করিয়া দিয়া এক কথায় এমন একটি ভাবের আকাশ খুলিয়া দেন, যে, আমাদের কল্পনা পাখা ছড়াইয়া উড়িয়া যায়, মেঘের মধ্যে হারাইয়া যায়! এক স্থলে আছে— "রায় বসন্ত কহে ওরূপ পিরীতিময়।" রূপকে পিরীতিময় বলিলে যাহা বলা হয়, আর কিছুতে তাহার অপেক্ষা অধিক বলা যায় না। যেখানে বসন্তরায় শ্যামের রূপকে বলিতেছেন।—

কমনীয়া কিশোর কুসুম অতি সুকোমল
কেবল রস নিরমাণ।"

সেখানে কবি এমন একটি ভাব আনিয়াছেন, যাহা ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না। সেই ধরা-ছোঁয়া দেয় না—এমন একটি ভাবকে ধরিবার জন্য কবি যেন আকুল ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। "কমনীয়" "কিশোর" "সুকোমল" প্রভৃতি কত কথাই ব্যবহার করিলেন, কিছুতেই কুলাইয়া উঠিল না—অবশেষে সহসা বলিয়া ফেলিলেন "কেবল রস নিরমাণ!" কেবল তাহা রসেই নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার আর আকার প্রকার নাই!

শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন;—

"আলো ধনি, সুন্দরি, কি আর বলিব?
তোমা না দেখিয়া আমি কেমনে রহিব?
তোমার মিলন মোর পুণ্য-পুঞ্জ-রাশি,
মরমে লাগিছে মধুর মৃদু হাসি!
আনন্দ মন্দির তুমি, জ্ঞান,শকতি,
বাঞ্ছাকল্পলতা মোর কামনা মূরতি।
সঙ্গের সঙ্গিনী তুমি সুখময় ঠাম।
পাসরিব কেমনে জীবনে রাধা নাম॥
গলে বনমালা তুমি, মোর কলেবর।
রায় বসন্ত কহে প্রাণের গুরুতর॥"

এমন প্রশান্ত উদার গম্ভীর প্রেম বিদ্যাপতির কোন পদে প্রকাশ পাইয়াছে কিনা সন্দেহ। ইহার প্রত্যেকটি সম্বোধন চমৎকার। রাধাকে যে কৃষ্ণ বলিতেছেন—তুমি আমার কামনার মূর্ত্তি, আমার মূর্ত্তিমতী কামনা—অর্থাৎ তুমি আমার মনের একটি বাসনা মাত্র, রাধারূপে প্রকাশ পাইতেছে, ইহা কি সুন্দর! তুমি আমার গলে বনমালা, তোমাকে পরিলে আমার শরীর তৃপ্তি হয়;—না—তুমি তাহারো অধিক, তুমি আমার শরীর, আমাতে তোমাতে প্রভেদ আর নাই;—না, শরীর না, তুমি

শরীরের চেয়েও অধিক, তুমি আমার প্রাণ, সর্ব্ব শরীরকে ব্যাপ্ত করিয়া যাহা রহিয়াছে, যাহারি আবির্ভাবে শরীর বাঁচিয়া আছে, শরীরে চৈতন্য আছে, তুমি সেই প্রাণ ;—রায় বসন্ত কহিলেন, না, তুমি তাহারো অধিক, তুমি প্রাণেরো গুরুতর, তুমি বুঝি প্রাণকে প্রাণ দিয়াছ, তুমি আছ বলিয়াই বুঝি প্রাণ আছে! ঐ যে বলা হইয়াছে "মরমে লাগিছে মধুর মৃদু হাসি!" ইহাতে হাসির মাধুর্য্য কি সুন্দর প্রকাশ পাইতেছে। বসন্তের বাতাসটি গায়ে যেমন করিয়া লাগে, সুদূর বাঁশীর ধ্বনি কাণের কাছে যেমন করিয়া মরিয়া যায়, পদ্ম মৃণাল কাঁপিয়া সরোবরে একটু খানি তরঙ্গ উঠিলে তাহা যেমন করিয়া তীরের কাছে আসিয়া মিলাইয়া যায়, তেমনি একটুখানি হাসি—অতি মধুর অতি মৃদু একটি হাসি মরমে আসিয়া লাগিতেছে; বাতাসটি গায়ে লাগিলে যেমন ধীরে ধীরে চোখ বুজিয়া আসে, তেমনিতর বোধ হইতেছে। হাসি কি কেবল দেখাই যায়? হাসি ফুলের গন্ধটির মত প্রাণের মধ্যে আসিয়া লাগে।

রাধা বলিতেছেন—

প্রাণনাথ, কেমন করিব আমি?
তোমা বিনে মন করে উচাটন
কে জানে কেমন তুমি!
না দেখি নয়ন ঝরে অনুক্ষণ,
দেখিতে তোমায় দেখি।
সোঙরণে মন, মুরছিত হেন
মুদিয়া রহিয়ে আঁখি॥
শ্রবণে শুনিয়ে তোমার চরিত,
আন না ভাবিয়ে মনে।
নিমেষের আধ পাশরিতে নারি
ঘুমালে দেখি স্বপনে।
জাগিলে চেতন হারাই যে আমি
তোমা নাম করি কাঁদি।
পরবোধ দেই এ রায় বসন্ত
তিলেক থির নাহি বাঁধি॥

ইহার প্রথম দুটি ছত্রে, ভাবের অধীরতা, ভাষার বাঁধ ভাঙ্গিবার জন্য ভাবের আবেগ কি চমৎকার প্রকাশ পাইতেছে! "প্রাণনাথ কেমন করিব আমি!" ইহাতে কতখানি আকুলতা প্রকাশ পাইতেছে! আমার প্রাণ তোমাকে লইয়া কি যে করিতে চায় কিছু বুঝিতে পারি না। এত দেখিলাম এত পাইলাম, তবুও প্রাণ আজও বলিতেছে "প্রাণনাথ কেমন করিব আমি!" বিদ্যাপতি বলিয়াছেন,

"লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু,
তবু হিয়ে জুড়ন না গেল!"

বিদ্যাপতি সমস্ত কবিতাটিতে যাহা বলিয়াছেন ইহার এক কথায় তাহার সমস্তটা বলা হইয়াছে এবং তাহা অপেক্ষা শতগুণ অধীরতা ইহাতে ব্যক্ত হইতেছে। "প্রাণনাথ কেমন করিব আমি!" দ্বিতীয় ছত্রে রাধা শ্যামের মুখের দিকে আকুল নেত্রে চাহিয়া কহিতেছেন "কে জানে কেমন তুমি!" যাহার একতিল ঊর্দ্ধে উঠিলেই ভাষা মরিয়া যায়, সেই ভাষার শেষ সীমায় দাঁড়াইয়া রাধা বলিতেছেন "কে জানে কেমন তুমি!"

আর এক স্থলে রাধা বলিতেছেন—

ওহে নাথ, কিছুই না জানি,
তোমাতে মগন মন দিবস রজনী।
জাগিতে ঘুমিতে চিতে তোমাকেই দেখি,
পরাণ পুতলী তুমি জীবনের সখি!
অঙ্গ আভরণ তুমি শ্রবণ রঞ্জন,
বদনে বচন তুমি নয়নে অঞ্জন!
নিমিখে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি,
রায় বসন্ত কহে পহু প্রেমরাশি!"

• ঠিক কথা বটে,—নিমিখে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি! যতই সময় পাওয়া যায় ততই কাজ করা যায়। আমাদের হাতে"শতেক যুগ" নাই বলিয়া আমাদের অনেক কাজ অসম্পূর্ণ থাকে। শতেক যুগ পাইলে আমরা অনেক কাজ সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারি। কিন্তু প্রেমের সময় গণনা যুগ যুগান্তর লইয়া নহে। প্রেম নিমিখ লইয়া বাঁচিয়া থাকে, এই নিমিত্ত প্রেমের সর্ব্বদাই ভয়, পাছে নিমিখ হারাইয়া যায়। এক নিমিখেমাত্র আমি যে একটি চাহনি দেখিয়াছিলাম, তাহাই হৃদয়ের মধ্যে লালন করিয়া আমি শতেক যুগ বাঁচিয়া থাকিতে পারি; আবার হয়ত আমি শতেক যুগ অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছি, কখন আমার একটি নিমেষ আসিবে একটি মাত্র চাহনি দেখিব। দৈবাৎ সেই একটি মুহূর্ত্ত হারাইলে আমার অতীত কালের শতেক যুগ ব্যর্থ হইল, আমার ভবিষ্যৎ কালের শতেক যুগ হয়ত নিস্ফল হইবে। প্রতিভার স্ফূর্ত্তির ন্যায় প্রেমের স্ফূর্ত্তিও একটি মাহেন্দ্র ক্ষণ একটি শুভ মুহূর্ত্তের উপরে নির্ভর করে। হয়ত শতেক যুগ আমি তোমাকে দেখিয়া আসিতেছি, তবুও তোমাকে ভাল বাসিবার কথা আমার মনেও আসে নাই —কিন্তু দৈবাৎ একটি নিমিখ আসিল, তখন না জানি কোন্ গ্রহ কোন্ কক্ষে ছিল—দুই জনে চোখোচোখি হইল, ভাল বসিলাম। সেই এক নিমিখ হয়ত গঙ্গার তীরের মত অতীত শত যুগের পাড় ভাঙ্গিয়া দিল ও ভবিষ্যৎ শত যুগের পাড় গড়িয়া দিল। এই নিমিত্তই রাধা যখন ভাগ্যক্রমে প্রেমের শুভ-মুহূর্ত্ত পাইয়াছেন, তখন তাঁহার প্রতিক্ষণে ভয় হয় পাছে এক নিমিখ হারাইয়া যায়, পাছে সেই এক নিমিখ হারাইয়া গেলে শতেক যুগ হারাইয়া যায়। পাছে শতেক যুগের সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়া সেই নিমিখের হারাণ রত্নটুকু আর খুঁজিয়া না পাওয়া যায়। সেই জন্য তিনি বলিয়াছেন "নিমিখে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি।"

এমন যতই উদাহরণ উদ্ধৃত হইবে, ততই প্রমাণ হইবে যে, বিদ্যাপতি ও বসন্তরায় এক কবি নহেন, এমন কি, এক শ্রেণীর কবিও নহেন।

বাউলের গান।

সঙ্গীত সংগ্রহ। বাউলের গাথা। *

এমন কোন কোন কবির কথা শুনা গিয়াছে, যাঁহারা জীবনের প্রারম্ভ ভাগে পরের অনুকরণ করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন—অনেক কবিতা লিখিয়াছেন, অনেক ভাল ভাল কবিতা লিখিয়াছেন, কিন্তু সে গুলি শুনিলে মনে হয় যেন, তাহা কোন একটি বাঁধা রাগিণীর গান, মিষ্ট লাগিতেছে, কিন্তু নূতন ঠেকিতেছে না। অবশেষে এইরূপ লিখিতে লিখিতে চারিদিক হাতড়াইতে হাতড়াইতে সহসা নিজের যেখানে মর্ম্মস্থান, সেই খানটি আবিষ্কার করিয়া ফেলেন। আর তাঁহার বিনাশ নাই। এবার তিনি যে গান গাহিলেন, তাহা শুনিয়াই আমরা কহিলাম, বাঃ, একি শুনিলাম! এ কে গাহিল! এ কি রাগিণী! এত দিন তিনি পরের বাঁশী ধার করিয়া নিজের গান গাহিতেন, তাহাতে তাঁহার প্রাণের সকল সুর কুলাইত না। তিনি ভাবিয়া পাইতেন না—যাহা বাজাইতে চাহি তাহা বাজে না কেন! সেটা যে বাঁশির দোষ। ব্যাকুল হইয়া চারিদিকে খুঁজিতে খুঁজিতে সহসা দেখিলেন তাঁহার

প্রাণের মধ্যেই একটা বাদ্য আছে। বাজাইতে গিয়া উল্লাসে নাচিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "এ কি হইল। আমার গান পরের গানের মত শোনায় না কেন? এত দিন পরে আমার প্রাণের সকল সুরগুলি বাজিয়া উঠিল কি করিয়া? আমি যে কথা বলিব মনে করি সেই কথাই মুখ দিয়া বাহির হইতেছে!" যে ব্যক্তি নিজের ভাসা আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে, যে ব্যক্তি নিজের ভাষায় নিজে কথা কহিতে শিখিয়াছে, তাহার আনন্দের সীমা নাই। সে কথা কহিয়া কি সুখীই হয়! তাহার এক একটি কথা তাহার এক একটি জীবিত সন্তান। ঘরের কাছে একটি উদাহরণ আছে। বঙ্কিম বাবু যখন দুর্গেশনন্দিনী লেখেন, তখন তিনি যথার্থ নিজেকে আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। লেখা ভাল হইয়াছে, কিন্তু উক্ত গ্রন্থে সর্ব্বত্র তিনি তাঁহার নিজের সুর ভাল করিয়া লাগাইতে পারেন নাই। কেহ যদি প্রমাণ করে যে, কোন একটি ক্ষমতাশালী লেখক অন্য একটি উপন্যাস অনুবাদ বা রূপান্তরিত করিয়া দুর্গেশনন্দিনী রচনা করিয়াছেন, তবে তাহা শুনিয়া আমরা নিতান্ত আশ্চর্য্য হই না। কিন্তু কেহ যদি বলে, বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর বা বঙ্কিম বাবুর শেষ-বেলাকার লেখাগুলি অনুকরণ, তবে সে কথা আমরা কাণেই আনি না।

ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে যাহা খাটে; জাতি সম্বন্ধেও তাহাই খাটে। চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া আমাদের মনে হয় যে, বাঙ্গালী জাতির যথার্থ ভাবটি যে কি, তাহা আমরা সকলে ঠিক ধরিতে পারি নাই—বাঙ্গালী জাতির প্রাণের মধ্যে ভাবগুলি কিরূপ আকারে অবস্থান করে, তাহা আমরা ভাল জানি না। এই নিমিত্ত আধুনিক বাঙ্গালা ভাষায় সচরাচর যাহা কিছু লিখিত হইয়া থাকে তাহার মধ্যে যেন একটি খাঁটি বিশেষত্ব দেখিতে পাই না! পড়িয়া মনে হয় না, বাঙ্গালীতেই ইহা লিখিয়াছে, বাঙ্গালাতেই ইহা লেখা সম্ভব, এবং ইহা অন্য জাতির ভাষায় অনুবাদ করিলে, তাহারা বাঙ্গালীর হৃদয়-জাত একটি নূতন জিনিষ লাভ করিতে পারিবে। ভাল হউক মন্দ হউক আজ কাল যে সকল লেখা বাহির হইয়া থাকে, তাহা পড়িয়া মনে হয় যেন এমন লেখা ইংরাজিতে বা অন্যান্য ভাষায় সচরাচর লিখিত হইয়া থাকে বা হইতে পারে। ইহার প্রধান কারণ, এখনো আমরা বাঙ্গালীর ঠিক ভাবটি, ঠিক ভাষাটি ধরিতে পারি নাই! সংস্কৃতবাগীশেরা বলিবেন, ঠিক কথা বলিয়াছ, আজকালকার লেখায় সমাস দেখিতে পাই না, বিশুদ্ধ সংস্কৃত কথার আদর নাই, এ কি বাঙ্গালা! আমরা তাঁহাদের বলি, তোমাদের ভাষাও বাঙ্গালা নহে, আর ইংরাজিওয়ালাদের ভাষাও বাঙ্গালা নহে। সংস্কৃত ব্যাকরণেও বাঙ্গালা নাই, আর ইংরাজি ব্যাকরণেও বাঙ্গালা নাই, বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালীদের হৃদয়ের মধ্যে আছে। ছেলে কোলে করিয়া সহরময় ছেলে খুঁজিয়া বেড়ান যেমন, তোমাদের ব্যবহারও তেমনি দেখিতেছি। তোমরা বাঙ্গালা বাঙ্গালা করিয়া সর্ব্বত্র খুঁজিয়া বেড়াইতেছ, সংস্কৃত ইংরাজি সমস্ত ওলট্ পালট্ করিতেছ, কেবল একবার হৃদয়টার অনুসন্ধান করিয়া দেখ নাই। আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থে একটি গান আছে—

"আমি কে তাই আমি জান্‌লেম না,
আমি আমি করি কিন্তু, আমি আমার ঠিক হইল না।
কড়ায় কড়ায় কড়ি গণি
চার কড়ায় এক গণ্ডা গণি
কোথা হইতে এলাম আমি, তারে কই গণি!"

আমাদের ভাব, আমাদের ভাষা আমরা

যদি আয়ত্ত করিতে চাই, তবে বাঙ্গালী যেখানে হৃদয়ের কথা বলিয়াছে, সেইখানে সন্ধান করিতে হয়।

যাঁহাদের প্রাণ বিদেশী হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা কথায় কথায় বলেন—ভাব সর্ব্বত্রই সমান। জাতি-বিশেষের বিশেষ সম্পত্তি কিছুই নাই। কথাটা শুনিতে বেশ উদার প্রশস্ত। কিন্তু আমাদের মনে একটি সন্দেহ আছে। আমাদের মনে হয়, যাহার নিজের কিছু নাই, সে পরের স্বত্ব লোপ করিতে চায়। উপরে যে মতটি প্রকাশিত হইল, তাহা চৌর্য্য-বৃত্তির একটি সুশ্রাব্য ছুতা বলিয়া বোধ হয়। যাঁহারা ইংরাজি হইতে দুই হাতে লুঠ করিতে থাকেন, বাঙ্গালাটাকে এমন করিয়া তোলেন, যাহাতে তাহাকে আর ঘরের লোক বলিয়া মনে হয় না, তাঁহারাই বলেন ভাষা-বিশেষের নিজস্ব কিছুই নাই, তাঁহারাই অম্লান বদনে পরের সোণা কাণে দিয়ে বেড়ান। আমারই যে নিজের সোণা আছে এমন নয়, কিন্তু তাই বলিয়া একটা মতের দোহাই দিয়া সোণাটাকে নিজের বলিয়া জাঁক করিয়া বেড়াই না। ভিক্ষা করিয়া থাকি, তাহাতেই মনে মনে ধিক্কার জন্মে. কিন্তু অমন করিলে যে স্পষ্ট চুরি করা হয়।

সামাস্য এবং বৈষম্য, দুটাকেই হিসাবের মধ্যে আনা চাই। বৈষম্য না থাকিলে জগৎ টিকিতেই পারে না। সব মানুষ সমান বটে, অথচ সব মানুষ আলাদা। দুটো মানুষ ঠিক এক ছাঁচের, এক ভাবের পাওয়া অসম্ভব, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। তেমনি দুইটি স্বতন্ত্র জাতির মধ্যে মনুষ্য স্বভাবের সাম্যও আছে, বৈষম্যও আছে। আছে বলিয়াই রক্ষা, তাই সাহিত্যে আদান প্রদান বাণিজ্য ব্যবসায় চলে। উত্তাপ যদি সর্ব্বত্র একাকার হইয়া যায়, তাহা হইলে হাওয়া খেলায় না, নদী বহে না, প্রাণ টেকে না। একাকার হইয়া যাওয়ার অর্থই পঞ্চত্ব পাওয়া। অতএব আমাদের সাহিত্যে যদি বাঁচিতে চায় তবে, ভাল করিয়া বাঙ্গালা হইতে শিখুক।

ভাবের ভাষায় অনুবাদ চলে না। ছাঁচে ঢালিয়া শুষ্ক জ্ঞানের ভাষার প্রতিরূপ নির্ম্মাণ করা যায়। কিন্তু ভাবের ভাষা হৃদয়ের স্তন্য পান করিয়া, হৃদয়ের সুখ দুঃখের দোলায় দুলিয়া মানুষ হইতে থাকে। সুতরাং তাহার জীবন আছে। ছাঁচে ঢালিয়া তাহার একটা নির্জ্জীব প্রতিমা নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারে না, ও হৃদয়ের মধ্যে পাষাণ-ভারের মত চাপিয়া পড়িয়া থাকে। Forei of Gravitation-কে ভারাকর্ষণ শক্তি বলিলে কিছুই আসে যায় না। কিন্তু ইংরাজিতে Libirty, ও Freedom শব্দে যে ভাবটি মনে আসে বাঙ্গালায় স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য শব্দে ঠিক সে ভাবটি আসে না, কোথায় একটু খানি তফাৎ পড়ে। ইংরাজিতে যেখানে বলে, "Frei as mountain air," আমরা যদি সেইখানে বলি "পর্ব্বতের বাতাসের মত স্বাধীন," তাহা হইলে কি কথাটা প্রাণের মধ্যে প্রকাশ করে? আমরা আজকাল ইংরাজীর ভাবের ভাষাকে বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতেছি—মনে করিতেছি ইংরাজি ভাবটি বুঝি ঠিক বজায় রাখিলাম, কিন্তু তাহার প্রমাণ কি? আমাদের সাহিত্যে এখন ইংরাজি-ওয়ালারা যাহা লেখেন, ইংরাজি-ওয়ালারাই তাহা পড়েন, ভাবগুলিকে মনে মনে ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া লন—তাঁহাদের যাহা কিছু ভাল লাগে, ইংরাজির সহিত মিলিতেছে মনে করিয়া ভাল লাগে। কিন্তু যে ব্যক্তি ইংরাজি বুঝে না,

সে ব্যক্তিকে ঐ লেখা পড়িতে দাও, কথাগুলি তাহার প্রাণের মধ্যে যদি প্রবেশ করিতে পারে তবেই বুঝিলাম যে, হাঁ, ইংরাজি ভাবটা বাঙ্গালা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নহিলে অনুবাদ করিলেই যে, ইংরাজি বাঙ্গালা হইয়া যাইবে এমন কোন কথা নাই।

অতএব, বাঙ্গালা ভাব ও ভাবের ভাষা যতই সংগ্রহ করা যাইবে ততই যে আমাদের সাহিত্যের উপকার হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই নিমিত্তই সঙ্গীত-সংগ্রহের প্রকাশক বঙ্গ সাহিত্যানুরাগী সকলেরই বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

Universal love প্রভৃতি বড় বড় কথা বিদেশীদের মুখ হইতে বড়ই ভাল শুনায়, কিন্তু ভিখারীরা আমাদের দ্বারে দ্বারে সেই কথা গাহিয়া বেড়াইতেছে, আমাদের কাণে পৌঁছায় না কেন?

আয়রে আয়, জগাই মাধাই আয়।
হরি-সঙ্কীর্ত্তনে নাচ্‌বি যদি আয়।
(ওরে) মার খেয়েচি না হয় আরো খাব;
ওরে তবু হরির নামটি দিব আয়
ওরে মেরেছ কলসীর কাণা,
তাই বলে কি প্রেম দিব না আয়।"

বাউল বলিতেছে,

"সে প্রেম করতে গেলে মরতে হয়।
আত্ম-সুখীর মিছে সে প্রেমের আশয়।"

গোড়াতেই মরা চাই। আত্মহত্যা না করিলে প্রেম করা হয় না। (পূর্ব্বেই আর একটি গানে বলা হইয়াছে,—

"যার আমি মরেছে, তার সাধন হয়েছে,
কোটি জন্মের পুণ্যের ফল তার উদয় হয়েছে।)"

তার পর বলিতেছে,—

"যে প্রাণ ক'রে পণ, পরে প্রেম-রতন
তার থাকে না যমের ভয়।"

যে মরে তার আর মরণের ভয় থাকে না। জগৎকে সে ভালবাসে এই জন্য সে জগৎ হইয়া যায়, সে একটি অতি ক্ষুদ্র "আমি" মাত্র নহে, যে যমের ভয় করিবে; সে সমস্ত বিশ্ব চরাচর।

অপ্রেমিক বলিবে, এ প্রেমে লাভ কি? ফুলকে জিজ্ঞাসা কর না কেন, গন্ধদান করিয়া তোমার লাভ কি? সে বলিবে গন্ধ না দিয়া আমার থাকিবার যো নাই, তাহাই আমার ধর্ম্ম। এই জন্য গন্ধ না দিতে পারিলে জীবন বৃথা মনে হয়। তেমনি প্রেমিক বলিবে মরণই আমার ধর্ম্ম, না মরিয়া আমার সুখ নাই।

"লোভী লোভে গণিবে প্রমাদ,
একের জন্য কি হয় আরের মরতে সাধ।"

বাউল উত্তর করিল,

"যার যে ধর্ম্ম, সেই পাবে সে কর্ম্ম,
প্রেমের মর্ম্ম কি অপ্রেমিকে পায়?"

বাউল বলিতেছে, সমস্ত জগতের গান শুনিবার এক যন্ত্র আছে—

ভাবের আজগবি কল গৌরচাঁদের ঘরে—
সে যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডেরর
খবর আন্‌ছে একতারে—
গো সখি, প্রেম-তারে।

প্রেমের তারের মধ্যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের তড়িৎ খেলাইতে থাকে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের খবর নিমেষের মধ্যে প্রাণের ভিতর আসিয়া উপস্থিত হয়। যাহাকে তুমি ভালবাস, তাহার কাছে বসিয়া থাক, অদৃশ্য প্রেমের তার দিয়া তাহার প্রাণ হইতে তোমার প্রাণে বিদ্যুৎ বহিতে থাকে, নিমেষে নিমেষে তাহার প্রাণের খবর তোমার প্রাণে আসিয়া পৌঁছায়; তেমনি যদি জগতের প্রাণের সহিত তোমার প্রাণ প্রেমের তারে বাঁধা থাকে, তাহা হইলে জগ-

তের ঘরের কথা সমস্তই তুমি শুনিতে পাও। প্রেমের মহিমা এমন করিয়া আর কে গাহিয়াছে!

জগতের প্রেমে আমরা কেন মজিতে চাহি না? আমরা আপনাকে বজায় রাখিতে চাই বলিয়া। আমরা চাই আমি বলিয়া এক ব্যক্তিকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিব, তাহাকে কোন মতে হাতছাড়া করিব না। জগৎকে বেষ্টন করিয়া চারিদিকে প্রেমের জাল পাতা রহিয়াছে। অহর্নিশি জগতের চেষ্টা তোমাকে তাহার সহিত এক করিয়া লইতে। জগতের ইচ্ছা নহে যে, তাহার কোন একটা অংশ, কোন একটা ঢেউ, স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া জগতের স্রোতকে ছুট্ করিয়া দিয়া উজানে বহিয়া যায়। সে চায় সকল ঢেউগুলি এক স্রোতে বহে, এক গান গায়; তাহা হইলেই সমস্ত জগতের একটি সামঞ্জস্য থাকে, জগতের মহাগীতের মধ্যে কোনখানে বেসুরা লাগে না। এই নিমিত্ত যে ব্যক্তি জগতের প্রতিকূলে আমি আমি করিয়া খাড়া থাকিতে চায়, সে ব্যক্তি বেশী দিন টিঁকিতে পারে না। ক্ষুদ্র নিজের মধ্যে নিজের অভাব পূর্ণ হয় না। অবশেষে সে দুঃখে শোকে তাপে জর্জ্জর হইয়া জগতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া হাঁপ ছাড়ে। এক গণ্ডূষ জলের মধ্যে মাছ কতক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে? কিছুদিনের মধ্যেই তাহার খোরাক ফুরাইয়া যায়, জল দূষিত হইয়া পড়ে, সমুদ্রের জন্য তাহার প্রাণ ছট্‌ফট্ করে। তখন সমুদ্রে যদি না যাইতে পারে, বড় মাছ হইলে শীঘ্র মরে, ছোট মাছ হইলে কিছুদিন মাত্র টিঁকিয়া থাকে। তেমনি যাহাদের বড় প্রাণ তাহারা বেশী দিন নিজের মধ্যে বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না, জগতে ব্যাপ্ত হইতে চায়। চৈতন্যদেব ইহার প্রমাণ। যাহাদের ছোট প্রাণ তাহারা অনেক দিন নিজেকে লইয়া টিঁকিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া চিরকাল পারিবে না। অনন্তকালের খোরাক আমার মধ্যে নাই। দুর্ভিক্ষে পীড়িত হইয়া তাহারা বাহির হইয়া পড়ে। এত কথা যে বলিলাম তাহা নিম্নলিখিত গানটির মধ্যে আছে।

"ওরে মন পাখী, চাতুরী করবে বল কত আর!
বিধাতার প্রেমের জালে
পড়বে না কি একবার!
সাবধানে ঘুরে ফিরে, থাক বাহিরে বাহিরে,
জাল কেটে পালাও উড়ে
ফাঁকি দিয়ে বার বার।
তোমায় একদিন ফাঁদে পড়তে হবে,
সব চালাকি ঘুচে যাবে,
অন্ন জল বিনে যখন করবে দুঃখে হাহাকার।"

গ্রন্থে প্রেমের গান এত আছে, এবং এক একটি গান শুনিয়া এত কথা মনে পড়ে যে, সকল গান তুলিলে, সকল কথা বলিলে পুঁথি বাড়িয়া যায়।

প্রকাশকের সহিত এক বিষয়ে কেবল আমাদের ঝগড়া আছে। তিনি ব্রহ্মসঙ্গীত ও আধুনিক ইংরাজি-ওয়ালাদিগের রচনাকে ইহার মধ্যে স্থান দিলেন কেন? আমরা ত ভাল গান শুনিবার জন্য এ বই কিনিতে চাই না। অশিক্ষিত অকৃত্রিম হৃদয়ের সরল গান শুনিতে চাই। প্রকাশক স্থানে স্থানে তাহার বড়ই ব্যাঘাত করিয়াছেন।

আমরা কেন যে প্রাচীন ও ইংরাজিতে অশিক্ষিত লোকের রচিত সঙ্গীত বিশেষ করিয়া দেখিতে চাই তাহার কারণ আছে। আধুনিক শিক্ষিত লোকদিগের অবস্থা পরস্পরের সহিত প্রায় সমান। আমরা সকলেই একত্রে শিক্ষালাভ করি, আমাদের সকলেরই হৃদয় প্রায় এক ছাঁচে ঢালাই করা। এই

নিমিত্ত আধুনিক হৃদয়ের নিকট হইতে আমাদের হৃদয়ের প্রতিধ্বনি পাইলে আমরা তেমন চমৎকৃত হই না। কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে যদি আমরা আমাদের প্রাণের একটা মিল খুঁজিয়া পাই তবে আমাদের কি বিস্ময়, কি আনন্দ! আনন্দ কেন হয়? তৎক্ষণাৎ সহসা মুহূর্ত্তের জন্য বিদ্যুদালোকে আমাদের হৃদয়ের অতি বিপুল স্থায়ী প্রতিষ্ঠা-ভূমি দেখিতে পাই বলিয়া। আমরা দেখিতে পাই মগ্নতরী হতভাগ্যের ন্যায় আমাদের এই হৃদয় ক্ষণস্থায়ী যুগ বিশেষের অভ্যাস ও শিক্ষা নামক ভাসমান কাষ্ঠ খণ্ড আশ্রয় করিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে না অসীম মানব হৃদয়ের মধ্যে ইহার নীড় প্রতিষ্ঠিত। ইহা দেখিলে আমাদের হৃদয়ের উপরে আমাদের বিশ্বাস জন্মে। আমরা তখন যুগের সহিত যুগান্তরের গ্রন্থনসূত্র দেখিতে পাই। আমার এই হৃদয়ের পানীয় এ কি আমার নিজেরই হৃদয়স্থিত সঙ্কীর্ণ কূপের পঙ্ক হইতে উত্থিত না অভ্রভেদী মানব হৃদয়ের গঙ্গোত্রী শিখরনিঃসৃত, সুদীর্ঘ অতীতকালের শ্যামল ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিত বিশ্বসাধারণের সেবনীয় স্রোতস্বিনীর জল। যদি কোন সুযোগে জানিতে পারি শেষোক্তটিই সত্য, তবে হৃদয় কি প্রসন্ন হয়! প্রাচীন কবিতার মধ্যে আমাদিগের হৃদয়ের ঐক্য দেখিতে পাইলে আমাদের হৃদয় সেই প্রসন্নতা লাভ করে। অতীতকালের প্রবাহধারা যে হৃদয়ে আসিয়া শুকাইয়া যায় সে হৃদয় কি মরুভূমি!

ঐ বুঝি এসেছি বৃন্দাবন।

আমায় বলে দেরে নিতাইধন॥

ওরে বৃন্দাবনের পশু পক্ষীর রব শুনিনা কি কারণ!

ওরে বংশীবট, অক্ষয় বট, কোথারে তমাল বন।

ওরে বৃন্দাবনের তরুলতা শুকায়েছে কি কারণ!

ওরে শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, কোথা গিরি গোবর্দ্ধন।

কেন এ বিলাপ! এ বৃন্দাবনের মধ্যে সে বৃন্দাবন নাই বলিয়া। বর্ত্তমানের সহিত অতীতের একেবারে বিচ্ছেদ হইয়াছে বলিয়া। তা যদি না হইত, যদি আজ সেই কুঞ্জের একটি লতাও দৈবাৎ চোখে পড়িত, তবে সেই ক্ষীণ লতাপাশের দ্বারা পুরাতন বৃন্দাবনের কত মাধুরী বাঁধা দেখিলাম।

সমস্যা।

—০:*:০—

আজকাল প্রায় এমন দেখা যায় অনেক বিষয়ে অনেক রকম মত উঠিয়াছে, কিন্তু কাজের সঙ্গে তাহার মিল হয় না। এমনও দেখা যায় অল্প বয়সে যাঁহারা পরমোৎসাহে সম্পূর্ণ নূতন করিয়া সমাজের পরিবর্ত্তন সাধনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, কিঞ্চিৎ অধিক বয়সে তাঁহারাই পুরাতন প্রথা অবলম্বন করিয়া শান্ত ভাবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন অনেকে ইহার কারণ এমন বলেন যে বাঙ্গালীদের কোন মতের বা কাজের উপরে যথার্থ অকৃত্রিম সুগভীর অনুরাগ নাই—মতগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য হৃদয়ের যতটা বলের আবশ্যক তাহা নাই। একথা যে সম্পূর্ণ অমূলক তাহা নহে, কিন্তু ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি কারণ জুটিয়াছে।

সমাজ যখন সমস্যা হইয়া দাঁড়ায় তখন মানুষ সবলে কাজ করিতে পারে না, যখন ডান

পা একটি গর্ত্তের মধ্যে নিবিষ্ট করিয়া বাঁ পা কোথায় রাখিব ভাবিয়া পাওয়া যায় না, তখন দ্রুতবেগে চলা অসম্ভব! কিংবা যখন মাথা টলমল করিতেছে কিন্তু পা শক্ত আছে, অথবা মাথার ঠিক আছে কিন্তু পায়ের ঠিকানা নাই —তখন যদি চলিবার বিশেষ ব্যাঘাত হয় তবে জমির দোষ দেওয়া যায় না। আমরা বঙ্গসমাজ নামক যে মাকড়ষার জালে মাছির ন্যায় বাস করিতেছি, এখানে মতামত নামক আসমানগামী ডানা দুটো খোলসা আছে বটে কিন্তু ছটা পা জড়াইয়া গেছে। ডানা আস্ফালন যথেষ্ট হইতেছে কিন্তু উড়িবার কোন সুবিধা হইতেছে না। এখানে ডানা দুটো কেবল কষ্টেরই কারণ হইয়াছে।

যেটা ভাল বলিয়া জানিলাম সেটা ভাল রকম হইয়া উঠেনা—জ্ঞানের উপর বিশ্বাস হ্রাস হইয়া যায়। যে উদ্দেশ্যে যে কাজ আরম্ভ করিলাম পদে পদে তাহার উল্টা উৎপত্তি হইতে লাগিল, সে কাজে আর গা লাগে না।

আমাদের সমাজ যে উত্তরোত্তর জটিল সমস্যা হইয়া উঠিতেছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কেহ বলিতেছে বিধবাবিবাহ ভাল, কেহ বলিতেছে মন্দ, কেহ বলিতেছে বাল্যবিবাহ উচিত, কেহ বলিতেছে অনুচিত, কেহ বলে পরিবারের একান্নবর্ত্তিতা উঠিয়া গেলে দেশের মঙ্গল, কেহ বলে অমঙ্গল। আসল কথা, ভাল কি মন্দ কোনটাই বলা যায় না— কোথাও বা ভাল কোথাও বা মন্দ।

বর্ত্তমান বঙ্গসমাজ যে এতটা ঘোলাইয়া গিয়াছে তাহার গুরুতর কারণ আছে। প্রাচীন কালে স্ত্রী পুরুষ বা সমাজের উচ্চনীচ শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার ন্যূনাধিক্য ছিল বটে কিন্তু শিক্ষার সাম্যও ছিল। সকলেরই বিশ্বাস, লক্ষ্য, আকাঙ্ক্ষা, রুচি ও ভাব এক প্রকারের ছিল। সমাজ-সমুদ্রের মধ্যে তরঙ্গের উচু নীচু অবশ্যই ছিল কিন্তু তেলে জলের মত একটা পদার্থ ছিল না। পরস্পরের মধ্যে যে বিভিন্নতা ছিল তাহার ভিতরেও জাতীয়ভাবের একটি ঐক্য ছিল, সুতরাং এরূপ সমাজে জটিলতার কোন সম্ভাবনা ছিল না! সে সমাজ সবল ছিল কি দুর্ব্বল ছিল, সে কথা হইতেছে না, কিন্তু তাহার সর্ব্বাঙ্গীন স্বাস্থ্য ছিল অর্থাৎ তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে সামঞ্জস্য ছিল; কিন্তু এখন সেই সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া গেছে! সেই জন্য বাঁ কাণ এক শোনে ডান কাণ আর শোনে, তুমি মাথা নাড়িতে চাহিলে, তোমার দুই পায়ের দুই বুড় আঙুল নড়িয়া উঠিল, এক করিতে আর হয়!

আমাদের দেশে ইংরাজী শিক্ষিত অশিক্ষিতের মধ্যে বিজাতীয় প্রভেদ দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং স্ত্রী পুরুষের মধ্যে, উচ্চ নীচের মধ্যে, প্রাচীন নবীনের মধ্যে অর্থাৎ বাপে বেটায় এক প্রকার জাতিভেদ হইয়াছে! যেখানে জাতিভেদ আছে অথচ নাই, সেখানে কোন কিছুর হিসাব ঠিক থাকে না। দুই বৃক্ষ দুই দিকে যদি মুখ করিয়া থাকে তাহাতে উদ্ভিদ্‌রাজ্যের কোন ক্ষতি হয় না—কিন্তু যেখানে ডালের সঙ্গে গুঁড়ির, আগার সঙ্গে গোড়ার মিল হয় না সেখানে ফুলের প্রত্যাশা করিতে গেলে আকাশ-কুসুম পাওয়া যায় এবং ফলের প্রত্যাশা করিতে গেলে কদলীও মিলে না।

আমাদের সমাজ যদি গাছপাকা হইয়া উঠিত তবে আর ভাবনা থাকিত না, তাহা হইলে আঁঠিতে খোসাতে এত মনান্তর, মতান্তর, অবস্থান্তর থাকিত না। কিন্তু হিন্দুসমাজের শাখা হইতে পাড়িয়া বঙ্গসমাজকে বল পূর্ব্বক পাকান হইতেছে। ইহার একটা আশু উপকার এই দেখা যায় অতি শীঘ্রই

পাক ধরে, গাছে পাঁচ দিনে যাহা হয় এই উপায়ে একদিনেই তাহা হয়। বঙ্গসমাজেও তাহাই হইতেছে! বঙ্গসমাজের যে অংশে ইংরাজী সভ্যতার তাত লাগিতেছে সেখানটা দেখিতে দেখিতে লাল হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু শ্যামল অংশটুকুর সঙ্গে তাহার কিছুতেই বনিতেছে না। এরূপ ফলের মধ্যে সহজ নিয়ম আর খাটে না।

পুরুষদের মধ্যে ইংরাজিশিক্ষা ব্যাপ্ত হইয়াছে, স্ত্রীলোকদের মধ্যে হয় নাই। শিক্ষার প্রভাবে পুরুষেরা স্থির করিয়াছেন, বাল্যবিবাহ দেশের পক্ষে অমঙ্গলজনক—ইহাতে, সন্তান দুর্ব্বল হয়, অল্প বয়সে বহুপরিবারের ভারে সংসার-সাগরের অশ্রুপূর্ণ লোনাজলে হাবুডুবু খাইতে হয় ইত্যাদি। এই শিক্ষার গুণে তাঁহারা আত্মসংযম পূর্ব্বক নিজের ও দেশের মঙ্গল অমঙ্গলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অধিক বয়সে বিবাহ করিবার পক্ষে উপযোগী হন। কিন্তু স্ত্রীলোকেরা এরূপ শিক্ষা পান নাই এবং অধিক বয়সে বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তুতও হন নাই। তাঁহারা অন্তঃপুরের পুরাতন প্রথার মধ্যে, ঠাট্টার সম্পর্কীয়দের চিরন্তন উপহাস বিদ্রূপের মধ্যে, বিবাহ প্রভৃতি গৃহকর্ম্মের নানাবিধ আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানের মধ্যে আশৈশব লালিত পালিত হইয়াছেন। আপিষের অন্নের ন্যায় প্রত্যুষেই তাঁহাদিগকে খরতাপে চড়ান হইয়াছে, এবং ক্রমাগত গরম মসলা পড়িতেছে—চেষ্টা হইতেছে যাহাতে দশ, বড় জোর সাড়ে দশের আগেই রীতিমত "ব'নে" পাকাইয়া তাঁহাদিগকে ভদ্রলোকের পাতে দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং স্ত্রীলোকদিগের বাল্যবিবাহ আবশ্যক। কিন্তু পুরুষেরা অধিক বয়সে বিবাহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলে মেয়েদের বর শীঘ্র জুটিবে না—তাঁহাদিগকে দায়ে পড়িয়া অপেক্ষা করিতে হইবে। তাহা ছাড়া অধিক বয়স্ক পুরুষেরা নিতান্ত অল্প বয়স্ক কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মতও হইবেন না। অথচ বহু দিন অপেক্ষা করিবার মত অবস্থা ও শিক্ষা নহে—বিশেষতঃ প্রাচীনারা কন্যার বিবাহে বিলম্ব দেখিয়া বিবাহের আবশ্যকতা সম্বন্ধে রীতিমত আন্দোলন করিয়া বেড়াইতেছেন। অনেকে বলিবেন স্ত্রীশিক্ষাও ত প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু সে কি আর শিক্ষা? গোটা দুই ইংরাজি প্রাইমার গিলিয়া এমন কি এণ্ট্রেন্সের পড়া পড়িয়াও কি কঠোর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়ের শক্তি জন্মে? শত শত বৎসরের পুরুষানুক্রমবাহী সংস্কারের উপরে মাথা তুলিয়া উঠা অল্প শিক্ষা ও অল্প বলের কাজ নহে। রীতিমত স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হওয়া ও অন্তঃপুরের চিরন্তন আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন হওয়া এখন অনেক দিনের কথা। অথচ বাল্যবিবাহের প্রতি বিদ্বেষ আজই জাগিয়া উঠিয়াছে। এখন কি করা যায়!

একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে বাস করিতেছি, অথচ বাল্যবিবাহ উঠাইতে চাই। একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে অধিকবয়স্ক নূতন লোক প্রবেশ করিতে পারে না। চরিত্রগঠনের পূর্ব্বেই উক্ত পরিবারের সহিত লিপ্ত হওয়া চাই, নতুবা সেই নূতন লোক অচর্ব্বিত কঠিন খাদ্যের ন্যায় পরিবারের পাকস্থলীতে প্রবেশ করিয়া বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত করে।

এই যেমন একটা উদাহরণ দেওয়া গেল, তেমনি আরেক শ্রেণীর আরেকটা উদাহরণ দেওয়া যাক্। ইংরাজি শিক্ষাসত্ত্বেও কেহ কেহ এমন বিবেচনা করেন যে, বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত নহে। বিধবাদের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকার অপেক্ষা

মহত্ত্ব আর কি হইতে পারে? ইহাতে পরিবারের মধ্যে একটি পবিত্র আদর্শের প্রতিষ্ঠা করা হয়।

যখন আজন্মকালের শিক্ষা ও উদাহরণের প্রভাবে বঙ্গনারী স্বামীকে দেবতা জ্ঞান করিত—স্বামীকেই স্ত্রীলোকেরা চরম গতি পরম-মুক্তির কারণ বলিয়া জানিত, তখন বিধবাদের ব্রহ্মচর্য্য পালন করা স্বাভাবিক ছিল, এবং না করা দূষ্য ছিল। কিন্তু সে শিক্ষা, সে উদাহরণ, সে ভাব চলিয়া যাইতেছে, তবে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত কিসের বলে দাঁড়াইবে। তাহা ছাড়া কেবল একটা বাহ্য অনুষ্ঠান পালন করার কোন ফল নাই, তাহার আভ্যন্তরিক ভাবেই তাহার মহত্ত্ব। এককালে আমাদের সমাজ ভক্তি ও স্নেহের সূত্রেই গাঁথা ছিল। তখন পুত্র পিতাকে, শিষ্য গুরুকে, ছোট ভাই বড় ভাইকে, সমস্ত স্নেহাস্পদেরা সমস্ত গুরুজনদের অসীম ভক্তি করিত। সমাজের সে অবস্থায় স্ত্রীও স্বামীকে দেবতা জ্ঞান করিত। সমাজের সমস্ত সুর এক হইয়া মিলিত। এখন স্বতন্ত্র শিক্ষার প্রভাবে সমাজের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ কতকটা একাকার হইয়া পড়িতেছে। এখন বড় ভাইকে ছোট ভাই, গুরুজনদিগকে স্নেহাস্পদেরা এমন, কি পিতাকে পুত্র তেমন ভাবে দেখে না, তেমন করিয়া মানে না—ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। এই সংক্রামক ভাব যদি সমাজের সর্ব্বত্রই আক্রমণ করিয়া থাকে তবে কি কেবল পতি-পত্নীর সম্পর্কই ইহার হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে? তাহাদের মধ্যেও কি সাম্যভাব প্রবেশ করে নাই, অথবা দ্রুতবেগে করিতেছে না? চারিদিকের উদাহরণে এই ভক্তির ভাব কি মন হইতে শিথিল হইয়া যায় নাই? আগেকার বউরা শাশুড়ীকে যেরূপ মান্য করিত, এখনকার বউরা কি তেমন মান্য করে? শাশুড়ীর প্রতি যে কারণে ভক্তির লাঘব হইয়াছে সেই কারণেই কি স্বামীর প্রতিও ভক্তির লাঘব হয় নাই? তবে কিরূপে আশা করা যায় পূর্ব্বে যেরূপ অচলা নিষ্ঠার সহিত বিধবার ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেন, এখনও তাঁহারা সেইরূপ পারিবেন? এখন বলপূর্ব্বক সেই বাহ্য অনুষ্ঠান অবলম্বন করাইলে কি সমাজে উত্তরোত্তর গুরুতর অধর্ম্মাচরণ প্রবেশ করিয়া নিদারুণ অমঙ্গলের সৃষ্টি করিবে না?

বিধবা বিবাহের সম্বন্ধে আরও একটা কথা আছে। আমাদের সমাজে একান্নবর্ত্তী পরিবারের মূল শিথিল হইয়া আসিতেছে। গুরুজনের প্রতি অচলা ভক্তি ও আত্মমত বিসর্জ্জনই একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রতিষ্ঠাস্থল। এখন সাম্যনীতি সমাজে বন্যার মত আসিয়াছে, কোঠা বাড়ি হইতে কঞ্চির বেড়া পর্য্যন্ত উঁচু জিনিষ যাহা কিছু আছে সমস্তই ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। তাহা ছাড়া শিক্ষাও যত বাড়িতেছে, মতভেদও তত বাড়িতেছে। দুই সহোদর ভ্রাতার জীবন যাত্রার প্রণালী ও মতে মিলে না, তবে আর বেশী দিন একত্র থাকা সম্ভবে না। একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা ভাঙ্গিয়া গেলে স্বামীর মৃত্যুর পর একাকিনী বিধবা কাহাকে আশ্রয় করিবে? বিশেষতঃ তাহার যদি ছোট ছোট দুই একটি ছেলে থাকে তবে তাহাদের পড়ান শুনান রক্ষণাবেক্ষণ কে করিবে? আজ কাল যেরূপ অবস্থা ও সমাজ যে দিকে যাইতেছে, তাহারই উপযোগী পরিবর্ত্তন ও শিক্ষা হওয়া কি উচিত নয়?

কিন্তু যতদিন একান্নবর্ত্তিত্ব একেবারে না ভাঙ্গিয়া যায় তত দিনই বা বিধবাবিবাহ প্রচার

রূপে সম্পন্ন হইবে কি করিয়া? স্বামী ব্যতীত শ্বশুরালয়ের আর কাহারও সহিত যাহার তেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না, সে রমণী স্বামীর মৃত্যুর পরে বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয়ের সহিত একেবারেই বিচ্ছিন্ন হইতে পারে, তাহাতে আপত্তি দেখি না। কিন্তু একান্নবর্ত্তী পরিবারে শ্বশুরালয়ে স্বামী ছাড়াও কত শত বন্ধন। অতএব স্বামীর মৃত্যুতেই শ্বশুরালয় হইতে ধর্ম্মতঃ মুক্তি লাভ করা যায় না। এত দিন যাহাদের সহিত রোগে শোকে বিপদে উৎসবে অনুষ্ঠানে সুখ দুঃখের আদান প্রদান চলিয়া আসিয়াছে,যাহাদের গৌরব ও কলঙ্ক তোমার নিকট কিছুই গোপন নাই, যেখানকার শিশুরা তোমার স্নেহের উপরে নির্ভর করে, সমবয়স্কেরা তোমার মমতা ও সান্ত্বনার উপর নির্ভর করে, গুরুজনেরা তোমার সেবার উপর নির্ভর করে, সেখান হইতে তুমি কোনক্রমে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পার না। তাহা হইলে ধর্ম্ম থাকে না, পরিবারের সুখশান্তি থাকে না। সমাজের ক্ষতি হয়। বিশেষতঃ বিধবার যদি সন্তান থাকে, তাহাদিগকে এক বংশ হইতে আর এক বংশে লইয়া গেলে পরিবারে অসুখ ও অশান্তি উপস্থিত হয়, যদি না লইয়া যাওয়া হয় তবে সন্তানেরা মাতৃহীন হইয়া থাকে।

ইংরাজি-শিক্ষিত অনেকের এমন মত আছে, যে, স্ত্রীলোকদিগকে অন্তঃপুরের বাহির করা উচিত হয় না, তাহাতে তাঁহাদের অন্তঃপুরসুলভ কমনীয়তা প্রভৃতি গুণ নষ্ট হইয়া যায়। এ কথার সত্যমিথ্যা গুণাগুণ লইয়া আমি বিচার করিতে বসি নাই। পূর্ব্বেই এক প্রকার বলিয়াছি সমাজের বর্ত্তমান বিপ্লবের অবস্থায় কোন্ কাজটা সমাজের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে উপযোগী কোন্‌টা নয় তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না।

বঙ্গনারীদের মুখপদ্ম যদি দুর্ভাগা সূর্য্যের তৃষিত নেত্রপথের অন্তরাল করাই অভিপ্রেত হয়,তবে বর্ত্তমান বঙ্গসমাজে তাহার কতকগুলি বাধা পড়িয়াছে, আমি তাহাই দেখিতে চাই। একটা দৃষ্টান্ত দেখিলেই আমার কথা স্পষ্ট হইবে। প্রাচীন কালে দেশ বিদেশে যাতায়াতের তেমন সুবিধা ছিল না—ব্যয় অধিক এবং পথে বিপদও অনেক ছিল। এই জন্য তখনকার রীতি ছিল "পথে নারী বিবর্জ্জিতা!" এই জন্য পুরাকালের পথিকগণের বধূজনবিলাপে কাব্য প্রতিধ্বনিত হইত। কিন্তু এখন সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। রেলের প্রসাদে পথ সুগম হইয়াছে, পথে বিপদও নাই। দেশে বিদেশে বাঙ্গালীদের কাজ কর্ম্ম হইতেছে। যখন পথ সুগম, ব্যয় অল্প, কোন বিপদ নাই, তখন স্ত্রীপুত্রের বিরহ কাহারও সহ্য হয় না। কিন্তু রেলের এক একটি গাড়ি একলা অধিকার করিতে পারেন এমন সঙ্গতিও অল্প লোকের আছে। এই জন্য আজকাল প্রায় দেখা যায় পরপুরুষদিগের সহিত একত্রে উপবেশন করিয়া অনেক ভদ্রলোকের পরিবার রেল-গাড়িতে যাত্রা করিতেছেন। উত্তরোত্তর এরূপ উদাহরণ আরও বাড়িতে থাকিবে। ইহা নিবারণ করা অসাধ্য। নিয়মের গ্রন্থি দুই চারিবার খুলিয়া ফেলিলেই তাহা শিথিল হইয়া যায়। বিশেষতঃ অনভ্যাসের সঙ্কোচ যত গুরুতর, নিয়মের আঁটাআঁটি তত গুরুতর নহে। অন্তঃপুর হইতে বাহির হইবার অনভ্যাস যদি অল্পে অল্পে হ্রাস হইয়া যায়,তাহা হইলে সমাজ-নিয়মের বাধা আর বড় কাজে লাগে না। আর একটা দেখিতে হয়—পূর্ব্বে অবরোধ প্রথা সর্ব্ববাদীসম্মত ছিল, সুতরাং তাহার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ছিল। এখন কেহ বা বাহিরে যান কেহ বা যান, না। যাঁহারা না যান তাঁহারা প্রসঙ্গক্রমে নানা গল্প শুনিতে পান,

নানা উদাহরণ দেখিতে পান। সুতরাং স্বভাবতঃই বাহিরে যাওয়া মাত্রই তাঁহাদের তেমন বিভীষিকা বলিয়া বোধ হয় না, এমন কি বাহিরে যাইতে অনেক কারণে তাঁহাদের কৌতূহল জন্মে। কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না এবারকার এক্‌জিবিশনে যত পুরোনারীর সমাগম হইয়াছিল বিশবৎসর পূর্ব্বে ইহার সিকি হইবারও সম্ভাবনা ছিল না। সমাজের পরিবর্ত্তনের প্রবল-প্রভাবে সেই যদি মেয়েরা বাহির হইতেছেন, তবে মূঢ়ের মত ইহা দেখিয়াও না দেখিবার ভাণ করা বৃথা। ইহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। প্রস্তুত না হইলে সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় মেয়েরা সেই বাহির হইবে—তবে অপ্রস্তুত ভাবে হইবে। তাহার দৃষ্টান্ত দেখ। অনেক ভদ্র পুরোনারী রেলগাড়ি প্রভৃতি প্রকাশ্যস্থানে যাত্রা করেন, অথচ তাঁহাদের বেশভূষা অতিশয় লজ্জাজনক। অন্তঃপুরের প্রাচীর যখন আবরণের কাজ করে তখন যাহা হয় একটা বস্ত্র পরার উপলক্ষ রক্ষা কর আর না কর, সে তোমার রুচির উপর নির্ভর করে। কিন্তু বাহির হইতে হইলে সমাজের মুখ চাহিয়া লজ্জারক্ষার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে—রীতিমত ভদ্রবেশ পরিতে হইবে। পুরুষদের পরিতে হইবে অথচ মেয়েদের পরিতে হইবে না, ইহা কোন্ শাস্ত্রে লেখে? ভদ্র পুরুষরা যখন জামা না পরিয়া বাহির হইতে বা ভদ্রসমাজে যাইতে লজ্জা বোধ করেন, তখন ভদ্র স্ত্রীরা কি করিয়া শুদ্ধমাত্র একখানি দেহ ঘষে সম্বরণীয় সূক্ষ্ম সাড়ি পরিয়া ভদ্রসমাজে বাহির হইবেন! আজকাল এরূপ রীতিগর্হিত ব্যাপার যে ঘটিতেছে, তাহার কারণ অভিভাবকদের এ বিষয়ে মতের স্থৈর্য্য নাই, একটা হিজিবিজি কাণ্ড হইতেছে। অন্তঃপুর হইতে স্ত্রীলোকদিগকে বাহিরে আনা তাঁহাদের মতও নয়, অথচ আনিতেও হইবে—এই জন্য অত্যন্ত অশোভনভাবে কার্য্য নির্ব্বাহ করা হয়। গৃহের স্ত্রীলোকদিগকে সর্ব্বজনসমক্ষে এরূপ ভাবে বাহির করিলে তাঁহাদের অপমান করা হয়। আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীদের উপহাস বিদ্রূপ উপেক্ষা করিয়া পুরস্ত্রীদিগকে যদি ভদ্রবেশ পরান' অভ্যাস করাও, তবে তাঁহাদিগকে বাহিরে আনিতে পার—নতুবা উচক্কা মত বা উপস্থিত সুবিধার খাতিরে এরূপ ভদ্রজন নিন্দনীয় ভাবে স্ত্রীলোকদিগকে বাহিরে আনিলে সমস্ত ভদ্র বঙ্গসমাজকে বিষম লজ্জায় ফেলা হয়।

একদল লোক আছেন তাঁহারা আধাআধি রকম সমাজ-সংস্কার করিতে চান। "একচোখো সংস্কার" নামক প্রবন্ধে তাঁহাদের সংস্কার কার্য্যের বিষয়ে বিস্তারিত করিয়া লিখিয়াছি। স্বামীর মৃত্যুর পরে পুনরায় বিবাহ করিলে পবিত্র দাম্পত্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়, এ বিষয়ে অনেকের সংশয় নাই। কিন্তু পৃথিবীর সুখ হইতে বিধবাদিগকে বঞ্চিত করা তাঁহারা নিষ্ঠুরতা জ্ঞান করেন। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখা যায় বিধবাদিগকে পৃথিবীর সুখে মগ্ন করিয়া রাখাই প্রকৃত নিষ্ঠুরতা। অতএব একটাকে ছাড়িয়া আর একটা রাখিতে গেলে ঘাড়কে ছাঁটিয়া মাথা রাখিতে গেলে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। একটি উদাহরণ দিলাম, কিন্তু এমন অনেক বিষয়েই প্রাচীন সমাজ নিয়মের সহিত রক্ষা করিয়া নূতন বন্দোবস্ত করিতে গিয়া সমাজের নানাদিকে জটিলতা আরও বাড়িয়া উঠিতেছে।

এমন জটিল সমস্যার মধ্যে বাস করিয়া সাম্প্রদায়িকতার অনুরোধে ব্যক্তিবিশেষের সামাজিক স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ করা অন্ধ

গোঁড়ামির কার্য্য। যদি কোন সম্প্রদায় এমন আইন জারি করেন, তাঁহাদের দলের সমুদয় লোককেই অবস্থা নির্ব্বিচারে বাল্যবিবাহ পরিহার করিতেই হইবে, বিধবা-বিবাহ দিতেই হইবে, অবরোধপ্রথা ভাঙ্গিতেই হইবে, তবে তাহাতে সমাজের অপকার হইতে পারে। মূল ধর্ম্মনীতি সমূহের ন্যায় সমাজ-নীতি সকল অবস্থায় সকল লোকের পক্ষে উপযোগী না হইতে পারে। পরিবার বিশেষে বাল্য-বিবাহ উঠিয়া গেলেও হানি নাই, কিন্তু সকল পরিবারেই একথা খাটে না। পরিবারবিশেষে বিধবাবিবাহ হইবার সুবিধা আছে, কিন্তু সকল পরিবারে নাই। স্ত্রী-বিশেষ স্বাধীনতার উপযোগী কিন্তু সকল স্ত্রী নহে। যাঁহারা বল পূর্ব্বক সমাজে একটা বিশৃঙ্খলা জন্মাইয়া দিতে চান, তাঁহারা যতই স্ফীত হউন না কেন, তাঁহাদিগকে সমাজের গাত্রে একটি সুমহৎ ক্ষত বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। সকল অবস্থাতেই আইনপূর্ব্বক বাল্য-বিবাহ বন্ধ করিলে সমাজে দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইতে পারে। অবস্থানির্ব্বিচারে বিবাহার্থিনী বিধবা মাত্রেই বিবাহ দিতে গেলে অস্বাস্থ্য-জনক উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়। স্ত্রী মাত্রেরই স্বাধীনতা দিতে গেলেই বঙ্গীয়-সমাজকে অপদস্থ হইতে হয়। তেমনি আবার বাল্যবিবাহই একমাত্র নিয়ম বলিয়া অবলম্বন করা, সকল অবস্থাতেই সকল বিধবার স্কন্ধেই বলপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য বোঝা চাপাইয়া দেওয়া এবং স্ত্রীলোকদিগকে কোন মতেই এবং কোনকালেই অন্তঃপুরের বাহিরে আনিবার চেষ্টা না করা অত্যন্ত অন্ধপ্রথাশৃঙ্খলবর্ত্তিতার পরিচায়ক। অতএব এই সকল সমস্যার প্রতি মনোযোগ করিয়া এক প্রকার গোঁয়ার্ত্তমি পরিত্যাগ কর। শান্ত সংযতভাবে সমাজ-সংস্কারের প্রতি মন দাও। অথচ বাঁধন ছিঁড়িবার উপলক্ষে তুচ্ছতর সাম্প্রদায়িক বাঁধনে সমাজের পঙ্গুদেহ জড়াইও না।

এক-চোখো সংস্কার।

সংস্করণের অর্থ স্বাধীনতা উপার্জ্জন। বাল্যাবস্থায় সমাজের শত সহস্র বন্ধন থাকে, শত সহস্র অনুশাসনে তাহাকে সংযত করিয়া রাখিতে হয়। সে সময়ে তাহার দিগ্বিদিক্-জ্ঞান-শূন্য স্ফূর্ত্তিকে দমন করিয়া রাখাই তাহার কল্যাণের হেতু। অবশেষে সে যখন বড় হইতে থাকে, তখন একে একে সে এক একটি বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলিতে চায়, শাস্ত্রের এক একটি কঠোর আদেশ কণ্ঠ হইতে অবতারণ করিতে চায়, লোকাচারের এক একটি দুর্ভেদ্য প্রাচীরের তলে গোপনে ছিদ্র করিয়া দেয় ও অবশেষে একদিন প্রকাশ্যে বারুদ লাগাইয়া সমস্তটা উড়াইয়া দেয়। ইহাকেই বলে সংস্করণ। তাই বলিতেছি সংস্করণের নাম স্বাধীনতার প্রয়াস। গুটিপোকা যখন প্রজাপতি হইয়া তাহার রেশমের কারাগার ভাঙ্গিয়া ফেলে, তখন সে সংস্কার করে। মাকড়সা যখন আপনার রচিত জালে জড়াইয়া পড়িয়া মুক্ত হইবার জন্য যুঝিতে থাকে তখন সে এক জন সংস্কারক। দুর্ভাগ্যক্রমে মনুষ্য-সমাজ-সংস্কার, সাপের খোলোষ ছাড়ার মত একটা সহজ ব্যাপার নহে। খোলোষের প্রতি এত মায়া মনুষ্য-সমাজ ব্যতীত আর কাহারো নাই।

সন্তানকে শাসন করা, সন্তানকে পালন করা তাহার শিশু অবস্থায় উপযোগী; কিন্তু সে অবস্থা অতীত হইলেও অনেক পিতা মাতা

তাহাদিগকে শাসন করেন, তাহাদিগকে বল পূর্ব্বক পালন করেন, তাহাদিগকে যথোপযোগী স্বাধীনতা দেন না। সন্তানের বর্ষে বর্ষে পরিবর্ত্তন আছে, অথচ পিতা মাতার কর্ত্তব্যের পরিবর্ত্তন নাই। ইহার ফল হয় এই যে, একদিন সহসা তাঁহারা দেখিলেন, সন্তান তাঁহাদের একটি আদেশ শুনিল না। মাঝে মাঝে এক একটা বিষয়ে তাঁহাদের অবাধ্যতা করিতে লাগিল। তাঁহাদের কখন এরূপ অভ্যাস ছিল না; বরাবর তাঁহাদের আদেশ পালিত হইয়া আসিতেছে, আজ সহসা তাহার অন্যথা দেখিয়া তাঁহাদের গায়ে সহ্য হয় না। উভয় পক্ষে একটা সংঘর্ষ বাধিয়া যায়। ইহাকেই বলে বিপ্লব! অবশেষে একে একে সে পিতা মাতার একটি একটি শাসন হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে থাকে, তাহার স্বাধীনতার সীমা পদে পদে বৃদ্ধি করিতে থাকে ও অবশেষে স্বাতন্ত্র্য লাভ করে, ইহাকেই বলে সংস্কার। বৃদ্ধ লোকেরা আক্ষেপ করিতে থাকেন যে, সন্তানদের অবনতি হইল; স্বাধীনতাই লাভ করুক, আর আত্মনির্ভরই শিখুক, আর আলস্যই পরিহার করুক, যখন গুরুজনের অবাধ্য হইল তখন আর তাহাদের শ্রেয়ঃ কোথায়? অবাধ্য না হইলেই ভাল ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু সংসারে যদি কোন মঙ্গল না যুঝিয়া না পাওয়া যায়, সকলি যদি কাড়িয়া লইতে হয়, কিছুই যদি চাহিয়া না পাওয়া যায়, তাহা হইলে অবাধ্য না হইয়া আর গতি কোথায়?

উপরের কথাটা আর একটু বিস্তৃত করিয়া বলা আবশ্যক। পৃথিবীতে কিছুই সর্ব্বতোভাবে পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ বলিতে গেলে অধীনতা মাত্রই অশুভ, স্বাধীনতা মাত্রই শুভ। মনুষ্যের প্রাণপণ চেষ্টা যাহাতে যথাসম্ভব স্বাধীনতা পায়। কিন্তু মনুষ্যের পক্ষে পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়া অসম্ভব। পৃথিবীতে যথাসম্ভব স্বাধীনতা পাইতে গেলেই নিজেকে অধীন করিতে হয়। দুর্ব্বলপদ বৃদ্ধ স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করিলে যষ্টির অধীনতা স্বীকার করেন। তেমনি রাজার (Government) অধীনে না থাকিলে প্রজার স্বাধীনতা রক্ষা হয় না, আবার প্রজার অধীনে না থাকিলে রাজাও অধিক দিন স্বাধীনতা রাখিতে পারেন না। আমরা যথাসম্ভব স্বাধীন হইবার অভিপ্রায়ে সমাজের শত সহস্র নিয়মের অধীনতা স্বীকার করি। যে ব্যক্তি সমাজের প্রত্যেক নিয়ম দাসভাবে পালন করে, আমরা তাহাকে প্রশংসা করি; যে তাহার একটি নিয়ম উচ্ছেদ করে, আমরা তাহাকে উচ্ছেদ করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হই। এইরূপে অধীনতাকে আমরা পূজা করি। এবং সাধারণ লোকে মনে করে যে অধীনতা পূজনীয়, কেননা সে অধীনতা; রাজার প্রতি অন্ধনির্ভর পূজনীয়, কেননা তাহা রাজ-ভক্তি; সমাজের নিয়ম পালন পূজনীয়, কেননা তাহা সমাজের নিয়ম। কিন্তু তাহা ত নয়। অসম্পূর্ণ পৃথিবীতে অধীনতা স্বাধীনতার সোপান বলিয়াই তাহার যা' গৌরব। সে কার্য্যের যখনি সে অনুপযোগী ও প্রতিরোধী হইবে তখনি তাহাকে পদাঘাতে ভাঙিয়া ফেলা উচিত। আমাদের এই কপাল, যে, কণ্টক বিঁধাইয়া কণ্টককে উদ্ধার করিতে হয়, কিন্তু তাই বলিয়া উদ্ধার হইয়া গেলেও যে অপর কণ্টকটিকে কৃতজ্ঞতার সহিত ক্ষতস্থানে বিঁধাইয়া রাখিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। যখন স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রাজ-শাসনের আবশ্যক থাকিবে না বরঞ্চ বিপরীত হইবে, তখন রাজাকে দূর কর, রাজভক্তি বিসর্জ্জন কর। যখন সমাজের কোন

নিয়ম আমাদের স্বাধীনতা রক্ষার সাহায্য না করিবে, তখন নিয়ম রক্ষার জন্য যে, সে নিয়ম রক্ষা করিতে হইবে তাহা নহে। তাহা যদি করিতে হয়, তবে এক অধীনতার হস্ত হইতে দ্বিতীয় অধীনতার হস্তে পড়িতে হয়। অসহায় স্যাক্সনেরা যেমন শত্রু-অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, প্রবলতর শত্রুকে আহ্বান করিয়াছিল, স্বাধীনতা পাইবার জন্য অস্তিত্ব প্রবল করিবার জন্য, স্বাধীনতা ও অস্তিত্ব উভয়ই বিসর্জ্জন দিয়াছিল, সমাজেরও ঠিক তাহাই হয়। ইহাই সংস্কারের গোড়ার কথা।

এক দল লোক বিলাপ করিবেই। বোধ করি এমন কাল কোন কালে ছিল না, যখন এক দল লোক স্মৃতি-বিস্মৃতি-বিজড়িত কুহেলিকাময় অতীত কালের জন্য দীর্ঘ নিশ্বাস না ফেলিয়াছে ও বর্ত্তমান কালের মধ্যে সর্ব্বনাশের প্রলয়ের, বীজ না দেখিয়াছে। সত্য যুগ কোন কালে বর্ত্তমান ছিল না, চিরকাল অতীত ছিল। তৃতীয় নেপোলিয়নকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, আপনি কি হইতে ইচ্ছা করেন? তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, "আমি আমার পৌত্র হইতে ইচ্ছা করি!" ভবিষ্যৎ তাঁহার চক্ষে এমন লোভনীয় বলিয়া ঠেকিয়াছিল! কিন্তু কত শত সহস্র লোক আছেন, তাঁহাদের উক্ত প্রশ্ন করিলে উত্তর করেন, "আমি আমার পিতামহ হইতে ইচ্ছা করি।" ইহাঁদের পৌত্রেরাও আবার ঠিক তাহাই ইচ্ছা করিবে। ইহাঁদের পিতামহেরাও তাহাই ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

এক দল লোক আছেন, তাঁহারা পরিবর্ত্তন মাত্রেরই বিরোধী নহেন। তাঁহারা আংশিক পরিবর্ত্তন করিতে চাহেন। তাঁহাদের বিষয় লেখাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। তাঁহারা বলেন, বিধবা-বিবাহে আমাদের মত নাই; তবে, সংস্কার করিতে হয় ত বিধবাদের অবস্থা-সংস্কার কর। তাহাদের উপবাস করিতে না হয়, তাহাদের মৎস্য মাংস খাইতে নিষেধ না থাকে, বেশ বিন্যাস বিষয়ে তাহাদের ইচ্ছাকে অন্যায় বাধা না দেওয়া হয়। এক কথায়, বিধবাদের প্রতি সমাজের যত প্রকার অত্যাচার আছে, তাহা দূর হউক, কিন্তু তাহাই বলিয়া বিধবারা সধবা হইতে পারিবে না। তাঁহারা বলিবেন;—"অসবর্ণ বিবাহ! কি সর্ব্বনাশ! কিন্তু অনুরাগ-মূলক বিবাহে আমাদের আপত্তি নাই। পিতামাতাদের দ্বারা বধূ নির্ব্বাচিত না হইয়া প্রণয়াকৃষ্ট বিবাহেচ্ছুক যদি স্বয়ং আপনার উপযোগী পাত্রী স্থির করে ত ভাল হয়। কিন্তু অসবর্ণবিবাহ নৈব নৈবচ।" তাঁহারা পুত্রের বয়স অধিক না হইলে বিবাহ দিতে অনুমতি করেন না, কিন্তু কন্যাকে অল্প বয়সে বিবাহ দেন। তাঁহারা স্ত্রী-শিক্ষার আবশ্যকতা বুঝিয়াছেন, কিন্তু স্ত্রী স্বাধীনতাকে ডরান। লোকাচার বিশেষের উপর তাঁহাদের বিরাগ নাই, তাহার আনুষঙ্গিক দুই একটা অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁহাদের আক্রোশ। তাঁহারা বুঝেন না যে, সেই অনুষ্ঠান গুলি সেই লোকাচারের স্তম্ভ। তাঁহারা যাহা বলেন, তাহার মর্ম্ম এই;—"সমস্ত বৃক্ষটির উপর আমাদের বিদ্বেষ নাই; কিন্তু উহার কতকগুলা জটিল শিকড় যত অনর্থের মূল আমরা শুদ্ধ কেবল ঐ শিকড়গুলা ছেদন করিব। আহা, গাছটি বাঁচিয়া থাক্!"

যদি তুমি বিধবা-বিবাহ দিতে প্রস্তুত না থাক, তবে বিধবারা যেমন আছে তেমনি থাক্। সমাজ যে, বিধবাদের উপবাস করিতে বলে, মাছ মাংস খাইতে, বেশভূষা করিতে নিষেধ করে, তাহার কারণ সমাজের খামখেয়ালী অত্যাচার স্পৃহা নহে। সমাজ বিধবা-

দিগকে বিধবা রাখিবার জন্যই এই কঠোর উপায় অবলম্বন করিয়াছে। যদি তুমি চির-বৈধব্য ব্রত ভালবাস,' তবে অন্য এ সম্বন্ধ কথা কহিও না। তুমি মনে করিতেছ ঐ বাঁকাচো। শিকড়গুলা গাছের কতকগুলা অর্থ-হীন গলগ্রহ মাত্র; তাহা নয়,—উহারাই আশ্রয়, উহারাই প্রাণ। যদি অসবর্ণ বিবাহে তোমার আপত্তি থাকে তবে পূর্ব্বরাগ মূলক বিবাহকে খবরদার প্রশ্রয় দিও না। ইহা সকলেই জানেন, অনুরাগের হিসাব কিতাবের জ্ঞান কিছুমাত্র নাই। সে, ঘর বুঝিয়া, দর করিয়া, গোত্র জানিয়া পাত্রবিশেষকে আশ্রয় করে না। তাহার নিকট রাঢ়ী বারেন্দ্র নাই; গোত্র প্রভেদ নাই; ব্রাহ্মণ শূদ্র নাই। অতএব অনুরাগের উপর বিবাহের ঘটকালির ভার অর্পণ করিলে সে জাতি বিজাতিকে একত্র করিবে, ইহা নিশ্চয়। অতএব হয়, অসবর্ণ বিবাহ দেও, নয়, পিতামাতার প্রতি সন্তানের বিবাহ ভার থাক্। কিন্তু এই পরাধীন বিবাহ-প্রথা রক্ষা করিতে হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আবার আরো অনেক গুলি আনুষঙ্গিক প্রথা রক্ষা করিতে হয়। যেমন বাল্যবিবাহ ও অবরোধ প্রথা। যদি স্ত্রীলোকেরা অন্তঃপুরের বহির্দ্দেশে বিচরণ করিতে পায়, ও অধিক বয়সে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত হয়, তবে অসবর্ণ বিবাহ আরম্ভ হইবেই। যখন যৌবনকালে কুমার কুমারী-দিগের পরস্পরের প্রতি অনুরাগ জন্মাইবে, তখন কি পিতামাতার ও চিরন্তন প্রথার নীরস আদেশ তাহারা মান্য করিবে? তাহা ব্যতীতও বাল্যবিবাহের আর একটি অর্থ আছে। বাল্যকাল হইতে দম্পতির একত্রে বর্দ্ধন, একত্রে অবস্থান হইলে, উভয়ে এক রকম মিশ খাইয়া যায়, বনিয়া যায়। কিন্তু যখন পাত্র ও পাত্রী উভয়ে বয়স্ক, উভয়েরই মন চরিত্র সংগঠিত ও মতামত স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে ও কচি অবস্থার নমনীয়তা চলিয়া গিয়াছে ও পাকা-অবস্থার দৃঢ়তা জন্মিয়াছে, তখন এমন দুই ব্যক্তিকে অনুরাগ ব্যতীত আর কিছুতেই জুড়িতে পারে না;—না, বাসস মৌপদ, না বিবাহের মন্ত্র। তাহাদের যতই বলপূর্ব্বক একত্র করিতে চেষ্টা করিবে, ততই তাহারা দ্বিগুণ বলে তফাৎ হইতে থাকিবে। অনুরাগ করা তাহাদের পক্ষে কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়াই অনুরাগ করা তাহাদের পক্ষে দ্বিগুণ দুঃসাধ্য হইয়া পড়িবে। অতএব যদি অসবর্ণ বিবাহ না দেও, তবে পূর্ব্বরাগ-মূলক বিবাহ দিও না, বাল্য বিবাহ প্রচলিত থাক্, অবরোধ-প্রথা উঠাইও না। তুমি যে মনে করিতেছ, সুবিধামত আমি সমাজ হইতে লোকাচারের একটি মাত্র ইট খসাইয়া লইব, আর অধিক নয়; তোমার কি ভ্রম! ঐ একটি ইট খসিলে কতগুলি ইট খসিবে ও প্রাচীরে কতখানি ছিদ্র হইবে তাহা তুমি জান না।

অতএব দেখা যাইতেছে, দুই দল লোক সমাজ-সংস্কার করে। এক, যাহারা লোকা-চারকে একেবারে মূল হইতে উৎপাটন করে, আর যাহারা লোকাচারের একটি একটি করিয়া শিকড় কাটিয়া দেয় ও অবশেষে কপালে করাঘাত করিয়া বলে, "এ কি হইল! গাছ শুকাইল কেন?" ইহাদের উভয়েরই আবশ্যক। প্রথম দল যখন কোন একটা লোকাচার আমূলতঃ বিনাশ করিতে চায়, তখন সমাজ কোমর বাঁধিয়া রুখিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু তাহাই বলিয়া যে, সংস্কারকদের সমস্ত প্রয়াস নিষ্ফল হয় তাহা নহে। তাহার একটা ফল থাকিয়া যায়। যদি বল যেখানে অবরোধপ্রথা একে-বারে রুদ্ধ করিয়া পাঁচজন সংস্কারক তাঁহাদের

পত্নীদিগকে গাড়ি চড়াইয়া রাস্তা দিয়া লইয়া যান, সেখানে দশজন স্ত্রীলোক পাল্কী চড়িয়া যাইবার সময় দরজা খুলিয়া রাখিলেও তাঁহাদের কেহ নিন্দা করে না। কেবল মাত্র যে তাঁহাদের নিন্দা করে না, তাহা নহে; তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়া সকলে বলাবলি করে, "হাঁ, এ ত বেশ! ইহাতে ত আমাদের কোন আপত্তি নাই! কিন্তু মেয়ে মানুষে গাড়ি চড়িবে সে কি ভয়ানক!" আপত্তি যে নাই, তাহার কারণ, আর পাঁচ জন গাড়ি চড়ে নহিলে বিষম আপত্তি হইত। সমাজ যখন দেখে, দশ জন লোক হোটেলে গিয়া খানা খাইতেছে, তখন যে বিশ জন লোক ব্রাহ্মণকে দিয়া মুরগী রাঁধাইয়া খায়, তাহাদিগকে দ্বিগুণ আদরে বুকে তুলিয়া লয়। ইহাই দেখিয়া অদূরদর্শিগণ আমূল-সংস্কারকদিগকে বলিয়া থাকে, "দেখ দেখ, তোমরাও যদি এইরূপ অল্পে অল্পে অগ্রসর হইতে, সমাজ তোমাদেরও কোন নিন্দা করিত না।"

এককালে যে লোকাচারের প্রাচীরটি আশ্রয় স্বরূপ ছিল, আর এক কালে তাহাই কারাগার হইয়া দাঁড়ায়। এক দল কামান লইয়া বলে, ভাঙিয়া ফেলিব; আর এক দল রাজমিস্ত্রির যন্ত্রাদি আনিয়া বলে না, ভাঙিয়া কাজ নাই, গোটাকতক খিড়্‌কির দরজা তৈরি করা যাক্। অমনি সমাজ হাঁপ ছাড়িয়া বলে, হাঁ, এ বেশ কথা! এইরূপে আমাদের অসংখ্য লোকাচারের প্রাচীরে খিড়্‌কির দরজা বসিয়াছে। প্রত্যহ একটি একটি করিয়া বাড়িতেছে; অবশেষে যখন দেখিবে তাহার নিয়ম-সমূহে এত খিড়্‌কির দরজা হইয়াছে যে, তাহার প্রাচীর আর রক্ষা হয় না, তখন সমস্তটা ভাঙিয়া ফেলিতে আর আপত্তি করিবে না, এমন কি, তখন ভাঙিয়া ফেলাও আর আবশ্যক হইবে না। এইরূপে এক-চোখো সংস্কারকগণ নিজের উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে যতটা সমাজ-সংস্কার করেন, এমন অল্প সংস্কারকই করিয়া থাকেন। ইহারা রক্ষণশীল দলভুক্ত হইয়াও উৎপাটনশীলদিগকে সাহায্য করেন।

কাব্যের উপেক্ষিতা।

কবি তাঁহার কল্পনা উৎসের যত করুণাবারি সমস্তই কেবল জনকতনয়ার পুণ্য অভিষেকে নিঃশেষ করিয়াছেন। কিন্তু আর একটি যে ম্লানমুখী ঐহিকের সর্ব্বসুখবঞ্চিতা রাজবধূ সীতাদেবীর ছায়াতলে অবগুণ্ঠিত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, কবি-কমণ্ডলু হইতে একবিন্দু অভিষেকবারিও কেন তাঁহার চিরদুঃখাভিতপ্ত নম্রললাটে সিঞ্চিত হইল না! হায় অব্যক্ত বেদনা, দেবী ঊর্ম্মিলা, তুমি প্রত্যুষের তারার মত মহাকাব্যের সুমেরুশিখরে একবার মাত্র উদয় হইয়াছিলে, তারপরে অরুণালোকে আর তোমাকে দেখা গেল না! কোথায় তোমার উদয়াচল, কোথায় তোমার অস্তশিখরী তাহা প্রশ্ন করিতেও সকলে বিস্মৃত হইল।

কাব্যসংসারে এমন দুটি একটি রমণী আছে যাহারা কবি কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়াও অমরলোক হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই। পক্ষপাতকৃপণ কাব্য তাহাদের জন্য স্থানসঙ্কোচ করিয়াছে বলিয়াই পাঠকের হৃদয় অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে আসন দান করে।

কিন্তু এই কবিপরিত্যক্তাদের মধ্যে কাহাকে কে হৃদয়ে আশ্রয় দিবেন, তাহা পাঠকবিশেষের প্রকৃতি এবং অভিরুচির উপর নির্ভর করে। আমি বলিতে পারি, সংস্কৃ

সাহিত্যে কাব্য যজ্ঞশালার প্রান্তভূমিতে যে কয়টি অনাদৃতার সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে, তাহার মধ্যে ঊর্ম্মিলাকে আমি প্রধান স্থান দিই।

বোধ করি তাহার একটা কারণ, এমন মধুর নাম সংস্কৃত কাব্যে আর দ্বিতীয় নাই। নামকে যাঁহারা নাম মাত্র মনে করেন আমি তাঁহাদের দলে নই। শেক্‌স্‌পিয়র বলিয়া গেছেন—গোলাপকে যে কোন নাম দেওয়া যাক্ তাহার মাধুর্য্যের তারতম্য হয় না। গোলাপ সম্বন্ধে হয়ত তাহা খাটিতেও পারে, কারণ গোলাপের মাধুর্য্য সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ। তাহা কেবল গুটিকতক সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষগম্য গুণের উপর নির্ভর করে। কিন্তু মানুষের মাধুর্য্য এমন সর্ব্বাংশে সুগোচর নহে, তাহার মধ্যে অনেকগুলি সূক্ষ্ম সুকুমার সমাবেশে অনির্ব্বচনীয়তার উদ্রেক করে। তাহাকে আমরা কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারা পাই না, কল্পনা দ্বারা সৃষ্টি করি। নাম সেই সৃজন কার্য্যের সহায়তা করে। একবার মনে করিয়া দেখিলেই হয় দ্রৌপদীর নাম যদি ঊর্ম্মিলা হইত তবে সেই পঞ্চবীরপতিগর্ব্বিতা ক্ষত্রনারীর দীপ্ত তেজ এই তরুণ কোমল নামটির দ্বারা পদে পদে খণ্ডিত হইত।

অতএব এই নামটির জন্য বাল্মীকির নিকট কৃতজ্ঞ আছি। কবিগুরু ইহার প্রতি অনেক অবিচার করিয়াছেন কিন্তু দৈবক্রমে ইহার নাম যে মাণ্ডবী অথবা শ্রুতকীর্ত্তি রাখেন নাই সে একটা বিশেষ সৌভাগ্য। মাণ্ডবী এবং শ্রুতকীর্ত্তি সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না, জানিবার কৌতূহলও রাখি না।

ঊর্ম্মিলাকে কেবল আমরা দেখিলাম বধূবেশে, বিদেহনগরীর বিবাহসভায়। তার পরে যখন হইতে সে রঘুরাজকুলের সুবৃহৎ অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করিল তখন হইতে আর তাহাকে একদিনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সেই তাহার বিবাহসভার বধূবেশের ছবিটিই মনে রহিয়া গেল। ঊর্ম্মিলা চিরবধূ—নির্ব্বাক্‌কুণ্ঠিতা নিঃশব্দচারিণী। ভবভূতির কাব্যেও তাহার সেই ছবিটুকুই মুহূর্ত্তের জন্য প্রকাশিত হইয়াছিল—সীতা কেবল সস্নেহ কৌতুকে একটিবার মাত্র তাহার উপরে তর্জ্জনী রাখিয়া দেবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! ইনি কে? লক্ষ্মণ লজ্জিত-হাস্যে মনে মনে কহিলেন, ওহো ঊর্ম্মিলার কথা আর্য্যা জিজ্ঞাসা করিতেছেন! এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ লজ্জায় সে ছবি ঢাকিয়া ফেলিলেন, তাহার পর রামচরিত্রের এত বিচিত্র সুখ দুঃখ চিত্রশ্রেণীর মধ্যে আর একটি বারও কাহারও কৌতূহল অঙ্গুলী এই ছবিটির উপরে পড়িল না। সে ত কেবল বধূ ঊর্ম্মিলা মাত্র।

তরুণ শুভ্রভালে যেদিন প্রথম সিন্দুর বিন্দুটি পরিয়াছিলেন, ঊর্ম্মিলা চিরদিনই সেই দিনকার নববধূ। কিন্তু রামের অভিষেক মঙ্গলাচরণের আয়োজনে যেদিন অন্তঃপুরিকাগণ ব্যাপৃত ছিল সেদিন এই বধূটিও কি সীমন্তের উপর অর্দ্ধাবগুণ্ঠন টানিয়া রঘুকুললক্ষ্মীদের সহিত প্রসন্ন কল্যাণ মুখে মাঙ্গল্য রচনায় নিরতিশয় ব্যস্ত ছিল না? আর যেদিন অযোধ্যা অন্ধকার করিয়া দুই কিশোর রাজভ্রাতা সীতা দেবীকে সঙ্গে লইয়া তপস্বী বেশে পথে বাহির হইলেন সেদিন বধূ ঊর্ম্মিলা রাজহর্ম্ম্যের কোন্ নিভৃত শয়নকক্ষে ধূলিশয্যায় বৃন্তচ্যুত মুকুলটির মত লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল তাহা কি কেহ জানে! সেদিনকার সেই বিশ্বব্যাপী বিলাপের মধ্যে এই বিদীর্য্যমাণ ক্ষুদ্র কোমল হৃদয়ের অসহ্য শোক কে দেখিয়াছিল! যে ঋষি কবি

ক্রৌঞ্চবিরহিণীর বৈধব্যদুঃখ মুহূর্ত্তের জন্য সহ্য করিতে পারেন নাই, তিনিও একবার চাহিয়া দেখিলেন না!

লক্ষ্মণ রামের জন্য সর্ব্বপ্রকারে আত্মবিলোপ সাধন করিয়াছিলেন, সে গৌরব ভারতবর্ষের গৃহে গৃহে আজও ঘোষিত হইতেছে, কিন্তু সীতার জন্য ঊর্ম্মিলার আত্মবিলোপ কেবল সংসারে নহে, কাব্যেও। লক্ষ্মণ তাঁহার দেবতাযুগলের জন্য কেবল নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, ঊর্ম্মিলা নিজের চেয়ে অধিক নিজের স্বামীকে দান করিয়াছিলেন। সে কথা কাব্যে লেখা হইল না। সীতার অশ্রুজলে ঊর্ম্মিলা একেবারে মুছিয়া গেল।

লক্ষ্মণ ত বারো বৎসর ধরিয়া তাঁহার উপাস্য প্রিয়জনের প্রিয়কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন—নারী জীবনের সেই বারোটি শ্রেষ্ঠ বৎসর ঊর্ম্মিলার কেমন করিয়া কাটিয়াছিল? সলজ্জ নবপ্রেমে আমোদিত বিকচোন্মুখ হৃদয়মুকুলটি লইয়া স্বামীর সহিত যখন প্রথমতম মধুরতম পরিচয়ের আরম্ভসময় সেই মুহূর্ত্তে লক্ষ্মণ সীতা দেবীর রক্তচরণক্ষেপের প্রতি নত দৃষ্টি রাখিয়া বনে গমন করিলেন—যখন ফিরিলেন তখন নববধূর সুচির প্রণয়ালোকবঞ্চিত হৃদয়ে আর কি সেই নবীনতা ছিল? পাছে সীতার সহিত ঊর্ম্মিলার পরম দুঃখ কেহ তুলনা করে, তাই কি কবি সীতার স্বর্ণমন্দির হইতে এই শোকোজ্জ্বলা মহাদুঃখিনীকে একেবারে বাহির করিয়া দিয়াছেন—জানকীর পাদপীঠপার্শ্বেও বসাইতে সাহস করেন নাই।

সংস্কৃত কাব্যের আর দুইটি তপস্বিনী আমাদের চিত্তক্ষেত্রে তপোবন রচনা করিয়া বাস করিতেছে। প্রিয়ম্বদা আর অনসূয়া। তাহারা ভর্তৃগৃহগামিনী শকুন্তলাকে বিদায় দিয়া পথের মধ্য হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিল, নাটকের মধ্যে আর প্রবেশ করিল না, একেবারে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল।

জানি, কাব্যের মধ্যে সকলের সমান অধিকার থাকিতে পারে না। কঠিন হৃদয় কবি তাঁহার নায়ক নায়িকার জন্য কত অমূল্য প্রতিমা গড়িয়া গড়িয়া নির্ম্মম চিত্তে বিসর্জ্জন দেন। কিন্তু তিনি যেখানে যাহাকে কাব্যের প্রয়োজন বুঝিয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলেন সেই খানেই কি তাহার সম্পূর্ণ শেষ হয়? দীপ্তরোষ ঋষিশিষ্যদ্বয় এবং হতবুদ্ধি রুদ্যমানা গৌতমী যখন তপোবনে ফিরিয়া আসিয়া উৎসুক উৎকণ্ঠিত সখী দুইটিকে রাজসভার বৃত্তান্ত জানাইল তখন তাহাদের কি হইল, সে কথা শকুন্তলা নাটকের পক্ষে একেবারেই অনাবশ্যক, কিন্তু তাই বলিয়া কি সেই অমেয় অকথিত বেদনা সেইখানেই ক্ষান্ত হইয়া গেল? আমাদের হৃদয়ের মধ্যে কি বিনা ছন্দে বিনা ভাষায় চিরদিন তাহা উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ফিরিতে লাগিল না?

কাব্য হীরার টুকরার মত কঠিন। যখন ভাবিয়া দেখি, প্রিয়ম্বদা অনসূয়া, শকুন্তলার কতখানি ছিল—তখন সেই কণ্বদুহিতার পরমতম দুঃখের সময়েই সেই সখীদিগকে একেবারেই অনাবশ্যক অপবাদ দিয়া সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করা কাব্যের পক্ষে ন্যায়বিচারসঙ্গত হইতে পারে কিন্তু তাহা নিরতিশয় নিষ্ঠুর।

শকুন্তলার সুখ সৌন্দর্য্য গৌরব গরিমা বৃদ্ধি করিবার জন্যই এই দুটি লাবণ্য প্রতিমা নিজের সমস্ত দিয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়াছিল। তিনটি সখী যখন জলের ঘট লইয়া অকালবিকশিত নবমালতীর তলে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন দুষ্মন্ত কি একা শকুন্তলাকে ভাল বাসিয়াছিলেন? তখন হাস্যে কৌতুকে নব

যৌবনের বিলোল মাধুর্য্যে কাহার শকুন্তলাকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল? এই দুটি তাপসী সখী। এরা শকুন্তলা শকুন্তলার এক তৃতীয়াংশ! শকুন্তলার অধিকাংশই এই অনসূয়া এবং প্রিয়ম্বদা, শকুন্তলাই সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্প। বারো আনা প্রেমালাপ ত তাহারাই সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দিল। তৃতীয় অঙ্কে যেখানে একাকিনী শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের প্রেমাকুলতা বর্ণিত আছে সেখানে কবি অনেকটা হীনবল হইয়াছিলেন—কোন মতে অচিরে গৌতমীকে আনিয়া তিনি রক্ষা পাইলেন—কারণ, শকুন্তলাকে যাহারা আবৃত করিয়া সম্পূর্ণ করিয়াছিল তাহারা সেখানে ছিল না। বৃন্তচ্যুত ফুলের উপর দিবসের সমস্ত প্রখর আলোক সহ্য হয় না—বৃন্তের বন্ধন এবং পল্লবের ঈষৎ অন্তরাল ব্যতীত সে আলোক তাহার উপর তেমন কমনীয় কোমল ভাবে পড়ে না। নাটকের ঐ কটি পত্রে সখীবিরহিতা শকুন্তলা এমনই সুস্পষ্টরূপে অসহায় অসম্পূর্ণ অনাবৃতভাবে চোখে পড়ে যে, তাহার দিকে যেন ভাল করিয়া চাহিতে সঙ্কোচ বোধ হয়—মাঝখানে আর্য্যা গৌতমীর আকস্মিক আবির্ভাবে পাঠকমাত্রেই মনে মনে আরাম লাভ করে।

আমি ত মনে করি, রাজসভায় দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে যে চিনিতে পারেন নাই তাহার প্রধান কারণ, সঙ্গে অনসূয়া প্রিয়ম্বদা ছিল না। একে তপোবনের বাহিরে, তাহাতে খণ্ডিতা শকুন্তলা, চেনা কঠিন হইতে পারে।

কিন্তু জ্ঞানবৃক্ষের ফল পাওয়ার পর স্বর্গের সুখস্বপ্ন আর টেঁকে না। নাটকের আরম্ভেই তিন সখীতেই যখন পরস্পর মিশ্রিত হইয়া দেখা দিল, তখন সেই মোহময় ফলটি সম্মুখে আসিয়া পড়ে নাই।—তখন এই তিনটিতে জড়িত একটি শকুন্তলা অখণ্ড সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া বৃক্ষলতা পুষ্পপল্লবের মধ্যে অতি মধুর মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইল। অনতিবিলম্বেই কৌতুকস্মিতহাস্য কবি শয়তানী করিয়া মায়াফলটি অকস্মাৎ মাঝখানে আনিয়া ফেলিলেন। বিচ্ছেদের কাজ আরম্ভ হইল। শকুন্তলা নিগূঢ় বেদনাভরে তাহার দুই সখীর পরম ঘনিষ্ঠ ঐক্যবন্ধন হইতে ছাড়াইয়া উঠিবার দিকে চলিল। ক্রমে পরস্পরের মধ্যে সম্পূর্ণ সহজ বোঝাপড়া দুঃসাধ্য হইতে লাগিল। এখন সখীরা পুঁথিপড়া বিদ্যার সাহায্যে অনুমানের দ্বারা শকুন্তলার নাগাল পাইবার চেষ্টা করে। শকুন্তলা গোপন গাছের ফলটি খাইল এবং তাহার পরেই একটা দুর্ভেদ্য আবরণ বক্ষের উপর তুলিয়া পরিল—এবং তাহার পরেই দেবদূত আসিয়া কহিল স্বর্গ হইতে বিদায় হও।

স্বর্গ ত ছারখার করিয়া শকুন্তলা বিদায় লইলেন, তাহার পরে সখীরা যখন শূন্য তপোবনে ফিরিয়া আসিল তখন কি তাহাদের শৈশবসহচরীর বিরহই তাহাদের একমাত্র দুঃখ? শকুন্তলার অভাব ছাড়া ইতিমধ্যে তপোবনের আর কি কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই? হায়, তাহারা যাহা জানিত না, তাহা জানিয়াছে। কাব্যের কাল্পনিক নায়িকার বিবরণ পড়িয়া নহে, তাহাদের প্রিয়তমা সখীর বিদীর্ণ হৃদয়ের মধ্যে অবতরণ করিয়া! এখন হইতে অপরাহ্ণে আলবালে জল সেচন করিতে কি তাহারা মাঝে মাঝে বিস্মৃত হইবে না? এখন কি তাহারা মাঝে মাঝে পত্রমর্ম্মরে সচকিত হইয়া অশোক তরুর অন্তরালে প্রচ্ছন্ন কোন আগন্তুকের আশঙ্কা করিবে না? মৃগশিশু আর কি তাহাদের পরিপূর্ণ আদর পাইবে?

প্রথম অঙ্কের সেই একটি মাত্র আকস্মিক

ঘটনায় তিন জনে এখন তিনটি লোক হইয়া গেছে। এখনঅতঃসহ শোক লইয়াও শকুন্তলা একাকিনী, এখন আর তাহার পার্শ্বে অনসূয়া প্রিয়ম্বদাকে তেমন করিয়া সাজে না! প্রথম অঙ্কে শকুন্তলার তপোবন বাস এবং শেষ অঙ্কেও তপোবন বাস, প্রথম অঙ্কে মিলন, শেষ অঙ্কেও তাই—কিন্তু দুই তপোবনে, দুই মিলনে প্রভেদ স্বর্গমর্ত্ত্য। প্রধান প্রভেদ একটিতে অনসূয়া প্রিয়ম্বদা আছে, আর একটিতে তাহারা নাই। শেষ অঙ্কে শকুন্তলা স্বতন্ত্র, নিজের সম্পূর্ণতা সাধনের জন্য এখন তাহাকে আর অন্য কাহারও অপেক্ষা করিতে হয় না। এখন তাহার মৃগশাবক তরুলতার স্থানে যে দুরন্ত শিশুটি আসিয়াছে, সে যথার্থই তাহার নিজের অংশ—তাহার স্মৃতির সুখ এবং বিচ্ছেদের বেদনা মূর্তিমান। এখন প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া কত সুদূরে গিয়া পড়িয়াছে! নাটকখানি যদি কোন নিকৃষ্ট কবির হাতে পড়িত তবে সে নির্ব্বোধ সম্ভবতঃ শেষ মিলনকালে অনসূয়া প্রিয়ম্বদাকে মর্ত্ত্য হইতে টানিয়া আনিয়া মিলনব্যাপারকে চারিদিক হইতে পরিপূর্ণ করিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু এমন অসাময়িক অঘটন ঘটনা আর কিছুই হইতে পারিত না। সে প্রিয়ম্বদা সে অনসূয়া আর নাই। এখন তাহাদিগকে ভর্ত্তৃভবনে রাজগৃহিণীর পার্শ্বে দাঁড় করাইলে মিলন নহে, পরন্তু অনতিক্রমনীয় বিচ্ছেদই দেদীপ্যমান হইয়া উঠিত।

অতএব রাজমহিষী শকুন্তলার সহিত এই দুটি তাপসকন্যার সে মিলন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে তাহা লইয়া মূঢ়ের মত নিষ্ফল ক্ষোভ করিতেছি না। এখন সেই সখীত্ববর্নির্মুক্তা স্বতন্ত্রা অনসূয়া এবং প্রিয়ম্বদাকে মর্ম্মরিত তপোবনে তাহাদের নিজের জীবনকাহিনীসূত্রে অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছি। তাহারাত ছায়া নহে; শকুন্তলার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা এক দিগন্ত হইতে অন্য দিগন্তে অস্ত যায় নাই ত। তাহারা জীবন্ত, মূর্ত্তিমতী। রচিত-কাব্যের বহির্দ্দেশে, অনভিনীত নাটোর নেপথ্যে এখন তাহারা বাড়িয়া উঠিয়াছে—অতিপিনদ্ধ বল্কলে এখন তাহাদের যৌবনকে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না—এখন তাহাদের কলহাস্যের উপর অন্তর্ঘন ভাবের আবেগ নববর্ষার প্রথম মেঘমালার মত অশ্রুগম্ভীর ছায়া ফেলিয়াছে। এখন এক একদিন সেই অন্যমনস্কাদের উটজপ্রাঙ্গণ হইতে অতিথি আসিয়া ফিরিয়া যায়। আমরাও ফিরিয়া আসিলাম।

সংস্কৃত সাহিত্যে আর একটি অনাদৃতা আছে। তাহার সহিত পাঠকদের পরিচয় সাধন করাইতে আমি কুণ্ঠিত। সে বড় কেহই নহে, সে কাদম্বরীকাহিনীর পত্রলেখা। সে যেখানে আসিয়া অতি স্বল্প স্থান অধিকার লইয়াছে। সেখানে তাহার আসিবার কোন প্রকার প্রয়োজন ছিল না। স্থানটি তাহার পক্ষে বড় সংকীর্ণ, একটু এদিকে ওদিকে পা ফেলিলেই সঙ্কট।

এই আখ্যায়িকায় পত্রলেখা যে সুকুমার সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আছে সেরূপ সম্বন্ধ আর কোন সাহিত্যে কোথাও দেখি নাই। অথচ কবি অতি সহজে সরল চিত্তে এই অপূর্ব্ব সম্বন্ধ স্থানের অবতারণা করিয়াছেন। কোন কোন খানে এই ঊর্ণ তন্তুর প্রতি একটুকু টান পড়ে নাই যাহাতে মুহূর্ত্তেকের জন্য ছিন্ন হইবার আশঙ্কা মাত্র ঘটিতে পারে।

যুবরাজ চন্দ্রাপীড় যখন অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করিয়া প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন তখন একদিন প্রভাতকালে তাঁহার গৃহে কৈলাস নামক এক কঞ্চুকী প্রবেশ করিল—তাহার পশ্চাতে একটি কন্যা, অনতিযৌবনা, মস্তকে ইন্দ্রগোপ

কীটের মত রক্তাম্বরের অবগুণ্ঠন, ললাটে চন্দন তিলক, কটীতে হেমমেখলা কোমল তনুলতার প্রত্যেক রেখাটি যেন সদ্য নূতন অঙ্কিত;—এই তরুণী লাবণ্য প্রভা প্রভাবে ভবন পূর্ণ করিয়া কণিতমণিনূপুরাকলিত চরণে কঞ্চুকীর অনুগমন করিল।

কঞ্চুকী প্রণাম করিয়া ক্ষিতিতলে দক্ষিণ কর রাখিয়া জ্ঞাপন করিল—"কুমার, আপনার মাতা মহাদেবী বিলাসবতী জানাইতেছেন—এই কন্যা পরাজিত কুলুতেশ্বরদুহিতা, বন্দিনী, পত্রলেখা ইহার নাম! এই বিগতনাথা রাজদুহিতাকে আমি দুহিতানির্ব্বিশেষে এতকাল পালন করিয়াছি। এক্ষণে ইহাকে তোমার তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী করিয়া প্রেরণ করিলাম। ইহাকে সামান্য পরিজনের মত দেখিয়োনা, বালিকার মত লালন করিয়ো, নিজের চিত্তবৃত্তির মত চাপল্য হইতে নিবারণ করিও, শিষ্যার ন্যায় দেখিও, সুহৃদের ন্যায় সমস্ত বিশ্রম্ভব্যাপারে ইহাকে অভ্যন্তরে লইও, এবং এই কল্যাণীকে এমন সকল কার্য্যে নিযুক্ত করিও যাহাতে এ তোমার অতিচির পরিচারিকা হইতে পারে।" কৈলাস এই কথা বলিতেই পত্রলেখা তাঁহাকে অভিজাতপ্রণাম করিল এবং চন্দ্রাপীড় তাহাকে অনিমেষলোচনে সুচিরকাল নিরীক্ষণ করিয়া "অম্বা যেমন আজ্ঞা করিলেন তাহাই হইবে" বলিয়া দূতকে বিদায় করিয়া দিলেন।

পত্রলেখা পত্নী নহে, প্রণয়িনীও নহে, কিঙ্করীও নহে, পুরুষের সহচরী। এই প্রকার অপরূপ সখিত্ব দুই সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী একটি বালুতটের মত—কেমন করিয়া তাহা রক্ষা পায়? নবযৌবন কুমার কুমারীর মধ্যে অনাদিকালের যে চিরন্তন প্রবল আকর্ষণ আছে তাহা দুই দিক হইতেই এই সংকীর্ণ বাঁধটুকুকে ক্ষয় করিয়া লঙ্ঘন করে না কেন?

কিন্তু কবি সেই অনাথা রাজকন্যাকে চিরদিনই এই অপ্রশস্ত আশ্রয়ের মধ্যে বসাইয়া রাখিয়াছেন, এই গণ্ডীর রেখামাত্র বাহিরে তাহাকে কোন দিন টানে নাই। হতভাগিনী বন্দিনীর প্রতি কবির ইহা অপেক্ষা উপেক্ষা আর কি হইতে পারে? একটি সূক্ষ্ম যবনিকার আড়ালে বাস করিয়াও সে আপনার স্বাভাবিক স্থান পাইল না। পুরুষের হৃদয়ের পার্শ্বে সে জাগিয়া রহিল, কিন্তু ভিতরে পদার্পণ করিল না। কোন দিন একটা অসতর্ক বসন্তের বাতাসে এই সখিত্ব পর্দ্দার একটা প্রান্তও উড়িয়া পড়িল না!

অথচ সখিত্বের মধ্যে লেশমাত্র অন্তরাল ছিল না। কবি বলিতেছেন পত্রলেখা সেই প্রথম দিন হইতেই চন্দ্রাপীড়ের দর্শনমাত্রেই সেবারসসমুপজাত হইয়া দিন নাই রাত্রি নাই উপবেশনে উত্থানে ভ্রমণে ছায়ার মত রাজপুত্রের পার্শ্ব পরিত্যাগ করিল না। চন্দ্রাপীড়েরও তাহাকে দেখা অবধি প্রতিক্ষণে উপচীয়মানা মহতী প্রীতি জন্মিল; প্রতি দিন ইহার প্রতি প্রসাদ রক্ষা করিলেন এবং সমস্ত বিশ্বাসকার্য্যে ইহাকে আত্মহৃদয় হইতে অব্যতিরিক্ত মনে করিতে লাগিলেন।

এই সম্বন্ধটি অপূর্ব্ব সুমধুর, কিন্তু ইহার মধ্যে নারী অধিকারের পূর্ণতা নাই। নারীর সহিত নারীর যেরূপ লজ্জাবোধহীন সখী সম্পর্ক থাকিতে পারে পুরুষের সহিত তাহার সেইরূপ অসঙ্কোচ অনবচ্ছিন্ন নৈকট্যে পত্রলেখার নারীমর্য্যাদার প্রতি কাদম্বরীকাব্যের যে একটা অবজ্ঞা প্রকাশ পায় তাহাতে কি পাঠককে আঘাত করে না? কিসের আঘাত? আশঙ্কার নহে, সংশয়ের নহে। কারণ কবি যদি আশঙ্কা

সংশয়েরও লেশমাত্র স্থান রাখিতেন তবে সেটা আমরা পত্রলেখার নারীত্বের প্রতি কথঞ্চিৎ সম্মান বলিয়া গ্রহণ করিতাম। কিন্তু এই দুটি তরুণ তরুণীর মধ্যে লজ্জা আশঙ্কা এবং সন্দেহেরও দোদুল্যমান স্নিগ্ধ ছায়াটুকু পর্য্যন্ত নাই। পত্রলেখা তাহার অপূর্ব্ব সম্বন্ধবশতঃ অন্তঃপুর ত ত্যাগই করিয়াছে কিন্তু স্ত্রী পুরুষ পরস্পর সমীপবর্ত্তী হইলে স্বভাবতই যে একটি সঙ্কোচে সাধ্বসে এমন কি সহাস্য ছলনায় একটি লীলান্বিত কম্পমান মানসিক অন্তরাল আপনি বিরচিত হইতে পারে ইঁহাদের মধ্যে সেটুকুও হয় নাই। সেই কারণেই এই অন্তঃপুরবিচ্যুতা অন্তঃপুরিকার জন্য সর্ব্বদাই ক্ষোভ জন্মিতে থাকে।

চন্দ্রাপীড়ের সহিত পত্রলেখার নৈকট্যও অসামান্য। দিগ্বিজয় যাত্রার সময় একই হস্তীপৃষ্ঠে পত্রলেখাকে সম্মুখে বসাইয়া রাজপুত্র আসন গ্রহণ করেন। শিবিরে রাত্রিকালে চন্দ্রাপীড় যখন নিজশয্যার অনতিদূরে নিহিত-শয়ন নিমগ্ন পুরুষসখা বৈশম্পায়নের সহিত আলাপ করিতে থাকেন তখন নিকটে ক্ষিতিতলবিন্যস্ত কুথার উপর সখী পত্রলেখা প্রসুপ্ত থাকে।

অবশেষে কাদম্বরীর সহিত চন্দ্রাপীড়ের যখন প্রণয় সংঘটন হইল তখনও পত্রলেখা আপন ক্ষুদ্র স্থানটুকুর মধ্যে অব্যাহতভাবে রহিল। কারণ পুরুষচিত্তে নারী যতটা আসন পাইতে পারে তাহার সঙ্কীর্ণতম প্রান্তটুকুমাত্র সে অধিকার করিয়াছিল,—সেখানে যখন মহামহোৎসবের জন্য স্থান করিতে হইল, তখন ঐটুকু প্রান্ত হইতে বঞ্চিত করা আবশ্যকই হইল না।

পত্রলেখার প্রতি কাদম্বরীর ঈর্ষার আভাসমাত্রও ছিল না। এমন কি, চন্দ্রাপীড়ের সহিত পত্রলেখার প্রীতিসম্বন্ধ বলিয়াই কাদম্বরী তাহাকে প্রিয়সখীজ্ঞানে সাদরে গ্রহণ করিল। কাদম্বরীকাব্যের মধ্যে পত্রলেখা যে অপরূপ ভূখণ্ডের মধ্যে আছে সেখানে ঈর্ষা সংশয় সঙ্কট বেদনা কিছুই নাই, তাহা স্বর্গের ন্যায় নিষ্কণ্টক, অথচ সেখানে স্বর্গের অমৃত-বিন্দু কই!

প্রেমের উচ্ছ্বসিত অমৃতপান তাহার সম্মুখেই চলিতেছে। ভ্রমেও কি কোন দিনের জন্য তাহার কোন একটা শিরার রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠে নাই? সে কি চন্দ্রাপীড়ের ছায়া? রাজপুত্রের তপ্ত যৌবনের তাপটুকু মাত্র কি তাহাকে স্পর্শ করে নাই? কবি সে প্রশ্নের উত্তর মাত্র দিতে উপেক্ষা করিয়াছেন। কাব্য-সৃষ্টির মধ্যে সে এত উপেক্ষিতা।

পত্রলেখা যখন কিয়ৎকাল কাদম্বরীর সহিত একত্রবাসের পর বার্ত্তাসহ চন্দ্রাপীড়ের নিকট ফিরিয়া আসিল, যখন স্মিতহাস্যের দ্বারা দূর হইতেই চন্দ্রাপীড়ের প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিয়া সে নমস্কার করিল, তখন পত্রলেখা প্রকৃতিবল্লভা হইলেও কাদম্বরীর নিকট হইতে প্রসাদলব্ধ আর একটি সৌভাগ্যের ন্যায় বল্লভতরতা প্রাপ্ত হইল এবং তাহাকে অতিশয় আদর দেখাইয়া যুবরাজ আসন হইতে উত্থিত হইয়া আলিঙ্গন করিলেন।

চন্দ্রাপীড়ের এই আদর এই আলিঙ্গনের দ্বারাই পত্রলেখা কবিকর্ত্তৃক অনাদৃতা। আমরা বলি কবি অন্ধ। কাদম্বরী এবং মহাশ্বেতার দিকেই ক্রমাগত এক দৃষ্টে চাহিয়া তাঁহার চক্ষু ঝলসিয়া গেছে, এই ক্ষুদ্র বন্দিনীটিকে তিনি দেখিতে পান নাই। ইহার মধ্যে যে প্রণয়-তৃষার্ত্ত চির বঞ্চিত একটি নারীহৃদয় রহিয়া গেছে সে কথা তিনি একেবারে বিস্মৃত হইয়াছেন। বাণভট্টের কল্পনা মুক্তহস্ত—অস্থানে

অপাত্রেও তিনি অজস্র বর্ষণ করিয়া চলিয়াছেন। কেবল তাঁহার সমস্ত কৃপণতা এই অবগতগাথা রাজদুহিতার প্রতি। তিনি পক্ষপাতদূষিত প্রেমান্ধতা বশতঃ এই পত্রলেখার হৃদয়ের নিগূঢ়তম কথা কিছুই জানেন না। তিনি মনে করিতেছেন সমুদ্রান্তে তিনি যে পর্যন্ত আসিয়া অনুমান করিয়াছেন, সে সেই পর্যন্ত আসিয়াই থামিয়া আছে—পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় সে ইহার অধিক অগ্রসর হয় নাই, তাই কাদম্বরী পড়িয়া কেবলই মনে হয় অন্য সমস্ত নায়িকার কথা অনাবশ্যক বাহুল্যের সহিত বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু পত্রলেখার কথা কিছুই বলা হয় নাই।

একটি পুরাতন কথা।

অনেকেই বলেন, বাঙ্গালীরা ভাবের লোক, কাজের লোক নহে। এই জন্য তাঁহারা বাঙ্গালীদিগকে পরামর্শ দেন Practical হও। ইংরাজি শব্দটাই ব্যবহার করিলাম। কারণ, ঐ কথাটাই চলিত। শব্দটা শুনিলেই সকলে বলিবেন, হাঁ হাঁ, বটে, এই কথাটাই বলা হইয়া থাকে বটে। আমি তাহার বাঙ্গলা অনুবাদ করিতে গিয়া অনর্থক দায়িক হইতে যাইব কেন? যাহা হউক্ তাঁহাদের যদি জিজ্ঞাসা করি, Practical হওয়া কাহাকে বলে, তাঁহারা উত্তর দেন,—ভাবিয়া চিন্তিয়া ফলাফল বিবেচনা পূর্ব্বক কাজ করা, সাবধান হইয়া চলা, মোটামুটি অর্থাৎ ভাবের প্রতি, বেশী আস্থা না রাখা, অর্থাৎ ভাবগুলিকে ছাঁটিয়া ছুঁটিয়া কার্য্যক্ষেত্রের উপযোগী করিয়া লওয়া। খাঁটি সোণায় যেমন ভাল মজবুত গহনা গড়ান' যায় না, তাহাতে মিশাল দিতে হয়, তেমনি খাঁটি ভাব লইয়া সংসারের কাজ চলে না তাহাতে খাদ মিশাইতে হয়। যাহারা বলে সত্য কথা বলিতেই হইবে, তাহারা Sentimental লোক, কেতাব পড়িয়া তাহারা বিগড়াইয়া গিয়াছে, আর যাহারা আবশ্যকমত দুই একটা মিথ্যা কথা বলে ও সেই সামান্য উপায়ে সহজে কার্য্য সাধন করিয়া লয় তাহারা Practical লোক।

এই যদি কথাটা হয়, তবে বাঙ্গালীদিগকে ইহার জন্য অধিক সাধনা করিতে হইবে না। সাবধানী ভীরু লোকের স্বভাবই এইরূপ। এই স্বভাববশতই বাঙ্গালীরা চাকরী করিতে পারে কিন্তু কাজ চালাইতে পারে না।

উল্লিখিত শ্রেণীর Practical লোক ও প্রেমিক লোক এক নয়। Practical লোক দেখে ফল কি,—প্রেমিক তাহা দেখে না এই নিমিত্ত সেইই ফল পায়। জ্ঞানকে যে ভালবাসিয়া চর্চ্চা করিয়াছে সেই জ্ঞানের ফল পাইয়াছে; হিসাব করিয়া যে চর্চ্চা করে তাহার ভরসা এত কম যে, যে শাখাগ্রে জ্ঞানের ফল সেখানে সে উঠিতে পারে না; সে অতি সাবধান সহকারে হাতটি মাত্র বাড়াইয়া ফল পাইতে চায়—কিন্তু ইহারা প্রায়ই বেঁটে লোক হয়—সুতরাং "প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ" হইয়া পড়ে।

বিশ্বাসহীনেরাই সাবধানী হয়, সঙ্কুচিত হয়, বিজ্ঞ হয়, আর বিশ্বাসীরাই সাহসিক হয়, উদার হয়, উৎসাহী হয়। এই জন্য বয়স হইলে সংসারের উপর হইতে বিশ্বাস হ্রাস হইলে পর তবে সাবধানিতা বিজ্ঞতা আসিয়া পড়ে। এই অবিশ্বাসের আধিক্যহেতু অধিক বয়সে কেহ একটা নূতন কাজে হাত দিতে পারে না, ভয় হয় পাছে কার্য্যসিদ্ধি না হয়—

এই ভয় হয় না বলিয়া অল্প বয়সে অনেক কার্য্য হইয়া উঠে, এবং হয়ত অনেক কার্য্য অসিদ্ধিও হয়।

মানুষের প্রধান বল আধ্যাত্মিক বল। মানুষের প্রধান মনুষ্যত্ব আধ্যাত্মিকতা। শারীরিকতা বা মানসিকতা দেশ কাল পাত্র আশ্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা অনন্তকে আশ্রয় করিয়া থাকে। অনন্ত দেশ ও অনন্ত কালের সহিত আমাদের যে যোগ আছে, আমরা যে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র নহি ইহাই অনুভব করা আধ্যাত্মিকতার একটি লক্ষণ। যে মহাপুরুষ এইরূপ অনুভব করেন, তিনি সংসারের কাজে গোঁজামিলন দিতে পারেন না। তিনি সামান্য সুবিধা অসুবিধাকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। তিনি আপনার জীবনের আদর্শকে লইয়া ছেলেখেলা করিতে পারেন না—কর্ত্তব্যের সহস্র জায়গায় ফুটা করিয়া পালাইবার পথ নির্ম্মাণ করেন না। তিনি জানেন অনন্তকে ফাঁকি দেওয়া চলে না। সত্যই আছে, অনন্তকাল আছে অনন্তকাল থাকিবে, মিথ্যা আমার সৃষ্টি—আমি চোখ বুজিয়া সত্যের আলোক আমার নিকটে রুদ্ধ করিতে পারি, কিন্তু সত্যকে মিথ্যা করিতে পারি না। অর্থাৎ ফাঁকি আমাকে দিতে পারি কিন্তু সত্যকে দিতে পারি না।

মানুষ পশুদের ন্যায় নিজে নিজের একমাত্র সহায় নহে। মানুষ মানুষের সহায়। কিন্তু তাহাতেও তাহার চলে না। অনন্তের সহায়তা না পাইলে সে তাহার মনুষ্যত্বের সকল কার্য্য সাধন করিতে পারে না। কেবলমাত্র জীবন রক্ষা করিতে হইলে নিজের উপরেই নির্ভর করিয়াও চলিয়া যাইতে পারে, স্বত্বরক্ষা করিতে হইলে পরস্পরের সহায়তা আবশ্যক, আর প্রকৃতরূপ আত্মরক্ষা করিতে হইলে অনন্তের সহায়তার আশ্রয় করে। বলিষ্ঠ নির্ভীক স্বাধীন উদার আত্মা সুবিধা, কৌশল, আপাততঃ প্রভৃতি পৃথিবীর আবর্জ্জনার মধ্যে বাস করিতে পারে না। যেমন অস্বাস্থ্যজনক স্থানে পড়িলে ক্রমে সে মলিন দুর্ব্বল রুগ্ন হইয়া পড়িবেই। সাংসারিক সুবিধা সকল তাহার চতুর্দ্দিকে বল্মীকের স্তূপের মত উত্তরোত্তর উন্নত হইয়া উঠিবে বটে কিন্তু সে নিজে তাহার মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে ক্ষীণ হইতে থাকিবে।

বিবেচনা বিচার বুদ্ধির বল সামান্য। তাহা চতুর্দ্দিকে সংশয়ের দ্বারা আচ্ছন্ন, তাহা সংসারের প্রতিকূলতায় শুকাইয়া যায়—অকূলের মধ্যে তাহা ধ্রুবতারার ন্যায় দীপ্তি পায় না। এই জন্যই বলি, সামান্য সুবিধা খুঁজিতে গিয়া মনুষ্যত্বের ধ্রুব উপাদান গুলির উপর বুদ্ধির তীক্ষ্ণধার ক্ষুদ্র কাঁচি চালনা করিও না। নৌকা যত বড় হউক না, সামান্য ফুটা হইলেই তাহার দ্বারা আর কোন কাজ পাওয়া যায় না। তখন যাহা তোমাকে ভাসাইয়া রাখে তাহা তোমাকে ডুবায়।

ধর্ম্মের বল যাহা অনন্তের নির্ভর হইতে নিঃসৃত এই জন্যই সে আপাততঃ অসুবিধা, সম্প্রদায়ের গঞ্জন এমন কি মৃত্যুকে পর্যন্ত ডরায় না। ফলাফল পর্যন্তই বুদ্ধি বিচারের সীমা, মৃত্যু পর্যন্তই বুদ্ধি বিচারের সীমা—কিন্তু ধর্ম্মের সীমা কোথাও নাই।

অতএব এই অতি সামান্য বুদ্ধি বিবেচনা বিতর্ক হইতে কি একটি সমগ্র জাতি চিরদিনের জন্য পুরুষানুক্রমে বল পাইতে পারে! একটি মাত্র কূপ সমস্ত দেশের তৃষা নিবারণ হয় না তাহাও আবার গ্রীষ্মের উত্তাপে শুকাইয়া যায়। কিন্তু যেখানে চির-নিঃসৃত নদী প্রবাহিত সেখানে যে কেবলমাত্র তৃষা-

নিবারণের কারণ বর্ত্তমান তাহা নহে, সেখানে সেই নদী হইতে স্বাস্থ্যজনক বায়ু বহে, দেশের মলিনতা অবিশ্রাম ধৌত হইয়া যায়, ক্ষেত্র শস্যে পরিপূর্ণ হয়, দেশের মুখশ্রীতে সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। তেমনি বুদ্ধি-বলে কিছু দিনের জন্য সমাজ রক্ষা হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মবলে চিরদিন সমাজের রক্ষা হয়, আবার তাহার আনুসঙ্গিকস্বরূপে চতুর্দ্দিক হইতে সমাজের স্ফূর্ত্তি, সমাজের সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্য বিকাশ দেখা যায়। রুদ্ধ-গুহায় বাস করিয়া আমি বুদ্ধিবলে রসায়নতত্ত্বের সাহায্যে কোন মতে অক্সিজেন গ্যাস নির্ম্মাণ করিয়া কিছুকাল প্রাণ-ধারণ করিয়া থাকিতেও পারি কিন্তু মুক্ত বায়ুতে যে চিরপ্রবাহিত প্রাণ, চিরপ্রবাহিত স্ফূর্ত্তি চিরপ্রবাহিত স্বাস্থ্য ও আনন্দ আছে তাহা ত বুদ্ধিবলে গড়িয়া তুলিতে পারি না। সঙ্কীর্ণতা ও বৃহত্ত্বের মধ্যে যে কেবল মাত্র কম ও বেশী লইয়া প্রভেদ তাহা নহে, তাহার আনুষঙ্গিক ফলাফলের প্রভেদই গুরুতর।

ধর্ম্মের মধ্যেই সেই অত্যন্ত বৃহত্ত্ব আছে—যাহাতে সমস্ত জাতি একত্রে বাস করিয়াও তাহার বায়ু দূষিত করিতে পারে না। ধর্ম্ম অনন্ত আকাশের ন্যায়; কোটি কোটি মনুষ্য পশু পক্ষী হইতে কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত অবিশ্রাম নিশ্বাস ফেলিয়া তাহাকে কলুষিত করিতে পারে না। আর যাহাই আশ্রয় কর না কেন, কালক্রমে তাহা দূষিত ও বিষাক্ত হইবেই। কোনটা বা অল্প দিনে হয়, কোনটা বা বেশী দিনে হয়।

এই জন্যই বলিতেছি—মনুষ্যত্বের যে বৃহত্তর আদর্শ আছে, তাহাকে যদি উপস্থিত আবশ্যকের অনুরোধে কোথাও কিছু সঙ্কীর্ণ করিয়া দাও, তবে নিশ্চয়ই স্বরায় হউক আর বিলম্বেই হউক, তাহার বিশুদ্ধতা সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যাইবে। সে আর তোমাকে বল ও স্বাস্থ্য দিতে পারিবে না। শুদ্ধ সত্যকে যদি বিকৃত সত্য, সঙ্কীর্ণ সত্য, আপাততঃ সুবিধার সত্য করিয়া তোল তবে উত্তরোত্তর নষ্ট হইয়া সে মিথ্যায় পরিণত হইবে, কোথাও তাহার পরিত্রাণ নাই। কারণ, অসীমের উপর সত্য দাঁড়াইয়া আছে, আমারই উপর নহে, তোমারই উপর নহে, অবস্থাবিশেষের উপর নহে—সেই সত্যকে সীমার উপর দাঁড় করাইলে তাহার প্রতিষ্ঠাভূমি ভাঙ্গিয়া যায়—তখন বিসর্জ্জিত দেবপ্রতিমার তৃণকাষ্ঠের ন্যায় তাহাকে লইয়া যে-সে যথেচ্ছা টানা-ছেঁড়া করিতে পারে। সত্য যেমন অন্যান্য ধর্ম্মনীতিও তেমনি। যদি বিবেচনা কর পরার্থপরতা আবশ্যক, এই জন্যই তাহা শ্রদ্ধেয়; যদি মনে কর, আজ আমি অপরের সাহায্য করিলে, কাল সে আমার সাহায্য করিবে, এই জন্যই পরের সাহায্য করিব—তবে কখনই পরের ভালরূপ সাহায্য করিতে পার না, ও সেই পরার্থপরতার প্রবৃত্তি কখনই অধিক দিন টিঁকিবে না। কিসের বলেই বা টিঁকিবে। হিমালয়ের বিশাল হৃদয় হইতে উচ্ছ্বসিত হইতেছে বলিয়াই গঙ্গা এত দিন অবিচ্ছেদে আছে, এতদূর অবাধে গিয়াছে, তাই সে এত গভীর এত প্রশস্ত; আর এই গঙ্গা যদি আমাদের পরম সুবিধা-জনক কলের পাইপ হইতে বাহির হইত তবে তাহা হইতে বড় জোর কলিকাতা সহরের ধূলাগুলা কাদা হইয়া উঠিত আর কিছু হইত না। গঙ্গার জলের হিসাব রাখিতে হয় না; কেহ যদি গ্রীষ্মকালে দুই কলসী অধিক তোলে বা দুই অঞ্জলি অধিক পান করে তবে টানাটানি পড়ে না—আর কেবল মাত্র কল হইতে যে জল বাহির হয় একটু খরচের বাড়াবাড়ি পড়িলেই ঠিক আবশ্যকের সময় সে

তিরোহিত হইয়া যায়! যে সময়ে তৃষা প্রবল, রৌদ্র প্রখর, ধরণী শুষ্ক, যে সময়ে শীতল জলের আবশ্যক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সেই সময়েই সে দলের মধ্যে ভাঙিয়া উঠে, দলের মধ্যে ফুরাইয়া যায়।

বৃহৎ নিয়মে ক্ষুদ্র কাজ অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু সেই নিয়ম যদি বৃহৎ না হইত তবে তাহার দ্বারা ক্ষুদ্র কাজ টুকুও অনুষ্ঠিত হইতে পারিত না। একটি পাকা আপেল ফল যে পৃথিবীতে খসিয়া পড়িবে তাহার জন্য চরাচরব্যাপী ভারাকর্ষণ শক্তির আবশ্যক—একটি ক্ষুদ্র পালের নৌকা চলিবে কিন্তু পৃথিবীবেষ্টনকারী বাতাস চাই। তেমনি সংসারের ক্ষুদ্র কাজ চালাইতে হইবে এই জন্য অনন্ত-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মনীতির আবশ্যক।

সমাজ পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু তাহার প্রতিষ্ঠাস্থল ধ্রুব হওয়া আবশ্যক। আমরা জীবগণ চলিয়া বেড়াই কিন্তু আমাদের পায়ের নীচেকার জমিও যদি চলিয়া বেড়াইত, তাহা হইলে বিষম গোলযোগ বাধিত। বুদ্ধিবিচারগত আদর্শের উপর সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলে সেই চঞ্চলতার উপর সমাজ প্রতিষ্ঠা করা হয়. মাটির উপর পা রাখিয়া বল পাই না, কোন কাজই সতেজে করিতে পারি না। সমাজের অট্টালিকা নির্ম্মাণ করি কিন্তু জমির উপরে ভরসা না থাকাতে পাকা গাঁথুনী করিতে ইচ্ছা যায় না—সুতরাং ঝড় বহিলে তাহা সবসুদ্ধ ভাঙিয়া আমাদের মাথার উপরে আসিয়া পড়ে।

বিধার অনুরোধে সমাজের ভিত্তিভূমিতে যাঁহারা ছিদ্র খনন করেন, তাঁহারা অনেকে আপনাদিগকে বিজ্ঞ Practical বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহারা এমন প্রকাশ করেন যে, মিথ্যা কথা বলা মন্দ, কিন্তু Political উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথা বলিতে দোষ নাই। সত্য ঘটনা বিকৃত করিয়া বলা উচিত নহে, কিন্তু তাহা করিলে যদি কোন ইংরাজ অপদস্থ হয় তবে তাহাতে দোষ নাই। কপটতাচরণ ধর্ম্মবিরুদ্ধ, কিন্তু দেশের আবশ্যক বিবেচনা করিয়া বৃহৎ উদ্দেশ্যে কপটতাচরণ অন্যায় নহে। কিন্তু বৃহৎ কাহাকে বলে! উদ্দেশ্য যতই বৃহৎ হউক না কেন, তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর উদ্দেশ্য আছে। বৃহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে গিয়া বৃহত্তর উদ্দেশ্য ধ্বংস হইয়া যায় যে! হইতেও পারে, সমস্ত জাতিকে মিথ্যাচরণ করিতে শিখাইলে আজিকার মত একটা সুবিধার সুযোগ হইল—কিন্তু তাহাকে যদি দৃঢ় সত্যানুরাগ শিখাইতে তাহা হইলে সে যে চির দিনের মত মানুষ হইতে পারিত! সে যে নির্ভয়ে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিত, তাহার হৃদয়ে যে অসীম বল জন্মাইত। তাহা ছাড়া, সংসারের কার্য্য আমাদের অধীন নহে। আমরা যদি কেবলমাত্র একটি সূচি অনুসন্ধান করিবার জন্য দীপ জ্বালাই সে সমস্ত ঘর আলো করিবে, তেমনি আমরা যদি একটি সূচি গোপন করিবার জন্য আলো নিবাইয়া দিই, তবে তাহাতে সমস্ত ঘর অন্ধকার হইবে। তেমনি আমরা যদি সমস্ত জাতিকে কোন উপকার সাধনের জন্য মিথ্যাচরণ শিখাই তবে সেই মিথ্যাচরণ যে আমার ইচ্ছার অনুসরণ করিয়া কেবলমাত্র উপকারটুকু করিয়াই অন্তর্হিত হইবে তাহা নহে, তাহার বংশ সে স্থাপনা করিয়া যাইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বৃহৎ একটি মাত্র উদ্দেশ্যের মধ্যে বদ্ধ থাকে না, তাহার দ্বারা সহস্র উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। সূর্য্যকিরণ উত্তাপ দেয়, আলোক দেয়, বর্ণ দেয়, জড় উদ্ভিদ্ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সকলেরই উপরে তাহার সহস্র প্রকারের প্রভাব কার্য্য করে;

স্ত্রী পুত্র পরিবার ভাবের নিকট ক্ষুদ্র হইয়া যায়।

আমাদের জাতি নূতন হাঁটিতে শিখিতেছে, এ সময়ে বৃদ্ধ জাতির দৃষ্টান্ত দেখিয়া ভাবের প্রতি ইহার অবিশ্বাস জন্মাইয়া দেওয়া কোন মতেই কর্ত্তব্য বোধ হয় না। এখন ইতস্ততঃ করিবার সময় নহে। এখন ভাবের পতাকা আকাশে উড়াইয়া নবীন উৎসাহে জগতের সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে। এই বাল্য-উৎসাহের স্মৃতিই বৃদ্ধ সমাজকে সতেজ করিয়া রাখে। এই সময়ে ধর্ম্ম, স্বাধীনতা, বীরত্বের যে একটি অখণ্ড পরিপূর্ণ ভাব হৃদয়ে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে, তাহারই সংস্কার বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। এখনি যদি হৃদয়ের মধ্যে ভাঙ্গা-চোরা টলমল অসম্পূর্ণ প্রতিমা, তবে উত্তরকালে তাহার জীর্ণ ধূলি মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে।

জীবনের আদর্শকে সীমাবদ্ধ করিয়া কখনই জাতির উন্নতি হইবে না। উদারতা নহিলে কখনই মহত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হইবে না। মুখশ্রীতে যে একটি দীপ্তির বিভাস হয়, হৃদয়ের মধ্যে যে একটি প্রতিভার বিকাশ হয়, সমস্ত জীবন যে সংসার-তরঙ্গের মধ্যে অটল অচলের ন্যায় মাথা তুলিয়া জাগিয়া থাকে, সে কেবল একটি বিপুল উদারতাকে আশ্রয় করিয়া। সঙ্কোচের মধ্যে গেলেই রোগে জীর্ণ, শোকে শীর্ণ, ভয়ে ভীত, দাসত্বে নতশির, অপমানে নিরুপায় হইয়া থাকিতে হয়, চোখ তুলিয়া চাহিতে পারা যায় না, মুখ দিয়া কথা বাহির হয় না, কাপুরুষতার সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়। তখন মিথ্যাচরণ, কপটতা, তোষামোদ জীবনের সম্বল হইয়া পড়ে।

সমাপ্ত

আলোচনা।

ডুব দেওয়া।

ছোট বড়।

ডুবিয়া যাওয়া কথাটা সচরাচর ব্যবহার হইয়া থাকে! কিন্তু ডুবিয়া মরিবার ক্ষমতা ও অধিকার কয়জন লোকেরই বা আছে! কথাটার প্রকৃত ভাবই বা কে জানে! কবিরা, ভাবুকেরা, ভক্তেরা কেবল বলেন ডুবিয়া যাও, ইতরলোকেরা চারিদিকে চাহিয়া কঠিন মাটিতে পা দিয়া অবাক্ হইয়া বলে, ডুবিব কোন্ খানে, ডুবিবার স্থান কোথায়!

জলাশয় ছাড়া যখন্ আর কিছুতে মগ্ন হইবার কথা হয়, তখন লোকে সেটাকে অলঙ্কার বলিয়া গ্রহণ করে—সেই জন্য সে কথা শুনিয়াও শোনে না, মুখে উচ্চারণ করিয়াও বোঝে না, এবং ও-বিষয়ের স্পষ্ট একটা ভাব মনে আনা নিতান্ত অনাবশ্যক মনে করে। কিন্তু আমি বলিতেছি কি, ও শব্দটাকে অলঙ্কার বলিয়া নাই মনে করিলাম; মনে করা যাক্ না কেন, যাহা বলা হইতেছে ঠিক তাহাই বুঝাইতেছে! সকলে নিশ্চিন্ত হইয়া বলিতেছেন, "আমরা ত আর জলে পড়ি নাই" কিন্তু যখন কাপড় ভিজিবার বা আশু বিপদের কোন আশঙ্কা নাই তখন একবার মনেই করা যাক্না কেন যে "হাঁ, আমরা জলেই পড়িয়াছি" দেখি না, কোথায় যাওয়া যায়!

এ জগতের সকল বস্তুরই দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ এই তিন প্রকারের আয়তন দেখা যায়। কিন্তু এই সকল আয়তনের অতীত আর-এক প্রকার আয়তন তাহাদের আছে, তাহাকে কি বলিব খুঁজিয়া পাইতেছি না। তাহা অসীমায়তনতা বা আয়তনের অসীম অভাব।

একটি বালুকণাকে আমরা যদি জড়ভাবে দেখিতে পাই, তাহা কতকগুলি পরমাণুর

সমষ্টি। কিন্তু বাস্তবিকই কি তাই! তাহাকে কতকগুলি পরমাণু সমষ্টি বলিলেই কি তাহার সমস্ত নিঃশেষে বলা হইল, তাহার আর কিছুই বাকী রহিল না! তাহা কি অনন্ত জ্ঞানের সমষ্টি নহে, অনন্ত ইতিহাস অর্থাৎ অনন্ত সময়ের সমষ্টি নহে! তাহার মধ্যে যতই প্রবেশ কর ততই প্রবেশ করা যায় না কি! তাহার বিষয় জানিয়া শেষ করিবার যো নাই—যতই জান ততই আরো জানার আবশ্যক হয়—জানিয়া জানিয়া অবশেষে যখন শ্রান্ত হইয়া সমুদয় জ্ঞানপুঞ্জকে অতি বৃহৎ স্তূপাকৃত করিয়া তুলা গেল তখনও দেখা গেল বালুর শেষ হইল না। অতএব নিতান্ত জড়ভাবে না দেখিয়া মানসিক ভাবে দেখিলে বালুকার আকার আয়তন কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়, জানা যায় যে তাহা অসীম।

আমরা যাহাকে সচরাচর ক্ষুদ্রত্ব বা বৃহত্ত্ব বলি, তাহা কোন কাজের কথা নহে। আমাদের চক্ষু যদি অণুবীক্ষণের মত হইত তাহা হইলেই এখন যাহাকে ক্ষুদ্র দেখিতেছি, তখন তাহাকেই অতিশয় বৃহৎ দেখিতাম। এই অণুবীক্ষণতা শক্তি কল্পনায় যতই বাড়াইতে ইচ্ছা কর ততই বাড়িতে পারে। অত গোলে কাজ কি, পরমাণুর বিভাজ্যতার ত আর কোথাও শেষ নাই; অতএব একটি বালুকণার মধ্যে অনন্ত পরমাণু আছে, একটি পর্ব্বতের মধ্যেও অনন্ত পরমাণু আছে, ছোট বড় আর কোথায় রহিল! একটি পর্ব্বতও যা পর্ব্বতের প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম অংশও তাই; কেহই ছোট নহে, কেহই বড় নহে, কেহই অংশ নহে সকলেই সমান। বালুকণা কেবল যে জ্ঞেয়তায় অসীম, দেশে অসীম তাহা নহে, তাহা কালেও অসীম, তাহারই মধ্যে তাহার অনন্ত ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান একত্রে বিরাজ করিতেছে। তাহাকে বিস্তার করিলে দেশেও তাহার শেষ পাওয়া যায় না, তাহাকে বিস্তার করিলে কালেও তাহার শেষ পাওয়া যায় না। অতএব একটি বালুকা অসীম দেশ অসীম কাল অসীম শক্তি সুতরাং অসীম জ্ঞেয়তার সংহত কণিকা মাত্র॥ চোখে ছোট দেখিতেছি বলিয়া একটা জিনিষ সীমাবদ্ধ নাও হইতে পারে। হয়ত ছোট বড়র উপর অসীমতা কিছু মাত্র নির্ভর করে না। হয়ত ছোটও যেমন অসীম হইতে পারে বড়ও তেমনি অসীম হইতে পারে। হয়ত অসীমকে ছোটই বল আর বড়ই বল সে কিছুই গায়ে পাতিয়া লয় না।

"যাহা কিছু, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনন্ত সকলি,
বালুকার কণা, সেও অসীম অপার,
তারি মধ্যে বাঁধা আছে অনন্ত আকাশ—
কে আছে, কে পারে তারে আয়ত্ত করিতে।
বড় ছোট কিছু নাই, সকলি মহৎ।"

যাহা বলিলাম তাহা কিছুই বুঝা গেল না, কেবল কতকগুলা কথা কহা গেল মাত্র। কিন্তু কোন্ কথাটাই সত্য; বালুকা সম্বন্ধে যে কথাই বলা হইয়া থাকে তাহাতে বালুকার যথার্থ স্বরূপ কিছুই বুঝা যায় না, এরূপ কথা মুখস্থ করিয়া রাখা যায়। ইহাতেও কিছু ভাল বুঝা গেল না, কেবল একটা বুঝিবার প্রয়াস প্রকাশ পাইল মাত্র।

বিজ্ঞ লোকেরা তিরস্কার করিয়া বলিবেন, যাহা বুঝা যায় না, তাহার জন্য এত প্রয়াসই বা কেন। কিন্তু তাঁহারা কোথাকার কে! তাঁহাদের কথা শোনে কে। তাঁহারা কোন্ দিন ঝরণাকে তিরস্কার করিতে যাইবেন, সে উপর হইতে নীচে পড়ে কেন! কোন্ দিন ধোঁয়ার প্রতি আইনজারি করিবেন সে যেন নীচে হইতে উপরে না ওঠে।

ডুবিবার ক্ষমতা।

যাহা হউক আর কিছু বুঝি না বুঝি এটা বোঝা যায় জগতের সর্ব্বত্রই অতল সমুদ্র। মহিষের মত পাঁকে গা ডুবাইয়া নাকটুকু জলের উপরে বাহির করিয়া জগতের তলা পাইয়াছি বলিয়া যে নিশ্চিন্ত ভাবে জড়ের মত নিদ্রা দিব তাহার যো নাই। এক এক জন লোক আছেন তাঁহাদের কিছুই যথেষ্ট মনে হয় না—খানিকটা গিয়াই সমস্ত শেষ হইয়া যায় এ বলিয়া উঠেন, এই বইত নয়! এই ক্ষুদ্রেরা মনে করেন, জগতের সর্ব্বত্রই তাঁহাদের হাঁটুজল, ডুবজল কোন খানেই নাই। জগতের সকলেরই উপরে ইহারা মাথা তুলিয়া আছেন—ঐ অভিমানী মাথাটা সবসুদ্ধ ডুবাইয়া দিতে পারেন, এমন স্থান পাইতেছেন না। অস্থির হইয়া চারিদিকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন। ইঁহারা যে জগতের অসম্পূর্ণতা ও নিজের মহত্ত্ব লইয়া গর্ব্ব করিতেছেন ইঁহাদের গর্ব্ব ঘুচিয়া যায় যদি জানিতে পারেন ডুব দিবার ক্ষমতা ও অধিকার সকলের নাই। বিশেষ গৌরব থাকা চাই তবে মগ্ন হইতে পারিবে। সোলা যখন জলের চারদিকে অসন্তুষ্ট ভাবে ভাসিয়া বেড়ায় তখন কি মনে করিতে হইবে কোথাও তাহার ডুব দিবার উপযোগী স্থান নাই। সে তাই মনে করুক কিন্তু জলের গভীরতা তাহাতে কমিবে না।

"আঁখি মুদে জগতেরে বাহিরে ফেলিয়া,
অসীমের অন্বেষণে কোথা গিয়েছিনু ”

ডুবিবার স্থান।

যখন একটা কুকুর একটি গোলাপ ফুল দেখে, তখন তাহার দেখা অতি শীঘ্রই ফুরাইয়া যায়—কারণ ফুলটি কিছু বড় নহে। কিন্তু এক জন ভাবুক যখন সেই ফুলটি দেখেন তখন তাঁহার দেখা শীঘ্র ফুরায় না, যদিও সে ফুলটি দেড় ইঞ্চি অপেক্ষা আয়ত নহে। কারণ সে গোলাপ ফুলের গভীরতা নিতান্ত সামান্য নহে। যদিও তাহাতে দুই ফোঁটার বেশী শিশির ধরে না, তথাপি হৃদয়ের প্রেম তাহাকে যতই দাও না কেন, তাহার ধারণ করিবার স্থান আছে। সে ক্ষুদ্রকায় বলিয়া যে তোমার হৃদয়কে তাহার বক্ষঃস্থিত কীটের মত গোটাকতক পাপড়ির মধ্যে কারারুদ্ধ করিয়া রাখে তাহা নহে। সে আরো তোমাকে এমন এক নূতন বিচরণের স্থানে লইয়া যায়, যেখানে এত বেশী স্বাধীনতা যে একপ্রকার অপরিচ্ছিন্ন অনির্ব্বচনীয়তার মধ্যে হারা হইয়া যাইতে হয়। তখন এক প্রকার অস্ফুট দৈববাণীর মত হৃদয়ের মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায় যে, সকলেরই মধ্যে অসীম আছে; যাহাকেই তুমি ভাল বাসিবে সেই তোমাকে তাহার অসীমের মধ্যে লইয়া যাইবে, সেই তোমাকে তাহার অসীম দান করিবে। কে না জানেন যাহাকে যত ভাল বাসা যায় সে ততই বেশী হইয়া উঠে —নহিলে প্রেমিক কেন বলিবেন "জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল ” একটা মানুষ যত বড়ই হউক না কেন, তাহাকে দেখিতে কিছু বেশীক্ষণ লাগে না—কিন্তু আজন্ম কাল দেখিয়াও যখন দেখা ফুরায় না তখন সে না জানি কত বড় হইয়া উঠিয়াছে! ইহার অর্থ আর কিছুই নহে, অনুরাগের প্রভাবে প্রেমিক একজন মানুষের অন্তরস্থিত

অসীমের মধ্যে প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন, সেখানে সে মানুষের আর অন্ত পাওয়া যায় না; হৃদয় যতই দাও ততই সে গ্রহণ করে, যত দেখ ততই নূতন দেখা যায়, যত তোমার ক্ষমতা আছে ততই তুমি নিমগ্ন হইতে পার। এই জন্যই যথার্থ অনুরাগের মধ্যে একপ্রকার ব্যাকুলতা আছে। সে এতখানি পায় যে তাহা প্রাণ ভরিয়া আয়ত্ত করিতে পারে না—তাহার এত বেশী তৃপ্তি বর্ত্তমান যে, সে-তৃপ্তিকে সে সর্ব্বতোভাবে অধিকার করিতে পারে না ও তাহা সুমধুর অতৃপ্তিরূপে চতুর্দ্দিক পূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতে থাকে। যেখানে অনুরাগ নাই সেই খানেই সীমা, সেই খানেই মহা অসীমের দ্বার রুদ্ধ, সেইখানেই চারিদিকে লৌহের ভিত্তি, কারাগার। জগৎকে যে ভাল বাসিতে শিখে নাই, সে ব্যক্তি অন্ধকূপের মধ্যে আট্‌কা পড়িয়াছে। সে মনে করিতেও পারে না এই টুকুর বাহিরেও কিছু থাকিতে পারে। তাহার নিজের পায়ের শিকলিটার ঝম্ ঝম্ শব্দই তাহার জগতের একমাত্র সঙ্গীত। সে কল্পনাও করিতে পারে না কোথাও পাখী ডাকে, কোথাও সূর্য্যের কিরণ বিকীরিত হয়।

অনুরাগেই যে যথার্থ স্বাধীনতা তাহার একটা প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। সম্পূর্ণ নূতন লোকের মধ্যে গিয়া পড়িলে আমরা যেন নিশ্বাস লইতে পারি না, হাত পা ছড়াইতে সঙ্কোচ হয়, যে কেহ লোক থাকে সকলেই যেন বাধার মত বিরাজ করিতে থাকে, তাহারা সদয় ব্যবহার করিলেও সকল সময়ে মনের সঙ্কোচ দূর হয় না। তাহার কারণ, এক মাত্র অনুরাগের অভাব বশতঃ আমরা তাহাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে পাই না, যেখানে স্বাধীনতার যথার্থ বিচরণ-ভূমি সে স্থান আমাদের নিকটে রুদ্ধ। আমরা কেবলি তাহাদের নাকে চোখে মুখে, আচারে ব্যবহারে, নূতন ধরণের কথায় বার্ত্তায় হুঁচট ঠোকর ধাক্কা খাইতে থাকি।

পুরাতনের নূতনত্ব।

অতএব দেখা যাইতেছে জগতের সমস্ত দৃশ্যের মধ্যে অনন্ত অদৃশ্য বর্ত্তমান। নিত্যনূতন নামক যে শব্দটা কবিরা ব্যবহার করিয়া থাকেন সেটা কি নিতান্ত একটা কথার কথা, একটা আলঙ্কারিক উক্তি মাত্র? তাহার মধ্যে গভীর সত্য আছে। অসীম যতই পুরাতন হউক্ না কেন তাহার নূতনত্ব কিছুতেই ঘুচে না। সে যতই পুরাতন হইতে থাকে ততই বেশী নূতন হইতে থাকে, সে দেখিতে যতই ক্ষুদ্র হউক্ না কেন, প্রত্যহই তাহাকে অত্যন্ত অধিক করিয়া পাইতে থাকি। এই নিমিত্ত যথার্থ যে প্রেমিক সে আর নূতনের জন্য সর্ব্বদা লালায়িত নহে, শুদ্ধ তাহাই নয়, পুরাতন ছাড়িয়া সে থাকিতে পারে না। কারণ নূতন অতি ক্ষুদ্র, পুরাতন অতি বৃহৎ। পুরাতন যতই পুরাতন হইতে থাকে ততই তাহার অসীম বিস্তার প্রেমিকের নিকট অবারিত হইতে থাকে, হৃদয় ততই তাহার মর্ম্মস্থানের অভিমুখে ক্রমাগত ধাবমান হইতে থাকে, ততই জানিতে পারা যায় হৃদয়ের বিচরণক্ষেত্র অতি বৃহৎ, হৃদয়ের স্বাধীনতার কোথাও বাধা নাই। যে ব্যক্তি একবার এই পুরাতনের গভীরতার মধ্যে মগ্ন হইতে পারিয়াছে, এই সাগরের হৃদয়ে সন্তরণ করিতে পারিয়াছে সে কি আর ছোট ছোট ব্যাংগুলার আনন্দ-কল্লোল শুনিয়া প্রতারিত হইয়া নূতন নামক সঙ্কীর্ণ কূপটার মধ্যে আপনাকে বদ্ধ করিতে পারে।

সাম্য।

এ জগতে সকলি যে সমান, কেহ য ছোট বড় নহে, তাহা প্রেমের চক্ষে ধরা পড়িল। এই নিমিত্ত যখন দেখা যায় যে, একজন লোক কুৎসিত মুখের দিকে অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া আছে, তখন আর আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই—আর একজনকে দেখিতেছি সে সুন্দর মুখের দিকে ঠিক তেমনি করিয়াই চাহিয়া আছে, ইহাতেও আশ্চর্য্য হইবার কোন কথা নাই। অনুরাগের প্রভাবে উভয়ে মানুষের এমন স্থানে গিয়া পৌঁছিয়াছে, যেখানে সকল মানুষই সমান, যেখানে কাহারও সহিত কাহারো একচুল ছোটবড় নাই, যেখানে সুন্দর কুৎসিত প্রভৃতি তুলনা আর খাটেই না। সীমা এবং তুলনীয়তা কেবল উপরে, একবার যদি ইহা ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারত দেখিবে সেখানে সমস্তই একাকার, সমস্তই অনন্ত। এতবড় প্রাণ কাহার আছে সেখানে প্রবেশ করিতে পারে, বিশ্বচরাচরের মহাসমুদ্রে অসীম ডুব ডুবিতে পারে। প্রেমে সেই সমুদ্রে সন্তরণ করিতে শিখায়—যাহাকেই ভালবাস না কেন তাহাতেই সেই মহা স্বাধীনতার ন্যূনাধিক আস্বাদ পাওয়া যায়! এই যে শূন্য অনন্ত আকাশ ইহাও আমাদের কাছে সীমবদ্ধরূপে প্রকাশ পায়, মনে হয় যেন একটি অচল কঠিন সুগোল নীল মণ্ডপ আমাদিগকে ঘেরিয়া আছে; যেন খানিকদূর উঠিলেই আকাশের ছাতে আমাদের মাথা ঠেকিবে। কিন্তু জানা থাকিলে দেখিতাম ঐ নীলিমা আমাদিগকে বাধা দেয় না, ঐ সীমা আমাদের চোখেরই সীমা; যদিও মণ্ডপের ঊর্দ্ধে আরও মণ্ডপ দেখিতাম, ঊর্দ্ধে উঠিলে আবার আর-একটা মণ্ডপ দেখিতাম, তথাপি জানিতে পারিতাম যে, উহারা আমাদিগকে মিথ্যা ভয় দেখাইতেছে, উহারা কেবল ফাঁকি মাত্র। আমাদের স্বাধীনতার বাধা আমাদের চক্ষু, কিন্তু বাস্তবিক বাধা কোথাও নাই।

স্বদেশ

আমার একজন বন্ধু দার্জিলিং কাশ্মীর প্রভৃতি নানা রমণীয় দেশ ভ্রমণ করিয়া আসিয়া বলিলেন—বাঙ্গালার মত কিছুই লাগিল না। কথাটা শুনিয়া অধিকাংশ লোকই হাসিবেন। কিন্তু হাসিবার বিশেষ কারণ দেখিতেছি না। বরং যাঁহারা বলেন বাঙ্গালায় দেখিবার কিছুই নাই, সমস্তটাই প্রায় সমতল স্থান, পাহাড় পর্ব্বত প্রভৃতি বৈচিত্র্য কিছুই নাই, দেশটা দেখিতে ভালই নহে, তাঁহাদের কথা শুনিলেই বাস্তবিক আশ্চর্য্য বোধ হয়। বাঙ্গালা দেশ দেখিতে ভাল নয়। এমন মায়ের মত দেশ আছে। এত কোল ভরা শস্য, এমন শ্যামল পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য এমন স্নেহধারাশালিনী ভাগী রথীপ্রাণা কোমলহৃদয়া তরুলতাদের প্রতি এমনতর অনির্ব্বচনীয় করুণাময়ী মাতৃভূমি কোথায়। একজন বিদেশী আসিয়া যাহা বলে শোভা পায়, কিন্তু আজন্মকাল ইঁহার কোলে যে মানুষ হইয়াছে সেও ইঁহার সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় না। সে ব্যক্তি যে প্রেমিক নহে ইহা নিশ্চয়ই। সুতরাং বাঙ্গালা দেশে সে বাস করে মাত্র, কিন্তু বাঙ্গালা দেশ সে দেখেই নি—বাঙ্গালা দেশে সে কখনো যায় নি, ম্যাপে দেখিয়াছে মাত্র। এত দেশে গিয়াছি এত নদী দেখিয়াছি কিন্তু বাঙ্গালার গঙ্গা যেমন এমন নদী আর কোথাও দেখি

নাই। কিন্তু কেন? অমুক দেশে একটা নদী আছে সেটা গঙ্গার চেয়ে চওড়া—অমুক সাগরে একটা নদী পড়িয়াছে সেটা গঙ্গার চেয়ে দীর্ঘ—অমুক স্থানে একটা নদী বহিতেছে, গঙ্গার চেয়ে তাহার তরঙ্গ বেশী। ইত্যাদি।

কেন।

এই কেন লইয়াই ত যত মারামারী। যে ভালবাসে সে কেনর উত্তর দিতে পারে না। তুমি তর্ক করিলে বাঙ্গালার চেয়ে কাশ্মীর ভাল দেশ হইয়া দাঁড়ায় কিন্তু তবু আমার কাছে কেন বাঙ্গালাই ভাল দেশ। তার্কিক বলেন, বাল্যাবধি বাঙ্গালা দেশটা তোমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, তাই ভাল লাগিতেছে। ঠিক কথা। কিন্তু অভ্যাস হইয়া যাওয়ার দরুণ ভাল লাগিবার কি কারণ হইতে পারে। তাঁহাদের কথার ভাবটা এই যে বাঙ্গালা দেশে আসলে যাহা নাই, আমি তাহাই যেন নিজের তহবিল হইতে দেশকে অর্পণ করি। এ কথা কোন কাজের নহে। প্রকৃত কথা এই যে, প্রেম একটি সাধনা। ভাল বাসিয়া আমরা যতই দেশের পানে চাহিয়া দেখিতে থাকি দেশ সদয় হইয়া তাহার প্রাণের মধ্যে আমাদিগকে লইয়া যান—কারণ সকলেরই প্রাণ আছে। ভাল বাসিলে সকলেই তাহার প্রাণে ডাকিয়া লয়। বাহ্য আকার-আয়তনের মধ্যে স্বাধীনতা নাই, তাহা সীমাবিশিষ্ট—আকার আয়তনের অতীত প্রাণের মধ্যেই স্বাধীনতা—সেখানে পায়ে কিছু ঠেকে না, চোখে কিছু পড়ে না শরীরে কিছুই বাধে না—কেবল এক প্রকার অনির্বচনীয় স্বাধীনতার আনন্দ। ইহার কাছে কি আর "কেন" ঘেঁসিতে পারে! স্বদেশে আমাদের হৃদয়ের কি স্বাধীনতা! স্বদেশে আমাদের কতখানি জায়গা! কারণ স্বদেশের শরীর ক্ষুদ্র স্বদেশের হৃদয় বৃহৎ। স্বদেশের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছি। স্বদেশের প্রত্যেক গাছপালা আমাদের চোখে ঠেকে না আমরা একেবারেই তাহার ভিতরকার ভাব তাহার হৃদয়পূর্ণ মাধুরী দেখিতে পাই। এই সৌন্দর্য্য এই স্বাধীনতা সকল দেশের লোকেই সমান উপভোগ করিতে পারেন। ইহার জন্য ভূগোল বিবরণ পড়িয়া রেলোয়ের টিকিট কিনিয়া দূরদূরান্তরে যাইবার প্রয়োজন নাই।

এক কাঠা জমি।

একদল লোক আছেন তাঁহারা যেখানে যতই পুরাতন হইতে থাকেন সেই স্থানে ততই অন্তরে অন্তরে বদ্ধ হইতে থাকেন। আর এক দল লোক আছেন তাঁহাদিগকে অভ্যাস সূত্রে কিছুতেই বাঁধিতে পারে না, দশ বৎসর যেখানে আছেন সেও তাঁহার পক্ষে যেমন, আর একদিন যেখানে আছেন, সেও তাঁহার পক্ষে তেমনি। লোকে হয় ত বলিবে তিনিই যথার্থ দূরদর্শী, অপক্ষপাতী কেবল মাত্র সামান্য অভ্যাসের দরুণ তাঁহার নিকট কোন জিনিষের একটা মিথ্যা বিশেষত্ব প্রতীতি হয় না। বিশ্বজনীনতা তাঁহারই সম্ভবে। ঠিক উল্টা কথা। বিশ্বজনীনতা তাঁহারই সম্ভবে না। বিশ্বের প্রত্যেক বিষয় প্রত্যেক মানুষেরই নিজ অর্জ্জন। একদিনে তাহা অর্জ্জন হয় না। ক্রমাগত অধিকার বাড়িতে থাকে। যিনি দশবৎসরে এক স্থানের কিছুই অধিকার করিতে পারিলেন না তিনি বিশ্বকে অধিকার করিলেন কি করিয়া! বিশ্ব

সর্ব্বত্রই অসীম গভীর এবং অসীম প্রশস্ত। অতএব বিশ্বের এক কাঠা জমিকে যথার্থ ভাল-বাসিতে গেলে বিশ্ব-জনীনতা থাকা চাই।

জগৎ মিথ্যা।

যাঁহারা বলেন জগৎ মিথ্যা, তাঁহাদের কথা এক হিসাবে সত্য এক হিসাবে সত্য নয়। ব্যক্তির হইতে জগৎকে যেরূপ দেখা যায় তাহা মিথ্যা। তাহার উপরে ঠিক বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না।

ঈথর কাঁপিতেছে আমি দেখিতেছি আলো; বাতাসে তরঙ্গ উঠিতেছে আমি শুনিতেছি শব্দ; ব্যবচ্ছেদবিশিষ্ট অতি সূক্ষ্মতম পরমাণুর মধ্যে আকর্ষণ বিকর্ষণ চলিতেছে আমি দেখিতেছি বৃহৎ দৃঢ় ব্যবচ্ছেদহীন বস্তু। বস্তুবিশেষ কেনই যে বস্তুবিশেষ রূপে প্রতিভাত হয় আর-কিছু রূপে হয় না, তাহার কোন অর্থ পাওয়া যায় না। আশ্চর্য্য কিছুই নাই, আমাদের নিকটে যাহা বস্তুরূপে প্রতিভাত হইতেছে, আর এক দল নূতন জীবের নিকটে তাহা কেবল শব্দরূপে প্রতীত হইতেছে। আমাদের কাছে বস্তু দেখা ও তাহাদের কাছে শব্দ শোনা একই। এমনও আশ্চর্য্য নহে, আর এক নূতন জীব দৃষ্টি শ্রুতি ঘ্রাণ স্বাদ স্পর্শ ব্যতীত আর এক নূতন ইন্দ্রিয় শক্তি দ্বারা বস্তুকে অনুভব করে তাহা আমাদের কল্পনার অতীত। বস্তুকে ক্রমাগত বিশ্লেষ করিতে গেলে তাহাকে ক্রমাগত সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মে পরিণত করা যায়—অবশেষে এমন হইয়া দাঁড়ায় আমাদের ভাষায় যাহার নাম নাই, আমাদের মনে যাহার ভাব নাই। মুখে বলি তাহা অনংখ্য শক্তির খেলা, কিন্তু শক্তি বলিতে আমরা কিছুই বুঝি না। অতএব আমরা যাহা দেখিতেছি শুনিতেছি, তাহার উপরে অনন্ত বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। কাজের সুবিধার জন্য রফা করিয়া কিছু দিনের মত তাহাকে এই আকারে বিশ্বাস করিবার একটা বন্দোবস্ত হইয়াছে মাত্র; আবার অবস্থা পরিবর্ত্তনে এ চুক্তি ভাঙিলে তাহার জন্য আমরা কিছুমাত্র দায়িক হইব না।

তুলনায় অরুচি।

এইখানে প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলিবার ইচ্ছা হইতেছে, এই বেলা সেই কথাটা লিখিয়া লই, পুনশ্চ পূর্ব্বকথা উত্থাপন করা যাইবে। অনেক লোক আছেন তাঁহারা কথা বার্ত্তাতেই কি আর কবিতাতেই কি, তুলনা বর্দাস্ত করিতে পারেন না তুলনাকে তাঁহারা নিতান্ত একটা ঘরগড়া মিথ্যারূপে দেখেন; নিতান্ত অনুগ্রহপূর্ব্বক ওটাকে তাঁহারা মানিয়া লন মাত্র। তাঁহারা বলেন যেটা যাহা সেটাকে তাহাই বল, সেটাকে আবার আর-একটা বলিলে তাহাকে একটা অলঙ্কার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি, কিন্তু তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। ইহঁারা কঠিন নৈয়ায়িক লোক, ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে সকল কথা বাজাইয়া লন, কবিতার তুলনা উপমা প্রভৃতি ন্যায় শাস্ত্রের নিকট যাচাই করিয়া তবে গ্রহণ করেন। অতএব ইহাঁদের কাছে শাস্ত্র অনুসারেই কথা কহা যাক। জগৎসংসারে কোন্ জিনিষটা একেবারে স্বতন্ত্র, কোন্ জিনিষটা একবড় প্রতাপান্বিত যে কোন-কিছুর সহিত কোন সম্পর্ক রাখে না? জড়বুদ্ধিরা সকল জিনিষকেই পৃথক্ করিয়া দেখে, তাহাদের কাছে সবই স্বপ্রধান। বুদ্ধির যতই উন্নতি হয় ততই সে ঐক্য দেখিতে পায়। বিজ্ঞান বল, দর্শন বল, ক্রমাগত একের প্রতি ধাবমান হইতেছে।

সহজচক্ষে যাহাদের মধ্যে আকাশ পাতাল, তাহারাও অভেদাত্মা হইয়া দাঁড়াইতেছে। এ বিশ্বরাজ্যে বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক ঐক্য, দর্শন দার্শনিক ঐক্য দেখাইতেছে, কবিতা কি অপরাধ করিল? তাহার কাজ জগতের সৌন্দর্য্যগত ভাবগত ঐক্য বাহির করা। তুলনার সাহায্যে কবিতা তাহাই করে; তাহাকে যদি তুমি সত্য বলিয়া শিরোধার্য্য না কর, কল্পনার ছেলেখেলা মাত্র মনে কর তাহা হইলে কবিতাকে অন্যায় অপমান করা হয়। কবিতা যখন বলে, তারাগুলি আকাশে চলিতে চলিতে গান গাহিতেছে—যথা

> There's not the smallest orb which thou beholdest
> But in his motion like an angel sings.

তখন তুমি অনুগ্রহ পূর্ব্বক শুনিয়া গিয়া কবিকে নিতান্তই বাধিত কর। মনে মনে বলিতে থাক, তারা চলিতেছে ইহা স্বীকার করি, কিন্তু কোথায় চলা আর কোথায় গান গাওয়া! চলাটা চোখে দেখিবার বিষয় আর গান গাওটা কাণে শুনিবার—তবে অলঙ্কারের হিসাবে মন্দ হয় নাই। কিন্তু হে তর্কবাচস্পতি, বিজ্ঞান যখন বলে, বাতাসের তরঙ্গ লীলাই ধ্বনি, তখন তুমি কেন বিনা বাক্যব্যয়ে অম্লান বদনে কথাটাকে গলাধঃকরণ করিয়া ফেল! কোথায় বাতাসের বিশেষ একরূপ কম্পন নামক গতি, আর কোথায় আমাদের শব্দ শুনিতে পাওয়া! সচরাচর বাতাসের গতি আমাদের স্পর্শের বিষয় কিন্তু শব্দে ও স্পর্শে যে ভাই-ভাই সম্পর্ক ইহা কে জানিত! বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করিয়া জানিতেন, কবিরা হৃদয়ের ভিতর হইতে জানিতেছেন। কবিরা জানিতেন, হৃদয়ের মধ্যে এমন একটা জায়গা আছে যেখানে শব্দস্পর্শ ঘ্রাণ সমস্ত একাকার হইয়া যায়। তাহারা যতক্ষণ বাহিরে থাকে ততক্ষণ স্বতন্ত্র। তাহারা নানা দিক্ হইতে নানা দ্রব্য স্বতন্ত্র ভাবে উপার্জ্জন করিয়া আনে, কিন্তু হৃদয়ের অন্তঃপুরের মধ্যে সমস্তই একত্রে জমা করিয়া রাখে, এবং এমনি গলাগলি করিয়া থাকে যে কোন্‌টি যে কে চেনা যায় না। সেখানে গন্ধকে স্পৃশ্য বলিতে আপত্তি নাই, রূপকে গান বলিতে বাধে না। পূর্ব্বেই ত বলা হইয়াছে, যেখানে গভীর সেখানে সমস্তই একাকার। সেখানে হাসিও যা কান্নাও তা, সেখানে সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা।

জ্ঞানে যাহারা বর্ব্বর তাহারা যেমন জগতে বৈজ্ঞানিক ঐক্য দার্শনিক ঐক্য দেখিতেও পায় না বুঝিতেও পারে না, তেমনি ভাবে যাহারা বর্ব্বর তাহারা কবিতাগত ঐক্য দেখিতেও পায় না বুঝিতেও পারে না। ইংরাজি সাহিত্য পড়িয়া আমার মনে হয় কবিতায় তুলনা ক্রমেই উন্নতি লাভ করিতেছে, যাহাদের মধ্যে ঐক্য সহজে দেখা যায় না, তাহাদের ঐক্যও বাহির হইয়া পড়িতেছে। কবিতা, বিজ্ঞান ও দর্শন ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া চলিতেছে, কিন্তু একই জায়গায় আসিয়া মিলিবে ও আর কখন বিচ্ছেদ হইবে না।

জগৎ সত্য।

যাহা হউক দেখা যাইতেছে, সবই একাকার হইয়া পড়ে, জগৎটা না থাকিবার মতই হইয়া আসে। যাহা দেখিতেছি তাহা যে তাহাই নহে ইহাই ক্রমাগত মনে হয়। এই জন্যই জগৎকে কেহ কেহ মিথ্যা বলেন।

কিন্তু আর এক রকম করিয়া জগৎকে হয়ত সত্য বলা যাইতে পারে।

সত্য যাহা তাহা অদৃশ্য, তাহা কখন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে তাহা একটা ভাব মাত্র। কিন্তু ভাব আমাদের নিকট নানারূপে প্রকাশ পায়, ভাষা আকারে, অক্ষর আকারে, বিবিধ বস্তুর বিচিত্র বিন্যাস আকারে। তেমনি প্রকৃত জগৎ যাহা তাহা অদৃশ্য, তাহা কেবল একটি ভাব মাত্র, সেই ভাবটি আমাদের চোখে বহির্জগৎ রূপে প্রকাশিত হইতেছে। যেমন, যাহা পদার্থ নহে যাহা একটি শক্তি মাত্র তাহাকেই আমরা বিচিত্র বর্ণরূপে আলোকরূপে দেখিতেছি ও উত্তাপ রূপে অনুভব করিতেছি, তেমনি যাহা একটি সত্যমাত্র তাহাকে আমরা বহির্জগৎ রূপে দেখিতেছি। একজন দেবতার কাছে হয়ত এ জগৎ একেবারেই অদৃশ্য, তাঁহার কাছে আকার নাই আয়তন নাই, গন্ধ নাই, শব্দ নাই, স্পর্শ নাই, তাঁহার কাছে কেবল একটা ভাব আছে মাত্র। একটা তুলনা দিই। তুলনাটা ঠিক না হউক একটুখানি কাছাকাছি আসে। আমার যখন বর্ণ পরিচয় হয় নাই, তখন যদি আমার নিকটে একখানা বই আনিয়া দেওয়া হয়—তবে সেই বইয়ের প্রত্যেক আঁচড় আমার চক্ষে পড়ে, প্রত্যেক বর্ণ আলাদা আলাদা করিয়া দেখিতে পাই ও সমস্তটা অনর্থক ছেলেখেলা মনে করি। কিন্তু যখন পড়িতে শিখি, তখন আর অক্ষর দেখিতে পাই না। তখন বস্তুতঃ বইটা আমার নিকটে অদৃশ্য হইয়া যায়, কিন্তু তখনি বইটা যথার্থতঃ আমার নিকটে বিরাজ করিতে থাকে। তখন আমি যাহা দেখি তাহা দেখিতে পাই না, আর একটা দেখিতে পাই। তখন আমি বস্তুতঃ দেখিলাম, গ-য়ে আকার ছ, (গাছ) কিন্তু ~~তাহা না~~ দেখিয়া দেখিলাম একটা ডালপালা-বিশিষ্ট উদ্ভিদ্ পদার্থ। কোথায় একটা কালো আঁচড় আর কোথায় একটা বৃহৎ বৃক্ষ! কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমরা বুঝিয়া পড়িতে পারি ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ আঁচড়গুলা কি সমস্তই মিথ্যা নহে! যে ব্যক্তি শাদা কাগজের উপরে হিজিবিজি কাটে তাহাকে কি আমরা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য বলিব না। কারণ অক্ষর মিথ্যা। আমার একরূপ অক্ষর আর-একজনের আর একরূপ অক্ষর। ভ যা মিথ্যা। আমার ভাষা এক তোমার ভাষা আর-এক। আজিকার ভাষা এক কালিকার ভাষা আর এক। এ ভাষায় বলিলেও হয় ও-ভাষায় বলিলেও হয়। গাছ বলিয়া একটা আওয়াজ শুনিলে আমি মনের মধ্যে যে জিনিষটা দেখিতে পাইব, আর একজন ব্যক্তি ট্রী বলিয়া একটা আওয়াজ না শুনিলে ঠিক সে জিনিষটা মনে আনিতে পারিবে না। অতএব দেখা যাইতেছে অক্ষর ও ভাষা তুমি ঘরে গড়িতা বন্দোবস্ত করিয়া বদল করিতে পার, কিন্তু তাহারি আশ্রিত ভাবটিকে খেয়াল অনুসারে বদল করা যায় না, তাহা ধ্রুব।

জগৎকে যে আমাদের মিথ্যা বলিয়া মনে হইতেছে, তাহার কারণ কি এমন হইতে পারে না যে, জগতের বর্ণপরিচয় আমাদের কিছুই হয় নাই! জগতের প্রত্যেক অক্ষর আঁচড়ের আকারে সুতরাং মিথ্যা আকারে আমাদের চোখে পড়িতেছে। যখন আমরা বাস্তবিক জগৎকে পড়িতে পারিব তখন এ জগৎকে দেখিতে পাইব না। এ পড়া কি এক দিনে শেষ হইবে! এ বর্ণমালা কি সামান্য!

এ জগৎ মিথ্যা নয় বুঝি সত্য হবে,
অক্ষর আকারে শুধু লিখিত রয়েছে।
অসীম হতেছে ব্যক্ত সীমা রূপ ধরি!

প্রেমের শিক্ষা।

কিন্তু কে পড়াইবে! কে বুঝাইয়া দিবে যে জগৎ কেবল স্তূপাকৃতি কতকগুলো বস্তু নহে, উহার মধ্যে ভাব বিরাজমান? আর কেহ নহে প্রেম। জগতে যে যথার্থ ভালবাসে সে কখন মনে করিতেও পারে না জগৎ একটা নিরর্থক জড়পিণ্ড। সে ইহারই মধ্যে অসীমের ও চির জীবনের আভাস দেখিতে পায়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে প্রেমেই যথার্থ স্বাধীনতা। কারণ যতটা দেখা যায় প্রেমে তার চেয়ে ঢের বেশী দেখাইয়া দেয়।

জগৎকে কখন মিথ্যা মনে করিতে পারি না, যখন জগৎকে ভালবাসি। একজন যে-সে লোক মরিয়া গেলে আমরা সহজেই মনে করিতে পারি যে, এ লোকটা একবারে ধ্বংস হইয়া গেল, কারণ সে আমার নিকট এত ক্ষুদ্র। কিন্তু একজন প্রিয় ব্যক্তির মরণে আমাদের মনে হয় এ কখনো মরিতে পারে না। কারণ তাহার মধ্যে আমরা অসীমতা দেখিতে পাইয়াছি। যাহাকে এত বেশী ভাল বাসিয়াছি সে কি একেবারে "নাই" হইয়া যাইতে পারে। সে ত কম লোক নয়। তাহাকে যতখানি হৃদয় দিয়াছি ততখানিই সে গ্রহণ করিয়াছে, তাহার উপরে যতই আশা স্থাপন করিয়াছি ততই আশা ফুরায় নি, রজ্জুবদ্ধ লৌহখণ্ডের মত আমার সমস্তটা তাহার মধ্যে ফেলিয়া মাপিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহার তল পাই নাই। যাহার নিকট হইতে সীমা যতদূরে তাহার নিকট হইতে মৃত্যুও ততদূরে। অতএব এতখানি বিশালতার এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে অন্তর্ধান এ কখনো সম্ভবপর নহে। প্রেম আমাদের হৃদয়ের ভিতর হইতে এই কথা বলিতেছে, তর্ক যাহা বলে বলুক। অতএব দেখা যাইতেছে, প্রেম আসিয়াই আমাদের শিক্ষা দেয় এ জগৎ সত্য এবং প্রেমই বলে সত্য উপরে ভাসিতেছে না সত্য ইহার অভ্যন্তরে নিহিত আছে। যাহা হউক পথ দেখিতে পাইলাম, আশা জন্মিতেছে ক্রমে তাহাকে পাইতেও পারি। ইহাকে অবিশ্বাস করিয়া মরণকে বিশ্বাস করিলে কি সুখ! হৃদয়ের সভ্যতার যতই উন্নতি হইবে এই মরণের প্রতি বিশ্বাস ততই চলিয়া যাইবে জীবনের প্রতি বিশ্বাস ততই বাড়িবে।

ভাল করে পড়িব এ জগতের লেখা।
শুধু এ অক্ষর দেখে করিব না ঘৃণা।
লোক হতে লোকান্তরে ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
একে একে জগতের পৃষ্ঠা উলটিয়া,
ক্রমে যুগে যুগে হবে জ্ঞানের বিস্তার।
বিশ্বের যথার্থ রূপ কে পায় দেখিতে!
আঁখি মেলি চারিদিকে করিব ভ্রমণ,
ভাল বেসে চাহিব এ জগতের পানে,
তবে ত দেখিতে পাব স্বরূপ ইহার!

ধর্ম্ম।

প্রেমের যোগ্যতা।

একেবারেই প্রেমের যোগ্য নহে এমন জীব কোথায়! যত বড়ই পাপী অসাধু কুঞী সে হউক না কেন, তাহার মা ত তাহাকে ভালবাসে। অতএব দেখিতেছি, তাহাকেও ভালবাসা যায়, তবে আমি ভালবাসিতে না পারি সে আমার অক্ষমতা।

পথ।

যেমন, জড়ই বল আর প্রাণীই বল সকলেরই মধ্যে এক মহা চৈতন্যের নিয়ম কার্য্য করিতেছে, যাহাতে করিয়া উত্তরোত্তর প্রাণ অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে, তেমনি পাপীই বল আর সাধুই বল সকলেরই মধ্যে অসীম পুণ্যের এক আদর্শ বর্ত্তমান থাকিয়া কার্য্য করিতেছে। স্বর্গের পাথেয় সকলেরই কাছে রহিয়াছে, কেহই তাহা হইতে বঞ্চিত নহে। তবে কেহ বা সোজা রাজপথে চলিয়াছে, কেহ বা নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃই হউক, কৌতূহলবশতঃই হউক, একবার মোড় ফিরিয়া গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, অবশেষে বহুক্ষণ ধাইয়া এ গলি ও গলি সে-গলি করিয়া পুনশ্চ সেই রাজপথে বাহির হইয়া পড়িতেছে, মাঝের হইতে পথ ও পথের কষ্ট বিস্তর বাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু জগতের সমুদয় পথই একই দিকে চলিয়াছে, তবে কোনটার বা ঘোর বেশী, কোনটার বা ঘোর কম এই যা প্রভেদ।

পাপ পুণ্য।

অতএব পাপ বলিয়া যে একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে তাহা নহে, পাপীর যে ধার্ম্মিকের চেয়ে বেশী কিছু আছে তাহা নহে, ধার্ম্মিকের যতটা আছে পাপীর ততটা নাই এই পর্য্যন্ত। পাপীর ধর্ম্মবুদ্ধি অচেতন অপরিণত। পাপ অভাব, পাপ মিথ্যা, পাপ মৃত্যু। অতএব আর সকলই থাকিবে কেবল পাপ থাকিবে না,—যেমন অন্ধকার-ঈথর কম্পন প্রভাবে উত্তরোত্তর আলোক হইয়া উঠে, তেমনি পাপ চৈতন্যের প্রভাবে উত্তরোত্তর পুণ্যে পরিণত হইতে থাকিবে।

চেতনা।

যাহা ধ্রুব তাহাই ধর্ম্ম। এই ধ্রুবের আশ্রয়ে আছে বলিয়াই জগতের মৃত্যুভয় নাই। একটি ধ্রুবসূত্রে এই সমস্ত বিশ্বচরাচর মালার মতন গাঁথা রহিয়াছে। ক্ষুদ্রতম হইতে বৃহত্তম কিছুই সেই সূত্র হইতে বিচ্ছিন্ন নহে, অতএব সকলেই ধর্ম্মের বাঁধনে বাঁধা। তবে, সেই বন্ধনসম্বন্ধে কেহ বা সচেতন কেহ বা অচেতন। অচেতনের বন্ধনই দাসত্ব, আর সচেতনের বন্ধনই প্রেম।

অচৈতন্য।

আমরা যতখানি অচেতন, ততখানি সচেতন নাই ইহা নিশ্চয়ই। আমাদের শরীরের মধ্যে কোথায় কোন্ যন্ত্র কিরূপে কাজ করিতেছে, তাহার কিছুই আমরা জানি না। একটুখানি যেখানে জানি, সেখানে অনেকখানিই জানি না শরীরের সম্বন্ধে যাহা খাটে, মনের সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই খাটে। আমাদের মনে যে কি আছে, তাহা খাত যৎসামান্য পরিমাণে আমরা জানি মাত্র, যাহা জানি না তাহাই অগাধ। কিন্তু যাহা জানিনা তাহাও যে আছে, ইহা অনেকেই বিশ্বাস করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন, মনের কার্য্য জানা, মনে আছে অথচ জানিতেছি না, এ কথাটাই স্বতোবিরুদ্ধ কথা—এমন স্থলে না-হয় বলাই গেল যে তাহা নাই।

বিজ্ঞান গ্রন্থে নিম্নলিখিত ঘটনা অনেকেই পড়িয়া থাকিবেন। একজন মুর্খ দাসী বিকারের অবস্থায় অনর্গল লাটিন আওড়াইতে লাগিল। সহজ-অবস্থায় লাটিনের বিন্দুবিসর্গও সে জানে না। ক্রমে অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল, পূর্ব্বে সে একজন লাটিন পণ্ডিতের নিকট দাসী ছিল। যদিও লাটিন শিখে নাই ও

জাগ্রৎ অবস্থায় তাহার লাটিনের স্মৃতি সম্পূর্ণ নিদ্রিত থাকে, তথাপি উক্ত পণ্ডিতকর্তৃক উচ্চারিত লাটিন পদগুলি তাহার মনের মধ্যে সমস্তই বাস করিতেছিল। সকলেই জানেন বিজ্ঞান-গ্রন্থে এরূপ উদাহরণ বিস্তর আছে।

বিস্মৃতি।

আমাদের স্মরণশক্তি অতি ক্ষুদ্র, বিস্মৃতি অতিশয় বৃহৎ। কিন্তু বিস্মৃতি অর্থে ত বিনাশ বুঝায় না। স্মৃতি বিস্মৃতি একই জাতি। একই স্থানে বাস করে। বিস্মৃতির বিকাশকেই বলে স্মৃতি, কিন্তু স্মৃতির অভাবকেই যে বিস্মৃতি বলে তাহা নহে। এই অতি বিপুল বিস্মৃতি আমাদের মনের মধ্যে বাস করিতেছে। বাস করিতেছে মানে কি নিদ্রিত আছে, তাহা নহে। অবিশ্রাম কাজ করিতেছে, এবং কোন কোনটা স্মৃতিরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। আমাদের রক্ত চলাচল অনুভব করিতেছি না বলিয়া যে রক্ত চলিতেছে না, তাহা বলিতে পারি না। পুরুষানুক্রমবাহী কতশত গুণ আমাদের মধ্যে অজ্ঞাতসারে বাস করিতেছে। তাহার অনেক গুলিই হয় ত আমাতে বিকশিত হইল না, আমার উত্তর পুরুষে বিকশিত হইয়া উঠিবে। এই গুলি, এই অতি নিকটের সামগ্রী গুলিই যদি আমরা না জানিতে পারিলাম, তবে সমস্ত জগতের আত্মা যে আমার মধ্যে গূঢ়ভাবে বিরাজ করিতেছে, তাহা আমি জানিব কি করিয়া! জগতের হৃদয়ের মধ্যে দিয়া আমার হৃদয়ে যে একই সূত্র চলিয়া গিয়াছে তাহা অনুভব করিব কি করিয়া! কিন্তু সে অবিশ্রাম তাহার কার্য্য করিতেছে। আমি কি জানি, বিশ্ব-সংসারের প্রত্যেক পরমাণু অহর্নিশি আমাকে আকর্ষণ করিতেছে, এবং আমিও বিশ্ব সংসারের প্রত্যেক পরমাণুকে অবিশ্রাম আকর্ষণ করিতেছি? কিন্তু জানি না বলিয়া কোন কাজটা বন্ধ রহিয়াছে!

জগতের বন্ধন।

বিশ্ব-জগতের মধ্যদিয়া আমাদের মধ্যে যে দৃঢ়সূত্র প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে ইহাই ছিন্ন করিয়া ফেলা মুক্তি, এইরূপ কথা শুনা যায়। কিন্তু ছিন্ন করে কাহার সাধ্য! আমি আর জগৎ কি স্বতন্ত্র? কেবল একটা ধরগড়া বাঁধনে বাঁধা? সেইটে ছিঁড়িয়া ফেলিলেই আমি বাহির হইয়া যাইব? আমি ত জগৎছাড়া নই, জগৎ আমাছাড়া নয়। আমরা সকলেই জগৎকে গণনা করিবার সময়, আমাকে ছাড়া আর সকলকেই জগতের মধ্যে গণ্য করি, কিন্তু জগৎত সে গণনা মানে না।

জগৎ দিনরাত্রি অনন্তের দিকে ধাবমান হইতেছে কিন্তু তথাপি অনন্ত হইতে অনন্ত দূরে। তাহাই দেখিয়া অধীর হইয়া আমি যদি মনে করি, জগতের হাত এড়াইতে পারিলেই আমি অনন্ত লাভ করিব, তাহা হয় ত ভ্রম হইতে পারে। অনন্তের উপরে লাফ দেওয়া ত চলে না। আমাদের সমস্ত লম্ফঝম্ফ এই খানেই। এই জগতের উপরেই লাফাইতেছি এই জগতের উপরেই পড়িতেছি। আর, এই জগতের হাত হইতে অব্যাহতিই বা পাই কি করিয়া? ক'ড়ে আঙুলটা হঠাৎ যদি একদিন এমনতর স্থির করে যে, অসুস্থ শরীরের প্রান্তে বাস করিয়া আমিও অসুস্থ হইয়া পড়িতেছি, অতএব এ শরীরটা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আমি আলাদা ঘরকন্না করিগে—সে কিরূপ ছেলে মানুষের মত কথাটা হয়!

সে যতই বাঁকিয়া থাকুক, যতই গা মোড়া দিক্, খানিকটা পর্য্যন্ত তাহার স্বাধীনতা আছে, কিন্তু তাই বলিয়া একেবারে বিচ্ছিন্ন হইবার ক্ষমতা তাহার হাতে নাই। সমস্ত শরীরের স্বাস্থ্য তাহার সহিত লিপ্ত, এবং তাহার স্বাস্থ্য সমস্ত শরীরের সহিত লিপ্ত। জগতের এই পরমাণুরাশি হইতে একটি পরমাণু যদি কেহ সরাইতে পারিত তবে আর এ জগৎ কোথায় থাকিত! তেমনি এক জনের খেয়ালের উপরে মাত্র নির্ভর করিয়া জগতের হিসাবে একটি জীবাত্মা কম পড়িতে পারে এমন সম্ভাবনা যদি থাকে, তাহা হইলে সমস্ত জগৎটা "ফেল" হইয়া যায়। কিন্তু জগতের খাতায় এরূপ বিশৃঙ্খলা এরূপ ভুল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব আমাদের বুঝা উচিত জগতের বিরোধী হওয়াও যা' নিজের বিরোধী হওয়াও তা, জগতের সহিত আমাদের এতই ঐক্য।

যে পথে তপন শশী আলো ধ'রে আছে,
সে পথ করিয়া তুচ্ছ, সে আলো ত্যজিয়া,
ক্ষুদ্র এই আপনার খদ্যোত আলোকে
কেন অন্ধকারে মর পথ খুঁজে খুঁজে!

* * * *

পাখী যবে উড়ে যায় আকাশের পানে,
সেও ভাবে এনু বুঝি পৃথিবী ত্যজিয়া।
যত ওড়ে, যত ওড়ে, যত ঊর্দ্ধে যায়
কিছুতে পৃথিবী তবু পারে না ত্যজিতে
অবশেষে শ্রান্ত দেহে নীড়ে ফিরে আসে।

জগতের ধর্ম্ম।

অতএব প্রকৃতির মধ্যে যে ধ্রুব বর্ত্তমান, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সচেতনে সেই ধ্রুবের অনুগামী হওয়াই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম শব্দের অর্থই দেখনা কেন। যাহাতে আবরণ বা নিবারণ করে তাহাই বর্ম্ম, যাহাতে ধারণ করে তাহাই ধর্ম্ম। দ্রব্যবিশেষের ধর্ম্ম কি? যাহা অভ্যন্তরে বিরাজ করিয়া সেই দ্রব্যকে ধারণ করিয়া আছে; অর্থাৎ যাহার প্রভাবে সেই দ্রব্যের দ্রব্যত্ব খাড়া হইয়াছে। জগতের ধর্ম্ম কি? জগৎ যে অচল নিয়মের উপর আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহাই জগতের ধর্ম্ম, এবং তাহাই জগতের প্রত্যেক অণু-কণার ধর্ম্ম।

উদাহরণ।

একটি উদাহরণ দিই। জগতের একটি প্রধান ধর্ম্ম পরার্থপরতা। স্বার্থপরতা জগতের ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ. এই নিমিত্ত জগতের কোথাও স্বার্থের নাই। পরের জন্য কাজ করিতেই হইবে তা' ইচ্ছা কর আর না কর। জগতের প্রত্যেক পরমাণু তাহার পরবর্ত্তী ও তাহার নিকটবর্ত্তীর জন্য, তাহার নিজের মধ্যে তাহার বিরাম নাই। তাহার প্রত্যেক কার্য্য অনন্ত জগতের লক্ষকোটি স্নায়ুর মধ্যে তরঙ্গিত হইতেছে। একটি বালুকণা যদি কেহ ধ্বংস করিতে পারে তবে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। তুমি স্বার্থপরভাবে বিদ্যা উপার্জ্জন ও মনের উন্নতি সাধন করিলে, কিন্তু জানিতেও পারিলে না, সে বিদ্যায় ও সে উন্নতির লক্ষ কোটি উত্তরাধিকারী আছে। তুমি দাও না দাও তোমার সন্তানসন্ততির মধ্যে সে উন্নতি প্রবাহিত হইবে। তোমার আশে পাশে চারিদিকে সে উন্নতির ঢেউ লাগিবে। তুমি ত দুই দিনে পৃথিবী হইতে সরিয়া পড়িবে, কিন্তু তোমার জীবনের সমস্তটাই পৃথিবীর জন্য রাখিয়া যাইতে হইবে—তুমি মরিয়া গেলে বাঁচিয়া তোমার জীবনের এক মুহূর্ত্ত হইতে বঞ্-

পীকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না, প্রকৃতির আইন এমনি কড়াক্কড়।

সচেতন ধর্ম্ম।

অতএব এ জগতে স্বার্থপর হইবার যো নাই। পরার্থপরতাই এ জগতের ধর্ম্ম। এই নিমিত্তই মানুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম পরের জন্য আত্মোৎসর্গ করা। জগতের ধর্ম্ম আমাদিগকে আগে হইতেই পরের জন্য উৎসৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে, সে বিষয়ে আমরা জগতের জড়াদপি জড়ের সমতুল্য। কিন্তু আমরা যখন স্বেচ্ছায় সচেতনে সেই মহাধর্ম্মের অনুগমন করি তখনই আমাদের মনুষ্যত্ব, তখনই আমরা জড়ের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেবল তাহাই নয়, তখনই আমরা মহৎ সুখ লাভ করি। তখনই আমরা দেখিতে পাই যে, স্বার্থপরতায় সমস্ত জগৎকে এক পার্শ্বে ঠেলিয়া তাহার স্থানে অতি ক্ষুদ্র আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই। কিন্তু পারিব কেন? অহর্নিশি অশান্ত অসুখ, হৃদয় ক্লান্ত হইয়া পড়ে, কিছুতেই তাহার আরাম থাকে না। যতই সে উপার্জ্জন করিতে থাকে যতই সে সঞ্চয় করিতে থাকে, ততই তাহার ভার বৃদ্ধি হইতে থাকে মাত্র। কিন্তু যখন আপনাকে ভুলিয়া পরের জন্য প্রাণপণ করি তখনি দেখি সুখের সীমা নাই। তখনি সহসা অনুভব করিতে থাকি, সমস্ত জগৎ আমার স্বপক্ষে। আমি ছিলাম ক্ষুদ্র হইলাম অত্যন্ত বৃহৎ। চন্দ্র সূর্য্যের সহিত আমার বন্ধুত্ব হইল।

জগৎ স্রোতে ভেসে চল
যে যেথা আছ ভাই,
চলেছে যেথা রবিশশী
চলরে সেথা যাই।

অপক্ষপাত।

জগৎ ত কাহাকেও একঘোরে করে না, কাহারো ধোপা নাপিত বন্ধ করে না। চন্দ্র সূর্য্য রৌদ্র বৃষ্টি, জগতের সমস্ত শক্তি সমগ্রের এবং প্রত্যেক অংশের আবশ্যক সমান দান করিতেছে। তাহার কারণ এই জগতের মধ্যে যে কেহ বাস করে কেহই জগতের বিরোধী নহে। পাপী অসাধুরা জগতের নীচের ক্লাসে পড়ে মাত্র, কিন্তু তাই বলিয়া ত তাহাদিগকে ইস্কুল হইতে তাড়াইয়া দিতে পারা যায় না। বাইবেলের অনন্ত নরক একটা সামাজিক জুজু বইত আর কিছু নয়। পাপ নাকি একটা অভাব মাত্র, এই নিমিত্ত সে এত দুর্ব্বল যে তাহাকে পিষিয়া মারিয়া ফেলিবার জন্য একটা অনন্ত জাঁতার আবশ্যক হবে না। সমস্ত জগৎ তাহার প্রতিকূলে তাহার সমস্ত শক্তি অহর্নিশি প্রয়োগ করিতেছে। পাপ পুণ্যে পরিণত হইতেছে, আত্মম্ভরিতা বিশ্বম্ভরতার দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে।

সকলে অ আত্মীয়।

নিতান্ত ঘৃণা করিয়া আর কাহাকেও একেবারে পর মনে করা শোভা পায় না। সকলেরই মধ্যে এত ঐক্য আছে। বুটেনকাশয় মহৎ লোক হইতে পারেন তাই বলিয়া যে গোবরের সঙ্গে সমস্ত আদান প্রদান একেবারেই বন্ধ করিয়া দিবেন ইহা তাঁহার মত উন্নতিশীলের নিতান্ত অনুপযুক্ত কাজ।

জড় ও আত্মা।

পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি আমাদের অধিকাংশই অচেতন, একটুখানি সচেতন মাত্র। তবে

আর জড়কে দেখিয়া নাসা কুঞ্চিত করা কেন? আমরা একটা প্রকাণ্ড জড় তাহারই মধ্যে একরত্তি চেতনা বাস করিতেছে। আত্মায় ও জড়ে যে সাত্ত্বিক জাতিগত প্রভেদ আছে তাহা নহে। অবস্থাগত প্রভেদ মাত্র। আলোক ও অন্ধকারে এতই প্রভেদ যে মনে হয় উভয়ে বিরোধীপক্ষ। কিন্তু বিজ্ঞান বলে, আলোকের অপেক্ষাকৃত বিশ্রামই অন্ধকার এবং অন্ধকারের অপেক্ষাকৃত উদ্যমই আলোক। তেমনি আত্মার নিদ্রাই জড়ত্ব এবং জড়ের চেতনাই আত্মার ভাব।

বিজ্ঞান বলে সূর্য্যকিরণে অন্ধকার রশ্মিই বিস্তর, আলোক-রশ্মি তাহার তুলনায় ঢের কম; একটু খানি আলোক অনেকটা অন্ধকারের মুখপাতের স্বরূপ। তেমনি আমাদের মনেও একটু খানি চৈতন্যের সহিত অনেক খানি অচেতনতা জড়িত রহিয়াছে। জগতেও তাহাই। জগৎ একটি প্রকাণ্ড গোলাকার কুঁড়ি তাহার মুখের কাছটুকুতে একটুখানি চেতনা দেখা দিয়াছে! সেই মুখটুকু যদি উদ্ধত হইয়া বলে আমি মস্ত লোক জগৎ অতি নীচ, উহার সংসর্গে থাকিব না, আমি আলাদা হইয়া যাইব, তবে সে কেমনতর শোনায়?

মৃত্যু।

ধর্ম্মকে আশ্রয় করিলে মৃত্যুভয় থাকে না। এখানে মৃত্যু অর্থে ধ্বংসও নহে, মৃত্যু অর্থে অবস্থাপরিবর্ত্তনও নহে, মৃত্যু অর্থে জড়ত্ব। অচেতনতাই অধর্ম্ম। ধর্ম্মকে যতই আশ্রয় করিতে থাকিব, ততই চেতনা লাভ করিতে থাকিব, ততই অনুভব করিতে থাকিব, যে মহা চৈতন্যে সমস্ত চরাচর অনুপ্রাণিত হইয়াছে, আমার মধ্যে দিয়া এবং আমাকে প্লাবিত করিয়া সেই চৈতন্যের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। যথার্থ জগৎকে জ্ঞানের দ্বারা জানিবার কোন সম্ভাবনা নাই, চৈতন্য দ্বারা জানিতে হইবে।

জগতের সহিত ঐক্য।

জগৎকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া সওয়াল-জবাব করাইলে সে খুব অল্প কথাই বলে, জগতের ঘরে বাস করিলে তবে তাহার যথার্থ খবর পাওয়া যায়। তাহা হইলে জগতের হৃদয় তোমার হৃদয়ে তরঙ্গিত হইতে থাকে; তখন তুমি যে কেবল মাত্র তর্ক দ্বারা জ্ঞানকে জান তাহা নহে, হৃদয়ের দ্বারা জ্ঞানকে অনুভব কর। আমরা যে কিছুই জানিতে পারি না তাহার প্রধান কারণ আমরা নিজেকে জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি, যখনি হৃদয়ের উন্নতি সহকারে জগতের সহিত অনন্ত ঐক্য মর্ম্মের মধ্যে অনুভব করিতে থাকিব, তখন জগতের হৃদয় সমুদ্র সমস্ত বাঁধ ভাঙ্গিয়া আমার মধ্যে উথলিত হইয়া উঠিবে, আমি কতখানি জানিব কত খানি পাইব তাহার সীমা নাই। একটুখানি বুদ্বুদের মত অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠিয়া স্বাতন্ত্র্য অভিমানে জগতের তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসিয়া বেড়াইলে মহত্ত্বও নাই, সুখও নাই। জগতের সহিত এক হইবার উপায় জগতের অনুকূলতা করা, অর্থাৎ ধর্ম্ম আশ্রয় করা। ধর্ম্ম, জগতের প্রাণগত চেতনা; তিনি নহিলে তোমার অসাড়তা কে দূর করিবে?

মূল ধর্ম্ম।

একজন বলিতেছেন, যখন প্রকৃতির মধ্যে সর্ব্বত্রই নৃশংসতা দেখিতেছি তখন নিষ্ঠুরতা যে জগতের ধর্ম্ম নহে, এ কে বলিতেছে?

জগতের অস্তিত্বই স্বয়ং বলিতেছে। নিষ্ঠুরতাই যদি জগতের মূলগত নিয়ম হইত, হিংসাই যদি জগতের আশ্রয়স্থল হইত তবে জগৎ এক মুহূর্ত্ত বাঁচিত না। উপর হইতে যাহা দেখি তাহা ধর্ম্ম নহে। উপর হইতে আমরা ত চতুর্দ্দিকে পরিবর্ত্তন দেখিতেছি কিন্তু জগতের মূল ধর্ম্ম কি অপরিবর্ত্তনীয়তা নহে? আমরা চারিদিকেই ত অনৈক্য দেখিতেছি, কিন্তু তাহার মূলে কি ঐক্য বিরাজ করিতেছে না? তাহা যদি না করিত, তাহা হইলে এ জগৎ বিশৃঙ্খলার নরকরাজ্য হইত, সৌন্দর্য্যের স্বর্গরাজ্য হইত না। তাহা হইলে কিছু হইতেই পারিত না, কিছু থাকিতেই পারিত না।

একটি রূপক।

অনেক লোক আছেন, তাঁহারা জগতের সর্ব্বত্রই অমঙ্গল দেখেন। তাঁহাদের মুখে জগতের অবস্থা যেরূপ শুনা যায়, তাহাতে তাহার আর এক মুহূর্ত্ত টিঁকিয়া থাকিবার কথা নহে। সর্ব্বত্রই যে শোক তাপ দুঃখ-যন্ত্রণা দেখিতেছি এ কথা অস্বীকার করা যায় না কিন্তু তবুও ত জগতের সঙ্গীত থামে নাই! তাহার কারণ, জগতের প্রাণের মধ্যে গভীর আনন্দ বিরাজ করিতেছে। সে আনন্দ-আলোক কিছুতেই আচ্ছন্ন করিতে পারিতেছে না, বরঞ্চ যত কিছু শোকতাপ সেই দীপ্ত আনন্দে বিলীন হইয়া যাইতেছে। শিবের সহিত জগতের তুলনা হয়। অসীম অন্ধকার-দিক্-বসন পরিয়া ভূতনাথ পশুপতি জগৎ কোটি কোটি ভূত লইয়া অনন্ত তাণ্ডবে উন্মত্ত। কণ্ঠের মধ্যে বিষপূর্ণ রহিয়াছে তবু নৃত্য। বিষধর সর্প তাঁহার অঙ্গের ভূষণ হইয়া রহিয়াছে, তবু নৃত্য। মরণের রঙ্গভূমি শ্মশানের মধ্যে তাঁহার বাস, তবু নৃত্য। মৃত্যুস্বরূপিণী কালী তাঁহার বক্ষের উপরে সর্ব্বদা বিচরণ করিতেছেন, তবু তাঁহার আনন্দের বিরাম নাই। যাঁহার প্রাণের মধ্যে অমৃত ও আনন্দের অনন্ত প্রস্রবণ, এত হলাহল এত অমঙ্গল তিনিই যদি ধারণ করিতে না পারিবেন তবে আর কে পারিবে। সর্পের ফণা, হলাহলের নীলজ্যোতি বাহির হইতে দেখিয়া আমরা শিবকে দুঃখী মনে করিতেছি কিন্তু তাঁহার জটাজালের মধ্যে প্রচ্ছন্ন চির-স্রোত অমৃত নিস্যন্দিনী পুণ্য ভাগীরথীর আনন্দ-কল্লোল কি শুনা যাইতেছে না? নিজের ডমরুধ্বনিতে, নিজের অস্ফুট হর্ষ গানে উন্মত্ত হইয়া নিজে যে অবিশ্রাম নৃত্য করিতেছেন, তাহার গভীর কারণ কি দেখিতে পাইতেছি? বাহিরের লোকে তাঁহাকে দরিদ্র বলিয়া মনে করে বটে, কিন্তু তাঁহার গৃহের মধ্যে দেখ দেখি, অন্নপূর্ণা চিরদিন অধিষ্ঠান করিতেছেন। আর ঐ যে মলিনতা দেখিতেছ, শ্মশানের ভস্ম দেখিতেছ, মৃত্যুর চিহ্ন দেখিতেছ, ও কেবল উপরে—ঐ শ্মশান-ভস্মের মধ্যে আচ্ছন্ন রজত-গিরি-নিভ চারু-চন্দ্রাবতংস অতি সুন্দর অমর বপু দেখিতেছ না কি? উনি যে মৃত্যুঞ্জয়; আর, মৃত্যুকে কি আমরা চিনি? আমরা মৃত্যুকে করাল-দশনা লোল-রসনা মূর্ত্তিতে দেখিতেছি, কিন্তু ঐ মৃত্যুই ইঁহার প্রিয়তমা, ঐ মৃত্যুকে বক্ষে ধরিয়া ইনি আনন্দে বিহ্বল হইয়া আছেন। কালীর যথার্থ স্বরূপ আমাদের জানিবার কোন সম্ভাবনা নাই, আমাদের চক্ষে তিনি মৃত্যু আকারে প্রতিভাত হইতেছেন, কিন্তু ভক্তেরা জানেন কালীও যা গৌরীও তাই; আমরা তাঁহার করালমূর্ত্তি দেখিতেছি, কিন্তু তাঁহার মোহিনী মূর্ত্তি কেহ কেহ বা দেখিয়া থাকিবেন। শিবকে

সকলে যোগী বলে। ইনি কাহার যোগে নিমগ্ন রহিয়াছেন?

যোগী হে, কে তুমি হৃদি আসনে,
বিভূতিভূষিত শুভ্রদেহ, নাচিছ দিগ্‌-বসনে।
মহা আনন্দে পুলক কায়,
গঙ্গা উথলি উছলি যায়,
ভালে শিশু শশী হাসিয়া চায়,
জটাজুট ছায় গগনে।

সৌন্দর্য্য ও প্রেম।

সৌন্দর্য্যের কারণ।

পূর্ব্বে এক স্থানে বলিয়াছি যে, যখন জগতের স্বপক্ষে থাকি, তখনই আমাদের প্রকৃত সুখ, যখন স্বার্থ খুঁজিয়া মরি তখনই আমাদের ক্লেশ, শ্রান্তি, অসন্তোষ। ইহা হইতে আরএকটা কথা মনে আসে। যাহাদিগকে আমরা সুন্দর বলি তাহাদিগকে আমাদের কেন ভাল লাগে?

পণ্ডিতেরা বলেন, যে সুন্দর তাহার মধ্যে বিষম কিছুই নাই;—তাহার আপনার মধ্যে আপনার পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য; তাহার কোনএকটি অংশ অপর একটি অংশের সহিত বিবাদ করে না; জেদ করিয়া অন্য সকলকে ছাড়াইয়া উঠে না; ঈর্ষাবশতঃ স্বতন্ত্র হইয়া মুখ বাঁকাইয়া থাকে না। তাহার প্রত্যেক অংশ সমগ্রের সুখে সুখী; তাহার ভাবে আমরা যে আপনারা সুন্দর সে কেবল সমগ্রকে সুন্দর করিয়া তুলিবার জন্য। তাহারা যদি স্বপ্রধান হইত, তাহারা যদি সকলেই মনে করিত আর সকলের চেয়ে আমিই মস্ত লোক হইয়া উঠিব, এক জন আর এক জনকে না মানিত, তাহা হইলে, না তাহারা নিজে সুন্দর হইত, না তাহাদের সমগ্রটি সুন্দর হইয়া উঠিত। তাহা হইলে একটা বাঁকাচোরা হ্রস্ব দীর্ঘ উঁচু নীচু বিশৃঙ্খল চক্ষুশূল জন্মগ্রহণ করিত। অতএব দেখা যাইতেছে, যথার্থ যে সুন্দর সে প্রেমের আদর্শ। সে প্রেমের প্রভাবেই সুন্দর হইয়াছে, তাহার আদ্যন্তমধ্য প্রেমের সূত্রে গাঁথা; তাহার কোন খানে বিরোধ বিদ্বেষ নাই। প্রেমের শতদল একটি বৃন্তের উপরে কি মধুর প্রেমে মিলিয়া থাকে। তাই তাহাকে দেখিতে ভাল লাগে। তাহার কোমলতা মধুর, কারণ কোমলতা প্রেম, কোমলতা কাহাকেও আঘাত করে না, কোমলতা সকলের গায়ে করুণ হস্তক্ষেপ করে, সে চোখের পাতায় স্নেহ আকর্ষণ করিয়া আনে। ইন্দ্রধনুর রংগুলি প্রেমের রং তাহাদের মধ্যে কেমন মিল। তাহারা সকলেই সকলের জন্য জায়গা রাখিয়াছে, কেহ কাহাকেও দূর করিতে চায় না, তাহারা সুরবালিকাদের মত হাত ধরাধরি করিয়া দেখা দেয়, গলাগলি করিয়া মিলাইয়া যায়। গানের সুরগুলি প্রেমের সুর, তাহারা সকলে মিলিয়া খেলাইতে থাকে, তাহারা পরস্পরকে সাজাইয়া দেয়, তাহারা আপনার সঙ্গিনীদের দূর হইতে ডাকিয়া আনে। এই জন্যই সৌন্দর্য্য মনের মধ্যে প্রেম জন্মাইয়া দেয়, সে আপনার প্রেমে অন্যকে প্রেমিক করিয়া তুলে, সে আপনি সুন্দর হইয়া অন্যকে সুন্দর করে।

সৌন্দর্য্য বিশ্বপ্রেমী।

যে সুন্দর, কেবল যে তাহার নিজের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে তাহা নয়;—সৌন্দর্য্যের সামঞ্জস্য সমস্ত জগতের সঙ্গে। সৌন্দর্য্য জগতের অনুকূল। কদর্য্যতা সয়তানের দল-ভুক্ত। সে বিদ্রোহী। সে যে টি কিয়া থাকে সে কেবল মাত্র গায়ের জোরে। তাও সে থাকিত না, কারণ, কতটুকুই বা তাহার গায়ে জোর; কিন্তু প্রকৃতি তাহা হইতেও বুঝি সৌন্দর্য্য অভিব্যক্ত করিবেন।

মনের মিল

জগতের সাধারণের সহিত সৌন্দর্য্যের আশ্চর্য্য ঐক্য আছে। জগতের সর্ব্বত্রই তাহার তুলনা তাহার দোসর মেলে। এই জন্য সৌন্দর্য্যকে সকলের ভাল লাগে। সৌন্দর্য্য যদি একেবারেই নূতন হইত, খাপছাড়া হইত, হঠাৎ বাবুর মত একটা কিম্ভূত পদার্থ হইত, তাহা হইলে কি তাহাকে আর কাহারো ভাল লাগিত?

আমাদের মনের মধ্যেই এমন একটা জিনিষ আছে, সৌন্দর্য্যের সহিত যাহার অত্যন্ত ঐক্য হয়। এজন্য সৌন্দর্য্যকে দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ "আমার মিত্র" বলিয়া মনে হয়। জগতে আমরা "সদৃশকে" খুঁজিয়া বেড়াই। যথার্থ সদৃশকে দেখিলেই হৃদয় অগ্রসর হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া ডাকিয়া আনে, কিন্তু সৌন্দর্য্যের মধ্যে যেমন আমাদের সাদৃশ্য দেখিতে পাই, এমন আর কোথায়? সৌন্দর্য্যকে দেখিলে তাহাকে আমাদের "মনের মত" বলিয়া মনে হয় কেন? সে-ই আমাদের মনের সঙ্গে ঠিক মেলে, কদর্য্যতার সঙ্গে আমাদের মনের মিল হয় না।

আমরা সকলেই যদি কিছু না কিছু সুন্দর হইতাম, তাহা হইলে সুন্দর ভাল বাসিতাম না!

উপযোগিতা।

যাহা আমাদের উপকারী ও উপযোগী, তাহাই কালক্রমে অভ্যাসবশতঃ আমাদের চক্ষে সুন্দর বলিয়া প্রতীত হয় ও বংশ পরম্পরায় সেই প্রতীতি প্রবাহিত ও পরিপুষ্ট হইতে থাকে, এরূপ কথা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। তাহা যদি সত্য হইত তাহা হইলে লোকে অবসর পাইলে ফুলের বাগানে বেড়াইতে না গিয়া ময়রার দোকানে বেড়াইতে যাইত, ঘরের দেয়ালে লুচি টাঙ্গাইয়া রাখিত ও ফুলদানীর পরিবর্ত্তে সন্দেশের হাঁড়ি টেবিলের উপর বিরাজ করিত।

আমরা সুন্দর।

প্রকৃত কথা এই যে আমরা বাহিরে যেমনই হই না কেন, আমরা বস্তুবিকই সুন্দর। সেই জন্য সৌন্দর্য্যের সহিতই আমাদের যথার্থ ঐক্য দেখিতে পাই। এই সৌন্দর্য্য-চেতনা সকলের কিছু সমান নয়। যাহার হৃদয়ে যত সৌন্দর্য্য বিরাজ করিতেছে, সে ততই সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারে। সৌন্দর্য্যের সহিত তাহার নিজের ঐক্য ততই সে বুঝিতে পারে, ও ততই সে আনন্দ লাভ করে। আমি যে, ফুল এত ভালবাসি তাহার কারণ আর কিছু নয়, ফুলের সহিত আমার হৃদয়ের গূঢ় একটি ঐক্য আছে—আমার মনে

হয় ও একই কথা। যে সৌন্দর্য্য ফুল হইয়া ফুটিয়াছে, সেই সৌন্দর্য্যই অবস্থাভেদে আমার হৃদয় হইয়া বিকশিত হইয়াছে; সেই জন্য ফুলও আমার হৃদয় চাহিতেছে, আমিও ফুলকে আমার হৃদয়ের মধ্যে চাহিতেছি। মনের মধ্যে একটি বিলাপ উঠিতেছে—যে, আমরা এক পরিবারের লোক, তবে কেন অবস্থান্তর নামক দেয়ালের আড়ালে পর হইয়া বাস করিতেছি; কেন পরস্পরকে সর্ব্বতোভাবে পাইতেছি না?

—

সুদূর ঐক্য।

সৌন্দর্য্যের ঐক্য দেখিয়াই বিকৃটর হ্যুগো গান গাহিতেছেন।

মহীয়সী মহিমার আগ্নেয় কুসুম
সূর্য্য, ধায় লভিবারে বিশ্রামের ঘুম।
ভাঙ্গা এক ভিত্তি পরে ফুল শুভ্রবাস,
চারিদিকে শুভ্রদল করিয়া বিকাশ
মাথা তুলে চেয়ে দেখে সুনীল বিমানে
অমর আলোকময় তপনের পানে;
ছোট মাথা দুলাইয়া কহে ফুল গাছে,
"লাবণ্য-কিরণ-ছটা আমারো ত আছে!"

"লক্ষ্যান্তরেহকশ্চ জলেষু পদ্মঃ" ইহাদের মধ্যেও ঐক্য।

—

সুন্দর সুন্দর করে।

সুন্দর আপনি সুন্দর এবং অন্যকে সুন্দর করে। কারণ, সৌন্দর্য্য হৃদয়ে প্রেম জাগ্রৎ করিয়া দেয়, এবং প্রেমই মানুষকে সুন্দর করিয়া তুলে। শারীরিক সৌন্দর্য্যও প্রেমে যেমন দীপ্তি পায় এমন আর কিছুতে না। মানুষের মিলনে যেমন প্রেম আছে, পশুদের মিলনে তেমন প্রেম নাই, এই জন্য বোধ করি, পশুদের অপেক্ষা মানুষের সৌন্দর্য্য পরিস্ফুটতর। যে মানুষ ও যে জাতি পাশব, নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন সে মানুষের ও সে জাতির মুখশ্রী সুন্দর হইতে পারে না। দেখা যাইতেছে, দয়ায় সুন্দর করে, প্রেমে সুন্দর করে, হিংসায় নিষ্ঠুরতায় সৌন্দর্য্যের ব্যাঘাত জন্মায়। জগতের অনুকূলতাচরণ করিলে সুন্দর হইয়া উঠি ও প্রতিকূলতা করিলে জগৎ আমাদের গালে কদর্য্যতার চূণকালি মাখাইয়া তাহার রাজপথে ছাড়িয়া দেয়, আমাদিগকে কেহ সমাদর করিয়া আশ্রয় দেয় না।

—

শান্তি।

এ শাস্তি বড় সামান্য নয়। আমাদের নিজের মধ্যে সৌন্দর্য্যের ন্যূনতা থাকিলে, আমরা জগতের সৌন্দর্য্য-রাজ্যে প্রবেশাধিকার পাই না, ধরণীর ধূলা-কাদার মধ্যে লুঠাইতে থাকি। শব্দ শুনি গান শুনি না, চলাফিরা দেখিতে পাই নৃত্য দেখিতে পাই না, আহার করিয়া পেট ভরাই কিন্তু সুস্বাদ কাহাকে বলে জানি না। জগতের যে অংশে কারাগার সেই খানে গর্ত্ত খুঁড়িয়া অত্যন্ত নিরাপদে বৈষয়িক কেঁচো হইয়া বুড়া বয়স পর্য্যন্ত কাটাইয়া দিই, মৃত্তিকার তলবাসী চক্ষুবিহীন কৃমিদের সহিত কুটুম্বিতা করি, ও তাহাদের সহিত জড়িত বিজড়িত হইয়া স্তূপাকারে নিদ্রা দিই।

—

উদ্ধার।

এই কৃমিরাজ্য হইতে উদ্ধার পাইয়া আমরা সূর্য্যালোকে আসিতে চাই।

জানিবে? সৌন্দর্য্য স্বয়ং। কারণ, অশরীরী প্রেম সৌন্দর্য্যে শরীর ধারণ করিয়াছে। প্রেম যেখানে ভাব সৌন্দর্য্য সেখানে তাহার অক্ষর, প্রেম যেখানে হৃদয় সৌন্দর্য্য সেখানে গান, প্রেম যেখানে প্রাণ সৌন্দর্য্য সেখানে শরীর, এই জন্য সৌন্দর্য্যে প্রেম জাগায়, এবং প্রেমে সৌন্দর্য্য জাগাইয়া তুলে।

কবির কাজ।

কবিদের কি কাজ, এইবার দেখা যাই-তেছে। সে আর কিছু নয়, আমাদের মনে সৌন্দর্য্য উদ্রেক করিয়া দেওয়া। উপদেশ দিয়া তত্ত্বনির্ণয় করিয়া প্রকৃতিকে মৃতদেহের মত কাটাকুটি করিয়া এ উদ্দেশ্য সাধন করা যায় না। সুন্দরই সৌন্দর্য্য উদ্রেক করিতে পারে। বৈষয়িকেরা বলেন ইহাতে লাভটা কি? কেবলমাত্র একটি সুন্দর ছবি পাইয়া, বা সুন্দর কথা শুনিয়া উপকার কি হইল? কি জানিলাম? কি শিক্ষালাভ করি-লাম; সঞ্চয়ের খাতায় কোন্ নূতন কড়িটা জমা করিলাম? কিছুক্ষণের মত আনন্দ পাই-লাম, সে ত সন্দেশ খাইলেও পাই। ততক্ষণ যদি পাঁজি দেখিতাম, তবে আজকেকার তারিখ বার ও কবে চন্দ্রগ্রহণ হইবে সে খবরটা জানিতে পাইতাম।

বৈষয়িকেরা যাহাই বলুন না কেন, আর কোন উদ্দেশ্যের আবশ্যক করে না, মনে সৌন্দর্য্য উদ্রেক করাই যথেষ্ট মহৎ। কবিতার ইহা অপেক্ষা মহত্তর উদ্দেশ্য আর থাকিতে পারে না। সৌন্দর্য্য উদ্রেক করার অর্থ আর কিছু নয়—হৃদয়ের অসাড়তা অচেতনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, হৃদয়ের স্বাধীনতাক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া দেওয়া। সে কার্য্যে যাঁহারা ব্রতী, তাঁহাদের সহিত একটি ময়রার তুলনা ঠিক খাটে না।

অতএব কবিদিগকে আর কিছুই করিতে হইবে না, তাঁহারা কেবল সৌন্দর্য্য ফুটাইতে থাকুন—জগতের সর্ব্বত্র যে সৌন্দর্য্য আছে, তাহা তাঁহাদের হৃদয়ের আলোকে পরিস্ফুট ও উজ্জ্বল হইয়া আমাদের চোখে পড়িতে থাকুক, তবেই আমাদের প্রেম জাগিয়া উঠিবে প্রেম বিশ্বব্যাপী হইয়া পড়িবে।

কবিতা ও তত্ত্ব।

কবিরা যদি একটি তত্ত্ববিশেষকে সমুখে খাড়া করিয়া তাহারই গায়ের মাপে ছাঁটছোট করিয়া কবিতার মের্‌জাই ও পায়জামা বানা-ইতে থাকেন, ও সেই পোষাকে সুসজ্জিত করিয়া তত্ত্বকে সমাজে ছাড়িয়া দেন, তবে সে তত্ত্বগুলিকে কেমন খোকা-বাবুর মত দেখায় ও সে কাজটাও ঠিক কবির উপযুক্ত হয় না। এক একবার এমন দর্জ্জীবৃত্তি করিতে দোষ নাই, এবং মোটা মোটা বয়স্ক তত্ত্বেরা যদি মাঝে মাঝে অনুষ্ঠানবিশেষের সময়ে তাঁহাদে থানধুতি ছাড়িয়া এইরূপ পোষাক পরি সভায় আসিয়া উপস্থিত হন, তাহাতেও তেম আপত্তি দেখি না। কিন্তু এই যদি প্রথা হই পড়ে, কবিতাটি দেখিলেই যদি দশজনে পড়ি তাহার খোসা ও শাঁস ছাড়াইয়া ফেলিয়া তা হইতে তত্ত্বের আঁটি বাহির করাই প্রথ কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন, তাহা হইলে নিশ্চ ক্রমে এমন ফলের চাষ হইতে আরম্ভ হই যাহার আঁটিটাই সমস্ত, এবং যে সকল ফ মধ্যে আঁটির বাহুল্য থাকিবে না শাস

মধুর রসই অধিক তাহারা নিজের খাঁটি দরিদ্র অস্তিত্ব ও মাধুর্য্য রসের আধিক্য লইয়া নিতান্ত লজ্জা অনুভব করিবে। তখন গহনা-পরা গর্ব্বিণীকে দেখিয়া ভুবনমোহিনী রূপসীরাও ঈর্য্যান্বিত হইবে।

তত্ত্বের বার্দ্ধক্য।

তত্ত্ব অর্থাৎ জ্ঞান পুরাতন হইয়া যায়, মৃত হইয়া যায়, মিথ্যা হইয়া যায়। আজ যে জ্ঞানটি নানা উপায়ে প্রচার করিবার আবশ্যক থাকে, কাল আর থাকে না, কাল তাহা সাধারণের সম্পত্তি হইয়া গিয়াছে, কাল যদি পুনশ্চ সে কথা উত্থাপন করিতে যাও তবে লোকে তোমাকে মারিতে আসে, বলে "আমি কি জাহাজ হইতে নামিয়া আসিলাম, না আমি কাল জন্মগ্রহণ করিয়াছি?" জ্ঞান একটু পুরাতন হইলেই তাহার পুনরুক্তি আর কাহারও সহ্য হয় না। অনেক জ্ঞান কালক্রমে লোপ পায়, পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, মিথ্যা হইয়া পড়ে। এমন একদিন ছিল যখন, আমরা শব্দ যে কাণেই শুনি সর্ব্বাঙ্গ দিয়া শুনি না, এ কথাটাও নূতন সত্য ছিল। তখন এ কথাটা প্রমাণ দিয়া বুঝাইতে হইত। কিন্তু হৃদয়ের কথা চিরকাল পুরাতন এবং চিরকাল নূতন। বাল্মীকির সময়ে যে সকল তত্ত্ব সত্য বলিয়া প্রচলিত ছিল, তাহাদের অনেকগুলি এখন মিথ্যা বলিয়া স্থির হইয়াছে, কিন্তু সেই প্রাচীন ঋষি-কবি হৃদয়ের যে চিত্র দিয়াছেন, তাহার কোনটাই এখনও অপ্রচলিত হয় নাই।

অতএব জ্ঞান কবিতার বিষয় নহে। কবিতা চিরযৌবনা। এই বৃদ্ধার সহিত বিবাহ দিয়া তাহাকে অল্পবয়সে বিধবা ও অনুমৃতা করা উচিত হয় না।

সৌন্দর্য্যের কাজ।

প্রকৃতির উদ্দেশ্য—জানান' নহে অনুভব করান'। চারিদিক হইতে কেবল নানা উপায়ে হৃদয় আকর্ষণের চেষ্টা হইতেছে। যে জড়হৃদয় তাহাকেও মুগ্ধ করিতে হইবে, দিবানিশি তাহার কেবল এই যত্ন। তাহার প্রধান ইচ্ছা এই যে, সকলের সকল ভাল লাগে, এত ভাল লাগে যে আপনাকে বা অপরকে কেহ যেন বিনাশ না করে, এত ভাল লাগে যে সকলে সকলের অনুকূল হয়। কারণ এই ইচ্ছার উপর তাহার সমস্ত শুভ তাহার অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে। প্রথম অবস্থায় শাসনের দ্বারা প্রকৃতির এই উদ্দেশ্য সাধিত হয়। প্রথমে দেখিলে, জগৎকে ঘুঁসি মারিলে তোমার মুষ্টিতে গুরুতর আঘাত লাগে, ক্রমে দেখিলে জগতের সাহায্য করিলে সেও তোমার সাহায্য করে। এরূপ শাসনে এরূপ স্বার্থপরতায় জগতের রক্ষা হয় বটে, কিন্তু তাহাতে আনন্দ কিছুই নাই, তাহাতে জড়ত্ব ও দাসত্বই অধিক। এই জন্য প্রকৃতিতে যেমন শাসনও আছে তেমনি সৌন্দর্য্যও আছে। প্রকৃতির অভিপ্রায় এই, যাহাতে শাসন চলিয়া গিয়া সৌন্দর্য্যের বিস্তার হয়। শাসনের রাজদণ্ড কাড়িয়া লইয়া সৌন্দর্য্যের মাথায় রাজচ্ছত্র ধরাই প্রকৃতির চরম উদ্দেশ্য। প্রকৃতি যদি নিষ্ঠুর শাসনপ্রিয় হইত, তাহা হইলে সৌন্দর্য্যের আবশ্যকই থাকিত না। তাহা হইলে প্রভাত মধুর হইত না, ফুল মধুর হইত না, মনুষ্যের মুখশ্রী মধুর হইত না। এই সকল মাধুর্য্যের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া আমরা ক্রমশঃ

স্বাধীনতার জন্ত প্রস্তুত হইতেছি। আমরা ভালবাসিব বলিয়া জগতের হিতসাধন করিব। তখন ভয় কোথায় থাকিবে! তখন সৌন্দর্য্য জগতের চতুর্দ্দিকে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে! অর্থাৎ আমাদের হৃদয়-কমল-শায়ী সুপ্ত সৌন্দর্য্য জাগ্রৎ হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি জাগিয়াই আমাদের চতুর্দ্দিকস্থ শাসনের সিপাহীগুলোর নাম কাটিয়া দিয়াছেন, জগতের চারিদিকে তাঁহার জয়জয়কার উঠিয়াছে।

স্বাধীনতার পথ প্রদর্শক।

কবিরা সেই সৌন্দর্য্যের কবি, তাঁহারা সেই স্বাধীনতার গান গাহিতেছেন, তাঁহারা সজীব মন্ত্রবলে হৃদয়ের বন্ধন মোচন করিতেছেন। তাঁহারা সেই শাসনহীন স্বাধীনতার জন্ত আমাদের হৃদয়ে সিংহাসন নির্ম্মাণ করিতেছেন, সেই মহারাজা কর্ত্তৃক রক্তপাতহীন জগৎজয়ের জন্ত প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছেন; কবিরা তাঁহারই সৈন্ত। তাঁহারা উপদেশ দিতে আসেন নাই। সজীবতা ও সৌন্দর্য্য লাভ করিবার জন্ত কখন কখন তত্ত্ব তাঁহাদের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাঁহারা তত্ত্বর কাছে কখন উমেদারী করিতে যান না। কবিরা অমর, কেন না তাঁহাদের বিষয় অমর, অমরতাকে আশ্রয় করিয়াই তাঁহারা গান গাহিয়াছে। ফুল চিরকাল ফুটিবে, সমীরণ চিরকাল বহিবে, পাখী চিরকাল ডাকিবে, এবং এই ফুলের মধ্যে কবির স্মৃতি বিকশিত, এই সমীরণের মধ্যে কবির স্মৃতি প্রবাহিত, এই পাখীর গানে কবির গান বাজিয়া ওঠে। কবির নাম নির্জ্জীব পাথরের মধ্যে খোদিত নহে, কবির নাম প্রভাতের নব নব বিকশিত বিচিত্রবর্ণ ফুলের অক্ষরে প্রত্যহ নূতন করিয়া লিখিত হয়। কবি প্রিয়, কারণ, তিনি যাহাদিগকে ভাল বাসিয়া কবি হইয়াছেন, তাহারা চিরকাল প্রিয়, কোন কালে তাহারা অপ্রিয় ছিল না, কোন কালে তাহারা অপ্রিয় হইবে না।

পুরাতন কথা।

যাঁহারা বলেন সকল কবিরা ঐ এক কথাই বলিয়া আসিতেছেন, নূতন কি বলিতেছেন? তাঁহাদের কথার আর উত্তর দিবার কি আবশ্যক আছে? এক কথায় তাঁহাদের উত্তর দেওয়া যায়। পুরাতন কথা বলেন বলিয়াই কবিরা কবি। তাঁহারা নূতন কথা বলেন না। নূতনকে বিশ্বাস করে কে? নূতনকে অসন্দিগ্ধচিত্তে প্রাণের অন্তঃপুরের মধ্যে কে ডাকিয়া লইয়া যাইতে পারে? তাহার বংশাবলীর খবর রাখে কে? কবিরা এমন পুরাতন কথা বলেন, যাহা আমার পক্ষেও খাটে তোমার পক্ষেও খাটে; যাহা আজও আছে, কালও ছিল, আগামী কালও থাকিবে? যাহা আজও আছে, কালও ছিল, আগামী কালও থাকিবে। যাহা শুনিবামাত্র সুদূর অতীত হইতে সুদূর ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিতে পারে ঠিক কথা। যাহা শুনিয়া আমরা সকলেই আনন্দে বলিতে পারি—পরের হৃদয়ের সহিত আমার হৃদয়ের কি আশ্চর্য্য যোগ, অতীত কালের হৃদয়ের সহিত বর্ত্তমান কালের হৃদয়ের কি আশ্চর্য্য ঐক্য! হৃদয়ের ব্যাপ্তি মুহূর্ত্তের মধ্যে বাড়িয়া যায়।

জ্ঞান ও প্রেম।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে জ্ঞানে প্রেমে অনেক প্রভেদ। জ্ঞানে আমাদের ক্ষমতা বাড়ে, প্রেমে আমাদের অধিকার বাড়ে। জ্ঞান শরীরের মত, প্রেম মনের মত। জ্ঞান কুস্তি করিয়া জয়ী হয়, প্রেম সৌন্দর্য্যের দ্বারা জয়ী হয়। জ্ঞানের দ্বারা জানা যায় মাত্র, প্রেমের দ্বারা পাওয়া যায়। জ্ঞানেতেই বৃদ্ধ করিয়া দেয়, প্রেমেতেই যৌবন জিয়াইয়া রাখে। জ্ঞানের অধিকার যাহার উপরে তাহা চঞ্চল, প্রেমের অধিকার যাহার উপরে তাহা ধ্রুব। জ্ঞানীর সুখ আত্মগৌরব নামক ক্ষমতার সুখ, প্রেমিকের সুখ আত্ম-বিসর্জ্জন নামক স্বাধীনতার সুখ।

নগদ কড়ি।

জ্ঞান যাহা জানে তাহা প্রকৃত জানাই নয়, প্রেম যাহা জানে তাহাই যথার্থ জানা। একজন জ্ঞানী ও প্রেমিকের নিকটে এই সম্বন্ধে একটি পারস্য কবিতার চমৎকার ব্যাখ্যা শুনিয়াছিলাম, তাহার মর্ম্ম লিখিয়া দিতেছি।

পারস্য কবি এইরূপ একটি ছবি দিতেছেন যে, বৃদ্ধ পককেশ জ্ঞান তাহার লোহার সিন্দুকে চাবি লাগাইয়া বসিয়া আছে; হৃদয় "নগদ কড়ি দাও" "নগদ কড়ি দাও" বলিয়া তাহারই কাছে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে, প্রেম একপাশে বসিয়াছিল, সে হাসিয়া বলিতেছে "মুস্কিল।"

অর্থাৎ জ্ঞান নগদ কড়ি পাইবে কোথায়! সে ত কতকগুলো নোট দিতে পারে মাত্র, কিন্তু সেই নোট ভাঙাইয়া দিবে এমন পোদ্দার কোথায়! জ্ঞানেত কেবল কতকগুলো চিহ্ন দিতে পারে মাত্র, কিন্তু সেই চিহ্নের অর্থ বলিয়া দিবে কে? জগতের সকল ব্যাঙ্কে নোটই দেখিতেছি, চিহ্নই দেখিতেছি, হৃদয় ব্যাকুল হইয়া বলিতেছে, নগদ কড়ি পাইব কোথায়? প্রেমের কাছে পাইবে।

আংশিক ও সম্পূর্ণ অধিকার।

যেমন শরীরের দ্বারা শরীরকেই আয়ত্ত করা যায় তেমনি জ্ঞানের দ্বারা বাহ্যবস্তুর উপরেই ক্ষমতা জন্মে, মর্ম্মের মধ্যে তাহার প্রবেশ নিষেধ।

একজন ইংরাজ স্ত্রীকবি এই সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। ইহার মর্ম্ম এই যে, যদি অংশ চাও তবে জ্ঞান বা শরীরের দ্বারা পাইবে তাও ভাল করিয়া পাইবে না যদি সমস্ত চাও তবে মন বা প্রেমের দ্বারা পাইবে।

INCLUSIONS

Oh, wilt thou have my hand dear,
to lie along in thine?
As a little stone in a running stream,
it seems to lie and pine.
Now drop the poor pale hand, dear,
unfit to play with thine.
Oh wilt thou have my cheek dear,
drawn closer to thine own?
My cheek is white, my cheek is worn,
by many a tear run down.
Now leave a little space, dear, lest it
should wet thine own.
Oh must thou have my soul, Dear,
commingled with thy soul?

Red grows the cheek, and warm the
hand, the part is in the whole:
Nor hands nor cheeks keep separate
when soul is joined to soul.
Mrs. Browning.

লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী, তুমি শ্রী, তুমি সৌন্দর্য্য, আইস, তুমি আমাদের হৃদয়-কমলাসনে অধিষ্ঠান কর। তুমি যাহার হৃদয়ে বিরাজ কর, তাহার আর দারিদ্র্য ভয় নাই; জগতের সর্ব্বত্রই তাহার ঐশ্বর্য্য। যাহারা লক্ষ্মীছাড়া, তাহার হৃদয়ের মধ্যে দুর্ভিক্ষ পোষণ-করিয়া টাকার থলি ও স্থূল উদর বহন করিয়া বেড়ায়। তাহারা অতিশয় দরিদ্র, তাহারা মরুভূমিতে বাস করে; তাহাদের বাসস্থানে ঘাস জন্মায় না, তরুলতা নাই, বসন্ত আসে না।

তুমি বিষ্ণুর গেহিনী। জগতের সর্ব্বত্র তোমার মাতৃস্নেহ। তুমি এই জগতের শীর্ণ কঠিন কঙ্কাল প্রফুল্ল কোমল সৌন্দর্য্যের দ্বারা আচ্ছন্ন করিতেছ। তোমার মধুর করুণ বাণীর দ্বারা জগৎ পরিবারের বিরোধ বিদ্বেষ দূর করিতেছ। তুমি জননী কি না, তাই তুমি শাসন হিংসা ঈর্ষা দেখিতে পার না। তুমি বিশ্বচরাচরকে তোমার বিকশিত কমলদলের মধ্যে আচ্ছন্ন করিয়া অনুপম সুগন্ধে মগ্ন করিয়া রাখিতে চাও। সেই সুগন্ধ এখনি পাইতেছি; অশ্রুপূর্ণনেত্রে বলিতেছি, "কোথায় গো! সেই রাঙা চরণ দুখানি আমার হৃদয়ের মধ্যে একবার স্থাপন কর, তোমার স্নেহহস্তের কোমল স্পর্শে আমার হৃদয়ের পাষাণ-কঠিনতা দূর কর। তোমার চরণ-রেণুর সুগন্ধে সুবাসিত হইয়া আমার হৃদয়ের পুষ্পগুলি তোমার জগতে তোমার সুগন্ধ দান করিতে থাকুক!

এই যে, তোমার পদ্মবনের গন্ধ কোথা হইতে জগতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। চরাচর উন্মত্ত হইয়া মধুকরের মত দল বাঁধিয়া গুন্ গুন্ গান করিতে করিতে সুনীল আকাশে চারিদিক্ হইতে উড়িয়া চলিয়াছে!

কথাবার্ত্তা।

সন্ধ্যাবেলায়।

১ম। আমি সন্ধ্যা কেন এত ভালবাসি জিজ্ঞাসা করিতেছ?

সমস্ত দিন আমরা পৃথিবীর মধ্যেই থাকি সন্ধ্যাবেলায় আমরা জগতে বাস করি। সন্ধ্যাবেলায় দেখিতে পাই, পৃথিবী অপেক্ষা পৃথিবীছাড়াই বেশী—এমন লক্ষ লক্ষ পৃথিবী কুচি কুচি সোণার মত আকাশের তলায় ছড়াছড়ি যাইতেছে। জগৎ মহারণ্যের একটি বৃক্ষের একটি শাখার একটি প্রান্তে একটি অতি ক্ষুদ্র ফল প্রতিদিন পাকিতেছে। তাকাই পৃথিবী। দিনে দেখিতাম পৃথিবীর মধ্যে ছোট-খাট যাহা কিছু সমস্তই চলা-ফিরা করিতেছে সন্ধ্যাবেলায় দেখিতে পাই পৃথিবী স্বয়ং চলিতেছে। রেলগাড়ি যেমন পর্ব্বতের খোদিত গুহার মধ্যে প্রবেশ করে—তেমনি, পৃথিবী তাহার কোটি কোটি আরোহী লইয়া একটি সুদীর্ঘ অন্ধকারের গুহার মধ্যে যেন প্রবেশ করিতেছে—এবং সেই বোবা ঝিল্লীর-গুহার ছাদের মণ্ডপে অযুত গ্রহতারা একেকটি প্রদীপ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে—তাহাদি নীচে দিয়া একটি অতি প্রকাণ্ডকায় গোলক নিঃশব্দে অবিশ্রাম গড়াইয়া চলিতেছে।

২য়। এই বৃহৎ পৃথিবী সত্য সত্যই যে অসীম আকাশে পথচিহ্নহীন পথে অহর্নিশি হূহু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, এক নিমেষও দাঁড়াইতে পারিতেছে না, ইহা একবার মনের মধ্যে অনুভব করিলে কল্পনা স্তম্ভিত হইয়া থাকে।

১ম। এমন একটি পৃথিবী কেন—যখন মনে করিতে চেষ্টা করা যায় যে, ঠিক এই মুহূর্ত্তেই অনন্ত জগৎ প্রচণ্ডবেগে চলিতেছে এবং তাহার প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম পরমাণু থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে; অতিবৃহৎ অতি গুরুভার লক্ষকোটি অযুত নিযুত চন্দ্র সূর্য্য তারা গ্রহ উপগ্রহ উল্কা, ধূমকেতু, লক্ষ যোজন ব্যাপ্ত নক্ষত্রবাষ্পরাশি কিছুই স্থির নাই; অতি বলিষ্ঠ বিরাট এক যাদুকর পুরুষ যেন এই অসংখ্য অনলগোলক লইয়া অনন্ত আকাশে অবহেলে লোফালুফি করিতেছে (কি তাহার প্রকাণ্ড বলিষ্ঠ বাহু! কি তাহার বজ্রকঠিন বিপুল মাংসপেশী!) প্রতি পলকেই কি অসীম শক্তি ব্যয় হইতেছে—তখন কল্পনা অনন্তের কোন্ প্রান্তে বিন্দু হইয়া হারাইয়া যায়!

২য়। অথচ দেখ, মনে হইতেছে প্রকৃতি কি শান্ত!

১ম। প্রকৃতি আমাদের সকলকে জানাইতে চায় যে, তোমরাই খুব মস্ত লোক—তোমরা আমাকে ছাড়াইয়া গিয়াছ। বিদ্যুৎমায়াবিনীকে তার দিয়া বাঁধিয়াছ—বাষ্প-দানবকে লৌহ কারাগারে বাঁধিয়া তাহার দ্বারা কাজ উদ্ধার করিতেছ। প্রকৃতি যে অতি বৃহৎ কার্য্যগুলি করিতেছে তাহা আমাদের কাছ হইতে কেমন গোপন করিয়া রাখিয়াছে, আর, আমরা যে অতি ক্ষুদ্র কাজটুকুও করি, তাহাই আমাদের চোখে কেমন দেদীপ্যমান করিয়া দেয়!

২য়। নহিলে, আমরা যদি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই অনন্তের কাজ চলিতেছে, তাহা হইলে কি আমরা আর কাজ করিতে পারি!

১ম। কম কাজ। বড় হইতে ছোট পর্য্যন্ত দেখ। শক্তি মহৎ শক্তিসম্পন্ন কত সহস্র নক্ষত্র লোক, অথচ দেখ, তাহারা ছোট ছোট মাণিকের মত কেবল চিকাচিক করিতেছে যেন। আমরা ফুল বনের মধ্যে বসিয়া আছি মনে হইতেছে চারিদিকে যেন ছুটি। অথচ প্রতি গাছে পাতায় ফুলে ঘাসে অবশ্রান্ত কাজ চলিতেছে—রাসায়নিক যোগবিয়োগের হাট বসিয়া গিয়াছে, কিন্তু দেখ, উহাদের মুখে গলদঘর্ম্ম পরিশ্রমের ভাব কিছুমাত্র নাই। কেবল সৌন্দর্য্য, কেবল বিরাম, কেবল শান্তি! আমি যখন আরাম করিতেছি, তখনো আমার আপাদমস্তকে কাজ চলিতেছে—আমার শরীরের প্রত্যেক কাজ যদি মেহনত করিয়া আমার নিজেকেই করিতে হইত তাহা হইলে কি আর জীবন ধারণ করিয়া সুখ থাকিত।

২য়। প্রকৃতি বলিতেছে, আমি তোমার জন্য বিস্তর কাজ করিয়া দিতেছি আর তুমি কি তোমার নিজের জন্য কিছু করিবে না! জড়ের সহিত তোমার প্রভেদ এই যে, তোমার নিজের জন্য অনেক কাজ তোমার নিজেকেই করিতে হয়। তুমি পুরুষের মত আহার উপার্জ্জন করিয়া আন, তার পরে সেটাকে পাকযন্ত্রে রাঁধিয়া লইবার অতি কৌশলসাধ্য কার্য্য ভার, সে আমার উপরে রহিল, তাহার জন্যে তুমি বেশী ভাবিও না। তুমি কেবল চলিবার উদ্যম কর, দেখিবে আমি তোমাকে চালাইয়া লইয়া যাইব।

১ম। ঠিক কথা, কিন্তু প্রকৃতি কখনো বলে না যে, আমি করিতেছি। আমাদের বেশীর ভাগ কাজ যে প্রকৃতি সম্পন্ন করিয়া

দিতেছে, তাহা কি আমরা জানি ? আমাদের নিরুদ্যমে যে শতসহস্র কাজ চলিতেছে, তাহা চলিতেছে বলিয়া আমাদের চেতনাই থাকে না। এই যে অতি কোমল বাতাস বহিতেছে, এই যে আমার চোখের সমুখে গঙ্গার ছোট ছোট তরঙ্গগুলি মৃদু মৃদু শব্দ করিতে করিতে তটের উপরে মুহুর্মুহু লুটাইয়া পড়িতেছে, ইহারা আমার হৃদয়ের এই অতি তীব্র শোক অহরহ শান্ত করিতেছে। জগতের চতুর্দ্দিক্ হইতে আমার উপর অবিশ্রাম সান্ত্বনা বর্ষিত হইতেছে অথচ আমি জানিতে পারিতেছি না, অথচ কেহই একটি সান্ত্বনার বাক্য বলিতেছে না কেবল অলক্ষ্যে অদৃশ্যে আমার আহত হৃদয়ের উপরে তাহাদের মন্ত্রপূত হাত বুলাইয়া যাইতেছে আহাউহুটুকুও বলিতেছে না। আমাদের চতুর্দ্দিকবর্ত্তী এই যে কার্য্যকুশল সদাব্যস্ত ব্যক্তিগণ গুপ্তভাবে পরস্পরে সকলে আমাদিগকে ভুলাইবার জন্য; অথবা আমাদিগকে জানাইবার জন্য যে আমরাই স্বাধীন।

২য়। অর্থাৎ, অধীনতা খুব প্রকাণ্ড হইলে তাহাকে কতকটা স্বাধীনতা বলা যাইতে পারে—কারাগার যদি মস্ত হয়, তবে তাহাকে কারাগার না বলিলেও চলে বোধ করি, আমাদিগকে স্থায়ীরূপে অধীন রাখিবার জন্য এই উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। পাছে মুহুর্মুহু আমাদের চেতনা হয় যে আমরা অধীন, ও বৈরাগ্য সাধনা দ্বারা প্রকৃতির শাসন লঙ্ঘন করিয়া স্বাধীন হইতে চেষ্টা করি, এই ভয়ে প্রকৃতি আমাদের হাত হইতে হাতকড়ি খুলিয়া লইয়া আমাদিগকে একটা বেড়া-দেওয়া জায়গায় রাখিয়া দিয়াছে। আমরা ভুলিয়া থাকি আমরা অধীনতার দ্বারা বেষ্টিত; মনে করি আমরা ছাড়া পাইয়াছি।

১ম। কিংবা এমনও হইতে পারে প্রকৃতি আমাদিগকে স্বাধীনতার শিক্ষা দিতেছেন। দেখ না কেন, উত্তরোত্তর কেমন স্বাধীনতারই বিকাশ হইতেছে! জড় যে, সে নিজের জন্য কিছুই করিতে পারে না। উদ্ভিদ তাহার চেয়ে কতকটা উচ্চ। কারণ টিঁকিয়া থাকিবার জন্য খানিকটা যেন তাহার নিজের উদ্যমের আবশ্যক, তাহাকে রস আকর্ষণ করিতে হয়, বাতাস হইতে আহার্য্য সংগ্রহ করিতে হয়! মানুষ এত বেশী স্বাধীন যে, প্রকৃতি বিস্তর প্রধান প্রধান কাজ বিশ্বাস করিয়া আমাদের নিজের হাতেই রাখিয়া দিয়াছেন। আর স্বাধীনতা জিনিষ বড় সামান্য নহে। জড়ের কোন বালাই নাই। আমরা মানুষেরা, কি করিলে যে ভাল হইবে, পদে পদে তাহা ভাবিয়া পাই না। আকুল হইয়া একবার এটা দেখিতেছি, একবার ওটা দেখিতেছি; এবং এইরূপ পরীক্ষা করিতে করিতেই আমরা শতসহস্র করিয়া মারা পড়িতেছি। উত্তরোত্তর যেরূপ স্বাধীনতার বিকাশ হইয়া আসিয়াছে, ইহারই যদি ক্রমিক চালনা হয়, তাহা হইলে মানুষের পর এমন জীব জন্মাইবে, যাহার ক্ষুধা পাইবে না অথচ বিবেচনা পূর্ব্বক আহার করিতে হইবে (অনেক মানুষেরই তাহা করিতে হয়) রক্ত সঞ্চালন ও পরিপাক কার্য্য তাহার নিজের কৌশলে করিয়া লইতে হইবে, (মানুষের রন্ধন কার্য্যও কতকটা তাহাই) ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার শরীরের পরিণতি সাধন করিতে হইবে —এক কথায়, তাহার আপাদমস্তকের সমস্ত ভার তাহার নিজের হাতে পড়িবে। তাহার প্রত্যেক কার্য্যের ফলাফল সে অনেকটা পর্য্যন্ত দেখিতে পাইবে। একটি কথা কহিলে আঘাত-

জনিত বাতাসের তরঙ্গ কতদূরে কত বিভিন্ন শক্তিরূপে রূপান্তরিত হইবে তাহা সে জানিবে, এবং তাহার সেই কথার ভাব সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কত হৃদয়কে কতরূপে বিচলিত করিবে; তাহার ফল পুরুষানুক্রমে কতদূরে কি আকারে প্রবাহিত হইবে তাহা বুঝিতে পারিবে।

২য়। আমাদের স্বাধীনতাও আছে, অধীনতাও আছে, বোধ করি, চিরকালই থাকিবে। স্বাধীনতার যেমন সাধনা আবশ্যক, অধীনতারও বোধ হয় সেই রূপ সাধনা আবশ্যক। হয় ত বা উৎকর্ষপ্রাপ্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধীনতাকেই যথার্থ স্বাধীনতা বলে। কেবল মাত্র স্বাতন্ত্র্যকে শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা বলে না। যথার্থ যে রাজা সে প্রজার অধীন, পিতা সন্তানের অধীন, দেবতা এই জগতের অধীন। অর্থাৎ স্বাধীনভাবে অধীনতাকেই শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা বলে। জড় পদার্থ অধীন ভাবে অধীন, মানুষেরা অধীন ভাবে স্বাধীন, আর দেবতারা স্বাধীন ভাবে অধীন। আমরা যখন মহত্ত্ব লাভ করিব, তখন আমরা জগতের দাসত্ব করিব, কিন্তু সেই দাসত্ব করাকেই বলে রাজত্ব করা। আর স্বতন্ত্র হওয়াকেই যদি স্বাধীন হওয়া বলে তাহা হইলে ক্ষুদ্রতাকেই বলে স্বাধীনতা, বিনাশকেই বলে স্বাধীনতা।

আত্মা।

আত্মগঠন।

সকল দ্রব্যই, যাহা কিছু নিজের অনুকূল, উপযোগী, তাহাই আপন শক্তি-প্রভাবে চারিদিক হইতে আকর্ষণ করিতে থাকে, বাকী আর সকলের প্রতি তাহার তেমন ক্ষমতা নাই। নিজেকে যথাযোগ্য আকারে ব্যক্ত ও পরিপুষ্ট করিবার পক্ষে যে সকল পদার্থ সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী, উদ্ভিজ্জ-শক্তি কেবল তাহাই জল বায়ু মৃত্তিকা হইতে গ্রহণ করিতে পারে, আর কিছুই না। মানুষের জীবনী শক্তিও কিছুতেই আপনাকে উদ্ভিদ্ শরীরের মধ্যে ব্যক্ত করিতে পারে না। সে নিজের চারিদিকে এমন সকল পদার্থই সঞ্চয় করিতে পারে যাহা তাহার নিজের প্রকাশের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল। মনের মধ্যে একটা পাপের সঙ্কল্প তাহার চারিদিকে সহস্র পাপের সঙ্কল্প আকর্ষণ করিয়া আপনাকে আকারবদ্ধ করিয়া তুলে ও প্রতিদিন বৃহৎ হইতে থাকে। পুণ্যসঙ্কল্পও সেইরূপ। সজীবতার ইহাই লক্ষণ। আমরা যখন একটি প্রবন্ধ লিখি, তখন কিছু সেই প্রবন্ধের প্রত্যেক ভাব কথা ভাবিয়া লিখিতে বসি না। একটা মুখ্য সজীব ভাব যদি আমার মনে আবির্ভূত হয়, তবে সে নিজের শক্তি-প্রভাবে আপনার অনুকূল ভাব ও শব্দ গুলি নিজের চারিদিকে গঠিত করিতে থাকে। আমি যে সকল ভাব কোন কালেও ভাবি নাই, তাহাদিগকেও কোথা হইতে আকর্ষণ করিয়া আনে। এইরূপে সে, একটি পরিপূর্ণ প্রবন্ধ আকার ধারণ করিয়া আপনাকে আপনি মানুষ করিয়া তুলে। এই জন্য, প্রবন্ধের মর্ম্মস্থিত মুখ্য ভাবটি যত সজীব হয় প্রবন্ধ ততই ভাল হয়; নির্জ্জীব ভাব আপনাকে আপনি গড়িতে পারে না, বাহির হইতে তাহার কাঠামো গড়িয়া দিতে হয়। এই নিমিত্ত ভাল লেখা লেখকের পক্ষেও একটি শিক্ষা। তিনি যতই অগ্রসর হইতে থাকেন ততই নুতন জ্ঞান লাভ করিতে থাকেন।

আত্মার সীমা।

আমার মনে হয়, মানুষের আত্মাও এই রূপ ভাবের মত। ভাব নিজেকে ব্যক্ত করিতে চায়। যেটি তাহার নিজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাহ্য বিকাশ তাহাই আশ্রয় করিতে করিতেই তাহার ক্রমাগত পুষ্টি সাধন হয়। আমরা মনের মধ্যে যাহা অনুভব করি, কার্য্যই তাহার বাহ্য প্রকাশ। এই জন্য আমাদের অধিকাংশ অনুভাব কাজ করিবার জন্য ব্যাকুল, আবার, কাজ যতই সে করিতে থাকে ততই সে বাড়িয়া উঠিতে থাকে। আমাদের আত্মাও সেইরূপ সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থায় নিজেকে প্রকাশ করিতে চায়। এবং সেই প্রকাশ চেষ্টা রূপ কার্য্যেতেই তাহার উত্তরোত্তর পুষ্টিসাধন হইতে থাকে। চারিদিকের বাতাস হইতে সে আপনার অনুরূপ ভাবনা কামনা প্রবৃত্তি আকর্ষণ করিয়া নিজের আবরণ নিজের সীমা নিজে রচনা করিতে থাকে। অবশিষ্ট আর কিছুরই উপরে তাহার কোন প্রভুত্ব নাই। আমরা সকলেই বন্ধু বান্ধব ও অবস্থার দ্বারা বেষ্টিত হইয়া একটি যেন ডিম্বের মধ্যে বাস করিতেছি ঐ টুকুর মধ্য হইতেই আমাদের উপযোগী খাদ্য শোষণ করিতেছি। একটি ব্যক্তি বিশেষকে যখন আমারা দেখি, তখন তাহার চারিদিকের মণ্ডলী আমরা দেখিতে পাই না। কিন্তু তাহার সেই খাদ্যাধার মণ্ডলী তাহার সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষিত ভাবে ফিরিতেছে। যে ব্যক্তি সৌন্দর্য্যপ্রিয়, সে তাহার দেহের মধ্যে, তাহার চর্ম্মাবরণ টুকুর মধ্যে, বাস করে না। সে তাহার চারিদিকের তরুলতার মধ্যে আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে বাস করে। সে যেখানেই যায় চন্দ্রসূর্য্যময় আকাশ তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে, তৃণ-পত্র পুষ্পময়ী বনশ্রী তাহাকে ঘিরিয়া রাখে। ইহারা তাহার ইন্দ্রিয়ের মত। চন্দ্র সূর্য্যের মধ্য দিয়া সে কি দেখিতে পায়; কুসুমের সৌগন্ধ্য ও সৌন্দর্য্যের সাহায্যে তাহার হৃদয়ের ক্ষুধা নিবৃত্ত হইতে থাকে। এই মণ্ডলীর বিস্তার লইয়া মানুষের ছোটবড়ত্ব। মনুষ্যের যে দেহ মাপিতে পারা যায়, সে দেহ গড়ে প্রায় সকলেরই সমান। কিন্তু যে দেহ দেখা যায় না, মাপা যায় না, তাহার ছোট বড় সামান্য নহে। এই দেহ, এই মণ্ডলী এই বৃহৎ দেহ, এই অবস্থা-গোলক, যাহার মধ্যে আমাদের শাবক আত্মার খাদ্য সঞ্চিত ছিল, ইহাই ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সে পরলোকে জন্মগ্রহণ করে।

মানুষ চেনা।

যেমন মানুষের বৃহৎ দেহটি আমরা দেখিতে পাই না, তেমনি যথার্থ মানুষ যে তাহাকেও দেখিতে পাই না। এই জন্য কাহারও জীবন-চরিত লেখা সম্ভব নহে। কারণ, লেখকেরা মানুষের কাজ দেখিয়া তাহার জীবনচরিত লেখেন। কিন্তু যে গোটাকতক কাজ মানুষ করিয়াছে তাই তিনি দেখিতে পান, লক্ষ লক্ষ কাজ, যাহা সে করে নাই, তাহা ত তিনি দেখিতে পান না। আমরা তাহার কতক গুলা কাজের টুকরা এখান ওখান হইতে কুড়াইয়া জোড়া দিয়া একটা জীবন-চরিত খাড়া করিয়া তুলি, কিন্তু তাহার সমগ্রটিকে দেখিতে পাই না। তাহার মধ্যস্থিত যে মহাপুরুষ অসংখ্য অবস্থায় অসংখ্য আকার ধারণ করিতে পারিত, তাহাকে ত দেখিতে পাই না। তাহার কাজ কর্ম্মের মধ্যে বরঞ্চ সে ঢাকা পড়িয়া যায়; আমরা কেবল মাত্র উপস্থিতটুকু দেখিতে পাই, যত কাজ হইয়া গিয়াছে, যত কাজ হইবে, এবং যত কাজ

হইতে পারিত, উপস্থিত কার্য্য খণ্ডের সহিত তাহার যোগ দেখিতে পাই না। আমরা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এক-একটা কাজ দেখিয়া সেই কার্য্য-কারকের মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এক একটা নাম দিই। সেই নামের প্রভাবে তাহার ব্যক্তি-বিশেষত্ব ঘুচিয়া যায়, সে একটা সাধারণ শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং ভিড়ের মধ্যে তাহাকে হারাইয়া ফেলি। আমরা রামকে যখন খুনী বলি, তখন সে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ খুনীর সহিত এক হইয়া যায়। কিন্তু রাম-খুনী ও শ্যাম খুনীর মধ্যে এই খুন সম্বন্ধেই এমন আকাশ পাতাল প্রভেদ যে, উভয়কে এক নাম দিলে বুঝিবার সুবিধা হওয়া দূরে থাকুক্, বুঝিবার ভ্রম হয়। আমরা প্রত্যহ আমাদের কাছের লোকদিগকে এইরূপে ভুল বুঝি। তাড়াতাড়ি তাহাদের এক-একটা নামকরণ করিয়া ফেলি ও সেই নামের কৃত্রিম খোলষটার মধ্যেই সে ব্যক্তি ঢাকা পড়িয়া যায়। অনেক সময়ে মানুষ অনুপস্থিত থাকিলেই তাহাকে ঠিক জানিতে পারি। কারণ, সকল মানুষই বৃহৎ। বৃহৎ জিনিষকে দূর হইতে দেখিলেই তাহার সমস্তটা দেখা যায়, কিন্তু তাহার অত্যন্ত কাছে লিপ্ত থাকিয়া দেখিলে তাহার খানিকটা অংশ দেখা যায় মাত্র, সেই অংশকেই সমস্ত বলিয়া ভ্রম হয়। মানুষ অনুপস্থিত থাকিলে আমরা তাহার দুই চারি বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত মাত্র দেখি না, যত দিন হইতে তাহাকে জানি, ততদিনকার সমষ্টি স্বরূপে তাহাকে জানি। সুতরাং সেই জানাটাই অপেক্ষাকৃত যথার্থ। পৃথিবীর অধিবাসীরা পৃথিবীকে কেহ বলিবে উঁচু, কেহ বলিবে নীচু, কেহ বলিবে উঁচু-নীচু। কিন্তু যে লোক পৃথিবী হইতে আপনাকে তফাৎ করিয়া সমস্ত পৃথিবীটা কল্পনা করিয়া দেখে, সে এই সামান্য উঁচুনীচুগুলিকে গ্রাহ্য না করিয়া বলিতে পারে যে পৃথিবী সমতল গোলক। কথাটা খাঁটি সত্য নহে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা সত্য।

শ্রেষ্ঠ অধিকার।

আত্মার উপরে শ্রেষ্ঠ অধিকার কাহার জন্মিয়াছে? যে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে পারে। নাবালক যে, তাহার বিষয় আশয় সমস্তই আছে বটে, কিন্তু সে বিষয়ের উপর তাহার অধিকার নাই—কারণ তাহার দানের অধিকার নাই। এই দানের অধিকারই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার। যে ব্যক্তি পরকে দিতে পারে সেই ধনী। যে নিজেও খায় না পরকেও দেয় না কেবল মাত্র জমাইতে থাকে, তাহার নিজের সম্পত্তির উপর কতটুকুইবা অধিকার। যে নিজে খাইতে পারে কিন্তু পরকে দিতে পারে না সেও দরিদ্র—কিন্তু যে পরকে দিতে পারে নিজের সম্পত্তির উপরে তাহার সর্ব্বাঙ্গীন অধিকার জন্মিয়াছে। কারণ, ইহাই চরম অধিকার।

আমাদের পুরাণে যে বলে, যে ব্যক্তি ইহ জন্মে দান করে নাই সে পরজন্মে দরিদ্র হইয়া জন্মিবে, তাহার অর্থ এইরূপ হইতে পারে যে, টাকা ত আর পরকালে সঙ্গে যাইবে না, সুতরাং টাকাগত ধনিত্ব বৈতরণীর এ পার পর্য্যন্ত। যদি কিছু সঙ্গে যায় ত সে হৃদয়ের সম্পত্তি। যাহার সমস্ত টাকা কেবল নিজের জন্য—নিজের গাড়িটি ঘোড়াটির জন্যই লাগে, তাহার লাখ টাকা থাকিলেও তাহাকে দরিদ্র বলা যায় এই কারণে—যে, তাহার এত সামান্য আয় যে তাহাতে কেবল তাহার নিজের পেট-টাই ভরে, তা'ও ভরে না বুঝি! তাহার কিছুই বাকী থাকে না—যতই কিছু আসে তাহার

নিজের অতি মহৎ শূন্যতা পূরাইতে, অতি বৃহৎ দুর্ভিক্ষ-দারিদ্র্য দূর করিতেই খরচ হইয়া যায়। সুতরাং যখন সে বিদায় হয়, তখন তাহার সেই প্রকাণ্ড শূন্যতা ও হৃদয়ের দুর্ভিক্ষই তাহার সঙ্গে সঙ্গে যায়, আর কিছুই যায় না। লোকে বলে, ঢের টাকা রাখিয়া মরিল! ঠিক কথা, কিন্তু এক পয়সাও লইয়া মরিল না।

নিষ্ফল আত্মা।

সুতরাং, আত্মকে যে দিতে পারিয়াছে আত্মা সর্ব্বতোভাবে তাহারই। আত্মা ক্রমশই অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে। জড় হইতে মনুষ্য-আত্মার অভিব্যক্তি; মধ্যে কত কোটি কোটি বৎসরের ব্যবধান। তেমনি স্বার্থসাধন-তৎপর আদিম মনুষ্য ও আত্মবিসর্জ্জনরত মহদাশয়ের মধ্যে কত যুগের ব্যবধান। একজন নিজের আত্মাকে ভালরূপ পায় নাই, আর এক জনের আত্মা তাহার হাতে আসিয়াছে। আত্মার উপরে যাহার অধিকার জন্মে নাই, সে যে আত্মাকে রক্ষা করিতে পারিবে তাহা কেমন করিয়া বলিব? সকল মনুষ্য নহে—মনুষ্যদের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যথার্থ হিসাবে তাঁহাদেরই আত্মা আছে। যেমন গুটিকতক ফল ফলাইবার জন্য শতসহস্র নিষ্ফল মুকুলের আবশ্যক, তেমনি গুটিকতক অমর আত্মা অভিব্যক্ত হয়, এবং লক্ষ লক্ষ মানবাত্মা নিষ্ফল হয়।

আত্মার অমরতা।

আত্মবিসর্জ্জনের মধ্যেই আত্মার অমরতার লক্ষণ দেখা যায়। যে আত্মায় তাহা দেখা যায় না, সে আত্মার যতই বর্ণ থাকুক ও যতই গন্ধ থাকুক তাহা বন্ধ্যা। একজন মানুষ কেনই বা আত্মবিসর্জ্জন করিবে! পরের জন্য নিজেকে কেনই বা কষ্ট দিবে! ইহার কি যুক্তি আছে! যাহার সহিত নিতান্তই আমার সুখের যোগ, তাহাই আমার অবলম্ব্য আর কিছুর জন্যই আমার মাথাব্যথা নাই, এইত ইহ-সংসারে শাস্ত্র। জগতের প্রত্যেক পরমাণুই আর সমস্ত উপেক্ষা করিয়া নিজে টিকিয়া থাকিবার জন্য প্রাণপণে যুঝিতেছে, সুতরাং স্বার্থপরতার একটা যুক্তি-সঙ্গত অর্থ দেখা যাইতেছে। কিন্তু এই স্বার্থপরতার উপরে মরণের অভিশাপ দেখা যায়, কারণ ইহা সীমাবদ্ধ। ঐহিকের নিয়ম ঐহিকেই অবসান, সে নিয়ম কেবল এইখানেই খাটে। সে নিয়মে যাহারা চলে তাহারা ঐহিক অতিক্রম করিয়া আর কিছুই দেখিতে পায় না, আর কিছুর উপরেই বিশ্বাস স্থাপন করে না। কেনই বা করিবে? তাহারা দেখিতেছে, এইখানেই সমস্ত হিসাব মিলিয়া যায়, অন্যত্র অনুসন্ধানের আবশ্যকই করে না। কিন্তু অমরতা কখন দেখিতে পাই? পৃথিবীর মাটি হইতে উদ্ভূত হইয়া পৃথিবীতেই মিলাইয়া যাইব, এ সন্দেহ কখন দূর হয়? যখন দেখিতে পাই, আমাদের মধ্যে একটি পদার্থ আছে, যে ঐহিকের সকল নিয়ম মানে না। আমরা আপনার সুখ চাই না, আমরা আনন্দের সহিত আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারি, আমরা পরের সুখের জন্য নিজেকে দুঃখ দিতে কাতর হই না। কোথাও ইহার "কেন" খুঁজিয়া পাই না। কেবল হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে পারি যে, নিজের ক্ষুধায় কাতর, সংগ্রাম-পরায়ণ এই জগৎ অতিক্রম করিয়া আর এক জগৎ আছে, ইহা সেইখানকার

নিয়ম। সুতরাং এই খানেই পরিণাম দেখিতেছি না। চারিদিকে এই যে বস্তু-জগতের ঘোর কারাগার ভিত্তি উঠিয়াছে, ইহাই আমাদের অনন্ত কবর-ভূমি নহে। অতএব যখনি আমরা আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে শিখিলাম, তখনি আমাদের গুরুভার ঐহিক দেহের উপরে দুটি পাখা উঠিল! পৃথিবীর মাটিতে চলিবার সময় সে পাখাদুটির কোন অর্থ বুঝা গেল না। কিন্তু ইহা বুঝা গেল যে ঐ পাখা দুটি কেবল মাত্র তাহার শোভা নহে উহার কার্য্য আছে। তবে যাহাদের এই পাখা জন্মায় নাই তাহাদেরও কি আকাশে উঠিবার অধিকার আছে?

স্থায়িত্ব।

আমাদের মধ্যে যে সকল উচ্চ আশা, যে সকল মহত্ত্ব বিরাজ করিতেছে তাহারাই স্থায়ী, আর যাহারা তাহাদিগকে বাধা দিয়াছে, তাহাদিগকে কার্য্যে পরিণত হইতে দেয় নাই, তাহারা নশ্বর। তাহারা এই খানকারই জিনিষ, তাহারা কিছু সঙ্গে সঙ্গে যাইবে না। আমার মধ্যে যে সকল নিত্য পদার্থ বিরাজ করিতেছে, তাহা তোমরা দেখিতে পাইতেছ না; তাহাদের চারিদিকে যে জড়স্তূপ উত্থিত হইয়া কিছুদিনের মত তাহাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহাই তোমরা দেখিতেছ। আমার মনের মধ্যে ধর্ম্মের আদর্শ বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহারই উপর আমার স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে। যখন কাষ্ঠলোষ্ট্রের মত সমস্ত পড়িয়া থাকে তখন ধর্ম্মই আমাদের অনুগমন করে। যাহার আত্মায় এ আদর্শ নাই, দেহের সহিত তাহার সম্পূর্ণ মৃত্যু হয়। জড়ত্বই তাহার পরিণাম। যে গেছে, সে তাহার জীবনের সার পদার্থ লইয়া গেছে, তাহার যা যথার্থ জীবন তাহাই লইয়া গেছে, আর তাহার দুদিনের সুখ দুঃখ, দুদিনের কাজকর্ম্ম আমাদের কাছে রাখিয়া গেছে। তাহার জীবনে অনেক সময়ে আজিকার মতের সহিত কালিকার মতের অনৈক্য দেখিয়াছি, এমন কি, তাহার মত একরূপ শুনা গিয়াছে, তাহার কাজ আর একরূপ দেখা গিয়াছে—এই সকল বিরোধ অনৈক্য চঞ্চলতা তাহার আত্মার জড় আবরণের মত এই খানেই পড়িয়া রহিল, ইহাকে অতিক্রম করিয়া যে ঐক্য যে অমরতা অধিষ্ঠিত ছিল, তাহাই কেবল চলিয়া গেল। যখন তাহার দেহ দগ্ধ করিয়া ফেলিলাম, তখন এগুলিও দগ্ধ করিয়া শ্মশানে ফেলিয়া আসা যাক্। তাহার সেই মৃত অনিত্য গুলিকে লইয়া অনর্থক সমালোচনা করিয়া কেন তাহার প্রতি অসম্মান করি? তাহার মধ্যে যে সত্য, যে দেবতা ছিল, যে থাকিবে, সেই আমাদের হৃদয়ের মধ্যে অধিষ্ঠান করুক্!

বৈষ্ণব কবির গান।

মর্ত্ত্যের সীমানা।

এক স্থানে মর্ত্ত্যের প্রান্তদেশ আছে, সেখানে দাঁড়াইলে মর্ত্ত্যের পরপার কিছু কিছু যেন দেখা যায়। সে স্থানটা এমন সঙ্কট স্থানে অবস্থিত যে, উহাকে মর্ত্ত্যের প্রান্ত বলিব, স্বর্গের প্রান্ত বলিব, ঠিক করিয়া উঠা যায়না—অর্থাৎ উহাকে দুইই বলা যায়। সেই প্রান্তভূমি কোথায়, পৃথিবীর আদিদেব

কাজে শ্রান্ত হইলে, আমরা কোথায় সেই স্বর্গের বায়ু সেবন করিতে যাই।

স্বর্গের সামগ্রী।

স্বর্গ কি, আগে তাহাই দেখিতে হয়। যেখানে যে কেহ স্বর্গ কল্পনা করিয়াছে, সকলেই নিজ নিজ ক্ষমতা অনুসারে স্বর্গকে সৌন্দর্য্যের সার বলিয়া কল্পনা করিয়াছে আমার স্বর্গ আমার সৌন্দর্য্যকল্পনার চরম তীর্থ। পৃথিবীতে কত কি আছে, কিন্তু মানুষ সৌন্দর্য্য ছাড়া এখানে এমন আর কিছু দেখে নাই, যাহা দিয়া সে তাহার স্বর্গ গঠন করিতে পারে। সৌন্দর্য্য যেন স্বর্গের জিনিষ পৃথিবীতে আসিয়া পড়িয়াছে, এই জন্য পৃথিবী হইতে স্বর্গে কিছু পাঠাইতে হইলে সৌন্দর্য্যকেই পাঠাইতে হয়। এই জন্য সুন্দর জিনিষ যখন ধ্বংস হইয়া যায়, তখন কবিরা কল্পনা করেন—দেবতারা স্বর্গের অভাব দূর করিবার জন্য উহাকে পৃথিবী হইতে চুরি করিয়া লইয়া গেলেন। এই জন্য পৃথিবীতে সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ দেখিলে উহাকে স্বর্গচ্যুত বলিয়া গোঁজামিলন দিয়া না লইলে যেন হিসাব মিলে না। এই জন্য, অজ ও ইন্দুমতী সুরলোকবাসী, পৃথিবীতে নির্ব্বাসিত।

মিলন।

তাই মনে হইতেছে, পৃথিবীর যে প্রান্তে স্বর্গের আরম্ভ, সেই প্রান্তটিই যেন সৌন্দর্য্য। সৌন্দর্য্য মাঝে না থাকিলে যেন স্বর্গে মর্ত্ত্যে চিরবিচ্ছেদ হইত। সৌন্দর্য্যে স্বর্গে মর্ত্ত্যে উত্তর প্রত্যুত্তর চলে—সৌন্দর্য্যের মাহাত্ম্যই তাই, নহিলে সৌন্দর্য্য কিছুই নয়।

স্বর্গের গান।

শঙ্খকে সমুদ্র হইতে তুলিয়া আনিলেও সে সমুদ্রের গান ভুলিতে পারে না। উহা কাণের কাছে ধর, উহা হইতে অবিশ্রাম সমুদ্রের ধ্বনি শুনিতে পাইবে। পৃথিবীর সৌন্দর্য্যের মর্ম্মস্থলে তেমনি স্বর্গের গান বাজিতে থাকে। কেবল বধির তাহা শুনিতে পায় না। পৃথিবীর পাখীর গানে পাখীর গানের অতীত আরেকটি গান শুনা যায়, প্রভাতের আলোকে প্রভাতের আলোক অতিক্রম করিয়া আরেকটি আলোক দেখিতে পাই, সুন্দর কবিতায় কবিতার অতীত আরেকটি সৌন্দর্য্য-মহাদেশের তীরভূমি চোখের সম্মুখে রেখার মত পড়ে।

মর্ত্ত্যের বাতায়ন।

এই অনেকটা দেখা যায় বলিয়া আমরা সৌন্দর্য্যকে এত ভালবাসি। পৃথিবীর চারিদিকে দেয়াল, সৌন্দর্য্য তাহার বাতায়ন। পৃথিবীর আর সকলেই তাহাদের নিজ নিজ দেহ লইয়া আমাদের চোখের সম্মুখে আড়াল করিয়া দাঁড়ায় সৌন্দর্য্য তাহা করে না—সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া আমরা অনন্ত রঙ্গভূমি দেখিতে পাই। এই সৌন্দর্য্য-বাতায়নে বসিয়া আমরা সুদূর আকাশের নীলিমা দেখি, সুদূর কাননের সমীরণ স্পর্শ করি, সুদূর পুষ্পের গন্ধ পাই, স্বর্গের সূর্য্য-কিরণ সেইখান হইতে আমাদের গৃহের মধ্যে প্রবেশ করে। আমাদের গৃহের স্বাভাবিক অন্ধকার দূর হইয়া যায়, আমাদের হৃদয়ের সঙ্কোচ চলিয়া যায়, সেই আলোকে পরস্পরের মুখ দেখিয়া আমরা পরস্পরকে ভাল বাসিতে পারি। এই বাতায়নে বসিয়া অনন্ত আকাশের জন্য আমাদের প্রাণ যেন হা হা করিতে থাকে, দুই বাহু তুলিয়া সূর্য্যকিরণে

উড়িতে ইচ্ছা যায়, এই সৌন্দর্য্যের শেষ কোথায় অথবা এই সৌন্দর্য্যের আরম্ভ কোথায়, আহারই অন্বেষণে সুদূর দিগন্তের অভিমুখে বাহির হইয়া পড়িতে ইচ্ছা করে, ঘরে যেন আর মন টেঁকেনা। বাঁশীর শব্দ শুনিলে তাই মন উদাস হইয়া যায়, দক্ষিণা বাতাসে তাই মনটাকে টানিয়া কোথায় বাহির করিয়া লইয়া যায়। সৌন্দর্য্যচ্ছবিতে তাই আমাদের মনে এক অসীম আকাঙ্ক্ষা উদ্রেক করিয়া দেয়।

সাড়া।

স্বর্গে মর্ত্ত্যে এমনি করিয়াই কথাবার্ত্তা হয়। সৌন্দর্য্যের প্রভাবে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে একটি ব্যাকুলতা উঠে, পৃথিবীর কিছুতেই সে যেন তৃপ্তি পায় না। আমাদের হৃদয়ের ভিতর হইতে যে একটি আকুল আকাঙ্ক্ষার গান উঠে, স্বর্গ হইতে তাহার যেন সাড়া পাওয়া যায়।

সৌন্দর্য্যের ধৈর্য্য।

যাহারা এমন হয় না, তাহার আজ যদি বা না হয়, কাল হইবেই। আর সকলে বলের দ্বারা অবিলম্বে নিজের ক্ষমতা বিস্তার করিতে চায়, সৌন্দর্য্য কেবল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে আর কিছুই করে না। সৌন্দর্য্যের কি অসামান্য ধৈর্য্য এমন কতকাল ধরিয়া প্রভাতের পরে প্রভাত আসিয়াছে, পাখীর পরে পাখী গাহিয়াছে, ফুলের পরে ফুল ফুটিয়াছে, কেহ দেখে নাই, কেহ শোনে নাই। যাহাদের ইন্দ্রিয় ছিল কিন্তু অতীন্দ্রিয় ছিল না, তাহাদের সম্মুখেও জগতের সৌন্দর্য্য উপেক্ষিত হইয়াও প্রতিদিন হাসিমুখে আবির্ভূত হইত। তাহারা গানের শব্দ শুনিত মাত্র, ফুলের ফোটা দেখিত মাত্র। সমস্তই তাহাদের নিকটে ঘটনা মাত্র ছিল। কিন্তু প্রতি দিন অবিশ্রাম দেখিতে দেখিতে, অবিশ্রাম শুনিতে শুনিতে ক্রমে তাহাদের চক্ষুর পশ্চাতে আরেক চক্ষু বিকশিত হইল, তাহাদের কর্ণের পশ্চাতে আরেক কর্ণ উদ্ঘাটিত হইল। ক্রমে তাহারা ফুল দেখিতে পাইল, গান শুনিতে পাইল। ধৈর্য্যই সৌন্দর্য্যের অস্ত্র। পুরুষদের ক্ষমতা আছে, তাই এতকাল ধরিয়া রমণীদের উপরে অনিয়ন্ত্রিত কর্ত্তৃত্ব করিয়া আসিতেছিল। রমণীরা আর কিছুই করে নাই, প্রতিদিন তাহাদের সৌন্দর্য্যখানি লইয়া ধৈর্য্য সহকারে সহিয়া আসিতেছিল। অতি ধীরে ধীরে প্রতিদিন সেই সৌন্দর্য্য জয়ী হইতে লাগিল। এখন দানব-বল সৌন্দর্য্য-সীতার গায়ে হাত তুলিতে শিহরিয়া উঠে। সভ্যতা যখন বহুদূর অগ্রসর হইবে, তখন বর্ব্বরেরা কেবলমাত্র শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতামাত্রের পূজা করিবে না। তখন এই স্নেহপূর্ণ ধৈর্য্য, এই আত্মবিসর্জ্জন এই মধুর সৌন্দর্য্য, বিনা উপদ্রবে মনুষ্য-হৃদয়ে আপন সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া লইবে। তখন বিষ্ণুদেবের গদার কাজ ফুরাইবে পদ্ম, ফুটিয়া উঠিবে।

জ্ঞানদাসের গান।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সৌন্দর্য্য পৃথিবীতে স্বর্গের বার্ত্তা আনিতেছে। যে বধির, ক্রমশঃ তাহার বধিরতা দূর হইতেছে। বৈষ্ণব জ্ঞানদাসের একটি গান পাইয়াছি, তাহাই ভাল করিয়া বুঝিতে গিয়া আমার এত কথা মনে পড়িল।

মুরলী করাও উপদেশ।
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ।
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপাম।
কোন্ রন্ধ্রে রাধা বলে ডাকে আমার নাম॥
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী সুললিত ধ্বনি।
কোন্ রন্ধ্রে কেকা শব্দে নাচে ময়ূরিণী॥
কোন্ রন্ধ্রে রসালে ফুটয়ে পারিজাত।
কোন্ রন্ধ্রে কদম্ব ফুটে হে প্রাণনাথ॥
কোন্ রন্ধ্রে ষড় ঋতু হয় এককালে।
কোন্ রন্ধ্রে নিধুবন হয় ফুলে ফলে॥
কোন্ রন্ধ্রে কোকিল পঞ্চম স্বরে গায়।
একে একে শিখাইয়া দেহ শ্যাম রায়॥
জ্ঞানদাস কহে হাসি।
"রাধে মোর" বোল বাজিবেক বাঁশী॥

বাঁশীর স্বর।

সৌন্দর্য্য-স্বরূপের হাতে সমস্ত জগৎই একটি বাঁশী। ইহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে তিনি নিশ্বাস পূরিতেছেন ও ইহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে নূতন নূতন স্বর উঠিতেছে। মানুষের মন আর কি ঘরে থাকে? তাই সে ব্যাকুল হইয়া বাহির হইতে চায়। সৌন্দর্য্যই তাঁহার আহ্বান গান। সৌন্দর্য্যই সেই দৈববাণী। কদম্ব ফুল তাঁহার বাঁশীর স্বর, বসন্ত ঋতু তাঁহার বাঁশীর স্বর, কোকিলের পঞ্চম তান তাঁহার বাঁশীর স্বর। সে বাঁশীর স্বর কি বলিতেছে? জ্ঞানদাস হাসিয়া বুঝাইলেন, সে কেবল বলিতেছে "রাধে, তুমি আমার"—আর কিছুই না। আমরা শুনিতেছি, সেই অসীম সৌন্দর্য্য অব্যক্ত কণ্ঠে আমাদেরই নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন। তিনি বলিতেছেন—"তুমি আমার, তুমি আমার কাছে আইস!" এই জন্য, আমাদের চারিদিকে যখন সৌন্দর্য্য বিকশিত হইয়া উঠে, তখন আমরা যেন একজন কাহার বিরহে কাতর হই, যেন একজন কাহার সহিত মিলনের জন্য উৎসুক হই—সংসারে আর যাহারই প্রতি মন দিই, মনের পিপাসা যেন দূর হয় না। এই জন্য সংসারে থাকিয়া আমরা যেন চির-বিরহে কাল কাটাই। কাণে একটি বাঁশীর শব্দ আসিতেছে, মন উদাস হইয়া যাইতেছে, অথচ এ সংসারের অন্তঃপুর ছাড়িয়া বাহির হইতে পারি না। কে বাঁশী বাজাইয়া আমাদের মন হরণ করিল, তাহাকে দেখিতে পাই না; সংসারের ঘরে ঘরে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াই। অন্য যাহারই সহিত মিলন হউক না কেন, সেই মিলনের মধ্যে একটি চিরস্থায়ী বিরহের ভাব প্রচ্ছন্ন থাকে।

বিপরীত।

আবার এক এক দিন বিপরীত দেখা যায়। জগৎ জগৎপতিকে বাঁশী বাজাইয়া ডাকে। তাঁহার বাঁশী লইয়া তাঁহাকে ডাকে।

আজু কে গো মুরলী বাজায়।
এ ত কভু নহে শ্যামরায়।
ইহার গৌর বরণে করে আলো,
চূড়াটি বাঁধিয়া কেবা দিল।
ইহার বামে দেখি চিকণ বরণী
নীল উয়লি নীলমণি॥

বিবাহ।

জগতের সৌন্দর্য্য অসীম সৌন্দর্য্যকে ডাকিতেছে। তিনি পাশে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। জগতের সৌন্দর্য্যে তিনি যেন জগতের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া বাঁধা পড়িয়াছেন। তাই আজ জগতের বিচিত্র গান, বিচিত্র বর্ণ, বিচিত্র গন্ধ, বিচিত্র শোভার মধ্যে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতেছি। তাই আজ জগতের সৌন্দর্য্যের অভ্যন্তরে অনন্ত সৌন্দর্য্যের আকর দেখিতেছি। আমাদের হৃদয়ও যদি সুন্দর না হয় তবে তিনি কি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আসিবেন?

অসীম ও সসীম এই সৌন্দর্য্যের মালা লইয়া মালা বদল করিয়াছে। তিনি তাঁহার নিজের সৌন্দর্য্য ইহার গলায় পরাইয়াছেন, এ আবার সেই সৌন্দর্য্য লইয়া তাঁহার গলায় তুলিয়া দিতেছে। সৌন্দর্য্য স্বর্গ মর্ত্ত্যের বিবাহ বন্ধন।

সমাপ্ত।

ভূমিকা।

উপহার।

ভাই জ্যোতিদাদা,

ইংলণ্ডে যাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনে পড়িত, তাঁহারই হস্তে এই পুস্তকটি সমর্পণ করিলাম।

স্নেহভাজন
রবি।

বন্ধুদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া এই পত্রগুলি প্রকাশ করিলাম। প্রকাশ করিতে আপত্তি ছিল;—কারণ, কয়েকটি ছাড়া বাকী পত্রগুলি ভারতীর উদ্দেশে লিখিত হয় নাই, সুতরাং সে সমুদয়ে যথেষ্ট সাবধানের সহিত মত প্রকাশ করা যায় নাই, বিদেশীয় সমাজ প্রথম দেখিয়াই যাহা মনে হইয়াছে তাহাই ব্যক্ত করা গিয়াছে। কিন্তু ইহাতে আর কোন উপকার হউক্ বা না হউক্, একজন বাঙ্গালী ইংলণ্ডে গেলে কিরূপে তাহার মত গঠিত ও পরিবর্ত্তিত হয় তাহার একটা ইতিহাস পাওয়া যায়।

আমার মতে যে ভাষায় চিঠি লেখা উচিত সেই ভাষাতেই লেখা হইয়াছে। আত্মীয় স্বজনদের সহিত মুখামুখী এক প্রকার ভাষায় কথা কহা ও তাঁহারা চোখের আড়াল হইবামাত্র আর এক প্রকার ভাষায় কথা কহা কেমন অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

পূজনীয় ভারতীর সম্পাদক মহাশয় আমার পত্রের উত্তরে তাঁহার যে সকল অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাও পুস্তকে নিবিষ্ট হইল। সকল বিষয়েরই দুই পক্ষ আছে। উভয় পক্ষই পাঠকদের দেখা আবশ্যক।

এই পুস্তক ছাপা হইবার সময় নানা কারণে আমি কোন মতেই নিজে তদারক করিতে পারি নাই, এই নিমিত্ত ইহাতে ভুল আছে বলিয়া সন্দেহ হইতেছে। এই অপরিহার্য্য ত্রুটি পাঠকেরা মার্জ্জনা করিবেন।

গ্রন্থকার।

য়ুরোপ-প্রবাসির পত্র।

(প্রথম পত্র)।

বিশে সেপ্টেম্বরে আমরা "পুনা" ষ্টীমারে উঠ্‌লেম। পাঁচটার সময় জাহাজ ছেড়ে দিলে। আমরা তখন জাহাজের ছাতে দাঁড়িয়ে। আস্তে আস্তে আমাদের চোখের সাম্‌নে ভারতবর্ষের শেষ তট-রেখা মিলিয়ে গেল। চারিদিকের লোকের কোলাহল সহিতে না পেরে আমি আমার নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পোড়লেম। গোপন কর্‌বার বিশেষ প্রয়োজন দেখ্‌ছিনে, আমার মনটা বড়ই কেমন নির্জ্জীব, অবসন্ন, ম্রিয়মাণ, হোয়ে পোড়েছিল, কিন্তু দূর হোক্‌গে—ওসব করুণ-রসাত্মক কথা লেখ্‌বার অবসরও নেই ইচ্ছেও নেই; আর লিখ্‌লেও, হয় তোমার চোখের জল থাক্‌বে না, নয় তোমার ধৈর্য্য থাক্‌বে না।

সমুদ্রের পায়ে দণ্ডবৎ। ২০শে থেকে ২৬শে পর্য্যন্ত যে কোরে কাটিয়েছি তা আমিই জানি। "সমুদ্র পীড়া" কাকে বলে অবিশ্যি জান, কিন্তু কি রকম তা জান না। আমি সেই ব্যামোয় পোড়েছিলেম, সে কথা বিস্তারিত কোরে লিখ্‌লে পাষাণেরও চোখে জল আস্‌বে! ৬টা দিন, মশায়, শয্যা থেকে উঠিনি। যে ঘরে থাক্‌তেম, সেটা অতি অন্ধকার, ছোট; পাছে সমুদ্রের জল ভিতরে আসে তাই চারদিকের জান্‌লা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ। অসূর্য্যম্পশ্যরূপ ও অবায়ুস্পর্শ-দেহ হোয়ে ছয়টা দিন কেবল বেঁচে ছিলেম মাত্র। প্রথম দিন সন্ধ্যে বেলায় আমাদের একজন সহযাত্রী আমাকে জোর কোরে বিছানা থেকে উঠিয়ে খাবার টেবিলে নিয়ে গেলেন। যখন উঠে দাঁড়ালেম তখন আমার মাথার ভিতর যেন একটা বিপর্য্যয় ব্যাপার বেঁধে গেল, মাথার ভিতর যা কিছু আছে সবাই মিলে যেন মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ কোরে দিলে, চোখে দেখ্‌তে পাইনে, পা চলে না, সর্ব্বাঙ্গ টলমল করে। দু পা গিয়েই একটা বেঞ্চিতে বোসে পোড়লেম। আমার সহযাত্রীটি আমাকে ধরাধরি কোরে জাহাজের

'ডেকে" অর্থাৎ ছাতে নিয়ে গেলেন। একটা রেলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেম। তখন অন্ধকার রাত। আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন। আমাদের প্রতিকূলে বাতাস বইচে। সেই অন্ধকারের মধ্যে—সেই নিরাশ্রয় অকূল সমুদ্রে দুই দিকে অগ্নি উৎক্ষিপ্ত করতে করতে আমাদের জাহাজ একলা চোলেছে, যেখানে চাই সেই দিকেই অন্ধকার, সমুদ্র ফুলে ফুলে উঠ্ছে—সে এক মহা গম্ভীর দৃশ্য! জাহাজ যখন চলে তখন তার দুই দিকে যেন আগুন ভেঙ্গে পড়ে, অন্ধকার রাত্রে সে বড় সুন্দর দেখায়। একেই Phosphorescence বলে।

সেখানে বেশীক্ষণ থাক্‌তে পারলেম না। ভয়ানক মাথা ঘুরতে লাগ্‌ল। ধরাধরি কোরে আবার আমার ক্যাবিনে (ঘরে) এলেম। সেই যে বিছানায় পড়লেম, ছ দিন আর এক মুহূর্ত্তের জন্যও মাথা তুলিনি। আমাদের যে ষ্টুয়ার্ড ছিল, (যাত্রীদের সেবার জন্য জাহাজে যে সব চাকর থাকে)—কারণ জানিনে—আমার উপর তার কেমন বিশেষ কৃপাদৃষ্টি ছিল। দিনের মধ্যে যখন-তখন সে আমার জন্যে খাবার নিয়ে উপস্থিত কর্‌ত; না খেলে কোন মতেই ছাড়ত না। সে বোল্‌ত, না খেলে আমি ইঁদুরের মত দুর্ব্বল হোয়ে পোড়ব (weak as a rat)। সে বোল্‌ত সে আমার জন্যে সব কাজ করতে পারে। আমি তাকে যথেষ্ট সাধুবাদ দিতেম, এবং জাহাজ ছেড়ে আস্‌বার সময় সাধুবাদের চেয়ে আরো কিঞ্চিৎ সারবান পদার্থ দিয়েছিলেম।

ছদিনের পর আমরা যখন এডেনের কাছাকাছি পৌঁছলেম তখন সমুদ্র কিছু শান্ত হোল। সে দিন আমার ষ্টুয়ার্ড এসে নোড়ে চোড়ে বেড়াবার জন্যে আমাকে বার বার অনুরোধ কোরতে লাগল। আমি তার পরামর্শ শুনে বিছানা থেকে ত উঠলেম, উঠে দেখি যে সত্যিই ইঁদুরের মত দুর্ব্বল হয়ে পোড়েছি! মাথাটা যেন ধার-করা, কাঁধের সঙ্গে তার ভালরকম বনে না; চুরি-করা কাপড়ের মত শরীরটা যেন আমার ঠিক গায়ে লাগছে না। ঘর থেকে বেরিয়ে ছাতের উপর গিয়ে একটা কেদারায় হেলান দিয়ে পোড়লেম। অনেক দিনের পর বাতাস পেয়ে বাঁচলেম। দুপর বেলা দেখি একটা ছোট নৌকা সেই সমুদ্র দিয়ে চোলেছে। চার দিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত আর ডাঙ্গা নেই, জাহাজ-শুদ্ধ লোক অবাক্! তারা আমাদের ষ্টিমারকে ডাকতে আরম্ভ করলে; জাহাজ থাম্‌ল। তারা একটি অতি ছোট নৌকায় কোরে কতকগুলি লোক জাহাজে পাঠিয়ে দিলে। এরা সকলে আরব দেশীয় এডেন থেকে মস্কটে যাচ্চে। পথের মধ্যে দিক্‌ভ্রম হোয়ে গেছে, তাদের সঙ্গে যা জলের পিপে ছিল, তা ভেঙ্গে গিয়ে জল সমস্ত নষ্ট হোয়ে গেছে; অথচ যাত্রী অনেক। আমাদের জাহাজের লোকেরা তাদের জল দিলে। একটি ম্যাপ খুলে কোন্‌দিকে ও কতদূরে মস্কট, তাদের দেখিয়ে দিলে; তারা আবার চল্‌তে লাগল। সে নৌকো যে মস্কট পর্য্যন্ত পৌঁছিবে তাতে সকলেই সন্দেহ প্রকাশ কোরতে লাগল।

২৮শে সেপ্টেম্বর শনিবার সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখি, আমাদের সম্মুখে সব পাহাড় পর্ব্বত উঠেছে। অতি সুন্দর পরিষ্কার প্রভাত; সূর্য্য সবে মাত্র উঠেছে, সমুদ্র অতিশয় শান্ত। দূর থেকে সেই পর্ব্বতময় ভূভাগের প্রভাতদৃশ্য এমন সুন্দর দেখাচ্ছে যে কি বলব। পর্ব্বতের উপর রঙ্গিন মেঘগুলি এমন নত হোয়ে পোড়েছে যে, মনে হয় যেন, অপরিমিত সূর্য্যকিরণ পান কোরে তাদের আর দাঁড়াবার শক্তি নেই, পর্ব্বতের

উপরে যেন অবসন্ন হয়ে পোড়েছে। আয়নার মত পরিষ্কার শান্ত সমুদ্রের উপর ছোট ছোট পাল-তোলা নৌকাগুলি আবার কেমন ছবির মত দেখাচ্চে!

এডেনে পৌঁছে বাড়িতে চিঠি লিখ্‌তে আরম্ভ করলেম কিন্তু লিখতে গিয়ে দেখি যে এই কদিন নাড়াচাড়া খেয়ে মাথার ভিতরে যেন সব উলটো-পালটা হোয়ে গেছে, বুদ্ধির রাজ্যে একটা অরাজকতা ঘটেছে; কি কোরে লিখব, ভাল মনে আস্‌চে না। ভাবগুলো যেন মাকড়-সার জালের মত ছুঁতে গেলেই অমনি ছিঁড়ে খুঁড়ে যাচ্চে। কিসের পর কি লিখব, তার একটা ভাল রকম বন্দোবস্ত কোরতে পারি-ছিনে। এই অবস্থায় লিখতে আরম্ভ করলেম, এমন বিপদে পোড়ে তোমাকে যে লিখতে পারিনি তাতে তোমার ক্ষোভের কারণ কিছুই নেই।

দেখ, সমুদ্রের উপর আমার কতকটা অশ্রদ্ধা হোয়েছে। কল্পনায় সমুদ্রকে যা' মনে করতেম, সমুদ্রে এসে দেখি তার সঙ্গে অনেক বিষয় মেলেনা। তীর থেকে সমুদ্রকে খুব মহান্ বোলে মনে হয়, কিন্তু সমুদ্রের মধ্যে এলে আর ততটা হয় না। তার কারণ আছে, আমি যখন বম্বের উপকূলে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখতাম তখন দেখ্‌তেম, দূর দিগন্তে গিয়ে নীল জল নীল আকাশে মিশিয়ে গিয়েছে, কল্পনায় মনে করতেম যে, একবার যদি ঐ দিগন্তের আবরণ ভেদ কোরতে পারি—ঐ দিগন্তের যবনিকা উঠাতে পারি, অমনি আমার সম্মুখে এক অকূল অনন্ত সমুদ্র একেবারে খুলে উঠবে। ঐ দিগন্তের পর যে কি আছে তা আমার কল্পনাতেই থাকৃত; তখন মনে হোত না, ঐ দিগন্তের পরে আর এক দিগন্ত আসবে! কিন্তু যখন সমুদ্রের মধ্যে এসে পড়ি, তখন মনে হয় যে, জাহাজ যেন চল্‌চে না, কেবল একটি দিগন্তের গণ্ডীর মধ্যে বোসে আছে। আমাদের কল্পনার পক্ষে সে দিগন্তের সীমা এত সঙ্কীর্ণ যেন কেমন তৃপ্ত হয় না। কিন্তু দেখ, এ কথা বড় গোপনে রাখা উচিত; বাল্মীকি থেকে বায়রণ পর্য্যন্ত সকলেরই যদি এই সমুদ্র দেখে ভাব লেগে থাকে, তবে আমার না লাগলে দশজনে যে হেসে উঠবে; গ্যালিলি-ওর সময়ে একথা বোল্লে হয়ত আমাকে কয়েদ যেতে হোত। এক কবি সমুদ্রের স্তুতি-বাদ কোরেছেন যে আজ আমার এই নিন্দায় তাঁর বোধ হয় বড় একটা গায়ে লাগবে না। যখন তরঙ্গ ওঠে; তখন বোধ করি সমুদ্র বেশ দেখায়, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যক্রমে সমুদ্রে তরঙ্গ-উঠলেই আমার এমন মাথা ঘুরতে থাকে যে আমার দেখা শুনো সব ঘুরে যায়।

আমি যখন ঘর থেকে বেরোতে আরম্ভ করলেম, তখন জাহাজের যাত্রীদের উপর আমার নজর পোড়ল ও আমার উপর জাহাজের যাত্রীদের নজর পোড়ল। আমি স্বভাবতই "লেডি"-জাতিকে বড় ডরাই। তাঁদের কাছে ঘেঁস্‌তে গেলে এত প্রকার বিপদের সম্ভাবনা, যে, চাণক্য পণ্ডিত থাকৃলে "লেডি"-দের কাছ থেকে দশ সহস্র হস্ত দূরে থাকৃতে পরামর্শ দিতেন। একত, মনোরাজ্যে নানা প্রকার শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘট্‌বার সম্ভাবনা—তা' ছাড়া সর্ব্বদাই ভয় হয় পাছে কি কথা বোল্‌তে কি কথা বোলে ফেলি, আর আমাদের অসহিষ্ণু কোমল-স্বভাব লেডি তাঁদের আদব-কায়দার তিলমাত্র ব্যতিক্রম সইতে না পেরে দারুণ ঘৃণায় ও লজ্জায় একেবারে মূর্চ্ছা যান, আর দশদিক থেকে দশটা জেন্টেল্‌ম্যান্ একেবারে হাঁ হাঁ কোরে এসে পড়েন। পাছে তাঁদের

গাউনের অরণ্যের মধ্যে পথহারা হোয়ে একেবারে ভেবাচেকা খেয়ে যাই, পাছে রাস্তায় পা ফেল্‌তে তাঁদের গাউনের উপর পা ফেলি; পাছে আহারের সময় তাঁদের মাংস কেটে দিতে হয়, পাছে মুরগীর মাংস কাট্‌তে গিয়ে নিজের আঙুল কেটে বসি—এই রকম সাত পাঁচ ভেবে আমি জাহাজের লেডিদের কাছ থেকে অতি দূরে থাক্‌তেম। আমাদের জাহাজে লেডির অভাব ছিল না কিন্তু জেণ্টেল্‌ম্যানেরা সর্ব্বদা খুৎখুঁৎ করতেন যে, তার মধ্যে অল্পবয়স্কা বা সুশ্রী একজনো ছিল না। একজন এত লম্বা, তাঁর ঠোঁট এত বঙ্কুর, তাঁর মুখে এত দাগ, তাঁর দাঁতের এত দৈর্ঘ্য, তাঁর আহারের পরিমাণ এত অপরিমিত যে, তেমন দুটো পুরুষ সচরাচর খুঁজ্‌লে পাওয়া যায় না। একজন আছেন তাঁকে জ্যামিতিশাস্ত্রের রেখা (Length without breadth) বলা যেতে পারে। তাঁর শরীর লম্বা, মুখ লম্বা, হাত লম্বা, পা লম্বা, চোখ ছোট, নাক ছোট, মাথা ছোট,। একজনের দাঁতের সম্পূর্ণরূপে অভাব ছিল, কিন্তু আহার কালে দন্তবান্ ব্যক্তিরা তাঁর কাছে পরাস্ত মান্ত। জাহাজে কেবল একজন যুবতী আছেন মাত্র, কিন্তু জেণ্টল্‌ম্যানদের পোড়া অদৃষ্টবশতঃ যাঁরা অধিকবয়স্কা ছিলেন তাঁরাই যৌবনের মুখস পোরে নানা প্রকার হাবভাব কোরে পুরুষদের হৃদয়-রাজ্যে একটা গোলমাল বাধাবার জন্যে যথাসাধ্য বলপ্রয়োগ করতেন, আর যুবতীটি ছিব্‌লামীর বয়স গিয়েছে মনে কোরে ঘোম্‌টা (Veil) টেনে এক প্রান্তে সারাদিন বাইবেল পোড়্‌তেন। পুরুষদের মন লুঠপাট কর্‌বার জন্যে এই দিদিমার বয়সী লেডিগণ যে রকম প্রাণপণে যত্ন করতেন, তা দেখ্‌লে তোমার মায়া হোত। পুরুষের কাছে তাঁদের সেই অতি মধুর ললিত-গলিত ভাবের হাসি, অতি ঢল ঢল ভাবের অঙ্গ-ভঙ্গী দেখে আমার প্রচুর পরিমাণে হাস্য ও করুণরসের আবির্ভাব হোত! কাপড়ে চোপড়ে, রঙে-চঙে তাঁরা তাঁদের ভাঙ্গা-চুরো রূপকে কোন প্রকারে ঠেকো দিয়ে রেখেছেন মাত্র।

পুরুষ যাত্রীদের মধ্যে অনেকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হোয়েছিল। ব—মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হোয়েছিল। তিনি লোক বড় ভাল। এমন ধাঁচের লোক বড় সচরাচর দেখা যায় না। তাঁর কথা অনর্গল, হাসি অজস্র, আহার অপরিমিত। সকলের সঙ্গেই তাঁর আলাপ, সকলের সঙ্গেই তিনি হাসি—তামাসা কোরে বেড়ান। তাঁর একটা গুণ আছে, তিনি কখনো বিবেচনা কোরে, ভেবেচিন্তে, মেজে-ঘোষে কথা কন না; ঠাট্টা করেন, সকল সময়ে তার মানে না থাকুক, তিনি নিজে হেসে আকুল হন। তিনি তাঁর বয়সের ও পদমানের গাম্ভীর্য্য বুঝে হিসাব কোরে কথা কন না, মেপে-জুকে হাসেন না ও দুদিক্ বজায় রেখে মত প্রকাশ করেন না, এই সকল কারণে তাঁকে আমার বড় ভাল লাগ্‌ত। তাঁর মনটা এখনো হামাগুড়ি দিচ্চে—কত প্রকার যে ছেলেমানুষী করেন তার ঠিক নেই; ঘোরতর বিজ্ঞতার আতিশয্যে মুখটা অন্ধকার কোরে তাঁকে মোটা-গলায় কথা কইতে কখনো শুনি নি। বৃদ্ধত্বের বুদ্ধি, ও বালকত্বের সাদাসিদা নিশ্চিন্ত ভাব একত্রে দেখলে আমার বড় ভাল লাগে। তাঁর একটা স্বভাব আছে যে কাহাকেও তিনি তার পিতা-মাতা-প্রদত্ত নাম ধোরে ডাকেন না—তিনি নিজে স্বতন্ত্র নাম করণ করেন। আমাকে তিনি "অবতার" বল্‌তেন, gregory সাহেবকে "গড়্‌গড়ি" বল্‌তেন, জাহাজের আর এক

যাত্রীকে "রুহিমৎস্ত" বোলে ডাকতেন ; সে বেচারীর অপরাধ কি তা জান? সাধারণ মানুষদের চেয়ে তার ঘাড়ের দিকটা কিছু খাটো ছিল, তার মাথা ও শরীরের মধ্যে একটা স্বতন্ত্র যোজক পদার্থ ছিল না বোলেও হয়। এই জন্যে ব—মহাশয় তাকে মৎস্য-শ্রেণীভুক্ত করে ছিলেন। কিন্তু আমি যে কোন অবতার-শ্রেণীর মধ্যে পোড়ে গিয়েছিলেম, তার কারণ সহজে নির্দ্দেশ করা যায় না। খাবার সময়ে তাঁর এক গল্প ছিল যে, এক জন নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিল, তার অপরিমিত আহার দেখে তার পাশের এক জন ভদ্র লোক বল্লেন, "মহাশয়, পরের খরচে আহার কোচ্চেন অতএব বড় ভাবনার বিষয় নেই বটে, কিন্তু মনে রাখবেন পেটটি আপনার।" কিন্তু ব—মহাশয় নিজে সকল সময়ে সেইটি মনে রাখেন না।

আমাদের জাহাজের T—মহাশয় কিছু নূতন রকমের লোক। তিনি ঘোরতর ফিলজফর মানুষ। তাঁকে কখনো চলিত ভাষায় কথা কইতে শুনিনি। তিনি কথা কহিতেন না, বক্তৃতা দিতেন। এক দিন আমরা দু চারজনে মিলে জাহাজের ছাতে দুই দণ্ড আমোদ-প্রমোদ কর্‌ছিলেম, এমন সময়ে দুর্ভাগ্যক্রমে ব—মহাশয় তাঁকে বল্লেন "কেমন সুন্দর তারা উঠেছে" এই আমাদের ফিলজফর মহাশয় তারার সঙ্গে মনুষ্য-জীবনের সঙ্গে একটা উৎকট সম্বন্ধ বাধিয়ে দিয়ে বক্তৃতা সুরু কল্লেন —আমরা বেচারীরা "মুখেতে চাহিয়া থাকে ক্যাল্ ক্যাল্ করিয়া" রইলেম। গল্প সল্প ঘুচে গেল, গান বাজনা থেমে গেল, জন দুয়েক ঢুল্‌তে আরম্ভ কোর্‌লেন, জন দুয়েক হাই তুল্‌তে আরম্ভ কোর্‌লেন—সমস্ত মাটি হয়ে গেল।

আমাদের জাহাজে একটি আস্তো জনবুল্ ছিলেন। তাঁর তাল বৃক্ষের মত শরীর, ঝাঁটার মত গোঁফ, সজারুর কাঁটার মত চুল, হাঁড়ির মত মুখ, মাছের চোখের মত ভাববিহীন ম্যাড়্‌মেড়ে চোখ, তাঁকে দেখলেই আমার গা কেমন কর্‌ত, আমি পাঁচ হাত তফাতে সোরে যেতেম। এক এক জন কোন অপরাধ না কোর্‌লেও তার মুখশ্রী যেন সর্ব্বদা অপরাধ কোর্‌তে থাকে। প্রত্যহ সকালে উঠেই শুনতে পেতেম তিনি ইংরাজি, ফ্রেঞ্চ হিন্দুস্থানী প্রভৃতি যত ভাষা জানেন সমস্ত ভাষায় জাহাজের সমস্ত চাকর বাকরদের অজস্র গাল দিতে আরম্ভ কোরেছে, ও দশদিকে দাপাদাপি কোরে বেড়াচ্চেন। তাঁকে কখনো হাস্‌তে দেখি নি, কারো সঙ্গে কথা বার্ত্তা নেই, আপনার ক্যাবিনে গোঁ হোয়ে বোসে আছেন। কোন কোন দিন "ডেকে" বেড়্‌তে আস্‌তেন, বেড়াতে বেড়াতে যার দিকে একবার কৃপা-কটাক্ষে নেত্রপাত করতেন, তাকে যেন পিঁপড়াটির মত মনে করতেন।

প্রত্যহ খাবার সময়ে ঠিক্ আমার পাশেই B—বোস্‌তেন। তিনি একটি ইয়ুরোপীয়। কিন্তু তিনি ইংরাজের মত পান খাইতে, শিষ্ দিতে, পকেটে হাত দিয়ে পা ফাঁক কোরে দাঁড়াতে সম্পূর্ণরূপে শিখেছেন। তিনি আমাকে বড়ই অনুগ্রহের চোখে দেখতেন। এক দিন এসে মহা গম্ভীর স্বরে বোল্লেন—"Young man তুমি Oxford-এ যাচ্ছ? Oxford University বড় ভাল বিদ্যালয়;"—এ কথা তিনি না বোল্লে Oxford University যেন মাটি হোয়ে যেত। আমি একদিন টেঞ্চ সাহেবের "Proverbs and their lessons" বই খানি পোড়ছিলেম, তিনি এসে বইটি নিয়ে শিষ দিতে দিতে দুচার পাত উল্‌টিয়ে

পাল্‌টিয়ে বল্লেন "হাঁ ভাল বই বটে!" টে্‌ক্কের অভাদৃষ্ট!! আমার উপর তাঁর কিছু মুরব্বিয়ানা ব্যবহার ছিল।

এডেন থেকে সুয়েজ যেতে দিন পাঁচেক লেগেছিল। যারা ব্রিন্দিশি পথ দিয়ে ইংলণ্ডে যায় তাদের জাহাজ থেকে নেবে সুয়েজে রেলোয়ের গাড়িতে উঠে অ্যালেক্‌জান্দ্রিয়াতে যেতে হয়; অ্যালেক্‌জান্দ্রিয়ার বন্দরে তাদের জন্যে একটা ষ্টীমার অপেক্ষা করে—সেই ষ্টীমারে চোড়ে ভূমধ্যসাগর পার হোয়ে ইটালীতে পৌঁছিতে হয়। আমরা overland যাত্রী, সুতরাং আমাদের সুয়েজে নাব্‌তে হোল। আমরা তিনজন বাঙ্গালী ও একজন ইংরাজ একখানি আরব নৌকা ভাড়া কর্‌লেম। মানুষেরা "divine" মুখশ্রী কতদূর পশুত্বের দিকে নাব্‌তে পারে, তা' সেই নৌকার মাঝিটার মুখ দেখ্‌লে জান্‌তে পার্‌তে। তার চোখ দুটো যেন বাঘের মত, কালো কুচ্‌কুচে রং, কপাল নীচু, ঠোঁট পুরু, সবশুদ্ধ মুখের ভাব অতি ভয়ানক। অন্যান্য নৌকার সঙ্গে দরে বোন্‌ল না, সে একটু কম দামে নিয়ে যেতে রাজি হোল। ব মহাশয় ত সে নৌকায় বড় সহজে যেতে রাজি নন; তিনি বোল্লেন আরবদের বিশ্বাস করতে নেই—ওরা অনায়াসে গলায় ছুরি দিতে পারে। তিনি সুয়েজের দুই একটা ভয়ানক অরাজকতার গল্প কোর্‌লেন। কিন্তু যাহোক্‌, আমরা সেই নৌকায়ত উঠলেম। মাজিরা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরিজি কয়, ও অল্প স্বল্প ইংরিজি বুঝতে পারে। আমরা ত কতক দূর নির্ব্বিবাদে গেলেম। আমাদের ইংরাজ যাত্রীটির সুয়েজের পোষ্টাফিসে নাব্‌বার দরকার ছিল। পোষ্ট-আফিস অনেক দূর, এবং যেতে অনেক বিলম্ব হবে, তাই মাঝিটি একটু আপত্তি কোর্‌লে; কিন্তু শীঘ্রই সে আপত্তি ভঞ্জন হোল। তার পরে আবার কিছু দূরে গিয়ে সে জিজ্ঞাসা কোল্লে "পোষ্ট—আফিসে যেতে হবে কি? সে দুই এক ঘণ্টার মধ্যে যাওয়া অসম্ভব"—আমাদের রুক্ষ স্বভাব সাহেবটি মহা ক্ষাপা হোয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন "your grand mother" এইতো আমাদের মাঝি ক্ষেপে উঠলেন, "What? mother? mother? what mother dont say mother" আমরা মনে করলুম সে সাহেবটাকে ধরে বুঝি জলে ফেলে দিলে, আবার জিজ্ঞাসা কোল্লে "what did say? (অর্থাৎ কি বল্লি?)" আমরা রয়েছি বোলেই বোধ হয় সাহেব তাঁর রোখ ছাড়লেন না। আবার বল্লেন "your grand mother' এইত আর রক্ষা নেই। মাঝিটা মহা তেড়ে উঠল। সাহেব গতিক ভাল নয় দেখে নরম হয়ে বল্লেন "you don't seem to understand what I say!" অর্থাৎ তিনি তখন grandmother বলাটা যে গালি নয় তাই প্রমাণ কোর্ত্তে ব্যস্ত। তখন সে মাঝিটা ইংরাজি ভাষা ছেড়ে ধমক দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল "বস্‌—চুপ!" সাহেব থতমত খেয়ে চুপ করে গেলেন, আর তাঁর বাক্য স্ফূর্ত্তি হল না। আবার খানিক দূর গিয়া সাহেব জিজ্ঞাসা কর্‌লেন "কতদূর বাকী আছে? মাঝী অগ্নিশর্ম্মা হয়ে চেঁচিয়ে উঠল "Two shillings give, ask what distance" এই অপূর্ব্ব ইংরাজিও ভাষান্তর হচ্চে "সবে দুশিলিং মাত্র ভাড়া দেবেন, তা আবার জিজ্ঞাসা করা হচ্চে কতদূর। আমরা এই রকম বুঝে গেলেম যে, দুশিলিং ভাড়া দিলে সুয়েজ রাজ্যে এই রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা আইনে নেই বুঝি? মাঝীটা যখন আমাদের এই রকম ধমক দিচ্চে, তখন অন্য অন্য দাঁড়িদের ভারি আমোদ বোধ হচ্চে,

তারা ত পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি কোরে মুচকি মুচকি হাসি আরম্ভ কোল্লে। মাঝী মহাশয়ের বিষম বদ্‌মেজাজ দেখে তাদের হাসি সামলানো দায় হোয়ে উঠেছিল। একদিকে মাঝী ধম্‌কাচ্চে, একদিকে দাঁড়িগুলো হাসি জুড়ে দিয়েছে, আমরা নিরুপায় রাগে ও লজ্জায় পুড়্‌ছিলেম, মাঝীটির উপর প্রতিহিংসা তোলবার আর কোন উপায় না দেখে আমরাও তিন জনে মিলে হাসি জুড়ে দিলাম—ও মনে মনে একটা সান্ত্বনা পেলেম যে 'নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে।' এরকম সুবুদ্ধি অনেক স্থলে দায়ে পড়ে খাটাতে হয়। মানে মানে সুয়েজ সহরে গিয়ে ত পৌঁছিলেম। আমার চক্ষে সুয়েজ সহরের নূতনত্ব এইটুকু লাগ্‌ল যে, এর চেয়ে খারাপ সহর আমি আর দেখি নি। সুয়েজ সহর সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার অধিকার নাই, কারণ আমি সুয়েজের আদ মাইল জায়গার বেশী আর দেখি নি। সহরের চারি দিকে একবার প্রদক্ষিণ করবার বাসনা ছিল, কিন্তু আমার সহযাত্রীদের মধ্যে যাঁরা পূর্ব্বে সুয়েজ দেখেছিলেন, তাঁরা বল্লেন; "এ পরিশ্রমে শ্রান্তি ও বিরক্তি ছাড়া অন্য কোন ফললাভের সম্ভাবনা নেই।" তাতেও আমি নিরুৎসাহ হইনি কিন্তু শুনলেম গাধায় চড়ে বেড়ান ছাড়া সহরে বেড়াবার আর কোন উপায় নাই। শুনে সহরে বেড়াবার দিকে টান আমার অনেকটা কোমে গেল, তার পরে শোনা গেল, এদেশের গাধাদের সঙ্গে চালকদের সকল সময়ে মতের ঐক্য হয় না, চালক যে দিকে যাবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, গাধাটির সকল সময়ে সেদিকে যাবার ইচ্ছে হয় না; তাঁরো একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন ইচ্ছে আছে; এই জন্যে সময়ে সময়ে দুই ইচ্ছের বিরোধ উপস্থিত হয়, কিন্তু প্রায় দেখা যায়, গাধার ইচ্ছে পরিণামে জয়ী হয়। সুয়েজে এক প্রকার অঘন্য চোখের ব্যামোর অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব—রাস্তায় অমন শত শত লোকের চোখ ঐ রকম রোগগ্রস্ত দেখতে পাবে। এখানকার মাছিরা ঐ রোগ চারিদিকে বিতরণ কোরে বেড়ায়। রোগ-গ্রস্ত চোখ থেকে ঐ রোগের বীজ আহরণ করে তারা অকুণ্ন চোখে গিয়ে বসে, এই রকমে চার দিকে ঐ রোগ ছড়িয়ে পড়ে।

সুয়েজে আমরা রেলোয়ে উঠলেম। এ রেল গাড়ির অনেক প্রকার রোগ আছে। প্রথমতঃ শোবার কোন বন্দবস্ত নেই, কেন না, বস্‌বার জায়গা গুলি অংশে অংশে বিভক্ত, দ্বিতীয়তঃ এমন গজ-গামিনী রেলগাড়ি সর্ব্বত্র দেখতে পাওয়া যায় না। সমস্ত রাত্রিই গাড়ি চোলেছে, দিনের বেলা যখন জেগে উঠলেম তখন দেখলেম ধুলোয় আমাদের কেবল গোর হয় নি, আর সব হয়েছে। চুলে হাত দিতে গিয়ে দেখি, চুলে এমন এক স্তর মাটি জোমেছে যে, মাথায় অনায়াসে ধান চাষ করা যায়। এই রকম ধুলোমাখা সন্ন্যাসীর বেশে আমরা অ্যালেকজাণ্ড্রিয়াতে গিয়ে পৌঁছলেম। রেলের লাইনের দুপারে—সবুজ শস্যক্ষেত্র। জায়গায় জায়গায় খেজুরের গাছে থোলো থোলো খেজুর ফলে রোয়েছে। মাঠের মাঝে মাঝে কূপ। মাঝে মাঝে দুই একটা কোঠা বাড়ি—বাড়ি গুলো চৌকোনা, থাম নেই, বারান্দা নেই—সমস্তটাই দেয়ালের মত, সেই দেয়ালের মধ্যে মধ্যে দুই একটা জানালা। এই সকল কারণে বাড়ি গুলোর যেন শ্রী নেই। যাহোক্ আমি আগে আফ্রিকার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত যে রকম অনুর্ব্বর মরুভূমি মনে কোরে রেখেছিলুম, চারিদিক দেখে তা কিছুই মনে হোল না। বরং চারি-

দিককার সেই হরিৎক্ষেত্রের উপর, খেজুর-কুঞ্জের মধ্যে প্রভাতটি আমার অতি চমৎকার লেগেছিল। অ্যালেকজান্দ্রিয়া বন্দরে আমাদের জন্যে "মঙ্গোলিয়া" ষ্টীমার অপেক্ষা কোর্‌ছিল। এইবার আমরা ভূমধ্যসাগরের বক্ষে আরোহণ কর্‌লেম, আমার একটু একটু শীত—শীত কোর্‌তে লাগ্‌ল। জাহাজে গিয়ে খুব ভাল কোরে স্নান কর্‌লেম, আমার তো হাড়ে হাড়ে ধূলো প্রবেশ কোরেছিল। স্নান করবার পর অ্যালেকজান্দ্রিয়া সহর দেখতে গেলেম। জাহাজ থেকে ডাঙ্গা পর্য্যন্ত যাবার জন্যে একটা নৌকা ভাড়া করলেম। এখানকার একটা একটা মাঝী সার উইলিয়ম জোন্সের দ্বিতীয় সংস্করণ বল্লেই হয়। তারা গ্রীক্, ইটালিয়ান্, ফ্রেঞ্চ, ইংরাজি প্রভৃতি অনেক ভাষায় চলন-সই রকম কথা কইতে পারে। শুন্‌লেম ফ্রেঞ্চ ভাষাই এখানকার সাধারণ ভাষা। রাস্তা ঘাটের নাম, সাইন্‌বোর্ডে দোকান গুলির আত্ম-পরিচয়, অধিকাংশই ফরাসী ভাষায় লেখা! অ্যালেক্‌জান্দ্রিয়া সহরটি সমৃদ্ধিশালী মনে হল। এখানে যে কত জাতের লোক ও কত জাতের দোকান বাজার আছে তার ঠিকানা নেই। রাস্তাগুলি পাথর দিয়ে বাঁধানো—তাতে বেশ পরিষ্কার থাকে, কিন্তু গাড়ির শব্দ বড় বেশী রকম হয়। খুব বড় বড় বাড়ি—বড় বড় দোকান, সহরটি খুব জম্‌কালো বটে। অ্যালেকজান্দ্রিয়ায় বন্দর খুব প্রকাণ্ড। অসংখ্য অসংখ্য জাহাজ এখানে আশ্রয় পায়। ইয়ুরোপীয়, মুসলমান সকল প্রকার জাতিরই জাহাজ এ বন্দরে আছে, কেবল দুঃখের বিষয় হিন্দুদের জাহাজ নেই।

চার পাঁচ দিনে আমরা ইটালীতে গিয়ে পৌঁছলেম। তখন রাত্রি একটা দুটো হবে। গরম বিছানা ত্যাগ কোরে, জিনিষ পত্র নিয়ে আমরা জাহাজের ছাতে গিয়ে উঠলেম। জ্যোৎস্না রাত্রি, খুব শীত; আমার গায়ে বড় একটা গরম কাপড় ছিল না। তাই ভারি শীত কচ্ছিল। আমাদের সুমুখে নিস্তব্ধ সহর, বাড়ি গুলির জানেলা দরজা সমস্ত বন্ধ—সমস্ত নিদ্রামগ্ন। আমাদের যাত্রীদের মধ্যে ভারি গোল পোড়ে গেল, কখনো শুনি—ট্রেণ পাওয়া যাবে, কখনো শুনি পাওয়া যাবে না। জিনিষ-পত্র গুলো নিয়ে কি করা যাবে ভেবে পাওয়া যায় না, জাহাজে থাক্‌ব কি বেরোবো কিছুই স্থির নেই। এক জন Italian officer এসে আমাদের গুণতে আরম্ভ কোরলে—কিন্তু কেন গুণতে আরম্ভ কোর্‌লে তা' ভেবে পাওয়া গেল না, জাহাজের মধ্যে এই রকম একটা অস্ফুট জনশ্রুতি প্রচারিত হোল যে, এই গণনার সঙ্গে আর আমাদের ট্রেণে চড়ার সঙ্গে একটা বিশেষ যোগ আছে। কিন্তু সে রাত্রে মূলেই ট্রেণ পাওয়া গেল না। শোনা গেল, তার পরদিন বেলা তিনটের আগে ট্রেণ পাওয়া যাবেনা। যাত্রীরা মহা বিরক্ত হোয়ে উঠল। অবশেষে সে রাত্রে ব্রিন্দিশির হোটেলে আশ্রয় নিতে হোল।

এইত প্রথম য়ুরোপের মাটিতে আমার পা পড়ল। জানোই ত আমি কি রকম কাল্পনিক মনে করেছিলেম, য়ুরোপে পৌঁছিয়েই কি এক অপূর্ব্ব দৃশ্য চোখের সুমুখে খুলে যাবে, সে যে কি তা' কল্পনাতেই থাকে, কথায় প্রকাশ করা যায় না, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে দেখে আস্‌ছি, কল্পনার সঙ্গে সত্য রাজ্যের প্রায় বনে না। আমার স্বভাব দোষে অনেক জিনিষ ভাল কোরে ভোগ করতে পারি নে। কোন নূতন দেশে আস্‌বার আগেই আমি তাকে এমন নূতনতর মনে কোরে রাখি যে, এসে আর তা' নূতন বোলে মনেই হয় না; কোন মহান দৃশ্য দেখবার আগেই আমি তাকে এমন

মহান্তর মনে কোরে রাখি যে, তা দেখে আর মহান্ বোলে মনে হয় না। ইউরোপ আমার তেমন নূতন মনে হয়নি শুনে সকলেই অবাক্!

আমরা রাত্রি তিনটের সময় ব্রিন্দিশির হোটেলে গিয়ে শুয়ে পোড়লেম। সকালে একটা আধ মরা-ঘোড়া ও আধ ভাঙ্গা গাড়ি চোড়ে সহর দেখতে বের হোলেম। সারথির সঙ্গে আর গাড়ি ঘোড়ার সঙ্গে এমন অসামঞ্জস্য যে কি বোল্‌ব! সারথির বয়স চৌদ্দো হবে—কিন্তু ঘোড়াটির বয়স পঞ্চাশ হবে—আর গাড়িটি পৌরাণিক যুগের মনে হোল। ছোট খাটো সহর যেমন হোয়ে থাকে, ব্রিন্দিশিও তাই। কতক গুলি কোটা বাড়ি, দোকান বাজার, রাস্তাঘাট আছে, হাঁ কোরে দেখবার জিনিস একটিও নেই। ভিক্ষুকেরা ভিক্ষা কোরে ফিরচে, দু চার জন লোক মদের দোকানে বোসে গল্প গুজব কোরচে—দুচার জন রাস্তার কোণে দাঁড়িয়ে হাসি তামাসা কোর্‌চে; লোক জনেরা অতি নিশ্চিন্ত মুখে গজেন্দ্র-গমনে গমন করচে; যেন কারো কোন কাজ নেই, কারো কোন ভাবনা নেই—যেন সহর শুদ্ধ ছুটি। রাস্তায় বড় গাড়ি ঘোড়ার সমারোহ নেই, লোক জনের সমাগম নেই। আমরা খানিকদূর যেতেই রাস্তা থেকে এক জন ছোক্‌রা আমাদের গাড়ি থামিয়ে হাতে একটা তরমুজ নিয়ে গাড়োয়ানের পাশে গিয়ে বোস্‌ল। ব—মহাশয় বোল্লেন, "বিনা আয়াসে এঁর কিছু রোজগার করবার বাসনা আছে।" তিনি এসে হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে মধ্যে মাঝে আমাদের দেখিয়ে দিতে লাগ্‌লেন, "ঐটে চর্চ্চ, ঐটে বাগান, ঐটে মাঠ" ইত্যাদি, তাতে যে আমাদের বিশেষ কিছু উপকার হয়েছিল তা নয়, তাঁর টীকাতে আমাদের কিছুমাত্র জ্ঞান বৃদ্ধি হয় নি, আর তাঁর টীকা না হলেও আমাদের কিছুমাত্র জ্ঞানের ব্যাঘাত হোত না। তাঁকে কেউ আমাদের গাড়িতে উঠতে বলে নি, কেউ তাঁকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসাও করে নি, কিন্তু তবু এই অযাচিত অনুগ্রহের জন্যে তাঁর যাচ্ঞা পূর্ণ করতে হোল। তারা আমাদের একটা ফলের বাগানে নিয়ে গেল। সেখানে যে কত প্রকার ফলের গাছ তার সংখ্যা নেই। চারিদিকে আঙুরে আঙুরে আচ্ছন্ন। থোলো থোলো আঙুর ফোলে রয়েছে। দু রকম আঙুর আছে—কালো আর সাদা। তার মধ্যে কালো গুলিই আমার বেশী মিষ্টি লাগ্‌ল। বড় বড় গাছে আপেল, পিচ প্রভৃতি অনেক প্রকার ফল ধেরে আছে। এক জন বুড়ি (বোধ হয় উদ্যান-পালিকা) কতকগুলি ফল ফুল নিয়ে উপস্থিত কোর্‌লে, আমরা সে দিকে বড় নজর কল্লেম না; কিন্তু ফল বিক্রয় কর্‌বার উপায় সে বিলক্ষণ জানে। আমরা ইতস্তত: বেড়াচ্চি এমন সময়ে দেখি একটি সুন্দরী মেয়ে কতকগুলি ফল আর ফুলের তোড়া নিয়ে আমাদের সুমুখে হাজির হোল, তখন আর অগ্রাহ্য কর্‌বার সাধ্য রইল না।

ইটালির মেয়েদের বড় সুন্দর দেখতে। অনেকটা আমাদের দেশের মেয়ের ভাব আছে। সুন্দর রং, কালো চুল, কালো ভুরু, কালো চোখ, আর মুখের গড়ন অতি চমৎকার। আমরা রাস্তায় ঘাটে কেবল ছোট-লোকদের মেয়েদের দেখেছি মাত্র, কিন্তু তাদের এমন ভাল দেখতে যে কি বোল্‌ব।

তিনটের ট্রেণে আমরা ব্রিন্দিশি ছাড়্‌লেম। রেলওয়ের পথের দুধারে আঙুরের ক্ষেত্র, সে চমৎকার দেখতে চার দিকের দৃশ্য এমন সুন্দর যে কি বোল্‌ব। পর্ব্বত, নদী, হ্রদ, কুটীর, ক্ষেত্র, ছোট ছোট গ্রাম প্রভৃতি যত

কিছু কবির স্বপ্নের ধন, সমস্ত চারিদিকে শোভা পাচ্চে। গাছ পালার মধ্যে থেকে যখন কোন একটি দুরস্থ নগর, তার প্রাসাদ-চূড়া, তার চর্চ্চের শিখর, তার ছবির মত বাড়িগুলি আস্তে আস্তে চোখে পড়ে, তখন বড় ভাল লাগে। একএকটি দৃশ্য আমার এত ভাল লেগে ছিল যে তা বর্ণনা করতে আমার ইচ্ছে কোরচে না। সন্ধ্যেবেলায় একটি পাহাড়ের নীচে অতি সুন্দর একটি হ্রদ দেখেছিলেম, তা আর আমি ভুলতে পারব না, তার চারিদিকে গাছ-পালা সন্ধ্যার ছায়া জলে পোড়েছে, সে অতি সুন্দর, তা আমি বর্ণনা কোরতে চাইনে।

রেলোয়ে কোরে যেতে যেতে আমরা Mont Cenis এর বিখ্যাত tunnel দেখলেম। এই পর্ব্বতের এপাশ থেকে ফরাসীরা, ওপাশ থেকে ইটালিয়নরা এক সঙ্গে খুদ্‌তে আরম্ভ করে, কয়েক বৎসর খুদ্‌তে খুদ্‌তে দুই যন্ত্রীদল ঠিক মাঝামাঝি এসে পরস্পরের সমুখা-সমুখী উপস্থিত হয়। এই গুহা অতিক্রম কোরতে রেলগাড়ির ঠিক আধ ঘণ্টা লাগ্‌ল। সে অন্ধকারে আমরা যেন হাঁপিয়ে উঠছিলেম। এখানকার রেল গাড়ির মধ্যে দিন রাত আলো জ্বালাই আছে, কেন না, এক এক স্থানে প্রায় পাঁচ মিনিট অন্তর একটা পর্ব্বত গুহা ভেদ কোরতে হয়—সুতরাং দিনের আলো খুব অল্পক্ষণ পাওয়া যায়। ইটালী থেকে ফ্রান্স পর্য্যন্ত সমস্ত—রাস্তা নির্ঝর, নদী, পর্ব্বত, গ্রাম, হ্রদ, দেখতে দেখতে আমরা পথের কষ্ট ভুলে গিয়েছিলেম—এই রাস্তাটুকু আমরা যেন একটি কাব্য পোড়তে পোড়তে গিয়েছিলেম।

সকাল বেলায় প্যারিসে গিয়ে পৌছলেম। কি জমকালো সহর! সেই অভ্রভেদী প্রাসাদের অরণ্যের মধ্যে গিয়ে পোড়লে অভিভূত হোয়ে যেতে হয়। মনে হয়, প্যারিসে বুঝি গরিব লোক নেই। আমার মনে হোল, এই সাড়ে তিন হাত মানুষের জন্যে এমন প্রকাণ্ড জমকালো বাড়িগুলোর কি আবশ্যক। একটা হোটেলে গেলেম, তার সমস্ত এমন প্রকাণ্ড কাণ্ড যে, ঢিলে কাপড় পোরে যেমন সোয়াস্তি হয় না, সে হোটেলে থাকতে গেলেও আমার বোধ হয় তেমনি অসোয়াস্তি হয়। একটা ঘরের মধ্যে কোথায় মিশিয়ে যাই তার ঠিক নেই। স্মরণ-স্তম্ভ, উৎস, বাগান, প্রাসাদ, পাথরে বাঁধানো রাস্তা, গাড়ি, ঘোড়া, জন-কোলাহল প্রভৃতি দেখে অবাক্ হোয়ে যেতে হয়। প্যারিসে পৌঁছিয়েই আমরা একটা "টার্কিব বাথে" গেলেম। প্রথমতঃ আমরা একটা খুব গরম ঘরে গিয়ে বোস্‌লেম, সে ঘরে অনেকক্ষণ থাক্‌তে থাক্‌তে কারো কারো ঘাম বেরোতে লাগল, কিন্তু আমার ত বেরোল না, আমাকে তার চেয়ে আর একটা গরম ঘরে নিয়ে গেল, সে ঘরটা আগুনের মত, চোখ মেলে থাক্‌লে চোখ জ্বালা করতে থাকে, মিনিট কতক থেকে সেখানে আর থাক্‌তে পারলেম না, সেখানে থেকে বেরিয়ে আমার খুব ঘাম হোতে লাগল। তার পরে এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে আমাকে শুইয়ে দিলে—তার পরে ভীমকায় একব্যক্তি এসে আমার সর্ব্বাঙ্গ ডল্‌তে লাগল। তার সর্ব্বাঙ্গ খোলা, এমন মাংস-পেশল চমৎকার শরীর আমি আর কখন দেখিনি "ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশু র্মহাভুজঃ" আমি মনে মনে ভাবলেম, ক্ষীণকায় এই মশকটিকে দলন করার জন্যে এমন প্রকাণ্ড কামানের আবশ্যক ছিল না। সে আমাকে দেখে বোল্লে, আমার শরীর বেশ লম্বা আছে—এখন পাশের দিকে বাড়লে আমি একজন সুপুরুষের মধ্যে গণ্য হব। আধ ঘণ্টা ধোরে সে আমার সর্ব্বাঙ্গ অবিশ্রান্ত দলন কোল্লে, ভূমিষ্ঠকাল থেকে আমি যত ধুলো

দেখেছি, আমার শরীর থেকে সব যেন উঠে গেল! শরীরটিকে যথেষ্ট রূপে দলিত কোরে আমাকে আর একটি ঘরে নিয়ে গেল. সেখানে গরম জল দিয়ে,সাবান দিয়ে, স্পঞ্জ দিয়ে শরীরটা বিলক্ষণ কোরে পরিষ্কার কোল্লে। পরিষ্করণ-পর্ব্ব শেষ হোলে আর একটা ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে একটা বড় পিচকিরি করে গায়ে গরম জল ঢাল্‌তে লাগল—হঠাৎ গরম জল দেওয়া বন্ধ কোরে বরফের মত ঠাণ্ডা জল বর্ষণ কোত্তে লাগল—এই রকম কখনো ঠাণ্ডা কখন গরম জলে স্নান কোরে একটা জলযন্ত্রের মধ্যে গেলেম—তার উপর থেকে, নীচে থেকে, চার পাশ থেকে, জল বাণের মত গায়ে বিঁধতে থাকে—সেই বরফের মত ঠাণ্ডা বরুণ-বাণ-বর্ষণের মধ্যে খানিক ক্ষণ থেকে আমার বুকের রক্ত পর্য্যন্ত যেন জমাট হোয়ে গেল—রণে ভঙ্গ দিতে হোল, হাঁপাতে হাঁপাতে বেরিয়ে এলেম। তার পরে এক জায়গায় পুকুরের মত আছে, আমি সাঁতার দিতে রাজি আছি কি না জিজ্ঞাসা কোর্‌লে—আমি সাঁতার দিলেম না, আমার সঙ্গী সাঁতার দিলেন; তাঁর সাঁতার দেওয়া দেখে তারা বলাবলি কোর্‌তে লাগল—"দেখ, দেখ, এরা কি অদ্ভুত রকম কোরে সাঁতার দেয়, ঠিক কুকুরের মত।" এতক্ষণে স্নান শেষ হোল। আমি দেখ্‌লেম, টার্কিস বাথে স্নান করা আর শরীরটাকে ধোপার বাড়ি দেওয়া এক কথা! তার পরে সমস্ত দিনের জন্য এক পাউণ্ড দিয়ে এক গাড়ি ভাড়া করা গেল। প্যারিস্ - একজিবিষণ দেখ্‌তে গেলেম। তুমি এইবার হয়ত খুব আগ্রহের সঙ্গে কাণ খাড়া কোরেছে, ভাব্‌ছ আমি প্যারিস্ একজিবিষণের বিষয় কিনা জানি বর্ণনা কোর্‌ব। কিন্তু দুঃখের বিষয় কি বল্‌ব, কলকাতার য়ুনিবর্সিটিতে বিদ্যা শেখার মত আমি প্যারিস একজিবিষণের সমস্ত দেখেছি কিন্তু কিছুই ভাল কোরে দেখি নি। একদিনের বেশী আমাদের প্যারিসে থাকা হোল না—সে বৃহৎকাণ্ড একদিনে দেখা কারো সাধ্য নয়। সমস্ত দিন আমরা দেখ্‌লেম—কিন্তু সে রকম দেখায়, দেখ্‌বার একটা তৃষ্ণা জন্মালো কিন্তু দেখা হোল না। সে একটা নগরবিশেষ। এক মাস থাকলে তবে তা বর্ণনা কর্‌বার দুরাশা করতেম। প্যারিস একজিবিষণের একটা স্তূপাকার ভাব মনে আছে, কিন্তু শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাব কিছুই মনে নেই। সাধারণতঃ মনে আছে যে, চিত্রশালায় গিয়ে অসংখ্য অসংখ্য চমৎকার ছবি দেখেছি—স্থাপত্যশালায় গিয়ে অসংখ্য অসংখ্য প্রস্তরমূর্ত্তি দেখেছি—নানা দেশ বিদেশের নানা জিনিষ দেখেছি; কিন্তু বিশেষ কিছু মনে নেই। তার পর, প্যারিস থেকে লণ্ডনে এলেম—এমন বিষণ্ণ অন্ধকার পুরী আর কখনো দেখিনি—ধোঁয়া, মেঘ, বৃষ্টি, কোয়াসা, কাদা আর লোকজনের ব্যস্ত-সমস্ত ভাব—এই হচ্চে লণ্ডনের যথা সর্ব্বস্ব। আমি দুই এক ঘণ্টা মাত্র লণ্ডনে ছিলেম—যখন লণ্ডন পরিত্যাগ কর্‌লেম, তখন নিশ্বাস পরিত্যাগ কোরে বাঁচলেম—আমার বন্ধুরা আমাকে বোল্লেন, লণ্ডনের সঙ্গে প্রথম দৃষ্টিতেই ভালবাসা হয় না; কিছু দিন থেকে তাকে ভাল কোরে চিন্‌লে তবে লণ্ডনের মাধুর্য্য বোঝা যায়।

দ্বিতীয় পত্র।

আমি ইংলণ্ড দ্বীপটাকে এত ছোট, ও ইংলণ্ডের অধিবাসীদের এমন বিদ্যালোচনাশীল মনে কোরেছিলেম যে, ইংলণ্ডে আসবার আগে আমি আশা কোরেছিলেম যে, এই ক্ষুদ্র দ্বীপের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত বুঝি টেনিসনের বীণাধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হোচ্চে, মনে কোরেছিলেম, এই দুই হস্ত-পরিমিত ভূমির যেখানে থাকি না কেন, গ্ল্যাড ষ্টোনের বাগ্মিতা, ম্যাক্সমূলরের বেদ-ব্যাখ্যা, টিণ্ড্যালের বিজ্ঞানতত্ত্ব, কার্লাইলের গভীর চিন্তা, বেনের দর্শনশাস্ত্র শুনতে পাব; মনে করে ছিলেম, যেখানে যাই না কেন, intellictual আমোদ নিয়েই আবালবৃদ্ধবনিতা বুঝি উন্মত্ত; কিন্তু তাতে আমি ভারি নিরাশ হোয়েছি; মেয়েরা বেশ ভূষায় লিপ্ত, পুরুষেরা কাজকর্ম্ম কোরচে, সংসার যেমন চোলে থাকে তেমনি চোলচে, কেবল রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে যা কিছু কোলাহল শোনা যায়। তুমি যদি কোথাও গেলে ত মেয়েরা জিজ্ঞাসা কোরবে, তুমি Ballএ গিয়েছিলে কি না, কন্সর্ট কেমন লাগল, থিয়েটরে একজন নূতন actor এসেচে, কাল অমুক জায়গায় ব্যাণ্ড হবে ইত্যাদি। পুরুষেরা বোলবে আফগান-যুদ্ধের বিষয় তুমি কি বিবেচনা কর? Marquis of Lorneকে লণ্ডনীয়েরা খুব সমাদর কোরেছিল, আজ দিন বেশ ভাল কালকের দিন বড় misereable ছিল। এদের মেয়েতে মেয়েতে যে সব গল্প চলে তা' শুনলে তোমার ভারি মজা মনে হবে, একটি কুশ্রী বালিকার সঙ্গে একটি ধনী ব্যারিষ্টরের বিয়ে হওয়াতে তাই নিয়ে একটি স্ত্রীসভায় যে সমালোচনটা চোলছিল, তা শুনে আমার চক্ষুস্থির হোয়ে গিয়েছিল; কুশ্রী মেয়ের বিয়ে হোয়ে গেলে এদেশের মেয়েদের প্রাণে বোধ হয় বড় আঘাত লাগে, মাতৃ-শ্রেণীর মধ্যে ভারি চোখ-টেপাটেপি পোড়ে যায়, তাঁরা মনের যন্ত্রণায় আর কিছু কোরতে না পেরে আড়ালে আবডালে সে বেচারীর প্রতি যথাসাধ্য বিদ্রূপের বাণ বর্ষণ কোরতে থাকেন। মাতৃদলের মধ্যে যাঁদের কুশ্রী মেয়ে আছে, তাঁহা মনে করেন অমুক মেয়েটার যদি অমন ভাল বিয়ে হোয়ে গেল তবে আমার মেয়েরা কি অপরাধ কোরলে; যাঁদের সুশ্রী মেয়ে আছে, তাঁরা মনে করেন অমুক মেয়েটার বিয়ে হোয়ে গেল আর আমার মেয়েদের হোল না? আর সাধারণ মিস্-শ্রেণীদের ত রাগে, ঘৃণায়, অভিমানে বুক ফেটে যায়, যে বেচারীর সৌভাগ্যক্রমে বিয়ে হোয়ে গেছে, যেন তার বড় অপরাধ। যাঁরা সেই কুশ্রী মেয়ের রূপ নিয়ে সমালোচনা কচ্ছিলেন তাঁদের মধ্যে একটি মেয়েও সুশ্রী ছিলেন না, পরের কুরূপ নিয়ে বিদ্রূপ করার অধিকার তাঁদের এক তিলও নেই। কাপড় চোপড়, গয়না পত্র, কার চোখ টেরা, কার নাক মোটা, কার ঠোঁট পুরু, কার বা হাতের কোড়ে আঙ্গুলের নখের কোন্ বাঁকা,—এই সব নিয়ে এখানকার মেয়েতে মেয়েতে ভারি হাসি তামাসা চোলে থাকে; আমার যতখানি অভিজ্ঞতা (যদিও খুব কম) তাতে তো আমি এই রকম দেখেছি। এদেশের মেয়েরা পিয়ানো বাজায়, গান গায়, আগুনের ধারে আগুন পোয়ায়, সোফায় ঠেসান দিয়ে নভেল পড়ে, ভিজিটরদের সঙ্গে আলাপচারি করে ও আবশ্যক বা অনাবশ্যকমতে যুবকদের সঙ্গে flirt করে, এইত আমার অভিজ্ঞতা। কিন্তু এদেশের old maid শ্রেণীরা ভয়ঙ্কর কাজের লোক Temperance Meeting

Working meu's Society প্রভৃতি যত প্রকার অনুষ্ঠানের কোলাহল আছে, সমুদয়ের মূলে ইঁারা আছেন। পুরুষদের মত তাঁদের আপিসে যেতে হয় না; মেয়েদের মত তাঁদের ছেলে পিলে মানুষ কোর্‌তে হয় না, এদিকে হয় ত এত বয়স হোয়েছে যে "বলে" গিয়ে নাচলে বা flirt কোরে সময় কাটালে দশ জনে হাসবে, হাতে তাঁদের সময় অগাধ পড়ে রোয়েছে, তাই জন্যে তাঁরা অনেক কাজ কোর্‌তে পারেন, বাস্তবিক তাতে অনেক উপকার হয়। বিদেশ থেকে আমরা এই মেয়েদেরই নাম বেশী শুনতে পাই—কিন্তু এদের থেকেই যদি সমস্ত বিলিতি মেয়েদের বিচার কোরতে যাও, তবে হয়ত ভ্রমে পোড়বে। এখানকার বিবিরা দরজিশ্রেণীর জীবিকা, ফ্যাসান-রাজ্যের বিধাতা ও যুবকদলের খেলানাস্বরূপ, খেলানা আমি এই অর্থে বল্‌চি,—যে, যখনি কারো সন্ধ্যের সময় একটু সময় কাটাবার আবশ্যক হোল, দুই একটি মিসের সঙ্গে হয়ত তিনি Sentimeutal অভিনয় কোরে এলেন। পুরুষদের মন ভোলানই মেয়েদের জীবনের একমাত্র ব্রত, যদি একজন পুরুষের মন ভোলাতে পারেন তবে মনে কোরলেন জীবনের একটা মহান্ লক্ষ্য সিদ্ধ হোল, পূর্ব্ব জন্মের অনেক তপস্যা সার্থক হোল, মনভোলানো-যজ্ঞে তাঁদের নিজের সুখ স্বাস্থ্য বলিদান দিতে তাঁরা কুণ্ঠিত নন, কোমর এঁটে এঁটে তাঁরা বোলতার মত কোমর কোরে তুলবেন—তার জন্যে তাঁরা সকল প্রকার যন্ত্রণা সহ্য কোরতে ও সকল প্রকার রোগ সঞ্চয় কোর্‌তেও রাজি আছেন। বাহারে কাপড় পোরে মাথায় গোটা কতক পালক গুঁজে দিন রাত্রি তাঁরা পুতুলটি সেজে আছেন, অভিনয় কোরে কোরে এমন তাঁদের অভ্যাস হোয়ে গেছে যে অস্বাভাবিকও তাঁদের স্বাভাবিক হোয়ে গেছে। যে মেয়ের সাজসজ্জা সৌন্দর্য্য বাইরে থেকে খুব স্বাভাবিক ও অযত্ন সাধ্য বোলে মনে হয়, যাদের কথা বার্ত্তার মাধুরীতে আয়াসের লক্ষণ দেখা যায় না, মনে হয় affectation, আদোবে জানে না, তারাই হয় তো পাকা affectation জানে। এমন হোতে পারে যে, একজন মেয়ে হয়ত পুরুষের প্রেমে পোড়েছে, সেই পুরুষের হৃদয় অধিকার করাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য, কিন্তু তাই বোলেই যে তিনি নিশ্চিন্ত হোয়ে বসে থাকেন, তা প্রায় দেখা যায়, না,—যেমন অনেক শিকারী খাবার জন্যে পাখী মার্‌তে যায় না, তাদের বন্দুকের লক্ষ্য সিদ্ধ হোল বোলে আরাম পায়, হৃদয় অধিকার কোরতে এঁরাও সেই আরাম পান। আমি মন ভোলাবার জন্য এ রকম হাব, ভাব, হাত পা নাড়া, গলা সেধে সরু করা, মিষ্ট ভাবের হাসি বের করা দু চক্ষে দেখতে পারিনে, হাব ভাবে আমার মন বোধ হয় কেউ ভোলাতে পারে না—পুরুষদের মন ভোলানো যাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, সেই মেয়েদের দেখলে আমার বড় মায়া হয়—যেন তাদের নিজের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। আমাদের দেশের মেয়েদের চেয়ে এদেশের কি বেশী উন্নতি দেখছি জান? না, এঁরা সাজগোজের শাস্ত্রে আমাদের চেয়ে বেশী ব্যুৎপত্তি লাভ কোরেচেন, আর লেখাপড়া শিখেচেন—লেখা পড়া শিখেছেন অর্থে এখানে এই রকম বোঝাচ্ছে যে নভেল পড়বার সময় এঁদের কখনো ডিক্সনারী খোলার আবশ্যক হয় না! আমি মনে কোরতেম intellectual খাদ্যই এদেশের লোকদের মনের এক মাত্র খোরাক—আমি মনে কোর্‌তেম, এদেশের মেয়েরাও intellectual আমোদেরই প্রধান

আমোদ মনে করে ও নাচ তামাসাকে তার নীচে স্থান দেয়। যদিও এ দেশের মেয়েদের মধ্যে বিদ্যাচর্চ্চা সুরু হোয়েচে, কিন্তু সে এত অল্প যে, তা' কারো নজরেই আসে না। বিলেতে এসে আমি অনেক বিষয়ে নিরাশ হোয়েছি। এখানে দ্বারে দ্বারে মদের দোকান। আমি রাস্তায় বেরোলে জুতোর দোকান, দরজীর দোকান, মাংসের দোকান, খেলনার দোকান, রাশ রাশ দেখতে পাই, কিন্তু বইয়ের দোকান দুটো দেখতে পাইনে—আমিত একেবারে আশ্চর্য্য হোয়ে গেছি। আমাদের একটি শেলীর কবিতা কোন্‌বার আবশ্যক হোয়েছিল কিন্তু কাছা-কাছির মধ্যে বইয়ের দোকান না দেখে এক জন খেলনা-ওয়ালাকে সেই বই আনিয়ে দিতে হুকুম কোরতে হোয়েছিল—আমি আগে জান্‌তেম, এ দেশে একটা কসাইয়ের দোকান যেমন দরকারী একটা বইয়ের দোকানও তেমনি!

ইংলণ্ডে এলে সকল চেয়ে চোখে কি পড়ে জান, লোকের ব্যস্তভাব। রাস্তা দিয়ে যারা চলে তাদের মুখ দেখতে মজা আছে—বগলে ছাতি নিয়ে হুস্‌ হুস্‌ কোরে চোলেছে, পাশের লোকদের উপর ভ্রূক্ষেপ নেই, মুখে মহা ব্যস্ত ভাব প্রকাশ পাচ্চে—সময় তাদের ফাঁকি দিয়ে না পালায় এই তাদের প্রাণপণ চেষ্টা। ইংলণ্ডে যে কত রেলোয়ে আছে তার ঠিকানা নেই, সমস্ত লণ্ডন-ময় রেলোয়ে—প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর এক একটা ট্রেণ যাচ্চে। একটা রেলোয়ে ষ্টেশনে গেলে দেখা যায়, পাশাপাশি যে কত শত লাইন রোয়েছে তার ঠিক নেই। লণ্ডন থেকে ব্রাইটনে আস্‌বার সময় দেখি, প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে—উপর দিয়ে একটা, নীচে দিয়ে একটা, পাশ দিয়ে একটা, এমন চারিদিক থেকে হুস্‌হাস্‌ কোরে ট্রেণ ছুটেছে—সে ট্রেণ গুলোর চেহারা দেখলে আমার লণ্ডনের লোক মনে পড়ে—এদিক থেকে ওদিক থেকে মহা ব্যস্ত-ভাবে হাঁস ফাঁস কোর্‌তে কোর্‌তে চোলেছে, এক তিল সময় নষ্ট কোরলে চলে না! দেশ ত এই এক রত্তি, নোড়ে চোড়ে বেড়াবার জায়গা নেই, দু পা চোল্লেই ভয় হয় পাছে সমুদ্রে গিয়ে পড়ি, এখানে এত ট্রেণ যে কেন ভেবে পাইনে! আমরা একবার লণ্ডনে যাবার সময় দৈবাৎ ট্রেণ মিস্‌ কোরেছিলেম, কিন্তু তার জন্যে বাড়ি ফিরে আস্‌তে হয় নি, তার আধ ঘণ্টা পরেই আর এক ট্রেণ এসে হাজির!

জীবিকার জন্যে এদেশে যেমন যুঝাযুঝি এমন আর কোথাও দেখি নি! এ দেশের লোক প্রকৃতির আদুরে ছেলে নয়—কারুর নাকে তেল দিয়ে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বোসে থাক্‌বার যো নেই—একেত আমাদের দেশের মত এদেশের জমীতে আঁচড় কাট্‌লেই শস্য হয় না, তাতে শীতের সঙ্গে মারামারি কোর্‌তে হয়—প্রথমতঃ শীতের উপদ্রবে এদের কত কাপড় দরকার হয় তার ঠিক নেই—তার পরে কম খেলে এদেশে বাঁচবার যো নেই, শরীরে তাপ জন্মাবার জন্যে অনেক খেতে হয়; এদেশের লোকের কাপড়, কয়লা, খাওয়া অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে না থাক্‌লে চলে না, তার ওপরে আবার মদ আছে। আমাদের বাঙ্গা-লার খাওয়া নাম মাত্র; কাপড় পরাও তাই। এদেশে Eittestরাই Survive করে, এদেশে যার ক্ষমতা আছে সেই মাথা তুল্‌তে পারে, দুর্ব্বল লোকদের এখানে রক্ষা নেই—একে প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ কোরতে হয়, তা'তে কার্য্য-ক্ষেত্রে সহস্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা রোখারুখি কোর্‌চে।

এ দেশের ছোট লোকদের দেখলে মনে হয় না তাদের কিছুমাত্র মনুষ্যত্ব আছে—তারা যেন পশু থেকে এক ধাপ উঁচু। তাদের মুখ দেখলে—নিদেন তাদের মধ্যে এক এক জনের মুখ দেখলে আমার কেমন গা শিউরে ওঠে—তাদের মুখ দেখে আর কেউ "human face divini" বোল্‌তে পারে না, পশুত্ব-ভাব-ব্যঞ্জক তাদের সেই লাল-লাল মুখ দেখলে কেমন ঘৃণা হয়! আর, তারা যে ময়লা তা' আর কি বোল্‌ব। এই সে দিন এক'টা পুলিষের মোকদ্দমা দেখছিলেম; একটা ছোট লোকের ছেলে মজা দেখবার জন্তে একটা ঘোড়ার জিব টেনে ছিঁড়ে ফেলেছিল, এমন পশুত্ব কখনো শুনেছ?

ক্রমে ক্রমে এখানকার দুই এক জন লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হোতে চোল্লো। একটা মজা দেখ্‌চি, এখানকার লোকেরা আমাকে অতি-দুগ্ধ-পোষা বালকের মত মনে করে। মনে করে ইণ্ডিয়া থেকে এসেচে কিছু জানে না, শোনে না, এ-কে দুচারটে জিনিষ দেখিয়ে শুনিয়ে বুঝিয়ে-শুঝিয়ে দেওয়া ভাল। এক দিন Dr—এর ভাইয়ের সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়েছিলেম, সে যে আমাকে বিরক্ত কোরে তুলেছিল তা আর বলবার কথা নয়। একটা দোকানের সুমুখে কতকগুলো ফোটোগ্রাফ ছিল—সে মনে কোরেছিল, ফোটোগ্রাফ দেখে আমার একেবারে—তাক্ লেগে যাবে—চক্ষু স্থির হোয়ে যাবে—সে আমাকে সেই খানে নিয়ে গিয়ে ফোটোগ্রাফের মহা ব্যাখ্যান কোর্‌তে আরম্ভ কোরে দিলে—সে আমাকে বুঝিয়ে দিলে যে, এক রকম যন্ত্র দিয়ে ঐ ছবি-গুলো তৈরি হয়, মানুষে হাতে কোরে আঁকে না—আমার চার দিকে লোক দাঁড়িয়ে, আমার এমন লজ্জা কোচ্ছিল! আমি তাকে বিশেষ কোরে বল্লেম যে, আমি ও খবরগুলি বিশেষ জানি, কিন্তু সে বিশ্বাস কোরবে কেন? একটা ঘড়ির দোকানের সাম্‌নে গিয়ে, ঘড়িটা যে একটা খুব আশ্চর্য্য যন্ত্র তাই আমার মনে সংস্কার জন্মাবার জন্তে চেষ্টা কোরতে লাগলেন; আমিত তাঁর অনুগ্রহের জ্বালায় একেবারে জ্বালাতন হোয়ে গিয়েছিলেম! একটা Fvening partyতে Miss—আমাকে জিজ্ঞাসা কোরছিলেন, আমি এর পূর্ব্বে পিয়ানোর ডাক শুনেছি কি না? এ দেশের অনেক লোক হয়ত পরলোকের একটা ম্যাপ এঁকে দিতে পারে কিন্তু ভারতবর্ষের সম্বন্ধে যদি এক বিন্দুও খবর জানে। ভারতবর্ষের লোকেরা গোখাদক নয় শুন্‌লে হয়ত তারা চার দণ্ড হাঁ কোরে থাকে—ইংলণ্ড থেকে কোন দেশের যে কিছু তফাৎ আছে তা তারা কল্পনাও কোরতে পারে না। ভারতবর্ষের কথা দূরে থাক্—সাধারণ লোকেরা কত বিষয় জানে না তার ঠিক নেই। এই মনে কর, প—ডাক্তারকে আমার শিক্ষক খুব educated man বোলে সুখ্যাতি কোরে থাকেন কিন্তু তিনি Shelley বোলে যে একজন কবি তাঁদের দেশে জন্মেছিল সেই খবর টুকু মাত্র জানেন, কিন্তু শেলী যে চেঞ্চি (Genci) বোলে একখানা নাটক লিখেছেন, বা তাঁর Fpipsychidion বোলে যে একটি কবিতা আছে, তা' আমার মুখে প্রথম শুন্‌তে পেলেন!

তৃতীয় পত্র।

আমরা সে দিন "ফ্যান্সি-বলে" অর্থাৎ ছদ্মবেশ নাচে গিয়েছিলেম—কত মেয়ে পুরুষ

নানা রকম সেজে গুজে সেখানে নাচতে গিয়েছিল—সে দেখতে বেশ জমকালো! প্রকাণ্ড ঘর, গ্যাসের আলোয় আলোকাকীর্ণ, চার দিকে ব্যাণ্ড বাজচে—৬৭০০ সুন্দরী, সুপুরুষ। ঘরে ন স্থানং তিল ধারয়েৎ—চাঁদের হাট ত তাকেই বলে—যে দিকে পা বাড়াই বিবিদের গাউন—যে দিকে চোখ ফেরাই চোখ ঝলসে যায়—এক একটা ঘরে দলে দলে স্ত্রী পুরুষে হাত ধরাধরি কোরে ঘুরে ঘুরে নাচতে আরম্ভ কোরেছে, দেখে মনে হয় যেন সবাই একেবারে আমোদে উন্মত্ত হয়ে গেছে—জ্ঞানশূন্য হয়ে যেন যোড়া যোড়া পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্চে, এক একটা ঘরে এমন ৭০।৮০ জন যুগল মূর্ত্তি ঘুরচে—এমন ঘেঁসাঘেঁসি যে, কে কার ঘাড়ে গিয়ে পড়ে তার ঠিক্ নেই, একটা ঘরে শ্যাম্পেনের কুরুক্ষেত্র পড়ে গিয়েছে, মদ্য মাংসের ছড়াছড়ি, সেখানে লোকে লোকারণ্য; এক একটা বিবির খাবার বিরাম নেই, দু তিন ঘণ্টা ধোরে ক্রমাগত তার মুখ চোলচে। একএকটা বিবির নাচের বিরাম নাই, দু তিন ঘণ্টা ধোরে ক্রমাগত তার পা চলুচে। সকলেরই মুখে হাসি, মন অধিকার কর বার যত প্রকারগোলাগুলি আছে, বিবিরা তা অকাতরে নির্দ্দয়ভাবে বর্ষণ করচেন—কিন্তু ভয় কোরো না, আমাদের মত পাষাণ হৃদয়ে তার একটু আঁচড়ও পড়ে নি! এক জন বিবি Snow maiden অর্থাৎ নীহার-কুমারী সেজে গিয়েছিলেন তাঁর সমস্তই শুভ্র, সর্ব্বাঙ্গে পুঁথির সজ্জা, আলোতে একেবারে ঝক্ মক্ কোরচে, একজন মুসলমানিনী মেয়ে সেজে গিয়েছিলেন—একটা লাল ফুলো ইজের উপরে একটা রেসমের পেশোয়াজ, মাথায় টুপির মত—এ কাপড়ে তাঁকে বেশ মানিয়ে গিয়েছিল। এক জন আমাদের দিশি মেয়ে সেজে গিয়েছিলেন—একটা সাড়ি ও একটা কাঁচুলি তাঁর প্রধান সজ্জা, তার উপরে একটা চাদর পোরেছিলেন, তাতে ইংরাজি কাপড়ের চেয়ে তাঁকে ঢের ভাল দেখাচ্ছিল। এক জন বিলিতি দাসী সেজে গিয়েছিল—যে রকম তার চেহারা, তাতে দাসীর পোষাক ছাড়া আর কিছুতে তাকে মানাতো না—এই রকম নানা লোক নানা রকম পোষাক পোরে গিয়েছিল। আমি বাঙ্গালার জমীদার সেজেছিলেম, জরী দেওয়া মখমলের কাপড়, জরী দেওয়া মখমলের পাগ্‌ড়ি প্রভৃতি পরেছিলেম। জনকতক ব্যক্তি মিলে পীড়াপীড়ি কোরে আমাকে একটা দাড়ি গোঁপ পরালেন, দুই এক জন মহিলা আমাকে দেখে বোল্লেন যে, সে দাড়ি গোঁপে আমাকে ভারি ভাল দেখাচ্চে, তাতে আমার স্বভাবতই ভারি গর্ব্বের আবির্ভাব হোল,- আমি সেই দাড়ি গোঁপ পোরেই "বলে" গিয়ে উপস্থিত হলেম—কিন্তু দর্পহারী মধুসূদন আছেন, আমি যে নাকালটা হলেম তা আর বক্তব্যও নয়, শ্রোতব্যও নয়, তা' শুনলে পাষাণেরও চোখ ফেটে মুক্তার মত ডাগর ডাগর অশ্রুবিন্দু দরদর ধারে বিগলিত হয়ে ধরণীতল অভিষিক্ত করবে—যে সকল, সুন্দরী বন্ধুদের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল, আমার দাড়ি গোঁপ দেখে তাঁরা আর কেউ আমাকে চিনতে পারেন না—অমুকের সঙ্গে সকলেই সেক্‌হ্যাণ্ড করলে—অমুক বাবুর সঙ্গে সকলেই সেক্ হ্যাণ্ড কোল্লে কিন্তু এ গরীবকে আর কেউ পোছে না। আমি যার কাছে যাই, সেই সোরে পড়ে! আমি তো রাগে দুঃখে অভিমানে বিরক্তিতে আ—লানিতে অভিভূত হয়ে সেই মুহূর্ত্তেই দাড়ি গোঁপ উৎপাটন কোরে একেবারে পকেটে

গুঁজলেম,তখন সমস্ত ভালোয় ভালোয় মীমাংসা হয়ে গেল! আমাদের মধ্যে অমুক অযোধ্যার তালুকদার সেজে গিয়েছিলেম—শাদা রেশমের ইজের জরিতে খচিত, শাদা রেশমের চাপকান, শাদা রেশমের জোব্বা, জরীতে ঝক্‌মকায়মান পাগড়ি, জরীর কোমরবন্দ—এইতো তাঁর সজ্জা। অযোধ্যার তালুকদারেরা যে এই রকম কাপড় পরে তা মনেও কোরো না, কিন্তু বিচার কর্‌বার লোক কোথায়? ধরা পড়বার কোন সম্ভাবনা ছিল না। আমাদের মধ্যে অমুক বাবু আফগান-সেনাপতি সেজেছিলেন।

গত মঙ্গলবার আমরা অমুকের বাড়িতে নাচের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলেম। সন্ধ্যে বেলায় কোথাও নিমন্ত্রণে যেতে হোলে কি রকম পোষাক পোর্‌তে হয়, জান? এখানে শীতের জন্ম সচরাচর মোটা কাপড় পোর্‌তে হয়, কিন্তু Evening party প্রভৃতিতে যেতে হোলে পাতলা কালো বনাতের কাপড় পোর্‌তে হয়, কেননা নিমন্ত্রণ সভায় খুব গ্যাস জ্বলে, অনেক লোকের সমাগম হয়, তাতে ঘর বেশ গরম হয়ে ওঠে, তা ছাড়া যদি নাচতে হয়, তা হোলে অত্যন্ত গরম হবার কথা। সন্ধ্যে পরিচ্ছেদের কামিজটি একেবারে নিষ্কলঙ্ক ধব-ধোবে শাদা হওয়া চাই, তার ওপরে প্রায় সমস্ত বুকখোলা এক বনাতের ওয়েষ্ট কোট থাকবে, কাল ওয়েষ্ট কোটের মধ্যে শাদা কামিজের সুমুখ দিকটা বেরিয়ে থাকবে, গলায় শাদা ফিতে (necktie) বাঁধা, সকলের ওপর একটি টেল্ কোট (লাঙ্গুল কোট)—টেল্‌কোটের সুমুখ দিকটা কোমর পর্য্যন্ত কাটা, আমাদের চাপকান প্রভৃতি পোষাকগুলি যেমন হাঁটুপর্য্যন্ত পড়ে, এ তা নয়। এর সুমুখ দিকটার সীমা কোমর পর্য্যন্ত, কিন্তু পেছন দিকটা কাটা নয়, সুতরাং ন্যাজের মত ঝুল্‌তে থাকে; আমরা যখন ইংরাজদের হনুকরণ করি, তখন বাধ্য হোয়ে এই ন্যাজ কোট পোর্‌তে হোল, কেননা ন্যাজ কোট না পোর্‌লে হনুকরণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর্ হয় না। নাচ-পার্টিতে যেতে হোলে হাতে এক যোড়া শাদা দস্তানা পোরতে হয়, কারণ যে মহিলাদের হাতে হাত দিয়ে নাচতে হবে, তোমার খালি হাত লেগে তাঁদের হাত ময়লা হয়ে যেতে পারে কিংবা তাঁদের হাতে যদি দস্তানা থাকে,তাঁদের দস্তানা ময়লা হোয়ে যেতে পারে। অন্ত কোন জায়-গায় লেডিদের সঙ্গে সেক্ হ্যাণ্ড কোর্‌তে গেলে হাতের দস্তানা খুলে ফেল্‌তে হয়, কিন্তু নাচের ঘরে তার আবশ্যক হয় না। যাহোক্ আমরা তো সাড়ে নটার সময় তাঁদের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেম। তখনও নাচ আরম্ভ হয় নি। ঘরের দুয়ারের কাছে গৃহকর্ত্রী দাঁড়িয়ে আছেন; তিনি বিশেষ পরিচিতদের সঙ্গে সেক্‌হাণ্ড কোর্‌চেন, অপরিচিতদের প্রতি শিরঃকম্পন কোর্‌চেন, সকলকে অভ্যর্থনা কোর্‌চেন। এ গোরাদের দেশে নিমন্ত্রণ সভায় গৃহকর্ত্তার বড় উঁচু পদ নেই, তিনি সভায় উপস্থিত থাকুন বা শয়ন-গৃহে নিদ্রা দিন, তাতে কারো বড় কিছু এসে যায় না। আমরা ঘরে প্রবেশ করলেম, গ্যাসের আলোয় ঘর আলোকাকীর্ণ, কিন্তু শত শত রমণীদের রূপের আলোকে সে গ্যাসের আলো ম্রিয়মাণ হোয়ে পোড়ছে, চারিদিক উজ্জ্বল হাস্যময়; রূপের উৎসব পোড়ে গিয়েছে, ঘরের ভিতরে প্রবেশ করবামাত্রই চোখে ধাঁধাঁ লেগে যায়। ঘরের এক পাশে পিয়ানো, বাঁশী, বেহালা বাজচে, ঘরের চারিধারে কৌচ, চৌকি সাজানো রয়েছে। ইতস্ততঃ দেয়ালের আয়নার ওপর গ্যাসের আলো ও রূপের প্রতিবিম্ব পোড়ে ঝক্‌মক্ কোরচে। নাচবার

ঘরের মেজে কাঠের, তার ওপর কার্পেট প্রভৃতি কিছু পাতা নেই, সে কাঠের মেজে এমন পালিশ করা যে পা পিছলে যায়; এখানে ঘর যত পিছল হয় ততই নাচবার উপযুক্ত হয়, কেননা পিছল ঘরে নাচের গতি খুব সহজ ও সুন্দর হয়, পা কোন বাধা পায় না, আর আপনা-আপনি পিছলে আসে। ঘরের চারি দিকে আশে-পাশে যে সকল বারান্দার মত আছে, তাই একটু ঢেকে ঢুকে, গাছ-পালা দিয়ে, দুই একটি কৌচ চৌকী রেখে Lover's bower (প্রণয়ীদের কুঞ্জ) নামে অভিহিত করা হোয়েছে। সেই খানে, নাচে শ্রান্ত হোয়ে বা কোলাহলে বিরক্ত হোয়ে দুই একটি যুবক যুবতী নিরিবিলি মধুরালাপে মগ্ন থাক্‌তে পারেন। ঘরে ঢোক্‌বার সময় সকলের হাতে সোণার অক্ষরে ছাপা এক এক খানি কাগজ দেওয়া হয়, সেই কাগজে কি কি নাচ হবে তাই লেখা থাকে। ইংরাজি নাচ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, এক রকম হচ্ছে স্ত্রী পুরুষে মিলে ঘুরে ঘুরে নাচা, তাতে কেবল দুজন লোক এক সঙ্গে নাচে; আর একরকম হোচ্ছে চারটি জুড়ি নর্ত্তক নর্ত্তকী চতুষ্কোণ হোয়ে সুমুখা-সুমুখী দাঁড়ায় ও হাতধরাধরী কোরে নানাভঙ্গীতে চলাফেরা কোরে বেড়ায়, কোন কোন সময় চার জুড়ি না হোয়ে আট জুড়িও হয়। ঘুরে ঘুরে নাচাকে Round dance বলে ও চলা-ফেরা কোরে বেড়ানোর নাম Square dance নাচ আরম্ভ হবার পূর্ব্বে গৃহকর্ত্রী মহিলা ও পুরুষদের মধ্যে আলাপ কোরে দেন, অর্থাৎ পুরুষ-অভ্যাগতকে সঙ্গে কোরে কোন এক অভ্যাগতমহিলার কাছে নিয়ে গিয়ে বলেন "মিস্ অমুক"! ইনি হোচ্ছেন মিষ্টার অমুক।" অমনি মিস্ ও মিষ্টার পরস্পর পরস্পরকে শিরঃকম্পন করেন। কোন মিসের সঙ্গে পরিচয় হবার পর তুমি যদি তাঁর সঙ্গে নাচতে ইচ্ছে কর, তা হলে পকেট্ থেকে সেই সোণার জলে ছাপানো programme টি বের কোরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করো "আপনি কি অমুক নৃত্যে বাক্‌দত্তা হয়ে আছেন?" অর্থাৎ "আর কেউ কি আগে থাক্‌তে আপনার সঙ্গে অমুক নাচের বন্দোবস্ত কোরে গেছেন?" তিনি যদি 'না' বলেন তাহলে তাঁকে বোলো "তা' হোলে আমি কি আপনার সঙ্গে নাচবার সুখভোগ কর্‌তে পারি?" তিনি তোমাকে Thank you বোল্‌লে তুমি বুঝলে যে তোমার কপালে তাঁর সঙ্গে নাচবার সুখ আছে। অমনি সেই কাগজটিতে সেই নাচের পাশে তাঁর নাম লিখে রেখো এবং তাঁর কাগজে তোমার নাম লিখে দিও। কাগজটা এই রকম,

PROGRAMME	ENGAGEMENTS
I. Lancers	
II. Valse	Miss Gordon
III. Quadrille	
IV. Gallop	Mrs. Egincourt
V. Polka	ইত্যাদি
ইত্যাদি	

(নাচের নাম)

যাদের সঙ্গে নাচবার বন্দোবস্ত হলো তাদের নাম।

এক পাশে নৃত্যের নাম, অপর এক পাশে নর্ত্তক বা নর্ত্তকীর নাম। নাচের বাজনা বেজে উঠল। অমনি শত শত যুগলমূর্ত্তি হাত ধরাধরি কোরে নাট্য-গৃহে নাচের জন্যে প্রস্তুত হোয়ে দাঁড়ালেন। নাচ আরম্ভ হোল। ঘুর—ঘুর—ঘুর। একটা ঘরে মনে কর, চল্লিশ পঞ্চাশ যুড়ি নাচচে, ঘেঁসাঘেঁসি, ঠেলাঠেলি এ-ওর ঘাড়ে পোড়ছে, এ-ওর গাউন মাড়িয়ে দিচ্চে, যুড়িতে যুড়িতে ধাক্কা-ধাক্কি, কিন্তু তবু ঘুর—ঘুর

—ঘুর। মনে হয় যেন আহ্লাদে পাগল হোয়ে সবাই মিলে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে; তালে তালে বাজনা বাজ্‌চে, তালে তালে পা পোড়চে, ঘর গরম হোয়ে উঠেছে, আর সে যে কি একটা উত্তেজনার তরঙ্গ উঠেছে, সে কি বল্‌ব! কোন নর্ত্তক-যুগলের দুজনের দুজনকেই হয়ত খুব ভাল লেগেছে, তাদের দুজনের ঠোঁটে হাসি একেবারে ফেটে পোড়্‌ছে। কোন যুবতীর ভাগ্যে এক বৃদ্ধ কুরূপ নর্ত্তক জুটেছে, তার মুখে আর হাসি নেই, সে অতি আড়ষ্ট ভাবে যন্ত্রের মত নাচচে; কোন লেডি Partner (সহ-নর্ত্তক) পান নি, তিনি দেয়ালের কোণে দাঁড়িয়ে সদ্বেষ-নয়নে হাসিমুখ ঘূর্ণ্যমান নর্ত্তক-যুগলকে নিরীক্ষণ কোর্‌চেন, আর বিফলে প্রফুল্লতার ভাণ কোরতে চেষ্টা কোর্‌চেন। তাঁর নাম Wall-flower, অর্থাৎ "দেয়াল-কুসুম;" তিনি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে নাট্যশালার দেয়ালের শোভা বর্দ্ধন করেন! একটা নাচ শেষ হোল, বাজনা থেমে গেল; নর্ত্তক মহাশয় তাঁর শ্রান্ত সহচরীকে আহারের ঘরে নিয়ে গেলেন, সেখানে টেবিলের উপর ফল মূল মিষ্টান্ন মদিরার আয়োজন; হয়ত আহার পান কোর্‌লেন, না হয় দুজনে নিভৃত কুঞ্জে বোসে রহস্যালাপ কোরতে লাগলেন। আমি নূতন লোকের সঙ্গে বড় মিলে মিশে নিতে পারিনে, যে নাচে আমি একেবারে সুপণ্ডিত সে নাচও নতুন লোকের সঙ্গে নাচতে পারিনে, প্রতিপদে ভুল হয়, লোকের গাউন মাড়িয়ে দিই, প্রান্ত লোককে ধাক্কা দিই, বোতলে পা ফেলি, কখনো বা অসাবধানে আমার সহনর্ত্তকীর পাও মাড়িয়ে দিই, আর এই রকম নানা প্রকার গলদ্ কোরে অবশেষে নাচের মাঝখানে থেমে পড়ি ও আমার সহচরীর কাছ থেকে মার্জ্জনা ভিক্ষা কোরে সে দিক থেকে আস্তে আস্তে পিট্টান দিই। সত্যি কথা বোল্‌তে কি, আমার নাচের নেমন্তন্ন গুলো বড় ভাল লাগে না। অপরিচিত মেয়ের সঙ্গে ওরকম পাগলের মত ঘুরে ঘুরে বেড়াতে আমার আদবে ভাল লাগে না। যাদের সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ আছে, তাদের সঙ্গে নাচ্‌তে আমার মন্দ লাগে না। Miss অমুকের সঙ্গে আমার বেশ আলাপ ছিল, আর তাঁকে বেশ দেখতে, তাঁর সঙ্গে আমি Gallop নেচেছিলেম, তাই জন্যে তাতে আমার কিছু ভুল হয়নি। কিন্তু Miss অমুকের সঙ্গে আমি Lancers নেচেছিলেম, তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না, আর তাঁকে অতি বিশ্রী দেখতে, তাঁর চোখ দুটো বের করা, তাঁর গাল দুটো মোটা, দাড়ির দিকটা অত্যন্ত ছোট, সব চেয়ে তাঁর স্বভাব খিটমিটে। তাঁর সঙ্গে নাচতে গিয়ে যত প্রকার দোষ হওয়া সম্ভব, তা ঘোটেছিল। যেমন তাস খেল্‌বার সময়ে খারাপ Partner পেলে তার পরে তার দলের লোক চোটে যায়, তেমনি নাচের সময় খারাপ Partner পেলে মেয়েরা ভারি চোটে যায়। তিনি বোধ হয় নাচবার সময় মনে মনে আমার মরণ কামনা কোরেছিলেন, নাচ ফুরিয়ে গেল আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেম, তিনিও নিস্তার পেলেন! আমি একবার একটি সুন্দরী Partner পেয়েছিলেম, তাঁর সঙ্গে না নাচতে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা কোরেছিলেম, কিন্তু গৃহকর্ত্রী আমাকে বিশেষ কোরে নাচতে অনুরোধ কোরলে, পীড়াপীড়ির পর নাট্যশালায় অবতরণ কোরলেম, কোন মতে নাচটা সমাপন কোরে দে ছুট্! প্রথমে নাচের ঘরে ঢুকেই আমি একেবারে চোম্‌কে উঠেছিলেম, দেখি যে শত শ্বেতাঙ্গিনীদের মধ্যে আমাদের একটী ভারতবর্ষীয়া শ্যামাঙ্গিনী রয়ে-

ন! দেখেই ত আমার বুকটা একেবারে চে উঠেছিল। আমার তাকে এমন ভাল গল যে কি বলব! তার সঙ্গে কোন মতে লাপ করবার জন্যে আমি ত ছট্‌ফট্‌ কোরে ড়াতে লাগলেম। কত দিন মনে কর কাল থ দেখিনি! আর, তার মুখে আমাদের ঙ্গালী মেয়েদের ভালমানুষী নম্রভাব এমন খানো যে কি বলব। আমি অনেক ইংরেজ য়েদের মুখে ভালমানুষী নরমভাব দেখেছি ন্তু এর সঙ্গে তার কি একটা তফাৎ আছে লতে পারি নে। তার চুল বাঁধা আমাদের শের মত, শাদা মুখ দেখে দেখে, আর উগ্র সঙ্কোচ সৌন্দর্য্য দেখে দেখে আমার মনটা ভতরে ভিতরে বড় বিরক্ত হোয়ে গিয়েছিল, তদিনে তাই বুঝতে পারলেম। সেই শ্বেতা-ঙ্গনীদের সভায় একটি কালো মিষ্টিমুখ দেখে আমার মনটা চুম্বকের মত সেই দিকে আকৃষ্ট হোয়েছিল। আমার বোধ হয় এরকম হবার মানে আছে—হাজার হোক্‌, ইংরেজ মেয়েরা ম্পূর্ণ আলাদা জাত, তারা আমাদের কথা-র্ত্তা ভাবভঙ্গি আচার ব্যবহারের মর্ম্মের ভতরে ঢুকতে পারে না। আমি এতদূর ংরিজি ভাব শিখিনি যে তাদের সঙ্গে বেশ খোলা-খুলি পরিচিত ভাবে কথা বার্ত্তা কইতে পারি, তাদের সঙ্গে দেখা হোলে কথাবার্ত্তা হবার যে সকল বাঁধি গৎ আছে, স-গুলি খুব ঝাড়তে পারি; আমি জিজ্ঞাসা কোরতে পারি, সম্প্রতি অপেরায় যাওয়া য়েছিল কি না, অমুক থিয়েটরে অমুক অভিনেতার অভিনয় কেমন লাগল, আজ ভারি াল দিন, ইত্যাদি। এই সকল বাঁধি গতের সীমা লঙ্ঘন কোরতে সাহস হয় না, ইংরিজী মনের ভাব-গতি খুব ভাল রকম জানলে তবে নির্ভয়ে স্বাধীনভাবে দুই একটা কথাবার্ত্তা কওয়া যেতে পারে। ভারতবর্ষীয়েরা আমাদের আপনাদের লোক; তাদের কাছে আমাদের অধিকার অনেকটা বিস্তৃত, চন্দ্রলোকের একটা মেয়ে মনে কোরে তাদের কাছে ঘেঁসতে তেমন একটু ইতস্ততঃ করবার ভাব আসে না। যাহোক্‌ দুঃখের কথা বোলব কি, যখন আমি একেবারে অত্যন্ত মুগ্ধ হোয়ে পড়েছি, তখন শোনা গেল যে সে একটি ফিরিঙ্গি মেয়ে; শুনে আমার মনটা একেবারে বিগড়ে গেল আর তার সঙ্গে আলাপ করা গেল না, কিন্তু কালো মুখের ছাপ আমার মনে রয়ে গেল।

আজ ব্রাইটনের অনেক তপস্যার ফলে সূর্য্য উঠেছেন। এদেশে রবি যেদিন মেঘের অন্তঃপুর থেকে বের হন্‌, সে দিন এদেশে একটি লোকও কেউ অন্তঃপুরে থাকে না—সে দিন লোকেরা একটু বেড়িয়ে বাঁচে। সেদিন সমুদ্রের ধারে বেড়াবার রাস্তায় লোক কিল্‌বিল কোরতে থাকে—এদেশে যদিও "বাড়ির ভিতর" নেই, তবু এদেশের মেয়েরা যেমন অসূর্য্যম্পশ্য-রূপা এমন আমাদের দেশে নয়—এদেশের সূর্য্যই যখন অনেকম্পশ্যরূপ তখন এদেশের মেয়েরাও ত অসূর্য্যম্পশ্যরূপা হবেই।

সাড়ে আটটার কমে আমাদের বিছানা থেকে ওঠা হয় না, ছটার সময় বিছানা থেকে উঠলে এদেশের লোকেরা এত আশ্চর্য্য হয় যে, দিন-দুপরে একটা স্কন্ধকাটা দেখলেও তারা সে রকম আশ্চর্য্য হয় না। তার পরে উঠেই আমি রোজ ঠাণ্ডা জলে স্নান করি। এ দেশের লোকেরা যাকে স্নান বলে, আমি সেরকম স্নানের বিড়ম্বনা করি নে। আমি মাথায় জল ঢেলে স্নান করি; গরম জল নয়—এখানকার এই বরফের মত ঠাণ্ডা জল। মাথায় জল ঢেলে স্নান করাতে এ দেশের

লোকে অসাধারণ বীরত্ব মনে করে, আমার নাম যে কেন এখনও ছাপার কাগজে উঠে যায় নি, আমি তাই ভাবচি। নটার সময় আমাদের খাবার আসে। এখানকার ৯টা আর সেখানকার ৬টা সমান। আমাদের আর একটি খাওয়া দেড়টার সময়, সেইটিই প্রধান খাওয়া—মধ্যাহ্ন-ভোজন। প্রত্যহ *** পার করচি তাতে কিছু মাত্র দ্বিধা নেই, মাঝে মাঝে ভেড়ার পদ-সেবাও কোরে থাকি। মধ্যে একবার চা রুটি প্রভৃতি আসে তার পরে রাত আট্‌টার সময় আর একটি সুপ্রশস্ত ভোজনের আয়োজন হয়ে থাকে, এই রকম আমাদের দিনের প্রধান কার্য্য হচ্চে খাওয়া।

অন্ধকার হয়ে আস্‌চে, চারটে বাজে বোলে, চারটে বাজলে পরে আলো না জ্বেলে পড়া দুষ্কর। এখানে প্রকৃত পক্ষে ৯টার সময় দিন আরম্ভ হয়, কেননা গড়ে রোজ আট্‌টার কমে ওঠা হয় না। এখানকার লোকের ছটার সময় হয়তো দুপর রাত্তির, এ দেশের প্যাঁচারা ছাড়া আর কেউ তখন জেগে নেই; তার পরে আবার বৈকাল চারটের সময়েই এখানকার দিনের আলো নিভে যায়, তাই এখানকার দিনগুল এমন ছোট মনে হয় যে কি বল্‌ব! এখানকার দিনগুল যেন দশটার সময় আপিস্‌ কোর্‌তে আসে, আর চারটের সময় বাড়ি ফিরে যায়। এখানে কাজ কোরে অবসর পাওয়া দুরে থাক্‌, কাজ করবার অবসর পাওয়া যায় না। সন্ধ্যের পর আমার মনের জড়-অবস্থা হয়, এমন জড়-অবস্থা হয় যে, তখন আর কোন কাজ করবার শক্তি থাকে না—সুতরাং আমার এ রকম ছোট দিনের সঙ্গে কারবার করা পুষিয়ে উঠচে না—ট্যাক্‌ ঘড়ির ডালা খুলতে খুল্‌তেই এ দেশের দিন চোলে যায়। এখানকার রাত্তির তেমনি ঘোড়ায় চোড়ে আসে, আর পায়ে হেঁটে চলে যায়—সে আর ফুরোয় না। এখানকার দিনগুলি যে কেবল অচিরস্থায়ী তা নয়, যতক্ষণ থাকে তাই না হয় একটু ভদ্র লোকের মত থাক্‌, তা নয়,—মুখ ভার কোরে খুঁৎখুঁৎ করতে করতেই তাঁর সমস্ত সময় চলে যায়।

মেঘ, বৃষ্টি, বাদল, অন্ধকার, শীত,—এ আর এক দণ্ডের তরে ছাড়া নেই। আমাদের দেশে যখন বৃষ্টি হয়, তখন মুষলধারে বৃষ্টির শব্দ মেঘ, বজ্র, বিদ্যুৎ, ঝড়—তাতে একটা কেমন উল্লাসের ভাব আছে, এখানে এ তা নয়, এ টিপ্‌টিপ্‌ কোরে সেই একঘেয়ে বৃষ্টি ক্রমাগতই অতি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে চোল্‌চে ত চোল্‌চেই —সে কেমন একটা ভিজে ভিজে ভাব। রাস্তায় কাদা, পত্রহীন গাছগুলো স্তব্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজচে, কাঁচের জান্‌লার উপর টিপ্‌টিপ্‌ কোরে জল ছিটিয়ে পড়চে, কেমন একটা অন্ধকার—অন্ধকার কোরে এসেছে আমাদের দেশে যেমন স্তরে স্তরে মেঘ করে এখানে আকাশ সমতল, মনে হয় না যে মেঘ করেছে, মনে হয় কোন কারণে আকাশে রংটা বুলিয়ে গিয়েছে; সমস্তটা জড়িয়ে স্থাবর জঙ্গমের যে কি একটা অবসন্ন মুখশ্রী দেখা যায় তা বর্ণনা করা যায় না। লোকের মুখে সময়ে সময়ে শুনতে পাই বটে যে, কাল বজ্র হয়েছিল, কিন্তু বজ্রের নিজের এমন গলার জোর নেই যে, তাঁর মুখ থেকেই সে খবর পাই—এখানকার বজ্রধ্বনি শুনতে গেলে বোধ হয় microphone ব্যবহার কোর্‌তে হয়। সূর্য্যতো এখানে গুজবের মধ্যে হয়ে পড়েছে যদি অনেক ভাগ্যবলে সকালে উঠে সূর্যের মুখ দেখতে পাই, তবে তখনি আবার মনে

"এমন দিন না রবে—তা' জান"

এই অন্ধকার দেশে আমার বুদ্ধি শুদ্ধি সমস্ত যেন ম্রিয়মাণ হয়ে গেছে, কিছু লেখা বেরোয় না, এমন কি গুছিয়ে একটা চিঠিও লিখতে পারিনে। চিঠি লেখবার বা অন্য কিছু লেখবার কথা মনে হোলেই আমার কেমন হাই উঠতে থাকে। দেশের সে সূর্য্যালোক ও জ্যোৎস্না কেমন সুখস্বপ্নের মত মনে পড়ে। আমাদের দেশে সেই সকালসন্ধ্যার ও জ্যোৎস্না রাত্রির মর্য্যাদা এ দেশে এসে বিশেষ কোরে বুঝতে পেরেছি!

দিনে দিনে শীত খুব ঘনিয়ে আসচে; লোকে বলচে, কাল পরশুর মধ্যে হয়ত আমরা বরফ পড়া দেখতে পাব। তাপমান যন্ত্র ৩০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত নেবে গিয়েছে—সেই তো হচ্চে freezing point, অল্প স্বল্প frost দেখা দিয়েছে। রাস্তার মাটি খুব শক্ত হয়ে গিয়েছে, কেননা তার মধ্যে যা জল ছিল সমস্ত জমাট্ হয়ে গিয়েছে। রাস্তার মাঝে মাঝে কাচের টুক্রোর মত শিশির খুব শক্ত হয়ে জোমে গিয়েছে, দুই এক জায়গায় ঘাসের মধ্যে কে যেন চূণ ছড়িয়ে দিয়েছে—বরফের এই প্রথম সূত্রপাত দেখচি। খুবই শীত পড়েছে, এক এক সময়ে হাত্ পা এমন ঠাণ্ডা হয়ে যায় যে জ্বালা করতে থাকে। সকালে লেপ থেকে বেরোতে যত ভাবনা হয়, সহমরণে যেতে হলেও আমার তত ভাবনা হয় না। কিন্তু আমার বীরত্বের কাহিনী শুন্‌লে হয়তো তুমি অবাক্ হয়ে যাবে। সেই সকালে উঠেই আমি বরফের মত ঠাণ্ডা জল মাথায় ঢেলে স্নান করি, মনে হয়, মাথাটা যেন খোসে পড়ল, সর্ব্বাঙ্গ অবশ হয়ে যায়; কিন্তু তার পরেই যে প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়, তাতে সমস্ত যন্ত্রণা ভুলে যেতে হয়।

আমাদের দিশি কাপড় দেখে রাস্তায় এক এক জন সত্যি সত্যি হেসে উঠে, এক এক জন এত আশ্চর্য্য হয়ে যায় যে তাদের আর হাস্‌বার ক্ষমতা থাকে না। কত লোক আমাদের জন্যে গাড়ি চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছে, তারা আমাদের দিকে এত হাঁ কোরে চেয়ে থাকে যে পিছনে গাড়ি আস্‌চে হুঁস নেই। প্যারিসে আমাদের গাড়ির পিছনে পিছনে এক দঙ্গল ইস্কুলের ছোক্‌রা চীৎকার করতে করতে ছুটেছিল, আমরা তাদের সেলাম করলেম। এক এক জন আমাদের মুখের উপর হেসে উঠে, এক এক জন চেঁচাতে থাকে—"Jack, look at the blackies!" কিন্তু আমি সে সব কিছুই গ্রাহ্য করি নি, আমার এক তিলও লজ্জা করে না।

চতুর্থ পত্র।

আমরা সে দিন House of Commonsএ গিয়েছিলেম, ভারি নিরাশ হোয়েছিলেম। পার্ল্যামেণ্টের অভ্রভেদী চূড়া প্রকাণ্ড বাড়ি ঝাঁকরা ঘরগুলো দেখলে খুব তাক্ লেগে যায়; কিন্তু ভিতরে গেলে তেমন ভক্তি হয় না। একটা বড় ঘরে House বসে, ঘরের চারিদিকে গোল গ্যালারী, তার এক দিকে দর্শকেরা বসে, আর একদিকে খবরের কাগজের Reporterরা বসে। গ্যালারীর অনেকটা থিয়েটরের dress circle এর মত। গ্যালারীর নীচে, অর্থাৎ থিয়েটরের জায়গায় stall থাকে,—সেইখানে মেম্বররা বসে। তাদের জন্যে দুপাশে হদ্দ দশখানি বেঞ্চি আছে, একপাশের পাঁচ খানি বেঞ্চিতে গবর্ণমেণ্টের দলে বসে, আর এক পাশের পাঁচ খানি বেঞ্চিতে

বিপক্ষ দল বসে, আর সুমুখের একটা প্ল্যাটফর্মের উপর একটা কেদারা আছে—সেই খানে প্রেসিডেণ্টের মত এক জন (যাকে Speaker বলে) মাথায় পরচুলা (wig) পোরে অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বোসে থাকেন। যদি কেউ কোন কোন অন্যায় ব্যবহার বা কোন আইন বিরুদ্ধ কাজ করে, তাহোলে Speaker উঠে তাকে বাধা দেয়। যেখানে খবরের কাগজের reporter রা সব বসে, তার পেছনে খড়খড়ি দেওয়া একটা গ্যালারি থাকে, সেইখানে মেয়েরা বসে, বাইরে থেকে মেয়েদের দেখা যায় না; দেখেছো পার্লামেণ্টের মেয়েদের আব্রু কত! আমরা যখন গেলেম, তখন O'dounel বোলে এক জন Irish member ভারতবর্ষ সংক্রান্ত বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, Press Act এর বিরুদ্ধে ও অন্যান্য নানা বিষয় নিয়ে তিনি আন্দোলন কোরছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে Irish member-রা House এ অত্যন্ত অপ্রিয়—তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হোয়ে গেল। House এর ভাবগতিক দেখে আমি ত ভারি আশ্চর্য্য হোয়ে গিয়েছি ম, এমন ছেলেমানুষী সচরাচর দেখা যায় না। যখন এক জন কেউ বক্তৃতা কোরচে' তখন হয়ত অনেক মেম্বর মিলে "ইয়া" "ইয়া" "ইয়া" "ইয়া" কোরে জানোয়ারের মত চীৎকার কোরে ডাকাডাকি কোরচে, হাসচে, এবং যতপ্রকার অসভ্যতা করবার তা কোরচে। আমাদের দেশে সভায় ইস্কুলের ছোক্‌রারাও হয়ত এমন করে না। কিন্তু তাও দেখেছি, এখানকার অন্যান্য সভায় এ রকম গোলমাল চণ্ডীপাঠ হয় না। অনেক সময়ে বক্তৃতা হচ্চে আর মেম্বরেরা কপালের ওপর টুপী টেনে দিয়ে অকাতরে নিদ্রা যাচ্চেন। একবার দেখলেম যে ভারতবর্ষীয় বিষয় নিয়ে একটা বক্তৃতার সময় ঘরে ৯।১০ জনের বেশী মেম্বর ছিল না, অন্যান্য সবাই ঘরের বাইরে হাওয়া খেতে, বা supper খেতে গিয়েছেন; আর যেই vote নেবার সময় হোল অমনি সবাই চারদিক থেকে এসে উপস্থিত হোলেন। সবাই প্রায় ঘর থেকে ঠিক কোরে এসেছিলেন কোন্ দিকে vote দেবেন; বক্তৃতা শুনে বা কোন প্রকার যুক্তি শুনে যে কারো মত স্থির হয়, তাতো বোধ হয় না। অনেক সময় Patriotism, Parti-ism এর কাছে পরাস্ত মানে। যত দূর দেখেছি আমার ত বোধ হয় Conservative রা অত্যন্ত অন্ধভাবে তাদের দলের গোঁড়া। Liberal দের কতকটা reasonable বোলে মনে হয়, তারা যা ভাল বোঝে তাই করে, তাই জন্যে Liberal দের আপনাদের মধ্যেও এত মতভেদ। নাক কাণ চোখমুখ বুজে একটা দল স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে চোলে আর বড় একটা পরস্পরের মধ্যে মতভেদ থাকে না। যাহোক্, আমি ভাবছিলেম, এই রকম দলাদলি ছিবলেমির উপর কত কত রাজ্য দেশের শুভাশুভ নির্ভর কোরচে!

গত বৃহস্পতিবারে House of Commons এ ভারতবর্ষ নিয়ে খুব বাদানুবাদ চোলেছিল, সে দিন ব্রাইট সিভিলসার্ভিস সম্বন্ধে ও গ্ল্যাডষ্টোন তুলা-জাতের শুল্ক ও আফগান-যুদ্ধ সম্বন্ধে ভারতবর্ষীদের দরখাস্ত দাখিল করেন। ৪টার সময় পার্ল্যামেণ্ট খোলে। আমরা কতকগুলি বাঙ্গালী মিলে ৪টে না বাজতে বাজতে হৌসে গিয়ে উপস্থিত হলেম। তখনো হৌস খোলে নি, দর্শনার্থীরা হৌসের বাইরে একটা প্রকাণ্ড ঘরে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের চারদিকে Burke, Fox, Chatham, walpole,

প্রভৃতি রাজনীতিবিশারদ মহাপুরুষদের প্রস্তর মূর্ত্তি দাঁড়িয়ে রোয়েছে। প্রতি দরজার কাছে পাহারাওয়ালা পাকাচুলের পরচুলা-পরা। গাউন ঝোলানো পার্লামেণ্টের কর্ম্মচারীরা হাতে দুই একটা খাতা পত্র নিয়ে আনাগোনা কোরছিলেন। তাঁদের মনে কি ছিল, আমি অবিশ্যি ঠিক কোরে বোল্‌তে পারিনে, কিন্তু তাঁদের সেই ভ্রূক্ষেপ-শূন্য মুখের ভাব দেখে আমার কল্পনা হোচ্ছিল, যেন তাঁরা মনে মনে দর্শনার্থীদের বোল্‌ছিলেন, "আমাদের দিকে একবার চেয়ে দেখ, আজকের কি হবে না হবে ভাই দেখবার জন্যে তোমরাত দুয়ারের কাছে হাঁ কোরে দাঁড়িয়ে আছ, কিন্তু আমরা তা সমস্ত জানি এখন কিছু ভাংচিনে, ক্রমে ক্রমে সব টের পাবে।" তাঁদের দেখে আমার কি মনে পোড়ল জান? আমাদের দেশের গ্রেট্‌ন্যাশানেল থিয়েটরে যখন এখনো যবনিকা ওঠেনি, দর্শকেরা সব বোসে আছে, তখন ষ্টেজের সেই পাশের দরজা দিয়ে দুই একজন ষ্টেজসংক্রান্ত লোক একবার ষ্টেজ থেকে বেরোচ্ছেন, একবার ষ্টেজের মধ্যে ঢুক্‌চেন, যেন তাঁরা দর্শকদের জানাচ্চে চান—"তোমরা ত এ ষ্টেজের মধ্যে ঢুক্‌তে পার না, এর ভিতরে কি হোচ্চে কিছুই জাননা, বেঞ্চিগুলো পর্য্যন্তই তোমাদের অধিকারের সীমা।" এই রকম তাঁদেরও সেই মহাহরস্যময় মুখের ভাব। এই উইগ গাউন্-পরা ব্যক্তিগণ পার্লামেণ্টের ক্লার্ক। এঁদের হাতের কাগজ পত্রগুলো দেখলে গা-টা কেঁপে ওঠে। চারটের সময় হৌস্ খুলল। আমাদের কাছে SPeaKers galleryর টিকিট ছিল। House of Commons-এ ৫ শ্রেণীর গ্যালারী আছে,—Stranger's gallery, SPeaker's gallery, Diplomatic gallery, Reporter's gallery, Lady's gellery, হৌসের যে কোন মেম্বরের কাছ থেকে বৈদেশিক গ্যালারীর টিকিট পাওয়া যায়, আর বক্তার অনুগ্রহ হোলে তবে বক্তার গ্যালারির টিকিট পাওয়া যেতে পারে। DiPlomatic gallery টা কি পদার্থ তা ভাল কোরে বলতে পারিনে, আমি যে কবার হৌসে গিয়েছি দুই একজন ছাড়া DiPlomatic gtlleryতে লোক দেখতে পাই নি। Stranger's gallery থেকে বড় ভাল দেখা শুনো যায় না. তার সামনে SPeaker's gallery, SPeakers, gallery র সুমুখে DiPlomatic gallery আমরা গ্যালারিতে গিয়ে ত বোসলেম। পরচুলাধারী SPeaker মহাশয় গরুড় পক্ষীটির মত তার সিংহাসনে গিয়ে বোসলেন। হৌসের সভ্যেরা সব আসন গ্রহণ কোরলেন। কাজ আরম্ভ হোল। হৌসের প্রথম কাজ প্রশ্নোত্তর করা। হৌসের পূর্ব্ব অধিবেশনে এক এক জন মেম্বর বোলে রাখেন। যে "আগামী বারে আমি অমুক বিষয়ে জিজ্ঞাসা কোরব, তার উত্তর দিতে হবে।" একজন হয়ত জিজ্ঞাসা কোরলেন. "অমুক জেলায় একজন ম্যাজিষ্ট্রেট অমুক আইনবিরুদ্ধকাজ কোরেছেন সেক্রেটরী মহাশয় তার কি কোন সংবাদ পেয়েছেন, আর সে বিষয়ে কি কোন বিধান কোরেছেন?" এ বিষয়ে যিনি দায়ী, তিনি উঠে তার একটা কৈফিয়ৎ দিলেন। সেদিন O'donnel নামে একজন Irishmember উঠে জিজ্ঞাসা কোরলেন যে. Echo এবং আরো দুই একটি খবরের কাগজে জুলুদের প্রতি ইংরাজ সৈন্যদের অত্যাচারের যে বিবরণ, বেরিয়েছে,সে বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কি কোন সংবাদ পেয়েছেন? আর সে সকল অত্যাচার কি খৃষ্টানদের অনুচিত নয়?" অমনি গবর্ণ-

মেন্টের দিক থেকে সার মাইকেল হিকস্‌বিচ উঠে ওডোনেলকে খুব কড়া বড়া দুই এক কথা শুনিয়ে দিলেন, অমনি একে একে যত আইরিষ মেম্বর ছিলেন,সকলে উঠে তার কড়া কড়া উত্তর দিতে লাগলেন,—এই রকম অনেক ক্ষণ ঝগড়া ঝাঁটি কোরে দুই পক্ষ শান্ত হোয়ে বোসলেন। এইরূপ উত্তর প্রত্যুত্তরের ব্যাপার সমস্ত হোলে পর যখন বক্তৃতা করবার সময় এল,তখন হৌস থেকে অধিকাংশই মেম্বর উঠে চোলে গেলেন। দুই একটা বক্তৃতার পর ব্রাইট উঠে সিভিলসর্ভিসের রাশি রাশি দরখাস্ত হৌসে দাখিল কোরলেন। বৃদ্ধ ব্রাইটকে দেখলে অত্যন্ত ভক্তি হয়, তাঁর মুখে ঔদার্য্য ও দয়া যেন মাখানো! ব্রাইটকে যখন আমি প্রথম দেখি, যখন আমি তাঁকে ব্রাইট বোলে চিন্‌তেম না, তখন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁর মুখ থেকে আমি চোখ ফেরাতে পারি নি। দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রাইট সে দিন কিছু বক্তৃতা করলেন না। হৌসে অতি অল্প মেম্বরই অবশিষ্ট ছিলেন, যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই নিদ্রার আয়োজন কোরছিলেন, এমন সময়ে গ্ল্যাডষ্টোন উঠলেন। গ্ল্যাডষ্টোন ওঠবামাত্রেই সমস্ত ঘর একবারে ঘোর নিস্তব্ধ হোয়ে গেল, গ্ল্যাডষ্টোনের স্বর শুনতে পেয়ে আস্তে আস্তে বাইরে থেকে দলে দলে মেম্বর আসতে লাগলেন, দুই দিকের বেঞ্চি পূরে গেল। তখন পূর্ণ উৎসের মত গ্ল্যাডষ্টোনের বক্তৃতা উৎসারিত হোতে লাগল, সে এমন চমৎকার যে কি বল্‌ব! কিছুমাত্র চীৎকার, তর্জ্জন গর্জ্জন ছিল না, অথচ তাঁর প্রতি কথা, ঘরের যেখানে যে কোন লোক বোসেছিল, সকলই একেবারে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল। গ্ল্যাডষ্টোনের কি এক রকম দৃঢ় স্বরে বালবার ধরণ আছে, তাঁর প্রতি কথা মনের ভিতর গিয়ে যেন জোর কোরে বিশ্বাস জন্মিয়ে দেয়। একটা কথায় জোর দেবার সময় তিনি মুষ্টি-বদ্ধ কোরে একেবারে নুয়ে নুয়ে পড়েন, যেন প্রত্যেক কথা তিনি একেবারে নিংড়ে নিংড়ে বের কোরচেন। আর সেই রকম প্রতি জোর-দেওয়া কথা দরজা ভেঙ্গে চুরে যেন মনের ভিতর প্রবেশ করে। আইরিষ মেম্বর সলিভানের সঙ্গে গ্ল্যাডষ্টোনের বাগ্মিতার তফাৎ কি জান? সলিভান পুরু হাত পা নেড়ে, চেঁচিয়ে মেচিয়ে, লুঠপাট কোরে বোলে যান, তাঁর বক্তৃতা মনে লাগে বটে, কিন্তু সে ভাব বড় বেশীক্ষণ থাকে না, তাঁর তর্জ্জন গর্জ্জনও যেমন থামে, শ্রোতাদের মনও অমনি জুড়িয়ে যায়। গ্ল্যাডষ্টোন অনর্গল বলেন বটে, কিন্তু তাঁর প্রতি কথা ওজন করা, তার কোন অংশ অসম্পূর্ণ নয়, তিনি বক্তৃতার প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত সমস্বরে জোর দিয়ে বলেন না, কেন না সে-রকম বলপূর্ব্বক বোল্‌লে স্বভাবতই শ্রোতাদের মন তার বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে দাঁড়ায়, তিনি যে কথায় জোর দেওয়া আবশ্যক মনে করেন, সেই কথাতেই জোর দেন; তিনি খুব তেজের সঙ্গে বলেন বটে, কিন্তু চীৎকার কোরে বলেন না, মনে হয় যা বোলছেন,তাতে তাঁর নিজের খুব আন্তরিক বিশ্বাস। গ্ল্যাডষ্টোনের বক্তৃতাও যেমন থাম্‌ল, অমনি হৌস শূন্যপ্রায় হোয়ে গেল, দুদিকের বেঞ্চিতে ৬।৭ জনের বেশী আর লোক ছিল না। গ্ল্যাডষ্টোনের পর স্মলেট যখন বক্তৃতা আরম্ভ কোরলেন তখন দুই দিককার বেঞ্চিতে লোক ছিল না বোল্লেও হয়; কিন্তু তিনি ক্ষান্ত হবার পাত্র নন, শূন্য হাউসকে সম্বোধন কোরে তিনি অত্যন্ত দীর্ঘ এক বক্তৃতা করলেন। সেই অবকাশে আমি অত্যন্ত দীর্ঘ এক নিদ্রা দিই। দুই একজন মেম্বর, যাঁরা উপস্থিত ছিলেন,

তাঁরা কেউ বা পরস্পর গল্প কোর্‌ছিলেন, কেউ বা চোখের ওপর টুপি টেনে দিয়ে ডিস্‌রেলীর পদচ্যুতির পর রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখছিলেন। হৌসে Irish member দের ভারি যন্ত্রণা; সে বেচারীরা যখন বক্তৃতা করতে ওঠে, তখন হাউসে যে অরাজকতা উপস্থিত হয় সে আর কি বলব! চারদিক থেকে ঘোরতর কোলাহল আরম্ভ হয়, অভদ্র মেম্বরেরা হাঁসের মত "ইয়া" "ইয়া" কোরে চেঁচাতে থাকে। বিদ্রূপাত্মক "hear" "hear" শব্দে বক্তার স্বর ডুবে যায়। এই রকম বাধা পেয়ে বক্তা আর আত্মসম্বরণ কোর্‌তে পারেন না, খুব জোলে ওঠেন, আর তিনি যতই রাগ কোর্‌তে থাকেন ততই হাস্যাস্পদ হন। আইরিষ মেম্বরেরা এই রকম জ্বালাতন হোয়ে আজকাল খুব প্রতিহিংসাপরায়ণ হোয়েছেন। হাউসে যে কোন কথা উঠে, প্রায় সকল বিষয়েই তাঁরা বাধা দেন, আর প্রতি প্রস্তাবে এক জনের পর আর একজন কোরে উঠে দীর্ঘকালব্যাপী বক্তৃতায় হাউসকে বিব্রত কোরে তোলেন। আমি ঠিক কোরে বোলতে পারিনে যে, আইরিষ মেম্বরেরা আগে থাকতেই ঐ রকম আচরণ কোরতেন বোলেই অন্যান্য মেম্বরেরা তাঁদের প্রতি ঐ রকম অত্যাচার করেন, কি, অন্যান্য মেম্বরদের কাছে অত্যাচার সোয়ে সোয়ে আইরিষ মেম্বরেরা এই রকম প্রতিহিংসা তুলতে আরম্ভ কোরেছেন। আমার স্বভাবতই আইরিষ মেম্বরদের প্রতি টান, সুতরাং স্বভাবতই আমার বিশ্বাস হয় যে, শেষোক্তটাই বেশী সম্ভব। এর কারণ সহজেই নির্দ্দেশ করা যায়, মনে কর আইরিষদের অনুগ্রহ কোরে পার্ল্যামেন্টে স্থান দেওয়া হোয়েছে, আইরিষরা সেই অনুগ্রহ পেয়েই যদি শান্ত ছেলে-গুলির মত হোসে বোসে থাক্‌ত, তাদের অস্তিত্ব আছে কি না আছে যদি জানা না যেত, তা হোলে অনুগ্রহ-কর্ত্তারা সন্তুষ্ট থাক্‌তেন কিন্তু তারাও যদি অন্যান্য মেম্বরদের মত বাদানুবাদ কোর্ত্তে থাকে, নিজের মত প্রকাশ করে, অন্য লোকের মত প্রতিবাদ করে, তা হোলে সকলের চোটে ওঠা খুব স্বাভাবিক। ইণ্ডিয়া-কৌন্সিলে যদি এক দল ভারতবর্ষীয় মেম্বর থাকে আর তারা যদি জুজুর মত বোসে না থাকে, সকল কথাতেই "হাঁ" না দিয়ে যায়, আর সঙ্কুচিত স্বরে কিছু বোলতে গিয়ে অমনি গবর্ণমেণ্টের নীরব চোখ-রাঙ্গানি দেখে থতমত খেয়ে যদি না বোসে পড়ে, কিংবা গবর্ণমেণ্টের উৎসাহজনক পিঠ-থাবড়া খেয়ে আহ্লাদে যদি গোলে না পড়ে, তাহোলে তাদের কি দুর্দ্দশা হয় মনে কোরে দেখ দেখি! তাহোলে দুদিন বাদেই তাদের ঘাড়ে হাতটি দিয়ে বলা হয় "বেরোও বেরোও বাপুগণ!" ইংলণ্ডে সভ্যদেশে, সমস্ত য়ুরোপের চোখের সাম্‌নে এ রকম ঘোটতে পারে না; একবার যখন তাদের অধিকার দেওয়া হয়েছে, তখন আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। তুমি নিজে রাজি হোয়ে তাদের সমান অধিকার দিলে, বোল্লে যে তোমাতে আমাতে আর বিভিন্নতা রইল না, তবে আজ কেন খুঁৎখুঁৎ কর? কিন্তু লোকে তা' ক'রে থাকে। আমাকে যদি কোন লেখক তার লেখা শোনাতে আসে আর বিশেষ কোরে বলে যে "তুমি খুব স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ কোরো, আমার কিছু মাত্র কষ্ট হবে না।" তা শুনেই যে আমি স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করি তা' নয়, কেন না আমি মনে করি, ও ব্যক্তি অত কোরে বোলছে যখন, তখন ওর ধ্রুব বিশ্বাস যে, ওর লেখায় এমন কোন দোষ নেই; যা' আমি বের করতে

পারি। আমি এখেনে দুজন ব্যক্তিকে বাঙ্গালা পড়াতেম, তাঁদের দুজনের মধ্যে যিনি একটু ভাল পড়তে পারতেন, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা কোরেছিলেন যে, "আমাদের দুজনের মধ্যে কে শীঘ্র শিখতে পারে?" আমি একটু ইতস্ততঃ করাতে তিনি বোল্লেন "তোমার কিছু মাত্র ভয় নেই, আমাকে নিন্দে কোরলে আমার তিল মাত্র কষ্ট হবে না।" অত কোরে কেন বল্লেন, জান? তিনি মনে মনে বিলক্ষণ জানতেন যে, আমি তাঁর প্রশংসা কোরবো। যিনি ভাল শিখতে পারতেন না, তিনি আমাকে এ-কথা জিজ্ঞাসাই কোরতেন না। এক দল বিজ্ঞ, বৃদ্ধ, তাঁদের সভায় আমাকে প্রবেশ কোরতে অনুমতি দিয়ে বোল্‌তে পারেন যে, আমাদের সঙ্গে সমান ভাবে তর্ক বিতর্ক কোরতে তোমাকে পূর্ণ অধিকার দিলেম, কিন্তু সমান ভাবে তর্ক বিতর্ক কোরতে গেলে তাঁরা মনে মনে রাগ কোরতে ত্রুটি করেন না। এর দুটো কারণ থাকতে পারে; এক তাঁরা যখন অধিকার দেন, তখন তাঁদের মনে মনে বিশ্বাস থাকে যে, বিজ্ঞতার ও বালকের চেয়ে আমরা এত শ্রেষ্ঠ যে, আমাদের কাছে ও ঠোঁট খুলতে পারবে না; নয়, তাঁদের সকলের মত এই যে, বালকের কাছ থেকেও জ্ঞান শিক্ষা করা যায়, কিন্তু সে মতের চারাগাছটি তাঁদের মাথায় সবে জোন্মেচে মাত্র, তার ডালপালা হৃদয় পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছতে পারে নি। তাঁদের মত বটে যে, সকলকে সমভাবে দর্শন করা উচিত, কিন্তু সমভাবে দর্শন করা তাঁদের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। তাঁদের মত যতক্ষণ কার্য্য-ক্ষেত্রে না নাবে, ততক্ষণ তাঁরা সকলের প্রতি সমান ব্যবহার কোরতে পারবেন, —এই কল্পনার উপর বিশ্বাস করে দশ জনকে সমবেত কোরলেন, কিন্তু যেই তাঁরা তাঁদের সঙ্গে সমান ব্যবহার কোরতে আরম্ভ কোরলেন, অমনি দেখলেন তাঁদের বুকের ভিতরে লাগে। আমার বোধ হয়, ইংরাজ মেম্বরদের সঙ্গে আইরিষ মেম্বরদের এই রকম সম্পর্ক। পার্ল্যালেণ্টের কথা তবে আজ এই পর্য্যন্ত থাক্‌।

পঞ্চম পত্র।

পাণিরত্নাস্তের সূচিপত্রে ইঙ্গ-বঙ্গ নামক এক অদ্ভুত নতুন জীবের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়,—তাদের ক'টা ক্ষুর ক'পাটি দাঁত, এ সিংহচর্ম্ম তাদের গায়ে চিলে হয় কি কষা হয়, তার বিস্তারিত বিবরণ সমেত একটা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখবার বাসনা আছে, সকলে অবধান কর। "এই বেড়াল বনে গেলেই বন বেড়াল হয়।" তোমাদের সেই বন্ধু যে, "হংস মধ্যে বকো যথা" হোয়ে তোমাদের মধ্যে থাকত, যা'র বুদ্ধির অভাব দেখে তোমরা অত্যন্ত ভাবিত ছিলে, ইস্কুলের মাষ্টাররা যাকে পিটিয়ে পিটিয়ে ঘোড়া করবার আশা একেবারে পরিত্যাগ করেছিলেন, সেই যখন এ বন থেকে ফিরে যাবে, তখন তার ঝুলোনো লেজ, বাঁকানো ঘাড়, নখালো থাবা দেখে তোমরা আধখানা হোয়ে, পিছু হোটে হোটে দেয়ালের এক কোণে গিয়ে আশ্রয় নেবে। এ বিলেত রাজ্য থেকে ফিরে গেলে পর বিক্রমাদিত্যের সিদ্ধ বেতালের মত আমার সঙ্গে সঙ্গে একটি "Oberon" ফিরবে, সে তোমাদের প্রতি লোকের চোখে এমন একটি মায়া রস নিংড়ে দেবে যে, আমাকে যদি গর্দ্দভমুখসিত "Bottom" এর মতও দেখতে হয়, তবু তোমরা মুগ্ধ হোয়ে যাবে।

বিলেতে নতুন এসেই বাঙ্গালীদের চোখে কোন্ জিনিষ ঠেকে, বিলিতি সমাজে নতুন মিশে প্রথমে বাঙ্গালীদের কি রকম লাগে, সে সকল বিষয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আপাততঃ কিছু বোলব না। কেন না, এ সকল বিষয় আমার বিচার করবার অধিকার নেই, যাঁরা পূর্ব্বে বিলেতে অনেক কাল ছিলেন, ও বিলেত যাঁরা খুব ভাল কোরে চেনেন, তাঁরা আমাকে সঙ্গে কোরে এনেছেন, ও তাঁদের সঙ্গেই আমি বাস কোরছি। বিলাতে আস্‌বার আগেই বিলেতের বিষয় তাঁদের কাছে অনেক শুনতে পেতেম, সুতরাং এখানে এসে খুব অল্প জিনিষ নিতান্ত নতুন মনে হোয়েছে, এখানকার লোকের সঙ্গে মিশতে গিয়ে প্রতি পদে হুঁচট খেয়ে খেয়ে আচার ব্যবহার আমাকে শিখতে হয় নি। এখানকার সমাজের স্ফটিক-শালায় প্রবেশ কোরে যখনি জল মনে কোরে কাপড় তুলতে গিয়েছি, তখনি আমার সঙ্গী আমাকে চোখ টিপে বোলে দিয়েছেন "এ জল নয়, এ মেজে।" সুতরাং আমাকে অপ্রস্তুত হোতে হয় নি। এখানকার চাকচিক্যময় সমাজের দেওয়াল-ব্যাপী আয়না দেখে আমি দরজা মনে কোরে যেমন সেই দিকে যাবার উদ্যোগ কোরেছি, আমার সঙ্গী অমনি আমার কাণে কাণে বোলে দিয়েছেন যে, "এ দরজা নয়, এ দরজা নয়, এ দেয়াল।" সুতরাং মাথা ঠুকে ঠুকে আমাকে শিখতে হয় নি যে, সেটা দরজা নয়, দেয়াল। অন্ধকারে প্রথম এলে কিছু দেখা যায় না; অনেক ক্ষণ থাকলে অন্ধকার চোখে অনেকটা সোয়ে গেলে তার পরে চারদিকের জিনিষ দেখা যায়, কিন্তু আমাকে সে রকম কোরে দেখতে হয় নি, আমার সঙ্গেই আলো ছিল। আমি তাই ভাবছি যে, আমার নিজের অভিজ্ঞতার বিষয়, আপাততঃ তোমাদের কিছু বোল্‌ব না। এখানকার দুই এক জন বাঙ্গালীর মুখে তাঁদের যে রকম বিবরণ শুনেছি, তাই তোমাদের লিখছি!

জাহাজে ত তাঁরা উঠলেন। যাত্রীদের সেবার জন্যে জাহাজে অনেক ইংরেজ চাকর থাকে, তাদের নিয়েই এদের প্রথম গোল বাধে। এরা অনেকে তা'দের "সার্ সার্" (Sir) বোলে সম্বোধন কোর্‌তেন, তাদের কোন কাজ কোর্‌তে হুকুম দিতে তাঁদের বাধো বাধো কোর্‌ত। জাহাজে তাঁরা অত্যন্ত সসঙ্কোচ ভাবে থাক্‌তেন। কোথায় কি কোর্ত্তে হবে রে বাপু, গোরা কাপ্তেন, গোরা মাঝী, পাছে রুখে দু কথা শুনিয়ে দেয়, নিতান্তই তাদের আশ্রয়ে আছি, কালো মানুষ দেখেও যে, টিকিট কিনতে দিয়েছেন, এই তাঁদের যথেষ্ট অনুগ্রহ। তাঁরা বলেন, সকল বিষয়েই তাঁদের যে, ও রকম্ সঙ্কোচ বোধ হত, তার আর একটা কারণ ছিল—"এক জন ইংরাজ যাত্রীর চেয়ে আমাদের ও রকম সঙ্কোচের ত্রস্ত অবস্থা কেন হয়, জান? সেটা কেবল ভয়ে নয়, তার সঙ্গে কতকটা লজ্জাও আছে। আমাদের কপালে 'নেটিব' বোলে একেবারে মার্কা মারা ছিল, আমরা যদি একটা কোন দস্তর বিরুদ্ধ কাজ করি, তা হোলে সাহেবরা হেসে উঠবেন, বলবেন ওটা অসভ্য, কিছু জানে না। তাই জন্যে যে কাজ কোর্ত্তে যাই, মনে হয়, পাছে এটা বেদস্তর হোয়ে পড়ে, আর বেদস্তর কাজ কোরলে তারা হুট করে তাড়িয়েই বা দেয়, আর যদি বা তাড়িয়ে না দেয়, নেটিব বোলে হেসেই বা উঠে।" জাহাজে ইংরাজদের সঙ্গে মেশা বড় হোয়ে ওঠে না। যে সাহেবেরা তখন জাহজে থাকেন, তাঁরা

টাট্‌কা ভারতবর্ষ থেকে আস্‌চেন, সে "হুজুর ধর্ম্মাবতার" গণ কৃষ্ণবর্ণ দেখলে নাক তুলে, ঠোঁট ফুলিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে চোলে যান, ও এই ঘোরতর তাচ্ছিল্যের স্পষ্ট লক্ষণগুলি সর্ব্বাঙ্গে প্রকাশ কোরে কৃষ্ণচর্ম্মের মনে দারুণ বিভীবিকা সঞ্চার কোরেছেন জেনে মনে মনে পরম সন্তোষ উপভোগ করেন। মাঝে মাঝে ভদ্র ইংরাজ দেখতে পাবে, তাঁরা হয়ত তোমাকে নিতান্ত সঙ্গীহীন দেখে তোমার সঙ্গে মিশতে চেষ্টা কোর্‌বেন,জানবে তাঁরা যথার্থ ভদ্র,অর্থাৎ ভদ্র ও উচ্চ পরিবারের লোক, বংশাবলীক্রমে তাঁরা ভদ্রতার বীজ পেয়ে আস্‌চেন, তাঁরা এখানকার কোন অজ্ঞাত-কুল থেকে অখ্যাত নাম নিয়ে ভারতবর্ষে গিয়ে হঠাৎ ফেঁপে ফুলে ফেটে আট-খানা হোয়ে পড়েন নি। এখানকার গলিতে গলিতে যে "জন, জোন্স, টমাস্‌" —গণ কিল্‌বিল কোর্‌চে, যাদের মা, বাপ, বোনকে একটা কসাই, একটা দরজী ও এক জন কয়লা বিক্রেতা ছাড়া আর কেউ চেনে না, তারা ভারতবর্ষের যে অঞ্চলে পদার্পণ করে, সে অঞ্চলে ঘরে ঘরে তাদের নাম রাষ্ট্র হোয়ে যায়, যে রাস্তায় তারা চাবুক হস্তে ঘোড়ায় চোড়ে যায় (হয়ত সে চাবুক কেবলমাত্র ঘোড়ার জন্যেই ব্যবহার হয় না) সে রাস্তাশুদ্ধ লোক শশব্যস্ত হোয়ে তাদের পথ ছেড়ে দেয়, তাদের এক একটা ইঙ্গিতে ভারতবর্ষের এক একটা রাজার সিংহাসন কেঁপে ওঠে, এরকম অবস্থায় সে ভেকদের পেট উত্তরোত্তর ফুল্‌তে ফুল্‌তে যে হস্তীর আকার ধারণ কোর্‌বে আমি ত তাতে বিশেষ অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পাইনে। তারা রক্তমাংসের মানুষ বৈত নয়,যে দেশেই দেখ না কেন, ক্ষুদ্র যখনি মহান্‌ পদ পায়, তখনি সে চোখ রাঙিয়ে বুক ফুলিয়ে মহত্ত্বের একটা আড়ম্বর, আস্ফালন কোর্‌তে থাকে; এর অর্থ আর কিছু নয় তারা মহত্ত্বের শিক্ষা পায়নি। যে সাঁতার জানে না, তাকে জলে ছেড়ে দেও, সে অবিশ্রান্ত হাত পা ছুঁড়তে থাক্‌বে, তাঁর কারণ সে জানে না যে, ভেসে থাক্‌বার জন্তে অল্প কৌশল আছে। যে কোন জন্মে ঘোড়া চালায় নি তাকে ঘোড়া চালাতে দেও, ঘোড়া বিপথে গেলে সে চাবুক মেরে মেরেই তাকে জর্জ্জরিত কোর্‌বে; কেন না সে জানে না যে একটু লাগাম টেনে দিলেই তাকে সোজা পথে আনা যায়। কিন্তু ভদ্র ইংরেজদের দেখ, তাঁদের কি সুন্দর মন! মাঝে মাঝে এক একটি ভদ্র সাহেবকে দেখা যায়, তাঁরা আংগ্লো ইণ্ডিয়ানত্বের ঘোরতর সংক্রামক রোগের মধ্যে থেকেও বিশুদ্ধ থাকেন, অপ্রতিহত প্রভুত্ব ও ক্ষমতা পেয়েও উদ্ধত গর্ব্বিত হোয়ে ওঠেন না। সমাজ-শৃঙ্খলচ্ছিন্ন হোয়ে, সহস্র সহস্র সেবকদের দ্বারা বেষ্টিত হোয়ে ভারতবর্ষে থাকা, উন্নত ও ভদ্র মনের এক প্রকার অগ্নিপরীক্ষা। দূর হোক্‌গে—আমি কি কথা বোলতে কি কথা পাড়লেম দেখ! যাহোক্‌, এতক্ষণে জাহাজ সাউথহাম্পটনে এসে পৌঁচেচে, বঙ্গীয় যাত্রীরা বিলেতে এসে পৌঁছলেন। লণ্ডন উদ্দেশ্যে চোল্লেন! ট্রেণ থেকে নাববার সময় একজন ইংরাজ গার্ড এসে উপস্থিত। বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা কোল্লে, তাঁদের কি প্রয়োজন আছে, কি কোরে দিতে হবে। তাঁদের মোট নাবিয়ে দিলে,গাড়ি ডেকে দিলে; তাঁরা মনে মনে বোল্লেন "বাঃ। ইংরেজরা কি ভদ্র!" ইংরাজরা যে এত ভদ্র হোতে পারে, তা' তাঁদের জ্ঞান ছিল না; অবিশ্যি তার হস্তে একটি শিলিং গুঁজে দিতে হোল, কিন্তু তা হোক্‌, আমাদের দেশে খেতাঙ্গদের কাছথেকে একটু আদর ও ভদ্রতা পাবার প্রত্যাশে রাজা

রায়বাহাদুররা কত হাজার হাজার টাকা খরচ কোরচেন, তবুও ভাল কোরে কৃতকার্য্য হোতে পারচেন না; এ জেনে এক জন নবাগত বঙ্গযুবক একজন যে কোন শ্বেতাঙ্গের কাছ থেকে একটি মাত্র সেলাম পেতে, অকাতরে এক শিলিং ব্যয় কোর্ত্তে পারেন। যাহোক্, বিলেতে প্রথম পদার্পণ করবামাত্রেই তাঁরা এই অতি নতুন ও আশ্চর্য্য জ্ঞান লাভ করেন যে, ইংরাজরা কি ভদ্র! আমি যাঁদের বিষয় লিখ্‌ছি, তাঁরা অনেক বৎসর বিলাতে আছেন, বিলাতের নানা প্রকার ছোট-খাটো জিনিষ দেখে তাঁদের কি রকম মনে হোয়েছিল তা' তাঁদের স্পষ্ট মনে নেই। যে সব বিষয় তাঁদের বিশেষ মনে লেগেছিল, তাই এখনো তাঁদের মনে আছে।

তাঁরা বিলেতে আস্‌বার পূর্ব্বে তাঁদের বিলিতি বন্ধুরা এখানে তাঁদের জন্যে ঘর ঠিক কোরে রেখেছিলেন। ঘর ঢুকে দেখেন, ঘরে কার্পেট পাতা, দেয়ালে ছবি টাঙ্গানো, একটা বড় আয়না এক জায়গায় ঝোলানো রয়েছে, কৌচ, কতকগুলি চৌকি, দুই একটা কাচের ফুলদানি, একপাশে একটি ছোট পিয়ানো! কি সর্ব্বনাশ! তাঁদের বন্ধুদের ডেকে বোল্লেন, "আমরা কি এখেনে বড়মানুষী কোর্ত্তে এসেছি? আমাদের বাপু বেশী টাকা কড়ি নেই, এরকম ঘরে থাকা আমাদের পোষাবে না।" তাঁদের বন্ধুরা অত্যন্ত আমোদ পেলেন, কারণ তখন তাঁরা একেবারে ভুলে গেছেন যে, বহুপূর্ব্বে তাঁদেরো একদিন এই রকম দশা ঘোটেছিল; নবাগতদের নিতান্ত অন্নজীবী বাঙ্গালী মনে কোরে অত্যন্ত বিজ্ঞতার স্বরে সেই বন্ধুরা বোল্লেন, এখানকার সকল ঘরই এই রকম!" তাঁরা বোল্লেন, "বটে!" দেশের উপর বৈরাগ্যের এই তাঁদের প্রথম সূত্রপাত হোল! তাঁরা বলেন, "আমাদের দেশে সেই একটা সেঁৎসেঁতে ঘরে একটা তক্তা ও তার উপরে একটা মাদুর পাতা, ইতস্ততঃ হুঁকোর বৈঠক রোয়েছে, কোমরে একটু খানি কাপড় জড়িয়ে জুতো জোড় খুলে দু-চার জনে মিলে শতরঞ্চ খেলা যাচ্চে, বাড়ির উঠোনে একটা গরু বাঁধা, দেয়ালে গোবর দেওয়া, বারান্দা থেকে ভিজে কাপড় শুকোচ্ছে ইত্যাদি। সেখানে থেকে এসে এ কার্পেটমোড়া, চিত্রিত-দেয়াল, চৌকি-টেবিল-সমাকুল ঘরে বাস কোরতে পাওয়া অনেক জন্মের অনেক তপস্যার ফল বোলে মনে হয়!" তাঁরা বলেন,—প্রথম প্রথম দিনকতক তাঁদের সে ঘর কেমন আপনার মত মনে হোত না, চৌকিতে বোসতে, কৌচে শুতে, টেবিলে খেতে, কার্পেটে বিচরণ কোরতে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ হত। কৌচে বোস্‌তে হোলে অত্যন্ত আড়ষ্ট হোয়ে বোস্‌তেন, ভয় হোত, পাছে কৌচ ময়লা হোয়ে যায়, বা কোন প্রকার হানি হয়; তাঁদের মনে হোত, কৌচ-গুলো কেবল ঘর সাজাবার জন্যেই রেখে দেওয়া হোয়েছে, ওগুলো ব্যবহার কোরতে দিয়ে মাটি করা কখনই ঘরের কর্ত্তার অভিপ্রেত হোতে পারে না। ঘরে এসে প্রথম মনের ভাব ত এই, তার পরে আর একটি প্রধান কথা বলা বাকি আছে।

বিলেতে ছোটখাট বাড়িতে "বাড়িওয়ালা" বোলে একটা জীবের অস্তিত্ব আছে হয়ত, কিন্তু যাঁরা বাড়িতে থাকেন, "বাড়িওয়ালী"র সঙ্গেই তাঁদের সমস্ত সম্পর্ক। ভাড়া চুকিয়ে দেওয়া, কোন প্রকার বোঝো পড়া, আহারাদির বন্দোবস্ত করা, সে সমস্তই বাড়িওয়ালীর কাছে। আমার বন্ধুরা যখন প্রথম বাড়িতে পদার্পণ কোরলেন, দেখলেন, এক বিবি এসে

অতি বিনীত স্বরে তাঁদের "সুপ্রভাত" অভিবাদন কোরলে, তাঁরা নিতান্ত শশব্যস্ত হোয়ে ভদ্রতার যথাযোগ্য প্রতিদান দিয়ে অতি আড়ষ্ট হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিন্তু যখন তাঁরা দেখলেন, তাঁদের অন্যান্য ইঙ্গ-বঙ্গ বন্ধুগণ তার সঙ্গে অতি অসঙ্কুচিত স্বরে কথাবার্ত্তা আরম্ভ কোরে দিলেন, তখন, আর তাঁদের বিস্ময়ের আদি অন্ত রইল না। মনে কর একটা জীবন্ত বিবি—জুতোপরা, টুপি-পরা! গাউন পরা! তখন সে ইঙ্গ-বঙ্গ বন্ধুদের উপর সেই নবাগত বঙ্গ-যুবকের অত্যন্ত ভক্তির উদয় হোল, কোন কালে যে এই অসমসাহসিকদের মত তাঁদেরও বুকের পাটা জন্মাবে, তা তাঁদের সম্ভব বোধ হোল না। যা হোক্, এই নবাগতদের যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত কোরে দিয়ে ইঙ্গ-বঙ্গ বন্ধুগণ স্ব স্ব আলয়ে গিয়ে সপ্তাহকাল ধোরে তাঁদের অজ্ঞতা নিয়ে অপর্য্যাপ্ত হাস্যকৌতুক কোরলেন। পূর্ব্বোক্ত গৃহকর্ত্রী প্রত্যহ নবাগতদের অতি বিনীত ভাবে কি চাই কি না চাই, জিজ্ঞাসা কোর্ত্তে আস্ত। তাঁরা বলেন, এই উপলক্ষে তাঁদের অত্যন্ত আহ্লাদ হোত। তাঁদের মধ্যে একজন বলেন, প্রথম দিন যে দিন তিনি এই বিবিকে একটুখানি ধমকাতে পেরেছিলেন, সে দিন সমস্ত দিন তাঁর মন অত্যন্ত প্রফুল্ল ছিল। জীবনের মধ্যে এই প্রথমে একজন ইংরেজকে একজন বিবিকে ধমকাতে পেরেছিলেন, অথচ সে দিন সূর্য্য পশ্চিম দিকে ওঠে নি, পর্ব্বত চলাফেরা কোরে বেড়ায় নি, বহ্নিও শীতলতা প্রাপ্ত হয় নি।

কার্পেটে-মোড়া ঘরে তাঁরা অত্যন্ত সুখে-বাস কোরচেন। তাঁরা বলেন, "আমাদের দেশে আমার নিজের ঘর বোলে একটা স্বতন্ত্র পদার্থ ছিল না; আমি যে ঘরে বোসতেম, সে ঘরে বাড়ির দশ জনে যাতায়াত কচ্চে, আমি এক পাশে বসে লিখচি, দাদা এক পাশে একখানা বই হাতে কোরে চলচেন আর এক দিকে মাদুর পেতে গুরু মশায় ভুলুঁকে উচ্চৈঃস্বরে সুর কোরে কোরে নামতা পড়াচ্চেন। এখানে আমার নিজের ঘর, আমার নিজের মনের মত কোরে সাজালেম, সুবিধামত কোরে বইগুলি একদিকে সাজালেম, লেখবার সরঞ্জাম একদিকে গুছিয়ে রাখলেম, কোন ভয় নেই যে, এক দিন পাঁচটা ছেলে মিলে সে সমস্ত ওলট্‌পালট কোরে দেবে, আর এক দিন ছুটোর সময় কালেজ থেকে এসে দেখব, তিনটে বই পাওয়া যাচ্চে না, অবশেষে অনেক খোঁজ খোঁজ কোরে দেখা যাবে বাড়ির ভিতরে মেজ মাসীমার কুলুঙ্গির উপর একখানা, দাদার বালিশের নীচে একখানা, আর একখানি নিয়ে আমার ছোট ভাগ্নীটি তাঁর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহচরীদের ডেকে ছবি দেখতে ঘোরতর ব্যস্ত আছেন। এখানে তোমার নিজের ঘরে তুমি বোসে থাক, দরজাটি ভেজানো, সট্ কোরে না বোলে কোয়ে কেউ ঘরের মধ্যে এসে পড়ে না, ঘরে ঢোক্‌বার আগে দরজায় শব্দ করে, ছেলেপিলেগুলো চারিদিকে চেঁচামেচি কান্নাকাটি জুড়েদেয় নি, নিরিবিলি নিরালা, কোন হাঙ্গাম নেই।" স্বদেশের উপর ঘৃণা জন্মাবার সূত্রপাত এই রকম কোরে হয়! তার পরে একবার যখন তোমার মন বিগড়ে যায়, তখন তুমি পিটপিটে হোয়ে ওঠ, দেশের আর কিছুই ভাল লাগে না, নানাপ্রকার খুঁটিনাটি ধোরতে প্রবৃত্তি হয়! তার পরে যখন বিবিদের সমাজে মিশতে আরম্ভ কর, তখন দেশের উপর ঘৃণা বদ্ধমূল হোয়ে যায়। প্রায় দেখা যায়, আমাদের দেশের পুরুষরা এখানকার পুরুষ-সমাজে বড় মেশেন না; তার কতকগুলি কারণ

আছে। এখানকার পুরুষ-সমাজে মিশিতে গেলে এক-রকম বলিষ্ঠ স্ফূর্ত্তির ভাব থাকা চাই, মাথা চুলকোতে চুলকোতে বাধো-বাধো নাকি-সুরে হুচারটে সসঙ্কোচ "হাঁ না" দিয়ে গেলে চলে না, খুব প্রাণখুলে কথা কওয়া চাই, পাঁচটা লোক দেখেই একেবারে অভিভূত হোয়ে পোড়েছি—এ রকম ভাব প্রকাশ না পায়; রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে অবাধে তোমার স্বাধীন মত ব্যক্ত কোর্ব্বে, তোমাকে কেউ ঠাট্টা কোরলে তুমি অমনি সরমে মোরে যেওনা, তুমিও তোমার আলাপীর সঙ্গে ঠাট্টা কোরে মজা কোরে ঘর সরগরম কোরবে, বহুদিনের পর তোমার পুরোণো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হোলে "Hallow my old boy" বোলে খুব সবল সেক্‌হ্যাণ্ড কোরবে, আর খুব গড়গড় কোরে কথা কোয়ে যাবে। কিন্তু বাঙ্গালীদের এ রকম ভাব প্রায় দেখা যায় না। বাঙ্গালী অভ্যাগত ডিন্নার টেবিলে তাঁর পার্শ্বস্থ মহিলাটির কাণে কাণে অতি মৃদু ধীরস্বরে মিষ্টি-মিষ্টি টুক্‌রো-টুক্‌রো দুই একটি কথা আধ-আধ গলানো সুরে কইতে পারেন, কোমল মধুর হাসি হাস্‌তে হাস্‌তে দুটো রস-গর্ভ বাক্য বল্‌তে পারেন, আর সে মহিলার সহবাসে তিনি যে স্বর্গ-সুখ উপভোগ কোরচেন, তা তাঁর মাথার চুল থেকে বুট-জুতোর আগা পর্য্যন্ত প্রকাশ হোতে থাকে, সুতরাং বিবিসমাজে বাঙ্গালীরা খুব পসার কোরে নিতে পারেন। এখানকার পুরুষ-সমাজে মিশতে গেলে অনেক পড়াশুনো থাকা চাই, নইলে অনেক কথায় অপ্রস্তুত হোতে হয়, একটা বড় কথা পোড়লে আমরা আমাদের পুরাতন চাণক্য ঋষির উপদেশ স্মরণ করি, অর্থাৎ "তাবচ্চ শোভতে মূর্খ যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে!" কিন্তু পুরুষ সঙ্গীদের কথাবার্ত্তায় খুব যোগ না দিলে তেমন মেশামেশি হবার কোন সম্ভাবনা নেই। মহিলাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করতে আমাদের বড় শিক্ষার দরকার করে না, সে বিষয়ে আমাদের অশিক্ষিত-পটুত্ব। আমাদের দেশের ঘোমটাচ্ছন্ন মুখচন্দ্র-শোভী অনালোকিত অন্তঃপুর থেকে এখানকার রূপের মুক্ত-জ্যোৎস্নায় এসে আমাদের মন-চকোর প্রাণ খুলে গান গেয়ে ওঠে।

একদিন আমাদের নবাগত বঙ্গ যুবক তাঁর প্রথম ডিনারের নিমন্ত্রণে গিয়েছেন। নিমন্ত্রণ সভায় বিদেশীর অত্যন্ত সমাদর। তিনি গৃহস্বামীর যুবতী কন্যা Miss অমুকের বাহু-গ্রহণ কোরে আহারের টেবিলে গিয়ে বোস্‌লেন। মিসের প্রতি হাসি, প্রতি কথা তাঁর হৃদয়ের সমুদ্রে এক একটা বিপর্য্যয় তরঙ্গ তুলতে লাগল। আমরা আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মুক্তভাবে মিশতে পাইনে, তার পরে নতুন নতুন এসে এখানকার স্ত্রীলোকদের ভাবও ঠিক বুঝতে পারিনে, আমরা কোন অপরিচিত মহিলার মুখ থেকে দুটো কথা শুনতে পেলে আহ্লাদে গোলে পড়ি, সামাজিকতার অনুরোধে তারা আমাদের মনোরঞ্জন করবার জন্যে যে সকল কথাবার্ত্তা হাস্যালাপ করে, আমরা তার ঠিক মর্ম্ম-গ্রহণ কোরতে পারিনে, আমরা হঠাৎ মনে করি, আমাদের ওপরেই এই মহিলাটির বিশেষ অনুকূল দৃষ্টি, নইলে এত হাসি, এত কথা কেন? যাহোক্, আমাদের বঙ্গ-যুবকটি তাঁর এই প্রথম ডিনারের নিমন্ত্রণে এক জন মহিলা, বিশেষতঃ একজন বিবির কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে মিষ্টহাসি ও মিষ্টালাপ পেয়ে অত্যন্ত উল্লসিত আছেন। তিনি মিস্‌কে ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত অনেক কথা বোল্লেন, বোল্লেন—

তাঁর বিলেতে অত্যন্ত ভাল লাগে, ভারতবর্ষে ফিরে যেতে তাঁর ইচ্ছে করে না, ভারতবর্ষে অনেক প্রকার কুসংস্কার আছে; এ কথা বলার অভিপ্রায় এই যে, বিবিটির মনে বিশ্বাস হবে যে তিনি নিজে সমস্ত কুসংস্কার হোতে মুক্ত, শেষকালে দুই একটি মিথ্যে কথাও বোল্লেন; বোল্লেন, তিনি সুন্দর বনে বাঘ শিকার কোর্ত্তে গিয়েছিলেন, একবার নিতান্ত মোরতে মোরতে, কেবল অসমসাহসিকতা কোরে, বেঁচে গিয়েছিলেন। মিস্‌টি অতি সহজে বুঝতে পারলেন যে, এই যুবকের তাঁকে অতি ভাল লেগেছে, তিনি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হোলেন, ও তাঁর মিষ্টতম বাক্যবাণ যুবকের প্রাণে হানতে লাগলেন! "আহা, কি গোছালো কথা! কোথায় আমাদের দেশের মেয়েদের মুখের সেই নিতান্ত শ্রমলভ্য দুই একটি 'হাঁ। না,'—যা' এত মৃদু যে, ঘোমটার সীমার মধ্যেই মিলিয়ে যায়; আর কোথায় এখানকার বিম্বোষ্ঠ-নিঃসৃত অজস্র মধুধরা, যা' অযাচিত ভাবে মদিরার মত মাথার শিরায় শিরায় প্রবেশ করে।" প্রথম ডিনারের নিমন্ত্রণে আমাদের বঙ্গ-যুবকের মনে এই কথা গুলি উঠে। সেই দিনেই তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে চিঠিলেখা স্থগিত কোরলেন!

এখন তোমরা হয়ত বুঝতে পারচ, কি কি মসলার সংযোগে বাঙ্গালী বোলে একটা পদার্থ ক্রমে বেঙ্গো অ্যাঙ্গ্লিক্যান কিংবা ইঙ্গবঙ্গ নামে একটা খিচুড়িতে পরিণত হয়। আমি অতি সংক্ষেপে তার বর্ণনা কোরেছি, সমস্ত প্রক্রিয়াটা বিস্তারিত কোরে লিখতে পারি নি। আমি তার বড় বড় দুই একটা কারণ দেখিয়েছি, কিন্তু এত সব ছোট ছোট বিষয়ের সমষ্টি মানুষের মনে অলক্ষিত পরিবর্ত্তন উপস্থিত করে যে, সে সকল খুঁটি নাটি কোরে বর্ণনা কোর্ত্তে গেলে আমার পুঁথি বেড়ে যায়, আর তোমাদের ধৈর্য্যও কোমে যায়। সুতরাং এই খানেই সে সকল বর্ণনা সমাপ্ত করা যাক্।

এখন মনে কর, এক বৎসর বিলেতে থেকে বাঙ্গালী তাঁর দেহের ও মনের প্রথম খোলস পরিত্যাগ কোরেছেন, ও হ্যাটকোট পরিধান কোরে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হোয়েছেন, ও মনে মনে কল্পনা কোর্‌চেন যে, এত দিনে তিনি গুটি-পোকাত্ব ত্যাগ কোরে প্রজাপতিত্বে উপস্থিত হোয়েছেন। এই অবস্থায় তাঁকে একবার আলোচনা কোরে দেখা যাক্। আমি দেখতে পাচ্ছি, তুমি মহা চোটে উঠেছ; তুমি বোলচ, "বিলেতে গিয়ে বাঙ্গালীদের বর্ণনা কোরতে বসাও যা, আর গোলকুণ্ডায় গিয়ে রাণীগঞ্জের পাথুরে কয়লার বিষয় লেখাও তাই।" কিন্তু স্থির হও, আমি তোমাকে কারণ দেখাচ্ছি। আমি তোমার গা ছুঁয়ে বলতে পারি, বিলাতী বাঙ্গালীর চেয়ে নতুন দ্রব্য বিলেতে খুব কম আছে। ইংরাজ ও আঙ্গ্লো-ইণ্ডিয়ান যেমন দুই স্বতন্ত্র জাত, বাঙ্গালী ও ইঙ্গ-বঙ্গও তেমনি দুই স্বতন্ত্র জীব। এই জন্যে ইঙ্গ-বঙ্গদের বিষয়ে তোমাদের যত নতুন কথা ও নতুন খবর দিতে পারব, এমন বিলাতের আর খুব কম জিনিষের উপর দিতে পারব। ইঙ্গ-বঙ্গদের সংখ্যা এত সামান্য যে, তুমি মনে কোরতে পার, আমি ব্যক্তি বিশেষদের উপর কটাক্ষ কোরে বোলছি কিন্তু তা' নয়; আমি ইঙ্গ-বঙ্গদের একটা সাধারণ আদর্শ কল্পনা কোরে নিয়েছি, আমার চারদিককার অভিজ্ঞতা থেকে স্বভাবতঃ বাঙ্গালীদের বিলেতে এলে কি কি পরিবর্ত্তন হতে পারে তাই ঠিক কোরেছি, ও সেই গুলি সমষ্টি বদ্ধ কোরে একটা সমগ্র চিত্র আঁকতে চেষ্টা কোরছি।

ইঙ্গ-বঙ্গদের ভাল কোরে চিনতে গেলে

তাঁদের তিন রকম অবস্থায় দেখতে হয়। তাঁরা ইংরাজদের সুমুখে কি রকম ব্যবহার করেন বাঙ্গালীদের সুমুখে কি রকম ব্যবহার করেন, ও তাঁদের স্বজাত ইঙ্গ-বঙ্গদের সুমুখে কি রকম ব্যবহার করেন। তাঁদের জিজ্ঞাসা কোর্‌লে তাঁরা বোলবেন, "আমরা তিন জায়গায় সমান ব্যবহার করি, কেননা আমাদের একটা 'Principle' আছে।" কিন্তু সেটা একটা কথার কথা মাত্র, আমি সে কথা বড় বিশ্বাস করি নে। একটি ইঙ্গ-বঙ্গকে একজন ইংরেজের সুমুখে দেখ, তাঁকে দেখলে তোমার চক্ষু জুড়িয়ে যাবে। কেমন নম্র ও বিনীত ভাব! ভদ্রতার ভাবে প্রতিকথায় ঘাড় নুয়ে নুয়ে পোড়ছে, মৃদু ধীর স্বরে কথাগুলি বেরোচ্ছে, তর্ক করবার সময় অতিশয় সাবধানে নরম কোরে প্রতিবাদ করেন ও প্রতিবাদ কোর্‌তে হোল বোলে অপর্য্যাপ্ত দুঃখ প্রকাশ করেন, অসংখ্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তাঁর অজস্র ভদ্রতা দেখে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সন্তুষ্ট মনে প্রার্থনা কোর্ত্তে থাকেন যে, তিনি যেন জন্ম জন্ম এই রকম প্রতিবাদ করেন। কথা কোন্ আর না কোন্ একজন ইংরেজের কাছে একজন ইঙ্গ-বঙ্গ চুপ কোরে বোসে থাক্‌লেও তাঁর প্রতি অঙ্গভঙ্গী প্রতি মুখের ভাবে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ হোতে থাকে কিন্তু তাঁকেই আবার তাঁর স্বজাতিমণ্ডলে দেখ, দেখবে, তিনিই একজন মহা তেরিয়া মেজাজের লোক। বিলেতে যিনি তিন বৎসর আছেন, এক বৎসরের বিলেত-বাসির কাছে তাঁর অত্যন্ত পায়া ভারি! এই "তিন বৎসর" ও "এক বৎসরের" মধ্যে যদি কখনো তর্ক ওঠে, তা' হোলে তুমি "তিন বৎসরের" প্রতাপটা একবার দেখতে পাও! তিনি প্রতি কথা এমন ভাবে এমন স্বরে বলেন যে, যেন সেই কথাগুলি নিয়ে সরস্বতীর সঙ্গে তাঁর বিশেষ বোঝা-পড়া হোয়ে একটা স্থির-সিদ্ধান্ত হোয়ে গেছে! যিনি প্রতিবাদ কোর্‌চেন তাঁকে তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলেন "ভ্রান্ত," কখনো বা মুখের ওপর বলেন "মূর্খ"! তাঁর ভদ্রতা একটি গণ্ডীর মধ্যে বাস করে, তার বাইরে প্রায় পদার্পণ করে না। ব্যক্তি বিশেষের জন্যে তিনি তাঁর ভদ্রতার বিশেষ বিশেষ মাত্রা স্থির কোরে রেখেছেন। ইংলণ্ডে যারা জন্মেছে, তাদের জন্যে বড় চামচের এক চামচ—ইংলণ্ডে যারা পাঁচ বৎসর আছে, তাদের জন্যে মাজারী চামচের এক চামচ— ইংলণ্ডে যারা সম্প্রতি এয়েছে, তাদের জন্যে চায়ের চামচের এক চামচ —ও ইংলণ্ডে যারা মূলে যায় নি, তাদের জন্যে ফোঁটা দুই তিন ব্যবস্থা! ইংলণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কের ন্যূনাধিক্য নিয়ে তাঁদের ভদ্রতার মাত্রার ন্যূনাধিক্য হয়। তাঁদের মাপাজোকা ভদ্রতার পায়ে গড় করি, তাঁদের "Principle"—এর পায়ে গড় করি!

বিলাতে এলে লোকে "Principle" "Principle" কোরে মহা কোলাহল কোর্ত্তে থাকে কিন্তু আমি ও-রকম বাক্যের আড়ম্বর সইতে পারিনে। আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা কোর্ত্তে চাই, "বাস্তবিক কি তোমরা একটা স্থির মত বেঁধেছ? আর সে মতগুলি বাঁধবার আগে কেন যে সেগুলি গ্রহণ কোর্‌লে তা' কি বিচার কোরে দেখেছ?" তাঁরা সকলেই বোলে উঠবেন "হাঁ;" কিন্তু আমি হলপ্ কোরে বোল্‌তে পারি, তাঁদের মধ্যে শতকরা নিরেনব্বই জন তা' করেন নি! ইংরেজরা তাঁদের যদি বলে যে, কাকে তাঁদের কাণ উড়িয়ে নিয়ে গেছে, তা' হোলে কাণে হাত না দিয়ে তাঁরা কাকের পশ্চাতে পশ্চাতে ছোটেন! যে দিন একজন

'গল্প কোরছিলেন যে, তাঁকে আর এক জন বাঙ্গালী জিজ্ঞাসা কোরেছিলেন যে, 'মহাশয়ের কি কাজ করা হয় ?' এই গল্প শুনবামাত্র আমাদের এক জন ইঙ্গ-বঙ্গ বন্ধু নিদারুণ ঘৃণার সঙ্গে বোলে উঠলেন, "দেখুন দেখি, কি Barbarous !" আমি আর থাক্‌তে পারলেম না, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা কোরলেম, "কেন Barbarous বুঝিয়ে দিন ত, মশায় !" তিনি কোন মতে বোঝাতে পারলেন না, তাঁর ভাবটা এই যে, যেমন মিথ্যে কথা না বলা, চুরী না করা, নীতি-শাস্ত্রের কতকগুলি মূল নিয়ম, তেমনি অন্ত মানুষকে তার জীবিকার কথা জিজ্ঞাসা না করাও একটা মূল নিয়মের মধ্যে, তার জন্তে অন্ত কারণ অনুসন্ধানের আবশ্যক করে না। আমি তাঁকে বল্লেম যে, "দেখুন মশায়, ইংরেজরা একটা জিনিষ মন্দ বলে বোলে আপনি অবিচারে অকাতরে সেটাকে মন্দ বোল্‌বেন না। কেন ইংরেজরা মন্দ বোল্‌চে, সেটা আগে বিচার কোরে দেখবেন, তার পরে যদি যুক্তিসিদ্ধ মনে হয়, তা হোলে না হয় মন্দ বোলবেন। চাকরীর কথা জিজ্ঞাসা করা ইংরাজেরা যে, কেন মন্দ বলে তার অবিশ্যি কারণ আছে ; অল্প বেতনে আপনি হয় ত অতি সামান্ত চাকরী কোরচেন, আপনাকে চাকরীর কথা জিজ্ঞাসা কোরলে আপনার হয়ত উত্তর দিতে সঙ্কোচ বোধ হতে পারে। কিন্তু আপনি যখন Barbarous বোলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন তখন এ সকল কারণ বিবেচনা করেন নি।" এর থেকে বেশ বুঝতে পারবে যে, যে ইঙ্গ-বঙ্গগণ আমাদের দেশীয় সমাজে নানা প্রকার কুসংস্কার আছে বোলে নাসা কুঞ্চিত করেন, বিলেত থেকে তাঁরা তাঁদের কোটের ও প্যান্টলুনের পকেট পুরে রাশি রাশি কুসংস্কার নিয়ে যান। কুসংস্কার আর কাকে বলে বল ? যতক্ষণে তুমি তোমার বিশেষ সংস্কারের একটা সন্তোষজনক কারণ দেখাতে না পার, ততক্ষণ আমি তাকে কুসংস্কার বোলব ! অতএব হে ইঙ্গবঙ্গ, তুমি ভারতবর্ষের প্রতি সামাজিক আচার ব্যবহারকে যে Prejudice বোলে ঘৃণা কর, সেই ঘৃণা করাটাই হয় ত এক প্রকার Prejudice ! তুমি হয়ত জাননা যে তুমি কেন ঘৃণা কোরচ। তোমার হয়ত একটা দারুণ কুসংস্কার আছে, যে তুমি ব্যতীত তোমার স্বদেশ-জাত আর সমস্ত দ্রব্যই মন্দ। আমি এক এক সময় ভাবি, এক জন বুদ্ধিমান প্রাণীর মনে কি রকম কোরে এ রকম অন্ধ কুসংস্কার জন্মাতে পারে। সে দিন এক জায়গায় আমাদের দেশের শ্রাদ্ধের কথা হোচ্ছিল, বাপ-মার মৃত্যুর পর আমরা হবিষ্য করি, বেশ ভূষা করিনে, ইত্যাদি—শুনে একজন ইঙ্গ-বঙ্গ যুবক অধীরভাবে আমাকে বোলে উঠলেন, যে, "আপনি অবিশ্যি, মশায়, এসকল অনুষ্ঠান ভাল বলেন না।" আমি বল্লেম "কেন নয় ? মৃত আত্মীয়ের জন্তে শোক প্রকাশ করাতে আমিত কোন দোষ দেখিনে। ভিন্ন-ভিন্ন দেশে শোক প্রকাশ করবার ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম আছে। ইংরাজেরা কালো কাপড় পোরে শোক প্রকাশ করে বোলে শাদা কাপড় পোড়ে শোক প্রকাশ করা অসভ্যতার লক্ষণ মনে কোরো না ; আমি দেখছি ইংরেজরা যদি আত্মীয়ের মৃত্যু উপলক্ষে হবিষ্যান্ন খেত, আর আমাদের দেশের লোকেরা না খেত, তাহলে হবিষ্যান্ন খায় না বলে আমাদের দেশের ওপর তোমার দ্বিগুণতর ঘৃণা হোত, ও মনে কোর্‌তে, হবিষ্যান্ন খায় না বোলেই আমাদের দেশের এই দুর্দ্দশা, আর হবিষ্যান্ন খেতে

আরম্ভ কোরলেই আমাদের দেশ উন্নতির চরম-শিখরে উঠতে পারবে।" এর চেয়ে কুসংস্কার আর কি হোতে পারে! ইঙ্গ-বঙ্গরা বলেন, দেশে গিয়ে দেশের লোককে সন্তুষ্ট করবার জন্যে দেশের কুসংস্কারের অনুবর্ত্তন করা ভীরুতা, শুদ্ধ তাই নয়, তাঁদের সামান্য Principle এর বিরুদ্ধাচরণ। এ কথা শুনতে বেশ, কিন্তু মহাবীরদের একবার জিজ্ঞাসা কর, তাঁরা বিলেতে কি করেন। তাঁরা ঘাড় নত কোরে ইংরাজদের কুসংস্কারের অনুসরণ করেন কি না? তাঁরা জানেন সে গুলি কুসংস্কার, তবু জেনে শুনে সে গুলি পালন করেন কি না? তুমি হয়ত জান, ইংরেজেরা এক টেবিলে তেরজন খাওয়া অত্যন্ত অলক্ষণ মনে করেন, তাঁদের বিশ্বাস, তা হোলে এক বৎসরের মধ্যে তাঁদের এক জনের মৃত্যু হ'বেই। একজন ইঙ্গ-বঙ্গ যখন নিমন্ত্রণ করেন, তখন কোন মতে তেরজন নিমন্ত্রণ করেন না, জিজ্ঞাসা কোরলে বলেন, আমি নিজে অবিশ্যি বিশ্বাস করিনে, কিন্তু যাঁদের নিমন্ত্রণ করি তাঁরা পাছে কষ্ট পান, তাই জন্যে বাধ্য হোয়ে এ নিয়ম পালন কোরতে হয়।" খুব উদার হৃদয় বটে! কিন্তু দেশে গিয়ে এ উদারতা কোথায় থাকে। তুমি হয়ত একটি সামান্য দেশাচার পালন কোরলে তোমার বাপ, মা, ভাই, বোন তোমার সমস্ত দেশের লোক অত্যন্ত আহ্লাদিত হন, তখন কি তুমি তাঁদের সকলের মনে কষ্ট দিয়ে সেই দেশাচারের উপর তোমার বুট-শুদ্ধ পদাঘাত কর না? এইরূপ পদাঘাত কোরতে পারলে বোলে কি সমস্ত বৎসরটা অত্যন্ত মনের আনন্দে থাক না? সে দিন এক জন ইঙ্গবঙ্গ একটি বালককে রবিবার দিনে রাস্তায় খেলা কোরতে যেতে বারণ কোরছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করাতে বোল্লেন, "রাস্তার লোকেরা কি মনে কোরবে?" রাস্তার লোকের কুসংস্কারের অনুবর্ত্তন কোরে তিনি যদি রবিবারে খেলা না করেন, তবে আত্মীয় স্বজনের কুসংস্কার বা সুসংস্কার বা নির্দ্দোষ সংস্কার তুচ্ছ কোরে রামনবমীর দিনে তিনি দেশে গোমাংস ভক্ষণ করেন কেন?—Principle!

কুসংস্কার মানুষকে কতদূর অন্ধ কোরে তোলে, তা' বাঙ্গালার অশিক্ষিত কৃষিদের মধ্যে অনুসন্ধান করবার আবশ্যক করে না, ঘোরতর সভ্যতাভিমানী বিলিতি বাঙ্গালীদের মধ্যে দেখতে পাবে। হঠাৎ বিলেতের আলো লেগে তাঁদের চোখ একেবারে অন্ধ হোয়ে যায়। কিন্তু বিলেতের কি দেখে তাঁরা মুগ্ধ হোয়ে পড়েন? আমি অনুসন্ধান কোরে দেখেছি, কেবল বাহ্য-চাকচিক্য! এ বিষয়ে তাঁরা ঠিক বালকের মত! একখানি বই দেখ্‌লে তাঁরা তার সোণার জলের চিত্র করা বাঁধানো মলাট দেখে হাঁ কোরে থাকেন, তার ভিতরে কি লেখা আছে, তার বড় খবর রাখেন না! কতকগুলি বাঙ্গালী বলেন, "এখানকার মত ঘর ভাড়া দেবার প্রথা তাঁরা আমাদের দেশে প্রচলিত কোর্‌বেন!" তাঁদের সেই একটি মাত্র সাধ আছে! তাঁদের চোখে বিলেতের আর কিছু তেমন পড়ে নি, যেমন বিলেতের ঘড় ভাড়া দেবার প্রথা! আর একজন বাঙ্গালী, তিনি আমাদের বাঙ্গালা সমাজসংস্কার কোর্‌তে চান, তাঁর প্রধান বাতিক, তিনি আমাদের দেশের মেয়েদের নাচ শেখবার বন্দোবস্ত কোরে দেবেন; বিলেতের সমাজে মেয়েদের পুরুষদের সঙ্গে একত্রে নাচটাই তাঁর চোখে অত্যন্ত ভাল লেগেছে, ও আমাদের সমাজে মেয়েদের না নাচাই তাঁর প্রধান অভাব বোলে মনে হয়, তিনি এখানকার সমাজ-সমুদ্র মন্থন

কোরে ঐ নাচটুকুই পেয়েছেন! এই রকম বিলেতের কতকগুলি ছোট-খাটো বিষয়ই তাঁদের চোখে পড়ে। তাঁরা বিশেষ কি কি কারণে বিলেতের ওপর এত অনুরক্ত ও আমাদের দেশের ওপর এত বিরক্ত হোয়ে ওঠেন, তা' যদি দেখতে যাও ত, দেখবে, সে সকল অতি সামান্য,—আমি পূর্ব্বেই তা' সঙ্ক্ষেপে বোলেছি। প্রথমতঃ, এখানকার সুসজ্জিত পরিষ্কার, পরিপাটী, নিরিবিলি বাসস্থানে স্বাধীনভাবে বাস করবার বন্দোবস্ত। দ্বিতীয়তঃ, এখানকার মহিলাদের সঙ্গে মেশামেশি; তাদের মৃদু হাসি, মিষ্টালাপ, শিষ্টাচার এক জন বঙ্গ-যুবকের মাথা অতি শীঘ্র ঘুরিয়ে দেয়। তিনি আমাদের দেশের মেয়েদের সঙ্গে এখানকার মেয়েদের তুলনা কোর্‌তে থাকেন; দেখেন, এখানকার মেয়েরা কেমন স্পষ্ট ও মিষ্ট কথা কয়, একটা কথা জিজ্ঞাসা কোরলে তার উত্তর পাবার জন্যে বছর পাঁচেক অপেক্ষা কোর্‌তে হয় না, তাদের মুখের উপরও যেমন ঘোমটার আবরণ নেই, তেমনি তাদের প্রতি আচার ব্যবহারের উপরে এক প্রকার কষ্টকর সঙ্কোচের আবরণ নেই। এই রকম কতকগুলি সাধারণ বিষয়ে আমাদের দেশের ও এদেশের মেয়েদের অমিল দেখে তার পরে তিনি কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বিষয় নিয়ে ছেলেমানুষের মত খুঁৎ খুঁৎ কোর্‌তে থাকেন! যে বালকের মাটির পুতুল আছে, সে আর একটি বালকের কাঠের পুতুল দেখে প্রথমতঃ তার নিজের কাঠের পুতুল নেই বোলে কাঁদ্‌তে বসে; এই রকমে তার নিজের পুতুলের ওপর যখন একবার বৈরাগ্য জন্মায়, তখন সেই কাঠের পুতুলের কাণে একটা মাকড়ি দেখে তার খুঁৎ খুঁৎ দ্বিগুণ বেড়ে ওঠে, তখন বিবেচনা করেনা যে, সেই কাঠের পুতুলের কাণে যেমন একটা মাকড়ি আছে, তেমনি তার মাটির পুতুলের গলায় একটা হার আছে; তার মা এসে বলে, "আচ্ছা বাপু তোর পুতুলের হাতে একটা বালা পরিয়ে দিচ্ছি।" সে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে মাটিতে পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে চীৎকার কোরে বোলে ওঠে "না আমার মাকড়ি চাই!" তার মা বলে "আচ্ছা বাপু, একটা মল দিচ্ছি না হয়!" সে দ্বিগুণ পা ছুঁড়ে বোলে ওঠে, "না, আমাকে মাকড়ি দে!" ইঙ্গ-বঙ্গেরা কতকটা এই রকম করেন। একজন ইঙ্গ-বঙ্গ মহা খুঁৎ খুঁৎ কোরছিলেন যে, আমাদের দেশের মেয়েরা পিয়ানো বাজাতে পারে না, ও এখানকার মত visitor দের সঙ্গে দেখা কোর্‌তে ও visit প্রত্যর্পণ কোর্‌তে যায় না। হরি হরি! তুমি কি কোরে আশা কোরতে পার যে, আমাদের মেয়েরা পিয়ানো বাজাতে পার্ব্বে? তা' হোলে একজন বাঙ্গালী এখানে এসে খুঁৎ খুঁৎ কোর্‌তে পারে যে, এদেশের মেয়েরা পান সাজ্‌তে পারে না। দেশে থাক্‌তে একবার শুনেছিলেম যে আমাদের দেশের মেয়েদের উপর একজন বাঙ্গালীর অভক্তি জন্মা'বার একটা প্রধান কারণ হোচ্চে এই যে, "ইংরাজের মেয়েরা এমন সরেশ লেবুর আচার তৈরি কোর্‌তে পারে যে, তার ভিতরে বিচি থাকে না, কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েরা ত তা পারে না।" এ গল্পটা আমার নিতান্ত জনশ্রুতি মনে হয় না। কেন না মানুষের স্বভাবই এই যে, সাধারণতঃ এক জনের ওপর চোটে গেলে তারপরে তার খুঁটি নাটি খোঁজ্‌তে আরম্ভ করে। সে দিন একজন বাঙ্গালী এখানকার সঙ্গে তুলনা কোরে আমাদের দেশের ভোজের প্রথা যে নিতান্ত barbarous তাই প্রমাণ করবার জন্যে বোল্লেন যে আমা-

দের দেশে খাবার সময় মাছি ভ্যান্ ভ্যান্ করে। আর আমাদের দেশের লোকেরা যে berbarous তাই প্রমাণ কর্‌বার জন্যে বল্লেন যে, সেখানে জুতো খুলে খেতে ব'সলে জুতো চুরি কোরে নিয়ে যায়। জানিনে হয়ত তাঁর বিশ্বাস যে, মাছি যদি বিলেতে আস্‌ত, ত এত সভ্য হোয়ে যেত যে, খাবার সময় আর ভ্যান্ ভ্যান্ কোর্‌ত না! আর তিনি হয়ত ভুলে গিয়েছিলেন, যে এদেশের লোকেরা জুতো খুলে খায় না। খুলে খেলে এখনে চুরি যেত কি না, সে বিষয়ে বলা ভারি শক্ত; অতএব সে বিষয়ে কোন প্রকার তুলনা উত্থাপন না করাই শ্রেয়! এই রকম ক্রমাগত প্রতি ছোট-খাটো বিষয় নিয়ে এদেশের সঙ্গে আমাদের দেশের তুলনা কোরে কোরে তাঁদের চটাভাব চটনমান যন্ত্রে blood heat ছাড়িয়ে ওঠে! একজন ইঙ্গবঙ্গ তাঁর সমবেদক বন্ধুদের দ্বারা বেষ্টিত হোয়ে বোল্‌ছিলেন যে, যখন তিনি মনে করেন যে, দেশে ফিরে গেলে তাঁকে চারিদিকে ঘিরে মেয়েগুলো প্যান্ প্যান্ কোরে কাঁদতে আরম্ভ করবে, তখন আর তাঁর দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না! অর্থাৎ তিনি চান্ যে তাঁকে দেখবামাত্রেই, "dear darling" বোলে ছুটে এসে তাঁর স্ত্রী তাঁকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করে তাঁর কাঁধে মাথা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে! এইটুকু অভিনয়ের ওপর তাঁর দেশে ফিরে যাওয়া নির্ভর কোরচে। তিনি তাঁর বাড়ির লোকদের ভালবাসার তত মূল্য দেখেন না, যত তাদের ভালবাসার অভিনয়ের! তিনি তাঁর স্বীয় পরিবারদের কত ভাল বাসেন, এর থেকে একবার বিবেচনা কোরে দেখ! তাঁদের একটি মাত্র আচারের পরিবর্ত্তন না হোলে তিনি বাড়ি ফিরে যেতে পারেন না, না জানি সে কি পরিবর্ত্তন। সে পরিবর্ত্তনে হয়ত চন্দ্র সূর্য্যের উদয়াস্তের বন্দোবস্ত একবারে উল্টে যেতে পারে, প্রকৃতির একটা মহা বিপ্লব বাধতে পারে! সে পরিবর্ত্তন কি? না, S. K. Nandi Esqr-এর স্ত্রী পরিবারেরা যদি তাঁকে দেখে আনন্দের অশ্রু বর্ষণ না কোরে ছুটে তাঁকে আলিঙ্গন কোর্ত্তে আসে!! আমি আগেই বোলেছি বিলেতের কতকগুলি বাহ্যিক ছোট-খাটো বিষয় বাঙ্গালীর চোখে পড়ে। তাঁরা যখন সাহেব হোতে যান, তখন সাহেবদের ছোট-খাটো আচার গুলি নকল কোর্ত্তে যান। ছোট-খাট বিষয়ে তাঁদের খুটিনাটি যদি দেখ, তবে একেবারে আশ্চর্য্য হোয়ে যাও! ডিনারের টেবিলে কাঁটা ছুরী উল্টে ধোরতে হবে, কি পাল্টে ধোরতে হবে, তাই জান্‌বার জন্যে তাঁদের প্রাণপণ যত্ন, অন্বেষণ ও "গবেষণা" দেখ্‌লে তোমার তাঁদের উপর ভক্তির উদয় হবে! কোটের কোন্ ছাঁট্‌টা fashionable হোয়েছে, আজ কাল nobility রা আট প্যাণ্টলুন্ পরেন কি ঢল্‌কো প্যাণ্টলুন্ পরেন, Waltz নাচেন কি Polka নাচেন, মাছের পর মাংস খান কি মাংসের পর মাছ খান, সে বিষয়ে তাঁরা অভ্রান্ত খবর রাখেন। তুমি যদি দস্তানা পরবার সময় আগে থাক্‌তে বুড়ো আঙ্গুল গলিয়ে দেও, তিনি তৎক্ষণাৎ বোলে দেবেন, ওরকম দস্তর নয়। ঐ রকম ছোট-খাটো বিষয়ে একজন বাঙ্গালী যত দস্তর বেদস্তর নিয়ে নাড়া চাড়া করেন, এমন একজন জন্‌বুল্ করেন না। তুমি যদি মাছ খাবার সময় ছুরী ব্যবহার করো *

* ইংরাজেরা মাছ খাবার সময় কেবল মাত্র কাঁটা ব্যবহার করেন। মাছ খাবার এক প্রকার বিশেষ ছুরি আছে।

তবে একজন ইংরাজ তাতে বড় আশ্চর্য্য হবেন না, কেন না, তিনি জানেন তুমি বিদেশী কিন্তু একজন ইঙ্গ-বঙ্গ সেখানে উপস্থিত থাক্‌লে তাঁর স্মেলিংসল্টের আবশ্যক কোরবে। তুমি যদি শেরী খাবার গ্যাশে শ্যাম্পেন খাও, তবে একজন ইঙ্গ-বঙ্গ তোমার দিকে তিন দণ্ড হাঁ কোরে তাকিয়ে থাক্‌বেন, যেন এমন জানোয়ার তিনি কখনো দেখেন নি; যেন একটা অভূত-পূর্ব্ব নিদারুণ বিপ্লব বেধে গেল; যেন, তোমার এই একটি অজ্ঞতার জন্যে সমস্ত পৃথিবীর সুখ-শান্তি নষ্ট হবার উপক্রম হোয়েছে! সন্ধ্যে বেলায় তুমি যদি Morning-coat পর, তা' হোলে তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট হোলে যাবজ্জীবন তোমাকে দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা দেন! একজন বিলাত-ফেরতা কাউকে মটন দিয়ে রাই দিয়ে* খেতে দেখলে বোল্‌তেন "তবে কেন মাথা দিয়ে চল না?" তাঁর পক্ষে রাই দিয়ে মটন খাওয়াও যা,' আর মাথা দিয়ে হাঁটাও তাই! এই রকম সব ছোট-খাটো বিষয়েই ইঙ্গ বঙ্গদের যত দৃষ্টি। ছোট খাটো বিষয়ে এত খুটি-নাটি কেন, যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে তার একটা কারণ দেখাতে পারি। বাঙ্গালী হোয়ে সাহেবের মুখষ পোর্‌তে গেলে প্রতি পদে ভয় হয়, পাছে বাঙ্গালিত্ব বেরিয়ে পড়ে; সুতরাং প্রতি সামান্য বিষয়ে সাবধান হওয়া স্বাভাবিক। তোমার বুকটা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কালো হোলেও হানি নেই, কেন না সে সব কাপড়ে ঢাকা থাকে, কিন্তু মুখটা এমন সাবধানে চূণকাম করা আবশ্যক যে, কোন জায়গায় কালো বেরিয়ে না থাকে। তুমি যদি সাহেব হোতে চাও, তবে সাহেবদের যত খানি বাইরে চর্ম্ম-চক্ষে দেখা যায়, তত খানি নকল কোরলেই যথেষ্ট। যে বাঙ্গালীরা বিলেতে আসেন নি, তাঁরা তোমার বাঁকানো ইংরিজি সুর, তোমার হ্যট্ কোট্ ও তোমার উদগ্র-মূর্ত্তি দেখে তাক্ হোয়ে থাক্‌বেন। কিন্তু একটা মজা দেখেছি, ইঙ্গ-বঙ্গেরা পরস্পর আপনাদের চেনেন; তাঁরা দল-বহির্ভূত লোকদের কাছে যথেষ্ট আস্ফালন করেন বটে, কিন্তু তাঁদের পরস্পরের কাছে কিছু গোপন নেই, তাঁরা নিজে বেশ জানেন যে,

> "কাকস্য পক্ষৌ যদি স্বর্ণযুক্তৌ,
> মাণিক্যযুক্তৌ চরণৌ চ তস্য;
> একৈকপক্ষে গজরাজমুক্তা,
> তথাপি কাকো নচ রাজহংসঃ।"

> সোণা দিয়ে বাঁধা হোক্ কাকটার ডানা;
> মাণিকে জড়ানো হোক্ তার পা দুখানা,
> এক এক পক্ষে তার গজমুক্তা থাক্,
> রাজহংস নয় কভু তবুও সে কাক!

আমি আর একটি আশ্চর্য্য লক্ষ্য কোরে দেখেছি যে, বাঙ্গালীরা ইংরাজদের কাছে যত আপনাদের দেশের লোকের ও আচার ব্যবহারের নিন্দে করেন, এমন একজন ঘোর ভারতদ্বেষী অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ান করেন না। তিনি নিজে ইচ্ছে কোরে কথা পাড়েন ও ভারতবর্ষের নানা প্রকার কুসংস্কার প্রভৃতি নিয়ে প্রাণ খুলে হাস্য পরিহাস করেন। তিনি গল্প করেন যে, আমাদের দেশে বল্লভাচার্য্যের দল বোলে এক প্রকার বৈষ্ণবের দল আছে, তাদের সমস্ত অনুষ্ঠান সবিস্তারে বর্ণনা কোরে থাকেন, তিনি বলেন, ভারতবর্ষীয়েরা অত্যন্ত অসভ্য ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন; তিনি ভারতবর্ষীয়-দের "নেটিব নেটিব" কোরে সম্বোধন করেন,

* বিলাতী ঔদরিক-শাস্ত্রে রাই দিয়ে মটন খাওয়া নিষিদ্ধ।

সভার লোকদের হাসাবার অভিপ্রায়ে নেটিব nautch girl রা কি রকম কোরে নাচে, অঙ্গভঙ্গী কোরে তার নকল করা হয় ও তাই দেখে সকলে হাসলে পরম আনন্দ উপভোগ করেন! তাঁরা যখন ভারতবর্ষীয়দের নিন্দে কোর্ত্তে থাকেন, তখন তাঁরা মনে মনে কল্পনা করেন তাঁরা নিজে "নেটিব" দলের বহির্ভূত! তিনি হয়ত মনে করেন, তাঁর শ্রোতরা অন্যান্য ভারতবর্ষীয়দের সঙ্গে তুলনা কোরে তাঁকে পচা পুকুরের পদ্ম, কাঁটাবনের গোলাপ বোলে মাথায় কোরে নেবে। তাঁর বিশ্বাস, তিনি যখন ভারতবর্ষীয়দের "প্রেজুডিসের" উপর কটাক্ষপাত কোরে অপর্য্যাপ্ত হাস্যকৌতুক করেন, তখন সকলে তাঁকে অবিশ্যি সে সকল "প্রেজুডিস্" হোতে মুক্ত বোলে গ্রহণ কোরবেন। তাঁর নিতান্ত ইচ্ছে, তাঁকে কেউ ভারতবর্ষীয় দলের মধ্যে গণ্য না করে। আমার মনে আছে, আমি দেশে থাক্‌তে একজন সুশিক্ষিত উড়িষ্যাবাসী আমার কাছে কথায় কথায় বোলেছিলেন যে "উড়ে মেড়ারা বড় মূর্খ!" শুনে আমার সর্ব্বাঙ্গ জলে গিয়েছিল। আমার এক বন্ধু পূর্ব্বাঞ্চলে তাঁর জমীদারী দেখতে গিয়েছিলেন, একজন মুসলমান তাঁকে কথাপ্রসঙ্গে বোলেছিল "মশায় নেড়েদের কখনো বিশ্বাস কোর্ব্বেন না!" এই উড়িষ্যাবাসীর মনোগত ভাব এই যে, "আমি মূর্খ নই।" আরএই মুসলমানটি জানাতে চান যে, তিনি বিশ্বাসপাত্র। কেন না, নিজে মূর্খ হোলে এই উড়িষ্যাবাসী কখনো অন্যের মূর্খতা নিয়ে বিদ্রূপ কোত্তেন না; আর এই মুসলমানটির যখন স্বজাতির অবিশ্বাসিতার ওপর এত ঘৃণা, তখন তিনি নিজে বিশ্বাসী না হোয়ে যান্ না! এই রকম দেখতে পাবে যে, সাহেব সাজা বাঙ্গালীদের প্রতি পদে ভয়, পাছে তাঁরা বাঙ্গালী বোলে ধরা পড়েন। একজন বাঙ্গালী একবার রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁর কৃষ্ণ চর্ম্ম দেখে আর একজন ভারতবর্ষীয় এসে তাঁকে হিন্দুস্থানীতে দুই এক কথা জিজ্ঞাসা করে, তিনি মহা খাপা হোয়ে তার কথার উত্তর না দিয়ে চোলে যান। কিন্তু এত রাগ করবার তাৎপর্য্য কি? তাঁর ইচ্ছে, তাঁকে দেখে কেউ মনে না কোর্‌তে পারে যে, তিনি হিন্দুস্থানী বোঝেন! তাঁর মা বাপেরা যে বাঙ্গালী ও সে হতভাগ্যেরা যে বাঙ্গালায় কথা কয় এতে তিনি নিতান্ত লজ্জিত আছেন। আহা, যদি টেম্‌সের জলে স্নান কোর্‌লে রংটা বদ্‌লাতো, তবে কি সুখেরই হোত! এক জন ইঙ্গ-বঙ্গ একটি "জাতীয়-সঙ্গীত" রামপ্রসাদী সুরে রচনা কোরেছেন; এই গানটার একটু অংশ পূর্ব্ব পত্রে লিখেছি, বাকি আর একটুকু মনে পড়েছে, এই জন্য আবার তার উল্লেখ কচ্চি। যদিও এটা কতকটা ঠাট্টার ভাবে লেখা হোয়েছে, কিন্তু আমার বোধ হয় এর ভিতরে অনেকটা সত্যি আছে। এ গীত যাঁর রচনা তিনি রাম-প্রসাদের মত শ্যামার উপাসক নন্, তিনি গৌরীভক্ত। এই জন্যে গৌরীকে সম্বোধন কোরে বল্‌ছেন—

"মা; এবার মোলে সাহেব হব;
রাঙা চুলে হাট বসিয়ে, পোড়া নেটিব নাম ঘোচাব!
শাদা হাতে হাত দিয়ে মা, বাগানে বেড়াতে যাব,
(আবার) কালো বদন দেখলে পরে "ডার্কি" বোলে মুখ ফেরাব!"

আমি পূর্ব্বেই বিলেতের Land lady (বাড়িওয়ালী) শ্রেণীর কথা উল্লেখ কোরেছি। তারা বাড়ির লোকদের আবশ্যক মত সেবা করে অনেক ভাড়াটে থাক্‌লে তারা চাক-

রাণী রাখে, এবং অনেক সময়ে তাদের আপনাদের মেয়ে বা অন্য আত্মীয়েরা তাদের সাহায্য করবার জন্যে থাকে। এই Land lady শ্রেণীরা আমাদের বিদেশী ইঙ্গ-বঙ্গদের প্রবাস-দুঃখ অনেক পরিমাণে দূর করে, কিংবা প্রবাস-সুখ অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত করে। অনেক ইঙ্গ-বঙ্গ সুন্দরী Land lady দেখে ঘর ভাড়া করেন। এতে তাঁদের সময় কাটাবার যথেষ্ট সুবিধে হয়। বাড়িতে পদার্পণ কোরেই তাঁরা ল্যাণ্ড-লেডির যুবতী কন্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কোরে নেন, দু তিন দিনের মধ্যে তার একটি আদরের নাম করণ করা হয়, সপ্তাহ অতীত হোলে তার নামে হয়ত একটা কবিতা রচনা কোরে তাকে উপহার দেন। কোন সন্ধ্যে বেলায় হয়ত রান্না ঘরে গিয়ে ল্যাণ্ড-লেডি, তার কন্যা, ও ঘরের দাসীটিকে বিজ্ঞান, দর্শন ও মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে দুই একটা বাঁধা গত শোনাতে থাকেন, তারা তাঁর লম্বা চৌড়া কথা গুলো হজম কোর্ত্তে না পেরে হাঁ কোরে ভাবে, ইনি একজন কেষ্ট বিষ্ণুর মধ্যে হবেন। কিন্তু Kitchen অঞ্চলে তিনি তাঁর গম্ভীর পাণ্ডিত্যের জন্যে তত বিখ্যাত নন; তাঁর নিজের বাড়ির ও পাশাপাশি দুয়েকটি বাড়ির দাসী শ্রেণীর মধ্যে তাঁর রসিকতার অত্যন্ত নাম-ডাক শোনা যায়। এই রকম জনশ্রুতি যে, সে দিন সন্ধ্যে বেলায় সিঁড়ির কাছে তিনি বাড়ির Kitchen maid Polly র দাড়ি ধোরে এমন একটি ঠাট্টা কোরেছিলেন যে, সে হাসতে হাসতে ছুটে পালিয়ে যায়। সে দিন Land ladyর মেয়ে তাঁকে এক পেয়ালা চা এনে জিজ্ঞাসা করেছিল যে, চায়ে কি চিনি দিতে হবে? তিনি হেসে বোল্লেন, "না নেলি, তুমি যখন ছুঁয়ে দিয়েছ, তখন আর চিনি দেবার আবশ্যক দেখছি নে!" ইঙ্গ-বঙ্গগণ বিলাতের এই দাসী শ্রেণীর বিমল-সংসর্গে দিন দিন উন্নতি লাভ কোর্ত্তে থাকেন। আচ্ছা, মেয়েদের সঙ্গে যদি মিশতে চাও, তবে ভদ্রলোকের মেয়েদের সঙ্গে মেশ না কেন? কিন্তু কতকগুলি কারণ আছে, যে জন্যে ভদ্রলোকের মেয়ে দের সঙ্গে তত মেশা হয় না। বাঙ্গালীদের উদ্যমের অভাব ও আলস্য বিলেতে এসেও ভাল কোরে ঘোচে না। তারা যে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে শ্রম স্বীকার কোরে এক জনের বাড়ি গিয়ে দেখা কোরে দুদণ্ড কথা কোয়ে আসবে তা' বড় হোয়ে ওঠে না। তার পরে আবার অনেক পড়া শুনো কোরে দেশ শুনো কোর্ত্তে যাবার বড় সময় পেয়ে ওঠেন না। তা' ছাড়া আমি দেখেছি, এক জন ভদ্রলোকের বাড়ি গিয়ে ভদ্র স্ত্রীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করা ও তাদের সঙ্গে নানা সামাজিক ভদ্রতার নিয়ম-পালন কোরে চলা অনেক বাঙ্গালীর পুষিয়ে ওঠে না; অনেকের দেখেছি, এক জন ভদ্র স্ত্রীর কাছে সঙ্কোচে মুখ ফোটে না, কিন্তু এক জন নীচশ্রেণীর মেয়ের কাছে তার অনর্গল কথা ফুটতে থাকে। কিন্তু সকলের চেয়ে প্রধান কারণ এই যে, ভদ্র লোকের স্ত্রীদের সঙ্গে তাঁরা তেমন মনের মত স্বাধীন ব্যবহার কোর্ত্তে পারেন না, ওরকম নিরামিষ মেশামেশি তাঁদের বড় মনঃপূত নয়। দাসীদের সঙ্গে তাঁরা বেশ অসঙ্কোচে অভদ্রতাচরণ কোর্ত্তে পারেন। আসল কথা কি জান? শাদা চামড়ার গুণে তাঁরা দাসীদের যথেষ্ট নীচ শ্রেণীর লোক বোলে কল্পনা কোর্ত্তে পারেন না; এক জন বিবি দাসী বোলে মনে কোর্ত্তে পারেন না। একটা শাড়ি পরা, ঝাঁটাহস্ত কালো মুখ দেখলে তবে তাঁদের দাসীর ভাব ঠিক মনে আসে। আমি জানি, এক জন ইঙ্গ-বঙ্গ তাঁর

বাড়ির দাসীদের মেঝদিদি সেজদিদি বোলে ডাকতেন; শুনলে কি গা জ্বোলে ওঠে না? তাঁর বাড়িতে হয়ত তাঁর নিজের মেজদিদি সেজদিদি আছেন; যখন কতকগুলো নীচ শ্রেণীর দাসীকে সেই নামে ডাক্‌চেন, তখন হয়ত তাঁর বিকৃত মনে একটু লজ্জা, একটু কষ্ট একটু সঙ্কোচও উপস্থিত হচ্চে না। হা দুর্ভাগ্য। ছেলেবেলা থেকে যাঁদের দেখে আস্‌ছি যাঁদের ভাল বাসা পেয়ে আস্‌চি, বিলেতে এমন কি জিনিষ থাক্‌তে পারে যা' দেখে তাঁদের ভুলে যাব, তাঁদের ওপর থেকে ভালবাসা চোলে যাবে, শুদ্ধ তাই নয় তাঁদের ওপর ঘৃণা জন্মাবে। এই কতকগুলি নীচ শ্রেণীর দাসী, কতকগুলি হীন-স্বভাব ল্যাণ্ড-লেডির সঙ্গে বৎসর দুয়ের হীন আমোদে কাটিয়ে যদি তুমি তোমার স্ত্রীর ভালবাসা, তোমার বোনের স্নেহ ভুলে যেতে পার, কত বৎসরের স্মৃতি মুছে ফেলতে পার, বাড়ির সমস্ত টান ছিঁড়ে ফেলতে পার, তবে তুমি কি না কোর্‌তে পার বল দেখি।

আমি এক জনকে জানি, তিনি তাঁর "মেজ দিদি, সেজদিদি"-বর্গকে এত মান্য কোরে চোল্‌তেন যে তাঁর কৃষ্ণবর্ণ গুরুজনকে তাঁর অর্দ্ধেক মান্য কোরলে, তাঁরা তাঁকে কুলের প্রদীপ ছেলে বোলে মাথায় কোরে রাখতেন। তাঁর ঘরে বা তাঁর পাশের ঘরে যদি এই দাসী-দের মধ্যে কেউ উপস্থিত থাক্‌ত, তাহোলে তিনি সসম্ভ্রম সঙ্কোচে শশব্যস্ত হোয়ে পোড়তেন। সে রকম অবস্থায় যদি তাঁর কোন ইঙ্গ-বঙ্গ বন্ধু গান কোরতেন বা হাস্য পরিহাস কোরতেন তা' হোলে তিনি অমনি মহা অপ্রতিভ হোয়ে বোলে উঠতেন, "আরে চুপ কর, চুপ কর, মিস্ এমিলি কি মনে কোর্বেন?" বিলেতে এসে এরা এই রকম কতকগুলি নীচ শ্রেণীর মেয়েদের সঙ্গে মিশে বিবিদের সঙ্গে আলাপ কোরচি মনে কোরে মহা পরিতোষ লাভ করেন। আমার মনে আছে, দেশে থাক্‌তে একবার এক ব্যক্তি বিলেত থেকে ফিরে গেলে পর, আমরা তাঁকে খাওয়াই, খাবার সময় তিনি নিশ্বাস ত্যাগ কোরে বোল্লেন, "এই আমি প্রথম খাচ্চি, যে দিন আমার খাবার টেবিলে কোন লেডি নেই।" শুনে আমি একটু আশ্চর্য্য হোয়ে গিয়েছিলেম, আমি জান্‌তেম যে, কোন ভদ্র বিবি একজন অস্ত্রীক পুরুষের বাড়িতে দেখা কোরতে বা খেতে আসেন না। তবে এ ব্যক্তি বলে কি? এ বিলেতে যত দিন ছিল, নিমন্ত্রণ খেয়ে কাটিয়ে-ছিল না কি? যা হোক্, তখন মনে কোরে-ছিলেম এ ব্যক্তি বিলেত থেকে আস্‌চে, অবিশ্যি সেখানে এমন কিছু দস্তর আছে যা' আমি ঠিক জানিনে। ওমা, এখেনে এসে সব বুঝতে পারচি, ব্যাপার খানা কি? এই সমস্ত ল্যাণ্ডলেডিবর্গের সঙ্গে প্রত্যেহ আহার করা হোত, আর দেশে নিরীহ বঙ্গবাসীদের নিকট "প্রত্যহ বিবিদের সঙ্গে খেয়েছি" বোলে জাঁক করা হত! এক জন ইঙ্গ-বঙ্গ একবার তাঁর কতকগুলি বন্ধুদের নিমন্ত্রণ কোরেছিলেন, খাবার টেবিলে কতকগুলি ল্যাণ্ডলেডি ও দাসী উপবিষ্ট ছিল, তাদের এক জনের ময়লা কাপড় দেখে নিমন্ত্রণ কর্ত্তা তাকে কাপড় বোদ্‌লে আস্‌তে অনুরোধ কোরে-ছিলেন, শুনে সে বোল্লে, "যাকে ভালবাসা যায়, তাঁকে ময়লা কাপড়েও ভালবাসা যায়!" যে দাসী এ রকম কোরে উত্তর দিতে পারে তা'কে কতদূর স্পর্দ্ধা দেওয়া হোয়েছে মনে কোরে দেখ। এ সকল দেখে এখানকার ইংরাজদের আমাদের বাঙ্গালীদের উপরে অত্যন্ত অশ্রদ্ধা হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সে দিন মিশেস্ উড়ো (পূজনীয় মৃত উড়ো সাহেবের বিধবা পত্নী) আমাকে বোল্‌ছিলেন, "শোনা যায় এখানকার বাঙ্গালীরা অত্যন্ত ছোট লোকদের সঙ্গে মেশে ও একত্রে খায়। একবার মনে কোরে দেখ দেখি, কতকগুলো বেহারা ও দরোয়ানের সঙ্গে তোমরা একাসনে বোসে খাচ্চ, সে কি বিশ্রী দেখা যায়!" শুনে লজ্জায় আমার শির একেবারে নত হোয়ে গেল! হে ইঙ্গ-বঙ্গ, যদি ইংরাজদের মুখ থেকে এ বিষয়ে উপদেশ না শুনিলে তোমাদের চৈতন্য না জন্মায়, তবে Thackeray এ বিষয়ে কি বলেন শোন ;—

"It may safely be asserted that the persons who joke with servants বা barmaids at lodgings are not men of a high intellectual or moral capacity. To chuck a still-room maid under the chin, or to send Molly the cook grinning, are not, to say the least of them, dignified act of any gentleman."

অতএব যারা ভদ্র-সমাজে মিশতে চান ও ভদ্র বোলে আত্মপরিচয় দিতে চান, তাঁরা যেন কতকগুলো রাঁধুনি ঘর-ঝাঁটুনী দাসীদের সঙ্গে অযোগ্য ঘনিষ্ঠতা না করেন। বিলেতের kitchen রাজ্যে যাঁরা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কোরেছেন, তাঁরা যেন দেশে গিয়ে না বলেন যে, বিলেতে থেকে শিক্ষা পেয়ে এলেম। এইরূপ নীচ শ্রেণীর মেয়েদের উপরে ভালবাসা দেখিয়ে রুটি ও কয়লাওয়লো যুবক বেচারীদের মনে ঈর্ষা জন্মিয়ে কষ্ট দেওয়া কি সভ্য-ভদ্র ভদ্রলোকের কাজ? শোনা যায়, এখেনে যখন অল্প স্বল্প বাঙ্গালীর আমদানি ছিল, তখন এখানকার সমাজে তাঁদের অত্যন্ত মান ছিল। অনেক ভদ্রলোক আলাপ না থাক্‌লেও তাঁদের নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠিয়ে দিতেন। এখানকার অনেক Lord ও Duke গণ তাঁদের সান্ধ্যসমাগমে আহ্বান কোর্ত্তেন। এখানকার ধনীলোকদের নিমন্ত্রণ-সভায় তাঁদের সমাদরের সীমা ছিল না। কিন্তু এখন সে সব নেই। এখন তুমি বিলেতে এলে তোমার ভাড়া-করা ক্ষুদ্র ঘরটিতে দিন-রাত বোসে থাক, ডাক্তারি ও আইনের কেতাবের লম্বা লম্বা পরিচ্ছেদগুলো গলাধঃকরণ কর, Polly, Molly, Melly বর্গের সঙ্গে রসিকতার আদান প্রদান কর ও রাত্রি আড়াইটার পর বিছানায় গিয়ে নিদ্রা দাও। যদি তুমি স্বভাবত মিশুক লোক হও, তবে জোগাড় জাগাড় কোরে দুচারটে পরিবারের সঙ্গে কোন উপায়ে আলাপ কোরে নেও, কিন্তু পূর্ব্বকার মত সে রকম সমাদর আর নাই, ও ক্রমে ক্রমে হয় ত এমন দিন আস্‌তে পারে, যে দিন ভারতবর্ষের ইংরাজদের মত এখানকার ইংরাজেরাও আমাদের ঘৃণার চক্ষে দেখবেন, কিন্তু যদি সে দিন আসে, তবে ইংরাজদের দোষ দিও না। অনেক ভারতবর্ষীয় এখেনে এসে যে রকম অন্যায় ব্যবহার কোরে গেছেন, তা' আমি লিখতে চাইনে। ভারতবর্ষীয়দের সংখ্যা এখানে অত্যন্ত অল্প বোলে সে সকল কথা অধিক লোকের কাণে উঠে না; কিন্তু যখন ক্রমেই ভারতবর্ষ থেকে এখেনে যুবকদের যাতায়াত বৃদ্ধি পেতে লাগ্‌ল, যখন ক্রমেই তাঁদের দল পুষ্ট হোতে চোল্‌ল, তখন তাঁদের গুণাগুণ প্রকাশ হবার সম্ভাবনা বাড়তে লাগ্‌ল। এখন যেন তাঁরা মনে করেন যে তাঁরা যে সকল অন্যায়াচরণ কোর্ব্বেন তা'তে যে, কেবল মাত্র তাঁদের যশোহানি হবে তা'

নয়, তাঁরা তাঁদের স্বদেশ ও স্বজাতির ওপরে কলঙ্ক আনয়ন কোরবেন।

এইবার ইঙ্গ-বঙ্গদের একটি অতি অসাধারণ ও বিশেষ গুণ তোমাকে বলছি। এখানে যাঁরা যাঁরা আসেন, প্রায় কেউ কবুল করেন না যে, তাঁরা বিবাহিত। যুবতী কুমারী-সমাজে বিবাহিতদের দাম অত্যন্ত অল্প। অবিবাহিত না হোলে কোন যুবতীর উপরে তুমি ভালবাসা দেখাতে পার না, সুতরাং বিলাতের অর্দ্ধেক আমোদ ভোগ কোর্ত্তে পার না। অবিবাহিত বোলে পরিচয় দিলে এখানকার অবিবাহিতদের সঙ্গে মিশে অনেক যথেচ্ছাচার করা যায়, কিন্তু বিবাহিত বোলে জানলে তোমার অবিবাহিত সঙ্গীরা তোমাকে ও-রকম অনিয়ম কোরতে দেয় না; সুতরাং অবিবাহিত বোলে পরিচয় দিলে অনেক লাভ আছে!

যা' হোক্, এই সকল ত ইঙ্গ-বঙ্গের আচরণ। অনেক ইঙ্গ-বঙ্গ দেখতে পাবে তাঁরা হয় ত আমার এই বর্ণনার বহির্গত। কিন্তু সাধারণতঃ ইঙ্গ-বঙ্গদের লক্ষণগুলি আমি যত দূর জানি তা' লিখেছি। আমার নিতান্ত ইচ্ছা, ভবিষ্যতে যে সকল বাঙ্গালীরা বিলেতে আসবেন তাঁরা যেন আমার এই পত্রটি পাঠ করেন। বাঙ্গালীদের নামে যথেষ্ট কলঙ্ক আছে, কিন্তু তাঁরা যেন সে কলঙ্ক আর না বাড়ান, তাঁরা যেন সে কলঙ্ক এ সাত সমুদ্র পরে আর রাষ্ট্র না করেন। জোন্মে অবধি শত শত নিন্দা, গ্লানি, অপমান নতশিরে সহ্য কোরে আসচি, এই দূর দেশে এসে একটু মাথা তোলবার অবকাশ পাওয়া যায়, এখানকার লোকেরা আমাদের অনেকটা সমান ভাবে ব্যবহার করে বোলেই আমাদের পদাঘাত জর্জ্জরিত মন একটু বল পেয়ে আত্মনির্ভর স্বাধীনতাপ্রিয়তা প্রভৃতি অনেক গুলি পৌরুষিক গুণ শিক্ষা করবার সুবিধে পায়; কিন্তু এখানেও দলে দলে এসে তোমরা যদি হীন ও নীচ ব্যবহার কোর্‌তে আরম্ভ কর, এখানকার লোকের মনেও বাঙ্গালীদের ওপর ঘৃণা জন্মিয়ে দেও, তা' হোলে এখেনেও তোমাদের কপালে সেই উপেক্ষা, সেই নিদারুণ ঘৃণা আছে! যে পথে যাবে, বাঙ্গালী বোলে তোমাদের দিকে সকলে আঙ্গুল বাড়াবে, যে সভায় যাবে, সভাস্থ লোকেরা তোমাদের দিকে তাচ্ছিল্যের ভ্রূকুঞ্চিত কটাক্ষ বর্ষণ কোরবে। বিলেতের কুহক গুলি আগে থাক্‌তে তোমাদের চক্ষে ধোর্‌লেম, যখন বিলেতে আস্‌বে, তখন সাবধানে পদ ক্ষেপ কোরো! ইঙ্গ-বঙ্গদের দোষ গুলিই আমি বিস্তৃত কোরে বর্ণনা কোর্‌লেম, কেন না লোকে গুণের চেয়ে দোষগুলিই অতি শীঘ্র ও সহজে অনুকরণ করে।

যাহোক্ বাঙ্গালীরা বিলাতের কামরূপে রূপান্তর ধারণ কোরে দেশে ফিরে চোল্লেন। এখন তাঁদের একটা ভয় হোচ্চে, পাছে বিলাতে আস্‌বার আগে তাঁদের যে সকল বন্ধু ছিলেন, তাঁর কাছে ঘেঁসে তাঁদের সঙ্গে আলাপ কোর্ত্তে আসেন। দেশে গিয়ে তাই তাঁদের বিশেষ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ কোর্‌তে হয়। কারো বা অত্যন্ত ভাবনা হোচ্চে, দেশে গিয়ে কাকাকে কি কোরে প্রণাম কোর্‌ব? কারো বা তাঁর স্ত্রীর ঘোমটাচ্ছন্ন মুখ কল্পনায় এসে আপাদমস্তক জ্বোলতে আরম্ভ কোরেছে! যা' হোক, দেশেত পৌঁছলেন। তাঁর স্ত্রীকে যথাসাধ্য পালিশ ও বার্ণিষ কোরে "নেটিব" কাকেদের দল ছেড়ে ইংরেজ ময়ূরের দলে মিশতে চোল্লেন। আগে কে জান্‌ত বল যে, সেখানে গিয়ে অত ঠোকর খাবেন! ভারতীতে

"ভারতবর্ষীয় ইংরাজ" বোলে প্রবন্ধের এক জায়গায় লেখা আছে ;—

"আমরা বিলাতে যে, এই সকল চাকচিক্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাই, তাহা আশ্চর্য্য নহে। এদেশে আমাদের চক্ষে এ সকল সচরাচর পতিত হয় না বলিয়া আমরা এক প্রকার সুস্থির থাকি ; ইংলণ্ডে গিয়া ইংরেজ-মহলে প্রবেশ করিয়া আমাদের মস্তক এমন ঘূর্ণিত হইয়া যায় যে, আপনাকে আপনারা স্থির রাখিতে পারি না। স্বদেশের প্রতি মমতা চলিয়া যায়, দেশীয়দিগের উপর অসভ্য বর্ব্বর বলিয়া ঘৃণা জন্মে। যাহা ইংরাজী তাহাই সেব্য,যাহা দেশীয় তাহাই ত্যাজ্য! হায়! ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের চক্ষু ফোটে, আমরা দেখিতে পাই, এ জাদুর রাজ্য আমাদের নহে, আমরা যে ইংরাজের পদধূলি লইতে যাই, তাহাদের পদাঘাত পাইয়া অবশেষে আমাদের চৈতন্য হয়!"

ভারতবর্ষে,গিয়ে ইঙ্গ-বঙ্গদের কি রকম অবস্থা হয় সে বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতাও নেই বক্তব্যও নেই। কিন্তু কিছু কাল ভারতবর্ষে থেকে তার পরে ইংলণ্ডে এলে কি রকম ভাব হয় তা' আমি অনেকের দেখেছি। তাঁদের ইংলণ্ড আর তেমন ভাল লাগে না ; অনেক সময়ে তাঁরা ভেবে পান না, ইংলণ্ড বোদ্‌লেছে, কি তাঁরা বোদলেছেন! আগে ইংলণ্ডের অতি সামান্য জিনিষ যা' কিছু ভাল লাগ্‌ত এখন ইংলণ্ডের শীত, ইংলণ্ডের বর্ষা তাঁদের ভাল লাগ্‌চে না, এখন তাঁরা ভারতবর্ষে ফিরে যেতে হোলে দুঃখিত হন না। তাঁরা বলেন, আগে তাঁদের ইংলণ্ডের Strawberry ফল অত্যন্ত ভাল লাগত. এমন কি, তাঁরা যত রকম ফল খেয়েছেন, তার মধ্যে straw-berryই তাঁদের সকলের চেয়ে স্বাদু মনে হোত। কিন্তু এই কয় বৎসরের মধ্যে straw-berryর স্বাদ বোদলে গেল না কি! এখন দেখছেন straw derryর চেয়ে অসংখ্য দিশি ফল তাঁদের ভাল লাগে। আগে Devon shire-এর ক্ষীর তাঁদের এত ভাল লাগতে যে, তার আর কথা নেই, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এখন দেখছেন আমাদের দেশের ক্ষীর তার চেয়ে ঢের ভাল লাগে। প্রথম বারে বিলেতের মুখ যে রকম দেখাচ্ছিল, এবারে ঠিক সে রকম দেখাচ্ছে না। কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! কিন্তু এর ভিতরে আমি তত আশ্চর্য্য কিছু দেখছিনে! এ রকম হবার কতকগুলি কারণ আছে। প্রধান কারণ হোচ্চে, বিলেত থেকে গিয়ে বিলেত ফেরতেরা সম্পূর্ণ বিলিতি চালে চলেন। তাঁদের গৃহসজ্জা বিলিতি রকমের, বিলিতি বস্ত্র পরিধান, দগ্ধ গোষ্পদ সেবন, তাঁদের স্ত্রী পরিবারদের ইংরিজি ভাবের আচার ব্যবহার ; সুতরাং বিলেতের বাহ্য চাকচিক্য চোখে সোয়ে গেলে এখেনে আর তেমন কিছু জিনিষ থাকে না, যা' দেখে তাঁদের ধাঁধা লেগে যায়। তা' ছাড়া তাঁরা ভারতবর্ষে গিয়ে স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে সংসারী হোয়ে পড়েন, রোজগার কোর্ত্তে আরম্ভ করেন, ভারতবর্ষের মাটিতে তাঁদের শিকড় একরকম বোসে যায়। ভারতবর্ষীয়দের একটু বয়স হোলেই তাঁদের মন কেমন শিথিল হোয়ে যায়, তখন তাঁরা পায়ের ওপর পা দিয়ে টানা পাখার বাতাস খেয়ে কোন প্রকারে দিন কাটিয়ে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত থাকেন। বিলেতে আমোদ ও বিলাসভোগ কোর্ত্তে গেলেও অনেক উদ্যমের আবশ্যক করে। এখানে এঘর থেকে ওঘরে যেতে হোলে গাড়ি চলে না, হাত পা নাড়তে চাড়তে দশটা চাক-

রের ওপর নির্ভর কোরলে চলে না। কেন না এখানে গাড়ি-ভাড়া অত্যন্ত বেশী, আর চাকরের মাইনে মাসে সাড়ে তিন টাকা নয়। এখানে একটা থিয়েটার দেখতে যাও; সন্ধ্যে বেলা বৃষ্টি পোড়েছে, পথে কাদা, একটা ছাতা ঘাড়ে কোরে মাইল কতক ছুটোছুটি কোরে তবে ঠিক সময় পৌছতে পার্ব্বে, যখন রক্তের তেজ থাকে, তখন এ সকল পেরে ওঠা যায়। যখন ছোট্ট নৌকাটির মত হাল্কা থাকা যায়, তখন পালে একটু বাতাস লাগলেই, জলে একটু তরঙ্গ উঠলেই টলমল্ কোর্‌তে থাকা যায়, কিন্তু যখন স্ত্রী, পুত্র, কাজ, কর্ম্ম নিয়ে ভারগ্রস্ত হোয়ে পড়া যায়, তখন আর, একটি অবলার একটি দীর্ঘ নিশ্বাসে উল্টে পোড়তে হয় না, ও একটি অশ্রুজলধারায় নৌকা ডুবি হয় না।

আমার চিঠি ক্রমেই বেড়ে যাচ্চে। আমার স্কন্ধে যখন উপদেশ—দানেচ্ছা চাপে, তখন আমি ঝট কোরে কলম থামাতে পারিনে; কিন্তু আর এক অক্ষরও লিখচিনে, এই খানেই থামা যাক্। কিন্তু আর একটি কথা না বোলে থাক্‌তে পারচিনে। দেশ থেকে—আমার কোন মান্য বন্ধু শিখরিণীচ্ছন্দে একটা কবিতা পাঠিয়ে দিয়েছেন, সেইটে তোমাকে না শুনিয়ে নিশ্চিন্ত হোতে পারচিনে। সেইটে শোনা শেষ হোলেই নিষ্কৃতি পাবে।

"বিলাতে পালাতে ছটফট্ করে নব্য-গৌড়ে,
অরণ্যে যে জন্যে গৃহগ-বিহগ-প্রাণ দৌড়ে।
স্বদেশে কাঁদে সে, গুরুজন-বশে কিছু হয় না,
বিনা হ্যাটটা কোটটা ধুতি-পিরহনে মান রয় না।
পিতা,মাতা,ভ্রাতা,নব-শিশু অনাথা, হুট্ কোরে,
বিয়াজে জাহাজে মসি-মলিন কোর্ত্তা বুট পোরে।
সিগারে উদ্গারে মুহু মুহু মহা ধূম্রলহরী,
সুখ-স্বপ্নে আপ্নে বড় চতুর মানে হরি হরি।
ফিমেলে ফী মেলে অনুনয় করে বাড়ি ফিরিতে,
কি তাহে, উৎসাহে মগন তিনি সাহেব গিরিতে।
বিহারে নীহারে বিবিজন সনে স্কেটিঙ করি,
বিষাদে প্রাসাদে দুখিজন রহে জীবন ধরি।
ফিরে এসে দেশে গল-কলর (collar) বেশে
হটহটে,
গৃহে ঢোকে রোখে, উলগ-তনু দেখে বড় চটে।
মহা আড়ী সাড়ী নিরখি, চুল দাড়ী সব ছিঁড়ে
ছুটা-লাথে ভাতে ছরকট করে আসন পিঁড়ে।

এই কবিতাটি যদি সংস্কৃত ছন্দে না পোড়তে পার, তা'হলে এর মস্তক ভক্ষণ করা হবে। অতএব নিতান্ত অক্ষম হোলে বরঞ্চ একজন ভট্টাচার্য্যের কাছে পড়িয়ে নিও, তা' যদি না পার, তবে এ কবিতাটি তুমি না হয় পোড় না। ইতি।

ষষ্ঠ পত্র।

আমাদের ব্রাইটনের বাড়িটি সমুদ্রের কাছে একটি নিরালা জায়গায়, এক সার ২০।২৫টি বাড়ি, বাড়িগুলির নাম হোচ্চে Medina Villas। Villa শুন্‌লে তোমাদের হঠাৎ মনে হবে বাগান-বাড়ি; আমি লণ্ডন থেকে যখন প্রথম শুনলুম যে, আমরা মেদিনা ভিলায় বাস কোর্‌তে যাচ্চি তখন কত কি কল্পনা কোরেছিলুম তা'র ঠিক নেই, বাগান, গাছ, পালা ফল, ফুল, মাঠ, সরোবর ইত্যাদি। বাড়িতে এসে যে দিকে চেয়ে দেখি, সেই দিকেই বাড়ি, ঘর, রাস্তা, গাড়ি, ঘোড়া, "ভিলা"র মধ্যে আমাদের বাড়ির সামনে দু চার হাত জমীতে দু চারটে গাছ পোঁতা আছে। বাড়ির দরজায় একটা লোহার কড়া knocker লাগানো আছে, সেইটেতে ঠক্

ঠিক্ কোর্‌লেম, আমাদের Land lady এসে দরজা খুলে দিলে। আমাদের দেশের তুলনায় এখানকার ঘরগুলো লম্বা চৌড়া ও উঁচুতে ঢের ছোট। ছোট ছোট ঘরগুলো চারিদিকে জানালা বন্ধ, একটু বাতাস আস্‌বার যো নেই; কেবল জান্‌লা গুলো সমস্ত কাচের বোলে আলো আসে। শীতের পক্ষে এরকম ছোট খাটো ঘর গুলো খুব ভাল, একটু আগুনে জাল্‌লেই সমস্ত বেশ গরম হোয়ে উঠে; কিন্তু তা' হোক,—যে দিন মনে কর মেঘে চারিদিক অন্ধকার হোয়ে গেছে, টিপ্ টিপ্ কোরে বৃষ্টি পোড়ছে, তিন চার দিন ধোরে মেঘ বৃষ্টি অন্ধকারের এক মুহূর্ত্ত বিরাম নেই, সে দিন এই ছোট্ট অন্ধকার ঘরটার এক কোণে বোসে আমার মনটা অত্যন্ত বিগড়ে যায়, কোন মতে সময় কাটে না: এক, দুই, তিন কোরে গুণে গুণে দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে সময় কাটাতে ইচ্ছে করে। খালি আমি বোলে নয়, আমার ইংরেজ আলাপীরা বলেন, সে রকম দিনে তাঁদের অত্যন্ত Swear করার প্রবৃত্তি জন্মায় Swear করা রোগটা সম্পূর্ণ য়ুরোপীয়, সুতরাং ওর বাঙ্গালা কোন নাম নেই, মনের ভাবটা অধার্ম্মিক হোয়ে ওঠে। ঘর গুলো যদি আরো একটু বরাজ হোত, তা হোলেও মনের এরকম খুঁৎ খুঁতে ভাব অনেকটা দূর হোত। ছোট হোক্ ঘর গুলো যথেষ্ট সাজানো; ছবি, টেবিল, চৌকি, কৌচ, ফুলদানি, পিয়ানো-ইত্যাদি গৃহ-সজ্জা। প্রায় প্রতি ঘরে এক একটা বড় বড় আয়না আছে, খেতে শুতে বোস্‌তে নিজের মুখ দেখতে পাওয়া যায়, সুশ্রী মানুষের পক্ষে এরকম মন্দ নয়, কিন্তু প্রতি পদে এই কালো মূর্ত্তি দেখলে আয়না গুলো ভেঙ্গে ফেল্‌তে ইচ্ছে করে, যত মনে করি সাহেব হোয়েছি, "নেটিব" ত্ব যতই ভুলে যেতে চেষ্টা করি, ততই যে ঘরে যাই, চারদিক থেকে আয়না গুলো আমাদের কালো মুখ প্রকাশ কোরে যেন ভেংচোতে থাকে; এক এক সময় জ্বালাতন হোয়ে উঠতে হয়। এখানকার বাড়িগুলো আমাদের দেশের কোঠা বাড়ির মত তেমন মজবুৎ নয়, বাড়ির অধিকাংশ কাঠের; আমাদের দেশে এরকম বাড়ি হোলে বোধ হয় উয়ে হজম কোরে ফেলে, বাতাসের ফুঁয়ে উড়ে যায়। যা' হোক্ এখানকার ঘর দুয়ারগুলি বেশ পরিষ্কার কোরে রাখে; বাড়ির ভিতরে প্রবেশ কোরলে আর কোথাও এক তিল ধূলো দেখবার যো নেই, মেজের সর্ব্বাঙ্গ কার্পেট প্রভৃতি দিয়ে মোড়া, সিঁড়িগুলি পরিষ্কার তক্ তক্ কোরচে, কোথাও একটুখানি দাগ নেই। আমাদের পরিষ্কারভাব বোলে যেন একটা স্বতন্ত্র মনোবৃত্তি আছে। চোখে দেখতে খারাপ হোলে এরা সইতে পারে না। প্রতি সামান্য বিষয়ে এদের ভাল দেখতে হওয়াটা প্রধান আবশ্যক। প্রতি পদে এরা সৌন্দর্য্য-চর্চ্চা করে। এখানকার পুরুষেরা টুপি খুলে সম্মান প্রদর্শন করে, কিন্তু এমন কোরে খোলে, যা'তে সেই সামান্য টুপি খোলতেও শ্রী প্রকাশ পায়। বিশেষতঃ এখানকার মেয়েরা প্রতি হাত পা নাড়ায় শ্রীর প্রতি লক্ষ্য করে। কিছু নেবার জন্যে হাত বাড়ালে এমন কোরে বাড়ায়, যাতে সুন্দর দেখায়, খাবার সময়ে এতটুকু মুখ মোছে, যা'তে খারাপ না দেখায়, পাছে লম্বা পদক্ষেপ হয় বোলে বিবিদের এক রকম নূতন ফেসানের কাপড় উঠেছে তা'তে তা'দের হাঁটুর কাছটা বাঁধা থাকে। এমন কি আমি সম্প্রতি দুই একটা কাগজে দেখতে পাই, একজন কাপড়ওয়ালা খুব ভাল দেখতে mourning dressএর

বিজ্ঞাপন দিয়েছে, শোকবস্ত্রও সুশ্রী দেখতে হওয়া আবশ্যক। দোকান থেকে যা কিছু জিনিষ আসে, তা' সুশ্রী কোরে মোড়া থাকে, দোকানদারেরা এরকম কোরে মোড়ার খরচটা অপ্রয়োজনীয় মনে করে না, যা' দুদণ্ডের বেশী ব্যবহার কোর্ত্তে হবে না তা'ও সুন্দর দেখতে হওয়া আবশ্যক। এই রকম প্রতি পদে এদের শিল্প-চর্চ্চার উন্নতি হয়। প্রথম হয়ত এই রকম সুশ্রী অঙ্গ-চালনা প্রভৃতি অভ্যাস-সাধ্য, কিন্তু ক্রমে সেটা স্বাভাবিক হোয়ে যায়, ও বংশাবলী ক্রমে সংক্রামিত হোতে থাকে। এরকম শিল্প-চর্চ্চার ভাব খুব ভাল তা'র আর সন্দেহ নেই, কিন্তু একটা স্বতন্ত্র পরিষ্কারের ভাব থাকাও আবশ্যক। এখানকার লোকেরা খাবার পরে আঁচায় না, কেননা আঁচানো-জল মুখ থেকে পোড়্‌চে, সে অতি কুশ্রী দেখায়, শ্রী হানি হয় বোলে পরিষ্কার হওয়া হয় না। এখানে যে রকম কাশী সর্দ্দির প্রাদুর্ভাব, তা'তে ঘরে একটা পিক্‌দানি নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু সে অতি কুশ্রী পদার্থ বোলে ঘরে রাখা হয় না, রুমালে সমস্ত কাজ চলে। আমাদের দেশের যে রকম পরিষ্কার-ভাব, তা'তে আমরা বরঞ্চ ঘরে একটা পিক্‌দানি রাখতে পারি, কিন্তু জামার পকেটে এরকম একটা বীভৎস পদার্থ রাখিতে ঘৃণা হয়। কিন্তু এখানে চোখেরি আধিপত্য। রুমাল কেউ দেখতে পাবে না তা' হোলেই হোল। চুলটি বেশ পরিষ্কার কোরে আঁচড়ানো থাক্‌বে, মুখটি ও হাত দুটি বেশ সাফ থাক্‌বে, তা'হোলেই লোকে সন্তুষ্ট থাকে, স্নান করবার বিশেষ আবশ্যক নেই। এখানে জামার উপরে অঙ্গাচ্ছ অনেক কাপড় পরে বোলে জামার সমস্তটা দেখা যায় না, খালি বুকের ও হাতের কাছে একটু বেরিয়ে থাকে; এক্‌রকম জামা আছে, তার যতটুকু বেরিয়ে থাকে ততটুকু জোড়া দেওয়া, সে টুকু খুলে ধোবার বাড়ি দেওয়া যায়; তাতে সুবিধে হোচ্চে যে, ময়লা হোয়ে গেলে জামা বদলাবার কোন আবশ্যক করে না, সেই জোড়া টুক্‌রো গুলো বদ্‌লালেই হোল। এখানকার দাসীদের কোমরে এক apron বাঁধা থাকে, সেইটি দিয়ে তাঁরা না পোঁছেন এমন পদার্থ নেই; খাবার কাচের প্লেট যে দেখছ ঝক্ ঝক্ কোরচে, সেটিও সেই সর্ব্ব-পাবক apron টি দিয়ে মোছা হোয়েছে কিন্তু তা'তে কি হানি, দেখতে তো কিছু খারাপ দেখাচ্ছে না। এখান্‌কার লোকেরা কিছু অপরিষ্কার নয়, আমাদের দেশে যা'কে "নোংরা" বলে, তাই। আমাদের দেশের পরিষ্কার ও এখানকার পরিষ্কারের একটা মিলন হোলেই বেশ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মিলন হয়। ভাল দেখতে হওয়ার প্রতি আমাদের অত্যন্ত কম লক্ষ্য; কিন্তু তার প্রধান কারণ আমরা গরীব। শিল্পের দিকে মনোযোগ দেবার আমাদের অবসর নেই। এখানে পরিষ্কার ভাবের যে অভাব আমরা দেখতে পাই, সে অনেকটা শীতের জন্যে। আমরা যে কোন জিনিষ হোক্‌না কেন, জল দিয়ে পরিষ্কার না হোলে পরিষ্কার মনে করিনে। এখানে অত জল নিয়ে নাড়াচাড়া পোষায় না। তা' ছাড়া শীতের জন্ত এখানকার জিনিষপত্র শীঘ্র "নোংরা" হোয়ে ওঠে না। আমাদের দেশে প্রায় সর্ব্বদা গা খোলা থাকে, তা' ছাড়া গর্ম্মিতে এমন অপরিষ্কার হোয়ে উঠ্‌তে হয় যে, না নাইলে তিষ্ঠোবার যো নেই। এখানে শীতেও গায়ের আবরণ থাকাতে শরীর তত অপরিষ্কার হয় না। এখানে জিনিষ পত্র পোচে ওঠে না, এই রকম পরিষ্কারের পক্ষে নানা বিষয়ে সুবিধে। আমাদের দেশে যে রকম পরিষ্কারের ভাব

আছে, তেমনি পরিষ্কার হওয়ার বিষয়ে অনেক কুসংস্কারও আছে। মনে কর আমাদের দেশের পুষ্করিণীতে কি না ফেলে? সে তৈলাক্ত অপরিষ্কার জলকুণ্ডে স্নান কোরলে আবার স্নান করবার আবশ্যক হয়। তেল মেখে জলে দুটো ডুব দিলেই আমরা গা সাফ হোল মনে করি। আমরা নিজের শরীর ও খাওয়া দাওয়া সংক্রান্ত জিনিষের বিষয়ে বিশেষ পরিষ্কার থাকি, কিন্তু ঘর দুয়ার যথোচিত পরিষ্কার করিনে। আমাদের চারদিক এই রকম অপরিষ্কার থাকে বোলে আমাদের স্বাস্থ্যও খারাপ। যা' হোক্, এবিষয়ে আর অধিক বক্তৃতা দেব'না। অন্যান্য দুই এক কথা বলি।

আমাদের দুই একটি কোরে আলাপী হোতে লাগল। ডাক্তার M একজন আধবুড়ো চিকিৎসা ব্যবসায়ী। তিনি একজন প্রকৃত ইংরাজ, ইংলণ্ডের বহির্ভূত কোন জিনিষ তাঁর পছন্দসই নয়। তাঁর কাছে ক্ষুদ্র ইংলণ্ডই সমস্ত পৃথিবী, তাঁর কল্পনা কখনো Dover Channel পার হয় নি। আমাদের তিনি অত্যন্ত কৃপাচক্ষে দেখতেন, বোধ হয় তার প্রধান কারণ, আমাদের ইংলণ্ডে জন্ম হয় নি। তাঁর কল্পনার এমন অভাব যে, তিনি মনে কোর্ত্তে পারেন না, যারা Ten commandments মানে না, তাদের মিথ্যে কথা বোলতে কি কোরে সঙ্কোচ হোতে পারে? খৃষ্ট লোকদের নীতির বিরুদ্ধে এই তাঁর প্রধান যুক্তি। যে ইংরাজ নয়, যে খৃষ্টান নয়, এমন একটা অপূর্ব্ব সৃষ্টি দেখলে তাঁর কল্পনা অত্যন্ত বিহ্বল হোয়ে পড়ে, তা'র মনুষ্যত্ব কি কোরে থাকতে পারে ভেবে পান না। তা'র motto হোচ্চে Cladly he would learn and gladly teach কিন্তু আমি দেখলুম তাঁর learn করবার চেষ্টা আছে, কিন্তু teach করবার মত সম্বল খুব কম। তাঁর স্বদেশীয় সাহিত্যের বিষয়ে তিনি আশ্চর্য্য কম জানেন; কতকগুলি মাসিক পত্রিকা পোড়ে তিনি প্রতি মাসে দুই চারিটি কোরে ভাসা ভাসা জ্ঞান লাভ করেন। ক্রমশঃ জানতে পারলুম, তিনি আমাদের মনে মনে uneducated বোলে জানেন, কেন না তিনি কল্পনা কোরতে পারেন না একজন Indian কি কোরে educated হোতে পারে? এখানকার বিবিরা শীতকালে হাত পা গরম রাখবার জন্যে এক রকম গোলাকার পদার্থের মধ্যে হাত গুঁজে রাখে তা'কে muff বলে, প্রথম বিলেতে এসে সেই অপূর্ব্ব পদার্থ যখন দেখি, তখন Dr. M কে সে দ্রব্যটা কি জিজ্ঞাসা করি! আমার প্রশ্ন শুনে তিনি আকাশ থেকে পোড়লেন, moff পদার্থটা আমি জানিনে শুনে তিনি ভেবে খুন। এর চেয়ে education-এর অভাব কি হোতে পারে বল? moff বোলে একটা সামান্য পদার্থ, যা বিলেতের একটা সামান্য অশিক্ষিত চাষা পর্যন্ত দেখলে বোলে দিতে পারে তা' আমি জানিনে! এমন ভয়ঙ্কর তোঁতা কল্পনা আমি আর কখনো দেখিনি। কিন্তু আমি এখানকার অনেক লোকের রোগ দেখিছি, তাঁরা আশা করেন, আমরা তাঁদের সমাজের প্রতি ছোট খাটো বিষয় জানব। একদিন একটা নাচে গিয়েছিলুম, একজন বিবি আমাকে জিজ্ঞাসা কোরলেন, "বধূটিকে (Bride) তোমার কি রকম লাগছে?" আমি জিজ্ঞাসা কোরলুম, "নব-বধূটি কে? অতগুলি মেয়ের মধ্যে একজন নব-বধূ কোথায় আছেন তা' আমি কিছুই জানতুম না। শুনে সে বিবিটি একেবারে আশ্চর্য্য

হোয়ে গেলেন, তিনি বোল্লেন "তা'র মাথায় orange blossom দেখে চিন্‌তে পারনি ?" আমার অপ্রস্তুত হবার কোন কথা হল না, কিন্তু বিবিটি যে রকম আশ্চর্য্য হোয়ে উঠে ছিলেন, তাতে আমাকে খানিকটা অপ্রস্তুত হোতে হোল। থতমত খেয়ে আমি জিজ্ঞাসা কোরলুম "ওঁর স্বামী সঙ্গে এয়েছেন ?" বিবিটি একটু বিরক্ত হোয়ে বোল্লেন "স্বামী আসেন নি ! নব-বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে স্বামী নেই !" আমি ভয় পেয়ে ভাব্‌লেম, আর অধিক প্রশ্ন করা শ্রেয় নয়। বিবিটি ভাব্‌লেন, "কোথাকার একটা নিউজিলাণ্ডরের সঙ্গে কথা কচ্চি ; এ orange blossom দেখে bride চিন্‌তে পারে না, আবার জিজ্ঞাসা করে, bride এর সঙ্গে স্বামী এয়েছে কিনা ! shocking ! !" তাঁরা মনে করেন,এত সামান্ত বিষয় আমাদের আত্ম-প্রত্যয় থেকে জানা উচিত। এই রকম এখানকার অনেক লোকের ভাব দেখিছি। যা হোক Dr. M এর কাছে এই রকম অনেক বিষয়ে আমার education এর অভাব প্রকাশ পেয়েছিল। তিনি সহজেই মনে কোরেছিলেন, "যে ব্যক্তি Muff কাকে বলে জানে না সে যে Shakespeare পোড়েছে সে একেবারে absurd !"

দুই মিস্‌ K-র সঙ্গে আলাপ হোলো। তাঁরা এখানকার পাদ্রির মেয়ে ! পাড়ার পরিবারদের দেখাশুনো, Sunday school-এর বন্দোবস্ত করা, working men দের জন্তে Temperance সভা স্থাপন ও তাদের আমোদ দেবার জন্তে সেখানে গিয়ে গান বাজনা করা,—এই সকল কাজে তাঁরা দিন রাত্রি ব্যস্ত আছেন। বিদেশী বোলে আমাদের তাঁরা অত্যন্ত যত্ন কোর্ত্তেন। নগরে কোথাও আমোদ উৎসব হোলে আমাদের খবর দিতেন, আমাদের সঙ্গে কোরে নিয়ে যেতেন, অবসর পেলে সকালে কিংবা সন্ধ্যে বেলায় এসে আমাদের সঙ্গে গল্প কোর্ত্তেন, ছেলেদের নিয়ে গিয়ে মাঝে মাঝে গান শেখাতেন, এক এক দিন তাঁদের সঙ্গে রাস্তায় বেড়াতে যেতুম। এই রকম আমাদের যথেষ্ট যত্ন ও আদর কোর্ত্তেন। বড় Miss K—অত্যন্ত ভাল মানুষ ও গম্ভীর। একটা কথার উত্তর দিতে কেমন থতমত খেতেন। "হাঁ—না—তা হবে—জানিনে" এই রকম তাঁর উত্তর। এক এক সময় কি বোলবেন ভেবে পেতেন না, এক এক সময় একটা কথা বোল্‌তে বোল্‌তে মাঝ খানে থেমে পোড়্‌তেন, আর কথা যোগাত না, সুতরাং বাকি টুকু আমাদের কল্পনার ওপর রেখে দিতেন। তাঁকে কোন বিষয়ে তাঁর মত জিজ্ঞাসা কোরলে তিনি বিব্রত হোয়ে পোড়তেন। তাঁকে যদি জিজ্ঞাসা করা যেত, "আজ কি বৃষ্টি হবে মনে হোর্চ্চে ?" তিনি বোল্‌তেন, "কি কোরে বল্‌ব।" তিনি বুঝতেন না সে বিষয়ে আমরা তাঁর মুখ থেকে একথা অভ্রান্ত বেদবাক্য শুন্‌তে চাচ্চিনে, তিনি কি আন্দাজ করেন তাই জান্‌তে চাচ্চি। কিন্তু তিনি আন্দাজ কোর্ত্তে নিতান্ত নারাজ। ছোট Miss K-র মত প্রশান্ত প্রফুল্লতার ভাব আর দেখি নি। একটি মূর্ত্তিমান সন্তোষের ভাব। দেখে মনে হয় কোন কালে তাঁর মনের কোন খানে এক তিল আঁচড় পড়েনি। খুব ভাল মানুষ, সর্ব্বদাই হাসি খুসি গল্প। কাপড় চোপড়ের আড়ম্বর নেই—কোন প্রকার ভাণ নেই ; অত্যন্ত সাদাসিদে।

ডাক্তার M এর বাড়িতে এক দিন আমাদের সান্ধ্য-নিমন্ত্রণ হোল। এখানকার নেমন্তন্নে আমাদের দেশের মত খাওয়াই মুখ্য

উদ্দেশ্য নয়। লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয়, গান বাজনা আমোদ প্রমোদের জন্তই দশ জনকে ডাকা হয়। আমরা সন্ধ্যের সময় গিয়ে হাজির হোলুম। একটি ছোট ঘরে অনেকগুলি মহিলা ও পুরুষের সমাগম হোয়েছে। ঘরে প্রবেশ কোরে কর্ত্তা গিন্নিকে আমাদের সম্মান জানালুম। সমাগত লোকদের সঙ্গে যথাযোগ্য অভিবাদন সম্ভাষণ ও আলাপ হোল। ঘরে জায়গার এত টানাটানি ও লোক এত বেশী যে চৌকির অত্যন্ত অভাব হোয়েছিল; অধিকাংশ পুরুষে মিলে আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প জুড়ে দিয়েছিলুম। নূতন কোন অভ্যাগত মহিলা এলে গিন্নি কিংবা কর্ত্তা তাঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ কোরে দিচ্চেন, আলাপ হবা মাত্র তাঁর পাশে গিয়ে একবার বস্‌চি কিংবা দাঁড়াচ্চি ও দুই একটা কোরে কথা বার্ত্তা আরম্ভ কোর্‌চি। প্রায় weather নিয়ে কথা আরম্ভ হয়; মহিলাটি বোল্লেন Dreadful weather'।" সে বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ মতের ঐক্য হোল। তার পরে তিনি অনুমান কোল্লেন যে আমাদের পক্ষে অর্থাৎ Indanদের পক্ষে এমন weather বিশেষ trying ও আশা কোল্লেন আকাশ শীঘ্র পরিস্কার হোয়ে যাবে, ইত্যাদি। তার পরে এই সূত্রে নানা কথা উঠল আর কি। সভার মধ্যে দুই জন সুন্দরী উপস্থিত ছিলেন, বলা বাহুল্য যে, তাঁরা জান্‌তেন তাঁরা সুন্দরী। বিলাতে আত্ম সৌন্দর্য্যে-অনভিজ্ঞা যুবতী দেখবার যো নেই!! এখেনে সৌন্দর্য্যের পূজো হয়; এখেনে রূপ কোন মতে গুপ্ত থাক্‌তে পারে না, রূপাভিমান সুপ্ত থাক্‌তে পারে না; চার দিক থেকে প্রশংসার কোলাহল তাঁকে জাগিয়ে তোলে; রূপের আলো দেখবামাত্র ভক্তদের পতঙ্গ-হৃদয় চারিদিক্ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তাকে ঘিরে ফেলে ও রূপসী যে দিকে যান, সেই ফড়িঙ্গের দল তার চতুর্দ্দিকে লাফিয়ে চোল্‌তে থাকে। Ball room এ তাঁর দর অত্যন্ত চড়া; নাচে তাঁর সাহচর্য্য-সুখ পাবার জন্তে দরখাস্তের পর দরখাস্ত আস্‌চে; তাঁর রুমাল কুড়িয়ে দেবার জন্তে শত শত হাত প্রস্তুত; তাঁর তিল মাত্র কাজ কোরে দেবার জন্য শত শত কায়মনোবাক্যে দিবারাত্রি নিযুক্ত। রূপবান্ পুরুষদেরও যথোচিত আদর আছে, তারা এখানকার Drawing room-এর Darling হোয়ে ওঠে, যুবতীরা তাঁদের আদর দিয়ে দিয়ে অনর্থ কোরে তোলে। আমি দেখচি, একথা শুনে তোমার এখানে আসতে অত্যন্ত লোভ হবে। তোমার মত সুপুরুষ এখানকার মত রূপমুগ্ধ দেশে এলে এখানকার হৃদয়-রাজ্যে এত তাল্‌চুর লোকসান কোর্‌তে পার যে, একটা নিদারুণ করুণরসোদ্দীপক ব্যাপার হোয়ে ওঠে, তা'হোলে চতুর্দ্দিক "থেকে

"————————ঘন
নিশ্বাস প্রলয় বায়ু, অশ্রুবারি ধারা
আসার, জীমূত-মন্দ্র হাহাকার রব—"

তুলে দেও। তা হোলে তোমার হৃদয়টিকেও খরচের খাতায় লিখতে হয়; এত নিশ্বাস-প্রলয়-বায়ুতে ও অশ্রুবারিধারা-আসারে কেউ যদি টিঁকে থাক্‌তে পারেন, তা হোলে তেমন লোকের মন spirit-এ ডুবিয়ে যত্ন পূর্ব্বক preserve কোরে British museum-এ রেখে দেওয়া উচিত, তেমন মন ফরমাস দিলে পাওয়া যায় না। বিলেতে রূপের চেয়ে recommendation letter খুব কম আছে। এ রকম অবস্থায় রূপ কখনো লুকিয়ে থাক্‌তে পারে না। যা' হোক্ নিমন্ত্রণ সভায় Miss H বড় রূপসী-শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু তাঁরা

দুজনেই কেমন চুপচাপ গম্ভীর হোয়েছিলেন। বড় যে মেশামেশি হাসি খুসী তা' ছিল না। ছোট মিস একটা কৌচে গিয়ে হেলান দিয়ে বোসলেন, আর বড় মিস্ দেয়ালের কাছে এক চৌকি অধিকার কোরলেন। আমার বোধ হয়, তা'র কারণ আমরা দুই এক জন ছাড়া ঘরে আর কেউ যুবক ছিল না। তরুণ-নেত্র তাঁদের রূপ ও সাজসজ্জা যেমন উপভোগ কোরতে পারে, এমন ত আর চসমা-চক্ষু পারে না। যা হোক আমরা দুই এক জনে তাঁদের আমোদে রাখবার জন্যে নিযুক্ত হলুম। দুর্ভাগ্য ক্রমে আমি কথোপকথনশাস্ত্রে তেমন বিচক্ষণ নই, এখানে যাকে উজ্জ্বল (bright) বলে তা' নই, অনর্গল গল্প হাসি আসে না, ও আকারে, ইঙ্গিতে, কথার আভাসে আমি রূপসীকে জানিয়ে দিতে পারি নে যে, আমার চকোর-নেত্র তাঁর রূপের জ্যোৎস্না ও আমার কর্ণ-চাতক তাঁর বাক্য-ধারা পান কোরে স্বর্গ-সুখ ভোগ কোরচে। বরঞ্চ এক এক সময় তাঁরা আমার গম্ভীর মুখ ও সংক্ষিপ্ত কথাবার্ত্তা শুনে তার উল্টো স্থির করেন। এ রকম অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়; কেন না আমার হৃদয় বাস্তবিক অত্যন্ত "gallant," যদিও আমার বাইরের ভাব দেখলে লোকের মন ঠিক তা'র উল্টো সিদ্ধান্তে উপস্থিত হবে। গৃহ-কর্ত্তা এক জন সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞতাভিমানিনী প্রৌঢ়া মহিলাকে বাজাতে অনুরোধের জন্যে এতক্ষণ আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা কোরছিলেন। গৃহের মহিলাদের মধ্যে তাঁর বয়স সব চেয়ে বেশী, এই জন্যে তিনি সব চেয়ে বেশী সাজ গোজ কোরে এসেছিলেন, তাঁর দু হাতের দশ আঙুলে যত আংটি ছিল, সভাস্থ সকল লোকের আঙুলের আংটির সমষ্টি তার অর্দ্ধেক হবে— কিন্তু হাজার সাজ সজ্জা করুন, তিনি বেশ জানতেন যে, তাঁর রূপের বাজার সম্পূর্ণ দেউলে হোয়ে গেছে, সুতরাং তিনি আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা কোরছিলেন, কখন তাঁর বাজাবার অবসর আসবে। আমি যদি নিমন্ত্রণকর্ত্তা হোতুম আর আগে থাকতে না জানতুম যে, তিনি পিয়ানো বাজাতে পারেন, তা হোলে তাঁর দশ আঙুলের বিশটা আংটি দেখে আমি বুঝতে পারতুম যে, তিনি পিয়ানো বাজাবেন বোলে বাড়ি থেকে স্থির সংকল্প কোরে এয়েছেন। যখন একজন কোন বিখ্যাত বাজিয়ে আপনার কেরামতী দেখাবার জন্যে বাজাতে বসে, তখন তা' আমার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হোয়ে ওঠে। আমি এখানকার গান বা বাজনার টপ্পা বা খেয়াল বেশ বুঝতে পারি, এক একটা খুব ভাল লাগে, কিন্তু কালোয়াতি কোলাহলে এক একবার আমাকে অত্যন্ত অধীর কোরে তোলে। তাঁর বাজনা সাঙ্গ হোলে পর গৃহকর্ত্রী আমাকে গান গাবার জন্যে অনুরোধ আরম্ভ কোরলেন। আমি বড় মুস্কিলে পোড়লুম। আমি জানতুম, আমাদের দেশের গানের ওপর যে তাঁদের বড় অনুরাগ আছে তা' নয়; তবে আমাকে গান কোরতে বলবার তাৎপর্য্য কি? গৃহকর্ত্তা ও গৃহকর্ত্রী দুজনেই আমার গান পূর্ব্বে শুনেছিলেন, সে গান গুলো তাঁদের অত্যন্ত হাস্যজনক লেগেছিল, তাঁদের তাতে এত আমোদ বোধ হয়েছিল যে, বাড়িতে গিয়েই বর্ত্তা গিন্নিতে মিলে পরামর্শ কোরলেন যে আগামী নেমন্তন্নে এই কালো Indian টাকে চীৎকার করাতে হবে, তা হোলে অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গের পক্ষে সে ভারি একটা "treat" হবে! আমি মনে মনে সে সমস্তই জানি, কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে কি করি বল? যদি বা ভদ্রতার খাতিরও লঙ্ঘন কোর্ত্তে পার্ত্তেম, কিন্তু পাশ থেকে যখন সুন্দরী

Miss H তাঁর মিষ্টতম আদরের স্বরে বোল্লেন "Yes, do give us a song, Mr. T.!" তখন Mr T. বাক্য ব্যয় না কোরে গান গাও য়ার ভূমিকা স্বরূপ দুই একটি আরম্ভ সূচক কাশী-ধ্বনি কোরলেম। সমস্ত সভা শান্ত হোল। আমি ভাবতে লাগলুম, কি গান গাব। আমি নিজে যে গানগুলি ভাল বাসি, সে গুলিকে এমন উলুবনে ছড়াতে কেমন প্রাণে লাগে; সে গান গুলি শুনে যে সকলে হাস্‌বে, তা' আমি সহ্য কোর্ত্তে পার্ত্তুম না। একটা গান ত আরম্ভ কোরলেম। এমন শোচনীয় অবস্থায় আমি আমার জীবনে আর কখনো পড়িনি; কোন প্রকার কোরে গোটাকতক সুর ও কথার সমষ্টি গলার ভিতর থেকে বের কোরেছিলেম আর কি। সভাস্থ Miss ও Mrs, দের এত হাসি পেয়েছিল, যে, সে স্রোতের উচ্ছ্বাসে ভদ্রতার বাঁধ টলমল কোরছিল; কোন মতে তাঁরা হাসি গোপন কোর্ত্তে পারছিলেন না, কেউ কেউ হাসিকে কাশির রূপান্তরে পরিণত কোর্‌লেন; কেউ কেউ হাত থেকে কি যেন পোড়ে গেছে ভাণ কোরে ঘাড় নীচু কোরে হাসি লুকোতে চেষ্টা কোর্‌চেন, এক জন কোন উপায় না দেখে তাঁর পার্শ্বস্থ সহচরীর পিঠের পেছনে মুখ লুকোলেন; যাঁরা কতকটা শান্ত থাক্‌তে পেরেছিলেন, তাঁদের মধ্যে চোখে চোখে টেলিগ্রাফ চোলছিল। সেই সঙ্গীত-শাস্ত্র-বিশারদ ছোকরাটির মুখে এমন একটু মৃদু ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের হাসি লেগেছিল যে, সে দেখে শরীরের রক্ত জল হোয়ে আসে। এই রকম অবস্থায় আমার মত ভাল মানুষ যে কি দুরবস্থায় পোড়েছিল, তা, তোমারা বেশ কল্পনা কোর্ত্তে পারচ। গান যখন সাঙ্গ হোল তখন আমার মুখ কাণ লাল হোয়ে উঠেছে, কেবল কালো রঙ বোলে কেউ দেখতে পায় নি। চারিদিক থেকে একটা প্রশংসার কোলাহল উঠলো, কিন্তু অত হাসির পর আমি আর সে দিকে বড় কর্ণপাত কোর‍্লেম না। ছোট Miss H. আমাকে গানটা ইংরিজিতে অনুবাদ কোরে বোল্‌তে অনুরোধ কোরলেন, আমি অনুবাদ কোরলেম, গানটা হোচ্চে "প্রেমের কথা আর বোল না।" তিনি অনুবাদটা শুনে আমাকে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা কোরলেন, তোমাদের দেশে প্রেমের স্বাধীনতা আছে নাকি? ভারতবর্ষের লোকেরা হ্যাট্‌ কোট্‌ পরে কিনা, বোম্বে অবধি ইংরিজি কয় কিনা ও শীতকালে কখনো বরফের ওপরে Skate করে কিনা যিনি জান্‌তেন না, তিনি এ খবরটি কোথা থেকে পেয়েছেন! আমি ত মুস্কিলে পোড়ে গেলুম, নত শিরে দুই একটা আঁ। ার্ঁ। কোরলুম আর কি। যা হোক্‌ সেই সন্ধ্যার মধ্যে আমাকে দুবার গান কোরতে হোয়েছিল। এই রকম গান-বাজনা গল্পস্বল্প চোলতে লাগল। কতকগুলি রোমের ভগ্নাবশেষের ফোটগ্রাফ ছিল, সেই গুলি নিয়ে গৃহকর্ত্রী কতকগুলি অভ্যাগতকে জড় কোরে দেখাতে লাগলেন। ডাক্তার নূতন একটা Telephone কিনে এনেছেন; সেইটি নিয়ে তিনি কতক লোকের কৌতুহল তৃপ্ত কোরচেন। পাশের ঘরে টেবিলে খাবার সাজানো আছে। এক এক বার গৃহকর্ত্রী এসে এক একজন পুরুষের কাণে কাণে বোলে যাচ্চেন, Miss অথবা Mrs. অমুককে Supper খানে নিয়ে যাও; তিনি গিয়ে সেই মহিলার কাছে তাঁকে খাবার ঘরে নিয়ে যাবার অনুমতি প্রার্থনা কোরলেন ও তাঁর বাহুগ্রহণ কোরে তাঁকে পাশের ঘরে আহার স্থলে নিয়ে গেলেন। এ রকম সভায় সকলে মিলে একবারে খেতে যায় না, তার

কারণ তা' হোলে আমোদ প্রমোদের স্রোত অনেকটা বন্ধ হোয়ে যায়। একে একে সকলের খাওয়া হোয়ে যায়। এই রকম এক সঙ্গে পুরুষ মহিলা সকলে মিলে গান বাজনা গল্প আমোদ প্রমোদ আহারাদিতে একটা সন্ধ্যা কাটানো গেল।

আমরা একটা কোন বিশেষ অনুষ্ঠান বা উৎসবের সময়েই লোক জন একত্রে ডেকে খাওয়া দাওয়া করি। আমাদের মধ্যে পরস্পর মিলনের উপলক্ষ্য খুব কম। তা' ছাড়া, যাঁদের সভার অধিষ্ঠাত্রী করা উচিত, সেই মহিলারাই আমাদের নিমন্ত্রণ সভায় উপস্থিত থাকেন না। খাওয়া দাওয়াই হোচ্চে আমাদের প্রধান আমোদ, তা ছাড়া, আর বাকী যে সব আমোদ, যেমন বাইনাচ, যাত্রা, গান, প্রভৃতি সমস্তই ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্যে। কিন্তু ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির চেয়ে উচ্চতর আমোদ যে মানুষ পরস্পরে সমভাবে মিলে মেশামেশি করা, পরস্পর পরস্পরকে আমোদ দেবার জন্যে নিজের সমস্ত গুণ প্রকাশ করা, পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে প্রশংসা ও মমতা পাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা, সে সকল আমাদের মধ্যে নেই। কতকগুলো নীচ শ্রেণীর ভাড়াটে মেয়ে বা এক ব্যক্তিবের জন্যে ধার করা গাইয়ে যখন অবস্তু অঙ্গ-ভঙ্গী কোরচে, বা ভাবসম্পর্ক-শূন্য রাগিণী ভাঁজচে, তখন আমরা এক দল নিমন্ত্রিত লোক হাঁ কোরে তাকিয়ে থাকি, ও "বাহবা বাহবা" করি। কিন্তু পরস্পরকে আমোদ দেবার জন্যে আমরা সকলে মিলে গান বাজনা আমোদ প্রমোদ করিনে। এই রকম কেনা বা ভাড়া করা আমোদ আমরা নাট্যশালা বা রঙ্গভূমিতে প্রত্যাশা করি; কিন্তু যখন একজন বন্ধুর বাড়িতে জড় হোয়েছি, তখন সকল ভদ্রলোকে মিলে পরস্পরের মধ্যে বন্ধুতা ও সদ্ভাবের চর্চ্চা করাই উচিত। আমরা যখন বাইনাচ দেখা, গান শোনা বা ঐ রকম কোন আমোদের জন্যে একত্র হই, তখন মনে হয় কতকগুলো লোক একটা নাট্য-গৃহে গেছে, কেবল প্রভেদের মধ্যে সেখেনে টিকিট কিনতে হয় না। সে রকম নিমন্ত্রণ-সভায় গেলে, মানুষ যে সামাজিক জীব, সে কেবল কতকগুলো প্রাণী আঁচড়া আঁচড়ি না কোরে একত্রে রোয়েছে দেখেই বোধ হয়। পরস্পরকে আমোদের জন্যে পরস্পরের উপর নির্ভর কোরতে হয় না। একজন গান কোরচে বা নাচচে আমরা সকলে মিলে শুনছি বা দেখছি, যদি নিজের নিজের বাড়িতে বাড়িতে বোসে শোনা বা দেখা যেত, তা হোলে আমরা পরিশ্রম স্বীকার কোরে এক জায়গায় জড় হোতেম না। মেয়ে পুরুষে একত্রে মিলে আমোদ প্রমোদ করাই ত স্বাভাবিক। মেয়েরা ত মনুষ্যজাতির অন্তর্গত, ঈশ্বর ত তা'দের সমাজের এক অংশ কোরে সৃষ্টি কোরেছেন। মানুষে মানুষে আমোদ প্রমোদে মেশামেশি করাকে একটা মহাপাতক, সমাজ-বিরুদ্ধ, রোমাঞ্চ-জনক ব্যাপার কোরে তোলা শুদ্ধ অস্বাভাবিক নয়, তা' অসামাজিক, সুতরাং এক হিসেবে অসভ্য। পুরুষেরা বাইরের সমস্ত আমোদ প্রমোদে লিপ্ত রোয়েছে, আর মেয়েরা তাদের নিজস্ব সম্পত্তি একটা পোষা প্রাণীর মত অন্তঃপুরের দেয়ালে শৃঙ্খলে বাঁধা আছে। এক দল বুদ্ধিমান বিবেচনা-শক্তি-বিশিষ্ট জীবকে কত শত শতাব্দী হোতে নির্দ্দয় লোকাচারের শাসন, পীড়ন, দমন, বন্ধন কোরে কোরে পোষা জন্তুর চেয়ে নির্জ্জীব, বশীভূত, সঙ্কুচিত, সঙ্কীর্ণ-মন কোরে তোলা হোয়েছে, সে একবার ভাল কোরে কল্পনা কোরে দেখতে গেলে, সর্ব্বাঙ্গ শিউরে ওঠে।

কোন এক জন মানুষের পরে এরকম সম্পূর্ণ একাধিপত্য করা; এক জন বুদ্ধি ও হৃদয়-বিশিষ্ট মানুষকে জন্তুর মত, এমন কি, তা'র চেয়ে অধম, একটা ব্যবহার্য্য জড় পদার্থের মত সম্পূর্ণরূপে নিজের প্রয়োজনের জিনিষ কোরে তোলা; যদি তার এক তাল সুখের জন্যে তোমার এক তিল সুখের ব্যাঘাত হয়, তা' হোলে সে টুকুও উচ্ছিন্ন কোরে দেওয়া; যদি তোমার ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্যে তাকে চির-স্থায়ী কষ্ট পেতে হয়, তবে তাও অম্লান বদনে তার স্কন্ধে স্থাপন করা এ সকল যদি পাপ না হয় তবে নরহত্যা করাও পাপ নয়; সমাজের অর্দ্ধেক মানুষকে পশু কোরে ফেলা যদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত বোলে প্রচার কর, তা হোলে তাঁর নামের অপমান করা হয়। মেয়েদের সমাজ থেকে নির্ব্বাসিত কোরে দিয়ে আমরা কতটা সুখ ও উন্নতি থেকে বঞ্চিত হই, তা' বিলেতের সমাজে এলে বোঝা যায়। আমরা অনেক জিনিস না দেখ্‌লে দূর থেকে কল্পনা কোর্ত্তে পারিনে, এমন কি বিশ্বাস কোর্ত্তে পারিনে। এখানে যতগুলি ভারতবর্ষীয় এয়েছেন, সর্ব্ব প্রথমেই তাদের চোখে কি ঠেকেছে?—এখানকার সমাজের সুখ ও উন্নতি সাধনে মহিলাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় সহায়তা। যাঁরা স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন, এখেনে এসে নিশ্চয়ই তাঁদের মতের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হোয়েছে।*

এখানকার নিমন্ত্রণ-সভা শিক্ষার যে কত সাহায্য করে তার ঠিক নেই। মুখে মুখে

---

* স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়ে অতি সাবধানে কথা-বার্ত্তা কহা উচিত। ইংলণ্ডে গেলেই বঙ্গীয় ইউরোপযাত্রীদের চর্ম্মচক্ষে কি যে এক বিস্ময়জনক ছবি পড়ে, তাহাতে করিয়া তাঁহাদের জ্ঞান চক্ষুর উন্মীলন একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়; ইংলণ্ডের জল বায়ু স্বতন্ত্র, ইংলণ্ডের পুরাবৃত্ত স্বতন্ত্র, ইংলণ্ডের জনসমাজের রুচি স্বতন্ত্র,—আমাদের দেশের জল বায়ু, পুরাবৃত্ত, জনসমাজের রুচি স্বতন্ত্র,—ইংলণ্ডীয় প্রকৃতির উপর ইংলণ্ডের সমাজ প্রতিষ্ঠিত, আমাদের দেশীয় প্রকৃতির উপর আমাদের দেশীয় সমাজ প্রতিষ্ঠিত,—ইউরোপযাত্রী বঙ্গ যুবকদের এজ্ঞানটি সহসা বিলুপ্ত হইয়া যায়। লেখককে যদি জিজ্ঞাসা করি, "তুমি আমাদের দেশীয় প্রকৃতিকে সমূলে উন্মূলন করিয়া তাহার স্থানে ইংলণ্ডীয় প্রকৃতিকে সিংহাসনস্থ করিতে চাও?"—তাহা শুনিবামাত্র তিনি হয় ত শিহরিয়া উঠিয়া তৎক্ষণাৎ স্পষ্টাক্ষরে "না" বলিবেন;—আমাদের দেশের আচার ব্যবহার সভ্যতা যাহা কিছু সমস্তই আমাদের দেশীয় প্রকৃতির গর্ভজাত সন্তান, সন্ততি, অগ্রে সেই প্রকৃতিকে উন্মূলন না করিয়া তিনি কিরূপে তাহার সেই সন্তান-সন্ততিগুলির উচ্ছেদ-কামনাকে মনে স্থান দিতে পারেন? অনতিপূর্ব্বে বহুতর ইংলণ্ডীয় স্ত্রীসমারোহের মধ্যে তিনি যখন এক জনের মুখে দেশীয় স্ত্রীলোকোচিত মাধুর্য্য ও ভাবভঙ্গী অবলোকন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার কেন এত ভাল লাগিয়াছিল? তখন ত বহিশ্চারিণী, বহুভাষিণী ব্যাপিকা সমাজ-রাজ্ঞী অপেক্ষা অন্তঃপুরচারিণী মৃদুভাষিণী লজ্জাশীলা গৃহলক্ষ্মীর সৌন্দর্য্য তাঁহার চক্ষে ভাল লাগিয়াছিল, এখন কি তাঁহার সে ভাব অন্তর্হিত হইয়াছে? তাহা ত বোধ হয় না,—তিনি এক দিকে অধিক ঝোঁক দেওয়াতে লেখনীর বেগ সম্বরণ করিতে পারেন নাই, ইহাই সম্ভব মনে হয়। শুধু কেবল স্বাধীনতা হইলেই যদি স্ত্রীদিগের আর

কথাবার্তায় মেয়ে পুরুষদের মধ্যে জ্ঞান ছড়িয়ে যায়। বিনা কষ্টে ও অলক্ষিত ভাবে মনের একটা শিক্ষা হোতে থাকে। একটা বিষয়ে নানা লোকের মত শুনতে পাওয়া যায়; কি রকম

কোন গুণের প্রয়োজন না হইত তাহা হইলে আমরা লেখকের মতে সম্পূর্ণ মত দিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা ত নহে—যেমন স্বাধীনতা চাই তাহার সঙ্গে তেমনি শোভন লজ্জাশীলতা বিনয়, সরলতা, উচ্চের প্রতি ভক্তিমত্তা, নীচের প্রতি দয়া দাক্ষিণ্য ইত্যাদি অনেক গুলি গুণ থাকা চাই, তবেই তাঁহারা স্ত্রীলোকের আদর্শ রূপে বরণীয় হইতে পারেন; নচেৎ স্ত্রী-স্বাধীনতার আর এক নাম স্বৈরচারিতা, ব্যাপিকতা প্রগলভতা, হইয়া দাঁড়ায়। প্রকৃত কথা এই যে, আমাদের দেশে এক্ষণে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, শিক্ষা বিষয়ক স্বাধীনতা, রুচি-বিষয়ক স্বাধীনতা, ইত্যাদি অনেক স্বাধীনতার অপ্রতুল রহিয়াছে, তাহার সঙ্গে কি-মাত্রা স্ত্রী-স্বাধীনতা ভালোয় ভালোয় টেঁকিয়া থাকিতে পারে তাহাই এখন বিবেচনা-স্থল; ইংলণ্ডের আর আর স্বাধীনতার সঙ্গে ইংলণ্ডোচিত স্ত্রী-স্বাধীনতা ইংলণ্ডেই শোভা পায়; তেমনি যদি আমাদের দেশোচিত স্ত্রী-স্বাধীনতা নৈসর্গিক শোভায় সমুত্থিত হয় তবেই ভাল, নইলে—মাথাটা খুব প্রকাণ্ড, ধড় খানি ছোটখাটো অথবা মাথায় হ্যাট্, গায়ে জামা, পায়ে চটি এইরূপে এক কিম্ভূত কিমাকার স্বাধীনতা। সকলের সহিত খাপ ছাড়া হইয়া দিন কতক মিথ্যা দাপাদাপি করিয়া বেড়াইলে তাহাতে কাহার যে কি উপকার হইবে তাহা ত বুঝা যায় না। "উঃ ইনি স্বাধীনতার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছেন,"—এরূপ যদি কেউ মনে করেন তবে তাঁহাদের জানা উচিত যে, এ স্বাধীনতা আত্মার স্বাধীনতাও

পরপুরুষগণের সহিত স্ত্রী-লোকগণের আমোদ-প্রমোদ, মেলা-মেশা, ইহা কতদূর প্রকৃত রূপে স্বাধীনতা নামের যোগ্য তাহাই সন্দেহ-স্থল। স্ত্রীরা যেমন গৃহকর্ম্মের উপযুক্ত, পুরুষেরা সেইরূপ বহির্ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিবার উপযুক্ত; স্ত্রীগণের মধ্যে যাঁহারা কাজের লোক তাঁহারা অধিকাংশ কাল গৃহাভ্যন্তরে থাকিতে বাধ্য হন, এবং পুরুষদিগের মধ্যে যাঁহারা কাজের লোক তাঁহারা অধিকাংশ কাল বাহিরে বিচরণ করিতে বাধ্য হন—অন্তঃপুরে থাকা স্ত্রীজনের পক্ষে সুবিধা বলিয়াই স্ত্রীলোকের অন্তঃপুর বাসের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে; পুরুষেরা স্বার্থপর বলিয়া ওরূপ প্রথা প্রচলিত হইয়াছে একথা কোন কার্য্যের কথা নহে; পুরুষেরা স্বার্থপর বলিয়া ছেলে-পিলে মানুষ করে না, রাঁধে বাড়ে না ইত্যাদি কথা যদি সত্য হয়, তবে এ কথাও কেননা সত্য হইবে যে, স্ত্রীরা স্বার্থপর বলিয়া আপিসে বেরোয় না, লাঙল চষে না, মোট বয় না, ইত্যাদি। অন্তঃপুর একটা কারাগার, অন্তঃপুরবাসিনীরা একটা বোবা জানোয়ার, পিতা-মাতাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করা দাসত্ব, এ সকল ইংরাজি বাঁধি বোল ইংরাজের মুখেই শোভা পায়, বিশেষতঃ সেই সব মানোয়ারীই বল আর জানোয়ারই বল; তাঁহাদের মুখে—যাঁহারা নারিকেলের ছোবড়া ভক্ষণ করিয়া তাহার অবশিষ্ট অংশকে আঁটি মনে করিয়া দূরে নিক্ষেপ করেন। যে ব্যক্তি আপন পিঙ্গল-নয়নে কল্পনার দূরবীক্ষণ প্রয়োগ করিয়া আমাদের অন্তঃপুরবাসিনীদিগকে কেবল শাসনভয়ে

কোরে মত গঠিত কোর্ত্তে হয়, কি রকম কোরে মত ব্যক্ত কোর্ত্তে হয়, ও কি রকম কোরে মতের প্রতিবাদ কোর্ত্তে হয়, সে বিষয় প্রতি মুহূর্ত্তে অভ্যাস হোতে থাকে। সমাজে মিশ্‌তে গেলে নানা বিরোধী মতের একটা সঙ্ঘাত উপস্থিত হয়, সুতরাং একটা বিষয়ের চারদিক দেখতে পাওয়া যায়, যদি দৈবাৎ বিবেচনা না কোরে একটা মত স্থির কর, অমনি সে মত চারিদিক থেকে হুঁচট খেতে থাকে, সুতরাং তোমাকে অনেকটা সাবধান হোতে হয়। সাহিত্য বিজ্ঞান, রাজনীতি সম্বন্ধীয় খবর দেখতে দেখতে মুখে মুখে সমস্ত দেশময় রাষ্ট্র হোয়ে যায়। একটা নূতন বই যদি ভাল হোয়ে থাকে, তবে মুখে মুখে ত'ার বিজ্ঞাপন প্রচার হয় ও দেশের মেয়ে পুরুষ সকলেই সে বইয়ের অস্তিত্ব জানতে পারে। এই রকম কোরে চার দিকের বাতাসে যেন জ্ঞান ছড়িয়ে যায়, নিশ্বেসের সঙ্গে যেন জ্ঞান লাভ করা যায়। এখানকার নিমন্ত্রণ-সভা গুণীদের উৎসাহ দেবার প্রধান স্থান। সভায় তাদের সম্মানের আর সীমা নেই। যাঁদের সঙ্গতি ও যোগ্যতা আছে, তাঁরা সকলেই গুণীদের নিমন্ত্রণ কোর্ত্তে চান। এখানকার নিমন্ত্রণ-সভার তাঁরা "Lion" সিংহ। মহা মহা কুলীন ব্যক্তিদের ঘরে তাঁরা পদধূলি দিলে শত শত "Duchess Countess" রা আপনাদের কৃতার্থ মনে করেন। এখানে গুণের আদর দেখলে আশ্চর্য্য হোয়ে যেতে হয়। আমাদের দেশের গুণীলোকদের যখন মনে করি, তখন মনে হয়, তাঁরা যদি ইংলণ্ডে জন্মাতেন, তা'হোলে তাঁদের পক্ষে ভাল হোত। স্ত্রী পুরুষে পরস্পরের কাছে থেকে প্রশংসা ও মমতা পাবার জন্যে আপনার আপনার গুণের চর্চ্চা কোর্ত্তে থাকে। সর্ব্বশুদ্ধ জড়িয়ে এখানকার মেশামিশির ভাব অতি সুন্দর। সে না দেখলে ভাল বোঝবার যো নেই। বাইনাচ দেখে, গান শুনে, ও লুচি সন্দেশ হজম বা-বদ-হজম কোরে যে ফল হয়, তা'র চেয়ে এখানকার সমাজে মিশলে যে মনের কত উন্নতি হয় তা' আমি এই ক্ষুদ্র চিঠির মধ্যে যথেষ্ট বর্ণনা কোর্‌তে পারিনে।

দেখে যে পতিকে রাঁধিয়া বাড়িয়া খাওয়ানোতে পতির প্রতি পত্নীর ভালবাসা প্রকাশ পায় না, পত্নীর প্রতি পতির নির্দ্দয় শাসনই প্রকাশ পায়; কুলরমণীরা যে, যে-সে পুরুষের সঙ্গে আমোদ করিয়া বেড়ায় না সে কেবল পতির শাসনভয়ে, পতির প্রতি ভালবাসা তাহার কারণ নহে, এমন কি যাহারা পুত্রের ভূমিষ্ঠ প্রণামে পিতৃভক্তি দেখে না—দাসত্ব মাত্রই দেখে; তাহারা আমাদের দেশীয় সভ্যতার ছোবড়া টুকুই সার পদার্থ সুতরাং সেই মহার্হ সভ্যতাকে নিতান্ত অসার পদার্থ মনে করিবে ইহা ত ধরাই আছে; কিন্তু তাহার প্রকৃত সার পদার্থ যে তাহার ভিতরকার শাঁস ইহা যদি একজন বাঙ্গালীরও চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতে হয় তবে সে বড় রহস্য; একজন বাঙ্গালিকে যদি শিখাইতে হয় যে অন্তঃপুর গৃহিণীগণের কারাগার নহে কিন্তু তাঁহাদের সাধের নিকেতন, পিতামাতার প্রতি পুত্রের নম্র ব্যবহার ভক্তি এবং ভালবাসার নিদর্শন, তাহার মধ্যে কঠোরতা কিছু মাত্র নাই; স্ত্রীলোকেরা যে, যে-সে পুরুষের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া আমোদ করে না সে কেবল এই জন্যে যে, তাহাদের পবিত্র গার্হস্থ্য ভাব আমোদ প্রমোদ অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক যত্নের ধন, এই সকল যৎপরোনাস্তি দুরূহ বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব যদি বাঙ্গালীকে শিক্ষা দিতে হয়, তবে নূতন একটা বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি না করিলে আর চলে না। ভারতী-সম্পাদক।

এখানে আবার মিলনের উপলক্ষ কত আছে, তার সংখ্যা নেই। ডিনার, বল্, Conversazione, চা-সভা, Lawn-parties, Excursions, Picnics, ইত্যাদি। Thackeray বলেন "Englise Society has this eminent advantage over all others—that is if there be any Society left in the wretched distracted old European continent—that it is above all others a dinner-giving Society." অবসর পেলে এক সন্ধ্যে বন্ধু বান্ধবদের জড় কোরে আহারাদি করা ও আমোদ প্রমোদ কোরে কাটানো এখানকার পরিবারের অবশ্য কর্ত্তব্য কাজের মধ্যে। ডিনার সভার বর্ণনা কোর্ত্তে বলা বাহুল্য। ডাক্তার M-এর বাড়িতে যে partyর কথা পূর্ব্বে উল্লেখ কোরেছি, তার সঙ্গে ডিনার-পার্টির প্রভেদ কেবল দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার (এ ম্লেচ্ছদের দেশে ভক্ষণটা আবার দক্ষিণ বাম উভয় হস্তের ব্যাপার)। আমি একবার এখানকার একটি বোট-যাত্রা ও picnic partyর মধ্যে ছিলুম। এখানকার একটি রাবিবারিক সভার সভ্যেরা এই বোট-যাত্রার উদ্যোগী। এই সভার সভ্য ও সভ্যারা sabbath পালনের বিরোধী। তাই জন্তে তাঁরা রবিবারে একত্র হোয়ে নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ করেন। এই রাবিবারিক সভার সভ্য আমাদের এক বাঙ্গালী মিত্র ম—মহাশয় আমাদের অনুগ্রহ কোরে টিকিট দেন। লণ্ডন থেকে রেলোয়ে কোরে টেম্‌সের ধারের এক গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছলেম। গিয়ে দেখ্‌লুম টেম্‌সে একটা প্রকাণ্ড নৌকা বাঁধা রোয়েছে, আর প্রায় পঞ্চাশ ষাট জন রবিবার-বিদ্রোহী মেয়ে পুরুষে একত্র হোয়েছে। দিনটা অন্ধকার, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, আর যাঁদের যাঁদের আসবার কথা ছিল, তাঁরা সকলে আসেন নি। আমার নিজের বড় এ পার্টিতে যোগ দেবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু ম—মহাশয় নাছোড়-বান্দা, তিনি আমাকে বিশেষ কোরে লোভ দেখালেন যে, সে খানে অনেক সুন্দরীর সমাগম হোচ্চে। শুনে আমি একটু যত্ন ও পরিশ্রম পূর্ব্বক সাজগোজ করে যথাসময়ে হাজির হলুম। গিয়ে দেখি, বোটে কেবল একটি মহিলা আছেন, যাঁকে দূর থেকে দেখলে হঠাৎ সুন্দরী বোলে ভ্রম হয়, আর বাকী মহিলাদের (তাদের প্রতি আমি অসম্মান করচিনে) কাউকেই আমার চোখে দর্শন-যোগ্য বোলে ঠেকে নি। যে একটিমাত্র রূপসী ছিলেন, তার চার দিকে এমন একটি ঘন ব্যূহ বদ্ধ হোয়েছিল, যে তা' ভেদ করবার চেষ্টা করা আমার মত ক্ষীণ প্রাণীর পক্ষে দুরাশা। সুতরাং আমি সে টক্ আঙ্গুর ফল পরিত্যাগ কোরে ম—মহাশয়ের কাছে গিয়ে কৈফিয়ৎ চাইলুম। কিন্তু কৈফিয়ৎ সন্তোষ-জনক হোক্ আর না হোক্ ফলে সমানই কথা! আমরা অনেক ভারতবর্ষীয় একত্র হোয়েছিলুম। বোধ হয় ম—মহাশয় সকলকেই সুন্দরীর লোভ দেখিয়েছিলেন, কেন না সকলেই প্রায় বাহারে সাজগোজ কোরে গিয়েছিলেন। অনেকেই গলায় লাল ফাঁসি (neck-tie) বেঁধে এয়েছিলেন, অন্যের গলায় ফাঁসি লাগানো তাঁদের আন্তরিক অভিপ্রায়; আর ম—মহাশয় স্বয়ং তাঁর neck-tie-এ একটি তলবারের আকারের পিন গুঁজে এয়েছিলেন। আমাদের মধ্যে এক জন তাঁকে ঠাট্টা কোরে জিজ্ঞাসা কোরলেন, "দেশের সমস্ত tie এ যে তলবারের আঘাত করা হোয়েছে, ওটা কি তারি বাহ্য লক্ষণ?" তিনি হেসে বোল্লেন "তা" নয় গো, বুকের কাছে একটা কটাক্ষের

ছুরি বিঁধেছে, ওটা তারি চিহ্ন।" দেশে থাক্‌তে বিঁধেছিল, কি এখানে বিঁধেছে, তা' কিছু বোল্লেন না। ম—মহাশয়ের হাসি তামাসার বিরাম নেই; সে দিন তিনি নৌকার সমস্ত লোকের সঙ্গে সমস্ত দিন ঠাট্টা ও গল্প কোরে কাটিয়েছিলেন। একবার তিনি সমস্ত মহিলাদের হাত দেখে গুণ্‌তে আরম্ভ কোরেছিলেন, তখন তিনি এত হাস্যজনক কথা বোলেছিলেন, ও বোট শুদ্ধ মহিলাদের এত প্রচুর পরিমাণে হাসিয়েছিলেন, যে, সত্যি কথা বোলতে কি, তাঁর উপর আমার মনে মনে একটু খানি দ্বেষের উদ্রেক হোয়েছিল; বোট শুদ্ধ মেয়ে যখন হেসে গড়াগড়ি যাচ্ছিলেন, তখন আমি এবং আর দুই চারিটি পুরুষ অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে দাঁড়িয়েছিলেন। যথাসময়ে বোট ছেড়েছিলো! নদী এত ছোট যে, আমাদের দেশের খালের কাছা কাছি পৌঁছোয়। জায়গায় জায়গায় নদীর ধারের দৃশ্য মন্দ নয়, কিন্তু সবশুদ্ধ জড়িয়ে যে বিশেষ সুন্দর দেখতে তা নয়। নৌকোর মধ্যে আমাদের আলাপ পরিচয় গল্প স্বল্প চোলতে লাগল। একজন ইংরেজের সঙ্গে আমাদের একজন দিশি লোকের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় তর্ক উঠল। আমাদের সঙ্গে এক জনের আলাপ হোল, তিনি তাঁদের ইংরিজি সাহিত্যের কথা তুললেন; তাঁর শেলীর কবিতা অত্যন্ত ভাল লাগে; সে বিষয়ে আমার সঙ্গে তাঁর মতের সম্পূর্ণ মিল হোল দেখে তিনি ভারি খুসী হোলেন; তিনি আমাকে বিশেষ কোরে তাঁর বাড়ি যেতে অনুরোধ কোরলেন, ও বোল্লেন, সেখানে গিয়ে আমরা দুজনে সাহিত্য আলোচনা কোরব। ইনি ইংরিজি সাহিত্য ও তাঁর নিজের দেশের রাজনীতি ভাল রকম কোরে চর্চ্চা কোরেছেন, কিন্তু যেই ভারতবর্ষের কথা উঠল, অমনি তাঁর অজ্ঞতা বেরিয়ে পোড়ল! তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা কোরলেন, "কোন্ রাজার অধীনে?" আমি অবাক্ হোয়ে বোল্লুম—"ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের।" তিনি বল্লেন, "তা" আমি জানি, কিন্তু আমি বোলচি, কোন্ ভারতবর্ষীয় রাজার অব্যবহিত অধীনে!" কি ভয়ানক! কলকাতার বিষয়ে এঁর জ্ঞান এই রকম! তিনি অপ্রস্তুত হোয়ে বোল্লেন, "আমার অজ্ঞতা মাপ কোর্বেন; ভারতবর্ষের বিষয়ে আমাদের ঢের জানা উচিত, কিন্তু লজ্জার সঙ্গে স্বীকার কোরচি আমি এ বিষয়ে খুব কম জানি।" এই রকম বোটের ছাতের উপর আমাদের কথাবার্ত্তা চোল্‌তে লাগল; আমাদের মাথার উপরে একটা কাপড়ের আচ্ছাদন আছে; বোটের ঘরের মধ্যে আহারের আয়োজন হোচ্চে, সেখানে স্থান নেই! মাঝে মাঝে টিপ টিপ কোরে বৃষ্টি হোচ্চে, কাপড়ের আচ্ছাদনে সেটা নিবারণ কোরচে। কিন্তু হঠাৎ এমন ঘোরতর বাতাস ও বৃষ্টি হোতে আরম্ভ হোল, যে কিছুতে নিবারণ হবার যো নেই। যে দিকে বৃষ্টির ছাঁট পৌঁছচ্চে না, সেই দিকে মেয়েদের রেখে, আমরা আর এক পাশে এসে ছাতা খুলে দাঁড়ালুম। ওমা দেখি, আমাদের দিশি বন্ধু ক—মহাশয় সেই মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছেন, আমি তাঁকে যথেষ্ট ঠাট্টা কোরে নিয়েছিলেম, তিনি বার বার কোরে বোল্লেন যে, বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়া ছাড়া তাঁর অন্য অভিসন্ধি ছিল না, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আমি তা বিশ্বাস করিনে। আমি তাঁকে তখনি শাসিয়ে রেখেছিলেম যে, দেশে একথা রাষ্ট্র কোরে দেব; তিনি, তখন বিশ্বাস করেন নি। তুমি এক কাজ কোর ত; বিকেলে সেই ঘরটাতে যখন তোমাদের পাড়ার

বৈঠক বোস্‌বে তখন তামাকের ধোঁয়ার সঙ্গে এই কথাটা ঘরের চারিদিকে বিস্তার কোরে দিও। কিংবা তা' যদি না কর ত, বিশম্ভর দাদাকে এই কথাটা অতি গোপনে বোলো ও কাউকে বোল্‌তে বিশেষ কোরে বারণ কোরো" তা' হোলেই সপ্তাহের মধ্যে সকলের কাণেই উঠবে। যাহোক সে দিন আমরা বৃষ্টিতে তিন চার বার কোরে ভিজে-ছিলেম। এই রকম ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে আমরা আমাদের গম্য স্থানে গিয়ে পৌঁছলেম। তখন বৃষ্টি থেমে গেছে, কিন্তু আকাশে মেঘ আছে ও জমি ভিজে। মাঠে নেবে আমাদের খাওয়া দাওয়া করবার কথা ছিল, কিন্তু আকাশের ভাবগতিক দেখে তা' আর হোল না। খাবার সময়ে দেখি, আহারের অত্যন্ত বিস্তৃত আয়োজন। আমাদের partyর যিনি প্রধানা, তিনি আমার অল্প খাওয়া দেখে বোল্লেন যে, আমার picnic এর উপযুক্ত ক্ষিধে নেই; কিন্তু তাঁর খাওয়ার পরিমাণ থেকে যদি picnic এর ক্ষিধের পরিমাণ অনুমান কোরে নিতে হয়, তাহোলে, আমি যদি গাছের পাতা হর্তুকী খেয়ে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে সহস্রবৎসর উপরে পা ও নীচে মাথা রেখে বৃকোদর ও অগস্ত্য মুনির আরাধনা করি তবু আমার picnic এর উপযুক্ত ক্ষিধে হয় না। খাওয়া দাওয়ার পর আমরা নৌকা থেকে নেবে বেড়াতে বেরোলেম; কোন কোন প্রণয়ীযুগল একটি ছোট নৌকা নিয়ে দাঁড় বেয়ে চোল্লেন, কেউ বা হাতে হাতে ধোরে নিরিবিলি কাণে কাণে কথা কইতে কইতে মাঠে বেড়াতে লাগ্‌লেন। আমাদের সঙ্গে একজন ফোটগ্রাফ্‌ ওয়ালা তার ফোটগ্রাফের সরঞ্জাম সঙ্গে কোরে এনেছিল, আমরা সমস্ত দল মাঠে দাঁড়ালেম, আমাদের ফোটগ্রাফ নেওয়া হোল। সে যন্ত্রে এক সেকেণ্ডের মধ্যে ফোটগ্রাফ নেওয়া যায়, সুতরাং একটু আধটু নোড়লে চোড়লেও বড় একটা হানি হয় না। সহসা ম—মহাশয়ের খেয়ালে গেল যে আমরা যতগুলি কৃষ্ণমূর্ত্তি আছি, একত্রে সকলের ছবি নেওয়া হবে। আমাদের মধ্যে এই একটি জন্‌-বুষের পুষ্যি বাছুর ছিলেন, তাঁরা এ প্রস্তাবে ইতস্ততঃ কোর্‌তে লাগলেন পাছে কৃষ্ণমূর্ত্তির দলের মধ্যে তাঁরাও পড়েন, কিন্তু এরকম একটা invidious distinction করা তাঁদের মনঃপূত নয়; কিন্তু ম—মশায় ছাড়বার পাত্র নন; তিনি ধোরে বেঁধে দাঁড় করিয়ে আমাদের ছবি নেওয়ালেন। যা হোক্‌ ছবি নেওয়া প্রভৃতি সাঙ্গ হোলে পর নৌকা লণ্ডন অভিমুখে ছাড়া হোল। তখন ভগবান্‌ মরীচিমালী তাঁহার সহস্র রশ্মি সংযমন পুরঃসর অস্তাচল-চূড়াবলম্বী কনক জলধর-পটল-শয়নে বিশ্রান্ত মস্তক বিন্যাস পূর্ব্বক অরুণ-বর্ণ নিদ্রাতুর লোচন মুদ্রিত করিলেন; বিহগকুল স্ব স্ব নীড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, গাভী-বৃন্দ হাম্বারব করিতে করিতে গোপালের অনুবর্ত্তন করিয়া গোষ্ঠাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। আমরা লণ্ডনের অভিমুখে যাত্রা কোরলেম। আমরা এক গাড়িতে কতকগুলি দিশিলোক ছিলেম, ও আমাদের সঙ্গে একজন ইংরেজ পুরুষ ও ইংরেজ মহিলা ছিলেন। ম—মহাশয় আমাদের সঙ্গে ছিলেন, সুতরাং আমাদের হাসি তামাসার আর অন্ত ছিল না। এইখানে তোমাকে একটা ঘোরতর গুপ্ত খবর দিচ্চি, খবরদার আর কাউকে বোল না। গাড়িতে আমাদের চ—মহাশয়ের রকম সকম যদি দেখতে তবে অবাক্‌ হোয়ে যেতে। মিস্‌ ড—য়ের সঙ্গে তিনি যে রকম ফিস্‌ ফিস্‌ কোরে কথাবার্ত্তা আরম্ভ কোরে দিলেন, মাঝে মাঝে তাঁর মুখের পর যে রকম ভাবপূর্ণ-দৃষ্টি-

পাত কোর্ত্তে লাগলেন ও ঠিক তাঁর পাশে যে রকম চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কোরে নিলেন যে তাতে ক—মহাশয় ম—মহাশয় ও র—মহাশয়ের মধ্যে একটা রহস্যপূর্ণ চোখ-টেপাটেপি পোড়ে গেল, ম—মহাশয় বাঙ্গালায় বোলে উঠলেন, "তুই ডাক্তারে মিলে ভুজং-এর মনের উপর surgery প্র্যাক্‌টিষ কোর্‌চেন নাকি?" ক—মহাশয় ডাক্তার এবং মিস্ ড—ও ডাক্তার।

সপ্তম পত্র।

দেখ, তোমকে যে পত্র লিখেছি, তা' ভারতীতে আমার ইচ্ছামতে প্রকাশ করা হোয়েছে। তাতে একজায়গায় স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমার মত প্রকাশ কোরেছিলুম, সম্পাদক মহাশয় তার বিরুদ্ধে এক নোটের বাণ বর্ষণ কোরেছেন। কিন্তু সেটা সম্পাদক মহাশয়ের লেখা কি না, সে বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ বর্ত্তমান। তিনি যে সেটা লেখেন নি, তা'র প্রধান প্রমাণ হোচ্চে এই যে, সম্পাদক মহাশয়ের গাম্ভীর্য্য এতদূর বিচলিত হোতে আর কখনো দেখিনি; দ্বিতীয়তঃ যে সকল যুক্তি প্রয়োগ করা হোয়েছে, তা' সম্পাদক মহাশয়ের লেখনীর অযোগ্য। খুব সম্ভব, কোন উদ্ধত যুবক সম্পাদকের ক্ষমতা নিজের তরুণ স্কন্ধে গ্রহণ কোরে ভারতীর এক কোণে অলক্ষিত ভাবে এই নোটটি গুঁজে দিয়েছেন। নোটে খোঁচা মারার প্রধান গুণ হোচ্চে যে, তা'র উত্তর দিতে বোস্‌তে প্রবৃত্তি হয় না। একটা নোটের বিরুদ্ধে "যুদ্ধং দেহি" বোলে কোমর বেঁধে আড়ম্বর করা শোভা পায় না। গোলা দিয়ে ওড়াতে এলে রীতিমত যুদ্ধসজ্জা কোর্ত্তে হয়, কিন্তু তুড়ি দিয়ে ওড়াতে এলে আর কথাটি নেই। যাহোক্ নানা কারণে একটা উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হোলুম। লেখক মহাশয় আমার মুখে কতকগুলো কথা গুঁজে দিয়েছেন, যা' আমি একেবারেই বলিনি, * তিনি কতকগুলো কথা নিয়ে অনর্গল বকাবকি কোরে গিয়েছেন যা একেবারে উত্থাপন করবারই কোন আবশ্যক ছিল না; † তিনি অনেক জায়গায় তলোয়ার নিয়ে তুমুল আস্ফালন কোরেছেন, কিন্তু তা'র ঘা লেগেছে বাতাসের গায়ে; আবার অনেক জায়গায় তিনি আমার লেখার বিরুদ্ধে বন্দুক ছুঁড়েছেন, তার থেকে আগুনও ছুটেছে, ধোঁয়াও বেরিয়েছে, শব্দও হোয়েছে, কিন্তু তাহাতে গুলি নেই, ফাঁকা আওয়াজ; ধোঁয়ার প্রাচুর্য্য ও শব্দের প্রাখর্য্য থেকে পাঠকেরা কল্পনা কোর্ব্বেন যে, যার প্রতি লক্ষ্য করা হোয়েছে সে ব্যক্তি বাসায় গিয়ে মোরে থাকবে; কিন্তু সে ব্যক্তির কাণে তালাধরা ও নাকে ধোঁয়া যাওয়া ছাড়া আর

* যথার্থ যদি এরূপ হইয়া থাকে তবে সে কথা-গুলা লেখকের উচিত ছিল উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া। ভা, সং

† কেন যে, আবশ্যক ছিল না তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। লেখক আমাদের নিরীহ দেশটির প্রতি স্বচ্ছন্দে ধিক্কারের খরশাণ কৃপাণ এবং উপহাসের তীক্ষ্ণ বাণ অনর্গল চালাইতে পারেন আর এক ব্যক্তি ঢাল দিয়া তাহা আটকাইতে গেলে সে তাহা পারিবে না কেননা লেখকের মতে তাহা অনাবশ্যক! এমন কি হইতে নাই যে, লেখক এক পক্ষে বেশী ঝোঁক দেওয়াতে তাঁহার চক্ষে তিনিই দেখিতেছেন যে, তাঁহার বিরোধী পক্ষের কং-গুলি উত্থাপনেরই যোগ্য নহে? ভা, সং

কোন রকম সাজ্ঘাতিক অপকার হয় নি। * লেখক মশায় বোলেছেন যে, "শুধু কেবল স্বাধীনতা হইলেই যদি স্ত্রীলোকদের আর কোন গুণের প্রয়োজন না হইত, তাহা হইলেই আমরা লেখকের মতে সম্পূর্ণ মত দিতে পারিতাম; কিন্তু তাহা ত নহে, যেমন স্বাধীনতা চাই তেমনি তাহার সঙ্গে শোভন লজ্জাশীলতা, বিনয়, সরলতা, উচ্চের প্রতি ভক্তিমত্তা, নীচের প্রতি দয়াদাক্ষিণ্য ইত্যাদি অনেক গুণ থাকা চাই," ইত্যাদি। কিন্তু এতটা হাঙ্গামা কেন? বাঙ্গালা বা সংস্কৃত আর্য্য বা অনার্য্য, সাধু বা অসাধু কোন ভাষার অভিধানে যদি স্বাধীনতা অর্থে বেহায়ামো, অবিনয়, অসরলতা, উচ্চের প্রতি অভক্তিমত্তা, নীচের প্রতি অদয়াদাক্ষিণ্য লেখা থাকৃত, তা' হোলে এতটা বাক্যব্যয় শোভা পেত, নইলে সরল-হৃদয় পাঠকদের চোখে ধূলো দেওয়া ছাড়া, লাথি মেরে মেরে এতটা বাক্যের ধূলো ওড়ানোর আর ত কোন ফল দেখিনে।* এই

* লেখক কি ভাবে কি কথা বলিতেছেন তাহার প্রতি তত আমাদের লক্ষ্য নহে যত—পাঠকেরা তাঁহার কথা কি ভাবে গ্রহণ করিবেন, তাহার প্রতি। আজিকার কালের কৃতবিদ্য ব্যক্তি মাত্রেরই লক্ষ্য দেশীয় কুসংস্কারের উপর—যিনি একটু কলম ধরিতে জানেন তিনি সর্ব্বাগ্রে তাহার উপরেই আপনার গোলোন্দাজির পরীক্ষা করিতে যা'ন, কিন্তু তাহার বন্দুকের গুলি-গুলো লাগে কোথায়? না, দেশীয় রীতি নীতি প্রথা যত কিছু আছে সকলেরই গাত্রে—তা' সে সু-ই হউক্ আর কু-ই হউক্—তা'র আর বাক্‌বিচার নাই। আমাদের দেশের ভাল রীতি ভাল প্রথা ইংরাজি রীতিনীতি প্রথার সহিত না মিলিলেই আজকের কালের কৃতবিদ্য বাবু লোকেরা সমস্ত-গুলিকেই কুসংস্কারের কোটায় ফেলিয়া দেন—সেই গুলিকে বাঁচানই আমাদের লক্ষ্য। পাছে লোকের মনে এই একটি কুসংস্কার জন্মে যে, বিবিদিগের চাল্-চোল্ ধরণ-ধারণের নামই স্ত্রী-স্বাধীনতা, আর আমাদের কুল-স্ত্রীদিগের চাল্-চোল্ ধরণ-ধারণের নামই হাতে হাতকড়ি পায়ে বেড়ি—অধুনা কেবল তাহারই প্রতিবাদ করা আমাদের এক মাত্র লক্ষ্য। ভাং সং

* অবশ্য কোন অভিধানে স্ত্রী-স্বাধীনতার ওপর অর্থ পাওয়া যায় না—কিন্তু কাজে কি দেখা যায়? লেখক যদি বিলাতি বিবিদিগকে আদর্শ না করিয়া বিশুদ্ধরূপে স্ত্রী-স্বাধীনতা-বিষয়ক একটি প্রবন্ধ লিখিতেন, তাহা হইলে স্ত্রী-স্বাধীনতার অতগুলি পার্শ্বি-রক্ষক Body guard আবশ্যক হইত না; কিন্তু লেখক বিলাতি বিবিদিগের চাল্-চোল্ ধরণ-ধারণের আনুষঙ্গিক রূপে স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন, এ জন্য বিলাতানভিজ্ঞ অধিকাংশ লোকের মনে সহসা এইরূপ একটা কুসংস্কার জন্মিতে পারে যে কার্য্যতঃ স্ত্রী-স্বাধীনতা আর কিছুই নহে—কেবল বিবিদিগের চাল্-চোল্ ধরণ-ধারণ ইত্যাদি। ইহা একটি লোক বিখ্যাত বিষয় যে, বিবিদিগের shopping এর জ্বালায় নির্দ্দোষ (?) আমোদাসক্তির জ্বালায়, তাহাদের স্বামীরা ধনে প্রাণে মারা যায়, অথচ স্ত্রী-স্বাধীনতার একটু কোথাও পাছে আঁচড় লাগে এই ভয়ে তাঁহারা সকল অত্যাচার ঘাড় পাতিয়া ল'ন, সকল বিষ হজম করিয়া ফেলেন। ইউরোপ ভিন্ন আর কোথাও যে, স্ত্রী-স্বাধীনতা নাই এমন নহে—জাপানে আছে,

সকল বকাবকির পর লেখক মহাশয় যেখানে "প্রকৃত কথা" বোলেছেন, সেই খানেই আমি সব চেয়ে কম আয়ত্ত কোরতে পেরেছি। তিনি বলেন, "প্রকৃত কথা এই যে, আমাদের দেশে এক্ষণে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, শিক্ষা বিষয়ক স্বাধীনতা, রুচি বিষয়ক স্বাধীনতা, ইত্যাদি অনেক স্বাধীনতার অভাব আছে, তাহার সঙ্গে কি মাত্রায় স্ত্রী-স্বাধীনতা ভালোয় ভালোয় টেঁকিয়া থাকিতে পারে, তাহাই এখন বিবেচনা-স্থলে।" প্রথমতঃ "শিক্ষাবিষয়ক স্বাধীনতা, রুচি বিষয়ক স্বাধীনতা" ও "ইত্যাদি অনেক স্বাধীনতার" অর্থ আমিত ভাল কোরে বুঝ্‌তেই পারলুম না; * দ্বিতীয়তঃ, রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে

বোম্বাইয়ে আছে, কিন্তু সে সকল নিয়ে আলোচনা করা লেখকের উদ্দেশ্য নহে,—সর্ব্বদেশ-সম্মত স্ত্রী-স্বাধীনতার বিশুদ্ধ আদর্শ নিয়ে আলোচনা করাও লেখকের উদ্দেশ্য নহে, ইংলণ্ডে যেরূপ স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রচলিত তাই যা' কেবল লেখকের এক মাত্র আলোচ্য বিষয়; এরূপ যখন—তখন ইংলণ্ডের প্রচলিত স্ত্রী-স্বাধীনতা যে কি ভয়ানক বস্তু—তাহা যে শত সহস্র স্থানে নামে স্বাধীনতা কাজে স্বৈরচারিতা—তাহা যে ঔদ্ধত্য, প্রগলভতা, গুরুজনের প্রতি অবজ্ঞা, দেহ-পীড়ন-বেশ-বাহুল্য এরূপ কতশত দোষে দূষিত Saturday Review প্রভৃতি কাগজে যাহার চীৎকার কাঁদুনি মধ্যে মধ্যে ভুক্ত-ভোগী জনের বুক ফাটিয়া বাহির হইয়া পড়িতে শুনা' গিয়া থাকে, লেখক সে সকল কথার একটুও উল্লেখ না করাতে দেশীয় লোকের চক্ষে এক রূপ ধূলি দেওয়া হইয়াছে—প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে যে, বিবিদিগের অনুকরণ করিলেই আমাদের কুল-রমণীরা নিষ্কণ্টকে স্বাধীনতা-পথে বিচরণ করিতে পারিবেন; আমরা সেই ধূলি অপনয়ন করিবার জন্যই বলিতেছি যে, যখন স্বাধীনতার সঙ্গে শোভন লজ্জাশীলতা, বিনয়, সরলতা, গুরুজনের প্রতি ভক্তি, নীচের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য, অপ্রগলভতা, ঔদ্ধত্যবিহীনতা ইত্যাদি গুণ-সমূহ থাকিবে তখনই জানিবে যে তাহা প্রকৃত স্বাধীনতা—ইংলণ্ডীয় স্ত্রী-স্বাধীনতা তাহা হইতে বহুদূরে স্থিতি করে; বোম্বাই দেশে যেমন স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে, সেরূপ তীব্রতা-বিহীন নির্ব্বিষ স্ত্রী-স্বাধীনতা যদি লেখকের অভিপ্রেত হইত তবে তাহার প্রতিবাদ করা দূরে থাকুক তাহা আমরা অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিতাম। যে স্ত্রী-স্বাধীনতার নামের দোহাই দিয়া শত সহস্র স্বেচ্ছাচারিতা নিত্য নিত্য পার পাইয়া যাইতেছে যে স্ত্রী-স্বাধীনতার নাম শুনিলেই আমাদের আপদ-মস্তক শিহরিয়া উঠে। ভাঃ সং

* অর্থাৎ আমাদের আপনার দেশের রাজ্য-শাসন-প্রণালী স্বদেশীয় লোকের আয়ত্তাধীন নহে। তাহা যদি আমাদের আপনাদের আয়ত্তাধীন হয় তাহা হইলে আমরা রাজনীতিবিষয়ক স্বাধীনতা প্রাপ্ত হই। শুক্‌-গর্ভ উপাধির টানে পড়িয়া আমাদের দেশের লোক স্বাভিপ্রেত শিক্ষালাভে বঞ্চিত হয়, ও যেরূপ শিক্ষা তাহাদিগকে জোর করিয়া গিলাইয়া দেওয়া হয় তাহাই তাহারা কণ্ঠস্থ করে। শিক্ষাদান যদি আমাদের আপনাদের অভিপ্রায় মাফিক হয় তবেই আমরা শিক্ষা-বিষয়ক স্বাধীনতা প্রাপ্ত হই।

কোট্ হ্যাট্ পরিলে কালোয় কালোয় মিশিয়া বাঙ্গালিকে ভূতের মত দেখিতে হয়

স্ত্রীস্বাধীনতার কোন্‌খান্‌টা যোগ আছে, তাই আমি ভাল কোরে দেখতে পেলেম না। আমাদের দেশে রাজনৈতিক স্বাধীনতা নেই বোল্লে এই বোঝায় যে, আমরা ইংরাজদের অধীনে বাস কোরচি ; * যদি এমন হোত যে স্ত্রী-লোকেরা অত্যন্ত বলিষ্ঠ জাতি, তা'দের অন্তঃপুর থেকে মুক্ত কোরে দিলে ইংরাজদের

তবু তাহা ভাল—কেন? না যেহেতু তাহা ইংরাজ-পছন্দ! রুচিরও কখনও কখনও দাসত্ব-শৃঙ্খল পরিতে সাধ যায়। রুচি যদি আমাদের আপনাদের আদর্শমাফিক হয়, অন্যের ধামাধরা না হয়, তবেই আমরা রুচি-বিষয়ক স্বাধীনতা প্রাপ্ত হই। ভাঃ সং

* বটেইত ; ইংরাজদের অধীনে বাস করচি বোলেই ত আমরা আমাদের স্ত্রীদিগকে তাহাদের সমক্ষে বাহির করিতে সঙ্কুচিত হই। আমাদের দুই দিকেই সঙ্কট ; যদি আমরা ইংরাজদিগকে জেতৃ-জাতীয় লোক মনে করিয়া তাহাদের নিকটে কুঁকড়িয়া সুঁকড়িয়া থাকি তবে তাহারা আমাদের অতি অপদার্থ জ্ঞান করিবে ও আমাদের স্ত্রীগণকে আমাদিগের হইতে এক ধাপ নয় উঁচু মনে করুক্—কিন্তু ভদ্রঘরের স্ত্রীলোকদিগকে যেরূপ সম্মান চক্ষে-দেখিতে হয়, তাহা তাহারা কখনই করিবে না, ক্রমাগতই শুনা যায় যে, বাঙ্গালীর স্ত্রী-স্বাধীনতা রেল-গাড়িতে ইংরাজের পুরুষস্বাধীনতার হস্তে যার পর নাই অপমানিত হইয়া থাকে ; এই এক দিক্, আর এক দিক্ এই যে, যদি আমরা ইংরাজদিগের সহিত সমকক্ষ ভাব ধারণ করিতে যাই তবে প্রথম প্রথম হয় ত তাহারা মুখে একটু আপ্যায়িত করিবে এই পর্য্যন্ত, ভিতরে ভিতরে যে আমাদের স্পর্দ্ধা নিবারণের উপায় চিন্তা করিবে ইহাতে আর কিছু মাত্র ভুল নাই। ইংরাজেরা কত বাঙ্গালীকে খুন করিয়া স্বচ্ছন্দে পার হইয়া যাই-তেছে, আর একজন স্ত্রীলোকের প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে ভয় পাইবে—ইহার কি কোন অর্থ আছে? যদি পরিশেষে বাঙ্গালি-বিচারকর্ত্তার হস্তে পড়িবার সম্ভাবনা থাকিত তবেই যা তাহাদের ভয়ের কারণ হইত—কিন্তু আমাদের দেশীয় বিচারালয়ের বিচার যেরূপ ইংরাজ ঘেঁসা তাহাতে আমাদের দেশের যেমন না কেন রাজরাণী হউন না, এক জন সামান্য ইংরাজ তাঁহার যথেষ্ট অপমান করিলেও আদালতের সম্মুখ বিচারে দাঁড়াইবে যে, বরং বাদিনীর দোষ—কেন সে প্রতি-বাদীকে রাগাইয়া দিল—প্রতিবাদীর কোন দোষ নাই। আবার, আমাদের দেশের এমন কতকগুলি ভাব আছে যাহা বিদেশীয় বিচারকের আমলেই আসিতে পারে না ; আমাদের দেশীয় স্ত্রীলোকের গায়ে সামান্য একটু অপমানের আঁচ লাগিলে তাহা যে কত অধিক বলিয়া বোধ হয় তাহা বিদেশীয় সর্ব্ব সহন-ক্ষম কঠোর মনে এক মুহূর্ত্তও স্থান পাইতে পারে না। আমাদের দেশীয় লোকরা আমাদের দেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে যেরূপ সম্মান-চক্ষে দেখে ইংরেজেরা কখনই সেরূপ দেখে না, ইহারও আবার প্রমাণ দিতে হইবে নাকি? এই সে দিন একজন ইংরাজ বিচার-কর্ত্তা প্যায়দোকে দিয়া একজন দেশীয় স্ত্রীলো-কের ঘোম্‌টা খোলাইলেন—এ কি বল দেখি? একজন বাঙ্গালি-বিচারকর্ত্তা যদি ইউরোপীয় কোন স্ত্রীলোকের প্রতি ওরূপ ব্যবহার করিত—তবে কাণ্ডটা কি হইত বল দেখি! এই সব বিচারকর্ত্তার হস্তে যখন আমাদের ধন প্রাণ মান নির্ভর করিতেছে

রাজত্ব লোপ হবার সম্ভাবনা, তা'হোলে বুঝতাম যে, রাজনৈতিকস্বাধীনতা নেই বোলে আমাদের দেশে স্ত্রী-স্বাধীনতার ঘোরতর ব্যাঘাত বর্ত্তমান। একটা

তখন স্ত্রী-স্বাধীনতাতে কি আর রুচি হয়? বরং একজন কেরাণীর পক্ষে বহুমূল্য ইংরাজী আস্‌বাব কেনা শোভা পায়—কেন না তাঁহাতে সে কেবল ধনে এবং পরিশেষে প্রাণে মারা যায় মাত্র; কিন্তু একজন রাজ-রাণীর পক্ষেও স্ত্রী-স্বাধীনতা শোভা পায় না—কেন না—অমূল্য কুলমানের বিনিময় ভিন্ন আমাদের দেশে স্ত্রী-স্বাধীনতা কিনিতে পাওয়া যায় না। ইহার কারণ আর কিছুই নহে—জেতৃজাতি জিতজাতির কুলমানের মূল্য অতি যৎসামান্য মনে করে; আমাদের ভদ্রলোকের স্ত্রীদিগকে আয়াদেরই সামিল মনে করে—তা চেয়ে নীচু বই উঁচু মনে করে না। কোন বাঙ্গালি ভদ্র ঘরের স্ত্রী দুর্ভাগ্য বশতঃ কতিপয় সভ্য ইংরাজমণ্ডলীর সঙ্গে এক টেবিলে খানা খাইতে বসিয়াছিল, সেই সভ্য-মণ্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ বলা কহা করিতে লাগিলেন যে, "শেষকালে মেৎরাণীর সঙ্গে আমাদের এক টেবিলে খানা খাইতে হইল।" বিদেশীয় রাজ্যে বাস করাতেই আমাদের ভাগ্যে সময়ে সময়ে ঐরূপ ঘটে; ম্যাঞ্চেষ্টরের একজন তাঁতির ছেলে যেখানে আমাদের দেশের ভদ্র-বংশীয় কায়স্থ কন্যাকে মেৎরাণী বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না, সেখানে ভদ্রবংশীয় স্ত্রীলোকদিগকে কত সাবধানে আগলিয়া রাখা কর্ত্তব্য তাহা কি আর বলিবার কহিবার বিষয়। ঠিক বিপরীত পৃষ্ঠ দেখিতে চাও ত বলি শুন; —আমাদের জাওসারে একবার কোন নৌকা-যাত্রী-ভদ্রলোকের নৌকায় তলা ফুটা হইয়া যাওয়াতে তিনি স্ত্রী-পুত্র সমভিব্যাহারে তাড়াতাড়ি ডাঙায় উঠিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; ডাঙায় কতকগুলি কুঁড়ে ঘর ও চাল-ডালের দোকান ছিল; তথাকার সকল লোকে মিলিয়া অতি যত্ন পূর্ব্বক স্ত্রীলোকটির সম্মান রক্ষার জন্য একটি কুঁড়ে ঘরের চারদিকে ঘের-ঘার দিয়া দিব্য একটি নিভৃত স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিল এবং আবশ্যক যত কিছু—সকলেই সহায়তা করিল, পারিতোষিকের কথা একবার মুখেও আনিল না; যে ব্যক্তি ঘর ছাড়িয়া দিয়াছিল সে ঘর ভাড়া স্বরূপ যাহা পাইল তাহাতেই সন্তুষ্ট। দেখ আমাদের দেশের চাষা ভূষা ইতর লোকেরাও কুল-স্ত্রীকে কিরূপ সম্মান-চক্ষে দেখে; ইহা ইউরোপ দেশের অতি ভক্তিপূর্ণ গ্যালান্‌ট্রী নহে—ইহা আর এক বস্তু; কি? না পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ পবিত্রভাবে দেখা। স্ত্রীলোকদিগকে মাতৃসম্বোধনে সম্মান করিবার প্রথা আমাদের দেশের যেটি আছে তাহার সহিত এবং ইউরোপ দেশীয় Gallantryর সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে দুয়ের মধ্যে স্বর্গ-নরক প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। দেশীয় কুলরমণীর যে একটি পবিত্র মর্য্যাদা তাহা কি Gallantry-পরায়ণ ব্যক্তিরা জানে? না তাহাদিগকে তাহা বলিয়া বুঝানো যাইতে পারে?—কিন্তু গ্যালান্‌ট্রী যে কি বস্তু তাহা আমরা বিলক্ষণ বুঝি—তাহার বশবর্ত্তী হইয়া একটি সুন্দরী মিস্‌ তাহার গুরুজনকে পশ্চাতে ফেলিয়া আপনি স্বচ্ছন্দে হট্‌ হট্‌ করিয়া প্রধান আসন গ্রহণ করেন—আমাদের দেশে এই সকল চাল্‌ চোল্‌ শিক্ষা হইলেই সর্ব্বনাশ! ইংরাজেরা যখন জেতৃজাতি এবং তাহারা আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের কুল-মর্য্যা-

স্বাধীনতা নেই বোলে পৃথিবীতে যদি আর কোন রকম স্বাধীনতা না থাকে, তাহোলে আমাদের দেশে পুরুষদের স্বাধীনতা আছে কি কোরে? আমাদের দেশে রাজনৈতিক-স্বাধীনতা নেই, অতএব পুরুষরা অন্তঃপুরে প্রবেশ করে না?* রাজনৈতিক-স্বাধীনতার সঙ্গে স্ত্রীস্বাধীনতার যদি কোন যোগ থাকে, তবে পুরুষ-স্বাধীনতার সঙ্গেও তা'র সেই পরিমাণে যোগ আছে সন্দেহ নাই। দেশীয় রাজার অধীনে থাক্‌লে স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়ে আমাদের এখনকার চেয়ে কি সুবিধা হোত ও কোন সুবিধা হোত, সেইটে বোল্লেই আমি চুপ কোরব। † লেখক মহাশয় হয়ত বোলবেন এখনো আমাদের দেশে স্ত্রী-স্বাধীনতার সময় আসে নি, সময় এলে স্বাধীনতা আপনা-আপনিই আস্‌ত। হঠাৎ যদি আজই সমস্ত স্ত্রীলোকেরা স্বাধীন হয়, তা' হোলে তা'র থেকে খারাপ ফল হোতে পারে। খুব সম্ভব আমাদের দেশে আজো স্ত্রীলোকদের স্বাধীন হবার সময় হয় নি, কিন্তু আমি ত আর তলবার হাতে কোরে স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রচার কোর্‌চি নে; কিংবা আমি ত আজই ভারতবর্ষের Governor general হোয়ে আইন বের কোর্‌চিনে যে, যারা স্ত্রী কন্যাদের স্বাধীনতা না দেয় তা'দের ফাঁসি দেওয়া হবে! আমি একটা কাগজে স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রার্থনীয় কি না, সে বিষয়ে আমার মত প্রকাশ কোরেছি; আমার আশাও ছিল না, উদ্দেশ্যও ছিল না যে, আমার প্রবন্ধটি পড়বামাত্র অমনি ভারতবর্ষের বিংশতি কোটি লোক তৎক্ষণাৎ তাদের স্ত্রী, কন্যা, ভগ্নীদের অন্তঃপুর থেকে মুক্ত কোরে তাঁদের অসূর্য্যম্পশ্যরূপত্বের গর্ব্ব থেকে বঞ্চিত কোরবে। আমি বিলক্ষণ জানতেম, সূর্য্যের এত সৌভাগ্য আজো হয় নি, যে, এত সহজে তার যুগযুগান্তরের আশা পূর্ণ হবে! আমার অভিপ্রায় এই ছিল যে যদি বা স্ত্রী-স্বাধীনতার সময় আমাদের দেশে এখনো না এসে থাকে তবে সেই সময় যত শীঘ্র আসে

দায় কোন তক্কাই রাখে না, তখন আমাদের কি-এত দায় পড়িয়াছে যে তাহাদের সমক্ষে আমাদের স্ত্রীলোকদিগকে বাহির না করিলেই নয়। ভাং সং

* পুরুষের অপমানিত হওয়া এবং স্ত্রীলোকের অপমানিত হওয়া যদি একই কথা হইত তাহা হইলে লেখক ঠিকই বলিতেছেন যে, স্ত্রীজাতিকে যেরূপ সাবধানে রক্ষা করা হয় পুরুষ জাতিকে সেরূপ রক্ষা করা না হয় কেন? কিন্তু বিলাতি গ্যালান্ট্রী-শাস্ত্রেও ত আছে যে স্ত্রীর গায়ে আঘাত লাগিলে যত লাগে পুরুষের গায়ে আঘাত লাগিলে উহার তুলনায় তাহা কিছুই নহে। ভাং সং

† আমাদের দেশে পূর্ব্বকালে অতি এক নির্ব্বিষ নিষ্কণ্টক স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রচলিত ছিল ইহা কাহারও অবিদিত নাই; বোম্বাই প্রদেশে এখনো তাহার কতকটা আভাস দেখিতে পাওয়া যায়; ইহাতেই যথেষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে স্বদেশীয় স্ত্রী-স্বাধীনতা স্বদেশীয় রাজ্য-শাসন-প্রণালীর আয়ত্তাধীনেই সুন্দর শোভায় পরিস্ফুট হইতে পারে। যেমন মুসলমানদিগের বাহুবল, তেমনি ইংরাজদিগের বাহুবল তিরস্করিণী মন্ত্র-বিদ্যা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর দিশি স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরোধী।

ভাং সং

আমাদের তার চেষ্টা করা উচিত। * প্রথমে আন্দোলন, তার পরে কাজ, তার পরে সিদ্ধি। সময় আসে নি বোলে যদি মুখ-বন্ধ কোরে বোসে থাকৃতে হয়, তাহোলে সময় কোন কালে আসে না। পৃথিবীতে কোন্ দেশে এমন কোন্ বৃহৎ সমাজ-সংস্কার হোয়েছে যা' আন্দোলন না কোরেই হোয়েছে? অত কথায় কাজ কি আমাদের বাঙ্গালা দেশে অতি অল্প দিন পূর্ব্বে যে ধর্ম্ম-সংস্কারের আরম্ভ হয় ও আজ পর্য্যন্ত যার আন্দোলন চোলচে, সেই বিষয়ে উদাহরণ দিলেই আমার যুক্তি অতি সহজে বোধগম্য হবে। † ভারতবাসীদের মন এখনো অজ্ঞতা কুসংস্কারাচ্ছন্ন আছে, নিরাকার ঈশ্বরের ভাব তারা বুঝতে পারবে না, সুতরাং এখনো সত্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার সময় হয়নি বোলে যদি রামমোহন রায় নিশ্চেষ্ট হোয়ে বোসে থাকৃতেন, যদি তখনকার বৃদ্ধ পৌত্তলিক সমাজের সঙ্গে ঘোরতর সংগ্রাম না কোরতেন, সময়ের অভাব, সময়ের শূন্য ভিক্ষার ঝুলি পূর্ণ করবার চেষ্টা না কোরে তিনি যদি ভিক্ষুক ভাবে অঞ্চল পেতে সময়ের মুখ-প্রতীক্ষা কোরে বোসে থাকৃতেন, তাহোলে আজকের এই ব্যাপ্যমান ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম কোথায় থাকৃত? * আমাদের দেশে স্ত্রী-স্বাধীনতার অভাব লোকে এখনো ভাল কোরে অনুভব কোরতে পারে নি, কিন্তু তাই বোলে কি চুপ কোরে বোসে থাকৃতে হবে? ব্যক্তি বিশেষের যদি অস্বাভাবিক কারণে ক্ষিদে আদবে না থাকে, তাহোলে তাকে খেতে দিওনা কেন না, সে হজম কোর্তে পারবে না; কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁকে কবিরাজ দেখানো কর্ত্তব্য, যাতে তার ক্ষিদে হয়, এমন বটিকা সেবন করানো আবশ্যক। আমি তাই ভেবে-চিন্তে ভারতীতে সমাজের জন্যে এক রতি বটিকার ব্যবস্থা কোরেছিলুম; কিন্তু রোগ এমন বদ্ধমূল, ও কবিরাজের

* "যত শীঘ্র আসে" এ চেষ্টা অপেক্ষা যত শোভন-ভাবে, নির্ব্বিঘ্ন ভাবে, নিরুপদ্রব ভাবে আসে, এই চেষ্টা অধিক প্রার্থনীয়। যদি বল-যে শেষোক্ত চেষ্টা বৃথা হইবে, তবে আর একজন বলিবে পূর্ব্বোক্ত চেষ্টা ও বৃথা হইবে; প্রকৃত কথা এই যে, দুই চেষ্টারই ফলের আশা এত অল্প যে, আমাদের ভাগ্যে উভয়ই এক প্রকার দুরাশা; কিন্তু যদি "যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধ্যতি কোঽত্র দোষঃ" এই ভাবিয়া কোমর বাঁধিয়া চেষ্টা করিতে হয় তবে শেষোক্ত প্রকারের চেষ্টাই সর্ব্বতো-ভাবেই শ্রেয়। ভাং সং

† আন্দোলন যাহাতে রীতিমত হয় অর্থাৎ এক-দিক্-ঘেঁসা না হয় এই জন্যই বর্ত্তমান প্রস্তাবটির পদে পদে টিপ্পনী সংযোগের এত [illegible]। ভাং সং

* "রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দেওয়া হোক্,—তিনি যেরূপ দেশীয় আকারে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, স্ত্রী-স্বাধীনতা সে ভাবে প্রচারিত হইলে আমরা ত বাঁচিয়া যাই—কিন্তু এ ত তা নয়—এ হচ্চে বিবিদের গাউনের আঁচল ধরিয়া চলা—আয়া-গিরি করা। বোম্বাই দেশেও ত স্ত্রী স্বাধীনতা আছে; স্বাধীন বৃত্তি ও রুচি সহকারে স্ত্রী-স্বাধীনতার ভাল একটা আদর্শ দাঁড় করাও—তাহা আমরা মাথায় করিয়া লইব; কিন্তু তাহা বলিয়া স্ত্রী স্বাধীনতার নামের খাতিরে তাহার একটা অন্তঃসার-শূন্য চিকণ-চাকণ আদর্শকে "এই উচ্ছিষ্টই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট" বলিয়া গলাধঃকরণ করিতে পারি না। ভাং সং

সাধ্যমত বটিকার মাত্রা এমন যৎসামান্য, যে তা'তে উপকার হবার সম্ভাবনা অতি অল্প। কিন্তু আমাদের দেশের সকল কবিরাজ মিলে যদি এই রমক বটিকা সেবন আরম্ভ করান, তাহোলে অচিরাৎ রোগীর ক্ষুধার সঞ্চয় হবে। লেখক মহাশয় বলেন "উঃ ইনি স্বাধীনতার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ কোরেছেন" এরূপ কেউ যদি মনে করেন, তবে তাঁহাদের জানা উচিত যে, এ স্বাধীনতা দেশেরও স্বাধীনতা নহে, আত্মারও স্বাধীনতা নহে, কেবল পর-পুরুষগণের সহিত স্ত্রীলোকগণের আমোদ-প্রমোদে মেলা-মেশা। কথা গুলো এমন কোরে বসানো হোয়েছে যে, শুনলে অনেক পাঠকের গা শিউরে উঠবে! "পর-পুরুষ!" "আমোদ-প্রমোদ!!" "মেলা-মেলা!!!" কি সর্ব্বনাশ! আমাদের ভাষায় "পর-পুরুষ" কথাটার সঙ্গে একটা দারুণ বিভীষিকা লিপ্ত আছে, লেখক মহাশয় সেই সুবিধা পেয়ে কথাটা ব্যবহার কোরেছেন। কিন্তু আমি জানতে চাই, পবিব "পর-পুরুষ" কথাটি কি অপরাধ কোরেচে, যে, সে বেচারীর ওপরে এত নিগ্রহ! পর বোলেই কি তার এত দোষ?* কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে বলে মহাত্মা লোকদের "বসুধৈব কুটুম্বকং।" "আমোদ-প্রমোদ" ও "মেলা-মেশা" কথা দুটো এমন ভাবে ব্যবহার করা হোয়েছে যে তার মধ্যে থেকে একটা ঘোরতর রহস্যপূর্ণ অর্থ প্রকাশ পাচ্চে। কিন্তু আমি আশা করি, আমাদের দেশের রুচি এখনো এমন বিকৃত হোয়ে যায় নি, দেশীয় লোকের মন এমন পশুত্বে পরিণত হয় নি, তাঁদের দৃষ্টি এমন "পিঙ্গল" হোয়ে যায় নি, ও তাঁদের "কল্পনার দূরবীক্ষণ" এত দূর পর্য্যন্ত বিগ্‌ড়ে যায় নি, যে, তাঁরা "আমোদ-প্রমোদ" ও "মেলা-মেশা" মাত্রেরই মধ্যে একটা হীন, একটা জঘন্য, একটা বীভৎস ভাব দেখ্‌তে পা'ন।* অতএব যদি "আমোদ-

* একজন পর-মানুষ কিছু দোষ করে নাই বলিয়া তাহার সহিত আত্মীয় স্বজনের মত ব্যবহার করিতে হইবে, তাহাকে ঘরের স্ত্রী-লোকদিগের সহিত মেলা-মেশা করিতে দিতে হইবে, ইহা কোন ইংরাজি আইনে পাওয়া যায়? ভাং সং

* লেখকের মত এই যে, যেমন পুরুষে পুরুষে আমোদ-প্রমোদে মেলা-মেশা নিষ্কণ্টকে চলিতে পারে, পরপুরুষে পরস্ত্রীতেও তাহা তেমনিই নিষ্কণ্টকে চলিতে পারে; কিন্তু কাজে কি দেখা যায়? দুই জন পুরুষ মানুষের মধ্যে যতই কেন বন্ধুতা ও ঘনিষ্ঠতার মাত্রা বাড়ুক না তাহাতে বিশেষ কাহারো কিছু আইসে যায় না; কিন্তু পরস্ত্রী এবং পর-পুরুষের মধ্যে নির্দ্দোষ বন্ধুতার মাত্রা বাড়িলে অনেকেরই তাহা শঙ্কার বিষয় হয় কেন? ইংরাজ-সমাজের বিধানানুসারে পরপুরুষদের সঙ্গে পরস্ত্রীদের হাত ধরাধরি করিয়া নাচিতে পর্য্যন্ত কোন দোষ নাই,—কিন্তু আমাদের চক্ষে ওটা কিছু আমোদ-প্রমোদ মেলা-মেশার আতিশয্য বলিয়াই ঠেকে। আমাদের দেশে স্ত্রী-স্বাধীনতা ছিল না এমন নহে এবং এখনো তাহা কোথাও কোথাও আছে, কিন্তু তথাপি স্ত্রীলোকেরা আমাদের এমনি সম্মানের পাত্রী যে পর-কেহ তাহাদিগকে স্পর্শ করিবে ইহা আমরা দেখিতে পারি না। সখ্য এবং দাম্পত্য দুয়ের মধ্যে কেবল একটা বালির বাঁধ সংস্থাপন করিয়া যাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকেন তাঁহারাই বলিতে পারেন—এতে দোষ কি, তা'তে দোষ কি, কিন্তু যাঁহারা স্ত্রী-স্বাধীনতা চা'ন অথচ সখ্য ও দাম্পত্য দুইকে সম্পূর্ণ পৃথক্

প্রমোদ" ও "মেলা-মেশা" মাত্রেরই খারাপ অর্থ না থাকে ও "পরপুরুষ" মাত্রেই যদি বাঘ ভাল্লুক বা চোর ডাকাত না হয়, তাহোলে "পরপুরুষের" সঙ্গে "আমোদ-প্রমোদ" "মেলা-মেশায়" কি দোষ আছে? একজন অন্যায় রূপে কারাবদ্ধ ব্যক্তিকে স্বাধীনতা দেবার বিরুদ্ধে তুমি ত বোল্‌তে পার যে, "এ স্বাধীনতা আত্মারও স্বাধীনতা নহে, দেশেরও স্বাধীনতা নহে, কেবল স্বজাতিবর্গের সহিত এক ব্যক্তির আমোদপ্রমোদ মেলা-মেশা, এ কতদূর স্বাধীনতা নামের যোগ্য তাহাই সন্দেহ স্থল!" আত্মার স্বাধীনতা ও দেশের স্বাধীনতা ব্যতীতও আরো অসংখ্য স্বাধীনতা আছে, যা প্রার্থনীয়।* উপসংহারে সম্পাদক মহাশয় বোলছেন যে, স্ত্রীগণকে অন্তঃপুরে রাখা পুরুষদের স্বার্থপরতার ফল নয়, সাংসারিক কাজ কর্ম্মের অনুরোধে তা স্বভাবতই হোয়ে দাঁড়িয়েছে। স্ত্রী-স্বাধীনতা বিরোধীদের এক এক অতি পুরাণো যুক্তি আছে; কিন্তু আমার বোধ হয় এটা আর কারো চক্ষে আঙুল দিয়ে দেখাতে হবে না যে, প্রাচীরবদ্ধ অন্তঃপুরের মধ্যে চিরকালের জন্তে প্রবেশ করা ও সমস্ত পৃথিবী থেকে আপনাকে রুদ্ধ কোরে রাখা

রাখিতে চা'ন তাঁহারা ঐ স্থানে প্রস্তরের বাঁধ ভিন্ন আর কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। লেখক হয় বলিবেন—সু-চক্ষে দেখিলে সকলই সু, কু-চক্ষে দেখিলে সকলই কু, তাহার যো নাই,—সহস্র বন্ধুনী হউন না কেন তাঁহার বাড়ীতে যদি পুরুষ-মানুষ কেহ না থাকে তবে ইংরাজি শাস্ত্রে তাঁহার ঘরে গিয়া তাঁহার সহিত সখ্যালাপ করা অবিধি হইল কেন? সু-চক্ষে দেখিলে তাহাতে ত কোন দোষ নাই। ভাং সং

* আত্মার স্বাধীনতা সকল অবস্থাতেই নির্দ্দোষ কিন্তু স্ত্রী-স্বাধীনতা যে অংশে বুঝায়—"পর পুরুষগণের সহিত একত্রে আমোদ-প্রমোদে মেলা-মেশা" সে অংশে তাহা নির্দ্দোষ হইতেও পারে, না হইতেও পারে; কে বলিতে পারে যে, তাহা নির্দ্দোষ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। সুতরাং আমরা এখনো বলিতেছি যে, পর-পুরুষদিগের সহিত আমোদ-প্রমোদে মেলা-মেশা আত্মার স্বাধীনতার ন্যায় দোষাশঙ্কার সীমা-বহির্ভূত এমন কোন বস্তু নহে যে, তাহা স্ত্রীলোকের অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে গণ্য হইবে; উহা অপেক্ষা বরং আপনাদিগকে মিথ্যা-অপবাদ নিন্দাগ্লানি প্রভৃতি হইতে রক্ষা করা স্ত্রীলোকদিগের বেশী কর্ত্তব্য কর্ম্ম। স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রার্থনীয় নহে—ইহা আমরা কোন কালে বলিও নাই বলিবও না, কিন্তু যে প্রকার স্ত্রী-স্বাধীনতা হইতে সুফল অপেক্ষা কুফলেরই অধিক সম্ভাবনা, সে স্ত্রী-স্বাধীনতা থাকা অপেক্ষা না থাকা-ই অধিক প্রার্থনীয়। যে দেশে বুদ্ধিমান লোকের নিকট বিবাহ বিভীষিকা-বিশেষ, সে দেশের স্ত্রী-স্বাধীনতার অনুকরণ করিবার জন্য হিন্দুসমাজের কি যে দায় পড়িয়াছে তাহা ত বুঝা যায় না; বোম্বাই দেশে কি স্ত্রীস্বাধীনতা নাই—মহারাষ্ট্রীয় দেশে কি স্ত্রীস্বাধীনতা নাই—সে-সব অগ্রাহ্য করিয়া ভয়ানক উৎপেতে ইউরোপীয় স্ত্রীস্বাধীনতাকে আদর্শ করিয়া চলিতে আমাদের যে, এত ব্যগ্রতা, তাহার অর্থ আর কিছুই নয়, খালি—বিধাতার বিড়ম্বনা; তাহার অর্থ—অর্থের অপব্যয়, সময়ের অপব্যয়, শরীরের কষ্ট, মনের কষ্ট আর মেম্‌-সাহেবি একটা ভমো—এই যা' কিছু। ভাং সং

স্বাভাবিক হওয়াই নিতান্ত অস্বাভাবিক।* যদি সত্যই স্বাভাবিক হোত তা' হোলে য়ুরোপে কেন এ স্বভাবের নিয়মের পরিবর্ত্তন হোক? এখানে কি স্ত্রীলোকদের স্বামী নেই, না সন্তান হোলেই তারা গঙ্গাসাগরে বিসর্জ্জন দিয়ে আসে? লেখক মহাশয় বলেন "কুল-রমণীরা যে, যে-সে পুরুষের সঙ্গে আমোদ করিয়া বেড়ায় না, সে কেবল পতির শাসনভয়ে নহে, পতির প্রতি ভালবাসাই তাহার কারণ।" ও হরি! আমি কি বলেছি যে কুল-রমণীরা "যে-সে" পুরুষের সঙ্গে কেবল "আমোদই" কোরে বেড়াবে? রেখা গুলিকে ঈষৎ বেঁকিয়ে চুরিয়ে বাড়িয়ে কমিয়ে, একটি সুশ্রী ছবিকেও কদর্য্য করা যায়, শিবকেও বাঁদর গোড়ে তোলা যায়। কোন পাঠক মহাশয় কি আমার লেখা থেকে মনে কোরেছেন যে আমাদের কুল রমণীরা পথে ঘাটে যাকে তাকে দেখবে তারই সঙ্গে আমোদ কোরে বেড়াবে?* অত কথায় কাজ কি, কোন্

* স্বাভাবিক-অস্বাভাবিকের সহিত এখানকার সম্পর্কই নাই—এখনকার যা' কিছু বিচার তা' কেবল সুবিধা অসুবিধা নিয়ে। আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থাতে স্ত্রীলোকদের অন্তঃপুর-বাস-প্রথা সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ বলিয়াই তাহা প্রার্থনীয়; যদি চতুর্দ্দিকে মানহানির ভয় সত্য সত্যই বিদ্যমান না থাকিত তাহা হইলে অন্তঃপুরকে কারাগারের সহিত তুলনা করিলে দোষের হইত না, কিন্তু দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া দেখিলে নিশ্চয়ই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে যে, অন্তঃপুর কুল-স্ত্রীদিগের কঠোর কারাগার নহে,—তাহা তাহাদের নিরাপদ-দুর্গ, অভয়-নিকেতন; আগে যথার্থ ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা চারিদিকের জঞ্জাল পরিষ্কার কর, তাহার পরে অন্তঃপুর-প্রথা অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তন কর—তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র অমত নাই। কিন্তু তা'ও বলি অন্তঃপুর-প্রথা একেবারেই উচ্ছেদ করা কখনই হইতে পারেও না পারিবেও না; এমন কি ইউরোপে অন্তঃপুরপ্রথা একেবারে যে নাই তাহা বোধ হয় না; ও-দেশে যদি পুরুষদিগের মেলা-মেশা করিবার স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট না থাকে তবে সে অভাব যত শীঘ্র পূরণ হয় ততই ভাল। Boudoir বোধ হয় কতকটা আমাদের অবরোধের কাছাকাছি যায়। যাহা হউক্—আমাদের দেশের অন্তঃপুর-প্রথা পরিবর্ত্তন করিবার যদি আবশ্যক হয় তবে আমাদের আপনাদের রকমে তাহা করা উচিত। "আপনাদের রকমে" কাহাকে বলে তাহার একটি দৃষ্টান্ত;—আমাদের দেশের অতিথি সেবা যেমন স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা যত্নের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহাকে আদর্শ করিয়া আমাদের অন্তঃপুর-প্রথা পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে, এমন কি অন্তঃপুরের গৃহিণী কোন অভ্যাগত ব্যক্তির অতিথিসৎকার করিলে তাহা আমাদের দেশাচারের চক্ষে ভাল বই মন্দ দেখিতে হয় না। বোম্বাই প্রদেশে এইরূপ প্রথা অদ্যাপি প্রচলিত আছে। ভাং সং

* যে-সে লোকের সহিত আমোদ-প্রমোদ করিয়া বেড়ানো সর্ব্বদাই হউক আর কদাচ কখনই হউক, তাহা কুল-স্ত্রীকে শোভা পায় না,—যে-সে লোক বলিলে শুদ্ধ যে, কেবল দুষ্ট লোকই বুঝায়, শুদ্ধ যে কেবল অভদ্র লোকই বুঝায়, শুদ্ধ যে কেবল পথের লোকই বুঝায় তাহা নহে; শান্তশিষ্ট লোক বল, ভদ্র লোক বল, পরিচিত লোক বল, অবস্থা-বিশেষে সকলেই যে-সে লোকের মধ্যে

দেশের পুরুষেরাই "যে-সে" পুরুষের সঙ্গে "আমোদ" কোরে বেড়ায়? আমরাত অনেক লোকের সঙ্গে মিলে থাকি, আমরা কি কেবলমাত্র আমোদ করবার জন্যেই মিলি? আমরা কাজ কর্ম্মের জন্যে মিলি, ভদ্রতার খাতিরে মিলি, বন্ধুভাবে মিলি, সাহায্য কোরতে মিলি, সাহায্য গ্রহণ কোরতে মিলি এবং মেলবার এমন আরো অসংখ্য উপলক্ষ আছে। পৃথিবীতে শত সহস্র মানুষ আছে ও মানুষ সামাজিক জীব, সুতরাং মানুষে মানুষে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হওয়াই স্বাভাবিক। নিতান্ত চোখে ঠুলি দিয়ে না বেড়ালে বা অন্তঃপুরের সিন্দুকে চাবি বন্ধ না থাকলে এরকম দেখা সাক্ষাৎ নিবারণের আর ত কোন উপায় নেই। তা ছাড়া অন্য লোকের সঙ্গে মেশা কি স্বামীর প্রতি অপ্রীতির চিহ্ন? আমি ত তার একটা অর্থ খুঁজে পাইনে।* তোমার একটি নিতান্ত অন্তরঙ্গ

পরিগণিত হইতে পারেন। লোকটি ভদ্রবংশীয়, লেখা পড়া জানে, কথাবার্ত্তা বেস্, ভদ্র আচার ব্যবহার, আমার পরিচিত—এই পর্য্যন্ত, কিন্তু আমি তাহার ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং চরিত্রের জন্য দায়ী নহি—এমন যে ব্যক্তি ইনিও এক হিসাবে যে-সে লোকের মধ্যে ধর্ত্তব্য—কোন্ হিসাবে? না যখন তাঁহাকে অন্তঃপুরের স্ত্রীগণের সহিত আলাপ করাইয়া দিবার কথা। যাহার সহিত সবে নূতন আলাপ হইয়াছে তাহার সহিত হাত ধরাধরি করিয়া নাচিতে স্ত্রী জনের যদি কোন বাধা না থাকে তবে যে-সে লোকের সহিত আমোদ-প্রমোদ করিয়া বেড়াইতে যে কিসের বাধা, তাহা বুঝা যায় না—সকল সময়েইত কিছু আর আমোদ-প্রমোদ দোষে কলঙ্কিত হয় না। ভাং সং

---

* কুল-স্ত্রীরা যে পর-পুরুষদিগের সহিত বেশী মেলামেশা ও আমোদ-প্রমোদ করে না, তাহার কারণ অনেক গুলি যথা;—(১) পাছে কুলোকে কুভাবে, যাহাকে খুব ভাল বলিয়া জানা আছে তাঁহারও অন্তঃকরণ কু হইবার আটক নাই; (২) পাছে সুলোকে কু ভাবে,—ইহাতেও আটক নাই; পরস্ত্রী পরপুরুষে মেলা-মেশা কতটুকু পর্য্যন্ত শোভা পায় তাহার একটা মাত্রা রাজ-নিয়ম দ্বারা আজি পর্য্যন্তও নির্দ্ধারিত হয় নাই, আমি যাহা দেখিয়া বলিব "ইহাতে দোষ নাই" আর একজন বলিবে "এতটা ভাল নয়;" সেক্সপিয়রের উইন্টরস্ টেলের হরমিওনী বেচারির ও তাঁহার স্বামীর দুর্দ্দশা বিবিসাহেবদিগকে বিলক্ষণই ভোগ করিতে হয়, কিন্তু কি করিবেন? দুর্জ্জয় দেশাচার—সুতরাং নাচার! (৩) পাছে স্বামীর মনে কু-আশঙ্কা স্থান পায়; স্বামীর মনে হয় ত এইরূপ একটা মাত্রা নির্দ্ধারিত আছে, যে, পর-পুরুষদের সহিত স্ত্রীলোকের এইটুকু পর্য্যন্ত মেলা-মেশাই ভাল, তাহা অপেক্ষা বেশী ঘনিষ্ঠতা ভাল না। যে স্ত্রী স্বামীকে ভাল বাসে সে স্ত্রী সেই মাত্রাটি অতিক্রম করিয়া স্বামীর মনে আঘাত দিতে কুণ্ঠিত হইবে না ত আর কে হইবে? সে মাত্রা কতটুকু স্বামীই তাহা জানে, স্ত্রী তাহা জানে না, সুতরাং যদি স্বামীর মনঃপীড়া জন্মানো স্ত্রীর প্রার্থনীয় না হয়, তবে শেষোক্তের উচিত পর-পুরুষদের সহিত আমোদ-প্রমোদে মেলা-মেশা না করা; যে স্ত্রী স্বামীকে অধিক ভাল বাসে তাহার তাহাতে প্রবৃত্তিই হয় না। সেক্সপিয়রের উইন্টরস্ টেলে লিয়ন্টীসের স্ত্রী হরমিওনী

প্রাণের বন্ধু আছে, কিন্তু তাই বোলে কি তুমি ঘোম্‌টা টেনে বোসে থাক্‌বে,* ও পর পুরুষের (অর্থাৎ বন্ধু ছাড়া অন্য কোন পুরুষের) মুখ

যখন লিয়ণ্টীসের একজন বন্ধুর সহিত সেকহ্যাণ্ড করিতেছেন তখন লিয়ণ্টীস আপন মনে বলিতেছেন—

Too hot, too hot !
To mingle friendship far is mingling bloods.
I have tremor cordis (হৃৎকম্প) on me my heart dances.
But not for joy,—not joy.—This entertainment
May a free face put on: derive a liberty
From heartiness from bounty, fertile bosom,
And well become the agent: it may I grant:
But to be paddling palms and pinching fingers;
As now they are; and making practised smiles,
As in a looking glass, and then to sigh, as twere
The mort of the deer (হরিণের মরণ কালীন দীর্ঘ নিশ্বাস) O, that is entertainment
My bosom likes not, nor my brows.

এই ত গেল সেক্সপিয়র;—আমাদের কোন সুবিচক্ষণ সাহেব-বন্ধুর মুখে আমরা স্বকর্ণে এইরূপ শুনিয়াছি;—"কি! আমার স্ত্রীর গাত্র অন্য লোকে স্পর্শ করিবে; আমি অন্য লোকের স্ত্রীর গাত্র স্পর্শ করিব—ছি!"

(৪) স্বামী মনে করিতে পারে যে, আমি আমার স্ত্রীর চরিত্র যেরূপ জানি তাহাতে সে পরপুরুষদের সহিত সহস্র মেলা-মেশা করিলেও কোন দোষের সম্ভাবনা নাই, কিন্তু সেরূপ করিলে অমুক অমুক ব্যক্তিরা কু মনে করিতে পারে—মিছামিছি একটা কলঙ্ক কুড়াইয়া প্রয়োজন কি? এরূপ যখন হইতেও পারে হইয়াও থাকে, তখন পরপুরুষদিগের সহিত আমোদ-প্রমোদ করিবার কি এমন মূল্য যে, তাহার জন্য স্ত্রী স্বামীর মনে এক মুহূর্ত্তেও ঐরূপ দুর্ভাবনা উদ্দীপন করিয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিবে। ভাং সং

* অত্যুক্তি। অন্তরঙ্গ লোকের নিকট কে ঘোম্‌টা টানিয়া বসিয়া থাকে? ঘোমটা যা' দেওয়া থাকে তাই থাকে, টানিয়া বেড়াইবার প্রয়োজনাভাবে শুধু শুধু কেন তাহা করিবে? অন্তরঙ্গ—প্রাণের কেন—মুখের বন্ধুর সঙ্গেও সকল স্ত্রীলোকেরই ত সহজভাবে কথাবার্ত্তা চলিয়া থাকে। তবে যদি বল যে ঘোমটা দেওয়াটাই অন্যায়—তবে সে কোন কাজের কথা নহে, কেন না তাহা ন্যায়ও নহে, অন্যায়ও নহে, তাহা দেশাচার মাত্র; তাহা দেখিতেও ভাল বই মন্দ নহে, যদি ঘোমটা না দেওয়া প্রথা থাকিত তাহা হইলে কালিদাসের এই সুন্দর কবিতাটি আমরা দেখিতে পাইতাম না—"কেয়মবগুণ্ঠনবতী নাতিপরিস্ফুটশরীর-লাবণ্যা।" অতি পরিস্ফুট লাবণ্যের তীব্রতাও নহে, অপরিস্ফুট লাবণ্যের মন্দতাও নহে, কিন্তু উভয়ের মাঝামাঝি অনতিপরিস্ফুট লাবণ্যের যে একটি মাধুর্য্য তাহা কেবল অবগুণ্ঠন দ্বারাই রক্ষিত হইতে পারে। ভাং সং

দেখবে না বা তাদের সঙ্গে কথা কবে না?* তাদের মুখ দেখলে বা তাদের সঙ্গে কথা কইলে কি তোমার বন্ধুর ভালবাসার প্রতিদান দেওয়া হোল না? এমন বন্ধুর সঙ্গে আমি ত কোন কারবার রাখিনে।†

যাহোক্—"এই সকল যৎপরোনাস্তি দুরূহ বিষয়ের তত্ত্ব" এই বাঙ্গালীকে শিক্ষা দেবার জন্যে লেখক মহাশয় একটা নূতন বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি করবার পরিশ্রম স্বীকার না কোরে যদি তাঁর অবসর মত এই ভারতীতে এ বিষয়ে মাঝে মাঝে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন, তা'হোলে এই য়ুরোপ-প্রবাসী বঙ্গ-যুবক গুরু-দক্ষিণা স্বরূপ তাঁর নোটানলের ইন্ধন-যোগ্য আরো কতকগুলো সৃষ্টিছাড়া সমাজ-সংস্কার মত পাঠিয়ে দেবে।

---

* মুখ দেখিতেও দোষ নাই, কথা কহিতে দোষ নাই, আলাপ করিতেই দোষ, সুতরাং এটাও অত্যুক্তি। ভাং সং

† আমার বন্ধুর সহিত আমি কোন কারবার রাখিব না, এমন কি তাহার মুখ দর্শন করিব না,—অপরাধ? না তিনি তাঁহার স্ত্রীর সঙ্গে আমার আলাপ করাইয়া দেন নাই; একটা ব্যাঘ্রের মুখ হইতে আমিষ কাড়িয়া লইলে তাহারই বটে ঐরূপ ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে কিন্তু লেখকের অতবড় রাগের তেমন ত কোন গুরুতর কারণ দেখা যায় না; ইংরাজেরা দেখ কেমন ধীর-প্রকৃতির লোক, তাঁহাদের স্ত্রীরা পরপুরুষদিগের সহিত নাচিলেও তাঁহাদের ধৈর্য্যলোপ হয় না। ভাং সং

অষ্টম পত্র।

আমি বিলিতি মেয়েদের একটু নিন্দে কোরে লিখেছিলুম বোলে, বুঝি সেটা ভাল লেগেছে। কিন্তু আমি সেটা কেবল এক শ্রেণীর মেয়েদের একটা ভাগ দেখিয়েছিলুম মাত্র, তাঁরা হোচ্চেন Eashionale মেয়ে, তাঁদের দোরস্ত কোর্ত্তে হোলে দিন দুই আমাদের দিশী শাশুড়ীর ও ঘরের বিধবা ননদের হাতে তাঁদের রাখতে হয়। তাঁরা হোচ্চেন বড় মানুষের মেয়ে কিংবা বড় মানুষের স্ত্রী, তাঁদের চাকর আছে, কাজ কর্ম্ম কোর্ত্তে হয় না, এক জন House-keeper আছে, সে বাড়ির সমস্ত ঘরকন্না তদারক করে, এক জন nurse আছে, সে ছেলেদের মানুষ করে, এক জন Governess আছেন (Governess ভদ্র লোকের মেয়েদের থেকে নেওয়া হয়) তিনি ছেলে পিলেদের পড়া শুনো দেখেন ও অন্যান্য নানাবিধ তদারক করেন; তবে আর তাঁর পরিশ্রম করার কি রইল বল, কেবল একটা ঘোরতর পরিশ্রম বাকি আছে, সেইটে তাঁর দিনের মধ্যে সকলের চেয়ে প্রধান পরিশ্রম, অর্থাৎ সাজসজ্জা করা; কিন্তু তার জন্য তাঁর Lady's maid আছে, সুতরাং এমন সাধের পরিশ্রমটাও সমস্তটা তাঁকে নিজের হাতে কোর্ত্তে হয় না। সকাল থেকে সন্ধ্যে-পর্য্যন্ত দিনটা তাঁর হাতে আস্ত পড়ে রোয়েছে, সকাল বেলায় বিছানায় পোড়ে, দরজা জানালা বন্ধ-কোরে সূর্য্যের আলোক আসতে না দিয়ে দিনটাকে কতকটা সংক্ষেপ করেন, বিছানায় শুয়ে শুয়ে breakfast খান ও এগারোটার আগে শয়ন-গৃহ থেকে বেরোলে যথেষ্ট ভোরে উঠেছেন মনে করেন। তার পরে সাজসজ্জা; সে বিষয়ে তোমাকে কোন

প্রকার খবর দিতে পারচিনে। শোনা যায় খুব সম্প্রতি বিলেতে স্নানটা fashion হয়েছে, কিন্তু এ Fashion টা খুব কম দূর ব্যাপ্ত হোয়েছে। সিমন্তিনীরা হাতের যতটুকু বেরিয়ে থাকে—মুখটি ও গলাটি দিনের মধ্যে অনেকবার অতি যত্নে ধুয়ে থাকেন; বাকি অঙ্গ পরিষ্কার করবার তাঁরা তত আবশ্যক দেখেন না, কেন না মনোহরণের প্রধান সিঁধ মুখটিতে কোন প্রকার মোর্‌চে না পোড়লেই হোল। মাসে দুবার একটা Sponge-bath নিলেই তাঁরা যথেষ্ট মনে করেন; Sponge-bath-এর অর্থ হোচ্চে, একটা ভিজে স্পঞ্জ দিয়ে গা সাফ. করে ফেলা, অর্থাৎ একটা ভিজে গামছা দিয়ে গা মোছা আর কি। আমি একটা ইংরেজ পরিবারের মধ্যে বাস কর্ত্তে গিয়েছিলেম, তাঁরা আমি স্নান করি শুনে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হোয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের কোন প্রকার স্নানের সরঞ্জাম ছিল না, সমস্ত আমার জন্যে ধার কোরে আন্‌তে হয়েছিল, এমন বিপদ! যা'হোক্, আমাদের বিলাসিনী স্নান কোর্‌লেন কি না বোল্‌তে পারিনে, তা'র পরে তাঁর সাজসজ্জার বিষয়ে আমি নিতান্তই অনভিজ্ঞ। কাপড়ের এখানে একটু ফিতে, ওখানে একটু পাড়, কোথাও একটু এলোমেলো করে দেওয়া, কোথাও একটু পিন্ দিয়ে আটকে রাখা। কত প্রকার টুক্‌রো টুক্‌রো জিনিষ পত্র এটে সেঁটে, মুখে কত প্রকার রং চং লেপে মনোদুর্গ আক্রমণের জন্য যথাযোগ্য যুদ্ধ-সজ্জা সমাপ্ত হয়। তার পরে এই রকম বাহারে সাজসজ্জায় এক বাণ্ডিল রূপের মত drawing-room-এর (অভ্যর্থনা-শালার) কোচে গিয়ে বসলেন; বাড়িতে লোক দেখা কোর্ত্তে এলে তাদের সঙ্গে আলাপচারী করা হচ্চে তাঁর কাজ, অনেক লোক একসঙ্গে এলে তাঁর কর্ত্তব্য হোচ্চে—তাঁর বাক্য ও হাসির অমৃত সকলকে সমানভাবে বিতরণ করা, বিশেষ কারো সঙ্গে বেশী কথা কওয়া বা বিশেষ কাউকে বেশী যত্ন করা কোন মতে উচিত নয়। একাজটা অত্যন্ত দুরূহ, বোধ হয় অনেক অভ্যেসে দুরস্ত হয়। আমি লক্ষ্য করে দেখি তাঁরা কি কোরে এ কাজ সিদ্ধ করেন; আমি দেখেছি তাঁরা এক জনের মুখের দিকে চেয়ে একটা কথা কন, তার পরে শেষ করেই সকলের দিকে চেয়ে একবার হাসেন, কখনো বা তাঁরা এক জনের মুখের দিকে চেয়ে একটা কথা আরম্ভ করেন, তার পর বল্‌তে বল্‌তে এক এক বার করে সকলের মুখের দিকে চেয়ে নেন, কখন বা, তাস খেলবার সময় যে রকম করে চট্ পট্ তাস বিতরণ করে, তেমনি তাঁরা আগন্তুকদের একে একে করে একটি একটি কথার টুকরো ছড়িয়ে ছড়িয়ে দেন, এমন তাড়াতাড়ি ও এমন সহজে করেন যে, তাঁদের হাতে যে অনেক কথার তাস গোছানো রয়েছে তা সহজেই বোঝা যায়। এক জনকে বল্লেন, "Lovely morning, is n't it?" তার পরেই তাড়াতাড়ি আর এক জনের মুখের দিকে চেয়ে বোল্লেন, "কাল রাত্তিরে সঙ্গীতশালায় মাডাম্ নীল্‌সন্ গান করেছিলেন, it was exquisite!" যতগুলি মহিলা Visitor বসেছিলেন সকলে ঐ কথায় এক একটা বিশেষণ যোগ কর্ত্তে লাগলেন; একজন বল্লেন "oh charming," একজন বল্লেন "Superb," একজন বল্লেন "Something unearthly," আর একজন বাকী ছিলেন, তিনি বল্লেন "Is n't it?" এই রকম সর্ব্বদিকব্যাপী কথাবার্ত্তা চল্‌তে থাকে। আমার ত বোধ হয়, এ এক রকম

সকাল বেলা উঠে কথোপকথনের মুগুর ভাঁজা। যা' হোক্ এই রকম মাঝে মাঝে visitor আনাগোনা কোরচে। বাকী সময় তিনি কি করেন? Mudies Library তে তিনি Subscribe করেন, সেখেন থেকে অনবরত নভেলগুলো তাঁর ওখেনে যাতায়াত কর্ত্তে থাকে। সেগুলো অনবরত গলাধঃকরণ কর্‌চেন। তা'ছাড়া flirt করা আছে। flirt করা কি জান? ভালবাসার অভিনয় করা। দুই পক্ষেই জানচেন যে, কেউ ভালবাস্‌চেন না, অথচ মিষ্ট হাসি ও মিষ্ট কথার অজস্র আদান প্রদান চল্‌চে; অভিনেত্রী হয়ত একটা অলীক ছুঁতো নিয়ে একটু অলীক অভিমান কোর্‌লেন অভিনেতা অমনি একটু সান্ত্বনার অভিনয় কর্‌লেন; একটা হয়ত রসিকতার কথা বল্লেন, অমনি অভিনেত্রী তাঁর তুষার-হস্তে ক্ষুদ্র-মুষ্টি উদ্যত করে আদর মাখা রাগের অভিনয় কোরে বল্লেন, "oh, you naughty, wicked provoking mon!" Naughty man অত্যন্ত তৃপ্তি-সূচক হাস্য করলেন। এই রকম রসিকতা হাসি তামাসা ও মিষ্ট কথার ক্ষণস্থায়ী গোলাগুলি বর্ষণের নাম flirt করা। এতে অনেকটা সময় বেশ আমোদে কেটে যায়। তা'ছাড়া (যদি তিনি miss হন) Love making আছে। flirt করার সঙ্গে হয়ত তার অল্প তফাৎ আছে। তবে এটা flirt করার চেয়ে আর একটু গম্ভীর ও স্থায়ী পদার্থ (যদিও সকল সময়ে স্থায়ী হয় কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত বল্‌তে পারিনে) অনেক চোখের জল ও নিশ্বেস খরচ কর্ত্তে হয়, সহচরীদের কাছ থেকে অনেক রহস্যপূর্ণ ঠাট্টা ও চোখ টেপাটেপি খেতে হয় ও দিনের মধ্যে দশবার করে blush কোর্ত্তে হয়। অজস্র নভেল পোড়ে মনটা এমন romantic হয়ে দাঁড়ায় যে, একটু অবসর পেলেই ভাল বাসায় পড়তে ইচ্ছে করে, খাঁটি heroine এর মত লম্বা চোড়া কাজ কোর্ত্তে ও লম্বা চৌড়া কথা কইতে সাধ যায়। সুতরাং নভেল-পড়া মেয়েদের ভালবাসায় পড়া অত্যন্ত আমোদের অবস্থা। চোখের-জল ও নিশ্বেস ফেল্‌তে হয় বটে; কিন্তু অনেক দিন থেকে তাঁদের বড় সাধ ছিল যে, একদিন এই রকম চোখের-জল ও নিশ্বেস ফেল্‌বার উপযুক্ত অবসর পান। এই রকম visitor অভ্যর্থনা করা, visit প্রত্যর্পণ করা, নতুন নভেল পড়া, নতুন fashion সৃষ্টি ও নতুন fashion-এর অনুবর্ত্তন করা, flirt এবং love করা হোচ্চে তাঁদের কাজ। এই রকম ফড়িঙের মত ঘাসে ঘাসে লাফালাফি কোরে তাঁদের জীবনের বসন্তকাল কাটে। এঁরাই হোচ্চেন fashionable মেয়ের দল। আমি দেশে থাক্‌তে এখানকার মেয়েদের যে রকম মনে কোরেছিলুম, এখেনে এসে তা'র সঙ্গে ঢের তফাৎ দেখ্‌ছি। আমাদের দেশে যেমন ছেলেবেলা থেকে মেয়েদের বিয়ের জন্যে প্রস্তুত করে, লেখা পড়া শেখায় না, কেননা মেয়েদের আফিসে যেতে হবে না; এখেনেও তেম্‌নি মার্কি দরে বিকোবার জন্য মেয়েদের ছেলেবেলা থেকে পালিস কর্ত্তে থাকে, বিয়ের জন্যে যতদূর লেখা পড়া শেখা দরকার ততদূর শেখায়, তা'র বেশী শেখায় না, কেননা তা'দের ত আপিসে যেতে হবে না! একটু গান গাওয়া, একটু পিয়ানো বাজানো, ভাল কোরে নাচা, খানিকটা French, একটু বোনা ও শেলাই করা জান্‌লে একটি মেয়েকে বিয়ের দোকানের জানলায় সাজিয়ে রাখ্‌বার উপযুক্ত বেশ একটি রং চোঙে পুতুল গোড়ে তোলা হয়। এবিষয়ে একটা দিশি পুতুল ও একটা বিলিতি পুতুলের যত টুকু

তফাৎ, আমাদের দেশের ও এদেশের মেয়েদের মধ্যে ঠিক ততটুকু তফাৎ মাত্র। দিশি পুতুলের অত সাজগোজ রংচঙের আবশ্যক করে না, আমাদের দিশি মেয়েদের পিয়ানো ও অন্যান্য টুকিটাকি শেখবার আবশ্যক করে না, বিলিতি পুতুলের কিছু বাহার আবশ্যক করে, বিলিতি মেয়েদেরও অল্প স্বল্প লেখা পড়া শিখতে হয়, কিন্তু দুইই দোকানে বিক্রিহবার জন্যে তৈরি হয়। এখেনেও পুরুষেরাই হর্ত্তা কর্ত্তা, স্ত্রীরা তাঁ'দের সম্পত্তি; যেমন গাড়ি চালাবার জন্যে ঘোড়া আবশ্যক করে, তেম্‌নি সংসার চালাবার জন্যে একটা স্ত্রীর দরকার, স্ত্রী একটি আবশ্যক জিনিষ-পত্রের মধ্যে। স্ত্রীকে আজ্ঞা করা, স্ত্রীর মনের মুখে লাগাম লাগিয়ে নিজের ইচ্ছে মত চালিয়ে বেড়ানো স্বামীরা ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট অধিকার মনে করেন। Fashionable মেয়ে ছাড়া বিলেতে আরো অনেক রকম মেয়ে আছে, নইলে বিলেতে সংসার চল্‌তো না। মধ্যবিৎ গৃহস্থদের মেয়ের কতকটা মেহন্নত কর্ত্তে হয়, অতটা বাবুয়ানা করলে চলে না। সকালে উঠে একবার Kitchen তদারক কর্ত্তে যেতে হয়, Kitchen পরিষ্কার আছে কি না, জিনিস পত্র যথাপরিমিত আনা হয়েছে কিনা, যথাস্থানে রাখা হয়েছে কি না, ইত্যাদি দেখা শুনা করেন; রান্না ও খাবার জন্য জিনিস আনতে হুকুম দিতে হয়, পয়সা বাঁচাবার জন্য নানা প্রকার গিন্নিপনার চাতুরী খেলাতে হয়, কালকের মাংসের হাড় গোড় কিছু যদি অবশিষ্ট থাকে, তাহলে বন্দোবস্ত কোরে তার থেকে আজকের সুপ চালিয়ে নেন, পর্শু দিনকার বাসী রাঁধা মাংস যদি খাওয়া দাওয়ার পর খানিকটা বাকী থাকে তা'হলে সেটাকে রূপান্তরিত কোরে আজকের টেবিলে আনবার সুবিধে করে দেন, এই রকম নানা প্রকার বন্দোবস্ত কর্ত্তে হয়। তার পরে ছেলেদের জন্য মোজা কাপড় চোপড় নিজের হাতে তৈরি করেন, এমন কি নিজেরও অনেক কাপড় নিজে তৈরি করেন। এঁদের সকলের ভাগ্যে নভেল পড়া ঘোটে ওঠে না; বড় জোর খবরের কাগজ পড়েন, তা'ও সকলে পড়েন না দেখেছি; অনেকের পড়াশুনার মধ্যে কেবল চিঠি পড়া ও চিঠি লেখা, দোকানদারদের বিল পড়া ও হিসাব লেখা। খানিকটা লেখাপড়ার চর্চ্চা না থাক্‌লে লেখাপড়ায় রুচি জন্মায় না। তাঁরা বলেন, "Politics এবং অন্যান্য গ্রাম্ভারি বিষয় নিয়ে পুরুষরা নাড়াচাড়া করুন; আমাদের কর্ত্তব্য কাজ স্বতন্ত্র।" তাই জন্যে তাঁরা লেখাপড়া চর্চ্চা করেন না; যেন পরের অধিকারে হস্তক্ষেপ কর্ত্তে নিতান্ত সঙ্কুচিত বোলেই তাঁরা লেখাপড়া করেন না, যেন নিতান্ত অনধিকার প্রবেশ হয় বোলেই তিনি প্রায় তাঁর স্বামীর Library তে পদার্পণ করেন না কিন্তু আমি এর মধ্যে কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য কিছু দেখতে পাই নে, আসল কথাটা হচ্চে, ইচ্ছে নেই; লাইব্রেরি যদি Ball-room হোত, তা' হোলে তাঁরা অধিকার অনধিকার নিয়ে বড় মাথা ঘোরাতেন না, আর Politics যদি নভেলের ভায়রা-ভাই হোত, তা' হোলে তাঁরা পুরুষের পাত থেকে Politics নিয়ে দুহাতে করে গিল্‌তেন। দুর্ব্বলতা মেয়েদের একটা ভূষণ বোলে গণ্য, এই জন্যে দুর্ব্বলতা মেয়েদের একটা গর্ব্বের বিষয়; মেয়েরা দুপা চোলে একেবারে এলিয়ে পোড়লে আমাদের চোখে সে কেমন একটু ভাল লাগে, আমার বোধ হয়, তার কারণ, ওরকম দেখলে আমাদের আশ্রয় দেবার প্রবৃত্তি-চরিতার্থ হয়, আশ্রয় দেবার প্রবৃত্তি

কতকটা গর্ব্ব থেকে হয়; নিজের শক্তি খাটাবার একটা অবসর পেলুম বোলে বেশ একটু তৃপ্তি হয়; বিশেষতঃ বেশ একটি সুন্দর পদার্থ যার দিকে আমাদের স্বভাবতঃ মনের টান, সে আমাদের আশ্রয়ে—আমাদের ছায়ায় লতার মত জড়িয়ে থাকুক্ তা' আমাদের ইচ্ছে করে, এই জন্যে মেয়েদের দুর্ব্বলতা আমাদের ভাল লাগে, তাই জন্যে আমরা তা'র মধ্যে একটু সৌন্দর্য্য দেখি, সুতরাং অনেক মেয়ে ভ্রান্ত না হোলেও এলিয়ে পড়েন, যিনি দশটা কাজ সহজে কোর্ত্তে পারেন, তিনি দেড় খানা কাজ কোরেই হাঁপাতে থাকেন। বুদ্ধি বিদ্যার বিষয়েও এই রকম; মেয়েরা জাঁক কোরে বলেন, "আমরা বাপু, ওসব Politics, Science বুঝিনে শুঝিনে।" বিদ্যার অভাব, বুদ্ধির খর্ব্বতা একটা প্রকাণ্ড জাঁকের বিষয় হোয়ে উঠে! পুরুষরা অমনি অতি স্নেহপূর্ণ আদর কোরে তাঁদের বলেন "হাঁ, ঠাকুরুণরা, তোমরা ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাক, ছেলে পিলে মানুষ কর, ওসকল শুষ্ক কাষ্ঠের বোঝা তোমাদের বইতে হবে না," ভাবটা, যে, তোমাদের একটা মহা কষ্ট থেকে উদ্ধার করলেম! কিন্তু বিদ্যা-চর্চ্চা রহিত কোর্‌লে একটা ভার থেকে মুক্ত করা হয় না, একটা অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়! এখানকার মধ্যবিৎ শ্রেণীর মেয়েরা বিদ্যাচর্চ্চার দিকে ততটা মনোযোগ দেন না, তাঁদের স্বামীরাও তার জন্যে বড় দুঃখিত নন, তাঁদের জীবন হোচ্চে কতকগুলি ছোট খাটো কাজের সমষ্টি। যা'হোক, সমস্ত দিন এই রকম ছেলেদের দেখা শুনা করে, কাপড়-বুনে, Visitor দের সঙ্গে কথা-বার্ত্তা কোরে কেটে যায়। সন্ধ্যেবেলায় স্বামী কর্ম্মক্ষেত্র থেকে একটি আদরের চুম্বন উপার্জ্জন কোর্‌লেন, (পরিবার বিশেষে যে তা'র অন্যথা হয় তা বলাই বাহুল্য) ঘরে তাঁর জন্যে আগুন জ্বালানো আছে, খাবার সাজানো আছে। সন্ধ্যে বেলায় স্ত্রী হয়ত একটা সেলাই নিয়ে বোস্‌লেন, স্বামী তাঁকে একটি নভেল চেঁচিয়ে পোড়ে শোনাতে লাগ্‌লেন, সুমুখে আগুন জ্বোল্‌চে, ঘরটি বেশ গরম, বাইরে হয়ত বৃষ্টি হচ্চে, জানালা দরজাগুলি বন্ধ। হয়ত স্ত্রী পিয়ানো বাজিয়ে স্বামীকে খানিকটা গান শোনালেন; কিন্তু সত্যি কথা বল্‌তে কি, Courtship এর সময় স্ত্রীর গলা অত্যন্ত ভাল লাগ্‌ত, কিন্তু বিয়ের পর স্ত্রীর গান শুনতে খুব কম লোকের আগ্রহ হয়, রোজ রোজ সেই একই রকম গলা, একই ধাঁচের গান শুনে খুব কম লোকেরই অরুচি না জন্মায়। গিন্নির গলা নেমন্তন্নের দিন কাজে লাগে, দশজন বন্ধু বান্ধবকে ডিনারে নেমন্তন্ন করলে যেমন টেবিল সাজাবার জন্যে অনেক জিনিষ সিন্দুক থেকে বেরোতে থাকে যা' সচরাচর ব্যবহার করা হয় না, তেমনি সেদিন স্ত্রীরও গলা বেরোয়। এখানকার মধ্যবিৎ শ্রেণীর গিন্নিরা এই রকম খাদাশিদে, যদিও তাঁরা ভাল ক'রে লেখাপড়া শেখেননি, তবু তাঁরা অনেক বিষয় জানেন, এবং তাঁদের বুদ্ধি যথেষ্ট পরিষ্কার; এদেশে কথায় বার্ত্তায় জ্ঞানলাভ করা যায়, তাঁরা অন্তঃপুরে বদ্ধ নন, বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে কথা বার্ত্তা কন, আত্মীয় সভায় একটা কোন উচ্চ বিষয় নিয়ে চর্চ্চা হোলে তাঁরা শোনেন ও নিজের বক্তব্য বোল্‌তে পারেন, এই রকম কোরে অনেক জান্‌তে পারেন ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা একটা বিষয়ের কতদিক দেখেন ও কি রকম চক্ষে দেখেন, তা' বেশ বুঝতে পারেন। সুতরাং একটা কথা উঠলে তিনি ভাল কোরে কইতে পারেন, কতকগুলো ছেলেমানুষী

আকাশ থেকে পড়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন না ও বুঝাতে না পেরে তাঁকে হাঁ কোরে থাক্‌তে হয় না, বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে খুব সহজ ভাবে গল্প স্বল্প কোর্ত্তে পারেন, নিমন্ত্রণসভায় মুখ-ভার কোরে বা লজ্জায় অবসন্ন হোয়ে থাকেন না, পরিচিতদের সঙ্গে অন্যায় ঘেঁসা ঘেঁসি নেই, কিংবা তাদের কাছ থেকে নিতান্ত অসামাজিক দূরেও থাকেন না। লোক-সমাজে মুখটি খুব হাসি খুসি, প্রসন্ন, যদিও নিজে খুব রসিকা নন, কিন্তু হাসি তামাসা বেশ উপভোগ কোর্ত্তে পারেন, একটা কিছু ভাল লাগ্‌লে মন খুলে প্রশংসা করেন, একটা কিছু মজার কথা শুনলে প্রাণ খুলে হাস্য করেন। ঠোঁট বন্ধ কোরে থাকা ও লজ্জায় ম্রিয়মাণ হোয়ে পড়া এখানকার মেয়েদের আচরণের আদর্শ নয়। মনে কোরে দেখ দেখি, একটি নিমন্ত্রণ সভায় ৩০টি মেয়ে ঘাড় হেঁট কোরে চুপচাপ বোসে আছেন, সে সভায় পুরুষদের কি দুরবস্থা, ক্রমে ক্রমে তাঁদেরও মুখ-বন্ধ হোয়ে আসে, মনের ভিতর এক রকম অসোয়াস্তি হয়, ও ঘোম্‌টা থাকলে ঘোমটা দিতে ইচ্ছে করে। লজ্জায় চুপচাপ কোরে থাকা অত্যন্ত অসামাজিক গুণ। তুমিত কতকগুলো বাঘের মধ্যে পড়নি, আপনার জাত, মানুষ, বিশেষতঃ ভদ্রলোক, কোন অভদ্র কুচরিত্র দলের মধ্যে গিয়ে পড়নি, তবে বেশ মিলে মিশে গল্প স্বল্প কোরবে না ত কি? লজ্জা দুদণ্ড দেখতে বেশ মন্দ লাগে না, হয়ত তার মধ্যে বেশ কবিত্বমাখা মাধুর্য্য দেখতে পাওয়া যায়; কিন্তু দিনরাত লজ্জার সঙ্গে কারবার করা অত্যন্ত যন্ত্রণা, দু তিন ঘণ্টা পরিশ্রম কোরে একটা কথার উত্তর পেলেম, একবার সওয়া গেল, কিন্তু দিন রাত যদি ঐ রকম একটা কথা শোনবার জন্যে গলদ্‌ঘর্ম্ম হোতে হয়, তা, হোলেত বাঁচা যায় না! তুমি যদি আমার সঙ্গে মন খুলে আমোদ প্রমোদ না কর তা' হোলে দায়ে পোড়ে তোমার সংসর্গ ছেড়ে আমাকে অন্য সংসর্গ খুঁজতে হয়। বিয়ের মন্ত্র কিছু ভালবাসা জন্মাবার মন্ত্র নয়, বিয়ে হোলেই ভালবাসা হয় না, ভালবাসাও নেই, অথচ আমার স্ত্রী যদি আমাকে কথায় বার্ত্তায় আমোদে না রাখতে পারেন, তা' হোলে আমি আমার সেই মূক সঙ্গিনী ছেড়ে কি অন্যত্র আমোদের সন্ধান কোরব না? আমার তাই বোধ হয় মেয়েদের একটা অস্বাভাবিক লজ্জা ও সঙ্কোচ চোলে যাওয়া ভাল, যৌবনের একটা স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস, হৃদয়ের ও মনোবৃত্তির স্বাভাবিক বিস্তার শিক্ষা ও অভ্যেসের চাপে না পিষে ফেলা ভাল।

আমি দিন কতক আমার শিক্ষকের পরি-বারের মধ্যে বাস করেছিলুম। সে বড় অদ্ভুত পরিবার। Mr. B—মধ্যবিত্ত লোক। তিনি লাটিন ও গ্রীক খুব ভাল রকম জানেন। তাঁর ছেলে পিলে কেউ নেই,—তিনি, তাঁর স্ত্রী, আমি, আর একটা দাসী এই চার জন মাত্র একটা বাড়িতে থাক্‌তুম। Mr.—আধবুড়ো লোক, অত্যন্ত অন্ধকার মূর্ত্তি, দিনরাত খুঁৎ খুঁৎ খিট্‌ খিট্‌ করেন, নীচের তলায় রান্নাঘরের পাশে একটি ছোট্টো জানলাওয়ালা দরজা-বন্ধ অন্ধকার ঘরে থাকেন একেত সূর্য্য-কিরণ সে ঘরে সহজেই প্রবেশ কোর্ত্তে পারে না, তাতে জানলার ওপর একটা পরদা ফেলা, চারিদিকে পুরোণো ছেঁড়া ধূলো-মাখা নানা প্রকার আকারের ভীষণদর্শন গ্রীক লাটিন বইয়ে দেয়াল ঢাকা, ঘরে প্রবেশ কোর্‌লে এক রকম বদ্ধ হাওয়ায় হাঁপিয়ে উঠতে হয়। এইঘরটা তাঁর Study. এইখানে তিনি বিরক্ত মুখে পড়েন ও পড়ান।

তাঁর মুখ সর্ব্বদাই বিরক্ত, আঁটি বুট জুতো পোর্‌তে বিলম্ব হোচ্চে, বুট্ জুতোর ওপর মহা চোটে উঠলেন, যেতে যেতে দেয়ালের পেরেকে তাঁর পকেট আট্‌কে গেল, রেগে ভুরু কুঁক্‌ড়ে ঠোঁট নাড়তে লাগলেন; তিনি যেমন খুঁৎ-খুঁতে মানুষ, তাঁর পক্ষে তেমনি খুঁৎ-খুঁতের কারণ প্রতিপদে জোটে, আস্‌তে যেতে তিনি চৌকাঠে হুচট খান, অনেক টানাটানিতে তাঁর দেরাজ খোলে না, যদি বা খোলে, তবু যে জিনিষ খুঁজছিলেন তা' পা'ন না, এক এক দিন সকালে তার Study তে এসে দেখি, তিনি অকারণে বোসে বোসে ভ্রূকুটি করে উ-আ কোরচেন ঘরে একটি লোক নেই। কিন্তু B—আসলে ভালমানুষ, তিনি খুঁৎ-খুঁতে বটে কিন্তু রাগী নন. তিনি খিট্‌-খিট্ করেন কিন্তু ধম্‌কান না। নিদেন তিনি মানুষের ওপর কখন রাগ প্রকাশ করেন না, Tiny বলে তাঁর একটা কুকুর আছে, তার ওপরেই তাঁর যত আক্রোশ, সে একটু নোড়লে চোড়লে তাকে ধম্‌কাতে থাকেন, আর দিনরাত তাকে লাথিয়ে লাথিয়ে একাকার করেন। তাঁকে আমি প্রায় হাস্‌তে দেখিনি। তাঁর কাপড় চোপড় ছেঁড়া অপরিষ্কার। মনুষটা এই রকম। তিনি এককালে পাদ্রি ছিলেন; আমি নিশ্চয় বোল্‌তে পারি, প্রতি রবিবারে তাঁর বক্তৃতায় তিনি শ্রোতাদের নরকের বিভীষিকা দেখাতেন Mr,—র এত কাজের ভিড়, এত লোককে তাঁর পড়াতে হোত যে, এক এক দিন তিনি ডিনার খেতে অবকাশ পেতেন না। এক একদিন তিনি বিছানা থেকে উঠে অবধি রাত্রি এগারোটা পর্য্যন্ত কাজে ব্যস্ত থাক্‌তেন। এমন অবস্থায় খিট্ খিটে হোয়ে ওঠা কিছু আশ্চর্য্য নয়। Mrs. B—খুব ভাল মানুষ, অর্থাৎ রাগী উদ্ধত লোক নন, এককালে বোধ হয় ভাল দেখতে ছিলেন, যত বয়স, তার চেয়ে তাঁকে বড় দেখায়, চোখে চসমা পরেন, সাজ গোজের বড় আড়ম্বর নেই। নিজে রাঁধেন, বাড়ির রাজকর্ম্ম করেন, (ছেলে পিলে নেই, সুতরাং কাজকর্ম্ম বড় বেশি নয়) আমাকে খুব যত্ন কোর্‌তেন। খুব অল্প দিনেতেই বোঝা যায় যে, Mr. ও Mrs, এর মধ্যে বড় ভাল বাসা নেই, কিন্তু তাই বোলে যে, দুজনের মধ্যে খুব ঝগড়া ঝাঁটি হয় তা' নয়, নিঃশব্দে সংসার চোলে যাচ্চে। Mrs. B—কখনো Mr. B—র Study তে যান না, সমস্ত দিনের মধ্যে খাবার সময় ছাড়া দুজনের মধ্যে আর দেখা শুনা হয় না, খাবার সময়ে দুজনে চুপচাপ বসে থাকেন, খেতে খেতে আমার সঙ্গে গল্প করেন, কিন্তু দুজনে পরস্পর গল্প করেন না। Mr.B.-র আলুর দরকার হয়েছে, তিনি গোঁ গোঁ করতে করতে Mrs, B—কে বোল্লেন "Some potatoes" (please কথাটা বোল্লেন না কিংবা শোনা গেল না) । Mrs, B—বোলে উঠলেন "I wish you were a litule more polite," Mr, B—বোল্লেন "I did say 'please.' Mrs. B—বোল্লেন" "I did'nt hear it" Mr, B—বোল্লেন "It was no fault of mine that you did'nt !" কথাটা সমস্তটা ভাল কোরে শোনা গেল না, এই খেনেই দুই পক্ষ চুপ করে রইলেন। মাঝের থেকে আমি অত্যন্ত অপ্রস্তুতে পোড়ে যেতেম। একদিন আমি ডিনারে যেতে একটু দেরী করেছিলেম, গিয়ে দেখি, Mrs, B—Mr, B—কে ধম্‌কাচ্চেন অপরাধের মধ্যে Mr. B,—মাংসের সঙ্গে একটু বেশী আলু নিয়েছিলেন, আমাকে দেখে Mrs. B. ক্ষান্ত হোলেন, Mr. B. সাহস

পেয়ে প্রতিহিংসা তোল্‌বার জন্তে দ্বিগুণ কোরে আলু নিতে লাগ্‌লেন, Mrs. B. তাঁর দিকে একটি নিরুপায় মর্ম্মভেদী কটাক্ষপাত কোর্‌লেন। দুই পক্ষই দুই পক্ষকে Dear বা Darling বোলে ভুলেও সম্বোধন করেন না, কিংবা কারো Christian নাম ধোরে ডাকেন না, পরস্পর পরস্পরকে Mr. B—ও Mrs. B—বোলে ডাকেন। আমার সঙ্গে Mrs. B. হয়ত বেশ কথা বার্ত্তা কচ্চেন, এমন সময় Mr. B. এলেন, অমনি সমস্ত চুপচাপ। দুই পক্ষেই এই রকম। একদিন Mrs. B. আমাকে Piano শোনাচ্চেন, এমন সময় Mr. B. এসে উপস্থিত হলেন, বোল্লেন, "When are you going to stop ?" Mrs. B. বোল্লেন "I thought you had gone out পিয়ানো থাম্‌ল। তা'র পরে আমি যখনি পিয়ানো শুনতে চাইতেম, Mrs. B. বোল্‌তেন, "that horrible man যখন বাড়িতে না থাক্‌বেন তখন শোনাব," আমি ভারি অপ্রস্তুতে পোড়ে যেতুম। দুজনে এই রকম অমিল, অথচ সংসার বেশ চোলে যাচ্চে। Mrs. B রাঁধচেন, বাড়চেন, কাজকর্ম্ম কোর্‌চেন, Mr. B রোজগার কোরে টাকা এনে দিচ্চেন; দুজনে কখন প্রকৃত ঝগড়া হয় না, কেবল কখন কখন দুই একবার দুই একটা কথা কাটাকাটি হোত, তা' এত মৃদুস্বরে যে, পাশের ঘরের লোকের কাণে পর্য্যন্ত পৌঁছায় না। যা হোক্ আমি সেখানে দিন কতক থেকে বিরক্ত হোয়ে সে অশান্তির মধ্যে থেকে চোলে এসে বেঁচেছি।

নবম পত্র।

আমি অন্ত লোকদের মুখ থেকে তাঁদের বিলেতের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ কোরেছিলুম, তোমাদের উপকারার্থে তা' আমি সংক্ষেপে লিপি-বদ্ধ কোরে যথা-সময় পাঠিয়েছি। আমার যা' কর্ত্তব্য তা' আমি কোরেছি, এখন তোমাদের কর্ত্তব্য হোচ্চে, সেটি আদ্যোপান্ত পাঠ করা ও সে বিষয়ে তোমাদের মতামত ব্যক্ত কোরে, যত শীঘ্র পার, আমাকে একটা উত্তর লিখে পাঠানো। কেমন ?

এর আগে তোমাদের যে সব চিঠি পাঠিয়েছি,তা'তে যখন যা' মনে হোয়েছে বোলেছি, এখন সেই গুলোকে আর একটু শৃঙ্খলবদ্ধ কোরে লিখতে চাই; এখেনে কিকি দেখে আমার মনে কি রকম সংস্কার হ'ল, আমি কি নতুন জ্ঞান লাভ কোর্‌লুম, আমার মনে কি নতুন মত গড়া হ'ল ও কি পুরোণো মত ভেঙ্গে গেল, তাই লিখতে চেষ্টা কোর্ব্ব। অতএব এবারকার চিঠির প্রধান নায়ক হোচ্চেন "আমি।" প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত, "আমি।" সুতরাং খুব সম্ভব যে, এই চিঠির কাগজের চার পৃষ্ঠা-পূর্ণ অহমিকা পোড়তে পোড়তে অর্দ্ধ পথে তোমার গা ঝিমিয়ে আস্‌বে, চোখের দ্বার রুদ্ধ হোয়ে যাবে ও নাসা-রন্ধ্র হোতে একটা বেসুরো কোলাহল উত্থিত হোতে থাক্‌বে। "আমি" পদার্থের মত প্রিয় ও আমোদজনক আর কি হোতে পারে বল ? কিন্তু আমরা সকল সময়ে বিবেচনা করিনে যে, "আমি" আমারই কাছে "আমি," কিন্তু তোমার কাছে "তুমি" বই আর কিছুই নয়। এই রকম সাত পাঁচ ভেবে "আমি" বোলে একটা বস্তুকে সহসা তোমাদের সভার মধ্যে

নিয়ে গিয়ে বলপূর্ব্বক খাড়া কোরে তুল্‌তে আমার কেমন সঙ্কোচ বোধ হোচ্চে। বিলেত সম্বন্ধে আমার নিজের যৎসামান্য অভিজ্ঞতার সারাংশ প্রকাশ কোর্ত্তে প্রস্তুত হোয়েছি। এই খানে একটা কথা বোলে রাখি; কথাটা কিছু গম্ভীর ছাঁচের। অভিজ্ঞতা বোল্‌তে কি বোঝায়? কতকগুলি বিশেষ ঘটনার বিষয়ে জ্ঞান সংগ্রহ করা ও তা'র থেকে একটা সাধারণ মত প্রতিষ্ঠা কোরে নেওয়া। আমি অতি বিনীত ভাবে নিবেদন কোর্‌চি যে, যে দিক থেকে দেখ, আমার অভিজ্ঞতার মূল্য বড় অধিক নয়। প্রথমতঃ, আমি এখেনে এত অধিক দিন নেই ও এত বিশেষ সুবিধে পাই নি, যা, থেকে এখানকার সমাজের অনেক দেখে শুনে নিতে পারি; দ্বিতীয়তঃ, বিশেষ ঘটনাবলী থেকে একটি যথার্থ সাধারণ মত তৈরি কোরে নিতে যতটা বুদ্ধির আবশ্যক, ততটা আপাততঃ আমার তহবিলে আছে কি না, সে বিষয়ে আমার নিজের ও আমার আলাপী বন্ধুবর্গের ঘোরতর সন্দেহ রোয়েছে। অতএব আমার এই আধ-সিদ্ধ অভিজ্ঞতার ব্যঞ্জন-গুলো তোমাদের পাতে দিচ্চি, যদি রুচিজনক হয় ও তোমাদের পাক-যন্ত্রের হানি-জনক বিবেচনা না কর, তা' হোলে সেবা কোরো। এই খানে আমার উদ্যোগ-পর্ব্ব ও বিনয়-পর্ব্ব শেষ কোরে, প্রবন্ধের যথাশাস্ত্র মুখ-বন্ধ কোরে প্রকৃত প্রস্তাব আরম্ভ করি।

আমরা লণ্ডনে দুই এক ঘণ্টা থেকেই ব্রাইটনে প্রস্থান করি। ব্রাইটন সমুদ্রের ধারে—একটা বড় সৌখীন (Fashionable) সহর। দেখতে শুন্‌তে আকারে ইঙ্গিতে লণ্ডনেরই মত, কেবল লণ্ডনের মত সে রকম অন্ধকার, মেঘাচ্ছন্ন, ভ্রূকুটী-কুটিল মুখ নয়। আমাদের একটি বাঙ্গালী পরিবার ব্রাইটনে বাস করেন, তাঁ'দের সেখেনে গিয়ে আশ্রয় নিলুম; দেখি আমাদের গৃহিণী তাঁর দিশি বস্ত্র পোরে ছেলে পিলে নিয়ে ঘরে অন্নপূর্ণার মত বিরাজ কোর্‌চেন;

তাঁর দিশি কাপড় দেখে তাঁর বিলিতি বন্ধুরা অত্যন্ত প্রশংসা করেন, ও তাঁর দিশি বন্ধুরা সেই পরিমাণে খুঁৎ খুঁৎ করেন। তাঁর দিশি কাপড় দেখে তাঁর বিলিতি বন্ধু Miss—বলেন, "ঐ রকম ভাঁজ ভাঁজ কাপড়ে যে একটি সুন্দর শ্রী আছে, তা' আঁটি—সাঁট ছাঁটা—ছোটা গাউনে পাওয়া যায় না;" তাঁর দিশি বন্ধু Miss—(একজন বিলিতি বাঙ্গালী) বলেন, যে, "যে কাপড়টা পরা হোচ্চে, সেটা একেত সম্পূর্ণ দিশি নয় (অর্থাৎ ফিন্‌ফিনে শান্তিপুরে সাড়ি নয়), তার উপরে তা'তে যদি এক রত্তি শ্রী থাক্‌ত, তা' হোলেও না হয় ভদ্রসমাজে পরা যেত, কিন্তু তা'ও নেই।" এই রকম বিলিতি ও দিশি, বন্ধুদের মধ্যে মতের আকাশ পাতাল তফাৎ দেখা যাচ্চে। আমি ত আগেই বোলেছি, যে, বাঙ্গালী সাহেব হোয়ে উঠলে তিনি সাহেবের ঠাকুরদাদা হোয়ে ওঠেন; আপনার লোক পর হোয়ে গেলে সে যেমন পর হোয়ে যায়, এমন আর কেউ হয় না। যা হোক্, আমাদের দেবীর যে, এখনো অনেক গুলি "কুসংস্কার" আছে, দেখে আমরা তৃপ্তি লাভ কোর্‌লেম। এমন কি তিনি বোল্লেন, যে, বিলেতে এসে তাঁর এসে তাঁর "কুসংস্কার" গুলি আরো বদ্ধ-মূল হোচ্চে। কি সর্ব্বনাশ! দেশের উপর ভালবাসা আরো বেড়েছে। কি আশ্চর্য্য! তিনি বোল্লেন তাঁর মনের এত-দূর পর্য্যন্ত উন্নতি হয় নি যে, সার্ব্বভৌমিক ভাব তাঁর মনে বদ্ধমূল হোতে পারে, বরঞ্চ সে বিষয়ে তাঁর মন আরো সংকীর্ণ হোয়ে এসেছে।

তোমরাই বল, বিলেতে এসেও এঁর যদি এই দুর্দ্দশা, তা' হলে এর কি আর শোধরাবার উপায় আছে? ছেলে পিলেরা দেখলুম, অত্যন্ত খুসীতে আছে, তাদের স্ফূর্ত্তি ও উদ্যম দেখে কে। সমস্ত দিনের মধ্যে লাফালাফি হুটোপাটির তিলেক বিশ্রাম নেই। এইমাত্র সু— এসে আমার লেখার সম্বন্ধে কত শত প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোরছিল; জিজ্ঞাসা কোরছিল, "কি কোরে আমি এত বড় চিঠি বাড়িতে লিখি, সে এর অর্দ্ধেকও লিখতে পারে না," দ্বিতীয় প্রশ্ন হ'ল, এত বড় চিঠি লেখবার আবশ্যক কি, ছোট কোরে লিখলেত সেই একই কথা," তৃতীয় প্রশ্ন হ'ল, "অত কষ্ট কোরে হাতে কোরে না লিখে যদি ছাপিয়ে পাঠিয়ে দেও তা হ'লে কি হানি," ছাপিয়ে পাঠালে তার মতে কত প্রকার সুবিধে তাই একে একে বোলতে লাগ্‌ল'; তা'র পরে আমার চিঠি পোড়তে চেষ্টা কোর্ত্তে লাগল, তার পরে তার শেষ উপসংহার হোচ্চে যে আমার লেখা অত্যন্ত খিজিবিজি বাঁকাচোরা অপরিষ্কার (সে নিজে বুঝতে পারলে না বোলে বোধ হয়), মুক্ত কণ্ঠে এই মতটি ব্যক্ত কোরে টেবিলের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ কোরলে। ইতি মধ্যে কখন বি—এসে আমার চৌকির পিছন দিক থেকে আমার কাঁধে চোড়ে বসবার বন্দোবস্ত করচে, তা'কে কাঁধে চোড়তে দেখে সু—র জেদ হোল, সেও কাঁধে চোড়বে, অবশেষে দুজনে আমার দুই কাঁধে চোড়ে বোসেছে, আমিত এই অবস্থায় লিখ্‌ছি। তোমরা এ কথা শুনে হয়ত অবাক্ হোয়ে গেছ, বিশেষতঃ তুমি যে শাসনভক্ত, তোমার চুল হয়ত দাঁড়িয়ে উঠেছে। এ ছেলে-দের পেলে তুমি দিন কতক পিটিয়ে মনের সাধ মেটাও।—না? দুরন্ত ছেলে তুমি দু চক্ষে দেখতে পার না। তুমি চাও, ছেলেরা গুরুলোকদের কাছে চুপ চাপ কোরে ঘাড়টি গুঁজে বোসে থাক্‌বে, কথা জিজ্ঞাসা কোরলে তবে কথা কবে, কথা কবার সময় গলার স্বর অত্যন্ত নীচু হবে, গুরুলোকদের সাক্ষাতে কোন প্রকার নিজের মত ব্যক্ত কোরবে না, * তাঁদের অত্যন্ত ভক্তি ও মান্য কোর্‌বে ইত্যাদি। এ যে শুধু ছেলে পিলেদের প্রতিই খাটবে তা নয়, গুরুলোকদের কাছে লঘু লোক মাত্রেরই এই সকল কর্ত্তব্য! তোমার মত হোচ্চে, "লালনে বহবো দোষাস্তাড়নে বহবো গুণাঃ, তস্মাৎ পুত্রঞ্চ ভৃত্যঞ্চ তাড়য়েন্নতু লালয়েৎ।†" যা হোক্, এই গুরুভক্তির বিষয়ে আমার অনেকটা মত পরিবর্ত্তন হোয়েছে, সে বিষয়ে তোমাদের

* এ জায়গাটা ভারি গোলমেলে—ছোটো ছেলেরা ঘাড় গুঁজে ব'সে থাক্‌বে এটি আমাদের দেশের কোন্ পিতা বা কোন হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি চক্ষে দেখিতে পারে? আর ছেলেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহারা বিনয় নম্রতা ও ভদ্রতা শিক্ষা না করিয়া ভদ্রসমাজে পুতলো বাজির ন্যায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইবে ইহাই বা কোন পিতা সভ্যতার চরম সীমা জ্ঞান করিতে পারে। আমাদের দেশের কোন্ পিতার মন এরূপ কঠিন তাহা জানি না যে প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র তাঁহার কোন কথার উত্তর না দিয়া ঘাড় গুঁজিয়া বসিয়া থাকিলে তিনি মনে মনে বড়ই আহ্লাদিত হ'ন—আহ্লাদের কারণ শুধু এই যে, পুত্রের উপর দেখ কেমন আমার প্রভুত্ব! এ সকল অত্যুক্তির প্রতিবাদ করিতে হইতেছে—ইহাতে হাসিও পায় কান্নাও পায় ভাং সং

† লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ॥

একটুকু বিস্তৃত কোরে বলচি। আমাদের সমাজের পথে ঘাটে ভালবাসার চেয়ে ভক্তির প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। আমাদের দেশে পরিবারের মধ্যে গুরুজনের সম্বন্ধে ভালবাসার সম্পর্ক যেন একেবারে নেই; * সমস্তই ভক্তি ও স্নেহ! বয়সের অতি সামান্য তারতম্যে, সম্পর্কের অতি সামান্য উচুঁ নীচুতে ভক্তি ও স্নেহের সম্পর্ক স্থাপিত হয়; অল্প কথায় বাজ কি, আমাদের তা ছাড়া আর কোন সম্পর্ক মূলে নেই, কেবল যমজ সন্তানদের মধ্যে কি রকম হয় বোলতে পারিনে। কিন্তু এরকম ভক্তিকে ভক্তি নাম দিলে সে নামের অসদ্ব্যবহার করা হয়,এ এক রকম অস্বাভাবিক মনোবৃত্তি, এক রকম অস্বাভাবিক ভয়। বড়দের আমরা স্বভাবতই ভক্তি করি, তাঁদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেখে আমরা স্বভাবতই তাঁদের উপর নির্ভর করি, কিন্তু আমাদের পরিবারের মধ্যে যে ভক্তি, যে নির্ভরের ভাব বদ্ধমূল, সে কি স্বাভাবিক? প্রতি পদে শিক্ষা, শাসন, ও অভ্যাসের প্রভাবেই কি তার জন্ম হয় না? ছেলেবেলা থেকে প্রতি পদে আমাদের কাণে মন্ত্র দিতে হয় যে, পিতা দেবতুল্য, গুরু দেব তুল্য; কেন, দেবতুল্য কেন? দেবভাবের কঠোর ও সুদূর সম্ভ্রম কেন তাঁদের উপর অর্পণ করা হয়? তাঁরা আমাদের ভালবাসার পিতা, ভালবাসার মাতা, ভালবাসার সঙ্গে আমরা তাঁদের মুক্ত আলিঙ্গনে গিয়ে বদ্ধ হব *, না যোড়হস্তে.

---

* ভালবাসা ব্যতীত ভক্তি হ'তেই পারে না; ভক্তি হ'তে যদি ভালবাসা উঠাইয়া লওয়া যায় তবে শুদ্ধ কেবল শাসন-ভয় মাত্র অবশিষ্ট থাকে; ভালবাসা পাত্র-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে, দম্পতি ভালবাসা পুত্র-কন্যার প্রতি কিছু অর্পিতে পারে না; পুত্র বাৎসল্য কিছু বন্ধুবর্গের প্রতি অর্পিতে পারে না; ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্দ কখনো গুরুজনের প্রতি অর্পিতে পারে না; দম্পতির ভালবাসাকে দম্পতি প্রেম কহে, পুত্রকন্যার প্রতি যে ভালবাসা তাহাকে স্নেহ কহে, বন্ধুবর্গের ভালবাসাকে বন্ধুতা, সখ্য, প্রণয় ইত্যাদি কহা যায়, উচ্চের প্রতি যে ভালবাসা তাহাকে ভক্তি কহে; অতএব ভক্তি ভালবাসা হইতে স্বতন্ত্র একটি বস্তু নহে, তবে কি—না ভক্তির ভালবাসা প্রণয়ের ভালবাসা নহে, স্নেহের ভালবাসা নহে, দম্পতি-প্রেমের ভালবাসা নহে, উহা অপেক্ষা আর একটু উচ্চ দরের ভালবাসা। যাঁহারা কেবল যাত্রার গীতেরই মর্ম্মজ্ঞ—উচ্চ অঙ্গের গীত তাঁহাদের কাছে গীতই নহে, তেমনি শুদ্ধ যাঁহারা কেবল সখ্য-রসেরই মর্ম্মজ্ঞ—ভক্তি তাঁহাদের চক্ষে ভালবাসাই নহে, সখ্যকে ধরিয়া বাঁধিয়া ভক্তির সিংহাসনে বসাইলে তবেই তাঁহাদের মনঃপূত হয়; কিন্তু তাঁদের জানা উচিত যে, যাত্রার সুরে খেয়াল ধ্রুপদ গান করা আর ভক্তিভাজন ব্যক্তির সহিত সখ্যরসের আলাপ করা, উভয়ই সমান—বেসুরো বেতালা বেমানান;—সমজদার ব্যক্তি তাহা শুনিবা মাত্র কাণে হাত দেন। ভাং সং

* অবশ্য শৈশব কালে এইরূপ আচরণই স্বাভাবিক কিন্তু এক জন ষোল বর্ষ বয়স্ক পুত্র ওরূপ ব্যবহার করিলে সেটা অত্যন্ত বেতালা ও বেসুরো হয় কি না একবার ভাবিয়ে দেখা হউক্—একটু যাহার বুদ্ধি হইয়াছে সে পুত্র শুধু শুধু কেনই বা ওরূপ করিবে। ষোল বর্ষের বালক পিতার নিকট পাঁচ বর্ষের শিশুর

বিনীত ভাবে আমাদের মানুষ পিতার কাছে না গিয়া আমাদের জাতের বহির্ভূক্ত কোন দেবতুল্য ব্যক্তির কাছে গিয়ে অতি সন্তর্পণে বোসে থাক্‌বো, অতি মৃদুস্বরে কথা কব, অতি নত ভাবে আত্মনিবেদন কোর্‌ব? এর মধ্যে কোনটা স্বাভাবিক?* আমাদের পরিবারে গুরুলোকদের পরে এই রকম একটা অস্বাভাবিক ভক্তির উদ্রেক কোরে দেওয়া হয়, গুরুলোকেরাও সেই অন্ধ ভক্তির প্রভাবে বলীয়ান্ হোয়ে ছোটদের উপর যথেচ্ছ-ব্যবহার করেন! তাঁরা চান, তাঁদের সমস্ত মত, সমস্ত আজ্ঞা ছোটরা অবিচারে শিরোধার্য্য কোরে নেয়, সে বিষয়ে তারা তিলমাত্র দ্বিরুক্তি বা দ্বিধা না করে; যেন ছোটরা কতকগুলি কলের কাঠের পুতুল, তাদের মন নেই, তাদের মনোবৃত্তি নেই, তাদের ইচ্ছে নেই, তাদের বিচার শক্তি নেই! সংসারে তোমার যত প্রকার বড় আছে (কেবল লম্বায় ছাড়া) তাঁদের কাছে তোমার বিবেচনা ও ইচ্ছে কিছুমাত্র খাটিয়ো না, সে গুলি আপাততঃ সঞ্চিত কোরে রেখে দেও, অবসর পেলে তোমার ছোটদের কাছে তা অন্ধভাবে খাটাতে পারবে; তা'তে সমাজের কোন আপত্তি নেই। আমাদের শাস্ত্রে বলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা* পিতৃতুল্য, কনিষ্ঠ ভ্রাতা

ভাণ করিয়া, অথবা দম্পতিপ্রেমোচিত অধীর ভালবাসার ভাণ করিয়া দৌড়া-দৌড়ি পিতাকে আলিঙ্গন করিলে সে যে কি এক অদ্ভুত দৃশ্য হয় তাহা বর্ণনাতীত। ভাং সং

* গুরুজনের সঙ্গে সখ্যরসের আলাপ করা অস্বাভাবিক কি স্বাভাবিক ইহা হৃদয়কে জিজ্ঞাসা কর—যিনি সর্ব্বতোভাবে ভাল চা'ন তাঁকে কোন রূপে কোন পীড়া দিতে তুমি চাও না; তুমি জান যে তোমার কোন বিষয়ে একটু কিছু ত্রুটি দেখিলে তাঁহার মনে যত লাগিবে এত আর কাহারো মনে লাগিবে না, এই জন্য তাঁর কাছে তুমি ভয় ভয় করিয়া চল; ইহা নিশ্চয় জানিও এরূপ ভয় ভালবাসা হইতেই জন্ম গ্রহণ করে; পুত্র যদি পিতাকে ভাল না বাসে তবেই সে তাহার পিতার মনে আঘাত দিতে কিছুমাত্র ভীত বা সঙ্কুচিত হয় না—সুতরাং সে-তাহার-ভয় কঠোর শাসন-ভয় হওয়া দূরে থাকুক তাহা অতি সুকোমল ভালবাসার ভয়, সুতরাং অতি সন্তর্পণে রাখিবার সামগ্রী। বন্ধুবর্গের সহিত যখন আমরা সখ্যরসে মিলিত হই, তখন আমরা অনেকটা অসংকোচ ভাবে চলা-বলা করি,—কেন? না, বন্ধুরা পিতার ন্যায় আমাদের মঙ্গলের জন্য একান্ত লালায়িত নহে; বন্ধুদিগের লক্ষ্য আমোদ-প্রমোদের দিকে; আমোদ প্রমোদের পক্ষে ঢিলাঢালা ভাব যেমন আবশ্যক, মঙ্গলের পক্ষে সংযত ভাব তেমনি আবশ্যক,—বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে মনের শৈথিল্য স্বভাবতঃ শোভা পায়, গুরুজন-সন্নিধানে মনের সংযত ভাব স্বভাবতঃ শোভা পায়; তা' যদি না বল তবে ভক্তি শব্দটাকে অভিধান হইতে উঠাইয়া দেও। ভাং সং

* ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে শাস্ত্রের অভিপ্রায় এরূপ নয় যে এক আধ বৎসরের ছোট বড় ধর্ত্তব্য, এখানে এই ইংরাজি প্রবাদটি স্মরণ করা উচিত, Letter killeth but spirit giveth life। (টীকাকার মহাশয় এই বচনটি উপদেশ না দিয়া যদি নিজের দৃষ্টান্তের দ্বারা সমর্থন করিতেন, তবে লেখকের পাঠকদের যথার্থ উপকার হইত। লেখক।) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিষ্ঠ ভ্রাতাকে

পুত্রতুল্য, শুনে শুনে অভ্যেস হোয়ে গেছে

জন্মিতে দেখিয়াছ; পিতা মাতা যেমন তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া আদর করে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও তাহাকে সেইরূপ আদর করিয়াছে, তাহার পাঠাদি শিক্ষার সহায়তা করিয়াছে তাহার যাহাতে প্রকৃত মঙ্গল হয় তাহাতে সচেষ্ট হইয়াছে, বন্ধুবর্গ যেমন বন্ধুবর্গের সহিত আমোদ করিতে পারিলেই পরস্পরের মঙ্গলামঙ্গলের অতি অল্পই খোঁজ খবর রাখে—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভাব সেরূপ নহে; কনিষ্ঠ ভ্রাতার যদি কোন অমঙ্গলের সূত্রপাত হয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অমনি তাহার প্রতি-বিধানের জন্য সচেষ্ট হয়; এ সকল আমলে না আনিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা যদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বলে যে, "তুমি কেবল বয়সেই জ্যেষ্ঠ" এরূপ কথাতে ভ্রাতৃভাব না ভ্রাতৃভাবের অভাব—কোন্‌টি প্রকাশ পায়? ইংরাজরা যদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে তুচ্ছ করিয়া উড়াইয়া দেয়, অথবা তাহার সহিত বয়োবিরুদ্ধ সখ্য ভাবের কথাবার্ত্তা কহিতে লজ্জা বোধ না করে তাই বোলে আমাদেরও কি সেইরূপ না করিলেই নয়। ইংরাজদিগের সভ্যতার ছোবড়া ভক্ষণ করিতে যাঁহারা ভালবাসেন তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দেও; তাঁহারা দেখেন— স্বাধীনতা, শেখেন—পর জাতির দাসত্ব; দেখেন—civilization, শেখেন—Devilization; দেখেন—স্বদেশা-নুরাগ, শেখেন—স্বদেশের প্রতি নির্ম্মমতা, দেখেন—দেশীয় পরিচ্ছদ, স্বদেশীয় আচার ব্যবহার, স্বদেশীয় চাল-চলন, ইত্যাদি সকলের প্রতি ন্যায় সঙ্গত পক্ষপাত, শেখেন কি?—না, স্বদেশীয় পরিচ্ছদের প্রতি, স্বদেশীয় আচার ব্যবহারের প্রতি, স্বদেশীয় সুরীতি সকলের প্রতি ন্যায়-বিরুদ্ধ বিরাগ। ভাং সং

বোলে ও আমাদের দেশে এই রকম একটা ভাব বর্ত্তমান আছে বোলে এর হাস্যজনকতা ঘুচে গিয়েছে, নইলে এর চেয়ে অদ্ভুত আর কি হোতে পারে? ভ্রাতা কি ভ্রাতার তুল্য হোতে পারে না? সংসারে কি পিতা পুত্র ছাড়া আর কোন প্রকার সম্পর্ক নেই? ভাই ভাইয়ের মধ্যে ভ্রাতৃভাব বোলে কি একটা ভাব বর্ত্তমান নেই? কোন প্রকারে কাণ ধোরে ভাইয়ের সম্পর্ক কি পিতা পুত্রের সম্পর্কের সঙ্গে মেলাতেই হইবে? এমন যন্ত্রণাও ত দেখি নি। তা'হোলে ত তুমি বোল্‌তে পার, হাত মাথার তুল্য; কিন্তু আমি বলি ওরকম তুলনার স্পৃহাটি পরিত্যাগ কোরে হাতকে হাতের স্থানে ও মাথাকে মাথার স্থানে স্ব স্ব কাজে বজায় রাখা হোক্। প্রকৃতি যা' কোরে দিয়েছে সেটাকে ভেঙ্গে চুরে মুচড়ে একটা বিকৃতাকার কোরে তুল'না। আমাদের দেশের শাস্ত্র যেমন (শাস্ত্র বোধ হয় সকল দেশেই সমান) আজ্ঞা করে, বুঝিয়ে বলে না, ভয় দেখায়, কারণ দেখায় না, আমাদের গুরুলোকেরাও তাই করেন। তাঁরা প্রতিপদে কারণ না দেখিয়ে আজ্ঞা করেন, ছোট যদি একবার জিজ্ঞাসা করে, "কেন?" তা' হোলে তাঁরা চোখ রাঙিয়ে বলেন, "হাঁ, এত বড় স্পর্দ্ধা!" এতে যে ছোটদের মনের একেবারে সর্ব্বনাশ হয়, তা তাঁরা বোঝেন না। একটা ঘোড়া কিংবা এক পাল গরুকে অবিচারে যেখানে ইচ্ছে চালিয়ে বেড়াও তাতে হানি নেই, কেন না তাতে বড় জোর তাদের শরীরের কষ্ট হবে, কিন্তু তাতে,তাদের মনোবৃত্তি বিকাশ ও বিচার-শক্তি পরিস্ফুটনের কোন ব্যাঘাত হবে না, কিন্তু কোন মানুষকে সে রকম কোর না,বিশে-ষতঃ তোমার নিজের ভাই, নিজের ছেলেকে।

তুমি নিশ্চয় জেনো যে, ছেলেবেলা, যখন আমাদের মন খুব কোমল থাকে, তখন থেকে যদি আমরা ক্রমাগত যুক্তিবিহীন আজ্ঞা পালন কোরে আস্‌তে থাকি, বড় লোক বোল্‌চেন বোলেই দ্বিরুক্তি না কোরে সব কথা আমাদের শিরোধার্য্য কোরে নিতে হয়, তা'হোলে বড় হোলেও আমাদের মনের সে অস্বাভাবিক অভ্যাস দূর হয় না, প্রশ্ন করার স্বভাবটা একেবারে চোলে যায়, আর সে রকম মনে কুসংস্কার অতি শীঘ্র আপনার শিকর বিস্তার কোর্ত্তে পারে।* আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদের একবার দেখ না, তাঁরা অনেক পোড়েছেন. কিন্তু তবু নিজের একটা স্বাধীন মত প্রকাশ কোর্ত্তে তাঁদের কেমন সাহস হয় না; যদি মিল কিংবা স্পেন্সেরের নাম কোরে তাঁদের নিতান্ত একটা আজগুবি কথা বল, দ্বিরুক্তিমাত্র না কোরে তা' তাঁরা মাথায় কোরে নেন; বিলিতি কেতাবে ইংরাজি ছাপার অক্ষরে যা' লেখা আছে, তা' তাঁরা আর বুঝে হজম কোর্ত্তে শ্রম স্বীকার করেন না, শুক পাখীর মত মুখস্থ কোরে যান, কেননা বিলিতি "authority"র উপর তাঁদের এমন অটল ভক্তি যে, বিচার না কোরেই ধোরে নেন যে, কথা গুলো সত্য হবেই। তা'তে আমি তাঁদের দোষ দিতে পারিনে; কেন না ছেলেবেলা থেকে তাঁদের মন এমনি ছাঁচে গড়া যে, বড় লোকের মুখের সাম্‌নে একটা প্রশ্ন কোরতে তাঁদের বুক ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ করে, বড় লোক যা' বোলেছেন তা'র উপরে আর কথা নেই।* তবে দুই বড় লোকের মধ্যে যখন মতের অনৈক্য হয়, তখন আমরা চুপ কোরে অপেক্ষা কোর্‌তে থাকি— আর এক জন বড় লোক এসে তার কি মীমাংসা কোরে দেন। আমরা বড়

* গুরুজনের প্রতি ভক্তি-অভক্তি ও শিক্ষার সুপ্রণালী কু প্রণালী এ দুটি বিষয় স্বতন্ত্ররূপে বিচার্য্য। ভাং সং

* আমরা আমাদের নিজের জীবনের পরীক্ষাতে দেখিয়াছি যে, লেখক যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। আমরা দেখিয়াছি যে, যাঁহারা যথার্থ ভক্তির পাত্র তাঁহাদিগকে ভক্তি করিলে মনুষ্যের স্বাধীনতা বৃদ্ধি হয় বই হ্রাস হয় না; শুভাকাঙ্ক্ষী গুরু-জনের প্রতি, জননী জন্মভূমির প্রতি, মনুষ্যের প্রকৃত মহত্ত্বের প্রতি যদি ভক্তি সমর্পণ না কর, তবে কাজেই চটক লাগানো, মন-ভোলানো, ভড়ং দেখানো যা' তা, তোমার চক্ষের সামনে পড়িলেই তা'রি কাছে ভক্তির অপব্যয় করিতে মন তোমার ধাবিত হইবে; আমি বিশেষ এক ব্যক্তিকে জানি, যাহার স্বদেশের প্রতি ও গুরুজনদিগের প্রতি ভক্তি থাকাতেই সে এত গুলি মহা প্রভুর-দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে রক্ষা পাইয়াছে—(১) মিল প্রভৃতি পণ্ডিতগণের অতিবাদ (২) বড চঙ্গে ইংরাজী সভ্যতা (৩) হুটপেটে ইংরাজী চাল-চলন, (৪) সুরুচি-বিরুদ্ধ সংক্ষিপ্ত-সার ইংরাজী ঢঙের কোর্ত্তা—যাহা তাহারা নিজেই তাহাদের স্বদেশীয় বড় লোকদের প্রস্তর মূর্ত্তির গায়ে পরাইতে নারাজ, (৫) দেশীয় ভাষার প্রতি অবহেলা, ইত্যাদি। সার কথা এই যে, গুরুভক্তি (অর্থাৎ শুভাকাঙ্ক্ষী উচ্চ উচ্চ লোকদের প্রতি ভক্তি) এবং সর্ব্বোচ্চ ধরিতে গেলে ঈশ্বর-ভক্তি স্বাধীনতার প্রাণ; স্বাধীনতা হইতে ভক্তিটিকে তফাৎ কর, অমনি তাহা স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হইবে

লোকের নামের ঢেউ দেখলেই যুক্তির হাল ছেড়ে দিয়ে বোসে থাকি! কিন্তু এরকম না হওয়াই আশ্চর্য্য। আমাদের নীতি শাস্ত্রে গুরুলোকের কাছে সম্পূর্ণ রূপে আত্ম বিসর্জ্জন করাই হোচ্চে পুণ্য। * ছোটদের পক্ষে গুরুদের আজ্ঞা পালন করা বাস্তবিকই ভাল, আমি ছোটদের গুরুদের বিপক্ষে বিদ্রোহ কোর্ত্তে বলচি নে, কিন্তু গুরুদের প্রতি আমার বিনীত নিবেদন যে, তাঁরা যেন ছোটদের আজ্ঞা না করেন; হয় অনুরোধ করেন, নয় কারণ প্রদর্শন করেন, যখন কারণ প্রদর্শন কোরেও ফল হোল না, তখন একটু খানি গুরুত্ব প্রয়োগ কর্ত্তে পারেন; কেন না, অপরিমিত ভক্তির রাজ্যে যুক্তির অত্যন্ত হীন পদ; তিনি ক্রমে এত মুষড়ে যেতে থাকেন যে, অবশেষে তাঁর আর মাথা তোলবার শক্তি থাকে না। দুর্ভাগ্য ক্রমে আমাদের আবার একটা আধটা গুরুলোক নয়, পদে পদে গুরুলোক। এই রকম ছেলে বেলা থেকে গুরুভারে অবসন্ন হোয়ে একটি মুমূর্ষু জাতি তৈরি হোচ্চে। ছেলে বেলা থেকে বলের অন্ধ দাসত্ব কোরে আস্‌চে সুতরাং বড় হোলে সে অবস্থা তার নতুন বা অরুচিজনক বোলে ঠেকে না, তা'র কাছে এ অবস্থা স্বাভাবিক হোয়ে গেছে। আজ্ঞা * পালন কোরে

* মস্তিষ্কের গুরুলোককে আমি মস্তিষ্কের ভক্তি করিব, হৃদয়ের গুরুলোককে হৃদয়ের ভক্তি করিব, একথাটি লেখক বোধ হয় বিস্মৃত হইয়াছেন। কার্লাইলের মতের সহিত আমার মতের অনৈক্য হইলে আমি তাঁহার সহিত কঠোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব, তাহাতে তাঁহার মনে আঘাত লাগিবে কি না লাগিবে তাহা আমি একবার মনেও করিব না, কিন্তু গুরুজনের সহিত কোন বিষয়ের তর্ক করিবার সময় একবারেই তাঁহার বিরোধী পক্ষ অবলম্বন করিতে মনের প্রবৃত্তিই হইবে না,—ভালবাসার রীতিই এইরূপ। যদি গুরু জন অপেক্ষা কোন বিষয় আমি ভাল বুঝি তাই বলিয়া কি সেই ভাল বোঝাটুকুর মূল্য এতই অধিক যে, "এ বুদ্ধির কাছে, কেবা কোথা আছে," যদি বুদ্ধি জারি করা নিতান্তই প্রয়োজন হয় তবে তার দেশ—কাল—পাত্র আছে, তার প্রথা আছে,—তর্কের অনুরোধে গুরু জনের মনে পীড়া দিতেই হইবে, কোন মতে ছাড়া হইবে না, কোন দেশের কোন শাস্ত্রে এরূপ লেখে না। ভাঃ সং

* পুত্র বড় ও উপযুক্ত হইলে গুরু জনেরা কখনই তাহাকে বল-পূর্ব্বক পরিচালন করেন না। গুরু জনেরা সত্য সত্যই কিছু এরূপ বোধশূন্য পাষাণ-অবতার নহেন যে, ছেলেপিলেদের উপর ক্ষমতা জারি করিবার জন্য তাহাদের উপর তাঁহারা প্রভুত্ব করেন, আর ছেলেপিলেরাও পেটে থেকে পোড়েই কিছু এতদূর বুদ্ধি-বিস্তার বৃহস্পতি হয় না যে গুরু জনের কথা শুনিয়া চলিলে তাহাদের উপকার না হইয়া অপকার হয়—তাহার স্বাধীন বুদ্ধি খেলিতে পায় না—বুদ্ধিবৃত্তি দমনে থাকে, মন দমিয়া যায় ইত্যাদি। প্রকৃত কথাটা এই, ছোট বালকদিগের পক্ষে শরীর চালনা ও সামান্য স্মরণশক্তি চালনাই যথেষ্ট, বালকদিগকে অতিশয় বুদ্ধি-চালনা শিক্ষা দিয়া তাহাদের অল্প বয়সেই প্রবীণ করিয়া তুলিলে তাহাদের মূলে আঘাত করা হয়। প্রকৃতি এইরূপ শিক্ষা দেন যে শরীরের স্ফূর্ত্তি প্রথমে, মনের স্ফূর্ত্তি তাহার পরে এবং বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি সর্ব্বাকার শেষে হইলেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়;

কোরে তার এমন অবস্থা হোয়ে যায় যে, আজ্ঞা কোরে বোল্লেই তবে সে একটা কথা গ্রাহ্য করে, বুঝিয়ে বোলতে গেলেই তবে বেঁকে দাঁড়ায়*। এখানকার বিখ্যাত বাঙ্গালা লেখকদের উলেখায় কেমন একটা আজ্ঞার ভাব দেখতে পাওয়া যায়, কথাগুলি অসন্দিগ্ধ, স্পষ্ট, জোর দেওয়া; পাঠকদের সঙ্গে সমান আসনে বোসে যে বিচার কোর্‌চেন তা মনে হয় না, কিংবা কথা কোয়ে কোয়ে যে চিন্তা কোর্‌ছেন তা'ও মনে হয় না; তাঁরা কতকটা গুরু মহাশয়ের মত কথা কন; মনে হয় হাতে একটা বেত আছে, চোখে একটা চসমা আছে, মুখে একটা কঠোর স্বাতন্ত্র্যের ভাব বর্ত্তমান; ইংরাজিতে যাকে Dogmatic বলে, তাঁদের লেখার আপাদ মস্তক সেই রকম। তা'তে তাঁদের দোষ নেই; নইলে পাঠকেরা তাঁদের কথা মানে না, পাঠকেরা সেই দেখেছেন, তুমি একটু ইতস্ততঃ কোরচ, কিংবা একটা কথা খুব জোর দিয়ে বোলচ না, কিংবা তোমার উচ্চ আসন থেকে এতদূর পর্য্যন্ত নেবে এসেছ যে, তাঁদের সঙ্গে সমান ভাবে বিচার কোর্ত্তে প্রবৃত্ত হোয়েছ, তা' হোলেই তোমার কথা একেবারে অগ্রাহ্য হোয়ে দাঁড়ায়। তুমি যুক্তি না দেখিয়ে একটা কথা জোর কোরে বল,' (অবিশ্যি তোমার একটু নাম থাকা দরকার) তাঁরা মনে করেন, "এটা বুঝি একটা ধরা-কথা, কেবল অজ্ঞতা বশতঃ আমরা জানিনে," তাঁরা অপ্রস্তুত হোয়ে সমস্বরে সবাই মিলে বোলে ওঠেন "হাঁ একথা সত্য, একথা সত্য।" যুক্তি দেখাতে গেলেই তাঁরা মনে করেন, তবে বুঝি এটাতে কোন প্রকার সন্দেহ আছে, এটা একটা স্থির সিদ্ধান্ত নয়; অমনি তাঁরা চোখ টেপাটিপি কোরতে থা'কেন; অত্যন্ত অবিশ্বাসের ভাব দেখান; মনে করেন, এবিষয়ে অনেক কথা ওঠানো যেতে পারে, অর্থাৎ আমি যদি বা না পারি, আমার চেয়ে আর কোন বুদ্ধিমান জীব হয়ত পারেন, যুক্তিটা শুনেই যে আমি বোলে যাব হাঁ সত্যি, আবার দুদণ্ড বাদে যদি ওর একটা ভুল বেরিয়ে পড়ে তা' হোলে কি অপ্রস্তুত হোয়ে পোড়ব? পাঠকেরা যে লেখকের কথা পালন কোর্ত্তে চান, সে লেখকদের পাঠকদের চেয়ে একটা স্বতন্ত্র প্রাণী হওয়া আবশ্যক; পাঠকদের কাছে এমন বিশ্বাস জন্মিয়ে দিতে হবে যে, তিনি সব জানেন, তাঁর উপরে আর কারু কিছু বলবার কথা নেই, বলবার কথা থাক্‌লেই তিনি একেবারে মাটি হোয়ে গেলেন। তার মূল কারণ, ছেলেবেলা থেকে আমরা শাসনের বশ, যুক্তির রাম রাজ্যে আমরা বাস করিনি। তুমি ঘর থেকে গোড়ে পিটে তৈরি কোরে আমাদের একটা অসন্দিগ্ধ আজ্ঞা দেও আমরা পালন কোরব, কিন্তু তোমার ঝুড়ি থেকে তোমার যুক্তির মাল মসলা গুলি বের কোরে আমাদের সুমুখে একটি পরামর্শ তৈরি কর, সে কোন কাজে লাগবে না। কেননা আমরা ছেলে বেলা থেকে আমাদের গুরু লোকেদের অভ্রান্ত বুদ্ধির উপর নির্ভর কোর্‌চি আমরা যেখেনেই আমাদের নিজের মত খাটাতে গিয়েছি সেই খেনেই তাঁরা ছেলে মানুষ বোলে আমাদের চুপ করিয়ে দিয়েছেন,

---

*এমন কি নিউটন বাকে এল প্রভৃতি অসাধারণ লোকেরাও তাঁহাদের গুরুদিগকে দেবতুল্য (অর্থাৎ আপনা হইতে অনেক বড়) জ্ঞান করিতেন। আগে যাঁহারা শ্রদ্ধাবান্ ভক্তিমান আজ্ঞাকারী সাকরেত না হয়, পরে তাহারা কখনই ওস্তাদ হইতে পারে না—ইহা বেদবাক্য। ভাঃ সং

কিন্তু কখনো যুক্তি দিয়ে আমাদের মুখ বন্ধ করেন নি। ছেলে মানুষের কাছে যুক্তি প্রয়োগ করা তাঁরা পরিশ্রম মনে করেন। আমাদের শাস্ত্রকারেরাও এক কালে তাই মনে কোর্ত্তেন, তাঁরা শ্রমসংক্ষেপ করবার জন্যে সত্য কথা গুলিও মিথ্যার আকারে প্রচার কোরেচেন, ও যুক্তির বদলে বিভীষিকা দেখিয়ে লোকের মনে বিশ্বাস জন্মিয়ে দিয়েছেন। যদি বল, গুরু লোকেরা আমাদের চেয়ে জ্ঞানী, সুতরাং তাঁদের হাতে আপনাকে সম্পূর্ণ রূপে গচ্ছিত রাখা আমাদের পক্ষে ভাল। তা' যদি বল, তা হোলে ইংরাজদের কাছ থেকে কতকগুলি স্বাধীনতা পাবার জন্যে আমরা খবরের কাগজে দাপা-দাপি কোরে মরি কেন? ইংরাজরা যে আমাদের চেয়ে জ্ঞানে ও গুণে শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। সম্পর্কে বড় কিংবা বয়সে বড়র চেয়ে গুণে-বড়র কাছে আত্ম-বিসর্জ্জন করা ঢের বেশী যুক্তিসিদ্ধ।* তবে কেন তাঁদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না কোরে আমরা নিজের হাতে কতকগুলি স্বাধীনতা নিতে চাই? তুমি বোলবে, যাঁদের আমাদের উপরে স্বাভাবিক অধিকার আছে, তাঁদের কাছে আমরা সর্ব্বতোভাবে আজ্ঞাবহ হোয়ে থাকব। তা' থাক না কেন? কিন্তু ফলে যে সমানই কথা। তোমার চড় মারবার অধিকার আছে বোলে যে ব্যক্তি চড় খাবে তার যে কিছু কম লাগবে তা'ও নয়। যেখানেই অন্ধ একাধিপত্য সেই খানেই খারাপ। যখন গুরুলোকেরা আপনার ইচ্ছা ও সংস্কার, এমন কি কুসংস্কারের বিরোধী হোল বোলে ছোটর প্রত্যেক ইচ্ছা অবিচারে দলন না কোর্ব্বেন, তখন অনেক উপকার হবে।* আমাদের দেশের অশুভের মূল ঐখান থেকে অনেকটা পোষণ পাচ্চে। এখানকার তুলনায় আমি সেইটি ভাল কোরে বুঝতে পেরেছি! সু—বি—দের দেখ, তাদের উদ্যম, উৎসাহ, অধীর বাল্য ভাব ও স্বাধীনতা-স্পৃহার সঙ্গে আমাদের দেশের ছেলেদের শুষ্ক, মলিন, গম্ভীর ধীর ভাব,† ও সম্পূর্ণরূপে পর-নির্ভরতার তুলনা কোরে দেখ, সে কি অনৈক্য! আমি ইংরেজের ছেলেদের সঙ্গে তুলনা কোরলুম না, পাছে তুমি বল তা'দের জাতিগত স্বভাবের সঙ্গে আমাদের জাতীয় স্বভাবের ভিন্নতা আছে। কিন্তু আমাদের দেশীয় ছেলেই যথোপযুক্ত স্বাধীনতার সঙ্গে পালিত হোলে তার কি রকম স্ফূর্ত্তি হয়, তা'র মনের স্বাস্থ্য কি রকম অক্ষুণ্ণ থাকে তাই দেখ। ছেলেদের স্বাভাবিক ভাব হোচ্চে প্রশ্ন করা, একটা জান্‌বার ইচ্ছে; এখানকার ছেলেরা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোরে

* একপাটি হৃদয়-শূন্য মাংসের কথা। সম্পর্কের বড়র সঙ্গে হৃদয়ের যেমন যোগ, জ্ঞানে ও গুণে বড়র সঙ্গে সেরূপ হওয়া দুর্ঘট। ভাং সং

* পুত্র পিতার অসম্মতিতে বিবাহ করাতে পিতা তাহাকে দূর করিয়া দিয়াছে—ইংলণ্ডে ত সর্ব্বদাই এরূপ ঘটিতে দেখা যায়। ভাং সং

† রুগ্ন ছেলে ভিন্ন অন্য কোন ছেলেকে আমি ত আজ পর্য্যন্ত শুষ্ক মলিন ধীর গম্ভীর দেখিনি। যে বয়সের যেটি স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম তাহা এখানেও যেমন বিলাতেও তেমনি—বিলাতে নয় ব্যাট বল্ খেলে, আমাদের দেশে নয় গুলিডাণ্ডা খেলে, বিলাতে হাইড্ অ্যাণ্ড সীক্ খেলে আমাদের দেশে নয় লুকাচুরি খেলে—প্রভেদের এই পর্য্যন্ত সীমা। ভাং সং

কোরে সারা হয়। সু আমাকে প্রশ্ন কোরে কোরে অস্থির কোরে তোলে; আকাশের তারা থেকে পৃথিবীর তৃণ পর্য্যন্ত এমন কোন পদার্থ নেই, বৈজ্ঞানিক খুঁটিনাটি কোরে সে যার ঘরের খবর না জানতে চায়। আমি যখন টর্কিতে ছিলুম' তখন একটি ছেলে আমার সঙ্গে খুব ভাব কোরে নিয়েছিল; পৃথিবীর যা' কিছু দেখতো, তাই যেন তার ভারি আশ্চর্য্য লাগত, প্রতি পদে প্রশ্নের ওপর প্রশ্ন কোরে আমাকে ভারি মুস্কিলে ফেলত; তার কৌতূহলের আর আদি অন্ত নেই। তা' ছাড়া এখানকার ছেলেদের এক রকম স্বাধীন ও পৌরুষের ভাব দেখলে অবাক্ হোয়ে যেতে হয়। তা'র প্রধান কারণ, এখানকার গুরুলোকেরা তাদের প্রতিপদে বাধা দেয় না, আর অনেকটা সমান সমান ভাবে রাখে। আমি এখানকার একটা প্রাইবেট স্কুল দেখেছিলেম; মাষ্টার ছেলেদের সঙ্গে ঠাট্টাঠুট্টি করেন, খেলা করেন, কত যে স্বাধীনতা দেন তা'র ঠিক নেই; অথচ তা'তে কিছু তা'দের "মাথা খাওয়া" হয় নি; পড়া শুনোতে তা'দের কিছুমাত্র ত্রুটি নেই। * এই ত গেল ছেলেদের কথা। আর বড়রা যে গুরুর সঙ্গে খুব কম সম্পর্ক রাখে তা' বলাই বাহুল্য। এখানে এমন স্বাধীন ভাব বর্ত্তমান যে, প্রভু ভৃত্যের মধ্যেও সে রকম আকাশ পাতাল সম্পর্ক নেই। † এখানে চাকরকে গালাগালি দেওয়া ও মারাও যা,' এক জন বাইরের লোককে গালাগালি দেওয়া ও মারাও তাই। আমাদের দেশের মত চাকরদের বেঁচে থাকা ছাড়া অন্য সমস্ত অধিকার মনিবদের হাতে নেই। চাকর কোন কাজ কোরে দিলে "Thank you," ও তা'কে কিছু আজ্ঞা করবার সময় "Please" বলা আবশ্যক।* একবার কল্পনা কোরে দেখ দেখি, আমরা চাকরদের বলচি, "অনুগ্রহ কোরে জল এনে দাও।" বা "মেহেরবাণিকরকে পানি লেওয়াও।" ও জল এনে দিলে বলচি "বাধিত রইলুম †"

* আমাদের দেশে টোলে এইরূপ প্রথাতেই শিক্ষা দেওয়া হইত, এক্ষণকার ইংরাজী বিদ্যালয়ের routine business প্রণালীতে বালকদিগের মন দমিয়া যায় ইহা আমি সম্পূর্ণ শিরোধার্য্য করি। ভাং সং

† আমাদের দেশের পাড়াগাঁ অঞ্চলেও এইরূপ দেখা যায়—লেখক সহরে Lord-দের ঘরে স্বতন্ত্র রূপ প্রথা দেখিবেন ইহা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি। ভাং সং

* লেখক এই মাত্র বলিলেন চাকর মনিবে বেশী তফাৎ ভাব নাই, ইহাতে বুঝায় যে, তাহারা বাড়ির লোকেরই সামিল; আমাদের দেশের গৃহস্থ মানুষদের ঘরেও চাকর মনিবের মধ্যে ঐরূপ ভাব দৃষ্ট হয়—তাহার সাক্ষী চাকরাণীকে ঝী বলিয়া সম্বোধন করিবার প্রথা; কিন্তু চাকরদের সঙ্গে পদে পদে সম্মানসূচক ব্যবহার করা—আষ্টে পৃষ্ঠে কাষ্ঠসভ্যতার ভার বহন করা—আমাদের দেশের সহজ-সভ্য লোকদিগের পোষায় না; গদ্দভও ভার বহন করিতে ভার বোধ করে, আমরা মনুষ্য হইয়া যদি ইচ্ছা পূর্ব্বক আপন স্কন্ধে আপন ভার চাপাই তবে তা'র চেয়ে আমরা বড় কিসে? ভাং সং

† এ সকল কৃত্রিম সভ্যতার না আছে অর্থ, না আছে কিছু; আমাদের দেশে এরূপ মৌখিক ভদ্রতার যত কম আমদানি হয় ততই ভাল; মনে কর ছেলের জ্বর হয়েছে আর যেই তার বাপ একটা হাতপাখা তুলে নিয়ে

তুমি হয়ত বলবে Thank you ও Please ও কেবল একটা মুখের কথা মাত্র। কিন্তু জাতীয় আচার ব্যবহার প্রতিপদে যে কথা দুটোর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, জাতীয় হৃদয়ে তা'র কারণ নিশ্চয়ই বর্ত্তমান আছে। কিন্তু এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে হয় ত জোর কোরে তর্ক করচি, তুমি হয় ত মান যে, হৃদয়ের মাটিতে শিকড় না থাকলে একটা কথা তিন দিনে শুকিয়ে মারা যায়। এখানে মনিবরা টাকা দেন ও চাকরেরা কাজ কোরে দেয়, উভয়ের মধ্যে কেবল এইটুকু বাধ্যবাধকতা আছে; তুমি টাকা না দিলে চাকর কাজ করবে না, চাকর কাজ না কোরলে তুমি টাকা দেবে না; কিন্তু একটু খানি কাজের ত্রুটি হোলে তা'কে ও তা'র অনুপস্থিত নির্দ্দোষ পিতা পিতামহ বেচারীদের সম্পর্কে বিরুদ্ধ বিশেষণ প্রয়োগ করবার কি অধিকার আছে? এখানে চাকরদের মধ্যে দাসত্বের ভাব যে কত কম, তা' হয় ত তুমি না দেখলে ভাল কোরে বুঝতে পারবে না। আমি একটি পরিবার জানি, সেখানে মনিবরা রান্না ঘরে যেতে হলে রাঁধুনিবি অনুমতি চেয়ে পাঠাতেন, পাছে তার কাজের মধ্যে intrude কোরলে সে বিরক্ত হোয়ে ওঠে! এই থেকে কতকটা বুঝতে পারবে। এই রকম এখানকার পরিবারে স্বাধীনতা মূর্ত্তিমান, কেউ কাউকে প্রভুভাবে আজ্ঞা করে না, ও কাউকে অন্ধ আজ্ঞা পালন কোর্ত্তে হয় না। এমন না হোলে একটা জাতির মধ্যে এত স্বাধীন ভাব কোথা থেকে আসবে? কিংবা হয় ত আমি উলটো বলচি, একটা জাতির হৃদয়ে স্বভাবতঃ এতটা স্বাধীন ভাব না থাকলে এমন কি কোরে হবে? যা'দের হৃদয়ে স্বাধীন ভাব নেই, তারা যেমন অম্লান বদনে নিজের গলায় দাসত্বের রজ্জু বাঁধতে পারে, একটু অবসর পেলেই পরের গলায়ও তেমনি অকাতরে দাসত্বের রজ্জু বাঁধতে ভাল বাসে। আমাদের সমাজের আপদ মস্তক দাসত্বের শৃঙ্খলে বদ্ধ। আমরা পারিবারিক দাসত্বকে দাসত্ব নাম দিই নে; কিন্তু নামের গিলটি কোরে আমরা বড় জোর দাসত্বের লোহার শৃঙ্খলকে সোণার আকার ধরাতে পারি, কিন্তু তার শৃঙ্খলত্ব ঘোচাতে পারিনে, তা'র যা কুফল তা' থেকে যায়। আমি আগে মনে কোরতুম যে, হিন্দুদের মনে একটা সহজ স্বাভাবিক ভাব আছে, কোন প্রকার অস্বাভাবিক বাঁধা বাঁধি, আইন কানুন নেই। কিন্তু কোন্ লজ্জায় আর তা' বোলব বল? হিন্দুদের মধ্যে অস্বাভাবিক আইন কানুন নেই? তাদের পরিবারের মধ্যে দেখ! আপনার ভাই বোন্ পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্রের মধ্যে কতটা বাঁধা বাঁধি আছে একবার দেখ। ভাইয়ের প্রতি কি রকম ব্যবহার কোর্ত্তে হবে তা' কোন্ দেশে শেখাতে হয় বল দেখি? তবে যদি বল যে, ভাইয়ের প্রতি পিতা বা পুত্রের মত ব্যবহার কোর্ত্তে হবে, তা' হ'লে শেখাবার খুব আবশ্যক করে বটে; * কোন

তার গায়ে বাতাস দিতে লাগল অমনি ছেলে বোলে উঠলেন "Thank you বাবা"—এরূপ কাষ্ঠ সভ্যতা কাষ্ঠ হৃদয়ের উপরেই ঘুণ করিতে পারে, সহজ হৃদয়কে আগুন করিয়া তোলে। ভাঃ সং

* মনে কর একটি বড় পুত্র এবং একটি ছোট পুত্র রাখিয়া পিতামাতা লোকান্তর গমন করিয়াছেন, এখন ছোটটিকে তাহার পিতা যেমন যত্ন করিতেন

মানুষের সহজ অবস্থায় আত্মপ্রত্যয় থেকে ও কথা মনে আসবার কোন সম্ভব নেই। গুরু-লোকদের কাছে বেশী কথা কওয়া বা হাসা পর্য্যন্ত নিষেধ। কি ভয়ানক! যাদের সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা * অনবরত থাক্‌তে হবে, তাঁদের সঙ্গে যদি মন খুলে কথা বার্ত্তা না কবে, প্রাণ খুলে না হাস্‌বে, তাঁদের কাছেও যদি জিবের মুখে লাগাম লাগিয়ে, হাস্যো-চ্ছ্বাসের মুখে পাথর চাপিয়ে, আর মুখের ওপর একটা সম্ভ্রমের মুখস্ পোরে দিন রাত্রি থাকতে হয় তা, হোলে কোথায় গিয়ে আর বিশ্রাম পাবে? ‡ ইনি দাদা, উনি কাকা, তিনি মামা, এ ছোট ভাই, ও ভাই-পো, সে ভাগ্নে, কারু কাছে ভাল কোরে মুখ খোলবার যো নেই *। কি করা যায়? বাড়ি থেকে বেরিয়ে বোসেদের চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে আড্ডা গাড়তে হয়, সেখানে পাঁচ জনে মিলে তামাক খাওয়া, দাবা খেলা, ও হাসি তামাসা করা যায়। এ দুর্দ্দশা কেন বল দেখি? আফিস থেকে এসে যেমন আফিসের কাপড় চোপড় ছেড়ে হাঁফ ছাড়া যায়, তেমনি বাড়িতে প্রবেশ করেই লৌকিক ব্যবহারের খোলষ পরিত্যাগ কোরে মনটাকে কেন একটুখানি

তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাহাকে সেইরূপ যত্ন না করিলে তাহার পক্ষে তাহা কর্ত্তব্য-বিরুদ্ধ, হৃদয় বিরুদ্ধ ও নিন্দনীয় হয় কিনা? পিতার অবর্ত্তমানে যাহা এইরূপ অবশ্যম্ভাবী-পিতা বর্ত্তমানে তাহা হইলে আরো ভাল হয় কি না? যে যাহাকে পুত্রের মত যত্ন করে তাহাকে সে পিতার মত ভক্তি করিবে কি না? ধাত্রীকে তাহার দুগ্ধ-পোষ্য শিশু স্বভাবতই মাতার মত এবং স্থল-বিশেষে তাহা অপেক্ষা অধিক ভালবাসে কি না? ধাত্রী পর হইয়াও যদি মাতার ন্যায় হইতে পারে তবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আপনার হইয়া কেন না পিতৃতুল্য হইতে পারিবে? বড়র প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা করিবে না ত কাহার প্রতি করিবে? ভাং সং

* চব্বিশ ঘণ্টা গুরুলোকের সঙ্গে থাক্‌লে ছেলেরা দুদিনে বুড়িয়ে যায়—কোন ছেলেকে আজ পর্য্যন্ত তদ্রূপ করিতে দেখি নাই। ভাং সং

‡ গুরুলোকেরা শিক্ষার স্থান, ভক্তি শ্রদ্ধার স্থান; বিশ্রামের স্থান বা বিনোদের স্থান নহেন; তাঁহারা যদি বিনোদের স্থান হইবেন, তবে সমবয়স্কেরা কি করিতে রহিয়াছে;—ক্ষুধার জন্য অন্ন রহিয়াছে, তৃষ্ণার জন্য জল রহিয়াছে, ইহা বিস্মৃত হইয়া ক্ষুধা পাইলে যে ব্যক্তি জল খায় ও তৃষ্ণা পাইলে ভাত খায়, সেই ব্যক্তিরই কর্ম্ম—বিনোদ ইচ্ছা হইলে গুরুলোকের নিকট যাওয়া ও সদুপদেশ এবং উচ্চ সহবাসের ইচ্ছা হইলে সমবয়স্কদিগের নিকট যাওয়া; ভক্তিভাজন ব্যক্তির সম্মুখে মন স্বভাবতই প্রশান্ত সংযত ভাব ধারণ করে—মনঃসংযম যাহা অনেক শিক্ষার ফল তাহা আপনাআপনি হয়, এ কিছু কম কথা নহে। ভাং সং

* কেন মুখ খুলিবার যো নাই? অবশ্য মুখ খুলিবার যো আছে—কেবল এলোমেলো যা ইচ্ছা তাই বকিবার যো নাই। গুরুজন-দিগের কথা বার্ত্তা, রীতি চরিত্র, দেখিয়া শুনিয়া বালকেরা কথা বার্ত্তা কহিতে বসিতে দাঁড়াইতে যত দিন না শেখে, তত দিন তাহারা অসম্বদ্ধ প্রলাপ করিলে আদর ভর্ৎসনা লাভ করে না এবং বালকদের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চাপল্য হ্রাস পায় ও গুরুজনদিগের প্রতি ভক্তিভাবের উদয় হয়, ইহা সকল দেশেই সমান। ভাং সং

হাত পা ছড়াতে দেওয়া হয় না? তখনো কেন আমি স্ত্রীর সঙ্গে চুপি চুপি ফিস্ ফিস্ কোরে কথা কব, পাছে পাশের ঘর থেকে শ্বশুর ভাশুর বা ঐ রকম একটা কোন মান্যবর পূজনীয় সম্পর্কের ব্যক্তি আমার স্ত্রীর গলা শুন্তে পায়? স্ত্রীর গলা বা হাসি শুন্‌লে কার কি সর্ব্বনাশ হয় বল দেখি? একেই কি সহজশোভন ভাব বলে? এর মধ্যে সহজ ভাব টা কোন্ খানে বল দেখি? বিলিতি বাঙ্গালীরা যে দেশে ফিরে গিয়ে খুঁৎ খুঁৎ করেন, ও বলেন আমাদের দেশে "Home" নেই, বিলেতেই যথার্থ "Home" আছে; তাঁরা বোধ হয় তা'র এই অর্থ করেন যে, বিলাতের পরিবারে একটা স্বাধীন-উচ্ছ্বাসের ভাব আছে *। বাপ মা, ভাই বোন, স্ত্রী পুত্রে মিলে হাসি, গল্প, গানে, অগ্নিকুণ্ডের চারধার উচ্ছ্বাসময় কোরে তোলে। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর বাড়িতে এসে একটা উল্লাস, একটা মেশামেশির ভাব দেখতে পাওয়া যায়। * এক ঘরে শ্বশুর তাঁর

* এইরূপ স্বাধীন উচ্ছ্বাসের ভাব দেখিবার জন্য বিলাতে যাইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, একজন সামান্য খৃষ্টান বাঙ্গালীর ঘরেও ঐরূপ স্বাধীন উচ্ছ্বাসের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সেরূপ উচ্ছ্বাস বাস্তবিক স্বাধীন উচ্ছ্বাস কিংবা প্রবৃত্তির অন্ধ উত্তেজনা, এইটির প্রতি একটু মনোযোগ করিলে ভাল হয়; দেশ কাল পাত্রোচিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া যে কার্য্য করা হয় তাহাই স্বাধীন নামের যোগ্য; স্বাধীন কিনা স্ববশ, কিন্তু স্ববশ দূরে থাকুক আমি যখন এরূপ অবশ হইয়া পড়িয়াছি যে গুরুজনের প্রতি একটুও দৃক্‌পাত নাই, আপনার সুখেই আপনি অচেতন, তখনকার সে মূঢ় ভাবকে স্বাধীনতা বলা আর পা-কে মাথা বলা উভয়ই সমান; স্ত্রীর সহিত যেরূপ মন খোলাখুলি করিয়া কথা বার্ত্তা কহা যায় তাহা কি গুরুজনের শ্রুতি-যোগ্য, না গুরুজনেরা তাহা শুনেন ইহা কাহারো প্রার্থনীয়? স্ত্রী পুরুষদের নির্জ্জনে কথা বার্ত্তা কহিবার রীতি সকল দেশেই প্রচলিত আছে কেবল আমাদের দেশে নহে; ইহার কারণ এই যে, পতি-পত্নীর মধ্যে এরূপ অভেদ সম্বন্ধ যে উভয়ের মধ্যে গোপনীয় কিছুই নাই, সুতরাং পতি-পত্নী নির্জ্জনে যেরূপ কথা-বার্ত্তা কহে গুরু-জন-সমক্ষে তাহারা সেই রূপ কথা বার্ত্তা কহিলে তাহাদের পতি-পত্নীত্ব ভূতপেত্নীত্বে পরিণত হয়; পতি-পত্নী যখন গুরুজনসমক্ষে সর্ব্বান্তঃকরণে আলাপ করিতে পারে না, তখন সে জায়গায় আলাপ না করাই ত ভাল, যে জায়গায় আমি মন খুলিয়া হাসিতে না পারি সেখানে না হাসাইত ভাল, এই সকল সোজা বিষয়কে নানা রূপে বাঁকাইয়া তাহা কোন জন্মে যা' নয় তাই করিয়া তোলা বক্তৃতা শক্তির অপব্যবহার ভিন্ন আর কিছুই নহে। ভাং সং

একটা গল্প মনে পড়িল,—এক জন সহস্রমারী দলের কবিরাজ রোগীকে দেখিতে আসিয়া তাহার ঘরের লোকদের জিজ্ঞাসা করিলেন "আর কোন চিকিৎসককে কি দেখানো হইয়াছিল?" তাঁহারা বলিলেন "অমুক চিকিৎসককে দেখানো হইয়াছিল" কবিরাজ বলিলেন "তিনি কি বলিয়াছেন" তাঁহারা বলিলেন তিনি বলিয়াছেন যে নাড়ীতে এখনো একটু বেগ আছে, আজকের দিন স্নানটা স্থগিত রাখিলে ভাল হয়" কবিরাজ ক্রোধান্বিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "আরে, আমি কি বলচি ওকে অষ্টপ্রহর জলে চুবিয়ে

দুই চারিটি বৃদ্ধ বন্ধু জুটিয়ে তামাক খেতে খেতে এখনকার ছেলে পিলেদের অশাস্ত্রীয় ব্যবহারে কলির দ্রুত উন্নতির আশঙ্কা কোরচেন, আর এক ঘরে বউ সাত হাত ঘোমটা টেনে তাঁর শাশুড়ীর কাছ থেকে নীরবে তাঁর দৈনিক তিরস্কার সেবন কোরচেন, আর এক ঘরে

মেরে ফ্যাল্!—আর কি বল্লেন?" উত্তর "আর বলেছেন আজকের দিন ভাত না দিয়ে খই বাতাসা এমনি সকল সামগ্রী খেতে দেওয়া হয়" কবিরাজ বলিলেন "আরে, আমি কি বলচি ওকে গাণ্ডে পিণ্ডে যা' তা' খাইয়ে ওকে একেবারে শেষ কোরে ফ্যাল্"—ইত্যাদি। বিলাতি শাস্ত্র বোল্‌চেন—লোক জন মিলে মিশে আমোদ করা ভাল, আরে আমাদের শাস্ত্র কি বোল্‌চে—যে, দুজন লোককে, এক ঠাঁই মিলে আমোদ কর্ত্তে দেখেচ কি আর অমনি মারো লাঠি! আমাদের দেশে কি বন্ধুবর্গেরা একত্র মিলে মিশে আমোদ করে না, বাপ মার কাছে ছেলেরা বসিয়া কি কখন সুখের আস্বাদ পায় না, না স্ত্রী পুরুষেরা পরস্পরের সহবাসে সুখভোগ করে না, না ছেলে পিলেরা আপনাদের মধ্যে বাল্যক্রীড়া করিয়া সুখী হয় না। অপরাধের মধ্যে পতি-পত্নীরা পিতা মাতা শ্বশুর শাশুড়ীর সমক্ষে পরস্পরের সহিত বাক্যালাপ করে না, না করিল তাহাতে কাহার কি ক্ষতি হইল—পতিপত্নীর পরস্পর হৃদয়বিনিময়ের কিছু ব্যাঘাত জন্মিল, না, বন্ধু জনগণের আমোদের কিছু ব্যাঘাত জন্মিল, না পিতা পুত্রের স্নেহ ভক্তির কোন ব্যাঘাত জন্মিল,—যাহা ঠিক, যাহা স্বাভাবিক, যাহা সভ্যোচিত, যাহা শোভন তাহাই হইল—যাহা বেঠিক, বেচাল, অসভ্যোচিত, অশোভন তাহাই হইল না। অন্তঃপুরবাসিনীরা আপনাদের মধ্যে যেমন সখ্যরসের আলাপ করিতে পারে পুরুষদের সঙ্গে কখনই তেমন পারে যেখানে পাঁচ জন স্ত্রীলোকে মিলিয়া সখ্যরসের আলাপে নিমগ্ন হয় সেখানে পুরুষ মানুষ গেলে তাহাদের আমোদে ব্যাঘাত পড়ে; এজন্য সখায় সখায় সম্মিলনের জন্য বহিরালয় এবং সখীতে সখীতে সম্মিলনের জন্য অন্তঃপুর সৃষ্ট হইয়াছে; ইহাতে পরিবারের স্ত্রীলোকদের এবং পুরুষদের সম্মিলনের কোন বাধা নাই, দুই এক স্থলে যা বাধা আছে তাহা দেশাচারের কোটায় ফেলিয়া দেওয়া উচিত (কোন্ দেশের দেশাচার একবারেই কুসংস্কার-বিহীন?) "বাধা নাই" কেবল নহে, পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদের পুরুষের মধ্যে সম্মিলন ঘটনার সময়ও নির্দ্ধারিত হইতে পারে, যেমন মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় ইত্যাদি; স্ত্রীলোকেরা আপনাদের মধ্যে যেমন অসঙ্কোচে সখ্যরসের আলাপ করিতে পারে, পুরুষদের সঙ্গে তাহারা তেমনটি পারে না বলিয়া সখ্যালাপ স্থলে এদেশে স্ত্রীলোকদের পুরুষদের একত্র সম্মিলনের প্রথা নাই। যদি কেবল অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকদের সঙ্গে পুরুষেরা সন্ধ্যা যাপন করে তবে তাহারা বাহিরের বন্ধুদিগের সঙ্গে মিলিয়া প্রকৃত পক্ষে সখ্যরস উপভোগ করিবে কখন্? যদি বল যে সখারা এবং সখীরা সকলে একত্রে মিলিয়া বন্ধুতালাপ করিতে হানি কি? তাহার এই উত্তর যে, সখার সঙ্গে সখার কিংবা সখীর সঙ্গে সখীর বন্ধুতা অতি নীচু দরের বন্ধুতা—সখা-সখীর মধ্যে চখা-চখীর ভাবই আসল বন্ধুতা! তাহার সাক্ষী—বল্-মজলিসে পর-পুরুষদের সঙ্গে নাচিবার জন্য ইউরোপবাসিনীদের মন কেমন নাচিয়া উঠে! ভাং সং

স্বামী তাঁর দুই একটি যুবা বন্ধু জুটিয়ে নিন্দালাপ * কোরচেন, এ রকম চিত্র এখানকার কেউ কল্পনা কোর্‌তে পারে না। আমাদের মুখ খোলবার জায়গা পরের কাছে। বউয়ের দুই চারিটি সমবয়সী এই আছে, তা'দের কাছে অবসর মত স্বামীর ভালবাসার গল্প করে; শাশুড়ীর কতকগুলি প্রৌঢ়া প্রতিবেশিনী আছে, সকলে মিলে পাড়ার অন্তঃপুরের সুস্বাদ গুপ্ত খবরের আলোচনা করা হয়, স্বামীর কতকগুলি যুবা বন্ধু আছে তা'দের সঙ্গে কালেজীয় অশাস্ত্র আলোচনা চলে, আর শ্বশুরের চণ্ডীমণ্ডপে পাড়ার কতকগুলি খুড়ো ও দাদা মহাশয়ের আমদানি হয়, ও ঐ সকল পাকাবুদ্ধিতে মিলে ইহকাল ও পরকালের অনেক কঠিন বিষয় মীমাংসা করেন। আমাদের পরিবারে পরকে আপনার কোরে নিতে হয়, কেননা আপনার সকলে পর।● অসদ্ব্যবহার বা পাপকার্য্যে লোকের স্বাধীনতা যত কমাও, ততই ভাল, কিন্তু নির্দ্দোষ এমন কি উপকারজনক বিষয়ে স্বাধীনতা যত কম ছাঁটা যায় ততই ভাল। শ্বশুরে স্ত্রীর গলা শুনলে পৃথিবীর কি হানি ও নরকের কি শ্রীবৃদ্ধি হয় বল দেখি? আপনার লোক সকলে মিলে-মিশে গল্প স্বল্প কোরলে উপাকার ছাড়া অপকার কি হয় বল দেখি? অনেকে সমাজের অনেক রকম বড় বড় সংস্কারের কথা পাড়েন, আমি একটা ছোট খাটো পরামর্শ দিচ্চি, শোন দেখি, আমাদের পরিবারের মধ্যে স্বাস্থ্যজনক স্বাধীনতা সঞ্চার কোরে দেও দেখি; টানাটানি, বাঁধাবাঁধি, শাসন ও পরনির্ভরতা কমিয়ে দেও দেখি। তুমি হয়ত ভারি চোটে উঠেচ, তুমি বল্‌চ যে "তুমি বিলেতে কি দেখেছ শুনেছ, তাই বল, আমরা মনোযোগ দিয়ে শুনি; কিন্তু এরকম যদি বক্তৃতা দিতে আরম্ভ কর, তাহোলে ত আর আমাদের ধৈর্য্য থাকে না।" কিন্তু তোমাকে এই খেনে বোলে রাখছি, আমি এ চিঠিতে টেম্‌স্‌টানেল ও ওয়েষ্টমিনিষ্টর হলের বর্ণনা কোর্ত্তে বসি নি। বিলাতের সমাজ আমি দেখে আমার কি মনে হোল ও আমার কি রকমে মত পরিবর্ত্তন ও গঠিত হোল তাই বোলব। আজ আমার যে মত তোমাদের বিস্তৃত কোরে লিখলুম, তা' এখানকার সমাজ দেখে আস্তে আস্তে আমার মনে বদ্ধমূল হোয়েছে। একটা সমাজের ভিতরে না থেকে বাইরে থেকে তা' আলোচনা কোরলে তার অনেক বিষয় যথার্থ রূপে চোখে পড়ে, ভিতরে থাকলে খুব কম। বয়স আমাদের চোখে পড়ে, সকলি স্বাভাবিক বোলে মনে হয়। আমার তাই একটি মহা সুবিধে, আর একটি সমাজের সঙ্গে তুলনা কোর্ত্তে পারচি। তোমার নিজের মতের সঙ্গে মিলল না বোলে তুমি হয়ত বোলবে বিলেতে গিয়ে লোকটার মাথা ঘুরে গিয়েছে। এ কথা বোলে কোন যুক্তি না দেখিয়ে আমার সমস্ত কথাগুলো একতোপে উড়িয়ে দিতে পার। কিন্তু আমি তোমাদের বিশেষ কোরে বোল্‌চি বিলেতে এসে কারু যদি মাথা না ঘুরে থাকে ত সে তোমাদের এই বিনীত দাসের।

● ইহাতে বুঝাইতেছে এই যে, নিন্দালাপই আমাদের একমাত্র আলাপ ও ইংরাজেরা সে রসে বঞ্চিত—gossiping শব্দের অর্থ তবে কি? বিবিদের সম্মিলনে নিন্দাবাদের ফোয়ারা কেমন খুলিয়া যায় তাহার একটি জাজ্জ্বল্যমান ছবি লেখকের হস্ত দিয়া ভারতীতে পূর্ব্বে একবার বাহির হইয়া গিয়াছে।

* বিলাত থেকে ফিরে এলে অধিকাংশেরই এইরূপ দশা ঘটে।

দশম পত্র।

স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয়ের সঙ্গে আমার ঝগড়াটা নিতান্তই চল্‌ল দেখছি। কিন্তু সে ত এক প্রকার সুখেরি বিষয়। বিষয়টা গুরুতর; সে সম্বন্ধে দু-পক্ষের মতামত ব্যক্ত হোয়ে একটা আন্দোলন হওয়াই প্রার্থনীয়। কিন্তু কথাটা যতই গুরুতর ও সারবান্ হোক্ না, আমার গলার দোষে মারা যায় বা! অর্থাৎ সম্পাদক মহাশয় পাছে তাঁর অত্যুচ্চ অট্টহাস্যের প্লাবনে আমার ক্ষীণ—কণ্ঠের কথা গুলো একেবারে ভেঙ্গে চুরে, উল্‌টে পাল্‌টে, তোলপাড় কোরে ভাসিয়ে নিয়ে যান, কথাগুলো একেবারে পাঠকদের কাণে ভাল কোরে না পৌঁছোয়। এখেনে একটা সেখেনে একটা তাঁর ছুঁচোলো নোটের হাস্য-বিষাক্ত খোঁচা খেয়ে খেয়ে আমার গরীব ভালমানুষ মত গুলি প্রাণের দায়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে দেশ ছাড়া হয় বা! পাঠক মহাশয়েরা আমার কথাটা একবার অবধান করুন্; আর কিছু নয়, লেখক মহাশয় আমার কথাটা আপনাদের ভাল কোরে শুন্‌তে দিচ্চেন না। আমি একটি কথা বোল্‌তে মুখ খোল্‌বার উপক্রম কোরেছি কি, অমনি তিনি দশটা কথা কোয়ে একটা ঘোরতর কোলাহল উত্থাপন কোরেছেন, আর আমার কথাটা একেবারে মাথা তুল্‌লে পারে নি। পাঠক মহাশয়েরা যদি এক পক্ষের কথা শুন্‌তে না পান ও গোলেমালে একটা ভুল বুঝে যান তবে বড় দুঃখের বিষয় হবে।

লেখক মহাশয়ের নোটের বিরুদ্ধে আমার প্রধান নালিশ ছিল এই যে, আমি যে কথা বলিনি, সেই কথা আমার মুখে বসানো হোয়েছে। তার উত্তরে তিনি বলেন যে, "লেখক কি ভাবে কি কথা বলিয়াছেন তাহার প্রতি তত আমাদের লক্ষ্য নহে যত পাঠকেরা তাঁহার কথা কি ভাবে গ্রহণ করিবেন তাহার প্রতি!" দোহাই পাঠক মহাশয়দের, আমি এক কথা বোল্লে আপনারা আর এক কথা যদি শোনেন তবে আমি গরীব মারা যাই কেন? আমি যদি বলি— বিশ্বম্ভর বাবুর দুই পা, আর আপনাদের মধ্যে কেউ শোনেন—বিশ্বম্ভর বাবুর চার পা, তা হোলে যদি সম্পাদক মহাশয় আমার চুলের ঝুটি ধোরে বিধি মতে নিগ্রহ করেন, ও দশটা শাস্ত্র থেকে প্রমাণ উদ্ধৃত কোরে, দশ জন পশু-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের মত নিয়ে আমাকে দশ ঘণ্টা ধোরে গম্ভীর ভাবে বোঝাতে আরম্ভ করেন যে, বিশ্বম্ভর বাবুর দুই পায়ের অধিক পা হবার কোন প্রকার সম্ভাবনা নেই; শুদ্ধ তাই নয়, তাই নিয়ে হাসি টিটকিরি কোরে, ঠাট্টা মস্‌করা কোরে দশ জন ভদ্রলোকের কাছে আমাকে বিধি মতে অপদস্থ করেন যদি, তবে আমি সহ্য করি কি কোরে বলুন দেখি? শাশুড়ীরা যে ঝীকে মেরে বউকে শিক্ষা দেন, তাতে যে অনেক সময়ে অনেক উপকার হয় সে বিষয়ে আমি দ্বিরুক্তি করিনে, কিন্তু আপনারা কি অস্বীকার কোর্ত্তে পারেন যে, উপকারটা বউয়ের হোক, কিন্তু যদি কারু পিঠে বেদনা হয় ত সে ঝীয়েরি! আচ্ছা ভাল —আমার পিঠ বেকার,অবস্থায় পোড়ে আছে, আর সম্পাদক মহাশয়ের মুষ্টির যদি আর কোন কাজ না থাকে তবে আমার নিরীহ পিঠের ওপর যথেচ্ছাচার করুন কিন্তু এটা যেন মনে থাকে, সে কিল গুলো প্রাপ্য আপনাদের, কেবল সম্পাদক মহাশয়ের অপূর্ব্ব বিচারে সে কিলের ভার যিশুখৃষ্টের মত আপনাদের হোয়ে সমস্ত আমাকেই বহন কোর্‌তে হোচ্চে!

লেখক মহাশয়ের সঙ্গে আমার একটা বিবাদ ছিল এই যে, তিনি স্বাধীনতা অর্থে বেহায়ামো, অবিনয়, অসরলতা, উচ্চের প্রতি অভক্তিমত্তা, নীচের প্রতি অদয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি ঠাউরেছেন কেন? তার উত্তরে তিনি যা' বলেন, তার ভাবটা হোচ্চে এই যে, পাছে পাঠকেরা তাই ঠাউরে থাকেন, এই কারণ বশতঃ আর কিছু নয়! কিন্তু আমার অপরাধ? লেখক বিলাতি বিবিদের চাল-চোল ধরণ-ধারণের আনুষঙ্গিক রূপে স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন, এজন্ত বিলাতানভিজ্ঞ অধিকাংশ লোকের মনে এইরূপ একটা কুসংস্কার জন্মিতে পারে যে, কার্য্যতঃ স্ত্রী-স্বাধীনতা আর কিছু নহে, কেবল বিবিদিগের চাল-চোল ধরণ-ধারণ ইত্যাদি। "ইহা একটি লোক-বিখ্যাত বিষয় যে, বিবিদের Shopping এর জ্বালায়, নির্দ্দোষ (?) আমোদাসক্তির জ্বালায়, তাহাদের স্বামীরা ধনে প্রাণে মারা যায়, অথচ স্ত্রী স্বাধীনতায় একটু কোথাও পাছে আঁচড় লাগে, এই ভয়ে তাঁহারা সকল অত্যাচার ঘাড় পাতিয়া লন, সকল বিষ হজম করিয়া ফেলেন।" ইত্যাদি। এর থেকে অনেক কথা উঠতে পারে। প্রথমতঃ, সম্পাদক মহাশয় তা হোলে এই কথা বলেন যে, বিবিদের চাল্-চোল্ ধরণে অবিনয়, অসরলতা, বেহায়ামো, উচ্চের প্রতি অভক্তিমত্তা, নীচের প্রতি অদয়াদাক্ষিণ্য প্রকাশ পায়; দ্বিতীয়তঃ, যেন আমি বিবিদের অবিনয়, অসরলতা, বেহায়ামো প্রভৃতির আনুষঙ্গিক স্বরূপেই স্ত্রী-স্বাধীনতা উল্লেখ কোরেছিলুম? সম্পাদক মহাশয় যে কেন বল্লেন, বিবিরা অবিনয়ী, অসরল, উচ্চের প্রতি তাদের ভক্তি নেই, নীচের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য নেই—তা' সম্পাদক মহাশয়ই জানেন; একমাত্র Shopping এর উদাহরণ দিয়ে তিনি ইংরেজ-মহিলাদের স্কন্ধে অত গুলো পাপের বোঝা চাপিয়েছেন। আমি ইংলণ্ডে যতই বেশী দিন থেকেছি ততই সেখানকার ইংরেজ-পরিবারের মধ্যে ভাল কোরে মিশেছি, আমি যতদূর জানি তাতে একথা আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌তে পারি (অনেক পাঠক মহাশয়ের অযথা দেশানুরাগে হয় ত আঘাত লাগতে পারে) যে, সম্পাদক মহাশয় ইংরাজ-মহিলাদের প্রতি যতগুলি দোষারোপ কোরেছেন তার কোনটা সত্য নয়। কোন ব্যক্তি-বিশেষের বিশেষ অভিধানে যদি বিনয় অর্থে যথাসাধ্য কথার উত্তর না দিয়ে, ঘোমটা টেনে, সঙ্কোচে, নিতান্ত ম্রিয়মাণ হোয়ে বোসে থাকা না হয়, তা' হোলে ইংরেজ ভদ্র মহিলারা বিনয়ের আদর্শ। ইংরাজ-পরিবারের মধ্যে এমন কত শত বালিকা(আমাদের দেশের পূর্ণ-যৌবনা) দেখা যায়, 'যারা সরলতার প্রতিমা, যারা তুষারের মত, নিজের শুভ্র ললাটের মত নিষ্কলঙ্ক; নিষ্কলঙ্ক অর্থে শুদ্ধ কার্য্যতঃ নিষ্কলঙ্ক নয়, তাদের মন বিশুদ্ধ, ছেলাবেলা থেকে তাঁদের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস স্ফূর্ত্তি পেয়েছে, দাসীদের কাছ থেকে বা অসংযমনা সমবয়স্কা প্রতিবেশিনীদের কাছ থেকে বিয়ের কথা, বরের কথা, সংসার-ধর্ম্মের কথা বা কোন রকম অসৎ কথা একটিমাত্র শোনেনি, সর্ব্বদা হাস্যোচ্ছ্বাসময়ী। উচ্চের প্রতি ভক্তি-মত্তা যদি বল তবে তা ইংলণ্ডে যেমন আছে, এমন অন্যত্র সচরাচর পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। যেখানে Carlyle কে গাড়ি চোড়ে যেতে দেখলে কত শত রাস্তার লোক টুপি খুলে গাড়ির পেছনে পেছনে ছুটেছিল; যেখানে কোথায় Shakespeare একটা গাছ পুঁতেছিলেন, কোথায় Addison এর একটা চৌকি আছে, সে সমস্ত লোকে একেবারে

তীর্থস্থান কোরে তুলেছে; যেখানে একজন কবির পাণ্ডুলিপি, একজন খ্যাত ব্যক্তির নিজের হাতের নাম সই পেলে লোকে আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করে, সেখেনে উচ্চের প্রতি ভক্তি-মত্তা নেই কি কোরে বোলব; আর সেই উচ্চের প্রতি ভক্তি-মত্তা হোতে সেখানকার স্ত্রীলোকেরাই যে বিশেষ বঞ্চিত এমন নয়। এ কথার উত্তর তেমন আর কিছু হোতে পারে না যেমন, একটিবার বিলেতে যাওয়া। কেননা আমি বলব 'না,' সম্পাদক মহাশয় বোলবেন 'হাঁ' আবার আমি বোলব 'না' আবার তিনি বোলবেন 'হাঁ;' এমন কোরে যতক্ষণে না হাঁপিয়ে পড়া যায় ততক্ষণ হয়ত 'হাঁ' 'না' চালানো যেতে পারে। কিন্তু সম্ভবতঃ এ বিসয়ে সম্পাদক মহাশয়ের আমার চেয়ে চের বেশী অভিজ্ঞতা আছে, সুতরাং এমন স্থলে আমার চুপ কোরে থাকাই শাস্ত্র-সম্মত; কিন্তু সম্পাদক মহাশয়ের মতে যা'ই হোক্ আমি কখনো বিবিদের অবিনয়, অসরলতা ইত্যাদির আনুষঙ্গিকরূপে স্ত্রী-স্বাধীনতার উল্লেখ কোরেছি কি না সেইটি বিবেচ্য স্থল। বিলেতে নিমন্ত্রণ সভায় স্ত্রীপুরুষ সকলে মিলে নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদ করে, একটা নতুন ভাল বই উঠলে সে বিষয়ে পরস্পর আপনাদের মতামত ব্যক্ত করে, একটা নতুন যন্ত্র উঠলে গৃহকর্ত্তা তাই নিয়ে অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গকে দেখান, গৃহকর্ত্রী রোমে গিয়াছিলেন সেখানকার প্রসিদ্ধ স্থানের যে সকল ফোটগ্রাফ নিয়েছিলেন তাই দেখিয়ে সকলকে আমোদে রাখেন ইত্যাদি প্রসঙ্গ উপলক্ষে কথায় কথায় আমি স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে নিজের মত ব্যক্ত করি; এর থেকে যদি কোন বিলাতানভিজ্ঞ ব্যক্তি মনে কোরে থাকেন যে, Shopping করাকেই স্ত্রী-স্বাধীনতা বলে বা বিলাতের মহিলারা যা কিছু মন্দ-আচরণ করেন (সত্যই হোক্ আর জন-শ্রুতিই হোক) তারই নাম স্ত্রী-স্বাধীনতা, তাহো'লে (বেয়াদবি মাপ কোর্ব্বেন) তাঁদের মস্তিষ্কের দোষ জন্মেছে একথা স্বীকার কোর্ত্তেই হয়। সত্য সত্য যা কিছু দোষ করি একে ত তার জন্যই আমরা ইহকালে পরকালে দায়ী, কিন্তু যে দোষ করিনি তার জন্যেও যদি কৈফিয়ৎ দিতে হয় তা' হোলে সংসারের পায়ে গড় করি! সম্পাদক মহাশয় মহা খাপা হোয়ে চক্ষু রাঙিয়ে বোল্‌চেন,—"য়ুরোপ ভিন্ন আর কোথাও যে, স্ত্রী-স্বাধীনতা নাই এমন নহে—জাপানে আছে, বোম্বাইয়ে আছে, কিন্তু সে সকল নিয়ে আন্দোলন করা লেখকের উদ্দেশ্য নহে—সর্ব্বদেশসম্মত স্ত্রী-স্বাধীনতার বিশুদ্ধ আদর্শ নিয়ে আলোচনা করাও লেখকের উদ্দেশ্য নহে, ইংলণ্ডে যেরূপ স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রচলিত তাই যা' কেবল লেখকের এক মাত্র আলোচ্য বিষয়, এরূপ যখন—তখন ইংলণ্ডের প্রচলিত স্ত্রী-স্বাধীনতা যে কি ভয়ানক বস্তু তাহা যে শত সহস্র স্থানে নামে স্বাধীনতা কাজে স্বৈর-চারিতা—লেখক সে সকল কথার উল্লেখ না করাতে প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে যে বিবিদের অনুকরণ করিলেই আমাদের কুলরমণীরা স্বাধীনতা পথে বিচরণ করিতে পারিবেন।" ইংলণ্ডের ধান ভান্‌তে গিয়ে আমি জাপানের বা বোম্বায়ের শিবের গান তুল্‌ব, সম্পাদক মহাশয় যদি কখনো এরকম আশা কোরে থাকেন, তাহোলে বলা বাহুল্য আমার মত প্রকৃতিস্থ লোকের কাছে সে আশা করা দুরাশা! আমি চোখে চস্‌মা এঁটে, চাপকান পোরে, জগতের অজ্ঞানতিমির-মোচন নিতান্ত মহামূল্য মতগুলি অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাঠকদের বিতরণ কর্‌ছিলুম না; আমি বৈঠকখানায় বোসে পাঠক মহাশয়দের

সঙ্গে দুদণ্ড গল্প স্বল্প করছিলুম। একটা গল্প থেকে আর একটা গল্প ওঠে। একটা নিমন্ত্রণ-সভা বর্ণনা কোরে সেই সূত্রে স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা আমার মনে এল, সে বিষয়ে আমার যা' কিছু বক্তব্য ছিল সব বোলে ফেল্লুম। আমার সে বক্তব্যের মধ্যে ইংলণ্ডের স্ত্রী-স্বাধীনতার উল্লেখমাত্র ছিল না, আর, সত্যের খাতিরে সম্পাদক মহাশয়ের কাছে নিতান্ত লজ্জার সহিত স্বীকার কোরতে হোচ্চে, জাপানের ও বোম্বায়ের স্ত্রী-স্বাধীনতা আমার মনেও আসেনি! মনে আসেনি—অপরাধ হোয়েছে বটে! তা' সম্পাদকীয় বেত্রাঘাতে মনে না আস্‌বার জন্যে যথেষ্ট শাস্তিও পেয়েছি। আচ্ছা, না হয়, এবার থেকে আমি যখনি স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা ভাবব, তখনি জাপান ও বোম্বায়ের কথা মনে কোরতে ভুলব না। সে কথা যাক্, আমার মত হোচ্চে এই—যে, বুট জুতো পরাকেও স্ত্রী-স্বাধীনতা বলে না, গোণ পরাকেও স্ত্রী-স্বাধীনতা বলে না, আর মটন দিয়ে রাই খেলেও স্ত্রী-স্বাধীনতার ব্যত্যয় হয় না। যদি কোন পাঠক এখন বুঝে থাকেন যে, বিবিরা যা' কোরে তা'ই স্ত্রী-স্বাধীনতা, ও সেই জন্যে আমার প্রতি মহা রুষ্ট হোয়ে থাকেন, তা' হোলে তাঁকে আমার বিনীত-নিবেদন এই যে, এই ভুল-বোঝা সম্বন্ধে যদি কারু কোন দোষ থাকে ত সেটা তাঁর বুদ্ধির। তাঁর কাণের যদি এমন একটা সৃষ্টি ছাড়া রোগ হোয়ে থাকে যে, যা তাঁকে বলা যায়নি তা তিনি শোনেন, তা' হোলে সে কাণ দুটো যতক্ষণে না বিশেষরূপে মেরামত করা হয় ততক্ষণ তাঁর সঙ্গে আমার মত লেখক কোন এলাকা রাখেন না। যাহোক্—আমি যদি বলি যে, ইংরাজ বিবিয়ানাকে স্ত্রী-স্বাধীনতা বলে না। (কিন্তু সেই সঙ্গে এও বলি, জাপানবিবিয়ানা বা বোম্বাই-বিবিয়ানাকেও স্ত্রী-স্বাধীনতা বলে না) তা হোলেই বোধ করি সম্পাদক মহাশয়ের সঙ্গে ও-সম্বন্ধে আমার বিবাদটা চুকে গেল। কেননা সম্পাদক মহাশয় এক প্রকার স্বীকারই কোরেচেন যে বিবিদের বিষাক্ত (!) অশোভন (!!) স্বাধীনতা পরিত্যাগ কোরে যদি "নির্ব্বিষ শোভন" স্বাধীনতা লেখক প্রচার করেন তা'হলে তিনি তা, আদরের সহিত গ্রহণ কোর্বেন। অনর্থক একটা ভুল বো'ঝার দরুণ গোড়াতেই তিনি তা, কোরতে পারেন নি; ভাল এখন ত সব মিট্‌মাট হোয়ে গেল তবে এখন স্বস্তি-বাচন পূর্ব্বক স্বাগত সম্ভাষণ কোরে আমার মতটিকে আদরের সহিত ঘরে নিয়ে যাওয়া হোক্—দরজা থেকেই হাঁকিয়ে না দেওয়া হয়!

সম্পাদক মহাশয়ের সঙ্গে সাধারণ বিষয়ে ত এক রকম ঐক্য হোল, এখন বিশেষ বিশেষ বিষয়ে এমনি ভালয় ভালয় মতের মিল হোয়ে গেলে বড় খুসী হওয়া যায়। সম্পাদক মহাশয় ত বোল্লেন, "নির্ব্বিষ" স্ত্রী-স্বাধীনতার সঙ্গে তাঁর কোন মনান্তর নেই; এখন কাকে তিনি "নির্ব্বিষ স্ত্রী-স্বাধীনতা" বলেন, সেইটে মীমাংসা হোয়ে গেলেই অধিক বক্তব্য থাকে না। সম্পাদক মহাশয়ের লেখা দেখে বোধ হয়, স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে আলাপ মাত্র হওয়া তাঁর মতে প্রার্থনীয় নহে, * কেননা "তাহাতে

* ইহা কোন কালেই আমাদের অভিপ্রেত নহে,— আমরা প্রখর স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরোধী-এই পর্য্যন্ত। প্রখর স্ত্রী-স্বাধীনতা কাহাকে বলে তাহার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিবার প্রয়োজন নাই। ভাঃ সং

ছে কুলোকে কুভাবে, সুলোকে কুভাবে ও
মীর মনে কু-আশঙ্কা স্থান পায়।" তা, যদি
, তা, হোলে বাইরের কিছু দেখবার জন্যে
হিলাদের অন্তঃপুর থেকে বের হওয়াও প্রার্থ-
য় নয়—কেননা পাছে তাতে কোরে
লোকে কুভাবে, সুলোকে কুভাবে, ও
মীর মনে কু-আশঙ্কা স্থান পাবার কোন
রণ ঘটে! * তা হোলে দাঁড়াচ্চে এই যে,
মাদের দেশে স্ত্রীলোকের যতটুকু স্বাধীনতা
াছে তা'ই "নির্ব্বিষ" স্বাধীনতা। কেন,
াদের ত নিশ্বাস ফেলবার স্বাধীনতা আছে,
সটা একটা "নির্ব্বিষ স্বাধীনতা;" হাই
তালবার ও পান সাজবার স্বাধীনতা আছে,
সটা আর একটা 'নির্ব্বিষ স্বাধীনতা', আহার
রবার স্বাধীনতা আছে, যদি কেউ আড়ি
কোরে তা'তে বিষ না মিশিয়ে দেয়, তাহোলে
সেটাও একটা "নির্ব্বিষ স্বাধীনতা!" তা' হোলে
ত আমাদের অনেক পরিশ্রম বেঁচে গেল,
আর কিছু করবার নেই। কিন্তু সেইটে
গোড়ায় বোল্লেই ত হোত। এটা কি রকম
হোল জান? করুণরসে নিতান্ত উচ্ছ্বসিত
হোয়ে একজন গরীবকে বলা হোল, "আমার
পকেটে যা' আছে বাপু, সব তুই নে!"
অথচ পকেটে একটি সিকি পয়সা মাত্র নেই।
ভাগ্যি ছিল না, তাইত এতটা করুণ রসের
কথা শোনা গেল। "পাছে কুলোক কু ভাবে,
ও সুলোক কু ভাবে এই জন্যেই কোন স্ত্রীলো-
কের কোন পরপুরুষের সহিত মেশা অবৈধ"—
এর চেয়ে অযৌক্তিক কথা সচরাচর শোনা
যায় না। এমন কি কাজ করা যেতে পারে
যা' কুলোক কু না ভাবতে পারে, এমন কি,
সুলোকের কু ভাবতে আটক না থাকে।
বল না কেন, আহার করা অবৈধ;—দুধেতে
প্রুসিক আসিড মেশানো থাক্‌তে পারে, মাছের
ঝোলে খানিকটা আফিম গোলা থাক্‌তে পারে,
আর ভারতের মধ্যে খানিকটা ক্রোর্ত্তেল থাকাও
নিতান্ত অসম্ভব নয়। যদি সম্পাদক মহাশয়
বোল্‌তেন, পরপুরুষের সঙ্গে এমনি কোরে
মেশা কর্ত্তব্য নয় যা'তে কোরে সাধারণতঃ
প্রকৃতিস্থ লোকে স্বভাবতই কু ভাবতে পারে—
সে এক স্বতন্ত্র কথা হোত, কিন্তু পাছে লোকে
কু ভাবে সেই জন্যে একেবারে পর-পুরুষের
সঙ্গে মেশাই কর্ত্তব্য নহে এ যে বড় ভয়ানক
কথা। যদি বল এমন স্থলে সাবধানে আহার
করা উচিত, যেখানে খাদ্যে বিষ থাক্‌বার যথার্থ
সম্ভাবনা আছে, তা হোলে কথাটা মানি, কিন্তু
খাদ্যে বিষ থাকা অসম্ভব নয় বোলে আহার
বন্ধ কর্ত্তে পরামর্শ দিলে—আর যে কোন
বুদ্ধিমান ব্যক্তিই তা, পালন করুন না কেন—

* আমাদের দেশে স্ত্রী-স্বাধীনতা নাই
সুতরাং স্ত্রী-স্বাধীনতাকে কতরূপে যে মারপ্যাঁচ
হইতে বাঁচাইয়া চলিতে হয় সে বিষয়েও তাঁহা-
দের অভিজ্ঞতা নাই, এমত স্থলে যদি "স্ত্রী-
স্বাধীনতা চাই-ই-চাই" এই ভাবটি তাঁহাদের
মনের ভিতর প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে
খেঁপাইয়া তোলা হয়, তবে যাঁহারা ঐ মতানু-
সারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবেন তাঁহারা স্ত্রী-
স্বাধীনতার যে একটি ভাল আদর্শ আছে তাহা
অমান্য করিয়া প্রখর স্ত্রী-স্বাধীনতার দিকেই
আপনাদের সমস্ত বিদ্যা বুদ্ধি বল পৌরুষ প্রয়োগ
করিবেন ইহা সম্ভব বোধ হয়; এই জন্য
আমরা বলিতে চাই যে, যখনই স্ত্রী ও পুরুষ-
দিগের মধ্যে মেলা-মেশার কথা উত্থাপন করা
হয়, তখনই এই বিষয়ে পাঠককে সাবধান
করিয়া দেওয়া উচিত যে, স্ত্রী-স্বাধীনতা মাত্রা
অতিক্রম করিলে তাহা ঘোরতর বিষাক্ত হইয়া
উঠে। ভাঃ সং

আমি করিনে।* পাছে "স্বামীর মনে কু অশঙ্কা স্থান পায়," এ সম্বন্ধেও পূর্ব্বোক্ত কথাটা খাটে, অর্থাৎ পর-পুরুষের সহিত যদি এমন কোরে মেশা যায়, যা'তে কোরে স্বামীর মনে কু-আশঙ্কা স্থান পাবার সম্ভাবনা থাকে তা হোলে তার থেকে হানি হোতে পারে, নতুবা নয়! সম্পাদক মহাশয় বলেন "স্বামীর হয়ত এইরূপ একটা মাত্রা নির্দ্ধারিত আছে যে, পরপুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের এইটুকু মেলামেশাই ভাল তাহা অপেক্ষা বেশী ঘনিষ্ঠতা ভাল না, যে স্ত্রী স্বামীকে ভাল বাসে সেই স্ত্রী সেই মাত্রাটি অতিক্রম করিয়া স্বামীর মনে আঘাত দিতে কুণ্ঠিত হইবে না ত কে হইবে?" সত্যইত! সচরাচর ত এমন হোয়েই থাকে। Jealous স্বামীরা পাছে মনে আঘাত পায় এই জন্যে ত য়ুরোপে অনেক হতভাগ্য রমণী ইচ্ছা কোরেই হোক বা শাসনভয়েই হোক্ সমাজে মেশে না। এখানেও অনেক সময়ে তাই ঘোট্‌বে। রমণীদের জীবন পর্য্যন্ত যখন স্বামীর ওপর নির্ভর করে তখন স্বামীর মন যুগিয়ে চল্‌বার জন্যে প্রাণপণ কোর্‌তে—ভালবাসায় না হোক্—দায়ে পোড়ে হয়। সম্পাদক মহাশয় বলেন "সে মাত্রা (মেলা মেশার মাত্রা) কতটুকু স্বামীই তাহা জানে, স্ত্রী তাহা জানে না," সে কি কথা? স্ত্রী তাহা জানে না এমনো হয়? হোতে পারে, কোন স্ত্রী-বিশেষ কোন স্বামী-বিশেষের মনের ভাব ভাল কোরে বুঝতে পারে নি; কি করা যাবে বল? তার জন্যে তা'কে কষ্ট সইতেই হবে। কিন্তু তাই বোলে চুলটা কাট্‌তে মাথাটা কাট্‌বে কে বল? দু চার জনের জন্যে সকলে কষ্ট পাবে কেন? অন্তঃপুর-বদ্ধ এমন ত অনেক স্ত্রীলোক আছে যারা স্বামীর মনের ভাব ভাল কোরে আয়ত্ত কোর্ত্তে পারে নি বোলে পদে পদে কষ্ট পায়, তবে কি তুমি বিবাহটা একেবারে উঠিয়ে দেবে! অতএব কথা হোচ্চে এই যে, পর-পুরুষের সহিত এমন কোরে মেশা উচিত নয় যা'তে কোরে স্বামীর মনে কু-আশঙ্কা স্থান পায় ও সাধারণত, প্রকৃতিস্থ কুলোক বা সুলোকে ন্যায্য-রূপে কু ভাব্‌তে পারে। এতেও একটা "কিন্তু" আছে। লোকের কু ও সু ভাবা অনেক সময়ে আবার দেশাচারের ওপর নির্ভর করে। এক জন স্ত্রীলোক অতি ফিন্‌ফিনে শান্তিপুরে সাড়ি পোরলে কুলোকেও কু ভাবে না, সুলোকেও কু ভাবে না, স্বামীর মনেও কু আশঙ্কা স্থান পায় না, কিন্তু সে যদি সেই ফিন্‌ফিনে সাঁড়িতে দৈবাৎ ঘোম্‌টা দিতে ভুলে যায়, তা হোলে কুলোকেও কু ভাবে, সুলোকেও কু ভাবে, আর স্বামীর মনেও হয়ত কু-আশঙ্কা স্থান পায়! অতএব নিরর্থক দেশাচারের পান থেকে একটু চুণ খোস্‌লে যদি কুলোকে কু বা সুলোকে কু ভাবে, তা' হোলে সেটা গ্রাহ্য করা যায় না। আজ আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে খোলা গাড়িতে একটু হাওয়া খেয়ে এলুম বোলে যদি লোকে কু বলে তা' তারা বলুক, কিন্তু যদি আমার স্ত্রী কোন এক পুরুষের বাড়িতে সমস্ত দিন বা রাত্রি যাপন কোরে আসে, তা হলে লোকে যদি কু ভাবে তা হলে সে কু ভাবাকে যথার্থ একটু সমীহ কোরে চল্‌তে হয়।

সম্পাদক মহাশয় নানা উদাহরণ প্রয়োগ কোরে রাজকীয় স্বাধীনতা সম্বন্ধে যা বোলেন,

* স্ত্রী-স্বাধীনতা মাত্রা অতিক্রম করিলে তাহা দোষাক্রান্ত হয় ইহা লেখক স্বীকার করেন—সে মাত্রা যে কতটুকু তাহা গড়ে জন সাধারণে বিদিত আছে—তাহার কোন বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্ভবে না। ভাঃ সং

স বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার মতের ঐক্য য়। উদ্ধত, গর্ব্বিত, বিকৃত, নীচ স্বভাব ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ানরা আমাদের যে রকম ীচু নজরে দেখে তা'রা যে আপনাদের জোতি-প্রচলিত ধ্বালাণ্টী আমাদের পুর-ীদের প্রতি প্রয়োগ না করবে—তা আশ্চর্য্য য়। কিন্তু তাতে বিশেষ কি এল গেল? স্ত্রী ুত্র পরিবার সমেত লাঙ্গুল নাড়্তে নাড়তে একটা গর্ব্ব স্ফীত অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ানের পা াট্তে যাবার প্রয়োজন কি? অধীনতার প্রতি মামাদের যে রকম অনুরাগ, পোসামোদ আমাদের যে রকম উপজীব্য হোয়ে উঠেছে, তা'তে হয়ত আমাদের অনেকে স্ত্রী কন্যা-গণকে স্বচ্ছন্দে এক জন শ্বেত-বদনের কাছে নিয়ে যাবেন, যদিও হয়ত নিজের কৃষ্ণ-চর্ম্ম বন্ধুর কাছে বেরকরতে কুণ্ঠিত হবেন! সে রকম স্থলে তাঁরা ঠেকে শিখবেন। যদি আপনাদের নিজের স্ত্রীকে রক্ষা করবার বল না থাকে তা হোলে না হয় ট্রেণে প্রভৃতি যাবার সময় বন্ধ সঙ্গ কোরে নিয়ে যাবেন, অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ানদের কাছ থেকে সহস্র হস্ত দূরে থাক্‌বেন। আমি বলি কি, আমাদের আপনাদের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষে পরস্পর মেলা-মেশা আলাপ-পরিচয় হোক্। নিমন্ত্রণ-সভায় স্ত্রীলোকেরা উপস্থিত থাকুন। যেখানে নানাপ্রকার বিষয় আলোচনা চোলচে সেখেনে তাঁরাও যোগ দেন। এই প্রকারে সঙ্কীর্ণ-স্থান-বদ্ধ তাঁদের কুঞ্চিত মন বিস্তার লাভ করুক্, স্বাধীন মুক্ত বায়ু সেবনে স্বাস্থ্য উপভোগ করুন।

একাদশ পত্র।

আমরা এখন লণ্ডন ত্যাগ কোরে এসেছি। লণ্ডনের জন সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটা খেলে তা' জান? বসন্তের আরম্ভ থেকে গর্ম্মির কিছুদিন পর্য্যন্ত লণ্ডনের জোয়ার Season। এই সময়ে লণ্ডন উৎসবে পূর্ণ থাকে;—থিয়েটার, নাচ, গান, প্রকাশ্য ও পারিবারিক "বল," আমোদ প্রমোদে চারদিক ঘেঁসাঘেঁসি ঠেসাঠেসি। ধনীলোকদের বিলা-সিনী মেয়েরা রাতকে দিন কোরে তোলে। আজ তাদের নাচের নেমন্তন্ন, কাল ডিনারের নেমন্তন্ন, পর্শু থিয়েটরে যেতে হবে, তশু রাত্তিরে ম্যাডাম প্যাটির গান শুনতে যেতে হবে, দিনের চেয়ে রাত্তিরের ব্যস্ত ভাব। সুকুমারী মহিলা, যাঁরা দু পা চোল্লে হাঁপিয়ে পড়েন, দুটো কাজ কোরলে চোখ উল্‌টে চৌকিতে এলিয়ে পড়েন, একটু গরম হোলে অবসন্ন হোয়ে পাখার বাতাস খেয়ে খেয়ে সারা হন, যাঁদের সুখ শান্তির জন্য শত শত মহিলা-সেবকেরা দিন রাত্রি প্রাণপণ কোর্‌চেন,—চৌকিটা সরিয়ে দেওয়া, প্লেটটা এগিয়ে দেওয়া, দরজাটা খুলে দেওয়া, মাংসটা কেটে দেওয়া, পাখাটা কুড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি উপায়ে যাতে কুসুম-সুকুমার তনু অবলাদের তিলমাত্র শ্রম স্বীকার না কোর্ত্তে হয়, তার চেষ্টা কোর্‌চেন, তাঁরা রাত্তিরের পর রাত্তির নটা থেকে ভোর চারটে পর্য্যন্ত গ্যাসের ও মানুষের নিশ্বাসে গরম ঘরের মধ্যে অবিশ্রান্ত নৃত্য কোর্‌চেন; সে আবার আমাদের দেশের মত অলস নোড়ে চোড়ে বেড়ানো বাইনাচের মত নয়, অনবরত ঘুরে ঘুরে দৌড়ে বেড়ানো; একে শ্যাম্পেনের তরঙ্গ মাথায় গিয়ে আবর্ত্ত তুলেছে, তা'তে আবার এই অবিশ্রাম ঘুরপাক্, এতে মহা মহা

জোয়ান পুরুষের মাথা ঘোরবার কথা, (পুরুদের আবার দুরকম মাথা ঘোরে, শ্যাম্পেন ও ঘুরপাকে বাইরের মাথা ও পার্শ্বস্থ সুন্দরী সহ-নর্ত্তকীর মধুর হাসির প্রভাবে ভিতরের মাথা ঘুরে যায়) এ রকম স্থলে ললিতা বালিকারা কি রকম কোরে টি'কে থাকেন, আমি তা'ই ভাবি; এ পরিশ্রমটা তাঁদের নিজে কোর্ত্তে হয়, কোন মহিলা-ভক্ত পুরুষ তাঁদের হোয়ে নেচে দেয় না। এই ত গেল আমোদ-প্রমোদ তা' ছাড়া এই সময়ে পার্লামেণ্টের অধিবেশন হয়; ব্যাণ্ডের একতান স্বর, নাচের পদশব্দ, ডিনার টেবিলের হাস্যালাপ—ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে একটা Political কোলাহল লণ্ডনের প্রাসাদারণ্য ধ্বনিত কোর্ত্তে থাকে। আমরা নিজ্জীব পর-রাজ্যবাসী জাতি, এখানকার Political উত্তেজনা না দেখলে হয় ত বুঝতে পারিনে। রক্ষণশীল ও উন্নতিশীল দলভুক্তরা প্রতি রাত্রের পার্লামেণ্টের রাজনৈতিক-মল্লযুদ্ধের বিবরণ কি আগ্রহের সঙ্গে পোড়তে থাকে, (এমন কি দোকানদার ও গাড়োয়ান পর্য্যন্ত),এক একটা রাজনৈতিক প্রশ্ন নিয়ে কত সভার সৃষ্টি হয়,ও কত তুমুল সংগ্রাম বাধে ,Conservative ও Liberal বা দুই পক্ষেই দুই পক্ষের দুর্ব্বল স্থান কি যত্নের সঙ্গে দিনরাত্রি অনুসন্ধান ও আক্রমণ কোরচে, সে ভাব আমাদের উত্তেজনা-শূন্য ঝিমন্ত দেশে দুই প্রহরের রৌদ্রে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে হাই তুলতে তুলতে কল্পনা করা একেবারে অসম্ভব। Season-এর সময় লণ্ডন এই রকম নানা প্রকার উত্তেজনায় সরগরম থাকে। তার পরে আবার ভাঁটা পোড়তে আরম্ভ হয়, লণ্ডনের কৃষ্ণপক্ষ আসে। তখন লণ্ডনের আমোদ কোলাহল বন্ধ হোয়ে যায়, লোকজন চোলে যায়; কেবল অল্প স্বল্প লোক, যাঁদের শক্তি নেই বা দরকার আছে, বা বাইরে যাবার ইচ্ছে নেই তারাই লণ্ডনে পোড়ে থাকে। যখন লণ্ডনে season নয়, তখন লণ্ডন থেকে চোলে যাওয়া একটা fashion। আমি একটা বইয়ে "Sketches and Travels in London"—Thackeray) পোড়েছিলুম, যে এক পরিবার বাড়ির সুমুখে দরজা জানলা সব বন্ধ কোরে বাড়ির পেছন দিকের ঘরে লুকিয়ে চুরিয়ে বাস কোর্ত্ত, তার কারণ, অন্য লোকেরা তা'হোলে মনে কোরবে যে season এর সঙ্গে সঙ্গে তারা লণ্ডন ছেড়ে চোলে গেছে। Season ফুরিয়ে গেলে লণ্ডনে মুখ দেখাতে হয়ত অনেকের লজ্জা করে, সুতরাং লণ্ডন শূন্য-প্রায় হোয়ে আসে। South Kensington বাগানে যাও; ফিতে, টুপি, পালক, রেশম, পশম ও গাল-রং-করা-মুখের সমষ্টি চোখ ঝোলসে প্রজাপতির ঝাঁকের মত বাগান আলো কোরে বেড়াচ্চে না; মহা মহা সুন্দরীরা অশ্ব ও রথের উপর থেকে পদাতিকদের প্রতি কটাক্ষের শতঘ্নী বর্ষণ কোরচেন না, কুঞ্জচ্ছায়ায় প্রণয়ী-যুগল ফুস্ ফুস্ কোরে কথা কইতে কইতে আপনাদের তুলনায় পৃথিবীর আর সকল লোককে হতভাগ্য মনে কোরচে না; বাগান তেমনি সবুজ আছে, সেখেনে তেমনি ফুল ফুটেছে, কিন্তু তা'র জীবন্ত শ্রী চোলে গিয়েছে। গাড়ি ঘোড়া লোকজনের হিজিবিজি ঘুচে গিয়ে লণ্ডনটা পরিষ্কার হোয়ে গেছে।

সম্প্রতি লণ্ডনের Season ভেঙ্গে গেছে আমরাও লণ্ডন ছেড়ে Tunbridge Wells বোলে একটা পাড়াগাঁর মত জায়গায় এসেছি অনেক দিনের পর পাড়াগাঁয়ের বাতাস খেয়ে বাঁচা গেল। লণ্ডনের বাতাসের মত বাতাস কোথাও দেখলুম না। হাজার হাজার

chimney অর্থাৎ ধূম-প্রণালী থেকে অবিশ্রান্ত পাথুরে কয়লার ধোঁয়া ও কয়লার গুঁড়ো উড়ে উড়ে লণ্ডনের বাতাসের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ কোরেছে। দুদণ্ড লণ্ডনের রাস্তায় বেড়িয়ে এসে হাত ধুলে সে হাত-ধোয়া জলে বোধ করি কালির কাজ করা যায়, কয়লার গুঁড়োয় বাতাস এমন ভরপূর। নিশ্বাসের সঙ্গে অবিশ্রান্ত কয়লার গুঁড়ো টেনে মাথায় একস্তর জোমে যায়; মাথার ঘিয়ে ও কয়লার গুঁড়োয় মাথাটাও বোধ হয় অত্যন্ত দাহ্য পদার্থ হোয়ে দাঁড়ায়। অনেক দিনের পরে এখানকার সূক্ষ্ম বাতাস টেনে লণ্ডনের ভার-গ্রস্ত বাতাসের প্রভেদ বুঝতে পারচি। Tunbridge Wells অনেক দিন থেকে তার লৌহ-পদার্থ মিশ্রিত স্বাস্থ্যকর উৎসের জন্যে বিখ্যাত। এই উৎসের জল খাবার জন্যে এখানে অনেক যাত্রীর সমাগম হয়। আমরা এখেনে এসে কল্পনা কোরলেম— উৎসটা না জানি কি সুন্দর দৃশ্য হবে;— চারদিকে পাহাড়, পর্ব্বত, গাছপালা থাকবে, "সারস-মরালকুলকূজিত, কনক-কমল-কুমুদ-কহ্লার-বিকসিত সরোবর "কোকিল-কূজন," "মলয়-বীজন," "ভ্রমর-গুঞ্জন" দেখতে ও শুনতে পাব, ও অবশেষে এই মনোরম স্থানে বসন্ত-সখার পঞ্চশরের প্রহার খেয়ে ও এক ঘটি জল খেয়ে বাড়ি ফিরে আসবো! ও হরি! গিয়ে দেখি, একটা হাটের মধ্যে একটা ছোটো গর্ত্ত পাথর দিয়ে বাঁধানো, সেখানে একটু একটু কোরে জল উঠেছে, একটা বুড়ি একটা কাচের গেলাস হাতে দাঁড়িয়ে আছে! —একটা বুড়ি!— একটি গজেন্দ্রগমনা, বিম্বোষ্ঠী, কম্বুকণ্ঠী, শুকচঞ্চু-নাসা, কেশরী-মধ্যা, কোকিলভাষিণী, মধুরহাসিনী বিলাসিনী ষোড়শী নলিনীপত্রের ঠোঙা হাতে কোরে দাঁড়িয়ে নেই, ("ঠোঙা" কথাটা বড় 'গ্রাম্য" হোয়ে পোড়ল, ওর সংস্কৃতটা কি?) একটা গাউন-জুতো-পরা বুড়ি এক এক পেনী নিয়ে কাচের গেলাসে কোরে জল বিতরণ কোচ্চে ও অবসর মতে একটা খবরের কাগজে গত রাত্রের পার্ল্যা-মেণ্টের সংবাদ পোড়ছে। চার দিকে দোকান বাজার; গাছ পালার কোন সম্পর্ক নেই; সুমুখেই একটা কশাইয়ের দোকান, সেখেনে নানা চতুষ্পদ ও দ্বিপদের মধ্যে "হংস মরাল কুলের" ডানা ছাড়ানো মৃত দেহ দড়িতে ঝুলচে; এই সব দেখে আমার মন এমন চোটে উঠলো যে, আমার কোন মতে বিশ্বাস হোল না যে, এ জল খেলে আমার কোন প্রকার রোগ নিবারণ হবে বা শরীরের কোন প্রকার উন্নতি হবে।

Tunbridge Wells কতকটা পাড়া-গাঁয়ের মত। এটা একটা পাহাড়ে জায়গা। এখেনে এসে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি। এখান-কার আকাশ মুখ গোঁ-করা নয়, বাড়ি গুলো অনাতিথ্য ভাব-সূচক নয়, পথিকদের মুখ ঘোরতর ব্যস্তভাবময় নয়, রাস্তা গুলো ঘঘর-ধ্বনিত পাষাণ-হৃদয় নয়। আসল সহরটা খুব ছোটো, দুপা বেরোলেই গাছ পালা মাঠ জঙ্গল দেখতে পাওয়া যায়। সহরটা অবশ্য কতকটা লণ্ডনের ছাঁচে গড়া। বাড়ি গুলো লণ্ডনের মত থাম-বারান্দা-শূন্য, ঢালু-ছাত-ওয়ালা সারি সারি এক ঘেয়ে ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে; অত্যন্ত শ্রীহীন দেখতে। দোকান গুলো তেমনি সুসজ্জিত, পরিপাটী, কাচের জানলা-দেওয়া। কাচের ভিতরে থেকে সাজানো পণ্য দ্রব্য দেখা যাচ্চে; কসাইয়ের দোকানে কোন প্রকার কাচের আবরণ নেই, চতুষ্পদদের আস্ত আস্ত শ্রীচরণ ঝুলচে,—

ভেড়া, গরু, শুওর, বাছুরের নানা অঙ্গ নানা প্রকার ভাবে চোখের সামনে টাঙ্গিয়ে রাখা হোয়েছে, হাঁস প্রভৃতি নানা প্রকার বিচিত্র মরা পাখী লম্বা লম্বা গলাগুলো নীচের দিকে ঝুলিয়ে আছে, আর খুব একটা জোয়ান ভুঁড়িওয়ালা ব্যক্তি হাতে একটা প্রকাণ্ড ছুরি নিয়ে কোমরে একটা আচলের মত কাপড় (apron) ঝুলিয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। বিলেতের ভেড়া গরু গুলো তাদের মোটা সোটা মাংস চর্ব্বিওয়ালা শরীরের জন্যে ও সুস্বাদের জন্য বিখ্যাত, যদি কোন মানুষ-খেগো সভ্য জাত থাকিত, তা হোলে বোধ হয় বিলেতের কসাই গুলো তাদের হাটে অত্যন্ত মার্ঘি দামে বিকোত। আমি একটা কসাই রোগা দেখিনি, এমন জোয়ান মোটা ভীষণাকার জানোয়ার খুব অল্প আছে। এখানকার কসাইয়ের দোকান গুলো দেখলে আমার গা শিউরে ওঠে, এখানকার সূক্ষ্ম স্নায়ু-বিশিষ্ট বিবিরা এ দৃশ্য কি কোরে সহ্য করেন, বোলতে পারিনে। অনেক বিবি ইচ্ছে কোরে বাজার কোর্ত্তে আসেন। ফলের দোকানে বা তরকারীর দোকানে সক্ কোরে বাজার কোর্ত্তে পারা যায়; কিন্তু কসাইয়ের দোকানের মত অমন নিষ্ঠুর জায়গায় ভদ্রলোকদের কোমল-হৃদয়া মেয়েরা কি কোরে সাধকোরে আসেন আমি তাই ভাবি, সব্বলি, অভ্যেস। এক জন বিবি বলেন যে, কসাইয়ের দোকান দেখলে তাঁর বেশ তৃপ্তি হয়; তাঁর মনে হয় যে, দেশে আহারের অপ্রতুল নেই দেশের পেট ভরবার মত খাবার প্রচুর আছে, দুর্ভিক্ষের কোন সম্ভাবনা নেই। ইংরেজদের খাবার টেবিলে যে রকম আকারে মাংস এনে দেওয়া হয়, তাতেও কেমন অহৃদয়তা প্রকাশ পায়; কেটে কুটে মসলা দিয়ে মাংস তৈরি কোরে এনে দিলে এক রকম ভুলে যাওয়া যায় যে, একটা সত্যিকার জন্তু খেতে বোসেছি; কিন্তু মুখ পা বিশিষ্ট একটা আস্ত প্রাণীকে অবিকৃত আকারে টেবিলে এনে দিলে একটা জীবন্ত প্রাণীর মৃত দেহ খেতে বোসেছি বোলে গা কেমন কোরতে থাকে। কসাইয়ের দোকানের ওপর অনেক কথা বল্লুম, কেননা বিলেতে এসে অবধি আমার ঐটের ওপর অত্যন্ত ঘৃণা আছে, সেই ঝাল ঝাড়তে গিয়ে কথাটা অত্যন্ত বিস্তৃত হোয়ে পোড়ল। নাপিতের দোকানের জানলায় নানা প্রকার কাঠের মাথায় নানা প্রকার কোঁকড়ানো পরচুলো বসান রোয়েছে, দাড়ি গোঁফ ঝুলচে, শত শত মার্কা মারা শিশিতে টাক-নাশক, চুল উঠে-যাওয়া নিবারক শত শত প্রকার অব্যর্থ ওষুধ রোয়েছে; দীর্ঘকেশী মহিলারা এই দোকানে গেলে সেবকেরা (সেবিকা নয়) তাঁদের মাথা ধুয়ে দেবে, চুল বেঁধে দেবে, চুল কুঁকড়ে দেবে, এবং এই রকম নানা প্রকার বাহার কোরে দিতে পারে। এখেনে মদের দোকান গুলোই সব চেয়ে জমকালো দেখতে, সন্ধ্যের সময় সে গুলো আলোয় আলোয় আলাকীর্ণ হোয়ে যায়, বাড়িগুলো প্রায় প্রকাণ্ড হয়, ভিতরটা খুব বড় ও সাজানো, ও খোদ্দেরের ঝাঁক দোকানের বাইরে ও ভিতরে সর্ব্বদাই, বিশেষতঃ সন্ধ্যে বেলায় লেগে থাকে। দরজীর দোকানও মন্দ নয়। নানা ফেসানের কোট প্যান্টলুন কাচের জানলার ভিতর থেকে দেখা যাচ্চে, বড় বড় কাঠের মূর্ত্তিকে কাপড় পরিয়ে সাজিয়ে রাখা হোয়েছে; মেয়েদের কাপড় চোপড় এক দিকে সাজানো; সে সকল নানা প্রকার সাজ সজ্জা টুকরো টাকরা আমার মত এক জন বিদেশী Bachelor এর

কাছে ঘোরতর রহস্য, তার মধ্যে দন্তস্ফুট করা আমার সাধ্য নয়; এই খানে যে কত লুব্ধ নেত্র দিন রাত্রি তাকিয়ে আছে তার সংখ্যা নেই, সাজ সজ্জার দিকে সকল দেশের মেয়েদেরই সমান টান। এখানকার বিলাসিনীরা, যাদের নতুন ফেসানের দামী কাপড় কেন্‌বার টাকা নেই, তা'রা দোকানে এসে দামী কাপড়গুলো ভাল কোরে দেখে যায়, তার পরে বাড়িতে গিয়ে সস্তায় নিজের হাতে তৈরি করে। এখানকার দোকান বাজার গুলো এই রকম লণ্ডনের ছাঁচে তৈরি। আমাদের বাড়ির কাছে একটা খোলা পাহাড়ে জায়গা আছে; সেটা Common অর্থাৎ সরকারী জায়গা; চারিদিক খোলা, বড় গাছ খুব অল্প; ছোট ছোট গুল্মের ঝোপ ও ঘাসে পূর্ণ, চারিদিক সবুজ, বিচিত্র গাছ পালা নেই বোলে কেমন ধুধু কোরচে, কেমন বিধবার মত চেহারা উঁচু নীচু জমি, কাঁটাগাছের ঝোপ ঝাপ, জায়গাটা আমার বেশ লাগে; মাঝে মাঝে এই রকম কাঁটা খোঁচা এবড়ো খেবড়োর মধ্যে এক এক জায়গায় একরকম ছোট ছোট নীল ফুল ঘেঁসাঘেঁসি ফুটে সবুজের মধ্যে স্তূপাকার নীল রং ছড়িয়ে রেখেছে, কোথাও বা ঘাসের মধ্যে শাদা শাদা ডেজি ও হোলদে বাটার-কপ্ এক রাশ ফুটে রোয়েছে, চারদিকে এই রকম একটা অনুর্ব্বর সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাচ্চে। মাঝে মাঝে ঝোপ ঝাপের মধ্যে ও গাছের তলায় এক একটা বেঞ্চি রোয়েছে, এইটে সাধারণের বেড়াবার জায়গা। কি ভাগ্যি গাছ পালা বসিয়ে এটা বাগান কোরে তোলা হয় নি, "আশ্রম-বাসিনী" প্রকৃতিকে সাজিয়ে গুজিয়ে "শুদ্ধান্ত যোগ্য" কোরে তোলা হয় নি। এখানে মানুষ এত জায়গা অল্প ও এত বড়, যে মানুষের ঘেঁসাঘেঁসি নেই, লণ্ডনের বড় বড় বেড়াবার বাগানের মত যে দিকে চাই সেই দিকেই ছাতা হস্ত, টুপি-মস্তক চোখ-ধাঁধক ভিড়ের চারদিক্ থেকে আনা গোনা নেই; দূর দূর বেঞ্চির মধ্যে নিরালা যুগলমূর্ত্তি রোদ্দুরে এক ছাতার ছায়ায় বোসে আছে; কিংবা হাত ধরাধরি কোরে নিরিবিলি বেড়াচ্চে, পাছে পাশের লোক শুনতে পায় বোলে গলা নাবিয়ে কথা কইতে হোচ্চে না কিংবা প্রাণ খুলে হাসির ব্যাঘাত হোচ্চে না। যাঁরা বলেন, গাছ পালা লতা পাতা ঘাস জল কেবল ছাগল গরুদের কাছেই আমোদ জনক, আরক্ত কপোল, আকর্ণ চক্ষু, আকুঞ্চিত কুন্তলের দিকেই যাঁদের আন্তরিক টান, তাঁরাও যে এখেনে এসে নিতান্ত নিরাশ হবেন, তা' নয় তাই বলচি সবশুদ্ধ জড়িয়ে Common জায়গাটা খুব উপভোগ্য। এখনো গর্ম্মিকাল শেষ হয় নি। এখেনে গর্ম্মিকালে সকাল ও সন্ধ্যে অত্যন্ত সুন্দর। গর্ম্মির পূর্ণ যৌবনের সময় রাত দুটো তিনটের পরে আলো দেখা দিতে আরম্ভ করে, চারটের সময় রোদ্দুর ঝাঁ ঝাঁ কোর্ত্তে থাকে ও রাত্রি নটা দশটার আগে দিনের আলো নেভে না। আমি একদিন ৫ টার সময় উঠে Common এ বেড়াতে গিয়েছিলুম। উঁচু একটা পাহাড়ের ওপর একটা গাছের তলায় গিয়ে বোস্‌লুম, দূরে ছবির মত সহর দেখা যাচ্চে, একটি লোকও তখন ওঠে নি, একটুও কোয়াসা নেই, চারদিক অত্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্চে। ঘুমন্ত সহরটা খুব সুন্দর দেখাচ্চে। তার নির্জ্জন রাস্তাগুলি, গির্জ্জের উন্নত চূড়া, রৌদ্র-রঞ্জিত বাড়িগুলি নীল আকাশের পটে যেন একটি অতি স্পষ্ট ছবির মত আঁকা। খুব ভাল লাগচে বটে কিন্তু ভাল লাগার প্রধান

কারণ হোচ্চে, একটা সহরের ঘুমন্ত ভাব কল্পনা করা! একটা ঘুমন্ত গ্রামের চেয়ে একটা ঘুমন্ত সহরের গাম্ভীর্য্য আছে; পরিশ্রম নড়া চড়া, ও যুঝাযুঝি বোলে একটা প্রকাণ্ড দৈত্য অসহায় শিশুটির মত ঘুমিয়ে আছে, তার কপাল থেকে ভাবনার ভ্রুকুঞ্চন মিলিয়ে গেছে; মুখের একটা দৃঢ়ভাব চোলে গিয়েছে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলো শিথিল হোয়ে এলিয়ে পোড়েছে। দিনের বেলায় আফিসের মূর্ত্তিতে যাকে খারাপ দেখাচ্ছিল এই ঘুমন্ত অবস্থায় তার মুখেই একটু সৌন্দর্য্য ফুটে উঠেছে দেখে আমার ভাল লাগে, নইলে আসলে এই সহরটা কিছুই ভাল দেখতে নয়, এখানকার বাড়ি গুলো আমি দুচক্ষে দেখতে পারিনে। জানলা-কাটা-কাটা চারটে দেয়াল, একটা ঢালুছাত ও তার ওপরে ধোঁয়া বেরোবার কতকগুলো কুশ্রী নল হোচ্চে এখানকার বাড়ির বাহ্য আকার; এ আর কি ভাল দেখাবে বল! ক্রমে ক্রমে যতই বেলা হোতে লাগল শত শত chimney থেকে অমনি ধোঁয়া বেরোতে লাগল, ধোঁয়াতে ক্রমে সহরটা অস্পষ্ট হোয়ে এল, রাস্তায় ক্রমে মানুষ দেখা দিলে, গাড়ি ঘোড়া বেরোতে আরম্ভ হোল, হাতগাড়ি কিংবা ঘোড়ার গাড়িতে কোরে দোকানীরা মাংস রুটি তরকারী বাড়িতে বাড়িতে বিতরণ কোরে বেড়াতে আরম্ভ কোরলে, (এখানে দোকানীরা বাড়িতে বাড়িতে জিনিষ পত্র দিয়ে আসে,) ক্রমে Commonএ লোক জোমতে আরম্ভ হোল, আমি বাড়ি ফিরে এলেম।

আমার এখানে একটি সাধের বেড়াবার জায়গা আছে, আমি সেখানে রোজ বিকেলে বেড়াতে যাই। সেটা একটা পাড়াগাঁর রাস্তা, পাথর দিয়ে বাঁধানো কিংবা খুব সমতল করা নয়, গাড়ির চাকার দাগে এবড়ো খেবড়ো উঁচু নীচু পাহাড়ে রাস্তা, দুধারে blackberryও ঘাস লতা গুল্মের বেড়া, বড় বড় গাছে ছায়া কোরে আছে, রাস্তার আশে পাশে ঘাস উঠেছে, ও ঘাসের মধ্যে daisy প্রভৃতি বুনো ফুল ফুটে আছে, পাড়াগাঁয়ের ছোটলোকেরা ধূলো কাদামাখানো ময়লা কোট প্যান্টলুন ও ময়লা মুখ নিয়ে আনাগোনা কোরচে (বর্ণনার এ অংশটা বড় romantic হোল না), ছোট ছোট ছেলে মেয়ে গুলো তাদের লাল৹লাল ফুলোফুলো মুখে বাড়ির দরজার বাইরে কিংবা রাস্তায় খেলা কোরচে, এমন মোটা সোটা গোলগাল ছেলে কোন দেশে দেখিনি। তাদের গাল দুটোর অযথা প্রাদুর্ভাবে নাক ও চোখ নিতান্ত হীন অবস্থায় উপত্যকার অন্ধকারে পোড়ে আছে, হাত পা গুলো অত্যন্ত মোটা, গাল দুটো অত্যন্ত লাল, একটা জীবন্ত মাংসের ঢিবি আর কি। এক একটা বাড়ির কাছে ছোট ছোট পুকুরের মত আছে, সেখানে পোষা হাঁস গুলো ভাসচে; মাঠ গুলো যদিও পাহাড়ে উঁচু নীচু, কিন্তু চষা জমি—এমন সমতল ও পরিষ্কার যে, আমাদের দেশের কোন সমভূমিতে এমন দেখিনি, ঘাস গুলো অত্যন্ত সবুজ ও তাজা, এখানে রৌদ্র তেমন তীব্র নয় বোলে ঘাসের রং আমাদের দেশের মতন হেজে যায় না, তাই কত্তে এখানকার মাঠের দিকে চেয়ে থাকতে অত্যন্ত ভাল লাগে, অজস্র সবুজ রঙে চোখ যেন ডুবে যায়, উঁচু নীচু পাহাড়, যতদূর দেখা যাচ্চে ঘাসের সবুজ প্লাবনে প্লাবিত, মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ ও শাদা শাদা বাড়িগুলো দূর থেকে ছোট ছোট দেখাচ্ছে, দুই রকম শুষ্ক মাঠ ছাড়িয়ে অনেক দূরে এসে একটা প্রকাণ্ড পাইন (pine) কেন্দ্র গাছের অরণ্য পাওয়া যায়, ঘেঁসাঘেঁসি

pine গাছে অনেক দূর জুড়ে অন্ধকার কোরে আছে, সে খুব গম্ভীর দেখতে। বাড়ি গুলো আমাদের দেশের কুঁড়ে ঘরের মত গরিবানা ও গাছ পালা ঘাসি মাঠের মধ্যে থাকবার উপযুক্ত সুন্দর দেখতে না;—সোজা, খাড়া, পরিপাটি দোতলা বাড়ি, বাস কোর্ত্তে খুব আরামের বটে, কিন্তু গাছ পালার মধ্যে দেখতে ভাল লাগে না, তবে এক একটা বাড়ি আপাদ মস্তক লতা ও ফুলে ঢেকে গিয়ে খুব ভাল দেখতে হোয়েছে।

বর্ণিমা নিয়ে আর বেশী বকাবকি কোরব না। তুমি হয়ত এতক্ষণ মনে করচ যে, এব্যক্তি কোথা থেকে আকাশথেকে-পড়া গোটাকতক কথা পেড়ে তাই নিয়ে অনর্গল বোকে যেতে লাগল। কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করেনি, কেউ জানতে চায় নি, অথচ গায়ে পোড়ে ধোরে-বেঁধে কতকগুলো লম্বা চোড়া Information দিতে আরম্ভ কোরলে। যা হোক্—এখন আমি ছেড়ে দিলুম তুমি কেঁদে বাঁচ।

দ্বাদশ পত্র।

গর্ম্মিকাল। আজ অতি সুন্দর সূর্য্য উঠেছে। এখন দুপর দুটো বেজেছে। আমাদের দেশের শীতকালের দুপর বেলাকার বাতাসের মত বেশ একটি মিষ্টি বাতাস বইচে, রোদ্দুরে চার দিক ঝাঁ ঝাঁ কোর্চে। এমন ভাল লাগচে, আর এমন একটু কেমন উদাস ভাব মনে আস্চে যে কি বোল্‌ব। মনের Sentimental অবস্থায় যে যে লক্ষণ হোয়ে থাকে, তা, আমার সব হোয়েছে যথা,—নিশ্বাস পোড়চে, একটু চুপ চাপ হোয়ে আছি, মুখটা একটু গম্ভীর হোয়ে গেছে—ইত্যাদি। কিন্তু আজকের রোদ্দুরে, গরমে, চারদিকের গাছ পালায়, বসন্তের বাতাসে, পাখীর ডাকে, যদি আমার এ রকম ভাব হোয়ে থাকে তা, হোলে কি "লোকটা দেখ্‌চি নিতান্তই কবি হোয়ে গিয়েছে" বোলে আমার একটা বদনাম হবার সম্ভাবনা আছে? দেশে যদি আমার "কান্ত" থাক্‌ত, তা হোলে আজ হয়ত এই দুরন্ত বসন্তে একান্ত প্রাণান্ত, ও "অন্ত" অক্ষর-বিশিষ্ট আরো অসংখ্য ঘটনা ঘোট্‌ত। এদেশে "বসন্ত" বোলে বাস্তবিক একটা পদার্থ আছে। আমাদের দেশে বসন্ত নেই, কেবল বসন্ত বসন্ত কোরে বিরহীগুলো ভারি গোল-মাল করে; বলে, মলয় বাতাসে তা, দেয় গা দগ্ধ হয়, আরে হবে নাকেন? সে চৈত্রি মাসের মলয় বাতাসে সহজ মানুষের গাপুড়ে যায়; তা' দের ত তবু অনেক দিনকার একটা বাঁধা দস্তর আছে! সেই বিরহিগণ একবার এখানে আসুন্ দেখি—দেখি, কেমন কোরে চন্দন আর পঙ্ক মাখেন, আর নলিনী-পত্রের বাতাস খান।

আমরা এখন Devon-Shire-এর অন্তর্গত টর্কী (Torquay) বোলে এক নগরে আছি। এমন সুন্দর জায়গা আমি কখনো দেখিনি। সমুদ্রের ধারে; চার দিকে পাহাড়। অতি পরিষ্কার দিন। মেঘ নেই, কোয়াসা নেই অন্ধকার নেই; চারি দিক হাস্যময়, চারি দিকে সবুজ বর্ণ, চারিদিকে গাছপালা, চারি-দিকে পাখী ডাক্‌চে, ফুল ফুটচে। যখন Tunbridge Wells এ ছিলুম, তখন ভাবতুম, এখেনে যদি মদন থাকে; তবে সে ব্যক্তি তার ফুলশর তৈরি করবার জন্তে এত ফুল পায় কোথা? অনেক বন বাদাড়, ঝোপ ঝাপ, কাঁটা গাছ হাতড়ে দু চারটে বুনো ফুল নিয়েই কাজ চালাতে হয়। কিন্তু Torquayতে মদন যদি গ্যাট্‌লিং এর কামানের মত এমন একটা বাণ উদ্ভাবন কোরে থাকে, যার থেকে প্রতি মিনিটে হাজারটা কোরে তীর ছোড়া যায়

আর সেই বাণ দিন রাত যদি কাজে ব্যস্ত থাকে, তবু মদনের ফুলশরের তহবিল এখেনে দেউলে হবার কোন সম্ভাবনা নেই ;—এত ফুল। যেখানে সেখানে, পথে ঘাটে ফুল। ফুল মাড়িয়ে চোল্‌তে হয়। আমরা রোজ পাহাড়ে বেড়াতে যাই। গরু চোরচে ! ভেড়া চোরচে ! এক এক জায়গায় রাস্তা এত ঢালু যে, উঠতে নাবতে কষ্ট হয়। এক এক জায়গা খুব সঙ্কীর্ণ পথ, দুধারে গাছ উঠে আঁধার কোরে আছে, ওঠবার সুবিধের জন্যে জায়গায় জায়গায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা সিঁড়ির মতন আছে, পথের মধ্যেই লতা গুল্ম উঠেছে, ফুল ফুটে রোয়েছে চার দিকে এমন মধুর রোদ্দুর, (হাস্‌চ কি ! রোদ্দুর মধুর হোতে পারে কি না, এখেনে এসে একবার দেখে যাও দিকি !) এত অগণ্য ফুল, যে মনের মধ্যে বসন্ত জেগে ওঠে, মলয় বাতাস বইতে থাকে। এখানকার বাতাস বেশ গরম ! ভারতবর্ষ মনে পড়ে। এই টুকু গরমেই লণ্ডনের প্রাণীদের চেয়ে এখানকার জীব জন্তুদের কত নির্জ্জীব ভাব প্রত্যক্ষ করা যায়। ঘোড়া গুলো আস্তে আস্তে যাচ্চে, মানুষ গুলোর তেমন ভারি ব্যস্ত ভাব নেই, গড়িমসি কোরে চোলেছে। আমি আজ কাল এমন আলস্য চর্চ্চায় ব্যস্ত আছি যে তোমাদের একটু ভাল কোরে চিঠি লেখ্‌বার সময় পেয়ে উঠিনে। দিনের মধ্যে তিন শো হাই উঠ্‌চে এক একটা বই খুল্‌চি ও তার ওপরে আধ ঘণ্টা চোখ বুলিয়ে দু ঘণ্টা চোখ বোজবার বন্দোবস্ত কোরে নিচ্চি, দোয়াতে কলম ডুবিয়ে কালি তুলে যেন সমুদ্র-মন্থনের মত একটা ঘোরতর ব্যাপার বোলে মনে হোচ্চে, চোখের পাতা ফেল্‌তে ও নিশ্বাস প্রশ্বাস নিতে পরিশ্রম বোধ হোচ্চে ! তুমি এখেনে এলে বড় আরামেই থাক। এখানকার মত দৃশ্য, নদীর ধার, মাঠ, পড়বার বই, গল্প করবার সময়, গান করবার নির্জ্জনতা, পর-নিন্দা করবার অবসর আর যদি কোথাও আছে।

এখানকার সমুদ্রের ধার আমার বড় ভাল লাগে। যখন জোয়ার আসে, তখন সমুদ্রতীরে খুব প্রকাণ্ড পাথর গুলো জলে ডুবে যায়, তাদের মাথা বেরিয়ে থাকে। খুব ছোট ছোট দ্বীপের মত দেখায়। জলের ধারেই ছোট বড় কত পাহাড় উঠেছে। ঢেউ লেগে লেগে পাহাড়ের নীচে সব গুহা তৈরি হোয়ে গেছে ; যখন ভাঁটা পড়ে যায়, তখন আমরা এক এক দিন এই গুহার মধ্যে গিয়ে বোসে থাকি। বেশ নির্জ্জন। সুমুখে দিগন্ত-বিস্তৃত সমুদ্র। গুহার মধ্যে জায়গায় জায়গায় অতি পরিষ্কার একটু একটু জল জোমে রোয়েছে, ইতস্তত: সমুদ্র-উদ্ভিদ (Seaweeds) পোড়ে রোয়েছে, সমুদ্রের এক রকম স্বাস্থ্য-জনক গন্ধ পাওয়া যাচ্চে চার দিকে পাথর ছড়ানো আছে। আমরা সবাই মিলে এক এক দিন সেই পাথর গুলো ঠেলাঠেলি কোরে নড়াবার চেষ্টা করি, নানা শামুক ঝিনুক কুড়িয়ে নিয়ে আসি। এক একটা পাহাড় সমুদ্রের জলের ওপর খুব ঝুঁকে পোড়েছে, আমরা প্রাণপণ কোরে এক এক দিন সেই অতি দুর্গম পাহাড় গুলোর ওপর উঠে বোসে নীচে সমুদ্রের ঢেউয়ের উত্থান পতন দেখি। সুমুদ্রের একটা হু হু শব্দ উঠচে, জলে এক একটা ছোট ছোট নৌকা পাল তুলে চোলে যাচ্চে, চারদিকে রোদ্দুর হাসচে, মাথার ওপর এক একটা ছাতা খোলা রোয়েচে, পাথরের ওপর মাথা দিয়ে আমরা শুয়ে শুয়ে গল্প কোরচি। আলস্যে কাল কাটাবার এমন জায়গা আর পাবে ? তুমি যে Thomson-এর Castle of Indolence

পড়েছ—এখানটা তার একটা জীবন্ত ছবি। এক এক দিন পাহাড়ে যাই, আর পাথর-দিয়ে-ঘেরা ঝোপঝাপে ঢাকা একটি প্রচ্ছন্ন জায়গা দেখলে সেই খাদটিতে গিয়ে একটি বই নিয়ে পোড়তে বসি। কিন্তু অতি একমনে বই পড়বার জায়গা টর্কী নয়। মনের এমন শিথিল অলস অবস্থায় অত মনোযোগ দেওয়া পোষায় না। তাই যদি পারবে তবে একদিকে এমন সুনীল সমুদ্র কি কোরতে, এমন রোদ্দুর উঠেছে কেন, এমন অতি পরিষ্কার আকাশ কি জন্যে? দুছত্র বই পোড়বে, আর দুদণ্ড সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাক্‌বে, চেয়ে থেকে থেকে সাত শ ভাবনা ভাববে, অথচ ভাবচ কি না ভাবচ—তা' বিশেষ মনোযোগ না দিলে টের পাওয়া যাবে না, হঠাৎ বইয়ের দিকে চোখ পড়বামাত্র আবার পড়া আরম্ভ করবার জন্যে খুব দৃঢ় সংকল্প কোরবে, কিন্তু দ্বিতীয় ছত্রের একটা কমা পর্য্যন্ত যেই পৌঁচেছ অমান মনটা অলক্ষিত ভাবে তোমার হাত ফোস্‌কে এমন একটা অদ্ভুত জায়গায় গিয়ে হাজির হবে, যে জায়গার বিষয় ইতিপূর্ব্বে তুমি কখনো ভাবও নি। মনটা সমস্ত দিন এই রকম লুকোচুরী খেলে বেড়ায় একটা বইয়ের দেড় পাতা পোড়তে আড়াই দিন লাগে।

আমি বড় বাজে কথা বোকে যাচ্চি, এ কিন্তু টর্কীর বাতাসের গুণে। মনের ভিতর হাজারটা কথা চলাফেরা কোরে বেড়ায়, কিন্তু কথা গুলো হাত ধরাধরি কোরে আসে না, পরস্পরের মধ্যে চেনা শুনো নেই, খাপ-ছাড়া, দল ছাড়া কথা গুলো মনের বড়রাস্তা দিয়ে খুব ঘেঁসাঘেঁসি কোর চোলেছে, কিন্তু পথিকদের মত কেউ কারো কোন এলাকা রাখে না। এমন ভাঙ্গাচোরা কথার জোড়াতাড়া চিঠি পোড়তে কি তোমাদের ভাল লাগ্‌চে?

তুমি যদি এখানে আস্‌তে ভাই, তা'হোলে সমুদ্রের শব্দ শুনতে শুনতে, সমুদ্রের ঢেউ গুণতে গুণতে ফুলের রাশে মাথা রেখে, ফুলের রেণু গায়ে মেখে, ফুলের মালা গেঁথে গেঁথে, ফুলের মধু খেতে খেতে, সন্ধ্যে বেলায় সাগর-বেলায়, দুজনেতে গলায় গলায়, ঘাসের পরে গাছের তলায়, গল্প হোত, হাসি হোত, ঠাণ্ডায় যদি কাশী হোত বাড়ি যেতেম, চা খেতেম, হেসে খেলে দিন কাটাতেম। কেমন! লোভ হোচ্চে কি? আমি ভাই কবি নই, একটা ঘোরতর কাজের লোক। তবে যে, এ জায়গাটা খুব ভাল লাগচে বলচি, তার কারণ হোচ্চে বরাবর শুনে আস্‌চি ভাল জায়গা দেখলে লোকের ভাল লাগা উচিত। না ভাল লাগলে বড় লজ্জার বিষয়। তুমি হোচ্চ কবি মানুষ, ছড়া টড়া লিখে থাক্‌, তুমি এখানে এলে বাস্তবিক তোমার লাগত ভাল।

একটা গল্প বলি শোন। আমাদের এখেনে দিন কতক Niss H ও Miss N ছিলেন। Miss H একজন চিত্রকরী। তাঁর বড় সুন্দর ছবি আঁকা আছে। তিনি প্রায় প্রত্যহ brekfast খেয়েই সমস্ত সরঞ্জাম নিয়ে ছবি আঁকতে বেরোতেন। iss N ক্রমিক কবিতা ও নভেল পড়েন, ও তিনিও নাকি শুনেছি কাগজে খুব ভাল ভাল Sonuet মাঝে মাঝে লিখে পাঠান। মাঝে মাঝে আমরা তাঁদের সঙ্গে বেড়াতে যেতেম। কোনখানে একটা এবড়ো খেবড়ো রাস্তা, কোথাও বা একটা ভাঙ্গাচুরো বেড়া, কোথাও বা খানিকটা বনজঙ্গল ঝোপঝাপ, কখনো বা এক খণ্ড মেঘের বিশেষ একটা রং দেখে তাঁরা মুগ্ধ হোয়ে যেতেন, ও শত মুখে ব্যাখ্যা

কোরতেন। আমার ত ভ্যাবাচ্যাকা লেগে যেত, আমি তাদের বিশেষ সৌন্দর্য্য বড় একটা বুঝতে পারতেম না; ঝট কোরে একটা মত ব্যক্ত কোরতে বড় ভয় কোরত। দ্বিরুক্তি মাত্র না কোরে তাঁদের মতে সায় দিয়ে যেতেম। রোজ রোজই আমি অতি ভাল মানুষটির মত তাঁদের প্রতি কথায় বিনীত ভাবে সায় দিয়ে যেতেম। শেষ কালে আমার বড় লজ্জা বোধ হোতে লাগ্‌ল। একদিন বেড়াতে বেরোবার সময় প্রতিজ্ঞা কোরলেম, "আজ আমি নিজে হোতে প্রকৃতির একটা কিছু সৌন্দর্য্য বের কোরে আগে থাক্‌তে তাঁদের দেখাব, তাঁদের মুখ থেকে বাহবা নিতেই হবে।" এই পণ কোরে ত বেরোনো গেল। চারদিকে ফুল আছে, গাছ পালা আছে, পাহাড় পর্ব্বত আছে, কিন্তু সে সব ত পুরোনো, একটা নতুন কিছু বের কোরতে হবে। খানিক দূর গিয়ে দেখি, একজনদের বাড়ির সুমুখে তারা একটি বাগান তৈরি কোরেছে, গাছ গুলোর ডাল পালা কেটে নানাবিধ আকারে পরিণত করা হোয়েচে। কোনটা গোল, কোনটা বা অষ্ট কোণ, কোনটা মন্দিরের চূড়োর মত। দেখেত আমার তাক্ লেগে গেল। পাছে তাঁরা আগে থাক্‌তে কিছু বোলে ফেলেন এই ভয়ে তাঁরা মুখ খুলতে না খুলতে তাড়া তাড়ি আমি চেঁচিয়ে উঠেছি, "How beautiful !" Miss H-কে তার একটা ছবি নিতে অনুরোধ কোরলেম। Miss H ও Miss N ত একেবারে হেসে আকুল, তাঁরা বোলে উঠলেন, "Oh, Mr. T., surely you are Joking !" Mr. T. ত কাল বিলম্ব না কোরে তাড়াতাড়ি হেসে উঠলেন; যেন 'তুমি [illegible] ঠাট্টা কোরে নিচ্ছেন ও তার জন্যে মনে ভারি তৃপ্তি ও গর্ব্বের উদ্রেক হোয়েচে। ভাল কোরে সামলাতে পেরেচি কি না বোলতে পারিনে। কিন্তু বড় অপ্রস্তুত হোল।। "যাবৎ কিঞ্চিৎ" বাক্যব্যয় না কোরে ছিলেম, "তাবচ্চ" যথা কথঞ্চিৎরূপে শোভা পেয়েছিলেম, কিন্তু প্রথম যে দিনই মুখ খুললেম সেই দিনই এই রকম হাস্যভাজন হোতে হোল। আমি কিন্তু Miss H ও Miss N.-এর ভাব আজ পর্য্যন্ত বুঝতে পারলেম না; তাঁরা একটা যাচ্ছেতাই বন বাদাড় দেখলে হাঁ কোরে চেয়ে থাক্‌তেন, আর অমন সুন্দর নানা আকৃতিতে ছাঁটা গাছ পালা তাঁদের পছন্দসই হোল না। সে দিন একটা ভিক্ষুক একটা ছেঁড়া টুপি পোরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল, হঠাৎ তাঁদের খেয়ালে কেমন লেগে গেল, তৎক্ষণাৎ তাকে আট গণ্ডা পয়সা (এক শিলিং) দিয়ে দাঁড় করিয়ে ছবি নেওয়া হোল, আর রাস্তা দিয়ে, কত মহা মহা সুন্দরী চোলে যায়, যাদের এক দিন দেখলে তিরিশ দিন মলয় সমীরণ ও চাঁদের কিরণে দগ্ধ কোরতে থাকে তাদের সম্বন্ধে তাঁরা একটি কথাও কন না। কেন বল দেখি? যাহোক অপ্রস্তুত হোয়ে বাড়ি গিয়েই একটা বাঙ্গালা কবিতা লিখিতে বোসলেম। Miss N আমাকে জিজ্ঞাসা কোরলেন, আমি কি বাড়িতে চিঠি লিখচি? আমি বিনয় সহকারে হাসতে হাসতে বোল্লেম যে, "আমি মাঝে মাঝে কবিতা লিখতে চেষ্টা কোরে থাকি, তাই দুই এক ছত্র কবিতা লিখচি।" শুনে অবধি Miss N.-এর আমার প্রতি ভারি ভক্তি হোয়েছে। তিনি মনে কোরলেন, লোকটা খুব ভাবুক হবে। তিনি তাঁর লেখা দুই একটা Sonnet আমাকে শোনাতে আরম্ভ কোরলেন। কবিতা পোড়তে পোড়তে

যেখানটা ভাল লাগত আমাকে চেঁচিয়ে শোনাতেন। আমার উচ্ছ্বাস দেখে কে! আমার পূর্ব্বকৃত কোন ত্রুটি তাঁর আর মনে রৈল না। ক্রমে ক্রমে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ ভারি পরিপক্ক হোয়ে উঠতে লাগল—এতদূর পর্য্যন্ত যে, একটা ফুসফাস উঠল। ম—সন্দেহ কোরলেন যে Miss N.-এর নেত্র, রূপ ও বাক্য-বাণ-বর্ষণের মধ্যে পোড়ে আমার বুকটা দু তিন টুক্‌রো হোয়ে গেছে। আমি তাঁকে বোঝাতে গেলেম, "মাথা নেই তার মাথা ব্যথা। আমি একটা হৃদয়হীন শীতল-শোণিত জীব। আমার হৃদয় দগ্ধও হয় না, ভস্মও হয় না, হারায়ও না, ভাঙ্গেও না, চুরেও না। অমন একটা বিষম নট্‌খোটে পদার্থের আমি কোন সম্পর্কই রাখিনে।" তিনি ত বিশ্বাসই কোরলেন না। তিনি বোল্লেন, "Courtship চালাও।" আমার মত চুপচাপ লাজুক মানুষ কি Courtship চালাবার উপযুক্ত নাবিক? আমি কি মশায় তার দিকে হাঁ কোরে চেয়ে ফোঁস ফোঁস কোরে নিশ্বেস ফেলতে পারি! ডিনার টেবিলে আমার দিকে একটা লবণদানী সরিয়ে দিলে এমনি অতিমাত্র কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হোয়ে টল টল নেত্রে অত্যন্ত কোমল ভাবপূর্ণ হাস্য-রসে মুখ খানা টসটোসে কোরে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা কি আমার কর্ম্ম? বায়রণ থেকে বেচে বেচে এমন কবিতা পোড়ে শোনানো, যাতে আমার মনের ভাব ব্যক্ত হয়, পোড়তে পোড়তে বিশেষ একটা লাইনে থেমে অতিশয় করুণ-রসের দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলা, সে সব কি আমার পোষায়? আমি কি হাঁটু গেড়ে বোলতে পারি—"সুন্দরি, ত্বমসি মম ভূষণং, ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভবজলধি রত্নং?" তোমরা কবি মানুষ তোমরা হোলে পারতে। কিন্তু এ কথা নিয়ে আর বেশী ঠাট্টা উচিত নয়, বিষয়টি গুরুতর, একটা মনুষ্য-মনের সুখ-শান্তি নিয়ে কথা হোচ্চে। আমার আলাপী অনেক লোকের মুখেই এই রকম একটা গুজব শুনতে পাচ্চি যে, আমি ভালবাসায় পোড়েচি ও সেই জন্যে মনে মনে আমায় অত্যন্ত কষ্ট হোচ্চে, সংবাদটা অত্যন্ত ভাবনা-জনক এবং শুনে অবধি আমি ভারি চিন্তিত আছি। কি কোরব বল দিকি? বিবাহের প্রস্তাব কোরব কি? অবিশ্যি, লোকের মুখে এক কথা শুনেই আমি তাড়াতাড়ি কোরে বিয়ে কোরতে যাচ্চিনে, আমি প্রথমতঃ তদারক কোরব যে, আমি ভাল বাসায় পোড়েচি কি না, তার পরে যদি প্রমাণ হয় তা হোলে তোমাদের এবং অন্যান্য আত্মীয় বন্ধুবান্ধব-দের পরামর্শ নিয়ে যা' হয় স্থির করা যাবে। কি বল? তার পরে গল্পের শেষ দিকটা শোন। সেই বাঙ্গালা কবিতাটা লিখছিলেম। চতুর্থ ছত্রে লাইনের শেষ ডেজি (daisy) কথাটা পোড়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার আর কোন মিল না পেয়ে সেই খেনেই কবিতাটা বন্ধ থাকে। এ দিকে Miss N. রোজই আমাকে পীড়াপীড় করেন, বলেন তোমার কবিতাটা অনুবাদ কোরে শোনাও। আমি ত আজ কাল কোরে রোজই স্থগিত রাখি। পরশু দিন তাঁরা এখান থেকে লণ্ডনে চোলে গিয়েচেন, ও আমাকে বিশেষ কোরে অনুরোধ কোরে গিয়েচেন "কবিতাটা অনুবাদ সমেত লিখে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।" কি করা যায় বল ত। ভারি মুস্কিলেই পোড়েচি। আমি বলি কি, তুমি ভাই আমার হোয়ে যত শীঘ্র পার একটা কবিতা লিখে পাঠাও। বিষয়টা কি জান? টর্কী না দেখে টর্কীর বর্ণনা কি

অসম্ভব মনে কোরচ? কিচ্ছুই না। ভাল জায়গা মাত্রেরই যে রকম বর্ণনা করা হয়, সেই রকম কোরলেই চুকে যাবে। অর্থাৎ, ফুল ফুটেচে, পাখী ডাকচে, বাতাস বয়, জ্যোৎস্না ওঠে। যত প্রকার মিষ্টি জিনিষ আছে, কোন প্রকারে কবিতাটার মধ্যে গুঁজে দেওয়া। গাজ পালার বর্ণনা সমাপ্ত কোরে যদি কোন রকম কোরে খানিকটা অশ্রুজল, হৃদয় ভাঙ্গাভাঙ্গী, নিরাশা, প্রিয়তমা, নিবিড় কুন্তল, সুদীর্ঘ নয়ন বসাতে পারো, তা হোলেই জিনিষটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হবে। দেখ, Nightingale, Violet, Forget me-not, Hyacinth প্রভৃতি কথা গুলো বাঙ্গালা কবিতার মধ্যে ভাল শোনাবে না। কিন্তু তার জন্যে বেশী ভেবো না। তুমি ত, কোকিল, পাপিয়া, মালতী, মল্লিকা, চামেলি, চম্পা লিখে দিও, তার পরে অনুবাদ কোরে দেবার সময় আমি যা হয় একটা উপায় কোরে দেব।

সমস্ত গল্পটা কি নিতান্ত আজ্‌গুবি মনে হচ্চে? তবে আসল কথাটা খুলে বোল্‌চি। এট আমার কথা নয়। এক ব্যক্তি তাঁর নিজের ঘটনা চিঠিতে আমাকে লিখেছিলেন, তাঁর চিঠি থেকে আমি উদ্ধৃত কোরে দিলেম। ব্যক্তিটি কে শুনবে? না; কাজ নেই বাপু; তোমরা আবার দশ জনের কাছে গল্প কোরে বেড়াবে। তোমাদের পেটে যদি একটি কথা থাকে। ভারি কৌতূহল হোচ্চে? আচ্ছা তাঁর নামের প্রথম অক্ষর লিখ্‌চি,—শ। বুঝেছ?

• —

ত্রয়োদশ পত্র।

ভারি কাজে ব্যস্ত। হাই তোলবার সময় নেই। সময় যদি নিলেমে বিক্রি হয়, তা হোলে যত ব্যস্ত লোক সংসারে আছে, আমি সকলের চেয়ে চড়াদাম ডাকি;—এত কাজ। এমন অবস্থায় তোমাদের চিঠি লেখা সামান্য কথা? এত ব্যস্ত অবস্থায় লিখতে বোস্‌লে কি বিপদ ঘটে জান? মনের বাক্সের চাবি পকেট হাৎড়ে খুঁজে পাওয়া যায় না, যদি বা বাক্স খোলা গেল, তাড়াতাড়ি, ব্যস্ত সমস্ত ভাবে, হাঁস্‌ ফাঁস কোরতে কোরতে, হুটপাট কোরে, যেখানে যত ভাব গোছানো ছিল, খুঁজতে গিয়ে সমস্ত ওলট্‌ পালট্‌ বিপর্য্যস্ত কোরে ফেলি; এটা তুল্‌চি, ওটা তুল্‌চি, কিন্তু যেটা আবশ্যক সেইটে পাওয়া যায় না। লিখতে গেলে কথা পোড়ে যায়। তাড়াতাড়িতে কর্ত্তার আগে ক্রিয়াকে আসন দেওয়া হয়, ও কর্ত্তা জায়গা না পেয়ে হয়ত কর্ম্মের পিছনে হতবুদ্ধি হোয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আজকেরকার চিঠিতে এই রকম নানা ত্রুটি হবার সম্ভাবনা আছে, তবু কোন প্রকারে আজকের মধ্যে চিঠিটা লিখতেই হবে। মনে আছে, তিন চার মেল আগে তোমাকে লাইন দশেকের যে একটি চিঠি লিখেছিলেম, তাতে তোমাকে আশ্বাস দিয়েছিলেম যে "শীঘ্রই তোমাকে একখানি বড় চিঠি লিখ্‌ব।" "লিখ্‌ব" ভবিষ্যৎ কালবাচক ক্রিয়া। আজ থেকে প্রলয় কাল পর্য্যন্ত ভবিষ্যতের সীমা। তা' ছাড়া যেমন একটি বাঁধা নিয়ম আছে যে, পয়সা চৌষট্টিটা হোলেই টাকায় পরিণত হয়; তেমন কোন শাস্ত্রেই এমন একটা ধরাবাঁধা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নেই যাতে অবিসম্বাদে বলা যায় যে, "শীঘ্র" এত আনা হোলে "দেরী" টাকায় পরিণত হয়। অতএব

তোমাদের এমন একটা অনিশ্চিত অনির্দ্দিষ্ট আশায় আর বেশী দিন ফেলে রাখতে চাই নে।

Christmas ফুরোলো, আবার দেখ্‌তে দেখ্‌তে আর একটা উৎসব এসে পোড়ল। আজ নূতন বর্ষের প্রথম দিন। কিন্তু তার জন্যে কিছুই গোলমাল দেখতে পাচ্চিনে। নূতন বৎসর যে এখানে এমন নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে আস্‌বে তা জানতেম না। শুনেছি ফ্রান্সে লোকে নতুন বৎসরকে খুব সমাদরের সঙ্গে আবাহন করে। কাল পুরাতন বৎসরের শেষ রাত্রে আমাদের প্রতিবেশীরা বাড়ির জানলা খুলে রেখেছিল। তার কারণ এই হোতে পারে যে, পাছে পুরাণো বৎসর ঘরের মধ্যে আট্‌কা পোড়ে থাকে, তার চোলে যাবার ব্যাঘাত হয়, আর পাছে নতুন বৎসর এসে জান্‌লার কাছে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, তার ঘরে ঢুক্‌তে বিশেষ কষ্ট হয়। এখেনে শীতে জান্‌লা দরজা সমস্ত বন্ধ থাকে কিনা, সুতরাং দরজা খুলে না দিলে নতুন বৎসর ঘরে ঢুক্‌তে পান না, বাইরে দাঁড়িয়ে সর্দ্দিতে মারা যান। আর পুরাণো বৎসরের বাড়ি যাবার সময় হোয়েছে, তাকে যদি অমন দরজা বন্ধকোরে রাখ, তবে সে ব্যক্তি দরজায় মাথা ঠুকে ঠুকে বাড়িময় দাপা-দাপি কোরে বেড়াতে থাক্‌বে। কিন্তু দুর্দ্দশার কথা কি বোল্‌ব, আমরা হচ্চি ঘোরতর অসভ্য অজ্ঞান লোক,—আমাদের বাড়ির জানলা কাল রাত্রে খুলে রাখা হয় নি, আমাদের চিমনির (ধোঁয়ার নলের) ভিতর দিয়ে ছাড়া পুরাতন বৎসরের আর বেরোবার জায়গা ছিল না। আজ সকালে উঠে এই কথাটা আমাদের হঠাৎ মনে পোড়ল। মনে পোড়ে অবধি আমরা অনুতাপে সারা হচ্চি। মনে কর প্রতি বাড়িতে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দ, আমাদের বাড়িতে ১৮৭৯। মনে কর যদি আমরা আর বাড়ির জানলা দরজা একেবারে না খুলি তাহোলে আর পঁচাত্তর বৎসর বাঁচলেও ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে মরি। কিংবা যদি চিত্রগুপ্তের খাতায় ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর প্রভুর আলয়ে শুভ পদার্পণ নির্দ্দিষ্ট থাকে, তা'হোলে সে শুভদিন আমার ভাগ্যে একেবারেই আসে না, চিরকালই আমি ১৮৭৯-তে থাকি। মন্দ কি ? চিরকালই যদি ১৮৭৯ এ থাক্‌তে পারি সে ত বেশ হয়। কিন্তু রোস,' একটু ভেবে দেখি। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে এমনিই কি আমার সুখের বৎসর গিয়েছে ? আহা! এর আগে এমন কত বৎসর গিয়েছে, যাদের ধোরে রাখ্‌তে পার্‌লে চির জীবন ধোরে রাখ্‌তুম। যা' হোয়ে গেছে, তাতো হোয়ে গেছে। এখন, আমার কুষ্টিতে লেখা আছে, যে,১৮৮১ খৃষ্টাব্দে আমার "ধন রত্নানি" একটি ভার্য্যা ও অনেক মিত্র লাভ হবে ; মনে কোরচি, ১৮৮২ কে আর ঘরে ঢুক্‌তে দেব না। যা' হোক্‌, নতুন বৎসরকে অনেক ক্ষণ ঘরের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা হোয়েছিল, আস্‌বামাত্রেই তাঁকে আবাহন কোর্ত্তে পারিনি, তার জন্যে আমরা তাঁর কাছে শত শত ক্ষমা চাচ্চি। নতুন বৎসরের আগমনে আজকের দিনের মুখশ্রী বড় উজ্জ্বল হোয়ে ওঠেনি। আজ ভারি মেঘ ও অন্ধকার কোরে আছে। নতুন বৎসরের উপক্রমণিকা যদি এই রকম অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়, তবে এর উপসংহার না জানি কি রকম হবে। টর্কী থেকে বহুদিন হোল আমরা আবার লণ্ডনে এয়েছি। টর্কীতে বসন্তের সঙ্গে প্রকৃতির ফুলশয্যা দেখেছিলেম। সেই উৎসব থেকে লণ্ডনের এই ব্যস্ত ভাবের মধ্যে এসে পোড়ে বড় ভাল লাগ্‌বে না। এখন আমি Mr K. র পরিবারের মধ্যে বাস করি। Mr K,. Mrs, K,. তাঁদের চার মেয়ে, দুই

ছেলে, তিন দাসী, আমি ও Toby বোলে এক কুকুর হোচ্চে এই বাড়ির জন সংখ্যা। Mr K. হোচ্চেন এক জন ডাক্তার। তাঁর মাথার চুল ও দাড়ি প্রায় সমস্ত পেকে গিয়েচে। বেশ বলিষ্ঠ ও সুশ্রী দেখ্‌তে। যেমন অমায়িক স্বভাব তেমনি অমায়িক মুখশ্রী। তাঁর পরিবারের সকলেই বড় ভাল লোক। আমার সঙ্গে অল্প দিনের আলাপেই বেশ বন্ধুত্ব হোয়েছে। Mrs K. আমাকে আন্তরিক যত্ন করেন। শীতের সময় আমি বিশেষ গরম কাপড় না পোরলে তাঁর কাছে ভর্ৎসনা খাই। খাব্যর সময় যদি তাঁর মনে হয়, আমি কম কোরে খেয়েছি, তা হোলে যতক্ষণ না তাঁর মনের মত খাই, ততক্ষণ পীড়াপীড়ি করেন। বিলেতে লোকে কাশীকে বড় ভয় করে; যদি দৈবাৎ আমি দিনের মধ্যে দুবার কেশেছি তা' হোলেই, তিনি জোর কোরে আমার স্নান বন্ধ করান, আমাকে দশরকম ওষুধ গেলান, শুতে যাবার আগে আমার পায়ে খানিকটা গরম জল ঢালবার বন্দোবস্ত করেন, তবে ছাড়েন। বাড়ির মধ্যে সকলের আগে বড় Miss K. ওঠেন। তিনি নীচে এসে ব্রেক্‌ফাষ্ট তৈরি হোয়েছে কি না তদারক করেন; অগ্নিকুণ্ডে দু চার হাতা কয়লা দিয়ে ঘরটি বেশ উজ্জ্বল কোরে রাখেন। খানিকক্ষণ বাদে সিঁড়িতে একটা দুদ্দাড় পায়ের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। বুড়ো K. শীতে হিহি কোর্ত্তে কোর্ত্তে খাবার ঘরে গিয়ে উপস্থিত। তাড়াতাড়ি আগুনে হাত, পা, পিট, বুক তাতিয়ে খবরের কাগজ হাতে খাবার টেবিলে এসে বোসলেন। তাঁর বড় মেয়েকে চুম্বন কোরলেন, আমার সঙ্গে সুপ্রভাত অভিবাদন হোল। লোকটা ভারি প্রফুল্ল। আমার সঙ্গে খানিকটা হাসি তামাসা হোল, খবরের কাগজ থেকে এটা ওটা পোড়ে শোনাতে লাগ্‌লেন। তাঁর এক পেয়ালা কফি শেষ হোয়ে গেছে, এমন সময়ে তাঁর আর দুটি মেয়ে এসে তাঁকে চুম্বন কোরলেন। তাঁদের সঙ্গে তাঁর বন্দোবস্ত ছিল যে, তাঁরা যে দিন mr K.-র আগে উঠ্‌বেন, সে দিন mr K. তাঁদের পাঁচ সিকে দেবেন, আর যে দিন Mr K, তাঁদের আগে উঠবেন, সে দিন Mr K,-কে তাঁদের চার আনা দিতে হবে। যদিও এত অল্প দিতে হোত, তবু Mr K,-র তাঁদের কাছে প্রায় তিন পাউণ্ড পাওনা হোয়েছে। রোজ সকালে Mr K, তাঁর পাওনার জন্যে দাবী করেন। কিন্তু তাঁর দেনদাররা হেসেই উড়িয়ে দেন। Mr K, বলেন "এ ভারি অন্যায়!" তিনি আমাকে মাঝে মাঝে মধ্যস্থ মেনে বলেন "আচ্ছা, Mr T. তুমিই বল, এরকম debt of honour ফাঁকি দেওয়া কি ভদ্রতা!" যাহোক্ রোজ রোজই Mr K,-র পাওনা বাড়চে। তার পরে Mrs K, এলেন। আমাদের ব্রেক্‌ফাষ্ট প্রায় সাড়ে নটার মধ্যে শেষ হয়। Mr K,-র বড় ছেলে আমাদের আগেই খাওয়া সেরে কাজে গিয়েচেন, আর Mr K,-র ছোট ছেলেটি ও ছোট মেয়েটি অনেকক্ষণ হোল খাওয়া শেষ কোরেচে। এক জনের কথা বোলতে ভুলে গিয়েছি। Toby কুকুরটি অনেকক্ষণ হলো এসে আগুনের কাছে আরামে বোসে আছে। ছোট্ট কুকুরটি। তার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া রোঁয়া। রোঁয়াতে চোখ মুখ ঢাকা। বুড়ো হোয়েছে আর তার একটা চোখ কানা হোয়ে গেছে। আদর পেয়ে পেয়ে এই ব্যক্তির কতকগুলি নবাবী চাল হোয়েছে। Drawing room ছাড়া অন্য কোন ঘরে তার মন বসে না। কথা নেই বার্ত্তা নেই, ঘরের সকলের চেয়ে ভাল কেদারাটিতে আরাম করে জাঁকিয়ে

উঠে বসা হয়; ঘরে যদি একঘর লোক হয় তবুও বোসে আছে, এক ব্যক্তির হয় ত বসবার জায়গা হোচ্চে না, কিন্তু Tody র তাতে আসে যায় না, কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ দৃক্‌পাত না কোরে দিব্য আরামে চৌকিতে তিনি বোসেচেন, তার এক পাশে যদি আর কেউ এসে বসে, অমনি তিনি মহা বিরক্ত হোয়ে দর্পে সে চৌকি থেকে উঠে গিয়ে তৎক্ষণাৎ পার্শের কোচটির ওপরে গিয়ে বোসে পড়েন। সকাল বেলায় ব্রেকফাষ্টের সময় তাঁর তিনটি বিস্কুট বরাদ্দ আছে। সে বিস্কুটগুলি নিয়ে সে খাবার ঘরে বোসে থাকে, যতক্ষণ না আমি গিয়ে সেই বিস্কুট গুলি নিয়ে তার সঙ্গে খানিকটা খেলা করি একবার তার মুখ থেকে কেড়ে নিই, একবার গড়িয়ে দিই, ততক্ষণ তার খাওয়া হয় না। আমি খেলা না কোরলে সে কোন মতেই খেতে রাজি হয় না। আমাকে সে বড় ভাল বাসে। আগে আগে যখন আমার উঠতে দেরী হোত; সে তার বরাদ্দ বিস্কুট নিয়ে আমার শোবার ঘরের কাছে বোসে ঘেউ ঘেউ কোরত। কিন্তু গোল কোরলে আমি বিরক্ত হোতুম দেখে সে এখন আর ঘেউ ঘেউ করে না। আস্তে আস্তে পা দিয়ে দরজা ঠেলে, যতক্ষণ না আমি দরজা খুলে দিই—চুপ কোরে বাইরে বোসে থাকে। দরজা খুলে ঘর থেকে বেরলেই সে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে লেজ নেড়ে সুপ্রভাত সম্ভাষণ করে; তার পরে একবার বিস্কুটের দিকে চায়, একবার আমার মুখের দিকে চায়। মনোগত ভাবটি এই যে, "প্রাতঃকৃত্য সারা হোয়েছে? তা, বেশ হোয়েছে। এখন আমার বিস্কুটটি একবার গড়িয়ে দেও; আমার বড় খেলা করবার ইচ্ছে গিয়েছে।" এক এক সময় সন্ধ্যে বেলায় পেছন দিকের দুটো পা গুটিয়ে সুমুখের দুটো পায়ের ওপর ভর দিয়ে মহা চিন্তিত ভাবে বৃদ্ধ আগুনের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে। আধ ঘণ্টা যায়, এক ঘণ্টা যায়, Tobyর হুঁস নেই, তখন তাকে আদর কোর্ত্তে যাও, মাথায় হাত বুলোও, মহা অসন্তুষ্ট ভাবে গোঁ গোঁ করে, মাথা নাড়ে। "বিরক্ত কর কেন? ভাবতে ভাবতে আমার মাথা ঘুরে যাচ্চে এখন উনি আমার মাথায় হাত বুলোতে এলেন!" এ ব্যক্তি পূর্ব্ব জন্মে কি ছিল বল দিকি? অ্যারিষ্টটল ছিল না কি? যাহোক, সাড়ে নটার মধ্যে আমাদের ব্রেকফাষ্ট শেষ হয়. তার পরে Mrs K, হাতে দস্তানা পোরে দাসীদের নিয়ে চৌতলা থেকে একতলা পর্য্যন্ত, জিনিষ পত্র গোছানো, ঘর দ্বার পরিষ্কার করানো ও সমস্ত গৃহকার্য্য তদারক কোরে উঠানাবা করেন। একবার রান্না ঘরে যান, সেখেনে শাকওয়ালা, রুটিওয়ালা, মাংসওয়ালার বিল দেখেন, যাকে যার চুকিয়ে দেবার দেন। মাঝে মাঝে ওপরে এসে Mr K-র সঙ্গে গৃহকার্য্যের পরামর্শ হয়। রান্না ঘরের উপকরণ পরিষ্কার আছে কিনা ও যথাস্থানে আছে কিনা দেখেন, ভাল মাংস এনেছে কিনা, ওজনে কমবেশী হয়েছে কিনা সে সব দেখেন। রাঁধুনীর সঙ্গে মাঝে মাঝে রান্নাতে যোগ দেন। এই রকম ব্রেকফাষ্টের পর থেকে প্রায় বেলা একটা দেড়টা পর্য্যন্ত তাঁকে নানাবিধ কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে তাঁর বড় মেয়ে যোগ দেন। মেজ মেয়ে Miss J. দেখি, প্রত্যহ একটি ঝাড়ন নিয়ে Drawingroom সাফ করেন। দাসীরা ঘর ঝাঁট দিয়ে যায়, আর জিনিষ পত্রে যা' কিছু ধূল লাগে তা' তিনি নিজের হাতে ঝেড়ে ঝুড়ে সাফ করেন। এখানকার অনেক ভদ্র-পরিবারেই Drawing room-এর জিনিষ পত্র সাফ করবার ভার

বাড়ির মেয়েরাই নেন। দাসীদের হাতে পাছে জিনিষ পত্র ভেঙ্গে যায় বা ভালরূপে পরিষ্কার না হয়। তৃতীয় মেয়ে Miss A. বালিষের আচ্ছাদন, আসন, মোজা, কাপড় প্রভৃতি নানাবিধ সেলাইয়ে নিযুক্ত হন, চিঠি পত্র লেখেন, এক একদিন বাজনা ও গান অভ্যেস করেন। বাড়ির মধ্যে তিনিই গাইয়ে বাজিয়ে। আজ কাল স্কুল বন্ধ, ছোট ছেলেটি ও মেয়েটি ভারি খেলায় মগ্ন। দেড়টার সময় আমাদের Lunch খাওয়া আছে। Lunch সমাপন কোরে আবার যিনি যাঁর কাজে নিযুক্ত হোলেন। এই সময়ে Visitor দের আসবার সময়। হয়ত Mrs K. Mr K.-র এক জোড়া ছেঁড়া মোজা নিয়ে চসমা পোরে Drawing room এ বোসে সেলাই কোরচেন। Miss A, একটি পশমের জামা তাঁর ভাইপোর জন্যে তৈরি কোরে দিচ্চেন। Miss J. একটু অবসর পেয়ে আগুনের কাছে বোসে হয়ত Green's History of the English People পোড়তে নিযুক্ত হোয়েছেন। বড় Miss K' হয়ত তাঁর কোন আলাপীর বাড়িতে Visit কোরতে গিয়েচেন। তিনটের সময় হয়ত একজন Visitor এলেন। দাসী Drawing room এ এসে বোল্লে "Mr ও Mrs A।" বোলতে বোলতে ঘরের মধ্যে Mr ও Mrs A' এলেন। মোজা জামা রেখে বই মুড়ে Mrs K' ও তাঁর কন্যারা আগন্তুকদের অভ্যর্থনা কোরলেন। Weather ভাল কি মন্দ, সে বিষয়ে পরস্পরের মতামত ব্যক্ত কোরলেন। Mrs A' বোল্লেন, "Mr X'-এর ৪৫ বৎসর তিন মাস বয়সে হাম হয়। হাম হয়েছিল বোলে তিনি চার দিন আপিসে যেতে পারেন নি। কাল আফিসে গিয়েছিলেন। তাঁর হাম হোয়েছিল বোলে আফিসের লোকেরা তাঁকে নির্দ্দয় রূপে ঠাট্টা কোরতে আরম্ভ কোরেচে।" Mrs J বোল্লেন, "অমন ব্যামো হোলে কি দুর্দ্দশা। একে ত ব্যামোর কষ্ট; তার ওপর কারো মমতা পাবার যো নেই; শুধু তাই নয়, ব্যামো হোলে আবার তাই নিয়ে হাসি তামাসা ঠাট্টা খেয়ে বেড়াতে হয়।" এই কথা থেকে ক্রমে হাম রোগের বিষয় যত কথা উঠতে পারে উঠল। Miss A বোল্লেন, "Mr Z-এর তৃতীয় ছেলেটির হাম হোয়েছে।" তার থেকে কথা উঠল যে, Mr Z'র যে এক Cousin Miss Y' অষ্ট্রেলিয়ায় আছেন, তাঁর Captain W-র সঙ্গে বিবাহ হয়ে গেছে। এই রকম খানিক ক্ষণ কথোপকথন হোলে পর তাঁরা চোলে গেলেন। বিকেলে হয়ত আমরা সবাই মিলে একটু বেড়াতে গেলুম। বেড়িয়ে এসে সাড়ে ছটার সময় আমাদের ডিনার খাওয়া হয়। ডিনার খেয়ে ৭টার সময় আমরা সবাই মিলে Drawing room এ গিয়ে বসি। আগুন জোলচে। ঘরটি বেশ গরম হয়ে উঠেচে। আমরা আগুনের চার দিকে ঘিরে বোস্‌লুম। এক এক দিন আমাদের গান বাজনা হয়। আমি ইতি মধ্যে অনেক ইংরাজি গান শিখেছি। জাঁক কর্‌তে চাই না কিন্তু তবু সত্যি কথা বল্‌তে কি, এখানকার লোকে আমার গলার বেশ প্রশংসা করে। আমি গান করি। Miss A বাজান। Miss A আমাকে অনেকগুলি গান শিখিয়েছেন। কিন্তু প্রায় সন্ধ্যে বেলায় আমাদের একটু আধটু পড়াশুনা হয়। আমরা পালা কোরে ৩ দিনে ছ রকমের বই পড়ি। বই পোড়তে পোড়তে এক এক দিন প্রায় ১১॥ ।২ হোয়ে যায়। ছেলেরা এখন শুতে গেছে। ছেলেদের সঙ্গে আমার ভারি ভাব হোয়ে গেছে। তারা আমাকে Uncle Arthur

বলে। Ethel ছোট মেয়েটি আমাকে ভারি ভাল বাসে। তার ইচ্ছে যে, আমি কেবল একলা তারই Uncle Arthur হই। তার ভাই Tom যদি আমাকে Uncle Arthur বলে তবেই তার ভারি কষ্ট উপস্থিত হয়। একদিন Tom তার ছোট বোনকে রাগাবার জন্যে একটু বিশেষ জোর দিয়ে বোলেছিল, He is my Uncle Arthur" এইত Ethel আমার গলা জড়িয়ে ধোরে তার ছোট ঠোঁট দুটি ফুলিয়ে ফুলিয়ে কাঁদতে আরম্ভ কোরে দিলে। কত কোরে তাকে থামাই। Tom একটু অস্থির, কিন্তু ভারি ভাল মানুষ। খুব মোটাসোটা। মাথাটা খুব প্রকাণ্ড। মুখটা খুব ভারি ভারি। সে এক এক সময়ে আমাকে এমন এক একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করে যে কি বোলব। একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা কোরছিল, "আচ্ছা, Uncle Arthur, ইঁদুররা কি করে?" Uncle Arthur বোল্লেন "তারা রান্না ঘর থেকে চুরি কোরে খায়।" সে একটু ভেবে বোল্লে, "চুরি করে? আচ্ছা, চুরি করে কেন?" Uncle বোল্লেন, "তাদের খিদে পায় বোলে।" শুনে Tom এর বড় ভাল লাগল না। সে বরাবর শুনে আসচে যে, জিজ্ঞাসা না কোরে পরের জিনিষ নেওয়া অন্যায়। আর একটি কথা না বোলে সে চোলে গেল। যদি তার বোন কখনো কাঁদে, সে তাড়াতাড়ি এসে সান্ত্বনার স্বরে বলে, "Oh, poor Ethel, don't you cry! Poor Ethel!" [illegible] বলে যে সে [illegible]সি চেপে [illegible] el এর মনে [illegible]নে জ্ঞান [illegible] Lady। [illegible] কেমন [illegible] গিয়ে ঠেস [illegible]য়ে বসে। [illegible] এক সময়ে ভৎ-[illegible]না কোরে বলা হয়, "আমাকে বিরক্ত কোর না।" এক দিন Tom পোড়ে গিয়ে কাঁদছিল। আমি তাকে বল্লেম "ছি! কাঁদতে আছে।" অমনি Ethel আমার কাছে ছুটে এসে জাঁক কোরে বোল্লে Uncle Arthur, Uncle Arthur, আমি একবার ছেলে বেলায় রান্না ঘরে পোড়ে গিয়ে ছিলেম, কিন্তু কাঁদিনি।" উঃ! বয়স কত?

Mr N—ডাক্তারের আর এক ছেলে বাড়িতে থাকেন কিন্তু তাঁরে দেখতে পাই নে। তিনি সমস্ত দিন আফিশে থাকেন। কিন্তু আফিশ থেকে এলেও তাঁর বড় একটা দেখা পাওয়া যায় না। তার কারণ কি জান? তিনি Miss I-এর সঙ্গে engaged। তাঁদের দুজনে কোর্টশিপ চোলচে। রবিবার দুবেলা তাঁকে নিয়ে তাঁর চর্চ্চে যেতে হয়। যখন বিকেলে একটু অবসর পান, তাঁর বাড়িতে গিয়ে এক পেয়ালা চা খেয়ে আসেন। প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যে বেলা তাঁদের বাড়িতে তাঁর নেমন্তন্ন আছে। এই রকমে তাঁর সময় ভারি অল্প। উভয়ে পরস্পরকে নিয়ে এমন সুখী আছেন যে, অবসর কাল কাটাবার জন্যে অন্য কোন জীবের সঙ্গ তাঁদের আবশ্যক করে না। শুক্রবার সন্ধ্যে বেলায় যদি আকাশ ভেঙ্গে পড়ে তবু Mr N. পরিষ্কার কোরে চুলটি ফিরিয়ে, পমেটম মেখে, কোট brush কোরে ফিটফাট হোয়ে, ছাতা হাতা কোরে বাড়ি থেকে বেরোবেনই। একবার খুব শীত পোড়ে ছিল, আর তাঁর ভারি কাশি হোয়ে ছিল; মনে কোরলেম, আজ বুঝি বেচারীর আর যাওয়া হয় না। কি আশ্চর্য্য! ৭টা বাজতে না বাজতেই দেখি তিনি ফিট্‌ফাট্ হোয়ে নেবে এসেচেন। তাঁর বাপ, মা, বোনরা, সবাই বোল্লে "It is very foolish of you' N" কিন্তু বোল্লে হয় কি? "নদী

যবে চলে সিন্ধুপানে, কার সাধ্য রোধে তার গতি।" নবী ত বাপ, মা বোনের উপরোধের শিলাবাধা লঙ্ঘন কোরে, কাশি হাঁচি ও রুমালে সর্দ্দিঝাড়ার কল স্বর কোরতে কোরতে সিন্ধুর উদ্দেশে চোল্লো। (উপমা কেমন হোল বল দেখি।) তখন বৃষ্টি পোড়চে, বরফ পোড়চে, রাস্তায় কাদা জোমেচে, তার পর দিন সকালে সর্দ্দিতে বেচারী মাথা তুলতে পারে না। এমন যন্ত্রণা!

যা হোক, আমার এই K পরিবারের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হোয়ে গেছে। সে দিন Miss N আমাকে বোলেছিলেন, যে, প্রথম যখন তাঁরা শুনলেন যে, একজন ভারতবর্ষীয় ভদ্রলোক তাঁদের মধ্যে বাস কোরতে আসচে, তাঁদের ভারি ভয় হোয়েছিল। "ব্যক্তিটা কি রকম হবে, না জানি। তার সাক্ষাতে আবার কি রকম আদবকায়দা রেখে চোলতে হবে? আমাদের কথা সে ভাল কোরে বুঝতে পারবে কি না"—এই রকম নানাবিধ ভাবনায় তাঁদের ত রাতে ঘুম হয় না। যে দিন আমার আসবার কথা ছিল, সেই দিন Miss A ও Miss J. তাঁদের এক আত্মীয়ের বাড়িতে পালিয়ে গিয়েছিলেন। প্রায় এক হপ্তা বাড়িতে আসেন নি! তার পরে হয়ত যখন তাঁরা শুনলেন যে, একটা পোষমানা জীব তাঁদের বাড়িতে এসেচে, সে ব্যক্তির চেহারা দেখে বোধ হয় না যে, তার কখন্নো মানুষের মগজের লাড়ু মানুষের ঠ্যাং-এর শিক্‌কাবাব বা খোকা খুকী ভাজা খাওয়া অভ্যেস ছিল, মুখে ও সর্ব্বাঙ্গে উল্কি নেই, ঠোঁট বিঁধিয়ে অলঙ্কার পরে না, তখন তাঁরা বাড়িতে ফিরে এলেন। Miss J. বলেন যে প্রথম প্রথম এসে যদিও আমার সঙ্গে কথা বার্ত্তা কোয়েছিলেন তবুও দুদিন পর্য্যন্ত আমার মুখ দেখেন নি। হয়ত তাঁর ভয় হোয়েছিল যে, কি অপূর্ব্ব ছাঁচে ঢালা মুখই না জানি দেখ্‌বেন। তার পর যখন আমার মুখ দেখলেন—তখন? তখন কি? আমার ত বিশ্বাস, তখন তাঁর মাথা ঘুরে গিয়েছিল। তোমরা হয়ত বিশ্বাস কোরবে না যে, এই মুখ দেখে কোন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির মাথা ঘুরতে পারে। কিন্তু সেটা তোমাদের ঘোরতর কুসংস্কার। ওই অমুখের আয়নায় আমার মুখটা দেখতে পাচ্চি। কেন, কি মন্দ? এ মুখ দেখে তোমাদের কারো মাথা ঘোরে নি সত্যি, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের মাথা আছে?

যা হোক্, এই পরিবারে আমি বেশ সুখে আছি। সন্ধ্যে বেলা বেশ আমোদে কেটে যায়,—গান, বাজনা, বই পড়া। সকলের সঙ্গে ভারি বন্ধুত্ব হোয়েছে। আর Fthel তার Uncle Arthur কে মুহূর্ত্ত ছেড়ে থাকতে চায় না।

সম্পূর্ণ

